রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

৬২শ ভাগ, প্রথম খণ্ড, ১৩৬-

সূচীপত্র

বৈশাখ—আশ্বিন

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

— o —

বিষয় সূচী

বিষয় সূচী

—o—

বিবিধ প্রসঙ্গ

চিত্রসূচী

রঙীন চিত্র

একবর্ণ চিত্র

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬২শ ভাগ ১ম খণ্ড } বৈশাখ, ১৩৬৯ { ১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠন

"ডিমক্রেসী", অর্থাৎ সাধারণতন্ত্র বলিতে যাহা বুঝায় তাহার নানা দেশে, নানা জনে, বহু বিভিন্ন ও বিচিত্র অর্থ করিয়াছেন ও সংজ্ঞা দিয়াছেন। চলিত যাহা আছে তাহার মধ্যে গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর "রিপাব্লিক" পুস্তকে প্রদত্ত সংজ্ঞায় বলে,

"Democracy, which is a charming form of government, full of variety and disorder, and dispensing a sort of equality to equals and unequals alike." (Plato—*The Republic*. Book VIII.—Translated by Benjamin Jowett).

"ডিমক্রেসী বলিতে শাসনতন্ত্রের এক মনোহর রূপ বুঝায় যাহা দ্বারা সমশ্রেণী ও অসমশ্রেণীর সকলের মধ্যে সাম্য প্রদত্ত হয়।"

প্লেটোর পরে আর এক গ্রীক মনীষী, আরিষ্টট্‌ল্, ঐ সংজ্ঞাতেই আরও প্রসারিত করিয়া বলিয়াছেন :

"If liberty and equality, as is thought by some, are chiefly to be found in democracy, they will be best attained when all persons alike share in the government to the utmost." (Aristotle. *Politics*. Book IV—Translated by B. Jowett).

"যদি সাম্য ও স্বাধীনতা প্রধানতঃ ডিমক্রেসীর মধ্যেই পাওয়া যায়—যেরূপ অনেকেই মনে করেন—তবে ঐ দুই অধিকারপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা হইবে যখন সর্ব্বজনে সমানভাবে শাসনতন্ত্রে পূর্ণরূপে অংশ গ্রহণ করিবে।"

প্লেটো এবং আরিষ্টট্‌ল্ এই দুই প্রাচীন মনীষী খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতকে যাহা প্রচার করিয়াছেন, কালের স্রোতে সে সকল মতের পরিবর্ত্তন ও প্রতিরূপ নানাভাবে হইয়াছে। বিখ্যাত ব্রিটিশ লেখক ও বিদ্বান টমাস কার্লাইল খ্রীঃ ঊনবিংশ শতকে বলিয়া গিয়াছেন :

"Democracy is, by the nature it, a self-cancelling business; and gives in the long run a net result of Zero."—Thomas Carlyle. *Chartism*, Chap. 6.

"ডিমক্রেসী, তাহার নিজস্ব প্রকৃতির গুণে নিজেকে বাতিল করে; এবং দীর্ঘদিন পরে তাহার হিসাব-নিকাশের ফল দাঁড়ায় শূন্য।"

মহাজনের মতামত যাহাই হউক, এই ডিমক্রেসী বা সাধারণতন্ত্র এখন সারা জগতে স্বাধীনতা ও প্রগতির মূলমন্ত্র হিসাবে স্বীকৃতি পাইয়াছে এবং জগতের অধিকাংশ দেশে শাসনতন্ত্রের অধিকারিবর্গ মুখে এই নীতি সাধারণ-তন্ত্রবাদ প্রচার করেন এবং ঐ মূলমন্ত্রের গান গাহিয়া চলেন—কার্য্যতঃ অবশ্য দাঁড়ায় অন্য ব্যাপার, অধিকারি-বর্গের ইচ্ছা ও প্রকৃতি অনুযায়ী।

এই সাধারণতন্ত্র বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন সময়ে নানা বিচিত্র রূপ লইয়াছে। এবং প্রত্যেক দেশেই শাসনতন্ত্রের রকমফের ও রদবদল হইয়াছে ও হইতেছে দলগত স্বার্থের প্রভাবে ও বিকারে, যেমন সম্প্রতি হইতেছে ফ্রান্সে এবং কিছুদিন পূর্ব্বে হইয়াছে সোভিয়েট দেশে। ইহার কারণ সাধারণতন্ত্র বলিতে এখন যাহা চলে তাহার নাম দলতন্ত্রই হওয়া উচিত। কেননা যে সকল দেশে সাধারণ-তন্ত্র চলিতেছে তাহার প্রায় সর্ব্বত্রই শাসনতন্ত্রের পূর্ণ অধিকার ও ক্ষমতা সে দেশের রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির মধ্যে

প্রবলতম অথবা গরিষ্ঠতম যে বা যাহারা দাঁড়ায়, সে বা তাহারাই গ্রাস করে। আবার ঐ দলের মধ্যে যাহার প্রভাব বা প্রতাপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেই একটি উচ্চতম অধিকারীর দল গঠন করিয়া রাষ্ট্রের শাসন ও পরিচালন করে। এই পরিচালনা ও শাসন ঐ উচ্চতম অধিকারী মহাশয়গণের স্বভাব প্রকৃতি অনুযায়ী চলে এবং দেশের অবস্থাও সেই চালনা অনুসারে উর্দ্ধগামী বা অধোগামী হয়।

এই সাধারণতন্ত্রের যে আদর্শ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কন দিয়া গিয়াছেন, সেই আদর্শই নাকি আমাদের দেশে চলিতেছে। সেই আদর্শ তিনি উচ্চারণ করেন তাঁহার ১৯শে নভেম্বর ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত বিখ্যাত "গেটিসবর্গ" বক্তৃতায়। সেই বক্তৃতায় ছিল :

"—That this nation, under God, shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth."—

(Abraham Lincoln, Gettysburg address).

—"ঈশ্বরের ইচ্ছাধীনে এই জাতি যাহাতে নূতন জন্মলাভ করিবে এবং যাহাতে জনসাধারণ প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্র, জনসাধারণ চালিত এবং জনসাধারণের স্বার্থ অনুগামী হয়"—

আদর্শ খুবই মহান্ সন্দেহ নাই, এবং আমাদের বুদ্ধি-বিচার অনুযায়ী যে মহাশয়বর্গ ভারতবর্ষের কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে পরম আনন্দে আরও পাঁচ বৎসরের জন্য অধিষ্ঠিত হইলেন, তাঁহাদের মুখের বাণীতে ঐ আদর্শের মাহাত্ম্য আমরা অহোরাত্র শুনিয়া পুলকিত হইব সন্দেহ নাই। কিন্তু কথা এক এবং কার্য্য অন্য, এই যা বিপদ! এ যেন হিন্দীর প্রবাদবাক্য "রাজায়োঁ কি বাত হাথী কি দাঁত—খানেকা এক দিখানেকা অওর।" এবং ঐ প্রবাদের পূর্ণ সমর্থন আমরা পাই নূতন মন্ত্রিসভা গঠনে, যাহাতে দলগত স্বার্থ ও দলগত অধিকার ভিন্ন অন্য কিছুর বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয় না।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যবর্গের নাম ও বিবরণ আনন্দবাজার পত্রিকায় নিম্নলিখিত ভাবে দেওয়া হইয়াছে :

নয়াদিল্লী, ৯ই এপ্রিল—আজ প্রাতে রাষ্ট্রপতি ভবনের এক ঘোষণায় ভারত সরকারের নূতন মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু সহ এই মন্ত্রিসভায় ১৭ জন পূর্ণমন্ত্রী এবং ৬ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন। এক কথায় বলিতে গেলে এই মন্ত্রিসভা নূতন কিন্তু ইহার আদল পুরাতন।

আগামীকাল সকাল সাড়ে নয়টায় নূতন মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতি ভবনে শপথ গ্রহণ করিবেন। বিদায়ী মন্ত্রিসভার ১১ জন সদস্যকে নূতন মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা হইয়াছে. ৫ জন রাষ্ট্রমন্ত্রীর পদোন্নতি হইয়াছে এবং শ্রী সি সুব্রহ্মণ্যম নূতন মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। ৬ জন রাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে ডাঃ সুশীলা নায়ার নূতন নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রম ও নিয়োগ বিভাগে শীঘ্রই আরও একজন রাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত করা হইবে। বিদায়ী মন্ত্রিসভায় যাঁহারা রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ডঃ বি ভি কেশকার বিগত নির্ব্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন এবং শ্রী ডি পি কার-মারকার, ডক্টর পাঞ্জাব রাও দেশমুখ ও শ্রী বি এন দাতারকে নূতন মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা হয় নাই।

আজ মন্ত্রীদের নামের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কোনও সহকারী মন্ত্রীর নাম নাই। সহকারী মন্ত্রীদের নাম পরে ঘোষণা করা হইবে বলিয়া জানান হইয়াছে।

পূর্ণ মন্ত্রিগণ

শ্রীজওহরলাল নেহরু—প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

শ্রীমোরারজী দেশাই—অর্থমন্ত্রী।

শ্রীজগজীবন রাম—পরিবহন ও যোগাযোগরক্ষামন্ত্রী।

শ্রীগুলজারীলাল নন্দ—পরিকল্পনা, শ্রম ও নিয়োগমন্ত্রী।

শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী—স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

সর্দ্দার শরণসিং—রেলমন্ত্রী।

শ্রী কে সি রেড্ডী—বাণিজ্য এবং শিল্পমন্ত্রী।

শ্রী ভি কে কৃষ্ণমেনন—প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

শ্রী এস কে পাতিল—খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী।

হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম—সেচ ও বিদ্যুৎমন্ত্রী।

শ্রীঅশোককুমার সেন—আইনমন্ত্রী।

শ্রীকেশবদেব মালব্য—খনি এবং ইন্ধনমন্ত্রী।

শ্রী বি গোপাল রেড্ডী—প্রচার ও বেতারমন্ত্রী।

শ্রী সি সুব্রহ্মণ্যম্—ইস্পাত এবং ভারী শিল্পমন্ত্রী।

ডঃ কে এল শ্রীমালী—শিক্ষামন্ত্রী।

শ্রীহুমায়ুন কবির—বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং সাংস্কৃতিক বিভাগের মন্ত্রী।

শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ—সংসদীয় বিভাগের মন্ত্রী।

রাষ্ট্রমন্ত্রিগণ

শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না—পূর্ত্ত গৃহনির্ম্মাণ এবং সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী।

শ্রীমানুভাই শা—বাণিজ্য এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যমন্ত্রী।

শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো—বাণিজ্য এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ে শিল্পমন্ত্রী।

শ্রীরাজবাহাদুর—পরিবহন এবং যোগাযোগ রক্ষা মন্ত্রণালয়ে জাহাজীমন্ত্রী।

শ্রী এস কে দে - সমাজ উন্নয়ন, পঞ্চায়েতীরাজ এবং সমবায় বিভাগের মন্ত্রী।

ডাঃ সুশীলা নায়ার—স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য পরামর্শ দিতে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে নির্দ্দেশ দিবার পর আজ পঞ্চম দিন মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হইল।

ভারত প্রজাতন্ত্রের এই তৃতীয় মন্ত্রিসভার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হইল :

(১) মন্ত্রিসভায় আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটি খুবই উপেক্ষিত।

(২) মন্ত্রীদের মধ্যে মাদ্রাজের শ্রীসুব্রহ্মণ্যম নূতন। ইস্পাত এবং ভারী শিল্পগুলি (সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রের) তাঁহার হাতে দেওয়া হইয়াছে।

(৩) ১৯৫৭ সনের মন্ত্রীদের মধ্যে মাত্র একজনই এই মন্ত্রিসভায় নাই। তিনি ডঃ সুব্বারায়ান। তিনি মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল নিযুক্ত হইয়াছেন।

(৪) কয়েকটি দপ্তর এক হাত হইতে অপর হাতে গিয়াছে। শ্রীজগজীবন রামকে রেলের ভার দেওয়া হয় নাই। তাঁহাকে পরিবহন ও সংযোগরক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। এই দপ্তর ছিল ডঃ সুব্বারায়ানের হাতে। সর্দার শরণ সিং ছিলেন ইস্পাত, খনি ও জ্বালানি মন্ত্রী। তিনিই এবার রেলমন্ত্রী হইলেন। শ্রীগোপাল রেড্ডী তথ্য ও বেতারমন্ত্রী হইয়াছেন। এই দপ্তর পৃথক মন্ত্রণালয় হিসাবে এই প্রথম পূর্ণ মর্য্যাদা পাইল।

(৫) বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তর এবং ইস্পাত, খনি এবং জ্বালানী দপ্তর ভাঙ্গিয়া নূতন ভাবে গঠন করা হইয়াছে। ইহার ফলে দুইটি নূতন দপ্তর গঠিত হইয়াছে; ইস্পাত ও ভারী শিল্প একটি দপ্তর। যে দপ্তরের মাথায় আছেন শ্রীসুব্রহ্মণ্যম। অপর দপ্তরটি হইল খনি ও জ্বালানী দপ্তর। যে দপ্তরের ভার পাইয়াছেন শ্রী কে ডি মালব্য। বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তর হইতে ভারী শিল্প বাদ গিয়াছে। ইহা এখন নূতন দপ্তর।

বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তরে একটি বিভাগ খোলা হইয়াছে। ইহা হইল আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়। শ্রীমানুভাই শা যিনি পূর্ব্বে শিল্প দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন তিনি রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে এই নূতন দপ্তরের ভার লইবেন। বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তরই শিল্প-নীতি স্থির করিবেন।

(৬) একটি দপ্তর -পুনর্ব্বাসন, বিলুপ্ত হইয়াছে।

পুনর্ব্বাসন এখন পূর্ত্ত, গৃহনির্ম্মাণ ও সরবরাহ দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত হইবে। শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নাই পুনর্ব্বাসনের কাজ দেখিবেন।

(৭) পাঁচজন রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণমন্ত্রীর পদে উন্নীত হইয়াছেন। তাঁহারা হইলেন : সর্বশ্রী কে ডি মালব্য, বি গোপালন রেড্ডি, হুমায়ুন কবীর, ডঃ কে এল শ্রীমালি ও সত্যনারায়ণ সিংহ।

(৮) মন্ত্রিসভায় ছয়জন রাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন। তার মধ্যে মাত্র একজন—ডাঃ সুশীলা নায়ার নূতন।

১৯৫৭ সনে প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত তালিকায় রাষ্ট্রমন্ত্রীর সংখ্যা ছিল পনেরো। আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন পূর্ণমন্ত্রিত্ব লাভ করিলে ঐ সংখ্যা চৌদ্দয় গিয়া দাঁড়ায়। এই চৌদ্দজনের মধ্যে পাঁচ জন এইবার পূর্ণমন্ত্রী হিসাবে উন্নীত হইলেন। একজন (ডঃ কেশকর) নির্ব্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন।

এই তালিকায় প্রদত্ত "রাষ্ট্রমন্ত্রী" দলের মধ্যে শ্রীমনুভাই শা প্রথমে ঐ পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। সে সময় যে বিবৃতি তিনি দিয়াছিলেন তাহাতে বুঝা গিয়াছিল যে, তিনি দীর্ঘদিন নিজ প্রদেশের ও কেন্দ্রের মন্ত্রিসভায় কাজ করিয়াছেন, অথচ তাঁহাকে নিজ দপ্তরে পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয় নাই এবং ইহাতে তাঁহার ঐ কাজে বাধা রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। পরে অবশ্য তিনি ঐ পদই গ্রহণ করিয়াছেন। এ বিষয়ে কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এই তালিকায় যে সকল নাম আছে তাঁহাদের মধ্যে পুরাতন যাঁহারা তাঁহাদের যোগ্যতা, জনস্বার্থ চিন্তা বা কার্য্যক্ষম উদ্যোগের কি পরিচয় দেশের লোকে আগের পাঁচ বৎসরে পাইয়াছে, তবেই হয় গোলযোগ। অবশ্য এই বর্ত্তমান তালিকায় চতুর লোকের অভাব নাই, তবে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, সেই চাতুর্য্যের কি ফল পাইয়াছে জনসাধারণ। কয়েকজন আছেন যাঁহাদের সততা সন্দেহের অতীত কিন্তু তাঁহারা নিজ বিভাগ চালনে দক্ষ ও কার্য্যক্ষম বলিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। কর্ম্মভার যাঁহারা অতীতে লইয়াছেন এবং বর্ত্তমানেও গ্রহণ করিলেন তাঁহাদের মধ্যে দায়িত্বজ্ঞানের অভাব কয়েকজনের ক্ষেত্রে একাধিকবার দেখা গিয়াছে, অন্যদের মধ্যে তিন-চারিজন মাত্র দায়িত্ব-

জ্ঞানের সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়াছেন, অন্যেরা দিনগত পাপক্ষয়েই সন্তুষ্ট—এবং নিজ অধিকারের ফলভোগে ব্যস্ত ও উৎসাহিত।

এহেন মন্ত্রিত্বের মধ্যে কিসের আশা নিহিত থাকিতে পারে? দলগরিষ্ঠ যাঁহারা এবং যাহাদের প্রাদেশিক প্রতিনিধিত্বেও ওজন আছে তাহাদের আশা এই যে, ভারতরাষ্ট্র নামক কামধেনু তাহাদের সকল প্রকার আশা, ভরসা, পিপাসা ও লালসা পূরণ করিবেন। এবং ঐ কামধেনুর দুগ্ধের ক্ষীর, সর ইত্যাদির জন্যই এত মনের জ্বালা তাঁহাদের, যাঁহারা আসন দখল করিতে পারেন নাই, এবং এই উল্লাস সেই মহাশয়গণের যাঁহারা স্বনামধন্য "নেপোর" মতই দধিভাণ্ডে হস্তক্ষেপের অধিকার পাইয়াছেন।

জনসাধারণের আশা কোথায়? এই পঞ্চদশ বৎসর যে সকল জনসাধারণের নিদারুণ কৃচ্ছ্রসাধন ও অভাব-অনটনের দুর্ব্বহভার বহনের ফলে কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন রাজ্যস্থ অধিকারিবর্গ সদর্পে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তাঁহাদের এই মন্ত্রিসভা হইতে আশা কি? এই যে এতদিন যাবৎ, বহুদিকের অনেক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের পথ বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও এবং জীবনযাত্রার পথ দুর্ব্বহ এবং কণ্টকিত হইলেও আমরা একের পর এক পাঁচশালা পরিকল্পিত নন্দনকাননে আকাশকুসুমের স্বপ্ন দেখিয়া সকল কষ্টই ভুলিয়া গিয়াছি, সেই পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রচালনা যাঁহাদের হাতে আমরা পরোক্ষভাবে আবার দীর্ঘদিনের জন্য দিলাম, তাঁহাদের কাছে আমরা কি প্রত্যাশা করিতে পারি?

আমরা কাবাইলের ভাষায় বলিব—শূন্য!

কলিকাতা বন্দরের পাইলট ও কর্তৃপক্ষ

গত ২৮শে চৈত্র, শনিবার কলিকাতা বন্দরের পাইলটদের সহিত বন্দরের অধ্যক্ষ, শ্রী বি, বি, ঘোষ এক চূড়ান্ত আলোচনার বৈঠকে বসেন। এই আলোচনার ফলে উচ্চতম কর্তৃপক্ষের সহিত পাইলট এসোসিয়েশনের যে বিরোধ চলিতেছিল তাহার—অন্ততঃপক্ষে সাময়িকভাবে অবসান ঘটে। এই আলোচনার আদান-প্রদানে উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট হইয়াছেন শোনা যায়, এবং উহার পরিণতিতে পাইলট এসোসিয়েশন তাঁহাদের কাজকর্ম্মে পূর্ণরূপে যোগদান করেন। এখন কলিকাতা হইতে সমুদ্রপথের যাতায়াত সমানে চলিতেছে এবং তাহাতে বাধাবিঘ্ন বিশেষ নাই।

কলিকাতা হইতে বঙ্গোপসাগর বা সাগর হইতে কলিকাতা যাতায়াত সমুদ্রগামী জাহাজের পক্ষে অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। তাহার কারণ এই যে, বন্দর হইতে গঙ্গার মোহানা পর্য্যন্ত এই জলপথ বালিচরে ভর্ত্তি এবং গঙ্গাবক্ষ এই পলি পড়ার দরুণ প্রায় অধিকাংশ স্থলে অগভীর হইয়া গিয়াছে। ক্রমাগত সেই বালিমাটি ড্রেজার দিয়া ছেঁচিয়া কাটিয়া বা তোলা সত্ত্বেও বড় জাহাজ চলাচলের জলপথ প্রশস্ত ও গভীর রাখা যায় না। বড় বড় চরগুলি যথা: বলারি চড়া এড়াইয়া যাইবার যে সঙ্কীর্ণ পথ ঐ ভাবে কাটিয়া পরিষ্কার করা হয় তাহাও এই যথেচ্ছকারিণী নদীর মতিগতি অনুযায়ী আঁকাবাঁকা ও অস্থায়ী ভাবে খোলা থাকে। আজ যেখানে গভীর জল, কাল সেখানে চর গঙ্গার কৃপায়—এ ত আছেই, উপরন্তু রূপনারায়ণ ও সুবর্ণরেখা যে বালিমাটি ও কাঁকর গঙ্গায় ঢালিয়া দেন, প্রবল জোয়ারে, বিশেষে ষাঁড়াষাড়ির বানে তাহাও ঠেলিয়া আনে ঐ কষ্টার্জ্জিত যাত্রাপথেরই উপর। ফলে সমুদ্রগামী জাহাজের যাতায়াত নির্ভর করে অতি নিপুণ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি পথপ্রদর্শকের নির্দ্দেশের উপর। এই পথপ্রদর্শক অর্থাৎ পাইলট প্রতিমুহূর্ত্তে জাহাজের গতিমুখ নির্দ্দেশ করেন এবং তাঁহার সজাগ দৃষ্টি ও নির্ভুল আদেশ-নির্দ্দেশের উপরই জাহাজের নিরাপত্তা নির্ভর করে। পাইলটদিগকে এই দীর্ঘপথের ক্ষুদ্রতম অংশ সম্বন্ধে অবহিত থাকিতে হয় এবং তাঁহাদের এই নদী-জলপথের স্থিতি-পরিস্থিতি বিষয়ে খবরাখবর পুরামাত্রায় প্রতিদিন লইতে হয়।

পাইলটের দায়িত্ব অনেক এবং সেই কারণে এই কাজের শিক্ষা ও নৈপুণ্য তাঁহারাই অর্জ্জন করিতে পারেন যাঁহাদের এই কাজে নৈপুণ্য, অধ্যবসায় ও দায়িত্বজ্ঞান দীর্ঘদিনের শিক্ষানবিশীতে অর্জ্জিত হয়।

বলা বাহুল্য এই কাজ যাঁহারা করেন তাঁহাদের কার্য্যের দায়িত্ব ও নৈপুণ্য অনুযায়ী বেতন ও অন্য ব্যবস্থা হিসাবে একটা সন্তোষজনক মীমাংসা না হওয়াতেই এই বিরোধ উপস্থিত হয়। ১৯৪৮ সনে পোর্ট কমিশনারদিগের চেয়ারম্যান, শ্রী এন. এম. আইয়ারের সঙ্গে পাইলট এসোসিয়েশন ঐ সকল ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি চুক্তি করেন। ঐ চুক্তিতে যে সকল সর্ত্ত আছে সেইরূপ ব্যবস্থা তাঁহারা চাহেন এবং সেই চুক্তির সাক্ষ্যরূপে তাঁহারা সেই সময়ে নির্দ্ধারিত সর্ত্তগুলি যাহাতে লিপিবদ্ধ আছে সেই চুক্তিপত্র দাখিল করিতে চাহেন। কেন্দ্রীয় সরকার সে আবেদন অগ্রাহ্য করায় পাইলটেরা চাকরিতে ইস্তফা দিবার নোটিশ দাখিল করেন। সেই নোটিশের

সময়কাল উত্তীর্ণ হয় বিগত ২৩শে ও ২৪শে চৈত্রের মধ্যরাত্রে।

কেন্দ্রীয় সরকার বাহাদুর ইহার জবাবে এক অর্ডিনান্স জারী করিয়া এই পাইলটদিগকে ভয় দেখাইয়া কাজ করিতে বাধ্য করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ৪৬ জনের মধ্যে ৪০ জন বলেন যে, তাঁহারা কেন্দ্রীয় সরকারের ঐ হুকুম মানিবেন না, তাহাতে তাঁহাদের যদি কারাবরণ করিতে হয় তাহাতেও তাঁহারা প্রস্তুত, কেননা কেন্দ্রীয় সরকার ঐ চুক্তিসম্বলিত দলিলের অকৃত্রিম-সত্যতা স্বীকার না করায়, তাঁহাদের মত দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন কর্মচারীদের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। এই অপমানজনক পরিস্থিতিতে তাঁহারা কাজ করিতে অসমর্থ ও অনিচ্ছুক এই কথা তাঁহারা স্পষ্ট ভাবে বলেন।

পোর্ট কমিশনারদিগের নূতন চেয়ারম্যান এই অবস্থার একটি সন্তোষজনক মীমাংসা করিতে পারিয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু এখনও জানা যায় নাই যে, কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে শেষ নিষ্পত্তি কি করিবেন। সুতরাং এই মীমাংসা এখন সাময়িক বলিয়াই স্থির করা উচিত, যদিও ইহার ফলে সম্প্রতি কলিকাতা বন্দরে জাহাজ চলাচলের কাজ অব্যাহত রহিল। পাইলটগণ উক্ত শনিবার দ্বিপ্রহর আড়াইটা হইতে যথাপূর্ব্ব কাজে নামিয়াছেন ও কাজ চলিতেছে। এই সাময়িক মীমাংসা যেভাবে হইয়াছে তাহার বিবরণ আনন্দবাজার পত্রিকা নিম্নরূপে দিয়াছেন :

"পাইলটরা শনিবার রাত্রেই কাজে যোগদান করেন। তবে তাঁহারা এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করেন নাই। এ সম্পর্কে কলিকাতা বন্দরের জনৈক মুখপাত্র জানান, এই বন্দরের মেরিন সার্ভিসকে অত্যাবশ্যক ঘোষণা করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক অর্ডিন্যান্স জারীর ফলে পাইলটদের পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের কোন দরকার নাই। কারণ অর্ডিনান্সের বিধি-অনুযায়ী তাঁহাদের পদত্যাগপত্র অকেজো হইয়া পড়িয়াছে।

"১৯৪৮ সনের যে চুক্তিতে কলিকাতা বন্দরের মেরিন সার্ভিসের বিভিন্ন বিভাগের তৎকালীন বেতন হার বজায় রাখিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া পাইলটরা দাবি করিতেছেন, এইদিনের বৈঠকে পাইলট এসোসিয়েশন সেই দলিল চেয়ারম্যান শ্রী ঘোষের নিকট উপস্থিত করেন। প্রকাশ, চেয়ারম্যান শ্রী ঘোষ এই দলিল সম্পর্কে তাঁহার মতামত জানান নাই। তবে ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে তিনি এ সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত বন্দর-কমিশনারদের সভায় উপস্থিত করিবেন। মে মাসের প্রথম সপ্তাহ মধ্যেই পাইলটদের বিভিন্ন দাবি সম্পর্কে পোর্ট কমিশনারদের সিদ্ধান্ত তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠাইবেন। আরও প্রকাশ যে, চেয়ারম্যান শ্রী ঘোষ পাইলটদের দাবিগুলি সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিয়া দেখিবার আশ্বাস দেন।

"এই বৈঠকের পর পাইলট এসোসিয়েশনের পক্ষে এক বিবৃতিতে জানান হয় যে, একটি সম্মানজনক মীমাংসায় উপস্থিত হওয়ায় শনিবারই পাইলটরা কাজে যোগ দিতেছেন। কোন জাহাজ ছাড়িতে দেরি হইবে না। জাহাজ চলাচলের জাতীয় স্বার্থ অব্যাহত রাখা হইবে। ঐ বিবৃতিতে আরও জানান হইয়াছে যে, অতঃপর পাইলট সার্ভিস প্রত্যক্ষ ভাবে চেয়ারম্যান শ্রী বি. বি. ঘোষের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে থাকিবে। পরিশেষে পাইলট এসোসিয়েশন জাহাজী ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মহল ও সংবাদ-পত্রগুলিকে ধন্যবাদ জানাইয়াছেন।

"এইদিন সন্ধ্যায় সরকারীসূত্রে প্রচারিত এক সংবাদে জানান হয় যে, পাইলটদের চাকুরির সর্ত্তাদি সম্বন্ধে পরিচিত হইবার জন্য পোর্ট কমিশনার্সের চেয়ারম্যান সাময়িক ভাবে পাইলট সার্ভিসকে তাঁহার তত্ত্বাবধানে রাখিবেন। পাইলটদের বিভিন্ন দাবি এই মাসের মধ্যেই চেয়ারম্যান কমিশনারদের সভায় উপস্থিত করিবেন ও সরকারকেও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানাইবেন বলিয়া চেয়ারম্যান শ্রী বি. বি. ঘোষ পাইলট এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের জানান।"

এই বিরোধের শেষ মীমাংসা যাহাই হোক—আমরা অবশ্য আশা করি যে, তাহা সন্তোষজনক হইবে। আমাদের মনে একটি প্রশ্ন জাগিতেছে—কলিকাতা বন্দরকে ঘায়েল করার জন্য এইরূপ আগ্রহান্বিত কে বা কাহারা? কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বুদ্ধি-বিবেচনার প্রাচুর্য্য নাই একথা জানিতে গণৎকারের সাহায্য প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যদি কলিকাতা বন্দরের পাইলট এসোসিয়েশনের মত দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন কর্মচারী-সংস্থাকে সত্য সত্যই কেহ জাল দলিল প্রস্তুত ও দাখিল করার মত ঘৃণ্য কাজের জন্য সন্দেহভাজন বলিয়াছেন বা ইঙ্গিত দিয়াছেন, তবে সেই মহাশয় ব্যক্তি কে সে কথা জানিবার অধিকার আমাদের আছে। লোকসভায় আমাদের মুখপাত্র খুবই কম, কিন্তু যে দুই-একজন সক্রিয় তাঁহাদের উচিত এই বিষয়ে প্রশ্ন তোলা।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুরি

পশ্চিম বাংলার কোনও ছাত্র বা অধ্যাপক, উচ্চতর শিক্ষা বা পাশ্চাত্ত্যদেশের অত্যাধুনিক গবেষণাপদ্ধতি নিরীক্ষণ ও অধ্যয়ন করিতে বিদেশযাত্রার উদ্যোগ করিলে, তাঁহাদের প্রবলতম বাধা আসে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে বৈদেশিক মুদ্রাক্রয়ের অনুমতির ব্যাপারে। বিদেশ-ভ্রমণ করিতে হইলে বা বৈদেশিক সভা-সমিতির আহ্বানে বক্তৃতা করিতে বা সম্মেলনে যোগ দিতে হইলেও সেই বাধার সম্মুখীন হইতে হয়। যদি কোনক্রমে তাহার কোনও স্বল্পতম পরিমাণে ব্যবস্থা হইল তবে ফিরিয়া আসিলে বিদেশে বেড়াইবার বা কোনও সামান্য কিছু ক্রয় করিবার বৈদেশিক মুদ্রা আসিল কোথা হইতে সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং সরকারী বিভাগের সন্দেহ ও অভিযোগ অতিক্রম করিতে অনেক ক্ষেত্রে নাজেহাল হইতে হয়। এককথায়, বিদেশযাত্রার পথে বৈদেশিক মুদ্রাক্রয়ের অনুমতি লাভ এক বিভীষিকায় দাঁড় করান হইয়াছে। অবশ্য যাঁহারা স্বদেশী বা বিদেশী সরকারী তরফের আওতায় অর্থাৎ আমন্ত্রণ বা বৃত্তিলাভ করিয়া যান বা যাঁহাদের ক্ষেত্রে অনুমতি না দিলে কোনও প্রভাবশালী সংবাদপত্রের আক্রোশের ভয় আছে সেখানে অন্য কথা।

আমরা জানি যে, এক বাঙালী সজ্জন বিদেশী সরকারের আমন্ত্রণে বিদেশযাত্রা করিবার সময় কলিকাতায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বৈদেশিক মুদ্রাক্রয়ের অনুমতি প্রার্থনা করায়, তাঁহাকে অনেক ঘুরাইয়া শেষে মাত্র ২৫ ডলারের অনুমতি দেওয়া হয়। ঐ যাত্রায় অন্য প্রদেশের আরও তিনজন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ছিলেন এবং দিল্লীতে গিয়া বাঙালী ভদ্রলোক শুনিলেন যে, তাঁহাদের প্রত্যেককে ২৫০ ডলারের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। তিনি সে কথা তাঁহার এক উচ্চপদস্থ আত্মীয়কে জানাইলে, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সে ভদ্রলোক নয়া দিল্লীতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে খোঁজ করেন এবং সেখানে তাঁহাদের বলা হয় যে, ওটা ভুল হইয়াছে।

আমরা জানি ও বুঝি যে, এইরূপ কড়াকড়ির প্রয়োজন আছে এবং ইহা না করিলে সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বৈদেশিক মুদ্রাব্যবস্থা ব্যাহত হইতে পারে। কিন্তু যাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম তাহা হইল এই যে, একই কাজে বিদেশযাত্রায় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকের জন্য বা ভিন্ন অবস্থার লোকের জন্য ব্যবস্থার এইরূপ প্রভেদ হয় কেন?

এইরূপ কড়াকড়ি একদিকে, অথচ যে সকল সচিত্র সাময়িকপত্রে দিল্লী, মাদ্রাজ ইত্যাদি রামরাজত্বের দেশের "সোসাইটি" নামক অপরূপ সংস্থার সদস্য ও সদস্যাদিগের কার্য্যকলাপের সচিত্র বৃত্তান্ত দেওয়া হয়, সেগুলিতে প্রায়ই দেখা যায় যে, শ্রীমান অমুক সপরিবারে, স্বাস্থ্য বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে এরোপ্লেনযোগে বিদেশযাত্রা করিয়াছেন এবং এই যাত্রায় তিনি ইয়োরোপের পাঁচ ছয়টি দেশ, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিক্রমা করিয়া জাপানের পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। সঙ্গের চিত্রে দেখা যায় যে, শ্রীমান সুপুষ্টা স্ত্রী ও পাঁচ-সাত দশটি সুপুষ্ট সন্তান লইয়া সানন্দে বিরাজ করিতেছেন, বলাবাহুল্য এইরূপ ব্যবস্থা এখনও চলিতেছে, এবং গৌড়জনকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করিতেছে।

এইরূপ হয় কেন এবং কি পদ্ধতিতে উহা সম্ভাব্য, সে প্রশ্নের উত্তর আমরা অনুমান করিতে পারি এবং ২৫শে চৈত্রের যুগান্তরে প্রকাশিত এক সংবাদে সেই অনুমানের যথার্থতা সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা দৃঢ়তর হইয়াছে। সংবাদটি এই:

কলিকাতা, ৭ই এপ্রিল—ভুয়া আবেদনপত্রের সাহায্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া হইতে লক্ষ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা বাহির করিয়া লইবার এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা সম্পর্কে কলিকাতার গোয়েন্দা পুলিস তদন্ত সুরু করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিস অনুমান করিতেছে যে, এই গুরুতর ঘটনাটি ব্যাঙ্কের আভ্যন্তরীণ শৈথিল্যের ছিদ্রপথেই ঘটিতে পারিয়াছে।

অত্যন্ত মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ ও ব্যয় সম্পর্কে যখন ভারত সরকার বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন ও কড়াকড়ি করিতেছেন তখনই এইরূপ অবাঞ্ছনীয় ক্ষতির সংবাদ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল মহলকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে।

এই ঘটনা সম্পর্কে জানা গিয়াছে, একদল লোক বিদেশে শিক্ষা গ্রহণ করিতে যাইবে কিংবা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে যাইবে ইত্যাদি নানা অজুহাত দেখাইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কলিকাতা অফিস হইতে লক্ষ লক্ষ টাকার সম পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুর করাইয়া লইতে সমর্থ হয়। পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষের সন্দেহ হওয়ায় তাঁহারা ব্যাপারটি গোয়েন্দা পুলিসের হস্তে অর্পণ করেন। পুলিস সংশ্লিষ্ট আবেদনপত্রগুলি সম্পর্কে প্রাথমিক তদন্ত করিয়া দেখিয়াছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় আবেদনকারীরা ভুয়া নামে আবেদন করিয়াছে কিংবা যে ঠিকানা দিয়াছে তাহা ভুয়া। স্বভাবতঃই অনুমান করা হইতেছে

যে, এই সকল ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা চোরাবাজারে চলিয়া গিয়াছে।

এ বিষয়ে যখন তদন্ত চলিতেছে তখন তদন্তের ফল প্রকাশিত হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। কিন্তু সংবাদে বলা হইয়াছে যে পুলিস অনুমান করিতেছে যে, "ঘটনাটি ব্যাঙ্কের আভ্যন্তরীণ শৈথিল্যের ছিদ্রপথেই ঘটিতে পারিয়াছে" সে বিষয়ে আমাদের প্রশ্ন এইমাত্র যে, ঐরূপ ঘটনায় ব্যাঙ্কের তরফে কি শুধু "শৈথিল্য" মাত্র এই অনুমানের অবকাশ আছে? যাঁহাদের হাতে এই ভাবে গাঁজা খাইয়া অন্যে বমাল সমেত সরিয়াছে, তাঁহারা কি সত্য সত্যই ঐরূপ "মনভোলা" লোক? কি জানি!

পশ্চিম বাংলার বেকার সমস্যা

এই প্রদেশের বেকার সমস্যা দিনে দিনে আরও নিদারুণ ও বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহার দরুন কর্তৃপক্ষের, অর্থাৎ পশ্চিম বাংলা সরকারের অধিকারী-বর্গের মনে উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে এ কথা সরকারি পক্ষ হইতে আগেও বলা হইয়াছে এবং সম্প্রতি (মঙ্গলবার ২৮শে চৈত্র) ভারত বণিক সভার বার্ষিক অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় সে কথার পুনরুল্লেখ করেন। তবে সেই কথার আলোচনায় ঐ সমস্যা সমাধানের বিশেষ কোনও পথনির্দেশ কেহই করেন নাই। আনন্দবাজারের বিবৃতিতে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে যে:

পশ্চিমবঙ্গে ক্রমবর্দ্ধমান বেকার সমস্যার প্রকৃত সমাধানের জন্য ছোটখাট শিল্পের উন্নতির প্রতি গুরুত্ব দিতে হইবে এবং বেকাররা যাহাতে চাকুরির আশায় বসিয়া না থাকিয়া নিজেরাই ছোট শিল্প ও ব্যবসা সুরু করিতে উদ্যোগী হন, তাহারও চেষ্টা করিতে হইবে।

মঙ্গলবার কলিকাতার গ্র্যাণ্ড হোটেলে 'ভারত বণিক সভা'র ৬২তম সাধারণ বার্ষিক সভার উদ্বোধন-কালে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা-বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই মন্তব্য করেন।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বলেন যে, শিল্প এবং বিশেষ করিয়া ছোট-খাট শিল্পের উন্নতির জন্য এই রাজ্যে একটি 'শিল্প পর্ষৎ' স্থাপনের প্রয়োজন রহিয়াছে এবং রাজ্য সরকার ঐ ব্যাপারে বিবেচনা করিতেছেন। প্রস্তাবটি হয়ত শীঘ্রই রূপায়িত হইবে।

ডাঃ রায় আরও বলেন যে, স্বল্পবিত্তের সাধারণ লোক যাহাতে শিল্প অথবা ব্যবসা সুরু করার ব্যাপারে অসুবিধা ভোগ না করে সেজন্য ব্যাপক ভাবে সমবায় সমিতি স্থাপনের এক পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনায় রহিয়াছে।

প্রারম্ভে রায় বাহাদুর মদনগোপাল রুংতা সভাপতির ভাষণে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে সরকারী ও বেসরকারী পর্য্যায়ে বৃহৎ শিল্পের প্রসার চাকুরি অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত সমাজে বেকার সমস্যার সমাধানে উল্লেখযোগ্য ভাবে সমর্থ হয় নাই। তিনি ছোট এবং মাঝারি শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের উদ্দেশ্যে এখনি এক "শিল্প পর্ষৎ" স্থাপনের দাবীও জানান।

আমরা এই বিবৃতিতে শিক্ষিত বেকারদিগকে সমস্যা-মুক্ত করার কোনও সন্তোষজনক ব্যবস্থা দেখি না। ডাঃ রায়ের মনে উদ্বেগ রহিয়াছে নিশ্চিত এবং তিনি পশ্চিম বাংলায় সরকারী তরফে বৃহৎ শিল্প যোজনায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন প্রধানতঃ ঐ সমস্যার সমাধানের জন্য ইহাও ঠিক। সেই প্রচেষ্টা বিফল হইয়াছে এ কথা এখন সকলেই জানে, সুতরাং শ্রীমদনগোপাল রুংতার মন্তব্যও ঠিক। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, ছোট ও মাঝারি শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের জন্য, শ্রীরুংতার এক "শিল্প পর্ষৎ" স্থাপিত হইলেই এই দুরূহ সমস্যার কোনও ব্যাপক সমাধানের পথ খুলিবে না। আমরা ঐরূপ 'শিল্প পর্ষৎ' স্থাপনের বিরোধী নহি। কিন্তু ঐ পর্ষৎ কি উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইবে এবং কি ভাবে ও কাহার দ্বারা চালিত হইবে তাহা প্রথমেই সম্যক ভাবে নির্দ্ধারিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

এক, পর্ষৎ স্থাপিত হইলে কয়েকজন লোকের কাজের সংস্থান হইবে এবং সেই পর্য্যন্ত বেকার সমস্যার পূরণ হইবে—যদিও দেখা যায় যে, পেন্সনপ্রাপ্ত স্থবির বা অনুগ্রহ-প্রাপ্ত বান্ধবস্বজনের সন্তানেরই সংস্থান হয় বেশী—ইহা ঠিক, কিন্তু তাহার পর? যদি পর্ষৎ পথনির্দ্দেশ ঠিক মত করিতে সমর্থ হয় এবং সেই নির্দ্দেশ অনুযায়ী কাজ অগ্রসর করার জন্য যথাযথ শিক্ষা ও অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শের ব্যবস্থাও করে, এবং সরকার কিছু আর্থিক সাহায্য বা ঋণের ব্যবস্থাও করেন, তবেই কি সমস্যা পূরণ হইবে? আমাদের কর্তৃপক্ষ সেদিকে চিন্তা করিতেছেন না বলিয়াই এই সমস্যা ক্রমে এত জটিল ও গভীর হইয়া দাঁড়াইতেছে।

সরকারী মহাশয় ব্যক্তিগণ যদি একটু অবসর মত এই দিকে চিন্তা করিতেন তবে বুঝিতেন যে, জলাধার নির্ম্মাণ ও জলে পরিপূর্ণ করিয়া কাঠের ঘোড়াকে "পানি পিয়ো" বলিলেই সে জল খায় না। জল খায় অন্যে—

বিশেষে অবাঞ্ছিত জনে। আমাদের বেকার শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের অবস্থা নানা কঠিন ও বিরূপ অবস্থার পরিবেশে ক্রমেই "দারুভূত" হইতেছে। যাহারা ঐ ভাবে বিকারগ্রস্ত হইয়াছে বা হইতেছে তাহাদের রোগের প্রতিকার অত সহজ নয়। এবং ভয়ের কারণ এই যে, বেকারের মধ্যে শতকরা ৮০।৯০ জন রোগাক্রান্ত হইয়াছে।

ইংরেজীতে যাহাকে বলে "conditioning" অর্থাৎ কোনও কাজ, শিক্ষা বা পরিস্থিতি অনুরূপ দেহমন গঠিত করার জন্য অনুকূল স্বভাব ও অনুভূতির ক্রমবিকাশ—সেই ব্যবস্থা আরম্ভ হওয়া উচিত কিশোর বয়সে এবং যৌবনের মুখে, স্কুলে-কলেজে নিজ পরিবারের মধ্যে। সেইরূপে স্বভাব গঠিত হয় নাই যাহাদের তাহাদের কাজে নিযুক্ত করিতে হইলে প্রথমে প্রয়োজন রোগের প্রতিকার ব্যবস্থার। নহিলে সেই "কাঠের ঘোড়া পানি পিয়ো"রই পুনরাবৃত্তি হইবে।

কংগ্রেসের বিজয়লাভ

কংগ্রেসের সভ্যগণ ভারতের জনসাধারণের নির্ব্বাচনের ফলে আবার ভারতের শাসনকার্য্যের ভার পাঁচ বৎসরের জন্য পাইলেন। তাঁহারা অবশ্য এই নির্ব্বাচনকে যে ভাবে জগতের সম্মুখে সাজাইয়া দেখাইতে চাহেন, আসলে বিষয়টি ঠিক সেরূপ নহে। তাঁহারা জগৎকে বুঝাইতে চাহেন যে, তাঁহাদিগের ব্যবস্থাতে ১৯৪৭-১৯৬২ এই চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে ভারতের জনসাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য অসম্ভব রূপে বাঁড়িয়াছে এবং ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি দ্রুতগতিতে এক শিখর হইতে আরও উন্নততর শিখরে পৌঁছাইয়া যাইতেছে। এবং আমরা সেই সোসিয়ালিজমের পথে মহাবেগে চলিয়াছি—যে সোসিয়ালিজম্ আমাদিগকে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার শেষ সীমানায় লইয়া যাইবে ও যাহার প্রবল শক্তিতে দেশ হইতে দারিদ্র্য চিরতরে নির্ব্বাসিত হইয়া যাইবে। দারিদ্র্যজাত অপরাপর সকল শরীর ও মনের দৈন্যও আর থাকিবে না। আসলে কি হইতেছে ও হইবার সম্ভাবনা তাহা বিচার করা যাউক। কংগ্রেস রাজ্যশাসনপ্রণালীর মধ্যে যে জিনিষটি প্রধানতঃ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহা হইল অর্থের অপব্যয়। দিল্লীর রাষ্ট্রীয় বিলিব্যবস্থার মধ্যে শত শত বৃহৎ অট্টালিকা ও প্রাসাদের ছড়াছড়ি ইউরোপ আমেরিকার বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী দেশগুলিকে লজ্জা দিতে পারে এতই তাহাদের সংখ্যা ও শোভা। এই সকল বৃহৎ বৃহৎ ইমারতের মধ্যে অনেকগুলি ব্রিটিশ আমলের। কিন্তু পণ্ডিত নেহরুর অন্তরে দেশের দারুণ দারিদ্র্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলার কোন আবেগ আমরা দেখি না। তিনি কত শত কোটি মুদ্রা জাঁকজমক জলুষ ও রাজধানীর শোভা বৃদ্ধির জন্য ব্যয় করিয়াছেন তাহার হিসাব আমাদিগের জানা নাই। তাঁহার রাজত্বের আমলাদিগের মধ্যে বড় দরজার কোন আমলাই দেশের অর্থ ব্যয় করিয়া বিদেশ ভ্রমণ করিতে বোধ হয় আর বাকি নাই। কত শত লোক, কমিটি ও ডেলিগেশন যে রাজকীয় খরচাতে নানা দেশে ঘুরিয়া আসিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশের বিদেশ ভ্রমণ না করিলে দেশের কোন ক্ষতি হইত না। বড় বড় আপিস-দপ্তরগুলির বিরাট্ বিরাট প্রাসাদতুল্য গৃহগুলিও অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রয়োজনীয় এবং আড়ম্বর মাত্র। লক্ষ লক্ষ গ্রামের যে নিদারুণ দারিদ্র্য, তাহার তুলনায় এই সকল আড়ম্বর ও শোভাবৃদ্ধির চেষ্টা অত্যন্তই অশোভন। নানাবিধ পরিকল্পনা ও বহুবিধ ডিপার্টমেন্টের চাপে দেশবাসী প্রজাদিগের দেয় রাজস্ব ক্রমশঃ বাড়িয়া বাড়িয়া তাহাদিগের দারিদ্র্য আরও দুঃসহ করিয়া তুলিয়াছে। কংগ্রেস রাজত্বের জমকালো ভাব প্রজার অভাব ও কষ্টের উপরেই জগদ্দল পাথরের মত প্রতিষ্ঠিত। যে দেশের লোকের মধ্যে অধিকাংশই পুরাপেট খাইতেও পায় না সেই দেশের পক্ষে এত ঐশ্বর্য্যের আতিশয্যের অভিনয় বড়ই দৃষ্টিকটু। কিন্তু ত্যাগব্রত-পালনকারী, ভোগবিলাসে অবিশ্বাসী কংগ্রেস দলের সভ্যগণ রাজকার্য্য করিতে নামিয়া রাজা-বাদশাদিগের তুলনায় কিছুমাত্র কম যাইলেন না। তাঁহারা প্রত্যেক কর্ম্মে নিযুক্ত সভ্যকে ঘরবাড়ী ও খরচের টাকা দিয়া এবং অন্য বহুবিধ উপায়ে চাকুরি-ব্যবসা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া দলের লোকেদের ও তাঁহাদিগের সম্পর্কিতজনের সুবিধার সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে রাজকর্ম্মের সহিত সংযোগের এত সুখ-সুবিধা দেখা যায় না। বহু ঐশ্বর্য্যশালী জাতির শাসনকার্য্যে নিযুক্ত দুই একজন অতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ছাড়া অপর কাহাকেও বাসের জন্য প্রাসাদ ও গাড়ী প্রভৃতি দেওয়া হয় না। গরীবের বুকের উপর ভার চাপাইয়া এবং প্রায় কোন কাজ না করিয়া, এমন কি শুধু অপকর্ম্ম মাত্র করিয়া এতটা সুবিধা ভোগ কেবল ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তাদিগের কপালেই জুটিয়াছে। কংগ্রেস দলের সাধাসিধা জীবন-যাত্রা পদ্ধতি শুধু বক্তৃতাতেই শুনা যায়। যাহাদিগের অর্থ আছে এবং যাহাদিগের নাই; উভয়ের নিকট হইতে সমান ভাবে জোর-জবরদস্তি করিয়া রাজস্ব আদায় করিয়া

এই ভোগ-বিলাস ও জাঁকজমকের কার্য্য চালান হইয়া থাকে। সকল ব্যক্তি সমানভাবে উৎপীড়িত হইলে যদি সেই অবস্থার নাম সাম্য হয়, তাহা হইলে আমাদিগের দেশে সাম্য পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত বলা চলে।

আসল অবস্থা কিছুমাত্র সুবিধাজনক নহে। না-খাইয়া মরা ও উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য লাভ ইহার মধ্যে নানা প্রকার কম-বেশী ভোজন ব্যবস্থা সম্ভবপর হইতে পারে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক এখনও দুইবেলা পুরাপেট খাইতে পায় না। খাদ্যের পুষ্টিদান ক্ষমতার অনুপাতে হিসাব করিলে ভারতবাসী জনসাধারণ অদ্ধ বা তাহা হইতেও কম খাইয়া থাকে। বস্ত্র নাই বলিলেও চলে। বাসস্থানগুলি পশুর বাসের অযোগ্য। পানীয় জল অথবা আবর্জ্জনা দূর করিবার ব্যবস্থা অতি সামান্য। কাজ-কারবার ও তাহার মূলধন নাই। কর্জ্জ করিলে শতকরা ১০ হইতে ২০ টাকা মাসিক হারে টাকা ধার পাওয়া যায়। অর্থাৎ বার্ষিক হার শতকরা ১২০-২৪০ টাকা! তাহাও এক শত টাকা কর্জ্জ করিলে দুই শত লিখিতে হয়। কাজের সুবিধা ভারত সরকারের বাহিরের মাল আমদানী বন্ধ করার ফলে ক্রমশঃ বিলীয়মান। আমদানী পথ্য শুধু সরকারী ব্যবসায় চালাইয়া রাখিবার জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ফলে গ্রামে ও শহরে অদ্ধেকের অধিক লোক বেকার। যদি কেহ কোন কাজ পায় তাহা সম্বৎসরে এক শত দিবসও চলে না। ভারত সরকার সকলকে পূর্ণরূপে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে অপারগ এবং তাঁহাদিগের যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনুসারে তাঁহারা চলিতেছেন তাহার পরিণাম বেকার অবস্থা ক্রমশঃ আরও বাড়িয়া যাওয়া, এ কথা স্থির নিশ্চয়। কাজ চালাইবার মাল-মশলা যন্ত্রাদি পাওয়া যায় না। যাইলেও কালোবাজারের দরে পাওয়া যায়। মূলধন শুধু কয়েকঘর ধনপতির হস্তে অথবা সরকারের সাহায্যে বিদেশীর নিকট কর্জ্জ করিতে পারা যায়। সাধারণের আয়ত্তের মধ্যে নেই। এমতাবস্থায় যে দেশে বেকারের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। কিন্তু বড় বড় কারখানা গঠন করিয়া কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জিত হইতেছে। পাঁচ হাজারী ও ততোধিক হাজারী মাসিক বেতনভোগীর সংখ্যা কম নহে। কারখানাতে সাধারণ কর্ম্মী মাসিক দুই-তিন শত টাকা অনায়াসে রোজগার করিতেছে। কনট্রাক্টর ও মাল সরবরাহকারিগণ লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করিতেছে। এই সকল লোকের সংখ্যা অতি অল্প। ইহা হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, কংগ্রেস রাজত্বে সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হইয়া আর্থিক ক্ষেত্রে অসাম্য আরও প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। জাতীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি "ভিতরের" কারখানা-ভিত্তিক চক্র গড়িয়া উঠিয়াছে যাহার মধ্যে থাকিলে "কুলি"র বেতন মাসিক দুই-তিন শত টাকা হয় ও কর্ম্মচারিগণ ৫০০।৫০০০ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন। সরকারী কর্ম্মচারিগণও মোটামুটি এই ভিতরের চক্রেরই হইয়া দাঁড়াইতেছেন এবং তাঁহাদিগের সুখ-সুবিধা বেতন ও উপরিও অপর সকল লোকের তুলনায় বেশ উচ্চেই আছে। এই ভিতরের চক্রের মোট লোক-সংখ্যা ২ কোটির অধিক হইবে না। অর্থাৎ শতকরা ৯৫ জন ভারতবাসী "বাহিরের" দারিদ্র্য-নিপীড়িত অর্থ-নৈতিক পরিস্থিতিতে অবস্থিত ও তাঁহাদিগের ভবিষ্যৎ বিশেষরূপে নিরাশার মেঘে আচ্ছন্ন।

পৃথিবীর সর্ব্বজাতির মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করিতে পণ্ডিত নেহরু আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া থাকেন বলিয়া জনশ্রুতি। এই জগৎমৈত্রীর জন্য ভারতের গরীব প্রজার কষ্ট-অর্জ্জিত অর্থের কোটি কোটি মুদ্রা ভারত সরকার প্রতি বৎসর ব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু বিশ্বমৈত্রী আসিবার কোনও লক্ষণই দেখা যায় না; উপরন্তু ভারতের বুকের উপর পাকিস্তান ও চীন জোর করিয়া জমি দখল করিয়া জুলুম করিয়া থাকে ও ভারত সরকার সে জুলুম অক্ষমের মত হজম করিয়া থাকেন। সুতরাং ভারতের যত শত কোটি মুদ্রা বিশ্বমৈত্রীর জন্য গত চৌদ্দ বৎসরে ব্যয় করা হইয়াছে তাহা জলে গিয়াছে বলিলে ভুল হয় না। কংগ্রেসী আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রনীতি বিফল ও ক্ষতিকর হইয়াছে বলা চলে। কংগ্রেসের স্বদেশের রাষ্ট্রনীতির যে সাম্যমৈত্রী ও স্বাধীনতার বড়াই তাহাও মিথ্যা; কারণ পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে সাম্য নাই—অর্থে, সামাজিক ভাবে অথবা দেশের ও বিশ্বের কোনও দরবারে। মৈত্রীও নাই, কারণ ভারতের প্রদেশগুলি এখন পরস্পরের সহিত দ্বন্দ্বে নিযুক্ত ও কে কাহার জমি অথবা সম্পদ কাড়িয়া লইবে সকলে সেই চিন্তায় মগ্ন। বাংলার অদ্ধেকের অধিক জমি পাকিস্তানকে দিয়া কংগ্রেস স্বাধীনতা ক্রয় করিয়াছিলেন। পরে হিন্দুস্থানী প্রদেশগুলির খাতিরে বাংলাকে সিংভূম, মানভূম, সাঁওতাল পরগণা, পূর্ণিয়া প্রভৃতি ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই। ইহাতে মৈত্রী বৃদ্ধি পায় নাই। পেটে ভাত নাই, অঙ্গে কাপড় নাই, মাথার উপর ছাদ নাই, অসুখের ঔষধ নাই, বিদ্যা অর্জ্জনের সুযোগ ও ব্যবস্থা নাই, কাজ করিবার ও উপার্জ্জন করিবার পথে অনেক বিঘ্ন, সরকারী অর্থ প্রধানতঃ শুধু জাঁকজমক, অট্টালিকা

নির্ম্মাণ। বৃহৎ কারখানা ও ডিপার্টমেণ্ট গঠনে ব্যয় হয়, দেশবাসীর ভিটামাটি হয় গবর্ণমেণ্ট, নয় ধনপতিদের কবলে পড়িয়া সাধারণে উচ্ছন্নে যায়,—এইরূপ অবস্থায় কংগ্রেস দেশের খুব উন্নতি করিয়াছেন আমরা মানিতে পারি না। তাঁহারা বহু অর্থ ব্যয় করিয়াও দেশবাসীর বহু অসুবিধার সৃষ্টি করিয়া যাহা করিয়াছেন তাহা যথেষ্ট ত নয়ই বরং ক্ষতি ও অবনতির দিক ঘেঁষিয়াই আছে। তাহা হইলে জনসাধারণ কংগ্রেসকে পুনর্ব্বার রাজত্বের আসনে বসাইল কেন? কারণ এই যে, কংগ্রেসের তুলনায় কম্যুনিষ্ট পার্টির ইজ্জত আরো নিচে। কংগ্রেস দেশের কোন উপকার করেন নাই ও ভাগবাট করিয়া অনেকটা অংশ নিজেদের কবলে রাখিয়াছেন; কিন্তু কম্যুনিষ্ট চীনের হস্তে দেশকে তুলিয়াই দিবেন বলিয়াই বহু লোকের বিশ্বাস। এই ভয়ে এবং গতানুগতিকতার স্রোতে ভাসিয়া চলিবার অনায়াস অবসাদজাত প্রেরণায় অনেকেই কংগ্রেসকে নির্ব্বাচন করিয়াছেন। ইহাতে কোন গৌরব নাই। কংগ্রেস যদি সত্য গৌরব অর্জ্জন করিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ভোগ বিলাস আত্মপ্রতিষ্ঠা ও হামবড়াই ছাড়িয়া গরীবের অন্ন-বস্ত্র-গৃহ-চিকিৎসা-শিক্ষা ও উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। না করিলে তাঁহারা পরে অপমানের পথেই রাজত্ব ছাড়িয়া আবার মূষিকত্ব প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই। অ.

ব্যবসা ও ধর্ম্ম

ব্যবসা ও ধর্ম্ম উভয়ই কোন কিছু একটা স্থির নির্দ্দিষ্ট বিষয় নহে। ব্যবসা বলিতে ঠিক কি বুঝায় তাহা বলা শক্ত। পুরাকালে সওদাগরেরা দূরদূরান্তর হইতে দ্রব্য-সম্ভার আনিয়া স্বদেশে বিক্রয় করিতেন এবং স্বদেশজাত বস্তু বিদেশে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিতেন। ইহাকে সকলে ব্যবসা-বাণিজ্য বলিতেন। ব্যবসার মধ্যে আরও ছিল ক্ষুদ্র বৃহৎ দোকান সাজাইয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় করা। এবং বিক্রয়বস্তু উৎপাদনও ব্যবসাই ছিল; যথা তৈল নিষ্কাশন অথবা বস্ত্র বয়ন। ব্যবসার আকার ও ক্রেতা-দিগের ক্রয়ের উদ্দেশ্য বুঝিয়া ব্যবসা পাইকারী কিম্বা খুচরা বলিয়া পরিচিত হইত। ব্যবসাদার ও সওদাগর-দিগের মধ্যে লক্ষপতি ক্রোড়পতি ব্যক্তিও অনেক থাকিতেন এবং তাঁহারা দেশের দশের উপকার ও সেবার জন্য অনেক সময় অকাতরে অর্থদান করিতেন। বৌদ্ধ-যুগে শ্রেষ্ঠীদিগের মধ্যে ধর্ম্মের জন্য উন্মুক্ত হস্তে দানের অভ্যাস দেখা গিয়াছিল এবং ভারতে বর্ত্তমানে যতগুলি মন্দির প্রভৃতি আছে তাহার মধ্যেও অনেকগুলি প্রাচীন কালে ব্যবসাদারদিগের অর্থেই নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধর্ম্মের সম্বন্ধ পুরাতন ও ঘনিষ্ঠ। ইহার প্রধান কারণ ব্যবসাদারদিগের নিজ নিজ পাপক্ষয় করিয়া পুণ্য অর্জ্জনের চেষ্টা। কারণ ব্যবসা করিতে গেলে প্রাচীন কালেও অধর্ম্ম ও অন্যায় করিয়া লাভ করিবার চেষ্টা সকল যুগেই দেখা গিয়াছে। এই সকল অধর্ম্ম ও অন্যায়ের মধ্যে উচ্চ মূল্যে নিকৃষ্ট বস্তু বিক্রয় করা সর্ব্ব প্রধান। ওজনে কম দেওয়া, একপ্রকার বস্তু বলিয়া অন্যপ্রকার বস্তু সরবরাহ করা, মিথ্যার সাহায্যে ক্রেতাকে বঞ্চনা করা প্রভৃতি বহুকাল অবধিই হইয়া আসিতেছে। যে সকল ব্যবসায়ী কারবার খুলিয়া মাল তৈরী করিতেন ও বর্ত্তমানে করেন, তাঁহারা শুধু যে ক্রেতাকেই ঠকাইতেন তাহা নহে; নিজেদের নিযুক্ত কর্ম্মীদিগের বেতন প্রভৃতির হিসাবে ঠকান ও গরীবকে অতি অল্প বেতনে কাজ করিতে বাধ্য করাও সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে দৈনিক এক পেনি বেতনে স্ত্রীলোকদিগকে কয়লার খাদে কাজ করিতে বাধ্য করা হইত। আমাদের দেশে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে কয়লার খাদের কুলিদিগের বেতন ছিল দৈনিক পাঁচ আনা (স্ত্রীলোক তিন আনা)। পরে কিছু কিছু করিয়া বেতন বৃদ্ধি হইয়া বর্ত্তমানে যাহা হইয়াছে তাহাও কর্ম্মীদিগের পরিবার প্রতিপালনের পক্ষে অত্যন্ত অল্প। কাঁচা মাল, যথা পাট ইত্যাদি, অল্পমূল্যে ক্রয়ের ব্যবস্থাও ব্যবসাতে লাভ করিবার একটা বড় রাস্তা। চাষ করিয়া অর্দ্ধাহারে কর্ম্মী থাকে এবং ব্যবসাদার অতিরিক্ত লাভের পয়সায় ফুলিয়া উঠিয়া লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বর্ত্তমান যুগে ব্যবসাদারদিগের প্রতিষ্ঠা আরও বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার কারণ দুইটি। প্রথমতঃ বৃহৎ কারখানা ও সকল সীমানা অতিক্রম করিয়া ব্যবসার প্রসার ও বিস্তার হওয়ার ফলে দানবীয় আকারের ব্যবসা ক্রমশঃ পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইতেছে। আধুনিক যুগের ব্যবসাদারগণ সকল মানবতা ও ধর্ম্মের উপরে। তাঁহারা কখনও কখনও অঙ্গুলি সঞ্চালনে লক্ষ লক্ষ লোকের উপকার করিয়া দেন; কখনও বা আরও অধিক লোকের চরম দুর্গতির কারণ হইয়া থাকেন। লোকসেবার আদর্শ যেরূপ বর্ত্তমানে নূতন রূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র গ্রাহ্য ও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, সর্ব্বমানবকে শোষণ করিয়া বিরাট বিপুল ঐশ্বর্য্য ও উৎপাদন শক্তির অধিকারী হওয়াও তেমনি সর্ব্বজনসম্মত হইয়া

মানুষের কষ্টের স্বাধীনতা-হানির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কর্ম্মে শুধু যে ধনপতিগণ নিযুক্ত আছেন তাহা নহে; রাষ্ট্রীয় শক্তিও মানবের বুকের উপরে শাসনের পাথর চাপাইয়া তাহাকে অর্থনৈতিক দাসত্বে আবদ্ধ করিয়া রাজত্ব ও ধনবাদের এক অপূর্ব্ব সমন্বয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে পার্থক্য মাত্র এই যে, আমেরিকাতে ধনপতিগণ ব্যক্তিসঙ্ঘ এবং রাশিয়াতে তাঁহারা শুধু ধনপতি নহেন জনপতিও। বর্ত্তমানে রাষ্ট্রীয়শক্তি ও ধনবাদের মধ্যে যে সখ্য স্থাপিত হইয়াছে তাহার ফলে মানব সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা কোথাও ব্যক্তিগত ধনবাদকে মারিয়া গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, যেমন রাশিয়াতে; কোথাও বা ধনপতিদিগের সাহায্যে ও সহায়তায় এক ভাগ বাটোয়ারার ব্যবস্থা করিয়া যুগ্মভাবে কর্ম্মীসমাজের উপর এক নূতন প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই কারণে কোন কোন দেশে যথা, ভারতবর্ষে ধনপতি ও রাষ্ট্রপতিদিগের মধ্যে বন্ধুভাব প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া চলিয়াছে। ধনপতিগণ রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিদিগকে সমাজের চক্ষে আসীন হইতে সাহায্য করেন ও রাষ্ট্রপতিগণও প্রতিদান হিসাবে ধনপতিদিগকে ধন ও যশ আহরণে সাহায্য করেন। ধর্ম্ম যে এই পরিস্থিতিতে কোথায় তাহা বলা বড়ই কঠিন। অবশ্য ধর্ম্ম কি তাহাও কেহ জানে না। সুতরাং যদি অল্প বেতনে বহু লক্ষ লোকে কাজ করিয়া ও অল্প মূল্যে নিজ শ্রমজাত বস্তু বিক্রয় করিয়া সর্ব্বমানবরাষ্ট্রীয় অথবা ব্যক্তিগত ধনবাদকে উন্নতির উচ্চতম শিখরে উঠাইয়া দিয়া, তৎপরিবর্ত্তে কয়েকটি হাসপাতাল ও স্কুল পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠেন; তাহাতে আমরা কিছু আপত্তি জানাইলেও অধিক লোকে সে কথা শুনিবে না। আমাদের মানিতেই হইবে যে, যেমন রাষ্ট্রীয় ধনপতি-জনপতিদিগের সমাজের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ও অসুবিধার কারণ হইয়া রাজস্ব আদায় করিয়া ও জাতির নামে বিদেশী অর্থ কর্জ্জ করিয়া সকল অর্থ অপব্যয় করিবার অধিকার আছে; তেমনি ব্যক্তিগত ধনবাদের প্রবলতম পূজারিগণেরও পূর্ণ অধিকার আছে কর্ম্মী ও ক্রেতাকে ঠকাইবার ও নানাপ্রকার অন্যায় উপায়ে বিপুল অর্থ আহরণ করিবার। কারণ এই দুই জাতীয় মানবশত্রুদিগেরই প্রতিষ্ঠা ছলে-বলে-কৌশলে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ইঁহারা যখন মদগর্ব্বে মত্ত হইয়া সমাজের বুকের উপর পদ সঞ্চালন করিয়া নব মানবধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে থাকেন তখন কাহারও ক্ষীণ কণ্ঠের ক্রন্দনে সে গতি রুদ্ধ হইতে পারে না। বিশেষ করিয়া যখন লক্ষ লক্ষ লোকের চাকুরি ও কাজ-কারবার করিয়া বাঁচিয়া থাকা ইঁহাদিগের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে। আমরা তাই সকল অধর্ম্মের কারণ যাহা তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া উচ্চ কণ্ঠে প্রচার করিব কারণ না, করিলে অনাহার কেহ থামাইতে পারিবে না। মানুষকে নানানভাবে আহত করিয়া তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করাই আজকালকার ধর্ম্ম। ইহা যে বুঝে না সে অতি বড় মূর্খ। • অ

ডাক্তার না জল্লাদ?

হাসপাতালের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এ প্রত্যহ সংবাদপত্র খুলিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। অভিযোগ আছে কিন্তু প্রতিকার নাই। সরকারও এ বিষয়ে উদাসীন। আগে ছিল হাসপাতালের অব্যবস্থা, পরে দেখা গেল কর্ম্মচারিদের কাজে শৈথিল্য। নার্স ডাক্তারদের রুগীদের প্রতি দুর্ব্যবহার ইহাও ঐ সঙ্গে দেখা দিল। দেখিবার লোক না থাকিলে, এই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্বাভাবিক। ডাক্তাররা কোন কিছু বিচার না করিয়াই কাজ করিয়া বসেন, ইহাও কয়েকটি ঘটনা হইতে আজকাল লক্ষ্য করা যাইতেছে। অথচ আগে এরূপ ছিল না। বিশেষ করিয়া মেডিকেল কলেজের সুনাম চিরপ্রসিদ্ধ ছিল। ইহাতে স্বাধীন সরকারের অকর্ম্মণ্যতাই প্রকাশ পাইতেছে।

বর্ত্তমানে চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রভূত উন্নতিলাভ করিয়াছে ইহাই শুনিয়া আসিতেছি। বিশেষ করিয়া সার্জ্জারি-বিদ্যায় ডাক্তারের ছুরি স্বয়ং ভগবানকেও তাক্ লাগাইয়া দিয়াছে। এহেন ডাক্তারের হাতে পরম নির্ভরতার সহিতই মানুষ রুগীদের ছাড়িয়া দেয়। অন্যের হাতে বিপদের সম্ভাবনা আছে বুঝিয়াই লোকে ছুটিয়া আসে মেডিকেল কলেজে। কারণ জানে, হাসপাতালের ডাক্তাররা সকলেই অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয়রূপ সকল সরঞ্জামই সেখানে হাতের কাছে মিলিবে। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায়, হাতের কাছে জিনিস থাকিতেও ডাক্তার তাহা ব্যবহার করিতে ভুলিয়া গেলেন এবং অভিজ্ঞ ডাক্তার হইয়াও অনভিজ্ঞের মত কাজ করিয়া বসিলেন। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি:

চার-পাঁচ বছরের ছেলে। খেলা করিতে করিতে তাহার চোখে কয়লার গুঁড়া যাইয়া পড়ে। বালক-বুদ্ধিতে চোখ রগড়াইবার ফলে উহা অস্বাভাবিকরূপে ফুলিয়া যায়। চোখের অবস্থা দেখিয়া বাপ-মা তাহাকে মেডিকেল কলেজে লইয়া আসেন। ডাক্তার চোখ পরীক্ষা করিতে গিয়াই কয়লা দেখিতে পাইলেন। আসলে

কিন্তু ঐ কয়লা-বিন্দুটি কয়লার নহে, চোখের ভিতর তাহার একটি তিল-চিহ্ন ছিল। 'বুদ্ধিমান ডাক্তার উহাকেই কয়লার গুঁড়া ভাবিয়া নির্ব্বিচারে ছুরি চালাইয়া দিলেন। কিন্তু কোথাও কয়লার চিহ্ন পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। শেষে হতাশ হইয়া ঔষধ দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ইঁহারাই মেডিকেল কলেজের নির্ভরযোগ্য ডাক্তার।

এই বালকটি নব বারাকপুরের ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পুত্র। তিনি স্বয়ং এই ঘটনাটি আমাদের কাছে আসিয়া বিবৃত করিয়াছেন। পুত্রটি এখনও শয্যাগত। চোখের পরিণাম এখন তাহার ভাগ্যের উপর নির্ভর করিতেছে। আমাদের বলিবার কিছু নাই, কোথায় আমরা নামিয়াছি ইহাই শুধু চিন্তা করিবার বিষয়।

দুর্নীতি দমনে পুলিশ গোয়েন্দা

কয়েক বৎসর ধরিয়া পুলিশের গোয়েন্দা-বিভাগ উচ্চপদস্থ এবং নিম্নপদস্থ কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতিমূলক কার্য্য দমনের জন্য দেখিতেছি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এবং সেজন্য বহু লোক দণ্ডিত, কর্ম্মচ্যুত কিংবা বিভাগীয় শাস্তিও পাইয়াছেন দেখিতেছি। গত ফেব্রুয়ারী মাসেও ছয়জন গেজেটেড অফিসারসহ ৮৭ জনের প্রতি প্রকাশ্য তদন্তের ব্যবস্থা হইয়াছে। সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় দুর্নীতি সরকারী দপ্তরের প্রায় সকল বিভাগেই পরিব্যাপ্ত। প্রতিরক্ষা, পূর্ত, শিল্প, বাণিজ্য, রেলওয়ে, খাদ্য, সরবরাহ কোনটাই বাদ পড়ে নাই। সবচেয়ে আশ্চর্য্য, অভিযোগও থামে না, ঘুষও থামে না। যাঁহারা দুর্নীতিপরায়ণ কর্ম্মচারীদের দমনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাঁহাদের উদ্যম প্রশংসনীয়। কিন্তু শাস্তি দেওয়াই ত শেষ কথা নয়, দুর্নীতি অবসানই প্রধান কাম্য। তাহা কমিতেছে কই?

সরকারী ব্যাপারে একের দোষে অন্যের শাস্তিভোগ করিতে হয় এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। আবার কতকগুলি এমন ঘটনা ঘটে, যাহাতে দুর্নীতির প্রকৃত দায়িত্ব কাহার, তাহা ধরাও কঠিন হয়। এই জন্যই গোবিন্দবল্লভ পন্থ বলিয়াছিলেন, সরকারী দপ্তরের ফাইলে বহু কর্ম্মচারীর স্বাক্ষরের বহর কমাইয়া বিভাগীয় কর্মচারীদের উপরেই দায়িত্ব দিলে দুর্নীতি সূত্র অনুসন্ধান সহজ হইবে। কিন্তু তাহাই বা পালিত হইল কই? নূতন মন্ত্রীসভা এবিষয়ে অবহিত হইবেন কি?

ডঃ বীরেশচন্দ্র গুহ

গত ২০শে মার্চ্চ লক্ষ্ণৌতে অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া বৈজ্ঞানিক ডঃ বীরেশচন্দ্র গুহ পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৫৮ বৎসর হইয়াছিল।

১৯০৪ সনে ময়মনসিংহে বীরেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বরিশাল জেলার বানরিপাড়ার সুপরিচিত গুহ-ঠাকুরতা পরিবারের সন্তান। তাঁহার পিতার নাম রাসবিহারী গুহ। তিন ভ্রাতার মধ্যে তিনি ছিলেন সর্ব্বকনিষ্ঠ। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত ছিলেন তাঁহার মামা। ছাত্রজীবনের সুরু তাঁহার বরিশালেই। পরে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। ছাত্রজীবন হইতেই স্বদেশী আন্দোলনের সহিত যুক্ত হন এবং তাহার ফলে তিনি ইংরেজ সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়েন। যাহার ফলে, গবেষণার জন্য তিনি ইংলণ্ড যাইতে চাহিলে, সরকার তাঁহাকে পাসপোর্ট দিতে অস্বীকার করেন। পরে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার জামিন হইয়া তাঁহাকে বিলাত পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। লণ্ডনে থাকাকালীন তিনি মার্কসবাদী রাজনীতির সঙ্গে জড়াইয়া পড়েন। মার্কসবাদী চিন্তানায়করূপে তাঁহার খ্যাতিও সে সময় ছড়াইয়া পড়ে। রাশিয়ার মার্কসবাদী চিন্তা-নায়ক বুখারিনের সহিত তাঁহার গভীর বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু তিনি কখনও প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির আসরে অবতীর্ণ হন নাই। বিলাতের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি দেশে ফিরিয়া আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের অধীনে অধ্যাপনা ও গবেষণা কার্য্য আরম্ভ করেন।

পরে এই বীরেশচন্দ্র ভিটামিন 'সি' সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করিয়া আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি অর্জ্জন করেন। রসায়নের গবেষণায় তাঁহার অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁহার এই অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারত সরকার তাঁহাকে খাদ্যবিভাগের উপদেষ্টা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। গত বৎসর মস্কোতে তিনি আন্তর্জ্জাতিক প্রাণরসায়ন সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতের বিজ্ঞান জগতের এক কীর্ত্তিমান পুরুষের তিরোধান ঘটিল এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উহার একজন শ্রেষ্ঠ সম্পদ হারাইলেন।

সক্রেটিসের মৃত্যু

(প্লেটো লিখিত "ফিডো" হইতে)

শ্রীকমলা দাশগুপ্ত

সক্রেটিস ছিলেন গ্রীস দেশের মহাজ্ঞানী দার্শনিক। খ্রীঃ পূর্ব ৪৬৯ সনে তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু খ্রীঃ পূঃ ৩৯৯ সনে। এথেন্সের ইতিহাসে সে সময়টা ছিল সাহিত্য, শিল্প, রাষ্ট্রনীতি এবং বাগ্মিতার সর্বশ্রেষ্ঠ কাল।

সক্রেটিসের স্বাভাবিক মৃত্যু হয় নি। চিরাচরিত সংস্কার ও চিন্তাধারাকে তিনি বিচার বিশ্লেষণ ক'রে সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করতেন ব'লে অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রতিপত্তিশালী শক্তিমান মানুষের দল তাঁর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। একটা বিচারের প্রহসনও খাড়া করা হয়। অভিযোগ ছিল যে, তিনি এথেন্সের যুবকদের মধ্যে দেবদেবীর প্রতি অনাস্থা সৃষ্টি ক'রে তাদের বিপথগামী করছেন। এই বিচারের প্রহসনে তিনি অপরাধী সাব্যস্ত হন এবং তাঁর প্রতি দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়, হেমলক বিষ পান ক'রে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। সে বিষের পেয়ালাও নিজে হাতে নিয়ে তাঁকে পান করতে হবে।

সক্রেটিস ছিলেন জ্ঞানপিপাসু। সারা জীবন ধ'রেই তিনি জ্ঞানের অন্বেষণে বিভোর ছিলেন। সংসারের প্রতি দৃষ্টি না দেওয়াতে তাঁকে ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটাতে হয়েছে।

তাঁর চেহারায় কোন আভিজাত্য ছিল না। সাজ-পোশাকও ছিল অতি সাধারণ ধরণের এবং ধোপদুরস্ত নয়। কিন্তু একদল অনুরাগী ভক্ত তাঁকে সর্বদা ঘিরে থাকত। তিনি লোকশিক্ষক ছিলেন, কিন্তু পেশাদার শিক্ষক ছিলেন না, বেতনও গ্রহণ করতেন না। তাঁর কোন নিয়মিত ক্লাশ করারও রীতি ছিল না। তিনি নিজের এবং অপরের চিন্তাধারাকে বিশ্লেষণ ক'রে, যাচাই ক'রে, পরীক্ষা ক'রে দেখতেন। এর জন্য যাকে পেতেন তাকেই প্রশ্ন করতেন, তার সঙ্গেই কথা বলতেন, আলোচনা করতেন। যেখানেই অধিক জনসমাগম হ'ত সেখানেই তাঁকে দেখা যেত, সেখানেই তিনি বক্তৃতা দিয়ে তাঁর দর্শন সম্বন্ধে বক্তব্য প্রকাশ করতেন।

সক্রেটিসের শিক্ষাপদ্ধতি ছিল ঘোর অজ্ঞেয়তাবাদীর মত, ঈশ্বরে অবিশ্বাসীর মত। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃত জ্ঞানের সাধনাই একমাত্র ধর্ম। তাঁর এই বিশ্বাসের অগ্নিপরীক্ষায় যা উত্তীর্ণ হতে পারত না তাতে তাঁর কোন আস্থা ছিল না। এটাই ছিল তাঁর কাছে ধর্ম। কিন্তু তাঁর দুর্বলচিত্ত অনুরাগীরা এটাকে ঈশ্বরে অবিশ্বাসের সামিল মনে করতেন। তাঁরা আরও ভাবতেন, এতে তাঁদের নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়ে আবেগের দাস ক'রে তুলবে। সক্রেটিসের এই দুর্বলচিত্ত অনুরাগীরা পরে কিন্তু আত্মপ্রবঞ্চনা, আত্মবিনোদন ও নীতিভ্রষ্টতার স্রোতে ভেসে গিয়েছিলেন।

তখনকার প্রচলিত বিশ্বাসে সক্রেটিসের আস্থা ছিল না। জ্ঞানের প্রচলিত ধারণাকে তিনি অসার ও ফাঁকি মনে করতেন। সেই সব ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে এবং প্রকৃত দর্শন ও বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করতে তিনি নিজের জীবন বিসর্জন দেন। কোন কিছুকেই তিনি নির্বিচারে মেনে নিতেন না। নিজের বিচারে যা তিনি অন্যায় ব'লে মনে করতেন তা করা তাঁর দ্বারা সম্ভবই ছিল না। তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধানের জন্য প্রতিটি বিষয়ে তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে চলতেন। তাঁর এই সুতীক্ষ্ণ প্রশ্নের সম্মুখে অন্ধবিশ্বাস, আনুমানিক সিদ্ধান্ত এবং মিথ্যা প্রত্যয় এক সঙ্গে সঙ্কুচিত হয়ে উঠত। কিন্তু তিনি নিজে তাঁর বক্তব্য কিছু লিখে যান নি। তাঁর অনুরাগী-শিষ্য প্লেটো এবং সমসাময়িক অন্যান্য জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁর শিক্ষাকে বিশদ ভাবে বর্ণনা করেছেন।

প্লেটো লিখিত "ফিডো" নামক পুস্তকে একেক্রেটিস ও ফিডোর কথোপকথনের কিয়দংশ নিম্নে দেওয়া হ'ল।

একেক্রেটিস—ফিডো, কারাগারের মধ্যে যেদিন সক্রেটিস বিষপান করেছিলেন সেদিন কি তুমি নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলে? অথবা অন্যের মুখে সেই কাহিনী শুনেছিলে?

ফিডো—আমি নিজেই সেখানে উপস্থিত ছিলাম, একেক্রেটিস।

একেক্রেটিস—তবে আমাকে তুমি বল, আমাদের গুরুদেব মৃত্যুর পূর্বে কি ব'লে গেছেন? কেমন ক'রে তিনি মৃত্যু বরণ করলেন? শুনলে আমার বড় আনন্দ

হবে। আজকাল আমাদের এখানকার লোকেরা এথেন্সে বড় একটা যায় না। অনেকদিন সেখান থেকেও এমন কেউ আসে না যে, এই সব ঘটনার কথা সঠিক ভাবে বলতে পারে। শুধু এটুকু জানা যায় যে, তিনি বিষপান ক'রে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এর বেশী আর কিছু আমরা জানি না।

ফিডো—তা হ'লে কি তুমি তাঁর বিচারের কাহিনী শোন নি?

একেক্রেটিস—হ্যাঁ, সে কথা আমরা শুনেছি কিন্তু অবাক্ হয়েছি এই দেখে যে, বিচার শেষ হবার পরেও বহুদিন পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হয় নি। এমন কেন হ'ল, ফিডো?

ফিডো—সে একটা আকস্মিক ঘটনা, একেক্রেটিস। এথেন্সবাসিগণ যে-জাহাজ প্রতি বছর ডেলোস মন্দিরে পাঠায় সেই জাহাজের পশ্চাতের গলুই ক্রাউনে ভূষিত করা হয়েছিল বিচারের আগের দিন।

একেক্রেটিস—এই জাহাজের তাৎপর্য কি?

ফিডো—এথেন্সবাসিগণ বলে যে, এই জাহাজে ক'রে থিসিউস সাতজন তরুণ ও সাতজন তরুণীকে ক্রীটদ্বীপে নিয়ে যায় এবং তাদের মৃত্যু থেকে রক্ষা করে। সে নিজেও রক্ষা পায়। কথিত আছে, এথেন্সবাসিগণ তখন দেবতা এপোলোর কাছে এই শপথ গ্রহণ করে যে, নিজেদের রক্ষার জন্য তারা প্রতি বছর জাহাজে ক'রে ডেলোস মন্দিরে পবিত্র ধর্মযাত্রা করবে। সেই অবধি আজ পর্যন্ত প্রতি বছরেই তারা এ কাজ ক'রে আসছে। এই ধর্মযাত্রা শুরু হবার মুহূর্ত থেকে এথেন্স নগরকে পবিত্র রাখার নিয়ম ছিল। আইন ছিল যে, যতদিন পর্যন্ত না ডেলোস মন্দির থেকে জাহাজটা ফিরে আসবে ততদিন পর্যন্ত কারও মৃত্যুদণ্ড কাজে পরিণত করা যাবে না। অনেক সময় প্রতিকূল বাতাসের জন্য জাহাজের ফিরে আসতে বহু বিলম্ব ঘটত। যখন এপোলো মন্দিরের পুরোহিত জাহাজটি ক্রাউনে ভূষিত করতেন তখনই এই পবিত্র ধর্মযাত্রা শুরু হ'ত। এবারেও সক্রেটিসের বিচারের আগের দিন এই ধর্মযাত্রা শুরু হয়। সেজন্যই সক্রেটিসের বিচার ও মৃত্যুর মধ্যে এত দীর্ঘ সময় তাঁকে কারাগারে থাকতে হয়েছিল।

একেক্রেটিস—তাঁর মৃত্যুর কাহিনী আমাকে বল, ফিডো। কি কি ঘটেছিল সেখানে? আমাদের গুরুদেবের কাছে তাঁর বন্ধুদের মধ্যে কে কে ছিলেন সে সময়ে? জেল-কর্তৃপক্ষ কি তাঁদের সেখানে থাকতে দেয় নি? তিনি কি নিঃসঙ্গ অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছিলেন?

ফিডো—না, না, তাঁর বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজনই সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

একেক্রেটিস—যদি তুমি ব্যস্ত না থাক তবে সেদিনের সমস্ত ঘটনা যথাসম্ভব সঠিক ভাবে আমাদের বল।

ফিডো—না, আমার কোন কাজ নেই। সবটাই আমি বলতে চেষ্টা করছি। গুরুদেবের কথা নিজে ব'লে অথবা অন্যের কাছ থেকে শুনে মনের মধ্যে যে স্মৃতি জাগে তাতে আমি সবচেয়ে বেশী আনন্দ পাই।

একেক্রেটিস—সত্যিই ফিডো, আমাকে তুমি তোমার মত শ্রোতাই পাবে। যা ঘটেছিল সঠিক ভাবে তাই বলতে চেষ্টা কর।

ফিডো—তাই করব। আমি নিজে সেদিন এমন ভাবে অভিভূত হয়েছিলাম যে, আমি অনুভবই করি নি আমার প্রিয়বন্ধুর মৃত্যুকালে আমি উপস্থিত আছি। তাঁর প্রতি আমার করুণাও হয় নি, কারণ, তাঁর কথাবার্তায়, হাবভাবে এবং এমন নির্ভীকতার সঙ্গে প্রশান্তচিত্তে তিনি মৃত্যুকে গ্রহণ করেছিলেন যে, তাঁকে আমার সুখীই মনে হয়েছিল, একেক্রেটিস। একথা আমি না ভেবে পারি নি যে, তাঁর অন্তিম যাত্রায় দেবতারা তাঁকে রক্ষা ক'রে চলবেন এবং তিনি যখন পরপারে পৌঁছবেন তাঁর মঙ্গল হবে, যদি সেখানে মানুষের মঙ্গল ব'লে কিছু থাকে। সেজন্যই আমি তাঁর প্রতি করুণা বোধ করি নি, যদিও এমন শোকের সময় তোমরা করুণাই আশা কর। তাঁর সঙ্গে দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা-কালে যে আনন্দ আমি সাধারণতঃ পেতাম সেই আনন্দও আমি সেদিন অনুভব করি নি, যদিও দর্শন সম্বন্ধেই আমাদের কথাবার্তা হয়েছিল। সেদিন যখনই আমার মনে হচ্ছিল যে, অবিলম্বেই তিনি মৃত্যু-কবলিত হবেন তখনই আনন্দ ও বেদনার অদ্ভুত মিশ্রণে এক অপূর্ব অনুভূতি আমাকে অভিভূত ক'রে দিচ্ছিল। আমরা যারা সেখানে উপস্থিত ছিলাম সকলেরই মনের এই একই অবস্থা ছিল—সকলেরই একবার হাসি, আবার কান্না। বিশেষ ক'রে এপোলোডোরাস। তাকে ত তুমি চেন, তার ধরন-ধারণও তুমি জান।

একেক্রেটিস—ভাল ক'রেই জানি।

ফিডো—সে একেবারেই নিজেকে সংযত করতে পারে নি, অন্য সবাই এবং আমিও খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম।

আমি সুরু থেকে সে কাহিনী বলতে চেষ্টা করব। যে কোর্টে সক্রেটিসের বিচার হয়েছিল সেখানে অন্যদের সঙ্গে আমি প্রতিদিন প্রাতে মিলিত হ'তাম। কারাগারের

কাছেই ছিল কোর্ট। কোর্ট থেকে আমরা কারাগারে সক্রেটিসের কাছে যেতাম। জেলের দরজা সকাল সকাল খুলত না। প্রতিদিনই আমরা দরজা খোলার সময় পর্যন্ত সেখানে কথাবার্তা বলতে বলতে অপেক্ষা করতাম।

দরজা খুললে আমরা সক্রেটিসের কাছে যেতাম। এবং সাধারণতঃ সমস্তটা দিনই তাঁর সঙ্গে কাটাতাম। কিন্তু সেই মৃত্যুর দিনে আমরা অন্য দিনের চেয়ে আগেই মিলিত হয়েছিলাম। কারণ, পূর্বদিন সন্ধ্যায় আমরা জেল থেকে বেরিয়েই জানতে পেরেছিলাম যে, ডেলোস মন্দির থেকে জাহাজটি ফিরে এসেছে। সেজন্য আমরা সেদিন যত শীঘ্র সম্ভব যথাস্থানে পৌঁছবার ব্যবস্থা করেছিলাম।

যখন আমরা জেলের দরজায় পৌঁছলাম তখন যে দ্বাররক্ষক অন্যদিন আমাদের ভিতরে ঢুকতে দিত সে এসে আমাদের অপেক্ষা করতে বলল, যতক্ষণ সে নিজে না ডাকে। সে বলল, এগারজন বিচারক আজ সক্রেটিসের লৌহ-শৃঙ্খল খুলে দিয়ে তাঁর মৃত্যুর নির্দেশ দিচ্ছেন। একটু পরেই দ্বাররক্ষক ফিরে এসে আমাদের ভিতরে যেতে বলল। আমরা ভিতরে ঢুকে দেখলাম, সবেমাত্র সক্রেটিসকে শৃঙ্খলমুক্ত করা হয়েছে। তাঁর স্ত্রী জ্যানথিপি আমাদের দেখে বিলাপ করতে করতে তারস্বরে কেঁদে উঠে বললেন, "সক্রেটিস, তুমি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে এই শেষবারের মত কথাবার্তা বলবে।"

সক্রেটিস ক্রিটোর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ক্রিটো, এঁকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও।" ক্রিটোর লোকেরা জ্যানথিপিকে বাড়ী নিয়ে গেল, জ্যানথিপি বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ভীষণ ভাবে কাঁদতে লাগলেন।

সক্রেটিস বিছানায় উঠে ব'সে শৃঙ্খলমুক্ত পা মুড়ে নিয়ে তাতে হাত বুলাতে বুলাতে আমাদের বললেন, আনন্দ জিনিসটা কি অদ্ভুত! বেদনার সঙ্গে এর আশ্চর্য ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অথচ মনে হয় দু'টো যেন বিপরীত অনুভূতি। মানুষের জীবনে এ দু'টি বস্তু এক সঙ্গে আসে না, কিন্তু যদি সে অনুসরণ করতে করতে একটাকে পেয়ে যায় তবে অন্যটাও সে পেতে বাধ্য—যেন আলাদা দু'টো জিনিসের প্রান্ত এক সঙ্গে বাঁধা। তিনি ব'লে চললেন—আমার মনে হয়, ঈসপ যদি এটা লক্ষ্য করতেন তা হ'লে তিনি এ নিয়ে এই রকম একটা গল্প লিখতেন যে, আনন্দ ও বেদনা যখন পরস্পর ঝগড়া করছিল ভগবান্ তাদের মধ্যে মিলন ঘটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাতে বিফল হয়ে তিনি ঐ দু'টি বস্তুর প্রান্তকে মিলিয়ে জুড়ে দিলেন। সেই জন্যই মানুষের জীবনে ওর একটা এলে অন্যটাও পিছন পিছন অনিবার্য ভাবেই আসবে। আমার বেলায়ও সেই অবস্থা। শৃঙ্খলে বাঁধা ছিল ব'লে পায়ে আমার ব্যথা ছিল, সেই ব্যথাকে অনুসরণ ক'রে এখন আরাম এসে পৌঁছেছে।

সিবিজ তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, একটা কথা আমাকে মনে করিয়ে দিয়ে ভালই করেছ। অনেক লোক তোমার কবিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। জেলে এসে তুমি এপোলো সম্বন্ধে স্তব লিখেছ এবং ঈসপের গল্পগুলি ছন্দোবদ্ধ কবিতায় রূপ দিয়েছ। দু'একদিন আগে ইভেনাস আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, জেলে এসে তোমার কবিতা লেখার কারণ কি? আগে ত তুমি কখনও এক লাইনও লেখ নাই। যদি তিনি আবার আমাকে জিজ্ঞেস করেন তবে কি উত্তর দিতে বল আমাকে?

সক্রেটিস বললেন, তাকে সত্য কথাই বলবে। বলবে যে, তার সঙ্গে বা তার কবিতার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আকাঙ্ক্ষা আমার ছিল না। আমি জানি সেটা সহজ কাজ নয়। আমি শুধু কতকগুলি স্বপ্নের তাৎপর্য নিয়ে পরীক্ষা করছিলাম। সে স্বপ্ন যদি আমাকে এই ধরণেরই সঙ্গীত লিখতে নির্দেশ দিয়ে থাকে তবে সেই নির্দেশ পালন ক'রে আমার বিবেককে হালকা করছিলাম। প্রকৃত ঘটনা এই যে, অতীত জীবনে একই স্বপ্ন আমি বার বার দেখেছি বিভিন্ন রূপে এবং সময়ে। কিন্তু সেই স্বপ্ন সর্বদাই আমাকে একই কথা বলত, "সক্রেটিস, তুমি সঙ্গীত নিয়ে কাজ কর, সঙ্গীত রচনা কর।"

আগে আমি মনে করতাম, দৌড়ের বাজীতে অংশ গ্রহণকারীদের যেমন দর্শকগণ উৎসাহিত করেন তেমনি স্বপ্নও আমার জীবনের কর্মকে উৎসাহিত করছে। মনে করতাম, যে-সঙ্গীতের কাজ আমি ইতিমধ্যেই ক'রে চলেছিলাম সেই সঙ্গীত রচনা করতেই স্বপ্ন আমাকে উৎসাহিত করছে; কারণ আমার ধারণায় দর্শনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত এবং দর্শন তত্ত্ব নিয়েই আমার সারাজীবন ব্যয়িত হয়েছে। কিন্তু তার পর আসে আমার বিচার। বিচারের পর যখন ডেলোস মন্দিরে ধর্মোৎসব হেতু আমার মৃত্যু হ'তে বিলম্ব হচ্ছিল তখন আমার মনে হ'ল হয়ত স্বপ্ন আমাকে সাধারণ অর্থেই সঙ্গীত রচনা করতে নির্দেশ দিত। তা হ'লে ত আমার তা করা উচিত, সে নির্দেশ অমান্য করা ঠিক হবে না। ভাবলাম পৃথিবী ত্যাগ ক'রে যাবার পূর্বে স্বপ্নের নির্দেশ অনুযায়ী কবিতা রচনা ক'রে আমার বিবেককে মুক্তি দেওয়াই ভাল। সেজন্য যে-দেবতার তখন উৎসব হচ্ছিল তাঁরই উদ্দেশে আমি প্রথম স্তব লিখলাম। তার পর ঈসপের যে-সব

গল্প আমি জানতাম এবং যা আমার হাতের কাছে ছিল তাই দিয়ে আমি কবিতা রচনা করলাম। যেটা প্রথম পেলাম সেটাই প্রথমে লিখলাম। আমার বিবেচনায় কবিতা লিখতে গেলে গল্পের উপর নির্ভর করতে হয়, তথ্যের উপর নয়, এবং আমি নিজে কাল্পনিক কাহিনী সৃষ্টি করতে জানি না। সিবিজ, তুমি ইভেনাসকে এই কথাই বলবে এবং আমার বিদায়-সম্ভাষণ জানাবে। তাকে আরও ব'ল যে, সে যদি জ্ঞানী হয় তবে যেন যত শীঘ্র সম্ভব আমার অনুসরণ করে। মনে হচ্ছে আজ আমার চ'লে যাবারই দিন, কারণ এথেন্সবাসিগণ তাই চায়।

সক্রেটিস ব'লে যেতে লাগলেন—ইভেনাস মৃত্যুই কামনা করবে এবং যে কেউ এই তত্ত্ব অনুশীলনের যোগ্যতা রাখে সে-ই মৃত্যু চাইবে। কিন্তু সে নিজের উপর জবরদস্তি ক'রে মৃত্যু চাপিয়ে দেবে না, কারণ সেটা অন্যায়। এই কথা বলতে বলতে সক্রেটিস বিছানা থেকে পা নামিয়ে দিলেন এবং কথাবার্তার বাকি সময়টা এই ভাবেই ব'সে রইলেন।

তখন সিবিজ জিজ্ঞেস করলেন—সক্রেটিস, এই কথা ব'লে তুমি কি বোঝাতে চাও? জোর ক'রে নিজের মৃত্যু ঘটানো অন্যায় বলছ, অথচ যে-মানুষ পরলোকে যাত্রা করছে তাকে অনুসরণ করার আকাঙ্ক্ষা দার্শনিকের হবেই বলছ। কথাটার তাৎপর্য বুঝিয়ে বল।

[এর পর, মৃত্যুর জন্য দার্শনিক আকাঙ্ক্ষা এবং আত্মহত্যার নৈতিক বোধ (Ethics of Suicide) সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা হয়।]

সক্রেটিসের কথা শেষ হ'লে ক্রিটো বললেন, তাই হোক, সক্রেটিস। কিন্তু তোমার সন্তানদের ব্যাপারে এবং অন্যান্য ব্যাপারে তোমার বন্ধুদের ও আমার কি করণীয় সে সম্বন্ধে তোমার নির্দেশ কি? কি ক'রে আমরা তোমার সবচেয়ে বেশী কাজে লাগতে পারি?

সক্রেটিস—ক্রিটো, আমি সর্বদাই তোমাদের যা ব'লে আসছি শুধু তাই কাজে পরিণত করলেই হবে। তোমরা নিজেদের প্রতি মনোযোগী হও, তা হ'লেই তোমরা যা কিছু করবে তাতে আমার এবং তোমাদের সকলেরই মঙ্গল বিধান করা হবে—যদিও এখনই তোমাদের সে সম্বন্ধে কোন প্রতিশ্রুতি দেবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি তোমরা তোমাদের নিজেদের প্রতি অমনোযোগী হও এবং আজ ও অন্য সময়ে আমাদের আলোচনা কালে জীবনের যে সুপথ দেখিয়ে দিয়েছি তা যদি অনুসরণ না কর তবে তোমাদের এখনকার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি যত জোরাল ও আন্তরিকই হোক না কেন, তা কোন কাজেই আসবে না।

ক্রিটো—আমরা সর্বতোভাবে তাই করতে চেষ্টা করব। কিন্তু কি ভাবে আমরা তোমাকে সমাধিস্থ করব?

সক্রেটিস জবাব দিলেন—যেমন তোমাদের ইচ্ছা তাই ক'রো। শুধু আমাকে তোমরা ধ'রে থেকো, তোমাদের মন থেকে হারিয়ে ফেলো না।

তার পর তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে স্মিত হাস্যে বললেন, বন্ধুগণ, ক্রিটোকে আমি বিশ্বাস করাতে পারছি না যে, আমি হচ্ছি সেই সক্রেটিস যে তোমাদের সঙ্গে কথা বলছে এবং যুক্তিবিন্যাস করছে। ক্রিটো মনে করছে যে, আমি হচ্ছি সেই দেহ যাকে এখনি সে মৃতদেহরূপে দেখবে। তাই সে জিজ্ঞেস করছে কি ভাবে আমাকে সমাধিস্থ করবে।

আমার বিষপানের পরে আমি যে আর তোমাদের সঙ্গে থাকব না আনন্দময়ের কাছে চ'লে যাব, এই কথাটা আমি যত যুক্তি দিয়েই প্রমাণ করতে চেষ্টা করি না কেন এবং তার দ্বারা তোমাদের ও নিজেকে সান্ত্বনা দেবার প্রয়াস পাই না কেন, ক্রিটোর কাছে সে সব বৃথা হয়ে যাচ্ছে। সেজন্য ক্রিটোর কাছে তোমরা আমার জন্য জামিন থাকবে, ঠিক যেমন আমার বিচারের সময় সে আমার জন্য জামিন ছিল। কিন্তু একটু ভিন্ন ধরণের জামিন। ক্রিটো আমার জন্য জামিন ছিল যে, আমি বিচারালয়ে উপস্থিত থাকব, পালাব না। কিন্তু তোমরা আমার জন্য ক্রিটোর কাছে জামিন থাকবে যে, আমার মৃত্যুর পর আমি চ'লে যাব, তোমাদের সঙ্গে থাকব না। তা হ'লে সে আমার মৃত্যু কম অনুভব করবে এবং যখন সে আমার দেহ অগ্নিদগ্ধ হতে অথবা সমাধিস্থ হ'তে দেখবে তখন সে এই ভেবে শোকাভিভূত হবে না যে, আমি একটা ভয়ঙ্কর বিভীষিকায় কষ্ট পাচ্ছি। তখন আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় সে বলবে না যে, সে সক্রেটিসকে সমাধিস্থ করবার জন্য প্রস্তুত করছে অথবা সমাধিস্থলে নিয়ে যাচ্ছে অথবা সমাধিস্থ করছে।

সক্রেটিস ব'লে যেতে লাগলেন—প্রিয় ক্রিটো, তোমার জানা উচিত যে, ভুল শব্দ ব্যবহার করা শুধু দোষেরই নয়, এতে আত্মারও অনিষ্ট হয়। তোমরা মন প্রফুল্ল রেখে বলবে যে, তোমরা আমার দেহকে সমাধিস্থ করছ। তোমাদের ইচ্ছামত যেভাবে ভাল মনে কর সেই ভাবেই সমাধি দিও।

এই কথা ব'লে তিনি উঠে অন্য ঘরে গেলেন স্নান করতে। ক্রিটো আমাদের অপেক্ষা করতে ব'লে তাঁর

সঙ্গে গেলেন। আমরা সক্রেটিসের যুক্তিসমূহ নিয়ে আলোচনা করতে থাকলাম। কত বড় বিপদ্ ও দুঃখের মধ্যে আমরা পড়েছি তা নিয়েও কথাবার্তা হতে লাগল। মনে হচ্ছিল যেন আমরা পিতাকে হারাতে যাচ্ছি, বাকী জীবন পিতৃহীন হয়ে থাকব। যখন তিনি স্নান শেষ করলেন তখন তাঁর সন্তানদের—একটি বড় ছেলে আর দু'টি ছোট ছেলে ও তাঁর স্ত্রীকে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সক্রেটিস ক্রিটোর সামনে তাঁদের সঙ্গে কথা বললেন এবং তাঁর অন্তিম আদেশ দিলেন। তার পর স্ত্রী ও সন্তানদের বিদায় দিয়ে তিনি আমাদের কাছে এলেন। তখন সূর্য অস্ত যাবার সময় প্রায় হয়ে এসেছে, কারণ তিনি বহুক্ষণ পর্যন্ত ভিতরে ছিলেন।

তারপর তিনি আমাদের কাছে এসে বসলেন, কিন্তু আর বেশী কিছু কথা হ'ল না। তখনই এগার জন কর্তৃপক্ষের আজ্ঞাবাহী সেবক এসে সক্রেটিসের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "সক্রেটিস, আমি জানি অন্য লোকেদের মত আপনি যুক্তিহীন নন। আমি যখন তাঁদের বিষপান করতে বলি তাঁরা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হন, আমাকে অভিশাপ দেন। আমি ত কর্তৃপক্ষের আজ্ঞাবাহী সেবকমাত্র। এ পর্যন্ত যত লোক এখানে এসেছেন তার মধ্যে আপনাকে আমি প্রথম থেকেই মহত্তম, শিষ্টতম ও সর্বোত্তমরূপে পেয়েছি। আমি নিশ্চিত জানি, আমার উপর আপনি রাগ করবেন না, প্রকৃত দোষী কারা তা আপনি জানেন এবং আপনার রাগ হবে তাদেরই উপর। আমাকে বিদায় দিন। যা অবধারিত তাকে যথাসম্ভব হাল্কা ভাবে গ্রহণ করতে চেষ্টা করুন। আপনি ত জানেন কেন আমি এসেছি।" এই কথা ব'লে সে পিছন ফিরে কাঁদতে কাঁদতে চ'লে গেল।

সক্রেটিস তার দিকে তাকিয়ে বললেন, বিদায়, তোমার কথা মতই আমি কাজ করব। তার পর আমাদের দিকে ফিরে তিনি বললেন, লোকটির কত সৌজন্য! আমি যতদিন ধ'রে এখানে আছি লোকটি সর্বদাই আমাকে দেখতে আসে এবং মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে কথা বলে। কি চমৎকার মানুষটি। আবার দেখ আমার জন্য সে কত কাঁদছে। এস ক্রিটো, আমরা ওর আদেশ পালন করি। বিষ যদি তৈরী হয়ে গিয়ে থাকে তবে তা আনা হোক, যদি না হয়ে থাকে তবে তা তৈরী করা হোক।

জবাবে ক্রিটো বললেন, না সক্রেটিস, আমার মনে হয় সূর্য এখনো পাহাড়ের উপরে রয়েছে, এখনো অস্ত যায় নি। তা ছাড়া, আমি জানি অন্যরা বিষপানের আদেশের পরেও বেশ দেরীতে বিষ পান করেন। প্রাণ ভ'রে তাঁরা পানভোজন করেন, এমন কি মনোনীত বন্ধুদের নিয়ে আমোদও করেন। তাই বলছি, তুমি ব্যস্ত হয়ো না, এখনো সময় আছে।

সক্রেটিস উত্তর দিলেন, ক্রিটো, তুমি যাঁদের কথা বলছ তাঁদের পক্ষে এটা করাই স্বাভাবিক। কারণ, তাঁরা মনে করেন যে, এরকম করলেই তাঁরা লাভবান্ হবেন। আমি স্বভাবতঃ এরকম করব না। কারণ, আমি মনে করি একটু দেরী ক'রে বিষ পান করলে আমার কিছুই লাভ হবে না। বরং যে জীবনটা শেষ হয়েই গেছে তাকে লোভীর মত আরও কিছুক্ষণ ধ'রে রাখতে গেলে আমার নিজেকেই অবমাননা করা হবে। কাজেই আমি যা বলছি তা পালন করতে অস্বীকার ক'রো না।

তখন ক্রিটো পাশে দণ্ডায়মান তাঁর ক্রীতদাসটিকে কিছু ইশারা করলেন। ক্রীতদাসটি বেরিয়ে গেল এবং একটু দেরীতে আর একটি লোককে নিয়ে সে ফিরে এল। এই লোকটিই বিষ দেবে, তৈরী করা বিষের পেয়ালা তার হাতে। তাকে দেখে সক্রেটিস জিজ্ঞেস করলেন, মহাশয়, এসব ব্যাপার আপনার জানা আছে, আমাকে কি করতে হবে?

উত্তরে সে বলল, আপনাকে শুধু এটা পান করতে হবে এবং হাঁটাচলা করতে হবে যতক্ষণ না আপনার পা দু'টো ভারী হয়ে আসে। তার পর শুয়ে পড়বেন, বিষের ক্রিয়া তখন আপনা থেকেই হবে। এই কথা ব'লে সে সক্রেটিসের হাতে বিষের পেয়ালা তুলে দিল। সক্রেটিস প্রসন্নবদনে সেই পেয়ালা গ্রহণ করলেন, একেক্রেটিস। তাঁর হাত কাঁপল না, মুখের রং বদলাল না, ভাব পরিবর্তন হ'ল না। তিনি লোকটির মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে জিজ্ঞেস করলেন, এই পানীয় থেকে কিছুটা কি দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে পারি, অথবা পারি না? লোকটি উত্তরে বলল, সক্রেটিস, আমরা শুধু ততটুকুই তৈরী করি যতটুকু প্রয়োজন, আর বেশী নয়।

সক্রেটিস বললেন, আপনার কথা আমি বুঝেছি। কিন্তু আমি মনে করি ভগবানের কাছে আমি নিশ্চয়ই প্রার্থনা করতে পারি যেন এখান থেকে যাত্রা আমার শুভ হয়, মঙ্গলময় হয়। এটুকুই আমার প্রার্থনা—তাই যেন হয়। এই কথা ব'লে সক্রেটিস বিষের পেয়ালা মুখের কাছে তুলে ধরলেন এবং শান্তভাবে প্রসন্নবদনে সবটাই নিঃশেষে পান করলেন। এর আগে পর্যন্ত আমাদের অধিকাংশ বন্ধুরাই তবু শোকটা বেশ সংযত রাখতে পেরেছিল। কিন্তু যখন আমরা তাঁকে সবটা বিষ নিঃশেষে

পান করতে দেখলাম তখন আর আমরা শোক সংবরণ করতে পারলাম না। আমি না চাইলেও আমার চোখের জল আর বাধা মানল না, আমি মুখ ঢেকে নিজের জন্তই কাঁদতে লাগলাম। তাঁর জন্য নয়, কিন্তু আমার এমন বন্ধু হারাবার দুর্ভাগ্যের জন্তই আমি কাঁদতে লাগলাম। এমন কি যে-ক্রিটো এর আগে অবধি তার কান্নাকে রোধ ক'রে রেখেছিল সেও এখন বেরিয়ে গেল। এপোলো-ডোরাস প্রথম থেকেই সর্বক্ষণ কেবল কাঁদছিল, একটু-ক্ষণের জন্তও থামে নি, সে এখন উচ্চস্বরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল এবং তাতে আমরাও সকলে এবার ভেঙে পড়লাম; শুধু সক্রেটিস ছাড়া।

প্রতিবাদের সুরে সক্রেটিস ব'লে উঠলেন, বন্ধুগণ, তোমরা কি করছ? আমি স্ত্রীকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলাম বিশেষ ক'রে এই জন্য যে, তারা যেন আমাকে এ ভাবে কষ্ট না দেয়, আঘাত না করে। আমি শুনেছি, মানুষের শান্তিতে মৃত্যু হওয়া উচিত। অতএব তোমরা শান্ত হও, ধৈর্য ধর। একথা শুনে আমরা লজ্জিত হলাম এবং কান্না থামিয়ে দিলাম। তিনি হাঁটাচলা করতে থাকলেন। অবশেষে তিনি বললেন যে, তাঁর পা ভারী হয়ে আসছে। তার পর সেই লোকটির কথা মত তিনি চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন।

যে লোকটি বিষ দিয়েছিল সে তাঁর পা ও পায়ের পাতা বার বার পরীক্ষা ক'রে দেখতে লাগল। তারপর সে তাঁর পায়ের পাতা জোরে চেপে ধ'রে জিজ্ঞেস করল, তিনি সেটা অনুভব করতে পারছেন কিনা। সক্রেটিস বললেন, না। তার পর তাঁর পা দুটো এবং ক্রমেই দেহের উপরের দিকে অবশ হয়ে আসতে লাগল। তিনি আমাদের দেখালেন যে, তাঁর দেহ ঠাণ্ডা ও শক্ত হয়ে আসছে। সক্রেটিস নিজেই সব বুঝতে পারছিলেন এবং বলছিলেন যে, যখন এটা উপরের দিকে উঠতে উঠতে তাঁর হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত পৌঁছবে তখন তিনি চ'লে যাবেন। যখন তাঁর কোমর অবধি ঠাণ্ডা হয়ে গেল তখন তিনি মুখের আবরণ সরিয়ে দিয়ে শেষ বারের মত কথা বললেন। তিনি বললেন, ক্রিটো, এ্যাসক্লিপিয়াসের কাছ থেকে একটা মোরগ ঋণ নিয়েছিলাম, সেটা শোধ ক'রে দিতে ভুলে যেও না। ক্রিটো উত্তর দিলেন, তাই হবে। তোমার আর কোন ইচ্ছার কথা বলবার আছে? সক্রেটিস এই প্রশ্নের আর কোন জবাব দিলেন না। একটু পরেই তাঁর দেহটা একটু ন'ড়ে উঠল। সেই লোকটি তখন তাঁর মুখের কাপড়টা সরিয়ে দিল। তাঁর চোখ দু'টি তখন স্থির হয়ে গেছে। ক্রিটো তখন তাঁর মুখ ও চোখ বন্ধ ক'রে দিলেন।

এই ভাবেই আমাদের বন্ধুর জীবন শেষ হয়ে গেল, একেক্রেটিস। আমি জীবনে যত মানুষ দেখেছি তার মধ্যে সক্রেটিস ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, সর্বাধিক ন্যায়-পরায়ণ এবং সর্বোত্তম মানব।

যুগান্তর

শ্রীশান্তা দেবী

কতদিন পরে সুলেখা আবার কলকাতায় এসেছে। ছোট্ট মেয়ে, প্রথম যেবার আসে দীর্ঘদিনই ছিল এখানে। কিন্তু এ পাড়ায় নয়। সে ছিল উত্তর অঞ্চলে। রাস্তাটার নাম ছিল সুকিয়া ষ্ট্রীট। ভোর হলেই অশ্বতরবাহিত ময়লা-ফেলা গাড়ী ঘড়র্ ঘড়র্ করে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিত। তার পর রোদ একটু ঝলমলিয়ে না উঠতেই দেখা দিত মেয়ে স্কুলের গাড়ীগুলি। মহাকালী পাঠশালার গাড়ীতে পাশের তিন-চারটি বাড়ীর ক্ষুদ্রকায়া মেয়েরা বিদ্যালাভের আশায় বইখাতা শ্লেট পাঁজা ক'রে নিয়ে এসে উঠত, সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়ী সে বাড়ী থেকে পাঁচ-সাতটি ছোট ছেলেও ছুটে বেরিয়ে আসত এবং সজোরে চেঁচাতে থাকত— "মহাকালী পাঠশালা

বিদ্যে হবে কাঁচকলা।"

বেথুন কলেজের বিরাট্ গাড়ীর অভ্যর্থনাও এই ছেলেদের কাছে বেশী শোভন হ'ত না। ছড়াটি ব্যাকরণ সঙ্গত না হলেও ছেলেদের খুবই প্রিয় ছিল! রোজ শোনা যেত— "বেথুন কলেজ, হ্যাভ নো নলেজ।

বড় বড় থাম, কুছ নেহি কাম।"

সে সময় স্কুলের মেয়েদের সাজ-পোশাকও ঠিক এখনকার মত ছিল না। মহাকালী পাঠশালার মেয়েরা ত সনাতন মতে শাড়ী প'রেই শিশু বয়স থেকে চলতে অভ্যস্ত ছিল। অন্যান্য স্কুলেও দশ-এগার বছরের চেয়ে বড় বয়সের মেয়েরা সকলেই শাড়ী পরত। অনেক মেয়ে আট-নয় বছর বয়সেই ফ্রক ত্যাগ করত। স্কুলের ছোট ছোট মেয়েদের পায়ে মল, মাথায় খোঁপা, পরণে শুধু ব্লাউস আর শাড়ী দেখা তখন কিছুই বিস্ময়কর ছিল না। শিক্ষয়িত্রীদের যত কমই বয়স হোক সাদা শাড়ী আর কালো জুতা পরাই ছিল নিয়ম; অনেকেই পুরা হাত ও উঁচু গলার সাদা জামা পরতেন, প্রসাধনে কোনরকম বাহুল্য ছিল না। স্নানের পর তোয়ালে ছাড়া মুখের উপর আর কিছু বুলোনোর কোন চিহ্ন কারুর বেশভূষায় লক্ষিত হ'ত না।

সেবার কলকাতায় থাকতে সুলেখা কিছুদিন স্কুলেও পড়েছিল। ঘোড়ায়-টানা বাসেই মেয়েরা যাতায়াত করত; কাজেই প্রথম ক্ষেপের মেয়েদের পৌনে আটটায় আলুভাতে ভাত খেয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়তে হ'ত; দ্বিতীয় ক্ষেপের মেয়েরা একটু দেরীতে স্কুলে যেত বটে, কিন্তু সে আনন্দটুকু তাদের মুছে যেত বিকেল বেলা। বিকেলে যখন সমস্ত স্কুল শূন্যপ্রায়, বোর্ডিং-এর মেয়েরা বড় বড় টেবিলে সারি বেঁধে খেতে বসে গিয়েছে, তখন সুলেখা প্রভৃতি ডে-স্কলার কয়েকটি মেয়ে অভুক্ত অবস্থায় শুকনো মুখে গাড়ী বারান্দার কাছে বই কোলে ক'রে ব'সে থাকত গাড়ীর আশায়। দ্বিতীয় ক্ষেপের বাসে ক'রে যখন তারা বাড়ী পৌঁছত তখন শীতকালে ত ঘরে ঘরে আলো জ্ব'লে উঠতই, গ্রীষ্মকালেও সূর্য্য ডুবে যেত! যাবার সময় পথে দেখত স্কুল-কলেজের ছেলেরা বই হাতে ছুটেছে নিজ নিজ বিদ্যামন্দিরের দিকে, মেয়ে স্কুলের গাড়ী দেখে দুই-একটা রসিকতাও করছে। ছেলেদের পোশাক-আশাকের তখন কোন ঘটা ছিল না, সাদা ধুতি আর সাদা সার্ট সম্বল। রিষ্টওয়াচ আর ফাউণ্টেন পেন তখন ছিল বিলাসী বাবুদের সম্পদ্। ফেরবার সময় এতই বেলা গড়িয়ে যেত যে, পথে ছেলেদের কোন চিহ্নও দেখতে পাওয়া যেত না।

সুলেখাদের স্কুলে ছিল টানা পাখা। গ্রীষ্মকালে পাঙ্খাকুলিরা পাখা টানতে টানতে ঘুমিয়ে পড়ত, কাজেই পাখা বন্ধ হয়ে যেত। মাষ্টারমশায়রা গরমে বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পাখা ধ'রে দিতেন সজোরে এক টান। দড়িতে টান লেগে পাঙ্খাকুলি বেচারী হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে জেগে যেত। আবার কিছুক্ষণ পূর্ণ-বেগে পাখা চলতে থাকত। এবার কলকাতায় এসে সুলেখা দেখছে মেয়েদের স্কুলের মাষ্টারমশায় বা পণ্ডিত-মশায়রা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়ে গিয়েছেন। দরোয়ান আর ড্রাইভার ছাড়া স্কুলের সব কর্ম্মীরাই নারী। মেয়েদের পড়াতে পড়াতে অকস্মাৎ নস্যির কৌটা খুলে নাকে নস্যি গুঁজতেন চাপকান-পরা সেকালের পণ্ডিতমশায়, আজও মনে পড়ে। ইতিহাসের মাষ্টারমশাই ট্যুইশন ক'রে ক'রে ক্লান্ত হয়ে এসে স্কুলের ক্লাশে ঘুমিয়ে পড়তেন আর মেয়েরা সেই সুযোগে পিছনের বেঞ্চে স'রে গিয়ে আড্ডা দিতে সুরু করত। সামান্য কোন আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেলে মাষ্টারমশায় পকেটঘড়ি বার ক'রে

টান হয়ে ব’সে তেড়ে বলতেন, “কি মায়েরা, জিহ্বা লক্ লক্ করছে?” অপ্রস্তুত হয়ে মেয়েরা বইগুলো কোলের উপর টেনে নিত। মাষ্টারমশায় তবুও গজ গজ করতে থাকতেন, “সখিত্ব করছেন মায়েরা, সখিত্ব করছেন!”

সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ীর সরু বারাণ্ডা থেকে সুলেখা সন্ধ্যাবেলা ঝুঁকে দেখত, বড় বড় দুই-একটা বাড়ীতে ইলেক্‌ট্রিক লাইট জ্ব’লে উঠছে, বাকি সব বাড়ীতেই কেরাসিনের লণ্ঠনের ম্লান আলো। তাদের পরিচিত বন্ধুদের বাড়ীগুলির মধ্যে একটিতে মাত্র বিজলীর উজ্জ্বল আলো। স্কুলের কথা মনে পড়ে, পণ্ডিতমশায় বলেছিলেন, “শীঘ্র স্কুলে ইলেক্‌ট্রিক পাখা চলবে।” তখন মজুমদারদের বাড়ীর মতন তাদের স্কুলেও আরামে হাওয়া খাওয়া যাবে।

সন্ধ্যা একটু গড়িয়ে রাত্রের দিকে গেলেই তাদের বাড়ীর পথটি নির্জ্জন হয়ে যেত। সদ্য আমদানি করা মোটর গাড়ী বা ট্যাক্সি মাঝে মাঝে বাঁশি বাজিয়ে ছুটলেও সর্ব্বদা যে দুই-চারটা গাড়ী চলত, তা বড় লোকদের ঘোড়ায় টানা পাল্কী বা ব্রুহাম গাড়ী অথবা দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর ঠিকে গাড়ী। তার দুইপাশের জানালাই প্রায় তোলা থাকত, ভিতরের আরোহীদের বিশেষ দেখা যেত না। পাদচারী পথিকবৃন্দের মধ্যে দুই-একটা ঝি রাঁধুনী ছাড়া স্ত্রীলোক সচরাচর চোখে পড়ত না। ঝিরা সবই একবস্ত্রা, সেই একমাত্র বস্ত্রও ধূলি-মলিন। সব জড়িয়ে সন্ধ্যায় রাস্তাটা কেমন যেন ক্লান্ত বিপন্ন মনে হ’ত। আলোর ঝলমলানি নেই, পোশাকের ছটা নেই, রেডিওর গানে পথিক উৎকর্ণ হয়ে ওঠে না। দেয়ালে দেয়ালে সিনেমার নায়িকাদের নানা ভঙ্গিতে আট ফুট লম্বা রঙীন ছবি নেই, মোড়ে মোড়ে সিনেমা হাউস নেই, ট্যাক্সি-গাড়ীর মাথায় রঙীন আলো নেই, দোকানের বেসাতি ও নাম রঙীন আলোর অক্ষরে নেচে নেচে চলে না। ক্লান্ত অবসন্ন কলকাতার ধূসর পথে নতমস্তক জনকতক পথিক এদিক্-ওদিক্ চলছে মাত্র।

পথে সন্ধ্যার আলো জ্ব’লে উঠলেই সুলেখা বাড়ীর কেরোসিন লণ্ঠনগুলি জ্বালাতে যেত। নিজেদের ঘরে ঘরে এক-একটা লণ্ঠন দিয়ে টেবিল-ল্যাম্পটা ভাল ক’রে পরিষ্কার ক’রে নিয়ে জ্বালিয়ে সুরেশ্বরের পড়ার টেবিলের উপর রেখে আসত। এই বাড়ীতে থেকেই সুরেশ্বর কলেজে পড়ত। সে ছিল সুলেখার কাকীমার ভাইপো। এক বাড়ীতে থাকলেও এই ছেলেমেয়ে দু’টি পরস্পরের সঙ্গে কথা বলত না। তরুণ ছেলেমেয়ের পরস্পরের সঙ্গে বাক্য-বিনিময় সে বাড়ীর আইনে অসঙ্গত ছিল। সুলেখা মাঝে মাঝে রান্নাঘরে পরিবেশনের সময় তার থালায় খাবার তুলে দিত, স্নানের সময় গরম জলের কেটলিটা স্নানের ঘরে রেখে আসত; সুরেশ্বর কাকীমার বাজার ক’রে আনলে সুলেখা তুলে রাখত। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘর থেকে বেরোবার আগেই সুলেখা যতটা পারিপাট্য বেশভূষায় করা যায় তা ক’রে নিত। কারণ রাত্রে শোওয়া চটকানো কাপড়-চোপড় সুরেশ্বরের সামনে প’রে যেতে তার ভাল লাগত না। স্কুলের গাড়ী এলে সুলেখা বেশ বুঝতে পারত উপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সুরেশ্বর বই হাতে তার গাড়ী-চড়া দেখছে। কিন্তু সাহস ক’রে সুলেখা পিছন ফিরে তাকাত না। গাড়ীটা যখন মোড়ের কাছে পৌঁছত তখন সুলেখা চকিতে একবার তাকিয়ে দেখত, সুরেশ্বর পিছন ফিরে বারান্দা থেকে ঘরে চ’লে যাচ্ছে। রোগা, লম্বা ছেলে, বড় বড় চোখ, কিন্তু অতি গম্ভীর মুখ। পরনে মোটা মিলের ধুতি আর প্রত্যহ সাবান-দেওয়া ফরসা গেঞ্জি। বাইরে না বেরোলে সার্ট পরত না সে। কিন্তু তার অতি সামান্য ঘরোয়া পোষাকও সাদা ধপ্‌ধপ্ করত।

সুরেশ্বর কলেজ থেকে ফিরে প্রত্যহই কাকীমার ঘরে নিয়ম ক’রে দুটো-একটা গল্পের বই রেখে দিয়ে যেত। কার জন্য রাখত কখন বলত না। সুলেখা সেগুলি তুলে নিয়ে পড়া শেষ হ’লে আবার কাকীমার ঘরে ফিরিয়ে দিত। সুরেশ্বরকে বলতে হ’ত না। সে ঠিক বুঝত সুলেখার পড়া হয়ে গিয়েছে। আজও সুলেখার মনে আছে এমনি করেই মারী করেলী, জেন অষ্টেন আর শার্লট ব্রন্টের বইগুলি তার পড়া হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজী নভেল তার খুব প্রিয় হলেও কাকীমার বাড়ীতে আর কেউ ওসব পড়ত না। নভেল পড়ার নেশা ছিল শুধু তাদের দু’জনের।

কলকাতায় এবার এসে মনে পড়ছে, সেবারের সেই ভূমিকম্পের কথা। হঠাৎ দুপুর রাত্রে ঘরটা ঝটকা দিয়ে দুলে উঠল। ঘুম ভেঙে যেতে মনে হ’ল, ঘরের খোলা জানালা জোড়া যেন পাশের বাড়ীর জানালায় গিয়ে ঠেকছে। সুলেখা ধড়মড় ক’রে উঠে দাঁড়াল। দরজা খুলে বেরোবার সময় অন্য সব দরজা খুলেই লোকে বেরিয়ে পড়ছে বোঝা যাচ্ছিল। লণ্ঠনের আলো কখন নিভে গেছে। অন্ধকারে ভাল ক’রে মানুষের মুখ দেখা যায় না। কে যে বেরিয়েছে আর কে যে বেরোয় নি বোঝা বড় শক্ত। সুলেখা সুরেশ্বরের দরজায় হাত দিয়েই টের পেল, ভিতর থেকে দরজা তখনও বন্ধ। সে

গুম্ গুম্ ক'রে দরজায় কিল দিতে লাগল। ঘুমন্ত চোখে দরজা খুলে সুরেশ্বর ছুটে বাইরে বেরিয়ে এল। সুলেখা তাড়াতাড়ি স'রে গেল। ধরা পড়ে যেতে সে চায় না। মনে হ'ল সুরেশ্বর যেন হাতটা সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে। পরদিন সকালবেলা কাকীমা সকলকে লুচি আর চিনি জলখাবার দিচ্ছিলেন। সুলেখা দেখল সুরেশ্বর তার মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কেউ লক্ষ্য করবে কি না করবে সে চিন্তা যেন তার একেবারেই নেই। সুলেখা মুখ তুলতেই সুরেশ্বরের গম্ভীর মুখে একটা মধুর করুণ হাসি ফুটে উঠল। তার মুক্তার মত দাঁতগুলি ঢাকাই ছিল, কিন্তু হাসির আলো মুখে যেন ছড়িয়ে পড়ছিল। সুলেখা তখনই মুখটা নীচু করে নিল।

দিনের চাকা আবার একই ভাবে ঘুরতে থাকল। সেই স্কুল, কলেজ আর বাড়ী। সকাল হতেই স্কুল যাওয়ার আয়োজন, সন্ধ্যা না হ'লে সেখান থেকে ফেরবার উপায় নেই। ছুটির পর বড় বড় থামের পাশে পাশে কয়েকটি ছোট ছোট মেয়ে ক্লান্ত পায়ে ঘুরে বেড়ায়। স্কুলের দ্বিপ্রহরের পূর্ণতার পরে অপরাহ্ণের শূন্যতা যেন মেয়েগুলিকে গ্রাস করতে আসে। তার পর অদ্ধশূন্য বাসে বাড়ী ফিরেই আগের মত জলখাবার খেয়ে লণ্ঠন জ্বালা আর টেবিল ল্যাম্প সাজানর পালা। উভয় পক্ষেই সেই চিরদিনের পূর্ণ নীরবতা। কিন্তু তারই মধ্যে কি যেন একটা আনন্দ ছিল; তাই সে দিনগুলিকে আজও ভোলা যায় না।

বি, এ, পাশ ক'রে সুরেশ্বর চাকরি নিয়ে পাটনা চ'লে গেল। যাবার সময় এক সেট ডিকেন্সের গ্রন্থাবলীতে "শ্রীসুলেখা দেবী" লিখে কাকীমার ঘরে রেখে গিয়েছিল। বিদায় নেওয়ার এর চেয়ে বেশী কোন সুস্পষ্ট চেষ্টা সে করে নি। সে বইগুলি আজও সুলেখার কাছে আছে।

সুলেখারও আর বেশী দিন কলকাতা বাস হ'ল না। বছর দুই পরে সেও বি, এ, পাশ ক'রে মা-বাবার কাছে ফিরে গেল। বাবা থাকতেন বীরভূমের গ্রামে। শুষ্ক রুক্ষ মাটির দেশ, সন্ধ্যার পর নিরন্ধ্র অন্ধকারে জোনাকির আলোও বিশেষ দেখা যায় না। গাছপালা কম, কোথায় বা জোনাকির দল এসে ভীড় করবে? শুধু আকাশের তারাগুলি মিট্ মিট্ করে জ্বলে। মনে হয় এই তারার আলো কলকাতার আকাশে, পাটনার আকাশে সর্ব্বত্রই জ্বলছে; কিন্তু কাহারও কোন খবর এরা বলে না, শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে।

মা'র মৃত্যুর পরে কত দিন ধ'রে এই কঙ্করবহুল দেশে মাটির ঘরের ছোট সংসারটি সে চালিয়ে এসেছে। বাকি পৃথিবীটাকে তার ভুলে থাকতে ইচ্ছা করত না, কিন্তু যোগ রাখবার কোন উপায় অবলম্বন করতেও সাহস হ'ত না। মাঝে মাঝে কাকীমার চিঠি আসত। সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ীর মানুষগুলির স্বাস্থ্য ভাল আছে এবং শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা কখন কি রকম কষ্ট তাদের দিচ্ছে, এর বেশী অন্য সংবাদ তাতে থাকত না। পাটনা বলে যে একটা শহর আছে কাকীমা বোধহয় ভুলেই গিয়েছিলেন।

শেষে একদিন বাবাও তাদের মায়া কাটিয়ে চ'লে গেলেন। সুলেখাকে নূতন কোন বন্ধনে বেঁধে দিয়ে তিনি যান নি। ওটা যে তাঁর একটা কর্ত্তব্য এটা মনে ভাবতেন কি না কেউ জানে না, মুখে কিছু প্রকাশ করতেন না। বাবার কাগজপত্র নাড়তে-চাড়তে গিয়ে তার নামে একটা তারিখহীন চিঠি পাওয়া গিয়েছিল। তিনি সুলেখাকে লিখেছিলেন, "মা, তোমার ভবিষ্যতের একটা উজ্জ্বল স্বপ্ন দীর্ঘদিন ধ'রে দেখেছিলাম। কেন যে তা সফল হ'ল না জানি না। হয়ত আমার ভীরুতা। প্রার্থী হয়ে কোথাও যেতে পারি নি।"

এতদিন বাবা-মা'র উপস্থিতি সুলেখার জীবনে ঘড়ির দমের মত ছিল। তাঁদের জীবনযাত্রার চারি ধারেই তার জীবন পাকে পাকে ঘুরত প্রতিদিন। সেই যুগল-জীবনযাত্রার অবসানে ঘড়ির দম ফুরিয়ে গেল। কিসের টানে আবার সে পাকে পাকে ঘুরবে? জীবনটাকে একটা ছন্দে বেঁধে না চালালে সে ত একই জায়গায় স্থাণু হয়ে থাকতে চায়। সুলেখা পড়াশুনা করেছিল, কিন্তু তা কাজে লাগায় নি। এতদিন পরে ঠিক করল চাকরির আবর্ত্তেই নিজেকে ঘোরাবে। না হ'লে একটা চলৎ শক্তিহীন প্রকাণ্ড বোঝার মত বাকি জীবনটা তার ঘাড়ে চ'ড়ে থাকবে। চাকরির কথা মনে হতেই সবার আগে মনে হয় কলকাতার কথা। সেখানেই সে পড়াশুনা করেছিল, সেখানেই দেখেছিল সংসার বন্ধন-হীন নারীও একটা গতিশীল জীবনের পথে ছু'টে চলে। ঘরের জীবনে যার রসের উৎস শুষ্ক, বাহিরের জীবনে সে একটা নূতন উৎস আবিষ্কার করতে পারে।

চেষ্টা তার সফল হল। কলকাতাতেই একটা কাজ জুটে গেল। এ সুকিয়া ষ্ট্রীট নয়, কলকাতার দক্ষিণ অঞ্চল। সেই বাল্যকালের স্কুল-কলেজের দিনে এই অঞ্চলটা তার এবং আরও অধিকাংশ বাঙালীর কাছে কতকটা অনাবিষ্কৃত ছিল। সুলেখা মনে মনে ভাবত সেখানে গাছপালায় ঢাকা বড় বড় কম্পাউণ্ডের মধ্যে দু-চারজন রাজা উজির বা জমিদার অথবা প্রভৃত খ্যাতিমান ব্যারিষ্টার বিরাট প্রাসাদের মধ্যে বাস

করেন। সাধারণ মানুষের অঞ্চলে তাঁরা আসেন না, সাধারণ মানুষরাও তাঁদের অঞ্চলে যায় না।

এতদিন পরে সেই সুলেখা দক্ষিণ কলকাতাতেই এসে পড়ল। দেখল এ ত তার সেই কল্পিত কলকাতা নয়। মাত্র দু'চারটে রাজা-উজীর গাছপালার অন্তরালে লুকিয়ে এখানে থাকে না। হাজার হাজার মানুষ দিবারাত্রি ঘুরছে ফিরছে, আসছে যাচ্ছে। অবশ্য নিরালা অঞ্চলও যে নেই তা নয়। সে তার বন্ধুর অনুর্ব্বর বীরভূমের মত নয় বা স্বপ্নের মায়া কাননের মতও নয়। জনবিরল পথের দুই ধারে থাম দেওয়া ফটকের ভিতর মোটা মোটা দেয়ালের বড় বড় দোতলা বাড়ী। যানবাহনের মধ্যে ঘোড়ার গাড়ীর কোন চিহ্ন নেই। রাত্রে পথের আলো স্তিমিত, লোকজন আরও কম। কিন্তু এই নিরালা অঞ্চলে সুলেখার গতিবিধি বিশেষ ছিল না। রাস্তার মোড়ে মোড়ে নির্জ্জন পার্কে, পুকুর বাঁধের অন্ধকার পথ দুই-একবার সে দেখেছিল। বড় বড় গাছের আড়ালে সাদা কাপড় পরা দুই-একটা মানুষ চলেছে, মুখ দেখা যায় না, ভয়ে কেমন যেন গা ছম্ ছম্ করে।

দিনের বেলার উজ্জ্বল আলোয় যে সব যানবাহন-লাঞ্ছিত চলচঞ্চল পথ তাকে এবার প্রতিদিন এই বিরাট্ নগরীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিত সে সুলেখার চোখে সম্পূর্ণ নূতন। ছেলেবেলায় যে কলকাতায় সে বাস ক'রে গিয়েছে সেখানের পথে সহস্র মানুষের মধ্যে দু'টি-তিনটির বেশী নারীকে দেখা যেত না, আজ সেখানে সকালবেলাই পথ দিয়ে রমণীর স্রোত চলেছে। কলকাতায় কি মেয়েরা গৃহকর্ম্ম ছেড়ে দিয়েছে? মেয়ে-গুলি ত শুধু পাঠশালার পোড়ো নয়। শুধু যে তারা ব্যস্তভাবে পথ দিয়ে ছুটেছে তাই নয়, তাদের মাথার ঘোমটা সকলেরই খ'সে পড়েছে। এ কি মহারাষ্ট্র না মাদ্রাজ? সিন্দুরশোভিতা সীমন্তিনীরাও অবগুণ্ঠন ভুলে গিয়েছেন। শুধু তাই নয়, কেউ বা ঘাড় পর্য্যন্ত চুল দুলিয়ে, কেউ বা লম্বা বেণী ঝুলিয়ে, কেউ বা চুলের গোড়ায় রঙীন প্রজাপতি ফাঁস বেঁধে পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। তাঁরা বয়স্কা। কিন্তু বয়সের পরিচয় ঢাকা দিয়ে রেখেছেন।

সুলেখার মনে পড়ে গেল ছেলেবেলায় সে একটা হাসির কবিতা পড়েছিল, এক বালক প্রেমিক একটি শিশু বালিকার প্রেমে পড়ে বলছেন, "ঐ বেণী দোলানো মেয়েটিরে বড্ড ভালবাসি, তাই এই পথেতেই এই গলিতে নিত্য যাই আসি।"

বাংলা দেশে যে এত রকম শাড়ী ছিল আর তাতে এত রঙের হিল্লোল ছড়াতে পারত তা সুলেখার জানা ছিল না। শান্তিপুরে আর ফরাস-ডাঙ্গার দুগ্ধশুভ্র শাড়ী কোথায় তলিয়ে গিয়েছে? স্কুলের শিক্ষয়িত্রীরা চৌখুপী, তেরছা ডুরে, বুটিদার, খাড়া ডুরে কত রকম রঙবেরঙের চোখ-ধাঁধানো শাড়ীই পরেছেন। আগে ত বালিকা ছাত্রীরাও এ রকম পরত না। গায়ের জামা ছোট হতে হতে এক বিঘতে পরিণত হলেও তাতে রঙের প্রাচুর্য্য আছে। সুলেখার মনে পড়ল কলেজে পড়ার সময় সে শান্তিনিকেতনের একটি মেয়ের কাছে শুনেছিল যে, রবীন্দ্রনাথ যখন কাঠিয়াওয়ার ভ্রমণ ক'রে আশ্রমে ফেরেন তখন তিনি আশ্রমের মেয়েদের বলেছিলেন, "তোমাদের পোষাকে পরিচ্ছদে রঙের কোন উচ্ছ্বাস নেই। ওখানকার মেয়েরা রঙে রঙে চারদিক আলো করে রাখে।" সেই রঙের হিল্লোল আজ কলকাতার পথে পথে বয়ে চলেছে, বর্ণহীন কলকাতা আর নেই। বৈধব্যের নিরাভরণতাও অতি বিরল হয়ে এসেছে।

রং শুধু মেয়েদের কাপড়ে নয়, প্রসাধনেও দেখা দিয়েছে। মাথায় ফুল, চোখে কাজল, নখে, ঠোঁটে রং সুলেখাদের সেই কলকাতায় ত দেখা যেত না। জানালা বন্ধ ঠিকে গাড়ীতে বা স্কুলের লম্বা কালো বাসে যে সব মেয়েরা যাতায়াত করত তাদের পোষাক-আষাক সাদা-সিধাই, পথও ছিল বর্ণহীন, পথের ধারের বাড়ীগুলিও রোদ-জলে ধুয়ে ধোঁয়া ধোঁয়া রং; গাছপালা, ফুলপাতা কিছুই প্রায় চোখে পড়ত না। দুই-একটা জীর্ণ ছাদে বেলফুলের টব কচিৎ দেখা যেত।

দক্ষিণ অঞ্চলে আধুনিক বাড়ীতে ছোট-বড় ছাদ আর বারান্দাও ফুলের পাতার রং আকাশে ছড়াতে শিখেছে; বেশী সৌখীন আর ব্যবসাদারী অঞ্চলে পথে পথে রঙীন আলো নৃত্য ক'রে পথিকের মন ভোলাচ্ছে। তার সঙ্গে চলেছে নানা সুরের ঝঙ্কার। দ্রুত ধাবমান গাড়ীগুলি তার সঙ্গে তাল রেখে ছুটেছে।

রঙের নেশা থেকে ছেলেরাও মুক্তি পায় নি। সেই সাদা ধুতি, সাদা সার্ট পরা ছেলেরা আজকাল চলেছে রঙীন হাফসার্ট আর রঙীন প্যান্ট প'রে। ছবি আঁকা জামারও অভাব নেই! সাজ বদলে তাদের চেহারায় চাকচিক্য বেড়েছে। চলার গতিও দ্রুত হয়েছে।

দীর্ঘকাল গ্রামের মেটে রঙের মধ্যে কাটিয়ে সুলেখার মনে হচ্ছিল যেন আলো আর রঙের রাজ্যে এসেছে, শহরটার গায়ে আর তার অধিবাসীদের মধ্যেও যেন একটা তারুণ্য ফুটে উঠেছে। যদিও পথের ধারের আস্তাকুঁড়গুলো কেবল আগের মতই অপরিবর্ত্তিত। তবু

সুলেখার মনে হচ্ছে কলকাতার এই রং, আলো আর প্রাণের চাঞ্চল্য যেন তার প্রাণটাকে নূতন ক'রে তুলছে। রাস্তায় অবিশ্রান্ত ধাবমান্ জনস্রোতের সঙ্গে তারও ছুটে চলতে ইচ্ছা করছে। কোথায় যাবে জানে না। কিন্তু চলার আনন্দ, নূতন পরিচয়ের আনন্দ তাকে টেনে নিতে চাইছে। এই নবাবিষ্কৃত জগতের নূতন রূপটা সে উপভোগ করতে চায়। নূতন বান্ধবীরা কাফেতে চা খেতে ডাকছে, সিনেমার নেশা জীবনকে কৃত্রিম সৌন্দর্য্য ও উত্তেজনায় চঞ্চল ক'রে তুলছে, খেলার মাঠে খেলার উন্মত্ততার অংশ যেন শ্রান্ত জীবনকে উৎসাহিত করছে। এ জীবনের সঙ্গে সুকিয়া ষ্ট্রীটে, কি বীরভূমে ত সুলেখার পরিচয় ছিল না! কৈশোরে তার জীবনটা ছিল ছায়ায় ঢাকা, আজ উজ্জ্বল আলো তার মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অনেক দিনের ঝিমোনো জীবনকে জাগিয়ে তুলেছে।

সুরেশ্বর কি আজও তেমনি শান্ত নীরব গম্ভীর আছে? তেমনি সকালে উঠে কাজে যায় আর সন্ধ্যায় কাজ থেকে ফিরে আলো জ্বেলে বই নিয়ে বসে? মনের কোন কথা বলে না, কোন ইচ্ছায়, কোন সখে চঞ্চল হয়ে ওঠে না? যদি তাকে একবার দেখতে পেত হয়ত দেখত সেও এ যুগের মানুষের মত চঞ্চল হয়ে ছুটে চলেছে নানা নূতনত্বের মধ্য দিয়ে, সেকালের বেশভূষা ত্যাগ ক'রে আধুনিক চটকদার সজ্জায় সজ্জিত হয়েছে। এই যে অবিশ্রাম ঘোরা, জীবনের নিকট থেকে এই যে শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত রস নিঙড়ে নেবার অনুক্ষণ চেষ্টা, সুরেশ্বর কি তা শেখে নি? সে যুগে তাদের পরিবারে জীবনযাত্রার এ প্রথা ত ছিল না; থাকলে হয়ত আজ সুলেখার জীবন অন্যরকম হ'ত। যদি আজকের মত স্কুল-কলেজের পর অনাত্মীয় ছেলেমেয়েরা বই-খাতা হাতেই জোড়ে জোড়ে বেড়াতে যেতে পারত, বা লেকের ধারে পাশে ব'সে চানাচুর আর কোকাকোলা খেতে পারত তা হ'লে তার জীবনে যে ক্ষীণ একটা রোমান্সের আলো ফুটি ফুটি ক'রেও ফুটতে পারে নি তার প্লাবনে জীবনটা উজ্জ্বল হয়ে উঠত। সেই ভূমিকম্পের রাত্রে সুরেশ্বরের হাতটা একবার স্পর্শ করাও পাপ মনে হয়েছিল। আজ মনে হয় কি মূর্খ সে ছিল! কিন্তু এখন কি এর কোন প্রতিকার আছে? কিছু সে চায় না। শুধু একবার দেখতে চায় সুরেশ্বর কেমন ভাবে চলছে আর সেই দিনগুলো তার মনে আছে কি না। মনে যদি থাকে তবে সেই আনন্দ জীবনটাকে একটু রঙীন করে তুলবে। ঐটুকুই সে সম্বল করে রাখবে মনের ভাণ্ডারে।

কাকীমা আজ নেই। কিন্তু সুকিয়া ষ্ট্রীটের সংসারটা আছে। সুলেখা যদি একদিন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয় ত কিছু ক্ষতি হয় না নিশ্চয়। কাকীমার ছেলে বৌ'রা ত আছে। কাকীমা তাদের ঘর-সংসার বেঁধে দিয়ে গিয়েছেন! কেন যে সুরেশ্বরের জন্য কিছু করেন নি বোঝা যায় না।

কিন্তু কাকীমার বাড়ী যেতে হ'ল না। সুরেশ্বরকে আকস্মিকভাবেই দেখতে পেল সুলেখা। রঙীন আলোয় স্নাত চৌরঙ্গীর ওষুধের দোকানে সুলেখা ঢুকতে যাচ্ছিল সেদিন সন্ধ্যাবেলা। ফুটপাথে পা দিতেই একটা গাড়ীর আওয়াজে পিছন ফিরে তাকাতে হ'ল। চোখ পড়ল কার চোখের উপর? দু'জনেই থমকে দাঁড়াল। এই কি সুরেশ্বর? প্রকাণ্ড নূতন গাড়ী থেকে আগাগোড়া পট্টবস্ত্রে সজ্জিত সুরেশ্বর নামল। সেই ঘন কৃষ্ণ-কেশের কোন চিহ্ন নেই। বড় বড় উজ্জ্বল চোখ দু'টি চশমায় ঢাকা। কিন্তু সুরেশ্বরের জীবনেও রং লেগেছে। বৈরাগ্যের রং। সুরেশ্বরকে গৈরিক ধারণ ক'রে মুণ্ডিত মস্তকে দেখবে, সুলেখা ভাবে নি কোন দিন। তার মনের চোখে সুরেশ্বর আজও তেমনি তরুণ ছিল যেমন এক সময় প্রতিদিন সে দেখত। কিন্তু আজ সেই ঋজু শরীর একটু নুয়ে গিয়েছে, সেই ক্ষীণ দেহ মেদবহুল হয়ে উঠেছে। সকলের চেয়ে বিস্ময়কর সেই নীরব কণ্ঠে আজ তার নাম অনায়াসে ধ্বনিত হয়ে উঠল, "সুলেখা যে! তুমি এতকাল পরে কোথা থেকে?"

এতকাল? সত্যই ত বহুকাল। সুলেখা ভুলে গিয়েছিল যে, সেই সুকিয়া ষ্ট্রীটের স্কুল-জীবনের পর দীর্ঘ দিন কেটে গিয়েছে। যে সুরেশ্বরকে সে রঙীন বুস সার্ট-পরা দেখবার আশা করেছিল তার মেদবহুল দেহে গৈরিক আলখাল্লা দেখে সুলেখার মনে পড়ে গেল জীবনটা অনেক পথ মাড়িয়ে চলে এসেছে। সুলেখা একটু চমকে উঠে বললে, "হ্যাঁ, আপনাকে—তোমাকে এখানে দেখব মনে করি নি। আমি আবার কলকাতায় এসেছি চাকরি নিয়ে।"

সুরেশ্বর বললে, "আমি এখানে একটা আশ্রম খুলেছি; তুমি যাবে দেখতে?"

সুলেখা বললে, "এই সিনেমা, রেডিও আর থিয়েটারের কলকাতায় আশ্রম? এ আমাদের বীরভূমে মানাত।"

সুরেশ্বর হেসে বললে, "এই কলকাতার উপযুক্তই আমার আশ্রম। সেখানেও নিয়ন লাইট, সিনেমা, রেডিও আছে। দেখছ না আমার গৈরিকও মুর্শিদাবাদ সিল্কের, যানও মোটর। আধুনিক না হ'লে আধুনিক যুগে

বৈরাগ্য-সাধনও বৃথা। মনটা যখন আমাদের রঙীন ছিল, তখন আমরা ভীরু মৌনী সন্ন্যাসী ছিলাম। আজ মনের রঙটা পুড়ে গেছে, তাই বাইরে রঙের প্রলেপ দিয়েছি। বৈরাগ্যের মধ্যে রসের সন্ধান করছি। এ নূতন যুগের পন্থাও নূতন। সে যুগ, সে দিন আর নেই।"

সত্যিই ত। মনে মনে হিসাব করল সুলেখা, পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে মৌনী সুরেশ্বরকে সে প্রথম দেখেছিল। সে যে তিন যুগ হয়ে গেল!

ত্রৈবিদ্য পণ্ডিতের চক্ষে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

১৯৩৬ সন। আমি তখন বঙ্গীয় আর্যসমাজের বেদ প্রচার বিভাগের কর্মী। শ্রীহট্টে আর্যসমাজ স্থাপন ক'রে নমঃশূদ্রাদি অনুন্নতশ্রেণীর উন্নয়ন কার্যে আত্মনিয়োগ করেছি।

কলকাতা হতে কর্তৃপক্ষের পত্র পেলাম—একজন প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ পণ্ডিতকে তাঁরা শ্রীহট্ট পাঠাচ্ছেন।

তাঁর প্রতীক্ষায় আছি। কখনও তাঁকে দেখি নাই। কেমন আকৃতি, কিরূপ প্রকৃতি কিছুই জানি না। অবশেষে একদিন তিনি এসে পড়লেন।

তাঁকে অভ্যর্থনা করে বসিয়েছি। জলযোগের ব্যবস্থা হচ্ছে—এমন সময় তিনি বললেন—"রাখ, ওসব পরে হবে। আমার পৈতে ছিঁড়ে গেছে—আগে একটা পৈতে দাও দেখি।"

বাড়ীতে পৈতে ছিল না। বাজার থেকে আনাতে যাচ্ছি—তিনি বললেন—"বাজারে কেন? ঘরে টোয়াইন সুতো নেই?"

আমি চমকিত হয়ে বললাম—"টোয়াইন সুতো ত আছে, তাই দিয়ে—!"

তিনি বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—"হাঁ হাঁ! তাই দিয়েই পৈতে করব! দেখ বাপু! আমি জাতিতে মুসলমান—ধর্মে বৈদিক! শুচিশুদ্ধ হিন্দু বিধবার হাতের তৈরি পৈতে না হলেও চলবে!"

আমি অধিকতর সচকিত। তিনি আমার মনোভাব বুঝলেন। বললেন—"ভাবছ, তাহ'লে পৈতেরই বা প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে। তবে পৈতে গেলেই জাত বা ধর্ম গেল—এরূপ বিশ্বাস আমার নাই। এই ত ট্রেনে, ষ্টীমারে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ছিলই না। ওটা কি জান? ওটা হ'ল আমাদের ধার্মিক পতাকা। ওই জাতীয় পতাকার মত!"

প্রথম আলাপেই মুগ্ধ হলাম। পরে ধীরে ধীরে তাঁর অপূর্ব চরিত্রের অধিকতর পরিচয় পেলাম।

বেদ, কোরাণ, বাইবেল তাঁর কণ্ঠস্থ। বোগদাদে তিনি আরবী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। হিব্রু ভাষায় বাইবেল পড়েছেন; অবশেষে কাশীতে বেদ অধ্যয়ন করেছেন।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের কাছে তিনি বৈদিক ধর্ম গ্রহণ করেন। সেদিন সারা ভারতে—এমন কি ভারতের বাইরেও তোলপাড় প'ড়ে যায়।

পণ্ডিতজী বললেন—"ত্রিবেণী-সংগমে স্নান ক'রে আমার বহু সংস্কার দূর হয়েছে। বেদ, কোরাণ বা বাইবেল, কোন শাস্ত্র অপৌরুষেয় বা অভ্রান্ত, এ কথা আমি মানি না। তবে সকল শাস্ত্রই জ্ঞানের আকর এবং নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল!"

দিন পনের-ষোল তাঁর সঙ্গে অতি অন্তরঙ্গ ভাবে কাটাই। সে দিনগুলি আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথের "গুপ্তধন" গল্পে মৃত্যুঞ্জয়ের স্বর্ণগৃহ আবিষ্কারের মতই আমার অভূতপূর্ব আনন্দলাভ হয়েছিল। দিনরাত আমার সে এক নেশার ঘোরে কেটে যেত। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছি। জিজ্ঞাসার আর অন্ত নাই। সমস্ত জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত হয়েছে। প্রাণে আনন্দের পর আনন্দের তরঙ্গ বয়ে গেছে।

তিনি বৃদ্ধ। আমি যুবক। কিন্তু তিনি স্বাস্থ্যবান। হয়ত তিনি আমার চেয়ে শক্ত। কাজেই রাত একটা-দেড়টা পর্যন্ত আমরা শাস্ত্রালাপ চালাতাম। কেউ ক্লান্ত হতাম না।

তিনি বলতেন—"দেখ বাপু, কূপমণ্ডূক হয়ো না। মনে ক'রো না—তোমার হিন্দু-ধর্মেই সব কিছু আছে।

হিন্দুর, মুসলমান, খ্রীষ্টানের কাছে অনেক কিছু শিখবার আছে। আবার মুসলমান, খ্রীষ্টানও হিন্দুর কাছে যথেষ্ট শিখতে পারে।"

একদিন রাত্রে ভগবদ্-বিষয়ক শাস্ত্রালোচনা চলছিল। তিনি বললেন, "বেদে একটি মন্ত্র পেয়েছি যার তুলনা নাই। এমনটি আর কোথাও পাই নাই।"

আমি পরম ঔৎসুক্যে প্রশ্ন করলাম—"কোন্ মন্ত্রটির কথা বলছেন?"

তিনি তাঁর অতুলনীয় কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"১

বাজসনেয়ি-সংহিতা, ৩১।১৮॥

গভীর রাত্রি। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ। সেই মহানীরবতা, নিশীথ-মৌনতা ভেদ ক'রে গুরুগম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে মৃত্যুঞ্জয়ী বেদমন্ত্রের আবৃত্তি আমাকে স্থান কাল ভুলিয়ে দিল। মনে হ'ল—প্রাচীন ভারতের কোন এক তপোবনে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি তাঁর মহান্ আবিষ্কারের কথা জগদ্বাসীকে শোনাচ্ছেন।

মনে আছে তাঁর কণ্ঠের অপূর্ব ওঙ্কার ধ্বনি। মনে আছে তাঁর "আজান" দেওয়া।

ওঙ্কার শুনে মনে হ'ল—দ্যুলোকে, ভূলোকে, অন্তরীক্ষে যে-অব্যক্ত সঙ্গীত নীরব ছিল—মৌন ছিল, তাই যেন ভাষা পেল; সমস্ত জগৎ যেন এক সঙ্গে একস্বরে গেয়ে উঠল তাঁর নামগান। ওই ক্ষুদ্র ওঁ শব্দের উচ্চারণ যে অমন ক'রে সমস্ত অস্তিত্বকে কম্পিত করতে পারে, তা আমার কল্পনারও অতীত ছিল।

প্রভাতের "আজান" জলস্থল আলোড়িত ক'রে, স্বপনের কুহকজাল ছিন্ন ক'রে সুষুপ্ত বিশ্বজগৎকে যেন উদ্বোধিত করল—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।" এই বাক্যই যেন বাক্যের অতীত বিশ্বসঙ্গীতের সুরে ধ্বনিত হ'ল!

একদিন বললেন, "হিন্দুধর্মের মহত্ত্ব আমায় আকৃষ্ট করত। কিন্তু হিন্দুর সমাজব্যবস্থা, হিন্দুর পুতুল-পূজা আমি বরদাস্ত করতে পারতাম না। জন্মাবধি তোমরা এতে অভ্যস্ত—তাই বুঝতে পার না, কিন্তু তোমাদের সমাজের বাইরে যারা, তাদের চক্ষে এ যে কি ভয়ানক, কি জঘন্য—তা তোমরা কল্পনা করতে পার না।

"যখন জানলাম—হিন্দুদের মধ্যে এমন সমাজও আছে, যেখানে জাতভেদ নাই, পুতুল-পূজাও পরিত্যক্ত, তখন আমার হিন্দু হবার আগ্রহ হ'ল। ঠিক এমনি সময়ে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের সঙ্গে আমার পরিচয় হ'ল। একজন মানুষের মত মানুষ দেখলাম। ধার্মিক, মানবপ্রেমিক, তেজস্বী, নির্ভীক পুরুষ! মন বললে, 'হাঁ! এঁরই কাছে দীক্ষা নেওয়া যেতে পারে!'

"তিনি কিন্তু আমাকে সহজে দীক্ষা দেন নি। প্রথমেই বললেন, 'ভাই, ভাল ক'রে ভেবে দেখ। ধর্ম পরিবর্তন ছেলেখেলা নয়।'

"ভাল করেই ভেবে দেখেছিলাম। যখন তাঁর বিশ্বাস হ'ল যে, আমি সত্যই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তখন তিনি আমাকে দীক্ষা দিলেন।

"আর্যসমাজ জাতিভেদ রহিত করেছে এবং বৈদিক একেশ্বরবাদ প্রচার করেছে। জাতিভেদের উচ্ছেদ এবং একেশ্বরবাদের প্রচার, এ আমারও জীবনের ব্রত।

"সংস্কার দূর করা সহজ নয়। আর্যসমাজেও এক ধরনের প্রতীক-উপাসনা দেখেছি। আবার মুসলমান সমাজেও যে তা দেখি নাই—তা নয়।

"দিল্লীতে এক শেঠ আর্যসমাজীর অতিথি হয়েছিলাম। একদিন তাঁর উপাসনাগৃহে গিয়ে দেখি—একটি গেরুয়া রঙের 'ল্যাঙ্গট' টাঙানো রয়েছে। নীচে তার ধূপ-ধুনা! ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় শেঠ পরম ভক্তিভরে বললেন, 'এটি স্বামীজীর (দয়ানন্দের) ল্যাঙ্গট।' তাজ্জব ব্যাপার!

"দিল্লীতে জুম্মা মসজিদে গেছ? আমি দিল্লী গেলেই সেখানে যাই। মুসলমানদের সমবেত উপাসনার তুলনা নাই! তার আকর্ষণ এখনও আমার বিন্দুমাত্র কমে নাই। কিন্তু এই জুম্মা মসজিদে হজরত মহম্মদের 'পদচিহ্ন' রক্ষিত আছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান যে-কেউ জুম্মা মসজিদ দর্শন করতে যান—তাঁকেই সেই পদচিহ্ন দেখান হয়। একটি ক্ষুদ্রগৃহে পট্টবস্ত্রে আবৃত উচ্চাসনে বিরাজমান সেই পদচিহ্ন-ফলককে ভক্তিভরে বাইরে এনে দর্শকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়। এবং দর্শকগণ, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রায় সকলেই তাকে প্রণাম করেন।

"আমার সঙ্গে যে-আর্যসমাজী ভৃত্য ছিল সে প্রণাম না ক'রে বলে উঠল—'মৈ বুৎপরস্ত নহী হুঁ।' পদচিহ্ন-ধারক চমকে উঠলেন।

---

১ "আমি জেনেছি তাঁহারে,
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।" নৈবেদ্য।

"জানি না হিন্দুর সংস্পর্শে এসে মুসলমানও পৌত্তলিক হয়ে উঠেছে কি না।"

আমি সবিনয়ে বললাম, "কথাটা বোধহয় মিথ্যে নয়। তা ছাড়া পৌত্তলিক হিন্দুরাই ত মুসলমান হয়েছেন। বাইরের থেকে মুসলমান কতই বা এসেছেন!

"বাংলা দেশে অশিক্ষিত মুসলমানের মধ্যেও অত্যন্ত দৃঢ় চরিত্রের একেশ্বরবাদী আমি প্রত্যক্ষ করেছি। শ্রীহট্টে নবীগঞ্জ অঞ্চলে এক মুসলমান কৃষকের মুখে এই ঘটনাটি শুনেছি:

"আমার সহোদর ভাইকে সাপে কামড়ায়। ওঝারা এসে ঝাড়ফুঁক করতে থাকে। ভাই আমার ক্রমশ: নির্জীব হয়ে আসছে। এমন সময় আমার কানে এল কেউ বলছেন—'মনসার শরণ নাও। দেবী বিষহরিকে ডাক—তোমার ভাই বেঁচে উঠবে।'

"আমি তখন ভাই-এর অচেতনদেহ কোলে নিয়ে বসে। মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। 'কিন্তু আল্লাকে ছেড়ে মনসার শরণ নেব—এও কি হতে পারে।'

"ওঝারা আশা ছেড়ে দিয়েছে। ভাই-এর দেহ ক্রমেই অবশ হয়ে আসছে—কানের কাছে সকলেই বলছে—'মা বিষহরিকে ডাক।' হিন্দুরা বলছে, অনেক মুসলমানও বলছে।

"কিন্তু আমি বলে উঠলাম—'এক ভাই যাচ্ছে শত ভাই যাক, ছেলে যাক, মেয়ে যাক—আল্লা ছাড়া আর কারও কাছে মাথা নোয়াব না।'

"পণ্ডিতজী। ভাই আমার মারা গেল—কিন্তু বিষহরির কাছে আমি মাথা নোয়াই নি।"

বেদজ্ঞ চমৎকৃত। কিছুক্ষণ তাঁর মুখে কথা সরল না। পরে ধীরে ধীরে বললেন—"এই হজরত মহম্মদের ধর্ম। বীরের ধর্ম।"

একদিন বললেন, "তোমাকে আর্যসমাজীর 'ল্যাঙ্গট-পূজা'র কথা বলেছি কিন্তু তাদের উপর সুবিচার করতে হ'লে আর একটি ঘটনার কথাও বলতে হয়।

"হায়দরাবাদে আর্যসমাজ-মন্দিরে সনাতনী ও আর্যসমাজীর মধ্যে শাস্ত্রযুদ্ধ চলেছে। বিষয়—প্রতিমা-পূজা।

"তুমুল তর্কের মধ্যে এক সনাতনী ব'লে উঠলেন, 'তোমরা মূর্তি-পূজা কর না—তবে দয়ানন্দ সরস্বতীর ছবি টাঙিয়ে রেখেছ কেন?'

"বলামাত্র আর্যসমাজী তার্কিক তৎক্ষণাৎ ফ্রেমে বাঁধান স্বামীজীর ছবি একটানে নাবিয়ে এনে তার উপর পদাঘাত করলেন। ছবি চুরমার হয়ে গেল।

"ব্যাপারটা কিন্তু উপস্থিত জনতাকে মর্মাহত করল। বহু সনাতনী পণ্ডিত ও শ্রোতা এবং অনেক আর্যসমাজীও এতে ক্ষুণ্ণ হলেন। অনেকেই বললেন, 'পূজা না হয় নাই করলে—তাই ব'লে পূজ্যব্যক্তির প্রতিকৃতিতে পদাঘাত! সমস্ত ব্যাপারেই একটা সংযম ও সীমা থাকা প্রয়োজন।'

"যাই হোক, আর্যসমাজ অসাধ্যসাধন করেছে—একথা স্বীকার করতেই হবে। মুচি, মেথর, মুর্দাফরাস' স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য ভেদ দূর ক'রে, সমস্ত হিন্দু জাতিকে পৈতে পরিয়ে, গাছ, পাথর, ভূত, প্রেত, সাপের পূজা ছাড়িয়ে এক পংক্তিতে আহার এবং এক মন্দিরে উপাসনায় সমবেত করা সহজ কথা কি?

"সমাজে সাম্য আনবার জন্যে চিন্তাশীল আর্যসমাজিগণ বহু চিন্তা করেছেন। এই চিন্তার ফলে তাঁরা এক অপূর্ব প্রথা প্রবর্তন করছেন। সেটি হচ্ছে 'কুলপদবী ত্যাগ! উচ্চ জাতীয়েরাই প্রথমে এই আদর্শ দেখাচ্ছেন। সকল কার্যে পদবীবিহীন নামমাত্রই তাঁরা ব্যবহার করেন। যেমন—হংসরাজ, ঋষিরাম, কাহনচাঁদ, রামদেব, কুশলচাঁদ ইত্যাদি। বৈষম্যের ইঙ্গিতমাত্রও তাঁরা বরদাস্ত করবেন না।"

একদিন রাত্রে আমার হাতে একটি "ব্রহ্মসঙ্গীত" গ্রন্থ দেখে তিনি তা থেকে কিছু পড়তে বললেন। আমি রবীন্দ্রনাথের রচিত কোন গান আবৃত্তি করলাম। তিনি বাংলা জানতেন না। কিন্তু সংস্কৃতবহুল রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অর্থগ্রহণে বিশেষ বাধা হ'ল না।

তিনি আমাকে আরও আবৃত্তি করতে বললেন। আমি একের পর এক আবৃত্তি ক'রে চললাম। রাত প্রায় কাবার। শেষে আমিই নিজে নিবৃত্ত হয়ে, তাঁকেও বিশ্রাম নিতে বাধ্য করলাম।

তার পরদিন থেকে আর অন্য আলোচনা নাই! কেবল রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা। আহার নিদ্রা ভুলে আমাদের উভয়ের মধ্যে চলেছে অবিরাম রবীন্দ্র-রচনা পাঠ ও শ্রবণ! কিছুতেই আর তাঁর পরিতৃপ্তি হয় না!

অবশেষে বিদায়ের দিনে তিনি বললেন, "আমি ওঁর নামমাত্র শুনেছিলাম। আমার ক্ষেত্র এবং বিষয় বিভিন্ন। বাংলাও আমি জানি না। কাজেই ওঁর সাহিত্য পাঠের সুযোগ কখনও হয় নাই। আজ দেখছি মস্ত ভুল করেছি। তিন বেদ (বেদ, বাইবেল, কোরাণ) আমি অধ্যয়ন করেছি। আজ চতুর্থ বেদের সন্ধান পেলাম। শেষ জীবনে এই চতুর্থ বেদ পাঠ করব।"

ত্রৈবিদ্য পণ্ডিতজীর সঙ্গে জীবনে আর সাক্ষাৎ হয় নাই। তাঁর শেষজীবনে চতুর্থ বেদের অধ্যয়ন তিনি আরম্ভ করেছিলেন কি না অথবা আরম্ভের পূর্বেই তাঁর জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে—কিছুই আমার জানা নেই।

রঙ্গমল্লী

শ্রীসীতা দেবী

১

বেলা পড়িয়া আসিতেছে, ছেলেমেয়েদের সকলের ফিরিবার সময় হইল। সেই সাত সকালে নামে মাত্র খাইয়া সকলে বাহির হইয়া যায়। ইস্কুলে, কলেজে কিছু খায় কিনা দুপুরে তা কেই বা জানে? সুরবালা ভয়ে কোনদিন কিছু জিজ্ঞাসা করেন না। পূর্ণিমা বড় চাপা মেয়ে, কোনদিনই অভাব-অভিযোগের কথা মায়ের কাছে বলে না। সে জানে সংসারের অভাব মিটাইবার ভার তাহার উপর, সে আবার কাহার কাছে অভিযোগ করিবে? এই বয়সেই সে বয়স্কা গৃহিণীর মত গম্ভীর হইয়া গিয়াছে, বাড়ীর কাহারও সঙ্গে গল্পগাছা করে না। প্রাণপণে খাটে, প্রাইভেট্ ট্যুশনি করে, তাহার উপর সারা দুপুর স্কুলে কাজ করে। এই ত তাঁহাদের আয়। ইহার উপর ছোট মেয়ে সরমার কলেজে পড়ার খরচ এবং একমাত্র ছেলে রমেন্দ্রের ইস্কুলে পড়ার খরচ বাবদ তাঁহার এক বড়মানুষ বোনপোর কাছে কিছু অর্থসাহায্য পান, এই যা রক্ষা। না হইলে এ দুটিকে মুর্খ হইয়াই থাকিতে হইত। পূর্ণিমা বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়া কলেজ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। প্রাইভেট্ পড়িয়া পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা তাহার ছিল, কিন্তু এখন আবার স্বল্প অবসর সময়ে ষ্টেনোগ্রাফি ও সেক্রেটারির কাজ শিখিবার জন্য প্রাণপণ করিতেছে। এটায় সফল হইলে সে অবস্থার উন্নতি করিতে পারিবে। শিক্ষয়িত্রীর কাজে কিই বা পাওয়া যায়? চিরকালই আধপেটা খাইয়া থাকিবার ইচ্ছা তাহার নাই।

রণেন ফিরিয়া আসিল সবার আগে। বইখাতা খাটের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল, "খাবার-টাবার কিছু আছে ঘরে? যা ক্ষিদে পেয়েছে।"

সুরবালা ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "দাঁড়া, দিদিরা আসুক, সকলকে একসঙ্গে চা দেব। নইলে একজন খাবে, বাকিদের চা ঠাণ্ডা হবে। ওরা যে আবার গরম-করা চা খেতেই চায় না।"

"কখন লেডীরা সব আসবেন, তার জন্যে আমাকে না খেয়ে ব'সে থাকতে হবে নাকি? যাও, চাই না খেতে আমি।" বলিয়া সে রাগিয়া চৌকাঠ ডিঙাইয়া একলাফে বাহিরে গিয়া পড়িল। সৌভাগ্যক্রমে গলিতে দুই পা অগ্রসর হইতে না হইতে দুই দিদিকেই গলির মোড়ে দেখা গেল। সরমা ভাইকে দেখিয়া উঁচু গলায় বলিল, "এখন বেরিয়ে কোথায় যাচ্ছিস?"

রণেন বলিল, "যাব আর কোন চুলোয়? তোমরা দয়া ক'রে আসছ কি না তাই দেখছিলাম। তিনজন একসঙ্গে না জুটলে ত মা খেতেই দেবেন না।"

পূর্ণিমা তখন কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। একটু নীচু অথচ দৃঢ় গলায় বলিল, "আচ্ছা, চেঁচিয়ে সারা পাড়াকে নিজেদের হাঁড়ির খবর জানাতে হবে না। চল ঘরে।"

তিনজনে বাড়ীতে আসিয়া ঢুকিল। মা পূর্ণিমাকে একপাশে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, "কিছু থাকে ত দে বাবা। খোকাটা না হলে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করবে। আমার কাছে কাল সকালের বাজারের পয়সা ছাড়া কিছু নেই।"

পূর্ণিমার হাতব্যাগে কয়েক আনা পয়সা প্রায় সর্ব্বদাই থাকিত। সারাদিনই তাহাকে ঘুরিতে হয়। সব সময় ট্রামে-বাসে যায় না। হাঁটিয়াও যায় মাঝে মাঝে। বেশী ক্লান্ত থাকিলেই ট্রামে চড়ে। এখন ব্যাগ হইতে একটা সিকি বাহির করিয়া দিল। ইস্কুল খুব দূরে নয়, না-হয় কাল হাঁটিয়াই যাইবে। এখনকার মত ত সকলের মেজাজ ঠাণ্ডা হোক।

ঠিকা ঝি পলাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাকে কোনরকমে দাঁড় করাইয়া, সুরবালা তাহার হাতে সিকিটা গুঁজিয়া দিলেন। "একটু মুড়িটা এনে দিয়ে যা।"

ঝি গজর্ গজর্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। রণেন নিজের ঘরে একটা হাতল-ভাঙা চেয়ারে বসিয়া পা নাচাইতে লাগিল। দুই দিদি অন্য ঘরে ততক্ষণ ইস্কুলের বেশ ছাড়িয়া কাপড়-চোপড় পাট করিয়া রাখিতে লাগিল। এই একখানি ঘরেই দুই মেয়ে ও মায়ের বাস। সংসারের বেশীর ভাগ জিনিষপত্রই এখানে। রণেনের ঘরটা এতই ছোট যে, তাহাতে নিজের বই খাতাপত্র ও কাপড়-জামা লইয়া রণেন মাত্র থাকিতে পারে, আর কিছু সেখানে ধরে না। বাহিরের কেহ কালেভদ্রে আসিলে

এই ঘরে মোড়াতে বা ভাঙা চেয়ারে বসে। স্ত্রীলোক হইলে মেয়েদের ঘরেই বসে।

মুড়ি আসিল, তাহা তেল নুন লঙ্কা দিয়া মাখা হইল। ছেলে-মেয়েরা চা খাইতে বসিল। পূর্ণিমা নিজে দু' চামচ মাত্র লইয়া বাকি ভাই-বোনকে ভাগ করিয়া দিল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিজে এত অল্প নিলি যে?"

পূর্ণিমা বলিল, "ক্ষিদে নেই, ইস্কুলে একবার খেয়ে এসেছি।"

এ কথা সে প্রায়ই বলে, মায়ের বিশ্বাস হয় না। মেয়ের চেহারা ত যা হইতেছে দিনের দিন। ছোটবেলায় কি সুন্দর মোটা-সোটা ছিল। রঙও কত পরিষ্কার ছিল। তাই ত তাহার বাবা আদর করিয়া নাম রাখিয়াছিলেন পূর্ণিমা। কিন্তু এখন আর সে রূপ কোথায়? সারাদিন খাটুনি আর আধপেটা খাওয়া। কাহার অদৃষ্টে ভগবান্ কি যে লিখিয়া রাখেন তাহা কে বা জানে? তবু এখনও যে দেখে মেয়েকে, চোখ ফিরাইতে পারে না। প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্মের মত দেখিতে। তেমনি নির্ম্মল, তেমনি সুন্দর।

সুরবালা সচ্ছল ঘরের মেয়ে, সচ্ছল ঘরেই বিবাহ হইয়াছিল। কলিকাতায় ঘর-বাড়ী অবশ্য ছিল না, কিন্তু ভাল ফ্ল্যাট ভাড়া করিয়া তাঁহারা থাকিতেন। স্বামীর উপার্জ্জন মন্দ ছিল না, মধ্যবিত্ত পাঁচটা মানুষ যে-ভাবে থাকে তাহাই থাকিলে তিনি দুই পয়সা রাখিয়াও যাইতেন। কিন্তু তাঁহার চালচলন ছিল বড়লোকের মত। ছেলেমেয়েকে সুসজ্জিত রাখা, ভাল ইস্কুলে পড়ানো, খাওয়া-দাওয়া বেশ ভাল দেওয়া, ইহার কোনটাই বিনা পয়সায় হয় না, কাজেই তিনি সামান্য কয়েক হাজারের জীবন বীমা ছাড়া আর কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। সুরবালার গহনা-গাঁটি কিছু ছিল, তবে উল্লেখ-যোগ্য কিছু নয়।

পূর্ণিমার বয়স যখন তেরো বৎসর, তখন হঠাৎ তাহার পিতৃবিয়োগ হইল। মেজো মেয়ে সরমা তখন আট বৎসরের, ছেলে রণেন পাঁচ বৎসরের। সুরবালার মনে হইল, হঠাৎ একটা উঁচু পাহাড়ের চূড়া হইতে কে যেন তাঁহাকে নীচে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। ছেলেমেয়েগুলি নির্ব্বাক আতঙ্কে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া রহিল।

শোকের অসহনীয় তীব্রতা কিছুদিনের পর খানিকটা কাটিয়া গেল। এখন চক্ষু মেলিয়া আবার তাকাইতে হইল সংসারের দিকে। সুরবালা একটা বুদ্ধির কাজ করিলেন, ঘটি-বাটি বেচিয়া, লোক দেখান ঘটা করিয়া স্বামীর শ্রাদ্ধ করিতে গেলেন না। আত্মীয়স্বজনে নিন্দা করিল, কিন্তু পরলোকগত স্বামী এই সব ভড়ংকে অত্যন্ত অপছন্দ করিতেন বলিয়া সুরবালা নিজের মতই বজায় রাখিলেন, সংক্ষেপেই কাজ সারিলেন।

ইহার পর আসিল সংসারের ভাবনা। খাইতে হইবে, পরিতে হইবে, কোথাও মাথা গুঁজিয়া থাকিতে হইবে। ছেলেমেয়ের পড়াশুনা বন্ধ করিলে চলিবে না। বড় বাড়ী ছাড়িয়া তখন এই ছোট দু'খানি ঘরে উঠিয়া আসিলেন, ঝি-চাকর সব ছাড়াইয়া দিলেন। দিন চলিতে লাগিল কোন মতে। গহনা-গাঁটি সব বিক্রী করিয়া দিলেন, আসবাবপত্র অনেক ছিল, স্বামী সখ করিয়া কিনিয়াছিলেন, সেগুলিও বিদায় হইল। এই দেড়খানি ঘরে সে-সব রাখিবার জায়গা কোথায়? একখানা বড় খাট শুধু রহিল, যাহা সুরবালার বিবাহের সময় ফুলশয্যার তত্ত্বে আসিয়াছিল।

সবচেয়ে ঘা খাইল পূর্ণিমা। বাবাকে সে অত্যন্ত ভালবাসিত, তাঁহার সম্বন্ধে নির্ভর ছিল তাহার অসীম, গর্ব্ব ছিল অভ্রভেদী। ভালভাবে থাকা, পাঁচজনের মধ্যে মাথা উঁচু করিয়া ঘোরা এ তাহার মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। সে যেন মরমে মরিয়া গেল। কিন্তু ছেলে-মানুষের মন, আবার যে সুদিন আসিবে এ বিশ্বাস তাহার গেল না। তাহাকেই চেষ্টা করিয়া পরিবারটিকে দারিদ্র্যের পঙ্ক হইতে টানিয়া তুলিতে হইবে। যথাসাধ্য ভালভাবে সে পড়াশুনা করিতে লাগিল।

সে যখন থার্ড ইয়ারে পড়ে তখন মা একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। পূর্ণিমা কলেজ ছাড়িল। ইস্কুলে টিচারের কাজ জুটিল একটা, প্রাইভেট্ পড়ানোর কাজ জোগাড় করিল গোটা দুই। এইভাবে সংসার চলিতে লাগিল। নিকট আত্মীয় একজনের অবজ্ঞাভরা সাহায্যে ভাই-বোনের পড়া চলিতে লাগিল। মনের ভিতরটা পূর্ণিমার জ্বলিয়া যাইত, কিন্তু উপায় বা কি? পড়াশুনা বন্ধ করার কথা চিন্তাও করা যায় না। তিনজনে যদি রোজগার করিতে পারে, কয়েক বৎসর পরে, তাহা হইলে হয়ত আগেকার সেই দিন ফিরাইয়া আনা যায়।

মা বলিলেন, "কি এত ভাবছিস হাঁ ক'রে? চা-টা যে জুড়িয়ে গেল।"

পূর্ণিমা পেয়ালাটা তুলিয়া শূন্য করিয়া আবার নামাইয়া রাখিল। বলিল, "ভাবছিলাম আজকাল সব কিছু নিয়ে ত আবেদন-নিবেদন, মিছিল হচ্ছে, ভগবানের কাছে যদি একটা আবেদন করা যেত যে, চব্বিশ ঘণ্টার বদলে ছাব্বিশ ঘণ্টা অন্ততঃ দিনটা ক'রে দাও। তাহলে

আর একটু কাজ করার সময় পাওয়া যায়, আরো দুটো পয়সা ঘরে আসে।"

রণেন বিদ্রূপের মত বলিল, "কেন বাপু, দিব্যি ত খাচ্ছ-দাচ্ছ, ঘুমোচ্ছ। কি অভাবটা তোমার শুনি?"

তাহার মা তাড়া দিয়া বলিলেন, "থাম্ ত তুই। সব কথায় কথা বলা।"

"আমি এরপর মুখটা শেলাই ক'রে রাখব। যা বলি, তাতেই তোমাদের রাগ হয়", বলিয়া একলাফে রণেন ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সরমা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন দিদি? টাকার খুব দরকার নাকি? কি কিনবে?"

পূর্ণিমা বলিল, "স্যাণ্ডাল্ একজোড়া কিনতেই হবে, এটার দফা হয়ে এসেছে। যে দুখানা শাড়ী বাইরে পরি, তারও একটা ছিঁড়বার উপক্রম করছে। মাইনে পেতে ত সাত তারিখ উৎরে যায়, অথচ দরকারগুলো সব পয়লা তারিখেই উপস্থিত হয়।"

সরমা বলিল, "আমাকেও দু' একটা জিনিষ কিনতে হবে, তবে একেবারে এই মাসেই নয়।"

পূর্ণিমা বলিল, "যাই, একটু পার্কে ঘুরে আসি, মাথাটা গরমে ধ'রে আসছে।" সে উঠিয়া পড়িল। সরমা একটু মুখ টিপিয়া হাসিল, মা অন্যদিকে তাকাইয়া রহিলেন।

বালীগঞ্জে ছোট-বড় পার্ক অনেকগুলি, সকাল-সন্ধ্যা এখানে ভিড় লাগিয়া থাকে। পূর্ণিমার দুই বেলাই একটু বেড়াইয়া আসা অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, বাল্যকাল হইতে। এখন সকালে আর ঘটিয়া ওঠে না, কাজের তাড়ায়, সন্ধ্যায় বেড়ানোটা সে ছাড়ে নাই। আধঘণ্টা অন্ততঃ সে বাহিরে ঘুরিয়া আসে, কাজের তাড়া যতই থাক।

মুখ-হাত ধুইয়া, চুল আঁচড়াইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। দরজার কাছে দাঁড়াইয়া একবার নিজের পরণের শাড়ীখানার দিকে তাকাইল। হাল্কা সবুজ রংএর, ময়লা হইয়াছে বলিয়া কিছু মনে হয় না, আজ কাজ চলিবে।

লেকের ধারের বেড়াইবার জায়গাটাই তাহার পছন্দ। লোকের ভিড় আছে বটে, তবে অনেকখানি বড় জায়গা, মাঝে মাঝে ফাঁক পাওয়া যায়। ওপারে রেল লাইনের দিকে চলিয়া গেলে ভিড়ও অত থাকে না। পার্কের ভিতরে ঢুকিয়া এদিক্-ওদিক্ তাকাইতে তাকাইতে পূর্ণিমা আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে লাগিল। চেনা মানুষ এধার-ওধার দেখিতে পাওয়া যায়। এই একই পাড়ায় তাহারা বহুদিন আছে, কাজেই পরিচিত লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। কিন্তু পূর্ণিমা যেন পরিচিত লোকেদের কাছাকাছি থাকিতে চায় না। হাঁটিতে হাঁটিতে একটু জনবিরল স্থানেই সে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘাসের উপর একটি ছেলে বসিয়া ছিল। সে বলিল, "আজ এত দেরি হল যে?"

ছেলেটি লম্বা তত নয় তবে রোগা বলিয়া লম্বাই দেখায়। রং ফরশা বলা চলে, মুখশ্রী চলনসই।

বসিয়া পড়িয়া পূর্ণিমা বলিল, "ইস্কুল থেকে বেরোতেই আজ দেরি হয়ে গেল। মেয়ে পড়ানোর কাজ ছাড়াও অন্য কাজ জুটে যায় ত মাঝে মাঝে?"

ছেলেটি বলিল, "ও, এই সময় তোমাদের প্রাইজের সব হাঙ্গাম বেধে যায়, না?"

পূর্ণিমা বলিল, "সে ত আছেই। তার উপর গরমও ত প'ড়ে আসছে? এখন আর হুড়োহুড়ি ক'রে কাজ করতে ভাল লাগে না।"

ছেলেটির নাম দীপক। সে বলিল, "যাদের খাটতে হয় সারাদিন, তাদের কাছে কোন কালটাই ভাল নয়। এই ত চার-পাঁচ দিন আগে অবধি শীতকালকে অভিশাপ দিচ্ছিলাম, ছোট দিন, মশা, শীতের জ্বালায় অস্থির, রাতে ঘুম হয় না, আর এখন আবার শীত চ'লে যাওয়াতে রাগ হচ্ছে। গরীব মানুষ, সারারাত ফ্যান চালাতে পারি না, গরমে ঘুম হয় না। এর মধ্যে আবার মশার কামড়ের জ্বালায়, মশারি বাদ দেওয়া যায় না। সারারাত সেদ্ধ হয়ে যাই যেন।"

পূর্ণিমা বলিল, "প্রাচীন ভারতে ত ফ্যান ছিল না, কিন্তু তখন লোকের চলত কি ক'রে? কোথাও ত হা হুতাশ দেখি না পাখার অভাবে? আমরাই ইস্কুলে, অফিসে ফ্যানের হাওয়া খেয়ে অভ্যাস খারাপ ক'রে ফেলেছি, বাড়ীতে ভীষণ জ্বালাতন লাগে।"

দীপক বলিল, "এমনি তাপের কথা কিছু নেই বটে, তবে বিরহের তাপ নিবারণের জন্যে গায়ে চন্দন-পঙ্ক মাখা আর পদ্ম-পাতায় হাওয়া খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।"

পূর্ণিমা বলিল, "সেও ত শুধু তপোবনে, শহরের মধ্যে ত ও প্রেস্‌ক্রিপশন্ চলবে না। তা হলে পুলিশে ধরবে যে?"

দীপক বলিল, "আরে না, আমাদের দেশের পুলিশ উদারনৈতিক আছে অনেকখানি। বেশীর ভাগ মানুষ, আমরা যে বেশে বাড়ীতে থাকি, তা ত কবিগুরুর ভাষায় 'দিক্ বসনের সুন্দর অনুকরণ:' কিন্তু কাকে কে ধরছে? এই যে সব এখানে বেড়াতে এসেছে, সেখানেও কি ভদ্রতার ব্যতিক্রম কোনখানে দেখছ না?"

"তা ত দেখছি, কিন্তু কিই বা করা যাবে ? যা গরীব দেশ। খেতেই পায় না ত কাপড় পরবে কোথা থেকে ? গান্ধীজি একবার গ্রাম অঞ্চলে গিয়েছিলেন সফর করতে। গ্রামের মেয়েদের পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে উপদেশ দেওয়ায় তাদের মধ্যে একজন গান্ধীজির স্ত্রীকে ডেকে বলল, মা, আপনি ওঁকে বলুন যে, আমাদের প্রত্যেকের জন্যে যদি উনি এক-একখানা শাড়ীর ব্যবস্থা ক'রে দেন, তা হলে আমরা রোজ স্নান করতে পারি। যে শাড়ীখানা প'রে আছি, তা ছাড়া ঘরে দ্বিতীয় কাপড় নেই। স্নান ক'রে কি পরব ?"

দীপক বলিল, "শহরেও অনেক ঘরে এই অবস্থা। গামছা পরার ঘটা দেখে তাই আমার মনে হয়। কিন্তু থাক এখন শাড়ীর ভাবনা। তুমি এসে অবধি ত খালি গরম আর শাড়ীর গল্পই হচ্ছে।"

পূর্ণিমা বলিল, "দুটোই আজ নিজের সমস্যারূপে খানিকটা দেখা দিয়েছে, সেই জন্যে বোধহয় ঐ কথাই খালি বলছি।"

দীপক একটু যেন চকিত হইয়া বলিল, "সে কি ? আমি বরং অবাক্ হয়ে যাই যে, এত অভাবের মধ্যেও তুমি এরকম ফিট্-ফাট্ থাক কি ক'রে। তোমাকে বাইরে কোথাও দেখলে কেউ কোনদিন গরীব ঘরের মেয়ে ব'লে ভাববে না।"

পূর্ণিমা বলিল, "গরীব ঘরের মেয়ে ত নই। অন্ততঃ জন্মেছিলাম যে ঘরে, সে ঘর গরীবের ঘর ছিল না। আজ যদিও নিজেরা গরীব হয়ে গেছি। দেখ, জীবনের সেই প্রথম দিকের কিছু কিছু অভ্যাস আমি কিছুতেই ছাড়তে পারি না। আমি তালি দেওয়া চটি বা ছেঁড়া, ময়লা কাপড় কিছুতেই পরতে পারি না। রোজ শাড়ী-জামা কাচি, রোজ ইস্ত্রি করি নিজে। ধোপার পাট আমাদের নেই, কিন্তু যাদের আছে, তাদের তুলনায় বরং আমরা বেশী পরিষ্কার, তবু কম পরিষ্কার নয়।"

দীপক মুখখানা একটু অপ্রতিভ করিয়া বলিল, "তুমি আমাকে বেশ নোংরা ভাব, না ? সব সময় তত সাবধান থাকতে পারি না, আর পরিচ্ছদের বাহুল্য ত নেই, কাজেই পরিচ্ছন্নতায় ত্রুটি নিশ্চয়ই ঘটে।"

পূর্ণিমা তাড়াতাড়ি কথাটা অন্য স্রোতে চালাইয়া দিল। বলিল, "কাল যে ছেলে পড়ানোর কাজটায় interview দিতে যাবে বলেছিলে, তার কি হ'ল ?"

দীপক বলিল, "গিয়েছিলাম, তবে হ'ল না বিশেষ কিছু। তাদের লোক রাখা হয়ে গিয়েছে। তবে সেখানেই আর একটা কাজের সন্ধান পেলাম। কাল যাব সেখানে।"

পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করিল, "সেটাও কি ছেলে পড়ানোর ?"

"তা ছাড়া অন্য কাজ আর আমাকে কে দেবে বল ? সাধারণ গ্র্যাজুয়েট্, বিশেষ training ত কোনদিকে নেই ? তবে এই যে কাজটার কথা কাল শুনলাম, তাতে দুটো বাচ্চা ছেলেমেয়েকে পড়াতে হবে, মাইনেটা সামান্য কিছু বেশী।"

পূর্ণিমা হঠাৎ বলিল, "তোমার আর আমার কয়েকটা জায়গায় বড় বেশী মিল, না দীপক ?"

দীপক বলিল, "অমিলেরও অভাব নেই। কিন্তু কোন্ মিলের কথা বলছ তুমি ?"

"এই দুজনেই পিতৃহীন, এবং আগে সম্পন্ন ঘরের ছেলেমেয়ে ছিলাম, এখন গরীব হয়ে গেছি।"

দীপক বলিল, "আর দুজনেই বাড়ীর প্রথম সন্তান হওয়াতে সব ভার ঘাড়ে পড়েছে আমাদেরই। তোমার তবু পরের বোনটি মানুষ হয়ে উঠতে পারে বছর দুইয়ের মধ্যে, তখন সে তোমার বোঝা খানিকটা লাঘব করতে পারে, কিন্তু আমার বোনগুলিও যত দিন যাচ্ছে তত নিজেরাই বোঝা হয়ে উঠছে। মা-বাবা কি ভেবে যে এই দারুণ জীবনসংগ্রামের দিনে তাদের এরকম মুখ্যু ক'রে রেখেছিলেন তাঁরাই জানেন।"

পূর্ণিমা বলিল, "আমাদের tradition আর সংস্কার মেয়েরা খালি রাঁধবে, খাবে এবং বংশবৃদ্ধির সহায়তা করবে। খাওয়াটা যে আসছে কোথা থেকে তার ঠিক নেই।"

দীপক বলিল, "আদর্শ হিসাবে মন্দ নয়। সব মেয়েরাই ঘর-সংসার ফেলে সারাদিন বাইরে ছুটে বেড়াবে, এটাও ভাল নয়। অন্ততঃ যাঁরা ঘরের গৃহিণী, সন্তানের মা। বাচ্চাগুলির দুর্দ্দশার শেষ থাকে না, সংসারও গোল্লায় যেতে বসে। অথচ কাজ না ক'রে করবেই বা কি ? দুবেলা দু' মুঠো খেতে ত হবে ?"

পূর্ণিমা বলিল, "অপূর্ব্ব সব পরিস্থিতি। অথচ ভগবান্ মানুষের পেটে যেমন ক্ষিদে দিয়েছেন, হৃদয়েও সেই রকম সঙ্গীর জন্যে আকাঙ্ক্ষা দিয়েছেন। অত্যন্ত দুঃখ পাবে জেনেও মানুষ এই সব পরিবার ফেঁদে বসে। এবং কে জানে, হয়ত কিছু সুখ এরই মধ্যে পায়।"

দীপক বলিল, "মনে ত হয় না। চারপাশে যাঁদের দেখি সারাদিন, তাঁরা হয় পরস্পরকে দাঁত খিঁচোচ্ছেন,

নয় ছেলেমেয়েদের ঠ্যাঙাচ্ছেন। এতে আর কি সুখ থাকবে?"

পূর্ণিমা বলিল "নিজেকে এইরকম একটা অবস্থায় কল্পনা করতে পার?"

দীপক বলিল "Heaven forbid! দরকার নেই আমার অমন চমৎকার কল্পনা ক'রে। ওটাকে আমি একটু ভাল কাজে লাগাবার জন্যে তুলে রাখি।"

পূর্ণিমা একটু বিষণ্নভাবে হাসিল। বলিল, "আমার মা এত দুঃখ পেয়েও এই ভাবনা ভাবা ছাড়েন না। এখনও মেয়েদের বিয়ের সম্বন্ধের নামে তাঁর দুই চোখ জল্ জল্ করে। অথচ মেয়ে যদি বিয়ে ক'রে চ'লে যায়, তা হ'লে নিজের যে কি দশা হবে একবার ভাবেন না।"

দীপক বলিল "সে ক্ষেত্রে মানুষ স্বভাবতঃই আশা করে যে, জামাই মেয়ের হয়ে তাঁর ভরণপোষণের ভার নেবেন।"

পূর্ণিমা বলিল, "মধ্যবিত্ত ঘরের জামাইয়ের সে সাধ্য থাকলে ত? নিজেদের সংসার চালাতেই জিব বেরিয়ে যায়।"

দীপক বলিল, "সবাই ত আমার মত নয়? মধ্যবিত্ত ঘরেও ভাল আয় করে এমন অনেক ছেলে আছে। তোমার কি আবার বিয়ের সম্বন্ধ এল নাকি? কোথা থেকে?"

পূর্ণিমা বলিল, "আসে মাঝে মাঝে এক-একটা। আমি বেশী আগ্রহ দেখাই না তা হ'লেই মা পেয়ে বসবেন।"

দীপক বলিল, "দাও না সরমার বিয়ে দিয়ে। ও ত দেখতে মন্দ কিছু নয়? রং ত তোমার চেয়ে ফরশাই আছে।"

পূর্ণিমা বলিল, "আমার কিছু আপত্তি ছিল না। কিন্তু মা যে বড় মেয়ের বিয়ে না দিয়ে ছোট মেয়ের বিয়ে কিছুতেই দেবেন না।"

দীপক এই সময় হাত-ঘড়ি দেখিয়া বলিল, "এবার উঠতে হয় আমায়।"

২

দীপক আর পূর্ণিমা একই পাড়ায় বাস করে, তবে খুব নিকট প্রতিবেশী নয়। একজনের বাড়ী হইতে আর একজনের বাড়ী পৌঁছিতে প্রায় চার-পাঁচ মিনিট লাগে। ছেলেবেলা হইতেই রাস্তাঘাটে, পার্কে তাহারা পরস্পরকে দেখিয়াছে। পূর্ণিমার চেহারা ভাল, কাজেই সে তরুণ দীপকের দৃষ্টি প্রথম হইতেই আকর্ষণ করিয়াছিল। দীপক সুন্দর নয়, তবে ভদ্র প্রকৃতির বলিয়া পূর্ণিমা তাহাকে লক্ষ্য করিত সর্ব্বদাই।

তবে আলাপ যে তাহাদের খুব অল্প বয়সেই হইয়াছিল তাহা নয়। একই কলেজে যখন ভর্ত্তি হইল, তখন কথাবার্ত্তা বলিতেও আরম্ভ করিল। এক সঙ্গে তাহারা ক্লাশ করিত না বটে, তবে মেয়েরা সকালের ক্লাশ সারিয়া যখন বাড়ী ফিরিবার জন্য ফুটপাথে নামিয়া আসিত তাহার আগে হইতেই ছেলের দল রাস্তা জুড়িয়া দাঁড়াইয়া যাইত। চোখে চোখে সারাক্ষণই পড়িত।

একদিন বৃষ্টির মধ্যে পূর্ণিমাকে বাহির হইতে দেখিয়া দীপক বলিল, "একটু দাঁড়িয়ে যান, একেবারে ভিজে যাবেন এখন ট্রামে উঠতে গেলে।"

একেবারে অপরিচিত হইলে পূর্ণিমা নিশ্চয়ই কথার উত্তর দিত না। কিন্তু এ কে, কাহাদের বাড়ীর ছেলে, কোথায় থাকে সবই তাহার জানা, কাজেই অত কড়াকড়ি করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। বলিল, "সহজে থামবে ব'লে ত মনে হচ্ছে না। বৃষ্টি শেষ হওয়া অবধি দাঁড়িয়ে থাকতে হ'লে ভয়ানক দেরি হয়ে যাবে।"

দীপক বলিল, "জলে ভিজে জ্বরে পড়লে, কলেজে ফিরতে তার চেয়েও বেশী দেরি হবে।"

এই ভাবে আলাপ আরম্ভ। ইহাতে আর ছেদ পড়িল না। আগে শুধু কলেজের রাস্তায় কথা হইত, এখন পার্কেও কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। পাড়া-প্রতিবেশীর নজর পড়িল এই দুই জনের উপর। মুখে মুখে কথা ছড়াইতে লাগিল।

মা একদিন পূর্ণিমাকে বলিলেন, "ওদের দীপকের সঙ্গে অত মেশামিশি করিস কেন? লোকে পাঁচ কথা বলতে সুরু করবে।"

পূর্ণিমা বলিল, "এক কলেজে পড়ি, বললামই বা কথা? আর ভারি ত মেশামিশি। পার্কে হাজার লোকের মধ্যে কথা বলি, না হয় রাস্তায় বা ট্রামে একটা কথা বলি। এর পর যখন চাকরি ক'রে খেতে হবে, তখন কথা না ব'লে পারব মানুষের সঙ্গে?"

মা বুঝিলেন, মেয়ে কথা শুনিবে না। সে ক্রমেই স্বাধীনচেতা হইয়া উঠিতেছে। সেদিন আর তিনি কথা বাড়াইলেন না। তাহার পর ত পূর্ণিমাকে বাধ্য হইয়া পড়া ছাড়িয়া দিতে হইল। পার্কে তাহাকে দেখিয়া দীপক বলিল, "পড়াটা ছেড়েই দিলে পূর্ণিমা? আর একটা বছর কোনমতে টেনেটুনে চালালে পরীক্ষা দিয়ে ফেলতে পারতে। চাকরির বাজারে গ্র্যাজুয়েটের যাও বা মান আছে, undergraduate-এর ত তাও নেই।"

ইহারা এখন পরস্পরকে নাম ধরিয়া ডাকে, "তুমি" বলিয়া সম্বোধন করে।

পূর্ণিমা বলিল, "না ছেড়ে করব কি? বাড়ীসুদ্ধ ত অনশনে আত্মহত্যা করতে পারি না? খেতে হ'লে আমাকে কাজ করতে হবে। মায়ের হাতে যা কিছু ছিল, তা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শুধু ওর উপর নির্ভর করলে আর দু' তিন মাসের বেশী চলবে না। এর মধ্যে আমাকে কাজ খুঁজে নিতে হবে।"

দীপক বলিল, "চট্ ক'রে যা পাওয়া যায়, তা হচ্ছে ছেলেমেয়ে প্রাইভেট্ পড়ানোর কাজ। আমি ত এখন তাই করছি সারাদিন ধ'রে। কলেজে নামে মাত্র যাই, পরীক্ষাটা আমায় দিতেই হবে।"

বেদনায় মুখ কালো করিয়া পূর্ণিমা বলিল, "আমার পড়াশুনো ঐ পর্য্যন্ত।"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া দীপক বলিল, "ভগবান্ যদি মুখ তুলে চান, তা হ'লে আমি তোমায় সাহায্য করব পূর্ণিমা।"

পূর্ণিমা বলিল, "ক'রো, তোমার কাছ থেকে সাহায্য নিতে আমার আপমান লাগবে না বোধ হয়।"

দীপক বলিল, "এর মধ্যে আবার 'বোধহয়' আছে নাকি কিছু? আমি কি শুধু একটা প্রতিবেশী ছেলে ছাড়া আর কিছুই নয় তোমার কাছে?"

পূর্ণিমা সোজা তাকাইল এবার দীপকের দিকে, বলিল, "না, তা নয়। সে ত তুমি জানই।"

দীপক বলিল, "জানি, কিন্তু এই যে কথাটা বললে নিজের মুখে, এও আমার আশ্চর্য্য ভাল লাগল।"

পূর্ণিমা শুধু একটু হাসিল। পরস্পরের মনোভাব তাহাদের জানাই ছিল। কিন্তু দুজনেই ত সংসারের বোঝায় ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে, হৃদয়ের ডাকে সাড়া দিবার সময় তাহাদের কোথায়? কিন্তু সময় নাই বা থাকিল? এ ডাক একবার হৃদয়ের ভিতর আসিয়া পৌঁছিলে আর ত ভুলিয়া থাকা যায় না? যাহা বাহিরের সংসারে এখন সম্ভব হইল না, অকরুণ ভাগ্যের অভিশাপে, কল্পনায় তাহাই তাহাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য হইয়া দাঁড়াইল।

সে ত দুই বৎসর আগের কথা। দিন তাহাদের একই ভাবে কাটিতেছে। দীপক আর পূর্ণিমার বাহিরের জীবনে খুব বেশী পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। এখনও তাহাদের দেখা করিবার জায়গা, পার্কে বা ট্রামে। দীপক তাহাদের বাড়ী আসে না, কারণ পূর্ণিমার মা তাহাকে একেবারে পছন্দ করেন না। পূর্ণিমা এই কপর্দ্দকহীন ছেলেটাকে হয়ত বিবাহ করিয়া বসিবে, ভাবিতেই তাঁহার বুক ভাঙিয়া যায়। তাঁহার হতভাগ্য জীবনে আশাভরসা আর কি-ই বা আছে? মেয়ে দু'টি তাঁহার দেখিতে ভাল, তাঁহাদের কুল উচ্চ, আত্মীয়স্বজনও অনেকেই সম্পন্ন অবস্থার। যদি কোন গতিকে পূর্ণিমা আর সরমার ভাল বিবাহ হইয়া যায়, তাহা হইলে যে তিনি মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন। ভাইকে তাহারাই মানুষ করিয়া তুলিবে। কিন্তু তাঁহার পূর্ণিমাকে গ্রাস করিতে কোথা হইতে এই রাহু আসিয়া জুটিল?

পূর্ণিমাও যায় না কখনও দীপকের বাড়ী। সেখানে তাহার জন্যও কোন সাদর আমন্ত্রণ নাই। দীপকের মা এই সব আধুনিক 'ধিঙ্গী' মেয়েদের পছন্দ করেন না। ইহারা ত প্রায় পুরুষ মানুষই? না আছে কোন লাজ-লজ্জা, না আছে কোন শ্রী। এমন মেয়ে বধূরূপে তিনি চান না। বাহিরে বাহিরে সারাদিন যদি চাকরি করিয়া বেড়াইবে, তাহা হইলে ঘর-সংসার, ছেলে-পিলে দেখিবে কে? তিনি জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত কি হাঁড়িই ঠেলিবেন? দীপক তাঁহার বড় ছেলে, সে যদি এইরকম মেয়ে বিবাহ করিয়া আনে, তাহা হইলে ঘর-সংসার ফেলিয়া নিশ্চয় তিনি কাশী চলিয়া যাইবেন। আজকালকার ছেলেদের পছন্দকেও বলিহারি! কি তাহারা চায় পত্নীর কাছে? তাঁহারও দুইটি মেয়ে আছে, যথাসাধ্য সুশিক্ষাই তিনি তাহাদের দিয়াছেন। ঘরকরণার কাজ, শেলাই-ফোঁড়াই সব জানে। কিন্তু নাচিতে গাহিতে জানে না, পুরুষের মত হট্ হট্ করিয়া আফিস আদালত ঘুরিতে পারে না; কাজেই কোন বরের তাহাদের পছন্দ হয় না। বাড়ীতে বসিয়া তাহারা বুড়ী হইতেছে। তাঁহার স্বামী নাই, ছেলের কোনও চেষ্টা নাই বোনদের বিবাহের জন্য। নিজে রস-কষ করিতে ব্যস্ত। তাহারই খাইয়া তিনি বাঁচিয়া আছেন, তাহাকে আর তিনি কি বলিবেন?

বুকের ভিতর থাকিয়া থাকিয়া পূর্ণিমা বড় শুষ্কতা অনুভব করে। কবে সে মানুষের মত করিয়া বাঁচিতে পারিবে? খাটিতে তাহার আপত্তি নাই, কিন্তু এই অনশনক্লিষ্ট মন লইয়া কতদিন খাটা যায়? শেষ পর্য্যন্ত শুধু খাটিয়াই মরিবে? কাহারও হাত ধরিতে পারিবে না? কাহারও বুকে মাথা রাখিতে পারিবে না? জীবনের ঊষায় মানুষ কত রঙীন স্বপ্ন দেখে, কিন্তু পূর্ণিমার চোখের সম্মুখে পৃথিবী ইহারই ভিতর মরুভূমির রূপ ধরিতেছে কেন?

জীবনযাত্রা তাহার বড়ই বৈচিত্র্যহীন। একটানা ক্লান্ত সুরে কাজের চাকা ঘুরিয়া চলিতেছে। সকালে

মেয়ে পড়াইতে যাওয়া, তার পর তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া ইস্কুলের জন্য প্রস্তুত হওয়া। আবার ইস্কুলেরই ফাঁকে স্টেনোগ্রাফি শিখিতে যাওয়া। বিকালে বাড়ী ফিরিয়া ক্ষুধার অন্ন হয়ত ভাল করিয়া কিছু জোটে না, তবে হৃদয়ের ক্ষুধা একটু হয়ত মেটে। দীপকের সঙ্গে দেখা হয়, কথা হয়। এইটুকুই। দীপকও ক্রমে যেন মুষড়াইয়া পড়িতেছে। উৎসাহের কথা, আশার কথা সে বলিতে পারে না কেন? পূর্ণিমা নারী, কিন্তু তাহার মনে যতটুকু সাহস আছে, দীপকের কি তাহাও নাই?

অসহ্য গরম পড়িয়া গেল দেখিতে দেখিতে। ইস্কুলের কাজে মাহিনা কম, তবে খাটুনিও কম। আজকাল বেলা দীর্ঘতর হইয়াছে। সাড়ে চারটার মধ্যে বাড়ী আসিলে অনেকক্ষণ সময় হাতে পাওয়া যায়, রাস্তার আলো জ্বলিয়া উঠিবার আগে। পূর্ণিমা পার্কে আজকাল একঘণ্টা কাটাইয়া আসে, আগে যেখানে আধ ঘণ্টা কাটাইত। সুরবালার মুখটা বড় অপ্রসন্ন হইয়া ওঠে এই সময়।

আজ ইস্কুল হইতে ফিরিয়া পূর্ণিমা দেখিল মা অসময়ে শুইয়া আছেন। ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে মা?"

মা বলিলেন, "খুব কিছু নয়, তবে মাথাটা একটু ধরেছে, গাটা জ্বর জ্বর করছে।"

পূর্ণিমা বলিল, "চুপ ক'রে শুয়ে থাক তা হ'লে, একেবারে উঠো না। যা করবার আমরাই করছি," মনটা তাহার একটু ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল, আজ আর তাহা হইলে বোধ হয় পার্কে যাওয়া যাইবে না। দীপক আসিয়া বসিয়া থাকিবে, তাহার পর এক সময় উঠিয়া চলিয়া যাইবে।

মা বলিলেন, "খুব একটা কিছু করতে হবে না। শরীর ভাল ঠেকছিল না ব'লে দুপুরেই আমি ডাল তরকারি রান্না ক'রে ঠাণ্ডা জলে বসিয়ে রেখেছি। শুধু ভাতটা ক'রে নিবি, সেই সঙ্গে দুটো আলু ভাতে দিয়ে নিস্। চায়ের জল বসিয়ে ঝি বাজারে গেছে খই-মুড়ি আনতে, চা টা ক'রে নিতে হবে।"

পূর্ণিমা বলিল, "আচ্ছা।" বাহিরের কাপড় বদ্‌লাইয়া সে চা তৈয়ারি করিবার জোগাড় করিতে লাগিল। সরমা আসিয়া পৌঁছিল, ঝিও আসিল। রণেনেরই বরং আজ দেরি হইল।

পূর্ণিমা বলিল, "খাব ত সেই আটটায়। এত আগে ভাত ক'রে হবেই বা কি? একটু ঘুরে আসি, তার পর সময় মত ভাত চাপালেই হবে।"

সরমা উদারভাবে বলিল, "তুমি যাও না। সারাদিন যা ভূতের মত খাটো। শুধু ভাত ত? সে আমি ক'রে নেব এখন।"

মা বলিলেন, "অল্প অল্প ক'রে সব শিখে নেওয়া ভাল, তোমারও ত একদিন দরকার হবে? কি আর এমন রাজা-বাদশার ঘরে যাবে?"

সরমা বলিল, "কারো ঘরে যদি নাও যাই, তা হ'লেও ত ভাত রেঁধেই খেতে হবে? তুমি কি আর চিরকাল রেঁধে দেবে? বুড়োও ত হচ্ছ?"

ছাড়া কাপড়-চোপড় গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে পূর্ণিমা ভাবিল, সত্যই মায়ের কি সুখের জীবন। হাড়ভাঙা খাটুনি, আর অনশন ও অর্দ্ধাশন। কত আরামে কাটিয়াছে তাঁহার বাল্য ও যৌবন। হঠাৎ ভগবান্ তাঁহাকে কোথা হইতে কোথায় ফেলিয়া দিলেন। পূর্ণিমা নিজে ত এখন অভাবপীড়িত, কোনদিন তাহার জীবনে পরিপূর্ণতা আসিবে কি?

পার্কে আসিয়া দেখিল, দীপক তখনও আসে নাই। যেখানে তাহারা সচরাচর বসে, সেখান হইতে একটু দূরে বসিয়া সে অপেক্ষা করিতে লাগিল। হঠাৎ চমকাইয়া দেখিল, দীপকের মা আর দুই বোন বেড়াইতে আসিয়াছেন। পূর্ণিমার খুব কাছে নয়, একটু দূরেই বেড়াইতেছেন। ইঁহাদের বিশেষ কখনও বেড়াইতে বাহির হইতে দেখা যায় না। আজ হয়ত গরমের আতিশয্যে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন, অন্য কোন কারণও থাকিতে পারে। তাহাকে দেখিলে কথাবার্ত্তা বলিবার চেষ্টা নিশ্চয়ই করিবেন না, কারণ পূর্ণিমার সঙ্গে দীপক কোনদিনই মা-বোনদের আলাপ করাইয়া দেয় নাই। তবু সে পিছন ফিরিয়া বসিল।

মিনিট পনেরো-কুড়ি পরে তাঁহারা চলিয়া গেলেন। এতটা সময় নষ্ট হওয়াতে পূর্ণিমা মনে মনে খুবই বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। তবে উঁহারা চলিয়া যাইবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই দীপক আসিয়া উপস্থিত হইল।

পূর্ণিমা বলিল, "কি, আজই এত দেরি যে? আমায় আজ আবার তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।"

দীপক বলিল, "মা আর বড়কী-ছুটকীর হঠাৎ আজ বেড়াতে বেরোবার সখ হ'ল। ওদের চোখের সামনে বসে তোমার সঙ্গে গল্প করা ত চলবে না? তাই ওরা ফিরে গিয়েছে দেখে তবে আমি বেরোলাম।"

পূর্ণিমা বলিল, "মাকে তুমি ভয়ানক ভয় পাও, না?"

দীপক একটু থামিয়া বলিল, "মাকে ভয় করি ঠিক নয়, তবে অশান্তিকে ভয় করি। সেটা কি তুমিও কর না? আমাকে কোনদিন ত বাড়ীতে যেতে বল না?"

পূর্ণিমা স্বীকার করিল, "তা বলি না বটে। অশান্তি আর কে চায় বল ?"

দীপক বলিল, "চায় না কেউ-ই। আর এখন ও সব নিয়ে চেঁচামেচি ক'রে হবেই বা কি ? পাকাপাকি কিছু হতে এখনও ঢের দেরি।"

পূর্ণিমা বলিল, "আচ্ছা দীপক, ধর কথার কথা, যদি কখনও তোমার বিয়ে করবার মত অবস্থা হয়, তখন কি করবে তুমি ?"

দীপক বলিল, "বিয়ে করব, আবার কি করব ?"

পূর্ণিমা বলিল, "আমাকে বিয়ে করবে ? তোমার পরিবারে আমার জায়গা হবে ?"

দীপক ম্লানভাবে একটু হাসিয়া বলিল, "বিয়ে করব আমি, তা আমার পরিবারে জায়গা হবে না ত কোথায় হবে ?"

পূর্ণিমা বলিল, "তোমার মা কিছুতেই রাজী হবেন না। ভীষণ গণ্ডগোল বাধবে।"

দীপক বলিল, "বোঝাপড়া তখন একটা করতেই হবে। এক সঙ্গে থাকা ছাড়া আর কি উপায় আছে বল ? দুটো সংসার চালাবার মত আয় আমি কোনদিনই করতে পারব না। আপোস একটা হবে। তুমি কিছু ছাড়বে, তিনি কিছু ছাড়বেন।"

পূর্ণিমা বলিল, "আমি কি ছাড়ব ? কি তুমি expect করবে আমার কাছে ?"

দীপক একটু ভাবিয়া লইয়া বলিল, "বাইরে গিয়ে চাকরি করাটা চলবে না। ওটা বাদ দিতে হবে। তবে ঘরে ব'সে কাউকে যদি পড়াও তাতে আপত্তি করতে পারবেন না।"

পূর্ণিমা ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল, "আর তোমার মা কি ছাড়বেন ?"

দীপক বলিল, "বিনাপণে ছেলে বিয়ে ক'রে বৌ আনবে, সেটা সহ্য করতে হবে। বাড়ীর মধ্যে তুমি যেভাবে চলতে অভ্যস্ত সেই ভাবেই চলবে, মা তাতে আপত্তি করতে পারবেন না।"

পূর্ণিমা বলিল, "আচ্ছা দীপক, আমি যে চাকরি ছেড়ে দেব, তা আমার মা, ভাই-বোন এদের কি হবে ?"

দীপক বলিল, "আজই ত আমরা বিয়ে করছি না ? ততদিনে সরমা তৈরি হয়ে নেবে, সে তোমার জায়গা নেবে আর কি ?"

পূর্ণিমা বলিল, "তার তৈরি হতেও অন্ততঃ তিন বছর, আর খোকার অন্ততঃ সাত বছর। নাঃ, প্রস্পেক্টটা খুব লোভনীয় মনে হচ্ছে না।"

দীপক মুখটা কালো করিয়া বলিল, "অপেক্ষা করা ছাড়া আর কি করা যায় বল ? তুমি কি আর কোন plan ভেবে পাও ?"

পূর্ণিমা বলিল, "বেশ অনেকক্ষণ ধ'রে ভাবলে কিছু যে একটা না বার করা যায়, তা নয়। এবার সেই চেষ্টাই দেখতে হবে। কিন্তু তোমার আমার মতে যে মেলে না ? আমি যেটাকে সম্ভব মনে করব, তুমি হয়ত সেটাকে একেবারেই অসম্ভব বা অনুচিত মনে করবে।"

দীপক বলিল, "ব'লেই ত আগে দেখ। তখন বোঝা যাবে, আমি অনুচিত মনে করি কি না করি। কিন্তু তুমি এখনই ওঠার জোগাড় করছ কেন ?"

পূর্ণিমা বলিল, "মা বড় অসুস্থ। কাজেই রান্নাবান্না একটু দেখতে হবে।"

দীপক বলিল, "কি হ'ল আবার তাঁর ? আমাদের বাংলা দেশের বিধবারা নিজেদের উপর যা অত্যাচার করেন, তাতে তাঁরা একদিনও যে ভাল থাকেন, সেই আশ্চর্য্য। আমার মাকে দেখ, সকাল থেকে খালি কি যে হটর-পটর ক'রে বেড়ান, তিনটার আগে তাঁর না হয় নাওয়া, না হয় খাওয়া। অথচ কি যে এত কাজ বুঝি না। রান্না ত ডাল ভাত আর বড় জোর শাক চচ্চড়ি, জলখাবার সকালে আটার রুটি, বিকেলে কিছুই না। ঘর ত দু'খানা, পরিষ্কার করতে দিন কেটে যাবার কথা নয়, পরিষ্কার বিশেষ করা হয়ও না। বোন দুটোও সারা দিন কি যে করে বুঝতে পারি না। ভূতের মত সেজে মায়ের পিছন পিছন ঘোরে। তা তোমার মায়ের কি জ্বর হয়েছে ?"

পূর্ণিমা বলিল, "জ্বরই, যদিও দেখতে দিলেন না। বড় ভয় করে মায়ের জন্যে। তিনি আছেন ব'লে, তবু একটা সংসারের মতো বজায় আছে। নইলে কে কোথায় ভেসে যেতাম কে জানে ? বড় বেশী খাটুনি ওঁর, এবং খাওয়া-দাওয়াও কিছু করেন না। একবেলা দুটো ডাল ভাত খেলেই কি মানুষের শরীর থাকে ? এক ফোঁটা দুধ সুদ্ধ তাঁকে দেবার উপায় নেই। এদিকে সব ভদ্রতা বজায় রাখতে হবে, পাকা বাড়ীতে থাকতে হবে, কাপড়-জামা পরে থাকতে হবে, খাটে শুতে হবে, কিন্তু অন্য দিকে হাঁড়ি যে শিকেয় উঠছে তা আর কে দেখতে আসছে বল ?"

দীপক বলিল, "আজকাল খোলার ঘর, টিনের ঘরও খুব সস্তা নয় পূর্ণিমা। কাজেই রাগের মাথায় যদি এ ঘর ছেড়ে দিয়ে ঐরকম কোন জায়গায় যাবার চেষ্টা কর, তাতেও কোন সুবিধা হবে না।"

পূর্ণিমা বলিল, "ভগবান্ এরকম বেড়া আগুনের মধ্যে ফেলেন কেন মানুষকে? কোনদিকে কোন উপায় নেই?"

দীপক বলিল, "তবে আর জীবনসংগ্রাম কথাটার উৎপত্তি হয়েছে কেন? এই যুদ্ধ করতে করতেই যদি কোন পথ পাওয়া যায়। অনেক মানুষ জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধই ক'রে যায়, কিন্তু খুঁজে কিছুই পায় না। তাদের কথা ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করি।"

পূর্ণিমা উঠিয়া পড়িল। বলিল, "তুমি খুব ভাল ছেলে দীপক, তোমার সান্ত্বনা পাওয়া সহজ। আমি যুদ্ধ করতে ভয় পাই না, কিন্তু আমার চেয়েও দুর্ভাগ্য মানুষ আছে ভেবে আমার কোন সান্ত্বনা নেই। আমার চেয়েও যারা ভাল আছে, তাদেরই কথা ভাবি। তারা কোন্ গুণে এত সৌভাগ্যবান্ হ'ল?"

দীপক বলিল, "মনে হচ্ছে যেন আমাকে ঠাট্টা করছ।"

পূর্ণিমা বলিল, "ঠাট্টা আমি কাউকেই করছি না। হয়ত নিজেকে করছি। কিন্তু আজ আর সময় নেই. আমি চললাম এখন।"

বাড়ী আসিয়া দেখিল, সরমা সবে ভাত চড়াইয়াছে। মা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। রণেন রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া সরমার সঙ্গে কি বিষয়ে গভীর আলোচনায় মত্ত। পূর্ণিমা কাছে আসিয়া বলিল "কি নিয়ে এত তর্ক হচ্ছে?"

রণেন বলিল, "আচ্ছা, তুমিই বল না দিদি। রোজ ডাল-ভাত এক তরকারি খেতে ভাল লাগে মানুষের?"

পূর্ণিমা বলিল, "কিছু না খেতে পাওয়ার চেয়ে ভাল লাগে।"

রণেন বলিল "আহা, ও আবার একটা কথা হল নাকি?"

পূর্ণিমা বলিল, "আচ্ছা, কথা নাই হ'ল, কিন্তু তুমি এখানে দাঁড়িয়ে ছোড়দির সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছ কেন? পড়াশুনো নেই?"

রণেন বলিল, "যা একটু আছে ভোর বেলা উঠে ক'রে নেব। সব সময় বইয়ে মুখ গুজড়ে ব'সে থাকতে ভাল লাগে না। মাথা ঘোরে, চোখ ঘোলা.হয়ে যায়।"

পূর্ণিমা বলিল, "এও ত এক নূতন কথা শুনছি। মাথা না হয় ধরে, চোখ কেন ঘোলা হবে? কৈ, আমাদের ত কখনও হয়নি"

রণেন কথার উত্তর না দিয়া সেখান হইতে সরিয়া গেল।

ভাত হইয়া গেল, খাওয়া-দাওয়া চুকিল খানিক পরে। মা কিছু খাইতে চাহিলেন না। তাঁহার সঙ্গে খানিক তর্কাতর্কি করিয়া মেয়েরা শেষে বাতি নিভাইয়া শুইয়া পড়িল।

দীপকের কথা থাকিয়া থাকিয়া পূর্ণিমার মনের মধ্যে খেলিয়া যাইতে লাগিল ছেলেটির উচ্চাকাঙ্ক্ষা বলিয়া কোনও জিনিস নাই নাকি?

(ক্রমশঃ)
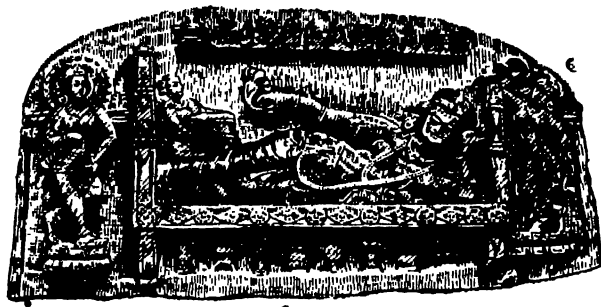
ভুলের মাশুল

শ্রীসমর বসু

ঘরের দাওয়ায় ব'সে ব'সে বাঁশী বাজাচ্ছিল চন্দন। একটা বাউল গানের সুর। গত বছর চৈত সংক্রান্তির মেলায় চড়কতলায় কোথা থেকে একটা বাউল এসেছিল, তারই মুখে শুনেছিল গানটা। কথাগুলো মনে নেই, সুরটা কিন্তু লেগে আছে কানে। অনেক দিন ধ'রে ভেঁজে ভেঁজে তবেই সেই সুরটা আড়বাঁশীতে তুলতে পেরেছে চন্দন। একমনে বিভোর হয়ে বাঁশী বাজিয়ে চলেছে। খেয়াল নেই রাত কত হ'ল।

ক্ষেত-খামারের কাজ সেরে সন্ধ্যার আগেই রোজ বাড়ী ফেরে চন্দন। গা-হাত ধুয়ে এসে কোনও দিন চারটি ভাত খায়, কোনও দিন প্যাঁজ মুড়ি আর একটু চা। তার পর দাওয়ায় এসে ব'সে ব'সে বাঁশী বাজায়। বাজাতে বাজাতে যখন ঘুম আসে তখন সোজা চ'লে আসে রান্নাঘরে। উনুন থেকে একটা নিভু নিভু কাঠ বের ক'রে নিয়ে বিড়ি ধরায়। কোলের ছেলেটাকে বুকে নিয়ে ঠিক সেই সময় সদু ও উঠে আসে ঘর থেকে। ঘুম জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস ক'রে—কি—এতক্ষণে বুঝি পেটের জ্বালা ধরল!

বিড়ির ধোঁয়া আচমকা আটকে যায় গলায়—কাশতে কাশতে জিজ্ঞেস করে,—কি রেঁধেছিস!

রোজের মত আজও সদু ঝেঁজে ওঠে,—যা জোটাচ্ছ তাই। আমি ত আর হাটবাজারে যাই না, পয়সাও রোজগার করি না।—এখন খাবে, না, রাত দুপুরে ন্যাকরা করবে।

চন্দন কিন্তু রাগ করে না। এই সময়টা ও কিছুতেই রাগতে পারে না। রাগ করতে ইচ্ছেও করে না। কিসের খুশিতে মনটা যেন টল্‌টল্ করে। বাঁশীর সুরটা মনটাকে মাতাল ক'রে রাখে। সদুর কোল থেকে ছেলেটাকে নিজের বুকে টেনে নেয়। টেনে নিয়ে বলে,—তুই ঠাঁই কর,'আমি একে শুইয়ে আসি।

আসলে মানুষটা কিন্তু মন্দ নয়,—ভাত বাড়তে বাড়তে সদু ভাবে।—বেশ নিজেকে নিয়ে ভুলে থাকতে পারে। পাড়ার আর পাঁচটা মানুষের মত নেশাভাঙ কিছু করে না। অন্য কোনও বদখেয়ালও নেই। এ্যাদ্দিন ত ঘর করছি, একদিনের তরেও গায়ে হাত তোলে নি।—কিন্তু আরও দু'পয়সা রোজগার করতে পারে ত। দড়ি পাকাতে পারে, কিংবা ঘুনি বুনতে পারে,—তা নয় শুধু ব'সে ব'সে বাঁশী ফোঁকা। তাও যদি যাত্রাদলে যেত,—পাড়ার পাঁচ জনে দেখত। তা নয় শুধু ঘরের কোণে ব'সে থাকা। ঘরকুণো ব্যাটাছেলে দু'চক্ষের বিষ।—সেবারে ওরা কত সাধাসাধি ক'রল অর্জুন করবার জন্যে। বাবুর অমনি দেমাক হ'ল। চেহারাটা ভাল, তাই লোকে সাধাসাধি করে। ঘটে ত আর কিছু নেই।—পাঁচকড়ি পরামাণিকের ছেলে মন্মথ,—করল অর্জুন। যেমন হাড়গিলে মার্কা চেহারা, তেমনি ঘড়ঘড়ে গলা। ওর জন্যেই ত সব মাটি হয়ে গেল। এবারের গাজনেও ত একটা পালা হবে শুনছি।—এবার কিন্তু ওরা আর বলতে আসে নি। কেনই বা আসবে? ঢের ঢের মানুষ দেখেছি বাপু, এমন বে-আক্কেলে দুটো দেখি নি।

মনে মনে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে চন্দন উঠোনে এসে বসে। লণ্ঠনের আলোটাকে একটু বাড়িয়ে দেয়। চন্দনের সামনে দুম্ ক'রে ভাতসুদ্ধ থালাটা বসিয়ে দিয়ে সদু চলে যায় ঘরে, দুগ্‌গাটাকে ডেকে তুলতে হবে। ঘুমিয়ে পড়লে মেয়ের জ্ঞান থাকে না। ঘুম থেকে উঠে কিছুতেই খেতে চায় না। অথচ বাপের সঙ্গে খাবে ব'লে ঠায় ব'সে থাকে। তার পর কখন ঘুমিয়ে পড়ে। বাপের সে-দিকে একটুও খেয়াল আছে? মেয়েটার বয়স হচ্ছে —কাপড় দরকার, ব'লে ব'লেও সদু সেটা আনাতে পারে নি। বলতে গেলেই বলে, ওর চেয়ে কত ধিঙ্গি মেয়ে জামা প'রে ঘুরে বেড়ায় দেখতে পাও না! ভদ্দর লোকেদের মেয়েরা বুঝি আর মেয়ে নয়।—শোন কথা। ভদ্দর লোকেরা যা করবে, ওকেও তাই করতে হবে? ওদের পয়সা আছে, ওরা লেখাপড়া জানে। ওরা যা করে তাই মানিয়ে যায়। ওদের সঙ্গে কি আমাদের কোনও তুলনা হয়! ছোট মুখে অত লম্বাচওড়া কথা যে কি ক'রে আসে সদু বুঝে উঠতে পারে না। সদু কতদিন বলেছে, একজোড়া হেলে আর একটা লাঙ্গল কিনতে। দরকার হলে কানের মাকড়ি জোড়া, আর দু-গাছা চুড়িও না হয় খুলে দেবে সদু। ঘরে লাঙল-গরু থাকলে আবার ভাবনা! অসুখ-বিসুখেও দু'দিন কাজে না বেরলেও ক্ষেতি নেই।

কিন্তু মানুষটার সেদিকেও কোনও হুঁশ আছে? পরের মজুর খেটে খেটে হাড়-মাস কালি হয়ে গেল, তার ওপর রাতদুপুর পর্য্যন্ত বাঁশী ফোঁকা। সংসারে কি আছে কি নেই সে-সব খবর কিছু রাখে? শ্বশুর-শাশুড়ী, দেওর-ভাসুর কেউ নেই তাই রক্ষে; নইলে অমন সোয়ামীর ঘর করতে পারত না সদু! নিজের পরিবারের যে খবর রাখে না, সে আবার কিসের সোয়ামী।

দুগ্‌গার হাত ধ'রে টানতে টানতে ওর বাপের সামনে বসিয়ে দিয়ে সদু রান্নাঘরে চ'লে যায়। ওর ভারী ভারী পা-ফেলার শব্দ থেকে চন্দন সব বুঝতে পারে। তাই মেয়েকে সান্ত্বনা দিতে দিতে পরোক্ষে বউকেই শান্ত করবার চেষ্টা করে। খেয়ে-দেয়ে ঘুমুলেই ত পারিস। রোজ-রোজ ডেকে খাওয়ান। নে, কাঁদিসনে, খেয়ে নে!

সদু কিন্তু আরও চ'টে যায়—সকাল সকাল খাবে কি! সন্ধ্যে থেকে বায়না ধ'রে বসে আছে, বাপের সঙ্গে খাবে। মেয়ের ওপর বাপের টান ত কত! মেয়েই বাবু বাবু ক'রে সারা।

—তা আমাকে কি করতে বলিস! চন্দন আর পারে না। একটু কর্কশ হয়ে ওঠে। সদু এতে বরং একটু খুশি হয়। বোবা হয়ে থাকলেই বিপদ্। বোবার সঙ্গে আবার ঝগড়া করা যায় নাকি! এবার সে দু'কথা বলতে পারবে। এতক্ষণে নিজের মনে মনেই গজরাচ্ছিল, তবুও চন্দনের ভাতের থালার দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে নেয় সদু। রাগ ক'রে ভাতের থালা উপুড় করা আবার অভ্যেস আছে মানুষের। খাওয়া না হ'লে,—সদুরও রাত কাটবে উপোসে। আর সে অশান্তির বোঝা কতদিন যে টেনে টেনে চলতে হবে কে জানে। ঝগড়া করা সদুর উদ্দেশ্য ত নয়, মানুষটাকে দুটো কথা বুঝিয়ে বলা।—কাঁসিতে নিজের ভাত বেড়ে নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে সদু। চন্দনের সামনে এসে বসে।

সেই থেকে তুই অত গজ গজ করছিস কেন বল্ ত! —চন্দনই আগে বলতে সুরু করল। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটনি খেটে এসে বাড়ীতেও যদি মুখঝামটা খেতে হয়, তা হ'লে একদিন—

কথাটা শেষ করতে দিল না সদু,—বললে—মুখঝাম্‌টা আবার কি। যা সত্যি তাই বলছি। সকাল সকাল খেয়ে নিলে, মেয়েটাও পেট ভ'রে দুটো খেতে পারে। এই ঘুম-চোখে ন্যাকড়-চ্যাকড় ক'রে খাওয়া! এতে কি আর গা-গতরে গত্তি লাগে। এরপর ত বিয়ে-থা দিতে হবে! কি দেখে তোমার মেয়েকে তারা ঘরে তুলবে? আমাদের গরীব গেরস্তের ঘরে মেয়েমানুষের গতর গেল ত সব গেল।

কি বলতে গিয়ে কি সব ব'লে ফেললে সদু! দুগ্‌গার বে'র কথা একটু আগেও মনে করে নি সে। ইচ্ছে ছিল চন্দনকে বলবে বাঁশী বাজান বন্ধ ক'রে যাতে আরও দুটো পয়সা ঘরে আসে সেই চেষ্টা দেখতে।—দুগ্‌গার বে'র কথা উঠতে, সব কেমন জল হয়ে গেল। ফিক্ ক'রে হেসে ফেললে চন্দন,—বললে, তুই আবার শাউড়ী হবি সদু! জামায়ের সামনে বেরুবি! কথা কইবি!—না একহাত ঘোমটা টেনে ফিস্ ফিস্ করবি? আমাকে দেখে তোর মা যেমন করত?

সদুও এবার হেসে উঠল। জিজ্ঞেস করল—আর দু'টি ভাত দেব?—চন্দন ঘাড় নেড়ে জানাল, না।

সদু ভাবল, ভালই হ'ল,—রেগে-মেগে না ব'লে এবার সে বুঝিয়ে বলতে পারবে। দুগ্‌গার বে নিয়েই কথাটা পাড়া যাবে। এবার থেকে কিছু কিছু টাকা জমাতে হবে,—বুঝলে। খরচা-খরচি ত আছে।

—কিসের খরচা!

—খোকার ভুজনোর খরচা, দুগ্‌গির বে'র খরচা।

গলার মধ্যে আলগোছে ঘটির সমস্ত জলটা ঢেলে দিয়ে—চন্দন ঢেঁকুর তুলতে লাগল। সদু বললে, বাড়তি কিছু রোজগার না করলে, পয়সা জমবে কি ক'রে?

—বাড়তি রোজগার? সে আবার কি? রাত-বিরেত খাটব নাকি।

রাত-বিরেত কেন? সাঁঝের বেলায় ইষ্টিশনের ধারে ত বাজার বসে। ক্ষেতের শাক-পাতাটা নিয়ে গিয়ে বসতে পার ত। দু'কাঁদি কলা পুরুষ্টু হয়েছে। থোড়-কলা, তার সঙ্গে দুটো লাউ-কুমড়ো শাক। কিছু কলা-পাতাও সঙ্গে নিতে পার। লোক বেড়েছে কত বুঝতে পার না। ইষ্টিশানের ধারে কত নতুন নতুন বাড়ী হয়েছে শুনছি। বাগানের তাজা শাক বাজারে পড়তে পায় না। বিকেলের দিকে আমিও যখন গা ধুতে যাব, চাট্টি কলমী শাক তুলে আনব'খন।

—তাতে তোর ক'পয়সা হবে শুনি?

—যা হয়, তা-ই বা আসে কিসে?

—তা ত বুঝলাম, কিন্তু সন্ধ্যে বেলায় ঘরে ঢুকলে আর বেরুতে ইচ্ছে করে না। আর ইষ্টিশান কি এখানে? পো-তিনেকের পথ। বিক্রিশুদ্ধ চুকিয়ে ফিরতে সেই যার নাম রাত ন'টা। অত রাত পর্য্যন্ত ঘরে তোরা একলা থাকবি।

—একলা আবার কি। আশ-পাশে ত কত লোক রয়েছে। আমার অমন ভয়ডর নেই।

—কিন্তু দিনকাল ভারী খারাপ, বুঝলি। কে কি

মতলবে গোরে কিছু বোঝা যায় না।…নে, তুই খেয়ে নে। রাত অনেক হয়েছে।

চন্দন উঠে পড়ল, একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে আবার গিয়ে বসল বাইরের দাওয়ায়। বাঁশীটা প'ড়ে রয়েছে, তুলে নিয়ে কোঁচার খুঁট দিয়ে মুছে, সেটাকে বাতায় গুঁজে রাখল।

পরদিন থেকে একবারে বদ্‌লে গেল চন্দন। সকাল সকাল ফিরে এল কাজ থেকে। চারটি ভাত খেয়ে গামছাটা বেঁধে নিল কোমরে। বাগান থেকে নিয়ে এল গোটা দুয়েক কুমড়ো, কিছু শাক আর এক কাঁদি কলা। বড় ঝুড়িটা ভর্তি ক'রে নিয়ে মাথায় তুলে নিল বোঝাটা। যাবার সময় ব'লে গেল—সাবধানে থাকিস দুগ্‌গির মা। রাত হলেই দোরে আগড় দিয়ে শুয়ে পড়িস।

একটু বোধহয় আঘাত লাগল সদুর মনে। আহা এই খাটাখাটি ক'রে এল। তা হোকগে, সবাই ত এই কাম করছে। না করলে চলবে কি ক'রে? কি দিনকাল পড়েছে! সদু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল দাওয়ায়। খুঁটিটা ধ'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, চন্দন কলা-বাগানের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়ল। মাথার ঘোমটা খুলে গেছে, সে-খেয়াল নেই। চন্দনের চওড়া পিঠে কত খাঁজ পড়েছে, এখনও গায়ে জোর কি কম? কোলের ছেলেটা হামা দিয়ে এসে এতক্ষণ ওর পা আঁচড়াচ্ছিল। চন্দন চোখের আড়াল হতেই, ওকে কোলে তুলে নিল সদু। চুমো খেতে খেতে ওকে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

ক্রমশঃ সবই সয়ে গেল। সন্ধ্যে বেলায় ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই চার-পাঁচ টাকা ক'রে রোজগার করা চাট্টিখানি কথা নয়। সদু-চন্দন দু'জনেই ওরা উঠে প'ড়ে লাগল। টাকার নেশা। টাকা জমাবার নেশা। চন্দনই শুধু খাটাখাটি করে না। আজকাল সদুও ওর সঙ্গে হাত লাগায়। নিজের হাতেই ও আনাজপাতি তুলে নিয়ে আসে। বিকেল বেলায় চন্দনকে একটু জিরোবার অবকাশ দেয়। নিজেই বাজরা সাজায়। চন্দন ব'সে ব'সে দেখে, সদু যেন একটু চকচকে হয়েছে। গা-গতরে মাংস ধরেছে। ভেতরটা চন্‌ চন্‌ ক'রে ওঠে। মনে পড়ে যায় বিয়ের কথা। চাঁদনের বৌ চাঁদপানা হয়েছে—যেন হর-গৌরী। পাড়াপড়শীর কথা মনে প'ড়ে যায়। এতদিন এসব কথা ভুলে গেছল চন্দন। আজ হঠাৎ মনে প'ড়ে যেতেই বুকটা যেন ধড়াস ক'রে উঠল। অনেক রাত পর্যন্ত একলা থাকে দুগ্‌গির মা। সবাই ত জানে চাঁদন গেছে ইষ্টিশানে। কেউ যদি আগড় ঠেলে ঢোকে। এমন সর্বনেশে রূপ।…চন্দন শিউরে উঠল। বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সদুকে ডাকল।

বলল, বাজরা আজ সাজাতে হবে না, শরীরটায় জুত নেই।

—সে কি গো এত আনাজপাতি যে নষ্ট হয়ে যাবে!

—তা ত সত্যি কথা! অনেক টাকার জিনিষ। চন্দন একবার ভাবল। শোন্‌—আজ সন্ধ্যা হলেই মোড়ল বাড়ী চ'লে যাস, বুঝলি—ফেরবার মুখে তোকে ডেকে নিয়ে আসব! ব'লেই, মাথায় তুলে নিল বাজরাটা।

—সে কি! দুগ্‌গি কোথায় থাকবে!

—ওদের সকলকেই নিয়ে যাবি। ঘরে চাবি দিয়ে যাবি।

—তার পর, কেউ যদি তালা ভেঙে ঢোকে? জান, ঘরে কত টাকা আছে!

মাথা থেকে বাজরাটা নামিয়ে উবু হয়ে ব'সে পড়ল চন্দন। বিঁড়েটা খুলে হাওয়া খেতে লাগল। তার পর বাজরাটা আবার মাথায় তুলে নিয়ে বলল, আমি যাবার সময় মোড়লপিসীকে ব'লে যাচ্ছি। সন্ধ্যাবেলায় সে এসে থাকবে। ঘরে একা মেয়েমানুষ থাকা ভাল নয়।

তবুও সন্দেহটা খচ্‌ খচ্‌ করতে লাগল। মাছের কাঁটা গলায় আটকে থাকলে যেমন খাবার-দাবার কিছুই ভাল লাগে না, সব সময় শরীরটা হাঁচড়-পাঁচড় করে—তেমনি অস্থির মন নিয়ে ইষ্টিশানের দিকে একটু একটু ক'রে এগোতে লাগল চন্দন। একবার ভাবল, বাজরা ফেলে ছুটে একবার ঘরে গিয়ে দেখে আসি—একা একা দুগ্‌গির মা কি করছে। সেই লোকটা চন্দনের খোঁজে ওদের বাড়ী আসতে পারে ত?—যাত্রাদলের কানাই-মাষ্টার। চোখ দু'টো লাল লাল। মাথায় এক ঝাঁকড়া চুল। ও-পাড়ার যতেকাকার কুটুম। ওদের বাড়ীই থাকে ক'টা মাস। গাজনের আগে আসে। সারা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস ধ'রে এখানে-সেখানে যাত্রা ক'রে বেড়ায়। চন্দনকে তার নাকি খুব ভাল লাগে। অনেকবার বলেছে ওর দলে ঢুকতে। চন্দন রাজী হয় নি। লোকটাকে দেখেই মনে হয় বদমাইস। রাতদিন নেশাভাঙ ক'রে প'ড়ে থাকে। মুখে খালি মেয়েমানুষ-দের কথা। দুগ্‌গির মা লোকটাকে চেনে। মাষ্টার যদি আসে, হয়ত দোর খুলে দেবে। ওর আবার ভারী যাত্রার সখ। চন্দন যাত্রা করে না বলে ওর কত রাগ। লোকটা যদি ঘরে ঢুকে পড়ে? কাপড় দিয়ে হয়ত বেঁধে ফেলবে ওর মুখটা, সদু চেঁচাতেও পারবে না। ছেলেমেয়েরা হয়ত ঘুমিয়ে থাকবে!…

ভেতরে আগুন জ্বলতে লাগল চন্দনের। ভাবল, তাড়াতাড়ি মালগুলো একটু কম দরে পাইকেরদের কাছে ফেলে দিয়ে এখনই ফিরে আসতে হবে। তাড়াতাড়ি পা চালাল চন্দন। সারা শরীর বেয়ে ঘাম গড়াচ্ছে। মাথার বোঝা নামিয়েই পাইকেরদের ডাকল। বাজরা খুলে তারাই সব মালপত্তর নামিয়ে রাখল। লম্বা মোজার মত থলেতে নোট আর খুচরোগুলো পুরে নিয়ে পেট-কাপড়ে বেঁধে ফেলল চন্দন। সামনের টিউবওয়েল থেকে পেট ভ'রে জল খেল। হাতে মুখে কাঁধে জল চাপড়াতে লাগল।

—কি গো স্যাঙাৎ, আজ যে এত তাড়াতাড়ি! চন্দন ঘাড় ফিরিয়ে দেখল তার দিকে চেয়ে, কানাই-মাষ্টার মুচকে মুচকে হাসছে।—ইস্, লোকটা তা হ'লে এখানেই রয়েছে! মুহূর্তের মধ্যেই সব রাগ গ'লে গিয়ে জল হয়ে গেল। মিছামিছি খামোকা কতকগুলো পয়সা কম গেল, এই ভাবনাতেই যা একটু কাতর হ'ল চন্দন। বলল, এখানে কি করছ মাষ্টার, বাড়ী ফিরবে না?

—তুমি কি এখনই ফিরছ নাকি!

—কি আর করি! বেচাকেনা যখন চুকে গেল।

—কেমন কামালে?

—আজ সুবিধে হ'ল নি।

—এই সাঁঝসকালে বাড়ী গিয়ে করবে কি! চল একটু গান শুনে আসি। বাজরাটা এই সাইকেলের দোকানে রেখে দাও, যাবার সময় নিয়ে গেলেই চলবে।

—কোথায় গান-বাজনা হচ্ছে।

—চল না, গেলেই দেখতে পাবে।···

ষ্টেশনের ধারেই কতকগুলো খোলার ঘর। মাষ্টারের সঙ্গে চন্দনও একটা বাড়ী গিয়ে ঢুকল। তার পর মাষ্টারের হাত ধ'রে টলতে টলতে যখন বাড়ী ফিরল, রাত তখন অনেক। গ্রাম নিঃঝুম। শুধু চন্দনের ঘরে টিম্‌টিম্ ক'রে আলো জ্বলছে। ব'সে ব'সে কাঁথা সেলাই করছিল সদু। ওদের গলার আওয়াজ পেয়ে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে এল। তবুও লোকটাকে ভাল ক'রে দেখতে পেল না। চন্দনকে ঠেলে দিয়ে গাছের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে লোকটা চ'লে গেল। আর চন্দন দাওয়ার সামনে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

এতক্ষণ ধ'রে যা ভাবছিল তাই। ফিরতে যখন রাত হচ্ছিল, তখনই বুঝতে পেরেছিল সদু—বদ্‌সঙ্গী জুটেছে। এবার তার কপাল পুড়বে।—বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছে মুখ থেকে। হাত ধরে টানতে টানতে ওকে ঘরে তুলে নিয়ে গেল। মেঝের ওপর মাদুর বিছিয়ে শুইয়ে দিয়ে মাথায় জল ঢালল, অনেকক্ষণ ধ'রে পাখার বাতাস করল। নিজের ঘরে এ উৎপাত না থাকলেও, পাড়াপড়শীর ঘরে এ সব কাণ্ড দেখেছে সদু। দেখে দেখে শিখে নিয়েছে—কি হলে, কি করতে হয়। পাখা টানতে টানতে ওর পাশেই শুয়ে পড়ল সদু। তার পর কখন ওর গলা জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকাল থেকেই সদু খুব সাবধানে রইল। একবারও মনে করিয়ে দিল না কাল রাত্তিরের কথা। চন্দন মনে মনে ভয় পেয়ে গিয়েছিল, ভাবল সদু বুঝি রাগ করেছে, তাই আর বেশী ঘাঁটাবার চেষ্টা করল না। যেমন রোজ মজুর খাটতে যায়, তেমনি বেরিয়ে পড়ল।

বিকেলে চন্দন যখন ফিরে এল, তখন যেমন রোজ দেয় তেমনি এক থালা ভাত বেড়ে দিল সদু, কিন্তু বাজরা সাজাতে বসল না। ভাত খাওয়া হলে একটা পান সেজে নিয়ে এল। বলল, দাওয়ায় গিয়ে বস গে, আজ আর বাজারে যেতে হবে না। কতদিন বাঁশী বাজাও নি—আজ বরং ব'সে ব'সে একটু বাঁশী বাজাও। চন্দনকে অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে, সদু ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, বা রে! আমার বুঝি বাঁশী শুনতে ইচ্ছে করে না।

পানটা মুখে দিয়ে চন্দনও ভাবল, তাই ভাল। আজ একটু বাঁশী বাজানো যাক। বাতা থেকে বাঁশীটাকে পেড়ে নিয়ে, গায়ের ধুলা-বালি ঝেড়ে-মুছে কোলের ওপর ফেলে রাখল। পান খাওয়া শেষ ক'রে বাঁশীটাকে তুলে নিল ঠোঁটে। অনেকক্ষণ ধ'রে চেষ্টা করল, কিন্তু সেই সুরটা কিছুতেই বাজাতে পারল না চন্দন। কাল রাত্তিরে শুনেছিল গানটা। খোলার ঘরে ব'সে মেয়েটা গেয়েছিল, কানাই-মাষ্টার বাজিয়েছিল হারমনিয়ম্। কি যেন নাম মেয়েটার—কুসুম। চন্দন আবার চেষ্টা করল, পারল না। বাঁশীটাকে দাওয়ায় ফেলে রেখে চন্দন উঠে পড়ল। আর একবার গিয়ে গানটা ভাল ক'রে শিখে আসতে হবে। আর একবার যেতে হবে কুসুমের কাছে। কুসুম। কপালে কাঁচপোকার টিপ। পানের রসে পুরু পুরু ঠোঁট দুটো টুকটুকে রাঙা। চন্দন পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল। কলাবাগানের ভেতর দিয়ে, বড় রাস্তার ওপর প'ড়েই জোরে জোরে পা চালাল।

ঘরে সন্ধ্যা দিতে গিয়ে সদু দেখল, দাওয়ায় কেউ নেই। বাঁশীটা প'ড়ে আছে। চাপ চাপ অন্ধকারে চোখ দিয়ে চিরে চিরে চন্দনকে খুঁজতে খুঁজতে বাঁশীটা কুড়িয়ে নিল সদু। ওর গায়ের ধুলো মুছিয়ে দিয়ে বাঁশীটাকে ঠোঁটে ঠেকাল। হয়ত বাজাবার জন্যে, কিংবা হয়ত বলতে চাইল—পোড়াকপালা, তুইও পারলি না ধ'রে রাখতে।

গোমুখের পথে

শ্রীভক্তি বিশ্বাস

চিরবাসা ধর্মশালা খুবই ছোট। পাথরের তৈরি চার-পাঁচটি ঘর ও কয়েকটি ঢাকা বারান্দা। কিছু বাসনপত্রও আছে। কোন লোক নেই—এমন কি চৌকিদারও নেই। এখানে আমাদের জিনিষপত্র রেখে পরদিন কেবল স্নান করবার সরঞ্জাম ও খাবার নিয়ে আমরা গোমুখ যাব এবং সেইদিনই ফিরে রাত্রে এখানে আশ্রয় নেব। দু'টি রাত্রি এখানে কাটাতে হবে।

ধর্মশালার কাছে পৌঁছে চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। সামনে ভগীরথ পর্বতশ্রেণী উজ্জ্বল হয়ে দেখা যাচ্ছে। গঙ্গা ওখান থেকেই নেমে এসে আমাদের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। ডাইনে শিবলিঙ্গ শৃঙ্গ—চিরতুষারাবৃত। অপূর্ব সে দৃশ্য।

গঙ্গার গর্জনকে ছাপিয়ে আর একটি গর্জন কানে আসে আমাদের। খুঁজতে থাকি সেই গর্জনের উৎস। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে তার উল্টোদিকের পাহাড় থেকে একটা ঝরণা বহু উঁচু থেকে নেমে এসে গঙ্গায় মিশেছে। তার কিছু অংশ সোজা নিচে পড়ছে জলপ্রপাত হয়ে। তাই তার অত শব্দ ও সৌন্দর্য। একটু দূরে পুবের পাহাড়ের পেছনে পূর্ণিমার চাঁদের আলো দেখা যাচ্ছে। গাঢ় নীল আকাশ আলোতে ভেসে যাচ্ছে। চাঁদ তখনও পাহাড়ের আড়ালে। অবাক বিস্ময়ে প্রকৃতির অপূর্ব সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকি একদৃষ্টে।

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। প্রচণ্ড শীত, বাইরের কন্‌কনে হাওয়া হাড়ে এসে বিঁধছে। কাঁপতে কাঁপতে আশ্রয় নিলাম ধর্মশালায়। এরই মধ্যে দিলীপ সিংরা পাহাড় থেকে শুকনো লম্বা লম্বা ঘাস ছিঁড়ে এনে শোবার ঘরের মেঝেতে বিছিয়ে দিয়েছে। তার ওপর দিয়েছে বিছানা পেতে। শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে এনে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে হাত-পা সেঁকবার জন্য। সুন্দরানন্দজী গরম জল করেছেন মুখ ধোবার জন্য। চায়ের জলও তৈরি হয়ে এল। এঁদের ব্যবহারে, সেবাতে ও আন্তরিকতাতে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি।

রান্না করতে করতে গল্প চলে। এদিকে ভালুক আছে। তা ছাড়া চিতল হরিণ মাঝে মাঝে দেখা যায়। গাইড বললে, পরদিন দেখিয়ে দেবে। তা ছাড়া আর কোনো জানোয়ার আছে বলে কেউ শোনে নি।

রাত্রে সুন্দরানন্দজী পরিপাটি করে রান্না করলেন। ভাত, রুটি, আপেলের কুসি দিয়ে ডাল আর আলুর তরকারি। যত্ন করে কম্বলের আসন পেতে ভোজপাতাতে পরিবেশন করে খাওয়ালেন। জীবনে এমন তৃপ্তি করে খেয়েছি বলে মনে হয় না। গরম জল দিলেন হাত ধুতে।

ভোজপাতা অর্থাৎ এই ভূর্জপাতা স্বভাবতঃই আমাদের মনে অতীতের অনেক গাঁথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। অবশ্য বর্তমান সহযাত্রীদের মধ্যে কেউ মনে মনে 'ভূর্জপাতায় নবগীত করো রচনা' আবৃত্তি করছিলেন কি না তা নিশ্চয় করে বলতে পারি না।

এই ভূর্জপাতা কিন্তু জল নিরোধক অর্থাৎ ওয়াটার প্রুফ।

বাইরে দুর্দান্ত শীত, চাঁদ আকাশের মাঝখানে। সমস্ত পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে জ্যোৎস্নাতে। আজ পূর্ণিমা। সামনে, পেছনে ও পাশে বরফে ঢাকা চূড়ায় আলো পড়েছে। গঙ্গার জলে আলো পড়েছে—গলানো রুপোর স্রোত যেন বয়ে যাচ্ছে। এক কথায় মোহিনী মায়ার সৃষ্টি করেছে পূর্ণিমার আলো।

রাত্রে প্রচণ্ড শীতে কেউই ভাল ঘুমুতে পারলাম না। ভোরে উঠেই আগুনের পাশে গিয়ে বসেছি। আরও ভোরে উঠে সাধুজী পূজোপাঠ শেষ করে আমাদের সেবাতে মন দিয়েছেন।

চা ও গত কালকার রুটি খেয়ে সকাল সাড়ে ছটার মধ্যে রওয়ানা হলাম আমরা। এক মাইল পরে ভোজ গাছের জঙ্গলের মধ্যে ভোজবাসা। এখানে ভোজবাবা[illegible] কুটীর। দেয়াল পাথরের—ছাদ ভোজপাতা ও ডাল দিয়ে তৈরি। "বাবা" নিজেও ভোজপাতার কৌপি[illegible] ছাড়া আর কিছুই পরেন না। বিরাট লম্বা পুরুষ—রো[illegible] ঝল্‌সানো ভস্ম মাখা দেহ—লম্বা লম্বা জটা মাথার দুলছে মিষ্টভাষী। আমরা প্রণাম করে বসলাম। ছাতু [illegible] চিনি দিয়ে তৈরি প্রসাদ দিলেন—জল দিলেন।

—"গোমুখ যায় গা? হাম্‌ ভি যায়েগা।" চলতে চলতে দিলীপ সিংকে বললাম, "কিধরসে যায় গা উপরসে? কেঁও—নিচেসে আও।"

—অর্থাৎ গঙ্গার কূলের পাথরের ওপর দিয়ে। দিলী[illegible] জানাল—এদের কষ্ট হবে।

—"ঠিক হায়! তোম্‌লোগ উপরসে আও—হাম নিচেসে যায় গা।"—

তিনি তার ছোট লাঠিটি হাতে নিয়ে লাফাতে লাফাতে গঙ্গার দিকে নামতে লাগলেন। আমরা পাহাড়ের গায়ের পথ দিয়ে চলেছি আর তাঁর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। দেখতে দেখতে তিনি গঙ্গার ওপরের পাথরে চলতে সুরু করলেন। পাখীরা যেমন হাঁটে, দূর থেকে তাঁকে তেমনি দেখাচ্ছিল। অজস্র পাথরের ওপর দিয়ে টুক্‌টুক্‌ করে লাফাতে লাফাতে তিনি ছোট্ট কালো বিন্দুটি হয়ে গঙ্গার বুকে যেন মিশে গেলেন।

আমরা এগুচ্ছি। আধ-মাইলের মধ্যে আরও দু'টি কুটীর। একটি শূন্য পড়ে আছে—রঘুনাথজী গত বছর দেহরক্ষা করেছেন। আর একটি কুটীর বন্ধ পড়ে আছে। সাধুজী গঙ্গোত্রী গিয়েছেন।

গঙ্গার ওপারে সুদর্শন শৃঙ্গ পূর্ণমূর্তিতে দেখা যাচ্ছে। এপারে চিরতুষারাবৃত শিবলিঙ্গ। মনে হয় একটু হাত বাড়ালেই যেন ছোঁয়া যাবে। সুদর্শনের পেছনে সূর্য উঠেছে। তার রশ্মি গোলাকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সম্মুখে ভগীরথ পর্বতশ্রেণী, তারও পেছনে সার্থকনামা চৌখাম্বা পর্বতশ্রেণী। তার চারটি খাম অর্থাৎ শৃঙ্গ। পথের আশে পাশে, সামনে পেছনে অজস্র ফুলের গাছ। গাছ ভর্তি নানা রঙের ফুল। বেগুনী রঙের রডোডেনড্রন—এরা পথের আকর্ষণ বাড়িয়েছে। সাধুজী গঙ্গাপুজোর জন্য ফুল সংগ্রহ করে তাঁর থলে ভরিয়ে ফেললেন।

কত যে ঝরণা পার হলাম। অল্প অল্প জল। জলের ওপরের পাথরে পা রেখে সাবধানে পার হচ্ছি। পাশে—একটু নিচে প্রচণ্ড গর্জন করে ভাগীরথী বয়ে চলেছেন। একটা পাহাড়ের ঝরণা পেরিয়ে ওপরে উঠে দেখলাম চীর ও ভোজ্‌গাছের জঙ্গল শেষ হয়েছে। সামনের ভগীরথ পর্বত খুব কাছে এসে গেছে। মনে হয় আমাদের পথ প্রায় শেষ হয়ে এল। গাইড দেখাল—"ওই যে দূরে পাহাড়ের গায়ে গোল মতন দেখছেন ওইটিই গোমুখ। আমরা আরও এগিয়ে গেলে ভাল করে দেখব।"

আরও এগিয়ে দেখি দু'পাশের পাহাড় মিশে এক হয়ে গেছে। মাঝখানটা যোগ করেছে বিরাট্‌ গ্লেসিয়ার। এখানে-ওখানে গঙ্গার অনেকগুলি ধারা পার হয়ে আমরা গ্লেসিয়ারের সামনে এসে দাঁড়াই। আশে-পাশে অসংখ্য বৃহদায়তন পাথর পড়ে আছে। পঁচিশ-ত্রিশ গজ দূরে দশতলা সমান উঁচু বরফ খাড়া উঠে গেছে। তার মাথার উপর উঁচু পাহাড় থেকে গড়িয়ে-আসা মাটি, পাথর ও বালি জমা হয়ে আছে। বরফ ক্রমাগত গলছে আর জলের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব বালি ও পাথর গড়িয়ে গড়িয়ে ঝর্‌ঝর্‌ করে পড়ছে। নিচে গঙ্গা পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে। কি যে তার গর্জন!—আর কি যে তার আস্ফালন। গ্লেসিয়ারের এখান থেকেই কি পুণ্যতোয়ার সুরু? কিন্তু—না, গঙ্গা আরও পেছনে বহুদূর থেকে আসছে। কোথায় তার সুরু কেউ বোধ হয় জানে না।

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যাই। আমাদের সামনে-পাশে গ্লেসিয়ার ভাঙছে গলছে—গুমগুম শব্দ হচ্ছে। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে চমকে উঠি। গ্লেসিয়ারের মাথার উপর একটা বিরাট্‌ পাথর, আমরা কিছুক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলাম যেন পড়বে পড়বে করছে। সেটি প্রচণ্ড শব্দে নীচে পড়ল। আমাদের থেকে কুড়ি গজ দূরে। জায়গাটা গড়ানে ছিল না, তাই রক্ষা।

গ্লেসিয়ার যেখানে পাহাড়ে মিশেছে, সেখানে গ্লেসিয়ার থেকে গড়িয়ে-আসা পাথরের জমা পাহাড়। জমা পাহাড় গঙ্গার জলে শেষ হয়েছে। এই পাহাড়ের মাথায় কে জানি না একটা ঝাণ্ডা লাগিয়ে রেখেছে—'গোমুখের নিশানা।'

আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকেন সুন্দরানন্দজী। তারপর ডাকেন আমার ভাগ্নেকে। বলেন—"চ'ল, আমার সঙ্গে চ'ল। জুতো খোল, প্যাণ্ট গুটিয়ে নাও।" ইসারা করেন গাইডদের—দুজন এগিয়ে যায়। আমাদের নতুন সঙ্গী ভাই সাহেব বলেন তিনিও যাবেন।

গঙ্গার তুহিন শীতল প্রবল স্রোত পার হয়ে সুন্দরানন্দজী তাঁর দলবল নিয়ে উপরের দিকে উঠে যান। বেলা বাজে এগারোটা। আমরা চুপ করে বসে থাকি। সূর্য মাথার উপর উঠে যায়—বেলা বাড়তে থাকে ক্রমশঃ। অবশিষ্ট গাইডকে জিজ্ঞাসা করি "ওরা কোথায় গেল?"
—"পাহাড়ের ওপর দিয়ে চলবার সুবিধে মতন পথ আছে কি না তাই খোঁজ করতে গেছে—এক্ষুণি ফিরবে।"

আমরা অপেক্ষা না ক'রে স্নান সেরে নি। বরফগলা জল। অবশ হয়ে আসে সর্বাঙ্গ। একটা অভূতপূর্ব শিহরণ জাগে দেহ ও মনে। স্নানের পর যেন নবজন্ম লাভ করি। তখনও প্রচণ্ড শব্দ ক'রে গ্লেসিয়ার ভাঙছে। শুধু তাই নয়, বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার ভয়ঙ্করত্বও বেড়ে চলেছে।

এদিকে সদলে সুন্দরানন্দজীর দেখা নেই। একটা ভয়-

ভয় ভাব আমাদের জড়িয়ে ধরল। এই ভয়ঙ্কর-এর রাজত্বে আমাদের সঙ্গীরা কোন্ নিরুদ্দেশ যাত্রা করল!

হঠাৎ জ্ঞানানন্দ দেখল—"ওই ওরা আসছে।"

কি ভয়ানক! গ্লেসিয়ারের মাথায়—যেখান থেকে পাথর ও বালি খসে পড়ছে—অজস্র পাথরের মাঝে দাঁড়িয়ে দুটি কাল বিন্দু হাত নেড়ে ইসারা করছে ব'লে মনে হ'ল। মনে হ'ল তারা নীচে নামবে কি না জানতে চাইছে। ভয়ে আমরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠি—"নেমো না—নেমো না ওদিকে পথ নেই। সরে যাও।"

হায় ভগবান! সে কথা তাদের কানে যাবে এমন কোন সম্ভাবনা নেই। গঙ্গার শব্দে সব ডুবে যাচ্ছে। চোখের সামনে গলন্ত পাহাড়ের সঙ্গে নেমে তারা চুরমার হয়ে যাবে। জ্ঞানানন্দ হাত নেড়ে ইসারা করে। তারা সরে যায়। যেদিকে বরফ নেই, ধসা পাহাড় সুরু হয়েছে সেদিকে চলে যায়।

আমরা জ্ঞানানন্দকে প্রশ্ন করতে সুরু করি—"ওরা কি করবে?"

—"ওরা নামবে।"

—"কেমন ক'রে? কোথা দিয়ে নামবে?"

—"দেখ ওরা কেমন নেমে আসে—ওই পাহাড় দিয়ে।"

আকণ্ঠ উৎকণ্ঠা ও বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকি। আর জ্ঞানানন্দ ইসারা করতে থাকে। ওরা সামনে এগিয়ে আসছে। ওই ওদের দেখা যাচ্ছে। ওরা নামছে। মনে হচ্ছে যেন ধসা পাহাড় থেকে বালি পাথর গড়িয়ে পড়ছে। এই—নেমে এল। দুটি পা তাদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তাদের অবয়ব স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ওরা ধসা পাহাড়ের নীচে জমা হওয়া বড় বড় পাথর ডিঙিয়ে গঙ্গার জলের ওপর হেঁটে পেরিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়াল। ঠিক 'দাঁড়াল' বললে কম বলা হয়। আবির্ভূত হ'ল যেন। দিলীপ ও হরচাঁদ। কিন্তু ওরা তিনজন কই? প্রশ্ন করি সমস্বরে। দিলীপ সংক্ষেপে জানায়—"আতা হ্যায়।" ধৈর্য ধরে বসে থাকে সবাই। বেলা গড়িয়ে যায়। প্রশ্নের উত্তরে স্বল্পভাষী দিলীপ জানায় বারবার—"ওরা এক্ষুণি আসবে। আপনাদের ওপরে নিয়ে যাবার জন্য আমরা পথ খুঁজতে গিয়েছিলাম। এদিকের পথ ত দেখলেন আপনারা—খুব খারাপ। আপনারা এখানেই স্নান করুন।"

—"রান্না?—খাওয়া?"

—"সে সব স[illegible]স করবেন।"

চুপ ক'রে সবাই বসে বসে বিরাট ধ্বংসের মাঝে সৃষ্টির দৃশ্য দেখতে থাকি।

বেলা একটার সময় দিলীপ বলে—"বেলা বেশী হয়ে যাচ্ছে—জল বাড়ছে। আমরা বরং ফেরার পথে এগিয়ে আধমাইল দূরে বসে থাকি। সেদিকেই ওরা আসবে। আর এখানে বসে থাকাও বিপজ্জনক। এইসব পাথর গড়িয়ে আমাদের গায়েও পড়তে পারে।

আমরা জিনিষপত্র গুছিয়ে জুতো পরে রওনা হই। সত্যই দেখি জল অনেক বেড়ে গেছে। পথ অনেক জায়গায় জলে ভেসে গেছে। তবু অনেক কষ্টে গাইডের হাত ধরে গঙ্গার ছোট ছোট ধারা পার হয়ে কিছুদূরে পাথরের ওপর বসি। সামনে গোমুখের পাহাড়—ওখান দিয়েই ওরা ফিরবে। কেননা ওরা গ্লেসিয়ারের ওপর দিয়ে ঘুরে ফিরবে, এতক্ষণে ভেঙ্গে কথা বলে দিলীপ।

আমরা চুপ ক'রে অপেক্ষা করি। মনের মধ্যে ঝড় উঠেছে। মনে একটি প্রশ্ন গুমরে উঠছে কেবল—ওরা এখনও ফিরছে না কেন? নতুন সঙ্গিনী বহিনজী ত পাথরের ওপর স্থির হয়ে গোমুখের দিকে মুখ ক'রে বসে আছেন। আমরা অজানা আশঙ্কাতে চুপ ক'রে থাকি। হঠাৎ সবাই লক্ষ্য করি—হরচাঁদ নেই।

—"কোথায় গেল সে?"

—"সে ওদের আনতে গেছে," উত্তরে দিলীপ বলে।

কখন চুপিসারে দিলীপ ওকে পাঠিয়ে দিয়েছে!

বেলা প্রায় আড়াইটার সময় বহিনজী নড়ে ওঠেন। বলেন—"ওই ওরা আসছে।"

ঠিকই। দূরে কয়েকটি কালো বিন্দু নড়ছে দেখা গেল। তারা আসছে—এক, দুই, তিন, চার—তা হ'লে সবাই সুস্থ আছে। আনন্দে আমরা উঠে দাঁড়াই।

পরম ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত দেহ নিয়ে চার জনা এসে কাছে বসে। মুখ কিন্তু খুশীতে ভরা। আমরা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকি। শুনি, তারা গঙ্গার সবচেয়ে বড় ধারাটি খালি পায়ে হেঁটে পার হয়ে গ্লেসিয়ারের পাহাড়ে উঠে যায়। গ্লেসিয়ারের উপর দিয়ে চলবার সময় ভাই সাহেব দু'বার পড়ে যান। তাকে টেনে তোলেন সাধুজী। আর একবার পড়ে আমার ভাগ্নে। একদম গ্লেসিয়ার বেয়ে নীচে পড়ে যাচ্ছিল। পড়লে আর তাকে আস্ত পাওয়া যেত না। দিলীপ সিং আচমকা উপুড় হয়ে শুয়ে তার হাতটা ধরে ফেলে, তারপর বহু কষ্টে তাকে হিঁচড়ে টেনে ওপরে তোলে। ভাগ্নের লাঠিটা গঙ্গায় ভেসে যাচ্ছিল। সাধুজী লাফ দিয়ে জলে নেমে সেটা উদ্ধার ক'রে তার হাতে দেন। এই ভাবে নিশ্চিন্ত

মৃত্যুর হাত এড়িয়ে তারা গঙ্গার গর্ভে আবার নেমে গিয়ে স্নান করে। সাধুজী পুজো করেন। এইজন্যই ওদের এত দেরি হ'ল। দিলীপ সবই জানত। আমাদের দুর্ভাবনা বাড়বে ভয়ে আর বলে নি। এই বিপদের মধ্যে ওদের টেনে নিয়ে যাবার জন্য সে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিল সাধুজীর ওপর।

সবাই ফেরার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে উঠি। এখন পাঁচ মাইল পথ ফিরতে হবে। তাও আবার সরল পথ নয় মোটেই। সাধুজী গা ঝাড়া দিয়ে ওঠেন। বলেন, "চলুন গঙ্গার পুজো করবেন।" বহিনজী, ভাই সাহেব এবং আমি তাঁর নির্দেশমত চলি। সাধুজী গঙ্গাস্তোত্র আবৃত্তি করেন সুললিত স্বরে। আমরা অঞ্জলিভরে ফুল ভাসিয়ে দি গঙ্গার জলে। গোমুখের বরফ-গলানো জলের প্রবল স্রোতে ফুলগুলি নাচতে নাচতে মিলিয়ে যায়।

দিলীপ ও তার সঙ্গীরা চা তৈরী ক'রে ফেলেছে ততক্ষণে।

চা ও নাস্তা খেয়ে আমরা ফেরার পথে রওনা হই। দুপুরের পুরো খাওয়ার আর সময় নেই।

কিন্তু বিপদের উপর বিপদ। আশ্চর্যও বটে! আসবার সময় অনেকগুলি ছোট ও মাঝারি ঝর্ণা হেঁটেই পেরিয়ে এসেছি। ফেরবার সময় দেখছি সারাদিন বরফ গলে সেগুলির জল এত বেড়ে গেছে যে, আর সহজে পার হওয়াই যায় না। কোথাও কোথাও সুবিধে মত ওপর দিকে উঠে পার হচ্ছি। কোথাও বা গাইডরা পাথর গড়িয়ে গড়িয়ে এনে দিচ্ছে। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ভীষণ ঠাণ্ডা পড়বে। কিন্তু তাড়াতাড়িও যে পথ চলা যাচ্ছে না। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, পরিশ্রমে অবসন্ন আমরা। কিছুদূর গিয়ে একটা ঝর্ণা এল। এতবড় হয়ে গেছে যে, জুতো পরে পার হওয়ার উপায় নেই—মাথা উঁচু করে কোন পাথর দাঁড়িয়ে নেই। তা ছাড়া এটি খুবই খরস্রোতা। দিলীপের ইসারায় হরচাঁদ জুতো খুলে মাল নামিয়ে রাখল মাটিতে। পিঠে করে এক এক করে পার করে দিল আমাদের। অনেকগুলি ঝর্ণা এইভাবে পার হতে হ'ল। ঝর্ণার সংখ্যাও যেন বেড়ে গেছে অনেক। রৌদ্রে বরফ গলে নতুন ঝর্ণার সৃষ্টি হয়েছে।

খানিকটা পথ যেতে গাইডরা প্রায় সমস্বরে চেঁচিয়ে অনতিদূরের উঁচু পাহাড়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কিন্তু আমরা মুখ ঘোরাতে না ঘোরাতেই কতগুলি চিতল দৌড়ে বনের মধ্যে চলে গেল। ভাল ক'রে দেখতেও পেলাম না। কতগুলি ছোট ও মাঝারি পাথর ঝর ঝর করে পাহাড়ের গা বেয়ে পড়ল ওদের চটুল পায়ের আঘাতে।

চলেছি—প্রায় ভোজবাসার কাছে এসে পড়েছি। বড় বড় পাথরের উপর দিয়ে পথ আমাদের এখন। চলছি—দেখি পাথরের উপর বরফ জমে রয়েছে অনেকটা পথ। কই, আসবার সময় ত চলবার পথে কোন বরফ দেখি নি। কোন কোন ঝর্ণার উপরে বরফ ছিল বটে, কিন্তু সে ত পাহাড়ের খানিকটা উঁচুতে। পথে কোথাও বরফ পেরোতে হয় নি। গাইডদের জিজ্ঞাসা করি। উত্তর পাই—"উপরসে আয়া হ্যায়।" অর্থাৎ পাহাড়ের উপর বিরাট বরফের চাকটি সবশুদ্ধ নেমে এসেছে রোদে খানিকটা গলে গিয়ে। বড় বিপজ্জনক পথ। কোথায় পা বসে যায় তার ঠিক নেই। ওপর থেকে বোঝাও যায় না কিছু। লাঠি ঠুকে ঠুকে আন্দাজে খুব সাবধানে চলতে হয়। আমার কষ্ট দেখে খানিকটা পথ হরচাঁদ পিঠে করেই নিয়ে গেল। একবার আমাকে পিঠে নিয়ে ওর পা হড়কে একটা গর্তের মধ্যে পা পড়ে গেল। আঘাত কারুরই লাগে নি। কিন্তু দিলীপ ওকে খুব ধমকাতে সুরু করল।

ভোজবাসা পৌঁছলাম প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি। ভোজবাবা বসে আছেন কুটিরে। প্রণাম করে বসলাম। প্রসাদ ও জল দিলেন। সবাইকে দেখে ভারী খুশী। বললেন যে, উনি তপোবনে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ গোমুখের পরে আরও আড়াই মাইল পথ। ফিরেছেন বারোটার সময়, অর্থাৎ চার ঘণ্টায় প্রায় পনের মাইল পথ অতিক্রম করেছেন। আর সেই পার্বত্য পনের মাইল যে কি ভয়ঙ্কর দুর্গম তা আমরা নগরবাসীরা কল্পনাই করতে পারি না।

বেলা পড়ে গেছে। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। তাড়াতাড়ি করে আমরা চিরবাসার উদ্দেশে রওনা হই।

চিরবাসায় পৌঁছলাম সন্ধ্যা সাতটায়। প্রচণ্ড শীত ও হাওয়া। সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে এলিয়ে পড়ি আমরা। কিন্তু সাধুজী ও তাঁর দল সেবা-তৎপর হয়ে ওঠেন। ওঁদের শ্রান্তি ক্লান্তি কিছুই নেই। বিছানা পাতা হয়, আগুন জ্বলে। চা ও নাস্তা মুখের সামনে হাজির হয়। রাত্রের খাবারও তাড়াতাড়ি করে তৈরী করেন সাধুজী, সহাস্যবদনে সবাইকে যত্ন করে খাওয়ান।

পরদিন সকালে উঠেই তোড়জোড় সুরু করতে হয় যাওয়ার জন্য। আজ উৎসাহ কম। চেনা পথের আকর্ষণ কমে গেছে। শরীরও দুর্বল হয়ে পড়েছে, ধীরে ধীরে অগ্রসর হই।

ভোজ গাছের জঙ্গলের কাছে এসে সাধুজী থামতে বলেন। আজ পরিপাটি করে বনভোজন হবে।

ভাগীরথার প্রশস্ত তীরে ভোজের জঙ্গল। আমরা পাথরে মাথা রেখে গাছতলায় শুয়ে পড়ি। মাঝে মাঝে সুন্দরানন্দজীর কাজ দেখতে থাকি।

গঙ্গায় স্নান সেরে নিলেন সাধুজী। প্রথমেই চা তৈরী হ'ল। তার পর ভোজপাতাতে আটা মেখে হাতে করেই রুটি তৈরী করলেন। আলুর ঝোল আগেই উনানে বসে গেছে। এদিকে হরচাঁদ কতগুলি বুনো টকপাতা কুড়িয়ে এনে দুটো পাথরে বেঁটে চাটনী তৈরী করল। মাটিতে পাথর দিয়ে ঠুকে ঠুকে গর্ত করে ভোজপাতা বসিয়ে "বাটি" তৈরী হ'ল। তাতে আলুর ঝোল রেখে রুটি আর চাটনী দিয়ে খাওয়া—সে স্বাদ অপূর্ব। আকণ্ঠ খেয়ে এক ঘণ্টা বিশ্রাম—সুখের যেন আর শেষ নেই।

গঙ্গোত্রীতে পৌঁছলাম তখন বিকেল পাঁচটা। এসেই স্বামিজী মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

ঘরের ভিতর বসে আছেন তিনি। ছোট্ট দরজার সামনে দাওয়াতে বসলাম। বললাম, "আমরা এইমাত্র গোমুখ থেকে ফিরে আসছি···।" কথা শেষ হওয়ার আগেই দেখি তিনি হাসছেন দুলে দুলে।

—"আ—গিয়া, আ—গিয়া বাঃ! বাঃ! হাম্ শুনা, সব আচ্ছা হায়। হাম্ শুন লিয়া।"

খুশীর আবেগে তিনি হাসছেন দুলে দুলে। সর্বাঙ্গ দিয়ে তাঁর হাসি ঝরে পড়ছে। প্রিয়জনরা ফিরে এসেছে কিনা।

—"বৈঠো, বৈঠো। লেও খাও। পানি পিয়োগি? আরামসে পিয়ো।"

দেহের অবসাদ কেটে যায়। খুশীমনে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ নিই।
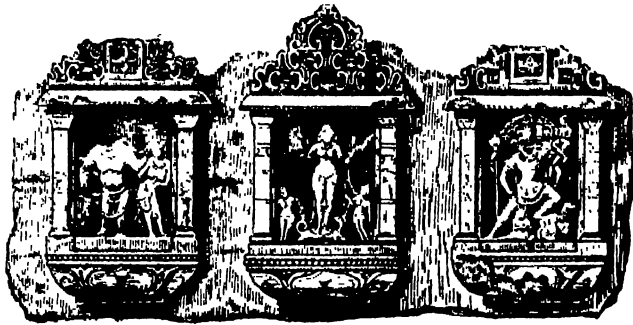
সে নহি

শ্রীচাণক্য সেন

১৬

সাবিত্রী আম্মার মৃত্যু-খবর দেববাণী পেল প্রভাতী সংবাদ-পত্রে।

নার্সিং হোমে টেলিফোন ক'রে জানল, মৃতদেহ সাবিত্রী আম্মার বাসগৃহে স্থানান্তরিত হয়েছে। বাসন্তী দেবীকে নিয়ে ফিরোজ সা' রোডের বাড়ীতে যখন দেববাণী পৌঁছল তখন সেখানে বেশ কিছু গণ্যমান্য লোকের সমাগম। পার্লামেণ্টের সদস্য যাঁরা দিল্লীতে আছেন প্রায় সবাই এসে গেছেন, আসছেন। একে একে মন্ত্রীরাও উপস্থিত হচ্ছেন। সাবিত্রী আম্মার প্রাণহীন দেহকে সোনালি সিল্কের লালপেড়ে সাড়ী, চন্দন, কুঙ্কুম, সিঁদুর ও ফুলে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে তাঁর শোবার ঘরে রাখা হয়েছে। সবাই এসে মৃতদেহ প্রদক্ষিণ করছেন, ফুল বা ফুলের মালায় শেষ-সম্মান জানাচ্ছেন। দেববাণী মাকে নিয়ে সাবিত্রী আম্মার সামনে শেষবারের মত কয়েক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়াল। গভীর প্রশান্তিতে চির-নিদ্রিত সাবিত্রী আম্মা। ম্লান কাঞ্চনবর্ণ সে প্রশান্তিকে কেমন যেন বিষণ্ণ করেছে। বিদায় নেবার সময় সাবিত্রী আম্মা বুঝি ব'লে গেছেন, ক্ষোভ নেই, নালিশ নেই, কিন্তু হ'ল না, হ'ল না, যেমন ভেবেছিলাম জীবন তেমনটি হ'ল না।

দেববাণীর ইচ্ছে ছিল, কিছু ফুল নিয়ে যায়, টাটকা, তাজা ফুল। নিউ দিল্লীতে ফুলের দোকান নেই, যেমন আছে কলকাতায় অজস্র; এখানে পাওয়া যায় কেবল গাঁদা ফুলের মালা, বাসি ফুলের তোড়া, গোলাপের পাপড়ি। সুতরাং খালি হাতেই যেতে হয়েছিল। সাবিত্রী আম্মাকে শেষ-দর্শন ক'রে বাসন্তী দেবীকে নিয়ে বাইরে এসে দেববাণী পুনরায় বিস্ময় ও বিরক্তির সঙ্গে দেখল, সমাগত স্ত্রী-পুরুষ সবাই মৃদুস্বরে বেশ জটলা সুরু ক'রে দিয়েছে; মৃত্যুকে অভিবাদন করবার উপযুক্ত নীরব গাম্ভীর্য প্রায় কারুর মধ্যেই নেই। কান পেতে শুনলে দেখা যায়, এমন কোনও বিষয় নেই যা আলোচিত হচ্ছে না; কেবল বোধ করি সাবিত্রী আম্মা ছাড়া। মৃত্যু এসে তার স্বাভাবিক দাবীতে একটি পরিণত বয়সের মহিলাকে তুলে নিয়ে গেছে; এ রকম ঘটনার আনুষ্ঠানিক রীতি পালন করবার জন্যে এদের আসতে হয়েছে, তাই এরা এসেছে।

এর মধ্যে দেববাণী একবার সরোজার খোঁজ করল। দ্বিতীয় ঘরে, সে দেখল, একজন শুভ্রকেশ, স্বাস্থ্যবান্ বৃদ্ধ কিছু লোকের সঙ্গে তামিল ভাষায় কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করছেন। নামজাদা কেউ এসেছেন খবর পেলে উঠে এসে বাইরে দাঁড়াচ্ছেন, এবং তাঁকে নিয়ে সাবিত্রী আম্মার ঘরে যাচ্ছেন। দেববাণী অনুমান করল, ইনি সাবিত্রী আম্মার স্বামী, সরোজার বাবা। অত্যন্ত গম্ভীর রাশভারী চেহারা, বড় বড় চোখ ঈষৎ রক্তবর্ণ। দীর্ঘ, মজবুত নাকে কঠিন ব্যক্তিত্ব সুপ্রকাশ। ভদ্রলোককে দেখে দেববাণীর মনে হ'ল, পৃথিবীকে তিনি সন্দেহে, ভয়ে, তুচ্ছতায় ও সচেষ্ট প্রতিরোধে সর্বদা খানিকটা দূরে সরিয়ে রাখছেন।

সরোজাকে দেববাণী কোথাও দেখতে পেল না।

আর একটু খোঁজার পর রামস্বামীকে দেখতে পেল দেববাণী। তাকে প্রশ্ন করল, "সরোজা কোথায়?"

জিভ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ ক'রে রামস্বামী জানাল, "সে জানে না।"

বাসন্তী দেবী লনের এক প্রান্তে দাঁড়িয়েছিলেন। দেববাণী এসে বলল, "মা, এবার চল।"

"সরোজাকে পেলি?"

"না।"

"সে কি?"

"চল, মা।"

গাড়ীতে ব'সে দেববাণীর সেই দিনের কথা মনে পড়ল যেদিন সে প্রথম সাবিত্রী আম্মার কাছে এসেছিল। কেন এসেছিল ভাবতে বড় বিস্ময় লাগল। দিল্লী এসে প্রথম প্রথম বন্ধুবান্ধবহীন দেববাণী কার কাছে যাবে, কোথায় সাহায্য পাবে কিছুই বুঝতে পারে নি। শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ে দু'তিনবার যাতায়াতের পর সে বুঝেছিল সরকার নামক

স্থবির যন্ত্রকে সচল করতে হলে তদ্বির নামক তেলের বড় প্রয়োজন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম যেদিন সে দেখা করতে গেল, বক্তৃতা দেবার কয়েক দিন আগে, অধ্যাপকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় এ কথাটা আরও পরিষ্কার ক'রে সে বুঝতে পারল। রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সাবিত্রী আম্মার নাম ক'রে দেববাণীকে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর কথাগুলি আজ দেববাণীর মনে পড়ল। ওঁর খুব কিছু ক্ষমতা নেই, তিনি বলেছিলেন, কিন্তু ভাল কোনও উদ্যোগ দেখলে উনি যেমন উৎসাহের সঙ্গে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন, এম. পি.-দের মধ্যে তেমন বোধ হয় খুব কম আছেন।

সামান্য কয়েক সপ্তাহে দেববাণীকে স্নেহ ও প্রীতির বন্ধনে বেঁধে ফেলেছিলেন সাবিত্রী আম্মা। শুধু যে সাধ্যের ও শক্তির অতিরিক্ত সাহায্য করতেই এগিয়ে এসেছিলেন তা নয়, তাঁর সঙ্গে স্নেহ-শ্রদ্ধা-স্নিগ্ধ সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে কতবার দেববাণী তাঁর কাছে এসেছে, প্রত্যেকবার তিনি সাদরে তাকে গ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয়, নিজের জীবনের কত-না গল্প করেছেন, দেববাণীর জীবনের কথা সাগ্রহে শুনেছেন, এমন কি তাঁর একমাত্র সমস্যা—কন্যা সরোজাকে নিয়ে পর্যন্ত তাদের অনেক কথাবার্তা হয়েছে। সাবিত্রী আম্মার চরিত্রের নির্মল ঔদার্য দেববাণীকে গভীর ভাবে স্পর্শ করেছিল। যখন সে বুঝতে পেরেছিল, রিসার্চ ইনষ্টিটিউট ব্যাপারে সত্যিকারের সাহায্য করবার ক্ষমতা সাবিত্রী আম্মার নেই, যে সব সূক্ষ্ম, জটিল, অনুচ্চারিত কারণে ব্যক্তিবিশেষের আয়ত্তে রাজনৈতিক ক্ষমতা এসে থাকে তার বাইরে বাস ক'রে তিনি কেবল প্রারম্ভিক ব্যর্থ চেষ্টা করতে পেরেছেন, তখনও দেববাণী ক্ষুণ্ণ হয় নি, বরং তাঁর অসহায় শুভানুধ্যায়ে আরও বেশি আকৃষ্ট হয়েছিল। অসাধারণ জীবন-তৃষ্ণা আশ্চর্য সাহসে, বিচিত্র পথে তাঁর জীবনকে বিকশিত করেছিল। দৃপ্ত মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হয়ে সে যখন ম্লান গোধূলিতে উপনীত হ'ল, শীতের বিশীর্ণা নদীর মত স্তিমিত হয়ে গেল তার তেজ, তখন, অপরিহার্য নিষ্ঠুর হিসাব-নিকাশে, সাবিত্রী আম্মা দেখতে পেলেন, তাঁর অগোচরেই অনেকখানি ফাঁক ও ফাঁকি জমা হয়ে গেছে। একদিন এ সব কথা নিজেই তিনি দেববাণীকে বলছিলেন। "ফুরিয়ে যাওয়া যে কত দুঃখের তা ফুরাবার মুখে না এলে আমরা বুঝতে পারি নে," বলেছিলেন সাবিত্রী আম্মা। "বৃদ্ধকালে কেবল মনে হয়, জীবনে ভুলগুলি যদি না হ'ত। ইচ্ছে হয়, আর একবার নতুন জীবন শুরু করি। অথচ এ-ও জানি যে, নতুন ক'রে শুরু মানে আবার নতুন ভুল।"

আশ্চর্য লাগে দেববাণীর ভাবতে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের জীবনে কি ভয়ানক তফাৎ। পশ্চিমে মানুষ জীবনকে ভোগ করতে চায়, তার চেয়ে বড় পাওনা তাদের নেই। ভোগ করবার বাধাও তারা কাটিয়ে উঠেছে। যে দারিদ্র্য জীবনকে উপবাসী রাখে, বঞ্চিত করে, সে দারিদ্র্য পশ্চিমে আর নেই। মানুষে মানুষে ব্যবধান ঘুচে গেছে অনেকখানি। পর পর মহাযুদ্ধে সামাজিক বিধি-নিষেধ গেছে ভেঙে। বিজ্ঞান ও যন্ত্র মানুষের জীবনকে ত্বরিৎ-গতি করেছে, ধীর-স্থিরতা আর নেই। এখনকার জীবনদর্শনের সবচেয়ে বড় কথা, ভোগ কর। নরনারীর দৈহিক আনন্দ সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমে তাই যৌবনের এত সম্মান, কদর। যৌবন আছে ত সব আছে; যেহেতু যৌবন চিরদিন থাকবে না, তাই যতদিন আছে, আনন্দ কর, স্ফূর্তি কর, ভোগ কর।

অথচ ভারতবর্ষে মানুষের জীবন এখনও ভিন্ন তালে চলছে। দারিদ্র্য মানুষকে উপবাসী ক'রে রাখছে। ভোগ-বিলাস কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় পয়সাওয়ালা মানুষের প্রাপ্য। তারা নাইট-ক্লাবে যায়, ক্যাবারে দেখে, মদ খায়, মেয়েমানুষ নিয়ে স্ফূর্তি করে। তারা দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। তাদের কেউ কেউ অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটে স্যুট তৈরি করে, ভিয়েনার অর্কেষ্ট্রা, মস্কোর ব্যালে ও প্যারিসের নাটক নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু মূলতঃ ভোগ এদের জীবনেও খিড়কির দরজা দিয়ে ঢোকে। ভারতবর্ষের জীবন-দর্শনে এখনও ভোগ-বিমুখতাকে, না-পাওয়াকে উচ্চ স্থান দেওয়া হচ্ছে। সেজন্য হয়ত ভারতীয় জীবন ক্ষুদ্র, ভীরু, স্বল্প-তৃপ্ত, দুঃসাহস-বিমুখ। তবু সে শান্ত, স্থির, মন্থর। হয়ত এ সবই বাধ্যতামূলক; বঞ্চিত মানুষের একমাত্র সম্বল পরলোক-নির্ভর, বাস্তব উদাসীন জীবন-দর্শন। কিন্তু ভারতবর্ষ যে এখনও ভোগী হয়ে ওঠে নি, উঠতে পারে নি, উঠতে আরও বেশ কিছুদিন লাগবে, এরই মধ্যে বর্তমান ভারতীয় বাস্তবের অনেকখানি নিহিত রয়েছে। সাবিত্রী আম্মা স্বামীকে ভাল না বেসেও গভীর অনিচ্ছায় তাঁর সন্তান গর্ভে ধারণ করেছিলেন; জীবনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার উদ্গত পরিতৃপ্তি খুঁজেছিলেন দেশপ্রেম ও দেশসেবার মধ্যে; উত্তেজনার বছরগুলি কেটে যাবার পর বুঝতে পারলেন ফাঁক ও ফাঁকি। সরোজা, তাঁর কন্যা, সে ফাঁক ও ফাঁকির দুঃসহ বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে। পশ্চিমে হ'লে,

দেববাণী ভাবল, সরোজা আধুনিক গল্প-উপন্যাসের নারী-চরিত্র অনুকরণ করত; মনোবিকলন-পারদর্শীরা, ওকে নানা রকম পরামর্শ দিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষে সরোজা মা, বাবা, ছ' হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতা, এবং বর্তমান যুগের অগভীর অবিশ্বাস—সব কিছুর বোঝা অজ্ঞানে অবচেতনে সজ্ঞানে ব'য়ে বেড়াচ্ছে; পশ্চিমের যে আধুনিকতায় সে খানিকটা অন্তত মুক্তি পেতে পারত তা থেকে বঞ্চিত হয়ে নিঃসার আক্রোশে কেবল আঘাত করছে।

বাসন্তী দেবীকে নীরব দেখে সারা রাস্তা দেববাণীও কোনও কথা বলল না। মৃত্যু মনকে বড় বিষণ্ণ ক'রে দেয়। সাবিত্রী আম্মার কথা ভাবতে ভাবতে বার বার সরোজার কথা মনে হতে লাগল। মার মৃত্যুর পর তার সঙ্গে যে দেখা হ'ল না একথা সে ভুলতে পারল না।

সারা দিনে দেববাণীর অনেকগুলি কাজ করবার ছিল। সাবিত্রী আম্মার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখবার জন্যে যমুনাতীরে নিগম্বোধ ঘাটে যাবার ইচ্ছে দেববাণীর হল না; বরং মনে পড়ল, সন্ধ্যের দিকে দরকারী একটা সাক্ষাৎকার আছে। বাসন্তী দেবী দু'দিনের জন্যে হরিদ্বার, ঋষিকেশ, লছমনঝোলা বেড়িয়ে আসতে চাইছেন; রামকৃষ্ণ মিশনে চিঠি লিখে অতিথিশালায় থাকবার ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছেন। কাল তিনি যাবেন, তাঁর টিকেট কেনবার ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যান্য কাজের মধ্যে, হিমাদ্রি ও খোকনের আসন্ন আগমনের আশায়, ছোট একটা ফ্ল্যাটের সন্ধান পাওয়া গেছে, সেটা একবার দেখে আসতে হবে।

নিজামুদ্দিনের বাসায় ফিরে চটপট তৈরী হল দেববাণী। স্নান সেরে, সাজ-পোশাক সমাপ্ত ক'রে দেখল, বাসন্তী দেবী তার জন্যে লুচি ভেজেছেন, সঙ্গে আলুর তরকারি। ব্রেকফাষ্ট সেরে দেববাণী তাড়াতাড়ি তিন খানা জরুরী চিঠি লিখে ফেলল। তার পর বেরিয়ে পড়ল।

প্রথমে যাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল দেববাণী, তিনি মার্কিন দূতাবাসের সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চপদ অফিসার, নাম আর্থার অসওড্‌স্ সারকিসিয়ান। ছ' ফুট দু-ইঞ্চি লম্বা, তেমনি চওড়া, মাথায় একটি চুলও নেই, মাংসল মুখখানায় থমথমে গাম্ভীর্যের মধ্যে, মার্কিন চেহারায় সচরাচর যেমন হয়ে থাকে, কোথায় একটু অপক ছেলেমানুষি লুক্কায়িত। চোখ গভীর নীল, সুপুষ্ট দীর্ঘ নাক। আর্থার সারকিসিয়ানের সামনে ব'সে দেববাণীর আর একবার মনে হল, মার্কিন জাতটার জীবনে পদে পদে খামখেয়ালি বিপরীতের দৌরাত্ম্য। এরকম দশাসই মানুষকে সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিভাগের অধিকর্তা ব'লে গ্রহণ করতে গেলে সংস্কৃতির যে বাস্তব ব্যাখ্যা প্রয়োজন, একমাত্র আমেরিকায় তা বিনা দ্বিধায় গৃহীত হ'তে পারে।

আর্থার সারকিসিয়ান দেববাণীর সঙ্গে সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করল। কিন্তু যে প্রয়োজনে দেববাণী এসেছিল সে বিষয়ে কথাবার্তায় সে খুব প্রীত হ'ল না।

দেববাণী বলল, "আপনি হয়ত জানেন আমি এবং আমার বন্ধু ডাঃ এইচ্ বসু, দিল্লীতে উচ্চতর বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি কেন্দ্র স্থাপন করতে চাই। আমাদের উদ্যোগে কয়েকটি মার্কিন বন্ধু এবং একটি ফাউণ্ডেসন সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"

আর্থার সারকিসিয়ান গম্ভীর মুখে বিস্ময় আমদানী ক'রে বলল, এ বিষয় সে কিছু জানে না।

দেববাণী আশ্চর্য না হয়ে একটু হাসল। সে জানে, আর্থার সারকিসিয়ানের সব ব্যাপারটা খুব ভাল জানা আছে। মৃদু হাস্যে সে জানিয়ে দিল, তুমি যে জান তা আমি জানি। এবং অল্প কথায় সে সারকিসিয়ানকে বিষয়টা বুঝিয়ে দিল।

সারকিসিয়ান প্রশ্ন করল, "আমেরিকায় কারা আপনাদের সাহায্য করছেন?"

দেববাণী জানত, সারকিসিয়ানের এ সব খবর জানা আছে। তাই নিঃসঙ্কোচে সে বলল।

সারকিসিয়ান আবার প্রশ্ন করল, "আপনি ত অনেক বছর আমেরিকায় আছেন?"

"আট বছর কাটিয়েছি আপনাদের অতিথি বৎসল দেশে," দেববাণী জবাব দিল।

"আপনার যে গবেষণায় নাম হয়েছে তা আমরা জানি। এমনকি আপনার গবেষণার কথা একাধিকবার আমরা এদেশে প্রচারও করেছি।"

"ধন্যবাদ। আপনাদের দেশে অকুণ্ঠ সাহায্য না পেলে আমি কিছু করতে পারতাম না," দেববাণী আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সুরে বলল।

"আপনার গবেষণা কি শেষ হয়েছে?"

"গবেষণা কি কখনও শেষ হবার, ডাঃ সারকি-সিয়ান?"

"তা হ'লে এক্ষুনি দেশে আসতে চাইছেন কেন?"

"চেষ্টা করলে গবেষণা দেশে এসেও চলতে পারবে।"

"কিন্তু, একটা ইনষ্টিটিউট গ'ড়ে তোলা ত সহজ কাজ নয়। তার ঝক্কি সামলাতে গিয়ে ইট-সুরকির ব্যবসাদার,

সরকারী দপ্তরে হানা দিতে দিতে আপনাকে বিজ্ঞান ছাড়তে হবে।"

"একবার ইনষ্টিটিউট চালু হয়ে গেলে তখন এসব সমস্যা আর থাকবে না।"

"তার চেয়ে আমেরিকায় আরও কিছুদিন কাজ করলে আপনার সুবিধে হ'ত না? ওখানে কি আপনার কোনও অসুবিধা হচ্ছে? যদি তাই হয়—"

"না, না। আমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। কি জানেন, ভারতবর্ষের এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বিজ্ঞানের। তাই আমরা বাইরে গিয়ে যেটুকু শিখেছি দেশে এসে তার ব্যবহারিক বিনিয়োগের চেষ্টা করা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য।"

সারকিসিয়ান বলল, "তা ত বটেই। আমার অবশ্য মনে হয়—এটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত ধারণা—এদেশে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন কৃষি-উন্নয়ন। আপনার পরিকল্পিত গবেষণাগারের চেয়ে ছোট ছোট লেবরেটরী তৈরী ক'রে মাটি, সার, শস্যের দুশমন কীট-পতঙ্গ ধ্বংস, এসব নিয়ে কাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। আমার মনে হয়—মাপ করবেন, আমার ভুলও হ'তে পারে—ভারতবর্ষে প্রাথমিক কর্তব্যগুলি উপযুক্ত প্রাধান্য পাচ্ছে না। অনেক বড় বড় কাজে আপনারা হাত দিচ্ছেন, অথচ যে-সব ছোট্ট ছোট্ট ব্যাপারের সঙ্গে আপনাদের বেশির ভাগ মানুষের জীবন ঘনিষ্ঠ জড়িত, সেদিকে উপযুক্ত নজর আপনাদের নেই।"

"আপনি যা বলছেন তা কতটা সত্যি আমার জানা নেই। আমি দেশে কাজকর্ম কোথায় কতটুকু হচ্ছে বিশেষ জানি নে। তবে এটুকু বুঝতে পারি যে, ছোট্ট ছোট্ট ব্যাপার নিয়ে ব'সে থাকার সময় আমাদের নেই। আমরা বড় দেরিতে সুরু করেছি। আমরা এখনও গরুর গাড়ীর যুগে আটকে রয়েছি, আপনারা মহাব্যোমে অভিযান চালাচ্ছেন। আমাদের ঘরে এখনও কেরোসিনের বাতি জ্বলে; আপনারা আণবিক শক্তিতে শিল্প-চালনার চেষ্টায় লেগে গেছেন। আমাদের হাতিয়ার এখনও কৃপাণ, বড় জোর রাইফেল; আপনারা আণবিক বোমায় পৃথিবী ধ্বংসের ক্ষমতা অর্জন করেছেন। যারা এগিয়ে গেছে আর যারা এগোতে পারে নি, তাদের মধ্যে প্রভেদ আজ যত বেশি ইতিহাসের অন্য কোনও যুগে এতটা ছিল না। সুতরাং আমাদের একসঙ্গে অনেক কিছু করতে হবে, এবং তাড়াতাড়ি করতে হবে। আমাদের সমাজ ছেঁড়া প্রাচীন কাঁথার মত, তাকে তালি দিয়ে আর চলবে না।"

"আপনি যা বললেন একথা এদেশে সর্বদা শুনতে পাই," আর্থার সারকিসিয়ান কিঞ্চিৎ হতবুদ্ধি হয়ে বলল, "অথচ এর অর্থ বুঝতে পারলেও যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমি নিজে নিঃসন্দেহ নই। উচ্চাশা খুব বড় জিনিষ, কিন্তু আশার বীজ ছড়িয়ে যদি ফসল কাটা না যায় তা হ'লে ফল অত্যন্ত খারাপ হ'তে পারে। ধরুন, আণবিক বোমা। এ কথা আজ সবাই জানে যে, আণবিক বোমা প্রায় প্রত্যেক মধ্যম অগ্রসর দেশে তৈরী হ'তে পারে। কিন্তু কথা হচ্ছে, তৈরী হওয়া দরকার কি না। একটা আণবিক বোমা তৈরী করতে যে অর্থ খরচ হয় তা দিয়ে অনেক অন্য ভাল কাজ করা সম্ভব। এবং ভারতবর্ষের মত দু'চারটে দেশ দু-দশটা আণবিক বোমা তৈরী করলে পৃথিবীর বর্তমান বিভীষিকার ভারসাম্য কোনও মতে বদলাবার সম্ভাবনা নেই।"

দেববাণী বলল, "আপনার তুলনাটা একটু বেখাপ্পা হল, কিছু মনে করবেন না। যতদূর জানি আমাদের দেশে আণবিক বোমা তৈরীর কোনও প্ল্যান নেই। বরং আপনারাই ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে আণবিক বোমা তৈরীর সুযোগ এবং কিছু কিছু সুবিধে ক'রে দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের আণবিক শক্তির প্রয়োজন আছে। শিল্প সংগঠনে বা বিদ্যুৎ নির্মাণে আণবিক শক্তি অবশ্য এখনও আপনাদের দেশেও খুব একটা সাহায্য করে নি, বা তাকে করতে দেওয়া হয় নি, কিন্তু এমন এক দিন নিশ্চয় আসবে যখন আণবিক শক্তির বিনিয়োগে আমাদের অগ্রগতি সহজতর হবে।"

আর্থার সারকিসিয়ান যে খুশী হল না, দেববাণী তা বুঝল।

সারকিসিয়ান কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে গলার স্বর মোলায়েম ক'রে প্রশ্ন করল, "আপনার গবেষণার বিষয় আমরা কি করতে পারি?"

দেববাণী বলল, "আমি খোলাখুলি কথা বললে অপরাধ নেবেন না ত?"

"নিশ্চয় না।"

"আমি শুনেছি, এ বিষয়ে আমাদের সরকার আপনাদের মতামত জানতে চেয়েছেন।"

"আর কি শুনেছেন?"

"আপনারা খুব একটা উৎসাহ দেখাচ্ছেন না।"

সারকিসিয়ান গভীর নীল-চোখে নীরবে তাকিয়ে রইল।

দেববাণী বলল, "উৎসাহ দেখান, না-দেখান আপনাদের ব্যাপার, আপনারা বুঝবেন। আমি

আপনাদের দেশ থেকে কোন সরকারী সাহায্য চাই নি। এদেশে গভর্ণমেণ্টের কাছে আমরা কেবল জমি চেয়েছি। আমাদের গবেষণাগারকে সরকারী প্রভাবের বাইরে রাখার চেষ্টা করছি আমরা। আপনার কাছে অনুরোধ, এমন কিছু করবেন না যাতে আমাদের উদ্যোগ ব্যর্থ হয়।"

আর্থার সারকিসিয়ান নীরবে চিন্তা করল।

তার পর বলল, "আপনি কবে আমেরিকা ফিরে যাচ্ছেন?"

"আরও কিছুদিন আছি। ছুটি একটু বাড়াতেও পারি।"

"একদিন আমাদের সঙ্গে ডিনার খেতে আসুন; খুব খুশী হবেন মিসেস সারকিসিয়ান।"

"ধন্যবাদ।"

"কবে আপনি ফ্রী আছেন?"

"সপ্তাহখানেক পরে।"

"কেন? এক সপ্তাহ পরে কেন?"

"ডাঃ বসুর আসার কথা দু'চার দিনের মধ্যে।"

"আমি আপনাকে ফোন করব'খন।"

আর্থার সারকিসিয়ান সাক্ষাৎকারের সমাপ্তি সূচনা করল।

দেববাণী তবুও ব'লে উঠল, "আমার অনুরোধ সম্পর্কে আপনি কিন্তু কিছু বললেন না।"

আর্থার সারকিসিয়ান তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। দেববাণীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে করমর্দন করতে করতে বলল, "এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ কিছু বলার নেই। কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচয় পাকা করবার ইচ্ছে রইল। ডাঃ বসু ও আপনি একদিন ডিনারে এলে খুব খুশী হব।"

দেববাণী বুঝতে পারল গবেষণাগার স্থাপনে এঁদের উৎসাহ নেই। বুঝতে পেরে মনটা তেতো হয়ে উঠল। বর্তমান কালে সবচেয়ে বড় মুশকিল, দেববাণী ভাবল, সরকারকে বাদ দিয়ে বা এড়িয়ে কোনও কিছু করা যায় না। বিদেশী মুদ্রার চলাচল সরকারের কঠোর তত্ত্বাবধানে। বেসরকারী সাহায্যও মার্কিন ও ভারত গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ছাড়া পাবার উপায় নেই। অথচ সরকারী মানসের রীতিনীতি অনেক সময়ে ব্যক্তি-মানসের চিন্তাধারা থেকে একেবারে আলাদা। গবেষণাগারের প্রস্তাব কেন মাঝপথে আটকে গেছে তার কিছু আন্দাজ এবার দেববাণী পেয়ে গেল। পাবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে সেই কথাটাই আবার নতুন ক'রে মনে হ'ল: এ আমার কাজ নয়। আমার ওপর এ দায়িত্ব চাপান হিমাদ্রির উচিত হয় নি। এ এক বিচিত্র দুনিয়ায় আমরা বাস করছি। কোনও কিছু রাজনীতি কূটনীতি থেকে আলাদা ক'রে দেখবার উপায় নেই। বিজ্ঞান পর্যন্ত রাষ্ট্রনীতির অন্যতম বাহনে পরিণত হয়েছে।

ঘড়িতে দেববাণী সময় দেখে নিল। আরও একজনের সঙ্গে দেখা করবার আছে। তিক্ত মন নিয়ে সেখানে যাবার খুব উৎসাহ নেই। তবু যেতে হবে। অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করা হয়ে গেছে।

গোকুলভাই বিপিনভাই দেশাই কনট সার্কাসে একটা ফ্ল্যাটে বাস করেন। আজীবন গান্ধীর সহচর-শিষ্য। উনিশ শ' একুশ সালে গান্ধীজি যখন অসহযোগ আন্দোলন সুরু করেন, গোকুলভাই তখন পুণায় একটা প্রতিষ্ঠাবান্ কলেজে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। অধ্যাপনা ছেড়ে গান্ধীর শিষ্য হলেন। পরে মহারাষ্ট্র অঞ্চলে অন্যতম ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিন দশকে বিপিনভাই গান্ধীর আশ্রমে চ'লে যান। তার পর থেকে এখন পর্যন্ত শিক্ষা-বিষয়ে নানা জাতীয় কাজকর্মে তিনি লিপ্ত। তিন-চারটে সরকারী কমিশন কমিটিতে তিনি সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন; কয়েক বছর বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারও ছিলেন। গোকুলভাই দেশাই-এর বয়স এখন পঁয়ষট্টি। শুভ্র-কেশ খুব ছোট্ট ক'রে ছাঁটা; ফর্সা গোলগাল মুখখানায় বুদ্ধির দীপ্তি, দার্শনিক প্রশান্তি। বড় বড় শাদা চোখের মাঝখানে কালো মণি এখনও আশ্চর্য উজ্জ্বল। বেঁটে-খাট দেহ, হালকা, গতিশীল।

গোকুলভাই দেশাই-র সঙ্গে একদিন সাবিত্রী আম্মার বাসায় দেববাণীর আলাপ হয়েছিল। গান্ধীজির শিষ্যত্ব দু'জনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গ'ড়ে তুলেছিল; সাবিত্রী আম্মা গোকুলভাইকে দেববাণীর কথা বেশ একটু ভাল করেই বলেছিলেন। দেববাণীরও অল্প সময়েই গোকুল-ভাই-এর প্রতি শ্রদ্ধা জন্মেছিল। দেববাণী বিদায় নেবার সময় তিনি বলেছিলেন, প্রয়োজন হলে সে যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করে।

সিঁড়ির নীচে এক শিখ-দরজি ছোট্ট দোকান খুলে বসেছে। তার পাশে পেভমেণ্টে মুচি বসেছে তার যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে। সিঁড়ি উঠে গেছে বক্র গতিতে দৃষ্টির আড়ালে। পেভমেণ্টে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে দেববাণী দরজিকে জিজ্ঞেস করল, দেশাই-সাব কি ওপরে থাকেন? দরজির মাথা নাড়া শেষ না হতেই সে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

দোতলায় দরজার গায়ে গোকুলভাই দেশাই-এর নাম দেখতে পেল। বেল টিপতে একটি তরুণ এসে দরজা খুলল।

"মিঃ দেশাই আছেন?"

"আছেন। আপনি ভেতরে আসুন।"

ভেতরে গিয়ে সে দেববাণীকে যে ঘরে বসাল তাতে আলোর অভাব। পুরাণো একটা সোফা সেটের স্থানে স্থানে রেক্সিন উঠে গেছে। এক কোণে একটা গোল টেবিলে এক রাশি সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন জড়ো হয়ে আছে। ঘরটায় খুব একটা আলো ঢুকতে পারে না। দেওয়ালের অনেকখানিতে রং-এর প্রলেপ, কিন্তু মাঝে মাঝে প্রলেপ উঠে গিয়ে সাদা বেরিয়ে পড়েছে। দেববাণী দেখল, দেয়ালে মাত্র দুখানা অলংকার। একখানা মহাত্মা গান্ধীর ছবি—মৃত দেহের আলোকচিত্র; অন্যখানা ইংরেজী ক্যালেণ্ডার।

একটু পরেই বিপিনভাই ঘরে এলেন। মোটা খদ্দরের কুর্তা ও পায়জামা। তাঁতে-বোনা মোটা পশমী চাদরে দেহ আবৃত।

দেববাণী দাঁড়িয়ে নমস্কার করতে বিপিনভাই তার দুখানি হাত ধ'রে ফেললেন। মুখখানা তাঁর বিষণ্ণ গম্ভীর।

"এই একটু আগে আমি ফিরেছি," বিপিনভাই বললেন। "আপনাকেও ত দেখলাম ওখানে।"

"আমি খবরের কাগজ খুলে জানলাম তিনি মারা গেছেন।"

"সাবিত্রীকে আমি অনেক বছর ধ'রে জানি। সে আমার অত্যন্ত আপনার লোক ছিল।"

দেববাণী চকিত দৃষ্টিতে বিপিনভাই-এর চোখে তাকাল। দেখল, নিস্তরঙ্গ বিষাদের মধ্যেও মৃদু আলোর ঝলকানি। গভীর অন্ধকার রজনীতে নক্ষত্রের আলো।

"সাবিত্রীর মত সাহসী স্ত্রীলোক সচরাচর দেখা যায় না। জীবনে কোনও প্রতিকূল অবস্থাই তাকে আটকাতে পারে নি। অমন দুঃসাহস আমি খুব বেশি দেখি নি।"

"আমি ওঁর জীবন-কাহিনী কিছু কিছু শুনেছি," দেববাণী মৃদুস্বরে বলল।

"কার কাছে?"

"উনিই বলেছেন।"

"আরও অনেক গুণ ছিল সাবিত্রীর। সে ছিল যাকে বলতে পার পরমা সুন্দরী। যেদিন সে প্রথম গান্ধীজির আশ্রমে এল—সে আজ অনেক দিনের কথা, তখন তার বয়স কম হয় নি—তাকে দেখে আমরা সবাই মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমার চেয়ে দু'এক বছরের ছোট ছিল সাবিত্রী। অল্প দিনেই আশ্রমে সে নিজের প্রতিষ্ঠা বিস্তার ক'রে নিয়েছিল।"

"খুব স্নেহশীল ছিল তাঁর মন," দেববাণী যোগ দিল।

"আর আশ্চর্য উদার," সোৎসাহে বললেন বিপিনভাই। "কোনও রকমের সঙ্কীর্ণতা সাবিত্রীর মনে স্থান পায় নি। আরও একটা বিশেষ গুণ ছিল তার—সংগ্রামে উৎসাহ। লড়তে না পারলে সে শান্তি পেত না। ছোট-বড় আন্দোলন যাই যখন হোক না কেন, জেলে যাবার জন্যে সাবিত্রী সবার আগে তৈরি।"

"অমন উদার ছিলেন বলেই অত সহজে আমাকে তিনি এত স্নেহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন," দেববাণী বলল, "সংগ্রামী ছিলেন, তাই আমার জন্যও কম চেষ্টা করেন নি।"

"আপনার মধ্যে যে 'ফাইট' আছে তা-ই সাবিত্রীকে আকর্ষণ করেছিল। কাউকে ভাল কাজের জন্যে লড়তে দেখলেই সে আনন্দ পেত, তার পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করত। আর এ জন্যেই স্বাধীনতার পর তার প্রতিষ্ঠা কমে গেল। তখনও সব কিছু নিয়ে তাকে লড়তে দেখে নেতারা অসন্তুষ্ট হলেন।"

"ও কথা আমাকেও তিনি বলেছিলেন।"

"আমাদের বেশির ভাগ নেতারাই, বোধ করি সমস্ত দেশটাই, স্বাধীনতার পর সংগ্রাম-ক্লান্ত। ইংরেজ বিদায় নিয়ে যেন আমাদের সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটিয়ে দিয়ে গেছে। দেশ গ'ড়ে তোলাও যে বিরাট সংগ্রাম, হয়ত স্বাধীনতা পাবার চেয়েও বড়, সেকথা আমরা মানতে রাজী নই। সাবিত্রী ছিল সেই মুষ্টিমেয়দের দলে যারা কিছুতেই লড়াই ছাড়তে রাজী নয়। আমি একবার তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ইংরেজ গেল, এবার লড়বে কার সঙ্গে?' মুহূর্তের দ্বিধা না ক'রে সে বলেছিল, 'ইংরেজের চেয়েও বড় শত্রু আছে, তার সঙ্গে।' আমি প্রশ্ন করলাম, 'কে সে?' উত্তর হ'ল, 'আমরা নিজেরা'।"

সাবিত্রী আম্মা সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বললেন বিপিনভাই দেশাই। দেববাণী বুঝল, এ সব কথা বলতে পেরে এই পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধের মন হাল্কা হতে পারছে। হয়ত সে বাইরের অল্প-পরিচিত মেয়ে বলেই বিপিনভাই প্রাণ খুলে এত কথা বলতে পারছেন, ফিরে যেতে পারছেন সেই সুদূর অতীতে যেখানে, অন্য কোনও যুগে, অন্যতর পরিস্থিতিতে, অন্য চরিত্রের ভূমিকায় তিনি, সাবিত্রী আম্মা এবং আরও অনেকে একদিন এক ভিন্ন রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বিপিনভাই-এর কথা

শুনতে শুনতে দেববাণীর মনে হ'ল, জীবন কি বিরাট্ আশ্চর্য, আর তারও চেয়ে বড় বিস্ময় মানুষের ভালবাসা।

সাবিত্রী আম্মার সঙ্গে বিপিনভাই দেশাই-এর জীবন কোন্ অদৃশ্য সূত্রে অতীতের কোনও এক অসতর্ক মুহূর্তে বাঁধা পড়েছিল, দেববাণী কেবলমাত্র আন্দাজ করতে পারল। এ বন্ধনের গভীরতা ছিল কতখানি, কিংবা তার ব্যাপকতা, বিপিনভাই-এর কথা শুনতে শুনতে মন তার তাই নিয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠল। বিপিনভাই ব'লে গেলেন সেই অতীতকালের রোমাঞ্চকর সব কাহিনী, যখন দেশের মুক্তির মধ্যে কত-না নরনারী নিজেদের জীবনের নানাবিধ সমস্যার মুক্তি-সন্ধান পেয়েছিল। আশ্রমিক জীবনের শান্তশ্রী বাতাবরণে হৃদয়ের উত্তাপ নিয়ে এঁরা সেদিন কি করতেন, দেববাণীর মন প্রশ্ন করল, কিন্তু বিপিনভাই-এর সন্ত-শোকতপ্ত স্বতঃস্ফূর্ত জবানবন্দীতে তার সম্যক্ জবাব পেল না। তার মনে পড়ল, মা বাসন্তী দেবীর কথা। "নবীন বাংলা"র যুগে বিবেকানন্দ-অরবিন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হৃদয় যে পাষাণ কঠিন নীরব সংযমে ত্যাগকে সবচেয়ে বড় ব'লে মেনে নিত, বিংশশতাব্দীর উত্তর-তিরিশের অনেক-তরল পরিস্থিতিতেও কি সে-রকম সংযমে প্রেমকে এঁরা কামনার আগুন থেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন? বিপিনভাই দেশাই অকৃতদার; তাঁর এই আজীবন কৌমার্যের পেছনে সাবিত্রী আম্মার প্রভাব কতটুকু? দেববাণী সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল, বিপিনভাই একবারও সাবিত্রী আম্মার স্বামীর নাম উল্লেখ করলেন না। সরোজার কথাও একবার তাঁর মুখে উচ্চারিত হ'ল না। সে সাবিত্রীর কাহিনী বলতে বলতে বার বার তিনি উদ্বেলিত হলেন, সে স্ত্রী নয়, মা নয়, শুধু নারী।

এমনি ক'রে প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেল। এক সময় হঠাৎ বিপিনভাই-এর খেয়াল হ'ল, দেববাণীকে তিনি কেবল নিজের কথা ও সাবিত্রী আম্মার কথাই ব'লে গেছেন, তার কথা একবারও জিজ্ঞেস করেন নি।

কথাবার্তার রাশ টেনে, সলজ্জ হাসির সঙ্গে বললেন, "এতক্ষণ আমি কেবল আমাদের কথাই ব'লে গেলাম; আপনার নিশ্চয় ভাল লাগছে না। আসলে মৃত্যু মানুষের মনকে বড় নরম ক'রে দেয়। স্মরণ করিয়ে দেয়, তোমারও সময় হয়ে এসেছে, তৈরি হয়ে নাও।"

"আপনার কথা শুনতে আমার খুব ভাল লাগছে," দেববাণী আন্তরিকতার সঙ্গে বলল।

"আমরা কেউ একবারে মরি না, আস্তে আস্তে মরি। বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু শুরু হয়। জীবনের এক-একটা দিক্ মরতে থাকে। এক একজন আত্মীয়-বন্ধু-স্বজনের মৃত্যুর সঙ্গে আমাদেরও খানিকটা ম'রে যায়।"

দেববাণীকে এবার তিনি বললেন, "এসব কথা থাক। আপনার বয়সে মৃত্যুর কথা শুনতে ভাল লাগে না। এবার আপনার কথা বলুন। সাবিত্রীর কাছে আপনার গবেষণাগারের কথা আমি শুনেছিলাম। কতদূর কি হ'ল বলুন।"

দেববাণী সব কিছু গুছিয়ে বলল। মার্কিন দূতাবাসে একটু আগে কথাবার্তা পর্যন্ত।

বিপিনভাই গভীর মনোযোগে শুনছিলেন। দেববাণী থামলেও তিনি কিছুক্ষণ ভাবলেন।

তার পর বললেন, "ব্যাপারটা কোথায় আটকেছে আন্দাজ করতে পারছি। আপনাদের গোড়ায় ভুল হয়েছে, আপনারা নির্দিষ্ট পথে এগোন নি।"

"নির্দিষ্ট পথ মানে?"

"গবেষণাগার স্থাপনের পরিকল্পনা প্রথমে আপনাদের ভারত সরকারের কাছে পাঠান উচিত ছিল। বিদেশী সাহায্য সংগ্রহের ব্যবস্থা ওঁরাই করতেন।"

"তা হ'লে উদ্যোগটাও ওঁদেরই হ'ত।"

"কিন্তু আপনাদেরও তাতে স্থান থাকত।"

"সে রকম স্থান আমরা চাই নি। আমরা চেয়েছিলাম বেসরকারী ভাবে কিছু তৈরি করতে।"

"বর্তমান অবস্থায় তা সম্ভব নয়। ভবিষ্যতেও এদেশে হবে কি না সন্দেহ।"

"কেন?"

"সম্ভব যে নয় তা ত দেখতেই পাচ্ছেন। ভারত সরকার জানেন না, যাঁরা আপনাদের অর্থ ও যন্ত্রপাতি দেবার আশ্বাস দিয়েছেন তাঁরা কেমন লোক, তাঁদের উদ্দেশ্য কি। মার্কিন গবর্ণমেণ্টও তাঁদের সরাসরি সাহায্য দিতে অনুমতি দেবেন, মনে হচ্ছে না। এদেশে যে কয়টি মার্কিন ফাউণ্ডেশন কাজ করছে, সবার সঙ্গে দু'দেশের গবর্ণমেণ্টের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে।"

"কিন্তু আমি নিজেই দেখেছি জার্মানীতে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক নিজেদের প্রচেষ্টায় মার্কিন সাহায্য নিয়ে মস্ত এক গবেষণাগার স্থাপন করেছেন। জার্মান সরকার তাঁদের বাধা দেন নি।"

"জার্মানীতে যা সম্ভব ভারতবর্ষে তা সম্ভব নয়। প্রথম কথা, ওরা অনেক এগিয়ে গেছে, ওদের প্রত্যেক

পদক্ষেপের আগে সতর্ক হয়ে চারদিকে তাকাতে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, ওরা ধনতন্ত্রের পথে চলছে, আমরা মোটামুটি সমাজতন্ত্র গঠন করতে চেষ্টা করছি। এদেশে দেশ গঠনে সরকারের যতখানি দায়িত্ব ও অভিভাবকত্ব, জার্মানীতে তা নয়। তা ছাড়া, আমার মনে হচ্ছে, মার্কিন সরকারও হঠাৎ একটা উচ্চতর বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের জন্যে অর্থ সাহায্য দিতে চট্ ক'রে রাজী হবেন না।"

"তাই ত দেখছি।"

"ওরা আমাদের অনেক সাহায্য করছে, কিন্তু মার্কিন জাতটা এমন দুর্ভাগা, সুনাম একেবারে পাচ্ছে না। তার কারণ ওরা আমাদের নতুন ক'রে ঢেলে সাজবার প্রয়াসে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে না। ওরা বলছে, তুমি রুগ্ন, দুর্বল, তোমার উপসর্গগুলি যাতে কমে আসে তার ব্যবস্থা করছি। আমরা বলছি, উপসর্গ নয়, আসল রোগটার চিকিৎসা প্রয়োজন। ওরা মানছে না।"

"ওদের বোঝাবার চেষ্টা করেছি আমরা ?"

"সরকারের তরফ থেকে চেষ্টার ত্রুটি হয়েছে ব'লে ত মনে হয় না। একটা কথা সচরাচর আমাদের দেশের লোকে জানে না। মার্কিন দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের ভাবগত আদান-প্রদান আজকের নয়, বহু দিনের। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা যাবার বেশ আগে আমাদের বেদান্ত দর্শন ওদেশে কিছু প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইংরেজের সঙ্গে আমাদের লড়াই-এ আমরা প্রথম মহা-যুদ্ধের পরেই আমেরিকার সমর্থন চেয়ে আবেদন-নিবেদন, প্রচার-প্রভাব শুরু করেছিলাম। গান্ধীজী নিজেও মার্কিন জনমত সংগঠনের জন্যে কম চেষ্টা করেন নি। লালা লাজপত রায় ও সরোজিনী নাইডুকে তিনি আমেরিকায় ভারতের স্বাধীনতা-দাবীর সমর্থন সংগঠনের জন্যে বার বার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝখান পর্যন্ত আমরা মার্কিন জাতটাকে ভারতবর্ষের সঙ্গে পরিচিত করাবার চেষ্টা ক'রে এসেছি। স্বাধীনতা পাবার পরে, ইংরেজের কথা বাদ দিলে, আমেরিকার সঙ্গেই আমাদের আদান-প্রদান সবচেয়ে বেশি। আজ ভারতবর্ষে বোধ করি কয়েক হাজার আমেরিকান 'বিশেষজ্ঞ', 'পারদর্শী', 'পরামর্শদাতা' অবস্থান করছেন। তাঁরা সমস্ত দেশে ছড়িয়ে রয়েছেন। অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করছেন, অনেকে গ্রামাঞ্চলে কাজ করছেন, আবার অনেকে শিল্প, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, এ সব বিবিধ বিষয়ে লিপ্ত আছেন। মার্কিন সংবাদপত্র-গুলি একে একে এদেশে প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে। সুতরাং ভারতবর্ষকে জানবার ও বুঝবার সুযোগ-সুবিধে আমেরিকার যতখানি ছিল বা আছে ততটা, ইংরেজ ছাড়া, বাইরের আর কোন দেশের নেই।"

"তবু, আপনি বলছেন, ওরা বুঝতে পারে নি ?"

"আমাদের ত তাই মনে হয়। ওরা হয়ত নিজেদের দিক্ থেকে বেশ ভালই বুঝে নিয়েছে। আমাদের মনে হয়, অন্য কোন জাতকে বুঝতে ও জানতে হ'লে যে অন্তর্দৃষ্টি, যে নিস্পৃহ আত্ম-নিবর্তনের প্রয়োজন তা ওদের কমই আছে। ওরা কেবল ওদের দৃষ্টিতে, মাপকাঠিতে সবকিছু বিচার ক'রে দেখতে চায়।"

"আমি অনেক দিন ওদের দেশে কাটিয়েছি," দেববাণী বলল। "ওদের চরিত্রের ভাল-মন্দ অনেক কিছু নিজের চোখে দেখেছি, মনে বুঝেছি। কিন্তু ভারতবর্ষে ব'সে ওদের কেমন দেখায় তা জানতে পারি নি।"

"তা হ'লে আপনি এবার কি করবেন ভাবছেন ?"

"আপাততঃ আমার আর কিছু করার নেই। আমার বন্ধু ডাঃ বসু হয়ত কয়েক দিনের মধ্যে এসে পড়বেন। গবেষণাগারের প্ল্যান আসলে তাঁরই।"

"সাবিত্রী আপনাদের কথা একদিন আমাকে বলছিল।"

দেববাণী একটু আড়ষ্ট হ'ল।

বিপিনভাই বললেন, "তিনি ত ভিয়েনা থেকে আসছেন।"

"হ্যাঁ।"

"কবে আসবেন ?"

"ঠিক জানি নে। আজ-কালের মধ্যে জানতে পারব।"

"তিনি এসে কি কিছু করতে পারবেন ?"

"আমি বিশেষ ভরসা পাচ্ছি নে। না পারলে, আমরা ফিরে যাব। দু'জনেরই চাকরি আছে।"

তার সঙ্গে বিপিনভাইও হাসলেন।

"দেশে কিছুদিন কাজ করুন না কেন ?"

"কাজ কোথায় ?"

"কাজ হয়ত জুটে যাবে। আগে মন স্থির করুন।"

"আপনি কি আমাকে বিশেষ কোনও চাকরীতে ডাকছেন ?"

"শুধু আপনাকে নয়। আপনাদের দু'জনকেই।"

হঠাৎ দেববাণীর মুখে কথা জোগাল না। সে নীরবে বিপিনভাই-এর মুখে তাকিয়ে রইল।

"আমি বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলাম। এ বছর বোধ করি আবার আমাকে এ দায়িত্ব

নিতে হবে। যদি আপনারা দেশে কাজ করতে চান, খুব সম্ভব দু'জনকেই আমরা নিতে পারব।"

"আপনাকে ধন্যবাদের ভাষা নেই আমার। অবশ্য আমরা দেশে কাজ নেব কি না তার কিছুই ঠিক নেই।"

"জানি। যদি নিতে চান, আমাকে লিখবেন।"

"আপনি আমাদের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিয়েছেন?"

"এক-আধটু নিয়েছি। বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগকে অনেকখানি বাড়াবার প্ল্যান তৈরী হয়েছে। গবর্ণমেণ্ট সে জন্যে টাকা দিচ্ছেন। পদার্থ ও রসায়ন দুটো বিভাগকেই আমরা অনেক বাড়াব। পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে আণবিক শক্তি নিয়ে রিসার্চ করবার ব্যবস্থা হবে। কথা হচ্ছিল দু'চার জন বিদেশী বিশেষজ্ঞ আনবার। আপনারা যদি আসেন তা হ'লে বেশ ভালই হবে। আপনার কাজকর্মের কিছুটা পরিচয় আমার জানা আছে; আমার বন্ধু ডাঃ ভগবান্‌দাসের কাছে ডাঃ বসুর কথা তুলেছিলাম।"

"কিন্তু আপনি কি ক'রে জানলেন আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব, বা আমাদের দেশে চাকরি নেবার ইচ্ছে আছে?"

বিপিনভাই হেসে বললেন, "আপনারা আমাদের যত অলস ও অকেজো ভাবেন ততটা আমরা নই। আমরাও সর্বদা উপযুক্ত লোক খুঁজে বেড়াচ্ছি। দুঃখের কথা, শিক্ষাবিভাগে উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় না, গেলেও ধ'রে রাখা যায় না। কিছুদিন পরে হয় তারা বিদেশে চ'লে যায় নয়ত সরকারী চাকরি নিয়ে বসে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তেমন মাইনে দিতে পারে না, তাই তাদের জোর কম। সাবিত্রীর কাছে আপনার কথা শুনে তখনই আমি ভেবেছিলাম বরোদায় আপনাকে আনা যায় কি না। সাবিত্রীকে বলেওছিলাম। কিন্তু আপনার গবেষণাগারের ব্যাপারটা ঠিক মত ফেঁসে যাওয়ার আগে আপনাকে কিছু বলা উচিত মনে করি নি।" হাসতে হাসতে বললেন, "ফেঁসে যে যাবে আমি আগেই জানতাম। আপনার ঠিকানা আমার কাছে ছিল, আপনি আমেরিকায় ব'সেই আমার চিঠি পেতেন। কিছুদিন আগে ডাঃ ভগবান্‌দাসের সঙ্গে বরোদা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল। জিজ্ঞেস করেছিলাম, বাইরে ভাল ভারতীয় বৈজ্ঞানিক তাঁর জানা কারা আছেন। অন্য দু'চার জনের সঙ্গে ভিয়েনায় ডাঃ বসুর কথাও তিনি বললেন। তক্ষুনি আমার মনে পড়ে গেল, ইনি সাবিত্রীর বাড়ীতে দেখা বাঙালী মেয়েটির বন্ধু। বুঝতে পারলেন"—

বিপিনভাই এবার উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন—"আমরা অনেক বড় জাল ফেলে মাছ ধরবার চেষ্টা করি। কিন্তু পাই নে। গবর্ণমেণ্ট সব ভাগিয়ে নিয়ে যায়।"

দেববাণী বলল, "শিক্ষাক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, একথা আমি অনেকের কাছে শুনছি। বিদেশে কিন্তু এতটা নেই। আমেরিকায় পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ব্যবসা-বাণিজ্য বা গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাইনে দিতে পারে না। যাঁরা শিক্ষা ও গবেষণা নিয়ে জীবন কাটাতে চান, তাঁরা অপেক্ষাকৃত দারিদ্র্য স্বীকার ক'রে নেন। তাঁদের পুরস্কার অনেকখানি পারমার্থিক। আমাদের দেশে আমরা খুব বড় গলায় স্পিরিচুয়ালিজমের কথা বলি, কিন্তু কাজের বেলায় আমরা বোধ হয় কারুর চেয়ে কম ভোগবিলাসী নই।"

"বরং অনেকের চেয়ে বেশি," জোর দিয়ে বললেন বিপিনভাই দেশাই। "অবশ্য তার কারণও আছে। বহুদিন না পেয়ে পেয়ে আমাদের ক্ষুধা আজ অনেক বেশি; সবকিছু আমরা একসঙ্গে, অন্তত খুব তাড়াতাড়ি পেতে চাই।" একটু থেমে আবার বললেন, "আপনি যখন কথাটা তুললেন, তখন আমার পক্ষে প্রশ্ন করা কি অন্যায় হবে যে, আপনারা দু'জনে কত টাকার চাকরি হলে দেশে ফিরতে পারবেন?"

আরক্ত হয়ে দেববাণী বলল, "দু'জনের কথা ত আমি বলতে পারব না।"

"তা হ'লে আপনার কথাই বলুন।"

"ভেবে দেখি নি। দেশে আসব চাকরি নিয়ে একথাটাই এখনও পরিষ্কার ক'রে ভাবি নি।"

"কিছু একটা আভাস দেওয়াও আপনার পক্ষে সম্ভব নয়?"

একটু ইতস্তত: ক'রে দেববাণী বলল, "কাজ পছন্দ হলে টাকার ব্যাপারে আটকাবে না শুধু এটুকু আপনাকে বলতে পারি।"

"আপনার একার কথা, না দু'জনার?"

লজ্জা পেয়ে দেববাণী বলল, "আমার একার। ডাঃ বসু খেয়াল হলে বিনে মাইনেতেও কাজ করতে পারেন।"

বিপিনভাই বললেন, "আমরা কি দিতে পারব জেনে রাখতে পারেন। সঠিক বলতে পারছি না, তবে দু'জনকেই আমরা অধ্যাপকের পদে নিতে পারব। এক-একটা বিভাগের সম্পূর্ণ পরিচালনার ভার থাকবে আপনাদের ওপর। আট শ' থেকে বার শ' গ্রেডের যে-কোন স্থানে আপনারা সুরু করতে পারবেন।"

দেববাণী বলল, "আপনার প্রস্তাব লোভনীয় সন্দেহ

নেই। ভেবে দেখব। যদি দেশে ফিরে আসতে চাই তা হ'লে এর চেয়ে ভাল কিছু ভাবতে পারি নে।"

বিপিনভাই প্রশ্ন করলেন, "বাধা কিসের?"

"বাধা একটু আছে," দেববাণী আস্তে বলল।

উঠল দেববাণী। এ প্রসঙ্গ সে বাড়তে দিতে চায় না। বিপিনভাইকে মাথা নীচু ক'রে নমস্তে জানাল। তিনি দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

সিঁড়ি বেয়ে নামবার মুখে হঠাৎ দাঁড়িয়ে দেববাণী ব'লে উঠল: "আপনি সরোজা কোথায় জানেন? সকালে ও-বাড়ীতে সরোজাকে ত দেখতে পেলাম না!"

বিপিনভাই-এর নরম শান্ত মুখে অচানক কাঠিন্য দেখতে পেল দেববাণী।

তিনি বললেন, "না।"

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দেববাণীর মনে হ'ল বিপিনভাই এক ঘণ্টা সাবিত্রী আম্মার গল্প করেছেন; এর মধ্যে যে তাঁর স্বামীর নামই উচ্চারণ করেন নি তা নয়, সরোজার নামও তিনি মুখে আনেন নি।

১৭

সন্ধ্যার পরে হিমাদ্রির কেব্‌ল্ পেল দেববাণী। "তোমার জরুরী আহ্বানের অর্থ বুঝতে পারছি না। তবুও আসছি। আজ ছুটি মঞ্জুর হ'ল। দেবকুমারকে 'তার' করেছি। কাল জেনিভায় পৌঁছব। ওখান থেকে কবে দিল্লী পৌঁছব জানাব।"

কিছুক্ষণ আগে কাছাকাছি বাড়ীতে বড় গোছের একখানা ফ্ল্যাট একমাসের জন্যে দেববাণী পেয়ে গেছে। আইরীণই ঠিক ক'রে দিয়েছে। সুইডিস এক ভদ্রলোকের ফ্ল্যাট, স্ত্রী দেশে চ'লে গেছেন, তিনি মাস দু-একের জন্যে হায়দরাবাদে যাচ্ছেন কাজে; দেববাণীকে 'কেয়ার-টেকার' হয়ে থাকতে হবে; ভাড়ার অর্ধেক দিলেই চলবে। অত বড় ফ্ল্যাটের কোনও প্রয়োজন ছিল না দেববাণীর; তবু সুবিধে অনেক, ভাড়া খুব বেশি নয়। আইরীণের গাড়ী দরকার হ'লে ব্যবহার করা যাবে, যদিও কিছুদিন হ'ল সে প্রায়ই ট্যাক্সি চড়ছে; ফ্ল্যাটে টেলিফোন আছে; শয়নঘর থেকে রান্নাঘর পর্যন্ত বিলেতী কায়দায় সাজান-গোছান। মা ত কাল হরিদ্বার যাচ্ছেন; দেববাণী বুঝতে পারছে, হিমাদ্রি আসবার সময় ইচ্ছে ক'রে তিনি স'রে পড়ছেন। যদিও বলছেন, দু'চার দিন পরেই ফিরে আসবেন, দেববাণীর ধারণা তিনি সপ্তাহ খানেক থাকবেন। খোকনকে নিয়ে তাকে একাই নতুন ফ্ল্যাটে থাকতে হবে। হিমাদ্রির জন্যে দেববাণী হোটেলে একটা ঘর বুক করতে যাচ্ছিল, এমন সময় আইরীণ এসে হাজির হল।

"তোমার একটা কেব্‌ল্ এসেছে, না? হিমাদ্রির ত?"

"হ্যাঁ।"

"কবে আসছে?"

"তা জানি নে। তবে আসছে।"

দেববাণী কেব্‌ল্‌টা আইরীণের হাতে দিল।

পরে দুষ্টু হাসিতে আইরীণের মুখ-চোখ ভ'রে গেল।

"কোন্ বাঁধনে এমন শক্ত ক'রে বেঁধেছ জানতে পারি কি?"

"আমাদের কবির ভাষায়, বন্ধনহীন গ্রন্থি।"

"আর গদ্যে?"

"বন্ধুত্ব।"

"না, না। প্রেম।"

"মস্করা রাখ। তুমি একটু বস। আমি ইম্পিরীয়েলে একবার ফোন করি।"

"কেউ এসেছি বুঝি?"

"না। হিমাদ্রির জন্যে একটা ঘর বুক ক'রে রাখি।"

"বাঃ। একটা পুরো ফ্ল্যাটে তোমাদের দু'জনের জায়গা হবে না?"

"মার খাবে।"

"আর কতদিন এই ছেলে-খেলা চলবে তোমাদের?"

"দেখি কতদিন চলে।"

"অর্থাৎ চালিয়ে যাবেই?"

"না চললে আর চালাব কি করে?"

"বাণী, তুমি এবার সীরিয়স হও।"

"সীরিয়স হয়েই ত আমার সব মুশকিল হয়েছে।"

"তা হ'লে হালকা হও।"

"দেখি হ'তে পারি কি না।"

"হিমাদ্রির জন্যে হোটেলে ঘর খুঁজছ কেন?"

"তবে সে থাকবে কোথায়?"

"কেন? তোমার কাছে?"

"তুমি বড্ড বেড়েছ।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, হিমাদ্রির থাকার ঘর ঠিক হয়ে গেছে।"

বিস্মিত দেববাণী প্রশ্ন করল, "কি বললে?"

"হিমাদ্রির থাকার ঘর ঠিক হয়ে গেছে।"

"কোথায়?"

"তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।"

"অন্ত কেউ ভাবলে আমার পক্ষে খুব খুশী হবার কথা নয়।"

"আ-হা! এই ত তোমার মুখ খুলেছে। মানুষ হয়েছ দেখতে পাচ্ছি।"

নিজের অসতর্ক প্রগল্ভতায় লজ্জিত হয়েছিল দেববাণী।

সে বলল, "সঙ্গদোষ।"

"সঙ্গগুণ বল। মোট কথা, হিমাদ্রির বাসস্থান ঠিক আছে।"

"কোথায় ঠিক হ'ল?"

"এখানে।"

"তার মানে?"

"খুব সহজ। হিমাদ্রি এখানে থাকবে। এই তুমি এখন যেখানে আছ।"

"আইরীণ!"

"বাণী!"

"তুমি কি ঠিক বলছ?"

খুশিতে উচ্ছল দেববাণী।

"বেচারা হিমাদ্রি। তোমার সঙ্গে থাকতে না পারলে, অন্তত তোমার কাছাকাছি ত থাক!"

"তুমি একটি এঞ্জেল, আইরীণ।"

"ধন্যবাদ। তা হ'লে তাই ঠিক রইল।"

"বব্‌কে জিজ্ঞেস করেছ ত?"

"না।"

একটু দমে গিয়ে দেববাণী বলল, "তা হ'লে কি ক'রে হবে?"

"বব্ নিজেই এ ব্যবস্থা দিয়েছে।"

"তাই নাকি?" আবার খুশিতে উছলে উঠল দেববাণী।

"এবার বল, বব্ একটি কিউপিড্?"

এতদিন দেববাণী গুছিয়ে যে-সমস্যার কথা ভাবে নি, ভাবতে চায় নি, তাকে না জানিয়েই তার মন সে-সমস্যার ওপর অনেকখানি প্রলেপ লাগিয়ে রেখেছে। দেশের মাটি, বায়ু, জল আর মানুষের স্পর্শে দেববাণীর অন্তর্দ্বন্দ্ব যেন অনেকখানি কোমল ও নরম হ'য়ে এসেছে। সলিসিটর তালুকদার বৈষয়িক বাস্তব যুক্তিতে তাকে কিছুটা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু ভয় তার সমস্যাকে মেটাতে পারবে না, দেববাণী তা ভালই বুঝতে পেরেছিল। তার মায়ের নীরব আকাঙ্ক্ষা ও অনুরোধ, সাবিত্রী আম্মার অভিজ্ঞতা-নিকষিত উপদেশ এবং বিপিনভাই দেশাই-এর অপ্রত্যাশিত কর্ম-প্রস্তাবনা: সবকিছু মিলে দেববাণীর অন্তরে একটা অব্যক্ত, অস্পষ্ট অনুভূতি সৃষ্টি করেছে, যাকে ভাষায় রূপ দিতে গেলে হয়ত বলতে হবে, সব কিছু আমাকে তোমার কাছে টেনে আনছে, আমি নিজে আর নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারছি না। দেবকুমার হিমাদ্রিকে মায়ের স্বামীর ভূমিকায় গ্রহণ করবে কি না এ প্রশ্নের জবাব দেববাণী এখনও পায় নি; কিন্তু মন তার বার বার বলছে, এ প্রশ্নের সমাধান আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না; এবার তার একটা বিহিত করতে হবে। দেশের সঙ্গে সামান্য নতুন পরিচয়েই দেববাণী বুঝতে পেরেছে, বিদেশে তারা যে-ভাবেই বছরের পর বছর কাটাক না কেন, ভারতবর্ষে তাদের সম্পর্ককে সামাজিক অনুমোদনে সুপক্ক না করতে পারলে সসম্মানে কাজ করা যাবে না। বিপিনভাই দেশাই তাদের দু'জনকে বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ে আহ্বান করেছেন; কিন্তু তাদের সম্পর্কে সামাজিক বৈধতার ছাপ না থাকলে এ চাকরি যে করা যাবে না, এটুকু দেববাণী ভালই বুঝতে পেরেছে।

স্বাধীন ভারতবর্ষের নীতি-মান দেববাণী খুব একটা এখনও জানতে পারে নি। তবু, যেটুকু দেখেছে এবং যা-সব এক সপ্তাহে শুনেছে তাতে বুঝতে পেরেছে, জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, এখানেও তেমনি নানা বিরুদ্ধ প্রভাবের সংগ্রাম চলছে। শহরে সমাজের উঁচু স্তরে নীতি-মান অনেকখানি নেমে এসেছে। নতুন ধনী-দের মধ্যে বোধকরি সবচেয়ে বেশি। অন্যান্য ভোগের সঙ্গে নারী ও সুরা ভোগও ভারতবর্ষে অনেক বেড়েছে স্বাধীনতার পরে। এককালের ভোগবিমুখ নেতাদের বর্তমান সম্ভোগ-বিলাসের যে-সব কাহিনী এরই মধ্যে সে শুনেছে তার যদি কিছুটাও সত্যি হয় তা হ'লে বুঝতে হবে, নীতি-বাগীশতা দেশে আর নেই। পরস্ত্রীকে বিবাহ করার কয়েকটি কাহিনী দেববাণী শুনেছে; ডিভোর্সের পর মেয়েরা স্বচ্ছন্দে আবার বিয়ে করছে। সাবিত্রী আম্মা একদিন হেসে বলেছিলেন, ডিভোর্স-করা মেয়েদের যত সহজে বিয়ে হয় কুমারী মেয়েদেরও তা হয় না! চলতি ভাষায় যাকে সোসাইটি বলা হয় তার মধ্যে সম্ভোগ-প্রবাহ যে অনেকখানি ছড়িয়ে পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

সামাজিক নীতি-মান ভদ্র জীবনের পক্ষে অবশ্যই অনেকখানি উদার হয়েছে। কে কাকে বিয়ে করল তা নিয়ে দেববাণীর ছাত্রকালেও যে আলোড়ন হ'ত, আজ আর তা নেই। কাজিন-ম্যারেজ পর্যন্ত সমাজ উদারতার সঙ্গে গ্রহণ করছে। একজনের স্ত্রীকে ভাগিয়ে নিয়ে বিবাহ করলেও সমাজে সে গৃহীত হচ্ছে: কিছুদিন আগে দেববাণীর সঙ্গে এমনি এক দম্পতির পরিচয় হয়েছিল

দিল্লীর কোনও কলেজে তাঁরা দু'জনেই পড়ান। মেয়েটি আগের স্বামীকে ছেড়ে বর্তমান স্বামীকে বিয়ে করেছে; ডিভোর্স পর্যন্ত নেয় নি। ভারতবর্ষের আইন বোধ হয় এ বিষয়ে যথেষ্ট কড়া নয়। আনুষ্ঠানিক বিবাহ আইনত স্বীকৃত; উত্তরাধিকারে উইল সবচেয়ে বেশি জোরাল। বিবাহ সম্পর্কে সমাজ ও দেশ যে অত্যন্ত উদার হয়েছে তাতে, অতএব, সন্দেহ নেই। কিন্তু অবিবাহিত নরনারীর একত্র জীবনকে সমাজ এখনও গ্রহণ করে নি। সহজে করবেও না। বিদেশে এ-ধরণের সম্পর্ককে সমাজ গ্রহণ না করলেও বর্জন করে না; সহ্য ক'রে নেয়। ভারতবর্ষে তা হবার নয়। এমন কি বিবাহের বাইরে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বও এদেশে কুৎসা ও ব্যঙ্গের বিষয়। অর্থাৎ, দেববাণী বুঝতে পেরেছে, ভারতবর্ষ কোনও রকমে মিলিয়ে দেবার জন্য ব্যগ্র; না মেলান পর্যন্ত তার মনে যেন শান্তি নেই। হিমাদ্রি ও আমি যদি দেশে এসে কাজ করতে চাই, বাস করতে চাই, দেববাণী মনে মনে গত কয়েকদিন বার বার বলেছে, তা হ'লে···তা হ'লে আমাদের বিয়ে করতে হবে, স্বামী স্ত্রী হতে হবে।

অথচ, কি আশ্চর্য, দুজনের টাকায় লেকের ধারে বাড়ী করবার সিদ্ধান্তের সময়ও এমন স্পষ্ট ক'রে একথা দেববাণীর মনে হয় নি।

সেদিন উত্তীর্ণ সন্ধ্যায় ম্যাসাচুসেট্‌স্ থেকে হিমাদ্রি অমন ক'রে বিদায় নেবার পর দেববাণী পরম নিশ্চিন্তে সারারাত ঘুমিয়েছিল। হিমাদ্রিকে সাধারণ পুরুষের নগ্ন ভূমিকায় দেখতে পেয়ে তার রমণী হৃদয় প্রগল্ভ পরিতৃপ্তিতে ভ'রে গিয়েছিল। সে যে নিজেকে দিতে পারে নি, এজন্য কোনও বেদনা সেদিন রাত্রে তার মনকে আঘাত করে নি। তার না-দেবার মধ্যে যে পরিপূর্ণ দান লুকিয়ে ছিল হিমাদ্রির মত অন্ধ মানুষের পক্ষেই তা দেখতে না পাওয়া সম্ভব; কিন্তু হিমাদ্রির কামনার বহ্নি দেববাণীর সর্বাঙ্গে নিবিড় সুখস্পর্শের মত সারারাত লেগে রইল।

পরের দিন সে হিমাদ্রিকে চিঠি লিখল, সপ্তাহ-শেষে আমি তোমার অতিথি হ'ব। এয়ারপোর্টে এস।

বেশ সেজেগুজে দেববাণী হারভার্ডে এসে উপস্থিত হ'ল। হিমাদ্রি কোনও দিন তাকে এমন সযত্নে সুবেশিত দেখে নি। এয়ারপোর্টেই অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল।

"কি দেখছ?"

দেববাণী চিঠিতেই 'তুমি' লিখেছিল। মুখে এবার সম্বোধনটা একটুও আটকাল না।

"খুব সেজেছ, তাই দেখছি।"

"হঠাৎ একটু সাজতে ইচ্ছে হ'ল।"

হিমাদ্রি হাসল।

"চিঠিতে কিছু লেখ নি। হঠাৎ চ'লে এলে যে?"

"হঠাৎ চ'লে আসার ইচ্ছে হ'ল।"

"খুব ছেলেমানুষি করছ দেখছি," হিমাদ্রি খানিক হতবুদ্ধির মত বলল।

"কেন? আমি কি বুড়ী হয়ে গেছি?"

হিমাদ্রির হোটেলেই দেববাণীর জন্যে ঘর নেওয়া হয়েছিল। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। হোটেলে পৌঁছে দু'জনে যে যার ঘরে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে একত্র বেরিয়ে পড়ল।

দেববাণী বলল, "চল কোথাও গিয়ে বসি।"

"পার্কে যাবে?"

"বড় ভিড়।"

"তা হ'লে?"

"ইউনিভারসিটির পার্কে চল। সেখানটা নির্জন।"

হিমাদ্রি একটু ইতস্তত করল।

"চল।" দেববাণী বলল, "তোমার ছাত্র ও সহকর্মীদের কাছে লজ্জা পাবার কিছু নেই।"

দু'জনে এসে ফুলে-ভরা রং-বাহার পার্কের ঘন সবুজ লনের একধারে বসল। হিমাদ্রির মুখে কথা নেই।

কথা বলল দেববাণীই।

"অমন হন্ হন্ ক'রে চ'লে এলে কেন সেদিন?"

"তা ছাড়া আর কি করবার ছিল, বল?"

দেববাণীর মুখে হঠাৎ কথা এল না। নিজেকে সে গুছিয়ে নিল। খোলাখুলি কথা বলা তার এমনই স্বভাব, আজ আরও মনস্থির ক'রে এসেছে পরিষ্কার কথা বলবে।

একটু পরে বলল, "তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও?"

হিমাদ্রি চমকিত হয়ে তাকাল। ব্যথা-আনন্দে অস্থির তার বড় বড় গম্ভীর চোখ দু'টি।

"হ্যাঁ।"

"তুমি সুখী হবে?"

"তাই ত মনে হচ্ছে।"

"আমার সবই ত তুমি জান।"

"সে কথা আবার তুলছ কেন?"

"আগে তোমাকে একটা কথা বলে নি। এ কথা শোনবার জন্যে তুমি অস্থির, শোনার অধিকারও তোমার পুরো। কথাটা আর কিছু নয়। আমি তোমাকে ভালবাসি।"

নির্বাক্ আনন্দে হিমাদ্রির মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"আমি তোমাকে ভালবাসি," দ্বিতীয়বার বলল দেববাণী। "আমাকে চেয়ে যে সম্মান তুমি দিয়েছ তাতে আমার জীবন যে কতখানি মূল্যবান্ হয়েছে তা তুমি বুঝবে না।"

"তা হ'লে তোমার মত আছে?"

"কিন্তু পুরুষ ব'লে তুমি আমার কতগুলো সমস্যা বুঝতে পারছ না। এ সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আমি মত দিতে পারছি না।"

"কি সমস্যা?"—হিমাদ্রির কণ্ঠে ব্যথার ধ্বনি দেববাণীর অন্তরে প্রতিধ্বনি তুলল।

"আমি মা।"

"তা কি আমি জানি না?"

"তুমি জান। কিন্তু খোকন আমাকে ছাড়া আর কাউকে জানে না। সে আমাকে তোমার স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ না-ও করতে পারে।"

"কেন করবে না? আমি তাকে যথেষ্ট স্নেহ করি।"

"খোকন তার বাবাকে ভোলে নি।"

একটু চুপ থেকে হিমাদ্রি প্রশ্ন করল, "তা হ'লে খোকনের জন্যে আমাদের বিয়ে হবে না?"

করুণ হাসল দেববাণী। "তুমি এ বাধার অর্থ সবটা বুঝবে না। খোকন তোমাকে গ্রহণ না করতে পারলে আমাকেও সে পাবে না।"

"তা হ'লে খোকনকে বুঝিয়ে বল।"

"সে সময় আজ নয়। খোকন এখানে নেই। সে বড় ছোট, এসব এখনও বুঝবে না।"

"তা হ'লে ভাবছ কেন?"

"সে আমাদের কথা বুঝবে না। কিন্তু নিজের কথা ঠিক বুঝবে। ভাববে, মা তাকে ছেড়ে চ'লে গেল।"

"তা হ'লে?"

"খোকন ছাড়া আরও একটা কথা আছে।"

"বল।"

"যদি সে রাজী হয়, যদি আমরা কোনও দিন এক হ'তে পারি, তবু আমি আবার নতুন ক'রে মা হতে পারব না।"

"কেন?"

"খোকনের জন্যে। তা ছাড়া, সে-বয়সও আমার নেই।"

হিমাদ্রি ভাবল। বলল, "বয়স তোমার আছে। কিন্তু তুমি যদি না চাও, তা হ'লে আমার সন্তানের জননী তোমাকে হতে হবে না।"

"তুমি দুঃখ পাবে না?"

"হয়ত পাব। কিন্তু সে দুঃখ সইবে।"

দেববাণীর চোখে জল এসে গেল।

"তুমি অনেক বড়, তোমাকে যত দেখছি, তত তোমার মাহাত্ম্যের কাছে আমি ছোট হয়ে যাচ্ছি। আজ আমার সকল সমস্যা, দ্বন্দ্ব, চিন্তা, ভাবনা আমি তোমাকে দিলাম। তার সঙ্গে আমাকেও দিলাম তোমার হাতে তুলে। তুমি সব শুনলে, সব বুঝলে। এবার যা বলবে আমি তাই করব।"

হিমাদ্রি দেববাণীর হাত দু'টি দু' হাতে ধরল। বলল, "তা হ'লে আমার প্রথম হুকুম তামিল কর।"

"হুকুম কর।"

"বড় ক্ষিধে পেয়েছে। চল খেতে যাই।"

হোটেলের ডাইনিং ঘরে দু'জনে এল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত দু'জনের কত কথা হ'ল। এক সময় দেববাণী বলল, "রাত অনেক হ'ল। এবার শুতে যাই।"

হিমাদ্রি উঠে দাঁড়াল।

দেববাণীকে বুকে টেনে নিয়ে হিমাদ্রি দেখল তার দেহ জ্বলল না। গভীর প্রেম তাকে শান্ত করেছে।

দু'দিন আনন্দে কেটে গেল, দুঃখেও। নিজেদের সমস্যা নিয়ে অনেক আলোচনা হ'ল। হিমাদ্রি বুঝল, দেববাণীর অন্তর্দ্বন্দ্ব বাস্তব, কঠিন; না মিটলে দেববাণী পুনরায় স্ত্রী হতে রাজী হবে না। হিমাদ্রি আরও দেখল, পুত্রকে দেববাণী যেমন ভালবাসে, তেমনই ভয় করে। তাকে নিজের আকাঙ্ক্ষার অনুকূলে আনবার কোনও পথ বা উপায় তার জানা নেই, তাকে নিজের সমস্যা বুঝিয়ে বলতে সে ভয় পায়। দেববাণীর একমাত্র ভরসা খোকন নিজেই একদিন মা'র অবস্থা বুঝবে। দেববাণীর মত বুদ্ধিমতী বৈজ্ঞানিক যে অসহায় ভাবে এমন একটা ভুলকে আঁকড়ে থাকতে পারে হিমাদ্রি ভাবতে পারে নি। তাকে গভীর ভাবে ভাল না বাসলে সে নিশ্চয় অত্যন্ত বিরক্ত হ'ত। বর্তমানে তার প্রধান চিন্তা হ'ল কি ক'রে দেববাণীর মন থেকে এ সংশয় দূর করা যায়। জোর ক'রে দেববাণীকে বাঁধা যাবে না। অথচ তাকে ধীরে আস্তে বন্ধনের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

দেববাণী ফিরে যাবার আগে হিমাদ্রি বাড়ী তৈরির কথা পাড়ল।

"তুমি একদিন বলেছিলে তোমার কলকাতায় লেকের ধারে একটা বাড়ী তৈরি করার ইচ্ছে।"

দেববাণী হেসে বলল, "সে ইচ্ছে এখনও আছে। আমাদের ছাত্রকালে লেক বড় রোমান্টিক ব্যাপার ছিল।

আমরা উত্তর কলকাতার মেয়েরা কালে-ভদ্রে বালীগঞ্জ যেতাম। আমি লেকে বেড়াতে দু'তিনবারের বেশি যাই নি। কিন্তু সে দু'তিনবারের কথা এখনও আমার মনে আছে। সুদীর্ঘ সরোবর, মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপ, নারিকেল গাছের সারি, বিস্তীর্ণ সবুজ ঘাস; সব কিছু মিলে এক আশ্চর্য কোমল অনুভূতি। ওখানে যারা রোজ বেড়াবার সুযোগ পেত তাদের বেশ হিংসা হ'ত আমার, এখনও মনে পড়ে। কলেজের মেয়েরা লেক-পারের রোমান্স নিয়ে অনেক গল্প করত। আমি ভাবতাম, জীবনে যদি কিছু করতে পারি, লেকের ধারে একখানা ছোট্ট বাড়ী করব।"

"রোমান্সের লোভে?"

"ছোট্ট একখানা একতলা বাড়ী, যার জানলা খুললে লেকের জল দেখা যাবে, নারকেল গাছের ছায়া পড়বে জলে, ঝিরঝিরে হাওয়া বার বার কাঁপিয়ে তুলবে লেকের জল। খুব ভোরে উঠে আমি একবার বেড়িয়ে আসব লেকের ধারে, লোকজন কেউ তখনও আসে নি, রাত্রি-শেষে লেক সবে জেগে উঠেছে।"

"সর্বনাশ! তুমি এত রোমান্টিক ছিলে নাকি!"

"কি ভয়ানক রোমান্টিক যে ছিলাম ছোটবেলা তা বুঝি বলার নয়। অসম্ভব রকম রোমান্টিক ছিলাম ব'লেই জীবনে অত বড় ভুল করা সম্ভব হয়েছিল।"

হিমাদ্রি তাড়াতাড়ি বলল, "লেকের ধারে বাড়ী একটা তৈরী ক'রে নাও না কেন?"

নিজের মনেই দেববাণী বলল, "করা হয়ত যায়। কিন্তু সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।"

হিমাদ্রি বলল, "এস দু'জনে একসঙ্গে একটা বাড়ী কিনে ফেলি?"

চমকে উঠল দেববাণী। হঠাৎ কিছু বলতে পারল না।

হিমাদ্রি বলল, "আমারও ইচ্ছে লেকের কাছাকাছি একটা বাড়ী করার। দু'জনের দু'টি ছোট্ট বাড়ী যোগ দিলে বেশ বড় একটা বাড়ী হতে পারে। বড় বাড়ীর অনেক সুবিধে।"

"কিন্তু সে বাড়ীতে বাস করবে কে?"

"বাড়ী বানালেই যে বাস করতে হবে তার কোনও মানে নেই। তুমি আর আমি একসঙ্গে ত কিছু এখনও করলাম না, এস আগে একটা গৃহ-নির্মাণ করি। যদি কোনও দিন আমরা বাস না-ও করি, আমাদের ভালবাসা ওখানে বাস করবে।"

দেববাণী তক্ষুনি রাজী হয়ে গেল।

"বেশ। কিন্তু কারুর বাড়ী আমি কিনতে রাজী নই। আমরা নতুন বাড়ী তৈরী করব।"

"সে ভয়ানক ঝামেলা।"

"মা সব ব্যবস্থা করতে পারবেন। তুমি যাকে জান না। তুমি এখান থেকেই ভাল কনট্রাকটার ঠিক করতে পারবে। তোমার ত চেনা-জানার অন্ত নেই।"

"টাকা কিন্তু আমি বেশি দেব।"

"কেন?"

"তাই নিয়ম।"

দেববাণী হাসল।

"দিয়ো। যত খরচ হবে তার একান্ন ভাগ তোমার, উনপঞ্চাশ ভাগ আমার। কনট্রোলিং শেয়ার তোমারই থাকবে।"

বাড়ী তৈরী হবার সঙ্গে সঙ্গে দেববাণীর মনে আশ্চর্য পরিবর্তন এল। হিমাদ্রি আলগোছে দায়িত্বের প্রায় সবটুকু তার ওপর ছেড়ে দিল। আরকিটেক্টের প্ল্যান নিয়ে হিমাদ্রির সঙ্গে আলোচনা করতে গেলে হিমাদ্রি বলল, "বাড়ীর আমি কি বুঝি বল? ও-সব তুমি যা ভাল মনে কর তাতেই আমার মত। বরং তোমার ওখানে এদেশী কোনও আরকিটেক্টকে দেখাও।" টাকা হিমাদ্রি দেববাণীর ব্যাঙ্কে তার নামে জমা ক'রে দিল। অর্থাৎ বাড়ী নিয়ে দেববাণীকে, অন্য সব কাজের মধ্যে, যথেষ্ট ব্যস্ত থাকতে হ'ল। মাকে টাকা পাঠান, মা'র চিঠির উত্তর দেওয়া, কনট্রাক্টরের সঙ্গে পত্রালাপ, সব কিছুই তাকে করতে হ'ল। মাঝে মধ্যে হিমাদ্রি এক আধবার পরামর্শ দিল, টেলিফোনে অনেকবার তার সঙ্গে দেববাণী আলাপ করল, কিন্তু হিমাদ্রি কেমন অনায়াসে একপাশে স'রে দাঁড়াল।

শুধু তাই নয়, বাড়ী মাত্র কিছুটা তৈরী হয়েছে, এমন সময় হিমাদ্রি আমেরিকা ছেড়ে য়ুরোপ চ'লে গেল।

হার্ভার্ডে হিমাদ্রির পড়ানর মেয়াদ শেষ হয়ে আসছিল। ইচ্ছে করলে সেখানেই, বা আমেরিকার অন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে সে আবার চাকরি পেতে পারত। কিন্তু দেববাণীকে সে জানাল, আমেরিকায় থাকবার ইচ্ছে তার আর নেই। সে যাচ্ছে লণ্ডনে।

দুজনে এবার যখন দেখা হ'ল, দেববাণী দেখতে পেল, হিমাদ্রি কেমন অস্থির হয়ে উঠেছে।

"তুমি আমার কাছ থেকে পালাচ্ছ কেন?" প্রশ্ন করল দেববাণী।

"পাছে তোমার ওপর জুলুম ক'রে বসি, তাই।" পরিষ্কার জবাব দিল হিমাদ্রি।

"তুমি পালিয়ে গেলে কি জুলুম কম করা হবে?"

"কাছে থাকলে আরও বেশি হবে।"

"এই সব বাড়ীঘরের দায়িত্ব আমার ওপর চাপিয়ে তুমি স'রে পড়ছ?"

"তুমি অনেক বোঝা বইতে পার, বাণী, এ বোঝাও তোমার সইবে। আমি এমনি ক'রে আর পারছি না।"

বড় ক্লান্ত মনে হ'ল হিমাদ্রিকে। দেববাণীর অন্তর ব্যথিয়ে উঠল। চোখে জল ঘনিয়ে এল। মনে মনে সে বলল, "আমি একাই বুঝি সব পারি! আমার ক্লান্তি নেই, আমি ভেঙে পড়ি না?"

হিমাদ্রি লণ্ডনে চ'লে যাবার পর দেববাণী একাই তাদের যৌথ গৃহ-নির্মাণের দায়িত্ব পালন করল। বাড়ীটা তৈরী হবার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য হয়ে দেববাণী দেখল, তার নতুন একটা সত্তাও বাস্তব জন্ম নিয়েছে।

হিমাদ্রির সঙ্গে সম্পর্কের এই প্রথম শরীরী প্রতিচ্ছবি দেববাণীর নতুন সত্তা। এর সঙ্গে তার পূর্বেকার জীবনের কোন সম্পর্ক নেই। এমনকি খোকন পর্যন্ত এর সঙ্গে জড়িত নয়। লেকের ধারে এই অপূর্ব গৃহ দেববাণী-হিমাদ্রির ভালবাসাকে প্রথম বাস্তব রূপ দিল। শুধু যে বাড়ীটার প্রতি সুগভীর মমতা দেববাণীর হৃদয় জুড়ে বসল তা নয়, এই প্রথম তার মনে সম্পত্তি-বোধ জেগে উঠল। মনে হ'ল, আমার এবার স্থিতি আছে, আমি এবার বড় কিছু বাস্তব সম্পত্তির মালিক। শুধু আমি নই, আমি ও হিমাদ্রি। এ আমাদের গৃহ, এর প্রত্যেকটি ইট, প্রতি বিন্দু সুরকি, প্রতি ইঞ্চি লোহা আমাদের একত্র করেছে। লেকের প্রশান্ত জল আমাদের বাড়ীর ছায়া বহন করছে, নারকেল গাছের ছায়া পড়েছে আমাদের বাড়ীর দেওয়ালে; বুদ্ধ মন্দিরের ঘণ্টা শোনা যাচ্ছে আমাদের বাড়ী থেকে; ঘন-সবুজ ঘাস এসে মিলেছে আমাদের বাড়ীর ফটকে।

বাড়ী তৈরী শেষ হলে তার অনেকগুলো ফটো আনাল দেববাণী। নানা দিক্ থেকে তোলা, প্রত্যেক-খানায় নতুন গৃহের নবতর শোভা। তিনতলা বড় বাড়ীর স্থাপত্য অনেকখানি মার্কিন, এবং হাল-ফ্যাসানের সুন্দর। কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে দেববাণী লণ্ডনে চ'লে গেল হিমাদ্রিকে ফটোগুলি দেখাতে।

খোকন তখন স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে নর্থ আয়ার্ল্যাণ্ড বেড়াতে গেছে। সাতদিন দেববাণী এবার লণ্ডনে কাটিয়ে এল। বড় আনন্দের সাতটা দিন। খোকনের সঙ্গে তার দেখা হ'ল না। আর সে কিছুই প্রায় দেখল না। যত দীর্ঘ সময় সম্ভব সে কাটাল হিমাদ্রির সঙ্গে।

লণ্ডন য়ুনিভার্সিটির কিংস্ কলেজে হিমাদ্রি তখন পড়ায়। দুজনে তারা লাঞ্চ খেল, বিকেলে বেড়াতে গেল, একসঙ্গে সঙ্গীত, নাটক, ছায়াচিত্র দেখল। আর প্রাণ খুলে কথা বলল।

শুধু তাই নয়। টেম্‌স্ নদীর ধারে হিমাদ্রিকে গান শোনাল দেববাণী। বহু বছর পরে আবার সে গান পর্যন্ত গাইতে পারল।

বাড়ীর ছবিগুলি দেখে হিমাদ্রি মহা খুশী।

"গৃহ ত হ'ল," একদিন সে বলল, "এবার গৃহ-প্রবেশ?"

"আশীর্বাদ কর, তাও যেন একদিন হয়।"

"আর কতদিন এমনি ক'রে কাটবে?"

বিষণ্ণ মুখে দেববাণী বলল, "জানি না। এখনও জানি না।"

"চল দেশে ফিরে যাই।"

"না। সময় তার এখনও আসে নি।"

"তুমি অকারণ ভয় পাচ্ছ, বাণী। আমি তোমার সমস্যা বুঝতে পেরেছি। খোকনকে তুমি তোমার অতীত জীবন থেকে আলাদা ক'রে দেখতে পারছ না; তাই তোমার ওকে নিয়ে এত ভয়। যে অতীত মিথ্যা, যার কোনও অর্থ নেই, তার সঙ্গে বেঁধে রেখেছ তুমি খোকনকে। তাতে তার ওপর ভয়ানক অন্যায় করছ তুমি। খোকনকে তোমার নতুন জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পার নি। পাবলে তোমার আর কোনও সংশয় থাকবে না।"

"তুমি ঠিকই বলেছ।"

"কিন্তু এভাবে ত চলতে পারে না। তুমি নিজেই কেবল এ অন্যায়ের প্রতিকার করতে পার। প্রতিকার তোমাকে করতেই হবে।"

"করব। আর কিছু সময় দাও আমায়।"

"কত সময়?"

"আরও কিছু দিন। যদি পারি প্রতিকার করতে, তোমার পাশে এসে দাঁড়াব। যদি না পারি, তুমি আমায় ক্ষমা করবে।"

বছরখানেক পরে হিমাদ্রি ভিয়েনা চ'লে গেল। তার মনে হ'ল, দেববাণীকে ভারতবর্ষে না নিয়ে গেলে তার সমস্যার সমাধান হবে না। দেববাণীর জানতে হবে, বুঝতে হবে, সে কোথাকার মেয়ে, কোন্ দেশের জল-মাটি-হাওয়া, প্রাচীন ইতিহাস, দূর-অতীত ঐতিহ্য তার ধমনীতে প্রবাহিত। যে-গৃহের প্রতি তার এত মমতা,

সে গৃহ তাকে দেখতে হবে। ভারতবর্ষে নতুন ক'রে দেববাণীকে বাঁধতে হবে।

ভিয়েনায় ব'সে হিমাদ্রি দেববাণীর দেশে আসবার ব্যবস্থা করল। দিল্লী ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণ তারই চেষ্টায় সম্ভব হ'ল। দেববাণী জানতেও পারল না।

ভারতবর্ষে রওয়ানা হবার দিন পনের আগে হিমাদ্রি আচমকা আমেরিকা চলে এল। নিউ ইয়র্কে দু'দিন কাটিয়ে সোজা ম্যাসাচুসেট্‌স্‌।

দিল্লীতে গবেষণাগার স্থাপনের প্রস্তাব শুনে প্রথম দেববাণী ভাবল, হিমাদ্রি বুঝি রসিকতা করছে। কিন্তু সে অবাক্ হয়ে দেখল, হিমাদ্রি যে কেবল আন্তরিক তাই নয়, বেশ কিছুদিন এ নিয়ে সে কাজ ক'রে গেছে, বহু বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে পত্রালাপ করেছে, আমেরিকায় একটি ফাউণ্ডেশনের কাছ থেকে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত আদায় করেছে। দেশে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে চিঠিপত্র লিখে নানা ধরণের খোঁজ-খবর, পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেছে। এমন কি গবেষণাগার-ভবনের প্ল্যান পর্যন্ত জার্মান আরকিটেক্ট দিয়ে তৈরী ক'রে নিয়ে এসেছে।

তিন-চার দিন ধ'রে কেবল এই নিয়েই তাদের আলাপ আলোচনা। দেববাণী প্রথমে জোরের সঙ্গেই আপত্তি করেছিল, কিন্তু হিমাদ্রি তার প্রত্যেকটি আপত্তি খণ্ডন ক'রে তাকে উৎসাহিত ক'রে তুলল। বিদেশে, সে বলল, দীর্ঘদিন কেটে গেল, আর বেশিদিন কাটান ঠিক হবে না। দেববাণী হয়ত ভাবছে দেশে গিয়ে লাভ নেই, কিন্তু দেশে না গিয়ে লাভ আরও কম। ভারতবর্ষ আমাদের ডাকছে, বাণী: সে তার সব সন্তানদের ডাকছে। মনে ক'রে দেখ, বিরাট্ আমাদের দেশ, সহস্র বছর নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে, আজ হঠাৎ য়ুরোপ-আমেরিকা-রাশিয়ার সঙ্গে দৌড়তে চাইছে। বিজ্ঞান ভারতবর্ষে যা করতে পারে পৃথিবীর আর কোথাও তা পারে না। এরা বিজ্ঞানের শক্তি নিয়ে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না, এদের বাড়তি উৎপাদনের জন্যে বাজার নেই, বিলাস-আরামের সামগ্রী নিয়ে জীবনটাকেই এরা অপচয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে; আর আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ গ্রামে এখনও কেরোসিনের লণ্ঠন পর্যন্ত জ্বলছে না। বিজ্ঞানের ব্যবহারিক অবদানের জন্যে ভারতবর্ষ আজ উন্মুখ হয়ে বসে আছে। আমরা যে যা শিখেছি, জেনেছি, বুঝেছি তা যদি দেশের সেবায় না লাগে তা হ'লে সে যে ব্যর্থ!

"দেশকে আমরা কতটুকু জানি? তুমি হয়ত কিছুটা জান, আমি তা একেবারে জানি নে।" দেববাণী ভয়ে ভয়ে বলল।

"বিদেশকেই কি আমরা একটুও জানি? তুমি এতগুলো বছর আমেরিকায় কাটালে, আমেরিকাকে তুমি কতটুকু জান? এদের ভাণ্ডার অপর্যাপ্ত, উপচে-পরা; নিজেদের সব চাহিদা মিটিয়েও এরা আমাদের কিছু দিতে পারছে, তাই আমরা মোটা মাইনের চাকরি করছি, ব্যাঙ্কে টাকা জমছে। কিন্তু এরা কি আমাদের প্রাণ-খুলে গ্রহণ করেছে? সর্বদা কি মনে করিয়ে দিচ্ছে না, মানুষ হিসেবে, দেশ হিসেবে তোমরা ছোট, আমাদের দয়া ও উদারতার প্রার্থী? এদের ব্যবহারে সহৃদয় অনুকম্পা দেখে তোমার গা জ্ব'লে যায় নি? আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতারা সত্যিকারের বুদ্ধিমান্ ও দেশপ্রেমিক হলে যে-সব ভারতীয় বিদেশে বিজ্ঞান শিখেছে তাদের সবাইকে দেশে ফিরে কাজে নেমে যেতে বাধ্য করতেন। রাশিয়া তাই করেছিল; কোন কোন আফ্রিকান দেশ আজও তাই করছে।"

"তোমার গবেষণাগারের প্রস্তাব ভারত সরকার গ্রহণ করবেন, ভরসা কি?"

"না করলে ক্ষতি নেই, আমরা একবার চেষ্টা ক'রে ত দেখি। আমিও বহুদিন বাইরে, দেশের মতি-গতি, দৃষ্টি-ধারণা আমার জানা নেই। এমন হ'তে পারে যে, বে-সরকারী মার্কিন সাহায্যে বে-সরকারী গবেষণাগার গঠনের প্রস্তাব গভর্ণমেণ্টের মনঃপূত হবে না। আবার, এমন না-ও হ'তে পারে। তুমি যখন যাচ্ছ দিল্লীতে তখন চেষ্টা ক'রে দেখতে দোষ কি? চেষ্টা করতে গিয়ে তুমি অনেক মানুষের সংস্পর্শে আসবে, অন্যথা সে সুযোগ তোমার হবে না। স্বাধীন ভারতের সঙ্গে তোমার বেশ খানিক পরিচয় হয়ে যাবে। হয়ত নিজেই বুঝবে, যেমন আমি মনে মনে নিঃসন্দেহে বুঝেছি, ভারতবাসী বাইরে যত সাফল্যই পাক না কেন, যে স্বাভাবিক শান্ত সাধনায় জীবন সত্যিকারের সফল, তা সে কেবল পেতে পারে ভারতবর্ষে।"

"অর্থাৎ তোমার ইচ্ছে আমরা দেশে ফিরে যাই।"

"আমার ইচ্ছের সঙ্গে তোমার ইচ্ছে একত্র না হলে তা যে সম্ভব নয়, বাণী! আমার মনে হয়, ভারতবর্ষে গিয়ে তুমিও আমার ইচ্ছেয় শেষ পর্যন্ত সায় দেবে। আমাদের দেশের মাটি-জল-হাওয়ার সবচেয়ে বড় গুণ কি জান? তারা টেনে কাছে আনে। মানুষের মনকে নরম, সিক্ত করে।"

দুঃখের সঙ্গে দেববাণী বলল, "আমার মত কঠিন-হৃদয় মেয়েকে তাই বুঝি তুমি দেশে পাঠাচ্ছ?"

"আমি পাঠাচ্ছি না। তুমি যাচ্ছ। আমি তোমার এ-যাওয়াকে মনে প্রাণে স্বাগত করি। দেশে গিয়ে তুমি দেখবে কত সহস্র অদৃশ্য বন্ধনে তার সঙ্গে তুমি বাঁধা। কলকাতায় গিয়ে দেখবে, তোমার সঙ্গে তার কত যুগের অনুচ্চারিত বন্ধন। অতীতের অনেক কিছু তোমার মনে পড়বে, তুমি বুঝবে কোন্ গভীর ধারায় জন্ম-জন্মান্তর থেকে আমাদের জীবন একসঙ্গে প্রবাহিত। আমরা ভারতবর্ষের লোক, বাণী, জীবনটাকে আমরা হঠাৎ-গজান মাশ্‌রুম ব'লে মনে করি না। আমাদের কাছে জীবন অনাদি-অনন্ত: এক ঘাটের দেনা-পাওনা নিয়ে সে অন্য ঘাটে উপস্থিত হয়, তার একটা রহস্যময় ধারাবাহিকতা আছে। দেশে না গেলে তোমার মনের অশরীরী ভয়গুলি কাটবে না, দ্বন্দ্বের মধ্যেই যে সমন্বয়ের বীজ লুকিয়ে আছে তার সন্ধান তুমি পাবে না।"

আজ দেববাণী বুঝতে পারছে হিমাদ্রির কথার সত্যতা। যে ভয়গুলিকে হিমাদ্রি 'অশরীরী' নাম দিয়েছিল তারা কেমন স্তিমিত হয়ে পড়েছে। কলকাতায় লেকের ধারে তাঁদের বাড়ী দেখে দেববাণীর মনে আশ্চর্য বেদনা মোচড় দিয়ে উঠেছিল: সে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল, হিমাদ্রিকে বাদ দিয়ে বাকী জীবনে কোনও আনন্দ পাওয়া তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। কলকাতায় যেখানেই সে গেছে—সায়ান্স কলেজে, নিজের কলেজে, বন্ধুদের হাতিবাগানের ছোট্ট সেই প্রাচীন ফ্ল্যাটে—সেখানেই হিমাদ্রির পদচিহ্ন তাকে বিহ্বল করেছে: সঙ্গে সঙ্গে অতীত জীবনের আতঙ্কিত ছায়াও দেখতে পেয়েছে দেববাণী; পথ চলতে মাঝে মাঝে আঁৎকে উঠেছে: এবং আরও বেশি ক'রে অনুভব করেছে হিমাদ্রির সংরক্ষক ব্যক্তিত্বের অভাব। দিল্লী এসে গবেষণাগারের প্রস্তাব নিয়ে গভর্নমেন্ট ও অন্যান্য অনেকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতে, আলাপ-পরিচয়ে, বন্ধুত্ব-আত্মীয়তায় দেববাণীর বিস্মিত অন্তর হিমাদ্রির সঙ্গে একত্র হয়ে কোনও বড় কিছু করবার আনন্দের প্রথম আস্বাদে বার বার শিহরিত হয়েছে। বাইরে সে মানতে চায় নি, কথাবার্তায় তার সমস্যাকে সে অনেক বড় ক'রে প্রকাশ করেছে, কিন্তু অলক্ষ্যে অন্তরের গভীরতম কোটরে দেববাণীর মন কোমল, স্নিগ্ধ, শান্ত হয়ে উঠেছে।

সাবিত্রী আম্মার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও বন্ধুত্ব না হলে, দেববাণী জানে, এই নতুন পরশ-পাথর উপলব্ধি তার হ'ত না। সাবিত্রী আম্মার মধ্যে দেববাণী নিজের জীবনের অপেক্ষাকৃত পুরাতন সংস্করণ দেখতে পেয়েছিল, যেমন তার মধ্যে তিনি নিজেকেই নতুন ক'রে দেখেছিলেন। হিমাদ্রি যে জীবনের ধারাবাহিকতার কথা বলত, তার অর্থ এতদিনে দেববাণীর কাছে একটু পরিষ্কার হ'ল। যে-পথে এই শতাব্দীর পাদদেশে সাবিত্রী আম্মা বিদ্রোহ করেছিলেন, যে অসামান্য দৃঢ় সাহসে, বলিষ্ঠ বিদ্রোহী আত্ম-বিশ্বাসে তিনি এক থেকে অন্য সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, প্রায় চল্লিশ বছর পরে দেববাণীও সে পথেরই নবতর শাখায় দুঃসাহসে আত্ম-প্রতিষ্ঠায় লেগে গিয়েছিল। তবু, যুগের ব্যবধানে, এই দু'ধারার মধ্যে প্রভেদ অনেক। সাবিত্রী আম্মা দেশের সেবায় স্বাধীনতা-সংগ্রামে নতুন ক'রে বাঁচবার আগুন পেয়েছিলেন। দেববাণীর জীবনে আজ পর্যন্ত ব্যক্তি ও পরিবারের বাইরে দেশ বা সমাজের বৃহত্তর উত্তাপ আসে নি। বিপিনভাই দেশাই-এর সঙ্গে আলাপ হবার আগে সাবিত্রী আম্মার জীবনের একটা দিক্ তার অজানা থেকে গিয়েছিল: যদিও আভাসে-ইঙ্গিতে সে বুঝতে পেরেছিল, গোপন কোনও ব্যথার মূক বোঝা তিনি বহন ক'রে চলেছেন। তাঁর নিঃশেষিত জীবনে এই নতুন আলোকপাতের পর সাবিত্রী আম্মার শেষ উপদেশ আরও গভীর ভাবে দেববাণীর মনকে প্রভাবিত করল।

১৮

পরের দিন বাসন্তী দেবীকে হরিদ্বারের রেল গাড়ীতে তুলে দিয়ে দু'একটা কাজকর্ম সেরে দেববাণী যখন নিজামুদ্দিনের বাসায় ফিরল তখন দুপুর শেষ হয়ে অপরাহ্ণ শুরু হয়েছে। নিস্তব্ধ বাড়ী—আইরীণদের কেউ বাড়ী নেই। সিঁড়ি বেয়ে দেববাণী ওপরে উঠে বারান্দায় এসেই চমকে গেল।

দেখল, বারান্দায় আরাম কুরসিতে ঘুমিয়ে রয়েছে সরোজা।

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল দেববাণী কিছুক্ষণ। সরোজার চুলে তেল পড়ে নি, রুক্ষ কুন্তল কোনও মতে বেঁধে রেখেছিল, এখন খুলে ছড়িয়ে পড়েছে চেয়ার ছাপিয়ে প্রায় মেঝে পর্যন্ত। চোখের কোণে কালি পড়েছে। অমন সোনার মত রং ম্লান। ঘুমন্ত মুখখানায় একবিন্দু কাঠিন্য নেই, বরং ক্লান্ত সৌন্দর্য অব্যক্ত বেদনার সঙ্গে মিশে অপূর্ব সুষমা সৃষ্টি করেছে। দামী কাঞ্জীপুর সিল্কের সাড়ী পরেছে সরোজা, তার সঙ্গে আজ আর ব্লাউজের মিল নেই; সাড়ীটাও অগোছাল ক'রে পরা। একটা কাশ্মিরী শাল গায়ে জড়ান; কিন্তু বুক থেকে

সরে গেছে, ঘুমন্ত নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে তার দুটি সুপুষ্ট কুমারী বুক উঠছে, নামছে।

ক'দিন ধরেই সরোজার কথা বার বার মনে হচ্ছিল দেববাণীর। সাবিত্রী আম্মার অসুখের সময় তার অন্য রূপ দেখে আরও বেশি। পরশু দিন সাবিত্রী আম্মার বাড়ীতে তাকে খুঁজে না পেয়ে দেববাণী বিস্মিত ও খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়েছিল। বিপিনভাই দেশাই-এর কাছে এ জন্যেই সে সরোজার খোঁজ নিয়েছিল। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও তার চেয়ে বেশি কিছু সে করতে পারে নি। তা ছাড়া, মনে মনে দেববাণী এ-ও ভেবেছে, সরোজাকে নিয়ে সত্যিই তার কিছু করার নেই। যে পরিস্থিতিতে লিওনার্ড হোপকে একদিন ফিরোজশাহ্ রোডের বাসায় নিয়ে যাবে ভেবেছিল, সাবিত্রী আম্মার দেহান্তের সঙ্গে সে পরিস্থিতিরও অবসান হয়েছে।

সরোজা যে এ ভাবে তার ফ্ল্যাটে এসে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকবে, দেববাণী একবারও ভাবে নি।

তার প্রথমেই মনে হ'ল, বেচারা ঘুমুক। কতদিন ভাল ক'রে ঘুম হয় নি নিশ্চয়; কত না ক্লান্তি ওর দেহে জমেছে। বারান্দায় জুতো খুলে খালি পায়ে দেববাণী এগিয়ে এসে সাবধানে ল্যাচ্-কী দিয়ে দরজা খুলল।

কিন্তু সে সামান্য শব্দেই জেগে গেল সরোজা।

সে যে জেগে গেছে, দেববাণী বুঝতে পারল না। দরজা খুলে ঘরে ঢুকবে, এমন সময় সরোজার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, "মাপ করবেন, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

দেববাণী ফিরে এসে তার সামনে দাঁড়াল। সরোজার চোখ রক্তিম। সে নিজেকে যেন চাবুক মেরে চেয়ারে সোজা ক'রে বসাল। দেববাণী বুঝল, আর যাই হোক, এ মেয়ে সহানুভূতির, সমবেদনার প্রার্থী হয়ে আসে নি।

"তাই ত দেখলাম," সে সামান্য হেসে বলল, "অনেকক্ষণ এসেছ বুঝি?"

হাত-ঘড়ি দেখে সরোজা বলল, "পঁয়ত্রিশ মিনিট।"

"তোমার ঘুম দেখছি খুব হাল্কা। অমি ঠিক উল্টো। একবার ঘুম এলে সহজে ভাঙ্গবে না।"

"আমি আপনার কোনও কাজে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি না ত?" সরোজা প্রশ্ন করল। "তা হ'লে বরং আমি আজ যাই।"

"না, না," দেববাণী জোর দিয়ে বলল, "আমার আজ এখন আর কাজ নেই। মা হরিদ্বার গেলেন। তাঁকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে দু'একটা কাজ সেরে এসেছি, আবার সেই বিকেলে বেরুব।"

ঘরে ঢুকল দেববাণী। ঘর থেকেই বলল, "তুমি বোস। কফি বানাচ্ছি। বড় তেষ্টা পেয়েছে।"

ইলেকট্রিক পারকোলেটরে কয়েক মিনিটে দু'কাপ গরম কফি তৈরি ক'রে নিল দেববাণী। সরোজা কফি পানে আপত্তি করল না। দেববাণী তার মুখোমুখি চেয়ারে গা এলিয়ে বসল।

বলল, "শীত শেষ হয়ে আসছে। দুপুরে ত রীতিমত রৌদ্রের তেজ। আজ দেখলাম রাস্তায় গাছ থেকে পাতা ঝরছে।"

কফি পান করল সরোজা একটাও কথা না ব'লে। পাত্র নামিয়ে রেখে প্রশ্ন করল:

"আপনার লেবরেটরী কবে তৈরি হচ্ছে?"

হেসে ফেলল দেববাণী। বলল, "আপাতত বোধ হয় হচ্ছে না।"

"ভেস্তে গেছে তা হ'লে?"

"একেবারে না গেলেও বোধ করি যাবে।"

"আমি খুব খুশী হয়েছি।"

"হবারই কথা। তুমি ভাবছ, কেমন, যা বলেছিলাম তাই হ'ল ত?"

ঈষৎ হাসি খেলে গেল সরোজার বাঁকা অধরে।

"মা নেই আপনার জন্যে দুঃখ করবার লোকের অভাব।"

"সত্যি তাই। দুঃখ আমারও হচ্ছে না।"

বিশ্বাস করল না সরোজা।

"হলেও আপনি স্বীকার করবেন না।"

"সত্যি হচ্ছে না। কারণ, এ ব্যাপারে আগাগোড়াই আমার উৎসাহের অভাব।"

"তা হ'লে এত উঠে-প'ড়ে লেগেছিলেন কেন?"

"স্বভাব। যা করি অমনি উঠে-প'ড়ে করি।"

"আপনি কবে ফিরে যাচ্ছেন আমেরিকা?"

"আরও মাস খানেক আছি।"

"মাদ্রাজ যাচ্ছেন কবে?"

"দু'সপ্তাহ পরে।"

"এখানে আবার ফিরে আসবেন?"

"সম্ভবতঃ আসব না। কলকাতা থেকে চ'লে যাব।"

সরোজার কথা ফুরোল। চুপ ক'রে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইল সে। কিছু দূরে নতুন-তৈরি পথের ধারে ঝুপড়িতে কয়েকটি দোকান বসেছে। বাড়ী-ঘর তৈরি

করতে রাজস্থানী মজুরদের রোজ আমদানী দিল্লী শহরে। তাদেরই দোকান। অমনি একটা দোকানের পানে তাকিয়ে রইল সরোজা।

দেববাণী ব'লে উঠল, "তুমি এবার কি করবে?"

বাইরে তাকিয়েই সরোজা জবাব দিল, "এবার মানে?"

"তুমি কি চাকরিই করবে?"

"তবে কি করব?"

বিরক্ত লাগল দেববাণীর খানিকটা। যদি সে কথা বলতেই না চায় তবে কেন এ ভাবে তার ঘরে এসে অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল?

সরোজা যেন তার মনের ভাব টের পেল।

বলল, "আপনি আমাকে দেখে অবাক্ হন নি?"

"খুশী হয়েছিলাম বেশি।"

"খুশী কেন?"

"তোমার মা মারা যাবার পরের দিন সকালে তোমাদের বাসায় তোমাকে দেখতে পাই নি। খোঁজ ক'রে দেখলাম, তুমি কোথায় কেউ জানে না।"

"কারুর জানবার প্রয়োজন ছিল না।"

"তার পর কাল বিপিনভাই দেশাই-এর সঙ্গে দেখা হ'ল। তাঁকে তোমার কথা জিজ্ঞেস করলাম। দেখলাম তিনিও জানেন না।"

"আপনি দেখছি আমার খুব খোঁজ করেছেন। মা-মরা মেয়েটার জন্যে নিশ্চয় আপনার দুঃখ হচ্ছিল।"

দেববাণী সোজা তাকাল সরোজার চোখে।

বলল, "অনেকবার আমার কি মনে হয়েছে জান? মনে হয়েছে তোমার গালে ঠাস ক'রে একটা চড় মেরে দি।"

সরোজা হতভম্ব হয়ে গেল। বড় বড় চোখে চেয়ে রইল দেববাণীর মুখে। ঠোঁট কেঁপে উঠল। মুখে এক ঝলক আগুন খেলে গেল। তার পর সে হঠাৎ হেসে উঠল।

সরোজা রেগেমেগে বেরিয়ে গেলে দেববাণী আশ্চর্য হ'ত না; তার অস্বাভাবিক দমকা হাসিতে সে হতবুদ্ধি হ'ল।

হাসতে হাসতে সরোজা বলল, "সে মন্দ হবে না। অন্তত নতুন কিছু হবে। কোনুও দিন চড় খেয়ে দেখি নি। খুব ব্যথা লাগবে বুঝি? গালে দাগ পড়বে না ত?"

দেববাণীর সহ্য হ'ল না। চেঁচিয়ে ধমক দিয়ে উঠল, "চুপ কর, সরোজা!"

বেহুঁস হাসি থামিয়ে সরোজা গম্ভীর হ'ল।

দেববাণী বলল, "তুমি আমার কাছে কেন এসেছ? কোনও কাজ আছে?"

অবাক্ হ'ল সরোজা। মনের মধ্যে হাতড়ে দেখে বলল, "না ত!"

"তবে এসেছ কেন?"

"এমনি। যাবার মত আর কোনও স্থান মনে পড়ল না, তাই।"

দেববাণীর দুঃখ হ'ল। বলল, "তোমার বাবা চ'লে গেছেন?"

"আমার মৃত জননীর ভূতপূর্ব স্বামী চ'লে গেছেন।"

"ছিঃ, সরোজা," দেববাণী আবার শাসন করল, "এমন ক'রে বলতে নেই।"

"তবে কেমন ক'রে বলতে আছে, ব'লে দিন। মার হার্টের ব্যারাম হ'ল, হাসপাতালে নিয়ে গেল সবাই। বার বার মাকে জিজ্ঞেস করলাম, বাবাকে খবর দেব? প্রত্যেক বার বললেন, দরকার নেই। অবস্থা যখন খুব বাড়াবাড়ি হ'ল তখন ভয় পেয়ে মা'র সহকর্মীরা মিলে বাবাকে তার করলেন। তিনি যখন এলেন তখন মার আর জ্ঞান নেই। মার শবদেহ চিতায় ভস্ম হবার বারো ঘণ্টা পরে তিনি বিদায় নিলেন।"

করুণ, তিক্ত হাসির সঙ্গে সরোজা যোগ দিল, "এবার বলুন, কেমন ক'রে বলব।"

দেববাণীর মুখে সহজে ভাষা এল না। কষ্ট ক'রে সে বলল, "তবু তিনি তোমার বাবা।"

"তাই ত মুশকিল! তিনি—তবু—আমার বাবা; স্বর্গগতা সাবিত্রী আম্মা—তবু—আমার মা।" সরোজা 'তবু' কথাটা জোর দিয়ে বেঁকিয়ে উচ্চারণ করল।

দেববাণী চুপ ক'রে রইল। সরোজা এবার একটানা ব'লে গেল: "সব ফাঁকি, জানেন? সব ফাঁকি। মা বারো-তেরো বছর বয়সে বিধবা হয়েছিলেন। ভাইদের সংসার থেকে পালিয়ে গিয়ে অ্যানি বেসান্তের শরণাপন্ন হলেন। লেখা-পড়া শিখলেন, বড় হলেন, যৌবন তাঁকে সৌন্দর্যে সুষমায় সাজিয়ে তুলল। তাঁকে দেখে ধর্মরাজ নামে একটি যুবকের আদর্শ-প্রবণতা উজিয়ে উঠল। তিনি চেয়েছিলেন বিধবা বিয়ে ক'রে সমাজসংস্কারের পথ দেখাবেন, হাতের কাছে অমন একটি সুন্দরী বিধবা পেয়ে তাকেই বিয়ে ক'রে বসলেন। কিন্তু তাকে সন্তানের জননী করতে পারলেন না। অতৃপ্ত মাতৃত্ব-ক্ষুধা নিয়ে সাবিত্রী আম্মা চরিত্রহীন হতে পারতেন; না হয়ে দেশসেবিকা হলেন। তিনি নামলেন দেশের কাজে,

ধর্মরাজ মাতলেন ধর্ম নিয়ে। এমনি ক'রে বছরের পর বছর কাটল। সাবিত্রী ধর্মরাজের কাছ থেকে একেবারে দূরে স'রে গেলেন। ধর্ম নিয়ে ধর্মরাজের মন ভরল না, তলে তলে ব্যর্থ পৌরুষের অপমানে তিনি দগ্ধ হচ্ছিলেন। সাবিত্রীর যত নামডাক হতে লাগল, ধর্মরাজের ঈর্ষা তত বেড়ে গেল। গোপনে তিনি আয়ুর্বেদ চিকিৎসা করালেন। তার পর একদিন এসে হাজির হলেন গান্ধী-আশ্রমে। সাবিত্রী তখন বিপিনভাই দেশাই নামে আর একজন দেশসেবকের প্রেমে পড়েছেন। দু'জনই দু'জনকে ভালবাসেন। গান্ধী-আশ্রমের ভালবাসায় ত 'দেহ' নেই, তাই তার তীব্রতা আরও বেশি। তবু সাবিত্রী তাঁর স্বামীকে সৌজন্য ও ভদ্রতার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। কিন্তু এত দীর্ঘ বছর পরে ধর্মরাজ যে স্বামীর সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন তা কি তিনি জানতেন? জোর ক'রে স্বামিত্ব খাটিয়ে ধর্মরাজ বিদায় নিলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে আতঙ্কে, লজ্জা, ঘৃণা ও দুঃখের সঙ্গে সাবিত্রী দেখলেন, তিনি মা হবার পথে। এই হ'ল সরোজা-সম্ভব মহাকাব্য।"

দেববাণী কি একটা বলতে গেল, সরোজা তাকে থামিয়ে ব'লে চলল, "মা আমাকে একেবারে চান নি, তবু আমি এলাম। বাবা আমাকে মার ওপর নির্দয় প্রতিশোধ নেবার অস্ত্র হিসেবে মোক্ষম ব্যবহার করলেন। আমি বেড়ে উঠলাম আশ্রমে। মনে আছে, শিশুকালের যে-ক'টা দিন মা কাছে থাকতেন, হয় অবাক্ হয়ে আমাকে দেখতেন, যেন আমি অচেনা, অজানা, অনাথা কোনও শিশু, নয়ত আমার দিকে তাকাতেও তাঁর লজ্জা হ'ত। সর্বদাই তিনি জেলে যাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকতেন। এমনি ক'রেই কিন্তু আমি বড় হয়ে উঠলাম। তার পর একদিন এক ভদ্রলোক এসে আমায় মাদ্রাজ নিয়ে গেলেন।"

একগুচ্ছ চুল কপাল বেয়ে চোখে নেমে আসছিল। হাত দিয়ে সরিয়ে সরোজা ব'লে চলল, "তিনি যে আমার বাবা প্রথমে আমি জানতে পারি নি। মা তখন জেলে। আশ্রমের সেক্রেটারী আমায় ডেকে শুধু বলল, তুমি আজ মাদ্রাজে স্কুলে যাবে, জামা-কাপড় গুছিয়ে নাও। দেখলাম, বলিষ্ঠ এক বৃদ্ধ তার ঘরে ব'সে আছেন। তিনি আমায় একবার তাকিয়ে দেখলেন। কাছে ডাকলেন না, কথা বললেন না। পরে আশ্রমের কেউ একজন আমায় বলল, উনি আমার বাবা। মনে আছে, শুনেই আমি তাকে হাতের কাছে একটা পাথর ছুঁড়ে মেরেছিলাম। সে ভদ্রলোক আমাকে সত্যিই মাদ্রাজ নিয়ে গেলেন। ট্রেনে কয়েকবার খেতে বলা ছাড়া একটা কথাও তিনি আমার সঙ্গে বললেন না। আমি ভয়ে কাঠ হয়ে রইলাম। মাদ্রাজে নেমে সোজা আমাকে নিয়ে তিনি স্কুলে গেলেন। বন্দী হলাম আমি কনভেন্টে।"

একটু থেমে সরোজা আবার বলতে লাগল, "মাসে একবার তিনি আমার খোঁজ নিতেন। সেদিন বোর্ডিং সুপারের আপিস ঘরে আমার ডাক পড়ত। গিয়ে দেখতাম আমার 'বাবা' বসে আছেন। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বলতেন, সব ভাল ত? আমি ঘাড় নাড়তাম। আর বলতেন, কিছু চাই? আমি আবার ঘাড় নাড়তাম। প্রত্যেক মাসে একবার এই প্রহসন হ'ত। তবু আমি বড় হতে লাগলাম। এমনি ক'রে যখন আমার বারো বছর বয়স তখন একদিন মা এসে স্কুলে হাজির। আমি কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে খেলছিলাম, একটা চাকর এসে আমায় আপিসে ডেকে নিয়ে গেল। গিয়ে দেখি একজন মহিলা ব'সে আছেন চেয়ারে, চমৎকার দেখতে। তাঁকে চিনতে আমার সামান্য একটু দেরী হ'ল। তিনি চেয়ে রইলেন আমার দিকে। আমি কেমন ভয় পেয়ে গেলাম। ইচ্ছে হ'ল ছুটে পালাই। অথচ পা দুটো কেমন অবশ। কিছুক্ষণ তিনি কোনও কথা বললেন না। আমিও মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। তার পর হঠাৎ তিনি আমাকে কাছে ডাকলেন। ভয়ে ভয়ে আমি এগিয়ে গেলাম। তিনি একখানা ইতস্ততঃ অনিচ্ছুক হাত আমার কাঁধে রাখলেন। আমার ইচ্ছে হ'ল কামড়ে দিই সে হাত। আমি কেবল দু'পা স'রে গেলাম।"

দেববাণী গম্ভীর মনোযোগে শুনছিল, সরোজা ব'লে চলল, "মাঝে মধ্যে মা আসতেন, যখন তাঁর সুযোগ-সুবিধে হ'ত। তা জানতে পেরে বাবার আসাও বেড়ে গেল। আমি বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে দু'পক্ষের নতুন টানাটানি সুরু হ'ল আমাকে নিয়ে। মা মাঝে মাঝে কাতর চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতেন, হয়ত আমাকে বুঝতে চাইতেন, চিনতে চাইতেন, কাছে টানবার পথ খুঁজতেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে আদান-প্রদানের কোনও রাস্তা ছিল না। আমার নিজের জীবনের ফাঁকি দিয়ে মার জীবনের ফাঁকি আমি পরিষ্কার দেখতে পেতাম। তখনও কলেজ-জীবন আমার শেষ হয় নি। বাবা একবার এসে আমাকে তাঁর কাছে পণ্ডিচেরীতে নিয়ে গেলেন। তখন তিনি মাদ্রাজ ছেড়ে পণ্ডিচেরীতে বাস করছেন, অরবিন্দ আশ্রমে নয়, কাছাকাছি নিজের আস্তানায়। আমাকে টানতে চাইলেন

ধর্মের পথে। আমার প্রচণ্ড হাসি পেল। আমাদের মধ্যে কথা হ'ত না একেবারেই, শুধু তিনি ঘণ্টাখানেক আমায় ধর্মোপদেশ দিতেন। দিন চারেক পরে আমার অসহ্য লাগল। চতুর্থ দিন তিনি ধর্মকথা সুরু করেছেন, আমি ব'লে উঠলাম, কাল আমি হস্টেলে ফিরে যাচ্ছি।

"তিনি বললেন, কেন?

"আমি বললাম, এমনি। আমার এখানে ভাল লাগছে না।

"তিনি বললেন, ধর্মকথা তোমার ভাল লাগছে না?

"আমি বললাম, না। একেবারে না।

"তিনি রেগে বললেন, মায়ের মেয়ে ত? তারই মত ধর্মে মতিহীন। যাও তবে, রাজনীতি কর গে।

"আমি বললাম, রাজনীতিও আমার ভাল লাগে না।

"তিনি বললেন, তবে কি ভাল লাগে।

"আমি বললাম, কিছু না।

"কিন্তু একদিন হস্টেল ছাড়তে হ'ল। কোথায় যাব বুঝতে না পেরে মার কাছে দিল্লীতে চ'লে এলাম। মা তখন লোকসভার সদস্যা। তিনি নতুন নেশায় মশগুল, কিন্তু আমার চোখে প্রচণ্ড ভাবে ধরা প'ড়ে গেল তাঁর জীবনের বিরাট্ ব্যর্থতা। তিনি দেখলেন না, অথচ আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম তাঁর একবিন্দু প্রভাব নেই, কেউ তাঁকে মানে না, সবাই তাঁকে নিয়ে হাসে, বড় জোর করুণা করে। কোনও কিছু না-করতে পারার অসহ্য শূন্যতা থেকে বাঁচবার জন্যে তিনি অনেক কিছু করতে চেষ্টা করতেন, অনেক কিছু নিয়ে লড়তে চাইতেন। কিন্তু তাঁর কথা বড় কেউ শুনত না, শুধু মাঝে মধ্যে তাঁর ন্যুইসেন্স ভ্যালুর খাতিরে এক-আধটু খাতির দেখাত। এ ফাঁকি কেবল মা'র জীবনে নয়, মা'র সহকর্মীদের অনেকের জীবনেই আমি দেখতে পেতাম। তাঁদের লোকসভার সদস্য হবার কোনও বিশেষ যোগ্যতা ছিল না; হয়েছেন, একদা কংগ্রেসে কাজের পুরস্কার হিসাবে। তাদের সে কাজ বহুদিন শেষ হয়ে গেছে, বর্তমান কাজে মন নেই, তবু জীবনের নিষ্ঠুর শূন্য অহমিকা ও দর্প কোনওমতে ঢেকে-ঢুকে তাঁরা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছেন। তাঁদের দেখে-শুনে আমার অসহ্য লাগত, ইচ্ছে হ'ত মুখের ওপর বলে দি, তোমরা মিথ্যে, ভুয়ো, ফাঁকি; বলতে না পেরে নিজের মধ্যেই জ্ব'লে মরতাম। মা'র জন্যে মাঝে মাঝে দুঃখ হ'ত। তিনি মানুষ ভাল ছিলেন, দৃষ্টি উদার ছিল, মনে সঙ্কীর্ণতা ছিল না; জীবনের পরিণত বছরগুলিতে অতৃপ্ত ভালবাসার স্নিগ্ধ বেদনা তাঁকে কোমল, সহানুভূতিশীল, শান্ত করেছিল। জানি, আমাকে নিয়ে তাঁর ভাবনা ছিল অনেক, সরোজা-সমস্যার কোনও সমাধান তিনি খুঁজে পান নি। আমাকে কোনওদিন তিনি বুঝতে পারেন নি, বোঝবার চেষ্টাও বড় একটা করেন নি। বরং আমাকে সর্বদাই একটা ভয় ও আতঙ্কের চোখে দেখেছেন। আমি যে তাঁর জীবনের সবটুকু ফাঁকি জেনে ফেলেছিলাম, এ অপরাধ তিনি ক্ষমা করেন নি। তাঁর প্ল্যাটোনিক প্রেমের খবরও আমার জানা ছিল। এ জন্যেও তিনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন, আর বিপিনভাই দেশাই আমাকে দেখতে পারতেন না। ওঁদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখলেই আমার হাসি পেত: দুই বুড়ো-বুড়ী, সারাজীবন একে অন্যকে চেয়ে এসেছে অথচ পাবার মত সাহস রাখে নি, ভাবতে আমি হেসে ফেলতাম, আর সেই হাসির আভাস দেখে বিপিনভাই ভয়ানক চটে যেতেন। কিন্তু সবকিছু সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত মা হয়ত আমাকে ভালই বাসতেন; মাঝে মাঝে নির্বোধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন আমার দিকে, আমাকে নিয়ে কি করবেন ভেবে পেতেন না, অথচ এটুকু বুঝতেন যে কিছু একটা তাঁর করা দরকার। অসহায় হয়ে যাকে ভাল লাগত আমার জন্যে তাঁরই শরণাপন্ন হতেন। যেমন আপনার হয়েছিলেন।"

সরোজার কণ্ঠস্বর একবার সামান্য ভারী হয়ে এসেছিল, শেষের কথাগুলি বলবার সময় আবার কঠিন হয়ে উঠল। "যেমন আপনার হয়েছিলেন" ব'লে যে-চোখে সে দেববাণীর দিকে তাকাল, তাতে দুর্বোধ্য প্রতিরোধ।

দেববাণী এতক্ষণে কথা বলল, "যে-সমস্যার সমাধানে তুমি তাঁকে বিন্দুমাত্র সাহায্য কর নি, বরং আরও জটিল করেছ, তাতে তিনি বিশ্বাসযোগ্য কারুর সাহায্য চাইলে তুমি রেগে যাবে কেন?"

সরোজা বলল, "শুধু এ জন্যে যে বিষয়বস্তুটা আমি। আমি একটা দুর্ঘটনা হয়ে জন্মেছিলাম, দুর্ঘটনা হয়ে বেড়ে উঠেছি, দুর্ঘটনা হয়ে একদিন ম'রে যাব। অনাকাঙ্ক্ষিত, অস্বাগত, অনিমন্ত্রিত জীবনের বোঝা আপনাকে যদি বইতে হ'ত তাহলে বুঝতে পারতেন।"

সাপের আস্ফালিত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মত হেসে উঠল সরোজা।

"এমনি একটি 'বিশ্বাসযোগ্য' বন্ধুর কাছে মা আমাকে সুপথে আনবার ভার দিয়েছিলেন। তাঁর নাম করতে আমার আর কোনও আপত্তি নেই, কেবল ঘৃণা ছাড়া। আপনাকে মা একদিন কয়েকজন এম. পি.-র সঙ্গে

আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন, মনে আছে? সেখানেও তিনি ছিলেন। দেশকর্মী হিসেবে একদিন নাকি তাঁর নাম ছিল, মা তাঁকে খুব খাতির করতেন, কারণ তিনি প্রায়ই এসে মা'র কাছে বসে তাঁর প্রশস্তি করতেন। আমি তখন সবে কলেজ ছেড়ে দিল্লী এসেছি। সে বন্ধুকে মা আমার কথা বললেন। বোধ হয় বললেন, ওকে একটু মানুষ ক'রে দিন। তিনি সোৎসাহে এ দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। আমার নতুন সংরক্ষকের বুদ্ধি ও পন্থায় সূক্ষ্মতা ছিল মানতেই হবে। আমার সঙ্গে তিনি ধীরে আস্তে আলাপ জমিয়ে নিলেন। চুল-পাকা এক ভদ্রলোককে একেবারে সমীহ না ক'রে পারা যায় না। তিনি কক্ষনো আমাকে একটি উপদেশ দিলেন না। সে জন্যেই তাঁর সঙ্গ আমার অসহ্য লাগে নি। আমাকে নিয়ে বেড়াতে যেতেন, সিনেমায় যেতেন, গল্প করতেন—আমাদের কথাবার্তায় সরোজা নামক সমস্যার আমদানী হ'ত না। অথচ আমি জানতাম তাঁর আসল কাজ হচ্ছে আমাকে 'সুমতি' দেওয়া, তাই আমি সতর্ক নজর রাখতাম। দু তিন মাসেও যখন তিনি আমাকে সুমতি দেবার চেষ্টা করলেন না তখন আমার সতর্কতা কমে গেল, বোধ করি আমি একটু সহজ হলাম। অন্ততঃ কলেজ হষ্টেলের বাইরে কারুর সঙ্গে এর আগে এতটা সহজ আমি হই নি। এবার সুযোগ বুঝে মার সেই হিতৈষী বন্ধু, আমার চতুর সংরক্ষক ছোবল মারলেন।"

গা থেকে কাশ্মীরী শাল মাটিতে প'ড়ে গেল। সরোজা জানলার বাইরে তাকিয়ে ব'লে চলল, "একদিন দুপুরে, মা তখন কাজে গেছেন, তিনি এলেন আমাদের বাড়ী। চাকরটা তার ঘরে ঘুমুচ্ছিল। আমিই তাঁকে বসতে দিলাম, কাছে ব'সে কথাবার্তা বললাম। কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর এতদিনের মুখোস খ'সে পড়ল, তিনি আমায় জোর ক'রে কাছে টেনে নিলেন।"

দেববাণীর দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল সরোজা। "প্রথমটা আমি অবাক্ হলাম, তার পর ভয় পেলাম, তার পর রাগ হ'ল, তার পর আমার ভয়ানক হাসি পেল। পাকা-চুল একটা বুড়ো মানুষ, যে নাকি দেশের সেবায় নাম করেছে, যার হাতে এক নির্বোধ জননী সন্তানে তার একমাত্র কন্যার মঙ্গল-দায়িত্ব সঁপে দিয়েছে, তার এই চমৎকার ব্যবহারে আমার পেটের মধ্য থেকে হাসি ঠেলে উঠে আসতে লাগল। তিনি ভাবলেন, আমাকে বুঝি অনেকখানি আয়ত্তে এনেছেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, হে ঈশ্বর, এ সময় মাকে এখানে নিয়ে এস, তাঁকে দেখতে দাও এই ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয়। মার বন্ধু যখন উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন, আমি আস্তে বললাম, 'একটু দাঁড়ান।' তিনি থামলেন। আমি উঠে দরজা বন্ধ করলাম। ফিরে এসে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে বললাম, 'কি চান?' তিনি রুদ্ধশ্বাসে বললেন, 'তোমাকে!' আমি বললাম, 'কেন? তিনি উত্তর না দিয়ে আমাকে টানতে গেলেন। আমি বললাম, 'টানবেন না। আমি দেব আপনাকে। শুধু একটা সর্তে।' তিনি নিঃশ্বাস চেপে বললেন, 'কি সর্ত?' আমি বললাম, 'আপনি চ'লে গেলে মাকে ফোন ক'রে ডেকে এনে সব ব'লে দেব।' তিনি আঁৎকে উঠলেন। আমি তখন দারুণ মজায় হাসছি। বললাম, 'শুধু তাই নয়, যাঁরা এখানে রোজ আসেন তাঁদের প্রত্যেককে বলে দেব। রাজী আছেন?' তিনি তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলতে গেলেন। আমি বললাম, 'পালাচ্ছেন কেন? এতটুকু সাহস নেই আপনার? আমি কিন্তু রাজী!' তিনি দরজা খুলে দৌড়ে পালালেন। এর দিন তিনেক পরে মা আমাকে কাছে ডেকে বললেন, বিয়ে করবে?"

সরোজা এবার উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল। সে যে এত জোরে হাসতে পারে দেববাণী জানত না। হাসতে হাসতে বলল, "বি-য়ে করবে? আমি কি উত্তর দিলাম জানি নে, পরের দিন চ'লে গেলাম কেপ কমোরিণ। সমুদ্র বাধা না দিলে আরও দূরে চ'লে যেতাম।"

দেববাণী দেখল, তার কিছু বলার মত কথা নেই।

সরোজাই আবার বলতে লাগল—এবার সে যেন থামতে ভয় পাচ্ছে—"ফাঁকি, বুঝলেন, সব ফাঁকি। দেশপ্রেম থেকে মনুষ্যপ্রেম পর্যন্ত সব ফাঁকি। এর মধ্যে যা একমাত্র সত্যি তা হচ্ছে দেহ। দেহের দাবী না মিটিয়ে উপায় নেই। দেহের আহার চাই, গৃহ চাই, পোশাক চাই—এবং যেহেতু দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষ আদিম-জীবন ত্যাগ করেছে—স্কুল, কলেজ, সব চাই। মার সেই পক্ককেশ বন্ধুর কথা আমি অনেক ভেবে দেখেছি। দোষ তাঁর কিছু নয়, দোষ দেহের। মা যাকে ভালবাসেন নি তাঁকে বিয়ে করেছিলেন, যাকে ভালবেসেছিলেন তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে পারেন নি। তাঁর দেহ, তাই কোনও দিন তৃপ্তি পায় নি। দেহ না থাকলে তিনি কখনও সরোজার জন্ম দিতেন না।"

দেববাণী বলল, "মানুষ ত শুধু দেহ নয়, তার আত্মাও আছে।"

সরোজা সে-কথা কানে তুলল না।

বলল, "কেপ কমোরিণ থেকে আমায় ফিরে আসতে হল। যতই অপছন্দ হোক না, মা ছাড়া যে আমার কেউ

নেই এই বিস্বাদ সত্য আমি বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু ফিরে এসেও মিথ্যা আর ফাঁকির মধ্যে আমি হাঁপিয়ে উঠলাম। সব চেয়ে অসহ্য লাগল আমার চতুর্দিকের মানুষগুলির নির্লজ্জতা। সুযোগ পেলেই আমি তাদের দংশন করতে লাগলাম। কিন্তু কারুর একবিন্দু লজ্জা হত না। মা বিব্রত, ক্ষুব্ধ, দুঃখিত হতেন। তাঁর সেই বন্ধুকে তিনি বাড়ীতে ডাকতেন, তিনিও নির্লজ্জ নিঃসংকোচে আসতেন, বার বার তাঁর চোখ আমাকে খুঁজে বেড়াত। আমার মনে হল, এ-ভাবে বেঁচে থাকা অসম্ভব। চাকরির চেষ্টা করতে লাগলাম। মার সাহায্য না নিয়ে। কিছুদিন ঘোরা-ফেরার পর সংবাদ-পত্রের এ কাজটা জুটেও গেল। আর এই সময় মা আপনাকে পেয়ে বসলেন। তাতে আমার আপত্তি হ'ত না, যদি-না আপনাকেও আমার পেছনে লাগিয়ে দিতেন। আপনার আগে আরও দু-চার জনকে লাগাবার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের আমি একটুও এগোতে দিই নি। ভেবেছিলাম আপনাকেও এক-পা এগোতে দেব না। কিন্তু পারলাম না।"

দেববাণী ব'লে উঠল, "আমি তোমার জন্য কিছু করতে চেষ্টা করি নি, চেষ্টা করবও না।"

সরোজা বলল, "আপনার সৌভাগ্য, আপনার বাবা ধার্মিক, মা দেশনেত্রী নন, আপনি সুন্দরী নন। আমার সবচেয়ে বড়া বিপদ্ মা, ম'রে গিয়েও তিনি আমায় রেহাই দেন নি। আর একটা বিপদ্ আমার সৌন্দর্য। আমি যদি কুৎসিত হতাম, তাহলে বোধহয় আমার পক্ষে বেঁচে থাকা সহজ হত। সৌন্দর্য আমার শত্রু। পুরুষের লোভকে সে ডেকে আনে। কাগজের সম্পাদক, রাজ-নৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী, সরকারী চাকুরে সব যেন হাঁ ক'রে গিলছে। ক্ষুধার্ত, উপবাসী পুরুষের দৌরাত্ম্যে একটা মেয়ে আমাদের দেশে স্বাধীন, স্বতন্ত্র ভাবে বাঁচতে পর্যন্ত পারে না। অথচ যত নীতিকথা এদেশে প্রতিদিন উচ্চারিত হয় তার একাংশও আর কোথাও শুনতে পাবেন না।"

দেববাণীকে নীরব দেখে সরোজা আবার বলল, "আমার দেহকে আমি ঘৃণা করি। আমার সৌন্দর্যকে আমি ঘৃণা করি। কেউ যদি আমাকে জোর ক'রে ধর্ষণ করত তাহলে আমি খুশী হতাম। আমার দেহকে শাস্তি দিয়ে, সৌন্দর্যকে অপমান ক'রে আমি তৃপ্তি পেতাম। কিন্তু সে দুঃসাহস পর্যন্ত এদেশের পুরুষগুলির নেই। ওরা চুরি করতে পারে, ঠকাতে ওস্তাদ, কিন্তু ডাকাতের দুঃসাহস ওদের নেই।"

নিথর নীরবতা হঠাৎ নেমে এল, সরোজার কথা শেষ হ'ল। দেববাণী উঠে দাঁড়াল। কিছু বলার নেই তার। সরোজা নিজের কথা বলতে পেরেছে, এতে ওর উপকার হবে। দেববাণীও টের পেল তার খিদে পেয়েছে। সরোজাও নিশ্চয় কিছু খায় নি। এখন আর রান্না করবার সময় নেই। বাইরে কোথাও খেয়ে নিতে হবে।

তাকে উঠতে দেখে সরোজা কেমন ভয় পেয়ে গেল। ব'লে উঠল, "বলতে পারেন, মার এখন মরবার দরকারটা কি ছিল? আমি কোথায় যাই? আমি যে একেবারে একা!"

আচমকা কেঁদে ফেলল সরোজা। কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়ল। তন্বী দেহ বার বার কেঁপে উঠতে লাগল।

দেববাণী কিছু করল না, কিছু বলল না। শুধু তার মনে একটা অনুত্তর প্রশ্ন জাগল। সাবিত্রী আম্মা আর দেববাণী যদি একই জীবনধারার দুটি শাখা, তাহলে সরোজা কি? কোন্ জীবন-নদীর উপশাখা সে? কোথায় কোন্ নদী বা সমুদ্রে, তার মোহানা?

ক্লিওপাট্রা একটি হীরকখণ্ডকে সুরায় গলিয়ে মার্ক এণ্টনীকে পান করতে দিয়েছিল। প্রত্যেক নারীর জীবনে সে হীরার টুকরো থাকে, তার বাসনা, তাকে গলিয়ে পরম দয়িতের ওষ্ঠাধরে তুলে দেয়। কিন্তু সাবিত্রী আম্মার হীরা কে পান করেছিল? সরোজা তার জীবনের হীরা সুরায় গলিয়ে পানপাত্রটিকে আছড়ে দিয়ে কঠিন প্রস্তর মেঝেতে ভেঙ্গে ফেলতে যাচ্ছে।

জীবনে বহুবার যে প্রশ্নে দেববাণীর হৃদয় উদ্বেলিত হয়েছে, নীরব কান্নায় কম্পিত সরোজার সামনে দাঁড়িয়ে আর একবার সে প্রশ্ন তাকে অস্থির করল। তার সবটুকু নারী-সত্তা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল: আমি কে, কোথায় আমার পরিণতি, আমার পূর্ণতা? চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে দৃঢ়-প্রত্যয়ে বলেছিল, সে দেবী নয়, সামান্য নারীও নয়; সে কবির পূজা চায় নি, অহংকৃত পৌরুষের অবহেলা চায় নি, দৃঢ়-বলিষ্ঠ পুরুষ-জীবনের সঙ্কট-সম্পদে পাশ থেকে কেবল সহায় হতে চেয়েছিল। চিত্রাঙ্গদা জানত না, পুরুষ-জীবনের সমভাগী হওয়া সহজ নয়। কোন জীবনই কোনও জীবনের সমভাগী হতে পারে না। এক-একটি মানুষ এক-একটি পর্বতচূড়া। তারা একে অন্যকে দেখে, একে অন্যের পানে হাত বাড়ায়, এমনকি হৃদয় পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়; মিলে মিশে এক হতে পারে না। জীবনের পর জীবন পুরুষ নারীকে, নারী পুরুষকে, কোন অজ্ঞাত, অপ্রাপ্য স্পর্শমণির অন্বেষণে বার বার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরম আগ্রহে প্রশ্ন করে—সূর্য যেমন

সমুদ্রকে প্রশ্ন করে—তুমি কি সেই? সে প্রশ্নের এক বিষণ্ণ উত্তর, সে নই, আমি সে নই।

১৯

অনেক মানুষের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেববাণী নিজের বুকের কাঁপন শুনতে পায় নি। মহাকায় এরোপ্লেনের গর্জনে সে কম্পন ডুবে গিয়েছিল। নিঃসার, নৈর্ব্যক্তিক মনে হয়েছিল দেববাণীর নিজেকে। আমি দেববাণী নই, সে নিজেকে বার বার বলছিল, আমি দেবী নই, সামান্য নারী নই, আমি কেউ নই। আমি শুধু জীবনের টুকরো ঝিলিক, অনেক ছাই-এর মধ্যেও আমি জ্বলছি, অঙ্গারে আমার কৃষ্ণ পরিণতি জেনেও আমি জ্বলছি। আমি জ্বলছি দেহের তাপে, আত্মার উত্তাপে। যে এক টুকরো আগুন মানুষের জীবনকে পবিত্র ক'রে, অমৃতত্বের আস্বাদ এনে দেয়, তাতে আমি পুড়ছি। ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন জীবন-বহ্নির সামান্য ছোঁয়ায়, পৃথিবীর জীবন-তৃষ্ণার মৃদুল হাওয়ায় আমি জ্ব'লে জ্ব'লে প্রতি মুহূর্তে ফুরিয়ে যাচ্ছি। এই জ্বলন্ত ঝিলিকটুকু আমার জীবনের একমাত্র হীরক-খণ্ড, ক্লিওপাট্রা যা মার্ক এণ্টনীর মুখে সুরায় গলিয়ে তুলে দিয়েছিল, সাবিত্রী আম্মা যা কাউকে দিতে পারেন নি, সরোজা যার দ্যুতি সইতে পারছে না।

হিমাদ্রি দেবকুমারকে সঙ্গে ক'রে এরোপ্লেন থেকে নামল। দূর হ'তে দেববাণী দেখল, ওরা নামছে। অনেক মানুষের মধ্যে দুটি মানুষ। তবু তাদের সঙ্গে এত মানুষের কোনও যোগাযোগ নেই। দুটি আগুনের ঝিলিক তৃতীয় ঝিলিকের পানে এগিয়ে আসছে। দুটি জলধারা তৃতীয় জলধারার সন্ধান করছে। দেববাণী স্থির অপেক্ষায় নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল। কে যেন তার অন্তরে ব'লে উঠল, তৈরি হও, এবার তোমার অন্তিম মুহূর্তের জন্যে তৈরি হও।

হিমাদ্রি দেবকুমারকে বাহুতে জড়িয়ে দেববাণীর মুখোমুখি দাঁড়াল। দেববাণী দেখল, তার মুখে বিজয়ের সূর্যালোক। একটি কথা না ব'লে হিমাদ্রি শুধু বিজয়ী হাস্যে, জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ব'লে দিল, এই নাও তোমার পুত্র, এই নাও তোমার মিত্র। যে সমস্যার সমাধান তুমি এত দীর্ঘ বছরে করতে পার নি, মাত্র দুটো দিনে আমি তা মিটিয়ে দিয়েছি। এবার তুমি আমাদের নাও।

দেববাণী সে জ্বলন্ত দৃষ্টি সইতে পারল না। তাকাল দেবকুমারের পানে। স্নিগ্ধ কিশোর মুখে জীবনের প্রথম অরুণালো ফুটে উঠেছে। দেবকুমার, খোকন, এক হাতে ধরে আছে হিমাদ্রির হাত, অন্য হাতে দেববাণীর। যেন বলছে, আমি ব্যবধান নই, সংযোগ।

দেববাণী চোখ বুজে হীরক-খণ্ডের সন্ধান করল। এই ত সেই অন্তিম মুহূর্ত, কোথায় আমার সে হীরার টুকরো, ক্লিওপাট্রা যা মার্ক এণ্টনীকে পান করিয়েছিল? অন্তরে ডুব দিয়ে তার সন্ধান পেল না দেববাণী। সে পালিয়েছে।

তার ব্যথিত ব্যর্থ সন্ধান বুঝি টের পেল হিমাদ্রি। যা সে কোনও দিন করে নি, আজ তাই ক'রে বসল। সবার সামনে দেববাণীর মাথায় হাত রাখল হিমাদ্রি। সে নিঃশঙ্ক হাতের স্পর্শ দেববাণীকে বলল, হারায় নি, তোমার স্পর্শমণি হারায় নি; শুধু এই মুহূর্তে তোমার অন্তর থেকে পালিয়ে সে আমাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে।

দেববাণী ভাবল, জীবনে চাওয়ার চেয়ে গ্রহণ করা অনেক কঠিন। যা চেয়েছি, তা গ্রহণ করার ভয়ে বার বার স'রে গেছি, এবার আর তাকে ফিরিয়ে দেবার উপায় নেই। এবার সে দুয়ার ভেঙে ঘরে উঠে এসেছে, আর ফিরে যাবে না।

দুজনকেই লক্ষ্য ক'রে সে বলল, "চল।"

হিমাদ্রি মৃদু হাস্যে প্রশ্ন করল: "কোথায় যাব?"

দেববাণী তার দিকে তাকাল। ভয়ে ভয়ে, নির্ভয়ে বলল, "ঘরে।"

সমাপ্ত

পক্ষীতীর্থ—মহাবলিপুরম্

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

কন্যাকুমারী থেকে ফিরছিলাম চিদম্বরম্ হয়ে, সন্ধ্যায় ট্রেনে চেপেছি—চিংলিপুটে নামব রাত দুটোয়। কার্ত্তিকের শেষ, বাংলায় ঋতু বদলের আয়োজন চলছে। হেমন্ত শেষ হয়ে আসছে শীত। এখানে বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী। একেবারে অঝোর ধারে বর্ষণ। সারা রাত্রি ধরে চলেছে সে পালা। ভোরবেলাতে পক্ষীতীর্থের বাস্ ধরব বলে রেলওয়ে বিশ্রামাগারে আশ্রয় নিয়েছি।

বাসে উঠে দেখি আকাশের চেহারা বদলে গেছে। এখন পথের দু'ধারে দেখছি অপূর্ব্ব দৃশ্য। বৃষ্টির দেবতা তাঁর অতি বৃহৎ জলপূর্ণ পাত্রটিকে চিংলিপুটের মাথাতেই যেন উজাড় করে দিয়েছেন। আকাশে ছেঁড়া মেঘ আছে প্রচুর, সে মেঘ নিঙড়ালে এক ফোঁটাও জল ঝরবে না বুঝি। ভরসার কথাই।

দু'পাশে জলে টইটুম্বুর মাঠ—তার বুক চিরে আঁকা-বাঁকা সরু পথটি কিন্তু অক্ষত। সেই পথ ধরে বাস্ ছুটছিল। আশেপাশে তাল নারিকেল বন—দূরে কয়েকটি পাহাড়। বাস্ থেকে দেখা যাচ্ছিল একটি পাহাড়—ওরই মধ্যে একটু বিশিষ্ট। শুনলাম, ওটিই বেদগিরি পাহাড় অর্থাৎ পক্ষীতীর্থ। যত কাছে মনে হচ্ছে তা নয়, চিংলিপুট থেকে নয় মাইল। গ্রামটির নাম তিরুক্কাল কুণ্ড্রম্। এ গ্রামেও একটি চমৎকার শিবমন্দির আছে, প্রকাণ্ড সরোবর আছে। এই মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ শিল্প-সুষমা দু'দণ্ড চেয়ে দেখবার মত। দেবতাকে নিয়ে পার্ব্বণ-উৎসবের ঘটা আছে—পথের ধারে ছাউনির মধ্যে রথখানি তার প্রমাণ। দোকানপসার আর যাত্রীতে জমজমাট একটি ক্ষুদে শহর। ধর্ম্মশালা আছে দুটি। অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন যেটি তার ঘরভাড়া দৈনিক পাঁচ সিকে করে। তা হোক, বাসস্থান হিসাবে নিন্দার নয়। ধর্ম্মশালা পরিদর্শকের সতর্ক দৃষ্টি থাকাতে জিনিস-পত্র খোয়া যাবার ভয় কম।

পৌঁছলাম বেশ সকালেই। একটু জিরিয়ে নিয়ে পক্ষীতীর্থে বেদগিরি পাহাড়ে উঠব ঠিক করলাম। সে এমন কিছু দূরে নয়—ধর্ম্মশালার পিছন থেকেই পাহাড় শুরু হয়েছে। দুরারোহও নয়, মাত্র পাঁচ-ছ' শ' সিঁড়ি। কিম্বা তারও কম। কিন্তু কামার বুড়ো হলে লোহা যে কঠিনতর হয় এই প্রবাদ বাক্য অতি সত্য। সুতরাং পাহাড়ে উঠবার সময় দু'তিন জায়গায় বিশ্রাম নিতে হ'ল—রীতিমত হাঁপাতে লাগলাম। অতি কষ্টে শেষ হ'ল ঊর্দ্ধারোহণ. বেদগিরীশ্বর মহাদেবের মন্দিরে পৌঁছলাম। এখানে লিঙ্গমূর্ত্তি শিব—মন্দিরগাত্রে ক্ষোদিত আরও কয়েকটি মূর্ত্তি—দুর্গা, কার্ত্তিক, গণপতি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি। এইসব দেখে একটি ফাঁকা জায়গায় এসে বসলাম।

পক্ষতীর্থ—বেদগিরি

পাখীর সম্বন্ধে পুরাণ-বর্ণিত গল্প বা প্রতিকূল মন্তব্য যাই থাকুক, এতগুলি সিঁড়ি ভেঙ্গে এই ঊর্দ্ধলোকে না আসতে পারলে আক্ষেপের সীমা-পরিসীমা থাকত না। শৈলশিখর থেকে মাঠ, গ্রাম, সরোবর সমেত দূর দিগন্তকে যে না প্রত্যক্ষ করেছে তাকে লাভ-লোকসানের হিসাব দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। শহরের রাজপথে মানুষ শুধু হারিয়ে যায় না, দৃষ্টির শক্তিও হ্রাস পায়। চারিদিকের বাড়ীঘর বস্তুপুঞ্জ বাধা হয়ে সত্য দর্শনের অন্তরায় সৃষ্টি করে। সামান্য অংশ দেখে সমগ্র কল্পনা করতে কষ্ট হয়। কিন্তু ঊর্দ্ধের এই দর্শন, এ শুধু নিসর্গশোভা বা গ্রাম-শহরের পূর্ণাঙ্গ রূপটিকে দেখা নয়—মাঠে-বনে-জলায়-পাহাড়ে-মন্দিরে-বাসগৃহে-যানবাহন-জনতায় মাখামাখি একটি অভিনব চিত্র। পাখী না আসা পর্য্যন্ত আমরা প্রাণ ভরে দেখতে লাগলাম। মানুষের হাতে তৈরী আর প্রকৃতির দানে সমৃদ্ধ স্থির পটভূমিকায় একটি ঈষৎ

স্পন্দমান অপরূপ আলেখ্য। দেখে দেখে দেখার আশ মেটে না।

দৃষ্টি মেলে রাখলাম দূরে—শাপভ্রষ্ট পাখী দু'টি কখন কোন্ দিক্ থেকে আসবে। ওরা নাকি বারাণসীর বাসিন্দা। প্রতি প্রত্যূষে বারাণসী থেকে যাত্রা করে রামেশ্বরে সমুদ্র স্নান সেরে দ্বিপ্রহরে আসে এই শৈল-শিখরে। এখানে আহার্য্য গ্রহণ করে ও সামান্যক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ফিরে যায় স্বধামে। প্রতিদিন ভারত পরিক্রমা আর কি। যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এই নিয়ম। নিত্য তীর্থ পরিক্রমা, পুণ্যসলিলে অবগাহন, দেবদর্শন—এত করেও কি পাপক্ষয় হচ্ছে না—ফুরোচ্ছে না অনাদি কাল থেকে এই আসা-যাওয়ার পালা? সেই অতি পুরাতন পাখীরা হয়ত মুক্তি লাভ করেছে। কিন্তু তীর্থ-মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখতে ভোগ-অর্চনার বিধিবিধান-গুলিকে জীইয়ে রাখতে হয়েছে। পুরোহিত যথা নিয়মে চারুভাণ্ড নিয়ে অপেক্ষা করেন—পেতে দেন দু'খানি কাঠের পিঁড়ি, পাখীর সামনে ধরে দেন ভোজ্য। পাখী আসে নিয়মিত ভাবেই। মেঘবৃষ্টি হলে কচিৎ কখনো আসে না। কোনদিন বা একটি আসে, কোনদিন যাত্রীদের ভাগ্যে যুগল দর্শন হয়।

দূরের পাহাড়ের দিকে চেয়ে আছি। সেই দিকে চেয়ে আছে সব যাত্রী। পাখী নাকি ওই দিক্ দিয়েই আসবে। আকাশে যে চিলগুলি পাক খাচ্ছে অনবরত তারই গা ঘেঁষে আসবে। বিশিষ্ট একটি বিন্দুর মত অথবা বিশেষ একটি ভঙ্গিকে আশ্রয় করে। চেয়ে থাকি আমরা। অপলক রুদ্ধশ্বাস।

হঠাৎ পাখী এলো অতর্কিতে—পাথরের পাশ দিয়ে। এলো একাকী। খাবার বাটিটা পাথরে ঠুকে পুরোহিত আহ্বান জানালেন। এগিয়ে এল পাখী। পিঁড়ির উপরে উঠে এল। চরু খেলে পরিতৃপ্তি করে। পাথরের ফাটলে একটু জল জমে ছিল, তাতে ঠোঁট ধুয়ে পাথরের আড়ালে চলে গেল। আবার বাটি ঠুকতে লাগলেন পুরোহিত। খানিক পরে এল আর একটি। মনে হ'ল প্রথমটিই ফিরে এল। অঙ্গসৌষ্ঠব দেহবর্ণ পালকের বিন্যাস কোথাও এতটুকু অমিল নাই। অনেকটা শঙ্খচিল জাতীয় পাখী, কিম্বা বইয়ে-দেখা ঈগল পাখীর ছবিটা যেন পাথরের উপরে জীবন্ত হয়ে উঠল। দ্বিতীয়টি ভাল করে আহার করল না, মুখও ধুলে না। সবাই বলল, প্রথমটিই ফিরে এসেছে। একটু আগে খেয়েছে আর খেতে পারে কখনও?

পাণ্ডার ছড়িদার বলল, না বাবু দুটোই আজ এসেছে। পাহাড় থেকে নেমে এসে বলল, ওই দেখুন একটা পাক খাচ্ছে মন্দির ঘুরে—আর একটা স্থির হয়ে বসে আছে মন্দির চূড়ায়।

কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু এদিকের সন্দেহ নিরসন হলেও অপর দিকের প্রত্যয় দৃঢ় হ'ল। বললাম, তা বটে। ওরা দেখছি মন্দিরেই থাকে—বারাণসীতে ফিরে যায় না।

ছড়িদার ম্লানমুখে জবাব দিল, যায় বইকি—একটু বিশ্রাম নিয়ে।

বাদানুবাদে ফল নাই। পাখী দেখতে পাহাড়ে না উঠলে একটি অপূর্ব্ব-দর্শন থেকে বঞ্চিত থাকতাম—এই সত্যটিই বার বার অনুভব করতে লাগলাম।

আহারাদি সেরে ঠিক করলাম, মহাবলিপুরমে যাব। মাত্র ন' মাইল পথ—ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে আসা-যাওয়া আর দর্শন।

নাতি ও গৃহিণী বললেন, আমরা কিন্তু যাচ্ছি না, কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি—ছুটোছুটি সইবে না।

শরীর ক্লান্ত ছিল আমারও, কিন্তু শিল্প-তীর্থের দুয়ারে এসে নিরর্থক ফিরে যাব—এই চিন্তা পীড়ন করতে লাগল। একাই বেরিয়ে পড়লাম। চমৎকার পথ—লোকালয় ছাড়িয়ে দু'ধারে অফুরন্ত শস্যশ্যামল মাঠ। আকণ্ঠ জলে ডুবে ধানের চারাগুলি বাতাসে দুলছে। আকাশ নীচেয় নেমেছে অনেকখানি, নরমও। ক'দিন ধরেই প্রচুর বর্ষণ হয়ে গেছে দু' পাশের নয়নজুলি দিয়ে কলকল শব্দে জলস্রোত বয়ে চলেছে। সেই স্রোত নেমে এসে এক জায়গায় সৃষ্টি করেছে একটি খাল। নেহাৎ দশ-বিশ হাত সঙ্কীর্ণ খাল নয়—এপার-ওপার নিয়ে চওড়া একটি নদীই। পথের নদী বলে জল গভীর নয়—তবু ওরই প্রতাপে দু'ধারে মোটর রিকশা গোযান প্রভৃতি আটক পড়েছে। আমাদের বাস্‌ও থমকে দাঁড়াল। মনটা খারাপ হয়ে গেল, এত করেও মহাবলিপুরমে পৌঁছানো গেল না! ওপারেও একখানা বাস্ দাঁড়িয়ে। খানিক পরে সেটা চলতে আরম্ভ করল এবং স্রোত ঠেলে এপারে এসে উঠল। আমাদের চালকও সাহস করে দরিয়ায় ভাসিয়ে দিলেন বাস্। ভাগ্যিস সেটা ভেসে যায় নি কিংবা ইঞ্জিনে জল ঢুকে বিকল হয় নি! জল ঠেলে উঠল বাসের মেঝে পর্য্যন্ত—মেঝেতে ঢেউ খেলতে লাগল। আমরা তাড়াতাড়ি জুতোশুদ্ধ পা উঁচু করে আড়ষ্ট হয়ে যে যার জায়গায় বসে রইলাম। নির্ব্বিঘ্নে অপর পারে পৌঁছল বাস্।

এটা কিন্তু মহাবলিপুরমের রাস্তা নয়। কতকগুলি

যাত্রী নিয়ে বাস্ দু' মাইল দূরের এই গ্রামখানিতে এসেছিল। যাত্রীরা নেমে গেলে আবার উজিয়ে নদী পার হয়ে মহাবলিপুরমের পথ ধরল। জানি না, সামান্য পয়সার জন্য এমন ঝুঁকি ওরা কেন নিয়েছিল।

এইভাবে বেশ খানিকটা সময় নষ্ট হওয়াতে অপরাহ্ণ বেলায় মহাবলিপুরমে পৌঁছলাম। বাস্ থেকে নামতেই কিশোর গাইডের দল ছেঁকে ধরল। ওরই মধ্যে একজন বেশী বয়সের ছোকরাকে বেছে নিলাম। তার বয়স তেইশ-চব্বিশের বেশী হবে না। চমৎকার ইংরেজি বলে, প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতাও আছে। বললে, তাড়াতাড়ি আসুন—এক জায়গার ব্যাপার ত নয়, ঘুরে ঘুরে সব দেখতে হবে।

একরকম দৌড়ে দৌড়েই তাকে অনুসরণ করলাম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দেখাশোনা করতে হবে। সব দেখতে হলে মাইল দুই পথ অন্ততঃ ঘুরতে হবে।

পাহাড়ের এক প্রান্ত থেকে আরম্ভ হ'ল পরিক্রমা। প্রথমেই দেখলাম, একটা ঢালু পাহাড়ের গায়ে প্রকাণ্ড একটা গোলাকার পাথর কাত হয়ে রয়েছে—মনে হয় একটু ঠেলা পেলেই ওটা গড়িয়ে পড়বে। কিন্তু অনেক ঝড় জল এবং মানুষের চেষ্টাকে উপেক্ষা করে যুগযুগান্ত ধরে ওটা যথাস্থানেই রয়ে গেছে।

গাইড বলল, এর নাম মাখন গোলা (বাটার বল), শ্রীকৃষ্ণের লীলার একটি উপাদান। ওই পাহাড়ের প্রান্ত ভাগে রয়েছে আর একটি লীলা-চিহ্ন—গোপীদের ঘোল মওয়ার পাত্র। ঘোল মউনি। এটিও অখণ্ড একটি পাথরে তৈরি, আকারে বৃহৎ হলেও সুগঠিত।

গাইড বলল, এ সবই শ্রীকৃষ্ণলীলার চিহ্ন—যদিও শ্রীকৃষ্ণ কোন দিন এখানে আসেন নি আর গোপীরাও এই পাত্রে দধি মন্থন করে নি।

এই সব দেখে মনে প্রশ্ন জাগে কোন্ সময়ে হয়েছিল মহাবলিপুরমের পত্তন? কৃষ্ণলীলার এই বস্তুগুলি কে তৈরি করিয়েছিলেন? পুরাণের কথা সর্বজনগ্রাহ্য নয়। কাজেই, বলি রাজার থেকে মহাবলিপুরমের উৎপত্তি এ তথ্য তার্কিকের জন্য নয়। আবার ঐতিহাসিকরাও এ সম্বন্ধে একমত নন। কেউ বলেন, সপ্তম শতাব্দীতে পল্লব যুগে নরসিংহ বর্ম্মণের সময় এই নগরীর পত্তন হয়—আর সেই সময় থেকে শিল্পসৃষ্টির কাজ চলে। এই বিরাট্ শিল্পকর্ম শেষ হতে আরও দু'এক শতাব্দী লেগেছিল। শিল্পকর্মে বৌদ্ধ প্রভাবও স্পষ্ট। অন্যমতে কল্যাণপুরার চালুক্যরা এর নির্মাতা। পরবর্ত্তী যুগে বিজয়নগরের হস্তক্ষেপও কিছু রয়েছে—তার সাক্ষ্য কৃষ্ণদেব রায় নির্ম্মিত অর্দ্ধসমাপ্ত মন্দিরটি। এটি ন্যাড়া পাহাড়ের মাথায়—গোবর্দ্ধন গুহায়, ঠিক উপরেই অবস্থিত।

গাইড বলল, কৃষ্ণদেব রায়ের আমলে এটির নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয়—শেষ হয় নি।

মনে হ'ল, মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বলতেই বা আপত্তি কি?

মন্দির দেখে নেমে এলাম পাহাড় থেকে। নীচের পাহাড়ের একটি প্রশস্ত গুহায় ব্রজলীলার বিরাট্ একটি চিত্র উৎকীর্ণ রয়েছে। গিরি গোবর্দ্ধন ধারণের চিত্র। শ্রীকৃষ্ণ একটি অঙ্গুলি দ্বারা অবলীলাক্রমে ধারণ করে আছেন গিরি গোবর্দ্ধন। তার তলায় শান্ত নিরুদ্বেগ লোকযাত্রার গতি। গো দোহন করছেন যশোমতী, দু'পাশে কৃষ্ণ বলরাম, রাখাল বালক, আর ব্রজ গোপীর দল। গাভী, বৎস, যশোমতী, বলরাম, রাখাল বালক, গোপাঙ্গনা সকলেই পূর্ণ অবয়ব বিশিষ্ট। কেবল শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিটি অপেক্ষাকৃত বড়—ঐশী সত্তাকে পৃথক্ করে দেখানোর জন্যই হয়ত বা। বেশ খানিকক্ষণ চেয়ে দেখবার মত ছবি।

কিন্তু সময় কম। এক ছবির রস মনের মধ্যে পরিপাক হতে না হতে আর একটি বিরাট্ ছবির সামনে এসে পড়লাম। ষাট-সত্তর হাত লম্বা ও চোদ্দ-পনের হাত উঁচু দ্বিধাবিভক্ত একটি পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য দেবদেবী নরনারী ও যাবতীয় প্রাণীমূর্ত্তির সমাবেশ। শিলাপটে অবিস্মরণীয় রিলিফ চিত্র।

গাইড বললে, এ হ'ল অর্জ্জুন-তপস্যার ছবি। ঐ দেখুন ঊর্দ্ধবাহু শীর্ণকায় অর্জ্জুন বসেছেন তপস্যায়—সামনে দেবাদিদেব মহাদেব এসেছেন বর দান করতে। দু'পাশে নাগনাগিনী, হস্তীযূথ, মৃগ, বানর, মূষিক, মার্জ্জারের সঙ্গে গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিন্নরের দল মিলে দেখছেন এই অপরূপ তপস্যা।

অর্জ্জুন-তপস্যা ব'লে ছবিটি পরিচিত হলেও আসলে এটি গঙ্গাবতরণের দৃশ্য। দ্বিধাবিভক্ত পাহাড়টিকে অনায়াসে নদীরূপে কল্পনা করে নেওয়া যায় কারণ ঐখানেই যাবতীয় জলচর প্রাণী ক্রীড়ারত। জলধারার বামে ছোট্ট একটি মন্দিরে দণ্ডায়মান শিবমূর্ত্তি—সামনে তপস্যারত ক্ষীণদেহ ঊর্দ্ধবাহু ভগীরথ। প্রাণীবৃন্দের মধ্যে দক্ষিণে বৃহদাকার হস্তীযূথ এবং ভগীরথের অনুকারী তপস্যারত মার্জ্জার, তার পায়ের তলায় ক্রীড়াশীল মূষিক। ওরই বিপরীতে গুহামুখে এক মৃগদম্পতি। হরিণটি পিছনের পা দিয়ে তার নাক চুলকোচ্ছে। ছবির থেকে

একটু দূরে রয়েছে এক বানর পরিবার—কপিপুঙ্গব বানরীর গা থেকে উকুন তুলছে—বানরী পিছন ফিরে বসে স্তন্যপান করাচ্ছে দু'টি বাচ্চাকে। পুরাণ কথার মহিমার সঙ্গে প্রাণীজগতের এমন বাস্তবানুগ মিশ্রণ পদ্ধতি কম ছবিতেই দেখা যায়। দেব, নর, যক্ষ, কিন্নর, নাগ প্রভৃতি ভক্তিভারাবনতচিত্তে চেয়ে রয়েছে শিলাগাত্রচ্যুত বারিপ্রবাহের দিকে। শিলা-রচিত এমন বিরাট্ রিলিফ-চিত্র পৃথিবীতে খুব বেশী নাই।

সবশুদ্ধ দশটি মণ্ডপ আছে মহাবলিপুরমে। সবগুলিই গঙ্গাবতরণের মত বিরাট্ নয়, কিন্তু বিষয়বস্তুর নির্ব্বাচনে ও বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। মহিষমর্দ্দিনী ও বরাহগুহা দু'টি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বরাহগুহায় আছে বরাহ ও বামন অবতার, সূর্য্য, দুর্গা, গজলক্ষ্মী মূর্ত্তি। এর সঙ্গে রয়েছে সপত্নীক ও সপার্ষদ রাজমূর্ত্তি। মূর্ত্তিটি নাকি রাজা মহেন্দ্র বর্ম্মণের।

মহিষাসুরমর্দ্দিনীগুহায় রয়েছে সর্পশয্যায় অনন্তশয়ান বিষ্ণুমূর্ত্তি আর যুদ্ধরত দেবী দুর্গা। এই বিস্তীর্ণ গুহা জুড়ে রণক্ষেত্রের তাণ্ডব দৃশ্য। প্রতিটি দেব ও দানব মূর্ত্তিতে রণমত্ততার দাপট—মাঝখানে রণদৃপ্ত ভঙ্গিতে দশ করে নানা আয়ুধ নিয়ে শক্তিরূপিণী দুর্গা। রণক্ষেত্রের ভয়াবহতা পরিস্ফুট করার জন্য রণশায়ী অসুর মূর্ত্তিও রয়েছে কতকগুলি। কর্ত্তিতমুণ্ড মহিষদেহ হতে অর্দ্ধ বিনিষ্ক্রান্ত মহিষাসুর—তার বলদৃপ্ত ভঙ্গিমায় যুদ্ধং দেহি ভাব। অপরূপ শিল্পসৃষ্টি! সে যুগে অতি সূক্ষ্ম তক্ষণ যন্ত্রের কথা কেউ ভাবতেও পারত না, অথচ একটি হাতুড়ি ও পাথর কাটা ছেনি মাত্র সম্বল করে এমন সূক্ষ্ম রেখা-বিন্যাসে কর্কশ পাষাণ গাত্রে সুনম্য মূর্ত্তিগুলি কোন্ যাদুমন্ত্রবলে যে জীবন্ত হয়ে উঠত সে রহস্যের সন্ধান কে দেবে!

মহিষমর্দ্দিনী গুহার সামনেই পুরাতন বাতিঘর (লাইট হাউস)। আজও সেখানে বাতি জ্বলে, কিন্তু এখানে বন্দরের কাজ শেষ হয়েছে। মহাবলিপুরম্ এককালে সমুদ্রের সংযোগে বাহির বিশ্বকে আত্মীয় করেছিল। আজ কতকগুলি পুরাতন শিল্পের নমুনা দেখতে যাত্রীরা ভিড় জমায় এখানে। আমাদেরই মত অল্প সময় হাতে নিয়ে ছুটে ছুটে শিল্প-উৎকীর্ণ পাহাড়ের গুহাগুলিতে ও রথ-গুলিতে চোখ বুলিয়ে, মুগ্ধ বিস্ময়ে বলে ওঠে, বাঃ—চমৎকার। ছুটির দিনে মাদ্রাজ থেকে দল বেঁধে যাত্রী আসে শোর টেম্পলের ধারে ক্যাসুরিণা কুঞ্জে। ওখানে বসে তারা হৈহুল্লোড় করে, গ্রামোফোন বাজায়, বেহালা, বাঁশী বা হারমোনিয়ামে সুর তোলে, ছবি আঁকে, দূরবীণ কষে দূর সমুদ্রে। হাটের প্রচণ্ড কোলাহল দিয়ে অতীতের ক্ষীণ সুরটিকে চাপা দেয়, বেলা-প্রতিহত সমুদ্র-তরঙ্গে ওঠে বিলাপধ্বনি।

মহিষাসুরমর্দ্দিনী গুহা থেকে পোয়াটাক পথ ডিঙ্গলে পঞ্চ পাণ্ডবের রথগুলি চোখে পড়বে। মনোলিথিক রথ অর্থাৎ আস্ত একটি পাথর কেটে তৈরী হয়েছে। দ্রৌপদীর, যুধিষ্ঠিরের, ভীমের, অর্জ্জুনের এবং নকুল-সহদেবের একত্রে এই পাঁচখানি রথ মানে পাঁচটি মন্দির। পরিষ্কার একটি বালুময় প্রাঙ্গণে ঝাউ কুঞ্জের মধ্যে রয়েছে এগুলি। দূর থেকে সর্ব্বপ্রথমে দৃষ্টি পড়ে প্রকাণ্ডকায় একটি হাতীর উপরে। স্বাভাবিক গাত্রবর্ণের জন্য এটিকে দূর থেকে জীবন্তবৎ মনে হয়। জলবায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ সহ্য করেও এগুলি অবিকৃত রয়েছে।

রথগুলি পঞ্চ পাণ্ডবের নামে চিহ্নিত হ'ল কেন—কে জানে! তবে পাণ্ডবদের বলবীর্য্য আকৃতি প্রকৃতি পদ-মর্য্যাদা অনুযায়ী এগুলি তৈরী হয়েছে তাতে সন্দেহ নাই। যেমন যুধিষ্ঠিরের রথে কারুকার্য্যের সমাবেশ, ভীমের রথখানি সব চেয়ে বড়, নকুল সহদেব দু'ভাইকে মিলিয়ে একখানি রথ, ইত্যাদি।

তাড়াতাড়ি শেষ করলাম রথ দেখা। একজন সরকারী রক্ষী মাত্র ছিল পাহারায়—আর গাইডের সঙ্গে ছিলাম আমি—সেই জনবসতিহীন প্রান্তরে আর কেউ ছিল না। সমুদ্র খানিকটা দূরে—তার গর্জ্জন শোনা যাচ্ছিল, আর ঝাউয়ের শাখায় বায়ুর শোঁ শোঁ শব্দ, বিরামহীন বিলাপধ্বনি। মনকে কিছুতেই বর্ত্তমানের ভূমিতে ধরে রাখা যায় না। অতীতকালের শিল্পকীর্ত্তি দেখতে দেখতে কেমন যেন বেদনায় ভারাক্রান্ত হয় মন। চোখে অফুরন্ত বিস্ময়, মনে অকারণ বেদনা, এদিকে সূর্য্য অস্তাচলে—বিদায়ের বাঁশীই বেজে চলেছে অবিরত।...অভিভূত ভাবে বালুপ্রান্তরে বসে পড়েছি।

বসলেন কেন বাবু—তাড়াতাড়ি না গেলে শোর টেম্পলে পৌঁছতে পারব না। গাইড তাড়া দিল।

চকিতে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, কতটা দূর?

পোয়া মাইল হবে।

এক রকম ছুটেই চললাম।

যেতে যেতে বাতি ঘরের সামনে বাঁ দিকে পড়ল একটি পাহাড়—তার গায়েও নানা শিল্প-নমুনা। সবগুলিই অসম্পূর্ণ। এ পাহাড়ের গায়েও অর্জ্জুন-তপস্যার (?) কাহিনী উৎকীর্ণ রয়েছে—শেষ হয় নি।

গাইড বলল, আসল থেকে নকল করার চেষ্টা।
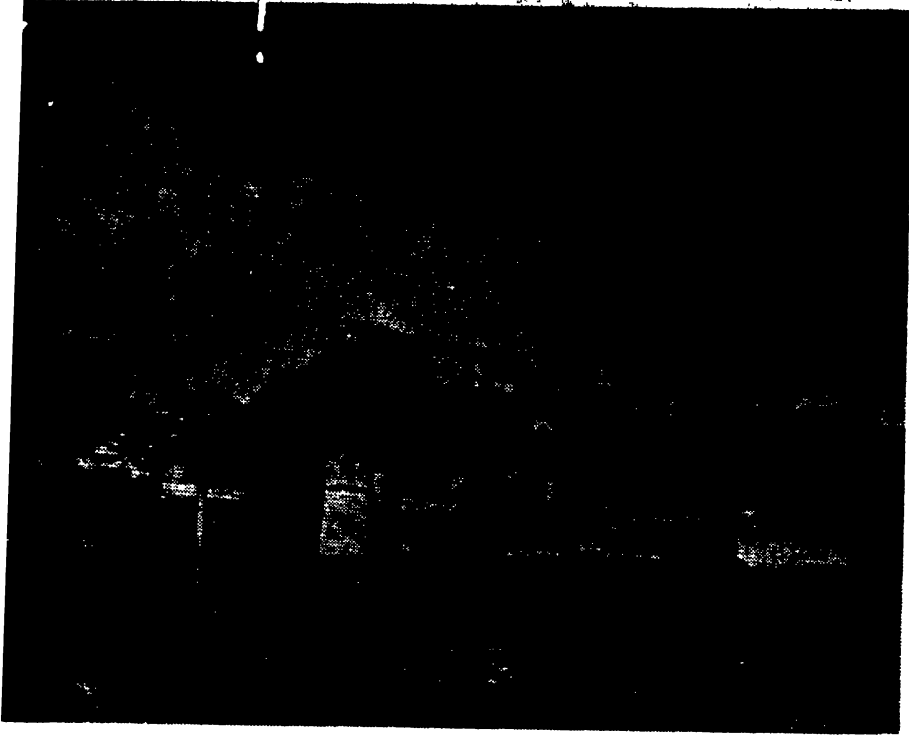
উদয়পুরের পীচোলা হ্রদের তীরে সুরম্য প্রাসাদ শ্রেণী
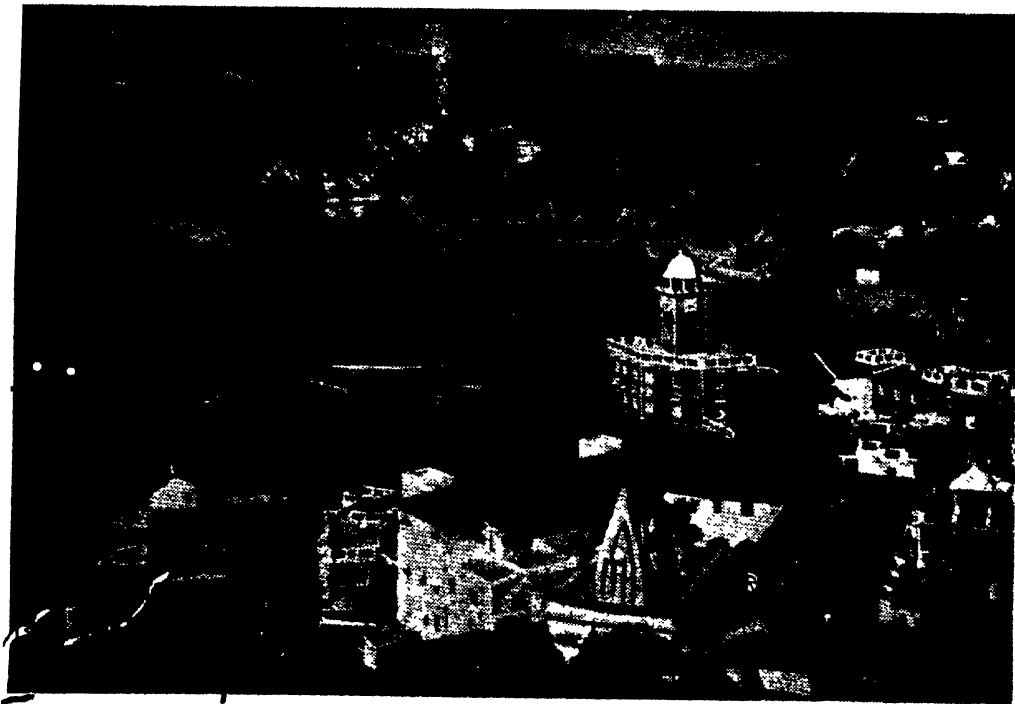
মাউন্ট আবুতে নাক্কি হ্রদের দৃশ্য

এখানকার সব পাহাড়েই অল্পবিস্তর এই নমুনা দেখতে পাবেন।

ভাবলাম এটা সম্ভব। এ হ'ল শিল্পক্ষেত্র, শিল্পী-মন এ ভূমিতে নিরুদ্যম থাকতে পারে না।

পথগুলি বেশ সুসংস্কৃত—মোটর-বিহারীদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সরকারের খরদৃষ্টি রয়েছে। মন্দির রক্ষণার ব্যবস্থাও নিন্দার নয়। শো'র টেম্পলটিকে সমুদ্র-গ্রাস থেকে বাঁচাবার জন্য যথাসাধ্য করেছেন সরকার। পাথরের পাঁচিল তুলেছেন তীরে—বেলাভূমিতে পাথর ফেলেছেন রাশি রাশি—তারই পারে নিষ্ফল আক্রোশে আছড়ে পড়ছে বঙ্গোপসাগরের দুরন্ত ঢেউগুলি। ফেনার ফুল ফুটছে রাশি রাশি।

প্রাচীন প্রবাদ বলে—সমুদ্র বেলাভূমি অতিক্রম করে না। তাই যদি হবে ত আর দু'টি মন্দির সমুদ্রগর্ভে বিলীন হ'ল কেমন করে? একদা যে মন্দিরের স্বর্ণচূড়া দেখে অর্ণবপোত থেকে স্থান নির্ণয় করতেন নাবিক ও বণিক্ দল—সেই স্বর্ণচূড়াবিশিষ্ট মন্দির আজ কোথায়?

প্রসঙ্গত ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যের চিত্রটি চোখের সামনে ভেসে উঠছে। অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশের সঙ্গে অপর অংশের ও বাহির বিশ্বের কয়েকটি রাজ্যের বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। স্থল এবং সমুদ্র উভয় পথে দস্যুভয় ছিল বলে বণিক্‌রা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে চলাফেরা করতেন। এই সময়কার দক্ষিণের একটি উল্লেখযোগ্য বণিক্‌দল হ'ল আইহোলের পঞ্চশত স্বামী। রাজাদের মত এঁদের কুলপঞ্জী ছিল—এঁরা বাণিজ্য-ধর্ম্মের রক্ষক। এঁদের কেতন ছিল বৃষলাঞ্ছিত। এঁরা বাসুদেব, খাণ্ডালি ও মূলভদ্রের বংশধর এবং বিষ্ণু, মহেশ্বর ও জিনদেবের উপাসক। জল ও স্থলপথে এঁরা চোল, চের, পাণ্ড্য, মালোয়া, মগধ, কোশল, সৌরাষ্ট্র, কম্বোজ, গল, পারস্য, নেপাল, ধহস্র, কুরুম্বা প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করতেন। পণ্যদ্রব্য ছিল—হস্তী, মণিমুক্তা, হীরক, এলাচ, লবঙ্গ, কর্পূর, মৃগনাভি, জাফরাণ ও নানাবিধ গন্ধদ্রব্য।

আবার বিদেশী বণিক্‌রাও ভারতরাজ্যে অভ্যর্থিত হতেন। তাঁদের নিরাপত্তার ভার নিত রাজ্য। একজন ইহুদী পর্য্যটক বেঞ্জামিন, চোল রাজত্বকালের বিবরণে বলেছেন—এঁরা অত্যন্ত বিশ্বস্ত জাতি, বিশেষ করে বাণিজ্যক্ষেত্রে তা প্রমাণিত করে থাকেন। বিদেশী বণিক্‌রা এঁদের বন্দরে প্রবেশ করা মাত্র রাজার কর্ম্মচারীরা এসে নাম, ধাম, পণ্যদ্রব্য প্রভৃতির বিবরণ লিখে নিয়ে সেটি রাজসমীপে প্রেরণ করতেন। রাজা বণিক্‌দলের প্রাণ ও পণ্যদ্রব্যের নিরাপত্তার ভার নিতেন। সে সব জিনিস বিনা পাহারায় খোলা মাঠে পড়ে থাকলেও খোয়া যাবার ভয় থাকত না। একজন রাজকর্ম্মচারী পণ্যবিক্রয় কেন্দ্রে অর্থাৎ কেনা-বেচার বাজারে বসে থাকতেন; তাঁর কাছে হারাণো জিনিসের বিবরণ দেওয়া থাকলে প্রাপ্তিমাত্র তিনি সেই জিনিসগুলি আবেদনকারীকে প্রত্যর্পণ করতেন। আমাদের বর্ত্তমান কালের সঙ্গে তুলনা করলে সে যুগকে রামরাজ্যের যুগ বলে মনে হবে না কি!

যাই হোক, আজ দু'টি মন্দির সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়েছে, মাত্র একটির ভগ্নাবশিষ্ট বিদ্যমান। সেই সপ্তম এবং শেষতম মন্দির প্রাঙ্গণে পুরাতন চিহ্ন রয়েছে বহু। মন্দিরের সামনে নাটমন্দির, ভোগমন্দির, নৃত্যসভা প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ চিহ্ন—পুরাতত্ত্ব বিভাগ এগুলিকে ভাগ করে রেখেছে। মন্দিরটি আছে অবিকৃত। একখানা অখণ্ড পাথর দিয়ে তৈরী নাকি এ মন্দির—যার ভিতরের অনন্ত শয্যার শায়িত বিষ্ণুমূর্তিটি পর্য্যন্ত।

ভিতরে সূচীভেদ্য অন্ধকার। কোন রকমে টর্চ্চ জ্বেলে প্রবেশ করা গেল। কিন্তু যুগযুগান্তরের সঞ্চিত জমাট বাঁধা অন্ধকার, সাধ্য কি কম-জোরী টর্চ্চে আলো তা ভেদ করে। অন্ধকারে দৃষ্টি বুলিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

উঁচু বাঁধের উপর বসে অনেকে সমুদ্রবায়ু সেবন করছেন। পিছনে অফুরন্ত মাঠ—সামনে অফুরন্ত জল। ডান ধারে বনঝাউ-এর কুঞ্জ পরিপাটি করে সাজান। এখানে ছুটির দিনে বৈচিত্র্যপিয়াসী নরনারীর ভিড় জমে—অতীতের পটভূমিকায় বর্ত্তমানের জলছবি তুলে দেখার চেষ্টা চলে। সে ছবি জলের আলপনার চেয়ে স্থায়ী নয়—আঁকার সঙ্গে সঙ্গে মুছে যায়। ঝাউবনের দীর্ঘনিশ্বাস বলে—নাই—নাই।

সূর্য্য অস্ত গেছেন বহুক্ষণ—গোধূলি আলোও একসময়ে ফুরিয়ে গেল। ধীরে ধীরে অন্ধকার গ্রাস করছে সমুদ্রকে। মহাবলিপুরমের মন্দির পাহাড় ঝাউবন পথ প্রান্তর একে একে মুছে যেতে লাগল। শুধু সমুদ্র-কল্লোলধ্বনি আর ঝাউবনের শন্‌শনানি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। নিরবধি কালের সঙ্কেতধ্বনি কি?

ফিরবার মুখে সেই অদৃশ্য মহাশিল্পীকেই দু'হাত জুড়ে প্রণাম জানালাম।

বরপণ-কন্যাপণ
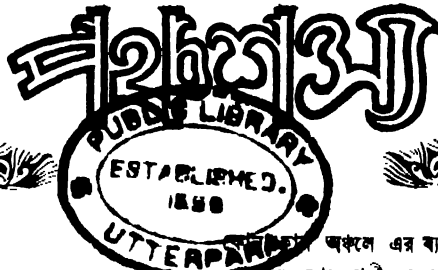
বাঙালী বর্ণহিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বরপণ যেমন একটি ভয়াবহ সামাজিক কু-প্রথা, নিম্নবিত্ত নিম্নজাতীয় কোন কোন বাঙালী হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে কন্যাপণও প্রায় তদ্রূপ। এই কন্যাপণ বরকে নিজে রোজগার ক'রে দিতে হয়, তার হয়ে তার পিতা বা অন্য কাউকে দিতে হয় না ব'লে এ নিয়ে চেঁচামেচি হয় না। মধ্যবিত্ত সমাজের কুমারী মেয়েরা অনেকে আজকাল উপার্জ্জনক্ষম হয়েছেন। তাঁরা যদি অতঃপর স্বোপার্জ্জিত অর্থের কতকাংশ বা বহুলাংশ স্বামী-সংগ্রহে ব্যয় করেন, তা নিয়েও উচ্চবাচ্য হবে না ব'লে আমাদের বিশ্বাস।

একেবারে সোজাসুজি না হোক, কার্য্যতঃ এখনই যে তাঁরা করছেন না, তাই বা বলি কি ক'রে? খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, বিবাহার্থী পুরুষ উপার্জ্জনক্ষম স্ত্রীর সন্ধান করেন: এর অর্থ, অর্থ চাই, শুধু স্ত্রী নয়। অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া সার্থক না হ'লে গাঁটের পয়সা খরচ করে বিজ্ঞাপন এঁরা দিতেন না!

অবশ্য উপার্জ্জনক্ষম কন্যার জন্যেও প্রচুর বরপণ দিতে হয়েছে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই এ দেশে!

আফ্রিকার কোন কোন জাতের মধ্যে কন্যাপণ দিতে গিয়ে বরেরা সর্ব্বস্বান্ত হয়ে যায়। বাগাণ্ডার বরকে কন্যার পিতামাতা ভাইবোন প্রত্যেকের কাছে বিবাহের ইচ্ছা জ্ঞাপন ক'রে চিঠি লিখতে হয়, সেই চিঠির প্রত্যেকটির সঙ্গে টাকা দিতে হয় বেশ অনেকটা ক'রে। কন্যাপণ ত দিতেই হয়, তা ছাড়া কন্যার অসংখ্য রকম ব্যবহারের জিনিষ, বিবাহের মিসিলের বাদ্যভাণ্ড, এসবও আছে। ইতিমধ্যে কন্যার দিকের কেউ যদি মারা যায় ত তার অন্ত্যেষ্টির এবং মৃতব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনদের শোকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ বিয়ারের ব্যবস্থাও তাকেই করতে হয়।

বিবাহের রাতটাই সবচেয়ে ভয়াবহ। বিয়ার যেমন শোকে সান্ত্বনা দেয়, বিয়ার না হ'লে আনন্দও তেমনি জমে না ভাল ক'রে, সুতরাং তার ব্যবস্থা চাই-ই চাই, আর শোকগ্রস্ত লোকের চেয়ে আনন্দকামী লোকের সংখ্যা যে অনেক বেশী তা ত বলাই বাহুল্য। বিবাহ হয়ে যাবার পরেও নিষ্কৃতি নেই। কন্যা স্বামীর গৃহে প্রবেশ করবেন, তার জন্যে দক্ষিণা, আসন পরিগ্রহ করবেন, তার জন্যে দক্ষিণা, স্নানাহার করবেন, তার জন্যে দুই দফা দক্ষিণা; তার পর স্বামীর সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করবেন, তার জন্যে ত অবশ্য বেশ একটু মোটা রকমের দক্ষিণা আছেই।

এই শেষ দক্ষিণাটা দেবার মত টাকা তখন যদি বরের হাতে আর উদ্বৃত্ত না থাকে ত অবস্থাটা কি দাঁড়ায় জানতে ইচ্ছে হয়। চড়া সুদে হ্যাণ্ডনোট জাতীয় কিছু লেখা হয় না নিশ্চয়ই।

বরপণ হিসেবে মেয়েদের যে কত কি দিতে হয় সে প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। অধিকাংশ সভ্যদেশে সকলেই চায় এবং আশা করে, যে, বিবাহের কন্যা কুমারী হবেন। সাইবেরিয়ার [illegible] অঞ্চলে এর ব্যতিক্রম। বিবাহের রাত্রে বর যদি বুঝতে পারে যে, তার পত্নী অক্ষতযোনি কুমারী ত পরদিন ভোরে উঠেই সে শ্বশুরবাড়ীতে চড়াও হয়ে এই বলে ঝগড়া করে যে, মেয়েটির যথোপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাতে অবহেলা হয়েছে। এই শিক্ষা দেওয়ার কাজে বৃত্তিভোগী পুরুষ নিয়োজিত হয় কোন কোন উপসম্প্রদায়ের মধ্যে। এও বরপণ ছাড়া আর কি?

ন্যাটা

ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে ন্যাটা অমুক, ন্যাটা তমুকের কথা প্রায়ই আপনারা শুনে থাকেন। ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যে কারুর বাঁ পা ডান পা'র চেয়ে বেশী চলে কি না লক্ষ্য করে কেউ দেখে না, কারণ সহজে লক্ষ্যগোচর হবার মত নয় ওটা।

ইংলণ্ডের রাণীমাতা এলিজাবেথ যে ন্যাটা তিনি বিলিয়ার্ড টেবিলে এলেই সেটা বোঝা যায়।

বাঁ-হাতে বিলিয়ার্ড খেলেন বলে এলিজাবেথের লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই। ইংরেজীতে বলা যায়, 'শী ইজ ইন গুড কম্পানী।' আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট ন্যাটা ছিলেন, তা সত্ত্বেও তখনকা'র পরিচিত পৃথিবীর একটা বৃহদংশ জয় করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয় নি। শার্ল মাইন্ ন্যাটা ছিলেন, বিজেতা যোদ্ধা বা সাম্রাজ্যপতি হিসেবে তাঁর স্থানও বেশ উঁচুতে। তখনকার দিন থেকে দেখতে পাওয়া যাবে, অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিই ন্যাটা। যেমন, চারজন বিশ্ববিখ্যাত চিত্র-শিল্পী, মিকালেঞ্জালো, লেনার্দো দাভিঞ্চি, রাফায়েল ও আধুনিককালের পিকাসো। অবশ্য দাভিঞ্চির বিশেষত্ব একটু ছিল। অন্য সকলের চেয়ে তিনি যে কত আলাদা, সেইটে প্রমাণ করবার জন্য তিনি ডান এবং বাঁ দুহাতেই সমান স্বচ্ছন্দে লিখতে এবং আঁকতে পারতেন।

লেখার কাজে ডান হাত ও বাঁ হাত সমানভাবে চলে এমন লোক একজনকে আমরা জানতাম, তিনি প্রবাসীর এককালীন সহযোগী সম্পাদক স্বর্গত চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। **Writers' Cramp** রোগ হবার জন্যে ডান হাতে একটানা বেশীক্ষণ লিখতে পারতেন না ব'লে বাঁ হাতে লেখা তিনি অভ্যাস করেছিলেন এবং সব্যসাচীর মত দু'হাতেই পর্য্যায়-ক্রমে লিখতেন। তাঁর লেখা ডান হাতের না বাঁ হাতের বলতে পারবার জন্তে প্রবাসীর সে-সময়কার সহকারী সম্পাদকরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতেন।

আরোহণ সমস্যা

মাথা ঘুরে যাবার মত গল্প একটা শুনুন। হিমালয়ের অন্নপূর্ণা গিরিশিখর বিজয়ী মরিস হার্টজগ ফরাসী দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গিরি-আরোহী ব'লে খ্যাত।

তাঁর একজন ভক্ত সম্প্রতি এক বন্ধুকে লিখে জানিয়েছেন, তাঁর ভক্তির স্রোতে হঠাৎ একটু ভাঁটার টান পড়েছে। কারণ, তিনি জানতে পেরেছেন, হার্টজগের ফ্ল্যাট-বাড়ীতে যখনই আলোর ফ্যুজ

বদলাবার প্রয়োজন হয়, তিনি ফ্ল্যাটগুলির জ্যানিটর, অর্থাৎ খবরদারি করবার লোকটিকে ডেকে পাঠান। সে যতক্ষণ না আসে, বাল্বও বদলানো হয় না, আলোও জ্বলে না ফ্ল্যাটে। বরিস হার্টজগ অন্ধকারেই বসে থাকেন, কেননা মই বেয়ে তিনধাপ উঠলেই তাঁর মাথা ঘুরতে থাকে।

বীরাভরণ

যেসব পুরুষ সাজগোজ করতে ভালবাসেন তাঁরা সবাই যে বীরপদবাচ্য তা মনে করবার কোন কারণ নেই, কিন্তু সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে এইটে দেখা গেছে যে, বীরপুরুষরা প্রায় সময়ই একটু আভরণ-বিলাসী হয়ে থাকেন।

বীরাভরণ

আফ্রিকার মাসাই যোদ্ধাদের জুড়ি সেই মহাদেশে মেলা ভার। এদের দিনের অনেকটা সময় কেবলমাত্র কেশবিন্যাসেই কেটে যায়। এর জন্যে প্রয়োজন হয় লাল মাটি, পুঁথি এবং নানা ধাতব অলঙ্কার। সঙ্গের ছবিটি কোন কেশ-প্রসাধন-সচেতন ললনার নয়, ছবিটি একটি মাসাই যোদ্ধার, বীরত্বে যে অদ্বিতীয়।

হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ফিরিয়ে আনা

হঠাৎ নিস্পন্দ হয়ে যাওয়া হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ফিরিয়ে আনবার জন্যে সম্প্রতিকালের চিকিৎসকরা অস্ত্রোপচার করে পাঁজরার ভিতর হাত চালিয়ে হৃৎপিণ্ড মাসাজ ক'রে কোন কোন ক্ষেত্রে ফল পান, অনেক ক্ষেত্রেই পান না। দেখা গেছে, এত ঝামেলা করবার কোন প্রয়োজনই আসলে নেই। হৃৎপিণ্ডের উপরকার পাঁজরায় খুব জোরে জোরে চাপ দেবার ফল একই হয়, বরং এটা করতে কোন তোড়জোড় দরকার হয় না এবং সময়ের অপচয় হয় না বলে রোগীদের বাঁচবার সম্ভাবনা বাড়ে।

অনেক বিশেষজ্ঞদের মতে এই নূতন পদ্ধতিটি কাজে লাগানো এতই অনায়াস-সাধ্য যে, রেডক্রসের কর্ম্মীদের এবং বয়-স্কাউটদের এটি শেখাবার ব্যবস্থা অবিলম্বে হওয়া উচিত।

ভূমিকম্পে কাঁপবে না

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিয়ে রাশিয়ার বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়াররা, যে কারণেই হোক, বেশী মাথা ঘামাচ্ছেন না ব'লে মনে হয়। কারণ, তাঁদের নানা চমকপ্রদ আবিষ্ক্রিয়া অব্যাহতগতিতে চলছে। কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে তাঁরা তাঁদের পারিপার্শ্বিককে ভুলতে চাইছেন কি ?

সম্প্রতি সে দেশের তুর্কমেনে বড় বড় বাড়ী তৈরী হচ্ছে, দৃঢ়ভিত্তির উপরে নয়, ঘন-সন্নিবিষ্ট সার সার স্প্রিংএর উপরে। রাশিয়ার সে-অঞ্চলে ভূমিকম্প খুব বেশী হয়, আর এই কম্পনের প্রকোপ অনেকটাই এই স্প্রিংগুলিতে অবসিত হয় ব'লে বাড়ীগুলোর কোন ক্ষতি হয় না।

বাড়ীগুলোর আভ্যন্তরীণ জলের পাইপ ইত্যাদিও কতকটা নমনীয় পদার্থ দিয়ে তৈরী হয়, যাতে কম্পনের ফলে তাদের কোথাও ফাট না ধ'রে।

দৃঢ়ভিত্তির উপরে সাধারণ পদ্ধতিতে তৈরী বাড়ীর তুলনায়, এই বিশেষ ধরণের বাড়ীগুলির নির্ম্মাণব্যয় শতকরা পঁচিশ' টাকা বেশী।

পৃথিবীর বৃহত্তম অর্ণবপোত

আমেরিকার এই এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার, অর্থাৎ এরোপ্লেনবাহী জাহাজটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমুদ্রগামী জাহাজ।

এর বিভিন্ন পর্য্যায়ের কর্ম্মচারী ও খালাসীদের সংখ্যা ২,৭০০। এর একশ'টি সংগ্রামী এরোপ্লেন নিয়ে ওড়বার এবং সেগুলোর তত্ত্বাবধায়ক

স্প্রিং ভিত্তির বাড়ী

বৃহত্তম অর্ণবপোত

করবার জন্যে মোতায়েন কর্মীর সংখ্যা ১,৪০০। এই ৪১০০ লোকের পানীয় জলের ব্যবস্থা হয় ২৬৪,০০০ গ্যালন লবণাক্ত সিন্ধুজল জ্বাল দিয়ে বাষ্প করে সেই বাষ্পকে আবার ঠাণ্ডা জলে রূপান্তরিত করে।

এই জাহাজে আছে, পোস্টাফিস, লাইব্রেরি, জুতো মেরামতের দোকান, দর্জির দোকান, কয়েকটি হেয়ার-কাটিং সেলুন অর্থাৎ চুলদাড়ি কামাবার জায়গা, এয়ার কণ্ডিশনিং অর্থাৎ তাপনিয়ন্ত্রণ, টেলিফোন, টেলিভিশন, এমন কি ব্যথা না দিয়ে দাঁত তোলার ব্যবস্থা।

এই জাহাজটির নির্মাণব্যয় ৮০ কোটি টাকা।

স. চ.

তেনারা কি আছেন?

একটি বিশিষ্ট ইংরেজী কাগজে একজন সাংবাদিক লিখছেন:

প্রেতাত্মাদের দুর্নাম আছে যে, তাঁরা খবরের কাগজের সংবাদদাতাদের

যে, আমি ভূত অথবা "ডাপি" কখনই দেখি নি

যতক্ষণ পর্য্যন্ত আরও নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা না দিতে পারি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাকে ভেবে নিতে হচ্ছে যে, "ডাপি" আমাকে দেখেছে এবং আপাতঃদৃষ্টিতে আমার উপস্থিতিতে রাগ করেছে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে যে সকল পুরাণো ভূতুড়ে বাড়ী গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রাকৃতিক বিরূপতার মধ্যেও টিঁকে আছে তাদের এখন সৌখীন হোটেলে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এখানে থাকতে হ'লে দিনে ১৮ পাউণ্ড খরচ করতে হয়। যদিও শনি-রবিবারের ছুটি উপভোগ করার মানসে, যে সকল যাত্রীরা এখানে এরোপ্লেন উড়ে আসেন তাঁরা কোন গম্ভীর প্রকৃতির প্রেতাত্মার ঠিক যোগ্য সঙ্গী নন, তবু না দমে গিয়ে ভূতরা অনতিদূরে এখন এখানকার "কটন উড" গাছগুলিতে বাস করছে।

জামাইকাতে এমন কেউ নেই যিনি বলতে পারেন ভূত কি। কিন্তু সকলেই নিশ্চিত যে, ভূত আছে, এবং তারা শান্তিতে না থাকতে পারলে বিরক্তি দেখায়, এবং যথোপযুক্ত কারণে তারা ব্যবহার ও শ্রদ্ধা চায়।

যখন কোন ভূত গাছের ছোট ডাল ভাঙ্গে, তখন যদি ফিরে না তাকান, তা হ'লে আপনার বড়ই খারাপ সময় আসছে। যদি কোন স্ত্রীলোক স্বামীর মৃত্যুর পরে, লাল পেটিকোট না পরেন তা হ'লে ভূতেরা তাঁকে কোন শান্তি দেবে না। একটি ছেলে নাকি কোনও একটি ভূতের দিকে ঢিল ছোঁড়ার পর একেবারে বোবা বনে গিয়েছিল।

শতাধিক ফিটের বেশী উঁচু এই কটন "উড" গাছগুলি, যে যুগে ক্রীতদাসদের দিয়ে এই দ্বীপের কৃষি প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ চলত, তার রক্তাক্ত ইতিহাসের প্রধান জীবন্ত সাক্ষী।

এদের ডাল হতে বন্দী পলাতকদের দেহ ঝুলত। অপরাধীদের এই বৃক্ষকাণ্ডের উপর চেপে ধ'রে, হাত পা বেঁধে বেত মারা হ'ত, এবং একাধিক বিফল বিদ্রোহের পরিকল্পনা এদের ছায়ায় করা হয়েছে, অথবা ঐ বিদ্রোহীদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে, এইসব স্থানে।

আজকাল এই বিশাল বৃক্ষগুলি শান্তিপূর্ণ কাজে লাগে। এই নির্জন বিশাল শিকড়গুলি প্রণয়ীদের জন্য আড়াল-ভরা আদর্শ মিলন ক্ষেত্র তৈরী করে। কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক নিগ্রো ও ততোধিক অল্পসংখ্যক শ্বেতকায় ব্যক্তিরাই এখানে রাতে এদের কাছাকাছি ঘুরতে সাহস করে।

"ডাপি" একটি অশান্ত দেহমুক্ত আত্মা অথবা নরকাগ্নির অংশ দিয়ে তৈরী পৃথক এক রকমের শয়তান জীব, এই বিষয়টি নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক চলে।

কিন্তু কোন রাশভারী যুবতীকে একটু কাতুকুতু দেওয়া, অথবা অত্যধিক আবেগপ্রবণ পাণিপ্রার্থীর বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে চিমটি কাটা ছাড়া এদের স্থূল জগতের আওতায় আসতে বড় একটা দেখা যায় না।

অবশ্য যদি এদের বৃক্ষের আশ্রয়ে চুপচাপ থাকতে দেওয়া যায় তা হ'লেই। যদি বিরক্ত করা যায় তা হ'লে এরা একেবারে শয়তানে পরিণত হয়।

বেশীর ভাগ দেশেই এই ধরণের "কটন উড"র কোন বিশেষ ব্যবসায়িক মূল্য নেই, কিন্তু জামাইকাতে এরা অধিবাসীদের দুই-তৃতীয়াংশের ঘরবাড়ী তৈরির কাজে লাগে।

এই বিশাল বৃক্ষগুলি এখন কুঠারাঘাতে ভূতলশায়ী হচ্ছে, নিজেদের পাতা-ঘেরা বাসস্থান চ'লে যাওয়াতে ভূতরা এখন নিশ্চয় শুকনো কাঠের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। যে এই বিশেষ কাঠ দিয়ে ঘর বানাবে সেই হতভাগ্য নিগ্রোর কপালে দুঃখ আছে।

আমি এইরূপ ভূতুড়ে পোড়ো ঘরের অনেক গল্প শুনেছি এবং পড়েছি। তাদের ইতিহাস একই রকমের। অনেকদিন শান্তিপূর্ণ অবস্থানের পরে হঠাৎ একদিন কোন বিশেষ কারণবশতঃ নয়, পাথর ছোঁড়া, জানলা ভাঙ্গা, অদৃশ্য জলাধার থেকে মেজেয় জল ফেলা, অদৃশ্য হাত দিয়ে আসবাবপত্র ভাঙ্গা, এসব ঘটে।

প্রথম জায়গাটি যেখানে আমি গিয়েছিলাম সেটি ছিল "স্প্যানিশ টাউন"। এটি সরকারের পুরাণো রাজধানী, বর্ত্তমান রাজধানী কিংস্টন থেকে কয়েক মাইল দূরে। এই বাড়ীটি একটি বাংলো বাড়ী, তিনটি

ঘর। চারিদিক্‌ দিয়ে বড় রকম জনতা একে ঘিরে ছিল। পুলিশ চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিচ্ছিল।

আমি একটি তরুণ দম্পতিকে দেখতে পেলাম, এঁরাই এই বাড়ীটির মালিক।

গৃহকর্ত্রীটি বল্লেন যে, তিনি নিজেই এই বাড়ীটি তৈরী করেছেন, এক বছরেরও বেশী কোন অত্যাচার না সয়ে এখানে আছেন। কিন্তু এক সপ্তাহ আগে একটি পাথর মাঝরাত্রে জানলা দিয়ে ঘরে এসে পড়ে, তার পরের দিন একটা "দামী" ফুলদানী মাটিতে প'ড়ে যায়, তার পর থেকে অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হ'তে থাকে। পাথরের ছোট নুড়ী থেকে পাউণ্ড ওজনের বড় পাথর বাড়ীর উপর ঘণ্টায় ঘণ্টায় পড়তে থাকে-চেয়ার টেবিল, বাড়ীতে ব্যবহৃত তৈজসপত্র সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে কে যেন ফেলতে থাকে। একটি দরজাকে কে যেন কুড়ুল দিয়ে টুকুরো ক'রে দেয়, আর খড়ের চালে দু'বার আগুন লেগে যায়।

বাড়ীটি পরীক্ষা করে দেখা গেল, এঁর গল্পটি সত্য। কিন্তু আমি যতক্ষণ ওখানে ছিলাম, নূতন কিছু ঘটল না। আমি ব্যাপারটিকে সমবেত হিস্টিরিয়া (mass hysteria) ঠিক করে ওইখানেই ছেড়ে দিলাম। কিন্তু "শ্যিফিল্ডে"র বাড়ীটির কাণ্ডকারখানা অত সহজে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

"শ্যিফিল" একটি পার্ব্বত্য গ্রাম, দ্বীপের আরেকদিকে অবস্থিত। আমি বাড়ীটির কথা তিন-চারজন লোক-পরম্পরায় শুনেছিলাম। আমি বাড়ীটির ঠিকানাও জানতাম না। কিন্তু আমার কাছে যে স্ত্রীলোকটির বাড়ী তার নামটা ছিল। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে একটি চাঁদের দোকানের সামনে ঘুমে ঢুলতে দেখলাম। বয়স তার ৮০ বা ৯০ এর মধ্যে, লিখতে অথবা পড়তে জানে না, সংবাদপত্রের সংবাদদাতাদের প্রতি বিশেষ কোন উৎসুক্য সে দেখাল না।

তার কাছ থেকে একটু বাঁধের ঝাঁকানি ও সঙ্গে একটা স্বীকৃতি পাওয়া গেল। তার বাড়ীতে একটা "ডাপি" আছে। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর সে একটু নরম হয়ে বল্ল, তার বাড়ীটি ওই স্থান হ'তে এক মাইল দূরে ও ডান দিকে।

আমি বাড়ীটি খুব সহজেই খুঁজে পেলাম, রাস্তা থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে। পাহাড়ের উপর কাউকে দেখা যাচ্ছিল না এবং এমন কোন জায়গা ছিল না যেখান থেকে আমাকে দেখা যায়। আমি ছ'টা বাঁকা সিঁড়ি দিয়ে উঠে ভিতরে গেলাম।

এই বাড়ীতে খালি দুটো ঘর ছিল, একটি সরু দুই পাল্লাওয়ালা দরজা যার আঙ্কুল নেই, এই দুটো ঘরকে পরস্পর সংযুক্ত করে রেখেছিল।

বাইরের বৃহত্তর ঘরটি একেবারে খালি, এবং এর একমাত্র প্রবেশপথ ছিল এর দরজাটি, যা দিয়ে আমি ঢুকেছিলাম। আরেকটা ঘরে দুটো ছোট জানালা, আর ছিল একটি খোলা আলমারী।

এই অল্পস্বল্প আসবাবপত্র, আমার মতে যেগুলি বড় ঘরে ছিল, সেগুলিকে কে যেন ছোটঘরে ছুঁড়ে ফেলেছে বলে মনে হচ্ছিল।

এই আলমারীতে তিনটি মেহগনি কোণের "ব্র্যাকেট" গুঁজে দেওয়া হয়েছে এবং এগুলির উপরে কাঠ ভেঙ্গে যেতে পারে এতটা জোরের সঙ্গে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে দুটো রান্নাঘরের চেয়ার ও একটি ছোট টেবিল।

আরেকটি বড় গোল টেবিল ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এটার ওপরটা ভেঙ্গে গিয়েছে, একটি খণ্ড ঝুলছে, আর আরেকদিকে একটা উল্টোন লোহার খাটের উপর গদী ফেলা আছে। একটি দেরাজ-আলমারী এর উপরে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। দুটো জানালার চারটে কাঁচের আবরণী ভাঙ্গা আর কতগুলি নানা "সেট" থেকে নেওয়া বাসন-কোসন, কতগুলি মরচে-ধরা ছুরী ও বাঁটা, একটা চূর্ণবিচূর্ণ বাতিদান ও দুটো তাক দরজার পিছন থেকে যেগুলিকে হিঁচড়ে বার করা হয়েছে, আর ভাঙ্গা কাঁচের মধ্যে ফুল আঁকা ছেঁড়া "ওয়াল পেপার"।

একটি জিনিষ, যেটা যথাস্থানে ছিল মনে হচ্ছিল, সেটা হচ্ছে জানালার পাশে একটা পেরেকে আটকান বড় কাঁচি।

আমি পাঁচটি দেখছিলাম, এমন সময়ে আলমারীর ওই জিনিষের গাদা থেকে ছোট টেবিলটি মাটিতে আছড়ে পড়ল। সেটাকে যথেষ্ট সাবধানেই রাখা হয়েছিল বলে মনে হয়েছিল, যখন প্রথম দেখেছিলাম, কিন্তু এখন মনে হ'ল আমি ভুল করেছিলাম। আমি এটাকে জিনিষের গাদার উপরে তুলে রাখছিলাম, এমন সময়ে একটা দেরাজ বিছানা থেকে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। এবার আমার মনে হ'ল, দেরাজ-আলমারীটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আমি সেটাকে হেলান দিয়ে রাখছি, এমন সময়ে ছোট টেবিলটা আবার প'ড়ে গেল। সবচেয়ে বিরক্তিকর জিনিষ হ'ল যে, আমি কোন জিনিষকেই নিজের চোখে পড়তে দেখি নি।

একটা চেয়ার একটু পিছলে গিয়ে আরেকটা চেয়ারের পায়ে আটকে গেল ও বিপজ্জনকভাবে দুলতে লাগল। যেই আমি সেটাকে ছুঁলাম, অমনি দুটোই আমার দুই বাহুর ঘেরের মধ্যে পড়ে গেল। যতক্ষণ আমি নিজেকে ভারমুক্ত করছি ততক্ষণে দেরাজ-আলমারীটা বিছানার পিছনে প'ড়ে গেল। যদিও আমি শপথ করে বলতে পারি যে, গদীটা দেয়ালের সঙ্গে শক্ত করে লাগান ছিল।

আমি ভাবলাম, কেউ বোধ হয় বাড়ীতে লুকিয়ে আছে, কিন্তু খুঁজে কাউকে পাওয়া গেল না। পাড়াতেও লোকজন কেউ ছিল না, এবং বাড়ীটার থেকে কাউকে যদি পালিয়ে চোখের আড়াল হ'তে হয় তা হ'লে তাকে দু'তিন মিনিট দৌড়তে হবে।

যখন আধঘণ্টা ধ'রে আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, তখন আমি চলে যেতে মনস্থ করলাম।

আমার অস্বস্তি লাগছিল এই ভেবে যে, আমি একটু তাড়াতাড়িই হাল ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু আমার ক্ষুধা বোধ হচ্ছিল। যেই আমি রাস্তায় নামলাম অমনি আমার পাশের একটা ঝোপের মধ্যে মস্ত একটা পাথর এসে পড়ল।

এবার আমি মনস্থির করে ফেল্লাম। আমি ভাবলাম ক্ষুধা থাক আর না থাক, আমি এ রকম কাউকে ভাবতে দেব না যে, আমি তাড়া খেয়ে পালাচ্ছি।

আমি বাড়ীতে ঢুকে অন্যরকম একটা ফন্দি বার করলাম; আমি ঘরের মাঝখানে দরজার মধ্যে ঢুকে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম।

অন্ধকার হয়ে এল, যতদূর সম্ভব ভূতটি হাল ছেড়ে দিয়েছে···আমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময়ে ঘুরে দাঁড়াতেই আমার পায়ে একটা টান পড়ল ও কাপড় ছেঁড়ার শব্দ পাওয়া গেল। আমি দেশলাই জ্বালিয়ে নীচে তাকালাম। আমার ডান পায়ের প্যান্টলুনের নীচের দিকের পটির কাপড় ভেদ করে একটা কাঁচির ফলা বাড়ীর নরম কাঠের মেজেয় গভীর ভাবে গেঁথে গিয়েছে।

কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরে, যখন আমি ওই বাড়ীতে ফিরে গেলাম তখন সেই বৃদ্ধাটি আবার বাড়ীতে বাস করছে আর সব চুপচাপ। বৃদ্ধাটি ভূতের আবির্ভাবের আরম্ভ বা শেষের কোনই সঙ্গত কারণ দেখাতে পারল না। খালি বল্ল যে, ভূতটি বোধ হয় কাঠের থেকে নিজেকে মুক্ত করে আবার কোন একটা গাছে ফিরে গিয়েছে।

স্মি

ভাসমান বাসা

মানুষের বাস করবার বাসা ত অনেক রকম হয়; সম্প্রতি একধরণের নূতন বাসস্থান এ ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছে, সেগুলি ভাসমান বাসা। বড় বড় বজরাকে মানুষের বাড়ীঘরে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। রূপান্তরিতও

ঠিক বলা যায় না, কারণ এগুলি পুরণো বজরা নয়, মানুষের বরাবর বাস করবার মত করেই এ গুলিকে তৈরি করা হয়েছে।

তিন ধরণের বজরা এখন পাওয়া যায়। খুব সৌখীন জিনিষ যেগুলি তাদের দাম হল সাড়ে সতেরো শ' পাউণ্ড। এতে একটি বড় শোবার ঘর আছে, ছোট একটি শোবার ঘর আছে। তা ছাড়া স্নানের ঘর, রান্নাঘর ও প্রবেশ পথ স্বরূপ একটি ছোট হল আছে। বসবার ঘরও আছে তাতে দিনে সোফা ও রাত্রে শোবার খাটরূপে ব্যবহার করা যায়, এমন একটি আসবাব আছে। এখানে রেফ্রিজারেটার ও রান্নার ষ্টোভ্ আছে দুরকম। বজরাটিকে এগুলির সাহায্যে উত্তপ্ত রাখা যায় ও গরম জলের ব্যবস্থা সারাক্ষণ করা যায়।

যেটি সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের উপযুক্ত করে গড়া, সেটির দাম সাড়ে তের শ' পাউণ্ড। এতে তিনটি শোবার ঘর আছে, তা ছাড়া স্নানের ঘর ও রান্নাঘর। ঢুকবার ছোট হল এবং বসবার ঘর আছে, বসবার ঘরে সেই আসবাবটিও আছে যেটা দু ভাবে ব্যবহার করা যায়।

সব চেয়ে শস্তা যেগুলি, তার দাম আট শ' পঁচাত্তর পাউণ্ড। এগুলিকে আধা-বোট শ্রেণীর ঘর বলা হয়। এতে একটা বড় শোবার ঘর, স্নানের ঘর ও রান্নাঘর আছে। প্রবেশ পথে ছোট হল ও পূর্ব্বোক্ত আসবাব সহ বসবার ঘরও আছে।

জল সরবরাহ ও জল নিষ্কাসনের ব্যবস্থা উন্নত "কপার পাইপ" দিয়ে করা। গ্যাসের ব্যবস্থা প্রভৃতি আধুনিক। জিনিষপত্র রাখবার মত জায়গা, বজরার সামনে ও পিছনে অনেকখানি করে। অনেকগুলি দেওয়াল আলমারি আছে। কাপড় রাখবার আলমারিও আছে।

তিন ইঞ্চি পুরু ওক্ কাঠের পাটাতনের উপর এই বজরাগুলি নির্ম্মিত। সত্তর ফুট এক একটি পাটাতনের দৈর্ঘ্য।

আমি যা বর্ণনা দিচ্ছি তাতে এই বাসাগুলি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণামাত্র হয়। লণ্ডনে অবস্থিত একটি অফিস এই বাসাগুলি নির্ম্মাণের সব ব্যবস্থা করেন। বজরাগুলি তৈরি হয় "সরে"র "ব্যাসিংষ্টোক", খালে।

এই খালে যদি কেউ বজরা সারাবছর রাখতে চান তাঁকে বাৎসরিক চল্লিশ পাউণ্ড হিসাবে ভাড়া দিতে হয়। এই ভাড়ায় খালের ধারে খানিকটা করে বাগান করবার জমিও পাওয়া যায়। আবর্জ্জনা পরিষ্কার করে নিয়ে যাওয়ার জন্ত বৎসরে দুই পাউণ্ড দিতে হয়। যদি বাসিন্দা চান, তাহলে বজরাতে জল ও বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

অবশ্য জলে বাসা বাঁধা জিনিষটা নূতন কিছু নয়। অনেক বড় নৌকাকেই বসতবাড়ীতে রূপান্তরিত করা বহুকাল থেকেই চলে আসছে। তবে বরাবর বাস করার জন্যই তৈরি করা ভাসমান গৃহগুলিকে অনেকেই বেশী পছন্দ করবেন বলে মনে হয়।

আজকাল খালি বাড়ী বা খালি ফ্ল্যাট পাওয়া অনেক টাকা খরচের ব্যাপার। শীঘ্র যে এগুলি একটু সুলভ হবে, তার বিন্দুমাত্রও লক্ষণ দেখা যায় না। এই জন্য মনে হয় এই ভাসমান গৃহগুলি লোকের কাছে আকর্ষণের বিষয়ই হবে।

সী

রঙের চিকিৎসা

ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল ছিলেন অসাধারণ মানুষ। শুধু সেবিকা সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাত্রী বলে নয়, আজকালকার বহু ব্যবহৃত একটি চিকিৎসা-পদ্ধতিরও আবিষ্কর্ত্রী তাঁকে বলা যায়। এটি হচ্ছে বিভিন্ন রঙের সাহায্যে চিকিৎসা। এ চিকিৎসা নানা স্থানে চলে, যেমন হাসপাতাল, নার্সিং হোম, বিকৃত মস্তিষ্কদের চিকিৎসাগার, এমন কি সাধারণ অপরাধীদের যেখানে রাখা হয়, সে সব জায়গায়ও। ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল বলেছিলেন, "রোগশয্যায়, সুন্দর জিনিষের, বিশেষ ক'রে উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট জিনিষের প্রভাব যে কতখানি, তা অনেকেরই সম্যক্ বোধগম্য হয় না। নানা আকৃতির ও নানা উজ্জ্বল রঙের জিনিষ রোগীর সামনে উপস্থিত করলে তার সুস্থ হয়ে ওঠার খুবই সাহায্য হয়।"

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাড্রিয়ান হিল্ অসুস্থ হয়ে মিড্ হৃষ্টের 'কিং এডওয়ার্ড দি সেভেন্থ' হাসপাতালে ছিলেন। এক বন্ধু সর্ব্বদা তাঁর বিছানার পাশে সুন্দর রঙের ফুলের গোছা সাজিয়ে রাখতেন। এই ফুলগুলি ক্রমাগত দেখে দেখে শিল্পী অ্যাড্রিয়ানের হঠাৎ আঁকবার প্রেরণা এসে গেল। সুন্দর একটি ফুলের কুঁড়ি আঁকলেন তিনি। আরোগ্যের পথে এই তাঁর প্রথম পদক্ষেপ। ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল যা অনেক দিন আগে আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি তা নূতন ক'রে আবিষ্কার করলেন।

কিছুদিন পরে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে তিনি একখানি বই লেখেন, সেটির নাম "আর্টের সাহায্যে নীরোগ হওয়া।" এর পর থেকে রঙের সাহায্যে লোককে নীরোগ করার চেষ্টায় তিনি অনেক সময় ব্যয় করতে লাগলেন।

রঙ কি ক'রে শারীরিক বা মানসিক রোগ সারাতে পারে এ একটা জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন বটে।

এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলেন রঙ মানুষকে অনুপ্রাণিত করে, দেহে মনে উত্তেজনার সঞ্চার করে। রঙ অবশ্য দেহ-মনকে নিস্তেজও ক'রে ফেলতে পারে। ধরুন একটা ঘরের চারটা দেওয়ালই যদি গাঢ় নীল রঙের হয়, তবে সেটাকে দেখলে দর্শকের মন অপ্রফুল্ল ও নিস্তেজ হয়ে যাবে, মন খারাপ হবে। হয়ত এ বিষয়ে তিনি খুব সচেতন না-ও থাকতে পারেন, কিন্তু মনের উপর এই রকম ক্রিয়াই হবে। আবার ঘরখানি যদি টাটকা মাখনের রঙে মণ্ডিত হয় তা হ'লে দর্শকের মন প্রফুল্ল হবে, তিনি খুব সুস্থ বোধ করবেন।

কেন এ রকম হয়? গাঢ় নীল রঙ কি দ্রষ্টার অজ্ঞাতসারেই মহাশূন্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়? আবার মাখনের উজ্জ্বল রঙ কি প্রথম আলোর কথা মনে পড়িয়ে দেয়? তা হ'তে পারে বটে। আমাদের জ্ঞাতসারে না হলেও আমাদের মন সর্ব্বদাই এই রঙের লীলায় সাড়া দেয়। বিজ্ঞানেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দলে দলে সৈন্যরা যখন দেশে ফিরতে লাগল তখন বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা এই প্রত্যাবর্ত্তনের জন্ত তৈরি হতে লাগলেন। তাঁদের প্রধান সমস্যা হ'ল যে, যুদ্ধ-ফেরত মানুষগুলিকে কি রঙের কাপড় দিলে তারা খুশী হবে। তাঁরা লীড্স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের বস্ত্র-বিভাগের অধ্যাপকের কাছে নিজেদের সমস্যা নিয়ে হাজির হলেন। তিনি বললেন, নীল রঙটা ভাল চলবে এবং কার্য্যতও দেখা গেল যে, গৃহ-প্রত্যাগত যোদ্ধার দল বেশীর ভাগই নীল রঙ পছন্দ করল। এটা হ'ল কেন? বিশেষজ্ঞ বললেন, এটা ত সোজা কথা। যে-সব মানুষ একটা রঙ অতিরিক্ত রকম ব্যবহার করেছে তারা সহজেই তার পরিপূরক রঙের দিকে ঝুঁকে পড়ে। সৈনিকরা খাকী রঙটা পরে, সেটা হলদের কাছাকাছি একটা রঙ, কাজেই বদলাতে বললে তারা নীল রঙটাই পছন্দ করে।

রঙের সাহায্যে নিজে যে বরলাভ করেছিলেন অ্যাড্রিয়ান হিল, তা

তিনি এখন অপরকে দান করতে আরম্ভ করলেন। এইভাবে রঙের সাহায্যে চিকিৎসা আরম্ভ হ'ল। হিলের প্রবর্ত্তিত প্রথায় এখন হাসপাতালে ও উন্মাদাগারে চিকিৎসা চালানো হয়।

দিন দিন অভিজ্ঞতা যত বাড়তে লাগল ততই মানুষের সঙ্গে রঙের সম্পর্কে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হতে লাগল। যেমন, সবুজ রঙটা মানুষের মনে স্নিগ্ধতার স্পর্শ দেয়। আমরা যখন ইঁট-কাঠের রাজ্য ছেড়ে মাঠে বা বনে যাই তখন এই সবুজ রঙই আমাদের মনে প্রফুল্লতার প্লাবন আনে। কিন্তু সবুজ বর্ণও যত খুশি যেখানে সেখানে লাগান চলবে না। খুব দুর্ব্বল রোগী গাঢ় সবুজ বেশী সহ্য করতে পারে না, হলদেটাও খুব বেশী পারে না। দুর্ব্বল অবস্থায় এই রঙগুলির ক্রিয়া হয়, খুব ভাল ওষুধ অত্যধিক পরিমাণে খাইয়ে দেওয়ার মত।

যখন রঙের সাহায্যে চিকিৎসা হয় তখন রোগী নিষ্ক্রিয়ও থাকে, সক্রিয়ও থাকে। তাকে খুব নামকরা ভাল ছবির নকল দেখান হয়, তাকে নিজে ছবি আঁকতেও বলা হয়। অনেক রোগীর এইরকম ক'রে হাত খুলে গেছে, তারা জলে গোলা রং দিয়ে ছবি এঁকেছে, রঙীন খড়ি দিয়েও এঁকেছে। নিজেরাও বিস্মিত হয়েছে। বন্ধুদেরও বিস্মিত করেছে। প্রতিদিন এই ধরণের শিল্পচর্চ্চা করায়, শরীরের সর্ব্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আবার স্বাস্থ্যের স্রোত এসেছে, ব্যাধির দিক্ থেকে মুখ ফিরিয়েছে। নিজের রচিত জিনিষ খুব উঁচু দরের না হলেও এর ব্যাঘাত হয় না।

মানসিক রোগগ্রস্তদের চিকিৎসায় রঙ দু'রকম কাজ দেয়। রোগী নিজের মনের সব কল্পনা, ভাবনা, ভাবোচ্ছ্বাস তুলির ভিতর দিয়ে বাইরে প্রকাশ ক'রে নিজের চিত্তকে হাল্কা ক'রে ফেলে, আবার এই ছবিগুলির সাহায্যে মনস্তাত্ত্বিক রোগীর মনকে ভালভাবে বোঝেন, রোগের বীজও অনেক সময় ধরা পড়ে। একজন রোগী সর্ব্বদা সূর্য্যকে কালো রঙে আঁকত। সূর্য্যের উজ্জ্বল আলো এই ব্যক্তির স্তিমিত মনে যেন ধরাই পড়ত না। আর একজন ছবি আঁকত খালি সুরক্ষিত স্থানের। লেখককে এঁর আঁকা একখানি ছবি দেখান হয়। একটি খামার বাড়ীর ছবি। বাড়ীর চারদিকে গোল ক'রে গাছের সার বসানো, চারদিক্ প্রাচীর এবং খাল দিয়ে সুরক্ষিত। এই রোগীটি সারাক্ষণ সন্ত্রস্ত, সে সারাক্ষণ নিজেকে নিরাপদে রাখতে চায়, কাজেই ছবিগুলি এই ধরণের।

মানসিক রোগীদের একটি হাসপাতাল দেখতে চলুন। ঘুরতে ঘুরতে একটি উজ্জ্বল বর্ণে সজ্জিত ঘরে এসে দেখবেন, সেখানে অনেকগুলি মহিলা ব'সে নানারকম কাজ করছেন। একজন কোণে বসে ছবি আঁকছেন। সঙ্গের ডাক্তারটি হয়ত বললেন, "উনি কি আঁকছেন দেখবার চেষ্টা করবেন না, উনি কাউকে দেখতে দেন না। তাঁর ছবিগুলি যদি আমরা দেখতে পেতাম ত তাঁর বিষয়ে কিছু জানা যেত। কিন্তু দেখতে না দিলেও এই ছবি আঁকার কাজে ব্যস্ত থাকায় তিনি আর আগের মত রাগারাগি মারামারি করেন না।"

ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ আর্ল হেগ একবার উত্তর আফ্রিকায় শত্রুর হাতে বন্দী হন। তিনি বলেন, "আমাকে একটা তারের বেড়া দেওয়া জায়গায় রেখেছিল। আমি মুক্ত প্রকৃতির বুকে থাকতে অভ্যস্ত, আমার নিজেকে অতি উৎপীড়িত ও আশাহীন লাগত। আমি সৌভাগ্যক্রমে একটা উপায় খুঁজে পেলাম, যাতে এই বন্দীশালার ভীষণতা কমে গেল। রোজ দুঘণ্টা ক'রে আমি ছবি আঁকতাম, এবং সর্ব্বদাই অনেকটা স্বস্তি অনুভব করতাম।"

স্বদেশে ফিরে এসে লর্ড হেগ্ নিজের এই তিক্ত অভিজ্ঞতা ভুলে যান নি। ছবি আঁকার সাহায্যে নৈরাশ্য জয় করার কথা তাঁর মনে ছিল। তিনি শুনলেন দেশে ছবি আঁকার সাহায্যে রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা কিরকম হচ্ছে এবং মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন যে, এই চিকিৎসা পদ্ধতিটি সাধারণ জেলখানাগুলিতে চালু করা যায় কি না।

তিনি শুনলেন অল্পবয়স্ক অপরাধীদের জন্যে 'ল্যাচ্‌মিয়ার রিসেপশন্ সেণ্টারে' এই ব্যবস্থার প্রচলন হচ্ছে এবং বয়স্কদের জন্যেও মেড্‌ষ্টোন জেলখানায় এটা অবলম্বন করা হচ্ছে। অল্পবয়স্কদের ছবিগুলি বেশ তাৎপর্য্যপূর্ণ। এই ছেলেগুলিকে নানাভাবে বিভক্ত ক'রে রাখার সুবিধা হ'ল এর থেকে। তাদের বিভিন্ন ধরণের আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ সুখ সব চিকিৎসকের চোখে ধরা পড়ল। বহির্মুখী মনের অধিকারী-গুলির যৌনচেতনা বেশী, হিংসাত্মক ভাবও বেশী। অন্তর্মুখীগুলি অতি বিষাদগ্রস্ত। তারা বেশীর ভাগই জাহাজডুবি প্রভৃতি ধ্বংসমূলক ছবি আঁকত এবং কবরের ছবি আঁকত।

এখন এটা সুপ্রমাণিত হয়েছে যে, কোন প্রকারের রোগীকেই ছবি আঁকার কাজে নিয়োজিত করলে সুফল একটা ফলেই। এবং এই হতভাগাদের যারা সাহায্য করতে চায়, তাদেরও সাহায্য হয়।

সী.

বামপন্থী

ইংলণ্ডের রাজমাতা এলিজাবেথের একটি সম্প্রতি তোলা ছবি দেখে দর্শকদের ভিতর শতকরা দশজন অন্ততঃ খুব ঔৎসুক্য অনুভব

বামপন্থী এলিজাবেথ

করবেন। কেন বলতে পারেন? কারণ রাজমাতা খুব নিশ্চিন্তভাবে বিলিয়ার্ড টেবিলে বল চালাচ্ছেন একটি লাঠির সাহায্যে এবং লাঠিটি তিনি ধরেছেন বাঁ হাত দিয়ে।

শুধু রাজমাতা এলিজাবেথ নয়, পৃথিবীতে আরো অন্ততঃ ত্রিশ কোটি লোক বাস করে, যারা বাঁ হাতে কাজ করে। এতে অসুবিধা আছে বৈ কি? খুব কষ্ট করেই তাদের দরজার হাতল ঘোরাতে হয়, জামার বোতাম লাগাতে হয়। যন্ত্রপাতি ব্যবহার, কাঁচি চালান, বাজনা বাজান, টেলিফোন ধরা, কর্কস্ক্রু ব্যবহার করা, খাবারের টিন খোলা,

কোন্‌টাই বা সোজা? সবগুলিই ডান হাতে ধ'রে ব্যবহার করবার মত করে তৈরী।

তবে সম্প্রতি বাম-পন্থীরা একটু সুবিধা পেয়েছে। আগেকার কালে কোন ছেলে বা মেয়ে বাঁ হাতে কাজ করবার চেষ্টা করেছে দেখলেই বাবা মা গর্জ্জন করে উঠতেন, "এই খবরদার! ডান হাত ব্যবহার কর নইলে দেখবে মজা।" ফলে ছেলেমেয়ের ছু হাতের কাজই থেমে যেত এবং তারা রেগে গর্ গর্ করতে থাকত।

আজকাল মনস্তাত্ত্বিক ও ডাক্তাররা বাবা-মাকে সাবধান করে দিয়েছেন। এখন ছেলে বাঁ হাতে কাজ করছে দেখলে তাঁরা আর ছেলেকে ঘাঁটান না। এখনকার অভিমত হচ্ছে, "যদি বাঁ হাতেই কাজ করবে ত ভাল ভাবেই কর।"

শতাব্দীখানিক আগে এই সব ছেলেমেয়েদের জন্যে যে বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে, তা কেউ মনেই করত না। সামান্য চেষ্টা হয়ত কখনও-সখনও হয়ে থাকবে। দাড়ি কামাবার জন্য "শেভিং মগ" অনেক তৈরী হয়েছিল যা বাঁ হাতে ধরা সহজ। হাতলের ডান দিকে একটা ছোট আয়না লাগান।

বাঁ হাতে কাজ করে এমন লোক আমেরিকায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ আন্দাজ আছে। এদের জন্যে আজকাল ব্যবসায়ীরা বিশেষভাবে তৈরী কাঁচি, বেসবল খেলার দস্তানা, কাস্তে, রিফ্রিজারেটার, ছুরি, গল্ফ খেলার 'ক্লব', বঁড়শি, ক্রিকেট বল প্রভৃতি অসংখ্য জিনিষ বাজারে ছাড়ছেন।

বছর ১৫।১৬ আগে, অর্থাৎ ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে, নিউইয়র্কের Trade Bank & Trust কোম্পানী কতকগুলি নূতন ধরণে ছাপা চেক্‌বুক বার করেছিলেন। যে দিকে যেটি থাকলে বাঁ হাতে লেখা সহজ হয় এটি সেই ভাবেই ছাপা।

বাঁ হাতে লেখার মুশকিল হচ্ছে এই যে, লেখক যা লিখলেন, তারই উপর দিয়ে তাঁর হাতটা টেনে ডান দিকে নিয়ে যেতে হয় এতে লেখা ধেবড়ে যাবার সম্ভাবনা। ডান হাতে যারা লেখে তাদের এ অসুবিধা নেই। তা ছাড়া বাঁ হাতে যিনি লিখবেন তিনি শেষে কি লিখেছেন তা সহজে পড়তে পারবেন না, কেননা হাতটা সে লেখা আড়াল করে রাখবে। অবশ্য তিনি কলমটা খানিকটা উঁচু ক'রে যদি ধরেন তবে কিছু সুবিধা হয়। কাগজ কি ভাবে সাজাবেন, কলম কেমন করে ধরবেন এ সবের অনেকরকম নির্দ্দেশ আছে যা মেনে চললে লেখা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়।

বাঁ হাত দিয়ে কাজ করাটাকে আপাতদৃষ্টিতে একটা দারুণ অসুবিধা বোধ হতে পারে। কিন্তু এটাকেও একটা বড় সুবিধায় পরিণত হতে দেখা গিয়েছে। গল্ফ খেলোয়াড়দের মধ্যে "বেঁয়ো" এডওয়ার্ড আর. মরো খুব নাম করেছিলেন, তাঁর জুড়ি মেলা ভার ছিল। বেসবল খেলোয়াড়দের মধ্যেও "বাম-পন্থী" বেবরুথ, লেফটি গ্রোভ্, ষ্ট্যান মিউসিয়াল, জনি পোড্রেস, প্রভৃতির নাম চিরস্মরণীয়।

বৈজ্ঞানিকরা এখনও বলতে পারেন না যে, এই বিশেষত্বটি বংশ-পরম্পরায় মানুষ লাভ করে না পরিবেশের ফলে অর্জ্জন করে। অনেকেই মনে করেন যে, দুইয়ের মিশ্রণে এর উদ্ভব হয়। অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, বাবা-মা দু'জনেই "বেঁয়ো" হলে ছেলেমেয়েদের অর্দ্ধেকগুলি অন্ততঃ এই দোষদুষ্ট হয়। যদি জনক-জননীর একজনের এই দোষ থাকে, তা হ'লে ছ'জন ছেলেমেয়ের ভিতর একজন "বেঁয়ো" হতে পারে। বাবা, মা দুজনেই স্বাভাবিক হলেও ষোলজন সন্তানের মধ্যে একজনের এই দোষ থাকতে পারে।

একটি ব্যাপার লক্ষ্য করলে বংশানুক্রমিক 'বাম-পন্থী' হবার সম্ভাবনাটা যেন অনেকটা দুর্ব্বল হয়ে যায়। একেবারে একরকম দেখতে যে সব যমজ সন্তান হয় তার ১০০ ভাগের কুড়িভাগ হয় একজন ডান হাতব্যবহারী ও অপরজন বাম হাতব্যবহারী। একই ভ্রূণ দুভাগে বিভক্ত হয়ে এদের জন্ম, তবে এরা দুজনে দুরকম হয় কেন? এতে ত মনে হয় ব্যাপারটা বংশানুক্রমিক নয়। আর একটা জিনিষের মানে বোঝা যায় না, যে পরিমাণ মেয়ে বাঁ হাতে কাজ করে, তার দ্বিগুণ সংখ্যক ছেলের এই বিশেষত্ব আছে।

ডাক্তাররা অনেকদিন থেকেই জানেন যে, অনেক লোকে একটা চোখ বা একটা পা অন্যটার চেয়ে বেশী ব্যবহার করতে ভালবাসে। চোয়ালের একদিকের দাঁত অন্যদিকের দাঁতের চেয়ে ব্যবহারে তার সুবিধা। যে দিকের চোখ বা দাঁত, তার উল্টো দিকের মস্তিষ্কের ভাগ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন বাঁ হাতকে আদেশ দেয় মস্তিষ্কের দক্ষিণ ভাগ। মস্তিষ্কের যে ভাগ মানুষের কথাবার্ত্তা বলার আদেশ দেয়, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা করার ব্যবস্থাও সেই ভাগে, দু'টি খুব কাছাকাছি। এর থেকে একটা ধারণা হয়েছে যে, মানুষকে জোর ক'রে কোন একটা বিশেষ হাত দিয়ে কাজ করালে, তার কথাবার্ত্তাও জড়িয়ে যায়।

এটার অবশ্য কোন প্রমাণ নেই যে, এরকম জোর খাটালে ছেলে তোত্‌লামি করবে। কুকুর-বেড়ালকে বিরক্ত করলে তার এ দোষ হওয়ার যতটা সম্ভাবনা, এতেও তাই। মনস্তাত্ত্বিকরা বলেন যে, ভাবপ্রবণ ছেলেপিলেকে কখনও জোর করে কিছু করান উচিত নয়। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে করাও, কিন্তু জোর খাটিও না।

একটা ব্যাপার একটু গোলমেলে ঠেকে। সদ্যজাত শিশুগুলি দুই হাতই সমানভাবে ব্যবহার করে। যে হাতের কাছে ধরবার জিনিষটা থাকে সেই হাত দিয়েই ধরে। ডান হাত ব্যবহার করাটাই যাতে তার অভ্যাস হয়, এই শিক্ষা দেবার জন্যে তার দরকারী জিনিষপত্র সবই তার ডান হাতের কাছে রেখে দেওয়া উচিত।

ছ'মাস থেকে এক বছরের মধ্যেই বোঝা যায় যে, শিশু কোন্ হাতটা ব্যবহার করা পছন্দ করছে। বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েই তিন থেকে সাত বছর বয়সের মধ্যে এটা পাকাপাকি রকম ঠিক করে নেয়।

ছেলে বেশ বড় হয়ে উঠেছে অথচ কোন্ হাতের উপর তার আস্থা বেশী তা সে ঠিক করতে পারছে না, এমনটি যদি হয়, তা হ'লে নিকটতম মনস্তাত্ত্বিক ডাক্তারের বাড়ী তাকে নিয়ে যাওয়া ভাল। তিনি পরীক্ষা করে ঠিক বলতে পারবেন, কোন্ হাতটা তার বেশী ব্যবহারযোগ্য।

যদি ছেলেটির বাঁ হাত দিয়ে কাজ করার ঝোঁক খুব বেশী মনে না হয়, তা হ'লে সহজেই তাকে উৎসাহ দিয়ে ডান হাত ব্যবহার করার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া যায়। যদি প্রকৃতি দেবী তাকে সত্যসত্যই 'বাম-পন্থী' করে থাকেন, তবে সেই হাত ব্যবহারেই সে সুদক্ষ হোক।

এর ভিতর সান্ত্বনার কথা অনেক আছে। Wisconsin University-তে গবেষণা করে দেখা গেছে যে, যারা ডান হাত চালায় তাদের চেয়ে বাঁ হাত চালিয়ে যারা তারা দ্রুততর বেগে কাজ করে। জন্তু-জগতে অনেক জানোয়ারই বাঁ থাবা দিয়ে কাজ করে। অনেকে আছে যাদের দক্ষিণ-বাম প্রভেদ নেই, দুটোতেই সমান ভাবে কাজ করে।
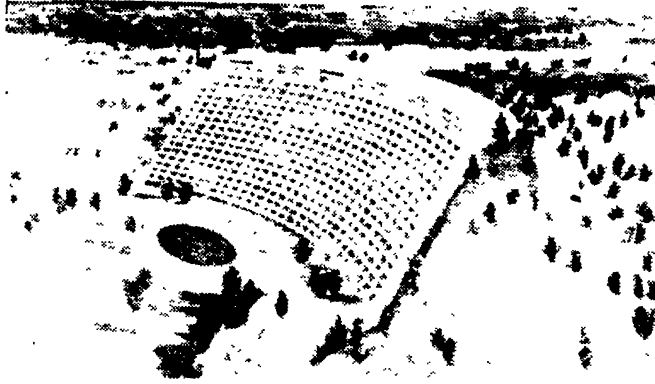
বিচিত্র হোটেল

প্রথম কখন যে বাঁ দিকটা সম্বন্ধে মানুষের আপত্তি বোধ হ'ল তা বলা যায় না, সেটা ইতিহাসের গর্ভে নিহিত। গ্রীকরা বাঁ দিক থেকে বজ্রধ্বনি শুনলে সেটাকে কুলক্ষণ ভাবত। কলম্বস সমুদ্রযাত্রা করার সময় গুয়াটিমালার লোকরা এক ভবিষ্যৎবক্তার পা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল। সে ব্যক্তি দুটো পা সজোরে ঘসত, যদি ডান পা-টা কাঁপত তা হ'লে লক্ষণ ভাল, বাঁ পা কাঁপলে অমঙ্গল-চিহ্ন।

আফ্রিকায় অনেক উপজাতির মধ্যে মেয়েদের ডান হাত দিয়ে রান্না করা নিয়ম। বিয়ের আংটি বাঁ হাতে পরার নিয়মটা বোধ হয় ভূত-প্রেতের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে।

বাঁ হাত দিয়ে কাজ ক'রে অতি যশস্বী হয়েছেন, এমন অনেক লোকের নাম ক্রমেই জানা যাচ্ছে। আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট্ থেকে রাণীমাতা এলিজাবেথ পর্য্যন্ত। কাজেই এতে আর লজ্জা পাবার এখন আছে কি?

সী.

বিচিত্র হোটেল

গ্রাণ্ড ক্যানিয়নের দক্ষিণ পাড়ে একটি ১৮ তলা ৬০০টি ঘর-বিশিষ্ট বিচিত্র হোটেল আছে। ছবিটা থেকে আন্দাজ করা যাচ্ছে যে, হোটেলটি ক্যানিয়নের একদম গা ঘেঁসে রয়েছে এবং প্রত্যেক তলাটা সিঁড়ির ধাপের মত পরের পর ঢোকান। এই বিচিত্র হোটেলের প্রবেশ পথটি আরও বিচিত্র। এর প্রবেশ পথ হ'ল একদম মাথার ওপরে। নীচে আবার একটা সুইমিংপুলও আছে।

গরিলারা আর কতদিন থাকবে?

আফ্রিকার বন্যজন্তু-সংরক্ষক সমিতির সর্ব্বপ্রধান কাজ হ'ল, ওখানকার পার্ব্বত্য অঞ্চলে এখনও যে শ' পাঁচেক গরিলা আছে তাদের রক্ষা করা। উইটওয়াটার স্ট্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ রেমণ্ড ডার্ট-এর মতে এই গরিলারা এখন আর ততটা হিংস্র নেই, যতটা লোকে মনে করে।

গরিলারা যে সব সময়ই হিংস্র হয় না, মাঝে মাঝে বন্ধুও হয়, তার একটা উদাহরণও এই অধ্যাপক মহাশয় দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, উগাণ্ডার একটি গরিলা-প্রধান জায়গায় রিউবেন নামে একজন গাইডকে তিনি জানেন যে, যখনই কোন হিংস্র গরিলার সামনে পড়ে, তখনই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। তার পর জানোয়ারটি আক্রমণ অথবা গর্জ্জন করা পর্য্যন্ত সে অপেক্ষা করতে থাকে। তাদের চোখের দিকে সে সোজাসুজি তাকিয়ে থাকে। তার মতে এদের তর্জ্জন-গর্জ্জন সবই অসার। তার পর দেখা যায়, তারা সত্যিই আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে যায় এবং সেখান থেকে চলে যায়।

এমন অনেক বন্যজন্তু দেখা গেছে, যারা শত্রুপক্ষের কাছ থেকে আঘাতপ্রাপ্ত না হ'লে অনেক সময় বন্ধুত্বেও পরিণত হয়।

পার্ক এ্যালবার্ট, রুয়াণ্ডা, এই সব জায়গায় একজাতীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন পাহাড়ী লোক বাস করে। তাদের কাছে গরিলাদের জীবন খুবই বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে।

এইখানে ওয়াটুসি নামে একজাতীয় লোক বাস করে যারা গবাদি পশুর উপাসক। তাদের দেশে যার যত বেশী গবাদি পশু আছে (তা সুস্থ বা অসুস্থ, যাই হোক) সে তত বড় লোক। দিনের পর দিন খেতে না পেলেও এরা এই গবাদি পশুদের মারে না।

এই পাহাড়ী অঞ্চলে ১০ হাজার ফুট উঁচু পর্য্যন্ত জায়গা সম্পূর্ণ ভাবে গরিলাদের নিজেদের ছিল। কিন্তু এখন সেই সব জায়গায় এই গবাদি পশুরা অবাধে বিচরণ করে আর সেই জায়গার ঘাস খেয়েই এরা বেঁচে থাকে। এই ভাবে তারা ঘাস খেতে খেতে উপরের দিকে উঠতে থাকে। ক্রমে ঘাস নিঃশেষ হয়ে যায় আর মাটির বড় বড় ঢিবি বেরিয়ে পড়ে। এই ভাবে এমন একদিন আসবে যেদিন এই রুয়াণ্ডা গরিলাদের আর থাকার জায়গা বা খাবার কিছুই থাকবে না। ফলে তাদের সংখ্যাও ক্রমে ক্রমে কমে আসবে। সত্যিই কি এমন কোনদিন আসবে যেদিন এই পৃথিবী থেকে গরিলা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে?

মাছ ধরার জালে কি শুধু মাছই ওঠে?

জেলেদের মাছ ধরার জালে যে সব সময়ই মাছ ওঠে তার কোন নিশ্চয়তা নেই; অনেক সময় তাদের জালে অনেক অদ্ভুত জিনিষও উঠে থাকে। অনেক সময় দেখা গেছে যে বড় বড় কাপড়জামা রাখার আলমারি পর্য্যন্ত তাতে উঠে এসেছে।

একবার ব্রিটেনে দুটো মাছ ধরার নৌকা পরস্পরের প্রায় ২০০ মাইল তফাতে থেকে মাছ ধরছিল। এদের জালে যা উঠেছিল, তার থেকে বেশী আশ্চর্য্যজনক কিছু মাছ ধরার জালে উঠতে পারে বলে আমার মনে হয় না।

প্রথম নৌকাটি, যেটি কর্ণওয়ালের কাছে নিউকেতে মাছ ধরছিল, তার জালে ওঠে এক হাঙরের মাথা। আর দু'দিন পরে দ্বিতীয় নৌকাটি, যেটি ফ্ল্যামবরোহেডে মাছ ধরছিল, তার জালে একটি হাঙরের মস্তক-বিচ্ছিন্ন দেহ ধরা পড়ে।

অনেকে হয়ত ভাবছেন যে, একই হাঙরের মাথা আর শরীর দুই নৌকায় ধরা পড়ল। কিন্তু সত্যিই তা হয় নি। এই অংশ দুটি, দু'টি আলাদা আলাদা হাঙরের।

স্পেনদেশীয় ক্রুশো

সিরানো নামে এক হতভাগ্য লোক একবার জাহাজডুবি হওয়ায়, ভাসতে ভাসতে একটা দ্বীপে গিয়ে পৌঁছয়। সম্পূর্ণ অনুর্ব্বর এই দেশে, জল, শস্য কোন জিনিষই মিলত না। তার কোন কাপড়-জামা ছিল না আর প্রখর সূর্য্যকিরণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার মতও সে কিছু খুঁজে পেত না। সমুদ্রের কচ্ছপ, ঝিনুকের শাঁস, আর ছোট ছোট চিংড়ি মাছ ছাড়া আর কিছুই সে খেতে পেত না। তার পানীয় ছিল বৃষ্টির জল আর কচ্ছপের রক্ত। এই ভাবে সে তিনটে বছর সেখানে একলাই কাটিয়ে দিল।

তার পর একদিন সে দেখল তারই মত একজন একটা তক্তায় ক'রে ভাসতে ভাসতে সেখানে এসে পৌঁছল। তারা তখন পরস্পরকে দেখে শয়তান বলে ভাবতে আরম্ভ করল। সিরানোর মনে হ'ল যে, ওই লোকটা যমের চর হয়ে তাকে প্রলুব্ধ করতে এসেছে। ওদিকে নতুন লোকটা সিরানোকে দেখে মনে করল যে, স্বয়ং যমই বুঝি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার পর সেই লোকটা চীৎকার করে যীশুর নাম করাতে সিরানো নিশ্চিন্ত হ'ল।

একদিন দেখা গেল একটা জাহাজ তাদের দিকে আসছে। তখন তারা এই লোকদের উদ্দেশে তাদের গোত্র ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে চীৎকার করে বলতে আরম্ভ করল।

তার পর সিরানোকে স্পেন দেশে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকে সে জার্ম্মানীতে যায় পঞ্চম চার্লস-এর সঙ্গে দেখা করতে। তখনও তার চুল, দাড়ি আগের মতই বড় বড় ছিল। সেই রাজসভায় সে রীতিমত একটা দ্রষ্টব্য জিনিষ হ'ল। সম্রাট তাকে বাৎসরিক কিছু টাকা বৃত্তিস্বরূপ দান করেন। কিন্তু হতভাগ্য সিরানো এই সুখ ভোগ করার আগেই মারা যায়।

স. না.

—০*০—

সত্য ঘটনা নয়

শ্রীবাণী রায়

খেটে-খাওয়া মেয়েটি উত্তেজিত হয়ে বলে চলল, "কি আর বলি আপনাকে? জানপ্রাণ যে কতবার বিপন্ন হতে গিয়েছে এই সামান্য সখটুকু রাখতে, বলা যায় না। আপনার লিখিয়ে বলে নাম হয়েছে, অফিসের স্যুভেনিরে লেখা চাইতে এলাম, মুখের ওপর 'না' বলে দিলেন ত! কিন্তু আমাদের কাছে কখন লোক ডাকতে আসবে সেই আশায় দোর খুলে রাখতে হয়। নিজে বয়ে নিয়ে যাই গীটারটা অনেক জায়গায়। গাড়ীটাও দেয় না।"

আমি মুখ খোলবার চেষ্টা করা মাত্র মেয়েটি পুনরায় উত্তেজিত কণ্ঠে বলে চলল, "জানি, আপনি কি বলতে চাইছেন। বলবেন, 'তবে যাওয়া কেন?' এই ত? ওই যে ষ্টেজে উঠে মাইকের সামনে বসে একটু চান্স পাব। নামটা বলে দেবে, শেষ হলে হাততালি পড়বে; এর লোভ ছাড়া আমাদের মত মানুষের পক্ষে সহজ নয়। রূপ নেই, গুণ প্রবেশিকা পাস। অর্থের ঘরে শূন্য। অতিকষ্টে টাকা জমিয়ে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গীটারটি কিনেছি। পাড়ার গানের স্কুলে শিখেছি প্রাণ দিয়ে, যদি কেউ ডাকে-টাকে বাজাবার জন্যে। এবার রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী, তাই আহার নিদ্রা ত্যাগ করে ক'খানি রবীন্দ্র-সঙ্গীত রপ্ত করেছি।"

চেয়ে দেখলাম, মেদশূন্য ছিপ্‌ছিপে শ্যামা মেয়েটির চেহারায় রূপ না থাকলেও দৃঢ় সংকল্পের তেজ আছে।

কিন্তু এত উত্তেজিত হচ্ছে কেন ও?

আমি ওকে চা-খাবার অনুরোধ জানাতে গেলাম, "দেখুন, একটু—"

"বুঝেছি। বলতে চান সাধনা করতে, ঘরে বসে। কি লাভ? তিরিশের উপর বয়স আমার। কেরাণী-গিরির সাধনায় বুড়িয়ে গেলাম। কিছু ফল হল?"

আমি বলতে আরম্ভ করলাম, "তা বলছি না—"

ঘড়ি-বাঁধা, অন্য আভরণ শূন্য হাতখানা নেড়ে মেয়েটি উত্তেজিত হয়ে উঠল আবার, "কি বলছেন জানি। যার জীবনে ছোট ভাইবোনের ঝগড়া, মা-বাবার রোগ ছাড়া

কিছু নেই, তার কাছে এটুকু অনেক। আপনি কি করে বুঝতে পারবেন? অনেক পেয়েছেন যে!"

অনেক না হোক, কিছু পাওয়ার লজ্জায় আমি নির্ব্বাক্ হয়ে বসে রইলাম। চটি দিয়ে আমার বসবার ঘরের সবুজ গালিচা নির্ম্মম ভাবে পেষণ করতে করতে পেটে-খাওয়া মেয়েটি ছট্‌ফট্ করতে লাগল অন্তর্দাহে।

কি হয়েছে ওর?

কথা বলবার চেষ্টা করে লাভ নেই। মেয়েটি আমাকে কথা বলতে দেবে না। এই আসরে আমার ভূমিকা নির্ব্বাক্ প্রহরী অথবা কাটা সৈন্যও বলতে পারেন। ওর কথার বাণে আমি কর্ত্তিত হয়ে নিরুত্তরে শুনতে লাগলাম। মেয়েটি বলে চলল:

বিখ্যাত রবীন্দ্র-জয়ন্তীর মেলায় একদিন একটা চান্স পেয়েছিলাম। আমাদের কলীগ অতসীর মামা সেক্রেটারী। ধরে পড়ে ওকে পাঁচ-মিনিটের প্রোগ্রাম পেলাম। অমন জায়গায় চান্স পেয়েছি। নিজেই গাড়ী ভাড়া করে গীটারটা টেনে নিয়ে গেলাম।

যেয়ে প্রথমে কোথা দিয়ে ঢুকব ঠিক নেই। পাঁচ-ছ'টা গেট, অন্য অনুষ্ঠানও হচ্ছে। ট্যাক্সি নিয়ে বাধ্য হয়ে গোটা ময়দান চক্কর দিয়ে মরলাম। শিখ ড্রাইভার জোর করে মিটারে বহু উঠিয়ে দিল খামোকা।

শেষে ঢুকলাম প্রধান ফটক দিয়ে। কার্ডে কিছু হদিশ ছিল না কোথায় আমার বাজনাটা হবে। আধো অন্ধকার মাঠে সারি সারি ষ্টল। কোথাও খুঁজে-পেতে একটা ভলান্টিয়ারের দেখা পেলাম না। এখানে-ওখানে লোকজন ছড়ানো, ছিটনো। কাউকে খুঁজে পাই না।

অবশেষে একজন ভদ্রলোককে আমার অবস্থাটা বললাম। আমি বাজাতে এসেছি। কিন্তু কোথায় বাজাব জানি না। ওঁরা আমার কোন খবর নেন নি বা দেন নি, একখানি কার্ড পাঠানো ছাড়া। আশেপাশে একাধিক ষ্টেজ দেখছি, সুতরাং কি করব?

ভদ্রলোক বললেন, "আমি দর্শক মাত্র। তবে ওই দিকে যেন একটা অফিস-মত দেখেছিলাম। আসুন, দেখা যাক।"

কাগজে-কাগজে এই জয়ন্তী-উৎসবের জয়জয়কার। আসল বস্তুটি কি এই ছাড়া-ছাড়া আয়োজনটি?

সেখানেও কেউ কিছুই বলতে পারলেন না কোথায় কি হবে। অথচ প্রোগ্রামে আমার নাম ছাপানো হয়েছে। সময় প্রায় হয়ে এসেছে।

মরীয়া হয়ে নিজেই ঘোরাঘুরি সুরু করলাম। অবশেষে একজন মহিলা দেখলাম। বকের মত সবুজ ঘাসে পা ফেলে ফেলে চলছেন কোন একদিকে।

সে কি সাজপোশাকের ঘটা। আপনার চেয়েও বয়সে বড় কিন্তু আপাদমস্তক ধোলাই। •

আমি মরমে মরে গেলাম। মেয়েটি একটু আপোষের সুরে বলল, আমার মুখ ভাব লক্ষ্য করে:

মানে আপনার মায়ের বয়সী তিনি। ওঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। ঝাড়ুঝাড়ু মুখখানা টেনে তুলে চলছিলেন। ওঁকেই মরীয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কোন্‌দিকে কাল্‌চারাল্ প্রোগ্রামটা হচ্ছে?"

শুকনো চামড়াঘেরা চোখে ধূর্ত্ত দৃষ্টি ঝলসে উঠল, রংমাখা ঠোঁট ফেটিয়ে আমার আপাদমস্তক দেখে আহ্বান জানালেন, "ও:! আসুন।"

ওঁর সঙ্গে একটা ঝুপসী—নীচু করে বাঁধা তাঁবুর নীচে এলাম। সেখানে একটি ষ্টেজ আছে, কিন্তু সীন সাজানো হচ্ছে পরবর্ত্তী অনুষ্ঠান রবীন্দ্র-নাটকের। নীচে সাঁৎসেঁতে মাটির বুকে নীচু ভাঙা তক্তপোশ, ধুলোঢাকা, সামনে পল্‌কা ভেনেস্তা চেয়ার।

মনটা দমে গেল। দর্শক নেই বললেই চলে। সার্কাসের লোক ডাকবার প্রথায় একটা লাউডস্পীকারে লোক ডেকে ডেকে ঘরে ঢোকানো হচ্ছে। আমি কোনমতে একটু স্থান পেলাম।

বাজনা যা হ'ল কি বলব! নামটাও ভাল করে বলে দিল না। দায়সারা ভাবে যেন আমাকে দয়া করছে এমনি প্রথায় দিল একটু পাঁচ মিনিট।

কোনমতে শেষ করলাম। দু'একটা হাততালি ভদ্রতার খাতিরে পড়ল। সঙ্কুচিত হয়ে তক্তপোশের এক কোণে গুটিয়ে বসলাম।

ঝাড়ু-ঝাড়ু মহিলাটি দেখলাম পাণ্ডা ব্যক্তি একজন। তিনিই বলে দিলেন, "এবার এখান থেকে উঠে ওধারে বসুন যেয়ে। আরও প্রোগ্রাম আছে কি না?"

কোথায় বসব বুঝতে পারলাম। নাকী-সুরে রবীন্দ্র-সঙ্গীত সুরু হয়ে গেছে ততক্ষণ। পিল্‌পিল্ করে যারা কানাতে ঢুকে চেয়ার টেনে টেনে বসছে তারা কেউ ঠিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বোদ্ধা বলে মনে হ'ল না।

গীটার হাতে দড়িদড়া বাঁশ বেধে হোঁচট খেতে খেতে অবশেষে লোকের দৃষ্টির আড়াল এড়িয়ে বার হয়ে বাঁচলাম। তখনি বীথি সেনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ও এসেছে মেলা দেখতে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিন্দুমাত্র লোভ নেই। আমি এহেন স্থানে গীটার বাজাবার ছাড়পত্র পেয়েছি শুনে সতাচ্ছিল্যে বলে উঠল "অ!"

তার পরে আমরা একটু এধার ওধার ঘুরে

বেড়ালাম। হাতে বাজনাটা থাকায় আমি বাড়ী ফিরতে ব্যস্ত হয়েছিলাম। বীথি সেন বলল, "একটু দেখে যান। এমন বড় জায়গায় ত রোজ আসা হয় না। দেখার বহু জিনিষ আছে।"

গলা শুকিয়ে এসেছিল। ভাবলাম এক কাপ চা খাই। চার পাশে যেন মনে হ'ল চায়ের ষ্টলই বেশী বেশী।

আবছা অন্ধকারে বসে আছে সারি সারি স্ত্রীপুরুষ। বাড়ী পালানো কলেজের ছেলেমেয়েই জমায়েৎ বাধিয়েছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কারুর চোখ নেই। ষ্টলে ভিড় নেই। খাবার দোকানে চেয়ার খালি পাওয়া দায়। গব্ গব্ করে গিলছে সবাই। অথচ শুনি নাকি এদেশে টি. বি.র প্রকোপ বেশী।

কিন্তু চা খেয়ে গলা যেন শুকিয়ে উঠল আরও। মরীয়া হয়ে মাংসের কাটলেট চাইলাম। ভিড়ের মধ্যে চেয়ে পাওয়া যায় না। দিয়ে গেল চিংড়ির চপ।

বীথি সেনকে বললাম, "চলুন, বাড়ী যাই। এখানে যে ধরণের ভিড় দেখছি, ভাল নয়। গীটারটা আস্ত নিয়ে ফিরতে পারলে বাঁচি।"

বীথি সেন বলল, "ব্যালেরিনার নাচটা একটু দেখে তবেই যাবেন। বাইরে থেকে আনিয়েছে।"

খোলা মাঠে ষ্টেজ—দপদপ করে আলো জলছে। নীচে আধভেজা ঘাসে বসে হাজার হাজার নরনারী। সেখানে একটা ফ্লাড্‌লাইট বা অন্য কোন আলো দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেই অন্ধকার অমাবস্যার অন্ধকারকে হার মানায়। কেমন করে যে অমন অন্ধকারে ছেলেমেয়ে পাশাপাশি বসে আছে জানি না।

আমি কিছুতেই ভিড়ে ঢুকতে রাজী হলাম না। অবশেষে বীথি আর আমি একটু বাইরে দাঁড়িয়ে উঁকি দিতে লাগলাম।

এখানে মেয়েটি দম নেবার জন্য একটুক্ষণ চুপ করা মাত্র আমি উঠে যেয়ে কোনমতে চায়ের কথা বেয়ারাকে বলে এলাম। কারণ, এই রেটে কথা বললে নিশ্চয় গলা শুকিয়ে যায়।

ফিরে আসা মাত্র মেয়েটি বলে উঠল:

জানি আপনি কেন ভেতরে গিয়েছিলেন। রেফ্রিজেরেটরের একপাত্র জল খেয়ে জিরিয়ে নিতে। বড়লোকদের অভ্যাস আমার বেশ জানা আছে।

আমি বলবার চেষ্টা করলাম, এই শীতে কি—

আমাকে বাধা দিয়ে মেয়েটি বলল, হ্যাঁ, শীতে গলা শুকিয়ে ওঠে সত্যি। আমার কাহিনী শুনেই এই যদি হয়, তবে প্রকৃতপক্ষে ষ্টলে আপনার মাথায় যে বরফ চাপাতে হ'ত।

আমি বলার চেষ্টা করলাম, আপনার অনেক অসুবিধা—

মেয়েটি উত্তেজিত হয়ে উঠল, অসুবিধা শুধু? আপনি ত কিছুই শোনেন নি। শুনুন তা হলে।

মেয়েটির মুখখানা যেন একটু করুণ-করুণ দেখাল, কিন্তু তার পরেই সে আবার জলে উঠল।

ব্যালেরিনার পোশাক পরতে সময় লাগছে, শুনলাম। পোশাক পরতে মানে পোশাক না পরতে সময় লাগল।

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকানো মাত্র সে বলল, মানে শীতের দিনে গায়ে কিছু কাপড়-চোপড় ছিল ত। সেগুলো খুলে জনগণসমক্ষে বার হতে হবে ত। ততক্ষণে মোটা গলায় এক ভদ্রলোক লোকসঙ্গীত ভাঁজতে লাগলেন। ভাষাটা অসমীয়া কি ওড়িয়া বুঝতে পারা গেল না।

ব্যালেরিনা এলেন। সমস্ত দেহে দু'সারি ফ্রিল ছাড়া কিছুই নেই, একটি বুকে, একটি কোমরে। লোক ভেঙে পড়ল দেখতে। ঠেলাঠেলি সুরু হল দারুণ।

হঠাৎ বীথি সেন বলে উঠল, "আমার বটুয়া!" হাতে ধরা একটা প্লাষ্টিকের বালতি ব্যাগ ছিল ওর। অফিস থেকে সোজা এসেছে। কাগজপত্রে, জিনিসে ভর্ত্তি। তার মধ্যে নূতন কেনা কাঁচ বসান কাল বটুয়ায় গোটা বারো টাকা ছিল। কোন ফাঁকে পিক্ পকেট হয়ে গেছে।

আমি বললাম, সর্বনাশ! দেখুন, পড়ে টড়ে যায় নি ত? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল আমিও ত ওর পাশে ছিলাম। তাড়াতাড়ি দেখি ডানহাতে গীটারটা ঠিক ধরা আছে, কিন্তু বাঁ হাতের কব্জী থেকে ঝোলান হাতব্যাগের জিপ খোলা। মধ্যে টাকার মানিব্যাগ নেই, কুড়িটি টাকার নূতন নোট ছিল।

মেয়েটি রাগে ফুলতে ফুলতে উঠে দাঁড়াল:

কি বলতে চান, শুনি? আমরা গরীব মানুষ, যেখানে এমন করে আমাদের টাকা খোয়া যায়, আমরা যাই কেন? সংস্কৃতির মূল্য দিতে হয়। এমন করে মূল্য দিয়েছে কে?

আমি সান্ত্বনা-প্রয়াসে মুখ খুলতে না খুলতে মেয়েটি বলে উঠল, বলতে পারেন কি, এমন রবীন্দ্রজয়ন্তী করা কেন? গরীবের টাকা মেরে দেয়া ভিন্ন কিছু দিয়েছে এই সমস্ত অনুষ্ঠান? বলতে পারেন? জানি, পারবেন না।

ঝড়ের মত বেগে খেটে-খাওয়া মেয়েটি নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল ঘর থেকে।

আমার ওকে চা-খাওয়ার কথা আর বলা হল না।
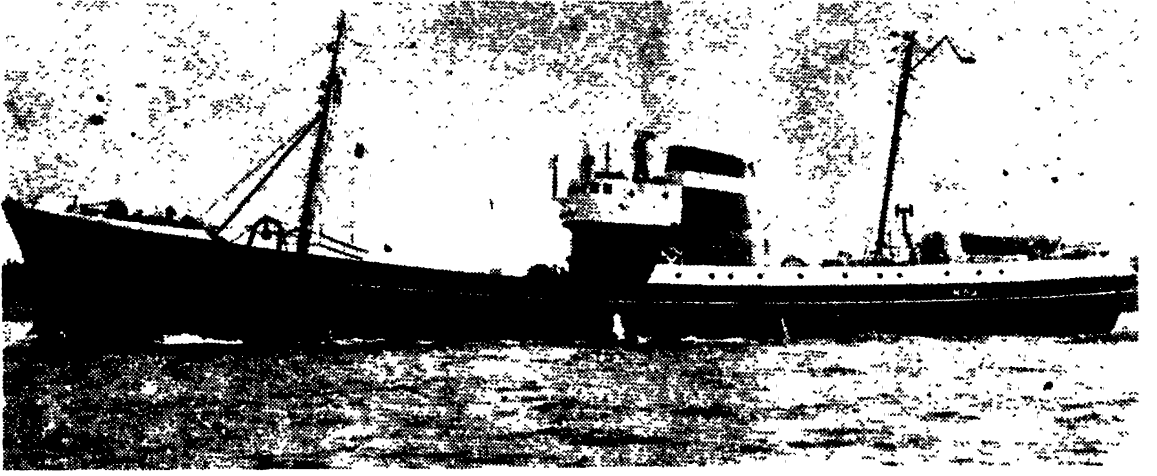
মৎস্যশহর থেকে উত্তর সাগর

শ্রীসুরেশচন্দ্র সাহা

ব্রিটেনের পূর্ব উপকূলে উত্তর সাগর তীরে লিঙ্কনশায়ার। এর ঐতিহ্য আছে, ইতিহাস আছে। লিঙ্কন শহরে হাজার বছর আগের তৈরি ক্যাথিড্রাল আজও অনেকের বিস্ময়। লর্ড টেনিসনের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠায় এখানে গ'ড়ে উঠেছে সাহিত্যিকদের কবিতীর্থ।

রোমান আক্রমণের প্রধান ঝাপটা লেগেছিল এই লিঙ্কনশায়ারে। ১০০ খ্রীষ্টাব্দে তৈরি পাসাণ প্রাচীর 'রোমান ওয়াল' আজও স্মরণ করিয়ে দেয় রোমকদের ব্রিটেন বিজয়ের কথা। রোমক কৃষ্টি ও সভ্যতার পরিচয় এখনও ছড়িয়ে আছে লিঙ্কনশায়ারের একাধিক গ্রাম আর শহরে। গ্রীম্‌স্‌বী, লেস্‌বী, থরন্‌স্‌বীর 'বী' আজও বহন করে চলেছে রোমান নামের স্বাক্ষর।

হাম্বার নদীমোহনার অদূরবর্তী গ্রীম্‌স্‌বীর গৌরব কিন্তু এজন্য নয়; অধুনা জগতে এটা এক অতুলনীয় মৎস্য-শহর। গ্রীম্‌স্‌বীবাসীরা গভীর সমুদ্রে মাছ ধরে, বেচে আর বাঁচে; দুনিয়ার হাটে পাঠায় মৎস্যের পসরা।

এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনে রেলওয়ে স্টেশনের বাইরে এসেই পড়া গেল আধ ডজন লোকের কবলে। ক্যান্ আই হেল্‌প ইউ, স্যার্—বললেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। লণ্ডনের মত কস্‌মোপলিটান শহরে আনাগোনা পৃথিবীর নানা জাতের—সাদা, কাল, পীত। এখানে কচিৎ-দেখা ভারতীয়ের প্রতি এদের ঔৎসুক্যের অন্ত নেই। নটিক্যাল স্কুল কোথায় জিজ্ঞেস করাতে বৃদ্ধটি বললেন—টেক্ দ্যাট বুস্, গেট ডাউন এ্যাট রাইবী স্কোয়ার, এনিবডি উইল শো ইউ। বুস্ মানে বাস—উচ্চারণে আঞ্চলিক অভিনবত্বের নমুনা, আমাদের পদ্মার এ-পারের 'খাব না' স্থলে 'খামুনা'র মত। বুস্ ধরার আগে খানিকটা আলাপ করে নেওয়া গেল। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি মাছধরা জাহাজের প্রাক্তন স্কীপার বা ক্যাপটেন, অপঘাতে আজ অচল। এখানকার লোকের উচ্চারণে নেই লণ্ডনীয়ার ককনী টান, বাচনে নেই ট্রেনের কামরায় দেখা-হওয়া গোমড়ামুখো আত্মাভিমানী ইংরেজের পালিশকরা স্বল্পভাষিতা। • •

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। শহরের অন্যতম মৎস্য-শিল্প কারখানা ফ্রেড্ স্মীথ্ এণ্ড কোম্পানীর অফিসে বসে আছি। কারখানার কর্মীরা অধিকাংশ মহিলা, সংখ্যায় দু'শতাধিক। ট্রলারের মাছ বাজার থেকে লরীভরা হয়ে আসছে কারখানায়। এখানে প্রত্যেক মাছের নাড়াভুঁড়ি, ডানা, লেজ, মাথা, কাঁটা বাদ দিয়ে মাংসখণ্ড তুলে নিয়ে টাটকা অবস্থায় বিক্রীর জন্য স্বাস্থ্যসম্মতভাবে প্যাকিং হচ্ছে। কারখানার অপরাংশে চলছে মাছের দীর্ঘস্থায়ী রক্ষণ-ব্যবস্থার কাজ—স্মোকিং,

ফিস-ডকে কর্মব্যস্ত কর্মচারীরা

সল্টিং, ড্রাইং, কুইক-ফ্রিজীং। এমনতর কাজচলা কারখানার সংখ্যা শহরে অনেক। গ্রীমস্‌বীর নব্বুই হাজার লোকসংখ্যার শতকরা সাইত্রিশ কর্মী ক'রে খাচ্ছে মৎস্যশিল্পের উপর—জাহাজকর্মী থেকে কারখানার মালিক, শ্রমিক, কেরাণী পর্যন্ত।

মিঃ স্মীথের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তাঁরই সৌজন্যে সম্ভব হ'ল আমার উত্তর সাগরে মৎস্যাভিযানে যাওয়ার। ব্যবস্থামত রাত সাড়ে তিনটায় এলাম ফিশ ডকে, ভাঁটার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ ছাড়বে। বিলেতের ফেব্রুয়ারী মাস, কি প্রচণ্ড শীত। সোঁ সোঁ করে বাতাস বইছে। পেঁজা তুলোর মত বরফ পড়ছে অঝোরে। মাথার টুপী, গায়ের ওভারকোটের উপর জমেছে বরফের এক শ্বেত স্তর। একে একে এল জাহাজের ডেক আর ইঞ্জিন কর্মীরা। সবাই সাহেব। সকলেরই আবহাওয়া উপযোগী পোশাক—বাইরে বেরোবার উপযুক্ত শার্ট, টাই, কলার, হ্যাট, কোট। পারিপাট্যের ত্রুটি নেই। মুহূর্তে মনে হ'ল দেশের ধলেশ্বরী নদীতে মাছধরা জেলেদের কথা। কত তফাৎ!

জাহাজের নাম ইরইক্যান, প্রায় চল্লিশ বছর আগের তৈরি। মালিক সার টমাস রবিন্‌সন কোম্পানী। এই কোম্পানীর আছে প্রায় পঁচিশখানা ট্রলার।

পৌঁছান গেল উত্তর সাগরে। জলের রং সবুজ—কোথাও হাল্‌কা, কোথাও ঘন রং। ইংলিশ চ্যানেলে প্রবেশপথে প্রথম দর্শন মেলে এই রকম জলের। আরব সাগর নীল, লোহিত সাগর লাল নয়। ভূমধ্যসাগর কোথাও সুনীল, কোথাও ভস্মধূসর; আটলান্টিক ছাই-ছাই। এদিকে বঙ্গোপসাগর কোথাও হাল্‌কা সবুজ, কোথাও প্রচণ্ড ঘন নীল, কোথাও বা ফিকে রং। উত্তর সাগর ছাড়া আর কোন সাগরের জল মনে হয় নি এমনি একটানা সবুজ।

উত্তর সাগরের ইতিহাস দীর্ঘ দিনের। এর মৎস্য-চারণ ক্ষেত্র মৎস্যপ্রাচুর্যে পৃথিবীতে অতুলনীয়। উত্তর সাগরের ডগার ব্যাঙ্কে মাছ ধরা হয়ে আসছে কত যুগ ধরে, তবু শেষ নেই। আজ ডগার ব্যাঙ্কের যেখানে সবুজ জলরাশি থৈ থৈ করছে, অতি সুদূর অতীতে ছিল সেখানে কত বনচারী হিংস্র প্রাণীর আবাস, গভীর অরণ্যানী। প্রাগৈতিহাসিক যুগের সে অরণ্য গেছে তলিয়ে, অরণ্যচারী জীবের স্থলে আজ বিচরণ করছে জলচারী মৎস্যকুল।

এইবার ফেলা হ'ল জাল। জাহাজ প্রায় পূর্ণ গতিতে এগিয়ে চলেছে, আর প্রায় সাড়ে তিন শ' ফুট জলের নীচে নারকেলের কাতার মত দেখতে শক্ত ম্যানিলা সুতোয় তৈরি জাল চলেছে অমসৃণ সাগরতলের মাটি ঘেঁসে। তিন ঘণ্টা পর জাল উঠিয়ে আনা হ'ল। কত মাছ—কড, প্লেইস, লেমন সোল, ডোভার সোল, হোয়াইটিং, টারবট, হ্যাডক, ফ্লাউণ্ডার, স্কেট ইত্যাদি। বঙ্গোপসাগরের চিরপরিচিত ভেটকী, চাঁদা, ফ্যাসা, চিংড়ি, পমফ্রেটের দর্শন মেলে না এখানে। ক্যাপটেন আণ্ডারউড নানা যন্ত্রকৌশলে জাল তোলার কাজ পরিচালনা করবার সময় বললেন—দেখেছ, জালের শেষ প্রান্তে যেখানে সমস্ত মাছ আটক হয়ে পড়ে, সেই কড এণ্ড ভেসে উঠেছে? প্রচুর কড মাছ ধরা পড়েছে কি না! বঙ্গোপসাগরেও এমনটি দেখা যায় যদি অনেক ভোলা আর ভেটকী মাছ ধরা পড়ে জালে। প্রায় চল্লিশ মণ মাছ উঠল—জলাভূমির অফুরাণ ফসল। এক স্থানে স্তূপীকৃত এত মাছ আগে কখনও দেখার

কড্ মাছ

সৌভাগ্য হয় নি। উন্মত্ত পুচ্ছ ঝটপটানিমুখর মাছের স্তূপে মৎস্যেতর প্রাণী, বা হাঙর মোটেই চোখে পড়ল না, যেমনটি পড়ে বঙ্গোপসাগরে।

কন্‌কনে হাওয়া, ঘন কুয়াসা, মাঝে মাঝে ছিট্‌ছাট্ বৃষ্টি, উৎকট শীত আর দোলা খাওয়া সাগর—এরই মধ্যে অনলসভাবে কাজ করতে হচ্ছে কর্মীদের। এদের আপাদমস্তক ছিল ওয়াটারপ্রুফের পোশাকে মোড়ক করা, ভেতরে শীতরোধক গরম কাপড়। নিমেষের মধ্যে সমস্ত মাছের পেট চিরে নাড়ী-অন্ত্র ফেলে পাইপে টানা সাগরের জলে ধুয়ে পরিষ্কার করা হ'ল। এক জাহাজ মাছ নিয়ে বন্দরে ফিরলেও দেখা যায় জাহাজটি কেমন ঝক্‌ঝকে। এতে আঁশটে গন্ধের বালাই নেই, অপরিচ্ছন্নতার প্রশ্রয় নেই। কড, হ্যাডক ইত্যাদি মাছের লিভারগুলি সংরক্ষিত হতে লাগল এক পাত্রে, বন্দরে ফিরে কড্‌লিভার তেল তৈরীর কারখানায় বিক্রীর জন্য। এর পর আরম্ভ হ'ল সমস্ত মাছ ডেকের নীচে ঠাণ্ডা ঘরে নিয়ে গুঁড়ান বরফের স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখার কাজ। সমস্ত কাজ নিষ্পন্ন হ'ল নিখুঁত নিষ্ঠা আর অসীম ক্ষিপ্রতায়—প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে। জাল ফেলার কাজ শেষ হয়েছিল আগেই; আবার চলল জাহাজ সম্মুখের দিকে এগিয়ে, তিন ঘণ্টার জন্য। এইভাবে রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা চলল জাল তোলা-ফেলার কাজ, আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে কর্মীদের খাওয়া, ঘুমান, বিশ্রাম।

আলোচনা হ'ল স্কীপার আণ্ডারউডের সঙ্গে। উত্তর সাগর থেকে ধ'রে-আনা মাছের প্রতিযাত্রায় গড় বিক্রীত মূল্য প্রায় বার হাজার টাকার কাছাকাছি; আর ডীপ সী বা দূর পাল্লার সাগরের এক ট্রিপের গড় মূল্য নিরূপিত হয়েছে প্রায় ৬৫,০০০৲ টাকা। বঙ্গোপসাগরের আট থেকে দশ দিনের যাত্রায় শিকার করা হাজার মণ মাছের দাম কমপক্ষে ২০,০০০৲ টাকা। নিয়মিত মৎস্য-শিকারের কাজ চলতে থাকলে প্রতি-যাত্রায় গড় বিক্রয় মূল্য ১০,০০০৲ টাকা হওয়া অসম্ভব নয়। স্কীপার আর তাঁর পরবর্তী অফিসার মেট ওদেশে বেতন পান না। মোট বিক্রীত মূল্য থেকে ট্রিপের সমস্ত খরচ কেটে নেওয়া হয়। বাকী টাকার শতকরা দশভাগ পান স্কীপার, সাতভাগ মেট। খাওয়া খরচ নিজেদের। ক্রুদের বেতন সপ্তাহে প্রায় ৮০৲ টাকা; তাছাড়া প্রত্যেকে বিক্রীত অর্থের প্রতি ১,০০০৲ টাকায় ৮৲ টাকা এবং আরও অতিরিক্ত ভাড়া ১৲ টাকা করে পাবে প্রতিদিন—তা সে যতদিনই সমুদ্রে থাক। খাওয়া ফ্রি।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। উত্তর সাগরও গভীর। কিন্তু উত্তর সাগর ছাড়াও ইংল্যাণ্ডের ট্রলারগুলি নানা জায়গায় মাছ ধরতে যায়। যে সব জাহাজ গ্রীনল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড, বেয়ার আয়ল্যাণ্ড, বালটিক সাগর, হোয়াইট সী ইত্যাদি স্থানে মাছ ধরতে যায় সেগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে ডীপ সাস্ ট্রলাররূপে
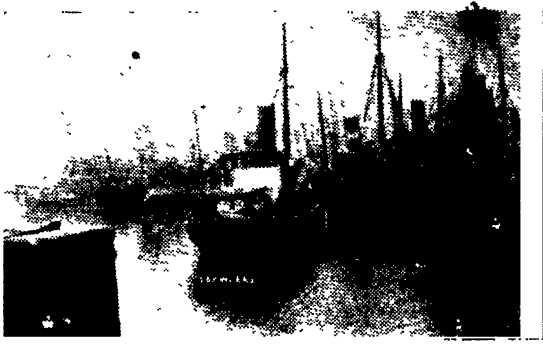
কতকগুলি মাছধরা জাহাজ

ডিস্টাণ্ট ওয়াটা'র ট্রলার্‌স্‌ হিসেবে। আর ঘরের কাছে সাগরে মাছধরা জাহাজগুলিকে ভাগ করা হয়েছে নর্থ সী ট্রলার্‌স্‌ বলে। এখানকার জাহাজ বেশীর ভাগ চলে কয়লায়, দূর পাল্লার জাহাজ ডিজেল তেলে।

একে একে পরিচয় হ'ল জাহাজ কর্মীদের সকলের সঙ্গেই। স্বজন বান্ধব থেকে দূরে সাগরে-থাকা এই মানুষদের সঙ্গে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই অন্য দেশের সমুদ্র-ধীবর সম্প্রদায়ের। সাগরে এদের এক জাত—এরা ফিসারম্যান। আচরণে যদু, মধু, রাম, শ্যামের মতই—রাফ্‌, রেডি, সিন্‌সিয়ার। এদের স্ল্যাং-বিকীর্ণ অজস্র অপ-ভাষা শুন্‌লে প্রথম প্রথম অবাক্‌ লাগে। এরা সমুদ্রে দিনের অবসরে বই পড়ে, টফী খায়, ছবি তোলে; পকেটে রাখে অপর্য্যাপ্ত ছবির প্যাকেটে আপন গার্ল ফ্রেণ্ডের ছবি, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এদের পড়া বেশীর ভাগ বইগুলি ক্রাইম, কমিক, কার্টুনে ভরা। এরা সাগরে বয়ে নিয়ে যায় সেই জাতের পত্রিকা যাতে স্থান পায় উচ্চ, মধ্য, নিম্নবিত্ত ঘরের নানা কেচ্ছার আদিরস সম্মত বর্ণনা—নিউজ অব্‌ দি ওয়ার্লড্‌, এম্পায়ার নিউজ ইত্যাদি। এমন কি প্রগতিপন্থী ডেইলী মিরর্‌ও এই পত্রিকাগুলির সমগোত্রীয়—অন্তত উদারনৈতিক দলের নিউজ ক্রণিক্‌লে এই মত।

একদিন পশ্চিম সাগরে চেয়ে আছি। দিনের শেষে কাচের জানালার মধ্য দিয়ে দেখা গেল লালরঙের গোল সূর্য। সাগরের জলে প্রতিচ্ছবি; দেখে মনে হ'ল অস্তাচলগামী রক্তিম রবি যেন দোল-খাওয়া সাগরের কোল ছেড়ে লাফ দিয়ে আকাশে উঠতে গিয়ে বার বার আছাড় খেয়ে আবার লুটিয়ে পড়ছে সাগরের বুকে। ক্রমে ঘনায়মান কালো কুয়াসার অন্তরালে বিলীন হয়ে গেল দিশেহারা দিনমণি।

পরদিন। জাহাজের চিলেকোঠা থেকে চারদিকে তাকিয়ে দেখা গেল শুধু জাহাজ, জাহাজ আর জাহাজ—মৎস্যশিকারে রত। মাঝে মাঝে চোখে পড়ল দু'চারটে মাল আর যাত্রীবাহী নানা দেশগামী জাহাজ। চারদিকে মৎস্যশিকাররত জাহাজগুলি গুণে দেখলাম প্রায় পঞ্চাশ খানা। সাগরের মাত্র এইটুকু অংশে। এক জাহাজ থেকে দূরবর্তী আর এক জাহাজের ক্যাপটেনের সঙ্গে আলাপ চলছে রেডিও টেলিফোনে:

কখন এলে, বিল্‌?—এই ত বিকেলে।

কত মাছ পেলে?—২০ মণ।

একেবারে কিন্তু বাজে কথা। পেয়েছে হয়ত পঞ্চাশ মণ। সত্যি কথাটা বলতে চায় না। পাছে ঐ জাহাজটিও এসে পড়ে এই ভাল মাছের জায়গায়। সকলেরই জানা আছে এই গুলমারার কথা। তবু পরস্পর আলাপ করে, শুভ কামনা করে, আলাপের ছেদ টানে—হ্যালো বিল, গুড বাই, ওল দি বেষ্ট ব'লে।

এদিকে ব্রিটেন, ওদিকে ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, জার্মানী, দক্ষিণ নরওয়ে—মধ্যিখানের উত্তর সাগরে কত দেশের কত জাহাজ চ'ষে বেড়াচ্ছে একবার কল্পনা করুন। বিচিত্র নয়, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে উত্তর সাগরের মৎস্যচারণযোগ্য আর কোন অংশই অকর্ষিত থাকে নি; এমন কি মৎস্যচারণ ক্ষেত্রের প্রতি-বর্গফুট স্থানেও জাহাজ-টানা জালকে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর গ্রীম্‌স্‌বী যে চারশ' ট্রলারের বাহিনী নিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মৎস্যবন্দরে পরিণত হবে তাতে আর আশ্চর্য কি? গ্রীম্‌স্‌বীর মত স্বয়ংসম্পূর্ণ মৎস্যবন্দর না দেখলে কল্পনা করা শক্ত হয় মৎস্যশিল্পের অধুনা বিরাটাকারের কথা।

ইংল্যাণ্ডের গভীর জলের মৎস্য শিকারের ইতিহাস বহু যুগ আগের। আর সুসংবদ্ধ শৃঙ্খলায় এর পরিকল্পনা নেওয়া হয় আজ থেকে ৭৬ বছর আগে ১৮৮৬ সনে। এদেশে তখন ভগবান্‌ শ্রীরামকৃষ্ণ দেহরক্ষা করেছেন। একটা তমসাচ্ছন্ন জাতকে বিবেকমন্ত্রে জাগিয়ে তোলার প্রস্তুতি চলছে। তখন এদেশবাসী ভাবতে পারে নি গভীর জলে মৎস্য-শিকারের কথা, বিলেতের লোকেও কল্পনা করে নি এর অধুনা বাণিজ্যিক ব্যাপকতার কথা। প্রথম যেদিন বিলেতের বাজারে আমদানী হয়েছিল অদ্ভুতদর্শন সমুদ্রের মাছ, চিররক্ষণশীল ব্রিটেনবাসীরা স্বাগত জানায় নি তাকে—এখনও যেমন আছে আমাদের দেশে সমুদ্রের মাছের স্বাদ আর মৎস্যরূপ সম্বন্ধে জনমনের সন্দেহ। বহু যুগের ব্যবধানে অবস্থা

গ্রীম্‌স্‌বীর বিরাট্ ফিশ-ডক

এমনি দাঁড়িয়েছে, আজ গোটা ইংল্যাণ্ডে সারা বছরে যত নদীর মাছ ধরা হয়, একমাত্র গ্রীম্‌স্‌বী বন্দরে প্রতিদিনে ট্রলার থেকে খালাস করা হয় সেই পরিমাণ সমুদ্রের মাছ। এখানে রোজ গড়ে ২০ খানা ট্রলার থেকে খালাস করা মাছের পরিমাণ প্রায় পঁচিশ হাজার মণ।

সাগর থেকে আবার ফেরা গেল শহরে। ফিশডকে প্রেস রিপোর্টার অনেক প্রশ্ন করলেন: উত্তর সাগরের ট্রিপ্ কেমন লাগল, কি ধারণা হ'ল ওদেশে মাছের কারবার দেখে, সাগরে মাছ ধরার রাজসিক আয়োজনের অনুপাতে বাজারে মাছের দাম কম, না বেশী মনে হয়— ইত্যাদি নানা প্রশ্ন। পরদিন সংবাদপত্রে বের হ'ল সমস্ত আলোচনার সচিত্র বিবরণ।

স্যার টমাস রবিনসন কোম্পানীর আর একটা জাহাজে উত্তর সাগরে এসেছিলাম দ্বিতীয়বার। ক্যাপ্টেনের নতুন কোন কৃতিত্ব দেখাবার সে কি চেষ্টা। নিজে সিনিয়ার, অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী। ইরইফ্যান জাহাজের ক্যাপ্টেনের প্রতি ওঁর উষ্মার ভাব গোপন রইল না। কারণ আছে। ওদেশে গণ্ডায় গণ্ডায় পাসকরা ক্যাপ্টেন আছেন যাদের অনেকের ভাগ্যে কোন জাহাজের চার্জ মেলে অনেক সময় হয়ত গঙ্গাযাত্রার কিছুদিন আগে। বহু ভাগ্যবান্ মিঃ আণ্ডারউড চার বছর সাধারণ ডেক-কর্মী হিসেবে কাজ করার পর পরীক্ষায় পাস করেই পেয়েছেন একটা জাহাজের চার্জ। এজন্য অনেকের ঈর্ষার পাত্র তিনি।

ফিশডকে একটা জাহাজ থেকে মাছ নামাল দেখা গেল। বার্ট্ ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানীর ১৫০ ফিট লম্বা ট্রলার। নাম সেরণ। এই কোম্পানীর আছে ২০ খানা মাছ-ধরা জাহাজ, সব ক'টা ডীপ্ সী ট্রলার। সেরণের মত একটা ট্রলারের নির্মাণমূল্য ২,৬৩৫,০০০ টাকা। গরম ও ঠাণ্ডা জলের ব্যবস্থা, আধুনিক পায়খানা, বাথরুম, খাওয়ার ঘর, থাকার ঘর—সবই আছে এখানে। আধুনিক বিলাসোপকরণ সজ্জিত একখানা ট্রলারে স্বাচ্ছন্দ্য যাত্রীবাহী জাহাজের তুলনায় কিছুমাত্র অকিঞ্চিৎকর নয়। সেরণের প্রতিযাত্রা ২১ থেকে ২৬ দিনের। ক্যাপ্টেন থেকে ক্রুসহ ২১ জন লোকের সেরণ ফিরেছে ২,৯৭৫ মণ মাছ নিয়ে। ভোর ছ'টার আগে সমস্ত মাছ নামান শেষ হয়ে সমবেত ক্রেতাদের মধ্যে অকৃশনে বিক্রী হয়ে গেল। বিক্রীর সময় উপস্থিত ছিলেন কোম্পানীর প্রতিনিধিরা। এইরূপে মাছ কিনে ব্যবসা করার জন্য গ্রীম্‌স্‌বীতে আছে ৬০০ ব্যবসায়ী। এরা মাছ কিনে প্রতি বাক্সে নিজেদের লেবেল এঁটে দেয়। তার পর লরী ভরে নিয়ে যায় নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে বা কারখানায়।

ডক-সংলগ্ন বাজারে মাছের ওপর লেবেল আঁটা হয়েছে

মিঃ ড'সন লক্ষপতি—পাকা ব্যবসায়ী। আইস্‌ল্যাণ্ডে মাছধরা নানা দেশের ট্রলার ধৃত মাছসহ সরাসরি গ্রীম্‌স্‌বীর বাজারে আমদানী করা যায় কি না তারই পরিকল্পনা করছিলেন। এতে ওদেশী গৃহিণীরা খুব খুশী—সস্তায় মাছ মিল্‌বে কিনা! কিন্তু স্থানীয় ট্রলার-মালিকদের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই, বেশী আমদানীর জোরে দাম পড়ে যাবে যে। ভারতের বাজারে আইস্‌ল্যাণ্ডের মাছ বিক্রী করবেন মিঃ ড'সনের এমন ইচ্ছাও ছিল।

নানা মৎস্য-প্রতিষ্ঠানের মত জাল তৈরীর কারখানা, জালে ব্যবহৃত নানা সরঞ্জাম তৈরীর কারখানা ইত্যাদিতে অনেকদিন যাতায়াত করতে হ'ল। কনসোলিডেটেড্ ফিশারিজ্ লিমিটেডের জাল তৈরীর কারখানায় গেলাম। কয়েকশ' মহিলা কর্মী আছে শুধু জাল বোনার কাজে।

জালের নানা অংশ এরা বুনে চলেছে ফোরম্যানের নির্দেশে। কলেও চলে জাল বুনটের কাজ। পরীক্ষায় দেখা গেছে কলের চাইতে হাতে তৈরী জালই দীর্ঘস্থায়ী, ব্যবহারের পক্ষে বেশী সুবিধাজনক। এরপর যাওয়া গেল এই কারখানার নেট ফিক্সিং ডিপার্টমেন্টে। সেখানে শুধু জালের নানা অংশ জুড়ে পূর্ণাঙ্গ জাল তৈরী হচ্ছে। ক্যানাডার এক বিখ্যাত মৎস্য-প্রতিষ্ঠানের জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ হ'ল এইখানে। শুধু চোখে দেখেই চলে যাওয়া নয়—হাতে-কলমে কিছু কাজ করা থাকলে একটা বিরাট্ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সুবিধা হবে। বিশেষজ্ঞ হওয়া উদ্দেশ্য না হলেও মাসখানেক যাবৎ করছেন জালের কাজ।

অনেকদিন পর। শেষবারের মত গিয়েছি উত্তর সাগরে। কাঁকড়া ধরা ছোট্ট জাহাজে। এবার আর খুব গভীরে নয়—উপকূলের কাছে কাছে। একটা বাক্সে গোটাকতক পাত্র আছে, তাতে টোপ। এমন কয়েকশ' বাক্স ফাৎনা বেঁধে ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল কয়েকদিন আগে। আজ তুলে তুলে দেখা গেল বড় বড় কাঁকড়া আর সাদা ছিট্ ছিট নীল খোলস গলদা চিংড়ি। এক জাহাজ কাঁকড়া আর গলদা চিংড়ি নিয়ে ফেরা গেল সেই দিনই, সন্ধ্যায়। জাহাজের দাম সওয়া লক্ষ টাকা; গভর্ণমেণ্টের তহবিল থেকে তৈরী। বর্তমান স্কীপারই গভর্ণমেণ্টের কাছে কিনে নিয়েছেন দশ হাজার টাকা জমা দিয়ে। অবশিষ্ট টাকা কিস্তিতে শোধ দেবেন। সরকারী মৎস্য-বিভাগের কর্মচারীরা এইসব মালিকদের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রাখেন। কার কি অসুবিধা হ'ল, আর কতটুকু সাহায্য করলে ঘাটে অকেজো পড়ে-থাকা জাহাজ আবার চালু হতে পারে ইত্যাদি দেখা এঁদের কাজ। ফিশডকে, কারখানায়, অফিসে ঘুরে নানা তথ্য সংগ্রহ করেন এই কর্মচারীরা। এই সব সংগৃহীত বিবরণ সামগ্রিকভাবে মৎস্য-শিল্পের কাজে লাগে।

ডকে ঢোকার সময় লক-গেটের প্রহরীকে কিছু দক্ষিণা দিতে হ'ল স্কীপারকে। দেওয়ার কানুন না থাকলেও দিতে হয় এক অলিখিত নির্দেশে। এখানেও এই—ছবির পর্দায় যমালয়ে জীবন্ত মানুষ ঘুষের কারবার দেখে বোধ হয় এমনি অবাক্ হয়েছিলেন। আমাদের দেশে আদালতের পিয়ন, গেটের দারোয়ান, অফিসের কেরাণী-কুল, থানার তিনিরা—এদের খুশী না করলে কোন কাজ হয় না। তবু ওদেশে আমার জানা একটিমাত্র ক্ষেত্রে এইভাবে পয়সা আদায় করতে দেখে মনটা কচ কচ্ করল।

এবার কি আবিষ্কার করলে স্-রে-স্—জিজ্ঞেস করলে কেউ কেউ। সদ্য ডিপ-সী-ফিশিং আরম্ভ করা দেশের একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে উত্তর সাগরের অভিজ্ঞতা নতুন আবিষ্কারের মত ত বটেই। কিন্তু তাই বলে কাঁকড়া ধরা জাহাজে! কিই বা থাকতে পারে অভিযানে—এমনিতর আলোচনা-মন্তব্য শোনা গেল কিছু কিছু। সাগরে যাওয়ার আগে কিন্তু রুমাল উড়িয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছিল জন, আলফ, ম্যাক্স, বারবারা—আরও অনেকে। বারবারার মুখে ছিল এ্যাপ্রিসিয়েশনের হাসি—অভিনন্দনের হাসি।

বারবারা একটি মেয়ের নাম।
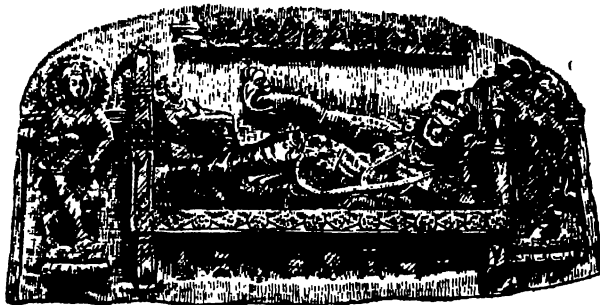
চেনা-অচেনা

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

অচেনা আকাশ, অচেনা সূর্য্য,
গ্রহতারাদের অন্য চেহারা।
পৃথিবী বন্য, পৃথিবী আর্দ্র, উষ্ণ পৃথিবী
অন্য চেহারা।
অগ্নিগর্ভ কম্পিত দেহে
কুৎসিত কোন্ সৃষ্টি লালসা,
লোভ-লেলিহান উষ্ণ লালসা
অহোরাত্রির লাভা-উৎসারে।
আকাশে মেঘের অন্য চেহারা,
প্রলয়-প্রতিভূ সৃষ্টির মেঘে
বিদ্যুৎলিপি অচেনা ভাষার।
উল্কা-উলোল দূর দিগন্ত ধূম-সমাকুল
অন্য চেহারা।
পরিচিত শুধু উদ্বাহু আলো
চির-সন্ন্যাসী ধ্রুবতারকার,
হয়ত অন্য ধ্রুবতারকার।

আদিম বন্য পৃথিবী মাতার
স্তন্যধারায় অজস্রতা।
স্ফীতবক্ষের স্তন্যধারার সুধাহলাহলে
অজস্রতা।
সৃষ্টির ভোরে মৃত্যু-আহবে আহুতি জীবের
অজস্রতা।
মহা-অরণ্যে মহা-মহীরুহ, মহাকায় কোটী করালমূর্ত্তি
ব্রন্টোসরাস, মেগালোসরাস, ডাইনোসরের
বীভৎসতা,
বীভৎসতার অজস্রতা।

আজকে তাদের ফসিল্ দেখছি।
ভাবছি, আজকে এই যে পৃথিবী,
পুরাতনী সেই পৃথিবী এই ত?
আজ ঢাকুরিয়া লেকের ওপারে
তরুণ-তরুণী হয়ত একটু
এদিক্ ওদিক্ দেখে নিয়ে খুব ত্বরিতে একটি
চুমো খেয়ে নিল।

ব্রন্টোসরাস, মেগালোসরাস অধ্যুষিত সে
পৃথিবী এই ত?
হয়ত তরুণ লিখেছে কবিতা,
সন্ধ্যার ম্লান আলোতে পড়তে
অসুবিধে নেই,
কবিতার সব কথা ক'টা তার
মনে গাঁথা আছে,
মনেরই কথা যে।
হয়ত তরুণী কোন্ গান গেয়ে
ঠিক জবাবটি দেবে তার তাই
ভাবছে।
আর আমি
ভাবছি, তুমি ত রয়েছ দেবতা,
ঐখানে ঐ লেকের ওপারে
ওদের প্রেমের পুরোহিত হয়ে,
সাক্ষী হয়েও তুমি ত রয়েছ,
মুগ্ধ সাক্ষী?
ওরাও তোমাকে ভাবছে দেবতা,
ভাবছে, এ প্রেমে এত মধু আছে
তুমি এ প্রেমের দেবতা ব'লেই।

ব্রন্টোসরাস, টিরানোসরাস, ডাইনোসরের বীভৎসতার
পৃথিবীতে তুমি ছিলে ত দেবতা?
যুগযুগান্ত সেই পৃথিবীতে ছিলে ত দেবতা?
কোন্ সুখে ছিলে?
আমারই মতন
মন ত তোমার? রূপের পূজারী তুমিও ত দেব
আমারই মতন?
কি ক'রে বাঁচতে?...

ফিরে যাই সেই প্রাক্-ইতিহাসে।
অচেনা আকাশে অচেনা সূর্য্য
দিবসের পথ পাড়ি দিয়ে চ'লে
গেছে তমিস্র অস্ত-অচলে।

মেগালোসরাস করালমূর্তি,
বিনিদ্র ছুটি চোখে নিভে গেছে
হিংসা-অনল, সঙ্গিনী তার
কি এনেছে ব'হে কুৎসিত আর
বীভৎস তার দেহ-সীমানায়,
ক্ষণিক আলোর ঝলকানি যেন
অচেনা আকাশে মেঘদের গায়ে,

যেই মেঘদের অন্ত চেহারা। পৃথিবী বন্ধ,
পৃথিবী আর্দ্র, উষ্ণ পৃথিবী।
উষ্ণ, আর্দ্র উৎসবক্ষণ বীভৎসতার,
এরই সন্ধানে রূপহীনতার অন্ধকার ও বন্ধুর পথে
বারবার তুমি ফিরেছ বন্ধু,
লোভে ছুরু ছুরু বক্ষে, তোমার
চক্ষে স্বপ্ন রূপসৃষ্টির।

ডব্লিউ স্কট অবলম্বনে

সুনীলকুমার নন্দী

সময় গড়ায় মুক্ত স্রোতে স্রোতে। সে-আদিম জাতি,
যাদের জানুর পরে আমাদের শৈশব নাচায়,
যাদের কাহিনীরাজ্যে শিশুকালে মুগ্ধ কান পাতি,
সাহসবিস্ময়রাশি দেশে দেশে, ঢেউয়ের চূড়ায়,
তাদের অস্তিত্বদীপ্তি কী করে যে যায় মুছে যায়!
তাদের সামর্থ্যশক্তি কত স্বল্প, কত না দুর্বল,
অক্ষয় স্বর্গের ওই অন্ধকার কিনারে দাঁড়ায়,
সমুদ্র-চড়ায় জীর্ণ জাহাজের মতো অবিকল,
জোয়ার কর্কশ কণ্ঠে ভাসায়! বিমুক্ত স্রোতে সময়ের জল।

তথাপি এখনো কেউ বেঁচে আছে মনে তুলে আনে,
বাজাতো পর্বতরাজ তার সেই বিষাণ যখন,
সে-ধ্বনিসংকেত চিনতো শৈলচূড়া, খাড়াই শিখানে
উপত্যকা, অরণ্য, প্রান্তর, গুহা, আগাছা বিজন;
যখন সুতীব্র রবে ভেসে যেত সতর্ক ঘোষণা,
বিশ্বস্ত আত্মীয়গোষ্ঠী দ্রুতটানে এসে তার পাশে
জমা হতো, উড়াতো সুউচ্চে তুলে গোষ্ঠীর নিশানা,
বার্তাবহ রক্তচিহ্ন উল্কাবেগে দিকে দিকে ভাসে,
আহ্বান-সংকেত বাজতো যুদ্ধশিঙা উচ্চরোলে
উল্লোল সন্ত্রাসে

শান্তিনিকেতনের উৎসব ও তার বৈশিষ্ট্য

শ্রীদুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে'—আনন্দ থেকেই জীবের জন্ম, আনন্দের মধ্যেই জীবনের প্রকাশ, আবার আনন্দ নিয়েই জীবের প্রত্যাবর্তন। বিশ্বের চারদিক্ তাকালেই দেখতে পাওয়া যায়, সর্বত্র আনন্দের লীলা চলছে; মানুষও যদি তার জীবনকে এই আনন্দ-স্রোতে সিক্ত করতে পারে, তবে কেবল আনন্দরসাস্বাদনই হবে না, আনন্দময়ের সঙ্গে পরিণামে হবে তার মিলন। এতে জীবন হয়ে উঠবে প্রফুল্ল ও সার্থক। রবীন্দ্রনাথ এই আনন্দের সদা-জাগ্রত ভাব জাগিয়ে রেখে গেছেন আশ্রমের উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। দেশের মধ্যে উৎসব-অনুষ্ঠান ত ছিলই; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একে নূতন একটি রূপ দিয়েছেন ঋতু-উৎসবের মাধ্যমে। তিনি দেখেছেন, শারদীয়া পূজো, লক্ষ্মী পূজো, বাসন্তী পূজো ইত্যাদির মধ্যে ঋতু-উৎসবই মুখ্য। তাঁর হাতে উৎসবগুলি হয়ে উঠেছে সার্বজনীন ও স্বতন্ত্রমর্যাদাসম্পন্ন। একদিকে এতে যেমন ভাবরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে রচিত হয়েছে অজস্র গান, কবিতা, নাটক ইত্যাদি। নাটকাশ্রিত নানা রস-ব্যঞ্জনা উৎসবগুলিকে করে তুলেছে অতি অপূর্ব। কবিগুরু ছিলেন প্রকৃতির পূজারী; এই পূজোর অর্ঘ্য তিনি নিবেদন করেছেন নানা ভাবে; মনের কথা অকপটে বলতে পেরেছেন এই সুযোগে। বিবিধ নৃত্যের মধ্য দিয়ে ঋতু-পূজোর অন্তর্নিহিত ভাব হয়েছে অভিব্যক্ত; আর এই সুরুচি-সমৃদ্ধ নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেছে শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা। অভিনয়ে মেয়েদের যোগদানে উৎসব হয়ে উঠেছে অকৃত্রিম। বাইরে থেকে এ-বিষয়ে নানা বিরূপ সমালোচনা, বিরুদ্ধতা ইত্যাদি হলেও কবি তাতে কর্ণপাত করেন নি; কারণ তিনি জানতেন, কোন বিষয়ে অন্তঃস্থলে প্রবেশাধিকার না জন্মালে কেবল বাইরে থেকে তার সমালোচনা করা যায় না। সেজন্য তিন এর বিরুদ্ধাচরণ উপেক্ষা করে কাজ চালিয়ে গেছেন। এ-উৎসব কেবল নিছক আমোদ-আহ্লাদের মধ্যেই সীমায়িত নয়; এর স্থান অনেক উর্দ্ধে। কবি বসন্তের দক্ষিণ বাতাসকে মনে করতেন উর্দ্ধলোকের দৈববাণী, শালবীথিকায় শাখার আন্দোলনকে তিনি মনে করতেন সেই চিরন্তনের অনাহত বীণার অশ্রুত গানের সুর। শোক-দুঃখের কারণ উপস্থিত হলেও তিনি কখনও উৎসব বন্ধ করতেন না। ১৯৩২ সনে 'বর্ষামঙ্গল' উৎসবের আগে কবির একমাত্র বংশধর দৌহিত্র নীতীন্দ্রের অকাল দেহাবসানে আশ্রমে শোকের ছায়া সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। আসন্ন উৎসবের জন্য প্রস্তুতির কথা কারও মনে স্থান পায় না, নাচ-গানের মহড়া হয়ে যায় বন্ধ। কবি এ-সব লক্ষ্য করে সবাইকে ডেকে বললেন, 'আমার ক্ষতি হয়েছে, বা আমার দ্বারে এসেছে আঘাত, তাতে বন্ধ থাকবে আশ্রমের উৎসব! একে আমোদ-আহ্লাদ বলে দেখো না, তা দেখলেই জাগবে সংকোচ। এ জিনিস শোক দুঃখ আঘাত আন্দোলন থেকে উর্দ্ধে; বর্ষে বর্ষে, কালে কালে পৃথিবীতে অনেক দুঃখের মধ্যে দিয়েই হয়েছে আনন্দের আগমন।' এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, কবিগুরুর তিরোভাবের পর আশ্রমে যে সমারোহে বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠিত হয়, তা কবির উক্ত নীতিরই অনুসরণে।

আশ্রমের উৎসব প্রসঙ্গে দিনেন্দ্রনাথের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তিনি ছিলেন 'সকল গানের ভাণ্ডারী, সকল নাটের কাণ্ডারী'। তিনি প্রতিসন্ধ্যায় বসতেন গানের আসরে প্রধান পুরোহিত হয়ে। ছাত্র-শিক্ষক তাঁকে ঘিরে নিয়ে বসত। আসর গরম হয়ে উঠত গান, নাটকাভিনয়, গল্প ও পাঠে।

আশ্রমে এখন যে সাহিত্যসভার মধ্য দিয়ে সাপ্তাহিক উৎসব হয়, তার গোড়ার কথা একটু বিচিত্র। প্রথম যখন সাহিত্যসভার পত্তন হয়, তখন এর উৎসবের রূপ ধরে নি। চেয়ার-টেবিল নিয়ে অন্য পাঁচ জায়গার মত সভা হ'ত। আশ্রমের অন্যতম শিক্ষক ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় ছিলেন কাশীর লোক; তিনি সেখানে ও অন্যত্র নানা শিল্পকলা দেখেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা হ'ল শান্তিনিকেতন আশ্রমে শিল্পকলার প্রবর্তন করতে। তিনি এই কাজে মুকুল দে, যদুকিশোর চক্রবর্তী প্রভৃতি ছাত্রদের উৎসাহিত করে তুললেন। ফলে, সভার আসবাব টেবিল-চেয়ারের স্থান অধিকার করল নানারকম ফুল, গাছের পাতা, ধূপ-ধুনো, আলপনা ইত্যাদি। তার পর বেদী রচনা ক'রে তাতে সভাপতিকে বসান ও মাল্যচন্দনে ভূষিত করানর প্রথা এল। এ সমস্তই করা হ'ল ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসরণ করে। অভ্যাগতজনকে নমস্কার

দেবার প্রথা প্রবর্তিত হ'ল এই সময় থেকে। ক্রমে ক্রমে ছেলেদের মধ্যে এই নূতনত্বের নেশা জেঁকে বসল। তারা বহু দূর-দূরান্তর থেকে নানারকমের বন্য ফুল সংগ্রহ করে আনত; এর মধ্যে বিশিষ্ট ফুল ছিল কেয়া, পদ্ম, নীলোৎপল ইত্যাদি। এই সব ফুল নিয়ে সভা সাজানর ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের শিল্পজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যেত। আল্পনা-রচনার মধ্যে ফুটে উঠত শিল্পরেখাঙ্কনের অপূর্ব সৌন্দর্য। রবীন্দ্রনাথ ছাত্র-ছাত্রীদের এই বিশিষ্ট রুচিবোধে পরম পরিতৃপ্ত হলেন। সেই থেকে সাহিত্য-সভা স্বতন্ত্র ধরনের উৎসবে পরিণত হ'ল। এই অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতাও হ'ত। এক-একটি 'ঘরকে' এক এক সপ্তাহে ভার নিতে হ'ত। ছেলেরা যে সমস্ত লেখা পড়ত, সেগুলি হাতে-লেখা পত্রিকার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হ'ত। ভিন্ন ভিন্ন ঘর থেকে পত্রিকা বের হ'ত ব'লে পত্রিকার সংখ্যাও ছিল একাধিক। বীথিকা, শান্তি, বাগান, প্রভাত ইত্যাদি পত্রিকার অস্তিত্বের কথা পাওয়া যায়। শান্তি পত্রিকাটি এখনও সেই পুরোনো দিনের স্মৃতি বহন করে চলেছে।

পৌরাণিক ঋতু-উৎসবের কথা রবীন্দ্রনাথের মনে জাগরূক ছিল। এ সম্বন্ধে ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়। একবার রবীন্দ্রনাথ বর্ষার সময় আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন না, তখন ক্ষিতিবাবু পৌরাণিক ধারা অনুসরণ করে বর্ষা-উৎসব করলেন। তিনি, শাস্ত্রী মহাশয়, দীনুবাবু প্রভৃতি সকলে মিলে বর্ষার শ্লোক, কবিতা, গান ইত্যাদি নির্বাচন করলেন। মহাসমারোহে উৎসব সুসম্পন্ন হ'ল। পরে আশ্রমে ফিরে কবিগুরুর ইচ্ছে হয়েছিল সভাটির পুনরনুষ্ঠান করাতে; কিন্তু তখন শরৎ প্রায় দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বললেন, তিনি শরতের গান বেঁধে দেবেন। শরৎকালে অনুষ্ঠিত এই শারদোৎসব নাটকখানির এক ইতিহাস আছে।

লাইব্রেরী ঘরের দোতলায় খড়ের ঘরে রবীন্দ্রনাথ থাকতেন কয়েকজন ছেলেকে নিয়ে। ছেলেরা তখনও ঠিক পোস মানে নি। তাই তাদের অশান্ত চিত্ত শান্ত করার জন্য তিনি ঐ ঘরে ব'সে একটি নাটক লিখলেন 'শারদোৎসব' নামে। এতে যে-সব গান রচিত হ'ল, তাতে সুর দিয়ে তিনি ছেলেদের শেখাতে লাগলেন। পরে ঐ ঘরে সভা ক'রে তিনি নাটকটি সবাইকে শোনালেন। নাটকে ঠাকুর্দার অভিনয় করেছিলেন ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রী মহাশয়। তিনি গান তেমন জানতেন না; রবীন্দ্রনাথ নেপথ্যে গান গেয়ে দিলেন আর অঙ্গভঙ্গি দিয়ে তা প্রকাশ করলেন ক্ষিতিমোহনবাবু। দর্শকের ধারণা হয়েছিল যে, রবীন্দ্রনাথের পরে এমন কণ্ঠস্বর আর শোনা যায় নি। তখন ক্ষিতিবাবুকে সকলে ধরে বসল গানের জন্য। বেকায়দায় পড়ে তিনি তখন সব কথা ফাঁস করে দিলেন।

রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় কবির জন্মোৎসব পালন করা হয় একটি বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করে। প্রচলিত নিয়মানুসারে উৎসবস্থানটি পত্রপুষ্প ও আল্পনায় সাজান হয়; কিন্তু যেভাবে মন্ত্রাদির পাঠ হয় তাতে কথা ওঠে, দেবতার পূজাক্ষেত্রে প্রযুজ্য মন্ত্রাদির ব্যবহার মানুষের পক্ষে প্রয়োগ করা সমীচীন কি না। কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী যখন শান্তিনিকেতনে এলেন, তখন তাঁর সম্মানের জন্য ২১টি তোরণ নির্মিত হয়, আর প্রত্যেক তোরণের স্তম্ভপদমূলে ছিল ২১ রকম বস্তু, যেমন, মহী গন্ধদ্রব্য শিলা ধান্য দূর্বা ফুল ফল দই ঘি স্বস্তিক সিঁদূর শঙ্খ কজ্জল গোরোচনা শ্বেত সর্ষপ কাঞ্চন রৌপ্য তাম্র চামর দর্পণ দীপ। অভ্যর্থনা-বেদীও ছিল উক্ত ২১টি মাঙ্গলিক দ্রব্যে পূর্ণ; এ ছাড়া ছিল অর্ঘ্যপাত্র, পুষ্পপাত্র, ধূপ, দীপ, পঞ্চশস্য, মধুপর্ক ইত্যাদি। এই রীতিতে উৎসব করায় নানা অনুকূল ও প্রতিকূল সমালোচনা হয়; কিন্তু পরে কলকাতায় এই রীতি অনুসারেই রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব পালিত হয়েছিল।

শুধু মুখের কথায় মনের ভাব প্রকাশ করার চেয়ে বিচিত্র সজ্জাপ্রকরণ, মুদ্রা ব্যবহার, আল্পনা ইত্যাদির প্রয়োগে উৎসব যে অধিকতর মহীয়ান্ হয়ে ওঠে, তা ভারতের বিদগ্ধজন ভেবে আসছিলেন বহুদিন থেকে। এগুলি হ'ল ভাষা প্রকাশের এক রূপান্তর। মঙ্গল-ইচ্ছা প্রকাশের ঐগুলি ছিল সাঙ্কেতিক রূপ; যেমন, বটপত্রের আল্পনা আঁকা হ'ত অভ্যর্থনার উৎসবে। বটপত্র হচ্ছে বক্ষঃস্থলের আকারের অভিব্যক্তি। এই চিত্রাঙ্কনে কৌশলে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ত, 'হে ভদ্র, সমস্ত হৃদয় পেতে তোমাকে আমরা অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করছি।' শুভাশীর্বাদের চিত্র ছিল একটি ত্রিভুজের উপর অঙ্কিত আরেকটি ত্রিভুজ, অথবা কুণ্ডলাকৃতি সর্পমূর্তি। একদিন ভারতে এই সব চিত্রাঙ্কনের যে এক বিরাট্ অভিব্যক্তি ছিল তার কিছু লুপ্তপ্রায় চিহ্ন পাওয়া যায় আল্পনা, বিগ্রহ প্রসাধন, পুজোর সাজসজ্জা বা তন্ত্রোক্ত মুদ্রাবিধিতে। রবীন্দ্রনাথ ভারতের সেই প্রাচীন ঐতিহ্য লোকসমক্ষে উপস্থাপিত করলেন এবং স্বীকৃতিও পেলেন সকলের।

আশ্রমের উৎসব সেই থেকে এইভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এবং অন্যত্রও এর বিরাট্ বিস্তৃতিলাভ ঘটেছে।

উৎসবে চিত্রকলার আবির্ভাবের মত নৃত্যেরও প্রবর্তন হয়েছিল শান্তিনিকেতনে এইরকম ভাবেই। বৈদিক যাগযজ্ঞে নৃত্যের একটি স্থান ছিল; কিন্তু পরবর্তীকালে কোন কারণে নৃত্যের মহত্ত্ব নষ্ট হয়ে গেলে তার অবশেষ রয়ে যায় মন্দিরে দেবদাসীদের মধ্যে; কিন্তু এদের নৃত্য সাধারণতঃ বিলাসী জনসমাজের ভোগতৃষ্ণাই বাড়িয়ে তুলত। সুতরাং এর মহিমা ঢাকাই পড়ে রইল, বলতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ চেষ্টায় নৃত্যের লুপ্ত মাহাত্ম্য উদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। নৃত্যকে ললিতকলার খাঁটি রূপ দিয়ে একে তিনি পরিণত করলেন শিক্ষার অঙ্গরূপে, আর তার প্রতিষ্ঠা হ'ল প্রথম শান্তিনিকেতনে। সৌন্দর্য বর্ণনা ও সাঙ্গীতিক রসানুভূতিই হ'ল নৃত্যের প্রধান লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ নাটকে নিজে নেচেছেন ঠাকুর্দা বা বাউলের ভূমিকায়। নৃত্যকলার সুপরিচ্ছন্ন ভাবটি তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ত্রিপুরাধিপতির সভায়। সেখানে তিনি গিয়েছিলেন রাজবন্ধুর আমন্ত্রণে। সেখানে মেয়েদের শালীনতাপূর্ণ নৃত্যকলা দেখে তিনি এর মহিমা ধরতে পারলেন; পরে শ্রীহট্টে মণিপুরীদের রাসনৃত্য দেখে এর প্রাচীন সামাজিক মূল্য সম্বন্ধে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় হ'ল এবং কি করে আধুনিক কালে এই নৃত্যকে সমাজের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে স্থান করে দেওয়া যায়, সে-সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলেন। সঙ্গীত ও শিল্পকলার মত নৃত্যকেও শিক্ষার অঙ্গ বলে স্বীকার করে নেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আশ্রমে মণিপুরী নৃত্যের প্রবর্তন করলেন। এ-জন্য তিনি দুইজন শিক্ষক আনালেন মণিপুর ও ত্রিপুরা থেকে। নৃত্যের মধ্য দিয়ে পূজো-নিবেদনের একটি অধ্যাত্ম রূপ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন কাঠিয়াবাড়ে। তিনি আশ্রমে নৃত্য শেখাবার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করেন। নৃত্যের সঙ্গে গান-রচনাও করেছিলেন তিনি সার্থকভাবে। শেষে নৃত্যকুশলী পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর সহায়তায় তিনি আশ্রমে নৃত্যশিক্ষা-প্রসারের সুযোগ পেলেন। প্রতিমা দেবীকে নিয়ে ইউরোপ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ নানা নৃত্য ও নৃত্যকুশলাদের সঙ্গে পরিচিত হন। প্রতিমা দেবী পূর্ব থেকেই এ-বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভ্রমণের সময় নৃত্যকলার নানা রূপ তাঁর চোখে পড়ল। আশ্রমে ফিরে প্রতিমা দেবী কয়েকজন মেয়েকে নিয়ে নৃত্যের মাধ্যমে রূপসৃষ্টির দ্বারা আশ্রমবাসীদের আনন্দ দিতে লাগলেন। উৎসাহিত হয়ে কবি লিখলেন 'নটীর পূজা'। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী শিল্পীগুরু নন্দলাল বসুর মেয়ে গৌরী দেবী এই নাটকটিকে নৃত্যে রূপ দিলেন। শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে পড়ল এক নূতন পরিচ্ছেদ; দেশের মধ্যেও আশ্চর্য সাড়া লাগল।

এই নৃত্যগুলি ছিল ঋতু উৎসবেরই অঙ্গ; প্রত্যেক গানের সঙ্গে তার অন্তর্নিহিত ভাব ও ব্যঞ্জনা দিয়ে নৃত্য রচনা হ'ত। গানগুলি ছন্দোময়; কিন্তু গদ্যেরও যে সাঙ্গীতিক নৃত্যছন্দ আছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের পাঠের মধ্যে। তিনি যখন পাঠ করতেন তখন পাঠের বিষয় সুরে সুরে মূর্ত হয়ে কলনাদিনী তটিনীর তরঙ্গভঙ্গের মত সঞ্চালিত হ'ত। কবির সপ্ততিতম জন্মোৎসবের জন্য 'শাপমোচন' নাটকের প্লট আদায় করা হ'ল তাঁর কাছ থেকে; আর এর প্রযোজনার ভার নিলেন প্রতিমা দেবী। নৃত্য-নাট্যের সূচনা হ'ল এর থেকেই। সুরের সংযোগ-পঠিত উপনিষদাদির অংশের ন্যায় নাটকের পাত্রপাত্রীর বক্তব্য গদ্যাংশ প্রাচীন কথকদের বলার ভঙ্গির মত সুরের সংযোগে প্রকাশ করা হ'ল 'শাপমোচনে'। এইভাবে সৃষ্টি হ'ল চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, চণ্ডালিকা ইত্যাদি নৃত্য-নাট্যের। দক্ষিণ ভারতের 'কথাকলি' নৃত্যও রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত করেন তাঁর আশ্রমে।

শান্তিনিকেতনের উৎসব মূলতঃ ঋতু উপাসনা নিয়ে। বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব ও বসন্তোৎসব—এই তিনটি মুখ্য। বর্ষামঙ্গলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পরে দু'টি উৎসব জুড়ে দিয়েছিলেন ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে। একটির নাম বৃক্ষরোপণ ও অপরটির নাম হলকর্ষণ। বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা কবিগুরু অনুভব করেছিলেন বহু আগের থেকে। তিনি বলেছেন, 'পৃথিবীর দান গ্রহণ করবার সময় লোভ বেড়ে উঠল মানুষের। অরণ্যের হাত থেকে কৃষিক্ষেত্রকে সে জয় করে নিলে, অবশেষে কৃষিক্ষেত্রের একাধিপত্য অরণ্যকে হটিয়ে দিতে লাগল। নানা প্রয়োজনে গাছ কেটে কেটে পৃথিবীর ছায়াবস্ত্র হরণ করে তাকে দিতে লাগল নগ্ন করে। তাতে তার বাতাসকে করতে লাগল উত্তপ্ত, মাটির উর্বরতার ভাণ্ডার দিতে লাগল নিঃস্ব করে। অরণ্যের আশ্রয়হারা আর্যাবর্ত আজ তাই খরসূর্যতাপে দুঃসহ।'

'এ কথা মনে রেখে কিছুদিন পূর্বে আমরা যে অনুষ্ঠান করেছিলাম সে হচ্ছে বৃক্ষরোপণ; অপব্যয়ী সন্তানকর্তৃক মাতৃভাণ্ডার পূরণ করবার কল্যাণ-উৎসব। আজকের অনুষ্ঠান পৃথিবীর সঙ্গে হিসাবনিকেশের উপলক্ষে নয়।

মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবার, পৃথিবীর অন্নসত্রে একত্র হবার যে-বিদ্যা, মানব-সভ্যতার মূলমন্ত্র যার মধ্যে, সেই কৃষিবিদ্যার প্রথম উদ্বোধনে আনন্দ-স্মৃতিরূপে গ্রহণ করব এই অনুষ্ঠানকে।'

বর্ষা-সম্বন্ধে কবিগুরুর রচিত গান, কবিতা ইত্যাদিতে বর্ষামঙ্গল-উৎসব মুখর হয়ে ওঠে। কোন কোন সময় দেখা গিয়েছে যে, উৎসবের সময়েই তুমুল বর্ষণ আরম্ভ হয়ে গেল। কবির কথা যেন মেঘের কানে ঠিক পৌঁছেছে আর মেঘ দলবল নিয়ে হাজির হয়েছে অনুষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা করতে।

বৃক্ষরোপণ-উৎসব বর্ষামঙ্গলেরই একটি অংশ। আশ্রমের বহু গাছ কবির স্বহস্তে রোপিত। যখন এদের রোপণ করা হয়, তখন 'নাচে গানে আনন্দ-উৎসবে তাদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা' হয়। যে-পঞ্চভূতে গাছের সৃষ্টি, সেই ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতকে আবাহন করে 'তাদের স্নেহধারায় বৃক্ষকে প্রাণবান্ করে তোলবার আয়োজন করা হয়'। হলকর্ষণ-উৎসবটি শ্রীনিকেতন-উৎসবের অন্তর্গত। এর নাম দেওয়া হয় সর্বপ্রথম 'সীতাযজ্ঞ'। এর প্রথম উদ্বোধন হয় ১৩৩৬ সালের ২০শে শ্রাবণ। একজোড়া হালের গরুকে উত্তমরূপে সাজিয়ে তাদের খেতে দেওয়া হয় কলাপাতায় করে যব, গুড় ইত্যাদি। এর পর তাদের লাঙ্গলের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে খানিকটা ভূমিকর্ষণ করা হয়, আর তার সঙ্গে মন্ত্রে গানে চারদিক মুখরিত হয়ে ওঠে।

শারদোৎসব হয় ঠিক পুজোর ছুটির আগে। আগমনীর সুরে চারিদিকে বইতে থাকে আনন্দের বন্যা। সকলের মধ্যে ছুটি ছুটি রব পড়ে যায়; ছেলেমেয়েদের মন সেই আনন্দরসে হয়ে উঠে সিক্ত। এই সময় শান্তিনিকেতনে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিশেষভাবে ফুটে ওঠে; সকলের মনে বইতে থাকে অপার আনন্দের সহস্র ধারা। এই আনন্দ পূর্ণ হয় কবির লেখা 'শারদোৎসব' নাটক অভিনয়ে। এই শারদোৎসবের সঙ্গে আরেকটি উৎসব যুক্ত হয়, এর নাম ছেলেমেয়েদের আনন্দবাজার। এই শারদোৎসবের ঠিক পরে আর ছুটির দুই বা তিন দিন আগে ছেলেমেয়েদের এই আনন্দের হাট বসে। 'গৌর-প্রাঙ্গণে' নিজেদের রুচিমত তারা দোকান সাজায়। চা-সরবৎ মিঠাইমণ্ডার দোকান, ম্যাজিকের ঘর, খেলার দোকানে জায়গাটি যায় ভ'রে। ছেলেমেয়েরা নিজেরাই পসরা তৈরি করে সাজায়; জিনিসের দাম হয় একটু সৌখিন ধরণের। যার যত বিক্রী বেশী, সেই হয় কৃতিত্বের অধিকারী। দোকানের লভ্যাংশ যায় দরিদ্রসেবায়।

বসন্তোৎসব অনুষ্ঠিত হয় দোল পূর্ণিমায়। এই উৎসব সুন্দর ও সুরুচিপূর্ণ করে তোলাই রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য। এর মধ্যে প্রাদেশিকতা লেশমাত্র না থাকায় উৎসবটি সার্বজনীন হয়ে পড়েছে। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এতে কোন নোংরামি বা অসংযমের নামগন্ধ নেই। বাসন্তী রঙে আশ্রম হয় রঙিন আর ছেলেমেয়েদের মনে নূতন প্রাণের সঞ্চারে যেন তারা নবীন হয়ে ওঠে প্রকৃতির শ্যামলতার সঙ্গে। বসন্ত ঋতুর আবাহন করা হয় গান, আবৃত্তি ও পাঠে।

পৌষ-উৎসব ঋতু উৎসবের সঙ্গে যুক্ত নয়। পৌষ মাসের ৭ই তারিখ শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে নানা কারণে। ১২৫০ সালের ৭ই পৌষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট ব্রাহ্মধর্মব্রত গ্রহণ করেন; শান্তিনিকেতন মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়েছিল ১২৯৮ সালের ৭ই পৌষ; ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ মহর্ষির অনুমতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করেন; মহর্ষিকৃত ট্রাষ্ট-ডিডে বৎসরে একটি মেলা বসানর কথা আছে, সেই মেলার উদ্বোধন হয় ৭ই পৌষ, সুতরাং এই তারিখটি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। ৭ই পৌষের মেলায় যে কোন ধর্মসম্প্রদায়ের সাধুপুরুষ এসে মেলাতে ধর্ম-বিচার ও ধর্মালাপন করতে পারেন। এই উৎসবে পৌত্তলিক আরাধনা, কুৎসিত আমোদ-প্রমোদ, মদ্য-মাংস ইত্যাদি নিসিদ্ধ। এই মেলার অন্যতম উদ্দেশ্য, আশ্রমের ভাবের সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় ঘটান। শান্তি-নিকেতনের প্রথম সাংবাৎসরিক উৎসবের বিবরণ তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা থেকে অংশতঃ উদ্ধৃত করা গেল:

"রাত্রি প্রভাত না হইতেই ব্রহ্মনামগানে গগন পরি-পূরিত হইতে লাগিল। প্রাতে আট ঘটিকার পূর্বে সমাগত সাধু সজ্জন সকল মঠের অভিমুখে কীর্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চারিদিকে মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। রক্তবর্ণ কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া দিনমণি সবেমাত্র আকাশে উদিত হইয়াছেন। এই সকল অনুকূল অবস্থায় সহজেই ত ঈশ্বরে মন সমাহিত হয়। তাহার উপরে 'চলো ভাই সবে মিলে যাই সবে পিতার ভবনে' এই সংকীর্তনের প্রত্যেক শব্দ যেন মর্মদেশ স্পর্শ করিতে লাগিল। বোধ হইল অসার সংসার ছাড়িয়া সত্য সত্যই আমরা সকলে প্রেমময়ের প্রেমরাজ্যের যাত্রী হইয়াছি।...শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপবাবু উদ্বোধন উপাসনা ও বক্তৃতা করিলেন। অনাথ অন্ধ খঞ্জদিগকে দিবার জন্য এ বৎসর পাঁচ শত বস্ত্র, পর্যাপ্ত

তণ্ডুল ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে মন্দিরের চারিদিকে সোপান শ্রেণীর উপরে সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। উপাসনা ভঙ্গ হইবার পরেই সকলে কীর্তন করিতে করিতে সপ্তচ্ছদ বৃক্ষের নিম্নে মহর্ষির সাধনা-বেদির দিকে চলিলেন। সেখানে বাবু কুঞ্জবিহারী দেবপ্রমুখ কয়েকজন অনেকক্ষণ ধরিয়া সঙ্গীত ও সংকীর্তন করিতে লাগিলেন।...মধ্যাহ্নের পর মঠের ভিতরে রাজকুমার বাবুর সংকীর্তন আরম্ভ হইল।...সংকীর্তন শেষ হইতে অপরাহ্ন হইয়া আসিল। ...সন্ধ্যার সময় আগন্তুক লোকসংখ্যার ইয়ত্তা রহিল না।...সন্ধ্যা ৬টার সময় উপাসনা আরম্ভ হইল। ভক্তি-ভাজন আচার্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রদ্ধাস্পদ চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ একত্রে বেদি গ্রহণ করেন। চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় উদ্বোধন ও উপাসনা করিলেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপদেশ দিলেন ও পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ হিন্দিতে গায়ত্রী ব্যাখ্যা করিলেন। বেদির পার্শ্বদেশ হইতে শ্রদ্ধাস্পদ নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্ম কি বুঝাইয়া দেন। পরিশেষে বন্দনগীতি হইয়া উপাসনা ভঙ্গ হইল।" (১৮১৪ শকের ৭ই পৌষ বুধবার)

রবীন্দ্রনাথের কাছে ৭ই পৌষ যে কত মহিমময় ছিল তা জানা যায় তাঁর লেখা একাধিক চিঠিতে। এ বিষয়ে অনুসন্ধানের ভার রইল শ্রদ্ধাবান্ পাঠকের উপর।

আমাদের সময়কার সাহিত্য ও আজকালকার সাহিত্য

শ্রীঅবনীনাথ রায়

আমাদের সময়ে বাংলা সাহিত্যের এবং সাহিত্যিকের অবস্থা কিরকম ছিল এবং এখন কিরকম হয়েছে, সে সম্বন্ধে দু'চার কথা বলতে ইচ্ছা করি। আশা করি আমার এই ইচ্ছাকে কেউ ধৃষ্টতা বলে মনে করবেন না, কারণ আমাদের যখন সাহিত্যে হাতেখড়ি হয় তার পর দীর্ঘ চল্লিশ বছর পার হয়ে গেছে। চল্লিশ বছর মানে প্রায় চারটে যুগ। ইতিমধ্যে দুটো মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। তার ফলে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার, চিন্তার ধারার, আদর্শের, ব্যবহারের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এ ভাল কি মন্দ সে কথা বলছি না, পরিবর্তন হয়েছে এটা 'ফ্যাক্ট'। কালক্রমে পরিবর্তন আসবেই, এও নিয়ম।

অবশ্য আমি সাহিত্যের বহিরঙ্গের কথাই বলব অর্থাৎ সাহিত্যিকদের পরস্পরের মধ্যে মেলামেশা, প্রীতির আদান-প্রদান, সাহিত্যিকদের আদর-আপ্যায়ন প্রভৃতির কথা। সাহিত্যের আদর্শ, মান এবং বিষয়বস্তুর কি পরিবর্তন হয়েছে, সে কথা তুলব না। কারণ, সে বিষয়টা তর্কের জটিল জালে জড়িত এবং বাদ-প্রতিবাদের সম্ভাবনায় কণ্টকিত। সুতরাং সে প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত।

আমরা সাহিত্যের যে সকল মহারথীদের দেখেছি এবং যাঁদের নিকট-সম্পর্কে এসেছিলাম তাঁরা আজ বেঁচে নেই। আমাদের পরবর্তী যুগের লেখকেরা, হয়ত তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই তাঁদের দেখেন নি। আমার মনে হয়, এতে তাঁদের লোকসান হয়েছে অপরিসীম। কারণ সাহিত্যিকের এবং তার মধ্যে দিয়ে সাহিত্যের একটা জীবন্ত রূপ এবং পরিচয় তাঁরা হারিয়েছেন। আমার বিশ্বাস সাহিত্যিকেরা সাধারণ মানুষের মত নন—তাঁদের দিয়ে সংসারের ষোল আনা কাজ চলে না। তাঁরা একটু বেশি পরিমাণে স্পর্শকাতর (sensitive) এবং আন্প্র্যাক্টিক্যাল (unpractical). তাঁদের বিষয়-বুদ্ধি কম। এগুলি গুণ তা বলছি না কিন্তু তাঁদের মনের গঠন এইরকম বলেই তাঁরা সাহিত্যিক হয়েছেন—নয়ত ভাল উকীল, ম্যাজিষ্ট্রেট বা সুদখোর মহাজন হতে পারতেন। ভাবপ্রবণ বা ইমোশন্যাল প্রকৃতির না হ'লে তাঁরা লেখক বা সাহিত্যিক হতে পারতেন না।

আমরা যাঁদের দেখেছি তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্র-নাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, করুণানিধান বন্দ্যো-পাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, অনুরূপা দেবী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার সরকার এবং আরও

অনেকে। প্রথম তিনজন ত সাহিত্যের দিক্‌পাল, চতুর্থ জন সংবাদ-সাহিত্যের দিক্‌পাল। এঁরা ত নিজেরাই একটা ইনষ্টিটিউশন্ স্বরূপ ছিলেন। কিন্তু বাকি সকলেও সাহিত্য এবং সাহিত্যিকের প্রতিমূর্তি ছিলেন, এ কথা যাঁরা তাঁদের দেখেছেন তাঁরা স্বীকার করবেন।

নিজের সাহিত্য-জীবনের কথা মনে পড়ে। কৈশোরে যদিও রবীন্দ্রনাথের নিকট-সংস্পর্শে এসেছিলাম কিন্তু আমার মধ্যে লেখার যে কোন শক্তি আছে, এ কথা কোনদিন মনে করি নি। এমন সময় ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষের দিকে চাকরি করতে গেলাম পুণায়। সেখানে বেঙ্গলী এসোসিয়েশনের একটা সাহিত্য শাখা ছিল। তার সেক্রেটারী শরৎচন্দ্র চৌধুরী একদিন ধরলেন, সাহিত্য শাখায় আমাকে একটা প্রবন্ধ পড়তে হবে। আমার শান্তিনিকেতন-বাস ছিল এই অনুরোধের হেতু। অনুরোধের ফলে একটা লেখা দাঁড় করাতে হ'ল। যতদূর মনে পড়ে, অবকাশ বা অবসর কিরকম করে কাটাতে হয়, এই ছিল সে লেখার বিষয়বস্তু। শ্রোতারা খুশী হলেন, আরও লেখার উপদেশ দিলেন। সে লেখার কোন রেকর্ড আজ আমার কাছে নেই কিন্তু উৎসাহের কথাটা মনে আছে। তার পর দীর্ঘ ৮ বছর একেবারে চুপচাপ। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে বদলি হয়ে এলাম দিল্লী। সেখানকার বেঙ্গলী এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী তখন সুরেন্দ্রকুমার সেন, হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ। তিনি এবং তাঁর সহযোগী সকলেই রবীন্দ্রপন্থী ছিলেন। তাঁরা স্থির করলেন, রবীন্দ্রনাথের "ফাল্গুনী" অভিনয় করবেন। সুরেন্দ্রকুমার অক্সফোর্ডের এম-এ—তিনি অক্সফোর্ডের উদাহরণ উদ্ধৃত করে বললেন, সেখানে সেক্সপীয়রের কোন নাটক অভিনয় করতে হ'লে প্রোগ্রামের গোড়ায় নাটকের একটা সারমর্ম দিতে হয়। এই সারমর্ম শুধু যে বইখানির গল্পের একটা সারাংশ হবে তাই নয়, উপরন্তু নাটকের বিষয়বস্তুর একটা উঁচুদরের সমালোচনাও হবে। সুরেন্দ্রকুমার এসোসিয়েশনের তিনজন সদস্যকে এই সারমর্ম লিখতে বললেন। আমার লেখাটা তাঁদের পছন্দ হ'ল। এই সময় প্রবাসী বাঙালীদের উত্তর ভারতের পত্রিকা "উত্তরা" বের হয়েছে। লক্ষ্ণৌ-এর ব্যারিষ্টার এবং কবি অতুলপ্রসাদ সেন তার সম্পাদক। সুরেন্দ্রকুমার সেন এবং তাঁর বন্ধুদের প্রস্তাবে এবং উৎসাহে ঐ লেখাটি ছাপার জন্য "উত্তরা"য় পাঠান হ'ল। সহকারী সম্পাদক সুরেশ চক্রবর্তী লেখাটি ফিরিয়ে দিলেন। সুরেন্দ্রকুমার এবং তাঁর বন্ধুরা কিন্তু আদৌ বিচলিত হলেন না। তাঁরা লেখাটি ফের পাঠালেন "সবুজপত্র" সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর কাছে। মাঝখানে তিন মাস কোন সংবাদ নেই। চতুর্থ মাসে আমাদের তিনজনের লেখাই "সবুজপত্রে" শুধু ছাপা হ'ল তাই নয়, প্রমথ চৌধুরী তার উপরে ভূমিকা করে লিখলেন যে, দিল্লীর উর্দু যেমন "সাফ আউর চুস্ত", সেখানকার বাংলাও সেইরকম "সাফ আউর চুস্ত"। অধিকন্তু কোন ফরাসী লেখকের লেখা উদ্ধৃত করে প্রমাণ করলেন যে, 'ফাল্গুনী'র সারমর্ম আমরা যেরকম লিখেছি, তার সঙ্গে উক্ত ফরাসী লেখকের মতের সামঞ্জস্য আছে।

আশাতীত সম্মান। যে লেখা 'উত্তরা' ফিরিয়ে দিয়েছিল, সেই লেখা সাহিত্যিক ধুরন্ধর প্রমথ চৌধুরী শুধু ছাপলেন তাই নয়, তার উপর আবার অনুকূল টিপ্পনী দিলেন। এর কিছু পরেই আমি ছুটি নিয়ে কলকাতা গিয়েছিলাম। তখন 'কালি-কলম' বেরিয়েছে। মনে আছে, কোন বন্ধুর সঙ্গে কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের উপর 'কালি-কলম' আপিসে যাই। সম্পাদক মুরলীধর বসু বসে ছিলেন। তিনি আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম। তখন তিনি বললেন, কোন্ অবনীনাথ রায়? যাঁর লেখা 'সবুজপত্রে' বেরিয়েছে? আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। মুরলীবাবু চোখ থেকে চশমাটা খুলে টেবিলের উপর রাখলেন—তার পর দু'হাত জোড় করে নমস্কার জানালেন।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য আত্মশ্লাঘা নয়—বলার উদ্দেশ্য কিরকম করে আমি সাহিত্যের পথে এলাম এবং আমার নিজের উপর আত্মবিশ্বাস জন্মাল। আমি নিশ্চিত জানি 'ফাল্গুনী' সম্বন্ধে আমার যে লেখা সেটা এমন কিছু উঁচুদরের নয় যে, প্রমথ চৌধুরী সেটা প'ড়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর আসল উদ্দেশ্য নিশ্চয় ছিল একজন দিল্লী-প্রবাসী বাংলা-লেখককে লেখায় উৎসাহ দেওয়া। কিন্তু এই উৎসাহের উদারতা ব্যর্থ হ'ল না—আমি সাহিত্যের পথে টিঁকে গেলাম। আমি দেখাতে চেষ্টা করছি, আমাদের সময়ে সাহিত্যিকদের মনে এই উদারতা ছিল, প্রসন্নতা ছিল। মুরলীধর বসুর উদাহরণ দিয়েছি, তিনি 'কালি-কলম' নামক একখানি ছোট কাগজের সম্পাদক হয়েও কোন্ লেখকের লেখা কোথায় কি বেরুচ্ছে সব খবর রাখতেন। আজকালকার সম্পাদকেরা যে তা রাখেন না তার পরিচয় আমি নিজের জীবনেই পেয়েছি। কলকাতার কোন বিখ্যাত মাসিকপত্রে (ইচ্ছে করেই নাম করলাম না) একটা লেখা দিতে গিয়েছিলাম। সম্পাদকের সামনে ধূমায়িত চায়ের কাপ রাখা ছিল। আসন গ্রহণ করতেও বললেন না। আমি দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়েই নিজের বক্তব্য পেশ করলাম। তিনি চোখ বুঁজে মুরুব্বিয়ানার সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার লেখা আর কোন্ পত্রিকায় বেরিয়েছে? ইত্যাদি। আমার বলার উদ্দেশ্য যে, আমাদের সময়ে এই অপমানটা ছিল না। আমি একজন বড় লিখিয়ে অর্থাৎ সাহিত্যিক না হতে পারি, কিন্তু আমিও একজন মানুষ। যে সাহিত্যকে আমি পেশা বা নেশা হিসাবে গ্রহণ করেছি, তার জন্যই আমার সম্মান হওয়া উচিত। নয়ত সাহিত্যকে গ্রহণ না করে আমি ব্ল্যাক মার্কেটের এজেণ্টও হতে পারতাম, তাতে পয়সা নিশ্চয় বেশি হ'ত।

এই প্রসঙ্গে আমার দিল্লীর বন্ধুদের আন্তরিকতার কথা আজও ভুলতে পারি নি, যদিও তার পর দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর কেটে গেছে। যেদিন "সবুজপত্রে" ঐ লেখা ছেপে এল সেদিন প্রথম দফা ডাঃ সুধীন্দ্রকুমার সেনের ল্যাবরেটারিতে আনন্দোচ্ছ্বাস হ'ল। ডাঃ সেন সেদিন ল্যাবরেটারির কোন কাজই করলেন না। তার পর দল বেঁধে যাওয়া হ'ল আদুবাবুর দোকানে অর্থাৎ এইচ. সি. সেন কোম্পানীর দোকানে। আদুবাবু নিজের হাতে চা করে সকলকে খাওয়ালেন। মিউনিসিপ্যালিটির ইঞ্জিনীয়র নিত্যগোপাল ভট্টাচার্য হঠাৎ আনন্দের আতিশয্যে টেবিলের উপর উঠে দাঁড়ালেন। পাখা চলছিল—অল্পের জন্য তাঁর মাথাটা ফাটল না। সেখানেই শেষ নয়। তার পর সন্ধ্যার দিকে দল বেঁধে অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রকুমারের কাশ্মীরী গেটের বাসায়। সেখানে রাত্রি পৌণে দশটা পর্যন্ত চা-জলখাবার খাওয়া, আনন্দ, নৃত্য ইত্যাদি। 'সবুজপত্র' হাতে হাতে ফিরতে লাগল। আনন্দ ততটা আমার নয়, যতটা আমার বন্ধুদের। পরিশেষে ক্লান্ত হয়ে রাত্রি দশটার ট্রেনে আমি দিল্লী নিউ ক্যাণ্টনমেণ্টে (তখন তাই নাম ছিল) নিজের বাসায় ফিরে গেলাম।

এখানে সব ঘটনা বলার উদ্দেশ্য এই কথা প্রমাণ করা যে, আমাদের সময় বন্ধুপ্রীতি এবং আন্তরিকতা সহজ ছিল—মানুষ আত্মকেন্দ্রিক ছিল না। বন্ধুর সম্মানে নিজে বিগলিত হয়ে সেই সম্মান নিজের ব'লে গ্রহণ করতে মস্ত বুকের পাটা লাগে—স্বার্থকেন্দ্রিক হৃদয়ের সাধ্যও নেই সেই বিরাট্ আনন্দের বেগকে ধারণ করে।

অবশ্য এই প্রশ্রয়ের ফলে মানুষ একটু বাতিকগ্রস্তও হয়ে ওঠে অর্থাৎ যার যে-শক্তি নেই, তার সে-শক্তি আছে সে মনে করে। হয়ত আমার বেলায়ও সে রকম একটু হয়েছে। নয়ত আমি যখন দিল্লীর পর মিরাটে বদলি হয়ে গেলাম, তখন শনিবার শনিবার দিল্লীতে সাহিত্য-সেবা করতে আসতাম কি ক'রে! আজ পরিণত বয়সে সে কথা মনে করে নিজের মনেই হাসি পায়। মিরাট থেকে দিল্লী ৪২ মাইল পথ—ট্রেনে ঘণ্টা তিনেক সময় লাগত। তা ছাড়া দু'দিকে রিক্‌শার খরচও আছে। শনিবার আপিসের পর বেরোতাম এবং রবিবার রাত্রে কিংবা সোমবার সকালে মিরাটে ফিরে যেতাম। "চতুরঙ্গ" নামে নয়া দিল্লীতে আমাদের একটা ক্লাব ছিল। লেখক অপূর্বমণি দত্তের বাড়ীতে শনিবার রাত্রে তার বৈঠক বসত। সেখানেই রোজ রাত্রে আহার এবং শয়ন। আমি যে বাড়িয়ে বলছি না তার প্রমাণ স্বরূপ অপূর্বমণি দত্ত, যামিনীকান্ত সোম, ভবানী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধুর নাম করতে পারি যাঁরা আমার কথার সত্যতার সাক্ষ্য দেবেন।

আজকের দিনে নিশ্চয় এই ঘটনাকে বাড়াবাড়ি বলে মনে হবে এবং আমাকে অনেকে সাহিত্যের বাতিকগ্রস্ত বলে মনে করবেন। আজ যে বয়সে পৌঁছেছি তাতে পিছন ফিরে জীবনের ঘটনার একটা মূল্যায়ন বা হিসাব-নিকাশ করতে ইচ্ছা হয়। সাংসারিক বুদ্ধির দিক্ দিয়ে যে ভুল করেছি তাতে সন্দেহ নেই। আজকে দেখি, সংসারে প্রতিটি পয়সা হিসাব করে চলতে হয়। তার উপর নিজের পরিবারের সুখ-দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি দিই নি। এও নিশ্চয় ত্রুটি। কিন্তু সেদিন তা মনে হয় নি। মনে হলে আর পারতাম না। একটা যেন ঝোঁকের মাথায় চলেছিলাম। সে ঝোঁক হ'ল সাহিত্যের ঝোঁক বা বাতিক।

কিন্তু যখন এই বাতিকের অপবাদ নিজের উপর নিই তখন বন্ধুবর অপূর্বমণি দত্তের কথাও মনে হয়। তাঁরই বা এই বাতিক কম কি ছিল! সপ্তাহে তিন বেলা এক বন্ধুকে পোষণ করা নিশ্চয় সাংসারিক বুদ্ধির লক্ষণ নয়!

মোদ্দা কথা হ'ল, যতই বাতিক বলে একে উড়িয়ে দিই না কেন, এর মধ্যে যে ভাল কাজ করার একটা জেদ আছে, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। জগতে সব বড় কাজই এই রকম বিষয়বুদ্ধিহীন জেদ থেকে হয়েছে।

বুদ্ধিহীনতার আরও বড় রকম প্রমাণ দিতে পারি। তখন প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং ভারতের ভিন্ন ভিন্ন শহরে তার অধিবেশন হচ্ছে। এই সব অধিবেশনে যোগ দিতে হ'ত, অথচ যাতায়াতের যে পাথেয় লাগত নিজের স্বল্প বেতন থেকে তা সংকুলান হ'ত না। গঙ্গারাম বলে একজন কুসীদজীবী আমাদের সঙ্গে চাকরি করতেন। প্রতি সম্মেলনের আগে তাঁর

কাছে পঞ্চাশ টাকা ধার নিতাম হ্যাণ্ডনোট লিখে। অধিবেশন থেকে ফিরে এসে কয়েক মাস লাগত এই ঋণ পরিশোধ করতে। টাকার দিক্‌টা ছাড়া সাংসারিক সুবিধা-অসুবিধার দিক্‌টা ছেড়েই দিলাম। একাধিকবার বাড়ীর অসুখের জন্য টেলিগ্রাম করে আমাকে সম্মেলন থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

এ সব উদাহরণ দেওয়াও নিজের সাহিত্যপ্রীতিকে বিজ্ঞাপিত করার উদ্দেশ্য নয়। এর থেকে এই কথা বোঝাতে চাই যে, আমাদের যুগে অর্থাৎ আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে মানুষের সাংসারিক বুদ্ধি এই রকমই ছিল। তখন মানুষ আদর্শবাদী ছিল। তার কারণও ছিল। খাওয়া-পরার তখন এত কষ্ট হয় নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধার সময় এবং তার কিছু পরেও অর্থাৎ ১৯৩৯-১৯৪০ সনেও মানুষ পেট ভরে খেতে পেয়েছে এবং নিজেদের ইচ্ছামত পরতে পেয়েছে। চাউলের দাম মানুষের ক্রয়শক্তির বাইরে বাড়ে নি, কেরোসিন তেল বাজার থেকে উবে যায় নি, কয়লার জন্য দোকানে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ত না। তার পর এর ষোলকলা পূর্ণ হ'ল ১৯৪৩ সনের মন্বন্তরে। এই মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার লোক মানুষের লোভের পায়ে আত্মবলি দিল। বাংলা দেশের এ এক কলঙ্কের ইতিহাস। শহরে রাস্তার ফুটপাথে, ল্যাম্প-পোষ্টে ঝুলে কত লোক অনশনে, অর্ধাশনে, কুখাদ্য খেয়ে প্রাণ দিয়েছে—সভ্য মানুষ তা চোখ মেলে দেখেছে কিন্তু নিজের লাভের মুনাফা কম হবে ব'লে চাল মজুত রেখেছে, বিক্রয় করে নি। এই সময় থেকেই মানুষ একেবারে পশুর স্তরে নেমে গেল। নীতি, আদর্শ, সভ্যতার বড় বড় বুলি ঘরের তাকে তোলা রইল—মানুষ নির্লজ্জ ভাবে আত্মপরায়ণ হ'ল। সাহিত্যে এবং সাহিত্যিকদের জীবনেও তার অনুপ্রবেশ ঘটল—কারণ সাহিত্যিকেরাও ত সামাজিক মানুষ। অধিকন্তু তাদের উপর প্রভাব পড়ল পাশ্চাত্ত্য দেশের কয়েকজন চটুল এবং জড়বাদী সাহিত্যিকের লেখার। সে-সব লেখকের নাম উল্লেখ করার স্থান এ নয়। ১৯৪৫ সনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হ'ল বটে কিন্তু মানুষ যে নৈতিক অধঃপতনের স্তরে নেমে গিয়েছিল তার থেকে তারা আর উঠল না। এই সময় যারা তরুণ অর্থাৎ যারা বিংশ শতাব্দীর প্রথম বা দ্বিতীয় পাদে জন্মগ্রহণ করেছে, তাদের নৈতিক জীবন ঐ সময়ের আবহাওয়ায় রচিত এবং পুষ্ট হয়েছে। সে জীবনের নীতি আত্মপুষ্টি, আত্মত্যাগ নয়। বন্ধুবর নীরদ চৌধুরী তাঁর আত্মজীবনীতে (Autobiography of an Unknown Indian) যে কথা লিখেছেন তার সঙ্গে অধিকাংশ লোকের মতের মিল হবে না জানি, কিন্তু আমার মনে হয় তার মধ্যে গভীর সত্য আছে। তিনি লিখছেন—

"Thus we were acquiring and assimilating a culture at that stage of its ripeness which precedes decline. For this reason, we, who were born in the last quinquennium of the nineteenth century can claim to be the last of the old contemptibles, and I am fond of saying without wishing to be taken too literally that no one born after 1900 has any living, first hand sense of that modern Indian culture which was built up by the great Bengali reformers from Rammohun Roy to Tagore, and which is now decaying." (p. 179).

নীরদবাবুর মতে রাজা রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে ভারতীয় সংস্কৃতি গ'ড়ে উঠেছে, সেটা এমন একটা পরিপক্ব অবস্থায় পৌঁছেছিল যে, তার পরে তার অপহ্নব হতে বাধ্য। সেই কারণে যারা ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে জন্মগ্রহণ করেছে তারা সেই সংস্কৃতির সাক্ষাৎ এবং জীবন্ত স্পর্শ পায় নি। আমরা যারা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাঁচ বছরের পাদে জন্মেছি তারাই সেই সংস্কৃতির শেষ প্রতিনিধি। নীরদবাবু তাঁর বক্তব্যকে আরও পরিস্ফুট করেছেন এই কথাগুলি দিয়ে :

"This degradation of Bengal, is, of course, part of the larger process of the rebarbarisation of the whole of India in the last twenty years, a story which is as sensational and as ominous for human civilization, but not as well-known, as the story of the barbarisation of Germany by the Nazis. But somehow, one did not expect Bengal, with her record of cultural achievement in modern times, to follow in the wake of the rest of India, to which she had given a new culture. In actual fact, the barbarisation of Bengal has been ever more complete than the barbarisation of the rest of India."

আমাদের সময়ে সাহিত্যিকের কোন আদর ছিল না, বরঞ্চ শ্লেষ এবং বিদ্রূপ ছিল। আমি যখন মিরাটে রাস্তা দিয়ে যেতাম তখন লোকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে দেখাত, 'ঐ যে ছাহিত্যিক যাচ্ছেন'। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে গাঁটের কড়ি খরচ করে যোগ দিয়েছি এবং আহার বাসস্থানের সুপ্রচুর অসুবিধা ভোগ করেছি। সেদিন মিত্র ঘোষ কোম্পানীর এক বন্ধু খুব উচ্ছ্বসিতভাবে বললেন, ট্যাক্সি করে নিয়ে না গেলে

আমরা কোন সাহিত্য-সভায় সভাপতিত্ব করতে যাই নে মশায়। কলকাতার উপরেই এই ব্যবস্থা, মফঃস্বলের কথা ছেড়েই দিলাম। আর রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে সভাপতিত্ব করার লোকই পাওয়া যায় না, এ কথা ত হামেশাই সংবাদপত্রে পড়ি। বাড়িতে থেকেও সাহিত্যেকেরা দরজায় ঝুলিয়ে দেন 'Not at home' পতাকা তা-ও জানি। যুগ পালটেছে কিন্তু আমাদের সময় সাহিত্যের প্রতি যে দরদ এবং সাহিত্যিকদের মধ্যে যে ভালবাসা দেখেছি, আজ তার একান্ত অভাব অনুভব করি।

আমাদের সময়ে লেখার মান নির্ধারিত হ'ত মাসিক পত্রের মধ্যস্থতায়। 'প্রবাসী' এবং 'ভারতবর্ষে' লেখা বেরুলে তা নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হ'ত। এখন সে ফোকাস্ স'রে গেছে সাপ্তাহিক পত্রে এবং রবিবারের সাহিত্য বিভাগীয় লেখায়। "দেশ" কাগজে এবং "অমৃত" কাগজে লেখা বেরুলে তাই নিয়ে আলোচনা হয় এবং 'আনন্দবাজার' এবং 'যুগান্তরের' সাহিত্য আলোচনী বিভাগে লেখা ছাপা হলে পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আমাদের সময়ে পত্র-পত্রিকায় লেখা পাঠালে তার প্রাপ্তি সংবাদ আসত এবং লেখা অমনোনীত হলে ফেরত পাঠানর ব্যবস্থা ছিল। এখন স্বীকারপত্রীর কথা ছেড়েই দিলাম, ডাক টিকিট দেওয়া থাকলেও কোন লেখা ফেরত আসে না। মাসের পর মাস যায়, লেখা ছাপা হয় না, ছাপা হবে কি না বোঝা যায় না এবং অভিমন্যুর মত সে লেখার নিষ্কাশনের পথ রুদ্ধ। রিপ্লাই কার্ড দিয়েও উত্তর পাই নি, এমন ঘটনা আমার নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যেই আছে।

নবীন সাহিত্যিকদের প্রতি আমাদের বিন্দুমাত্র আক্রোশ নেই, বরঞ্চ অপরিসীম শ্রদ্ধা এবং স্নেহ আছে। তাঁদের সঙ্গে মিলতে গিয়েও ব্যর্থ হয়েছি। তার কারণ বয়সের বাধাই একান্ত নয়, আমরা আমাদের নিজেদের ধারণা এবং অভিজ্ঞতার দুর্গে বন্দী, এই ধারণা এবং অভিজ্ঞতা তাঁদের সঙ্গে মেলে না।

আর একটা কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আমাদের সময়ে কোন লেখক বা লেখিকা উল্লেখযোগ্য কোন লেখা লিখলে আমরা তাঁকে খুশী হয়ে অভিনন্দন জানাতাম। কারণ, তখন ঐ টুকুই ছিল ভাল লেখার পুরস্কার। অভ্যাসবশত এখনও কোন কোন লেখককে উপযাচক হয়ে তাঁদের ভাল লেখার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে থাকি। বলা বাহুল্য এর কোন উত্তর আসে না। তাঁরা সেটা তাঁদের প্রাপ্য বলেই গণ্য করেন—ফলে আমাদের লজ্জাই সার হয়।

এতক্ষণ যে দুই যুগে এবং দুই দলে বিভেদের কথা উল্লেখ করলাম তার অন্তর্নিহিত কারণ হ'ল পারিশ্রমিক দেওয়ার ব্যবস্থা। আমাদের সময়ে লেখা ছিল সখের—তাতে পয়সা আসত না—কাজেই বেশি লোকে এই নিয়ে মাথা ঘামাত না। এখন লেখা হয়েছে একটা উপার্জনের পন্থা—সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে এসেছে প্রতিযোগিতা। শুধু উপার্জন নয়, সেই সঙ্গে সম্মান এবং সরকারের দেওয়া পুরস্কার। অতএব প্রতিযোগিতা না এসে পারে না। অনেক লেখা পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়ে একেবারে পুস্তক প্রকাশকের দপ্তরে চলে যায় এমন ব্যবস্থাও হয়েছে শুনেছি। তার পর আছে সিনেমার প্রলোভন। আজকালকার দারুণ অনটনের দিনে এই দুর্নিবার লোভের হাত থেকে কয়জন অব্যাহতি পাবে? প্রতিযোগিতার পিছনে আছে বিদ্বেষ, সংঘর্ষ এবং হয়ত বা মৃত্যু। বাংলা দেশের সংস্কৃতি তার সাহিত্যকে এই অবাঞ্ছনীয় ঘোড়দৌড় এবং সাহিত্যিককে তার অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করুক, এই প্রার্থনা জানাই।
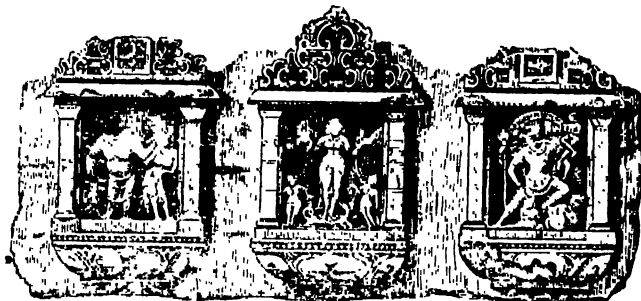
মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বিধবা-বিবাহে আপত্তি কেন করিয়াছিলেন ?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

১। একটা প্রবল জনশ্রুতি আছে যে, ঢাকার রাজা রাজবল্লভ বাংলা দেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলন মানসে বড় বড় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মত লইতে থাকিলে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইহার বিরোধিতা করেন। ফলে ইং অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে যে সমাজ-সংস্কার হইতে পারিত তাহা শতাধিক বৎসর পিছাইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এই আপত্তি ঈর্ষ্যা-প্রণোদিত; তিনি দেখিলেন যে, তিনি ব্রাহ্মণ ও সমাজ-পতি হইয়া যে কাজে হাত দিতে পারেন নাই, বৈদ্য (হঠাৎ বড়লোক তাঁহার তুলনায়) রাজা রাজবল্লভ সেই কাজ করিলে তাহার কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হইয়া যাইবে, এবং তাঁহার নিজের কীর্ত্তি ম্লান হইয়া যাইবে। আমরা তাঁহার আপত্তি ঈর্ষ্যা-প্রণোদিত, এ কথা বিশ্বাস করি না, তবে তাঁহার আপত্তি ভুলবশতঃ হইতে পারে। এক্ষণে দেখা যাউক, কেন তিনি বিধবা-বিবাহে আপত্তি করিয়াছিলেন? এ বিষয়ে কিছু demographic বা সমাজতাত্ত্বিক তথ্য পরিবেশন করিব।

২। কুমারী থাকিতে বিধবাকে বিবাহ করিতে সাধারণতঃ লোকে নারাজ। তবে যে লোকে বিধবা বিবাহ করে, তাহার কারণ অন্যরূপ। কতকটা ব্যক্তিগত রুচির উপর নির্ভর করে; কতকটা সামাজিক কারণে—যেমন স্ত্রীলোকের সংখ্যাল্পতা হইলে লোকে সাধারণতঃ কুমারী পায় না। ইউরোপীয় সমাজেও সাধারণতঃ কুমারী-বিবাহের প্রতি আকর্ষণ বেশী—যেখানে বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে কোনও প্রকার ধর্ম্মীয় বা সামাজিক আপত্তি বা বাধা নাই, যেখানে বিধবা-বিবাহ করিলে কেহ নিন্দিত হয় না। মুসলমান সমাজে বিধবা-বিবাহ খুব চল। হজরত মহম্মদ নিজে বিধবা-বিবাহ, এমন কি পুত্রবতী বিধবা বিবাহ করিয়াছিলেন। আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী মুসলমান সমাজে প্রায় সকল বিধবাই বিবাহ করেন। এ বিষয়ে ১৯২১ সনের বাংলার সেন্সাস রিপোর্টে কতকগুলি আবশ্যকীয় তথ্য দেওয়া আছে। (২৭৪-২৭৫ পৃঃ দেখুন।)

৩। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রীয় বলিয়া আন্দোলন চালান ও ইং ১৮৫৬ সনে বিধবা-বিবাহ আইন পাশ করান, তখন যাঁহারা বিধবা-বিবাহে আপত্তি করেন তাঁহাদের অন্যতম প্রধান যুক্তি ছিল যে, বাংলা দেশে বিবাহযোগ্যা কন্যার সংখ্যা বিবাহযোগ্য বরের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী। যে-সব নারী বিবাহের একবার সুযোগ পাইয়াছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিধবা হইয়াছে, তাহাদের পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার বা সুযোগ দিলে অনেক কুমারীই একবারও বিবাহ করিবার সুযোগ পাইবেন না, বাধ্য হইয়া অনূঢ়া থাকিয়া যাইবেন। ফলে সমাজে "অ"-বিবাহিতাদের সংখ্যা সমানই থাকিয়া যাইবে; এবং সমাজে অনাচারের বৃদ্ধি হইবে। বয়স্কা কুমারী অপেক্ষা বিধবারা, ইঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ সন্তানবতী, নিজেদের অধিকতর সংযত রাখিতে পারেন।

এই আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে প্রবল ছিল। ইং ১৮৭২ সনের সেন্সাস হইতে দেখিতে পাই যে, বাংলার হিন্দুসমাজে প্রতি ১,০০০ পুরুষে ১,০০০ জন করিয়া নারী ছিল। নারীর সংখ্যা বাঙালীদের মধ্যে আরও বেশী ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ উড়িষ্যা ও 'পশ্চিম' হইতে বহু হিন্দুপুরুষ কর্ম্মোপলক্ষে বাংলায় আসিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের স্ত্রীরা দেশে ছিল এবং ১৮৭২ সনের সেন্সাস আমাদের দেশে প্রথম সেন্সাস বলিয়া কিছু নারী গণনা হইতে বাদ পড়ার সম্ভাবনা বেশী।

নিম্নে আমরা সর্ব্ব-ধর্ম্মের যে সব লোক সেন্সাসের সময় বাংলা দেশে ছিল, বাংলার পল্লী-অঞ্চলে ছিল ও বাংলার স্বাভাবিক জনসংখ্যা, যাহারা বাংলায় জন্মিয়াছে কেবলমাত্র তাহাদের ধরিয়া হিসাব দিলাম:

প্রতি ১,০০০ পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা

	সর্ব্ব-ধর্ম্মের সেন্সাসের সময় থাকা	পল্লী-অঞ্চলে	স্বাভাবিক জন-সংখ্যা
১৮৭২	৯৯২	১,০০৭	×
১৮৮১	৯৯৪	১,০০৬	১,০১৩

ইহা হইতে মনে হয়. উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি স্বাভাবিক জনসংখ্যার মধ্যে, স্ত্রীলোকের অনুপাত ১০১৩-র ঢের বেশী ছিল। সমাজপতিরা তাহা লক্ষ্য করিয়া বিধবা-বিবাহে ঐরূপ আপত্তি করেন।

৪। ইংরেজী ১৯৩১ সনে প্রতি ১,০০০ পুরুষে

স্ত্রীলোকের অনুপাত কমিয়া নিম্নলিখিত মত দাঁড়াইয়াছিল। যথা :

সর্ব্ব-ধর্ম্মের লোকের মধ্যে	প্রতি ১,০০০ পুরুষে
সেন্সাসের রাত্রিতে	৯২৪
হিন্দুদের মধ্যে	৯০৮
বাংলার পল্লী-অঞ্চলে	৯৫৫
স্বাভাবিক জনসংখ্যায়	৯৪২

উহা হইতে মনে হয় যে, হিন্দুদের মধ্যে স্বাভাবিক জনসংখ্যায় : ৯৪২ − ৯২৪ = ১৮ + ৯০৮ = ৯২৬ জন

এই আন্দাজ কিছু কম-বেশী হইতে পারে। কম হইবার সম্ভাবনা বেশী।

বাংলা দেশে ১৯২১ সনের সেন্সাস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট টমসন সাহেব দেখাইয়াছেন যে, গড়ে স্বামী-স্ত্রীর বয়সের পার্থক্য ৮·০৩ বৎসর।

১৯৩১ সনে বয়স হিসাবে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা কেবলমাত্র হিন্দুদের মধ্যে এইরূপ ছিল। যথা :

বয়স	পুরুষ	স্ত্রীলোক
১৫—২৫	×	২২,২৮,৪৭৮
২০—৩০	২২,২১,১৬৩	২১,২০,৫৫৮
২৫—৩৫	২১,২০,৯০৭	×
১৭—২৩	×	১৫,২৫,০০৪
২৪—৩০	১৬,০৪,৭৭৪	×

স্বামী যদি স্ত্রী অপেক্ষা যথাক্রমে ৫, ৭ ও ১০ বৎসরের বড় হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের সংখ্যাধিক্য শতকরা হিসাবে যথাক্রমে +০·২৪ ; −৫·৯৭ ও +৫·০৭ হয়। এই হিসাব সেন্সাসের রাত্রিতে যত সংখ্যক হিন্দু পুরুষ ও স্ত্রী ছিল তাহাদের ধরিয়া ; এমতে স্ত্রীলোকের হাজার করা অনুপাত যখন ৯০৮ তখনই বিবাহযোগ্য বয়সের পুরুষ ও স্ত্রীদের ঐরূপ স্ত্রীলোকের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়।

এইবার আমরা ইং ১৯২১ সনের হিসাব দিব, যখন হিন্দুদের মধ্যে সেন্সাসের রাত্রিতে হাজার পুরুষে ৯১৬ জন স্ত্রীলোক ছিল। যথা :

বয়স	পুরুষ	স্ত্রীলোক
১০—১৫	×	৯,৩৮,৪৬১
১৫—২০	১০,০৫,৮৮৭	১০,৩১,৬২১
২০—২৫	৯,৩৪,৫১৬	৯,৭৫,৮১৬
২৫—৩০	১০,৭৯,৫৩৫	×
৩০—৩৫	৯,১৪,২৩৬	

স্বামীর বয়স স্ত্রী অপেক্ষা ৫, ১০ ও ১৫ বৎসর বেশী হইলে নিম্নলিখিত মত কম-বেশী হয়। যথা :

স্ত্রীর বয়স	স্বামীর বয়স স্ত্রী অপেক্ষা ৫	১০	১৫ বছর বেশী
১০—১৫	−৬·৭৬%	+০·৪২%	−১৩·১৫%
১৫—২০	+১০·৩৭%	−৪·৪৪%	+১২·৯১%
২০—২৫	+৯·৬৩%	−৬·৭৮%	×

এইরূপ কম-বেশী হইবার কারণ, ইং ১৯১৮ ও ১৯১৯ সনের ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে পুরুষ অপেক্ষা বিবাহযোগ্যা বয়সের স্ত্রীলোক বেশী মারা যায়। আরও একটি কারণ, স্ত্রীলোক যখন বিবাহযোগ্যা হয়, তখন তাহাদের বয়স কম করিয়া বলা হয়। এক কথায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা সামান্ত কিছু বেশী।

৫। হিন্দু-সমাজে বিবাহযোগ্যা স্ত্রীলোকের সংখ্যা বিবাহযোগ্য পুরুষ অপেক্ষা এখনও কিছু বেশী ধরিয়া লইতে পারি। ইং ১৮৮১ সনে স্বাভাবিক জনসংখ্যার মধ্যে নারীর অনুপাত ছিল ১০১৩ ; আর ১৯৩১ সনে হইতেছে ৯৪২। ৫০ বছরে ১০১৩ − ৯৪২ = ৭১ জন কমিয়াছে। আমরা Man in India পত্রিকায় ১৯৫৭ সনের এপ্রিল-জুন সংখ্যায় দেখাইয়াছি যে, পূর্ব্বে নারীর অনুপাত কম ছিল। আমরা যদি বর্ত্তমানে যে হারে নারীর অনুপাত কমিতেছে পূর্ব্ববর্ত্তী ১২৫ বছরেও সেই হারে কমিয়াছে ধরি, তাহা হইলে আন্দাজ ইং ১৭৫৬ সনে নারীর অনুপাত হয় ৮৩৬ জন। সেন্সাসের রাত্রিতে যত স্ত্রী ও পুরুষ ছিল, তাহাদের ধরিয়া হিসাব করিলে এই অনুপাত ৮৩৬-এর স্থলে ৮১৯ হইবে।

সাধারণ হিন্দুর মধ্যে যখন নারীর অনুপাত ৯০৮ জন ; বাংলার রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনুপাত হইতেছে ৯৬০ জন ; অর্থাৎ ৫২ জন বেশী। এই বেশীটা যদি ১৭৫৬ সনের লব্ধ অনুপাত ৮৩৬-এতে যোগ দিই, তাহা হইলে ঐ সময়ে রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের মধ্যে স্ত্রীলোকের অনুপাত প্রতি ১,০০০ পুরুষে ৮৮৮ জন, প্রায় বর্ত্তমানের সর্ব্বসাধারণ হিন্দুদের মধ্যে অনুপাত ৯০৮-এর কাছাকাছি।

এজন্য সে সময়েও রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিবাহযোগ্যা নারীর সংখ্যা যে বিবাহযোগ্য পুরুষ অপেক্ষা বেশী ছিল সহজেই অনুমান করা যায়।

৬। পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের অনুপাত পুরুষদের তুলনায় কম হইলেও আমরা যত কম ধরিয়াছি তত কম নাও হইতে পারে। ১১৭৬ সনের মন্বন্তরে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষ বেশী মরিয়াছে—যেমন সাধারণ দুর্ভিক্ষে হয়,

ধরিয়া লইলেও মন্বন্তরের পরের ১৫ বৎসর ধরিয়া দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যা, মড়ক প্রভৃতিতে স্ত্রী-পুরুষ কি হারে মরিয়াছে বলা দুষ্কর। বন্যায় স্ত্রীলোক সাঁতার জানে না বলিয়া বেশী মরিতে পারে; খাইবার দোষে যে মড়ক হয় তাহাতে স্ত্রীলোক বেশী মরে, একথা সত্য হইলেও ঠিক কি হারে মরিয়াছে এবং তজ্জন্য অনুপাতের কি ভাবে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল বলা বড় শক্ত।

৭। একটি কারণে মনে হয় যে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে স্ত্রীলোকের অনুপাত বেশ বেশী ছিল। বাংলা দেশে বিধবা-বিবাহ চলিত; এমন কি পুত্রবতী বিধবারাও বিবাহ করিতেন; এজন্য জীমূতবাহন (আন্দাজ ইং ১০৫০ সনে) তাঁহার দায়ভাগের ১০ম অধ্যায়ে পোষ্য-পুত্রের অধিকার আলোচনাকালে বলিয়াছেন;—

"যিনি যাঁহার বীজ হইতে উৎপন্ন তিনি তাঁহার ধন পাইবেন—অপরে পাইবেন না। নারদ বলেন যদ্যপি দুই পিতার ঔরসজাত দুই পুত্রের মধ্যে মাতার ধন লইয়া বিবাদ হয়, তাহা হইলে যাহার পিতা যে ধন দিয়াছেন তিনি সেই ধন পাইবেন, অপরে পাইবেন না।" এ বিষয়ে বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন।

সমাজে পুত্রবতী বিধবাদের বিবাহ প্রচলিত না থাকিলে এইরূপ ধন বণ্টনের প্রয়োজন অনুভূত হইত না। এইরূপ বিবাহ হইত; তজ্জন্য জীমূতবাহন উপরোক্তরূপ ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হন।

বিধবা নাবালক শিশুপুত্র লইয়া পুনরায় বিবাহ করিলে সেই শিশুপুত্র-সহ তাঁহার দ্বিতীয় স্বামীর ঘর করা স্বাভাবিক। এইরূপ বিধবার প্রথম স্বামীর ঔরস-জাত পুত্র তাঁহার দ্বিতীয় স্বামীর পুত্রদের সহিত একত্রে বাস করিবে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যু হইলে তাঁহার ঔরসজাত পুত্রগণের সহিত বিধবার প্রথম স্বামীর ঔরসজাত পুত্র সম্পত্তির কোন অংশ বা মাসহারা পাইবে কি না। শূদ্রদের বেলায় অবরুদ্ধা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রগণ কিছু অংশ পায়। এরূপ অবস্থায় উপরোক্তরূপ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। ইহারই নিরাকরণার্থে দায়ভাগ-কার পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

নব্য-স্মৃতির প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দন তাঁহার অষ্টাবিংশতি-তত্ত্বের অন্যতম দায়তত্ত্বে পূর্ব্বোক্ত জীমূতবাহনের ব্যবস্থা উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বহাল রাখিয়াছেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক। এমতে আমরা তাঁহাকে ইং ১৫০০ সনের লোক বলিয়া ধরিতে পারি।

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার আন্দাজ ইং ১৭০০ সনের লোক। তিনি তাঁহার দায়ক্রম সংগ্রহে বিভিন্ন পিতার ঔরসজাত একই মাতার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে ধনবিভাগ সম্বন্ধে আরও বিশদ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সমাজে বিধবা-বিবাহ, তথা পুত্রবতী বিধবা-বিবাহের যথেষ্ট চল না থাকিলে জীমূতবাহনের সময় হইতে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের সময় পর্য্যন্ত সাতশত বৎসর ধরিয়া ব্যবহার শাস্ত্রে এইরূপ ধন বিভাগের ব্যবস্থা থাকিত না।

কিন্তু জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রণীত বিবাদ-ভঙ্গার্ণব সেতুতে (ইং ১৭৯৭ সালে) এইরূপ ব্যবস্থার অনুল্লেখ হইতে মনে হয় যে, এই সময়ে বিধবা-বিবাহ আদৌ হইত না—সেজন্য তর্কপঞ্চানন মহাশয় এ বিষয়ে কিছু লিখেন নাই। সমাজ-ব্যবস্থার সহিত ব্যবহার শাস্ত্রের কিছুটা time lag বা আগুপাছু থাকা সম্ভব। সেজন্য মনে হয় ইং ১৭০০ সনের পূর্ব্ব হইতেই বিধবা-বিবাহের সংখ্যা কমিতেছিল এবং মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় আদৌ চালু ছিল না। দেড়শত, দুইশত বৎসর বিধবা-বিবাহ বন্ধ থাকার ফলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময়ে এরূপ সন্দেহ লোকের মনে হয় যে, বিধবা-বিবাহ আদৌ আইন-সঙ্গত কি না। এজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু চেষ্টায় ইং ১৮৫৬ সনে বিধবা-বিবাহ আইন পাশ করান। ঐ আইনের Preamble-এ বা সূচনায় আছে:—

"Whereas it is known, that by the law as administered in the Civil Courts established in the territories in the possession and under the Government of the East India Company, Hindu widows, with certain exceptions, are held to be, by reason of their having been once married, incapable of contracting a second valid marriage, and the offspring of such widows by any second marriage are held to be illegitimate and incapable of inheriting property, etc., etc."

এই বিধবা-বিবাহ, এমন কি অক্ষতযোনি বাল-বিধবারও বিবাহ বন্ধ হওয়ার হেতু কি? এক সমাজপতিগণের আপত্তি; আর স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী হওয়ায়, যখন বিবাহের জন্য কুমারীই সহজে পাওয়া যায়, তখন কেন বিধবা-বিবাহ করিব? আমাদের মনে হয় শেষোক্ত কারণেই বিধবা-বিবাহ কমিতে কমিতে একেবারে লোপ পাইয়াছিল; কারণ সমাজপতিগণ

হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রে ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও যে এইরূপ আপত্তি করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণের অভাব। এ বিষয়ে জনশ্রুতি পর্য্যন্ত নাই।

৮। এই নারীর অনুপাতের কমতিতে পূর্ব্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে প্রভেদ আছে। বর্ত্তমানে (ইং ১৯৩১ সনে) বাংলার সর্ব্বধর্ম্মের লোকদের মধ্যে ও হিন্দুদের মধ্যে অঞ্চলভেদে নারীর অনুপাত এইরূপ। যথা:

	সর্ব্বধর্ম্ম	হিন্দু
বাংলা	৯২৪	৯০৯
পশ্চিমবঙ্গ	৯৪২	৯৪৪
মধ্যবঙ্গ	৮৪৬	৮২৬
উত্তরবঙ্গ	৯২১	৮৯৬
পূর্ব্ববঙ্গ	৯৫৭	৯৫২

পশ্চিমবঙ্গে ও মধ্যবঙ্গে নারীর অনুপাত খুব কম হইবার কারণ, বাহির হইতে বহু পুরুষ কলিকাতা ও তৎ-সন্নিহিত ২৪ পরগণা, হাওড়া ও হুগলী জেলার কল-কারখানায় কাজ করিবার জন্য, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য আসিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ বা বর্দ্ধমান বিভাগ হইতে হাওড়া ও হুগলী জেলা বাদ দিয়া এবং মধ্যবঙ্গ বা প্রেসিডেন্সী বিভাগ হইতে ২৪পরগণা জিলা ও কলিকাতা বাদ দিয়া হিসাব করিলে দেখা যায় যে, প্রতি ১,০০০ পুরুষে নারীর অনুপাত এইরূপ:

বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর	৯৭৪
নদীয়া, মুর্শিদাবাদ যশোহর ও খুলনা	৯৪৬
উভয়কে একত্র করিয়া যে "পশ্চিমবঙ্গ"	৯৬৫

ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ লইয়া যে পূর্ব্ববঙ্গ তাহা অপেক্ষা নারীর অনুপাত ৯৬৫—৯৫২ = ১৩ বেশী।

ইংরেজী ১৮৮১ সনে যখন কল-কারখানা সবে শুরু হইয়াছে, বহিরাগতদের সংখ্যা এত বেশী হয় নাই, তখনকার নারীর অনুপাত হইতেছে:

পশ্চিমবঙ্গ	১,০৫০	গড় ১০০৬ পূর্ব্ববঙ্গের সহিত পার্থক্য = ৪৯
মধ্যবঙ্গ	৯৬১	
উত্তরবঙ্গ	৯৭৩	
পূর্ব্ববঙ্গ	৯৫৭	

পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের নারীর অনুপাত পূর্ব্ববঙ্গ অপেক্ষা ঢের বেশী।

এমতে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় (ইংরেজী ১৭৫৬ আন্দাজ) যখন সমগ্র বঙ্গে আমাদের পূর্ব্ব অনুমান অনুযায়ী নারীর অনুপাত ৮৩৬ ছিল, তখন পশ্চিমবঙ্গে বা মধ্যবঙ্গে নারীর অনুপাত ৮৩৬ অপেক্ষা ঢের বেশী ছিল; আর পূর্ব্ববঙ্গে ছিল কম। আন্দাজে-মৌজে হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে অনুপাত ৮৩৬+২৫ = ৮৬১; আর পূর্ব্ববঙ্গে ৮৩৬—২৫ = ৮১১।

৯। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি স্বসমাজে রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের মধ্যে ১০০০ পুরুষে ৯৬০ জন স্ত্রীলোক (বর্ত্তমানের হিসাবে) বা ৮৮৮ জন (আমাদের হিসাব অনুযায়ী) দেখিলেন। রাজা রাজবল্লভ জাতিতে বৈদ্য—তিনি স্বসমাজে বৈদ্যদের মধ্যে ১০০০ পুরুষে ৯২২ জন স্ত্রীলোক (বর্ত্তমানের হিসাবে) বা (পূর্ব্বের অনুরূপ হিসাবে ৮৩৬+৯২২−৯০৮ = ৮৫০ জন) দেখিলেন।

মহারাজার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল পশ্চিমবঙ্গে ও মধ্যবঙ্গে, রাজবল্লভের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল পূর্ব্ববঙ্গে। আন্দাজে-মৌজে হিসাবে পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গে যেখানে স্ত্রীলোকের অনুপাত ৮৮৮+২৫ = ৯১৩ জন, পূর্ব্ববঙ্গে সেখানে অনুপাত ৮৫০ − ২৫ = ৮২৫ জন।

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করিয়া রাঢ়ী শ্রেণী ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিবাহযোগ্যা বয়সের স্ত্রীলোকের আধিক্য; আর পূর্ব্ববঙ্গে বৈদ্যদের মধ্যে বিবাহযোগ্যা বয়সের স্ত্রীলোকের সংখ্যাল্পতা। এই সংখ্যাল্পতা বা সংখ্যা-গরিষ্ঠতা কিরূপ ছিল, তাহা নিম্নের হিসাব হইতে বুঝা যাইবে। আমরা বর্ত্তমানে বিভিন্ন বয়সের যেরূপ লোক আছে সে সময়ে সেইরূপ ছিল ধরিয়া লইয়াছি।

	অনুপাত ৯০৮		অনুপাত ৯১৩		অনুপাত ৮২৫	
বয়স	পুরুষ	স্ত্রীলোক	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
১৫-২৫		২২,২৮		২২,৪০		২০,২৮
২০-৩০	২২,২১	২১,২১	২২,২১	২১,৩৩	২২,২১	১৭,২৮
২৫-৩৫	২১,২১		২১,২১		২১,২১	

সামাজিক পরিবেশ যদি উক্তরূপ হয় বা উহার কাছাকাছিও হয় তাহা হইলে যেখানে কৃষ্ণচন্দ্রের বিধবা-বিবাহে আপত্তি হইবে, রাজবল্লভের বিধবা-বিবাহের অনুকূলে মত হইবে। দুই জনেরই উদ্দেশ্য সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা। পূর্ব্ববঙ্গে যে নারীর সংখ্যাল্পতা বিশেষ ছিল, তাহা ব্রাহ্মণদের "ভরার মেয়ে" বিবাহ হইতে সহজেই অনুমান করা যায়। এ সম্বন্ধে আরও বিশদ অনুসন্ধান ও আলোচনা হওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করি। বিশেষ করিয়া মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় সমাজপতিকে ঈর্ষ্যা-দুষ্ট বলিবার আগে।

হরতন

শ্রীবিমল মিত্র

১

এই সবে আরম্ভ হ'ল। এই কেষ্টগঞ্জ থেকেই আরম্ভ হ'ল হরতনের গল্প। একদিকে হরতন আর কর্ত্তামশাই, কর্ত্তামশাই আর বড়গিন্নী, আর একদিকে দুলাল সাহা আর নতুন বৌ-এর গল্প। আর তাছাড়া এ জগদীশ ডাক্তারেরও গল্প বটে। সবাই একলাই এসেছিল এখানে একদিন। একলাই সবাই এসেছিল আর কেষ্টগঞ্জে এসেই এ-গল্পের সব চরিত্র একদিন একাকার হয়ে গিয়েছিল। এই কর্ত্তামশাই, হরতন, বড়গিন্নী, দুলাল সাহা, নতুন-বৌ আর জগদীশ ডাক্তার। এ তাদেরই গল্প।

বলতে গেলে কর্ত্তামশাই-ই কেষ্টগঞ্জের আদি লোক। আদি এবং অকৃত্রিম। সাতপুরুষ আগেকার খবর কর্ত্তামশাই-এর জানা নেই। কিন্তু তার পরের খবর আগে সকলকে ধ'রে ধ'রে শোনাতেন।

কর্ত্তামশাই বলতেন—তোমরা তখন জন্মাওনি হে, আমরাও তখন জন্মাইনি, এ সেই যুগের কথা—

কথা বলতে গেলে কর্ত্তামশাই-এর আর তালজ্ঞান থাকত না। আদি কুলুজি ধ'রে টান দিতেন। আদিশূর কবে একদিন কাদের এনে বসতি করিয়েছিলেন এই গৌড়-বাংলায়। এ-বংশের মূল ছিলেন সেই ধর্ম্মদাস দেবশর্ম্মণঃ। তখন ইছামতী এইরকম ছিল নাকি? রাজ-পুরোহিত তিনি। তাঁর খাতিরই ছিল আলাদা। হাতীতে চ'ড়ে রাজবাড়ী যেতেন। প্রতিদিন তাঁর বরাদ্দ ছিল একশ' আটটি পদ্মপাতা। একশ' আটটি পদ্মপাতার ওপর নৈবেদ্য সাজিয়ে তিনি তাঁর গৃহ-বিগ্রহ সিংহ-বাহিনীর পুজো করতেন। তার পর রাজবাড়ীতে গিয়ে সুরু হ'ত ধর্ম্মালোচনা। রাজা শুনতেন, পাত্র-মিত্ররা শুনতেন। রাত্রে ভাগবত পাঠ হ'ত। সেই ভাগবত-পাঠ হবার সময়ই একদিন এক কাণ্ড হ'ল।

—কি কাণ্ড কর্ত্তামশাই?

যারা গল্প শুনত তারা অনেকবার শুনেছে ঘটনাটা। গৌড়েশ্বরের বুকটায় হঠাৎ কেমন একটা ব্যথা ক'রে ওঠে। আর তার পর থেকেই রাজ্যের দুর্দ্দশা সুরু হয়। তার পর যুদ্ধ-বিগ্রহ মড়ক-মহামারী অতিক্রম ক'রে কেমন ক'রে কেষ্টগঞ্জের ভট্টাচার্য্য-বংশ আবার ধনে-জনে বিলাসে-বৈভবে ভ'রে উঠেছিল কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য্য পর্য্যন্ত, সে-গল্পও সবাই শুনেছে অনেকবার। সেই কেদারেশ্বরের একমাত্র বংশধর কর্ত্তামশাই। এই কীর্ত্তীশ্বর ভট্টাচার্য্য। এ-গল্পের প্রধান বাহন।

আগে কীর্ত্তীশ্বর ভট্টাচার্য্যের শ্রোতা ছিল। তখন সন্ধ্যেবেলা আসর বসত বৈঠকখানায়। পান, তামাক, দোক্তা, পিকদানী থাকত। টানা-পাখা, আতরদান, দীপক-বাতি। সবই থাকত। এখন আর সে-সব কিছু নেই। কীর্ত্তীশ্বর ভট্টাচার্য্য এখন আরও বুড়ো হয়ে পড়েছেন। নেহাৎ নাক দিয়ে নিঃশ্বাস পড়ছে এখনও, তাই বেঁচে আছেন বলা চলে। শুধু খড়মটা টেনে টেনে এখনও এসে বসেন ফরাসটার ওপর। তাও বিকেলের দিকে। একটু সন্ধ্যের আবছায়া নামতেই উঠে পড়েন। উঠে গিয়ে নিজের ঘরের পালঙ্‌টার ওপর শুয়ে পড়েন। আর হাঁপান। হাঁপানি ঠিক নয়। আর হাঁপানি হলেই বা কি করছেন! উপায় ত কিছু নেই? কোনও রকমে ক'টা দিন কাটিয়ে দিতে পারলেই বেঁচে যান।

হঠাৎ কার যেন পায়ের শব্দ হ'ল। বড়গিন্নী নাকি

—কে?

সেই সে-যুগের রাশভারি গলাটা তখনও ছিল। আগে গলার শব্দে রাস্তা দিয়ে চলতে ভয় হ'ত লোকের। আর তাছাড়া আগে 'কে' ব'লে ডাকলে সাড়া দেবার লোকও ছিল আশে-পাশে। হুকুম তামিল করবার হুকুম-বরদার ছিল। লোকে মানত। সুখে-দুঃখে বিপদে-আপদে কর্ত্তামশাই-এর কাছে পরামর্শ চাইতে আসত। আগে তাঁর ডাকে সাড়া না দিলে চাবুক খেতে হ'ত দেউড়ির দারোয়ানের কাছে। এখন আর সে-সব নেই। বন-জঙ্গল হয়ে গেছে চারদিকে। কাল-কাসুন্দির বন হয়ে গেছে সব জায়গায়। হাঁটা-চলা নেই। লোকজনের আনাগোনা নেই। যেন ভূতের বাড়ী হয়েছে ভট্‌চার্য্যি-বাড়ী। লোকে বলতো—হবে না, পুরুত-গিরি করতে এসে রাজা হয়ে বসলো। এ কী কপালে

সয়? একটা ছেলে ছিল। কীর্ত্তীশ্বর নিজের নামের ছন্দ মিলিয়ে তার নাম রেখেছিলেন সিদ্ধেশ্বর। কর্ত্তা-মশাই ডাকতেন—সিধে ব'লে। ভেবেছিলেন সিদ্ধেশ্বর বড় হয়ে মানুষ হবে।

—কে?

—আমি!

—ও! আমি ভাবলুম···

কী ভাবলেন কর্ত্তামশাই কে জানে! সেটা আর মুখে উচ্চারণ করলেন না। বড় গিন্নী একেবারে বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন—তেল গরম করে এনেছিলুম—

—দাও, দিচ্ছ দাও, তবে ও আর ভাল হবে না।

ব'লে বুকের ওপর হাত বোলাতে লাগলেন কর্ত্তা-মশাই। রোজ শেষ রাত্রের দিকে কেমন যেন একটা টান ধরে বুকে। বড় গিন্নী রোজই এই সময়ে আসেন। সরষের তেল গরম ক'রে বুকের ওপর মালিশ ক'রে দেন। তারপর যখন অন্ধকার হয়ে আসে তখন দেয়াল-গিরিটা জ্বেলে দেন। তেল মালিশ করাতে করাতে অনেক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েন কর্ত্তামশাই। নাক ডেকে ওঠে। হয়ত স্বপ্ন দেখেন। সেই সব আগেকার দিনের স্বপ্ন। হঠাৎ যেন তাঁর চোখের সামনে হাজার ঝাড়ের বাতিগুলো জ্ব'লে ওঠে। আবার গৌড়েশ্বরের রাজ-পুরোহিত ধর্ম্মদাস ভট্টচার্য্যির একশ' আটটা পদ্মপাতার ওপর গৃহ-বিগ্রহের পুজোর নৈবেদ্য থরে থরে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আবার শাঁখ বেজে ওঠে অন্দরমহলে। ছেলে হয়েছে। ছেলে হয়েছে। কেদারেশ্বর ভট্টচার্য্যির বংশের একমাত্র শিবরাত্রির সলতে। আবার কেষ্টগঞ্জের ঘাটে এসে নৌকো লেগেছে। কাশী থেকে এসেছেন শিরোমণি বাচস্পতি। পাইক-পেয়াদারা দৌড়ে গিয়েছে পাল্কী নিয়ে। পাল্কীতে ক'রে তিনি এলেন রাজবাড়ীতে। বিরাট্ পণ্ডিত। কাশীর রাজার পণ্ডিত। কেদারেশ্বর তাঁকেই ডেকে পাঠিয়েছেন ছেলের কোষ্ঠী গণনা করতে। তিনি জন্মপত্রিকা তৈরি করলেন। তারপর পাঠ। জাতকের কর্কটে বৃহস্পতি, লগ্নে চন্দ্র। এতচ্ছকীয় সৌরচৈত্রস্য পঞ্চমদিবসে সোমবাসরে অমাবস্যায়াংতিথৌ শুভযোগে চতুষ্পাদকরণে পূর্ব্বভাদ্রনক্ষত্রান্বিতে কুম্ভরাশৌ মঙ্গলস্য দ্বাদশাংশে যামার্দ্ধে অশেষগুণালঙ্কৃত-পবিত্র-ব্রাহ্মণকুলোদ্ভবস্য শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহোদয়স্য শুভাভিনব প্রথম কুমারঃ জাতঃ। শুভমস্তু!

কেদারেশ্বর তবু কিন্তু বুঝতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন—কেমন দেখলেন পণ্ডিত মশাই?

কাশীর রাজার পণ্ডিত শিরোমণি বাচস্পতি। সংস্কৃত শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান। বললেন—এই সন্তান আপনার বংশের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করবে। তবে চতুঃষষ্টি বৎসর বয়ক্রম কালে রাহুর দশা পড়বে। নীচ জাতীয় লোকের সংস্পর্শে সমূহ ক্ষতি, জাতককে সতর্ক থাকতে হবে—ওই বয়েসেই যা কিছু অনিষ্ট হবার আশঙ্কা আছে।

—কীসে অনিষ্ট রোধ হবে?

শিরোমণি বাচস্পতি বললেন—সে বহুদিন পরের কথা, তখন অবস্থা বিবেচনা ক'রে ব্যবস্থা করলেই চলবে।

কেদারেশ্বর আবার জিজ্ঞেস করেছিলেন—আর আয়ু? পরমায়ুর কথা বললেন না তো?

শিরোমণি বাচস্পতি বললেন—জাতক দীর্ঘায়ু।

কিন্তু সে তো চৌষট্টি বছর আগেকার কথা। তখন ভট্টাচার্য্য বংশের ধন-দৌলতের প্রাচুর্য্য ছিল। সেই কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য্যের একদিন কাল হ'ল। তখন কীর্ত্তীশ্বর শিশু। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব পরিজন-গলগ্রহে পূর্ণ ছিল যে বাড়ী তা ধীরে ধীরে একদিন নির্জ্জন হয়ে এল। কীর্ত্তীশ্বর বিয়ে করেছিলেন। সন্তানও হয়েছিল। প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের পুনরাবির্ভাব হবার আশাও ছিল। কিন্তু হয়নি তা। কেষ্টগঞ্জের বাজার যে আজকে ধনে-জনে মানুষ-জনের আনাগোনায় এমন গম্ গম্ করবে তা তখনকার দিনে কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। অথচ তাই-ই সম্ভব হয়েছে। এদিকটা দিনে দিনে নির্জ্জন, নিরিবিলি, নিঃশব্দ, নিরানন্দ হয়ে উঠেছে, আর ওই বাজারের দিকটা কেবল দিনের পর দিন আরো সশব্দ, আরো সৌখীন, আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে। আগেকার দিনে বাজারে চার-পাঁচটা দোকান ছিল। একটা মুড়কি-বাতাসার, একটা মাটির হাঁড়ির, একটা পাটের আড়ত। এমনি খুচরো কয়েকটা দোকান টিম্-টিম্ ক'রে চলত। ওদিকে খেয়াঘাটে নৌকো এসে ভিড়ত ব্যাপারীদের। ধান, চাল, বাঁশ, মাটির হাঁড়ি-কুঁড়ি আর খড়ের নৌকো। কোথায় কত দূরে যে সে-সব চালান যেত তার ঠিক-ঠিকানা কেউ রাখত না। কীর্ত্তীশ্বরও সে-সব নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। নায়েব-গোমস্তা ছিল, তারাই সে-সব খবর দিত। তাই তখন সব খবর কানে আসত। আজকাল আর কিছুই জানতে পারেন না তিনি। নায়েব গোমস্তা কেউই নেই। শুধু আছে নিবারণ। তা নিবারণও বুড়ো হয়ে গেছে। তারও চোখে ছানি পড়েছে।

নিবারণ দিনান্তে একবার ক'রে আসে। ফরাসের সামনে একবার দাঁড়িয়ে দ্বিধা করে।

—কিছু বলবে ?

নিবারণ বলে—বলছিলুম, বাঁওড়টা জমা দেওয়ার কথা !

—কোন্ বাঁওড় ?

—হুজুর, পেঁপুলবেড়ের দরুণ বাঁওড় !

—কে জমা নেবে ?

নিবারণ একটু ভয়ে ভয়ে মাথা নিচু করলে।

বললে—আজ্ঞে হুজুর, দুলাল সাহা—

বারুদের মুখে দেশলাই পড়লেও বুঝি এমন শব্দ ক'রে ফেটে ওঠে না। দুলাল সাহার নামটার মধ্যেই বুঝি বারুদ লুকিয়ে ছিল। আর তর্ সইল না। সঙ্গে সঙ্গে একেবারে দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠলেন কীর্ত্তীশ্বর।

—এখনও বুঝি সব খেয়েও আশ মেটেনি নির্ব্বংশের বেটার ! এখনও গরম মেটেনি। আরো খেতে চায় ?

নিবারণ কী বলবে বুঝতে পারলে না। হুজুরের সামনে দাঁড়িয়ে থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল।

—যাও, সামনে থেকে দূর হয়ে যাও—

নিবারণ আর এক মুহূর্ত্ত সামনে দাঁড়াতে সাহস পেলে না। তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে কানের খাঁজে রাখা কলমটা ফস্ ক'রে মেঝের ওপর প'ড়ে গেল। সেটা কুড়িয়ে নিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল নিবারণ। তারপর বাইরের বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সোজা একেবারে একতলায় কাছারিঘরে এসে ঢুকল।

নিতাই বসাক তক্তপোশের ওপর হাঁ ক'রে ব'সে মিনিট গুণছিল, আর মাঝে মাঝে হাতঘড়িটা দেখছিল। নিবারণ ঘরে ঢুকতেই মুখ দেখে ব্যাপারটা বুঝতে পারলে।

বললে—কী হ'ল ? কী বললেন কর্ত্তামশাই ?

নিবারণের সাহস হল না সত্যি কথাটা বলতে। তক্তপোশটার ওপর ক্যাশ্-বাক্সটার সামনে এসে ব'সে হাঁপাতে লাগল। বললে, না বসাক মশাই, কর্ত্তামশাই রাজী হলেন না।

—তব্ কী বললেন তিনি ? খুব ক্ষেপে গেলেন ?

নিবারণের হয়েছে জ্বালা। নিতাই বসাককেও চটাতে পারে না, কর্ত্তামশাইকেও চটাতে পারে না। দুকুল বজায় রেখে চলতে হয় তাকে। আজ পনেরো বছর ধ'রে এমনি চালাতে হচ্ছে। অর্থাৎ সেই যেদিন কেষ্টগঞ্জের বাজারে দুলাল সাহা এসে আড়ত খুলেছে, সেই দিন থেকেই।

—তাহলে আমি সাহাবাবুকে ওই কথাই গিয়ে বলি, যে সাহাবাবুর নাম শুনেই কর্ত্তামশাই ক্ষেপে গেলেন ? বলি গিয়ে ওই কথা ?

নিবারণ তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো—না, না, বসাক মশাই, ও-কথা বলবেন না, কর্ত্তামশাই-এর এখন শরীরটে একটু খারাপ, তাই বললেন পরে বিবেচনা ক'রে দেখবেন, আপনি একটু সা'বাবুকে বুঝিয়ে বলবেন আজ্ঞে, যেন কিছু না মনে করেন—

নিতাই বসাক বাজে কথা বলবার লোক নয় অত। তারও সময়ের দাম আছে। সেই পনেরো বছর আগে যখন দুলাল সাহা বলতে গেলে রাস্তার ভিখিরি ছিল, অর্থাৎ রাস্তায় ঘুনসী ফিরি করে বেড়াতো, তখন থেকেই নিতাই বসাক দুলাল সাহাকে চিনতো। কতদিন দুলাল সাহার ভাত জোটেনি কপালে। দুটো মুড়ি চিবিয়ে ইছামতীর জল আঁজলা ক'রে খেয়ে তেষ্টা মিটিয়েছে। সেই নিতাই বসাকই দুলাল সাহাকে মতলব দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে এত বড় করিয়েছে। এই কেষ্টগঞ্জের বাজারে পাটের আড়ত খুলিয়েছে দুলাল সাহাকে দিয়ে। পাট থেকে তিসি, তিসি থেকে ধান। শেষকালে এবার চিনির কলও খুলতে চায়। সুগার মিল। পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়টা পেলে দুলাল সাহার একেবারে মনস্কামনা পূর্ণ হয় বোধহয়। এত পেয়েও আশা মেটেনি বেটার। এত খেয়েও পেট ভরে নি।

—কিন্তু একটা কথা আজকে তোমাকে ব'লে যাচ্ছি নিবারণ, ও বাঁওড় আমরা নেবোই।

নিবারণ হাঁ হয়ে রইল। তারপর সামলে নিয়ে বললে—আপনি রাগ করেন কেন বসাক মশাই, খামোকা রাগ করেন কেন ?

—রাগ করবো না ? ভাল মানুষের মত একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলুম, তা ত তোমার কর্ত্তামশাই শুনলেন না, শুনলে তোমার কর্ত্তামশাইয়ের ভালই হ'ত, এই অভাব-গণ্ডার দিনে দুটো কাঁচা টাকার মুখ দেখতে পেতেন, তা যখন তাঁর ইচ্ছে নয়, তখন আমরাও কী ব্যবস্থা করতে হয় তা জানি—

নিতাই বসাক উঠে যায় যায় প্রায়।

নিবারণ প্রায় শেষ চেষ্টার সুরে বললে—আপনি যেন এ-সব কথা আবার সা'বাবুর কানে তুলবেন না দয়া ক'রে, আমি নাহয় আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখবো'খন—

—আর দেখতে হবে না তোমাকে নিবারণ, যা পারি আমরাই দেখাবো !

—আজ্ঞে, আপনারা দেখাবেন মানে ?

—মানে, আমরা ও পেঁপুলবেড়ের বাঁওড় নেবোই।

তোমার কর্তামশাই-এর বাবার সাধ্যি নেই আমাদের আটকায়—এই তোমায় ব'লে রেখে গেলুম!

ব'লে হন্ হন্ ক'রে নিতাই বসাক সদর দরজা দিয়ে একেবারে সোজা বাইরের দেউড়ির কালকাসুন্দির বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সত্যিই, দুলাল সাহা যেন কেষ্টগঞ্জের বাজারে ধূমকেতুর মত উদয় হয়েছিল একদিন। আর তার পর থেকেই কীর্তীশ্বরের বুকের এই টানটা সুরু হয়েছে। সন্ধ্যেথেকেই কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা মনে হয় বুকের কাছাটায়। তার পর যত রাত বাড়ে তত টানটাও বাড়ে। তখন বড় গিন্নী বুঝতে পারেন না। বড়গিন্নী মনে করেন বুঝি কর্তামশাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। আস্তে আস্তে মশারীটা খাটিয়ে চার পাশে ধারগুলো গুঁজে দেন ভাল ক'রে। তার পর এক সময়ে নিজেও কর্তা-মশাইয়ের পাশে শুয়ে পড়েন।

কিন্তু সেদিন কর্তামশাই একটু অন্যমনস্ক ছিলেন।

বললেন—ও কিসের গন্ধ আসছে বড়গিন্নী?

—লুচি ভাজার!

লুচি ভাজার! জিজ্ঞেস করলেন—এত রাত্তিরে আবার লুচি খাবার সখ হ'ল কার?

বড়গিন্নী বরাবরই কম কথার মানুষ। তিনি কিছু উত্তর দিলেন না।

কর্তামশাই আবার বললেন, কথা বলছ না যে?

—কি বলব?

—এই লুচি খাবার কার সখ হ'ল এত রাত্তিরে? আর লুচি যদি খাবার সখই হয় ত এত গন্ধ ছড়ায় কেন? মনে হচ্ছে ঘিটা ভাল—

বড়গিন্নী তবু কথা বললেন না। কিন্তু কর্তামশাই আর থাকতে পারলেন না। উঠলেন বিছানা ছেড়ে।

—আবার উঠছ কেন এই শরীর নিয়ে?

কর্তামশাই রেগে গেলেন। বললেন—উঠব না ত কি করব? দেখতে হবে না কার লুচি খাবার সখ হ'ল? এত রাত্তিরে এত ভাল ঘি পুড়িয়ে কোন্ বেটা লুচি খাচ্ছে?

বলতে বলতে কর্তামশাই খড়ম পায়ে গলিয়ে ঘরের দরজা খুলে বারান্দায় গিয়ে সিঁড়ির কাছ থেকে ডাকলেন নিবারণ, অ নিবারণ—

কাছারি-ঘরের পাশেই নিবারণের শোবার ঘর। চটা-ওঠা মেঝে। চামচিকে আর আরশোলার রাজত্ব ঘরখানায়। আগে এ ঘরখানায় বৈঠকখানা ছিল। বড় বড় অয়েল-পেন্টিং। তাও একটাও ভাল অবস্থায় নেই। মহারাজ ধর্মদাস ভট্টাচার্য্যের মুণ্ডুটা উইপোকায় কেটে ফুটো ক'রে দিয়েছে। কেদারেশ্বরের সোনার গড়গড়ার নলের ওপর মরচে প'ড়ে আছে। মাকড়সার জাল জটিল হয়ে উঠেছে গৃহ-বিগ্রহ সিংহবাহিনী পটের ওপর। ছেঁড়া তুলো ওঠা গদির এক কোণে একটা ময়লা মশারী খাটিয়ে তখন শোবার উদ্যোগ করছিল নিবারণ। নিতাই বসাক দুপুর বেলাই বকিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়টা নিয়ে ক'দিন থেকেই আনাগোনা করছিল। সুগার-মিল করবে। দুলাল সাহা ক'মাস থেকেই বলছিল—কর্তামশাইকে বলেছ নাকি নিবারণ?

নিবারণ বলেছিল—আজ্ঞে, বলতে আমার সাহস হয় না—

—কেন? টাকা নেবে জমি বেচবে, চুকে গেল ল্যাটা! এতে আর সাহসের কথা কি আছে?

নিবারণ বলেছিল—আজ্ঞে সা'মশাই, আপনি ত কর্তামশাইকে চেনেন—

—তা জমি কি কর্তামশাই আগে বেচেন নি যে এত ভয়? জমি বেচে-বেচেই ত তোমার কর্তামশাই পেট চালাচ্ছে এতদিন। আর আমি ত তোমার কর্তা-মশাইকে তার বাস্তুভিটে বেচতে বলছি নে—

তার পর একটু থেমে আবার বলেছিল—শেষকালে সেই-ই ত বেচতে হবে, তবু না-হয় একজন বাঙালীকেই বেচলেন তোমার কর্তামশাই!

তাতেও যখন কোনও কাজ হয় নি তখন নিবারণের হাতে কিছু গুঁজে দিতে চেয়েছে দুলাল সাহা। টাকায় সব বেটা বশ হয় আর তুচ্ছ নিবারণ বশ হবে না? টাকার মহিমার গোড়ার কথাটা বুঝেছিল দুলাল সাহা অনেক দিন। সেই টাকা দিয়েই হাত করতে চেয়েছিল নিবারণকে।

—তুমি ত অনেক দিন চাকরি করলে নিবারণ, চাকরি ক'রে চুল পাকিয়ে ফেললে? কিছু জমাতে পেরেছ এতদিনে? কিছু আখেরের কাজ করতে পেরেছ?

নিবারণ হেসেছিল শুধু। বলেছিল, আজ্ঞে, আমার আর আখের! অনেক খেয়েছি কর্তামশাইয়ের, অনেক ভোগ করেছি, এখন এ-বয়েসে আর আখেরের লোভ দেখাবেন না—

এমনি ক'রেই এতদিন টানা-হ্যাঁচড়া চলছিল, আজ একেবারে কাটাকাটি হয়ে গেল। ভালই হ'ল। এর পর আর দুলাল সাহাও ডাকবে না। নিতাই বসাকও দরবার করতে আসবে না। কেষ্টগঞ্জের বাজারের দিকে

আর না গেলেই হ'ল। নিবারণ মশারীটা খাটিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ছিল। হঠাৎ ওপরে কর্তামশাই-এর ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল।

—নিবারণ, অ নিবারণ!

খড়মের শব্দটা নিচের দিকেই নামছিল।

নিবারণ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বারান্দায় এসে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

—যাই কর্তামশাই।

সিঁড়ির একেবারে শেষ ধাপে কর্তামশাই-এর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা।

—লুচি-ভাজার গন্ধ কোত্থেকে আসছে নিবারণ? এত রাত্তিরে কেষ্টগঞ্জে কার এত লুচি খাবার সখ হ'ল জান?

—আজ্ঞে, দুলাল সাহার বাড়ীতে।

—আমি ঠিক ধরেছি, দুলাল সা' বুঝি আজকাল পাড়ায় জানান্ দিয়ে লুচি খেতে সুরু করেছে? বড় বেয়াদপ ত!

নিবারণ বললে, আজ্ঞে কর্তামশাই, তা নয়। আপনাকেও নেমন্তন্ন করতে এসেছিল দুলাল সা'—আমি শরীর খারাপ ব'লে আপনার সঙ্গে দেখা করতে দিই নি—

—ভালই করেছ। বেয়াদপদের সঙ্গে দেখা করার প্রবৃত্তি নেই আমার। তা কিসের নেমন্তন্ন?

—আজ্ঞে দুলাল সা' দীক্ষা নিচ্ছে। গুরু করেছে যে! তাই খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে, পাঁচজনকে নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াচ্ছে—

কর্তামশাই হাসলেন কি ভ্রূকুটি করলেন বোঝবার উপায় নেই। বললেন, বেয়াদপের আবার দীক্ষা! চাষার আবার জামাই!

কথাটা ব'লে চ'লেই যাচ্ছিলেন। কিন্তু কি ভেবে আবার দাঁড়ালেন। বললেন, তা ঘটা ক'রে লোক খাওয়াচ্ছে কেন? টাকা দেখাবার জন্যে? টাকা না দেখাতে পারলে বুঝি ঘুম হচ্ছে না? যত সব···

—আজ্ঞে না, ইনি মহাপুরুষ ব্যক্তি! শুনলাম দেবতুল্য মানুষ। এঁর দর্শন পাওয়া ভাগ্যের কথা!

কর্তামশাই রেগে গেলেন।

—রাখ তোমার কথা। মহাপুরুষ আর লোক পেলেন না কেষ্টগঞ্জে, উঠতে গেলেন দুলাল সা'র বাড়ী! চামারের একশেষ! আসলে টাকা দেখানো। কেষ্টগঞ্জের লোককে দেখানো হচ্ছে—ওগো দেখ, আমার কত টাকা হয়েছে। আমি বুঝি নে কিছু? আমাকে বোকা পেয়েছে?

বলতে বলতে আবার নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় ধপাস ক'রে শুয়ে পড়লেন। প'ড়েই হাঁপাতে লাগলেন। বড়গিন্নী চুপ ক'রে ব'সে ছিলেন তখনও বিছানার পাশে। বললেন, জানলাটা বন্ধ ক'রে দাও ত বড়গিন্নী, কি বিচ্ছিরি গন্ধ ঘি-এর, নাক জ্ব'লে গেল, যেন চামড়া পোড়াচ্ছে—

ক্রমশঃ

সর্ব্বোদয়

শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

দক্ষিণ আফ্রিকা সাধারণতন্ত্রের জোহানেসবার্গ রেলওয়ে স্টেশনে ১৯০৩ সনের এক অপরাহ্নে ডারবানগামী ট্রেন ছাড়িবার সময় হইয়া আসিয়াছে। জোহানেসবার্গের তরুণ ভারতীয় আইনজীবী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ডারবান চলিয়াছেন। তাঁহার বয়স ত্রিশের কোঠায়। কয়েক মাস হইতে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের মুখপত্র 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' প্রকাশ করিতেছিলেন। 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' সাপ্তাহিক পত্রিকা। ডারবান হইতে ইহা প্রকাশিত হইত। 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন'-এর আর্থিক সঙ্কট মোচনের উদ্দেশ্যেই গান্ধী ডারবান যাইতেছিলেন। গাড়ী ছাড়িবার একটু আগে গান্ধীর গুণগ্রাহী 'ট্রান্সভাল ক্রিটিক'-এর সহকারী সম্পাদক এইচ. এস. এল. পোলক গান্ধীর সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তিনি পথে পড়িবার জন্য গান্ধীকে একখানা বই দিলেন। যথাসময়ে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ২৪ ঘণ্টার লম্বা পাড়ি। পরদিন সন্ধ্যায় গান্ধীর ডারবান পৌঁছিবার কথা।

গাড়ী ছাড়িবার পর নিজের আসনে বসিয়া গান্ধী পোঁলকের দেওয়া বইখানা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তিনি পাঠে তন্ময় হইয়া গেলেন এবং বইখানা আগাগোড়া পড়িয়া ফেলিলেন। পুস্তকের বিষয়বস্তু তাঁহার মনে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলিল।

বইখানা উনবিংশ শতকের ইংরেজ মনীষী জন রাস্কিনের "আনটু দিস লাস্ট"।1 এই বইয়ে তিনি বলিয়াছেন যে, কাহারও টাকা আছে এবং কাহারও টাকা নাই বলিয়াই টাকার কদর। আমার প্রতিবেশীর টাকার প্রয়োজন না থাকিলে আমার টাকা মূল্যহীন হইয়া পড়ে। প্রতিবেশী গরীব হইলে এবং বহুদিন বেকার বসিয়া থাকিলে আমার টাকার দাম বাড়িয়া যায়। রাস্কিনের মতে মানুষ সম্পদের নামে আসলে চায় ক্ষমতা। নিজের টাকা-পয়সা বাড়াইবার চেষ্টা না করিয়া মানুষের অল্পে তুষ্ট হইয়া গভীরতর আনন্দলাভের চেষ্টা করা উচিত। একই জিনিষ একই সময়ে একাধিক জনের থাকিতে পারে না। সুতরাং যতদিন দীনতম ব্যক্তি জীবনধারণের পর্য্যাপ্ত উপকরণ না পায়, ততদিন পর্য্যন্ত বিত্তবান্ ব্যক্তিগণের বিলাস বর্জ্জন করা উচিত। যখন দীনতম ব্যক্তিরও কোন অভাব থাকিবে না, তখনই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হইবে। মানুষের ইতিহাসে সেদিন সুবর্ণযুগের সূচনা হইবে।

রাস্কিনের বাণীতে গান্ধী নিজের চিন্তার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইলেন। গান্ধী পূর্ব্ব হইতেই বিশ্বাস করিতেন যে, যে সমাজ এবং আর্থিক সংগঠনে প্রত্যেকটি মানুষের কল্যাণ হয়, একমাত্র সেই সমাজ এবং আর্থিক সংগঠনই গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা উচিত। সমষ্টির কল্যাণেই ব্যষ্টির কল্যাণ, এ সত্যও তাঁহার অজানা ছিল না।

অনেকদিন পূর্ব্বেই আর একটি কথা গান্ধীজীর মনে জাগিয়াছিল। তিনি মনে করিতেন যে, শ্রমজীবী এবং আইনজীবী উভয়ে একই উদ্দেশ্যে কাজ করিয়া থাকেন। উভয়েরই উদ্দেশ্য জীবিকার সংস্থান। সুতরাং ইঁহাদের কাজে কোন মৌলিক পার্থক্য নাই। রাস্কিন বলেন যে, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অসি, লেখনী বা অস্ত্রোপচারের অস্ত্র দ্বারা দেশের সেবা করে। আর শ্রমজীবী কোদালি দ্বারা দেশ ও দশের সেবা করে। রাস্কিনের কথায় গান্ধীর বিশ্বাস দৃঢ়তর হইল। এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। সর্ব্বপ্রকার শ্রমের মূল্যই এক, রাস্কিন কোথাও এমন কথা বলেন নাই। মানুষে মানুষে বৈষম্যের উপর তিনি বিশেষ জোর দিয়াছেন। তাঁহার মতে শক্তিমান্ বিত্তবানের নীতিবোধই শক্তিহীন নির্ধনকে রক্ষা করিতে পারে। ধর্ম্মভীরু মানুষের বিবেকবুদ্ধির নিকট আবেদনই কেবল বৈষম্যের দুঃখ দূর করিতে পারে। এই আবেদন সফল হইলে এক বিরাট্ বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবে। এই পরিবর্ত্তন সর্ব্ববাদিসম্মত এবং সর্ব্বজনগ্রাহ্য হইবে। সেই জন্যই ইহা মহান্ এবং গৌরবময়। এই পরিবর্ত্তন মানুষের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিবে।

"আনটু দিস লাস্ট" পাঠে গান্ধীজী আর একটি সত্যের সন্ধান পাইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে,

---

(1) John Ruskin—**Unto This Last**: Four Essays on the First Principles of Political Economy.

শ্রমিক, কৃষক এবং কারুশিল্পীর জীবনই আদর্শ জীবন। পূর্ব্বে কোনদিনই একথা তাঁহার মনে জাগে নাই। এই উপলব্ধি তাঁহার নিকট এক নব দিগন্তের দ্বার খুলিয়া দিল।

রাস্কিনের ভাবধারা গান্ধীর মনোরাজ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলিল। বহুদিন হইতে তিনি যে সত্যের সন্ধান করিতেছিলেন এবং অংশতঃ যাহা উপলব্ধিও করিয়াছিলেন এবার তাহার সহিত পূর্ণ পরিচয় ঘটিল। রাস্কিন গান্ধীজীর উপর কি গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন তাঁহার নিজের কথাতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর ১৯৪৬ সনের অক্টোবর মাসে তিনি বলেন—ঐ পুস্তক ("আনটু দিস লাস্ট") আমার জীবনের মোড় ঘুরাইয়া দিল।[2] গান্ধীজী আরও বলেন যে, মনোরাজ্যের বিপ্লবকে নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার মত মনোবল রাস্কিনের ছিল না। কিন্তু গান্ধীজী ভিন্ন ধাতুতে গঠিত ছিলেন। নিজের জীবনে উপলব্ধ সত্যের প্রয়োগ এবং প্রতিষ্ঠা না করিয়া তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইতেন না। সত্যের সন্ধান এবং অনুসরণের বিচিত্র কাহিনীই তাঁহার জীবনের ইতিহাস। বুদ্ধি, চিন্তা এবং কর্ম্মের সামঞ্জস্য সাধনই গান্ধীর জীবন-দর্শনের মূলসূত্র। এ কথা মনে না রাখিলে গান্ধীকে বোঝা যাইবে না।

"আনটু দিস লাস্ট" পড়া শেষ করিয়া গান্ধী গভীর চিন্তায় ডুবিয়া গেলেন। যাহা পড়িয়াছেন, মনে মনে তাহারই আলোচনা করিতে করিতে এক সময় ঘুমাইয়া পড়িলেন। রাস্কিনের প্রচারিত আদর্শে জীবন গঠন করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া তিনি পরদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিলেন।[3] এই ভাবে একটি মহান্ জীবনাদর্শ জন্মগ্রহণ করিল। এই আদর্শ সর্ব্বোদয়। পরবর্ত্তীকালে গান্ধীজী গুজরাটি ভাষায় "আনটু দিস লাস্ট" অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ "সর্ব্বোদয়" নামে প্রকাশিত হয়।

সর্ব্বোদয় (সর্ব্ব+উদয়) কথাটির অর্থ সকলের কল্যাণ। (উদয়=অভ্যুদয়, সমৃদ্ধি, কল্যাণ)। গান্ধীজীর মতে সকলের কল্যাণের প্রকৃত অর্থ সকলের মহত্তম কল্যাণ। ইংরেজ দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম (Jeremy Bentham) প্রচারিত হিতবাদও (Utilitarianism) মানব-কল্যাণের আদর্শ প্রচার করে। কিন্তু সর্ব্বোদয় এবং হিতবাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সর্ব্বাধিক কল্যাণ ("greatest good of the greatest number to the greatest extent") সাধন হিতবাদের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সংখ্যালঘুদলের স্বার্থ বিসর্জ্জন দেওয়া সম্পূর্ণভাবে ন্যায় ও নীতিসঙ্গত। দশজনের ক্ষতি করিয়া যদি একশ' জনের উপকার করা যায়, তবে দশজনের ক্ষতি করিলে দোষ হয় না। প্রচলিত গণতন্ত্রগুলিও এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। "কারও পৌষ মাস, কারও সর্ব্বনাশ" হিতবাদ প্রকৃত প্রস্তাবে এই হৃদয়হীন আদর্শের দার্শনিক রূপ মাত্র। সাদা কথায় হিতবাদ বলে যে, একশ' জনের মধ্যে ৫১ জনকে বাঁচাইবার জন্য প্রয়োজন হইলে বাকী ৪৯ জনের সর্ব্বনাশ করিতে হইবে। এইভাবে হিতবাদ মানুষে মানুষে এবং গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে স্বার্থের পার্থক্য এবং সংঘাত মানিয়া লইয়াছে। একজনের যাহাতে মঙ্গল হয় অন্যের তাহাতে মঙ্গল নাও হইতে পারে এই মতের পোষকতা করিয়া হিতবাদ শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষের প্রশ্রয় দিয়াছে এবং দিতেছে। ফলে কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই বেশী হইয়াছে।

পক্ষান্তরে সর্ব্বোদয় মানুষে-মানুষে এবং শ্রেণীতে-শ্রেণীতে স্বার্থের পার্থক্য স্বীকার করে না। বিশ্বের সর্ব্বত্র এক এবং অখণ্ড প্রাণসত্তার বিচিত্র প্রকাশ। প্রাণ এক এবং অখণ্ড। একই প্রাণসত্তা বিভিন্ন জনের মধ্যে বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়। এই বৈদান্তিক তত্ত্ব যদি মিথ্যা না হয়, তাহা হইলে মানুষে-মানুষে স্বার্থের পার্থক্য এবং সংঘাতের কথা উঠিতেই পারে না। সুতরাং একের কল্যাণের মধ্যেই সকলের এবং সকলের কল্যাণের মধ্যেই একের কল্যাণ নিহিত আছে। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা এ ধারণার পোষকতা করে না। বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, একজনের যাহাতে কল্যাণ অন্যের তাহাতেই সর্ব্বনাশ। বাড়ীতে চুরি বা ডাকাতি হইলে গৃহস্থের সর্ব্বনাশ হয়। কিন্তু চোর বা ডাকাত তাহাতে লাভবান্ই হয়। সর্ব্বোদয়বাদীর মতে চুরি-ডাকাতি আপাতদৃষ্টিতে চোর-ডাকাতের পক্ষে লাভজনক হইলেও আসলে তাহাদের অকল্যাণেরই কারণ। জ্ঞানের অভাবেই আমরা একথা বুঝিতে পারি না। যাহাতে একজনের প্রকৃত কল্যাণ হয়, অন্য সকলের পক্ষেও তাহাই কল্যাণের

---

(2) "That book marked the turning point in my Life."

(3) "(I) arose at the dawn ready to reduce these (Ruskin's) principles to practice."

কারণ। আমাদের অজ্ঞান এই সত্যোপলব্ধির অন্তরায়। ই অজ্ঞানের আবরণ ছিন্ন করিয়া নিখিল বিশ্বের সহিত একাত্মবোধই জীবনের লক্ষ্য। প্রতিটি জীবের কল্যাণ-সাধনের চেষ্টাই আত্মোপলব্ধির পথ। কাহারও প্রকৃত কল্যাণসাধন করিতে হইলে প্রথমে তাহাকে ভালবাসিতে হয় এবং ভালবাসা যদি খাঁটি হয়, তবে মানব-প্রেমিক স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে দীন ও দুঃস্থের দুঃখের অংশ গ্রহণে প্রস্তুত থাকেন।

সর্ব্বোদয়-সমাজে ব্যক্তি-গোষ্ঠী এবং শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষের স্থান নাই। "যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে" বিশ্ববিধাতার নিকট সর্ব্বোদয়বাদীর এই একমাত্র প্রার্থনা। হিতবাদী বলেন যে, কোন কথা বা চেষ্টা যতই ভাল হউক না কেন, কাহারও কাহারও তাহাতে অকল্যাণ হইবেই। তাহা হইলে কি কর্ত্তব্য? হিতবাদী উত্তর দিবেন—কোন কাজে যাহারা দলে ভারী তাহাদের মঙ্গল এবং যাহারা সংখ্যায় কম তাহাদের অমঙ্গল হইলেও সেই কাজ করিতে হইবে। পাশ্চাত্ত্যের জীবনাদর্শ হিতবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই আদর্শ সর্ব্বোদয় এবং অহিংসার বিরোধী। সর্ব্বজীবের সপ্রেম সেবা সর্ব্বোদয়ের আদর্শ। প্রেমে হিংসার স্থান নাই। হিংসা সর্ব্বক্ষেত্রে অনিষ্টকর। সেইজন্য হিংসা বর্জ্জনীয়। কিন্তু হিতবাদীর হিংসার আশ্রয় গ্রহণে নৈতিক আপত্তি নাই। প্রয়োজন মনে করিলে তিনি হিংসার সাহায্যেই কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করিবেন। কিন্তু হিংসার প্রয়োজনীয়তা স্বীকারের মধ্যে গুরুতর বিপত্তির আশঙ্কা রহিয়াছে। দেয়ালের গায়ে ছোট্ট একটি ছিদ্র যেমন কালে বড় হইয়া সমগ্র অট্টালিকাকে ভূমিসাৎ করিতে পারে, হিংসার স্বীকৃতিও তেমনই ঘোর অমঙ্গল ডাকিয়া আনিতে পারে।

গান্ধীর জীবন-দর্শনে সাধ্য ও সাধন—লক্ষ্য ও পথ—এক ও অভিন্ন। সর্ব্বোদয় গান্ধীর আদর্শ। অহিংসা এবং প্রেমের পথে এই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইবে। অহিংসা ও সর্ব্বোদয়ের সাধক এবং হিতবাদীর মধ্যে পার্থক্যের প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেন—"সমগ্রের মহত্তম কল্যাণ সাধনের জন্য অহিংসার পূজারী প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও দ্বিধা করিবেন না।···সমগ্রের মহত্তম কল্যাণে সর্ব্বাধিক সংখ্যকেরও মহত্তম কল্যাণ। সুতরাং হিতবাদী এবং অহিংসার পূজারী বহুক্ষেত্রেই একমত হইবেন এবং একই পথে চলিবেন। কিন্তু একদিন না একদিন তাঁহাদের ছাড়াছাড়ি হইবেই। সেদিন ইঁহারা স্বতন্ত্র এবং হয়ত পরস্পরের বিরোধী নীতি অনুসরণ করিবেন। হিতবাদী কোন ক্ষেত্রেই নিজের প্রাণ বিপন্ন করিবেন না। কিন্তু অহিংসার পূজারী প্রয়োজন হইলে প্রাণ বিসর্জ্জনেও পশ্চাৎপদ হইবেন না।[4]"

হিতবাদের আদর্শই রাষ্ট্র চালনায় গণতন্ত্রের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু গণতন্ত্র অহিংসায় বিশ্বাস করে না। এ কথা সত্য যে, গণতন্ত্র প্রকাশ্যে হিংসার প্রশ্রয় দেয় না। কিন্তু গণতন্ত্রবাদিগণ প্রয়োজনবোধে হিংসার পথে উদ্দেশ্য সাধনে পশ্চাৎপদ হ'ন না এবং হইবেন না। কিন্তু কোন্ ক্ষেত্রে হিংসা প্রয়োজন এবং কোন্ ক্ষেত্রেই বা হিংসা প্রয়োজন নয়, কে তাহা স্থির করিবেন? শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষের সমর্থক এবং গণতন্ত্রবাদিগণের বিচারে বৈষয়িক উন্নতি অর্থাৎ সুখ, সম্পদ্, শক্তি লাভই জীবনের চরম লক্ষ্য। শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষের সমর্থকগণ ত ভাব এবং আধ্যাত্মিক সম্পদের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। গণতন্ত্রবাদী ততদূর না গেলেও বৈষয়িক এবং ঐহিক উন্নতি সাধনকেই প্রাধান্য দিয়া থাকেন।

গণতন্ত্রের বাহিরের চেহারা অহিংস সন্দেহ নাই কিন্তু যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রত্যেক নাগরিকের—সংখ্যাগরিষ্ঠের নয়—কল্যাণ সাধনের আদর্শ অনুসরণ করে না তাহাকে অহিংস মনে করা কি ভুল নয়? কেবল তাহাই নয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি কি স্বীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বার বার হানাহানি করে নাই? প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যতেও কি করিবে না? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইংল্যাণ্ডের সমাজ এবং রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক সন্দেহ নাই! কিন্তু অতিবড় মার্কিন এবং ইংরেজ ভক্তও ইহাদের কোনটিকেই অহিংস বলিতে পারিবেন না। মহৎ উদ্দেশ্য—উদ্দেশ্য মহৎ কিনা কে বিচার করিবে?—সাধনের জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে—এই ত গণতন্ত্রের সমর্থকদের মত। ইহার জন্য গরুচুরি হইতে বৈষ্ণব বন্ধন সব কিছুই করিতে হইবে। রক্তপাত করিলেই হিংসা হয় না। নিজেদের

(4) ". . . . will strive for the greatest good of all and die in the attempt to realize the ideal . . . . the greatest ~~good of~~ all invariably includes the greatest good of the greatest number, and, therefore, he and the utilitarian will converge at many points in their career, but there does come a time when they must part company, and even work in opposite directions. The utilitarian, to be logical, will never sacrifice himself. The absolutist (i.e., the follower of pure non-violence) will even sacrifice himself."—Gopinath Dhawan—**The Political Philosophy of Mahatma Gandhi**, pp. 53-54

ভীরুতা, শারীরিক দুর্বলতা, লোক-গঞ্জনা এবং আইন ও প্রতিহিংসার ভয় বহু ক্ষেত্রেই আমাদিগকে হিংস্র আচরণ হইতে নিরস্ত করে। কিন্তু হিংস্র চিন্তা এবং বাক্যের পথে এ সমস্ত বাধা নাই। হিংস্র আচরণ না করিয়াও চিন্তা এবং বাক্যে হিংস্র হওয়া যায়।

রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের অপরিহার্য্য অঙ্গ। এই দলগুলি হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ অনুষ্ঠান করে না সত্য; কিন্তু তাহারা কি পরস্পরের প্রতি মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ এবং হিংস্র মনোভাব পোষণ করে না? নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বের প্রতিযোগী দলগুলি কি পঞ্চমুখে পরস্পরের কুৎসা রটনা করে না? প্রতিপক্ষকে অপদস্থ এবং নাজেহাল করিবার জন্য ইহারা কি দিনের পর দিন মিথ্যা এবং অর্দ্ধ-সত্যের জাল বুনয়া চলে না? গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সৈন্য ও পুলিশ-বাহিনী কি তাহার হিংসায় বিশ্বাসের কথাই ঘোষণা করে না? এই সমস্ত কারণেই গান্ধীজী গণতন্ত্রকে অহিংস মনে করিতেন না।

গণতন্ত্র এবং সর্ব্বাত্মক (Totalitarian) উভয় প্রকার রাষ্ট্রই হিতবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মতলব হাসিল করিবার জন্য দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে ইহাদের বিবেকে বাধে না। কিন্তু দুর্নীতির সাহায্যে মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে উদ্দেশ্য সফল হইলেও —সকল ক্ষেত্রে হয় না—উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব নষ্ট হইয়া যায়।

সর্ব্বাত্মক রাষ্ট্রের সমর্থনকারিগণ ত খোলাখুলিই বলেন যে, রাষ্ট্র পরিচালনায় হিংসা অপরিহার্য্য। তাঁহাদের মতে সৃষ্টির মধ্যেই সঙ্ঘর্ষের বীজ নিহিত আছে। তাঁহারা বলেন যে, যুগে যুগে পুরাতনের গর্ভে যে নূতনের আবির্ভাব হয়, বলপ্রয়োগে তাহাকে বাহিরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। নূতনের জন্মে বলই ধাত্রীর কাজ করে। গণতন্ত্রের সমর্থনকারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থরক্ষার জন্য সংখ্যালঘুর স্বার্থ উপেক্ষা করেন। কিন্তু গণতন্ত্র বিরোধিতাকে অস্বীকার করে না। পক্ষান্তরে বিরোধী শক্তি বা শক্তিগুলিকে সমূলে উচ্ছেদ করা সর্ব্বাত্মক রাষ্ট্রের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। সমাজদেহের এক অংশের কল্যাণের জন্য অপরাপর অংশকে ধ্বংস করা সর্ব্বাত্মক রাষ্ট্রনীতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই রাষ্ট্রনীতি কোন প্রকার বাধা বা বিরোধিতা সহ্য করে না।

গান্ধী ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী। ১৯৪৬ সনে মার্কিন সাংবাদিক ও গ্রন্থকার লুই ফিসারকে তিনি বলেন যে, তিনি (গান্ধী) সমাজবাদী হইলেও অন্ধ, বধির এবং মূক জনের ক্ষতি করিয়া নিজের উন্নতি কামনা করেন না। বৈষয়িক অগ্রগতিই সমাজবাদিগণের জীবনের মূলমন্ত্র। অন্ধ, বধির এবং মূক জনগণের জন্য তাঁহারা মাথা ঘামান না। মার্কিন রাষ্ট্র তাহার প্রত্যেক নাগরিকের জন্য হাওয়া গাড়ীর ব্যবস্থা করিতে চায়। তিনি তাহা চান না। স্বীয় ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতাই তাঁহার কাম্য। তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে যেন নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত সোপানশ্রেণী রচনা করিতে দেওয়া হয়। ইহার অর্থ এই নয় যে, সত্যই তিনি এরকম কিছু করিতে চান। সমাজবাদী রাষ্ট্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্থান নাই। এই রাষ্ট্রের নাগরিকের নিজের দেহের উপরও কর্ত্তৃত্ব নাই।5

গান্ধীজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, প্রচলিত গণতন্ত্রগুলি সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে পারে না। এই জন্যই স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর তিনি এক-দল দর্শনপ্রার্থীকে বলেন—যে-স্বাধীনতা আমরা লাভ করিয়াছি তাহা প্রকৃত স্বরাজ নয়। আপনারা ক্ষমতার পিছনে না ছুটিয়া গ্রামে চলিয়া যান। দিল্লীতে যে স্বরাজ আসিয়াছে, দেশের দূরতম প্রান্তের কুটীরেও যাহাতে তাহা পৌঁছিতে পারে তাহার জন্য পল্লীবাসীকে প্রস্তুত করুন। তাহা না করিলে কোন দিনই প্রকৃত স্বরাজ লাভ হইবে না।

গান্ধীজী এখানে স্বরাজ এবং স্বাধীনতা এই দুইটি কথা ব্যবহার করিয়াছেন। সাধারণতঃ একই অর্থে ব্যবহৃত হইলেও গান্ধীজীর মতে ইহারা এক নয়। ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কি? সাদা কথায় বলিতে গেলে স্বাধীনতা অপূর্ণ স্বরাজ। স্বরাজ পূর্ণ স্বাধীনতা। কথাটা একটু খুলিয়া বলা যাক। স্বাধীনতা বলিতে কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা বোঝায়। কিন্তু কেবল মাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা দ্বারা মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন

---

(5) "My socialism means 'even unto this last'. I do not want to rise on the ashes of the blind, the deaf and the dumb. In their (the Socialists') socialism probably these have no place. Their one aim is material progress. America aims at having a car for every citizen. I do not. I want freedom of full expression for my personality. I must be free to build a stair-case to Sirius, if I want. That does not mean I want to do any such thing. Under the other socialism, there is no individual freedom. You own nothing, not even your own body." —D. G. Tendulkar—**Mahatma,** Vol. VII, p. 190

বিকাশের পথ খুলিয়া যায় না। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অতীত এবং সাম্প্রতিক ইতিহাস এ মতেরই পোষকতা করে। সর্ব্বাত্মক রাষ্ট্র এবং "পিপ্‌ল্‌স্‌ রিপাব্‌লিক"গুলির ইতিহাসও একই সাক্ষ্য দেয়। একথা সত্য যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তি বা স্বরাজ লাভের প্রথম এবং প্রধান সোপান। কিন্তু এখানেই পথের শেষ নয়। কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতাই মানুষের বন্ধন মোচন করিতে পারে না। তাহার জন্য ভয়, অভাব এবং অজ্ঞান হইতে মুক্তি এবং চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাও চাই। এই মুক্তি এবং স্বাধীনতার জন্যই সামাজিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রয়োজন। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সম্ভব নয়। এই জন্যই গান্ধীজী সর্ব্বাগ্রে দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বরাজ বা সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতাই তাঁহার চরম লক্ষ্য ছিল। কথা উঠিতে পারে যে, গান্ধী কেবলমাত্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভে সচেষ্ট হইয়াছিলেন কেন? আরও কত দেশ ত পরাধীন ছিল ও আছে। গান্ধীজী বলিতেন যে, প্রত্যেকেরই সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রতিবেশীর কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট হওয়া উচিত। আপন এবং নিকটজনের প্রতি কর্ত্তব্য পালনই কর্ত্তব্য পালনের পথে প্রাথমিক পদক্ষেপ। সেই জন্যই গান্ধীজী ভারতবর্ষকে নিজের সাধনার ক্ষেত্র করিয়াছিলেন। গান্ধীজী ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামে সত্যাগ্রহের প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা স্বরাজ নয়। তাহার মনে সর্ব্বোদয়ের পথেই স্বরাজ বা সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তি সম্ভব। কিন্তু তাঁহার মতে সাধ্য ও সাধন এক এবং অভিন্ন। সুতরাং সর্ব্বোদয়ই স্বরাজ। গান্ধীজী মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও হিংসা এবং দুর্নীতির বিরোধী ছিলেন। এই জন্যই তিনি বলিতেন যে, কেবলমাত্র উদ্দেশ্যের মহত্ত্বই সব নয়। হিংস্র, নীতি-বিরোধী উপায়ও সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অসদুপায় অবলম্বন করিলে মহত্তম উদ্দেশ্যও কলুষিত, বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়ে। বিরোধীপক্ষ বলিবেন যে, বাস্তব জীবনে খাঁটির সঙ্গে মেকির অর্থাৎ সত্যের সঙ্গে মিথ্যার খাদ না মিশাইলে কাজ হয় না। সোনার সঙ্গে অন্য ধাতু না মিশাইলে অলঙ্কার হয় না। উত্তরে বলা যায় যে, অন্য ধাতু মিশাইলেই সোনা আর সোনা থাকে না। তাহাকে আর সোনা বলা চলে না। সোনার সঙ্গে বিশেষণ জুড়িয়া তাহার সত্য পরিচয় দিতে হয়। যে কোন উদ্দেশ্যে দুধে যত কম জলই মিশানো হউক, সে জল মিশানো দুধ, দুধ নয়।

হিতবাদ এবং শ্রেণী-সংগ্রামের আদর্শ পাশ্চাত্ত্যের দান। প্রাচ্যজগৎ গান্ধীজীর মাধ্যমে জগতের নিকট সর্ব্বজনের মহত্তম কল্যাণের বাণী প্রচার করিয়াছে। গান্ধীজী এই আদর্শের স্রষ্টা নন। সুদূর অতীতে পুণ্য-তপোবনে ভারতের ঋষিকণ্ঠে "সর্ব্বে নঃ সুখিনঃ সন্তু" এই প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল। বিশ্বের রাজনীতি ধুরন্ধরগণ অনেকেই আজ সহাবস্থানের বুলি আওড়াইতেছেন। কিন্তু সর্ব্বোদয় ব্যতীত প্রকৃত সহাবস্থান সম্ভব নয়। সহাবস্থান ভারত-আত্মার শাশ্বত মর্ম্মবাণী। ভারতবর্ষ যুগে যুগে এই বাণীকে বাস্তব রূপ দেওয়ার সাধনা করিয়াছে।

"তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট্ হিয়া।"

মৃণালভোজী কবির কল্পনামাত্র নয়। ভারতবর্ষের ইতিহাস ইহার সাক্ষী। সেইজন্যই জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধ এবং ইনকুয়েইজিশন ভারতবর্ষের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিতে পারে নাই। স্বাধীন ভারতের ভাগ্য-বিধাতৃগণ আজও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের নীতিকে বাস্তব রূপ দেওয়ার চেষ্টা করিতেছন। স্বাধীন ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতিও সহাবস্থানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু নেতৃবৃন্দের অযোগ্যতা, তাঁহাদের নিজেদের এবং অনুচরবর্গের ভুল-ভ্রান্তি ও অসাধুতা এবং প্রতিকুল পরিবেশের জন্য ফলে শিব গড়িতে প্রায়ই বানর হইয়া যাইতেছে। আমাদের নিজেদেরও দোষ আছে। কাহাকে দোষ দিব—

"এ তোমার, এ আমার পাপ।"

সর্ব্বোদয় সমাজ এবং রাষ্ট্রের চেহারা কিরকম হইবে? গান্ধীজী নিজেই তাহার উত্তর দিয়াছেন—সত্য এবং অহিংসা সর্ব্বোদয়-সমাজের ভিত্তি। এ সমাজে মানুষে-মানুষে কৃত্রিম ব্যবধান, জাতি ও ধর্ম্মের ব্যবধান এবং শোষণের স্থান থাকিবে না। সর্ব্বোদয়-শাসিত সমাজ এবং রাষ্ট্রে ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের সুযোগ থাকিবে। এই গান্ধীজীর ধ্যানের ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষে কোনপ্রকার পরাধীনতা থাকিবে না। প্রত্যেক নাগরিক ভারতবর্ষকেই তাহার মাতৃভূমি মনে করিবে। প্রত্যেকে মনে করিবে যে, দেশ-গঠনে তাহার মতামতও উপেক্ষিত হইবে না। শ্রেণী-বৈষম্য লোপ পাইবে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় পাশাপাশি শান্তিতে বাস

করিবে। নারী ও পুরুষ সমান অধিকার ভোগ করিবে। বাহিরের কোন রাষ্ট্রের সহিত ভারতবর্ষের বিরোধ থাকিবে না। অস্পৃশ্যতা থাকিবে না। সর্ব্ব-প্রকার মাদক-দ্রব্য বর্জ্জিত হইবে। ভারতবর্ষ কাহাকেও শোষণ করিবে না এবং নিজেও শোষিত হইবে না। তাহার নামমাত্র সৈন্য বাহিনী থাকিবে। দেশী এবং বিদেশী ব্যক্তি-স্বার্থ জনস্বার্থের বিরোধী না হইলে তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। আমি দেশী এবং বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য করাকে ঘৃণা করি। এই আমার স্বপ্নের ভারতবর্ষ।[6]

এই সর্ব্বোদয়, স্বরাজ বা রামরাজ্যের আদর্শকে বাস্তব রূপ দেওয়া সম্ভব কি? সম্ভব হউক না হউক, চেষ্টা করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। এই চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও ক্ষতির আশঙ্কা। সর্ব্বোদয় সমাজ এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও এই চেষ্টা যাঁহারা করিবেন তাঁহাদের চারিত্রিক উন্নতি এবং ব্যক্তিত্বের পরিণতি অবশ্যম্ভাবী। সেই ত মস্ত লাভ। আমাদের সাধনা ব্যর্থ হইয়া গেলেও অনাগত যুগের মানুষ হয়ত আমাদের অপূর্ণ সাধনাকে পূর্ণ করিবে।

মনে রাখিতে হইবে যে, ইতিহাসের রথচক্র মন্থর গতিতে আবর্ত্তিত হয়। কোন সংস্কারকই নিজের জীবিত কালের মধ্যে স্বীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত সংস্কার করিয়া উঠিতে পারেন না। তাড়াহুড়া করিয়া মানুষের প্রকৃতি বদলান যায় না। আধ্যাত্মিক সাধনার ন্যায় জীবনের অন্য সাধনাতেও 'মানস মুকুল' আগুনে ভাজা যায় না। "সবুর বিহনে" ফুল ফোটে না বা তাহার সৌরভ ছড়ায় না। তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে হয়।[7]

(6) ". . . . no distinction of caste or creed, no opportunity for exploitation and full scope for development . . . . for individuals as well as for groups" ". . . . an India in which the poorest shall feel that it is their country, in whose making they have an effective voice; an India in which there shall be no high class and no low class of people; an India in which all communities shall live in harmony. There can be no room in such an India for the curse of untouchability; or intoxicating drinks and drugs. Women will enjoy the same rights as men. Since we will be at peace with the rest of the world, neither exploiting nor being exploited, we shall have the smallest army imaginable. All interests not in conflict with the interest of the dumb millions will be scrupulously respected, whether foreign or indigenous. I hate the distinction between foreign and indigenous. This is the India of my dreams . . . ."—Gopinath Dhawan—**The Political Philosophy of Mahatma Gandhi**, p. 178. D. G. Teudulkar—Mahatma, Vol. III, p. 141.

(7) "The mills of the gods grind slowly in the making of history, and zealous reformers meet with defeat if they attempt to save the world in their generation by forcing on it their favourite programme. Human nature cannot be hurried."—S. Radhakrishnan—**The Hindu View of Life**, p. 50.

আর কেউ হয়ত আসবে না

শ্রীঅর্ণব সেন

শ্যামল বলে, 'তুমি আজকাল কেমন যেন বদলে গেছ!' দীপিকা উত্তর দেয় না। সত্যিই কি বদলেছে? কিন্তু কেমন যেন স্বপ্নের মত মনে হয় বিয়ের আগের সেই দিনগুলো! সেই লুকিয়ে লুকিয়ে একসঙ্গে ঘোরা, সিনেমায় যাওয়া, গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাওয়া—সব কিছুই যেন কেমন মোহময় উত্তেজনা! সেই মোহ, স্বপ্ন, শিহরণ কোথায় যেন হারিয়ে গেল। তবু হারিয়ে যাওয়ার কথা ত নয়। শ্যামলকে সে পেতে চেয়েছে তার সমস্ত দেহমন দিয়ে। তাই তার হাতেই ছেড়ে দিয়েছে তার ভাবনা, তার হাতেই সমর্পণ করেছে তার ভবিষ্যৎ। সে যেন সম্মোহিতার মত স্রোতের টানে হাল ছেড়ে নৌকোর মত ভেসেছে। এখনও স্বপ্ন ব'লে মনে হয়, সেই রেজিষ্ট্রি আপিসে যাওয়া, হাতের ওপর হাত রাখা, মালাবদল, ট্যাক্সি করে ওর চার বন্ধু মিলে রেষ্টুরেন্টে গিয়ে খাওয়া, টুকরো টুকরো শুধু স্মৃতি। না, সে ভীরু। তাই সে ভাবতে চায় নি, ছেড়ে দিয়েছে নিজেকে, শুধু সে জেনেছে তাকে সে পেতে চায়। ওর জন্যেই এই ফ্ল্যাট বাড়ী ভাড়া ক'রে শ্যামল উঠে এসেছে নিজের বাড়ী ছেড়ে, এও সে জানে। কিন্তু এই ত সব নয়। কিই বা আর করার ছিল? সে ভাবতে চায় নি কিছু, তবু তাকে ভাবতে হয়েছে। অনেক অনুনয়-বিনয় করে সে চিঠি লিখেছিল বাবা-মা'র কাছে কিন্তু তাঁদের মত পাওয়া যায় নি। তাই এ ছাড়া পথ ছিল না। দীপিকা জানত, সে ফিরতে পারবে না। তবু ভেবেছিল, বিয়ের পর হয়ত সব ঠিক হয়ে যাবে। না, বাবা সে চিঠির জবাব দেন নি। দ্বিতীয় চিঠিরও না। বাবা-মা এত নিষ্ঠুর হবেন তা সে ভাবতে পারে নি। শুধু একটিবার ওঁরা যদি আসতেন কিংবা ওদের যেতে বলতেন!

দীপিকা শ্যামলকে বলেছে, 'আসলে আমরা ভুলই করেছি এভাবে বিয়ে করে। বাবা-মা'র মত নিয়ে করলেই হ'ত।'

শ্যামল ক্ষুব্ধ বিরক্ত হয়ে উত্তর দিয়েছে, 'থামো, এই সব বাজে কথা আমার ভাল লাগে না। মত নিতে গেলে এই বিয়ে আর হ'ত না।'

দীপিকা বলেছে, 'তা ত বুঝি, দোষ আমারই।'

শ্যামল বলেছে, 'চুপ কর, যা হবার তা হয়ে গেছে এখন অনর্থক ভেবে লাভ কি?'

কিন্তু এই ভাবনাটা যদি না থাকত! তা সে পারে নি। সারাজীবনের মত এমন ভাবে বাবা-মা'র সঙ্গে, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কহীন সে কেমন করে বাঁচবে? বাবা-মা একদিন ঠিকই তার বিয়ে দিতেন। কিন্তু সে অন্যরকম। যার সঙ্গে তার বিয়ে হ'ত তাকে সে জানত না অন্তরে, চিনত না মনেপ্রাণে। তবু না জেনেও তার সবকিছু তাকে দিত। এখানে তা নয়। সব জেনেশুনেই সে এগিয়ে এল মন্ত্রমুগ্ধের মত। এর ফল কি ভাল হবে? এ বিয়ে কি সত্যিই বিয়ে?

আজ ও একজনের স্ত্রী। শ্যামল হয়ত ভালবাসে তাকে আগের মতই। কিন্তু যদি কোনদিন কিছু হয়? কোথায়ই বা সে যাবে? কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে? সেদিন এই নিঃসঙ্গ দীন পৃথিবীতে একা সে কেমন করে বাঁচবে? বাবা, মা, দিদি, কেউ ত একবার তাকে ডাকল না? ওরা সকলেই ভুল বুঝল। শুধু সে আর শ্যামল। শ্যামল আর সে।

দীপিকা শুয়ে ছিল। একটু পরেই শ্যামল ফিরবে। তার আপিস ফেরার সময় হয়েছে। দীপিকা ভাবছিল, এবার উঠে গিয়ে চায়ের জল চড়াবে। সন্ধ্যে নেমে এসেছে। বাড়ীতে থাকতে এই সময় সে কোনদিন এমন ভাবে শুয়ে থাকে নি। বিকেল হতেই সে সারা গা ধুয়ে চুল বেঁধেছে। নিত্য নতুন ঢঙে চুল বাঁধা রপ্ত করেছে। তার পর কোনদিন বা ছাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চেয়েছে। কোনদিন গিয়েছে পার্কে বেড়াতে। দেশবন্ধু পার্কের কৃষ্ণচূড়ার লাল সমারোহ তার মনে দাগ কেটেছে। পুকুরের জলের উচ্ছলতা তার ভাল লেগেছে। আজ তার সব পাওয়া যেন ফুরিয়ে গিয়েছে। কেমন যেন ক্লান্ত, রিক্ত মনে হয় নিজেকে। অজানা অবসাদ, ক্লান্তি আর চিন্তার গ্লানি। তার ভাবনা যদি সে ভুলতে পারত। কেন এমন হয়? এই নিঃসঙ্গ নির্জনতা। চার পাশে এত লোক, এত

চিৎকার, কলরব, কিন্তু ও যেন ছন্নছাড়া। শ্যামল কেন এত দেরি করে? ও বোঝে না। শুধু বিরক্ত হয়। কিন্তু সে ত তাকে ঠকাতে চায় নি। 'আমি যদি হাসতে না পারি তা হ'লে কি আমার দোষ?' তবু শ্যামল তাই ভাবে।

ঠিক তখন ও মাথার ওপর হাতের ছোঁয়া অনুভব করল।

'এই! কি হয়েছে তোমার? শুয়ে আছ যে!'

সে বসল তার পাশে।

'কিছু না।' দীপিকা উত্তর দিল।

শ্যামল বিলি কাটল তার চুলে। নিচের চুলগুলো আলতো করে ধ'রে টানল। 'তুমি দিনরাত কি ভাব বল ত?' শ্যামলের মুখ ঝুঁকে পড়ল তার মুখের উপর।

'সরো, সব সময় বিরক্ত ক'রো না। ভাল লাগে না।' দীপিকা হাত দিয়ে সরিয়ে দিল শ্যামলের মুখ।

'তোমার কি করেছি আমি? একটা অদ্ভুত মেয়ে, তুমি!' শ্যামল তিক্ত বিরক্ত গলায় বলল, 'কি হয়েছে তোমার?'

'কিছু না।' দীপিকা উঠে বসল। আঁচল জড়াল খোলা গায়ে। 'তোমার চা নিয়ে আসি।' দীপিকা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গেল। হঠাৎ শ্যামল হাত বাড়িয়ে মুঠো ক'রে ধরল তাকে।

'শোন, হয় তুমি সব ভুলে আমার কাছে থাক আর না হ'লে—' শ্যামল একবার চাইল দীপিকার ম্লান বিষণ্ণ চোখের দিকে।

দীপিকা মাথা নিচু করে বলল, 'আর না হ'লে চলে যাও এখান থেকে। এই ত বলবে তুমি?' দীপিকা শ্যামলের হাতের মুঠো থেকে ছাড়িয়ে নিল। তার পর ভাঙাভাঙা গলায় বলল, 'ঠিকই তোমার কথা। আমাকে নিয়ে তুমি সুখী হবে না। আমি ত তোমার জীবনটাকেই বিষিয়ে তুলেছি, তাই না? কিন্তু আজ ত ফেরার পথ নেই। তোমাকে ছেড়ে কোথায়ই বা যাব?'

'উপায় থাকলে যেতে, তাই না?' বিদ্রূপের সুরে বলল শ্যামল।

দীপিকা উত্তর না দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সকালবেলা দীপিকার যখন ঘুম ভাঙল তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছিল শ্যামলের মুখের ওপর। কাল রাত্রেও মেঝেতেই শুয়েছে দীপিকা, বলেছে, তার মেঝেতেই শুতে ভাল লাগে। শ্যামল শুয়েছে খাটের ওপর। রাত্রে ঘুম হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বড় বিপর্যস্ত বিক্ষুব্ধ ঘুম। ঠিক ঘুম নয়, যেন ক্লান্ত চৈতন্যের অবসাদ। মাথাটা ভার ভার লাগছে এখনও। ঘুমিয়েও সে যেন নিশ্চিন্ত হতে পারে না। তার মনে হয়, দিনের পর দিন এ যেন ক্লান্তিকর এক অবসাদকেই টেনে টেনে এগিয়ে যাওয়া। সময়ের বোঝায় চিন্তার ভারে সে অবসন্ন। শ্যামল তার স্বামী, আইনত সে তার স্ত্রী। তার কর্তব্য তাকে করতেই হবে। বাবা, বাবা কি একবার, শুধু একটি বার ডাকবেন না? কিন্তু কেন অন্যায়? সে কি অন্যায় করেছে? বাবা-মা'র মতে এ বিয়ে অসামাজিক। কিন্তু সমাজ কি এখনও বেঁচে আছে আগের যুগের মত? সমাজের অন্যায় দাবী কেন সে মেনে নেবে? মনুষ্যত্ববোধ, মানবতা, স্নেহপ্রীতির ওপরই কি সমাজ প্রতিষ্ঠিত নয়? বাবা, মা, দিদি, আত্মীয়স্বজন—সকলেই কি মনুষ্যত্বহীন? স্নেহ, ভালবাসা, প্রীতি—কোন কিছুরই কি মূল্য থাকবে না? সেই ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। বাবার হাত ধ'রে ও কত জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছে। গেছে পার্কে, চিড়িয়াখানায়, বোটানিক্যাল গার্ডেনে, গড়ের মাঠে, আরও কত জায়গায়। সেই বয়সেই ও বুঝত, বাবা ওকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন। কোথায় গেল সেই ভালবাসা, স্নেহ? তাছাড়া যার জন্যে সবকিছু করা সেই শ্যামল আজকাল যেন কেমন খিটখিটে, রাগী, মেজাজী হয়ে উঠেছে। ও নিশ্চয় ভাবে ও ঠকে গেছে। আশ্চর্য, মানুষ ভুল করে, কিন্তু ফেরার পথ বন্ধ জেনেও করে।

চায়ের কাপ নিয়ে দীপিকা যখন শ্যামলের সামনে এসে দাঁড়াল তখন শ্যামল সবে খবরের কাগজটা খুলেছে।

'চা এনেছি।'

'ও'। শ্যামল দীপিকার হাত থেকে কাপটা নিয়ে বলল, 'কি, মুখ গোমড়া কেন? একটু হাস, দেখি। শুধু চা কি ভাল লাগে?'

'শুধু চা নয়, বিস্কুটও এনেছি।' হাতের বিস্কুটগুলো রাখল দীপিকা কাপের পাশে প্লেটের ওপর।

'তোমার চা?'

'আনছি।'

দীপিকা আর এক কাপ চা নিয়ে এল।

'বস না ওই চেয়ারটায়।'

'বসব না। একটা কথা বলব?' দীপিকা ভয়ে ভয়ে বলল।

'কি কথা? বল।' কাগজ পড়তে পড়তেই বলল শ্যামল।

'কিছু না, এমনি বলছিলাম। থাক্, দরকার নেই।'

'বল না!' শ্যামল কাগজটা রাখল টেবিলে। চায়ের কাপে চুমুক দিল। 'এই ত তোমার দোষ। এত চাপা তুমি। যা বলবে বল না, লজ্জার কি?'

'না, কিছু না। সত্যি কিছু না।' দীপিকা হাসল।

'দূর বোকা মেয়ে!'

'আমি বোকা, না তুমি বোকা?' চটুল হ'ল দীপিকা।

'বেশ আমিই বোকা। এবার বল, শীগ্‌গির বল, না বললে ছাড়ব না।' বলতে বলতে শ্যামল দীপিকাকে ধরল।

'আঃ, তুমি কি যে কর! এখুনি ঝিটা সবকিছু দেখে ফেলবে। এই ছাড় বলছি, কামড়ে দেব।' দীপিকা চিমটি কাটল শ্যামলের হাতে।

'এই দুষ্টু মেয়ে? লাগছে। আঃ, বল না!' শ্যামল হাত ছেড়ে দিল।

'আজ দুপুরে বেরোব একটু।' দীপিকা বলল।

'কোথায় যাবে?'

'ক'টা জিনিষ দরকার,' দীপিকা মুখ টিপে হাসল।

'বেশ ত, যেও।'

'হুঁ, বলে রাখলাম। আবার রাগ ক'রো না।'

'কবে রাগ করেছি? যাক্ ওসব কথা। আজ কিন্তু তাড়াতাড়ি অফিস যেতে হবে। এমনিতেই লেট্ হয় রোজ। আজ আবার এক ম্যানেজিং ডিরেক্টর আসছেন।'

'বেশ বাবা, বেশ। তাড়াতাড়ি রান্না করছি। ওই জন্যেই ত বিয়ে করা।' দীপিকা চায়ের কাপটা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই শ্যামল বলল, 'খুব যে কথা ফুটেছে দেখছি!'

দুপুরের চড়া রোদ্দুরটা তখন একটু কমেছে। গলির মধ্যে ঠাণ্ডা ছায়া। লোকজনের চলাফেরা কম। বাস থেকে নামবার পর থেকেই দীপিকার ভয় ভয় করছিল। বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করছিল কতকটা অস্বাভাবিক ভাবে। ঘেমে উঠছিল সে। বাবা নিশ্চয় এখন ঘুম থেকে উঠে পড়েছেন। হ্যাঁ, তিনটের পরই বাবা উঠে পড়েন। কিন্তু সে গিয়ে কি বলবে? প্রথম কি কথা বলবে? ভেবে ভেবে সে ঠিক করে উঠতে পারে না। ক্ষমা চাইবে? বলবে, অন্যায় হয়েছে? যদি বাবা রেগে ওঠেন? একটা কাণ্ড না হয়। বিয়ের পর এপাড়ায় ও আর পা দেয় নি। পরিচিত কারুর সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়? বাড়ীটা দেখা যাচ্ছে। প্রথমে দরজায় কড়া নাড়তে হবে। কে খুলে দেবে? রুমি, ববি ত স্কুলে গেছে নিশ্চয়। চাকরটা দুপুরে থাকে না। বাড়ীতে শুধু বাবা মা, আর হয়ত দিদি।

দীপিকা দরজার সামনে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। আর একবার ভাবল। তার পর দরজার কড়াটা নাড়ল। কই, কেউ সাড়া দিল না ত? কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল দীপিকা। নিঝুম নিস্তব্ধ বাড়ী। গলিটা নির্জন। ঠিক এইভাবে এইখানে ও রাতদিন দাঁড়িয়ে থেকেছে। স্কুল থেকে ফিরে এসে পাগলের মত কড়া নেড়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুলত বাড়ীর লোকজনকে। এই ত সেদিনও কলেজ থেকে ফিরে এসে কড়া নেড়েছে। দাঁড়িয়ে থেকেছে, অপেক্ষা করেছে। কিন্তু এমন অস্বাভাবিক অস্বস্তি কোনদিন সে অনুভব করে নি। আবার একবার কড়া নাড়ল দীপিকা।

দরজাটা খুলে দাঁড়ালেন বাবা।

'তুমি?'

বাবা, ব'লে ডাকতে চাইল দীপিকা। কিন্তু তার গলা দিয়ে যেন আওয়াজ বেরুতে চাইল না। একটা অজানা ভয়ে সে নিশ্চুপ হয়ে রইল।

'কি চাও তুমি? আবার এখানে কেন?' বাবা দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে দাঁড়ালেন। আধময়লা ধুতি। খালি গা।

'বাবা, আমি এসেছিলাম।' অনেক চেষ্টা ক'রে বলল দীপিকা। সে বলতে চায় অনেককিছু। এতক্ষণ ধ'রে ভেবেছিল যা কিছু। সে বাবাকে ফিরে পেতে চায়, সকলকে সে পেতে চায়।

'বল।' কর্কশ কঠিন হয়ে উঠলেন বাবা। 'তোমার লজ্জা করে না বেহায়া মেয়ে! বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে। তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। তুমি আমার কাছে মৃত। যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফিরে যাও।'

'বাবা।' আর একবার ব্যাকুল স্বরে ডাকল দীপিকা। অজস্র কান্নার সমুদ্র তার বুকের মধ্যে উত্তাল উদ্দাম হয়ে উঠল।

'তুমি আমার বংশের কলঙ্ক! তুমি আমার মুখে চুণকালি দিয়েছ! আমি বেঁচে থাকতে এ বাড়ীতে তোমার ঢোকা হবে না, এটুকু মনে রেখ।'

দরজাটা বন্ধ হ'ল। দীপিকার মনে হ'ল, স্নেহ, ভালবাসা, প্রীতির, কাঁচের মিনার ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল এক মুহূর্তে।

বাবা এত নিষ্ঠুর হবেন তা ও ভাবতে পারে নি। বাবা এত নিষ্ঠুর? একটিবার ওর কথা ভেবে দেখলেন না? ওর দিক্ একবার মনে এল না?

দীপিকা শুয়ে ছিল বিছানায়, বালিশের মধ্যে মুখ

গুঁজে। ও কেমন ক'রে বাঁচবে? শুধু শ্যামল আর ও? ওর অফিস থেকে ফেরার সময় হয়েছে। শ্যামল যদি জানতে পারে?

ঠিক তখনই শ্যামল এল। 'কি, ঘুরে আসা হ'ল? কি কিনলে দেখাও।' শ্যামল হেসে এগিয়ে এল, আর সেই মুহূর্তে স্তম্ভিত হ'ল দীপিকার দিকে চেয়ে।

তার খোলা চুল। এলোমেলো শাড়ি। লুটিয়ে-পড়া আঁচল। ঘরের মেঝেয় পড়ে-থাকা চুলের ফিতে। সমস্ত কিছু তার নজরে পড়ল। দীপিকা কাঁদছিল বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে।

'এই, কি হয়েছে তোমার?' শ্যামল এগিয়ে এল ব্যস্ত হয়ে। বসল দীপিকার পাশে।

শ্যামল দীপিকার পিঠের ওপর হাত রাখল।

'এই, হ'ল কি? বল না!'

দীপিকা চুপ।

'কথা বল। লক্ষ্মীটি।' শ্যামল ঝাঁকুনি দিল দীপিকার কাঁধ ধরে। 'কি হয়েছে বল! শরীর খারাপ, অসুখ?'

'না।' দীপিকা উত্তর দিল।

'কি হয়েছে তোমার? বল লক্ষ্মীটি, মণি!'

'কিছু না।'

'কিছু না? তবে অমন করছ কেন?' হঠাৎ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল শ্যামল। দু'হাত দিয়ে জোর ক'রে ধরে সে দীপিকার মুখ ফেরাল।

'বল, তোমার কি হয়েছে।'

মুখোমুখি দীপিকা চাইল ভীত দৃষ্টিতে শ্যামলের দিকে। তার চোখ জলছিল ক্ষোভে, অভিমানে।

'এ আমার ভাল লাগে না দীপু। তোমার এই ছেলেমানুষী আমার ভাল লাগে না!' কঠিন হ'ল শ্যামলের মুখ।

'বাবার কাছে গিয়েছিলাম। তাড়িয়ে দিলেন।' দীপিকা বলল ভয়ার্তস্বরে।

শ্যামল স্থির মূর্তির মত বসে রইল কিছুক্ষণ। তার পর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তোমাকে আমার বলার কিছু নেই।'

একদিন। দু'দিন। তৃতীয় দিন শ্যামলই প্রথম কথা বলল, 'এভাবে তুমি বাঁচবে না। না খেয়ে কোন লাভ হবে না।'

'জানি।'

'শোন, ম'রে লাভ কি হবে? তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর, আমি বলছি তোমার বাবা একদিন আসবেন। সকলেই আসবে। এভাবে তুমি ভেঙে প'ড়ো না। তুমি যদি এভাবে মন খারাপ কর তা হ'লে আমি বাঁচব কেমন করে? তুমি অবুঝ হয়ো না। তা বাবাই তোমার কাছে বড় হলেন? আমার কথা তুমি ভেবে দেখবে না? আমি কি তোমাকে ঠকিয়েছি?'

'আমি ত তা বলি নি, ভাবিও নি কোনদিন।' দীপিকা ম্লান বিষণ্ণ গলায় উত্তর দিল।

'চল, খাবে চল।' শ্যামল বলে।

দীপিকা আর খেতে যেতে আপত্তি করে নি।

অফিস যাওয়ার সময় দীপিকা পান নিয়ে এল শ্যামলের জন্যে। 'নাও, পানটা ধর।'

'খাইয়ে দাও।' শ্যামল বলল।

'এবার চলি তা হ'লে?' শ্যামল দীপিকার গালে হাত ছোঁয়াল।

দীপিকা দরজার পাল্লার গায়ে ঠেস দিয়ে নিরুত্তাপ গলায় বলল, 'এস।'

'আশ্চর্য! তুমি অমন মুখ ভার করেই থাকবে?'

'এরকমই ত মুখ আমার।'

শ্যামল বেরিয়ে গেল কোন কথা না বলে।

শেষ দুপুরের হাওয়া কেমন যেন উদাসকরা! জানলার পর্দা উড়ছে। বাতাসের ঢেউ নামছে পর্দা বেয়ে। শ্যামল বলেছে, বাবা আসবেন একদিন ঠিকই। হ্যাঁ, নিজের মেয়েকে কি ফেলে দিতে পারে? একেবারে সব সম্পর্ক কি ছিন্ন করতে পারে? সত্যিই কি যে ভাল হ'ত বাবা এলে!

যা ভেবেছিল তাই। জানলা দিয়ে বাতাস আসতে লাগল। এ ভাবতে পারা যায় না। সত্যিই কি বাবা এসেছেন? দীপিকার ঘুমন্ত শরীরের ওপর দিয়ে বাতাস বয়ে গেল। বাবা তা হ'লে সত্যিই এলেন!

'দেখ্ দীপু, তুই আমাকে ভুল বুঝিস না। আমার সেদিনের ব্যবহার ভুলে যা। তুই আমাকে ক্ষমা কর্।' বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। ছিঃ, ছিঃ, বাবা কি বলছেন? ক্ষমা চাইছেন বাবা! বাবা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আধময়লা ধুতি, ইস্ত্রি-ভাঙা দুমড়ে-যাওয়া শার্ট, এলোমেলো চুল। দীপিকা প্রণাম করল। 'থাক্ থাক্।' তার মাথায় হাত ছোঁয়ালেন বাবা।

'তোর সুখেই আমার সুখ। তোর জন্যে এটা এনেছি, কিছুই ত দিতে পারি নি তোকে।' বাবার হাত থেকে প্যাকেটটা নিয়ে খুলল দীপিকা। শাড়িটার নরম ছোঁয়া, নতুন-নতুন গন্ধ সে অনুভব করল। কি চমৎকার! বাবা ঠিক মনে রেখেছেন ওর প্রিয় রঙটি!

হলুদ রঙের শাড়ি। সর্ষে ফুলের রঙ। হলুদ ফুলের রঙ। এক ঝাড় হলুদ ফুল। সারা ঘর জুড়ে সেই রঙ। একটা হলুদ রঙের মেঘ এসে ঢেকে দিল বাবাকে। 'বাবা, বাবা' বলে চীৎকার করল দীপিকা।

ঘরে কেউ ছিল না। কখন যেন সন্ধ্যে নেমেছে। অন্ধকার ঘর, আলো জ্বলে নি। সে একা শুয়ে। চোখ খুলে তার মনে হ'ল সে ক্লান্ত, একা। নিজেকে অসহায় সম্বলহীন বলে মনে হ'ল। স্বপ্ন আর বাস্তবের পার্থক্য যদি না থাকত! দীপিকা শুয়েই রইল।

শ্যামল ফিরল না এখনও। হয়ত তার কাজ রয়ে গেছে। ফিরবে নিশ্চয়। যদি না ফেরে? যদি তার কিছু হয়? কত কিছুই ত হতে পারে। সকালবেলা ও অফিস গেছে মন ভারি ক'রে। এই অন্ধকার ঘর, অনন্ত নৈঃশব্দ্যের মধ্যে সে একা। কিন্তু রাস্তার আলো, হৈ চৈ, উচ্ছ্বাস, কলরব। সেখানে সে নেই। এই তার আশ্রয়, শেষ সত্য—ধরতেই হবে, না হ'লে সে স্রোতের টানে ভেসে যাবে। দীপিকা ভাবল, 'আমি ওকে দিতে পারি সবকিছু। কিন্তু আমি ত দিই নি সব।' সে ফিরবে। আর কেউ হয়ত আসবে না। 'আমি নিজেকে আড়াল করে রেখেছি তার কাছ থেকে। আমি আমার মাঝে তাকে দেখতে দিই নি। আমি দেওয়াল সরিয়ে দেব। আমি আমার আয়নায় দেখাব তার মুখ। আমি হব আয়না।'

দীপিকা বিছানা থেকে উঠে ধীরপায়ে গিয়ে দাঁড়াল জানলার কাছে। রাস্তার দিকে চেয়ে রইল সে। শ্যামল ফিরবে।

তখন সে আর শ্যামল। শুধু শ্যামল।

স্তব্ধ প্রহর

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

এগারো

আশুবাবু পরের দিন সত্যিই অবাক্ ক'রে দিলেন।

শোভনা উত্তেজনা উদ্বেগের প্রচণ্ড দোলায় দুলে শেষ রাতে একেবারে ঘুমের অতলে ডুবে গেছল। ঘুম ভাঙল যখন তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে।

প্রথমটা জানলা দিয়ে-আসা সকালের আলোয় চোখ মেলে কিছুক্ষণ কেমন একটা আশ্চর্য নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি অনুভব করেছিল। যেন এই মুহূর্তের চেতনাটুকু ছাড়া জীবনে আর কিছু নেই। এই বিছানা-তোশকহীন তক্ত-পোশের শক্ত কাঠের স্পর্শটুকু, জানলা দিয়ে দেখতে-পাওয়া উঠোনের ওধারে গাছপালার মাথায় আকাশের রক্তাভ একটু উজ্জ্বলতা, সমস্ত শরীরে অতৃপ্ত ঘুমের ঈষৎ গ্লানির সঙ্গে মেশানো একটা লঘু তৃপ্তির স্বাদ। অসুখের প্রথম ধাক্কা সামলে ওঠার পর হাসপাতালে যেমন হ'ত এক-একদিন। দায়িত্বহীন ভাবে জীবন ছুঁয়ে শুধু ভেসে থাকার একটা অনুভূতি। যা কিছু চঞ্চল, উদ্বেল, বিক্ষুব্ধ করে মনকে, সব যেন অনুভূতির গভীর তরলতার নিচে তলিয়ে গেছে। শুধু আছে একটা ভারমুক্ত চেতনা, অগ্রপশ্চাৎ কার্য-কারণ ইচ্ছা সঙ্কল্পের ধারাবাহিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন। আজ কাল পরশুর কোন ভাবনার জবর দাবী নেই শুধু উপস্থিতকে গ্রহণ করবার একটা নির্লিপ্ত মৃদু ঔৎসুক্য।

হাসপাতালেও এ ভাবটা বেশীক্ষণ থাকত না। হঠাৎ যেন বুদ্বুদের অদৃশ্য আবরণ ফেটে গিয়ে চমক ভেঙে যেত।

আজ চমকটা ভাঙল আরও বেশী তীব্র ভাবে। মনের ওপরকার স্বচ্ছ প্রশান্তির ঢাকনাটা হিংস্র ভাবে ছিঁড়ে ফেলে বাস্তব বর্তমান প্রবল বন্যাবেগে যেন ঝাঁপিয়ে এল তার চেতনায়। নতুন একটি দিন তার সমস্ত দায়, সমস্ত অমীমাংসিত প্রশ্ন নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে এড়িয়ে যাবার কোন পথ নেই। একা... কি এই সকাল বেলাটুকু কর্তব্য সম্বন্ধে দ্বিধাসংশয় নিয়ে কাটান যাবে না। যা করবার এখুনি করতে হবে। আশুবাবুর হেঁসেলে গিয়ে রান্নার যোগাড় দিয়েই তা নিত্য নিয়মিত ভাবে সুরু। কিন্তু আজকের সেই সামান্য কাজটার অর্থ ও চেহারা সত্যিই আলাদা হয়ে গেছে।

বিছানা ছেড়ে উঠে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আশুবাবুর কাজে যাবার জন্যে শোভনা প্রস্তুত হচ্ছিল এমন সময়ে ঘরের বাইরে আশুবাবুর গলা পাওয়া গেল, তুমি কি উঠেছ শোভনা মা?

গলাটা স্নেহার্দ্র ব'লেই মনে হ'ল, কিন্তু এক পলকে শোভনার মনটা তখন যেন বেঁকে দাঁড়িয়েছে।

আশুবাবু যদি নিজে থেকেই এখুনি প্রসঙ্গটা আবার তুলতে এসে থাকেন তা হ'লে সে বুঝি নিজেকে সংযত রাখতে পারবে না। ফল তার যাই হোক।

বাইরে অবশ্য সে শান্ত কণ্ঠেই সাড়া দিলে, হ্যাঁ, এই যে যাচ্ছি!

ভেজানো দরজাটা খুলে দিয়ে তার পর বাইরে বেরুবার উপক্রম করতে আশুবাবুই কিন্তু বাধা দিলেন।

না, না এখন তোমায় রান্নার জন্যে ডাকতে আসি নি। চল, তোমার ঘরেই চল। দুটো কথা আছে।

একটু বিস্মিত হয়েই শোভনা আবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। আশুবাবু তা হ'লে সকাল বেলাটাই ছিঙ না ক'রে ছাড়বেন না! পাছে মনের এই অবস্থায় বেশী রূঢ় হয়ে পড়ে এই ভয়ে নিজেকে কিছুটা সামলাবার জন্যে ঘরের একটি মাত্র চেয়ারের সে ধুলো মুছে পরিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

আশুবাবু কিন্তু ততক্ষণে তক্তপোশের ওপরই নিজে থেকে ব'সে পড়েছেন।

সে কি! ওখানে বসলেন কেন?—শোভনা সত্যিই কুণ্ঠিত হয়ে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, আশুবাবু বাধা দিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি পড়াশুনা কি করেছ বল ত মা?

প্রশ্নটা এমন অপ্রত্যাশিত যে, শোভনা খানিকক্ষণ কোন জবাব দিতেই পারলে না। আঘাত ঠেকাবার জন্যে যে-ভাবে মনটাকে তৈরি করেছিল, তা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে বিলম্ব হ'ল।

আশুবাবু শোভনার নীরবতার ভুল অর্থ ক'রে তাকে আশ্বস্ত করবার জন্যে বললেন,—তোমার লজ্জা করবার কিছু নেই। বি-এ, এম-এ পাস করবার কথা জানতে

চাইছি না। এমনি পড়াশুনা কিছু করেছ ত? স্কুলে কতদূর পড়েছ?

স্কুলের পর কলেজেও কিছুকাল পড়েছি। শোভনা একটু বিমূঢ় ভাবেই জানালে।

কলেজেও পড়েছ!—আশুবাবু যেন একটু বেশীরকম উল্লসিত হয়ে উঠলেন,—ব্যস! তা হ'লে আর কথাই নেই! কি পড়েছিলে? আর্ট্‌স্‌?

হ্যাঁ। তবে তাকে পড়া বলে না। এক বছরও পুরো কলেজে যাই নি।

ওই ওতেই হবে! ওতেই হবে!—আশুবাবু উৎসাহের ঝোঁকে তক্তপোশ থেকে উঠেই পড়লেন। তার পর শোভনার অনুচ্চারিত বিমূঢ়তা একটু যেন অনুমান ক'রে বললেন,—কেন এ কথা জিজ্ঞেস করলাম বুঝতে পারছ না ত? না পারবারই কথা। বলছি, এখনই বলছি।

কথাটা ব্যাখ্যা ক'রে বলবার আগে আশুবাবু আবার কিন্তু অসংলগ্ন ভাবে সম্পূর্ণ অন্য পথে চ'লে গেলেন। গম্ভীর হয়ে বললেন,—কাল তুমি অমন ক'রে চ'লে আসবার পর সারা রাত ঘুমোতে পারি নি, জান!

আমার সত্যি অন্যায় হয়েছিল।—শোভনা আন্তরিক ভাবে তার অপরাধ স্বীকার করবার সুযোগটুকু নিলে।

না, না তোমার অন্যায় কিছু হয় নি। আশুবাবু প্রতিবাদ করলেন,—অন্যায় হয়েছে আমার! রাত্রে ভাবতে ভাবতে সেই কথাটাই বুঝলাম। বুঝলাম যে, কোথায় মনের মধ্যে একটা গোপন অহঙ্কার জন্মেছে আর সেই অহঙ্কারে তোমার ওপর একটু জোর খাটাতে আরম্ভ করেছি।

এ সব আপনি কি বলছেন!—শোভনা সত্যিই বিমূঢ় ভাবে জানালে,—আমি আপনার কেউ নয়। তবু আপনি আমার যা উপকার করছেন তা কি ভোলবার!

ঠিক, ঠিকই বলেছ! আর অহঙ্কার ত সেইজন্যেই জন্মেছে। তোমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই, শুধু একটু স্নেহ মায়া পড়েছে ব'লে তোমায় আশ্রয় দিয়েছি, কাজ দিয়েছি, তোমার উপকার করতে চাইছি। কিন্তু আসলে সবটাই ত নিঃস্বার্থ পরোপকারের গর্বে নিজের ইচ্ছে আর মতামত তোমার ওপর চালান। তোমাকে সত্যিই যত স্নেহই করি না, নিজের মর্জি-মাফিক তোমার ভাল করবার অধিকার আমার নেই।

শোভনা বিস্ময়বিমূঢ় ভাবে এবার নির্বাক্‌ হয়েই রইল। আশুবাবুকে এ যেন সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্যরূপে দেখা। কিন্তু সত্যিই কি তাই? আশুবাবুকে সহৃদয় এবং সেকেলে বৃদ্ধ ব'লে যে একটা সোজা হিসেব ধ'রে রেখেছিল, এই ক'দিনের পরিচয়েই ত ক'বার তা একটু-আধটু পাল্টাতে হয়েছে। তাঁর মনের চেহারায় এই দিক্‌টাও সুতরাং অবিশ্বাস্য হবে কেন? হয়ত অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট একটা ধারণা ধ'রে থাকা ভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়।

আশুবাবুর বেলা বিস্ময়টা একটু বেশী বোধ করছে, এ কথা ঠিক। কাল রাত্রি পর্যন্ত তাঁর যে পরিচয় পেয়েছে তার সঙ্গে আজ সকালের এই কঠিন আত্মবিচার সহজে মেলান যায় না।

আশুবাবু তাঁর কথার উত্তর কিছু চান নি। কি উত্তর দেবে তা ভেবেও পাচ্ছিল না। তবু কিছুই না ব'লে এতক্ষণ চুপ ক'রে থাকতে শোভনা অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিল।

আশুবাবু সে অস্বস্তি নিজেই দূর ক'রে বললেন,—এ সব কথা তোমার কাছে বলবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তোমার পড়াশুনার কথাটা যে-জন্যে জিজ্ঞাসা করতে এলাম, তার ভূমিকা হিসেবেও এগুলো না বললে নয়। আমি কাল রাত্রেই ঠিক করেছি মা, তোমায় আর আমি আমার হেঁসেল ঠেলতে দেব না।

কেন?—শোভনার গলায় যে কাতরতা ফুটে উঠল সেটা আন্তরিক।

শুধু রাঁধুনীগিরি করিয়ে তোমার জীবনটা নষ্ট করবার অধিকার আমার নেই ব'লে। তাতে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে তুমি দুটো খেয়ে-প'রে থাকতে পারবে বটে, কিন্তু তাই ত সব নয়?

শোভনা অবাক্‌। এ সব ত তারই নিজের মনের কথা! আশুবাবু যেন তার প্রতিধ্বনি করছেন মাত্র। কিন্তু আশুবাবুর মুখে শুনে নিজের কথারই প্রতিবাদ করতে হ'ল।

সব হয়ত নয়, কিন্তু তা ছাড়া আমার উপায় কি? আপনার এ অনুগ্রহ না পেলে আমায় ত রাস্তায় দাঁড়াতে হ'ত।

তা হয়ত হ'ত। কিন্তু সে কথা ভাববার এখন আর ত দরকার নেই। রাস্তায় যখন দাঁড়াতে দিই নি, তখন শুধু দুমুঠো অন্ন আর মাথা গোঁজবার একটু আশ্রয় দিয়েই তোমায় বেঁধে রাখব কেন? আমি তোমায় অনুগ্রহ করতে চাই না, চাই সত্যিই তোমায় সাহায্য করতে। সেই জন্যেই তোমার লেখাপড়ার খোঁজ নিলাম। যদি কোথাও পড়ানর কাজ পাও নিতে পার না?

খুব পারি! কিন্তু সেরকম কাজ কি সত্যি পাব! তা ছাড়া···

শোভনাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে আশুবাবু

বললেন, তা ছাড়া যা আছে সে সব কথা পরে ভাবা যাবে। আপাততঃ টিউশনি গোছের একটা কাজ বোধ হয় তোমায় যোগাড় ক'রে দিতে পারব। আশা করছি তোমার অপছন্দ হবে না।

অপছন্দ হবে কেন?—শোভনা কৃতজ্ঞ স্বরে জানালে, আপনি কি যেমন-তেমন একটা কাজ আমায় দেবেন? শুধু একটা কথা ভাবছি।

একটু চুপ ক'রে থেকে শোভনা দ্বিধাটুকু জয় ক'রে বললে, ভাবছি কালকের কথাটা আপনি আজ আর একেবারেই ভুললেন না কেন? কাল আপনার কাছে ওই খবর পেয়ে যা বলেছি তাতে কি অসন্তুষ্ট হয়েছেন? জানি না আমার কথাটা আপনাকে বোঝাতে পেরেছিলাম কি না?

প্রথমে সত্যিই বুঝতে পারি নি মা। আশুবাবু গাঢ় স্বরে স্বীকার করলেন, প্রথমে না বুঝে সত্যিই অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম। শুধু অসন্তুষ্ট কেন, তোমার ওপর রাগই হয়েছিল। তার পর প্রায় সারারাত ওই কথা নিয়েই ভেবেছি। ভেবে বুঝেছি, তোমার মন দিয়ে তোমাদের সমস্যা বোঝা যেমন আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তেমনি আমার নিজের সংস্কার ও ধারণা থেকে কোন মীমাংসা তোমার ওপর চাপাবার অধিকারও আমার নেই। তোমার নিজের পথ তুমি নিজেই বুঝে নেবে। তোমার মধ্যে সে জোর যে আছে তার প্রমাণ একটু পেয়েছি ব'লেই মনে হচ্ছে। অনুপমকে তুমি যদি খুঁজতে চাও, আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত। তা যদি না চাও, আমি আমার জেদ তোমার ওপর খাটাব না। এই সব কথাই ভাবতে ভাবতে নিজের দুর্বলতাটুকুও বুঝতে পেরেছি মনে হয়েছে। তাই থেকেই বুঝেছি, স্নেহ মায়া মানে নিজের ধারণা ও ইচ্ছে দিয়ে তোমায় ঘিরে রাখা নয়। তোমার নিজের একটা স্বাধীন সত্তা আছে। নিজের জীবন নিজেই তুমি চালাবে। স্নেহ মায়া যেটুকু আমার আছে তাই দিয়ে তোমায় শুধু আমি সাহায্য করতে পারি।

শোভনাকে শোনাবার জন্যে শুধু নয়, নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্যেই যেন এক নাগাড়ে কথাগুলো ব'লে আশুবাবু চুপ করলেন।

অভিভূত হয়ে শোভনা তার পর অনেকক্ষণ কিছু বলতে পারল না। চোখ যে কেন তার তখন অশ্রুসজল হয়ে এসেছে সে জানে না। মুখ ফিরিয়ে আঁচলে চোখটা একবার মুছে নিয়ে সে প্রায় অস্ফুট স্বরে বললে, আপনার কাছে নতুন করে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আপনাকে ছোট করব না। কিন্তু আপনাকে যে অনেকখানি ভুল বুঝেছিলাম তা স্বীকার ক'রে ক্ষমা চাইছি। আর একটা কথাও সেইসঙ্গে স্বীকার করছি। আপনার কাছে আশ্রয় পেয়ে শুধু আপনার রান্নাবান্না ক'রে দিন কাটাতে মনটা মাঝে মাঝে বেঁকে দাঁড়িয়েছে সত্যি। নিজেই অন্য কোন উপায় খোঁজবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আপনার স্নেহের আড়ালে এমনি ক'রেই যদি জীবনটা কেটে যায় তাতে ক্ষতি কি! আপনার হেঁসেলে কাজ না ক'রে অন্য কোথাও পড়ানর কাজ নিলে কি-ই বা নতুন কিছু আমার হবে। আমার জীবনে আর কিছু ত হবার নয়?

কেন নয়! আশুবাবু দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ জানালেন, জীবনের হওয়া না হওয়া কি এর মধ্যেই সব ক'ষে ফেলা যায়! এই বয়সেই অনেক কিছু হয়ত তুমি দেখেছ, সয়েছ। কিন্তু তবু সামনে অনেক পথ প'ড়ে আছে তোমার। সে পথে সাহস ক'রে পা বাড়াতে তোমায় হবে। ভবিষ্যৎ অজানা হলেও। সে যাই হোক, আমার হেঁসেলে তোমার আর বন্দী থাকা চলবে না। আমার হেঁসেলই কদিন বাদে বন্ধ হয়ে যাবে।

বুঝতে পারলাম না আপনার কথা! আপনার খাওয়াদাওয়ার একটা ব্যবস্থা ত দরকার।

সে ব্যবস্থা হবে—আশুবাবু এবার হেসে বললেন, তবে এখানে আর নয়। আমি কিছু দিনের জন্যে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াব ঠিক করছি। বয়স অনেক হয়েছে, এরপর আরো অথর্ব হয়ে পড়লে যা পারব না, মনের সেই সাধটা এখন মিটিয়ে নিতে চাই।

এক সঙ্গে অনেক প্রশ্নই মনে ভীড় করে এল ব'লে বোধ হয় শোভনা প্রথমটা কিছুই বলতে পারল না।

আশুবাবুই নিজে থেকে তাকে আশ্বস্ত করবার জন্যে আবার বললেন,—তোমার কোন ভাবনা নেই মা। যাবার আগে তোমার একটা কাজের ব্যবস্থা আমি ক'রে দিয়ে যাবই। আর তুমি যদি নিজে থেকে না চ'লে যেতে চাও, তা হ'লে এঘর চিরকালের জন্যে তোমার, এইটুকু জানিয়ে যাচ্ছি।

আশুবাবু দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন,—হ্যাঁ, আজ শুধু তোমার নিজের রান্নাবান্না তুমি ক'রে নিও। আমায় আজ আমার সেই বন্ধু উমেশ তার ওখানে খেতে বলেছে।

আশুবাবুকে বেরিয়ে যেতে গিয়ে এবারও কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হ'ল।

কই, শোভনা দেবী কোথায়?—ব'লে নিখিল বক্সীই দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

আশুবাবুকে দেখে প্রায় তাচ্ছিল্যভরে নমস্কারের ভঙ্গিতে একবার হাত তুলে সে তাঁকে পাশ কাটিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে শোভনাকে উদ্দেশ ক'রে বললে—দেখেছেন আমার দেওয়া কাগজগুলো!

দেখেছি। শোভনার গলার স্বরে একটু অস্বস্তিই প্রকাশ পেল, ওগুলো আপনি নিয়ে যেতে পারেন।

শোভনা পাশের তাকের ওপর থেকে কাগজপত্রগুলো নিয়ে নিখিলের দিকে বাড়িয়ে ধরলে। গত রাত্রে বিছানায় পিঠে ঠেকবার পর কৌতূহল বশে সে সত্যিই এগুলোর ওপর আলো জেলে একবার চোখ বুলিয়েছিল।

আশুবাবু তখনও দরজার একটা পাল্লা ধ'রে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

নিখিল তাঁর দিকে একবার চেয়ে নিয়ে হেসে উঠে বললে—এগুলো কি আমি ফেরত নিতে এসেছি? আপনাকেই দিয়েছি ওগুলো। প'ড়ে কি মনে হ'ল বলুন, নেবেন ও চাকরী?

কি চাকরি? আশুবাবু গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন।

এই, মেয়েদের যে সব চাকরির আজকাল সুবিধে! নিখিল আশুবাবুর দিকে ফিরে সহজ রসিকতার সুরে বললে,—শাড়ী আর চেহারায় একটা নতুন মার্কেট তৈরী হচ্ছে ত! যত বিদ্যাবুদ্ধিই থাক, ধুতি-পাঞ্জাবীর সেখানে কোন দাম নেই।

উনি কি চাকরির কথা আপনাকে বলেছিলেন?—আশুবাবুর গলার স্বর বেশ কঠিন।

উনি বলবেন কেন? আমার কি নিজে থেকে বোঝবার ক্ষমতা নেই? নিখিল অবিচলিত ভাবে হাসতে হাসতে বললে,—স্বামী ত একরকম নিরুদ্দেশ ব'লেই মনে হচ্ছে। অন্ততঃ এতদিনে আমি ত একবার চুলের টিকিও দেখিনি। আর সেরকম কিছু না হলে আপনার ওখানে ওঁকে রাঁধুনীগিরিই বা করতে হবে কেন? তাই এই কাজটার খবর পেয়ে ওঁকে কাগজপত্রগুলো দিয়ে গেছলাম। ওঁর এখন যা অবস্থা তাতে এরকম কাজ পেলে খুশীই হবেন ভেবেছি।

শোভনা তখন আশুবাবুর অকারণ অপ্রত্যাশিত অপমানের কথা ভেবে লজ্জায় সঙ্কোচে এতটুকু হয়ে গেছে।

আশুবাবু কিন্তু আগের চেয়ে নরম গলায় জিজ্ঞাসা করলেন,—কাজটা কি?

কি বলুন না শোভনা দেবী! আপনি ত সব পড়েছেন?

শোভনাকে নীরব দেখে নিখিল বেশ জোরেই হেসে উঠে আবার বললে,—আমি যেন কি একটা অন্যায় ক'রে ফেলেছি মনে হচ্ছে। কিন্তু প্রতিবেশী হিসেবে একটু সাহায্য করতে চাওয়া ছাড়া কোন অভিসন্ধি আমার আছে ব'লে ত বুঝতে পারছি না। বেশ, আপনিই শুনুন আশুবাবু। কাজটা যাকে বলে ইংরেজী ক'টা কাগজের বিজ্ঞাপনের প্রতিনিধির। আজকাল মেয়েদেরই এসব কাজে চাহিদা হয়েছে। চেহারা চলন বলন একটু ভাল হ'লে তারা যা আদায় করতে পারে পুরুষদের তা সাধ্য নেই। কাজকর্মের সন্ধানেই ত দিনরাত ঘুরি। এ কাজটা নিজের জন্যেই খুঁজতে গেছলাম। কিন্তু খবরাখবর নিয়ে বুঝলাম, ওখানে আমার মত হতভাগা পুরুষের কোন আশা নেই। তাই ওঁর কথা ভেবে ওঁকেই সুবিধেটা দিতে চেয়েছিলাম। খুব অন্যায় কিছু করেছি?

না, তা করেন নি! কাগজপত্রগুলো আমি একবার শুধু দেখতে চাই!—ব'লে শোভনার হাত থেকে সেগুলো নিয়ে আশুবাবু বেরিয়ে গেলেন।

খানিক দু'জনেই একেবারে নীরব।

নিখিলই প্রথম হেসে উঠে অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতাটা ভেঙে দিয়ে বললে,—ব্যাপারটা কি হ'ল সত্যিই বুঝতে পারছি না। আপনি হঠাৎ এমন আড়ষ্ট গম্ভীর হয়ে গেলেন কেন? কিছু নোংরা জঘন্য কাজে আপনাকে ঠেলতে চেয়েছি ব'লে মনে হচ্ছে?

তা হয়ত ঠেলেন নি, কিন্তু আশুবাবুকে আমার ঘরে অপমান করবার স্পর্ধা আপনি কোথায় পেলেন!—শোভনার রুদ্ধ রাগের জ্বালা এতক্ষণে যেন ফেটে বেরুল।

অপমান!—নিখিল যেন একেবারে হতভম্ব, আশুবাবুকে আবার অপমান করলাম কোথায়? ওঃ, ওঁর রাঁধুনীগিরির কথা বলেছি ব'লে? তাতে অন্যায়টা কি হয়েছে। সত্যিই ত তাই আপনি করছেন। এই কি আপনার যোগ্য কাজ নাকি?

আমার কি যোগ্য না-যোগ্য সে বিচার আপনার ওপর ছেড়ে দিয়েছি ব'লে ত মনে পড়ছে না! শোভনার গলায় এবার তীব্র বিদ্রূপের ধার।

আপনি রাগই করুন আর যাই করুন, সত্যি কথা আমি না ব'লে পারি না। ওই আমার বদ্‌স্বভাব। ও বৃদ্ধ যেভাবে কাগজগুলো নিয়ে গেলেন তাতে ত নিজে থেকে আপনার অন্নদাতা অভিভাবক হয়ে উঠেছেন বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু ওঁর তাঁবেদার হয়েই আপনি জীবন

কাটাবেন নাকি! কাগজপত্র উনি ত দেখতে নিয়ে গেলেন কিন্তু অমন বিনে মাইনের রাঁধুনী উনি কি সহজে ছাড়তে চাইবেন? শুনুন, আপনার সম্বন্ধে কিছু খোঁজ আমি না নিয়ে পারি নি···

ধন্যবাদ!—নিখিলকে মাঝ পথেই থামিয়ে দিয়ে শোভনা তিক্ত কঠিন স্বরে বললে, এখন অনুগ্রহ ক'রে আপনি একটু যাবেন? আমি দরজাটা বন্ধ করতে চাই!

নাঃ, খুব কড়া অপমানই করতে চাইছেন বুঝতে পারছি। সব কেমন গণ্ডগোল হয়ে গেল। আচ্ছা, এখন আমি যাচ্ছি। আপনার মাথা ঠাণ্ডা হলে আর একবার বোঝাবার চেষ্টা ক'রে দেখব।

মুখে একটু বিমূঢ় হাসি নিয়ে নিখিল বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই শোভনা সশব্দে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলে।*

ক্রমশঃ

* এই উপন্যাসটির পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের একটি চুম্বক আগামী জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে ছাপা হবে।

ভোরের প্রসাদ

শ্রীহেমলতা দেবী

জগৎ, তোমারে ভালবেসেছিনু
কোন্ আদিযুগে, আদিম প্রাতে,
আকাশ যেদিন ভিজাইল মাটি
বিন্দু বিন্দু শিশির-পাতে।
চেতনা জাগিল মাটির বক্ষে,
প্রাণের স্পর্শে উঠি, শিহরি,
দেখে রাশি রাশি ফুল ফুটে ওঠে
কালো তার দেহ আলোয় ভরি'।
রঙে রঙে রাঙা হ'ল যে আকাশ,
বাতাস হ'ল যে সুগন্ধ-ময়,
ভালবেসে এসে নিভৃতে গোপনে
প্রতি জনে জনে কি কথা কয়!

আয় আনন্দ, আয়রে ছন্দ,
আয়রে শিশির-ভেজা ফুলদল
প্রেমের প্রসাদ বিলায়ে জগতে
আন্ শান্তির পূত পরিমল।
জগৎ আমার, জগৎ আমার,
প্রেমের তুমি যে প্রস্রবণ,
প্রেমের পরশে জাগিল হরষে
আকাশে বাতাসে আলিঙ্গন।
মিলনের সুর ঐ শোনা যায়,
বাঁশী বাজে ঐ সুদূরে দূরে।
ভোরের প্রসাদ নেমে এল আজ
শান্তিনিবিড় অন্তঃপুরে।

চীনা কবিতা : শ্রীদিলীপ দত্ত। কৃত্তিবাস প্রকাশনী, কলিকাতা-৪. মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

মূল চীনা কবিতার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নেই ; অনুবাদের মাধ্যমে বৈচিত্র্যমণ্ডিত চীনা সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সংক্ষিপ্ত। চীনাদের সংস্কৃতি ও সাহিত্য সুপ্রাচীন। বহু বিদগ্ধ মানুষের মনন-সম্পদে চীনা সাহিত্য পরিপুষ্ট ; বহু কলারসিক এবং অগণিত কাব্যরসিকের রসনিবেদনে চৈনিক কাব্যসাহিত্য এবং শিল্পকর্ম অনন্য মর্যাদায় ভূষিত হয়েছে। অনুবাদক দিলীপবাবু সুপ্রাচীন চীনা কবিতার স্বাদ পাবার সুযোগ আমাদের যেমন দিয়েছেন ঠিক তেমনি ধারা তিনি আধুনিক চীনা কবিতার সঙ্গেও আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছেন। চিয়েন চিয়েন আধুনিক চীনা কবিতার নতুন যুগের প্রবর্তক। চিয়েনের কবিতায় মিলের প্রাধান্য নেই। প্রাক আধুনিক যুগ থেকে পিছিয়ে গিয়ে আমরা যদি খ্রীষ্টপূর্ব যুগ পর্যন্ত সংক্রমণ করি তা হ'লে দেখা যে, চীনা কবিতায় 'মিল' রাজত্ব করেছে দোর্দণ্ড প্রতাপে। চিয়েন সেই মিলকে অতিক্রম করলেন। অধিকার করলেন তার একান্ত আবশ্যকতাকে; চিয়েন আধুনিক মানুষের মনের কথা বললেন আধুনিক ভাষায় :

"পাহাড়ের চূড়োয়
সূর্যের মশাল জ্বলে।
আমরা তুলো কুড়োই।
আমরা তুলো কুড়োই –
ক্ষুধার্ত আমরা ;
ক্লান্ত আমরা ;
সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরি।"

টিয়েন চিয়েন ছাড়াও সেচ কো চিয়া, কেংচি, আই চিং, ফলিনো প্রমুখ আধুনিক চীনা কবিদের কাব্যানুবাদ আলোচ্য গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। প্রাচীন চীনা কবিদের কবিতার স্থানও হয়েছে এই সংকলনে, প্রাচীনদের মধ্যে ওয়েঙ্গ ওয়েই, লি পো, ওয়াং সাং লিং, টুফু, প্রমুখ খ্যাতনামা কবিদের কাব্যানুবাদ স্থান পেয়েছে। প্রাচীনদের মধ্যে যেমন ক্লাসিক্যাল রোমান্টিসিজমের সুর প্রমূর্ত, ঠিক তেমনি আধুনিকদের মধ্যে রিয়ালিজমের সুর প্রতিধ্বনিত। অনুবাদকের ভাষা ও বাচনভঙ্গি কবিজনোচিত। তাঁর কবিহৃদয় স্থানকালের ব্যবধানে উত্তীর্ণ হয়েছে অনায়াসে : দিলীপবাবু সহৃদয় হৃদয়সংবাদী ; তাই তাঁর অনুবাদ সহজ ও স্বচ্ছ হয়েছে।

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

রসসমীক্ষা : শ্রীরমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। পরিবেশক : মুখার্জি বুক হাউস, ৫৭, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ছয় টাকা।

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের তথ্য সমূহ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়া বিভিন্ন আধুনিক ভাষায় বহুগ্রন্থ রচিত হইয়াছে। অন্যভাষার কথা বলিতে পারি না, তবে বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলির অধিকাংশই ঠিক আধুনিক পাঠকের উপযোগী ভাবে লিখিত বলা যায় না। আলোচ্য গ্রন্থখানি সম্পূর্ণতঃ না হইলেও অংশতঃ এই ধারার ব্যতিক্রম দেখা যায়। ইহার অনেক অংশ পাঠ করিয়া কৌতূহলী পাঠক মাত্রই তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন মাঝে মাঝে বাংলা সাহিত্য হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হওয়ায় বাংলাসাহিত্যরসিকের বুঝিবার সুবিধা হইবে। সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রে রসসম্বন্ধে যে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায় প্রধানতঃ তাহারই পরিচয় এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে। তবে গ্রন্থকার সর্বত্র প্রাচীন মতের অনুমোদন করেন নাই। প্রাচীন শাস্ত্রের ত্রুটিনিরূপণ প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন 'সংস্কৃত আলংকারিকেরা সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাপারে কবিপ্রতিভাকে তাহার প্রাপ্য স্বীকৃতিদান করেন নাই।...সাহিত্যকে পূর্ণমনুষ্যত্বের বিকাশরূপে উপলব্ধি করেন নাই।' (পৃঃ ৯, ১০)। গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে গ্রন্থকার কাব্যের উদ্দেশ্য বিষয়ে প্রাচীন ধারণা সম্বন্ধে রূঢ় অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—'সংস্কৃত আলংকারিকদের দৃষ্টি অলংকার শাস্ত্রের প্রাচীন মতবাদ ও ঐতিহ্যের দ্বারা বিমোহিত হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহারা গতানুগতিকাস্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া আনন্দকে সর্ববিধকাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; পূর্বে বলিয়াছি, আনন্দলাভ কাব্যের গৌণ ফল ; ইহার মুখ্যফল আত্মপ্রকাশ।' (পৃঃ ১৭৮-৯) প্রাচীন মতবাদের অপক্ষপাত আলোচনা উপযোগী না হইলেও কঠোর মন্তব্য সর্বথা বর্জনীয়। গ্রন্থকারের মতামত সম্পর্কে বিচার ক্ষুদ্র সমালোচনার মধ্যে সম্ভব নয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

পথের টানে : বিভা সরকার। প্রকাশক এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পত্রাঙ্ক ১৯০, মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

ভ্রমণ-কাহিনীর মুখ্য উদ্দেশ্য তথ্য-পরিবেশন হইলেও, রচনার গুণে কিভাবে তাহা উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের পর্যায়ে উঠিতে পারে, আলোচ্য পুস্তকখানি তাহার এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ কি করিয়া সরস গল্পে পরিণত করা যায়, বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিতা লেখিকা তাহা এই পুস্তকে দেখাইয়াছেন। ইহাকে সাধারণশ্রেণীর ভ্রমণ-কাহিনী বলিলে ভুল করা হইবে। লেখিকা শুধু স্থান ও পথের বর্ণনা দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পথে-দেখা মানব-চরিত্রচিত্রণের চেষ্টাও করিয়াছেন। কতগুলি চরিত্র এরূপ সজীব যে, আমরা যেন তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাদিগের দুঃখ-দুঃখ অনুভব করিতেছি। গল্পের ভঙ্গিতে রচনা-শৈলী, মানবচরিত্রের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, নীরস জিনিষকে সরস করিয়া তুলিবার শক্তি ও একটি সমবেদনশীল পরিচ্ছন্ন কবিমানসের পরিচয় আলোচ্য ভ্রমণ-কাহিনীটিকে সুখপাঠ্য ও সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। পুস্তকখানির প্রধান গুণ, একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া পারা যায় না। আমরা এরূপ পুস্তকের বহুলপ্রচার কামনা করি।

শ্রীকৃষ্ণধন দে

রূপদক্ষ রবীন্দ্রনাথ : মৃণাল ঘোষ, চন্দননগর হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। ১৯০৬, পৃঃ ১৫।

কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার ধারায় বিশ্বজনের চিত্ত মোদিত হইয়াছে। কবি, গীতিকার, শিক্ষাবিদ্ রবীন্দ্রনাথ আমাদের সম্মুখে শতধা বিরাজিত, কিন্তু তিনি জীবনের প্রায় শেষ পর্বে যে অনন্যসাধারণ কলাকৌশলের পরিচয় দিলেন তাঁহার চিত্রাবলীর মধ্যে সেই পরমাশ্চর্য আত্মপ্রকাশের পরিপূর্ণ রূপটি আমরা বহুদিন ধরিতে পারি নাই। আজও তাহা রবীন্দ্রানুরাগী বাঙালীর নিকট দুর্বোধ্য হেঁয়ালীর মত। কয়েকজন বিশিষ্ট রবীন্দ্রানুরাগী এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, যেমন শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, অর্ধেন্দু গাঙ্গুলী, অসিতকুমার হালদার, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মুকুল দে প্রভৃতি। কিন্তু রবীন্দ্রচিত্রকলা সম্বন্ধে এ আলোচনা মনোজ্ঞ হইলেও, বহুধা বিসারী বলা চলে না। প্রতীচ্যের লেওনার্দো দা ভিঞ্চি, র‍্যাফেল প্রভৃতি চিত্রশিল্পীকে ঘিরিয়া কত কাহিনী রচিত হইয়াছে। এমন কি রবীন্দ্রসমকালীন শিল্পী পিকাসো সম্বন্ধে নিত্য নূতন কত মনোজ্ঞ আলোচনা প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রায় আড়াই হাজার ছবি আঁকিলেন, ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কলারসিকগণ তাঁহার চিত্র প্রদর্শনী দেখিয়া কত না প্রশংসাবাক্য বর্ষণ করিলেন। কিন্তু বাঙ্গলার রসিকসমাজে রবীন্দ্রচিত্রশিল্প উপলব্ধি করার ব্যাপক প্রয়াস আজও দেখা যায় না।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক কবিশিল্পীর চিত্রসৃষ্টিবিষয়ে স্বল্পপরিসরে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছেন। কয়েকজন রূপতাত্ত্বিক রবীন্দ্রানুরাগীর আলোচনা লেখকের বিশ্লেষণ ভঙ্গির ফলে আরও চিত্তচমৎকারী হইয়া উঠিয়াছে। আপন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে রবীন্দ্রচিত্রশিল্প উপলব্ধি করার প্রয়াস ইহাতে আছে। স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় চিত্রসৃষ্টির মূলে রবীন্দ্র অন্তর্লোকের পরিচয় তিনি দিয়াছেন। চিত্রাঙ্কন বিষয়ে কবির বহু উক্তি উদ্ধৃত করিয়া উহার বিষয়বস্তু, টেকনিক, ডিজাইন ইত্যাদি সম্বন্ধে সুনিপুণ আলোচনা করিয়াছেন। কবি নিজেই বলিয়াছেন, "কোন শিল্পরীতি অনুসারে আমি ছবি আঁকতে চাইনি, রঙের এবং রেখার ছন্দময়, আনন্দময় অনুভূতিই আমার চিত্রসৃষ্টির গোড়ার কথা।" রবীন্দ্রচিত্রকলার মধ্যে সেই রেখার খেলা ও আকারের লীলাই বর্তমান প্রবন্ধে বাঙ্ময় রূপ লাভ করিয়াছে। লেখক বলিয়াছেন, "রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সম্পূর্ণ রবীন্দ্ররচনাবলীর সস্তা সংস্করণের ন্যায় তাঁর চিত্রাবলীর সুলভ এবং সংক্ষিপ্ত সংস্করণ দেশে প্রচারিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।" যাহা হউক, লেখক গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে রবীন্দ্রচিত্রসৃষ্টির যে মূল রূপটি রবীন্দ্ররসিক সমাজকে উপহার দিয়াছেন তাহার জন্য তিনি বাঙ্গালীমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ।

শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য

অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ : ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা-১২। মূল্য ৬.০০ ছয় টাকা মাত্র।

আলোচ্য গ্রন্থে কবি সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ-কৃতিত্বের দিকটাই দেখানো হইয়াছে। যে গুণটি থাকিলে অনুবাদও রসোত্তীর্ণ হয়, সেই গুণ ছিল অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথের। কথার অনুবাদ, অনুবাদ নহে। ভাব এবং রসের অনুবাদই প্রকৃত অনুবাদ। এই তথ্যটি না জানিলে অনুবাদ রসহীন হইয়া পড়ে। যেমন—

প্রিয়া মোর মনের মত, ফুলবুকে মোর মদ হাতে,
দুনিয়ার সুলতানেরে গোলাপ গণি এই রাতে।
আজিকে এ মজলিসে কাজ কি জেলে মোমবাতি?
সজনী চাঁদ বদনী বেশ বিরাজে জলসাতে।

এ অনুবাদ, অনুবাদই হইয়াছে কিন্তু রস কোথায়? কিন্তু ঐ ক'টি লাইনই সত্যেন্দ্রনাথ লিখিলেন—

প্রিয়া যবে পাশে, হস্তে পেয়ালা, গোলাপের মালা গলে;
কে বা সুলতান? তখন আমার গোলাম সে পদতলে।
বলে দাও বাতি না জ্বালায় আজি আমোদের নাহি সীমা,
আজ প্রেয়সীর মুখচন্দ্রের আনন্দ-পূর্ণিমা!

এইরূপ অসংখ্য উদাহরণ তাঁর কাব্য-সংগ্রহে রহিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি আটটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম পরিচ্ছেদে ইংরাজী কবিতার অনুবাদে সত্যেন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য, তৃতীয় পরিচ্ছেদে বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ ও সত্যেন্দ্রনাথ, চতুর্থ পরিচ্ছেদে হিন্দী কবিতার অনুবাদ, পঞ্চম পরিচ্ছেদে ফরাসীকাব্য ও সত্যেন্দ্রনাথ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ফারসী কবিতার অনুবাদ, সপ্তম পরিচ্ছেদে ওড়িয়া সাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথের অনুসরণ ও অষ্টম পরিচ্ছেদে কয়েকটি কঠিন কবিতা।

ভাষা জানা এবং ভাষাকে আয়ত্ত করার মধ্যে তফাৎ অনেকখানি। কবি সত্যেন্দ্রনাথ ভাষাকে আয়ত্ত করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার অনুবাদে এতটা মাধুর্য দেখিতে পাই। তিনি অনুবাদে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, না মৌলিক রচনায়, এ লইয়া অনেক মতদ্বৈধতা আছে। কবি হিসাবে যে-খ্যাতি তাঁর পাবার তা তিনি পাইয়াই গিয়াছেন। বিশেষ করিয়া রবীন্দ্র-প্রতিভার পাশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা কম শক্তির কথা নয়। তিনি ছিলেন ছন্দের কবি। ইহা কি তাঁহার অপবাদ? তিনি ছন্দ লইয়া খেলা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোথাও কবি-ধর্ম হইতে চ্যুত হন নাই। অবশ্য এ বিষয়ে দ্বিমত থাকা স্বাভাবিক। যেমন গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "...সত্যেন্দ্রনাথের রচনায় দোষত্রুটির সন্ধানে আমরা দেখি যে, তিনি অনেক মৌলিক কবিতা রচনা করেছেন কিন্তু তার মধ্যে সর্বক্ষেত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় নি। অসাধারণ তথ্যভার হয়ত তত্ত্ব বা রসকে চাপা দিয়াছে। শব্দচয়নে তিনি এমন বিভোর যে, কাব্যিক প্রয়োজনের পরিসীমা যে কখন তিনি অতিক্রম ক'রে গেছেন তা তাঁর খেয়াল থাকে নি।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক অনুবাদের কথাই বলিয়াছেন। এবং এই অনুবাদের বিভিন্ন দিক এবং ছন্দ লইয়া যে ভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারও পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে। এদিক দিয়া তাঁহার এই গ্রন্থের 'অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ' নামকরণটি সার্থক হইয়াছে। এই অমূল্য গ্রন্থের প্রচার আবশ্যক।

চেনা মুখ অচেনা মন—সন্তোষকুমার দত্ত, 'মা' প্রকাশনী ৫৭, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য আড়াই টাকা মাত্র।

আলোচ্য গ্রন্থখানি কয়েকটি গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি সাময়িক পত্রে পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। গল্পগুলি সুলিখিত। লেখক গল্প বলিবার কৌশল জানেন। বিশেষ করিয়া 'নূরজাহান' ও 'রমণী' গল্পটি আর সবকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। লেখকের ভাষা সহজ, কোথাও কষ্ট-কল্পনা নাই। এই গুণই লেখককে একদিন বড় করিয়া তুলিবে। সকল পাঠকের কাছেই ইহা ভাল লাগিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

গৌতম সেন

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা।

শ্রীকৃষ্ণ

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬২শ ভাগ
১ম খণ্ড | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯ | ২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

কলিকাতা বন্দরের উদ্বেগজনক অবস্থা

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ে কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব অন্য যে কোন ভারতীয় বন্দর অপেক্ষা অধিক। এই বন্দর বিদেশে ভারতীয় পণ্য রপ্তানীর প্রধান পথ। এই পথে বৈদেশিক মুদ্রা—যাহা ভারতের প্রাণবায়ু দাঁড়াইয়াছে—উপার্জ্জনের জন্য কাঁচা পাট ও পাট হইতে প্রস্তুত বস্ত্রাদি, চা, কয়লা, খনিজ পদার্থ, চামড়া ইত্যাদি যাহা বিদেশে প্রেরিত হয় তাহাতে সমগ্র ভারতের রপ্তানীজাত আয়ের অর্দ্ধেক অর্জ্জিত হয়। অন্যসকল ছোটবড় বন্দর একত্রে মিলিয়া বাকী অর্দ্ধাংশ অর্জ্জন করে। সুতরাং এই বন্দর অচল হইলে ভারতের অর্থনৈতিক সঙ্কট অনিবার্য।

অন্যদিকে পশ্চিম বাংলার জীবনস্রোতও এই বন্দরের অবস্থা-ব্যবস্থার সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। এই বন্দর শুধু বিদেশের সঙ্গে নয়, ভারতের সমুদ্রকুলস্থিত অন্য অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগের সহজ ও সরল পথ। এই বন্দরের কাজ ব্যাহত হইলে পশ্চিমবঙ্গেরও সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। অতএব এই বন্দরের কার্য্যক্রমে সুব্যবস্থা ও বন্দরের মুখ সুগম রাখার উপর পশ্চিম বাংলার কর্ত্তৃপক্ষেরও নজর রাখা উচিত ও প্রয়োজন। এবং সেই সঙ্গে যাঁহারা পশ্চিমবঙ্গের মুখপাত্র হিসাবে কেন্দ্রীয় লোকসভায় ও রাজ্যসভায় প্রেরিত হইয়াছেন তাঁহাদেরও এবিষয়ে গুরুতর দায়িত্বজ্ঞান থাকা উচিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অথচ আমরা দেখি যে, এই কলিকাতা বন্দরকে সচল ও সুগম রাখার জন্য যাহা কিছু অবশ্যকর্ত্তব্য, সে-সকলেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও আমলামহলে এক অত্যাশ্চর্য্য দীর্ঘসূত্রতা ও ঔদাসীন্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বন্দরের অবনতি রোধের জন্য যাহা কিছু প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনায় থাকা উচিত ছিল—যথা নদীতে জলস্রোত বাড়াইবার জন্য ফরাক্কায় বাঁধ নির্ম্মাণ, নদী-গর্ভের বালু ও পঙ্ক নিষ্কাশন, ইত্যাদি—তাহার আরম্ভ হইল দশ বৎসর পরে এবং তাহাও 'ঢিমে তেতালা' গতিতে। এই দীর্ঘদিন এভাবে অবহেলিত হওয়ার ফলে নদী এত বেশী মজিয়া গিয়াছে যে, এখন ছোট ও মাঝারি সমুদ্রগামী জাহাজের পক্ষেও এই বন্দরে আসা-যাওয়া বিপদসঙ্কুল এবং অতিশয় নিপুণ ও সুদক্ষ পাইলটের সাহায্য বিনা অসম্ভব। বড় জাহাজ, অর্থাৎ ছয়-সাত হাজার টনের অধিক মালবাহী, এ বন্দরে এখন আসিতে পারেই না, যদি না হুগলী নদীর মোহানা অঞ্চলে বা তাহার পূর্ব্বে, তাহার মাল আংশিক ভাবে খালাস করিয়া তাহার ভার লাঘব করা হয়। এই কারণে দীর্ঘ দিন গড়িমসি করিবার পর পরম অনিচ্ছাসত্ত্বে—হলদীয়ায় একটি ছোট বন্দর নির্ম্মাণের আয়োজন চলিতেছে—মৃদুমন্দ গতিতে, বলা বাহুল্য!

এই বন্দরে জাহাজ চলাচলের এক নূতন অন্তরায় দেখা দিয়াছে, সম্প্রতি পাইলট ধর্ম্মঘটের ফলে। কলিকাতা বন্দরে ৪৬ জন পাইলট জাহাজের চলাচল কাজে নিযুক্ত

আছেন। ইঁহাদের মধ্যে ৪০ জন পদত্যাগ করার নোটিশ যথাযথ ভাবে কিছুকাল পূর্ব্বে দিয়াছিলেন এবং সম্প্রতি তাঁহাদিগের প্রতি সুবিচার করার বিষয়ে হতাশ হইয়া তাঁহারা একজোটে পদত্যাগ করিয়া কাজ বন্ধ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার অর্ডিনান্স জারী করিয়া এই কাজ-বন্ধকরা আটকাইবার চেষ্টা করেন কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। এই কাজ বন্ধ করার ফলে বন্দরে জাহাজ চলাচল ক্রমেই স্তিমিত হইয়া আসিতেছে। সরকার অবশ্য নানাপ্রকার "এমার্জেন্সি" মূলক জরুরী ব্যবস্থা করিতেছেন যাহার মধ্যে ড্রেজার ও ডেসপ্যাচ সার্ভিসের কয়েকজন পাইলটকে এই জাহাজ চলাচলের ব্যাপারে নিযুক্ত করার ব্যবস্থাই প্রধান। কিন্তু অন্যদিকে এই বন্দরের শিক্ষানবীশ ১৩ জন পাইলটের মধ্যে ১১ জন পদত্যাগ করায় অবস্থা আরও ঘোরালো হইয়াছে।

বিগত ৮ই মে জাহাজ চলাচল দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীরাজবাহাদুর পাইলট ধর্ম্মঘট সম্পর্কে এক বিবৃতি কেন্দ্রীয় রাজ্যসভায় উপস্থিত করেন। বিবৃতিতে পাইলটদিগের "সুবুদ্ধির উদয়" সম্পর্কে আশা জানাইয়া পরে এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করা হইয়াছে যে, পাইলটদের বেতনের হার ইত্যাদি সম্পর্কিত পোর্ট কমিশনারের প্রস্তাবসমূহ সরকার বিবেচনা করিয়া দেখার সুযোগ পাইবার পূর্ব্বেই পাইলটরা চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। পাইলটদের এই কার্য্যদ্বারা পরিষ্কার ভাবে অত্যাবশ্যক সংস্থা (সংরক্ষণ) অর্ডিনান্সের (ইহা কলিকাতার বন্দরের ছয় শ্রেণীর নাবিকদের চাকুরি ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য) বিধি ভঙ্গ করা হইয়াছে বলিয়া বর্ণনা করিয়া বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে যে, পাইলটরা যদি তাহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন না করেন, তবে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

শ্রীরাজবাহাদুর তাঁহার বিবৃতিতে বলেন, স্যাণ্ডহেডস্ হইতে কলিকাতা বন্দর পর্য্যন্ত জাহাজ চালনার কাজ হুগলী পাইলট সার্ভিস ও এসিস্ট্যাণ্ট হারবার মাস্টারস্ সার্ভিস করিয়া থাকে। স্বাধীনতার পর এসিস্ট্যাণ্ট হারবার মাস্টারদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়। অতঃপর অন্যান্য নৌসার্ভিস বেতন বৃদ্ধির দাবী করায় সরকার ১৯৫৪ সনে ঠাকুর কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটির সুপারিশ কার্য্যকরীও করা হয়। তাহা সত্ত্বেও পাইলট ও অন্যান্য কর্মীর মধ্যে অসন্তোষ থাকায় সরকার একটি একসদস্যযুক্ত কমিটি নিয়োগ করেন। ঐ কমিটির রিপোর্ট যখন কলিকাতা পোর্ট কমিশনারস্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত স্পেশ্যাল কমিটির বিবেচনাধীন ছিল, তখন ঐ ৪০ জন পাইলট এক মাসের নোটিশ দিয়া পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা সরকারকে জানান যে, তাঁহারা ভারত সরকারের অধীন কাজ করিয়া যাইতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু সরকার এই পরিবর্ত্তন প্রয়োজন মনে করেন নাই।

অতঃপর পোর্ট কমিশনার্সের সহিত পাইলট প্রতিনিধিদের কয়েকটি আলোচনা হয়। পরিশেষে পোর্ট কমিশনার্সের বর্ত্তমান চেয়ারম্যান নিজে সহানুভূতি সহকারে এই বিষয়টি বিবেচনা করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় পাইলটগণ স্বাভাবিকভাবে কাজ চালাইয়া যাইতে স্বীকৃত হন।

তার পর স্পেশাল কমিটির সিদ্ধান্ত পাইলটদিগকে জানাইলে গত ১লা মে তাঁহারা হঠাৎ জানাইয়া দেন যে, স্পেশাল কমিটির সিদ্ধান্ত সন্তোষজনক নহে বলিয়া তাঁহারা তাঁহাদের পদত্যাগ অবিলম্বে কার্য্যকরী করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

স্পেশাল কমিটি পাইলট সার্ভিসের উচ্চতর পদগুলির বেতন বৃদ্ধি ও বেতনাদির হার বৃদ্ধি সুপারিশ করিয়াছেন। কমিশনার্স মনে করেন যে, ইহার অতিরিক্ত সুবিধা দিলে সর্ব্বত্র অসন্তোষ দেখা দিবে।

সরকার এই উচ্চশিক্ষিত অধিক বেতনভোগী পাইলটদের কাজে সর্ব্বদাই বিশেষ গুরুত্ব দেন। পাইলটগণ চরম পন্থা অবলম্বন করায় দুঃখিত এবং মনে করেন যে, ইহা কলিকাতা বন্দর ও সমগ্র দেশের স্বার্থের পরিপন্থী। সরকার আশা করেন, তাঁহারা এই পন্থা পরিহার করিবেন। পাইলটগণ এই পন্থা অবলম্বন করায় অর্ডিন্যান্স লঙ্ঘন করা হইয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন না করিলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। কলিকাতার পাইলটদিগের এক মুখপাত্র জানাইয়াছেন যে, মন্ত্রীমহাশয় যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে মূল বিষয়টি চাপা দিয়া এবং অবান্তর বিষয় যথা —অন্যান্য মেরিন সার্ভিসের প্রসঙ্গ—ইহার সঙ্গে জুড়িয়া এক গোলকধাঁধার সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহাতে পাইলটগণ দুঃখিত ও বিস্মিত। তাঁহারা তাড়াহুড়া করিয়া পদত্যাগ করেন নাই বরং তাঁহারা শুধু সুবিচারই চাহিয়াছেন।

পাইলটদিগের এই ক্ষুব্ধ ও হতাশ অবস্থা আসিল কিসে সে বিষয়ে কোনও সম্যক বিবৃতি আমাদের চক্ষুগোচর হয় নাই। ২৭শে বৈশাখের 'আনন্দবাজার পত্রিকার' একটি বিশেষ রিপোর্টে তাহার যে আংশিক বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে নিম্ন-উদ্ধৃত অংশ আছে :

"কিন্তু জাতীয় অর্থনীতিতে এই বিপর্য্যয় কেন?

কলিকাতা বন্দরের অধিকাংশ পাইলট গুহ রায় কমিটি অথবা পরবর্ত্তী সাব-কমিটির রিপোর্টে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের মূল বক্তব্য ১৯৪৮ সনে বেঙ্গল পাইলট সার্ভিস কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন হইতে কলিকাতা বন্দর কর্ত্তৃপক্ষের আওতায় আনিবার সময় প্রদত্ত চুক্তি কার্য্যকরী করিতে হইবে। ঐ চুক্তি অনুযায়ী মেরিন সার্ভিসের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে তৎকালীন বেতন হারের তারতম্য চিরকাল বজায় রাখিতে হইবে। অর্থাৎ অন্ত কোন বিভাগে মাহিনা বাড়িলেই তাঁহাদেরও সেই হারে বর্দ্ধিত বেতন দিতে হইবে। তাঁহাদের বক্তব্য ১৯৪৮ সালের পর অন্যান্ত বিভাগের মাহিনা বাড়িয়াছে কিন্তু পাইলটদের মাহিনা বাড়ে নাই।

"পাইলটরা বর্ত্তমানে কত মাহিনা পান, গুহ রায় কমিটি ও বন্দর কমিশনারদের সাব-কমিটি তাঁহাদিগকে কি বেতন দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং তাঁহারাই বা কি বেতন দাবি করিতেছেন নিম্নে তাহার একটি চিত্র দেওয়া হইল। মেরিন সার্ভিসের অন্যান্ত বিভাগ ও বন্দরের অপর কয়েকটি চাকুরির বেতনও তুলনামূলকভাবে নিম্নে দেওয়া হইল।

"পাইলটদের বর্ত্তমান বেতন হার—৬০০—৪০—১০০০—৫০—১২৫০/ই, বি ১৩৫০—৫০—১৪০৫৲ টাকা। তৎসহ কম্পেনসেটারী ভাতা ৭৫৲, মহার্ঘ ভাতা ১০০৲ (১০০০ মূল বেতনের নিম্নে), মেসিং ভাতা ৮০৲ টাকা, এ্যাওয়ে ও বেস ভাতা গড়ে মাসে ৭৫৲, পোশাক ভাতা ২৫৲, কন্‌ভেয়্যান্স ভাতা ১০০৲ টাকা। বাড়ী ভাড়া ভাতা মূল বেতনের শতকরা দশ টাকা, নাইট ফি মাসে ৬০০৲ গড়ে। (তিন হাজার টনের একটি জাহাজে প্রতি রাত্রে নাইট ফি ১৮৲—তিন হইতে পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত প্রত্যেক জাহাজের জন্ত প্রতি রাত্রে ৩১·৫০, তাহার উপরে ৫৪৲ টাকা) ইহার উপর অতিরিক্ত কাজের জন্ত ভাতা গড়ে মাসিক ১৫০৲ টাকা।

"এই বেতন হার অনুযায়ী ন্যূনতম বেতনের একজন পাইলট ৬০০৲ মূল বেতনে থাকাকালীন বর্ত্তমানে বিভিন্ন ভাতা সহ মাসে অন্যূন প্রায় ১৮৬৫৲ টাকা পাইবার অধিকারী। বন্দর কর্ত্তৃপক্ষের মতে সিনিয়র পাইলটদের অনেকের আয় বর্ত্তমানে মাসিক ২৫০০৲ টাকার মত।

"১৯৫৮ সন হইতে নবাগতদের জন্ত নির্দ্দিষ্ট নাইট ফি ৩৫০৲ টাকা ধার্য্য করা হয়। গুহ রায় কমিটি পাইলটদের বেতন বা নাইট ফি বৃদ্ধির প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

"কিন্তু পোর্ট কমিশনার্সের সাব-কমিটি নির্দ্দিষ্ট নাইট ফি ৩৫০৲ টাকা হইতে বাড়াইয়া ৪৫০৲ টাকা সুপারিশ করেন। তাঁহারা এই নাইট ফিকে মূল বেতনের অন্তর্ভূত করিয়া নূতন বেতন হার প্রস্তাব করেন ৮০০৲ হইতে ১৭৫০৲ ও তৎসহ বিশেষ বেতন ১০০৲ টাকা। অন্যান্ত ভাতা পূর্ব্বের ন্যায়। কিন্তু পাইলটগণ উহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। পাইলট এসোসিয়েশন কমিটির নিকট নিম্নরূপ বেতন হার প্রস্তাব করেন:

"৬৮০—৪০—১০০০, ৫০—১৬৫০। তৎসহ বর্ত্তমান নির্দ্দিষ্ট নাইট ফি ৩৫০ টাকা। অর্থাৎ বেতন দাঁড়াইবে ১০৩০৲ হইতে ২০০০৲ টাকা—তৎসহ অন্যান্ত ভাতা।"

আমরা জানি না যে, এই ব্যাপারের মূল সূত্র কোথায় জট পাকাইয়া আছে। ইহার পূর্ব্বে যে সকল বিবৃতি প্রকাশিত হয় তাহাতে মনে হয় যে, পাইলটগণের আত্ম-সম্ভ্রমের উপর আঘাত পড়াতেই এই অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।

শ্রীরাজবাহাদুর কি দিল্লী বসিয়া এ বিষয়ে তাঁহার দায়িত্ব পালন পূর্ণভাবে করিতে পারিবেন? আমরা সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করিয়া এ প্রসঙ্গ এখনকার মত শেষ করি।

পাকিস্থান ও ভারত

আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, যখনই পাকিস্থান ভারতের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ বিশ্বজগতে প্রচার করিবার সুযোগের খোঁজ করেন তখনই এদেশে একটা সাম্প্রদায়িক আগুন জ্বালাইবার বিশেষ চেষ্টা চলে। বর্ত্তমান সময়ে সম্মিলিত জাতি-কেন্দ্রের নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর সম্পর্কে সেই পুরাতন চেষ্টা আবার চলে। চুরি করিয়া যে চোর ক্ষতিগ্রস্ত গৃহস্থকেই চৌর্য্যাপবাদ দেয়, তাহার প্রয়োজন প্রথমেই সেই গৃহস্থকে অন্যায় অত্যাচারের অপবাদ দেওয়া। এবারও সেই চেষ্টাই চলে, অবশ্য সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

ঐরূপ সুযোগ খোঁজার জন্ত নিপুণ লোকের প্রয়োজন এবং সেই লোক হয় প্রচ্ছন্ন ভাবে বিপক্ষের সকল প্রতিষ্ঠানে অনুপ্রবেশ করে অথবা আন্তর্জ্জাতিক নিয়ম অনুসারে প্রদত্ত যে অধিকার বিদেশী দূতাবাসের কর্ম্মচারি-গণ পাইয়া থাকেন তাহার অপব্যবহার করে।

সম্প্রতি মালদহে কয়েকজন নির্ব্বোধ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকের হঠকারিতায় যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সম্ভাবনা ঘটে তাহা সরকারী দৃঢ় হস্তক্ষেপে অল্পেই নিবিয়া যায়। কিন্তু তাহাকে ব্যাপক করিবার চেষ্টায় পাকিস্থানী সহকারী হাই কমিশনার ও উক্ত হাই কমিশনের একজন

উচ্চপদস্থ বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইবে এই আশায় পূর্ব্বাহ্ণেই অতিরঞ্জিত সংবাদ পাকিস্থানে প্রেরণ করিয়া সেখানের হিন্দুদের উপর ব্যাপক অত্যাচারের অনুশীলন করিয়াছেন, এই অভিযোগ এখানের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

আরও অল্পদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় দাঙ্গা বাধাইবার এক চেষ্টা হয়, তাহার কারণ ছিল এক অখ্যাত ও অজ্ঞাত হিন্দী চটি পুস্তকে প্রকাশিত হজরত মহম্মদের কল্পিত ছবির প্রকাশ। পুস্তকটি বাজেয়াপ্ত হইবার পরেও বিক্ষোভ মিছিল ও দাঙ্গা বাধাইবার যেরূপ চেষ্টা হয় তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, কোনও "লুক্কায়িত হস্ত" ঐ উদ্যোগের জন্ম টাকা ছড়াইয়াছে এবং উস্কানি দিবার জন্ম লোক নিযুক্ত করিয়াছে। এই টাকা ও লোকের ব্যবস্থা কোথা হইতে আসিয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য।

অন্যদিকে অনুপ্রবেশের ব্যবস্থাও যে আছে তাহার প্রমাণ সহজেই পাওয়া যায়। অবশ্য একথা বলা প্রয়োজন যে, এই অনুপ্রবেশ অর্থে তাঁহাদের কথা বলা হইতেছে না যাঁহারা পশ্চিম বাংলারই সন্তান এবং যাঁহাদের রক্তমাংস গড়িয়া উঠিয়াছে আমাদের সকলের একই দেশমাতার স্নেহধারায়। তাঁহাদের অধিকার জন্মগত এবং যতদিন তাঁহারা সেই দেশমাতৃকাকে অস্বীকার না করেন ততদিনই তাহা থাকিবে। এবং সেই সঙ্গে একথাও বলা প্রয়োজন যে, যে-সকল পাকিস্থানের গুপ্তসহায়ক ঐরূপে অনুপ্রবেশ করিয়া ভারতের ক্ষতি করার চেষ্টা করিতেছে তাহারা সকলেই মুসলমান নহে—বরঞ্চ বলা উচিত যে তাহাদের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা চতুর তাহাদের অধিকাংশই হিন্দু।

এই অনুপ্রবেশের ফলে নানা স্থলে পাকিস্থানি ঘাঁটি নির্মিত হইতেছে এবং সেগুলিকে সুদৃঢ় করার চেষ্টায় পাকিস্থানের পরামর্শ ও সাহায্য মুক্তহস্তে বিতরিত হইতেছে। এই সকল ঘাঁটি নানা জায়গায় আছে। বিশেষে সেই সকল স্থলে যাহাকে ইংরাজীতে বলে Strategic—অর্থাৎ যুদ্ধ বা সজ্ঘর্ষকালে গুরুত্বপূর্ণ স্থল, যথা রেল, বিমানপোত বা জাহাজ চলাচলের কেন্দ্র বা বিদ্যুৎ সরবরাহ ও ঐ জাতীয় অত্যাবশ্যকীয় সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

সম্প্রতি আনন্দবাজার ঐ জাতীয় একটি সংবাদ দিয়াছেন যাহা সঠিক হইলে প্রণিধানযোগ্য। সংবাদটি এইরূপ :

"পাকিস্থান-দরদী একশ্রেণীর লোকের চক্রান্তের ফলে কলিকাতা বন্দরে ভারতীয় শ্রমিকদের বাদ দিয়া পাকিস্থানী মুসলমান শ্রমিককে চাকুরি দেওয়ার এক গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

"প্রকাশ, কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতা বন্দরে তিনশত শ্রমিক চাহিয়া ডক লেবার বোর্ড এক বিজ্ঞাপন দেন। ইহাতে হলদিয়া বন্দরের বেশ কিছু সংখ্যক বাঙালী তরুণ শ্রমিক দরখাস্ত করে। প্রকাশ, হলদিয়া বন্দরে নবেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত কাজ হইয়া থাকে ও এই বন্দরে যাহারা কাজ করে তাহাদের অধিকাংশই বাঙালী শ্রমিক।

"ডক লেবার বোর্ডের অভিপ্রায় ছিল কলিকাতা ডকের শ্রমিকদের শূন্য পদে হলদিয়ার বাঙালী তরুণদের নিয়োগ করা। কিন্তু প্রকাশ, ইহাতে বাদ সাধেন ডক লেবার বোর্ডের কয়েকজন সদস্য। তাঁহাদের অদৃশ্য ঘুঁটি চালনার ফলে হলদিয়ার বাঙালী শ্রমিকদের বাদ দিয়া ৩০০ শ্রমিকের মধ্যে ২৯০ জন শ্রমিক নিয়োগ করা হয় পাকিস্থানী মুসলমান শ্রমিকদের মধ্য হইতে।

"প্রকাশ, কলিকাতা বন্দরের ডক শ্রমিকদের মধ্যে শতকরা ৬০ জনই নাকি পাকিস্তানী মুসলমান। কলিকাতা ডক শ্রমিকদের সংখ্যা বর্ত্তমানে প্রায় ৫০ হাজার।

"ইতিমধ্যে পুলিশী সূত্রে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, এই পাকিস্থানী শ্রমিকদের মধ্যে এক শ্রেণীর শ্রমিকের মতিগতি নাকি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সন্দেহ উৎপাদন করিয়াছে। আরও জানা গিয়াছে যে, কয়েকদিন আগে এই পাকিস্থানী ডক-শ্রমিকদের একাংশ প্রকাশ্যেই মালদহের ঘটনা লইয়া প্রতিবাদ সভার আয়োজন করিয়াছিল।"

রেলগাড়ী ও রেলযাত্রী

কিছুদিন পূর্ব্বে যখন বারাসাত-বসিরহাট রেলের "নূতন সংস্করণ" খোলা হয়, আমরা লিখিয়াছিলাম যে, এই লাইন যাঁহাদের ব্যবহারের জন্ম নির্মিত ও স্থাপিত হইল, তাঁহারা যদি যথাযথ ভাবে ইহার ব্যবহার করেন তবে ঐ লাইন বর্দ্ধিত হইয়া মেন লাইনে যুক্ত হইবার এবং ট্রেন সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হওয়ার সম্ভাবনা আরও নিশ্চিত হইতে পারে। মার্টিন কোম্পানীর আমলে ভাড়ায় ফাঁকি ও অন্ত অপব্যবহার ছিল কিছুমাত্রায় কিন্তু পরে অন্ত কোম্পানী উহা লইবার পর উহা এরূপ ব্যাপক ভাবে আরম্ভ হয় যে, কোম্পানী বাধ্য হইয়া লাইন বন্ধ করে।

ঐ লাইন নূতন ভাবে খোলার সময় যাত্রীদের মুখ-

পাত্র হিসাবে এক গণদেবতার উপাসক যে বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহাতে যাত্রীদের এই অন্যায় ও অসৎ আচরণই যে ঐ লাইনে ট্রেন চলা বন্ধ হওয়ার প্রধান কারণ এ কথার উল্লেখমাত্রও ছিল না, উপরন্তু এরূপ বলা হয় যেন ঐ সকল যাত্রীদের আন্দোলনের ফলেই লাইন পুনর্ব্বার খোলা হইল। বলাবাহুল্য ঐরূপ বিবৃতিতে অসৎ লোকের উৎসাহ বাড়ে এবং তাহাদের অসদাচরণের ফলে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হওয়ায় প্রকৃত সজ্জন ব্যক্তিদের কষ্ট বাড়ে।

অকারণে "এলার্ম" চেন টানিয়া ট্রেন থামায় যাহারা তাহাদের মধ্যে কিছু অংশ নির্ব্বোধ, তাহারা "শুধু অকারণ পুলকে" ট্রেন থামাইয়া বাহাদুরী লয়, কিছু নিষ্কর্ম্মা লোক যাহারা পরের অপকারেই আনন্দ পায়, কিন্তু অধিকাংশই ফাঁকিবাজ, বিনা ভাড়ায় ট্রেনে চলার যাত্রী, এরা এবং এদের সাথী সহকারী দল ঐ ভাবে ট্রেন থামাইয়া যেখানে-সেখানে ওঠে-নামে।

পূর্ব্ব রেলওয়েতে এইরূপ চেন টানায় এখন ট্রেন চলাচলে বিশেষ বাধার সৃষ্টি হইতেছে। নীচে উদ্ধৃত সংবাদটিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

"পূর্ব্ব রেলওয়েতে গড়ে দৈনিক ৪৫ বার এলার্ম চেন টানা হয়। কেবলমাত্র জরুরী প্রয়োজনের জন্যই এলার্ম চেন ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিতান্ত অপ্রয়োজনেই এলার্ম চেন টানা হয়।

"১৯৬০ সনে শুধুমাত্র পূর্ব্ব রেলওয়েতে ১১,৩১০ বার এলার্ম চেন টানা হইয়াছে। এর মধ্যে মাত্র ২২০টি ক্ষেত্রে যথার্থ প্রয়োজনে এলার্ম চেন টানা হইয়াছিল।

"এই এলার্ম চেনের অপব্যবহার নিরোধের জন্য যাত্রীসাধারণের সহযোগিতা বিশেষ প্রয়োজন। এর জন্যই পূর্ব্ব রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ যে সকল যাত্রী এলার্ম চেন অপব্যবহারকারীদের ধরিয়ে দিতে সাহায্য করিবেন, তাঁহাদের পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সর্ব্বোচ্চ পুরস্কারের পরিমাণ পঞ্চাশ টাকা।"

শুধু পুরস্কার ঘোষণায় কাজ হইবে বলিয়া মনে হয় না কেননা যাহারা ঐ ভাবে চেন টানে তাহাদের মধ্যে দলবদ্ধ দুর্ব্বৃত্তের সংখ্যাই অধিক। তাহাদের ধরাইতে যাওয়ায় সাহসের প্রয়োজন আছে।

টেলিফোন ও বিদ্যুৎ সরবরাহের তার চুরি

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা টেলিফোন বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, তামার তার কাটিয়া চুরি করার ফলে টেলিফোনে দূরবার্ত্তা প্রেরণের বিশেষ অসুবিধা প্রায়ই ঘটে। তিনি জানান যে কলিকাতা-বোম্বাই, কলিকাতা-মাদ্রাজ ও কলিকাতা-দিল্লী, এই তিনটি লাইনেই গত বৎসর প্রায় ৩২৫ মাইল পরিমাণ তামার তার চুরি হয় যাহার মূল্য ৫৩৫,০০০ টাকা। এই তার-চোরেরা মোটর লরী ও মোটরকার যোগে চলাফেরা করে এবং ইহাদের কাজ যে ভাবে করা হয় তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, ইহাদের পিছনে বড় বড় ধনী কারবারী আছে। চুরি এবং চোরাই মাল চালান ও বিক্রয়—এ সবের ব্যবস্থাও বেশ সুসংবদ্ধ। বিশেষে খড়্গপুর হইতে রুরকেলা পর্য্যন্ত অঞ্চলে চোরের দল খুবই চতুর।

অধ্যক্ষ বলেন যে, এই চুরি বন্ধ করার জন্য তামায় মোড়া ইস্পাতের তার ব্যবহার করা যইতেছে, যাহাতে তার কাটিয়া প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ তামা সংগ্রহ করা সহজ হইবে না। মাটির নীচে নালি কাটিয়া তারের কেব্‌ল্‌ বসাইবার ব্যবস্থা এখন দূর অঞ্চল পর্য্যন্ত করা হইতেছে। তিনি বলেন যে, কলিকাতা হইতে বেনারস পর্য্যন্ত ঐ ভাবে কেব্‌ল্‌ বসাইবার কাজ এ বৎসরের বর্ষাকালের পূর্ব্বেই সম্পূর্ণ হইবে আশা করা যায়। ইহাতে ঐরূপ চুরির দরুণ টেলিফোনের কাজে বাধা-বিপত্তি কিছু কমিবে।

এই সকল ব্যবস্থাই ভাল। কিন্তু আমরা জানিতে চাই যে, যাহারা এই ভাবে দেশের সমূহ ক্ষতি করিয়া চোরাই মালের কারবার চালায় তাহাদের ধরা এবং কঠিন সাজা দিয়া ধাতস্থ করা কি অসম্ভব? এই চোরা কারবারীদিগের আড়ত আস্তানা সব কিছুই ত প্রকাশ্য স্থলে রহিয়াছে এবং ঐ কারবারীরা বাড়ী ঘর মোটর সব কিছুই করিতেছে জনসাধারণের চোখের সামনে। তবে ইহাদের ধরপাকড়ও করার বাধা কোথায় এবং কি কারণে ইহারা দীর্ঘ দিন এই ভাবে আইন শৃঙ্খলার সকল ব্যবস্থা ভণ্ডুল করিয়া ক্রোড়পতি হইতেছে?

চোরের ও চুরির প্রাদুর্ভাব ব্যাপক হয় তখনই যখন চোরাই মাল বেচার ব্যবস্থা সহজ ও সরল থাকে। এ দেশে চোরা কারবার যে ভাবে নির্ব্বিবাদে চালাইতে দেওয়া হয় তাহাতে চুরির কাজে উৎসাহ বাড়িবারই কথা।

আমাদের প্রশ্ন এই যে, যাঁহাদের উপর চুরি ও চোরাকারবার দমনের ভার দেওয়া আছে তাঁহারা চোর ও চোরাকারবারী ধরিতে অপারগ কেন? তাঁহাদের ব্যর্থতার মূল কোথায় তাহাও কি জানা অসম্ভব?

কলিকাতা পৌরসভা

কলিকাতা পৌরসভার কার্য্যাবলী এক প্রহসনের অংশাবলী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অকারণে বাক্‌বিতণ্ডা ও উড়োতর্ক, প্রায় যে কোন অজুহাতে সভা বন্ধ বা মুলতবী এ ত লাগিয়াই আছে, উপরন্ত পৌরজনের স্বাস্থ্য, সুবিধা ও নিরাপত্তার জন্য যে সকল কাজ অত্যাবশ্যকীয় তাহাতেও সূত্রপাত হইতেই বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি করা এই ত নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে। উপরন্ত আছে সারা জগতের রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কিত প্রসঙ্গের অবতারণা—যাহাতে পৌরসভার কাজ ক্রমাগত ব্যাহত হয়।

'আনন্দবাজার পত্রিকা' এই পৌরসভারই একদল সম্পর্কে একটি কৌতুকপ্রদ সংবাদ দিয়াছেন। উহা এইরূপ :

"কলিকাতা কর্পোরেশনে জনপ্রিয় ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠন, উপযুক্ত পরিমাণ পানীয় জল সরবরাহ, রাস্তা হইতে আবর্জ্জনা এবং ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার করা ইত্যাদির দাবিতে শুক্রবার বিকালে কর্পোরেশনের কেন্দ্রীয় ভবনে এক গণ-ডেপুটেশনের পক্ষে বিরোধী ইউ. সি. সি. দলের নেতা শ্রীধীরেন ধর এবং শ্রীনিরঞ্জন সেন, এম এল এ মেয়রের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি মেয়রের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

"ডেপুটি মেয়র শ্রীতুলসীচরণ পাল প্রতিনিধিগণকে জানান যে, তিনি তাঁহাদের বক্তব্য মেয়র শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদারকে জানাইবেন। ইহার পর উক্ত গণ-ডেপুটেশনের পক্ষ হইতে মেয়রের উদ্দেশ্যে ডেপুটি মেয়র শ্রীপালের নিকট বারো দফা দাবিসম্বলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। গণ-ডেপুটেশনে অংশ গ্রহণকারী নাগরিকগণ তৎপর একে একে ঘটনাস্থল পরিত্যাগ করেন। ঐ স্মারকলিপিতে যে সকল দাবির কথা জানান হইয়াছে তাহার মধ্যে ৭২ ইঞ্চি মেন পাইপের কাজ অবিলম্বে শেষ করা, পলতায় পরিস্রুত জলের শোধনাগার নির্ম্মাণের কাজ সুরু করা এবং ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা প্রধান।"

"জনপ্রিয় ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি" গঠনে ইউ. সি. সি. দলের ও "গণ-ডেপুটেশনের" আগ্রহ আমরা সহজেই বুঝিতে পারি! কিন্তু অন্য দফাগুলি পড়িয়া আমরা হাসিব না কাঁদিব ঠিক করিতে পারি নাই। ঐ সকল কাজে এত দেরি কেন হইয়াছে ও হইতেছে সে বিষয়ে আমরা যাহা জানি এবং ভুক্তভোগী পৌরজনমাত্রেই জানে—তাহাতে এই "গণ-ডেপুটেশনের" বক্তব্যকে আমরা উপহাস বলিয়াই বুঝিব। রাস্তা হইতে আবর্জ্জনা হটায় যাহারা এবং ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার করে যাহারা, তাহারা ত মনের আনন্দে কাজে অবহেলা করিয়া পৌরজনের কষ্টার্জ্জিত অর্থে প্রদত্ত ট্যাক্সের সদ্ব্যবহার করিতেছে। তাহাদের এই অপকর্ম্মের প্রধান সহায়ক যে "গণ-দেবতা"র উপাসকবৃন্দ, তাঁহারাও কি ঐ গণ-ডেপুটেশনে ছিলেন? যদি ছিলেন তবে বলিতে হইবে ব্যাপারটি উপভোগ্য প্রহসন ছিল।

নূতন শহর নির্ম্মাণের নূতন ব্যবস্থা

পুকুর ভরাট করিয়া বা নাবাল জমিতে মাটি উঁচু করিয়া তাহাকে বাস্তু নির্ম্মাণের উপযোগী করা, পদ্ধতি হিসাবে নূতন কিছু নয়। কিন্তু সম্প্রতি কলিকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণদুয়ারী অঞ্চলের নোনা খালবিল ও জলায়-ভরা অঞ্চলে জমি উদ্ধারের যে ব্যবস্থা আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহা এদেশে নূতন।

কোনও নাবাল জমি বা পুকুর ভরাটের সাধারণ ব্যবস্থায় সেখানে রাবিশ বা কারখানার ছাই ঢালা হয়, অভাবে অন্য কোথায়ও গর্ত্ত বা পুকুর কাটিয়া মাটি সংগ্রহ করিয়া তাহা ব্যবহার করা হয়। এই দুই ব্যবস্থাতেই ভরাট করার মাল সংগ্রহ করা এখন মুশকিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কেননা রাবিশ বা ছাই যে পরিমাণে পাওয়া যায় তাহা চাহিদার অনুপাতে অত্যন্ত কম এবং গর্ত্ত খুঁড়িয়া পুকুর ভরাট করায় খরচের অঙ্ক এখন খুবই বেশী এবং গর্ত্ত খোঁড়ার জন্য উপযোগী জমিও কলিকাতায় বা তাহার আশে-পাশে পাওয়া কঠিন। কেননা গর্ত্ত কাটিলে সেখানের জমি নষ্ট হয়। অন্যদিকে কলিকাতার গায়ে যে গঙ্গার প্রবাহ-পথ রহিয়াছে, সেখানের নদীগর্ভে গঙ্গা নিজেই উত্তর-পূর্ব্ব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে বালিমাটি আনিয়া ঢালিতেছেন। সেই পলিমাটি পরিমাণেও অশেষ এবং তাহাকে কাটিয়া তুলিলে গঙ্গাবক্ষে নৌকা জাহাজ ইত্যাদির চলাচলের সুবিধা এবং অন্য অনেক প্রকারে মানুষের উপকার হয়। সুতরাং এই পলিপড়া বালিমাটি নদীগর্ভ হইতে কাটিয়া তুলিয়া যদি জমিভরাটের কাজে লাগানো যায় তবে সব দিকেই উপকার। প্রশ্ন শুধু খরচের এবং পরিবহন সমস্যার।

বহুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার নীচের গঙ্গায় ড্রেজারে-কাটা মাটিজল পাইপে ঢালিয়া নদীর এপারের দিকে নাবাল জমিকে উদ্ধার করা হয়। সে কাজ খুব বেশী দিন চলে নাই এবং খুব কিছু বিস্তৃত অঞ্চল উদ্ধার হইয়াছিল কিনা আমাদের জানা নাই।

সম্প্রতি চিৎপুর খালের মুখের বিপরীত দিকে, ঘুসুরির চরে ড্রেজার চালাইয়া বিরাট পরিমাণে বালি-মাটি কাটিয়া, তাহা ২৪ ইঞ্চি ব্যাসের পাইপের মারফৎ পাম্প করিয়া সাড়ে ৩ মাইল চালাইয়া ঐ নোনা-জলা অঞ্চলে ঢালা হইতেছে। এই বালিকাদা জলের স্রোত এইরূপ বেগে চালানো হইতেছে যে দিনে তিন বিঘা প্রমাণ জমি আট ফুট উঁচু করিয়া উদ্ধার করা যাইবে বলিয়া আন্দাজ করা যাইতেছে।

সাড়ে ৩ বর্গ মাইল, অর্থাৎ প্রায় ৬৮২৫ বিঘা জমি উদ্ধার করিয়া কলিকাতা শহরের সম্প্রসারণ করা হইবে বলা হইয়াছে। এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, জমির দাম যাহাতে সাধারণ গৃহস্থের আয়ত্তের বাহিরে না যায় সে দিকে প্রাদেশিক কর্ত্তৃপক্ষ নজর রাখিবেন। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর এই মহান উদ্যোগের প্রশংসা করি এবং আশা করি যে, ঐ শেষ সর্ত্ত দৃঢ় থাকিবে।

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের বিদায়বাণী

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিদায় লইয়াছেন। আমাদের আশা আছে যে, আমরা সেই রাজেন্দ্রবাবুকে ফিরিয়া পাইব যিনি মহাত্মাজীর জীবনাদর্শ সম্মুখে ধরিয়া দেশের কাছে আত্মনিবেদন করিয়াছেন। মহাত্মাজীর ছায়ায় যাঁহাদের জীবন পূর্ণভাবে গঠিত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে রাজেন্দ্রবাবু অন্যতম এবং সেই কারণে তাঁহার এই রাষ্ট্রপতির আসন ছাড়িয়া আশ্রমজীবন গ্রহণ করার প্রাক্কালে উচ্চারিত বিদায়বাণী শুধুমাত্র উচ্চাধিকারীর বিদায়কালীন ভাষণ নয়, উহা সেইরূপ উন্নতচেতা দেশ-প্রেমিকের বাণী, যাঁহার চিন্তাধারায় দল, জাতি বা গোষ্ঠীর স্বার্থপ্রণোদিত কামনার লেশ নাই। সেই কারণে আমরা তাঁহার রেডিয়ো প্রচারিত বিদায়কালীন বাণীর সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। রাজেন্দ্রবাবু বলেন:

"আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলি উল্লেখযোগ্য উন্নতি করিয়াছে। কোন রাজনৈতিক দলের চেষ্টায় বা প্রশাসনিক ব্যবস্থার ফলে ঐ উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে, একথা না বলিয়া ইহাই বলিব যে, ঐ অগ্রগতির মূলে রহিয়াছে জনগণের শুভবুদ্ধি ও শৃঙ্খলাবোধ। জনগণের এই শুভবুদ্ধি ও শৃঙ্খলাবোধের জন্য ভারতের তিনটি সাধারণ নির্ব্বাচন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

"যে-কোন দেশে গণতন্ত্রের সাফল্য নাগরিকদের বা ভোটদাতাদের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। আমরা যদি জনগণকে গণতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিতে না পারি এবং গণতন্ত্রকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে যেসব গুণ থাকা প্রয়োজন, সেই সব গুণের অনুশীলন না করি, তাহা হইলে জনগণের ইচ্ছায় আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত গণ-তন্ত্রের নিরাপদ ও সুস্থ বিকাশ ঘটিবে না।

"আমাদের চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি বা দুর্নীতি আমাদের নজরে পড়িবে, সেগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া সেগুলি দূর করার দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেককে গ্রহণ করিতে হইবে।

"দেশের যুব সমাজের প্রতি আমার উপদেশ এই যে, তাঁহারা যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছু দেখিবার শিক্ষা গ্রহণ করুন এবং ঘটনা ও পরিস্থিতির মূল্য নির্দ্ধারণে সঠিক পরিমিতি-বোধ অর্জ্জনে তৎপর হোন। আমি যে কাজের কথা বলিতেছি, তাহা সহজ নহে, কিন্তু নিষ্ঠার সহিত চেষ্টা করিলে উহা খুব বেশী কঠিন বলিয়া মনে হইবে না। কোন কিছুর মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে জ্ঞাতসারে চেষ্টা করিতে হয়। উহা এক মানসিক প্রক্রিয়া। কিন্তু আমাদের সম্মুখে এমন কয়েকটি উচ্চ আদর্শ রহিয়াছে যাহা আমাদের সত্য পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে। সত্যের মূল্য যদি আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, তাহা হইলে ব্যক্তিগত এবং জাতীয় স্বার্থের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ বাধিলে সমস্যার সমাধান করা আমাদের পক্ষে কঠিন হইবে না।

"ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থের মধ্যে কোন সত্যকার বিরোধ থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ একটি অপরটির অঙ্গীভূত। যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে এই দুইটি বিষয়কে দেখিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিলেই জনগণের পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং জাতীয় সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক সকল প্রকার বিরোধের সমাধান সহজেই করা যাইতে পারে।

"আমি এ কথা আপনাদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, আমাদের ন্যায় গণতান্ত্রিক সংবিধান যেমন জনগণকে কতকগুলি অধিকার প্রদান করে, তেমনি আবার তাঁহাদের উপর কতকগুলি দায়িত্বও অর্পণ করে। যথা-যথভাবে দায়িত্ব পালন করিলে অধিকার লাভ করা যায়। ঐ অধিকারগুলি সুসম্পাদিত কর্ত্তব্যের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। অধিকার ভোগ করিতে হইলে আমা-দিগকে আমাদের কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। আমাদের কর্ত্তব্যের উপর যথাযথ গুরুত্ব অর্পণ করিতে হইবে।"

তাঁহার এই বাণীতে যুবকসমাজের উদ্দেশ্যে তিনি যাহা বলিয়াছেন এবং অধিকার ও দায়িত্বের মধ্যে নিবিড় যোগের যে কথা তিনি জানাইয়াছেন তাহা যদি দেশের যুবজন বুঝিতে চেষ্টা করেন তবে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে। আমাদের দেশে এখন অবিবেচক ও

দায়িত্বহীন লোকেরই সংখ্যা বেশী এবং প্রধানতঃ সেই কারণেই দেশের অবস্থা এইরূপ বিক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট।

আসামের ঘৃণ্য জাতীয়তা বিরুদ্ধতা

আসামের যাঁহারা কংগ্রেসের দলপতি ও কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের অনুগত অনুচর, তাঁহারাই আসাম প্রদেশ দখল করিয়া বিগত পনর বৎসর উক্ত প্রদেশে রাজত্ব করিয়া চলিয়াছেন। ইঁহাদিগের একমাত্র গুণ যে, ইঁহারা আসামী ভাষায় কথা বলিতে পারেন ও ইঁহাদিগের অপরাপর প্রদেশবাসীদিগের প্রতি কোন বন্ধুভাব নাই। আসাম প্রদেশ শুধু আসামী ভাষাভাষীর আবাসভূমি হইবে, অন্তরে অন্তরে এই কথাই এই সকল জাতীয়তাবাদের শত্রুদিগের ভিতরে চিরজাগ্রত ছিল ও বর্ত্তমানেও আছে। সংখ্যায় ইঁহারা অপরাপর আসামবাসীদিগের তুলনায় অধিক ছিলেন না এবং নানান প্রকার কল্পিত ও মিথ্যা সংখ্যা প্রকাশ করিয়া ইঁহারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেন যে আসামী ভাষাভাষিগণই আসামের সংখ্যা-গরিষ্ঠ। এবং গোপনে ইহারা আসামের মুসলমানদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া স্থির করিয়া নেন যে, ঐ মুসলমান-দিগের ভাষাও আসামী। মুসলমানদিগের জাতি ও ভাষা বহুক্ষেত্রে নিজ সুবিধা অনুযায়ী হইয়া থাকে। যথা, পাকিস্থানের জাতীয় ভাষা পূর্ব্বে বলা হইত উর্দ্দু; যদিও কোনও পাকিস্থান এলাকার পুরুষানুক্রমিক বাসিন্দার মাতৃভাষা উর্দ্দু নহে। আসামী মুসলমানগণ নিজেদের ভাষা আসামী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন ও তাহাতেও যখন আসামীর সংখ্যা-গরিষ্ঠতা পূর্ণরূপে প্রমাণ হইল না তখন পাকিস্থান হইতে আসামী পুলিশের ও সরকারী কর্ম্মচারীদিগের সাহায্যে, আরও মুসলমান আমদানী করা আরম্ভ হইল। বর্ত্তমানে আসাম মুসলমানের সংখ্যাধিক্যে জর্জ্জরিত এবং ক্রমশঃ আসাম ও নাগা এলাকা যাহাতে পাকিস্থানের অন্তর্গত হইয়া যায় সেই ব্যবস্থায় পাকিস্থান আজ মহা উৎসাহে নিযুক্ত। এই মুসলমানের সহিত চক্রান্ত করিয়া বাংলা ও পার্ব্বত্য ভাষাভাষী আসামীদিগকে দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা যাঁহারা করিয়াছিলেন ও করিতেছেন তাঁহারা ভারতীয় কংগ্রেস পার্টির পরম অনুগত। এই কারণে তাঁহাদিগের নেহরুর দরবারে স্থান খুবই উচ্চে। কারণ উক্ত দরবারে কোন ভাষারই মান ইজ্জৎ বিশেষ নাই, হিন্দী ব্যতীত। এবং ভারতের শতকরা চল্লিশ জন বা ততোধিক ব্যক্তি হিন্দী ভাষাভাষী—এই মিথ্যা প্রচার করিবার জন্ত তাঁহারা বিশেষ উৎসাহের সহিত ভারতের বহু লোকের ভাষাই হিন্দী বলিয়া প্রচার করিতেছেন যাঁহাদিগের ভাষা কোনও ভাবেই হিন্দী নহে। আসামীগণও অদূর ভবিষ্যতে হিন্দীকে মাতৃভাষা বলিয়া মানিয়া লইতে পারে এবং তাহা যদি হয় তাহা হইলে আসামীগণ সত্য সত্যই জাতে উঠিতে পারিবেন। ভোজপুরী, মৈথিলী ও মাগধী ভাষা বর্ত্তমানে হিন্দী বলিয়া পরিচিত। পাঞ্জাবী ভাষাও প্রায় সেই অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে। আসামী, নেপালী, ভুটানী, সিকিমী, মাড়োয়ারী, আজমিরী প্রভৃতি ভাষাও ধীরে ধীরে হিন্দীর কবলে পড়িয়া নিজত্ব হারাইবে, সন্দেহ নাই। অর্থাৎ আসামীর যে বাংলা ও পার্ব্বত্য ভাষার সহিত শত্রুতা, তাহার মূলে আছে হিন্দুস্থানী সাম্রাজ্যবাদ। এই কারণেই আসামীরা যখন "বঙ্গাল খেদা" আন্দোলন করিয়া বহু বাঙ্গালীর ঘর-দুয়ার জ্বালাইয়া ও বাঙ্গালী নরনারীর উপর অত্যাচারের চূড়ান্ত করিল, তখন নেহরু সরকার তাহাদিগকে কিছুত বলিলেনই না, বরঞ্চ নেহরু স্বয়ং আসামী যুবকদিগের প্রতি নিজের প্রীতির কথা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিলেন। বর্ত্তমানে যে আসাম পাকিস্থানের লক্ষ লক্ষ "পঞ্চম বাহিনী"র ও গুপ্তচরদিগের বাসভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার জন্ত নেহরু ও তাঁহার হিন্দী প্রচার প্রধানতঃ দায়ী। আসামী ভাষাভাষিগণ অল্প সময়ের মধ্যে যে সংখ্যায় দ্বিগুণের অধিক "বাড়িয়া যাইল" তাহার জন্তও কংগ্রেস দলই দায়ী। বহু অন্যায় ও আইনে পদাঘাত করা সত্ত্বেও যে আসামী নেতাগণ এখনও "তখ্‌তে" অধিষ্ঠিত রহিয়াছে তাহার জন্তও কংগ্রেস দল দায়ী। হিন্দী ও আসামী ভাষার প্রচারের জন্ত বাংলা ভাষাভাষীরা যে অত্যাচার, অবিচার ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছে ও হইতেছে বিহারে ও আসামে, তাহার জন্তও দায়ী কংগ্রেস দলের সত্যের প্রতি অশ্রদ্ধা ও মতলব হাসিল করিবার জন্ত মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে দ্বিধা না করা। এই অবস্থায় যদি ভারতের একতা রক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতাদিগের দ্বারা সে কার্য্য সিদ্ধ হইবে না। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বর্ত্তমানে নিজের পূর্ব্ব বিশ্বাস ও নীতি পরিবর্ত্তন করিবার কথা চিন্তা করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে এখন আর কিছু হইবে না। এখন একমাত্র পন্থা বিহার ও আসাম হইতে বাংলা ও পার্ব্বত্য ভাষাভাষীদিগের এলাকাগুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া। তাহা করিলে আসাম ভবিষ্যতে পাকিস্থানের কবলে পড়িবে না। না করিলে, অবশ্যই আসামের দুর্দ্দশার চূড়ান্ত হইবে। অ

কলিকাতা উন্নয়ন তথা স্বপ্ন-বিলাস

শুনা যাইতেছে, কলিকাতা মহানগরীকে সংস্কার করা হইবে। কিন্তু তাহা কি ভাবে করা হইবে এবং তাহার প্ল্যানই বা কি, তাহা আমাদের জানা নাই। শুধু দেখিতেছি, মাঝে মাঝে এলোপাথাড়ি ভাবে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইতেছে। অথচ আমরা জানি, উন্নয়নমূলক কাজের উদ্দেশ্যেই ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট গঠন করা হইয়াছিল। তাঁহারা কিছু যে করেন নাই এমন নয়, শহরে এবং শহরের উপকণ্ঠে সম্পূর্ণ খেয়াল-খুশিমত বসতি বিস্তার করিয়া চলিয়াছেন। উপকণ্ঠের জঞ্জাল বাড়াইয়া আর লাভ নাই, খাস কলিকাতার সমস্যারই ত অন্ত নাই। ব্রিটিশ আমলে ১৪ লক্ষ শহরবাসীর জন্য পানীয় জল সরবরাহের যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, প্রায় সেই ব্যবস্থাই আজকের উনত্রিশ-ত্রিশ লক্ষ লোকের জন্যও রাখা হইয়াছে। অপরিস্রুত জল সরবরাহের ব্যবস্থাও তদনুরূপ। বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ড্রেন-পায়খানা নাই, ময়লা ও আবর্জ্জনা সাফ করার এবং রাস্তা পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছে। ইহার ফলে, ময়লা নিকাশের ড্রেনগুলি মধ্যে মধ্যে ভরাট হইয়া থাকায় সামান্য বৃষ্টি হইলেই রাস্তায় জল জমিতেছে। শহরের অধিকাংশ রাস্তাই অত্যন্ত সংকীর্ণ। বর্ত্তমান লোক-সংখ্যার চাহিদামত গাড়ী চালানো দুঃসাধ্য। কলিকাতায় ও পার্শ্ববর্ত্তী মিউনিসিপ্যাল এলাকাসমূহে পানীয় জল সরবরাহের ও ময়লা নিকাশের জন্য বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতাক্রমে রাজ্য সরকার একটি বিরাট পরিকল্পনা প্রবর্ত্তনের উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছেন। উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নাই, তবে সমস্যাটির জটিলতাও অবর্ণনীয়। কলিকাতা শহরে রাস্তার নীচে পানীয় জলের ও ময়লা নিকাশের বড় বড় পাইপগুলি পাশাপাশি বসান হইয়াছে। পুরাতন বলিয়া স্থানে স্থানে ঝাঁঝরা হইয়া গিয়া, উভয় পাইপের মধ্যবর্ত্তী উপকরণগুলি পরস্পরের ভিতর প্রবেশ করিয়া সর্ব্বনাশ ঘটাইতেছে। যে কারণে কলিকাতার শতকরা ৯০ জন লোক আমাশয় ডিসপেপসিয়া প্রভৃতি পেটের রোগে ভুগিতেছে। সমস্ত কলিকাতা শহর খুঁড়িয়া ময়লার ও পানীয় জলের পাইপগুলি নিরাপদ ব্যবধানে সরাইয়া দিতে না পারিলে কোনদিনই শহরবাসীরা পাকস্থলীর রোগ হইতে মুক্তি পাইবে না।

কিন্তু এখানেও সমস্যা আছে। শহরের রাস্তাগুলি অত্যন্ত সংকীর্ণ, যে কারণে বর্ত্তমান জনসংখ্যার চাহিদা অনুসারে গাড়ী চলাচলের চাপ সহ্য করিতে পারে না। গাড়ীর সংখ্যা বাড়াইতে এবং অপঘাতে মৃত্যু সংখ্যা কমাইতে হইলে, রাস্তাগুলি এখনকার তুলনায় দ্বিগুণ কিংবা তিনগুণ চওড়া করা দরকার। কিন্তু রাজ্যসরকারের ঔদাসীন্যে-পুষ্ট ফাটকাবাজির ফলে জমির দর পূর্ব্বের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় রাস্তা চওড়া করার পথও রুদ্ধ হইয়াছে। কারণ সেই হারে ক্ষতিপূরণ না দিয়া সরকার বা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট জমি দখল করিতে পারে না। অথচ এই হারে ক্ষতিপূরণ দিতে হইলে সরকারের টাকায় ত কুলাবেই না, কুবেরের ঐশ্বর্য্যও নিঃশেষ হইয়া যাইবে। সুতরাং এই পরিকল্পনাকে যথার্থ রূপ দিতে হইলে, জমির দাম কমাইতে হইবে। ইহা ছাড়া, দ্বিতীয় পথ নাই।

সরকারের পক্ষপাত-নীতি

হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষারূপে ব্যবহার করিবার জন্য, কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে নানা কৌশল বিস্তার করিতেছেন—ইহা আর গোপন নাই। অথচ ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মুখে প্রায়ই শুনা যায়, ভারতবর্ষের চৌদ্দটি আঞ্চলিক ভাষা—সব কয়টিই সমান, প্রত্যেকটির পরিপুষ্টির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সমপরিমাণে আগ্রহী। কিন্তু ইহা মৌখিক কথা। কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে, তাঁহারা হিন্দীর আধিপত্য বিস্তার ও প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না। তাঁহাদের এই পক্ষপাতিত্বের দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বিগত পার্লামেণ্টে গৃহীত হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন আইনটির কথা উল্লেখ করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়।

আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—অহিন্দী-ভাষীকে হিন্দী ভাষার প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা-পরিষদ্ উদারভাবে হিন্দী পুস্তক উপহার দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে সকল অহিন্দী-ভাষী রাজ্যে হিন্দী শিক্ষা ঐচ্ছিক কিংবা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে, সেই সকল রাজ্যের স্কুল-কলেজ এবং সাধারণ পাঠাগার এই উপহার পাইবে। শিক্ষা-পরিষদ্ এই উদ্দেশ্যে প্রচুর সংখ্যক হিন্দী পুস্তক ক্রয় করিবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতি আছে, তাঁহারা অহিন্দী-ভাষীর উপর হিন্দীকে বোঝার মত চাপাইয়া দিবেন না। উপহার দিবার এই পদ্ধতিটি চাপাইয়া দিবারই রকমফের নহে কি? কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতির সহিত আর একটি যে নীতিমূলক সর্ত্ত সংশ্লিষ্ট আছে তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। কোন আঞ্চলিক ভাষার স্বার্থ

ক্ষুণ্ণ হইবে না, এমন পদ্ধতিতেই হিন্দীভাষা প্রচার করিবার কথা। এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, কেন্দ্রীয় সরকার প্রচুর সংখ্যক হিন্দী পুস্তক ক্রয় করিবেন—যাহা শুধু হিন্দী পুস্তকের প্রকাশন-ব্যবসায় এবং হিন্দী সাহিত্য ও সাহিত্যিকের আর্থিক উন্নতির সহায়ক। এখানে হিন্দী এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক অহিন্দী-ভাষার মধ্যে সহানুভূতির বৈষম্যই কি প্রকাশ পাইতেছে না? হিন্দী পুস্তকের সহিত সম পরিমাণের আঞ্চলিক ভাষার পুস্তক উপহার দিবার ব্যবস্থা করিলে কাহারও কিছু বলিবার থাকিত না। অভিযোগ আমাদের সেইখানেই।

রাষ্ট্রপতির বিদায়-সম্বর্দ্ধনা

ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে তাঁহার অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে আন্তরিক ও সশ্রদ্ধ বিদায়-অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। সংসদ-সদস্য শ্রীরামধারী সিং দীনকর মানপত্র পাঠ করেন। এই মানপত্রে বলা হইয়াছে—"আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, ভারতবাসীর অন্তঃকরণ আপনার সঙ্গেই থাকিবে। কারণ দেশবাসী আপনার এবং আপনি দেশবাসীর। জনগণের সেবা করা ও তাহাদিগকে সত্যপথে চালিত করাই আপনার জীবনের উদ্দেশ্য। এতদিন ধরিয়া জাতি আপনার নিকট হইতে যে উপদেশ পাইয়া আসিয়াছে তাহা অব্যাহত থাকিবে বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।"

মানপত্রের উত্তরে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন যে, "আজ তাঁহাকে যে শ্রদ্ধা ভালবাসা প্রদর্শিত হইল তাহাতে তিনি অভিভূত। আপনাদিগকে আমি নতমস্তকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। জাতির সেবার জন্য যখনই আহ্বান আসিয়াছে, তখনই তিনি সাধ্যমত তাহাতে সাড়া দিয়াছেন। সুস্থ থাকিলে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্তও তিনি জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করার বাসনা রাখেন।"

বারো বৎসর ধরিয়া রাষ্ট্রপতির আসনে বসিয়া তিনি ছুটির ঘণ্টাই শুনিয়াছেন। আজ বিদায়-কালে তাই তিনি উল্লসিত হইয়া বলিলেন, তিনি নিজেকে অত্যন্ত ভারমুক্ত মনে করিতেছেন। রাষ্ট্রপতির আসনে বসিবার আগে পর্য্যন্ত তিনি ছিলেন সদাকৎ আশ্রমের বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ। এই আশ্রম ছাড়িবার বাসনা তাঁহার কোনকালেই ছিল না। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরুর অনুরোধে তাঁহাকে এই পদ গ্রহণ করিতে হয়। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। পরে তিনি মহাত্মা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি অধ্যায়ে গান্ধীজীর একনিষ্ঠ অনুগামীরূপে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের বহুবিধ কর্ম্ম-কীর্ত্তি আজ ইতিহাসের সামগ্রী। এই আন্দোলনের সময়েই তাঁহার চির-ঈপ্সিত সদাকৎ আশ্রমটি স্থাপিত হয়। এই আশ্রমই ছিল তাঁহার অতিপ্রিয় স্থান। পাটনা-দানাপুরের পথে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে এই আশ্রম। দীর্ঘ বারো বছর সগৌরবে রাষ্ট্রপতি ভবনে অতিবাহিত করিয়া কর্ম্মক্লান্ত অপরাহ্নে আজ আবার সেই সদাকৎ আশ্রমেই তিনি ফিরিয়া যাইতেছেন। যদিও জানি, তিনি সেখানে থাকিয়াও দেশের অনেক কাজই করিবেন। এবং ইহাও জানি, প্রজাতন্ত্রী ভারতরাষ্ট্রের অধিনায়করূপে তিনি জনচিত্তে যে শ্রদ্ধার আসনলাভ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অবসর গ্রহণের পরও অটুট থাকিবে।

মোক্ষগুণ্ডম বিশ্বেশ্বরায়া

আজিকার জগৎকে পরিকল্পনার জগৎ বলা যায়। পৃথিবীর প্রত্যেকটি প্রগতিশীল দেশ ও জাতি নিজ নিজ জন্মভূমি বা দেশের সন্তানগণের উন্নয়নকল্পে সুগঠিত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্যক্রম চালাইতেছে। যে সকল দেশে ঐরূপ পরিকল্পনা গঠনে সমর্থ লোকের অভাব সেখানেও অনেক ক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের বিভিন্ন কমিটি সেই অভাব পূরণে ব্যস্ত আছে।

এইরূপে পরিকল্পনা গঠন করিয়া ব্যাপক ভাবে উন্নয়ন কার্য্য করার বিষয়ে সোভিয়েট রুশ পথপ্রদর্শকরূপে খ্যাত। কিন্তু আমাদের এই অনগ্রসর দেশে এক কর্ম্মবীর জন্মগ্রহণ করেন যিনি নিজের প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের গুণে সোভিয়েটের পরিকল্পনাকারীদের আগে এদেশেই ঐ পথের সার্থকতা দেখাইয়াছিলেন। এই অনন্যসাধারণ মনীষাযুক্ত মহাশয়ব্যক্তির নাম মোক্ষগুণ্ডম বিশ্বেশ্বরায়া।

বিশ্বেশ্বরায়া জন্মগ্রহণ করেন রবীন্দ্রনাথের জন্মবৎসর, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহার জন্মস্থল মহীশূর রাজ্য অন্তর্গত কোলার জেলার মুদেনাহাল্লি গ্রাম। তিনি জন্মেছিলেন এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে। ১৫ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় কিন্তু তাঁহার স্নেহময়ী মাতা সে অভাব অনেকটা পূরণ করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের কর্ম্মসূত্র ও চরিত্রবল এই মহীয়সী নারীরই আগ্রহে ও নির্দ্দেশে গঠিত হইয়াছিল। তাঁহার ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষালাভ হয় প্রথমে বাঙ্গালোরে এবং

পরে পুনার কলেজ অফ্ সায়েন্সে। ১৮৮৩ সনে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পুনা হইতে ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ে ডিগ্রী লাভ করেন।

তাঁহার কর্মজীবন আরম্ভ হয় তখনকার বোম্বাই প্রদেশের পূর্ত্তবিভাগের সহকারী ইঞ্জিনীয়ারের পদে ১৮৮৪ সনে। ১৯০৪ সনে তিনি সুপারিন্টেণ্ডাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার হইয়াছিলেন। কিন্তু ১৯০৮ সনে তিনি সরকারী কাজে ইস্তফা দিয়াছিলেন, কেননা তাঁহার দেশ-উন্নয়নের স্বপ্নে যেরূপ বিশাল ও ব্যাপক ইঞ্জিনীয়ারিং-পরিকল্পনা তিনি মানসচক্ষে দেখিয়াছিলেন, সরকারী চাকরিতে তাহাকে বাস্তবে পরিণত করা অসম্ভব, এই ধারণা তাঁহার মনকে চঞ্চল করিয়া তোলে। বোম্বাই সরকারে কাজের সময়েও তিনি বানের জল নিকাশের জন্য নূতন ধরনের দ্বার নির্ম্মাণ করেন এবং এডেন শহরের সেনানিবাসের জন্য মলপ্রণালী ও পয়ঃপ্রণালী তৈয়ারীর নূতন ধরনের নক্সা করিয়াছিলেন।

১৯০৯ সনে তিনি নিজাম হায়দরাবাদের ইঞ্জিনীয়ারিং উপদেষ্টার কাজ করিয়াছিলেন এবং হায়দরাবাদ শহরের ড্রেন এবং ঐ রাজ্যে বন্যা নিবারণ সম্পর্কে অনেক ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। ঐ বৎসরেরই শেষে তিনি মহীশূর রাজ্যে প্রধান ইঞ্জিনীয়ার ও কর্মসচিব নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯১২ সনে মহীশূর রাজ তাঁহার অসাধারণ মেধা ও কর্ম-কুশলতা দেখিয়া তাঁহাকে দেওয়ানের পদে উন্নীত করেন। কোথাও কোন ইঞ্জিনীয়ার ঐ পদে ইঁহার পূর্ব্বে অভিষিক্ত হন নাই। ১৯১৮ সনে মহীশূরে ব্রাহ্মণদিগের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে স্থানীয় সরকার অব্রাহ্মণদিগকে বেশী সংখ্যায় চাকরিতে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত করেন। বিশ্বেশ্বরায়া সমাজের সর্ব্বস্তরে শিক্ষাদানে বিশ্বাসী ছিলেন এবং শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের মধ্যে কার্য্যের যোগ্যতায় যে প্রভেদ তখন ছিল তাহাও চলিয়া যাইবে, ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা। এই সঙ্গে এ কথাও বলা প্রয়োজন যে, তিনি ঐ রাজ্যে শিক্ষার বিস্তারে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন অসংখ্য বিদ্যালয় স্থাপনে এবং মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় পত্তনে ও গঠনে। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, কাজের ভার ও কর্ম্মে নিয়োগ ব্যাপারে যোগ্যতা ভিন্ন অন্য কোন প্রশ্নকে আমল দেওয়া উচিত নয়। এইজন্য মহীশূরে জাতি অনুপাতে চাকুরিতে স্থান দেওয়ার ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি দেওয়ানের পদে ইস্তফা দিয়াছিলেন ঐ ১৯১৮ সনেই।

দেওয়ানের কাজ ছাড়ার পরও তিনি মহীশূরের উন্নয়নে অনেকভাবে সাহায্য করেন এবং মহীশূর রাজ্যের উন্নয়ন এই অনন্যসাধারণ প্রতিভাযুক্ত অক্লান্ত কর্ম্মীর জীবনের সার্থকতার প্রধান নিদর্শন। কাবেরী নদীতে কৃষ্ণরাজসাগর বাঁধ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র ও নূতন ধরনের জলসেচ ব্যবস্থা, ভদ্রাবতীতে লৌহ উৎপাদন প্রতিষ্ঠান, মহীশূরের চন্দন ও চন্দনতৈলের অতি-আধুনিক কারখানা এবং প্রসিদ্ধ মহীশূর সাবানের কারখানা, এই সকলই তাঁহার উদ্যম ও উদ্যোগের নিদর্শন।

ব্যক্তিগত জীবনে ইনি ছিলেন অতি শুদ্ধচেতা, সরল সাধু ব্যক্তি এবং তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও কার্য্যপটুতার সহায়তা চাহিলেই পাওয়া যাইত। মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধে তিনি উড়িষ্যায় বন্যা নিবারণের প্ল্যান তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিলেন এবং তুঙ্গভদ্রার উপর বিরাট্ বাঁধ ও বিশাল হ্রদ স্থাপনাও তাঁহারই উপদেশের ফল।

নানাদিকে তাঁহার প্রতিভার আলোকশিখা ছুটিত। এবং প্রায় যে কাজে বা যে বিষয়ে তিনি চেষ্টিত হইতেন তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইত। জীবনে অনেক সম্মান, অনেক সমাদর তিনি পাইয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার অমায়িক প্রকৃতিতে সে সকলের কোনও ছাপ পড়ে নাই।

এই অসাধারণ কর্ম্মময় জীবনের অবসান ঘটে বিগত ১৪ই এপ্রিল, বাংলা ১৩৬৮ সালের শেষদিনে।

ডঃ সুহৃদচন্দ্র মিত্র

গত ৫ই মে বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী ও কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মনোবিদ্যা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ সুহৃদ-চন্দ্র মিত্র মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর হইয়াছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষামূলক মনোবিদ্যার কৃতী ছাত্র সুহৃদচন্দ্র ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করিয়া জার্ম্মানী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। পরে বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর ছাত্র ও সহকর্ম্মীরূপে এদেশে কলিত মনোবিদ্যা ও ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ শাস্ত্রের প্রসারকল্পে অনলস প্রচেষ্টার স্বাক্ষর রাখেন। ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যার পরীক্ষক, একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা, বহু মনোবৈজ্ঞানিক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটার ও ন্যাশনাল ইনষ্টিট্যুটের ফেলো ছিলেন।

ডঃ মিত্র ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মনোবিদ্যা শাখার এককালীন সভাপতি এবং আন্তর্জ্জাতিক মনঃ-সমীক্ষক সম্মেলনে একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি

লুম্বিনী মানসিক চিকিৎসালয়, বোধিপীঠ ও আরও একাধিক প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে মনোবিজ্ঞানের অনুশীলন এখনও অল্পই হইয়াছে এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প-বাণিজ্য ও সমাজ-ব্যবস্থাপনার পথে এই বিদ্যার আলোকসম্পাত করিয়া নূতন কর্ম্মাদর্শ স্থাপন ও ব্যক্তি-মূল্যায়নের চেষ্টা আমরা কমই করিয়াছি। মনোবৈকল্যের প্রতিকারে এবং সুস্থ জনমনস্তত্ত্ব গঠনে মনোবিজ্ঞানের আধুনিকতম সিদ্ধান্তগুলি নিয়োগ এবং প্রয়োগের ব্যবস্থাও প্রায় কিছুই আমরা করি নাই। আমাদের দেশে এই বিজ্ঞান এখনও প্রধানতঃ কেতাবী-বিদ্যার স্তরেই আবদ্ধ রহিয়াছে। সেদিক দিয়া ডাঃ গিরীন্দ্রশেখরের পর ডঃ মিত্র অনেক কাজ করিয়াছেন। একদিকে অধ্যাপক ও পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব সম্পর্কীয় মূল্যবান বই-পুঁথির লেখকরূপে, অন্যদিকে একাধিক মানসিক চিকিৎসা-কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টারূপে দেশে তাঁহার যে সম্মানিত আসনটি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার শূন্যতা সহজে পূর্ণ হইবে না। তা ছাড়া ডঃ মিত্রকে কেন্দ্র করিয়া দেশের তরুণ-সমাজ ছোটখাটো যে মনোবিজ্ঞানীর গোষ্ঠীটি তৈরি করিয়াছিল, তাহার কাজও বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইবে। ফ্রয়েড, এডলার ও ইয়ং প্রমুখের হাত দিয়া এযুগে বিচিত্র পথে অনুসন্ধান ও গবেষণা চালাইয়া মনোবিজ্ঞান যে অজস্র সম্পদ আহরণ করিয়াছে, তাহার বার্ত্তা বাঙালীর গোচরে পৌঁছাইয়া দিতেছিলেন এই তরুণ-সমাজ ডঃ মিত্রের নায়কত্বায়। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুতে যে কতবড় ক্ষতি হইয়া গেল তাহা এক কথায় বলিবার নহে।

পরলোকে ফজলুল হক

গত ২৭শে এপ্রিল অবিভক্ত বাংলার অন্যতম নেতা এ. কে. ফজলুল হক পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যু-কালে তাঁহার বয়স ৮৯ বৎসর হইয়াছিল।

ফজলুল হক ১৮৭৩ সনের অক্টোবর মাসে বরিশাল জেলার সাতুরিয়া গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাড়ী চাখার গ্রামে। পিতার নাম ওয়াজেদ আলি। তিনি বরিশালে আইন ব্যবসায় করিতেন। ১৮৯০ সনে ফজলুল হক বিভাগীয় বৃত্তিলাভ করিয়া এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাস করেন। ১৮৯৪ সনে গণিত, রসায়নশাস্ত্র এবং পদার্থবিদ্যা এই তিনটি বিষয়ে একই সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি. এ. পাস করেন। ১৮৯৮ সনে আইন পরীক্ষা দিয়া তিনি স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষানবীশী করেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতিও করিতে থাকেন।

ফজলুল হকের জীবন অতি বিচিত্র। দৈহিক শক্তিও ছিল অসাধারণ। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি আপন ব্যক্তিত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ১৯১৪ সনে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯৩৫ সনে হক সাহেব কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হন। এবং ১৯৩৭-৪৭ সন পর্য্যন্ত তিনি বঙ্গদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। পাকিস্থান হওয়ার পর ১৯৫৬ সনে হক পূর্ব্ববঙ্গের গবর্ণর হন। হক সাহেব রাজনৈতিক পটভূমিকায় বিভিন্নরূপে বিভিন্ন সময়ে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। দেশ বিভাগের পর পাকিস্থানেও অনেক দায়িত্বপূর্ণ সম্মানের আসনে তিনি অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। কিন্তু একমাত্র ইহাই তাঁহার প্রকৃত পরিচয় নহে। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের জন-নায়ক। অসচ্ছল পরিবারে তাঁহার জন্ম। আপন প্রতিভাবলে তিনি খ্যাতি অথবা ক্ষমতার মোহে এ দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে ভুলিয়া যান নাই। বরং বলা যায়, জনসাধারণের সান্নিধ্যেই তিনি ভাল থাকিতেন। জনসাধারণকে তিনি বুঝিতেন, জনসাধারণও তাঁহাকে বুঝিত। মাটির মানুষ হক সাহেব 'চলেন খাঁটি মানুষ'। এমন মানুষকে শ্রদ্ধা না করে কে! সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত, ভালবাসিত। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাঁহারা তাঁহার বিরোধী ছিলেন, ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহারাও এই মানুষটিকে ভাল না-বাসিয়া পারেন নাই। তিনি জীবনে সবচেয়ে বড় কাজ করিয়া গিয়াছেন, ১৯৩৮ সনে মন্ত্রিসভা গঠনের পর তাঁহারই প্রেরণায় ঋণসালিশী আইন প্রবর্ত্তন করিয়া বাংলার কৃষক শ্রেণীকে পুরুষানুক্রমিক ঋণের বোঝা হইতে বহুল পরিমাণে অব্যাহতি দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই উদ্যোগে বিনাব্যয়ে বাধ্যতা-মূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের নীতি গৃহীত হয় এবং ঐরূপ শিক্ষার ব্যয় সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জমির উপর শিক্ষাকর আদায়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই যে আর্ত্তের জন্য বেদনা, আর কাহারও মধ্যে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। এক কথায় তিনি ছিলেন মানব-দরদী। কিন্তু রাজনীতির চক্রে পড়িয়া এমন লোককেও শেষ বয়সে নাজেহাল হইতে হইয়াছে, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয়। তিনি সদালাপী ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা, পাকিস্থান হওয়ার পরও তিনি পুরাতন বন্ধুদের ভোলেন নাই। এরূপ একজন দরদী বন্ধু হারাইয়া আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি।

বৌদ্ধ-ভারতে গণতন্ত্র

(প্রতিযোগিতায় পঞ্চম পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধ)

শ্রীনরেন ভট্টাচার্য্য

১

বুদ্ধ এবং বিম্বিসারের যুগে রাজতন্ত্রের পাশাপাশি যে কিছু কিছু ক্ষুদ্রায়তন অভিজাত সাধারণতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল এ বিষয়ে রীজ ডেভিড্‌স্ প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।১ কিন্তু ভারতের প্রাচীনতম ইতিহাসে গণতন্ত্রের ঐতিহ্য খুঁজতে গেলে আমাদের আরও পিছিয়ে যেতে হবে।২ কারণ ঋগ্বেদে আমরা এমন কয়েকটি শব্দের পরিচয় পাচ্ছি যেগুলি পরবর্ত্তীকালে নিঃসন্দেহে অরাজতন্ত্রী শাসনতন্ত্রের পরিচয় বহন করেছে। যেমন আমরা ঋগ্বেদে 'গণ' শব্দটির ইঙ্গিত পেয়েছি যার নেতা হিসাবে 'গণপতি' বা 'জ্যেষ্ঠ' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ ঐ গ্রন্থে বর্ত্তমান। শেষের শব্দটি সম্ভবতঃ পালি সাহিত্যের 'জেট্‌ঠকের' সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত এবং এটা অসম্ভব নয় যে, এই শব্দগুলির মধ্যেই সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রের ধারণা প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে ধরনের রাষ্ট্রের পরিচয় আমরা প্রথম দিক্‌কার বৌদ্ধশাস্ত্রে পাই।৩ বৈদিক যুগে সাধারণতন্ত্রের কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় না পেলেও সে যুগে প্রজাদের যে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক অধিকার ছিল শাসনযন্ত্রের উপর তাদের যে প্রকৃতই কার্য্যকরী নিয়ন্ত্রণ ছিল—তার প্রমাণ হিসাবে ঋগ্বেদ ও পরবর্ত্তী বৈদিক গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত সভা৪ ও সমিতি৫ নামক রাজনৈতিক সংস্থাদ্বয়ের কথা বলা চলতে পারে। অথর্ব্ববেদে রাজার মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে: প্রজাপতির দুই কন্যা—সভা ও সমিতি যেন আমাকে যুগ্মভাবে সমর্থন করেন, যাঁর সঙ্গে সেখানে আমার দেখা হবে, তিনি যেন আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেন; হে পিতৃগণ, আমি যেন সেখানে এমন কথা বলতে পারি যে-কথায় সকলে একমত হবেন।৬ ঋগ্বেদের শেষ শ্লোকে বলা হয়েছে: আপনাদের সমাবেশে আপনারা প্রত্যেকে অভিপ্রায়ে, লক্ষ্যে ও চিন্তায় একমত হোন।৭ অথর্ব্ববেদেও ঐ এক কথাই বলা হয়েছে।৮ সেখানে এমন অনেক শ্লোক পাওয়া যায় যেখানে সদস্য বিতর্কে জয়লাভের এবং অপরের সমর্থন আদায়ের জন্য দেবতার নিকটে প্রার্থনা করছেন।৯ কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা দেখি যে, বৈদিক যুগের শেষ দিকে এই ধরনের গণতান্ত্রিক আচরণ প্রায় সর্ব্বাংশেই শিথিল হয়ে গেছে; সূত্রগ্রন্থসমূহে দেখা যায় যে, রাজা এবং প্রজা উভয়েরই ঘাড়ে দৈবানুমোদিত কর্ত্তব্যের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু প্রজার রাজনৈতিক অধিকারের খাতায় জমার অঙ্ক একেবারে শূন্যের ঘরে।১০

রীজ ডেভিড্‌স্ বলেছেন: প্রাচীনতম বৌদ্ধ প্রমাণপঞ্জীসমূহ ছোট বড় শক্তিমান রাজতন্ত্রের পাশাপাশি পূর্ণ অথবা অংশতঃ স্বাধীন সাধারণতন্ত্রের অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে।১১ তাঁর মতে এই সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি বিরূপ ছিল বলেই ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ এদের অস্তিত্বের কোন উল্লেখ করে নি।১২ কিন্তু ডঃ জয়সোয়ালের মতে এই ধারণা যথার্থ নয়, কারণ, অবৌদ্ধ সাহিত্যেও সাধারণতন্ত্রের পরিচয় বর্ত্তমান।১৩ জৈন শাস্ত্রগ্রন্থে 'গণরাজ' এবং 'দ্বৈরাজ্যের' উল্লেখ আছে।১৪ পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে 'সংঘ' এবং 'গণের' উল্লেখ আছে।১৫ মহাভারতেও সাধারণতন্ত্র সম্বন্ধে

---

১ রায়চৌধুরী, Political History of Ancient India, পৃঃ ১৯১।

২ মজুমদার, রায়চৌধুরী ও দত্ত, Advanced History of India, পৃঃ ২৯;

৩ মজুমদার (স), The Vedic Age, পৃঃ ৩৫২।

৪ ঋগ্বেদ—৬।২৮।৬; ৮।৪।৯; ১০।৩৪।৬; অথর্ব্ববেদ—৭।১২; শুক্ল যজুর্ব্বেদ—১৬।২৮; ১৬।২৪, ইত্যাদি।

৫ ঋগ্বেদ—৯।৯২।৬; ১০।৯৭।৬; অথর্ব্ববেদ—৬।৮৮।৩; ৩,৪।২; ৫।১৯।১৫; ৭।১২।১; ১২।১।৫৬; ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৫।৩, ইত্যাদি।

৬ অথর্ব্ববেদ ৭।১২।১;

৭ ঋগ্বেদ ১০।১৯১।৪;

৮ দ্রঃ ব্লুমফীল্ড, Sacred Books of the East XLII. পৃঃ ১৩৬

৯ অথর্ব্ববেদ ২।২৭।

১০ মজুমদার (স), The Vedic Age. পৃঃ ৪৮২-৪৮৮;

১১ রীজ ডেভিড স, Buddhist India, পৃঃ ২।

১২ ঐ ঐ পৃঃ ২।

১৩ জয়সোয়াল, Hindu Polity, পৃঃ ২১।

১৪ আচারাঙ্গ ২।৩।১।১০ [Sacred Books of the East XXII]

১৫ অষ্টাধ্যায়ী ৩,৩,৮৬ (জয়সোয়াল থেকে উদ্ধৃত)।

পুরো একটি অধ্যায় লিখিত আছে।১৬ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও দুই প্রকারের সাধারণতন্ত্রের উল্লেখ পাই।১৭ এ ভিন্ন ডঃ জয়শোয়াল, অপরাপর প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থেও গণতন্ত্রের ইঙ্গিত আছে বলে দাবী করেন।

গৌতম বুদ্ধ সাধারণতন্ত্রী দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর চেতনায় সাধারণতন্ত্রের বীজ লুকিয়ে ছিল বলেই তিনি তাঁর সংঘে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রবর্ত্তন করেছিলেন। মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রান্তে আমরা দেখি যে, ভিক্ষুগণকে প্রদত্ত গৌতমের সাতটি উপদেশের মধ্যে অন্ততঃ চারটিতে গণতান্ত্রিক আচরণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।১৮

"ভিক্ষুগণ, যতদিন ভ্রাতৃবর্গ আপনাদের সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়া বারংবার একত্রিত হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।

"যতদিন তাঁহারা সমগ্র হইয়া একত্রিত হইবেন, সমগ্র হইয়া উত্থান করিবেন, সমগ্র হইয়া সংঘনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসমূহের সম্পাদন করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।

"যতদিন তাঁহারা অব্যবস্থিতের ঘোষণা না করিবেন, ব্যবস্থিতের উচ্ছেদ না করিবেন, যথাব্যবস্থিত শিক্ষাপদসমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।

"যতদিন তাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অভিজ্ঞ, বহুপূর্ব্বগ, সংঘপিতা, সংঘ-পরিনায়ক, তাঁহাদের সৎকার করিবেন, তাঁহাদের সম্মান ও পূজা করিবেন, তাঁহাদের বাক্য শ্রোতব্যরূপে গ্রহণ করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।"১৯

২

বুদ্ধ ও বিম্বিসারের যুগে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাধারণতন্ত্রী জাতি ছিল উত্তর বিহারের বজ্জি বা বৃজিগণ এবং কুশীনারা ও পাবার মল্লগণ।২০ বৃজিরা ছিল দুই ভাগে বিভক্ত; মিথিলার বিদেহগণ এবং বৈশালীর (বৈশালীর) লিচ্ছবিগণ।২১ এ ভিন্ন অপরাপর সাধারণতন্ত্রের মধ্যে কপিলাবস্তুর শাক্যগণ, দেবদহ ও রামগ্রামের কোলিয়গণ, সুংসুমার পাহাড়ের ভগ্‌গগণ, অল্লকপ্পের বুলিগণ, কেশপুত্তের কালামগণ এবং পিপ্পলিবনের মোরিয়গণ।২২

বৃজিদের সাধারণতন্ত্রের সীমারেখা ছিল উত্তরে নেপাল, দক্ষিণে গঙ্গানদী, পূর্ব্বে কোশী ও মহানন্দা এবং পশ্চিমে গণ্ডক। মোট আটটি গণ (অঠ্‌ঠ কুল) নিয়ে বৃজি সাধারণতন্ত্র গঠিত ছিল; বিদেহ, লিচ্ছবি, জ্ঞাতৃক, বৃজি, উগ্র, ভোগ, কৌরব এবং ঐক্ষাক। ব্রাহ্মণগ্রন্থের যুগে বিদেহে রাজতন্ত্র বর্ত্তমান ছিল; প্রাচীনতর উপনিষদেও বৈদেহ জনকের উল্লেখ আছে।২৩ জনকবংশের উল্লেখ আমরা রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে পাই।২৪ কিন্তু আমাদের আলোচ্য যুগে বিদেহের সীমারেখা অনেকটা পূর্ব্বদিকে সরে এসেছিল। বিদেহের রাজবংশের পতনের পরেই বৃজিদের বৃজি-সাধারণতন্ত্র গঠিত হয়েছিল—এ অভিমত ডঃ রায়চৌধুরী পোষণ করেন।২৫ নেপালের দক্ষিণে ছিল লিচ্ছবিরাজ্য। লিচ্ছবিগণের রাজধানী ছিল বৈশালী, যা কালক্রমে সমগ্র বৃজি সংযুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী হয়। সম্ভবতঃ লিচ্ছবিরা নয়টি গোষ্ঠীতে (নব লেচ্ছই, পাঠান্তরে, নব লেচ্ছতি) এবং নয়টি গোষ্ঠীর নয়জন প্রধান প্রতিনিধির দ্বারাই (গণরাজা) গঠিত হ'ত লিচ্ছবি 'প্রেসিডিয়াম' (গণরাজ্যানো)।২৬ জ্ঞাতৃককুল বাস করত: বৈশালীরই আশে-পাশে, তাদের আসল ঘাঁটি ছিল কুণ্ডগ্রামে এবং কোল্লগে। বিখ্যাত ধর্ম্মগুরু মহাবীর বা নিগণ্ঠ নাতপুত্ত (জ্ঞাতৃপুত্র) এই জ্ঞাতৃককুলেরই সন্তান। এর পর মূলবৃজিদের কথা। তারা লিচ্ছবিদের থেকে পৃথক্ হলেও, তাদেরও প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র ছিল বৈশালী। উগ্র, ভোগ, কৌরব এবং ঐক্ষাক প্রভৃতি কুল আশে-পাশেই বাস করত। তাদের সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় না।

১৬ শান্তিপর্ব্ব ১০৭ অধ্যায়।
১৭ জয়শোয়াল, Hindu Polity, পৃঃ ৪১।
১৮ দীঘ নিকায়—২।১৬,৩।
১৯ ভিক্ষু শীলভদ্রের অনুবাদ।
২০ রায়চৌধুরী, Political History of Ancient India, পৃঃ ১৯১।

২১ রীজ ডেভিড্‌স্‌ Buddhist India, পৃঃ ২২।
২২ রায়চৌধুরী, Political History of Ancient India, পৃঃ ১৯১।
২৩ শতপথ ব্রাহ্মণ ১১।৩।১-৩; ১১।৩।২-৪ তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণ ৩।১০।৯।৯ বৃহদারণ্যক ৩য় ও চতুর্থ অধ্যায়।
২৪ রামায়ণ ১।৭১।১-১৩; বিষ্ণুপুরাণ ৪।৫; ভাগবত ৯।১৩।
২৫ রায়চৌধুরী, op cit, পৃঃ ১২১।
২৬ জৈনধর্মের কল্পসূত্র, Sacred Books of the East XXII, পৃঃ ২৬৬।

বৃজিদের পরই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাধারণতন্ত্র ছিল মল্লদের। মল্লরাজ্য ছিল দু'টি, একটি কুশীনারায় এবং অপরটি পাবায়। সম্ভবতঃ ককুত্থা নদী (আধুনিক কুকু উভয় রাষ্ট্রকে পৃথক্ করেছিল)।২৭ রীজ ডেভিড্‌সের মতে, চৈনিক পরিব্রাজকদের বর্ণনা যদি সত্য হয় তা হ'লে মল্লরাজ্য ছিল শাক্যরাজ্যের পূর্ব্বে এবং বৃজিরাজ্যের উত্তরে।২৮ ডঃ জয়শোয়ালের মতে মল্লরাজ্য ছিল শাক্যদের দক্ষিণে এবং বৃজিরাজ্যের পূর্ব্বে।২৯ বিদেহের ন্যায় মল্লরাষ্ট্রেও প্রথমে রাজতন্ত্র বর্ত্তমান ছিল। বিম্বিসারের আবির্ভাবের অনতিকাল পূর্ব্বেই মল্লরাষ্ট্রে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল। লিচ্ছবিদের সঙ্গে মল্লগণের সম্পর্ক গোড়ার দিকে ভাল না হলেও পরে উভয়-শক্তি একত্র হয়েছিল, পার্শ্ববর্ত্তী মগধরাজ্যের সাম্রাজ্যবাদী গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য।

এর পরে আসে কপিলাবস্তুর শাক্যদের কথা। বুদ্ধের পিতা ছিলেন শাক্যকুলের একজন প্রধান। শাক্যরাজ্যের উত্তরে ছিল হিমালয়, পূর্ব্বে রোহিণী নদী এবং দক্ষিণে ও পশ্চিমে রাপ্তী নদী।৩০ রাজধানী কপিলাবস্তু ছাড়াও শাক্যরাজ্যে আরও অনেক নগর ছিল—যেমন চাতুমা, সামগাম, খোমদুস্‌স, শীলাবতী, মেতলুপ, উলুম্ব, সক্কর ও দেবদহ।৩১ কোলিয়গণ ছিল শাক্যদের প্রতিবেশী; কানিংহাম কোলিয় রাজ্যটিকে কোহান এবং উনি (অনোমা) নদীদ্বয়ের মধ্যে স্থান দিয়েছেন। কথিত আছে, একদা শাক্য ও কোলিয়গণের মধ্যে অত্যন্ত সদ্ভাব ছিল। কিন্তু নদীর জলের ভাগ নিয়ে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। বুদ্ধের হস্তক্ষেপে যদিও রক্তপাত এড়ানো সম্ভবপর হয়, তা সত্ত্বেও উভয় রাজ্যের শত্রুভাব দূর হয় নি।৩২ ভগ্‌গ বা ভর্গরা বাস করত কৌশাম্বী (বর্ত্তমান কোশাম, এলাহাবাদের সন্নিকটে) রাজ্যের উপকণ্ঠে—এ কথার সমর্থন মহাভারত থেকে পাওয়া যায়।৩৩ তাদের কেন্দ্র ছিল সুংসুমারের পার্ব্বত্য দুর্গ; রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে বর্ত্তমান মির্জ্জাপুরের অন্তর্গত চুনার।৩৪ অল্লকপ্পের বুলি এবং কেশপুত্তের কালামগণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না; তারা যে কুশীনারার মল্লদের প্রতিবেশী ছিল এতে কোন সন্দেহ নেই, তবে তাদের রাজ্যকে বর্ত্তমানে চিহ্নিত করা প্রায় অসম্ভব।৩৫ অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত পাঠে জানা যায় অলাড় নামে বুদ্ধের এক গুরু কালাম কুলের সন্তান ছিলেন।৩৬ পিপ্পলিবনের মোরিয়গণ ছিল কোলিয়দের প্রতিবেশী। পিপ্পলিবনকে হিউয়েন সাঙ ন্যগ্রোধবনের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখেছেন।৩৭ পরবর্ত্তীকালে এই মোরিয় কুল থেকেই প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠতম রাজবংশের উদ্ভব হয়।

৩

এর পর আসছে শাসনতন্ত্রের কথা। এ বিষয়ে আমাদের হাতে মালমশলা অল্প হলেও, তা মোটামুটি একটা ধারণা গঠন করার পক্ষে যথেষ্ট। বৌদ্ধ-শাস্ত্র-গ্রন্থে স্বাভাবিকভাবেই শাক্য সাধারণতন্ত্রের উপর জোর বেশী দেওয়া হয়েছে। শাক্য-রাজ্য আশী হাজার পরিবার নিয়ে গঠিত ছিল একথা বুদ্ধঘোষ বলে গেছেন।৩৮ শাসনসংক্রান্ত এবং অপরাপর কাজকর্ম্ম হ'ত কপিলাবস্তুতে অবস্থিত একটি সাধারণ সভাগৃহে, যার নাম ছিল সন্থাগার (=সংস্থাগার)। অম্বট্‌ঠ সুত্তান্তে আমরা শাক্যদের সন্থাগারের উল্লেখ পাচ্ছি।৩৯ রাষ্ট্রপ্রধান একজনই হতেন, তাঁর উপাধি ছিল রাজা। তিনি কিভাবে নির্ব্বাচিত হতেন এবং তাঁর কার্য্যকালই বা কতদিন ছিল, এ বিষয়ে কিছুই বলা যায় না। আমরা শাক্যদের দু'জন রাষ্ট্রপ্রধানের নাম পেয়েছি—শুদ্ধোদন এবং ভদ্দিয়। বুদ্ধ যখন ন্যগ্রোধ-আরামে (বটবৃক্ষ সমন্বিত একটি বৃহৎ বাগান) বাস করতেন সেই সময় একটি নূতন সভাগৃহ নির্ম্মিত হয়, বুদ্ধ যার উদ্বোধন করেছিলেন। অপরাপর নগরেও সভাগৃহ ছিল। গ্রামসভা বসত গাছের তলায়। সাধারণ শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্য কিছু কিছু 'অফিসার' নিযুক্ত করা হ'ত। ছোটখাট বিচারকার্য্য স্থানীয়ভাবেই সম্পন্ন করা হ'ত; কোন বৃহৎ বিষয় হ'লে মূল সভাগৃহে তা নিষ্পন্ন হ'ত। শাক্য-পার্লামেণ্টের সদস্য-সংখ্যা ছিল পাঁচ শ'। একাধিক বিবাহ শাক্যদের নিকট আইনগ্রাহ্য অপরাধ ছিল।৪০

২৭ রায়চৌধুরী op cit, পৃঃ ১২৬।
২৮ রীজ ডেভিড্‌স্ Buddhist India, পৃঃ ২
২৯ জয়শোয়াল, Hindu Polity, পৃঃ ৪৩।
৩০ ওল্‌ডেনবার্গ, Buddha, পৃঃ ৯৫-৯৬।
৩১ রীজ ডেভিড্‌স্, op. cit, পৃঃ ১৮।
৩২ রায়চৌধুরী, op cit, পৃঃ ১৯২।
৩৩ মহাভারত, সভাপর্ব্ব ৩০।১০।১৪।
৩৪ জয়শোয়াল, op cit পৃঃ ৪৩।
৩৫ রীজ ডেভিড্‌স্ op cit, পৃঃ ৮, ৯, ২২।
৩৬ বুদ্ধচরিত ১২।৩, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।
৩৭ ওয়াটার্স্, On Yuan Chwang II, পৃঃ ২৩-২৪।
৩৮ দ্রঃ, রীজ ডেভিড্‌স্, Dialogues of the Buddha ১।১৪০ টীকা।

ডাঃ বিমলাচরণ লাহা লিচ্ছবিদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।৪১ জাতকগ্রন্থে লিচ্ছবিদের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহকদের 'গণরাজা' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।৪২ একপণ্ণ এবং চুল্ল-কালিঙ্গ জাতকের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, ৭৭০৭ জন গণপ্রতিনিধি দ্বারা লিচ্ছবি পার্লামেণ্ট গঠিত ছিল।৪৩ রাষ্ট্রপতির উপাধি ছিল রাজা, উপরাষ্ট্রপতির উপরাজা, সৈন্তাধ্যক্ষের সেনাপতি এবং অর্থমন্ত্রীর ভণ্ডাগারিক। পার্লামেণ্টের একজন অধ্যক্ষ বা স্পীকার থাকতেন, তাঁর উপাধি ছিল মহত্তক।৪৪ এদের বিচারপদ্ধতি ছিল খুবই উন্নত। অপরাধী সাতবার বিচারের সুযোগ পেত এবং সাতটি ধর্ম্মাধিকরণের যে কোন একটি অপরাধীকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করলেই অপরাধী খালাস পেত। তবে দোষী সাব্যস্ত হলে উচ্চতর আদালতে তার মামলা পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত।৪৫ প্রাথমিক তদন্ত হ'ত বিনিচ্চয় মহামাত্যের (নিম্ন আদালত) কাছে। দ্বিতীয় স্তরের শুনানী হ'ত বোহারিকের (=ব্যবহারিক, আইনজ্ঞ বিচারপতি) কাছে। তারও উপর সূত্রধরের (হাইকোর্ট) কাছে আপীল চলত; তারও উপর আপীল চলত অঠ্ঠ-কুলে (আটজন অঞ্চল-প্রতিনিধির বোর্ড)। এ ছাড়াও উপরাজা এবং পরিশেষে রাজার (রাষ্ট্রপতি) নিকট আপীল করা চলত।৪৬

আগেই বলা হয়েছে, লিচ্ছবিরা ছিল বৃজি সাধারণ-তন্ত্রের অন্তর্গত। মল্লদের সঙ্গে লিচ্ছবিদের গাঁটছড়া বাঁধা দেখে অনুমান করা যায় যে, বৃজি সাধারণতন্ত্র যুক্ত-রাষ্ট্রীয় (ফেডারেল) ছিল না, পক্ষান্তরে তা ছিল সংযুক্ত-রাষ্ট্র (কনফেডারেসী)। সংযুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বাধীন ছিল, এমন কি স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতিও তারা গ্রহণ করতে পারত। অপরাপর সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির শাসনতন্ত্র শাক্য ও লিচ্ছবিদের অনুরূপ ছিল। রীজ ডেভিড্‌স্ কোলিয় এবং মল্লদের শাসনতন্ত্রের যে সামান্য দু'-একটা নমুনা দিয়েছেন তাতে এই ধারণাই দৃঢ় হয়।৪৭ মল্লদের পার্লামেণ্টেই আনন্দ বুদ্ধের মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করেছিলেন।

৪

কিন্তু কালক্রমে এই সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলি নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয় নি। উপরোক্ত সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিল বৃজি সংযুক্ত রাজ্য। বিম্বিসারের যুগে গঙ্গার অপর তীরবর্ত্তী অঞ্চলসমূহ তারা আক্রমণ করে।৪৮ যে কারণে রাজা বিম্বিসার বৈশালীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন। বৃজিদের সঙ্গে মগধের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সুরু হয় বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুর আমলে। বুদ্ধঘোষ বিরচিত সুমঙ্গল-বিলাসিনী থেকে জানা যায় যে, অজাতশত্রু কর্ত্তৃক বৈশালী আক্রমণের কারণ ছিল লিচ্ছবিগণ কর্ত্তৃক কতকগুলি বিষয়ে বিশ্বাসভঙ্গ।৪৯ এ যুদ্ধে অজাতশত্রু দু'টি মারণাস্ত্রের ব্যবহার করেছিলেন—মহাশিলাকণ্টক (কামান জাতীয় অস্ত্র) এবং রথমুষল (ট্যাঙ্ক জাতীয় বস্তু)।৫০ বিখ্যাত আজীবিক গুরু গোশাল মংখলি-পুত্তের মৃত্যুর সময় এই যুদ্ধ সুরু হয় এবং তার ষোল বছর পরে মহাবীরের মৃত্যুর সময় মল্লরা শোকের প্রতীক হিসাবে একটি মশাল শোভাযাত্রা বার করে।৫১ এ থেকেই বোঝা যায়, ষোল বছরেও অজাতশত্রু বৈশালী ধ্বংস করতে পারেন নি। অতঃপর তিনি তাঁর মন্ত্রী বর্ষকারের কূটনীতির দ্বারা সাধারণতন্ত্রী রাজ্যগুলির মধ্যে ভেদ সৃষ্টি ক'রে অবশেষে বৈশালী জয় করতে সক্ষম হন।৫২ কোশলের আক্রমণে বুদ্ধের জীবনকালেই শাক্য সাধারণতন্ত্র ধ্বংস হয়। কোশলরাজ পসেনদি (প্রসেনজিত) গৌতমবুদ্ধের একজন একান্ত ভক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর পুত্র বিডূড়ভ শাক্যদের ব্যবহারে কুপিত হয়ে শুধু শাক্যরাজ্য আক্রমণই করেন নি, শাক্য-পুরীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে ছেড়েছিলেন।৫৩ অজাতশত্রুর বৈশালী জয়ের সঙ্গে সঙ্গে মল্লরাও ধ্বংস

---

৩৯ দীঘ নিকায় ১।৩, তুলঃ Dialogues, ১।১১৩।

৪০ রক্‌হিল—Life of the Buddha, পৃঃ ১৪-১৫।

৪১ দ্রঃ লাহা, Some Kshatriya tribes of Ancient India

৪২ বেশালীনগরে গণরাজকুলানাং অভিষেকপোক্খরণিং (Hindu Polity থেকে উদ্ধৃত)।

৪৩ রায়চৌধুরী, Political History of Ancient India, পৃঃ ১২৩।

৪৪ জয়শোয়াল, Hindu Polity, পৃঃ ৪৫-৪৬।

৪৫ রীজ ডেভিড্‌স্, Buddhist India, পৃঃ ২২।

৪৬ টার্ণার, J. A. S. B. (৭ম), পৃঃ ৯৯৩-৯৪।

৪৭ রীজ ডেভিড্‌স্, op cit, পৃঃ ২১।

৪৮ রায়চৌধুরী op cit পৃঃ ১২৬।

৪৯ লাহা, Buddhistic Studies, পৃঃ ৯৯।

৫০ মজুমদার (স), Age of Imperial Unity, পৃঃ ২৫।

৫১ ভদ্রবাহুর কল্পসূত্র (বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত)।

৫২ দীর্ঘ নিকায়, মহাপরিনির্ব্বাণ সুত্রান্ত।

৫৩ রীজ ডেভিড্‌স্, Buddhist India, পৃঃ ১১-১২

হয়। কেশপুত্ত কালক্রমে কোশলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় ৫৪

এখন কথা ওঠে, এই সব সাধারণতন্ত্র-সমূহের পতনের কারণ কি? মহাভারতেও এই প্রশ্ন যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে ভীষ্মকে করানো হয়েছে।৫৫ জবাবে ভীষ্ম বলেছিলেন, লোভ এবং ঈর্ষ্যা, উৎপীড়ন, চক্রান্ত এবং বিভেদ; পারস্পরিক বিশ্বাসের অভাব এবং দীর্ঘসূত্রিতা। অবশ্য ভীষ্ম সাধারণতন্ত্রের ভাল দিকগুলিরও উল্লেখ করেছেন এবং কেন্দ্রীভূতশক্তি সংযুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করেছেন। কৌটিল্যের মতে সাধারণতন্ত্রের পতনের কারণ হ'ল ব্যক্তিগত শত্রুতা এবং ক্ষমতালোভ।৫৬ বৃজি সাধারণতন্ত্র প্রসঙ্গে অজাতশত্রুর মন্ত্রী বর্ষকারের সম্মুখে আনন্দকে উদ্দেশ করে গৌতমবুদ্ধ যা বলেছিলেন তা এ প্রসঙ্গে রীতিমত প্রণিধানযোগ্য৫৭ :—

"যতদিন বৃজিগণ জনসাধারণের অবাধ সম্মিলনের আয়োজন করবেন…যতদিন তাঁরা সমগ্র হয়ে উত্থান করবেন, সমগ্র হয়ে বৃজিগণের করণীয় সম্পাদন করবেন… ততদিন তাঁদের পতন না হয়ে উত্থান হবারই কথা। যতদিন তাঁরা অব্যবস্থিতের ঘোষণা না করবেন, ব্যবস্থিতের উচ্ছেদ-সাধন না করবেন…বয়োজ্যেষ্ঠদের সৎকার করবেন…কুলস্ত্রী ও কুলনারীদের অধঃপাতিত না করবেন…নগর, জনপদ ও চৈত্যসমূহের সৎকার করবেন…ততদিন তাঁদের পতন না হয়ে উত্থান হবারই কথা।" অতঃপর গৌতমবুদ্ধ বর্ষকারকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ব্রাহ্মণ, যতদিন এই সাতটি মঙ্গলদায়ক ধর্ম্ম বৃজিদের মধ্যে বর্ত্তমান থাকবে…ততদিন তাঁদের পতন না হয়ে উত্থান হবারই কথা।"

প্রত্যুত্তরে বর্ষকার গৌতমবুদ্ধকে বললেন, "দেব, এই সাতটি ধর্ম্মের মাত্র একটিও পালন করলে, পতন না হয়ে বৃজিদের উত্থান হবারই কথা, আর সাতটি পালন করলে ত কথাই নেই। কূটনীতি অথবা মিত্রভেদ অবলম্বন ভিন্ন যুদ্ধে বৃজিগণকে পরাস্ত করার কোন উপায়ই নেই।"

৫৪ রায়চৌধুরী, op cit, পৃঃ ১৯৩।
৫৫ শান্তিপর্ব্ব, ১০৭ অধ্যায়।
৫৬ জয়শোয়াল, Hindu Polity, পৃঃ ১৬৮।
৫৭ দীর্ঘ নিকায়, ২।১৬।১-৫।

বাবলুর মন

শ্রীহরিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
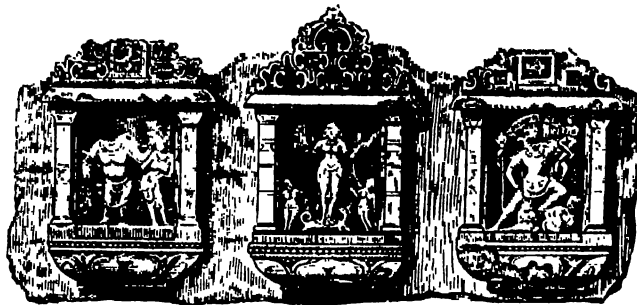
শীতকালের ভোরে বাবলুর মনটা সবচেয়ে বেশী খারাপ হয়ে যায়। যে সময় কাকগুলো বাসা ছাড়তে পারে না; সামনের নারকেল গাছের মাথায় বসে ডাকে। একজনের ডাক শুনে অপরজন সাড়া দেয়। ডাকের পালা শেষ হ'লে ডানা-ঝটপটানো সুরু। ঠিক তখনই বাবলুর মনটা শিবপুরে চলে যায়। তার পর পুবের আকাশটার একটা রঙের ছোপ ধরে। তখনই সারাটা আকাশকে বাবলুর আরও ভাল লাগে। জানলাটা ফাঁক করে, মাথায় র‍্যাপারটা মুড়ি দিয়ে বাবলু চুপচাপ বসে থাকে। পাশে ঠাকুমা তখন থাকেন না। ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের চড়া হুইসেলটা বাবলুর মনে দোলা লাগায়। বড় হলে ঐ ইঞ্জিনের ট্রেনে চেপে বিয়ে করতে যাবে। শাঁখ বাজাবার দরকার নেই। কি মজা!

ইঞ্জিনের বাঁশী শুনতে শুনতে মন চলে যায় 'শালিমার' এক নম্বর গেটের কাছে—তার পর বেতাইতলা। বেতাইতলায় বাবা, মা, ছোট ভাই আবীর আর ঘোতনটা এখনও মা'র কাছেই থাকে। শীতের ভোরে ট্রেনগুলো গেলে সারাটা বাড়ী যেন আরও বেশী করে কেঁপে ওঠে। বাবলুর হাসি পায়। আবীর যখন এসে থাকবে তখন হয়ত ভয়েই কাঠ হয়ে যাবে! সারাটা বাড়ীতে অনেক লোকজন। তবু? বাবলু একা। তার সঙ্গী নেই, সাথী নেই। ঘোতনের জন্য মনটা আরও বেশী খারাপ লাগে। এই ভোরে মাকে আঁকড়ে ধ'রে শুয়ে আছে। বাবলুও একদিন ছিল। ঘুম ভেঙে যায় প্রথমে। ঘুম ঘুম চোখে ঠাহর করতে পারে না। কোন্‌টা জানলা, কোন্‌টা দরজা সব কেমন গুলিয়ে যায়। তার পর ধীরে ধীরে সব চেতনা ফিরে আসে। আবার সব ঠিক হয়ে যায়। আজকাল ঠাকুমাকে আর ডাকতে হয় না। প্রথম প্রথম ঠাকুমাকে কি ডাকই না ডাকতে হ'ত! ঘুম কিছুতেই ছাড়তে চাইত না। স্কুল কামাই হয়ে যেত। এখন ঘড়িতে এলার্ম বাজবার আগেই উঠে পড়ে। ঘরে কড়িকাঠের ফাঁকে চড়ুই পাখীটা বাবলুকে চিনে ফেলেছে। খুট করে আওয়াজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিড়িক চিড়িক করে ডেকে ওঠে। কালো ডোরা-কাটা চড়াই পাখী। ওর জোড়াটা গরম কালে পাখার ব্লেড লেগে মরেছিল। ঐ ডোরা-কাটা চড়ুইটা ভোর না হতেই খুব জোরে ডাকে। ডাক শুনে কেষ্টদার কাঠের গোলা থেকে আর একটা পাখী ডেকে ওঠে। ফুচকে পাখীটা গলায় এত জোর পায় কোথায়? এইবার বাস্‌গুলো গারাজ থেকে ছাড়ে। ট্যাক্সিগুলো ষ্টেশনের দিকে দৌড়য়। প্রথম কে যাবে তারই খেলা সুরু হয়। ষাট বছরের বুড়ো নারাণদার বাস্‌টাকে বাবলুর ভাল লাগে। হ্যাঁ, বাবলু এই ভোরেই বাসের হর্ণ শুনে বাস চিনতে ভুল করে না। ঠাকুমা কেমন পা-টা ঘষে ঘষে চলেন। কোন কাকা ধুপ-ধাপ করে চলে। এ-সব বাবলুর জানা। নারাণদা বাসের কন্‌ডাক্টর, তবু তার মাঝে একটা মানুষকে বাবলু খুঁজে পায়। কেউ ওকে আপনি বলে না এক নারাণদা ছাড়া। বাসে উঠলে কত গল্প। বাসের কাঁচে লাল রঙে কত কবিতা।

পরে জেনেছিল বাবলু—ওটা নারাণদার ছেলে লিখেছে। কি সুন্দর সুন্দর কথা। একটা দেবদারু গাছের ফাঁকে মাটির ঘর, ঐ ঘরেই নারাণদা থাকে। নারাণদাকে ভাল লাগার সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু ভাল লাগে। ভাল লাগে নাতনীটিকে। মুখ দিয়ে কথা ফোটে নি। তবু বোনের কোলে চেপে দেবদারু তলায় দাঁড়িয়ে থাকে। হাতটা নেড়ে দাদুকে কাছে ডাকে। মাথাটা হেলে-দুলে ওঠে।

খাকী শার্ট-পরা শীতে হিহি-করা মানুষটাকে দেখলে বাবলুর দুঃখ লাগে। ঠাকুমাকে খুব ভোরে উঠতে হয়। কাকাদের ভোরে চাকরি। মশারিটা তুলে বিছানার বাইরে বসেন। কানে কম শোনেন। সাপের ফণার মত হাতের চেটোটা কানের পাশে মেলে ধরেন। ঘড়ির দিকে চেয়ে থাকেন। তার পর পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়েন।

আর ঠিক সেই সময় ময়দানের চার্চ থেকে একটা ঘণ্টা বেজে ওঠে। একটা মিষ্টি সুর তুলে একটানা বেজে চলে। বাবলু শুয়ে শুয়ে যীশুর কথা ভাবে। ব্যাণ্ডেল চার্চের পাদ্রীর মুখটা বাবলুর খুব ভাল লাগে। যীশুর ছবি দেখলে বাবলুর চোখে জল আসে। ক্রুশবিদ্ধ মুখে থাকে এক স্বর্গীয় হাসি। হাসির কথা মনে হলেই বাবলুর

মুখটা গম্ভীর হয়ে যায়। যীশুর কথা, মা মেরীর কথা মনে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে বাবলুর আর একটা ছবি মনে পড়ে। সেখানে যীশু নেই—মা মেরীও নেই। সব কোথায় উধাও হয়ে যায়। তার বদলে ঘোতন আর মা'র কথা মনে পড়ে। কখন ওরা এসে ভিড় জমায় আবার কখন চলে যায় ঠিক থাকে না। শিবপুরে বাবা নিশ্চয় ঘুম থেকে উঠলেন। হিটারটা জ্বেলে চায়ের জল চাপালেন। এ সব বাবলুর মুখস্থ। চা খেয়ে টেবিল ল্যাম্পের স্পষ্ট আলোয় বই পড়া সুরু করবেন। সব কাজ বাবার ছকে বাঁধা। বড় হলে সেও বাবার মত হবে।

ঠাকুমা উঠে যাওয়ার পরই বাবলুর পালা। প্যাণ্টটা ছেড়ে ছোট একটা চাদর মুড়ি দিয়ে বাথরুমে যাবে। যাবার আগে চটকলের চড়া বাঁশীটা বাজবে। ঐ বাঁশী শুনলে ওর মনে ভরসা জাগে। না, সারা পৃথিবীতে তার চেয়েও ভোরে ওঠা লোক আছে। এই বোধটা আসার সঙ্গে সঙ্গে ভোরে ওঠার কষ্টকে আর কষ্টই মনে হয় না। সে সবে ঘুম থেকে উঠছে। আর শ্রমিকদের কাজ সুরু হ'ল। পুকুরের ওপারে কচি কলাপাতা-গুলোর দিকে বাবলু চেয়ে থাকে। আলো প'ড়ে পাতার ডগাগুলো বেশ চিক চিক করছে। চিরুন কলাপাতাগুলো ঠিক চিরুণীর মত হয়ে গেছে। ঠাকুমা কয়লার চুপড়িটা নিয়ে এবার রান্না ঘরে ঢুকলেন। এ সব বাবলুর হিসাব আছে। ঘুঁটের আগুনগুলো যখন গনগনে হবে, ঠিক তখনই ঠাকুমা কয়লার চুপড়িটা উজাড় করে দেবেন, প্রথমে সাদাটে ধোঁয়া উঠবে—তার পর ধোঁয়াটা গাঢ় হবে। শেষে গমকে গমকে কালো ধোঁয়া রান্নাঘরকে ঘিরে ফেলবে। সাধ্য কার ওখানে থাকে। বাবলু যখন হাত-মুখ ধুতে যাবে, ঠিক বন্ধুর মত ভারী ধোঁয়ার একটা অংশ ওকে ঘিরে ধরবে। বন্ধু, তোমার দেরি কত! এই সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে ধোঁয়া আকাশের সঙ্গী হবে। ঠিক এই মুহূর্তে বাবলুর সঙ্গীহারা জীবনকে বড় একঘেয়ে লাগবে।

বাড়ীর ধোঁয়াটাও তার দুঃখ বোঝে—কিন্তু আর কেউ বোঝে না কেন?

নিজের বাড়ীর ধোঁয়াতে দম বন্ধ হয় না। কিছুই মনে হয় না। তাই যখন দেখে ঘর ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে, মন চায় না, তবু ধোঁয়াকে কষ্ট দেবার জন্য জানলা-দরজা বন্ধ করে দিতে হয়। মশারিটা না হ'লে কালো হয়ে যাবে। ধোঁয়া কমবার পর জানলাটা ফাঁক করে শেষ রাতের তারাকে দপ দপ করে জলতে দেখবে। নিঃসঙ্গ তারাটাকে বাবলুর পছন্দ। শিবপুর থেকেও ঐ তারাটা দেখা যায়। এখানকার গঙ্গাকে ওখানে দেখা যায়। এখানকার চাঁদকে ওখানে। আমবারুণির দিন, কিংবা পালা-পার্বণে গঙ্গাস্নানে গেলে বাবলুর মনটা আরও খারাপ হয়ে যায়। ঠাকুমা বাবলুর গম্ভীর মুখ দেখে বুঝতে পারেন না বাবলুর মনের কথা। এ গঙ্গায় দাঁড়ালে শিবপুরের গঙ্গার কথা মনে পড়ে। শিবপুরের ষ্টীমারঘাটটার জন্য মন কেমন করে। বাবা তিন জনকে সাইকেলে চাপিয়ে ছুটির দিন ষ্টীমার ঘাটে বেড়াতে আসেন। আহা! কত আনন্দ না পাওয়া যায়। গঙ্গায় ভেসে-যাওয়া খড়ের নৌকো দেখে মন চলে যায় অনেক দূরে। বাবা চিনে বাদাম খান। চিনে বাদাম খেতে বাবার খুব ভাল লাগে। বাবার পেটের যন্ত্রণা হয়, ডাক্তার বারণ করেন, তবু বাবা ঐ সব জিনিষ খান। আর বাবলুরা? তিন জনে দুর্গা পাণীর দোকান থেকে কোকাকোলা খায়। ঘোতনটা এখনও 'ষ্ট্র'তে খেতে পারে না। বিষম খায়। নাক দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। আবীরটা খুব চালাক। দুর্গা পাণীর চায়ের গ্লাসটা গরম জলে ধুয়ে নেয়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। নৌকোর ছই-এর মধ্যে আলো জ্বলে। একটা লোক বাঁশের আগায় একটা হুক লাগিয়ে রাস্তার আলোগুলো জ্বেলে দেয়। আকাশের বুকে তারার মেলা বসে। ঐ সময় বাবলুর মনটা কেঁদে ওঠে। এবার ফেরার পালা। আবীর আর ঘোতনকে নামিয়ে দিতে হবে শিবপুরের বাড়ীতে। ওখান থেকে বাবার সঙ্গে ঠাকুমার কাছে। কত আর দূর! তবু সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে তুলসীতলা থেকে মা যখন প্রণাম সেরে উঠে আসেন ঠিক তখনই বাবলুর মনটা হু-হু করে। ঘোতন আর আবীর দাদার মুখের দিকে তাকাতে পারে না। এ দুঃখ কে বুঝবে? গলার কাছে কি একটা ঠেলে ওঠে। মনে হয় বাবলুর কত কি! আবার রাস্তায় শুম হয়ে চলা। সাইকেলের ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে আসা। সারাটা রাস্তাকে মনে হয় কত বড়। রাস্তাই ফুরোয় না। আর শনিবার! রাতে খেলা সুরু করতে না করতে ঘোতনের চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে, আবীর ঘন ঘন হাই তুলবে। সন্ধ্যাবেলা দাদার প্রতীক্ষায় থাকতে আবীর আর বাবলুর কি ভালই লাগে। রকের ওপর দু' ভাই পথ চেয়ে বসে থাকে। কখন দাদা আসবে। মাকে বার বার জিজ্ঞেস করে দাদার কথা। শেষে সন্ধ্যা যত ঘনিয়ে আসে ততই ওরা আনচান করে। সাইকেলের ঘণ্টি শুনলেই চমকে ওঠে। ও বাড়ীর

কেলুর ওপর আবীর আর বোতনের খুব রাগ। কেলু এক নাগাড়ে সাইকেলের ঘণ্টি বাজায়।

গঙ্গাস্নানের পর পাণ্ডা বাবলুর সারাটা মুখে চন্দনের ছোপ দেয়। ভিজে গামছাটা পাট করে মাথার ওপর দিলেই, বাবলুর চলার গতিটা ঠাকুমা বুঝতে পারেন। সমান তালে ঠাকুমা চলতে পারেন না। কোমরটা টনটন করে ওঠে। পা-টা এদিক্-ওদিকে হেলে পড়ে। তবু বাবলুর চলা চাই। ময়রার দোকানে এসে বাবলুর গতি থামে। ঠাকুমা বুঝতে পারেন। দানাদার একটা চাই।

পূর্ণিমার চাঁদকে দেখলে বাবলুর মা'র কথা মনে পড়ে। শিবপুরের দাওয়ায় বসে মা তাকে চাঁদ মামার গল্প বলতেন। সে নাকি বাঁ হাতটা নেড়ে চাঁদকে ডাকত। সে যখন মা'র পেটে ছিল তখন ঠাকুমা তার মাকে চাঁদ-দেখান জল খাওয়াতেন রোজ। যাতে চাঁদের মত সুন্দর ছেলে হয়। বাবলুর মুখটাও নাকি সুন্দর। সবাই বলে। বাবলুর এখন অনেক চিন্তা। ইঁদুরকে দাঁত দিয়ে কত মিনতি করেছিল। কিন্তু তার দাঁতটা বড়ই হয়ে যাচ্ছে।

তার পর বাড়ী। ঠাকুমার কাছে এসে মনটা খুব দমে যায়। সারাটা বাড়ী ফাঁকা। কাকারা বাইরে। একা একা থাকতে ভাল লাগে না, চোখের জল বাধা মানে না। দেখতে দেখতে রাত ঘনিয়ে আসে। শুয়ে পড়ে। ঠাকুমার পাশে শুয়ে ঘুম আসে না। এপাশ-ওপাশ করে। ঘন ঘন জল খায়। তার পর এক ফাঁকে ঘুমিয়ে পড়ে। আবার ভোর হয়। এমনি করে অনেক সোমবার এল। অনেক সোমবার ভোরে বাবলু উঠল।

ঘুম থেকে উঠেই ঠাকুমা ঠাকুর-দেবতার নাম নেবেন। টিউব-ওয়েলে জল তোলবার জন্য ভারী আসবে। জল তুলতে তুলতে ভারীর হাতটা টন টন করবে। জলটা আর হুস হুস করে আসবে না। একটু বিরাম। তার পর আবার ক্যাচ-ক্যাচ শব্দ। ঠাকুমা বাথরুমে স্নান সুরু করবেন। ঠাকুমার ঠোঁটটা শীতে কাঁপবে। ঠাকুরদের নামগুলো জড়িয়ে যাবে। তার পর ঘরে আসবেন। পাটের কাপড়টা প'রে গোপালের ভোগ চড়াবেন। গোপালকে দিয়ে তার পর সেই ভোগ সবাই খাবে। গোপালের সামনে ব'সে ঠাকুমা অঝোরে কাঁদেন। ঠিক ঐ সময় লেপটা হটিয়ে দিয়ে বাবলু আসন-পিঁড়ি হয়ে অন্ধকারে সবার অগোচরে মশারির মধ্যে তার ভগবান্‌কে ডাকে। শিবপুরের জন্য প্রার্থনা করে—পরীক্ষার পাশের কথা জানায়, ইস্কুলের পাশে পা-ভাঙ্গা কুকুরটার জন্য মিনতি জানায়। আর অঙ্কের মাষ্টারমশাইকে ভাল লাগে না। বড় নিষ্ঠুর! বাবলু ঈশ্বরের কাছে মাষ্টারের সুমতি প্রার্থনা করে। রুগ্ন মাধববাবুর জন্য চোখে জল আসে। প্রার্থনার ফাঁকে ফাঁকে লক্ষ্য করে, ঠাকুমা কেমন কেঁপে ওঠে। গায়ের চামড়াগুলো কেমন কুঁচকে যায়। লোল চামড়ার ফাঁকে জমে-থাকা জলগুলো কেমন আলো প'ড়ে চিক চিক করে। ঠিক এমনি সময় রান্নাঘরে কয়লা কাটার ফটাফট শব্দ আসে। বাবলু বলে, কয়লারা যুদ্ধ করছে। থেকে থেকে গনগনে আগুন জ্বলে। বাবলু চুপচাপ চোখ বুজে শুয়ে থাকবে। ঠাকুমার পা-ঘষার শব্দ আসবে। তার পর বাবলুর ঘুম যাবে ভেঙে। জাগা ঘুম ভাঙতে দেরিই হয়। এই সময় বাবলুর আপন খেলার সংসারটা দেখবার সময়। চায়ের প্যাকেট। সিগারেট খোলের রাংতা। এক ফাঁকে উঠে পাশের ঘরের দরজার ফুটো দিয়ে বাঁ-চোখটা রেখে ছোট কাকাকে দেখে। চাকরি করছিল, বেশ ছিল। বোনাস পেয়ে বাবলুকে কত কি না কিনে দিয়েছিল। সেই ছোট কাকা পাগল হয়ে গেল। সার্কাস দেখিয়েছিল, চিড়িয়াখানা দেখিয়েছিল। রাঁচি থেকে ওঁরা ফিরিয়ে দিয়েছেন। ছোট কাকার কোলের ওপর অনেকগুলো বেড়াল শুয়ে থাকে। সব সময়। ছোট কাকাকে কারখানার লোকেরা পাগল করে দিল। ভদ্রঘরের ছেলেদের ওপর কারিগরদের হিংসা। বাবলু ভেবে পায় না। মানুষগুলো কেন এত ছোট হয়। কত কথাই বলত ছোট কাকা। বাবলু হয়ত বুঝত, কতক বুঝত না। তিন তিন বার স্কুল ফাইনাল ফেল করল ছোট কাকা। বড় হবার শখ ছিল। গায়ের মধ্যে একটা শির শির করা দুঃখ চলাফেরা করে। ছোট কাকা ঘুমোয়। এইবার ভগবান্ রামকৃষ্ণের কাছে হাত জোড় করে প্রার্থনা জানায়। আর ভাবতে পারে না। মাথার মধ্যে সব যেন জট পাকিয়ে যায়। আড়মোড়া ভাঙে। যেন কতই না ঘুমে ডুবে ছিল! প্যাণ্ট পরা, জামা পরা, ওর মধ্যে মাফলারটাও জড়াতে হবে। 'সান-প্রটেকট' টুপিটাও পরতে হবে। ছেলেদের কাছে বাহাদুরি নিতে হবে। একটু 'হালুয়া' কিংবা চিড়ে ভেজান থাকে। ইস্কুলে যাবার মুখেই ন' কাকার ঘর। সারাটা দিনের মধ্যে দশ মিনিটের জন্য ন' কাকার দেখা পায়। পরিষদের মিটিং, কারখানার চাকুরি, আর রাত জেগে গল্প লেখা।

এইত ন' কাকার কাজ, বাবলুর জলখাওয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ন' কাকা যেন হাতগুণে জানতে পারেন। 'এই ছোক্‌রে' বলে চেঁচাবেন, বাবলুও এই ডাকটার জন্ম সজাগ হয়ে থাকে। ন' কাকার বিয়ে হবে পঁচিশে বৈশাখ, বড়িষা বড় বাড়ীতে। আশীর্বাদের দিন কাকীমাকে বাবলু দেখে এসেছে। কাকীমা বাবলুকে কোলে নিয়েছে। আর বাবলু অবাক্‌ বিস্ময়ে কাকীমার চোখ দুটোর দিকে দেখেছে। কি সুন্দর চোখ। ভাল লেগেছে কাকীমাকে। আবার মন খারাপ হয়ে গেছে। কাকীমার এই ছোট্ট বাড়ীতে কষ্ট হবে। ইস্কুলের দেরি হবে। ন' কাকা একবার বাবলুর দিকে কট্‌মট্‌ করে দেখবেন। জুতো, জামা, কোটগুলো ঠিক করে দেবেন, এই সময় ন' কাকা বাবলুর মুখে নিষিদ্ধ ডিম আধখানা ফেলে দেন। ঠাকুমাকে লুকিয়ে। ন' কাকার ঘরে হিটার। বন্ধুদের চা, ডিমভাজা বেশ চলে। বড় হলে বাবলুও একটা হিটার কিনবে। এইবার প্রার্থনা সংগীত গাইতে হবে।

"ভগবান্ রোজ তুমি একটা করে ডিম জোগাও,
রাতে মাঝে মাঝে একদিন দিওগো পোলাও"

বাবলু হাসে আর খায়। ন' কাকার ঈশ্বর খাওয়ার ঈশ্বর। গান শেষ হবার সঙ্গে ন' কাকা হুঙ্কার ছাড়েন। বাবলুও ছুটে ইস্কুলে পালায়।

সেবারের কথা। কোন আত্মীয় মারা গেলেন। কাকাদের একমুখ দাড়ি মাথায় রুক্ষ চুল। বাবলু ঘুরে-ফিরে কাকাদের দেখত আর ভাবত, কেন এমন হয়। রোজ সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুমাকে জিজ্ঞাসা করত, মানুষ ম'রে যায় কোথায়। ঠাকুমার ভাসা ভাসা উত্তরে বাবলুর মন ভরত না। তখন আকাশের দিকে চেয়ে উত্তর খুঁজত। একদিন এমনি ক'রে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ সারাটা আকাশ ছেয়ে গেল। আচম্‌কা শিলাবৃষ্টি! কত আনন্দ! মুখে ঠাণ্ডা শিল পড়ার কি আনন্দ। বোতলে ভরল। কত বরফ, বাবলুর গলা ব্যথা হয়ে গেল। হঠাৎ বাবলুর মনে চিন্তা এল। এবার কিছুদিনের জন্ম মুক্তি। পরীক্ষার পর মা'র কাছে থাকবে। ছোট ভাইকে তিন চাকার সাইকেলে বসিয়ে খেলবে। বাবার সঙ্গে সন্ধ্যায় ষ্টীমার ঘাটে বেড়াতে বেরুবে। মা'র কাছে শুয়ে শুয়ে যত খুশি রূপকথার গল্প। সারাটা বছরের মধ্যে এই প্রথম লম্বা ছুটি। পরীক্ষার পর অফুরন্ত সময়। সময় তাড়াতাড়ি কেটে যায়। •

বাবলুর পরীক্ষা হয়ে গেল। বাবাও নিতে এলেন। এ কি নতুন কথা শুনছে বাবার মুখ থেকে। এবার আবীর আসবে নাকি! ঠাকুমার কাছে থাকবে। বাবলু এতক্ষণ পোষা বেড়ালটার ল্যাজ ধ'রে ঘোরাচ্ছিল, পায়রা-গুলোকে অসময়ে গম ছড়িয়ে দিয়েছিল। রেডিওটা ঘুরিয়ে অজানা সেণ্টার ধরেছিল। কেবল আনন্দ! ঠাকুমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। কিন্তু এই মনটাই হঠাৎ গুম হয়ে গেল। কখন ভোর হবে এতক্ষণ এই চিন্তাই ছিল। এখন? কাঁটার মত বেঁধা একটা ব্যথা জাগছে মনে মনে। কারণটা বাবলু বুঝতে পারছে না। এত আনন্দ, আবার এত দুঃখ কেন?

•

রাত ঘনিয়ে এল। বাবা আর ঠাকুমার কত গল্প। বাবলুর চোখ ঘুমে জড়িয়ে ধরল, বাবা আর ঠাকুমার কথাগুলো যেন কোন্ দূর থেকে ভেসে আসছে। শেষে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। শেষ রাতে ঘুম ভেঙে গেল। মশারিটা তুলে বাইরে এল। এতদিন এই জায়গাটাকে ভালবাসতে পারে নি। সবাই তাকে যেন পুরু রাজার মত বন্দী ক'রে রেখেছে। কত সময় ভেবেছে এখানে সুখ নেই, আনন্দ নেই, শিবপুরেই মুক্তি আছে। কিন্তু আজ বাবলুর চোখে জল কেন? সন্ধ্যার সে উৎসাহ কোথায় গেল। বাবার নাক ডাকছে, ন' কাকা লিখছে। শিবপুর থেকে আসবার দিন যেমন কেঁদেছিল—এ ত তেমনি কান্না! ঠাকুমা একলা শুয়ে আছেন। আজ সারাটা দিন একাদশীর উপবাস করেছেন। মুখটা শুকিয়ে গেছে। কতদিন আগে ঠাকুমার সিঁথিতে সিঁদুর ছিল। ঠাকুমা শাড়ী পরতেন। ঠাকুমা কিছু ভোলবার জন্ম সারাটা দিন কয়লার গুঁড়ো দিয়ে গুল দেন। সাবান কাচেন। লক্ষ্মীপুজো, ইতুপুজো, সত্যনারায়ণ নিয়ে ভুলে আছেন। ঠাকুমা এখানে একা, তাই ঠাকুমা এখানে সম্পূর্ণ ঠাকুমা। কোন সঙ্গী নেই, সাথী নেই, ছোট কাকার জন্ম কাঁদছেন। তবু ঠাকুমার জয়-জয়কার। ঠাকুমার চিন্তা করতে করতে হঠাৎ আবীরের চিন্তাটা মনে ভেসে উঠল। এইবার বাবলু বুঝল আসল দুঃখের কারণটা। বাবলুর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল। বাবলু ঠাকুমাকে আগলে রেখেছে। আর আজ? বাবলু চলে যাবে, আবীর এসে থাকবে। বাবলু পাঁচজনের সঙ্গে মিশে একটা হারিয়ে-যাওয়া বাবলু হয়ে যাবে। লোকে বলবে আবীরের কথা। ঠাকুমাকে সবাই নিতে আসে, ঠাকুমা যান না। ঠাকুমাকে তাই সবাই চেনে।

খুব ভোরবেলা বাবলু মনটা বেঁধে ফেলল। এখানেই থাকবে। ছুটিটা এখানে কাটাবে। বাবার কানে ফিস

ফিস ক'রে জানাল। বাবা ঘুম ঘুম চোখে বুঝতে পারলেন না। ছেলেটা বলে কি।

বেলাতে বাবার ডাকে ঘুম ভাঙল না। ঠাকুমা আর বাবলু জড়াজড়ি ক'রে শুয়ে আছে। বাবলুর প্যাণ্টের ফিতের সঙ্গে ঠাকুমার থানের খুঁট বাঁধা। বাবা দেখলেন। সাইকেলের ঘণ্টি বাজালেন। কিন্তু কোথায় কি? আজ মরুর বুকে বুঝি মেঘের ছায়া পড়েছে!

"ভাবেজীর ভাবান্তর"

শ্রীজয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রাবণ মাসের 'প্রবাসীতে' শ্রীনরেন্দ্র দেব 'ভাবেজীর ভাবান্তর' শীর্ষক প্রবন্ধে আচার্য বিনোবাভাবে, তথা সর্বোদয় আন্দোলন সম্পর্কে যে সব মত প্রকাশ করেছেন, তা তাঁর একার নয়; বাংলার শিক্ষিত সমাজের বহু ব্যক্তিই এরকম মত পোষণ করেন। তাই এক অর্থে প্রবন্ধটি জনমত গঠনের সহায়ক হয়েছে। কিন্তু স্বাধীন বুদ্ধিজীবী হিসেবে শিক্ষামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বোদয় আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি অনুধাবন করবার ফলে আমার ধারণা হয়েছে যে, শ্রীনরেন্দ্র দেবের বক্তব্যের প্রায় সম্পূর্ণই স্বল্পচিন্তা ও আক্রমণাত্মক মনোভাবের দ্বারা কলুষিত। বিশেষ করে বিনোবাজী ও সর্বোদয় সম্বন্ধে তিনি যে অশ্রদ্ধাসূচক ভাষা ও বাচনভঙ্গি ব্যবহার করেছেন, তা চিন্তাজগতে ভারতীয় আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাই জনমত গঠনের দিক থেকেই এ বিষয়ে একটি দ্বিতীয় মত প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এ কথা আদৌ সত্য নয় যে, "একমাত্র এদেশের গ্রাম্য-পরিবেশে বর্দ্ধিত, স্বল্পশিক্ষিত, প্রাচীনপন্থী এবং অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী ধর্মভীরু মানুষ ছাড়া আর কেউ বিনোবাজীর এই আন্দোলনকে এক কল্পনাবিলাসী রাজনৈতিক সাধুর দিবাস্বপ্ন ভেবে কোন আমলই দিতে চাইছেন না।" শ্রীতারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত অপর কোন সাহিত্যিক সর্বোদয় আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসেন নি, এও অসত্য। একটু খোঁজ-খবর নিলেই শ্রীনরেন্দ্র দেব জানতে পারতেন যে, বাংলা দেশের বহু উচ্চশিক্ষিত সাহিত্যিক, অধ্যাপক ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীই সর্বোদয় আন্দোলনের প্রতি শুধু সহানুভূতি-সম্পন্নই নন, এ আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে সাহায্যও করে থাকেন। যথা—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, শ্রীঅন্নদাশংকর রায় ও তাঁর স্ত্রী শ্রীলীলা রায়, ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত, শ্রীবিমল ঘোষ, শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র, শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, কাজী আবদুল ওয়াদুদ, শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনারায়ণ চৌধুরী ও আরো অনেকে। আর শ্রীনরেন্দ্র দেব এসব তথ্য জানেন না, এ কথাই বা বলি কি করে? সর্বোদয়ের বিভিন্ন পুস্তিকা ও পুরাণো ইস্তাহার প্রভৃতি ঘেঁটে দেখতে পাই যে, তিনি ও তাঁর স্ত্রী রাধারাণী দেবী অনেক বৎসর যাবৎ সর্বোদয় আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয় এবং ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। সহসা তাঁর প্রবন্ধটি প'ড়ে অনেক পাঠকই হয়ত বিস্মিত হয়ে ভাবছেন, ভাবান্তর হয়েছে কার?

ব্যক্তিগত কথা বাদ দিয়ে শ্রীনরেন্দ্র দেবের মূল সমালোচনায় এলে দেখতে পাই যে, বাংলা দেশের অন্য অনেক শিক্ষিত লোকের মতই তিনি সর্বোদয় আন্দোলনের কেন্দ্রীয় এবং প্রান্তীয় আদর্শগুলির তারতম্য হৃদয়ঙ্গম করতে অসমর্থ হয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক, অশ্লীল পোষ্টারের বিরুদ্ধে বিনোবাজীর আন্দোলনের কথা। লেখক বলেছেন, "ভারতীয় যুবকদের নৈতিক চরিত্ররক্ষার কত সহজ উপায়ই না তিনি উদ্ভাবন করেছেন, ভেবে বিস্মিত হতে হয়।" প্রকৃতপক্ষে কিন্তু বিনোবাজী কখনও একথা বলেন নি যে, ভারতীয় যুবকদের নৈতিক চরিত্র রক্ষার জন্যে তিনি অশ্লীল পোষ্টারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন। তাঁর সহজ বক্তব্য হচ্ছে এই যে, মানুষের জীবনের পবিত্র দিক্‌-গুলিকে কুৎসিত আকারে পথে-ঘাটে লোকের চোখের সামনে তুলে ধরা অসঙ্গত। স্ত্রী-পুরুষের যৌন জীবন পবিত্র, নারীদেহের সৌন্দর্যও পবিত্র। ভারতীয় আদর্শে

উভয়েরই অতি উচ্চ স্থান আছে। কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের যৌন সম্পর্ককে কিংবা নারীদেহকে বিকৃত রূপ দিয়ে জন সমক্ষে তুলে ধরা প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য, কোন সভ্যতারই আদর্শ হতে পারে না। এই আদর্শ ই বিনোবাজী প্রচার করছেন; শুধু অশ্লীল পোষ্টার অপসারিত করে জনসাধারণের নৈতিক উন্নতিসাধন করবার চেষ্টা করার মত শিশু তিনি নন। দ্বিতীয়তঃ অশ্লীল পোষ্টার আন্দোলন অনেকখানি বিনোবাজীর ব্যক্তিগত আন্দোলন। সর্বোদয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন, এমন নয়। যাঁরা এর কোন বিশেষ গুণ দেখতে পান না, তাঁরা অন্ততঃ সমগ্র সর্বোদয় আন্দোলনকে আক্রমণ না করলেও পারেন।

আরেকটি মূলতঃ ব্যক্তিগত মতের জন্য লেখক বিনোবাজীর উপর জেহাদ ঘোষণা করেছেন। সে হচ্ছে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ। গান্ধীজীর মত বিনোবাজীও জন্ম-নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষা যৌন সংযমেরই অধিক পক্ষপাতী। পৃথিবীর সব দেশেই এ বিষয়ে বিভিন্ন মত আছে। সাধারণ মানুষের পক্ষে যৌন সংযম পালন করা প্রকৃতই কষ্টসাধ্য। কিন্তু নৈতিক আদর্শ হিসেবে বোধ হয় পৃথিবীর সব সভ্য মানুষই যৌন সংযমকে মেনে নেয়। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, বিনোবাজী কিংবা সর্বোদয়ের অপর নেতারা এ নিয়ে কোন আন্দোলন সুরু করেন নি, এবং শ্রীনরেন্দ্র দেবের মত ভিন্নমতাবলম্বীদের আক্রমণও করেন না।

•অনুরূপ আরেকটি বিষয় হচ্ছে বাংলা ও বাঙালীর প্রতি বিনোবাজীর মনোভাব। বাংলা দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে, আসামে বিনোবাজীর বক্তৃতার যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং সে প্রতিবাদ সংবাদপত্রে ছাপাও হয়েছে। কিন্তু তথাপি শ্রীনরেন্দ্র দেব ভুল সংবাদকে ভিত্তি ক'রে বিনোবাজীর বিরুদ্ধে অপপ্রচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। জীবনের ব্রত হিসেবে বিনোবাজী যে মানবপ্রেম ও মানবসেবা বেছে নিয়েছেন, তাতে যদি লেখক সন্তুষ্ট না হন, তবে বিনোবাজীর বিভিন্ন রচনা ও ভাষণ পাঠ করলেই তিনি জানতে পারতেন যে, বাঙালীর প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি ও মমত্ববোধ রয়েছে।

এবারে মূল বিষয়গুলিতে আসা যাক। লেখক সর্বোদয়ের নেতাদের সম্বন্ধে বিভিন্ন তাচ্ছিল্যসূচক মন্তব্য করে বলেছেন যে, "ভূদানের ফলে এক নূতন ভূস্বামী সম্প্রদায়েরই সৃষ্টি হচ্ছে। তাঁর এ বক্তব্য থেকে মনে হয় যে, অনেক বৎসর সর্বোদয় আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকা সত্ত্বেও তিনি এর মূল লক্ষ্যগুলিই বুঝতে পারেন নি। জমির মালিকানা বিলোপ ক'রে গ্রামের জমিতে সমস্ত গ্রামবাসীর সার্বজনীন মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করাই সর্বোদয়ের উদ্দেশ্য। ভূদান এ আন্দোলনের প্রথম সোপান মাত্র। ভূদান আন্দোলন অগ্রসর হতে হতে গ্রামের অধিকাংশ জমির দান সমাপ্ত হ'লে তাকে তখন গ্রামদান বলা হয়। এরকম গ্রামে পরিবারের আকার অনুযায়ী সকলের মধ্যে সমানভাবে শস্য বণ্টন করা হয়, সার্বজনীন মালিকানায় বিভিন্ন প্রকার ছোট শিল্প নির্মাণ ক'রে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন ও উন্নতির ভিত্তি স্থাপন করা হয়, নিরবচ্ছিন্ন প্রচার ও আচারের ফলে জাতিভেদ, বর্ণভেদ লোপ পায়, এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে সর্বজন-নিয়ন্ত্রিত সমাজকল্যাণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বিহার, রাজস্থান, মাদ্রাজ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশে এরূপ অনেক আদর্শ গ্রাম গঠিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও ২৬টি গ্রামদান হয়েছে। সবগুলো গ্রামে সমান কাজ হয় নি, কিন্তু এ গ্রামগুলি পর্যটন করলে যে কোন নিরপেক্ষ ও মুক্তমনা ব্যক্তিই মুগ্ধ হবেন।

শ্রীনরেন্দ্র দেবের সুচিন্তিত অভিমত যে, বিনোবাজী নাকি উচ্চশিক্ষার বিরোধী এবং দেশসুদ্ধ লোককে কারিগর বানাবার পক্ষপাতী। আর এর ফলে নাকি এ দেশের সংস্কৃতি জাহান্নমে যাবে, এবং এ দেশ অন্যান্য দেশের চেয়ে বিভিন্ন দিকে আরো পিছিয়ে পড়বে। কিন্তু উচ্চশিক্ষার বিরোধী হতে গেলে যে ক্ষুদ্র মন থাকবার প্রয়োজন, তা বিনোবাজীর নেই। তিনি যা বলেছেন তা এদেশের এবং অন্য অনেক দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সুচিন্তিত অভিমত, আর তা হচ্ছে এই যে, এদেশের মত জনসমস্যাভারাক্রান্ত দেশে রচনাত্মক যুগে সকলেই সাধারণ উচ্চশিক্ষার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠলে দেশের দ্রুত শিল্পায়ন ত ব্যাহত হবেই, উপরন্তু বেকারের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাবে। তাই সাধারণ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যাদের স্বাভাবিক আকর্ষণ ও প্রতিভা আছে, তাদের বাদ দিয়ে আর সকলকে কারিগরি শিক্ষা লাভেরই চেষ্টা করা উচিত। এ দেশের আর্থিক উন্নতি ও বেকার সমস্যা নিয়ে যাঁরা বিন্দুমাত্রও চিন্তা করেছেন, তাঁরাই জানেন যে, এ ছাড়া গত্যন্তর নেই। অর্থনীতির সাধারণ ছাত্রও জানেন যে, জাপান, সোভিয়েৎ ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশে সাধারণ উচ্চশিক্ষার পরিবর্তে কারিগরি শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণের ফলেই ন্যূনতম সময়ে শিল্পায়ন সম্ভব হয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন

যে, বিনোবাজী কিংবা সর্বোদয়ের অপর কোন নেতা শিল্পায়নের বিরোধী নন। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে তাঁরা শুধু শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষপাতী।

শ্রীনরেন্দ্র দেব এই বলে বিনোবাজীর বিরুদ্ধে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার অভিযোগ এনেছেন যে, বিনোবাজী নাকি সৈন্যবাহিনীকে বিদায় করে দিয়ে শান্তিসেনার হাতে প্রতিরক্ষার ভার অর্পণ করতে বলছেন। প্রকৃতপক্ষে বিনোবাজী কিংবা অন্য কোন সর্বোদয় নেতা এরকম কিছুই বলেন নি। গান্ধীজী বলতেন যে, কোন দেশের সব লোক যদি সত্যিকারের অহিংস অসহযোগ শিখতে পারে, তবে কোন বহিঃশত্রুর পক্ষে সে দেশ স্থায়ীভাবে শাসন করা কিংবা অধিকার করে থাকা সম্ভব নয়। ফলে কোন প্রকৃত অহিংস জাতি সশস্ত্র সেনাবাহিনীর সাহায্য ছাড়াই বিদেশী শত্রুকে সে দেশ থেকে পালাতে বাধ্য করতে পারে। গান্ধীজী নিজেও কখনও বর্তমানে সৈন্যবাহিনীকে ছুটি দিতে বলেন নি; কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর পাল্টা আক্রমণ তিনি সম্পূর্ণ সমর্থন করেছিলেন। বিনোবাজীও নিজের মনে অনাগত দিনের সোনার স্বপ্ন দেখেন মাত্র। তাঁর মতে পৃথিবীর সব দেশের লোক যদি প্রথমে শান্তিসেনাজাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সাহায্যে আভ্যন্তরীণ সব সমস্যার সমাধান করতে শেখে, তবে ক্রমশঃ প্রতিরক্ষার জন্য আর সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন হবে না, কারণ অহিংস উপায়েই আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহেরও সমাধান হবে। বিনোবাজী একথা কখনও বলেন নি যে, বর্তমান অবস্থায় ভারতের পক্ষে সৈন্যবাহিনী তুলে দিয়ে অহিংসভাবে পাকিস্থান কিংবা চীনদেশের সম্ভাব্য আক্রমণ রোধ করবার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত।

শান্তিসেনার প্রসংগে লেখক প্রশ্ন তুলেছেন, শান্তিপ্রিয় স্বেচ্ছাসেবকদের বিনোবাজী 'সেনা' আখ্যা দিলেন কেন? আর নিজেই উত্তর দিয়েছেন, "তাঁর মধ্যে মহারাষ্ট্র-শোণিত প্রবাহিত। আজ মসিজীবী হলেও একদা তাঁরা অসিজীবীই ছিলেন। তাই শান্তির ক্ষেত্রেও তাঁরা 'সৈনিক' সংজ্ঞাটাই পছন্দ করেন বেশী।" এ ধরনের ব্যাখ্যার গুণাগুণ বিচার করবার প্রবৃত্তি সকলের হয় না। কিন্তু একথা লেখকের জানা উচিত ছিল যে, কেউ হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হলেই তাকে সৈন্য আখ্যা দেওয়া হয় না। সৈন্যের বিশেষ গুণ হচ্ছে যে, সে দেশকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত রাখবার জন্য আত্মবলি দিতে সর্বদা প্রস্তুত। সেরূপ দেশকে শোষণ ও আত্মকলহ থেকে মুক্ত রাখবার জন্য যাঁরা আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত হবেন, তাঁদের বলা হবে শান্তিসেনা।

শ্রীনরেন্দ্র দেব বলেছেন যে, সর্বোদয় আন্দোলন 'অতি মানবীয়'। তিনি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, সত্য, প্রেম ও মৈত্রীর বাণী যুগ-যুগান্তর ধ'রে পৃথিবীতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই সর্বোদয় আন্দোলনও ব্যর্থ হতে বাধ্য। একথা সত্য যে, ইতিহাসের আদিপর্ব থেকে দানবের দুর্জয় প্রতাপ দমনের উদ্দেশ্যে যুগে যুগে যে দেবতার মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে, তা কখনও সম্পূর্ণ সফল হয় নি। কিন্তু উন্মাদ ছাড়া কেউ প্রচার করবেন না যে, অসত্য, ঘৃণা ও কলহের মধ্যেই মানবজাতির ভবিষ্যৎ-মংগল নিহিত। সমস্যার কঠিনতায় বিচলিত হয়ে একমাত্র দুর্বলচরিত্র ব্যক্তিরাই আদর্শ পরিত্যাগ করে থাকে। আর যিনি মহান্, তিনি দৃপ্তকণ্ঠে এই অভয়-বাণীই ঘোষণা করেন, 'সত্য যে কঠিন, তাই কঠিনেরে ভালোবাসিলাম—সে কখনও করে না বঞ্চনা।' শ্রীনরেন্দ্র দেব বিনোবাজীকে উপহাস করেছেন, কারণ বিনোবাজী ভিক্ষাপাত্র নিয়ে এক জনপদ থেকে অন্য জনপদে ছুটে চলেছেন পদব্রজে। লেখকের মতে "দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে বিনোবাজীর পদযাত্রাটা এখন ব্যসনে দাঁড়িয়ে গেছে। ওঁর পদযাত্রা যদি আজ বন্ধ করে দেওয়া হয়, উনি নিঃসন্দেহে অসুস্থ হয়ে পড়বেন।" একথা ধ্রুব সত্য। অপর পক্ষে শ্রীনরেন্দ্র দেবের মত যাঁদের জীবন 'অচল অবরোধে আবদ্ধ' হয়ে আছে, তাঁরা হয়ত হাঁটতে চেষ্টা করলেই অসুস্থ হয়ে পড়বেন। বিশ্বমানবের প্রেমে উন্মত্ত বহু ভিক্ষুকই যুগ-যুগান্তর ধরে 'জনতার মাঝখানে' নেমে এসে পথকে সম্বল করেছেন—

"তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে জীর্ণ কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিঁধিয়াছে পদতলে
প্রত্যহের কুশাংকুর, করিয়াছে তারে অবিশ্বাস
মূঢ় বিজ্ঞজনে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস
অতিপরিচিত অবজ্ঞায়—গেছে সে করিয়া ক্ষমা
নীরবে করুণনেত্রে, অন্তরে বহিয়া নিরুপমা
সৌন্দর্য প্রতিমা।"

রঙ্গমল্লী

শ্রীসীতা দেবী

৩

গরমটা বেশ ভালভাবে জানান দিতেছে। পূর্ণিমার আজকাল রাস্তাঘাটে কষ্ট হয়। ট্রাম-বাসেও কষ্ট, হাঁটিতেও কষ্ট। অনেক দিনই সে কষ্ট সহ্য করিতেছে, কিন্তু শরীর তাহার সুকুমারই থাকিয়া গিয়াছে।

শনিবারে তাহাকে স্কুলে যাইতে হয় না, কিন্তু যে দু'টি মেয়েকে প্রাইভেট পড়ায়, তাহাদের কাজটা করিতে হয়। সকালের পড়ান সারিয়া যখন বাড়ীতে ফিরিবার জন্য সে পথে পদার্পণ করিল তখন রাস্তাঘাট প্রখর রৌদ্রে ভরিয়া উঠিয়াছে। কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে সে দ্রুতপদে পথ অতিক্রম করিতে লাগিল।

গলির মোড়ে আসিতে আসিতে মনে হইল যেন দীপককে দেখা যাইতেছে। একবার ভাবিল, একটু দাঁড়াইয়া যায়, হয়ত দেখা হইতে পারে। কিন্তু যা রোদ! মনে হয় যেন মাথার ভিতর অবধি ফোস্কা পড়িয়া যাইতেছে। আর দীপক তাহাকে দেখিতে পাইবে কি না কে জানে? পথে দাঁড়াইয়া ত ডাকাডাকি করা যায় না? তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া সে বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

সরমাও তখনই যেন কোথা হইতে বেড়াইয়া আসিল। এ পাড়ায় তাহার বন্ধুবান্ধব অনেক, সহ-পাঠিনীও অনেক। তাহাদেরই একজনের বাড়ী সে গিয়াছিল গল্প করিতে। দিদিকে দেখিয়া মহা উৎসাহে চীৎকার করিয়া উঠিল, "জান দিদি, কি মজা হয়েছে?"

দিদি বলিল, "কৈ না, কোন মজার কথা ত জানি না।"

সরমা বলিল, "আহা, শোনই না। আভারা আজ যাচ্ছে সিনেমা দেখতে। আগেই টিকিট কেনা হয়ে গেছে। আজ তিনটের 'শো'-তে। এর মধ্যে আভার বৌদি জ্বর ক'রে বসেছেন। ম্যালেরিয়া জ্বর ত? যার নাম ১০৪° ডিগ্রী। যেতে সে পারবেই না।"

পূর্ণিমা বলিল, "তা ত বুঝলাম, কিন্তু মজাটা এর মধ্যে কোন্‌খানে?"

সরমা বলিল, "বলছি ত। আভা ধরেছে আমাকে তার সঙ্গে যেতে ঐ টিকিটখানা নিয়ে। বলছে, গত জন্মদিনে সে আমাকে কিছু প্রেজেন্ট দেয় নি, এই নাকি প্রেজেন্ট্। আমি যাব ভাই। তুমিও চল না ভারি ত খরচ এক টাকা চার আনা। দিতে পারবে না? এই ত কাল মাইনে পেলে?"

পূর্ণিমা বলিল, "দিতে হয়ত পারি, যদিও দেওয়া মানেই একটা কিছু দরকারী জিনিষের বদলে দেওয়া। আমোদ-প্রমোদের জন্যে আধ পয়সাও ত খরচ করি না কখনও। সারাক্ষণ খালি ভাবছি, এটা করা উচিত হবে কি না। যাক্‌গে, একটা অনুচিত কাজই করি না-হয়। মানুষ-জন্ম আর হবে কি না কে জানে? অনুচিত কাজ-গুলোই বেশী ক'রে মনটাকে টানে যেন। উচিতের মধ্যে আজকাল আর বেশী রস পাই না।"

সরমা বলিল, "যাবে তা হ'লে? আচ্ছা তবে টাকাটা দাও, আমি একছুটে দিয়ে আসি আভাকে, সে টিকিটটা করিয়ে রাখবে।"

পূর্ণিমা হ্যাণ্ডব্যাগ হইতে পয়সা বাহির করিতে করিতে বলিল, "একসঙ্গে যদি না পায়? তা হ'লে ত আমাকে একলা বসতে হবে? যদিও তাতে আমার কিছু এসে যাবে না।"

সরমা বলিল, "আহা, তা কেন? কতগুলো টিকিট ওদের, মেয়েরাও যাচ্ছে, ছেলেরাও যাচ্ছে। যদি এক-সঙ্গে আর একটা টিকিট না পাওয়া যায়, ত ছেলেরা কেউ গিয়ে আলাদা বসবে।"

পূর্ণিমা পয়সা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিবামাত্র সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

পূর্ণিমা বাহিরে যাইবার কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া স্নান করিবার জোগাড় করিতে লাগিল। মা এই সময় রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া শুইবার ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। বলিলেন, "সরি আবার এই রোদে দৌড়ল কোথায়?"

পূর্ণিমা ব্যাপার খুলিয়া বলিল। মা বলিলেন, "আভাদের সঙ্গে যাবি? তা যা, মেয়েরা সবাই ত যাচ্ছে?"

পূর্ণিমা হাসিয়া বলিল, "মেয়েরা যাচ্ছে না ত কি আমরা ওদের ছেলেদের সঙ্গে চ'লে যাচ্ছি?"

মা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "আহা তাই কি বলছি নাকি? বড় কথা ধরিস তোরা। ওদের দু'টি ছেলে ত বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে। নানা জায়গায় মেয়ে দেখছে ওরা। পাছে লোকে এই নিয়ে কথা বলে, তাই ভাবছিলাম আর কি?"

পূর্ণিমা বলিল, "বলে বলুক। লোকের কথা শুনতে গেলে ত হাঁড়ির ভিতর ঢুকে ব'সে থাকতে হয়, বাইরের জগতে আর মুখ দেখাতে হয় না। জগৎটা যে কত বদলে গেছে মা, তা আমাদের দেশের অনেকেই জানে না। আজকাল মেয়েকেও যখন সমানে খেটে খেতে হচ্ছে পুরুষের সঙ্গে, তখন অত নবাব-বেগমের মত পরদার আড়ালে লুকিয়ে থাকবে কি ক'রে?"

মা অবশ্য অন্তঃপুরে মানুষ, এবং জীবনের প্রথম ভাগ পরদার আড়ালেই তাঁহার কাটিয়াছিল, কিন্তু এখন সে কথা ভাবিয়া লাভ কি? মেয়েকে যখন ছেলের কাজ করিতে হইতেছে, তখন ছেলের অধিকার সে না চাহিবে কেন? তাঁহার কাজ পড়িয়া ছিল, তিনি তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন।

সরমা ফিরিল, তাহার পর সকলে নাওয়া-খাওয়ায় মন দিল। দুপুরে ট্রামে করিয়া যাইতে হইলে, পূর্ণিমাদের আনন্দ অনেকখানিই কমিয়া যাইত, কিন্তু আভারা সকলে ট্যাক্সি করিয়া যাইতেছে, সেই সঙ্গে তাহাদেরও যাইতে বলিয়াছে, সুতরাং ভাবনা নাই। কোনমতে আভাদের বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিলেই হয়।

দুপুর আড়াইটের সময় যখন দুই মেয়ে চলিল সিনেমা দেখিতে তখন তাহাদের মা দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "ভগবান্ বাছাদের আমার গড়েছিলেন ভাগ্যবানের হাতে পড়বার মতন ক'রে, কিন্তু কি অদৃষ্টের ফের। শেষ অবধি কোন ভিখারীর ঘরে গিয়ে না ঢোকে। কিছুই করতে পারলাম না এদের জন্যে।"

পূর্ণিমা ও সরমা যথাকালে আভাদের বাড়ী পৌঁছিল এবং সেখান হইতে সদলে চলিল সিনেমাতে। দলটি মস্ত বড়; আভারা তিন বোন, তাহাদের দুই ভাই, এক ভগ্নীপতি এবং নিমন্ত্রিতা দুই সখী। ঠাণ্ডা সিনেমার হলে বসিয়া পূর্ণিমার যেন দেহটা জুড়াইয়া গেল।

তাহারা কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে আসিয়াছিল। তখনই ঘরের আলো নিভিল এবং ছবি সুরু হইল।

খুব চটকদার গল্প, অভিনয়ও হইতেছে ভাল। নায়ক-নায়িকার প্রেমাভিনয় বড় বেশী বাস্তব হইয়া উঠিতেছে। এতগুলি যুবকের সঙ্গে বসিয়া পূর্ণিমার কেমন যেন অসোয়াস্তি লাগিতে লাগিল। সিনেমা দেখা খুব বেশী তাহার অভ্যাস নাই।

হঠাৎ দেহে তাহার একটা মৃদু শিহরণ খেলিয়া গেল। ঐ চিত্রের নায়কের অবস্থায় দীপককে কল্পনা করা যায় কি? না, না, সে বড় মৃদু স্বভাবের, এত আবেগ, এত উচ্ছ্বাস তাহার মধ্যে কোথায়? আর পূর্ণিমা নিজে? সে কি এই রূপে ধরা দিতে পারে প্রণয়ীর বাহুবন্ধনে? কে জানে? মনটাকে সজোরে সে অন্য দিকে ফিরাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু খুব সহজে ফিরিল না।

ছবি দেখা শেষ হইল। হলে আলো জ্বলিয়া উঠিল। বাহির হইতে হইতে আভা পূর্ণিমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন লাগল ভাই, পূর্ণিমাদি?"

পূর্ণিমা বলিল, "ভালই ত।" একটু বিব্রত বোধ করিল। আভার একটি ভাই কান-খাড়া করিয়া তাহার কথা শুনিতেছে।

বাড়ী যখন ফিরিল, তখন রাস্তায় আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। দীপক নিশ্চয় বসিয়া বসিয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। যাক, কাল দেখা ত হইবেই। দীপকও মাঝে মাঝে অনুপস্থিত হয় ত? তাহাতে পূর্ণিমা ত রাগ করে না?

নিজের মনকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া সে কাপড়-চোপড় বদ্‌লাইয়া ফেলিল। একখানা হাত-পাখা লইয়া ছোট বারান্দাটাতে বসিয়া হাওয়া খাইতে লাগিল। মনের ভিতরটা যেন খচ্‌খচ্ করিতে লাগিল। সারাদিনটার ভিতর দীপকের সঙ্গে দেখাই হইল না তাহার। আচ্ছা, আভার ভাইয়েরা তাহাদের সঙ্গে ছিল বলিয়া দীপক কি অসন্তুষ্ট হইতে পারে? খুব সঙ্কীর্ণ-চিত্ত তাহাকে মনে হয় না, রাগারাগি সহজে করে না, কিন্তু তবু স্থির করিয়া কিছু বলা যায় না। মায়ের সম্বন্ধে ভয় তাহার একটা আছেই, যতই কেননা সেটা অস্বীকার করুক। তাহার মা'টি আবার বেশ একটু উগ্র প্রকৃতির, পাড়ায় ঝগড়াটী বলিয়া তাঁহার নাম আছে।

সুরবালা রান্নাঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া বসিলেন। মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কেমন লাগল ছবি?"

পূর্ণিমা একটু যেন নিরুৎসাহিত ভাবেই বলিল, "মন্দ নয়।"

মা বলিলেন, "আজকাল এই সব দেখেশুনে বড় এঁচড়ে পেকে যাচ্ছে ছেলেমেয়েগুলো। রণুকে কোথাও যেতে দিই না, তবু ইস্কুলের ছেলেদের কাছে কত কি ছাইভস্ম শিখে আসে।"

পূর্ণিমা বলিল, "কি আর করবে মা? সংসারে

থাকতে গেলে অত কি ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলা যায়? কত রকম লোকের সঙ্গে মিশতে হবে, কত জায়গায় যেতে হবে। তার মধ্যেও যারা ভাল থাকে, ভদ্র থাকে, তারাই সত্যিকারের ভাল। যার কোনদিন কোন পরীক্ষাই হ'ল না, সে ভাল কি মন্দ তা ত বোঝাই যায় না।"

তাহার মা বলিলেন, "তোমরা যে আজকাল কি সব কথা বল, অর্দ্ধেক কথার মানে হয় না। আমরা ত বুঝি বাপু ছেলেপিলেকে মন্দ সংসর্গ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়।"

পূর্ণিমা বলিল, "বাঁচান যদি যেত তা হ'লে কিছু বলবার ছিল না। কিন্তু কি ক'রে পারবে মা? যাক্‌গে ওসব কথা। তুমি নিজে আছ কেমন? সন্ধ্যায় একবার করে টেম্পারেচার দেখতে বলেছিলাম, তা কি একদিনও দেখ?"

তাহার মা বলিলেন, "না বাছা, অত আমার সময় কোথায়? এমনিতে তেমন কিছু ত খারাপ বোধ করি না।"

পূর্ণিমা বলিল, "কত আর ওতে সময় লাগবে মা? এক মিনিটের ত ব্যাপার। দেখলেই ভাল হ'ত।"

রাত্রির অনেকটাই তাহার জাগিয়া কাটিয়া গেল। মাথাটা তাহার বড়ই উত্তেজিত ছিল, স্বপ্নও দেখিল অনেক বেশী। কি যে দেখিল তাহা সকালে তেমন মনে রাখিতে পারিল না। নিজের বিবাহ যেন দেখিয়াছিল, কিন্তু বরের মুখ মনে আনিতে পারিল না।

রবিবার দিনটা তাহার একমাত্র পরিপূর্ণ ছুটির দিন। নিজের ও ভাইবোনের যত শেলাইয়ের কাজ সে এই দিনে সারে। সারা সপ্তাহের জমা করা ক্লান্তি দূর করিবার জন্য দুপুরে একটু ঘুমাইয়াও লয়।

বিকালে চা খাইয়া ভাবিল, আজ একটু সকাল সকালই বাহির হওয়া যাক্। কাজ যাহা ছিল তাহা ত শেষই করিয়া রাখিয়াছে। এখনও একটু রোদ আছে, আস্তে আস্তে হাঁটিলে সেটুকুরও তেজ কমিয়া যাইবে। দীপক আজ তাড়াতাড়িই আসিবে বোধ হয়, কাল দেখাই হয় নাই। পূর্ণিমার চেয়ে এই দৈনন্দিন দেখা করাটাকে দীপকই যেন মূল্য দেয় বেশী।

দীপক আসিয়া ঠিকই বসিয়া ছিল। পূর্ণিমাকে দেখিয়াই বলিল, "খুব সিনেমা দেখা হচ্ছে আজকাল, না?"

পূর্ণিমা বসিয়া বলিল, "দু'বছরে একবার গেলে যদি 'দেখা হচ্ছে' বলা চলে, তবে দেখা হচ্ছে। কেন, তোমার বুঝি খুব রাগ হয়েছে?"

দীপক বলিল, "না, খুব রাগ হয় নি। তবে গেলে যদি ত আমাকে জানিয়ে গেলেই ত পারতে? আমি তা হ'লে আর এখানে এক ঘণ্টা শুধু শুধু ব'সে থাকতাম না। এবং চেষ্টা করলে আমিও হয়ত ঐ সময় ঐ সিনেমাটাতে যেতে পারতাম।"

পূর্ণিমা অনুতপ্ত হইয়া বলিল, "সত্যি দীপক, তোমাকে জানানই উচিত ছিল। কিন্তু এমন হট্ ক'রে সব ঠিক হ'ল যে, কিছু জানাবার সময়ই পেলাম না। আর জানাতাম কি ক'রে বা বল? তোমার বাড়ীতে চিঠি পাঠালে ত গণ্ডগোল বেধে যেত, এবং তোমাকে যে বাড়ীতে পেত তারই বা ঠিকানা কি? তাই আর সে চেষ্টা করি নি। আর এখানে এসে ব'সে ছিলে, তাতে আর দুঃখ কি? খানিকটা বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা হয়ে গেল।"

দীপক বলিল, "তা অবশ্য। তা ছবিটা দেখলে কেমন?"

পূর্ণিমা বলিল, "ভালই। তবে আমার ত সিনেমায় যাওয়া বিশেষ অভ্যাস নেই, থেকে থেকে একটু অসোয়াস্তি লাগে।"

দীপক বলিল, "তুমি ত খুব উদারনৈতিক এ সব বিষয়ে। তোমারও অসোয়াস্তি লাগে?"

পূর্ণিমা একবার বঙ্কিম কটাক্ষপাত করিল দীপকের দিকে, বলিল, "উদারনৈতিক ব'লেই লাগে বোধ হয়।"

দীপক তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরাইয়া দিল, বলিল, "তোমার মা এখন আছেন কেমন? আর ত জ্বরটর হয় নি?"

পূর্ণিমা বলিল, "হয়েছে কি না তা জানব বা কেমন ক'রে? দেখতে ত দেবেন না, এবং একেবারে যতক্ষণ না গড়িয়ে পড়বেন, ততক্ষণ শোবেনও না।"

দীপক বলিল, "গোটা দুই বছর হঠাৎ যদি এগিয়ে যেত তা হ'লে ভাল হ'ত।"

পূর্ণিমা বলিল, "কোন্ দিকে ভাল? এক ত আমরা আরো খানিকটা এগোতাম বার্দ্ধক্যের দিকে। দ্বিতীয়, অনশনক্লিষ্ট দেহগুলোর রোগবালাই জুটে যাওয়াও অসম্ভব হ'ত না।"

দীপক বলিল, "ও ত গেল খারাপের দিক্‌টা। তুমি বড় pessimistic পূর্ণিমা। ভালর দিকে, সরমা ততদিন বি-এ পাস করে যাবে। রণেনও আই-এ পাস করবে

া করবার মুখে থাকবে। আর আমার বাড়ীতেও একটি বোনের দায় থেকে মুক্ত হতে পারি, মা খুব জোর চেষ্টা করছেন। আমার উপর ত কোনো আশা রাখেন না, এবার তাঁর গুরুদেবকে ধ'রে পড়েছেন।"

পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করিল, "পাত্র কাউকে পাওয়া গেছে নাকি?"

দীপক বলিল, "গুরুঠাকুর ত একজনকে খাড়া করেছেন। মায়ের আপত্তি নেই, কারণ দিতে-থুতে কিছু হবে না, দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ে। কিন্তু বড়কী মহা কান্না জুড়েছে, সে ওরকম বিয়ে চায় না। অবস্থা বোঝে না এই সব গণ্ডমূর্খ মেয়েরা।"

পূর্ণিমা বলিল, "অবস্থা বুঝলেই কি আর মানুষের সাধ কিছু থাকে না? অনাহারে যে মরে সে হয়ত দায়ে প'ড়ে ঘাস-পাতা খায়, তাই ব'লে ভাত খাবার জন্যে কি মন কাঁদে না?"

দীপক বলিল, "তুমি ক্রমে ক্রমে বড় বামপন্থী হয়ে পড়ছ পূর্ণিমা। কোনদিন হয়ত দেখব, পার্কে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেছ।"

পূর্ণিমা হাসিয়া বলিল, "তুমি তা হ'লে ত লেকের জলে ডুবেই যাবে বোধ হয়?"

দীপক একটু যেন বিরক্ত হইয়া বলিল, "তুমি আমাকে খুব গোঁড়া আর সেকেলে মনে কর,—না?"

পূর্ণিমা বলিল, "গোঁড়া একটু আছ ত। সেকেলে খুব নয় অবশ্য, তা হ'লে কি আর এসে আমার সঙ্গে ভাব করতে?"

দীপক বলিল, "তোমার একদিকে একটু সুবিধা আছে, যা আমার নেই। তোমার সংসারের সকলে তোমার ঘাড়ে চ'ড়ে আছে বটে, কিন্তু তারা তোমার মতামতকে সম্মান ক'রে চলে। আমার সংসারটির সে সব আপদ্ বালাই নেই। তাঁদের মনোভাব হচ্ছে, 'তোরই শিল তোরই নোড়া, তোরই ভাঙি দাঁতের গোড়া।' আমি পুরুষ মানুষ ব'লেই বোধ হয়। ছেলে য, সে বাধ্য সংসারের ভার নিতে। মেয়ে যদি নেয়, সেটা তার অনুগ্রহ।"

পূর্ণিমা বলিল, "তোমার কথাটার মধ্যে সত্য যে একেবারে নেই তা নয়। কিন্তু থাক সে কথা। ভগবান্ র অদৃষ্টে যা লিখেছেন। সম্প্রতি দু' বৎসরের মধ্যে ার কি ঘটবে কি না ঘটবে জানি না, তবে একটা নিষ ঘটবে। আমি ষ্টেনোগ্রাফিটা পাস করব, আর ' ছিঁচকে ইস্কুল-মাষ্টারীর দায় এড়িয়ে একটা ভাল রি পাব। হয়ত একটু মানুষের মত থাকতে পারব, হয়ত মাকে হাড়ভাঙা খাটুনির থেকে একটু নিষ্কৃতি দিতে পারব।"

দীপক একটুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "দেখ পূর্ণিমা, একটা কথা বলি তোমাকে। হয়ত সত্যিই আমাকে আরো গোঁড়া আর সেকেলে ভাববে, তবু বলছি। তোমার এই যে ষ্টেনোগ্রাফার বা সেক্রেটারি হবার প্ল্যান্, এটা আমার একেবারেই ভাল লাগে না, মনে বড় একটা অশান্তি জাগে।"

পূর্ণিমা বলিল, "কেন শুনি?"

দীপক বলিল, "এতদিনও অবশ্য তুমি বাড়ী ব'সে থাক নি, চাকরি করেছ, প্রাইভেট ট্যুশনি করেছ। কিন্তু সে পাড়ার মধ্যে মেয়েদের ইস্কুলে কাজ, পড়িয়েছ যাদের তারাও মেয়ে। এ তবু চলছিল একরকম। কিন্তু এর পর যদি ষ্টেনোগ্রাফারের কাজ করতে হয়, তাহ'লে ত বিপদ্। হাজারটা অসভ্য পুরুষ মানুষের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি ক'রে রোজ দুবেলা তোমাকে ট্রামে বাসে উঠতে হবে। ঘণ্টা সাতেক ব'সে থাকতে হবে অগুনতি লোলুপ দৃষ্টির সামনে। পারবে তুমি? মান-সম্ভ্রম বজায় রেখে এ ক্ষেত্রে চলাই যেন অসম্ভব মনে হয়।"

উত্তেজনায় পূর্ণিমার মুখটা লাল হইয়া উঠিল, বলিল, "একথা বলছ তুমি কি ক'রে দীপক? হারেমের বিবি হয়ে ব'সে থাকবার মত কি আমার অদৃষ্ট? বাবা ম'রে ত আমাদের অকূলে ভাসিয়ে গেছেন। তবু হাড় শক্ত ছিল ব'লে, না খেয়ে শুকিয়েও এখন বেঁচে আছি, ভাই বোন দুটোকেও বাঁচিয়ে রেখেছি। কবে যে তোমার সংসারী হবার মত অবস্থা হবে, তা জানি না। কি রকম সংসার যে সেটা হবে, তাও যে খুব বুঝি তা নয়। এ ক্ষেত্রে নিজে প্রাণপণে খেটে যে আমি অবস্থার উন্নতি করতে চাইছি, কোথায় তুমি তাতে উৎসাহ দেবে, না এই কথা? মান সম্ভ্রম নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাব? মান সম্ভ্রম বলতে বোঝই বা কি তুমি? ভিড়ের মধ্যে লোকের গায়ে ছোঁওয়া লাগবে, না হয় দুটো বাজে কথা কানে যাবে। এতেই আমি বয়ে যাব? ভদ্রসমাজে আর আমার স্থান হবে না? এত মেয়ে যে খেটে খাচ্ছে এখন, তারা সবাই বয়ে গেছে? তাদের আর মা-বাপের ঘরে স্থান নেই? বিবাহিতা মেয়েও ত কত শত কাজ করছে, তাদের স্বামীরা গলায় দড়ি না দিয়ে আছে কি ক'রে?"

দীপক ব্যস্ত হইয়া বলিল, "রাগ ক'রো না, রাগ ক'রো না, দোহাই তোমার।' একে ত যা সুখে আছি, তার উপর তোমার সঙ্গে ঝগড়া বাধাতে চাই না। অতদূর অবধি ভেবে কি বলেছি? আমার অপদার্থতার

জন্তেই যে তোমাকে এই অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে তা কি জানি না? আমি যদি একটা সুখের সংসার তোমায় offer করতে পারতাম, তা হ'লে কি আর তুমি এই সবের মধ্যে যেতে? কিন্তু যতই অক্ষম হই, তোমার গায়ে অপমানের আঁচ লাগছে, ভাবতে আমার বুক ভেঙে যায়।"

পূর্ণিমা যেমন হঠাৎ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তেমনই এক মুহূর্তে নিভিয়াও গেল। দীপকের ম্লান মুখ দেখিয়া তাহার মায়াও হইল। বৃথা ইহাকে কথা শোনান। যে মানুষ যেমন হইয়া জন্মিয়াছে। দীপকের কথা শেষ হইতেই সে বলিল, "সত্যিকারের অপমান থেকে আমি নিজেকে রক্ষা করতে জানি দীপক, তুমি ভয় পেয়ো না।"

দীপক বলিল, "ভয় না পেয়ে কি করি বল ত? যা সব গল্প শুনি! তুমি সুন্দরী মেয়ে, বয়স তোমার খুবই কম, তুমি চোখে পড়বে সকলেরই। পুরুষজাতিটিকে তুমি চেন নি এখনও ভাল ক'রে। তারা ওঁৎ পেতে থাকে হিংস্র জানোয়ারের মত।"

পূর্ণিমা চেষ্টা করিয়া হাসিয়া বলিল, "যাঃ, ভয় তুমি আমাকে পাওয়াবেই। আজ যাই, রাস্তায় আলো জ্ব'লে গেছে অনেকক্ষণ হ'ল। আচ্ছা, আজ অনেক তর্কাতর্কি হ'ল কিছু মনে ক'রো না।"

দীপক পূর্ণিমার হাতটা আলগোছে একবার ধরিয়া তখনই ছাড়িয়া দিল। চারিদিকে বড় মানুষের ভিড়। পূর্ণিমা এইবার নিজের বাড়ীর পথ ধরিল।

৪

সরমার কলেজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মাস দুইয়ের মত সে এখন নিশ্চিন্ত। সে কলেজ হইতে আসিয়াই লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল, "বাবাঃ এ দু'মাসের মধ্যে আমি আর সকালে উঠছি না। আটটা বাজবে তবে আমি উঠব।"

রণেন বলিল, "কি যে সব অদ্ভুত নিয়ম। স্কুলের চেয়ে ত কলেজের পড়া ঢের বেশী, অথচ কলেজেই গাদা-গাদা ছুটি, আর আমাদের বেলায় অষ্টরম্ভা।"

তাহার মন্তব্যের কোন উত্তর দিল না দিদিরা। পূর্ণিমা ছোট বোনকে বলিল, "শুধু ঘুমোবার জন্তেই ছুটিটা হয়েছে,—না? পড়াশুনো করতে হবে না? আর ক'মাস আছে বা final দিতে। ফেল-টেল করা আমাদের অবস্থার লোকের চলে না।"

সরমা বলিল, "আরে বাবা, চব্বিশ ঘণ্টাই ঘুমোব এমন কথা ত বলি নি। পড়াও করব, মায়ের সঙ্গে সঙ্গে এবার রান্নাও করব। ওটা না শিখলে কি আর চলে? মায়ের জন্তে একটু তালমিছরি আন না দিদি, বড় কাসেন থেকে থেকে।"

পূর্ণিমা বলিল, "আচ্ছা, আনছি, আমি বেরোচ্ছিলামই সাবান আনতে, ওটাও সেই সঙ্গে নিয়ে আসছি। মা ত আমাকে কিছুই বলতে চান না।"

সরমা বলিল, "অসুখ শুনলেই তুমি জ্বর দেখতে চাও, ডাক্তার ডাকতে চাও, তাই বলেন না বোধহয়।"

পূর্ণিমা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিল। সামান্ততম জিনিষও তাহারা পারিলে নিজেরাই কেনে। ঐক সকালের বাজারটা করিবার অবসর পায় না। এখানেই ঠিকা ঝিয়ের সুযোগ। যাহা দুই-চারি পয়সা পারে সরাইয়া রাখে। তবে মা খুব হিসাবী মানুষ, খুব সুবিধা ঝিয়ের হয় না।

বাড়ীর সবচেয়ে কাছে যে দোকানটা সেইখানে ঢুকিয়া সে সাবান কিনিতে লাগিল। হঠাৎ পিছন হইতে দীপক বলিল, "কি কিনছ পূর্ণিমা?"

পূর্ণিমা পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া বলিল, "সাবান আর তালমিছরি কিনব ব'লে বেরিয়েছি। তুমি কি মনে ক'রে?"

দীপক বলিল, "শুনে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে যে আমি face powder কিনতে এসেছি।"

পূর্ণিমা বলিল, "ওমা, সে কি? তুমি কি করবে ও জিনিস নিয়ে?"

দীপক বলিল, "নিজের জন্তে নয়, বড়কীকে আজ দেখতে আসছে, কাজেই চুণকাম একটু করতেই হবে। মায়ের ফরমাশ।"

সেল্‌স্‌ম্যান এই সময় কাগজে মুড়িয়া পূর্ণিমাকে তাহার ক্রীত সাবান দিয়া গেল। দীপকের জিনিষ যতক্ষণ না কেনা হইল, ততক্ষণ পূর্ণিমা অপেক্ষা করিল, তার পর দু'জনে এক সঙ্গে বাহির হইল। দীপক জিজ্ঞাসা করিল, "তালমিছরি কিনছ কেন? কাসি হয়েছে নাকি এই প্রচণ্ড গরমে?"

পূর্ণিমা বলিল, "আমার হয় নি, মায়ের হয়েছে। আচ্ছা, বড়কী তবে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে ওখানে?"

দীপক বলিল, "রাজী না হয়ে আর করে কি? যা বকুনি শুনছে উদয়াস্ত। মা অবশ্য অন্যায় কথা কিছু বলছেন না। বড়কী ছুটকীকে রোজগার ক'রে খাবার মত কোন ট্রেনিং দেওয়া হয় নি। মা বলছেন, তিনি মারা যাবার পর ওরা কোথায় থাকবে, কি খাবে? আমি

যদি তাদের ভার আর না বইতে চাই? আইনতঃ বাধ্য ত নই আমি?"

পূর্ণিমা হাসিয়া বলিল, "তোমার মনের আইনই যে বাধ্য করবে তোমায় দীপক। ওদের ভার কাঁধের থেকে তুমি ফেলে দিচ্ছ এ আমি কল্পনাই করতে পারি না। চল, ফেরা যাক, বড় রোদ।"

রাস্তায় বাহির হইয়া দীপক বলিল, "ওদের ভার আমি যদি কাঁধ থেকে ফেলে দিই, তাতে কি তুমি খুশী হও?"

পূর্ণিমা বলিল, "দূর, তা কেন? ওদের দেখতে হবে বৈকি তোমায়। আমার মত স্বাধীন জেনানা ক'রে তাদের তৈরি ত কর নি?"

"আমি ত মালিক নই তৈরি করার, আমি আছি শুধু ভূতের বোঝা বইতে। আচ্ছা চলি, নেমন্তন্ন না পেলে রাগ ক'রো না। দু'চারজন আত্মীয়স্বজন ছাড়া কাউকেই আমরা বলতে পারব না।"

দীপক চলিয়া গেল, পূর্ণিমাও যথাসাধ্য দ্রুতপদে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। সরমা তখনও খাটে পা ছড়াইয়া শুইয়া আছে। তাহার পাশে বসিয়া পূর্ণিমা বলিল, "জানিস, দীপকের বোন বড়কীর বিয়ে হচ্ছে এক দোজবরের সঙ্গে।"

সরমা বলিল, "জানি ত। ঐ ত লিলিরা থাকে ওদের পাশের বাড়ী, ছাদে উঠলেই গল্প করা যায়, ওরা শুনেছে। কলেজে আমায় বলছিল লিলি। বড়কী নাকি কেঁদে-কেটে হাট বসিয়েছে। বরের অনেক ছেলেপিলে, সব বড় বড়। তার টাক প'ড়ে গেছে মাথায়, মস্ত বড় ভুঁড়িওয়ালা লোক। তা বড়কীর মা তাকে মেরেধ'রে রাজী করেছে। আমি ভেবেছিলাম তুমি জান বুঝি, তাই তোমায় বলি নি। আচ্ছা ভাই, এই রকম বিয়ে করা যায়? বিয়েটা মেয়েদের জীবনের সব চেয়ে আনন্দের জিনিষ না?"

পূর্ণিমা বলিল, "ভাবতে ত তাই ইচ্ছে করে, কিন্তু ক'টা মেয়ে বা আনন্দ করতে পায়, আমাদের দেশে? হয় বিয়ের আগে ঠ্যাঙানি খায়, নয় পরে বরের হাতে ঠ্যাঙানি খায়, এই ত অধিকাংশের জীবন।"

সরমা বলিল, "রক্ষে কর, এর চেয়ে সাতজন্মে বিয়ে না করা ভাল।"

পূর্ণিমা হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল। সরমার বয়স হইয়াছে আঠার বৎসর, কিন্তু মনটা বড়ই কাঁচা আছে। বিবাহ লইয়া তাহার সঙ্গে বেশী আলোচনা চলে না। সরমাকে কিছু বলিল না বটে, তবে মনের মধ্যে কথা-গুলো ঘুরপাক খাইতে লাগিল। বাস্তবিক, এ রকম বিবাহ কোন প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে করে কি করিয়া? অতি অবাঞ্ছিত, একেবারে অপরিচিত একটা মানুষের কাছে দেহ মন প্রাণ সব সমর্পণ করা? পূর্ণিমার শরীরটা যেন গুলাইয়া উঠিল। কিন্তু ভারতবর্ষে এটাকে কেহই অস্বাভাবিক বা বীভৎস ভাবে না কেন? পূর্ণিমার মনোজগৎটা অন্য রকম, সে এভাবে চিন্তা করিতে পারে না। একমাত্র প্রাণপ্লাবী ভালবাসার খাতিরে এমন করিয়া আত্মদান করা যায়। কিন্তু ক'জন মেয়ে এই ভাবে ভালবাসিতে পারে? ক'জনই বা এমন ভালবাসা পায়? সত্যকার ভালবাসা কাহাকে বলে? চিনিবার উপায় কি? তাহার জীবনে যাহাকে সে ভালবাসা বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, তাহা কি এই প্রাণপ্লাবী প্রেম? কোন্ কষ্টি-পাথরে ঘষিলে বুঝা যাইবে ইহা খাঁটি সোনা কি না? পরীক্ষা না হইলে সত্য মিথ্যা বুঝা ত যায় না?

সরমা হঠাৎ বলিল, "দিদি, কি এত হাঁ ক'রে ভাবছ?"

দিদি বলিল, "এই বড়কীর বিয়ের কথা ভাবছিলাম। বেচারীর কি কপাল দেখ ত? দেখতে সুন্দর হওয়া না হওয়া ত ভগবানের হাত। আর মা-বাবা যদি লেখা-পড়া না শেখায়, সেটাও তার নিজের দোষ নয়। অথচ সব শাস্তিটাই পাবে সে। আশ্চর্য্য, তাকে যে এ রকম ক'রে বলি দেওয়া হচ্ছে তার জন্যে মা বা ভাইয়ের কোন লজ্জা নেই।"

সরমা গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা, দীপকদা ত' আধুনিক যুগের মানুষ, সেও এতে সায় দিচ্ছে?"

পূর্ণিমা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "সায় দিচ্ছে কি না জানি না, তবে মায়ের কাজের কোনই প্রতিবাদ করছে না।"

সরমা বলিল, "ভারী স্বার্থপর ত। তুমি ভাই যে ঐ পরিবারে কি ক'রে বিয়ে করছ জানি না। একেবারে hopeless রকম পাড়াগেঁয়ে। বুড়ী ত সারাদিন গামছা প'রে কাটিয়ে দেয়, জল ঢেলে ঢেলে হাতে-পায়ে হাজা ধরিয়ে ব'সে আছে।"

পূর্ণিমা বলিল, "যা সাংসারিক অবস্থা, বিয়ে যে কবে ও করতে পারবে জানি না। বাপের সংসারের ভারেই ডুবে মরতে বসেছে, তা নিজে সংসার করবে কি? ও সবই শেষ পর্য্যন্ত স্বপ্নই না হয়ে দাঁড়ায়।"

সরমা বলিল, "শুধু ও কেন, তুমিই বা কি ক'রে ঘাড় থেকে বোঝা নামাবে শুনি? আমরাও ত তোমার উপর চেপে ব'সে আছি। আমার ত এখনও দু' বছরের বেশী

দেরি বি-এ পাস করতে। তখন যদি একটু হাল্কা হতে পার। কিন্তু আমার তাই ভাল লাগে না। বেশ young থাকতে থাকতে, সুন্দর থাকতে থাকতে বিয়েটা হয়ে গেলে ভাল না? কেমন চমৎকার দেখায়? না আমাদের কলেজের চিন্ময়ীদির মত টাক-পড়া মাথায় সিঁদুর প'রে বাহার দিয়ে বেড়ান ভাল?"

পূর্ণিমা বলিল, "যা ভাল লাগে, সুন্দর লাগে, তাই কি সব সময় হয়? বেশীর ভাগ সময়ই হয় না। দেখবি, তোর দিদিও কোনদিন আগাগোড়া শাদা মাথায় সিঁদুর পরে শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে।"

সরমা বলিল, "দূর, কি যে বাজে বক। এমন সুন্দর দেখতে তুমি, কত ভাল মেয়ে, কাজের মেয়ে। তুমি কেন old maid হয়ে ব'সে থাকতে যাবে? দীপকদার বিয়ে করবার ক্ষমতা না থাকে, সে পথ দেখুক না?"

পূর্ণিমা তাড়া দিয়া বলিল, "যাঃ, কি বাজে বকিস? ঐ নাও, কে আবার এখন দরজা ঠ্যাঙাতে বসল?

সরমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। একজন দশ-বারো বৎসরের ছেলে দাঁড়াইয়া আছে, হাতে ছোট করিয়া ভাঁজ-করা একখানা কাগজ। সরমাকে দেখিয়া, কাগজটা তাহার হাতে দিয়া বলিল, "এই চিঠিটা দীপুদা, পূর্ণিমাদিকে দিতে বলল," বলিয়া একছুটে পলায়ন করিল।

সরমা মুখভঙ্গি করিয়া চিঠিখানা লইয়া দিদির কাছে চলিল। তাহার মায়ের মত সরমারও দীপককে পছন্দ নয়। অন্ততঃ দিদির স্বামী হিসাবে। কি একটা মিন্‌মিনে ছেলে। দিদির যে কি কারণে এই ব্যক্তিকে এত পছন্দ, সরমা তাহা ভাবিয়াই পায় না।

পূর্ণিমা চিঠি খুলিয়া পড়িয়া দেখিল। ছোট চিঠি।

পূর্ণিমা,

আজ সন্ধ্যাবেলা পার্কে যেতে পারব না। তখন তাড়াতাড়িতে বলতে ভুলে গেলাম। বড়কীকে যাঁরা দেখতে আসবেন, তাঁরা কতক্ষণে বিদায় হবেন জানি না। একেবারে রাত হয়ে গেলে আর যাব না। কিছু মনে ক'রো না। কাল সব কথা হবে।

দীপক।

পূর্ণিমা চিঠিখানা নিজের হ্যাণ্ডব্যাগে ঢুকাইয়া রাখিয়া দিল। বলিল, "যাক্, একটা দিন বাড়ীতেই থাকি না-হয়। রান্নাটা এবেলা আমিই করি গে। মা ত কাসছেন বলদি, তাঁকে একটা বেলা অন্ততঃ ছুটি দিই।"

সরমাও উঠিয়া বসিল, বলিল, "চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই।"

দুই বোনে গিয়া প্রচুর বকাবকি করিয়া মাকে রান্নাঘর হইতে বাহির করিয়া নিজেরা তাঁহার স্থান দখল করিয়া বসিল।

পরদিন ইস্কুল হইতে ফিরিয়া পূর্ণিমা বলিল, "যাক, আজ খবর পেলাম, আমার পরীক্ষাটা দু'তিন দিনের মধ্যেই হয়ে যাচ্ছে। তা হ'লে সারা ছুটিটা চেষ্টা ক'রে কাজ আমি একটা জুটিয়ে নেব। এবং রাঁধুনি একটা রাখবই আমি তার পরে। মাকে আর দুবেলা আগুন-তাতে বসে থাকতে দিচ্ছি না।"

সরমা বলিল, "পাস ঠিক করবে দিদি?"

পূর্ণিমা বলিল, "ক্লাশের মধ্যে আমি সবচেয়ে ভাল মেয়ে। আমিই পাস করব না?"

সরমা বলিল, "তা হলে ত পাস করবেই। বাবা রে, কবে যে আমার সব পরীক্ষা শেষ হবে! আমি বাপু তোমার মত ভাল মেয়ে নয়, আমার পড়া-টড়া ভাল লাগে না।"

পূর্ণিমা বলিল, "তবে কি বড়কীদের মত হয়ে থাকতে ইচ্ছে করে?"

সরমা বলিল, "তাও নয়। কোন চেষ্টা না ক'রেই যদি বেশ আরামে আর সচ্ছলভাবে থাকা যেত ত বেশ হ'ত।"

পূর্ণিমা বলিল, "অত সুখ ভগবান্ যাদের দেন, তারা সংখ্যায় অতি মুষ্টিমেয়। এবং আমরা একেবারেই সে দলের নই।"

আজ একটু দেরি করিয়াই পূর্ণিমা বাহির হইল। এত গরমে রোদ না পড়া পর্য্যন্ত কিছুতেই তাহার ইচ্ছা করিল না বাহিরে যাইতে। দীপক কাল আসে নাই, তাই আজ সে সকাল সকাল আসিয়া বসিয়া আছে। পূর্ণিমাকে দেখিয়া বলিল, "কাল আসতে পারি নি ব'লে আশা করি রাগ কর নি।"

পূর্ণিমা বলিল, "তোমারও মাঝে মাঝে আসা হয় না, আমারও হয় না, এই নিয়ে ক্রমাগত রাগ করতে থাকলে ত আর কিছু করবার সময়ই পাওয়া যাবে না। তার পর, তোমাদের কনে দেখার পর্ব্ব চুকল কখন?"

দীপক বলিল, "তা সন্ধ্যার পর অবধি ব'সে ছিল সব।"

পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করিল, "অতক্ষণ ধ'রে কি কথা হ'ল? বড়কীকে পছন্দ হ'ল তাদের?"

দীপক বলিল, "না পছন্দ হবে কেন? স্ত্রী বলতে ওরা ত বোঝে সামান্য একটু উঁচুদরের ঝি, সে হিসেবে বড়কী মন্দ কি? কাজকর্ম্ম করতে পারে।"

পূর্ণিমা বলিল, "জেনে-শুনে এইরকম বিয়ে দিচ্ছ বোনের ?"

দীপক বলিল, "আমি ত বলেইছি, আমি কিছু দেবার বা করবার মালিক নয়। মায়ের মেয়ে, তাঁর যা খুশি করুন।"

পূর্ণিমা বলিল, "কে এসেছিল দেখতে ?"

দীপক বলিল, "বর স্বয়ং, এবং তাঁর এক কাকা।"

পূর্ণিমা বলিল, "বড়কী তা হ'লে বরকে দেখেছে ?"

দীপক বলিল, "দেখল ত।"

তাহার কণ্ঠে কোথাও উৎসাহের লেশ নাই। পূর্ণিমা কথাটা ঘুরাইয়া অন্য কথা পাড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ছাত্রের দল কি তোমায় গ্রীষ্মের ছুটি দেবেন, না সমানে প'ড়েই চলবেন ?"

দীপক বলিল, "পড়লেই ভাল আমার পক্ষে। যদি ছুটি চাই তা হ'লেই ত মাইনে নিয়ে টানাটানি করবে ? বসিয়ে বসিয়ে প্রাইভেট ট্যুটরকে কেউ টাকা দিতে চায় না, অথচ গরমের ছুটিতেও সমানেই খেতে-পরতে হয়।"

পূর্ণিমা বলিল, "ইস্কুলটা এ হিসাবে ভাল বাপু। মাইনে বেশী দেয় না, কিন্তু ছুটিতে মাইনে বন্ধ করে না।"

দীপক বলিল, "ইস্কুল ত ভাল অনেক দিকেই, তা তোমার যে পছন্দ নয়। তোমার পরীক্ষা হচ্ছে কবে ?"

পূর্ণিমা সংক্ষেপে বলিল, "এই হপ্তায়ই।"

দীপক কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পরে বলিল, "বড়কীকে যারা দেখতে এসেছিল, তাদের বাড়ী একটি ভাল ছেলে আছে। সুন্দর মেয়ে, বড় বংশের মেয়ে হলে তারা বিনা পণে নিতে রাজী আছে। ওদের ঘরটা একটু নীচু।"

পূর্ণিমা বলিল, "কার জন্যে পাত্র দেখছ ? আমার জন্যে নাকি ?"

দীপক ঠোঁটটা একটু বাঁকাইয়া হাসিল। বলিল, "তাই দেখাই আমার উচিত বটে, তবে এখনও ত প্রাণ ধ'রে পারছি না। আমি ভাবছিলাম সরমার কথা। দেখতে ত বেশ ভালই, অবশ্য তোমার মত নয়।"

পূর্ণিমা বলিল, "হ'ল কি দীপক ? তুমিও compliment দিচ্ছ ? যা হোক, ধন্যবাদ। তবে সরমার এখনই বিয়ে দেবার কোন কথাই ওঠে না। বয়সও কম, মনও অত্যন্ত কাঁচা। বিয়ে যে কাকে বলে তাই ভাল ক'রে বোঝে না।"

দীপক বলিল, "এ আবার তোমার বেশী বাড়াবাড়ি পূর্ণিমা। আমাদের দেশে মেয়ের আঠার বছর বয়স ত যথেষ্ট বয়স, প্রায় অরক্ষণীয়া। আর যত কাঁচা বড়রা ছোটদের ভাবে, সত্যিই তারা তত কাঁচা নয়। বাড়ীতেই তার অনেক পরিচয় পাই।"

পূর্ণিমা বলিল, "তা পাও গিয়ে। মোটকথা সরমার বিয়ের কথা আমরা এখন কেউই ভাবছি না। আজকালকার দিনে গোমুখ্যু হয়ে বিয়ে করা কিছু নয়, বড় বেশী risk নেওয়া হয় ওতে। বি-এটা অন্ততঃ পাস ত করুক। তার পর যদি বিয়ে করতে চায়, এবং বর ওর পছন্দ হয়, তখন ভাবা যাবে।"

দীপক বলিল, "ওর বিয়ে হয়ে গেলে তোমার বোঝা একটু হাল্‌কা হ'ত, এই জন্যে বলা আর কি ?"

পূর্ণিমা বলিল, "তা কি আর জানি না ? কিন্তু বিনাপণে দিতে হলেও বিয়ে দিতে কিছু খরচ ত আছে ? শুধু ঠেলে বার করে দিলেই ত হয় না ? টেরই পাবে নিজে এবার। যতই দ্বিতীয়পক্ষের বিয়ে হোক এবং পণ না নিক, তবু দেখবে খরচ আছে।"

দীপক বলিল, "আমি আর কি টের পাব ? যাঁর উৎসাহে হচ্ছে এ সব তিনিই বুঝবেন। আমি ত ব'লেই দিয়েছি, আমার কাছে সিকি পয়সা নেই। না খেয়ে, না প'রে, তিনি এখনও খান দুই গহনা ধ'রে রেখেছেন, তাই বেচে খরচ করবেন।"

পূর্ণিমা বলিল, "যা হোক, তোমাদের বাড়ী দু'খানা গহনাও তবু ছিল, আমাদের ত তাও নেই।"

দীপক বলিল, "বাক্সে দু'খানা গহনা থাকার চেয়ে পেটে বিদ্যে থাকা ঢের কাজের জিনিষ। আমাদের গহনা বেচা টাকা ত বড়কীর বিয়েতেই শেষ হবে। কিন্তু তোমরা তিন ভাইবোনে তৈরি হয়ে নিলে চিরজীবন ভাল ভাবে থাকতে পারবে।"

পূর্ণিমা বলিল, "আশা ত করি। আচ্ছা দীপক, বিয়ে কি তোমাদের নিজের বাড়ীতেই হবে নাকি ? জায়গা বড় কম না ?"

দীপক বলিল, "ওখানে ত চারটে লোক পাশাপাশি দাঁড়াবার জায়গা নেই। আমাদের বাড়ীর পিছনে যে ইস্কুল-বাড়ীটা আছে, সেটারই একতলায় হবে ঠিক ক'রে রেখেছি। ইস্কুলের সেক্রেটারী যিনি তিনি আমার খুব চেনা লোক। তাঁকে এক রকম ব'লেই রেখেছি। আচ্ছা পূর্ণিমা, যদিই বুঝিয়ে পড়িয়ে মাকে রাজী করতে পারি এবং তোমাদের ডাকতে পারি, তা হ'লে কি আসবে ?"

পূর্ণিমা বলিল, "না, না, আমি যেতে পারব না, আমার ভীষণ লজ্জা করবে। পাড়ার সব লোকই ত জানে আমাদের কথা, কত রকম যে মন্তব্য হবে তার ঠিক নেই।"

দীপক একটু যেন ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "থাক তবে। সামান্য একটু খুশী হব, তাই বা ভগবান্ হতে দেবেন কেন?"

পূর্ণিমা বলিল, "সময় যখন মন্দ হয়, তখন এই রকমই হয় বটে, আবার ভাল সময় যখন আসে তখন হুড়মুড় ক'রেই আসে।"

দীপক বলিল, "সকলের কপালেই কি আসে?"

পূর্ণিমা উত্তর দিল না। ইহার পর কথাবার্ত্তার মোড় ফিরিয়া গেল অন্য দিকে।

পূর্ণিমার পরীক্ষা আসিয়া গেল, এবং দেখিতে দেখিতে পারও হইয়া গেল।

বাড়ী আসিবামাত্র সরমা ছুটিয়া আসিল, জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন পরীক্ষা দিলে দিদি?"

দিদি বলিল, "বেশ ভালই ত দিয়েছি মনে হচ্ছে।"

সরমা জিজ্ঞাসা করিল, "কবে result জানতে পারবে?"

পূর্ণিমা বলিল, "তাড়াতাড়িই পারব। এ ত বি-এ, এম-এ পরীক্ষা নয় যে ছ'মাস কেটে যাবে?"

পূর্ণিমা আবার বলিল, "দেখ, এক কাজ করতে হবে। আমাদের পাশের বাড়ীর ওরা Statesman রাখে ত? রোজ বিকেলে কাগজগুলো এনে wanted বিজ্ঞাপনগুলো দেখতে হবে। যারাই টেনো চায়, সব নাম ঠিকানা লিখে রাখব। যেই ফল জানতে পারব, অমনি apply করব। মোট কথা, ছুটির মধ্যে আমার একটা চাকরি ঠিক ক'রে নিতেই হবে।"

সরমা বলিল, "আচ্ছা ভাই, তোমার যদি কোন সাহেবী অফিসে কাজ হয়?"

পূর্ণিমা বলিল, "হোক না, মন্দ কি?"

"সারাক্ষণ ইংরেজী বলতে পারবে?"

পূর্ণিমা বলিল, "তা পারব না কেন? সাধারণ মত কথাবার্ত্তা বলার অভ্যাস ত আছে খানিক খানিক। আরও বলতে বলতে সড়গড় হয়ে যাবে। আমায় ত আর বক্তৃতা দিতে হবে না ইংরেজীতে।"

সরমা বলিল, "আমি হলে ভাই, ভয় পেয়ে যেতাম। আমি মোটেই পারি না ইংরেজী বলতে।"

পূর্ণিমা বলিল, "ভয় পেলে আমাদের চলবে কেন? আমাদের ত বাবাও নেই, বড় ভাইও নেই। ভয় ভাঙাবার কেউ নেই, তাই নিজেরাই শক্ত হয়ে থাকতে হবে, ভয় না পেয়ে।"

সরমা বলিল, "তাই বললেই ভয় যায় নাকি? আমার ত এখনও ভূতের ভয় করে।"

পূর্ণিমা বলিল, "তা যদি সখ ক'রে এখন ভয় পাও ত কি করা যাবে?"

তাহাদের মা আসিয়া কাছে বসিলেন, বলিলেন, "হ্যাঁ রে কোথায় কাজ নিবি এখন বলছিলি?"

পূর্ণিমা বলিল, "এখনও কাজ পাই নি ত কোথাও? কোন অফিসে কাজের চেষ্টা করব।"

মা বলিলেন, "অনেক বেশী খাটতে হবে। আর দুপুর রোদে ট্রামে বাসে বাদুড়-ঝোলা হয়ে যেতে হবে।"

পূর্ণিমা বলিল, "না, মা, দাঁড়িয়ে যেতে হতে পারে, তবে বাদুড়-ঝোলা হয়ে নিশ্চয় যাব না।"

সরমা বলিল, "দিদিকে ভয় পাওয়াবার চেষ্টা বৃথা, ওতে ওর খালি রোখ চ'ড়ে যায়।"

ক্রমশঃ
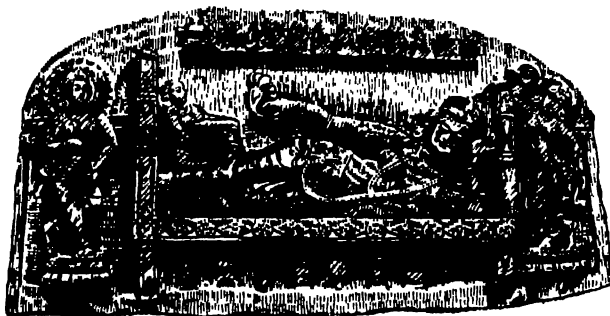
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মানবধর্ম

(প্রতিযোগিতায় মনোনীত প্রবন্ধ)

শ্রীমতী তৃপ্তি রায়চৌধুরী

সাহিত্য মানুষেরই হৃদয়ের রসে নিষিক্ত, তারই আশা-বাসনার বিচিত্র স্বপ্নে রঞ্জিত। তাই সাহিত্যের মধ্যে যুগে যুগে বিপুল মানবসংসার বার বার কল্লোলিত হয়ে উঠেছে, জনপদজীবন কলরবে মুখরিত হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যে এই মানবস্বীকৃতি খুব পুরাতন নয়, দেবমহিমার ঊর্দ্ধায়ন থেকে বাঙ্গালী লেখকের দৃষ্টি খুব বেশীদিন মানবসংসারের ছায়া আলোকের লীলায় নিষিক্ত হয়ে ওঠে নি। মানুষের জীবনের যে একটি বিরাট্ মহিমা আছে, অনন্ত রহস্য আছে তার হৃদয় ঘিরে, এ সত্য বাঙ্গালী লেখকের অজানাই ছিল। তাই প্রাচীন বাংলা সাহিত্য দেবপূজার ঘণ্টাধ্বনিতে মুখরিত। অস্পৃশ্য মানবজীবন তাতে কুণ্ঠাভরে স্বীকৃতি জানিয়ে এসেছে মাত্র।

প্রকৃতির বিরাট্‌রূপ মানবজীবনে যে বিপুল রহস্য ও বিস্ময়চেতনার সঞ্চার করেছিল সেই বিস্ময়চেতনা থেকেই দেবমহিমার স্তব আরম্ভ হয়েছিল। মানুষ বার বার প্রকৃতির অপরূপ মোহন রূপে মুগ্ধ হয়েছে, তার ভয়াল কান্তিকে দেখেছে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে —আর বার বারই এই বিরাট্ বিপুল রহস্যের মধ্যে নিজের ক্ষুদ্রতাকে অনুভব করেছে বেশী করে। এই অসহায়ত্ব চিরদিনই একটা সুনিশ্চিত আশ্রয় খোঁজে। মানুষও চেয়েছে জীবনের ঊর্দ্ধলোকে কোন অতিলৌকিক শক্তির আশ্রয়। সাহিত্য যদি মানবচেতনার রূপকার হয় তবে তার মধ্যে মানুষের তৎকালীন জীবনবোধের বা যুগনিষ্ঠার ছবি ধরা পড়বেই। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য এই অতিলৌকিক জীবনচর্য্যার পরিচয়বাহী।

মধ্যযুগে এসে বাঙ্গালী লেখকের জীবনরস পিপাসা সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশের পথ খুঁজল। প্রাক্-ইসলামিক ভারতীয় সংস্কৃতির বিচিত্র প্রকাশের প্রায় সর্ব্বত্রই মায়াবাদের স্পর্শ, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্থান প্রায় ছিল না বললেই চলে। মানুষের স্বাতন্ত্র্যবোধও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে ক্ষীণ। বৌদ্ধ বিপ্লবের আলোড়নে প্রাচীন যুগে যে মানবস্বীকৃতির সূচনা দেখা গিয়েছিল, মুসলমান আক্রমণের পর তা আবার নতুন করে দেখা গেল বাংলা সাহিত্যে ; কারণ ইসলামধর্ম্ম প্রবলভাবে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছে।

ইসলামের সাম্যবাদ ও তার সঙ্গে হিন্দুমানসের সংঘাত, এই দুই ভাবধারার ফলে সাহিত্যে মানবস্বীকৃতি সুরু হ'ল। মানবজীবন তখনও সাহিত্যে পূর্ণ স্বীকৃতি পায় নি। তা সত্ত্বেও বলা যায় দেবমহিমার বিশাল বনস্পতির ছায়ায় ক্ষুদ্র মানবজীবনের অঙ্কুর মাথা তুলতে আরম্ভ করেছিল। অঙ্কুরের একটি ক্ষুদ্র প্রান্ত থেকে তার প্রথম স্বীকৃতি ধ্বনিত হ'ল। এই মানবতাবোধকে কাব্যে রূপ দেবার চেষ্টা চলেছিল সত্য, কিন্তু অতি ক্ষীণধারায়। বার বার তা ব্যক্তিকে অতিক্রম করে অতিমানবের ক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছিয়েছিল। মানুষ তার অখণ্ড সত্যস্বরূপে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে নি—দেবমহিমার আলোর পেছনে মানবসংসারের বিচিত্র রূপ ছায়াময় হয়ে গিয়েছিল।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব মধ্যযুগের সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একটি উল্লেখযোগ্য দিক্ নির্দ্দেশ। তাঁর ধর্ম্মে যে চিরন্তন মানবিকতা ছিল তার সুর তৎকালীন সমস্ত সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে। বৈষ্ণবীয় মধুরিমা সমসাময়িক জীবনধারা থেকে সাহিত্যের উপাদান খোঁজবার প্রেরণা দিয়েছে এবং ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যভাবের মধ্যে মাধুর্য্যের সঞ্চার করে মানবপ্রীতির এক অভিনব রূপায়ণ ঘটিয়েছে। এই মানবস্বীকৃতি থেকেই জীবনী সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে, যা মধ্যযুগের সাহিত্যকে একটি উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে।

বৈষ্ণব সাহিত্যে যে মানবতাবোধের প্রথম উন্মেষ, তার ধারা মঙ্গলকাব্যের মধ্যে দিয়েও প্রবাহিত হয়ে এসেছে। বৈষ্ণব কাব্যের বিকাশ অসীমের দিকে, কিন্তু মঙ্গলকাব্য "লোকাতীতকে সমাজজীবনের সহজ সম্বন্ধের মধ্যে প্রকাশ করতে চেয়েছে।" এগুলোও দৈবীমহিমার রঙে রঞ্জিত, কিন্তু দেবতার লীলা প্রচারের চেষ্টা সত্ত্বেও মানবজীবন যে এগুলোতে মুখ্য অবলম্বন হয়ে উঠেছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। সমাজের সমস্ত মানুষের জীবনের ছায়া এতে পড়ে নি সত্য, কিন্তু কয়েক শ্রেণীর মানুষের জীবনচর্য্যার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় মঙ্গলকাব্যগুলোর ভেতর দিয়ে। এখন থেকেই দেখা যায় মানবজীবন আর উপেক্ষিত হয়ে নেই সাহিত্যের দরবারে, উপরন্তু বিচিত্র কলরবে মুখরিত হয়ে উঠেছে। তাই ফুল্লরা কালকেতুর জীবনচর্য্যা ও চাঁদসদাগর বা লাউসেনের পুরুষকার যেমন করে জীবন্ত হয়ে ওঠে. দেবতার মহিমা তেমন করে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না।

বৈষ্ণব পদাবলীতে যে মানবধর্মের সূচনা হয়েছিল তা যখন ধীরে ধীরে অতিপ্রিয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিকাশে রূপান্তরিত হয়ে গেল, তখন তৎকালীন সমাজমানস সাহিত্যের মধ্য দিয়ে নতুন করে মানবতাবোধের আশ্রয় খুঁজল। শাক্ত পদাবলীতে নতুন করে মানবধর্মের প্রতিষ্ঠা হ'ল। দেবতা এসে বাঙ্গালীর ঘরের অজস্র হাসিকান্না হৃদয়মাধুর্য্যের মধ্যে বাঁধা পড়লেন। শাক্ত সাধকদের লক্ষ্য মুক্তি, কিন্তু সেই মুক্তি এই বেদনাদীর্ণ জগতের বৃন্ত থেকে মুক্তি, জীবন থেকে পলায়নী মনোভাব নয়। তাঁরা মানবজমিতে আবাদ করে সোনা ফলাতেই চেয়েছেন—কারণ তাঁরা জানেন "ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি।" শাক্ত পদাবলীর মূল্য শুধু ঐতিহাসিকতায় নয়,—তা কবি-মনের বেদনায় প্রসারিত। এরই মধ্যে দিয়ে মানবহৃদয়ের স্নেহ ভালবাসা বাৎসল্যের সুরগুলো একটি অখণ্ড সঙ্গীতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

তৎকালীন অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যে দিয়েও এই মানবধর্মকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মূলতঃ চৈতন্য-প্রভাব থেকেই এই মানবতার সঞ্চার হয়েছে। ভাগবতের অনুবাদে শ্রীকৃষ্ণের যে রূপ আঁকা হয়েছে তাতে ঐশ্বর্য্যরূপের চেয়ে মধুর লীলাই বেশী করে মূর্ত্ত হয়েছে। রামায়ণ মহাভারত অনুবাদের মধ্যেও বিরাট্ বিপুল মানবজীবনের তরঙ্গলীলা মূর্ত্ত। দেবতার লীলা নয়, মানুষই আপন মহিমায় দেবোপম হয়ে উঠেছে, কিন্তু মর্ত্ত্য-মানুষের স্নেহ প্রেম দুঃখ বেদনা সমস্ত কিছুরই সার্থক রূপায়ণ আছে এগুলোর মধ্যে।

বৈষ্ণব কাব্যের মানবতার যাত্রা অব্যাহত ভাবে চলেছে পল্লীগাথাগুলোর ভেতর দিয়ে। এই পথচলা আর একক নয়, নিঃসঙ্গ নয়, তার সঙ্গী হয়েছে বিপুল মানব-সংসারের কত বিচিত্র হৃদয়ের রহস্য, কত চারুনয়না গৃহবধূর বিচিত্র দিবাস্বপ্ন, কত প্রেমিক হৃদয়ের অশ্রুসিক্ত আকাঙ্ক্ষা। বাঙ্গালীর কাব্যে মানবতাবোধের চরম প্রকাশ ঘটেছে বোধ হয় এই পল্লী গাথাগুলোর ভেতর দিয়েই। জীবনের পথ দিয়ে যত পথিক চলে যায় তাদেরই বহুবিস্মৃত পদচিহ্নের পদাবলী পল্লীগাথাগুলো জীবনে কোন অসীমের স্বপ্ন নয়, অপ্রাপনীয়ের দুরাশা নয়। কেবলমাত্র সহৃদয়ের বিচিত্র লীলার মধ্যে, সংসারের অজস্র মায়ামোহের মধ্যে বাঁধা পড়বার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা রূপ পেয়েছে পল্লীগাথার মধ্যে। পল্লীকবি রূপসী গ্রামবালার হৃদয়-রহস্যে অবগাহন করতে চেয়েছেন—"কন্যা তুমি হও গহিন গাঙ আমি ডুইব্যা মরি"। কখনও বা টুকটুকে লঙ্কাগাছ দেখে "গুণবতী ভায়ের" জন্য তাঁর মন উদাস হয়ে গিয়েছে। জীবনের ক্ষুদ্র তুচ্ছ সমস্ত রূপ, অস্ফুট বাসনা বেদনা সমস্ত যেন নিটোল অশ্রুবিন্দুর মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পল্লীগাথাগুলোর মধ্যে। পল্লীকবিরা সৃষ্টি করেছেন মনের রম্য স্পন্দন, যে রসময় রূপময় মন আপন সত্তাকে যুগ যুগ ধরে বাঁচিয়ে রাখে সাহিত্যের মধ্যে। এই হৃদয়ের কথাকে অনাবৃত করে দেখাবার চেষ্টা পল্লীগানের প্রতিটি ছত্রে। যে সহজ কথার গুণ "অল্পের মধ্যে অনেক কথা বলা," সেই সহজ ভাষা, সহজ ছন্দে মানব-জীবনের বিচিত্র রূপায়ণ ঘটেছে।

সাহিত্যের মধ্যে মানবজীবন এতখানি অন্তরঙ্গ, জীবন্ত হয়ে উঠেছিল বলেই ভারতচন্দ্রের মঙ্গলকাব্যের মধ্য দিয়েও মানবজীবনই একান্ত সত্য হয়ে উঠেছে। "নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার" মত প্রোজ্জ্বল মহাদেবকেও ভারতচন্দ্র একান্ত মানবীয় রূপে চিত্রিত করেছেন—"ভূত নাচাইয়া ফেরে গানবাদ্য বাজাইয়া।" সাধারণ গৃহস্থের মত শিব ঘর-সংসার করেছেন, লাঙ্গল বুনেছেন, শূন্যহাতে ঘরে ফিরে গৃহিণীর কাছে লাঞ্ছিত হয়েছেন। মানবতাবোধ সাহিত্যে এত অন্তরঙ্গ স্বীকৃতি লাভ করেছিল যাতে দেবীর কাছে বর প্রার্থনা করতে গিয়ে ঈশ্বরী পাটনী কোন অলৌকিক জিনিষ প্রার্থনা করে নি—মানবহৃদয়ের একটি চিরকালীন কামনা রূপ পেয়েছে তার কথায়—"আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।"

জীবনবোধের মধ্যে যে আন্তরিকতা থাকলে সাহিত্যরচনা সত্যকার সার্থক হয়ে ওঠে, মধ্যযুগের সাহিত্য সম্পূর্ণ না হলেও প্রায় ক্ষেত্রেই সেই আন্তরিকতার পরিচয়বাহী। মানবজীবনকে বাদ দিয়ে সাহিত্য-রচনা হয় না। কারণ সাহিত্য শুধু criticism of life নয় creation of life-ও বটে। জীবনবোধ ও মানবধর্ম সাহিত্যকে দেয় বিস্তার, তাকে উত্তীর্ণ করে কালাতীত মহিমায়। মধ্যযুগের সাহিত্য দেবমহিমার অন্তরাল সরিয়ে মানবসংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করেছিল বলেই তার মধ্যে সত্যকার রসানুভূতি সঞ্চারিত হয়েছে। "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"—জীবনের ক্ষেত্রে একথা যেমন সত্য, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তেমনি সত্য। এই মানবসত্যকে গ্রহণ করেছে বলেই মধ্যযুগের সাহিত্য উৎকেন্দ্রিক হয় নি—তার বাণীপ্রকাশে এসেছে অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা, যা তাকে সার্থক রসবোধের প্রতিষ্ঠাভূমিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

লাভা

শ্রীসাধনা কর

শিলঙ শহরের ঘরে ঘরে চাঞ্চল্য ও বিস্ময়ের অবধি রইল না। জানা-অজানা কাহিনী-আলোচনায় মুখর হ'ল শহরবাসী। দারোগা-পুলিসে মিলে তোলপাড় করলে। কিন্তু সেদিনের নিদারুণ ঘটনার পরে সেই যে সাহেব নীরব হয়ে গেছেন, আর একটি শব্দ কেউ তাঁর মুখ থেকে বের করতে পারে নি। ডাক্তাররা পরীক্ষা ক'রে রায় দিয়েছেন—স্নায়ু-বিকলতায় সাহেবের বোধ-শক্তি লুপ্ত-প্রায়; সে বোধ ফিরে পাবার সম্ভাবনা কম।

শিলঙের লাবান-অঞ্চলে পাহাড়ের স্তরে স্তরে উঠে গেছে ঘরবাড়ী; পাইন ও অর্কিডে সাজান বাগান—প্রকৃতি-রচিত সৌন্দর্য-লোকের বুকে মনুষ্য-রচিত গৃহ-শিল্প মিলে মনোরম স্বপ্নলোকের সৃষ্টি হয়েছে। উপর থেকে সমতলে নেমে আসার পথটি পাহাড় থেকে পাহাড়ের স্তরে ঘুরে-ফিরে হঠাৎ কিছুটা সোজা হয়ে গেছে। দূর থেকে দেখে মনে হয় একটা সাপ এঁকে-বেঁকে নীচের খাদে মুখ ঢুকিয়ে কি খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ পাশে পাহাড়, ও পাশে খাদ। সে খাদ দুর্গম নয়—অনায়াসে তার মধ্যে ওঠা-নামা করা যায়। আবার ঢালু পথে নামতে গিয়ে অতর্কিতে প'ড়ে গেলে মৃত্যু ঘটাও আশ্চর্য নয়। কিন্তু কচি-কচি বাচ্চারাও অবাধে এ পথে যাতায়াত করে, কখনও কোন অঘটন ঘটে নি।

এতদিন না ঘটলে যে কোনদিনই ঘটবে না, এ কথা কি বলা যায়? জিৎবাহাদুরেরই ত্রুটি বসন্তের আগমনে ফাগুয়ার রেশে তার মন ছিল ফূর্তিভরা; রাতের আড্ডার মৌজ সম্পূর্ণ ঘোচে নি, দুধ-বিলির শেষে একটা পাহাড়িয়া গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে দ্রুতবেগে সে নেমে আসছিল, পথের শেষ দিকে ঘোড়ার রাশ টানবার খেয়াল হয় নি। রাগবী হুমড়ি খেয়ে পড়ল গিয়ে খাদে। চিৎকারে চারদিক্ সচকিত হয়ে উঠল। হতবুদ্ধি জিৎ-বাহাদুর প্রথমটা কাঠের মত দাঁড়িয়ে থেকে পরক্ষণেই ঝাঁপিয়ে নেমে গেল। কিন্তু তখন আর-কিছু করবার নেই। খাদ জুড়ে প'ড়ে আছে রাগবী। নিদারুণ ব্যথায় দেহটা এঁকে-বেঁকে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। আঘাতে-আঘাতে ঢন্-ঢন্ ক'রে বেজে চলেছে টিনদুটো—ভিতরের দুধ প'ড়ে রাগবীর পিঠ সাদা। দেখতে দেখতে লোক জমে উঠল। বহুকষ্টে ঘোড়াটাকে খাদ থেকে উঠিয়ে আনা হ'ল। জিৎবাহাদুর তাড়াতাড়ি টিন খুলে ফেলে দ'লে-ম'লে ওকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু ঘোড়া গড়িয়ে প'ড়ে গেল। সে কি তার দুঃসহ আর্তনাদ! বুদ্ধিভ্রষ্টের মত জিৎবাহাদুর এদিক্-ওদিক্ তাকিয়ে নিজের ভাষায় বলতে লাগল—পান ছে বরষ ধরি মো এত্তা দুধ বিক্রি গরদাইছু, এত্তিদিন কে পানি ভয়ো না, আজু কি না এস্তো ভয়ো।

(অর্থাৎ—পাঁচ-ছ বছর ধ'রে আমি এত দুধ বিক্রি করছি, কোনদিন কিছু হ'ল না, আজ কেন এমন ঘটল।)

সমবেত দু-একজন স্মরণ করিয়ে দিলে—'সাহেবকে খবর দাও।'

জিৎবাহাদুরের চোয়াল-উঁচু পাহাড়ী মুখখানার উপর দিয়ে চকিতে একখণ্ড মেঘ ভেসে গেল। ঘোড়া তার নিজের নয়, ক্যাপ্টেন্ রিচার্ড টমসনের। সে ঘোড়ার তদারক করে মাত্র, পরিবর্তে দু'বেলা দুধ বিলি করবার জন্য নিয়ে আসে।

—দেরি ক'রো না, যাও। ডাক্তার এনে সাহেব ঘোড়াটাকে দেখাবার ব্যবস্থা করুন।

জিৎবাহাদুর আলো দেখতে পেল। এতক্ষণ কেন এ কথাটা মনে প'ড়ে নি। কতদিন ত সে সাহেবের আদেশে ঘোড়া নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে এনেছে। খুব ভাল ডাক্তার। ঊর্ধ্বশ্বাসে সে ছুটল।

পাহাড়ের মোড় ঘুরেই ওপাশে সাহেবের বাংলো। ভোর্ হতে না হতে তিনি বারান্দায় এসে বসেছেন। মেজাজ ভাল নেই। রাতে স্বপ্ন দেখেছেন—ছোট্ট একটি মেয়ে, তারার মত স্নিগ্ধ তার চোখ, ভোরের আলোর মত উজ্জ্বল হাসি, আগ্রহে এগিয়ে আসছিল তাঁরই দিকে।—এতদিনের প্রতীক্ষার শেষে ও তবে এল! নির্মম নিষ্ঠুর মেয়ে!

টমসন দু'হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে যাবেন,—অকস্মাৎ ধেয়ে এল ঝড়, ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ, আকাশ ও মাটি লালে-লাল হয়ে গেল—সে কি আগুন, না, রক্তের স্রোত! গুমরে উঠল একটা করুণ চাপা-কান্না। ঘুম

গেল ভেঙে, সাহেব ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলেন। বহুক্ষণ অবধি বুকের কাঁপুনি থামতে চায় নি। ওষুধ খেলেন, পায়চারি করলেন। দুঃখের রাত শেষ অবধি ভোর হ'ল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন তিনি। বাইরে এসে ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু শান্ত হলেন। বয়স তাঁর সত্তর অতিক্রান্ত। বার্ধক্য-জীর্ণ দেহ, শোকার্ত মন। চলাফেরায় তিনি প্রায় অক্ষম। দিনের অধিকাংশ সময়ই কাটে ইজি-চেয়ারে। সেদিন ভোর থেকেই অত্যধিক ক্লান্তি বোধ করতে লাগলেন। প্রত্যেকদিন দুধ বিলি করতে যাবার আগে জিৎবাহাদুর রাগবীকে নিয়ে আসে, সাহেবের সামনে দাঁড় করিয়ে দানাপানি খাওয়ায়, দলাই মলাই করে, টমসন তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। রাগবী হর্ষে হ্রেষাধ্বনি ক'রে বেরিয়ে যায়। সেদিন সাহেবের বিন্দুমাত্র সামর্থ্য বা উৎসাহ রইল না যে উঠে ঘোড়াকে একটু আদর করেন। জিৎবাহাদুর চলে গেল, তিনি শূন্য চোখে দেখলেন, দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইজিচেয়ারে মাথা হেলিয়ে দিলেন—আর কেন, এবার গেলেই হয়। বেঁচে থেকে কেবল কষ্ট-ভোগ।

টমসন জানেন—দুঃস্বপ্নটা আর কিছুই নয়, গত সন্ধ্যার ভুলের জের। কি যে ভুল তাঁর হ'ল! ইজিচেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন, এক সময় মনে হ'ল দু'টি বড় বড় কোমল চোখ তাঁর প্রতি স্থির হয়ে আছে। সচকিত হয়ে সাহেব ব'লে উঠলেন—কে? কে ওখানে দাঁড়িয়ে?

উত্তর এল না। টমসন দ্রুত নড়াচড়া করতে অপারগ। তবু উঠে দাঁড়ালেন। খস্‌খস্ একটা আওয়াজও যেন ভেসে এল কানে। সাহেব টলতে টলতে গিয়ে পিছনের জানালার পর্দা সরালেন। দৃষ্টি প্রখর নয়, সন্ধ্যার আবছায়ায় কাউকে দেখা গেল না। কানে বেজে উঠল দূরাগত চাপা কান্নার স্বর। সাহেব হেঁকে উঠলেন—বয়, বয়।

খানসামা ছুটে এল।

—কে এসেছিল বাগানে?

—কেউ না।

—কেউ না? কোথায় ছিলে তুমি?

—এখানেই, এই বাগানে।

—কাউকে দেখতে পাও নি?

—না।

—পিছনের গেট বন্ধ?

—হ্যাঁ। ওটা সারাক্ষণই বন্ধ থাকে।

—ভাল ক'রে দেখেছ?

—হ্যাঁ।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে টমসন নিরাশ হলেন। বুঝলেন—তাঁরই ভুল হয়েছে। হয়ত কোন পাখী চলাফেরা করছে, খচ্‌মচ্ আওয়াজ উঠেছে; বাতাস বয়ে গেছে, চাপা কান্নার মত ভেসে এসেছে। কিন্তু বাস্তবে ভুল ধরা পড়লেই কি অন্তরে তাকে স্বীকার করা চলে! ঘটনা ভিতরে ভিতরে যথেষ্ট আলোড়ন তুলল, শরীর-মন হ'ল বিকল। স্বপ্নেও তারই জের চলেছিল। সাহেব ইজিচেয়ারে নড়ে-চড়ে বসে বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন—ভুয়ো, সব ভুয়ো।

মিস্টার নন্দী রিটায়ার্ড জজ। কর্মজীবনে টমসনের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল। বর্তমানে এ শহরেই তিনি অবসর-জীবন যাপন করছেন। মাসখানেক আগে একদিন সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। কথাচ্ছলে বলে গেছেন—রবার্ট নিকলসনরা নাকি শীগ্‌গীরই এখানে ফিরে আসছেন—এমনি একটা গুজব শোনা যাচ্ছে। বাড়ীটা বিক্রী করে দেবার ইচ্ছে। কি সব যেন গোলমাল আছে, সে সব পরিষ্কার করা প্রয়োজন; নিজেরাই আসবেন জানিয়েছেন। খবরটা শুনতে শুনতে সাহেব এমন বিদ্বেষ-ভরে তাকিয়েছিলেন যে, মিঃ নন্দী অপ্রস্তুত হয়ে ফিরে গেছেন। তার পর থেকে রক্তের তালে তালে, বক্ষঃ-স্পন্দনে-স্পন্দনে ধ্বনিত হয়ে চলেছে কথাটা। ঘুমে জাগরণে তাঁর শান্তি নেই, অন্য কোন ভাবনা নেই। হাওয়ার শব্দে চমক লাগছে—কে এল? রাস্তা দিয়ে লোক যেতে দেখলেই ঔৎসুক্যে তাকিয়ে দেখেন। দিনকের দিন অত্যন্ত উন্মনা হয়ে উঠছেন। গত সন্ধ্যায় নয়ত এমন একটা বিভ্রমও ঘটে!

চিন্তাটাকে কিছুতে সরাতে পারছেন না, টমসন অস্থির চিত্তে ইজিচেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন—ভুয়ো, সব ভুয়ো।

রুমালে কপালটা মুছে ফেললেন। কিন্তু মিস্টার নন্দী ত বাজে কথা বলবার লোক নন, সংবাদে নিশ্চয় একটু সত্য নিহিত আছে। হয়ত আসবে, একা রবার্ট কিংবা তার ছেলে। সবাই আসছে এমন কথা ত মিস্টার নন্দী বলেন নি। নিগূঢ় অন্তরে একটা সূক্ষ্ম বেদনা-বিদ্যুৎ খেলে গেল। যখনই এ সন্দেহটা মাথা জাগিয়ে উঠছে, সাহেব স্থির থাকতে পারছেন না। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে তিনি সান্ত্বনা দিচ্ছেন—সে কি

একবারের জন্যও আসতে চাইবে না? টমসন বেঁচে আছেন সে কি জানে না? হয়ত এতদিনের পুরোনো স্থানে ফিরে আসবার ইচ্ছা তার হবে, হয়ত আসবে, কিন্তু তাঁর কাছে এসে দাঁড়াবার সাহস তার হবে না। বোকা ভীরু মেয়েটা···। ভাবতে ভাবতে টমসন ইজিচেয়ারে সটান হয়ে বসলেন—কে, কে?

স্পষ্ট পায়ের শব্দ কানে এসেছে। এবার ভুল হতেই পারে না। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে দেখলেন—সামনে জিৎবাহাদুর। সাহেবের মুখে-চোখে হতাশার ছাপ ফুটে উঠল। ক্লান্ত স্বরে বললেন—কে? বাহাদুর? আন রাগবীকে।

দুধ বিলি শেষে রাগবী এলে সাহেব তাকে নিজের হাতে রুটি খাওয়ান। জিৎবাহাদুর নীচু সুরে কি বললে, সাহেব বুঝতে পারলেন না। শ্রবণ-শক্তিও তাঁর ক্ষীণ। বিরক্তিভরে বললেন—কি হয়েছে, জোরে বল। খাদে পড়ে গেছে? কে? রাগবী?

বলার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত সাহেব দাঁড়িয়ে উঠলেন—রাস্কেল।

দাঁড়াতে অসমর্থ হয়ে তিনি ধপ করে পড়ে গেলেন চেয়ারে। বয় চা দিতে এসেছিল, তাড়াতাড়ি ধরে ফেললে। টমসন তখন অনড়।

—সাব্, সাব্।

বয় ছুটে গিয়ে ব্র্যাণ্ডির বোতল নিয়ে এল। পান করে সাহেব একটু সুস্থ বোধ করলেন। বয় আশ্বাস দিয়ে বললে বিশেষ কিছু হয় নি। আমি ব্যবস্থা করছি। ভাবনা নেই।

টমসন রক্তহীন মুখে তাকালেন। বয় ত্রস্তপদে বারান্দা থেকে নীচে নেমে গেল। মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে ছিল জিৎবাহাদুর। বৃষ্টি নয়, ভূমিকম্প নয়, পাহাড়ের ধ্বস-নামা নয়, রোজকার পথে নামতে গিয়ে বিপত্তি এর কি কোন কৈফিয়ৎ আছে? কিন্তু জিৎবাহাদুর জাত-পাহাড়ী, নির্ভীক, সত্যনিষ্ঠ। দোষ করলে মাথা পেতে দণ্ড নিতে জানে; দোষীকে শাস্তি না দিয়ে তাদের চোখে ঘুম আসে না, মুখে খাবার রোচে না। আবার দোষ না করলে দণ্ড দেওয়া বা নেওয়া তাদের স্বভাব নয়। বয় এসে জিজ্ঞাসা করতে সে সত্য কথাই বললে। বয়ের মুখ হ'ল বিবর্ণ। ধিক্কার দিয়ে বললে—করেছিস কি বাহাদুর!

জিৎবাহাদুর কপাল চাপড়ালে। বয় একটুক্ষণ ভাবলে, তার পরে নির্দেশ দিলে—রাগবীকে এখানেই নিয়ে আয়। জিৎবাহাদুর সাঁ সাঁ বেগে ছুটে চলে গেল। লোকজন, দড়ি, বাঁশ জোগাড় ক'রে রাগবীকে তুলে নিয়ে এল। রাগবীর আর্তনাদে এবং নিদারুণ অস্থিরতায় বীভৎস দৃশ্যের সৃষ্টি হ'ল। পাগলের মত দৌড়ে এলেন টমসন। দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন—রাগবী, আমার রাগবী। সাহেবের নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র স্নেহের সম্বল, তার বেঁচে-থাকার আনন্দ রাগবী। সাহেব বার বার তার উপর ক্রুশ এঁকে দিলেন। অস্ফুটস্বরে বলতে লাগলেন—না, না, শান্ত হ', সব ঠিক হয়ে যাবে। বয়, ডাক্তার···।

ঝড়ের মুখে-পড়া পাতার মত কাঁপছে তাঁর হাত-পা। বয় এবং জিৎবাহাদুর মিলে বুদ্ধি ক'রে বাঁশের গায়ে আরেকটা বাঁশ আড়ভাবে আটকে দিলে। রাগবীর সামনের দুটো পা তার উপর ঝুলিয়ে রেখে বেঁধে দিয়ে তাকে দাঁড় করান গেল। রাগবী বোধ হয় স্বস্তি পেল। শান্ত হয়ে এল তার বিক্ষোভ এবং চিৎকার।

পশুর ডাক্তার এসে বহুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন। টমসনের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারলেন না। সাহেবের ইতিহাস ত তাঁর অজানা নয়! বেরিয়ে যেতে যেতে তিনি গম্ভীর মুখে ব'লে গেলেন—ক্যাপ্টেন, কিছু যদি করবার থাকত, চেষ্টার ত্রুটি করতাম না। যা করবার এবারে তুমি কর।

—হুম্—ডাক্তার আসার সঙ্গে সঙ্গে টমসন উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, নিষ্পলক চোখে দেখছিলেন, এতক্ষণে বসে পড়লেন।

পাহাড়ের শিখর বেয়ে সূর্য উপরে উঠতে লাগল, রঙের পর রঙ বদল হতে লাগল। এপাশে ছায়া নেমে এল, রাগবীর কর্ণ-বিদারক আর্তনাদের বিরাম নেই। এদিক্-ওদিক্ মুখ ফিরিয়ে সে অতি পরিচিত একটি মুখ এবং বহুকালের স্নেহস্পর্শটিকে খুঁজে খুঁজে আকুল হ'ল। পাথরের মূর্তির মত সাহেব বসে রইলেন। তাঁর সমস্ত বোধের মধ্যে রণিত হয়ে চলেছে—এবারে যা করবার তুমি কর।

এ ত কথা নয়, নির্দেশ। রাগবীকে গুলি ক'রে মেরে ফেলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তিনি ছিলেন শিকারী, জাঁদরেল মিলিটারী ক্যাপ্টেন। একটি গুলি ছোঁড়া তাঁর কাছে ঢিল-ছোঁড়ার সামিল। কিন্তু তাঁর পক্ষে আজ সেটাই কঠিনতম কাজ। সাহেবের মুখ কুঞ্চিত রেখায় বিকৃত হয়ে গেল। তাঁর চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগল—একটি মূর্তি—নবীন যৌবনোদ্দীপ্ত সৌম্য-কান্তি তরুণ। বাকল-খসে-পড়া ইউক্যালিপটাস গাছের মত শুভ্র মসৃণ বর্ণ, দীর্ঘ সটান অথচ কঠিন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, নাক-

মুখ-চোখ বাটালি-কাটা। কখনও সে শান্ত নীরব রাগবীকে খেলাচ্ছলে খেপিয়ে তুলে হাসিতে মেতে উঠছে; কখনও বা সুনিপুণ দক্ষতায় দুর্বার ঘোড়াটাকে অকস্মাৎ নিশ্চল নিস্পন্দ ক'রে ফেলে গর্বে উল্লসিত হচ্ছে —টমসনের নিরেট লোহার বুকখানার মধ্যে দিনের পর দিনের ছবি খোদাই করা আছে। রাগবীর সঙ্গে সে-ছবি এক ফ্রেমে বাঁধান। রাগবী ত কেবল তাঁর নিঃসঙ্গ-জীবনের স্নেহের পাত্র নয়, সে যে তাঁর মৃত-পুত্রের স্মৃতি-চিহ্ন।—সাব্।

টমসন সজাগ হয়ে চোখ তুললেন। বয় অর্ধস্ফুটস্বরে বললে—রাগবী বড় কষ্ট পাচ্ছে···।

—বন্দুক আন।

বয় ঘরে চলে গেল। টমসন ধীরে ধীরে মাথাটি এলিয়ে দিলেন রাগবীর গায়ে। হাত বুলোতে বুলোতে গুন্‌গুন ক'রে বললেন—তুইও চলে যাবি, তুই-ও।

রাগবী যেন বুঝতে পারলে তাঁর বেদনা। সাহেবের হাতে মাথা রেখে কাতর স্বরে ডেকে ডেকে উঠল।—ক্যাপ্টেন টমসন, এক্ষুণি ওটাকে গুলি ক'রে মেরে ফেল। এ চিৎকার অসহ্য।

টমসন চমকে ফিরে চাইলেন। চোখের দৃষ্টি হ'ল প্রখর—দেয়ালের কোণ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে কে? ঠাহর হ'ল না, সন্দেহে সাহেব ঝুঁকে পড়লেন।

—ঘরে রোগী, শান্তিভঙ্গের জন্য পুলিসকে ফোন করতে বাধ্য হব।

বিদ্যুৎ-স্পন্দন খেলে গেল শিরায় শিরায় স্নায়ুতে স্নায়ুতে। টমসন সটান দাঁড়িয়ে উঠলেন।—ঐ যে, রবার্ট নিকলসন—সেই মুখ, সেই স্বর, সেই হাঁটাচলা। ভুল নয়, ভুল হতেই পারে না।—বন্দুক, বয় বন্দুক আন, জলদি;—চলে যাচ্ছে যে। বয়,—

হাঁক-ডাক শুনে বয় এল দৌড়ে, বারান্দায় বেরিয়েই নিশ্চল হয়ে গেল। নিকলসনকে সে দেখতে পেয়েছে। সাহেব এগিয়ে এলেন কয়েক পা। গর্জে উঠলেন—স্টুপিড্, ইডিয়ট। কেন দেরি করছ, দাও বন্দুক।

পুড়ে যেন তিনি লাল টকটকে হয়ে গিয়েছেন। হাত বাড়াতে হাত কাঁপছে, পা ফেলতে পা টলছে, হুড়মুড় ক'রে পড়েই যান বুঝি-বা। জিৎবাহাদুর ছিল কাছেই, পিছন থেকে ধরতে এল। সাহেব ঝাঁকিয়ে উঠলেন—না, না, বন্দুক, বন্দুক—।

হাত বাড়িয়ে দিলেন। এগিয়ে আসতে চাইলেন সবেগে। বয় এসে বন্দুক হাতে দিলে। সাহেব প্রায় টেনে কেড়ে নিলেন সেটা। শক্ত ক'রে চেপে ধরলেন। বজ্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন বয়ের দিকে। বয় শঙ্কিত হ'ল। সাহেবের দৃষ্টির অর্থ তার বোধগম্য। চুপিসারে খস্‌খসে গলায় সাহেব ব্যগ্রকণ্ঠে বললেন—বয়, গত সন্ধ্যায় আমি ভুল শুনি নি; বল, ভুল নয়, সে এসেছিল!

বয় মাথা নত করলে। আর অস্বীকার করা সম্ভব নয়। গতকাল সে স্বেচ্ছায় মিথ্যা বলেছে। সত্য বলা কি তার পক্ষে সম্ভব? সে ত আজকের লোক নয়! প্রথম যখন সে সাহেবের কাছে কাজে আসে, ডিক ও স্টেলা তখন এতটুকু—গাড়ী ক'রে দু'জনে ঘুরে বেড়াত, গল্প শুনত তার কাছে; কত সময় দুষ্টুমি ক'রে তার বকুনি খেয়েছে, আবার হেসে এসে পাশে বসেছে; নিষিদ্ধ খাবারের জন্য আবদার ধরত যখন-তখন। সেই ডিক, স্টেলা বড় হ'ল, রাগবীকে নিয়ে ঘুরে বেড়াল। তার পরে কি-সব ঘটনা ঘটে গেল, সব হ'ল নষ্টভ্রষ্ট। সে ডিক বেঁচে নেই, এত বছর পরে সেই স্টেলা ফিরে এসে যখন গোপনে তার সঙ্গে দেখা করলে, জল-ভরা চোখে পিতা টমসনকে একটিবার দেখতে চাইলে, সে আপত্তি করতে পারে নি। আড়াল থেকে সাহেবকে দেখে যাবার পরামর্শ দিয়েছিল। সে ভালভাবেই জানত—ক্রোধে ক্ষোভে অপমানে শোকাঘাতে টমসন অর্ধোন্মাদ। দেখা হলে কি বিপদ্ ঘটিয়ে ফেলবেন কে জানে। বয় তাই সঙ্কল্প করেছিল—ওদের আসার সংবাদ সাহেবের কাছে গোপনই রাখতে হবে। কিন্তু দৈবগতিকে সেই বিপর্যয়ই কি-না ঘটল!

বয়ের মুখ দেখেই সত্য অবহিত হলেন টমসন। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন বয়ের দিকে, ক্রমে ক্রমে তাঁর রুক্ষ-কঠিন চাহনির মধ্যে একটা তরল-কোমল ছায়া নেমে এল। ঠোঁটের কোণে দেখা দিল একটা অদ্ভুত হাসি। ফিস্ ফিস্ ক'রে বললেন—সে এসেছে, আমার ভুল নয়; না এসে কি পারে? কাছে এসে দাঁড়াবার সাহস নেই। বোকা বোকা···। বলতে বলতে তাঁর চোখ উঠল জ্ব'লে, গলার স্বর হ'ল কর্কশ—ছলাকলা জানত না, ওরা যে অতি ভাল ছিল, তাই ত মেয়েটাকে ধাপ্পা দিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে; শয়তান, জন্ম শয়তান ঐ দুই বাপ-বেটা।

সাহেব দাঁতে দাঁত পিষলেন। চোখে জ্বলতে লাগল ধিকি-ধিকি কালাগ্নি। দেয়ালের ওপাশে গাছের ফাঁকে রবার্ট নিকলসনের বাড়ীর কিছু অংশ দেখা যায়। সেদিকে তাকিয়ে সাহেব স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মেরী আর রবার্ট নিকলসন সমবয়সী, লণ্ডনের একই পাড়ায় ছিল বাড়ী। ছেলেবেলা থেকে দু'জনে একত্রে

বড় হয়ে উঠেছে। মেরী অপূর্ব সুন্দরী, ধীর স্থির, কোমল প্রকৃতির। রবার্ট তার বিপরীত। অল্পবয়স থেকে হিংস্র কুটিল দুর্দান্ত। মেরী তাকে কখনই পছন্দ করতে পারে নি। কিন্তু মেরীর প্রতি রবার্টের লোভ ছিল দুর্দমনীয়। জোর ক'রে তার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চাইত এবং মেরী উত্যক্ত হয়ে কেবলই তাকে এড়িয়ে চলত। তার পরে কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে সে যখন দেখলে বুদ্ধিদীপ্ত উন্নত-রুচি টমসনকে, ভুলে গেল অন্য সব পুরুষ-বন্ধুদের। তার ধ্যানজ্ঞান হ'ল 'টম'। হিংসায় ক্রোধে অপমানে পোড়া বারুদের মত কালো হয়ে রইল রবার্টের অন্তর। এমন পরাজয় তার জীবনে ঘটে নি। সে নানা ভাবে চেষ্টা করতে লাগল যাতে টমসন ও মেরীর মধ্যে বিদ্বেষ ঘটে। যত হ'ল ব্যর্থকাম, তত জমতে লাগল আক্রোশ। কিছুদিনের মধ্যেই টমসন মেরীকে বিয়ে করে ভারতবর্ষে চলে এলেন। প্রেমের মাধুর্যে ভরে উঠল বিশ্বভুবন। রবার্টের কথা তাঁদের মনেই রইল না।

বছর দুই-তিন পরে সেবার টমসন লাহোরে বদলি হয়ে গিয়েছেন। কানাঘুষায় শুনতে পেলেন—অল্পদিন আগে একজন ইংরেজ মিলিটারীতে কাজ নিয়ে এসে-ছিলেন। বিশেষ কোন দুষ্কৃতির জন্য তাঁর কঠিন দণ্ড বিধান হতে যাচ্ছে। নাম শুনেই টমসনের কেমন সন্দেহ জাগল। সেই রবার্ট নিকলসন নয় ত! খোঁজ নিলেন —সে-ই বটে। খবরটা মেরীর কানেও পৌঁছেছিল। এ নিয়ে দু'জনে আলোচনা করলে। রবার্টের প্রতি তখন কারুরই আর বিদ্বেষ নেই। স্বজাতি-প্রীতি এবং বাল্যসঙ্গীর প্রতি সহানুভূতিই প্রবল হয়ে উঠল। মেরী স্বামীকে অনুরোধ করলে এবং টমসনও স্বেচ্ছায় তদ্বির-তদারক করে রবার্টকে মুক্তি দিলেন, এমন কি চাকরিরও ক্ষতি হ'ল না। বন্ধুরূপে সে প্রবেশ করলে দু'জনের জীবনে। অত্যন্ত অমায়িক, সব বিষয়ে উৎসাহী, যেন আগেকার সে নিষ্ঠুর খল-প্রকৃতির রবার্টই নয়। দু'দিনে সে টমসন ও মেরীর অন্তর জয় করে ফেললে। আজ এখানে পার্টি, কাল ওখানে বেড়াতে যাওয়া, দুর্গম বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে-পর্বতে শিকারে ছোটা—দিনগুলি হাওয়ার বেগে ফুলের পাপড়ির মত উড়ে চলে গেল। শিকারে টমসনের অফুরন্ত উৎসাহ। সুযোগ পেলেই সে-সবে তিনি মেতে ওঠেন। রবার্ট ভাল শিকারী নয়, কিন্তু প্রমোদের আয়োজন করাতে এবং পার্টি জমাবার গুণে তার জুড়ি নেই। কোন ব্যাপারেই তাকে বাদ দেওয়া চলে না। একান্ত ভাবে যখন তাঁরা রবার্টকে বিশ্বাস করেছেন সেই সময়েই অকস্মাৎ ধরা পড়ল—কূট-কুশলী রবার্ট। জঘন্য তার উদ্দেশ্য। এক শিকারে গিয়ে সে টমসনের প্রাণনাশের সুচতুর চেষ্টা করলে। দৈবক্রমে রক্ষা পেয়ে গেলেন সাহেব। ঘটনা প্রকাশ হয়ে যেতে রবার্ট পালিয়ে কোথায় যে গেল, বহু বছর তার সন্ধান মিলল না। জীবনের পথে চলতে চলতে টমসন ও মেরী প্রায় ভুলেই গেলেন তার কথা। নিয়তির চক্রান্ত—একদিন এই শিলঙের পাহাড়ে ফের তার সঙ্গে দেখা। চিরদিনের দুশ্চরিত্র মদ্যপ রবার্ট। মিলিটারীর আইন ভঙ্গ ক'রে কঠিন শাস্তি পেয়েছে; স্বাস্থ্য ভগ্ন-প্রায়; কর্ম-হীন অবস্থা, দুর্দশার চরমে উপনীত হয়েছে। এদিকে ঘরে তখন তার এক পাহাড়ী বউ, তিন-চারটি ছেলেমেয়ে। রবার্টের কাতর যাচ্ঞায় মেরী ও টমসনের হৃদয় দ্রব হ'ল। নিজে যে বাড়ীটা এখানে শখ করে কিনেছেন, তারই অদূরে একটি ছোট্ট বাড়ী সস্তা দামে কিনে দিলেন। অর্থ-সাহায্যে রক্ষা করলেন পরিবারটাকে। ক'টা বছর আবার নির্বিঘ্নে অতিবাহিত হ'ল। টমসন সস্ত্রীক ঘুরে বেড়ান কর্মস্থানে। ছেলে ডিক থাকে দেরাদুনে হোষ্টেলে, মেয়ে স্টেলা দার্জিলিঙের কনভেন্টে। শিলং তাদের সকলেরই প্রিয় স্থান। ছুটি হলেই সকলে এসে সমবেত হন। মেরী ফুলে-ফলে সজ্জিত করে তোলে বাড়ী; টমসন এসে ঘুরে বেড়ান পাহাড়ে পাহাড়ে শিকারে, আর ডিক এবং স্টেলার প্রচণ্ড আকর্ষণ হচ্ছে ঘোড়া—রাগবী। রবার্টের কাছ থেকেই কেনা হয়েছিল রাগবীকে। সঙ্গীও জুটে গেল—রবার্টের ছেলেমেয়ে বব ও হেলেন। ছুটিতে ছুটিতে এসে চারজনে মিলে তারা ঘুরে বেড়ায়—কোথায় কোন্ পাহাড়ের শিখরে-শিখরে, কোন্ অগম্য ঝর্ণার ধারে ধারে, চেরাপুঞ্জির গহন অরণ্যে —নিত্য নূতন স্থানে তাদের আনন্দ-অভিযান। প্রথমে মেরী কোন আশঙ্কা করে নি। বরঞ্চ ছেলেমেয়ের স্ফূর্তিতে আমোদই পেত। দিনে দিনে শঙ্কিত হয়ে উঠল। মায়ের প্রাণ, সন্তানের অমঙ্গল-শঙ্কা জাগে পদে পদে। রবার্টকে সে অন্তর থেকে বিশ্বাস করতে পারে না, বব ও হেলেনকেও নয়। পড়াশুনায় ববের মন নেই, দুঃসাহসিকতায় সে উন্মত্ত। ওদিকে হেলেন প্রজাপতি-স্বভাবা। রূপ-চর্চায়, লাস্য-লীলায় সুনিপুণা। ক্ষণে ক্ষণে ভবিষ্যৎ ভেবে মেরীর বুক দুর্-দুর্ করে ওঠে। মেয়ের জন্যই তার বেশী ভয়। স্টেলা জন্ম থেকে রুগ্ন, ক্ষীণ-স্বাস্থ্য, সযত্ন লালনে বড় হয়ে উঠেছে। নম্র, শান্ত, লজ্জাশীলা সে। ওদের সঙ্গে হুজুগে মেতে বিপদের মুখে সে এগিয়ে যায়—মেরী ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বারে বারে

বাধা দিতে চায়। ডিক মায়ের সঙ্গে তর্ক ক'রে অন্তরঙ্গ বোনটিকে দলে টেনে নেয়; বলে—অমনি করে ঘুরে বেড়িয়ে ওর স্বাস্থ্য যাবে ফিরে, দেখো তুমি।

মেয়ে বাপের কাছে এসে দাঁড়ায়। তার মুখ কাল, চোখ সজল। অভিমানের অন্ত নেই। দেখে পিতৃ-হৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে। মেয়ে যে তাঁর ব্যথা পাবে এ তিনি সইতে পারেন না। অতএব ডিক এবং স্টেলাদের ভ্রমণে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে না। দু'ভাই-বোন হোষ্টেলে বসে দিন গোণে—কবে কলেজ বন্ধ হবে, তারা শিলং যাবে, রাগবীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়বে অজানার পথে। ববেরও ছিল একটা ঘোড়া—জকি। চারজনে সেই দু'টো ঘোড়া নিয়ে পিক্‌নিক্ করবে দূর-দুরান্তরে, ছবি তুলবে, সমবয়সী ক'টি প্রাণী মিলে গল্প-গুজবে হবে মাতোয়ারা। তখন তাদের এমনই একটা বয়স যখন মা-বাবার আকর্ষণের চেয়ে অনেক বেশী আকর্ষণ সঙ্গী-সাহচর্যের। কত ছুটিতে মেরী টমসন অন্যখানে বেড়াতে গিয়েছেন, স্টেলা ও ডিক চলে এসেছে শিলং। ডিকের স্বভাবে মা-বাবার স্বভাব মেশানো ছিল। বাইরে সে টমসনের মতই প্রাণোচ্ছল, স্নেহ-পরায়ণ; দুর্জ্ঞেয়কে জেনে এবং দুরূহের সাধনায় ব্রতী হয়ে তার অসীম আনন্দ। কিন্তু স্বভাবের অতলে তলিয়ে ছিল গভীর নিষ্ঠা। বিদ্যার্জনে সে ফাঁকি সইতে পারত না, যাকে একবার ভালবাসত সে ভালবাসায় এতটুকু খাদ থাকত না। মা-বাবার প্রতি ছিল তার অসীম শ্রদ্ধা এবং বোনের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা দেখে গর্বে তৃপ্তিতে টমসন ও মেরীর বুক ভরে উঠত—তাঁদের খাদহীন ভালবাসার দু'টি পুষ্প। মেরী প্রার্থনা করত —হোলি মাদারের কৃপায় সংসারের মলিনতা যেন কোনদিন তার সন্তানদের স্পর্শ না করে।

সেবার ডিকের ফাইন্যাল পরীক্ষার বছর। স্টেলারও সিনিয়র-কেম্ব্রিজ-পড়া শেষ হবে। স্থির হয়েছে—কয়েক মাসের জন্য সবাই মিলে লণ্ডনে বেড়াতে যাবেন। ডিক সেখানে ব্যারিষ্টারী পড়বে, স্টেলাও ভর্তি হয়ে যাবে ইউনিভার্সিটিতে। গ্রীষ্মের ছুটিতে শিলং যাওয়া হ'ল না, দু'জনেই পড়ায় ব্যস্ত। টমসন আর মেরী আছেন নৈনিতালে। পরীক্ষা-শেষে ভাই-বোন মা-বাবার কাছে যাবে। সিনিয়র-কেম্ব্রিজ পরীক্ষা শেষ হতে-না-হতে খবর পাওয়া গেল—রবার্টের ছেলে বব স্টেলাকে বিয়ে করেছে!

শিলঙে ছুটে এল ডিক, মেরী, টমসন। কোন ফল হ'ল না। রবার্ট ব্যবস্থা দিয়ে প্রচুর টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বাড়ী বন্ধক রেখে পরিবারবর্গ নিয়ে পালিয়েছে—কোথায়, কেউ জানে না।

কেঁদে ফেলে মেরী বললে—এতদিনে রবার্ট তার আক্রোশ মিটিয়ে নিল। এ সব তারই শয়তানী। টমসনও বুঝলেন—রবার্ট আগে থেকেই ফন্দি ক'রে সব ঘটিয়েছে।

তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজা হ'ল ভারতবর্ষ। ডিক ক্ষিপ্ত-প্রায় হয়ে নানা দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াল—ইউরোপ, আমেরিকা, নিউজিল্যাণ্ড—যে যেখানে বললে। কিছুতেই সে বিশ্বাস করতে পারলে না—তার প্রতি হেলেনের ভালবাসা ছলনা, ববের বন্ধুত্ব কপটতার নামান্তর। ওদের বিশ্বাসঘাতকতা, অকৃতজ্ঞতা এবং এই অপমান তাকে তিলে তিলে দগ্ধ করলে। দেহমন ভেঙে পড়ল, মা-বাবার কাছে মুখ দেখান হ'ল ভার। মা যে অনেক আগেই এমনি-এক অঘটনের আশঙ্কায় তাকে সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন। ঘনিষ্ঠ বন্ধু বব এবং হেলেন সম্বন্ধে কোন সন্দেহ সে পোষণ করতে পারে নি। মেরী একবার ডিককে হোমে পাঠিয়ে দেবার অভিমত প্রকাশ করেছিল, ডিক রাজী হয় নি। যুক্তি দেখিয়েছিল—এখানকার পড়া সাঙ্গ ক'রে তবেই হোমে যাওয়া সঙ্গত। কিন্তু আজ তার নিজের কাছে অজানা নেই যে, কিসের মোহে মায়ের কথায় সে স্বীকৃত হয় নি। কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে বন্ধুত্ব হয়েছে বব আর হেলেনের সঙ্গে। রূপময়ী লাস্যবতী হেলেনের মায়াঞ্জন লেগেছিল চোখে, রঞ্জিত হয়েছিল মন, সে মোহপাশ ছিন্ন করা তার সাধ্য ছিল না। হেলেন তাকে কথা দিয়েছিল—ডিকের এখানকার পড়া সাঙ্গ হলে সেও তার সঙ্গে হোমে যাবে, সোস্যাল সায়েন্স্ পড়বে।—মিথ্যাবাদিনী, ছলনাময়ী, সর্বনাশী!

ডিক উন্মত্তের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল। বব শঠ, ধূর্ত, স্বার্থবুদ্ধিপরায়ণ; কি তার যোগ্যতা আছে, কোন্ গুণে সে স্টেলার মত মেয়েকে ভুলিয়ে নিলে। স্টেলার স্বামী—বব!—যতবার কথাটা মনে জাগে, দেহে মনে আগুন জ্বলে ওঠে; রোষে ডিক গুমরে মরে। রাতের পর রাত ঘুমোতে পারল না। কঠিন অসুখ গ্রাহ্য করলে না। কেবল ওদের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে শেষে একদিন শয্যা নিলে। বহু প্রয়াসে মেরী ও টমসন যখন তাকে নিজেদের কাছে ফিরিয়ে আনলেন তখন তার শেষ অবস্থা। মৃত্যুর ক'দিন আগে ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিল রাগবীকে দেখবে।

হয়ত ভেবেছিল—সুখের সঙ্গী, অবলা জীব, সে-ই বুঝতে পারবে তার মূক বেদনা। হয়ত-বা তাকে আদর ক'রে সে একটু আনন্দ পেতে চেয়েছিল কিন্তু বাসনা রইল অপূর্ণ। ক'দিন বাদেই ডিক হার্টফেল করলে।

মেরী শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। কিছুদিনের মধ্যে সেও বিদায় নিলে। প্রজ্জ্বলিত প্রতিহিংসা এবং বজ্রদগ্ধ অন্তর নিয়ে প'ড়ে রইলেন টমসন। অবসর গ্রহণের পর শিলঙ এসে সুদীর্ঘ চোদ্দ-পনের বছর নিঃসঙ্গ-জীবন যাপন ক'রে চলেছেন—কবে ওরা ফিরে আসবে, নিজের হাতে তিনি প্রতিশোধ নেবেন, শান্ত হবে তাঁর মন।

—এতদিনে ওরা এসেছে—সাহেব অতীত স্মৃতির পুনর্জাগরণে ভূকম্পের আন্দোলনে আন্দোলিত হতে লাগলেন। বিড় বিড় ক'রে বললেন—গুলী রাগবীর জন্ম নয়, ধূর্ত শেয়ালদের জন্ম…।

চোখের সামনে ভেসে উঠল স্বপ্নের দেখা দৃশ্যটি—লালে লাল আকাশ মাটি, রক্ত-গঙ্গা বয়ে গেছে, ফেটে পড়েছে আগ্নেয়গিরি, ভিতরের পাক-খাওয়া গলন্ত ধাতু-স্রোত ভাসিয়ে নিচ্ছে দিক্‌দিগন্ত…।

পাগলের মত অট্টহাস্য ক'রে উঠলেন টমসন—কাউকে রেহাই দেবেন না তিনি, কাউকে না।

—বাবা।

প্রবল চমকে সাহেব ফিরে তাকালেন। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল চিন্তাজাল।

—বাবা, আমি স্টেলা।

কুড়ি-একুশ বছরের ক্ষীণ-স্বাস্থ্য হাস্যোচ্ছল তরুণী নয়, চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের পরিণত-বয়স্কা এক মহিলা—বর্ণ-গোলাপী আভায় সমুজ্জ্বল, নারীত্বের পূর্ণ বিকাশে অপরূপ মহিমা-মণ্ডিত। কিছুক্ষণ টমসন তাকে চিনতেই পারলেন না, বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইলেন। স্টেলা—সেই মেরীর চোখের মত চোখ, নীলচে উজ্জ্বল, বিষণ্ণতায় মর্মস্পর্শী। গত রাত্রে এ চোখ দুটিই কি তিনি স্বপ্নে দেখেছেন! সাহেব অস্থির হয়ে উঠলেন, শক্ত ক'রে বুকে চেপে ধরলেন বন্দুকটা। মাথা নেড়ে ব'লে উঠলেন—না, না, না।

স্টেলা এগিয়ে এল। ক্লিষ্ট মুখে বললে—বাবা, আমি—।

কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে পড়ল কান্নার মত। সাহেব আরও চঞ্চল হলেন। তাঁর ঠোঁট নড়তে লাগল।

—কিছু বলছ, বাবা?

—কেন, কেন এসেছ তুমি, যাও, যাও—সাহেব পিছিয়ে গেলেন কয়েক পা।

স্টেলা তাকিয়ে রইল। ঢোক গিলে বললে—রাগবী যে ভীষণ চিৎকার করছে, আমি এসেছি রাগবীকে, রাগবীকে…।

টমসন তাকালেন। 'রাগবী' শব্দটিই মাত্র কানে গিয়েছিল।—রাগবীকে দেখতে এসেছ। না এসে কি তুমি পার মা!

সাহেবের স্বরে স্টেলার চোখে জল এল। মাথা হেঁট করলে। সাহেব আর সে মুখ থেকে চোখ ফেরাতে পারলেন না। লজ্জানত মুখখানা তাঁর কতদিনের বুভুক্ষা মিটিয়ে দিলে। এক মুহূর্তে মন শান্তি ও তৃপ্তিতে ভ'রে গেল। এই ত তাঁর সেই পরিচিত স্টেলা। রাগবীর চিৎকারে ও যে দূরে থাকতে পারে নি; লজ্জা শঙ্কা সব ভুলে ছুটে এসেছে! কোমল ভীরু স্টেলা, নিজের হাতে ছোলা খাওয়াত রাগবীকে, আব্দারে অভিমানে আনন্দে প্রফুল্লতায় অহরহ কেড়ে নিত বাপের মন।

রাগবী জলের জন্ম মুখ বাড়িয়ে বিকট আর্তনাদ ক'রে উঠল। সচেতন হয়ে ফিরে টমসন তার গায়ে হাত রাখলেন—ভাখ্‌, রাগবী, কে এসেছে। তোরই জন্মে ওর এখানে আসবার সাহস হয়েছে রাগবী, তোরই জন্মে…। সাহেবের স্বর কাঁপতে লাগল। স্টেলা মুখ তুলতে পারল না। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে নিজেকে শক্ত রাখল। রাগবী অবিরাম চিৎকার ক'রেই চলেছে। স্টেলা উদ্বেগে আকুল হ'ল। শুষ্ক কণ্ঠে দ্রুত ব'লে গেল—বাবা, বব কাল রাত থেকে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছে, একটুও ঘুমোতে পারে নি।

—কে?

সাহেব ভ্রূকুটি করলেন। চোখ ত নয়, যেন জ্বলন্ত এক টুকরো অঙ্গার। মরিয়া হয়ে স্টেলা বললে—ডাক্তার যে তাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছেন, রাগবীকে শান্ত কর বাবা।

বলতে বলতে সে আতঙ্কে দূরে সরে গেল। বব তাকে গেট থেকেই আসতে বাধা দিয়েছিল। সাহেবের কাছে যাওয়া বিপদ্‌জনক। সে নিষেধ স্টেলা শোনে নি। বব রাগবীর চিৎকারে ঘুমোতে পারছে না, উত্তেজিত হয়ে উঠেছে; রবার্ট পুলিসে খবর দিতে উদ্যত;—স্টেলা উদ্বেগে ছুটে এসেছে। এ বৃদ্ধ বয়সে টমসন আবার কোন্‌ হাঙ্গামা বাধিয়ে বসেন কে জানে! ববের কাছ থেকে সে কি শোনে নি সাহেবের শোচনীয় অবস্থা? কিন্তু সাহেবের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে তার প্রাণ কেঁপে গেল। টমসন যেন দৃষ্টি দ্বারা দগ্ধ ক'রে ফেলবেন স্টেলাকে!

—মা, চলে এস।

রিন্‌ রিন্‌ ক'রে বেজে উঠল একটি কচি গলার স্বর। বছর সাত-আটেকের একটি মেয়ে গেটের বাইরের লোক ঠেলে পার হয়ে ভিতরে ঢুকল। ছুটতে ছুটতে এসে জড়িয়ে ধরলে স্টেলাকে—মা।

সাহেবের কঠিন দৃষ্টিতে বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠল—হুবহু ছোট্ট স্টেলা, তেমনি কাঁকড়া কাঁকড়া কোঁকড়ানো চুল, তেমনি দৌড়োবার ভঙ্গি, পাতলা রিনরিনে গলা—স্বাস্থ্য-সুন্দর মেয়েটি আরও বেশী মনোহারিণী। সাহেবের দৃষ্টি নিস্পলক হয়ে রইল। সে দৃষ্টিতে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল স্টেলা। মেয়েকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে কঠোর স্বরে বললে—কেন এখানে এসেছ, অবাধ্য মেয়ে? মেয়েটির মুখের দীপ্তি নিভে গেল। করুণ কণ্ঠে বললে—তুমি এস।

—যাও, এক্ষুণি যাও। এই মুহূর্তে—।

ছোট্ট মেয়েটি বিমর্ষ মুখে ধীরে ধীরে চলে যেতে লাগল, ফিরে ফিরে মায়ের দিকে তাকালে। সাহেব নড়ে উঠলেন, ঝুঁকে পড়ে কি বলতে গেলেন, দৃষ্টিতে ফুটে উঠল তীব্র তিরস্কার। স্টেলা বিচলিত হ'ল। মনে পড়ল—ছোট ছেলেমেয়ে টমসনের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তারই সমবয়সী ছেলেমেয়েদের নিমন্ত্রণ করে কত খাওয়াতেন, পকেট-ভর্তি আনতেন টফি-লজেন্স; তার হাতে দিতেন, সে সকলকে বিতরণ করত। সে যেন কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেকার কথা নয়, কোন ঘটনাই যেন ঘটে যায় নি। সে-ই বাড়ী, সেই গাছের তলা, সেই স্টেলা ও টমসন—স্নেহের দৃঢ়-বন্ধনে-আবদ্ধ। স্টেলা সম্মোহিতের মত বললে—ওর নাম লুসি, ডাকব ওকে?

সাহেব ভ্রুকুঞ্চিত করে নিজেকে সামলে নিলেন।

এদিকে রাগবীর ধ্বস্তাধ্বস্তিতে তার পায়ের বাঁধন আল্‌গা হয়ে গিয়েছিল, ভাঙা পায়ে আঘাত খেয়ে সে এক বিকট চীৎকার করে উঠল। স্টেলা সচকিত হ'ল। একবার তাকিয়ে দেখল ও বাড়ীর দিকে। দ্রুত এগিয়ে এল খানিকটা, কাতর-স্বরে বললে—বাবা, আমার কথা রাখ। বব অসুস্থ, তার বিশ্রাম প্রয়োজন। রাগবীর চীৎকারে ঘুমোতে পারছে না।

—এই জন্যে তুমি এসেছ?

সাহেব যেন বুলেট ছুঁড়ে মারলেন। রক্তহীন মুখে স্টেলা তাকাল—বাবা!

ছোট মেয়েটির ম্লান-করুণ মুখখানা ওর মুখের ছায়ায় চকিতে ভেসে গেল। সাহেব অশান্ত হয়ে উঠলেন। খিঁচিয়ে উঠে বললেন—কি চাও তুমি, রাগবীকে থামিয়ে দেব? খুশী হবে? তবেই তুমি খুশী হবে?

স্টেলা অপ্রতিভ কাতর মুখে চেয়ে রইল।

সাহেবের অস্পষ্ট সুর শোনা গেল—খুশী হবে, খুশী, তাই হোক, তাই...।

সাহেবের মুখে দেখা গেল অদ্ভুত এক হাসির ভঙ্গিমা, যেন কান্নার নামান্তর। বন্দুক উঠালেন, হাত কাঁপল না, দৃষ্টি ফিরল না, শুধু শব্দ হ'ল—ক্লিক্, গুড়ুম্।

শেষবারের মত ক্রেন্দারব তুলে রাগবী একতাল মাংসপিণ্ড হয়ে গড়িয়ে পড়ল। নিষ্ঠুর ঔৎসুক্যে সাহেব মেয়ের দিকে তাকালেন—এই ত চেয়েছিলে? আর ত কোনও প্রয়োজন নেই?

একটা একটা করে প্রত্যেকটি শব্দ তিনি অতি কষ্টে যেন উচ্চারণ করলেন। স্টেলার মর্ম বিদ্ধ হ'ল। মাথা নত হয়ে গেল। হতভাগ্য বৃদ্ধ, সব হারিয়ে পোড়া বটগাছের মত টিকে আছেন। রাগবীও ছিল, সে-ও গেল—স্টেলা মুখ ফিরিয়ে রুমালে চোখ মুছে ফেললে। প্রবল ইচ্ছা জাগল—একটি গভীর চুম্বন এঁকে দিয়ে যায় পিতার লোল-রেখাঙ্কিত কপালে। আর কি কোনদিন তাঁর এত কাছে সে আসবার সুযোগ পাবে? আসতে ভরসা পাবে? সে ধীরে সাহেবের দিকে অগ্রসর হ'ল।

—স্টেলা, কেন দেরি করছ, চলে এস। বব ডাকছে, বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছে, শীগ্‌গির এস। কোথা যাচ্ছ, এস, তাড়াতাড়ি।

দু'বাড়ার দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে রবার্ট। চোখে তার ক্রুর উল্লাস, মুখে দৃপ্ত অবজ্ঞা। স্টেলাকে টমসনের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে সে উত্তেজনায় ঝুঁকে পড়েছে। তড়িৎ-স্পৃষ্টের মত টমসন ফিরে দাঁড়ালেন। হুকুমের স্বরে মেয়েকে বললেন—না, যাবে না, যেতে পাবে না।

স্টেলা বিবর্ণ হয়ে গেল। একবার দেয়ালের দিকে, একবার টমসনের দিকে তাকাল।

—স্টেলা, স্টেলা।

চকিত হয়ে উঠল স্টেলা। বব বিছানা ছেড়ে বারান্দায় এসে ডাকছে—দরজার পাট ধরে দাঁড়িয়েছে, নিজের হাতের উপর কাত হয়ে আছে তার মাথা।

—ও মাই গড্, উঠে এসেছে, বব্, বব্...।

সব ভুলে স্টেলা দ্রুত ফিরে চলল সেদিকে, আগুন জ্বলে উঠল টমসনের চোখে। পলক ফেলতে না ফেলতে গর্জে উঠল বন্দুক, পর পর গুলী বেরিয়ে গেল, ধোঁয়ায় চীৎকারে নিদারুণ বিভীষিকার সৃষ্টি করলে। বব ঝাঁপিয়ে পড়ে সাহেবকে জাপটে ধরলে। হাত থেকে তাঁর বন্দুক পড়ে গেল। লোক জড়ো হ'ল। ধোঁয়া কমলে দেখা গেল—অদূরে স্টেলার রক্তাপ্লুত দেহ পুঁটলি হয়ে পড়ে আছে; গেটের কাছে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে আছে স্টেলার ছোট্ট মেয়েটি; দেয়ালের পাশে রবার্ট ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হাত-পা নিয়ে মরণ-যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে; ও-বাড়ীর দরজা পর্যন্ত গিয়ে বিঁধেছে গুলী, কিন্তু, বব কাত

হয়ে পড়ে যাওয়াতে অক্ষতই রয়েছে; আর, এদিকে বয়ের দৃঢ়-বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ থেকে টমসন অট্টহাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে ভেঙে পড়ছেন—শয়তান, স-ব শয়তান। রাগবীকে চুপ করাতে পাঠিয়েছে, ওদের কাছে ফিরে যাবে, হা হা হা···আর কোন প্রয়োজন নেই? হা, হা, হা—ফের যাবে···হা হা হা···টমসনকে চেন না, হা হা··· কৃতঘ্ন, শয়তানের দল।

—০✽০—

বাংলা কথাসাহিত্যে বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ

শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী

যদিও বাংলা কথাসাহিত্যের বয়স দেড়শ' বছরের বেশী নয়, আর বোধ হয় ধরে নিতে পারি প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'ই তার আদি গদ্য কথা-গ্রন্থ, তবু বিস্তৃতি আর গভীরতায় বাংলা সাহিত্য যেন অন্য অন্য প্রদেশের সাহিত্যের চেয়ে বেশ একটু এগিয়ে গেছে।

অনেকেই বলেছেন, বাংলা দেশে বাঙালী লেখক ও পাঠকের জীবনে ইংরেজী আমল থেকেই ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব বেশী রকম প্রতিফলিত হয়েছে। কেননা কথাসাহিত্যে প্যারীচাঁদ, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের সমস্ত রচনাতেই আমাদের সাহিত্যের ভারতচন্দ্র মুকুন্দরাম আদি কবি লেখকদের প্রভাবের চেয়ে বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব বেশী দেখা যায়।

আর সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ে তখনকার দিনের বিশেষ কোন শৌর্য-বীর্যের ইতিহাস-ঐতিহ্যহীন বাঙালীর জীবনে কোন এক নিগূঢ় দেশপ্রেমের আদর্শের প্রেরণায় ও আকাঙ্ক্ষায় তাঁদের সকল রচনাতেই বিভিন্ন প্রদেশের বহু চরিত্র এসে ভিড় করেছে। তাই এসে দাঁড়িয়েছেন পৃথ্বীরাজ, রাণা প্রতাপ, রাজসিংহ দেশপ্রেমের প্রতীক রূপে; এবং রাজস্থানের নারীরা সংযুক্তা, পদ্মিনী, কর্মবতী, কৃষ্ণকুমারীরা সতীধর্ম তেজস্বিতা বীরত্ব আত্মত্যাগের পরম আদর্শরূপিণী হয়ে।

যদি কথাসাহিত্যের সীমানাকে গদ্য ছাড়াও কাব্য কাহিনীর এলাকায় মিলিয়ে দেওয়া যায়, তা হ'লে রাজস্থানের কাহিনীর জাতীয় বিশিষ্টতা নিয়ে সর্বপ্রথম কাব্য কথা লেখেন কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। পদ্মিনী উপাখ্যান ও অন্য অন্য কাহিনী।

এবং সেই মনোভাবের ধারা-পথেই আমাদের সর্বপ্রথম যে উপন্যাস গ্রন্থ আমরা পেয়েছি, সেটা হ'ল বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী। যার ঘটনার স্থান হ'ল বাংলা দেশের গড়মান্দারণ, কিন্তু নায়ক-নায়িকা জগৎসিংহ, ওসমান, আয়েষা একেবারেই অন্য প্রদেশের বীর ও রূপসী তেজস্বিনী নারী। এক কথায় বলা যায়, বাংলা ভাষায় প্রথম ঔপন্যাসিকের প্রথম বইয়ের উপাদান ও প্রধান চরিত্র অবাঙালী বা অন্য প্রদেশীয়। কিন্তু সেদিনের বাঙালীর মন রাজস্থানী জগৎসিংহ, পাঠান বীর ওসমান, অপূর্বচরিত্রা আয়েষাকে অন্য প্রদেশের লোক মনে করে নি। যেন বাঙালী বলেই আপনার করে নিয়েছিল। তার পরবর্তী উপন্যাসে কপালকুণ্ডলাতেও মতিবিবি, কপালকুণ্ডলা—পেষমন সংবাদেও আমরা আগ্রা দিল্লী ও বাংলার এক অপূর্ব সংমিশ্রিত সাক্ষাৎ ও আলাপ দেখতে পাই। যাতে বাঙালিনী পদ্মাবতীর সহসা মতিবিবি রূপে মোগল শাহজাদার সখি স্বরূপিণী হওয়া আর আবার একেবারেই বাঙালী মেয়ের ভাবে ভাবিতভাবে পেষমনের সঙ্গে গল্প করাও আমাদের সেকালের পাঠকদের কাছে আশ্চর্য কিছু মনে হয় নি। 'মৃণালিনী' উপন্যাসেও হেমচন্দ্র বাংলা দেশের ছেলে, মনোরমা বাঙালীর মেয়ে রূপে চিত্রিত হয়েছেন। গিরিজায়া ত খাঁটি বাঙালী বোষ্টুমের মেয়ে (বৈষ্ণবী নয়)। যে 'মথুরা' নগরের বিবাগিনী মধুর-হাসিনী নাগরীকে খুঁজে বেড়ায় কীর্তন গান গেয়ে যেখানে সেকালের বাংলার রাজধানী নবদ্বীপ আর উত্তর প্রদেশের মথুরা নগরী এক হয়ে মিশে গেছে যেন। এবং 'মথুরা-বাসিনী' মৃণালিনী আর মথুরা-বাসিনী নন, বাঙালিনী হয়ে গেছেন। এর অনেক পরে রাজসিংহ রচিত হয়। তাতেও রূপনগরা রাজকন্যা

সখীরা রাজপুতানীরা বাঙালীর মনে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। যে ভাবেই হোক, যে কারণেই হোক, কোন্ ক্ষোভ কোন্ আশা কোন্ দুঃখ আমাদের সাহিত্য, সাহিত্যিক ও পাঠকদের রাজস্থানের ভাবে অভিভূত করে দিয়েছিল তা আর বিশেষ করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা এই সাহিত্যের আদি উৎসই ছিল দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার স্বপ্ন।

রমেশচন্দ্রের চারখানি উপন্যাসেও আমরা ঐতিহাসিক দিল্লী আগ্রার কাহিনী পাই। বাঙালী নায়কের গার্হস্থ্য চিত্র ও প্রেম মোহ তাতেও মিলে-মিশে আছে 'বঙ্গবিজেতা' ও 'মাধবীকঙ্কণে'। তাঁর পরের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'জীবনপ্রভাতে' এঁকেছেন মহারাষ্ট্র জীবনের প্রভাতসূর্য শিবাজী মহারাজ, সাধারণ সৈনিক রঘুনাথ হাবিলদার এবং বিশ্বস্ত অনুচর 'তানাজী'। 'জীবনসন্ধ্যায়' এসেছেন রাজস্থানের অস্তগামী বীর-প্রমুখ।

এক কথায় সে শতাব্দীতে যেন বাঙালী লেখকরা দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে দেশপ্রেমের প্রেরণায় রাজস্থানী মারাঠী বীরদের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিলেন।

এর কয়েক বছর পরেও সেকালের সরলা দেবী সম্পাদিত (১৩০১।১৪) 'ভারতী'তে দেখা গেল অবনীন্দ্রনাথের 'রাজকাহিনী'। রাজস্থানী বীর রাণা-মহারাণাদেরই নিয়ে আর এক রকমের অপূর্ব চিত্রকথাময় কাহিনীতে যেন পূর্ব লেখকদের রচনার নব উপসংহার। মেবারের শিহ্লোট বংশের শিলাদিত্য, গ্রহাদিত্য, বাপ্পারাও, হাম্বীর, লছমী রাণী কমলাবতী আদি লেখার গুণে আবারও যেন আমাদের ঘরের লোক হয়ে গেছেন।

আর রাজস্থানের কাহিনী শেষ হয় নি আজও। দেশ স্বাধীন হবার পর এই সেদিনও আমরা পেয়েছি শ্রীদেবেশ দাশের 'রাজোয়ারা'। এমন আরও বই আছে।

এই দেশপ্রেমের ভাবে অনুপ্রাণিত লেখা রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনীতেও পেয়েছি আমরা। সেও কথাসাহিত্যই, যদিও ছন্দোবদ্ধ ও ভাষার মাধুর্যে অতুলনীয় কাব্য। কবি রাজপুত মারাঠীদের বীর-কাহিনী ছাড়াও শিখ ধর্মগুরু ও শিখ বীরদের নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। দু'একটি কথায় রাজস্থানের মরুপ্রান্তরময় গ্রাম-জীবনের চিত্র এঁকেছেন, দ্বিপ্রহরে দুর্গপ্রাকারে প্রহরারত সৈনিকের স্বল্পমাত্র আহার্য জোয়ারের রুটি সেঁকে নেওয়ার কথাও ভোলেন নি।

এমন কি, কথাসাহিত্যের আর এক দিক্ ব'লে যদি নাট্য-সাহিত্যকে ধরে নেই, তা হ'লে মধুসূদন থেকে গিরীশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলালও ওই বিভিন্ন প্রদেশের বীরসম্প্রদায়ের দেশপ্রেম, সতীকথা, আত্মত্যাগ নিয়ে নাটক রচনা করেছেন।

গিরীশচন্দ্রের 'সৎনাম' নাটকও অন্য প্রদেশের সৎনামী সাধু সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও দেশপ্রেমের এক কাহিনী—মোগল যুগের। এই সঙ্গে স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের কথাও মনে হয়। তিনিও সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নেতা কুনওয়ার সিং বা কুমার সিংহের বীরত্ব কাহিনী নিয়ে তাঁর 'অমর সিংহ' উপন্যাস লেখেন।

কিন্তু এঁরা এই রাজস্থানী রাজা, মারাঠী বীর, শিখগুরু, ঝাঁসির রাণী, তাঁতিয়া তোপী, নানা সাহেব, কুমার সিংহ প্রমুখ যাঁরা বারে বারে আমাদের বাংলা সাহিত্যে দেখা দিয়েছেন, তাঁরা কেউই প্রায় সাধারণ শ্রেণীর মানুষ নন, রাজা মহারাজা, রাণী মহারাণী ও সামন্ত সর্দার জমিদার শ্রেণী এবং ধর্মসম্প্রদায়।

ভিন্ন প্রাদেশিক সাধারণ মানুষের সাধারণ কথা তখনও সাহিত্যের উপজীব্য হয় নি মনে হয়।

২

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর আবির্ভাবের পরেই যেন সহসা এই বীর, মহাবীর, রাণা, মহারাণা, রাণী, বাদশা, বেগম, নবাব, রাজা নিয়ে লেখা সাহিত্যের জোয়ারে ভাঁটা পড়ল।

এবারও ইংরেজী সাহিত্যের সংস্পর্শ থেকেই বোধ হয় পাওয়া এ যুগের অনেকের মনে প্রতিবেশী প্রদেশ, প্রতিবেশী মানুষের জীবনযাত্রা কেমন তা দেখার কৌতূহল দেখা দিল।

দেখতে পেলাম, প্রায় ৬০।৬৫ বছর আগের সরলা দেবী সম্পাদিত 'ভারতী'তে যতীন্দ্রমোহন সিংহের লেখা 'উড়িষ্যার চিত্র' নামে রচনাবলী। দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত উড়িষ্যার জমিদার বীরভদ্র মর্দরাজ তাঁর অনুচর, কর্মচারী, নায়েব, গোমস্তা, জ্যোতিষী, গণক, পুরোহিত এবং তন্ত্র গৃহিণী তেলহলুদ প্রসাধিতা পানগুণ্ডি বিলাসিনী প্রতাপান্বিতা সূর্যমণি, বীরভদ্রের পূর্বস্ত্রীর কন্যা শোভাবতী ও শোভাবতীর বিবাহ-কাহিনী নিয়ে সে চিত্রাবলী।

তাতে খণ্ড খণ্ড ভাবে উড়িষ্যার গ্রামের সমাজের যে চিত্র পাওয়া যায়, দেবালয়, পাঠশালা, ভাগবতঘর, অন্তঃপুর, মহাজন, পঞ্চায়েত, প্রজা, খণ্ডাইত্ জাতি নিয়ে এমন সমাজ-চিত্রময় লেখা এর আগে বা পরে কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। উড়িষ্যার দেউল, মন্দির, শিল্প, তীর্থ, স্থাপত্য নিয়ে ইংরেজী বাংলা অনেক বই

আছে, কিন্তু মানুষ নিয়ে, সমাজ নিয়ে এই একটি মাত্র বই ছাড়া আর লেখা আছে কি না জানি না।

এবং এই সময়েই এই ভারতীতেই দেখেছি 'বিহারে বাঙালিনী' নামে কয়েকটি বিহারের অন্তঃপুরচিত্র। যাঁরা প্রবাসে থেকে বাংলা আচার ও ভাষা প্রায় ভুলে গেছেন তাঁদের কথা। অনামিকা রচনা। লেখক বা লেখিকার নাম ছিল না। বিহারের মানুষ নয় কিন্তু।

আমাদের প্রায় পাশাপাশি প্রদেশ এবং তখন ত বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম এক 'সুবা' বা প্রদেশই ছিল। ভাষা অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু কোন ভাষাভাষীর তখনও পরস্পরে অন্য-ভাষীয় সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহল দেখা যায় নি। বাঙালী অনেক—বহুদিন ধরে সে সব জায়গায় বাস করলেও। তবু বিহার নিয়ে কিছু লেখা আছে। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের ছোট ছোট গল্পে একটু-আধটু বিহারের মানুষ দেখা গেছে—যদিও খুব কমই। বনফুলের ছোট ছোট গল্প আর বড় লেখাতেও কিছু চিত্র পাওয়া যায় রোগী ও চিকিৎসক সংবাদে ও সাধারণ নরনারী নিয়েও। সবচেয়ে বড় করে বা বেশী করে পাওয়া গেছে শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ীর '৪২-এর পটভূমিকায় 'জাগরী'তে। পরে 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে'। শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের বহু লেখাতেও আমরা বিহারের গ্রামের কথা ও গ্রামীণ মানুষ দেখতে পাই। 'স্বর্গাদপি গরীয়সী'তে ত ওদেশের নরনারী ও বাঙালী মিলে-মিশে আছেন। যতীন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বিহার চিত্র'ও স্মরণীয় আইন-আদালত কথা নিয়ে। 'মানসী ও মর্মবাণী'তে প্রকাশিত হয় ১৩২৫।২৬ বা ঐ সময়ে।

রাজশেখর বসু মহাশয়ের 'গড্ডলিকা'য় 'ভূষণ্ডির মাঠে'র শিবুর জন্মান্তর কুন্নার মধ্যে 'কারিয়া পিরেত' রূপে। আর 'তেত্রিকে মাই'য়ের আঁতুড়ের চিত্র। বিহারের গ্রাম-জীবনের একটি অদ্ভুত নিখুঁত নবজাতকের কথা।

বসু মহাশয়ের 'গাণ্ডেরীরাম বাটপাড়িয়াকে'ও অন্য প্রদেশীয়ের নিখুঁত একটি চিত্রের মত পাই। যেন কবিকঙ্কণের ভাঁড়ু দত্তের মত একটি অমর চিত্র। যে কোন মুহূর্তে 'রাম রামজী' বলে এসে সামনে দাঁড়ালেই চিনতে পারা যাবে। এককথায় পরশুরামের 'কারিয়া পিরেত' 'তেতরী'র মা'ই হোক, বা 'গাণ্ডেরীরামই' হোক তারা চিরকালের প্রচ্ছদে প্রতীক মানুষ।

এই সময়ের কিছু আগে বা সমসময়েই আমরা বিহার প্রসঙ্গে আর একখানি বই পেয়েছিলাম, যার তুলনা বাংলা সাহিত্যে আর নেই মনে হয়। সেখানি হচ্ছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক'। সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' ও রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রে'র মত এই লেখকও যেন পাহাড়, পর্বত, নদী, প্রান্তর, বন-অরণ্যময় প্রকৃতির রূপের সমুদ্রে ডুবে গেছেন। কিন্তু সহসা সবিস্ময়ে চোখে পড়ে, শুধু প্রকৃতিই নয়, দেশকালাতীত মানব-জাতির সঙ্গেও লেখক একাত্ম হয়ে গেছেন। সব মানুষই সর্বত্রই তাঁর আপনার জন। সব গ্রাম, সব দেশ, নদ-নদী, পাহাড়, বন, দিন-রাত্রি, ঋতু, মাস, রৌদ্র, জ্যোৎস্না, ফল, শস্য তাঁর হৃদয়ের স্পন্দনের সঙ্গে রক্তের স্রোতের সঙ্গে মিশে গেছে। চিনা ঘাসের দানা, কলাইয়ের ছাতু, কেঁদ ফল, মকাই শস্য, সাঁওতাল রাজা দোবরু পান্না, তার মেয়ে এঞ্জিন-ঝাড়া কয়লাকুড়ানী রাজকন্যা ভানুমতী, শুধুমাত্র ছ'আনা দামের একখানি লোহার কড়ার ঐশ্বর্য-লোভী দরিদ্র পেয়াদা মুনেশ্বর সিং (যে কড়াতে তার ভাত রান্না, রুটি করা হবে, রাত্রে মাথায় দিয়ে শোওয়াও চলবে!) অপদেবতা, পশুর দেবতা, জিনপরী অলৌকিক কাহিনীর সঙ্গে লেখক একীভূত হয়ে গেছেন। দরিদ্র নর্তক ধাতুরিয়া ধাওতাল সাহু ফুলের 'বাগান পাগল' গনোরী তেওয়ারীদের নিয়ে লেখকও যেন পাঠকের চোখের সামনে দাঁড়ান। যেন শোনা যায়, চুপি চুপি যুগলকিশোরকে লেখক বলছেন, "এই সব ফুলের গাছের কথা সে যেন কাহাকেও না বলে। তাহলে তাহাকে ত লোকে পাগল ভাবিবেই, সেই সঙ্গে আমাকেও বাদ দিবে না।"

এবং বই শেষ হলেও লেখকের সঙ্গে আমরা সরস্বতী কুণ্ডীর আশপাশের বনভূমির কথা, পশুপাখী, নানারকম মানুষ-ভরা পূর্ণিয়ার গ্রাম্য-জীবনের 'নাড়াবইহারে'র কথা চুপিচুপি ভাবি। যারা আমাদের কল্পনার মাঝে উঁকি-ঝুঁকি মারে বারে বারে।

কিন্তু আমাদের সে কল্পনা রেললাইনের পাশের নদী বন-প্রান্তর মাঠ জঙ্গলই শুধু চেনে আর দেখেছে।

'উড়িষ্যার চিত্রে' উড়িষ্যার মানুষ, সমাজ-জীবন পাই, প্রকৃতিকে পাই না। 'ছিন্নপত্র', 'পালামৌর' কবি দর্শক, দেখেছেন, নিজের অন্তর মন দিয়ে অনুভব করেছেন। কিন্তু বিভূতিভূষণ বিদেশ মানুষ প্রকৃতিতে একেবারে মিশে গেছেন সব দেহ মন সত্তা প্রেম ভালবাসা দিয়ে। পাঠকের মনেও যার ছোঁয়াচ লাগে।

অবনীন্দ্রনাথের 'ভূতপতরীর দেশে'ও কতকটা এই ভাব আছে। কিন্তু সে চিত্রশিল্পীর দেখা এক চিত্রজগত।

৩

উত্তরপ্রদেশ বা আগেকার ইউ. পি. যুক্তপ্রদেশ নিয়ে বিশেষ কোন লেখা কোন লেখকের আমরা দেখি নি। অথচ সে-সব দেশে প্রবাসী বাঙালী অনেক ছিলেন। তার কারণ একটা মনে হয়, যুক্তপ্রদেশ ত আসলে বিরাট্ ভাবে একটা জোড়াতাড়া দেওয়া দেশ। আগ্রা, অযোধ্যা, কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা, আবার হিমালয়ের গাঢ়োয়াল, সবশুদ্ধ তার সীমানাও যেমন বিস্তৃত, পাঞ্জাব রাজস্থান, বিহার পাশাপাশি নিয়ে গঙ্গাযমুনার সঙ্গে সঙ্গে তেমনি তীর্থও পায়ে পায়ে। সুতরাং মানুষ যে কত দেশের কত রকমের, ধরনের, জাতি ও ভাষায় তার আর শেষ নেই। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষেত্রী, অন্য বর্ণ ও সম্প্রদায় যাদের জাতি পাঁতি আচার-ব্যবহারের কোন ঠিক ধরন নেই। কাশী অযোধ্যার সভ্যতাধারার সঙ্গে আগ্রা লক্ষ্ণৌর ধারা মেলে না। পাহাড়ীদের সঙ্গে সমতলের মানুষের আকাশপাতাল তফাৎ। পাঞ্জাবী উড়িয়া বাঙালীর মত একধরনের মানুষ তারা নয়।

সাধারণ মানুষের অবশ্য দু' একটা ছোট গল্প 'উত্তরা' পত্রিকায় দেখেছি পূর্ণশশী দেবীর লেখা ইউ পি'র লোকের কথা।

মধ্যপ্রদেশ সম্পর্কেও সে দেশবাসীর কথা নিয়ে ঐ কারণেই নানা প্রদেশীয় ধরন বলেই বিশেষ কোন লেখা হয় নি মনে হয়। অবশ্য ঐতিহাসিক রচনা আছে কিছু কিছু রাজা মহারাজা নিয়ে।

৪

দিল্লী পাঞ্জাববাসীরা আমাদের সাহিত্যের জগতে অবশ্য আছেন। যদিও দিল্লীবাসীরা সেই মোগল আমলের কেল্লা প্রাসাদ হারেমেই আজও রয়েছেন। আর পাঞ্জাবীরা রইলেন শিখধর্মগুরুদের ও শিখবীরদের ত্যাগ ও শৌর্যের ইতিহাসে। দিল্লী পাঞ্জাবের সাধারণ হিন্দু মুসলমান আমাদের সাহিত্যে আজও অচেনা। হিন্দু জাঠচাষী গুজর আহীর বণিক্ ক্ষেত্রী ব্রাহ্মণ তাঁদের আচার-ব্যবহার আনন্দ সৌজন্যের সঙ্গে আমরা মোটেই পরিচিত নই। বাঙালী নিমন্ত্রণ খেয়ে আসেন ডাক্তার উকীল সম্প্রদায় হিসাবে—রাজকর্মচারী হিসাবেও। কিন্তু তাঁরাও আমাদের অচেনা, আমরাও অচেনা তাঁদের।

আর বিরাট্ যে সাধারণ মুসলমান সম্প্রদায়, যাঁরা নবাব বেগম 'রইস' নন। নানারকম ব্যবসায়ী জরীজড়া ও কারুশিল্পী, দোকানওয়ালা, শালকর, ধুনকর, রংরেজ, ফলওয়ালা, গায়ক, বাদক, সৌখীন দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের উর্দু হিন্দী মিশ্র মধুরভাষা, সৌজন্যময় ব্যবহারের জীবনযাত্রার ধরনের কথা আজও কারুর জানা নেই। এবং হয়ত কেউ জানলেও বলতে পারেন নি। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী মহাশয়ের মহাস্থবির জাতকেই সামান্য দু'এক জায়গায় দেখেছি। এককথায় এই সাধারণ শ্রেণীর পাঞ্জাবী ও দিল্লীওয়ালাদের আমরা এখনও চিনি না।

দাক্ষিণাত্যের বিষয়েও এই কথাই আসে। মাদ্রাজ, অন্ধ্র, কেরল, মালাবার, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর সব শুধু আমাদের বেড়াবার ও তীর্থময় জায়গা। কোনার্ক থেকে কুমারিকা অবধি সেতুবন্ধ রামেশ্বর নিয়ে লেখা সবটাই আমাদের তীর্থভ্রমণ কাহিনী। দেশ-দর্শন কথাই আছে সেই বহু লেখায়। কিন্তু দক্ষিণের মানুষ আর ভাষা, তাঁদের সমাজ আর আচার-ব্যবহার প্রায় অজানাই আছে। উত্তরের চেয়েও অজানা তাঁরা।

সাধারণ মারাঠীদের সম্বন্ধে নিতান্ত একালে দু'এক-খানা বই পাওয়া গেছে চারু দত্ত মহাশয়ের লেখা 'পুরণো কথা' ও গল্প কুঞ্জরাও। এবং শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসুর লেখা ওই দেশের ছোট গল্প (বিচিত্রায় প্রকাশিত) কয়েকটি। আর শ্রীমতী অমিতাকুমারী বসুর লেখা বই অনুবাদ গল্প 'মহারাষ্ট্রী উপকথা'। কিন্তু খুব বেশী লেখা দেখা যায় না।

গুজরাটিদের নিজেদের সাহিত্য খুব সমৃদ্ধ হলেও, সে দেশের মানুষ আমাদের বাংলা দেশে অনেক থাকলেও, তাঁদের সমাজ, রীতি-নীতি, মানুসজন নিয়ে কোন রচনাই আমার চোখে পড়ে নি। রাজস্থানের বা রাজোয়াড়ার কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু তাতেও দেখা যাবে, সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার কথা কিছুই কেউ বলেন নি। সে-সব লেখায় আমাদের পরাধীনতার গ্লানির দুঃখকে সরিয়ে দিয়ে আমাদের পুরাণো ঐতিহ্যের স্বাধীন দিনের শৌর্যবীর্যময় রূপকে ফোটানর একটা চেষ্টা-বিশেষ ছিল।

আর সে সব ঘটনা, কাহিনী, কথা ত ইতিহাসাশ্রিত, কাজেই যুদ্ধবিগ্রহ বীরত্ব-কথাই তাতে পাওয়া যায়।

এবং সেই ইতিহাস ইংরেজ ও মুসলমান ঐতিহাসিক-দের কাছে পাওয়া। সে সব দেশের গ্রামীণ নরনারীকে তাই তাতে খুঁজে পাওয়া যায় না।

এ ছাড়াও প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, আগে পরেও যাঁরা ওসব দেশে বাস করেছেন, তাঁরাও ভাষা, পর্দা, আচার-ব্যবহারের ভেদাভেদের জন্যও মানুষের ঘরোয়া পরিচয় পান নি, বিশেষ করে পর্দার জন্য। যে কারণে পাশাপাশি বাস করেও আজও হিন্দুরা মুসলমানের ঘরের কথা জানেন না। মুসলমানও হিন্দুদের কমই জানেন।

অবশ্য এ যুগে অনেক জায়গায় মেশামেশি বেড়েছে, পর্দাও ছিঁড়েছে, আন্তঃপ্রাদেশিক কুটুম্বিতাও সুরু হয়েছে দু'এক জায়গায়; কিন্তু সে স্তর ত জনসাধারণের স্তর নয়—চল্লিশ কোটি মানুষের এক কোটিও তাঁরা নন। ইংরেজী শিক্ষিত স্তর তাঁরা।

কাজেই শাস্ত্র, পুরাণ, ধর্ম, তীর্থ, তীর্থকৃত্য, এমনকি নাম-গোত্রের অবধি মাদ্রাজ-পাঞ্জাব-গুজরাট কাশ্মীর সুদূর উত্তর-দক্ষিণের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মিল থাকলেও কখনও ভাষা, কখনও সামাজিক আচার, কখনও স্থানীয় রীতি-নীতির জন্য আমাদের প্রাদেশিক জীবনের সাধারণ স্তর পরস্পরে প্রায় অচেনাই আছে।

৫

যদিও এখন বর্মা বিদেশ, ভারতের অঙ্গ ও অংশ ছিল দু'দশক আগে। ব্রহ্মদেশ—এই বর্মার কথাও আমরা কথাসাহিত্যে পেয়েছি, শরৎচন্দ্রের 'ছবি' গল্পেতে আর 'শ্রীকান্তে' কিছু। এবং শ্রীমতী সীতা দেবীর লেখা কয়েকটি গল্পেও কিছু পাওয়া যায়। পাশাপাশি দেশ আসামের মানুষের কথা নিয়ে বই মাত্র একখানিই সম্প্রতি চোখে পড়েছে 'পূর্বপার্বতী'। একশ্রেণী আসামের মানুষের 'তুকতাক', 'গুণীডাইনী' বাধাবিধি লোক-সমাজচিত্র খানিকটা তাতে পাওয়া যায়।

এবং আন্দামান নিয়েও এঁরই লেখা আর একটি বই 'সিন্ধুপারের পাখী'তে অপরাধী ভবঘুরে নানা জাতির ও দেশের আবহাওয়ার কথা—নরনারীর প্রেমের ঈর্ষার কাহিনী পাই। লেখকের নাম শ্রীপ্রফুল্লকুমার রায়।

এই সঙ্গে প্রাদেশিক ঠিক বলা যায় না, আঞ্চলিক বলা যায়, সাঁওতাল জাতি ও কয়লাকুঠীর মজুর মানুষগুলি নিয়ে শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা গল্পগুলি খুব সমাদৃত হয়েছিল—প্রায় ত্রিশ বছর আগে।

আর এখন বিদেশ,—একান্তভাবেই একদিন যে স্বদেশ ছিল সেই পাকিস্থানের সাধারণ মানুষের কথা, চমৎকার ছোট ছোট গল্পে, শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র আর শ্রীঅচিন্ত্য সেনগুপ্ত মহাশয়ের কলম থেকে পাওয়া গেছে। কত আপনার অথচ কত সুদূর আপনজনের ছবির মত মানুষগুলি ফুটে উঠেছে যেন। দেশ বিভাগের আগেও যেমন, পরেও তেমনি যেন আছে!

মোটামুটি আমাদের কথাসাহিত্য তবু কয়েকটা প্রদেশের মানুষকে চেনবার, জানবার চেষ্টা করেছে মনে হয়;

আগের কালে ছিল ইতিহাসাশ্রিত—অর্থাৎ পরের মুখে ঝাল খাওয়া। একালে এসেছে নিজের চোখে দেখা, কানে শোনা, মেলামেশার কৌতূহল।

তবু মনে হয় হয়ত বহু ভাল লেখকের ভাল লেখা আমার চোখে পড়ে নি। যার কারণ বড় তাড়াতাড়ির ও প্রচারের যুগ এটা। বই বেরুতে বেরুতেই বছর শেষ হয়ে যায়। প্রকাশক অসতর্ক হয়ে পড়েন। লেখক আবার লিখতে বসেন। পুরণো লেখাতে উদাসীন হয়ে যান। ভাল লেখা হলেও বইগুলি সব যেন বেঠিকানা হয়ে যায়।*

* নিখিলভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের ১৩৬৮ সালের কলিকাতা অধিবেশনে পঠিত।

শ্রীমতী ও মতি

শ্রীতপতী মুখোপাধ্যায়

রায়দের প্রাসাদোপম বাড়ীর মঙ্গলাঙ্গনে যে সব দুধে-আলতায় দাঁড়িয়েছে তারা সুন্দরী বটে, কিন্তু শ্রীমতীর মত নয়। কে যেন বলেছিল সপ্তদশী সেই বধূকে দেখে—এ যেন এক জলপ্রপাত,—তেমনি অপূর্ব রূপের প্রবাহ, তেমনি গম্ভীর, তেমনি বিস্ময়কর, তেমনি প্রবল। রূপের সঙ্গে মিলিয়ে শ্রীমতীর বলিষ্ঠ চরিত্র, আভিজাত্যের অহঙ্কার, পিতার ও পতির অর্থের গৌরব, বংশাভিমান। কিন্তু সব কিছুর চেয়ে বিস্ময়কর তার ঘড়ির কাঁটার মত নির্ভুল ব্যবহার। যাকে যা দিতে হয়, যতটা পরিমাণে, তা মেপে মেপে দেয় শ্রীমতী,—কোথাও উচ্ছ্বাস নেই, কোথাও কার্পণ্য নেই, কোথাও দারিদ্র্য নেই। ব্যালান্স তার চরিত্রের মূলমন্ত্র।

শ্রীমতীর সঙ্গে প্রথানুযায়ী যে দাসী এসেছিল বাপের বাড়ী থেকে, তার নাম মতি। তার নামেও যেমন শ্রী-টি বাদ গেছে, তেমনি তার চেহারায়। অপরূপ সুন্দরী শ্রীমতীর সাভরণ উজ্জ্বলতার পাশে সে যেন এক ছায়া, কুৎসিত ছায়া। স্বভাবও তার

তেমনি অশোভন। যেমন ঝগড়াটে, তেমনি কর্কশ।

শ্রীমতীর মেজো দেবর রসিক ছোকরা। বলে, "বৌদিদির মাতাঠাকুরাণী যে এত দাসী থাকতে কেন ঐ ভীষণ কুচ্ছিৎ দাসীটিকে পাঠালেন জানিস্? আলোর পাশে কালো যেমন আলোকে ফুটিয়ে তোলে—তেমনি ওর কুশ্রীতা নতুন বৌদির সুশ্রীতাকে ফুটিয়ে তুলবে ব'লে।" আসলে তা নয়, শ্রীমতীদেরই বাড়ীতে জন্ম মতির, একই বৎসরে, আর চিরদিন শ্রীমতীর সেবা সে করেছে আপ্রাণ, কেঁদে-কেটে সেই মতিই এসেছে সঙ্গে।

শ্রীমতী ক'মাস পরেই তার বিয়ে দিয়ে দেয়—স্বামীর পুরাণো চাকর রঘুর সঙ্গে। লোকে বলে, "বা, যেন মাণিকজোড়।" আশ্চর্য্য এই, যে রঘুকে মতি আগে "গুণ্ডা," "ওরাং-ওটান" (কলকাতার চিড়িয়াখানায় এই জীবের সঙ্গে লোমশ বেঁটে রঘুর আশ্চর্য্য মিল দেখে) ব'লে ডাকত, কোমর বেঁধে কোঁদল করত—বিয়ের পর সে সতী স্ত্রী বনে গেল। শ্রীমতী হেসে বলে, "সিঁদুরের গুণ।"

তাদের চারজনের দাম্পত্য জীবন সহজ ছন্দেই চলে, তবে ওরা চারজন, প্রভু আর ভৃত্য, একই প্রাসাদের বাসিন্দা—এইটুকুই শুধু মিল।

নইলে ওদের জীবনের ছন্দ আলাদা, তাল মান লয় আলাদা। বন্ধুবান্ধব মোসাহেব আত্মীয়র দল জগৎলালকে তারিফ করে—পুরুষস্য ভাগ্যম্ বটে। শুনে খুশী হয় জগৎলাল—আর হবে না কেন, অমন স্ত্রী, যার ব্যবহারে, চেহারায়, চরিত্রে কোন ত্রুটি নেই—সমছন্দ কাব্যের মত—নয় ব্যাকরণের শব্দরূপের মত নির্ভুল।

জগৎলাল স্ত্রীকে আদর করে বলে, "লক্ষ্মীর প্রসাদ পেয়েছিলেন বংশের পূর্ব্বপুরুষেরা—আর লক্ষ্মীকেই পেলাম আমি।" আর নারায়ণের মত সাড়ম্বরে তাঁর লক্ষ্মীকে তিনি আদর দিয়ে ঢেকে রাখেন। তবে, জগৎলালের আদর-প্রেম সবই চোখে দেখা যায়—গহনা, সাড়ী শুধু নয়, বাড়ী, জমিদারী শেয়ারের আকারে তা শ্রীমতীর পায়ের কাছে এসে পড়ে—অর্থশালী ব্যস্ত পুরুষের উচিত প্রেমার্ঘ্য।

মতিও কিছু পায় স্বামীর কাছে। তাও চোখে দেখা যায়। বড় ধেনো খেতে ভালবাসে রঘু, আর খেয়ে তার পৌরুষ হ'ল মতিকে নিরর্থক পেটানো। মতির অঙ্গে তাই "আদরের চিহ্ন" থাকেই—কালশিরে বা কাটা দাগ। কিন্তু মতির সন্তান হবার সময় ঐ রঘু ঘরের সামনে বসে মতির চেয়েও জোরে কাঁদে, ওর অসুখ হ'লে মায়ের মত স্নেহে সেবা করে।

মতি যদি কখন রেগে বলে, "দেখ ত, এবারও বিয়ের তারিখে বড় জায়গীর একটা দেবেন বাবু দিদিমণিকে আর তুমি! একটা কুঁড়ে ঘরেরও সংস্থান নেই—বুড়ো বয়সে কি করব বল ত আমরা!"

রঘু হেসে বলে, "তুই থাকতে আমার বাড়ীঘর দরকার নেই রে, তুই-ই আমার সম্পত্তি।" মোটা রুপোর খাড়ু দেয় সে বৌকে। কিন্তু কি বিড়ম্বনা, সেই খাড়ুরই আঘাতে রঘুর নেশা প্রায় ছুটে যায়, রেগে বলে—"আমারই ঘাড়ে পেত্নীটা ভর করল?"

আবার বছর ঘুরে ঘুরে আরো এক বিবাহ সাম্বৎসরিক আসে। গতবার ছিল মফঃস্বলে সিনেমাঘর, এবার দেবেন জাগীর—এক বিধবার সম্পত্তি সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে।

জাগীর দেখতে যাবেন জগৎলাল, সঙ্গে রঘু চাকর—প্রিয়মথ গাড়ীতে মাল বোঝাই করছে শ্রীমতী নিজে দাঁড়িয়ে। অবশেষে মিষ্টি করে বলে, "গিয়ে টেলিগ্রাম ক'রো।" এও বলতে ভোলে না যে বিধবাটির কান্না দেখে যেন গলে গিয়ে বেশী টাকা না দিয়ে বসেন জগৎলাল। জগৎলাল স্ত্রীর পার্থিব জ্ঞানে খুশী হয়ে বলেন—"পাগল হয়েছ।"

গাড়ী ছেড়ে দেয়—মার্ব্বেলের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে শ্রীমতী ভাবে—'যাঃ, ভুলে গেলাম আসল কথা বলতে।' মনে করেছিল একবার কথার ছলে বলবে তার জায়ের ছোট বোনের হীরের মানতাসার কথাটা—তা হ'লেই জগৎলাল তার ইচ্ছাটা বুঝে নিতেন।

মতিও বাসন মাজা ছেড়ে ছাই হাতে গালে হাত দিয়ে বলে, "যাঃ, ভুলে গেলাম আসল কথা বলতে।" রঘুর জন্যে সে নিজের বকৃশিস বাঁচিয়ে রেখেছে—ন্যাকড়ায় মোড়া তার সে দান কি এখনও দেওয়া যায় না? বাবু কি দেখতে পাবে? থাক্ মদ ও দিয়ে, তবুও। দৌড়ে যায় মতি—গাড়ী মন্থর গতিতে বেরুচ্ছে। পিছনে বসে রঘু—ওকে দেখে গর্ব্বিত হাসি হাসে। ন্যাকড়া-বাঁধা আনা ক'টা ছুঁড়ে দেয় মতি, গাড়ীর জানালায় বেধে পড়ে যায়—আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদে মতি।

পরদিন বিকালে শ্রীমতী গা ধুয়ে চুল বাঁধছে। পিছনে দাসী দাঁড়িয়ে রুপোর কাঁটা, সোনার চিরুণী এগিয়ে দিচ্ছে। হাতীর দাঁতের চিরুণীতে সিঁদুর নিয়ে সীমন্তরেখা রঞ্জিত করার জন্যে নিটোল শুভ্র

হাতের বঙ্কিম-রেখা মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ হয়ে থাকে। মোহিনী নিজেই নিজের প্রতিবিম্বে মুগ্ধ যেন।

কিন্তু সিঁদুর সীমন্তে পৌঁছবার আগেই মহা বিপর্য্যয় ঘটে গেল। শ্রীমতীর এক দেওর পাগলের মত দরজা ঠেলে ভিতরে এসে প্রলাপ বকার মত এলোমেলো বলতে থাকে—"সর্ব্বনাশ হয়ে গেল, সর্ব্বনাশ হয়ে গেল বৌদি—দাদা—দাদা আর নেই, মোটর এক্সিডেন্টে—"শ্রীমতী তখনই মূর্চ্ছাহত হয়ে মর্ম্মর মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে। সেই মোটর এক্সিডেন্টে রঘু চাকরও প্রাণ হারিয়েছে।

শোকের হিম যেন সারা বৃহৎ বাড়ীটাতে চির-শৈত্যের নিষ্প্রাণতা এনে দেয়। শ্রীমতী, সেই সাভরণা দৃপ্তা রাণী যেন আজ রিক্তা সন্ন্যাসিনী, শৈত্যের রাজ্যের হিম-প্রতিমা। লোকে অবাক্ হয়ে দেখে, চমৎকৃত হয়ে বলাবলি করে, এই ত আদর্শ নারী।

বিবাহিত জীবনের প্রাচুর্য্য ঠেলে ফেলে দিয়েছে সে, সোনার অঙ্গ নিরাভরণ, শ্বেতবসনা শুধু সে, নিজেদের শয়নকক্ষের ঐশ্বর্য্য ছেড়ে চলে গেছে পূজোর ঘরের পাশে যেখানে আসবাব নেই, মখমলের উপাধানের কোমলতা নেই, দর্পণের দর্প নেই—আছে কেবল তার ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি আর স্বামীর দেয়াল-জোড়া অয়েল-পেন্টিং।

যেমন শ্রীমতীর বিবাহিত জীবনে ছিল লক্ষ্য যে প্রতি পাদক্ষেপে লক্ষ্মীর প্রসাদ ফুটে উঠবে সংসারে, এখন তেমন তার লক্ষ্য হ'ল কি করে দান-ধ্যান, উপবাস, ব্রত নিয়ম পালনে, কৃচ্ছ্রসাধনে তার বৈধব্যের শুচিতার যশ ছড়িয়ে পড়বে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-পরিজন, আশ্রিত অনুগৃহীতের দল একবাক্যে শ্রীমতীর পুণ্যের যশ প্রচার করে। মন্দিরের পুরোহিতদের আয় বেড়ে যায়।

আর মধ্যে মধ্যে এঁরা যখন পুণ্যবতী বিধবার ধূপসুরভিত ঘরের ব্রতরতা শ্রীমতীর কাছ থেকে বাইরে এসে দেখেন, যে, সংসারের দশ কাজের মধ্যে মতি ঠিক আগের মতই লেগে আছে, পরণে তার শ্রীমতীর পরিত্যক্ত রঙীন সাড়ী, তার কণ্ঠস্বর কখনও ঝগড়া, কখনও উচ্চহাস্যে ধ্বনিত হচ্ছে কলতলা থেকে, তখন তাঁরা চোখ কপালে তুলে বলেন—"আচ্ছা, ওরও ত স্বামী গেছে। ছোটলোকগুলোর কি প্রাণধর্ম্ম থাকে না?" মতি তাঁদের দেখে হেসে কুশল সম্ভাষণ করে, তাঁরা মুখ বেঁকিয়ে চলে যান। শ্রীমতী শেষে মতিকে ডেকে বলে—"ওরে, অন্ততঃ হাতের গয়না, নাকের গয়না খোল্, রঙিন শাড়ী খোল্, লোকে নিন্দে করছে যে।" মতি অবাক্ হয়ে যায়, তার পর বলে,—"দিদিমণি কি বলছ, এই কাঁচের চুড়ি সে নিজে হাতে আমাকে পরিয়েছে যাবার আগে, আর নাকের ফুল—জান, কতদিন কত কষ্টে ধেনো মদ না খেয়ে তবে পয়সা জমিয়েছিল সে।" শ্রীমতী পরম বিরক্তি ভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়—ছোটলোকের কথাই আলাদা।

বছর ঘুরে যায়—বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে আসে আমের বোলের গন্ধ, গাছে গাছে আম ধরে। এ বাড়ীর যে আমবাগান এ অঞ্চলে প্রখ্যাত আর তাতে জগৎলালের বাবার লাগানো একটি দশেরা আমের গাছ ছিল। এই আমের একটু ইতিহাস আছে। জগৎলাল আর রঘু চাকর যখন বালক তখন এই গাছে প্রথম আম ফলে, নতুন ধরণের ছোট ছোট আম, আর তার মিষ্টি রসে অমৃতের স্বাদ, দুই বালক খেলা করতে করতে তা প্রাণ ভ'রে খেত। তারা বড় হ'ল, কিন্তু পৃথিবীর এত রকমের ফল খেয়েও জগৎলালের যেমন তৃপ্তি হয় না, তার ক্রোড়পতির সৌখিন রসনার বিচারেও শ্রেষ্ঠ ঐ লোভনীয় ছোট আম, তেমনি দরিদ্র রঘুর মোটা ভাত, আর কুচি লঙ্কা তেঁতুল খাওয়া জিভেও এ সুরভিত মধু আমের কাছে কেউ নয়। ঐ আমের লোভ যেন দুজনকে একসূত্রে বেঁধে রাখত—তাদের দুজনের স্ত্রীরাও সস্নেহে হাসত তাদের কাণ্ড দেখে।

এবারও বাগান থেকে ঝুড়িভর্ত্তি আম যথানিয়মে এল বাড়ীতে। শ্রীমতীর যে ছোট জা তার আহারের পরিচর্য্যা করে, সে সযত্নে সাজিয়ে নিয়ে গেল শ্বেত-পাথরের থালায় এই আম আর ঘরের তৈরী মিষ্টি, আজ নির্জ্জলা একাদশীর উপবাসের পর শ্রীমতী খাবে।

আহার শেষ হ'ল। একটি আম আর খেতে পারে নি শ্রীমতী, মতি বাসন তুলতে আসাতে তাকে সেটি সাদরে দিয়ে বলে "নে, খা।"

কিন্তু মতির এ কি হ'ল! সে সেই অর্দ্ধভুক্ত আমের দিকে তাকিয়ে দেখলে—তার পর হাতের আমটি ছুঁড়ে শ্রীমতীর পায়ের কাছে ফেলে দিলে, যেন ওটা জলন্ত অঙ্গার। তার পর জীবনে এই প্রথম অন্নের সামনে বুকফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে ছুটে বেরিয়ে চলে গেল ঘর থেকে। শ্রীমতী তার অবাধ্য

খেয়ালে বিরক্ত হয়ে ভাবতে লাগল, হঠাৎ হ'ল কি মতির? কিন্তু মতির জন্যে ভাবনার সময় তার নেই, সামনে এক গুচ্ছ ড্রইং পড়ে, নানান স্থপতিদের কাছ থেকে ওগুলো আনিয়েছে সে—তার স্বামীর নামে সহরে একটা স্তম্ভ করবে। সবচেয়ে আড়ম্বর যার নক্সার, অথচ, দামটা খুব সুবিধার 'কোট' করেছে, সেইটির দিকে মনোযোগ দেয় সে।

আর নিচের তলায়, কয়লার ঘরের পাশে যে ছোট অন্ধ কুঠরী ছিল তাদের দুজনের ঘর, সেখানে অন্ধকারে মাটিতে লুটিয়ে মতি কাঁদে—'রঘু, রঘু, রঘু।'

বিপ্লবী যোগী রসিক

(স্মৃতিচারণ)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

শ্রীঅরবিন্দের অদ্ভুত টানে দেশ-বিদেশ থেকে ভেসে আসত কত রকমেরই যে বিচিত্র মানুষ: সাধু, ব্রহ্মচারী, কবি, দার্শনিক, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, লেখক, শিল্পী, দেশসেবক ···আরও যে কত নোঙরহারা যাযাবর যাদের নেই সংজ্ঞা, উপাধি, চালচুলো। এদের মধ্যে একটি বিচিত্রতম মানুষের সঙ্গে আমার হঠাৎ ঘনিষ্ঠতা হয় পণ্ডিচেরীতে—বিশ বৎসর আগে। তিনি স্বনামধন্য শ্রীহৃষীকেশ কাঞ্জিলাল—সর্বশ্রদ্ধেয় বীর, রসিক, পণ্ডিত, বক্তা, বিপ্লবী তথা শঙ্করপন্থী সন্ন্যাসী—দশনামী সম্প্রদায়ের। মহাযোগী ভোলানাথ গিরি তাঁকে হরিদ্বারে সন্ন্যাসে দীক্ষা দিয়ে নাম দেন বিশুদ্ধানন্দ গিরি। কিন্তু আমরা সবাই তাঁকে "ঋষিদা" বলেই ডাকতাম—তিনিও আপত্তি করতেন না। বলতে কি, তাঁর কিছুতেই আপত্তি ছিল না, বলতেন প্রায়ই: "আমি ঝালে ঝোলে অম্বলে সব তাতেই আছি ভাই, নাম নিয়ে কি হবে?" গেরুয়াধারী, শুদ্ধাচারী অথচ গৃহীদের সঙ্গে গৃহী, অনাচারীর সঙ্গে সহজিয়া। সংস্কৃতে অসামান্য বহুপাঠী, অথচ হাসিখুসিতে শিশুসরল। সর্বোপরি, চিন্তায় ভাবুক অথচ আচরণে উচ্ছল রসরাজ! এক কথায়, একটি অবিস্মরণীয় মানুষ যাকে বলে।

তাঁর কথা প্রথম শুনি বন্ধুবর শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের মুখে। নলিনীদা সম্প্রতি সপরিবারে পণ্ডিচেরি আশ্রমবাসী হয়েছেন, যদিও শ্রীঅরবিন্দকে তিনি গুরু বলতেন প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে—যে সময়ে বারীনদা, উপেনদা, ঋষিদা ও মতিদার (শ্রীমতিলাল রায়) সঙ্গে তিনিও গুরুর কাছে যোগশিক্ষা করতেন পণ্ডিচেরির সদ্যোজাত যোগাশ্রমে। তাঁর কাছে কত যে শুনতাম ঋষিদার অন্তহীন রসিকতার গালগল্প! তার পরে বারীনদার কাছে শুনি ঋষিদার দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যের তথা অবিশ্রান্ত প্রাণশক্তির কথা, যে-প্রাণশক্তিতে বারো বৎসর আন্দামানে বাসের পরেও ভাঁটা পড়ে নি। আর উপেনদার মুখে শুনতাম তাঁর দুঃসাহসিকতার কথা।

দুঃসাহসী ব'লে দুঃসাহসী! যে-মানুষ গৃহী হয়েও বিপ্লবের আগুনে ঝাঁপ দেয়, তীক্ষ্ণধী হয়েও (ঋষিদারই ভাষায়) "ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে"—ধ্রুব নিরাপদকে ছেড়ে অধ্রুব সঙ্কটযাত্রার নেশায় মাতে, আর ক্ষণোচ্ছ্বাসের ঝোঁকে নয়, জেনেশুনে, যে, দেশকে জাগাতে গিয়ে জীবন বিপন্ন করলেও দেশ জাগবে না—("এ বিপুল ঘুমের দেশে ভাই লোকে যে জাগতে না জাগতে ফের ঢুলে পড়ে"—বলতেন ঋষিদা প্রায়ই) মাঝ থেকে ফল হবে শুধু হাতের পাঁচ খুইয়ে সর্বস্বান্ত হওয়া—দুঃসাহসী বলব না তাকে? শ্রীঅরবিন্দ ও বারীনদার গুরু বিষ্ণুভাস্কর লেলের কথাও ঋষিদার মুখে শুনতাম। "লেলে মহারাজ যোগী ছিলেন বটে ভাই," বলতেন ঋষিদা, "নৈলে ভাবো, মনকে একদম খাঁ খাঁ শূন্য করতে পারে কেউ? শ্রীঅরবিন্দ এঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে তবে না পেরেছিলেন গীতার 'ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ' নির্দেশটি পালন করার কৌশল আয়ত্ত করতে? জান ত?"

জানতাম বৈ কি। কারণ গুরুদেব ১৯৩২ সনে ৮ই মে তারিখে একটি পত্রে আমাকে স্বহস্তে লিখেছিলেন যে, লেলের নির্দেশে চ'লে তিনদিনে তিনি এমন চিন্তাশূন্যতায় আসীন হয়েছিলেন যে-ভূমিকা থেকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া

যায়, কি ভাবে চিন্তারা আসে বাইরে থেকে * আমাকে লিখেছিলেন যে, লেলের কাছ থেকেই তিনি প্রথম এ আশ্চর্য অবস্থার হদিস পান, তার আগে তিনি জানতেন না যে, কোন্ চিন্তাকে আসতে দেব না দেব স্থির করবার মতন আত্মকর্তৃত্ব যোগবলে অর্জন করা যায়। এ বিষয়ে আমার ইংরেজী স্মৃতিচারণ Sri Aurobindo Came to Me-তে লেখা আছে বিশদ ক'রেই। তবু এ প্রসঙ্গের উল্লেখ করলাম শুধু ঋষিদার যোগতাত্ত্বিকতার খবর দিতে।

এই খবর দেওয়ার কিছু প্রয়োজন আছে এই জন্যে যে, ঋষিদা সচরাচর ঘুণাক্ষরেও আভাস দিতেন না তিনি অন্তরে কতবড় নির্ভেজাল যোগী—শান্ত, স্থির, অনাসক্ত। আমাদের সঙ্গে হাসিগল্পেই কাল কাটাতেন, যাকে গ্রাম্য ভাষায় বলে "ফষ্টিনষ্টি"। কি হাসাতেই যে পারতেন! সময়ে সময়ে তাঁর কথায় হাসতে হাসতে আমাদের সত্যিই পেটে খিল ধ'রে যেত। এমনই গুপ্তযোগী ছিলেন তিনি যে, এর ওর তার সঙ্গে আমি প্রায়ই বলাবলি করতাম—ঋষিদার নিজমূর্তির খবর পাওয়া ভার, ছদ্মবেশী তিনি স্বভাবে। তা ছাড়া বারো বৎসর আন্দামানে কাটিয়ে এসেও এ সরসতা বজায় রাখা সম্ভবে!—ক'জন পারে এহেন অসাধ্য সাধন করতে? ইত্যাদি।

কিন্তু আমি ছিলাম স্বভাবে নাছোড়বান্দা ত—ছেঁকে ধরতাম তাঁকে: "এহো বাহ্য ঋষিদা—আগে কহুন আর," ব'লে। তখন তিনি বলতেন—সব সময়ে নয় তবে মাঝে মাঝে। ভাগ্যক্রমে তাঁর কয়েকটি আত্মকাহিনী প্রবন্ধে তথা গল্পাকারে প্রকাশ করেছিলাম—তাই থেকে কিছু উদ্ধৃত করি অকুতোভয়ে। (একটু রং ঢং দিয়েই বলব—তবে মূল আখ্যান ও ভঙ্গি বজায় রেখে।)

"কেন জানি না ভাই, আমাদের এই মনঠাকুরের লীলাখেলার তল পাবে কে বল?"—বললেন ঋষিদা একদিন—"তবে ঠাকুর বলেছেন না, মন ধোপা-ঘরের কাপড়, লালে ছোপাও লাল, নীলে নীল—তাই হয়ত বৈরিগীদের কথা শুনতে শুনতে আমার বালক মনে লেগে গেল সে-রঙের ছোপ। মনে হ'ত লালাবাবুর কথা, বিল্বমঙ্গলের কথা—এঁরা যখন ঘর ছেড়ে বিবাগী হয়ে পেয়েছিলেন হরিঠাকুরকে, তখন আমিই বা পাব না কেন যদি ঘর ছাড়ি এক কাপড়ে? ভাবতে ভাবতে দুর্মতি চাপল: স্কুল-পালান সঙ্গীও মিলে গেল—ঠাকুর দয়াল ত, জুটিয়ে দিলেন ব্যথার ব্যথী—সেও বলল হরিঠাকুরকে পাওয়াই চাই। অথ, একদিন রাতে আমরা দুই কিশোর—তখন আমার বয়েস তের কি চোদ্দ—এক কাপড়ে ঝুলি কাঁধে নিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়লাম ধ্রুবের জাঁকাল পণকে নিজের মনে ক'রে জপতে জপতে: 'তৎস্থানম্ একম্ ইচ্ছামি ভুক্তং নান্যেন যৎ পুরা'—অর্থাৎ আমি চাই শুধু সেই রাজ্য যা আমার আগে কেউ ভোগ করে নি। টোলে পড়া ছেলে—সংস্কৃত জানার অভিমানও ছিল বৈ কি, তার উপর ভর করল বৈরিগী হবার অভিমান—কাজেই আমাকে রোখে কে?

"ঠিক হ'ল যাব পুরী। কিন্তু পূবদিকে না গিয়ে পশ্চিমে মোড় নিয়ে পৌঁছলাম গয়া! তখন লোকে বলল, এখান থেকে কাশী যাওয়াই বেশি সহজ। গয়া ভাল লাগল না, কারণ আমি ত নির্বাণ ঠাকুরকে চাই নি, চেয়েছি হরিঠাকুরকে। কাশী অবশ্য শিবের রাজধানী। হোকগে, হরি হর ত ভিন্ন নয়। তবে আর ভয় কি? তা ছাড়া কাশীর দশাশ্বমেধের নাম শোনা ছিল। চললাম সেই দিকে মরীয়া হয়ে। হাতে যে দু'চার টাকা ছিল, পথে খরচ হয়ে গেল। কাশীতে পৌঁছলাম একেবারে অকিঞ্চন অবস্থায় যাকে বলে।

"কিন্তু স্বপ্নভঙ্গের প্রথম ধাক্কা এল সেখানে। ভাষ্য—দারুণ উদরাময়। হেতু—ছাতু।

কোথায় বা হরদেব কোথায়ই বা হরি?
কোথায় বা মালপোয়া—ছাতু খেয়েই মরি!

"কী করি? অগত্যা বৈরিগীকে শরণ নিতে হ'ল সংসারীর। বাবু ত আমাদের দেখেই গর্জে উঠলেন, 'কে রে?' আমাদের বুক কেঁপে উঠল, চিঁ চিঁ ক'রে বললাম, 'আমরা—বাবুমশায়! দু'টি কলকাতার ছেলে—কাশীতে দশাশ্বমেধ ঘাটে ভিড়ে আমাদের কাকা কোথায় যে হারিয়ে গেছেন—'

"বাবুমশায় দাঁত খিঁচিয়ে ভেংচিয়ে নাকীস্বরে বললেন, 'ঔবেঁ আঁর কী? আমার মাঁথাঁ কিঁনেছেঁন—কঁলকাঁতার ছেঁলে যঁখন!'

"'কে রে বাংলা কথা কয়?' বলতে বলতে গিন্নির অভ্যুদয়। 'আহা! কাদের বাছা রে?'

"ভরসা পেয়ে যথাবিধি চোখের জলের বন্যা বইয়ে দিলাম, বললাম, 'আমাদের কাকা হারিয়ে গেছেন মা,

---

* এ চিঠিটি ছাপা হয়েছে SRI AUROBINDO ON HIMSELF & MOTHER গ্রন্থে ১৩৩ পৃষ্ঠায়: "In a moment my mind became silent and then I saw one thought and then another coming in a concrete way from outside..." ইত্যাদি।

পথের ভিড়ে—তাই দুদিন পথে পথে ঘুরছি না খেয়ে—

"কর্তা বাদ সাধবার আগেই গিন্নি আমাদের হাত ধ'রে টেনে দাওয়ায় বসালেন: 'আহা! বোসো বাবা, বোসো। এমন সোনার অঙ্গে ছাই মাখালোই বা কোন্ পোড়ামুখো নাগা সন্নিসি শুনি?' আমরা ভয়ে ভয়ে কর্তার দিকে আড়চোখে তাকাতেই গিন্নি ঝংকার দিয়ে ব'লে উঠলেন, 'ওর কথায় কিছু মনে ক'রো না বাবা। ও অলপ্পেয়ের ভীমরতি হয়েছে যাট বছর বয়সেই—দয়াধর্মকে বিদেয় করেছে কুলোর বাতাস দিয়ে। নৈলে এমন দুধের বাছাকে মুখখিস্তি করে? যাও না, তোমার পিণ্ডি গিলে যাও না আপিসে—হাঁ ক'রে দেখছ কি?'

"গৃহিণী গৃহমুচ্যতে—গৃহী করেনই বা কী? সোনাহেন মুখ ক'রে দু'টি অন্ন গলাধঃকরণ করতঃ টাঙ্গা ক'রে প্রয়াণ করলেন আপিস। পরদিন সকালেই আমাদের বললেন, 'চল্, তোদের জন্যে চাঁদা চেয়ে আনি—ট্রেণভাড়া।'

"বিশ্বাস ক'রেই দ'-য়ে মজলাম। তিনি ধুরন্ধর ধাঁহাবাজ—নিয়ে গেলেন গিন্নির আশ্রয় থেকে সোজা পুলিস আপিসের বেঘোরে। পুলিস সাহেব শুনেই সহংকারে বললেন, 'ননসেন্স! কাকা হারিয়ে গেছে! আষাঢ়ে গল্প। মিথ্যেবাদীর ডিম—বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে মজা ক'রে ইসকুল কামাই করতে।'

"আমরা কেঁপেই সারা। বললাম, 'মা গঙ্গার দিব্যি পুলিস সাহেব—আমরা সত্যিই—'

—'ড্যাম্ ইওর মাদার গ্যাঞ্জেস! উল্লুক ছেলে! বজ্জাতির আর জায়গা পাও নি? সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। থাক্ দুটোতে থানায় নজরবন্দী—বল্ বাড়ীর ঠিকানা কি? অ্যাঁ?—ভবানীপুর।—ছা। সেখানে আজই তার করছি। শোন্—এই! কী দুটোতে গুজুর গুজুর করছিস? শোন্ কান খাড়া ক'রে—যদি ভালো চাস। আমার তারের আজই জবাব পাব। যদি তোরা সত্যি হারিয়ে গিয়ে থাকিস তবে—কাকা-টাকা থাক—বাড়িতে বাবা-মা আছে ত? তাঁদের কাছেই পাঠিয়ে দেব, কে তোদের নেই-কাকার খোঁজ করবে শুনি? ফের গুজুর গুজুর!' ব'লেই আমাদের দু'জনের দু'কান ধ'রে কাছে টেনে এনে: 'তোরা যদি সত্যিই হারিয়ে গিয়ে থাকিস ত কোন দুর্ভাবনা নেই, পুলিসের লোক তোদের বাড়ী পৌঁছে দেবে। কিন্তু যদি মিথ্যে ঠিকানা দিয়ে থাকিস, কি বাড়ী থেকে না ব'লে পালিয়ে এসে থাকিস তবে বেতিয়ে তোদের ছাল চামড়া না তুলি ত আমার নাম কৃতান্তকুমার খাস্তগীর নয়।'

"আমাদের বুকের রক্ত জল হয়ে গেল। কেঁচো খুঁড়তে এ কি সাপ বেরুল! কেন মিথ্যে হরিঠাকুরকে চেয়ে বৈরিগী হ'তে বেরিয়েছিলাম! কিন্তু কি করা? একে পুলিস সুপুরিণ্টেন্ডেন্ট্ তার ওপরে কৃতান্তকুমার। নাম আর পদবী, এ বলে আমাকে দেখ, ও বলে আমাকে।

"কিন্তু বোকা বোকা দেখতে হ'লে কি হয়—ভিতরে ভিতরে শয়তান ত! ভালমানুষের পো হয়েই র'য়ে গেলাম জমাদারের তদারকে এক টিনের ঘরে। রাতে উঠে জমাদারকে, মাঠ থেকে আসছি ব'লে গাড়ু হাতে বেরিয়েই লম্বা। আমার সমানধর্মী ভায়াটিও আমার মতনই যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং পন্থায় অচিরে মিললেন এসে আমার সঙ্গে মণিকর্ণিকার ঘাটে। তার পরে ভোর রাত থেকে ফের চলা সুরু, এবার পুবদিকে—কলকাতা বাগে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধ'রে। গিন্নিমা আমাদের হাতে তিনটি ক'রে টাকা দিয়েছিলেন দোকানে ইচ্ছে হ'লে কিছু কিনে খেতে। কিন্তু সে টাকা দু'দিনেই নিঃশেষ। তার পর আর কি? সনাতন ভিক্ষাবৃত্তি, আর চলা। রাস্তায় জল ঝড় ধুলো কাদা কিছুরই অভাব ছিল না, অভাব ছিল শুধু আশ্রয়ের। কারণ ঠেকে শিখেছিলাম ত—যেখানে-সেখানে আশ্রয় চাইতে ভরসা পেতাম না। হয় চটি, না হয় কোন ধর্মশালা, না হয় কোন গোয়ালঘর গোয়ালঘরই সই। ভাই, কলিতে যে ধ্রুব জন্মায় না—তখন বুঝলাম হাড়ে হাড়ে—ধ্রুব—যে নাকি 'সর্বতো মন আকৃষৎ' তাকে 'বিষ্ণুমেবাত্মসংশ্রয়' করতে পারত ক্ষুৎপিপাসা ভুলে। আমাদের পাপ মন ভাই, খিদে পেলে বিশ্ব ভুলে যায়—বিষ্ণু তো বিষ্ণু।

"তবু ভাই আপ্তবাক্য মিথ্যে হবার নয়—চলাচলম্ ইদং সর্বং—সবকিছুই চলন্ত—কাজেই দিনের পর দিন চলতে চলতে পৌঁছলাম শেষে আমরা গিরিডিতে।

"সেখানে আমার সাথাটির এক মামা থাকত। সে আর না পেরে 'মামার সঙ্গে একটু দেখা ক'রে আসি' ব'লেই আমাকে রাত্রে একা ফেলে দে চম্পট। আমি তখন একলা আশ্রয় নিলাম এক ভাঙা মন্দিরে। আমি বুঝেছিলাম সে আর ফিরবে না। কিন্তু এত ক্লান্ত যে পাশ ফিরতে না ফিরতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

"পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল। যা ভেবেছিলাম। সে উবে গেছে। অমনি ফের দুর্জয় অভিমান এল—এ-সংসারে কেউ কারো নয়। একটা গান আছে না:

'ভেবে দেখ মন, কেউ কারো নয় মিছে ফেরো ভূমণ্ডলে,
ভুলো না দক্ষিণে কালী বদ্ধ হয়ে মায়া জালে!—'

"চোখ দিয়ে দরদর ক'রে জল ঝরতে লাগল।

কাতর হয়ে ঠাকুরকে বললাম, 'ঠাকুর! তুমি জান তোমাকে পেতে, ধ্রুব হ'তে, ঘর ঠেলেছিলাম। কিন্তু ধ্রুব হওয়া মাথায় থাক্‌—এখন বাড়ী ফিরে প্রহ্লাদের বাড়া মার খেতে হবে। এমনি ক'রেই কি চলতে হয় ঠাকুর?'

"বলি, আর কান্না নামে তোড়ে, অভিমান ওঠে ফুঁসে, হরিঠাকুরকে তা হ'লে পাওয়া যায় না—হাজার ঘর ছাড়লেও?

"ভাবি, দুর হোক গে ছাই, যে আমায় চায় না তার জন্যে আমারই বা কেন মাথাব্যথা? অথচ হরিঠাকুর আমাদের সত্যি চান না একথা ভাবতেও যে বুকের মধ্যে টনটনিয়ে ওঠে! ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছেলেমানুষি ক্ষোভে বলি, 'ঠাকুর! সবচেয়ে রাগ হয় তোমার ওপর—তোমার এই না-থাকার জন্যে!' এমন সময়ে কে যেন স্পষ্ট বলল, 'দূর! কে বললে তিনি নেই, তিনি আছেন ব'লেই সব কিছু আছে।' রুখে উঠে বললাম, 'আছেন না ঢেঁকি! আর যে থেকেও নেই তাকে নিয়ে আমার হবে কি শুনি? বেল পাকলে কাকের কি?...' এমনি যে কত ছেলেমানুষি অভিযোগ—চোদ্দ বৎসরের অপোগণ্ড বৈ ত নই ভাই!—'প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি'—বলেছেন ত ঐ ঠাট্টার ঠাকুরটিই।

"এমন সময়ে"—বললেন ঋষিদা আমার হাত চেপে ধ'রে—চোখে অশ্রু-আভাস—"হলপ ক'রে বলছি তোমাকে ভাই, শুনলাম পরিষ্কার একটি অপরূপ স্বর—আহা, স্বর ত নয়, যেন বাঁশী গো! বলছে, 'ওরে, এখানে যদি তুই কৌপীন প'রে মাত্র পনের দিন হরি হরি বলতে পারিস তবে হরিঠাকুরকে পাস।'"

আমি এই প্রথম টুকলাম, কারণ সে সময়ে (ইন্দিরার অভ্যাগমের আগে) আমি কোন স্বর কি বাঁশী কি নূপুর শুনি নি। বললাম, "অ্যাঁ! বলেন কি দাদা? পরিষ্কার শুনলেন—যেমন শুনছেন আমার স্বর? না কল্পনা?"

ঋষিদা হেসে বললেন, "ভাই! তুমি যতটা পরিষ্কার সুরে এ-প্রশ্নটি করলে তার চেয়েও পরিষ্কার সে-স্বর। আমি এ রকম স্বর আরও একবার শুনেছি—অনেক পরে। বলছি। কিন্তু এ-প্রসঙ্গটা শেষ করি আগে।"

আমি বললাম, "রসুন। আমি শুনেছি সত্যিকার দৈববাণী শুনলে মন না কি আনন্দে ছেয়ে যায়—কল্পনার স্বরে এ হয় না।"

ঋষিদা হেসে বললেন, "সাধু সাধু! ভুল শোন নি ভাই। কিন্তু শুধু আনন্দই নয়—যথার্থ দৈববাণী শুধু সুধাময়ই নয়—খরধার—হৃদয়গ্রন্থি সব ছিঁড়ে-খুঁড়ে একাকার করে—যেখানে ছিল সংশয়ের মরুভূমি সেখানে ফেটে পড়ে প্রত্যয়ের গঙ্গা—যেমন অর্জুনের বাণে মুমূর্ষু ভীষ্মের মুখের কাছে ছলকে উঠেছিল।"

"তার পর?"

"সে কি আনন্দ! ধ'রে রাখতে পারি না। তবে কে বলে ঠাকুর ডাকলে সাড়া দেন না? আর এত কাছে তিনি! মাত্র পনেরটি দিন হরি নাম জপ করলেই তিনি দেবেন দেখা? তবে আর কি? কেল্লা ফতে—মার্ দিয়া!"

ব'লে একটু থেমে মুচকে হেসে ঋষিদা বললেন, "কিন্তু তখন কি জানি ভাই, যে অধর আর পানপাত্রের মাঝখানে চুলচেরা ফাঁকটিও পর্বতপ্রমাণ? যেই রুখে উঠে মাত্র দু'টি দিন হরি হরি করেছি অমনি বিরাট্ শুষ্কতায় মন হয়ে গেল মরুভূমি, আর সঙ্গে সঙ্গে—বলব কি ভাই!—মার হাতের রান্না মাছের ঝোল আর দিদিমার পায়েসের বাটি ভেসে উঠল কলির ধ্রুব-মহারাজের ধ্যাননেত্রে—সঙ্গে সঙ্গে তিন মাসের দাবিয়ে-রাখা খিদে লোভের ঝোড়ো হাওয়ায় জ্ব'লে উঠল দাউ দাউ ক'রে—আমি সেই দিনই ভিক্ষে ক'রে পাওয়া টাকায় টিকিট কিনে রওনা হলাম কলকাতায়।"

ঋষিদা বললেন করুণ হেসে, "এমনিই হয় ভাই ভারতের তীর্থপথে: নশ্বর দুধের বাটি আর মাছের ঝোল 'সলিড্' হয়ে পথ আগলে দাঁড়ায় শাশ্বতের। কেবল সেদিন এই একটা মস্ত শিক্ষা হয়েছিল আমার, যে, ভগবান্‌কে চাইলে পাওয়া যেমন সুসাধ্য, পেতে চাওয়া ঠিক তেমনি দুঃসাধ্য। আর এরই নাম হ'ল আচার্য শঙ্করের 'অনির্বাচ্যা মহতী মায়ালক্ষণা শক্তিঃ—যা নানা-ভাবং নয়তি—' এই হ'ল মায়াশক্তির লক্ষণ—এই বহুরূপী প্রবঞ্চনা।"

বলতে বলতে ঋষিদার চোখ দু'টি শঙ্করভক্তিতে ফের ঝিকমিকিয়ে উঠল, বললেন গাঢ় কণ্ঠে, "অথচ একেই তোমাদের পণ্ডিচেরি আশ্রমের সবজান্তারা বলেন জগৎকে অস্বীকার করার মূঢ়তা। অর্বাচীনরা কেউ পড়েছে তাঁর ভাষ্য—ব্রহ্মসূত্র—বিবেকচূড়ামণি—আত্ম-বোধ? আর যদি প'ড়েও থাকে, বোঝবার বুদ্ধি আছে তাদের যারা শুধু জয় গুরু জয় গুরু ক'রে ভাবে সরাসর সুপ্রামেণ্টালে পৌঁছে গোঁফে চাড়া দেবে? আচার্য শঙ্কর বরং বলেছেন বার বারই যে, ভয়ভ্রান্তের কাছে সর্পে রজ্জুজ্ঞানই ত সত্য। মায়া ক্লি নেই নাকি যে, তর্কের দাপটে নস্যাৎ ক'রে দেবে? আর শুধু কি শঙ্করাচার্যই মায়াকে মঞ্জুর করেছেন? গীতার ঠাকুরও বলেন নি কি:

গুণময়ী মায়া দৈবী তথা দুরত্যয়া? মায়ার মোহ যদি না থাকত তা হ'লে মাছের ঝোল আর দুধের বাটির টানে কি ঠাকুরের টান হার মানত টাগ-অফ-ওয়ার-এ? এ জগতে—ঐ ত তুমিও ত গাও কি চমৎকার তোমার বাবার গান—আহা, কি গানই তিনি লিখে গেছেন:

'কেন ভূতের বোঝা বহিস পিছে,
ভূতের ব্যাগার খেটে মরিস মিছে?
দেখ্ ঐ সুধাসিন্ধু উছলিছে
পূর্ণ-ইন্দু-পরকাশে!'

শঙ্কর আর যাই হোন এত বড় বেকুব ছিলেন না যে, বলবেন, মনের স্তরে মন যা দেখে তার অস্তিত্ব নেই। তিনি বলতেন, এ-স্তর পেরিয়ে শিবনেত্রে এ জগতের যে চেহারা দেখা যায় সে-চেহারার সঙ্গে আমাদের চর্মচক্ষে দেখা বিশ্বের চেহারার তফাৎ আকাশ পাতাল।"

আমি বললাম, "পণ্ডিচেরিতে যদু মধুর উপর রাগ করবেন না দাদা, তারা আপনার শঙ্করভাষ্যের ব্যাখ্যা শুনতে চায় নি ব'লে। আমার আর এক বিদ্বান্ বন্ধু শ্রীরামপুরে একবার ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে দিতে শঙ্করের প্রতিভার উল্লেখ করেছিলেন। সেখানে ছিল শ্রীঅরবিন্দের দু'টি ধনুর্ধর শিষ্য। তারা বন্ধুবরকে অপমান করে: কি? আপনি গুরুদেবের শিষ্য হয়ে শঙ্করের প্রশংসা করছেন—যিনি মায়াবাদী ছিলেন ব'লে গুরুদেব তাঁর মত খণ্ডন ক'রে এসেছেন তাঁর প্রতি বইয়ে!"

ঋষিদা বললেন হেসে: "ঐখানেই ত গাড়োলেরা গোলে পড়েছে, তাই না বুঝল শঙ্করকে, না শ্রীঅরবিন্দকে। তুমি জান শ্রীঅরবিন্দকে আমি কি চোখে দেখি। সেদিনও তোমাকে বলেছি আমি আর এ-সাধু ও-সাধু ক'রে বহূদক হতে চাই না, শ্রীঅরবিন্দকে দেখে কুটীচক ব'নে গেছি, সার্থক হয়ে গেছে আমার জন্ম। কিন্তু তাই ব'লে কি আর সব মহাগুরুকে ছোট না করলেই নয়? আরে, শঙ্কর শ্রীঅরবিন্দ দু'জনেই দিক্‌পাল—শঙ্করও মণ্ডন মিশ্রের মতামত খণ্ডন করতে চেয়েছিলেন, যেমন চৈতন্যদেব বাসুদেব সার্বভৌমের মত খণ্ডন করতে চেয়েছিলেন। এ তাঁদের সাজে। কিন্তু তাই ব'লে যদু মধু বিধু সিধু এরাও মত দেবে শঙ্কর বড় না শ্রীঅরবিন্দ বড়, বিষ্ণু বড় না ব্রহ্মা বড়? বিক্রমাদিত্য যদি যুদ্ধ করতেন চন্দ্রগুপ্তর সঙ্গে তা হলে কি তাঁদের জমাদার-কোতোয়ালরা ব'লে দিতে পারত লড়াইয়ে জিতবেন কিনি? তাছাড়া শ্রীঅরবিন্দ কি নিজে তাঁর 'লাইফ ডিভাইনে' প্লেটো ও শঙ্করকে বুদ্ধিলোকে মানুষের শীর্ষ-স্থানীয় বলেন নি?"

এর পিছনে একটি ব্যথার ইতিহাস আছে—thereby hangs a tale: সেটি হ'ল এই যে, ঋষিদা একবার পণ্ডিচেরিতে শঙ্কর সম্বন্ধে প্রতি সপ্তাহে পাঠ দিতেন। শ্রীঅরবিন্দের এক অতিভক্ত তাঁর ভাষণের কুব্যাখ্যা ক'রে তাঁকে থামিয়ে দেয়। ঋষিদার মনে সে-দুঃখ বরাবরই কাঁটার মতন খচ খচ করত। তা ছাড়া আরও একটা কথা বুঝতে হবে ঋষিদাকে ঠিক বুঝতে হ'লে: যে, তিনি হরিদ্বারে শঙ্করভাষ্য শুধু যে পড়েছিলেন তাই নয়—শুধু স্বাধ্যায় নয়, শঙ্কর ছিলেন তাঁর কাছে ভারতের পুণ্যশ্লোক মহাজনদের অন্যতম। কি যে উৎসাহ ছিল তাঁর শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে! ঈশ কেন কঠ মণ্ডূক ও মাণ্ডূক্য উপনিষদের সঠিক বাংলা অনুবাদ তিনি যে কি বিপুল পরিশ্রম ক'রে প্রকাশ করেছিলেন—করতে করতে চোখের পাতা বেড়ে চোখ ঢেকে যায় তাঁর। প্রতি উপনিষদে শুধু মূল শঙ্করভাষ্য নয়, সে-ভাষ্যের সুদীর্ঘ বাংলা অনুবাদও প্রকাশ করেছিলেন তিনি, যাতে শঙ্করকে লোকে ভুল না বোঝে। এ টীকাগুলি আমাকে তিনি উপহার দিয়েছিলেন—আজও পড়তে পড়তে ঋষিদার গভীর পাণ্ডিত্য ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পেয়ে বিস্ময়ের আমার অবধি থাকে না। আর যেখানেই ভালবাসা গভীর সেখানেই একটু আঘাতও শেল হয়ে বাজে—কে না জানে?

কিন্তু শুধু শঙ্করভাষ্য নিয়ে প্রেমের গবেষণাই নয়, তিনি যে পণ্ডিচেরিতে এবং তার পরে উত্তর-পণ্ডিচেরি জীবনে কি দুষ্কর তপস্যা করেছিলেন ইষ্টকে উপলব্ধি করতে, সে-খবর তাঁর বন্ধুদের মধ্যেও খুব কম লোকেই রাখতেন, কারণ, বলেছি ঋষিদার এমনিই স্বভাব ছিল, কোনদিনই ধরা-ছোঁওয়া দিতে চাইতেন না তিনি। আমি তাঁর উপাধি দিয়েছিলাম: "অগাধ জলের মীন"। মাঝে মাঝে শুশুকের মত জলের উপরে ডিগবাজি খেতেন বটে পরমানন্দে, কিন্তু তার পরেই ফিরে যেতেন স্বধামে—অগাধ জলে। বাইরে অবিমিশ্র কাটুস-কুটুস, ছড়াকাটা, ঠাট্টা-তামাসা, হাসি-গল্প; ভিতরে আত্মারাম, শান্ত, আপূর্যমান, অচলপ্রতিষ্ঠ।

সচরাচর তিনি বলতেন না তাঁর নানা আধ্যাত্মিক অনুভূতি-উপলব্ধির কথা। কিন্তু আমি ও ইন্দিরা হরিদ্বারে তাঁকে চেপে ধরতাম। ইন্দিরাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন, বিশেষ ক'রে তার ভবসমাধি দেখার পরে। হয়ত আরও সেই জন্যেই তিনি আমাদের কাছে বলে-

ছিলেন একদিন আর একটি দৈববাণী শোনার কাহিনী। এ কাহিনী শুনে আমি তখনই লিখে একটি মাসিকীতে ছেপেছিলাম। সেই লেখা থেকেই টুকে দিই।

* * *

পণ্ডিচেরির সঙ্গে ঋষিদার যোগসূত্র ছিন্ন হওয়ার পরে সেখান থেকে চ'লে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নানা অভিজ্ঞতা হয়—নানা দুঃখ-কষ্ট স্বপ্নভঙ্গের মাধ্যমে উপলব্ধি করেন ভাগবতী করুণা। কিন্তু হরিদ্বারে আমাদের মাঝে মাঝেই বলতেন: "ভাই, এখন দেখি যে কিছুই জানি না, জানতে পারি নি জানার মতন ক'রে। অথচ যৌবনে জ্ঞানের, পাণ্ডিত্যের কি অভিমানই না ছিল!—ফলও যা হবার: হয়ে উঠলাম হঠকারী—কাঁচের জন্যে কাঞ্চন খোয়ালাম—বলে না? কেমন ক'রে—বলি শোন।

"পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দের কাছে কিছুদিন থেকে চ'লে আসার পরে আমার প্রথম দিকে গভীর বৈরাগ্য হয়। কেবল জপতাম ভর্তৃহরির 'বৈরাগ্যম্ এবাভয়ম্।' পণ নিলাম—ভগবানকে প্রত্যক্ষ করতেই হবে। পরিব্রাজক হয়ে ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছলাম মায়াবতীতে রামকৃষ্ণ মঠে—অদ্বৈত আশ্রমে। সেখানে এক বৎসর ধ'রে স্বাধ্যায় ও ধ্যানধারণা করার পরে হঠাৎ বিরাট শুষ্কতায় মন ছেয়ে গেল, মনে হ'ল, শুধু যে অপরোক্ষ অনুভব আমার হবার নয় তাই নয়; আশেপাশে আর কারুরই হয় নি ঈশ্বরসাক্ষাৎকার। ক্ষোভ উঠল ফুলে—'দুত্তোর' ব'লে নেমে এলাম হিমালয় থেকে। কেন মিথ্যে বিড়ম্বনা? ভগবান্ পাওয়া যখন অসম্ভবের কাছাকাছি তখন শুধু শোনা কথার বেসাতি ক'রে সিদ্ধ সাধকের ভড়ং ক'রে কি হবে? তার চেয়ে সৎকর্মে ব্রতী হয়ে সুভদ্রের মতন দেশের কাজে নামা যাক্। এখানে-ওখানে নানা সাধুর কাছে গিয়ে দরবার করা সুরু করলাম: 'আপনারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে সবাইকে বলুন দেশের সেবা করতে, আর আপনারাও নেমে যান দেশের কাজে। মিথ্যে নাকের ডগায় ত্রাটক ক'রে ব্রহ্মনাম জপ ক'রে কেন এ খাবি-খাওয়া? আপনাদের সাধু ব'লে নামডাক আছে, আপনারা কাজে নামলে লোকে শুনবে, দেশ বড় হবে।'

"কিন্তু উঁহু! সাধুরা ভবীরও বাড়া—ভুলবার নয়। আমাকে হাঁকিয়ে দিলেন অর্ধচন্দ্র দিয়ে। আমার বিষম রাগ হ'ল, ব'লে বেড়াতে লাগলাম যে সাধুরা সবাই হয় মোহমুগ্ধ, তাই না পেয়েও ভাবছে পেয়েছে, কিংবা ভণ্ড—ভড়ং ক'রে পরের মাথায় হাত বুলিয়ে শাস্ত্র ও ভগবানকে ভাঙিয়ে খাচ্ছে। লেখাপড়া ত একটু শিখেছিলাম ভাই, বলতেও পারতাম—বুলিবাজ হওয়া কিছু শক্ত কাজও নয়। কাজেই নানা জায়গায় এ যুগের নাস্তিক ভোগবাদীদের মধ্যে লেকচার দিয়ে হাততালির হরির লুট কুড়োতে লাগলাম—প্রমাণ ক'রে যে, এই সব মেকি সাধুদের তথাকথিত আঁকাল অনুভূতি উপলব্ধিও কিছুই নয়—শুধু স্নায়বিক উত্তেজনার ফল। একমাত্র বাস্তব হ'ল মানুষ—'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই,' বলেছিল সাক্ষাৎ চণ্ডীদাস। অতএব ভগবান্ ভগবান্ ক'রে অনর্থক হা হুতাশ বা ভেল্কিবাজি না ক'রে জনহিতে আত্মনিয়োগ করাই হ'ল সৎকর্ম, বৈরাগ্য অপকর্ম, আত্মবোধ ব্রহ্মলাভ ইত্যাদি সবই বুলিবাজি।

"কিছুদিন এইভাবে যত্র তত্র বক্তৃতা দিয়ে শেষে নিলাম এক ইস্কুলে চাকরি। ছেলে ঠেঙাই আর সাধুদের ঠেঙাই।

"কিন্তু এসবের ফলে একটু আত্মপ্রসাদ লাভ হ'লেও অন্তরের দিকে মাঝে মাঝে তাকাই আর চমকে উঠি। সে কী অন্ধকার রে বাবা! খাঁ খাঁ করছে। ফাঁকি দিয়ে কি আর ফাঁক ভরে ভাই? অথচ কর্ম জড়ায় হাজারো ফাঁসে। এতদিন ব'লে বেড়িয়েছি সাধুরা, জ্ঞানীরা, ধ্যানীরা কেউই কিছুই পায় নি, এখন আর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করি কোন্ মুখে? বলি কী ক'রে যে বক্তৃতা দিয়েও বিশেষ কিছু হয় না?

"এমনি শোকাবহ নাস্তিক শূন্যবিলাসী অবস্থায় একদিন এক বৈষ্ণবপদাবলীর পাতা উল্টোতে উল্টোতে হঠাৎ চোখে পড়ল বিদ্যাপতির বিখ্যাত পদ:

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম সুতমিতরমণীসমাজে
তোহে বিসরি' মন তাহে সমর্পিনু
অব মঝু হব কোন্ কাজে?
মাধব হাম পরিণাম নিরাশা!

"অমনি ফের শুনলাম দৈববাণী—একেবারে প্রত্যক্ষ, ঠিক যেমন তোমার কথা শুনি তেমনি পরিষ্কার: অমুক ভ্রান্ত, তমুক ভণ্ড—এসব রটিয়ে তোর কি লাভ হ'ল শুনি? নিজে কি পেলি কিছু—ওরা কেউই কিছু পায় নি বলতে বলতে? ছাড়্ এ মিছে বাগাড়ম্বর। ছেলেবেলায় যে-ডাক শুনেছিলি অথচ সাড়া দিয়েও দিতে পারিস নি—সেই পথেই চল্ তোর স্বধর্ম পালন ক'রে—পরধর্মো ভয়াবহঃ।

"চমকে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে চোখে নামল অশ্রুর ঢল, মনে অনুতাপ, কী ক'রে কাল কাটাচ্ছি? শ্রীঅরবিন্দকে কি দেখি নি? লেলেকে কি দেখি নি? শঙ্করাচার্যকে কি ভালবাসি নি? আরও কত মহাজনের

মুখের শান্তির ছবি স্মৃতিপটে ফুটে উঠল। অমনি মুহূর্তে যেন হারানিধি ফিরে পেলাম—সঙ্গে সঙ্গে বিবেক মণি, বৈরাগ্য রতন। ফিরে এলাম সাধুর স্বধর্মে—গভীর জিজ্ঞাসায়। মনে প'ড়ে গেল—একবার কতদিন আগে পণ্ডিচেরিতে কি উপলব্ধি হয়েছিল, কৃষ্ণ এসে বলেছিলেন, 'দেখ্, তুই খাচ্ছিস নে আমি খাচ্ছি।' অমনি কি কাণ্ড ভাই, দেখি ঘটি থেকে জল ঢালছি মুখে—কিন্তু কে ঢালছে। আমি ত নেই—এ যে কৃষ্ণ! এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি—কৃষ্ণ চলেছেন আমাকে বাহন ক'রে! সে যে কি আনন্দের অবস্থা ভাই, ভাষায় কেমন ক'রে প্রকাশ করব? অথচ এহেন দুর্লভ অবস্থা পাওয়ার পরেও ফের এল কিনা অবিশ্বাস! তবু বলবে মায়া ব'লে কিছু নেই, শঙ্কর ভ্রান্ত?"

ইন্দিরা ও আমি গভীর ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম ক'রলাম।

* * *

অনেক সাধু দেখেছি কিন্তু গৈরিকধারী শঙ্করপন্থী মায়াবাদী সাধু যে এমনটি হ'তে পারে, ঋষিদাকে না দেখলে বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারতাম না। এমন সরল, স্নেহময়, উদার, রসরাজ!

তিনটি কারণে তিনি আমার কাছে থাকবেন চির-স্মরণীয়: পাণ্ডিত্য থেকেও নিরভিমান; বৈরাগী হয়েও স্নেহশীল এবং আধ্যাত্মজ্ঞানী হয়েও আশ্চর্য রসিক। শেষে তাঁর রসিকতার সম্বন্ধে দু' তিনটি দৃষ্টান্ত দিয়েই ইতি করব।

হরিদ্বারে গঙ্গাতীরে এক ছাইমাখা নগ্ন সাধুকে দেখেছিলাম। কনকনে শীত, সাধুজিকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এই ঠাণ্ডায় খালি গায়ে বাইরের কনকনে হাওয়ায় সারাদিন ব'সে থাকেন, শীত করে না আপনার?"

সাধুজির সে কী হাসি, "করলই বা শীত?"

আমি বললাম, "সে কি? যদি ধরুন অসুখ করে?"

সাধুজি ফের স্নিগ্ধ হেসে বললেন, "এ দেহ-মন-প্রাণ তাঁকে নিবেদন ক'রে দিয়েছি। কাজেই দেখবার ভার এখন তাঁর—আমার নয়। এই দেখ না, সামনে দু'টি কৃষাণ মেয়ে রাঁধছে—হাঁড়িকুঁড়ি তাদেরই। এমনি সব সময়েই জুটে যায়। তাঁর 'পরে নির্ভর ক'রে কেউ কি কখনো ঠকেছে?"

আমি ও ইন্দিরা মুগ্ধ হয়ে সাধুজিকে প্রণাম করলাম। আমি বললাম, "সাধুজি! আশীর্বাদ করবেন যেন আপনার ভগবৎনির্ভরের ছিটেফোঁটা পাই এ-জীবনে। আপনি খাঁটি সাধু—ত্যাগী।"

সাধুজি বললেন, "রোসো বাবা! ত্যাগী কিসে? কী ছিল আমার—যাকে ত্যাগ করেছি? নৈমিষারণ্যে আমার জন্ম গরীবের ঘরে। উলঙ্গ হয়ে জন্মেছিলাম, সারা জীবন কেটেছে উলঙ্গ হয়ে—শেষ নিঃশ্বাস ফেলবও উলঙ্গ হয়ে। জন্ম-নিঃস্বকে কি ত্যাগী বলা যায়? না বাবা, ত্যাগ-ট্যাগ নিয়ে কথা নয়—আসল কথা হ'ল ঠাকুরকে ভালবাসা—তাঁর জন্যে সব পণ করা, প্রাণ পর্যন্ত। তবে এ সবই ত তুমি জান।"

"তবু বলুন, সাধুজি।"

"কী বলব বাবা?"—সাধুজি হাসলেন ফের—"তুমিই আজ সকালে গাইছিলে না:

তোমারে কী বলো বলিব শ্যামল,
বলিবার কথা কিছু কি আছে?
একই কথা শুধু বলি তাই বঁধু
পরাণ আমার তোমারে যাচে।

এই-ই হ'ল শেষ কথা—শ্যামলকে বলা—তোমাকে নৈলে আমার চলে না। তোমাকে আমার চাই-ই চাই। এই একাঙ্গী হওয়া—তাঁকে ছাড়া আর কিছুই না চাওয়া—ব্যস্, তাহলেই মিলবে—না মিলেই পারে না। তাঁকে যেই কেউ বলে, 'ঠাকুর আমি তোমার', সেই ঠাকুরও তাকে বলেন, 'আমিও তোমারি।' তবে বলার মতন বলা, ডাকার মতন ডাকা চাই, তবে না?"

আরো অনেক চমৎকার চমৎকার কথা বলেছিলেন সাধুজি। কিন্তু সে থাক্।

ঋষিদাকে গিয়ে বললাম, "দাদা, চমৎকার সাধু দেখে এলাম। আপনাদের দশনামী সম্প্রদায়ের সাধু, নাম বললেন ব্রহ্মগিরি। অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বললেন। একটি কথা যা বললেন, আপনার কথা মনে পড়ল।"

ঋষিদার সে কী খিল খিল ক'রে হাসি! বললেন, "হবে না? সব সাধুরই এক রা তো। যা হোক শুনি রা-টি কী?"

"আপনি সেদিন এক ভদ্রমহিলাকে বলছিলেন না? অবিকল সেই কথা। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, কী করলে ভগবান্ লাভ হবে। আপনি বলেছিলেন, 'যখন তাঁকে আর পাঁচটার মধ্যে না চেয়ে সবার আগে চাইবে। আমি ঠাকুরও চাই, কুকুরও চাই, মুগুরও চাই, পুকুরও চাই—এ নয়। শুধু ঠাকুরকেই চাই, তার পরে যদি আরো কিছু চাওয়ার থাকে তবে সে তিনিই ব'লে দেবেন।' ব্রহ্মগিরিজিও ঠিক এই কথাই বললেন। একেবারে নির্ভেজাল সাধু দাদা, খাঁটি মাল যাকে বলে।"

ঋষিদা হেসে বললেন, "ঠিক বলেছ ভাই। আর

যুগে যুগে এরকম কয়েকটি নির্ভেজাল সাধু দেখা যা ব'লেই এত ভেজালের বাজারেও ভগবানকে ঢুঁ দিতে হয়। ভারতকে ধারণ ক'রে আছে আজ এঁদেরি তপস্যা জেনো। মহাভারতে এই কথাই বলেছেন ব্যাসদেব: 'লোকা: হি সর্বে তপসা ধ্রিয়ন্তে'—বিধাতার সৃষ্ট প্রতি জগৎকে তপস্যাই ধারণ করে। আর কাদের তপস্যা জানো?—এই ধরণের কয়েকজন খাঁটি সাধুর।"

ব'লেই ফিক্ ক'রে হেসে, "তবে যেমন এও সত্যি যে, এই জাতীয় সাঁচ্চা সাধু আজও দেখা যায়, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে এও সত্যি যে এদের দেখা যত্রতত্র মেলে না। অনেক খুঁজতে খুঁজতে তবে মেলে। কেবল তোমাদের কলকাতার বাবুরা দু'চারটি মেকি সাধু দেখেই যে সিদ্ধান্ত করেন যে, 'অশক্ত: তস্কর: সাধু: বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী'—অর্থাৎ তস্কর যখন অক্ষম হয় তখনই সাধু হয় যেমন বেশ্যা তপস্বিনী হয় বৃদ্ধা হ'লে তবেই।" বলেই থেমে, "তবে সবচেয়ে বিপদ্ কাদের জানো? তাদের, যাদের সাধু হবার সাধ্য নেই অথচ সাধ আছে—অর্থাৎ যাদের পাকা চোর হবার প্রতিভা আছে তারাও যখন পেলা পাবার লোভে গায়ে ছাই মেখে বোম্ বোম্ ক'রে শিষ্যদের মাথায় হাত বুলোয় তখনই ফ্যাসাদ। কিংবা বলতে পার, যারা সব ছাড়বার ডাক শোনে নি তাদের যোগী কি ত্যাগী হ'তে চাওয়া। এইরকম সাধুরাই দু'চারদিন সাধুগিরি ক'রে হাতে-নাতে ধরা প'ড়ে যায়, আর অমনি লোকে বলে টিটকিরি দিয়ে, 'বলেছিলাম!' আমি কিন্তু একবার এমন একটি যৌবনে যোগী সাধু দেখেছিলাম যার জুড়ি মেলে না, মানে, যে নিন্দুকদের টিটকিরি দেবারও পথ রাখে নি—গুরুর কাছে গর্জন ক'রে আলটিমেটাম দিয়ে। শোন বলি।

"সে সময়ে আমি খুব সাধন-ভজন করছি। হঠাৎ এক বলিষ্ঠ হিন্দুস্থানী গেরুয়াধারী যুবক ছাই মেখে 'কৌপীনবন্ত: খলু ভাগ্যবন্ত:'দের ক্লাসে ভর্তি হ'য়ে সোজা আমার কাছে এসে দরবার করলেন—ভগবান্ পাইয়ে দিতে হবে। আমি তাকে শাস্ত্রবাক্য ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে বললাম, 'ভগবান্ পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয় ভৈয়া! আগে গুরুকরণ করতে হবে।' উত্তরে সে যা বলল, তাতে আমার চক্ষুস্থির!"

"কী রকম?"

ঋষিদা বললেন, "আর কী রকম? সে বলল, 'আমার গুরুকরণ হয়ে গেছে সাধুজি! গুরুজি বাৎলেও দিয়েছে কী কী করতে হবে। আমি সেসব করছিও বাকায়দা। কিন্তু ফল পাচ্ছি না।"

"পাবেন, চিন্তা কী?"

'না চিন্তা আমার কিছুই নেই সাধুজি—'

যৌবনে-যোগী বললেন হেসে, 'আর গুরুজিও জানেন।'

"আমি তো অবাক্ শুনে"—বললেন ঋষিদা।

"তাই কী বলব ভেবে না পেয়ে শুধালাম, 'গুরুজি জানেন মানে? কী জানেন?'

"সে অম্লানবদনে বলল হেসে, 'গুরুজিকে বলেছি—আমার নববধূ বালিকা—বয়স এগারো। আমি গুরুজিকে পাঁচ বৎসর সময় দিয়েছি। এই পাঁচ বছরে ভগবান্ পাইয়ে দেন তো ভাল, নৈলে ফিরে যাব বৌয়ের কাছে—মনে রাখবেন, সে তখন হবে ষোড়শী'।"

ব'লেই ঋষিদার সে কী খিল খিল ক'রে হাসি!

* * * *

একদিন ঋষিদা বললেন, আর এক কাহিনী—তখন আমি কলকাতার আশ্রমের জন্যে চ্যারিটি কন্সার্ট দিয়ে টাকা তুলছি। আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিতেই আলিঙ্গন ক'রে বললেন, "বুক জুড়োলো ভাই—কী ফ্যাসাদেই যে পড়েছিলাম!"

"ফ্যাসাদ?"

"নয়ত কী? ট্রামে ঠাঁই নেই একটি বেঞ্চিতেও—কেবল একটি মহিলাদের বেঞ্চিতে একটি মহিলার পাশে ছাড়া। অগত্যা আমি বললাম, 'মা, বসতে পারি কি একটু?' ওমা! তখন কি জানি—সামনের বেঞ্চিতেই যে মহাকায় মহাজন হ্যাটকোট-পরা—তিনি তাঁর ভর্তা তথা কর্তা? তিনি মুখ ফিরিয়ে গর্জে উঠলেন: 'অফ কোর্স নট্, লেডীস্ সীট!'

"আমি বললাম একগাল হেসে, 'আমারও কোঁচা-কাছা নেই, ভয় কি?' ভর্তা কর্তা প্রায় হর্তা হয়ে ওঠেন আর কি, এমন সময়ে ভর্ত্রী ধমকে উঠলেন, 'গোল ক'রো না। বুড়ো মানুষ সাধু, বসলেনই বা।'

"ভর্তা গোঁ হয়ে চুপ ক'রে রইলেন খানিকক্ষণ। পরে একটু ঘাড় বেঁকিয়ে আমার দিকে তাকাতেই আমি বললাম, 'সাহেবের করা হয় কি?'

"তিনি ধমকে উঠলেন, 'আমি খেটে খাই।'

"আমি 'ও!' ব'লে একটু চুপ ক'রে থেকে ফের সলজ্জে ধরলাম, 'সাহেব খাটান কাকে?'

"তিনি গম্ভীর মুখে বললেন, 'আমি কন্সালটিং এঞ্জিনিয়র।'

"আমি একগাল হেসে বললাম, 'তবে ত আপনি আমারি দলে। আমিও যে কন্সালটিং এঞ্জিনিয়র!'

"তিনি ভ্রূভঙ্গ ক'রে বললেন, 'ননসেন্স! You are a parasite.'

"আমি সুধামাখা হেসে বললাম, 'না সাহেব। আপনি যেমন ইঁট কাঠ চুন সুরকির খবর রাখেন—বাড়ী কি ভাবে তৈরি করতে হয়, রাখতে হয়, মেরামত করতে হয় তার উপদেশ দেন, আমিও ঠিক তাই করি। এই যে দেহ—এতে কে থাকে, কেমন ক'রে একে টেঁকসই করা যায়, ভাঙন ধরলে কি ভাবে মেরামত ক'রে কর্তাকে রাজার হালে রাখা যায়—রোগ-শোক, পাপ-তাপ, অসুখ-বিসুখে কি ধরনের শান্তির সিমেণ্টে তাকে খাড়া রাখা যায়—কুচিন্তারা আক্রমণ ক'রে অশান্তিতে নাজেহাল করলে কি ভাবে মনকে পবিত্র করা যায় গুরুর করুণার আলো-হাওয়ার ভেণ্টিলেশনে—এই সব উপদেশ আমিও দিই ঠিক আপনার মতন। তবে আপনার সঙ্গে আমার কেবল একটি জায়গায় ভেদ আছে: আপনি কেউ কন্সাল্ট করতে এলে তার কাছে ফী নেন—আমি উপদেশ দিই ফ্রী অফ চার্জ—যে আসে তাকেই উদ্ধার করি বিনামূল্যে।'"

আমরা একঘর লোক—হেসে কুটি কুটি।

আর একদিন আরও মজা হয়েছিল। ঋষিদার জবানীতেই বলি:

"আজও ফের আসছি তোমার গান শুনতে ভাই, কেবল ট্রামে নয় বাসে। সেখানেও ফের ঐ অবস্থা। কেবল একটি কলেজের মেয়ের পাশে জায়গা আছে। আমি গিয়ে বসতেই সে বলল, 'How dare you? ladies'—' আমি তাকে থামা দিয়ে বললাম, চুপ কর্। এমনি কি কুরুক্ষেত্তর ঘটেছে বল্ ত যে রাগ ক'রে ঘর ছেড়ে চ'লে যাচ্ছিস? দিদিমা বুড়ো হয়েছেন, একটু বকেছেন, তাতে কি এমন মনে করবার আছে?'

"মেয়েটি ত থ। 'কি বলছেন সব ননসেন্স!'

"বাসের সবাইয়েরই চোখ তখন মেয়েটির 'পরে। আমি বললাম তাদের দিকে তাকিয়ে মিনতির সুরে, 'দেখুন ত মশায়েরা সবাই! আপনারাই বিচার করুন। বলুন ত—এ কি উচিত? অবলা যার নাম সে এমন সবলার মতন ব্যবহার করলে কি ভাল দেখায়? ওর দিদিমা ব'কে কেঁদে সারা—বললেন মেয়ে গট্ গট্ ক'রে বেরিয়ে গেল, বললে—চ'লে যাবে জব্বলপুর। আমি বুড়ো মানুষ হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে বাস্ ধরলাম ওকে ধরতে। বলুন ত—এ কি ভাল? কার দিদিমা না বকেঝকে? তাই ব'লে কি গঙ্গাবাগে-পা দাদামশায়কে দৌড় করাতে হয়? চ' অবলা! বাড়ী চ'—দিদিমা বকবে না আর, কথা দিচ্ছি। এক কাপড়ে কোথায় চলেছিস—জব্বলপুর কি এখানে রে?'

"মেয়েটির মুখ লাল হ'ল—লাফিয়ে উঠে গট্ গট্ ক'রে চ'লে গেল, লজ্জায় রাগে লাল হয়েও বটে, খানিকটা ভয় পেয়েও বটে—কে জানে কোন্ পাগলের হাতে পড়েছে ভেবে।"

এম্‌নি আরও কত গল্পই না করতেন ঋষিদা! রসিকতার ভাণ্ডার ছিল তাঁর অফুরন্ত। স্থানাভাব, তাই আর একটু জের টেনেই ইতি করব।

ফ্রয়েড-প্রমুখ মনোবিকলনীরা বলেন, যারা আমিষাশী তারা নিরামিষাশী হ'লে প্রায়ই রসিয়ে রসিয়ে গল্প করে তাদের পুরাকালে মাছ-মাংস খাওয়ার কথা। ঋষিদা গল্প করতেন তাঁর মিষ্টান্ন-প্রিয়তার কথা! বলতেন প্রায়ই, "ভাই, বয়েস আশী পেরুল ব'লে, কিন্তু দাও আমাকে ক্ষীর ছানা ননী, দাও আমাকে মাখন পনীর সর, দাও আমাকে সন্দেশ গোল্লা জিলিপি, দাও আমাকে সরভাজা সরপুরিয়া মোহনভোগ, মতিচুর, মনোহরা, তোফা, বোঁদে, ভাপা দই, জিভে গজা—উঁহুঃ, অরুচি হবে না কিছুতেই, কথা দিচ্ছি। গেলাপ হয় ত ফের পাঠিও আন্দামানে। হ্যাঁ, গাওয়া ঘি—ঐ দেখ স্বরাজ হ'ল, দিল্লীর লোকসভায় গরু এল যে কত দেশ থেকেই ভিড় ক'রে, শিং ভেঙে বাছুর তাই বা কত! অগুন্তি! অথচ ঘরে ঘরে গাওয়া ঘি-ই কিনা হ'ল বাড়ন্ত! শুধুই গোবর—তা আবার ষাঁড়ের! অথচ বল ত ভাই, ভব্য যোগীর কি গব্যঘৃত না হ'লে চলে?" ইন্দিরার দিকে তাকিয়ে, "শুধু মনস্তাপেই মিইয়ে গেলাম মা। শরীরে আর পদার্থ নেই—" ব'লেই কপালে করাঘাত ক'রে, "কিং বা স্বয়ম্ভু শিবশক্তিদেবা কুর্বন্তি কপালদুঃখং ন দূরম্—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তেত্রিশ কোটি দেবতা সবাই মিলে চেষ্টা করলেও কপালে যা আছে হতেই হবে মা, হবেই হবে, হবেই হবে—তাই আমার হয়েছে ঘৃতচিন্তা চমৎকারা—যোগে মন বসাই কি ক'রে বল?" ইন্দিরার চোখ ছল ছল ক'রে উঠল, বলল, "মুসুরিতে আমার বাবার চমৎকার গরু আছে, রোজ পনের সের দুধ দেয়—"

"আহা হা—মা! আমাকে তোমার বাবা পুষ্যি নিল না—লক্ষ্মী মা আমার! তাঁর কাছে এখন থেকে নিরন্তর ক'রো আমার গুণগান।"

ইন্দিরা চোখে জল মুখে হাসি অবস্থায় সেদিনই মুসুরিতে লিখে দিল। ওর পিতা ক্যাপ্টেন কৃপারাম তাঁর বিখ্যাত সাভয় হোটেলের কর্মকর্তাকে দিয়ে বাড়ীর

গরুর দুধ থেকে তোলা গাওয়া ঘি পাঠিয়ে দিলেন দু'বোতল। এদিকে আমি দু'টিন চীজ কিনে দিলাম ঋষিদার হাতে। বললাম, "কেবল একটা কথা ঋষিদা। চীজের টিন খুললে তাড়াতাড়ি খেয়ে শেষ ক'রে ফেলবেন কিন্তু! রেখে রেখে খাবার চেষ্টা করবেন না—বেশিদিন খাওয়া যায় না এ-বস্তু।"

"বেশ, বেশ ভাই! আহা, এমন না হ'লে দরদী! এস, বুকে এস—ঘি চাইতে চীজও এল। শতায়ু হও ভাই, সহস্রায়ু হও মা ইন্দিরা!"

তিন দিন পরে ফের দেখা—ভোলাগিরি আশ্রম হরিদ্বারে। বললাম, "কি দাদা? গাওয়া ঘি আর চীজ পেয়ে যোগে মন বসছে ত এখন?"

ঋষিদা করুণ হেসে বললেন, "গাওয়া ঘি ফিরিয়ে আনল নবযৌবন ভাই—'শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল'—তুমিই সেদিন গাইছিলে না কি একটা কীর্তনে? কিন্তু চীজ খাওয়া বুঝি হ'ল না আর এ-জন্মে।"

"সে কি দাদা?"

"আর সে কি?" বললেন ঋষিদা সুদীর্ঘশ্বাসে। "খেলেই যে ফুরিয়ে যাবে দু'দিনে! সেই ভয়ে আর টিন খুলতে পারি নি প্রাণ ধ'রে।"

ইন্দিরা হেসে গড়িয়ে পড়ল।

শুধু আর একটি গল্প বলব।

* * *

"শ্রীঅরবিন্দের কাছে কতরকম চিড়িয়াখানা চীজই যে আসত! একদিন এসেছে এক মোটাসোটা মোহান্ত। শ্রীঅরবিন্দ তখন ঘরের মধ্যে। আমরা তাঁর অপেক্ষা করছি বাইরের বারান্দায়—আমি, বারীন, ক্ষিতীশ দত্ত, আরো কে কে। সে বললে আমাকে, 'শ্রীঅরবিন্দ মস্ত যোগী শুনে এসেছি। তিনি নিশ্চয়ই জ্যোতিষ জানেন?' আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, 'না, তিনি জানেন না, কিন্তু আমি জানি।' মোহান্তর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে, 'জানেন? তবে বলুন তো আমার সুদিন কবে আসবে?' আমি বললাম, 'তথাস্তু। কেবল চোখ বন্ধ করতে হবে।' সে পরমানন্দে চোখ বন্ধ করল। 'খুলো না কিন্তু যতক্ষণ না বলি—আমি দেখছি তোমার কপালটা। হ্যাঁ, এবার জিভ বের করো, আরো—আরো একটু—হয়েছে, হয়েছে, দিব্যি জিভ! একটু রোসো, আমি সমাধিস্থ হয়ে দেখি—কত ধানে কত চাল। যতক্ষণ না বলি চোখ খুলো না, এবং জিভ বের ক'রে রেখো, নৈলে স-ব যাবে ভেস্তে।'

"বেচারা তো মা কালীর মতন লকলকে জিভ বের ক'রে চোখ বুজে ঠায় ব'সে রইল। আমি আর সবাইকে ইশারা করতেই তারা পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল আমার পিছু পিছু।

"পরে শুনলাম, আধঘণ্টা সে ঐ অবস্থায় ছিল। যখন চোখ খুলল তখন দেখে ঘরে কেউ নেই।"

ব'লে ঋষিদার ফের সেই প্রাণখোলা হাসি—ঠিক একটি দুষ্টু ছেলের হাসি। শুনলে কে বলবে তিনি অত বড় পণ্ডিত কি যোগী?

৬,
২৫

আর একজন সতী

শ্রীপ্রফুল্ল সরকার

এই ঘোর কলিযুগে যে আবার একজন এমন সীতা-সাবিত্রীর মত মহাসতীর মুখ দেখা যাবে, এ আশা ত একালের বুড়ীরা স্বপ্নেও করে নি। তাই এ পাড়া ও পাড়া সাত পাড়ার মেয়েরা এ বাড়ীতে ভেঙ্গে পড়েছে। সেই অলৌকিক খবর রটবার সঙ্গে সঙ্গেই নীলিমার চার পাশে তারা ভিড় ক'রে আসছে। পাশের বাড়ীর বাঁড়ুজ্যে গিন্নী সঙ্গে সঙ্গে নীলিমার থান কাপড় ছাড়িয়ে তাঁর নিজের নূতন চওড়া টকটকে লাল পাড় গরদের শাড়ী পরিয়ে দিয়েছেন, তার সাদা সিঁথিতে মোটা ক'রে তেল সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছেন, নীলিমার হাঁটু পর্যন্ত কোঁচকান চুলের ভার এলিয়ে দিয়ে তাকে একটা কৌচে বসিয়ে দিয়েছেন। বাঁড়ুজ্যে গিন্নী, তাঁর চার-পাঁচ বৌয়েরা একসঙ্গে শাঁখ বাজিয়ে নীলিমাকে বরণ করলেন, নীলিমাকে ঠিক দেবীপ্রতিমার মত দেখাচ্ছে। ক্রমে ক্রমে ভিড় বাড়তে লাগল। কুমারী, যুবতী, প্রৌঢ়া, থুথ্‌ড়ে বুড়ী সবাই তার মধ্যে আছে। এয়োস্ত্রীরা নীলিমার সিঁথিতে মুঠো মুঠো সিঁদুর লেপে দিচ্ছে। তার পর সেই ছোঁয়ানো সিঁদুর তারা যত্ন ক'রে সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যাচ্ছে মহা পবিত্র বস্তুর মত। কেউ তার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে স্বর্গীয় জ্যোতির আবিষ্কার করছে। অল্পবয়স্ক মেয়েরা তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করছে, পায়ের ধুলো নিচ্ছে।

খবর যখন আরও প্রচার হবে তখন আরও দূর দূর থেকে মেয়েরা আসবে। শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সিঁদুরের এমনি হোলিখেলা চলবে। এমনি আরও কতদিন—কত মাস—কত বছর চলবে কে জানে। হয়ত নীলিমা যতদিন বাঁচবে—এমন কি হয়ত তারও পরে—সে প্রবাদের মত হয়ে যাবে।

এই অঞ্চলের পুরুষরাও এই অলৌকিক ব্যাপার নিয়ে চায়ের দোকানে, বৈঠকখানায় আলোচনা করছে, তর্ক-বিতর্ক করছে, এ রকম ঘটনা পূর্বে আরও কোথায় কোথায় হয়েছে প্রবীণ লোকেরা সে-সব কাহিনী শোনাচ্ছেন।

অন্য সময় হ'লে এত ধকলে নীলিমা হয়ত ক্লান্ত হয়ে পড়ত। কিন্তু তার নিজের অসহ্য আনন্দ তার দৈহিক ক্লান্তির কথা ভুলিয়ে দিচ্ছে। চারদিকের এই উচ্ছ্বসিত আনন্দ, সম্মান, ভক্তির মধ্যে তার মুখের মিষ্টি হাসিটি ফুলের মত ফুটে আছে। বড় অকস্মাৎ ভাগ্য যেন তার গলায় এক বিরল জয়মাল্য পরিয়ে দিয়েছে। কয়েক ঘণ্টায় মাত্র সাধারণ এক স্কুল-মাষ্টারণী থেকে সবাই যেন তাকে পৃথিবীর মহারাণীর সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছে, তার নারীজন্মকে ধন্য ক'রে দিয়েছে।

কিন্তু যে ভদ্রলোকটি আজ থেকে ঠিক ছ' বছর আগে হঠাৎ প্রাণ হারিয়ে আজ আবার তেমনি হঠাৎ প্রাণ পেয়ে ফিরে এসেছে, তার এই সৌভাগ্যের সিংহদ্বার খুলে দিয়েছে, সেই রক্তকে নিয়ে কেউ তেমন মাতামাতি করছে না। তাই-ই হয়। এখন অবশ্য তার পরণে গেরুয়া কাপড় বা উত্তরীয় নেই। ধুতি আর পাঞ্জাবী প'রে বাইরের ঘরে রক্ত পরিচিত লোকদের সঙ্গে আলাপ করছে, তার প্রাণ ফিরে পাবার অলৌকিক কাহিনী শোনাচ্ছে। তার ন' বছরের ছেলেটিকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধ'রে আছে। এর যখন চার বছর বয়স তখন সে মারা যায়। বাপের মুখ, বাপের স্মৃতি তার মনে দাগ কাটবার মত বয়স তার ছিল না। আজ আবার নূতন ক'রে পরিচয় হচ্ছে। বাপ-ছেলের টান বাড়ছে। ছেলেটি যেন কি এক ঐশ্বর্য পেয়েছে। এক মুহূর্তও বাপের সঙ্গ ছাড়ছে না।

ঘটনাটা যেন একটা আজব গল্প। বিশ্বাস হয় না। তবু সত্যি। ঘটল কাল একেবারে সকাল বেলাই। দিনটা রবিবার। আজ আর স্কুল নেই। নীলিমা সেই কোন্ ভোরে উঠে সেই ছোট্ট ঘরটিতে ঢুকেছে, যেখানে স্বামীর একখানা বড় ছবি জলচৌকির উপর দাঁড় করিয়ে রাখা আছে, ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে রাখা আছে, ধূপদানিতে ধূপ জ্বালাবার অপেক্ষায় আছে। স্বামীর স্মৃতি-ভরা যত জিনিষ—একটা পরিত্যক্ত বেহালা, এক জোড়া খড়ম, ছাতা, সব সেই ঘরে সাজিয়ে রাখা আছে। আজ এই ছ' বছর ধ'রে নীলিমা সকালে খানিকক্ষণ আর রাত্রিতে খোকনকে ঘুম পাড়িয়ে যতক্ষণ না নিজের চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসত, স্বামীর সেই সুন্দর মুখের ছবির দিকে এক

দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত। তার স্বামী নেই—এ কথা সে ভুলে থাকত। কত কথা, কত ছোট ছোট সুখ-দুঃখের স্মৃতি ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে তাকে অধীর করত। দু' চোখ জলে ভ'রে আসত। তার পর রাত অনেক হয়ে গেলে সে ঘর বন্ধ ক'রে শুতে যেত। প্রতিদিন ফুল পাওয়া সম্ভব হ'ত না। কিন্তু রবিবার বাসিফুল ফেলে দিয়ে তাজা ফুলে ফুলদানি সাজিয়ে দিত। রবিবার নীলিমা অনেকক্ষণ থাকত। খোকনকে ঘরে নিয়ে গিয়ে তার বাবার গল্প বলত। বলত, বড় হয়ে বাবার মত অমনি সুন্দর বেহালা বাজাতে শিখবে খোকন, কেমন? মনে পড়ত সেই নূতন বিয়ে হবার পর বারান্দায় জ্যোৎস্নায় ব'সে রজত বেহালায় ইমন কল্যাণ, বেহাগের সুরের ঝঙ্কার তুলত. নীলিমা মুগ্ধ হয়ে শুনত। কত সুখ, কত সোহাগ, কত আবেগ-কাঁপানো সেই দিনগুলি।

নীলিমা অনেক ভাগ্য ক'রে এসেছিল। নইলে বাপ-মা মরা মেয়ে, মামার বাড়ী মানুষ, তার কপালে অমন বর জুটল কেমন ক'রে। হ্যাঁ, রূপের জোর ছিল তার, নইলে বিদ্যে ত তার আই-এ পর্যন্ত।

তার প্রতিভাবান্ স্বামী। বেহালায় অমন হাত খুব কম লোকেরই ছিল। এখানে ফিল্ম কোম্পানীতে রজত ভাল চাকরি করত। তার ছাত্রছাত্রী ছিল, সেখানেও তার রোজগার ভাল ছিল। তার পর ডাক এল বোম্বাই থেকে। সেখানে আরও টাকা, আরও যশ। রজত মাসে মাসে ঠিক টাকা পাঠাত, ছুটি পেলেই নিজে আসত। তার পর ক্রমশঃ কাজের চাপে সে আর বেশী আসতে পারত না। আসা-যাওয়ার মোটা খরচও আছে। তার পর দেড় বছর পরে সেই বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। সেই কাল টেলিগ্রাম এল সন্ধ্যাবেলায়। তার স্বামী হঠাৎ কলেরায় মারা গেছে। তার সেখানকার বন্ধুরা তার শেষ কাজ করেছে। অত দূর থেকে তাদের নিয়ে আসা সম্ভব হয় নি।

তার অমন রূপবান্, সবল সমর্থ স্বামী! নীলিমা যেন কিছু বুঝতে পারছিল না। জোরে কেঁদে উঠবার মতও তার শক্তি ছিল না।

তার দু'দিন পরে তার বন্ধুরা টি-এম-ও ক'রে এক হাজার টাকা পাঠিয়ে দিল। তার মাইনের টাকা দু' মাসের। খোকন তখন চার বছরে পড়েছে।

তারপর সে কি আথান্তর অবস্থা। তাদের দেখবার কেউ নেই। কোন জায়গা থেকে কোন খবর দেওয়া-নেওয়ার লোক নেই। তার ভাসুর লক্ষ্ণৌ-এ কলেজের প্রফেসার। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ অতি ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। কলকাতায় এলে ভাসুর উঠবেন এখানে এই মাত্র। নীলিমা তাঁর ঠিকানাও জানে না। কোন খবরই দেওয়া গেল না। এখানে তার স্বামীর বন্ধু-বান্ধব কে ছিল তাও সে জানে না। মামা অবিশ্যি এসেছিলেন। শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যেতে তাদের নিয়ে যাবারও প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু স্বামীর শত স্মৃতি-জড়ানো এই বাড়ী ছেড়ে যাবার কথা নীলিমা ভাবতেও পারে নি।

নিজের চেষ্টায় সে এ পাড়ার মেয়েদের স্কুলে চাকরিটি পেয়েছিল। তার পর সুখেদুঃখে দিন চ'লে যাচ্ছিল। স্বামীর কথা একদিনের জন্যেও সে বিস্মৃত হয় নি। বোধ হয় যতদিন তার জীবন থাকত কোনও দিন হ'ত না। এই দীর্ঘ ছ' বছর সে অন্য কোন পুরুষের চিন্তা মনে স্থান দেয় নি। মন-প্রাণ দিয়ে সে নিজের কাজ ক'রে গিয়েছে। ভগবান্, স্বামী আর নিজের শিশু-ছেলেটি ছাড়া তার দিনরাত্রির চিন্তা জুড়ে আর কিছু আসতে পারেনি।

ভগবান্ হয়ত তাই দয়া করেছেন। স্বানে থেকে কানে শুনেছেন।

এই ত কালকের ঘটনা। মনে পড়লে এখনও তার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠছে। ফুলদানিতে তাজা ফুল দিয়ে, ধূপ জ্বেলে সে স্বামীর ছবির সামনে ব'সে চোখ বুজে স্বামীর ধ্যান করছে। তার কানে যায় নি নতুন রাঁধুনীটা কখন কথা বলেছে, কখন ঘর দেখিয়েছে। পায়ের শব্দ শুনে সে পিছন ফিরে তা[illegible] দেখে, গেরুয়া কাপড়, উত্তরীয় পরা, মাথা-মু[illegible] এক সন্ন্যাসী হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে রয়েছেন। প্রথমটা সে হকচকিয়ে গিয়েছিল। তার পর সে মু[illegible] কি ভোলবার। মনে হ'ল যেন সে স্বপ্ন দেখছে। তার পর স্বামীর বুকের ওপর আছড়ে পড়ে তার শরীরের সঙ্গে নিজেকে যেন সে মিশিয়ে দেবে—তার পর তার ছ'বছরের সঞ্চিত কান্না সে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। রজতেরও চোখ ভাসিয়ে টস্ টস্ ক'রে অবিশ্রান্ত অশ্রু তার মাথা চুল ভিজিয়ে দিল।

তার পর থেকে সুরু মেয়েদের অযাচিত বাঁধভাঙ্গা আনন্দ ও ভক্তির স্রোত। অবিশ্রাম লোকের আনাগোনা।

সেই একই অলৌকিক কাহিনী। সহরের বাইরে এক গেঁয়ো জায়গায় রজতেরা সুটিং করতে যায়। সেইখানেই সে হঠাৎ ঐ ভীষণ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে, একরকম বিনা চিকিৎসাতেই অল্পক্ষণের মধ্যে মারা

যায়। তার পর ঝড়বৃষ্টির মুখে প'ড়ে তার সহকর্মীরা তার দেহ দাহ না করতে পেরে নদীর ধারে ফেলে রেখেই চ'লে যায়। পরে এক সন্ন্যাসী সেই পথেই যাচ্ছিলেন, ঐ অবস্থায় তাকে প'ড়ে থাকতে দেখে তাকে জীবন দান করেন এবং সঙ্গে ক'রে হিমালয়ের দূর অঞ্চলে তাঁর আশ্রমে নিয়ে যান। কোন সংবাদ দেবার নিষেধ ছিল তাঁর। এতদিন পরে তিনি ফিরে আসবার প্রত্যাদেশ দিয়েছেন।

সবাই শুনলেন আর বললেন, এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে শুধু নীলিমার সতীত্বের বলে। স্বয়ং যমরাজাও তার স্বামীর দেহ স্পর্শ করতে পারে নি। সন্ন্যাসী শুধু নিমিত্ত মাত্র।

নীলিমার আর কারো দিকে চাইবার অবকাশ নেই। স্বামীর সঙ্গে তার কত কথা বলবার আছে। তার কাছটিতে যাবার জন্যে তার সমস্ত মন উন্মুখ হয়ে রয়েছে। কিন্তু এই জলের স্রোতের মত আসা এই মেয়েদের ভিড়কে ঠেকিয়ে সেই নিভৃত অবসর সে কেমন করে পাবে। স্বামীকে নিজেহাতে ভালমন্দ রেঁধে খাওয়াবার জন্যে, তার একটু সেবা করবার জন্যে কি ব্যাকুল হ'য়ে পড়েছে সে, কিন্তু তার কিছু করবার জো নেই।

দুপুর বেলার দিকে জনতা একটু স্তিমিত হয়ে গেল। নীলিমা তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিলে। রজত এখনও খায় নি। তার জন্যে অপেক্ষা ক'রে রয়েছে। [illegible] দেখলে, ওর মুখটা কেমন ম্লান দেখাচ্ছে। মুখের রংটা যেন ফ্যাকাসে। নীলিমা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললে। তার স্বামীর কি রূপ ছিল! না জানি কত কষ্ট হয়েছে, এই ছ' বছর সন্ন্যাসীর মত নিঃসঙ্গ কষ্টের জীবন কেটেছে না জানি কত অর্দ্ধাহারে অনাহারে। নীলিমার দু'চোখ জলে ভ'রে উঠল।

তুমি কত রোগা হয়ে গেছ। নীলিমা বললে।

রজত হেসে বললে, তুমি আমার চেয়েও রোগা হয়ে গেছ। আমার জন্যে বড় ভাবতে, না?

নীলিমা কি বলবে? কথায় কতটুকু বলা যায়?

ও কি, দুধটুকু ফেলে রাখলে কেন? না, না, সবটুকু তোমায় খেতে হবে, কোন কথা শুনব না। নীলিমা একটু থেমে বললে, কি মুশকিল যে হয়েছে, আমি তোমার জন্যে কিছু করতে পারছি না। জানি না এই হাঙ্গাম আর ক'দিন চলবে। আমি একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি।

এ ত তোমার পাওনা নীলু। এ সম্মান, এ ভক্তি মেয়েরাই মেয়েদের দেয়। আমার কিন্তু ভারি আনন্দ হচ্ছে নীলু।

কতদিন পর নীলিমা এই আদরের ডাক শুনল। বললে, ভগবান্ তোমায় ফিরিয়ে দিয়েছেন, এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য, বড় আনন্দ আমার আর কিছু নেই। তুমি জান না আমি কি বিব্রত বোধ করছি, তোমার কাছে দু' দণ্ড বসতে পাচ্ছি না।

কিছুদিন সহ্য করতেই হবে। রজত হেসে বললে। আমার জন্যে একটুও মন খারাপ ক'রো না। আমি ত সব সময়ই তোমায় দেখছি, তোমার কাছে কাছে আছি।

ইতিমধ্যেই মেয়েদের আনাগোনা আরম্ভ হয়ে গেল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও নীলিমাকে উঠে যেতে হ'ল।

রজত খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইল। তার পর উঠে পায়চারি করতে লাগল। খোকন বোধ হয় পাশের বাড়ী খেলতে গেছে। এই সব গোলমালে আজ তার স্কুলে যাওয়াই হ'ল না। সারা বাড়ীতে যেন একটা জমজমাট উৎসবের আবহাওয়া বইছে। নীলিমা যে ঘরে আছে সেখান থেকে মেয়েদের কলগুঞ্জন ভেসে আসছে। রজত উঠে পড়ল। ঘেরা-বারান্দার ভেতর দিয়ে এসে সেই ছোট্ট ঘরটার শিকল খুলে ভেতরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। এ ঘরে সব যেমন ছিল ঠিক তেমনি আছে। ছবিটা এখনও সরিয়ে দেওয়া হয় নি। ফুল-গুলি শুধু একটু এলিয়ে পড়েছে। রজত অনেকক্ষণ তার ছবির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। নীলিমা এখন ত ছবির আসল মানুষটাকেই পেয়েছে। এ ছবিতে নীলিমার আর কোন প্রয়োজন থাকবে না। রজত ভাবতে লাগল। দীর্ঘ ছ' বছর দিনের পরে দিন নীলিমা এখানে ফুল দিয়েছে, ধূপ জ্বালিয়েছে। চোখ বুজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার চিন্তা করেছে। হয়ত মনের আবেগে তার সঙ্গে কত কথা বলেছে। তাকে ডেকেছে, কত অভিমান করেছে, কত হয়ত দুঃখ জানিয়েছে। রজত একটা ভারি নিঃশ্বাস ফেললে। না, নীলিমার মত মেয়ে হয় না। কাল তাকে চিনতে পেরে নীলিমার সেই আনন্দে হাসি-কান্নায় থরথর ক'রে কাঁপা মুখখানা রজতের মনে পড়ল আর তার বুকের ভেতরটা কি এক অসহ্য অস্থিরতায় কেঁপে উঠল। রজত কতক্ষণ তার নিজের চিন্তায় ডুবে ছিল জানে না। হঠাৎ খোকন এসে ঘরে ঢুকল, তার হাত ধ'রে বললে, বাবা, তুমি এখানে, আমি কতক্ষণ ধরে তোমায় খুঁজছি। এমনি ভয় হ'ল। ভাবলুম, তুমি বুঝি আবার চ'লে গেলে। ভারি করুণ দেখাল খোকনের মুখখানা। রজতের বুকটা দুলে উঠল। সে

খোকনকে দু' হাতে বুকে জড়িয়ে ধ'রে বললে, না বাবা, আর কোথাও যাব না।

খোকন বললে, হ্যাঁ বাবা, তুমি নাকি খুব ভাল বেহালা বাজাও, মা আমায় কতবার বলেছে। বাজাও না একটু শুনি।

রজত বললে, আচ্ছা তোমায় শোনাব। কালই শোনাব।

তার পর খোকন তার কোমর জড়িয়ে ধরে বললে, আমায় কিন্তু শিখিয়ে দিতে হবে। মা বলেছিল, আমি বড় হলে তোমার মত বেহালা কিনে দেবে। জান বাবা, মা না রোজ এই ঘরে ব'সে ব'সে কাঁদত। আমি কতদিন জানলা দিয়ে দেখেছি। আমারও ভারি কান্না পেত।

রজত আর এ ঘরে থাকতে পারল না। একটা দুঃসহ আবেগে তার বুকের কাছটা মোচড় খেতে লাগল। তার মনে হ'ল, আর কিছুক্ষণ এখানে থাকলে সে হয়ত চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠবে।

সেই রাত ন'টার সময় ভিড় পাতলা হয়ে এল। নীলিমা ছুটি পেল। তার বিশ্রামের দরকার। রজতের জন্যে সে একটু কিছু রেঁধে দিতে পারছে না, তার মন বড় উতলা হয়ে রয়েছে। কাল বোধ হয় রথের ছুটি। ভিড় তা হ'লে কাল অনেকগুণ বেড়ে যাবে। নীলিমার যেন কান্না পেল।

নীলিমা নিজে হাতে লুচি ভেজে রজতকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ালে। তার পর তার পাতেই তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে ঘরে এল।

রজত চুপ ক'রে ব'সে ছিল। নীলিমা হেসে বললে, কি, ঘুম পাচ্ছে?

রজত বললে, না।

তবে অমন চুপচাপ ব'সে আছ? কই সেই হিমালয়ের আশ্রমের গল্প বলবে বলেছিলে, আজ বল, শুনি। কি খেতে সেখানে? হ্যাঁগো? শুধু ফলমূল? দুধ পাওয়া যেত না? কই তুমি কিছু বলছ না, আমিই শুধু ব'কে মরছি। কি হয়েছে বল?

রজত ম্লান হেসে বললে, কিছু না।

নীলিমা তবু ছাড়বে না। হ্যাঁ কিছু হয়েছে। বল লক্ষ্মীটি। অত মন-মরা হয়ে আছ কেন?

রজত বললে, কিছু হয় নি। সত্যি। সারাদিন বড় ধকল গেছে। আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই, তুমি ঘুমোও।

নীলিমা ছোট মেয়ের মত খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। শেষকালে তুমিও কি আমায় দেবী ভাবতে আরম্ভ করলে না কি? এ কি, তোমার চোখে জল কেন? কি হয়েছে বল? লুকিও না, লক্ষ্মীটি।

তার পর একটু একটু ক'রে সেই সর্বনাশের কথা নীলিমাকে শুনতে হ'ল। রজতের না ব'লে উপায় ছিল না। রজত তার মোহগ্রস্ত অবস্থায় কল্পনা করেছিল এক, কিন্তু এখানের এ ছবি ত তার কল্পনায় ছিল না। তার নিজের মন আজ তাকে খণ্ড-বিখণ্ড ক'রে দিচ্ছে। তার ব'সে, দাঁড়িয়ে, খেয়ে ঘুমিয়ে কিছুতেই স্বস্তি নেই। তার বুক ফেটে যাচ্ছিল। আজ বিকেলে সেই ছোট্টঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে কেন জানি ওর মনে হয়েছিল যে, আর একটি দিন ও সত্য গোপন করলে তার খোকনের, তার স্ত্রীর, তার নিজের মহা অমঙ্গল হবে। আর একটি দণ্ডও দেরী করা তার উচিত হবে না।

রজত ধীরে ধীরে তার অপরাধের কথা বলতে লাগল। সে সত্যিই মরে নি। সে নিজেই তার মৃত্যুর খবর পাঠিয়েছিল। ফিল্মের একটা মেয়েকে দেখে সে পতঙ্গের মত ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল। রূপের লোভ, ভোগের লোভ তাকে উন্মাদ ক'রে দিয়েছিল। সে তার স্ত্রীপুত্রের কাছে লুপ্ত হয়ে হারিয়ে যেতে চেয়েছিল চির-কালের মত। কিন্তু অনেক—অনেক দিন পরে তার মোহভঙ্গ হ'ল। ফিরে আসবার যে-পথ সে নিজে বন্ধ ক'রে দিয়েছিল, মিথ্যা প্রবঞ্চনা দিয়ে আর এক মিথ্যা দিয়ে আবার সেই পথে তাকে ফিরে আসতে হয়েছে। সে মহাপাপী! তার অপরাধের ক্ষমা নেই। রজতের চোখ দিয়ে বড় বড় জলের ফোঁটা তার গাল বেয়ে পড়ছিল।

নীলিমার একখানা হাত রজতের হাতে ধরা দিল। নীলিমার মনে হ'ল, সেটা যেন তার হাত নয়, সেটা যেন একটা পাথর।

রজত নীলিমার সেই হাতখানা চেপে ধ'রে বললে, বল, তুমি আমায় ক্ষমা করবে। নইলে আমি এক মিনিটও শান্তি পাচ্ছি না। আমি মহাপাপী, তবু আমি ক্ষমা চাইছি। তুমি আমায় ক্ষমা কর।

নীলিমা শুধু আস্তে আস্তে বললে, ছিঃ, কেঁদ না। তুমি শোও, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। নীলিমার গলায় ক্ষোভ নেই, তিরস্কার নেই। অসম্ভব স্থির, শান্ত। তার চোখে জলের বাষ্পও নেই।

রজতের সমস্ত শরীর-মনের মধ্যে একটা নিদারুণ ক্লান্তি তাকে অবসন্ন ক'রে তুলল। নীলিমা যেন তাকে পরম আশ্বাস দিয়েছে। নীলিমার ভালবাসার কোমল স্পর্শ তার মাথার পিঠের উপর দিয়ে তাকে সান্ত্বনা
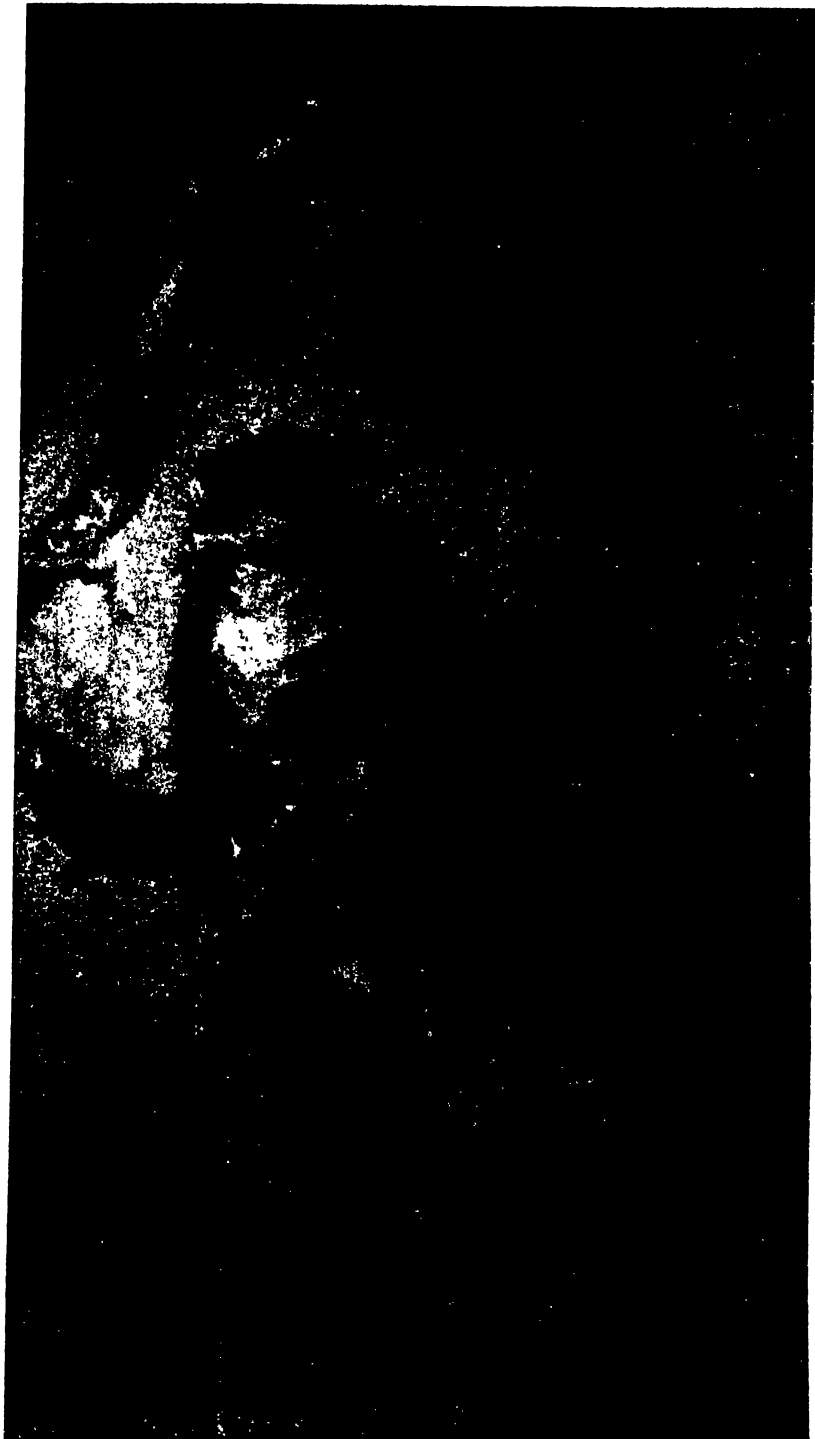
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ঝড়ের পর

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী ১৩৩৯ বৈশাখ হইতে পুনর্মুদ্রিত

পাহাড়ী মেয়েরা মাছ ধরিতেছে

দিচ্ছে। ঝড়ের পর শান্তির মত ধীরে ধীরে তার দুঃসহ আবেগে ক্লান্ত শরীর মুদে আসতে লাগল। সে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল।

নীলিমার ঘুম এল না। অনেকক্ষণ চুপচাপ ব'সে রইল। ঘুমন্ত খোকনের মুখে আজ দু'দিন কি যেন এক আনন্দের কোমল ছায়া দুলতে থাকে। আজও সেই ছায়া ঘুমের উপর পাতলা জ্যোৎস্নার প্রলেপের মত লেপে রয়েছে। রঞ্জত তার সব অপরাধ স্বীকার ক'রে, সব বোঝা হাল্কা হয়ে পরম আশ্বাসে ঘুমিয়ে পড়েছে।

এ ঘর যেন তাড়া ক'রে তাকে বাইরে নিয়ে এল। নীলিমা আলো নিবিয়ে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। আকাশে অনন্ত তারা। মনে হ'ল সংসারের দুঃখ তার এতদিন একা একা সে বয়ে এসেছে, এবার ছুটি নিলে কেমন হয়। এই ক' পা গেলেই ত গঙ্গা। তার শীতল জলের তলায় চিরকালের মত ঘুমিয়ে পড়বার জন্যে নীলিমার বড় লোভ হচ্ছে। আর সহ্য করবার শক্তি তার নেই। কারও উপর রাগ, নালিশ, ক্ষোভ, অভিমান তার আর কিছু নেই। কাল আবার কত ভিড় হবে। সিঁদুর পরাবে শাঁখ বাজাবে। কি ক'রে কিসের জোরে সহ্য করবে নীলিমা? তার চেয়ে এই অন্ধকারের মধ্যে সে যদি মিশে যায়, হারিয়ে যায়, তা হলে কেউ তাকে খুঁজে পাবে না, কেউ তাকে পূজো করতে আসবে না।

নীলিমা আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল সদর দরজার দিকে। বাঁ দিকে সেই ছোট্ট ঘর। নীলিমা খানিকক্ষণ দাঁড়াল। তার পর শিকল খুলে ভেতরে এল। আলোর সুইচটা টিপে দিলে। আলোয় ঘর ভরে উঠল। রজনী-গন্ধার মৃদু গন্ধে ঘরের বাতাস সুরভিত হয়ে উঠেছে। এক দৃষ্টিতে তার ছ' বছরের দিনরাত্রির সঙ্গী সেই ছবির দিকে চেয়ে রইল।

কি জানি, কি হ'ল নীলিমার। সেই ছবির তলায় মাথা ঠেকিয়ে উপুড় হয়ে প'ড়ে সে কাঁদতে লাগল। সে কান্না নিঃশব্দ। শুধু চোখের জল ছবিটার কাঁচের উপর থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে মেঝের উপর ঝ'রে পড়ছে। কিন্তু এ কান্না কেন?

নীলিমা ঠিক জানে না। মনে হ'ল, সব ফাঁকি, সব অমর্যাদার উর্দ্ধে যে স্বামী তার কল্পনায় ছিল, যার শরীর ছিল না, যার তৃষ্ণা ছিল না, সেই কল্পনার, সেই ছায়ার পায়ে ছাড়া এই ছ'বছরের লজ্জার, ব্যর্থতার কান্না আর কোথাও কাঁদবার নেই, কোথাও শোনাবার নেই।

বিজ্ঞাপনে কাজ হয়

শ্রীমিহির সিংহ

রোমান্সের গল্প লেখা কিম্বা বলা যত দিন যাচ্ছে ততই শক্ত হয়ে উঠছে। অবাস্তব পটভূমিকায় চড়া রং-এর কাহিনীতে রোমান্স সৃষ্টি করা হয়ত যায়। কিন্তু পাঠকেরা চাইবেন বাস্তবের ছোঁয়াচ। অর্থাৎ গল্প রোমান্টিকও হবে আবার তার পাত্র-পাত্রী ও পরিবেশ থাকবে এমন যে, দৈনন্দিন জীবনে তারা মোটেই অপরিচিত নয়। পাঠক পুলকিত হয়ে ভাববেন যে, এই ঘটনাটা তাঁর নিজের জীবনে ঘটলেও ঘটতে পারত। কিন্তু কোথায় আমাদের ইস্কুল, কলেজ, আপিস, বাজার দিয়ে ঘেরা দিনের মধ্যে সে অবকাশ, যে অবকাশে একটা চকিত চাহনিকে ঘিরে গ'ড়ে ওঠে সম্পূর্ণ একটা গল্প? আসলে যে গল্পটা বলতে যাচ্ছি আজকে, সেটার মতন গল্প হলেও সত্যি গোছের ঘটনা আজকাল বিশেষ ঘটে না।

আমাদের গল্পের নায়ক সুরঞ্জন একালে জন্মালেও যেন গল্পের নায়ক হবার জন্যেই জন্মেছিল। তার গোটা পারিপার্শ্বিকটাই নিজস্ব রোমান্টিক। বয়স কম, অবস্থা ভাল, একটা ছোটখাট পৈতৃক ব্যবসা আছে যার জন্যে ব্যক্তিগত প্রয়াস বিশেষ কিছু লাগে না। বলা বাহুল্য সে দেখতে সুশ্রী, সাধারণ ভাবে শিক্ষিত এবং স্বভাবে লাজুক। কিন্তু সব চাইতে রোমান্টিক হ'ল তার সাংসারিক অবস্থা, মাথার উপরে বাবা নেই, মা নেই, সে-ই বলতে গেলে বাড়ীর কর্ত্তা। ছোট বোন আছে,

আর আছেন দূর সম্পর্কের এক পিসীমা। ভেবে দেখতে গেলে রোমান্সের প্রত্যেকটি উপকরণই উপস্থিত, নেই শুধু একটি।

সুরঞ্জনদের বাড়ীর আবহাওয়াটাও যেমন ঢিলেঢালা, তাদের বনেদি পাড়াটার আবহাওয়াও তেমনি ঢিলে-ঢালা। রবিবার দিন সমস্ত পাড়াটাই যেন ছুটি আর অবসরের মেজাজে পরিপৃক্ত হয়ে থাকে। সকাল বেলার চা শেষ হতে দশটা হয়েছে, পিসীমার অনেক অনুনয় সত্ত্বেও রবিবারের বাজারটা বাদ দেওয়া গিয়েছে, সুরঞ্জন অত্যন্ত হৃষ্টমনে খবরের কাগজগুলি হাতে ক'রে দোতলার ছাতে এসে বসল রোদে পা মেলে দিয়ে। কিন্তু ব'সেই লক্ষ্য করল পাড়ার চেহারাটা হঠাৎ একটু ফিরে গিয়েছে। বাগান পেরিয়ে গুণেনবাবুদের বাড়ীটা এতদিন খালি প'ড়ে ছিল, তার জানলায় জানলায় ঝুলছে রঙিন পর্দা আর বারান্দা থেকে ঝুলছে রঙিন শাড়ী। সুরঞ্জন একটু কৌতূহলী হ'ল, গুণেনবাবু নিশ্চয়ই আসেন নি, কেননা তিনি ও তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রী বছর দুয়েক আগে কাশীতেই স্থায়ীভাবে বাস করবেন ব'লে চ'লে গিয়েছেন। যতদূর জানে গুণেনবাবুর এমন কোন নিকট আত্মীয় নেই যাদের বাড়ীতে অত রঙিন রঙিন শাড়ী ঝুলতে পারে। উঠে গিয়ে আলসের ধারে দাঁড়িয়ে কাগজ পড়ার ভান ক'রে সুরঞ্জন দৃষ্টি হানতে লাগল আরও মনোরম তথ্য আবিষ্কারের আশায়। ভগবান্ সদয় ছিলেন—নইলে আমাদের গল্পই বা কেমন ক'রে হবে?—অল্পক্ষণের মধ্যেই রঙিন শাড়ীগুলির অন্ততঃ একজন অধিকারিণীর দেখা মিলল। নাঃ, দেখতে যেন ভালই, সুরঞ্জন ত্রস্ত দৃষ্টিতে যাচাই ক'রে নিল অন্য কোন বাড়ী থেকে কেউ সন্দিগ্ধ-ভাবে তার আচরণ লক্ষ্য করছে কিনা।

আধ ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একান্ত অনুরাগী সুরঞ্জন মৈত্র নব প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে অনেক কিছু তথ্য সংগ্রহ ক'রে ফেলল—অবশ্য আন্দাজী: বাড়ীতে একজন প্রৌঢ় আছেন, নিশ্চয়ই বাবা। একজন মা-ও নিশ্চয়ই আছেন, যদিও তঁকে চাক্ষুষ দেখা গেল না, কেননা ছেলেমেয়েরা আসবাবপত্র সরান ইত্যাদি সমস্ত সাংসারিক কর্তব্য সম্বন্ধেই উচ্চৈঃস্বরে মা'র মতামত জানতে চাইছে। ছেলেমেয়ে অনেকগুলি, সবচেয়ে বড় বোধ হয় হাল-ফ্যাশানের রঙিন চৌখুপি শাড়ী-পরা মেয়েটিই। তার কাছাকাছি বয়সের আর একটি বোন আছে, ঈষৎ স্থূলাঙ্গী। তা ছাড়া আরও একটি বোন ও দুই ভাই—সবাই অত্যন্ত ব্যস্ত নতুন বাড়ীতে এটা ওটা সেটা গুছিয়ে নেওয়ার কাজে। ভাড়াটে তাতে সন্দেহ নেই। সুরঞ্জন বেশ খুশীই হয়ে উঠল, কাগজ না প'ড়ে বেশ সশব্দে রেডিও সিলোন্-এর বিজ্ঞাপন-মিশ্রিত হিন্দী গান শুনতে লাগল।

লাজুক ছেলে সুরঞ্জন, মনের মধ্যে খুব তুচ্ছ কারণেই রঙিন কল্পনার জাল বোনা তার স্বভাব। সুশ্রী সপ্রতিভ কর্মব্যস্ত প্রতিবেশিনী যে তার মন টানবে এতে খুব আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু ছিল না। প্রকৃতপক্ষে পরবর্ত্তী দু'তিন দিনের অনেকটা সময়ই কাটল গুণেনবাবুদের বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে থেকে। ফেব্রুয়ারী মাস, শীতের আমেজ এখনও আছে, তার সঙ্গে সঙ্গে আছে বহু শীতকালীন কর্ত্তব্য যা প্রত্যেক মধ্যবিত্ত বাড়ীর মেয়েরাই ক'রে থাকে। যথা লেপ রোদে দেওয়া, বড়ি শুকোতে দেওয়া, পাঁচিলের উপর দিয়ে বিভিন্ন আকৃতির আচারের বোয়েমের লাইন দেওয়া, ইত্যাদি। সুরঞ্জনের অবশ্য সব চাইতে ভাল লাগে যখন তার নাম-না-জানা প্রতিবেশিনী আসে রোদে শাড়ী মেলতে কিম্বা ভিজে চুল শুকোতে। এতদূর থেকেও যেন সুরঞ্জনের নাকে ভেসে আসে ভিজে চুল আর ভিজে কাপড়ের সুগন্ধ। সেদিন যেন সুরঞ্জনের মনেই হ'ল যে তার ঔৎসুক্য সম্বন্ধে মেয়েটিও সচেতন। যেন তার উপস্থিতিতে মেয়েটি বারে বারে আসে, বেশীক্ষণ থাকে, চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনাকে আরও লীলায়িত করে। সুরঞ্জন প্রেমে প'ড়ে গেল।

রাত্রে খেতে ব'সে যেন অবহেলা ভরে বোনকে জিজ্ঞেস করল, তুই দেখেছিস গুণেনবাবুদের বাড়ী কারা এসেছে, বোধ হয় ভাড়াটে?

সুরমা দাদারই মত স্বল্পবাক্, সে খেতে ব'সে কি একটা বই-এর পাতা ওল্টাচ্ছিল, মুখ না তুলেই বলল, ঐ ত মঞ্জরীরা।

সুরঞ্জন হেসে ফেলে বলল, ক'দিন এসেছে?—তোর সঙ্গে ত এর মধ্যেই খুব খাতির হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।

সুরমা এবার বই থেকে চোখ তুলে বলল, খাতির ওর সঙ্গে কোন কালেই নেই, তবে চিনি ওকে অনেকদিন। ফার্ষ্ট ইয়ারের মাঝামাঝি থেকে ও আমাদের সঙ্গে পড়ছে, হোষ্টেলেই অবশ্য থাকত এতদিন।

সেদিন সুরঞ্জন এ প্রসঙ্গ আর দীর্ঘ করতে চাইল না, তবে নামটা তার মনের মধ্যে গুঞ্জন ক'রে ফিরতে লাগল—মঞ্জরী।

সপ্তাহ কেটে গিয়ে ফের আর একটা রবিবার। ঘরের ভিতর থেকেই দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে মঞ্জরী কিছুক্ষণ হ'ল বাড়ীর চাকর আর অন্য ভাইবোনেদের

সঙ্গে মিলে প্রবল উৎসাহে রেডিওর 'এরিয়াল' খাটাতে ব্যস্ত। সুরঞ্জন সবে একটা খবরের কাগজ নিয়ে ছাতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, এর মধ্যে সুরমা কখন নিঃশব্দে দোতলায় উঠে এসেছে লক্ষ্য করে নি। সে হঠাৎ দাদার পাশ থেকে চিৎকার ক'রে উঠল, এই মঞ্জু, কি করছিস?

মঞ্জুর উত্তর শোনবার আগেই সুরঞ্জন মুখ লাল ক'রে নিজের ঘরে পালিয়ে এল; সত্যি রমাটা দিন দিন একটা ইডিয়ট হচ্ছে। একটু পরেই সুরমা এসে ঘরে ঢুকতে সুরঞ্জন বলল, তুই ওরকম গাঁক্ গাঁক্ ক'রে চেঁচাতে শিখলি কবে? বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে হলে আমরা হয় তাকে নিজেদের বাড়ী ডাকি, নয়ত তার বাড়ীতে যাই। ওরকম সাত মাইল দূর থেকে সাইরেনের মত চেঁচাই না।

সুরমা experiment করছিল নিজের বই খোঁজার অছিলায় দাদার বইগুলো কত অল্প সময়ে কি পরিমাণে লণ্ডভণ্ড ক'রে দেওয়া যায়। দাদার গলার স্বরে একটা নতুন কিছু আঁচ ক'রে সে চকিতে ঘুরে দাঁড়াতে সুরঞ্জনের ফর্সা মুখ হঠাৎ লাল হয়ে উঠল। সুরমা বলল, তা বেশ ত, মঞ্জুকে আমাদের বাড়ীতেই নিয়ে আসা যাবে, তোর সঙ্গে আলাপও হবে সবই হবে। সুরঞ্জন ঠিক কি বলবে ভেবে পেল না। বেরিয়ে যেতে গিয়ে সুরমা দু' পা পেছিয়ে এসে বলল, তুই দাদা হিসেবী লোক বটে। জানিস ওরাও বারেন্দ্র—লাহিড়ী।

এবার সুরঞ্জনের মনে হচ্ছিল, কিছু একটা উত্তর না দিলে মেয়েটা বড্ড বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুরমা বলল, বুধবারের আগে আমার সময় হবে না। ওকে আমি বুধবার বিকেলে কলেজ ফেরতা নিয়ে আসব। তুই যদি পারিস, চারটের মধ্যে চ'লে আসিস, সবাই এক সঙ্গে চা খাওয়া যাবে। পিসীমাকে আমিই ব'লে রাখব এখন।

বুধবার পর্য্যন্ত অতগুলো ঘণ্টা সময় যে কি ক'রে কাটল সুরঞ্জনের তা সে নিজেই জানে। যাই হোক, ঘড়ি ত তার আপনার নিয়মে ঘুরবেই। বুধবার দিন ভোর হ'ল, সুরঞ্জনের অধৈর্য্য হৃদয়ের মধ্যে দিয়ে একটা একটা ক'রে মিনিট পেরিয়ে গেল। অফিস থেকে বাড়ী ফিরে সে জামা কাপড় ছেড়ে তৈরী হয়ে দেখল, চারটে বাজতে তখনও বেশ কিছুটা সময় বাকী। মঞ্জরী যখন এসে পৌঁছল তখন চারটে ত বেজে গিয়েছে, সাড়ে চারটেও অনেকক্ষণ পার হয়ে গিয়েছে। তার কারণ এই না যে, সে এই বৈকালিক নিমন্ত্রণের কথা ভুলে গিয়েছিল, কিম্বা কলেজে বা বাড়ীতে তাকে আটকে পড়তে হয়েছিল। তার কারণ এই যে, সে কিছুতেই সুরমার কথা মতন কলেজের কাপড় প'রে অথবা চুল না বেঁধে আসতে রাজী হয় নি। সুরঞ্জনের মতন প্রেমে না পড়লেও আসলে সেও অত্যন্ত উৎসুকভাবে প্রতীক্ষায় ছিল এই দিনটির।

রমার দাদা যে অনেক সময়ই তাকে দেখবার চেষ্টা করেন সেটা মোটেই তার নজর এড়ায় নি। অন্য কেউ এভাবে দেখলে সে হয়ত একটু চটেই যেত কিন্তু এই সুপুরুষ যুবকটির খবরের কাগজ নিয়ে ছেলেমানুষী অভিনয় দেখে তার গোড়া থেকেই মজা লেগেছিল। তার পরে যখন সুরমার মতন নাক তোলা মেয়ে এসে তাকে বলল, এই মঞ্জু, তুই বুধবারে কলেজ ফেরত আমাদের বাড়ী যাবি, আমার দাদা তোর সঙ্গে আলাপ করবে। তখন থেকেই সে বেচারীর অপরিণত মনের মধ্যেটা একটা না-জানা কিছুর প্রত্যাশায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে। সে কারণে-অকারণে মা-বাবাকে আর ভাইবোনদের আদর ক'রে দিচ্ছে আর মনে মনে ভাবছে, যদি আমার ঐ ফর্সা মতন ভদ্রলোকের সঙ্গেই বিয়ে হয় ত আমার বন্ধুদের মধ্যে কাকে কাকে নেমন্তন্ন করব।

ঠিক চারটে একচল্লিশের সময় সুরমা তার বন্ধুর সঙ্গে দাদার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, তোরা কথা বল্, আমি এক মিনিট বইগুলো রেখে আসি। বইগুলো রেখে আসা অবশ্য ছুঁতো মাত্র, আসলে সে এক ছুটে বইগুলো উপরে রেখে এসে খাবার ঘরের জানলার পাশ থেকে দেখবার চেষ্টা করতে লাগল দু'জনে কি করে। সে তৈরিই হয়ে ছিল যে তারা খুব সলজ্জভাবে প্রথম আলাপের পদক্ষেপ সুরু করবে এবং সে নিজে প্রচুর পরিমাণে ঈর্ষ্যান্বিত হবে। কিন্তু জানলা দিয়ে যতটুকু দেখতে পেল তা অবশ্য একেবারেই অন্যরকম। মঞ্জরী যে প্রথমদিন একটু আড়ষ্ট হয়ে থাকবে তা সে ধ'রেই নিয়েছিল, কিন্তু তার দাদার ধরণ-ধারণ দেখে সে একে-বারে অবাক্ হয়ে গেল। সুরঞ্জন কোন কারণে অসোয়াস্তি বোধ করলে বা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লে কিরকম তার মুখের চেহারা হয় সুরমার তা খুব জানা আছে। দাদা যে একটা কিছু কারণে ভয়ানক রকমের অসোয়াস্তি বোধ করছে তা বুঝতে তার বাকী রইল না। প্রথম দু'এক মিনিটের মধ্যে সুরঞ্জন আর মঞ্জরীর কি কথাবার্তা হয়েছে সে জানে কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক তার পরে তারা কেউ কারুর সঙ্গে আর কথা বলতে চাইছে ব'লে মনে হ'ল না। রাগে দুঃখে সুরমার প্রায় চোখে জল এসে গেল। মঞ্জরীকে বলতে গেলে সে একরকম

জোর ক'রেই ধ'রে এনেছে। আগে যদিও মঞ্জরী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সে ভাবে নি কোনদিনই, তবু এই কয়দিনে মঞ্জরীর সঙ্গে বন্ধুত্বটা হঠাৎ যেন জমে উঠেছে। মনে মনে সে দাদার পছন্দের তারিফ না ক'রে পারে নি, সত্যি বেশ সুন্দর মেয়ে মঞ্জরী। কিন্তু দাদা ইডিয়টটা যে এরকম সব মার্ডার ক'রে দেবে তা কে জানত?

যাই হোক, সেদিনকার চা-এর আসর বিশেষ জমল না। সুরমা তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যকে যথাসাধ্য দূরে রেখে অনেক চেষ্টা করল আবহাওয়াটাকে তরল করবার। রেকর্ড বাজাল, ছবির অ্যালবাম দেখাল, এমন কি নিজে একটা গান গেয়ে মঞ্জরীকে দিয়েও গাওয়াল কিন্তু দাদার সঙ্গে তার বন্ধুর আলাপটাই খুব জমল না। কথাবার্তা অবশ্য দু'জনেই বলল, সুরঞ্জন চেষ্টাও করল একটু সহজ হবার কিন্তু প্রথম কয়েক মিনিটের অস্বস্তির ইতিহাসটুকু খচখচ করতেই লাগল। বিকেল ফুরিয়েই গিয়েছিল, সন্ধ্যাও ঘন হয়ে এল, এক সময়ে মঞ্জরী বলল, এবার বাড়ী যাই। সুরঞ্জন তাকে সদর দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে উপরে নিজের ঘরে চ'লে গেল। সুরমা মঞ্জরীদের বাড়ী পর্য্যন্ত গেল তাকে পৌঁছিয়ে দিতে। এইবার সুরু হ'ল সুরঞ্জন বেচারীর অন্তর্দ্বন্দ্ব। আসলে সে নিজেও বুঝতে পারে নি, ঠিক কি ব্যাপারটা হ'ল। খুব সপ্রতিভ সে কোন কালেই নয়, মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করার ব্যাপারে অপটুই বলতে হবে। কিন্তু দূরবর্ত্তিনী ওই মেয়েটি কেমন যেন তাকে একটু বেশী ক'রেই টেনেছিল। দূর থেকে তার গলার স্বর, তার চলার ধরণ হঠাৎ যেন খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। অনেক আগ্রহ ক'রে সে বসেছিল তার সঙ্গে আলাপ করবে বলে। সব লাজুক মানুষদের মতন সেও মনে মনে অনেক আউড়িয়ে ছিল, তাকে কি বলবে, এমন কি কোন্ হাসির ঘটনা শোনাবে। নিজের মনে মনে ঠিকই ক'রে রেখেছিল, সে বোনের বন্ধুত্বের অধিকারে গোড়া থেকেই আপনি না ব'লে তুমিই বলবে। কিন্তু কি হ'ল? অনেক ভেবেও কিনারা করতে পারল না। এইটুকু শুধু বুঝতে পারল, যে, দূরত্বের ব্যবধানটুকু বাদ দিয়ে মেয়েটিকে দেখার প্রথম মুহূর্ত্তেই তার সম্বন্ধে কেমন একটা স্পষ্ট বিতৃষ্ণার ভাব এসে পড়েছিল, যেটাকে সে আর কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারল না। কিন্তু বিতৃষ্ণা? কেন? দূরের থেকে মেয়েটির গতি যত সুন্দর মনে হয়েছিল, সোফায় হেলান দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকলে তার চাইতে তাকে বেশী বই কম সুন্দর ত মনে হচ্ছিল না? নিঃসন্দেহে সে দেখতে ভাল, ব্যবহারে নম্র অথচ সপ্রতিভ। তবু কেন এই বিরাগ—সুরঞ্জন মুশকিলে পড়ে গেল।

সুরমা ত বুঝতেই পেরেছিল যে কিছু একটা হয়েছে, কিন্তু ঠিক যে সেটা কি তা ধ'রে উঠতে পারে নি। দাদার উপরে এতটা রাগ জমা হয়ে ছিল যে, দাদার সঙ্গে এ প্রসঙ্গই সে আর উত্থাপন করল না, বলা বাহুল্য সুরঞ্জনও মঞ্জরীর কথা বা সেদিনকার চায়ের আসরের কথা বোনের সঙ্গে আলোচনা করতে পারল না। মোটের পরে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা দিয়ে অপ্রীতিকর ঘটনাটিকে চাপা দিয়ে দেওয়া হ'ল।

এর পরে মাস আড়াই তিন কেটে গিয়েছে, ভাই-বোনের মধ্যে সম্পর্কটা স্বাভাবিক নিয়মেই অনেক ভাল হয়ে এসেছে। রবিবার সকালবেলা চা খেতে ব'সে সুরমা হঠাৎ বলল, আজকে মঞ্জরীরা চ'লে যাচ্ছে জানিস? সুরঞ্জন সম্পূর্ণ অন্য একটা কি কথা চিন্তা করছিল; সে চমকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কেন? কোথায়? সুরমা বলল, ওর বাবা ত রিটায়ার করেছেন, তাই ওরা এখন ওদের নিজেদের বাড়ীতেই থাকবে, এতদিন সেখানে ভাড়াটে ছিল ব'লে যেতে পারছিল না। মঞ্জরীর কথাটা মন থেকে অনেকটা মুছে এসেছিল; আজকে হঠাৎ ধক্ ক'রে সুরঞ্জনের বুকের মধ্যে বাজল। সব ব্যাপারটা ভেবে তার নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী বলে মনে হতে লাগল। খবরের কাগজ হাতে দোতলার ছাতে যাওয়া ছেড়েই দিয়েছিল, আজকে অনেকদিন পরে সে গিয়ে আস্তে আস্তে আলসে ধ'রে দাঁড়াল। মঞ্জরী তাকে দেখতে পেল কি না বুঝতে পারল না। তিনমাস আগে আর এক রবিবারে সে যেরকম ব্যস্তভাবে অনেক কাজ ক'রে বেড়াচ্ছিল, আজও তেমনি ব্যস্ত ব'লেই মনে হ'ল তাকে। সুরঞ্জনের শুধু মনে হ'ল, তার যেন গতি অনেক ম্লান হয়ে গেছে, সেদিন যেন সে ঘুরছিল প্রাণের উচ্ছল আনন্দে, আর আজকে যেন নেহাতই কাজের তাগিদে। অত্যন্ত ভারী মনে সুরঞ্জন ভেবে দেখল যে, সেদিন মঞ্জরী ব্যস্ত ছিল নতুন জায়গায় সংসার পাতার কাজে, আর আজকে সে ব্যস্ত পাততাড়ি গোটাতে। তার মনটা তার নিজের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে বলল, শুধু তোমার জন্যেই, তা না হ'লে এ গল্পের শেষটা হতে পারত একেবারেই অন্যরকম, নয় কি? প্রথম দর্শনে তোমার হ'ল বিতৃষ্ণা, কিন্তু কেন?—তার কোন কারণ ত তুমি নিজেই খুঁজে পাও নি। নিজের মনের চাঞ্চল্যটা কমানোর জন্যে সুরঞ্জন হাতের খবরের কাগজটার

দিকে মন দেওয়ার চেষ্টা করল। হঠাৎ প্রবল বিস্ময়ে সে আবিষ্কার করল, তার প্রশ্নের উত্তর জ্বলজ্বল করছে রবিবাসরীয় কাগজের প্রথম পৃষ্ঠাতেই। সিকি পাতা জোড়া একটা অতি পরিচিত বিজ্ঞাপন যেন একটি প্রসিদ্ধ দাঁতের মাজনের, সুন্দরী একটি তরুণীর ছবি, তার সঙ্গ সবাই পরিহার করছে তার মুখের দুর্গন্ধের জন্যে, মেয়েটির চেহারা এমন কি চুল বাঁধার ভঙ্গিটি পর্য্যন্ত অবিকল মঞ্জরীর মতন!

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

শ্রীসুনীতি দেবী

আমার পিতৃদেব বিজয়চন্দ্র মজুমদারের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব গত ১৯৬১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা 'হলে' অনুষ্ঠিত হয়। ছোটখাট আরও দু'একটি সভাতেও তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে। তা ছাড়া কলকাতার প্রায় প্রত্যেক বাংলা, ইংরেজী, ওড়িয়া ও উর্দ্দু মাসিক ও দৈনিকে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছু আলোচনা হয়েছে। সব হয়ত চোখে পড়ে নি, তবে অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য্য ও ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের গবেষণামূলক রচনা দু'টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হয়ত আরও উল্লেখযোগ্য লেখা বেরিয়েছে, কিন্তু আমার দেখার সৌভাগ্য হয় নি, কাজেই সেগুলির বিষয় কিছু বলতে পারলাম না। আশা করি সেই সব লেখকেরা ক্ষমা করবেন। জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে বিভাস রায়চৌধুরীর লেখা জীবনীতে বিজয়চন্দ্রের জীবনকথা, তাঁর প্রতিভা, তাঁর রচনাবলী, এ সব সংক্ষেপে সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে। মাসিক ও দৈনিকের সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলিতেও তাঁর ভক্ত পাঠক ও ছাত্রদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। এত সব লেখার পর আমার হয়ত কিছু না লিখলেও চলত, কারণ সম্প্রতি 'বিশ্বভারতী' পত্রিকার অনুরোধ এড়াতে না পেরে একটি লেখা দিয়েছি। 'প্রবাসী'র অনুরোধ এড়ানও সহজ নয়, কারণ 'প্রবাসী'র জন্ম থেকে পিতৃদেব তার সঙ্গে যুক্ত। 'প্রবাসী'র ষষ্টিবার্ষিকী সংখ্যায় এটি দেবার কথা ছিল, কিন্তু নানা কারণে তখন পেরে উঠি নি।

বিজয়চন্দ্র নিজে আত্মপ্রচারবিমুখ ছিলেন, এমন কি তাঁর রচনাবলীর বিজ্ঞাপনও নিজে দিতেন না; তা সত্ত্বেও তাঁর বইগুলি যথেষ্ট সমাদৃত ও প্রচারিত হয়েছিল। তিনি যদি নিজের কথা বলতে ভালবাসতেন তা হলে তাঁর বাল্য-যৌবনের কত মধুময় স্মৃতি আমাদের কাছে সঞ্চিত থাকত। নাতি-নাতনীরা খাতা-পেনসিল নিয়ে হয়ত কাছে বসেছে, প্রশ্ন করছে, "দাদা, বল না তুমি ছেলেবেলায় কি করতে, বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন ভাবে গ'ড়ে উঠলে?" ইত্যাদি। অমনি হেসে বলতেন, "বুঝেছি, তোরা লিখে নিতে চাস্। দাদাকে তোরা অমর না ক'রে ছাড়বি না দেখছি।" বাস্—ঐ পর্য্যন্তই। বন্ধুবান্ধবের কত গল্প বলতেন, কিন্তু নিজের বিষয় নীরব। আমরা যা জেনেছি তা বন্ধুদের, কিংবা বাবার বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে শুনে।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে বহু প্রতিভাবান্ ব্যক্তি আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, বাবা তাঁদের অন্যতম। পূর্ব্ববঙ্গে ফরিদপুর জেলায় খালবুলা গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা জমিদার হরচন্দ্রের কুলপদবী 'মৈত্র' হলেও তাঁদের একজন পূর্ব্বপুরুষ বাদশাহী আমলে 'মজুমদার' উপাধি পাওয়াতে, বংশানুক্রমে সেইটাই চ'লে এসেছে।

গ্রামের পাঠশালা ছেড়ে কৃষ্ণনগর স্কুলে পড়ার সময় কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে তিনি অচ্ছেদ্য সৌহার্দ্যবন্ধনে আবদ্ধ হন। কলকাতায় কলেজ-জীবনে যাঁদের সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্বন্ধ গ'ড়ে উঠেছিল তার মধ্যে ডাঃ নীলরতন সরকারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাবার কঠিন অসুখে একবার ডাঃ নীলরতন সরকার তাঁকে দেখতে এলে, তিনি বলেছিলেন, "এতগুলো সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে কষ্ট ক'রে এলে কেন নীলু।" নীলরতন তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "তোমার বাড়ীর লোকদের জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবে একটাও সিঁড়ি ভাঙ্গি নি, সব আস্ত আছে!" শুনে আমরাও হেসে উঠেছিলাম। নীলরতন না জানিয়ে এসে যদি বাবার হাতখানি ধরতেন,

অন্ধ অবস্থায়ও বাবা ব'লে উঠতেন "এ যে ডাক্তারের হাত। চিনতে আমার দেরি হয় না।" নীলরতনের অল্প কয়েক মাস আগেই বাবা চ'লে যান। সে খবর নীলরতন জানতেন না, কারণ তিনি নিজেই তখন অসুস্থ। সেই অসুখের মধ্যেও তিনি ঈষৎ প্রলাপের ঘোরে ব'লে উঠেছিলেন, "আমরা গান ধরেছি, বিজয় দোহার দাও।"

ছাত্রাবস্থায় কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে বাবা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। বাড়ীর সঙ্গে এতে স্বভাবতই বিরোধ হয় এবং তখন তাঁকে ছাত্র পড়িয়ে মেসের খরচ চালাতে হত। প্রায় সব ছাত্রেরাই তখন বহু কষ্টে মেসের খরচ চালিয়ে পড়াশুনা করতেন। এখনকার দিনে প্রতি সপ্তাহে দুবার 'সিনেমা' দেখার যুবক-দলের কাছে একটা গল্প না ব'লে পারলাম না। ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য বাবার সহপাঠী ছিলেন। তাঁকেও অনেক টানাটানির মধ্যে কলকাতায় থাকার ও পড়ার খরচ চালাতে হত। তিনি নিজে ত মিতব্যয়ী ছিলেনই, বন্ধুদেরও খরচ সম্বন্ধে সংযত রাখতেন। একদিন সন্ধ্যায় মাঠ থেকে অনেকটা হেঁটে মেসে ফিরবার পথে দেখলেন, একজন ফুলওয়ালা চাঁপাফুল বিক্রি করতে করতে যাচ্ছে, আর এক পয়সায় একটি গুচ্ছ দিচ্ছে। বাবা তখুনি একটি পয়সা দিয়ে কিনতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু প্রাণকৃষ্ণ বাবু বাবার হাত ধ'রে টেনে বললেন, "তুমি বড় খরচে হে বিজয়। ফুলের গন্ধ শুঁকতে ভাল লাগছে ত এস আমরা এক কাজ করি। ফুলওয়ালা যে পথ দিয়ে যাবে, আমরাও যতক্ষণ পারি ওর পিছন পিছন যাব, আর সুগন্ধ উপভোগ করব। কিনবার কি দরকার?" এই ব'লে দলসুদ্ধ ফুলের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে আরও অনেক দূর হাঁটলেন! বাবার কষ্টার্জ্জিত টাকার একটি পয়সা বাঁচল!

বি-এ পাশ ক'রে নিজের জীবিকার্জ্জনের জন্য বাবা দুর্গম ওড়িষ্যার বামড়া রাজ্যে কাজ নিয়ে যান। এই সময় কটকে ভক্তকবি মধুসূদন রাও-এর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয় ও পরে মধুসূদনের জ্যেষ্ঠা কন্যা বাসন্তী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। চোদ্দ বছর বয়সেই বাসন্তী দেবী পিতৃগৃহে খুব ভালভাবে সংস্কৃত সাহিত্য পড়েছিলেন—যার জন্য ডাঃ নীলরতন সরকার ঠাট্টা ক'রে বলতেন, "বিজয়ের বৌ সংস্কৃত পণ্ডিত হ'ল, আমরা ত কথা বলতেই সাহস পাব না।"

কিছুদিন সরকারী জেলা-স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজ ক'রে বাবা ওকালতি পাশ করেন ও সম্বলপুরে ওকালতি আরম্ভ করেন। সে সময় ওড়িষ্যার কয়েকটি মিত্ররাজ্যেরও আইন-পরামর্শদাতা ছিলেন। সেই সব রাজ্যে যাতে প্রজাদের উপর অত্যাচার না হয় এবং তাদের উন্নতি হয় এদিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। এই সব রাজ্যের মধ্যে সোনপুরের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল অতি নিকট আত্মীয়ের মত। সুখে-দুঃখে তাঁরা সর্ব্বদা বাবার পাশে দাঁড়িয়েছেন। প্রথম চাকুরী-জীবনে বামড়ার যুবরাজের গৃহশিক্ষক ছিলেন, কিন্তু যুবরাজ যখন রাজা হলেন তখন হয়ত ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক কোন বাধায় তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কমে যায়। বাবার স্বাধীন মতামত এই সব রাজ্যে প্রভাব বিস্তার করে, এটা ব্রিটিশ সরকার বিশেষ পছন্দ করতেন না। বহুদিন পরে বাবা অন্ধ হয়েছেন এই খবর পেয়ে যুবক রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেব আর দূরে থাকতে না পেরে ছুটে বাবার সঙ্গে দেখা করতে এলেন, আর বাবাকে জড়িয়ে 'গুরু গুরু' বলতে বলতে অশ্রুপাত করতে লাগলেন। তার পর বললেন, "আপনি চিকিৎসার জন্য ইউরোপে যান, যা খরচ হবে আমি দেব।" কিন্তু বাবা তাঁকে অনেক বুঝিয়ে নিরস্ত করেন—যে এ অন্ধত্ব সারবার নয়।

রবীন্দ্রনাথ, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ, প্রভৃতি সমসাময়িক সব মনীষীদের পত্রাবলী কয়েক বছর আগে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বাবাকে যে সব চিঠি লিখতেন তারও কিছু কিছু শান্তা দেবী তাঁর পিতার জীবনীতে প্রকাশ করেছেন।

বাবা ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, পালি, ওড়িয়া, উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষা ত জানতেনই, তাছাড়া কোলদের সঙ্গে তাদের মুণ্ডা ভাষায়ও কথাবার্ত্তা বলতে শুনেছি। সংস্কৃত এত ভাল জানতেন যে, তাতেও অনেক মৌলিক কবিতা লিখে গেছেন। তাঁর ২৫।২৬ বছর বয়সে কটকে থাকার সময় সেখানে একজন অন্ধ মহারাষ্ট্র কবি এসেছিলেন। তাঁর সভায় তাঁর কবিতার পাদপূরণে মুখে মুখে বাবা সংস্কৃত কবিতা রচনা ক'রে সকলকে চমৎকৃত করেন। পরে সেই কবিতা থেকে 'ঈশস্তুতি' নামক কবিতাটি প্রয়াগ থেকে প্রকাশিত 'সারদা' সংস্কৃত পত্রিকায় ছাপা হয় এবং বাবার এত অল্পবয়সে এরকম আশ্চর্য্য সংস্কৃত জ্ঞানের কথা যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করে।

'প্রবাসী'র সঙ্গে বাবার যখন যোগ, তখন বাবা পূর্ণ উদ্যমে সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, প্রভৃতি নিয়ে চর্চ্চা করছেন। বাবা নিজে প্রবাসী বাঙালী, তাই 'প্রবাসী' পত্রিকায় মহা উৎসাহে লিখতে আরম্ভ করলেন। রামানন্দবাবু তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে লিখতে

বলেছিলেন ও মন্তব্য করেছিলেন, "আপনার কাছে সবরকম লেখা চাই—কারণ আপনি খুব versatile"। বাবার 'বনলীলা' পড়ে রামানন্দবাবু লিখেছিলেন, "বনলীলা ছন্দের মধুর ঝঙ্কারে এবং কবিত্বে মনোজ্ঞ হইয়াছে। ছন্দের এত বাঁধুনির মধ্যে এতটা কবিত্ব রাখা বিশেষ ক্ষমতা ও প্রতিভার পরিচায়ক।" এ প্রবন্ধটিতে বিশেষভাবে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ঘটনা লিখছি, তাই বাহুল্যভয়ে বাবার মধুময় ও প্রাণবন্ত কবিতা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করছি। পাঠকেরা নিজেরা যদি সেগুলি তাঁর বই থেকে প'ড়ে নেন, তবে নিশ্চয়ই মুগ্ধ হবেন।

কলকাতার কয়েকটি পত্রিকা অভিযোগ করেছিলেন যে, "বিজয়বাবু এখন 'প্রবাসী'কেই বেশি লেখা দেন।" এই নালিশ শুনে রামানন্দবাবু বলেছিলেন যে, প্রবাসী বাঙালীর রচনায় 'প্রবাসী'রই দাবি আগে। বাবাকে এই সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন, "বাস্তবিক আমি কলিকাতার ও বঙ্গের অন্য স্থানবাসী অনেক সুলেখককে পত্র লিখিয়া উত্তর পাই নাই। সুতরাং যদি 'প্রবাসী' আপনার সমুদয় শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি পায়, তাহাতে কিছুই অবিচার হয় না।" তবে একথাও ঠিক যে বাবা বাংলার কোন পত্রিকাকেই বঞ্চিত করেন নি। পুরাণো দিনের 'দাসী', 'নব্যভারত', 'বামাবোধিনী', 'ভারতী' এসব ছাড়াও নূতন নানা বিখ্যাত ও অখ্যাত কাগজেও লেখা দিয়েছেন। 'প্রবাসী'তে নানারকম লেখা দিতে হবে ব'লে প্রবন্ধ ও কবিতা ছাড়া গল্প, উপন্যাস ও নাটিকা পর্য্যন্ত লিখে দিয়েছেন। তাছাড়া মাসের পর মাস পুস্তক সমালোচনার ভার নিয়েছেন। যে সব ছবি 'প্রবাসী'তে ছাপা হ'ত তারও কতকগুলির বিষয় নিয়ে কবিতা লিখে দিতেন। এই প্রসঙ্গে একটি মজার ঘটনা না ব'লে পারছি না। আমার তখন 'প্রবাসী'র লেখা বুঝবার বয়স হয় নি বটে, তবে ছবি সম্বন্ধে শিশুসুলভ ঔৎসুক্য কিছু কম ছিল না। একটি ইউরোপীয় ছবি—(সৈনিক তার প্রিয়তমার কাছে বিদায় নিচ্ছে) হাতে নিয়ে বাবা দেখছেন ও মনে মনে গুন্‌গুন্ করছেন—সম্ভবতঃ কবিতাই, এমন সময় আমি হুমড়ি খেয়ে ছবির উপর প'ড়ে বললাম, "আমি দেখি, আমি দেখি।" বাবা ছবিটি আমার হাতে দিয়ে বললেন, "সাবধানে দেখ, ওটা ছাপা হবে, যেন ময়লা না হয়।" আমি সাবধানেই দেখছিলাম, কিন্তু বারান্দার চালে কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টির যে জলটুকু জমেছিল, তা থেকে হঠাৎ একটি ফোঁটা সৈনিক-পত্নীর বাহুমূলে পড়ল। বাবা চট ক'রে রুমাল দিয়ে মুছে দিলেন বটে, তবু দাগটি রইল। রামানন্দবাবুকে ব্যাপারটি লিখে দিলেন। ভাবলেন, ছবির ব্লক হলে বুঝি ঐ দাগটুকু থাকবে না। কিন্তু হায়, সে দাগ চিরস্থায়ী হয়ে রইল—শুধু চিত্রপটে নয়, একটি চঞ্চলা বালিকার স্মৃতিপটেও! এখনও পুরাণো 'প্রবাসী'তে সেই ছবিটির গায়ে দাগটুকু লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, যদিও তা খুব ক্ষীণ।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় ঐতিহ্য ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে বাবা লণ্ডনে যান। ফিরে এসে 'প্রবাসী'তে বিলাতের বিষয় একটি লেখা দিয়েছিলেন। 'প্রবাসী' সম্পাদক তাঁর মন্তব্যে লিখেছিলেন যে, "বিজয়বাবুর প্রৌঢ় অবস্থার অভিজ্ঞতার মূল্য যথেষ্ট।" বাবা তখুনি কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে একটি কৌতুকপূর্ণ কবিতা লিখে পাঠান। তার মর্ম্ম এই যে, "প্রৌঢ় নামে আমায় কিনা বুড়ো বলে চোখ টেপা?" আর যারা আমায় বুড়ো বলছে—"তাদের যেন নাতির নাতি খেপায় ব'লে বুড়ো হাতী।" ইত্যাদি। সে কবিতাটি রামানন্দবাবুর পরিবারে ও বাইরের পাঠকদের কাছেও খুব প্রিয় হয়েছিল। তখনকার মান অনুযায়ী বাবা প্রৌঢ় হলেও এখনকার দিনে ৪৭ বছরে লোকে যুবাই থাকে।

অন্ধ হয়ে বাবা ২৮বছর বেঁচেছিলেন। এই সময়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে দু'তিনটি বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে কতগুলি গবেষণামূলক বহুমূল্য পুস্তক প্রকাশ করেছেন। 'বঙ্গবাণী' মাসিকের সম্পাদনা করার সময় দেখেছি, প্রত্যেকটি রচনা পড়িয়ে শুনে নিজে বাছাই ক'রে দিয়েছেন। এখনকার মত তিনি বেতনভোগী সম্পাদক ছিলেন না। লেখার জন্যও কখনও কোন কাগজের কাছে মূল্য দাবি করেন নি। তবে অন্ধ হবার পর একমাত্র 'প্রবাসী' সম্পাদকই তাঁর লেখার জন্য কিছু কিছু পারিশ্রমিক পাঠাতেন। বাবা নিতে অস্বীকৃত হলে রামানন্দবাবু বলেছিলেন, "কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ এটা আমায় দিতে দিন, আমি আপনার লেখার দাম দিচ্ছি একথা ভাববেন না।"

লঘুরচনা, ব্যঙ্গকৌতুক, শিশুসাহিত্য, এ সবেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর সকল ব্যঙ্গ, সকল কৌতুক কি লেখায়, কি গল্পের মধ্যে সর্ব্বদা সুরুচিপূর্ণ ছিল। যদিও অপরের রুচির অভাবের প্রতি তাঁর উন্নাসিক মনোবৃত্তি প্রকাশ পেত না। তাঁর তেজস্বী, বলিষ্ঠ মন অন্যায়কে প্রশ্রয় দিত না বটে, তবে লোকের নিন্দা-অপবাদ প্রচার তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। বাড়ীর কেউ কারও নিন্দা করতে আরম্ভ করলে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিতেন।

বাইরের লোকে তাঁর সামনে অপরের নিন্দা করলে একেবারে চুপ ক'রে যেতেন, নয়ত অন্য প্রসঙ্গ তুলে সে কথা চাপা দিতেন। আমাদের একজন বন্ধু বলেছিলেন, "He is a perfect gentleman".

শিশুর প্রতি তাঁর ভালবাসা বাড়ীর নাতি-নাতনীর উপর অজস্র বর্ষিত হ'ত। বড় নাতনীর সব রচনা তিনি না শুনলে তার মন উঠত না। দাদামশায়রা ত নাতি-নাতনীদের ভালবেসেই থাকেন, কিন্তু তারাও তার প্রতিদান দিত প্রাণ ঢেলে। যে কোন সভাসমিতিতে তাঁর নাতি হাত ধ'রে তাঁকে নিয়ে যেত, নতুন বই বেরুলেই প'ড়ে শোনাত। যদিও এ সবের জন্য লোক নিযুক্ত ছিলেন। চোখে না দেখেও বাবা গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাদের সব দিকে লক্ষ্য রাখতেন। তিন বছরের মেজ নাতনী কার বাড়ীতে গিয়ে নিজের মনে পিয়ানো বাজিয়ে সুর তুলেছে। শোনামাত্র তাকে পিয়ানো কিনে দিলেন, ও শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বললেন। বুঝেছিলেন, তার মধ্যে সঙ্গীতে অনুরাগ আছে, আর সেটা বিকশিত হওয়া দরকার। ছোট নাতনীর সত্যপ্রিয়তা বড় ভালবাসতেন এবং বাড়ীতে কি কি ঘটছে সে বিবরণ তার কাছে নিতেন। আমাদের বলতেন,"তোমরা ভাব আমার দুশ্চিন্তা হবে, তাই অনেক কথা গোপন রাখ। ওর কাছে শুনে নি তাই। না শুনে মনে মনে যে আরও দুশ্চিন্তা হয় তা তোমরা বোঝ না।"

ছোটদের মনের কথা নিজের মন দিয়ে অনুভব করতেন। একটি ঘটনা বলি। একবার অনেক দূর পথ নৌকায় যাওয়া হচ্ছে। আমার দু'বছরের ছোট মেয়ে বদ্ধ অবস্থায় আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে, তার দিদিমাকে বার বার বলছে, 'আমায় কোলে নিয়ে বেড়াও।' বড়রা সেটা নিছক আবদার ভেবে কান দিচ্ছেন না, কিন্তু বাবার দরদী মন তার ছোট্ট মনের ব্যথাটুকু অনুভব করেছিল। তিনি চড়ায় নৌকা ঠেকাতে বললেন, আর মাকে তখন নেমে নাতনীকে কোলে ক'রে বেড়াতে হ'ল কিছুক্ষণ। তার মনটা খুশী হয়ে উঠল ও নৌকায় ফিরেই ঘুমিয়ে পড়ল। শুধু নিজের সন্তান-সন্ততিদের জন্য তিনি ব্যস্ত হতেন তা নয়, সব শিশুরাই তাঁর আদরের ছিল। প্রতিবেশিনী এক মহিলা যাকে বলতেন, "আমার ছেলে দুটি সুবিধা পেলেই বিজয়বাবুর কাছে ছুটে যায়। কই, আর কারও কাছে ত যেতে চায় না।" আমরা জেঠতুত-খুড়তুত ভাইবোনে মিলে অনেকগুলি ছিলাম, বন্ধুবান্ধবেরও অভাব ছিল না। বাবা আমাদের সঙ্গে কত সময় খেলা করতেন, কখনও বা গল্প বলতেন—যেন আমাদেরই সমবয়সী বন্ধু। কিন্তু তাঁর কাছে বকুনি না খেলেও তাঁর অবাধ্য হওয়া আমাদের কল্পনার অতীত ছিল। বাড়ীতে পোষা পশুপক্ষীরাও তাঁর স্নেহরসে সিক্ত থাকত। পায়রাগুলিকে নাম ধ'রে ডাকলে উড়ে এসে তাঁর মাথায়, কাঁধে বসত আর তাঁর হাত থেকে খাবার খেত। বাড়ীতে গরু, ছাগল, হরিণ, ময়ূর, খরগোস, হাঁস, মুরগী, পায়রা, এ সবের অভাব ছিল না। কিন্তু খাঁচায় পাখী পোষা ভালবাসতেন না।

ভয় কাকে বলে তিনি জানতেন না। একবার বর্ষায় সম্বলপুর থেকে নৌকাপথে একটা কাজে তাঁর যাবার কথা। সেদিন পাহাড়ী মহানদীতে বন্যা এসেছে দুকুল ছাপিয়ে। সবাই বারণ করছে—"আজ দিনটি বাদ দিয়ে যান।" কিন্তু কথা আছে সেদিন যাবার, তাই তিনি সেই পাথরে ভরা বেগবতী নদীর বুকে নৌকা ভাসিয়ে নির্ভয়ে চ'লে গেলেন। অন্ধ সংস্কার তাঁর কিছুই ছিল না। আমাদের দেশের হাঁচি, টিকটিকি ও নানা বাধা-নিষেধের কথা উল্লেখ ক'রে তিনি বলতেন—"বাধা পেয়ে ফিরে আসা ত কাপুরুষের কাজ। যত বাধা আসবে সব ডিঙ্গিয়ে যেতে হবে, তবেই ত সাফল্য লাভ হবে।" তাই বুঝি "পথের কাঁটা রক্তমাখা চরণতলে একলা দল রে" গানটি এত ভালবাসতেন।

নিজ কর্ত্তব্যে দৃঢ়, নিজের দুঃখে অবিচলিত এই মানুষটি ভিতরে ভিতরে এত কোমল ও স্নেহশীল ছিলেন যে, অন্যের কোন শারীরিক বা মানসিক কষ্টে অধীর হয়ে উঠতেন। অন্যের অসুখবিসুখে এত উদ্বিগ্ন হতেন যে ভাল ক'রে খাওয়া-দাওয়া করতে পারতেন না। অথচ মৃত্যুশয্যায় শুয়েও কষ্ট-যন্ত্রণার কথা বলেন নি। যে কাছে এসেছে তার হাতখানি হাসিমুখে সস্নেহে টেনে ধরেছেন। বড় নাতনী তাঁর কঠিন অসুখের খবর পেয়ে শিশুপুত্রকে নিয়ে কলকাতায় এসেছিল। বাচ্চাকে তিনি 'বাপু' ব'লে ডাকতেন। সেও এসেছে শুনে অধীর আগ্রহে ব'লে উঠলেন, "আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে বোঝাতে পারি না। বাপুকে আমার কোলে দে।" সেই বোধ হয় তাঁর শেষ কথা।

তাঁর রচনাবলীর সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠকের পরিচয় যথেষ্ট আছে মনে হয়। স্কুল-পাঠ্যপুস্তকও তিনি রচনা করেছিলেন, এবং তার বহুল প্রচার হয়েছিল। তাঁর "জীবনবাণী" বইখানি বাংলা গদ্যসাহিত্যে এক অমূল্য সৃষ্টি। উপন্যাস-প্লাবিত বঙ্গদেশেও বইখানির এত সমাদর হয়েছিল যে, অতি অল্প সময়েই প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যায়। রাখালচন্দ্র সেন আই. সি. এস. মডার্ণ রিভিয়ু-তে

এই বইটির সমালোচনা ক'রে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে-ছিলেন। মূল পালি থেকে অনূদিত তাঁর 'থেরীগাথা'ও অতি অল্প সময়ে বাজারে নিঃশেষ হয়ে যায়। দুঃখের বিষয় তাঁর বই এখন কিনতে পাওয়া যায় না। বাংলার মফঃস্বল অঞ্চল থেকে কেউ কেউ কলকাতায় এসে অনেক খুঁজেও তাঁর বই পান নি ব'লে দুঃখপ্রকাশ করেছেন। বাংলার পুস্তক-প্রকাশকেরা যদি তাঁর কোন কোন বই পুনঃ প্রকাশিত করেন তবে বাঙ্গালী পাঠক আবার তাঁর লেখার পরিচয় পেয়ে ধন্য হতে পারেন। তাঁর অন্ধ অবস্থায় লেখা 'হেঁয়ালি' ও 'রুচিরা' কাব্যগ্রন্থ দু'টি পড়লে তাঁর অন্তরের প্রশান্তির কথা পাঠকের মনে উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে। কি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাঁর ছিল, তা যিনিই কাছে এসেছেন তিনিই অনুভব করেছেন। নিজের ব্যক্তিগত অক্ষমতার জন্য একদিনও আক্ষেপ করেন নি বীরের মত অটল ধৈর্য্যে সব সয়ে গেছেন। দৃষ্টির অভাবে একটি দিনও তাঁর আলস্যে বা নিরানন্দে কাটে নি। বিধাতা তাঁকে অকৃপণ হাতে দৈহিক সৌন্দর্য্য দিয়ে-ছিলেন, তার মধ্যে বিশেষত্ব ছিল তাঁর চোখ দু'টি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অন্ধ হলেও সে চোখের অপরূপ জ্যোতি ম্লান হয় নি। কেউ কাছে এলে অন্ধচোখের দৃষ্টি দিয়ে তাকে যেন সস্নেহে আলিঙ্গন করতেন ও মনের আনন্দও চোখে ফুটে উঠত।

আমার মা'র কথা না বললে বাবার কথাও যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তিনি বাবার যা সেবা করেছিলেন, সংসারে তা দুর্লভ। বাবার অন্ধ অবস্থায় মা তাঁর চক্ষু হয়ে সব চালিয়েছেন। একজন মহিলা বলেছিলেন, "গান্ধারীর কথা বইয়ে পড়েছিলাম, আজ তা প্রত্যক্ষ করলাম।" বাবার স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল যে, কোন্ বইয়ের কোন্ পাতায় কি লেখা আছে ব'লে দিতে পারতেন, কিন্তু ছেলেবেলায় দেখেছি, সংস্কৃত কাব্য আবৃত্তি করতে করতে যদি হঠাৎ কোথাও আটকে যেতেন, মা সঙ্গে সঙ্গে বাকিটুকু ব'লে দিতেন, তখন মা'র স্মরণশক্তি দেখে আমরা গর্ব্বিত হয়ে উঠতাম। বাবার অতিথি-বৎসলতার সাক্ষ্য অনেকেই দেবেন, কিন্তু এটা ঠিক যে মা'র আন্তরিক যোগ না থাকলে তা কখনই সম্ভব হ'ত না। জ্ঞানে, গুণে, বিদ্যায় মা'র চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ হলেও বাবা মাকে কোনদিন উপেক্ষা করেন নি, চিরদিন শ্রদ্ধা ক'রে এসেছেন।

শেষদিন পর্য্যন্ত বাবা পারিবারিক সুখশান্তি উপভোগ করেছেন,—পত্নী, সন্তান, নাতি নাতনী, আত্মীয়, বন্ধু, সকলে শ্রদ্ধা, ভালবাসা, প্রীতি দিয়ে তাঁকে ঘিরে রেখে-ছিলেন। আমার বড় মেয়ে কণা বলেছিল—দাদা আমাদের জীবনের সূর্য্য। একথা সত্য। সব অবস্থাতেই তিনি বাড়ীর প্রাণকেন্দ্র ছিলেন। তাঁর আলোয় আমরা প্রাণ পেয়েছি। বিকশিত হতে পেরেছি, এ যে কত বড় সৌভাগ্য তা ব'লে বোঝান যায় না।

আমি কতটুকুই বা লিখতে পারলাম তাঁর কথা,—কতটুকুই বা প্রকাশ করতে পারলাম সেই বিরাট্ প্রতিভাবান্ পুরুষের সত্তাকে। তবু সন্তানের কর্ত্তব্য হিসাবেই এই অক্ষম লেখাটুকু পাঠক-পাঠিকার চোখের সামনে ধরতে সাহস পাচ্ছি।
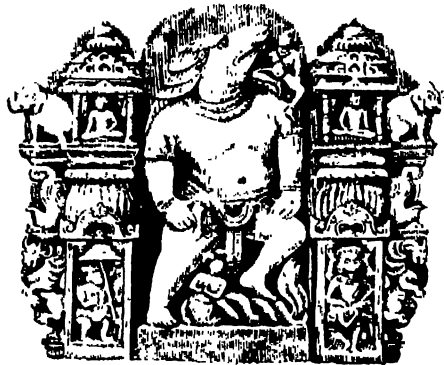
অস্থিরতা ভাল

"ওরে, একটু স্থির হয়ে বোস্' একথা প্রায় সব ছেলেমেয়েদেরই কখনো না কখনো অভিভাবকদের কাছ থেকে শুনতে হয়েছে এবং এখনো হয়। তবে কথাটাকে সদুপদেশ বলা যায় কি না সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। ছেলেমেয়েরা যখন মনে মনে শোনা গানের সঙ্গে পা দিয়ে তাল দেয়, নাহক পায়ের আঙুলগুলোকে নাচায়, হাঁটু দোলায়, তখন তাদের মা-বাবারা বিরক্ত হন, কিন্তু চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে হাত-পা নিয়ে এই রকমের ছটফট করা অনেক বেশী ভাল!

ইউরোপ-আমেরিকায় নতুন গবেষণার ফলে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, একটানা অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার অভ্যাস যাঁদের, তাঁদের দেহের ভিতরকার রক্ত সহজে দানা (Clots) বাঁধে, শিরাতে প্রদাহ হয়, এমন কি, ভয়াবহ থ্রম্বোসিস রোগে মারা পড়বার সম্ভাবনা তাঁদের বেশী থাকে।

গত বিশ্বযুদ্ধের সময় লণ্ডনের 'এয়ার রেড শেলটার'গুলোতে এক বা একাধিক রাত যাঁদের গাদাগাদি করে থাকতে হয়েছিল, রক্তবাহী শিরার মধ্যে রক্ত দানা বাঁধা থ্রম্বোসিস রোগ তাদের মধ্যে ছয়গুণ বেড়ে গিয়েছিল। এরোপ্লেন বা ট্রেন বা মোটর গাড়ীতে দীর্ঘকাল এক ভাবে বসে থেকে এসেই অনেকে এই দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়েছেন দেখা গেছে। এমন কি, এক পায়ের উপর আর এক পা রেখে বসে সিনেমা দেখে আসার ফলে এই রোগ হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

আপনার পায়ে কি প্রায়ই ঝিঁঝিঁ ধরে? তা যদি হয় সাবধান হয়ে যান। না হয় একটু হাঁটু দুটোকে মাঝে মাঝে দোলাবেন, গোড়ালির কাছে দুটো পাকে দু'চারবার পাক দেবেন, পায়ের কোন জায়গায় একটানা বেশীক্ষণ চাপ না পড়ে তা দেখতে হবে।

থেকে থেকে এক পাক যদি ঘুরে আসতে পারেন ত আরো ভাল। আর, ছেলেমেয়েরা খুব বেশী দুরন্তপনা না করলে "ওরে, একটু স্থির হয়ে বোস্" এরকম উপদেশ তাদের না দিতেই চেষ্টা করবেন।

বাড়ীর কাজে এটম

এরপর বাড়ীর কাজে এটমের ব্যবহার শুরু হবে। এমন দিন আসছে যখন আণবিক শক্তি ব্যবহার করে আপনি মাসিক ১২ টাকা খরচে আপনার বাড়ী গ্রীষ্মকালে যাতে ঠাণ্ডা থাকে এবং শীতকালে গরম থাকে তার ব্যবস্থা করতে পারবেন এবং বারোমাস চব্বিশঘণ্টা যথেষ্ট গরম জলের যোগান পাবেন।

এটা হবে সুদূর ভবিষ্যতে নয়, হয়ত আর চার-পাঁচ বৎসরের মধ্যেই ইউরোপ আমেরিকাতে গ্যাস ইত্যাদির মত আণবিক শক্তিও গৃহী লোকেদের আয়ত্তে আসবে। এই শক্তি পাওয়া যাবে, মোটর গাড়ীর ব্যাটারীর দ্বিগুণ সাইজের এক-একটি ব্যাটারী থেকে, যেগুলো হবে আসলে এটমিক রি-এক্টরের এক-একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

আণবিক শক্তির নামেই মনে আতঙ্ক জাগে, কিন্তু যে উপকরণগুলি থাকলে আণবিক বিস্ফোরণের পারম্পর্য শুরু হতে পারে, তার কোনটাই এই ব্যাটারীগুলোতে থাকবে না।

অংরেজী হঠাও

পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যার এক-দশমাংশের মাতৃভাষা ইংরেজী। এক-চতুর্থাংশের সঙ্গে ইংরেজীতে ভাবের আদান-প্রদান চলে।

ব্যবসাবাণিজ্য, রাজনীতি, বিজ্ঞান এবং অন্য নানাবিধ বিদ্যার চর্চ্চায় ইংরেজী আজকের দিনে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্য দেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে সমাদৃত।

সাধারণ বিচারে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী লোক, সংখ্যায় ন্যূনাধিক ষাট কোটি চীন ভাষায় কথা বলে, কিন্তু এই ভাষার চারটি আঞ্চলিক উপভাষা উক্ত অঞ্চলের লোক ভিন্ন অন্য চীনেদের কাছেও প্রায় দুর্বোধ্য।

এর পরেই ইংরেজীর স্থান, ইংরেজী যাদের মাতৃভাষা তাদের সংখ্যা ২৫ কোটি। তারপর যথাক্রমে স্পেনীয় ১৪ কোটির, রুশীয় ১৩ কোটির, জার্ম্মান দশ কোটির, জাপানী সাড়ে নয় কোটির, আরবী আট কোটির, বাংলা এবং পোর্তুগীজ প্রত্যেকটি সাড়ে সাত কোটির, উর্দু সাত কোটির, ফরাসী এবং হিন্দি প্রত্যেকটি সাড়ে ছয় কোটির এবং ইতালিয় সাড়ে পাঁচ কোটির মাতৃভাষা।

কিন্তু আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে ইংরেজীর সমকক্ষ এর কোনটাই নয়। তার প্রমাণ পৃথিবীতে যত চিঠি ডাকে দেওয়া হয় তার শতকরা ৭০টির ঠিকানা লেখা হয় ইংরেজীতে; পৃথিবীর শতকরা ৬০টি রেডিও প্রোগ্রামের ভাষা ইংরেজী, রুশ এবং চীন দেশের অধিকাংশ আন্তর্জাতিক প্রচারকার্য্য ইংরেজীর মাধ্যমে চলে, এছাড়া পৃথিবীর সমস্ত বিমান চালক, বিমান-বন্দর এবং বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণের ভাষা ইংরেজী। এমন কি নিজ নিজ দেশের মধ্যেও জার্ম্মান ফরাসী বৈমানিকরা বিমান চালনার কাজে ইংরেজীই আজকাল ব্যবহার ক'রে থাকেন; আন্তর্জাতিক গাড়ির ক্ষেত্রেও ইংরেজী সর্ব্বাগ্রগণ্য ও অপরিহার্য্য।

১৯৫৫ সনে বান্দুং এ এশিয়া ও আফ্রিকার যে ২৯টি দেশের কনফারেন্স হয়েছিল, তার আদ্যোপান্ত সমস্ত কাজ নির্ব্বাহিত হয়েছিল ইংরেজীর মাধ্যমে। এর কিছুকাল পরে মিশর ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক চুক্তি হয়, তাতে বলা হয়েছিল, সন্দেহস্থলে চুক্তির সর্ত্তগুলির ইংরেজী পাঠকেই প্রামাণ্য ব'লে গণ্য করতে হবে।

প্রগতিশীল ভাষা ক্রমশঃ সহজ হয় ব্যাকরণের দিক দিয়ে, বানানের দিক দিয়ে। দেখা গেছে এই সব দিক দিয়ে অনগ্রসর জাতিদের ভাষা প্রায়শঃই হয় খুব জটিল। কতকটা এই কারণেও পৃথিবীর অনগ্রসর জাতিদের মধ্যে ইংরেজীর এত আদর। ইংরেজী সহজ ভাষা। ঘানাতে ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা ব'লে ঘোষণা করা হয়েছে এবং প্রাইমারী স্কুল থেকেই সে-দেশের ছেলেমেয়েদের ইংরেজী শেখাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আফ্রিকার পূর্ব্বাঞ্চলের উপজাতিরা আরবী এবং বাণ্টু ভাষার মিশ্রণে উৎপন্ন সোয়াহিলী ভাষা সহস্রাধিক বৎসর ধ'রে ব্যবহার ক'রে আসছিল, তারা সম্প্রতি ভাষার ক্ষেত্রে সোয়াহিলী এবং ইংরেজীকে সমান মর্য্যাদা দিচ্ছে।

নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ডস্, অষ্ট্রিয়া, পোর্তুগাল, গ্রীস, তুরস্ক এবং জাপানের সমস্ত স্কুল ও কলেজে হয় ইংরেজী অবশ্যই শিক্ষণীয় ভাষা, নয়ত যেসব ভাষা শেখাবার বৈকল্পিক ব্যবস্থা আছে তাদের

মধ্যে সবচেয়ে বেশী সমাদৃত। পশ্চিম জার্ম্মেনীর প্রত্যেকটি স্কুলে ছয় থেকে নয় বৎসর ধ'রে ইংরেজী শেখাবার ব্যবস্থা আছে। পূর্ব্ব জার্ম্মানীতেও ইংরেজী জনপ্রিয় ভাষা। সোভিয়েট রুশিয়ার অনেক বড় সহরে ইংরেজী একটি অবশ্য-শিক্ষণীয় ভাষা।

আমাদের প্রতিবেশী আফগানিস্থানে কিছুদিন আগে ইংরেজী ভাষা শেখাবার একটি কেন্দ্র খোলা হলে তাতে নাম রেজিষ্ট্রি করবার জন্যে বরফের ঝড়ের মধ্যে বহু লোক কিউ দিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আর অস্মদ্দেশের কূপমণ্ডুকরা "অংরেজী হটাও" ব'লে আওয়াজ তুলছেন। অতি চমৎকার।

স. চ

ভ্রাম্যমাণ গৃহ

নাইজেরিয়ার কাছে কামেরুনে একটা বিয়ের ঠিকঠাক করা হয়েছে!

কন্যাপণ দিতে হবে একটা গরু, ছটা ছাগল, চারটে মুরগীর ছানা, এবং একপাত্র মাছ। কিন্তু কন্যার পিতা মুক্তহস্ত, তিনি বরকন্যাকে একটি বাড়ীও দিয়েছেন পাবার।

ভ্রাম্যমাণ গৃহ

বাড়ীটিতে বেশ থাকতে ইচ্ছা করে। এটি নাকি বছরের পর বছর আবহাওয়ার উৎপাত সহ্য করবে, আর বাড়ীর অধিবাসীরা বেশ গরমে আর আয়েসে থাকবে এই কড়ারে করা হয়েছে। এটি তিন বৎসর ধ'রে কন্যার গ্রামে ছিল, কিন্তু এইবারে একে জঙ্গলের কাছে ছেলের গ্রামে স্থানান্তরিত করা হবে।

এটা অবশ্য কিছু এমন সমস্যা নয়, কতগুলি স্বেচ্ছাসেবক এগিয়ে এসেছে। এরা দেশীয় ভাগেই কন্যার আত্মীয়। এরা কুঁড়ে ঘরটিকে সবশুদ্ধ কাঁধে তুলে নিয়ে পনের মাইল হেঁটে যাবে। নতুন অধিকারীটি বাড়ীর ছাতে দাঁড়িয়ে এই বহনকারীদের পথ ব'লে দেয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে ঢাক বাজাতে থাকে যাতে এরা বাজনার তালে তালে চলতে পারে।

এই বহনকারীদের দ্বিগুণভাবে পুরস্কৃত করা হবে—প্রথমে যাত্রার অবসানে এদের বাড়ীতে মদ্য পান করতে দেওয়া হবে। অঙ্গীকারও করা হবে যে, দম্পতির ছেলেমেয়েদের প্রত্যেকের নাম, বহনকারীদের প্রত্যেকের নামানুসারে করা হবে।

অন্য দেশীয়দের চোখে এইরূপ গৃহ স্থানান্তরিত করা অদ্ভুত হ'লেও এই প্রথাটি কিছু অসাধারণ নয়। ঝরণার জল শুকিয়ে গেলে, ধীবরদের মাছ ধরার অসুবিধা ঘটলে, অথবা শিকারে জন্তুর অভাব ঘটলে, একটা গ্রামকে গ্রাম এই ভাবে স্থানান্তরিত করা হয়।

কৃত্রিম উপগ্রহগুলি বাদ দিলে কতগুলি উপগ্রহ সৌর জগতে আছে?

আমাদের একত্রিশটিকে জানা আছে। সবচেয়ে বড় গ্রহ জুপিটার, বারটি চাঁদ তাকে গোল হয়ে ঘিরে চলেছে। এদের একটি আবার উল্টো পথে ঘোরে। শনি গ্রহের নয়টি উপগ্রহ, টাইটান তার মধ্যে অন্যতম। এর আবহাওয়া আছে।

ইউরেনাসের পাঁচটি উপগ্রহ আছে। নেপচুন এবং মঙ্গলগ্রহ প্রত্যেকের দুটো ক'রে। এই ত গেল ত্রিরিশটি উপগ্রহ, কিন্তু একত্রিশতমটি কোনটি? কোন্‌টি আবার? সেটি আমাদের চাঁদ।

সবচেয়ে পুরোণ লিখিত ভাষা কোনটি?

"সুমেরিয়ান" ভাষা। এই ভাষা মেসপোটেমিয়ান উপত্যকায় ছ'হাজার বৎসর আগে আর্দ্র মাটির ফলকে লেখা হ'ত।

নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোন্‌টি বেশী বাঞ্ছনীয়—যুদ্ধক্ষেত্র না রাজপথ?

যতগুলি যুদ্ধে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যোগ দিয়েছে, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ থেকে আরম্ভ ক'রে কোরিয়ান যুদ্ধ পর্যন্ত, তাতে ৭,০৪,৭৭৩ সংখ্যক ব্যক্তি মারা গিয়েছেন। পথে মোটর গাড়ী চালানর চেয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করা নিরাপদ, কেননা আমেরিকায় প্রায় ১,২৬৫,০০০ ব্যক্তি মোটর দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। যদিও যুদ্ধবিগ্রহ থেকে মোটর গাড়ী অনেক বেশী আধুনিক।

বন্দী অবস্থায় জলহস্তী কি খায়?

সব কিছু খায়। "বঙ্গো" ব'লে একটি আফ্রিকান জলহস্তী ওয়াশিংটনের চিড়িয়াখানায় ৪২ বৎসর থাকবার পর যখন মারা গেল তখন তার পেটের ভিতর থেকে পাওয়া গিয়েছিল, একটি "পকেটবুক" "লিপষ্টিক", একটি ২৫ ক্যালিবারের বন্দুকের গুলী, পেরেক, বলটু, সেলের খোলস, তার, ট্রামের টিকিট, ২'৫০ ডলারের ধাতব মুদ্রা, এবং কিছু পাথর। "বঙ্গো" পায়ে চোট লেগে না হয়ে মারা গিয়েছিল।

স্মি

কলের রেস্তরাঁ

উপরে যে রেস্তরাঁর ছবি দেখছেন, তাতে খাবার পরিবেশন করবার লোক নেই, ঠাণ্ডা খাবার গরম করে এনে দেবার লোক নেই, খাবারের দাম নেবার এবং টাকার ভাঙানি দেবার লোক নেই। রেস্তরাঁর এই সমস্ত কাজ যেসব কলের সাহায্যে চলে, সেই কল চালাবার জন্যেও কেউ সেখানে বসে থাকে না। যদি নিউ ইয়র্কে কখনও আপনি যান, আর এই রেস্তরাঁটিতে খেতে ঢোকেন, কাউকে কোথাও না দেখে ডাকাডাকি ক'রে যেন ফিরে আসবেন না।

কলের রেস্তরাঁ।

সার সার কলের গায়ে নানারকম খাদ্য ও পানীয়ের নাম ও দাম লেখা আছে দেখবেন। কলের ছাঁদায় ঠিক দামটি গুঁজে দিলেই যা চান তা বেরিয়ে আসবে। ঠাণ্ডা খাবার যদি গরম করতে চান, একজায়গায় দেয়ালের গায়ে একটি বোতাম টিপলেই একটি ইলেকট্রনিক' উনুন উনুন চ'লে আসবে আপনার হাতের গোড়ায়। এর জন্যে আপনাকে পয়সা দিতে হবে না। উনুনের মধ্যে খাবারের প্লেটটি চালিয়ে দিন, আধ মিনিট থেকে এক মিনিটের মধ্যে 'রাডার' শক্তির সাহায্যে খাবার এত গরম হবে যে, হাত দিয়ে ছুঁতে পারবেন না। খাবারের প্লেটটা কিন্তু ঠাণ্ডাই থাকবে।

কলের ছাঁদায় ধাতব মুদ্রা দিতে হয়। ধরা যাক, আপনার সঙ্গে কেবল নোট আছে, খুচরো নেই। খুচরো পাওয়া নেই, ঠিক কলটির কাছে গিয়ে তার ছাঁদায় নোট ঢুকিয়ে দিয়ে বোতাম টিপুন, ধাতব মুদ্রায় ঠিক হিসাব মত ভাঙানি বেরিয়ে আসবে।

আমাদের দেশে এইরকম কলের রেস্তরাঁ যদি কেউ খোলেন, কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে ব্যবসা গুটিয়ে ফেলতে হতে পারে। কলকাতায় এককালে বেশ কতগুলি পাবলিক টেলিফোন বুথ খোলা হয়েছিল, যার কলের ছাঁদায় দু-আনি গুঁজে দিয়ে টেলিফোন করা চলত। কিছুদিন পর দেখা গেল অচল মেকি দু আনি ছাড়া আর কিছুই প্রায় কলগুলির পেটে পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে বুথগুলির সব ক'টিই রাতারাতি উঠে গিয়েছে।

চাঁদে পৌঁছতে আর দেরী নেই

নাসা নামটির ব্যবহার আমরা আগেও প্রবাসীর পঞ্চশস্য বিভাগে করেছি, অতঃপর আরও করব, সে কারণে বলে রাখা ভাল যে, নাসা মানে হচ্ছে **NASA** অর্থাৎ আমেরিকার **National Aeronautics and Space Administration.**

নাসা আশা করছেন, অদূর ভবিষ্যতে তাঁরা একটি অতিকায় রকেটের সাহায্যে তিনজন মহাকাশযাত্রীকে আড়াই দিনে চাঁদে পৌঁছে দিতে পারবেন।

মহাকাশযাত্রার উপযোগী যে পোশাক তাঁরা পরে থাকবেন তার সাহায্যে কিছুদিন চাঁদে তাঁরা চন্দ্রলোকে অবস্থান করতে পারবেন। তারই মধ্যে তাঁদের চন্দ্র পর্যবেক্ষণ সমাপ্ত ক'রে আবার আড়াই দিনের পথ অতিক্রম ক'রে তাঁদের পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে। অবশ্য নাসা আশা করছেন যে, ক্রমশঃ প্রত্যেকটি অভিযানে যাত্রী-সংখ্যা বাড়বে এবং চন্দ্রলোকে যাত্রীদের অবস্থানের সময়ও দীর্ঘতর হবে।

এই সঙ্কল্পকে কার্যে পরিণত করতে যে কত রকমের এবং কত অসংখ্য খুঁটিনাটি হিসাবের প্রয়োজন হবে, কত রকম অপায়ের চিন্তা এবং কত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে তার বোধগম্য আলোচনা করবার সাধ্য আমাদের নেই।

যে যে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে তার কয়েকটির কথা কেবল বলি।

চাঁদের সর্বাঙ্গই প্রায় পাথরের গুঁড়োয় ঢাকা। এই গুঁড়োর আস্তরণ কোথাও কয়েক ইঞ্চি কোথাও বা কয়েক শ' ফুট গভীর। ধুলোর আস্তরণ যেখানে বেশী গভীর যাত্রীবাহী মহাকাশ-যান সেরকম কোন জায়গায় অবতরণ করলে যাত্রীসহ তার সমাধি হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

চন্দ্রলোকে বাতাস নেই, সুতরাং ৪০০০ মাইল বেগে যে মহাকাশ-যান চন্দ্রলোকে এসে পৌঁছচ্ছে, তার থেকে প্যারাশুট নিয়ে লাফিয়ে নেমে প্রাণ বাঁচাবার কোন উপায় থাকবে না। সুতরাং চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছে বিপরীত দিকের রকেট কতগুলো এমন সূক্ষ্ম হিসাব অনুযায়ী 'ফায়ার' করতে হবে, যাতে যানটি খুব আস্তে চাঁদের উপর নামে, ফিরে আবার পৃথিবীর দিকেই না ছুটতে শুরু করে।

মহাকাশের পথ অসংখ্য ছোট ছোট উল্কাপিণ্ডে বিকীর্ণ। এদের সঙ্গে সঙ্ঘাতে মহাকাশযানের দেহ বিদীর্ণ হয়ে যেতে পারে। তা যাতে না হয় সে ব্যবস্থাও চাই।

মহাকাশযানে চন্দ্রলোকে অবতরণ ও প্রত্যাবর্তন

'রেডিও-একটিভিটি' কথাটির বাংলা জানি না, যাঁরা আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় সর্বত্র ইংরেজি বর্জনের পক্ষপাতী, তাঁরা হয়ত জানেন। কিন্তু বাংলা শব্দ যেটা তাঁরা বলবেন, তাতে জিনিসটা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান একটু মাত্র বাড়বে বলে মনে করি না। যা হোক, জিনিসটার স্বভাব ভাল না। মুক্ত আকাশে এই জিনিসটার প্রভাব অত্যন্ত বেশী। বিশেষ করে, হঠাৎ সৌরশিখার উৎসারে এদের দৌরাত্ম্য ভীষণরকম বেড়ে যায়। সেরকম কিছু ঘটলে, চন্দ্রলোকযাত্রীদের পৃষ্ঠপ্রদর্শন ক'রে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না!

এ সমস্ত সত্ত্বেও অধ্যাপক জেমস্ ইভেন্স বলছেন, ১৯৬৭ বা ১৯৬৮ সনের মধ্যে পৃথিবীর মানুষ চন্দ্রলোকে পদার্পণ করবে।

কাটা-খাল-বিহার

[illegible] রাজ্য, দামোদর, ভাক্রা-নাঙ্গাল, কত সব কত পরিকল্পনায় খাল ত কাটা হল এ দেশে, তার একটিতেও আজ অবধি একটিও যাত্রীবাহী নৌকা চলছে বলে আমাদের জানা নেই। [illegible]

কাটা-খাল-বিহার

অকৃত্রিম সরকারী চাকুরেরা মোটর-বোটে ক'রে হ্রদ পরিদর্শন করেন। নৌকা-বিহার সেটাকে বলা যায় না।

ইংলণ্ডের কাটা খালগুলিতে বেসরকারী লোকদের জন্যেও কিন্তু সত্যিকারের নৌকা-বিহারের ব্যবস্থা আছে। যে সব নৌকায় তাঁরা চড়তে পান, তার একটির ছবি এইসঙ্গে দেওয়া হ'ল। এটিকে একটি ভাসমান হোটেলও বলা চলে। যোলজন যাত্রীর স্নানাহার, খেলাধুলা এবং নিদ্রার ব্যবস্থা এতে আছে।

কাজ নিয়ে থাকুন

সাম্প্রতিক কালের বৈজ্ঞানিকদের মতে কর্মব্যস্ত মানুষদের স্বাস্থ্য অনেক বেশী ভাল থাকে, নিষ্কর্মাদের তুলনায়। মনস্তত্ত্ববিদরা বলছেন, যাদের কাজ কম, অবসর বেশী, তাঁরা দ্রুত অবনতির দিকে এগিয়ে যান, মনের দিক দিয়ে এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও। ব্যাধির আক্রমণ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা তাঁদের কমে যায়, এবং যদি বা তাঁরা বাস্তবিক রোগগ্রস্ত হয়ে নাও পড়েন, নিজেদের নানাপ্রকারের রোগগ্রস্ত ব'লে তাঁরা কল্পনা করেন এবং এই সমস্ত কাল্পনিক ব্যাধির দুর্ভোগগুলি বাস্তবের [illegible]।

ডোডোর বিবরণ

ডোডো বলে একরকম পাখী ছিল, এবং তারা এখন একেবারে লুপ্তপ্রায় হয়েছে তা অনেকেই জানেন বোধহয়। এরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে গিয়েই মারা গেল বলা যেতে পারে। ডোডোরা পায়রাদের জ্ঞাতিভাই, এরা মরিশিয়াস দ্বীপে বাস করত। অন্য কোনো জীবের সঙ্গে এদের সম্পর্ক ছিল না। ওখানে শিকারী জন্তু কোনোরকম ছিল না, কাজেই ডোডোদের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে উড়ে পালাতে হ'ত না। আরামে বাস করতে করতে ওরা খুব বড় আর মোটা হয়ে পড়ল, এবং উড়তে একেবারে ভুলেই গেল। হঠাৎ দ্বীপের অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। একদল নাবিক এসে অবতীর্ণ হ'ল দ্বীপে, খাবারের খোঁজে। তারা দেখল এ পাখীগুলো উড়ে পালাতে জানে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব লাঠির ঘায়ে মারা পড়ল। এই ভাবে শেষ হয়ে গেল ডোডো পাখীর বংশ!

[illegible]

পাঁচ বছরের হিসাব নিয়ে দেখা গেছে যে, যত যাত্রী য়ুরোপ থেকে উত্তর আমেরিকায় গেছেন, তার মধ্যে বেশীর ভাগ গিয়েছেন এয়ারোপ্লেনে। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে জাহাজে ক'রে গিয়েছেন ৮৬৬৫০০ আর শূন্যে উড়ে পার হয়েছেন ১৯৩৮০০০ জন।

শ্যামদেশের যাযাবর

শ্যামদেশবাসী একদল যাযাবর মানুষের সামনে এক নূতন বিপদ্ উপস্থিত হয়েছে। তিন হাজার বছর ধরে এই মানুষগুলি দুর্ভিক্ষ, বন্যা, বিদ্রোহ প্রভৃতিতে উৎপীড়িত হয়েছে। বর্ব্বর, প্রতিবাসীরাও এদের উপর উৎপাত করতে ছাড়ে নি।

শ্যামদেশের যাযাবর

এরা আসলে চীনদেশের বাসিন্দা, এদের বলা হয় "মিয়াও"। খ্রীষ্টের জন্মের এক হাজার বছর আগে এরা জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয় অনেকগুলি যুদ্ধনিরত জাতির দ্বারা।

দস্যুরা বারবার তাদের উপর আক্রমণ চালাতে থাকে। প্রকৃতি-দেবীও সদয় ছিলেন না এদের উপর, বছরের পর বছর ধরে তাদের অনাবৃষ্টি আর দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হতে হয়েছিল। অবশেষে তারা শ্যামদেশের উত্তরভাগে এসে বসবাস করতে লাগল।

এখানে তারা আফিং গাছের চাষ করত। এতে তাদের খুব বড়লোক হয়ে উঠবার সম্ভাবনা ছিল না, তবু খাওয়াপরা কোনোমতে চলে যেত। আগেকার শ্যামদেশের শাসকরা তাদের কোনোরকমে নিরুৎসাহিত করতেন না।

কিন্তু এখনকার থাইল্যাণ্ডের শাসকরা এই আফিং-এর ব্যবসা বন্ধ করতে চেষ্টা করছেন। মিয়াওদের সামনে এখন দুটি পথ খোলা আছে। হয় তাদের চিরঅভ্যস্ত কাজকর্ম সব ত্যাগ করে জনসাধারণের মধ্যে মিশে যাওয়া, আর না হয় এ দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া এবং অন্য কোনো ভূখণ্ডে গিয়ে বাসা বাঁধা ও নিজেদের চিরাচরিত প্রথায় আবার চলতে থাকা। দ্বিতীয়টিতে তাদের স্বাধীনতা বজায় থাকবে।

ওরা যে ধরণের কুঁড়ে ঘরে বাস করে তা অতি সহজেই তৈরি করা যায়। মিয়াও জাতি নিজেদের স্বাধীনতাকে এত বেশী মূল্য দেয় যে, অদূর ভবিষ্যতেই দেখা যাবে যে, তারা নূতন দেশে গিয়ে জুটেছে। তা হ'লে বোঝা যাবে যে ভাগ্যবিধাতার হাতের আর একটা মার খেয়ে তারা সামলে উঠল।

টিউনিশীয় মরাই

পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা ত ক্রমেই বাড়ছে অথচ খাদ্য ত এই বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাড়ছে না? কাজেই খাদ্যসম্ভার বৃদ্ধি করা এবং শস্যাদি ভালভাবে জমিয়ে রাখা এখন একটা খুব দরকারী ব্যাপার হয়ে উঠেছে।

টিউনিশীয় মরাই

সুসভ্য দেশে এসবের ভাল ব্যবস্থাই আছে, কাজেই সমস্যার সমাধান হ'তে দেরি হয় না, কিন্তু অনেক মানুষ এখনও আছে যাদের আদিম অবস্থা থেকে খুব বেশী কিছু উন্নতি হয় নি। এদের পক্ষে এই সবের ব্যবস্থা করা খুব কঠিনই আছে।

এই শস্য পুঁজি করে রাখার ব্যবস্থাটা টিউনিশিয়ার মেডেনিন প্রদেশের গুহাবাসী আরবরা বেশ নতুনভাবে করে। তারা একটি বিশাল মরাই তৈরি করে ডালপালা দিয়ে বুনে। তার গড়নটা হয় খানিকটা ফুলদানি ধরণের, তলার দিকটা চ্যাপটা। শীতকালে তাদের সমাজের সকলের জন্য যে শস্য দরকার তা এই মরাইতে জমানো থাকে।

এই মানুষগুলি দরিদ্র, কাজেই শস্য তাদের কাছে বহুমূল্য। দৈনিক যতখানি শস্য বার করা হয় তা একজন প্রৌঢ়বয়স্ক মাতব্বর ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ওজন করান, পাছে অপচয় হয়।

তারা বলে, আজ না-হয় একটু কম করেই খেলে, সেটা ভবিষ্যতে একেবারে উপোস করা যদি নিবারণ করে ত তাতে ক্ষতি কি?

অবশ্য এটি ছাড়াও প্রত্যেক পরিবারের খাদ্যের পুঁজি কিছু কিছু থাকে, নিজের নিজের গুহাতে। কিন্তু এরা সমবেতভাবে খেটে ফসল তোলে, কাজেই শস্যটার উপর সকলেরই অধিকার থাকে, এবং সবাইকার মত নিয়েই এর ভাগ বাঁটোয়ারা হয়।

অমরত্ব

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

মাঠের ওপরে ঐ যে গাছটা,
কি গাছ জানিনে,
ওটা যেন ঠিক গাছ নয়,
যেন একটু আলাদা।

একদিন ওর পাশ দিয়ে যেতে
হঠাৎ আমার গায়ে কাঁটা দিল।
ওর ডাল থেকে ফাঁস প'রে কেউ
ঝুলেছে ব'লে ত কখনো শুনিনি,
তবুও কেন যে গায়ে কাঁটা দিল!

আরো একদিন গায়ে কাঁটা দিল:
সেদিন গাছটা ডাকল আমাকে।
কেন মনে হ'ল ডাকল গাছটা
তা শুধু জানিনে।

ডাকতে যে পারে, কথা সে বলবে,
এই কথা ভেবে গায়ে কাঁটা দিল।

তারপর থেকে কতবার গেছি
গাছটির কাছে। আমার মধ্যে
একটি মানুষ আছে যার কোনো
ভাষা নেই, যাকে আমার নিজেরই
ভাষা কোনোদিন বোঝাতে পারিনি,
তার কান দিয়ে শুনতে চেয়েছি
ভাষাহীন ঐ গাছটির ভাষা।
পাইনি শুনতে।

ফুল ফোটাবার, ফল ধরাবার
পাতা ঝরাবার ভাষায় যে কথা
বলা যায়, সে ত সকল কালের
সকল গাছের সহস্রবার ক'রে বলা কথা।

একান্ত তার নিজের কথাটি
বলতে সে ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না,
অথবা বলছে এমন ভাষায়
যে ভাষার আমি কিছুই জানিনে।

আলোছায়া ভরা এই পৃথিবীর
স্নেহকোলে দিন কাটল অনেক,
কানায় কানায় রসে ভরা দিন।
কোলের দখল ছেড়ে যেতে হবে,
অনাগত যারা পৃথিবী-মায়ের
স্তন্যপিপাসু, তাদের জন্যে।

তারপর কোথা যাব তা জানিনে।

সেখানে কি শুধু আলো আছে?
শুধু ছায়া আছে?
নাকি আর-কিছু আছে
আলোও যা নয়, ছায়াও যা নয়?
কিছুই জানিনে।

ভাবিনে তা নিয়ে।
যদি থাকি, জানি, ডানকোল থেকে
বাম কোলে যাব। ভালই থাকব।
আজকে আমার মন ভার ভার
ঐ গাছটার কথা ভেবে। ওর
আমাকে যে কথা বলবার ছিল,
সে কথা না শুনে এ পৃথিবী ছেড়ে
হয়ত আমাকে চ'লে যেতে হবে।
হয়ত যেখানে যাব সেইখানে
আর সব আছে,
গাছ নেই।

মৃত্যুতে তারা মরবে না, এই
দৃঢ়প্রত্যয় মানুষের মনে।
গাছটি যখন মরবে তখন
সে কি হবে তার চরম মৃত্যু?
অমৃতপাত্রে অধিকার শুধ

মাহুষেরই, আর কারো নয়? এই
গাছটির দাম বিধাতার চোখে
আমার চেয়ে যে কেন কম
আর কিসে কম, তাই ভাবছি।
তা'ছাড়া ভাবছি,
গাছটি যে কথা আমাকে বলতে চাইছে,
অনন্তকাল সেই কথাটিকে শুনব না
আর বুঝব না, এই বিধিলিপি নিয়ে
এসে থাকি যদি পৃথিবীতে, তবে
অনন্তকাল ধ'রে হবে যেই প্রস্তরচনা
বিধাতার হাতে,
তার সব কটি পাতায় পাতায়
লেখা হয়ে যাবে আমার হাতের
স্বাক্ষর নিয়ে একটি সাক্ষ্য—
অমরত্বের
সীমাহীন নিরর্থকতার।

ঐ গাছটিও একথাটাই কি
চাইছে বলতে?
কিছুই জানিনে।

প্রশ্নোপনিষদ্

শ্রীপুষ্প দেবী

প্রথম প্রশ্ন

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃনুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টু বাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥

দেবগণ মোরা নিত্য হোমের কালে
কল্যাণময় শব্দ যেন গো শুনি,
চক্ষেতে মোরা দেখিবারে যেন পাই
কল্যাণময় তব ওই রূপখানি।
স্থির সমাহিত অঙ্গ হয় গো যেন
তব স্তব পূজা করি মোরা যে সময়,
দেবতাগণের হিতকর পরমায়ু
এই দেহ মাঝে যেন দেবভোগ হয়॥

বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপন্তম্।
সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্তমানঃ প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্য্যঃ॥৮

সর্ব রূপেতে জ্যোতির্ম্ময় সে
সকল প্রাণীতে মূর্ত্ত জ্ঞান,
সবের আধার আশ্রয় সেই,
দীপ্ত সেজন দীপ্তিমান্,
শতরূপে সেই সবের পরাণ
সূর্য্য রূপেতে উদিত হন,
তেজ রূপে তিনি, তাপ রূপে তিনি
জানে তাহা জ্ঞানী মনীষী জন।
আঁধার কালিমা গাঢ় তমসায়
যখন যা কিছু আড়াল রয়
সূর্য্যের সম নিমেষে আলোকি'
সত্য নিত্য বিরাজময়॥

অথ উত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়া আত্মানম্ অন্বিষ্য আদিত্যম্ অভিজয়ন্তে। এতদ্ বৈ প্রাণানাম্ আয়তনম্। এতৎ অমৃতম্ অভয়ম্ এতৎ পরায়ণম্। এতস্মাৎ ন পুনঃ আবর্ত্তন্তে ইতি এষ নিরোধঃ। তদ্ এষঃ শ্লোকঃ। (১০)

ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া তপের দ্বারায় প্রাপ্ত হয়,
আত্মার মাঝে তাঁহারে পাইয়া জীবন যে হয় অমৃতময়।
কর্মের মাঝে লভি' সান্ত্বনা সৎ করমেতে কাটায় যেই,
চন্দ্রলোকেতে সুখ লভি' পুনঃ এই পৃথিবীতে জনমে সেই।
সৎ করমেতে কাটায়ে জীবন তবুও তাঁরে যে স্মরে না হায়
চন্দ্রলোকেতে জনম লভিয়া পুনরায় সেই জনম লয়।
কিন্তু যেজন কর্ম মাঝেতে সত্য ব্রহ্মে স্মরণ করে,
পুনরায় সেই লভে না জনম, মিশে সে ব্রহ্মে মৃত্যু-পরে।
এই শ্লোক জেন শাস্ত্রের কথা, বেদের মন্ত্র জানিও এই,
তাঁরে না ডাকিলে নাহি চ মুক্তি, মোক্ষের পথ জানিও সেই

প্রাণস্যেদং বশে সর্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্।
মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাং চ বিধেহি নঃ॥১৩

যে প্রাণ মর্ত্তে আর যা স্বর্গে
সবই তোমার অধীনে রয়,
তুমিই তাদের যাহাকিছু কর,
তোমারই আজ্ঞা সকলে বয়।
জননী যেমন করেন রক্ষা
শিশু তনয়ের বক্ষে ধ'রে,
তুমিও তেমনি শ্রী ও প্রজ্ঞা
দাও আমাদের যতন ক'রে।

কলকাতায় বৈশাখ

শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র

গুমোট দুপুরে, আকাশ যেন কী ঢাকনি
উঁচু বাড়িটায় পৌঁছে নজর বন্ধ।
তবু ডগ্‌মগ্‌ কৃষ্ণচূড়ার পাপড়ি,
সবুজ বোঁটায় ঝরবার হাওয়া বইছেই।
আর, ঢং ঢং ট্রামের ঘণ্টা, লোক গিজ্‌গিজ্‌ রাস্তা—
মধ্যদিনের কাক ডাকে কা কা,
বাস্‌ গর্জায় গ্রামে।

নজর চলে না, চলে না, চলে না সে দূরে—
যেখানে দুপুর তাপস স্তব্ধ, দগ্ধ।
বেড়াতে করবী দুলছে হাওয়ায়,
জলে ডুব দেয় পাখিটা,
গরুর গলায় ঘণ্টা বাজছে,—
রাখালের বাঁশি মাঠেতে,
পায়ে-চলা পথ তৃষার্ত জিভ
ডুব দিতে নামে জলেতে।

যেখানে গেরুয়া মাটির ঢেউয়েতে
বৈশাখী আলো প্রখর অন্ত দেশে—
চাঁপাতে বকুলে, বেলে, মাধবীতে
কাঁচা আমে, রোদে ঝাউয়ের কান্না মেশে—
এখানে আকাশ সে আকাশ নয়,
যদিও সময় কৃষ্ণচূড়ার পাখা—
চল্‌তি ট্রামের ঝক্‌ ঝক্‌ আর ঢং ঢং
আর উঁচু দেয়ালের ওপরে হঠাৎ ফাঁকা।

সর্প

শ্রীসুনীলকুমার নন্দী

গলায় পরলো ছেলেটির দেওয়া যে ফুলমালা,
শয্যায় ভাঙা হলুদ চাঁদের শায়িত আলোয়
সারা রাত্রির পেষণে সে-মালা সর্প যেন
মনে হয় তার, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জড়াল দেহ—
ভয় শিরশির, জানাজানি হলে নষ্ট কুসুম
সকলে বলবে, ছুঁড়ে ফেলে দেবে, খ'সে যাবে এই
দলিত মালার কুসুমের মতো; চুপ্‌, চুপ্‌, চুপ্‌—
কি ক'রে জানবে, চিহ্ন কিছুই রাখে নি দেহ।
তবু ছম্‌ছম্‌ ছায়া ফেলে এক শৈল-শিখর,
যার ঢালু খাদে কূল ভেঙেছিলো বন্ধ জোয়ার—
মোহনার মুখে তারি ঢেউ বুকে তুলছে ফণা।
সাবধান মেয়ে, ওই বিষধর সর্প কখন ছোবল মারে—
ছেলেটির মৃত মন ফিরে পেতে ভাসাতে না হয়
বেহুলা-ভেলা।

———

সুখুয়া-দুখুয়া

শ্রীআভা পাকড়াশী

কি সুন্দর নাম সুখুয়া আর দুখুয়া। নদীর একপারে সুখুয়া গ্রাম আর একপারে দুখুয়া। আবার নদীর নাম সুখচরিয়া। তার ওপর যে বাঁধ তৈরী হ'ল তার নাম আবার সুখুয়া-দুখুয়া। কিন্তু যাদের নামে নাম তারা কি সত্যিই সুখী হয়েছিল? তারা দু'টি ছিল মাণিকজোড়। একজন সুখীয়া, সে ছেলে। আর মেয়েটার নাম ছিল দুঃখমতীয়া।

ঝাঁসি থেকে গিয়েছিলাম ববিনা। এখানে আছে মস্তবড় মিলিটারি ছাউনি। আর তারই কল্যাণে ববিনাকে মনে হয় একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এখান থেকে আমাদের যাবার কথা ছিল 'মাতাটিনা' ড্যাম দেখতে। কোন কারণে না হয়ে ওঠায় রাগের চোটে বৌদির আমার মাথাটাই ঢিলে হবার যোগাড়। তাই না দেখে দাদা আমাদের নিয়ে চললেন সুখুয়া-দুখুয়া ড্যাম দেখাতে। নামটা শুনে অবধি ভারী একটা কৌতূহল হচ্ছিল মনের মধ্যে। দেখে সত্যিই চোখ জুড়িয়ে গেল। বাঁধের কোন বিরাট্ আকার বৈশিষ্ট্য নেই, আছে পারিপার্শ্বিকের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য। পাহাড়িয়া জায়গা। পাহাড়ের ছাউনি-ঘেরা ছোট্ট ছোট্ট দু'খানি শান্ত গ্রাম; মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে এই নদী। তার ওপর ছোট্ট বাঁধ। বাঁধের তলা দিয়ে আছে আণ্ডার-গ্রাউণ্ড টানেল, সেটা রোজ বিকেল পাঁচটায় খোলে। সেই সময় এপারের লোক যায় ওপারে আর ওপারের লোক আসে এইপারে। জল বয়ে চলেছে ক্ষেতের দিকে, উর্ব্বরা ক'রে তুলছে শুষ্ক কঠিন মাটিকে, ফলছে জওয়ার, বাজরা। চাষীরা মনের আনন্দে দু'হাত ভ'রে ফসল নিয়ে ঘরে যাচ্ছে। দিনান্তের ভুখ মেটাতে আর লালাজীর কাছে ভিখ্ মাঙ্গতে হচ্ছে না। দু'ধারে ক্ষেতের শ্যামলিমা দেখে মনে হ'ল, সুখে-দুঃখে ভালই আছে চাষীরা। তাই কি এর নাম সুখুয়া-দুখুয়া? দাদা বললেন, না, তা নয়। এর পেছনে রয়েছে এক করুণ কাহিনী। এই নামকরণের পেছনে রয়েছে এক রক্তেলেখা ইতিহাস।

এপারে থাকত ছেলেটি মানে সুখীয়া আর ওপারে থাকত মেয়েটি দুঃখমতীয়া। ছেলেটি তার গৃহপালিত পশু মানে ছাগল-ভেড়া নিয়ে চরাতে যেত পাহাড়িয়া ঘাটিতে বাই নদীর পারে। মেয়েটি আসত বাসনের পাঁজা নিয়ে মাজতে বা ঘাগরি-লুগড়ী নিয়ে কাচতে। এরও ভেড়া চরান হ'ত না, ওরও বাসন মাজা হ'ত না। হয়ত সুখীয়া ডাক ছাড়ত, "এ দুখীয়া, রে দুঃখমতীয়া, আরে ইধার চলি আওয়া, কা করতি হো ঘসর, ঘসর?" ব্যস, হয়ে গেল দুঃখমতীয়ার বাসন মাজা। রইল প'ড়ে সব। ও লগির এক ঠেলায় বাঁশের ভেলা নিয়ে চ'লে এল এপারে। তার পর সুরু হ'ল হুটোপাটি কোন একটা ছুতো ধ'রে। হয়ত একজন গিয়ে চ'ড়ে বসল লুকাট গাছে। আর পাকা পাকা লুকাট নিজে খেয়ে কাঁচাগুলো দিল অন্যকে। তাই নিয়ে লেগে গেল ঝগড়া। আবার দুঃখমতীয়া কখন কখন সুখীয়ার ছাগলছানাকে তাড়া করতে সুরু করে, সেগুলো ছোটে আর প্রাণপণে চেঁচায় ব্যা—ব্যা। দুখীয়া ওদের ভেঙ্গায় ব্যা—ব্যা। পেছনে ছাগল তাড়ান লাঠিটা নিয়ে তাড়া ক'রে আসে সুখীয়া। এমনি ক'রে কাটে কৈশোর।

কিছু জমি আছে সুখীয়ার বাবার। তারই পেছনে উদয়াস্ত পরিশ্রম ক'রে বছরের সাত মাসের মত পেট ভরাবার জোগাড় করে সে। সুস্থ, সবল, পেশীবহুল চেহারা তার। মাথায় মুরেঠা বেঁধে পায় তেলে ভেজান পেরেকের নাল দেওয়া ভারী নাগরাটা পরে; হাতে লাঠি নিয়ে যখন জোর কদমে হাঁটে, তখন মনে হয় হ্যাঁ, বুন্দেলখণ্ডি জোয়ান বটে। সুখীয়ার মা ঠিক এর উল্টো। রোগক্ষয়া চেহারা, মোটেই খাটতে পারে না। অথচ সচরাচর তা হয় না। এ দেশের মাটি অকৃপণ হওয়ায় আর জলের অভাব থাকায় মেয়েরাও খুব পরিশ্রমী হয়, এমনকি পুরুষদের থেকে বেশী। তবে সুখীয়ার বাপুজীর বরাতটা ভাল নয়, তার কথায় সে বলে, "হামারী তগদিরই এইসি, দুবলিপতলি দুলহনীয়া মেরী কিসমত মে রহি ত কা কিয়া যায়? কৈকে ত সকব নেহি? অব লড়কা বহু লাওব এইসি তন্দুরস্তবালি, যো বহিকো পিটে শকে!" দুখীয়াকে বড় পছন্দ তার। তবে এমন মেয়ে, ওর বাপ পণ নেবে অনেক টাকা। এক ত জওয়ানী ভরি, দুসরি গোরী গোরী।

ওদের কৈশোর পেরিয়ে যৌবন আসে। এখন

জোয়ান ছেলে সুখীয়া বাপের সঙ্গে ক্ষেতের কাজে হাত লাগায়। নদীর ওপারে দুঃখমতীয়ার পিলি লাহেঙ্গা আর লাল দোপাট্টা কখন কখন দেখা গেলেও চকিতে মিলিয়ে যায়। সেও এখন তার মায়ের ভাষায় স্তিয়ানী লড়কি।

সেবার দেশে ভারী অজন্মা পড়েছে। নদী পুকুর সব শুকিয়ে উঠেছে। মানুষ নিজের প্রয়োজনের জল পাচ্ছে না, মাটি ভেজাবে কি দিয়ে। আর মাটি না ভিজলে ফসল ফলবে কোত্থেকে? এখন আর ভেলার দরকার হয় না, হেঁটেই এপারে চ'লে আসে দুঃখমতীয়া, মাথায় পর পর তিনটে গাগরী বসিয়ে নেয়। লালাজীর বাড়ীতে কুয়ো আছে, তারই জল নিয়ে যাবে। সরম-ভরম এখন তফাৎ রেখেছে। কথায় বলে পহলে জান, পিছে মান। সুতরাং এখন জান বাঁচাবার প্রশ্নটাই আগে। গাঁয়ের ছোকরাগুলো দুখীয়াকে দেখলেই হন্তে হয়ে ওঠে যেন। তালি পিটতে থাকে, শিশ মারতে থাকে, তবে সুখীয়াকে সঙ্গে দেখলেই পালায়। অনেকে আবার ঠাট্টা ক'রে বলে, "আরে সুখীয়া-কি দুলহনীয়া হামে সব ভাবী লাগত্ রে, না ছেড়্, উসে না ছেড়্।" এবার সুখায়াকে বলে, "কাহেকো দের করত্ হো সুখন ভাইয়া? চুড়ি ডাল দে ভাবী-কি হাত, পহনা দে হাতকড়ি।" দুঃখ-মতীয়াই হেসে মুখ ঘুরিয়ে জবাব দেয়, "আরে মেরে দেবরজী, তেরে আঁখিয়ন নিদ নহি আওত হোই মেরি চিন্তামে, আরে কিস্তে ভালা আদমী সব।"

কিন্তু কুয়োর জলও আর দিতে চায় না লালাজী। সেখানেও টান ধরে। এক-একদিন শূন্য গাগরী নিয়েই ফিরতে হয় দুখীয়াকে। তেমনি রোদ্দুরের তাত হয়েছে। মাটি ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। গরম লুয়ে ঝাপটা বইছে। ধূলোর ঝড় উড়ছে মাঠের ওপর দিয়ে। চতুর্দ্দিকে রুক্ষ শুকনো মাটি যেন তৃষ্ণায় চিৎকার করছে, ম্যয় পিয়াসা হুঁ, ম্যয় পিয়াসা হুঁ, পানি দে, মুঝে পানি দে।

সেদিন শেষ দানাক'টি রান্না করেছে দুঃখমতীয়ার মা, তার পর খেতে দিতে গিয়ে দেখে, জল নেই গাগরীতে। তামার গাগরী ছিল তিনটে। গত সনের ফসল ভাল হওয়ায় কার্ত্তিকীর মেলা থেকে কিনে এনেছিল। এবার পেট ভরাতে তার দুটোই বাঁধা পড়েছে লালাজীর গদীতে। বাকি আছে মাত্র একটা। সেটা নিয়েই বেরিয়ে গেল দুখীয়া। সুখীয়াও এসেছে জল নিতে। মাটি তেতে আগুন হয়ে আছে, পা রাখবে কার সাধ্য? তবু জল চাই, তৃষ্ণার জল। সুখীয়ার মা'র জ্বর। গা একেবারে আগুন। আর খালি বলছে—"বড়ি পিয়াস লগি হ্যায় বেটা, পানি পিলাই দে, জরাসা পানি। গলা ত ভিজাই দে।" তাই রোজের মাপা জলে আজ আর কুলোয় নি।

আগে আগে চলেছে দুঃখমতীয়া, সে জানেও না পেছনে আসছে সুখীয়া। লালাজীর খিড়কির দরজাটা খটখটাতেই লালাজীর সেই পাজী তাড়ি-খাওয়া ছেলেটা এসে দরজা খুলে দিয়ে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে একগাল হেসে মুখে একটা শব্দ ক'রে দুখীয়াকে বলল, "আঙ্গে আইন হ্যায় পানি লেনে। বড়ী লচক দিখাওতিন। আরে পানি অভ্ভি বহুত কিমতি হ্যায় রাণীজী, সোনেকি তরহ কিমতি। কুছ ভেঁট দে। তব না পানি মিলি?" দুখীয়া তাকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে বলে, ইয়ারকি করবার আর সময় নেই তোর? বাড়ীতে ভুখা পিয়াসা মা-বাপ ব'সে রয়েছে, দাও পানি দাও। আর আছে ত মাত্র এই গাগরীটা, সেটাও তোর চাই? কঞ্জুস কহিঁকে।

লালাজীর ছেলে এবার চোখ নাচিয়ে বলে, "আরে কওন তুহার গাগরী মাঙ্গত্ হ্যায় রে, ম্যায় তো গোরী মাঙ্গত্ হ্যায়, গোরী।" ব্যস, কথা আর তার শেষ হ'ল না। সুখীয়া গিয়ে বাঘের মত লাফিয়ে পড়ল তার ঘাড়ে।

এই ঘটনার পর আর জল পায় না সুখীয়া আর দুখীয়া। দুজনেই মা-বাপের অসন্তোষ কুড়োয়। লালাজী ক্ষেপে যাওয়ায় এখন আর বাসন রেখেও বাজরা গেঁহু দেবে না তাদের। সে ত গেল, এখন প্রধান সমস্যা হ'ল তৃষ্ণার জল। পানি-কি পিয়াস। কি করা যায়, মহা সমস্যা হ'ল। এদিকে জোয়ান ছেলে সুখীয়া আর স্তিয়ানী মেয়ে দুখীয়া, দুজনকে জড়িয়ে গাঁয় বদ্‌নামও রটল কম না। সকলে বলে, কেনই বা এদের লগন হচ্ছে না? এদিকে দু'পক্ষেরই এই বিয়েতে মত। আসলে আটকাচ্ছিল টাকায়। সুখায়ার বাপ ভেবেছিল, এই বছর ফসল ভাল হলে সেই টাকায় ঘরে আনবে দুখীয়াকে। আর মওকা বুঝে দুখায়ার বাবা আরও দাঁও কষছিল।

কঙ্কালসার গরু দুটোকে চাল থেকেই খড় টেনে টেনে খাওয়াচ্ছিল দুখীয়া। আর সখেদে বলছিল, "আপনে না খায় মিলত্ হ্যায়, তুঝে কা খিলাই বোল্? লে, ছপ্পরই খায় যা।" এমন সময় লাফাতে লাফাতে আসে সুখীয়া। এতটা উচ্ছ্বসিত বা আনন্দিত হতে সুখীয়াকে যেন অনেক দিন দেখে নি দুখীয়া। ওর এই মূর্ত্তিটা যেন ভুলেই গেছে দুখীয়া। তবু একটু খুশী মনেই মুখ ঘুরিয়ে বলে, "কা ভইল তেরা; ইত্তে নাচ দিখাওত্

হো?" এবার পাগড়িটা খুলে বাতাস খেতে খেতে সুখীয়া বলে, "আরে চল্ মেরে সাথ গাগরীয়া লে কর, দেখ্, তুঝে পানি মিলা দেব্ পানি।" আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠে দুখীয়ার চোখ-মুখ, বলে, "সচ্?" "হাঁ রে হাঁ, চল্ জল্দি।"

আর দেরি করে না দুখীয়া, গাগরীটা তুলে নিয়ে ছুটতে থাকে সুখীয়ার পেছনে। পেছনে শুকনো সরু নদী এক দিকে বাঁক নিয়েছে—সেই বাঁকের মুখে ভিজে বালু প্রাণপণে খুঁড়তে থাকে সুখীয়া আর হঠাৎ ফোয়ারার মত খানিকটা জল উছলে ওঠে। সেই জল থালায় ক'রে ধ'রে তাড়াতাড়ি গাগরীতে ঢালে দুখীয়া। আবার বীরবিক্রমে খুঁড়ে চলে সুখীয়া, আর তার পেশীবহুল হাত দুটো দেখতে দেখতে দুখীয়ার মনে জলের তৃষ্ণা ছাড়াও অন্য যেন কিসের একটা তৃষ্ণা জেগে ওঠে। চোখের দৃষ্টি কেমন যেন বদ্‌লে যায় তার। উচ্ছলতার বদলে সে যেন কেমন উদাস হয়ে ভাম মেরে বসে। সুখীয়ার উল্লাস দেখতে থাকে। হঠাৎ চমক ভাঙ্গে সুখীয়ার; নজর পড়ে ওর দিকে, আর ডাকে, ও দুখু? "হেই দুখীয়া তেরা কা ভইল? ইত্তে পানি দেখত্ দেখত্ তেরে জিয়ারা উছলত্ নাহি? খুশী নাই লাগত্ তেরী?" এবার ওর চোখের দিকে তাকিয়ে সুখীয়াও কেমন থমকে যায়। তার পর সব ছেড়ে এসে দুখীয়ার পাশটিতে ব'সে তার হাত দুটো নিজের হাতে তুলে নিয়ে নীচু গলায় বলে, "কাহেকি দিল উদাস করতি হায় বোল? অবকি শাওনমে তুঝে ম্যায় জরুর অপনা জরু বনাওব্। ইয়ে গোরী গোরী হাথ মে মেহদি-কি রং সে লালি বনাওব, আউর করি কারি চুড়িঁয়া হাত ভরকে পহনাই দেওব্।" এবার এক ঝটকায় নিজের হাত দু'খানা ছাড়িয়ে নেয় দুখীয়া। তার সুন্দর মুখে তখন সত্যিই মেহদির ছোপ লেগেছে। মুখে বলে—"ধ্যেৎ, ম্যয় উওসব নাই শোচত্ রহিন।" সুখীয়া বলে, "তব বোল্ কা শোচত্ রহিন?" এবার দুখীয়া বলে, "দেখ্ উস্ রোজ রামুচাচা কহত্ নাই রহন?"

সুখীয়া বলে, "কা কহত্ রহন?" এবার দুখীয়া একটু বিরক্তির সুরেই ওকে ভাল ক'রে বোঝাবার জন্য বলে, আরে সেই যে রামুচাচা যে পঞ্জাবের চণ্ডীগড় থেকে এসেছিল, বলছিল নদীকে কি রকম ক'রে বেঁধেছে, তেমনি ক'রে যদি আমাদের এই নদীটা, এই সুখচরিয়াকে বাঁধা যায় তবে কেমন হয় তুই বল্? তা হ'লে এই নদীটাতে এত জল হবে যে, জলের তোড়ে ফুলে ফেঁপে ছল ছল ক'রে চলবে আর নদীর দু'ধারে সবুজ হয়ে থাকবে। ফলবে জওয়ার, বাজরা, গেঁহু, ভুট্টা, মানুষগুলো পেট ভরে খেয়ে আরও তাগড়া হবে। গাই, ভঁয়েস, ভেড়া, বকরা সবাই খেতে পাবে। তা ছাড়া পিয়াস লাগলেই পাওয়া যাবে পানি, লোটা ভ'রে ভ'রে জল খেয়ে তেষ্টা মেটাতে পারবে। এই গরমেও এমনি ক'রে বিনা জলে এত তকলিফ্ করতে হবে না। কষ্ট পেতে হবে না। একটুখানি তেষ্টার জলের জন্য লালাজীর গোড় লাগতে হয় না, পায় পড়তে হয় না, ভেবে দেখ্ সুখীয়া কি ভাল হয় তবে। পারিস না তুই অমনি বাঁধ তৈরী করতে? বাঁধতে পারিস না সুখচরিয়াকে। কথাগুলো বলতে বলতে চোখ দুটো যেন উত্তেজনায় ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায় দুখীয়ার। মুখখানা আশায়-আনন্দে যেন চক চক ক'রে উঠে ওর। সুখীয়ার চওড়া বুকখানায় হঠাৎ যেন কেমন মোচড় লাগে। তার শরীরের প্রতিটি পেশীতে যেন কম্পন লাগে, মনে হয় আজই এক্ষুণি সে তার পিয়ারীর, প্রেয়সীর এই ইচ্ছাটি পূর্ণ করে। কিন্তু এ ত আর তার একার পক্ষে সম্ভব নয়? দেখবে, সে ঐ রামুচাচাকে ধরবে। যদি সরকারকে ব'লে সে-ই এই সুখচরিয়া বাঁধবার ব্যবস্থা ক'রে দেয়, তবে দুখীয়ার এই স্বপ্ন সফল হবে। সত্যি, ওর কথা শুনতে শুনতে সুখীয়া ঐ শুকনো সুখচরিয়ার বালুর চড়াতেই যেন জলের ঢেউ দেখতে পাচ্ছিল।

বহু-প্রতীক্ষিত শ্রাবণ মাস এসেছে। ধারা-বরিষণে ঠাণ্ডা হয়েছে ধরিত্রী। তিজের পরবে মেতে উঠেছে সারা উত্তর প্রদেশ। এই ছোট দু'টি গ্রামেও এসেছে পরবের আনন্দ। মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী থেকে বাপের বাড়ী এসেছে। রং-বেরংএ ছোপান কাপড় পরেছে আর সেজেগুজে গাছের ডালে বাঁধা দোলনায় দুলছে আর সাঁওনি গাইছে। এমন আনন্দের দিনে দুঃখমতীয়ার আমাদের ভারী দুঃখ,সে বেচারীর হয়েছে ভারী মুশকিল। এমন সুন্দর হরিয়ালি রং শাড়ী বেঁধেছে, লাল রং-এর চোলি পরেছে। চোখে দিয়েছে কাজল, কপালে পরেছে বিন্দি, হাতে দিয়েছে মেহেন্দি, মস্তবড় চোটি বানিয়েছে, চলার ঠমকে তা একবার এদিক্ যাচ্ছে, একবার ওদিক্। পায়ের পায়জনিয়া বাজছে ছম ছম। কিন্তু এত যে সাজ, দেখায় কাকে? সুখচরিয়া আর শুকনো চরা নেই, দরিয়া হয়ে উঠেছে। ভরা নদী ছল ছল করছে। ভেলা ক'রেও পার হওয়া যায় না। চাই নৌকো। এখন নৌকো আছে সেই রহমৎ চাচার। সে আবার এক পয়সা নেবে এপারে আনতে, আর এক পয়সা নেবে ওপারে নিয়ে যেতে। তাও কি সব সময় খালি পাওয়া

যায়? নদীর ধারে ধারেই ঘুরে বেড়ায় দুঃখমতীয়া, যদি একবার দেখা যায় সুখীয়াকে। ভাবে, যদি একটা সাঁকো থাকত তবে এক্ষুণি ওপারে গিয়ে দেখে আসত কি করছে সুখীয়া। সেই রামুচাচা বলছিল, পঞ্জাবের শতাজু নাকি নদীর ওপর যে বাঁধ বানিয়েছে সেই বাঁধের মধ্যে দিয়ে আবার নদীর ওপার থেকে এপারে যাওয়া যায়। সুন্দর ঠাণ্ডিঘর সেটা। কেননা উপর দিয়ে জল পড়ছে অনবরত। সেটা কেমন রাস্তা ভাবতে পারে না দুখীয়া। নীচে জল ওপরে জল, মাঝখান দিয়ে সড়ক; তার মধ্যে আবার বিজলি বাতি জ্বলে! চারদিকে ঘেরা গুফার মত? নাকি সুড়ং-এর মত রাস্তাটা? হয় না এমনি একটা বাঁধ, তাদের এই সুখচরিয়ার ওপর? দেবে না সরকার তাদের পানির ব্যবস্থা ক'রে? পঞ্জাবের মত তাদের দেশও ত রুখাসুখা? তবে? না, অমনি হবে না, দেশের ছেলেবুড়ো-জোয়ান সকলে মিলে যদি জিগির তোলে, 'হমারে মাঙ্গে পুরি হো! ভুখে পেটমে রোটি দো।' তবে যদি হয়। পারে, এ সুখীয়া পারে। তবে তাকে বলতে হবে, লাগাতে হবে ঐদিকে। গঁওয়ার ত, যেদিকে একবার গোঁ ধরবে সেটাকে ক'রে ছাড়বে। এখন পড়েছে ক্ষেতিবারি নিয়ে। জোর ফসল ফলাবে। কেন? সেটা মনে করতেই মুখটা সলজ্জ হয়ে ওঠে দুঃখমতীয়ার। কি যে তার বাবার গোঁ, পুরো একশো এক টাকা নগদ রূপেয়া নেবে তবে লড়কিকে কড়া পহনাতে দেবে। কত তকলিফ্ হচ্ছে সুখীয়াদের। ওর মাতারিটা ম'রে গেছে অজন্মার সময়, ঘরে রুটি পাকাবার পর্য্যন্ত লোক নেই।

এদিকে সুখীয়া ভাবছে। কবে এই ফসল ঘরে উঠবে আর মহাজনের দেনা শোধ হবে, বাকি ফসল বিক্রি ক'রে সে ঘরে আনবে দুখীয়াকে। আর এই ক্ষেতি-বারির কাজ মিটলে রামুচাচাকে ধ'রে সব জেনে নিয়ে ঐ ব্যাপারটার জন্য উঠে প'ড়ে জান দিয়ে লাগতে হবে। সত্যিই তাহ'লে আর কারুই কোন অভাব থাকে না। শুধু তাই নয়, সবচেয়ে সুখী হবে দুখীয়া। হঠাৎ সেই দিনকার ছবিটা, সেই আশায়, উৎসাহে, উত্তেজনায় ফেটে-পড়া দুখীয়ার মুখখানা চকিতে মনে প'ড়ে যায় সুখীয়ার।

•

আজ মাঙ্গনি হচ্ছে সুখীয়া আর দুখীয়ার। সামনে আসছে হোরী পরব, তার পর হবে সাদী। আজ পাক্কি বাত হয়ে গেল। রূপেয়া জমা করেছে সুখীয়ার বাবা, সবটা পারে নি। পঁচাশ রুপেয়া বাকি আছে, সাদীর দিন পুরো ক'রে দেবে বলেছে। আজ অবশ্য দুখীয়ার বাবা সকলকে লাড্ডু বেঁটেছে। হবু দামাদকে নতুন ধুতি, কুর্ত্তা আর একজোড়া বেশ ভারী আর মজবুত নাগরা আর পাগড়ি দিয়েছে। পাগড়িটা দুখীয়ার মা নিজে হাতে গুলাবী রং ক'রে তাতে আবার খস্এর আতর মাখিয়ে অভ্রের কুচি ছিটিয়ে দিয়েছে। ঢোলকের সঙ্গে গানে মেতেছে পাড়া-পড়শীরা।

আর ত এখন সুখীয়ার সঙ্গে দেখা হবে না দুখীয়ার। সেই সাদীর দিন আসবে সুখীয়া এই সব ধুতি কুর্ত্তা প'রে, মাথায় ঐ মুরেঠা বেঁধে। সেদিনটার কথা মনে পড়তে চোখটা কেমন স্বপ্নালু হয়ে ওঠে দুখীয়ার। তার বচপনের সাথী সুখীয়া আজ কতদূরে রয়েছে, আর যখন-তখন তার কাছে যাবার উপায় নেই। হঠাৎ গলার হাঁসুলিতে হাত লাগে, এটা দিয়েছে সুখীয়ার বাবা। আর এই চাঁদির কবচটা তার বাবা দেবে সুখীয়াকে। কালো তাগায় বেঁধে গলায় পরবে সুখীয়া, তার ভরা গলায় বড় সুন্দর মানাবে।

হোরী উৎসব সুরু হয়েছে। ফাগুয়া খেলছে সারা উত্তর প্রদেশ। এদের গাঁয়েও লেগেছে উৎসব। সুখীয়া দিন গুণছে, আর ক'দিন আছে হোরীর, কেননা হোরীর পরই হবে তার সাদী। দুখীয়া তার হবে। তার দুলহন হয়ে ঘরে আসবে।

দুখীয়াও এখন তার বাপের সঙ্গে ক্ষেতের কাজে যায়। সুন্দর স্বাস্থ্য হয়েছে তার। একাই বয়েলগাড়ী চালিয়ে আনে। হবে না কেন, বুন্দেলখণ্ড ঝাঁসির রাণীর দেশ। এখানকার মেয়েরাও হয় সেই রকম শৌর্য্য-বীর্য্যময়ী বীরাঙ্গনা।

সাদী হয়ে গেল সুখীয়া দুখীয়ার। দুই গাঁয়ের লোকই খুব আনন্দ করল। তবে নই বহু হয়ে ঘুঙ্ঘট প'রে আর বেশী দিন থাকতে পেল না দুখীয়া। কাজের ভার পড়ল। রসুইতে রুটি পাকাল, ক্ষেতে শ্বশুর আর সুখীয়ার জন্য খানা পৌঁছল। ন্যাকড়ায় করে বাজরার রুটি, আচার আর লোটা ভ'রে জল নিয়ে ঝুড়ির মধ্যে বসায় আর সেই ঝুড়ি মাথায় ক'রে চলার তালে লাহেঙ্গা দোলাতে দোলাতে আর পায়ের পায়জনিয়া ছম্ ছম্ করতে করতে ক্ষেতের দিকে রওনা দেয়। ওর আশাপথ চেয়ে ব'সে থাকে বাপ-বেটা। বুড়ো বাপের খাবার আর জল আগে নামিয়ে দেয় দুখীয়া, তার পর গাছের আড়ালে যেখানে সুখীয়া ব'সে আছে সেখানে গিয়ে তাকে খাবার দেয়। গোগ্রাসে খায় সুখীয়া আর উবু হয়ে ওর পাশে ব'সে খুশী খুশী চোখে ওর খাওয়া দেখে দুখীয়া। তার পর

শূন্য ঝুড়ি মাথায় ক'রে অন্য আরও মেয়েদের সঙ্গে দল বেঁধে গালগল্প করতে করতে ঝোপড়িতে ফেরে দুখীয়া।

এই সুখের দিন আর বেশী রইল কোথায়? আবার সুরু হ'ল লোকের ঘরে ঘরে হাহাকার। আবার দানা ফুরোল। সুরু হ'ল জলাভাব। এবার ভোটের মরসুম পড়ল। পাঁচ বছর হয়ে গেছে নতুন ক'রে চুনাও হবে। বুন্দেলখণ্ড থেকে দাঁড়াল একজন উকিল, নাম তার বিনায়েক নায়েক। গাঁয় গাঁয় সে বক্তৃতা দিয়ে ফিরতে লাগল। তোমাদের সব অভাব মিটিয়ে দেব, চাষের জন্য জমি ব্যবস্থা ক'রে দেব, সস্তায় বীজ ফেলার বন্দোবস্ত ক'রে দেব, এই সব নানান হেন করেঙ্গা, তেন করেঙ্গা। দুখীয়া বলে সুখীয়াকে "অবকি ইয়ে মওকা না ছোড়্ সুখীয়া, হামারে সুখচরিয়া-কো বাঁধাই লে। ঔর তো ইতনে দুঃখ সহা নাই যাইত্ হায়। অব হম তিন হায়, যব চার হই যাওব তব তো আউর ভুখন্ মরন্ লাগব্।" সুখীয়া ওর হাতটা ধ'রে কাছে টেনে ঘনিষ্ঠ হয়ে জিজ্ঞেস করে, "কাহে রে দুখুয়া! সচ্ মুচ্ অব হাম চার হোই লাগ কা?" দুখীয়া বলে, "ধ্যেৎ, পিছেকে বাত কহন লগি তো তু অভ্ভি পকড় বৈঠত্ হো।"

যাই হোক বহু কষ্টে অনেক পায় ধরাধরি ক'রে শেষ পর্য্যন্ত সুখীয়া আর দুখীয়ার চেষ্টায় আর নেতৃত্বে বাঁধের পরিকল্পনা হ'ল। ওদের উৎসাহে খুব শীগ্‌গির কাজ এগোতে লাগল।

দিনমজুরেরও অভাব হ'ল না। সারা গাঁয়ের মেয়ে-পুরুষ মিলে সমান খাটতে লাগল। সুখীয়া-দুখীয়া বুঝিয়ে দেওয়ায় গাঁয়ের লোকেরাও বুঝেছিল যে, এই সুখচরিয়া বাঁধা পড়লেই তাদের পক্ষে বিরাট্ মঙ্গল হবে। ভবিষ্যতের দিনগুলি হবে সোনায় ভরা। পেটভরা খাবার পেয়ে তাদের বালবাচ্চাদের মুখে হাসি ফুটবে। তাই সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দিনে দিনে বাঁধ গ'ড়ে উঠতে লাগল।

ঘরে আর মন বসে না দুখীয়ার। তার মন সব সময় প'ড়ে থাকে বাঁধের দিকে। এ যেন তার একটা নেশা। সব-সময় সে ওখানে থাকতে চায়, দেখতে চায় কোথায় কি হচ্ছে, কেমন ক'রে হচ্ছে। কোন কিছুই যেন তার চোখ থেকে এড়িয়ে না যায়। না ছাড়িয়ে যায়। এটা যেন একমাত্র তারই একটা সুন্দর স্বপ্ন, দিনে দিনে তার চোখের উপর সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিয়ে সত্যি হয়ে উঠছে যেন। তাই সে ঘরে যেতে চায় না। যেটুকু সংসারের কাজ না করলে নয়, তাই করে। তাও যেমন-তেমন ক'রে করে। ভুল হয়ে যায় সব কাজে। ঠিকমত হয় না ঘরের কাজ। বিরক্ত হয় বুড়ো শ্বশুর। আপন মনে গজ গজ ক'রে বলে, "দুনিয়াকে হালই বদল গইল বা, ইত্তে রূপেয়া ভালকর বহু লাইন হায়, ত উকা জিয়ারা ঘরমে নাই বৈঠত্, ঘড়ি ঘড়ি বাহার দৌড়তিন হায় ঘরকি বহু। লোগুা হমারা এইসি বুড়বকু, না কুছ বোলত না চালত। আউর উকা মরদ না বোলে ত হমারে বাত থোড়েই মানবে করি? খানে বৈঠো ত পানি নাহিনা। পানি হায় তো রোটি নাহিনা। উকার মন বহি দরিয়াকি বান্ধে পে লাগিবা।" আবার ছেলের কাছেও সাতখানা ক'রে বৌয়ের নামে লাগায়। বলে, হ্যাঁরে, তুই বৌকে একটু শাসন করিস না, আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলছিস, নতুন বৌকে দশটা মরদের মধ্যে কাজ করতে দিয়েছিস। সারাদিন তাদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে, তাই ওর ঘরে মন বসে না। চোখ মেলে দেখিস না তুই? তুক্ করেছে নাকি তোকে? একেবারে ভেড়ুয়া বানিয়ে দিয়েছে? ছেলেও চোখ গরম ক'রে বলে, বুড়ো হয়ে তোমার ভীমরতি ধরেছে। সে যেখানে থাকে আমিও ত সেখানে থাকি, কই দেখি না ত তাকে কোন মরদের সঙ্গে ঘুমুতে? ও সেরকম নয় বাপু। ও ছোট থেকেই আমাকে চেনে। আসলে এইসব ছোট-খাট কাজে ওর মন বসে না। ওর মনটা ঐ আকাশের মত বড়, ও শুধু নিজের ভাল, নিজের আরাম চায় না। বলে, আরাম হারাম হায়। ও চায় সকলের সুখ হোক, সকলের ভাল হোক। সবাই পেটভর খানা খাক। তাই ত ও দেখে কেমন ক'রে সুখচরিয়া বাঁধা পড়ছে। কি ক'রে জলের গতি ঘুরবে আর সেই জল গিয়ে পড়বে ক্ষেতির নালায়-নালায়, তার পর ফলবে সোনেকি তরহ, গেঁহু, বাজরা, জওয়ার। সকলের দিল ভ'রে যাবে। হুড় হুড় ক'রে জল বেরুবে ঐ ছোট ছোট গেটের মধ্যে দিয়ে। ফেনায় নীল হয়ে থাকবে। রুখা আসুক, শক্ত গরমী গিরুক, শুকোবে না সেই জল। ছাতি ভ'রে জল খেতে পারবে সবাই। পিয়াস বুঝাতে পারবে ঐ জলে গাই, ভঁয়েস, মানুষ, পাখী সবাই, সবাই।

বুড়ো খানিকক্ষণ চুপ ক'রে শুনে এবার এক ধমক দিয়ে বলে, "চুপ যা বুদ্ধু কঁহিকে, তুঝে সচ্ মুচ কুছ কর দিহিস্ হায় বহুয়া। আরে জওয়ান আরতিয়া কি ঘরমে যব জিয়ারা নাই লাগত্ হ্যায়, বে কভি অচ্ছি নাই হউতিন্। ইয়ে হাম জানিত্ হ্যায়।" এমন সময় দুখীয়া আসে দৌড়তে দৌড়তে, বলে, "রে সুখীয়া চল্ রে, জল্‌দি চল্, বহি সড়কওয়া হোয়ে লাগ্। চার দরিয়া ভর যাইহেঁ তবে ইয়ে পার সে হোইপার যায় সকত হো, ফির ওহি পার সে ইহে পার।" ছুটল দুজনে। তাদের

বহু-আকাঙ্ক্ষিত সেই আণ্ডার-গ্রাউণ্ড টানেল তৈরী হচ্ছে। প'ড়ে রইল বুড়ো। আর ফুঁসতে লাগল মনে মনে। পাড়ার আরও দু'চার জন মোড়ল এসে বসল মাটির দাওয়ায়। উবু হয়ে চটের ওপর গোল হয়ে ব'সে ছিলিম ফুঁকতে ফুঁকতে যতটা পারল দুখীয়ার নামে নালিশ করল তাদের কাছে। তারাও সকলে মাথা নেড়ে সায় দিল বুড়োর কথায়। কারণ, উপস্থিত সকলেই এই ব্যাপারে ভুক্তভোগী। তাদেরও বাড়ীর বহু বিটিয়া এমন কি জওয়া, কিষণীয়ার মায়েরাও মানে বাড়ীর গিন্নীরাও গিয়ে জুটেছে বাঁধের কাজে। ঐ সুখীয়াই ত ভজিয়ে বের করেছে তাদের। ওর জন্যই ত তাদের ঝোপড়িরও এই দুরবস্থা। শান্তি নেই তাদের ঘরেও। মরদগুলোকে এখন আওরতের মত চৌকাবর্ত্তনও করতে হচ্ছে আবার অল্প-স্বল্প ক্ষেতিবারিও দেখতে হচ্ছে। জওয়ান মরদরা ত কুলি খাটছে বাঁধে। যত মরণ হয়েছে এই বুড্ঢাগুলোর। কোথায় সারা জীবন মাথার ঘাম পায় ফেলে পাসিনা বহিয়ে ছেলেদের বড় করল, কি না বুড়া-হাপায় সুখে থাকবে, জওয়ান ছেলে ক্ষেতিবারিতে কাজ করবে, আর বহু আসবে, সে ক্ষিধের সময় গরম রুটি পাকিয়ে দেবে। কমজোর উমরিয়া শ্বশুরকে একটু দিখভাল করবে, তা নয় সবই উল্টোপুরাণ। এমনি ক'রেই বেড়ে চলে অসন্তোষের ধোঁয়া।

মানুষ সব সময় কাছেরটা নিয়ে বিচার করে। দূর ভবিষ্যতে কার কি সুখ হবে, হবে কি না হবে সে ত অনিশ্চিত। বর্ত্তমানের অসুবিধেটাই বড় তাদের কাছে। ছোট বাচ্চাগুলো মা পায় না। বুড়ো-বুড়ীরা সময়ে খাবার পায় না। নালিশের পাহাড় জমে ওঠে তাদের মনে।

ওদিকে বাঁধের কাজ পুরোদমে চলেছে। ছোট্ট বাঁধ, কতদিন আর সময় লাগবে। এখন জোর কাজ চলেছে। পাওয়ার হাউস তৈরী হয়ে এল ব'লে। মেয়েরা কাছা দিয়ে রঙিন শাড়ী বা ঘাঘরা প'রে মাথায় কড়া নিয়ে মশলা বইছে। সারি দিয়ে চলেছে গান গাইতে গাইতে। পায় তাদের সের দু'সের ওজনের রূপোর ঝুমর, কারুর বা একটা পা খালি, অজন্মার সময় পেটে খেতে পা খালি করতে হয়েছে। কারুর বা দুই হাত, দুই পা, সবই খালি। কিন্তু এখন আর এসব দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই কারুর, চলেছে সবাই নেশার ঘোরে, শেষ করতে হবে বাঁধ।

সেদিন সারাদিন ক্ষেতে নিড়ানি দিয়েছে বুড়ো, সুখীয়ার বাপুজী। রাতের বাসি-রুটি নিয়ে ক্ষেতে গিয়েছিল। এবার ভীষণ ভুখ লেগেছে। পিয়াসের চোটে গলাটা টানছে যেন, মন করছে ঝোপড়িতে ফিরেই দু' তিন লোটা পানি একসঙ্গে গিলে খানিকটা চোখ বুজে আরাম করবে। এখন ত আর বহু ক্ষেতে নাস্তা আনে না? ক্লান্ত পা-টা কোনরকমে টেনে টেনে সে চলে ঝোপড়ির দিকে। রোদে মাথার অতবড় মুরেঠা তেতে আগুন হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে যেন মাথায় একটা আগুনের গোলা পরেছে। মুখটি রোদের ঝাঁঝে লাল হয়ে উঠেছে। চোখের ওপর হাত রেখে রাস্তা ঠাহর করতে করতে পথ হাঁটে সে।

ঝোপড়িতে পৌঁছে দেখে তালাবন্ধ, না বহু, না বেটা, কেউ নেই। রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে ওঠে ওর। তবে কি আজ দুপহরেও বহু ঘরে আসে নি? রুটি পাকায় নি? কিন্তু এই কড়া রোদ আর ধূপে যে তার শরীর কেমন করছে, অন্ততঃ এখন তার একটু ছায়ার দরকার, যেখানে ব'সে সে মাথার পাগড়িটা খুলে একটু বাতাস খেতে পারবে। তারই ঘর তারই ঝোপড়ি অথচ দরকারের সময় সেই সে ঘরে ঢুকতে পারছে না, পারছে না নিজের খাটিয়ায় শুয়ে ক্লান্ত শরীরটাকে একটু বিশ্রাম দিতে। আজ মনে পড়ে তার সেই দুব্লি পতলি বহু সুখীয়ার মাকে। কখন সে ক্ষেতিবারি ক'রে ফিরবে তারই আসরা নিয়ে সে খিড়কিতে চোখ পেতে ব'সে থাকত। ফিরে এলেই ঝটপট্ লোটাভরা পানি আর খানিকটা ভেলি গুড় এনে দিত। তার পর ধীরেসুস্থে খেতে দিত তাকে। আর আজ যেমন হয়েছে তার বেটা, তেমনি হয়েছে বহু। না আছে কোন আক্কেল, না আছে কোন শরম বা উমরিয়া লোক বুড়োমানুষের ওপর শ্রদ্ধা। না! আজ সে একটা হেস্তনেস্ত করবেই— হয় এসপার, না হয় ওসপার। আচ্ছা বহু এনেছি, চিড়িয়ার মত খালি তার মন প'ড়ে থাকে বাইরে। চুড়েল কহিঁকে।

হঠাৎ ছুটতে ছুটতে আসে দুঃখমতীয়া। ওকে দেখেই বলে, "আরে বাপু তু আই গইল। চল্ চল্ অন্দর চল্, বড়ি ধূপ হইল্ বা।" তাড়াতাড়ি তালা খুলে দেয়। বুড়ো কথাও বলে না, নড়েও না, যেমন বসে ছিল তেমনি ব'সে থাকে পেয়ারা গাছটার নীচে। এই আমরুদ গাছটা পুঁতেছিল ঐ সুখীয়ার মা। এর ছায়াটুকুতেও যেন রয়েছে তার স্পর্শ। এবার ছেলে ফিরল। বলে, "ই কা? তু ইহা কাহে বৈঠল্ বা বাপু; দুখীয়া নাই আওয়া?" তার পর ফিরে দেখে ঘর খোলা। ভেতরে গিয়ে একটু কর্কশ স্বরেই দুখীয়াকে বলে, "ওহি টোপিবালে

সাবঠোরে কো সাথ কা বকবকাওত্ রহিন তু? ম্যয় ওহি পায়সে মাট্টি ঢোয়ত ঢোয়ত দেখত্ রহন। জলদি ঘর নাই আই সকিত্ হ্যায়? বুড়হৌয়া কি তকলিফ ভইল।" কোন উত্তর দেয় না দুখীয়া এই অভিযোগের, সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত মুখটা নিচু ক'রে আগুনের জাল ঠেলতে ঠেলতে তাড়াতাড়ি রুটি পাকাতে থাকে।

ছেলে এল, এসেই ঘরে ঢুকে বহুর সঙ্গে ফুসুর-ফাসুর ক'রে পেয়ার করতে ব'সে গেল। কেন, বাপটা যে এই রোদে পুড়ে চিমড়ে ম'রে যাচ্ছে, সে কি দেখতে পেল না? শুধু একবার ডেকে হয়ে গেল? আর একবার বলতে পারল না? ভীষণ রেগে গেল বুড়ো। মাথাটা রাগে আর তাতে ঝিম ঝিম করতে থাকে তার। হাতের সেই নিড়ানিটা নিয়েই ভেতরে ঢুকে পাগলের মত ছেলেকে সেই নিড়ানির বাঁট দিয়ে পিটতে সুরু ক'রে দেয়। বলে,"বেইমান, হারামজাদা, বুড্ঢা বাপ চাহে ধুপ মে মর যাইহে তব্বো তেরা হুঁস নাই হোয়ত্? চায় না রোটি মিলে তব্বো বহু কো পেয়ার করন লাগি যাওত্? এইসি বেটোয়া হামার না রহে, মর যাইহে সোই ভালা।" এই বুলি মুখে বলছে আর সমানে মারছে। ছেলেও প্রথমটা হতভম্ব হয়ে যায়, বুড়োর গায় শক্তিও ত কম নয়! মারের চোটে নাক দিয়ে তখন তার ভলভল ক'রে রক্ত বেরোচ্ছে। সেও ত ক্লান্ত, সারাদিন মাটি তুলেছে ঝুড়ি ভ'রে ভ'রে। ওদিকে দুখীয়া চিৎকার করছে, "আরে বুড়হৌয়া ছোড় দে উসে, ছোড় দে, গোড় লাগি তেরি। ও তোহরি বাত বাতাওত্ রহা, তেরে লিয়ে হামে ডাঁটত্ রহা। ছোড় উসে, ছোড়।" বারণ করায় আরও রাগ চড়ে বুড়োর। নিড়ানির হাতলটা ভেঙ্গে যেতে সে এবার উহুনের মধ্যে থেকে একটা জলন্ত কাঠ বের ক'রে ছেলেকে মারতে যায়। ওদিকে ছেলে সমানে দাঁড়িয়ে মার খাচ্ছে, প্রতিরোধ করছে না, বলছে, "মার্, আউর মার্, অগর তুঝে ইহ্‌মে সন্তোষিয়া মিলে ত মুঝে মারই ভাল্ বাপু, তু মার্ ডাল্ মুঝে।"

এবার আর দুখীয়ার সহ্য হয় না। সে এই অমানুষিক মার আর দেখতে পারছিল না। হঠাৎ এক ঝটকায় সে বুড়োর হাত থেকে জলন্ত চেলা কাঠখানা কেড়ে নিয়ে বেশ ক'রে ঘা কতক বসিয়ে দেয় শ্বশুরের পিঠে। জ্বালার চোটে চিৎকার ক'রে ওঠে বুড়ো।

আশপাশের ঘরবালেরা মানে পাড়াপড়শীরা উঠোনে জড়ো হয়ে গেছে ততক্ষণে; কেউ ওর পক্ষে, কেউ এর পক্ষে বলছে। যারা আসে নি কেউ বা তাদের খবর দিতে দৌড়েছে। গাঁয় এমন এক-আধটা মারামারি লেগেই থাকে। এটা অবশ্য আরও একটু বেশী চাঞ্চল্যকর। কেননা বউ মেরেছে তার শ্বশুরকে। এই বার্তাই রটে গেল ক্রমে ক্রমে যে, দুখীয়া "ওই সুখীয়াকি বহুয়া উকা শ্বশুরকো লকড়িসে মার দিহিস্।" ওরা অবাক্ হয়ে বলছে —আঁ! তার পরই দৌড়চ্ছে দুখীয়া আর সুখীয়ার ঝোপড়ির দিকে। যেন কত বড় একটা মজা হচ্ছে সেখানে।

নাঃ, এখন থেমেই গেছে মারামারিটা। বুড়োটা পিঠের জ্বালায় কাৎরাচ্ছে। একজন বুড্ঢা, ঐ রামশরণিয়ার চাচা তার পিঠে পুরাণা ঘিউ ড'লে দিচ্ছে। আর জওয়ান সুখীয়াটা দালানের এক ধারে খুঁটি ধ'রে মাথা হেঁট ক'রে ব'সে আছে। তার সারা গায় কালশিটের দাগ। বাঁদিকের কপালটা ফুলে রয়েছে। আর ঠোঁটটা কেটে গিয়ে ঝুলে পড়েছে। নাকের নীচে চাপ-চাপ রক্ত শুকিয়ে রয়েছে। গাঁওবালেরা সব বলছে, ছিঃ ছিঃ সুখায়া, তুই কি একটা মরদ না আউরৎ? বহুকে কিছু বলিস না কেন? তার এত বড় আস্পর্দ্ধা কিনা তোর বাপের গায় হাত তোলে? যার জন্য তুই এই জমিনের স্পর্শ পেলি, দুনিয়ার আলো দেখলি, যে তোকে ছোটবেলায় কলিজা থেকে নামাত না, বলত, মেরে ববুয়া, মেরে লাল, তেরে বহুয়া লাওব, বিলকুল রাণী যেইসি। কত টাকা পণ দিয়ে তোর বউ এনে দিল, আর তুই সেই বউয়ের গোলাম হয়ে গেলি? ছিঃ ছিঃ সুখায়া, তুঝে দেখ্ কর হামে সব শরম লাগত্ হ্যায়।

দুখীয়া লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে, ঘুঙ্ঘট দিয়ে মুখ ঢেকে চাকু নিয়ে বেয়গন কাটছে, মনে মনে সে একটার পর একটা চিন্তা কাটছে, তাই বেগুনগুলো কাটা হচ্ছে অসমান। কোনটা বড় কোনটা ছোট। কিন্তু সেই বা কি করে? সে যে তার প্রাণের চেয়েও ভালবাসে সুখীয়াকে। যদিও আজ সুখীয়া তাকে সন্দেহ করেছে, ঐ সাহেবটার সঙ্গে জড়িয়ে তাকে গালি বকেছে, তারই ওপর রাগ ক'রে বাপের হাতে এত মার খেয়েছে। না হলে একবার সে রুখে উঠলে বুড়োর সাধ্যি ছিল অত মারে? এ তার স্বেচ্ছাকৃত আত্মনিপীড়ন, কিন্তু কি ক'রে সে সহ্য করে? তাই ত সে মেরে বসল বুড়োকে।

অনবরত গালাগাল আর ধিক্কার শুনতে শুনতে এবার যেন কেমন পাগলের মত লাল চোখ দুটো তুলে দুখীয়ার দিকে তাকায় সুখীয়া। পেটে তার ক্ষিধের আগুন জ্বলছে, গা ব্যথায় টাটিয়ে রয়েছে, এদিকে মন তার রাগে কালো হয়ে উঠছে। হঠাৎ সে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ায় আর ছুটে গিয়ে দুখীয়ার হাতের সব্জি কাটা

চাকুটা কেড়ে নিয়ে সেই ঘোমটা দেওয়া দুখীয়াকে সেই চাকু দিয়ে কোপাতে থাকে আর চিৎকার ক'রে বলতে থাকে, "আবে দেখো সব, হম মরদ হ্যায় না আউরৎ? দেখো বাপু হাম ভেড়ুয়া নাই হোইন, দেখো হাম ইসে মারিত্ হ্যায়। বাতাও, ঔর মারে? ঔর মারে?"

ওদিকে দুখীয়া আপ্রাণ চিৎকার করছে। যারা সুখীয়াকে এতক্ষণ তাতাচ্ছিল তারা, আর ওর বুড়ো বাপ কেউ ছাড়াতে পারে না তাকে। রোক চেপে গেছে তার। পাগলের মত চাকু বসিয়ে চলেছে সুখীয়া, হাতে, পিঠে, পায়, কোমরে, পেটে। এবার অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে যায় দুখীয়া। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মাটির দাওয়া। এবার জ্ঞান ফেরে সুখীয়ার, হঠাৎ সে থেমে যায়। চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠে মুখের ঘোমটা খুলে দেয় দুখীয়ার আর ডাকে বড় কোমল স্বরে, দুখুয়া, রে দুঃখমতীয়া? আর্ত্তস্বরে বলে, "মর্ গই তু? তুঝে হাম মার ডালিন কেয়া? আরে দুঃখমতীয়া!" এবার তার রক্তে-ভেজা শরীরটা দু'হাতে তুলে নিয়ে ছুটে চ'লে যায় সুখীয়া।

শহরের হাসপাতালে গরুর গাড়ী ক'রে পৌঁছতে পৌঁছতে গাড়ীর মধ্যেই সুখীয়ার কোলে মাথা রেখে মরে দুখীয়া। শেষ সময় তার মুখে ফুটে উঠেছিল এক চিলতে করুণ হাসি, আর বলেছিল, পানি—পানি দে। পারে নি সুখীয়া জল দিতে, পারে নি তাকে। তার কাছে জল ছিল না।

বাউরা হয়ে যায় সুখীয়া। আর তাকে দেখা যায় না। বাঁধের কাছেও না বা গাঁয়ও না। কেউ আর তাকে দেখতে পায় না। এ দিকে পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে। খুন-কা বদলা খুন। জানের বদলে জান। ফাঁসি ত তাকে দিতেই হবে। যে এই ভাবে নিষ্ঠুরের মত নিজের স্ত্রীকে চাকু মারতে পারে, খুন করতে পারে, তার মত সাংঘাতিক লোককে ছেড়ে রাখলে ত সবার বিপদ্। গাঁয়ের বিপদ্, দেশের বিপদ্, সরকারের গাফিলতি হয় তাতে। সুতরাং ধর তাকে, পাকড়াও ক'রে নিয়ে এসে ফাঁসিতে লটকিয়ে দাও তাকে। তবে না উচিত সাজা হবে তার?

এ ধারে বাঁধের কাজ শেষ। এতদিনে গাঁয়ের লোকেদের সেই সম্মিলিত প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে। কিন্তু এই বাঁধ যাদের জন্য গ'ড়ে উঠল, প্রথম উদ্যম ছিল যাদের, যারা স্বপ্ন দেখত কি ভাবে এটা গ'ড়ে উঠবে, তারা আজ কোথায়? গাঁয়ের লোক তাদের অভাবটা এতদিনে যেন ভাল বুঝতে পারছে; কত বড় জিনিষ আজ তারা পেল। কত বড় মঙ্গল হ'ল তাদের? আর ভুখা পিয়াসা মরতে হবে না। উঃ কি জলকষ্টই না ছিল তাদের? আর আজ কত জল! কত পানি! সুখচরিয়ার আজ ভরা যৌবন এসেছে, ফুলে ফেঁপে ছলছল, কলকল করছে। আর কত উঁচু থেকে আছড়ে পড়ছে নীচে। কি ডাক তার! কি আওয়াজ! কাছে গেলে কানে তালা লাগে। কিন্তু গাঁয়ের মানুষ যাই করুক তারা সরল সিধা। তাদের রাগে বা অনুরাগে, আদরে বা অনাদরে কোন ভেজাল নেই। তাই এরা বলছে, সমানে সুখীয়া আর দুখীয়ার কথা বলছে। বলছে, আজ তারা থাকলে কত খুশী হ'ত। কত আনন্দ করত। সেই সব হ'ল কিন্তু ওরাই দেখতে পেল না। তাই ওরাও সুখচরিয়ার গুমগুম শব্দর মধ্যে শুনতে পাচ্ছে দুখীয়ার চাপা গুমরানো কান্না। বলছে, "রে শুনু, ই কা আওয়াজ? এইসি লাগত্ হ্যায় কি মালুম হোত রোয়ত্ হ্যায়, কোই ফুট ফুট কর্ রোয়ত্ হ্যায়। জরুর উকা অন্দর দুখীয়া বৈঠল বা। না মালুম সুখীয়া-কি কা ভইল? কঁহা চলা গওয়া লণ্ডোয়া?" সত্যিই যেন ওর মধ্যে ব'সে দুখীয়া কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে!

আজ বাঁধ উদ্‌ঘাটন করা হবে। বিনায়েক নায়েক এসেছেন। প্রচুর লোকজন এসেছে, আর এসেছে অনেক মালা, অনেক ফুল। এখন সমস্যা হ'ল, কি নাম হবে এই বাঁধের? গাঁয়ের সবাই কিন্তু একজোট হয়ে বলল, "যিকা লিয়ে ইকা হামে মিলি, ওহিকা নাম রখওয়াই দেও বিনায়েকজী।" আজ স্লুইস্ গেট খোলা হবে। ঐ সব ছোট ছোট গেটগুলোর মধ্যে দিয়ে জল বেরুবে। কি সখই ছিল দুখীয়ার দেখবে, কেমন ক'রে জল বেরোয়। এদের কাছে সব শুনে বিনায়েক নায়েক বললে, তবে ত ঐ সুখীয়ার বাবা ঐ বুড়্‌ঢাকে দিয়েই প্রথম বাঁধ খোলান উচিত। তারই ছেলে বউ যখন এত তকলিফ করেছে তখন এই সম্মান ত তারই প্রাপ্য। একসঙ্গে হৈচৈ ক'রে ওঠে সবাই। হ্যাঁ, মত আছে তাদের, খুব মত আছে।

বুড়ো এসেছে। এখন দিনের আলোয় এসেছে, সবাই মিলে ধ'রে এনেছে তাকে। ও কিন্তু আসে এখানে, রোজ রাতে আসে, আর নিজের কালিপরা লণ্ঠনটা উঁচু ক'রে তুলে ধ'রে রেখাঙ্কিত মুখে বিড় বিড় ক'রে বলে, "কাঁহা গ্যায়া মেরা লাল! আ যা বেটা, লৌট আ। আ যা রে দুখীয়া মেরা বহুয়া!" চোখের দৃষ্টি ওর ঘোলাটে। যেন একটা বাজে-পোড়া শক্ত গাছ। ওর গলায় একরাশ ফুলের মালা পরিয়ে সবাই

আনন্দে চিৎকার ক'রে উঠল। বিনায়েক নায়েক ওরই হাতে দিলেন কাঁচি, প্রথম ভেতরে যাবার শুভ সূচনা, লাল ফিতে কাটার জন্ম। বুড়ো বোবা। নিঃশব্দ। চোখের কি মুখে কোন অনুভূতি নেই। শুধু যখন স্লুইস গেটগুলো খোলা হ'ল তখন হাউহাউ ক'রে বুক চাপড়ে কেঁদে উঠল, মেরে সুখুয়া, মেরে দুখুয়া। বিনায়েক তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, কেঁদ না বুড্‌ঢা, আজ তাদের জন্তে এতবড় জিনিষটা গ'ড়ে উঠল। গাঁসুদ্ধ লোকের অভাব ঘুচল। তাদের নামেই এর নাম হ'ল আজ সুখুয়া-দুখুয়া বাঁধ।

স্লুইস গেট দিয়ে হুড় হুড় ক'রে জল বেরুচ্ছে। বুড়ো হঠাৎ চিৎকার দিয়ে ওঠে, "আরে ইয়ে পানি নাহিনা, ইয়ে মেরা বহু-বেটোয়া-কি লহু হ্যায়, লহু, খুন হ্যায়, খুন।" কিন্তু শত শত লোকের চিৎকার আর ঢোলের শব্দে ডুবে যায় বুড়োর কান্না।

দূরে দেখা যায় কারা যেন ছুটে আসছে। পাহাড়ের গা বেয়ে নামছে নদীর ঢালে। ও কি? আগে আগে দৌড়চ্ছে কে ও? ও যে সুখীয়া আর পেছনে লাল পাগড়ি, এ-যে পুলিশ, পুলিশে তাড়া করেছে সুখীয়াকে। ছুটছে সুখীয়া, প্রাণপণে ছুটছে। ছুটতে ছুটতে ফেলে দিল মাথার পাগড়ি, হাতের পোঁটলা, লাঠি—সব, তার পর? ওরা চিৎকার করে, ওরে সুখীয়া ম'রে যাবি, ভেসে যাবি দরিয়ার জলে। কেউ শুনল না, খালি একটা আর্ত্তনাদ উঠল, রে দুখীয়া! মেরে দুঃখমতীয়া! তার পর সব চুপ।

সকলের চোখের ওপর দিয়েই জলের তলায় তলিয়ে গেল সুখীয়া। জলের মধ্যেই যেন সে তার হারানো প্রিয়া দুখীয়াকে খুঁজে পাবে। পুলিশ বলল, এতদিন কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নি ওকে। তবে আজ সকালে ঐ টিলার ওপর দাঁড়িয়ে ঐ বাঁধের দিকে তাকিয়ে ছিল সুখীয়া। বোধহয় ওরও মনে হয়েছিল, কাঁদছে দুখীয়া, ডাকছে তাকে দুঃখমতীয়া, ঐ সুখচরিয়ার মধ্যে ব'সে। বলছে, রে চল্‌ সুখুয়া বহি সড়কওয়া হোয়ে লাগ্‌।

উর্ব্বশী ও পুরুরবা
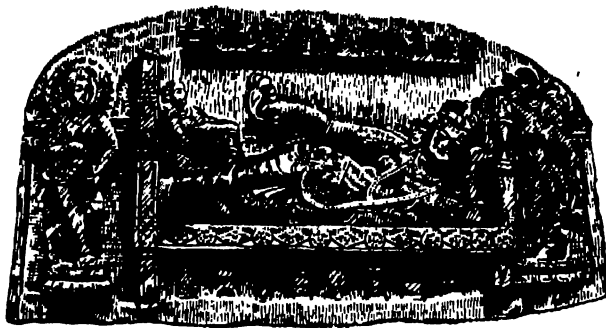
শ্রীসুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়

তিরল গ্রাম থেকে ধূলায় ধূসরিত যে পথখানি বিসর্পিত গতিতে আরামবাগের দিকে গেছে—একদা এক সোনালী প্রভাতে একাকী আমি সেই পথ দিয়ে আরামবাগ যাচ্ছিলাম।

নির্জন পথ। কাছাকাছি লোকালয় নেই। পথের দুপাশে রকমারি গাছের সস্নেহ আলিঙ্গন—তারই মাঝখানে ধূসর নরম পথটি পরম সুখে তন্দ্রাতুর। পাতার ফাঁক দিয়ে সোনালী আলোর ঝর্ণাধারা নেমে এসে নিঃশব্দে তাকে ডাকছে, "ওঠো গো রাই, রাত পোহালো।" তবু পথের ঘুম ভাঙছে না। সেই স্বপ্ন-রাজ্যে আমি এক সচল ছায়ামূর্তি যেন।

সামনে বামদিকে ঘন বেণুবন। ডানদিকে সুপারি গাছের প্রাচীর-ঘেরা আম-বাগান। বাগান পার হলেই খানিকটা প'ড়ো জমি। তার পর বট অশ্বত্থের প্রাচীন জঙ্গল।

সে প'ড়ো জমিটার কাছাকাছি আসতেই মানুষের পূর্বপুরুষদের ক্রুদ্ধ কলরব কানে এল—"খ্, খ্রী খ্রী!"

দ্রুতপদে সেই ফাঁকা জায়গাটার কাছে গিয়ে দেখি দুই দল হনুমান্—"যুদ্ধং দেহি" রণহুঙ্কারে রত হয়েছে।

প্রাচীনকালে যুদ্ধের প্রথম পর্বে গালাগালি দেবার প্রথা ছিল। হনুমান্দের লড়াই তখন পর্যন্ত সেই প্রথম পর্যায়ে আছে দেখে—একটি ভাল জায়গা বেছে নিয়ে মহানন্দে দর্শক হলাম।

দেখলাম, দুই দলের বীরবৃন্দ পরস্পরকে নিদারুণ ভাবে গালাগালি দিচ্ছে। তাদের ভাষা যদিচ আমার অবোধ্য, তবু যে ভাবে মসীকৃষ্ণ বদনান্তরাল থেকে হিংস্র ভয়াল দংষ্ট্রাপংক্তি মুহুর্মুহু বিকশিত হচ্ছিল—তাতে বুঝলাম যে, গালাগালিগুলি নাইট্রিক এ্যাসিডপূর্ণ বাল্বের চেয়েও তেজগর্ভ।

চারিদিকেই ব্যস্ততার ভাব। সবচেয়ে ব্যস্ত হনুমান্-গিন্নীরা। বাচ্চাগুলো এমনি বাঁদর যে এক মুহূর্ত স্থির হতে জানে না। বাচ্চাদের লেজ শক্ত মুঠায় ধরে গিন্নীরা বসে আছে। তবু তারা ডিগবাজি খাবার জন্য ছটফট করছে। বাচ্চাকে সামলাতে না পেরে এক মা ত রেগে মেগে বাচ্চার ঘাড়ে ঠাস ঠাস করে দুই চড়ই মেরে দিল।

মুশকিল বাধাল এক বেয়াড়া ছোঁড়া। মায়ের হাত ফস্কে দৌড়াল সে প'ড়ো জমিটার মাঝখানের জিওল গাছটার দিকে। দোল খাবে। ব্যাকুল হয়ে তার মা তার পিছন পিছন ছুটল।

সঙ্গে সঙ্গে এদিকের ডাল থেকে কয়েকটা ইতর গুণ্ডা ঝপাঝপ লাফ দিয়ে পড়ে সেই অবোধ বালক আর অবলা নারীর দিকে ছুটল।

ওপারের হনুমতী-মহলে ভয়ার্ত চিৎকারের একটা ঝলক বয়ে গেল। পরক্ষণেই শত শত কেউটে সাপের ক্রুদ্ধ চাপা হিস্ হিস্ শব্দ শুনতে পেলাম। ওদিক্ থেকে প্রায় পনেরটা বীর হনুমান্ কিং আর্থারের নাইটদের মত ছুটে আসছে। লেজগুলি বাঁকা লাঠির মত আকাশের দিকে খাড়া হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে বাচ্চাকে বুকে চেপে ধরে সেই হনুমতী পালিয়েছে।

এরা গিয়েছিল বর্শাফলকের আকারে। ওরা এল অর্দ্ধচন্দ্রাকারে। ওদের ঘেরাও আক্রমণের ব্যূহ দেখে এরা থমকে দাঁড়াল। এরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ওরা দলে ভারী। ছুটে আসছে যেন কালবোশেখীর ঝড়। ওদিক্ থেকে উৎসাহবর্দ্ধনকর তুমুল চিৎকার ভেসে এল—"ভ্যালা মেরা ভাইয়ো—গো অন্, গো অন্।"

এদের তখন থতমত অবস্থা। লেজগুলি ধনুকের মত পিঠের উপর কাঁপছে। চার হাতে ভর দিয়ে এরা ভাবছে, হোয়াট ইজ্ টু বি ডান্?

অকস্মাৎ সমস্ত কলরব ডুবিয়ে এক গুরুগম্ভীর আওয়াজ এপারের তরুশীর্ষ থেকে উচ্চারিত হ'ল "হুপ!"

ব্যস্! ঐ একটি মাত্র "হুপ।" মনে হ'ল, কোন্ দূর দিগন্ত থেকে মেঘের আওয়াজ ভেসে এল। এ দিকের দলপতি কোন্ সু-উচ্চ বৃক্ষশীর্ষে বসে দূরবীণ কষছিল জানি না—কিন্তু আদেশ শোনামাত্র এরা এ দিকের গাছে উঠে পড়ল।

ওদিকের যোদ্ধারা ততক্ষণ এ দিকের গাছতলায়

উপস্থিত। তড়াক্ তড়াক্ করে লাফিয়ে এদিক্ থেকে প্রায় পঁচিশটা হনুমান্ বিরাট্ এক চক্রব্যূহ বানিয়ে গাছের তলায় মুখ খিঁচিয়ে দাঁড়াল।

পরক্ষণে পরপারের অদৃশ্য দলপতির আদেশ ক্রম-উচ্চ-নিনাদে বিঘোষিত হ'ল—হুপ—হুপ—হুপ। সারা বন যেন সে শব্দে থম থম করতে লাগল।

হুকুম শোনামাত্র ওরা বাঁশ-বনে ঢুকল। তার পর সুরু হল ভীষণ লড়াই। কত নল, নীল, গয়, গবাক্ষ মরিয়া হয়ে লড়াই সুরু করল। দীর্ঘ উল্লম্ফন, আর্তনাদ, উল্লাস, গর্জন, ধাবনে চারদিকে যেন ঝড় বইল। কি প্রচণ্ড প্রাণশক্তি, কি অপরিমিত অপচয়!

পাঁচ মিনিটের মধ্যে আবার সব চুপ চাপ। গাছের পাতাটিও নড়ছে না। সব চুপ। কি এক আসন্ন প্রত্যাশায় গাছে গাছে বীরবৃন্দ স্তব্ধ, অনড়। এমন সময় এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল।

এক লাবণ্যময়ী সুন্দরী ওদিকের বন থেকে ধীরে ধীরে বার হলেন। এগিয়ে আসতে লাগলেন তিনি। নিশীথ গগনের দ্বিতীয়ার ক্ষীণ শশাঙ্ক রেখার মত তাঁর অধরে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। কি নিশ্চিন্ত ভাব, যেন কোথাও কিছু এতক্ষণ হয় নি। কি গমন-মহিমা! যেন অচ্ছোদ সরসীনীরে মহাশ্বেতা স্নানে চলেছেন।

বহুক্ষণ থেকে হনুমান্‌দের কাণ্ড দেখে দেখে আমার মন নিআণ্ডারথাল যুগে চলে গিয়েছিল। এদের মত কত লড়াই না আমি করেছি। প্রাচীন প্রস্তর যুগ থেকে সুরু করে ভারতে আর্য-আগমনকাল পর্যন্ত আমার গোষ্ঠীর নারী ও পশুসম্পদ বাড়াবার জন্য এদের মত কত লড়াই না আমি করেছি। তমিস্রাবৃত প্রাক্-বৈদিক যুগে কত দুরন্ত রণান্তে আমার প্রিয়তমা রল্লাকে বার বার ছিনিয়ে এনেছি।

বহু-বহুকাল আগের আমার সেই যুগযুগান্তের স্মৃতি একটু একটু করে সবটা মনে ভেসে উঠল। প্রাচীন যুগের রক্তধারা উষ্ণ উল্লাসে যখন আমার ধমনীতে বহমান, ঠিক সেই সময়ে সামনেই দেখলাম সেই "গেলি কামিনী গজহুঁ গামিনী!" মুগ্ধ কণ্ঠ থেকে অজ্ঞাতে ধ্বনিত হ'ল "বাঃ!"

"বাঃ" বলার সঙ্গে সঙ্গে বাঁশ-বনের একটা নুয়ে-পড়া বাঁশ সড়াৎ করে সোজা হয়ে গেল। মনে হ'ল কল্যাণ-কটকের ভৈরব নামক ব্যাধের ধনুকের ছিলাটি বুঝি দীর্ঘরাব নামক শৃগালটি ছিঁড়ে দিয়েছে। পরক্ষণে পাকা দেড়মণ ওজনের এক বিশাল বপু হনুমান্ আমার সামনে এসে বিশ্রী মুখভঙ্গি করে জিজ্ঞাসা করল, "খ্যা র‍্যা?"

হনুমান্ ত নয় যেন এটিলা দি হন্! চোখ দুটো যেন দু'টুকরো গাঢ় নরকাগ্নি।

দূর থেকে চিৎকার শুনতে পেলাম "ও মোশাই, পরাণ্ডানে পাইল্যেসুন পাইল্যেসুন।" দূরে কয়েকজন কৃষক যাচ্ছিলেন। আমার বিপদ্ বুঝে তাঁরা ডাকছেন "প্রাণটা নিয়ে পালিয়ে আসুন, পালিয়ে আসুন।"

কিন্তু পালাই কি ক'রে? এক সেকেণ্ডের ষাট ভাগের এক ভাগ সময় যদি নষ্ট করি এঁর উত্তর দিতে, তা হ'লে আমাতে আর আমি নেই। দাঁত আর নখ দিয়ে উনি আমাকে ফালা ফালা করে চিরে ফেলবেন।

কেমন করে হৃদয় আমাকে পথ বাৎলে দিল জানি না (বুদ্ধি এরূপ ক্ষেত্রে সব সময় বিপদে ফেলে), আমি সেই উর্বশীর দিকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করে তীব্র আবেগ ভরে বলে উঠলাম, "হো ইউ সি, শী ইজ্ এ ফ্যান্‌টম্ অফ ডিলাইট।"

বৃত্রাসুরের মত দুর্দ্ধর্ষ দলপতির দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হ'ল। আশ্চর্য ব্যাপার। আপনারা কেউ বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, কিন্তু আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম, তাঁর চোখে ওমর খৈয়ামী পেলব চাওনী ফুটে উঠল। দেখতে দেখতে এটিলা হ'ল প্রেমমুগ্ধ পুরুরবা। কাব্যে, সাহিত্যে, পুরাণে, রূপকথায় যেখানে যত প্রেমে পড়ার লক্ষণ পড়েছি, সে সব লক্ষণ হুবহু মিলে যেতে লাগল। তাঁর সর্ব শরীরে মৃদু শিহরণ বয়ে গেল। ভাবলাম, এই বুঝি গান ধরে "সুন্দরী তুমি শুকতারা।"

কিন্তু চকিতে এই ভাবটা কেটে গেল। চোখে এক সংকল্পের দৃঢ়তা। পরক্ষণেই রোমশ দীর্ঘ ল্যাজটি তুলে পুরুরবা ছুটল উর্বশীর দিকে। আমিও দৌড় দিলাম। যেতে যেতে শুনতে পেলাম, পিছনে কলরব উত্তাল হয়ে উঠেছে।

আমি কিন্তু ধীর পদে হাঁটতে সুরু করলাম। মাথার উপর নীল আকাশ চক্ চক্ করছে। নীচে চির পুরাতন নাটকের অভিনয় চলতেই লাগল।

হরতন

শ্রীবিমল মিত্র

২

বলতে গেলে ভোরবেলা থেকেই দুলাল সা'র বাড়িতে উৎসব আরম্ভ হয়েছিল। উৎসব কাজে-অকাজে দুলাল সা'র বাড়িতে হয়েই থাকে। দুলাল সা'র বড় ছেলের বিয়েতেও কেষ্টগঞ্জের তাবৎ লোককে বলা হয়েছিল। এটা দুলাল সা'র নিয়ম।

দুলাল সা বলে—আরে, মানুষ দুটো ডাল-ভাত খাবে, তাতেই এই!

দুলাল সা হুকুম দিয়ে দিয়েছিল বাড়িতে এসে যে খেতে চাইবে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া চলবে না। অতিথি নারায়ণ। মানুষকে অভুক্ত রেখে বিদায় দিলে নারায়ণ অসন্তুষ্ট হন। যত দিন যাচ্ছে, ততই দুলাল সা'র দেব-দ্বিজে ভক্তি বাড়ছে। আর ততই ফুলে-ফেঁপে উঠছে দুলাল সা। একদিন ঘুনসি ফিরি ক'রে বেড়িয়েছে কেষ্টগঞ্জের ব্যাপারীদের কাছে। তখন আঁজলা ক'রে জল খেয়ে পেট ভরিয়েছে। সে-সব দিন কেষ্টগঞ্জের বুড়ো মানুষরা স্বচক্ষে দেখেছে। আর বট গাছতলাটায় শুয়ে থাকত। কতদিন রাস্তার কুকুরের সঙ্গে এক জায়গায় কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে রাতও কাটিয়েছে। তখন ক্ষিধে কাকে বলে জেনেছে। তখন ঘর-বাড়ি কাকে বলে তাও জেনেছে। কিন্তু দুলাল সা'র মনে আছে সব।

বলে—মনে থাকবে না? যে মনে না রাখে সে মহাপাতক, নরকেও তার ঠাঁই নাই হে—সে নরাধম।

দুলাল সা কাছারি-ঘরের দাওয়ার বেঞ্চিতে ব'সে মালা জপে আর গল্প করে। আর এখন গল্প করা ছাড়া কাজই বা কী! সব কাজ-কর্ম্ম দেখাশোনার ভার নিয়েছে নিতাই বসাক। নিতাই বসাকও জুটে গিয়েছিল ঠিক সময় মতন। নিতাই বসাকও তার মতন ফ্যা ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়াত আর দু'টো পয়সার জন্যে দোরে দোরে হন্যে হয়ে ফিরত। লাজ-লজ্জার বালাই ছিল না নিতাই-এর। বছর কয়েকের বয়েস কম ছিল নিতাই-এর। সেই নিতাই-ই বলতে গেলে দুলাল সা'কে মহাজনী কারবারে নামিয়েছিল।

কিছু না। সামান্য তিরিশ টাকা মূলধন ছিল দুলালের। কেষ্টগঞ্জে যত ব্যাপারীদের নৌকো আসত তাদের কাছ থেকে এক আনা ক'রে পয়সা জমা নিত দুলাল সা। এক মাস পরে সেই ব্যাপারীই যখন আবার মাল নিয়ে আসত কেষ্টগঞ্জে, তখন আবার আর এক আনা। মাসে এক আনা পয়সা দিতে এমন আর কি!

মতলবটা নিতাই-এর। সবাইকে বলত—হরিসভার চাঁদা।

—হরিসভায় কি হবে?

—আজ্ঞে আপনারা আসেন এখানে, দিনমানে ব্যবসা-বাণিজ্য করেন, রাত্তিরবেলা একটু ভগবানের নাম হবে। পরকালের একটু কাজ হবে! পাপক্ষয় হবে!

কেউ-কেউ বলত—পাপ আর এমন কি করছি বলো না, জ্ঞানতঃ কিছু পাপ ত করি নি হে—

—বলেন কি ব্যাপারী মশাই? পাপ করছি না! অজ্ঞান্তে কত মশা-মাছি মাড়িয়ে ফেলছি, কত নিরীহ পোকা-মাকড় খেয়ে ফেলছি তার কি ঠিক আছে? এই ত সেদিন ঘরের জানলা বন্ধ করতে গিয়ে একটা টিকটিকি চেপটে মারা গেল—তা এটা পাপ হ'ল না? আর বেঁচে থাকাটাই ত পাপ সংসারে—

দুলাল সা'র অকাট্য যুক্তি। সেই হরিসভার চাঁদা তোলাটাই শেষকালে মূল ব্যবসা হ'ল দুলাল সা আর নিতাই বসাকের। দুলাল সা ঘুম থেকে উঠে দু'টো মুড়ি চিবিয়ে জল খেয়েই ঘাটে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। আর ব্যাপারীদের নৌকো এলেই কোঁচার খুঁট খুলে দাঁড়াত। বলত—চাঁদাটা দ্যান্?

মাত্র ৩ এক গণ্ডা পয়সা। কত দিকে কত পয়সা চ'লে যাচ্ছে ব্যাপারীদের। জল-পুলিসকেই এটা-ওটা কত দিতে হয়। কত অপচো-নষ্ট হয়। ইঁদুরে-বেরালে কত কী খেয়ে নেয়। আর বাক্যব্যয় না করে পয়সা চারটে দিয়ে দিত ব্যাপারীরা। কখনও কখনও জিজ্ঞেস করত—হরিসভা হ'ল তোমাদের?

দুলাল সা বলত—আর দেরি নেই, এইবার ইঁট পোড়াতে হবে—

—আবার ইঁট কেন? খড়ের আটচালা করলেই ত হয়।

দুলাল সা জিভ কাটত—আজ্ঞে তা কি হয়?

ঠাকুর-দেবতার কাজ ব'লে কি অত অপগেরাস্থি করতে আছে ? যা করবো ভালো ক'রেই করবো আমরা—

ভালো ক'রে হরিসভা করবে ব'লেই দেরি হতে লাগল। যত দেরি হতে লাগল তত চাঁদা উঠতে লাগল। যত চাঁদা উঠতে লাগল তত স্বাস্থ্য ভাল হতে লাগল দুলাল সা আর নিতাই বসাকের। হরিসভার কাজ আরও জুতসই ক'রে করবার জন্যে কর্তামশাই-এর জমির ওপর একটা চালাঘর করতে হ'ল। কর্তামশাই হলেন প্রেসিডেণ্ট। দুলাল সা আর নিতাই বসাক হ'ল সেক্রেটারি, রবার ষ্ট্যাম্প হ'ল। তখন কর্তামশাই-এর কাছে ঘন-ঘন যাতায়াত ছিল। কর্তামশাই-এর পায়ের ধুলো না পেলে জলগ্রহণই করত না দুলাল সা আর নিতাই বসাক।

সে সব পনের বছর আগেকার কথা।

কর্তামশাই-এর কাছে গেলে আর ছাড়তে চাইতেন না তিনি। গৌড়েশ্বরের পুরোণ ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্মদাস দেবশর্ম্মণঃর কাহিনী, একশো আটটা পদ্মপাতার গল্প, হাতীতে চ'ড়ে রাজবাড়ি যাওয়ার কথা—সব কিছু শোনাতেন। শেষকালে বলতেন—তোমাদের যখন যা দরকার হবে, আমার কাছে বলবে, আমি সব দেব—

বলতে গেলে এখন যেখানে দুলাল সা'র বাড়ি, এই জমিও কর্তামশাই-এর দেওয়া। হরিসভা করবার জন্যেই কর্তামশাই এই জমি দিয়েছেন।

কর্তামশাই বলতেন—ধর্ম্ম লোপ পেয়েছে ব'লেই ত এখন বাঙালীর এই দুর্দ্দশা—

দুলাল সা কাপড়ের খুঁটটা গায়ে দিয়ে সামনে সবিনয়ে হাতজোড় ক'রে ব'সে থাকত। বলত, আজ্ঞে, তা ত বটেই—

নিতাই বসাক বলত—সেইজন্যেই ত কর্তামশাই, ধর্ম্ম নিয়ে প'ড়ে আছি দুই বন্ধুতে—

কর্তামশাই বলতেন—কত টাকা চাঁদা উঠল ?

দুলাল সা বলত—এক আনা ক'রে মাথাপিছু চাঁদা, কত উঠবে, আজ পর্য্যন্ত সর্ব্ব-সাকুল্যে পঁচাত্তর টাকা সাত আনা তবিলে জমা আছে—

—এত কম ?

—আজ্ঞে, কেউ কি দিতে চায়, জোর-জবরদস্তি করে ওই আদায় করেছি, তাই-ই ঢের বলতে হবে !

আর তার পরেই নিবারণের ডাক পড়ত। নিবারণকে বলতেন—কিছু টাকা এদের দিতে হবে নিবারণ ! তবিল থেকে কিছু দাও ত এদের—

এমনি ক'রে কত টাকা যে কর্তামশাই দিয়েছেন হরিসভার জন্যে তার হিসেব কর্তামশাই-এর জানা না থাকলেও নিবারণের জানা আছে। শুধু কাঁচা টাকাই নয়, জমি বেচেছেন হরিসভার জন্যে। নিজের জবানীতে চিঠি লিখে দিয়েছেন কেষ্টগঞ্জের ব্যাপারীদের কাছে। কেষ্টগঞ্জের ক্ষেত-মজুররা, জোতদাররা পর্য্যন্ত এক আনা ক'রে মাসে-মাসে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত হরিসভাও হয়েছিল একটা। পাঁচ বিঘে জমির এক কোণে একটা চালাঘর ! সে এমন কিছুই না। টিম টিম ক'রে দিন-কয়েক গান-টান হয়েছিল, অষ্ট-প্রহর হয়েছিল। একবার চব্বিশ-প্রহরও হয়েছিল। কিন্তু ভেতরে-ভেতরে যে সেই টাকা সুদে খাটিয়ে দুলাল সা অত টাকার মালিক হয়ে যাবে তা কর্তামশাই কল্পনাও করতে পারেন নি। দুলাল সা কেষ্টগঞ্জে হরিসভার চাঁদা তোলা নিয়ে যখন ব্যস্ত থাকত, তখন নিতাই বসাক চাঁদা-তোলার নাম ক'রে কলকাতায় যেত কাঁচা টাকা নিয়ে। সেখানে গিয়ে কি ফন্দী-ফিকির করে পাটের দালালীর ব্যবসা ক'রে রাতারাতি বড়লোক হবার সুলুক-সন্ধান আবিষ্কার ক'রে বসল তা কর্তামশাই জানতে পারেন নি। যখন জানতে পারলেন তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। একদিন কেষ্টগঞ্জের বাজারে পাটের আড়ত খুলে বসল দুলাল সা। তার পর কোথা থেকে দু'জনে পরিবার ছেলে সব নিয়ে এল। পাঁচ বিঘে জমির ওপর বাড়ি হ'ল পাকা। পাকা দালান উঠল তাদের কেষ্টগঞ্জে। কেষ্টগঞ্জের লোক হঠাৎ একদিন চোখ মেলে দেখলে, দুলাল সা আর নিতাই বসাক লাখপতি হয়ে গেছে।

কর্তামশাই একদিন ডেকে পাঠালেন দুলাল সা'কে।

নিবারণ ফিরে এল। বললে, এখন পুজো করছেন দুলালবাবু, ওবেলা আসবেন—

কিন্তু ওবেলাও এল না দুলাল সা। নিতাই বসাককেও ডাকতে পাঠিয়েছিলেন। নিতাই বসাকও নেই কেষ্টগঞ্জে। সেও সেদিন কলকাতায় গেছে। এই রকম ক'রে তাঁকে অপমান করেছে দু'জনেই। এমনি ক'রেই দিনের পর দিন বছরের পর বছর কেটে গেছে। আর নিবারণের মুখ থেকেই দুলাল সা'র আঙুল ফুলে কলা-গাছ হওয়ার খবর পেয়েছেন। দোতলার জানালা থেকে দুলাল সা'র দালানটা দেখা যায় ব'লে সে জানালাটাই বন্ধ করে দিয়েছেন পেরেক মেরে। কিন্তু জানালায় পেরেক মারলে কি হবে, দুলাল সা'র খবর কেষ্টগঞ্জে চাপা থাকে না। দুলাল সা'র আড়তে হালখাতা হলে ঢাক-ঢোল-সানাই-কাঁসি বাজে। দুলাল সা'র বাড়িতে বার মাসে তের পার্ব্বণ। গাঁয়ের একশো খানা বাড়িতে নেমন্তন্ন হয়। দেখতে দেখতে দুলাল সা আর নিতাই

বসাক কেষ্টগঞ্জের গণ্যমান্য লোক হয়ে উঠল। কর্ত্তা-মশাই-এর চোখের সামনেই সব ঘটল। আর কর্ত্তামশাই এই পনের বছর ধ'রে কেবল ধাপে ধাপে নেমে চলেছেন। এখন তাঁর বাড়ির চারদিকে কাল-কাসুন্দির ঝোপ হয়েছে, একমাত্র ছেলে সিদ্ধেশ্বর নিরুদ্দেশ হয়েছে। পুত্রবধূটি মারা গেছে। শেষ পর্য্যন্ত হরতন ছিল। তিন বছরের নাতনী কর্ত্তামশাই-এর। সেও একদিন চ'লে গেছে।

শেষ পর্য্যন্ত একদিন হঠাৎ দুলাল সা এসেছিল।

তখন দুলাল সা বেশ ভারিক্কি হয়েছে। নতুন মটর-গাড়িতে চ'ড়ে দুলাল সা আর নিতাই বসাক এসেছিল কর্ত্তামশাই-এর চণ্ডীমণ্ডপে। এসেই দু'জনে কর্ত্তামশাই-এর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গিয়েছিল। কিন্তু তার আগেই কর্ত্তামশাই পা সরিয়ে নিয়েছিলেন।

বলেছিলেন, খবরদার, পা ছুঁয়ো না, বেয়াদপির আর জায়গা পাও নি?

দুলাল সা মাথা নিচু ক'রে বলেছিল, আপনি আমায় আজ যা বলবেন সব মাথা পেতে নেব, এই আপনার সামনে আমি মাথা পেতে দিলুম—

ব'লে দুলাল সা সত্যি-সত্যিই মাথা পেতে দিলে।

কর্ত্তামশাই বললেন, এবার কি মতলব বল ত? আবার হরিসভা?

—আপনার আর দশজনের চাঁদাতেই হরিসভা করেছিলাম কর্ত্তামশাই, সে-কথা আমি এখনও সকলকে বলি। বলি, কর্ত্তামশাই না থাকলে আমার এই অগাধ ঐশ্বর্য্য, এই বাড়ি গাড়ি কিছুই হ'ত না—

কর্ত্তামশাই বলেছিলেন, তুমি নির্লজ্জ আহাম্মক, তাই এমন ক'রে বলতে পার, অন্য লোক হ'লে জিভ খ'সে যেত।

নিতাই বসাক পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ চুপ ক'রে। বললে, সবই ত আপনার আশীর্ব্বাদে হয়েছে কর্ত্তামশাই, আপনি কেন রাগ করেন?

—রাগ করব না? আবার বলছ রাগ করি কেন? বেয়াদব কোথাকার? সিদ্ধেশ্বরকে তোমরা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নাও নি? আমার সঙ্গে কথা-বলা পর্য্যন্ত সে বন্ধ করেছিল, সে কাদের মতলবে শুনি? আমার নাতনী মারা গেল, তাতেও আমি এক ফোঁটা কাঁদতে পারি নি, তা জান?

দুলাল সা বললে, আজ্ঞে সে-সব ত পুরোণ কথা, চুকে-বুকে গেছে, এতদিন পরে সে-সব কথা আবার তুলছেন কেন?

—তুলব না? আমি কি সে-সব ভুলে গেছি মনে কর? আমার এত সর্ব্বনাশ ক'রে আমার সামনে আবার মুখ দেখাতে এসেছ? লজ্জা করে না তোমাদের? দুটো টাকা হয়েছে ব'লে কি ধরাকে সরা জ্ঞান করেছ?

নিতাই বসাক বললে, আজ্ঞে, আজকে দুলালের ছেলের বিয়ে, আপনি যদি গিয়ে না দাঁড়ান ত কে দেখবে? আপনিই ত আমাদের সকলের ভরসা?

—থাম, খুব হয়েছে।

ব'লে কর্ত্তামশাই জোরে জোরে হাঁফাতে লাগলেন। তার পর নিবারণকে বললেন, নিবারণ, তুমি ব'লে দাও এদের, আমরা সারস্বত ব্রাহ্মণ, নীচ-জাতের বাড়িতে সারস্বত-ব্রাহ্মণরা ভোজ খেতে যায় না, ভোজ খাবার বামুন আলাদা পাওয়া যায়, তাদের বাজারে ভাড়া পাওয়া যায়।

ব'লে সেদিন কর্ত্তামশাই তাদের মুখের ওপর খট্‌খট্ ক'রে খড়ম পায়ে দিয়ে সোজা দোতলায় নিজের ঘরে চ'লে গিয়েছিলেন। তারপর সেদিনও লুচি-ভাজার গন্ধ এসেছিল হাওয়ায় ভেসে। সেদিনও ঘি-এর গন্ধে কষ্ট হয়েছিল কর্ত্তামশাই-এর। হরিসভা করবার নাম ক'রে চাঁদা তুলে লোক ঠকিয়ে যারা টাকা করে, তাদের টাকায় ধিক্, তাদের জীবনে ধিক্, তাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই কর্ত্তামশাই-এর।

সেদিনও বড়গিন্নী পাশে শুয়েছিলেন চুপ ক'রে। কর্ত্তামশাই রেগে বলেছিলেন, জানালাটা বন্ধ ক'রে দাও ত বড়গিন্নী, যেন চামড়া পোড়া গন্ধ আসছে।

তা কর্ত্তামশাই সম্পর্ক রাখুন আর না রাখুন, দুলাল সা'র তাতে কিছু আসে যায় নি। নিতাই বসাকেরও কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় নি। লোকে ভুলে গেছে হরিসভার কথা। সেই ইছামতীর ধারে যেখানে দুলাল সা কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়ে হরিসভার চাঁদা চেয়ে বেড়াত, সেখানেই এখন দুলাল সা'র মস্ত পাটের আড়ত হয়েছে। এখন সেই সেদিনকার ব্যাপারীরাই এখন দুলাল সা'র সামনে হাত-জোড় ক'রে থাকে। দুলাল সা সারা কেষ্টগঞ্জের পাটের বাজার হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু চেহারা, পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, ভাব-ভঙ্গি কিছুই বদলায় নি। এখনও সেই নদীর বাঁধানো ঘাটে রোজ ভোরবেলা দুলাল সা যায়। সঙ্গে চাকর যায় গামছা-তেল-বালতি নিয়ে। প্রথমে পৈঁঠের ওপর বসে

গায়ে মাথায় পায়ে সর্ব্বাঙ্গে সরষের তেল মাখে। কি শীত কি গ্রীষ্ম কি বর্ষা যে-কোনও ঋতুতে ভোর চারটের সময় ঘাটে গেলেই দুলাল সা'কে দেখা যাবে। নৌকোর ভেতর তখন সব ঘুমে অসাড়। সেই অত রাত থাকতে দুলাল সা সেখানে বসে ভাল ক'রে সারা শরীরে তেল মাখবে। তার পর বালতি ক'রে নদী থেকে জল তুলে নিজের হাতে ঝাঁটা দিয়ে ঘাটের পৈঁঠেগুলো ঘ'ষে ঘ'ষে ধোবে। তার পর সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলে নিজে নদীতে নেমে এক ঘণ্টা ধ'রে অবগাহন স্নান করবে। তার পর একে একে ব্যাপারীরা আসবে, কেষ্টগঞ্জের দোকানের লোকজন জাগবে। তখন স্নান শেষ হয়ে গেছে দুলাল সা'র।

—প্রাতঃপ্রণাম সা-মশাই।

—প্রাতঃপ্রণাম। কে? মুকুন্দ?

অন্ধকার ঝাপ্‌সা আলোয় ভাল ক'রে দেখা যায় না। তবু গলা শুনেই বুঝতে পারে দুলাল সা। কিন্তু দেখা হলেই সকলের খবরাখবর নেওয়া চাই।

বলে, তোমার জামাই কেমন আছে মুকুন্দ? চিঠি পেয়েছ? হ্যাঁ ভাল কথা, তোমার গাইটা বিইয়েছে নাকি? হরি, হরি, যাই, সবাই ভাল থাকলেই ভাল মুকুন্দ, হরি ছাড়া কোনও ভরসা নেই, জানলে হে মুকুন্দ, বিপদে আপদে ভবসাগরে হরিই একমাত্র কাণ্ডারী, যাই—হরি হরি।

তা দুলাল সা মিথ্যে কথা বলে না। হরিই যে ভবসাগরে একমাত্র কাণ্ডারী এ-কথা দুলাল সা নিজের জীবন দিয়েই প্রমাণ ক'রে দিয়েছিল। নইলে, কি ছিল তার, আর কি হয়েছে। সেই হরিসভাটা এখনও আছে। লম্বা মানুষ-সমান ইটের পাঁচিল দিয়ে নিজের বাস্তুর সীমানার মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলেছে। সেখানে এখন দুলাল সা'র গরু থাকে।

দুলাল সা বললে, তোমরা ত বুঝবে না, তোমরা ভাববে সংসারে টাকাই বুঝি সব, আরে সংসারে টাকাই যদি সব হ'ত ত আমি ত্রিসন্ধ্যে হরিকে ডাকি কেন? না ডাকলেই ত পারতাম!

লোকে বলে, আজ্ঞে আপনি হলেন ভক্ত মানুষ! আপনার সঙ্গে কার তুলনা?

দুলাল সা রেগে যায়। বলে, ওই তোমাদের এক কথা! ভক্ত হওয়া অত সোজা? ভক্তি-ভক্তি ক'রে চেঁচালেই ভক্তি আসে? ভক্তির জন্যে কষ্ট করতে হয় না? ভক্তি কি গাছের ফল হে যে আঁকসি দিয়ে পাড়লাম আর খেলাম? ভক্তির জন্যে মেহনত লাগে না? তা হলে ত আমি হরিসভা ক'রে কাজ-কর্ম্ম ছেড়ে হরিনাম গান শুনলেই পারতাম। হরিসভা তুলে দিলাম কেন? বল ত হরিবিলাস, তুমি বল ত, তুলে দিলাম কেন?

হরিবিলাস বলে, আজ্ঞে আপনার গরু রাখবার জন্যে!

—আরে দূর! তোমার হরিবিলাস নামটাই মিথ্যে! গরু রেখেছি কি দুধ খাবার জন্যে? গরুর দুধ আমি বাজার থেকে কিনতে পারি না? আমার পয়সা নেই?

—আজ্ঞে তা বলি নি আমি!

—দূর মুর্খ!

পাশেই কান্ত ব'সে ছিল। সে অনেকবার কথাটা শুনেছে। উত্তরটাও তার জানা। সে বললে, আজ্ঞে গো-সেবা করার জন্যে।

দুলাল সা হাসে। বলে, তুই মুখ্য মানুষ, তুইও জানিস, আর হরিবিলাস জানে না। আরে গো-সেবা আর হরিনাম-শোনায় কিছু তফাৎ আছে মুর্খ? দে, কত এনেছিস দে—

একদিকে ধর্ম্মালোচনা চলে আবার মহাজনী কারবারও চলে। সুদের হিসেব-পত্র নিয়ে কড়া-গণ্ডা-ক্রান্তির হিসেবও চলে কাছারিতে। এটা দুলাল সা'র পরোপকার-বৃত্তি। কত দুঃস্থ লোক টাকার অভাবে ঘটি-বাটি বেচে দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। তাদের উপকারের জন্যেই এই মহাজনী ব্যবসা তার। নইলে এটাকে ব্যবসা বলাই ভুল। অন্যায়। দুলাল সা রোজ রাত থাকতে উঠে নদীতে গিয়ে নিজের হাতে ঘাট ধুয়ে স্নান করতে নামে। তার পর চাকর বালতি নিয়ে ঝাঁটা নিয়ে উপরে দাঁড়িয়ে থাকে বাবুর জন্যে। স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে দুলাল সা সারা রাস্তা গঙ্গা-স্তোত্র আওড়াতে আওড়াতে বাড়ী আসে। তখন নতুন-বৌ পূজার জোগাড় ক'রে তৈরি থাকে। বাড়ীতে ফিরে দুলাল সা'কে আর ডাকতে হয় না। নতুন-বৌ তার আগেই ঘুম থেকে উঠে গরদের শাড়ী প'রে ভিজা চুলে পূজার ব্যবস্থা ক'রে দেয়।

দুলাল সা প্রথম প্রথম বলত, তুমি কেন মা আবার এত কষ্ট ক'রে উঠতে গেলে? নিধু ত ছিল—

নতুন-বৌ সে-কথার উত্তর দিত না। শ্বশুরকে পূজায় বসিয়ে দিয়ে তাঁর সকালের জলযোগের ব্যবস্থা ক'রে তবে তার মুক্তি। শুধু শ্বশুরের কাজই নয়। সারা বাড়ীতে যে-যেখানে আছে সবাইকে দেখবার ওই একটা মানুষ নতুন-বৌ।

দুলাল সা বলত, এই যে নতুন-বৌ, এই যে নতুন-বৌ

না হলে কিছুই হয় না এ সংসারে, এও ত সেই হরির দয়ায়, হরির দয়া না হলে কি আমি নতুন-বৌকে পেতাম? তোমরাই বল না, পেতাম?

কান্ত বলত, আজ্ঞে, উনি মানুষ নন, মা-লক্ষ্মী আমাদের—

বলতে গেলে এ বাড়ীতে নতুন-বৌ আসবার পর থেকেই দুলাল সা'র সংসারে লক্ষ্মী এসে আসন নিয়েছেন। বাড়ী আগেই হয়েছিল, ব্যবসা আগেই হয়েছিল, টাকাও আগেই হয়েছিল। কিন্তু সংসারে শান্তি বলতে যা বোঝায়, সুখ বলতে যা বোঝায় সব এসেছে নতুন-বৌ আসবার সঙ্গে সঙ্গেই। নতুন-বৌ আসবার সঙ্গে সঙ্গেই দুলাল সা'র যেন বাড়-বাড়ন্ত হয়েছে। তিনখানা বাস্ করেছে দুলাল সা। একটা ধানকল করেছে। বাস্তুভিটের পাশেই নতুন পাকা-দালান তুলেছে। এবার একটা সুগার-মিল করবার ইচ্ছে। পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়টা যদি পাওয়া যেত ত সুগার-মিলের পক্ষে জায়গাটা ভারি সুবিধার হ'ত। জল, কয়লা, রেল-ইষ্টিশনটা কাছে। কোনও দিকেই আর কোনও অসুবিধা থাকত না। কর্ত্তামশাই-এর কাছে নিজেও গিয়েছে কতদিন। কতদিন নিবারণকেও ডেকে পাঠিয়েছে।

বলেছে, এবার ত তোমার বয়স হ'ল নিবারণ, এবার পরকালের কথা একবার ভাব—

নিবারণ বলেছে, আজ্ঞে, সা' মশাই, আমার আর পরকাল—

—ভেবেছ চিরকাল কি এই রকমই কাটবে? এই দেখ না, এই আমার কথাটাই ভাব না, আমি কি আর বাবুয়ানি করতে পারি না ভেবেছ? পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে গদির উপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকলেই পারি। কিসের আমার গরজ ভোরবেলা ঘাটে গিয়ে নিজের হাতে ঝাঁটা ধরার? করি কার জন্যে? করি কিসের জন্যে শুনি?

—আজ্ঞে পরকালের জন্যে!

—তবে? তবেই বোঝ! আমার আর কি? আমার আর টাকার দরকার কিসের? আমি একলা কত খাব? সুগার-মিলটা হলে তোমাদেরই লাভ। দেশের দশ-জনেরই লাভ। দেশের লোক বড় গরীব। আমি এক-কালে গরীব ছিলুম, গরীবের দুঃখ আমি বুঝব না ত কে বুঝবে বল দিকিনি? তোমার কর্ত্তামশাই বুঝবে?

—আজ্ঞে কর্ত্তামশাইয়ের কথা ছেড়ে দিন।

—তা হ'লেই বোঝ, সুগার-মিলটা হলে দেশের লোকেরই লাভ। দেশের গরীব লোকরা কাজ পাবে, দু' মুঠো পেট ভ'রে খেতে পাবে, পরতে পাবে, গরীবদের দুর্দ্দশা দেখলে আমি চোখের জল রাখতে পারি নে, তা জান?

নিবারণ কিছু কথা বললে না। চুপ ক'রে রইল।

দুলাল সা বললে, আর এই যে তুমি, তোমাকেও ত পনর বছর দেখে আসছি, আগে তোমার কি চেহারা ছিল, আর এখন কি হয়েছে বল দিকিনি? কিসের লোভে কর্ত্তামশাইয়ের কাছে প'ড়ে আছ বল ত? পেট ভ'রে খেতে পাও? মাইনে-টাইনে পাও?

নিবারণ তবু কথা বললে না।

দুলাল সা আবার বললে, যাক্ গে, তুমি খেতে পাও আর না পাও, তুমি মাইনে পাও আর না পাও, তা আমার দেখবার দরকার নেই। তোমার ব্যাপার তুমি বুঝবে, আমি কে? আমি কেউ না। তবে কি জান, কারোর দুঃখ দেখলে আমার মনের ভিতরটা যেন কেমন হু-হু করে। আমি না বলে থাকতে পারি নে। ভাবি তুমিও ত মানুষ হে, তোমার ছেলেমেয়ে বউ না-ই বা রইল, তোমার সুখ-সুবিধা-আহ্লাদ ব'লেও ত একটা জিনিষ আছে। তাই বলছিলাম, পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়টা যদি দিতে আমাকে ত তোমারও একটা হিল্লে হয়ে যেত, তা তুমি যখন…

—বাবা!

হঠাৎ নতুন-বৌ ঘরে ঢুকল।

দুলাল সা বললে, এই যে মা উঠি, এই নিবারণকে বলছিলাম ওই পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়টার কথা। বলছিলাম, আমার আর কি! দেশের লোক দু'টো খেতে পায় তারই সুবিধা করার জন্যেই সুগার-মিলটা করা, নইলে—

নিবারণ নতুন-বৌয়ের দিকে চেয়ে বললে, আমি উঠছি, আপনাদের দেরি হয়ে গেল—

দুলাল সা বললে, তা হলে কথাটা মনে রেখ নিবারণ, আমি না হয় নিতাইকে একবার কর্ত্তামশাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দেব'খন—

হঠাৎ নতুন-বৌ বললে, এত অপমান করার পরেও আবার কর্ত্তামশাইয়ের কাছে নিতাই কাকাবাবুকে পাঠাবেন বাবা? যদি আবার অপমান করে?

দুলাল সা বললে, ধর্ম্মের পথে ত বাধা আসবেই মা, তা ব'লে অপমানের ভয়ে ধর্ম্ম ত ছাড়তে পারি না—

—কিন্তু যে ছোটলোক তার সঙ্গে সংস্রব নাই-বা রাখলেন আপনি?

নিবারণের কথাটা গায়ে লাগল। বললে, আমার

মুখের সামনে আর বুড়োমানুষকে গালাগালটা না-ই বা দিলে মা! তিনি ত কোনও অপরাধ করেন নি!

নতুন-বৌ বললে, দেখুন, আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি, বাবা ধর্ম্মভীরু মানুষ তাই এর পরেও আপনাকে ডেকে ভদ্রভাবে কথা বলেছেন, আমি হলে অন্য রকম ব্যবহার করতাম।

নিবারণ বললে, তুমি সব জান না মা, তুমি নতুন এসেছ কেষ্টগঞ্জে, তাই এ কথা বলছ, কর্ত্তামশাইকে আমি ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি। তা যদি হ'ত ত আমি এই অবস্থায় তাঁর কাছে প'ড়ে থাকতাম না—

দুলাল সা লুফে নিলে কথাটা। বললে, আমিও ত তাই বলছি। তুমি কেন প'ড়ে প'ড়ে ঝাঁটা-লাথি খাচ্ছ নিবারণ? আমি তোমাকে ডবল মাইনে দিচ্ছি, তুমি আমার এখানে এস, সুগার-মিল খুললে তুমি আরও মোটা টাকার মাইনে পাবে।

নিবারণ হাসল। বললে, আপনি আর আমাকে লোভ দেখাবেন না সা' মশাই, ইহকালটা ত গেছেই, পরকালটা আর খোয়াতে চাই নে।

—এই কি তোমার শেষ কথা?

নতুন-বৌ বললে—আপনি উঠুন বাবা, বেলা হয়ে গেল, যার-তার সঙ্গে কথা ব'লে আপনি আর মেজাজ খারাপ করবেন না। নিতাই-কাকা আছেন, ঢেঁপুল-বেড়ের বাঁওড় উনি কি ক'রে রাখতে পারেন তাই দেখি!

ব'লে দুলাল সা'কে হাতে ধ'রে নতুন-বৌ অন্দরের ভেতর নিয়ে গেল।

নিবারণ চ'লেই আসছিল। ভেতরে কাছারি ঘর থেকে কান্ত ডাকলে। বললে—সরকার মশাই, ইদিকে আসুন!

নিবারণ চেয়ে দেখলে, বললে—কী বলছো কান্ত?

—বলছি, আপনার মত আহাম্মক মানুষ ত আমি আর দু'টো দেখি নি। এমন সুযোগ কেউ হেলা-ফেলা করে?

—কিসের সুযোগ? একটু বুঝিয়ে বল?

—বলি কর্ত্তামশাই ত যেতে বসেছে। যেটুকু আছে তা-ও গেল বলে। এই ত গুছিয়ে নেবার সময়!

নিবারণ আবার হাসল। বললে—তুমি আমাকে আজও চিনলে না কান্ত! সবাই কি গুছিয়ে নিতে চায়, না পারে? না সকলের সে-প্রবৃত্তি থাকে?

ব'লে নিবারণও আর দাঁড়াল না সেখানে। খাঁ খাঁ করা রোদ উঠেছিল বাইরে। ছাতাটা খুলে বাইরের রাস্তায় পা বাড়াল।

কিন্তু যেদিন সেই রাত্রে লুচি ভাজার গন্ধে কর্ত্তামশাই-এর ঘুমের ব্যাঘাত হ'ল, তার পরদিনই ঘটনাটা ঘটল।

কেষ্টগঞ্জের লোক সাধারণতঃ এমন ঘটনা কখনও দেখে নি। কখনও শোনে নি। দুলাল সা ভোর রাত্রে যেমন রোজ চাকরকে সঙ্গে নিয়ে ইছামতীতে স্নান করতে যায়, তেমনি সেদিনও গেছে। আব্‌ছা-আব্‌ছা অন্ধকার। ভালো ক'রে ভোর হয় নি তখনও। হঠাৎ মনে হ'ল অশথ গাছটার তলায় কে যেন ব'সে আছে স্থির নিশ্চল হয়ে। দেখেই কেমন মনে হ'ল, এতদিন যেন এঁকেই মনে-প্রাণে খুঁজছিল দুলাল সা।

এ সেই রাত চারটের সময়কার ঘটনা। আর বেলা দশটার মধ্যে সারা কেষ্টগঞ্জে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে দুলাল সা'র বাড়ীতে এক সাধুপুরুষ এসেছেন। দুলাল সা' মশাই দীক্ষা নেবে।

ব্লক-ডেভেলপ্‌মেণ্ট অফিসার সুকান্ত আধুনিক ছোকরা। কলকাতা থেকে নতুন এসেছে কেষ্টগঞ্জে। সাইকেল চ'ড়ে অফিসে যাচ্ছিল। হঠাৎ সা'মশাই-এর বাড়ীর সামনে ভিড় দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—কি হয়েছে এখানে? ভিড় কেন এত?

নিতাই বসাক সুকান্তবাবুকে দেখেই দৌড়ে কাছে এসেছে। বললে—আসুন স্যার, আসুন—

—কি হয়েছে নিতাইবাবু? ব্যাপার কি?

—আজ্ঞে, আপনারা সাহেব মানুষ, আপনারা ত আবার এ-সব বিশ্বাস করবেন না। তাজ্জব ব্যাপার কিন্তু, একেবারে ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ, ভূত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ সব ঝাঁ ঝাঁ ক'রে ব'লে দিচ্ছেন। আমি ত স্যার চমকে গেছি, যা যা আমায় বললেন সব মিলে গেল—

সুকান্ত তবু বুঝতে পারলে না। বললে—কে? লোকটা কে? কোত্থেকে এল?

—লোক-টোক নয়, খাঁটি মহাপুরুষ! হিমালয় থেকে এসেছেন, আবার কালই হিমালয়ে চ'লে যাবেন!

সুকান্ত পকেট থেকে একটা সিগারেট-কৌটা বার ক'রে তার থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার সাইকেলে উঠতে যাচ্ছিল। বললে—দূর মশাই, কি যে বলেন আপনারা, এ-সব আপনাদের সুপারষ্টিশন্, এ-সব বলবেন না কাউকে, লোকে হাসবে।

নিতাই বসাক সাইকেলের হ্যাণ্ডেলটা চেপে ধরলে। বললে—না না, আপনি তা হ'লে শুধু একবার ওঁর চেহারাটা দেখে যান, দেখবেন চোখ দিয়ে কি-রকম জ্যোতি বেরোচ্ছে—

—না মশাই, শেষকালে যদি জ্যোতির ধাক্কায় অজ্ঞান হয়ে যাই, কাজ নেই, আমি চলি—

ব'লে ব্লক-ডেভেলপমেন্ট অফিসার সাইকেল চ'ড়ে সিগারেট টানতে-টানতে চ'লে গেল। কিন্তু ভিড় কমলো না তা ব'লে। যত বেলা বাড়তে লাগল ততই ভিড় বেড়ে চলে। কেষ্টগঞ্জের মাইল দশেকের মধ্যে খবরটা রটে গেল যে, দুলাল সা'র বাড়ীতে এক সাধু এসেছেন। দুলাল সা তাঁর কাছে দীক্ষা নিচ্ছে। দুলাল সা'র পাটের আড়তে যারা এসেছিল তাদের সবাইকে নেমন্তন্ন করলে নিতাই বসাক।

—আজ রাত্রে কিন্তু আসা চাই হাজরা মশাই! গুরুদেবের প্রসাদ পাবেন!

যারা নৌকোর ব্যাপারী তারা সারা রাত নৌকোয় কাটিয়ে ভোর ভোর কেষ্টগঞ্জ থেকে রওনা দেয়। একদল যায়, আর একদল আসে। এই রকমই নিয়ম। কেউ-কেউ কেষ্টগঞ্জের বাজারে গিয়ে এখানে-ওখানে রাত কাটায়। কিন্তু সেদিন শুধু হাজরা মশাই ই নয়, পোদ্দার মশাই, পাল মশাই, দাস মশাই, সকলে প্রসাদ পেলে। ভাল খাঁটি ঘি-এ ভাজা গরম-গরম লুচি, কুমড়োর ছক্কা, ছোলার ডাল, দই, পায়েস সবই খেলে। এমন খাওয়া নতুন নয়। যারা ব্যাপারী, তারা এখন সা'মশাই-এর বাড়ীতে বরাবর পাত পেড়ে খেয়ে গেছে অনেকবার। কেষ্টগঞ্জের গাঁয়ের লোকরাও খায়। ব্রাহ্মণদের জন্যে আলাদা, শূদ্রদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা।

সুকান্তবাবুর বাঙলোতে গিয়ে নিতাই বসাক নিজে নেমন্তন্ন ক'রে এসেছিল।

সুকান্ত বলেছিল—খেতে আর আমাদের কিসের আপত্তি, কিন্তু ভক্তি-টক্তি আমাদের নেই মশাই, আমরা ও-সব বুজরুকিতে ভুলি না।

—কিন্তু ভক্তি না থাক, আপনাকে স্যার যেতেই হবে, দুলাল অনেক ক'রে ব'লে দিয়েছে—আর আপনার স্ত্রীকেও—

সুকান্ত কিন্তু-কিন্তু করছিল। নিতাই বসাক বললে—আপনার কিছু কষ্ট হবে না, আমরা গাড়ি পাঠিয়ে দেব, আপনি খাবেন আর সাধু-দর্শন ক'রে চ'লে আসবেন -

সুকান্ত হেসে বললে—কিন্তু দর্শনী দিতে হবে নাকি আবার আপনাদের সাধুকে?

—না না, সে-রকম সাধু নয় স্যার। একটা পয়সা নেন না তিনি। ফল-মূল ছাড়া কিছু আহারই করেন না। নইলে দুলাল কি আর সাধে দীক্ষা নিচ্ছে তাঁর কাছে!

তার পর একটু থেমে বললে—আর বললে বিশ্বাস করবেন না স্যার, যাকে যা ব'লে দিচ্ছেন সব তাহা মিলে যাচ্ছে। আমি কবে পেয়ারা গাছে উঠে পেয়ারা পাড়তে গিয়ে পা মচকে পড়ে গিয়েছিলুম, সব ব'লে দিলেন। আর দুলালের ত কথাই নেই স্যার, সে সাধুবাবার পা জড়িয়ে ধ'রে ব'সে আছে সমস্তদিন—

—সে কি? দুলালবাবুরও কিছু ব'লে দিয়েছেন নাকি?

—আজ্ঞে, সব সব স্যার, কিছু বাকি নেই আর বলতে। দুলালকে ব'লে দিয়েছেন, এই এখন থেকে গুড্-টাইম পড়ল। এইবার দুলাল ধুলো-মুঠো ধরবে আর সোনা-মুঠো হবে।

সুকান্ত বললে—আমার হাত দেখে বলতে পারবেন আপনাদের সাধু? আমার ত কুষ্ঠি নেই—

—কি বলেন স্যার, হাত দেখতেও হবে না, আপনার মুখ দেখেই ভূত-ভবিষ্যৎ গড়-গড় ক'রে ব'লে দেবেন। আপনি কি জানতে চান, বলুন?

সুকান্ত বললে—আমার কনফার্মেশনের ব্যাপারটা নিয়ে জিজ্ঞেস করতাম আর কি! রাইটার্স বিল্ডিং-এ এত ক্লিক্ চলছে, আমার পেপারটা চাপা দিয়ে রেখেছে মশাই সবাই। অথচ দেখুন, আমি সকলের চেয়ে সিনীয়র।

নিতাই বসাক বললে—সে কি? আপনার প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে আলাপ নেই?

সুকান্ত বললে—না—আপনার আছে?

—আরে কার সঙ্গে আমার আলাপ নেই, তাই বলুন? আগে বলতে হয় আমাকে!

সুকান্ত বললে—অতুল্য ঘোষ? তাঁর সঙ্গে আলাপ আছে?

—অতুল্যদা?

নিতাই বসাক মিটি মিটি হাসতে লাগল। বললে—আগে এ-সব কথা বলতে হয় আমাকে? দেখুন দিকিনি স্যার, এ-সব কথা আমাকে আপনি একদম বলেন নি! আগে বললে আপনি যা চাইতেন সব ক'রে দিতাম! মিনিষ্টাররা ত আমার সব হাত ধরা! এই দেখুন, সুগার-মিল করব, মেশিনারি পাচ্ছিলাম না, কলকাতা থেকে চিঠি নিয়ে একেবারে সোজা দিল্লী চ'লে গেলাম, সেখানে যেতেই কাজ ফতে।

সুকান্ত সেন নিজে গভর্ণমেন্ট অফিসার। কিন্তু

তবু সেও অবাক্ হয়ে গেল। বললে—দিল্লীতে গিয়ে কাকে ধরলেন?

নিতাই বসাক বিজ্ঞের মত রহস্যময় হাসি হাসতে লাগল আবার।

বললে—সব বলব আপনাকে স্যার, সব বলব। আমি যখন আছি তখন আপনার কিছু ভাবনা নেই। দিল্লীর কাকে আপনি ধরতে চান বলুন না? লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, জগজীবন রাম, যাকে আপনি বলবেন, সবাই আমার এই মুঠোর মধ্যে!

সুকান্ত যেন ভরসা পেলে। বললে—ঠিক আছে, আমি যাবো'খন সন্ধ্যেবেলা –

নিতাই বসাক উঠল। বললে—আমি আপনাকে গাড়ি পাঠিয়ে দেব স্যার, আপনি সস্ত্রীক চলে আসবেন তার পর খাওয়া-দাওয়ার পর আবার আপনাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেব!

ব'লে নিতাই বসাক উঠল।

রাত তখন অনেক। লুচি ভাজার গন্ধে বাতাস ভুর-ভুর করছে। দুলাল সা'র বাড়ীর সামনের পুকুরের পাড়ে এঁটো কলাপাতের ডাই জমে গেছে। এ-গ্রামের ও-গ্রামের সব লোক এসে খেয়ে গেছে পাতা পেতে। দুলাল সা' মশাই এতদিন পরে গুরু পেয়েছেন। কোনও কার্পণ্য করেন নি লোক নিমন্ত্রণের ব্যাপারে। সবই হরির ইচ্ছে। ভবসাগরে হরি ছাড়া কারোর কোনও ভরসা নেই। এক-একজন ক'রে লোক এসে দুলাল সা'র গুরুকে দর্শন করেছে, আর যার যা-খুশি প্রণামী দিয়ে গেছে। একটা রূপোর মস্ত বড় থালা পাতা ছিল, তার ওপর টাকা আধুলি পয়সা, নোট, মোহর প'ড়ে পাহাড় হয়ে আছে। সাধু-মহারাজ ব'সে আছেন ডানলোপিলোর তৈরি ভেলভেটের ওয়াড় লাগানো গদিতে। গরদের থান দিয়ে সাধু-মহারাজকে মুড়ে দিয়েছে দুলাল সা। সাধু-মহারাজ নিজে কিন্তু নির্বিকার। দুলাল সা'র চাকর চার পাশে দাঁড়িয়ে বিকেল থেকে চামর হেলিয়েছে কেবল মাথার ওপর। মাথার ওপর ইলেকট্রিক-পাখা বন্‌বন্ ক'রে ঘুরছে, তবু গরম কাটে না। সামনে ধুপ-ধুনো গুগগুল জলছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে গেছে ঘরটা। সাধু-মহারাজের চেহারাটাই ঝাপসা হয়ে গেছে ধোঁয়ার চোটে। ভালো ক'রে নজর করলে দেখা যায়, দুলাল সা সাধু-মহারাজার পায়ের কাছে উপুড় হয়ে প'ড়ে আছে আর দু'হাতে সাধু-মহারাজের পা-জোড়া ছুঁয়ে আছে।

সন্ধ্যা থেকেই এই রকম। যে আসছে সে-ই দুলাল সা'র ভক্তি দেখে আর চোখের জল রাখতে পারছে না। ব্লক-ডেভেলপমেণ্ট অফিসার সুকান্ত সস্ত্রীক এসেছিল। প্রথমে এত বিশ্বাস-টিশ্বাস ছিল না। একটু নাস্তিক গোছের লোক বরাবরই। সাধু-সন্ন্যিসী কিম্বা ভগবান্-টগবানে এত বিশ্বাস কোনকালেই নেই। নেহাৎ নিতাই বসাকের কথায় এসেছিল। কিন্তু এসে সাধু-মহারাজের চেহারা দেখে আর কথা শুনেই অবাক্।

শেষকালে চ'লে যাবার আগে কি জানি কি হ'ল, পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার আস্ত নোট বার ক'রে রূপার থালার উপর রেখে দিলে।

বাইরে আসতেই নিতাই বসাক ধরলে। বললে, কি স্যার, আমি যা বলেছিলাম, সব মিলেছে ত?

সুকান্তর স্ত্রী পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে, বড় অদ্ভুত, সত্যি!

সুকান্ত জিজ্ঞাসা করলে, সাধু-মহারাজ কি কাল ভোরবেলাই চ'লে যাবেন?

—হ্যাঁ স্যার, ভোর চারটায় নৌকায় তুলে দিতে হবে। কিছুতেই আর থাকতে রাজি করান গেল না, একেবারে নির্লোভ পুরুষ ত, সংসারে থাকতেই চান না। দুলালের অনেক পুণ্যবল তাই অমন গুরু পেয়েছে। একটা ফোটো তুলে নিয়েছি, সেইটে বাঁধিয়ে পূজা হবে এবার থেকে—

আবার দু'জনকে গাড়ি ক'রে বাড়ি পৌঁছে দিলে নিতাই বসাক। ওদিকে ব্যাপারী মশাইরাও একে একে দর্শন ক'রে প্রণামী দিয়ে খাওয়া-দাওয়া ক'রে চ'লে গেল। হাজরা মশাই, পোদ্দার মশাই, পাল মশাই সবাই খুশী। দুলাল সা ভক্ত মানুষ। ভক্তি না থাকলে এমন গুরু ক'জন পায়? সবাই বলতে লাগল—কলিযুগে ভক্তিই একমাত্র সার দ্রব্য।

যখন সবাই চ'লে গেছে, যখন বাড়ী খালি হয়-হয়, নতুন-বৌও তখন শুতে যাচ্ছিল। নতুন-বৌয়েরই বেশী খাটুনী গেছে। দুলাল সা সারাদিন উপোস করেছে বটে, কিন্তু ঝঞ্ঝাট যা-কিছু সব গেছে নতুন-বৌয়ের উপর দিয়ে। এতগুলো লোকের খাওয়া-দাওয়া, এতগুলো টাকা খরচ। সা'-বাড়ীর যে-যাই করুক, নতুন-বৌয়ের কাছেই সকলের চাবি-কাটি। দুলাল সা'র সিন্দুকের চাবি থাকবে নতুন-বৌয়ের কাছে। সৌরভী দৌড়তে দৌড়তে এল।

বললে, নতুন মা, ভাঁড়ারের চাবি দাও, মিষ্টি বার করতে হবে।

মিষ্টি! এত রাত্রে আবার মিষ্টি কে খাবে? সমস্ত লোকের খাওয়া-দাওয়া সারা হবার পর ভাঁড়ারের চাবি আঁচলে বেঁধে নতুন-বৌ দোতলায় নিজের ঘরে গিয়ে বিশ্রামের আয়োজন করছিল, এমন অসময়ে আবার কে খেতে এল?

—কে? খাবে কে? সবাই ত খেয়ে চ'লে গেছে! খেতে বাকি আছে কেউ?

সৌরভী বললে, ভস্চার্যিয় বাড়ী থেকে কর্ত্তামশাই এয়েচেন—

—কর্ত্তামশাই? কোন্ কর্ত্তামশাই?

—আবার কোন্ কর্ত্তামশাই? কেষ্টগঞ্জের বুড়ো-কর্ত্তামশাই। আর সঙ্গে আছে নিবারণ সরকার। দু'জনের খাবার বন্দোবস্ত করতে বললেন নিচেয়—

—তুই ঠিক জানিস? ঠিক জানিস কর্ত্তামশাই এসেছেন?

নতুন-বৌয়ের তবু বিশ্বাস হ'ল না। বললে, চল্, আমিও যাচ্ছি, দেখে আসি গে। কর্ত্তামশাই এ বাড়ীতে আসবে, এ বাড়ীতে খাবে, এ ত হয় না, তুই ভুল শুনেছিস।

নতুন-বৌ আর থাকতে পারলে না, তর তর ক'রে সিঁড়ি বেয়ে একেবারে নিচেয় নেমে এল। এসে দেখলে, সৌরভী যা বলেছে, ঠিকই বলেছে। কর্ত্তামশাই নিজেই এসেছেন। তাঁর পেছনে পেছনে নিবারণও রয়েছে।

ক্রমশঃ

অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীঅবনীনাথ রায়

একে একে অনেক বন্ধুরই স্মৃতিতর্পণ করেছি কিন্তু শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের করতে হবে, এ কথা স্বপ্নেও ভাবি নি। বরঞ্চ আশা করেছিলাম, তিনি একদিন আমার সম্বন্ধে হয়ত লিখবেন। তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে আশঙ্কা না করার কারণ, তিনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন—বোধ হয় উনিশ-কুড়ি বছরের তফাৎ। কিন্তু মৃত্যুর বিষয়ে কোন নিয়মই খাটে না।

রবিকে আমি খুব ছোট বয়স থেকে দেখেছি—তখন তিনি স্কুলের ছাত্র। আমি যখন মিরাটে চাকরি করতে যাই তখন আমি বয়সে একেবারে তরুণ—মাত্র সাতাশ বছর বয়স। সেই তরুণ বয়সের নবীন চোখে রবিকে দেখেছিলাম এবং বলতে পারি, ভালবেসেছিলাম। যে সকল গুণ থাকলে মানুষকে ভালবাসা যায়, আমার আদর্শ অনুযায়ী সব গুণই রবির ছিল। সুশ্রী গৌরবর্ণ পাতলা চেহারা, মুখে বুদ্ধির ছাপ, ব্যবহারে সৌজন্যের প্রতিমূর্ত্তি, সাহিত্যে, সঙ্গীতে এবং অভিনয়ে অনুরক্তি এবং দক্ষতা—এ সব গুণগুলিরই সমাবেশ রবির চরিত্রে হয়েছিল। তার পর তিনি স্কুলে ভাল ছাত্র বলে খ্যাত ছিলেন। ক্রমে স্কুল পেরিয়ে কলেজে এলেন এবং সেখানেও তাঁর সেই মেধাবী ছাত্রের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রইল। মিরাট কলেজের অধ্যক্ষ ও ডোনেল (T.F.O' Donnel) সাহেবের এবং মিরাট কলেজের তদানীন্তন সেক্রেটারি সার সীতারামের (বর্ত্তমানে উত্তর প্রদেশ গবর্ণমেণ্টের

অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আবগারী বিভাগের মন্ত্রী) তিনি অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। সুতরাং এম-এ পাশ করার পর মিরাট কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ লাভ করতে তাঁর কোন অসুবিধা হয় নি। তাঁর চাকরির বেলায় বাঙালী অ-বাঙালী নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠে নি। কারণ ছাত্র এবং অধ্যাপক মহলে এবং মিরাটের অন্যান্য হিন্দুস্থানী জনগণের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ অত্যন্ত মধুর ছিল। রবির চেয়ে যাঁরা চাকরিতে সিনিয়র, সেই অধ্যাপকেরা রবিকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন দেখেছি। তিনি কাউকে কোনদিন কোন রূঢ় কথা কিংবা দুর্বাক্য বলেছেন বলে শুনি নি।

অধ্যাপকের জীবনেও রবীন্দ্রনাথ খুব সফলতা লাভ করেছিলেন। তাঁর পড়ানোর খুব সুনাম হয়েছিল এবং তিনি এম-এ এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষক নিযুক্ত হতেন। তিনি ইংরেজিতে এম-এ পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট অনেক বইয়ের নোট লিখেছিলেন। তিনি একজন ভাল স্পোর্টসম্যান ছিলেন—হকি এবং ফুটবল ভাল খেলতেন। ভাল গান গাইতে পারতেন এবং অভিনয়ে স্ত্রীলোকের ভূমিকা গ্রহণ ক'রে সাধুবাদ লাভ ক'রেছিলেন।

সাহিত্যের প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। মিরাট কলেজ ম্যাগাজিনের এডিটর ছিলেন মিঃ জিলানি নামক উর্দ্দুভাষার একজন মুসলমান অধ্যাপক। কিন্তু রবীন্দ্রকেই সেটা চালাতে হ'ত। তাঁর অনুরোধে পড়ে এই ম্যাগাজিনে আমি Mayor of Castorbridge এবং Jude the Obscure প্রভৃতি টমাস হার্ডির বই সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেছি মনে পড়ছে। মিরাটে "মিত্র বিহার" নাম দিয়ে আমাদের স্বর্গগত বন্ধু সুলেখক প্রিয়কুমার গোস্বামীর বাড়িতে একটা সাপ্তাহিক বৈঠকের আয়োজন করেছিলাম। সেই গোষ্ঠীর সভ্যসংখ্যা ছিল মাত্র ছয় জন। সেই সান্ধ্য-বৈঠকে রবীন্দ্রনাথের পাঠ, আলোচনা এবং গানের কথা এখনও মনে আছে। এই গোষ্ঠীর তিন জন গত হয়েছেন—অপর দু'জন কলকাতায়। তাঁদের সঙ্গেও বিশেষ যোগাযোগ নেই। কিন্তু সকলের স্মৃতি অম্লান হয়ে আছে। সাহিত্যিক-জীবনের এইটুকুই লাভ। মানুষ চলে গেলেও স্মৃতিটুকু থাকে।

একবার আমি এলাহাবাদ থেকে মিরাট বদলি হয়ে গেলাম। ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা এবং পড়াশোনার জন্য পরিবারবর্গ এলাহাবাদেই রইলেন। কিন্তু মিরাটে গিয়ে থাকবার জায়গা পাই নে। তরুণ-অধ্যুষিত মেসে আমাদের নিতে চায় না। একলা একখানা বাড়ি ভাড়া করে ঠাকুর-চাকর রেখে থাকাও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। এই সময় রবীন্দ্র একখানা বাড়িতে একলা থাকতেন। তখনও তাঁর বিয়ে হয় নি। বাবা এবং ঠাকুমা গত হয়েছেন। সুতরাং একজন পাহাড়ী চাকরই তখন রবির কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড। আমার দুর্দ্দশার কথা শুনে রবীন্দ্র তখুনি বললেন, আপনি এখুনি আমার এখানে চলে আসুন। সেই ভাবে একত্র আমরা অনেকদিন রইলাম, বোধ হয় মাস ছয়েক হবে। তার মধ্যে আমার ছোট ভাগ্নে চাকরির চেষ্টায় মিরাটে এল। তারও স্থান ঐ বাসায় হ'ল।

মিরাটের ছোট্ট বাঙালী সমাজে পরস্পরের মধ্যে যে রকম মনের মিল এবং সহানুভূতি, এমন প্রবাসে আর কোন শহরে দেখি নি। মিরাটের দুর্গাবাড়ীকে কেন্দ্র করে তার বাঙালী-সমাজে জীবন স্পন্দিত। এই দুর্গাবাড়ীতে লাইব্রেরী, ঐকতানবাদন (concert), ড্রামাটিক শাখা, সাহিত্য পরিষদ, সোস্যাল সার্ভিস (মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করে দরিদ্র গৃহস্থদের সাহায্য) প্রভৃতি অনেকগুলি বিভাগ আছে। পছন্দ অনুসারে একটি বা একাধিক শাখার সদস্য হতে কোন বাধা নেই। রবীন্দ্র, আমার মনে হয়, সবগুলি বিভাগেরই সদস্য ছিলেন, কারণ কেউ তাঁকে ছাড়ত না। শেষে তিনি লাইব্রেরী বিভাগের সভাপতি ছিলেন।

রবির লেখা শেষ চিঠিখানা এখনও আমার কাছে রয়েছে। এইখানাই যে তাঁর শেষ চিঠি হবে তা অবশ্য জানতাম না। চিঠিখানার তারিখ ১০ই নবেম্বর। আমি উত্তর দিয়েছিলাম ২৫শে নবেম্বর। আমার চিঠি তিনি পেয়ে গেছেন এই আমার সান্ত্বনা। কারণ তাঁর দেহান্ত হয়েছে ১লা ডিসেম্বর।

চিঠিখানা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

67/72, West End Road
Meerut Cantt.
10. 11. 61

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার আশীর্ব্বাদ পত্র যথাসময়ে পেয়েছি। কিন্তু পূজার পরে University Youth Festival-এ যেতে হয়েছিল। তাই উত্তর দিতে বিলম্ব হ'ল। এই পত্রযোগে আমি আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি, গ্রহণ করবেন।

অরীন্দ্রজিৎবাবুর "বৈদিকী" যথাসময়ে পেয়েছিলাম। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে উত্তরও দিয়েছি। তবে তাঁর চেয়েও বেশি কৃতজ্ঞ বীণা লাইব্রেরি আপনার কাছে,

কারণ এতদিন পর্য্যন্ত এত দূরে থেকেও আপনি আজও বীণা লাইব্রেরির শুভকামনা করে আসছেন। এ কথা আমি আমাদের নূতন কর্মীদের ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি। "উত্তরার" বার্ষিক চাঁদা পাঠান হয়েছে।

মিরাটের পূজো যথারীতি সারা হ'ল। এখন পূজার ব্যাপারের চাইতে অভিনয়ের দিকেই সকলের ঝোঁক বেশি, কারণ মহিলারাও সমান উৎসাহী। অতএব উপলক্ষ্য থাক বা না থাক, অভিনয় একের পর এক হয়েই যাচ্ছে।

দিল্লীর ডাঃ সুধীন সেনের তিরোধানের কথা শুনলাম, জানি না সত্য কিনা। সব দিক্ দিয়ে একটা মানুষের মত মানুষ ছিলেন। * * *

আপনার আর কোন নূতন বই বেরুবার সম্ভাবনা আছে কি? আমার ত একের পর এক বই বেরিয়ে যাচ্ছে—তবে সেগুলি আপনাকে বলার মত নয়। M. A. Text বইগুলি edit করছি। সামান্য কিছু নামও হয়েছে, অদূর ভবিষ্যতে সামান্য কিছু অর্থাগমও হতে পারে। তবে সৃষ্টি-সাহিত্যে কিছুই করতে পারলাম না, যদিও এত ইচ্ছা ছিল। আপনার কাছে থাকলে হয়ত হ'ত।

প্রণত

রবি

এই স্বয়ং-প্রকাশ চিঠি সম্বন্ধে মন্তব্য করা বৃথা। চিত্তবৃত্তির গভীরতা ও আন্তরিকতা এবং পরিশুদ্ধ সাংস্কৃতিক মনের পরিচয় এর ছত্রে ছত্রে রয়েছে। আমার গভীর দুঃখ এই যে, এমন স্পর্শকাতর একটি শ্রদ্ধালু মনকে আমরা খুব অল্প বয়সে হারালাম—তাঁর বয়ঃক্রম পঞ্চাশের নীচে।

পুরাতন ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সুন্দরবনের প্রাচীন ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে জয়নগর মজিলপুর নিবাসী স্বনামধন্য ঐতিহাসিক ও সুলেখক শ্রীকালিদাস দত্ত মহাশয় বহুকাল যাবৎ আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। "প্রবাসী", "ভারতবর্ষ" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রসমূহে তাঁহার লিখিত সচিত্র বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। কালিবাবুর সঙ্গে পূর্ব্বে আমার সাক্ষাতের সুযোগ হয় নাই, এবার মজিলপুর গ্রামের পাঠাগারের উৎসব উপলক্ষে সেখানে যাইবার সুযোগ হইয়াছিল। আমি মজিলপুর পূর্ব্বে যাই নাই। কাছাকাছি গিয়াছি, এবার সেখানে গিয়া পরম আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিয়া আসিয়াছি। সেখানে আমাকে যেরূপ আদরের সহিত সযত্নে একজন সভার পরিচালক লইয়া গিয়াছিলেন তাহা আমার স্মরণ হইলেও আনন্দ হয়। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ২১শে মাঘ শনিবার জয়নগর মজিলপুর রওয়ানা হইলাম। পথে পূর্ব্বপরিচিত এবং যাঁরা ঐ পথে যাওয়া-আসা করেন, তাঁদের জানা-শোনা সেই বালিগঞ্জ, ঢাকুরিয়া, যাদবপুর, গড়িয়া, বারুইপুর, শাসন, গোচারণ, সোনারপুর প্রভৃতি বহু ষ্টেশন পার হইয়া সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় জয়নগর মজিলপুর পৌঁছিলাম। বেশ বড় স্টেশন। প্রাচীন গঙ্গার খাত এক সময়ে পল্লীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। মজিলপুরের অনতিদূরে মল্লিকপুর গ্রাম, সেখানে হিন্দু মুসলমান মিলিত ভাবে বাস করেন।

আমি সভামণ্ডপের পাশে একটি বাড়ীতে গেলাম। বাড়ীর মালিক থাকেন কলিকাতা। ভাড়া দিয়াছেন। তাহারই একটি ঘরে "শান্তিসঙ্ঘ" লাইব্রেরী অবস্থিত। অনেক প্রাচীন পুঁথিপত্র আছে। আমাকে তাঁরা মজিলপুরের মোয়া ইত্যাদি বিভিন্ন মিষ্টান্ন দ্বারা জলযোগের ব্যবস্থা করিলেন।

সাড়ে সাতটায় সভা আরম্ভ হইল। বৃহৎ সুন্দর সুসজ্জিত প্যাণ্ডেল। এক দিকে রঙ্গমঞ্চ। শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বহু ব্যক্তি, সম্ভ্রান্ত মহিলারা, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের, বালিকা বিদ্যালয়ের ও বালকদের বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকারা সভাতে উপস্থিত ছিলেন। বালক-বালিকা ও কিশোর-কিশোরীদের আবৃত্তি, অভিনয়, নৃত্য-গীত, সঙ্গীত হইয়াছিল। এ সমুদয় উপভোগ করিয়া রাত্রিতে

ব্রোঞ্জ নির্মিত বিষ্ণুমূর্তি

সেখানকার সরকার-বাড়ীতে ভোজন ইত্যাদি করিয়া সেখানেই বিশ্রাম করিলাম।

পরদিন প্রত্যুষে বেলা আটটার সময় পাশাপাশি অনেক পুকুরের ধার দিয়া মিউনিসিপ্যালিটির পথ ও দীঘি সরোবরের পাড় দিয়া চলিলাম শ্রীকালিদাস দত্ত মহাশয়ের বাড়ী; তাঁহার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তিনি পল্লীর সর্ব্বজনপ্রিয় প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি। বিগত ১৩৬৭ সালে 'বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের' তৃতীয় রবীন্দ্রজয়ন্তী সভা জয়নগর মজিলপুরের সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে স্থানীয় রবীন্দ্রজয়ন্তী পরিষদের আহ্বানে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীকালিদাস দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

কালিদাসবাবুকে দেখিবার আগ্রহ আমার অনেক দিন হইতেই ছিল। কাজেই পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বসত বাড়ী পাশে রাখিয়া আমরা কালীবাবুর বিরাট্ প্রাঙ্গণে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বৃহৎ ও সুন্দর প্রাচীন দ্বিতল বাড়ী, কালিদাসবাবুকে আমার সঙ্গী-যুবক বলামাত্র তিনি সাদরে আহ্বান করিলেন। দীর্ঘ প্রশস্ত বারান্দা শোভনরূপে সজ্জিত। কালীবাবু প্রথমেই জলযোগে আপ্যায়িত করিয়া বিবিধ ঐতিহাসিক কাহিনী বলিলেন। বিশেষ করিয়া সুন্দরবনের ঐতিহ্য তথ্য, এবং তাঁহার সংগৃহীত ও সযত্নে রক্ষিত বহু প্রাচীন মুদ্রা, লিপি, পুঁথি, মূর্ত্তি দেখাইলেন এবং তাহাদের পরিচয় দিলেন। তাঁহার বাড়ীর দ্বিতলের বারান্দায় যে স্থানে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষের কিয়দংশ রচনা করেন, সে স্থানটিতে দেখিলাম মর্ম্মর প্রস্তরে সে বিবরণটুকু খোদিত রহিয়াছে। মানুষ চলিয়া যায় কিন্তু তার কীর্ত্তি বাঁচিয়া থাকে।

চব্বিশ পরগণার হরিরামপুর পল্লী হইতে সংগৃহীত বহু মুদ্রা তাঁহার কাছে দেখিলাম। ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে, যেমন, রূপার, তক্ষশীলা প্রভৃতি স্থানের মৌর্য্য যুগের মুদ্রা দেখিলাম। কালীবাবু আমাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি মুদ্রা উপহার দিয়াছিলেন।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মীরজাফরের সহিত লর্ড ক্লাইবের যে সন্ধি হয় তাহাতেই ২৪ পরগণার ইংরাজাধিকার আরম্ভ হয়। সে সময়ে কোম্পানীর নবপ্রাপ্ত জমিদারীর প্রথম ষোড়শ মাস কর আদায়ের ভার কোম্পানী নিজ হস্তেই রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কোম্পানী রাজস্ব বিলি করিবেন স্থির করিয়া ২১শে মে তারিখে ইস্তাহার জারি করেন এবং তিন বৎসরের জন্য পরগণা বিলির ব্যবস্থা করেন। আমরা ঐ সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী একখানি খোদিত লিপি দেখিতে পাই। তাহা এইরূপ :

রঘুনাথ দত্তস্য্ত দত্ত অভিরাম তার পুত্র
এ চূড়ামণি পাকুড়িয়া ধাম। নবাব জাফর খাঁ
দুরন্ত হইল। তার ভয় চূড়ামণি দত্ত পালাইলা।
১১৩২ সালে জ্ঞাতি কুটুম্ব ছাড়ে শূন্য হ'ল গ্রাম।
চূড়ামণি কলিকাতা করিলেন ধাম।
নবাব সিরাজদোলা কলিকাতা লুটিল।
সেই কালে চূড়ামণি গ্রাম উদ্ধারিল।
১১৬২ সালে। জঙ্গল কাটিয়া বাটি করিলা নির্ম্মাণ।
লিখিয়া আপন হাতে রাখিলা নিশান।
বড় ঝড় ১১৪৬ সাল। বরগি সাল ১১৫৮ চৈত্র।

এই খোদিত লিপিটি বারাসতের অন্তর্গত সূর্য্যপুর গ্রামের পাকুড়িয়া অঞ্চলের অন্তর্গত সাতিবোনা, চব্বিশ পরগণার বারাসত থানার নন্দদুলালের মন্দিরে কৃষ্ণ প্রস্তরের গায়ে খোদিত রহিয়াছে।

This inscription was fixed on Dattabati

গুপ্তযুগের সূর্য্যমূর্ত্তি

শিব অর্দ্ধনারীশ্বর

in the village of Suryapur at Pakuria. It is inscribed on a black stone and now kept in the temple of Nandadulal at Satibona, P. S. Barasat, 24 Parganas.

আকাশাদি রসক্ষৌণী শিতেশকে শিবালয়ং
মুদ শ্রীকেশবোকাষিৎ বাসুদেবেন শিল্পীনা।

মন্দির বাজার, কেশবেশ্বর। এই মন্দির শিলা-লিখন অনুযায়ী দেখিতে পাই, ১৬৭০ অব্দে মন্দিরটি নির্ম্মিত হয়। এ মন্দিরটি আমি দেখি নাই, দেখিলে চিত্র সংগ্রহ করিতে পারিতাম এবং মন্দিরের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা দেখিবার সুযোগ হইত।

এই সঙ্গে আমি তিনটি চিত্র প্রকাশ করিলাম, প্রথমটি হইতেছেন অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি। সেনরাজাদের সময়ের বল্লালসেন ছিলেন অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির উপাসক। তাঁহার তাম্রশাসনে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির উল্লেখ আছে। আমার সংগৃহীত অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির বিষয় পূর্ব্বে 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। মৎপ্রণীত 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' দ্বিতীয় সংস্করণে চিত্রসহ প্রকাশিত হইয়াছে, আমার মূর্ত্তি কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত। প্রাপ্তিস্থান 'বিক্রমপুর পুরাপাড়া', সংগৃহীত আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দী কাল। আমি এই মূর্ত্তিটি রাজসাহী বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে দিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত অজিত মুখার্জ্জি মহাশয় তৎপ্রণীত 'Art of India' নামক গ্রন্থে এ মূর্ত্তিটির পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন: Ardhanarisvara, Vikrampur, Bengal, Black-Stone. Date i. e. 12th century A. D. Location : Dacca Museum-Bengal ভুল লেখা হয়েছে। জানি না এখন উহা রাজসাহীতেই আছে কি না।

আমরা এই সঙ্গে যে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিটির চিত্র প্রকাশ করিলাম তাহা দণ্ডায়মানরূপে নির্ম্মিত। শিব ও পার্ব্বতীর গঠনেও বৈচিত্র্য রহিয়াছে। কেহ লক্ষ্য করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। বিষ্ণুমূর্ত্তিটি ব্রঞ্জের নির্ম্মিত, সুন্দরবনে প্রাপ্ত, কালিদাস দত্ত সংগৃহীত।

সূর্য্যমূর্ত্তিটিও সুন্দরবনে প্রাপ্ত—আশুতোষ মিউজিয়মে কালিদাস দত্ত কর্ত্তৃক প্রদত্ত। মূর্ত্তির পরিচয় সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সেনরাজগণের সময়েও বাংলার রাজ-পরিবারের মধ্যে সূর্য্যোপাসনা প্রচলিত ছিল। সেনরাজ-গণের মধ্যে কেহ কেহ আপনাকে পরম সৌর বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। গৌড়েশ্বরের অমাত্য বলভদ্র সেনের পূর্ব্বপুরুষ একজন পরম সৌর ছিলেন। 'মৎস্য-পুরাণ', 'অগ্নিপুরাণ' প্রভৃতি বহু পুরাণে সূর্য্যমূর্ত্তির ধ্যান আছে। ধ্যান এইরূপ :

"মিত্রদেব—সপ্তাশ্বে ও সারথিযুক্ত একচক্র মহারথে অধিষ্ঠিত। দুই হস্তে পদ্ম এবং বক্ষে কঞ্চুক ও চর্ম্ম ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহার কেশগুলি অকুঞ্চিত ও প্রভামণ্ডল-মণ্ডিত। কেশ সুবেশযুক্ত ও স্বর্ণ-রত্ন-বিভূষিত। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে নিক্ষুভা ও বাম পার্শ্বে রাজ্ঞী। উভয়ে সর্ব্বাভরণসংযুক্তা ও কেশহার সমুজ্জ্বলা। উক্ত রথ মকরধ্বজ বলিয়া বিখ্যাত। সকলেরই মণ্ডলযুক্ত মুকুট দিতে হইবে। মিত্রদেবের সম্মুখভাগে পুরুষরূপী দুইটি মূর্ত্তি করিতে হইবে, তন্মধ্যে দণ্ড বা যমের এক বক্ত্র এবং স্কন্দ তেজোকরাযুক্ত হইবেন। দিব্যদেহধারী ও সর্ব্বলোকের আলোকদানকারী বাটকে হয়ারূঢ় পদ্মের উপর স্থাপন করিবে। সূর্য্যের মণ্ডল জাতি ও হিঙ্গুল-বর্ণবৎ হইবে। চতুর্ভুজই হউক বা দ্বিভুজই হউক, মিত্রদেবকে রেখামান দ্বারা সুশোভিত, দ্বিহস্তোপরি পদ্ম ও সবলাশ্বরথে স্থাপন করিবে। দণ্ড ও পিঙ্গল নামক খড়্গধারী দুইটি দ্বারপালকও রাখিতে হইবে।"

আমরা এই প্রবন্ধে যে চিত্র কয়খানা প্রকাশ করিলাম, তাহা হইতে মূর্ত্তি কয়টির পরিচয় সুস্পষ্ট ভাবে বুঝা যাইবে

স্তব্ধ প্রহর

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
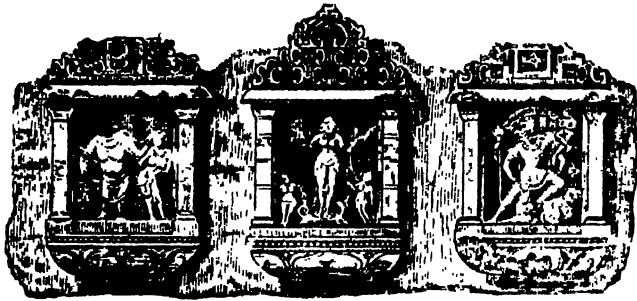
(১৩৬৮ সালে প্রকাশিত এই ধারাবাহিক উপন্যাসটির প্রথম দশটি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত গল্পাংশ।)

হাওড়ার পুলের কাছে একটি জেটীর ধারে ব'সে পরপর সাতদিন শোভনা অপেক্ষা করেছে, দুপুর থেকে সন্ধ্যা পার হয়ে যত রাত অবধি সম্ভব। তার স্বামী অনুপম ফিরে আসে নি, একটা চিঠিও লেখে নি।

অনুপম আর আসবে না, জীবনে হয়ত আর তার সঙ্গে দেখাও হবে না, শোভনা মনে মনে নিশ্চিতভাবেই এখন জেনে নিয়েছে।

নতুন পাকা বাড়ী আছে একটা-আধটা, সেই সঙ্গে কাঁচা নর্দমা, নোংরা ডোবা, টিনের চালের মাটি কোঠা, প্রায় ধ্বসে-পড়া পুরণো হাড়গোড় বেরুনো ভিটে। এমনি একটি পুরণো ভিটের এককোণের একটি ঘরই পৃথিবীতে এখন তার একমাত্র আশ্রয়। যে ঘরে অনুপম যক্ষা রোগীদের হাসপাতাল থেকে এনে তাকে তুলেছিল, প্রথম মাসের পর দ্বিতীয় মাসে যে ঘরের ভাড়া এখনও দেওয়া হয় নি।

বাড়ীওয়ালা বৃদ্ধ আশুবাবু বাড়ীভাড়ার কথা তোলেন নি। ইতি-মধ্যে অনেকবার নিজের বাগানের ফলমূল, এটা-সেটা তাকে দিয়ে গেছেন, আপত্তি করলে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়েছেন।

এক রাত্রে নিজের খাবার শোভনাকে খাইয়ে একটা পোস্টকার্ড তার হাতে দিয়ে বললেন, তোমার নামে চিঠি, নিচে কোন নাম-সই নেই, কিন্তু চিঠি যে অনুপমবাবুর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শোভনা ভাবছে, কেন এ চিঠি না প'ড়ে সে ফেলে দিতে পারবে না? এইটেই তার নতুন জীবন-সঙ্কল্পের প্রথম পরীক্ষা মনে করতে দোষ কি? কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পড়ল সে চিঠিটা। অনুপম লিখেছে, তার জন্যে আর বৃথা অপেক্ষা না করতে, তাকে না খুঁজতে।

পরদিন আশুবাবু এসে বললেন, মধু ত আজও আসছে না, তুমি আজকের রান্নাটা যদি আমার ক'রে দাও।

সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠ।

সেইদিনই ওদিককার ঘরের বাসিন্দা নিখিল বক্সী এসে নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, প্রতিবেশী হবার দাবিতে আপনার উপর একটু অত্যাচার করতে এলাম।

ওঁর বুড়ী মা আর-সব করে দেন, শুধু চোখছুটো একেবারে গিয়ে সেলাইয়ের কাজটা ওঁকে দিয়ে এখন আর হয় না। নিখিল বক্সীর অকুণ্ঠিত অনুরোধ এড়াতে না পেরে তার জামার ছেঁড়া পকেট সেলাই ক'রে দিতে রাজী হ'ল শোভনা।

সামান্য দু'চারটে কথা এর পর আশুবাবুর সঙ্গে শোভনার যা হয়েছে, তাতে আশুবাবুর একটা ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শোভনাকে রান্নার ভার দেওয়ার ব্যবস্থাটা দু-একদিনের সাময়িক ব্যাপার নয়। তাকে ঠিক রাঁধুনী হিসেবে নেবার অনুগ্রহ যে এটা নয় তাও শোভনাকে ইঙ্গিতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন।

আশুবাবুর কথায়-বার্ত্তায় ও ধরণ-ধারণে বোঝা গেছে যে, থাওয়া-থাকার ভাবনাটা এখনকার মত সে ভুলে থাকতে পারে।

বৃষ্টি মাথায় ক'রে নিখিল বক্সী এল। শোভনার সঙ্গে তার গল্প জমাবার চেষ্টা। শোভনা বলল, জামার সেলাইটা ঠিক হয়েছে ত?

নানা কথার মধ্যে নিখিল স্বীকারই করল, জামাটা একটা ছুতো।

আপনার আসল কথাটা কি?

নিখিল স্বীকার করল, সেটা স্বাভাবিক কিছু নয়। তার একটু কৌতূহল। শোভনার স্বামীর দীর্ঘ অনুপস্থিতি সম্বন্ধে কৌতূহল।

নিখিলের মা তাকে সাবধান ক'রে দিলেন, মেয়েটির কিছু একটা গোলমেলে ব্যাপার আছে ব'লে মনে হয়, ওর সঙ্গে মেলামেশা না করাই ভাল।

আশুবাবু মাছ-মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন, এখন আবার মাছ-মাংস আসছে বাজার থেকে। একদিন বাজার আসার পরেও দুটো টাকা প্রায় জোর ক'রে গছিয়ে দিয়ে গেলেন, যদি আর-কিছু দরকার-টরকার হয়, আনিয়ে নিও ব'লে। অনুগ্রহের চেহারাটা বড় স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সেদিন আশুবাবু তাঁর বহুদিনের অভ্যাসের ব্যতিক্রম ক'রে রাত্রে মিষ্টি আর ফলমূলের বদলে ভাত খাবেন ব'লে গেছেন। যার জন্যে এ ব্যতিক্রম, তাকে কিছু দাম দিতেই ত হয়। কি সে দাম?

একটু একটু ক'রে সংসারের কর্তৃত্ব তার হাতে জমছে।

আশুবাবু একদিন তাকে একজোড়া শাড়ী দিয়ে বললেন, এসব জিনিষ আমার কাছ থেকে বিনা প্রতিবাদেই তোমাকে নিতে হবে। এটাকে দয়ার দান মনে ক'রো না, তা হ'লেই লজ্জার বা গ্লানির কিছু থাকবে না।

আপত্তি জানিয়ে এই সহৃদয় বৃদ্ধকে সামান্য একটু আঘাত দিতেও তার বেধেছে।

একদিন বেশ রাত হ'ল আশুবাবুর বাড়ী ফিরতে। দু'জন ভদ্রলোক ধরাধরি ক'রে তাঁকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেলেন। আশুবাবু বললেন, ও কিছু না মা! অনেকটা হেঁটে একটু ক্লান্ত হয়েছিলাম কিনা? তাই মাথাটা একটু ঘুরে গিয়েছিল।

এত রাত অবধি কেন ঘুরছিলেন, এ প্রশ্নের উত্তরে আশুবাবু বললেন, একটা জরুরী ব্যাপার ছিল কি না তাই একটু -

জরুরী ব্যাপারটা কি তা একটু পরে জানা গেল। অনুপমের ঠিকানা পাওয়া গেছে। আশুবাবুর বন্ধু উমেশ রক্ষিত তাঁদের পাড়ার একটি ষ্টেশনারি দোকানে কি কিনতে গিয়ে তাঁকে দেখেন। সে দোকান চেনে উমেশবাবুর জানা এমন একটি লোককে আজ বিকেলে এখান থেকে তাঁকে নিয়ে যেতে আসতে বলেছিলেন। দোকানে গিয়ে অনুপমকে পাওয়া যায় নি। সেখান থেকে তার বাসার ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে আশুবাবু সেই বাসার খোঁজ করতেও গিয়েছিলেন, শুধু ঠিকানার

গোলমালের জন্যে ঠিক জায়গায় পৌঁছতে পারেন নি। বললেন, আর ভাবনা ক'রো না মা। একবার যখন সেই পেয়েছি, ও ঠিকানা আমি খুঁজে বার করবই।

শোভনাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে বললেন, এই খোঁজ পাওয়ার খবর শুনে তোমার একটু আগ্রহ দেখলে ত মনটা খুশী হয়। এমন ত আর নয় যে, অনুপমের খোঁজ করতেই আর তুমি চাও না?

হঠাৎ মুখটা ফিরিয়ে শোভনা সোজা আশুবাবুর দিকে তাকিয়ে দৃঢ় স্বরে বললে, যদি বলি তাই?

যখন বোঝাই যাচ্ছে, দেখা হবার ভয়ে অনুপম পালিয়ে বেড়াচ্ছে তখন তাকে খুঁজে বার করবার জন্যে ব্যাকুল সে হবে কেন?

তবে ঈষৎ একটা বেদনাময় কৌতূহল আছে তার মনে। কি কারণে অনুপম এমন ক'রে তাকে ফেলে যেতে পারল তা জানবার একটা আগ্রহ মনকে এখনো যে পীড়িত করে তা সে অস্বীকার করতে পারে না।

এই কৌতূহলকেও প্রশ্রয় না দিতে সে দৃঢ়সঙ্কল্প।

নিখিল বন্দ্যা এর মধ্যে একদিন কতগুলি কাগজ রেখে গিয়েছিল, রাত্রে শুতে গিয়ে সেই কাগজগুলি পিড়ে দেখল।

বারো

গলি-ঘুঁজি নয়, বেশ ফাঁকা খোলামেলা জায়গাই বলা যায়। কিন্তু কিছুদিন আগেও জায়গাটা যে শহরের বহু দূরে, সব কাজের বার, নাবাল জংলা জলা মাত্র ছিল তার চিহ্ন এখনও প্রচুর।

কোথাও যাদের ঠাঁই মেলে নি এই কচুরিপানায়-মজা অগভীর জলার ওপরই এসে তারা কোনরকমে ডেরা বেঁধেছিল। খোলার চাল, মুলী-বাঁশের দেওয়াল দেওয়া খুপরি খুপরি সব বাসা, বেশীর ভাগই জলার ওপর মাচা বেঁধে বসানো। খরার দিনেও বাঁশের সাঁকো দিয়ে তাতে পৌঁছতে হয়েছে। বর্ষায় ত বাসার মধ্যেই থই থই করেছে জল।

সর্বহারাদের নিরুপায় বসতি যখন এখানে সুরু হয়েছিল তার পর অনেক বছর কেটে গেছে।

বসতি বেড়েছে। কচুরিপানার বংশই বছরের পর বছর নতুন ক'রে বেড়ে জলার ওপর শুকনো খোলস বিছিয়ে বিছিয়ে মাটি উঁচু ক'রে তুলেছে। নিজেদের চেষ্টায় পুকুর ডোবা কেটেও বাড়তি জলের সদ্গতি ক'রে ডাঙা শুকনো ক'রে তোলবার ব্যবস্থা হয়েছে কোথাও কোথাও।

কারুর কারুর ইতিমধ্যে ভাগ্যও ফিরেছে। মুলী-বাঁশের বদলে ইটের দেওয়াল, খোলার বদলে টিনের চালও দেখা যায় এখানে-সেখানে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও চারিদিকে কচুরিপানায় মজা জলা এখনও আগের যুগের দখল সম্পূর্ণ ছাড়ে নি।

বাঁধানো সরল সোজা রাস্তা এখনও নেই। এলো-মেলো ভাবে যেমন বসতি উঠেছে তেমনি ডোবা পুকুর জলা জংগলের ভেতর দিয়ে আঁকা-বাঁকা পায়ে-চলার পথ। খানা-খন্দর ওপর কোথাও এক-আধটা নারকেল খেজুরের গুঁড়ি ফেলা। কোথাও তাও নেই।

এই পথেই সেদিন সকালবেলা শোভনাকে দেখা গেল। সঙ্গে আশুবাবু ত আছেনই তাঁর বন্ধু উমেশবাবুও এসেছেন।

অনেক খুঁজে-পেতে তাঁরা এই এলাকাটা বার করেছেন কিন্তু আসল ঠিকানা এখনও পান নি।

এলাকাটা বড় ছোট নয়। বিস্তীর্ণ একটা বাদা-গোছের জায়গা। বোধ হয় সেই জব চার্ণকের আমল থেকেই অব্যবহার্য ব'লে অবজ্ঞাত হয়ে প'ড়ে ছিল। রাজ-নীতির নিষ্ঠুর তামাসায় সেই জায়গাই ছিন্নমূল মানুষের কাছে পরম মূল্যবান্ হয়ে উঠবে কে জানত!

অন্য অনেক এ ধরণের বসতিতে যেমন, এখানে তেমন বাসিন্দাদের সংহতি গ'ড়ে উঠতে পারে নি বিশাল বিস্তৃতির জন্যেই। ছাড়াছাড়া ভাবে দু'চারটি ঘরের বসতি এক এক জায়গায় জড়ো করা। বসতির এক জটলার সঙ্গে আরেকের তেমন যোগাযোগ নেই।

জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে সঠিক খবর কোথাও তাই মেলে নি।

নতুন ডেরা এদিকে-ওদিকে এখনও অনেকে বাঁধছে। এ ত আর তাদের গ্রাম নয় যে, সকলের নাম মুখস্থ থাকবে?

তা ছাড়া নামটাও লুকোন কি না কে জানে।

উলঙ্গ অর্ধোলঙ্গ কৌতূহলী একদল ছোট ছেলে-মেয়েদের কাছেই সাহায্য পাওয়া গেছে সবচেয়ে বেশী। এ অঞ্চলে নতুন চেহারা দেখে তারাই সঙ্গ নিয়েছে গোড়া থেকে।

এদের মধ্যে একটি ছেলে নিজের বৈশিষ্ট্যেই সর্দার স্থানীয়। চালাক চতুর সপ্রতিভ ছেলে। পরণে একটা ছেঁড়া তালিমারা খাটো খাকি রঙের হাফ্‌প্যাণ্ট ছাড়া কিছু না থাকলেও তার চাল-চলনে একটা অকুণ্ঠ ভারিক্কি ভাব।

নামটা শুনে ও এ অঞ্চলে নতুন এসেছে জেনে অন্য সকলের গোল থামিয়ে সে ভুরু কুঁচকে কি একটু ভেবেছে তার পর চেহারার বর্ণনা নিজে থেকেই দিয়ে ঠিক হচ্ছে কি না জানতে চেয়েছে।

বর্ণনা নেহাৎ ভাসাভাসা। চেহারার চেয়ে

পোশাকটাই তার মধ্যে প্রধান। তবু কিছুটা মিল দেখে শোভনা তার বর্ণনা সমর্থন করেছে।

আপাততঃ সেই ক্ষুদে সর্দারের নির্দেশেই তারা চলেছে দূরের ক'টা নারকেল গাছ-ঘেরা বসতির দিকে।

অনুপমকে তার নতুন আস্তানায় খোঁজবার জন্যেই যে এ অভিযান তা বোধহয় বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই।

হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত শোভনা সেই সঙ্কল্পই আশুবাবুকে জানিয়েছে। নিজেই উৎসাহ ক'রে আশুবাবুকে নিয়ে প্রথম উমেশবাবুর বাড়ি গেছে এবং সেখান থেকে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এই অঞ্চলে এসেছে, অনুপম যে দোকানে কাজ করে সেখান থেকে যতটুকু সম্ভব খবর সংগ্রহ ক'রে।

দোকানে গিয়ে অনুপমের দেখা পেলে অবশ্য এতদূর আসবার প্রয়োজন হ'ত না।

কিন্তু দোকানে শোনা গেছে যে, অনুপম ক'দিন ধরেই নাকি কাজে আসছে না।

অনুপমকে দোকানে না পেয়ে শোভনা হতাশ কি বিস্মিত হয় নি। সে যেন মনে মনে জানত, অনুপমের দেখা অত সহজে পাওয়া যাবে না।

দোকানের মালিক ও অন্য একজন কর্মচারীর কাছে অনুপমের এখনকার বাসার যে ভাসা ভাসা হদিস পাওয়া গেছে তাও খুব ভরসা করবার মত ব'লে মনে হয় নি।

অনুপম কিছুদিন মাত্র এ দোকানের চাকরিতে ঢুকেছে জানা গেছে। স্থায়ী চাকরিও নয়, ক'দিনের জন্যে শিক্ষানবিশী বলা যায়। তার বিশেষ ঠিকানা পরিচয় তাই কেউ জানে না। কাজের শেষে একজন কর্মচারী ওই অঞ্চলের দিকে যেতে দেখেছে, এইটুকু মাত্র সন্ধানের সূত্র।

এই সূত্রটুকুর ভরসা না ক'রে সন্ধানে ক্ষান্ত হওয়াও চলত।

কিন্তু শোভনা তা হয় নি। যত ক্ষীণ সূত্রই হোক, শেষ পর্যন্ত তা অনুসরণ না ক'রে হাল ছাড়বে না এই এখন তার কঠিন প্রতিজ্ঞা।

অনুপমকে খোঁজা সম্বন্ধে অত দ্বিধা সংশয় উদ্বেগ এই সে রাত্রেও যার মনে ছিল তার হঠাৎ এই সঙ্কল্প একটু বিস্ময়কর সন্দেহ নেই।

মনের এই পরিবর্তনের ধাপগুলো তাই জানবার কৌতূহল হতে পারে।

শোভনা নিজেও সুস্পষ্টভাবে অবশ্য এ বিষয়ে কিছু বলতে পারবে না।

নিখিল বক্সী বেরিয়ে যাবার পর সশব্দে দরজা বন্ধ ক'রে সে কিছুক্ষণ অক্ষম ক্ষোভে নিজের মনেই ফুলেছিল। এ রাগটা ঠিক নিখিল বক্সীর ওপরও নয়, নিয়তি স সার অনুপম সব যেন এক সঙ্গে জড়িয়ে গেছে একটা দুরন্ত ক্ষোভ অভিমানের লক্ষ্য হিসাবে।

আশুবাবু তাকে নিজের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে নিতে ব'লে গিয়েছিলেন।

শোভনা কিন্তু অনেক বেলা পর্যন্ত দরজা খুলে ঘরের বাইরেও যায় নি।

তার মনের গতি বুঝতে পারলে আশুবাবু হয়ত নিজেই তাকে ডাকতে পাঠাতেন। কিন্তু তিনি নিজেই তখন বেশ একটু বিচলিত। শোভনা যথাসময়ে নিজের, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে নেবে, এই নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে একটু সকাল সকালই বন্ধু উমেশবাবুর বাড়ির দিকে তিনি রওনা হয়ে গেছেন।

অনেক বেলা পর্যন্ত শোভনা তাই নিজের মনের ক্ষুব্ধ উত্তেজনা নিয়ে একলা থাকতে পেরেছে।

সকালের এ ক্ষুব্ধ উত্তেজনা গত রাত্রের দ্বিধা সংশয়ের দোলা থেকে আলাদা। তার মন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রবাহে এখন ভেসে গেছে অস্পষ্ট একটা বিদ্রোহের চেতনায়।

যা কিছু আজ তার জীবনকে চারিদিক্ দিয়ে জড়িয়ে নিষ্ফল ক'রে রেখেছে, এ সব ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়া যায় না?

নাম ধাম পরিচয় এ সবই ত তার বেলায় নিরর্থক ক'টা বন্ধনের জাল মাত্র। এ সবই অস্বীকার করলে ক্ষতি কি?

সত্যিই যদি দুঃসাহসিক একটা ঝাঁপ দেয় ভবিষ্যতে, পিছনের সব কিছু চিহ্ন মুছে ফেলতে না পারুক সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে?

ধর্ম ন্যায় নীতির সংস্কারকে আঁকড়ে ধ'রে থাকার কোন মোহ ত তার থাকা উচিত নয়। মৃত্যুর অতল অন্ধকারের কিনারা থেকে সে ফিরে এসেছে শুধু কি ক্ষীণ বিবর্ণ একটা জীবনধারা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে?

ভাগ্য তাকে বঞ্চনা করেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে অনুপম তার সঙ্গে, সেই বঞ্চনায় ও আঘাতে প্রতিশোধের আগুনই তার মধ্যে জ্ব'লে উঠা উচিত।

না, প্রতিশোধও নয়, তার তীব্র বাসনাও একটা বন্ধন, বিপক্ষকেই বিপরীত দিক্ দিয়ে একমাত্র আরাধ্য ক'রে তোলা। প্রতিশোধে তার প্রয়োজন নেই। তার বদলে থাক অসীম ঔদাসীন্য। অনুপম একটা সাময়িক তিক্ত স্মৃতিমাত্র! আর ভাগ্য? ভাগ্য ত আসলে পুরুষ। তাকে উপেক্ষা করবার সাহস থাকলেই সে পদ-প্রান্তে পড়বার জন্যে পিছু পিছু ফেরে।

শোভনার অস্থির উত্তপ্ত কল্পনা অদ্ভুত সব সম্ভাবনা তার সামনে যেন প্রত্যক্ষ ক'রে তোলে।

ভাগ্য পুরুষ। আর পুরুষই আজ সবকিছুর রাশ নিজের হাতে ধ'রে ব'সে আছে। কিন্তু এই পুরুষ লোভী দুর্বল উদ্‌ভ্রান্ত। ইচ্ছে করলে, আর মনের অর্থহীন অনুশাসন অগ্রাহ্য করতে পারলে, এই পুরুষের জগতে শুধু অঙ্গুলি হেলনে নিজের ভাগ্য রচনা করা যায়।

তার জন্যে সামান্য যেটুকু উপকরণ দরকার তা কি তার একেবারেই নেই?

নিখিল বক্সীই ত এক দিক্‌ দিয়ে তা স্বীকার ক'রে গেছে। শুধু যোগ্যতা নয়, নারীত্বের অন্ধ আকর্ষণ যেখানে প্রধান সম্পদ্‌, সে চাকরি শোভনাকে দেবার কথা নইলে সে ভাববে কেন?

সে সুন্দরী নয় শোভনা জানে, কিন্তু দেহসৌষ্ঠবের কিছু আকর্ষণ যে তার আছে একথাও তার অবিদিত নয়।

পুরুষের পৃথিবীকে যা টলায় সে শক্তি তার মধ্যে যতটুকুই থাক তা ব্যবহার করতে হ'লে ওই সামান্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহের চাকরির জন্যে করবে কেন? দাম যদি নিতে হয় তা হ'লে কড়ি নয় মোহরই তার চাই।

নিজেকে আর এক ভূমিকায় সে দেখবার চেষ্টা করে। না, উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল স্বৈরিণীর ভূমিকায় ঠিক নয়। এমন এক ভূমিকায়, যাতে মনের সংস্কার ও বিবেকের শাসনে জীবনকে শীর্ণ উপবাসী রাখার কোন গরজ নেই।

তার কল্পনার উত্তপ্ত প্রবাহ কতদূর তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেত বলা যায় না, কিন্তু মাঝ পথেই বাধা পড়েছে।

দরজায় কার যেন মৃদু করাঘাত।

আশুবাবুর কি নিখিল বক্সীর হতে পারে না। মধু হলেও দরজায় অত কোমল ভাবে ধাক্কা দেবে না। বাইরে থেকেই ডাকবে।

শোভনা একটু বিস্মিত হয়ে দরজাটা খুলেছে, খুলে অবাক্‌ হয়েছে আরও বেশী।

নিখিল বক্সীর বৃদ্ধা মা দরজায় দাঁড়িয়ে।

এ বাড়ীতে যতদিন আছে তার মধ্যে এক-আধবার সামান্য দু'একটা মৌখিক কথাবার্তার বিনিময় হ'লেও পরস্পরের ঘরে আলাপ করতে যাওয়ার মত কোন সম্বন্ধ তাদের মধ্যে গ'ড়ে ওঠে নি। বৃদ্ধা কোনদিন ইতিপূর্বে তার ঘরে আসেন নি, সেও যাবার প্রয়োজন বোধ করে নি। এক হিসাবে এই ঘনিষ্ঠতার অভাবই শোভনার কাম্য ছিল। বৃদ্ধা যে গায়ে প'ড়ে আলাপ করতে উৎসুক হন নি তার জন্যে সে কৃতজ্ঞ।

কিন্তু আজ হঠাৎ সব কিছু উল্টে গেল কেন!

ভদ্রতার খাতিরে 'আসুন' ব'লে বৃদ্ধাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে শোভনা সবিস্ময়ে সেই কথাই ভেবেছে।

বৃদ্ধা তার আহ্বানে ঘরে ঢুকেছেন এবং তার পর বেশীক্ষণ অনিশ্চয়তার দোলায় তাকে দুলিয়ে রাখেন নি।

নিখিল বক্সীর মা যে খুব প্রসন্ন মুখে তার দরজায় এসে দাঁড়ান নি শোভনা আগেই তা লক্ষ্য করেছে। ঘরে ঢোকবার পর তাঁর মুখ আরও কঠিন হয়ে উঠেছে।

শোভনার দিকে সুস্পষ্ট ঘৃণার দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি কোন রকম ভণিতা না ক'রেই রূঢ়কণ্ঠে বলেছেন, তোমার অবস্থা আমি বুঝি বাছা। বিয়ে-করা স্বামী হোক না হোক, যার সঙ্গে ঘর করছিলে সে ছেড়ে পালিয়েছে, এখন যাকে হোক পাকড়াও না করলে তোমার নয়। কিন্তু আমার ওই হতভাগা ছেলেটির দিকে নজর দিয়ে ত কিছু লাভ হবে না বাছা। ও ফুটো পয়সা দিয়ে তুমি করবে কি? তার চেয়ে শাঁসালো কাউকে ধরবার চেষ্টা কর।

কথাগুলো ব'লেই বৃদ্ধা চ'লে গেছেন। শোভনা তখন স্তম্ভিত অসাড় একটা পাথরের মূর্তি মাত্র।

কতক্ষণ, সে জানে না, যেন এক যুগ বাদে তার মনে হয়েছে দরজায় নিঃশব্দে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

মনের সাড় একটু ফেরবার পর লোকটাকে চেনাও গেছে। সে নিখিল বক্সী।

শোভনা চীৎকার করে নি, সশব্দে দরজা বন্ধ ক'রে দেয় নি, শুধু বিস্ময়-করুণ ভাবে একটু হেসেছে এবার নিখিল বক্সীর দিকে চেয়ে।

নিখিল কিন্তু হাসে নি। তার তিক্ত রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠ শুধু শোনা গেছে—সন্তানের শুভকামনায় মা'র অন্ধ অস্থিরতার মহিমান্বিত রূপ ত দেখলেন। কোন কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা ক'রে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করাই উচিত। তবু দুটো কথা না ব'লে পারছি না। ফুটো পয়সার বেশী যার দাম নেই ব'লে জানেন সেই ছেলেরই সর্বনাশের ভাবনায় মা ভীত। তাঁর ধারণা, তাঁর ছেলের আপনার সম্বন্ধে দুর্বলতা জেগেছে। মা'র কখনও ভুল হয় না। মনের অগোচর কথাও তিনি জানতে পারেন। তাই আপনাকে জানিয়ে যাচ্ছি, ভবিষ্যতে আপনার ছায়া মাড়িয়েও আপনাকে বিড়ম্বিত করব না। তেমন বুঝলে এ বাসাও ছেড়ে যাব।

নিখিল কখন চ'লে গেছে তাও যেন ভাল ক'রে শোভনা টের পায় নি।

মধু এসে তাকে যখন ডেকেছে তখনও সে দেওয়ালে ভর দিয়ে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে।

সেই দিন রাত্রেই আশুবাবুর কাছে অনুপমকে খুঁজতে যাওয়ার সম্বন্ধে সে জানিয়েছে।

আশুবাবু বিস্মিত হয়েছেন কিন্তু আপত্তি জানান নি।

শুধু বলেছেন, ভাল ক'রে নিজের মনকে বুঝেছ ত মা! আমার কি, আর পাঁচজনের খাতিরে কিছু তুমি করো, এ আর আমি চাই না।

শোভনা এ কথার উত্তরে কিছু বলে নি, শুধু মৌনতা দিয়েই তার সঙ্কল্পের অটলতা বুঝিয়ে দিয়েছে।

আশুবাবু খানিক বাদে নিজে থেকেই আবার বলেছেন, নিখিলবাবুর দেওয়া কাগজগুলো আমি নাড়াচাড়া ক'রে দেখলাম। আমার মনে হচ্ছে সাধারণ টিউশনির চেয়ে ও কাজ নেওয়াই তোমার পক্ষে ভাল।

এ সব কথা আমি এখন ভাবছি না। শোভনা শান্ত স্বরে বলেছে, চাকরি নেব কি না তাও ভাববার সময় এখনও আসে নি।

আশুবাবু কি বলতে গিয়ে থেমে গেছেন। শোভনার বর্তমান মনের অবস্থাটা ঠিক অনুমান না করতে পারলেও অন্য প্রসঙ্গে আগ্রহ যে তার নেই, এটুকু বুঝতে তাঁর দেরি হয় নি।

উমেশ রক্ষিতকে ধ'রে পরের দিন সকালেই অনুপমের খোঁজে বার হওয়ার এইটুকুই পূর্ব ইতিহাস।

অর্ধোলঙ্গ ছোকরা পথপ্রদর্শকের নামটা ইতিমধ্যে জানা গেছে।

জানিয়েছে সে নিজেই।

জলা জঙ্গলের পথে বেশ কিছুদূর হাঁটবার পর উমেশ রক্ষিতই বুঝি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আর কতদূর যাব বল ত? তুমি ঠিক জান ত খোকা?

খোকা খোকা করছেন কেন? আমি কি খোকা? খোকা সম্বোধনে অপমানিত বোধ ক'রে ছেলেটি জানিয়েছে—আমার নাম নন্তু।

যেভাবে নন্তু দাঁড়িয়ে পড়েছে তাতে মনে হয়েছে সম্বোধনের ত্রুটিতে সব বুঝি পণ্ড হয়।

হাসি চেপে আশুবাবু বলেছেন, তাই ত! নামটাই আমাদের আগে জেনে নেওয়া উচিত ছিল। সত্যি খুব অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু নন্তু, যে বাড়িতে আমাদের নিয়ে যাচ্ছ সেখানে অনুপমবাবুকে তুমি দেখেছ ত?

বাড়িতে দেখব আবার কি? নন্তু কিঞ্চিৎ অধৈর্যের সঙ্গে জানিয়েছে—আমি কি ওখানে থাকি যে বাড়িতে দেখব? এই রাস্তায় ওখানে যেতে দেখেছি। আর অনুপম-টনুপম আমি জানি না। নতুন লোক আর ধুতি-পাঞ্জাবী পরা ফিলিম ফিলিম চেহারা বললেন, তাই ত এদিক পানে যাচ্ছি। এখানে ধুতি-ফুতি কেউ পরে নাকি? সব পাজামা প্যান্ট। আর ফিলিম ফিলিম চেহারা বা দেখবেন ক'টা?

নন্তুর দীর্ঘ বক্তৃতার মাঝে তিনজনে হতাশ ভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছেন।

কিন্তু এতদূর এসে মাঝ পথে ফিরে যাওয়ার কোন মানে হয় না।

নন্তুকে তোষামোদে সন্তুষ্ট ক'রে তাই পথ দেখাতে রাজী করাতে হয়েছে আবার।

তিনটি নারকেল গাছের নিশানা দেওয়া যে বসতিতে নন্তু নিয়ে গেছে, চারিদিকের কচুরিপানায় ভরা জলার মধ্যে সেটি আধ-জাগা ছোট একটু চরের মত জায়গা। মাচার ওপরে পাখির খাঁচার মত ছোট ছোট ক'টি মুলী-বাঁশের বেড়ার ঘর বেঁধে তিনটি দরিদ্র পরিবার সেখানে কোনরকমে মাথা গুঁজে থাকে।

আশুবাবুদের আশঙ্কাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে এবার। খোঁজ-খবর নিয়ে যা জানা গেছে—তাতে সকালের সমস্ত ঘোরাঘুরিই পণ্ডশ্রম ব'লে বুঝতে দেরি হয় নি। অনুপম ব'লে কেউ সেখানে থাকে না। সে নামও কেউ ওখানে শোনে নি।

উমেশ রক্ষিতই যেন হতাশ হয়েছেন সবচেয়ে বেশী। হতাশ ও লজ্জিত। অনুপমকে খুঁজে না পাওয়া যেন তাঁরই অপরাধ।

বাঁশের একটা নড়বড়ে সাঁকো সন্তর্পণে পার হতে হতে ফিরে আসবার পথে তিনি লজ্জিতভাবে বলেছেন, খবরটা এমন ভুয়ো হবে ভাবতেই পারি নি। আর তাদেরই বা দোষ কি। এমন উড়ো খবরে বিশ্বাস ক'রে তোমাদের আনাই আমার অন্যায় হয়েছে।

শোভনা তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলেছে, আপনার কি দোষ বলুন। যা করেছেন সে ত আমারই জন্যে। আমার জন্যে আপনাদের মিথ্যে হয়রান হতে হ'ল, এই আমার দুঃখ।

হাতে ধরবার ও পা ফেলবার একটি ক'রে মাত্র বাঁশ বাঁধা। সাঁকো থেকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মাটিতে পা দিয়ে আশুবাবু শোভনার দিকে ফিরে কি বলতে গিয়ে থেমে গেছেন।

শোভনা সাঁকোর ওপরেই দাঁড়িয়ে প'ড়ে পিছন ফিরে কি যেন দেখছে।

কি দেখছিলে মা? শোভনা আবার মুখ ফিরিয়ে

সাঁকো পার হবার জন্যে পা বাড়াতে আশুবাবু জিজ্ঞাসা করেছেন।

কিছু না। সাঁকো থেকে তাড়াতাড়ি নেমে এসে শোভনা যেন একটু কুণ্ঠিতভাবে কৈফিয়ৎ দিয়েছে তারপর, কত দুর্গতির মধ্যেও মানুষ বাঁচতে পারে তাই দেখছিলাম। ক্রমশঃ

দীনেশচন্দ্র সেন ও বাংলা সাহিত্য

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

সম্প্রতিকালে বাংলার লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য নিয়ে অনেকের মধ্যে নানা চর্চা ও গবেষণা দেখা দিয়েছে। জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হ'তে হ'লে এই গবেষণা অপরিহার্য। বাংলার চতুর্থ ও পঞ্চম দশক কালের জীবনযাত্রা ছিল অস্থির ও অস্থায়ী। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা ও পরিশেষে দেশভাগের লাঞ্ছনা এই দু'-দশককে বাঙালীকে নানা দিকে খর্ব ক'রে দিয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও সে তার সংস্কৃতিকে ভোলে নি। ষষ্ঠ দশকে এসে জীবন যখন আবার খানিকটা সুরে বইতে সুরু করল, নতুন ক'রে তৈরি হ'ল তালপাতার পুঁথি থেকে কাগজের পুঁথি। এই লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহে দীনেশচন্দ্র ছিলেন আধুনিক বাঙালীর পথিকৃৎ। সুতরাং আজকের নতুন গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁকে বিস্মৃত হ'লে বাঙালী নিজের সংস্কৃতির অঙ্গেই কুঠারাঘাত করবে। এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্রের জীবনী আলোচনার প্রয়োজন আছে।

ঢাকা জেলার বগজুড়ি গ্রামে ১৮৬৬ সনের ৬ই নবেম্বর দীনেশচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ঈশ্বরচন্দ্র সেন ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা জেলার সুয়াপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজী, বাংলা ও ফার্সীতে সুপণ্ডিত ছিলেন। দীনেশচন্দ্রের জন্মের পূর্বেই তিনি বাংলা ভাষায় 'সত্য ধর্মোদ্দীপক নাটক', 'ব্রহ্মসঙ্গীত রত্নাবলী' এবং 'দিনাজপুরের ইতিহাস' রচনা করেন। তৎকালীন ইংরেজী পত্রিকা 'ইংলিশম্যানে' তিনি নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর ধর্মমত ছিল আদিসমাজের অনুকূল। যদিও তিনি সহধর্মিণী রূপলতা দেবীর প্রতিবন্ধকতায় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করতে পারেন নি, কিন্তু আজীবন তিনি একনিষ্ঠ ভাবে ব্রাহ্মমত অবলম্বন ক'রেই চলেছিলেন। রূপলতা দেবী ছিলেন গোকুলকৃষ্ণ মুন্সীর কন্যা। তিনি যেমন পরমাসুন্দরী ও হিন্দুধর্মে নিষ্ঠাবতী নারী ছিলেন, তেমনি গুণে ও স্নেহে ছিলেন দেবীসদৃশা। গোকুলকৃষ্ণের পারিবারিক মর্যাদা এত অধিক ছিল যে, সে অঞ্চলে যাত্রা, কবি, কীর্তন, টপ্পা, খেমটা প্রভৃতি সঙ্গীতচর্চার যতগুলি দল ছিল, তারা মুন্সীবাড়ীতে গেয়ে নাম করলে তবে অন্যত্র খ্যাতি পেত। দীনেশচন্দ্রের মধ্যে এই সঙ্গীতচর্চার প্রতি গভীর অনুরাগ বোধ করি মাতামহের বংশ থেকেই আসে।

দীনেশচন্দ্র ছিলেন তাঁর পিতামাতার দ্বাদশ সন্তান এবং একমাত্র পুত্র। এজন্য পরিবারে তাঁর আদরের শেষ ছিল না। তাঁর পিতামহ রঘুনাথ সেনের ছিল বাগানের সখ। নানা জায়গা থেকে নানা রকম ফলের গাছ এনে তিনি নিজের বাগানকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছিলেন। পাখীদের কলকাকলিতে সে বাগান সর্বদাই পূর্ণ থাকত। এ দৃশ্যও কবি দীনেশচন্দ্রকে শিশুকাল থেকেই প্রভাবিত করে।

কিন্তু ১৮৮৬ সন যেন এক দারুণ মহামারী নিয়ে এসে দীনেশচন্দ্রের পরিবারে দেখা দিল। এ সময়ে অতি অল্পকালের মধ্যে তাঁর বাবা, মা ও কয়েকটি ভগ্নীর মৃত্যু হয়। গোটা পরিবারটা যেন শ্মশানে পরিণত হয়ে গেল। এ সময়ে দীনেশচন্দ্র ঢাকা কলেজে বি. এ. পড়ছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের উপর তাঁর অসাধারণ অনুরাগ ছিল এবং পাঠ্য পুস্তকের চাইতে অপাঠ্য পুস্তকাবলীর উপরেই তাঁর ঝোঁক ছিল অধিক। শিশুকাল থেকেই রামায়ণ ও মহাভারত তাঁর প্রায় মুখস্থ ছিল। এ সম্পর্কে তাঁকে তাঁর বিধবা ভগ্নী দিগ্‌বসনী দেবী সাহায্য করতেন। দিগ্‌বসনীর বিয়ে হয়েছিল কোন বৈষ্ণব পরিবারে। বৈষ্ণব সাহিত্যের তিনি একজন অনুরাগী পাঠিকা ছিলেন। দীনেশচন্দ্রের প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ

প্রথমতঃ এই ভগ্নীর উৎসাহেই জন্মায়। ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি দীনেশচন্দ্রের এত বেশী অনুরাগ ছিল যে, প্রথম জীবন থেকেই তাঁর একখানি ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস লিখবার কল্পনা ছিল। ইংরেজী সাহিত্যের যেসব মহারথী তাঁর মনকে বিশেষ ভাবে দোলা দিতেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন—সেক্সপীয়র, মিল্টন, ওয়েবষ্টার, ভিক্টোর হিউগো, ইউজিন স্যু, গ্যেটে, ফোর্ড, মার্লো, বোমণ্ট ফ্লেচার, টেনিসন, ওয়াল্টার স্কট, চেটারটন, কীটস, প্রভৃতি। তেমনি ভারতীয় দৃষ্টিতে সংস্কৃত ও গ্রীক আলঙ্কারিকদের রীতি আলোচনা তাঁর অনুশীলনকর্মের একটি প্রধান বিষয় ছিল। স্কটের 'লেডী অব দি লেকের' প্রায় পুরোটা তিনি অনুরূপ বাংলা ছন্দে অনুবাদ করেছিলেন; এ সময়ে তাঁর বয়স ছিল মাত্র সতের।

শারীরিক অসুস্থতায় যথাসময়ে বি. এ. পরীক্ষা দিতে না পেরে দীনেশচন্দ্র পরে শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ স্কুলে মাষ্টারী ক'রে বি. এ. পরীক্ষা দেন এবং ইংরেজীতে অনার্সসহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিস্ময়ের বিষয় যে, একদিকে এই ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি অসাধারণ অনুরাগ এবং অন্যদিকে দিগ্‌বসনা দেবীর সাহচর্যে বাংলার পুরাণ ও বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি সেই বয়সেই দীনেশচন্দ্রকে মহাপণ্ডিত ক'রে তুলেছিল। বি. এ পাশের পর হবিগঞ্জ স্কুল ত্যাগ ক'রে তিনি কুমিল্লায় এসে শম্ভুনাথ ইন্‌ষ্টিটিউশনের হেডমাষ্টার হন। এ সময়ে কবি নবীনচন্দ্র সেন ছিলেন ফেনী সাবডিভিশনের ম্যাজিষ্ট্রেট; তিনি দীনেশচন্দ্রকে ফেনী হাইস্কুলের হেডমাষ্টার পদে নিয়োগ করতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু দীনেশচন্দ্র তা গ্রহণ করেন নি; পরে তিনি ভিক্টোরিয়া স্কুলে এসে ১৮৯১ সনে হেডমাষ্টাররূপে যোগদান করেন। এই ভিক্টোরিয়া স্কুলে থাকাকালেই দীনেশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র সূত্রপাত হয়। তখন তাঁর পরিবারে নিজের স্ত্রী ভিন্ন আর কেউই ছিলেন না, সকলেই তখন লোকান্তরিত। শ্বশুরালয়ের সঙ্গেও তাঁর বিশেষ সম্প্রীতি ছিল না। এ সব কারণে জীবন সম্পর্কে বীতস্পৃহ হয়ে তিনি মনে মনে স্থির করলেন—কোনও মহৎ ব্রতে জীবন উৎসর্গ করবেন।

তিনি বলতেন: 'আমি ধন-মান-প্রতিষ্ঠা কিছুই চাই না, আমি বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি. হব; যদি তা না হ'তে পারি, তবে সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক হব।' বস্তুতঃ, তরুণ-জীবনে দীনেশচন্দ্র যে কত কবিতা লিখেছিলেন, তার হিসেব নেই। তা একত্র করলে ওয়েবষ্টারের অভিধানের মত একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হতে পারত। অষ্টাদশ বর্ষে তাঁর 'কুমার ভূপেন্দ্র সিংহ' নামক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এক অগ্নিদাহে তার সমস্ত কপিই নষ্ট হয়ে যায়। ফলে কাব্য সম্পর্কে তিনি অনেকখানি নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন। ১৮৯১ সন থেকে তাঁর সাহিত্য-প্রতিভা বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলীকে আকৃষ্ট করে। এ সময়ে পর পর তাঁর তিনটি প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথা: 'কালিদাস ও সেক্সপীয়র' যোগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'জন্মভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, 'অনুসন্ধান' পত্রিকা পত্রস্থ করে 'জন্মান্তরবাদ', এবং তৃতীয় প্রবন্ধ হচ্ছে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', কলকাতার এক এসোসিয়েশন উক্ত বিষয়ক প্রবন্ধের জন্য একটি পদক ঘোষণা করেন, এবং দীনেশচন্দ্রই সেই পদক লাভ করেন। এই প্রবন্ধের পরীক্ষক ছিলেন চন্দ্রনাথ বসু ও রজনীকান্ত গুপ্ত। 'জন্মান্তরবাদ' প্রবন্ধ প'ড়ে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'অনুসন্ধান' পত্রিকার সম্পাদককে এক পত্রে লিখে জানান: 'আমি ভবিষ্যৎবাণী করিতেছি, এই লেখক অচিরে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিবেন।' দীনেশচন্দ্রের জীবনে সেই ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ হয় নি।

একবার এক ছুটির অবকাশে ঢাকায় গিয়ে তিনি 'পদাবলীর আলোকে চৈতন্য' বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন এবং 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' সম্পর্কে বিশ্লেষণ ক'রে সকলকে শোনান। তাঁর আত্মীয় এবং কুমুদবন্ধু সেন ও অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের পিতা এটর্ণি প্রসন্নকুমার সেন তাতে মুগ্ধ হয়ে বলেন: 'কি আশ্চর্য, আমাদের দেশী সাহিত্যে যে এ রকম রত্নের ভাণ্ডার, তা আমি জানতাম না। এবার থেকে আমি ইংরেজী ও সংস্কৃত ছেড়ে দিয়ে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য ভাল ক'রে পাঠ করব।' প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, প্রসন্নকুমার ইংরেজী সাহিত্যে বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং বিভিন্ন ইংরেজী পত্রে প্রবন্ধ লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দীনেশচন্দ্র স্থির করেন - ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস না লিখে তিনি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যেরই ইতিহাস রচনা করবেন।

এ সময়ে বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ দীনেশচন্দ্রের আর একটি প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল। তিনি জানতে পারলেন—ত্রিপুরার অরণ্যপল্লীগুলিতে বহুসংখ্যক জীর্ণ তালপত্রের এবং তুলট কাগজের বাংলা পুঁথি আছে। এ পর্যন্ত Asiatic Society of Bengal শুধু সংস্কৃত পুঁথিরই খোঁজ করতেন। বাংলা পুঁথির দু'একখানির নাম একমাত্র হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভিন্ন আর বড় একটা কেউ

জানতেন না। দীনেশচন্দ্র ঝড়-জল ও বাধাবিপত্তি তুচ্ছ ক'রে জীবন ঢেলে দিলেন এই পুঁথি সংগ্রহের কাজে। এ সময়ে তাঁর মানসিক অবস্থা এরূপ ছিল যে, এ কাজে যদি তাঁর মৃত্যুও হয়, তবে সেই মৃত্যুকে তিনি জীবনের পরম সার্থকতা হিসেবেই জেনে যাবেন। এই ভাবে তিনি সমগ্র বঙ্গভূমি পরিভ্রমণ ক'রে পুঁথির পর পুঁথি আবিষ্কার ও সংগ্রহ ক'রে বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলেন। যে সব কবি এক এক কালে আবির্ভূত হয়ে বাংলা সাহিত্যকে নানা ভাবে গ'ড়ে তুলেছেন, তাঁরা কবেই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছিলেন। দীনেশচন্দ্রর অক্লান্ত চেষ্টার ফলে বাংলার বিভিন্ন পুরাণ, মঙ্গলকাব্য, কড়চা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়ে সেই বিস্মৃত কবিরা বাঙালী পাঠকের জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের সুযোগ পান। তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' এদিক্ দিয়ে বাংলা সাহিত্যের খনি, সন্দেহ নেই। এই খনি থেকে কত শিল্পী কত রত্ন গ্রহণ ক'রে পরবর্তীকালে খ্যাতিলাভ করেছেন, তার অন্ত নেই। ত্রিপুরারাজ্যের অর্থানুকূল্যে ১৮৯৬ সনে ত্রিপুরা রাধারমণ প্রেস থেকে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রথম প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় থেকে সুরু ক'রে প্রত্যেকের মুখে মুখে তখন এই গ্রন্থের প্রশংসা। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বললেন: 'দীনেশচন্দ্র সেন—হবেন আমাদের টেন।' বিচারপতি বরদাচরণ মিত্র লিখলেন: 'এই পুস্তক সমালোচনার ক্ষেত্রে টেনের মতো তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিশালী এবং উপকরণ সংগ্রহের বিশালতায় মর্লের স্কেচের মতো একটি রত্নভাণ্ডার।'

এ সময়ে ভিক্টোরিয়া স্কুলকে কলেজে পরিণত করার জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। কিন্তু অকস্মাৎ মস্তিষ্কের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। সেই অবস্থায় তাঁকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে তখন তিনি বিশেষ সম্মানিত লেখক। এসময়ে যে সমস্ত মনীষী ব্যক্তি নানাভাবে তাঁর সাহায্যে আসেন, তাঁদের মধ্যে এফ. এইচ. ক্রাইন, জর্জ গ্রীয়ারসন, স্যার জন উডবার্ণ, মিঃ স্যাভেজ, মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য ও রাজা রাধাকিশোর মাণিক্য, বরদাচরণ মিত্র, ময়ূরভঞ্জের মহারাজ বাহাদুর, গগনেন্দ্র-সমরেন্দ্র-অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি প্রধান। স্বল্প রোগমুক্ত হয়ে দীনেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' ও সরলা দেবী-সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকার সঙ্গে কার্যসূত্রে যুক্ত হন। অতঃপর তিনি যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেন, তার মধ্যে 'বেহুলা' ও 'রামায়ণী কথা' সব চাইতে অধিক জনপ্রীতি অর্জন করে। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকখানি গ্রন্থও বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যথা—সতী, জড়ভরত, ফুল্লরা, ধরাদ্রোণ, কুশধ্বজ, মুক্তাচুরি, রাখালের রাজগী, রাগরঙ্গ, সুবল সখার কাণ্ড, শ্যামলী খোঁজা, প্রভৃতি। এসব গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, দীনেশচন্দ্র কখনও এ সমস্ত উপাখ্যান সাধারণ গল্প বা রূপকথার ভাবে লেখেন নি। 'বেহুলা' ইংরেজীতে অনুবাদ করেন কিরণচন্দ্র সেন ও ক্যাপ্টেন পিটাভেল, 'সতী'র ইংরেজী অনুবাদ দীনেশচন্দ্র নিজেই করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করেন কেমব্রিজের বাংলার অধ্যাপক জে. ডি. এণ্ডারসন।

১৯০২ সনে দীনেশচন্দ্র স্যার আশুতোষের সংস্পর্শে এসে ক্রমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রীডার' নিযুক্ত হন এবং স্যার আশুতোষের নির্দেশে ইংরেজী ভাষায় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের একখানি মৌলিক ইতিহাস রচনা করেন। ভগিনী নিবেদিতা গ্রন্থের যাবতীয় পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া দেখে দেন। গ্রন্থখানি বিলাতে বিশেষভাবে আদৃত হয়। ডাঃ ওল্ডেনবার্গ, ডাঃ কারণ, ডাঃ গ্রিয়ারসন, ডাঃ সিলভাঁ লেভি, ডাঃ ব্লক প্রভৃতি প্রাচ্যবিদ্যার পণ্ডিতগণ এবং বিলাতের প্রসিদ্ধ পত্রিকা-সম্পাদকেরা তাঁদের লিখিত সুদীর্ঘ সমালোচনায় এই গ্রন্থের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ হাওএল্স্ একবার দীনেশচন্দ্রকে তাঁর কলেজ পরিদর্শন করতে নিয়ে গিয়ে সভায় দাঁড়িয়ে বলেন: 'আপনারা এই একান্ত অনাড়ম্বর বাঙ্গালী লেখকের নাম অবশ্যই শুনেছেন, হয়ত আপনারা জানেন—ইনি একজন বাংলাভাষার লেখক; কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই জানেন না যে, ইউরোপের এমন কোনো প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র নেই—যেখানে ডাঃ সেনের নাম সম্মানের সঙ্গে উচ্চারিত না হয়।'

জে. ডি. এণ্ডারসন, আই-সি-এস, বলেন: 'আপনি তাঁদের নাম জানেন না, এরকম বহু শিক্ষিত লোক জগতের নানাস্থানে আছেন—যাঁরা আপনার লেখার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা বহন করেন।'

শাসনকর্তাদের মধ্যে স্যার জন উডবার্ণ, লর্ড হার্ডিঞ্জ, লর্ড রোণাল্ডসে, লর্ড লিটন, স্যার ষ্ট্যানলি জ্যাকসন প্রভৃতি সকলেই ছিলেন দীনেশচন্দ্রের রচনার অনুরাগী পাঠক। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তাঁর মৌলিক

সাহিত্য-অবদানের অনেক প্রশংসা করেন। ডাঃ সিলভাঁ লেভি নানা ফরাসী পত্রিকায় দীনেশচন্দ্রের কৃতিত্বের কথা বহু প্রবন্ধেই উল্লেখ করেছেন। এরকম একখানি পত্রে তিনি একবার উল্লেখ করেন যে—'বঙ্গদেশকে ইউরোপের সুধীসমাজে ঘনিষ্ঠভাবে চেনাবার জন্য দীনেশবাবু যা করেছেন, অপর কোনো লেখক তা করতে পারেন নি।'

এ সময় থেকে পরবর্তী বিশ বছর কালের জন্য দীনেশচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য পদে নিযুক্ত হন। তাঁর এ সময়ের ইংরেজী গ্রন্থগুলির মধ্যে :—History of Bengali Language and Literature, Typical Selections from Old Bengali Literature, Chaitanya and His Age, Medieval Vaishnab Literature, History of Bengali Prose Style, Glimpses of Bengal History, Folk Literature of Bengal, The Bengali Ramayanas প্রভৃতি প্রধান। ইউরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর যে সমস্ত আলোচনামূলক পত্র ব্যবহার হয়, তাও এক-একটি সাহিত্যের খনি স্বরূপ। টাইম্‌স্ পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে একবার লেখা হয়: History of Bengali Literature and Language প'ড়ে পাঠক যে অভিজ্ঞতা লাভ করবেন বিলেতি পঞ্চাশজন ভূপর্যটকের পুস্তকে বা লেখায় তা পাবেন না। লটির ত্রিবাঙ্কুরের মন্দিরের অনুষ্ঠানগুলির কৌতূহল-উদ্রেককারী বর্ণনা ও নিভাবিলনের আড়ম্বরপূর্ণ হিন্দুশাস্ত্রের ব্যাখ্যা এই সহজ ও অনাড়ম্বর বইখানির সঙ্গে তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর বোধ হ'ত। এই টাইম্‌স্ পত্রিকাই আর-একবার লেখেন: ভবিষ্যতে বঙ্গবাসীর মানসনেত্রে উপকরণ সংগ্রহ বিষয়ে দীনেশচন্দ্রের বীরভূমির রক্তবর্ণ ভূমি ও পূর্ব্ববঙ্গের নদনদীর উপকূলে ভ্রমণ একটা কল্পনা-জগৎ বিচিত্র ক'রে দেখাবে, যেন আবহমান কাল ধ'রে এক পর্যটক গ্রীষ্ম ঋতুর সৌরকর মাথায় ক'রে এবং ঝড়বৃষ্টির পথ দিয়ে গঙ্গার নিম্ন উপত্যকাতে স্বীয় দেশের ভাষার সমৃদ্ধির জন্য রত্ন সন্ধান করছে।

১৯১৮ সন পর্যন্তও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। এ সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র বহুবার স্যার আশুতোষকে অনুরোধ জানিয়েছেন যাতে বাংলায় এম-এ পরীক্ষার প্রবর্তন হয়। কিন্তু স্যার আশুতোষ কোনরকম সাড়া দেন নি। পরে ১৯১৯ সনে আশুতোষ রাজি হন এবং বলেন: 'এম-এ পরীক্ষা শুধু বাংলায় সীমাবদ্ধ থাকবে না। প্রাদেশিক অন্যান্য ভাষাভাষী লোকদের জন্যও দ্বার খোলা রাখব; বাংলা ভাষা এখনও জগতে এরূপ প্রতিষ্ঠিত হয় নি যে সকলেই তা বুঝবে। এজন্য ইংরেজী ভাষায় এর ইতিহাস ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ক বই থাকা চাই।'

সুখের বিষয় যে, এর পর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম. এ. ক্লাশ খোলা হয় এবং প্রায় ২৩।২৪ বছরকাল ধ'রে দীনেশচন্দ্র বাংলা বিভাগের কর্ণধাররূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকেন। এ সময়ে বহু গ্রন্থ তাঁকে ইংরেজীতে প্রণয়ন করতে হলেও বাংলা গ্রন্থও তিনি একেবারে কম লেখেন নি। সেগুলোর মধ্যে ওপারের আলো, নীলমাণিক, আলো-আঁধারে, চাকুরির বিড়ম্বনা, তিন বন্ধু, সাঁঝের ভোগ, গৃহশ্রী, বৈশাখী প্রভৃতি উপন্যাস উল্লেখযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে তিনি রচনা করেন 'বৃহৎ বঙ্গ।' বঙ্গীয় সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, ধর্ম ও সুকুমার কলার ঐতিহাসিক উপাদানে এই গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। বৃহত্তর বঙ্গকে বুঝতে হলে 'বৃহৎ বঙ্গ' অপরিহার্য। এতদ্ব্যতীত দীনেশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ অবদান 'ময়মনসিংহ গীতিকা' বা 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা।' পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য চাষী ও সাধারণ পল্লীবাসীদের যে গল্প বলবার একটা বিশেষ ভঙ্গি আছে, তার সঙ্গে তিনি প্রথম পরিচিত হন ময়মনসিংহের জনৈক চন্দ্রকুমার দে রচিত 'কেনারাম' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ ক'রে। পরে এই চন্দ্রকুমারের সাহায্যে তিনি এরকম কিছু কাব্যকাহিনী সংগ্রহ করেন। এই হচ্ছে 'ময়মনসিংহ গীতিকা' বা 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র মূল উৎস। দীনেশচন্দ্র নিজে এবং কোন কোন লোকের সাহায্যে সমগ্র গাথা-কাহিনী সংগ্রহ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা যদিও এ সময়ে অত্যন্ত সঙ্কটজনক ছিল, তবু স্যার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ইংরেজী অনুবাদ ও মূল কবিতা দু'ভাগে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। 'মহুয়া'র ইংরেজী সংস্করণ পাঠ ক'রে ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজ বাংলার নিরক্ষর চাষীদের কবিত্বশক্তির পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হন। ক্রমে সরকারী অর্থ-সাহায্যে অন্যান্য খণ্ডগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা হ'ল এবং 'ময়মনসিংহ গীতিকা' নামটি পরিবর্তিত হয়ে 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নাম দেওয়া হ'ল। এই গীতিকা সম্পর্কে বিলাতের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ও সমালোচক স্যার উইলিয়াম রটেনস্টাইন লেখেন: 'অজন্তা, বাগ ও ইলোরা প্রভৃতি স্থানে যা চিত্রিত দেখেছিলাম, ভারত-নারীর সেই অপরূপ রূপ বঙ্গপল্লী-গীতিকায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে।'

রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্রকে লিখে জানান: 'বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি কাব্যগুলি ধনীদের করমাসে ও খরচে খনন করা পুষ্করিণী, কিন্তু ময়মনসিংহ গীতিকা বাংলা পল্লী-হৃদয়ের গভীর স্তর থেকে স্বত: উৎসারিত উৎস, অকৃত্রিম বেদনার স্বচ্ছধারা। বাংলা সাহিত্যে এমন আত্মবিস্মৃত রসসৃষ্টি আর কখনও হয় নি। এই আবিষ্কৃতির জন্যে আপনি ধন্য।'

বঙ্গীয় পল্লীগীতিগুলির সমন্বয়ে দীনেশচন্দ্র 'পুরাতনী' নামে স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এতে প্রাচীন মুসলমান মহিলাদের আদর্শ জীবনীর সঙ্গে অনেক হিন্দু-রমণীর জীবনবৃত্তান্তও সুললিত ভাবে লিপিবদ্ধ হয়। এই জাতীয় একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'বাংলার পুরনারী।' 'পদাবলী মাধুর্য' ও 'রেখা' তাঁর অপর দু'খানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. লিট উপাধিতে ভূষিত করেন। এতদ্ব্যতীত ভারতমহামণ্ডলী কর্তৃক 'পুরাতত্ত্ববিশারদ', নবদ্বীপ বিদ্বৎমণ্ডলী কর্তৃক 'কবিশেখর' এবং গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক 'রায়বাহাদুর' উপাধিতেও তিনি ভূষিত হন। তাঁর জীবনকথা আলোচনা প্রসঙ্গে দি ন্যাশনাল লিটারেচার কোম্পানী প্রকৃতই বলেছেন—

'দীনেশবাবুর পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা তাঁহাকে স্বদেশে ও বিদেশে বিদ্বান্ জনমণ্ডলীর মধ্যে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছে। ম্যাডেলিন রোঁলা তাঁহাকে Savant অর্থাৎ আচার্য বলিয়া উল্লেখ করিয়া সংক্ষেপে তাঁহার জীবনী ও তদ্‌রচিত পুস্তকতালিকা প্রদান করিয়াছেন। বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার কীর্তি সর্ববাদী স্বীকৃত হইয়াছে। প্রথম যৌবনে যিনি বাংলার লুপ্তপ্রায় শত শত প্রাচীন গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, প্রৌঢ় বয়সে যিনি বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা করিয়া বাংলা ও ইংরেজীতে বহু সরস প্রবন্ধে চৈতন্য-জীবন ও রাধাকৃষ্ণলীলা সুললিত ও মর্মস্পর্শী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, বার্দ্ধক্যে যিনি বঙ্গদেশের জাতীয় জীবন ও তাহার শিক্ষা সংক্রান্ত এবং সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, এবং জীবন-সায়াহ্নে যিনি বঙ্গপল্লীর অপূর্ব সম্পদ্ পল্লীগীতিগুলি প্রকাশিত করিয়া বঙ্গসাহিত্যের একটি নূতন দিক্ উদ্ভাসিত করিয়াছেন, শৈশব হইতে জীবনে যিনি কোন দিন বিশ্রামপ্রার্থী হন নাই, যাঁহার রচনার লালিত্য ও মধুর ভাষা পাঠকের মর্মস্পর্শ করিয়া শতবার চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত করিয়াছে, তাঁহার প্রতি বাঙ্গালীমাত্রেই কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।'

দীনেশচন্দ্র যেমন উদার, সদালাপী ও নিরহঙ্কার ব্যক্তি ছিলেন, তেমনি ছিলেন মানুষমাত্রের প্রতিই স্নেহশীল। সাহিত্যই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ধ্যান, জ্ঞান ও সাধনা। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি একাগ্র ভাবে সাহিত্য-সাধনাই ক'রে গেছেন। সংক্ষিপ্তাকারে তাঁর যে সমস্ত জীবনী রচিত হয়েছে, তার মধ্যে রোমাঁ রোলাঁর ভগ্নী ম্যাডেলিন রোলাঁ রচিত জীবনীটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিদেশ থেকে তিনিই প্রথম দীনেশচন্দ্রকে আচার্য ব'লে সম্বোধন করেন। বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে তিনি ছিলেন যথার্থই আচার্য। তাঁর পথ ও রচনা অনুসরণ ক'রে পরবর্তীকালে বহু লেখক জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। আধুনিক বাঙ্গালী চিন্তাধারার একজন পথিকৃৎ ছিলেন দীনেশচন্দ্র।

ভারতের নব-জাগরণের মূল উৎস আত্মীয়-সভা

শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ

মানুষ দেশ ও কালের অধীন। বর্ত্তমানে যে যুগে, যে কালে আমরা বাস করিতেছি, ইহার প্রবর্তক যে মহাত্মা রামমোহন, আশা করি কেহই ইহা অস্বীকার করিবেন না। এ যুগের জ্ঞান ও ধর্ম্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, রাষ্ট্রনীতি ও বিশ্বনীতি, প্রভৃতির তিনি ছিলেন মূল উৎস। ভারতের নবজাগরণের তিনি ছিলেন অগ্রদূত, জাগরণের সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার প্রতিভার আলোকে প্রথম উদ্ভাসিত হইয়াছে।

বাঙ্গলা গদ্য, ব্যাকরণ, ভূগোল, জ্যামিতি প্রভৃতি জ্ঞানের অবান্তর বিভাগগুলিরও তিনিই ছিলেন এদেশে মূল প্রবর্তক, ব্যবহারিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের দৈন্য দূর করিবার জন্য তিনিই এদেশে ইংরাজী শিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন, আইনের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার, ভূমিস্বত্ব, প্রজাস্বত্ব প্রভৃতিতেও তাঁহার দান নগণ্য নহে। শাসকগোষ্ঠীর অন্যায়ের প্রতিবাদেও তাঁহার লেখনী নীরব ছিল না। এজন্য বাংলা ও পারশি উভয় ভাষায় তিনি দুইখানি সংবাদপত্র প্রবর্তন করেন। ভারতের ধর্ম্মবিরোধ ও সম্প্রদায়বিরোধ দূর করিতেই তাঁহার আত্মীয়সভা ও ব্রহ্মসভার সৃষ্টি। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পরস্পর ভাবের আদান-প্রদানে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে মৈত্রী ও সৌহার্দ্যবৃদ্ধিই ছিল তাঁহার একমাত্র কাম্য। এজন্য তিনি ধর্ম্মমাত্রের সাধারণ ভিত্তি বেদান্তপ্রতিপাদ্য পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়াছিলেন।

বিশ্বব্যাপী সকল কালকল্প মনুষ্যহৃদয়ের যে অক্ষয় ঐক্যসূত্র, বন্ধনরজ্জু—উহা একেশ্বরবাদ। জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম, ও দেশ নির্বিশেষে সকল মানুষের একই ঈশ্বর। দেশভেদে, ভাষাভেদে, কোথাও তিনি "গড", কোথাও "আল্লা", কোথাও বা অন্যকোন নামে পরিচিত। আবার একই দেশে সম্প্রদায়ভেদে লোকে তাঁহাকে শিব, বিষ্ণু, বুদ্ধ ও ব্রহ্ম নামেও ডাকিয়া থাকে। আমাদের আত্মা বা ব্যক্তিচৈতন্য এই বিশ্বাত্মা বিশ্বচেতনার অঙ্গীভূত। তিনি আমাদের সকলের পিতা মাতা, অন্তরঙ্গ বন্ধু ও বিধাতা "স বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা"। তিনি বুঝিয়াছিলেন, সর্ববিধ মনুষ্যধর্ম্মের পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠাভূমি হইতেছে—উপনিষদ্ অধ্যাত্ম ধর্ম্ম। কায়মনোবাক্যে পরমাত্মার সেবা করিলে আমাদের সর্ববিধ মঙ্গল হয়।

এজন্য তিনি রংপুর হইতে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে এই মহানগরীতে পদার্পণ করিয়াই প্রথমে তাঁহার মাণিকতলার বাড়ীতে আত্মীয় সভার উদ্বোধন করেন, পরে উহা তাঁহার সিমলার বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। ইহার অধিবেশন যে কেবল রামমোহনের গৃহেই হইত, তাহা নহে, এই সভায় যাঁহারা যোগ দিতেন, মধ্যে মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে তাঁহাদের গৃহেও অধিবেশন হইত। প্রধানতঃ ধর্ম্মসংস্কারের আদর্শ লইয়াই ইহা স্থাপিত হইলেও, নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের এখানে আলোচনা চলিত। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই মে রবিবারে আত্মীয়সভার বিবরণে "ক্যালকাটা জার্ণাল" এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, এই সভায় জাতিভেদ, নিষিদ্ধ-খাদ্য, বালবিধবা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সহমরণ প্রভৃতি বাংলার সামাজিক জীবনেরও নানা দুঃখ দুর্গতির ও সমস্যাসংশয়ের আলোচনা হইয়াছিল। এখানে বেদপাঠ ও ব্রহ্মসঙ্গীত ব্যতীত এই সব আলোচনায় শাস্ত্র ও সমাজের সনাতন বিধিব্যবস্থাগুলিকে যুগ ও যুক্তির আলোকে তুলিয়া ধরিয়া উহাদের ভিতরের ফাঁক ও ফাটলের পরীক্ষা চলিত। শাস্ত্র, সমাজ ও সমাজ-সংস্কারের বিচিত্র বন্ধনে বদ্ধ স্বাধীন মানবাত্মার বন্ধন-মুক্তির এই প্রথম প্রয়াস, প্রথম পদক্ষেপ সুরু হইল। আত্মীয়সভার সভ্যেরা নিজেদের যুক্তিবাদের অনুকূলে এই শাস্ত্রবাণী উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো নির্ণয়ং।
যুক্তিহীনবিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

যাহা হউক, সভার আত্মীয় বিশেষণটি দেখিয়া কেহ কেহ এরূপ মনে করেন যে, বেদান্তপ্রতিপাদ্য পরমাত্মার কথা এখানে আলোচিত হইত বলিয়া সভার নামটি ঐ হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রামমোহনের অপূর্ব ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে এখানে তিনি এক অভিনব বন্ধু-গোষ্ঠী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিলেই বুঝা যায় যে, সেদিনে তাঁহারা এই নগরীর সামাজিক জীবনে কোন্ স্থান অধিকার করিয়া-

ছিলেন। গোপীমোহন ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, টাকীর জমিদার বৈকুণ্ঠনাথ রায় ও কালীনাথ রায়, তেলিনীপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দকিশোর বসু (রাজনারায়ণের পিতা), আন্দুলের রাজা কাশীনাথ, ভূকৈলাসের রাজা কালীকিঙ্কর প্রভৃতি প্রত্যেকে সেদিন নূতন বাংলা তথা নব্যভারতের গঠনে রামমোহনের নিত্য পার্শ্বচর ছিলেন। ইঁহাদের প্রত্যেকের জীবনে বিত্ত ও বিদ্যার বিস্ময়কর রাখীবন্ধন ঘটিয়াছিল। বিদ্যা দিয়াছিল তাঁহাদিগকে মুক্তদৃষ্টি, আর বিত্ত দিয়াছিল উহাকে রূপে রূপে অপরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি।

এতদিনে সভার যাযাবর অবস্থা ঘুচিয়া ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে আগষ্ট, ৬ই ভাদ্র বুধবার সন্ধ্যায় ৪৯ নং আপার চিৎপুর রোডে, ফিরিঙ্গী কমললোচন বসুর ভাড়াটে বাড়ীতে ব্রহ্মসভা নাম লইয়া, স্থির হইয়া বসিবার অবকাশ মিলিল। এই ব্যাপারে তাঁহার সহকর্মী পূর্ব্বোক্ত অনুরাগী বন্ধুবর্গ ব্যতীত উইলিয়াম ডাফের নামও উল্লেখযোগ্য। ইনি শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশন পরিত্যাগ করিয়া বন্ধু রামমোহনের সঙ্গী হইয়াছিলেন এবং "হরকরু" আফিসের উপরতলায় একেশ্বরবাদের উপদেশ দিতেন। রামমোহন তাঁহার অনুগত বন্ধু তাঁরাচাদ চক্রবর্ত্তী, চন্দ্রশেখর দেব প্রভৃতিকে লইয়া এখানে উপস্থিত থাকিতেন। একদিন গৃহে ফিরিবার পথে বন্ধুদের অনুরোধে রামমোহন নিজেদের একটি উপাসনা-গৃহ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। স্বকীয় গৃহ-নির্ম্মাণ সময়সাধ্য বলিয়া ৪৯নং আপার চিৎপুর রোডে, ফিরিঙ্গী কমললোচন বসুর বাড়ী ভাড়া লইয়া উল্লিখিত দিবসে বুধবারের সন্ধ্যায় প্রথম স্থায়িভাবে সমাজ বসিল। তিনজন তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ প্রথমে বেদপাঠ করেন। পরে শ্রদ্ধেয় উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদের মূলাংশ পাঠ করেন, পরে শ্রদ্ধেয় রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ব্যাখ্যান দিলেন। অবশেষে ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল। আত্মীয় সভায় ইতস্তত: ভ্রাম্যমান ব্রহ্মাগ্নি আজ হইতে চিরন্তন হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। এখানে সভাকে অবশ্য বেশী দিন থাকিতে হয় নাই। এক বৎসর পাঁচ মাসের মধ্যেই ঐ কমল বসুর বাড়ীর নিকটেই সুতানটি নিবাসী কালীপ্রসাদ রায়ের নিকট হইতে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই জুন চারি কাঠা দুই ছটাক জমি ক্রয় করা হয়। দ্বারকানাথ, প্রসন্নকুমার, কালীনাথ ও স্বয়ং রামমোহন ছিলেন ইহার ক্রেতা। বাড়ী তৈয়ারী করিবার কাজও শীঘ্রই আরম্ভ হইল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী ১১ই মাঘ শনিবার ভাড়াটে বাড়ী হইতে এই পবিত্র ব্রহ্মাগ্নি ৫৫নং আপার চিৎপুর রোডের নবনির্ম্মিত দ্বিতল ভবনে রক্ষিত হইল। "ব্রহ্মাগ্নি"র এই গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানটি মহাসমারোহে রামমোহনের নিজের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হইল। নগরীর বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, এমন কি একজন ইংরেজও এই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। প্রাচ্যপ্রথায় বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-বিদায়ও হইয়াছিল। একটি ন্যাসপত্র রচনা করিয়া রামমোহন ইহার পরিচালনার ভার টাকীর জমিদার বৈকুণ্ঠনাথ রায়চৌধুরী, রাধাপ্রসাদ রায় ও রমানাথ ঠাকুরকে অর্পণ করেন। ইহার প্রথম সম্পাদক তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও প্রথম আচার্য্য হন শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। সপ্তাহে সপ্তাহে প্রতি শনিবারের সন্ধ্যা-বেলায় ইহার অধিবেশন হইত; শনিবারে আরম্ভ হইয়া পরে বুধবারে প্রবর্ত্তিত হয়। অধিবেশনগুলিতে ব্রহ্ম-সঙ্গীত ও বেদপাঠ হইত, অবশেষে আচার্য্য উপদেশ দিতেন।

রামমোহন তাঁহার প্রগতিশীল উদার অন্তরের প্রতীক-রূপে এই সভাটিকে এদেশের মাটিতে রোপণ করেন। তিনি ইহার ন্যাসপত্রের মধ্যে একস্থানে বলিয়াছিলেন যে, সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মবিশ্বাসী ও ধর্ম্মমতাবলম্বী মানববৃন্দের মধ্যে যাহাতে ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় হয়, কেবলমাত্র সেইরূপ উপদেশ, প্রচারবাণী, প্রার্থনা ও সঙ্গীত এখানে অনুষ্ঠিত হইবে। তাঁহার এই উন্নত আদর্শকে, অনেকে মানব-মুক্তির জয়পত্র বা ভারতের স্বাধীনতার মহাপাত্র বলিতে চাহেন। তিনি এই বৎসরের ১৫ই নবেম্বর তারিখে বিলাত যাত্রা করেন। আফ্রিকা ঘুরিয়া পালের জাহাজে তখন ইউরোপে যাইতে হইত; সেদিনের বিলাতযাত্রা এজন্য বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। সেখানে পৌঁছিতে তাই তাঁহার প্রায় ৫ মাস সময় লাগিয়াছিল। এই যাত্রাই তাঁহার মহাযাত্রা হইয়াছিল। তিনি আর স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল নগরীতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আত্মীয়সভার মত তাঁহার এই ব্রহ্মসভাও ছিল চির-প্রগতিপন্থী। এজন্য কেবল বেদপাঠ ও ব্রহ্মসঙ্গীতেই এই সভার কার্য্য সীমাবদ্ধ ছিল না। বহু জনহিতকর কর্ম্মেরও ইহা মূল উৎস হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই নবেম্বর "ক্যালকাটা কুরিয়ারে" এই মর্ম্মে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, যে গত শনিবার সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় ব্রহ্মসভা সকল শ্রেণীর দেশীয় লোকে পরিপূর্ণ

হইয়া যায়। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে এই সভা সতীদাহ নিবারণ আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার জন্য আনন্দ প্রকাশ করে। সভাপতির প্রস্তাব অনুসারে বালেশ্বরের আর্ত্তদিগের ত্রাণকল্পে চাঁদার খাতা খুলিয়া হাজার টাকার চাঁদা তোলা হয়।

এ সময় রামমোহন ব্রহ্মসভা হইতে বহুদূরে ইংলণ্ডে বাস করিতেছিলেন; কিন্তু একদা যেখানে তিনি অধ্যাত্ম ধর্ম্মের পুণ্য হোম হুতাশন প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন, কালধর্ম্মে তাহা ক্ষীণ হইলেও কদাপি নির্ব্বাপিত হয় নাই। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া সেদিন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে দিব্য আলোক উত্তাপ নিরন্তর। বালেশ্বরের আর্ত্তত্রাণের প্রসঙ্গে মনে পড়ে, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের উত্তর-পশ্চিম ভারতের দুর্ভিক্ষে দ্বারকানাথের ন্যায় তাহার সুযোগ্য পুত্র দেবেন্দ্রনাথও ২৪শে মার্চ্চের সাপ্তাহিক উপাসনান্তে দুর্ভিক্ষে দুর্গতদিগের সাহায্যের জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন।

রামমোহনের প্রবাসযাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার ব্রহ্মসভা বন্ধু দ্বারকানাথের অর্থসাহায্যে এবং আপনার হাতে গড়া পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সেবায় কোনওরূপে কষ্টে-সৃষ্টে বাঁচিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ অনুরাগের উজ্জ্বল আলোক জ্বালিয়া রামমোহনের ব্রহ্মসভার অন্ধকারাবৃত কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। মরাগাঙ্গে যেন জোয়ার দেখা দিল। নিজের হাতে গড়া তত্ত্ববোধিনী সভাটিকে তিনি এখানে লইয়া আসিলেন। চিত্রকরের মত তিনি ক্ষিপ্র হস্তে তুলির পর তুলি চালাইয়া রামমোহন যাহার আদরা আঁকিয়া দিয়া ছিলেন, সেই ছবিখানিকে রঙে, রূপে অপরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। লোকসেবাই যে ঈশ্বর-সেবা, রামমোহনের এই মর্ম্মবাণী তাঁহার "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনামেব" এই দেববাণীতে মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সভায় একাধারে রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের যুগ্ম সাধনা মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ পূর্ব্ব সভার নামকরণ করিয়াছিলেন 'তত্ত্বরঞ্জিনী'। রাম-মোহনের হাতেগড়া পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আসিয়া তত্ত্বরঞ্জিনীর "তত্ত্ব অংশ" রাখিয়া, "রঞ্জিনী" অংশে বসাইলেন বোধিনী। এইরূপে উভয়ের সাধনার ভিন্ন ধারা গঙ্গা ও যমুনার মত এক ধারায় মিলিত হইয়া ভারতীয় ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিকে সরস ও শোভন করিয়া তুলিল। এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার। তখন বাংলা দেশের সকল গণ্যমান্য মনীষিবৃন্দ এই সভার সভ্য ছিলেন। সভ্যসংখ্যা প্রায় আট শত উঠিয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কবি ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সে যুগের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই সভার সদস্য ছিলেন। অতঃপর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র আসিয়া যখন ইহাতে যোগ দিলেন তখন যেন এই সমাজের নবযৌবন দেখা দিল।

নানা স্থানে সমাজের শাখা প্রশাখা স্থাপিত হইতে লাগিল, কলিকাতার মধ্যে ভবানীপুর ও বেহালায় আরও দুইটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইল।

ভবানীপুরে "তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা" স্থাপিত হইল। কেশবচন্দ্র ভারতের নানা স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। সুদূর বোম্বাইয়ে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের অনুসরণে "প্রার্থনা-সমাজ" স্থাপিত হইল। সেদিনে গুণানুরাগী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগ দিতে দক্ষিণেশ্বর হইতে জোড়াসাঁকোতে আসিতেন; এই ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতলকক্ষের উপাসনার বেদিকায় তিনি প্রথম কেশবচন্দ্রকে আবিষ্কার করেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রভাব আজ দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, মিশনের যে সকল প্রাচীন সভ্য ইহাকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সেই স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি অনেকেই মূলতঃ এই ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

সেদিনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র ঋষিকল্প দ্বিজেন্দ্রনাথ, ভারতের প্রথম "আই সি এস", মহর্ষির মধ্যম পুত্র, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি এবং ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ এবং গুণেন্দ্রের পুত্র গগনেন্দ্র, অবনীন্দ্র প্রভৃতি সকলের জীবনেই এই ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব পতিত হইয়াছিল।

মধ্য ভারতের জনক ও যুগস্রষ্টা মহাত্মা রামমোহন রায় হইতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাংলার সাধক ও মনস্বীগণের পুণ্যপদধূলিতে এই ভবন পবিত্র হইয়াছিল।

এরূপ একটা ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান এই মহানগরীতে আর দ্বিতীয় নাই, অথচ ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে ইহার অতীত অবদান আজ একেবারে বিস্মৃতির অন্ধকারে যেন চিরদিনের মত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ইহার অতীতের গৌরব আর বিন্দুমাত্রও চোখে পড়ে না।

ভারত আজ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, অথচ এই স্বাধীনতা ও গণজাগরণের মূলমন্ত্র যেখানে প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল, ভারতের নবলব্ধ স্বাধীনতা সেই পুণ্য স্থানটির কোন মর্য্যাদা দিল না।

এই অন্যায়, এই অপকর্ম্মের জন্য কে দায়ী? কাহাকে দোষ দিব? আমরা কাহাকেও দোষী করিতে চাহি না; আমাদের মনে হয় যে এ দোষ সকলের—হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, ভারতীয়, অভারতীয়—আমরা কেহই বাদ যাই না; কারণ রামমোহন কোনও দল গড়িতে চাহেন নাই; বরং আপনা আপনি সকল দল ভাঙিয়া, যাহাতে সমগ্র পৃথিবীতে একটি মাত্র দল গড়িয়া উঠে, তাঁহার প্রেম-দৃষ্টিতে, এই ব্রহ্মসভার মধ্য দিয়া তিনি উহাই চাহিয়াছিলেন, এইজন্য এই ক্ষণজন্মা যুগপুরুষ জাতির জনকের নাম লইয়া আমরা প্রত্যেককে আহ্বান করি। এদেশে ওদেশে সকল দেশের সকলকেই আহ্বান করি, রাজার এই প্রথম ভবনটিকে আপনার যথাযোগ্য মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করুন। কবিকণ্ঠে বলিতে ইচ্ছা হয় এই অমোঘ সত্য বাণী—

"হে নির্ভীক, দুঃখ-অভিহত,
কার নিন্দা কর তুমি? মাথা কর নত,
এ আমার, এ তোমার পাপ,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,
রাখ নিন্দা-বাণী, রাখ আপন সাধুত্ব-অভিমান,
শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয় পারাবার
নূতন সৃষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয়ধ্বজা তুলে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অপার মহিমা?"

শকুন্তলোপাখ্যান-চিত্রণে

মহাভারত ও কালিদাস
প্রতিযোগিতায় মনোনীত প্রবন্ধ

শ্রীসমীরণ চক্রবর্ত্তী

মহাকবি কালিদাস 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটক রচনা করিবার পরবর্ত্তীকাল হইতে তাঁহার এই অমর নাটক জনসমাজে এতই সমাদর লাভ করিয়াছে যে, ইহার কাহিনী অত্যন্ত সুবিদিত এবং ইহার উৎস যে মহাভারতের[১] 'শকুন্তলোপাখ্যান', তাহাও জনপ্রিয়তা ও বহুল প্রচারের দিক্ হইতে ইহার বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। যদিও কালিদাস কোথা হইতে তাঁহার কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছিলেন সেই বিষয়ে মতদ্বৈধ বর্ত্তমান, তথাপি সম্ভাব্যতার দিক্ দিয়া বিচার করিলে মহাভারতের শকুন্তলোপাখ্যানকেই এই নাটকের উৎস বলা যাইতে পারে। 'পদ্মপুরাণের'[২] (স্বর্গখণ্ড) শকুন্তলা-কাহিনীর সহিত কালিদাসের আখ্যানাংশের অধিকতর সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও ঐ কাহিনীর মধ্যে অনেক আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি ও স্ববিরোধ আছে। আর পদ্মপুরাণকে কালিদাসের পরবর্ত্তী বলিয়া বিবেচনা করিবারও কারণ বিদ্যমান। কিংবা পদ্মপুরাণের মূল অংশ কালিদাসের পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকিলেও 'শকুন্তলোপাখ্যান' তাহাতে অনেক পরবর্ত্তী সংযোজন। পদ্মপুরাণের আনন্দাশ্রম-সংস্করণে এই কাহিনী দৃষ্ট হয় না। প্রকৃতপক্ষে মহাভারতেই আমরা সর্ব্বপ্রথম শকুন্তলা-কাহিনীর সাক্ষাৎ লাভ করি। কাব্য হিসাবে এই মূল কাহিনীর মূল্য অতি সামান্য, এমন কি শূন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সাধারণ ভাবেও অনলঙ্কৃত ভাষায় রচিত এই কাঠামোটির কালিদাসের হাতে যে অদ্ভুত রূপান্তর ঘটিয়াছে তাহা বিস্ময়কর। কবির সৃজনী প্রতিভার বলে মহাভারতের কাহিনী সম্পূর্ণ নবরূপে দেখা দিয়াছে এবং স্বভাবতঃই এই নবীনমূর্ত্তি কাব্যরসিকগণের চিত্তজয়ে সমর্থ হইয়াছে। ইহাই কবির নাটকের অধিকতর প্রচার ও জনপ্রিয়তার কারণ।

উভয় কাহিনীর তুলনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার পূর্ব্বে উভয় আখ্যানাংশের সুসংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে।

মহাভারতের কাহিনী নিম্নরূপ :

পুরুবংশাবতংস রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়াক্রমে কণ্বমুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন। ফলাহরণে বহির্গত মুনির অনুপস্থিতিতে তাঁহার পালিতা কন্যা শকুন্তলা অতিথি-সৎকার করেন। এই সাক্ষাতে উভয়ের মধ্যে প্রণয় সঞ্চার হয়। রাজার জিজ্ঞাসায় শকুন্তলা স্বয়ং বিশ্বামিত্র ও মেনকার মিলনে নিজ জন্মের কাহিনী বর্ণনা করিলেন। ক্ষত্রিয়বংশেই তাঁহার জন্ম শুনিয়া রাজা তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। শকুন্তলা এই বিবাহের সর্ত্ত[৩] সম্বন্ধে রাজাকে অবহিত করিবার পর তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি হইলে উভয়ের মিলন হইল। ইহার পর আশ্রম হইতে রাজার প্রস্থান। তিন বৎসর পরে শকুন্তলা পুত্রসন্তান প্রসব করেন এবং তাহারও ছয় বৎসর পরে পুত্র-সমভিব্যাহারে রাজসমীপে গমন করেন। ইতিমধ্যে রাজা শকুন্তলার কোন সংবাদ লন নাই। রাজসভায় আসিয়া পূর্ব্বের চুক্তি অনুযায়ী শকুন্তলা পুত্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক-প্রার্থনা করিলেন। রাজা স্বেচ্ছাক্রমেই বিবাহ ও নিজ-অঙ্গীকার অস্বীকার করিলে শকুন্তলা ভর্ৎসনাপূর্ণ বাক্যে রাজাকে তিরস্কার করেন। অতঃপর দৈববাণীতে শকুন্তলার উক্তির সত্যতা বিঘোষিত হইল এবং রাজা তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

কালিদাসের কাহিনী :

এইখানেও মৃগয়াক্রমে রাজার আশ্রমে আগমন। তৎকালে কণ্বমুনি সোমতীর্থে গিয়াছিলেন। শকুন্তলা ও তাঁহার সখীদ্বয়ের সহিত রাজার সাক্ষাৎ হইল। সখীদ্বয় (অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা) রাজাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। রাজার কৌতূহলে অনসূয়া শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। ইহার পরে সখীগণের চেষ্টায়

১। মহাভারতের আদিপর্ব্বে শকুন্তলার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

২। কেহ কেহ ঘটনাসাদৃশ্যের জন্য পদ্মপুরাণ—স্বর্গখণ্ডের অন্তর্গত শকুন্তলা-কাহিনীকেই কালিদাসের নাটকের উৎস বলিয়া থাকেন। এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য :

1. Introduction Sakuntalam—ed. by Prof B. Goswami.
2. Kalidasa and the Padmapurana—by Haradatta Sarma (Cal. 1925)

৩। এই সর্ত্ত ছিল—উত্তরকালে শকুন্তলার পুত্রকে যৌবরাজ্য-প্রদান।

উভয়ের মিলন হইল। রাজা রাজধানীতে প্রস্থান করিলে পতিচিন্তারতা শকুন্তলার উপর আসিল দুর্ব্বাসার অভিশাপ।৪ কর্ত্তব্যভ্রষ্টা শকুন্তলার উপর 'রাজা তোমাকে চিনিতেও পারিবেন না'—এইরূপ শাপবজ্র নিক্ষেপ করিয়া কোপনস্বভাব মুনি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তখন প্রিয়ংবদার অনুনয়ে তিনি 'অভিজ্ঞান-প্রদর্শনে এই শাপের অন্ত হইবে'—এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া গেলেন।

আশ্রমে ফিরিয়া কণ্ব জানিতে পারিলেন যে, শকুন্তলা গর্ভবতী। কালক্ষেপ না করিয়া তিনি দুষ্মন্তের নিকট তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন। সঙ্গে গেলেন মুনির দূতরূপে শার্ঙ্গরব, শারদ্বত এবং প্রাচীনা গৌতমী। শাপবশতঃ রাজা শকুন্তলাকে চিনিতে পারিলেন না। অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়ক৫ স্নানকালে শক্রাবতারের জলে পড়িয়া যাওয়াতে শকুন্তলা তাহা দেখাইতে পারেন নাই। (পতিগৃহে যাত্রাকালে সখীদ্বয় ইহা দেখাইবার কথা বলিয়া দিয়াছিলেন) ঋষিকুমারের অনুরোধ এবং রোষকে উপেক্ষা করিয়াও রাজা ধর্ম্মলোপ ভয়ে শকুন্তলাকে গ্রহণ করিলেন না। অতঃপর শকুন্তলার অন্তর্দ্ধান ঘটিল। পরে ধীবরের নিকট সেই অঙ্গুরীয়ক ফিরিয়া পাওয়াতে রাজার স্মৃতি জাগ্রত হইল এবং তিনি শোকে মুহ্যমান হইলেন। অবশেষে দেবগণের চেষ্টায় দৈত্যবধ-প্রসঙ্গে রাজার স্বর্গে গমন এবং প্রত্যাবর্ত্তনকালে মারীচের আশ্রমে কুমার সর্ব্বদমনের সহিত পরিচয়। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুনর্মিলনে পরিসমাপ্তি।

মূল কাহিনীতে আমরা পাই চারিটি চরিত্র—শকুন্তলা, দুষ্মন্ত, কাশ্যপ এবং সর্ব্বদমন। পার্শ্বচরিত্র সৃষ্টি করা হয় নাই। কিন্তু বিভিন্ন পার্শ্বচরিত্রের মাধ্যমে যে মূল কাহিনীর পরিস্ফুটন সম্ভব, তাহা কালিদাসের অজ্ঞাত ছিল না এবং তিনি অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, শার্ঙ্গরব, শারদ্বত, মাধব্য প্রভৃতি পার্শ্বচরিত্র সৃষ্টি করিয়া কাহিনীকে পূর্ণাবয়ব করিয়াছেন। এই চরিত্র সৃষ্টি নাট্যকাররূপে কালিদাসের প্রতিভার অন্যতম নিদর্শন।

ঘটনার বিবর্ত্তনে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার স্থান অপরিহার্য্য। কালিদাস ইঁহাদের যেভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে শকুন্তলা অপেক্ষা ইঁহারাও কম চিত্তাকর্ষক হ'ন নাই। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রণয়বিকাশ ও তাহার পরিপূর্ণতার পথে ইঁহাদের অবদান অতুলনীয়। কথাবার্ত্তা ও পরিচয় ঘটিয়াছে ইঁহাদের মাধ্যমেই। মূল কাহিনীতে শকুন্তলাকে যেভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে, তাহাতে নারীজনসুলভ লজ্জা ও শালীনতার অভাব পীড়াদায়ক ভাবেই লক্ষিত হয়। সেখানে শকুন্তলা নিজেই প্রগল্ভতার সহিত নিজ জন্মের কাহিনী (যাহা বর্ণনা করা সম্ভবতঃ অপর কোন কুমারীর পক্ষে সম্ভব ছিল না) বর্ণনা করিয়াছেন।৬ এই নির্লজ্জতার অপবাদ হইতে কবি শকুন্তলাকে রক্ষা করিয়াছেন। এখানে শকুন্তলা লজ্জাশীলা ও নারীসুলভ-মাধুর্য্য ও কোমলতায় গঠিতা। অনসূয়াই রাজার জিজ্ঞাসায় শকুন্তলার জন্মকাহিনী বিবৃত করেন, এবং তাহাও যথেষ্ট শালীনতার সহিত। বিশ্বামিত্র ও মেনকার মিলনের বৃত্তান্ত তিনি সম্পূর্ণ বর্ণনা করেন নাই, ইঙ্গিতের দ্বারাই ইহা সিদ্ধ হইয়াছে। সেখানে কালিদাস বলেন,

'অনসূয়া—তদো বসন্তোদারসমএ যে উম্মাদাযওঅং রূবং পেক্‌খিঅ—৭

(অর্দ্ধোক্তে লজ্জয়া বিরমতি)'

ইহা সম্পূর্ণরূপে তপস্বিকন্যার অনুরূপ হইয়াছে।

আবার মহাভারতে শকুন্তলার পক্ষে অস্বাভাবিক ব্যবহারের আরও নিদর্শন রহিয়াছে, বিবাহের চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে। দুষ্মন্ত বিবাহের প্রস্তাব করিলে, শকুন্তলা বলিতেছেন—

'সত্যং মে প্রতিজানীহি যথা বক্ষ্যাম্যহং রহঃ।
ময়ি জায়েত যঃ পুত্রঃ স ভবেত্ত্বদনন্তরম্॥
যুবরাজো মহারাজ সত্যমেতদ্ব্রবীমিতে।
যদ্যেতদেবং দুষ্মন্ত অস্তু মে সঙ্গমস্ত্বয়া॥'৮

অর্থাৎ আমার গর্ভে যে কুমারের জন্ম হইবে, ভবিষ্যতে তাহাকে যৌবরাজ্য প্রদানের অঙ্গীকারে আপনি স্বীকৃত থাকিলে আমাদের মিলন হউক। এই প্রকার চুক্তি-সম্পাদন আশ্রমের তপস্বিবালিকার পক্ষে ত দূরের কথা, নগরের কুমারীর পক্ষেও অশোভন এবং অস্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রেও কালিদাস তাঁহার শকুন্তলাকে এইরূপ চুক্তির অবতারণা হইতে বাঁচাইয়াছেন। তাঁহার নাটকে শকুন্তলা স্বয়ং রাজাকে বা নিজবিবাহ সম্পর্কে কোন কথাই বলেন নাই। তাঁহার সলজ্জ ভাবভঙ্গি ও উক্তি-সমূহ সম্পূর্ণ রুচিসঙ্গত। সখীর উত্তরকালীন কুশল

৪। বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা তপোধনং বেৎসি নমামুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং নস বোধিতোহপি সন্ কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব॥
৪র্থ অঙ্ক (বিষ্কম্ভক)

৫। এই অঙ্গুরীয়ক রাজা স্বয়ং শকুন্তলাকে পরাইয়া দিয়াছিলেন।

৬। মহাভারতে শকুন্তলা, 'শৃণু রাজন্ যথাতত্ত্বং যথাহস্মি দুহিতা মুনেঃ' —এইরূপে আরম্ভ করিয়া নিজ কাহিনী বর্ণনা করেন।

৭। অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্—প্রথমাঙ্ক

৮। মহাভারত—আদি পর্ব্ব

সখীদ্বয়ের নিকট অবশ্যই কাম্য, তাই অনসূয়া রাজার নিকট এই প্রতিশ্রুতি প্রার্থনা করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে শকুন্তলার প্রতি কোন অযত্ন বা স্নেহাভাব প্রদর্শিত হইবে না।

'জহ গো পিঅসহী বন্ধুজনযোঅণিজ্জা ণ হোই
তহ নিব্বাদেহি'—৯

(আমাদের প্রিয়সখা যেন বন্ধুজনের শোকের কারণ না হ'ন সেইরূপ করিবেন।)

রাজাও এই আশঙ্কা দূর করিয়া বলিয়াছেন—

'পরিগ্রহবহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে।
সমুদ্ররসনাচোর্ব্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্॥'১০

এইরূপে রোম্যাণ্টিক-কাহিনীর নায়িকার যে সকল গুণ বা বিশেষত্ব থাকা উচিত, তাহা কবি শকুন্তলাতে সুন্দর ভাবে আরোপ করিয়াছেন—সেই কারণেই শকুন্তলার সৌন্দর্য্য এত অধিক। এই সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা। শকুন্তলাকে সম্পূর্ণতা-দানের পক্ষে ইঁহারা অপরিহার্য্য। এই কর্ম্মের অবসানে তাঁহারা বিদায় লইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি ইঁহাদের ভূমিকার সৌন্দর্য্য ও গুরুত্বের উপর আলোকপাত করে।

…'প্রিয়ংবদা আর অনসূয়া। তাহারা ভর্ত্তৃগৃহগামিনী শকুন্তলাকে বিদায় দিয়া পথের মধ্য হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিল; নাটকের মধ্যে আর প্রবেশ করিল না, একেবারে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল।১১

…'শকুন্তলার অধিকাংশই অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, শকুন্তলাই সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। বারো আনা প্রেমালাপ ত তাহারাই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দিল।'১২

এই দুইটি প্রধান চরিত্র ব্যতীত অন্যান্য চরিত্র-সৃষ্টির মধ্যেও বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য ও সার্থকতা বিদ্যমান্। নাটকের ঘটনাসংঘাতকে ফুটাইয়া তুলিবার ও বৈচিত্র্য-সৃষ্টির জন্য ইহাদের প্রয়োজন। শার্ঙ্গরবের সহিত পঞ্চমাঙ্কে রাজার কথোপকথন যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক। মহাভারতের কণ্বচরিত্রকেও কবি সম্পূর্ণতা দান করিয়াছেন। সমগ্র কন্যাবৎসল পিতৃসমাজের একটি মনোহর চিত্র আমরা কণ্বচরিত্রের মধ্যে পাই। চতুর্থাঙ্কে শকুন্তলার বিদায়কালে তাঁহার উক্তি ও আচরণ যে করুণ রসের সৃষ্টি করে তাহা অনবদ্য।

বিদূষক চরিত্রটি১৩ বিশুদ্ধ হাস্যরসের ও ঘটনাপ্রবাহের পক্ষে সহায়তা করিয়াছে। এই সকল পার্শ্বচরিত্রগুলি ঘটনাকে সুষ্ঠু ক্রমপরিণতির দিকে আগাইয়া দেয়।

শুধু যে চরিত্রচিত্রণের দিক্ হইতে কবি মূল কাহিনীটিকে পূর্ণতা দিয়াছেন তাহা নহে, মূল কাহিনীর অন্যান্য অস্বাভাবিকতাকেও তিনি বর্জ্জন করিয়াছেন। মহাভারতে দেখা যায় কণ্বমুনি ফলাহরণের জন্য বাহিরে গিয়াছেন। ইত্যবসরে রাজার আবির্ভাব, শকুন্তলার সহিত সাক্ষাৎ, প্রণয়, আলাপন, শকুন্তলার নিজ বৃত্তান্ত-কথন, বিবাহের চুক্তি নির্দ্ধারণ, অতঃপর গান্ধর্ব্বমতে উভয়ের বিবাহ, মিলন এবং রাজার আশ্রম হইতে প্রস্থান—এতগুলি ঘটনা ঘটিয়া গেল! ফলাহরণের কাল যতই দীর্ঘায়িত হউক না কেন, এত ব্যাপার তাহার মধ্যে ঘটিয়া যাওয়া অস্বাভাবিক নয় কি? আর দীর্ঘায়িত হইবার কোন কথা বা কারণও পাওয়া যায় না। শকুন্তলা নিজেই রাজাকে 'ক্ষণমাত্র' প্রতীক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন, যাহাতে মুনি ফিরিয়া আসিয়া কন্যা-সম্প্রদান করিতে পারেন।

কাজেই এই অত্যল্পকালের মধ্যে এত ঘটনা সন্নিবেশ অসঙ্গত এবং উভয়ের মধ্যে গভীর প্রণয়সঞ্চারও অস্বাভাবিক। এই অসম্ভাব্যতাকে দূর করিবার জন্য কবি তাঁহার নাটকে মুনিকে সোমতীর্থে পাঠাইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার অনুপস্থিতির কাল দীর্ঘায়িত হইবার সুযোগ ঘটিয়াছে। আর রাজাও ঋষিকার্য্য সম্পাদনের জন্য কয়েকদিন আশ্রমে রহিলেন। এই অবকাশে তাঁহার শকুন্তলার সহিত প্রণয়বিকাশের সুযোগ হইয়াছে। সম্পূর্ণ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অঙ্ক কবির স্বকীয় উদ্ভাবন এবং তাহারা এই প্রণয়বিকাশের চিত্র।

মহাভারতের কাহিনীতে আমরা দেখিতে পাই যে, দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মিলনের তিন বৎসর পরে কুমার সর্ব্বদমনের জন্ম। মহাভারতের কবি বলিতেছেন:

…'অসূয়ত চবামোরুঃ কুমারমমিতৌজসম্॥
ত্রিষু বর্ষেষু পূর্ণেষু দীপ্তানলসমদ্যুতিম্।'১৪

৯। অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ তৃতীয়াঙ্ক

১০। অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্- তৃতীয়াঙ্ক

১১, ১২। প্রাচীন সাহিত্য। 'কাব্যের উপেক্ষিতা'।

১৩। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে বিদূষকের নিম্নরূপ সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে-

'কুসুমবসন্তাদ্যভিধঃ কর্ম্মবপুর্ব্বেশভাষাদৈঃ।
হাস্যকরঃ কলহরতির্বিদূষকঃ স্যাৎ স্বকর্ম্মজ্ঞ॥'বিশ্বনাথ-সাহিত্যদর্পনঃ। ৩।৫০

১৪। মহাভারত—আদিপর্ব্ব

ইহাও অস্বাভাবিক নয় কি? আবার পুত্রজন্মের পর ছয় বৎসরের মধ্যে মুনি শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করেন নাই। কিন্তু লৌকিকতার দিক্ হইতে বিবাহিতা স্ত্রীর সুদীর্ঘ কাল যাবৎ পিতৃগৃহে বাসের অনৌচিত্য সম্পর্কে কালিদাস সচেতন ছিলেন। তাই তিনি বলেন :

'সতীমপি জ্ঞাতিকুলৈকসংশ্রয়াং জনোঽন্যথা
ভর্তৃমতীং বিশঙ্কতে।১৫
অতঃ সমীপে পরিণেতুরিষ্যতে প্রিয়াঽপ্রিয়া বা
প্রমদা স্ববন্ধুভিঃ॥'

কাজেই এক্ষেত্রে শকুন্তলার গর্ভবতী হইবার কথা শ্রবণমাত্রেই মুণি তাঁহাকে দুষ্মন্তের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং নিজকর্ত্তব্যসমাধানে নিরুদ্বেগ হইলেন।

অতঃপর প্রত্যাখ্যান বৃত্তান্ত ও দুষ্মন্তচরিত্রের বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতে পারে। মহাভারতে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে বিস্মৃত হন নাই, কিন্তু স্বেচ্ছাক্রমেই তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। শকুন্তলা রাজসন্নিধানে আসিয়া সর্ব্বদমনকে যৌবরাজ্য প্রদানের প্রার্থনা জানাইলেন :

'অয়ং পুত্রস্ত্বয়া রাজন্ যৌবরাজ্যেঽভিষিচ্যতাম্।
যথা মৎসঙ্গমে পূর্ব্বং কৃতো যঃ সময়স্ত্বয়া॥'১৬

কিন্তু দুষ্মন্ত তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াও প্রকাশ্যে তাহা স্বীকার করেন নাই—

'সোঽথ শ্রুত্বৈব তদ্বাক্যং তস্যা রাজা স্মরন্নপি।
অব্রবীন্ন স্মরামীতি কস্য ত্বং দুষ্টতাপসি।...
যথেষ্টং গম্যতাং ত্বয়া॥'১৭

তখন শকুন্তলা পুনঃপুনঃ সত্যের প্রাধান্য ও আশ্রেয়তার কথা উল্লেখ করিয়া রাজাকে তিরস্কার করা সত্ত্বেও রাজা তাঁহাকে স্বেচ্ছায় গমন করিতে বলিলেন। ইহার পরে দৈববাণী শকুন্তলাকে সমর্থন করে :

'অথান্তরীক্ষাদ্দুষ্মন্তংবাস্তবাচাশরীরিণী॥
ভরস্ব পুত্রং দুষ্মন্ত মাঽবমংস্থাঃ শকুন্তলাম্।
ত্বং চাস্য ধাতা গর্ভস্য সত্যমাহ শকুন্তলা॥'১৮

তখন দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে গ্রহণ করিয়া বলেন যে, লোকনিন্দার ভয়েই তিনি ঐরূপ আচরণ করিয়াছেন। যাহাই হউক—এই আচরণ পুরুবংশাবতংসের উপর গৌরবময় আলোকপাত করে না। সংস্কৃত নাটকের নায়কের চরিত্র বিশেষ ভাবে সদ্গুণান্বিত হওয়া আবশ্যক—এ বিষয়ে নাট্যশাস্ত্রকারগণের বিশেষ বিধি১৯ রহিয়াছে। সেক্ষেত্রে তাহার পক্ষে বিবাহিতা পত্নীর সহিত এরূপ শঠতা অশোভন। এই বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যা-ভাষণের অপবাদ হইতে নায়ককে মুক্ত করা প্রয়োজন বলিয়া কালিদাস দুর্ব্বাসার শাপের অবতারণা করিয়াছেন। এই শাপবৃত্তান্তকে অনেকেই সুনজরে দেখেন নাই, কেহ কেহ ইহাকে কাহিনীর ত্রুটিরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এই অবতারণা ত্রুটি ত নহেই, পরন্তু কালিদাসের শিল্পনৈপুণ্যের গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়।

প্রথমতঃ এই শাপের দ্বারা দুষ্মন্তচরিত্রের দুর্ব্বলতাটুকু ঢাকা পড়িয়াছে এবং পঞ্চমাঙ্কে শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণতা চিত্রিত হইয়াছে। যে প্রত্যাখ্যান ছিল কলঙ্ক, তাহাকেই কবি রাজার কীর্ত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ এই শাপব্যাপারের মাধ্যমে কবির নিজস্ব জীবনদর্শন প্রতি-ফলিত। এই শাপ গুরুতর পাপের কঠোর শাস্তি। সামাজিক সেবাধর্ম্মের বিধি লঙ্ঘনের অপরাধে শকুন্তলাকে এই দণ্ডভোগ করিতে হইল। অনায়াসে যে মিলন ঘটিয়াছিল, যাহা আত্মকেন্দ্রিক ও স্থূলদৈহিকতার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ, তাহা শাপের দ্বারা শাসিত হইয়াছে। 'দুর্ব্বাসার শাপে যাহা ঘটাইয়াছে স্বভাবের মধ্যে তাহার বীজ ছিল। কাব্যের খাতিরে যাহাকে আকস্মিক করিয়া দেখানো হইয়াছে তাহা প্রাকৃতিক।'২০ এই শাপবৃত্তান্তের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও উচ্চস্তরের নাট্যপ্রতিভা ও সংযম লক্ষ্য করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইতিপূর্ব্বেই এই ২১শাপের সার্থকতার উপর রবীন্দ্রনাথ,৪ চন্দ্রনাথ৫ মহাশয়২২ প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণ প্রভূত আলোকপাত করিয়াছেন।

এই শাপের অনুসিদ্ধান্তরূপেই অঙ্গুরীয়ক-বৃত্তান্তের আবির্ভাব। অভিজ্ঞানরূপেই অঙ্গুরীয় ব্যবহার সুপ্রাচীন রীতি। এক্ষেত্রেও কবি তাহার ব্যবহার করিয়া দুষ্মন্ত-শকুন্তলার উত্তরমিলনের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন।

১৫। অভিজ্ঞান-শকুন্তলম। পঞ্চমাঙ্ক।

১৬। মহাভারত—আদিপর্ব্ব

১৭। মহাভারত—আদিপর্ব্ব

১৮। মহাভারত—আদিপর্ব্ব

১৯। 'প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষির্ধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান্। দিব্যোঽথ দিব্যাদিব্যো বা গুণবান্ নায়কো মতঃ॥' সাহিত্যদর্পনঃ ৬।৯

২০। প্রাচীন সাহিত্য। 'শকুন্তলা'।

২১। প্রাচীন সাহিত্য। 'শকুন্তলা' এবং 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' —রবীন্দ্রনাথ।

২২। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলের অর্থ'— চন্দ্রনাথ বসু।

মহাভারতীয় কাহিনীতে এই নূতন বিষয় দুইটির সংযোজন সম্পর্কে A. W. Ryder-এর উক্তিটি উল্লেখ করা চলে—

'That there may be an ultimate recovery of memory, the curse is so modified as to last only until the king shall see again the ring which he has given to his bride. To the Hindus, curse and modifications are matters of frequent occurence; and Kalidasa has delicately managed as not to shock even a modern and western reader with a feeling of strong improbability.'

এই সংযোজনের মূলে রহিয়াছে প্রেমসম্পর্কে কবির নিজস্ব মতবাদ। সমাজের সহিত ব্যক্তিজীবনের সম্পর্ক ও সমাজের দাবীও ইহাতে পরিস্ফুট।[২৪]

এইরূপে শাপ ও শাপমোচনের ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া কবি মূল কাহিনী হইতে সরিয়া গেলেন এবং নিজ কাহিনীকে আরও কয়েকটি পর্য্যায়ের মধ্য দিয়া পরিচালিত করিলেন। পঞ্চমাঙ্কে প্রত্যাখ্যানের পর হইতে শকুন্তলার অন্তর্দ্ধান, অঙ্গুরী-উদ্ধার ও পুনর্মিলন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণই কবির স্বকপোলকল্পিত, এবং এই কল্পনা-মাধুর্য্য কাহিনীকে সুন্দরতর ও সম্পূর্ণতর করিয়াছে। ষষ্ঠ অঙ্কে রাজার পশ্চাত্তাপের দৃশ্য পাওয়া যায়। কালিদাস এই পশ্চাত্তাপের অগ্নিতে দুষ্মন্তের প্রাক্তন-দুষ্কৃতিকে ভস্ম করিয়া তাঁহাকে নূতন জীবন দান করিয়াছেন এবং প্রেমসম্পর্কে সম্পূর্ণ নূতন ধারণাও দুষ্মন্তের হৃদয়ে জাগ্রত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে রাজার জীবনে প্রেম ও বিবাহ ছিল ক্ষণস্থায়ী, আনন্দদায়ক কৌতুকমাত্র। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—'সকৃৎ কৃতপ্রণয়োঽয়ং জনঃ'।[২৫] কিন্তু পশ্চাত্তাপের পর নূতন দৃষ্টিতে, প্রেম তাহার গুরুত্ব ও স্বকীয় মহিমা লইয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

ইহার পর সপ্তম সর্গে দৈবকৌশলে পুনর্মিলন। এই স্তরে শকুন্তলাও কঠোর তপশ্চরণের মধ্য দিয়া নূতন গৌরব লাভ করিয়াছেন। এই স্বর্গীয় মিলনের দৃশ্যও মর্ত্ত্যসীমার ঊর্দ্ধে মারীচাশ্রমে অঙ্কিত হইয়াছে। সপ্তম সর্গে বর্ণিত দ্বিতীয় মিলনের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তি উল্লেখযোগ্য :

'যেমন শ্লোকের এক চরণ সম্পূর্ণ মিলের জন্য অন্য চরণের অপেক্ষা করে, তেমনি দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রথম মিলন সম্পূর্ণতালাভের জন্য এই দ্বিতীয় মিলনের একান্ত আকাঙ্ক্ষা রাখে। শকুন্তলার এত দুঃখকে নিষ্ফল করিয়া শূন্যে দুলাইয়া রাখা যায় না।...শকুন্তলার শেষ অঙ্ক, নাটকের বাহ্যরীতি অনুসারে নহে, তদপেক্ষা গভীরতর নিয়মের প্রবর্ত্তনায় উদ্ভূত হইয়াছে।'[২৬]

সুতরাং মহাভারতের কাহিনীর এই পরিবর্দ্ধন কাহিনীর উৎকর্ষকেই বর্দ্ধিত করিয়াছে।

মহাভারতের কাহিনীর সহিত কালিদাসের নাটকের প্রভেদ মোটামুটি প্রদর্শিত হইল। সহৃদয় পাঠক মাত্রেই এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে কবির প্রতিভার স্বাক্ষর খুঁজিয়া পাইবেন। মহাভারতে আমরা যাহা পাই তাহা কাহিনীর কঙ্কালমাত্র। রোমান্টিকতার কোন স্পর্শ এখানে নাই। মহাভারতের কবি ঘটনাহিসাবেই ঐ কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন, তিনি কাব্য করিতে বসেন নাই। কিন্তু কালিদাস মূলতঃ কাব্যসৃষ্টি[২৭] করিতে বসিয়াছেন, সংবাদপরিবেশন তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। উদ্দেশ্যের এই পার্থক্য হইতেই কাহিনীরচনায় তাঁহাদের বিভিন্নতা উদ্ভূত। সার্থক কাব্য-রচনা সহজ বিষয় নহে—'আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, তাতে ভালবাসা দিয়ে', তবে কবিকে মানসী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতে হয়। কালিদাসও নূতন চরিত্র রচনা করিয়াছেন, অপরিণত চিত্রকে বিকশিত করিয়াছেন, তাঁহার নিজস্ব কাব্য-কৌশলসমূহ—সুললিত ছন্দ, সরল প্রকাশভঙ্গি, অনন্যসাধারণ উপমাসম্ভার, ধ্বনিমাধুর্য্য প্রভৃতির দ্বারা মহাভারতের কাহিনী-কঙ্কালকে অবলম্বন করিয়া কাব্যপ্রতিমা গড়িয়াছেন। কবি ভারতবাসী; ভারতবাসীর নিকট পৌরাণিক কাহিনীর আবেদন যে অধিক তাহা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন, এবং এই কারণে মহাভারতের আখ্যানকে নিজকাব্যের মূলরূপে গ্রহণ করেন। কবির লেখনীস্পর্শে নিষ্প্রাণ কঙ্কালে আসিয়াছে প্রাণপ্রবাহ, শুষ্কতরু হইয়াছে পল্লবিত, নিকষকৃষ্ণ লৌহ হইয়াছে

২৩। A. W Ryder -Kalidasa. p—101

২৪। নাটকের মধ্যে কালিদাসের এই বিশিষ্ট ধারণার পরিচয় পর্য্যালোচনের জন্য দ্রষ্টব্য :

ক) প্রাচীন সাহিত্য। 'শকুন্তলা', 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' - রবীন্দ্রনাথ

খ) চন্দ্রনাথ বসু 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলের অর্থ'

২৫। অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ পঞ্চমাঙ্ক।

২৬। প্রাচীন সাহিত্য—'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা'।

২৭। সংস্কৃত সাহিত্যে নাটক ও কাব্যের অন্তর্গত। ইহা দৃশ্যকাব্য। 'দৃশ্যশ্রব্যত্বভেদেন পুনঃ কাব্যং দ্বিধা মতম্। দৃশ্যং তত্রাভিনেয়ম্।' —সাহিত্যদর্পনঃ ৬।১
অতএব নাটকেও কাব্যের ধর্ম্ম ও গুণসমূহ থাকা প্রয়োজন।

নয়নরঞ্জক সুবর্ণে পরিণত। এই নাটককে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত সারস্বতসমাজ যে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাইয়াছেন—তাহার মূলে আছে নাটকরচনায় কবির প্রতিভার স্বকীয়তা। এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে ধরা পড়ে, যখনই আমরা মহাভারতের কাহিনীর সহিত ইহাকে তুলনা করিয়া থাকি। পরিচিত ও সাধারণ জিনিষকে আর্ট নূতন করিয়া উপস্থাপণ করে। এক্ষেত্রেও সাধারণ আখ্যানকে কবি যেভাবে অসাধারণ নাটকে পরিণত করিয়াছেন, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' কবির সর্বাপেক্ষা সার্থক সৃষ্টি। তাঁহার অপরাপর কাব্যগ্রন্থাবলীর শোভাও আমাদের মনোহরণ করে, কিন্তু এই নাটকে তাঁহার সুপরিণত প্রতিভার ছাপ ও শকুন্তলার জীবনবিবর্তনের ধারাপ্রদর্শনকে লক্ষ্য করিয়া গেটে তাঁহাকে যে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল :—

তাঁহাকে যে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল :—

নব বৎসরের কুঁড়ি, তাঁরি এক পাতে বরষ
শেষের পক্বফল।
প্রাণ করে চুরি আর, তারি এক এক সাথে
প্রাণ এনে দেয় পুষ্টিবল॥
আছে স্বর্গলোক আর, সেই এক ঠাঁই,
বাঁধা যেথা আছে মহীতল।
হেন যদি কোথা থাকে, তুমি তবে তাই,
ওহে অভিজ্ঞান-শকুন্তল॥

পুস্তক-পরিচয়

রবিচ্ছবি—(১৩৬৮) গীতবিতান—সম্পাদক শ্রীপ্রভাত গুপ্ত সঙ্কলিত ও শ্রীশঙ্কর মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত, ২৫ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড, মূল্য ৬৲ ছয় টাকা।

কবিগুরুর শেষ দশকে (১৯৩১-৪১) কত মূল্যবান তথ্য এখনও অপ্রকাশিত হয়ে প'ড়ে আছে সে বিষয়ে পত্রিকাদিতে প্রকাশের চেষ্টা চলছে। প্রভাত গুপ্ত ১৯৩১-৩৬ অর্থাৎ ৭৫ বর্ষপূর্ত্তি থেকে শেষ রোগসঙ্কটগুলি সুরু হওয়ার আগে পর্য্যন্ত শান্তিনিকেতনে তাঁর কাছে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেন। সেই পাঁচ বছরেই তাঁর ভক্তি পূর্ণ অথচ সজাগ দৃষ্টি দিয়ে ছোটখাটো বহু রচনা ও ঘটনার মালা প্রভাতবাবু গেঁথে গেছেন; ২০০ পাতার মধ্যে অল্প আলোচনার মধ্যে, তালিকা সমেত নাট্য ও অভিনয় প্রসঙ্গ ও মৌখিক ভাষণের তারিখ সমেত তালিকা দু'টি প্রত্যেক রবীন্দ্র-ভক্ত প'ড়ে সুখী হবেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রিয় আত্মীয় গগনেন্দ্র অবনীন্দ্র ও দিনেন্দ্র ঠাকুরও বহু ভূমিকায় রবীন্দ্র নাট্য পরিবেশনে সার্থক অভিনয় করে গেছেন। এমনকি সেকালের শ্রেষ্ঠ কমিক্ অর্দ্ধেন্দু মুস্তফীও তাঁদের "খাম্ খেয়াল" সভায় যোগ দিতেন। প্রধান ও সুদক্ষ অভিনেতা গিরীশ ঘোষ ও অমৃত বসু মহাশয়রাও অভিনেতা রবীন্দ্রনাথের তারিফ করে গেছেন এবং শিল্পী শিশির ভাদুড়ী তাঁর স্নেহ লাভ ক'রে কয়েকটি নাটক ও গল্পের নাট্য প্রযোজনা করে ধন্য হয়ে গেছেন। রবীন্দ্র শতাব্দীতে সেই সব প্রায়-ভুলে-যাওয়া অধ্যায়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি এখন প্রভাত গুপ্ত রচিত "রবিচ্ছবি" (যেমন আমি তাঁর রবিচ্ছায়া কথা তুলেছিলাম)। বহু অবজ্ঞাত কক্ষে দৃষ্টিপাত করতে পাঠক-পাঠিকাদের উৎসাহ দেবে। তিনি ঠিক বলেছেন: "দূরে থেকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অজানা বিস্ময় কাছে গিয়ে দেখার যখন সুযোগ এল তখন জানার বিস্ময়।"

"রবীন্দ্র-রচনা কোষ" সুরু করেছেন শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব। তাঁর সঙ্গে শ্রীপুলিন সেন, প্রভাত গুপ্ত, প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত প্রভৃতি আবিষ্কারের কাজে নামলে তবেই প্রথম শতাব্দী শেষে "রবীন্দ্র-পরিচয়" পূর্ণাঙ্গ হবে হয়ত দ্বিতীয় শতাব্দী উৎসবে। জার্ম্মাণীর কবি নাট্যকার (Goethe) গ্যয়টের সঙ্গে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের তুলনা সম্ভব। দুজনেই গদ্যে ও পদ্যে তাঁদের রচনায় জগতের বিস্ময় হয়ে থাকবেন। Browning Cyclopædia অনুসরণ ক'রে Tagore Cyclopedia যখন লেখা হবে তখন 'রবিচ্ছবির' মত তথ্যপূর্ণ গ্রন্থের উপকারিতা বোঝা যাবে। প্রভাতবাবুকে লেখা চিঠিগুলিও বইখানির শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।

গীতবিতান পত্রিকা—(১৩৬৮) রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা, সম্পাদক শ্রীপ্রভাত গুপ্ত, ৩৩৪ পৃষ্ঠায় এই বৃহৎ গ্রন্থ ছেপে ও আট টাকায় উৎসর্গ ক'রে প্রভাতবাবু তাঁর শ্রদ্ধা ও সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম প্রকাশিত গীত বিতান বার্ষিকী 'শত বার্ষিকী' আয়তনে বড় হলেও ভারসাম্য সর্ব্বত্র রাখতে পারে নি: শ্রীবার্ণিক রায় একা প্রায় ১০০ পৃষ্ঠা-ব্যাপী তাঁর পুস্তিকায়, রবীন্দ্র গীত-নাট্যের আলোচনা করেছেন বাকী ২০০ পাতার মধ্যে 'গীত বিতানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও তাঁদের রবীন্দ্র উৎসবের বিবরণী (সচিত্র) আছে। এই উৎসবের মধ্যে যাঁদের হারিয়ে আমরা ব্যথিত যথা অতুল গুপ্ত, ইন্দিরা দেবী ও সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁদের উদ্দেশে সচিত্র অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়েছে। শ্রীচিত্তরঞ্জন দেবের "রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত ভাষণাদির অনুলেখন সূচী"টি বিশেষ চিত্তাকর্ষক, কিন্তু বাংলা পত্রিকার বাইরে তাঁর রচনাদির চুম্বক ও আলোচনা বিশ্ব সংবাদ সাহিত্যের পাঠ করার উপর নির্ভর করে তাই Moscow International Congress of Orientalists দের সামনে আমি ১৯৬০ সনে এ প্রস্তাব তুলি যে-আন্তর্জ্জাতিক গ্রন্থপঞ্জী (International Tagore Bibliography) সঙ্কলন সুরু হোক্। শ্রীপুলিন সেন এদিকে কিছু কাজ করেছেন বিশ্ব-ভারতীর অনুমতি নিয়ে "সাহিত্যে সমসাময়িকতা" (রবীন্দ্র ভাষণ) প্রভৃতি ছাপায় গ্রন্থের মূল্য বেড়েছে। শান্তিনিকেতনে 'রবীন্দ্র পরিচয় সভা' আলোচনাটি তথ্যপূর্ণ, শ্রীমতী শৈলনন্দিনী সেন "আশ্রমে ছাত্রীজীবন" লিখে ভবিষ্য ছাত্রীদের প্রেরণা দিয়েছেন। মেয়েদের হাতের কাজ কারু-শিল্পাদি (বিশেষ শ্রীনিকেতনের) এই সঙ্গে প্রকাশ করলে সবাই সুখী হ'তাম। কারণ পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী থেকে নাতবৌ শ্রীমতী (হাতি সিং)

ঠাকুর পর্যন্ত কলাভবনের সঙ্গীত ভবনের বিকাশ নানা ভাবে সাহায্য করে গেছেন। প্রবোধচন্দ্র সেনের বাণী ও বীণা তথা শৈলজারঞ্জন মজুমদারের 'রবীন্দ্র সঙ্গীতের ঐতিহ্য'; জনসহযোগে রবীন্দ্র সঙ্গীত (সুধীরচন্দ্র কর), স্বরলিপি সমস্যা (নীহারবিন্দু সেন), গীতাঞ্জলীর গান (প্রফুল্লকুমার দাস), রবীন্দ্র সঙ্গীত আলোচনা (সাধনা কর), "মায়ার খেলা" ইন্দিরা দেবী কথিত (শ্রীক্ষিতীশ রায়) ও অধ্যক্ষ অনাদিকুমার দস্তিদার লিখিত মূল্যবান বহু সন্দর্ভ এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

গীত বিতান প্রকাশিত এই দুইখানি বইএর বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীকালিদাস নাগ

ছিন্নপত্রাবলী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী, বারো টাকা।

কোন মহৎ শিল্পীর শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় পুণ্যকর্ম তাঁর রচনাবলীর সর্বাঙ্গসুন্দর প্রকাশ। 'সর্বাঙ্গসুন্দর' শব্দটি বলতে শুধু সুমুদ্রণ, শোভন অঙ্গসজ্জা বোঝায় না। তার সঙ্গে যখন লেখক বা শিল্পীর সৃষ্টি তার সম্পূর্ণতা নিয়ে, প্রমাদহীন সহযোগী তথ্য-নির্দেশ নিয়ে রসিক গোষ্ঠীর সম্মুখে উপস্থিত হয় তখনই সমজদার মন তাকে সর্বাঙ্গসুন্দর বলে ঘোষণা করে। 'ছিন্নপত্রাবলী' রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে। এর পূর্বে আমরা 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। মধ্যে ১৩৬১-৬৩ সালের 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় 'ছিন্নপত্র' পর্যায়ে অতিরিক্ত বহু পত্র প্রকাশিত হয়। আলোচ্য ছিন্নপত্রাবলী গ্রন্থখানির প্রথম বৈশিষ্ট্য হ'ল, 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থে যে-পত্রগুলির অংশবিশেষ বর্জিত হয়েছিল, এ গ্রন্থে শুধু যে সেই পত্রগুলি পূর্ণাবয়ব নিয়ে দেখা দিয়েছে তা নয়, স্বর্গতা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে লিখিত অতিরিক্ত একশ' সাতখানি পত্র ঐতিহাসিক কালক্রম রক্ষা করে এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। কাজেই একদিকে যেমন 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থে প্রকাশিত পত্রগুলির পূর্ণতর পাঠ পাওয়া যাচ্ছে, অন্যদিকে গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত অতিরিক্ত পত্রগুলি এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পূর্বের পত্রমধ্যবর্তী ফাঁকগুলি পূর্ণ হয়েছে। রবীন্দ্র-শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে এই ধরণের কর্মই স্মরণীয় কাজ। সম্পাদনা কর্মে যাঁর খ্যাতি সুধী-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠ সেই অক্লান্তকর্মী শ্রীপুলিনবিহারী সেন 'ছিন্নপত্রাবলী' সংকলন ও সম্পাদন কর্মের গুরুদায়িত্ব পালনে মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা দরকার।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী মহাশয়াকে লিখিত মূল পত্রগুলির কোন কোন স্থলে শব্দ-বিশেষ ছিন্ন অথবা লুপ্ত হয়েছিল। সুবিবেচক সম্পাদক অনুমানপূর্বক যে-পাঠগুলি বসিয়েছেন, একটি ক্ষেত্রেও তার অযৌক্তিকতা দেখা গেল না। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী যখন যেখানে চিঠিগুলি পেতেন, সেই স্থান ও তারিখ তিনি বসিয়ে রাখতেন চিঠির নিচে। সম্পাদক মহাশয় মুদ্রিত গ্রন্থে সেগুলিকে অনুরূপ রীতিতে বসিয়ে দিয়েছেন ফলে পাঠকদের বিশেষ সুবিধা হয়েছে। সম্পাদনা কার্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক্ অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অঙ্কিত চিত্র ও পেনসিল স্কেচগুলি। এগুলির বিন্যাসও অতি সুষ্ঠু হয়েছে। কাজেই সব মিলিয়ে 'ছিন্নপত্রাবলী' যথার্থই সর্বাঙ্গসুন্দর।

'ছিন্নপত্রাবলী' সম্পর্কে কেউ কেউ এমন মন্তব্য করেছেন, এই গ্রন্থখানি যেহেতু রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটিকে প্রকাশ করে নি সেজন্য পত্রসাহিত্য হিসাবে এর মূল্য বুঝি বেশি নয়। এসব সমালোচক চিঠিতে কি জানতে চান বোঝা দুরূহ। তাঁরা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা নিয়ে অগ্রসর হন, যে-কোন সাধারণ মানুষ যে-ভাবে চিঠি লেখে তাঁরা বোধ করি আশা করেন রবীন্দ্রনাথও ঠিক সেই মেজাজ, সেই ভাষায় চিঠি লিখবেন। এই গোড়ায় গলদ দূর হওয়া দরকার। আমাদের জনৈক সাহিত্যিক একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশেষণ বসিয়েছিলেন 'জীবন-শিল্পী'। যোগ্য বিশেষণ, কেননা জীবন ত কবির কাছে একটি শিল্পকর্ম। তিনি জীবন ও শিল্পকে এক করেই দেখেছেন, এই চিঠিগুলি সেই শিল্পীজীবনের স্বাক্ষরবহ। যাঁরা বৈষয়িক চিঠি পড়তে চান তাঁরা দেখবেন, বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লেখা চিঠিগুলি। আশু-প্রকাশ্য এই গ্রন্থে কৌতূহলী পাঠক দেখতে পাবেন, কবি কী ভাবে কন্যাদায়ে বিব্রত, ঋণদায়ে সন্ত্রস্ত এবং ঋণ শোধের পন্থা নির্ণয়ে বীতনিদ্র। কিন্তু বব্ [ইন্দিরা দেবী] ত প্রিয়নাথ সেন নন। কবি তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন:

> "তোর এমন একটি অকৃত্রিম স্বভাব আছে, এমন একটি সহজ সত্যপ্রিয়তা আছে যে, সত্য আপনি তোর কাছে অতি সহজেই প্রকাশ পায়।...আমি তো আরও অনেক লোককে চিঠি লিখেছি, কিন্তু কেউ আমার সমস্ত লেখাটা আকর্ষণ করে নিতে পারে নি।..."

এবং আরো লিখেছেন:

> "তোকে আমি যে-সব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যে-রকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আমার আর কোন লেখায় হয় নি।"...(৭ অক্টোবর ১৮৯৪)

১৮৮৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৯৫ ডিসেম্বরের মধ্যে ইন্দিরা দেবীকে (তখন বব্) লিখিত পত্রাবলী সংকলিত হয়েছে। 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হয়েছিল (১৩১৯) তখন তার মধ্যে কবিবন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা আটখানি পত্র সংকলিত হয়েছিল, 'ছিন্নপত্রাবলী' গ্রন্থে ঐ পত্রগুলি বর্জন করা শোভন হয়েছে। কেননা, ঐ পত্রগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রাতিস্বিক কৌতুকচ্ছটা যতই বিকীরিত হোক তবু এই পত্রাবলী সংকলনে (শুধু ইন্দিরা দেবীকে লিখিত) শ্রীশচন্দ্রকে লিখিত পত্রগুলি অবাঞ্ছিত বলেই বোধ হবে।

এই পূর্ণাঙ্গ পত্রসংকলনে রবীন্দ্রনাথ পূর্বের চেয়ে আমাদের আরো কাছের মানুষ হয়ে উঠেছেন। তাঁর সৌন্দর্যমুগ্ধ নয়ন-মন চিঠিগুলির মধ্যে সাধারণ বস্তু অ-সাধারণ করে প্রকাশ করেছে। তার সঙ্গে রয়েছে সাধারণ চাষী মানুষের প্রতি গভীর মমতার স্পর্শ। রয়েছে আমাদের ইংরেজ-চাটুকারিতার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও আত্মশক্তি অর্জনের প্রশ্ন। মনের কত ধরণের চিন্তা, ভাবনা, কল্পনা, স্বপ্ন সাধনার কথা। একটি পত্রাংশ তুলে না দিয়ে পারলাম না।

"আমাদের ভারতবর্ষের সবচেয়ে জীর্ণতম কুটারের মলিনতম চাষীকে আমি আমাদের আপনার লোক মনে করতে কুণ্ঠিত হব না, আর যারা ফিটফাট কাপড় পরে dog-cart হাঁকায় আর আমাদের নিগার বলে, তারা যতই সভ্য, যতই উন্নত হোক, আমি যদি কখনও তাদের সংস্রবের জন্যে লালায়িত হই তবে যেন আমার উপরে জুতো পড়ে।" (ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩।)

—চিঠিখানি 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থে পড়ি নি। এমনি চিঠিগুলি রবীন্দ্রনাথকে বেশি করে চেনায়। কাজেই হয়ত রবীন্দ্রনাথের একান্ত ব্যবহারিক পারিবারিক জীবনের কথা বেশি পাই না, কিন্তু জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বকে পাই। এই সূত্রে লিটন স্ট্রেচির মন্তব্য যোগ ক'রে আমি এই অতুলনীয় গ্রন্থের সমালোচনা শেষ করছি:

"No good letter was ever written to convey information or to please its recipient; it may achieve both these results incidentally but its fundamental purpose is to express the personality of the writer."

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

॥—শ্রীসুকুমার সুর। শ্রীঅরবিন্দ মন্দির, বারাণসী হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পত্রাঙ্ক ১০৪, মূল্য ২৲ টাকা।

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি সুরচিত ও কবির ছন্দজ্ঞানের পরিচায়ক। সাবলীল ভাষা ও মার্জ্জিত রসজ্ঞান এই কাব্যগ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। ইহাতে এমন কতগুলি ভাবদ্যোতক গীতিকবিতা আছে যাহা পাঠক চিত্তকে অধ্যাত্মরসে আপ্লুত করিবে।

কবিতা—শ্রীবীরেন্দ্র মল্লিক। অগ্রণী বুক ক্লাব, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পত্রাঙ্ক ৯৮, মূল্য দুই টাকা মাত্র।

কবি বীরেন্দ্র মল্লিক অল্পদিনের মধ্যেই কবিখ্যাতি অর্জ্জন করিয়া বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত হইয়াছেন। এই পুস্তকে তাঁহার পূর্ব্বপ্রকাশিত অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থের কবিতা সংকলিত হইয়াছে। কবিতাগুলির স্বচ্ছন্দ গতিবেগ, বর্ণনাশৈলী ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য আমাদিগকে মুগ্ধ করে। তরুণ কবি কোথাও অতি-আধুনিকতার অস্পষ্টতা ও দুর্ব্বোধ্যতার মধ্যে নিজের বক্তব্য হারাইয়া ফেলেন নাই। কবিতাগুলিতে যথেষ্ট ভাবসম্পদ আছে এবং তাহা এক রসোত্তীর্ণ স্তরে পৌঁছিয়াছে।

দন্তরুচি কৌমুদী—শ্রীকালিদাস রায়। এম্, কে, পালিত এণ্ড কোং, ৮নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পত্রাঙ্ক ১৩০, মূল্য দুই টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

গ্রন্থকার কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় এই গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন—"এর বেশির ভাগ রচনা ৪০।৫০ বৎসর আগে রচিত। তখনকার সমাজকে লক্ষ্য করেই রঙ্গব্যঙ্গের শরসন্ধান হয়েছে এবং ইহার মধ্যে সে কালের সমাজের একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যাবে।" কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে রচিত এই কবিতাগুলি পড়িলে মনে হয় এগুলি আধুনিক যুগসাহিত্যের সঙ্গেও যেন বেমানান হয় না। বাংলার সাহিত্যাকাশে কবিশেখর কালিদাস রায় উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে বিরাজিত। কবিবর কুমুদরঞ্জন মল্লিক ছাড়া এখন তাঁহার সমগোত্রীয় আর কেহই জীবিত নাই। তিনি তাঁহার জীবনব্যাপী কাব্যসাধনার অবসরেও বঙ্গসাহিত্যের বিভিন্নস্তর যে ভাবে নানা দিক দিয়া তাঁহার প্রজ্ঞা ও মনীষার দানে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কৌতুকরসের ক্ষেত্রেও তাঁহার কৃতিত্ব যে অসামান্য তাহা আলোচ্য পুস্তকখানি পাঠ করিলে বেশ বোঝা যায়। যে সময়ে তিনি 'বেতালভট্ট' এই ছদ্মনামে কৌতুকরসাশ্রিত কবিতাগুলি লিখিয়াছিলেন তখন তিনি যে কোন কারণেই হউক আত্মনাম প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। বাংলার কৌতুক-কাব্য-সাহিত্যে এই গ্রন্থখানি যে স্থায়ী আসন লাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীকৃষ্ণধন দে

পঞ্চোপাসনা—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ., পি এইচ. ডি, এফ এ. এস, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও কারমাইকেল অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। কে, এল, মুখোপাধ্যায়, ৬/১এ বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা-১২। মূল্য—১২৲।

আধুনিক হিন্দুর উপাস্য প্রধান পঞ্চদেবতা (গণেশ বিষ্ণু শিব শক্তি ও সূর্য) ও তাঁহাদের উপাসকদিগের ঐতিহাসিক বিবরণ বর্ত্তমানে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও প্রাচীন সাহিত্য পর্য্যালোচনা করিয়া এই বিবরণ সংকলিত হইয়াছে। বিষয়টি অতি ব্যাপক—একজনের পক্ষে বা একখানি গ্রন্থে ইহার সকল দিকের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া কঠিন। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে মনীষী শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় যে কার্য্যের সূচনা ও পথনির্দেশ করিয়াছিলেন সুপণ্ডিত বর্ত্তমান গ্রন্থকার বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নবলব্ধ উপকরণের সাহায্যে তাহাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছেন। দীর্ঘদিনের গবেষণার ফলে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থ বাঙালী পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করিবে এবং ভবিষ্যৎ কর্ম্মিবৃন্দকে কর্ম্মের প্রেরণা দান করিবে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

সাহিত্য ও শিল্পলোক—শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৫·০০ টাকা মাত্র।

আলোচ্য বইখানিতে গ্রন্থকার সাহিত্য ও শিল্পলোক সম্বন্ধে বিবিধ দিক লইয়া তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। 'শিল্পসৃষ্টির উৎস ও শিল্পের স্বরূপ' এই মূল্যবান প্রবন্ধটি গ্রন্থখানির প্রাণবস্তু। শিল্প সম্বন্ধে মনীষীদের মতবাদ সংযোজন একটি অমূল্য সংযোজন। দার্শনিক ক্রোচের মতটি এখানে উদ্ধৃত করিলেই ইহার যাথার্থ্য নির্ণীত হইবে। "কল্পনাপ্রিয় মানুষ বহির্বিশ্বে যে দৃশ্য দেখে সে-দৃশ্যই হ'ল শিল্পরচনার উপাদান। বস্তু বিশ্লেষণ শিল্পের কাজ নয়, বস্তুকে সত্য বা কাল্পনিক ব'লে রায় দেওয়াও শিল্পের উদ্দেশ্য নয়, বস্তুর গুণ নির্ণয় কিংবা সংজ্ঞা নির্ণয় করাও শিল্পসৃষ্টির এলাকার বাইরে। শিল্পের প্রধান পরিচয় হ'ল বস্তুস্বরূপের অনুভব এবং শিল্পরচনার মাধ্যমে তার প্রকাশ। মানুষের মনে কল্পনার সৃষ্টি হয়েছে আগে, চিন্তা পরে। বস্তু সম্পর্কে একটা কাল্পনিক ধারণায় পৌঁছার আগে সেই বিষয়ে চিন্তা জাগ্রত হওয়া সম্ভব নয়।"

এর চেয়ে ভাল বিশ্লেষণ আর হয় না। শিল্প সম্বন্ধে অন্যান্যদের বক্তব্যও প্রায় অনুরূপ।

সাহিত্য সম্বন্ধে বলিতে গিয়া গ্রন্থকার 'কথার মায়া'র উল্লেখ করিয়াছেন। সত্য, 'কথাই' ত সব। যেজন্য সাহিত্যকে কথা-সাহিত্য বলা হয়। "শুধু লৌকিক জগতের কেন, আধ্যাত্মিক জীবনের গভীর কথাগুলোকেও যদি হালকা সুরে কথায় প্রকাশ করা যায়, সেকথা সংসারী লোকের মনেও আনন্দ দিতে পারে। শ্রীম-লিখিত 'কথামৃত' এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।"

গ্রন্থকার সাহিত্যেরও কয়েকটি ভাগ লইয়া সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়াছেন। যেমন—রোমান্টিক সাহিত্য, ঐতিহাসিক উপন্যাস, এ-যুগের সাহিত্য, যুগান্তরকারী উপন্যাস, বাংলা উপন্যাসে সমাজ-চেতনা, গণ-সচেতন বাংলা সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য-শিল্প, রম্য রচনা, লোকসাহিত্য ও লোকসঙ্গীত। ইহা ছাড়াও পৌরাণিক নাটক প্রসঙ্গে গ্রন্থকার অনেক কথাই বলিয়াছেন।

গ্রন্থকার রোমান্টিক সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে একটি নির্মম সত্য কথা বলিয়াছেন, "সাহিত্য আলোচনায় আমরা রোমান্টিক শব্দটি হামেশাই ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু রোমান্টিক সাহিত্যের স্বরূপ-লক্ষণ কী একথা জিজ্ঞেস করলে সাধারণ পাঠক কেন, সাহিত্যের অধ্যাপককেও অনেক চিন্তা করে উত্তর দিতে হয়। সেই দিক দিয়া গ্রন্থকারের এই অধ্যায়টি মূল্যবান সংযোজন। ইহার পর উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা। এই উপন্যাসে ইতিহাস কতটুকু থাকিবে, থাকিবে কি থাকিবে না, থাকিলেও কি-ভাবে থাকিবে গ্রন্থকার ইহার দিগ্‌নির্ণয় করিয়াছেন।

বস্তুতঃ সাহিত্যের বিভিন্ন দিক লইয়া এরূপ গভীর আলোচনা আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া জানি না। ইহার প্রয়োজন ছিল। বিশেষ করিয়া আধুনিক বেপরোয়া যুগে রাশ সংযত করিতে ইহার প্রয়োজন অনেকখানি। এরূপ অমূল্য গ্রন্থের আমরা বহুল প্রচার কামনা করি।

গৌতম সেন

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

জন্ম :
১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৭১

মৃত্যু :
১৩ই আশ্বিন, ১৩৫০

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬২শ ভাগ ১ম খণ্ড | আষাঢ়, ১৩৬৯ | ৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

জাতীয় ঐক্য ও সংহতি

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক সনাতনধর্ম্মপন্থী বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতার সহিত আমাদের দীর্ঘ আলোচনা হয়। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল, সেই নেতার রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের সর্ব্বভারতীয় প্রসারের জন্য ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা। ঐ নেতা ছিলেন হিন্দীভাষী, আমাদের আলোচনাও হয় ঐ ভাষায়, কিন্তু তিনি অল্পক্ষণের মধ্যেই স্বীকার করেন যে, ইংরেজীর সাহায্য বিনা তাঁহার প্রচারকার্য্য সফল হওয়া অসম্ভব। তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক সংস্কার ধর্ম্মগত বাধার বিষয়ে তিনি বলেন যে, তাঁহার উদ্দেশ্য ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যেই সংহতি আনয়ন করা, অন্য ধর্ম্মমতবাদীদের সঙ্গে তাঁহার প্রচারের কোনও সম্পর্ক নাই। তবে হিন্দু বলিতে তিনি হিন্দুত্বের কোনও সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞা দিতে বা মানিতে রাজী নহেন, কেননা হিন্দু-ধর্ম্মের বিশাল প্রবাহে বহু শাখা-প্রশাখা আসিয়া মিলিয়াছে, আবার সাগর সঙ্গমে যাইবার মুখে উহা বহু ভাবে বিভক্তও হইয়াছে। বেদোক্ত উদাহরণ দিয়া তিনি বলেন যে, যেমন ব্যাধের শরাহত তৃষ্ণার্ত্ত চাতক গঙ্গাগর্ভে পড়িয়াও বিনা জলপানে মরিল, কেননা সে স্বাতিনক্ষত্রের জলবিন্দু ছাড়া অন্য কিছু পান করে না, তেমনি প্রত্যেক হিন্দুরই অধিকার আছে তাহার নিজের বিশিষ্ট মতবাদ দৃঢ়ভাবে ধরিয়া চলার, কিন্তু যেমন গঙ্গা-জল অপবিত্র নহে তেমনি হিন্দুধর্ম্মের অন্য মতবাদকেও অপবিত্র বা অপাংক্তেয় বলার অধিকার কাহারও নাই। এই কথার পর তিনি সহজভাবে বলেন যে, ভাষার বা হিন্দুধর্ম্মমতবাদের কোনও গণ্ডি তিনি স্বীকার করেন না, কেননা যেমন চক্ষুকর্ণ রুদ্ধ করিয়া পথচলা অসম্ভব তেমনই মনের দ্বার রুদ্ধ করিয়া কোন কিছুর বিচার, প্রচার বা অধ্যয়ন আলোচনাও অসম্ভব। উক্ত নেতা মহাশয় শাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিত, কিন্তু অস্পৃশ্যতার গণ্ডি লঙ্ঘন করিতে না পারায় তিনিও রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বিফলকাম হইয়াছেন।

আমাদের ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারিবর্গ জাতীয় ঐক্য ও সংহতি চাহেন আরও প্রশস্ত ক্ষেত্রে। তাঁহারা সকলে বক্তৃতায় বৃহস্পতি এবং রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে অনেকেই বিজ্ঞ এবং প্রায় সকলেই অভিজ্ঞ—কিন্তু কাজে দেখা যায় যে, প্রাজ্ঞ কেহই নহেন। যদি তাঁহাদের মধ্যে প্রাজ্ঞ কেহ থাকিতেন এবং "প্রজ্ঞা ভিনত্তু মে তম" এই বাক্যের যদি কোনও সার্থকতা থাকে তবে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির পথে যে সকল অন্তরায় রহিয়াছে, যাহার কারণে দেশে হিংসা-বিদ্বেষ ও বিভেদ-বিচ্ছেদ রহিয়াছে, তাহার সূত্র খুঁজিতে তাঁহাদের এরূপ তিমিরাচ্ছন্ন অবস্থা হইত না। দেশ ও জাতির প্রগতির পথে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা যে কি বিষম বাধা সে বিষয়ে ইঁহারা নানা-ভাবে নানা কথা বলিয়াছেন এবং সে সকলই অবশ্য-স্বীকার্য্য। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এই দুইটি অমূর্ত্ত ও অব্যক্ত রাশির প্রকৃতি বা রূপ সম্বন্ধে ইঁহারা কোনও নিশ্চিত তথ্য বা সংজ্ঞা দিতে অসমর্থ। রোগের নিদান কারণ বা উপসর্গ সম্বন্ধে যদি কোনও নির্দ্দেশ না থাকে তবে তাহার চিকিৎসা যেমন অসম্ভব তেমনই

জাতীয় সংহতি পরিষদের এই প্রয়াসও ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

কিন্তু এই ব্যর্থতার কারণ কি? কেন এই বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ মহাশয়েরা আমাদের জাতীয় জীবন যে দুই মহাব্যাধিতে আক্রান্ত তাহাদের কারণ বা নিদান নিরূপণে সামর্থ্যের অভাব দেখাইতেছেন? জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার-বিশ্লেষণে পটুত্ব সবই ত তাঁহাদের আছে। তবে এই মহান দায়িত্ব পালনে ইঁহারা ব্যর্থ হইতেছেন কেন?

এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয় আমরা জানি। কিন্তু উত্তর না পাইলে বলিতে হয় যে, জাতীয় সংহতি পরিষদ বৃথাই সম্মেলন, অধিবেশন ইত্যাদিতে সময় নষ্ট করিতেছেন, কেননা এই রোগের প্রতিকার তাঁহাদের অসাধ্য, নহিলে বুঝিতে হয় যে, এই জাতীয় ঐক্য ও সংহতির চেষ্টা এক প্রহসন মাত্র, কেননা যেখানে কঠোর ব্যবস্থার প্রয়োজন সেখানে ইঁহারা স্তোকবাক্য ও নীতিকথার উচ্চারণে দেশের লোককে ভুলাইয়া অন্য দিকে মন দিয়াছেন।

আমরা সহজ বুদ্ধিতে ও সরল দৃষ্টিতে যাহা বুঝিতেছি এবং দেখিতেছি তাহাতে মনে হয় এই ব্যর্থতার মূলে আছে সেই রুদ্ধ দ্বারের অবস্থা, বিশেষে প্রাদেশিকতার বেলায়। হৃদয় মনের সকল দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া অন্তরের পাপে আচ্ছন্ন বিচার-বুদ্ধি লইয়া, কেহ কি কখনও কোনও মহান ব্রত উদ্‌যাপনে সমর্থ হইয়াছে? আমাদের মতে ইহাদের সকলেরই সেই অবস্থা, সকলেই সেই সযত্নে রক্ষিত পাপকে বাঁচাইয়া কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টায় কৃত্রিম ব্যগ্রতা ও ব্যস্ততা দেখাইতেছেন। ঐ অন্তর্নিহিত পাপ স্বার্থজনিত, তবে সেই স্বার্থের প্রকৃতি ও ব্যাপ্তির ইতর-বিশেষ আছে বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে। শুধু কেহ নিজ স্বার্থচিন্তায় মগ্ন, কেহ বা গোষ্ঠীগত বা দলগত স্বার্থে প্রভাবিত এবং প্রায় সকলেই প্রাদেশিক পক্ষপাতিত্বের মোহে অল্পবিস্তর আচ্ছন্ন।

রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দীকে সর্ব্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা ঐ আঞ্চলিকতার রূপান্তর মাত্র মনে হয়, কেননা যেভাবে হিন্দীর বর্ত্তমান অনগ্রসর ও অপূর্ণ অবস্থা জানিয়াও উহার আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে তাহাতে মনে হয় উহা অবিমিশ্র সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত নহে। অবশ্য বর্ত্তমান অবস্থায় ইংরেজীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম রাখা উচিত এই অভিমত সংহতি পরিষদ প্রকাশ্যভাবে জানাইয়াছেন এবং সম্পূর্ণানন্দ কমিটি ইংরেজীর বদলে হিন্দী বা অন্য ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা মাধ্যমরূপে গ্রহণ করায় শিক্ষার মান যাহাতে অবনত বা ব্যাহত না হয় সেদিকে সতর্ক লক্ষ্য রাখিতে যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাহারও পূর্ণ সমর্থন পরিষদ দিয়াছেন।

সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে দেশের লোকের শিক্ষা-দীক্ষার অভাব এবং এক শ্রেণীর লোকের—যাঁহাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশ বিভাগে ক্ষতি হইয়াছে প্রধানতঃ তাঁহাদের প্রতিহিংসা-পরায়ণতা একদিকে এবং অন্যদিকে পাকিস্থানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির প্রতি সেখানের শাসকবর্গের ঘৃণ্য ও নীচ অত্যাচার এই ব্যাধিকে মাঝে মাঝে তীব্র ও প্রখর করিয়া তুলে। উপরন্তু ভারতের নানা স্থানের অনগ্রসর লোকের মধ্যে ধর্ম্মান্ধতাও এ জাতীয় অনর্থের কারণ হইয়া দাঁড়ায়, বিশেষে হিন্দী-ভাষী অঞ্চলে। এ ছাড়া পাকিস্থানী গুপ্তচরের ও প্রচ্ছন্ন পাকিস্থানী পঞ্চমবাহিনীর উস্কানী ও অন্য চক্রান্তও মাঝে মাঝে প্রবলভাবে সাম্প্রদায়িক আগুন জ্বালাইবার চেষ্টা করে, বিশেষে যখন পাকিস্থান ভারত-বিরোধী অভিযান চালায়। কলিকাতায় সম্প্রতি "মনোহর কহানীয়া" নামে অতি নগণ্য ও অজ্ঞানা পুস্তিকায় প্রকাশিত আপত্তিজনক চিত্র ও কাহিনী লইয়া যে গোলমাল সৃষ্টির চেষ্টা হইয়াছিল তাহার মূল উদ্দেশ্যই ছিল ঐরূপ প্রতি-হিংসা-পরায়ণতা জাগাইয়া তোলা। কলিকাতায় কর্ত্তৃপক্ষের দৃঢ় হস্তক্ষেপে সে চেষ্টা বিফল হয়। মালদহে ঐরূপ উস্কানী দুই দিকেই ছিল, অর্থাৎ সংখ্যাগুরুদের মধ্যেও পাকিস্থানের গুপ্তচর ও অর্থসাহায্য সক্রিয় হইয়াছিল মনে হয়, এবং সেখানের কর্ত্তৃপক্ষ সময় মত দৃঢ় হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই তাহাও শোনা যায়।

সাম্প্রদায়িকতার দূরীকরণ এক জটিল সমস্যা সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা বৃদ্ধি পাইতেছে মনে হয় না, বরঞ্চ ইহার বিস্তৃতিই ক্রমে সঙ্কুচিত হইতেছে। প্রাদেশিকতার তুলনায় এই ব্যাধি অনেক কম প্রখর এবং ঐ দুইয়ের মধ্যে দেশের সংহতি ও ঐক্য নাশে প্রাদেশিকতাই অধিক মারাত্মক।

জাতীয় সংহতি পরিষদ সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে যে দুই দিনব্যাপী (২রা ও ৩রা জুন) অধিবেশন করিয়াছেন, তাহাতে এই সকল কথার আলোচনা হইয়াছে, যদিও স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী সভাপতি থাকা সত্ত্বেও কোনও সমস্যার স্থির-মীমাংসা উপস্থাপিত করা হয় নাই। করার মধ্যে প্রধানতঃ এই জাতীয় সংহতির বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ও সংবাদপত্রের দায়িত্ব সম্পর্কে কিছু নির্দ্দেশ ও সুপারিশ দান ও পঞ্চায়েৎ সম্বন্ধেও কিছু অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়, পঞ্চায়েৎ ও সংবাদপত্র সম্পর্কে উক্ত অধিবেশনে যাহা প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা এইরূপ :

বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করার ব্যাপারে পরিষদ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের সংহতিসাধনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। এই কারণেই পরিষদ জন্ম ও বাসস্থান, জাতি ও ধর্ম্ম বিশ্বাস বিচারে কাহাকেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত না করার জন্য বিশেষভাবে সুপারিশ করিয়াছেন।

পঞ্চায়েতরাজ নির্ব্বাচনের আচরণবিধি প্রণয়নের ব্যাপারে আরও আলোচনা পরিষদ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করিলেও, পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচনে দলীয় রাজনীতি বর্জ্জনের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে পরিষদ কেবল অন্তর্বর্ত্তীকালীন স্তরেই নহে, আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণের পরও ইংরেজী ভাষাকে আবশ্যিক ভাষা হিসাবে শিক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেন। পরিষদ আশা করেন যে, হিন্দী উৎকর্ষ লাভ করার পর আভ্যন্তরীণ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজীর স্থান গ্রহণ করিলেও ইংরেজী বরাবরই আন্তর্জ্জাতিক যোগসূত্র হইয়া থাকিবে। এই কারণেই পরিষদ এই সুপারিশ করিয়াছে যে, ছাত্রদের ক্রমে ক্রমে যেমন হিন্দী ভাষা বিশেষভাবে আয়ত্ত করিতে হইবে তেমনই আবার ইংরেজী সম্বন্ধেও তাহাদের কাজ চালানর মত জ্ঞান থাকিতে হইবে, যাহাতে তাহারা ইংরেজী ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতা অনুধাবন করিতে পারে। গত বছর মুখ্যমন্ত্রী-সম্মেলনে যেসব সুপারিশ করা হয় পরিষদ তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলেন যে, হিন্দী ও ইংরেজী শিক্ষার মান উন্নত করিতে হইবে এবং স্কুল ও কলেজে উহার উচ্চ মান রক্ষা করিতে হইবে।

পরিষদের এই বৈঠকে কতিপয় সদস্য বলেন যে, বিভেদ সৃষ্টিকারী শক্তির বিরুদ্ধতা করিয়া এবং উত্তেজনা বিরোধ ও বিসম্বাদ সৃষ্টিকারী ঘটনাবলী প্রকাশে দায়িত্ব-জ্ঞান এ সংযমের পরিচয় দিয়া সংবাদ জাতীয় ঐক্য ও সংহতিসাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। তথ্য ও প্রচার দপ্তরের সহযোগিতায় পরিষদের উদ্যোগে সংবাদপত্রের আচরণবিধির যে খসড়া প্রণয়ন করা হইয়াছে আজকার বৈঠকে তাহা লইয়া আলোচনা করা হয় এবং পরিষদ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই খসড়া-আচরণবিধি সংবাদপত্রসমূহ গ্রহণ করিতে পারেন। প্রেস কমিশন যে সাত দফা আচরণবিধি সুপারিশ করিয়াছেন তাহার স্থলে এই খসড়া-আচরণবিধিতে আট দফা সুপারিশ করা হইয়াছে।

জাতীয় সঙ্গতি পরিষদ সংবাদপত্রের আচরণবিধির যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহা হইতেছে :

(১) সংবাদপত্রকে জনগণের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির মনোভাব বাড়াইয়া তোলা, তাহাদের মধ্যে জাতির প্রতি আনুগত্য এবং এক জাতীয়তার মনোবৃত্তি সৃষ্টির সমস্ত প্রকার সক্রিয় ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) জাতি, সম্প্রদায়, ধর্ম্ম, অঞ্চল এবং ভাষাগত মনোভাবকে জাতীয় স্বার্থের ঊর্দ্ধে সংবাদপত্রগুলি যেন কখনই স্থান না দেন।

(৩) দেশবাসীর পরস্পরের মধ্যে উত্তেজনা অথবা দেশের মধ্যে বিভেদ-সৃষ্টিকারী কোন ব্যক্তি, দল অথবা গোষ্ঠীর কোন প্রচেষ্টাকেই ক্ষমার চক্ষে দেখা সংবাদপত্রের পক্ষে উচিত হইবে না।

(৪) হিংসাত্মক কার্য্যকলাপে উস্কানিদান অথবা বিরোধ মীমাংসার পন্থা হিসাবে হিংসাত্মক নীতি অবলম্বনের পক্ষে প্রচারকার্য্য হইতে সংবাদপত্রকে সর্ব্বদা বিরত থাকিতে হইবে।

(৫) ভিত্তিহীন সংবাদ এবং সে সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্যে ভ্রম সংশোধন সংবাদপত্রকে করিতে হইবে।

(৬) যেসব অসমর্থিত সংবাদে উত্তেজনা ও বিভেদ সৃষ্টির অংশ আছে তাহার প্রকাশ স্থগিত রাখিতে হইবে।

(৭) এই ধরনের সংবাদ ফলাও করিয়া প্রকাশ না করাই বাঞ্ছনীয়।

(৮) জাতির অগ্রগতি এবং ঐক্যের সহায়ক সংবাদ-সমূহ ভালভাবে প্রকাশ ও প্রচার করিতে হইবে।

এই সকল নির্দ্দেশ ও সুপারিশে যে নীতিগত ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে সে সবই সমর্থনযোগ্য এবং আচরণীয়ও সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহা প্রয়োজন সে পদার্থটি এই সকল আলোচনা, বিবেচনা, উপদেশ, নির্দ্দেশ, সুপারিশ, ইত্যাদি, ইত্যাদি হইতে সযত্নে বিবর্জ্জিত হইয়াছে। সেইটি হইল স্বার্থচিন্তার এবং স্বার্থবিজড়িত কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে দৃঢ় বিধিনির্দ্দেশ।

আসামের জঘন্য "বঙ্গাল খেদা" ব্যাপারে যাহা ঘটিয়াছে এবং আসামের কয়েকটি সংবাদপত্রে যেভাবে নীচতার নির্লজ্জ সমর্থন দিয়াছিল সেরূপ ক্ষেত্রে কি করা হইবে সে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণই রহিয়া গেল। যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়, সংবাদপত্র ইত্যাদিকে এইরূপ

বিনামূল্যে উপদেশ, নির্দ্দেশ কারণে-অকারণে দিয়া থাকেন সেই মহাপ্রাণ মহোদয়গণকে আমরা সানুনয় অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে নিজেদের হৃদয়মনের দুয়ার খুলিয়া নিজেদের অন্তরকে নিরাময় করুন।

পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা

সংবাদপত্রে যে সমস্ত মন্তব্য ও তথ্য প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে মনে হয় যে, পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী শিল্পযোজনায় প্রধান অন্তরায় দুইটি, বিদ্যুৎশক্তির অভাব ও পরিবহন ব্যবস্থায় অসম্ভব অনটন। পরিবহন ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছুদিন পূর্ব্বে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার্স অফ কমার্সের তৎকালীন সভাপতি তাঁহার বিদায় অভিভাষণে বলিয়াছিলেন যে, যদিও পশ্চিমবঙ্গ কয়লা ও লৌহ-ইস্পাত উৎপাদনের অন্যতম কেন্দ্র, তথাপি রেল-পরিবহনের বিপরীত ব্যবস্থায় এখানের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির কাজ ঐ দুই বস্তুর অভাবে বিষম ভাবে ব্যাহত হইতেছে।

আমরা জানি যে, রেলদপ্তর মালবাহী গাড়ী ও ইঞ্জিন ইত্যাদির অভাবে সকল দিকের চাহিদা সমান ভাবে মিটাইতে অসমর্থ। কিন্তু পরিকল্পনা, শিল্পযোজনা ইত্যাদিতে একটা সাধারণ নিয়ম যে, যদি কোনও উপকরণ বা কোনও ব্যবস্থায় চাহিদা অনুযায়ী যোগান না থাকে, তবে যে ভাবে ও যে ক্ষেত্রে সেই উপকরণ প্রয়োগ করিলে সামগ্রিক ভাবে (অর্থাৎ সমস্ত দেশের হিসাবে) উৎপাদন সর্ব্বাধিক হইবে, সেই ভাবেই তাহা বণ্টন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে মালগাড়ীর যোগান বিষয়ে কি এই নিয়ম অনুসারে ব্যবস্থা হইতেছে? সভাপতি মহাশয়ের ভাষণে সেরূপ হইতেছে না বলিয়াই বুঝা যায়।

সম্প্রতি বৈদ্যুতিক-শক্তির সরবরাহ লইয়া যে গোলযোগ চলিতেছে তাহা সর্ব্বজনবিদিত। কলিকাতা নগরের সাধারণজনে যে পাখা-বাতি, রন্ধন, তাপ-নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদিতে বিদ্যুৎ-শক্তি ব্যবহার করে সেখানেও চাপের (voltage) বিপর্য্যয় এত বেশী হইয়াছে যে, অনেক ক্ষেত্রে মোটর ও অন্য যন্ত্রাদি বিকল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। কলকারখানায় ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ঐ বিপর্য্যয় দুই ভাবে দেখা দিয়াছে। প্রথমতঃ সরবরাহের অভাব এবং দ্বিতীয়তঃ বৈদ্যুতিক চাপের ব্যতিক্রম।

কিছুদিন পূর্ব্বে সরকারী দপ্তর হইতে বলা হইয়াছিল যে, আগামী ১৯৬৩ সনের শেষে, ব্যাণ্ডেলের বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র চালু হইলে পরে, এই বিদ্যুৎ-শক্তির অভাব দূর হইবে। কিন্তু সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, এখানের পরিসংখ্যান-বিশেষজ্ঞগণ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শ্রেণীর চারশতটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান অবস্থা এবং উহাদের তৃতীয় যোজনাকালীন উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ-পরিকল্পনাসকলের বিশদ ও ব্যাপক ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন যে, বিদ্যুতের চাহিদা মিটাইবার যে ব্যবস্থা বর্ত্তমানে করা হইয়াছে তাহা পূর্ণরূপে কার্য্যকরী হইলেও চাহিদার এক বিপুল অংশ অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

আশা করা যায় যে, সময় থাকিতে এই অভাব পূরণের চেষ্টা আরম্ভ করা হইবে। একদিকে পরিবহন ও অন্যদিকে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ—এই দুই ব্যবস্থা বিপর্য্যয় হইলে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পযোজনা শুধু ব্যাহত নয়, ব্যর্থও হইতে পারে। আধুনিক প্রথায় প্রত্যেকটি শিল্পের উৎপাদনক্রমের এক নিম্নতম সীমা আছে যাহার নীচে উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যের পড়তা ঠিক মত হয় না, অর্থাৎ বহির্জগতে সেই সকল দ্রব্যের সহিত এখানের সামঞ্জস্য থাকে না সুতরাং তাহার রপ্তানী সম্ভব হয় না। এবং দেশের ভিতরে বাহিরের পণ্য-আমদানী বন্ধ করিয়া "চড়া দরে খেলো মাল" বিক্রয়ের যে অপরূপ ব্যবস্থায় দেশবাসী বর্ত্তমানে ক্লিষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে সেই রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থা স্থায়ী হইতে বাধ্য।

বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ

একদিকে ব্যবস্থার অভাবে তৃতীয় পরিকল্পনার শিল্পযোজনা ব্যর্থ হওয়ার চিত্র আমরা দেখি পশ্চিমবঙ্গে, অন্যদিকে দেখি নয়াদিল্লী অভিনব ব্যবস্থা করিতেছেন সেই তৃতীয় পরিকল্পনার রুধির যোগাইবার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনে উদ্যত।

বিগত ৮ই জুন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই লোকসভায় ঘোষণা করেন যে, বৈদেশিক মুদ্রার অনটনের যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে, তাহার প্রতিকারে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। এই ব্যবস্থায় আমদানীর পরিমাণ আরও সঙ্কুচিত করা হইবে, এবং বিদেশ ভ্রমণও আরও কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে। অর্থাৎ ভারতীয় নাগরিকদিগের গলায় ফাঁস ও পায়ের বেড়ী আরও কঠোর ভাবে বন্ধন করা হইবে। তবে সেই সঙ্গে শ্রীদেশাই এই আশ্বাসও দিয়াছেন যে, বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল খালি হইলেও তৃতীয় পরিকল্পনার মন্থর গতি মন্থরতর হইবে না বরঞ্চ উহা কিছু দ্রুতই হইবে। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে ভারতীয় নাগরিক আশা করিতে পারেন যে, তাঁহার প্রপৌত্রের আমলে এই অর্থনৈতিক রজ্জুর বন্ধন কিছু কম কঠোর হইতে পারে—

যদি না পরিকল্পনার ঠেলায় দেশের জনসাধারণের অস্তিত্বই বিপর্য্যস্ত হয়।

আমদানীনিয়ন্ত্রণের আওতায় সরকারী-বেসরকারী উভয় প্রকার আমদানীই পড়িবে। অর্থাৎ যে ভাবে কলিকাতা মহানগরীর ৬০ লক্ষ লোকের স্বাস্থ্য ও সঙ্গতিকে বিষম ভাবে বিপদগ্রস্ত করিয়া ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের পাম্প আমদানী ছয় বৎসর যাবৎ নিয়ন্ত্রণের দোহই দিয়া রোধ করা হইয়াছে, সেই কঠোর ভাব কঠোরতর করা হইবে এবং জনসাধারণের নিত্য-প্রয়োজনীয় নানা বস্তুর আমদানী আরও সঙ্কুচিত করিয়া চোরাকারবারের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করা হইবে। আর নিয়ন্ত্রিত করা হইবে বিদেশ যাত্রা। ঐ দুই বিষয়ে অর্থমন্ত্রীর বিবৃতি "যুগান্তর" সংক্ষেপে এইরূপে দিয়াছেন:

"সঙ্কল্পিত ব্যবস্থাগুলি সংক্ষেপে বর্ণনার পর শ্রীদেশাই বলেন, দেশের রপ্তানী বৃদ্ধির চেষ্টা দ্বিগুণ করা একান্ত আবশ্যক এবং রপ্তানী বৃদ্ধি করিতে হইলে সেইভাবে উৎপাদনের বুনিয়াদও গড়িয়া তুলিতে হইবে। আন্তর্জ্জাতিক লেন-দেনে আমাদের উদ্বৃত্ত তহবিল বৃদ্ধি করিয়া আবার পূর্ব্ব অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে কৃষিপণ্য উৎপাদনের একটি বড় ভূমিকা রহিয়াছে। দ্বিতীয় ব্যবস্থা হইল আমরা ইতোমধ্যে বাহির হইতে যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাইয়াছি, তাহা খুব তাড়াতাড়ি কাজে লাগানো। তৃতীয়তঃ, সরকারী খাতেই হউক আর বে-সরকারী খাতেই হউক বিদেশী পণ্য আমদানীর জন্য অবাধে বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা ব্যবহারের যে অনুমতি এখন দেওয়া হইতেছে, তাহা আরও ছাঁটাই করিতে হইবে।

চোরাগলি দিয়া বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা পাচার হইয়া যাওয়ার প্রবণতার প্রতি অর্থমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার এই অবৈধ নির্গমন পথ বন্ধ করিতে হইবে।

যে সকল বিদেশ যাত্রার জন্য সাধারণতঃ বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা মঞ্জুর করা হয় না, শ্রীদেশাই সেগুলিকে এই শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত করেন। তিনি বলেন যে, বেশ কিছু বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের জন্য ব্যবসায় ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশ গমন আরও নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। সকল প্রকার চোরাই চালান বন্ধ করীর জন্য ক্ষিপ্র ব্যবস্থা অবলম্বনের কথাও বিবেচিত হইতেছে।

শ্রীদেশাই বলেন যে, আমদানী আরও হ্রাস করার জন্য এই সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর এবং বাঞ্ছনীয়ও বটে।

শ্রীদেশাই বলেন, আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণের কাজে দৃঢ় পদে ও আস্থার মনোভাব লইয়া অগ্রসর হইতে হইলে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিলকে স্বাভাবিক অবস্থায় আবার লইয়া যাইতে হইবে এবং সেজন্য আগামী বৎসরগুলিতে আমাদেরও সামাজিক শৃঙ্খলা ও সঙ্গতির আরও বেশী প্রয়োজন। প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে এমন একটা সময় আসে, যখন গৌরব-জনক উচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়।"

শ্রীদেশাই প্রমুখাৎ মন্ত্রীমহাশয়দিগের লক্ষ্য অত্যুচ্চ সন্দেহ নাই কিন্তু নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে চোরাকারবার যদি এরূপ ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত না থাকিত এবং টাকার চেষ্টায় জনসাধারণের হিত সম্পর্কে চিন্তা এইভাবে বিসর্জ্জন না দেওয়া হইত তবে বলিতে পারিতাম যে ঐ লক্ষ্য "গৌরব-জনক"। জনশিক্ষা, জনকল্যাণ, জনমঙ্গল এই সকল গালভরা শব্দ ত মন্ত্রীমহাশয়গণ কারণে-অকারণে উচ্চ-কণ্ঠে উচ্চারণ করেন, আমাদের কি বুঝিতে হইবে যে আমাদের প্রতারিত করিবার মহৎ উদ্দেশ্যেই ঐ শ্রুতিমধুর মিথ্যাগুলি প্রয়োগ করা হয়?

শ্রীমোরারজী দেশাই শিক্ষামন্ত্রী নহেন এবং সম্ভবতঃ তিনি শিক্ষার জন্য বিদেশ যাত্রার প্রয়োজন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কিন্তু ঐ শিক্ষার জন্য বিদেশ যাত্রায় নূতন প্রতিবন্ধক আরোপণ করার পূর্ব্বে শিক্ষা-মন্ত্রীর সঙ্গে তিনি কি কোনও আলোচনা করিয়াছেন? এই বিদেশে শিক্ষালাভ আরও বিস্তৃত না করিলে শ্রীদেশাইয়ের "উচ্চ লক্ষ্য" শুধু পরিকল্পনার আকাশকুসুম হইয়াই থাকিবে, এ কথা যদি কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর শ্রীদেশাইকে না বুঝাইতে পারে, তবে বুঝিব যে সেই দপ্তর মৌলানার মৃত্যুর পরেও পূর্ব্ববৎ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াই আছে।

মন্ত্রীমহাশয়ের উদ্দেশ্য মহৎ এবং তাঁহার কার্য্যকলাপ ও ব্যবস্থা এতই উচ্চকোটির যে, তাহাতে জনসাধারণের মঙ্গল চিন্তার ন্যায় অবান্তর প্রশ্নের অবকাশই থাকে না। কিন্তু যে উচ্চ লক্ষ্যের কথা তিনি শুনাইয়াছেন তাহা কোন্ পথে কি ভাবে ও কবে কাহারও পক্ষে পৌঁছান সম্ভবপর হইবে সে বিষয়ে ত কিছুই শুনিলাম না। আপাত-দৃষ্টিতে যাহা দেখিতেছি এবং এতদিন দেখিয়া আসিতেছি তাহাতে শুধু একটি ইংরেজী প্রবাদবাক্যের সার্থকতাই অনুভব করিতেছি। সেই প্রবাদে বলে "The road to Hell is paved with Good Intentions" অর্থাৎ কি না "নরক যাত্রার পথ মহৎ উদ্দেশ্যেই সুগম হয়।"

যদি কেহ বিশ্বাস না করেন তবে তিনি যেন কলিকাতা নগরের অবস্থা নিরীক্ষণ করেন। চতুর্দ্দিকে মহৎ উদ্দেশ্য ও মহান পরিকল্পনায় পরিবেষ্টিত হওয়ায় এই মহানগরী কি ভাবে মহানরকে পরিণত হইতেছে দেখিলেই ঐ প্রবাদের সার্থকতা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইবেই।

সংবাদপত্র খুলিলেই দেখি যে, কেন্দ্রীয় কোন না কোনও দপ্তরে দশ-বিশ লক্ষ বা দু-দশ কোটি মুদ্রার অপচয় বা অপব্যয়ের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন লিখিবার সময় দেখি যে প্রতিরক্ষা বিভাগের ৬২ সনের অডিট রিপোর্টে ঐরূপ "চাঞ্চল্যকর তথ্য" রহিয়াছে। এগুলির বিষয়ে মন্ত্রীমণ্ডল তুরীয়ভাব অবলম্বন করেন, যত আক্রোশ শিক্ষার উপর। আমাদের প্রশ্ন এই যে, শিক্ষার জন্য বিদেশ যাত্রায় ভারতে অর্জ্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সবসুদ্ধ বাৎসরিক ব্যয়ের পরিমাণ কি? ভারতে অর্জ্জিত বৈদেশিক মুদ্রার কথা বলিতেছি এই কারণে যে, বৈদেশিক বৃত্তি বা বিদেশে কোনও বিশেষ বিষয়ে ব্যবহারিক শিক্ষালাভের বৈদেশিক ব্যবস্থায় আমাদের দেশের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিলে কোন বিশেষ টান পড়ার কথা নাই। এবং আমাদের জিজ্ঞাস্য এই কথাও যে, কেন্দ্রীয় দপ্তরগুলিতে যে বৈদেশিক মুদ্রা অপচয়ের বৃত্তান্ত পাওয়া যায় তাহা শিক্ষাব্যয়ের সঙ্গে তুলনীয় কি?

কংগ্রেসের নূতন সভাপতি

বিগত ৬ই জুন, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকরী সভার এক বিশেষ অধিবেশনে অন্ধ্র প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসঞ্জীবায়া কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নির্ব্বাচনে কোনও গোলযোগ হয় নাই বলা বাহুল্য, কেননা রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়া বনবাসের সামিল গণ্য করা হয়। রাষ্ট্র চালনায় বা শাসনতন্ত্র পরিচালনায় যে "রুটি ও মৎস্য"—অর্থাৎ ক্ষমতার হিসাবে বা নগদ মূল্যের ওজনে—প্রাপ্তি প্রায় শতকরা নিরানব্বই জন অধিকারীর জোটে, এবং কংগ্রেসের অন্য অধিকারিবর্গেরও ভাগ্যক্রমে আসিয়া থাকে, কংগ্রেস সভাপতির কপালে তাহার কোনও কিছুই থাকে না। সুতরাং এই নির্ব্বাচনে প্রতিযোগিতার কোন প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীসঞ্জীবায়ার বয়স চল্লিশ বৎসরের মত, এবং তিনি হরিজন শ্রেণীর। এই দুই হিসাবেই তিনি কংগ্রেস সভাপতিত্বের আসনে কিছু নূতনত্ব আনিতেছেন। আশা করা যায় কর্ম্মক্ষেত্রেও তিনি নূতন দৃষ্টিভঙ্গির কিছু পরিচয় দিতে সমর্থ হইবেন, কেননা তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

ভারতে কংগ্রেস শাসনতন্ত্র অধিকার করার পর কংগ্রেসের দ্রুত অবনতি হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, কংগ্রেসের অধিনায়কগণ ব্যক্তিগত স্বার্থের তাড়নায় রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের যূপকাষ্ঠে বাঁধিয়া প্রায় সকল প্রাচীন নীতি ও আদর্শকে বলিদান করিয়াছেন। কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের বক্তৃতা প্রধান বা অন্য পরাক্রান্ত মন্ত্রীর প্রতিধ্বনিমাত্র এবং কংগ্রেস অধিবেশনের একমাত্র সার্থকতা কংগ্রেস অধিকারিবর্গের পদলেহনে স্বার্থান্ধ চাটুকারবর্গের কৌশল ও পটুত্ব প্রদর্শন এবং কংগ্রেস অধিকারবর্গের আত্ম-বিজ্ঞাপন। কংগ্রেসের সভাপতিত্বের সার্থকতা সামান্যই।

সে যাই হউক বিদায়ী সভাপতি শ্রীনীলম সঞ্জীব রেড্ডি, যিনি পুনর্ব্বার অন্ধ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, কংগ্রেসের সভাপতিরূপে কিছু স্বাধীন চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন এবং যদিও তাঁহার সাক্ষাৎভাবে কোনও কিছু করিবার ক্ষমতা ছিল না, তথাপি দুই-এক সময়ে কংগ্রেসের কুচক্রীদিগের বিরুদ্ধে তিনি স্পষ্ট মতামত জানাইয়া কিছু প্রতিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শ্রীসঞ্জীবায়া সেই অন্ধ্র দেশেরই মুখ্যমন্ত্রীর আসন ছাড়িয়া কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করিতে আসিয়াছেন। আশা করা যায় তিনিও কিছু স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিতে সক্ষম হইবেন।

কংগ্রেসে নীতিজ্ঞানের নূতন সংজ্ঞা

বিগত ৫ই জুন নয়া দিল্লী হইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি রচিত একটি নোট প্রকাশিত হয়। ঐ নোটে "এক শ্রেণীর" কংগ্রেস-কর্ম্মীর মধ্যে "ঘোরতর শৃঙ্খলাহীনতা" কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, বিগত নির্ব্বাচনের সময় ঐরূপ শৃঙ্খলাহীনতার কারণে নয় শতাধিক কংগ্রেস-সদস্য কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি নাকি এই ব্যাপারে "দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও অসুবিধার সম্মুখীন" হইয়া পড়িয়াছেন এবং ঐরূপ কার্য্যকলাপকে "নীচাশয়তা" ও "হীনমনোভাবসূচক শৃঙ্খলাহীনতা" আখ্যা দিয়াছেন। উপরন্তু কংগ্রেসকমিটি জানাইয়াছেন যে, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিসমূহ ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এইরূপ "ঘোরতর" শৃঙ্খলাভঙ্গে বিচলিত হইয়া সাধারণ নির্ব্বাচন চলিবার সময়েই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

কতকক্ষেত্রে এইরূপ গুরুতর অপরাধের বিষয়ে নির্ব্বাচনের পরে বিবিধ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি নানা

ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং ঐরূপ শৃঙ্খলাভঙ্গের বহু ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত প্রয়োজন এইরূপ জানাইয়াছেন।

আমরা আশ্চর্য্য হই যে, সারা ভারতে যে অনাচার ও দুর্নীতির প্লাবন কংগ্রেসের নামে তাহার অনুচরবর্গ চালাইতেছে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইতেছেন না, যত দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা কি শুধু এই নির্ব্বাচন-ঘটিত শৃঙ্খলাহীনতার কারণে? যাহাই হউক, এতদিনে আমরা বুঝিলাম যে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ন্যায়ধর্ম্ম ও নীতি সম্পর্কে অভিনব নূতন মান স্থাপনে চেষ্টিত হইয়াছেন। বোধ হয় অনাচার ও দুর্নীতি বলিতে পূর্ব্বদিনে—অর্থাৎ কংগ্রেসী সহজিয়া ও পরকীয়াবাদ সরকারী ধর্ম্মনীতি রূপে প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে যাহা বুঝাইত, কংগ্রেসী মনোবিদ্যাবিশারদগণ সে সকলকে উচ্চাঙ্গের যাদুকরী বিদ্যার অন্তর্গত করিয়াছেন। এখন "হীনমনোভাব" ও নিশ্চয়তা বুঝায় শুধু সেই ক্ষেত্রে যেখানে "পালের গোদার" নির্দ্দেশ অমান্য বা অগ্রাহ্য করিয়া কোনও অনুচর নিজ স্বার্থপূরণের কংগ্রেস-নির্দ্দিষ্ট পথ ছাড়িয়া অন্য পথ দেখে। অবশ্য সেই অনুচরবর্গ যদি একজোটে প্রবল হইয়া উঠে তবে তাহাদের নেতৃত্বেবরণ ভিন্ন অন্য কোন উপায় থাকে না—যেমন হইয়াছে উত্তরপ্রদেশে।

শৃঙ্খলাহীনতার প্রশ্ন ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্য্যের অভিযোগ সম্পর্কে এক তদন্ত কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। দেখা যাউক ঐ কমিটির সদস্যবৃন্দ অন্তর্ঘাত ও নীচাশয়তা ইত্যাদির কোন্ নূতন সংজ্ঞা আবিষ্কার করেন। মহাত্মা গান্ধী কি সাধে বলিয়াছিলেন যে, শাসনতন্ত্র অধিকার করার পর কংগ্রেস নাম তুলিয়া দেওয়া হউক।

ভারতে ইংরাজী ভাষার স্থান

ইংরাজী ভাষা বহিষ্করণের জন্য ভারতে দুই প্রকার আন্দোলন বর্ত্তমানে চলিতেছে। প্রথমটি, হিন্দীভাষাভাষী এবং হিন্দীভাষায় পটু যাঁহারা সেরূপ একদলের চেষ্টায় সজোরে চালিত হইয়াছে। যে ভাবে উহা চালিত হইয়াছে তাহাতে ঐ আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্য অতি সহজভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। উদ্দেশ্য শুধু এই যে, সকল সরকারী এবং অসংখ্য বে-সরকারী কাজে ও ব্যাপারে, হিন্দীভাষায় অধিকার থাকার দরুণ, অন্যায় অগ্রাধিকার ও আধিপত্য লাভের নিশ্চয়তা। হিন্দী যাঁহাদের মাতৃভাষা বা যাঁহাদের মাতৃভাষার লিখনে দেবনাগরী অক্ষর ব্যবহৃত হয়—যথা মাগধী, মৈথিলী, মারাঠি ও পাঞ্জাবী—তাঁহাদের পক্ষে হিন্দীভাষা ব্যবহার সহজ ও সরল হইবে। অন্যদিকে যাঁহাদের মাতৃভাষা হিন্দী নয় এবং মাতৃভাষার লিখনে দেবনাগরী অক্ষরের ব্যবহার নাই তাঁহাদের পক্ষে ঐ ভাষা শিক্ষা, বিদেশী ভাষার ন্যায়, আয়াসসাধ্য এবং পটুত্বলাভ সময়সাপেক্ষ। উপরন্তু বর্ত্তমানে কয়েকজন হিন্দী বিদ্যাদিগ্‌গজের চেষ্টায় হিন্দীতে নানা কৃত্রিম ও নানা নূতন বা প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দের এবং সেই সঙ্গে নূতন ভাবের অব্যয় প্রত্যয় ইত্যাদির ব্যবহার চলিতেছে। হিন্দীভাষা শিখিতে হইলে শিক্ষকের নিজ অভিরুচি অনুযায়ী ঐ সকলের ব্যবহার বা বিবর্জ্জন শিখিতে হয়। উপরন্তু শিক্ষকের আদি নিবাস অনুযায়ী সেখানের স্থানীয় ভাষার ব্যবহারও অনেক ক্ষেত্রে আসিয়া যায় যাহার মধ্যে অনেক কিছু অন্য অঞ্চলের হিন্দীবিশারদগণের মতে অশুদ্ধ বা অস্পষ্ট। সুতরাং ভিন্ন ভাষাভাষীর পক্ষে হিন্দী শিক্ষা এখনও সহজ নয়। হিন্দীর এখন রূপান্তর চলিতেছে, যেমন বাংলার ক্ষেত্রে হইয়াছিল বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের আমলে। তবে হিন্দীভাষায় এখনও কোনও বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমচন্দ্র দেখা দেন নাই। দীর্ঘদিনের উপেক্ষা ও চর্চ্চার অভাবে হিন্দী নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল, এখন তাহাকে সার্ব্বভৌম প্রতিষ্ঠা দেবার প্রবল চেষ্টায় এই সকল নব রূপান্তর চলিতেছে, তাহার কোন্‌টি স্থায়ী কোন্‌টি ক্ষণস্থায়ী তাহা বুঝিবার সময় এখনও আসে নাই।

অন্যদিকে ঐ উপেক্ষা ও চর্চ্চার অভাবে হিন্দী অনগ্রসর এবং ইংরাজীর স্থান অধিকারে অসমর্থ। এমনকি অন্য দুই-একটি ভারতীয় ভাষা অপেক্ষাও উহার অবস্থা অসম্পূর্ণ ও অচল এবং ঐ কারণে "হিন্দী বোলো" চীৎকারের প্রতিক্রিয়াও দেখা দিয়াছে নানা স্থলে!

অন্যদিকে সংবিধানকার মহাশয়গণ এই সমস্ত কথা কোনও বিশদ আলোচনা বা বিচার না করিয়াই ভারতের শাসনতন্ত্রের ৩৪৩ (১) অনুচ্ছেদে বিধান দিয়াছেন যে, দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী ভাষা ভারতের সরকারী ভাষা হইবে। অবশ্য তাহার পর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া প্রথমতঃ তাঁহারা ৩৪৩ (২) অনুচ্ছেদে বিধান দেন যে (১) অনুচ্ছেদে যাহাই উল্লিখিত হউক না কেন, নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের পর হইতে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত ইংরাজী ভারতের সরকারী ভাষারূপে ব্যবহৃত হইবে। এবং ৩৪৩ (৩) অনুচ্ছেদে ঐ পনের বৎসর অতিক্রান্ত হইলেও ইংরাজীকে সরকারী ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা পার্লামেণ্টকে দেওয়া হইয়াছে। ঐ ১৫ বৎসর শেষ হইবে ১৯৬৫ সালে, যখন ভারতের রাষ্ট্রভাষাসমস্যা সঙ্গীন হইবে।

বিগত ৬ই জুন আনন্দবাজার পত্রিকা নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রকাশ করেন :—

নয়াদিল্লি, ৫ই জুন—১৯৬৫ সনের পর হিন্দী ভারতের একমাত্র সরকারী ভাষা হিসাবে গণ্য হইবে না। সেই সঙ্গে ইংরেজীও অন্যতম সরকারী ভাষা হিসাবে চলিতে থাকিবে।

ভারতের শাসনতন্ত্রে এইরূপ বিধান আছে যে, ১৯৬৫ সনের পর হইতে হিন্দীই ভারতের একমাত্র সরকারী ভাষা হইবে।

হিন্দীভাষী অঞ্চলে দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলির অনুশীলন সম্পর্কে শ্রী এইচ বি কামাথের কয়েকটি অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী উল্লিখিত বিষয়ের সমর্থনে আজ যথেষ্ট ইঙ্গিত দেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, প্রধানমন্ত্রী ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, সহকারী ভাষা হিসাবে ইংরাজী চলিতে থাকিবে। এবং ইংরাজীকে সহকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতিদানের জন্য তিনি লোকসভায় একটি বিল উত্থাপিত করিবেন। শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত তারিখের পর সরকারী ভাষা হিসাবে হিন্দী অবশ্যই প্রবর্ত্তিত হইবে। কিন্তু তাঁহারা ঐ তারিখ হইতে হিন্দীকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রবর্ত্তন করিতে পারিবেন না।

এই আইন প্রণয়ন ও গৃহীত হইবার পরও সরকারী কাজে ভাষা বিপর্যয়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, অবশ্য ইহা না করিলে অবস্থা আরও আশঙ্কাজনক হইত।

অন্য যে ক্ষেত্রে ইংরাজী বহিষ্কারের চেষ্টা চলিতেছে তাহা শিক্ষার উচ্চ ও উচ্চতম স্তরে। এখানে যাঁহারা উদ্যোগী তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক ইত্যাদি আছেন, যাঁহাদের মধ্যে একজন বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন। ইঁহাদের মতে এখনই শিক্ষার সকল স্তরে মাতৃভাষার প্রচলন করিয়া ইংরাজীকে বিদায় দেওয়া উচিত।

আমরা আশ্চর্য্য হই যে, এইসকল মহাপণ্ডিত লোক কোনও অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া এরূপ আন্দোলনে যোগদান করেন কিরূপে। ইংরাজীর পরিবর্ত্তে বাংলায় সম্পূর্ণভাবে শিক্ষা দিতে হইলে শিক্ষক, অধ্যাপকদিগকেও ঐ বিষয়ে নূতন শিক্ষাগ্রহণ করিতে হইবে এবং পড়াইবার জন্য পুস্তকাদি লিখাইতে হইবে। না হইলে তাঁহারা পড়াইবেন কি, বলিবেন ও ব্যাখ্যা করিবেন কি ভাষায় এবং তাঁহাদের বক্তৃতা ও ব্যাখ্যা বুঝিবে কে ও কিরূপে? এবং সম্পূর্ণরূপে বাংলায় শিক্ষিত ছাত্র শিক্ষার পর অন্য প্রদেশে কি বলিবে বা করিবে?

পাকিস্থানে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ

করাচী হইতে প্রেরিত সংবাদে জানা যায় যে, বিগত ৭ই জুনের রাত্রে পাকিস্থান একটি দুই স্তরে বিভক্ত রকেট মহাকাশে ক্ষেপণ করিয়াছে। ঐ রকেটটি মার্কিন "নাইক" ক্ষেপণাস্ত্র, এবং যদিও পাকিস্থান কর্ত্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে, উহা আবহাওয়া-সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে কিন্তু ঐরূপ ক্ষেপণাস্ত্রে ব্যবহারিক শিক্ষালাভের ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে কি, সে বিষয়ে জগতের অন্য কাহারও কোন সন্দেহের অবকাশ নাই, একথা বলা যায় না। এ বিষয়ে অর্থাৎ প্রকৃত উদ্দেশ্য কি সে বিষয়ে—ঐ সংবাদের সঙ্গে প্রেরিত কূটনৈতিক মন্তব্য এইরূপ :

ক্রমান্বয়ে এ ধরনের আরও কয়েকটি রকেট উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা পাকিস্থানের রহিয়াছে। প্রথম রকেটটির নাম দেওয়া হইয়াছে "রেবার-এক।" ঘণ্টায় ২৪০০ মাইল বেগে উহা মহাকাশের প্রান্ত-সীমা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

রকেট উৎক্ষেপণের দ্বারা পাকিস্থান কেবলমাত্র মহাকাশ-যুগেই প্রবেশ করিল না—এশিয়ার বিভিন্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্র, বিশেষ করিয়া ভারতকে উত্যক্ত করিয়া তোলার একটি সুযোগও পাইল।

উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের সহিত পাকিস্থানের সম্পর্ক বর্ত্তমানে অতিশয় জটিল এক পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছে।

এখানকার কোন কোন কূটনীতিকের মতে রকেট উৎক্ষেপণের উদ্দেশ্য শান্তিপূর্ণ বলিয়া সরকারী ঘোষণা সত্ত্বেও মার্কিন জাতীয় মহাকাশ ও মহাকাশ-পরিক্রমা সংস্থা এ ভাবে রকেট ও তৎসংক্রান্ত ট্রেনিংয়ের সুযোগ দিয়া ভারত-পাকিস্থান সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নূতন ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার উদ্ভব করিলেন, যাহা শেষ পর্য্যন্ত অত্যাধুনিক অস্ত্রের ক্ষেত্রে অবস্থা পাকিস্থানেরই অনুকূল করিয়া তুলিয়া এ অঞ্চলের সামরিক ভারসাম্য বিনষ্ট করিয়া দিবে।

গত বৎসর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্থানকে এফ-১০৪ স্টার ফাইটার জঙ্গী বিমান সরবরাহ করিলে পর ভারতে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল—তৎসত্ত্বেও পেণ্টাগন বা মার্কিন সামরিক হেডকোয়ার্টার্স হইতে আকাশের দিকে ব্যবহারযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্রসহ অন্যান্য অতি-আধুনিক অস্ত্র পাকিস্থানকে সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সামরিক আইন প্রত্যাহারের মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে এবং নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর বিতর্কের মাত্র কয়েক দিন পূর্ব্বে যে রকেটটি আকাশের দিকে ছুঁড়িয়া দেওয়া হইল, এখানকার কূটনৈতিক মহল তাহাও লক্ষ্য করিয়াছেন।

মার্কিন পেন্টাগনের যুদ্ধবিশারদগণ কিউবাকে সোভিয়েটের কোলে তুলিয়া দিয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই দেখা যাইতেছে। যুদ্ধই যাহাদের একমাত্র লক্ষ্য তাহারা যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাইতে ব্যগ্র হইবে সে আর আশ্চর্য্য কি?

রাজনীতির অভিশাপ

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বহুবর্ষ ধরিয়া প্রাণপাত করিয়াও সর্ব্বস্ব হারাইয়া ভারতের অল্প সংখ্যক দেশভক্ত নরনারী যখন ব্রিটিশের সহিত সর্ত্ত করিয়া ভারতের বৃহত্তর অংশ স্বাধীন ভাবে শাসন করিবার অধিকার লাভ করিলেন, তখন সেই সকল দেশসেবকের সংখ্যালঘুত্বের সুযোগে বহুলোকে তাঁহাদিগের সহিত দল বাঁধিয়া রাজ্যশাসন কার্য্যে ঢুকিয়া পড়িল। ইহাদিগের পিছনে ছিল ভারতের বাজারের সুবিধাবাদী সুদখোরের দল ও অন্যায়-বাণিজ্যের মহারথিবৃন্দ। চাকুরি রক্ষা করিতে ব্যগ্র পূর্ব্বকালের ব্রিটিশ পদলেহনকারী উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারিগণও এই সময় হঠাৎ দেশভক্তি ও দেশনেতা-দিগের চাটুকারিতায় অকস্মাৎ পারগ হইয়া উঠিলেন। এমত অবস্থায় কংগ্রেসের দুই এক শত বুদ্ধিমান ও সাধু লোকের পক্ষে এই বিরাট্ দেশের শাসনকার্য্য সুশৃঙ্খলা ও ন্যায়ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়া চালান অসম্ভব হইয়া উঠিল। হয়ত, দেশের জনসাধারণের মধ্যে কংগ্রেস দলের বাহিরের যে সকল সৎ ও দেশভক্ত লোক ছিলেন, তাঁহাদিগকে ডাকিয়া লইলে, কংগ্রেস শাসনকার্য্য অন্যায় ও অধর্ম্মবর্জ্জিত ভাবে চালাইয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু কংগ্রেসের নেতাদিগের ও তাঁহাদিগের স্বার্থান্বেষী অনুচরবর্গের পক্ষে তাহা করা সম্ভব হয় নাই। ফলে কংগ্রেসের সহিত ব্রিটিশ যুগের ন্যায়জ্ঞানহীন রাজকর্ম্মচারী ও ব্রিটিশের দ্বারা দেশ শোষণে সুশিক্ষিত বাজারের জনশত্রু ধনিকগণ্ডির একটা সমভিব্যহারের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া গেল। অতঃপর কংগ্রেসের কিছু কিছু সাধু লোকও ধর্ম্মের পথ ছাড়িয়া অন্যায় ও অধর্ম্মের আশ্রয়ে নিজ স্বার্থসিদ্ধি করিতে নামিয়া পড়িলেন। এই সকল লোকের মধ্যে কর্ম্মশক্তিমান পুরুষও কিছু ছিলেন, যাঁহাদিগকে সঙ্গে না রাখিলে কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতাদিগের পক্ষে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে দলের সংগঠিত শক্তি রক্ষা করা সম্ভব হইত না। এই সকল অবস্থাবৈগুণ্যের ফলে কংগ্রেসের দেশ-শাসনের কার্য্য অচিরে শতকরা নব্বই ভাগ (বা ততোধিক) ব্যক্তিই অযোগ্য, অসৎ ও কর্ম্মে অপারগ হইয়া পড়িল। উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণও প্রধানতঃ অতি-বিশিষ্ট নেতা দিগকে খুশী রাখিতেই ব্যস্ত থাকিলেন ও অপরাপর ঘাটোয়ালবৃন্দ লুঠের বখরার হিসাবেই মশ্‌গুল হইয়া রহিয়া দেশের ও দেশবাসীর ভালমন্দের কথা ভাবিবার আর অবসর পাইলেন না। ভারতের জনসাধারণ দুইশত বর্ষের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধাক্কায় যে মানসিক অবসন্নতায় আচ্ছন্ন ছিলেন সে অবস্থায় তাঁহারা এই নূতন অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবেন, ইহা আশা করাই ভুল হইত। সুতরাং কংগ্রেস রাজত্বে অরাজকতা, অন্যায়, অধর্ম্ম, অবিচার, অবৈধ কারবার, উৎকোচ দান ও গ্রহণ ইত্যাদি ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিল, এবং দেশের প্রধান প্রধান নেতাগণ অপরাধে সাফাই গাহিয়াই দিন কাটাইতে আরম্ভ করিলেন।

"প্রবাসীর" ইতিহাসের সহিত ভারতের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাস ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। এই পত্রিকা ইহার ষাটবৎসরাধিক জীবনকালে ব্রিটিশের অন্যায় অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্রমাগতই প্রতিবাদ করিয়াছে ও সেই সকল অন্যায় প্রভৃতি প্রমাণও করিয়াছে। সুতরাং কংগ্রেসের বর্ত্তমান "নীতির"র প্রতিবাদ করাও আমরা প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি, এবং দেশের সুনাম ও দেশবাসীর সুযশ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বর্ত্তমান শাসন-ধারার আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক বলিয়া বোধ করি। বহুলোকেই দেশের অবস্থা বিচার করিয়া এই প্রকার সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু দেশের নেতৃস্থানীয় লোকেরা পুনর্ব্বার নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে জয় লাভ করিয়া অন্যায়ের দমন ভুলিয়া গতানুগতিকতা দোষে আরও জড়াইয়া পড়িতেছেন। ইহাই দুঃখের কথা।

"স্বাধীনতার" ক্রমবিকাশ

ভারতে যখন বৃটিশ সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন ভারতীয় সাধারণের রাজ দরবারের সাহায্যে কোনও প্রকার সুখ-সুবিধা লাভের সুযোগ ছিল না। যাহারা হাতজোড় করিয়া অথবা ব্রিটিশের দুষ্কর্ম্মের সহায়তা করিয়া রাজশক্তির আশ্রয়ে নিজ অবস্থার উন্নতি করিয়া লইতে পারিতেন, তাহাদিগের সংখ্যা অল্পই ছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে কিছু লোক ছলে ও কৌশলে বিশেষ উন্নতি করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই,

কিন্তু ভারতের জনসাধারণের অথবা যাহারা ব্রিটিশের বিরুদ্ধতায় নিযুক্ত ছিলেন; তাঁহাদিগের অবস্থা মনের ও দেশবাসীর শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে উচ্চে থাকিলেও অপর সকল ক্ষেত্রেই দুর্দ্দশাগ্রস্তই ছিল। ব্রিটিশ আমলের অবসানের নিকটকালে বহু লোকেই রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে সাঁচ্চা লোক অনেক ছিলেন কিন্তু মতলবী লোকও ছিলেন বহু সংখ্যক যাঁহারা নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রা সুগম হইবে ভাবিয়াই দেশসেবার অভিনয়ে নামিয়াছিলেন। কিছু ব্যবসাদারও এই সময়ে মহাত্মা গান্ধী ও অপরাপর দেশনেতাদিগকে অর্থ দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। আজ তাঁহারা সেই সকল দানের প্রতিদান হিসাবে ভারতের ব্যবসা ক্ষেত্রে বহু সুযোগ-সুবিধা একচেটিয়া করিয়া লইতে পারিয়াছেন। দেশভক্ত ও দেশসেবক যাঁহারা ছিলেন কংগ্রেস দলের সহিত ঘনিষ্ঠতার বন্ধনে বাঁধা; তাঁহারা "স্বাধীনতার লুঠের" কিছু কিছু ভাগ পাইয়াছেন। যাঁহারা যূথভ্রষ্টভাবে একাকী কিম্বা ছোট ছোট দল গড়িয়া লইয়া ব্রিটিশের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাঁহারা আজ কোথায়, তাহা বলা কঠিন। কেহ কেহ কংগ্রেস ব্যতীত অন্য অন্য রাষ্ট্রীয় দলে যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া যান নাই। অনেকে বর্ত্তমান স্বাধীন ভারতের রাজশক্তি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিবার প্রয়াসে নিযুক্ত। অনেকে আবার রাজনীতি ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু ভারতের যে বিরাট লোকসমাজ তাহার অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতার ফলে, তাহার আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই স্বাধীনতা সাধারণের বিশেষ সুবিধা ও সুযোগ লাভের কারণ হয় নাই। হইয়াছে মুষ্টিমেয় কিছু স্বার্থান্বেষী লোকের অতিরিক্ত ঐশ্বর্য্য যশ ও শক্তি সুবিধা লাভের কারণ। ইহাই কি আমাদিগের স্বাধীনতার আদর্শ ছিল? স্বাধীনতা অর্থে কি আমরা ব্যবসা ও কারবার বৃদ্ধির কথাই ভাবিতাম, না তাহার কোনও অপর ও গভীরতর অর্থ ছিল?

বর্ত্তমানে আমরা যাহা দেখি তাহাতে মনে হয় যে, স্বাধীনতার অর্থ জাতির সকল লোকের আমলাতন্ত্রের নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিবার "অধিকার" মাত্র। কারণ বর্ত্তমান ভারতে সকল মানুষের গৃহনির্ম্মাণ, বস্ত্র ও খাদ্য আহরণ, ঔষধ, শিক্ষা, বিদেশ ভ্রমণ, ব্যবসা ও কারবার চালনা, চাকুরি পাওয়া প্রভৃতি বিষয়ে পদে পদে আমলা রচিত বাধা অতিক্রম করিয়া ও আমলাদিগের অনুমতি লাভ করিয়া তবে নিজ নিজ অভিলাষ পূর্ণ করিতে হয়। বর্ত্তমানে আমলাতন্ত্রের রাজশক্তি ব্যবহারে নিয়মকানুনের ধাক্কায় কাহারও পক্ষে গৃহের জন্য সিমেন্ট, বস্ত্রবয়নের জন্য সুতা, রন্ধনের জন্য চিনি, চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত ঔষধ, শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রসারের জন্য মুদ্রণের উপকরণ কাগজ প্রভৃতি সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাঁহাদিগের কাজকারবারের জন্য বিদেশায় অথবা স্বদেশ-জাত মাল-মসলা প্রয়োজন হয় তাঁহারা অসহায় ভাবে "হায় লাইসেন্স, হায় পারমিট" করিয়া ঘুরিয়া মরিতেছেন। তাঁহাদিগের সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাওয়া কিম্বা তাঁহাদিগের কারবারে-নিযুক্ত শ্রমিকদের বেকার অবস্থার জন্য দায়ী ভারতের আমলারাজ।

বর্ত্তমান ভারতের রাষ্ট্র ও সমাজের বিলিব্যবস্থার রীতি-নীতি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে,কংগ্রেস সরকারের যাঁহারা নেতা তাঁহারাই দেশ ও সমাজের একচ্ছত্র অধিপতি এবং সকল সুযোগ-সুবিধা তাঁহাদিগের অনুচরদিগের জন্যই সুরক্ষিত ও একচেটিয়া করিয়া রাখা হইয়াছে। অপর যাঁহারা আছেন তাঁহাদিগের মধ্যে দুঃসাহসী ও দুর্দ্দান্ত চরিত্রের ব্যক্তিগণ চুরি, ডাকাতি, গুপ্তভাবে মাশুল না দিয়া মাল আমদানি, চোরাই মাল বিক্রয়, উৎকোচ দান করিয়া সুবিধা আহরণ প্রভৃতিতে নিযুক্ত থাকেন। অর্থাৎ সকল দিক দিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান ভারতে রাষ্ট্রীয় দলের চাটুকারিতা অথবা মিথ্যা ও অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত আর্থিক উন্নতির কোন পথ নাই। এই হীন অবস্থার নাম যদি সোসিয়ালিজম হয় তাহা হইলে সে সোসিয়ালিজম বড়ই ঘৃণ্য প্রতিষ্ঠান। এখন দেখা যাউক, প্রথমতঃ যে কাহারা এই বিরাট্ শাসন প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ এই দেশ ও প্রদেশের রাজতন্ত্রগুলি চালাইতেছেন। এই কার্য্যের মূলে রহিয়াছে কংগ্রেস ও তাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাযুক্ত কম্যুনিষ্ট ও অপরাপর "বাম"পন্থী রাষ্ট্রীয় দলগুলি। ইঁহারা ভারতীয় জনসাধারণকে বুঝাইয়াছেন যে, তাঁহারাই রাষ্ট্রের মালিক ও তাঁহারা ভোট দিয়া যাহাকে রাজকার্য্যে বসাইতে ইচ্ছা করিবে সেইই লোকসভা, বিধান সভা প্রভৃতি অলঙ্কৃত করিয়া দেশ শাসনের কাজ করিতে পারিবে। গতানুগতিক ভাবে রাজকার্য্য চলিতে থাকে, সকল অন্যায় ও অধর্ম্মকে একপ্রকার মানিয়া লইয়া, দেশবাসী নিঃস্ব ও অসহায় অবস্থায় ক্রমশঃ দুর্দ্দশার অতলে যাইয়া পড়িতেছেন। দলের লোকে যত বড়ই

হ'ক না কেন তাহার ত কোন শাস্তি হয়ই না, উপরন্তু তাহাদিগকে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া বারে বারে কর্ম্মে নিযুক্ত করা হয়। দলের লোক যত বড়ই নিষ্কর্ম্মা ও নির্ব্বোধ হউক না কেন, তাহাকে বারে বারে মন্ত্রীত্বে অথবা অপর কোন উচ্চ আসনে বসাইতেই হইবে। এই যে নিয়োগ ও উচ্চাসনে স্থাপনের পদ্ধতি ইহার তুলনায় পরিবারগত জমিদারী ও রাজা মহারাজার রাজত্ব কোনও অংশে নিকৃষ্ট ছিল না। পূর্ব্বকালে বংশানুক্রমিক ভাবে পাগলেও রাজা হইতে পারিত। নির্ব্বোধ ও অধার্ম্মিক তো হইতই। এখন প্রায় শতবর্ষ ধরিয়া স্বাধীনতা, ন্যায় ও ধর্ম্মের কথা আওড়াইয়া যদি আমরা আবার সেই গর্হিত ও ঘৃণ্য "অভিজাত" বাদেরই আর একটি অধিকতর অপরিষ্কার ও কৌলিন্য-বর্জ্জিত সংস্করণ সমাজের স্কন্ধে স্থাপন করি তাহা হইলে আমাদিগের উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারতের বাসিন্দাগণ আমাদিগকে স্মরণ করিয়া যে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে নির্ব্বাচনপদ্ধতির ফলে দেশের সর্ব্বাপেক্ষা অকর্ম্মা, অশিক্ষিত ও অধার্ম্মিকদিগের দ্বারা দেশ-শাসনকার্য্য চালিত হইতে পারে সে পদ্ধতির মূল্য বিচার করাও প্রয়োজন। স্বাধীনতা ও মুক্তির হাওয়া যে দেশে বহিতে পারে না আমলা-গঠিত নিয়মের প্রাকার অতিক্রম করিয়া, এবং যে দেশে অন্যায় ও অধর্ম্ম ব্যতীত সাধুভাবে কেহ কোনও কিছু করিতে পারে না, এবং যে দেশে চাটুকারিতা ও দুষ্টের সহায়তা না করিয়া কাহারও পক্ষে কোনও কিছু করা বা পাওয়া সম্ভব নহে; সেই দেশে স্বাধীনতা আছে, ইহা উচ্চকণ্ঠে কে প্রচার করিবে? শুধু সেই করিবে যাহার এই পাকাপরিস্থিতিতে লাভের সম্ভাবনা ও আমদানি আছে।

কংগ্রেসের ভারতে রাজত্ব, জমিদারী অথবা "গদি" পুনঃস্থাপন করিবার যে প্রচেষ্টা ও আমলাবর্গের হস্তে ভারতবাসীকে বিনা সর্ত্তে সমর্পণ করিয়া দিবার যে মহাপাপ, তাহার জন্য কংগ্রেসের নেতাগণই প্রধানত দায়ী। কিন্তু তথাকথিত বামপন্থিগণও ইহার জন্য দায়ী। কেননা তাঁহারা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয়-পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিতে সেরূপ কোনও আপত্তি জানান নাই যাহা হইতে মনে হইতে পারে যে তাঁহারা উক্ত পন্থাকে অন্যায়, অধর্ম্ম ও পাপপ্রবৃত্তি-সহায়ক বলিয়া মনে করেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যদি কোন বিরুদ্ধ-দলের সাহায্যে ভারতের ন্যায় ও ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব করিতে হয়, তাহা হইলে সে দল গঠিত হওয়া প্রয়োজন। যে সকল দল আছে সেগুলি কংগ্রেসের প্রতিযোগিতা করিলেও সকলেরই অন্তরের ভাব ও রাষ্ট্রীয় অভিলাষ একই। অর্থাৎ দেশবাসীকে দমন দলন ও শোষণ করিয়া নিজ নিজ দলের প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করা। স্বাধীনতার অর্থ বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ভারতের জনসাধারণ পুনর্ব্বার স্বাধীনতাসংগ্রামে নিযুক্ত হইলে তাহাতে কেহ গভীর আপত্তি জানাইতে পারেন না। অ

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ৯৮তম জন্ম-বার্ষিকী

গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ৯৮তম জন্ম-বার্ষিকী উৎসব আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবাসী অফিসে সম্পন্ন হইয়া গেল। এই সভায় পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন ডঃ উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল। সভায় অনেকেই উপস্থিত ছিলেন—সাহিত্যিক, সাংবাদিকগণও উপস্থিত হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত বানারসী দাস চতুর্ব্বেদী, ডঃ কালিদাস নাগ এবং দেবজ্যোতি বর্ম্মণ প্রভৃতি তাঁহাদের বক্তৃতায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কথা বলিয়াছেন। দেবজ্যোতি-বাবু বলিলেন, 'শুধু সাংবাদিকতা নয়, ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসের অর্দ্ধশতাব্দীর সঙ্গে জড়িত হইয়া রহিয়াছেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। সাংবাদিকতার যে আদর্শ তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন আজ তাহা স্খলিত হইয়াছে এবং তার পরিণাম শুভ হয় নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের রচনাবলীর একটি সংকলন প্রকাশিত হইলে আধুনিক সাংবাদিক এবং রাজনীতিবিদ উভয়েই সমান উপকৃত হইতে পারিতেন।'

একথা খুবই সত্য, সাংবাদিক হিসাবে তিনি একটি দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। এরূপ নির্ভীক নিরপেক্ষ সমালোচনা—যাহার আজও জুড়ি মিলিল না, বিশেষ করিয়া নিজেকে ধরা না দিয়া যেটুকু বলিবার তাহা বলা—এ সংযম আর কাহারও মধ্যে দেখা যায় না। তিনি ছিলেন জীবন্ত 'এনসাইক্লোপিডিয়া'। যখনই যাঁহার প্রয়োজন হইয়াছে, তিনি ছুটিয়া আসিয়াছেন রামানন্দ-বাবুর কাছে। সাংবাদিকতার এ দৃষ্টান্ত এদেশে বিরল। সেযুগে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রামানন্দর নাম একই সঙ্গে উচ্চারিত হইত। এমনি ঘনিষ্ঠ ছিলেন তাঁহারা উভয়ে। 'প্রবাসী'ই একমাত্র পত্রিকা যেখানে রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল রচনাই প্রকাশিত হইয়াছে। আজ যাঁহারা খ্যাতনামা সাহিত্যিক, তাঁহাদের সে যশের সূচনা করিয়া দিয়াছে এই প্রবাসীই। প্রবাসীতে লেখা বাহির হইলে জাতে উঠা যাইবে এমনি ধারণা ছিল তাঁহাদের। তাই প্রবাসী শুধুমাত্র পত্রিকা নয়, একটা আইডিয়া।

আর দুই বৎসর পরে এই মহাপুরুষের শতবৎসর পূর্ণ হইবে। পণ্ডিত বানারসী দাস চতুর্ব্বেদী মহাশয় বলিলেন, ভারতের অন্যান্যস্থানে তাঁহার এই শতবার্ষিকী জন্মোৎসবের উদ্যোগ-আয়োজন ইহারই মধ্যে সুরু হইয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয় বাংলা দেশ নীরব। তবে একথা বিশ্বাস করি, গুণিজনের সংবর্দ্ধনায় বাংলার তরুণদল নিশ্চয়ই আগাইয়া আসিবে।

পরিশেষে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন, মধ্য কলিকাতার 'নাট্যম' সঙ্গীত পরিবেশনের দায়িত্ব লইয়া সেদিন অনুষ্ঠানটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছে।

রমেশচন্দ্র সেন

খ্যাতনামা সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র সেন গত ১লা জুন তারিখে তাঁহার সিঁথির বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৮ বৎসর হইয়াছিল।

রমেশচন্দ্র ১৩০১ সালের ৭ই চৈত্র ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ক্ষীরোদচন্দ্র সেন।

সাহিত্য-জীবনের সুরুতেই রমেশচন্দ্র 'সাহিত্য সেবক সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলা দেশের অন্যতম প্রাচীন সাহিত্য সংস্থা। এই সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তীর উদ্যোগ-আয়োজনে কিছুদিন হইতে তিনি খুব ব্যস্ত ছিলেন। তিরিশের দশকে এই সমিতিতে যাঁহারা কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধাদি পাঠ করিতেন এবং যাঁহারা সেই সমস্ত পঠিত রচনা লইয়া আলোচনা করিতেন, আজ তাঁহাদের অনেকেই যশস্বী লেখক। তিনি নিজেও কুশলী সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার বহু গল্পই প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার 'শতাব্দী', 'কুরপালা', 'পুব থেকে পশ্চিমে', 'নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ', প্রভৃতি উপন্যাসে তাঁহার সমাজ-জ্ঞান ও জীবন-বোধের যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, গল্প ও সংলাপ-গ্রন্থনে এবং চরিত্র বিশ্লেষণে যে নৈপুণ্যের স্বাক্ষর আছে, তা খুব সুলভ স্তরের জিনিস নয়। তিনি ছিলেন আত্মসমাহিত উদাসীন স্বভাবের মানুষ। বিশেষ করিয়া, তাঁহার মত অমায়িক, শান্ত সাহিত্যগত প্রাণ খুব কমই দেখা গিয়াছে। তিনি নবীন, প্রবীণ সকলেরই বন্ধু ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে একজন সহৃদয় সাহিত্যিক ও সজ্জন বাঙালীর আসন শূন্য হইল।

ছবি বিশ্বাস

বাংলার জনপ্রিয় অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ছবি বিশ্বাস গত ১১ই জুন মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন। তিনি ঐদিন সপরিবারে মোটরযোগে তাঁহার পৈতৃক বাসভবন বারাসতের নিকট জাগুলিয়ায় আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে মধ্যমগ্রামের নিকট বিপরীতগামী একটি লরীর সহিত ধাক্কা লাগিয়া এই দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং তাঁহার স্ত্রী এবং অন্যান্য আরোহীরা আহত হইয়া আর. জি. কর হাসপাতালে ভর্ত্তি হ'ন। বিশ্বাসের এই আকস্মিক মৃত্যু সকলকে অভিভূত করিয়া দিয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬২ বৎসর হইয়াছিল।

তিনি কলিকাতায় ১৯০০ সনের ১৩ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ভূপতিনাথ বিশ্বাস। জাগুলিয়ার সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশের আভিজাত্য তাঁহার আচার-আচরণে সর্ব্বদাই প্রকাশ পাইত। কলিকাতার হিন্দু স্কুলে তাঁহার অধ্যয়ন সুরু হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর, তিনি কিছুদিন প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়াশুনা করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার অভিনয় করিবার ঝোঁক প্রবল হইয়া উঠে। বিশেষ করিয়া, শিশিরকুমারের অভিনয়-নৈপুণ্য সে সময় তাঁহার উপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে।

সিকদার বাগানের বান্ধব সমাজে 'নদীয়া বিনোদ' যাত্রাভিনয়ে তিনি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁহার 'নিমাই' সে সময় অশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রবোধ গুহের আনুকূল্যে 'মীরকাসিম' নাটকে নামভূমিকায় অভিনয় করিয়া তিনি যে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেন, সে-খ্যাতি তিনি কোনদিন ম্লান হইতে দেন নাই। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভাই তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ আসনে বসাইয়া দিয়াছে। তিনি ছিলেন চরিত্রাভিনেতা। এই অভিনয়ে তিনি আজও অদ্বিতীয়। জীবনে তিনি কি চিত্র-জগতে, কি মঞ্চ-জগতে বহু অভিনয় করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটি অভিনয়ই অতুলনীয়। সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁহার অভিনয়ে সংযম—যাহা অনেকের মধ্যেই নাই। তাঁহার 'কাবুলিওয়ালা', 'প্রতিশ্রুতি' ও 'সাহেব বিবি গোলাম' ভুলিবার নয়।

তিনি বহু শিল্প-সংস্থার সহিত জড়িত ছিলেন। অভিনেতৃ সঙ্ঘ তাহাদের অন্যতম। কেন্দ্রীয় সঙ্গীত-নাটক আকাদমী ১৯৬০ সনে তাঁহাকে তাঁহার নাটক ও চলচ্চিত্রে অভিনয় শ্রেষ্ঠতার জন্য সম্মানিত করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন মিতভাষী। কিন্তু তিনি সকলেরই বন্ধু ছিলেন। এমন সদালাপী বন্ধুবৎসল হাস্যরসিক পুরুষ এযুগে দুর্লভ। এদিক দিয়া তাঁহার অভাব যেমন পূর্ণ হইবার নহে, তেমনি অপূরণীয় ক্ষতিও হইল সমগ্র বাংলা দেশের নাট্য ও চিত্রজগতের।

গণতন্ত্র, গণতন্ত্রের সঙ্কট ও ভারত

প্রতিযোগিতায় চতুর্থ পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধ

শ্রীদুলাল দেববর্মণ

ভারত স্বাধীন হবার পর চতুর্দশ বর্ষ অতিক্রান্ত হ'ল। স্বাধীনতালাভের এই দীর্ঘকাল পরেও কিন্তু একটা প্রশ্ন জেগে রয়েছে ভারতবাসীর মনে—যে স্বাধীনতা আমরা চেয়েছিলাম, ঠিক সেই স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি কি না? বিদেশীর শাসনমুক্ত ভারত আমরা পেয়েছি সত্য, কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা কি পেয়েছি?

এখানে এই 'স্বাধীনতা' এবং 'প্রকৃত স্বাধীনতা' কথা দু'টির মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি না ভাববার বিষয়। কয়েক শতাব্দী পূর্বে স্বাধীনতা বলতে আমরা যা বুঝতাম এখন ঠিক তা বুঝি না। রাজা বা শাসনকর্তার স্বাধীনতাই তখন ছিল যথেষ্ট, কিন্তু এখন আমরা চাই প্রজার স্বাধীনতা। এই প্রজা তথা জনসাধারণের স্বাধীনতা আসলে যে কি তার আলোচনা করতে গিয়ে আমরা পৌঁছই গণতন্ত্রে। গণতন্ত্র কথাটার অর্থ জনসাধারণের নিজেদের শাসনতন্ত্র। জন সংখ্যার বিশালতার মত গণতন্ত্রও অত্যন্ত ব্যাপক এবং উদার। কেবল রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে নয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনেও গণতন্ত্রের সীমানা বিস্তৃত। বস্তুতঃ গণতন্ত্র মানুষের জীবনকে আজ এত দিক্ দিয়ে স্পর্শ করেছে যে, তাকে একটি তন্ত্র বা মতবাদ না বলে জীবনাচরণের দর্শন বল্‌লেই ঠিক বলা হয়।

গণতান্ত্রিক আদর্শের ব্যাপ্তির মধ্যে কিছুটা স্থিতিস্থাপক গুণও রয়েছে। গণতন্ত্রকে দু'দিক থেকে টানলে একদিকে তা যেমন স্পর্শ করে ধনতন্ত্রকে, অন্যদিকে তেমনি সমাজতন্ত্রকে। রাজনৈতিক পরিভাষায় গণতন্ত্রের এই প্রথম অবস্থার নাম বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং দ্বিতীয় অবস্থার গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র। বর্তমান যুগে গণতন্ত্রের এই শেষের স্তরটাই সকলের কাম্য। একক ভাবে গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র কেউ আজ মানুষের চাহিদা পুরোপুরি মেটাতে পারে না। ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং সামাজিক সাম্য উভয়ই আমাদের সমপ্রয়োজন। ব্যক্তি হিসাবে মানুষ যতখানি সত্য, সামাজিক প্রাণী হিসাবেও ঠিক ততখানি। গণতন্ত্র মানুষের এই উভয় সত্যকেই মৌলিক বলে স্বীকার করে।

গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে আরও কাছে এনে যাচাই করে দেখা যায়। আসলে জিনিস দুটো একই বস্তুর দুটো পিঠ। এই দুপিঠের নাম হচ্ছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক সাম্য। এ দুটো জিনিসকে বিচ্ছিন্ন করা আজকের দিনে সত্যিই কঠিন। এ যুগে তাই গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র পরস্পরের পরিপূরক দু'টি আদর্শ। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র পরস্পরের কাছ থেকে যখন যতটা দূরে সরে যায়, তাদের মধ্যে ত্রুটি এবং বিচ্যুতিও দেখা দেয় তত বেশী। এই ত্রুটি এবং বিচ্যুতিকে আমরা ভাগ করে থাকি দুই ভাগে। অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের মত গণতন্ত্রও মাঝে মাঝে সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে, এবং তা পড়ে ঐ দু'টি কারণে। প্রথম কারণ হচ্ছে গণতন্ত্রকে কার্যকর করার পথে পন্থাগত, দ্বিতীয়—ভিন্ন আদর্শ এবং কর্মসূচীর সঙ্গে সংঘাত-জনিত। গণতান্ত্রিক আদর্শের অগ্রগতির আলোকে এই উভয়বিধ ত্রুটি এবং বিপদের পটভূমিকায় দাঁড় করাতে চাই ভারতকে। ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার কাঠামোয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কাদামাটি এবং সাংস্কৃতিক রুচিবোধের রং মাখিয়ে যে মূর্তিটি আমরা খাড়া করি—তা কি সত্যই গণতন্ত্রের?

যে কোন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার দু'টি সজীব অঙ্গ সরকার এবং জনসাধারণ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার এবং জনসাধারণ পরস্পর সংবদ্ধ। যুগের পর যুগ ধ'রে যে সব সমস্যার সঙ্গে লড়াই করে এসেছে মানুষ, গণতন্ত্র তারই একটা ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা। সর্বাধিক জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত সরকার জনসাধারণের সর্বাধিক কল্যাণে নিযুক্ত থাকবে, এটা গণতন্ত্রের আবশ্যিক দাবী। পতন-অভ্যুদয়ের বহু বন্ধুর পন্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে ভারতের জনগণও আজ এই গণতন্ত্রের আদর্শেই উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। গণতন্ত্র আজ ভারতের জাতীয় স্বীকৃতি অর্জন করেছে। সম্প্রতি ভারতের সরকার তথা শাসক দল সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সংকল্প ঘোষণা করেছেন। বলা বাহুল্য, এই ঘোষণার পর ভারতে গণতন্ত্রের ভূমিকা আরও বিস্তৃত হয়ে উঠেছে।

গণতান্ত্রিক আদর্শ এবং কর্মপন্থার আলোচনা প্রসঙ্গে

এবার দেখা যাক, ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি না, অথবা তা হতে চলছে কি না। গণতন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রসঙ্গকে শিরোলেখ হিসাবে উল্লেখ করে আমরা আলোচনাটি সংবদ্ধ করবার চেষ্টা করব।

নির্বাচন

গণতান্ত্রিক পন্থার প্রথম হাতিয়ার হচ্ছে ব্যাপক নির্বাচন। উন্মাদ ও বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যতীত প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক নরনারী এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারে। স্বাধীনতা লাভের পরে গণতন্ত্রের পথে ভারতের প্রথম পদক্ষেপ প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার। কিন্তু একটা কথা, এদেশে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সত্য, কিন্তু সর্বত্র এ অধিকার সার্থক হয়ে উঠছে না। ব্যাপক অশিক্ষা এবং রাজনৈতিক চেতনার অভাব এর প্রধান কারণ: তা ছাড়া, এই ভোটাধিকারের ফলে নির্বাচক-সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলেও নির্বাচন-প্রার্থী হবার সুযোগ যথেষ্ট সম্প্রসারিত হয় নি। রাজনৈতিক জ্ঞানের অভাব এবং তার প্রয়োগ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য, উপযুক্ত নির্বাচক তৈরীর পথে একটি বড় বাধা। অপর পক্ষে রাজনৈতিক জ্ঞান এবং অন্যান্য বহু গুণ থাকা সত্ত্বেও শুধু দারিদ্র্য এবং অর্থাভাব বশতঃ বহু যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচন-প্রার্থী হতে পারে না। বহু অযোগ্য এবং অসদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত ব্যক্তি কেবল টাকার জোরে এবং প্রচার কৌশলে 'ভোট চুরি' এবং 'ভোট ক্রয়' ক'রে নির্বাচনের বৈতরণী পার হয়ে যায়। নির্বাচনের সাফল্যের ব্যাপারে টাকা এবং প্রচারের এই ভূমিকা যে কোন গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে কলঙ্ক-স্বরূপ। ভারতে গণতন্ত্র গতিশীল এবং প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারছে না অনেকটা এই কারণে।

গত সাধারণ নির্বাচন দুটোর ফলাফলের দিকে তাকালে দেখা যায়, ভারতের শাসকদল অর্ধেকেরও কম ভোট পেয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। এই সংখ্যা মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা চল্লিশের কাছাকাছি। দেখা যাচ্ছে, প্রদত্ত ভোটের শতকরা ষাটটি ভোট কংগ্রেস পায় নি, কিন্তু একক দল হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় শাসন-ক্ষমতা দখল করে বসেছে। বহুদল প্রথার কুফলের ফলেই অবশ্য এটা সম্ভব হয়েছে। গণতন্ত্রের একটা মৌলিক সর্ত হচ্ছে—অধিকসংখ্যক জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার। ভারতের বর্তমান সরকার কিন্তু গণতন্ত্রের এই প্রথম সর্তটিই পূরণ করতে পারে নি।

এই বিরাট্ দেশে প্রত্যক্ষ নির্বাচন সত্যিই অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু সার্থক গণতন্ত্রের জন্ম সেখানেই সহজ হয় যেখানে নির্বাচন-প্রথা প্রত্যক্ষের যথাসাধ্য কাছাকাছি থাকে। পরোক্ষ নির্বাচন জনসাধারণের মনে বিশেষ আশা বা প্রেরণার সৃষ্টি করতে পারে না। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে, রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনে জনসাধারণ নিষ্ক্রিয় দর্শক থাকে মাত্র। নির্বাচন-ব্যবস্থারই ত্রুটির ফলে দেখা যায়, সমগ্র দেশের ভাগ্য-বিধাতা হয়েও প্রধানমন্ত্রী ক্ষুদ্র একটি অঞ্চলের প্রতিনিধি মাত্র। গণতান্ত্রিক আদর্শ এবং কর্মসূচীর মধ্যে এ এক বিরাট্ পার্থক্য।

দল

গণতান্ত্রিক শাসনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ একাধিক রাজনৈতিক দল। একদলীয় শাসনে গণতন্ত্র কখনও মাথা তুলতে পারে না, কারণ সেখানে শাসকদলের স্বার্থ এবং সঙ্কীর্ণতা সমস্ত স্বাধীন চিন্তাকে চেপে রাখে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসকদলের সঙ্গে বিরোধীদলের উপস্থিতি আবশ্যক। অবশ্য এক্ষেত্রে উভয় দলকেই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হতে হবে। সরকার তথা শাসকদল যদি অগণতান্ত্রিক উপায়ে বিরোধীদলকে দমন করতে থাকে, বিরোধীদল বাধ্য হয়ে গোপন আন্দোলন, অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ বা বিপ্লববাদের আশ্রয় নেয়। অপরপক্ষে বিরোধীদল যদি গণতান্ত্রিক বিরোধিতায় সন্তুষ্ট না থেকে বিদ্রোহ এবং ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী সুরু করে দেয়, সরকারও তখন লাঠি, গুলী এবং কালা-কানুনের সাহায্য নিয়ে বিরোধীদের দমন করতে অগ্রসর হয়। ফলে গণতন্ত্রের সকল সম্ভাবনা তখন তিরোহিত হয়। গণতন্ত্র মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত। দু'টি পাখা মেলে সে উড়ে চলতে থাকে গন্তব্যের দিকে। কিন্তু দলতন্ত্রের এই দুরবস্থা নষ্ট করে দেয় তার উড়বার ক্ষমতা। সরকার ও বিরোধী পক্ষ গণতন্ত্রের দু'টি পাখা, এদের একটিও যদি কোনক্রমে ভেঙে পড়ে বা পঙ্গু হয়ে যায়, পাখী অমনি মুখ থুবড়ে পড়ে মাটিতে। গণতন্ত্রের আর একটি দোষ, তার ঝোঁক শুধু পরিমাণের দিকে, গুণের দিকে নয়। 'ক্রুট মেজরিটি'র জোরে সংখ্যাগুরুদল নিজেদের যে কোন প্রস্তাব—তা যতই কেননা জনস্বার্থবিরোধী হোক, অনায়াসে পাস করিয়ে নিতে পারে। সংখ্যালঘু পক্ষের প্রতিবাদ এক্ষেত্রে অরণ্যে রোদন ছাড়া আর কি?

সরকার-বিরোধী দলগুলির একটা মস্ত বিপদ্ হচ্ছে দলের সংখ্যাধিক্য। বিরোধীদলের সংখ্যা যত বেশি হবে, শাসকদল তত শক্তিশালী হবে। ভারতে বিরোধী-দলের সংখ্যা বড্ড বেশি এবং তাদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য নেই বললেই চলে। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলির কোন স্পষ্ট আদর্শ পর্যন্ত নেই। নেতৃত্বের জন্য

দ্বন্দ্ব আর বিদ্বেষকে সম্বল ক'রে এরা রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে থাকে। ভারতে এমন অনেক 'সর্বভারতীয়' দল আছে যাদের অস্তিত্ব এবং পরিচিতি একটি জেলা বা কয়েকটি শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

বস্তুতঃ এই ধরনের দলতন্ত্র একটি স্ববিরোধী ব্যাপার এবং তা গণতন্ত্রের পরিপন্থীও। সঙ্কীর্ণ দলনীতির ফলে মানুষ বৃহত্তর স্বার্থের কথা প্রায়ই ভুলে যায়। মানুষের প্রতি মর্যাদা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ গণতান্ত্রিক আদর্শের অমূল্য সম্পদ্। সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ এই অমূল্য সম্পদ্‌কেও মূল্যহীন করে তোলে। অপরদলের লোকের প্রতি অবিশ্বাস এবং নির্বিচারে তাদের আদর্শকে অশ্রদ্ধা করা দলতন্ত্রের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। দলীয় বিদ্বেষের ফলে একই দেশের মধ্যে যেন একাধিক জাতির সৃষ্টি হয় এবং নিজের দেশবাসীকে অনেক সময় বিদেশীর চেয়েও পর বলে মনে করা হয়। বিদেশের প্রতি প্রেম এবং স্বদেশের প্রতি বিমুখতা গণতান্ত্রিক চেতনাকে মূঢ় করে তোলে।

বিভেদ

দলীয় সংকীর্ণতার পরে আর যে দু'টি বিপদের কথা মনে পড়ে, তা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রাদেশিকতা। এর প্রথমটি হচ্ছে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বাই-প্রোডাক্ট এবং দ্বিতীয়টি কংগ্রেসী শাসন-ব্যবস্থা। সম্প্রতি এই সঙ্গে আরও একটি সমস্যার যোগ ঘটেছে, তা হচ্ছে—ভাষা-সমস্যা। সাম্প্রদায়িকতার বিষ আজ অনেকটা স্তিমিত। গত নির্বাচনে হিন্দুমহাসভা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের পাতা থেকে বিদায় নিয়েছে। কেরল, পশ্চিমবঙ্গ এবং মাদ্রাজে, দল হিসেবে মুসলিম লীগ আবার মাথা চাড়া দিবার চেষ্টা করছে। তবে সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে দৌড়ের পাল্লায় বর্তমানে প্রাদেশিকতাই অগ্রসর। প্রাদেশিকতার দ্বন্দ্বে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি জড়িত থাকায় সমাধান তাদের আয়ত্তের বাইরে। কেন্দ্রীয় সরকার যদি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে এই সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হতেন তা হ'লে বিপদ এতদূর গড়াত না। কেন্দ্রীয় সরকারের নিষ্ক্রিয় এবং দুর্বল নীতি, রাজ্যবিশেষের প্রতি অশোভন অনুগ্রহ এবং অন্যের প্রতি বিমাতৃসুলভ ব্যবহার বিপদকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। প্রাদেশিকতার সঙ্গে ভাষা-সমস্যা যুক্ত হওয়ায় সম্প্রতি অবস্থা আরও জটিল হয়ে উঠেছে। ভাষা হচ্ছে মানুষের বিকাশের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ মাধ্যম। মানুষের কণ্ঠ থেকে তার মাতৃভাষাকে ছিনিয়ে নেবার মত নিষ্ঠুরতা খুব কমই আছে। মাতৃভাষার প্রকাশকে রুদ্ধ করে গায়ের জোরে অন্য ভাষা চাপানোর নাম ভাষা-সাম্রাজ্যবাদ। এই সাম্রাজ্যবাদ তথা বিরোধ শুধু জাতীয় সংহতির বিরুদ্ধেই নয়, গণতন্ত্রের সম্মুখেও একটি বিরাট্ চ্যালেঞ্জ।

দুর্নীতি

বিভেদের মত দুর্নীতির দাপটও আজ ভারতে প্রকট। সাংগঠনিক দৌর্বল্য এবং আদর্শগত নিষ্ঠার অভাবই এই দুর্নীতিকে ডেকে নিয়ে এসেছে। শাসনকার্যে দক্ষতা এবং সততার অভাব দিন দিন বর্ধিত করে তুলছে এই পাপ। অধিকাংশ সরকারী অফিসে ঢুকলেই একটা সাধারণ উক্তি শোনা যায়—'আমরা কিছু পেয়ে থাকি।' জাতীয় সম্পদ্ অপহরণের ঘটনা আজ আর নতুন কিছু নয়। সুবিধাভোগী শ্রেণী সমাজে আধিপত্য করায় সমাজের সর্বত্র এই বিষ সংক্রামিত। যে সরষে দিয়ে ভূত ছাড়াবার কথা, সেই সরষের মধ্যেও ভূত ঢুকে বসে আছে। আশ্চর্যের কথা, সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী সরকার কিন্তু এত সব ভূত এদেশে ছেড়ে রেখে যায় নি। এদের অধিকাংশই সাম্প্রতিক কালের সৃষ্টি। অসহায় গণতন্ত্রের ঘাড় মটকাবার কাজে দেশী ভূতেরাই অধিকতর পারদর্শী মনে হচ্ছে।

আমলাতন্ত্র

বিদেশী শাসনের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে ভূতটি এসেছে, সেটা হচ্ছে আমলাতন্ত্র। সাত সমুদ্র তের নদী পার থেকে এসে এদেশ শাসনের জন্য একদল প্রভুভক্ত প্রাণী সৃষ্টির প্রয়োজন তাদের ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ-ভারতের আমলা আর স্বাধীন-ভারতের আমলার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। ব্রিটিশ যুগের আমলারা ছিল প্রভুশক্তির তল্পীবাহক, কিন্তু বর্তমানে তারা নিজেরাই এক-একজন প্রভু। দেশের ভাগ্যবিধাতারা আবার এই আমলাদের উপরই নির্ভরশীল। শিক্ষিত, দক্ষ এবং সৎ আমলা শাসনযন্ত্রকে সুপরিচালিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু অতিরিক্ত আমলা-নির্ভরতা তাদের করে তোলে উদ্ধত এবং স্বেচ্ছাচারী। দেশের নেতৃবর্গ এবং জনসাধারণ—এই দু'য়ের মধ্যে একটা মারাত্মক ব্যবধান সৃষ্টি করে আমলাতন্ত্র। স্বেচ্ছাচারী আমলাদের হাতে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার স্বভাবতঃই নিগৃহীত হতে থাকে। গণতন্ত্রের এই ধরনের নিগ্রহ ভারতে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা।

ধন-বৈষম্য

গণতন্ত্র শুধু শাসন-পদ্ধতি নয়। ক্রম-বিবর্তনের ফলে তাকে মানুষ এবং তার সমাজের একটা পূর্ণতর রূপান্তর

বলা চলে। গণতন্ত্রের আলোচনার সময় তাই পুরো সমাজটা চোখের সামনে ধরে রাখতে হয়। আজকের সমাজ অর্থ-ভিত্তিক হওয়ায় অর্থনৈতিক অবস্থাটাও তাই গণতন্ত্রের একটা আবশ্যিক দিক্। গোড়াতেই বলেছি, গণতন্ত্রের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক্ দুটো আজ একে অপরের হাত ধরে চলেছে।

অর্থনৈতিক প্রসঙ্গে প্রথমেই আমাদের সম্মুখীন হতে হয় একটা বিশেষ সমস্যার। অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক্ দিয়ে ভারত নিঃসন্দেহে পশ্চাৎপদ। অনুন্নত দেশের অর্থনীতিতে উৎপাদনের প্রয়োজন সর্বাধিক, তাই দেশের নেতারা বলেন, 'কম খাও, বেশি পরিশ্রম কর।' জাতীয় আয় বৃদ্ধির জন্য ত্যাগ এবং শ্রম স্বীকার আমাদের সকলের কর্তব্য। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় আমাদের পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার—জাতীয় আয়টা আসলে কি? দেশের মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির আয়-স্ফীতি, না জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন? যে দেশে জন-কুড়ি পুঁজিপতির হাতে দেশের সমস্ত সম্পদ্ এবং সম্পদের উৎস কেন্দ্রীভূত, সেখানে জাতীয় আয়ের কথাটা উপহাস মাত্র। জাতীয় আয় বা উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারটা বণ্টন-নিরপেক্ষ নয়। জাতীয় আয়ের উপর সাধারণের অধিকার সাব্যস্ত না হ'লে তা প্রকৃত জাতীয় আয় হিসেবে গণ্য হতে পারে না। বণ্টন ব্যবস্থায় সাম্য এবং সামঞ্জস্য না আনলে গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক দিকটা কখনও যুগোপযোগী হয়ে উঠবে না। সংযম, ত্যাগ এবং পরিশ্রমের উপদেশ শুধু দরিদ্র জনসাধারণের উপরে বর্ষিত হলেই চলবে না, মুনাফালোভীদের মুনাফা এবং লোভের হস্তকেও নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। প্রায়ই দেখা যায়, নেতৃবৃন্দ জনসাধারণকে যে উপদেশ দিচ্ছেন, নিজেরা তা পালন করবার প্রয়োজন মনে করেন না। নিজেরা আচরি' ধর্ম পরকে না শেখালে সে শিক্ষা কখনও সার্থক হয়ে ওঠে না। চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য হয় না, কথাটা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও খাটে।

আইন

এবার আসা যাক আইন এবং আইনসভা প্রসঙ্গে। আইনের দ্বারা সরকার এবং জনসাধারণের আচরণ ও কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। আইনসমূহ অবশ্যই নিরপেক্ষ, সর্বত্র-প্রযোজ্য এবং সর্বজন-গ্রাহ্য হওয়া দরকার। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই আইন প্রণয়ন করে থাকেন। গণতন্ত্রে আইন ও স্বাধীনতা অবিচ্ছেদ্য। ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র শাসক-গোষ্ঠী কখনও গণতান্ত্রিক আইনের জনক হতে পারে না। তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচন-রীতির নানাবিধ ত্রুটির ফলে জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ সব সময় আইন-সভায় আসতে পারেন না। ভারতীয় আইনসভাগুলিতে আবার দু'টি ক'রে কক্ষ আছে। নিম্নকক্ষ বা বিধানসভার (কেন্দ্রে লোকসভার) সদস্যগণ জনগণের দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত হওয়ায় উচ্চকক্ষের উপস্থিতি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে হয়। উচ্চকক্ষের 'অভিভাবকত্ব' নিম্নকক্ষের সদস্য-গণের বুদ্ধি ও কাণ্ড-জ্ঞানের উপর অনাস্থা এবং সন্দেহ-জ্ঞাপক। এই ধরনের সন্দেহ এবং অবিশ্বাস গণতান্ত্রিক আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী।

'হেবিয়াস কর্পাস' বা ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষামূলক আইনগুলি গণতন্ত্রের রক্ষা-কবচ। ভারতে কিন্তু এই রক্ষা-কবচকেও ব্যর্থ করবার ব্যবস্থা আছে—যার নাম জন-নিরাপত্তা আইন বা 'কালা-কানুন'। সমাজ-বিরোধী-দের হাত থেকে জনসাধারণকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে এই আইন প্রবর্তিত হলেও সমালোচকদের মতে এ আইন জন-নিরাপত্তার একেবারে উল্টো। ক্রুদ্ধ এবং প্রতিহিংসা-পরায়ণ সরকার এই আইনের সাহায্যেই জনগণের রক্ষা-ব্যূহকে ধূলিসাৎ করে দিতে পারেন।

আইনের সাহায্য গ্রহণ ব্যাপারটাও এদেশে বেশ জটিল এবং ব্যয়-বহুল। দরিদ্র দেশবাসীর পক্ষে বহুক্ষেত্রে আইন তথা ন্যায়-বিচারের দাবী জানানো সম্ভব হয়ে ওঠে না। আইনের মূল উদ্দেশ্য অনেক সময় এই কারণে ব্যর্থ হয়ে যায় এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার স্বভাবতঃই অসহায় থেকে যায়।

সংবিধান

আইনের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ে সংবিধানের কথা। বলাবাহুল্য, নির্বাচন, দল, ধন-বৈষম্য এবং আইন ইত্যাদির আলোচনা প্রসঙ্গে সংবিধানের অবতারণা আমরা ইতিমধ্যেই করেছি। সংবিধান রাষ্ট্রের আইনসমূহের উৎস। যে কোন দেশের সংবিধানে তার রাষ্ট্রীয় চরিত্র প্রতিফলিত হয়ে থাকে। সংবিধানে নিজ নিজ রাষ্ট্রের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের ছাপ পড়বেই। এ কারণ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সংবিধানের বাইরের দিকটায় অনেক অমিল থাকতে পারে। কিন্তু অন্তরে তাদের মিল থাকবেই। গণতন্ত্রের মূল সর্তগুলিই হচ্ছে সেই মিল। ভারতীয় সংবিধানে ব্যক্তি ও সমষ্টির বিকাশের অধিকার, সংবাদপত্র ও সভা-সমিতিতে মত প্রকাশের অধিকার, স্ব স্ব রাজনৈতিক ধারণার অনুবর্তী দল গঠনের অধিকার ইত্যাদি স্বীকার করে নেওয়া

হয়েছে। জনসাধারণের এই অধিকার তথা স্বাধীনতাগুলি বিপন্ন হলে রাষ্ট্রের কাছে তার প্রতিকারের জন্য দাবী এবং অভিযোগও পেশ করা চলে। কার্যকালে অবশ্য দেখা যায়, রাষ্ট্রের বকলমে সরকার এই অধিকারগুলি নিয়ন্ত্রিত করেন, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজের স্বার্থেই করেন। ফলে, অভিযোগের প্রতিকার প্রায়শঃ দুর্লভ হয়ে ওঠে এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার অবস্থা নিতান্ত কাহিল হয়ে পড়ে। পুলিশী রিপোর্টের উপর নির্ভর করে যেখানে চাকুরিজীবীর চাকুরি যায়, শিক্ষা-জীবী কর্মচ্যুত হন, সেখানে মৌলিক অধিকারগুলির উপর বিশ্বাস স্বতঃই শিথিল হয়ে আসে। সংবিধানের এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করে অনেকে বলেন, এক হাতে যেমন জনসাধারণকে ঢালাও অধিকার দেওয়া হয়েছে, অন্য হাতে আবার তা ফিরিয়েও নেওয়া হয়েছে।

একনায়কতন্ত্র ?

ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির এই গতি এবং প্রকৃতি লক্ষ্য করে প্রশ্ন তোলা যায়—ভারত প্রকৃতপক্ষে যে পথ ধরে এগিয়েছে, তার নাম কি? গণতন্ত্র, না একনায়কতন্ত্র? না অন্যকিছু? নির্বাচন, দল এবং সংবিধান ইত্যাদি প্রসঙ্গে যে আলোচনা আমরা করেছি তা থেকে যে উত্তর পাওয়া যায় তা নির্দিষ্ট কোন পন্থার সমর্থক নয়। গণতন্ত্রের নাম করে ভারতে যে ক্রিয়াকলাপ চলছে, তার সবগুলি গণতন্ত্র-সম্মত নয়। বরং সেগুলি বহুলাংশে 'মিশ্রতন্ত্র' এবং মিশ্রতন্ত্রের ছায়ায় গ'ড়েওঠা একনায়কতন্ত্র বলা চলে। শাসক-সম্প্রদায় সংখ্যালঘিষ্ঠ হলে একনায়কতন্ত্রকে তারা ডেকে আনবেই। দলীয় একনায়কতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিপূজা এবং ব্যক্তিত্বের উপর বিশেষ অধিকার আরোপ আমন্ত্রণ জানায় ব্যক্তি-একনায়কতন্ত্রকে। ভারতের স্ফুটনোন্মুখ গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই উভয় একনায়কতন্ত্রই চ্যালেঞ্জস্বরূপ। ইতিপূর্বে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আমরা দলীয় একনায়কতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এবার ব্যক্তি একনায়কটিকে চেনবার চেষ্টা করব। শাসকদল থেকে এই বিশেষ ব্যক্তিটিকে কয়েকটি বিশেষ অধিকার দান করা হয়েছে। দলের মধ্যে একমাত্র তিনিই দশ বছরেরও অধিককাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন। আরও বিপদের কথা এই যে, বিরোধী দলের লোকেরাও তাঁকে তাঁর দল থেকে স্বতন্ত্র করে দেখেন, এবং তাঁর এই 'স্বাতন্ত্র্যের' প্রতি প্রায় সর্তহীন আনুগত্য জানান। গণতন্ত্র মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত প্রতিভা বা বিশেষ গুণসমূহকে অবশ্যই শ্রদ্ধা করে, কিন্তু তার জন্য তাকে বিশেষ রাজনৈতিক অধিকার দান করে না। পৃথিবীর যেখানে ব্যক্তি-একনায়কতন্ত্র গড়ে উঠেছে, দেখা গেছে, যে-ব্যক্তিটিকে কেন্দ্র করে এই 'তন্ত্র' গ'ড়ে ওঠে তাঁকে সবাই প্রথমে অ-সাধারণ বলে মনে করে।

একনায়কতন্ত্রের আর একটি লক্ষণ—অতিরিক্ত জাঁকজমক এবং পুলিশী-আড়ম্বরের আড়ালে নায়ককে রহস্যময় করে রাখা। ভারতরাষ্ট্রের 'গণতান্ত্রিক' নায়কের সফরকালে যে আড়ম্বর এবং পুলিশ-সজ্জা আমরা দেখি, তাতে করে তাঁকে কোন রাজা-মহারাজা বা ব্রিটিশ আমলের বড়লাট থেকে আলাদা করে ভাবতে পারি না। গণতান্ত্রিক আদর্শ কখনও জনগণের নিজস্ব নেতাকে (হলেনই বা তিনি শাসনতান্ত্রিক নেতা) জনগণের কাছ থেকে দূরে স'রে থাকতে প্ররোচিত করে না।

গণতন্ত্রের একটা অগ্নি-পরীক্ষা হয়ে গেছে বেরুবাড়ী-প্রশ্নে। বলাবাহুল্য, গণতন্ত্র এই পরীক্ষায় শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। বেরুবাড়ী ইউনিয়ন, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের অংশ, কিন্তু ভারতের জনগণের দাবী অগ্রাহ্য করে তাকে বলি দেওয়া হ'ল ব্যক্তি-বিশেষের প্রেষ্টিজের বেদীমূলে। একনায়কতন্ত্র ছাড়া আর এমন কোন পন্থা নেই, যার সাহায্যে প্রমাণ করা চলে দেশের চেয়ে ব্যক্তি বড় এবং দলের চেয়ে দলপতি। একটা রাষ্ট্রের সংবিধান যখন একজন ব্যক্তির স্বার্থে (হলেনই বা তিনি প্রধানমন্ত্রী) পরিবর্তিত হয়, তখন গণতন্ত্রের দাবীকে পদদলিত করে একনায়কতন্ত্রকেই শিরোধার্য করা হয় না কি?

এবার আমরা গোড়ার কথায় ফিরি। আমাদের আজকের উদ্দেশ্য ছিল গণতান্ত্রিক আদর্শ এবং তার সঙ্কটের পটভূমিকায় ভারত ও তার শাসন-প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা। বলা বাহুল্য, এতক্ষণ আমরা তাই করেছি। এই আলোচনার আলোকে দাঁড়িয়ে আমরা দেখেছি, ভারতে গণতন্ত্রের বিকাশ এখনও অসম্পূর্ণ, এবং যে পথে সে এগিয়ে চলেছে তাতে তা কখনও পূর্ণ হবে, এমন আশাও কম। প্রতিকূল পরিবেশ এবং অবিরাম সংঘাতের ফলে গণতন্ত্রের ত্রুটিগুলো এখানে যেভাবে বিকশিত হয়েছে, গুণগুলো ঠিক সেভাবে হয় নি। গণতন্ত্র আসলে নেতিবাচক কোন আদর্শ নয়, সৃজন ও বিকাশ-ধর্মী একটি জীবনযাত্রা। গণতন্ত্রকে সার্থক করে তুলতে হলে তার এই অন্তর্নিহিত জীবনাদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। হ্যাঁ, আর একটি শিক্ষা আমরা এই প্রসঙ্গে লাভ করলাম, বিপরীত-মুখী পন্থার সাহায্যে গণতন্ত্র কখনও আমাদের আয়ত্তে আসবে না। গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে তা গণতান্ত্রিক উপায়েই করতে হবে।

বাতিক

শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়

বেদেডাঙ্গা স্কুলে নতুন চাকরি নিয়ে এলেন মাষ্টারমশাই। ছোট স্কুল। সবে ক্লাস টেন খোলা হয়েছে। এখনও এফিলিয়েশন পাওয়া যায় নি।

বাঁকুড়া জেলার গ্রাম। লালমাটির অনুর্বর প্রান্তর। আদিগন্ত মাঠ একদিকে নেমে গেছে লীলায়িত ঢেউ-খেলানো ভঙ্গিতে। অন্যদিকে শালের বন লালমাটির প্রান্তরের শেষ থেকে সুরু হয়েছে। এসব অঞ্চলে গাছ-পালার সবুজ সমারোহ নেই খুব বেশী। প্রান্তরে কাঁটাগাছের ঝোপ। গ্রামের মধ্যে অশথ, বট, দু'চারটে আম-জাম ইত্যাদি বড় গাছেরই। লতাগাছ বা সবুজ রঙের ঝোপঝাপের বড় অভাব।

মাষ্টারমশাইয়ের নাম নিবারণ চক্রবর্তী। এই জেলারই লোক। মাইল বিশ দূরের কোন্ একটা গ্রামে যেন বাড়ী। বয়স বেশী নয় খুব। পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। দোহারা লম্বা গড়ন। মুখটা রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। একমাথা কালো চুল অবিন্যস্ত। হাতে ক'রে পিছনের দিকে প্রায়ই ঠেলে দেন উনি।

মাষ্টারমশাইয়ের সঙ্গে একটা ছুটিতে এসে আলাপ হ'ল। আমি কলকাতার সদাগরী অফিসে রেকর্ড-নবীশের কাজ করি। ছোটখাট ছুটিতে ছুটে আসি বাড়ী। কলকাতার অন্ধকার মেসবাড়ী থেকে বের হয়ে পাড়াগাঁয়ের এই আলো-হাওয়ার মধ্যে ক'টা দিন বড় আনন্দে কাটাই। সেবার গাঁয়ে এসে মাষ্টারমশাইয়ের কথা শুনলাম। হাইস্কুল হচ্ছে ও তার জন্যে যে চাঁদা দিতে হবে ভালরকম, সে কথাও জানা গেল।

বিকেলে মাষ্টারমশাইয়ের সঙ্গে আলাপ হ'ল। স্কুলটা গ্রামের একপ্রান্তে। খ'ড়ো ঘর, মাটির দেওয়াল, নিকোন-পোছান মেজে। সামনে অনেকখানি মাঠ। কাছেই একটা ইঁদারা। সেটি সিমেন্ট বাঁধান। একটি প্রাচীন ঝুরিনামা বটগাছ। তার পিছনেই মাষ্টারমশাইয়ের থাকবার ঘর। স্কুলের সেক্রেটারী আমার বন্ধু। তার সঙ্গেই বেড়াতে বেরিয়েছি।

সে বলল, 'চল, মাষ্টারমশাইকেও ডেকে নি।'

বললাম, 'মাষ্টারমশাই যদি ব্যস্ত থাকেন অন্য কাজে?'

—'কি কাজে ব্যস্ত থাকবেন আবার? হয়ত দেখবি মাঠে ব'সে বই পড়ছেন।'

ওর কথাই ঠিক। ঝুরিনামা বটগাছের কাছে ব'সে নিবিষ্টমনে বই পড়ছেন মাষ্টারমশাই। স্কুলের পিছনেই লালমাটির প্রান্তর সুরু হয়েছে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে শাল-বনের পিছনে। পিড়িং পিড়িং পাখার ডাক শুনতে পাচ্ছি।

—'মাষ্টারমশাই, বই পড়ছেন নাকি?'

কালো মানুষটি মুখ তুলে তাকালেন। তার পর স্নিগ্ধ হাসিতে চোখ দু'টি উজ্জ্বল ক'রে বললেন, 'কোন্-দিকে চলেছেন? শুধু বেড়াতে নাকি?'

—'হ্যাঁ বেড়াতেই। সঙ্গে এটি আমার বন্ধু। চ'লে আসুন না আমাদের সঙ্গে। একটু বেড়িয়ে আসবেন।'—

মাষ্টারমশাই আমাদের সঙ্গী হলেন। লালমাটির প্রান্তরের উপর দিয়ে অনেকখানি হেঁটে গেলাম। প্রায় শালবনটার কাছাকাছি গিয়ে বসলাম আমরা। এখন আর রোদ নেই। তবু সন্ধ্যে নামতে বাকী আছে। মরা বিকেলে লালমাটির প্রান্তর অপরূপ লাগে।

মাষ্টারমশাইকে বললাম, 'কেমন লাগছে জায়গাটা আপনার?'

—'আমাদের আর লাগালাগি কি? আমরা পাড়া-গাঁয়ে থাকি। আপনি মহানগরীর লোক। আপনার চোখে ভাল লাগবে সব।'

—'শুধু আমার চোখে কেন মাষ্টারমশাই? এই শান্ত নিস্তব্ধতা, এই মরা বিকেল এসব যে কোন কর্মক্লান্ত লোকেরই মনে সুন্দর লাগবে।'

আমার কথাগুলি কবিতার মত শোনাচ্ছিল। আমার নিজের কানেও তাই ঠেকল। হয়ত সেই কারণেই হেসে উঠলেন মাষ্টারমশাই।

বললেন, 'আপনি মশাই বেশ সুন্দর ক'রে কথা বলেন ত! আমরা গাঁয়ের মানুষ। অমন সব কথা মুখে আসে না। আমাদের কেঠো কেঠো কথা সব।'

—'এর আগে কোন্ স্কুলে ছিলেন?'

—'চড়ারডিতে। তারও আগে পায়রাখালি। ধনেশপুর, খড়কুসম, কুশদ্বীপ কত স্কুলেই ত কাজ করলাম। সে প্রায় এখান থেকে মাইল ত্রিশ হবে।

চড়ারডি স্কুল আমার নিজে হাতে গড়া। একটা এম-ই স্কুলকে হাইস্কুলে দাঁড় করিয়েছি। ওর প্রতিটি ইট আমার নিজের সামনে গাঁথানো। বুঝলেন?'

—'তা, সে স্কুল ছাড়লেন কেন?' মাষ্টারমশাইকে বললাম।

—'যা হয় সব জায়গায়, তাই হ'ল শেষটা। স্কুল দাঁড়িয়ে গেল। আমারও প্রয়োজন শেষ হ'ল।'

বন্ধুটি বোধ হয় এ সব কথা জানত। তা ছাড়া একটা স্কুলের সেক্রেটারী সে। এ সব আলোচনায় বোধ হয় ইচ্ছে করেই যোগ দিচ্ছিল না।

আমি বললাম, 'কিন্তু আমাদের স্কুল কেমন লাগছে আপনার?—হাইস্কুল হবে ত এখানে?'

কথা শুনে মাষ্টারমশাই কেমন আশ্চর্য হলেন মনে হ'ল। বললেন, 'হবে না মানে? কাছাকাছি দশ মাইলের মধ্যে স্কুল নেই। আশে-পাশে এত প্রাইমারী স্কুল, এরাই ছেলে পাঠাবে দলে দলে। স্কুল গ'ড়ে উঠবে না কেন?'

মাষ্টারমশাইয়ের কথা খুব সত্যি। অকাট্যও বলা যায়। তা ছাড়া দশ মাইলের মধ্যে হাইস্কুল নেই, এটাই কেমন আশ্চর্য। অন্য দেশে এক মাইল ছু' মাইল অন্তর স্কুল রয়েছে। আর দশ মাইলের মধ্যে স্কুল থাকবে না, এটাই বরং বিচিত্র কথা।

বাড়ী ফিরে মাষ্টারমশাইয়ের সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনলাম বন্ধুর কাছে। কোন স্কুলেই নাকি টিকে থাকতে পারেন না উনি। ছোট স্কুলে গিয়ে জোটেন। অক্লান্ত পরিশ্রমে তাকে হাইস্কুল করে তোলেন। সে সময়টা একচ্ছত্র সম্রাট্ থাকেন উনি। চাঁদা আদায় করা, বাড়ী বাড়ী গিয়ে ছেলে জোটান, বেগারে মুনিষজন দিয়ে কাজ করানো, স্কুলের বাড়ী তৈরী করা ইত্যাদি যেন সবকিছু দশ হাত দিয়ে করতে থাকেন। স্কুল চালু হয়ে গেলেই কেমন যেন অবসন্ন হয়ে পড়েন উনি। টিচারদের সঙ্গে খিটিমিটি সুরু হয়। তুচ্ছ কথায় সেক্রেটারীর সঙ্গে বচসা করেন। ফলে সে স্কুল থেকে বিদায় নিতে হয়। স্কুলের সেক্রেটারী জলের কুমীরের সমান। তার সঙ্গে ঝগড়া করে জলে বাস করা যাবে কেন?

বন্ধুকে বললাম, 'তা হ'লে এত জেনে-শুনে ওকে নিয়ে এলে কেন তুমি?'

—'না নিয়ে এসে উপায় কি আর?' বন্ধু হেসে বলল, 'নতুন স্কুলে ভাল টিচার আসবেন কেন?—তা ছাড়া এই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে।'

ওর কথা মানতে হ'ল। বললাম, 'তা ঠিক।'

বন্ধু বলল, 'শুধু তাই নয়। উনি অনার্স গ্র্যাজুয়েট। বি. টি-তে নাকি ফার্ষ্টক্লাশও পেয়েছিলেন।'

—'অদ্ভুত লোক ত? কোথাও টিকতে পারেন না? শ্যাওলার মত ভেসে বেড়াবেন শুধু?'

বন্ধু হাসতে লাগল।

এর পর মাষ্টারমশাইয়ের আশ্চর্য কার্যক্ষমতার পরিচয় পেলাম। আশেপাশের গ্রামে গ্রামে দলবল জুটিয়ে ঘুরে বেড়ালেন উনি। আমাদের গ্রামেও মিটিং করলেন। স্কুল গঠনের উদ্দেশ্য ইত্যাদি সবকিছু প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন গ্রামবাসীকে। মাতব্বরদের নিয়ে নিজেই একদিন গেলেন ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে সরকারী সাহায্যের জন্য। মোটকথা আমাদের ঐ অঞ্চলে তার নামে একটা ধন্য ধন্য পড়ে গেল।

চাঁদা উঠল অনেক! সরকারী সাহায্যও মিলল কিছু। নতুন বাড়ী হ'ল স্কুলের। সামনের মাঠে সুন্দর একটি বাগান রচনা করা হ'ল। কি এক ধরনের গাছ লাগিয়ে স্কুলের নামটি লিখে দেওয়া হ'ল। মাঠের উপর সেটি বড় সুন্দর দেখাতে লাগল। ছেলেদের খেলবার মাঠও তৈরী। দূর গ্রামের ছাত্রদের জন্য বোর্ডিং ঘরও সম্পূর্ণ হ'ল। এক কথায় স্কুলটি একটি সুন্দর সুচারু রূপ পেল।

সমস্ত বর্ষাকাল কাটিয়ে একেবারে পুজোর সময় বাড়ী গেলাম। মাষ্টারমশাইয়ের সঙ্গে পরদিনই দেখা হ'ল। নমস্কার করে বললাম, 'কি করেছেন মাষ্টারমশাই? এত সুন্দর স্কুলবাড়ীটা হয়েছে যে চোখ ফেরান যায় না। এর সব কৃতিত্বই আপনার।'

মাষ্টারমশাই বিনয়ে ভেঙ্গে পড়লেন। আমাকে বললেন, 'আমি আর কি করেছি এমন? আপনাদের সকলের সাহায্য না পেলে ত কিছুই হয়ে উঠত না।'

বাধা দিয়ে বললাম, 'ওসব বাজে কথা। এ স্কুল আপনার কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবে।'

মাষ্টারমশাই হাসতে লাগলেন। পরিতৃপ্তির হাসি। তাঁর চোখেমুখে সেই রেখাই ফুটে উঠতে লাগল বারবার।

এর পর বছর-খানেক কেটে গেল। মাসে একবার ছুবার গ্রামে যাই! মাষ্টারমশাইয়ের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়। স্কুল চালু হয়ে গেছে। এফিলিয়েশনও পাওয়া গেছে। ছেলেরা পরীক্ষা দিয়েছে সে বছর। সে পরীক্ষার ফলও খুব ভাল। আশেপাশের গ্রামেও ঐ অঞ্চলটার আমাদের স্কুলের খুব সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে

মাষ্টারমশাইয়েরও নাম হ'ল। অমন কর্মিৎকর্মা লোক আর হয় না। সকলে এই কথাই বলল।

সেবার কি একটা ছুটিতে গিয়ে কিন্তু অন্য কথা শুনলাম। মাষ্টারমশাইয়ের নাকি বনিবনা হচ্ছে না আর। সেক্রেটারীর সঙ্গে মন কষাকষি হয়েছে। অধীনস্থ টিচাররাও তাঁর প্রতি প্রসন্ন নন। সব ব্যাপারেই বড় বাড়াবাড়ি করেন উনি। ওঁর কথাই যেন চরম। তার আর নড়চড় হবে না। এইরকম নানা অভিযোগ তাঁর নামে।

শুনে মনটা দমে গেল। এইরকমই সর্বত্র ঘটেছে। মাষ্টারমশাইও সেকথা বলেছিলেন। কিন্তু এখানেও যে তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে এটা কেউ মনে করি নি। সন্ধ্যের সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। উনিও সেই এক কথা বললেন। এখানের কাজে ইস্তফা দেবেন এবার। মাষ্টারিই আর করবেন না। একটা ছোটখাট ব্যবসা করার ইচ্ছে খুব।

আমাকে বললেন, 'আমার একটা উপকার করুন না।'

বললাম, 'নিশ্চয়ই করব। বলুন না কি করতে পারি?'

—'ভাবছি সিমেন্টের ব্যবসা করলে কেমন হয়? এখন ওটার চাহিদা খুব। আপনি আমার হয়ে একটু যোগাযোগ করুন না কলকাতায়।'

বললাম, 'নিশ্চয় চেষ্টা করব। খোঁজখবর নিয়ে আপনাকে জানাব সব, কেমন?'—

তখন ঝুরিনামা বটগাছের আড়ালে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে। পাখ-পাখালীর রব নেই। যে যার ঘরে ফিরেছে। সুমুখের স্কুলবাড়ীটার দিকে একবার চাইলাম। মাষ্টারমশাইয়ের হাতে-গড়া স্কুল। আবার তাকেই ছেড়ে যেতে হবে। মনে বেশ দুঃখ হ'ল।

কলকাতায় ফিরে সিমেণ্টের আর খোঁজ নেওয়া হয় নি। নানা কাজের ভিড়ে ওকথা বেমালুম ভুলে গেছি। বন্ধুর কাছে খবর পেলাম, আমাদের স্কুল ছেড়ে চ'লে গেছেন মাষ্টারমশাই। এখন নতুন হেডমাষ্টার এসেছেন।

বৎসরখানেক পরের কথা। দুর্গাপুর স্টেশনে নেমে বাসে চেপে বসেছি। আজকাল বারাজ হয়ে ভারী সুবিধা। তিন-চার ঘণ্টার মধ্যেই বাড়ী পৌঁছুতে পারি।

বড়জোড়া থানার কাছে বাস্ থামল। সময় লেখানর জন্য। ড্রাইভারের পাশে একটা সীট দখল ক'রে ব'সে আছি। থানা ছাড়িয়ে মিনিট পাঁচেক পরেই বাস্ থামল আবার।

একটু গুঞ্জন উঠল।

কে একজন বলল, 'কি মাষ্টারমশাই, এখানে নামছেন কেন?'

কৌতূহল হওয়ায় মুখ বের ক'রে তাকালাম।

কালো দীর্ঘ মানুষটি কাকে যেন উদ্দেশ ক'রে বললেন, 'এখানে স্কুলের নতুন বাড়ী হচ্ছে যে, একটু তদারক করতে যাচ্ছি।'

শীতের দুপুর। রোদ বেশ স্বচ্ছ আর উজ্জ্বল মনে হয়। দু'তিনজন লোক মোটরবাস্ থেকে নেমে সামনে এগিয়ে গেল। ওদের সকলের আগে আগে সদর্পে পা ফেলে চলেছেন আমাদের মাষ্টারমশাই।

আসল কথাটাই এতদিন বুঝতে পারি নি। স্কুল গড়াই মাষ্টারমশাইয়ের বাতিক। নেশাও বলা যেতে পারে। এক স্কুল গ'ড়ে আবার অন্য স্কুলে যান।

এখানেও কতদিন টিকবেন কে জানে?

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজ

(প্রতিযোগিতায় মনোনীত প্রবন্ধ)

শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের কবি ও শিল্পী সত্তা আমাদের চক্ষে এমন উজ্জ্বল ভাবে প্রতিভাত যে, সামাজিক বা আর্থিক বিষয়াবলী সম্বন্ধে তাঁর অভিমত বিশেষ জনপ্রিয় নয়। সমগ্রভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসাহিত্যই পাঠক মহলে অনাদৃত, এর মধ্যে সমাজপদ্ধতি, অর্থব্যবস্থা ইত্যাদি সাহিত্যেতর বিষয়গুলি আবার বিশেষ ভাবে অবহেলিত। অথচ রবীন্দ্রনাথের সমগ্র ব্যক্তিত্বের স্বরূপ অনুধাবন করার জন্ম, রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ পরিচয় পাবার নিমিত্ত তাঁর সাহিত্যিক ও শিল্পী সত্তার মতই সামাজিক মানুষ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও চর্চা হওয়া প্রয়োজন। ১৩১১ সালের ভাদ্র মাসে লিখিত রবীন্দ্রনাথের "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধ, রবীন্দ্রমানসের সমাজ-চেতনার দিকটি হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। একে প্রত্যুত তাঁর সামাজিক ঘোষণাপত্র আখ্যা দেওয়াও অত্যুক্তি নয়।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজ একটি নূতন সমাজ-ব্যবস্থা—আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামো। ভবিষ্যতের আদর্শ সমাজ সংক্রান্ত কোন পরিকল্পনার পর্যালোচনা করার পূর্বে এই জন্ম প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার একটু বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কারণ বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার অপূর্ণতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি আদর্শবাদী মনুষ্য হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে বলেই সে ভবিষ্যতের এক সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ-ব্যবস্থার পরিকল্পনা রচনা ক'রে তার প্রতি সমাজের সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এই ভাবে তাদের বাঞ্ছিত লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হবার জন্ম অনুপ্রাণিত করে। আর রবীন্দ্রনাথ যে আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার মূল সূত্র বর্ণনা করে গেছেন, আজকের দুনিয়ায় তার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না বোঝার জন্মও বর্তমান সমাজের পরিস্থিতি বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া প্রয়োজন।

কয়েকটি তথ্য দিয়ে এ প্রসঙ্গের সূত্রপাত করা হবে। এই ব্যাপারে গোড়াতেই প্রসিদ্ধ আমেরিকান সমাজ-বিজ্ঞানী এরিখ ফ্রমের ঋণ স্বীকার করা উচিত মনে করি। প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার স্বরূপ নির্ধারণ প্রসঙ্গে তাঁর The Same Society পুস্তকের তথ্যাবলী থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়েছি। যাই হোক, প্রাচ্য দেশসমূহে বিধিবদ্ধ ভাবে সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রস্থ পরিসংখ্যান পাবার ব্যবস্থা এখনও গ'ড়ে ওঠে নি। তাই এ প্রসঙ্গে পশ্চিমের পরিসংখ্যানই ব্যবহার করতে হবে। Maurice Halbwaches তাঁর Les Causes du Sucide গ্রন্থে বলছেন, ":১৮৩৬ থেকে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আত্মহত্যার শতকরা হার প্রুসিয়ায় ১৪০ ভাগ ও ফ্রান্সে ৩৫৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ১৮৩৬ থেকে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইংলণ্ডে প্রতি দশ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ৬২ জন আত্মহত্যা করত আর ১৯০৬ থেকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এ সংখ্যা ১০০ জনে গিয়ে দাঁড়ায়। এই একই সময়ে সুইডেনের আত্মহত্যার হার ৬৬ জন থেকে ১৫০ জনে দাঁড়ায়।" এরিখ ফ্রম তাঁর পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে পাশ্চাত্য দেশসমূহে আত্মহত্যা, নরহত্যা, এবং মদ্যাসক্তি ইত্যাদি জীবনবিমুখ বৃত্তির বিস্তারিত পরিসংখ্যান দিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, "তা হ'লে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউরোপের সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক, শান্তিপ্রিয় এবং সমৃদ্ধ দেশগুলিতে এবং পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ দেশ আমেরিকাতে মানসিক পীড়ার ভীষণতম উপসর্গ পরিলক্ষিত হচ্ছে।"

এ ত গেল সাধারণ অবস্থার কথা। সাধারণ অবস্থা অর্থাৎ যখন সুরা ও সাকী ছাড়াও সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন, ফ্রিস্টাইল কুস্তি এবং সংবাদপত্র ও হরার কমিকস-এর মাধ্যমে পর্যাপ্ত ভাবে উত্তেজনা আহরণ করার, পলায়নবাদী মনোবৃত্তির আদর্শ নর্মভূমি রয়েছে। কোন কারণে যদি কয়েক দিনের জন্মও এই সব আধুনিক "মনোরঞ্জন ব্যবস্থা" বন্ধ রাখা যায়, তা হ'লে নিঃসন্দেহেই আত্মহত্যা ও নরহত্যার সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুরোগাক্রান্তদের সংখ্যাও বেড়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে এরিখ ফ্রমের একটি প্রত্যক্ষ পরীক্ষার বিবরণ উল্লেখযোগ্য: "বিভিন্ন শ্রেণীর আণ্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্রদের নিয়ে আমি নিম্নোক্ত পরীক্ষাটি করেছিলাম। তাদের এই কথা কল্পনা করতে হয়েছিল যে, তাদের তিন দিনের জন্ম নির্জনবাস করতে হবে এবং এই সময়ের মধ্যে তারা রেডিও বা পলায়নবাদী সাহিত্য পাবে না বটে কিন্তু "সৎ" সাহিত্য, স্বাভাবিক খাদ্য এবং অন্যান্য সুবিধা পেতে কোন বাধা নেই। এইরকম অবস্থায় তাদের মনে কি প্রতিক্রিয়া হবে, তা তাদের কল্পনা করতে বলা

হয়েছিল। প্রতিটি দলের শতকরা প্রায় ৯০ জনই জবাব দিয়েছিল যে, ঐ রকম অবস্থা অত্যন্ত আতঙ্কজনক বা ভীষণ কষ্টকর। আর তাই তারা বলেছিল যে, দীর্ঘকাল ঘুমিয়ে বা ছোটখাট ঘর-গৃহস্থালীর কাজ করে কোন মতে তারা ঐ অবধি সমাপ্তির জন্য প্রহর গুণবে। মাত্র অল্প কয়েকজন এই কথা বলেছিল যে, ঐ রকম নিঃসঙ্গতায় তারা বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে এবং একা একা থাকার সময়টুকু উপভোগ করা যাবে।"

নিজের মুখোমুখী হ'তে এই যে ভয়, এ কেবল পাশ্চাত্ত্য দেশেরই বৈশিষ্ট্য নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তী ভারতবর্ষে, বিশেষ করে এর নাগরিক অংশ সম্বন্ধেও এ কথা সমধিক প্রযোজ্য। যাই হোক, বর্তমান সমাজের এই আত্মহত্যা প্রবণতার মূলে কিন্তু দারিদ্র্য নয়। কারণ, পূর্বে Maurice Halbwaches প্রদত্ত যে পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করা হয়েছে তার সংঘটন কালের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, যে সময় পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে আত্মহত্যার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই যুগ তাদের পক্ষে আবার ভৌতিক সমৃদ্ধির সূত্রপাতের কালও বটে। ব্যক্তিগত ভাবে মানুষ দারিদ্র্যের জন্য যে আত্মহত্যা করে না তা নয়, তবে Halbwaches-এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলিতে আত্মহত্যার হার সর্বনিম্ন এবং ইউরোপের ক্রমবর্ধিষ্ণু ভৌতিক সমৃদ্ধির সঙ্গী হয়ে দেখা দিয়েছে আত্মহত্যার বর্ধিত হার। আলবিয়র কামুর লেখনীতে যেন সত্য সত্যই এ যুগের আর্তনাদ ধ্বনিত হয়েছে, "দর্শন জগতে মাত্র একটি যথার্থ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আছে এবং এ হচ্ছে আত্মহত্যা।" (The Myth of Sisyphus)। স্মরণ রাখতে হবে যে, আজকের সাহিত্য জগতে পূর্বোক্ত মনোভাবের ত্রয়ী প্রতিনিধি কামু, সার্তর ও হেমিংওয়ে ভৌতিক সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ইউরোপ ও আমেরিকার সন্তান—দরিদ্র এশিয়া বা আফ্রিকার শিল্পী নন।

অবশ্য এ যুগের এই আত্মহত্যাপ্রবণতা ও জীবন-বিমুখ পলায়নী মনোবৃত্তি মূল রোগ নয়—এগুলি হ'ল রোগের উপসর্গ। গলদ সমাজের গোড়াতেই। এই শতাব্দীর মানুষ নিঃসঙ্গ, একাকী। মরুভূমির বালুকণার মত আমরা পরস্পরের পাশাপাশি থেকেও কারও সঙ্গে মানবীয় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ নই। আমাদের সংখ্যা আছে, কিন্তু সংহতি নেই। প্রত্যুত আমরা যাকে আজ সমাজ বলে আখ্যা দিই, অনেক সমাজ-বিজ্ঞানীর মতে তা "human jungle" ব' মনুষ্য বসবাসের জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই নয়।

ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতাকে যদি ব্যক্তিগত ব্যাপার মনে ক'রে আলোচনাবৃত্তের বাইরে রাখা যায় তা হ'লে সমাজের দু'টি স্তম্ভ বাকী থাকে। এগুলি হচ্ছে রাজনৈতিক ও আর্থিক। রাজনৈতিক, অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে সমাজ শাসিত বা সঞ্চালিত হয় এবং আর্থিকের তাৎপর্য হ'ল সমাজের সদস্যদের ভৌতিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য যে উৎপাদন ব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত। সমাজের বর্তমান ব্যাধির কারণ তাই আমাদের রাজনৈতিক ও আর্থিক—এই দুই ক্ষেত্রে আবিষ্কারের প্রয়াস করতে হবে।

বর্তমান বিশ্বে মোটামুটি দু'রকম রাজনৈতিক ব্যবস্থা দেখা যায়। একটি হ'ল প্রাচীন রাজতন্ত্রের উত্তরসাধক একনায়কত্ব ও অপরটি গণতন্ত্র। একনায়কত্বের রূপ বহু—নগ্ন সৈনিক-শাসন থেকে সুরু ক'রে কমিউনিষ্টদের রাজনৈতিক স্বৈরতন্ত্র পর্যন্ত। হুকুম মোতাবেক ওঠা-বসা ও চলাফেরা করা যে মনুষ্যত্বের পরিপন্থী—এ কথা এক জর্জ অরওয়েলের "এনিম্যাল ফার্ম"-এর "দাসত্বই স্বাধীনতা" আপ্তবাক্যের পূজারী সদস্যরা ছাড়া আর সকলেই স্বীকার করবেন। স্বৈরতন্ত্রের আওতায় মানুষ এক নৈর্ব্যক্তিক "পিপ্‌ল্" বা "মাস"-এ পর্যবসিত হয়। বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের রঙিন চশমার ভিতর দিয়ে যাঁরা পৃথিবীকে দেখেন না, তাঁদের কাছে একথা বলাই বাহুল্য যে, ব্যক্তি-মানবের স্বাধীনতার পরিপন্থী একনায়কত্ববাদী শাসনব্যবস্থা কোনক্রমেই কাম্য নয়। একথা যদি ধ'রেও নেওয়া যায় যে, কমিউনিষ্ট তন্ত্রে সাধারণ মানুষের অন্নবস্ত্রের অভাব দূর হয়ে থাকে, তবু দাঁড়টি ও তার শিকল সোনার হওয়া সত্ত্বেও দাঁড়ের ময়নাকে নিশ্চয় স্বাধীন বলা হবে না।

প্রচলিত গণতন্ত্র অর্থাৎ প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা নগ্ন একনায়কত্বের চেয়ে ভাল হ'লেও কোন মতেই আদর্শ ব্যবস্থা নয়। কারণ কয়েক বৎসর অন্তর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মুষ্টিমেয় মুরুব্বিদের দ্বারা মনোনীত কোন প্রার্থীকে ভোট দেওয়া ছাড়া সমাজের রাজনৈতিক কার্য সঞ্চালনের ব্যাপারে জনসাধারণের আর কোন স্বাধীনতা বা অধিকার নেই। দেশের কার্যকলাপ পরিচালনা করার বিধান রচনা করেন কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা দ্বারা মনোনীত কয়েকশত প্রতিনিধি এবং তাকে কার্যান্বিত করেন কয়েক লক্ষ সরকারী কর্মচারী। ঘটনাচক্রে এঁরা সবাই আবার জনসমুদ্রের ভিতর এক-একটি ছোট দ্বীপের মত এক-একটি বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টি করেন। রাজনৈতিক নেতা ও জনপ্রতিনিধি

এবং সরকারী কর্মচারীরা জনসাধারণের অংশ হয়েও এক এক স্বতন্ত্র দ্বীপের মানুষ। ভারতবর্ষের জনসাধারণ তাদের স্বল্পকালীন গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতাতেও এ কথা এরই মধ্যে বড় নগ্ন ভাবে উপলব্ধি করেছে। এ ছাড়া জনসাধারণ পরস্পরের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা দ্বারা সমাজের কার্যকলাপ সঞ্চালিত করবে ও এই প্রক্রিয়ায় পারস্পরিক সম্বন্ধ-বন্ধনকে প্রাণবন্ত (organic) করে তুলবে—প্রচলিত গণতন্ত্রে তার কোন উপায় নেই। স্বৈরতন্ত্রে মানুষ যেমন "মাস", গণতন্ত্রে মানুষ তেমনি ভোটার। অর্থাৎ একই নৈর্ব্যক্তিকতার অভিব্যক্তি। প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা সমূহের অপূর্ণতা এই অপরিহার্য সিদ্ধান্তের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করছে যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমন একটি নূতন প্রথা প্রবর্তন করা দরকার যা প্রতিটি ব্যক্তিকে তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে মানবীয় সম্বন্ধে সংযুক্ত ক'রে সাধারণ লক্ষ্য পরিপূর্তির অভিমুখে সুসংহত ভাবে চলার সুযোগ দেবে।

পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ—এই দুই ভিন্ন নামে পৃথিবীতে আজ যে অর্থব্যবস্থা চলছে, একটু তলিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, তা এক এবং অভিন্ন। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে আজ যন্ত্রবিপ্লবের ন্যায়সঙ্গত পরিণতি—কেন্দ্রিত উৎপাদন ব্যবস্থা চলছে। বিগত কয়েক দশকে পুঁজিবাদের স্বরূপ পরিবর্তিত হয়েছে সত্য এবং এর ফলে মার্কস তাঁর "ক্যাপিট্যাল" গ্রন্থে শ্রমিকদের আর্থিক দুরবস্থার যে চিত্র অঙ্কন করেছিলেন, আজকের দুনিয়ায় তাও হয়ত আর বিশেষ কোথাও নেই; কিন্তু পুঁজিবাদের মূল চারিত্রধর্ম—মানুষের চেয়ে বস্তুকে বড় মনে করার বৃত্তির কোন ইতর-বিশেষ হয় নি। সমাজবাদের বিচারধারা বস্তুকে মানুষের ঊর্দ্ধে স্থাপনকারী এই মনোবৃত্তিকে স্থানচ্যুত ক'রে মানুষকে স্বমর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে—এই অভয়বাণী উচ্চারণ করে আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু কি কমিউনিজ্‌ম্‌, কি গণতান্ত্রিক সমাজবাদ,—সমাজবাদের কোন ফলিত স্বরূপই এ আশা পূর্ণ করতে সক্ষম হয় নি। আজকের পৃথিবীতে সমাজবাদী দেশগুলির উপাস্য দেবতা হ'ল পুঁজিবাদী দেশের ভৌতিক প্রগতি। সমাজবাদী দেশের নেতৃবৃন্দ নিজ দেশে মানবীয় মূল্যবোধ স্থাপনা পর্বকে সুদৃঢ় করার পরিবর্তে থেকে থেকে এই হুঙ্কার ছাড়েন যে, আর পাঁচ বা দশ বৎসরের মধ্যে তাঁরা ভৌতিক সম্পদ্ উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী আমেরিকাকে "ক্যাচ আপ" করবেন বা তার সমকক্ষ হবেন।

অতএব এর ফল হয়েছে এই যে, কি স্বৈরতন্ত্রে, কি গণতন্ত্রে এবং পুঁজিবাদ অথবা সমাজবাদ নির্বিশেষে প্রচলিত প্রতিটি সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষ নিজেকে আর মানবীয় শক্তি ও গুণের সক্রিয় ধারক ও বাহক জ্ঞান করে না। মানুষ যেন এখন মানবেতর কোন স্থূল শক্তির করুণার উপর নির্ভরশীল এক দীন দরিদ্র "বস্তুতে" পরিণত হয়েছে। প্রচলিত অবস্থাকে এরিখ ফ্রম নিম্নোক্ত প্রকারে ব্যক্ত করেছেন, "আজকের সমাজে এই পারস্পরিক সম্বন্ধ-বিহীনতা বা নিঃসঙ্গতা (alienation) প্রায় চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে। মানুষের সঙ্গে তার কাজ, তার উপভোগ্য উপকরণ, রাষ্ট্র, প্রতিবেশী মানুষ এবং এমন কি স্বয়ং তার নিজের সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও এই নিঃসঙ্গতার রাজত্ব ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষ তার স্বসৃষ্ট বস্তুসমূহের এমন একটি দুনিয়া সৃষ্টি করেছে যার অস্তিত্ব পূর্বে কখনও ছিল না। যান্ত্রিক ক্ষেত্রে সে যে-সব কলকব্জা নির্মাণ করেছে সেগুলিকে চালু রাখার জন্য তাকে এক জটিল সমাজ-যন্ত্রেরও জন্ম দিতে হয়েছে। কিন্তু তার এই সমগ্র সৃষ্টির স্থান তার নিজের ঊর্দ্ধে। নিজেকে সে আর স্রষ্টা বা সমগ্র সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু মনে করে না, মানুষ এখন তার হস্ত-দ্বারা সৃষ্ট এক গোলামেরও গোলাম। তার নিজের সৃষ্টি যতই বিশাল ও অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে ওঠে, ততই সে মানুষ হিসাবে নিজেকে দুর্বল ও ক্ষমতাবিহীন মনে করে। মানুষ তার নিজের শক্তির সম্মুখীন হয় নিজের সঙ্গে সম্বন্ধবিহীন স্বসৃষ্ট বস্তুগুলির মাধ্যমে। মানুষের সৃষ্টিই আজ তার প্রভু, মানুষ স্বয়ং তার নিজের উপর প্রভুত্ব হারিয়ে ফেলেছে।"

এই উৎপাদন ব্যবস্থার আওতায় সমাজের মেরুদণ্ড শ্রমিক সমাজের অবস্থা কেমন হয়? চার্লি চ্যাপলিনের "মডার্ণ টাইমস",-এর এক নিখুঁত ব্যঙ্গচিত্র। শ্রমশিল্পের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে জনৈক বিশেষজ্ঞ J. J. Gillespie-র ভাষায় প্রচলিত উৎপাদন পদ্ধতিতে কোন শ্রমিক যে জিনিসটির অংশবিশেষ উৎপাদন করছে, তার পিছনে কোন্ আর্থিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য বিদ্যমান তা সে জানে না, ঐ জিনিসটির বদলে অপর একটি জিনিস অপর এক ভাবে কেন সে উৎপাদন করবে না, তাও তার জানা নেই। উৎপাদন ব্যবস্থার সংগঠন বা পরিচালনের সঙ্গে সে সম্বন্ধবিহীন। উপরওয়ালার নির্দেশে সে যে যন্ত্রটিতে কাজ করছে, তারই মত নিরাসক্ত ও নৈর্ব্যক্তিক ভাবে সে উৎপাদন ক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে—যেন সেও ঐ যন্ত্রটির একটি অঙ্গ। প্রত্যুত পক্ষে কেন্দ্রিত উৎপাদন ব্যবস্থার শ্রমিকদের কাজ সম্বন্ধে, আজ এই

কথা বলা চলে যে, যতটুকু কাজ যন্ত্র দিয়ে হবার নয়, সেইটুকু করার জন্যই শ্রমিকটির প্রয়োজন। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলতে গেলে, "...এ অবস্থায় শ্রমিক পরমাণুকৃত পরিচালকমণ্ডলীর অঙ্গুলি হেলনে নৃত্যরত একটি আর্থিক পরমাণুতে পরিণত হয়। তোমার স্থান এই এখানে, তুমি এই ভাবে বসবে, তোমার বাহুদ্বয় 'ক' ব্যাসার্ধের পরিধিতে 'খ' ইতে এগোবে ও পিছবে এবং ০·০০০ মিনিটের মধ্যে এই সঞ্চালন ক্রিয়া নিষ্পন্ন করতে হবে।"

আর এই পরিচালকমণ্ডলী বা উপরওয়ালা ম্যানেজাররাও আত্মতৃপ্ত নন অথবা তাঁদের কাজ তাঁদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সহায়ক হয় না। কারণ ম্যানেজারেরা শ্রমিকদের সঞ্চালিত করলে কি হবে, আর এক দল নৈর্ব্যক্তিক শক্তি তাঁদের চিন্তা ভাবনার উপর চেপে বসে আছে। এরিক ফ্রম চমৎকার ভাবে এর বর্ণনা করেছেন। তাঁর কথায় বলতে গেলে, শ্রমিক বা আর সকলের মত (কেন্দ্রিত উৎপাদন ব্যবস্থার) ম্যানেজারকেও অশরীরী দানবদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। অপরাপর দৈত্যাকৃতি কলকারখানা যার সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিশালাকৃতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার, সুবিপুল উপভোক্তা গোষ্ঠী যাদের মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে বা নানা রকম ফন্দি-ফিকির করে হাতে রাখতে হবে, দৈত্যাকৃতি শ্রমিক সঙ্ঘ ও দানব-সদৃশ সরকার—এদের সবাইকে নিয়ে ম্যানেজারকে সর্বদা শশব্যস্ত থাকতে হয়। আর এই সব দানবগুলি যেন সত্যকার জীবিত প্রাণী। এরাই ম্যানেজারের কার্যকলাপ নির্ধারণ করে এবং শ্রমিক ও কেরাণীদের সঞ্চালিত করে।"

অতএব প্রশাসনিক ক্ষেত্রের মতই আর্থিক ক্ষেত্রেও কাজ চালাবার জন্য ক্ষমতার আসল নিয়ামক আমলা-তন্ত্রের সৃষ্টি হয়। কিন্তু কর্মক্ষেত্রের বিপুল বিস্তারের জন্য এখানেও মানুষে মানুষে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ গ'ড়ে উঠতে পারে না এবং তার ফলে সেই নৈর্ব্যক্তিক মনোভাবের সূত্রপাত হয়। আমলা এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রেম বা ঘৃণার মানবীয় সম্পর্ক নয়, যান্ত্রিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। কর্মক্ষেত্রে মানবীয় অনুভূতি থাকা আমলাদের পক্ষে অযোগ্যতা; কারণ আদর্শ আমলার কাছে মানুষ বলে কোন কিছু নেই, আছে "ফাইল", "রেকর্ড", "কেস" অথবা কতকগুলি সংখ্যা অথবা অন্যবিধ প্রতীকাত্মক বস্তু। অর্থাৎ ষোল আনা "রক্তকরবী"র দেশ আর কি! উৎপাদন ব্যবস্থার ব্যক্তিগত মালিকানা থাকলে শ্রমিক আন্দোলনের চাপে শ্রমিকদের সঙ্গে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভয়ে ও বাজারের চাপে উপভোক্তাদের সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থার পরিচালক আমলারা তবু একটু মানবোচিত ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু সমাজবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় অর্থাৎ শিল্প ব্যবসায়ের রাষ্ট্রীয়করণ হলে আমলাদের উপর আর ঐটুকু নিয়ন্ত্রণও থাকে না, তখন তাঁরাই সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন।

অবশ্য শিল্প ব্যবসায়ের আধুনিক মালিকের দলও যে নিজ ব্যবসায় বা কর্মচারীদের সঙ্গে মানবীয় সম্বন্ধে যুক্ত, তা বলা যায় না। কারণ মালিকের যতই সদিচ্ছা থাকুক না কেন, তাঁকে কাজ চালাবার জন্য আমলাদের উপর নির্ভর করতেই হবে। সুতরাং মালিকের মালিকানার দাম দলিলের ঐ এক টুকরো কাগজের বেশী নয়। এই জন্য তিনি তাঁর কমিশন ও লভ্যাংশ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন, ব্যবসায়ের অন্য কোন ব্যাপারে মাথা ঘামান না, ঘামাতে পারেনও না। তা ছাড়া শেয়ার বাজার, ব্যাঙ্ক, ক্রেডিট, ট্যারিফ ইত্যাদি নানাবিধ অশরীরী দানবের উৎপাত স্বয়ং তাঁকেও তাঁর কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং এদের কারণে তাঁর স্বাধীনতাও খর্ব হয়। যৌথ কোম্পানীগুলির অবস্থা আরও খারাপ। সাধারণ অংশীদারদের কাছ থেকেই ব্যবসায়ের অধিকাংশ পুঁজি সংগৃহীত হলেও শতকরা দুই চার ভাগ শেয়ারের মালিক এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠীই ব্যবসায় পরিচালন করেন। সাধারণ অংশীদারদের পক্ষে সংগঠিত হয়ে এই সব কায়েমী স্বার্থের প্রভাব দূর করা অসম্ভব। আর তা ছাড়া অধিকাংশ অংশীদার কেবল কত লভ্যাংশ ঘোষিত হ'ল—এইটুকু জেনেই তাঁদের মালিকানার কর্তব্য পালন করে থাকেন, অংশীদারদের বাৎসরিক সভার প্রক্সির কাগজটি ভরে পাঠাবার কথাও তাঁদের খেয়াল থাকে না।

উৎপাদনের সঙ্গে উপভোগ অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। এ ক্ষেত্রেও সেই অর্থহীনতা, উদ্দেশ্যবিহীনতার রাজত্ব। বিজ্ঞাপনের প্রভাবে শাড়ী গয়না কেনা অথবা সিনেমা-থিয়েটার দেখার মতই নিত্য নূতন মডেলের গাড়ী রেডিও টেলিভিশন রেফ্রিজারেটার এয়ারকুলার ইত্যাদি কেনার মূলে রয়েছে প্রত্যক্ষ প্রয়োজন নয়, বিজ্ঞাপনের অন্তর্গূঢ় প্রভাব। বিজ্ঞাপনের কারণেই এই সব বস্তুর মালিকানার সঙ্গে সামাজিক মর্যাদাবোধ যুক্ত হয়ে পড়েছে এবং তাই যাঁদের এই সব জিনিস নেই তাঁরা অত্যন্ত খিন্ন চিত্তে নিজেদের "অযোগ্যতা" দূর করার প্রাণপণ প্রয়াস করছেন। নিত্য নূতন বস্তু পাবার এই প্রয়াসের কারণে আর্থিক ক্ষেত্রে সর্বনাশ হলেও এবং অত্যধিক চিন্তা-ভাবনা ও পরিশ্রমের কারণে শরীর ও মনে বিপর্যয়

সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও মানুষ নগদে না পারলে কিস্তিতেই এসব কেনার মোহ বর্জন করতে পারছে না। অর্থাৎ যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা একদিকে যেমন মুঠো ভ'রে সমৃদ্ধি দিচ্ছে অন্যদিকে তেমনি নিত্য নূতন চাহিদা সৃষ্টি করে তার পরিপূর্তির জন্য মানুষকে কলুর বলদের মত প্রতিনিয়ত যন্ত্রের চতুর্দিকে ঘুরতে বাধ্য করে অর্থ শরীর মন—সব দিক্ থেকে তাকে নিঃস্ব করে ফেলছে। আবার এই যন্ত্রের সঙ্গে তার ব্যবহারকারীর সম্বন্ধও যান্ত্রিক ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা ডায়েল ঘুরিয়ে টেলিফোনে কথাবার্তা বলি অথবা সুইচ টিপে রেডিও চালাই বটে; কিন্তু এই সব যন্ত্রের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আমরা একেবার অজ্ঞ। অর্থাৎ উৎপাদনের মত উপভোগের ক্ষেত্রেও আমরা কোন জীবন্ত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ নই। আমরা যে বস্তু-জগতে বাস করি, সেখানে নৈর্ব্যক্তিকের সঙ্গে নৈর্ব্যক্তিক মিলিত হয়।

যাদের রাজনৈতিক ও আর্থিক সম্বন্ধ এই রকম নৈর্ব্যক্তিক, তাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদিও নৈর্ব্যক্তিক হবে, এতে আর আশ্চর্যের কি আছে। এ যুগে প্রত্যক্ষ নাটকাভিনয় বা সঙ্গীতের আসরের চেয়ে রেডিও, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র যে অধিক জনপ্রিয় তার অন্যতম প্রধান কারণ এই। একই কারণে একালে ক্লাসিকের পরিবর্তে রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা কাহিনী অথবা যৌন সাহিত্যের কাটতি বেশী। সাহিত্য-পত্রিকার চেয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কেচ্ছা কাহিনীর কারবারী সিনেমা পত্রিকা বিকোয় বেশী। শেকসপীয়র, মিল্টন, দান্তে অথবা গ্যেয়েটে ইত্যাদির দেশে মাঝারী ধরণের প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যিকদের বিচরণকে নিছক পুঁজিবাদের অবক্ষয় ব'লে ধিক্কৃত করার প্রচেষ্টার অতীব সরল পদ্ধতি অবলম্বন করে রেহাই পাওয়া যাবে না। কারণ টলষ্টয়, ডস্টয়ভোস্কি, গোর্কী ও পুশকিন গোগোলের মত প্রচণ্ড মার্তণ্ডের উত্তরসাধক সাহিত্যিকদের খুব বেশী হ'লে মৃৎপ্রদীপের আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এ যুগে পৃথিবীর কোন দেশে সমাজের কোন ক্ষেত্রেই আর গোটা মানুষের আবির্ভাব হচ্ছে না—এটা বালখিল্যদের যুগ, এ যুগ খণ্ডিত মানবদের।

২

তা হ'লে প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে এই যে, আজকের পৃথিবীতে মানুষের এই যে শোচনীয় অবস্থা তার কারণ কি? পূর্বেই আভাস দেওয়া হয়েছে যে, পুঁজিবাদকে সব রোগের কারণ বর্ণনা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করার দিন আর নেই; কারণ "সমাজবাদী দেশসমূহের" মানুষও একই রকম নিঃসঙ্গতার রোগে ভুগছে এবং সেখানেও মানুষের স্থান বস্তুর নীচে। রুশ কর্তৃপক্ষ যখন স্পুৎনিক নিয়ে খুব মাতামাতি করছেন তখন রাশিয়ার যে গ্রামীন চাষীটি প্রশ্ন করেছিল যে, এতে তাদের মত সাধারণ ব্যক্তিদের কি লাভ হ'ল—এ ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, এ রোগের প্রতিকার রাজ্য ব্যবস্থা বা উৎপাদন ব্যবস্থার পরিচালক পরিবর্তনের দ্বারা হবে না, কারণ রোগের মূল আরও গভীরে। কি রাজনৈতিক ব্যবস্থা, কি উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সীমার বাইরে প্রতিষ্ঠান বিশালায়তন হয়ে পড়লে প্রতিষ্ঠান ও তার সম্বন্ধিত অঙ্গসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধের মূর্ত ভাব (concreteness) নষ্ট হয়ে অমূর্ত ভাব (abstractness) সুরু হতে বাধ্য। আর এর সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুরই বাস্তবতার ভাবও লুপ্ত হয়ে যায়। এরিস্টটল সর্বপ্রথম এই সত্য আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, কোন নগর-সাধারণতন্ত্রের জনসংখ্যা যদি একটি নির্দিষ্ট সীমার বাইরে বেড়ে, আজ আমরা যাকে শহর আখ্যা দিয়ে থাকি, সেই পর্যায়ে উপনীত হয়, তা হ'লে তা আর মনুষ্য বসবাসের যোগ্য থাকে না। আর আজকের এই যে অশরীরী কর্তৃত্ব এবং যান্ত্রিক সমরূপতা—এর মূল কারণ হ'ল প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থা। এই উৎপাদন ব্যবস্থার জন্য অতি সত্বর মানুষকে নিজেদের মেশিনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়, এর জন্য নিয়ন্ত্রিত গণ-আচরণ পদ্ধতি (disciplined mass behaviour) চাই এবং কোন রকম বাহ্য শক্তি প্রয়োগ ব্যতিরেকেই মানুষকে সাধারণ রুচি ও আনুগত্যের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়।

যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থাই যে যান্ত্রিক মানুষ ও যান্ত্রিক সমাজের কারণ, একথা এরিখ ফ্রমের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য থেকে স্পষ্ট হবে: "শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে এই সব নূতন যন্ত্র নির্মাণ করতে করতে মানুষ তার এই নূতন কাজে এমন মগ্ন হয়ে পড়ল যে, এই কাজই তার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। একদা তার যে উদ্যম ও শক্তি ঈশ্বরের আবিষ্কার ও মুক্তির সাধনায় নিয়োজিত হ'ত, এবার থেকে তা প্রকৃতিকে দাসী বানাবার কাজে ও ক্রমবর্ধমান ভৌতিক স্বাচ্ছন্দ্যের খোঁজে নিয়োজিত হতে লাগল। উৎপাদনকে এক শ্রেয়স্কর জীবন-প্রাপ্তির সাধন হিসাবে নিয়োগ করতে সে ভুলে গেল। সম্মোহিতের মত সে অধিক ও বিচিত্র উৎপাদনকেই লক্ষ্য করে তুলল এবং জীবনের স্থান উৎপাদনের নিম্নে হ'ল। ক্রমবর্ধিত শ্রম-বিভাজন, কর্মের উত্তরোত্তর যন্ত্রীকরণ এবং সামাজিক

সংগঠনের নিত্যবর্ধনশীল আকারের কারণে মানুষ এই সব যন্ত্রের প্রভু হবার পরিবর্তে স্বয়ং এর এক-একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পর্যবসিত হয়ে পড়ল। মানুষের অবস্থা একটি পণ্য বা কোন বিনিয়োগের (investment) মত হয়ে উঠল। সাফল্য অর্থাৎ যথাসম্ভব অধিক মুনাফার বিনিময়ে বাজারে আত্মবিক্রয় করাই তার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। ব্যক্তি হিসাবে তার মূল্য নিজের বাজার দরের উপর, প্রেম যুক্তিশীলতা বা চারুকলার ক্ষেত্রস্থ দক্ষতা ইত্যাদি মানবীয় গুণ-নির্ভর নয়। অতঃপর নূতনতর ও উন্নততর পণ্যের উপভোগ, সঙ্গীত, চলচ্চিত্রাভিনয়, নানাবিধ আমোদ-প্রমোদ, যৌনসম্ভোগ, সুরা ও সিগারেট ইত্যাদি অধিকাধিক মাত্রায় ব্যবহার এবং সুখ সমঅর্থদ্যোতক শব্দ হয়ে দাঁড়ায়। অধিকাংশের সঙ্গে সহমত হওয়ার মাধ্যমে যে আত্মানুভূতি জাগে তদ্ব্যতিরেকে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অপর কোন চেতনা না থাকায় কারও সঙ্গে মতের মিল না হলেই সে অসহায় ও উৎকণ্ঠিত বোধ করে। আধুনিক মানুষ নিজের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বসৃষ্ট উপকরণ এবং নিজের হাতে-গড়া নেতৃবৃন্দের এই ভাবে উপাসনা করে যে, সে সব যেন তার দ্বারা সৃষ্ট নয়, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও মহান্ কোন কিছু বস্তু।"

কেবল এরিখ ফ্রমই নয়, আরও বহু সমাজবিজ্ঞানীরও এই মত। বি. এইচ. মেয়ো তাঁর "ডেমোক্রেসি এণ্ড মার্ক্‌সইজ্‌ম্‌" গ্রন্থের ২৭৩ পৃষ্ঠায় বলছেন : "স্বাধীনতা, শিল্প নৈপুণ্য, মানসিক শান্তি এবং ভ্রাতৃত্ব ভাবের সব চেয়ে বড় শত্রু সম্ভবতঃ রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ নয়, এর কারণ বৃহৎ যন্ত্র-শিল্পের মধ্যেই নিহিত। এ কথা যদি সত্য হয় তা হ'লে বলতে হবে যে, এখনও আমরা উদ্যোগীকরণ ও যন্ত্রকৌশলের সঙ্গে সম্যক্‌ ব্যবস্থাপিতকরণের পরিবেশ রচনা করতে সমর্থ হই নি। যাই হউক, গডউইন থেকে আরম্ভ করে মামফোর্ড পর্যন্ত প্রতিটি সংবেদনশীল সমাজ বিশ্লেষকের এই একই মত।"

বর্তমান সভ্যতা ও শিল্প-উদ্যোগের অন্যতম পীঠস্থল ইংলণ্ডের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ইংরেজ পণ্ডিত H. J. Fleure বলছেন, "যন্ত্রশিল্পের অজানা গোলক-ধাঁধায় ইংলণ্ডই সর্বপ্রথম পদার্পণ করে। এর ফলে দেশের জনসাধারণ মাটির সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্যুত হয়ে শহরের বস্তিতে একত্র হ'ল। এই প্রক্রিয়ায় সুপ্রচুর অনর্জিত সম্পদ্‌ স্তূপীকৃত হ'ল এবং এই সম্পদ্‌ আবার শ্রমশিল্পের পুঁজি হিসাবে ব্যবহৃত হতে লাগল। জনসাধারণের অবস্থা অসংখ্য পরমাণুর আকস্মিক মিলনভূমির মত হয়ে দাঁড়াল। অথচ চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও সময় সময় এ কথা বিস্মৃত হন যে, জনসমাবেশ ও সমাজ সমঅর্থদ্যোতক শব্দ নয় এবং সামাজিক প্রাণীর পক্ষে সামাজিক জীবন এক প্রাথমিক প্রয়োজন স্বরূপ। একথা সত্য যে, সমাজের একজন হবার এই আকূতি মানুষের এক মৌলিক বৈশিষ্ট্য হওয়ায় জনসেবামূলক কার্য, খেলাধূলা এবং এমন কি লঘুচেতা ও কুখ্যাত গোষ্ঠীর মাধ্যমে বিকল্প অভিব্যক্তি পেল ; কিন্তু সমগ্র ভাবে স্থানীয় সামাজিক জীবনের সঙ্গে ঐ সব গোষ্ঠীর সম্বন্ধক্ষেত্র অত্যন্ত সীমিত।" (Peter Manniche-এর Living Democracy in Denmark গ্রন্থের ভূমিকা)।

নজিরের সংখ্যা আর না বাড়িয়ে তাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মানুষকে তার স্বসৃষ্ট এই নিঃসঙ্গতার, উদ্দেশ্যবিহীন জীবনধারণের ক্লেশকর পরিস্থিতির হাত থেকে রক্ষা করতে হলে রাজনৈতিক এবং আর্থিক ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে মানুষে মানুষে প্রত্যক্ষ এবং জীবন্ত সম্বন্ধ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। পশ্চিমের আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা সেই বাঞ্ছিত সমাজ-ব্যবস্থাকে মুখোমুখি সমাজ (face to face community) অথবা কমিউনিটেরিয়ান সোসাইটী আখ্যা দেন। এই সমাজের সদস্যরা যথাসম্ভব প্রত্যক্ষ ভাবে নিজেদের সব কাজ করবেন এবং কি রাজনৈতিক, কি আর্থিক ক্ষেত্রে কাজ ও কর্তৃত্বের ভারার্পণ (delegation) যথাসম্ভব কম হবে।

৩

আধুনিক সমাজের ব্যাধি ও তার নিদান সম্বন্ধে আলোচনার পর এর পরিপ্রেক্ষিতে এবার রবীন্দ্রনাথের "স্বদেশী সমাজ"-এর বক্তব্য বিশ্লেষণ করা যাক। অবশ্য ভারতের পরাধীনতার মৌলিক কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ১৩০৩ সালেই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, "বারুদ এবং শীসকের গোলক দ্বারা তাহার স্বাধীনতা অপহৃত হইতে পারে না। আগে আমাদের সমাজ নষ্ট হইয়াছে, ধর্ম বিকৃত হইয়াছে, বুদ্ধি পরবশ হইয়াছে, মনুষ্যত্ব মৃতপ্রায় হইয়াছে, তাহার পরে আমাদের রাষ্ট্রীয় দুর্গতির সূচনা হইয়াছে। সকল অবমাননা, সকল দুর্বলতার মূল সমাজের মধ্যে, ধর্মের মধ্যে।" ("ভারতপথিক রামমোহন রায়," রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৯৫।) জাতি এবং মনুষ্যের জীবনে সমাজের ভূমিকা সম্বন্ধীয় এই সূত্র সংক্ষিপ্ত হলেও একটি চিরপুরাতন সত্যের নব আবিষ্কার।

এ কথা বলাই বাহুল্য যে, সমাজের বিকৃতির ফলে

যদি দেশ ও জাতি পরাধীন হয় তা হ'লে স্বাধীনতা অর্জন ও অর্জিত স্বাধীনতাকে বজায় রাখার জন্য সুস্থ সমাজের ভূমিকা আরও কত গুরুত্বপূর্ণ। "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধের মারফত রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই কথাটিই আমাদের সামনে উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন। প্রবন্ধটি লিখিত হয় বাংলা দেশের জলকষ্ট নিবারণ সম্বন্ধে তদানীন্তন সরকারের মন্তব্য প্রকাশিত হবার পর। দেশবাসীর সরকার-নির্ভর মনোবৃত্তি রবীন্দ্রনাথকে কেবল বাংলা বা ভারতবর্ষের নয়, বিশ্বের প্রতিটি দেশের নাগরিকের মৌল স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্র রচনায় অনুপ্রাণিত করে।

স্বাভাবিক সময়ে সমাজের অনন্য ভূমিকার উল্লেখ দ্বারা রবীন্দ্রনাথ এই আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি বলেন, "আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য রাজা করিয়াছেন. কিন্তু বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্যন্ত সমস্তই সমাজ এমন সহজ ভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বন্যার মত বহিয়া গেল তবু আমাদের সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদিগকে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দেয় নাই।···সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই।" কিন্তু আজ? "আজ সমাজের মনটা সমাজের মধ্যে নাই। আমাদের সমস্ত মনযোগ বাহিরের দিকে গিয়াছে।" কারণ, "···সহায়তা লাভ, কল্যাণ লাভের সূত্রে দেশের যে হৃদয় এতদিন সমাজের মধ্যেই কাজ করিয়াছে ও তৃপ্তি পাইয়াছে, তাহাকে বিদেশীর হাতে সমর্পণ করা হইল। যেখান হইতে দেশ সমস্ত উপকার পাইবে সেখানেই সে তাহার সমস্ত হৃদয় স্বভাবতই দিবে।" স্বাধীনতার চোদ্দ বৎসর পরও ভারতের এই যে হতশ্রী অবস্থা এর মূল কারণ রাষ্ট্র-নির্ভরতা এবং এই কথাই আজ থেকে ছাপ্পান্ন বৎসর পূবে আর্য-দৃষ্টিসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করে গিয়েছিলেন—"আমাদের সমস্ত মনোযোগ বাহিরের দিকে গিয়াছে।"

ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে বসে রবীন্দ্রনাথ "স্বদেশী সমাজ" লেখার তিন বৎসর পর ইতিহাসের এক বিচিত্র নির্দেশে ভারতের পশ্চিম সীমান্তের এক মহাপুরুষও এদেশের হৃতগৌরব অবস্থার কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। আমরা মহাত্মা গান্ধীর কথা বলছি। তিনি অবশ্য তখন দক্ষিণ আফ্রিকার এক তরুণ ব্যারিষ্টার। কিন্তু দেশের মৌলিক সমস্যাসমূহ তখন থেকেই তাঁর মনকে আলোড়িত করছে এবং তারই পরিণাম হ'ল তাঁর "হিন্দ স্বরাজ" গ্রন্থ। "হিন্দ স্বরাজ"-এ গান্ধীজীর কল্পিত প্রশ্নালু পাঠক সমাজের ভূমিকা সম্বন্ধীয় এই জাতীয় উক্তি শুনেই বিলাতের পার্লামেন্টের দোহাই দিয়ে বহির্মুখী মনোবৃত্তির সমর্থন করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও এই জাতীয় পল্লবগ্রাহী সমালোচনা উঠতে পারে অনুমান ক'রে গোড়াতেই তার জবাব দিয়ে গেছেন। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করে তিনি মন্তব্য করেছেন, "বিলাত দেশের সমস্ত কল্যাণকর্মের ভার স্টেটের হাতে সমর্পণ করিয়াছে; ভারতবর্ষ তাহা আংশিক ভাবে মাত্র করিয়াছিল।" ভারতবর্ষের এই আংশিক রাজ্য-নির্ভরতার স্বরূপ আরও একটু সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, "রাজা যদি সাহায্য বন্ধ করেন, হঠাৎ যদি দেশ অরাজক হইয়া আসে, তথাপি সমাজের বিদ্যাশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা একান্ত বাধাপ্রাপ্ত হয় না। রাজা যে প্রজাদের জন্য দীর্ঘিকা খনন করিয়া দিতেন না তাহা নহে, কিন্তু সমাজের সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই যেমন দিত, তিনিও তেমনি দিতেন। রাজা অমনোযোগী হইলেই দেশের জলপাত্র রিক্ত হইয়া যাইত না।"

ভারত ও ইংলণ্ডের পূর্বোক্ত ভিন্ন ঐতিহ্যের তর্কসঙ্গত পরিণতি কি? রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "···ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার প্রাণশক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণের কল্যাণ-ভার যেখানেই পুঞ্জিত হয় সেখানেই দেশের মর্মস্থান। সেইখানে আঘাত করিলেই সমস্ত দেশ সাংঘাতিক রূপে আহত হয়। বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্যস্ত হয় তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়। এই জন্য ইউরোপে পলিটিক্‌স্ এত অধিক গুরুতর ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয় তবেই যথার্থ ভাবে দেশের সংকটাবস্থা উপস্থিত হয়। নিঃস্বকে ভিক্ষাদান হইতে সাধারণকে ধর্মশিক্ষাদান, এ সমস্ত বিষয়ই বিলাতে স্টেটের উপর নির্ভর, আমাদের দেশে ইহা জনসাধারণের ধর্মব্যবস্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত—এই জন্য ইংরেজ স্টেটকে বাঁচাইলেই বাঁচে, আমরা ধর্মব্যবস্থাকে বাঁচাইলেই বাঁচিয়া যাই।" আজকে স্বাধীনতা লাভ করার পরও আমরা হিতব্রতী রাষ্ট্রের (welfare state) নামে নূতন করে সরকার-নির্ভর হয়ে আত্মশক্তিকে বিসর্জন দিতে বসেছি এবং তার পরিণাম স্বরূপ রাষ্ট্রযন্ত্র ও তার পরিচালক আমলাদের সর্বশক্তিমান্ করে গ'ড়ে তুলে কিঞ্চিৎ আরাম ও বিরামের বিনিময়ে আমাদের স্বাধীনতাকে বিকিয়ে দিচ্ছি। দেশের বর্তমান অবস্থায় তাই রবীন্দ্রনাথের সতর্কবাণী স্মরণ রাখা বিশেষ প্রয়োজন। তিনি জানতেন যে, "যে কর্ম সমাজ

সরকারের দ্বারা করাইয়া লইবে, সেই কর্ম সম্বন্ধে সমাজ নিজেকে অকর্মণ্য করিয়া তুলিবে।" আর সমাজকে অকর্মণ্য করে তোলার পরিণাম আমরা জানি। স্বাধীন ভারতের সরকার সম্বন্ধেও এই একই কথা প্রযোজ্য। কারণ প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থায় সরকারের চারিত্র-ধর্মে মূলগত কোন পার্থক্য হয় না।

সরকার-নিরপেক্ষ, জনশক্তি-আধারিত সমাজোন্নয়ন কার্য পরিচালন করার প্রস্তাবকে অগভীর জ্ঞানের ব্যাপারীরা হতাশাসঞ্জাত মনোবৃত্তির দ্যোতক আখ্যা দিয়ে থাকেন। রাজদ্বারে ভিক্ষাপ্রাপ্তির আশা নেই বলেই আত্মশক্তির সাধকরা স্বাবলম্বনের কথা বলছেন—এই-ই হয় সমালোচকদের বক্তব্য। এঁদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বজ্রকঠোর কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, "আমি স্পষ্ট বলিতেছি, রাজা আমাদিগকে মাঝে মাঝে লগুড়াঘাতে তাঁহার সিংহদ্বার হইতে খেদাইতেছেন বলিয়াই যে অগত্যা আত্মনির্ভরকে শ্রেয়জ্ঞান করিতেছি, কোনদিনই আমি এরূপ দুর্লভ-দ্রাক্ষাগুচ্ছ-লুব্ধ হতভাগ্য শৃগালের সান্ত্বনাকে আশ্রয় করি নাই। আমি এই কথাই বলি, পরের প্রসাদভিক্ষাই যথার্থ 'পেসিমিস্ট' আশাহীন দীনের লক্ষণ। গলায় কাছা না লইলে আমাদের গতি নাই, এ কথা আমি কোনমতেই বলিব না। আমি স্বদেশকে বিশ্বাস করি, আমি আত্মশক্তিকে সম্মান করি। আমি নিশ্চয় জানি যে, যে উপায়েই হউক, আমরা নিজের মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি করিয়া আজ যে সার্থকতালাভের জন্য উৎসুক হইয়াছি, তাহার ভিত্তি যদি পরের পরিবর্তন-শীল প্রসন্নতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাহা পুনঃ পুনঃই ব্যর্থ হইতে থাকে। অতএব ভারতবর্ষের যথার্থ পথটি কি, আমাদিগকে চারিদিক্ হইতেই তাহার সন্ধান করিতে হইবে।"

সুতরাং মুক্তি রাজশক্তির প্রসাদভিক্ষার পথে নেই, আছে ভারতবর্ষের সনাতন ঐতিহ্যে। এ ঐতিহ্যের স্বরূপ নিম্নরূপ: "মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয় সম্বন্ধ স্থাপনই চিরকাল ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান চেষ্টা ছিল। আমরা যে-কোন মানুষের সংস্রবে আসি, তাহার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া বসি। এই জন্য কোনও অবস্থায় মানুষকে আমরা আমাদের কার্য-সাধনের কল বা কলের অঙ্গ বলিয়া মনে করিতে পারি না। ইহার ভালমন্দ দুই দিকই থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা আমাদের দেশীয়, এমন কি তদপেক্ষাও বড়, ইহা প্রাচ্য" (প্রবন্ধ লেখক কর্তৃক বিশেষ ভাবে চিহ্নিত)। এ যুগে বিশ্বের তাবৎ সমাজ-ব্যবস্থায় রাষ্ট্র, পার্টি অথবা উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থার বেদী-মূলে মানুষকে বলি দেবার যে মনোবৃত্তি দৃষ্টিগোচর, তার কারণ হচ্ছে মানুষকে গৌণ জ্ঞান করা, মানুষকে কোন কার্যসাধনের কল বা কলের অঙ্গ বিবেচনা করা। রবীন্দ্রনাথ তাই তাঁর "স্বদেশী সমাজ"-এ রোগের একেবারে মূলের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, বর্তমান ব্যাধির প্রতিকার মানবীয় দৃষ্টিকোণ—মানবতাবাদী জীবনদর্শনে। আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকামীর তাই রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত উপদেশ বিস্মৃত হলে চলবে না: "প্রয়োজনের সম্বন্ধকে আমরা হৃদয়ের সম্বন্ধ দ্বারা শোধন করিয়া লইয়া তবে ব্যবহার করিতে পারি। ভারতবর্ষ কাজ করিতে বসিয়াও মানবসম্বন্ধের মাধুর্যটুকু ভুলিতে পারে না। এই সম্বন্ধের সমস্ত দায় সে স্বীকার করিয়া বসে। আমরা এই দায় সহজে স্বীকার করাতেই ভারতবর্ষের ঘরে পরে, উচ্চে নীচে, গৃহস্থে ও আগন্তুকে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে। এই জন্যই এদেশে টোল পাঠশালা জলাশয় অতিথিশালা দেবালয় অন্ধ-খঞ্জ-আতুরদের প্রতি-পালন প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনও দিন কাহাকেও ভাবিতে হয় নাই।" নিছক প্রয়োজন অর্থাৎ স্বার্থের সম্বন্ধের আধারে যে সমাজ-ব্যবস্থা গ'ড়ে ওঠে তা আজকেরই মত "মেকানিষ্টিক" বা যান্ত্রিক হতে বাধ্য। আজকের এই যান্ত্রিক সমাজে জীবনরসায়নের সঞ্চার করার জন্য কেবল সমাজকল্যাণমূলক আইন-কানুন বা আমলাদের দ্বারা কল্যাণমূলক কার্যকলাপ সঞ্চালিত করাই যথেষ্ট নয়। যে মানবীয় প্রেরণার বশবর্তী হয়ে মানুষ নিরন্নকে অন্ন দেয়, অন্ধ-খঞ্জ-আতুরদের সেবা করে, মানুষে মানুষে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের সেই করুণামূলক সমাজ-ব্যবস্থাই রবীন্দ্রনাথের কাম্য ছিল। কারণ ব্যক্তি-মানবের হৃদয় আছে, পক্ষান্তরে রাষ্ট্র সংবেদনশীলতা-বিবর্জিত এক নৈর্ব্যক্তিক সত্তা।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মানুষের চিন্তা ভাবনা ও কর্মকে প্রতিনিয়ত সমাজমুখী রাখার উপায় কি? কারণ পরার্থ-বৃত্তির মত স্বার্থবোধও মানুষের স্বভাবে ওতপ্রোত। মানুষের স্বার্থভাবনাকে অপনোদিত ক'রে তাকে সমাজ-মুখী করার সমস্যা এ যুগের সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে একটি বড় প্রশ্ন। মানুষকে সহস্রবিধ বিধিবিধানের দাস করে শাস্তির ভয়ে তার অসামাজিক বৃত্তিসমূহের কণ্ঠরোধ করা সমাজবাদের আদর্শ। এর বিকল্প হিসাবে হিতব্রতী রাষ্ট্র সর্ব-সাধারণের কাছ থেকে যথাসম্ভব অধিক কর নিয়ে আমলাদের দ্বারা জনকল্যাণের কাজ করাতে চায়।

উভয় ব্যবস্থাতেই চৈতন্যশীল ও মুক্ত জীব হিসাবে মানুষের ভূমিকা কুণ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধে এই মৌলিক সমস্যার সমাধানের জন্য এক বৈপ্লবিক পন্থা নির্দেশ করেছিলেন। পন্থাটি বৈপ্লবিক হলেও অভিনব নয় কিন্তু।

রবীন্দ্রনাথের নিদান প্রাচ্যের ধর্মমূলক ঐতিহ্যের উপর আধারিত। একদা সমাজ-কল্যাণের জন্য প্রবর্তিত হিন্দু সমাজের যে সব প্রথা আজ প্রাণহীন জড় আচার মাত্রে পর্যবসিত, তাদের সত্য স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের চোখে ধরা পড়েছিল। তিনি দেখেছিলেন, "গৃহের এবং পল্লীর ক্ষুদ্র সম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া প্রত্যেককে বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত করিয়া অনুভব করিবার জন্য হিন্দুধর্ম পন্থা নির্দেশ করিয়াছে। হিন্দুধর্ম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, সমস্ত মনুষ্য ও পশুপক্ষীর সহিত আপনার মঙ্গলসম্বন্ধ স্মরণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে। ইহা যথার্থ রূপে পালিত হইলে ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকের পক্ষে ও সাধারণ ভাবে বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলকর হইয়া উঠে।" ধার্মিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক সংহতি বিস্তৃত করে রাখার এই পরিকল্পনা কেবল যে সমাজকেই দৃঢ় বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত করবে তাই নয়, এর ফলে ধর্মেও নবজীবনের সঞ্চার হবে। শুষ্ক জ্ঞানমার্গ অথবা ভক্তিমার্গের নিছক ভাবাবেগ বিংশ শতাব্দীর মানুষের ধর্ম-পিপাসা মেটাতে পারবে না। তাই রবীন্দ্রনাথের ধর্মের সঙ্গে জনকল্যাণের সমন্বয় সাধন করার এই প্রস্তাব একাধারে দ্বিবিধ বিপ্লব। আর রবীন্দ্রনাথের এ পরিকল্পনা যে অবাস্তব কবিকল্পনা নয়, তার প্রমাণ অতীতের বিবেকানন্দ এবং এ যুগের গান্ধী ও বিনোবা ভাবের সাধনা।

সুতরাং এই আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রত্যক্ষ কর্তব্য কি? রবীন্দ্রনাথ তাঁর "স্বদেশী সমাজ"-এর সদস্যদের কর্তব্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "আমাদের সমাজে প্রত্যেকের সহিত সমস্ত দেশের একটা প্রাত্যহিক সম্বন্ধ কি বাঁধিয়া দেওয়া অসম্ভব? প্রতিদিন প্রত্যেকে স্বদেশকে স্মরণ করিয়া এক পয়সা অথবা তদপেক্ষা অল্প, একমুষ্টি অথবা অর্ধমুষ্টি তণ্ডুলও স্বদেশ-বলিস্বরূপে উৎসর্গ করিতে পারিবেন না? স্বদেশের সহিত আমাদের মঙ্গলসম্বন্ধ—সে কি আমাদের ব্যক্তিগত হইবে না? আমরা কি স্বদেশকে জলদান, বিদ্যাদান প্রভৃতি মঙ্গলকর্মগুলিকে পরের হাতে সমর্পণ করিয়া দেশ হইতে আমাদের চেষ্টা চিন্তা ও হৃদয়কে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিব?" "স্বদেশের ভার আমরা প্রত্যেকেই এবং প্রতিদিনই গ্রহণ করিব—তাহাতে আমাদের গৌরব, আমাদের ধর্ম। এইবার সময় আসিয়াছে, যখন আমাদের সমাজ একটি সুবৃহৎ স্বদেশী সমাজ হইয়া উঠিবে। সময় আসিয়াছে, যখন প্রত্যেকে জানিবে আমি একক নহি—আমি ক্ষুদ্র হইলেও আমাকে কেহ ত্যাগ করিতে পারিবে না, এবং ক্ষুদ্রতমকেও আমি ত্যাগ করিতে পারিব না।" আবার, "...সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যহ অতি অল্পপরিমাণেও কিছু স্বদেশের জন্য উৎসর্গ করিবে। তা ছাড়া প্রত্যেক গৃহে বিবাহাদি শুভকর্মে গ্রামভাটি প্রভৃতির ন্যায় এই স্বদেশী সমাজের একটি প্রাপ্য আদায় দুরূহ বলিয়া মনে করি না। ইহা যথাস্থানে সংগৃহীত হইলে অর্থাভাব ঘটিবে না। আমাদের দেশে স্বেচ্ছাদত্ত দানে বড়ো বড়ো মঠ মন্দির চলিতেছে, এ দেশে কি সমাজ ইচ্ছাপূর্বক আপনার আশ্রয়স্থান আপনি রচনা করিবে না? বিশেষত যখন অন্নে জলে স্বাস্থ্যে বিদ্যায় দেশ সৌভাগ্যলাভ করিবে তখন কৃতজ্ঞতা কখনই নিশ্চেষ্ট থাকিবে না।"

আপাতদৃষ্টিতে এ কর্মসূচীকে অকিঞ্চিৎকর মনে হতে পারে, কারণ বড় বড় হেঁয়ালিপূর্ণ তত্ত্বকথা এর মধ্যে নেই। কিন্তু এই লঘুস্বরূপ কর্মসূচীর ভিতর অন্তর্নিহিত সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে সমাজ-চেতনা—সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে সামাজিক কর্তব্য সম্বন্ধে দায়িত্ববোধ। ছোট ছোট কর্তব্যকর্মের মাধ্যমে সমাজের সঙ্গে এই সাযুজ্যবোধ যদি জাগ্রত হয়, তা হ'লে যুদ্ধের বার আনাই জয় হয়ে যায়। এই জন্য পরম আত্মবিশ্বাস সহকারে রবীন্দ্রনাথ বলতে পেরেছিলেন, "নিজের শক্তিকে অবিশ্বাস করিবেন না—আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, সময় উপস্থিত হইয়াছে। নিশ্চয় জানিবেন, ভারতবর্ষের মধ্যে একটি বাঁধিয়া তুলিবার ধর্ম চিরদিন বিরাজ করিয়াছে। নানা প্রতিকূল ব্যাপারের মধ্যে পড়িয়াও ভারতবর্ষ বরাবর একটা ব্যবস্থা করিয়া তুলিয়াছে, তাই আজও রক্ষা পাইয়াছে। এই ভারতবর্ষের উপরে আমি বিশ্বাস স্থাপন করি। এই ভারতবর্ষ এখনই এই মুহূর্তেই ধীরে ধীরে নূতন কালের সহিত আপনার পুরাতনের আশ্চর্য একটি সামঞ্জস্য গড়িয়া তুলিতেছে। আমরা প্রত্যেকে যেন সজ্ঞান ভাবে ইহাতে যোগ দিতে পারি—জড়ত্বের বশে বা বিদ্রোহের তাড়নায় প্রতিক্ষণে ইহার প্রতিকূলতা না করি।"

৪

রবীন্দ্রনাথের এই স্বদেশী সমাজের কল্পনা কোন

স্থানীয় আনুগত্য (parochialism) চালিত সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক নয়। ঔপনিষদিক ভাবধারায় ওতপ্রোত ভূমাপ্রেমী বিশ্বমানব কদাচ অল্পে সন্তুষ্ট হতে পারেন না। তাই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজের সদস্যরা স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের অধিবাসী হলেও তাদের মন ছোট্ট গ্রামটির চতুঃসীমার মধ্যে বন্দী থাকবে না। দেশী মেলা রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এই মেলায় যেমন দেশী পণ্য ও কৃষিদ্রব্যের প্রদর্শনী থাকবে, তেমনি ভাল কথক, কীর্তন গায়ক, যাত্রার দল এবং ম্যাজিক লণ্ঠন ইত্যাদির সাহায্যে জনশিক্ষার প্রসার করা হবে। প্রত্যুত রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজ ও বিরাট্ বিশ্বের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের কাজ করবে এই মেলা।

শুধু তাই নয়। ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এই স্বদেশী সমাজ ভারতের ইতিহাস-নির্দিষ্ট কর্তব্য ও যথাযথ ভাবে পালন করবে। কি সেই ইতিহাসের বিধান? সমন্বয়। যে ভারত-তীর্থের কবি এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে শকহুন দল পাঠান মোগলকে এক দেহে লীন হতে দেখেছিলেন, তিনি আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, "বিধাতা যেন একটা বৃহৎ সামাজিক-সম্মিলনের জন্য ভারতবর্ষেই একটা বড় রাসায়নিক কারখানা ঘর খুলিয়াছেন।" সুতরাং রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজে ভীরু আত্মসঙ্কোচনের দুর্বৃত্তির স্থান নেই। একদিকে স্বয়ংশাসিত স্বাবলম্বী পল্লী এবং তার অপর দিগন্ত নিখিল বিশ্ব। কারণ রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন, "...প্রত্যেক জাতিই বিশ্বমানবের অঙ্গ। বিশ্বমানবকে দান করিবার, সহায়তা করিবার সামগ্রী কি উদ্ভাবন করিতেছে, ইহারই সদুত্তর দিয়া প্রত্যেক জাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যখন হইতে সেই উদ্ভাবনের প্রাণশক্তি কোন জাতি হারায়, তখন হইতেই সেই বিরাট্ মানবের কলেবরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গের ন্যায় সে কেবল ভারস্বরূপ বিরাজ করে। বস্তুতঃ, কেবল টিকিয়া থাকাই গৌরবের নহে।"

"দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে"—ভারতাত্মার এই বাণী রবীন্দ্রমানসে তার সত্য স্বরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল বলে তিনি ভারতের নানক, কবীর ও বৈষ্ণব সাধকদের ভিতর ইসলাম ও হিন্দুধর্মের সমন্বয় আবিষ্কার করেছিলেন। একই কারণে তিনি এ দেশের মাটিতে ইংরেজদের পদার্পণকে কোন প্রক্ষিপ্ত ঘটনা জ্ঞান ক'রে বিদেশীর ছোঁয়া থেকে বাঁচার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন নি। আদর্শ ইতিহাসজ্ঞের দৃষ্টিতে ভারতভূমিতে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়ে তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে, একদা যে ভারতবর্ষ সর্বত্র শান্তি সান্ত্বনা ও ধর্ম ব্যবস্থা স্থাপন করে মানবের ভক্তিপাত্র হয়েছিল, কালের প্রভাবে তা হারাবার পর ইংরেজের আসার প্রয়োজন ছিল। কারণ, "ইংরেজের প্রবল আঘাতে এই ভীরু পলাতক সমাজের ক্ষুদ্র বেড়া অনেক স্থানে ভাঙ্গিয়াছে। বাহিরকে ভয় করিয়া যেমন দূরে ছিলাম, বাহির তেমনি হুড়মুড় করিয়া একেবারে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে—এখন ইহাকে ঠেকায় কাহার সাধ্য। এই উৎপাতে আমাদের যে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গেল তাহাতে দুইটা জিনিস আমরা আবিষ্কার করিলাম। আমাদের কি আশ্চর্য শক্তি ছিল তাহা চোখে পড়িল এবং আমরা কি আশ্চর্য অশক্ত হইয়া পড়িয়াছি তাহাও ধরা পড়িতে বিলম্ব হইল না।"

"আমাদের যে শক্তি আবদ্ধ আছে তাহা বিদেশ হইতে বিরোধের আঘাত পাইয়াই মুক্ত হইবে—কারণ, আজ পৃথিবীতে তাহার কাজ আসিয়াছে। আমাদের দেশের তাপসেরা তপস্যার দ্বারা যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন তাহা মহামূল্য, বিধাতা তাহাকে নিষ্ফল করিবেন না। সেইজন্য উপযুক্ত সময়েই তিনি নিশ্চেষ্ট ভারতকে সুকঠিন পীড়নের দ্বারা জাগ্রত করিয়াছেন।" দেশ-কালের ঊর্ধ্বে বিরাজিত যে ঋষিদৃষ্টির প্রসাদে রবীন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত সত্য উপলব্ধি ও ব্যক্ত করতে পেরেছিলেন, তিনি যে স্বদেশী সমাজের মাধ্যমে কোন রকম সঙ্কীর্ণতা বা স্থানীয় আনুগত্যের প্রশ্রয় দেবেন, এ কথা মনে করা ভ্রমাত্মক।

৫

প্রাচীন সংস্কার-চালিত ভেদবুদ্ধি আজ ফলিত বিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণকারী হওয়ায় মানব প্রজাতির অস্তিত্বের সম্মুখে এক সঙ্কট উপস্থাপিত হয়েছে—এ কথা অনস্বীকার্য। শুদ্ধ বিজ্ঞান (pure science) কিন্তু মানুষে মানুষে সর্বপ্রকার ভেদবিভেদ দূর করে একত্বের বাণীই প্রচার করছে। রসায়ন শাস্ত্র ও পদার্থ বিজ্ঞান যেমন জড় পদার্থের মৌলিক একত্ব আবিষ্কার করেছে, নৃতত্ত্ব, জীববিজ্ঞান, শারীরবৃত্ত ও প্রাচীন ইতিহাসও তেমনি মানুষের সনাতন অভিন্নতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। ভারতের প্রাচীন ঋষিদেরই মত আধুনিক বিজ্ঞান যেন বলছে, "ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি"—এই এককেই যদি মানুষ জাগে তবে সে সত্য হয়; "ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ"—এই এককে যদি না জানে তবে

তার মহতী বিনষ্টি। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজরূপী এবমণ্ডলির সমবায়ে যে ভারতবর্ষ গ'ড়ে উঠবে সে দেশ তাই বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি করবে, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করবে। "ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া জানে না, সে পরকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করে না। এইজন্যই ত্যাগ না করিয়া, বিনাশ না করিয়া, একটি বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায়। এইজন্য সকল পন্থাকেই সে স্বীকার করে, স্বস্থানে সকলেরই মাহাত্ম্য সে দেখিতে পায়।" কারণ, "ঐক্য সাধনই ভারতবর্ষীয় প্রতিভার প্রধান কাজ। ভারতবর্ষ কাহাকেও ত্যাগ করিবার, কাহাকেও দূরে রাখিবার পক্ষে নহে; ভারতবর্ষ সকলকেই স্বীকার করিবার, গ্রহণ করিবার বিরাট একের মধ্যে সকলকেই স্ব-স্ব প্রধান প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করিবার পন্থা, এই বিবাদনিরত ব্যবধানসংকুল পৃথিবীর সম্মুখে একদিন নির্দেশ করিয়া দিবে।"

ভারতের ইতিহাস-নির্দিষ্ট ভূমিকা ও ভারতবাসীর শক্তির প্রতি গভীর বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আদর্শের স্বদেশী সমাজ গড়ার জন্য আমাদের ডাক দিয়েছিলেন। "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, "আমাদের দেশ ত একদিন ধনকে তুচ্ছ করিতে জানিত, একদিন দারিদ্র্যকে শোভন মহিমান্বিত করিতে শিখিয়াছিল; আজ আমরা কি টাকার কাছে সাষ্টাঙ্গে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া আমাদের সনাতন ধর্মকে অপমানিত করিব? আজ আবার আমরা সেই শুচিশুদ্ধ, সেই মিত-সংযত, সেই স্বল্পোপকরণ জীবনযাত্রা গ্রহণ করিয়া আমাদের তপস্বিনী জননীর সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিব না? একদিন যাহা আমাদের পক্ষে নিতান্তই সহজ ছিল তাহা কি আমাদের পক্ষে আজ একেবারেই অসাধ্য হইয়াই উঠিয়াছে?—কখনোই নহে। নিরতিশয় দুঃসময়েও ভারতবর্ষের নিঃশব্দ প্রকাণ্ড প্রভাব ধীরভাবে নিগূঢ়ভাবে আপনাকে জয়ী করিয়া তুলিয়াছে। আমি নিশ্চয় জানি, ভারতবর্ষের সুগম্ভীর আহ্বান প্রতি মুহূর্তে আমাদের বক্ষঃকুহরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে; এবং আমরা নিজের অলক্ষ্যে শনৈঃ শনৈঃ সেই ভারতবর্ষের দিকেই চলিয়াছি।" আমরা ঋষিকবির বিশ্বাস ও আস্থার কতটা উপযুক্ত তা ভবিষ্যৎ ইতিহাসই কেবল বলতে পারবে।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ সমাজ সম্বন্ধীয় বক্তব্যের দাঁড়ি কমা সহ সবটুকু হুবহু বজায় রাখার কথা বলা হচ্ছে না। তাঁর বিকেন্দ্রিত স্বাবলম্বী সমাজ ও অর্থ-ব্যবস্থার মূল পরিকল্পনা বা আদর্শ বজায় রেখে ঐ পরিকল্পনার যুগোপযোগী সংস্কার করা যেতে পারে এবং করা উচিতও। আসল কথা হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথের "স্বদেশী সমাজ"-এর মূল বক্তব্য ছাপ্পান্ন বৎসর পূর্বেকার মত আজও সত্য। বরং কালের প্রভাবে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিকৃতি ও তজ্জনিত মানুষের দুর্দশা আরও নগ্নভাবে প্রকট হবার দরুণ "স্বদেশী সমাজ"-এর আদর্শের সার্থকতা ও প্রযোজনীয়তা আজ আরও বেশী।
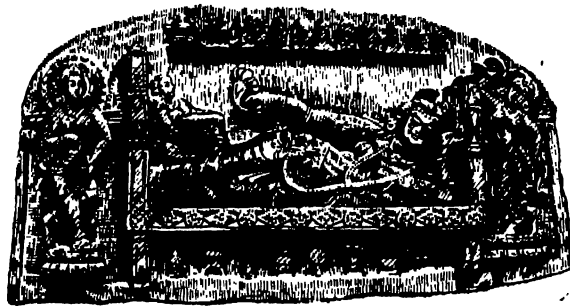
রঙ্গমল্লী

শ্রীসীতা দেবী

৫

পূর্ণিমা ভাল করিয়াই পাস করিল, এবং যতগুলি বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিতে পারিল, সব জায়গায়ই আবেদন-পত্র পাঠাইয়া দিল। স্কুলেরও ছুটি হইয়া গেল, এখন প্রায় অখণ্ড অবসর। বাড়ীতে যে দু'টি মেয়েকে পড়াইত, তাহাদের কাজটা অবশ্য রহিল। অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া রোজ চিঠির বাক্স দেখিতে লাগিল, যদি কোন উত্তর আসে।

সরমা বেড়াইতে লাগিল, ঘুমাইতে লাগিল, এবং মাঝে মাঝে মনে পড়িলে, রান্নাও করিতে লাগিল। একদিন ঘুরিয়া আসিয়া খবর দিল, "পরশু বড়কীদির বিয়ে হচ্ছে, জান ?"

পূর্ণিমা বলিল, "কই, দীপক ত বলে নি ?"

সরমা বলিল, "হয়ত লজ্জায় বলে নি, আমাদের নেমন্তন্ন করছে না ত? আমি কিন্তু লিলিদের বাড়ী গিয়ে উঁকি মেরে বিয়ে দেখে আসব।"

পূর্ণিমা বলিল, "যাঃ, কি দরকার? ওরা যদি দেখে ফেলে ত মাঝ থেকে লজ্জায় পড়বি।"

সরমা বলিল, "এমন জায়গায় দাঁড়াব যে কেউ দেখতেই পাবে না, আমার ভুঁড়োপেটা বরটাকে দেখবার বড় সখ।"

তাহার দিদি বলিল, "তোর জন্যে ঐ রকম একটা এনে দিই না ?"

সরমা বলিল, "ইস্, দেখই না এনে? নিজের বেলায় ত বেশ ফরসা দেখে বর বেছেছ, আর কচি দেখে।"

পূর্ণিমা বলিল, "থাক, থাক, আর এখন অত বরের ভাবনায় কাজ নেই। যখন সময় হবে, নিজেই বেছে নিস্।"

এমন সময় রণেন লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া বলিল, "এই নাও বড়দি, তোমার একটা চিঠি।"

পূর্ণিমা তাড়াতাড়ি চিঠিখানা তার হাত হইতে তুলিয়া লইল। উপরে কোম্পানীর নামের ছাপমারা খাম। খুলিয়া দেখিল, তাহাকে কাল এগারোটার সময় সাক্ষাৎ করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। প্রথম প্রতিক্রিয়া হইল নিছক আনন্দ, তাহার পর একটা অনির্দিষ্ট আশঙ্কায় বুকটা দুর দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

ভাইবোনে একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের চিঠি দিদি ?"

খামখানা তাহাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া পূর্ণিমা বলিল, "এখান থেকে ডাক এসেছে interview-এর জন্যে।"

রণেন বলিল, "খুব বড় কোম্পানী দিদি ?"

পূর্ণিমা বলিল, "নামটা ত শুনছি অনেক দিন থেকে।"

সরমা বলিল, "অফিসের কর্ত্তা যদি সাহেব হয় ?"

পূর্ণিমার যে সে ভয় একেবারে ছিল না, তাহা নয় কিন্তু কোন বিষয়েই যে সে ভয় পাইয়াছে, ইহা কখনও স্বীকার করিতে চাহিত না। বলিল, "হয়, হবে। সাহেবরা ত আর রাক্ষস নয় যে আমাকে দেখলেই হাঁউ মাঁউ খাঁউ ব'লে তেড়ে আসবে। আর ওরা এক দিকে ভাল দিশি লোকের চেয়ে।"

সরমা বলিল, "বাবাঃ, আমি হলেই হয়েছিল আর কি? ইংরিজি বুঝতেই জিব বেরিয়ে যেত। আচ্ছা দিদি, স্টেনোরা ত খুব সেজেগুজে যায়, না?"

পূর্ণিমা বলিল, "ওর কি আর কোন আইন আছে? যার যেমন ইচ্ছে। তবে খুব পরিপাটি পরিচ্ছন্ন নিশ্চয়ই থাকতে হবে।"

সরমা বলিল, "তোমার ত ভাল শাড়ীটাড়ি বেশী নেই ?"

পূর্ণিমা বলিল, "আস্তে আস্তে বাড়াতে হবে শাড়ীর সংখ্যা। এখন না হয় মায়ের ঢাকাই শাড়ীর ভাণ্ডার থেকে এক-আধখানা ধার নেব, যেগুলি তিনি তোর বিয়ের জন্যে জমিয়ে রেখেছেন।"

সরমা বলিল, "আহা, শুধু আমার বিয়ের জন্যেই আর কি? তুমি বড়, তুমি ত আগে বিয়ে করবে।"

পূর্ণিমা বলিল, "হ্যাঃ, আমার আবার বিয়ে! আচ্ছা তুই ত এ বেলা রাঁধছিস না? আমি একটু ঘুরে আসি, কেমন? বেশি দেরি করব না।"

সরমা বলিল, "যাও, যাও, এরপর ক'দিন শ্রীমান্

হয়ত বেরোতেই পারবেন না ঘর থেকে বোনের বিয়ের হাঙ্গামে।"

পূর্ণিমা হাসিয়া বাহির হইয়া চলিল। একবার ভাবিল, অফিসের চিঠিখানা লইয়া যায়, তাহার পর ভাবিল থাক, দরকার নাই, দীপক কিছুই খুশী হইবে না।

সে গিয়া বসিতে না বসিতে দীপক আসিয়া উপস্থিত হইল। বড়ই পরিশ্রান্ত দেখাইতেছে তাহাকে। পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করিল, "এ রকম চেহারা কেন? মনে হচ্ছে সারা দুপুর যেন রোদে ঘুরে বেড়িয়েছ?"

দীপক বলিল, "প্রায় তাই। সেই যে প্রবাদে বলে না যে, ভারি ত না বিয়ে, তার দু' পায়ে আল্তা? আমাদের হয়েছে তাই। ঐ ত না ছিরির বিয়ে, মেয়েটাকে জলেই ফেলে দেওয়া হচ্ছে, তার আবার ঘটা কত! এটা চাই, সেটা চাই। ঘুরতে ঘুরতে মাথা ধ'রে গেল।"

পূর্ণিমা বলিল, "এইবার বোঝ দীপক, ভারি যে স্ত্রী-স্বাধীনতার উপর বিমুখ তুমি? বড়কীর যদি কোন সামর্থ্য থাকত, তা হ'লে এমন অদৃষ্ট হ'ত কি তার? চিরকাল কেউ কি কাউকে ঘাড়ে ক'রে রাখতে পারে? তুমি নিজেও ত এই ভয়ে পিছিয়ে গেলে কোনও প্রতিবাদ করলে না, মায়ের এই নিষ্ঠুরাচরণের। আমিই যদি তোমার বোনের মত হতাম ত আমাকেও ত এমনি ক'রে যার তার কাছে বলি দিয়ে দিত। মায়ের এমন কুবুদ্ধি হয় নি তাই।"

দীপক বলিল, "অতখানি নিন্দার যোগ্য আমি নই কিন্তু। বোনদের পড়াবার ক্ষমতা যদি আমার থাকত তা হ'লে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে হলেও আমি তাদের পড়াতাম। কিন্তু নির্গুণে সাপের কুলোপারা চক্রকে গ্রাহ্য করে না কেউ। স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী আমি নই, তবে সংসারের দিকটা মেয়েরা একেবারে ভাসিয়ে দিক, এটাও চাই না।"

"সংসারের দিক্ না ভাসিয়ে দিলে যদি হাঁড়ি-চড়া বন্ধ হয়?"

দীপক বলিল, "ঐখানেই ত মুশকিল, এইখানে এসেই ত সব তর্ক থামিয়ে দিতে হয়।"

পূর্ণিমা খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কাল থেকে বোধ হয় তোমার আর কয়েকদিন বেড়াতে আসাই হবে না, না দীপক? কাজে ব্যস্ত থাকবে।"

দীপক বলিল, "বড়কী শ্বশুরবাড়ী চ'লে গেলে পর তার পর হাঁক ছেড়ে আবার বেরোব। আজই তোমায় বলব ভেবে এসেছিলাম।"

পূর্ণিমা বলিল, "বোনটার জন্যে তোমার কষ্ট হচ্ছে না?"

দীপক বলিল, "হচ্ছে বই কি? আমি মানুষ ত? কিন্তু দরিদ্রের মনোরথে কি এসে যায় বল? হৃদয়েই ওঠে হৃদয়েই মিলিয়ে যায়।"

দুইজনে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর দীপক জিজ্ঞাসা করিল, "পরীক্ষার result বেরিয়েছে পূর্ণিমা?"

পূর্ণিমা বলিল, "হ্যাঁ, সে ত অনেক দিন হ'ল।"

"ভাল ক'রেই পাস করেছ নিশ্চয়? আমায় বল নি কেন?"

পূর্ণিমা বলিল, "তুমি শুনে ত কিছু খুশী হও না, তাই বলতে সঙ্কোচ লাগে।"

দীপক বলিল, "কাজের জন্যে applyও নিশ্চয় করেছ?"

পূর্ণিমা বলিল, "করেছি, একটা interveiw-এর জন্যে ডাকও এসেছে আজ।"

দীপক একটু ব্যস্ত হইয়াই যেন জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা থেকে?"

পূর্ণিমা নাম বলিল। দীপক বলিল, "ও, নামটা শুনেছি বটে। তবে বিশেষ কিছু জানি না ওদের সম্বন্ধে। খুব বড় নয়, মাঝারি গোছের বড়। ক্রমে ক্রমে ফেঁপে উঠছে।"

পূর্ণিমা বলিল, "অফিস যে কি বস্তু, তা চোখেও দেখি নি এর আগে। যাক, সব জিনিসেরই আরম্ভ আছে ত?"

দীপক জিজ্ঞাসা করিল, "কবে যাচ্ছ interview দিতে?"

পূর্ণিমা বলিল, "কাল এগারোটার সময়।"

দীপক একটু থামিয়া বলিল, "কপালে একটা কাজলের টিপ প'রে যেও, নজর কম লাগবে।"

পূর্ণিমা বলিল, "যত সব ধারণা তোমাদের। এত মেয়ে যে খেটে খাচ্ছে, তাদের ক'জনকে কে জল দিয়ে গিলে খেয়েছে শুনি? আমার চেয়ে সুন্দর মেয়েও কত আছে।"

দীপক বলিল, "কাল যে আমায় সারাদিন ঘুরতে হবে কাজে। না হ'লে তোমার সঙ্গে গিয়ে অফিসের দরজা অবধি পৌঁছিয়ে দিয়ে আসতাম।"

পূর্ণিমা বলিল, "থাক, ঢের হয়েছে। Bodyguard

নিয়ে ঘুরতে হবে এমন রূপবতী আমি নই। লোকে দেখলে হাসবে, ঠাট্টা করবে।"

দীপক বলিল, "এখান থেকে অফিসের পাড়াটা বেশ দূর আছে।"

অতঃপর নানা বিষয়ে আরো দুই-চারিটা কথাবার্ত্তা বলিয়া দীপক ও পূর্ণিমা বাড়ীর পথ ধরিল।

সকাল হইতেই পূর্ণিমা নিজেকে সকল দিক্ দিয়া প্রস্তুত করিতে লাগিল। ভয় সে কোনমতেই পাইবে না, যাহাই ঘটুক না কেন। কি কি প্রশ্নের সম্মুখীন তাহাকে হইতে হইবে তাহা সে মনে মনে আন্দাজ করিয়া লইল, এবং কি উত্তর দিতে হইবে তাহাও বার বার করিয়া মনে মনে মুখস্থ করিয়া ফেলিল। খুব সম্ভব ইংরেজিতেই কথাবার্ত্তা বলিতে হইবে। কাহার সামনে বসিতে হইবে, কে জানে? বাঙালী হইলে সবচেয়ে ভাল, কিন্তু বাঙালী নাও হইতে পারে ত? ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশের লোক হইতে পারে, আধা দেশী, আধা বিলাতীও হইতে পারে। কথা বুঝিতে পারিলেই হয়, উত্তর দিতে তাহার কোন অসুবিধা হইবে না। কাপড়-জামা গুছাইয়া রাখিল। মায়ের ভাণ্ডারের সযত্নসঞ্চিত শাড়ী হইতে একখানি শাড়ী সত্যই ধার করিয়া লইল। অফিসে হয়ত আরো মহিলা-কর্ম্মী আছে, তাহাদের পাশে পূর্ণিমাকে বেশী ম্লান দেখাইলে চলিবে না।

যথাসময়ে স্নানাহার করিয়া সে বাহির হইল। সরমা ও রণেন তাহার সঙ্গে সঙ্গে ট্রামের রাস্তা পর্য্যন্ত আসিল।

বালীগঞ্জ হইতে অফিস পাড়ায় পৌঁছিতে সময় লাগে অনেকক্ষণ। ট্রামে ভিড়ও ভীষণ। এই ভাবেই রোজ তাহাকে যাওয়া-আসা করিতে হইবে, যদি কাজটা সে পায়।

যথাস্থানে নামিয়া হাঁটিয়া গিয়া বিরাট্ একটা চারতলা বাড়ীতে ঢুকিতে হইল। Lift আছে, হাঁটিয়া উঠিতে হইল না। অফিসটা তিনতলায়।

খুঁজিয়া লইয়া ঢুকিতে কোন বেগ পাইতে হইল না। মস্ত বড় একটা হলঘর, ষ্টীলের আসবাবে পূর্ণ, সার সার মানুষ বসিয়া কাজ করিতেছে। চকচকে কাঠের পার্টিশন দেওয়া কর্ত্তাদের সব ঘর। টেলিফোনের শব্দ, calling-bell-এর শব্দ। টাইপরাইটারের খট্ খট্ শব্দ। কোথায় কাহার কাছে সে খোঁজ লইবে?

কিন্তু তাহাকে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল না এক মিনিটের বেশী। একজন দারোয়ান আসিয়া তাহার কি কাজ জানিয়া লইল, এবং তাহাকে ছোট একটি ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল। নিজের নাম কাগজের টুকরায় লিখিয়া পূর্ণিমা দারোয়ানের হাতে দিয়া দিল। ঘরে আরও একজন মহিলা ও দুইজন পুরুষ বসিয়া আছেন। পুরুষদের দিকে সে তাকাইল না, তাঁহারা অবশ্য পূর্ণিমাকে বেশ ভালভাবেই দেখিয়া লইলেন। মহিলাটির দিকে তাকাইয়া দেখিল, অতি শীর্ণাঙ্গী, মধ্য-বয়স্কা মহিলা। গায়ের রংও কালো। পূর্ণিমা মনে মনে বলিল, "আমার চেহারা এই রকম হলে, দীপক খুব নিশ্চিন্তমনে আমাকে ছেড়ে দিতে পারত।"

দারোয়ান আসিয়া দাঁড়াইল। পূর্ব্বাগতা মহিলার দিকে তাকাইয়া বলিল, "সেবা রায়।"

ভদ্রমহিলা উঠিয়া দারোয়ানের সঙ্গে চলিয়া গেলেন। পূর্ণিমার কল্পনাটাও যেন তাঁহার পিছন পিছন চলিল। কিন্তু অজানা সবই, কল্পনা তাহার বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিল না। সে একলা মেয়ে, বসিয়া আছে দুইজন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে, তাহার কেমন যেন বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল।

ভদ্রমহিলা কয়েক মিনিট পরেই ফিরিয়া আসিলেন। একটা রং-ওঠা ছাতা ফেলিয়া গিয়াছিলেন, সেইটা তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। মুখ নিদারুণ গম্ভীর ও বিরস। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তাঁহার পর্ব্ব শেষ হইয়া গেল। বেশী কিছু প্রশ্ন নিশ্চয়ই ইঁহাকে করা হয় নাই!

ইহার পর এক ভদ্রলোকের ডাক আসিল। তাঁহার মিনিট দশ লাগিল বিদায় হইতে। এখন বাকি পূর্ণিমা ও অন্য ভদ্রলোকটি। ভয় পাইবে না বলিয়া সে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু প্রায় ভয়ের কাছাকাছি একটা ভাব তাহাকে পাইয়া বসিতে লাগিল।

অন্য ভদ্রলোকও কিছুক্ষণ পরে বিদায় হইয়া গেলেন। দারোয়ান আসিয়া বলিল, "পূর্ণিমা সান্যাল।"

পূর্ণিমা চলিল তাহার সঙ্গে। পা যে একটুও কাঁপিল না, তাহা নয়, জোর করিয়া নিজেকে শান্ত করিল। কাজ করিতে আসিয়াছে, ভয় পাইবে কেন? কোন অপরাধ ত করিতেছে না?

একটা ঘরের দরজা খুলিয়া দারোয়ান তাহাকে ঢুকাইয়া দিল। বড়ই ঘর, অফিস হিসাবে বেশ সুসজ্জিত। টেবিলের ওধারে একটা চেয়ারে একজন ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। চকিতে তাঁহার দিকে নেত্রপাত করিতেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া ইংরেজীতে বলিলেন, "সুপ্রভাত, বসুন আপনি।"

বেশ পরিষ্কার উচ্চারণ. বাঙালী কি অন্ত প্রদেশের তাহা ঠিক বুঝিতে পারিল না। এক নিমেষের দৃষ্টিতে পূর্ণিমা দেখিল, শ্যামবর্ণ দীর্ঘাকৃতি ভদ্রলোক। খুব উজ্জ্বল চোখ, নাকটাও বেশ উঁচু। কপালটা খুব প্রশস্ত।

চেয়ার টানিয়া বসিতে না বসিতে তিনি বলিলেন, "ইংরেজীতে কথা বলতে ভাল পারেন কি না, এবং বুঝতে ঠিক পারেন কি না, সেটা আমার জানা দরকার। কাজ-কর্ম্ম সব ইংরেজীতেই হবে। আমি বাঙালীই।"

বাঙালী? বাঁচা গেল। পূর্ণিমার মনটায় স্থৈর্য্য ফিরিয়া আসিল। তখনই প্রশ্ন হইল, "আপনি কোন্ ইয়ারে পাস করেছেন?"

পূর্ণিমা বলিল, "এই বৎসরেই, এই ত ক'দিন আগে।"

"ও, তা হ'লে এই লাইনে কাজ আপনি আগে করেন নি?"

পূর্ণিমা বলিল, "না।"

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন রকম চাকরি আগে করেছেন?"

পূর্ণিমা বলিল, "স্কুলে টিচারী করেছি বছর দুই-তিন। প্রাইভেট্ ট্যুশনিও অনেক দিন করেছি।"

আবার প্রশ্ন, "স্কুলের কাজ ছেড়ে দিলেন কেন?"

পূর্ণিমা বলিল, "ওতে মাইনে বড় কম। সংসার চলে না।"

"আপনি কি বিবাহিতা?"

পূর্ণিমার গালের কাছটা একটু যেন লাল হইয়া উঠিল। বলিল, "না।"

"আপনার বাবা বেঁচে আছেন?"

"না, তিনি আমার বাল্যকালেই মারা গিয়েছেন।"

"বাড়ীতে আর কে কে আছেন?"

"আমার মা, আমার ভাই, বোন।"

"ভাই কি ছোট না বড়?"

"ভাই সব চেয়ে ছোট, বোনও আমার চেয়ে ছোট।"

"আপনার উপার্জ্জনেই সংসার চলে?"

পূর্ণিমা একটুখানি যেন দম লইয়া বলিল, "হ্যাঁ, আর কোনও আয় নেই।"

ভদ্রলোকও মিনিট দুই থামিলেন। তাহার পর আবার আরম্ভ করিলেন।

"আপনি পড়াশুনা কতদূর করেছেন?"

"বি-এ পড়তে পড়তে ছেড়ে দিলাম, চাকরি নিতে হ'ল।"

"কি subject ছিল আপনার?"

পূর্ণিমা বলিল, "ইতিহাস আর ফিলসফি।"

"ফিলসফি নিলেন কেন? ওটাতে চাকরি-বাকরির ত কোন সুবিধা নেই?"

পূর্ণিমা বলিল, "তা নেই বটে। তবে আমি অধ্যাপকের কাজ করব এই প্রথমে ভেবেছিলাম, এই লাইনে আসব ভাবি নি। তা ছাড়া আই. এ-তে লজিকে বেশ ভাল মার্ক্স্ পেয়েছিলাম।"

"কোন্ কলেজে পড়তেন আপনি?"

"আশুতোষ কলেজে।"

ভদ্রলোক এইবার থামিলেন। বলিলেন, "এ পর্য্যন্ত ত আপনি ভালই উৎরলেন। ইংরেজী বলতে পারেন, এবং বুঝতেও কিছু অসুবিধা নেই। আচ্ছা, আসল কাজ। চিঠি dictate করছি একটা। লিখুন।" তাহার দিকে কাগজ ও পেন্সিল অগ্রসর করিয়া দিলেন।

পূর্ণিমা এতক্ষণে খানিকটা স্বাভাবিকই হইয়া উঠিয়াছিল, ডিক্টেশন্ লইতে তাহার অসুবিধা হইল না। লেখা শেষ হইলে ভদ্রলোক ঘণ্টা বাজাইয়া দারোয়ানকে ডাকিলেন, বলিলেন, "এর সঙ্গে যান আপনি আমার হেড-টাইপিষ্টের কাছে। এটা টাইপ ক'রে নিয়ে আসুন। তিনি অমনি আপনার speed-টা দেখে নেবেন।"

পূর্ণিমা চলিল দারোয়ানের সঙ্গে। হেড-টাইপিষ্ট প্রৌঢ়-বয়স্ক ভদ্রলোক। মাথার চুল শাদা হইয়া আসিয়াছে। পূর্ণিমা যতক্ষণ টাইপ করিল, তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার কাজ দেখিতে লাগিলেন। শেষ হইলে কাগজখানা লইয়া দেখিলেন। বলিলেন, "মন্দ নয়, প্রথম কাজের পক্ষে। যান, বড় সাহেবকে দেখিয়ে আসুন, দেখতেই যখন তিনি চেয়েছেন।

"দারোয়ানের সঙ্গে আবার সে পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া গেল। বড়সাহেব কাজ দেখিয়া বলিলেন, "ভুল আছে অবশ্য, তবে নিদারুণ বেশী নয়। আচ্ছা, আসুন এখন। দু-তিন দিনের ভিতরই ফলাফল আপনাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেওয়া হবে।" এবার বাংলাতেই কথা বলিলেন। পূর্ণিমা তাঁহাকে নমস্কার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

এতক্ষণে তাহার খেয়াল হইল যে, বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া আছড়াইতেছে। নিজেকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "পারই ত হয়ে এলাম, এখন আর ভয় কি?"

রোদের তেজ বড় প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। কি আর করা? খাটিয়া খাইতে যাহাদের হয়, তাহাদের অত আরাম করিবার অবসর কোথায়? ভালর মধ্যে ট্রামে

এখন আর ভিড় নাই। নিশ্চিন্ত আরামে বসা যায়। সব যাত্রী এখন অফিস পাড়ার দিকে, ফিরিবার লোক দু' চারজন মাত্র।

কাজটা তাহার হইবে কি? তাহার সাধ্যমত সে প্রশ্নের উত্তর ভালই দিয়াছে। বেশী দেরি করে নাই, টাইপ করিতেও দু-তিনটার বেশী ভুল করে নাই, তাহাও মারাত্মক ভুল কিছু নয়। অন্য কর্ম্মপ্রার্থীদের দু'জন ত সরাসরি বিদায় হইয়াছে। তৃতীয়জন মিনিট দশ-বারো ছিল বড়সাহেবের ঘরে। পূর্ণিমাই আধ ঘণ্টার উপর বসিয়া বসিয়া তাঁহার প্রশ্নের জবাব দিয়াছে। এমনিতে ত মনে হয়, সে এ পরীক্ষায় ভাল ভাবেই উত্তীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু অফিসে কাজকর্ম্ম যাহারা করে, তাহাদের কাছে কর্ত্তারা কতখানি পটুত্ব আশা করেন, তাহা পূর্ণিমা জানে না।

বড় সাহেবটিও মানুষ ভালই মনে হয়। বাঙালী যে, সেও একটা মস্ত বাঁচোয়া। খুব কঠোর না হওয়াই সম্ভব, চেহারায় কথাবার্ত্তায় অযথা গম্ভীর নয়, অথচ প্রগল্‌ভও নয়। ইংরেজী ত বেশ ভাল বলেন, বিলাত-ফেরৎ সম্ভবতঃ। চেহারাটা সুন্দর বলা যায় না, কিন্তু চোখে না পড়িয়া যায় না। বয়স কত হইবে কে জানে? ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে যাহা কিছু হইতে পারে। ইঁহারই কাজ তাহাকে করিতে হইবে বোধহয়। ঐ বড়ঘরে এক পাল লোকের মধ্যে তাহাকে বসিতে হইবে না ত?

তাহার বাড়ী আসিয়া পড়িল। বড় রাস্তায় নামিয়া গলিটুকু হাঁটিয়া যাইতে হয়। সরমা দিদির ফেরার আশায় রণেনের ঘরের জানলা খুলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। দিদি আসিতেছে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম হ'ল ভাই।"

ভিতরে ঢুকিয়া, কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে পূর্ণিমা বলিল "রোস, বসি একটু আগে।" ঘরে গিয়া সে ধপ্ করিয়া নিজের তক্তপোশে বসিয়া পড়িল। মা খাটে শুইয়া ছিলেন, উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "বাবাঃ, মেয়ের কি শ্রী হয়েছে। এই রোদে মানুষে বেরোতে পারে?"

পূর্ণিমা বলিল, "দায়ে পড়লে বেরোতেই হয়।"

সরমা একখানা হাত-পাখা লইয়া তাহাকে হাওয়া করিতে লাগিল; বলিল, "এই গলিটুকু ছাড়া নিশ্চয়ই আর কোথাও হাঁটতে হয় নি? অফিস নিশ্চয় বড় রাস্তার উপরে?"

পূর্ণিমা বলিল, "হ্যাঁ; কিন্তু না হাঁটলেও বাইরে গরম অসহ্য। ট্রামে ব'সে ব'সে মনে হচ্ছিল যেন ডেকচিতে ভাপে সেদ্ধ হচ্ছি।"

সরমা বলিল, "এবার বল ত কি রকম interview হ'ল?"

পূর্ণিমা বলিল, "আমার মতে ত হ'ল ভালই, এখন তারা খুশী হল কি না তা কি ক'রে বলব? তবে দু'তিন দিনের মধ্যেই জানিয়ে দেবে বলেছে।"

"কে কথা বলল ভাই তোমার সঙ্গে?"

পূর্ণিমা বলিল, "ওদের বড়কর্ত্তা বা বড় সাহেব। ভদ্রলোক বাঙালী, তবে আমার সঙ্গে ইংরেজীতেই কথা বার্ত্তা বললেন।"

"কেন ভাই?"

"এই আমি ইংরেজী ভাল বুঝতে ও বলতে পারি কি না সেইটা দেখবার জন্যে। সব কাজ ত ইংরেজীতেই করতে হবে।"

সরমার আর কৌতূহলের শেষ নাই। জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম দেখতে ভাই তিনি? কত বয়স?"

পূর্ণিমা হাসিয়া বলিল, "দেখতে মন্দ নয়, খুব লম্বা চওড়া, রংটা শ্যামবর্ণ। বয়স কি জানি কত। ছেলে-মানুষ নয় ত, তবে বুড়োও একেবারেই নয়।"

"কি নাম তাঁর?"

পূর্ণিমা বলিল, "কি আশ্চর্য্য! আমি কি তাঁর নাম জিজ্ঞেস করেছি নাকি? জানতেই পারব যদি ওখানে কাজ করতে যাই।"

"তোমাকে কি কি জিজ্ঞেস করলেন?"

যতদূর তাহার মনে ছিল, পূর্ণিমা বলিয়া গেল। তাহার মা বলিলেন, "ও মা, এত ঘরের কথাও জানতে চায় নাকি?"

পূর্ণিমা বলিল, "সপ্রতিভ ভাবে কথাবার্ত্তা বলতে পারি কি না, সব বিষয়ে, তাই বোধ হয় দেখতে চায়। আচ্ছা এইবার একটু জল এনে দে আমাকে, গলাটা একেবারেই শুকিয়ে উঠেছে।"

মা বলিলেন, "লিলিদের বাড়ীর হরির লুটের বাতাসা দিয়ে গিয়েছে, তাই দু'খানা এনে দে দিদিকে, জলের সঙ্গে।"

সরমা মায়ের আদেশ পালন করিতে গেল।

৬

পরদিন আর একখানা চিঠি আসিল পূর্ণিমার নামে। তবে তাহাদের কর্ত্তা কলিকাতার বাহিরে রহিয়াছেন, পাঁচ-ছয়দিন পরে ফিরিবেন, সুতরাং interview-এর তারিখ পড়িয়াছে এক সপ্তাহ পরে। পূর্ণিমা ভাবিল,

"ভালই হ'ল, ততদিনে আমার এই interview-এর ফল জানা হয়ে যাবে। মোট কথা কাজ আমার একটা হবেই।"

দীপকের সঙ্গে কাল দেখা হয় নাই, আজ ত হইবেই না, আজই তাহার বোনের বিবাহ। কাল যদি বড়কী সকাল সকাল বিদায় হইয়া যায়, তাহা হইলে সন্ধ্যার দিকে দীপক বাহির হইতে পারে।

সরমা বলিল, "আমি কিন্তু ভাই বড়কীদির বিয়ে দেখতে যাব। পাড়ার মেয়ে, চেনা মেয়ে, হয়ত কুটুম্বই হবে একদিন, তার বিয়ে উঁকি মেরে দেখলে অন্যায় কিছু হবে না।"

পূর্ণিমা বলিল, "অন্যায় হবে কে বলছে? তবে তারা যদি কেউ তোকে দেখে ফেলে, তবে অপ্রস্তুতে পড়তে হবে।"

সরমা বলিল, "কি ক'রে দেখবে আমাকে? পাঁচ-ছ'জন মেয়ের মধ্যে, বারান্দা অন্ধকার ক'রে আমরা দাঁড়াব, ওরা লাইট-জ্বালা ঘর থেকে কিছুই দেখতে পাবে না আমাদের।"

পূর্ণিমা বলিল, "তবে যা, এতই যখন সখ। কিন্তু রাত বেশী করিস্ না, মা ভাববেন।"

সরমা বলিল, "আরে না। গোধূলি লগ্নে বিয়ে, শুধু স্ত্রী-আচার আর কনে সভায় নিয়ে যাওয়া অবধি দেখে ফিরে আসব। বিয়ে-বাড়ীতে দেরি হয় খাওয়ার জন্যে। এখানে ত কেউ খাওয়াচ্ছে না, তা দেরি আর কি করতে করব?"

বিকাল হইতে না হইতে সরমা লিলিদের বাড়ী পলায়ন করিল। যতটুকু আনন্দের ভাগ পাওয়া যায়। শুধু শুধু বাড়ী বসিয়া আর কি করিবে, পূর্ণিমা গিয়া খানিকটা লেকের ধারে বেড়াইয়া আসিল একলা একলাই। বখা ছেলের দল পাড়ায় মন্দ নাই। একজন পূর্ণিমাকে একলা দেখিয়া পাশ দিয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল, "আজ সে কোথায় গেল?" পূর্ণিমা বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল।

সরমা বাড়ী ফিরিল প্রায় আটটার সময়। একলা ফিরিলে পাছে মা বকেন, এই ভয়ে চার-পাঁচজন সঙ্গিনীর মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া ফিরিল। তাহারা সরমাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আবার কলহাস্যে রাস্তা মুখরিত করিয়া চলিয়া গেল। পূর্ণিমা বলিল, "নাও, খেয়ে নাও আগে তার পর গল্প শুনব। মাকে বসিয়ে রেখ না।"

তিন ভাইবোনে খাইতে বসিল। তাড়াতাড়ি খাওয়া হইয়া গেল, কিই বা এমন খাইবার থাকে? মা কাজ সারিয়া নিজের সামান্য জলযোগের আয়োজন করিতে লাগিলেন। পূর্ণিমা শুইয়া পড়িয়া বলিল, "নে, এইবার বল্ দেখি, কি রকম বিয়ে দেখলি।"

সরমা বলিল, "সত্যি, দেখবার মত কিছু ছিল না ভাই। বরটা ত ঠিক কোলাব্যাঙের মত। আর বড়কীদিকেও কিছুই সাজায় নি। মাথায় সোলার মুকুট না থাকলে কেউ তাকে ক'নে ব'লে মনেই করত না। কাপড়টার কুড়ি টাকার বেশী দাম হবে না, তেমনি জামা। হাতে কয়েক গাছি চুড়ি ঝক্ ঝক্ করছিল, তাও নাকি ব্রোঞ্জের, লিলিরা বলল। আর এক গাছা কাঁচের চুড়ি, শাঁখা, এই সব। কপালে চন্দন দিয়েছে অবশ্য, ফুলের মালাও দিয়েছে, কিন্তু কিছুই ভাল দেখাচ্ছিল না।"

পূর্ণিমা বলিল, "সাজাবে আর কোথা থেকে, যা ত ওদের অবস্থা। মেয়েটাকে কোনমতে বিদায় করল আর কি! লোকজন বেশী গিয়েছিল?"

সরমা বলিল, "দূর, কোথায়? ঘরে বাইরের সব লোক মিলিয়েও পঞ্চাশ জন হবে কি না সন্দেহ।"

পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করিল; "কে বরণটরণ করল? ওর মা ত বিধবা, তাঁকে এ সবের মধ্যে থাকতে নেই।"

সরমা বলিল, "বরণ করলেন মস্ত মোটা এক মহিলা, লালপেড়ে গরদের শাড়ী পরা। বড়কীদির মাকে ত প্রায় দেখতেই পেলাম না। একবার শুধু দেখতে পেলাম রান্নাঘরের কাছে, ঠাকুরকে বকছেন। প্রায় অন্যদিনের মতই মূর্ত্তি, শুধু গামছাটা ছেড়েছেন, এই যা রক্ষে!"

গল্প করিতে করিতে কখন এক সময় তাহারা ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিনটাও একই ভাবে কাটিয়া গেল। চিঠিপত্র কিছু আসিল না, পূর্ণিমা ইহাতে খানিকটা ক্ষুণ্ণ হইল। অবশ্য একদিন পরেই যে চিঠি আসিবে এমন কোন কথা নাই। দীপকের সঙ্গেও সেদিন দেখা হইল না, বোধ হয় ক'নে বিদায় করিতে কিছু রাত হইয়া গিয়া থাকিবে।

সকালে উঠিয়া পূর্ণিমা তাহার স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর বাড়ী একবার বেড়াইয়া আসিল। তিনি খুব বেশী দূরে থাকেন না। রোদ বেশী ঝাঁঝাল হইয়া উঠিবার আগেই সে ফিরিতে পারিবে।

ভদ্রমহিলা তাহাকে আদর করিয়াই বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাত সকালেই এসেছ যখন, তখন নিশ্চয়ই কোন খবর আছে?"

পূর্ণিমা বলিল, "পাকাপাকি খবর বলতে পারি না, তবে কাজের একটা সম্ভাবনা ঘটেছে। একটা

interview দিয়ে এসেছি, আর একটার ডাক পেয়েছি, কাজেই ভাবলাম যে আপনাকে জানিয়ে রাখা উচিত। ছুটির পরে আমি স্কুলে আর নাও ফিরতে পারি।"

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, "তা নিজের উন্নতির জন্যে স'রে পড় যদি ত কি আর বলতে পারি? লোক দেখব এখন। তবে এ লাইনটা মন্দ না পূর্ণিমা, অল্প বয়সী মেয়েদের পক্ষে। স্টেনোর কাজ যেমন স্কুলের কাজের ফাঁকে ফাঁকে শিখেছ, তেমনি ক'রে যদি বি. এ. বি. টি.-টা প'ড়ে পাস ক'রে নিতে ত এ কাজেও উন্নতি হ'ত।"

পূর্ণিমা বলিল, "অত সময় ত দিতে পারব না। আমার যে খুব তাড়াতাড়ি আয় বাড়ান দরকার। বি. এ. বি. টি. হ'তে গেলে অন্ততঃ আরও তিন বছর লাগত।"

"তবে আর কি উপায় বল? তোমাকে হারাবই দেখছি আমরা।"

আরও দুই-চারিটা কথাবার্ত্তার পর পূর্ণিমা ফিরিয়া আসিল। সদর দরজার গায়ে লাগান চিঠির বাক্স। ইহার চাবি একটা পূর্ণিমার চাবির তাড়ায় থাকে। বাক্সের তালাটা খুলিয়া দেখিল একখানাই চিঠি। সেই পরিচিত খাম। তাড়াতাড়ি চিঠিখানা লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বসিয়া পড়িল। কি আছে ইহার মধ্যে, কে জ'নে?

কম্পিত বক্ষে সে মাথার একটা কাঁটা দিয়া খামখানা খুলিয়া ফেলিল। যাক, বাঁচা গেল। তাহাকে কর্ম্মে নিয়োগ করা হইয়াছে। সরমা ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'ল ভাই? ঐ কোম্পানীটার চিঠি ত?"

পূর্ণিমা বলিল, "হ্যাঁ, কাজ পেয়েছি।"

সরমা দু'পাক নাচিয়াই লইল আনন্দে। জিজ্ঞাসা করিল, "কত মাইনে হবে ভাই তোমার? কবে থেকে কাজে লাগবে?"

"এখন দেবে দেড়শ ক'রে। মাস দুই পরে যখন পাকা হবে কাজ, তখন বাড়বে। সোমবার থেকেই join করতে লিখেছে।"

রণেন ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "আমাকে কিন্তু একটা ভাল প্রেসেন্ট কিনে দিতে হবে, প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে।"

মাও রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, "কাজ ঠিক হয়ে গেল?"

"হ্যাঁ মা, সোমবার থেকে যাব।"

"টাকা-পয়সার একটু সুবিধে হবে বটে, কিন্তু কোন বিপদ্-আপদ্ না ঘটে।"

পূর্ণিমা বলিল, "কিছু বিপদ্ ঘটবে না, দেখো তুমি। তা হ'লে আর এত মেয়েকে করে খেতে হ'ত না।"

জগৎটাই যেন পূর্ণিমার চোখে রঙীন লাগিতে লাগিল। পিতার মৃত্যুর পর সাংসারিক দিক্ দিয়া এই প্রথম ভগবান্ তাহাকে একটু সুবিধা দিলেন। ভাগ্য প্রসন্ন থাকিলে একটু একটু করিয়া মানুষের মত জীবন হয়ত সে গড়িয়া তুলিতে পারিবে। মাকে একটু বিশ্রাম দিতে পারিবে। ভাইবোন দু'টির পড়াশুনার ভাল ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

সারাদিন তাহার যেন স্বপ্ন দেখিয়া কাটিয়া গেল। প্রথমেই এই ঠিকা-ঝিটাকে বিদায় করিয়া একটা রাত-দিনের লোক রাখিতে হইবে. ভারি কাজ সবই সে করিবে, মা সামান্য কিছু করিবেন। আর একবেলা অন্ততঃ একটু দুধ রাখিতে হইবে মায়ের জন্য। তাহার পর শিক্ষানবিশীর পর্ব্ব শেষ হইলে একটু ত আরো আয় বাড়িবে? তখন খোকাকে আর একটা ভাল স্কুলে দিতে হইবে, পারিলে একটা কোচিং ক্লাশে। পড়াশুনা তাহার মোটেই ভাল হইতেছে না। অথচ প্রথম হইতেই যদি সে কাঁচা হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার ভবিষ্যৎ ত অন্ধকার। বেটা ছেলে, তাহাকে অসংখ্য প্রতি-যোগিতায় টিকিয়া ত থাকিতে হইবে? ভদ্রলোকের মত জীবনযাপন করিতে হইবে ত? বাবার কথা মনে করিয়া পূর্ণিমার চোখে জল আসিল। কত আনন্দে, কত প্রাচুর্য্যের মধ্যে তাহারা তখন দিন কাটাইয়াছে।

বেলা পড়িয়া আসিল। সবাই আবার দিবানিদ্রা ত্যাগ করিয়া নিজের নিজের কাজে মন দিল। পূর্ণিমা চুল বাঁধিয়া গা ধুইয়া বেড়াইতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। রণেন চা খাইয়াই এক ছুটে কোথায় পলায়ন করিল। যাইতে যাইতে দিদিকে শুনাইয়া বলিয়া গেল, "আর কিন্তু খই-মুড়ি জলখাবার চলবে না, ভাল ভাল জলখাবার চাই এর পর।"

দিদি হাসিয়া বলিল, "আমি কি লাখপতি হতে যাচ্ছি যে এতরকম ফরমাশ করছিস?"

সরমা উঠিয়া বসিল, বলিল, "আমি মাকে একটু সাহায্য ক'রেই একটুখানি বেড়িয়ে আসব লিলিদের বাড়ী। বড়কীদিটা বাবার বেলায় কতখানি চেঁচাল, সেটা একটু শুনতে হবে।"

পূর্ণিমা কথার উত্তর না দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। আজ হয়ত দীপকের সঙ্গে তর্ক বাধিয়া যাইবে। পূর্ণিমার মন এখন আনন্দে পূর্ণ, কোনরকম বিদ্রূপ সমালোচনা শুনিতে সে এখন রাজী নয়।

দীপক যথাস্থানে আসিয়া বসিয়া আছে। গায়ের জামাটা নূতন। বোধ হয় ভগিনীর বিবাহের দিন পরিবার জন্ম সে কিনিয়াছিল। তবে কয়েকদিন অবিশ্রান্ত খাটুনির পর তাহাকে যেন আরো রোগা দেখাইতেছে।

পূর্ণিমা কাছে আসিয়া বসিয়া বলিল, "যাক, নিষ্কৃতি পেয়েছ তা হ'লে, তিন দিন পরে?"

দীপক বলিল, "পেলাম ত।"

পূর্ণিমা বলিল, "সব ভালয় ভালয় হয়ে গেছে ত? কোথাও কোন বাগড়া পড়ে নি?"

দীপক বলিল, "বাগড়া আমাদের দিক্ থেকে কিছু পড়ে নি, কারণ পড়বার scope ছিল না। শুধু মেয়েটি দিয়ে দেবার কথা, দিয়ে দিয়েছি। পঁচিশ জন বরযাত্রী এসেছিল, তাদের খাইয়েও দিয়েছি। ওরাই বরং কথা রাখে নি। গায়ে হলুদের তত্ত্বে একটা হার দেবে বলেছিল বড়কীকে, সেটা দেয় নি।"

পূর্ণিমা বলিল, "তা ভাল, সকল দিক দিয়েই এঁরা চৌকস্ দেখছি।"

দীপক কোন উত্তর দিল না। পূর্ণিমা বুঝিতে পারিল, বোনের বিবাহের কথা তাহার আর ভাল লাগিতেছে না। ভাল লাগিবার কথাও নয় অবশ্য।

খানিক পরে পূর্ণিমা বলিল, "জান দীপক, আমার সে কাজটা হয়ে গেছে। সোমবার থেকে join করতে হবে।"

দীপকের মুখে কোন উৎসাহের ছায়া পড়িল না। নিস্পৃহভাবেই বলিল, "খুব চট্ ক'রে হয়ে গেল দেখছি। বেশী competition ছিল না বুঝি?"

পূর্ণিমা হাসিয়া বলিল, "ও, বেশী competition থাকলে আমি কাজ পেতাম না, তাই বলতে চাইছ? তা আমি থাকতে থাকতে ত তিনজন পরীক্ষা দিল, আগে পরে আর কত গিয়েছে কে জানে?"

দীপক জিজ্ঞাসা করিল, "মেয়ে ছিল আর কেউ?"

"ছিল ত একজন।"

দীপক জিজ্ঞাসা করিল, "কত বয়স, কি রকম দেখতে?"

পূর্ণিমা বলিল, "কি জ্বালা, গেছে ত কাজ করতে, তার কত বয়স আর কি রকম চেহারা তা নিয়ে কি হবে?"

দীপক বলিল, "তুমি ত সব জান। বড় সাহেবরা বেশ ভাল চেহারা, কাঁচা বয়সের মেয়েই চায়। প্রথমেই বাদ দিয়ে দেয়, যদি দেখে বুড়ী কি কুৎসিত।"

পূর্ণিমা বলিল, "কে জানে বাপু, অত শত জানি না। কাজের কথাই ত বলল সব। কত বয়স তাও জানতে চায় নি, রূপ কত আছে, তাও খুঁটিয়ে দেখে নি।"

দীপক বলিল, "এরপর ঠিকই দেখবে। সিংহের গুহায় ঢুকছ তা মনে রেখ। বড় সাহেবটি কেমন? কোন্ দেশী?"

পূর্ণিমা বলিল, "বড় সাহেবটি বাঙালীই। দেখে-শুনে ত ভালই মনে হ'ল। বেশ ভদ্র, অথচ বেশ শক্ত।"

"কি নাম?"

"তা ত জানি না।"

"কত বয়স?"

পূর্ণিমা বলিল, "তুমিও দেখি সরমার মত আরম্ভ করলে। বয়স কত কি ক'রে বলব? দেখে মনে হয়, চৌত্রিশও হতে পারে, চল্লিশও হতে পারে।"

দীপক বলিল, "ঐটাইত dangerous age, যৌবনটা যখন বিদায় নেব নেব করছে। মন খালি বলে, সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল, সকলই ফুরায়ে যায় মা।"

পূর্ণিমা বলিল, "এত জ্ঞান হ'ল কোথা থেকে? নিজের বয়স ত চব্বিশও পার হয় নি।"

দীপক বলিল, "নিজের অভিজ্ঞতা নাই হ'ল, জানি তবু। ভদ্রলোক দেখতে কেমন?"

পূর্ণিমা বলিল, "ভালই, তবে কন্দর্পকান্তি কিছু নয়। বেশ লম্বা চওড়া।"

দীপক বলিল, "দাঁড়াও, সব খোঁজ নিতে হচ্ছে। অফিস পাড়ায় আমার দেদার চেনাশোনা লোক আছে।"

পূর্ণিমা বলিল, "তোমার মত পাগল যদি ত্রিসংসারে কোথাও আছে। তুমি কি তাঁর সঙ্গে ছুটকীর বিয়ে দিতে যাচ্ছ যে অত খবরে তোমার দরকার?"

দীপক বলিল, "ছুটকীর অত সৌভাগ্য হবে কোথা থেকে? তবে অন্ত কাউকে পাছে মনে ধ'রে যায়, সেই এক ভয়।"

পূর্ণিমা বলিল, "থাম বাপু, তোমায় অত মাথা ঘামাতে হবে না। ঐ বয়সের কৃতী ভদ্রলোক, এতদিন কিছু আইবুড়ো হয়ে ব'সে নেই। ঘরে হয়ত মোটা গিন্নী এবং ছ'টি ছেলেমেয়ে বিরাজমান।"

এমন সময় পার্কের এক কোণে একটা গোলমাল ওঠাতে সকলের মন সেইদিকে চলিয়া গেল। একটা মোটর-কারের সঙ্গে একটা সাইকেলের ধাক্কা লাগিয়াছে। আরোহীটি একেবারে চিৎপাত হইয়া পড়িয়াছেন, ভিড় জমিয়া গিয়াছে চারিধারে।

দীপক বলিল, "স্টেনো হওয়ার চেয়ে আর একটা বিপদ্জনক কাজ আছে, সেটা হচ্ছে গাড়ীর ড্রাইভার

হওয়া। দোষ যারই হোক, মার খাবার বেলা তারাই খায়।"

যাহা হউক, পাঁচজনে মিলিয়া মিটাইয়া দেওয়ায় মার আর কাহাকেও খাইতে হইল না। সেখান হইতে নিজেদের বসিবার স্থানে ফিরিয়া আসিয়া পূর্ণিমা বলিল, "পরশু বড়কীর বিয়ে দেখে এসেছে উঁকি মেরে সরমা। লিলিদের বাড়ীর পিছনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল সব।"

দীপক বলিল, "অল্পবয়সী মেয়ের কৌতূহল ঢের বেশী, অল্পবয়সী ছেলের চেয়ে। বিশেষ বিবাহাদি ব্যাপারে।"

পূর্ণিমা বলিল, "পারিবারিক উৎসবগুলো ত মেয়েদেরই ব্যাপার। ছেলেরা দর্শক মাত্র।"

দীপক বলিল, "থাক না, দর্শক না হাতী। এই তিন দিন যা খাটতে হয়েছে আমাকে, তা যে কোন মেয়েকে পেড়ে ফেলত।"

পূর্ণিমা বলিল, "কাজ করার অভ্যাস যাদের নেই, খানিকটা কাজকেই তারা অসম্ভব বেশী কাজ মনে করে। দেখ ত আমার মাকে, মুখ বুঁজে সারাদিন কি পরিশ্রমটাই না করেন। মাইনে করা লোক রাখলে দুটো লোক লাগত অত কাজ করতে। অবশ্য নিজের স্বাস্থ্যটা একেবারে নষ্ট ক'রে ফেলেছেন। কিন্তু উপায়ই বা কি ছিল এতদিন?"

দীপক একটুখানি হাসিয়া বলিল, "এবার ত বড়লোক হ'তে চলেছ, ঠাকুর-চাকর রাখতে পারবে।"

পূর্ণিমা বলিল, "ঠাট্টা ক'রো না বাপু। এটা যে আমার কাছে কি ভয়ানক দুঃখের ব্যাপার ছিল, তা যদি জানতে।"

দীপক বলিল, "ঠাট্টা করতে যাব কেন? গরীব হওয়ার দুঃখ আমি জানি না নাকি? তুমি শুধু অভাব সহ্য করেছ, আমি সেই সঙ্গে অপমানও সহ্য করেছি। ঘরে আমাকে কেউ মানে না, আমি শুধু তাদের রসদ জোগানদার। বাইরেও যে আমার খুব মান আছে তা নয়। আমার মতের মূল্য কারও কাছেই খুব বেশী নয়।"

পূর্ণিমা একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "ক্ষোভ তোমার হতে পারে দীপক। কিন্তু তুমিই বা আমার মতের কি মূল্য দাও? সব বিষয়েই ত আমরা আলাদা মত নিয়েই আছি। আমি কিন্তু এ নিয়ে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করি না, এমন কি মনে মনেও না। প্রত্যেক মানুষের অধিকার থাকা উচিত নিজের মত পোষণ করবার। সেই মত ব্যবহারিক জীবনেও খাটান যায় কি না, তা আলাদা কথা। প্রায়ই তা যায় না।"

দীপক বলিল, "ভালবাসার খাতিরে সব মত বিসর্জ্জন মেয়েরা দিতে পারে। এর দৃষ্টান্ত বিরল নয় কিছু।"

পূর্ণিমা বলিল, "মেয়েমানুষ হলেও আমি যে তা পারি না দীপক। আমাকে ত পুরুষের জায়গায়ই দাঁড়াতে হয়েছে, আমার সংসারে? এর দায়ঝক্কি, চিন্তা-ভাবনা সব ত আমার। শুধু নিজের হৃদয় নিয়ে থাকলে ত আমার চলে না।"

দীপক বলিল, "সেইখানেই ত বিপদ্। আমাদের কারোই অবসর নেই নিজেদের হৃদয়ের ভাবনা ভাববার। যাদের অদৃষ্ট এইরকম, ভগবান্ তাদের মনে ভালবাসা দিতে যান কেন তাও জানি না।"

পূর্ণিমা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ইহার আর কি উত্তর আছে?

দীপক বলিল, "অনির্দ্দিষ্ট কাল অপেক্ষা ক'রে থাকা ছাড়া আর কোন পথ নেই আমাদের সামনে। সে পথের শেষে কি আছে, তাই বা কে জানে?"

পূর্ণিমা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এ সব প্রশ্নের ত উত্তর নেই কিছু? তুমিও তা জান, আমিও জানি। আচ্ছা, উঠি এখন, অন্ধকার হয়ে গেল।"

দুইজনই উঠিয়া পড়িল। একটুখানি ভারাক্রান্ত মনেই যে-যাহার বাড়ী চলিয়া গেল।

পূর্ণিমা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সরমা মহোৎসাহে মায়ের সঙ্গে গল্প করিতেছে। সেও ছোট বারান্দায় একটা মোড়া টানিয়া লইয়া বসিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, "কি গল্প শুনে এলে?"

সরমা বলিল, "জান দিদি, ভীষণ কান্নাকাটি করেছে বড়কীদি। মাকে জড়িয়ে ধ'রে একেবারে ডুকরে কান্না। ঐ ত ছিরির মা আর ঐ ত ছিরির জীবন। তা ছেড়ে যেতে আবার কান্না।"

মা বলিলেন, "ও রে, জন্মাবধি যে ঘরে আছে, তা ছাড়তে মানুষের বড় কষ্ট হয়। তুই কি বুঝবি, ছেলেমানুষ। আর ঐ মা ত পেটে ধরেছে, এত বড়টা করেছে। গালমন্দ যাই দিয়ে থাক, ওকে আঁকড়েই ত বড়কী এতদিন ছিল? কাঁদবে না ছেড়ে যেতে?"

পূর্ণিমা বলিল, "যা শ্বশুরবাড়ী হ'ল, ভয়ে কেঁদে থাকাও আশ্চর্য্য নয়। বাপের বাড়ী সুখের নয়, তবু সেটার সঙ্গে চেনাশোনা হয়ে গিয়েছিল। অজানার ভয়, বড় ভয়।"

সরমা আবার আরম্ভ করিল, "বরের বাড়ী থেকে যারা নিতে এসেছিল, তারা সব মুখ ব্যাজার ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল। এরা চেঁচিয়েই অস্থির, ওদের বেশী খাতির

করে নি। শুধু দীপঙ্করদা গম্ভীরমুখে তাদের অভ্যর্থনা ক'রে বসাল, চা-টা দিল। বড়কীদি যখন যাবার সময় এসে প্রণাম করল, তখনও গোঁজ মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল, হাসলও না, কাঁদলও না।"

দীপকের গল্প আরম্ভ হইলেই মা সেখান হইতে উঠিয়া যান, আজও উঠিয়াই গেলেন। পূর্ণিমা বলিল, "সমস্ত ব্যাপারটাই ওর এত খারাপ লেগেছে যে, আর কিই বা সে করতে পারত? হাসা ত যায়ই না, কাঁদাটাও যেন ঠাট্টার মত দেখায়।"

সরমা বলিল, "কি জ্বালা বাবা! এমন বিয়ের চেয়ে চিরকাল আইবুড়ো থাকা ভাল।"

পূর্ণিমা বলিল, "চিরকাল নিজে ক'রে খাবার ক্ষমতা থাকলে সেটা করা যায় অবশ্য। বড়কীর ত সে ক্ষমতা নেই? ঝাঁটা মেরেও যদি কেউ দু'মুঠো খেতে দেয়, তবে তাকে তাই স'য়ে থাকতে হবে।"

সরমা বলিল, "শুনলে ভয় লাগে ভাই দিদি। কার কপালে কি যে থাকে।"

পূর্ণিমা বলিল, "নিজের কর্ম্মদোষে অনেক সময় কপাল দোষ হয়। খুব ভাল ক'রে পড়াশুনো কর, যেন ভাত খাবার জন্যে কখনও কারও গোয়ালে ঢুকতে না হয়।"

সরমা বলিল, "করি ত পড়াশুনো যথাসাধ্য, তার পর কপালে কি আছে কে জানে?" ক্রমশঃ

অর্থচক্র

(নাটিকা)

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

১ম দৃশ্য

[ছোট একটা ঘরে এক পাশের তক্তপোশের উপরকার বিছানা এখনও তোলা হয় নি। গৃহের অপর দিকে দেয়াল ঘেঁসে একটা ছোট টেবিলের উপর বিস্তর খাতার বিপুল স্তূপ। স্কুলমাষ্টার গিরীশ সেখানে একটা অর্দ্ধভগ্ন কেদারায় ব'সে একটার পর একটা খাতা সংশোধনে ব্যস্ত। গিন্নি শিবানীর প্রবেশ।]

শি। ও মা! এখনও বসে বসে ছিষ্টির খাতা দেখছ! বলি, নাইবে খাবে কখন? এর পর চেঁচাবে 'দেরি হয়ে গেল, দেরি হয়ে গেল,' যেন আমারই জন্যে রোজ দেরি হয়ে যায়। ওঠ, ওঠ।

[গিরীশ নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ায়, কিন্তু তখনও চোখ থাকে খাতারই দিকে কিছুক্ষণ এবং পেন্সিলের আঁচড় কয়েকটা তার উপর টেনে হঠাৎ ছুঁড়ে ফেলে দেয় খাতাটা টেবিলের অপর প্রান্তে, তার পরই দেয় ছুট। শিবানী এক দৃষ্টে তার এই কাণ্ড দেখে এবং পরক্ষণেই খাতার স্তূপের উপর কটাক্ষপাত করে।]

২য় দৃশ্য

[গিরীশ আহারে বসেছে। স্বামী আহারে বসলে স্ত্রীর সুবর্ণ-সুযোগ। যাকে বলে বাগে পাওয়া। তখন আর পাশ কাটিয়ে পা চালিয়ে যাবার উপায় নেই। দক্ষিণ হস্তই চালাতে হবে এবং কান দুটো খাড়াই থাকবে নির্ঘাৎ]

শি। আমি বলি কি, এভাবে আর কত দিন চলবে?

[বিস্মিত গিরীশ মুখ তুলে স্ত্রীর দিকে তাকায় এবং কথার ভূমিকাটা বুঝতে চেষ্টা করে]

শি। এম. এ. পড়তে পড়তে যখন বি. এল. ক্লাসেও বিকালে ছুটতে তখন বলতে বি. এল. টা থাকবে হাতের পাঁচ। সেই হাতের পাঁচটাকে কি হাতের তেলোতেই রেখে দেবে চিরটাকাল? তবে আর অত কষ্ট করে পাশই বা করলে কেন আর এত রাশি রাশি খাতা দেখে হায়রাণি কেন? মাইনে ত ঐ চারটি খোলার কুচো। এতে ত আর সংসার চলে না? থার্ড মাষ্টারির থার্ড ক্লাস আয়ে কখনও সংসার চলে?

গি। ওঃ, এই কথা। তা বেশ ত, ছেলে ঠ্যাঙানো আসছে মাস থেকেই দেব ছেড়ে। তার পরই সুরু করব মক্কেল ঠকানো ব্যবসা।

শি। তাই কর। স্কুলের রাশখানেক খাতার বদলে যদি ব্রীফের কাগজ একখানিও পাও দিনান্তে তবে এমন ভাবে প্রাণান্ত হতে হয় না প্রতিদিন।

গি। তবে কি জান? সেখানেও আছে বিপদের ভয়। বরং বেশী বিপদ।

শি। কি রকম?

গি। রকমটা হচ্ছে মাছ ধরার মত।

শি। তার মানে?

গি। মানে বঁড়শির ছিপ ফেলে যেমন ঠায় বসে থাকতে হয় সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি, হয়ত শেষ পর্যন্ত একটা মাছও ঘায়েল হ'ল না, তেমনি কালো কালো ঘাগরা পরে কত আকাঙ্ক্ষী আইনজীবী যে ঘুরে বেড়ায় সারাদিন আইন মন্দিরে, সন্ধ্যে নাগাদ হয়ত একেবারেই মক্কেল জোটে না। এমন ধারা একটি-দু'টি নয়, বহু। বার লাইব্রেরীতে বসে বসে চপ্-কাটলেট খাবার পয়সাটিও জোটে না। তাও আনতে হয় পকেটে করে গিন্নির আঁচলের গাঁট থেকে। তবে হ্যাঁ, ঐ বঁড়শিরই সুতো ছাড়ার মতই যদি কিছুকাল গিন্নির গাঁটের পয়সায় চপ্-কাটলেট চালিয়ে যেতে পারে তবে আখেরে—যখন মক্কেলরা মামলাজীবীর মর্ম বুঝে হুড়মুড় করে এসে পড়তে থাকবে, তখন সুদে-আসলে সব উঠে আসবে ঐ রুই-কাৎলার মত। তখন আর চুণো-পুঁটির ফাৎনায় ফাঁকি-বাজির বাজে ঠোকর নয়।

শি। ঐ নাও! তুমি আবার সাহিত্য সৃষ্টি করে তুলছ যে? রক্ষে কর। ঐটেতেই আমার বড় ভয় লাগে। আচ্ছা, তোমার চপ্-কাটলেটের পয়সা আমারই গাঁট থেকে দেব। এখন ঘাগরা পরে চট্‌পট্ বেরিয়ে পড় ত। বল, কবে থেকে বেরুবে?

গি। কিন্তু শিক্ষকতার কাজটা ছিল বড় উঁচুদরের। কচি কচি মনের মধ্যে কত মহৎ আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলবার এমন সুযোগ! আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য যে, শিক্ষকদের বেতন উচ্চহারের ত নয়ই, মধ্যস্তরের ব্যবস্থাও আজ পর্যন্ত হ'ল না। ঐ যাঃ দেরি হয়ে গেল! আচ্ছা তোমায় কতদিন বলেছি, এত গরম ভাত এনে দিও না পাতে। জুড়োতে গিয়ে দেরি হয়ে যায়।

[খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়ে গিরীশ।]

শি। (সহাস্যে) হ্যাঁ, তাই ত। যত দোষ আমারই। গরম ভাতের জন্যেই যত দেরি, না? আর এত গরম গরম বক্তৃতাগুলোর কোন দোষ নেই, না?

৩য় দৃশ্য

[গিরীশ মাষ্টারমশাইর বিদায়-সম্বর্দ্ধনা। নানা রঙের ফুলের মালা তার গলায় পরিয়ে দিল ছোট্ট একটি ছেলে। তার পরই তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল একটির পর একটি ছেলে। সে যেন আর থামে না। যখন প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায় এক-একটি ছেলে, দেখা যায় অশ্রুসিক্ত তাদের কপোল। হেডমাষ্টার মশাই পাশেই বসে ছিলেন। গিরীশের চোখেও জল।]

হেডমাষ্টার। এই যে গুরুশিষ্যের এমন মধুর সম্পর্কটা আজ দেখছি, তা আর কখনও দেখবার সৌভাগ্য হবে না। আপনি সত্যিই শেষ কালে চলে যাচ্ছেন! আমাদের ভবিষ্যৎটা বড়ই অন্ধকারে আচ্ছন্ন এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আপনি চলে গেলেই শিক্ষক-ছাত্রের একটা রেষারেষি ভাব ফুটে উঠবে আমি বেশ বুঝতে পারছি। আপনি কি মন্ত্রে ওদের মুগ্ধ করে রেখেছিলেন সেইটে আমাদের একটু বলে যান।

গি। মন্ত্র-তন্ত্র জানি না। তবে এইটুকু বুঝি ওদের আমি বড়ই ভালবাসি। ওদের কাউকে যদি কখনও বিপথে পদার্পণ করতে দেখেছি তখন তাকে ভর্ৎসনা করবার আগে নিজের অন্তরে যাতনা অনুভব করেছি নিদারুণ। তার পর ঐ নিজ অন্তর্দাহের তাপে পূত হয়ে যখনই যা বলেছি তাকে, তা বিফলে যায় নি। এই ভালবাসাটুকু আমার অর্জিত ধন নয়, এ নৈসর্গিক সম্পদ্ আমার। এর জন্য বিধাতাকেই ধন্যবাদ দি'। আমার কৃতিত্ব কিছুই নেই, হেডমাষ্টারমশাই।

হেডমাষ্টার। বড়ই দুঃখের বিষয় আপনার মত আদর্শের লোককে আমরা রাখতে পারলুম না।

গি। শুধু এখানে নয়, অনেক স্কুলেরই এই একই দুর্দশা, শুধু আদর্শ নিয়ে আর ক'দিন চলে বলুন। আর্থিক সংকট মহা সংকট। যতদিন পর্যন্ত শিক্ষকতার আর্থিক মান অন্যান্য কর্মীদের সমান না ক'রে তুলতে পারবেন হেডমাষ্টারমশাই, ততদিন পর্যন্ত উপযুক্ত ব্যক্তি উপচে চলে যাবেই অন্যত্র। আর ঐ যে বললেন ভবিষ্যতে গুরু-শিষ্যে রেষারেষি, তার মূলে দরিদ্র শিক্ষকদের সম্মান টিঁকতে পারেই না ছাত্রদের কাছে। জানেন?—আমরা কে কত মাইনে পাই—যা আমরাও সব জানি না—কিন্তু ওদের সবারই তা মুখস্থ? পড়া মুখস্থ করার আগে এ যদি কোন ছাত্র মুখস্থ না করলো তবে অন্যদের রায়ে সে ক্লাসের অযোগ্য।

৪র্থ দৃশ্য

[গিরীশের গৃহ। শিবানী আসীন। গিরীশের প্রবেশ।]

গি। ছেলেরা যে এত ভালবাসত আমায় তা ত আগে বুঝতে পারি নি।

[ফুলের মালা হাতে করিয়া]

এই দেখ, শ্বেত, রাঙা, পীত—প্রত্যেকটি ফুলে কচি কচি ছেলেদের যেন বুকের বিচিত্র অভিব্যক্তি! তরুণ প্রাণের দান কি খাঁটি! আর যে ব্যবসায়ে নামতে যাচ্ছি সেখানকার মাল-মশলা ঠিক বিপরীত। এইটে আমার মহাদুঃখ।

[শিবানী কোন জবাব না দিয়ে দুঃখিত ও নিরুপায় ভাবে তাকিয়ে থাকে স্বামীর দিকে। গিরীশই আবার বলতে থাকে।]

গি। আর দেখ, লক্ষ্মী ঠাকুরুণের খোসামোদ করা—সে আমার দ্বারা হবে না। মক্কেল যদি নিজে থেকে এল ত এল। না এল ত ব্যস্। তুমি বরং স্তব মন্ত্রে-টন্ত্রে তাঁকে বশ করবার চেষ্টা কর।

[শিবানী অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ, পরে ধীর পদে চলে যায় পাশের ঘরে।]

৫ম দৃশ্য

[ঠাকুর পুজার ছোট্ট একটি ঘর। ছোট্ট একটি লক্ষ্মীমূর্তি। একটা প্রদীপ হস্তে শিবানীর ধীর পদে প্রবেশ। বেদীর পাশে প্রদীপ রেখে প্রণাম। পরে মাথা তুলে স্তব গান।]

শিবানীর স্তবগান :

মাগো লক্ষ্মীরাণী কমল-আননা,
দয়া করি নিজগুণে বিতর করুণা।
সুখদা মোক্ষদা তুমি পতিত-পাবনী,
বিষ্ণুজায়া দুঃখহরা ত্রিলোক-পালিনী।
না জানি মা ভক্তি স্তুতি-ভজন-পূজন,
কৃপা বিতরিতে তবু হয়ো না কৃপণ।
করজোড়ে তব পদে যাচি মা করুণা,
পূর্ণ কর মনোবাঞ্ছা, করো না বঞ্চনা।
[স্তবান্তে পুনরায় প্রণাম।]

৬ষ্ঠ দৃশ্য

[গিরীশ আবার সেই দেয়াল-ঘেঁসা টেবিলটার উপর রাশি রাশি কাগজপত্র নিয়ে ঝুঁকে পড়েছে। তা অবিশ্যি আর ছেলেদের পরীক্ষার কাগজ নয় কিন্তু তা ব্রীফের কাগজও নয়।]

গি। (স্বগতঃ) পড়ুয়ার পালা ত শেষ করা গেছে। মামলার মক্কেল এখনও এসে ত জুটলো না। টাউটের টোপ ত ফেলেছি বিস্তর। কিন্তু মাছ ফাঁদে পড়ছে কৈ? ইংরেজীতে প্রবাদ আছে অবসরের সুসময়ে বা দুঃসময়েই নাকি মানব-মস্তিষ্কে দানবের আবির্ভাব হয়। তাই ত দেখছি সাহিত্য-দানব এসে ভর করেছে আমার উপর। আর তার কীর্তি এই সব।

[কাগজপত্রের প্রতি গিরীশের দৃষ্টি নিক্ষেপ। শিবানীর প্রবেশ।]

শি। কি ফ্যাসাদেই পড়া গেল? ও ছাইভস্ম লিখে কার পিণ্ডি দেবে শুনি? এই ভয়টাই করছিলাম। যার মাথায় চেপে বসবে এই সাহিত্য-ভূত, সে ইস্কুলেই যাক, আর আদালতেই যাক, ভূত ত ছাড়তে চাইবে না। ছাড় ছাড় এই ব্যাপার খাটা। এর চেয়ে দেখছি ইস্কুল-মাষ্টারিই ছিল ভাল। ভ্যালা এক ভোলানাথের পাল্লায় পড়া গেছে! ঘরে যে চাল নেই তা আর ক'বার ক'রে বলব? নাও, ওঠো। একটা বিহিত কর গে যাও।

[শিবানীর প্রস্থান।]

গি। (স্বগতঃ) যেমন দম্‌কা হাওয়ার মত আসা, তেমনি ঝড়ো শাণিত বাক্যবাণ হেনে, দমকা ভঙ্গিতেই নিক্রান্ত। হুঁ, কবি নিছক কাল্পনিক নারীর মুখেই ফোটান নি এ বুলি—

"রচিছ ছন্দ দীর্ঘ হ্রস্ব
মাথা ও মুণ্ড ছাই ও ভস্ম
মিলিবে কি তাহে হস্তী অশ্ব
না মিলে শস্যকণা?
অন্ন জোটে না কথা জোটে মেলা;
নিশিদিন ধরে এ কি ছেলে খেলা?
ভারতীরে ছাড়ি ধর এই বেলা
লক্ষ্মীর উপাসনা।"

আচ্ছাঃ, বিহিত করতে লাগা যাক বিধিমত। কিন্তু কি করি? দেখা যাক ধার-টার অন্ততঃ পাই কি না আপাততঃ কোথাও। কিন্তু আর-এক কবির সেই গানটা যেন আমায় ছাড়তে চায় না :

"জননী বঙ্গভাষা এ জীবনে
চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি
অমল কমল চরণে স্থান।"
[শিবানীর পুনঃ প্রবেশ।]

শি। ও মা! গান গাওয়া হচ্ছে দেখছি! বেশ নিশ্চিন্দি ভাব। ওদিকে যে বাড়ীঅলা এসে হত্যা দিয়েছে দোরে গো। গেল মাসে ত ফাঁকি-ঝুঁকি দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছিলে। এখন দু' মাসের ভাড়া। কি বলবে বল গে যাও। বাড়ীঅলা না ছিনে জোঁক?

গি। তাই ত, কি করা যায় এখন?

[নেপথ্যে বাড়ীঅলার হাঁক—বেরিয়ে আসুন না একবার গিরিধরবাবু।]

গি। ও বাবা! এ যে হেঁড়ে-গলায় চেঁচাতে সুরু করে দিলে। আর আমার নাম যে গিরিধর না, গিরীশ তাও ভুলেছে ব্যাটা টাকার তাগাদায়। (জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে) যাচ্ছি মশাই—বসুন। দেখি ত ডেস্কে ক'টা টাকা আছে। (ডেস্কে হাতড়াবার পর) নাঃ, এ ত কিছুই না। জামার পকেটে বোধ হয় মোটে গোটা দশেক আছে, হ্যাঁ।

শি। আচ্ছা, আমার সিঁদুরকৌটোয় কিছু হবে। আর খোকার সেই গুপ্তধনের তহবিলে দেখি কি পাই।

[শিবানীর প্রস্থান ও অল্প পরেই পুনঃ প্রবেশ।]

শি। নাঃ, কিছুই বিশেষ হ'ল না। এই নাও।

গি। দেখি, দেখি, সবশুদ্ধ কত হ'ল। এ মা! মাত্র তিরিশ টাকা। আচ্ছা, তাই নিয়েই যাই ত এখন।

[নেপথ্যে আবার বাড়ীঅলার হাঁক—।]

বাঃ অঃ। কি হ'ল, গিরিধরবাবু?

গি। এই এলুম বলে। [গিরীশের প্রস্থান।]

৭ম দৃশ্য

[গিরীশের নীচের ঘর। বাড়ীঅলা আসীন। গিরীশের প্রবেশ]

গি। এই নিন, আজ এই তিরিশ টাকা—

বা। মশাই কি তামাসা করছেন?

গি। আহা হাঃ! তামাসা করব কেন? আজ সব টাকা এক সঙ্গে দিতে পারছি না।

বা। (চীৎকার করিয়া) আজও দিতে পারছেন না!

গি। আ হা হা, অত চট্‌বেন না।

বা। নাঃ চট্‌ব না, হেসে কথা কইব?

গি। আচ্ছা, কাল আপনাকে নিশ্চয়ই দেব।

বা। আবার কাল?

গি। হ্যাঁ, এবার আর নড়চড় হবে না, দেখবেন।

বা। কাল এসে নিশ্চয়ই যেন পাই সব টাকা। পুরো একশ'। পুজোর মাস। আর একদিনও দেরি চলবে না। মনে থাকে যেন।

গি। নিশ্চয়, নিশ্চয়। কাল আপনাকে ঠিক দেব।

বা। ঠিক?

গি। ঠিক ঠিক।

[বাড়ীঅলার প্রস্থান ও শিবানীর প্রবেশ]

শি। বলি পুজোর মাস কি শুধু ওর একলারই? আমাদেরও পুজোর মাস না? আমাদের বাছাদের পরনে ছেঁড়া কাপড়-জামা তা তুমি নিজের চোখেই দেখছ। আমিও বলছি কতবার তোমায়। সেদিকে একটুও না ভেবে ফট্ করে বলে দিলে পুরো একশ' টাকাই ওকে দেবে, আর কালই। আর কোথেকেই বা একশ' টাকা কালই পাবে শুনি?

[বাইরে থেকে জোর গলায় হাঁক এল, "গিরীশবাবু আছেন?"]

শি। ঐ আবার এসেছে কর্মনাশার দল। আমি যাই, ব'লে পাঠাই, এখন দেখা হবে না। যত সব—

গি। আরে না না, ছিঃ! ভদ্রলোকেরা এসেছেন। (উচ্চস্বরে) আসুন আসুন, দাশুবাবু, সোজা চলে আসুন।

[শিবানীর সরোষে প্রস্থান এবং মাসিকপত্র-সম্পাদক ও পুস্তক-প্রকাশক দাশুবাবু ও তাঁর বন্ধু সন্তোষবাবুর প্রবেশ]

দা। আমার সেটা কতদূর গিরীশবাবু?

গি। এই ত দেখুন না, সকালে উঠেই আপনার লেখা নিয়েই বসেছিলাম। তা লক্ষ্মীঠাকরুণ যদি নিতান্তই অপ্রসন্ন থাকেন, সরস্বতীর সেবা করা দায় হয়ে পড়ে। ভোর হতেই টাকার তাগাদা শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। পুজোর বাজারে সকলেরই জোর তাগাদা।

দা। (সহাস্যে) সত্যিই তাই। আমিও যে মহালয়ার আগেই আপনার বইখানা বার করতে চাই।

গি। হ্যাঁ, তা দেব, প্রায় হয়ে এল লেখাটা।

দা। না, না, এখন আর প্রায় বললে চলবে না। আমাকে কালই প্রেসে দিতে হবে। কালই দিয়ে ফেলবেন একটু মেহনৎ ক'রে।

গি। (উচ্চহাস্য) হাঃ হাঃ হাঃ! আপনারও কালই দরকার? আজ যে আসছে সেই আবার কালও আসবে। কাল একটা যজ্ঞি করা যাবে আমার এখানে তা হ'লে। যত লোক আসবে তাগাদায়, এক এক করে সবাইকে ধরে ধরে যজ্ঞাগ্নিতে উৎসর্গ করা যাবে। কি বলেন সন্তোষবাবু, হাঃ হাঃ!

দা। আর আপনিই বা পুণ্যাগ্নি থেকে বঞ্চিত থাকবেন কেন? আপনাকে নিয়েই ঝাঁপ দেওয়া যাবে হোমাগ্নিতে। না, না, তামাসা নয়, কালই লেখাটা চাই।

গি। আচ্ছা দেখা যাক।

[দাশু ও সন্তোষের প্রস্থান। গিরীশের মূর্তিটা কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকে। অগ্নিতে ঝাঁপ দেওয়ার কথাটাই ভাবতে থাকে। কথাটার মধ্যে বুঝি একটা সম্মোহনের উন্মেষ আছে!]

গি। (স্বগতঃ) বেশ বলেছে—হোমাগ্নি। তাই বা কেন, চিতোরের চিতা।

(শিবানীর প্রবেশ)

শি। ও কি? গালে হাত দিয়ে ভাবছ দেখছি। এই ত একটু আগে দেখলাম খুব হাসাহাসি হচ্ছে এখানে। আর ওদিকে খিড়কীর দরজায় কত লোককে আমার সামলাতে হ'ল জান? মুদি, ধোপা, গয়লা—সব নাছোড়বান্দার দল। তোমার মত আমিও 'কাল', 'কাল' বলে সবাইকে ফিরিয়ে দিয়েছি।

গি। ওঃ, বেটাদের সব মচ্ছব পড়েছে! তা মচ্ছবই ত বটে। দুর্গোৎসব। কারু আশ্বিন মাস কারু সর্বনাশ। কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে প্রবাদ বাক্যেরও বুলি বদলায় এক-আধটু। যাই, দেখি আজ। টাকার সন্ধানে সুমেরু অবধি ঘুরে আসব। দেখি কি পাওয়া যায়।

৮ম দৃশ্য

[শহরতলীর রাস্তা। সন্ধ্যাকাল]

ঠিকাদার। আরে, এই যে বাড়ীঅলা বাবু। বাড়ী মেরামতি বাকি টাকাটা কিন্তু পুজোর মুখেই চাই। আজই যাব আপনার কাছে টাকাটা আনতে।

বাড়ীঅলা। আরে হবে, হবে। দেখ না। দু' দু' মাসের ভাড়া বাকি ফেলেছে একেক ভাড়াটে। আজ জোর তাগাদা দিয়ে এসেছি সব। কাল পেলেই তোমার বাড়ী বয়ে দিয়ে আসব নিশ্চিত। তোমায় আর যেতে হবে না। জান, টাকা যেমন অচল পদার্থ, তেমনি আবার সময় মত সচলও। নড়ে না ত নড়ে না, আবার নড়তে সুরু করলে চলতেই থাকে।

[অনতিদূরে গিরীশ দাঁড়াইয়া। পরোক্ষে সব দর্শন ও শ্রবণ। ঠিকাদার চলতে থাকে। হঠাৎ পাশের একটা খোলার ঘরের দোকান থেকে হাঁক আসে নটবরের]

ন। বলি অ ঠিকেদার বাবু! পাশ কাটিয়ে যে বড় চলি যেতি নেগেছ! এই ত পুজোর বাদ্যি বাজতি নাগছে; তা তোমার টাকা কই গো? ওর নাম কি, আমার দেড় শ' টাকায় মধ্যে এক শ' মোদ্দা দিতেই হবি যে এই মহালয়ার মধ্যি।

ঠি। বাঃ! নটবর, তোমার দোকানটা ত বেশ সাজিয়েছ! আর বেশ বুদ্ধি করে মাল-মশলা রেখেছ। খান-কতক ইঁট সাজিয়ে রেখেছ, তারই পাশে ঐ আলগা ইটেরই দেয়ালের ওধারে রেখেছ খানিকটা চূণ, তার পাশেই মগরাই বালি। সব আমাদের মত ঠিকেদারের খোরাক। আর তার পরই তোমার বন্ধু বলাই মুদির দোকান। ওরও বুদ্ধি খুব উঁচু দরের। মুদিখানার মধ্যেই দেখছি একটা কাচের আলমারিতে রেখেছে খান কতক বই। দেখি, দেখি। (নিরীক্ষণ করিয়া) রামায়ণ, মহাভারত, ভারতচন্দ্র, চণ্ডীদাস, নূতন পঞ্জিকা, থিয়েটার সঙ্গীত, ডিটেকটিভ উপন্যাস, বাঃ! ও বুঝেছে, উদরের খোরাকের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের খোরাকও কাটে বেশ।

ন। বাঃ! কি সব বকতি নেগেছ? এত বক্তিমে কেন? খোসামুদিতে চিঁড়ে ভিজবে না ঠিকেদার বাবু। ওতে আমি ভুলছি না। ওর নাম কি—আমি বলছি আমার টাকার কথা।

ঠি। আরে হ্যাঁ হ্যাঁ। সেই ধান্দায়ই ছুটোছুটি করছি। দেনা-পাওনা ত সকলেরই আছে, সেইটে বুঝিস না কেন? পাওনার টাকা হাতে পেলে তবে না দেনা শোধ দেবে। ঘর থেকে বার করে কে কবে টাকা শোধ দেয় বল্?

(ঠিকাদারের প্রস্থান।)

বলাই মুদি। নটুদা! এইবার আমি বলি। পাশাপাশি দোকান আমাদের, চাল-ডাল তুমি হাত বাড়িয়েই পাও, কিন্তু হাতে হাতেই পয়সাটা ত পাই না। পয়সার দেনা টাকায় দাঁড়াচ্ছে, তার পর গড়াচ্ছে নোটের অঙ্কে, সে হিসাব তুমি রাখ না। কাল খাতা খুলে দেখলাম, তোমার কাছে পাওনা আমার শ'এর ওপর। কথাটা বুঝলা না? ঠিকেদার ঠেঁ টাকাটা যদি পাও, নটুদা, তবে সে টাকা আমার থাকল। এ আমি বলে রাখছু হেঁ। দাশুবাবুর বইয়ের দামটা এবার চুকিয়ে দিতে হবে। তাগিদ কর্যা গেছেন নিজে এইসে।

নটবর। আরে হ্যাঁরে হ্যাঁ, আমার সে হিসাব আছে। আমার কাছে ঠিক পাবি। টাকা আমাদের মত গরীব মানষের হাতে জমে যায় না। জানিস, যাদের যত টাকা বেশী তাদেরই তত টাকার মমতা। হাতে গেল ত আঠার মত গেল আটকে। জানিস, বলাই, সেদিন ঐ আনন্দবাজারটায় পড়তেছিলাম একজন লিখছে, ধনী নোকদের ঐ টাকা আটক রাখার জন্তি আমাদের মত গরীব নোকেদের ব্যবসা যায় পদে পদে আটকে। বড়

খাঁটি কথা নিখেছে। ওর নাম কি—তাই বলতেছি তোর টাকা আমি আটকে রাখব নি। ভুক্তভোগী যে।

বলাই। ঠিক বলিছ নটুদা। আমাদের গরীবের ঘর যেন খুদ্দুর জলাশয়। জল এক বাগে আসে আর এক বাগে যায় বয়ে। আর তেনারা, ঐ মহাজনেরা যেন একেকটি মহা সমুদ্দুর। জল যদ্দি গড়িয়ে সেথা পড়ল ত ব্যস্? আর বয়ে যাবার যোটি নেই।

ন। বাঃ বেশ বলিছিস ত বলাই! তোর ঐ রামায়ণ-মহাভারত বেচে বেচেই দেখছি তোর বিবেচনাও বেশ খোলতাই হয়্যা পড়তিছে।

ব। শুধু কি বই বেচি নটুদা? খুলে খুলে পড়িও যে ফুরসুৎ মাফিক, কথাটা বুঝলা না?

ন। বেশ বেশ—পড়াশুনো আমাদের অমনি কর্যাই চালাতি হবে।

ব। না নটুদা, সরকার আমাদের তরেও লেখা-পড়ার আয়োজন করতি নেগেছেন। ঐ কি না বলে এডাল্ট এডুকেশন না কি? দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী—সে নাকি এক তাজ্জব ব্যাপার। আমাদের মত সমিখি নোকেদের তরেই নাকি সেই ব্যবস্থা।

ন। ঠিক বলিছিস্। সেদিন ঐ কাগাজখানাতেই দেখতিছিলাম বটে। দেখা যাক কত দূর কি হয়। —সরকার ত অনেক বিবৃহৎ বাক্যিই ঝাড়ে।

ব। যাই বল নটুদা, সরকারকে আমরা যতই গাল দি' না কেন, অনেক সত্যিকারের কাজে এইবার হাত দিতি নেগেছেন। এই দেখ না কেন, এমন যে পেরলয় নদী ময়ূরাক্ষী আর দামোদার। তেনাদের বেঁধে বেঁধে ধরি দিতেছেন চাষাদের ক্ষেতে ক্ষেতে, কথাটা বুঝলা না? হেঁ হেঁ, আর ইচ্ছামত গমন নয়—বান ডাকি দেশের সর্বনাশ করা আর চলবেক নি।

ন। হ্যাঁ রে বলাই। আর শুধু কি তাই? শুধুই কি জল সরবরাহ? আচ্চয্যি ব্যাপার এই যে, ঐ জলের মধ্যি হতি বিজুলীর নিষ্কাশন। সগগের জলদ, মানে মেঘের মধ্যি বিজুলী থাকে এই ত জানতাম। মর্ত্তের জলের মধ্যিও বিদ্যুৎ—এ বড়ই তাজ্জবের ব্যাপার। শুধু জলই চাষাদের ক্ষেতে ক্ষেতে না, ওর নাম কি—ঐ বিজুলীও কর্মীর দ্বারে দ্বারে। তাই বলতিছিলাম কব বড় বড় কথাই যদি সরকার কাজে নাগাতি পারে তবে দেশে সোনা ফলবে তা আচ্চয্যি কি? আচ্ছা বলাই, সন্ধ্যা উৎরে গেল। আর খদ্দের আসবে না। এখন হরিভক্তির একখানা গান শোনা ত। সারাদিন টাকা পয়সার চিন্তায় চিত্তটা যেন খেঁৎলে যায়। নে ধর একখান গান।

(বলাই একটা একতারা লইয়া গান ধরে, নটবর বাঁয়া তবলায় ঠেকা দেয়।)

গান

আলাইয়া ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

"ওরে দয়াল নামে ভাস সুখে মন আমার,
কেন রে ভাব আর?
ওরে দয়াময় এই মন্ত্র জপে, দয়াময়ে প্রাণ সঁপে
দয়াল বলে ভবার্ণবে দাও সাঁতার।
তরঙ্গ গর্জনে শঙ্কা পেয়ো না,
কলুষ কুম্ভীর পানে ফিরেও চাহিও না,
ভয় কি রে, মহামন্ত্র ভুলো না,
কিছুতেই কিছু হবে না।
যদি পড় রে আবর্ত জলে
উর্দ্ধে দুই বাহু তুলে
বলো "কোথায় রইলে ভবের কর্ণধার?"
চেয়ে দেখ হলো বেলা অবসান
মিছে কাজে কেন হায় রে ভোল নিজ পরিত্রাণ?
দূরে ফেলে দেও ধূলির ধন-মান,
বিবেক ভেলায় দৃঢ় বাঁধ প্রাণ।
ও রে, সাহসে নির্ভর করে ঝাঁপ দিয়ে যাও রে প'ড়ে,
ডুবিলেও অবশ্য পাবে উদ্ধার।
দয়াল নামে ভাস সুখে মন আমার।

৯ম দৃশ্য

[গিরীশ তার পড়বার ঘরে একাকী। নিশীথ রাত্রি।]

গি। (স্বগতঃ) সুমেরু থেকে কুমারি পর্যন্ত সারাদিন ঘুরেও ত কোথাও টাকা পেলাম না। পথে-ঘাটে সকলেই যে যাকে পায় টাকার তাগাদাই করছে দেখলাম। এই ত পুজোর বাজারের দৃশ্য! যেমন আধমরা মাছিটার মাথা কামড়ে ধরে পিঁপড়ে বীর, পিঁপড়েকে ধরে ধরে খায় চড়ুই পাখী, ওদিকে বেড়াল বসে তাক্ করে চড়ুইটার দিকে। পুজোর বাজারে বলির ধূম। পুজোবাড়ীতে পাঁঠা বলি, কারবারের বাজারের দেনাদারের পেছনে ছুটেছে পাওনাদার তার খেড়োর রক্তমলাট হিসাবের-কেতাবের খাঁড়া হাতে ক'রে, চাষী হত্যা দিয়েছে ফড়ের দ্বারে, ফড়ে ফিঙের মত দোকানে দোকানে লেগেছে, দোকানীরা হতাশ হয়ে হাঁক দিচ্ছে ছোট বড়বু বাদের দরজায় দরজায়,

তাগাদার চোটে ছোট বাবুদের মাথার ঠিক নেই, আর বড় বাবুরা মাথা ঠিক রাখতেই দরজায় তালা লাগিয়ে পুজোর ছুটিতে ঠাণ্ডা মিঠে হাওয়া খেতে গেছেন। আচ্ছা, আমিও একটা ব্যবস্থা করছি। আমার যেতে হবে আরও একটু দূর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই রাতেই।

(একটা রশি সন্তর্পণে সংগ্রহ করে নিরীক্ষণ করবার পর, গলায় তা পরিয়ে কি ভাবে ফাঁসটা লাগাবে তার একটা মহড়া দিয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে)

গি। (স্বগতঃ) হ্যাঁ, ঠিক হবে। কিন্তু এই শেষ রাত্রির এই আসন্ন বলিদানের পূর্বেকার আমার মনের ভাবটা নিবেদন করে যেতে হবে ঐ নিদয়া বাগ্‌দেবীরই চরণে। অন্তিমের পুজো তাঁরই প্রাপ্য যিনি আমার অস্তিত্বের কারণ। তাই জীবনের শেষ অঙ্ক আঁকতে এই নিশীথে শেষবার কলমটা ধরি। যে গল্পটা লিখছিলাম দাশুবাবুর জন্যে তারই নায়ককে এনে ফেলব বিষম বিপাকে। তার পর তাকে দিয়ে আত্মহত্যা করাব। হ্যাঁ, ঠিক হবে। তার মুখে আমার মনের বাণী ফুটিয়ে তুলব—আত্মহত্যার পূর্বেকার মনের অবস্থা। নিজের জীবনের যবনিকা নিজেই ফেলা কেমনতর তা এমন ক'রে এঁকে কেউ দেখায় নি।

[লেখায় গিয়ে নিবিষ্ট কিছুক্ষণ, তার পর উঠে]

গি। (স্বগত) যাক্ শেষ করা গেল শেষ লেখা। এইবার এই শেষ নির্দেশ লিখে দি' একটা কাগজের টুকরোয়। (লিখতে লিখতে সঙ্গে সঙ্গে পাঠ) "আমার মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী, আর কেউ না। যত পাওনাদার আসবে, তাদের মধ্যে যে ভারতীর দূত তাকে যেন দেওয়া হয় এই গল্পের পাণ্ডুলিপি। আর লক্ষ্মীর দাস যারা আসবে তাদের চোখের সামনে খুলে যেন দেওয়া হয় আমার মৃতমুখ। এবার পুজোয় হাজার হাজার বলির সঙ্গে মা-দুর্গার চরণে আমার বলিটাই পড়ুক তবে সবার আগে।"

গান (গুন্ গুন্ করে)
(বেহাগ)

তবে মুক্ত করে দি চিত্ত-বিহগের পিঞ্জর-জ্বালা,
সাঙ্গ হোক আজি এ নিশীথ কালে এই জীবনের পালা।
নমো দুর্গতিনাশিনী
নমো মহিষমর্দিনী
আর একটি বলি লহ ওগো দশভুজা!
হাজারো বলি সাথে এই না তব পূজা।
দেখো যেন বেঁচে না যায় একটিও বলি,
পশু সাথে লহ আজ একটি নরবলি।
নমো দুর্গতিনাশিনী
নমো মহিষমর্দিনী
নমো নমো নমঃ।

এবার যাই ওদের ঘুমন্ত মুখে দিয়ে যাই একটি করে শেষ চুম্বন। আর দু' ফোঁটা অশ্রু।

[গৃহান্তরে প্রবেশ। শয়ন কক্ষ। ঘুমন্ত শিশু দু'টির কপালে আলগোছে চুম্বন। তার পর স্ত্রীর শয্যার দিকে তাকিয়ে দেখে তা শূন্য!]

এ কি! শিবানী গেল কোথায়? কি আশ্চর্য! আরে, সদর দরজা খোলা দেখছি। ব্যাপার কি? শিবানীর মাথায়ও কি আমার মত ভূত ঢুকল? তা হ'লে সে কি আমার আগেই—?

[খোলা দরজা দিয়ে শিবানীর প্রবেশ।]

এ কি? এত রাতে কোত্থেকে?

শি। (সহাস্যে) রাত কোথা? দেখছ না ভোর হয়েছে।

গি। ভোর! হ্যাঁ, তাই ত দেখছি। আর তোমার মুখে-চোখেও দেখছি হাসির ভোর। ব্যাপার কি? বলছি, এই শেষ রাতে গিয়েছিলে কোথা?

শি। (পূর্ববৎ সহাস্যে) শেষ রাতে যাই নি, সন্ধ্যা রাতেই গিয়েছিলাম। তোমাকে দেখে তখন মনে হ'ল খুব মেতেই আছ তোমার লেখা নিয়ে—রাতে ঘুমুবে না নিশ্চয়।

গি। (স্বগত) কিন্তু আমার প্ল্যানটা কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে সব। শিবানীর মুখে এত হাসির ছটা কেন?

শি। তোমার গল্পটা লেখা শেষ হ'ল?

গি। হ্যাঁ, শেষ করে ফেলেছি। একেবারেই শেষ করেছি। আর লিখব না কখনো। সব খতম।

শি। না, না, লেখার ওপর রাগ ক'রো না। আমি একটা ফন্দি তোমায় বাৎলে দিচ্ছি।

গি। ফন্দি? কি ফন্দি শুনি?

শি। আমি দাদার কাছে শুনলাম বাংলা লিখেও আজকাল অনেকে বেশ দু'পয়সা রোজগার করে। বিশেষ করে নাকি তোমার মত যে-সব উকিল, ব্যারিষ্টার পশার জমাতে পারে না, তারাই নাকি বাংলা লেখা জমায় ভাল—বেশ রোজগার করে। তা তুমি যা লিখছ তাই বা মিছে যায় কেন? দাশুবাবুর জন্যে যেটা লিখছ তার একটা দাম চেয়ে নিও।

গি। (উদাস ভাবে) তা আমি চেয়েছিলাম। কিন্তু ভরসা কিছুই দেয় না। দেখা যাক। সেখানেও ঐ

একই কথা। আগে কিছুকাল মক্কেলের হাতে-পায়ে ধরা, আখেরে মক্কেলই যেমন পায়ে এসে পড়ে মায় টাকার ভেট শুদ্ধ, এ সাহিত্য বাজারেও তেমনি, এখন প্রকাশক-সম্পাদকদের খোসামোদ কর, পরে ওরাই হত্যা দেবে এসে তোমার দোরে।

শি। এখানে যখন দেখছি দাশুবাবু হত্যাই খানিকটা দিয়েছেন তোমার দোরে, তখন তোমার সাহিত্য-সূর্য উঠল বলে। ভাবনা কি?

গি। তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। কিন্তু ভোর ত হয়ে গেল। বাড়ীঅলা আবার এল বলে। ভোরেই আসবে বলে গেছে। এখন উপায়? (স্বগত) নাঃ, আমার প্ল্যানটা একেবারে ভেস্তে গেল!

শি। (আঁচলের গাঁট খুলে দু'খানি একশ' টাকার নোট বার করে) উপায়, এই নাও। এর একখানা দাও বাড়ীঅলাকে। আর একখানায় আমাদের পুজোর বাজার হবে। গয়না কিছু দাদাকে দিয়ে বাঁধা রাখিয়ে এনেছি এই টাকা।

[গিরীশ উৎফুল্ল হয়ে গান ধরল।]

গি। (গান) একটি বলি তবে বাঁচালে মাগো।
সন্তানেরে বাঁচাইতে তুমি সদা জাগো।
নমো দুর্গতিনাশিনী
নমো মহিষমর্দিনী।

[গানের কথা শুনে শিবানীর বিস্মিত ভাব। তা দেখে গিরীশ প্রদর্শন করে রশি ও কড়িকাঠের ব্যবস্থা। শিবানী বিস্মিততর এবং পরক্ষণেই গালে হস্ত প্রদান ও স্তব্ধ।]

(নেপথ্যে বাড়ীঅলার হাঁক।)

বাড়ীঅলা। গিরিধরবাবু আছেন?

শি। ঐ নাও! ভোর হতেই তর সইল না।

গি। এই যাচ্ছি, বসুন।

১০ম দৃশ্য

নীচের ঘর

[বাড়ীঅলা আসীন, গিরীশের প্রবেশ।]

গি। এই নিন। যখন কথা দিয়েছি, তখন আর কি নড়চড় হতে দেব? [একশ' টাকার নোট প্রদান।]

বা। হাঃ হাঃ, তা ত জানিই গিরিধরবাবু। আপনি একটি ভদ্রলোক, সে কি জানি না? এই নিন দু'মাসের রসিদ একেবারে সঙ্গেই এনেছি। আচ্ছা নমস্কার, উঠি তবে, অনেক জায়গায় যেতে হবে।

গি। নমস্কার। কিন্তু শুনুন।

বা। বলুন।

গি। আমার নামটা গিরিধর না, গিরীশ। এ রসিদে দেখছি ঠিকই লেখা আছে। কিন্তু গিরিধর বলে ডাকেন কেন বলুন ত?

বা। ও, মাপ করবেন। টাকা টাকা ক'রে মাথার ঠিক নেই।

গি। এইবার মাথা ঠিক হ'ল ত?

বা। হ্যাঁ নিশ্চয় নিশ্চয়, যা বলেছেন।

[বাড়ীঅলার প্রস্থান।]

১১শ দৃশ্য

[সদর রাস্তা, বাড়ীঅলার গমন।]

বা। (স্বগত) আজ দেখছি সুপ্রভাত। যখন সকাল সকাল পেয়েই গেলাম তখন অমনি জগু ঠিকেদারকে দিয়েই যাই টাকাটা। এই গিরিধরের টাকার ভরসা করেই তাকে আশা দিয়েছিলাম। নইলে ঘরের টাকা থেকে কে কবে দেনার টাকা শোধ করে? হাতের টাকা তো সব অন্য সাত-পাঁচ ভাবে বাজেট হয়ে থাকে আগে থাকতেই। এই যে ঠিকাদারের বাড়ী এসে গেল।

[ঠিকাদারের বাড়ীর সামনে]

বা। ওহে জগন্নাথ, আছ নাকি বাড়ী?

জ। আছি, আসুন আসুন।

বা। দেখছ ত? বাড়ী চড়াও ক'রে পাওনার তাগাদাই লোকে করে, কিন্তু বাড়া বয়ে সাত সকালে দেনার টাকা দিতে আসি, সে আমিই। এই নাও তোমার টাকা। [নোট প্রদান।]

জ। হাঃ হাঃ! তা ত জানিই বাবু। আপনি একজন মানুষের মত লোক, তা আমি বিলক্ষণ জানি।

বা। যাই এইবার গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসিগে। তুমি আবার আমার একটু সুখ্যাত ক'রে অহমিকার পাপ বাড়ালে। সেটুকুও ধুয়ে ফেলতে হবে পুণ্যস্নানে।

[বাড়ীঅলার প্রস্থান।]

জ। এ টাকা আর ঘরে তুলব না, একেবারে নটবরকে দিয়ে আসি গে। গিন্নী সন্ধান পেলে চিলের মত—

১২শ দৃশ্য

[নটবরের দোকান। নটবর আসীন। জগুর প্রবেশ।]

জ। এই যে, নটবর, তামাক টেনেই চলেছ দেখছি। সকাল থেকে ক' ছিলিম হ'ল? হাত বাড়ালেই পাশের মুদি বন্ধুর কাছ থেকে তামাক, টিকে সবই পাও, পয়সা ত লাগে না। ভাবনা কি?

ন। এই যে ঠিকেদারবাবু! বসুন, বসুন। ওরে তিনু ওর নাম কি, বাবুদের হুঁকোটা দিয়ে যা। আর এক ছিলিম তামাক ভাল ক'রে সেজে দে ত। এটা ত পুড়ে ভস্মি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ঠিকেদারবাবু, ওর নাম কি— তামাকটা একটু বেশীই চলে আমার। এই আপনাদের মত পাঁচজনের পদধূলি পড়ে ত? সে আমার সৌভাগ্যি। তবে পয়সা লাগে না যে বললেন না? ঐটে হ'ল ভুল। পয়সা যথেষ্টই লাগে। ধারে পাই বটে সব, আর সে-ই ত আরও সব্বনেশে ব্যবস্থা। কাল বলছিল বলাই— এক শ'র উপর পাওনা। শুধুই ত তামাক, টিকে না, চাল, ডাল, তেল, ঘি যাবতীয় রসদ। তাও মানে মানে সব দিতে পারি না, জমে যায়। পুজোর বাজার বলে তাগাদা সুরু করেছে। আমিও ঠিক ক'রে রেখেছি আপনার কাছ থেকে টাকাটা পেলেই শোধ ক'রে দেব। নইলে, ঘরের টাকা ভেঙ্গে দেনা শোধ ত কোন কাজের কথা নয়। কি বলেন?

জ। হ্যাঁ, তা ঠিক। যখন এমনতর সাধু ইচ্ছা তুমি মনে পোষণ করছ, তখন এই নাও তোমার একশ' টাকা। [নোট প্রদান।]

ন। হাঃ হাঃ, আজ কি সুপ্রভাত! বেরথাই ছিলিমের পর ছিলিম পোড়াই নি। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধিদাতার চরণে প্রার্থনা নিবেদনও করতেছিলেম ভোর থেকেই। তবেই না আপনাকে ছুট্যে আসতে হয়্যাছে আমার নেকট। দাঁড়ান আপনার সুমুখেই অমনি বলাইর দেনাটা শুধে দি।

[পাশের দিকে মুখ বাড়িয়ে]

বলি, বলাই ভায়া আছ? [বলাইর মস্তক প্রকাশন।] এই যে, এই দেখ, হাত বাড়ালেই যেমন জিনিষ পেয়েছি, তেমনি হাত বাড়িয়েই টাকাটাও দিচ্ছি। এই নাও। (নোট প্রদান।)

বলাই। নটুদা আমার মহৎ ব্যক্তি, জানেন ঠিকেদার বাবু।

ন। আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকেদারবাবুই আগে মহৎ ব্যক্তি। বাড়ী বয়ে আমায় দিলেন ঐ টাকা, তবে না তুমি, ভায়া পেলে।

ব। সে ত আমি আগে থেকেই সব পাকা কথা কয়ে রেখেছি। সময়ে সময়ে সবাই মহৎ আর সময় সময়, বুঝলেন না কথাটা?

ন। যা যা, আর বকিস্ নি। ঐ শোন্ মহালয়ার ঢাক বাজতে লেগেছে। বাজে কথা এখন রাখ্।

ব। সেই কথাই ত বলছি। মচ্ছবের মহা লগ্নেই মানব হয় দেবতা। কথাটা বুঝলা না? আচ্ছা নটুদা, তুমি আছ ত? আমার দোকান পানে একটু নজর রেখ। আর তিনুকেও একটু দেখতে বল। আমার ঝাঁপ খোলাই রইল। দাশুবাবুর টাকাটা এই বেলাই শোধ ক'রে দি'গে। এ নোট ভাঙালেই হুস্ ক'রে উবে যাবে। দেনা শোধটা আগে। বুঝলা না কথাটা? ভদ্রলোক বার বার তাগাদা কর্যা গেছেন।

১৩শ দৃশ্য

গিরীশের গৃহ।

দাশু। আছেন নাকি গিরীশবাবু?

গি। আছি, আসুন আসুন দাশুবাবু।

[উভয়ের আসন গ্রহণ]

দা। শেষ হ'ল লেখাটা, মশাই?

গি। হ্যাঁ, মশাই, কাল সারা রাত জেগে শেষ করেছি শেষ রাতে শেষটায়। এই নিন।

[পাণ্ডুলিপি প্রদান। দাশু পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে পড়তে থাকে কিছুক্ষণ। প্রথম থেকে পাতাগুলো আল্গাভাবে চোখ বুলিয়ে গিয়ে শেষের দিকে চোখ একেবারে নিবিষ্ট হয়ে পড়ে। মুখ-চোখ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।]

দা। বাঃ! এ বড় চমৎকার ত! এই যে ছেলেটির আত্মহত্যার পূর্ব মুহূর্তের মনোভাব বর্ণন, এ একেবারে বিস্ময়কর! পড়তে পড়তে মনে হচ্ছে যেন আমিই যাচ্ছি করতে আত্মহত্যা! এ তাজ্জব বর্ণনা আপনি লিখলেন কি ক'রে গিরীশবাবু? আচ্ছা, এই নিন লেখাটার জন্যে আপাততঃ একশ' টাকা। পরে ছাপার পর বই হয়ে বাজারে বিক্রী হতে থাকলেই দফে দফে আপনি শ' পাঁচেক ত পাবেনই। বেশীও হতে পারে। সে, বিক্রীর মুরসুম বুঝে। আচ্ছা, এখন উঠি, নমস্কার।

গি। নমস্কার। [দাশুর প্রস্থান ও শিবানীর প্রবেশ।]

শি। দেখি দেখি! আজ কার মুখ দেখে উঠলাম?

গি। আমারই মুখ দেখে, আবার কার মুখ?

[সহাস্যে নোটখানি প্রদান।]

শি। [নোট হাতে নিয়ে একটু নিরীক্ষণের পর] এ কি! এ ত দেখছি আমারই সেই নোট!

গি। তোমার কোন্ নোট ?

শি। আরে যে দুটো নোট একটু আগে তোমায় এনে দিলুম, তারই একখানা বাড়ীঅলাকে যে দিলে, সেই নোট গো।

গি। কি ক'রে বুঝলে সেই নোট ?

শি। এই ত সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের মোহর মারা, আর এই ত সেই নম্বর একেবারে। এই দেখ, দু'ঘণ্টার মধ্যেই ঘরের টাকা ঘরে ফিরে এল। যাই, এই দিয়েই আমিও আমার ঘরের গয়না খানিকটা ত ঘরে ফিরিয়ে আনি।

[শিবানীর প্রস্থান।]

গি। তা হ'লে, এবার পুজোয় একটা বলি নেহাৎই বেঁচে গেল। সমাপ্ত

ট্রেন ফেল

শ্রীমিহির সিংহ

রায়সাহেব আর. এল. মিত্র যখন তাঁর মস্ত শরীরটাকে টেনে এনে প্ল্যাটফর্মে পৌঁছলেন তখন শ্যাওড়াফুলি লোক্যালের শেষ কামরাটি সিগন্যালের আলোটাকে অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে। রতনলালবাবু এ লাইনের নিয়মিত যাত্রী। তাঁর নিজের হাতে গড়ে-তোলা ব্যবসাটার হেড অফিস ক্যানিং স্ট্রীটে হলেও তার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে আছে হাওড়া, হুগলীর ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে। এদিকে বাগনান পর্য্যন্ত আর ওদিকে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত তাঁকে প্রতি সপ্তাহেই একবার-দু'বার যেতে হয়, মান্থ্লি টিকিট করাই থাকে।

আগে যখন রায়সাহেব হন নি, ভবানীপুরের বাড়ীটা একরকম বন্ধকই রেখে অসীম সাহসে ব্যবসায় নেমেছেন। তখন চড়তেন থার্ডক্লাসে, আর যেতেনও অনেক ঘন ঘন। কিন্তু সে সব অধ্যায় বিশ-ত্রিশ বছরেরও বেশী পুরণো হয়ে গেছে। ইংরেজ আমলের শেষের দিকে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড আর কালেক্টরেটের কর্ত্তাদের সঙ্গে মিলে-মিশে চলতে শিখেছেন। পয়সা করেছেন দু' হাতে—মানও বেড়েছে। যুদ্ধের সময়ে সমস্ত কাজ-কর্ম্মেরই গতি এত দ্রুত হয়ে উঠেছিল যে, একটা জিপই কিনে ফেলেছিলেন, অনিশ্চিত ট্রেনের উপরে নির্ভরশীলতা ত্যাগ করবার জন্যে। জিপটা আজ বুড়ো হয়ে এসেছে, যেমন হয়ে গেছেন তিনি নিজে।

জামাই বাগনানের লোক, সে-ই দেখাশোনা করে ওদিক্কার কাজকর্ম, ত. ছাড়াও তার অনেক কিছু ঘোরা-ঘুরির ব্যাপার আছে—কংগ্রেসের কাজে, সমাজসেবার কাজে। জিপটা সে-ই রেখে দিয়েছে। রতনলালবাবুর নতুন এ্যাম্বাসাডর পারত পক্ষে কলকাতা ছেড়ে বেরোয় না। হিসেবী মানুষ তিনি, অনেক খতিয়ে দেখেছেন, ট্রেনে যাওয়া অনেক আরামপ্রদও বটে, খরচও তাতে কম। তবে এখন আর ফার্ষ্টক্লাসে না গেলে চলে না। শরীরটা আগের মতন কষ্টসহিষ্ণু নেই, দিন দিনই বেজুত হয়ে পড়ছে।

ষ্টেশনে ঢুকেই মিত্র মহাশয় বুঝতে পেরেছিলেন এ ট্রেনটা ধরা সম্ভব নয়। গাড়ীটা যখন ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে একটা ট্র্যাফিক জ্যামের মধ্যে পড়ল তখনও তিনি একটু একটু দুরাশা করছিলেন যে, ট্রেনটা যদি দু-চার মিনিট লেট করে ছাড়ে তা হ'লে হয়ত ধরাও যেতে পারে। কিন্তু মানুষের ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার কথা ভেবে ত সব দুনিয়াটা চলে না! মিত্রসাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে গিয়ে হঠাৎ সচেতন হলেন যে, তিনি প্রচুর হাঁপাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, দেখলেন শরীরটা ঘামে ভয়ানক ভিজে উঠেছে। ধুতি, পাঞ্জাবী লেপ্টে গায়ে লেগে গিয়েছে। সমস্ত মনটাই কেমন যেন অস্বস্তিতে ভ'রে উঠল। হাত-ঘড়িটা, সেঁটে-যাওয়া আস্তিন টেনে সরিয়ে বার করে দেখলেন প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে পরের ট্রেনটার জন্যে।

মে মাসের প্রচণ্ড গরম। প্ল্যাটফর্ম্মের ছাদ থেকে সুরু করে বেঞ্চিগুলো পর্য্যন্ত তেতে ঝাঁ ঝাঁ করছে। লাইনের দিকে ত তাকানো যায় না—হাওয়ার স্রোত উত্তাপের হল্কায় হিল্‌হিল্ করে কাঁপছে। রতনলালবাবুর মাথার মধ্যেটা যেন কেমন করে উঠল। একবার ভাবলেন ফিরে যাই বাড়ীতে, কাল যাওয়া যাবে শ্যাওড়াফুলি।

কিন্তু অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ মন। ম্যানেজার রায়মশয় অপেক্ষা করে থাকবে, আর বড়বাবু আসবেন না তা হতেই পারে না। রতনলালবাবু পা বাড়ালেন ষ্টেশনের ভিতর দিকে। চল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিট সময় কাটানোর জন্যে।

সবই ইলেক্‌ট্রিক ট্রেন। ধোঁয়া নেই, ধুলো নেই, নানারকমের শব্দ নেই। ঝাঁকুনি ত নেই-ই। মিত্র মহাশয় একটা মস্তবড় নিঃশ্বাস ফেলে খালি কামরাটার প্রশস্ত আসনের উপরে বসে পড়লেন। ট্রেন প্রায় তখনই অতিকায় সাপের মতন সঙ্কেত ধ্বনি করে ছেড়ে দিল।

ইলেক্‌ট্রিক মোটরের ব্যাপার, ষ্টীম বা কয়লার কারবার নেই। বিনা আয়াসে দু-চার সেকেণ্ডের মধ্যেই গতি অত্যন্ত দ্রুত হয়ে ওঠে। রতনলালবাবু একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বসলেন। কিন্তু শরীরটা যেন কেমন আনচান করতে লাগল। কোকাকোলা পছন্দ করেন না মোটেই—ঠাণ্ডা বলে তবু খেয়েছেন দুটো। একবার মনে হ'ল তাতে একটু আরাম পেলেন কিন্তু তাও কেটে গেল একটুক্ষণের মধ্যেই। গরমটা শুধু প্রচণ্ডই নয়—অপার্থিব গোছের। মস্তবড় কাঁচের জানলাটার ধার দিয়ে রোদে ঝলসানো যে গ্রামগুলো চলে যাচ্ছে—আধ মিনিট, এক মিনিটের জন্যে যে ইট আর সিমেণ্টের ষ্টেশনগুলো থমকে থাকছে, তারা যে তাঁর ত্রিশ বছরের পরিচিত, আজ তাঁর তা মনে হচ্ছে না। সূর্য্যের এ সর্বধ্বংসী রূপ তিনি কখনও দেখেন নি। ইলেক্‌ট্রিক ট্রেনের প্রচণ্ড গতিও তার নাগালের বাইরে তাঁকে নিয়ে যেতে পারল না।

শ্যাওড়াফুলি ষ্টেশনের কাছে পৌঁছে ট্রেনটা মিনিট কতক দাঁড়িয়ে রইল কোনও একটা না-জানা কারণে। মিত্র মহাশয়ের আরও অসহ্য লাগতে লাগল। এতক্ষণ তিনি একেবারে ধুঁকছিলেন রৌদ্রের প্রবল অত্যাচারের তলায়। এমন কি, কপাল থেকে ঘাম সরানোর কিংবা ঘামে ভিজে লেপ্টে-যাওয়া ধুতি বা পাঞ্জাবীটাকে গায়ের থেকে তফাৎ করার চেষ্টাও ছেড়ে দিয়েছিলেন। এখন নেহাৎ অভ্যাসের বশেই উঠে ব'সে একটু ঠিকঠাক করবার চেষ্টা করছিলেন নিজেকে। শ্যাওড়াফুলি এসে গেছে, ষ্টেশনেই রিকশ পাওয়া যাবে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছানো যাবে অফিসে। কিন্তু কি জ্বালাতন—এখানে আবার দাঁড় করিয়ে রাখবে নাকি একঘণ্টা?

রোদের ঝাঁঝটা আরও ঘনিয়ে এল তেতে-ওঠা লাইনের খোয়া আর লাইনের পাশে-দাঁড়ানো দরিদ্র বাড়ীগুলির দেওয়াল থেকে। মিত্র মহাশয়ের নজরে পড়ল তাঁর জানলার ঠিক সামনের বাড়ীটার দিকে। বাড়ী বললে তাকে হয়ত বেশী সম্মানই দেওয়া হয়। একটাই বোধ হয় ঘর। টালির ছাদ। সামনে আধটাক উঠোন মত একটু জায়গা। একটা টিউবওয়েল একদিকে, আর একদিকে একটা তুলসী গাছের বেদী। প্রচণ্ড রোদের নিষ্ঠুরতায় তুলসীর কঠিন প্রাণও মুহ্যমান। সমস্ত প্রকৃতির কাছে বাড়ীটা এতই নগ্নভাবে আত্মসমর্পণ করেছে যে, মিত্র মহাশয়ের অন্তরাত্মা শিউরে উঠল। আর তার চাইতেও একটি শীর্ণ মা জীর্ণ কাপড় সাম্‌লে টিউবওয়েলের হাতল ধ'রে অপ্রচুর জলভিক্ষা করছেন রুদ্র প্রকৃতির কাছ থেকে। আর ঘরের সামনে সংক্ষিপ্ত ছায়াটুকুর মধ্যে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে আছে দু'টি শিশু। শিশুদু'টি হয়ত মা'র চাইতেও শীর্ণতর। কিন্তু বাল্যের সেই সুকুমার গোলগাল ভাবটি তাদের শরীর থেকে বিদায় নিলেও বিসদৃশভাবে রয়ে গেছে তাদের গণ্ডদু'টিতে। সব মিলিয়ে দৃশ্যটি বাংলা দেশের পক্ষে ভয়ানক কিছু নতুন নয়। কিন্তু আজকে প্রৌঢ় রতনলালবাবুর মনে কেন যেন বড্ড নিষ্ঠুর আঘাত হান্‌ল।

আর একটা শঙ্খধ্বনি ক'রে ট্রেন ছাড়ল। ষ্টেশনের প্রায় গায়েই দাঁড়িয়ে ছিল। মিনিটখানেকের মধ্যেই মিত্র মহাশয়ের পরিচিত চেহারাটি দেখা গেল সাইকেল রিক্‌শর উপরে বড় রাস্তায়। দারুণ অগ্নিবাণ বর্ষিত হচ্ছে সূর্য্যদেবের জ্বলন্ত তূণ থেকে। কিন্তু মিত্র মহাশয়ের চেতনায় সেটা আর ছাপ ফেলতে পারল না। তাঁর কানে বাজতে লাগল ট্রেন থামার নিস্তব্ধতার মধ্যে ভেসে-আসা টিউবওয়েলের ঘ্যাচাং ঘ্যাচাং শব্দটি। রতনলালবাবু বিচক্ষণ ব্যবসায়ী। মানুষকে তিনি সাধারণভাবে অবিশ্বাস করেন না কিংবা অপছন্দও করেন না, তবে মানুষের সঙ্গে পয়সা-কড়ি ছাড়া আর কোনও রকমের সম্পর্ক সহজে করতে চান না। এটা তাঁর অজানা নয় যে, তাঁর মতন ভাগ্যবান্‌ সবাই নয়—পৃথিবীতে দুঃখী মানুষের সংখ্যাই বেশী। কিন্তু অকারণ করুণার ভাবালুতা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ! মানুষকে তিনি ঠকাতেও ভালবাসেন না আবার কেউ তাঁর কাছে অমনিতে কিছু পায়ও না। অথচ আজকে প্রকৃতির নির্মমতার সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ কেমন অনভ্যস্ত ভাবে আত্মীয়তা অনুভব করলেন জীবনের কাছে মার-খাওয়া দুঃখী মানুষের সঙ্গে।

মিত্র সাহেব ক্ষিপ্র সিদ্ধান্তে আসার মানুষ। রিক্‌শওয়ালাকে বললেন, বাঁদিকের গলিতে ঢোক। সে পুরণো লোক। অনেক সময়েই নিয়ে যায় রায় সাহেবকে। বুঝতে পারল না, কোথায় যেতে চান তিনি। মিত্র

মহাশয় বললেন, তুমি চল আমি বলছি। গলিটা এঁকে-বেঁকে শেষ হয়েছে রেললাইনের ধারে। তার পরে একটা লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে চলে গেছে ওপারে। লাইনের কিনারায় গিয়ে মিত্র মহাশয় বললেন, এখানে রাখ। পাশের একটি কবিরাজের সাইনবোর্ড লাগান ঘর থেকে একজন বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসুভাবে তাকাতে, রায় সাহেব বললেন, এই বাড়ীটাতে কে থাকে জান? ভিতর থেকে তখনও ভেসে আসছে টিউবওয়েলের শব্দ। ভদ্রলোকটি একটু হাত কচলানোর ভঙ্গি ক'রে বললেন, রবি ত এখন বাড়ী নেই—ও গেছে দোকানে। ওর স্ত্রী আছে—ডেকে দেব? রতনলালবাবু খুব ক্লান্ত বোধ করছিলেন। বললেন, তার দরকার নেই কিন্তু পুরো নামটি জানতে চাই। ভদ্রলোকটি বললেন, রবি সরকার, মালতী স্টোর্সে কাজ করে। মালতী স্টোর্সটা ত আপনি চেনেন? সিনেমা হাউসের গায়ে? মিত্র মহাশয় জবাব প্রায় একরকম না দিয়েই ফিরতে বললেন রিক্‌শওয়ালাকে। তাঁর সমস্ত মাথা তখন ঝিম্‌ ঝিম্‌ করছে। মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে খশখশের পর্দার পিছনে আশ্রয় নিতে।

যখন ম্যানেজার রামসদয়বাবুকে ব্যস্ত ক'রে তিনি উপস্থিত হলেন অফিসে তখন ঘড়িতে প্রায় তিনটে বেজেছে। তার ঘণ্টা তিনেক বাদে শ্যাওড়াফুলিতেই মারা গেলেন রায় সাহেব আর. এল. মিত্র—মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে।

এই দিনটির পরে সাতটা-আটটা মাস কেটে গিয়েছে। গরমের যুগ অনেকদিন ফুরিয়েছে—বর্ষা শরৎও কেটে গেছে—হেমন্ত পেরিয়ে এখন এসেছে শীতের সময়, সবাই বলাবলি করছে, এরকম ঠাণ্ডা অনেক বছর ধ'রে পড়ে নি। বাংলা দেশের আর সব জায়গার মতন শ্যাওড়াফুলিতেও এসেছে শীত। আততায়ীর ছোরার মতন কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া, লেপ-কম্বল গরম কাপড়ের মধ্যে ফাঁক খুঁজে বেড়াচ্ছে, যে পথে ঢুকে হাড় পর্য্যন্ত বিঁধিয়ে দেওয়া যায় বরফের ধারে। তার উপরে সকাল থেকে সুরু হয়েছে ঝিরঝিরে বৃষ্টি।

গলিটার মোড়ে একটা জিপ এসে থামল। তার পরে একটু ইতস্তত: ক'রে সেটা প্যাচ্‌পেচে কাদার উপর দিয়ে গোঁ গোঁ করতে করতে এগিয়ে এল ভিতর দিকে। দু'পাশে বস্তিগোছের বাড়ীগুলোর থেকে অনেক কৌতূহলী মুখ উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল, ব্যাপারটি কি বুঝবার জন্যে। কবিরাজী দোকানটার কাছে এসে জিপটা থামল। একজন সোলার টুপী মাথায় ভদ্রলোক বর্ষাতিটা ভাল ক'রে বেঁধে নেওয়ার জোগাড় করতে করতে পিছন থেকে একটি সপ্রতিভ চেহারা টপাস ক'রে নেমে পড়ল। কবিরাজী দোকানটার থেকে একজন ভদ্রলোক কাশির ধমক সামলাতে সামলাতে বেরিয়ে আসছিলেন—তাকে জিজ্ঞাসা করল, রবি সরকারের বাড়ী কোন্‌টা? পাশের থেকে একটি শীর্ণকায় শিশু কাদামাখা পায়ে দৌড়ে বাড়ীটার ভিতরে গিয়ে চেঁচাতে লাগল, মা মা, দেখ পুলিসের গাড়ী এসেছে—বাবার নাম বলছে। বাড়ীর মধ্যে থেকে বোধ হয় তার মা-ই বেরিয়ে এলেন—কোলে আর একটি শিশু, স্পষ্টভাবেই অসুস্থ, গায়ে কাঁথা জড়ান। জিজ্ঞাসা করলেন, কাকে চাই? ততক্ষণে জিপের থেকে ভদ্রলোকটি নেমে পড়েছেন। তিনি বললেন, আপনার স্বামীর নাম কি রবি সরকার? পাশের থেকে কবিরাজ মহাশয় বললেন, হ্যাঁ, আপনাদের প্রয়োজনটা কি? ভদ্রলোকটি বললেন, আপনাদের বাড়ীটা একটু দেখতে চাই। আমাদের কোম্পানীতে একটা অর্ডার আছে, আপনাদের উঠোনে একটা ডীপ টিউবওয়েল লাগিয়ে দিতে হবে—ইলেক্‌ট্রিক পাম্প্‌ সমেত। রবি সরকারের স্ত্রী বিহ্বল ভাবে বললেন, কিন্তু আমাদের উঠোন—মানে আমাদের বাড়ী ত ডিক্রী ক'রে নিয়ে নিয়েছে—আমাদের ত একদিন-দু'দিনের মধ্যেই চ'লে যেতে হবে এখান থেকে। ভদ্রলোক অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। বললেন, তা হ'লে ত মুশকিল হ'ল, আচ্ছা আপনাকে পরে জানাব। কবিরাজ মহাশয়ও একটু হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন, এবার বললেন, ওরা বড় দুঃখী স্যা'র, ওদের কিছু টাকা দিয়ে দিতে পারেন না? ভদ্রলোক জিপে উঠতে উঠতে বললেন, না, আমাদের সেরকম অর্ডার ত নেই।

জিপটা পা টিপে টিপে গলিটা থেকে বেরিয়ে গেল। বৃষ্টিটা ঝিরঝির ক'রে কাদার উপরে পড়তে লাগল। দুপুর বেলাতেই মনে হ'ল সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে। হতভাগ্য রবি সরকারের স্ত্রী হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন, অদৃষ্টের এ কি নির্মম পরিহাস তাঁদের সঙ্গে! কে চাইল তাঁদের এই উপকার করতে - আর যদি এত টাকাই খরচ করতে চাইবে ত সেই টাকাটাই কেন দিতে পারল না তাঁদের হাতে তুলে?

রায়সাহেব আর. এল. মিত্রের নিয়মনিষ্ঠ হিসেবী আত্মা বোধ হয় জানতে পারল না যে, তাঁর করুণাও ফেল করল সময়ের ট্রেনটা।

নার্স

শ্রীকৃষ্ণধন দে

ধীরা, তুই এ-বেডের মেয়েটাকে দেখেছিস্ ?
টানাটানা চোখ, আর ফুলো-ফুলো গাল ?
বছর সাতেক হবে, রোগাটে গড়ন,
সবে ওর জীবনের রঙিন্ সকাল !
প্রথম যেদিন এল, সারাদিন তার
কার তরে কান্নার নাই যে সীমা !
সঙ্গে ত এসেছেন হাসিমুখে বাপ,
কি সুন্দর শাড়ী প'রে রূপবতী মা।
মেয়েটা তবুও যেন খুঁজেছে কাকে,
দেখেছি, সবার পানে চেয়েই থাকে !

পুতুল দিয়েছে কাছে, দিয়েছে খাবার,
বাপ শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেন ওকে,
বলেছেন মা—"থাক লক্ষীটি এবার,"—
মেয়েটা শুধুই চায় সজলচোখে।
ঁরা ত গেলেন চ'লে, শুয়ে বিছানায়
মেয়েটা ফুঁপিয়ে কাঁদে সারাটা বেলা ;
আমি এসে বলি,—"খুকু, কেঁদ নাকো আর,
তোমায় আমায় হবে পুতুল খেলা।
নাম কি তোমার বল ?"—শেষে শুনিনু,
কাঁপা কাঁপা স্বর তার—"আমি যে বিনু"।

ধীরা, তুই জানিস্ না কি যে ব্যথা ওর,
হঠাৎ পেয়েছি টের দুপুরে সবি,
ফ্রকের ভিতরে তার বুকের কাছে,
কাঁচি দিয়ে কাটা ফটো, নারীর ছবি।
শুধানু—"বল না বিনু, ইনি কে তোমার ?"
চমকি উঠিল বিনু ব্যাকুল মনে,
ছোট হাতদু'টি দিয়ে ধরে মোর হাত,
কেড়ে যেন নিতে চায় পরমধনে।
দেখিনু সজলচোখে মিনতি ঝরে,
ছবিটি ফিরায়ে দিনু তাহারি করে।

বিকালে এলেন বাপ, সেজেগুজে মা,
বিনুর কাছেতে মা'র মামুলি কথা,
"কি কি খেতে সাধ যায় ? চাই কি পুতুল ?
কী ছবির বই ?"—যেন কত মমতা।
বিনু শুধু চুপ ক'রে ভাবে কত কী,
মা শেষে বলেন রেগে—"দুষ্টুমি ছাড়ো,
একগুঁয়েমিতে শুধু জালিয়েছ হাড়,
এখানেই থাক তুমি, যতদিন পার।
—এ মেয়েকে নিয়ে শুধু বাড়ে জঞ্জাল,"
মা গেলেন চ'লে, তেত হ'ল যে বিকাল।

ধীরা, তুই জানিস্ না, দেখেছি যে আমি,
মাঝরাতে চুপি চুপি ছবি নিয়ে তার,
কত অফুরান্ কথা, কত অভিমান,
জ্বরের বিঘোরে সুর চাপা কান্নার।
ডাক্তার সেন শুধু মোরে বলেছেন—
এ মেয়ের স্পাইনটা পোরাস্, শিথিল,
ক'দিন যে বাঁচে তার কিছু ঠিক নেই,
নার্ভগুলো সাড়াহীন, স্পঞ্জী, জটিল।
বাঁচতেও পারে যদি ভাল থাকে মন,
মনে যদি শক্ লাগে তবে ত মরণ !

আসেন নি দুটো দিন ওর বাপ মা,
এলেন তৃতীয় দিনে পুতুল কিনে,
মা এসে বলেন,—"বিনু, ছিল যে পার্টি,
নতুন ভায়ের তব জন্মদিনে।
এবার বিনুর মুখে ফুটল আলো,
"আমাকে খুঁজেছে খোকা ?"—বলল হেসে ;
মা বলেন "প্রথমটা কেঁদেছিল খুব,
সামলায় ওর মামী, দিদিমা এসে।"
—"একবার এনো তাকে," বিনু বলে ধীরে,
"এ নরকে !" রাগ ক'রে মা যান ফিরে।

হঠাৎ সেদিন, শোন্, কি হ'ল ব্যাপার,
কি যেন দেখতে পেয়ে মা রেগে বলেন—
"কার ছবি ওটা বিনু ? দাও হাতে দাও,"
এই ব'লে জোর করে ছবিটা নিলেন।

বিহু শুধু কেঁদে ওঠে, বলে, "দোব না,
ফিরে দাও ও ছবিটা, পায়ে পড়ি দাও!"
ছবি দেখে মা'র মুখ হ'ল যে কালো,
কুচি কুচি ক'রে তিনি দেন ছবিটাও!
বিহুর চোখে যে শুধু অশ্রু ঝরে,
লুটায়ে পড়িল বিহু শয্যা 'পরে।

ধীরা, তুই জানিস্ না, রাত তিনটেয়
এলেন আমার ডাকে ডাক্তার সেন,
বিকারের ঘোরে বিহু ছবি ফিরে চায়,
নাড়ী দেখে ডাক্তার চোখ মুছলেন।
হঠাৎ আমার হাত ধরে সে চেপে,
অস্ফুট স্বরে বলে,—"এলে তুমি মা?"
আমি কানে কানে বলি "এসেছি বিহু"—
শেষ হাসি, কি পুলক, নাই যে সীমা।
—তারপর ধীরে ধীরে জীবনের আলো
ঠিক ভোর পাঁচটায় কোথা মিলাল!

ধীরা, তুই জানিস ত আমাদের মন,
নিথর, অনড়, শুধু কাজ ক'রে যাই;
দেখেছি মরণ কত, কত যে জীবন,
কান্নাহাসির খেলা খেলি যে সদাই।
আবার সে-বেডে এল আর একজন,
সেও চ'লে যাবে, কেউ আসবে আবার,
তবু কী যে সুখ পায় অপরাধী মন
একটি শিশুর কাছে "মা" হয়ে থাকার!
চির অভিশাপ মাঝে ক্ষণ আশীর্ব্বাদ,
অনন্ত রাত্রির এ যে জোনাকির সাধ!

সাঁওতাল বিদ্রোহ ও পাকুড় অঞ্চল

শ্রীকালীপদ ঘটক

সাঁওতাল বিদ্রোহের পটভূমি বহু পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়াছিল। আসল বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন তারিখে। পাঁচকোঠিয়ার রাক্ষসী থানে দারোগা মহেশলাল দত্ত ও তাঁহার অনুচরগণকে হত্যা করার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহের ভয়াবহতা প্রবল আকারে আত্মপ্রকাশ করে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দামিন-ই-কোর চতুষ্পার্শ্বে ছড়াইয়া পড়ে।

জুলাই মাসের প্রথম দিকে গোড্ডা, পাকুড়, মহেশপুর, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে লুণ্ঠনাদি চলিতে থাকে, এবং বহুদিন যাবৎ বিদ্রোহীদের দমন করা কোন মতেই সম্ভবপর হয় নাই। গোড্ডা অঞ্চলে প্রায় বিশ হাজার বিদ্রোহী সাঁওতাল দলবদ্ধ হইয়া সমগ্র অঞ্চল ব্যাপিয়া অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল। অম্বর পরগণায় লক্ষণপুরের সিংরায় সাঁওতাল নামক জনৈক বিদ্রোহী গচো মাঝির সহিত মিলিত হইয়া উক্ত অঞ্চলে লুঠতরাজ আরম্ভ করে এবং লিটিপাড়ার ঈশরী ভকৎ ও তিলক ভকৎ নামক দুইজন শঠ ও ধনী মহাজনের দোকান-পাট লুঠ করিয়া তাহাদের আত্মগোপ... গোমস্তা খুতা ভকৎকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করে। ঈশরী ও তিলক পূর্ব্বাহ্ণে সংবাদ পাইয়া প্রাণভয়ে ভীত হইয়া গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। সেই কারণে এ যাত্রা তাহাদের কোন রকমে জীবন রক্ষা পায়। উক্ত গ্রামের অপর কয়েকজন ময়রা ও ব্যবসায়ী সাঁওতালদের ভয়ে মহুল গাছের কোটরে গিয়া লুকাইয়া থাকে, সাঁওতালেরা দিকু গুপ্তচরদের মুখে সংবাদ পাইয়া তাহাদের প্রত্যেককে কোটর হইতে বাহির করিয়া একে একে হত্যা করে।

সাঁওতাল বিদ্রোহকালীন দামিন-ই-কোর উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের সহিত সাঁওতালদের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল বলিয়া মনে হয় না! বিদ্রোহের সময় সাঁওতালেরা উক্ত স্বার্থপর হিন্দুদের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। শুধু কুমার, কামার, ডোম, তেলী, চামার ও আরও কয়েকটি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের উপর তাহারা কোনরূপ অত্যাচার করিত না। পরন্তু তাহাদের সহিত সাঁওতালদের যথেষ্ট মেলামেশা ও পারস্পরিক হৃদ্যতা ছিল। সেই কারণে উক্ত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই

বিদ্রোহের সময় সাঁওতালদিগকে নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছিল। কামারেরা বিদ্রোহের সময় সাঁওতালদের জন্য অস্ত্র নির্মাণ করিত, ডোমেরা যুদ্ধক্ষেত্রে রণবাদ্য বাজাইয়া তাহাদের সহায়তা করিত এবং অন্যান্যদের মধ্যে অনেকেই প্রত্যক্ষ ভাবে সাঁওতালদের সহিত যুদ্ধে যোগদান করিয়া তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল।

দামিন-ই-কোর বহু পাহাড়িয়াও বিদ্রোহীদলে যোগদান করে। 'হিল রেঞ্জার্স' দলভুক্ত পাহাড়িয়া সৈন্যগণ ইংরেজ সরকারের পক্ষ হইয়া সাঁওতালদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হইলেও অন্যান্য পাহাড়িয়াদের মধ্যে অনেকেই বিদ্রোহীদের সহিত বহু প্রকারে সহিযোগিতা করিয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় কামার, কুমার, গোয়ালা, ডোম, তেলী, চামার, প্রভৃতি নিম্নবর্ণের হিন্দুরা এবং কিছু সংখ্যক পাহাড়িয়াও বিদ্রোহীদের সহিত যোগদান করিয়া তাহাদের যথেষ্ট শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিল।

এই সময় ইংরেজ সরকারের পক্ষ হইতে আর একটি ঘোষণা-পত্র প্রচার করিয়া জানাইয়া দেওয়া হয় (২৩শে জুলাই) যে, সাঁওতালদের অন্যান্য জাতির মধ্যে কেহ যদি সরকারের শান্তিপ্রিয় প্রজাগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে তাহা হইলে তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহী বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

হিরণপুর, পাকুড়, প্রভৃতি অঞ্চলে লুঠতরাজ চলিতে থাকাকালীন সাঁওতালেরা দিকুদের (হিন্দু ভদ্রশ্রেণী) নিকট হইতে যথেষ্ট সহযোগিতা লাভ করিয়াছিল। বিদ্রোহীদল জিতপুর, হিরণপুর, মানসিংপুর প্রভৃতি লুঠ করিবার পর পাকুড়ের সন্নিকটবর্তী সংগ্রামপুর অভিমুখে ধাবিত হয় এবং সেখানকার রহমতি মণ্ডল নামক জনৈক বর্দ্ধিষ্ণু মুসলমান চাষীর যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাহার গৃহে অগ্নিসংযোগ করে। অম্বর বা আম্বাড় পরগণার অধিবাসিগণ ভীতিগ্রস্ত হইয়া দলে দলে জমিদারের কাছারি বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। এই সময় কাঞ্চনতলার বাবু জগবন্ধু রায় মহাশয় (অম্বরের দেওয়ান) নানা ভাবে আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্য করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সংগ্রামপুর অভিযান শেষ করিয়া বিদ্রোহীগণ পাকুড় আক্রমণ করে এবং তিনদিন যাবৎ রাজপ্রাসাদ অবরুদ্ধ রিয়া রাখে। পাকুড় এষ্টেটের রাণী ক্ষেমাসুন্দরী পূর্বেই মূল্যবান ধনরত্ন, গৃহদেবতা মদনমোহনজীর বিগ্রহ সহ জঙ্গীপুর গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। পাকুড়

চক্রপাণীশ্বর শিবমন্দিরের ধ্বংসস্তূপ (পাকুড়)
পাশে সেবায়েত অনিল চক্রবর্তী

অবরোধের চতুর্থ দিবসে, ১২ই জুলাই তারিখে, বিদ্রোহী নেতা সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব সদল বলে পাকুড় রাজবাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অবাধে লুণ্ঠন চালাইতে থাকে। কিন্তু এ স্থান হইতে আশানুরূপ ধনরত্ন তাহারা হস্তগত করিতে পারে নাই। রাণী ক্ষেমাসুন্দরী পূর্বেই সেগুলি স্থানান্তরের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পাকুড় রাজবাটী ও অন্যান্য কয়েকজন বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থের বাড়ী লুঠ করিয়া সাঁওতালেরা সেখান হইতে বীরদর্পে ও বিজয়গর্বে প্রস্থান করে। অল্প কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে পাকুড়াধিপতির প্রাসাদশীর্ষের দিকে চাহিয়া দূর হইতে সাঁওতালদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, সেই রাজবাটী আজ তাহাদেরই অমানুষিক উন্মাদনায় বিদ্রোহীর লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়া গেল। রাজশক্তি অন্তর্হিত, আমলাতন্ত্র প্রাণভয়ে ভীত হইয়া দিক্‌দিগন্তে পলায়িত।

সাঁওতালদের পাকুড় অভিযান কাহিনীর সহিত সেখানকার দীনদয়াল রায় নামক জনৈক ধনী মহাজনের শোচনীয় জীবন-কাহিনী এক বিয়োগান্ত নাটকের করুণ ব্যঞ্জনায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া

আছে। সাঁওতাল বিদ্রোহের ফলে সে সময় সমগ্র দেশব্যাপী একটা অনিশ্চয়তা ও অরাজকতার ভাব চলিতেছে। ধনদৌলত অপেক্ষা প্রাণরক্ষার দিকেই ভীতি-গ্রস্ত জনসাধারণের প্রবণতা অধিক। সবকিছু পিছনে ফেলিয়া দূর-দুরান্তে গিয়া কোনরকমে আত্মগোপন করিয়া জীবন রক্ষার জন্য সকলেই ব্যস্ত। বিদ্রোহ-বিধ্বস্ত গ্রাম ও জনপদগুলি প্রায় জনশূন্য। পাকুড় অঞ্চলের অবস্থাও তদ্রূপ। সেখানকার বৃদ্ধ দীনদয়াল রায় ছিলেন ও অঞ্চলের কুসীদজীবী মহাজনদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তি। সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তিনি যথাসর্বস্বের মায়া ত্যাগ করিয়া অতি অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভিটামাটি ছাড়িয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পাকুড় লুণ্ঠন শেষ করিয়া বিদ্রোহিগণ পাকুড় পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইলে পর সেখানকার অধিবাসিগণ কিছুটা সাহস সঞ্চয় করিয়া একে একে বাড়ী ফিরিতে থাকে। উক্ত দীনদয়াল রায় মহাশয়ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্য অনুচর সহ পুনরায় স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। গৃহে পদার্পণ করিবার প্রাক্কালে রায়মহাশয় তাঁহার গৃহসঞ্চিত ধনৈশ্বর্যের কথা চিন্তা করিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়েন। কিন্তু গৃহে ফিরিয়া দেখিতে পান যে, তাঁহার মৃত্তিকা-নিম্নে প্রোথিত বিপুল ধনরাশি সাঁওতালেরা লুণ্ঠন করিতে পারে নাই, দৈবক্রমে ওগুলি বাঁচিয়া গিয়াছে। দীনদয়াল হাতে যেন স্বর্গ পাইলেন, নূতন করিয়া যেন বিপুল ঐশ্বর্য লাভের আস্বাদ পাইয়া আনন্দে তিনি আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার উৎসাহ ও উদ্যম এতখানি বাড়িয়া গেল যে, পাকুড়ের জমিদারের অনুপস্থিতি ও অম্বর পরগণার তৎকালীন বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগ লইয়া নিজেকে তিনি অম্বরের জমিদার বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাঁহার মহাজনী কারবারের জন্য ব্যবহৃত বৈঠকখানা ঘরে হঠাৎ তিনি জমিদারী সেরেস্তা খুলিয়া বসিলেন। তাঁহার জাবদা খাতার লেখক ও হিসাবটানা মুহুরী রাতারাতি নায়েব-গোমস্তা তহশীলদারে পরিণত হইয়া গেল। রাজোচিত প্রতাপ-প্রতিপত্তি প্রদর্শনেও রায়মহাশয় কিছু-মাত্র কার্পণ্য করিলেন না। সাঁওতালদের প্রতি আক্রোশবশতঃ অম্বরের অন্তর্বর্তী সাঁওতাল পল্লীগুলিতে লোকজন পাঠাইয়া অসহায় সাঁওতাল রমণী ও শিশুদের উপর কঠোর উৎপীড়ন চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার এ দোর্দণ্ড প্রতাপ ও যথেচ্ছাচার তাঁহার উন্মাদ ও বেয়াদপ প্রজাগণ বেশীদিন কিন্তু বরদাস্ত করিল না। হঠাৎ একদিন একদল সশস্ত্র সাঁওতাল অতর্কিতে চারিদিক হইতে তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। রায়মহাশয় ধারণা করিতে পারেন নাই যে, তাঁহার সন্তলব্ধ অম্বর মসনদ অসভ্য ও বর্বরদের পাল্লায় পড়িয়া এত শীঘ্র বিপন্ন হইয়া উঠিবে।

এই কাহিনীর পরবর্তী অংশ কিন্তু অতিশয় মর্মান্তিক এবং যার-পর-নাই অমানুষিক। দীনদয়াল রায় তাঁহার ভ্রাতা নন্দকুমার ও ভগ্নী বিমলা দেবীর সহিত একদিন চৌধুরী পুকুরে স্নান করিতে যান। সেই সময় এক বিদ্রোহীদল হঠাৎ সেইস্থানে আবির্ভূত হইয়া দীনদয়াল রায় ও তাঁহার ভ্রাতা-ভগ্নীকে আক্রমণ করে। নন্দকুমার ও বিমলা দেবী কোনরকমে সেইস্থান হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন। বৃদ্ধ দীনদয়াল রায় শারীরিক অসামর্থ্যবশতঃ পলায়ন করিতে সক্ষম না হওয়ায় বিদ্রোহীদের হাতে ধরা পড়িয়া যান। বিক্ষুব্ধ ও রণোন্মত্ত সাঁওতালের দল তীর, ধনুক, টাঙ্গি, বর্শা, প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা দীনদয়ালকে হঠাৎ আক্রমণ করে এবং শিকারী কুকুর দিয়া তাঁহার দেহের মাংসপিণ্ড পর্যন্ত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। দীনদয়ালের অবস্থা যখন প্রায় অর্ধমৃত সেই সময় জগন্নাথ সর্দার নামক তাঁহারই এক প্রাক্তন ভৃত্য টাঙ্গি দিয়া তাঁহার প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলে এবং এক-একটি কোপ দিয়া চিৎকার করিয়া বলিতে থাকে—"এই আঙ্গুল দিয়ে একদিন সুদের টাকা গুণতিস, গরীবের সেই রক্তশোষা কড়ি। এই হাত দিয়ে গরীবের মুখ থেকে তার ক্ষুধার অন্ন কেড়ে নিয়ে একদিন তুই ধন সঞ্চয় করেছিলি। আজ তার প্রতিশোধ।"

সঙ্গে সঙ্গে দীনদয়ালের মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহার করুণতম কাহিনীর পরিসমাপ্তি এখনও ঘটে নাই। তাঁহার ছিন্নমুণ্ড লইয়া সাঁওতালেরা চক্রপাণীশ্বর শিবের মন্দিরে গিয়া গজালে টাঙ্গাইয়া রাখে এবং তাহার উষ্ণ রক্তে মন্দিরের প্রাচীরগাত্র রঞ্জিত করিয়া দেয়। দীনদয়ালের সেই মন্দিরগাত্রের রক্তের দাগ বহুকাল যাবৎ মুছে নাই।

কুসীদজীবী মহাজনদের হত্যা করিবার সময় সাঁওতালেরা অতিশয় নির্মম হইয়া উঠিত। কাহারও কাহারও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছেদন করিবার সময় চিৎকার করিয়া বলিত,—"এই জাড়ুই"—অর্থাৎ জাড় বা শীতকালের সুদ মিটাইয়া দেওয়া হইল। "এই রোদাই"—অর্থাৎ রৌদ্রের দিন বা গ্রীষ্মকালে দেয় সুদের টাকা মিটাইয়া দিলাম। এবং মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিবার সময় বলিয়া উঠিত—"এই ফরকতি"—অর্থাৎ সমগ্র ঋণ পরিশোধ হইল। বরাকর

নদীতীরে নারায়ণপুরের জমিদারকে হত্যা করিবার সময় ঠিক এইরূপ ব্যাপারই সংঘটিত হইয়াছিল। জমিদার বাবুর মস্তক ছিন্ন করিয়া তাঁহার তাজারক্তে তর্পণ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিল উন্মত্ত সাঁওতাল,—ফারকোত, ফারকোত।

শুধু এতদ্দেশীয় লোকেরাই এই হাঙ্গামায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। বহু ইউরোপীয় নীলকর, রেলওয়ে অফিসার ও অন্যান্য বহু নবাগত ইংরেজকেও বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল। সাঁওতালেরা বিদেশীদের বহু নীল ও রেশমের কুঠি ধ্বংস করিয়া দেয় এবং সুযোগ পাইলেই ব্রিটিশ রাজের সাহায্যকারী এই বিদেশীয়-দিগকে নির্মমভাবে হত্যা করিতে থাকে।

পার্শ্ববর্তী মুর্শিদাবাদ সীমান্তে হাঙ্গামার সংবাদ পাইয়া সেখানকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টু গুড ৭সংখ্যক রেজিমেণ্ট এন. আই. দলভুক্ত চারিশত পল্টন সহ ঔরঙ্গাবাদের (মুর্শিদাবাদ জেলার তৎকালীন একটি মহকুমা) দিকে অগ্রসর হন এবং বিদ্রোহীদের অগ্রগতির সংবাদ পাইয়া ধুলিয়ানে গিয়া অবস্থান করেন। বিদ্রোহী সাঁওতালগণ ঝিকরহাটি রাজকাছারি ও মহেশপুর রাজ-বাটী লুণ্ঠন করিয়া বহু ধনরত্ন হস্তগত করে। ১৫ই জুলাই তারিখে প্রায় তিন-চারি হাজার সাঁওতালের সহিত মিঃ টু গুডের উপরিউক্ত সৈন্যদলের সংঘর্ষ বাধে। এই যুদ্ধে সাঁওতালেরা অতিশয় সাহসের সহিত অগ্রসর হইয়া তিন তিনবার প্রতিপক্ষ সৈন্যদলকে আক্রমণ করে। কিন্তু সুশিক্ষিত ও সমর-নিপুণ ইংরাজ সৈন্যগণের আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মুখে তাহাদের রণকৌশল ব্যর্থ হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাহাদের পরাজয় ঘটে। এই যুদ্ধে দুইশত সাঁওতাল নিহত হয় এবং বিদ্রোহীদের নিকট হইতে নগদ সাত হাজার টাকা ও চারি হাজার টাকার লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি উদ্ধার করা সম্ভব হয়। সাঁওতাল নেতা সিধু ও কাহ্নু এই যুদ্ধে সামান্য আহত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

পাকুড়ের সন্নিকটবর্তী তরাই নদীর তীরে উপরিউক্ত রেজিমেণ্টের দুইশত সৈন্যের সহিত প্রায় পাঁচ হাজার সাঁওতালের পুনরায় এক সংঘর্ষ বাধে। এই যুদ্ধে সাঁওতালেরা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে এবং অসংখ্য সাঁওতালকে ইংরাজ সৈন্যের আগ্নেয়াস্ত্রে প্রাণ হারাইতে হয়। এই সময় ত্রিভুবন সাঁওতাল নামক এক বিদ্রোহীর পরিচালনায় বিদ্রোহী দল কর্তৃক তিনজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক ও দুইজন ভদ্রমহিলা নিহত হইয়াছিলেন (Mr. Hennessay ও তাঁহার দুই পুত্র এবং Miss Thomas and Miss Pell)। অবশ্য সিধু ও কাহ্নু

মদনমোহনের মন্দির (পাকুড়)

নারীজাতির উপর অস্ত্রপ্রয়োগের পক্ষপাতী ছিল না। উপরিউক্ত ইংরাজ মহিলাদের হত্যাকারীদিগকে সিধু সর্দারের নিকট কৃতকর্মের জন্য রীতিমত জবাবদিহি করিতে হইয়াছিল। সিধু সর্দার তাহাদিগকে যথেষ্ট ভৎসনা করে ও ভবিষ্যতের জন্য বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দেয়।

প্রায় মাসাবধি কালের মধ্যে বিদ্রোহ প্রশমনের যখন কোন লক্ষণই দেখা গেল না, তখন ইংরাজ সরকার কঠোরতর ব্যবস্থা অবলম্বনে মনোযোগী হইলেন। দানাপুর হইতে আরও কিছু সৈন্য সহ জেনারেল লয়েডকে উপদ্রুত অঞ্চলে পাঠানো হইল। তৎপূর্বে দানাপুর হইতে ১৩ সংখ্যক রেজিমেণ্ট এন. আই. দলভুক্ত তিনশত সৈন্য সহ ক্যাপ্টেন ওয়াটারম্যানকে ভাগলপুর রক্ষার জন্য পাঠানো হইয়াছিল। ২৫শে জুলাই তারিখে তিনি ভাগলপুরে আসিয়া পৌঁছেন। সেইদিনই মেজর শাকবুর্গ ক্যাপ্টেন শেরউইল সহ তিনশত সৈন্যের অপর একটি দল লইয়া (৪০ সংখ্যক রেজিমেণ্ট এন. আই.) ভাগলপুর হইতে দীঘি হইয়া দামিন-ই-কো অঞ্চলে অভিযান চালাইবার জন্য রওনা হইয়া যান। লেঃ কর্ণেল লিপট্র্যাপ আরও আড়াই শত সৈন্য লইয়া (৪২ রেজিমেণ্ট এন. আই.) ২৯শে জুলাই তারিখে সকালবেলা ভাগলপুরে

পৌঁছেন এবং সেইদিনই অপরাহ্নে মেজর ক্রুয়ার-এর অধীন সাড়ে তিনশত সৈন্যের অপর একটি বাহিনীও তথায় গিয়া মিলিত হয়। লেঃ কঃ লিপট্রাপ তাঁহার সৈন্যদল লইয়া "লেডি হ্যাকওয়েল" ষ্টীমার যোগে রাজমহল অভিমুখে রওনা হইয়া যান এবং কলগাঁও অঞ্চলে অভিযান পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হন।

সৈন্যদলের সর্বাধিনায়ক জেনারেল লয়েডের উপস্থিতি ও সৈন্যদলের ব্যাপক অভিযান ভীতিগ্রস্ত ও পলায়িত জনসাধারণের মধ্যে কিছুটা সাহস ও মনোবলের সঞ্চার করে। জমিদার মহাজন ধনী ব্যবসায়ী ও নীলকুঠির মালিকগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইংরাজ সরকারের সহিত বিদ্রোহ দমনে সর্বতোপ্রকারে সহযোগিতা করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহাদের নিজ ব্যয়ে সৈন্যদলের জন্য রসদ সরবরাহের দায়িত্বভার গ্রহণ করে। মুর্শিদাবাদের মহারাজা বিদ্রোহ দমনে সহায়তা করিবার জন্য কতকগুলি সুশিক্ষিত হাতী পাঠাইয়া দেওয়ায় সৈন্যদলের পক্ষে কর্দমাক্ত দুর্গম পথ ও জলাভূমি অতিক্রম করিয়া অভিযান পরিচালনা করিতে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

মেজর শাকবুর্গ, মেজর বারোজ, ক্যাপ্টেন শেরউইল প্রমুখ সৈন্যাধ্যক্ষগণ সুশিক্ষিত সৈন্যদল সহ বিভিন্ন দিকে অভিযান চালাইতে থাকেন। এই সময় ইংরাজ সৈন্যের সহিত সম্মুখ সংগ্রামে বহু সাঁওতাল প্রাণ বিসর্জন দেয়, অনেকে গুরুতররূপে আহত হয় এবং সৈন্যদলের আক্রমণে বিপর্যস্ত হইয়া বিদ্রোহীদের অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া সাময়িক ভাবে গভীর জঙ্গলে গিয়া আত্মগোপন করিয়া থাকে। বহু সাঁওতালী গ্রাম ধ্বংস করিয়া ফেলা হয় এবং বহু গ্রাম হইতে প্রচুর পরিমাণে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি পুনরুদ্ধার করা হয়। গণপৎ গোয়ালা নামক বিদ্রোহীদের এক দলপতিকে গ্রেপ্তার করিবার সময় তাহার বাড়ী হইতে স্তূপীকৃত শস্যসম্ভার ও বহু মূল্যবান্ দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। উক্ত লুণ্ঠিত দ্রব্যসমূহের মধ্যে ইংলিশ চেয়ার, মহিলাদের ব্যবহৃত আয়না ও নানাপ্রকার মূল্যবান্ বস্ত্রও ছিল। লুণ্ঠিত দ্রব্যগুলি উদ্ধার করিয়া গণপতের ঘরবাড়ী চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ভূমিসাৎ করিয়া ফেলা হয়।

মুর্শিদাবাদের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত যে সৈন্যদলটি বিদ্রোহীদের অনুসরণ করিয়া দামিন-ই-কোর পাহাড় অঞ্চলে গিয়া অভিযান চালাইতে থাকে সেই দলের সহিত ২৭শে জুলাই তারিখে বারহারোয়া-বারহেট মধ্যবর্তী রঘুনাথপুর গ্রামে সিধু ও কানুর দলের সংঘর্ষ বাধে। এই যুদ্ধে সাঁওতালেরা যথেষ্ট সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিলেও শেষ পর্যন্ত তাহাদের পরাজয় ঘটে। বিজেতা সৈন্যদল বিদ্রোহীদের কবল হইতে বারহেট বাজার পুনরুদ্ধার করে। অতঃপর তাহারা উন্মত্ত অভিযান চালাইয়া সিধু ও কানুর জন্মভূমি ভগ্নাডিহি গ্রামখানি ধ্বংস করিয়া ফেলে। গৃহে গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া সমগ্র গ্রামখানি ভস্মীভূত করিয়া দেয়।

দামিন-ই-কোর ছোট্ট একটি সাঁওতালী গ্রাম। যেখানে একদিন দশ হাজার সাঁওতাল সমবেত হইয়া ইংরাজ সরকারের কু-শাসন ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে জীবনমরণ সংগ্রামের সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিল, যে গ্রাম সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরবের মত সাঁওতাল-বীরের জন্মদাত্রী, যেখান হইতে নিপীড়িত আদিবাসীর সমবেত কণ্ঠের বজ্রনির্ঘোষে একদিন ধ্বনিত হইয়াছিল প্রথম স্বাধীনতার বাণী, সেই চম্পার স্বপ্নদুলাল আদিম জাতি অধ্যুষিত ভগ্নাডিহি গ্রামখানি গোরাপল্টনের পৈশাচিক দাপটে অণু অণু হইয়া মাটির বুকে মিশিয়া গেল। আসলে কিন্তু ভগ্নাডিহি মরে নাই। স্বেচ্ছাচারী ইংরাজ সরকার ও রক্তশোষক ধনী ও মহাজন শ্রেণীর বিরুদ্ধে দামিন-ই-কোর আকাশে-বাতাসে বিদ্রোহের যে বিষবাষ্প একদিন সে ছড়াইয়া দিয়াছিল, শক্তি তাহার অপরিমেয়। তাই ভগ্নাডিহি ধ্বংস করা হইলেও বিদ্রোহীরা কিছুমাত্র দমে নাই। দৃঢ়তর সঙ্কল্প লইয়া দ্বিগুণতর উৎসাহে তাহারা ইংরাজ সরকারের সহিত সমানে সংগ্রাম চালাইয়া যায়। সে সংগ্রাম দীর্ঘদিন স্থায়ী হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে বিদ্রোহ দমন সংক্রান্ত কতকগুলি আভ্যন্তরীণ বিষয় লইয়া ভাগলপুরের কমিশনার মিঃ ব্রাউনের সহিত বাংলা গবর্ণমেণ্টের প্রায়ই মতদ্বৈধ ঘটিতে থাকে এবং মিঃ ব্রাউনের কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে ক্রমশঃই তাঁহারা আস্থা হারাইয়া ফেলেন। বাংলার ছোটলাট মিঃ ফ্রেডারিক জেমস্ হ্যালিডে নানা কারণে মিঃ ব্রাউনের উপর বিশেষ সদয় ছিলেন না। তাঁহার বিদ্রোহ সংক্রান্ত কতকগুলি সুপারিশ মিঃ হ্যালিডে নাকচ করিয়া দেন। অতঃপর নদীয়া বিভাগের কমিশনার মিঃ এ. সি. বিডওয়েলকে বিদ্রোহ দমনের জন্য বিশেষ কমিশনার (Special Commissioner) নিযুক্ত করিয়া রাজমহলে পাঠান হয়। ৬ই আগষ্ট তারিখে বাংলা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি মিঃ গ্রে, মিঃ বিডওয়েলকে সরকারী নির্দেশ জ্ঞাপন করেন এবং রাজমহলে গিয়া বিদ্রোহ দমন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়া জেনারেল লয়েডের সহিত অতি সত্বর যোগাযোগ স্থাপন করিবার নির্দেশ দেন। মিঃ এ্যাসলি ইডেন ও মিঃ বার্নসকে মিঃ বিডওয়েলের অধীন সহকারী কমিশনাররূপে নিয়োগ করা হয়

মিঃ পন্টেটকেও এই সময় নির্দেশ দেওয়া হয় দামিন-ই-কো অঞ্চলে বিদ্রোহ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে মঃ বিডওয়েলের আজ্ঞাধীন সহকারীরূপে কার্য করিবার জন্য।

সরকার পক্ষ হইতে ব্যাপক সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইলেও বহুদিন যাবৎ এই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভবপর হয় নাই। লর্ড ডালহৌসী এই হাঙ্গামাকে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের Final minute-এ "a local outbreak and little looked for" বলিয়া মন্তব্য করেন। কিন্তু এই local outbreak ভয়াবহতায় ব্রিটিশ ভারতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে সংঘটিত যে কোন outbreak অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া আমাদের মনে হয় না। মাত্র তীর-ধনুক অস্ত্রধারী অশিক্ষিত ও শৃঙ্খলাহীন সাঁওতালদের এই local outbreak দমন করিবার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আগ্নেয়াস্ত্রধারী সুশিক্ষিত ইংরেজ সৈন্যদলকে দীর্ঘ আট মাস কাল ধরিয়া নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইয়াছিল। ক্ষয় ক্ষতি এবং প্রাণহানিও গবর্ণমেণ্ট পক্ষে বড় কম হয় নাই। ভারতের বুকে সর্বপ্রথম ব্রিটিশ-বিরোধী গণসংগ্রামের প্রবর্তক ও পরিচালক ভারতীয় এই আদিবাসী সমাজ। বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক আদিবাসী অভ্যুত্থান ও রক্তাক্ত বিপ্লবকাহিনী অদ্যাপি এ বিষয়ে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি বহন করিতেছে। সাঁওতাল বিদ্রোহ তাহার জলন্ত প্রমাণ। বিদ্রোহের সূত্রপাত যে ভাবেই হউক—এ বিপ্লব যে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ বিরোধী গণ-সংগ্রামে পরিণতি লাভ করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সিপাহী বিদ্রোহেরও দুই বৎসর পূর্বে ভারতীয় আদিবাসী জাগরণের স্মরণীয় এক দৃষ্টান্ত হিসাবে দামিন-ই-কোর সাঁওতাল সেদিন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে যে অপূর্ব বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহা জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে বিশেষ একটি স্মরণীয় অধ্যায়। বিক্ষুব্ধ ভারতবাসীর পক্ষ হইতে ব্যাপক ভাবে ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামের সূত্রপাত এই সময় এই আদিবাসী সমাজ হইতেই। সিপাহী বিদ্রোহে তাহার পূর্ণতর পরিণতি আমরা লক্ষ্য করিয়াছি।

বিদ্রোহী সাঁওতালদিগকে সহজে দমন করা যখন কোন মতেই সম্ভবপর হইল না, তখন উপদ্রুত অঞ্চলে সামরিক আইন (Martial Law) জারি করিবার কথা কর্তৃপক্ষগণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। সার ফ্রান্সিস হেলিডে এইরূপ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য

চৌধুরী পুকুর (পাকুড়) দীনদয়ালকে এখানে হত্যা করা হয়

পূর্বেই প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু সার বার্নস্ পিকক এ বিষয়ে সার হেলিডের সহিত একমত না হওয়ায় ভারত গবর্ণমেণ্ট সে সময় সামরিক আইন জারি করিতে স্বীকৃত হন নাই। অতঃপর বাংলা গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বিদ্রোহিগণকে দশ দিনের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য নির্দেশ দিয়া একটি নোটিশ জারী করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৫৫ সনের ১৭ই আগষ্ট তারিখে প্রচারিত উক্ত ঘোষণাপত্রের বাংলা অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"...রাজবিদ্রোহ কর্ম করিয়া অত্র দেশ লুট ও উজাড় করিতেছে—আর সৈন্যের সহিত আপত্য করিতেছে—উহারদিগের মধ্যে এমত অনেক ব্যক্তী আছে জে আপনাদিগের নির্বুদ্ধি ও দুষ্কর্ম জ্ঞান করিয়া মার্জ্জনা ও পূর্ব্বকারাবস্থা পুনরায় পাইবার প্রার্থী আছে—এ বিষয় ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদা আপনার প্রজার সুখ...তাহারা মন্দলোকের পরামর্শে কুপথগামী হয় ইচ্ছুক নয় এ নিমিত্ত কেবল এই সকল ব্যক্তী জাহারা প্রধানমন্ত্রী ও সরদার কিম্বা কোন খুন করিতে প্রাধান্তরূপে অধিক থাকা প্রকার হইবেক তদ্ব্যতিরিক্ত সকল সাঁওতালগণ জাহারা ১০ দিবসের মধ্যে কোন হাকিমের সম্মুখে হাজীর হইয়া আজ্ঞাবাহী হইবেক তাহাদিগের দোশ মার্জ্জনা করা জাইবেক—জখন তাহাদের আজ্ঞাবাহীযুক্ত প্রকাশ হইবে তখন তাবত নালিশ সাঁওতালদিগের যাহা প্রমাণযোগ্য হইবেক তাহা সুন্দররূপে তদারক করা যাইবেক কিন্তু যদ্যপি সকল রাজদ্রোহি এই ইস্তাহার জারির পর বিপরিত আচরণ করে তাহার সক্ত ও নিদারুণ সাজা পাইবেক। ইতি সন ১৮৫৫ সাল—তাঃ ১৭ই আগষ্ট—মোতাক সন ১২৬২ সাল—২ ভাদ্র।"

সাঁওতাল পরগণার ডেপুটি কমিশনার মহোদয়ের অফিসে উল্লিখিত ইস্তাহারের কপি সংরক্ষিত আছে।

উপরিউক্ত ঘোষণায় বিশেষ কোন ফল হয় নাই। ইংরেজ সৈন্যের সহিত সম্মুখ সংগ্রামে স্থানে স্থানে সাঁওতালদের যদিও পরাজয় ঘটিতে থাকে এবং নানাভাবে তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, তথাপি তাহাদের যুদ্ধবিরতির কোন লক্ষণ দেখা যায় না। উপরন্তু ইংরেজ সৈন্যের বিরুদ্ধে তাহাদের আক্রোশ ও দুর্বার সমরস্পৃহা ক্রমশই যেন বাড়িয়া যাইতে থাকে। পরাজিত সাঁওতালগণ বনে-জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়া তাহাদের দলপুষ্টি ও নানাভাবে শক্তি সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিতে থাকে এবং সুযোগ পাইলেই, পুনরায় লুঠতরাজ ও ইংরেজ সৈন্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইতে থাকে। এইরূপে বিদ্রোহের পরিধি ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। দামিন-ই-কো অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া পশ্চিমে ভাগলপুর হইতে মুঙ্গের ও হাজারীবাগ সীমান্ত, পূর্বে মুর্শিদাবাদ জেলার কিয়দংশ ও সমগ্র বীরভূম জেলা এবং দক্ষিণে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড অতিক্রম করিয়া দামোদর তীরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত বিরাট্ এক যুদ্ধক্ষেত্রের সৃষ্টি হইল।

বিদ্রোহীদিগকে যত সহজে দমন করা সম্ভবপর হইবে বলিয়া ইংরেজ সরকার ধারণা করিয়াছিলেন, কার্যতঃ দেখা গেল তাঁহাদের সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। দেশব্যাপী অরাজক অবস্থা সমানে চলিতে থাকে। ইংরেজ সরকারের শাসন ব্যবস্থা ও সামরিক শক্তি সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে ক্রমশই যেন একটা হতাশার ভাব দেখা দিতে লাগিল। বিদ্রোহ দমনে সরকার পক্ষের ব্যর্থতা ও অস্বাভাবিক বিলম্ব ঘটিবার অন্যতম কারণ সিভিল ও মিলিটারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে পদে পদে মতভেদ ও ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি। ১৮৫৫ সনের "ক্যালকাটা রিভিউ" পত্রিকায় জনৈক লেখক এ বিষয়ে কটাক্ষ করিয়া লিখিয়াছিলেন :

"The confidence of our subjects in our rule is shaken, and in many parts they have undergone great suffering. A portion of the public is audibly grumbling at the apparent of union and concert in the Government. Public money is melting away. Public works are at a standstill. Specially it is to be feared that the pet scheme of the day, the Railway, has received a serious check."

এই সময় এই আদিবাসী বিপ্লব ব্যাপকভাবে দেশের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। দিকে দিকে অশান্তি ও হানাহানি। সরকার পক্ষ হইতে বিদ্রোহ দমনের যথেষ্ট চেষ্টা করা হইলেও দীর্ঘ পাঁচ মাস কালের মধ্যে অবস্থার যখন কোন পরিবর্তন ঘটিল না তখন ইংরেজ সরকার কঠোরতর ব্যবস্থা অবলম্বন করাই সমীচীন বলিয়া মনে করিলেন। ১৮৫৫ সনের ১০ই নবেম্বর তারিখে উপদ্রুত অঞ্চলে সামরিক আইন জারী করা হইল। ঘোষণাটি নিম্নরূপ :

"It is hereby proclaimed and notified that the Lt.-Governor of Bengal, in the exercise of the authority given to him by Regulation X of 1804, and with the assent and concurrence of the President in Council, does hereby establish Martial Law in the following districts, that is to say : so much of the district of Bhagalpur as lies on the right bank of the river Ganges ; so much of the district of Murshidabad as lies on the right bank of the river Bhagirathi ; the district of Birbhum. And that the said Lt.-Governor does also suspend the functions of the ordinary criminal courts of judicature within the districts above described with respect to all persons, Santals and others, owing allegiance to the British Government in consequence of their either having been born or being residents within its territories and under its protection, who, after the date of this Proclamation and within the districts above described, shall be taken in the act of opposing by force of arms the authority of the same, or shall be taken in the actual commission of any overt act of rebellion against the state ;

And that the same Lt.-Governor does also hereby direct that all persons, Santals and others, owing allegiance to the British Government who, after the date of his proclamation, shall be taken as aforesaid, shall be tried by Court Martial ; and it is hereby notified that any person convicted of any of the said crimes by the sentence of such court will be liable under Section 3, Regulation X of 1804, to the immediate punishment of death."

এই সামরিক আইন জারীর পরও সাঁওতাল বিদ্রোহের তীব্রতা আশানুরূপ হ্রাস পায় নাই। ইহার পরবর্তী ঘটনাবলী তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

শিল্পী ও পৃষ্ঠপোষক

ডাঃ আনন্দ কুমারস্বামী
অনুবাদ : সুধা বসু

১। ভূমিকা

'নর্ম্মাল' (normal) শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন 'নর্ম' থেকে। আর এটির সম্বন্ধ রয়েছে গ্রীক ভাষার 'নমন' অর্থাৎ ছুতোরের মাপযন্ত্র ইত্যাদি এবং 'জিগ্‌নোস্কিন' অর্থাৎ 'কিছু জানা' আর সংস্কৃত ভাষার 'জ্ঞা' ধাতুর সঙ্গে। আধুনিক ইংরাজী ভাষার 'নো' (know) শব্দের সঙ্গে এদের সকলেরই ধাতু ও অর্থগত সম্বন্ধ রয়েছে। এই প্রবন্ধের শিরোনামা দ্বারাও এইরূপেই শিল্পের প্রকৃতি ও মূল্য সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যায়। শিল্পী মানুষ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বাস্তবিক সম্পর্ক নির্ণয় কোন মতেই তর্কের বিষয় নয়; অথবা বারংবার চেষ্টা ও ভুলের মধ্যে দিয়ে বুঝে নেবার জিনিষও নয়। পরন্তু, এ হ'ল একটা নির্দ্দিষ্ট জ্ঞানের বস্তু। এই জন্যই সেণ্ট টমাস বলেছেন, "শিল্পের একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ও পরিণতি আছে এবং ইহা বিশেষ বিশেষ কর্ম্মপ্রণালী নিরূপণের সহায়ক।" ভারতবর্ষেও ঠিক এইরকমেই শিল্পকে শিক্ষণীয় জ্ঞানের সমষ্টি এবং আয়ত্ত ক'রে নিতে হবে এমন একটি কলাকৌশলরূপে বিবেচনা করা হয়। যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং বা কারিগরি বিদ্যা শিখে এমন কিছু কার্য্যকরী জিনিষ উৎপাদন করতে বা নির্ম্মাণ ক'রে দিতে হয় পৃষ্ঠপোষক বা মালিকের ইচ্ছানুসারে, যা হয়ত বহুলাংশে স্রষ্টার ব্যক্তিগত রুচি প্রবৃত্তির বহির্ভূত। শিল্পের স্বাভাবিক আদর্শের মধ্যে সাধারণ জীবনাদর্শের স্বীকৃতি পূর্ব্ব থেকেই বিদ্যমান রয়েছে একটা নির্দ্ধারিত মূল্যবোধের পরম্পরায়। পক্ষান্তরে নিঃসন্দেহেই দেখা যায় যে, "নবজাগরণের (রেনেসাঁস) দিন থেকে শ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শনসমূহকে সাধারণ জীবনযাত্রার মানদণ্ডে বিচার করেই ক্রয়-বিক্রয় হ'ত" (র‍্যাণকে)। আরও সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, রবিবারের পুণ্যাহের মত কলাশিল্পও মানুষের জন্যই সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে সৃষ্টি হয়েছিল। অবশেষে এও সাব্যস্ত হ'ল যে, শিল্পচর্চ্চার মানসেই শিল্পসৃষ্টি এবং জীবনের ক্ষতি স্বীকার করেও এর উন্নতিসাধন করা উচিত। আমরা বহুদিন ধরেই অনুভব করছি যে, আধুনিক কালের শিল্পের গতি সর্ব্বতোভাবে স্বাভাবিক পথে চলছে না। কিন্তু এই অস্বাভাবিকতা অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা যেন উহাকে সাধারণ উপসর্গের চেয়ে বেশী কোন ব্যাধি বলে মনে না করি; অথবা সেই ব্যাধি উপশমের কোন উপায় অনুসন্ধানেও প্রবৃত্ত না হই। বরং সমগ্ররূপে কিছু উন্নতি বা সংস্কারের দিকে চেষ্টা করলে ভাল হয়। শিল্পের ক্ষেত্রে সমগ্রভাবে একটা সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি হলে উহার সব বিভাগেই প্রকৃত সৌন্দর্য্যের বিকাশ সম্ভব। আমরা কোনরকমেই শিল্পে মানবধর্ম্ম আরোপ করব না এবং শিল্পরাজ্যে এই অনিয়ম বিশৃঙ্খলার জন্য শিল্পসত্তাই দায়ী—একথাও বলব না। বরং প্লোটাইনাসের উক্তিটি আমাদের স্মরণে আনা উচিত—"সাধারণ মানব প্রকৃতির অন্তরে চারু ও কারু-কলার জন্য যে আবেদন দেখা যায়—তা অনিয়ন্ত্রিত মুক্ত মানবসত্তার মধ্যেও নিহিত আছে।"

২। শিল্প সম্বন্ধে অস্বাভাবিক মত।

মানব সভ্যতার ইতিহাসের ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন দু'টি সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ে অর্থাৎ ইউরোপের সুপরিণতির (classical) যুগের শেষভাগে ও বিগত পাঁচশ' বছরে ওদেশে শিল্প সম্বন্ধে একটা অস্বাভাবিক মতবাদ সৃষ্টি হয়ে প্রচলিত হয়ে পড়েছিল। এশিয়া মহাদেশে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে অনুরূপ কোন আদর্শ-বিচ্যুতি কোন কালেই ঘটে নি। তবে এও লক্ষ্য করার বিষয় যে, ঐ দু'টি যুগে এশিয়া ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শ-দোষে প্রভাবিত হয়েছিল এবং সে প্রভাবের ফলে বর্ত্তমান যুগে এমন সব তথা-কথিত শিল্প-সৃষ্টি চলছে যা, যে-কোন শ্রমজাত শিল্পে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল সমাজে উৎপন্ন দ্রব্য থেকেও নিকৃষ্ট। যদি আমরা মনে করি যে, শিল্পের স্বাভাবিক আদর্শ এখনও খ্রীষ্টধর্ম্মের মূলগত কাল্পনিক অনুশাসনের সঙ্গে তত্ত্বের দিকে যোগযুক্ত আছে—তবে আমাদের অবশ্যই সেই ভাবে বিচার করতে হবে যে, সমসাময়িক খ্রীষ্টীয় আচার-আচরণ পাপপুণ্যের বিচারকে নৈতিক দিকে গণ্ডীবদ্ধ করে—শিল্পী সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের জ্ঞান অর্জ্জন না করে—শিল্প ও চিন্তাশীলতার দু'টি ক্ষেত্রকেই কার্য্যতঃ ধনীসমাজের তাঁবেদার করে তুলেছিল।

আধুনিক মতানুসারে যা কিছু ব্যবহারিক জীবনের

জন্য নির্ম্মিত হোক—তাই-ই হ'ল আলঙ্কারিক বা কারু-শিল্প ; ব্যবহারিক বা শ্রমজাত শিল্প। আর যা সৃষ্টি হবে মানুষের আত্মিক উন্নতি বা বুদ্ধিকে দীপ্ত করণের উদ্দেশ্যে, তাহা হ'ল সূক্ষ্ম বা চারুশিল্প, অথবা খাঁটি শুদ্ধ শিল্প ; নতুবা সাধারণ শিল্প, যার প্রকাশনা ও আরম্ভ হবে বড় অক্ষরে। শিল্পের স্রষ্টা শিল্পীকুলকেও এইরূপে দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। কারু বা শ্রমজশিল্পের স্রষ্টা হলেন মেহনতী মানুষ, আর চারুশিল্পের রচয়িতা হলেন শিল্পী। যদি কোন শ্রমিক কিছু জিনিসপত্র তৈরী করেন অথবা কোন শিল্পবস্তু উপভোগ করেন—তবে তা বিশেষ কোন ব্যবহারিক জিনিষ উৎপাদনের মানসেই করেন না—বরং অবসর বিনোদনের বিশেষ প্রিয় কর্ম্ম হিসাবেই করে থাকেন। শ্রম অপনোদনের পরিকল্পনায় যে শিল্পী কর্ম্মহীন জীবনের সম্মুখীন হয়েছিলেন, ভগবানের কৃপায় তিনি সেই অবসর যাপনের মধ্যে একটি "উচ্চতর জিনিষের" সাহচর্য্য পেয়ে গেলেন। শ্রমিককে যুগপৎ 'মুক্ত' মানুষ বলা যেতে পারে। কারণ, কাজ করে রুজির যোগাড় করা অথবা অনাহারে দিন কাটানো—দুই-ই তাঁর ইচ্ছাধীন। এ বিষয়ে বাস্তবে তাঁকে দাসত্বের পর্য্যায় থেকে স্বতন্ত্র করে ধরা যেতে পারে। কারণ, দাসত্বগ্রহণকারীকে কিছু-না-কিছু কাজ অবশ্যই করতে হবে ; অনশন অর্দ্ধাশনের সম্মুখীন হতে তাঁকে কোনক্রমেই দেখা যাবে না।

শিল্পী হলেন উচ্চতর শ্রেণীর পর্য্যায়ভুক্ত। তিনি যদি ধর্ম্মঘটে লিপ্ত হন অথবা কোন চিলে-ঘরে যদি স্বীয় আদর্শে অনশনে দিন কাটাতে থাকেন, তা হ'লেও শ্রমজীবীর মত তাঁকে সমাজবিরোধী ব'লে ধিক্কৃত করা চলে না। বরং সকলে তাঁকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না বলেই ধারণা হবে এবং লোক-সমাজ আরও ভাবতে উৎসাহিত হবে যে, তিনি (শিল্পী) এ সমস্ত কাজ ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্যই করে যাচ্ছিলেন। আধুনিক কালের শিল্পী হলেন বিশেষ এক ধরনের মানুষ। অন্যান্য সকল মানুষের সঙ্গে তাঁর প্রভেদ সৃষ্টি হ'ল তাঁর সংবেদনশীল মনটির জন্য ; বাস্তবিক পক্ষে তাঁর জ্ঞানের জন্য নয়। আবার এই সংবেদনশীলতার জোরেই তিনি কতকগুলি নৈতিক স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগও পেয়ে থাকেন। যদিও শিল্পী তাঁর শিল্পকর্ম্মের জন্য মূল্য ও মজুরি আশা করেন এবং কোন কোন সম্ভাব্য ক্ষেত্রে উচ্চতর হারে পেয়েও থাকেন, তথাপি এ বিষয়ে তাঁকে হিসাব দেখাতে অথবা জবাবদিহি করতে হয় না। পৃষ্ঠপোষক ক্রেতা বাঁশীওয়ালাকেই মূল্য দান করেন, সুরকে হয়ত তখন আহ্বান করেন না। যদি কোন পৃষ্ঠপোষক কোন শিল্পবস্তুকে তাঁর মনের মত হয় নি বলে গ্রহণ করতে নারাজ হন, তবে সমগ্র শিল্পী-সমাজ উঠবেন ক্ষিপ্ত হয়ে ; আর প্রশ্ন উঠবে—পৃষ্ঠপোষক কি করে জানলেন যে, তিনি বাস্তবিক কি চান ?

শিল্পীর আত্মপ্রকাশের জন্য তাঁকে প্রশংসা করা হয় কেন ? অথচ অন্য লোকদের সম্পর্কে এ ব্যাপারটি যে কেন নিন্দনীয় তা কখনও ব্যাখ্যা করা হয় নি। অথবা আচরণবাদীরাও (Behaviourists) সর্ব্বদা স্মরণে রাখেন না যে, শিশুরাও কান্নার মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশই করে এবং প্রতিটি সমাজবিরোধী দস্যু-প্রকৃতির মানুষও তার অন্তর্নিহিত ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েই চলে ; আর জন-সাধারণ বা সমাজকে মনে করে একটি শামুকের মত নিজের আশ্রয় ও আত্মগোপনের স্থান। আধুনিক শিল্পীর একক প্রদর্শনী সম্পর্কে জনসাধারণকে যতটা আগ্রহশীল দেখা যায়—তার সবটাই শিল্পের আকর্ষণে নয়। বাস্তবিকপক্ষে এ আকর্ষণ হ'ল একটি অদ্ভুত ধরনের এবং সাধারণতঃ একটা অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশনার সম্মুখীন হওয়ার উদ্দেশ্যেই। শিল্পী যদি নিজের মত করে, স্বাধীন ভাবে চিত্র রচনা ক'রে যেতে পারেন, তবে তিনি সর্ব্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণীয় শ্রমবহুল কর্ম্মের পর্য্যায় অতিক্রম ক'রে উন্নত স্তরে উঠতে পারেন। যদি বিশেষ একখানি চিত্রের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হয়, তবে তাঁকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উহার প্রতিলিপি প্রস্তুত করণের উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। আবার যদি কোন কিছু গড়নের জন্য একখণ্ড কঠিন প্রস্তর হাতে এল—তখনই খোঁজ করতে হবে একদল ভাড়াটে স্থপতির। বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনেও শিল্পীর স্বাধীনতা আছে। তাঁর পরিকল্পিত বিষয়সমূহ কতকগুলি ধারণার সমষ্টিমাত্র নয় ; উহা হ'ল কতিপয় আদর্শের সমাহার এবং এ বিষয়ে শিল্পীর বিশেষ দোষ-গুণের বিচার করাও চলে না। কারণ এ হ'ল যুগধর্ম্মের প্রভাব। স্বকীয় ব্যক্তিসত্তার উপরেও কাজ করছে যে যুগের মানুষ, তিনিই সেই সেই যুগের ধর্ম্মধারার প্রতীক। আর এ যুগের প্রধান লক্ষণ হ'ল ভাবপ্রবণতা ও বাস্তবকে এড়িয়ে কুসংস্কারের প্রতি অনুরক্তি। 'অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে' (Dark Ages) ও অন্যান্য সব স্বাভাবিক কালে মানুষ যেমন নৈরূপ্যবাদী প্রতীক ও গূঢ়ার্থক নক্সা অলঙ্করণেই শিল্প-ব্যঞ্জনা সীমিত রেখে চলতে অভ্যস্ত ছিলেন—আজ আর তা সম্ভব নয়। শিল্পী আজ তাঁর পটে রূপায়িত করেন প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, নগ্নমূর্ত্তিমালা, আলোর খেলা, অথবা স্বীয় আত্মাকে।
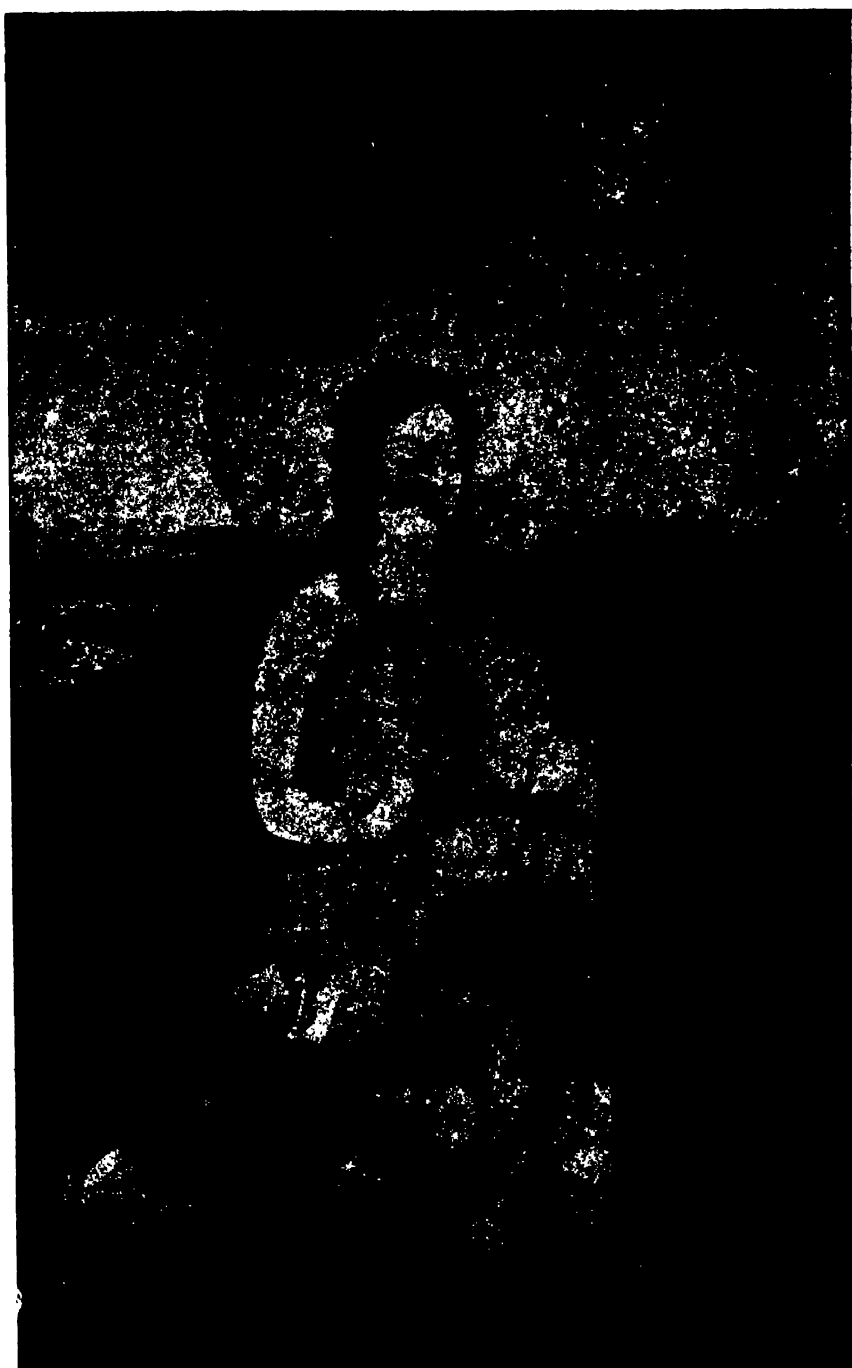
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

কমলিনী

শ্রীকুলজারঞ্জন চৌধুরী

প্রবাসী, পৌষ ১৩৩৮ হইতে পুনর্মুদ্রিত

অবসর বিনোদনে

দুষ্টু ছেলে

ফটো : শ্রীআনন্দ মুখার্জি

এই রূপায়ণ কখনও হুবহু অর্থাৎ যেমনটি আছে তেমনটিই; আবার কখনও হয় নিজস্ব রুচি ও কল্পনার জারক রসে রসিয়ে কষিয়ে নিয়ে একটি নতুন ও উন্নত ধরণের আদর্শ রূপসৃষ্টি। শিল্পীর বিশিষ্ট শক্তি হ'ল কোন বস্তুর বিশিষ্ট রূপ দান এবং এই জাতীয় রূপায়ণ স্বাভাবিক যুগে প্রায় অজ্ঞাতই ছিল।

বাস্তবিক পক্ষে আধুনিক শিল্পের "গূঢ় অর্থ" সম্বন্ধে সমালোচকের যথেষ্ট বক্তব্য আছে। কিন্তু এই সকল গূঢ়তত্ত্ব ও অর্থ সম্বন্ধে কখনও কিছু শোনা বা জানা যায় নি। পক্ষান্তরে আমাদের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের একটিতে নিযুক্ত সমসাময়িক শিল্প-ইতিহাসের জনৈক অধ্যাপক যিনি যুবসমাজের শিক্ষাদাতা, তাঁরই কথা উদ্ধৃত করা যাক,—"শিল্পীর রচনা যে দুর্বোধ্য হবে তা ত স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী। কারণ, উদ্দীপনা, বিহ্বলতা ও মোহিনীশক্তির দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ তাঁর সংবেদনশীল মন আত্মপ্রকাশ করেছে এক অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়ের নিগূঢ় ও প্রত্যক্ষ অনুভূত সত্যের ভাষায়।" অর্থাৎ শিল্পী সবুজ মাঠের রূপকল্পনায় ছেলেমো ভাবের প্রকাশ করবে এই-ই আশা করা হয়। আধুনিক শিল্পীরা শিল্পের মধ্যে প্রকাশিত নির্দ্দিষ্ট রকমের গূঢ় অর্থকে কিরূপ তিক্ত-বিরক্ত ভাবে ও নিরুৎসাহের দৃষ্টিতে বিচার করেন তা বোঝা যায়, ব্লেকের মূর্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে মিঃ কেনের সাম্প্রতিক কয়েকটি মন্তব্য দেখে। তিনি বলেছেন,—"ব্লেকের প্রতিভার নিদর্শন এই সকল অতি-চমৎকার শিল্পকর্ম্মের প্রত্যেকটি খুঁটি-নাটির অর্থ উদ্ধার করতে গেলে উহাকে রুচিবিরুদ্ধ মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে উহা যে বিশেষ অর্থপূর্ণ, সে কথা আজ অস্বীকার করবার উপায় নেই এবং ব্লেক স্বয়ংও তাঁর শিল্পের মধ্যে অবশ্যই একটা গভীর গূঢ় অর্থ উপলব্ধি করেছিলেন।"

বিপরীত পক্ষে, শিল্প সম্বন্ধে স্বাভাবিক মতটিতে দেখা যায় যে, সৌন্দর্য্য ও জ্ঞানাংশক বিষয়সমূহ একযোগে থাকা চাই। তা না হ'লে শিল্প হয়ে ওঠে একটি গাণিতিক সমীকরণের সামিল। আর শিল্পবস্তুর খুঁটিনাটির মধ্যে দুর্বোধ্য ভাব ও ভুল-ভ্রান্তি যদি কিছু থাকে, তাও হয় নিষ্ফল ও অসার। এই সম্পর্কে অধ্যাপক টকাক্স্ খুব সুন্দরভাবে বলেছেন,—"প্রাচ্য আদর্শে কোন অঙ্গ অবয়বের অস্পষ্ট রূপ ও আবছা ভাব এবং কোন অসম্পূর্ণ আকৃতিকে পুরোপুরি শিল্পের মর্য্যাদা দেওয়া যায় না।" কোন শিল্পবস্তুর বাহ্যরূপ অথবা, আধ্যাত্মিক মূল্য আমরা বিচার করি কি না-করি সে স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু উহার সৃষ্টির মূলে একটা কার্য্যকরী আদর্শ থাকবেই।

শিল্পকথা প্রসঙ্গে টলষ্টয় কিন্তু খুব সুন্দরভাবে বলেছেন যে, শিল্প হবে মুখ্যতঃ আলাপচারী। উহা কিছু না কিছু প্রকাশ করবেই। তা ছাড়া উদ্দেশ্যের দিকে শিল্প হবে মানবধর্ম্মী। এই মন্তব্যসমূহের বিচারে বলা যায় যে, শিল্পমধ্যে যাই-ই প্রকাশিত হবে—তা যেন মানসিক ও নৈতিক—উভয় দিকে মূল্যবান্ হয়। এই জাতীয় বিচারে তিনি প্লেটো ও অ্যারিষ্টটলের অলঙ্কার শাস্ত্র সম্বন্ধীয় মতবাদের সঙ্গে সমভাবাপন্ন হয়ে গেছেন। এজন্য এ ধারণা করাও সমীচীন নয় যে, একজন শিল্পী ও একটি সাধারণ মানুষে গুণগত কোন পার্থক্য থাকবে না। কিন্তু একজন পরিপূর্ণ মানুষের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার গুণই থাকা বাঞ্ছনীয়। আর সনাতন অনন্ত মানুষ যিনি, তিনি একাধারে শিল্পী ও পৃষ্ঠপোষক দুই-ই। সুতরাং তাঁকে জেনে নিতে হবে কোন্‌টি বাস্তবিক করণীয় এবং তা কেমন ক'রে করতে হয়। কোন জিনিস সঠিকভাবে গ'ড়ে তোলা বা সৃষ্টি করা শুধু কৌশলের উপরই নির্ভর করে না; উহার সঙ্গে চাই উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের মিলন; আবার নিছক বুদ্ধির দীপ্তিতেও সম্ভব হয় না—তার সঙ্গে আরও চাই ইচ্ছাশক্তির সমন্বয়। শিল্পীর যদি কেবলমাত্র কর্ম্মকুশল হলেই চলে, তা হ'লে সাধারণ মানুষেরও একটা সৎ উদ্দেশ্য থাকলেই চলতে পারে।

খ্রীষ্টীয় শিল্পের প্রারম্ভিক রচনাবলীতে পরিস্ফুট হয়েছে সুপরিণতিমূলক অবনতি-প্রসূত অবাস্তবতা থেকে স্বাভাবিকতার পথে প্রত্যাগমন। সেই অবনতির সূচনা-কালে, বর্ত্তমান যুগের মতই, শিল্পীরা নিজেদের তাগিদে এবং আত্মপ্রচারের উদ্দেশ্যেই শিল্পচর্চ্চা করতেন। অগাস্টাইনের মতবাদের মধ্যে এই পরিবর্ত্তন বিশেষ স্পষ্ট-ভাবে প্রকট হয়েছে, যখন তিনি ভ্রান্তিকর কূটতর্কের (sophistry) সমালোচনা করতে গিয়ে বললেন,—"যে কথা বক্তব্যের দায়িত্ব এড়িয়ে কেবল শব্দালঙ্কারের বোঝায় ভারী হয়ে ওঠে—তাই-ই হ'ল ভ্রান্তিমূলক তর্ক।" বলডুইনের মতে অগাস্টাইনের নিজস্ব আলঙ্কারিক বাক্য-বিন্যাসও সুদূর অতীতকালের যাযাবর মানবসমাজ কর্ত্তৃক ব্যক্তিবিশেষের জয়গানের ধারাবাহিক পদ্ধতি থেকে সত্য সন্ধানের প্রেরণা লাভের আদর্শেরই সমধর্ম্মী; আর প্লেটোর সেই মারাত্মক প্রশ্ন যে, কূটতার্কিকেরা মানুষকে কি বিষয়ে এত বক্তার করে তোলে এবং অ্যারিস্টটলের অলঙ্কার-শাস্ত্রীয় মতবাদ যাতে বক্তা অপেক্ষা সত্য প্রকাশের দিকে প্রবণতা অধিক, প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গেও সাদৃশ্যযুক্ত।

বিপরীতপক্ষে আমাদের এই বর্ত্তমান যুগ 'তার্কিক-

তার দ্বিতীয় পর্য্যায়ে' পুনরাগমন করেছে। আমরা আবার সত্য ও সৌন্দর্য্যকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্রভাবে মূল্য নির্দ্ধারণের কথা চিন্তা করছি। আমরা যে ধরণের শিল্প-সৃষ্টি করছি—প্লেটো তাকে বলেছেন তোষামুদে স্তুতি-বাদের সামগ্রী; শিক্ষাপ্রদ নয়, বরং আপাতরমণীয় অর্থাৎ কর্ম্ম বা সাধনার উপযোগী না হয়ে কেবল বিলাস-ব্যসনের উপকরণমাত্র। অথচ সমস্ত স্বাভাবিক কালে শিল্প ছিল মননশীল ধ্যানপরায়ণ জীবনেরই অঙ্গ। এর থেকে সাধারণ দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে যে, আমরা মনে করি যে, বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ এবং প্লেটো ও দান্তের রচনাবলী এখন আমাদের কাছে সম্মানযোগ্য কদর না পেলেও সাহিত্যিক ও সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যানের দিকে মূল্যবান্ বলেই অদ্যাপি উহা পাঠের প্রচলন রয়েছে। প্রাচীন যুগের ও প্রাচ্যদেশীয় চাক্ষুষ শিল্পকেও অনুরূপ ভাবেই আমরা বিচার করে থাকি; আর সর্ব্বদাই উহাকে সাধারণ প্রকৃতির অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য অথবা জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে বিবেচনা না করে একটু রসাল, একটু বিশিষ্ট এবং যেন কিছুটা দুরস্ত বলেই মনে করি।

এর কারণ, এখন আর আমরা কতকগুলি সত্যঘটনা ছাড়া প্রকৃত সত্যের আদর্শকে উপলব্ধি করতে পারি না। আমরা শিল্পকে সাধারণ বস্তুর স্থূলাভিসিক্ত করেই চিন্তা ও বিচার করি। এইরূপ জড়বাদী ও ভাবপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের পক্ষে এত স্বাভাবিক যে, আদিম মানবের শিল্প সম্বন্ধে প্রায়শঃই শুনতে পাই যে, "দেহগঠন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোন জ্ঞানলাভের পূর্ব্বেই তাঁরা এই সকল শিল্প সৃষ্টি করেছিলেন।" অনেকের মতে হয়ত এ ধারণা একটা সাধারণ সুপ্রচলিত ধারণা মাত্র। কিন্তু এই বিষয়টি আমাদের সমস্ত শিল্পের ইতিহাসেই বেশ জোরালো ভাবে বিবৃত হয়েছে। আর যদিও শিল্পের ইতিহাসগ্রন্থসমূহে আদিম শিল্পের মহনীয় গুণরাজির প্রতি যথেষ্ট মৌখিক শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয়েছে, তথাপি উহার বিবর্ত্তন ও পরিণতি সম্বন্ধে ধারণা বিশেষ স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হয় নি। বস্তুতঃ শিল্প বিষয়ে আমাদের উপস্থিত জ্ঞান ও ধারণা এত সীমিত এবং তা আবার আমাদের নিজেদের পক্ষে এত আত্মতুষ্টিকর যে, বাস্তবিকই আমরা আদিম-মানব ও বর্ব্বর জাতির নৈরূপ্যবাদী শিল্পকে অল্প-বিস্তর আমাদের স্বকীয় অনুকরণবাদী নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রশংসনীয় প্রতিযোগিতার দিকে ঝুঁকে পড়তে দেখি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, আদিম অধিবাসী ও বর্ব্বর জাতির মানুষেরা "ঐ রকমই অঙ্কন করতেন"। কারণ, এর থেকে উন্নততর কোন রীতি-পদ্ধতিতে কেউ তাঁদের শিক্ষাদান করে নি।

এও অবশ্য অনস্বীকার্য্য যে, সকল প্রকার শিল্পই অনুকরণবাদী, অর্থাৎ শিল্পী যা চোখে দেখেছেন—তারই রূপায়ণ করে যাচ্ছেন। কিন্তু আজকের দিনে সে রকম সাদা চোখে দেখার প্রশ্ন নয়। এখন সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখা অন্তরের দেখা। আমরা ভুলে যাই যে ব্যক্তিবিশেষ যে দৃষ্টিতে একটি গাছকে দেখবে—অপরাপর ব্যক্তিরা হয়ত সেভাবে নাও দেখতে পারেন। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি আসল গাছের মধ্যে আরও অধিক কিছুর সন্ধান পেতে পারেন। এ বিষয়টি অন্য ভাবে বিচার করতে গেলে মূর্ত্তি-বিরোধিতার মূলে যে যুক্তিপূর্ণ বিশিষ্ট অর্থ আছে—তাকে বাস্তবিকই অস্বীকার করা হয়। আর উহাকে অস্বীকার করতে গেলে Tertullian-এর কথাই মনে পড়ে। তিনি বলেছেন যে, নোয়ার নৌকায় চেরাবিম ও সেরাফিমের সঙ্গে মূর্ত্তি-বিরোধিতার আদর্শের কোন সাদৃশ্য বা সম্বন্ধ নেই; আর একখানি সুবিস্তৃত দৃশ্যচিত্র অপেক্ষা একটি ক্রুশ বা একটি চক্রের মধ্যে হয়ত বিশ্বপ্রকৃতির সত্যরূপ অধিক উপলব্ধি করা যেতে পারে।

শিল্পের মধ্যে মুখ্যতঃ শিল্পীর আত্মপ্রচার ও জাঁকালো করে কিছু প্রকাশনার চেষ্টা অনবরত হওয়ার ফলে এমন একটা ভাবধারা গ'ড়ে উঠেছে যে, আজকের দিনে শিল্প-ইতিহাস বলতে কেবলমাত্র শিল্পীর জীবনকাহিনী অথবা, কোন শিল্পীগোষ্ঠীর কথা, তাঁদের বৈশিষ্ট্য, একের উপর অপরের প্রভাব ইত্যাদির বিবরণকেই বোঝায়। তাঁদের শিল্পকর্ম্মের মূলে যে অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য ও আদর্শ রয়েছে তার কোন আভাস ইঙ্গিত একেবারেই পাওয়া যায় না। শিল্প আলোচনা করতে বসে আমরা উহার রীতি পদ্ধতি বা শৈলীর প্রতিই অধিকতর রূপে মনো-নিবেশ ক'রে থাকি। অথচ এ বিষয়টি প্রায় আকস্মিক ও যথার্থ প্রত্যাশিত। তাও আবার এমন কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল যার কিছুই অনায়াসে বোধগম্য নয়, সৃষ্টি করাও চলে না, আর একটি সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা ব্যতীত উহার ব্যাখ্যাও সম্ভব নয়। শিল্পীর ব্যক্তিগত রুচি প্রবৃত্তিই হ'ল তাঁর রচনাশৈলীর উৎস। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা হ'ল স্বাভাবিক বৃত্তির শিল্পী হন বেহুঁস অর্থাৎ অচেতন মানুষ। এর মধ্যে যাঁরা নিজস্ব একটা স্বপ্নময় ভাবালুতাপূর্ণ জগতেই বাস করেন, তাঁরাই কেবল সচেতন ভাবে স্বকীয় একটি রীতি গঠন করতে পারেন। সেই সকল স্বাভাবিক যুগের

শিল্পকলার বিচার করতে গিয়ে আমাদের আলোচনার গতি যদি স্তব্ধ হয়ে যায়, তাতে বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নেই; বিশেষতঃ যখন ঐ যুগের শিল্পীরা কদাচিৎ তাঁদের রচনাবলী নামাঙ্কিত করতেন। তা ছাড়া কোন শিল্পীরই জীবনচরিত লিখনেরও রেওয়াজ ছিল না। উপরন্তু আমাদের এও মনে হয় না যে, স্বাভাবিক গতির শিল্প এমন একটা আদর্শের নিগড়ে বাঁধা ছিল যার বাইরে গিয়ে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি অথবা উহার বিশুদ্ধ তত্ত্বালোচনার কোন চিন্তা বা উপলব্ধির সাধনা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। মানুষ অবশ্যই তাঁর আত্মগত গণ্ডি থেকে নিজেকে কোন না কোন প্রকারে মুক্ত করে নিতে পারে, যেমন করে বিশেষ একটা অনুরক্তির বিষয়ের একটি অংশকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। আর এক্ষেত্রে হারানো ও প্রাপ্তি—এই দু'টি অভিব্যক্তিরই অর্থ এক। এবং এও মনে হয় না যে, বিশ্বস্রষ্টা মহান্ শিল্পীর যে 'রীতি', যার মধ্যে ধারাবাহিক ভাবে, সীমিতরূপে প্রকাশিত হয়েছে এক বিশুদ্ধ নির্ভেজাল কলাকৌশল তার মধ্যেও কোনরকম স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নেই। ফলে তার এই বিশ্বপটে তিনি মানুষ এবং ক্ষুদ্রতম ও সুক্ষ্মতম কীটানুকীটের রূপারোপও একই ভাবে ওজন ক'রে প্রত্যেকের স্বকীয় বিশিষ্টতা ও নিজত্ব বজায় রেখেই করেছেন। এই আদর্শেই কোন স্বাভাবিক ও সর্ব্ববাদীসম্মত সমাজে একই স্থাপত্য রীতিতে গীর্জ্জা ও সেতু নির্ম্মিত হলেও উদ্দেশ্য, উপযোগিতা ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

৩। পৃষ্ঠপোষক ও শিল্পী

সাধারণ মানুষও একজন পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠেন যখন জীবনের কোন প্রয়োজন মেটানর উদ্দেশ্যে তিনি নিজেকে এবং অপরকেও কোন কাজে নিযুক্ত করেন। তিনি স্বগত ভাবে অথবা, কোন প্রতিবেশীকে বলেন যে, তাঁর নিজের এবং তিনটি শিশুর জন্য একটি বাসগৃহ বা একটু আশ্রয়স্থল আবশ্যক, তখন তাঁর অন্তরের সুপ্ত শিল্পী অথবা, সেই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি হয়ত উত্তরে বলবেন, "হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, তোমার কয়েকটি কামরাযুক্ত একটি বাড়ীর দরকার।" এই ভাবে তাঁর মনপটে গ'ড়ে উঠবে একখানি সুন্দর গৃহের প্রতিচ্ছবি এবং তিনি যদি শিল্পী বা কারিগর হন, তবে তাঁর জানা থাকবে কি কি উপাদান কোথায় কি প্রকারে পাওয়া যেতে পারে; আর কেমন ক'রে গৃহ নির্ম্মাণের কাজ সুরু করা যেতে পারে। উপরন্তু পৃষ্ঠপোষক হয়ত প্রকাশ করলেন যে, তাঁর এমন আর একটি জিনিষের প্রয়োজন যা হবে তাঁর ধ্যান-সাধনার সহায়ক এবং তাঁর উপাসনা কর্ম্মেও ব্যবহৃত হতে পারে। এর জবাবেও শিল্পী বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, আপনি একটি মূর্ত্তিরও প্রয়োজন অনুভব করছেন। আমি আপনার জন্যে বিভিন্ন মূল্যের ক্রুশে-বিদ্ধ যীশুর প্রতিমূর্ত্তি অথবা একখানি মাদোনা মূর্ত্তি তৈরি করে দিতে পারি।" এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে শিল্পীকে এখন তাঁর পৃষ্ঠপোষকের প্রকৃত চাহিদা মেটাতে পারে এমন ভাবে কাজটি সম্পূর্ণ করতে হবে। শিল্পীর হাতে যদি তৈরি জিনিষ থাকে, তা হ'লেও উদ্দেশ্য ও আদর্শের দিকে কিছু রদ-বদল হবে না। পার্থক্য দাঁড়াবে এই যে, পৃষ্ঠপোষকের চাহিদা সম্বন্ধে শিল্পীর পূর্ব্ব ধারণা অনুযায়ীই জিনিস প্রস্তুত ক'রে বাজারে উপস্থিত করা হবে। আলোচ্য দু'টি ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, সাধারণ ভাবে শিল্পের উপলক্ষ্যই হ'ল মানুষ। এবং প্রতিটি শিল্পবস্তুই সৃষ্ট হয়ে থাকে কোন বিশেষ চাহিদা মেটানর জন্যে। কোন কিছু গড়ন বা নির্ম্মাণের মূল কারণ সর্ব্বদাই ঘটনাক্রমে উপস্থিত হয়। আর সেই নির্ম্মিতি মুখ্যতঃ ব্যবহারিক জীবনের উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে।

জীবনে কি কি অপরিহার্য্য? জৈব প্রকৃতির তারতম্য অনুসারে প্রয়োজনীয়তায়ও থাকে পার্থক্য। একটি শূকর-ছানার পক্ষে সহজ ভাবে আবর্জ্জনার আধারে প্রবেশ করার সুযোগই যথেষ্ট। কিন্তু এ ধারণা আজ অনেকেরই যে, মানুষ কেবলমাত্র "মোটা ভাত-কাপড়ের উপরে নির্ভর করে বেঁচে থাকে না।" পশুত্বের পর্য্যায় থেকে উন্নীত হয়ে বাস্তবিক মানুষের মত যদি তাকে বাঁচতে হয়, তবে মানসিক ও আধ্যাত্মিক দিকেও তার কতকগুলি প্রয়োজন থাকবেই। কোনদিনই সংস্থান না হলেও মানুষ আজীবন একখানি সুন্দর ও আরামদায়ক গৃহের প্রয়োজন অনুভব করে, আকাঙ্ক্ষা করেই যাবে। অতীত এবং বর্ত্তমান—কোন কালেরই কোন অসভ্য অমার্জ্জিত মানবসমাজের কথা উল্লেখ করা যায় না। আমরা যারা দু'টি ভিন্ন রীতির চর্চ্চা করে থাকি, তাদের লক্ষ্য করেই যা হয় বলা যেতে পারে। কারণ আমরা কতগুলি জিনিস প্রস্তুত করি দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের উদ্দেশ্যে; আর বাকী সবকিছু করি একমাত্র গূঢ় অর্থদ্যোতনার মানসে। শিল্পের সুপরিণতযুগের সায়াহ্নকালে প্রকৃতপক্ষে আমরাই প্রয়োজনের উর্দ্ধেকার সুক্ষ্ম চারুকলা ও ব্যবহারিক কারুকলার মধ্যে প্রভেদের প্রাচীর তুলে দিয়েছি। এই সকল অতীত যুগের এবং

বিশেষ করে আধুনিককালের বৈশিষ্ট্যই হ'ল যে, সমাজে অবিসম্বাদিতভাবে থাকবে দুই শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের মানুষ। এক শ্রেণী মেটাবে সমাজের আত্মিক ক্ষুধা; আর একদল সরবরাহ করবে দৈনন্দিন প্রয়োজনের দ্রব্য-সামগ্রী। প্রথমোক্তটি হ'ল কলাশিল্পীর পর্য্যায়ভুক্ত; দ্বিতীয়টি পড়ল শ্রমশিল্পীর কোঠায়।

শিল্পী-সম্প্রদায়কে নিয়ে এই সমাজবিন্যাসের নীতিগত সার্থকতা সম্বন্ধে আমরা বেশী কিছু আলোচনা করতে পারি না। শুধু রাস্কিনের অনুশাসনটিকেই স্মরণ করতে পারি—"চারুকলা-বর্জ্জিত শ্রমশিল্প বর্ব্বরতারই নামান্তর।" আর বলতে পারি যে, যে-সমাজ বর্ণ ও কর্ম্ম বিভাগের ভিত্তির উপর স্থাপিত, সেখানে শিল্পীদের মধ্যে স্বতন্ত্র শ্রেণী বা স্তর বিভাগের কোন প্রশ্নই ওঠে না। প্লেটো যেমন বলেছেন, "যত বেশী কাজ করা যায়, তত অধিক সহজে, অধিকতর সুফল পাওয়া যায়। যখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি বা প্রতিভা অনুযায়ী কিছু কাজ করেন, তখনই প্রতিটি মানুষের অন্তরে নিহিত আত্মার প্রতি সুবিচার করা হয়।"

পৃষ্ঠপোষক যিনি, তিনি অতি সাধারণ স্তরের লোকই হোন অথবা, আমাদের ন্যায় সংস্কৃতিবান্, শিল্পপ্রিয় ও উচ্চতর জীবনে অনুরক্ত মানুষই হোন—তাঁর উপরে এই সকল অবস্থার প্রভাবকে বিচার করতে হবে। ব্যবহারিক শিল্প থেকে সূক্ষ্ম উঁচু দরের শিল্পকে পৃথক্ ক'রে আর শ্রমজীবী ও শিল্পীর মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে মানুষের জীবনে ক্ষতিবৃদ্ধি সাধিত হয়েছে কতখানি? একটা বিরাট্ জনসমাজকে বুদ্ধিবৃত্তিহীন শ্রমজীবীতে পরিণত করে, আর অন্যদিকে একটি মুষ্টিমেয় মানব-গোষ্ঠীকে স্বেচ্ছায় সৌন্দর্য্যসাধনার সহায়ক বস্তু নির্ম্মাণের সুযোগ দান ক'রে কি ফল হয়েছে? কোন কাজ স্বকীয় ভাবেই অশুভ এবং জীবনের যা কিছু উচ্চতর, তার চর্চ্চা অবসর সময়েই করণীয়; আর পরিশ্রম লাঘবের পন্থাসমূহ সবই শাপে বর—এ কথা ধারণা করে—ব্যবহারকারীদের (মানুষ মাত্রই ব্যবহারকারী) কি লাভ-লোকসান হয়েছে? উঁচুদরের ওস্তাদ গায়কগণের গান যদি কোন প্রেক্ষাগৃহে অথবা, রেডিওর মারফতে শোনা যায়, তা হ'লে মনুষ্যত্বের দিকে উহার জন্য কি শিক্ষানবীশীর সঙ্গীতচর্চ্চা বন্ধ হয়ে যাবে, না গ্রামের বেহালাবাদকের মৃত্যুতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে, তা পূরণ হতে পারবে? কয়েকটি চারু ও কারুকলার সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলেই কি সব হ'ল? আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ও পরিবেশে মানসিক উৎকর্ষের দিকে যদি শিল্পের কোন মূল্য না থাকে—তা হ'লে কয়েকটি সংগ্রহ-শালা (Museums), বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিল্প শিক্ষা ও আলোচনা এবং সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ও কলাশিল্প বিষয়ক কিছু পরিমাণ সাহিত্যই কি আমাদের সেই অভাব উপযুক্ত পরিমাণে পূরণ করতে পারবে? বর্ত্তমানে আমাদের জীবনে ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রীর অবশিষ্ট নিদর্শনসমূহ যা প'ড়ে থাকবে, তা দিয়ে কি ক'রে ভবিষ্যতের মানুষ অন্ধকার সভ্যতার মূল্য বিচার ও নির্ণয় করবে? পৃথিবীর বর্ত্তমান যে-সকল জাতির সামাজিক বিন্যাস ও গার্হস্থ্য শিল্পের ক্ষেত্রে এখনও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় নি, তাঁরা কি আমাদের সভ্যতাকে প্রশংসা করে ও ভালবাসে, না ভয় করে বা ঘৃণা করে? ধরা যাক, আমাদের রুচি বুদ্ধি বিশেষ মার্জ্জিত ও শিক্ষিত হয়েছে এবং আমাদের একখানি কার্পেটের প্রয়োজন। তখন আমাদের সমুখে দু'টি রাস্তা খোলা থাকবে। হয় আমরা কিনব একখানি অতি প্রাচীন প্রাচ্যরীতির কার্পেট অথবা, বিশেষ পুরাতন আংটাওয়ালা পশমের কম্বল; না হয় ত প্রশস্ত তাঁতে প্রস্তুত বিশেষ রংএর একখানি কাপড়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আর সমসাময়িক কালে জাত বস্তু-সামগ্রী সম্বন্ধে সর্ব্বোত্তম যা করা যায়, তা হ'ল নেতিবাচক শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন; অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে, এর মধ্যে এমন কিছু দোষণীয়ও নেই অথবা ইহা কিছু ভাবব্যঞ্জনাময়ও নয়। এসব সাদাসিধে ধরনেরই জিনিস, আর তেমন গূঢ় অর্থ-সমৃদ্ধও নয়। অনুরূপ ভাবেই গৃহসজ্জার আসবাবের ব্যাপারেও আমাদের পক্ষে সম্ভব হলে একটি প্রাচীন কিছু, না হয়ত প্রাচীন দ্রব্যের একটি ভাল অনুলিপি বা অনু-করণমূলক জিনিষও অন্ততঃ সংগ্রহ করা উচিত। আমাদের সমাজের কারিগর সম্প্রদায়ের নিজস্বতা বলতে কিছু নেই, আমাদের মনের মত করে কিছু গড়নেরও ক্ষমতা নেই। তাঁদের উপজীবিকাই হচ্ছে প্রাচীন জিনিষকে অনুকরণ করা, না হয়ত কোন বস্তুতে যন্ত্রজাত অলঙ্করণ যোজনা করা, যা হয়ত অতি প্রয়োজনীয় বলেই সহ্য করা যেতে পারে। বর্ত্তমান যুগে উৎপন্ন দ্রব্যরাজি বিচার করলে মনে হবে যে, আধুনিক জগৎ বিশেষ আরামদায়ক হতে চলেছে; অন্য পক্ষে ঐ সকল জিনিষের মধ্যে প্রতিভাত হচ্ছে অদ্ভুতরকমের বুদ্ধিহীনতার ছাপ ও ব্যঞ্জনাবিহীন ভাব। আমাদের এও হয়ত প্রতীতি হয় না যে, আজ আমরা সংগ্রহশালাসমূহে যে সকল প্রাচীন জিনিষপত্র সংরক্ষণ করে থাকি, তা একদিন বাজারে প্রচলিত

সাধারণ ব্যবহারিক দ্রব্যই ছিল এবং উহা তখন ন্যায্য-মূল্যে ক্রয় করাও যেত।

আমাদের কাছে এও অবিশ্বাস্য যে, আজ আমরা যাঁদের বাধ্যতামূলক অবসর সময়ে শিক্ষিত করে তুলতে নানা চেষ্টা ও পরিকল্পনা করি এবং যাঁরা ভাগ্যক্রমে বেকারত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল বলেই সংস্কৃতি চর্চ্চার এই সুযোগ প্রাপ্ত, তাঁদের অপেক্ষা এই সকল বস্তুসামগ্রীর স্রষ্টা যাঁরা তাঁরা সমাজে ঢের বেশী সুখী, বেশী বুদ্ধিমান্ ও সভ্য। সিংহলে বংশপরম্পরাগত কারুশিল্পীদের কাজে নিযুক্ত করবার সুযোগ আমার হয়েছিল। তাঁদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ ছিলেন স্মরণাতীত যুগপরম্পরায় স্থপতি, চিত্রকর এবং ছুতোর। আর এই সকল মানুষ আজ আমেরিকার ইস্পাত ও খনির স্বেচ্ছাধীন শ্রমিকের মতই শ্রেণী-বিরোধের কবলিতরূপেই নিজেদের মনে করতে শিখছে। দৈনিক বেতনে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বস্তু উৎপাদন করতেই হ'ত। এই জীবিকা বা বৃত্তি তাঁদের স্বকীয় জীবনের এমন বিশেষ একটি অঙ্গস্বরূপ হয়ে উঠেছিল যে, তারা যে কেবল সারাদিন ধরেই কাজ করত তা নয়, রাত্রে বাতি জ্বেলেও কাজ চালাত। অথচ বাস্তবে তারা আর্থিক দিকে লাভবান্ না হয়ে বরং ক্ষতিগ্রস্ত হ'ত। তাদের হাতের সেই সকল সৃষ্টিসম্ভার আজ সংগ্রহশালা-সমূহে স্থান অধিকার করেছে।

আমাদের উদ্ভাবিত এই সভ্যতা সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করতে যেটুকু সময় আবশ্যক হয়, তার চেয়ে অনেক দ্রুত উহাকে ধ্বংস করতে পারে। এবং ব্যবহারকারীকে কিছু প্রদান অপেক্ষা যে অধিক বঞ্চনা করা হয়, তা যে কোনপ্রকার প্রয়োজনীয় বস্তুর গণ্ডির মধ্যে দিয়েই সুপরিস্ফুট হয়। মূলতঃ এক স্বাভাবিক সমাজে বাস করেও শিল্প সম্বন্ধে প্লেটোর কিরূপ ভাবাপন্ন হওয়া উচিত ছিল তা অধ্যাপক ম্যাকমোহনের ভাষায় ব্যাখ্যাত হতে দেখে আমাদের আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই। তিনি বলেছেন, "আমরা আজ শিল্প বলতে যা বুঝি, তার প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে বিদ্বেষপরায়ণ।" এই উক্তিটির সঙ্গে নির্ব্বিবাদে আরও একটি কথা যুক্ত করা যেতে পারে যে, "সভ্যতা বলতে আজ যা কিছু বোঝায়, উহা প্রায় সবকিছুর প্রতি সক্রিয়ভাবে বিদ্বেষভাবাপন্ন।"

শিল্পী ও পৃষ্ঠপোষক সম্বন্ধে যা আলোচিত হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে পুনরায় ফিরে যাওয়া যাক। প্রাক্-নব-জাগরণের যুগে যেমন কোন জিনিষের স্রষ্টাকে কারিগর আখ্যা দান করা হ'ত, অর্থাৎ "শিল্পনৈপুণ্য দ্বারা রচিত কোন বস্তুর স্রষ্টা", তেমনি পুনর্জ্জাগরণোত্তর কালে মানুষ ও তার নামকে কেটে দু'টি ভাগ করা হয়েছিল। যার ফলে এক পর্য্যায়ভুক্ত হয়েছিল এমন শিল্পী মানুষ যারা কাজে নিযুক্ত হ'ল চিত্রশালার মধ্যে, আর উহার বিপরীত দিকে রইল কারখানায় কর্ম্মে রত শ্রমিক-সম্প্রদায়। এরিকগিল যেমন বলেছেন, "আমরা যেন এই কথাই বলতে চাই যে, কারখানার কর্ম্মিগণের মন বলতে কিছু নেই (তাঁদের অবসর সময় ব্যতীত); কিন্তু সেই স্বতন্ত্র শ্রেণীর মানুষ যাঁদের শিল্পী আখ্যা দেওয়া হয়, তাঁদের আবার মন ব্যতীত কিছুই নেই।" এইরূপে মানুষের দু'টি অংশই দেবভাবাপন্ন পূর্ণতার দিকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এই পূর্ণতা বা নিখুঁত ভাব সম্বন্ধে সকলপ্রকার রীতি বা ধারার মধ্যে কোন স্বতন্ত্র ভাব নেই। উহা হ'ল একটি সত্তা ও দু'টি প্রকৃতিরই সম্পূর্ণতা, যা হ'ল যুগপৎ ধ্যান-পরায়ণ ও কার্য্যকরী।
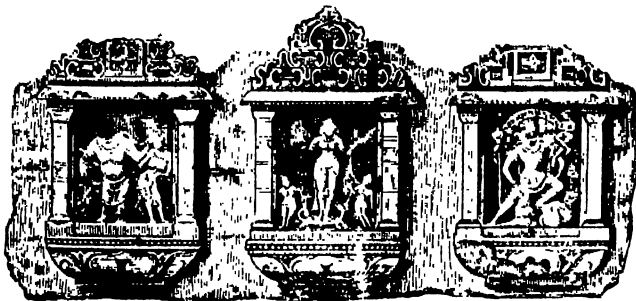
বাসা বদল

শ্রীরঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়

সারাটা রাত স্রেফ জেগে জেগে কেটেছে, পলকের জন্যেও দু' চোখের পাতা এক করতে পারে নি মমতা। রাত-প্রহরী কনস্টেবলের বুটের আওয়াজে রাস্তার কুকুর-গুলো চিৎকার ক'রে উঠেছে কখন, রোঁয়া-ওঠা ময়লা বেড়ালটা এঁটো বাসনের গাদায় খুটখাট্ করেছে ক'বার, রেললাইনের ধারে হিন্দুস্থানী কুলি-ব্যারাকের মাতাল মহানন্দ আনন্দ করতে করতে ফিরেছে কত রাতে, সবই একে একে ব'লে যেতে পারে সে।

প্রথম রাতে বার-দুই উঠে পায়চারি করেছে, ঘাড়ে-মুখে জল ছিটিয়েছে, একখানা বই নিয়েও বসেছে খানিক, কিন্তু ঘুম যেন অগস্ত্য-যাত্রা করেছিল চোখ থেকে, আর ফেরে নি। অতীনকে ডাকতে গিয়েও ডাকে নি, সারা-দিনের পরিশ্রমের পর ওকে আর বিরক্ত করতে ইচ্ছে হয় নি মমতার। আনন্দ মানুষের ঘুম কেড়ে নেয়? মনে মনে ভেবেছে মমতা। কোন গুপ্তধন কিংবা লটারীর টিকিট পাওয়া নয়, চাকরিতে স্বামীর প্রমোশন কিংবা বিদেশে ছেলের উন্নতির খবর পাওয়াও নয়, শুধু মনের মতন একখানা ফ্ল্যাট ভাড়া পাওয়া। তাও হয়ত নয়। আবার ভেবেছে মমতা, তবে কিসের আনন্দ? উত্তর কলকাতার উত্তরতম প্রান্তের এই নরক থেকে মুক্তি পেতে চলেছে ব'লে? নরক নয়ত কি—কতকগুলো গেঁয়ো, অশিক্ষিত লোক, যাদের আচার-ব্যবহারে কোন রুচি নেই, যারা দিনরাত শুধু এর-ওর-তার সঙ্গে কোঁদল ক'রে বেড়ায়, কেঁচো-কেন্নোর মত ঘরভরা গুচ্ছের ছেলেমেয়ে নিয়ে যারা শুধু পশুর জীবন যাপন করে—তাদের পাড়াকে নরক ছাড়া আর কি ভাবতে পারে মমতা!

অনেকক্ষণ থেকেই একটা মশা ভন্‌ভন্ করছিল মমতার মুখের কাছে। কখনও চোখের পাতায়, কখনও নাকের ডগায়, কখনও বা কানের পাতায় বসছিল আর সুড়সুড়ি দিচ্ছিল। হাত নেড়ে নেড়ে অনেকবার তাড়িয়েছে মমতা, কিন্তু এবার যেন একটু বিরক্ত হয়ে উঠল। 'ফ্লিট' ছড়ালেও মরে না এ পাড়ার মশাগুলো; আর, একটু ফাঁক পেয়েছে কি ঢুকে পড়েছে মশারির মধ্যে। হরিপালের মশা যে অমন বিখ্যাত, তাও বোধ হয় এমন নয়।

ধড়মড় ক'রে উঠে পড়ল মমতা, আলো জ্বালল, খসে-পড়া আঁচলটা কাঁধের ওপর টেনে দিয়ে মশারির ভেতর ঢুকল আবার। দীপুর মুখে হাত বুলোল একবার। মশার কামড়ে লাল হয়ে উঠেছে কয়েক জায়গায়। ওপাশে অতীন শুয়ে, ঘুমে বেঘোর। হাত চাপড়ে কয়েকটা মশা মারল মমতা। রক্তে টোবা টোবা হয়ে ছিল যেন। বিছানার কোণগুলো ঠিক ক'রে দিল একবার, স'রে-যাওয়া লেপটা টেনে দিল অতীনের গলা অবধি, তার পর আলোটা নিভোতে গিয়ে হঠাৎ যেন চমকে উঠল মেঝেয় চোখ পড়তেই। খাটের পায়ার কাছে ওটা কি প'ড়ে? মাথা নিচু ক'রে দেখল মমতা। বরবটির টুকরো। গেল মঙ্গলবার থেকে, মাঝরাতে একটা বিছে কামড়াবার পর, কেমন একটা ভয় ধ'রে গেছে তার। মেঝেয় টুকরো কিছু প'ড়ে থাকলেই চমকে ওঠে। মনে পড়ে বিছেটার কামড়। রাত ভোর, পর-দিনও দুপুর পর্যন্ত প্রায়, ছট্‌ফট্ ক'রে বেরিয়েছে সে। শিরায় শিরায় সে কি টান আর জ্বলুনি!

মান্ধাতার আমলের বাড়ী। যেমন অন্ধকার, তেমনি স্যাঁতসেঁতে। এক বাঘ-ভাল্লুক ছাড়া সবরকম জীবেরই আনাগোনা এখানে। এমন জায়গায় মানুষে বাস করে? অন্ধকারেই আস্তে আস্তে দীপুর মাথায়-মুখে হাত বুলোতে থাকে মমতা। ভুগে ভুগে ছেলেটা সারা। একটা মাস পুরো যায় না, সুস্থ থাকে। আজ বমি, কাল পায়খানা। সর্দি-জ্বর ত হামেশাই লেগে আছে। আলো নেই, হাওয়া নেই, হাত-পা ছড়িয়ে একটু খেলবে, এমন একটা উঠোন পর্যন্ত না। তাই কি একটু বাইরে বেরোবার জো আছে! যত সব ছোটলোকের বাস এ-পাড়ায়। সারা গায়ে গুচ্ছের খোস-চুলকানি নিয়ে কেলে-কেলে ছেলেমেয়েগুলো এর-ওর-তার সঙ্গে কেবল ঝগড়া বাধায় আর খিস্তি-খেউড় ক'রে মরে। বাপ-মায়েরাই বা কি! তারাই বা কোন্ ভদ্রলোক যে ছেলেপুলেগুলো শান্ত-সুধারা হবে!

ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরল অতীন। শব্দ পেয়ে 'মিটসেফের' তলা থেকে একটা ছুঁচোই বোধ হয় ছুটে পালাল ঘরের এধার থেকে ওধারে। এতক্ষণে খেয়াল

হ'ল মমতার, ঘরের নালাটা বন্ধ করা হয় নি। থাকগে, নষ্ট করার মত কোন খাবার ত আর নেই খাটের তলায়! কিন্তু—যদি পায়া বেয়ে বেয়ে বিছানায় উঠে আসে? একবার ত এসেছিল, আর তার চিহ্নটা এই ক'বছরেও অতীনের পা থেকে মুছে যায় নি। অনেক টাকা খরচ হয়েছিল সেবার।

আবার উঠল মমতা, আলো জ্বালল, তাকাল নালার দিকে। কিন্তু নালা ত বন্ধ করাই আছে। তবে ঢুকল কোন্ চুলো দিয়ে আবার? বিরক্তিতে গজ্ গজ্ করতে করতে এধারে-ওধারে, মিটসেফের পাশে, খাটের তলায় —সব ক'টা জায়গাই ভাল ক'রে লক্ষ্য করল মমতা, পা দিয়ে মেঝের ওপর আওয়াজও করল বার দুই-তিন, কিন্তু না ছুঁচো, না কোন গর্ত—কিছুই চোখে পড়ল না তার। শেষে, দরজার কোণায় সেই পুরনো গর্তটা—যেটা এই সেদিনও খানিক সিমেণ্ট দিয়ে বুজিয়ে দিয়েছিল সে, চোখে পড়ল। তাড়াতাড়িতে পা-মোছা ঝাড়নটাই সেখানে গুঁজে দিল মমতা। কে জানে, যদি আবার ঢোকে।

কিছুতেই আজ আর ঘুম আসছে না মমতার চোখে। কি যে হয়েছে, সে নিজেই বুঝতে পারে না। এদিকে রাত ক্রমেই শেষ হয়ে আসছে। ভোরে উঠে কত কাজ। রান্নাবান্না ত আছেই, তা ছাড়া কত বাড়তি কাজও আছে কাল। বাড়ী বদলের ঝামেলা কি কম! এটা গুছোও রে, ওটা গুছোও রে, এটা পাড়ো, ওটা তোল। কাচের বাসন না ভাঙে, পাথরের থালা-বাটি না দু'খান হয়, লক্ষ্মীর পাট সামলাও, বইপত্তর, খাতা কাগজ না হারায়, তোরঙ্গ-স্যুটকেশ বার কর, বাসনপত্র না খোয়া যায় দেখ—আরও কত কি! সেবার বাসা পাল্টানোর সময় দিদিমার দেওয়া খাগড়াই কাঁসার অমন ভারি গেলাসটা যে কোথায় গেল, কে নিয়ে গেল, ধরতেই পারল না মমতা! শুধু কি তাই, অতীনের মাফ্‌লার আর তার নিজের নতুন শাড়িখানাও যেন হঠাৎ উধাও হয়ে গেল। পাঁচ-ভিড়ের মধ্যে কে যে সরাল, নজরই করতে পারল না সে।

ঘোষেদের বাড়ীর ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে চারটে বাজল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ময়লা গাড়ীর আওয়াজ উঠবে, নোংরা পরিষ্কার করবে মেথরেরা। মোড়ের মাথায় ঘেউ ঘেউ ক'রে ছুটোছুটি করবে নেড়ী কুকুর দুটো, তাদের পিছু পিছু চার-ছ'টা ছানাও। আর সঙ্গে সঙ্গে অশ্রাব্য গালি দিতে দিতে ঘড়ঘড় ক'রে তাদের দিকে ময়লা গাড়ীটা এগিয়ে নিয়ে যাবে হিন্দুস্থানী মেথরটা। তার একটু পরেই ভাঙা গলায় চিৎকার ক'রে নামগান করতে করতে গঙ্গাস্নানে যাবে চরণদাস পণ্ডিত।

পণ্ডিত না ছাই! মমতা আগেও ভেবেছে, এখনও ভাবল। ভোরবেলা গঙ্গাস্নান করবে আর সারাদিন মোড়ের মাথায় চায়ের দোকানে ব'সে পরের ঘরের বৌ-ঝির কেচ্ছা গাইবে। বজ্জাতের শিরোমণি লোকটা। একবার তারও পেছনে দিনকতক লেগেছিল।

কিসের একটা শব্দ হ'ল না? বালিশের চাপ থেকে কানটা মুক্ত ক'রে নিল মমতা। নিশ্চয় ফেলার মা—দোতলার জানলা দিয়ে নোংরা ফেলল তাদের ঘরের পাশের সরু গলিটায়। ঘর বোঝাই ছেলেমেয়ে। ফি বছর হাসপাতালে যায়। কতদিন বারণ ক'রে দিয়েছে মমতা, এ ঘরে তারা শোয়, গন্ধে টিঁকতে পারে না, বাচ্চার নোংরা-টোংরাগুলো যেন একটু দূরে কোথাও ফেলে আসে; কিন্তু তা কি শুনবে? হেসে বলবে, 'কিছু মনে ক'রো না ভাই, ভুল হয়েছে।' পরে আবার ফেলবে! বেশি বললে তেড়ে আসে—'এ ত কারও কেনাকাটা রাস্তা নয়, সরকারী গলি। বেশ করব ফেলব। কচিকাচার ঘর হলে তুমিও ফেলতে।' ওর সঙ্গে যোগ দেবে চোদ্দ নম্বর বাড়ীর নিতাইয়ের মা। বৌটাকে দেখতে পারে না মমতা, শুধু মমতা কেন, এ পাড়ার অনেকেই। আজ চাট্টি চাল দাও, কাল দু'টো আলু দাও, কোনদিন গণ্ডা চারেক পয়সা দাও—নিত্যই এমন লেগে আছে। প্রথম প্রথম কত দিয়েছেও মমতা, কিন্তু ফেরৎ পায় নি কোনদিন। সংসারের অলক্ষ্মী! দুধো দুধো মেয়েগুলো মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়াবে কতকগুলো ছোঁড়ার সঙ্গে, নিজে ভিক্ষে ক'রে ক'রে বেড়াবে। শেষের দিকে দিন দু'তিন ফিরিয়ে দিয়েছে মমতা, তাই আক্রোশ। স্বামীটা মাতাল, কাজকর্ম নেই, তাস-পাশা নিয়েই প'ড়ে আছে দিনরাত।

ব্রহ্মবান্ধব কি আর টিঁকবেন এ যাত্রায়? হঠাৎ কেন জানি মমতার চোখের সামনে ভেসে উঠল তাঁর জরাগ্রস্ত চেহারাটা। ওদেরই সামনের বাড়ীর একতলার ভাড়াটে। তিন ছেলের কেউই দেখে না, তাই মেয়ের কাছে প'ড়ে আছেন। মেয়ে-জামাইও ইদানীং সুনজরে দেখে না। বড় খিটখিটে আর বদমেজাজী, দিনরাত শাপ-শাপান্ত, গালাগাল-মন্দ। পঞ্চাশের পর থেকেই নাকি আত্মঘাতী হবার বাসনা জেগেছে, অথচ চুরাশী হ'ল। কলতলায় প'ড়ে গিয়ে সেদিন হাত-পা ভেঙেছেন, মাথা ফাটিয়েছেন। ডাক্তার ত আশা রাখেন না, তবে উনি এখনও রাখেন। সাত বছরের নাতনীকে আশ্বাস

দেন, সেরে উঠে চিড়িয়াখানায় বেড়াতে নিয়ে যাবেন; মেয়েকে বলেন, 'ঝগড়া করিস নে জামাইয়ের সঙ্গে, ক'দিন বাদে আমি নিজে তোকে ত্রিবেণীতে চান করিয়ে আনব।' বৃদ্ধের ওপর মমতার কেমন একটা যেন মায়া প'ড়ে গেছে। এই সেদিনও বাইরের রোয়াকে ব'সে তেল মেখেছেন, রোদ পুইয়েছেন। জানলা গোড়ায় তাকে দেখে ব'লে উঠেছেন, 'কি গো মেয়ে, শরীরটা তোমার শুকনো শুকনো দেখছি কেন!'

ওই বাড়ীরই দোতলার ভাড়াটে গণেশ হালদার, লোকটা বড় বদ। মমতা দু' চক্ষে দেখতে পারে না। অফিস থেকে ফিরে ঠায় ব'সে থাকবে জানলা গোড়ায় আর চেয়ে থাকবে তাদের ঘরের দিকে। জানলায় পর্দা টাঙানো ত বলতে গেলে ওরই জন্যে। সেবার অতীনের ফুল কিনে নিয়ে আসা দেখে সে কি টিটকিরি লোকটার। ঘরে বৌ আছে, তবু ছুঁকছুঁকুনির শেষ নেই। বৌটাও তেমনি, বুড়ী হতে চলল, এখনও সাজগোজের ঘটা কত! তবু যদি রূপ থাকত! আগের ভাড়াটেরা বরং লোক ভাল ছিল। স্বামী-স্ত্রী, তিনটি ছেলেমেয়ে। বৌটির বয়স অল্প, মমতার সঙ্গে বড় ভাব ছিল। সিমলে ষ্ট্রীটে উঠে গেছে মাস কয়েক হ'ল। উঠবে না কেন, এ হতচ্ছাড়া পাড়ায় কেউ থাকতে পারে? শুধু যা তারাই রয়ে গেল এই আট বচ্ছর। কত খোঁজাখুঁজি, কত বলা-কওয়া, এখানে ছোটা, ওখানে ছোটা, ঘর কি ছাই সহজে মেলে? শেষে—

অন্ধকারেও অতীনকে একবার লক্ষ্য করল মমতা। আজ সারাদিন কি কষ্টটাই না গেছে বেচারির। খেতে-করতে দুপুর গড়িয়ে গেছে, চান পর্যন্ত হয় নি। এক মাস সেলামী আর তিন মাসের ভাড়া অগ্রিম দিয়ে বিল কাটিয়ে তবে নিশ্চিন্দি। দক্ষিণ খোলা বড় বড় দু'খানা ঘর, দোতলার ওপর, সামনেই পার্ক। মমতা যা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। ভাড়াটা অবশ্য এখানকার তুলনায় অনেক বেশী, তা হোক। নিঃশ্বেস ফেলে বাঁচবে ত অন্ততঃ। কোন্ ঘরটা শোবার জন্যে ব্যবহার করবে ওরা? মনে মনে হিসেব করতে থাকে মমতা, রাস্তামুখো ঘরটা, না ভেতরেরটা? অতীনের মত, রাস্তার দিকের খানা, আর ওর ইচ্ছে ভেতরেরটা। রাস্তামুখো ঘরখানা ড্রয়িং রুম হলে বেশ হয়। দীপু পড়ল, কি লোকজন এলে বসল, গল্প করল। খান দুয়েক চেয়ার আরও কিনতে হবে। রান্নাঘরটাও বেশ বড়, অনেক-গুলো তাক-কুলুঙ্গীও আছে। জিনিসপত্র ফেলে ছড়িয়ে রাখা যাবে। এখানে দড়ির আলনা, ওখানে হুক, পেরেক—মাথা তুললে ঠোকা লাগা—এ সব কিছুর ভয় নেই।

একখানা আয়না লাগান দেরাজ এবার ও সুবিধে মত কিনে ফেলবে। ওর অনেক দিনের শখ। গরম পোশাক আর তোলা জামাকাপড়গুলো রাখা যায় ভাল ভাবে। তোরঙ্গটায় ধরে না। আর একটা কাঠের ক্যাশবাক্স। পিসিমার বাড়ীতে দেখে এসেছে ও, খুচরো পয়সা, কাগজপত্র, কি ছোটখাটো জিনিষপত্র বেশ রাখা যায়।

আর নয়। ভোর হয়ে এসেছে। মেথরের গাড়ী বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। এক-আধটা কাকও ডাকতে সুরু করেছে কুলী-ব্যারাকের ধারে নিম গাছের মাথায়। নেড়ী কুকুরের চীৎকারও ভেসে আসছে দূর থেকে।

উঠে পড়ল মমতা। আলগা খোঁপাটা ঠিক ক'রে নিল, তার পর মশারিটা একটু ফাঁক ক'রে আল্‌তো ভাবে মেঝেয় পা ফেলেছে কি পটাস ক'রে একটা শব্দ। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণায় যেন নাকটা কুঁচকে গেল তার। একটা আরশোলা মাড়িয়ে ফেলল বোধ হয়। তাড়াতাড়ি আলোটা জ্বালল সে, পলকের জন্যে মেঝের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ঘুরিয়ে নিল সঙ্গে সঙ্গে। গোড়ালিতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে এসে দরজা খুলল, তার পর সোজা কলতলা। জল দিয়ে ঘষে ঘষে পা-টা পরিষ্কার ক'রে নিল সে।

ঠাণ্ডা হাওয়ায় কি বিশ্রী একটা দুর্গন্ধ। মেথরে গলির ড্রেন খুলেছে নিশ্চয়। তাড়াতাড়ি নাক চাপা দিল মমতা। এখানে এই ক'বছরে সব কিছু সহ্য হয়ে গেছে তার, কিন্তু এই দুর্গন্ধটা আজও তার ধাতসওয়া হ'ল না। কতদিন বমি পর্যন্ত করে ফেলেছে সে গন্ধের চোটে। এ জায়গায় থাকলে মানুষে রোগে ভুগবে না ত কি! এ কি বাসের উপযুক্ত জায়গা—এ নরক! নরক!

বাজারের থলি হাতে বেরোচ্ছিল অতীন, এগিয়ে এসে মমতা বলল, গুচ্ছির শাকপাতা আজ আর এনো না, একটু মাছ কি আধসের টাক আলু হলেই হবে। ঘরে কপি আছে, বেগুন আছে, তাইতেই এবেলা-ওবেলা হয়ে যাবে'খন। কাল সকালে ত আর রান্নার পাট নেই। বাসি আনাজ রেখে লাভ কি?

অতীন এগোচ্ছিল, মমতা আবার বললে, স্টোভটা সারান হয়েছে কি না দেখো, নইলে অসুবিধে হবে কাল। কাল ত স্টোভেই রাঁধতে হবে। আর শোন, কয়লার দামটা অমনি মিটিয়ে দিয়ে এস। দুধের দাম আমি

মিটিয়ে দিয়েছি। আহা,—মমতার গলার স্বর একটু খাদে নেমে এল, লছমীর সে কি কান্না, বলে, 'আট বছর দুধ দিচ্ছি এ পাড়ায়, তোমার মত লোক দেখি নি।' দীপুর জন্যে আধ সের দুধ দিয়ে গেল অমনি। দাম নিলে না কিছুতেই। বললে, 'ও কি আমার কেউ নয় দিদিমণি?' আমি আবার ওকে একখানা পুরোনো কাপড় দিলাম, দীপুর দরুণ একটা ছেঁড়া কোট ছিল, সেখানাও দিলাম ওর ছেলের জন্যে। একগাল হাসি—খুব খুশী হয়েছে।

অতীন বললে, বেশ করেছ। আজ ত মঙ্গলবার; মুড়িওলা আর কেরোসিনওলাও ত আসবে, না?

হ্যাঁ, আসবে। ওদের দামটাও মিটিয়ে দেব।

কলতলায় ব'সে ঠিকে-ঝি আন্না একখানা কাঠের ওপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে থালা মাজছিল। বেরিয়ে এসে বললে, তোমরা চ'লে যাচ্ছ, আমাকে একটা নতুন কাপড় দিও দিদিমণি। আর ত দেবে না কখনো!

অতীন হাসল একটু, তার পর বেরিয়ে গেল। মমতা বললে, নতুন কাপড় ত এখন নেই, আমার একটা চাদর আছে, তোকে দেব'খন। ঠাণ্ডার সময় গায়ে দিস।

আন্না খুব খুশী। হাসতে গিয়ে মিশির ছোপ-ধরা সব ক'টা দাঁতই বেরিয়ে পড়ল তার। বলল, তা হ'লে ত খুবই ভাল হয় দিদিমণি। ভোরের বেলা ঠকঠক্ ক'রে কাঁপি, এমন একখানা 'কানি' নেই যে, গায়ে দিই।

ঘরের মেঝেয় একখানা মাদুর বিছিয়ে দীপু তার বই রাখার ছোট্ট স্যুটকেশটা পেড়ে বইগুলো একবার বার করছিল, আর একবার তুলছিল। এপাশে-ওপাশে ছড়ানো লাট্টু, গুলি, ছোট একখানা ব্যাট, নেট আর পালকের বল। মমতা ঘরে ঢুকতেই বলল, আমার হুইশিলটা চাঁদু নিয়ে গেছে মা, আমাকে বলেও নি।

দীপুর সংসারের ওপর একটু ঝুঁকে প'ড়ে মমতা বলল, তুমি দেখেছ নিয়ে যেতে? না দেখে—

দীপু জোরগলায় বলে উঠল, হ্যাঁ, আমি দেখেছি। কাল যখন এসেছিল—

কাল আবার চাঁদু কখন এল?

এল না? তুমি পাঁউরুটি দিলে, কলা দিলে—সেই যে সকালবেলা—

ও তাই বুঝি? তা নিয়ে গেছে, আবার দিয়ে যাবে'খন।

মুখে মমতা যাই বলুক, মনে মনে সে জানে, চাঁদু যদি হুইশিলটা নিয়ে গিয়েও থাকে, আর ফিরিয়ে দেবে না। ভারি চোর ছেলেগুলো—ওই চাঁদু আর বলাইটা। দীপু তখন আরও ছোট, ওর বাক্স থেকে একটা ছোট্ট দম-দেওয়া রেলগাড়ী হারিয়ে যায়। ক'দিন বাদে চাঁদুর বাড়ীতে গিয়ে মমতা সেটা দেখতে পেয়েছিল। ওকে কোন কথা জিগ্যেস করবার আগেই ওর মা বলেছিল, ধর্মতলা থেকে গাড়ীটা ওর বাবা কিনে এনেছে। চক্ষু-লজ্জায় আর কিছু বলতে পারে নি মমতা। বলাইটাও অমনি। একবার একটা ক্যাম্বিসের বল নিয়ে পালিয়ে-ছিল। দিলে না কিছুতেই। শেষে ওর মা পর্যন্ত তেড়ে এল। বললে, আমার ছেলে অমন চোর নয়—সে শিক্ষেই আমাদের নয়। দিনকতক ওদের আসা-যাওয়া বন্ধ ছিল। পরে দীপুই আবার ডেকে আনে। কি বলবে মমতা, ছোট ছেলে, ওদের কি আর লজ্জা-সরমের বালাই আছে, না মান-সম্মানের কিছু বোঝে? ওদের কি দোষ, বাপ-মা-ই ত 'নাই' দিয়ে দিয়ে ছেলেগুলোর সর্বনাশ করছে!

উনুনে ভাতের হাঁড়ি চাপাতে গিয়ে হঠাৎ মমতার মনে প'ড়ে যায় বীরুদার কথা। অতীনের বন্ধু। আজ এখানে খাবার কথা ব'লে এসেছে অতীন। আপদে-বিপদে ওই লোকটিই এই পাড়ায় আসা-ইস্তক ওদের দেখে আসছে। তাই এখান থেকে চ'লে যাবার আগে এক সঙ্গে দু' বন্ধু খেতে চায়। তাই নিমন্ত্রণ। আরও এক কুনকে চাল ধুয়ে হাঁড়িতে চাপিয়ে দিল মমতা। দুটো আলুও সেই সঙ্গে। আলুভাতে আর কড়াইয়ের ডাল বীরুদার বড় প্রিয় খাদ্য।

দীপু তখনও তার স্যুটকেশ গুছোচ্ছে দেখে মমতা বলল, হ্যাঁ রে, তোর কি আজ আর পড়া-টড়া হবে না? খালি স্যুটকেশ গুছোলেই চলবে? এদিকে ত আটটা বাজতে চলল। পড়বি-ই বা কখন, স্কুলেই বা যাবি কখন?

দীপু কোন কথা বলার আগেই সদরের দরজায় রিক্শা থামার আওয়াজ হ'ল। মমতা মুখ বাড়িয়ে দেখল অতীন। এক হাতে বাজারের থলে, আরেক হাতে দইয়ের ভাঁড়টা ধ'রে নামছে। কাঁধের ওপর একগোছা দড়ি, রিক্শার পা-দানিতে কতকগুলো মলাট কাগজ।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে মমতা বাজারের থলি আর দইয়ের ভাঁড়টা ধ'রে নিল। অতীন বলল, জিনিষপত্র বাঁধতে দড়ি আর মলাট লাগবে, তাই কিছু কিনে নিয়ে এলাম।

ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল দীপু। বলল, আমার বইয়ের মলাট হবে বাপি। আমি দু'খানা নেব।

রিক্শার দাম মিটিয়ে, মলাটগুলো নিয়ে অতীন ভেতরে চ'লে এল। বলল, রাস্তায় গণদেবের সঙ্গে দেখা হ'ল।

লরী ঠিক করেছে, টাকা তিরিশের মত পড়বে। কাল ভোর সাতটা নাগাদ আসবে।

জন-দুই কুলীর কথা বললে না কেন। এই সব ভারী ভারী জিনিষপত্র নামানো, তোলা—এসব কি কুলী নইলে চলে?

কুলী নিয়ে তুমি মাথা ঘামাও কেন? তোমার ডিপার্টমেণ্ট রান্না—তাই নিয়ে মাথা ঘামাবে,—ওহো, স্টোভের কথাটা একেবারে ভুলে গেলাম যে।

দেখলে ত কেন মাথা ঘামাই! কৃত্রিম কোপ প্রকাশ ক'রে মমতা চ'লে যাচ্ছিল, অতীন বললে, ডান হাতের কিছু বন্দোবস্ত আছে? খিদে পেয়েছে ভয়ঙ্কর।

নিশ্চয়ই আছে! হালুয়া খেতে চাও তৈরি আছে, এখুনি দিতে পারি। নয়ত রুটি আছে, সেঁকে দিচ্ছি। বল ত মুড়িও তেল-লঙ্কা দিয়ে মেখে দিতে পারি। যা বলবে তাই হবে।

মুড়ি দাও চাট্টি। অতীন বলল, দীপু কি খেল?

ওর যা বরাদ্দ—মুরগীর ডিম একটা, রুটি এক পিস। মুড়ি কি তেল দিয়ে মেখে দেব, না শুকনো খাবে?

যা ইচ্ছে দাও। খিদেয় নাড়ি-ভুঁড়ি পর্যন্ত হজম হবার জোগাড়! পরক্ষণেই গলার স্বরটা একটু খাদে নামিয়ে অতীন বললে, স্টোভটা কি এবেলা নইলে হবে না? আমাকে একটু কাজে বেরুতে হবে—

এবেলা কেন, ওবেলা না হলেও চলবে। তবে তাগাদাটা একবার দেওয়া। কাল চ'লে যাব, যদি না পাই ত আবার আসতে হবে তোমাকে—

তুমি কি একেবারেই এ পাড়ার মায়া কাটাতে চাও নাকি? আসতে ত হবেই। ডাইং ক্লিনিং-এ জামা-ধুতি রইল, স্কুল থেকে দীপুর ট্রান্সফার সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে আগামী সপ্তায়। একবার কেন, এখন অনেক-বারই আসতে হবে। ঘাবড়াবার কিছু নেই, মুড়িটা খেয়েই তোমার স্টোভ আমি এনে দিচ্ছি। এখন দাও দিকি চট্‌ ক'রে—

আমি বুঝি ঘাবড়াচ্ছি! কৃত্রিম ক্রোধে মুখখানা ভারি ক'রে মমতা চ'লে গেল।

কুলী-ব্যারাকের একটা হিন্দুস্থানী বৌ মমতাকে খুঁটে দেয়। রাস্তার ধারের রোয়াকে উঠে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, তোমরা এখান থেকে চ'লে যাচ্ছ মাইজি?

তেল-মাখা মুড়ির বাটিটা অতীনের হাতে ধ'রে দিয়ে মমতা বললে, হ্যাঁ গো মেয়ে, তোমরা ত আর আমাদের রাখলে না, কি করি বল—

কত দূরে যাচ্ছ?

নিজের হিন্দিতে নিজেই হাসতে হাসতে মমতা বললে, হেহুয়া জান্‌তা—হেহুয়া? হিঁয়াসে আধা ঘণ্টা লাগেগা। তুমি উধারমে কভি যাতা? হাম তুমকো হামার কুঠিকা নাম্বার দেগা। যব্‌ উধারমে যায়েগা—হামার কুঠিতে যাস, বুঝলি?

কথার শেষটা বাংলায় ব'লে খিলখিল ক'রে হেসে উঠল সে। হিন্দুস্থানী বৌটিও এতক্ষণ হাসছিল। বলল, হামি বাংলা বুঝে—তুমি বাংলামে বল—

আমি চ'লে যাচ্ছি, তুই কার কাছে খবর পেলি?

আমার ছেলের কাছে।

তাদের এ পাড়া থেকে উঠে যাবার খবর তা হ'লে সারা পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে? মনে মনে মমতা একটু খুশীই হ'ল বুঝি। তারা যে এ পাড়ায় থাকার লোক নয়, নেহাৎ দায়ে প'ড়েই ছিল এতদিন, এটা বুঝুক এ পাড়ার লোক। বলল. এবার যে ঘর পেয়েছি, খুব ভাল ঘর—বুঝলি? তুই যাস একদিন।

কবে যাবে?

কালই চ'লে যাব।

কালই! একটুক্ষণের জন্যে চুপ ক'রে থাকল হিন্দুস্থানী বৌটি। তার পর বলল, তুমি খুব ভাল লোক মাইজি। তোমার খোকাবাবুও খুব ভাল। হামার খুব ভাল লাগে ওকে। ছ'মাস তোমাকে ঘুঁটিয়া দিচ্ছে হামি, কভি গর্‌বর্‌ নেহি হুয়া—

হিন্দুস্থানী বৌটির কথাগুলো বড় ভাল লাগল মমতার। মিটসেফ থেকে দুটো কলা আর খান তিন-চার হাতে-গড়া রুটি এনে তার হাতে দিয়ে বললে, তোর ছেলেকে খেতে দিস বৌ। যাবার আগে একবার আসিস, কেমন?

সন্ধ্যের মুখে বেরুল অতীন। দীপুও ছাড়ল না কিছুতে, সঙ্গ নিল। মমতা বলল, বেশি দেরি ক'রো না, আমিও একবার বীরুদার বাড়ী যাব বৌদির সঙ্গে দেখা করতে। টুকুনের ঠাকুমার সঙ্গেও ইচ্ছে আছে একবার দেখা করার। চ'লে যাব কাল, বুড়ি অত করে আপদে-বিপদে, না দেখা করাটা অন্যায় হবে। তুমি এলে তবে বেরুতে পারব—

অতীনরা বেরিয়ে গেলে মমতা কাপড় বদলাল। দোরে-দোরে জল ছিটিয়ে লক্ষ্মীর পাটের প্রদীপটা জ্বালল, তার পর শাঁখটা তিনবার বাজিয়ে, ঠাকুর-প্রণাম সেরে দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো শ্বশুর-শাশুড়ীর ফটোর দিকে

নজর করতেই খেয়াল হ'ল সেগুলো নামিয়ে রাখা হয়েছে। মুহূর্তের জন্যে মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে উঠল মমতার। ঘরটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে। দেওয়ালগুলো আদল-গা। শুধু কয়েকটা পেরেক আর ফটোর ফ্রেমের মাপে ধুলোর দাগ। মশারির দড়ি, পুরণো ক্যালেণ্ডার, আর দীপুর স্বহস্ত-অঙ্কিত পেন্সিল-রেখায় মামদো ভূতের চেহারা। এ পাড়াতেই থাকে তপুরা—মা-মরা ছেলেটা মমতার বড় ন্যাওটা, ঝগড়া ক'রে এসে দেওয়ালে ওর ছবি এঁকেছিল দীপু, তলায় 'মামদো ভূত' কথাটা তাকে লক্ষ্য ক'রেই লেখা।

অনেকক্ষণ ধ'রে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল মমতা, হাসল একবার নিজের মনে। হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল তার, তপু ক'দিন আসছে না, জ্বর হয়েছিল শুনেছিল, কেমন আছে সে!

হাতে কোন কাজ ছিল না, বিছানাটা ঝেড়ে মশারিটা খাটাল মমতা। তার পর জানলাটা বন্ধ করতে গিয়ে কি ভেবে কে জানে, খুলে দিল হাট ক'রে। বসল ধারটিতে গিয়ে। রাস্তাটা অন্ধকার, আলো জ্বলে নি এখনও। হয়ত আজও লাইন বিগড়েছে। এধারে-ওধারে বাড়ীর জানলা-দরজা দিয়ে যা একটু-আধটু আলোর ফালি এসে পড়েছে। শীতের ধোঁয়ায় সার্চ লাইটের ফলার মত স্পষ্ট। দূরের কোন বাড়ী থেকে ভেসে আসছিল রেডিওর গান, এধার-ওধারের ঘর থেকে কোন পড়ুয়ার গলা, হিন্দুস্থানী কুলি-ব্যারাক থেকে কোন দুরন্ত ছেলের হুটোপুটির শব্দ। কখনো কখনো মাল-গাড়ী শান্টিং-এর ভোঁস ভোঁস।

অন্ধকার রাস্তায় চোখ মেলে চুপচাপ ব'সে ছিল মমতা আর লোক-চলাচল লক্ষ্য করছিল। বাড়ীটা বড় ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে, দীপু নেই, অতীন নেই—সেই কখন বেরিয়েছে, এখনও ফিরছে না। ওধার থেকে জন তিন-চার ছেলে আসছিল কলরব করতে করতে। মুখটা ঘুরিয়ে দেখল মমতা। দীপকের দল। লেখাপড়া করে না, কাজকর্ম নেই, সারাদিন রোয়াকে ব'সে আড্ডা দেয়। ওদের মধ্যে ননীগোপাল ছেলেটা একটু ভাল।

অন্ধকারে চলন্ত দলটা একটু দাঁড়িয়ে পড়ল। জানলার ধারে এগিয়ে এসে দীপক বলল, আপনারা কি কালই চ'লে যাচ্ছেন বৌদি?

হ্যাঁ ভাই, কালই যাচ্ছি। মাথার কাপড়টা অল্প একটু টেনে দিল মমতা।

কখন যাবেন?

সকালেই।

একটুক্ষণের জন্যে চুপ ক'রে রইল দীপক। তারপর বলল, পাড়াটা একেবারে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। আসছে হপ্তায় সুধীরবাবুরাও চ'লে যাবেন। বঁড়শেতে বাড়ী কিনেছেন। তবু যাই হোক, আপনারা ছিলেন, পাড়ায় পুজো-আচ্চাটা হ'ত, এবার বোধ হয় বন্ধ হয়ে যাবে।

কেন ভাই, বন্ধ হবে কেন, তোমরা ত আছ। আমরা আর কি কাজে লাগতাম!

কাজে না লাগলেও মাথা হয়ে ছিলেন। আপদে-বিপদে অতীনদার কত পরামর্শ নিয়েছি! সেবার সূর্য সংঘের সঙ্গে কালী পুজো নিয়ে ঝগড়া হবার সময় অতীনদা না থাকলে একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারি ঘটে যেত! অতীনদা ছিলেন বলেই ব্যাপারটা আপোষে মিটে গেল, নইলে হয়ত খুনোখুনি রক্তারক্তি হ'ত। যাকগে, কাল সকালে আসব'খন। আটটার আগে ত আর যাচ্ছেন না।

ওরা চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ জানলায় ব'সে রইল মমতা। ছেলেগুলো আড্ডা দিক আর যাই করুক, খুব ভদ্র। পাড়ার ভাল-মন্দয় আগ বাড়িয়ে যায়। বেচারামের মা ম'রে যাবার সময় চাঁদা তুলে ওরাই সদ্গতি করেছিল বুড়ীর। ব্রাহ্মণের বিধবা, হয়ত ঘরেই পচত, কিংবা কর্পোরেশনের গাড়ী এসে গাদায় নিয়ে গিয়ে ফেলত! ওরা ভার নেয় বলেই বছরান্তে পুজো-পার্বণগুলো এখনও হয় পাড়ায়।

চোদ্দ নম্বর বাড়ীর নিতাইয়ের মা একটা বাচ্চা ছেলে সঙ্গে কোথায় যেন চলেছিল। জানলায় মমতাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। বলল, চুপচাপ ব'সে আছ যে দিদি! বাড়ীতে কেউ নেই বুঝি? উত্তরের প্রতীক্ষা না ক'রে সে-ই আবার বলল, আমারও আজ বাড়ীতে কেউ নেই, কর্তা গেছে বে-বাড়ীতে। মেয়েগুলোও গেছে সব। আমার নিজের শরীরটা ভাল নেই, তাই আর গেলাম না। তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে: হ্যাঁ দিদি, তোমরা নাকি কালই এ পাড়ার মায়া কাটাচ্ছ? কোথায় যাচ্ছ ভাই?

অন্যদিন হলে মমতা হয়ত কথা বলত না, কিন্তু আজ শেষের দিনটায় মনটা যেন কেমন হয়ে গেল তার। বলল, যাচ্ছি ভাই হেদোর কাছাকাছি। যেও না একদিন—

যাব, নিশ্চয়ই যাব: এখানে থাকতে ত আর তোমার ঋণ শোধ করতে পারলাম না ভাই! ওটা শোধ করতেও যাব, অমনি বাসাটাও দেখে আসব।

মমতার মনটা যেন আজ ভয়ঙ্কর ভিজে মনে হ'ল।

বলল, ও সামান্ত ঋণের কথা আর তুলছেন কেন দিদি! ওটা আর দিতে হবে না। আপনি এমনিই একদিন যাবেন—

তুমি ত আর কেষ্ট চক্কোত্তির বৌ নও—তুমি যেমন ভাল ঘরের মেয়ে, তেমনি ভাল ঘরের বৌ—তুমি ত ও-কথা বলবেই ভাই। কেষ্টর বৌটা ও-বেলা আমায় কি অপমানটাই না করলে! শেষে বলে কিনা বেরিয়ে যাও বাড়ী থেকে! নিতাইয়ের মায়ের গলাটা ভারি হয়ে এল। কি বলব ভাই, বড় দুঃসময় পড়েছে, নইলে কি আর ও-কথা শুনতে হয়! সংসারে দুঃখীর মর্ম আর ক'জনা বোঝে! অথচ আমারও বাপের পয়সা ছিল, বাড়ী-ঘরদোর ছিল, আর যার হাতে বাপ তুলে দিয়েছিল আমায় চিরকালের জন্যে, সেও পথ-কুড়োনো ছেলে ছিল না। কি করব, অদেষ্ট—অদেষ্ট—পোড়া অদেষ্টর জন্যে আজ আমার এই হাল—

অন্ধকারেও মনে হ'ল নিতাইয়ের মায়ের চোখ দুটো জল-চিক্‌চিক্ করছে।

একটুক্ষণ চুপ থেকে মমতা বলল, সঙ্গে এটি কে ভাই?

ছেলেটার কাঁধে হাত রেখে নিতাইয়ের মা বলল, এটি আমার সম্পর্কে এক বোনপো হয়। বিশু দত্তের গলিতে উঠে এসেছে এরা আজ ক'দিন হ'ল। এখানকার দোকানপাট কিছু চেনে না। কোথায় আটা ভাঙাবে, কোথায় ঘুঁটে পাওয়া যায়, কয়লা পাওয়া যায় কিছুই জানে না। তাই একটু সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছি দেখিয়ে-চিনিয়ে দিতে। মধু গোয়ালার দুধ খেয়ে দু'দিনেই পেট ছেড়ে দিয়েছে এর বাচ্চা বোনটার। এই ত একটু আগেই নিয়ে গিয়েছিলাম আমাদের দুধওয়ালা মাগীটার কাছে—ওই যে কি নাম যেন—

মমতার নিজেরও ওই সমস্যার কথাটা মনে এল। নতুন পাড়ায়, নতুন জায়গায় ওকেও ভুগতে হবে এখন কিছুদিন। এখানে উঠে আসার পর যেমনটি হয়েছিল। কোথায় দোকানপাট, কোথায় কি, কার দুধে জল কম—খুঁজতে পেতে, ঠিক করতে বেশ কিছুদিন লেগেছিল। তার ওপর সব নগদ-নগদ কেনা। দুটি পয়সা কেউ বাকি রাখে না, তবু যাই হোক এ-পাড়ায় পাঁচটা বাচ্চা-কাচ্চা ছিল, বীরুদারা ছিলেন, অসুবিধে হয় নি বিশেষ। সেবার অতীনের অসুখের সময় কি কম সাহায্যটা সে পেয়েছিল ঝুমুদের কাছ থেকে! রাত দুপুরে কোথায় বরফ, কোথায় ডাক্তার, সে এক হুলুস্থুল ব্যাপার। ডাকবামাত্রই ছুটে এসেছিল ঝুমু—এতটুকুও মুখ ভার করেনি। কে জানে, নতুন পাড়ার বাসিন্দেরা হবে কেমন!

ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠতে যাচ্ছিল মমতা, হঠাৎ চোখ পড়ল সামনের দোরে। রিক্‌শা থেকে নামছিল একটি বৌ, দু-তিনটি বাচ্চা আর মাঝবয়সী একটি লোক।

লোকটা ব্রহ্মবান্ধবের মেজ ছেলে না? টুক ক'রে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে, ফের জানলায় এসে চোখ দুটো তীক্ষ্ণ করল মমতা। হ্যাঁ, তাই হবে, বছর তিনেক আগে ভাগ্নীর বিয়ের সময় এসেছিল। বৌটা এখন আরও মোটা হয়েছে।

ব্রহ্মবান্ধবের অসুখ কি বাড়াবাড়ি নাকি! জানলা দিয়ে ওদের ঘরটা একবার ভাল ক'রে লক্ষ্য করবার চেষ্টা করল মমতা। বড় ছেলেও এসেছে বোধ হয়। বৌটি ত দাঁড়িয়ে ঘরের চৌকাঠে।

কিন্তু অতীন, দীপু ফিরছে না কেন এখনও? ব'লে দিল সে অত ক'রে সকাল-সকাল ফিরতে! তা সেই দেরি! এদিকে আটটা বাজতে চলল, কখনই বা বীরুদের বাড়ী যাবে, টুকুনের ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করবে, আর কখনই বা রাতের খাবার ক'খানা তৈরি করবে!

তোলা উনুনটা ধরাতে যাচ্ছিল মমতা, অতীনরা এসে পড়ল। মমতা কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার আগেই বিরক্তি-ভরা কণ্ঠে অতীন বলল, আর বল কেন, ছত্রিশ জনের সঙ্গে কেবলই দেখা হয়ে যায়, আর হাজার রকম জবাবদিহি করতে হয়! আর তোমার এই ছেলেটিও হয়েছে তেমনি। যারই সঙ্গে দেখা হয়, 'আমরা এখান থেকে চ'লে যাচ্ছি, জানিস?' ব'লে খবরটা না জানালে যেন চলছিল না!

মমতা সে কথায় কোন কান দিল না। বলল, সামনের বাড়ীর বুড়োর অবস্থা বোধ হয় ভাল নয় গো! ছেলে-বৌরা সব এসে পড়েছে।...একবার দেখে এলে ভাল হ'ত। সামনা সামনি রয়েছি এতকাল, না গেলে বড় খারাপ দেখায়।

অতীন বলল, বেশ ত, একবার ঘুরে এস না! কিন্তু বীরুদার ওখানে যাবে কখন? এদিকে মেঘ করেছে খুব, এখুনি হয়ত জল নামবে! যা করবে তাড়াতাড়ি কর—

সারা শরীরে একটা অপরিসীম ক্লান্তি, নিদারুণ অবসাদ। চোখ দুটো যেন ঘুমে জড়িয়ে আসতে চায়। একবার ইচ্ছে হ'ল অতীনকে মমতা বলে, 'আজ পাঁউরুটি

কি মুড়ি খেয়ে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাক,' কিন্তু মাখা ময়দার তালটা দেখে চুপ ক'রে গেল সে।

দীপু বিছানায় গিয়ে শুয়ে ছিল, মমতা চেঁচিয়ে বলল, ঘুমোস নি যেন বাবা, এখুনি গরম গরম ভেজে দিচ্ছি।

বাইরে বৃষ্টি নেমেছিল, ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক আসছিল দরজা পথে। অতীন বলল, দরজাটা বন্ধ ক'রে দাও, নইলে ঠাণ্ডা লাগবে। সময়টা বড় খারাপ পড়েছে, চারধারে জ্বরজ্বালা হচ্ছে।

তপুটার নিমোনিয়ার মত হয়েছে। মমতা বলল, ক'দিন আগে খুব জলে ভিজেছিল ত! মা নেই, কাকীও নজর রাখে না ছেলেটার ওপর, আহা, আসবার সময় আঁচলটা টেনে ধরেছে—আসতে দেবে না কিছুতেই। বলে, তুমি বস মাসীমা, যাবে না! যত বলি 'বাবা আবার আসব,' শোনে না কিছুতেই। বলে, তোমরা ত চ'লে যাচ্ছ কাল এ-পাড়া থেকে, আর আসবে না! শেষে ওর কাকীই জোর ক'রে আঁচলটা ছাড়িয়ে নিল। সে কি কান্না ছেলেটার হাউ হাউ ক'রে—! কি করব, থাকবার যে উপায় নেই, নইলে কি আর ওই ছেলে ফেলে আসা যায়!

সামনের বাড়ীতে ঢুকেছিলে নাকি? বুড়োকে কেমন দেখলে?

বুড়োর অবস্থা ভাল নয়। ডাক্তারে জবাব দিয়ে গেছে। আজ দুপুর থেকে আবার উকি উঠছে।

কথাবার্তা বলছে?

বলছে মানে! জ্ঞান ত রয়েছে সম্পূর্ণ। এখন হয়েছে ছেলেমেয়ে সবাই ওর ভাল। অমন ছেলেমেয়ে ক'জনা পায়! আমি যেতেই, কষ্ট হচ্ছে, তবু হেসে বলল, এস মেয়ে, বস। ক'দিন বিছানায় প'ড়ে আছি, একবার উঁকি দিতেও কি নেই! মেজ ছেলের বড় ছেলেটা বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে না, বুড়ো বলছে, দাঁড়া, উঠি আগে বিছানা থেকে, তার পর দেখব ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা কতদিন থাকে। তোরা কেউ ভাবিস না, আমি ওর বিয়ের ভার নিচ্ছি—ও বৈরাগ্য আমরাও একদিন দেখিয়েছি!

কৌতুকের সুরে অতীন বলল, বুড়ো কি ভাবে, এ যাত্রায় ও উঠবে বিছানা থেকে?

না ভাবলে আর ও-কথা বলে! মেয়েকে বললে, নতুন বাজার থেকে ময়ূরপুচ্ছ আনিয়ে মধু দিয়ে মেড়ে দিতে! খেলে নাকি উকি ওঠা বন্ধ হবে।

সেকেলে মানুষ ত, পাঁচ রকম টোটকাটুটকির খবর জানে!

একখানা থালায় খান তিনেক পরটা আর খানিক আলুর তরকারি সাজিয়ে দীপুকে বিছানা থেকে তুলে আনল মমতা। বলল, নে বাবা, দু'খানা খেয়ে নিয়ে যত পারিস ঘুমো, কিচ্ছু বলব না। তার পর অতীনের উদ্দেশে বলল, তুমিও ব'সে যাও না, এই সঙ্গে। শীতের রাত, এখুনি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে খাবার।

ঘরের আলো নিভিয়ে মমতা যখন মশারির ভেতর ঢুকল, ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে এগারোটা। আজও রাত হয়ে গেল তার শুতে। ভেবেছিল সকাল সকাল কাজ সারবে, কিছুতেই আর হয়ে উঠল না। পাশের গলির নালায় ছরছর্ জলের আওয়াজটা একটু একটু ক'রে বাড়ছে মনে হ'ল, টিপটিপ বৃষ্টি বোধ হয় জোরে নামল।

অন্ধকারে চোখ বুজে অনেকক্ষণ প'ড়ে রইল মমতা। ক্লান্ত চোখ দুটো জ্বলছে সেই কখন থেকে, তবু ঘুম আসে না। আবোল তাবোল রাজ্যের চিন্তা দমকা হাওয়ার মত এসে তার ঘুমের ঘরে যেন ডাকাতি করতে শুরু করেছে। বোজা চোখের সামনে কেবলই ভেসে ওঠে পাড়াটার ছবি। এখানে সব মুখ চেনা, সবার কণ্ঠস্বর পরিচিত, ভালোয়-মন্দয় মেশানো লোকগুলোর সব রকম ব্যবহারই জানা হয়ে গেছে মমতার। আর ওখানে, ওদের নতুন বাড়ীর পাড়ায় একটি লোকও তার চেনা নয়, জানা নয়, একটি দিনের জন্যেও তাদের মুখ দেখে নি সে। তারা কেমন লোক, ভাল না মন্দ, মিশুকে না কুঁহলে, কিছুই জানে না সে। সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায় জড়ান দিনগুলো তাদের যে ঘরে, যে বাড়ীতে, যে পাড়ায় দীর্ঘকাল ধরে কেটেছে, সেখানে আজই তাদের শেষ রাত্রি যাপন। কাল থেকে তারা সম্পূর্ণ এক নতুন জগতের বাসিন্দা, তাদের পুরোনো এ পাড়াটা শুধু একটা স্মৃতি মাত্র হয়ে যাবে আর কয়েক ঘণ্টা পরে। শ্যাওলাধরা কলতলায় সকালের যে রোদ মাত্র ঘণ্টা কয়েকের জন্যে এসে একবার দেখা দিয়ে যায়, বিকেলের যে আলো পশ্চিমের জানলা দিয়ে মাত্র ক'টা মুহূর্তের জন্যে ঘরের ভেতর উঁকি দিয়ে যায়, সে রোদ আর সে আলো হয়ত ও বাড়ীতে আছে, কিন্তু তবু সে আর এ বুঝি এক জিনিস নয়। রোঁয়া-ওঠা মুখপোড়া কাক হয়ত ও পাড়াতেও আছে অনেক, তবু যে কাকটা সকাল বেলায় কলঘরের টিনের আড়ালে ব'সে তাকে জ্বালাতন করে, ঠিক তার দেখা হয়ত ও পাড়াতে মিলবে না কোন দিন। এঁটো বাসনের গাদায় ফরফর্ ক'রে উড়ে এসে

বসে যে চড়ুইগুলো, আর ভাত ঠুকরে খায়, কিম্বা মিটসেফের গা বেয়ে সারবন্দী যে কাঠ-পিঁপড়ে খাবারের সন্ধানে ঘোরে, সেগুলো হয়ত এখন থেকে অন্য কোথাও ঘুরবে।

কিন্তু এসব কি ভাবছে আজ মমতা? মাথা খারাপ হ'ল নাকি তার? কাক-চড়ুই পাখী-পিঁপড়ে কি করবে না করবে, তা নিয়ে তার মাথাব্যথা কিসের?

আপন মনেই একবার হাসল মমতা। অতীন যদি শোনে একথা, নিশ্চয়ই তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে।

ডাক্তারের কথা মনে আসতেই তপুর মুখখানা ভেসে উঠল চোখের সামনে। কাল সকালেই বড় ডাক্তার আসবে তাকে দেখতে। মা-মরা কচি ছেলে! জলে জলে ভিজেছে, কেউ নজর রাখে নি। এখন বুকে সর্দি চেপে বসতে খেয়াল হয়েছে কাকীর। এই দিন-সাতেক আগেও কাকী বকতে তার কাছে ছুটে চ'লে এসেছিল ছেলেটা। সারাদিন আর বাড়ী যায় নি। তারই কাছে খেয়েছে, দুপুরে তারই কোলের কাছটিতে শুয়েছে। সন্ধ্যেবেলা যাবে না, তবু খেলনার লোভ দেখিয়ে জোর ক'রে তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে মমতা।

বালিশের ঝালর দিয়ে চোখটা একবার মুছে নিল মমতা। কাল তারা চ'লে যাবার আগেই যেন ডাক্তার আসে তাকে দেখতে। তবু খবরটা নিয়ে যেতে পারবে—

এরই মাঝে এক ফাঁকে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, বুঝতে পারে নি মমতা। হঠাৎ অতীনের ডাকাডাকিতে ঘুমটা ভেঙে গেল। শুনতে পেল মেঘ ডাকার শব্দ, সেই সঙ্গে মুহুর্মুহু বাজ পড়ার আওয়াজ। বাইরে মুষলধারায় বৃষ্টি নেমেছে। মান্ধাতা আমলের পুরোনো বাড়ী তাদের, ফাটা জানলার ফাঁক দিয়ে জল ঢুকে সারা মেঝেটা ভ'রে গেছে।

কিন্তু অতীন ডাকছিল শুধু সে-কারণে নয়। সামনের বাড়ীর ব্রজবান্ধব বোধ হয় মারা গেছেন। বৃষ্টি আর বাজের আওয়াজকে ছাপিয়েও মাঝে মাঝে ভেসে আসছে কান্নার রোল।

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল মমতা। তাকের উপর টাইম-পিসটা দেখল একবার। রাত শেষ হয়ে গেছে। শুধু মেঘ ক'রে আছে ব'লেই এখনও অন্ধকার কাটে নি। রাস্তার দিকের জানলাটা একটু ফাঁক করল মমতা। পিচকিরির মত জলের ছাট এসে লাগছে মুখে। তবু একবার তাকিয়ে দেখল সামনের দিকে সে। ও-বাড়ীর জানলাও বন্ধ। তবে সদর-দরজাটা হাট ক'রে খোলা। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ব্রজবান্ধবের বড় ছেলে আর ছোট ছেলে। দু'জনেরই মুখ ভার। রাস্তায় এক কোমর জল, ভেতরের উঠোনটাও ভ'রে গেছে জলে।

জানলাটা আবার বন্ধ ক'রে দিল মমতা। অতীন বললে, অসময়ে জল নেমে ত মহা বিপদ্ বাধালে দেখছি! এরকম জল হলে লরীই বা আসবে কি ক'রে, মালপত্তরই বা উঠানো যাবে কি ক'রে!

আঁচল দিয়ে বৃষ্টিভেজা মুখটা মুছতে মুছতে মমতা বলল, এ যা জল দাঁড়িয়েছে, কোন গাড়ীই ঢুকবে না গলিতে। বুড়োর ছেলেরা দাঁড়িয়ে আছে চৌকাঠের ওপর, তাতেই ওদের হাঁটুর কাছে গিয়ে জল ঠেকেছে।

ঘরের বাইরে বেরিয়ে আকাশের চেহারাটা একবার দেখে নিল অতীন। বলল, আকাশের যা ভাবগতিক, তাতে ত মনে হয় না আজ আর বৃষ্টি থামবে। সারা আকাশটা কালো হয়ে আছে মেঘে মেঘে।

একটু চুপ থেকে অতীন আবার বলল, বৃষ্টি থামলেই বা যাওয়া হবে কি ক'রে! সামনের বাড়ীর ওই অবস্থা—জল একটু কমলেই ওরা মড়া বার করবে। এই ত একটুকুন সরু গলি—লরী দাঁড়াবেই বা কোথায়, আর ওরাই বা—

বাধা দিয়ে মমতা বলল, জলটা থামুক ত আগে। তার পর কি করা যাবে-না-যাবে ভাবা যাবে। হাজার হলেও সামনাসামনি বাড়ী—লোকে কি বলবে!

জল অবশ্য একটু বাদেই থামল, তবে আকাশটা তেমনি মুখভার ক'রেই রইল। জানলাটা সম্পূর্ণ খুলে দিল মমতা। গলির জল এর মধ্যে আরও খানিক বেড়েছে। সামনের ঘরে কান্নার আওয়াজ কমেছে, তবে থামে নি। ব্রজবান্ধবের জামাইয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যেতেই একটু স'রে এল মমতা।

রাস্তার জল এ-বাড়ীর কলতলাও ভাসিয়েছিল। শুধু বাথরুমটা একটু উঁচু ব'লে পৌঁছতে পারে নি। অতীনের মুখ ধোওয়ার পাট চুকলে মমতা গিয়ে ঢুকল বাথরুমে। যাবার সময় ব'লে গেল অতীনকে, দীপু যেন ঘর থেকে না বেরোয়। নইলে এখুনি নৌকো ভাসাবে আর জল ঘাঁটবে।

কাপড় কাচার পাট সেরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখে সে, জানলায় দাঁড়িয়ে অতীন গণদেবের সঙ্গে কথা বলছে। মমতাকে দেখেই অতীন একটু হেসে বলল, আর কি, এবার উনুন ধরাও, রান্না চাপাও। গণদেব যা বলছে, তাতে আজ কেন, কালও আমাদের যাওয়া

হয় কি না সন্দেহ। ওধারের রাস্তায় মানুষপ্রমাণ জল দাঁড়িয়েছে।

হঠাৎ নিজেকে কেমন একটু হাল্কা মনে হ'ল মমতার। একটা চাপা আনন্দেই বুঝি চোখ দু'টো তার চক্‌চক্ ক'রে উঠল একবার। তবু যথাসম্ভব তা ঢাকবার চেষ্টা ক'রে বলল, নেহাৎই যদি না হয়, কি আর করা যাবে! পরক্ষণেই সুর পাল্টে: গণদেব জলে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে এসে বসুক না—

চট ক'রে একবার ঘরের ভেতর ঢুকল মমতা। তাড়াতাড়িতে খেয়াল ছিল না ব'লেই বোধ হয় ভিজে কাপড়ের ডেলাটা হাত থেকে নামিয়ে রাখল খাটের বিছানার ওপর। তার পর লক্ষ্মীর পাটের কাছে গিয়ে গলায় আঁচল দিয়ে বারবার ধ'রে অনেকক্ষণ প্রণাম করল।

যুগসন্ধিক্ষণে আফ্রিকা

শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সুদূরপ্রসারী উল্লেখযোগ্য ঘটনা এশিয়া ও আফ্রিকার পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতা অর্জন। বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক বিশ্ব-ইতিহাসে একটি বিশেষ অধ্যায়—এই দশকেই দুর্বার গতিতে পরিবর্তন আসিয়াছে আফ্রিকা মহাদেশে। যুগযুগান্তরব্যাপী নিদ্রার হইয়াছে অবসান; সুপ্তোত্থিত আফ্রিকা আজ প্রস্তুত, সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করিতে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ বাণিজ্যিক স্বার্থে ছলেবলে-কৌশলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। আফ্রিকা ছিল তাহারই অন্যতম মূল্যবান্ শিকার। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এই মহাদেশটি বণ্টিত হইয়া গেল ধনতন্ত্রের ধ্বজাবাহী ইউরোপের প্রধান শক্তিগুলির মধ্যে।

শ্বেত জাতি কৃষ্ণকায় আদিম জাতিকে সুসভ্য করার যে নৈতিক দায়িত্ব প্রায় দুই শত বৎসর পালন করিয়া আসিল তাহার ফলেই না আজ এই মহাদেশে প্রাচুর্যের মধ্যে নিদারুণ দারিদ্র্য। শাসন ও শোষণের ফলে আফ্রিকা বিবর্ণ আর ইউরোপের ধনতন্ত্র রক্তিম। আলবার্ট সোয়েৎজারের ভাষায়, **Who can describe the injustice and the cruelties that, in the course of centuries, they have suffered at the hands of Europeans?**

অফুরন্ত প্রাকৃতিক এবং মানবিক সম্পদ্ থাকা সত্ত্বেও বিদেশী-পদানত অন্যান্য দেশের ন্যায় আফ্রিকার অর্থনীতি অত্যন্ত অনগ্রসর। সাধারণ মানুষ শোচনীয় ভাবে প্রাণধারণের গ্লানি বহন করিয়া চলিয়াছে। তীব্র বর্ণ-বৈষম্যের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ ছাত্রছাত্রীর দরুণ মাথাপিছু আশী পাউণ্ড ব্যয়িত হইলে, কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্রছাত্রীর মাথাপিছু খরচ হয় মাত্র তিন পাউণ্ড। ১৯৫৩ সনের বাণ্ট শিক্ষা আইন অনুসারে দক্ষিণ আফ্রিকার শিক্ষাদপ্তর কৃষ্ণকায় আফ্রিকানদের যে কোন বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দিতে পারে। সমাজের সর্বস্তরে এইরূপ ঘৃণ্যতম বৈষম্য ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির অধীন সব দেশেই পরিব্যাপ্ত ছিল। রাজনৈতিক অধিকার দেশীয় সন্তানদের দেওয়া হয় নাই। তাহার ফলে শিক্ষাবঞ্চিত স্বাধীনতাপ্রাপ্ত শিশু দেশগুলি অভিজ্ঞতার অভাবে বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হইতেছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেখি একভাষী জাতিকে বহুধাবিভক্ত, আবার বহু ভাষাভাষী বিভিন্ন গোষ্ঠীকে একই রাষ্ট্রভুক্ত করিয়া আফ্রিকায় জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির পথে প্রতিবন্ধকতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে, সোমালীভাষীদের উপযুক্ত সুযোগ দিলে একটি জাতি গড়িয়া উঠিবার পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কৃত্রিমভাবে এই ভাষার মানুষ ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইটালীর অধিকারভুক্ত অঞ্চলসমূহে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ব্রিটিশ-অধিকৃত গোল্ডকোষ্টে (বর্তমান ঘানার) একটি মাত্র কথ্য ভাষা আকানের চারিটি লিখিত রূপ সৃষ্টি করা হইয়াছিল। ঐক্যের উপাদান-গুলিকে কোন সময়েই বিদেশী শক্তি একত্রীভূত হইতে

সাহায্য করে নাই। তাহা ছাড়া শাসক জাতির সংস্কৃতি ও রাজভাষা মুষ্টিমেয় লোকেরই জ্ঞাত ছিল—আর ইহারাই হইয়াছিল ঔপনিবেশিক স্বার্থের তল্পীবাহক।

বিদেশীরাজ আফ্রিকার আদিম উপজাতীয় বিরোধ এবং দেউলিয়া সামন্ততন্ত্র অটুট রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। সাংবাদিক জন্ গান্থারের ভাষায় যতক্ষণ আফ্রিকা উপজাতীয় মনোভাবসম্পন্ন (সুতরাং আধুনিক চিন্তাধারা বর্জিত) আছে ততক্ষণ সে কোন সমস্যাই নয়।

কিন্তু অত্যাচার আর কুশাসনের মধ্যেই নিহিত থাকে মহামুক্তির তীব্র স্পৃহা। আফ্রিকাগণমানসে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নিবাত নিষ্কম্প শিখার মত প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আফ্রিকার নবজাগরণে ভারতবর্ষ চীন প্রভৃতি এশিয়ার দেশগুলির মুক্তি আন্দোলনের প্রভাব অপরিসীম। এই মহাদেশে মুক্তি আন্দোলন যতই তীব্র হইয়াছে অকথ্য নির্যাতন ততই অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরন্ত হস্তচ্যুতির ভয়ে ব্রিটিশ উপনিবেশ মন্ত্রী (২২শে অক্টোবর ১৯৫২) ঘোষণা করিয়াছিলেন—**Britain's ambitions in Africa are not going to be turned aside by a band of terrorists.**

কনিষ্ঠ ভ্রাতাই বা নীরব থাকিবে কেন। ইতিহাসে কাণ্ডজ্ঞানহীন পর্তুগীজ প্রতিনিধি নিরাপত্তা-পরিষদে সদম্ভে জানাইলেন—**The Portuguese have been in Africa for five Centuries and they intend to stay whatever the cost.** মস্তিষ্কে বিকৃতি ঘটিলেই এইরূপ বেপরোয়া উক্তি করা সম্ভব।

দূরদর্শী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড ম্যাকমিলান সাম্প্রতিককালে আফ্রিকা পরিদর্শনে গিয়া সমগ্র আফ্রিকা-ব্যাপী জাতীয়তাবাদের তীব্র ফেনিলোচ্ছ্বাস উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদে, মধ্য ইউরোপে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পূর্ব ইউরোপে এবং এই শতাব্দীরই মধ্যভাগে এশিয়ার বন্ধনমুক্তির জলন্ত উদ্দীপনা আঘাত হানিয়াছিল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে। আজ সেই জাতীয়তাবাদের উত্তালতরঙ্গে আফ্রিকার আন্তরসৌন্দর্য ক্রমবিকাশমান, অপরধারে ঔপনিবেশিক শক্তিপ্রভার শেষ রক্তিমাভা বিলীয়মান।

গত ছয় বৎসরে আটাশটি দেশ মুক্তির স্বাদ পাইয়াছে। ১৯৫০ সনে রাষ্ট্রসঙ্ঘে মিশর, ইথিওপিয়া, লাইবেরিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে সদস্য ছিল। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লিবিয়া, সুদান, টিউনিশিয়া, ঘানা, গিনি, বৈদেশিক-শাসন-মুক্ত হইয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগদান করিল। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ষোলটি রাষ্ট্র এবং ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে মরিটানিয়া ও সিয়েরা লিওন এবং ট্যাঙ্গাইনিকা স্বাধীনতা পাইয়াছে। কিন্তু আফ্রিকা আজও সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে পারে নাই। আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবীর উত্তরে পর্তুগীজ এ্যাঙ্গোলায় ও মোজাম্বিকে, পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়ায় ব্রিটিশ দমনমূলক-নীতি অনুসরণ করিতেছে। অগণিত শহীদের শোণিত-ধারায় আফ্রিকা সিক্ত। কঙ্গোতে রাষ্ট্রসংঘের প্রাক্তন মুখ্য পরিচালক ও'ব্রায়ানের বিবৃতিই ষড়যন্ত্রকারী কায়েমীস্বার্থের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়াছে। বেলজিয়ম, ব্রিটেন ও দক্ষিণ রোডেশিয়ার জঘন্য সড়যন্ত্র না থাকিলে হয়ত কঙ্গো অন্যান্য দেশের ন্যায় শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারিত। দীর্ঘ আট বৎসর সংগ্রামের পর মাত্র কয়েকদিন হইল সংগ্রামের বিরতি হইয়াছে ফরাসী অধিকৃত আলজেরিয়ায়। বিভিন্ন রণাঙ্গনে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া ফরাসী সামরিক মেজাজ সম্বিৎ হারাইয়া ফেলিয়াছে। এই সামরিকবাহিনী শ্বেতাঙ্গ 'কলোন'দের সাহায্যে আলজেরিয়ার স্বাধীনতায় বাধা দিতেছিল। সম্প্রতি দ্যগল সরকার ও কারহাত আব্বাসের অস্থায়ী আলজেরিয়া সরকারের মধ্যে সন্তোষজনক ভাবে আলোচনা চলিতেছে। কিন্তু আলোচনার ফলাফল সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। হয়ত কলোন নেতা সালোনের নেতৃত্বে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম দেখা যাইতে পারে, আবার আলজেরিয়া দ্বিধাবিভক্ত হওয়াও অসম্ভব নয় মোটেই।

সাম্য ও স্বাধীনতা লাঞ্ছিত হইতেছে রোডেশিয়া ও নিয়াসাল্যাণ্ড যুক্তরাষ্ট্রে। কৃষ্ণকায়দের ভোটাধিকার সীমাবদ্ধ রাখিয়া নানাভাবে সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গসম্প্রদায় প্রভুত্ব চালাইতেছে। নিয়াসাল্যাণ্ডের জননায়ক হেষ্টিংস বান্দা এবং উত্তর রোডেশিয়ার নেতা কেনেথ কাউণ্ডা এই ফেডারেশনের তীব্র বিরোধিতা করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে ব্রিটিশ সরকার গণ-ইচ্ছাকে রূপায়ণের জন্য উত্তর রোডেশিয়ায় নূতন সংবিধান ঘোষণা করিয়াছেন। দক্ষিণ রোডেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী শ্বেতাঙ্গ মোক্তার স্যার রয় ওয়েলনস্কি প্রত্যক্ষসংগ্রামের পর্যন্ত হুমকি প্রদর্শন করিয়াছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গপ্রধান সরকার বিশ্ববাসীর নিকট ধিকৃত ও নিন্দিত। এই অ-গণতান্ত্রিক সরকার ১৯৪৮ সন থেকে আন্তর্জাতিক আইন, মানবিক অধিকার সনদ লঙ্ঘন করিয়া উৎকটভাবে বর্ণবৈষম্যনীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। সার্পভিলের হত্যাকাণ্ডের পর কমন-

ওয়েলথ ত্যাগে বাধ্য হইয়াছে এই অনুদার দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার। ১৯৬১ সনের ১৩ই এপ্রিল রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ (প্রস্তাব নং ১৫১৪) দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে একক বা যৌথ-ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করিয়াছে। আফ্রিকা সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘের কার্যাবলীর তীব্র সমালোচনা করা হয়। কঙ্গো বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশাবলী (১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই, ২১শে জুলাই এবং ৯ই আগষ্টের গৃহীত প্রস্তাব) বেলজিয়ম উপেক্ষা করিয়াও ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। বিজার্তার ঘটনায় ফরাসী সরকার রাষ্ট্রসংঘকে অগ্রাহ্য করিতে স্পর্ধা পাইয়াছে। এমনি ভাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নির্দেশের মূল্য কতটুকু সেই সম্পর্কে সন্দেহ জাগিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও স্বীকার করিতেই হইবে যে, বিভিন্ন স্বার্থের সংঘর্ষের মধ্য দিয়া উত্তেজনা-প্রশমনে অনন্য প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রসংঘই। কিছুটা দৌর্বল্য থাকিলেও ইহার সাংস্কৃতিক বা অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে নৈতিক প্রভাব অসামান্য। আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলনে রাষ্ট্রসংঘের অবদান অনস্বীকার্য। বিশ্বের সর্বত্র উপনিবেশবাদের দ্রুত অবসান ঘটাইবার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ একটি কমিটি গঠন করিয়া বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের যোগদানের ফলে রাষ্ট্রসংঘ সার্বজনীন বিশ্বসভার রূপ পরিগ্রহ করিতেছে।

এখন প্রশ্ন বর্তমান আফ্রিকা কোন্ পথে? বিশ্বের বিবদমান শক্তিগোষ্ঠীগুলি নানাভাবে নবজাগ্রত রাষ্ট্র-গুলিকে বিশেষ মতবাদে ধর্মান্তরিত করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াসী। এই টানাপোড়েনের পরে আফ্রিকার ভবিষ্যৎ রূপ চিন্তা করা সহজসাধ্য নয়। তবে মূল শক্তিশালী চিন্তাধারা অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে যে, নবীন রাষ্ট্রসমূহ মোটামুটি দুই পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বান্দুং-এ আফ্রো-এশীয় সম্মেলনে আফ্রিকা হইতে মিশর, ইথিওপিয়া, ঘানা, লাইবেরিয়া, লিবিয়া ও সুদান যোগদান করিয়াছিল। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইথিওপিয়া, ঘানা, লিবিয়া, লাইবেরিয়া, টিউনিশিয়া, মরক্কো, মিশর ও সুদান উপনিবেশবাদের দ্রুত অবসান এবং মানবিক অধিকারের প্রতি আস্থাজ্ঞাপন ইত্যাদি বান্দুং নীতি গ্রহণপূর্বক বৃহৎ প্রজাতান্ত্রিক আফ্রিকা রাষ্ট্র-গঠনের নীতি ঘোষণা করে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ক্যাসাব্লাঙ্কা সম্মেলনে রাজনৈতিক মিলনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই গোষ্ঠী বেলগ্রেডে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসম্মেলনে যোগদান করিয়াছিল।

আফ্রিকার আর একটি চিন্তাধারা পশ্চিমী-ঘেঁষা। নাইজিরিয়া, সেনেগাল, মাদাগাস্কার ইত্যাদি ফরাসীভাষী দেশগুলি ১৯৬১-র জুলাই মাসে ডাকার সম্মেলনে রাজ-নৈতিক একীকরণের পরিবর্তে ইউরোপীয় 'সাধারণ বাজার' অনুসরণে অর্থনৈতিক ঘনিষ্ঠতার নীতি ঘোষণা করিল।

মে মাসে মনরোভিয়া সম্মেলনেও অর্থনৈতিক মিলনকেই দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিয়াছে। ১০৬২-র জানুয়ারী মাসে লাগোস সম্মেলনেও পূর্বোক্ত ঘোষিত নীতি সুস্পষ্ট করা হইয়াছে। আগামী এপ্রিলেই আদ্দিস আবাবায় এই গোষ্ঠীর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

এই গোষ্ঠী পররাষ্ট্রনীতিতে উপনিবেশবাদের বিরোধী কিন্তু ক্যাসাব্লাঙ্কা গোষ্ঠীর সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করিয়া অস্থায়ী আলজেরিয়া সরকারকে স্বীকার করে না। এই গোষ্ঠী আধুনিক ধনতন্ত্র সমর্থন করে। ক্যাসাব্লাঙ্কা গোষ্ঠী ভারতের ন্যায় সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের মিশ্র অর্থনীতি অনুসরণ করিতেছে। এই দুই গোষ্ঠীর প্রভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে কিন্তু ইহাদের প্রভাবমুক্তও অনেকরাষ্ট্র রহিয়াছে।

অর্থনৈতিক এবং সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক উন্নয়নে উভয় গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিরই প্রবল আগ্রহ। কিন্তু অনগ্রসর দেশ হিসাবে মূলধনের অপ্রতুলতা, দক্ষ কারিগরের অভাব বিশেষ প্রতিবন্ধক।

তাই লাইবেরিয়া, নাইজিরিয়া, ঘানা ইত্যাদি সকল রাষ্ট্রই পাশ্চাত্ত্যের দেশগুলি হইতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সাহায্য গ্রহণ করিতেছে। উপযুক্তভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে এই সব দেশ সমৃদ্ধ এবং গণতন্ত্রের সুদৃঢ় ভিত্তি হইতে পারিবে।

আফ্রিকার দিনে এশিয়া এবং আফ্রিকা একটা বিরাট সমাজ-সাধনার পরীক্ষা ক্ষেত্র—"নব অভ্যুদয়ের অগ্রচ্ছটা"। আজ এই বিরাট অঞ্চলে ঐতিহ্য লঙ্ঘনের সংকল্প যতটা আছে ততটাই আছে নব্যতন্ত্রের প্রতি আবেশবিহ্বলতা। বিদ্রোহের বাষ্পোচ্ছ্বাস ঘনীভূত হইয়া নবজীবনবাদের ভিত্তিমূল সৃষ্টির সময়ে ঐতিহ্যের সহিত বর্তমানের অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হইবে। সেকু তুরে, টম মবুয়া, অথবা নক্রুমার মত নেতাগণ আজ তাই আদিম মানুষকে ধীরে ধীরে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে এবং আফ্রিকা পরিপ্রেক্ষিতে আফ্রিকার সমস্যা বিচারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্ববাসী কোন বিশেষ মতবাদে অদীক্ষিত আফ্রিকার নিকট বিরাট আশা পোষণ করিতেছে।

রাল্‌ফ্ বুঞ্চে তাই বলিয়াছেন: The under-privileged people of Asia and Africa are the biggest factors for our hopes for peace.

শিলা কত বড় হয়

সব চেয়ে বৃহদাকার শিলা, যা দেখা গেছে বলে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আছে, তার ব্যাসের আয়তন ছিল ১৭ ইঞ্চি, অর্থাৎ প্রায় এক হাত। কিন্তু শিলার এত বড় আয়তন সত্যই একটা অভাবনীয় ব্যাপার। সাধারণতঃ খুব বড় শিলাগুলি হাঁসমুরগীর ডিমের আকারের হয়। বেশীর ভাগ শিলাই হয় তার চেয়ে অনেক ছোট, সিকি ইঞ্চি ব্যাসের মতন। বরফ হয়ে জমে যাওয়া বৃষ্টির ফোঁটা থেকে শিলার উদ্ভব, তারপর বায়ুবাহিত আরো কত জলকণা তার সংস্পর্শে এসে জমে গিয়ে সংলগ্ন হয় তার সঙ্গে, ভূপৃষ্ঠে বর্ষিত হবার আগে, তার উপর তার পরিণত আকারের পরিমাপ নির্ভর করে।

ছেলেবেলায় শিলাবৃষ্টির সময় শিলা কুড়িয়ে খাওয়া একটা মহা আনন্দের জিনিষ ছোটদের কাছে। অনেকগুলি শিলা একসঙ্গে ক'রে রুমালে বেঁধে রাখলে সেগুলি জুড়ে গিয়ে নানারকমের দেখতে হয়, সেটাও একটা আনন্দদায়ক খেলা। কিন্তু শিলাপাত প্রায়শঃই আনন্দের জিনিষ হয় না। ফসলের প্রচুর ক্ষতি হয় শিলাবৃষ্টির ফলে। সাধারণতঃ আমাদের দেশে যে সময় শিলাবৃষ্টি হয় তখন আম বড় হবার মুখে। শিলার আঘাত আমের যেখানে যেখানে লাগে সেখানগুলি শক্ত হয়ে যায়, আহারযোগ্য থাকে না। শিলার আঘাতে বাড়ী ও গাড়ীর জানালার কাচ ভেঙে যেতে আমরা দেখেছি, ছাগল ভেড়াও কচিৎ কদাচিৎ মারা যেতে শুনেছি। মানুষও যে মারা পড়তে পারে না বা মরে না তাও নয়। উপরি উক্ত ১৭ ইঞ্চি ব্যাসের শিলাটি একটা হাতীর মাথায় পড়লে তারও নিশ্চয় প্রাণসংশয় হ'ত।

হিমযুগ ও খণ্ডপ্রলয়

ইতিহাস বলতে আমরা যা বুঝি তা কিঞ্চিদধিক ২০০০ বৎসরের পুরণো। আরো পিছনে কোথাও কোথাও আমরা যেতে পারি, কিন্তু কিছুদূর গিয়েই এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছই যেখানে বিশ্বাস্য ও অবিশ্বাস্য, বেশীর ভাগই অবিশ্বাস্য, কিংবদন্তী ছাড়া আর কিছু আমাদের জন্যে অবশিষ্ট থাকে না।

অনেকে বলেন, এর কারণ আর কিছু নয়, মানুষ তখন লিখতে পড়তে জানত না, তাই নিজেদের কোনো ইতিহাস তারা রেখে যেতে পারে নি। কিন্তু কথাটা বোধহয় ঠিক নয়।

তিন, চার, এমন কি পাঁচ হাজার বৎসর আগেও মানুষ যে সভ্যতার, সংস্কৃতির, সুরুচিসম্মত জীবনযাত্রার মাপের একটি সু-উচ্চ স্তরে এসে উপনীত হয়েছিল তার প্রচুর প্রমাণ প্রতিনিয়তই প্রত্নতত্ত্ববিদদের কল্যাণে পাওয়া যাচ্ছে। মিশর এবং পেরুর আদিম অধিবাসীরা তাদের মৃতদের দেহ কি উপায়ে যে সুরক্ষিত ক'রে রাখত, যাতে বহু সহস্র বৎসর পরেও সেই মামিগুলি প্রায় অবিকৃত অবস্থায় আছে, তার রহস্য বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীদেরও অজানা। এমন সুক্ষ্মবস্ত্র তারা বয়ন করত যা আজকের দিনের তাঁতি বা মিলওয়ালাদের ক্ষমতার বাইরে। আজকের দিনের যান্ত্রিক স্থপতিদের পিরামিড নির্মাণ করতে বললে তাঁরা অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করবেন। হারাপ্পা, মোহেঞ্জোদাড়োর নগর-পরিকল্পনার কাছ থেকে এই যুগের ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট-দের অনেক কিছুই শিখবার আছে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইসব সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের একমাত্র সূত্র হচ্ছে এদের সমাধি। মানুষগুলির সমাধি, এবং সহর বন্দরগুলির সমাধি।

আজকের দিনের সভ্যতার যদি হাইড্রোজেন বোমার কল্যাণে হঠাৎ অবলুপ্তি ঘটে ত আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা বিংশ শতাব্দীতে উজিয়ে এসে ঠিক সেইভাবেই হোঁচট খেয়ে থামবেন, আমরা যেভাবে দু'হাজার বৎসর আগেকার ইতিহাসের এলাকায় এসে থেমে যাই।

এই কিঞ্চিদধিক দু'হাজার বৎসর আগেকার সমৃদ্ধ সব সভ্যতা, হিটাইট, অ্যামোরাইট, কার্থেজীয়, ক্যালডীয়, ব্যাবীলোনীয়, ফিনিসীয়, সিন্ধুদেশীয়, এরা নিজেদের কি পরিচয় রেখে গেছে আমাদের জন্যে?

কিন্তু যখন তারা ছিল পৃথিবীতে, আজকের দিনের কোনো রাজ্য বা সাম্রাজ্যের চেয়েই তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছু কম ছিল না।

তাদের নামের সঙ্গে জড়িত কতগুলি কিংবদন্তী ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না এটা কিছুতেই সম্ভব হতে পারত না, যদি না একটা খণ্ডপ্রলয় জাতীয় কোনো-কিছুতে এদের সকলেরই প্রায় একই সঙ্গে অবলোপ ঘটত। অর্থাৎ এমনভাবে ঘটত, যাতে, প্রায় বাকী কেহ না রহিল বংশে দিতে বাতি।

এরকম খণ্ডপ্রলয় জাতীয় কিছু যে সত্যই ঘটেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে সাইবেরিয়াতে, যেখানে প্রাগৈতিহাসিক জীবদের শেষ প্রতিনিধি ম্যামথরা শেষ চেষ্টা করে দেখছিল, এই সুন্দর পৃথিবীতে একটুখানি জায়গার দখল নিজেদের জন্যে রাখতে পারে কি না।

পারল না। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তারা।

এই ম্যামথরা, যাদের দাঁত বারো থেকে পনেরো ফুট লম্বা হ'ত, যারা হাতীদের চেয়ে বহু গুণ বড় আকারের, এরা দলে দলে সাইবেরিয়ার বনাঞ্চলে ঘুরে বেড়াত। কিন্তু কয়েক শতাব্দী ধ'রে শত শত ম্যামথের মৃতদেহ বরফ-সমাধি থেকে তুলে এনে তাদের মাংস খেয়েছে ঐ অঞ্চলের মানুষরা, তাদের দাঁত বিক্রি করে পয়সা করেছে। আর এ কাজ যারা করেছে তাদের প্রায় সকলেরই সাক্ষ্য হচ্ছে এই, যে, এই ম্যামথদের মুখে যে তৃণগুল্মাদি ছিল দেখা গেছে, সেগুলি উষ্ণপ্রধান দেশের তৃণগুল্ম। অর্থাৎ কিনা, সাইবেরিয়াতে যখন তারা চ'রে বেড়াত, তখন সাইবেরিয়া ছিল উষ্ণপ্রধান দেশ।

তাহলেই তিনটি কথা নিয়ে ভাবতে হবে। এক, ম্যামথদের দেহ এমন সুরক্ষিত অবস্থায় ছিল যে, তাদের মাংস আহারযোগ্য ছিল। দুই, তাদের মুখে তৃণগুল্মাদি পাওয়া গিয়েছিল। তিন, সেই তৃণগুল্ম উষ্ণপ্রধান দেশের।

ভূবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকের ধারণা, [illegible]

মেরু থেকে হিমপ্রবাহ উত্তর ভূমার্ধকে ক্রমশঃ বরফের আস্তরণে ঢেকে ফেলেছিল, সেই সময় ম্যামথদের অবলুপ্তি ঘটে। মানতে আপত্তি নেই, কিন্তু ঐ ক্রমশঃ কথাটা নিয়ে একটু গোল বাধে।

হঠাৎ যদি দেখা যায়, কলকাতার আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে, ক্রমশঃ ঠাণ্ডা পড়ছে খুব বেশী ক'রে, সেই ঠাণ্ডা ক্রমে দুঃসহ হয়ে আসছে, আমরা কি করব? কলকাতা ছেড়ে চ'লে যাব, দক্ষিণে বা পশ্চিমে বা পুবে, যেদিকেই ঠাণ্ডা একটু কম হবার সম্ভাবনা, সেইদিকে। আমরা হয়ত নিজের চাকরি, মেয়ের কলেজ এবং বিজ্ঞানীদের পরামর্শ, ইত্যাদির কথা ভেবে দু'চারদিন দেরি করব, কিন্তু মানবেতর প্রাণীদের ত আর এসব ঝামেলা নেই। তাদের জৈবচৈতন্য তাদের অনেক আগেই ঐরকম পরিবেশ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে, তা যায় নি।

কি হয়েছিল তা হ'লে? অসহ্য ঠাণ্ডায় প্রাণ হারাবার পর বরফ প্রবাহ এসে যদি তাদের সমাধিস্থ করে থাকে তা হ'লে মৃত্যু ও সমাধির মধ্যেকার সময়ের ব্যবধানটাকে যত অল্প বলেই কল্পনা করা যাক, তার মধ্যে তাদের দেহে পচন ধরত এবং তাদের মাংস এত কাল পরে এমন তাজা আহারযোগ্য থাকত না।

এই রহস্যের মীমাংসার ইঙ্গিত রয়েছে এদের মুখাভ্যন্তরের তৃণ-গুল্মগুলিতে। যখন এদের মৃত্যু হয় তখন এরা আহারে রত ছিল, আর চোয়ালের মধ্যে তৃণগুল্মগুলিও যে তাজা অবস্থায় পাওয়া গেছে তাতে প্রমাণ হয় যে, হিমসমাধির পূর্ব্বে এগুলিও পচে যাবার সময় পায় নি। অর্থাৎ যে হিমপ্রবাহে এদের মৃত্যু হয় সেটা ক্রমশঃ শৈত্যবৃদ্ধি হয়ে ঘটে নি, উষ্ণযুগ থেকে হিমযুগে উত্তরণ চক্ষের পলকে ঘটেছিল। এই মুহূর্ত্তে যারা পৃথিবীর একটি তাপপ্রধান অঞ্চলে নিশ্চিন্তে তৃণগুল্ম ভক্ষণে নিরত, ঠিক পরের মুহূর্ত্তেই তারা জমে বরফের মত হয়ে গেল এবং স্তূপাকার বরফের নীচে চাপা পড়ল।

ম্যামথ

সাইবেরিয়ার বরফের নীচে যেসমস্ত প্রাগৈতিহাসিক ঘোড়ার দেহ আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় যে, তারা মৃত্যুর সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ব্যাপারটা যদি আকস্মিক শৈত্যপাতের মত কিছু হ'ত ত এরা নিশ্চয় যে যেখানে ছিল সেখান থেকে ছুট দিত এবং সেইরকম ভঙ্গিতেই তাদের দেহ আবিষ্কৃত হ'ত। সহজেই বোঝা যায় যে, একটা পরিপূর্ণ হিমযুগ মুহূর্ত্তের মধ্যে এসে প'ড়ে এদেরও অভিভূত করে ফেলেছিল।

•

পৃথিবীর একটি বিস্তীর্ণ উষ্ণ অঞ্চলের তাপ মুহূর্ত্তাংশের মধ্যে অসম্ভব রকম নেমে যাওয়ার ফলে অন্যান্য অঞ্চলে নিশ্চয় ভীষণ রকমের বন্যা, [illegible] ইত্যাদি দৈবদুর্বিপাক দেখা দিয়েছিল।

[illegible] অনুমান হয় যে, আজ থেকে পাঁচ-ছ'হাজার বৎসর [illegible] জাতীয় কিছু একটা ঘটেছিল যার ফলে তখনকার দিনের মানুষরা তাদের বিচিত্র এবং সমৃদ্ধ সমস্ত সভ্যতা নিয়ে একই সঙ্গে প্রায় লোপ পেয়ে যায়। এই কারণেই তারা নিজেদের সমাধি ভিন্ন আর বিশেষ কিছু আমাদের জন্যে রেখে যেতে পারে নি।

পৃথিবীতে এইরকমের নিদারুণ দৈবদুর্বিপাক নিয়ে হিমযুগ কেন এসেছিল, নিশ্চয় কোনো প্রাকৃতিক কারণেই ত এসেছিল! সে কারণটি কি?

অনেকে মনে করেন, কারণটা হচ্ছে এই যে, পৃথিবী ঐ সময় নিজের অক্ষদণ্ডের উপর অনেকখানি কাৎ হয়ে পড়েছিল। যাতে তার মেরু সংস্থান যায় বদলে।

কেন কাৎ হয়ে পড়েছিল তা নিয়েও জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই।

পেনিসিলিন

যত্রতত্র পেনিসিলিন ব্যবহারের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে [illegible] মত দ্রুতগতিতে বদলাচ্ছে।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং [illegible]জাতীয় এক উদ্ভিজ্জের রোগ-জীবাণু ধ্বংস করবার ক্ষমতা [illegible]

এবং এঁকেই পেনিসিলিনের আবিষ্কারক বলে স্বীকার করা হয়। সেই থেকে তেরো বৎসর ধ'রে দু'জন ব্রিটিশ ডাক্তার, হাওয়ার্ড ডব্লিউ ফ্লোরী এবং আর্নেষ্ট চেন গবেষণা করে এর থেকে এমন একটি পদার্থ বিবাক্ত করেন, যা প্রয়োগ করে একটি পনেরো বৎসর বয়সের বালককে তাঁরা নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হন। এই পদার্থটির নাম দেওয়া হয় পেনিসিলিন।

দু'তিন বৎসর এর ব্যবহার যুদ্ধক্ষেত্রগুলিতে সীমাবদ্ধ থাকার পর ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ জনগণের চিকিৎসার ক্ষেত্রে এর প্রথম আবির্ভাব।

পেনিসিলিনের সুষ্ঠু প্রয়োগে তখন থেকে অগণিত প্রাণ রক্ষা পেয়েছে, অবর্ণনীয় যাতনার উপশম হয়েছে, অনেকগুলি সংক্রামক রোগ, যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার মত অস্ত্র চিকিৎসকদের আগে জানা ছিল না, যেমন জীবাণুঘটিত এণ্ডোকার্ডাইটিস নামক হৃদরোগ, সিফিলিস, গনোরিয়া, এবং নিউমোকক্কাস ঘটিত নিউমোনিয়া, দেখা গেল নবাবিষ্কৃত পদার্থটির এইসব রোগের জীবাণুর সঙ্গে যুঝবার এবং তাদের ধ্বংস করবার ক্ষমতা অসাধারণ। এই আবিষ্কারকে তাই বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলে অভিনন্দিত করা হ'ল। এমন কথাও শোনা যেতে লাগল, যে, পৃথিবীতে রোগজীবাণু থেকে মুক্ত সত্যযুগের সূত্রপাত হল এতদিনে।

কিন্তু স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সত্যযুগ ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা পেনিসিলিনের সত্যই আছে কি না, সাম্প্রতিককালে বিশেষজ্ঞদের মনে এই সন্দেহ ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়ে আসছে।

তার কারণ, অনেক ক্ষেত্রে পেনিসিলিন ব্যবহারের ফল মারাত্মক হতে দেখা গেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পেনিসিলিন ইন্‌জেকশন যেসব রোগীকে দেওয়া হবে, তাদের মধ্যে শতকরা চারজনের ক্ষেত্রে allergy জনিত কুফল ফলবেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। এরা সবাই যে প্রাণে মারা যাবে তা নয়, কিন্তু এদের মধ্যে অনেককেই ভুগতে হবে প্রচুর এবং মৃত্যুর হারও এদের মধ্যে খুব কম নয়।

Allergy জনিত হাঁপানি ইত্যাদি রোগে যাঁরা কখনো না কখনো ভুগেছেন, পেনিসিলিন ব্যবহারের ফল তাঁদের মধ্যে অনেকেরই বেলায় খুব সাংঘাতিক হতে পারে।

এইজন্যে ইউরোপ আমেরিকাতে আজকাল পেনিসিলিন ইন্‌জেকসন দেবার সময় চিকিৎসকরা পেনিসিলিনের প্রতিষেধক নানাপ্রকারের ওষুধ, রক্তচলাচল বন্ধ করবার বন্ধনী ইত্যাদি হাতের কাছে নিয়ে বসেন।

যুদ্ধ ক'রে ক'রে জীবাণুগুলিরও পেনিসিলিনের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা জন্মায়। কারণে অকারণে পেনিসিলিন ব্যবহারের পর হয়ত দেখা যাবে, সত্যকার প্রয়োজনের সময় পেনিসিলিন আর কাজ করছে না।

এইসব কারণে, বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্র ভিন্ন অন্যত্র পেনিসিলিনের ব্যবহার আজকাল বিশেষজ্ঞদের অনুমোদিত নয়।

গোপন কথা

রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্‌চেভ একবার মস্কোর সাধারণ কর্মীরা তাঁকে কি চোখে দেখে জানবার জন্যে তাঁদের একটি পল্লীতে ছদ্মবেশে গিয়ে একটি রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে ভাব জমান। একটি শুঁড়িখানায় বসে দুজনে খানিক মদ্যপান করবার পর কথায় কথায় রাজমিস্ত্রিটিকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, ক্রুশ্‌চেভকে তার কেমন লাগে। চারপাশটাকে সন্তর্পণে একবার দেখে নিয়ে রাজমিস্ত্রিটি তাঁকে ইসারা করে ডেকে নিয়ে যায় অন্ধকার জনহীন একটা গলির মধ্যে। সেইখানে আবার চারদিক্‌টাকে একবার দেখে নিয়ে তাঁর কানের খুব কাছে মুখ নিয়ে সে বলে, খুব ভাল লাগে আমার ক্রুশ্‌চেভকে।

ক্রুশ্‌চেভের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে আমেরিকানদের রসিকতার এটি একটি নমুনা।

একটি গুটিপোকা কতটা রেশম উৎপাদন করতে পারে

এক গুটিপোকার গুটিতে কখনো কখনো ১০০০ গজের মতন রেশম-তন্তু পাওয়া গিয়ে থাকে। গুটিটিকে গরমজলে ডোবালে তন্তু আল্‌গা হয়ে যায় এবং প্রায়শঃই রীলের সুতোর মত টানা লম্বা সেই তন্তু অটুট অবস্থায় ছাড়িয়ে নেওয়া সম্ভব হয়।

আমাদের নিকটতম নক্ষত্র

আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী নক্ষত্রটির নাম আল্‌ফা সেণ্টরি। ঘণ্টায় সাতশ' মাইল বেগে চলে এমন একটি জেট প্লেনে চড়ে দশ লক্ষ বৎসরে আপনি এই নক্ষত্রে পৌঁছতে পারেন।

কুক্‌রি

নেপালের প্রাচীন ইতিহাস গভীর রহস্যাবৃত। পুরাতন পুঁথি ইত্যাদি যা সে-দেশে পাওয়া গেছে, সেগুলি সমস্তই ধর্মসম্বন্ধীয় এবং রূপক ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। অনেকে মনে করেন গৌতম বুদ্ধ আনুমানিক ৪৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে ধর্মপ্রচারণা উপলক্ষ্যে নেপাল উপত্যকা পরিভ্রমণ করেন।

নেপালের অধিবাসী গুর্খাদের নেপালে প্রথম আবির্ভাব এবং কালক্রমে নেপাল বিজয়ের ইতিহাসও অস্পষ্ট। কথিত আছে, রাজপুতানার কোনো একটি প্রাচীন জাতি শত্রুপরিবৃত হয়ে, নিজেদের স্ত্রীপুত্র-কন্যারা যাতে শত্রু-কবলিত না হয় সেজন্য তাদের সকলকে হত্যা করে বীরবিক্রমে শত্রুব্যূহ ভেদ ক'রে হিমালয়ের দিকে চলে যায়। এরাই পরে নেপালের গুর্খা নামক একটি গ্রামে এসে উপস্থিত হয় এবং সে দেশীয় মেয়েদের বিবাহ করে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করে।

নেপালের রাজধানী কাঠমণ্ডু থেকে মাত্র ৫০ মাইল দূরের এই গ্রামটিতে সম্ভবতঃ এইভাবে পৃথিবীর বীরাগ্রগণ্য দুর্ধর্ষ গুর্খাজাতির প্রথম উদ্ভব।

গুর্খাদের কথা মনে এলেই তাদের কুক্‌রির কথা না ভেবে পারা যায় না। আমাদের ছেলেবেলায় জামার পকেটে আমরা দু'ফলা ছুরী নিয়ে বেড়াতাম। ওটা নানা কাজে লাগত। হাঁসের বা ময়ূরের পালকের কলম কাটা, পেন্সিল কাটা, কাঁচা আমের বা শসা-পাকুড়ের খোসা ছাড়ানো, স্কুলের ডেস্কে নিজের নামের অক্ষর খোদাই করা, তামাসা-তামাসা করে দেশোদ্ধারের জন্যে তৈরি হওয়া, সব ঐ দিয়ে চলত। কোনো কোনো কলকের নিষ্পত্তিও ওর সাহায্যে হত মাঝে মাঝে। কুক্‌রির ব্যবহার তার চাইতেও ব্যাপকতর। জ্বালানী কাঠ কাটা, তরকারি কোটা, ফলের খোসা ছাড়ানো, এসব ত আছেই, তার উপর আছে চিতাবাঘের ভুঁড়ি ফাঁসানো এবং তার চেয়েও গুরুতর কাজ,

বিপথগামিনী স্ত্রীর নাক বা কান কেটে দেওয়া আর তার প্রণয়ীর গলাটি কেটে দেওয়া।

গুর্খাদের এই কুকরির ব্যবহার সম্বন্ধে নানারকম গল্প প্রচলিত আছে, তার অনেকগুলি সম্ভাব্যতার সীমানা ছাড়িয়ে যায়। একটি মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য গল্প বিগত মহাযুদ্ধ থেকে ফিরে এসে কেউ কেউ করেছেন। গল্পটি হচ্ছে এই। রাত্রির পাহারায় নিযুক্ত একটি গুর্খা সৈনিক টহল দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে শত্রুদের আস্তানার মধ্যে ঢুকে যায়। সেখানে গিয়ে সে দেখে, শত্রুসৈন্যরা জোড়ায় জোড়ায় এক-একটি কম্বল মুড়ি দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। কুকরিটি বের করে সে সেটাকে কাজে লাগাল। প্রত্যেকটি জোড় ভেঙে একটি করে শত্রুসৈন্যের গলাটি সে কেটে রেখে এল। ঘুম ভেঙে উঠে প্রতিটি জোড়ার অক্ষতকণ্ঠ সৈনিকটির মনোভাব খুব বীরোপম হয়েছিল কি না বলা শক্ত।

নেপালের দশদিন-ব্যাপী দশরা উৎসবে অনেক মহিষ বলি হয় এইসব মহিষেরও মুণ্ডপাত কুক্‌রির এক আঘাতেই করা নিয়ম।

কিন্তু এই কুকরি দিয়ে নেপালী গুর্খাদের বিচার চলে না। গুর্খারা অনমনীয় দুর্দ্ধর্ষ বীর কিন্তু সেই একই সঙ্গে তারা অত্যন্ত হাসিখুশী, শান্তিপ্রিয় জাতি।

ক্রিশ্চিয়ান রাডিশ

পালের জাহাজের দড়িদড়া

পালের জাহাজ আজকাল বড় আর একটা দেখা যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাষ্পীয় পোত আবিষ্কারের পূর্ব্বে পৃথিবীর সমস্ত বাণিজ্যিক আদান-প্রদান যে সমস্ত পালের জাহাজে সমুদ্রপথে চলত, তাদের প্রতিনিধি স্থানীয় অতি অল্পসংখ্যক পালের জাহাজে নাবিকদের কোথাও কোথাও নৌচালনা শিক্ষা দেওয়া হয়। নরওয়ের ক্রিশ্চিয়ান রাডিশ এমনই একটি জাহাজ। এর মাস্তুল, পাল, ইত্যাদিতে ব্যবহৃত দড়িদড়ার দৈর্ঘ্য ১৮ মাইল।

অসাধারণ ছেলেমেয়ে

বিগত এক শতাব্দী ধ'রে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে মানুষের ধারণা একাধিকবার বদলেছে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বিজ্ঞানীদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এরা তাড়াতাড়ি খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠে তাড়াতাড়ি নিবে যায়। আগে পাকলে আগে পচবে, এই মতের বিরোধিতা করবার কথা কারও মনে হত না। এর কিছুদিন পরে শোনা যেতে লাগল, এই ধরণের ছেলেমেয়েরা পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে না, বেখাপ্পা অদ্ভুত ধরণধারণ হয় তাদের।

খুব সাম্প্রতিক কালে, বোধহয় দশ বৎসরও হয় নি এখনো, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের দিকে তাদের অভিভাবকদের এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে পড়তে আরম্ভ করেছে। এর আগে পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের দিকেই বেশী করে নজর দেওয়া হত, মেধাবী ছেলেমেয়েরা ডবল প্রোমোশন পেয়েছে দেখলেই নিশ্চিন্ত বোধ করতেন সবাই।

আপনার ছেলেমেয়েরা অসাধারণ কি না বলতে পারেন কি আপনি? কি ক'রে সেটা বোঝা যায় তা কি আপনি জানেন? উপায় আছে বুঝবার।

যে সব ছেলেমেয়েরা অসাধারণ হয়, প্রায়শঃই দেখা যায়, তাদের পিতা-মাতা বা নিকট আত্মীয়দের কারও না কারও মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু থাকে। জীবনে বড় রকম কিছু একটা করবার ক্ষমতা কোনো কোনো বংশের বিশেষত্ব। আপনার ছেলেমেয়েরা সেরকম বংশে জন্মেছে কি না তা আপনি সহজেই বলতে পারবেন।

অসাধারণ ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ ক্লাসে সবচেয়ে বয়সে ছোট হয়। এবং তারও মধ্যে সে কোনো কোনো বিষয়ে দু-একটা ক্লাসের মত এগিয়ে থাকে।

হাতে কলমে করবার কাজের চাইতে যে সমস্ত কাজে বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহার বেশী, সেগুলির প্রতি এদের বেশী পক্ষপাত দেখা যায়। সাহিত্য, প্রাচীন ইতিহাস ও গণিত এদের আকর্ষণ করে বেশী।

এরা খেলাধুলা খুব পছন্দ করে এবং কোনো কোনো খেলায় প্রায়শঃই

এরা পারদর্শিতা অর্জন করে। যে সমস্ত ক্রীড়ার সাফল্য বুদ্ধিসাপেক্ষ সেগুলিই এরা ভালবাসে বেশী, যেমন ফুটবল, বেস্‌বল, বঁড়শিতে মাছ ধরা, ইত্যাদি।

এরা বই পেলেই পড়ে, তা সে হাসির গল্পই হোক আর অভিধানই হোক। উৎসাহ জিনিষটা এদের স্বভাবে বেশী থাকে। অন্য ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে তুলনায় এরা সব-কিছুই বেশী উৎসাহ সহকারে করে। জীবনে অনেক বেশী বিষয়ে এরা রস পায়, এমন কি জীবনটাতেই এরা রস পায় অন্যদের চেয়ে অনেক বেশী।

উপযুক্ত পরিবেশ পায় না বলে এদের উজ্জ্বল্য অনেক সময় বিপ্রস্ত হয়ে যায়। তাই এই বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করবার জন্যে ইউরোপ আমেরিকায় এদের জন্যে পৃথক্ স্কুল, বা একই স্কুলের মধ্যে পৃথক্ ক্লাসের ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

কাঁচে দাগ কেটে কি হীরার পরীক্ষা হয়?

না। হীরা দিয়ে কাঁচে দাগ কাটা যায় সত্যি কথা, কিন্তু ইস্পাত, চুনী, নীলা ও পান্না দিয়েও তা করা যায়। এমন কি কাঁচ দিয়েও কাঁচে দাগ কাটা সম্ভব। খনিজ ও মণিমাণিক্যের কাঠিন্যের মাপকাঠির ঊর্দ্ধসীমা যদি ১০ ধরা যায় ত কাঁচের জায়গা ৫ বা ৬ এর গাঠে। কাঁচের সমান বা তার চেয়ে সামান্য বেশী কঠিন যে-কোনো পদার্থ দিয়ে দাগ টানলেই কাচের গায়ে দাগ পড়বে। অতএব আপনি যেটাকে হীরা ভাবছেন, সেটা সত্যিই হীরা কি না তা জানবার সত্যিকার উপায় হ'ল একটি সদাশয় জহুরীকে দিয়ে সেটাকে যাচাই করে নেওয়া। সদাশয় জহুরী কোথায় পাওয়া যাবে সেটা আশা করি আমাদের কাছে জানতে চাইবেন না।

পাকস্থলীর বাতায়ন

এক্স রে-র আবিষ্কার তখনো হয় নি, পাকস্থলীর অভ্যন্তরে খাদ্যবস্তু জীর্ণ হবার প্রক্রিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন একজন ডাক্তার। তাঁর এবং মানব-সন্তানের কপালগুণে একটি পাকস্থলীর বাতায়ন খুলে গিয়েছিল তাঁর চোখের সামনে।

সে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী।

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের এক কনকনে ঠাণ্ডা শীতের রাত্রে যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার সীমান্তবর্তী এক জায়গায় ক্যাম্পের আগুনের পাশে অ্যালেক্স সেন্ট্ মার্টিন নামক উনিশ বৎসর বয়সের একটি ফ্রেঞ্চ্ ক্যানাডীয় তরুণের সঙ্গে একজন বিরাটাকার শিকারীর কোনো কথা নিয়ে দ্বন্দ্ব সুরু হয় এবং একটি দোনলা বন্দুক নিয়ে দুজনে কাড়াকাড়ি করতে থাকে। হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ হবার সঙ্গে সঙ্গে সেন্ট্ মার্টিন অস্ফুট আর্তনাদ করে বুক চেপে শুয়ে পড়ে আগুনের পাশে।

কাছেই ফোর্ট ম্যাকিনাক। সেখানকার ডাক্তার উইলিয়াম বোমণ্ট্ খবর পেয়ে চলে আসেন ছেলেটিকে দেখতে। দেখবার পর সে-রাত্রে তাঁর ডায়েরীতে তিনি লেখেন: "দেখলাম বাইরের ক্ষতস্থান দিয়ে একটা টার্কীর ডিমের মত বড় একটুকরা ফুসফুস বেরিয়ে এসেছে, তার নীচে বেরিয়ে রয়েছে পাকস্থলীর খানিকটা, আর তাতে এতবড় একটা ফুটো যার ভিতর আমি আমার তর্জনীটা ঢুকিয়ে দিতে পারি। ......ছেলেটাকে বাঁচাবার কোনো চেষ্টা সম্পূর্ণ নিরর্থক বলেই আমার মনে হ'ল।"

কিন্তু অ্যালেক্স সেন্ট মার্টিন মরল না। পরদিন সকালে বেশ কিছু বিস্ময়াবিষ্ট ডাক্তার উইলিয়াম বোমণ্ট্ তাকে নিজের কেবিনে নিয়ে এলেন।

মাস চারেকের মধ্যে সেন্ট্ মার্টিন সম্পূর্ণ সেরে উঠল সবদিক্ দিয়ে, কেবল তার পাকস্থলীর সেই ফুটোটা বন্ধ হল না। বাস্তবিক এতই বড় ছিল সেই ফুটোটা, যে ডাক্তার বোমণ্ট্ তার উপর পুল্টিস্ চাপা দিয়ে রাখতেন, যাতে খাদ্যবস্তু বেরিয়ে না আসে তা দিয়ে।

আরও কিছুদিন কাটবার পর ফুটোটা ঢেকে গেল পাতলা একটি চামড়ার আবরণে, কিন্তু সেটা গজাল এমন ভাবে, যে, ইচ্ছে করলেই আঙুল দিয়ে সেটাকে সরিয়ে ফুটোটাকে খুলে দেওয়া যায়।

ডাক্তারের কপালগুণ ছাড়া এটাকে আর কি বলা যাবে? পৃথিবীর কোনো মানুষ এর আগে যা কখনো ভাবেনি, তা দেখতে পাবার সৌভাগ্য ঘটে গেল ডাক্তার বোমণ্টের। আঙুল দিয়ে ফুটোর উপরকার পর্দাটি যখন ইচ্ছে সরিয়ে তিনি পাকস্থলীর স্পন্দন, খাদ্যবস্তু জীর্ণ হবার প্রক্রিয়া, ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। দরকার মত খাদ্য বা পানীয় ফুটোর ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে, আবার দরকার মত সেগুলিকে বের করে নিয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চলতে লাগল।

এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে বিজ্ঞানীদের পূর্বতন অনেক বদ্ধমূল ধারণা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এই প্রথম জানা গেল, পচনের মত কোনো প্রক্রিয়ার সাহায্যে খাদ্যবস্তু জীর্ণ হয় না, বা জাঁতাকলের মত ক'রে পাকস্থলী খাদ্যবস্তুকে পিষেও নেয় না জীর্ণ করবার জন্যে। বোমণ্ট প্রথম প্রমাণ করলেন, খাদ্যবস্তু জীর্ণ হয় জারক (gastri) রসের সাহায্যে।

কোন্ খাদ্য হজম হতে কত সময়ের দরকার হয়, ডাক্তার বোমণ্ট্ তার একটি তালিকা তৈরি করলেন। এই তালিকাটিকে ভিত্তি করেই আজকের দিনের ডায়েটেটিক্স্ নামক বিজ্ঞানের উদ্ভব।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ অ্যালেক্স্ সেন্ট্ মার্টিনের পাকস্থলী জখম হবার দশ বৎসর পরে ডাক্তার বোমণ্ট তার পাকস্থলীর জারক রস একটি বোতলে জমিয়ে সুইজারল্যাণ্ডের একজন বিখ্যাত রাসায়নিক ব্যারণ জন্স্ জ্যাকব বার্জেলিউসের কাছে পরীক্ষার জন্যে পাঠিয়ে দেন। বার্জেলিউস দুটি জিনিস পান এই রস বিশ্লেষণ ক'রে, একটি হাইড্রোক্লোরিক এসিড, অন্যটি যে কি তা তিনি বুঝতে পারেন নি। তিন বৎসর পর একজন জার্মান বৈজ্ঞানিক ডাক্তার থিওডোর সওয়ান এই অজ্ঞাত পদার্থটির স্বরূপ নির্দ্ধারণ করলেন। জানা গেল এই পদার্থটি পেপ্‌সিন।

স. চ.

দীর্ঘায়ু

আজকাল লোকে বাঁচে আগের চেয়ে বেশী, যদিও অনেকে এটা জানেনা। যদি আপনার সাধারণ স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল হয়, তা হ'লে আপনি যে বেশীদিন বাঁচবেন, এটা আজকালকার ডাক্তার এবং প্রাণতত্ত্ববিদ্‌রা প্রচার করে থাকেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে মানুষ যতদিন বাঁচত, আজকাল তার চেয়ে কুড়ি বৎসর বেশী বাঁচে। পরমায়ু আরো দশ বৎসর বেড়ে যেতে পারে কিছুদিনের মধ্যে, কারণ রোগ সারাবার ও রোগের প্রতিষেধক ওষুধ ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং জনস্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থাদিরও উন্নতি হচ্ছে।

পরমায়ু বাড়ছে। এখন আর জীবনযুদ্ধ থেকে স'রে দাঁড়াবার ভাবনা ভাবতে হবে না। এখন ভাববেন, নূতন জীবনের মধ্যে পুনঃ-

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা। বিলাত, য়ুরোপ ও আমেরিকার এটা নিয়ে নানা আলোচনা চলছে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পেন্সন্ প্রথা চালু হওয়া এর একটা কারণ, এবং জাতীয় বীমা আর একটা কারণ।

এখন এই বাড়তি পরমায়ু নিয়ে আমরা করব কি, এই হচ্ছে প্রশ্ন। এতদিন পর্য্যন্ত ত আমাদের জাগরণের সব ক'টা ঘণ্টাই প্রায় জীবিকা অর্জ্জনের কাজে ব্যয় করতে হত। যাওয়া-আসার কাজে কিছু সময় যেত। কাজেই অবসর সময়টা ছিল অত্যন্তই কম।

উত্তরে বলা যায় যে, আমাদের অধিকাংশেরই অন্তরতম সত্তায় নিজের খুশিমত জীবন যাপন করবার একটা গভীর বাসনা আছে। খুব অধিক সংখ্যক মানুষ শীঘ্রই এভাবে থাকতে সক্ষম হবেন। প্রত্যেক মানুষকে অবশ্য ভেবে স্থির করতে হবে যে তিনি কি ভাবে জীবন যাপন করতে চান, এবং সোজাসুজি তার ব্যবস্থা করতে লেগে যেতে হবে।

তবে একটা জিনিষ মনে রাখা অত্যন্ত আবশ্যক। প্রতিবেশীদের সঙ্গে রেষারিষি আর চলবেনা, জীবনযাত্রার মান বদলে ফেলতে হবে। পেন্সনের আয়ে খুব কলাও করে থাকা ত চলে না।

ট্যাক্স কম দিতে হবে, ঋণের সুদ ও আসল শোধ, জীবনবীমার প্রিমিয়াম দেওয়া প্রভৃতি খরচ সম্ভবতঃ আর থাকবে না। কাপড়-চোপড় বেশী খরচ না করলেও চলবে।

অবসর সময়ের কাজ, ইংরেজিতে যাকে hobby বলে, তার প্রয়োজনীয়তা এখন বিশেষ রকম বেড়ে যাবে। এ বিষয়ে আমেরিকায় কি হচ্ছে দেখলে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। ছোটখাট ব্যবসা শুরু করে অনেক লোক খুব কৃতকার্য্য হয়েছেন সেখানে।

যাঁরা মাছ ধরতে ভালবাসেন তাঁরা এ সময়ে ছিপ, সুতো বঁড়শি প্রভৃতি অনায়াসে তৈরি করতে পারেন, শিকারীরা বন্দুক মেরামত করতে পারেন, অস্ত্র অস্ত্রশস্ত্র শান দিতে পারেন। ব্যায়ামবিদ্‌রা ক্রিকেটের ব্যাট ও টেবিলের র‍্যাকেট প্রভৃতি ঠিক করতে পারেন। যাঁরা ডাকটিকিট সংগ্রহ করেন তাঁরা সেগুলির বাজার-দরের খোঁজ নিতে পারেন।

যাঁরা ফুল ও তরকারির বাগান পছন্দ করতেন, এখন ঐ দিকে বেশী করে মন দিয়ে নিজের বাড়ীর প্রয়োজন ত সমস্তই মেটাতে পারেন। যা বাড়ীতে প্রয়োজন নেই তা বাজারে বিক্রী করে দেওয়া যায়। যাঁরা এককালে অতীত কালের নানা জিনিষ ঘর সাজাবার জন্যে আহরণ করতেন, তাঁরা সেইরকম জিনিষ, তা ছাড়া আসবাবপত্র নূতন ক'রে পালিস ক'রে বিক্রী করতে পারেন। যাঁরা নৌকা চালাতেন অবসর বিনোদনের জন্যে, তাঁরা তৈরি নৌকার ব্যবসা করতে পারেন।

যে সব জিনিষে আগে আনন্দ পেতেন, সেইগুলিই জীবিকা অর্জ্জনের জন্য অবলম্বন করলে মনে প্রচুর সুখ-শান্তি থাকে, সন্তোষের অভাব হয় না।

একজন পঁয়ষট্টি বৎসরের বৃদ্ধ এক নূতন ব্যবসা ফেঁদেছেন। আগে হাঁস মুরগী পুষতেন, এখন ডিমের উপর নানারকম নানা রং-এর ছবি এঁকে বাজারে বিক্রী করেন। মানুষের মুখই বেশী আঁকেন।

আর এক বৃদ্ধ নাতিনাতনীদের জন্মদিনে উপহার দেবার জন্যে নিজে খেলনা তৈরি করতেন। সেগুলি দেখে সবাই খুব তারিফ করত। এখন তিনি খুব কলাও ক'রে এই কাজ চালাচ্ছেন, কারখানাই খুলে বসেছেন।

অবসরপ্রাপ্ত এন্‌জিনীয়ার, কলকব্জার মিস্ত্রি, প্রভৃতি মানুষেরা নিজের নিজের লাইনে কতরকম নূতন জিনিষ উদ্ভাবন করছেন। একজন ডাক্তার যব গম্ প্রভৃতি নিয়ে পরীক্ষা করতেন, এখন তিনি নূতন খাদ্যই আবিষ্কার ক'রে ফেলেছেন।

কতদিকেই যে মানুষের মন যায়। এক ভদ্রলোক মাছ ধরতে ভালবাসতেন, তিনি নানারকম টোপ বিক্রী করেন এখন। আর এক বৃদ্ধ ছাত্রদের কাছ থেকে তাদের পুরনো পাঠ্য বই কিনে নেন অর্দ্ধেক দামে। সেইগুলিই তারপর নূতন ছাত্রদের কাছে কিছু চড়া দামে বিক্রী হয়। আর এক নব্বই বৎসর বয়সের যুবক নিজের স্কুটারে চ'ড়ে আশেপাশের সব বাড়ীর পোষা জন্তু-জানোয়ারদের ডাক্তারি ক'রে বেড়ান।

এ সবগুলি খবর থেকে এই প্রমাণ হয় যে, দেহ এবং মনকে কর্ম্মক্ষম রাখতে পারলেই দীর্ঘায়ু হওয়া যায়। আমাদের পরমায়ু বেড়েছে বটে, কিন্তু দেহ মনকে যদি শুধু আলস্যে ডুবে থাকতে দেওয়া হয় তা হ'লে দ্রুত ক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যায় মানুষ।

ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের এই দশাই হত। তাঁরা নূতন দেশ, নূতন জলহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারতেন না। বছর ষাট বয়স হলেই তাঁরা খুব প্রচুর পরিমাণ পেন্সনসহ অবসর নিয়ে দেশে ফিরতেন এবং প্রায়শঃই অনতিবিলম্বে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটত তাঁদের।

এখন আর কর্ম্মক্ষম সুস্থ মানুষে এ ভাবে থাকতে পারে না।

কাজ থেকে অবসর নিলেই যে একেবারে চলৎশক্তি রহিত স্থবির হয়ে ব'সে যেতে হবে এটা আর কেউ মনে করে না।

পাঁচমিশালীর দেশ

একজন পর্য্যটক লিখছেন :

টেল্ আভিভ্-এ একটি রাস্তা আছে যার নাম বেন্ য়েহুডা ষ্ট্রীট্। এইখানে বেড়াতে বেড়াতে কিপ্‌লিং-এর কথা মনে পড়ে যায়।

সে বেচারী ভদ্রলোক যদি এখানে আসতেন তা'হলে তাঁর কবিতার লাইনগুলি তাঁকে গিলেই খেতে হত। এই বিচিত্র মনোমুগ্ধকর দেশে পূর্ব্ব ও পশ্চিম সারাক্ষণই এসে পরস্পরের সঙ্গে মিলছে। টেল্ আভিভ্, জেরুসালেম বা হাইফা যেখানেই যান, এই মিলনের দৃশ্য দেখবেন প্রতি রাস্তার মোড়ে, প্রতি তরুশ্রেণী-মধ্যবর্ত্তী মোটর রাস্তায়। রেড্ সী পর্য্যন্ত এই একই দৃশ্য।

এই যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন, সেটা ঐ দিন বড় বেশী করে নজরে পড়ল। আমি সেদিন এক আমেরিকান মহিলার সঙ্গে দুপুরের খাওয়া খেতে বসেছিলাম। ইনি Fifth Avenue-এর বৈজ্ঞানিক সজ্জায় সজ্জিত ফ্ল্যাট্ ছেড়ে, ইস্‌রায়েলে এসে বাসা বেঁধেছেন। এখানে আরাম কম, খাটুনি বেশী। তিনি যে জন্মেও আর টেলিভিসন্ দেখবেন না, তার জন্যে তাঁর কোনো ক্ষোভ আছে ব'লে মনে হ'ল না।

খাওয়ার পর আমি রিহোভথের কমলালেবুর বাগানে গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে মরোক্কো বাসিনী কয়েকজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বললাম, এরা আগে মরুভূমির মধ্যে গুহায় বাস করত। কয়েকটি য়েমেন্ থেকে আগত মেয়ে ও দেখলাম, যারা এই দেশে আসবার আগে মোটর গাড়ী চোখে দেখে নি।

এই দুটো চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দিলাম। এই দশ বছর বয়স্ক রাষ্ট্রে কুড়ি লক্ষ আন্দাজ লোক বাস করে, তাদের মধ্যে কম হলেও সত্তরটা দেশের লোক মিলে মিশে রয়েছে।

এদের সকলকেই এক বিশেষ অর্থে ইহুদি বলা যায়। এরা সকলেই পুরাতন হিব্রু জাতিগুলির কোনও না কোনোটির থেকে উদ্ভূত, এবং অনেকে ইহুদি ধর্ম্মই পালন করে।

কিন্তু এই দুটি বিষয় বাদ দিলে তাদের ইহুদি ব'লে চিনবার কোনো উপায়ই নেই। চেহারাতে কিছুই ধরা পড়ে না। তারা সকলেই যে ইহুদি নামক একটা বিশেষ জাতির মানুষ তা মনেই হয় না।

ইহুদিরা ৭০ খ্রীষ্টাব্দের, প্যালেষ্টাইন থেকে বিতাড়িত হয় রোমানদের দ্বারা, এবং পৃথিবীর নানা দেশে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করে। য়ুরোপ বাসী ইহুদি আছে, আমেরিকান, ক্যানাডিয়ান্ এবং অষ্ট্রেলিয়ান্ ইহুদিও আছে। এসিয়া, আফ্রিকা ও ভারতেও ইহুদি আছে।

ইসরায়েলে আমি ভারতীয় চেহারার ইহুদি দেখেছি, তাদের চেহারায় ভারতীয়ত্বার কারণ, তারা সত্যই ভারতীয়। ইথিওপিয়ান্ ইহুদি দেখেছি, যারা অন্য হাবসীদের মতই কৃষ্ণবর্ণ। যারা মরোক্কো, বা ইরাক্ থেকে এসেছে, তাদের চেহারা সম্পূর্ণই আরবদের মত।

এখন ইস্রায়েলের অধিবাসী যারা, তারা একটি পাঁচমিশালী জাত। কয়েকটি মাত্র জিনিষ তাদের সকলের সাধারণ সম্পত্তি। সেগুলি হচ্ছে একই ভাষা, একই পৌরাণিক কিংবদন্তী এবং ঐতিহ্য, তাদের নবলব্ধ জাতীয়তা বোধ, ও যদিও সর্ব্বক্ষেত্রে নয়, একই ধর্ম্মে বিশ্বাস।

সী

ডাচ্ নিউগিনির অধিবাসী

ডাচ নিউগিনির সোয়াট উপত্যকার পার্বত্য মানুষগুলি মাঝে মাঝে যুদ্ধ করাটাকে কিছু নীতিবিরুদ্ধ ভাবে না।

ডাচ্ নিউগিনির অধিবাসীদের যুদ্ধসজ্জা

এরা প্রস্তর যুগের উলঙ্গ অধিবাসী, সভ্যতার সংস্পর্শ থেকে বহুদূরে থাকে। এরা হাজার হাজার বৎসর ধরে যেরকম ভাবে থেকেছে, ওলন্দাজ সরকার এদের সেরকম ভাবে থাকতে অধিকার দিয়েছেন। এদের কাছে যুদ্ধ বাধবার দুটি মাত্র সভ্যকার কারণ আছে। একটি হচ্ছে স্ত্রীলোক চুরি, অন্যটি শুয়োর চুরি।

বিয়ে করতে হ'লে স্ত্রী কিনতে হয়। সাধারণতঃ কড়ির সাহায্যে কেনা বেচা হয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে একটির বেশী স্ত্রী বিয়ে করা অসম্ভব।

কখনো কখনো মেয়েটির পরিবারের কাছ থেকে নানান কিস্তিতে দাম দিয়ে তাকে কেনে লোকটি। সাধারণ মূল্য হচ্ছে তিরিশ থেকে চল্লিশটি কড়ি অথবা একটি বড় শুয়োর।

সময়ে সময়ে কোন একটি পুরুষ কেনে একটি বিবাহিত রমণীকে নিয়ে পালিয়ে যায়। তার মানেই যুদ্ধ। স্বামী এবং তার প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিরাই যুদ্ধ সুরু করে।

এই সোয়াট উপত্যকার মানুষরা তাদের শুয়োরগুলিকে সবচেয়ে মূল্যবান্ ভাবে। সবাই যতগুলি পারে ততগুলি রাখতে চায়। একটি উচ্চাকাঙ্খা-সম্পন্ন প্রস্তর যুগের মানুষ আবার যতগুলি পারে স্ত্রীও রাখতে চায়। যতগুলি স্ত্রী থাকবে ততগুলি ক্ষেত পাবে সে, অবশ্য স্ত্রীরাই এই ক্ষেতগুলির দেখাশুনো করে।

স্ত্রীদের ভরণ-পোষণের কোন দায়িত্ব নেই স্বামীদের স্ত্রীরা তাদের নিজেদের ও তাদের সন্তানদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব যে শুধু নেয় তা নয়, স্বামীদেরও দায়িত্ব তারাই নেয়।

উত্তর বোর্ণিও

যদিও যুদ্ধের সময় প্রতিপক্ষের মস্তক কেটে নেওয়া থেমে গিয়েছে এবং স্থানীয় কুখ্যাত "লং হাউস"গুলি, যেখানে এইসকল বীভৎস বিজয়চিহ্ন রাখা হ'ত, সব উঠে যাচ্ছে তবুও উত্তর বোর্ণিও এখনো একটি দস্তুরমত উত্তেজনা-সঞ্চারকারী স্থান বলে গণিত হয়। এর তীরে তীরে জলদস্যুরা এখনো হানা দিয়ে বেড়ায়।

সুগম যাতায়াতের পথের অভাবই এই আধুনিক যুগে জলদস্যুতার একটি প্রধান কারণ, আর এই যাতায়াতের পথের অভাব এই দেশের দ্রুত উন্নতির পথে একটি প্রধানঅন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উত্তর বোর্ণিওর পরিধি আয়ারল্যাণ্ডের সমান, এবং এতে মাত্র পনের'শ মাইল আন্দাজ রাস্তা আছে। এর মধ্যে চার'শ মাইল মাত্র পাথর বাঁধানো, আর বাকী সব মাটির অথবা সুরকির।

রাস্তা তৈরী করা একটি শ্রমসাধ্য কাজ। কারণ গ্রীষ্ম প্রধান দেশের আবহাওয়া এবং জঙ্গল ছাড়াও এই দেশটি অত্যন্ত পর্ব্বত সঙ্কুল ততরাং পাহাড়ের গায়ের পাশে পাশে পাথর কেটে রাস্তা তৈরী করা হচ্ছে।

এই রাস্তা তৈরীর কাজ এদেশীয় স্ত্রীলোকরাই করে। এরা এই কাজে একেবারে আদিম যুগের হাতিয়ার ব্যবহার করে। সঙ্গে যে ছবি দেওয়া হল, তাতে মেয়েগুলি ধূমপানের অবসর নিয়ে বসে আছে। তারা যে রাস্তাটি করছে তার নাম হ'ল "মৃত্যুপ্রাচার"। এর অসংখ্য সুদৃঢ় বাঁক ও খাড়া ধারের জন্য এর এই নামকরণ হয়েছে।

ধ্বস নামা ও বর্ষাকালে অতিবৃষ্টির ফলে যারা এই রাস্তা ব্যবহার করে, তারা নানা বিপদের সম্মুখীন হয়। কিন্তু এই সকল ব্যাপারই

ধূমপানের অবসর

স্থানীয় মেয়েদের আমোদ দেয়, তারা অবজ্ঞা দেখিয়ে খেতকায় মানুষের "জীপ" গাড়ীকে বলে "পাগলামীর বস্থ"।

সমুদ্র কার অধিকারে ?

সাধারণতঃ সমুদ্র সকলেরই অধিকারে। আচারসম্মত ভাবে একটি জাতি একটি সমুদ্রের তীর থেকে তিন মাইল দূর অবধি জল দাবী করতে পারে। কিন্তু এই নিয়মটি সব জাতি মেনে নেয় না। রাশিয়া, কলম্বিয়া এবং গোয়াটেমালা তাদের সমুদ্রতীর থেকে বারো মাইলের চেয়ে বেশী কাছে ভিন্ন দেশীয় জেলেদের আসতে দেয় না। চিলি, ইকোয়েডর, পেরু এবং এলসালভেডর প্রশান্ত মহাসাগরের তীর হতে দু'শ মাইল দূর পর্য্যন্ত তাদের জল বলে দাবী করে।

কখন ধূমপান বন্ধ করলে আর কোন কুফল ফলে না ?

বোষ্টনের পিটার বেন্ট ব্রিগহ্যাম হাসপাতালের রেডিওলজিষ্টদের মধ্যে প্রধান যিনি তাঁর নাম হচ্ছে ডাঃ মেরিন সি সস্‌ম্যান। তাঁর মতে ধূমপান অনেকদিন ধরে করে তারপর বন্ধ করলেও সুফল পাওয়া যায়।

যারা ধূমপান করে না, এরকম লোক ধূমপায়ীদের জন্যে শোকসভায় সর্ব্বদাই যোগদান করবে। কিন্তু একেবারে হতাশ হয়ে গেলেও চলবে না। কিছু না কিছু সর্ব্বদাই করা যায়। তিরিশ বৎসর ধরে ধূমপান করার পর, তারপরেও যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলেও ফুসফুসের ক্যানসার রোগ অর্দ্ধেকের বেশী কমে যায়। ডাঃ সসম্যান বলেন, "এর থেকে বোঝা যায় যে, কথা আছে শেষ খড়টি না চাপান পর্য্যন্ত উটের পিঠ ভাঙ্গে না, তেমনি এ কথাও সত্য যে শেষ উটটি না চাপালে খড়ের মানুষের পিঠ ভাঙ্গে না।"

হাওয়ার চেয়ে হাল্‌কা আকাশযান কত বোঝা বহন করে ?

হিণ্ডেনবার্গ হাওয়ার চেয়ে হাল্কা ভারবাহী যানের যুগ শেষ করে দিয়েছিল ৬ই মে, ১৯৩৭ তারিখে। এই তারিখে সে চুরমার হয়ে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই হাওয়াই জাহাজটিতে ৭২ জন যাত্রীর জন্য ষ্টেটরুমের ব্যবস্থা ছিল, স্নানের ঘরগুলিতে শাওয়ার ছিল, একটি গ্র্যাণ্ড পিয়ানো ছিল, আর ছিল যাত্রীদের ঘরের দুদিকে পায়চারী করে বেড়াবার জন্য ১০০ ফুট ডেক্। এই আকাশযানে বাপবন্দি গাড়ী, কেমিক্যালে ভর্ত্তি ড্রাম, আকাশে বহন করে নিয়ে যাবার মত বোঝাও চিঠিপত্র, সবশুদ্ধ ৫০ টনেরও বেশী মাল চাপানো চলত।

স্মি

হিণ্ডেনবার্গ

হরতন

শ্রীবিমল মিত্র

৩

কর্ত্তামশাই আসবার আগে অনেকবার ভেবেছিলেন। দুলাল সা'র বাড়ীতে আসবার আগে ভাল ক'রে অনেকবার ভাবাটাই উচিত। দুলাল সা ত শুধু পাটের আড়তদারই নয়, সে যে কর্ত্তামশাই-এর জীবনে মূর্ত্তিমান্ দুগ্রহ একটা।

নিবারণ বলেছিল—আপনি আর কর্ত্তামশাই না-ই বা গেলেন, লোক ত দুলাল সা ভাল নয়—

লোক যে দুলাল সা' ভাল নয়, তা কি আর কর্ত্তামশাই জানেন না? ভাল ক'রেই জানেন। সে কথা কর্ত্তামশাই-এর চেয়ে ভাল ক'রে আর কেউই জানে না এই কেষ্টগঞ্জে।

তবু বলেন—না নিবারণ, আমাকে নিজে না গেলে হবে না—চল—

—কিন্তু তা ব'লে এত রাত্তিরে?

কর্ত্তামশাই বলেছিলেন—দিনমানে ত সাধু থাকছে না তোমার!

তা সত্যি! কালকে ভোরবেলাই চ'লে যাবে যে। আজ রাত্রে না গেলে হবে কি ক'রে? নিবারণ তখন প্রায় শুতে যাবার যোগাড় ক'রে ফেলেছিল। হঠাৎ কর্ত্তার কি খেয়াল হ'ল, তিনি সেই দোতলা থেকে আবার খড়মের শব্দ করতে করতে নেমে এসেছিলেন।

বড়গিন্নী সেদিনও সরসের তেল গরম ক'রে এনেছিল বাটিতে। কিন্তু হঠাৎ কর্ত্তামশাইকে ঘরে না দেখে কেমন অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। এমন ত হয় না। বরাবর খাওয়া-দাওয়ার পরই নিজের বিছানাটায় এসে শুয়ে পড়েন কর্ত্তামশাই। কিন্তু আজকে হঠাৎ এই ব্যতিক্রম কেন তা বুঝতে পারে নি বড়গিন্নী। পাশের ঘরে আওয়াজ শুনে আরও অবাক্ হয়ে গেল।

—তুমি এখেনে?

কর্ত্তামশাই তখন নিজেই সিন্দুকটা খুলেছেন। বহুদিনের পুরোন সিন্দুক। কর্ত্তামশাই-এর বৃদ্ধ প্রপিতামহ কালিকেশ্বর দেবশর্ম্মণঃর আমলের সিন্দুক। চিরকাল বন্ধই থাকে। সিন্দুকটা খুলতেই যেন অনেক যুগের জমানো অতীত একসঙ্গে দাঁত বার ক'রে হেসে উঠল। লোহার ডালা। কয়েকটা পেতল-কাঁসার বাসন ওপরে, তাও বেশির ভাগ সব বার ক'রে নেওয়া হয়েছে। সিদ্ধেশ্বরের বিয়ের সময় অনেক বাসন বেরিয়েছিল। তার পর কোথায় সে সব গেল। একটা একটা ক'রে সব কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। কর্ত্তামশাই-এর চোখের সামনে সব ভাসছে এখনও। বিয়ে ত ভালই দিয়েছিলেন সিদ্ধেশ্বরের। কিন্তু ওই যে দুলাল সা। দুলাল সাই দিনরাত মতলব দিত। কানে ফুস-মন্তর দিত। ওদের সঙ্গেই মেলামেশা করত সব সময়।

একদিন ব'কে দিয়েছিলেন কর্ত্তামশাই। সেদিনও অনেক রাত হয়েছে। তখনও বাড়ী ফেরে নি সিদ্ধেশ্বর। বিয়ে হয়েছে, মেয়ে হয়েছে। তবু বাউণ্ডুলে স্বভাব সিদ্ধেশ্বরের। নিবারণকে সেদিন ব'লে রেখেছিলেন কর্ত্তামশাই। বলেছিলেন—সিধু এলেই আমাকে ডেকে দেবে ত নিবারণ—

বৌমাকেও ব'লে রেখেছিলেন।

নলহাটির গগন চাটুজ্জের মেয়েকে পুত্রবধূ করেছিলেন কর্ত্তামশাই। কর্ত্তামশাই বলেছিলেন—তুমি একটু কড়া হতে পার না বৌমা?

বৌমা মাথার ঘোমটা আরও টেনে নিচু ক'রে দিয়েছিল শ্বশুরের সামনে।

—আমার ছেলে হয়ে সে ওই বখাটে ছোঁড়াদের সঙ্গে আড্ডা দেবে? আমার মুখে চুণ-কালি দেবে, আর আমাকে তাই দেখতে হবে?

এক-একদিন নিবারণকেও জিজ্ঞেস করতেন—আচ্ছা, ওদের সঙ্গে সিধে কোথায় যায় বল ত নিবারণ?

নিবারণ জানত সব কিন্তু মুখ ফুটে বলবার সাহস হ'ত না। কতদিন নিবারণ দেখেছে, দুলাল সা আর নিতাই বসাকের সঙ্গে ছোটবাবু চণ্ডীতলার বাঁধাঘাটে ব'সে বড় কলকে টানছে। বলতে গেলে নিতাই বসাকই ছিল ছোটবাবুর প্রাণের স্যাঙাত। সারাদিন গুজ গুজ ফিস্ ফিস্ চলত তার সঙ্গেই। তার পর এক-একদিন কোথায় থাকত, কোথায় খেত কেউ জানতে পারত না।

যখন রাত দু'প্রহর পেরিয়ে যেত তখন চুপি চুপি বাড়ীতে ঢুকত।

—তুমি একটু কড়া হতে পার না বৌমা? ওরা সব ডাকাত। ওই দুলাল সা, নিতাই বসাক, সবাই ডাকাত এক-একটা!

বৌমা কোনও দিন শ্বশুরের সামনে মুখ তুলে চায় নি পর্য্যন্ত, ওই কথাগুলোই তার কানে যেত কি না তাও বোঝা যেত না। বড়গিন্নীও কিছু বলত না বৌমাকে।

কর্ত্তামশাই বড়গিন্নীকেও জিজ্ঞেস করতেন—সিধে যায় কোথায়? তুমি কিছু জান? কি করে এত রাত পর্য্যন্ত?

বড়গিন্নী বলত—আমি ত কিছু জানি নে।

—তা তুমি যদি না জানবে ত ছেলের মা হয়েছিলে কেন শুনি?

শেষকালের দিকে কর্ত্তামশাই যেন উন্মাদের মত হয়ে গিয়েছিলেন। শেষকালে একদিন বৈঠকখানার সামনেই ব'সে রইলেন। বললেন—আজ হয় এস্পার নয় ওস্পার—

ক্রমে রাত অনেক হ'ল। কর্ত্তামশাইও ব'সে, নিবারণও ঠায় ব'সে।

নিবারণ শেষকালে বললে—আপনার শরীর খারাপ, আপনি এবার শুতে যান কর্ত্তামশাই—

কর্ত্তামশাই বললেন—তুমি থাম নিবারণ, তোমার যদি ছেলে থাকত ত তুমি বুঝতে পারতে যে ছেলে থাকার কি জ্বালা! এমন যার ছেলে তার ঘুম আসে? ঘুমিয়ে তার শান্তি হয়?

এর পর আর নিবারণের কথা বলার সাহস হয় নি।

তার পর রাত বারোটা বাজল। একটা বাজল। কর্ত্তামশাই ঠায় বসে রইলেন। কারোর কথাতেই আর নড়লেন না। তার পর ভোরের দিকে কর্ত্তামশাই-এর কেমন মাথাটা ঘুরে গেল। তিনি সেইখানে ব'সে ব'সেই ঘুরে প'ড়ে গিয়েছিলেন। তার পর দিন ডাক্তার এসেছিল, কবিরাজ এসেছিল। তার পর ছ'মাস শয্যাশায়ী ছিলেন। যখন বিছানা ছেড়ে উঠলেন তখন মাথায় আরও বড় টাক প'ড়ে গেছে। যেন ছ'মাসের মধ্যেই দশ বছর বয়েস বেড়ে গেছে।

•

এও সেই পনের বছর আগেকার ঘটনা।

পনের বছর আগে যখন দুলাল সা আর নিতাই বসাক সবে এই কেষ্টগঞ্জে হরিসভা খোলার মতলব করছে। কর্ত্তামশাই-এর সাত বিঘে জমির ওপর দুলাল সা বাড়ী তুলবে-তুলবে করছে। সেই সময় থেকেই সিদ্ধেশ্বর ওদের দলে ভিড়ে গিয়েছিল।

একদিন সিদ্ধেশ্বরকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করেছিলেন কর্ত্তামশাই—তুমি ওদের সঙ্গে মেশো কেন শুনি?

কর্ত্তামশাই-এর সামনে সিদ্ধেশ্বরের কথা বলার সাহস হ'ত না কোনওকালে।

—কথা বলছ না কেন? ওদের সঙ্গে কেন মেশো? ওরা তোমার মেশার যুগ্যি?

তবু সিদ্ধেশ্বর কথা বলে নি কিছু।

কর্ত্তামশাই আবার কড়া সুরে বলেছিলেন—যত সব বাউণ্ডুলে ফেরেব্‌বাজের দল, জাতের ঠিক নেই যাদের, তারাই হ'ল তোমার ইয়ার-বক্সি? তোমার বাপকে যারা অপমান ক'রে যায়, তাদের সঙ্গে মিশতে তোমার লজ্জা করে না? বেকুব কোথাকার?

তারপরে একটু থেমে বলেছিলেন—এর পর ফের যদি ওদের সঙ্গে মেশো ত বাড়ী থেকে তোমাকে দূর ক'রে দেব ; তা মনে রেখ—

হঠাৎ যেন বারুদে কেউ আগুন ধরিয়ে দিলে। সিদ্ধেশ্বর এমনিতে নিরীহ গোবেচারী মানুষ। ছোটবেলা থেকে কখনও কর্ত্তামশাইয়ের সামনে মুখ তুলে কথা বলে নি। কিন্তু সেদিন কি হয়েছিল কে জানে। সিদ্ধেশ্বর এই প্রথম মাথা তুলল।

বললে, আপনার বাড়ীতে আমি আর থাকতে চাইও নে!

—কি? কি বললে? কি বললে তুমি?

সেয়ানা জোয়ান ছেলে! কিন্তু কর্ত্তামশায়ের তখন রাগে কর্ত্তব্যজ্ঞান হারিয়ে গিয়েছিল বোধ হয়। বললেন, কি বললে তুমি, আবার বল?

কথাগুলো চীৎকার ক'রেই বলছিলেন কর্ত্তামশাই। চীৎকার ক'রে সব কথা বলা অভ্যাস তাঁর। চীৎকার শুনে ভেতর থেকে বড়গিন্নীও এসে পড়েছিলেন। বৌমার কানেও কথাটা গিয়েছিল। কর্ত্তামশাইয়ের চীৎকারে সেই ফাঁকা বাড়ীটা তখন হাহাকার ক'রে উঠেছে। নিবারণ সামনে দাঁড়িয়েও কিছু বলতে সাহস পাচ্ছিল না।

—আপনার বাড়ীতে আমি আর থাকতে চাইও নে।

আর সঙ্গে সঙ্গে ঠাস্‌ ক'রে এক চড় কষার শব্দ হ'ল। কর্ত্তামশাইয়ের বুড়ো হাতের চড় জোয়ান সিদ্ধেশ্বরের গালে ব'সে ফেটে চৌ-চাকলা হয়ে গেল!

নিবারণ ভয়ে হাঁ-হাঁ ক'রে উঠেছে। বড়গিন্নীও ঘরের মধ্যে ঢুকে সমস্ত কাণ্ড-কারখানা দেখে অবাক্‌।

কর্ত্তামশাই তখন থর থর ক'রে কাঁপছেন। বলছেন, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। বাড়ীতে থাকতে চাস নি ত বেরিয়ে যা! আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা—

বড়গিন্নী আর কথা বাড়াতে দেয় নি সেদিন। সিদ্ধেশ্বরের হাতটা ধ'রে সোজা ঘরের ভেতরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তার পর থেকে যতদিন সিদ্ধেশ্বর বাড়ীতে ছিল, ততদিন বাপের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। কোনও রকমে আসত একবার বাড়ীতে। তাও অনেক রাত্রে। কখন আসত সে, আর কখন ঘুমোত, কখন খেত, কিছু টের পেতেন না কর্ত্তামশাই। ছেলের নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করতেন না প্রথম প্রথম।

অনেক দিন পরে আর থাকতে পারেন নি। বড়গিন্নীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সিধু কোথায়?

বড়গিন্নী বলেছিল, বাড়ীতে।

কর্ত্তামশাই বলেছিলেন, এখনও ও-বেটাদের সঙ্গে মেশে?

—তা জানি নে।

ওই পর্য্যন্ত!

তার পর বহুদিন কোনও খবরই রাখতেন না ছেলের। ছেলে বাড়ীতে আসে, বাড়ীতে ঘুমোয়, খায়, আর কিছু নয়। নিবারণের সঙ্গে কর্ত্তামশাই হাজারো-ব্যাপার সম্পর্কে কথা বলতেন, ঘুণাক্ষরে একবারও সিদ্ধেশ্বরের নাম মুখে আনতেন না।

আস্তে আস্তে দুলাল সা, নিতাই বসাক দু'জনেই দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ ক'রে দিলে। নিজের চোখেই সব দেখতে লাগলেন, নিজের কানেই সব শুনতে লাগলেন। শেষ পর্য্যন্ত একদিন সেই সিদ্ধেশ্বরও আর ফিরে এল না। রাত কেটে গেল, পরদিন সকাল হ'ল। তার পরদিনও কেটে গেল। তখনও আসে নি সিদ্ধেশ্বর।

বড়গিন্নী কাছে গিয়ে বসল সেদিন। বললে, সিধুর খোঁজ করলে না তুমি?

—কেন? সিধু আসে নি?

—না।

—কাল কখন বেরিয়েছে?

—কালও আসে নি। আজ তিনদিন তার দেখা নেই। বৌমা বড় কান্নাকাটি করছে।

কর্ত্তামশাই গুম্ হয়ে গেলেন। আর সেই যে সিদ্ধেশ্বর চ'লে গিয়েছিল, আর তার কোনও খোঁজ নেই। কেউ খুন করল, না কি কোথাও সন্ন্যাসী হয়ে চ'লে গেল, তারও কোনও হদিস নেই এই এত বছর।

কর্ত্তামশাইও আর তার খোঁজ করেন না। খোঁজ করতে চেষ্টাও করেন না কখনও। যাক, যে যাবে তাকে কে ধ'রে রাখতে পারে?

এত বছর ধ'রে এ-সব ঘটনা ঘটে গেছে তবু এ নিয়ে কখনও কর্ত্তামশাই হা-হুতাশ করেন নি। চতুঃষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁর একটা ফাঁড়া আছে; একথা বলেছিল কাশীর পণ্ডিত শিরোমণি বাচস্পতি। এখন এই চৌষট্টি বছর বয়স হ'ল তাঁর। এখন আর কিসের ফাঁড়া থাকবে? আর ফাঁড়া থাকলেই বা কি? এই কেষ্টগঞ্জে এত কাণ্ড হ'ল। দুলাল সা আর নিতাই বসাকই ত তাঁর জীবনে দু'-দুটো মস্ত ফাঁড়া! তারাই বা তাঁর কি এমন ক্ষতি করতে পারলে? সাত বিঘে জমি নিয়েছে, নিক। তাঁকে ঠকিয়ে টাকা নিয়েছে, নিক! তাতে তিনি এমন কিছু গরীব হয়ে যান নি। তা ছাড়া দেশেও ত কত কাণ্ড হয়ে গেল। ইংরেজরা চ'লে গেল। হিন্দু-মুসলমানে মারামারি-কাটাকাটি হ'ল। অমন ভাতের দুর্ভিক্ষ হ'ল দেশে। পদ্মার পার থেকে লোকজন এসে কেষ্টগঞ্জের বাজারে ছাউনি করল—তখনও ত তিনি খেতে পেয়েছেন। তখনও ত তাঁকে ভিক্ষে করতে হয় নি। এখনও ত তিনি ছাদের তলায় ঘুমোন, এখনও ত রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হয় নি তাঁকে।

কিন্তু দুলাল সা'র বাড়ীতে সাধুর খবরটা শোনার পর থেকেই কেমন যেন বিচলিত হয়ে গেছেন। নিবারণকে বারবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তুমি কিছু শুনেছ নিবারণ?

নিবারণের খেয়াল ছিল না। জিজ্ঞাসা করলে, কিসের কি কর্ত্তামশাই?

—যাকে যা বলছে, সব মিলে যাচ্ছে? সাধুর কথা বলছি। দুলাল সা'র বাড়ীতে যে সাধু এসেছে।

নিবারণ বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ কর্ত্তামশাই। হুবহু। আমি বাজারে গিয়েছিলাম, সেখানে পাল মশাইয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল, তিনি ত একেবারে অবাক্। আর দেখা হ'ল সুকান্তবাবুর সঙ্গে—

—সেটা কে?

—আজ্ঞে ওই যে নতুন সরকারী আপিস হয়েছে, সেই আপিসের বড়সায়েব!

—বড়সায়েব মানে?

নিবারণ বললে, আজ্ঞে অনেক টাকা মাইনে পায়, ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসার, বউ নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়—

—বউ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়? কেন?

নিবারণ বললে, আজ্ঞে কলকাতার লোক ত। এখানে বন-জঙ্গলের মধ্যে প'ড়ে থাকেন, কি করবেন, তাই কেষ্টগঞ্জের বাজারের দিকে মাঝে মাঝে কেনা-কাটা করতে আসেন—

—সে কি বলছিল?

নিবারণ বলেছিল, তিনিও ত অবাক্। তিনি বলছিলেন, তোমার কর্ত্তামশাইকে বল একবার সাধুকে দেখে আসতে, সাধু সব ব'লে দেবেন, বড় ভাল গুরু পেয়েছে দুলাল সা' মশাই—

—হ্যাঁ, যাচ্ছি আমি ওই চাঁড়ালের বাড়িতে, আমি ওই নেমক-হারামের বাড়িতে যাচ্ছি, যেতে আমার বয়ে গেছে।

তার পর উঠে যাবার আগে বোধ হয় আর একবার লুচি-ভাজার গন্ধটা নাকে এসে লাগল। নাকটা একবার হাত দিয়ে টিপে ধরলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, সাধু বেটা কবে যাবে?

নিবারণ বললে, আজ্ঞে, কাল সকাল বেলায়। এই দু'দিন ধ'রে ত কেবল খাওয়া-দাওয়া উৎসব চলছে, আজকেই শেষ খাওয়া—আপনি যাবেন?

—তুমি থাম! আমি কখনও লুচি খাই নি জীবনে?

বলতে বলতে ওপরে নিজের ঘরে গিয়ে উঠলেন। খাওয়া-দাওয়া আগেই সারা হয়ে গিয়েছিল। বড়গিন্নী তখনও ঘরে আসে নি। বিছানায় শুতে গিয়েও আবার কি ভাবলেন। জানালাটা খোলা ছিল। অনেক আলো, অনেক উৎসবের আয়োজন হয়েছে ওদিকে। কর্ত্তামশাই একবার সেই দিকে চাইলেন। তার পর আস্তে আস্তে পাশের ঘরে গেলেন। তার পর কোমরের ঘুন্‌সী থেকে চাবিটা বার ক'রে লোহার সিন্দুকটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কতদিনকার সিন্দুক, আর কতদিনকার তালা। ইতিহাসের পলি প'ড়ে প'ড়ে সব ঢেকে গিয়েছে। একদিন কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য্য এই সিন্দুক খুলেই টাকা বার করেছেন, হীরে মুক্তো সোনা বার করেছেন। তখন এ-সিন্দুক ভর্ত্তি ছিল। তখন জমিদারীর আমদানী হলেই সে-সব এর ভেতরে এসে ঢুকত। প্রথম যুদ্ধের সময় চালের দাম বেড়েছে, ধানের দাম বেড়েছে, যা-কিছু লাভ হয়েছে সবই জমেছে এই সিন্দুকে। সিন্দুকটার সামনে গিয়ে কীর্ত্তীশ্বর খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। কোথাকার কোন্ কর্ম্মকারের হাতে-গড়া সিন্দুক যেন হঠাৎ বড় মুখর হয়ে উঠল। ছোটবেলায় এই সিন্দুকেই রোজ মা সিঁদুর লাগিয়ে দিতেন নিজের হাত দিয়ে। তারপর গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করতেন। এ সেই সিন্দুক। এই সেদিনও আর একটা বড় যুদ্ধ হয়ে গেছে। কোথায় জার্ম্মানীতে না আমেরিকায়। কীর্ত্তীশ্বর তার খবরও রাখেন নি। শুধু মাঝে মাঝে দেখেছেন কেষ্টগঞ্জের ওপর দিয়ে উড়ো জাহাজ উড়ে যাচ্ছে। লোকে বলত—বোমা ফেলতে যাচ্ছে বর্ম্মা-মুলুকে। যুদ্ধ যেখানেই হোক, সেবারের মত একটা পয়সাও আমদানী হয় নি তাঁর। একটা পয়সাও এর ভেতরে এসে ঢোকে নি। জমিগুলো বেচে যা টাকা পেয়েছেন তা পেটে খেতেই ফুরিয়ে গেছে। কীর্ত্তীশ্বর সেইখানে দাঁড়িয়ে একটা একটা ক'রে চাবি খুঁজে খুঁজে তালার গর্ত্তে লাগাবার চেষ্টা করলেন। অতীতের স্বপ্নরা যেন এই রাত্রে আবার পাখী হয়ে তাঁর মাথার ওপর এসে উড়তে লাগল।

—তুমি এখানে?

চমকে উঠেছেন কীর্ত্তীশ্বর। হঠাৎ পেছন ফিরেই দেখলেন বড় গিন্নী। তার পর আর দ্বিধা না ক'রে হাতটা ঢুকিয়ে দিলেন সিন্দুকের অন্ধকারের ভেতর, যেন অনেক-গুলো আশা এক সঙ্গে বস্তু হয়ে তাঁর হাতে ঠেকল। আশাগুলো যেন তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে বন্দী হতে চাইছে। অন্ধকারে তাদের দেখা যায় না। অন্ধকারে তাদের চেনা যায় না। অন্ধকারে শুধু তাদের অনুভব করা যায়। তাই যতগুলো পারলেন ততগুলো তাড়া-তাড়ি হাতে তুলে নিলেন। তার পর আবার সিন্দুকের ডালাটা নামিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বড়গিন্নী জিজ্ঞেস করলেন, ওগুলো নিয়ে কোথায় যাচ্ছ এখন?

কীর্ত্তীশ্বর কথা বললেন না।

বড়গিন্নী পেছন পেছন দরজা পর্য্যন্ত এসে আবার জিজ্ঞেস করলে, কোথায় যাচ্ছ, বলছ না যে?

কীর্ত্তীশ্বর তখন নাগালের বাইরে চ'লে গেছেন। তাঁর কানে কথাটা গেল কি গেল না, তাও বোঝা গেল না। শুধু তাঁর খড়মের আওয়াজ সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে নিচের বারান্দার পাশে বৈঠকখানার ভেতরে অস্পষ্ট হয়ে মুছে গেল।

সেই অত রাত্রে কর্ত্তামশাই নিবারণকে নিয়েই এসে-ছিলেন এ বাড়িতে। উৎসব-অনুষ্ঠান যা-ই হোক না কেন, চেহারা দেখে মনে হয় যেন তখন সব শেষ হয়ে গেছে। ভালই হয়েছে। কেউ দেখতে না পেলেই হ'ল। কর্ত্তামশাই এই এতদিন পরে এই প্রথম আসছেন

এখানে। নিজেরই দেওয়া জমি। হরিসভার নামে দান করেছিলেন দুলাল সা'কে। কিন্তু তখন কি জানতেন এখানে এত বড় প্রাসাদ গ'ড়ে তুলবে দুলাল সা? আর প্রাসাদ গ'ড়ে নিজের বসত-বাড়ি করবে সেটাকে?

—তুমিই আগে ভেতরে যাও নিবারণ, বল গিয়ে কর্ত্তামশাই এসেছেন!

—আপনি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন, সেটা কি ভাল দেখাবে?

কর্ত্তামশাই রেগে গেলেন; বললেন, যা বলছি তুমি তাই কর না—

এর পরে আর নিবারণের দাঁড়ান চলে না। নিবারণ ভেতরেই ঢুকছিল। কর্ত্তামশাই বাইরে থেকে বাড়ির ঐশ্বর্য্য দেখে অবাক্ হয়ে গেলেন। ইলেকট্রিক লাইট নিয়েছে দুলাল সা। ইলেকট্রিক লাইটের তলায় শ্বেত-পাথরের পৈঁঠেগুলো চক্ চক্ ঝক্ ঝক্ করছে। একটু দূরেই কলাপাতা মাটির খুরি-গেলাস প'ড়ে আছে। সেখানে নেড়ি-কুকুরের জটলা। লুচি ভাজাটা বোধ হয় বন্ধ হয়েছে। সেই গন্ধটা আর নেই তেমন। শুধু এঁটো কলাপাতার গন্ধেই জায়গাটা ভ'রে আছে।

কিন্তু নিবারণকে আর বেশি দূর যেতে হ'ল না। সামনে বুঝি নিতাই বসাক আসছিল। একেবারে হাতে-নাতে ধ'রে ফেলেছে। আর দূরে কর্ত্তামশাইকে দেখে দৌড়ে এসেই পায়ের ধুলো মাথায় নিয়েছে।

—থাক্, থাক্ নিতাই, থাক্ থাক্—

নিতাই বসাক কিন্তু তবু ছাড়ে না। বললে, না কর্ত্তামশাই, পায়ে হাত না দিতে পারলে আমি এখান থেকে উঠছি নে—

শেষে কর্ত্তামশাই নিতাই বসাককে ধ'রে তুললেন। বললেন, দুলালের বাড়িতে নাকি কোন্ সাধু এসেছে শুনলাম নিতাই?

—আজ্ঞে হ্যাঁ কর্ত্তামশাই, দুলাল তখন থেকে দুঃখু করছিল আপনি এলেন না ব'লে! আমাদের যে আজ কি সৌভাগ্য!

কর্ত্তামশাই বললেন, আর স্বাস্থ্য ত তেমন নেই নিতাই, তাই কোথাও বড় বেশি বেরুই নে!

—চলুন চলুন—ভেতরে চলুন—

কর্ত্তামশাইকে ধীরে-সুস্থে হাত ধ'রে ভেতরে নিয়ে চলল নিতাই। বললে, এই বাড়ী হবার সময়ও আপনাকে নেমন্তন্ন করেছিলাম, তখন আপনি আসতে পারেন নি, তার পর দুলালের বড় ছেলে বিজয়ের বিয়ের সময়ও আপনাকে বলেছিলাম, তখনও আপনি আসতে পারেন নি, এ কি আমাদের কম আফ্‌শোস কর্ত্তামশাই?

কর্ত্তামশাই চলছিলেন সঙ্গে সঙ্গে আর চারদিকের ঐশ্বর্য্য দেখে অবাক্ হয়ে যাচ্ছিলেন। এত বড় বাড়ী করেছে দুলাল সা। সব সেই চুরির পয়সায়। এতদিন যা শুনেছিলেন সব যেন অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে হ'ল। চুরির পয়সায় কি এত কিছু হয়? শুধু ঐশ্বর্য্য নয়, এই সুখ, এই শ্বেত পাথর, এই ইলেকট্রিক লাইট, এই উৎসব! সব মিথ্যে শুনেছিলেন তা হ'লে?

নিবারণও পেছন পেছন আসছিল। কর্ত্তামশাই পেছন ফিরে বললেন—নিবারণ, এস—

যেন নিবারণ সঙ্গে না থাকলে তিনি জোর পাবেন না। সঙ্গে নিবারণ থাকা চাই। তার পর আবার বললেন—ওগুলো আছে ত?

নিবারণ বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে—

তার পর যেন নিজের দুর্ব্বলতা ঢাকবার জন্যেই নিতাই বসাকের দিকে চেয়ে বললেন—কতকগুলো কুষ্ঠি এনেছিলাম—

নিতাই বসাক বললে—তা কুষ্ঠি আনবার কি দরকার ছিল। বাবা ত মুখ দেখেই ভূত-ভবিষ্যৎ সব ব'লে দিচ্ছেন—

কর্ত্তামশাই যেন আশা পেলেন। বললেন—সব? সব ঠিক-ঠিক ব'লে দিচ্ছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ কর্ত্তামশাই। একেবারে বোকা বানিয়ে দিয়েছেন আমাদের সকলকে। দুলাল ত কাল থেকে একেবারে বাবার পা আর ছাড়ে নি—

হঠাৎ সামনে কে যেন এসে দাঁড়াল। এসে কর্ত্তা-মশাইকে চোখের দৃষ্টি দিয়ে ভাল ক'রে দেখতে লাগল।

নিতাই বসাক বললে—এই হ'ল আমাদের নতুন বৌ—

নতুন বৌ! কর্ত্তামশাই চিনতে পারলেন না।

—আজ্ঞে বিজয়ের বৌ! দুলালের পুত্রবধূ।

বিজয়! কাউকেই চেনেন না কর্ত্তামশাই! কবে বিজয় হ'ল, কবে তার বউ এল বাড়ীতে, সে খবর শুধু কানেই এসেছে এতদিন। দেখেন নি কাউকেই। তবু বললেন—বিজয়? বিজয় বুঝি দুলালের বড় ছেলে?

নিতাই বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, বিজয় ত এখানে নেই এখন, সে আপনাকে দেখলে খুব খুশী হ'ত!

—কোথায় সে?

—আজ্ঞে, বিলেতে। বিলেতে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ছে।

কথাটা যেন তীরের মত বিঁধল কর্ত্তামশাই-এর কানে! দুলাল সা শুধু বাড়ী গাড়ী ঐশ্বর্য্যই করে নি, সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকেও মানুষ করেছে। এ সমস্তই কি চুরির টাকায়? সমস্তই কি মিথ্যের দাবীতে?

—এস নতুন বৌ, এঁকে প্রণাম কর!

কর্ত্তামশাই চমকে উঠলেন। বললেন—থাক, থাক, আর প্রণাম করবার দরকার কি?

নতুন-বৌ কিন্তু এক-পাও এগোয় নি। সেখানে দাঁড়িয়েই বললে—কাকে প্রণাম করতে বলছ তুমি কাকাবাবু? তোমাদের যিনি অপমান করেন, যিনি তোমাদের দেখলে গালাগালি দেন, তাকে তুমি কোন্ আক্কেলে প্রণাম করতে বলছ আমাকে শুনি?

নিতাই বসাকও একটু ঘাবড়ে গেল। বললে—দেখছেন ত কর্ত্তামশাই আজকালকার মেয়েদের কথা বলার ধরণ-ধারণ?

নতুন বৌ তবু থামল না। তার জিভের ধার তখনও তেমনি তীক্ষ্ণ ক'রে বললে—আজকালকার মেয়েদেরও মান-অপমান জ্ঞান কর্ত্তামশাই-এর মতই টন্‌টনে কাকাবাবু, তারা অত সহজে ভোলে না—

—তুমি থাম ত নতুন-বৌ। কার সঙ্গে কি রকম কথা বলতে হয় জান না। চলুন কর্ত্তামশাই, সামনে, সামনের ঘরেই বাবা আছেন—চলুন—

ব'লে নিতাই বসাক কর্ত্তামশাইকে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে চলল।

মাথার ওপরে পাখা ঘুরছিল বন্ বন্ ক'রে। তবু পাশেই চামর নিয়ে একজন চাকর বাবার মাথার ওপর দোলাচ্ছে। দুলাল সা উপুড় হয়ে প'ড়ে আছে বাবার পায়ের সামনের গদির ওপর। বাবার হাত দুলালের মাথায়। নিতাই বসাককে বেশি কিছু বলতে হয় নি। সে একেবারে কর্ত্তামশাইকে বাবার সামনে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছে। কর্ত্তামশাই-এর পেছনে নিবারণও ব'সে আছে। নিতাই বসাক এক তাড়া কোষ্ঠি সামনে ফেলে দিয়েছে। তা প্রায় খান পনের হবে। গোল ক'রে পাকানো হলদে রঙ-এর কাগজের বাণ্ডিল।

নিতাই বসাক ঢুকেই বাবার সামনে বাণ্ডিলটা রেখে দিয়েছিল। আর যা বলবার তাও বলেছিল।

তার পর ধূপ আর ধুনোর গন্ধের ভারে সমস্ত আব-হাওয়াটা যেন কেমন স্বর্গীয় হয়ে উঠেছিল। কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য্যের ছেলে কীর্ত্তীশ্বর ভট্টাচার্য্য আজ নিজে এসেছেন দুলাল সা'র বাড়ী—এও যেন একটা ঘটনা। কত লোকই ত এল। কত লোকই ত এসে খেয়ে-দেয়ে বাবাকে প্রণাম ক'রে সাধ্যমত প্রণামীও দিয়ে গেল। কর্ত্তামশাই আসেন নি ব'লে কেউ-ই ত আফশোষ করে নি! কেষ্টগঞ্জের বর্ত্তমান ইতিহাসে কর্ত্তামশাই কতটুকু! তাঁর আসা-না-আসার জন্যে কার কি ক্ষতি বৃদ্ধি হয়? কিন্তু তবু কেন তিনি এলেন? এও কি তাঁর দুর্ব্বলতা? দুলাল সা লোক ঠকিয়ে বড়লোক হয়েছে ব'লে কি তাঁর হিংসে? নইলে এতবার খোসামোদ করার পরেও তিনি যখন একবারও আসেন নি, তবে আজ কি করতে এলেন? কোষ্ঠি দেখাতে? তাঁরও ভাল সময় আছে কি না তাই জানতে? কিন্তু সে ত শিরোমণি বাচস্পতি ব'লেই দিয়েছিলেন চৌষট্টি বছর আগে, তাঁর জন্মের সময়। আজই ত তাঁর চৌষট্টি বছর বয়েস হ'ল! নীচ জাতীয় লোকের সংস্পর্শে তাঁর বিপদ্ আছে! তবে কি এখানে এসে তাঁর কোনও বিপদ্ হবে?

কর্ত্তামশাই পাশে নিবারণের দিকে চাইলেন।

একটার পর একটা দুর্য্যোগ তাঁর মাথার ওপর দিয়ে ঝড়ের বেগে চ'লে গিয়েছে। কই, তখন ত তিনি এত দুর্ব্বল হয়ে পড়েন নি। কেন তিনি এখানে এলেন? নিজের পিঠে নিজেরই তাঁর চাবুক মারতে ইচ্ছে হ'ল। অথচ কত লোককে তিনি নিজেই চাবুক মেরেছেন একদিন। সিদ্ধেশ্বরকেই ত একদিন চড় মেরেছিলেন! কই, সেদিন ত তিনি এমন ভেঙে পড়েন নি। আর বৌমা? বৌমাও যদি একটু শক্ত হ'ত তখন তাঁর মত। বৌমাও একদিন চ'লে গেল! বড় আঘাত পেয়েছিলেন কর্ত্তামশাই সেদিন, নিজে দেখে বেছে পুত্রবধূ করেছিলেন। ভেবেছিলেন, ভট্টাচার্য্য-বংশের কুললক্ষ্মী আবার ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত হয়ে উঠবে পুত্রবধূর আবির্ভাবে! অথচ এই এখনই দুলাল সা'র পুত্রবধূকে দেখে তাঁর নিজের পুত্রবধূর কথাই আবার মনে প'ড়ে গিয়েছিল।

পাশের নিবারণের দিকে ফিরে বললেন—কেমন কাঠ-কাটা কথা দেখলে ত নিবারণ?

নিবারণ বুঝতে পারলে না। বললে—আজ্ঞে, কার কথা বলছেন?

—ওই দুলাল সা'র বেটার বউ-এর।

নিবারণ বললে—আজ্ঞে, শুনলাম ত!

কর্ত্তামশাই বললেন, একবার ভাবলাম বউটার গালে ঠাস্ ক'রে চড় মারি—

—আজ্ঞে কথাগুলো ভাল নয় ত! আমাকেও ওমনি ক'রে কথা বলে!

কর্ত্তামশাই বললেন, নেহাৎ এদের বাড়িতে এসেছি তাই কিছু বললাম না—

নিবারণ বললে, আজ্ঞে, না ব'লে ভালই করেছেন! পরস্ত্রী ত!

কর্ত্তামশাই বললেন, রেখে দাও তোমার পরস্ত্রী। নিজের মেয়ে হলে আমি কেটে দু'খান ক'রে ফেলতাম না?

নিবারণ বললে, আজ্ঞে দুলাল সা বলে ওই নতুন বউই নাকি এ সংসারের লক্ষ্মী!

—কি রকম?

কর্ত্তামশাই যেন ভুলে গেলেন, কোথায় ব'সে আছেন তিনি! বললেন, বলে নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বলে ত! ওই বউ আসার পর থেকেই ত দুলাল সা'র অবস্থা ফিরল। ছেলে বিলেত গেল, আগে টিম্‌টিম্ ক'রে চলছিল, এখন রমারম অবস্থা! ওই নতুন বউই এ বাড়ির সব কর্ত্তামশাই—দুলাল সা'র নিজের ত বউ নেই! সে আগেই গত হয়েছে।

কর্ত্তামশাই-এর কথাগুলো ভাল লাগছিল না শুনতে। এখানে এসে এতক্ষণ ব'সে থাকতে থাকতে যেন ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছিল। আশে-পাশে দু'চার জন ভক্ত তখনও হাতজোড় ক'রে চোখ বুজে ব'সে আছে। কারও মুখেই কোনও কথা নেই। এমনি চুপ ক'রে দুলাল সা'র ভক্তির বাড়াবাড়ি দেখবার জন্যেই এসেছিলেন নাকি তিনি?

কর্ত্তামশাই নিবারণকে আবার ডাকলেন, নিবারণ—

—আজ্ঞে।

কর্ত্তামশাই বললেন, চল, চ'লে যাই, মোহরটা দিয়ে দাও—

নিবারণ নিজের ফতুয়ার পকেট থেকে একটা মোহর বার ক'রে কর্ত্তামশাই-এর দিকে এগিয়ে দিতে গেল। জাহাঙ্গীরের আমলের সোনার মোহর। খাঁটি সোনার তৈরি।

কর্ত্তামশাই বললেন, না, তুমিই দাও—

বাবার সামনে একটা রুপোর থালা পাতা ছিল। তার ওপর রুপোর টাকা, কাগজের নোট প'ড়ে আছে। নিবারণ মোহরটা তারই ওপর ফেলে দিলে। ফেলে দিতেই একটা ঝনাৎ ক'রে শব্দ হ'ল।

কর্ত্তামশাই বললেন, এবার নিতাইকে ডাক নিবারণ, চল আমরা যাব—

নিতাই শুনতে পেয়েছে। শুনেই কাছে ঝুঁকে প'ড়ে বললে, সে কি কর্ত্তামশাই, আর একটু বসুন, কোষ্ঠিটা দেখা হোক—

কর্ত্তামশাই বললেন, কিন্তু রাত বাড়ছে, আর ত থাকতে পারি না আমরা, আমার বুকের ব্যথাটা যে বাড়ছে—

—আচ্ছা, আর একটু বসুন।

ব'লে নিতাই বাবার সামনে নিচু হয়ে হাতজোড় ক'রে কি যেন সব বললে। বাবা ধ্যানস্থ ছিলেন। এবার চোখ খুললেন। বললেন, ভাগ্যফল? কার?

নিতাই বসাক কর্ত্তামশাই-এর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। বাবা খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন কর্ত্তামশাই-এর দিকে। তার পর নিজের মনেই যেন বললেন—হতভাগ্য! ভাগ্য আপনাকে পরাস্ত করেছে, আমি তার কি করব? আমার কি হাত আছে?

কর্ত্তামশাই-এর মুখটা আরও গম্ভীর হয়ে উঠল। তিনি কিছু বলবার আগেই নিতাই বসাক সামলে নিলে। বললে, আজ্ঞে উনি এই কুষ্ঠিগুলো এনেছিলেন, যদি একটু দয়া করে দেখতেন—

বাবা সামনের বাণ্ডিলটা খুলে একটা কোষ্ঠি খুলে ধরলেন। তার পর কি দেখলেন কে জানে। বাবার চোখজোড়া যেন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল ধীরে ধীরে!

এতক্ষণে কর্ত্তামশাই বললেন, ওটা দেখবেন না, ও মারা গেছে—

বাবা যেন আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলেন। জিজ্ঞেস করলেন, মারা গেছে?

—হ্যাঁ, মারা গেছে, পনের বছর আগেই মারা গেছে!

—কার কোষ্ঠি এটা? এ আপনার কে?

কর্ত্তামশাই বললেন, ও আমার নাত্‌নী। হয়তন!

—আপনি ঠিক জানেন এ মারা গেছে?

নিবারণও চুপ করে শুনছিল। এবার বললে, হ্যাঁ, বহুদিন আগেই মারা গেছে, আজ বেঁচে থাকলে অনেক বয়েস হ'ত—পনের বছর আগের কথা।

—কত বয়েসে মারা গেছে?

নিবারণই উত্তর দিলে। বললে, তিন বছর বয়েসে!

বাবা যেন আরও মনোযোগ দিয়ে কোষ্ঠিটা দেখতে লাগলেন এবার। কর্ত্তামশাই নিবারণের মুখের দিকে চাইলেন। তার পর সেখান থেকে নিতাই বসাকের মুখের দিকেও দৃষ্টি ফেরালেন। কেমন? তোমাদের মহাপুরুষের বিদ্যে ধরা পড়েছে এবার। নিবারণও যেন

মনে মনে সশঙ্ক হয়ে উঠেছিল। নিতাই বসাকই একটু বিব্রত হয়ে উঠল। বাবার পরাজয় যেন নিতাই বসাকেরই পরাজয়। দু' দিন ধ'রে এত লোক এসে পরীক্ষা ক'রে গেছে, কেউ ধরতে পারে নি। এতক্ষণে কর্ত্তামশাই-ই যেন প্রথম ধ'রে ফেললেন। অথচ নিতাই বসাক খবরটা যে জানে না, তা নয়। দুলাল সা জানে, নিতাই বসাক জানে। কেষ্টগঞ্জের তাবৎ সবাই জানে। সিদ্ধেশ্বরের প্রথম সন্তান। তার অন্নপ্রাশন ঘটা ক'রেই করেছিলেন কর্ত্তামশাই। কর্ত্তামশাই-এর বাস্তুভিটে নতুন ক'রে আবার সাজিয়েছিলেন। কত লোক এসেছিল, কত লোক খেয়ে গিয়েছিল। তখন ত এমন দশা হয় নি কীর্ত্তীশ্বরের। তখন সিদ্ধেশ্বরও ছিল।

দুলাল সা'র যেন এতক্ষণে ধ্যান ভাঙল।

সে উঠে বসল। 'বাবা' ব'লে একটা ভক্তির হুঙ্কার ছাড়ল। তার পর চারদিকে চেয়ে দেখল।

নিতাই বসাক দুলালকে বললে, কর্ত্তামশাই এসেছেন, চেয়ে দেখ দুলাল—

দুলাল সা বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে কর্ত্তামশাই-এর দিকে। তার পর আবার শিবনেত্র ক'রে বাবার পায়ের সামনে ডানলোপিলো-গদির উপর উপুড় হয়ে পড়ল।

কর্ত্তামশাই ইঙ্গিত করলেন নিবারণকে। বললেন, চল নিবারণ, উঠি—

নিবারণ কোষ্ঠিগুলো গুছিয়ে নেবার জন্যে হাত বাড়াচ্ছিল।

কিন্তু হঠাৎ বাবার মুখে কথা ফুটল। বললে, এ মরে নি! মারা যেতে পারে না এ। জাতিকার পরমায়ু এখনও আছে—

নিতাই বসাকও একটু মুহ্যমান হয়ে গিয়েছিল।

বললে, কিন্তু বাবা, হরতন যে মারা গেছে, আমরা যে সবাই জানি!

তখনও বাবা কোষ্ঠিটা নিয়ে একমনে দেখছিলেন। এবার নিবারণের দিকে সেখানা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, অষ্টমে বৃহস্পতি, এ জাতিকা অল্পায়ু নয়, দশমে শুক্র, চতুর্থে লগ্নপতি বুধ তুঙ্গী—

কোষ্ঠিটা ফিরিয়ে দিয়ে নির্বিকার হয়ে গেলেন বাবা!

কিন্তু কর্ত্তামশাই উঠতে গিয়েও আর উঠতে পারলেন না। বললেন, কিন্তু তাকে যে চণ্ডীতলার শ্মশানে সৎকার ক'রে আসা হয়েছে?

বাবা মাথা নাড়তে লাগলেন।

—না, এ নাতনী আপনার এখনও জীবিতা! আপনার বংশের লক্ষ্মীই ছিলেন ইনি। এঁকেই আপনি গৃহ থেকে দূর ক'রে দিলেন? গৃহলক্ষ্মীকে কেউ ত্যাগ করে?

কর্ত্তামশাইয়ের মুখখানা শিশুর মত সরল হয়ে গেছে। এ আজ কি কথা শুনছেন তিনি! তিনি একবার নিতাই বসাকের মুখের দিকে চাইলেন। নিবারণ কর্ত্তামশাইয়ের দিকে চেয়ে ছিল। সেও যেন হতবাক্ হয়ে গেছে। এই পনের বছর পরে এ কি শুনছেন তিনি!

—এঁকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসুন আপনি। আপনার গৃহে নিয়ে আসুন। আবার আপনার গৃহ ধনে-জনে-ঐশ্বর্যে ভ'রে উঠবে, আবার আপনার অবস্থার পরিবর্ত্তন হবে।

—কিন্তু সে যে মারা গেছে। আমি যে চণ্ডীতলার শ্মশানে নিয়ে তাকে সৎকার ক'রে এসেছি।

বাবা হাসলেন।

—আপনি নিজে তার সৎকার করেছেন? আপনি ভাল ক'রে স্মরণ ক'রে দেখুন ত?

কর্ত্তামশাই কিছু ভাবতে পারছেন না আর তখন। নিবারণের দিকে ফিরলেন তিনি আবার। নিবারণও তখন হতভম্ব দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আছে। পনের বছর আগের কথা! এতদিন পরে সে স্মরণ করা কি অত সহজ। তখন সিদ্ধেশ্বর ছিল। কর্ত্তামশাইয়ের বড় আদরের নাতনী ছিল হরতন। সেই হরতন এখনও বেঁচে আছে? সেই হরতনই তাঁর গৃহলক্ষ্মী? সে ফিরে এলে আবার তাঁর গৃহ ধনে-জনে-ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে?

কর্ত্তামশাই যেন সব মনে করবার চেষ্টা করতে লাগলেন আবার।

বাবা আবার প্রশ্ন করলেন - আপনি নিজেই তার সৎকার করেছিলেন?

কর্ত্তামশাই বললেন, না।

—তবে? তবে কে সৎকার করতে শ্মশানে গিয়েছিল?

কর্ত্তামশাই বললেন, আমার ছেলে সিদ্ধেশ্বর গিয়েছিল। আমি নিজে যাই নি। আমার বড় আদরের নাতনী ছিল হরতন, তার সৎকার করতে আমি পারি নি, তাই…

তার পর হঠাৎ নিবারণের দিকে ফিরে বললেন, নিবারণ, তুমি গিয়েছিলে? তোমার কিছু মনে আছে?

নিতাই বসাক এবার নিবারণের মুখের দিকে চাইলে।

দুলাল সা হঠাৎ ভক্তির আধিক্যে হুঙ্কার দিয়ে উঠল

—বাবা, তুমিই সত্য…তুমিই সত্য, ভব-সংসারে আর সব মিথ্যে বাবা…

ধূপ-ধুনোর ধোঁয়ায় ঘরখানা তখন ঝাপসা হয়ে এসেছে আরও। কে বুঝি ধুনুচিতে আরও খানিকটা ধুনো গুড়িয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে। চাকরটা সব মন দিয়ে শুনছিল। তার হাতের চামরটাও যেন থেমে গেছে হঠাৎ। যারা এতক্ষণ হাত-জোড় ক'রে চোখ বুজে বাবার ধ্যান করছিল, তারা এবার চোখ খুললে। কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়া চারদিকে। এই বিংশ-শতাব্দীর কেষ্টগঞ্জে হঠাৎ যেন আবার মধ্যযুগ ফিরে এল রাতারাতি।

দুলাল সা এবার আর পারলে না। সেই উপুড়-অবস্থাতেই হাউ-মাউ ক'রে ডুকরে কেঁদে উঠল, ভাঙ্গা গলায় আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল—ভক্তি দাও বাবা, ভক্তি দাও—

কর্ত্তামশাইয়ের মুখখানার দিকে চেয়ে নিতাই বসাকও চেঁচিয়ে উঠল—জয় বাবা গুরুদেব—

আর কর্ত্তামশাইয়ের মনে হ'ল তিনি যেন পাগল হয়ে যাবেন! নিবারণের দিকে চেয়ে ধমকে উঠলেন—কি হ'ল, তোমার মনে পড়ছে না?

বিপদ্ হ'ল নিবারণের। সে প্রাণপণে মনে করবার চেষ্টা করতে লাগল। তারও বয়স হয়েছে। এ বয়সে কি আর সেই আগেকার স্মরণশক্তি আছে? না কি, নিবারণ সেই আগেকার নিবারণই রয়েছে। তারও ত মাথায় টাক পড়েছে। তারও ত চুল পেকেছে। তারও ত দাঁত নড়ছে।

—বাবা!

হঠাৎ দরজার দিক্ থেকে মেয়েলি গলার শব্দ শুনে সবাই চেয়ে দেখলে সেখানে নতুন-বৌ এসে দাঁড়িয়েছে।

নতুন-বৌ বললে, রাত অনেক হ'ল, বাবার শরীর খারাপ, সারাদিন জলগ্রহণ করেন নি, সকলকে এবার উঠতে বলুন কাকাবাবু—

ক্রমশঃ

রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ

শ্রীউষা বিশ্বাস

আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত এবং মেয়েদের ও ছেলেদের একই প্রকার শিক্ষাব্যবস্থা হওয়া সমীচীন কিনা এ সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট মতদ্বৈধ আছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ আজও এ বিষয়ে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি। অনেকেরই মতে নারী ও পুরুষের দেহমনের গতি ও প্রকৃতি এবং উভয়ের জীবনের স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র যখন সম্পূর্ণ বিভিন্ন তখন তাদের শিক্ষাব্যবস্থাও ভিন্নরূপ হওয়া প্রয়োজন। আবার কেউ কেউ বলেন, শিক্ষায় মানুষমাত্রেরই জন্মগত এবং 'সহজাত' অধিকার আছে। তাই শিক্ষা থেকে নারীকে বঞ্চিত করলে তাকে মানুষের জন্মগত অধিকার থেকেই বঞ্চিত করা হয়। নারীরও পুরুষের মতই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে। সে শুধু পুরুষের জন্যেই সৃষ্ট হয়েছে—তার জীবনের অন্য কোনও সার্থকতা নেই, একথা বললে তার মনুষ্যত্বকেই অপমান করা হয়। সে 'অর্দ্ধেক মানবী' ও 'অর্দ্ধেক কল্পনা' নয়—যাকে পুরুষ গড়েছে, 'সৌন্দর্য সঞ্চারি আপন অন্তর হতে'। নর ও নারীর উভয়েরই পরিচয় হচ্ছে যে তারা মানুষ,—যে মানুষ বিধাতারই সৃষ্টি। বাস্তবিকই, "বিদ্যা যদি মনুষ্যত্বলাভের উপায় হয়" এবং বিদ্যালাভে যদি মানুষমাত্রেরই 'সহজাত' অধিকার থাকে, তবে নারীকে তার 'সহজাত' অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোনও যুক্তিই থাকতে পারে না। এই উভয়বিধ মতের মধ্যেই যে কিছু কিছু সুযুক্তি আছে, সেকথা অস্বীকার করা যায় না। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও কিছু চিন্তা করেছিলেন। শান্তিনিকেতনে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনটিতে তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা দেশে সহশিক্ষা প্রবর্তন করেন। শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই যে তিনি নারীর সহজ মনুষ্যত্বকে বা তার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করেন নি তা তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়। বিশ্ব-

ভারতীতে সহশিক্ষা প্রবর্তন করে তিনি শিক্ষায় নরনারীর সমান অধিকারকেই ঘোষণা করে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন—"যাহা কিছু জানিবার যোগ্য তাহাই বিদ্যা, তাহা পুরুষকেও জানিতে হইবে, মেয়েকেও জানিতে হইবে—শুধু কাজে খাটাইবার জন্য যে তাহা নয়, জানিবার জন্যই। মানুষ জানিতে চায়, সেটা তার ধর্ম; এইজন্য জগতের আবশ্যক অনাবশ্যক সকল তত্ত্বই তার কাছে বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছে। সেই তার জানিতে চাওয়াকে যদি খোরাক না জোগাই কিংবা তাকে কুপথ্য দিয়া ভুলাইয়া রাখি তবে তার মানব প্রকৃতিকেই দুর্বল করি, এ কথা বলাই বাহুল্য।" তিনি আরও বলেছেন, "কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষাপ্রণালীতে মেয়ে পুরুষে কোথাও কোন ভেদ থাকিবে না এ কথা বলিলে বিধাতাকে অমান্য করা হয়।" তাঁর মতে "বিদ্যার দুটো বিভাগ আছে। একটা বিশুদ্ধ জ্ঞানের, একটা ব্যবহারের বিশুদ্ধ জ্ঞানে নারী ও পুরুষের, উভয়েরই যে সমান অধিকার আছে, এ কথা অস্বীকার করলে নারীর সহজ মনুষ্যত্বেরই অবমাননা করা হয়। মেয়েদের মানুষ হতে শিক্ষা দেবার জন্যে তাদের দেওয়া চাই বিশুদ্ধ জ্ঞান—যা তাদের মনুষ্যত্বলাভেরই উপায়। আর সেই সঙ্গে তাদের মেয়ে হতে শিক্ষা দেওয়াও দরকার। সেটিই হচ্ছে "ব্যবহারিক" শিক্ষা, যা তাদের নারীজীবনের স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্রের উপযোগী করে গড়ে তুলতেই সহায়তা করবে। নারীর "ব্যবহারের" ক্ষেত্রটি বা তার স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্রটিও যে স্বতন্ত্র হওয়া দরকার, একথাও অস্বীকার করা যায় না, কারণ তার শরীর ও মনের গতি এবং প্রকৃতি, পুরুষের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। নারী ও পুরুষের মধ্যে এই পার্থক্যটি বিধাতারই সৃষ্ট। এই পার্থক্যকে অস্বীকার করলে বিধাতার সৃষ্টিকেই অবিশ্বাস করা হয়। কিন্তু এ যুগের প্রগতিবাদিনীগণ উৎসাহাতিশয্যে এই মূল কথাটিই ভুলে যান যে, পুরুষদের সঙ্গে তাঁদের দেহগত ও প্রকৃতিগত বৈষম্যটিও উপেক্ষণীয় নয়। পুরুষদের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ যে, তাঁরা যুগ যুগ ধরে মেয়েদের শুধু দমিয়েই রাখতে চেয়েছেন, কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাদের উপরে অবিচার অত্যাচারও করেছেন। তাঁদের অভিযোগটি যে নিতান্তই ভিত্তিহীন তা নয়। অবস্থা বিশেষে বা স্থল বিশেষে ব্যতিক্রম হলেও নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র যে স্বভাবতই বিভিন্ন, এ কথাও অনস্বীকার্য। কিন্তু এই ভেদ বা পার্থক্যের মূলে কোনও অসাম্য বা অবিচার নেই। নারী ও পুরুষের মধ্যে এই দেহগত ও প্রকৃতিগত বিভিন্নতা না থাকলে এবং তাদের সম্বন্ধটি একান্তই প্রতিযোগিতামূলক হলে বিধাতার সৃষ্টিই উল্টে যেত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

"If woman begins to believe that, though biologically her function is different from that of man, psychologically she is identical with him if the human world in its mentality becomes exclusively made, then before long it will be reduced to utter inauity. For life finds its truth and beauty, not in any exaggeration of sameness, but in harmony"—

অর্থাৎ 'নারী যদি সত্যিই বিশ্বাস করতে থাকে যে, সে কেবল জৈব প্রকৃতিতেই পুরুষ থেকে ভিন্ন এবং পুরুষের থেকে তার মনস্তাত্ত্বিক কোনও প্রভেদ নেই—এই পৃথিবীশুদ্ধ লোকই যদি শুধু পুরুষমনোবৃত্তিসম্পন্ন হয় তাহলে অনতিবিলম্বে বিধাতার সৃষ্টিই অর্থহীন হবে। কারণ, জীবনের প্রকৃত সত্য ও সুষমা সুসামঞ্জস্যের মধ্যেই নিহিত আছে—নিরবচ্ছিন্ন অভিন্নতার আধিক্যের ভিতরে নয়।' আধুনিক কালের নারী প্রগতিবাদিনীগণ অনেক সময়েই একথার সত্যতা স্বীকার করেন না। তাঁরা পুরুষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাঁদের সঙ্গে সমান অধিকার দাবী করে বলেন যে, নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্রের মধ্যে কোনও ভেদ নেই। আজকালকার দিনে কঠিন জীবন-সংগ্রামে নেমে অনেক মেয়েকেই হয়ত দৈনন্দিন জীবনের দুঃসহ দৈন্য, অভাব ও দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও পুরুষদের সঙ্গে তাদের সহযোগিতাই কাম্য—প্রতিযোগিতা নয়। পুরুষ যদি নারীকে তার কর্মসহচরী বলেই মনে করে, তবেই সাম্যের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে সত্যিকার সম্বন্ধটি গড়ে উঠবে।

নারীপ্রগতিবাদিনীরা এ কথাও বলে থাকেন যে, যুগ যুগান্তর ধরে সকল দেশেই পুরুষেরা শুধু মেয়েদের উপরে প্রভুত্বই করে এসেছে এবং মেয়েদের অনেক বিষয়ে কতকটা দায়ে পড়েই পুরুষদের আনুগত্য স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু পুরুষেরা যে কেবল গায়ের জোরেই মেয়েদের স্কন্ধের উপর এই আনুগত্যের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে তা বলে মনে হয় না। তাহলে তাদের আনুগত্য দাসীত্বমাত্রেই পর্যবসিত হ'ত। যেহেতু ভালবাসাই তাদের স্বাভাবিক ধর্ম, তারা স্বেচ্ছায় এই আনুগত্যকে বরণ করে নিয়েছে। তারা ভালবাসার কাছে স্বেচ্ছায়ই আত্মসমর্পণ করে এবং প্রিয়জনদের জন্যে অশেষ আত্মত্যাগও তারা করে। এই ভালবাসা বিনা সংসারে কন্যা, ভগিনী, গৃহিণী ও জননীর কর্তব্য হয়ে উঠত এক

বিষম দায়। যার বুকে বিধি অপার সন্তান স্নেহ দিয়েছেন বলেই তিনি সন্তান পালনের জন্যে অশেষ দুঃখ ক্লেশ সয়ে থাকেন। প্রেম আছে বলেই স্ত্রী স্বামীকে সেবা করে তৃপ্ত হয়, গৃহধর্ম পালনে আনন্দ পায়। আবহমান কাল থেকে মেয়েরা এই ভালবাসার দায় স্বেচ্ছায় ও আনন্দেই বহন করে এসেছে। এইজন্যেই তারা স্বামী, সন্তান ও পরিবারের অন্যান্য প্রিয়জনদের সুখের কাছে নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে অকাতরে ও হাসিমুখে বলি দিয়েছে। তারা তাদের কাছে আনুগত্যকে মোটেই দাসত্ব বলে মনে করে নি। তারা গৃহ ও পরিবারের স্নেহবন্ধনে ইচ্ছা করেই ধরা দিয়েছে। ভালবাসার ধর্মই হচ্ছে এই স্বেচ্ছাকৃত আত্মসমর্পণ ও আত্মবিসর্জন। এতে নেই লেশমাত্র অগৌরব বা হীনতার গ্লানি। নারী চিরদিন এই ভালবাসা দিয়েই তার গৃহকে সুখশান্তির নীড় করে গড়ে তুলতে চেয়েছে। সে তার প্রিয়জনদের কাছে আত্মসমর্পণ করেই সংসারে তার আপন স্থানটি অধিকার করেছে এবং সমাজেও তার আপন প্রতিষ্ঠা স্থাপন করতে পেরেছে। নইলে আনুগত্য তার কাছে হয়ে উঠত—পীড়াদায়ক ও অপমানজনক।

মেয়েদের পক্ষে ভালবাসা এবং সংসারে প্রিয়জনদের কাছে "একনিষ্ঠ" আত্মসমর্পণই যে স্বাভাবিক, সমাজও এই শিক্ষা তাদের চিরকাল দিয়ে এসেছে। কবিগুরু বলেছেন—"মেয়েদের ভালবাসার উপরই সমাজ ঝোঁক দিয়াছে, এইজন্য মেয়েদের দায় ভালবাসার দায়। পুরুষের শক্তির উপরই সমাজ ঝোঁক দিয়াছে, এইজন্য পুরুষের দায় শক্তির দায়।" শক্তি ও ভালবাসা—উভয়ের মধ্যে উপযুক্ত ভারসাম্য রক্ষিত হলেই নারী ও পুরুষের মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধটি গড়ে উঠবে। নারী তখন হয়ে উঠবে পুরুষের শুধু নর্মসহচরীই নয়—তার প্রকৃত "সহযাত্রী" এবং কর্মসহচরী—তার সঙ্কটে সহায়, চিন্তায় অংশী, এবং সুখে দুঃখে সহচরী।' মেয়েদের নারী-জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্যেও তাদের উপযোগিতা অর্জন করতে হবে। এজন্যেও তাদের বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন আছে। এরূপ শিক্ষাও স্ত্রীশিক্ষার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হওয়া উচিত। অপর দিকে, মানুষ হিসেবেও মেয়েদের পুরুষদের মতই উচ্চ শিক্ষালাভের এবং জ্ঞান সঞ্চয়ের পূর্ণ অধিকার আছে।

গৃহই নারীর প্রকৃত ও প্রধান কর্মক্ষেত্র বিবেচিত হলেও, আজকের দিনে তাকে কেবল গৃহকোণচারিণী হয়ে থাকলেই চলবে না। তার উপরে দাবী সমগ্র বিশ্বের। গৃহসীমানার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে তার নিজ জীবনকে সীমাবদ্ধ করে সে আজ তাই বিশ্বের দাবীকে ভুলে থাকতে পারে না। কবিগুরু ঠিকই বলেছেন—"আজ সর্বত্র মেয়েরা ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে, বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে, এখন এই বৃহৎ সংসারের দায়িত্ব তাদের স্বীকার করতেই হবে, নইলে তাদের লজ্জা, তাদের অকৃতার্থতা।" সেজন্যে তাদের আজ বিশ্বের জ্ঞান, কর্ম ও চিন্তাধারার সঙ্গেও পরিচিত হতে হবে। তাদের জানতে হবে আজকের দিনে সকল দিক্ দিয়ে জগৎ কতখানি এগিয়ে গিয়েছে—তার কোথায় কি ঘটছে। দৃষ্টির ও কর্মের এই প্রসারতার জন্যেও চাই উপযুক্ত জ্ঞান ও শিক্ষা। যে নারী একান্ত ভাবেই গৃহিণী তিনি আজ আমাদের আদর্শ নন। যিনি ঘরে ও বাইরে কল্যাণী, তিনিই আমাদের আদর্শ। এই কথাটিই মনে রেখে মেয়েদের শিক্ষার আয়োজন করা দরকার।
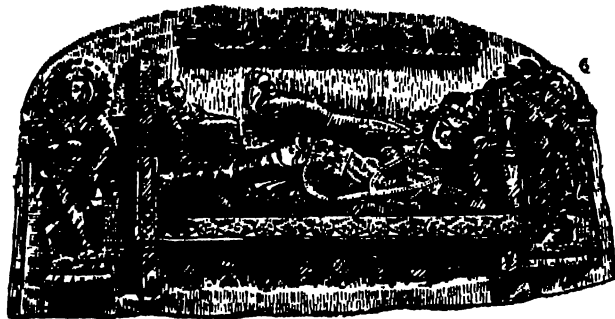
পল্লী উন্নয়ন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীকানাইলাল দত্ত

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে একদিকে যেমন বিপুল ও বিস্ময়কর সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন অন্যদিকে তেমনি বহু বিচিত্র রচনাত্মক কর্মের মাধ্যমে দেশ ও জাতির সমুন্নতি বিধানের প্রকৃষ্ট পথের নির্দেশ করে গেছেন। তাঁর এই রচনাত্মক কর্মের উজ্জ্বলতম নিদর্শন, আজকের বিশ্ববন্দিত বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন। বিশ্বভারতী বা শ্রীনিকেতন কোনটাই বিত্তবান মানুষের সাময়িক খেয়ালের ফলশ্রুতি নহে। ঋষি-কবির ধ্যান দৃষ্টিতে জাতির মুক্তির উপায় সম্পর্কে যে কর্মসূচী অবশ্য অনুসরণীয় ব'লে প্রতিভাত হয়েছিল, এ তারই বাস্তব রূপ।

বিশ্বভারতী-শান্তিনিকেতন আমাদের জীবনের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে, কি পরিমাণে আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রুচিকে উন্নত, মার্জিত ও পরিশীলিত করেছে তার সঠিক মূল্যায়ন এখনও বাকি। দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত সাহচর্য লাভ করেছেন এমন বহু প্রভাবশালী ব্যক্তি আমাদের মধ্যে বিরাজমান। কবির প্রতি তাঁদের ব্যক্তিগত অনুরাগ ও ভক্তির গভীরতাই কবিকে বাদ দিয়ে কবিকৃতির বিচারে বিপুল বিঘ্ন সৃষ্টি করে। কবির সহকর্মী এবং সহচরবর্গের ভাষ্যের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ স্বাভাবিক। অতএব সঠিক মূল্যায়নের জন্য দেশবাসীকে আরও বহুদিন অপেক্ষা করতে হবে। পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক কবি-কর্মের বিচার একই কারণে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ হতে পারে না। তথাপি একথা বোধ হয় নির্বিঘ্নে বলা চলে যে, গ্রামোদ্যোগ কর্মসূচী রূপায়ণের কেন্দ্র শ্রীনিকেতন যতটা সফল হয়েছে কবিও ততটা সার্থক ও সত্য কর্মে ব্রতী হয়েছিলেন। শ্রীনিকেতনই হচ্ছে কবির দেশের কাজের মূর্তি, একথা প্রভাতকুমার লিখেছেন তাঁর বিখ্যাত 'রবীন্দ্রজীবনী' গ্রন্থে।

শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার পূর্বেই কবি গ্রামোন্নয়নের কর্মে ব্রতী হয়েছিলেন তাঁর জমিদারী পতিসর, কালিগ্রাম, শিলাইদহ, বিরাহিমপুর প্রভৃতি অঞ্চলে। গ্রাম উন্নয়নের কাজ সাধারণত কবি বা সাহিত্যসেবীর কর্ম নয়। তথাপি কবি, কেন এবং কেমন করে এই কর্মের প্রতি আকৃষ্ট হলেন সেটুকু না জানলে তাঁর কাজের মূল্য পুরাপুরি উপলব্ধি করা যাবে না।

উনিশের শতককে বাংলা তথা ভারতবর্ষের নবজাগৃতির যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়। এই শতকের শেষের দিকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হবার একটা আকাঙ্ক্ষা দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার তখন প্রগতিশীল দেশবাসীর অন্যতম প্রেরণা স্থল। এখানেই 'ন্যাশনাল' নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলার সূচনা। জাতীয় কংগ্রেস এই হিন্দুমেলার স্বাভাবিক ক্রম-পরিণতি। নবজাগ্রত জাতীয় চেতনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়। পরবর্তীকালে দেশে যখন রাজনীতির দাবি প্রবল হয়ে উঠেছে কবি তখন কখন প্রত্যক্ষভাবে, কখন অপ্রত্যক্ষভাবে সর্বদাই সে দাবি মেনে নিয়েছেন। নিবিড়ভাবে যেমন যুক্ত হন নি তেমনি সম্পূর্ণ পরিহার করেও চলেন নি কোন দিন। দেশের ডাকে সাড়া দিয়েছেন সর্বদাই। তাঁর অমর লেখনীর অজস্র গান, তাঁর অমিতশক্তিধর প্রবন্ধ-সাহিত্য অযুত-ধারায় নবজাগ্রত দেশবাসীর চিত্তে প্রেরণা দান করেছে। কিন্তু স্বাধীনতা-কর্মীদের সঙ্গে প্রকৃত লোক-হিত সম্পর্কে কবির মিল হ'ল না। রবীন্দ্রনাথ রাজনীতি চর্চা করেছেন, আলোচনা করেছেন অন্য প্রসঙ্গের আলোচনাক্রমে—যেমন সমাজ, শিক্ষা, পল্লী ইত্যাদি। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মীদের চলতে হয় ঠিক উল্টো পথে। তাদের আলোচনায় অন্যান্য প্রসঙ্গ এলেও রাজনীতি মুখ্য। রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে মতভেদ প্রবল হয়ে উঠলে কবির মতামত জনচিত্তে প্রয়োজনীয় আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে নি। রাজনীতিক মাদকতা, আন্দোলনের উত্তেজনা ও নগদ লাভের আশায় সমগ্র দেশ সেদিন প্লাবিত হলেও কবি স্বীয় সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলেন। স্বাধীনতা বলতে তিনি কেবল ইংরেজ শাসনের অবসানই বুঝতেন না। তিনি বুঝতেন, লক্ষ লক্ষ মানুষের সার্বিক মুক্তি ও সম্প্রীতিই হ'ল সত্যকার স্বাধীনতা। আর সেই সামগ্রিক স্বাধীনতা ভারতবর্ষ ইংরেজহীন হলেই আমরা পাব, এই চিন্তাকে কবি একান্তই অশ্রদ্ধেয় বলে মনে করতেন।

স্বদেশ উদ্ধার সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুবই স্পষ্ট এবং ইতিবাচক ছিল। তিনি লিখেছেন, "স্বদেশকে উদ্ধার করতে হবে 'নিজেদের পাপ হইতে।' অন্যথায় 'ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়।'" পন্থা কি? তিনি বললেন, "গ্রামে যাও, নিভৃত পল্লীতেই দেশের প্রাণকেন্দ্র, সেখানেই সুরু করতে হবে কাজ"।

"একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া যাহাকে কেহ কোন দিন ডাকিয়া কথা কহে নাই তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আশা দাও, তাহার সেবা কর, তাহাকে জানিতে দাও মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে, সে জগৎ সংসারে অবজ্ঞার অধিকারী নহে। অজ্ঞান তাহাকে নিজের ছায়ার কাছে ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে, সেই সকল-ভয়ের বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার বক্ষপট প্রশস্ত করিয়া দাও। তাহাকে অন্যায় হইতে, অনশন হইতে, অন্ধ সংস্কার হইতে রক্ষা কর। নূতন বা পুরাতন কোন দলই তোমার নাম না জানুক। যাহাদের হিতের জন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছ প্রতিদিন তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা ও অবিশ্বাস ঠেলিয়া এক পা এক পা করিয়া সফলতার দিকে অগ্রসর হইতে থাক।"

কবি প্রভূত ধনশালী প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার পুত্র—মানুষ হয়েছেন এদেশের প্রধান নগরী কলিকাতার বুকে। গ্রামের মানুষের সঙ্গে সাধারণ হিসেবে চলিত কথায় তাঁর খাদ্যখাদকের সম্পর্ক। কবির সমসাময়িক কালে জমিদারগণ প্রজাপুঞ্জের হিতসাধন কর্মে উদাসীন হয়ে পড়েছেন। ইংরেজ শাসনের ভিত্তি এদেশে যতই দৃঢ় হয়েছে গ্রাম ও গ্রামীন মানুষ-সাধারণের দুর্দশা ততই বেড়েছে। স্বাধীনতার চৌদ্দ বছর পরেও গ্রামের মানুষ সে দুর্দশা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

যোগাযোগ ব্যবস্থার ত্রুটি, শাসককুলের বৈশ্যবৃত্তির প্রতি সমীহা প্রভৃতি নানাবিধ কারণে মুসলমান রাজত্ব-কালেও আমাদের গ্রামগুলির সহজ সরল জীবনধারা অব্যাহত ছিল। পঞ্চায়েত কেন্দ্রিক গ্রাম্য-জীবন তার সুখ-দুঃখ সম্পদ্ বিপদ্ নিয়ে মোটামুটি সমৃদ্ধই ছিল। ইংরেজী শিক্ষা ও শাসনের হেরফেরে যোগাযোগ ব্যবস্থার কিছু উন্নতি সাধিত হয় বলেই গ্রাম আর শহরের মধ্যে ব্যবধান কমে যায়। শহরের দিকেই সেদিন পাল্লা ভারি ছিল—নানা কর্মের সুযোগ, আরাম-বিরাম ভোগ-বিলাসের বহু বিচিত্র আয়োজনে প্রলুব্ধ হয়ে যে পারল সেই শহরবাসী হ'ল। এমনি করেই গ্রামের সম্পদে শহর পুষ্ট হতে লাগল আর গ্রামের জীবনধারা দিন দিন ক্ষীণতর হতে থাকল। গ্রাম্য-জীবনের এই দুঃসহ দুরবস্থা প্রত্যেকটি হৃদয়বান মানুষের কাছেই ধরা পড়েছিল। গ্রামে ফিরে যাবার কেতাবী বক্তৃতা ছাড়া প্রকৃত আয়োজন কিন্তু খুব অল্পই হয়েছে। দুই-চারজন আদর্শ-বান কর্মীর কথা বাদ দিলে দেখা যাবে, এখানে-সেখানে যে সব গ্রামোন্নয়নের কিছু কিছু কাজকর্ম হয়েছে তার বেশির ভাগ উদ্যোক্তারা এক একটা মুচিরাম গুড়। তারা কেউই কবির মত হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেন নি, "পল্লীকে বাইরে থেকে পূর্ণ করার চেষ্টা কৃত্রিম। তাতে বর্তমানকে দয়া করে ভবিষ্যৎকে নিঃস্ব করা হয়।" পল্লীর উন্নতি সাধনের এই মৌল কথাটি কবি কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়েই উপলব্ধি করেন নি। দীর্ঘদিন পল্লীবাসীদের একজন হয়ে তাদের মধ্যে বসবাস করে এটা তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন।

জমিদারী কাজকর্ম দেখার সূত্রে রবীন্দ্রনাথ গ্রামীন্ মানুষের নিকট সান্নিধ্য লাভ করেন। তাদের দুঃখ, দুর্দশা, দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা আর অসহায়তা তিল তিল ক'রে প্রকটিত হয়ে তাঁর চিত্তে যে গভীর বেদনার সৃষ্টি করেছিল তা একদিকে, 'সন্ধ্যা', 'এবার ফিরাও মোরে' জাতীয় অপূর্ব কবিতার স্তবকে স্তবকে, 'রাজনীতির দ্বিধা' প্রভৃতি অগ্নিগর্ভ প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে ও নানা বিচিত্র লেখার (সাধনা প্রভৃতি কাগজে) মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করেছে—অন্যদিকে সেই দুঃসহ অবস্থার অবসানকল্পে স্বীয় পদ্ধতিতে কর্মে ব্রতী হয়েছেন। কবি যত বেশি পল্লী-মানুষের সঙ্গে মিশেছেন, যত নিবিড়ভাবে তাদের জেনেছেন, ততই লোকহিতের উপায় সম্পর্কে স্বীয় মতে তাঁর বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে। "স্বাধীনতা পাবার চেষ্টা করব স্বাধীনতার উল্টো পথ দিয়ে এমনতর বিড়ম্বনা আর হতেই পারে না।" কবি দেশকে এই বিড়ম্বনার হাত থেকে মুক্ত করবার জন্য একলাই কর্মে প্রবৃত্ত হলেন।

"প্ল্যান ছিল না বটে, কিন্তু দুটো একটা সাধারণ নীতি আমার মনে ছিল।" এই নীতির উপর ভিত্তি করেই কবি কাজ সুরু করলেন তাঁর জমিদারীতে। বিরাহিমপুর পরগণাকে পাঁচটা মণ্ডলে ভাগ করে পাঁচজন কর্মীর অধীনে পাঁচটি পল্লীসমাজ স্থাপন করেন। এই সব সমাজের মুখ্য কাজ ছিল—গ্রামের রাস্তাঘাট নির্মাণ ও পরিষ্কার করা, জলকষ্ট দূর করা, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, সালিশ বিচার দ্বারা সর্ববিধ বিরোধের নিষ্পত্তি করা, বিদ্যালয় স্থাপন ও ধর্মশালা, শস্যভাণ্ডার সৃষ্টি। এ ছাড়া এই সব পল্লীসমাজের মাধ্যমে নানাবিধ অর্থকরী শস্য ও ফসল উৎপাদনের চেষ্টা করা হ'ত। আলুর চাষ ও আমেরিকান ভুট্টা ফলাবার চেষ্টা, ক্ষেতের

আইলে ও বসতবাড়ীর সীমানাতে আনারস, খেজুর, কলা প্রভৃতি গাছ লাগাবার জন্য কৃষকদের তিনি উৎসাহিত করতেন, যাতে এক টুকরা জমিও অকারণে পড়ে না থাকে।

ঐ যুগে কৃষিকার্য বস্তুত: অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত হ'ত। কবি বুঝেছিলেন কৃষির উন্নতিবিধান করতে হলে বিজ্ঞান-লব্ধ উন্নত জ্ঞানের প্রয়োগ অপরিহার্য। এই সময়ে একখানি পত্রে তিনি লেখেন :

"We all hope that here science in the end would help man. She will make the necessities of life easy accessible to every man, so that humanity will be freed from its tyranny of matter which now humiliates her. The struggling mass of men is great in its paths, in its latency of infinite power."

এ ত কেবল কথার কথা নহে। এ যে উপলব্ধি। জনতার সাধ্য কি কবির উপলব্ধির সঙ্গে একাত্ম হবে। তাঁর উপলব্ধিকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য কারও অপেক্ষা তিনি করলেন না। পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও জামাতা নগেন্দ্র-নাথকে পাঠালেন বিজ্ঞান-ভিত্তিক উন্নত কৃষিবিদ্যা শিখতে। এঁরা যখন কৃষিবিদ্যা শিখতে গেলেন তখনও কৃষিকার্য আমাদের দেশে শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠে নি—যদিও জনক রাজার কথা পুণ্য কাহিনী বলে পঠিত হ'ত। বক্তৃতা বা বইতে অবশ্য কৃষির প্রতি গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজনের কথা কেউ কেউ উল্লেখ করতে সুরু করেছেন।

আমাদের দেশে কথা ও কাজের মধ্যে ব্যবধান বিস্তর। রবীন্দ্রনাথ সত্যদ্রষ্টা ঋষি-কবি। তাঁর যে কথা সেই কাজ। দেশের লোক যখন তাঁর কথামত কাজ করল না তখন তিনি নিজেই অগ্রণী হয়ে কথাকে কর্মের রূপ দিলেন। কেবল অর্থ দিয়ে নয়, বা নেতৃত্ব মাত্র দিয়ে নয় ; কবি কায়মনোবাক্যে কর্মে প্রবৃত্ত হলেন। কায়মনোবাক্যে যে কর্মে ব্রতী হয়েছিলেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ জামাতা ও একমাত্র পুত্রকে গ্রামীণ মানুষের কল্যাণবহ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবার প্রয়াস। দেশের মানুষকে কোন কাজে আহ্বান করে—সে কাজে নিজের ছেলেকে সর্বাগ্রে নিযুক্ত করার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে খুব বেশি নেই।

রথীন্দ্রনাথ আমেরিকায় শিক্ষা সমাপন করে পিতৃ-দেবের জমিদারীতে কাজ আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু নানাবিধ কারণে সেখানে তিনি দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারেন নি। ১৯২২ সন নাগাদ তাঁর কর্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত হয় সুরুলে—এই কেন্দ্র এখন শ্রীনিকেতন নামে ভুবন-বিখ্যাত হয়েছে। কিন্তু এর সুরু হয়েছিল অতি সামান্য ভাবে ; লোককল্যাণের প্রবল ইচ্ছা আর স্বীয় সিদ্ধান্তে অবিচল নিষ্ঠা ভিন্ন সে দিন আর কোন সম্বলই ছিল না। শ্রীনিকেতন কেন্দ্রের কাজের গোড়ার দিকে দেশের লোকের সহায়তা তেমন জোটে নি। কিন্তু বিদেশী বিত্তশালী কবিভক্ত 'কৃষক' এলমহার্স্ট নির্বাধে ও নিঃশঙ্কচিত্তে সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা দিয়েছিলেন। কবির পরিকল্পনা, এলমহার্স্টের অর্থ সাহায্য ও শ্রমে, রথীন্দ্র-নাথের ঐকান্তিকতা ও কালীমোহন ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজন আদর্শ কর্মীর সেবায় শ্রীনিকেতন আজ পরিকল্পিত গ্রামোদ্যোগের কর্মসূচী রূপায়নের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র বলে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি লাভ করেছে। শ্রীনিকেতনের কথা এখন বহুশ্রুত।

কবির পল্লী উন্নয়নের চেষ্টাকে কোন একটি বিশেষ স্থানে কর্মের মাধ্যমে পূর্ণরূপে দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হ'ত না, যদি শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠিত না হ'ত। সেই দিক্ দিয়ে শ্রীনিকেতনের গুরুত্ব সমধিক। কবি নিশ্চয়ই এ গুরুত্বের কথা অনুধাবন করেছিলেন ; কিন্তু এর প্রতি অখণ্ড মনোযোগ দেবার অবসর পান নি। তাঁর জমিদারী অঞ্চলের গ্রামগুলিতে তিনি অতুল সেন প্রমুখ কর্মীর সহায়ে যে কাজ সুরু করেছিলেন তা যাতে ব্যাহত না হয় তার জন্য অবশ্য বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন।

গ্রামোন্নয়ন কর্মের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি নিজ জমিদারীর আয়ের টাকা প্রতি এক আনা দিয়ে একটি তহবিল সৃষ্টি করেন। এ টাকা তিনি পল্লীবাসীকে দান হিসেবে দিয়ে তাদের ছোট করে দেন নি। দিয়েছেন চাঁদা হিসাবে। গ্রামবাসীদেরও তাদের আয়ের টাকা পিছু এক আনা দিতে হ'ত এই তহবিলে। কবির অনুমোদনক্রমে অতুল সেন মহাশয় 'শ্রমদানের' প্রথা প্রচলন করেন। যাঁরা দারিদ্র্যের জন্য দিতে অপরাগ ছিলেন তাঁরা গায়ে গতরে খেটে নিজেদের দেয় চাঁদা শোধ করতেন। এমনি স্বেচ্ছায় শ্রম দানের ফলে খুব অল্প সময়ে ঐ অঞ্চলের বহু জনপদের চেহারা বদলে গিয়েছিল। এই ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। গ্রামের সালিশ বিচারের জরিমানার টাকাটার অপব্যয় নিবারণ করে কবি গ্রাম-সংগঠনের কাজে লাগান।

কবি বলেছেন 'প্রাণ জাগিলেই কাহারো পরামর্শ না লইয়া আপনি চলিতে প্রবৃত্ত হয়।' এইখানে কবি

গ্রামবাসীর প্রাণটা জাগিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র। আর তার ফলে গ্রামে গ্রামে স্কুল, বড়দের লেখাপড়ার ব্যবস্থা, চিকিৎসালয়, পানীয় জলের ব্যবস্থা সবই হয়েছিল। এমন কি ধর্মগোলা, শস্য ভাণ্ডার; কৃষি ব্যাঙ্কও। এ দেশে সমবায় প্রথা চালু হবার পূর্বেই কবি পতিসরে কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপন করেছেন। নোবেল পুরস্কারের এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা কবি প্রথমে এই ব্যাঙ্কেই গচ্ছিত রেখেছিলেন—গ্রামের উন্নতির জন্য চাষীর যে টাকা চাই। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ভুবনবিখ্যাত কবি, নিজে ধনী জমিদার কিন্তু ভাবছেন নিরন্ন অসহায় দেশবাসীর কথা—অভ্যস্ত ভারতীয় মনে এ বিস্ময় জাগায়। চাষীকে মহাজনের কবল থেকে বাঁচাবার উপায় সম্পর্কে কবি অনেক ভেবেছেন। নিজের সীমিত আর্থিক ক্ষমতা নিয়ে অল্প সুদে টাকা ধার দিয়ে তাদের রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন।

গ্রামের উন্নতির দুইটি দিক্ আছে।—একটি তার প্রাণকে জাগিয়ে তোলা আর সেই জাগ্রত মানুষকে সমাজ-সচেতন করে কর্মে প্রবৃত্ত করা। কবি বলেছেন, "সমাজই বিদ্যার ব্যবস্থা করেছেন, তৃষিতকে জল দিয়েছেন, ক্ষুধিতকে অন্ন, পূজার্থীকে মন্দির, অপরাধীকে দণ্ড, শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা, গ্রামে গ্রামে দেশের চরিত্র রক্ষিত ও শ্রীকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।" একলা হ'লে হবে না—সমাজবদ্ধ হয়ে সকলে মিলে একযোগে একত্রে করতে হবে। কবি তাঁর স্বদেশী সমাজের পরিশিষ্টে গ্রামোন্নয়ন কাজের খসড়া দিয়েছেন এবং পল্লীর উন্নতি প্রবন্ধে বিস্তারিত করে বলেছেন।

দ্বিতীয় দিক্‌টির বহিরঙ্গ হচ্ছে রাস্তাঘাট নির্মাণ, পানীয় জলের ব্যবস্থা, বিদ্যালয়, ধর্মশালা স্থাপন ইত্যাদি। অবশিষ্ট কর্মটি দুরূহ কিন্তু সাতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। দরিদ্র পল্লীবাসীর আয়ের ব্যবস্থা। পল্লীর অর্থনীতিতে রবীন্দ্রনাথের গভীর জ্ঞান সর্বজনবিদিত। তাদের অর্থনৈতিক দুর্দশার নিরাকরণের উপায় নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন—একই জমিতে একাধিক ফসল ফলাও, অপচয় নিবারণ কর, বেশি ফলন হয় এবং ভাল দাম পাওয়া যায় এমন ফসল ফলাও, ইত্যাদি।

গ্রামীন্ শিল্পকে কৃষির পরিপূরক রূপে পুনর্গঠিত করা এবং কৃষিকার্যে আধুনিক উৎপাদন-পদ্ধতি ও উন্নততর কৃষিবিদ্যার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি নিঃসংশয় ছিলেন। নিজ জমিদারীতে তিনি এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। আখ-মাড়াই কল, গুটিপোকার চাষ, ইত্যাদি তিনি সেখানে প্রবর্তন করেন। এগুলি অবশ্য স্থূলবুদ্ধি মানুষের দ্বারাই সম্ভব। কিন্তু আমাদের ভাগ্য ভাল, কবি এর মধ্যে আবদ্ধ থাকেন নি। তাঁর দৃষ্টি অন্যত্র প্রসারিত হয়েছিল। যে সব আসবাবপত্র, তাঁতের কাপড়, বাটিকের কাজ, চামড়ার দ্রব্যাদি আজকাল শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের নামে চলে এবং যার ব্যবহার রুচিশীলতার পরিচায়ক বলে দেশে-বিদেশে স্বীকৃত হয়েছে তার শুভারম্ভ গ্রামোন্নয়নের চিন্তায়। এখন এ কাজ শ্রীনিকেতনে মাত্র সীমাবদ্ধ নেই। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বহু সহস্র মানুষ এর দ্বারা জীবিকার্জন করছেন। এ বিষয়ে রথীন্দ্রনাথ ও তদীয় সহধর্মিনী প্রতিমা দেবীর অবদান অবিস্মরণীয়।

কবির জীবদ্দশায় তাঁর গ্রামোন্নয়নের কর্মসূচী দেশে বিশেষ সাড়া জাগাতে না পারলেও, স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় সরকার তা গ্রহণ করেছেন। কবি একক-ভাবে তাঁর সীমিত অর্থশক্তি নিয়ে নিজ জমিদারীতে যে সাধনা সুরু করেছিলেন সেই কর্মসূচী সরকারী ব্যবহার মাধ্যমে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের প্রতিটি গ্রামে গ্রামে মোটামুটি অনুসৃত হচ্ছে। স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল আনন্দময় গ্রামের যে স্বপ্ন কবি দেখতেন তা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করতে চলেছে। আমাদের দুর্ভাগ্য কবি তা দেখে যেতে পারেন নি। আমাদের সান্ত্বনা কবি অন্তরীক্ষ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করবেন।

বাংলা ও বাঙালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিশ্ববিদ্যালয় অবরোধ

'যুগান্তর' বলিতেছেন :

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ছাত্র সমাজকে কেন্দ্র করিয়া পরাধীন ও স্বাধীন ভারতে এই পর্য্যন্ত কম ইতিহাস রচিত হয় নাই। কিন্তু গত মঙ্গলবার ২২শে মে যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তার তুলনা খুব বেশী নাই। কার্য্যত: মেডিকেল ছাত্রগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দশ ঘণ্টাকাল 'অবরোধ' করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু ছাত্রগণ কর্তৃক এই 'আক্রমণ' ও 'অবরোধের' আমরা প্রশংসা করিতে পরিতাম, যদি উহা কোন বীরত্বপূর্ণ মহৎ কাজের জন্য অনুষ্ঠিত হইত। কিন্তু ইদানীং সংস্কৃতির নামে যেমন নাচগানের আসর ও হল্লা বড় হইয়া উঠিতেছে, তেমনি বীরত্ব ও মহত্ত্ব গিয়া ঢুকিয়াছে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ঘেরাও করার মধ্যে। শ্রদ্ধা, সম্মান ও শিষ্টাচারবোধের কোন বালাই নাই—বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার আজ মারমুখী ছাত্রদের হাতে কেবল করুণার পাত্র নহেন, হতভাগ্য বন্দীমাত্র! সেই সঙ্গে সিণ্ডিকেটের কয়েকজন সদস্যও নিশ্চয় বুঝিয়া লইয়াছেন মেডিকেল ছাত্র ও মেডিকেল ষ্টুডেণ্ট কাহাকে বলে! বৃহৎ একদল ছাত্র সারা বছর পড়াশুনা ছাড়া আর সমস্ত 'সৎকার্য্য' করিয়া থাকে। সুতরাং পরীক্ষার তারিখ নিকটবর্ত্তী হইলেই এই সমস্ত ছেলের দল হল্লা করিতে থাকে—'পরীক্ষার তারিখ হটাও!' কেবল মেডিকেল ছাত্রদেরই এই দাবি নূতন নয়, অন্যান্য পরীক্ষার সময়ও প্রতি বছর এমন দাবি উঠিয়া থাকে। কারণ, অপদার্থ ছাত্রের সংখ্যা আজ বাংলা দেশে কম নহে। আরও দুর্ভাগ্যের কথা সত্যকার যারা ভাল ছাত্র, যারা উচ্ছৃঙ্খলতা না করিয়া পড়াশুনা করিয়া ভবিষ্যতে মানুষ হইতে চাহে, তারাও এই হল্লাবাজের দলে পড়িয়া অসহায় বোধ করে।"

একই বিষয়ে 'স্বাধীনতার' মত :

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া পুলিস গত মঙ্গলবার রাত্রে মেডিকেল ছাত্রদের উপর নির্মমভাবে লাঠি চার্জ্জ করিয়াছে, কাঁদুনে গ্যাস ছুড়িয়াছে। সত্তর জন ছাত্র আহত হইয়াছে, বার জনের আঘাত খুবই গুরুতর। ১২৫ জনের মত ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ঘটনার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ও গোলদীঘির রাস্তায় যে দৃশ্য দেখা গিয়াছিল তাহা একটি ক্ষুদ্র রণক্ষেত্রের আকার ধারণ করিয়াছিল। দেখা গেল পুলিসের গাড়ী ছুটিতেছে, যুবকদের উপর বেপরোয়া লাঠি পড়িতেছে, টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া হইতেছে আহত যুবকদের লইয়া হাসপাতালের দিকে দৌড়াদৌড়ি পড়িয়া গিয়াছে তবে এ রণক্ষেত্রের বিশেষত্ব হইল—এক দিকে দেড় হাজার নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ মেডিকেল ছাত্র, আর অপর পক্ষে ছিল সশস্ত্র পুলিসবাহিনী। শান্তিপূর্ণ যুবকদের উপর পুলিসের এই তাণ্ডব নৃত্যের কি প্রয়োজন ছিল? ছাত্ররা গিয়াছিলেন—পরীক্ষার তারিখ পিছাইবার দাবি জানাইবার জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য শ্রীসুরজিৎ লাহিড়ী পুলিসকে ডাকাইয়া আনিলেন, আর পুলিস আসিয়া মেডিকেল ছাত্রদের, যাঁহারা আগামী কাল ডাক্তার হইবেন, ভবিষ্যতের বুকভরা আশায় যাঁহারা চিকিৎসা বিদ্যা অর্জ্জন করিতেছেন—তাঁহাদের বেধড়ক পিটাইয়া দিলেন।

উপাচার্য্য শ্রীসুরজিৎ লাহিড়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে পুলিস ডাকাইয়া আনাইয়া রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষায়তনের পবিত্রতা নষ্ট করিলেন ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখা যায় নাই।"

এই পত্রিকার রিপোর্ট একান্ত পক্ষপাতদুষ্ট—এবং বিকৃত। অবশ্য এই দৈনিকের পরম-বৈশিষ্ট্যই এইখানে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যে একান্ত নিরুপায় হইয়াই পুলিস ডাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এমন মনে করিবার কারণ আছে। পুলিসও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধৈর্য্যের সঙ্গে অপেক্ষা করেন। ছাত্রদের হল্লাবাজী হইতে বিরত হইবার জন্যও তাঁহারা অনুরোধ করেন—কিন্তু সবই বৃথা। ফলে যাহা অনিবার্য্য তাহাই ঘটিল।

সমস্ত ব্যাপারটি অনুসন্ধান সাপেক্ষ। কাজেই এ বিষয়ে এখনই কোন মতামত দেওয়া হয়ত উচিত হইবে না। কেবল একটি কথা বলিব যে, যে-ভূত কর্ত্তারা নাচাইয়াছেন সেই ভূতের হাতে দেশের ভবিষ্যৎ যদি নির্ভর করে, তাহা হইলে সে-ভবিষ্যৎ আলোকময় না হইয়া ঘোর অন্ধকারেই আবৃত থাকিবে।

'স্বাধীনতা'—ছাত্রদের পক্ষে কোন দোষই দেখিতে পান নাই। এই পত্রিকা তাঁহার স্বভাবগত মতই প্রকাশ করিয়াছেন। বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত !!

ভারতীয় মুসলমানদের সহিত পাকিস্থানীদের যোগসাজস

'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশ :

"পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের কোচবিহার জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্ত হইতে সুরু করিয়া জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহের এলাকাভুক্ত সুদীর্ঘ ভারত-পাকিস্থান সীমান্ত জুড়িয়া একটি পাকিস্থানী চক্রান্ত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিশেষ করিয়া এই সকল জেলার সীমান্তসমূহে ভারতীয় এলাকার অভ্যন্তরে এরূপ অনেক ভারতীয় মুসলমানের ঘরবাড়ী রহিয়াছে যেখানে অনুসন্ধান করিলে বহু অবাঞ্ছিত পাকিস্থানী নাগরিকের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

দেশ বিভাগের পর জলপাইগুড়ি শহরের এক প্রভাবশালী মুসলমান গৃহ এই জঘন্য সর্ব্বনাশা চক্রান্তে লিপ্ত আছে বলিয়া সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদেও জানা গিয়াছে যে, গত সপ্তাহে দুইজন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত তথাকথিত ভারতীয় নাগরিক এই জেলা শহরে আসিয়া কার্য্য সমাধার পরে পুনরায় পাকিস্থানে ফিরিয়া গিয়াছে। বস্তুত স্থানীয় মুসলমান নাগরিকদের সঙ্গে পাকিস্থানী মুসলমানদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রহিয়াছে বলিয়াও বিশিষ্ট মহল হইতে অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে।"

মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, কুচবিহার, মালদহ প্রভৃতি সীমান্ত অঞ্চলের অবস্থাও একই প্রকার। এখানে পাকিস্থানী হামলা প্রাত্যহিক ব্যাপার। এই সমস্ত ব্যাপার পুলিস মহলের জানা আছে। কেবল পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলে নহে, খাস কলিকাতার কতকগুলি বিশেষ এলাকার পাকিস্থানীদের ভারতরাষ্ট্র এবং সমাজ-বিরোধী কার্য্যকলাপের ডিপো হইয়াছে। শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার আই. বি. বিভাগের পুলিস এ বিষয়ে সবই জানেন। কিন্তু সমস্ত বিষয়টিকে তাঁহারা অবহেলার দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ও বৃহত্তর কলিকাতার মহত্তর পরিকল্পনার স্বপ্ন-বিলাসে মগ্ন! সামান্য বিষয়ে দৃষ্টিদানের তাঁহার সময় বোধ হয় নাই। এমনও হইতে পারে যে, ভারতের মহামন্ত্রী শ্রীনেহরু মুসলমানদের প্রতি সদয় থাকিবার আদেশ দিয়াছেন, কারণ তাহা না হইলে পাকিস্থান ক্রুদ্ধ হইবে !!

মৎস্য-পুরাণ

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র মতে :

"বাঙালী গৃহস্থের দৈনন্দিন জীবনে নানাবিধ সঙ্কটের সঙ্গে মৎস্য-সঙ্কটও নিত্যকার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধারণ মানুষের অবশ্য-প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম চড়িয়াছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের মতে উহা মায়া বা মতিভ্রম হইলেও মধ্যবিত্ত পরিবারের যাঁহাদের স্বল্প আয়ে সংসার চালাইতে হয় তাঁহাদের অভিজ্ঞতায় জিনিষপত্রের দর চড়িবার দুর্ভোগ মর্ম্মে মর্ম্মে সত্য। মাছের বাজার যে আগুন হইয়াছে তাহার জন্য অবশ্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে সরাসরি দায়ী করা যায় না। তবে কথা কি, দায়-ভাগ যেমনই হউক বাঙালী গৃহস্থের রন্ধনশালা হইতে মাছের পাট বলিতে গেলে প্রায় তুলিয়া দিতে হইতেছে। ঘি, দুধ, মাখন অনেক দিন হইতেই অধিকাংশ বাঙালী পরিবারের নাগালের বাহিরে ; মাংস এবং ডিমও রোজ কিনিবার সামর্থ্য নাই। বাঙালীর খাদ্যতালিকায় পুষ্টিকর বস্তু বলিতে ছিল মাত্র মাছ, তাহাও বেশী নয়—বড়-জোর এক টুকরা কিংবা সামান্য এক মুঠা চুনোপুঁটি-জাতের ছোট মাছ। এখন তাহাও জুটাইতে পারা কঠিন। ভাগ্যবানরা ছাড়া কাহারও সাধ্য নাই যে, কলিকাতার মাছের বাজারে প্রবেশ করিতে পারে। মধ্যবিত্ত বাঙালীকে এই দুর্ভোগ কেবল সাময়িক কোনও কারণে দুই-একদিন সহিতে হইতেছে না, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এই দুরবস্থা চলিতেছে।..."

বার বার মৎস্য লইয়া একই ব্যাপার ঘটিতেছে। ইহাতে মনে করিতে পারি যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার অন্যান্য নানা বিষম সমস্যার মত এ ব্যাপারেও ব্যর্থ হইয়াছেন। অথচ "গভীর সমুদ্রের" মাছ বাঙালীকে খাওয়াইবার জন্য ইতিমধ্যেই এক কোটির বেশী টাকা গভীর সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছেন! অবশ্য টাকাটা সেই চিরপরিচিত গৌরী সেন মহাশয়ের! পশ্চিমবঙ্গ সরকার মৎস্য বিষয়ে আমাদের সুপ্রচুর 'প্রতিশ্রুতি' ভক্ষণ করাইয়াছেন, কিন্তু তাহা মৎস্যহীন মৎস্যের প্রতিশ্রুতি।

এবার ডাঃ বিধান রায়ের প্রেসক্রিপ্‌শন অনুযায়ী বাঙালীকে আপেল, নাশপাতি, বর্ত্তমান কলা, আনারস, দুধ-ঘি-মাখন প্রভৃতি সহজপ্রাপ্য এবং প্রায় মূল্যহীন খাদ্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইবে! কলিকাতার তথা সমগ্র বঙ্গদেশে এ-সব দ্রব্য ত পথে-ঘাটে পাওয়া যায় !!

খোলাখুলি বলাই ভাল

কালনার 'পল্লীবাসী' (২৩।৫।৬২) বলিতেছেন :

"দেশ বিভাগ মানিয়া লওয়ার পনের বৎসর পরেও আজও যখন পাকিস্থানে হিন্দু নিগ্রহ অব্যাহত, তখন আর আজে-বাজে কথা নয়, একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির কথাই চিন্তা করা ভাল।

দেশ বিভাগের সময়ও পূর্ববঙ্গে প্রায় দেড় কোটি হিন্দু ছিল, তার কতক শেষ হইয়াছে আর কতক পলাইয়া আসিয়াছে, এখনও প্রায় পঞ্চাশ-ষাট লক্ষ 'জিম্মি' হইয়া আছে। ইহাদের জান মান প্রাণ—কোন কিছুরই নিশ্চিন্ততা নাই।

পশু, পিশাচ, দৈত্য বর্ব্বর প্রভৃতি গালি দিয়া তীব্র ভাষায় নিন্দা করিয়া পাকিস্থানের মতি পরিবর্ত্তনের আর আশা নাই। তোষণনীতি শোচনীয় ভাবেই ব্যর্থ হইয়াছে। ভারতের ধর্ম্মনিরপেক্ষতার মর্য্যাদায় লজ্জিত হইয়া উহারা সংযত হয় নাই, বরং দিন দিন বাড়াবাড়িই করিতেছে।

এদেশের বহু মুসলমান যে আজও গোপনে উহাদেরই সহায়তা করিতেছে—এই সব কথা এখন আর লুকোছাপা থাকিতেছে না। সীমান্তে পাকিস্থানীদের হাম্‌লায় এদেশের মুসলমানেরাই যে তাহাদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিতেছে—এই সব খবর যে ভাবে উপেক্ষা করা চলিয়াছিল, এখন আর তাহা করা চলিতেছে না। করা সমীচীনও নয়।"

কাহার পক্ষে সমীচীন নয়? আমরা অর্থাৎ সাধারণ বাঙালী হিন্দু যাহাই ভাবি না কেন—আমাদের (শাসকদের পক্ষে) কল্যাণ রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন নায়করা অন্যরূপ ভাবিতেছেন। প্রাসাদে তাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসিয়া যাঁহারা শাসন কার্য্য পরিচালনা করেন তাঁহারা পাকিস্থানে অসহায় বাঙালী হিন্দু নরনারীদের অবস্থা কি করিয়া বুঝিবেন? ইহাদের মাটিতে নামাইতে পারিলে হয়ত কিছু কাজ হইত।

দুর্গাপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে চারিটি আঞ্চলিক ভাষায় পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব

বর্দ্ধমানের "দৃষ্টি" (২৩।৫।৬২) বলিতেছেন :

"দুর্গাপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পরিচালক সমিতি সম্প্রতি স্থির করিয়াছেন যে, আগামী বর্ষ হইতে চারিটি আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে ভর্ত্তি পরীক্ষা (Admission Test) লওয়া হইবে। গুজরাট রাজ্য সরকারের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে গুজরাট ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা পূর্ব্বেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; বিহার ও মধ্যপ্রদেশে আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের কথা ইতিমধ্যেই উত্থাপিত হইয়াছে।"

"ভারতবর্ষে চারিটি সর্ব্বভারতীয় উচ্চতর পর্য্যায়ের ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। ইহা ছাড়া ভারত সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত ১৩টি ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষালয় আছে। দুর্গাপুর ইহাদের অন্যতম।

"দুর্গাপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের ছাত্রগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাংলা, হিন্দী, অসমীয়, এবং উড়িয়া ভাষায় দুর্গাপুরে ভর্ত্তি পরীক্ষা লওয়া হইবে। দুর্গাপুরে যে ভাঙনবাজী আরম্ভ হইতেছে তাহা শুধু দুর্গাপুরেই সীমিত থাকিবে না। সর্ব্ব ভারতীয় এবং আঞ্চলিক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও ইহা ছড়াইয়া পড়িতে পারে। ছড়াইয়া পড়িলে অপ্রত্যাশিত ব্যাপার হইবে না।

"লক্ষ্য করার বিষয়, একমাত্র ইংরাজীর মাধ্যমেই দুর্গাপুরে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত শিক্ষাদান চলিবে। শিক্ষাদান ইংরেজীর মাধ্যমে হইলে পরীক্ষা গ্রহণও আশা করা যায় ইংরেজীর মাধ্যমেই হইবে।" এই অবস্থায় চারিটি আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে ভর্ত্তি পরীক্ষা লওয়ার ব্যবস্থা হইতে অধিকতর জটিলতারই উদ্ভব হইবে বলিয়া অনেকে মনে করেন। উচ্চতর ও মাধ্যমিক বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন ও পরীক্ষায় উত্তর লেখার ভাষা আঞ্চলিক ভাষা; অতএব ভর্ত্তি পরীক্ষাও আঞ্চলিক ভাষাতেই লওয়া কর্ত্তব্য, এই যুক্তি বলেই দুর্গাপুরের কর্ত্তৃপক্ষ চারিটি আঞ্চলিক ভাষায় ভর্ত্তি পরীক্ষা লওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

"কিন্তু সর্ব্বভারতীয় টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার অধ্যক্ষগণের সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সর্ব্বভারতীয় উচ্চতর ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার মাধ্যম হইবে ইংরেজী, নিম্ন কারিগরি শিক্ষা (Polytechnical and Overseer) হইবে আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে।

যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক বহিঃ-পরীক্ষক হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের বাহিরের ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যে সব খাতা পাইয়াছিলেন তাহাদের কিছু অংশ ইংরেজী এবং বাকি অংশ আঞ্চলিক ভাষায় উত্তর লেখা হইয়াছিল। যে যে কলেজ হইতে খাতা আসিয়াছিল সেই সব কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ অনুরোধ করিয়াছিলেন যেন উত্তরের ইংরেজী অংশের উপর ভিত্তি করিয়াই নম্বর

দেওয়া হয়। যাদবপুরের অধ্যাপকগণ ইহাতে স্বীকৃত না হইয়া খাতা ফেরৎ দিয়াছিলেন।

বাংলার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে বাঙালী ছাত্রদের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট আসন নাই। বাঙালী ছাত্রদের ঐ সব কলেজে ভর্ত্তি হইতে হইলে বিশেষ প্রাদেশিক ভাষাতেই admission test দিতে বাধ্য হইতে হইবে—অথচ পশ্চিমবঙ্গের বেলায় ব্যবস্থা অন্যপ্রকার! এখানে কলেজগুলিতে ভিন্ন প্রদেশীয় ছাত্রদের জন্য যে কেবল সংরক্ষিত সিট আছে তাহাই নহে, তাহারা নিজ মাতৃভাষায় পরীক্ষাও দিতে পারিবে। ব্যবস্থা ভাল—কিন্তু বাঙালী ছাত্রদের জন্য অন্য প্রদেশের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে বিমাতাসুলভ ব্যবস্থা কেন? দুর্গাপুরে অবাঙালী ছাত্রদের যে সুবিধা দেওয়া হইবে, বাংলার বাহিরে অন্যত্র বাঙালী ছাত্রদেরও অনুরূপ সুবিধা অবশ্যই দিতে হইবে।

অন্নং বলং মনুষ্যাণাম্

বাঁকুড়ার "মল্লভূম" (২৩-৫-৬২) বলিতেছেন :

"প্রাত্যহিক জীবনে কত না কারণে আমরা দুঃখ পাই, বেদনাহত হই। তখন আমাদের ব্যথাবিধুর চিত্ত নিয়ে আমরা কোথায় আশ্রয় খুঁজে নিই? গৃহে; স্নেহ প্রীতি আর ভালবাসা পাবার আশায় আমরা কার মুখের দিকে তাকাই? আত্মীয়স্বজনের প্রতি।

"গৃহ আর আত্মীয়স্বজনকে নিয়েই ত আমাদের গৃহ-জীবন। এই গৃহ-জীবনকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে আমরা সর্ব্বদা সচেষ্ট। এই যে আমরা কাজ করি, অর্থোপার্জ্জন করি, এ-সবকিছুই গৃহ-জীবনকে অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা।

"গৃহে সুখ থাকলে সমস্ত জাতির মুখে হাসি ফোটে। গৃহ-জীবন দৃঢ় হলে জাতির ভিত্তি অটুট হয়ে ওঠে।

"কিন্তু খাদ্য ছাড়া কোন গৃহেই সুখ থাকে না, গৃহ-জীবন দৃঢ় হয় না। সাধারণের সাগ্রহ সহযোগিতা ব্যতীত সরকারী পরিকল্পনা লিপিবদ্ধই থেকে যাবে, সার্থক হবে না। ফলে ইতিমধ্যেই যারা খাদ্যাভাবে কষ্ট পাচ্ছে, তাদের দুর্গতির আর সীমা থাকবে না। সেই জন্যে এ বিষয় সকলেরই সহযোগিতা প্রয়োজন।" (কি প্রকারে?)

কিন্তু দেখা যাইতেছে খাদ্য উৎপাদনের বৃদ্ধি চেষ্টায় বাংলা "সরকার যে সমুদয় পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছেন তাহাতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি অপেক্ষা খাদ্য-উৎপাদন-বৃদ্ধির-সেরেস্তায় কর্ম্মচারী উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে।" এই বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

দৃষ্টি আকর্ষণ যত ইচ্ছা করুন, কিন্তু অন্ধের দৃষ্টিশক্তি আছে কি? কিছু কাল পূর্ব্বে মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষের ১২৫ কোটি টাকার যে কৃষি-উন্নয়ন এবং খাদ্যশস্য বৃদ্ধির বিরাট্ এক পরিকল্পনা ফলাও করিয়া প্রকাশ করা হয়, তাহার কি হইল? ১২৫ কোটি টাকার কি অংশ ব্যয় হইল? সরকারী পরিকল্পনা প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রে আমাদের কাছে আকাশের পরীর মতই ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে থাকে!

'মল্লভূম' বলিতেছেন, খাদ্যাভাবে মানুষের আর দুর্গতির সীমা থাকিবে না। বলা বাহুল্য, দুর্গতি বহুকাল পূর্ব্বে সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। আর সর্ব্বসাধারণের সংযোগিতার অর্থ (সরকারের কাছে) 'জি হুজুর' বলা।

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা

বনগ্রামের "দৈনন্দিন" বলেন :

"বহু সমস্যাসঙ্কুল বনগ্রাম কেন্দ্রের স্কুল ফাইনাল ও তাহার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার শেষ হইয়াছে। গত কয়েক বৎসরের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা মনে করিলে সমস্যা-সঙ্কুলই বলিতে হয়। কেহই এই পরীক্ষাকেন্দ্রের সুষ্ঠু পরিচালনার হাল স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন না। নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদে গতানুগতিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া কোনপ্রকারে পরীক্ষার দিনগুলি অতিবাহিত করিয়া কৌশলে পরীক্ষা গ্রহণ কার্য্য সমাধা করিবার আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া আসিতেছেন।"

পরীক্ষা-কেন্দ্রের কার্য্য পরিচালনার কমিটি একাধিক অধিবেশনে নানারূপ যুক্তি তর্ক ইত্যাদির মাধ্যমে ছাত্রদের দুর্নীতি দমনের সহায়ক হইবেন—এইরূপ আশ্বাস দান করিয়া শিক্ষকগণকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রহরা দিবার বা পরীক্ষা পরিচালনা করিবার দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া কিছু সংখ্যক শিক্ষক কার্য্যে ব্রতী হইয়া দেখেন 'যারা সাথে এসেছিল ফেলে গেল অসময়।' যাঁহারা প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাঁহারা কেহই নাই। ছাত্রদের বিভিন্ন সংস্থা হইতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে বুলেটিন বাহির হয়। পরীক্ষার সময় কিন্তু তাহাদের কাহাকেও দুর্নীতির বিরুদ্ধতা করিতে দেখা যায় না। সুতরাং কেন্দ্রের বাহিরে চতুর্দ্দিকে রাস্তায়, পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীগুলিতে দলে দলে দুষ্কৃতিকারিগণ গুণ্ডামি, মস্তানি, হৈ-হল্লা ইত্যাদি সুরু করিয়া দেয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা কক্ষগুলিতে নানারূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, যাহা পরীক্ষা গ্রহণের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যে সকল ছাত্র প্রকৃত পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক, এক কথায় যাহারা মেধাবী

এবং ভাল ছেলে তাহারা নানারূপ অসুবিধা বোধ করে। শিক্ষকগণ অসহায়। তাঁহাদের তখন দিনগত পাপক্ষয় করিয়া কাজ শেষ করা ছাড়া আর কিছুই করিবার থাকে না।

"পরীক্ষার পূর্ব্বে কয়েকজন শিক্ষকের নামে ডাকযোগে যে সকল পত্র আসে তাহা কেবলমাত্র শাসানি বাক্য নহে—অশ্লীল ভাষায় পূর্ণ ছিল। পরীক্ষা চলাকালীনও দুই-একজন ঐরূপ পত্র পাইয়াছেন। পথেঘাটে কটু-বাক্যও শিক্ষকগণ হজম করিয়াছেন।"...

একই মন্তব্য—আমাদের ভবিষ্যৎ ভূতের হাতে! ছাত্ররা যাহাই করুক, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই পুলিস ডাকা চলিবে না। যদি হয়—ষ্ট্রাইক!

ছাত্ররা ভাবিয়া দেখুন—তাঁহারা নিজেদের এবং দেশের ভবিষ্যৎকে ষ্ট্রাইক করিতেছেন কিনা। কিন্তু কেবল ছাত্রসমাজকে দোষ দিয়া লাভ কি?

আসিবা দিন

জলপাইগুড়ির 'জনমত' (১১৷৫৷৬২) বলেন:

"সর্ব্বত্রই শুনিতে পাওয়া যায় জমিদারী উচ্ছেদের পর এ পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়া যাইতেছে না। নূতন জরীপের বিরুদ্ধে অভিযোগ অগণিত। ইহার সুব্যবস্থা হইতে কত বৎসর লাগিবে কেহ বলিতে পারে না। ফলে বহু জমিতে চাষ আবাদ ভাল হইতেছে না। জলপাইগুড়ি শহরে করলা নদীর উপরে কচুরী-পানার বাগানের মালিক কে তাহা এখনও স্থির হয় নাই। অতএব বর্ষার বন্যার উপর ভরসা ছাড়া উপায় নাই। এমনি বহু কচুরী বিভিন্নরূপে জেলায় চাপিয়া আছে। সরকারী হিসাবে এই জেলায় চা বাগান বাদে প্রায় দুই লক্ষ একর জমি সরকারের হাতে আসিয়াছে। ইহার মধ্যে মাত্র ৫৭,০০০ একর চাষের উপযুক্ত। এই জমির মধ্যে ৩৭,০০০ একর জমি এ পর্য্যন্ত বিলি ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে। প্রত্যেকে তিন হইতে পাঁচ একর জমি পাইয়াছে এগুলি ভাল আমন ধানের উপযুক্ত দহলা হইলে ৬০ হইতে ৮০ মণ ধান প্রত্যেকে পাইতে পারে। "প্রত্যেকে অর্থ একটি পরিবার।" ক্ষতিপূরণের টাকা এক সঙ্গে পাইলে কোন ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইত। কিন্তু দশ বৎসরে একটু একটু করিয়া টাকা দেওয়ার ফলে সে সুযোগ হইতে বাংলার চাষী জোতদার ও জমিদার বঞ্চিত হইল। এই জেলায় এ পর্য্যন্ত ১০,৩৪,০০০ (?) টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ দেওয়া হইয়াছে। টাকার অঙ্কটি বিরাট্। কিন্তু এই টাকা কতটি পরিবার কিরূপ কিস্তিতে পাইল ইহা জানিতে পারিলে বুঝিতে পারা যাইত, এই ক্ষতিপূরণের টাকায় দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হইল কি না অথবা সব টাকা প্রাণ রাখিতেই ফুরাইয়া গেল।"

সরকারী সব কাজেরই একই অবস্থা এবং ব্যবস্থা। টাকা আদায়ের বেলা অবশ্য সরকারী তৎপরতা অতীব প্রশংসনীয়! সরকারী আপিসে পত্রাদির ফাইল পরিষ্কার করিতে সময় লাগে অপরিসীম। অথচ এই সব কাজ পূর্ব্বকালে খুবই তাড়াতাড়ি হইত বলিয়া জানি। সরকারী দপ্তরখানায় প্রত্যহ কর্ম্মচারী এবং কর্ম্মীর সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং কর্ম্মতৎপরতাও সেই হারে হ্রাস পাইতেছে। কল্পনার পরী ধরিতে যাঁহারা সদাই ব্যস্ত—সাধারণ মানুষের দাবীদাওয়া এবং অভাব-অভিযোগের প্রতি যথাযথ দৃষ্টিদান করিয়া তাহার প্রতিকারের সময় তাঁহাদের নাই।

কিন্তু 'বাঁ-হাতের' দাবী মিটাইতে পারিলে সরকারী কর্ম্মচারীরা অবশ্যই অসম্ভব তৎপরতা দেখাইয়া থাকেন—এ কথা ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন।

ত্রিপুরার সমস্ত বাজারে আগুন

ত্রিপুরার 'সেবক' (২০৷৫৷৬২) দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন:

"ত্রিপুরার বাজারে আগুন লাগিয়াছে। দাম বাড়ে নাই এমন কোন জিনিষ নাই। অনেক ক্ষেত্রে দাম ডবল হইয়া গিয়াছে। মাছ, তরকারীর আমদানী না থাকায় দাম ডবলেরও উর্দ্ধে চলিয়া গিয়াছে। ইহা আগরতলা বাজারের অবস্থা। শুনা যায়, মফঃস্বলে মাছের পাত্তাই নাই।

"একমাত্র ডাল, তেল, নুন, কেরাসিনের দাম কিছু উঠানামা করে। এ কয়টির প্রয়োজন মিটিলেই মানুষ জীবনযাপন করিতে পারে না। জীবনযাপনে বহুবিধ জিনিষের দরকার। কিন্তু নিত্যপ্রয়োজনীয় ও ব্যবহার্য্য জিনিষের দাম উর্দ্ধশ্বাসে যে ভাবে লম্ফঝম্ফ মারিতেছে তাহাতে সর্ব্বস্তরের মানুষই আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে।

"আগরতলার বাজারে না পাওয়া যায় মাছ, না পাওয়া যায় তরিতরকারি। যে সামান্য পরিমাণ মাছ, তরকারির আমদানী হয় তাহাতে শহরের এক-দশমাংশ লোকের চাহিদাও মিটিতে চায় না। মাছ খাদ্যতালিকার একটি প্রধান অপরিহার্য বস্তু হইলেও অনেকের ভাগ্যে

এই বস্তুটি জুটে না। খাদ্যসামগ্রীর অভাব তীব্রতর হওয়ায় বহু লোক এক ভয়াবহ খাদ্য-সঙ্কটে পড়িয়াছে। ত্রিপুরার মফঃস্বলের অবস্থা আরও ভয়াবহ। সে সমস্ত অঞ্চলে রোজি-রোজগারের কোন পথ নাই অথচ খাদ্য-সামগ্রী এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আগরতলার চেয়েও অধিক চড়া দরে কিনিতে হয়। অধিকাংশ লোকেরই এত চড়া দামে খরিদ করিবার ক্ষমতা নাই।"—

সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আজ একই প্রকার। সরকার বাহাদুর অবশ্য 'কমিশন' বসাইয়া (সেই সঙ্গে কতকগুলি পেয়ারের লোকের কিছু আমদানীর ব্যবস্থা করিয়া) দেশের খাদ্যসমস্যার কাগজী সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু যাহাদের হাতে খাদ্যদ্রব্যাদি বিতরণের ভার—সেই সব ব্যবসায়ীরা সরকারকে রম্ভা প্রদর্শন করিয়া দ্রব্যসম্ভারের মূল্য আরও উর্দ্ধমুখী করিতেছেন! ইহাদের একদিনে সায়েস্তা করা যায়, কিন্তু সরকারের সে শক্তি নাই, ইচ্ছাও নাই। সরকার খাজনা আদায় করিয়া তাহার অপব্যয় করিতেই জানে। সাধারণ মানুষ সংঘবদ্ধ হইয়া এই কল্যাণরাষ্ট্রের (শাসক-দের পক্ষে) সমাপ্তি ঘটাইতে পারে। কিন্তু কে ইহাদের নেতৃত্ব করিবে। যে-সব নেতা কথায় কথায় গণ-আন্দোলনের ধ্বনি তোলেন তাঁহারা, তাঁহারা জনগণকে সামনে ঠেলিয়া দিয়া নিজেরা অন্ধকারে আত্মগোপন করেন। পূর্ব্বেকার বহু আন্দোলনেই ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।

নব আবিষ্কার

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় খাদ্য-সঙ্কটের কারণ সম্পর্কে বলিতেছেন যে:

"কলিকাতায় সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় নিযুক্ত অফিসারদের পূর্ব্বাঞ্চলীয় আলোচনাচক্রে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বলেন যে, গত দশ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের চাউল ও গমজাত খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ দৈনিক মাথাপিছু তিন আউন্স করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্বে ১৩ আউন্স ছিল, এখন ১৬ আউন্সে দাঁড়াইয়াছে। তিনি বলেন একে এই বৃদ্ধি, তাহার উপর ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা নূতনভাবে খাদ্য সঙ্কটের সৃষ্টি করিয়াছে।

পৃথিবীর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশি জমিকে কাজে লাগানো হইয়াছে বলিয়া শ্রী সেন জানান। তিনি বলেন যে, মোট জমির প্রায় ৯০ শতাংশকেই এই রাজ্যে চাষের আওতায় আনা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্যকেন্দ্রে এই আলোচনা-চক্রের বৈঠক বসে। শ্রী সেন উহার উদ্বোধন করেন। নেফা, নাগা-হিলস্, মণিপুর, ত্রিপুরা, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা এবং বিহারের প্রতিনিধিগণ এই বৈঠকে যোগ দেন।"

খাদ্যমন্ত্রী শ্রী সেন খাঁটি সত্য এবং তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। তবে এ বিষয় Sample Survey তিনি বোধ হয় মন্ত্রী মহাশয়ের এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের পরিবার মহলেই করিয়াছেন এবং তাহার ফলেই এই অমূল্য তথ্যলাভ করিয়াছেন।

কিন্তু সাধারণ মানুষের ঘরের খবর তিনি কতটুকু রাখেন? যাহারা একবেলা পেট পুরিয়া খাইতে পায় না, তাহাদের 'খোরাক বাড়িয়াছে' বলা, সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কি হইতে পারে? 'টন্-মন্' বিশারদ সাংখ্যিক মন্ত্রী মহাশয়ের বিদ্যা-বুদ্ধি যে প্রকার দেখা যাইতেছে, তাহাতে তাঁহাকে নোবেল প্রাইজ—অথবা 'বঙ্গ-রত্ন' উপাধি দান করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদের ভারতরত্ন-মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছা করিলেই ইহা করিতে পারেন!

১০ বছরে ত্রিপুরায় মুসলিম জনসংখ্যা শতকরা প্রায় ৬৮ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে

ত্রিপুরার "সেবকে" প্রকাশ:

"সাধারণভাবে দশ বছরে জনসংখ্যা মোটামুটি শতকরা ২০ জন বৃদ্ধি পাইলেও ত্রিপুরায় মুস্লিম জনসংখ্যা এই সময়ে শতকরা প্রায় ৬৮ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশ্বস্ত-সূত্রে প্রকাশ বিগত লোক গণনায় ত্রিপুরায় মুস্লিম সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২ লক্ষ ৩০ হাজার। ১৯৬১ সনে ইহাদের মোট সংখ্যা ছিল ১,৩৬,৯৪০।

স্বাভাবিকভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১০ বছরে মুস্লিম সংখ্যা ১ লক্ষ ৬৫ হাজার হইতে পারে। তাহা হইলে অতিরিক্ত ৬৫ সহস্র মুস্লিম কোথা হইতে আসিল এ প্রশ্ন উঠাই স্বাভাবিক। প্রকাশ স্থানীয় শাসন কর্ত্তৃপক্ষ মুস্লিম জনসংখ্যার এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। বাড়তি মুস্লিম জনতা পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতেই আসিয়া ত্রিপুরায় ভারতীয়রূপে বসবাস করিতেছে এইরূপ যে ধারণা এতদিন জনমনে দানা বাঁধিয়াছিল তাহা যে একেবারে অমূলক নহে—স্থানীয় প্রশাসনের কেহ কেহ নাকি এখন একথা বিশ্বাস করেন।

"প্রকাশ থাকে যে, পূর্ব্ব পাকিস্থানের সহিত ত্রিপুরার সীমান্ত ৭২০ মাইল। এই দীর্ঘ সীমান্ত এলাকা পাহারা

দিয়া পাক্‌-মুস্লিম অনুপ্রবেশ বন্ধ করিতে হইলে যে পুলিসী ব্যবস্থা এবং সৎ প্রশাসনিক কাঠামো থাকা বাঞ্ছনীয় তাহা ত্রিপুরায় নাই।

"মুস্লিম জনসংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধির ফলে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক জীবনে যে আঘাত আনিয়াছে তাহার প্রতিকার কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির উপর নির্ভর করে।"

ভারত সরকার এ-বিষয়ে নির্ব্বিকার! উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার এবং দিল্লীর চারি পাশ ঠিক থাকিলেই হইল। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলগুলি গেলেও তাঁহাদের ক্ষতি নাই, বরং এক প্রকার নিশ্চিন্তই হইবেন!

ত্রিপুরা এবং আসাম যে অচিরে নতুন পাকিস্থানী-দাবীর বিষয় হইবে, সে-বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন অবকাশ নাই! পাকিস্থানী হামলা সীমাহীন, ভারত সরকারের 'তীব্র প্রতিবাদও' ঠিক তেমনি অপরিসীম। এমন ক্লীব-সরকার ধরণীতে বিরল!

জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ

কয়েকদিন পূর্ব্বে সংবাদে প্রকাশ:

"হিন্দুরা দাবী জানাইয়াছেন যে, ভারতে যাইবার জন্য আইনের বেড়াজাল এবং কড়াকড়ি শিথিল করিয়া মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট দেওয়া হউক। অন্যথায় তাঁহাদের আত্মহত্যা বা ধর্ম্মান্তরিত হওয়া ছাড়া অন্য কোন পন্থা থাকিবে না।

"অপরদিকে যদিও বা কেহ কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া ভারতে আসিয়া পৌঁছিতেছেন তাঁহাদেরও গ্রেপ্তার করিয়া আবার পাকিস্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে।

"গেদে ষ্টেশনে ঐরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছে। পুলিস অবশ্য নিরুপায়। তাহারা বাধ্য হইয়াই আজ ঐ কাণ্ডটি করিয়াছে।" (কিন্তু নরক হইতে পলাতক হিন্দুদের পুনরায় পাকিস্থানে চালান করিবার হুকুম পুলিসকে কে দিয়াছে?)

"যে যুবকটিকে পাকিস্থানে ফেরত পাঠানো হইয়াছে, তাঁহার সম্পর্কে সংবাদ লইয়া জানা গেল যে, বিগত ২৯শে এপ্রিল পাবনা শহরে হিন্দু-বিরোধী দাঙ্গার সময় তাঁহার চারি ভ্রাতা এবং এক ভ্রাতৃবধূকে মুসলমানগণ ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। তাঁহারা পাবনা শহরের উপকণ্ঠে ছোট শালগাড়িয়াতে বসবাস করিতেন। তাঁহার বিবৃতিতে প্রকাশ যে, তাঁহাদের পরিবারের অন্যান্যদের যখন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইতেছিল ঐ সময় তিনি পালাইয়া যান এবং জনৈক মুসলমানের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি বিভিন্ন স্থানে ঘোরাফেরার পর আজ ভিসা-পাসপোর্ট বা মাইগ্রেশন ছাড়াই পাকিস্থান সীমান্ত অতিক্রম করিয়া গেদে আসিয়া পৌঁছান। কিন্তু ভারতীয় পুলিস তাঁহাকে ঐ স্থান হইতে আর অগ্রসর হইতে দেয় নাই।" (এই যুবকের হাতে বোধ হয় পুলিসকে দিবার মত টাকা ছিল না!)

"পুলিসের নিকট জানা গেল যে, ঐ ধরনের কোন হিন্দু বা উদ্বাস্তু ভারতে আসিয়া পৌঁছিলে তাঁহাদের সম্পর্কে কি করিতে হইবে, সে বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত ভারত সরকারের নিকট হইতে 'কোন নির্দ্দেশই' পায় নাই। ফলে তাহারাও ঐ সম্পর্কে নিরুপায়।"

কোন নির্দ্দেশই যখন পুলিস পায় নাই, তখন কাহার নির্দ্দেশে তাহারা অসহায় হিন্দুদের জোর করিয়া আবার পাক-নরকে চালান করিতেছে? এ-প্রশ্নের জবাব ডাঃ রায় দিবেন কি? কালীবাবুকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা!

সংবাদে আরও জানা যায়:

"ইতিপূর্ব্বে ফরিদপুর হইতে আগত অপর একটি তরুণীকেও সীমান্ত চেক্‌-পোষ্টের পুলিস ঐ একই অজুহাতে পাকিস্থানে ফেরত পাঠাইয়া দিয়াছে।

"ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনের অফিসের হয়রানি ছাড়াও রাজশাহীর সহকারী হাই-কমিশনার অফিসের নিকটে পাক্‌-পুলিসের আবার এক দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রকাশ যে, পাক্‌-উত্তরবঙ্গের যে সকল হিন্দু রাজশাহীস্থ উক্ত হাই-কমিশন অফিসে মাইগ্রেশনের আবেদন লইয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের সেখানে যাইতে দেওয়া হইতেছে না। জানা গেল যে, হিন্দুরা রাজশাহী এবং উহার কাছাকাছি কোন রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌঁছিলেই পুলিস এবং গোয়েন্দা কর্ম্মচারীরা তাঁহাদের সেখানে যাইবার উদ্দেশ্য জানিয়া লয়। যদি জানিতে পারে যে, তাঁহারা মাইগ্রেশনের জন্য হাই-কমিশন অফিসে যাইতেছেন তবে সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহাদের ষ্টেশন হইতে ফিরাইয়া দেওয়া হইতেছে। কেহ উহার প্রতিবাদ করিলে তাঁহাকে জোরপূর্ব্বক বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া হইতেছে।

"মাইগ্রেশনের কড়াকড়ি ছাড়াও দর্শনা ষ্টেশনে দিনের পর দিন হিন্দুদের হয়রানির মাত্রা বাড়িয়া যাইতেছে।

"আজ দর্শনা হইয়া তিনটি হিন্দু পরিবার পশ্চিমবঙ্গে আসিবার সময় তাঁহাদের আপত্তিজনকভাবে পাক্‌-শুল্ক ও পুলিস কর্ম্মীরা তল্লাসী করিয়াছে বলিয়া ভারতীয় সীমান্ত পুলিসের নিকট তাঁহারা অভিযোগ করিয়াছেন। তাঁহারা মাইগ্রেশন করিয়াই চলিয়া আসিয়াছেন। পাক্‌ শুল্ক ও পুলিস কর্ম্মীরা নাকি তাঁহাদের বলে যে, তাঁহা

ভারতে গিয়া পাকিস্থান বিরোধী প্রচার করিবেন না বলিয়া তাঁহাদের এক অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দিয়া যাইতে হইবে। তাঁহারা উহাতে অস্বীকার করিলে তাঁহাদের উপর তল্লাসীর মাত্রা এরূপ বৃদ্ধি পায় যে, শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারা ৫৪০৲ টাকা দিয়া রেহাই পান।"

পাকিস্থানের হিন্দুদের রক্ষা করিতে পারিব না, অথচ যাহারা নিজেদের বাঁচাইবার জন্য এদিকে আসিবে তাহাদের জোর করিয়া আবার মৃত্যুমুখে ঠেলিয়া দিব—এ রহস্যের অর্থ বুঝা অসম্ভব। পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের হঠাৎ এ বিষম কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং তৎপরতার কারণ কি?

বিদায় বাঙালী রিয়ার-অ্যাডমিরাল চক্রবর্ত্তী

"বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল যে, দীর্ঘ ৩১ বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া বিশ্বস্তভাবে এবং যোগ্যতার সহিত নৌ-বিভাগে চাকুরি করিবার পর রিয়ার-অ্যাডমিরাল চক্রবর্ত্তী ছুটিতে যাইতেছেন।" গত কিছুকাল ধরিয়া তাঁহাকে লইয়া অনেক বাদ-বিতণ্ডা হইয়াছে।

রিয়ার-অ্যাডমিরালদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবীণ কর্ম্মচারী হিসাবে ভারতীয় নৌবাহিনীর অধিনায়ক পদে উন্নীত হইবার জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রীর নিকট তিনি যে আবেদন করিয়াছিলেন সেই আবেদন বিবেচনা করিয়া দেখা হয় নাই। এরূপ অবস্থায় দেশের নৌবাহিনী হইতে নিঃশব্দে বিদায় গ্রহণ করা ছাড়া তাঁহার আর কোনও গত্যন্তর নাই। ১৯৩১ সনে ডাফরিন জাহাজ হইতে শিক্ষালাভের পর তিনি নৌবাহিনীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। নৌবাহিনীর নিয়ম ও শৃঙ্খলা অনুযায়ী এতদিন তিনি মুখ বুজিয়াছিলেন এবং এখনও মুখ বুজিয়াই আছেন

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রিয়ার-অ্যাডমিরাল সোমানকে নৌবাহিনীর অধিনায়ক পদে নিয়োগের জন্য যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্রধানমন্ত্রী কিংবা প্রতিরক্ষামন্ত্রী যে সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করিবেন—এমন সম্ভাবনা নাই।

রিয়ার-অ্যাডমিরাল চক্রবর্ত্তী রিয়ার-এ্যাডমিরালদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সিনিয়র অফিসার বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট যে আবেদন করিয়াছেন কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার সেই আবেদনে কর্ণপাত করিবেন না। নৌবাহিনীর নিয়মাবলী অনুসারে সিনিয়রমোষ্ট রিয়ার-অ্যাডমিরাল হিসাবে শ্রীচক্রবর্ত্তীরই নৌবাহিনীর অধিনায়কের পদ পাওয়া উচিত ছিল। লোকসভায় এই ব্যাপার সম্পর্কে যে সমস্ত আলাপ-আলোচনা হইয়াছে তাহা হইতেও বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, কর্ত্তৃপক্ষ রিয়ার-অ্যাডমিরাল চক্রবর্ত্তীর আবেদন বিবেচনা করিয়া দেখিবেন না।

"রিয়ার অ্যাডমিরাল চক্রবর্ত্তী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির নিকট আপীল করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতিই সশস্ত্র বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক। জানা গিয়াছে যে, সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ চক্রবর্ত্তীকে রাষ্ট্রপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি দিতেও রাজী নহেন। খুব সম্ভবত চক্রবর্ত্তীর আবেদনও রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করা হইবে না।" (ভারতীয় সংবিধানে ভারতীয় নাগরিকের এ অধিকার হরণ করিবার ক্ষমতা কাহারও আছে কি না জানি না। খুব সম্ভবত নাই। রিয়ার-অ্যাডমিরাল চক্রবর্ত্তীর বিষয় লইয়া পত্রপত্রিকায় এবং সর্ব্বসাধারণে বিশেষ আলোড়ন হইয়াছে—দেখা যাক আমাদের নূতন রাষ্ট্রপতি এই বিষয় লইয়া কি করেন। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সর্ব্বাধিনায়কের নিকট হইতে একজন সামরিক অফিসার নিশ্চয়ই সুবিচার আশা করিতে পারে।)

"নৌবাহিনীর অধিনায়কের মারফৎ রিয়ার-অ্যাডমিরাল প্রতিরক্ষামন্ত্রীর নিকট যে দুইখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত তিনি তাহাদের একখানিরও কোনও জবাব পান নাই। রিয়ার-অ্যাডমিরাল চক্রবর্ত্তী এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি একখানি আবেদনপত্র এবং গত মে মাসের প্রথম দিকে আর একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।"

সৌজন্যবোধ কাহাকেও শিক্ষা দেওয়া যায় না—ইহা সহজাত। রিয়ার-অ্যাডমিরাল চক্রবর্ত্তীর বিষয় লইয়া এত হৈ-চৈ এবং আলোচনা লোকসভায় হইয়া গেল, কিন্তু আমাদের প্রখ্যাত আইন-সচিব এ-অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিলেন না কেন? কবীর সাহেবও নির্ব্বাক—অথচ দুই জনই বাঙালী। বে-আইনী কার্য্যের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী প্রতিবাদ করিলেন না—ইহা সত্যই বিচিত্র!!

কংগ্রেসী এম-পি'র দল, বিশেষ করিয়া বাঙালী এম-পি'রা রিয়ার-অ্যাডমিরাল চক্রবর্ত্তীর প্রতি জঘন্য আচরণের প্রতিবাদে একেবারে মুখ বন্ধ করিয়া রহিলেন। ইঁহারা লোকসভার সদস্য, না বেতনভোগী কর্ম্মচারী তাহা বুঝা গেল না।

পৃথিবীর সকল দেশের সকল নির্য্যাতীত জাতি ও মানুষের পরম দরদী মহামতি শ্রীল শ্রীযুক্ত নেহরু—নিজের দেশের মানুষের প্রতি অবিচার সমর্থন করিতে লজ্জাবোধ করিলেন না। প্রদীপের তলায় অন্ধকার বেশী।

পশ্চিম বাঙ্গলার প্রদেশ-পালক ডাঃ রায়—বাঙ্গালীর প্রতি এ-অবিচারের প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্যবোধ করিলেন না—অথচ ইনিই নাকি বাঙ্গালী-প্রধান।

বাঙালীমানস ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি

শ্রীসুধাংশুবিমল বড়ুয়া

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের ক্ষীয়মান দীপশিখাটি শেষ আশ্রয় লাভ করে বাংলার মাটিতেই। নানা প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও বাঙালী পরম অনুরাগের সহিত চারশো বছরের অধিককাল ধরে এই দীপশিখাটি উজ্জ্বল করে রেখেছিল। সেই আলোতে একদিন আলোকিত হ'ল সমগ্র এশিয়াখণ্ড। অবশেষে বুদ্ধের ভারত এই বাংলা ও বাঙালীর মধ্য দিয়েই এশিয়ার তথা সমগ্র বিশ্বের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য গ্রহণ করে। বৌদ্ধধর্মের কল্যাণস্পর্শে বাঙালীমানসে যে এক অপূর্ব প্রাণচেতনার সাড়া জাগে তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে আমাদের জাতীয় জীবন ও সাহিত্যে।

গৌতমবুদ্ধের সাক্ষাৎ শিষ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একজন ছিলেন বাঙালী। তাঁর নাম বঙ্গীশ। তিনি আবার অতুলনীয় কবিপ্রতিভারও অধিকারী ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে থেরগাথায় বলা হয়েছে: "বঙ্গে জাতো'তি বঙ্গীসো বচনে ইস্‌সরোচিত",—বঙ্গদেশে জন্ম এবং কবিত্ব-প্রধান হেতু বঙ্গীশ। বুদ্ধদেব নিজেও একবার বাংলা দেশের সুম্ভভূমির (<সুহ্মভূমি) অন্তর্গত শেতকনগরে এসেছিলেন বলে সংযুক্তনিকায়ে উল্লেখ আছে। বুদ্ধদেবের বাংলায় আগমনের আর একটি কাহিনী পাওয়া যায় অনাথপিণ্ডকের কন্যা সুমাগধার প্রসঙ্গে। ঐ সময়ে তিনি নাকি ছয় মাসকাল পুণ্ড্রবর্ধনে এসে বাস করেন। প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্‌ তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তেও উল্লেখ করেন যে বুদ্ধদেব পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট ও কর্ণসুবর্ণে এসে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের বাংলায় আগমনের এ সমস্ত কাহিনীকে ঐতিহাসিকগণ তেমন প্রামাণ্য বলে মনে করেন না। এদিক্‌ থেকে দেখতে গেলে বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই যে বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল এ কথা বলা কঠিন। তবে অন্তত সম্রাট্‌ অশোকের পূর্বেই যে বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ সাঁচীস্তূপের একটি দানলিপি। সাঁচীস্তূপের তোরণ নির্মাণের যাঁরা ব্যয়ভার বহন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মহীয়সী বাঙালী মহিলা: "ধমতায় দানং পুঞ্‌বদনিয়ায়" পুণ্ড্রবর্ধনের ধমতা বা ধর্মদত্তার দান। এর থেকে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের প্রমাণ পাওয়া যায়। মৌর্যসম্রাট অশোকের (খ্রীষ্টপূর্ব ২৭৩—২৩২) সময়ে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্ম বিশেষ ভাবে বিস্তারলাভ করে পঞ্চম শতকে। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ানের বিবরণ হতে এ কথা জানতে পারা যায়। তিনি তাম্রলিপ্তি নগরীতে দু বছর ধরে বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুশীলন করেন। তখন তিনি তাম্রলিপ্তি নগরীতেই বাইশটি বৌদ্ধবিহার দেখেছিলেন। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে, তখন সমগ্র বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্ম কতদূর বিস্তারলাভ করেছিল।

সপ্তম শতাব্দীতে বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্ম যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে হিউয়েন সাঙ্‌ তার মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন। সমতট, পুণ্ড্রবর্ধন, কজঙ্গল, তাম্রলিপ্তি ও কর্ণসুবর্ণে তখন অনেকগুলি বিহারে সহস্র সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করতেন। তাছাড়া সেংচি এবং ইৎসিং নামক পরিব্রাজকদ্বয়ের বর্ণনা হতেও তৎকালীন বাঙালী বৌদ্ধদের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ধর্ম ও আচারনিষ্ঠার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে বাঙালী কুলতিলক শীলভদ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ বাঙালীর স্মৃতির মণিকোঠায় চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন।

অষ্টম শতকের মধ্যভাগে পালরাজগণের অভ্যুদয়ে বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্ম খুবই প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। বস্তুতঃ পালযুগকে বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলা যায়। জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী বিকাশে বাংলার ইতিহাসে পালযুগ অতুলনীয়। এই প্রসঙ্গে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "এই সাম্রাজ্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালীর নূতন জাতীয় জীবনের সূত্রপাত হয়। ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্যের অভ্যুদয়েই এই জাতীয় জীবন প্রধানত আত্ম-বিকাশ করেছিল। পালরাজগণের চারশো বছরব্যাপী রাজ্যকাল বাঙালী জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগ। ধর্ম-পালের রাজ্য বাঙালীর জীবনপ্রভাত" (বাংলা দেশের

ইতিহাস)। বিক্রমশিলা বিহার, সোমপুর বিহার, ওদন্তপুর বিহার, জগদ্দল এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় পালরাজাদের অমরকীর্তির অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর।

অষ্টম শতকের পূর্ব থেকেই বৌদ্ধধর্মের মধ্যে এক পরিবর্তনের সূচনা হয়। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত এই চারশো বছর ধরে বাংলা ও মগধের ইতিহাসে এই পরিবর্তিত ধর্মমতের প্রাধান্য দেখা যায়। ভারতের বাইরে তিব্বত, যবদ্বীপ, মালয় এবং সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলেও এর বিশেষ প্রভাব বিস্তার হয়। বাংলা দেশে এই পরিবর্তিত ধর্মমত সাধারণ ভাবে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বলে অভিহিত। এই তান্ত্রিক সাধনার অন্যতম প্রধান ধারাই সহজযান। সহজিয়া সাধকগণ তাঁদের ধর্মমতকে সাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য যে পদগুলি রচনা করেন সেগুলি চর্যাপদ নামে পরিচিত। এগুলি মোটামুটি দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত। এই চর্যাপদগুলির মধ্য দিয়েই বাংলাভাষা ও সাহিত্য সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এই সহজিয়া বৌদ্ধসাধকেরা পূজার্চনা ও মন্ত্রজপে মোটেই বিশ্বাসী ছিলেন না। এ সব বাহ্যানুষ্ঠানকে তাঁরা স্পষ্ট নিন্দাই করেছেন:

মন্তণ তন্তণ ধেঅন ধারণ।
সব্ববি রে বঢ় বিবৃভমকারণ॥

—মন্ত্রতন্ত্র ধ্যানধারণা এসব বড় বিভ্রমের কারণ। প্রাচীন সংস্কার ও ধর্মমতের বিরুদ্ধে তাঁরা যে তীব্র কটাক্ষ করেছেন তার থেকে এঁদের সংস্কারমুক্ত স্বাধীন বিচারবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। সেই যুগেও আমাদের জাতীয় গণমানসে স্বাধীন চিন্তার স্ফুরণ হয়েছিল।

শূন্যতা ও করুণার মিলনে যে বোধিচিত্ত উৎপন্ন হয় সেই পরম সুখাবস্থাকেই সহজিয়ারা একমাত্র কাম্য মনে করেন। তাঁরা এই মহাসুখকে অবলম্বন করে তাঁদের সাধনার ভিত্তি স্থাপন করেছেন। কিন্তু এই চর্যাপদগুলির দার্শনিক মতবাদই শুধুমাত্র তার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক নয়। এর সাহিত্যিক মূল্যও কম নয়। উপমা, অলংকার ও অনুভূতির গভীরতায় ধর্মতত্ত্বের ফাঁকে ফাঁকে কাব্যরস জমে উঠেছে প্রচুর। যেমন:

উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই শবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ শবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥
উমত সবরো পাগল সবরোমা কর গুলী গুহড়া তোহোরী।
নিঅ ঘরণী নামে সহজ সুন্দরী॥
নানা তরুবর মোউলিল রে গঅনত লাগেলী ডালী।

—উচ্চ পর্বতশিখরে শবরকন্যা একাকী বিচরণ করছে। বিচিত্র তার সাজসজ্জা। পরনে ময়ূরপুচ্ছ, কানে কুণ্ডল এবং গলায় কুঁচের মালা। মত্ত শবর তাকে চিনতে পারে না। পরকীয়া প্রেমের তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে। শবরী বলে, দোহাই তোমার—গোল ক'রো না। আমি তোমারই ঘরের নারী সহজসুন্দরী। এ ভাবে পর্বতশিখরে শবরকন্যা, মুকুলিত তরু ইত্যাদিতে ধর্মতত্ত্বকে ছাপিয়ে আমাদের এক অপরূপ কাব্যের জগতে নিয়ে যায়। তাছাড়া এই পদগুলির মধ্যে বাংলা দেশের তদানীন্তন সমাজ-জীবনের যে চিত্র পাওয়া যায় তার ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়। বর্তমানে আমরা যাকে গণসাহিত্য বলি তার আভাস রয়েছে এই পদগুলির মধ্যে। সর্বোপরি উত্তর যুগের বাংলা-সাহিত্যে এই পদগুলির যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। ছন্দ, উপমা ও ভাবের দিক্ থেকে বাংলা-সাহিত্যে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এতদ্ব্যতীত বাংলাদেশে মধ্যযুগে বাউল বৈষ্ণব প্রভৃতি যে সকল ধর্মমত প্রাধান্য লাভ করেছিল তার উপর সহজিয়া বৌদ্ধমতের প্রভাব অপরিসীম। তবে একটা কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলার তান্ত্রিকধারার সহিত যুক্ত হয়ে সহজপন্থীদের সাধনা শেষ পর্যন্ত যে পরিণতি লাভ করে তাতে মূল বৌদ্ধধর্মের আদর্শের থেকে অনেকখানি দূরে সরে যায়।

তারপর এল বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার যুগ। এই যুগ হ'ল মোটামুটি ভাবে ত্রয়োদশ শতক থেকে সপ্তদশ শতক। ত্রয়োদশ শতক ভারতবর্ষের ইতিহাসে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের যুগ। এই সময়ে সেনরাজগণের অভ্যুদয়ের ফলে বাংলাদেশে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম বেশ প্রতিপত্তি লাভ করে এবং বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্মানুষ্ঠান, আচার-ব্যবহার পুনরুজ্জীবিত হয়। পাল-চন্দ্রযুগে বৌদ্ধধর্ম রাজশক্তির যে আনুকূল্য লাভ করে সেন-বর্মণযুগে যে সে আনুকূল্য পায় নি শুধু তা নয়, পক্ষান্তরে নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। পাল-চন্দ্রযুগের সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে যে উদারতা ছিল সেন-বর্মণযুগের রক্ষণশীল মনোভাবের মধ্যে তার কিছুমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেন ও বর্মণেরা বাংলার ও বাঙালীর ছিলেন না—এঁরা বহিরাগত। এদিক্ থেকে পাল-চন্দ্রবংশ শুধুমাত্র বাংলার ও বাঙালীর ছিলেন না, বাঙালী জনমানসের অত্যন্ত কাছাকাছি ছিলেন। আজও বাঙালী পরম মমতায় জীইয়ে রেখেছে মহীপাল-যোগীপাল-ভোগীপালের গানের স্মৃতি। এক-দিকে ব্রাহ্মণ্য প্রতিক্রিয়া আবার অন্যদিকে তুর্কী আক্রমণের অমানুষিক নির্মমতার ফলে বৌদ্ধধর্মের প্রাণ-

কেন্দ্র বৌদ্ধবিহারগুলি ধ্বংস হয়। এইভাবে বাংলাদেশ হতে বৌদ্ধধর্ম লুপ্তপ্রায় হয়ে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামে শেষ আশ্রয় লাভ করে। পূর্বাঞ্চলের এই বৌদ্ধেরাই বাংলার একপ্রান্তে আজিও বৌধর্মের ক্ষীণ শিখাটি পরম অনুরাগে জ্বালিয়ে রেখেছে সন্ধ্যাপ্রদীপের মতই।

বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্যসমাজের প্রবল প্রতিক্রিয়া নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পুনরুত্থিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতা থেকে বৌদ্ধধর্মের একটি বিরাট্‌ ও মহৎ অধ্যায়কে একেবারে মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিল। বুদ্ধকে একসময়ে বিষ্ণুর অবতার বলে স্বীকৃতি দিলেও কিংবা দু'লাইন বুদ্ধপ্রশস্তি রচিত হলেও বিশাল হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে তার স্থান কতটুকু? এই যুগে বাংলার বৈষ্ণব এবং শাক্তসমাজে বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে যে উগ্র অসহিষ্ণুতা দেখা দেয় তার নজির রয়েছে চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত এবং বল্লালসেনের নামে প্রচলিত দানসাগর প্রভৃতি গ্রন্থে। চৈতন্যভাগবতে আমরা দেখতে পাই, নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কোন কারণে ক্রুদ্ধ হয়ে বৌদ্ধদের বিতাড়িত করছেন। 'নাস্তিক' ও 'পাসণ্ডী' বৌদ্ধদের নিন্দায় বাংলার 'বিনয়ী' বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও কি রকম মুখর হয়ে উঠেছিলেন তার প্রমাণ অন্যত্রও আছে। আচণ্ডালে প্রেম বিলানোই ছিল বৈষ্ণব ধর্মের আদর্শ। কিন্তু বৌদ্ধদের প্রতি আচরণে এই আদর্শের সমর্থন কোথায়? ব্রাহ্মণ্যসমাজের প্রতিক্রিয়ার ফলে এই সময়ে অনেক বৌদ্ধদেবদেবীকে ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়েছিল। বুদ্ধও সময়ে সময়ে শিব, জগন্নাথ কিংবা অন্য কারও পোশাক পরে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছেন।

তার পর এল বিস্মৃতির যুগ। সপ্তদশ শতকের শেষভাগ থেকে আমাদের জাতীয় আত্মবিস্মৃতির ফলে বুদ্ধ ও বৌদ্ধ-সংস্কৃতির তেমন সুস্পষ্ট প্রকাশ আমাদের সাহিত্যে দেখা যায় না। মধ্যে মধ্যে হয়ত বিচ্ছিন্নভাবে দু-এক জায়গায় উল্লেখমাত্র পাওয়া যায়। নানাপ্রকার সামাজিক বিপ্লবের ফলে আমাদের জাতীয় জীবন হতে যেমন বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির মহিমা বিস্মৃতপ্রায় হয়েছিল, তেমনি আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রায় মুছে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন, "বঙ্গগৌরবের মধ্যমণি বিক্রমপুরবাসী দীপঙ্করের নাম পর্যন্ত বিক্রমপুরবাসীরা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। নালন্দা, বিক্রমশিলা, ওদন্তপুর ও সুবর্ণবিহারের নামই বা কে শুনিয়াছিল? কেবল আমরা যুধিষ্ঠির, ভীম প্রভৃতি পঞ্চপাণ্ডবের নাম লইয়া গর্ব করিতে শিখিয়াছিলাম; কেবল ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতির স্বপ্নে বিভোর ছিলাম। বাড়ীর কাছে কলিঙ্গের যে ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ সৈন্য হত্যা করিয়া রাজা অশোক অনুতপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ মহাযুদ্ধের কথাও আমরা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু কবে কোন্‌ যুগে কুম্ভকর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইয়া সুগ্রীব প্রভৃতি বানরেরা তাঁহার উদরস্থ হইয়া কর্ণরন্ধ্র দিয়া বহির্গত হইয়াছিল এবং লক্ষ্মণের শক্তিশেল উপলক্ষে মারুতি কবে কোন দিক্‌ দিয়া গন্ধমাদন শৈল কাঁধে করিয়া লঙ্কাক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছিল, স্মরণাতীত কালের সেইরূপ উপকথা আমরা পয়ারছন্দে পাঠ করিয়া কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম।" (বৃহৎ বঙ্গ।)

কিন্তু জাতীয় জীবনের এই আত্মবিস্মৃতি চিরন্তন সত্য নয়। তাই অন্ধকারের আবরণ ভেদ করে একদিন আলোর অভ্যুদয় হ'ল। এল পুনরুত্থানের যুগ। উনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে ভারতের ইতিহাসে জাতীয় জাগরণের একটি গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হয়। এই জাতীয় সচেতনতার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতের মহিমার সঙ্গে আমাদের নূতন করে পরিচয় হয়। জাতীয় জাগরণের এই বিরাট্‌ সন্ধিপর্বে বাঙালী আবার নূতন ভাবে বুদ্ধমহিমাকে উপলব্ধি করল। বলা বাহুল্য, রামমোহন—কেশবচন্দ্র—রবীন্দ্রনাথের বাংলার পক্ষে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। আর নব্য-বাংলার বুদ্ধবরণের প্রতিফলন দেখা যায় আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রায় প্রতিটি স্তরে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সাধু অঘোরনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র দাস, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং ঈশানচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি মনীষিগণের চেষ্টায় বৌদ্ধসংস্কৃতির অনুশীলন চলতে থাকে। তা ছাড়া গিরীশচন্দ্র ঘোষের 'বুদ্ধদেব চরিত' নাটক (১২৯২ বঙ্গাব্দ), নবীনচন্দ্র সেনের 'অমিতাভ' কাব্য (১৩০২ বঙ্গাব্দ) এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'বুদ্ধবরণ' ও 'বুদ্ধপূর্ণিমা' কবিতা প্রভৃতিতে তদানীন্তন বাঙালী মানসের প্রতিফলন দেখা যায়।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধ-সংস্কৃতি নিয়ে বাঙালী মানসের অনুসন্ধিৎসার পূর্ণতম অভিব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে। বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে বুদ্ধ ও বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দান অপরিসীম। আমাদের দেশে বৌদ্ধ-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে কবির কি গভীর আগ্রহ ছিল তা তাঁর একটি উক্তিতে সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে,—"ভারতীয় সংস্কৃতির বহুতর উপকরণ বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে।...এই বৌদ্ধ-শাস্ত্রের পরিচয়ের অভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস কাণা হইয়া

আছে। একথা মনে করিয়াও কি দেশের কয়েকজন যুবা দেশের বৌদ্ধ-শাস্ত্র উদ্ধার করাকে চিরজীবনের ব্রত স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে না?" এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অধ্যাপক নিতাইবিনোদ গোস্বামীকে বৌদ্ধ-শাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য সিংহল প্রেরণ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আর বর্তমান শান্তিনিকেতন যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র সে কথা বলাই বাহুল্য।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ ও গানে বৌদ্ধ-সংস্কৃতির ব্যাপক ও গভীর মহিমা প্রকাশ পেয়েছে। এই বৌদ্ধ সংস্কৃতির মধ্য দিয়েই যে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল, রবীন্দ্রনাথ এ কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। "ভারতবর্ষে বৌদ্ধ-ধর্মের অভ্যুদয়কালে এবং তৎপরবর্তীযুগে সেই বৌদ্ধ সভ্যতার প্রভাবে এ দেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যশক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোনও কালে হয় নাই" (যাত্রার পূর্বপত্র—পথের সঞ্চয়।) তাই কবি বর্তমানের গ্লানি থেকে ফিরে তাকিয়েছেন ভারতের অতীত গৌরবের সেই মহান্ অধ্যায়ের প্রতি। সেই অধ্যায়ের মহানায়ক বুদ্ধকে সম্বোধন করে কবির আকুল প্রার্থনা:

ওই নামে একদিন ধন্য হল দেশে দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।
সেই নাম আরবার এ দেশের নগরে প্রান্তরে
দান করো তুমি।
বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থক হোক, মুক্ত হোক মোহ আবরণ—
বিস্মৃতির রাত্রিশেষে এ ভারতে তোমারে স্মরণ
নবপ্রাতে উঠুক কুসুমি।
(বুদ্ধদেবের প্রতি।)

আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধসংস্কৃতি আলোচনার ক্ষেত্রে যে প্রাণগঙ্গা বইয়ে দিয়েছেন সে ধারা কোনদিন লুপ্ত হবার নয়। একেবারে আধুনিক যুগেও বৌদ্ধ সংস্কৃতির অনুশীলনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা' খুবই আশাপ্রদ।

আমাদের দেশে বৌদ্ধ সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে বৌদ্ধ সাহিত্যিকগণের অবদানও কম নয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ সংস্কৃতির আলোচনার সূত্রপাত করেন উনবিংশ শতকের বৌদ্ধ সাহিত্যিকগণ। বাংলার এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের নিভৃত পল্লীনিবাসে বসে তাঁরা যে সাধনার সূত্রপাত করেন তা' আমাদের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতাগণের অগোচরে রয়ে গেলেও উপেক্ষণীয় নয়। ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্মের ক্ষীয়মান শিখাটি যেমন এ'রা পরম মমতায় আঁকড়ে ছিলেন, তেমনি বাংলা সাহিত্যের বৌদ্ধ বিভাগটিও এঁরা সঞ্জীবিত রেখেছেন। বাংলার বৌদ্ধ সাহিত্যিকগণের মধ্যে কবি ফুলচন্দ্র বড়ুয়ার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ইনি কবি নবীনচন্দ্র সেনের জন্মভূমি নয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এর পূর্বেও বাঙালী বৌদ্ধসমাজে প্রচলিত পালা গান ইত্যাদি জাতীয় কয়েকটি রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু রচয়িতার সঠিক নামধাম জানবার উপায় নেই। কবি ফুলচন্দ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের রাণী পুণ্যশীলা কালিন্দীর পৃষ্ঠপোষকতায় 'বৌদ্ধরঞ্জিকা' ('৮৭৩?) নামক একটি সুললিত কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। নীচে বৌদ্ধরঞ্জিকার অন্তর্গত কল্পতরুর বর্ণনা থেকে তাঁর রচনার একটু নমুনা দেওয়া গেল—

তরু মনোহর দেখিতে সুন্দর কাঞ্চন-সদৃশ অঙ্গ।
বহু পল্লবিত অতি সুশোভিত বিহঙ্গাদি করে রঙ্গ॥
কুসুম সৌরভে অতি মধু লোভে পুঞ্জে পুঞ্জে গুঞ্জে কত।
কোকিল কুহরে ময়ুরি ময়ুরে বিহরয়ে অবিরত॥

এ ছাড়া পণ্ডিত ধর্মরাজ বড়ুয়া (১৮৬০-৯৪), নবরাজ বড়ুয়া (১৮৬৬-৯৬), ভিক্ষু অগ্রসার ও কবি সর্বানন্দের (১৮৭০-১৯০৮) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সর্বানন্দ অল্পবয়সেই কবিত্বশক্তির পরিচয় দেন। তাঁর গৌতমবুদ্ধের জীবনী অবলম্বনে লিখিত 'জগজ্জ্যোতিঃ' কাব্যগ্রন্থ তৎকালীন সুধীসমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কবি নবীনচন্দ্র সেন 'জগজ্জ্যোতি'র পাণ্ডুলিপি পাঠ করে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন, "সর্বানন্দ, তুমি 'জগজ্জ্যোতিঃ' লিখবে জানলে আমি অমিতাভ লিখতাম না।" এই উক্তির মধ্যে সর্বানন্দের কবিপ্রতিভার পরিচয় নিহিত আছে। এ ছাড়া সে যুগে আরও অনেকেই বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ভাবধারার প্রবর্তনে যত্নবান্ হন। এই সময়ে বৌদ্ধসংস্কৃতিমূলক যে কয়েকটি পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে তার মধ্যে বৌদ্ধ পত্রিকা, বৌদ্ধবন্ধু, জগজ্জ্যোতিঃ, জাগরণী, বুদ্ধিষ্ট্ ইণ্ডিয়া, সংঘশক্তি, বৌদ্ধবাণী, উদয় ও সম্বোধি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি আমাদের জাতীয় চেতনায় বৌদ্ধসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের বীজ বপন করেন বাংলার বৌদ্ধ সাহিত্যিকগণই।

কৌশানীতে সরলা বেন-এর "লক্ষ্মী আশ্রম"

প্রতিযোগিতায় মনোনীত প্রবন্ধ

আভা পাকড়াশী

কুমায়ূ পাহাড়ের কোলে চতুর্দিকে চীড় আর দেবদারুর ছায়ায় ঘেরা, সুষুপ্ত পাহাড়ী গ্রাম এই কৌশানী। এর পদপ্রক্ষালন করে বয়ে চলেছে উর্ব্বরা কোশী নদী। নদীর দুধারে সবুজ উপত্যকার বুকে থাকে থাকে সাজান ক্ষেত। প্রত্যেকটি থাক বিভিন্ন রংএর। মনে হয় কোন নিপুণ শিল্পী তার রংতুলি দিয়ে নির্জ্জনে বসে এই অপূর্ব্ব কারুকলার সৃষ্টি করেছে। আসলে ঐ পাহাড়ীরা কোন থাকে বুনেছে গাজর, তার পর বিট্, তার পরের সিঁড়িতে লেটুস, আবার টম্যাটো বা পিঁয়াজ। এছাড়া ধান বা গমের ক্ষেতগুলিকে দূর থেকে দেখলে মনে হয় কেউ বুঝিবা সোনা গলিয়ে ঢেলে দিয়েছে। এমনিই অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেছে ঐ বায়ু-হিল্লোলে প্রকম্পিত ক্ষেতগুলি।

রাণীক্ষেত থেকে বাসে কৌশানী আসার সময় যে নৈসর্গিক শোভা দেখেছি ঐ পথের দুধারে, তার বর্ণনা ভাষায় করা অসম্ভব। আমরা কৌশানী এসেছিলাম. এর অন্যতম আকর্ষণ দুশো মাইল ব্যাপী স্নো রেঞ্জ দেখতে। বরফাচ্ছাদিত ত্রিশূল, নন্দাদেবী, নন্দাকোঠ, যুধিষ্ঠির, এইসব চুড়াগুলি এখান থেকে খুবই নিকটে দেখা যায়। মনে হয়, একটা ছুট দিলেই পৌঁছে যাব ঐ দেবভূমিতে। গান্ধীজী এই কৌশানীর নাম দিয়েছিলেন ভারতের সুইজারল্যাণ্ড।

এখানে আসার পথে অপ্রত্যাশিত ভাবে এই মহাপুরুষের একটি ভক্তশিষ্যার দেখা পেলাম। কি ভাবে এই ইংরেজ দুহিতা গান্ধীজীর কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেবার আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে চলেছেন দেখলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে।

দুটি ইংরেজ শিষ্যা ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর, যাঁরা তাঁর বাণীকে ভগবৎমুখ-নিঃসৃত আদেশ বলে মনে করতেন। তিনি তাদের নামকরণ করেছিলেন যথাক্রমে মীরা বেন ও সরলা বেন। মীরা বেন মহাত্মার তিরোধানের পর স্বদেশে প্রত্যাগমন করেছেন। এঁর লেখা নানা অভিজ্ঞতার কাহিনী "স্পিরিট্‌স্ পিলগ্রিমেজ" নামে ধারাবাহিক ভাবে 'ইলাষ্ট্রেটেড্ উইকলি অব ইণ্ডিয়াতে' অনেকেই পড়ে থাকবেন। অন্য জন মানে সরলা বেন এখনো তাঁর বাণী স্মরণ ক'রে সর্ব্বোদয় সংস্কার রূপ দেবার চেষ্টা করছেন, এই মনোরম পরিবেশে তাঁর নিজের হাতে গড়ে তোলা স্কুলটিতে।
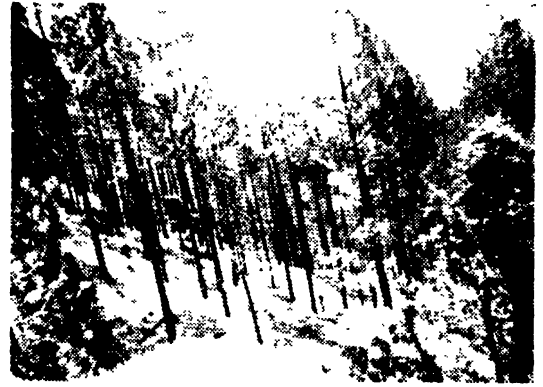
কৌশানির চীড়ের শোভা

আমরা রাণীক্ষেত থেকে বেরিয়ে সোমেশ্বর হয়ে পথে কৌশানীকে ফেলে রেখে আবার নীচে নামতে লাগলাম। গরুড় হয়ে বাগেশ্বরের সরযূ আর গোমতীর সঙ্গম আর পাণ্ডবদের প্রতিষ্ঠিত বাগেশ্বর শিবের মন্দির দর্শনে গিয়েছিলাম। ফিরতি পথে বাসে উঠলেন সোনালীচুল, সৌম্যদর্শনা এক ইংরেজ মহিলা। পিঠে তাঁর গুরুভার একটি ঝোলা, পরিধানে পুরু খদ্দরের সালোয়ার কামিজ। গরমে ও পথশ্রমে মুখটি লাল হয়ে উঠেছে। সঙ্গে একটি সুদর্শনা কান্তিমতী পাহাড়ী কন্যা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অথচ অতি সাধারণ বেশভূষা। গরমে আমাদেরও বেশ কষ্ট হচ্ছিল। কারণ কৌশানী থেকে বাগেশ্বর প্রায় তিন হাজার ফিট নীচে।

বেশ ক্লান্ত মনে হ'ল ভদ্রমহিলাকে। অতবড় একটি বোঝা না-জানি তিনি কতদূর থেকে বয়ে এনেছেন। তাঁর পার্শ্বচারিণীর হাতও খালি নয়। তবু পরিচয় জিজ্ঞেস করতে প্রশান্ত হাসির সঙ্গেই উত্তর দিলেন। আমরা কৌশানীতে ডাকবাংলোয় থাকব জেনে

তের হোটেলের বারান্দা হইতে দৃশ্যমান স্নো-রেঞ্জ

আমাদের তাঁর স্কুলে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। কোন্‌ পথে গেলে সহজে পৌঁছতে পারব তারও নির্দেশ দিলেন। উনি এসেছিলেন ওঁর স্কুলের একটি ছাত্রীকে বাড়ী পৌঁছে দিতে ও সেই গ্রামের কিছু কাজে। সেই ছাত্রীটি এইসব ফল মিষ্টি দিয়েছে তার স্কুলের বান্ধবীদের জন্য। দ্রব্য যে মূল্যেরই হোক স্নেহের দান, মাথায় ক'রে নিয়ে চলেছেন গুরু মা।

পরদিন আমরা গেলাম তাঁর স্কুলটি দেখতে। বাস-স্ট্যাণ্ড থেকে অনেক উঁচুতে পাহাড়ের একটি চূড়ার ওপর তাঁর স্কুলটি। আমরা যখন পৌঁছলাম তখন তিনি অফিসঘরে বসে চিঠিপত্র লিখছিলেন। তেমনি পুরু খদ্দরের সালোয়ার কামিজ পরা, খালি পা। মাটির মেঝেতে চট পাতা তার ওপর একটি নীচু ডেস্ক। পা মুড়ে বসে সেই ডেস্কে হাত রেখে একমনে লিখে চলেছেন। এই ভঙ্গিমা মনে পড়িয়ে দিল মহাত্মাজীকে। আমাদের দেখে সরল হাস্যে স্বাগত জানিয়ে সামনের পাতা চটের ওপর বসতে বললেন। ইংরেজীতে কথাই বলেন না বলতে গেলে। পরিষ্কার হিন্দীতে আমাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন, "ক'দিন বাইরে থাকার দরুণ অনেক কাজ জমে গেছে আপনারা যদি দয়া করে আগে স্কুলটি ঘুরে দেখে আসেন তবে বড় ভাল হয়। ততক্ষণে আমার কাজ সারা হয়ে যাবে আশা করি।" সেই কালকের দেখা মেয়েটিকে ডেকে আমাদের সব দেখাতে বললেন।

মেয়েটির নাম কান্তি। আমরা আসায় সে খুব খুশী হয়েছে বলল। হঠাৎই মনে হল এটি কোন তপস্বিনীর আশ্রম, আর এরা সব ঋষি-কন্যা। পরে বুঝলাম সত্যিই তাই। সম্পূর্ণ পুরুষবর্জিত এই আশ্রমটিকে এরাই স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তুলেছে। প্রথমে গেলাম রন্ধনশালায়। এখানে মেয়েরা নিজেরাই পালা করে রান্না করে। পুরনো কাপড়ের সুতো দিয়ে তৈরী আসন পেতে সকলে মেঝেতে বসেই খায়। প্রত্যেক মেয়েকেই স্কুলে ভর্ত্তি হবার সময় একটি থালা ও ঘটি আনতে হয়। আর নিজেদেরই তা পরিষ্কার করতে হয়। কাঠের জ্বালে রান্না হয়। মেয়েরাই ঐ কাঠ জঙ্গল থেকে কেটে আনে। নিজেদের খাবার জিনিষ ওরা নিজেরাই উৎপন্ন করে। প্রধান খাদ্য ভাত আর রুটি।

দেখলাম মেয়েরা ক্ষেতে কাজ করছে। কোন দল গান গাইতে গাইতে ধান রুইছে। আবার কিছু মেয়ে পাকা ফসল কাটছে। একটি মেয়ের দল সব্জির বাগানে মাটি কোপাচ্ছে। কেউ বা ঝুড়ি ভরে আলু তুলছে। যাঁতার ঘরেও গম ভাঙ্গছে মেয়েরাই।

গোশালা। সুপুষ্ট গরুগুলি আলস্য-সুখে জাবর কাটছে। গোদোহন ও তাদের পরিচর্য্যা মেয়েরাই করে। এই গরুর দুধও সমান ভাগে সব মেয়েরা পায়।

তাঁতঘর। কতকগুলি মেয়ে চরকায় সুতো কাটছে। একদল সেগুলি রং করছে। অন্যদল আবার সেই সুতো দিয়ে কাপড় বুনছে। এদের পরবার কাপড় এরা নিজেরাই বুনে নেয়। সালোয়ার কামিজও ঐ থেকেই সেলাই করে।

কম্বলঘর। এখানে মেয়েরা ভেড়ার লোম থেকে উল তৈরী ক'রে সেই উল নানা রং-এ রঙিয়ে তাই দিয়ে কম্বল কালিন এইসব বুনছে। অদ্ভুত ক্ষিপ্রভাবে চলছে এদের হাত। তবুও রং মিলিয়ে সুন্দর নক্সাদার ডিজাইন দিয়ে একটি বড় কালিন শেষ করতে এদের প্রায় এক দেড় মাস লেগে যায়। কত যে সোয়েটার বুনেছে তার ঠিক নেই। আমরা এদের কাছ থেকে একটি কম্বল ও দুটি সোয়েটার কিনে কিছু সাহায্য করলাম। বড় মেয়েগুলি ছোটদের শেখাচ্ছে এ বোনার কায়দা। আমি কান্তিকে জিজ্ঞেস করলাম, "এইসব মেয়েরা কার কাছে এমন নিপুণ কারিগরি শিখেছে?" বললে, সর্ব্বোদয় সঙ্ঘ থেকে প্রথমে শিক্ষয়িত্রী এসে এদের শিখিয়েছেন। পরে এরা আবার ছোটদের শেখাচ্ছে। এখানকার এই নিয়ম। এই সংস্থায় ভর্ত্তি হতে হলে আগে ছাত্রীর মা বাবাকে লিখে দিতে হবে যে, তাঁদের মেয়েকে এঁরা যে সঙ্ঘে পাঠাতে চাইবেন সেখানে পাঠাতে হবে এবং সেখানে গিয়ে তাদের এমনি একটি সংস্থা গড়ে তুলতে হবে। এখানে মেয়েরা শেখে প্রধানতঃ কৃষিবিদ্যা, গোপালন, সমাজবিজ্ঞান, বস্ত্রশিল্প, সিল্ক ও উল বয়ন,

সাধারণ বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, গৃহবিদ্যা, রন্ধন, ইত্যাদি। জিজ্ঞেস করলাম, এর জন্য এই সব মেয়েদের কত টাকা ফিস্ দিতে হয়? বলল, মাসে মাত্র কুড়ি টাকা। তবে হরিজন মেয়েদের জন্য গবর্ণমেণ্ট থেকে কিছু সাহায্য আসে।

ওখান থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম, মেয়েরা সব কাপড় কাচছে। ঝরণার জল একটি চৌবাচ্চায় জমা ক'রে সেই জলে স্নান করছে আর কাপড় পরিষ্কার করছে। এক-একটি মেয়ে অতগুলি করে কাপড় পরিষ্কার করছে কেন জিজ্ঞেস করায় উত্তর দিল, আজ ওদের পালা পড়েছে সকলের কাপড় কাচার, তাই। এখানে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জন্য খাটবে এই শিক্ষাই দেওয়া হয়। আমাদের মূলমন্ত্র হ'ল সাম্যবাদ আর স্বাবলম্বী হতে হবে।

এবার হাসপাতালে এলাম। সেখানে কয়েকটি অসুস্থ মেয়েকে অন্য কয়েকটি বড় মেয়ে শুশ্রূষা করছে। এই রুগীর সেবাও এদের পাঠের মধ্যে গণ্য। এমন কি গাছ-গাছড়া থেকে প্রাথমিক ওষুধ তৈরী করাও শেখে এরা। জিজ্ঞেস করলাম, 'এদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় না কেন? বলল, নিয়ম নেই! তবে নেহাৎ অসুস্থ হলে বা কোন জরুরী দরকার পড়লে তখন কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করেন। না হলে আমরা বছরে মাত্র পাঁচ সপ্তাহের ছুটি পাই। বললাম, কষ্ট হয় না? হেসে বলে, মোটেই না। এখানে এই সব মেয়েদের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করায় এমন একটা নিবিড় বন্ধন গড়ে ওঠে যে, এদের ছেড়ে গেলেই বরং কষ্ট হয়। চিঠি লেখারই সময় পাই না। যদিও মাসে একটা চিঠি শুধুমাত্র গার্জেনকে লেখার অনুমতি আছে।

সত্যি দেখলাম, প্রত্যেকটি মেয়েই কি হাসিখুশী আর স্বাস্থ্যোজ্জ্বলা। এরা প্রাণের আবেগে কাজ করে চলেছে! কাজ এদের কাছে বোঝা নয়, তাই কোন কাজেই এরা ভয় পায় না বা ক্লান্তও হয় না। সত্যি এরা যেন এক একটি কর্তব্যের প্রতিমূর্তি। হাসি-গল্পের মধ্য দিয়ে সারাদিন পরিশ্রম করে চলেছে। ক'বছর তোমাদের শিখতে হয় এখানে? বলল, তিন বৎসর। এর মধ্যে দু' বৎসর ছাত্রীরা প্রবেশনায় থাকে। তার পর এদের পরীক্ষা করে দেখা হয়। এদের মধ্যে যারা স্থায়ী সদস্যা হবার যোগ্যা তাদের আরও শিক্ষা দেওয়া হয়। এই পরবর্তী ছাত্রীদের কাছ থেকে আর কোন ফিস্ নেওয়া হয় না। শুধুমাত্র পাঁচটি টাকা নেওয়া হয় এদের তেল, সাবান আর হাত খরচের জন্য। বললাম, তুমি বুঝি এই দলের? সহাস্যে উত্তর দেয়, হ্যাঁ, আমি আর আমার দিদি দুজনেই এখন এখানে আছি। পরে

কোশানিতে সরলাবেনের লক্ষ্মী-আশ্রম
(দক্ষিণ হইতে—গোরা, কান্তি, সরলা, লেখিকা, শঙ্কর)

কোথায় যেতে হবে তা এখনও জানি না। বহেনজী যা বলবেন তাই হবে। বহেনজী মানে শ্রীমতী সরলা বেন।

এই সবুজ রং-এর খদ্দরের শাড়ী পরিহিতা পর্বত-দুহিতাটিকে প্রকৃতি-কন্যা বলেই মনে হচ্ছিল। আমাদের পেয়ে ওরও যেন আনন্দের শেষ নেই। আমার ছোট ছেলের সঙ্গে সমানে হাসি-গল্প করছে, আবার শতমুখে আমাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে, এতই উৎসাহ। নিজেদের এই সংস্থার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এর গুণাগুণ বর্ণনায় মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

লাইব্রেরী দেখতে যেতে অনেকগুলি বই দিল আমাদের সর্বোদয় সংস্থার। আমরাও আগ্রহ করে কিনলাম। হাতে তৈরী আটা আর গুড়ের নাড়ু এনে আমাদের জল খাওয়াল। পাহাড়ী গান গেয়ে শোনাল। ওদের দেশের সুমিষ্ট আর সবচেয়ে প্রিয় বেড়ুফল আর কা-ফলের গান।

"বেড়ুপাকো বারামাস্তা
নরন কাফল পাকো নয়তা মেরি ছয়লা—"

ভারী মিষ্টি গলা এই কিশোরীর। আজও এই টানা সুরের পাহাড়ী গানটি কানে বাজে। এবার আমরা আবার অফিস ঘরে ফিরে চললাম।

শ্রীমতী সরলার কাছে এসে তাঁর স্কুলের প্রশংসা করায় খুবই প্রীত হলেন। তার পর ব্যক্ত করলেন এই স্কুলের আসল উদ্দেশ্য। "গ্রাম উন্নয়ন, ও স্বাবলম্বন এই হ'ল দেশের ও জাতির উন্নতির মূল। এই কথাই বলতেন মহাত্মাজী, সুতরাং আমি সেই ব্রতই নিয়েছি। আমার মতের সঙ্গে বিনোবাজী সম্পূর্ণ একমত, তাই আমাদের পথও এক। আমার এই স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্তা দুটি ছাত্রীও যদি দুটি গ্রামকে জাগাতে পারে, তবে

লক্ষ্মী-আশ্রমের ক্ষেতের দৃশ্য

তাদের ছাত্রীরা আবার অন্য গ্রামকে সংস্কৃত করবে। এই ভাবে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে শিক্ষা, সাম্যবাদ আর স্বাবলম্বী হবার প্রেরণা। তাই এখন আমি মাসে অন্ততঃ পনেরো দিন কান্তি বা তার দিদিকে নিয়ে অন্য গ্রামে গিয়ে তাদের মধ্যে এমনি প্রেরণা দেবার চেষ্টা করি। তবে দেখছেন ত, আমাদের অর্থের বড় অভাব—তাই বলছি আপনারা যদি হাতেকাটা সুতো পাঠিয়ে দেন বা বছরে কিছু অর্থসাহায্য করেন বা বন্ধুদের দিয়ে কিছু সাহায্য করান, বড়ই উপকৃত হব। যদিও আশে পাশের আর অনেক দূর গ্রাম থেকেও আমার স্কুলে ছাত্রী আসে কিন্তু বেশীর ভাগ মেয়েই টাকা দিতে পারে না। এই পাহাড়ীরা বড় গরীব আর দুঃস্থ। এরা মেয়ে পেট ভরে খেতে পাবে, শুধু এই জন্যই তাদের স্কুলে পাঠিয়েছে, শিক্ষাটা তাদের কাছে গৌণ।" আমি বললাম, "কেন, গবর্ণমেণ্ট মানে নেহরুজীর কাছে আবেদন করলেই ত পারেন। এটি যখন গান্ধীজীর আদর্শের প্রতীক তবে কেন তিনি সাহায্য করবেন না?" প্রথমে কিছু বললেন না। মাথা নীচু করে কি যেন চিন্তা করলেন। পরে বললেন, "নেহরুজী এখন আর এই আদর্শের পক্ষপাতী নন। তিনি যন্ত্রদানবের মোহে পড়ে মনুষ্যশক্তিকে অবহেলা করছেন। এই কারণেই তাঁর দান নিতে আমার বাধে।" আত্মবিশ্বাসে আস্থা-শীলা এই মহিলার প্রতি শ্রদ্ধাপ্লুত হয়ে ওঠে মন।

এই যন্ত্রযুগেও একজন ইংরেজ মহিলার ভারতের মাটিতে বর্ত্তমান বিনোবাজী ও স্বর্গত মহাত্মাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করে যাবার মত অধ্যবসায় ও মনের বল দেখে সত্যিই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যেমন পাণ্ডবদের শুধু ধর্ম্ম ভরসা ছিল, শ্রীমতী সরলা বেনেরও সেই একমাত্র ধর্ম্মই ভরসা—বিশেষ করে স্বাধীনতা লাভের পর সরকারের সহযোগিতার অভাবে শ্রীমতী মীরা বেনের ভারত ত্যাগের ইতিহাসের পর। যাই হোক পাঠকপাঠিকারাও দয়া করে শ্রীমতী সরলা বেনের সামান্য আবেদন মঞ্জুর করবার চেষ্টা করবেন আশা করি।

এর পর আমার ছেলের অনুরোধে আমাদের মাঝে এসে দাঁড়ালেন। ফটো তোলা হ'ল। কান্তিও দাঁড়াল হেসে। পরে এঁরা গুরু-শিষ্যা আমাদের অনেক দূর অবধি পৌঁছে দিয়ে গেলেন! আমরা নেমে এসেও দেখলাম, ওঁরা আমাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছেন। এই মায়ার বাঁধনেই বেঁধেছেন ঐ পাহাড়ীয়া কঠিন কঠোর মানুষগুলিকে। "মাতাজী কি আশ্রম" বলতে তারা এক বাক্যে সহজেই তাঁকে চেনে। তিনি যে তাঁদের দুর্দ্দিনের বন্ধু, দুর্ব্বলের সহায়। "আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখাবে অন্যেরে" গীতার এই বাণীর তিনি জলন্ত নিদর্শন। তিনি ছাত্রীদের সঙ্গে সমানে পরিশ্রম করেন। সব কাজে তাদের সাহায্য করেন। তাঁর স্কুলে উচ্চনীচু ভেদ নেই। সবাই সমান। সকলের সমান অধিকার আছে প্রত্যেক কাজে। যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের ভাগ পায় তারা, জাত অনুযায়ী নয়। এই লক্ষ্মী আশ্রমের চতুর্দ্দিকে যেন সত্যিই মালক্ষ্মীর প্রসন্ন কৃপাদৃষ্টি উপলব্ধি করা যায়। এই আশ্রমকন্যারা যেন সারাদিন সমস্ত কাজের মধ্যে দিয়ে তাঁরই আরাধনা ক'রে চলেছে। দিকে দিকে মানুষে মানুষে এই হানা-হানি, আর লক্ষ্মীর অবমাননার দিনে, এই আশ্রম কন্যা-দের ও আশ্রমের লক্ষ্মীশ্রী সত্যিই মনে সাড়া জাগায়।

ক'দিন আকাশ ছিল মেঘে ঢাকা তাই আমরা সেই বহু প্রত্যাশিত স্নো রেঞ্জ দেখতে পাই নি। কিন্তু সেদিন বিকেলেই তুষারশুভ্র পর্ব্বতমালার একটি বিরাট মিছিল আমাদের চোখের সামনে উন্মুক্ত হয়ে ফুটে উঠল। গিরি-রাজের এ কি অপূর্ব্ব প্রকাশ! সামনেই তুষারধবল ত্রিশূল। বিদায়ী সূর্য্যের আলো-ঝলমল্ বরফাচ্ছাদিত চূড়াগুলিকে কে যেন আমাদের সামনে সাজিয়ে দিয়েছে। এই মহান্ প্রকাশকে দু'হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে এবার আমরা তৃপ্তমনে কৌশানী থেকে বিদায় নিলাম।

মনে একটু ব্যথা শুধু জেগে রইল, আর কানে বাজতে লাগল সরলা বেন-এর সেই কাতর মুখের করুণ আবেদন। আমাদের এই "কস্তুরবা মহিলা উত্থানমণ্ডলকে" একটু সাহায্য করবেন কিন্তু আপনারা। আমার ঠিকানা—

কস্তুরবা মহিলা উত্থানমণ্ডল
লক্ষ্মী আশ্রম কৌশানী (আলমোড়া)।

স্তব্ধ প্রহর

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

আপনি ? আবার এসেছেন ?

শোভনাকে চমকে দাঁড়াতে হ'ল।

হ্যাঁ সেই ছোকরাটিই পেছন থেকে ডাকছে। সেই নন্থ।

সকলকে এড়িয়ে নন্থর কাছে ধরা পড়তে হবে শোভনা সত্যিই ভাবে নি।

এত বড় বিরাট্ অঞ্চল। এর মধ্যে পরিচিত বলতে ওই নন্থ আর তার দলের কয়েকটি ছেলেমেয়ে। তাদের কারুর চোখে পড়বার কথা শোভনার মনেই হয় নি।

কিন্তু দেখা গেল, আর যার হোক, নন্থর চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়।

আমি সেই দূর থেকে দেখেই আপনাকে চিনতে পেরেছি।

নন্থ কাছে এসে দাঁড়াল। তার পর বেশ একটু জেরার ভঙ্গিতেই জিজ্ঞাসা করলে—আজ আবার কাকে খুঁজতে এসেছেন ?

একটা কিছু উত্তর না দিলেও চলে। নন্থর কাছে জবাবদিহি দেবার কোন দায় ত তার নেই ?

বললেই হয় একটু ধমক দিয়ে—সে খবরে তোমার কি দরকার বাপু ? তুমি কি এখানকার পাহারাদার নাকি ?

কথাটা মনে ক'রেই কিন্তু হাসি পেল। নন্থর সারল্যে ওরকম অকারণ আঘাত দেওয়া তার সাধ্য নয়।

সেই হাসি নিয়েই সস্নেহে শোভনা বললে, কাউকে না খুঁজলে বুঝি এখানে আসতে নেই ?

দূর !

হাতের গুলতিটা দিয়ে দূরের একটা পেয়ারা গাছে অকারণে তাচ্ছিল্যভরে একবার তাগ্ ক'রে নন্থ বললে, এখানে সখ ক'রে কেউ আসে বুঝি ? এটা কি চিড়িয়াখানা না গড়ের মাঠ ?

না, নন্থর কাছে যেমন-তেমন ক'রে কথা ঘুরোন যাবে না।

শোভনা তবু আর একবার কথাটা এড়াবার জন্যে বললে, তুমি চিড়িয়াখানায় গেছ ?

গেছি একবার। আবার যেতাম। কিন্তু চার আনা ক'রে পয়সা নেয় যে!—ব'লেই নন্থ আবার নিজের প্রশ্নে ফিরে এল—কই, কাকে খুঁজতে এসেছেন বললেন না ত ?

আমি নিজেই জানি না ত তোমায় কি বলব! শোভনা হাসল—আমি শুধু সেই—বাড়ীটায় একবার যাচ্ছি।

সেই তিন মাথা চরে ?

তিন মাথা চর !—শোভনা এবার বিস্মিত।

হ্যাঁ, ওই যেখানে তিনটে নারকেল গাছ আছে। ওটাকে আমরা তিন মাথা চর বলি। আমাদের এখানে সব ওই রকম নাম আছে কিনা! ওই যে দেখছেন মাথা-কাটা তাল গাছটা দাঁড়িয়ে আছে, ওর পেছনের বাসাগুলোকে আমরা বলি কাটামুণ্ডুতলা, আর ওই···

নিজের এলাকার ভৌগোলিক পরিচয় দিতে দিতে থেমে গিয়ে নন্থ জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু ওখানে ত আপনি সেদিন গেছলেন ? ওখানে ত আপনাদের চেনা কেউ নেই ?

তবু আর একবার এমনি আলাপ করতে যাচ্ছি! ব'লে শোভনা এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলে একটু দ্রুতপদেই।

কিন্তু নন্থকে অত সহজে ছাড়ানো সম্ভব নয়।

ছুটে এসে শোভনার নাগাল ধ'রে ফেলে সে ভারিক্কি চালে বললে, ওখানে আপনি যাবেন কি ক'রে ? রাস্তা জানেন ?

তা জানি বই কি! শোভনাকে হেসে বলতে হ'ল, সেদিন যে এলাম! সেই ত বাঁশের সাঁকোটা দিয়ে যেতে হয়।

সে বাঁশের সাঁকো আর আছে নাকি!—নন্থ তার বিশদ জ্ঞানের পরিচয় দিলে,—এই কাল সকালে সেটা ভেঙে গেছে না! এখন অন্য রাস্তা দিয়ে যেতে হয়। চলুন আপনাকে দেখিয়ে নিয়ে যাই।

অগত্যা নন্থর নায়কত্ব শোভনাকে মেনে নিতেই হ'ল।

আজ সকালে এখানে আসবার জন্তে রওনা হবার আগে শোভনার মনে দ্বিধা-সঙ্কোচ-সংশয় যথেষ্টই ছিল। ছিল, এখানে সেই প্রথম দিন এসে নিষ্ফল হয়ে ফিরে যাবার পর থেকেই।

মাত্র তিন দিন আগের কথা।

কিন্তু এই তিন দিনে তার জগৎটা আর একবার যেন ওলট-পালট হয়ে গেছে।

বাইরে থেকে কিছুই অবশ্য হয় নি ব'লে মনে হতে পারে।

ফিরে যাবার পর আশুবাবু সেদিন তাকে নিজের ঘরে বসিয়ে অনেকগুলো কথা বলেছিলেন। সে-সব কথা আশুবাবু বলবেন তা যেন তার জানাই ছিল।

আশুবাবু তাঁর বাড়ীতে শোভনার চিরকাল আশ্রয় থাকা সম্বন্ধে আর একবার গভীর আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর নিজের কিছুদিনের জন্তে বাইরে যাবার সঙ্কল্প সম্বন্ধেও অটলতা দেখিয়েছেন। সেই সঙ্গে শোভনাকে আবার অনুরোধ করেছেন, নিখিল বক্সীর প্রস্তাবিত কাজটা নেওয়ার কথা আরেকবার বিবেচনা ক'রে দেখতে।

বলেছেন, আমি অনেক ভেবে দেখলাম মা। এরকম কাজ পেলে না নেবার কোন মানে হয় না।

অনুপমকে খুঁজতে গিয়ে বিফল হয়ে ফিরে আসার পর থেকেই শোভনা কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক। তার দিক্ থেকে কোন জবাব না পেয়ে আশুবাবুকে আবার বলতে হয়েছে,—আমি আর বেশীদিন এখানে নেই। যে কয়দিন আছি তার মধ্যেই তোমার একটা স্থিতি দেখে যেতে পারলে নিশ্চিন্ত হতাম। অনুপমবাবুকে খোঁজবার কোন চেষ্টাই তুমি কর, এ আর আমার ইচ্ছে নয়। সে যদি তোমাকে তার জীবন থেকে বাদ দিতে পেরে থাকে তা হ'লে তুমিই বা পারবে না কেন? সেই জন্য মনকে শক্ত ক'রে তোমায় সঙ্কল্প স্থির করতে হবে। তোমার নিজের আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্তেই তোমায় একটা কোন কাজ নিতে বলছি, নইলে তোমার মত একটা মেয়ের দু'বেলা দু'মুঠোর ব্যবস্থা করার সঙ্গতি আমার আছে। কিন্তু আমার কাছেও ঋণী আছ ভেবে নিজেকে তুমি ছোট মনে করবে, এ আমি চাই না। সত্যি কথা বলতে গেলে, নিখিল বক্সীর গায়ে প'ড়ে চাকরির খবর দেওয়াটা আমার তখন অত্যন্ত খারাপই লেগেছিল। কিন্তু পরে কাগজপত্রগুলো দেখে বুঝলাম, কাজটা সত্যিই ভাল। এ কাজ পেলে, নিতে তোমার আপত্তি করা উচিত নয়।

আপত্তি করবার আগে কাজটা ত পাওয়া দরকার! শোভনা একটু ম্লান হেসে বলেছে, নিখিলবাবু খবর এনেছেন মাত্র। এ কাজ যে আমি পাব তার ভরসা কি!

তা অবশ্য নিখিলবাবুকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। তুমি যদি বল ত আমিই জিজ্ঞাসা করতে পারি।

না, জিজ্ঞাসা করতে হ'লে আমিই করব।—ব'লে শোভনা তখনকার মত উঠে পড়েছে। কিন্তু বাইরে যাবার আগে ফিরে দাঁড়িয়ে একটু হেসে স্বরটা হাল্কা রাখবার চেষ্টা ক'রে বলেছে,—আপনি কিন্তু এখন আর কোথাও নেমন্তন্ন নিয়ে বসবেন না। যে ক'দিন আছেন, আমার রান্নাই আপনাকে খেতে হবে। আপনার জন্তে এইটুকু করবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন না।

কথাগুলো ব'লেই আশুবাবুর উত্তরের জন্তে অপেক্ষা না ক'রে শোভনা তার নিজের ঘরে চ'লে গেছে। কেন যে এই কথাগুলো বলতে তার চোখ জলে ভ'রে উঠেছে, সে নিজেও ভাল ক'রে জানে না। এইটুকু শুধু বুঝেছে যে, এই অশ্রু শুধু কৃতজ্ঞতার নয়। ভুল হোক, ঠিক হোক, অনুপমের এই শহরেই থাকার খবর পাবার পর থেকে যা যা ঘটেছে, যে অশান্তি, উদ্বেগ, যন্ত্রণা, হতাশা ও অকারণ লাঞ্ছনার তিক্ততা তাকে জর্জর করেছে, সব যেন এক সঙ্গে জড়িত হয়ে তার অশ্রুর উৎস খুলে দিয়েছে।

নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে শোভনা সেদিন কেঁদেছিল নিজেকে সংবরণ করবার কোন চেষ্টা না ক'রে।

তার জীবনে এবারের এই নিদারুণ সঙ্কট দেখা দেবার পর এই তার প্রথম কান্না। অবারিত উচ্ছ্বসিত। যেন তার গভীর হৃদয়মূলই এক দুর্বার স্রোতে ভেসে যাচ্ছে।

এমন কান্না জীবনে কখনও সে কেঁদেছে ব'লে মনে পড়ে না।

মৃত্যুর সেই প্রথম সুস্পষ্ট পদক্ষেপ অনুভব করবার পরও কান্না তার আসে নি।

একটা অসহায় আতঙ্কই তখন প্রধান, কিন্তু তার সঙ্গেই একটা কঠিন অনমনীয় সঙ্কল্পের দৃঢ়তা! নিজেকে কাতর হয়ে লুটিয়ে পড়তে সে দেবে না।

মনে আছে, বাড়ী থেকে সেই প্রথম হাসপাতালে নিয়ে যাবার দিনও সে কাঁদে নি। অন্ততঃ তার চোখে এক ফোঁটা জল অনুপমকে সে দেয় নি দেখতে। দেয় নি অনুপমের জন্তেই।

অনুপমকে কেমন অসহায় দিশাহারা মনে হয়েছিল। মৃত্যুর ছায়াচ্ছন্ন নিজের জীবনের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে যত না দুঃখ হয়েছিল, তার চেয়ে বেশী হয়েছিল, অনুপমের নিরুপায় বিমূঢ়তার কথা ভেবে তার প্রতি মায়ায়।

কিন্তু তবু শোভনা কাঁদে নি।

এমন একটা প্রসন্নতা মুখে রাখবার চেষ্টা করেছিল, যেন ক'দিনের জন্যে কোথাও একটু ঘুরে আসতে যাচ্ছে মাত্র।

অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ীটা যেন একটা রাজরথ।

ষ্ট্রেচারে শুইয়ে তাতে নিয়ে গিয়ে তোলা যেন একটা খেলা।

অনুপম কি অসহায় বিমূঢ় ভাবে অ্যাম্বুলেন্স গাড়ীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, শোভনা এখনও যেন দেখতে পায়।

অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভারই অনুপমকে বলেছিল, কই মশাই, আসুন। গাড়ীতে উঠুন। তার পর অনুপম বিহ্বল ভাবে গাড়ীতে উঠতে যেতে আবার বলেছিল, ঘরের দরজাটায় তালা দিয়ে আসবেন না?

শোভনা তখন গাড়ীর ভেতরে ষ্ট্রেচারে শায়িত। চোখে সে কিছু দেখতে পায় নি, যা কিছু কানেই শুনেছে, তবু সমস্ত দৃশ্যটা তার যেন দেখা মনে হয়।

মুখে কিছু বলবার সুযোগ ছিল না, কিন্তু মনে মনে বলেছে, তুমি ভেব না, কিছু ভেব না। আমি ঠিক সেরে ফিরে আসব।

হাসপাতালে যাওয়ার ব্যবস্থা স্থির হবার সময় এ কথা অবশ্য মুখেই বলেছিল বার বার। অনুপমকে কত বিষয়েই পাখী-পড়া ক'রে কি করতে হবে না হবে বুঝিয়েছিল।

অনুপমের তখন থেকেই কেমন যেন আচ্ছন্ন অবস্থা। মুখের দিকে নির্বোধের মত নীরবে তাকিয়ে থাকত শুধু।

তখনও শোভনা কাঁদতে পারত, কিন্তু সব কান্না হৃদয়কে যেন পাথর-চাপা দিয়ে সে রুদ্ধ ক'রে রেখেছিল।

সেই পাথর কি ক'রে যে এতদিন বাদে প্রথম স'রে গেল, কে জানে!

চোখের জলে মনের অনেক দুঃখ বেদনা গ্লানি নাকি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

অনেকক্ষণ বাদে চোখ মুছে বিছানায় উঠে ব'সে শোভনার কিন্তু তা ঠিক হয়েছে ব'লে মনে হয় নি। শুধু চোখের জলে ধুয়ে নিজের কাছে নিজের মনটা আর একটু যেন স্বচ্ছ হয়েছে।

সেই অস্থির আবর্ত আর নয়, তার বদলে নিজেকে বিচার করবার একটা প্রশান্তি কিছুক্ষণের জন্যে সে বুঝি পেয়েছে।

বিচার ক'রে যা বুঝেছে তাই থেকেই কি এই জ্বালার রাজ্যে আবার ফিরে আসার নির্বন্ধ?

হয়ত তাই। কিন্তু তার আগে আরও এমন একটি ঘটনা ঘটেছে যা এখানে আসার সংকল্পে সাহায্য করেছে না বাধা দিয়েছে, এখনও শোভনা ভাল ক'রে জানে না।

ঘর থেকে বেরিয়েই নিখিল বক্সীকে উঠোন পার হয়ে চ'লে যেতে দেখেছে সেদিন।

শুনুন।—গভীর দ্বিধা জয় ক'রে শোভনা শেষ পর্যন্ত তাকে ডেকেছে নিজে থেকেই।

নিখিল থমকে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু পিছু ফিরে তাকায় নি পর্যন্ত।

শোভনাকেই গম্ভীর স্বরে আবার বলতে হয়েছে,—একটা কথা শুধু শুনে যান।

নিখিল এ ডাক শুনেও কয়েক সেকেণ্ড যে নীরবে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে, শোভনার পক্ষে তা-ই অসহ্য অপমান ও গ্লানি। আশুবাবুর ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময়, পাছে তিনি নিখিলকে দেখতে পেয়ে আগেই কিছু ব'লে বসেন এই আশঙ্কাতেই শোভনা অবশ্য নিজের প্রথম দ্বিধা জোর ক'রে কাটিয়ে উঠেছিল। এখন কিন্তু লজ্জা ও অনুশোচনা করবার যেন তার জায়গা নেই।

নিখিল বক্সী শেষ পর্যন্ত মুখ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে শোভনার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

মুখ তার কঠিন কি অপ্রসন্ন নয়, কিন্তু কেমন ক্লান্ত ও কাতর। তার স্বাভাবিক সপ্রতিভ উচ্ছলতা এমন ভাবে লুপ্ত হয়ে যাওয়া যেন অবিশ্বাস্য।

এ পরিবর্তনের কারণ বিশ্লেষণ করবার মত মনের অবস্থা শোভনার নয়। সে শান্ত ও ঈষৎ কঠিন স্বরে বলেছে—আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কোন ভয় নেই। আমি শুধু একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্যে আপনাকে ডাকলাম। স্বার্থটা অবশ্য আমারই, তবে খবরটা আপনার কাছেই পাওয়া ব'লেই আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে। আপনি যে কাজের কথা বলেছেন সেটা আমার পক্ষে পাওয়া কি সত্যিই সম্ভব?

সম্ভব ব'লেই ত মনে হয়। নইলে মিছিমিছি আপনাকে খবর দিতাম না। কিন্তু এ কাজ এখন আপনার না নেওয়াই ভালো। নিখিলের স্বর রুক্ষ নয় শুধু একটু যান্ত্রিক।

কেন?—নিজের অজ্ঞাতসারেই শোভনার কণ্ঠস্বর একটু তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে।

নিখিল বক্সী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ধীরে ধীরে বলেছে,—খবরটা যখন আমিই এনেছি তখন তার জন্যে ওইটুকু কৃতজ্ঞতার ঋণেও আপনাকে বাঁধা রাখতে চাই না ব'লে।

কৃতজ্ঞতার বালাই যদি আমার না থাকে!—শোভনা পাল্টা আঘাত দেবার জন্যে এর চেয়ে তীব্র কিছু বলার কথা সেই মুহূর্তে খুঁজে পায় নি।

ভাষায় না থাক, স্বরের তীব্রতায় যে জ্বালা ছিল তা কিন্তু সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে নিখিল একটু হেসে বলেছে,—আপনার ও বালাই না থাক্, কৃতজ্ঞতার লোভ ত অপরের থাকতে পারে? সে লোভও মনের বাঁধন আলগা ক'রে দেবার পক্ষে অনেক সময়ে যথেষ্ট।

তার মানে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা আপনার নয়।—বিদ্রূপ করতে গিয়ে শোভনার কণ্ঠে একটু বিমূঢ় বিস্ময় যেন আপনা থেকে মিশে গেছে।

না, নয়। ব'লে নিখিল বক্সী আর কিন্তু সেখানে দাঁড়ায় নি।

আকুল কান্নায় মনে যে স্বচ্ছতা কিছুক্ষণের জন্যে অনুভব করেছিল সে, এই সাক্ষাতের পরেই অবশ্য দূর হয়ে গেছল।

দ্বিধা-সংশয়ের দোলায় দুলেছিল তার পর থেকেই।

কি সে করবে? একটা চকিত অস্পষ্ট ছবি স্মৃতি থেকে মুছে নিতে পারলেই একদিক্ দিয়ে সব দোলা বুঝি থেমে যায়।

কিন্তু মুছে দিতে পারবে কি?

জীবনের নিষ্ঠুর দুর্জ্ঞেয় ঘূর্ণি এমন এক জায়গায় তাকে এনে ফেলেছে যেখানে পরের ধাপ নেবার সমস্ত দায়িত্ব তার নিজের।

এবার আর আশুবাবু কি আর কারো হাত দিয়ে ভাগ্যের দাবার চাল নয়। সে নিজেই নিজের এখন নিয়ন্তা।

ইচ্ছে করলে অতীতকে সত্যিই সজ্ঞানে সে এবার মুছে দিতে পারে চিরকালের মত। কেউ কিছু জানে না, জানতে চাইবে না। জবাবদিহি যদি দিতে হয়ত এবার শুধু নিজের অন্তরের কাছে।

অন্তরের মধ্যে সব প্রশ্ন কি এখনো নীরব হয় নি?

তা যে হয় নি, এই জলার রাজ্যে আবার ফিরে আসাই তার প্রমাণ।

নসুর নির্দেশে সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক্ দিয়ে শোভনা সেই তিনমাথার চরে এসে ওঠে।

জলার মাঝখানে সামান্য একটু উঁচু নাতিপ্রশস্ত খানিকটা শুকনো ডাঙা। তিনটি দুঃস্থ পরিবার তারই মধ্যে কোনরকমে পাশাপাশি বাসা বেঁধে আছে। বাসা নেহাৎ বলতে হয় তাই। কোনরকমে মাথা গোঁজার ঠাঁই। চালের কোথাও ভাঙা মরচে-ধরা টিন, কোথাও ছেঁড়া তেরপল, খড়, কি খোলার অভাব মিটিয়েছে। মুলী-বাঁশও সকলের জোটে নি দেয়াল তুলতে। জানলা বলতে অধিকাংশই ফোকর শুধু। তার গায়ে চটের পর্দা ঝুলছে। দরজার বদলে বাঁখারি-দরমার আগড়।

তিনটি বাসার মাঝখানের এজমালী উঠোনের মত জায়গাটুকুতে যে গুটি-তিনেক উলঙ্গ শিশু খেলা করছে তারা কিন্তু বেশ হৃষ্টপুষ্টই মনে হয়। ঘরদোর আসবাব পোশাকে যে চরম দারিদ্র্য পরিস্ফুট, বাসিন্দাদের চেহারায় কি মুখের ভাবে তার গ্লানির যেন চিহ্ন নেই। ঘরের নামে যা পরিহাস, তাও বেশ পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার। মাটির উঠোন নিকোনো গোছানো। যে দু'টি অল্পবয়সী বধূ ঈষৎ ঘোমটা দিয়ে বিস্মিত চোখে শোভনাকে নিজেদের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে, তাদের দেহে ও মুখে স্বাস্থ্যশ্রীর একেবারে অভাব নেই।

নসু তিনমাথার চরে পৌঁছে দিয়েই তার কর্তব্য শেষ মনে ক'রে ইতিমধ্যে চ'লে গেছে। যাবার আগে শুধু জিজ্ঞাসা করেছে—এবার আপনি পথ চিনে ফিরে যেতে পারবেন ত?

শোভনা ঘাড় নেড়ে তাকে আশ্বাস দিলেও নসু তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ পালন না ক'রে ছাড়ে নি। দূরে এক দিকে হাতের গুলতিটাই তুলে ধ'রে ব'লে গেছে—ওই যে জোড়া খেজুর গাছ দেখছেন, সোজা ওই দিকে মুখ রেখে চ'লে যাবেন, আর পথ ভুল হবে না তা হ'লে।

নসু চ'লে যাবার পর শোভনা বেশ একটু অস্বস্তিই বোধ করেছে, এই অপরিচিতদের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে থেকে।

কিন্তু এ অস্বস্তি শুধু নয়, এর চেয়ে অনেক বেশী কিছু দুর্ভোগের সম্ভাবনা জেনেই সে এখানে এসেছে। সুতরাং বিচলিত হলে তার চলবে না।

বধূরা কেউ নিজে থেকে তার সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা করে নি। শুধু একটু সন্দিগ্ধ ও বিস্মিতভাবে তার দিকে চেয়ে থেকেছে।

উঠোনের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে তিনটিও একটু যেন ভয়ে বিস্ময়ে আড়ষ্ট।

কি এখন করা উচিত শোভনা স্থির করতে পারে নি। নিজে থেকেই সে কি আলাপ করবে এদের কারুর সঙ্গে? কিন্তু আলাপ সুরু করবে কি নিয়ে?

এখানে আসার সঙ্কল্প যখন স্থির করেছে তখন এই সমস্যার কথাটা মাথায় আসে নি।

সমস্যাটা কিন্তু আপনা থেকেই মিটে যায়।

একটি শিশু উঠোন থেকে মা'র কাছেই যাবার জন্যে টলতে টলতে কয়েক পা চ'লে প'ড়ে গিয়ে কেঁদে ওঠে। শোভনা কিছু না ভেবেই তাকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে গায়ের ধুলো ঝাড়বার চেষ্টা করায় একটি বধূ এগিয়ে এসে শিশুটিকে নিজের কোলে টেনে নিয়ে একটু অপ্রসন্ন স্বরেই বলে—থাক্, আপনার হাত নোংরা হবে!

তা হ'লই বা! ব'লে একটু হেসে শোভনা এ সুযোগ নষ্ট হতে দেয় না। জিজ্ঞাসা করে, এ সব ছেলেমেয়ে আপনার?

আমার কেন হবে? আমার এইটি। আঞ্চলিক টানের সঙ্গে একটু যেন প্রসন্ন মুখে কথাগুলি ব'লে অপর বধূকে দেখিয়ে দিয়ে জানায়—ও দুটি ছেলে মেয়ে ওই ওর।

আপনারা কতদিন এখানে আছেন? এ প্রশ্ন করা এর পর সহজ।

আমি এক বছর, আর ওরা তিন-চার বছর হবে। তাই না?

দ্বিতীয় বধূটিও এবার এগিয়ে কাছে এসেছে। প্রশ্নটা তাকেই।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে দ্বিতীয় বধূটিই এবার শোভনাকে জিজ্ঞাসা করে—আপনি সেদিন দু'জন বুড়ো মানুষের সঙ্গে এখানে এসেছিলেন না? ওই ছোকরাটার সঙ্গে?

শোভনা এ কথা স্বীকার করবার আগেই আবার বধূটি জিজ্ঞাসা করে—যাকে খুঁজছেন সে ত এখানে নেই শুনে গেছেন। আজ আবার এসেছেন কেন তা হ'লে?

এসেছি, সে এখানেই আছে জেনে। ব'লে শোভনা তাদের দিকে চেয়ে একটু হাসল। ক্রমশঃ

পুস্তক পরিচয়
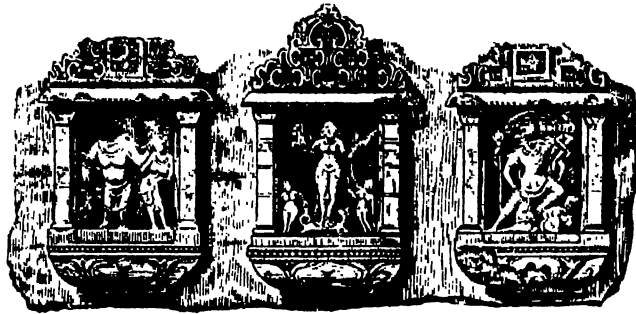
ভারতবর্ষে রাষ্ট্রভাষা ও লিপি এবং পরিভাষা সমস্যার সমাধান : শ্রীদেবলকুমার গুপ্ত প্রণীত ও প্রকাশিত, ১৯ সি, রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ১৲ টাকা চার আনা।

১৯৪৯ সালে গণপরিষদে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের কাষ্টিং ভোটের জোরে একমাত্র হিন্দীকেই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা করা হইয়াছে। তারস্বরে ভারতকে পরম গণতন্ত্রীদেশ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়া থাকে—কিন্তু বাস্তবে ইহার বিপরীতই দেখা যাইতেছে। গত বৎসর প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে, রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিগণ জাতীয় সংহতি সম্পর্কে তিনদিন ব্যাপী দিল্লীতে এক সম্মেলনে মিলিত হইয়া, দেশের শিক্ষা এবং পরিশাসনের ভাষা একমাত্র হিন্দী এবং নাগরী লিপি ব্যবহৃত হইবে—এই পরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্তের দ্বারা তাঁহারা জাতীয় সংহতি সৃষ্টি না করিয়া—দেশময় প্রবল বিরোধই সৃষ্টি করিয়াছেন। লেখক বহু পণ্ডিত ব্যক্তির মতামত এবং সুযুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন হিন্দীর দাবী কত অসার, কত মূল্যহীন। লেখকের চেষ্টা সার্থক হইয়াছে; হিন্দীভাষার প্রচারকদের দাবী যে কত ভ্রান্ত, লেখক তাহাও দেখাইয়াছেন। বলা বাহুল্য—ভোটের জোরে (?) একটি মাত্র ভাষাকে অন্যভাষী মানুষদের ঘাড়ে হয়ত সাময়িক কালের জন্য চাপানো যায়, কিন্তু সে ভাষা "মীটিংকা কাপড়ার" বেশী কাজের হইবে না। হাট-বাজারের ভাষা ঠাকুরঘর কিংবা বাসরঘরের ভাষা কখনও হইবে না। গায়ের জোরে (সাময়িক) হিন্দী এবং দেবনাগরী লিপি দ্বারা ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করিতে গেলে কালবাহী ভারতীয়ত্বের জীর্ণ ত্বক সে টান সহ্য করিতে পারিবে না।

আলোচ্য পুস্তকখানির ব্যাপক প্রচার কল্যাণকর হইবে। লেখক যদি এই পুস্তকখানির ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে খুবই ভাল হয়। পুস্তকের মূল্যবান তথ্যগুলি ভারতের সকল প্রদেশের সকল লোকের প্রয়োজন।

ই-চ

স্বর্ণমুকুট : গোপেন্দ্র বসু। ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায় এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ কর্তৃক ১।১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পত্রাঙ্ক ১৪৩, মূল্য ২·৫০ নয়া পয়সা।

আলোচ্য পুস্তকখানি কিশোর-পাঠ্য উপন্যাস। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের স্বর্ণমুকুট কিভাবে এক রহস্যময় সিন্দুকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল ও কিভাবে বহুদিন পরে আজকালকার ছেলেদের দ্বারা তাহার পুনঃপ্রাপ্তি ঘটিল তাহারই এক চিত্তাকর্ষক গল্প। লেখকের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি সুন্দর। নীলকর সাহেবদের দৌরাত্ম্য ও তৎকালীন জমিদারদের প্রভাব, প্রতাপ, ও ধ্বংসের কারণ লেখক উজ্জ্বলভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং প্রতাপাদিত্য যুগের বাংলার ইতিহাসের কিছুটা দিক কাহিনীর মধ্যে ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী : শ্রীসুধাকণা চক্রবর্ত্তী। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, পত্রাঙ্ক ১২২, মূল্য দুই টাকা।

লেখিকা পূতচরিত্র আদর্শকর্মযোগী ব্রাহ্মসাধকের জীবনী ও রচনাবলী হইতে কিছু কিছু সংকলন করিয়া শ্রদ্ধার্ঘ্যরূপে এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন। শ্রীশচন্দ্র ছিলেন নীরব কর্মী ও অকৃত্রিম দেশসেবক। শিক্ষকতাবৃত্তির মাধ্যমে সমাজসেবাই ছিল তাঁহার জীবনের লক্ষ্য। এরূপ আদর্শচরিত্র ব্যক্তির জীবনী ও রচনাসংগ্রহ সকলেরই পাঠ করা উচিত।

শারদোৎসব-দর্শন : সমীরণ চট্টোপাধ্যায়। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, পত্রাঙ্ক ১১৭, মূল্য দুই টাকা।

রবীন্দ্রনাথের শারদোৎসব নাটিকাটির আলোচনা ও চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ লেখক নিপুণভাবে করিয়াছেন। রবীন্দ্রপ্রতিভার সহিত দেশবাসীর পরিচয়সাধন করাই প্রকাশকের উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্যেই তিনি এই গ্রন্থপ্রকাশে সহায়তা করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থে লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আছে এবং তাঁহার বিশ্লেষণশক্তিও প্রশংসার যোগ্য।

মৃত্যুশোক : শ্রীযতীশ চট্টোপাধ্যায়। শ্রীব্রতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রীতিনগর, নদীয়া হইতে প্রকাশিত, পত্রাঙ্ক ৫৮, মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

পত্নীবিয়োগের অন্তর্জ্বালায় পীড়িত হইয়া লেখক যেসব কবিতা রচনা করিয়াছেন সেগুলি এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। "এই লেখাগুলির অন্তরালে একটা দুর্নিবার ঝড়ের ঝাপটই আছে, সে ঝড় তাঁর বেদনার কালবৈশাখী।" কবিতাগুলিতে একটা স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস আছে এবং সে উচ্ছ্বাস শোকাগ্নিস্পর্শে উজ্জ্বল ও মর্মগ্রাহী হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহা ব্যক্তিগত গণ্ডি ছাড়াইয়া পাঠকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণধন দে

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক—শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, মূল্য ৯৲, পৃষ্ঠা ৩৬৪।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কিত এই পুস্তকে লেখক বিবলিওগ্রাফী ব্যতীত অন্যান্য বিষয়গুলি আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার একজন অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক এবং দীর্ঘদিন যাবৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট গ্রন্থাগারের সহিত সংযুক্ত। ইহা ব্যতীত তিনি নানা ভাষাবিদ্ এবং পুরাতন লেখক এবং গ্রন্থাগার সম্পর্কে আরও কয়েকখানি বাংলা ও একখানি ইংরেজী বই লিখিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি পরিবর্ধিত এবং পরিশোধিত সংস্করণ।

পুস্তকখানি ২৩টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত যথা—জনসাধারণের গ্রন্থাগার; রাষ্ট্র ও গ্রন্থাগার; পুস্তক নির্বাচন; পুস্তকের জাতি বিচার: পুস্তকের শ্রেণী বিভাগ; ডিউইর দশমিক বিভাগ; বিষয় অনুসারে জাতি বিচারের

অসুবিধা, নূতন করিয়া জাতি বিচার ও তালিকা প্রণয়ন; পুস্তকের জাতি বিভাগ; পুস্তক মধ্যে প্রয়োগ; পুস্তকের জাতি বিচারে ইঙ্গিত; বাংলা সাহিত্যের জাতি বিচারের ছক; পুস্তকের তালিকা প্রণয়ন; তালিকা প্রণয়ন-ব্যবহারিক দিক নিয়মাবলী; গ্রন্থাগার সংগঠন; গ্রন্থাগার পরিচালনা; গ্রন্থাগার নীতি; সন্ধান দেওয়ার কাজ; গ্রন্থাগার প্রচার ও কার্য্য সম্প্রসারণ; স্কুলের গ্রন্থাগার ও শিশুকেন্দ্র; গ্রামে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এবং পরিভাষা।

গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর পক্ষে এই পুস্তকখানি বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। ৪৩টি ছবি ও ছক থাকাতে পুস্তকের বক্তব্য পরিস্ফুট হইয়াছে। লেখক চলতি ভাষায় লিখিয়াছেন, কোন কোন স্থলে ইহার একটু আতিশয্য হইলেও কোথাও আবার তথাকথিত 'সাধু' ভাষা আসিয়া পড়িয়াছে। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ের উপরে যে সকল মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সকলে গ্রহণ করিবেন এরূপ আশা করা যায় না। তবে লেখক এই সকল গুরুতর বিষয়ে নিজ সুদৃঢ় মত ব্যক্ত করিয়া বলিষ্ঠ মনের পরিচয় দিয়াছেন।

এদেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা ও সাহিত্য শৈশব অবস্থায়। যাঁহারা এই পারম্ভিক কার্য্য করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে রাজকুমারবাবু একজন। এই বিষয়ে বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েসন গত প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবৎ গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ ও 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার মাধ্যমে খুব প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়া যাইতেছে। বিদ্যাটি বর্ত্তমানে বিদেশ হইতে আসিলেও, দেশে সার্ব্বজনীন শিক্ষা প্রসারের ফলে, ইহার গুরুত্ব খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। গ্রন্থাগার ব্যতীত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা অসম্ভব। এই বিষয়ের বাংলা তথা ভারতীয় পরিভাষা যত একরূপ হয় ততই ভাল। বর্ত্তমান গ্রন্থে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে লেখকগণ বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করেন ইহাতে বিভ্রমের সৃষ্টি করে। সকলের মিলিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একই পরিভাষা গ্রহণীয়। পুস্তকখানির ছাপা ও কাগজ ভাল।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

ঈশ্বর সান্নিধ্যবোধের সাধনা—(সাধু লরেন্সের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁহার কতিপয় আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ ও পত্রের বঙ্গানুবাদ)—শ্রীহরিশচন্দ্র সিংহ প্রণীত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির প্রকাশকমণ্ডলী, ৪নং ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো, কলিকাতা-২৫। মূল্য ৮০ নয়া পয়সা। পৃষ্ঠা ৮৮।

বইখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। সংসারে কর্ম্মময় জীবন, কাজকর্ম্মে নিরন্তর ব্যস্ত থাকিয়া ঈশ্বরে মন সতত নিযুক্ত রাখা একেবারেই অসম্ভব এরূপ মনোবৃত্তি লইয়া যাঁহারা বলেন যে, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী না হইলে ঈশ্বরে মন সতত নিযুক্ত রাখা চলে না তাঁহারাও ৪০০ বৎসর আগেকার এই খ্রীষ্টীয় সাধুটির প্রসঙ্গ ও পত্রাবলী পাঠে তাঁহাদের ধারণা পরিবর্ত্তন করিবেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার সত্যই বলিয়াছেন যে, "কর্ম্মবিরল সন্ন্যাস জীবন যাপন ..... অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। এরূপ পরিস্থিতিতে সাধু লরেন্সের কথা আমাদের মনে আশার সঞ্চার করে।"

এই সাধুটির বর্ণিত মূলতত্ত্ব ও সাধনার ইঙ্গিত আমাদের দেশে অনেক মহাপুরুষের বাণীতে অনেক প্রাচীন কাল হইতেই দেখা যায়। কিন্তু ভিন্ন দেশে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর উপলব্ধিও যে অনুরূপ ইহাই ইহাতে প্রমাণিত হয়। সাধু লরেন্স খঞ্জ ছিলেন এবং কাজে তাঁর পটুতা ছিল না, একথা নিজেই তিনি বলিয়াছেন। রান্নার কাজ তাঁহার ভাল লাগিত না, তথাপি ঐ কার্য্যেই তাঁহাকে দীর্ঘকাল নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল। এইসব অসুবিধার মধ্যে থাকিয়াও তিনি ঈশ্বর-সান্নিধ্য সুস্পষ্টভাবে অনুভবে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, "...নির্জ্জন উপাসনার সময়ে ঈশ্বরের সঙ্গে আমার সংযোগ যত নিবিড় হয় তার চেয়ে বেশী নিবিড় সংযোগ হয় যখন আমি সাংসারিক কাজে ব্যাপৃত থাকি।" কিরূপে ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল তাহা জানিতে পারিলে সকলের পক্ষেই বিশেষতঃ আমাদের দেশের মহিলাদের (যাঁহাদের রন্ধনাদি গৃহকর্ম্মে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতে হয়) বিশেষ কল্যাণজনক হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি! মূল গ্রন্থখানি ফরাসী ভাষায় লিখিত হইলেও নানা দেশে নানা ভাষায় ইহা অনূদিত হইয়াছে কিন্তু বাংলা ভাষায় ইহার অনুবাদ হয় নাই। সেইজন্যই অনভিজ্ঞদের সুবিধার জন্য সরল ও সহজ ভাষায় বঙ্গানুবাদের এই প্রচেষ্টা। গ্রন্থখানি যাহাতে সহজলভ্য হয় তজ্জন্য স্বল্পমূল্যে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারেরও চেষ্টা করা হইতেছে। এই সাধু প্রচেষ্টা সফল হইবে ইহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রবন্ধ ও পত্রাবলীর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব, ভাষার সরলতা, অনুভূতি প্রকাশের উপলব্ধি-প্রসূত নিপুণতা এবং সর্ব্বোপরি অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রন্থখানিকে বিশেষ মর্য্যাদা দান করিয়াছে।

দি ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট: শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত। ৫, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোড, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

সাময়িক পত্রিকা হইলেও, এই গ্রন্থখানি একটি বিশিষ্ট সংস্করণ. রবীন্দ্র শতবার্ষিকীকে উপলক্ষ্য করিয়া এরূপ বিশেষ সংকলন-গ্রন্থ ইহার পূর্ব্বে অনেকগুলি বাহির হইয়াছে বটে কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থখানি গতানুগতিকতার বহু ঊর্দ্ধে। ইহার অধিকাংশ লেখাই তাঁহারাই লিখিয়াছেন, যাঁহারা কবির খুব নিকট সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন। এইসব লেখার বৈশিষ্ট্যই হইল যাহা আমরা কেহই জানি না, পুস্তকাকারেও যাহার সাক্ষাৎ নাই তাহার সহিত আমাদের পরিচয় দান করা; ইংরাজী ও বাংলা প্রবন্ধে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থখানি তাই সকল দিক দিয়াই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই গ্রন্থে যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অসিতকুমার হালদার, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলি, গোপাল হালদার, ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, প্রবোধচন্দ্র সেন, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, ডঃ রাধাকৃষ্ণণ, সুধীরঞ্জন দাস, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, ফাদার পিয়ার ফালোন, নরম্যান কাজিনস, অধ্যাপক ও. সি. গাঙ্গুলি, দিলীপকুমার রায়, অনিলবরণ রায়, ডঃ নিকোলাস রেইন, অধ্যাপক তান-উন-শান, গোপাল রেড্ডি, ওয়াই চেলিশেভ, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ শচীন সেন, অশোক চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক হেলমার্ট, জি, কলিস, ডঃ রমা চৌধুরী, ডঃ কালিদাস নাগ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া অনেকগুলি আর্ট-প্লেট বইখানির শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। সবচেয়ে বড়কথা, প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া এইরূপ একখানি অমূল্যগ্রন্থ উপহার দিয়া কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের কর্ম্মকর্ত্তারা শুধু দুঃসাহসেরই পরিচয় দেন নাই, একটি মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিলেন।

কী হেরিলাম নয়ন মেলে : মায়া দাশ। ..., কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ২'৫০ নয়া পয়সা।

লেখিকা এই গ্রন্থে কাশ্মীর, দক্ষিণভারত, গরুমারা অরণ্য, নালন্দা, রাজগীর, উড়িষ্যা, কোনারকের সূর্য্যমন্দির প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রের বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন। ভ্রমণ-কাহিনী বলিতে আমরা যাহা বুঝি, এই গ্রন্থখানি তাহা হইতে স্বতন্ত্র। ইহাতে তথ্যও আছে, কিন্তু বলার ভঙ্গিতে ইহা সাহিত্যের মর্য্যাদাও লাভ করিয়াছে। ভ্রমণ-কাহিনীকেও যে সরস করা যায় এবং ইহা যে পাঠক-মনকে কতখানি আকৃষ্ট করে তাহা প্রবোধ সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে' ও মনীন্দ্রনারায়ণ রায়ের 'বহুরূপের' জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়।

এই বইখানি পাঠ করিয়া সকলেই আনন্দ পাইবেন। গ্রন্থ প্রকাশনে প্রকাশক মহাশয় বিশেষ যত্ন লইয়াছেন। বিশেষ করিয়া কয়েকখানি হাফটোন ছবি দিয়া ইহার মর্যাদা আরও বৃদ্ধি হইয়াছে।

কাঁচা মাটি পাকা পথ—শ্রীদীপেন রায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৪'৫০ ন.প।

একটি মিষ্টি গল্প লইয়া লেখক এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। অভিজাত ঘরের শিক্ষিত একটি ছেলে বায়ু পরিবর্তন করিতে আসিয়া কিরূপে একটি জংলী মেয়েকে বিবাহ করিতে বাধ্য হয় এবং যাহার ফলে তাহার জীবনের সকল দিকে চির খাইয়া যায় তাহারই এক মর্মন্তুদ কাহিনী।

সলিল ও ইরা—যাহাদের লইয়া গল্প, তাহাদেরই জীবনাকাশে ধূমকেতুর মত আসিয়া উদয় হইল কেলি। রং তার কালো, শিক্ষা-সভ্যতার বালাই নাই -সলিলের পিতা মিঃ রায়ের রুচির দিক দিয়া,বিশেষ করিয়া আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হইতেছে দেখিয়া তিনি কিছুতেই ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। অসহায়ের মত গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু মানাইয়া লইতে চাহিলেন না। চাকর বনবিহারী যতদিন বাঁচিয়া ছিল ততদিন উহাদের আগলাইয়া লইয়া চলিয়াছিল। কিন্তু সলিলের পুত্র হওয়ার পর মিঃ রায় অন্যরূপ হইয়া গেলেন। বংশের আভিজাত্য রক্ষার্থে ছেলেটিকে তাহার মায়ের কাছ হইতে সরাইয়া লইলেন। এই ট্র্যাজেডি গল্পটিকে পরিণতির দিকে আগাইয়া লইয়া গিয়াছে। পরিণতির মোচড়টিতে কিন্তু ছোট গল্পের টেকনিক আসিয়া পড়িয়াছে। অবশ্য তাহাতে বইখানির মর্যাদা আরও বাড়িয়াছে। গল্পের চরিত্রগুলি আপন আপন বৈশিষ্ট্য লইয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

লেখকের ভাষা সরলতায় সুন্দর। বিশেষ করিয়া, তিনি গল্প বলিতে জানেন। সকল শ্রেণী পাঠকেরই ভাল লাগিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

গৌতম সেন

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা

বিধানচন্দ্র রায়

জন্ম :

মৃত্যু :
১লা জুলাই, ১৯৬২

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬২শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৬৯

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বিধানচন্দ্র রায়

যে সময়ে বাংলা ও বাঙালীকে তাহাদের ভাগ্যদেবতার নিষ্ঠুর পরিহাসে আহত ও জর্জ্জরিত হইতে হইতেছে, যখন দেশ দ্বিখণ্ডিত, অগণিত বাস্তুহারা আশ্রয়-আশ্বাসের সন্ধানে পশ্চিম বাংলার ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে জলস্রোতের ন্যায় আসিতেছে, দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তাণ্ডবে বিধ্বস্ত-প্রায় এবং দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড ঘূর্ণিমন্থনে বাঙালী পাইয়াছে হলাহল ও ভারতের অন্য অঞ্চল পাইয়াছে অতুল সম্পদ, সেই সময়ে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন বিধানচন্দ্র রায়। অবশ্য বিধানচন্দ্রের আগমনের পূর্ব্বে রাষ্ট্রের অধিকার হস্তান্তরিত হইয়াছিল এবং অভাগা খণ্ডিত বাংলার পশ্চিম অংশে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়া মুখ্যমন্ত্রীরূপে অন্য একজন নির্ব্বাচিতও হইয়াছিলেন। কিন্তু দেশ তখন ঝড়ঝঞ্ঝাহত অর্ণবপোতের মত উদ্দামগতিতে অনিশ্চিতের দিকে ছুটিয়াছে। তাহার কর্ণধার হওয়ার জন্য যে বিরাট পরিমাপে শক্তিসামর্থ ও যোগ্যতার প্রয়োজন তাহা তাঁহার না থাকায় তিনি সরিয়া যান এবং তাঁহার পরেই আসেন এই মহান জননায়ক, অসংখ্য সমস্যাসঙ্কুল ও নিদারুণ অভাব-অনটন-প্রপীড়িত এই প্রদেশের প্রশাসন ও পরিচালনের ভার গ্রহণ করিতে।

বিধানচন্দ্র রায় ১৯৪৮ সনে মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। তারপর এই অভিশপ্ত প্রদেশের উপর দিয়া কত ঝড়ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে, অভাব-অনটন-প্রপীড়িত বিভ্রান্ত জনগণকে বিক্ষুব্ধ করিয়া দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা ব্যবস্থার উপর কতশত ছোটবড় আঘাত-সংঘাত করা হইয়াছে, কি ভাবে কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্রমতি অধিকারীদিগের অন্যায় আচরণে পশ্চিমবঙ্গের ও বাঙালীর স্বার্থ ও জন্মাধিকার খর্ব্ব ও ব্যাহত করার চেষ্টা চলিয়াছে, সে সকল কথাই ত বাঙালী মাত্রেই জানে। এবং ইহাও সর্ব্বজনবিদিত যে, সে সকল উদ্দাম বিক্ষোভ-বিশৃঙ্খলা, শরণার্থী জনস্রোতের উচ্ছ্বাস এবং শত শত জটিল সমস্যার আবর্ত্তের মধ্যে ঐ ধীরস্থির, উন্নতশির জননায়ক কি অসীম ধৈর্য্য ও অদম্য সাহসের সহিত সকল বাধাবিঘ্ন ও যাবতীয় বিপদ-আপদ অতিক্রম করার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

লোকে জানে "আমরা কি পাই নাই" এবং "কি অধিকার হইতে আমরা বঞ্চিত"। আজিকার দিনে সাংবাদিক জগতে যাঁহারা সংবাদ বা তথ্য পরিবেশন করেন তাঁহাদের ধারণা যে, সেই সংবাদ বা সেই তথ্যই পাঠকের মুখরোচক হইবে যাহাতে পাঠকের মনে বিদ্বেষ, বিক্ষোভ বা অনুরূপ ভাবোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে। সুতরাং যাহা পাই নাই বা যাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি তাহার কথাই মুখরোচক—যাহা পাইলাম তাহার কথা "কে শোনে?" সুতরাং এই বিপরীত ভাবোন্মত্ত বাঙালী পাঠকের এবং শ্রোতার চক্ষুকর্ণের তৃপ্তির জন্য শুধুই অভাব-অনটন বা অন্যায়-অনাচারের সংবাদই সজোরে প্রকাশিত হয়। বাঙালীর ব্যর্থতার পিছনে এই উত্তেজনা-বিলাস এবং ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তা ও পরশ্রীকাতরতার কারণে সমষ্টিগতভাবে

অধিকারপ্রাপ্তি প্রচেষ্টাকে বলি দেওয়া যে কতটা কাজ করিতেছে সে কথা কে ভাবে বা কে দেখে?

বাস্তবিকই ডাঃ রায়কে প্রত্যেক কাজে এই দুই বিপরীত শক্তির সহিত যুঝিতে হইয়াছে। একদিকে কেন্দ্রীয় অধিকারীবর্গের প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ ও অবিচারের বিরুদ্ধে অন্যদিকে নিজের দেশের ও নিজের দলের লোকের নিজ বা গোষ্ঠীগত স্বার্থান্ধতার সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় বাধাদান। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থায় যে হতোদ্যম হইয়া তিনি সরিয়া যান নাই ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য। নিজের সকল স্বার্থ ও সঙ্গতির চিন্তা দূর করিয়া এইভাবে অন্য কেহ নিজের ভবিষ্যৎ, ব্যক্তিগত সুখ-শান্তির সকল চিন্তা বিসর্জন দিয়া একাগ্রচিত্তে দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য অবিশ্রাম কঠোর পরিশ্রম করার মত শক্তি-সামর্থ্য বা হৃদয়-মন আর কাহারও ছিল কি?

বিধানচন্দ্র রায়ের মধ্যে সেই শক্তি-সামর্থ্য সেই অচলা বিশ্বাস ও স্বার্থত্যাগ ছিল বলিয়াই বিগত চৌদ্দ বৎসরের এত বাধা-বিপত্তি কাটাইয়া আজও পশ্চিম বাংলা ও বাঙালীর আশার প্রদীপ জ্বলিতেছে এবং দেশের সন্তানগণ শত বিপরীত পরামর্শ সত্ত্বেও সম্পূর্ণভাবে বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ধ্বংসের পথে দ্রুত অবতরণ করিতেছে না। সকল ব্যর্থতা সকল শূন্যতার আলোড়নের মধ্যে ঐ পৌরুষদীপ্ত, উন্নতশির পুরুষসিংহের উদাত্তকণ্ঠের আহ্বান এই দীর্ঘদিন দেশের সকল জনগণকে দিয়াছে আশ্বাস, দিয়াছে উদ্দীপনা এবং দিয়াছে তাহাদের অগ্রসর হইবার ভরসা ও ক্ষমতা যাহারা নিজের মধ্যে শুনিয়াছে সেই মহান জননায়কের আহ্বানের প্রতিধ্বনি।

আজ মহাকালের ইঙ্গিতে বাংলা মায়ের এই বরপুত্র শান্তিময়ের ক্রোড়ে ফিরিয়া গিয়াছেন। যে আদর্শ, যে বিশ্বাসের প্রদীপ তিনি জ্বালিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সহকর্মীবৃন্দকে তিনি উদ্দীপনাও দিয়া গিয়াছেন তাহার শিখা উজ্জ্বল রাখিতে। তিনি কর্মময় পূর্ণ জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন। কল্যাণময় সত্যসুন্দর তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করুন, এই কামনা জানাইয়া শেষ করি।

পশ্চিমবঙ্গের নূতন মন্ত্রীসভা

বিগত ৯ই জুলাই সকালে কলিকাতা রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গের নূতন মন্ত্রীসভা আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি অনাড়ম্বর ছিল এবং তাহার একমাত্র বিশেষত্ব এই যে, কোন মন্ত্রীকে কি কি দপ্তরের ভার দেওয়া হইয়াছে তাহা নিশ্চিত ভাবে ঘোষিত হইল ঐ অনুষ্ঠানের পর। মন্ত্রীমণ্ডল ও মন্ত্রিগণের প্রত্যেকের দপ্তরের তালিকা এই ভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ভার লইয়াছেন (মুখ্যমন্ত্রীত্ব ছাড়া) এই কয়টি দপ্তরের, যথা: খাদ্য ও সরবরাহ, কৃষি, অর্থবিভাগ, উন্নয়ন বিভাগ ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের সাধারণ শাসন, রাজনীতি, দুর্নীতি দমন ও নির্বহন শাখাগুলির।

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়, মন্ত্রী—স্বরাষ্ট্র বিভাগের আরক্ষা, প্রতিরক্ষা বিশেষ, পাশপোর্ট, মুদ্রণ ও পরিবহন শাখা।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মন্ত্রী—পূর্ত্ত বিভাগ ও গৃহ-নির্ম্মাণ বিভাগ।

শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, মন্ত্রী—সেচ ও জলপথ বিভাগ।

শ্রীঈশ্বরদাস জালান, মন্ত্রী—স্বরাষ্ট্র বিভাগের সংবিধান ও নির্ব্বাচন শাখা এবং আইন বিভাগ।

শ্রীরায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, মন্ত্রী—শিক্ষা বিভাগ।

শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ, মন্ত্রী—বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগ, কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প বিভাগ এবং সমবায় বিভাগ।

শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়, মন্ত্রী—স্বরাষ্ট্র বিভাগের কারা ও সমাজকল্যাণ শাখা।

শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য, মন্ত্রী—ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব বিভাগ।

শ্রীজগন্নাথ কোলে, মন্ত্রী—স্বরাষ্ট্র বিভাগের প্রচার শাখা, অন্তঃশুল্ক বিভাগ ও বিধানিক বিষয়।

ডাক্তার জীবনরতন ধর, মন্ত্রী—স্বাস্থ্য বিভাগ।

শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, মন্ত্রী—স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন ও পঞ্চায়েৎ বিভাগ, সমষ্টি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কৃত্যক বিভাগ এবং আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ।

শ্রীমতী আভা মাইতি, মন্ত্রী—উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্ব্বাসন বিভাগ এবং ত্রাণ বিভাগ।

শ্রী এস এম ফজলুর রহমান, মন্ত্রী—পশুপালন ও পশু চিকিৎসা বিভাগ, মৎস্য বিভাগ ও বন বিভাগ।

শ্রীবিজয় সিং নাহার, মন্ত্রী—শ্রম বিভাগ।

মুখ্যমন্ত্রী ও এই চৌদ্দ জন মন্ত্রী ছাড়াও এগারো জন রাষ্ট্রমন্ত্রী ও দশজন উপমন্ত্রী বিভিন্ন দপ্তরের শাখা-প্রশাখার ভার লইয়াছেন। মন্ত্রীসভা মূলতঃ সেই সভাই যাহা এই নির্ব্বাচনের পর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক গঠিত হয়। তবে দপ্তরের বণ্টনে অনেক পরিবর্ত্তন দেখা যায়।

বাংলায় ডাঃ রায়ের আকস্মিক মৃত্যুর পর মন্ত্রীসভার নেতৃত্ব সম্বন্ধে অনেক গুজব রটে। আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, মন্ত্রীসভায় বিভেদ-বিচ্ছেদ—গুজবে যাই বলুক—

এখন হইবে না। আমরা সুখী হইয়াছি যে, শ্রীঅতুল্য ঘোষের চালনায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নেতৃত্ববরণ ও মন্ত্রীসভা গঠনের কাজ এরূপ সুষ্ঠু শোভন ও সমীচীন ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

নূতন মন্ত্রীসভার নেতৃত্ব করিতেছেন শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। রাষ্ট্র পরিচালনা, শাসনতন্ত্র সরল ও সবল অবস্থায় রক্ষা এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন উন্নয়ন ও পরিবর্দ্ধন বিষয়ের সমস্যা পূরণ এই তিনটি জটিল ও দুরূহ কার্য্য সমাধানে যে অভিজ্ঞতা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও উদ্যমের প্রয়োজন সে সকলই পূর্ণমাত্রায় আছে নূতন মুখ্যমন্ত্রীর। শুধু যা অভাব স্বাস্থ্যের ও দৈহিক শক্তির। এই সমস্যাপূর্ণ বিবাদ-বিক্ষোভ আকীর্ণ দলাদলির রঙ্গমঞ্চ যাহার নাম পশ্চিমবঙ্গ, তাহার পরিচালনার ও কল্যাণসাধনে যে অমানুষিক মানসিক ও দৈহিক পরিশ্রমের প্রয়োজন, তাহাতে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মত শালপাংশু কবাটবক্ষ বিরাট পুরুষেরও দেহ ভাঙিয়া গেল আমাদের সম্মুখে। প্রফুল্লচন্দ্র অবশ্য নিজের ক্ষমতার সীমা অনুমান করিয়া কিছু ভার তাঁহার সহকর্মীদের উপর দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারাও সকল বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উপর নির্ভর করিতে অভ্যস্ত, জানি না নূতন ব্যবস্থায় তাঁহারা কতটা কাজ স্বতঃপ্রবৃত্ত ও সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া করিতে সমর্থ হইবেন। অবশ্য মন্ত্রীমণ্ডলের অধিকাংশই শ্রীপ্রফুল্ল সেনের দীর্ঘদিনের পরিচিত সহযোগী ও সহকর্মী এবং অন্যেরাও কিছুদিন একযোগে কাজ করিয়াছেন।

মন্ত্রীমণ্ডলের অন্যদের বিষয়ে কিছু বলা এখানে চলে না। এতদিন তাঁহারা সকলে পাহাড়ের আড়ালে থাকিয়া কাজ করিয়া গিয়াছেন। সে কাজের ভালমন্দ সকল কিছুরই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন বিধানচন্দ্র রায়। এখন তাঁহাদের প্রায় সকলকেই সাধারণের সম্মুখে জনমতের তীব্র আলোকে দাঁড়াইতে হইবে। তাহার আরম্ভ সবেমাত্র হইয়াছে সুতরাং এখন তাহার ফলাফল না দেখিয়া কিছু আলোচনা করা অবান্তর। তবে মন্ত্রীমণ্ডলে কর্ম্মঠ ও অভিজ্ঞ লোকের অভাব নাই, তবে কে কেমন বিচক্ষণ তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় এতদিন সাধারণে পায় নাই সুতরাং তাঁহাদের যোগ্যতার কোন বিচার করা অসম্ভব।

রাজ্য সরকারের কাজ ডাঃ রায়ের নির্দ্দেশ ও পরিকল্পনায় যে দিকে ও যে ভাবে চালিত হইয়াছিল, নূতন ব্যবস্থায় তাহাই বহাল থাকিবে এ কথা শ্রীপ্রফুল্ল সেন জানাইয়াছেন। সম্প্রতি রাজ্য সরকারের চলতি বৎসরের ব্যয়ের বরাদ্দ ও আয়ের পরিসর সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় আলোচনা ও বিতর্ক আরম্ভ হইয়াছে উহাতেই বুঝা যাইবে যে কিরূপ সক্রিয়ভাবে ও কোন মুখে পশ্চিম বাংলার সরকারি কার্য্যক্রম চালিত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রদিগের বিদেশ যাত্রা

কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের দেশের অন্যতম ভাগ্যনিয়ন্তা শ্রীমোরারজী দেশাই এক চমকপ্রদ ফতোয়া জারী করিয়া আমাদের আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছেন। এই ফতোয়া জারীর পূর্ব্বে এক বিবৃতিও তিনি দিয়াছিলেন যাহাতে ঐরূপ বিকট ও সাধারণতন্ত্র-বিরোধী আদেশের উদ্দেশ্য ও কারণ তিনি প্রকট করেন। কারণটি অবশ্য টাকার টানাটানি, যাহার দরুন তৃতীয় পরিকল্পনার (আকাশ কুসুমের) নন্দনকানন গঠিত ও বিন্যস্ত হওয়ায় বাধা পড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। বিদেশ হইতে ধারকর্জ্জ বা দান পাওয়া ক্রমেই কঠিন হওয়ায় বিদেশী মুদ্রার খরচ কমাইতে হইবে, যাহাতে আমাদের যাহা আছে তাহাতেই সঙ্কুলান হয়।

এতদূর পর্য্যন্ত বিবৃতি পরিষ্কার ও সহজবোধ্য। অবশ্য শ্রীমোরারজী দেশাই তাঁহার সরকারী মনোবৃত্তি অনুযায়ী অনেক কিছু চাপিয়া গিয়াছেন, যাহা প্রকাশ করিলে এই সুমধুর ব্যাখ্যানের রসভঙ্গ হইত। যথা, পরিকল্পনার কাজে অপব্যয়-অপচয়ের কথা, এবং পরিকল্পনাপ্রসূত ফলপ্রাপ্তিতে নৈরাশ্যজনক ব্যর্থতার সমাচার—যাহার পিছনে আছে অসাধু ও অকর্ম্মণ্য সরকারী কর্ম্মচারী নিয়োগ এবং উচ্চ অধিকারীবর্গের কাণ্ডজ্ঞানহীনতা ও দেশাত্মবোধ জলাঞ্জলি দিয়া আত্মীয়-গোষ্ঠী পোষণের স্পৃহা। সে সকলের দরুন এই অর্থাভাব কতটা প্রখর হইয়া উঠিতেছে সে কথা শ্রী দেশাই বলেন নাই এবং আমরা যে সকল মহাশয় ব্যক্তিকে নির্ব্বাচনী ছাপ দিয়া নয়া দিল্লীতে আমোদ-প্রমোদ ও আহার-বিহার করিতে পাঠাইয়াছি—আমাদেরই খরচে—তাঁহারাও এসব অবান্তর প্রশ্নের উপর কোনও জোর দেন নাই। কেন প্রশ্ন করেন নাই তাঁহারা, একথা ভাবাও বৃথা কেননা সে জবাবদিহি করিবে কে?

তাহার পর আসে উদ্দেশ্যের কথা। সে বিষয়ে শ্রীদেশাই অল্পকথায় বলেন যে, উদ্দেশ্য তৃতীয় পরিকল্পনার বিদেশী মুদ্রার চাহিদা মিটাইবার জন্য পুঁজি হইতে অযথা বা অপ্রয়োজনীয় কাজের জন্য অযথা বিদেশী মুদ্রা নির্গমের পথ রোধ করা। অর্থাৎ কিনা বাজে কাজে বা বাজে মাল খরিদের জন্য বিদেশী মুদ্রার অপব্যবহার বন্ধ করা। এই বিবৃতি প্রায় কাদাজলেরই মত নির্ম্মল ও স্বচ্ছ, কেননা

ইহাতে নিজের ইচ্ছা ও জ্ঞানবুদ্ধিপ্রবৃত্তি অনুযায়ী তিনি প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয়, জরুরী ও বাজে এই সকল শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। এটা শ্রী দেশাই ও অর্থ দপ্তরের মহারথীদিগের স্বভাবগত। যে জিনিষটা ক্ষেত্র-বিশেষে অতিশয় জরুরী দাঁড়ায় যেরূপ সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত রোগীর জন্য বিদেশী উচ্চগুণসম্পন্ন ঔষধ বা কাজ-কারবারে অতি প্রয়োজনীয় বিদেশী যন্ত্র বা যন্ত্রের অংশ—সে সকল বিনা ব্যবস্থায় বা বিনা চিন্তায় অপ্রয়োজনীয় বা স্বল্প প্রয়োজনীয় বলিয়া তাহার আমদানী বিশেষ সঙ্কুচিত বা নিষিদ্ধ করিয়া শ্রী দেশাই ও তাঁহার আমলাতন্ত্র দেশ-বাসীকে বিপদে ফেলিয়া কালোবাজারিদিগের উৎসবের আয়োজন ইতিপূর্ব্বে বহুবার করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। সুতরাং ধরা যাইতে পারে অপ্রয়োজনীয়-প্রয়োজনীয় সম্পর্কে শ্রী দেশাইয়ের বিশদ ব্যাখ্যা প্রকৃত পক্ষে বিপরীত ব্যাখ্যাই।

তাহার পর আসিল উপায় নির্দ্দেশ এবং সঙ্গে সঙ্গে ফতোয়া জারী। এই ফতোয়া জারীর মধ্যে নির্ব্বুদ্ধিতা ও যথেচ্ছাচার এতই সুস্পষ্ট যে আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি দেশের লোকের ও দেশের সংবাদপত্রগুলির এ বিষয়ে ঔদাসিন্য দেখিয়া। এই ফতোয়া জারীর পর এ দেশ হইতে এ দেশবাসীর বিদেশযাত্রা নিষিদ্ধ হইল! আগেকার দিনে—অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলে—আমাদের বিদেশযাত্রা যেমন পুলিসের ইচ্ছাধীন ছিল এবং পুলিস বা লাট-বেলাটের সভাসদ অথবা শাসকবর্গের প্রিয়পাত্র-দের অনুগ্রহ না হইলে বিদেশযাত্রা দুরূহ ছিল, আজ সেই অবস্থাই কঠিনতর ও ঘৃণ্যতররূপে আসিয়াছে, শ্রী দেশাইয়ের অনুগ্রহে এবং লোকসভা ও রাজ্যসভার জড়ভরতদিগের অবহেলা ও অকর্ম্মণ্যতার প্রসাদে। প্রভেদ এইমাত্র যে আগে যে কাজ পুলিসে করিত এখন সে কাজ করিবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গুণবান আমলাতন্ত্র।

শিক্ষার ব্যাপারে বিদেশযাত্রা যে কতটা প্রয়োজনীয় সে কথা শ্রী দেশাই বোধ হয় জানেন না, কেননা তিনি উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে (এবং উচ্চ-আদর্শ সম্পর্কে) যে কোন বিশেষ জ্ঞান বা খোঁজ রাখেন সে কথার কোনও পরিচয় তাঁহার কথায় বা কাজে আমরা পাই নাই। যদি তাহা থাকিত তবে শিক্ষার জন্য বিদেশ যাত্রার বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে এরূপ নিয়ন্ত্রণ ও নিরোধ ক্ষমতা তিনি দিতেন না, যাহার ব্যবহার কোনও নিয়ম-নির্দ্দেশ বা ব্যবস্থা অনুযায়ী নয়, কোনও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিচার-বিবেচনা বা উপদেশ অনুযায়ীও নয়। বস্তুতঃপক্ষে ইহাতে রিজার্ভব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীদিগকে যে ক্ষমতা যে ভাবে দেওয়া হইয়াছে তাহা ব্রিটিশ আমলে পুলিসেরও ছিল না। এবং সেই কারণে আমাদের সন্দেহ জন্মিয়াছে যে এই ফতোয়ার পিছনে অন্য গূঢ় অভিসন্ধি আছে যাহার বিষময় প্রতিক্রিয়ায় জ্বলিবে বাঙ্গালী ছাত্র। আমরা বাঙ্গালী ছাত্রের বিদেশযাত্রার পথ রুদ্ধ হইল এই আশঙ্কা করিতেছি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এ বিষয়ে অবহিত হইতে বলিতেছি।

এই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যাঁহাদের হাতে তাঁহারা কি প্রকার লোক এবং তাঁহাদের কার্যকলাপ কিরূপ সুনিয়ন্ত্রিত ও সন্দেহের অতীত তাহা নিম্নস্থ সংবাদে পাওয়া যাইবে। সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন আনন্দ বাজার পত্রিকা :—

"বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের জন্য যখন কঠোর নিয়ন্ত্রণা-দেশ বলবৎ করা হইতেছে, সেই সময়ে প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা মূল্যের বিদেশী মুদ্রা কালোবাজারে পাচার হইয়াছে।

"কলিকাতা পুলিসের জালিয়াতি নিরোধ বিভাগ এই অভিযোগটি সম্পর্কে যে তদন্ত সুরু করিয়াছিলেন তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। প্রকাশ, পুলিস এ পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া হইতে ৭০০টি ফাইল আটক করিয়াছে।

"অভিযোগ এই যে, এই সাত শত বৈদেশিক মুদ্রার পারমিটের মধ্যে শতকরা ৫০টি পারমিটই ভুয়া। প্রতিটি পারমিটে গড়ে চার হাজার টাকা করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

"পুলিসের অভিযোগে আরও প্রকাশ যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে যখন এই ফাইলগুলি আটক করা হয় তাহার পূর্বেই কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অনেক ফাইলের জরুরি পাতাগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া নাকি প্রমাণ নষ্ট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

"১৪ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রা প্রতারণার এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি যেভাবে পুলিশের হাতে আসে তাহা চিত্তাকর্ষক। নূতন বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন জারী হওয়ার পূর্বে যদি কোন মেডিকেল গ্রাজুয়েট উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত যাইত, তাহা হইলে তাহাকে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুর করা হইত। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এই সকল বরাদ্দ মঞ্জুর করিতেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আবেদনকারী ছাত্রদের বৈদেশিক মুদ্রার পারমিট ইসু করিতেন। এই পারমিটটি আবেদনকারীকে ব্যাঙ্কে জমা দিতে হইত। তখন ঐ ব্যাঙ্ক ইংলণ্ডের কোন ব্যাঙ্কের নামে আবেদনকারীর পক্ষে ড্রাফট ইসু করিত।"

অভিযোগে প্রকাশ যে, এক শ্রেণীর ব্যক্তি ভুয়া

মেডিক্যাল গ্রাজুয়েটদের নাম করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে বৈদেশিক মুদ্রার জন্য আবেদন করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ নাকি কোন তদন্ত না করিয়াই তাহাদের নামে হাজার হাজার টাকার বৈদেশিক মুদ্রার পারমিট মঞ্জুর করেন। অভিযোগে আরও প্রকাশ যে, কয়েকটি ক্ষেত্রে এমন অনেকের নামে বৈদেশিক মুদ্রার পারমিট ইস্যু করা হয় যে, যাহাদের নামে পাসপোর্ট পর্য্যন্ত ইস্যু হয় নাই।

"পুলিসের মতে সমস্ত ঘটনাই হয়ত লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যাইত যদি না কিছুকাল পূর্ব্বে টালিগঞ্জের একটি বাড়ীতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি চিঠি আসিয়া পৌঁছিত। অভিযোগে প্রকাশ, এই বাড়ীর মালিক একদিন দেখেন, তাঁহার বাড়ীর ঠিকানায় এক ডাক্তারের নামে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে একটি চিঠি আসিয়াছে। ঐ চিঠিতে জানান হইয়াছে যে, ঐ ডাক্তারের বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুর হইয়াছে। বাড়ীর মালিক খুব বিস্ময় বোধ করেন, কারণ ঐ নামে কোন ডাক্তার তাঁহার বাড়ী থাকেন না। কিছুদিন পরে এক অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া ভদ্রলোকের কাছে ঐ চিঠিটি দাবী করে। ভদ্রলোকের ইহাতে সন্দেহ প্রবল হয়। তিনি তখনই লালবাজারে আসিয়া পুলিসকে সব ঘটনা জানান। পুলিস এই ব্যাপারে তদন্ত সুরু করে ও তাহার ফলেই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি উদ্ঘাটিত হয়।"

এই সংবাদটিতে যাহা আছে, তাহার সহিত ইতিপূর্বে যে সকল বাঙালী রোগচিকিৎসা শিক্ষায় বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য উচ্চপ্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে বিদেশে গিয়াছেন তাঁহাদের অভিজ্ঞতার কথা যদি আমরা ধরি তবে এই মোরারজী প্রদত্ত ক্ষমতার পূর্ণ অপপ্রয়োগ বাঙালী ছাত্রের বিরুদ্ধে হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কেননা বাঙালী ছাত্রের হাতে এরূপ অর্থবল সাধারণতঃ থাকে না যাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে সেরূপ তদ্বির চলে যাহার ফলে ঐ ১৪ লক্ষ টাকা জলে গিয়াছে।

ভারতের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা

সভ্যজগতের অন্তর্গত সকল দেশেই রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ ও বহির্রাষ্ট্রের সহিত যোগাযোগ রাখিবার ব্যবস্থা তিনটি পৃথক দপ্তরের উপর ন্যস্ত হয়। একের কাজে অন্যে হস্তক্ষেপ করে না। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী সমস্ত মন্ত্রীমণ্ডলের সহিত পরামর্শ করিয়া যে কোন দপ্তরের কাজে নূতন নির্দ্দেশ দিতে পারেন। সেই নির্দ্দেশ তাঁহার ইচ্ছা অনুযায়ী হয় না, যদি সেই দেশে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকে, কেননা সেরূপ কাজ সমালোচনা করার পূর্ণ অধিকার থাকে সকল সদস্যের। যদি রাষ্ট্রের কোন অঞ্চলের নিরাপত্তা বা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয় এরূপ কোন নির্দ্দেশে বা আদেশে তবে সেই অঞ্চলের সকল সদস্যদিগের অধিকার থাকে—দল নির্ব্বিশেষে সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করার এবং সেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থার বিষয়ে জনসাধারণকে প্রকাশ্য ভাবে অবহিত করার। অবশ্য দেশ যদি একনায়কত্বে কঠোর বন্ধনে শৃঙ্খলিত না হয় বা সদস্যগণ প্রাণহীন যন্ত্রচালিত ক্রীড়নক পুত্তলিকার মত দলাধিপতির নির্দ্দেশে সকল দায়িত্বজ্ঞান ও কর্ত্তব্যবোধ বিসর্জ্জন দিয়া মূকবধির ক্লীবের অবস্থায় বিরাজ করেন। জানি না লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের অবস্থা কি। আসামের প্রতিনিধিদিগের মধ্যে সংখ্যাগুরু যাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞানবুদ্ধি-বিবেচনার সীমা কোথায় সে কথা ত প্রকট হইয়া গিয়াছে।

আমাদের দুই প্রতিবেশী, চীন ও পাকিস্থান, আমাদের রাষ্ট্র ধ্বংস করার সকল আয়োজন নির্ব্বিবাদে ও নিশ্চিন্ত মনে চালাইয়া যাইতেছে। আমাদের উচ্চতম অধিকারী যিনি তাঁহার এতদিনে হুঁস হইয়াছে যে,তাঁহার স্বকপোলকল্পিত শান্তিশীল চীনের সাম্রাজ্যবাদ, পরস্বাপহরণ স্পৃহা ও বিশ্বাসঘাতকতার আক্রমণ হইতে ভারতকে রক্ষা করার বিষয়ে অকেজো। সুতরাং প্রতিরক্ষা বিভাগকে এতদিনে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে চীনের আক্রমণ রোধ করার ব্যবস্থা করিতে। জানি না যখন দুই বিরোধী দলের মধ্যে সংঘর্ষের ক্ষণ আসিবে তখন আমাদের কর্ণধার আবার কথার ফোয়ারা খুলিয়া পিছু হটিবেন কি না।

এই চীনের আক্রমণাত্মক কার্য্যাবলী সম্পর্কে যে সকল তথ্য ও পত্রাদি বিগত ৬ই জুলাই লোকসভায় উপস্থাপিত করা হয় তাহার বিবরণে আমরা দেখি যে, বিগত ১৯৫৯ সনে নয়াদিল্লীস্থ চীন রাষ্ট্রদূত আমাদের পররাষ্ট্র সচিবকে বলিয়াছিল যে, ভারতের ক্ষমতা নাই যে সে এক সঙ্গে দুই বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করে। এবং এই দুই নম্বরের শত্রু যে পাকিস্থান সে কথাও স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়। আমরা আরও দেখি যে ৩০শের জুনের চিঠিতে ভারত সরকার চীনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন যে সে শুধু পূর্ব্বেকার বন্ধুত্ব ও কাশ্মীর সম্পর্কে নিরপেক্ষতা নীতিই বিসর্জ্জন দেয় নাই উপরন্তু সে "অন্য এক আক্রমণকারী রাষ্ট্রের" সহিত সন্ধি ও সীমান্ত ব্যবস্থা করি

তাহার আক্রমণাত্মক কাজে উৎসাহ ও উস্কানী দিতেছে। এই অন্ত আক্রমণকারী রাষ্ট্র যে পাকিস্থান সে কথা কাশ্মীর বিষয়ে মীমাংসার কথায় সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

আমরা ভাবিয়াছিলাম যে, পাকিস্থান সম্পর্কে এতদিনে বুঝি পণ্ডিত নেহরুর মোহ কাটিয়া গেল। কিন্তু ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশকারীদিগের বহিষ্কারের—যাহা ত্রিপুরার আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থারূপে গৃহীত হইয়াছিল—ব্যবস্থা সরাসরি রদ করিয়া পণ্ডিত নেহরু জানাইয়া দিয়াছেন যে, তিনি এখনও মোহাচ্ছন্ন এবং ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা বিষয়ে তাঁহার মন এখনও সমানেই বুদ্ধি-বিবেচনা শূন্য ও কাণ্ডজ্ঞানহীন অবস্থাতেই আছে। এই অনুপ্রবেশে ভারতের পূর্ব্ব-সীমান্ত কি ভাবে বিপন্ন হইতেছে সে বিষয়ে আনন্দবাজার লিখিতেছেন :

সিঙ্গাবাদ (মালদহ) হইতে নূতন বস্তী (দক্ষিণ বেরুবাড়ী)—উত্তরবঙ্গের ভারত-পাকিস্থান সীমান্তে বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভ্রমণ করিয়া এবং সরকারী ও বেসরকারী স্তরে দায়িত্বশীল মহলের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া আমার ধারণা হইয়াছে, পাকিস্থান হইতে ক্রমাগত হিন্দু বিতাড়নের পিছনে একটি পরিষ্কার মতলব কাজ করিতেছে।

সেই মতলবটি হইতেছে ইহাই, ভারত-পাকিস্থান সীমান্ত বরাবর একটি সুদৃঢ় মুসলিম বলয় সৃষ্টি করিয়া ভারতের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে দুর্ব্বল করিয়া তোলা এবং পাকিস্থান যে এই কার্য্যে অনেকাংশে সফল হইয়াছে তাহা মুসলমান অধ্যুষিত সীমান্ত অঞ্চলের বর্ত্তমান চেহারা দেখিয়া বুঝিতে একটুও বিলম্ব হয় নাই।

সীমান্ত অঞ্চলের যেখানেই হিন্দু বসতি আছে, কি পাকিস্থানে, কি ভারতীয় এলাকায়, পাক হানাদারেরা নানাভাবে—কখনও সরকারী ভাবে, কখনও বা বেসরকারীভাবে—সেই সব বসতিতে হামলা করিয়া হিন্দু অধিবাসীদের মনে এমন ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছে যে, তাহারা প্রাণ বাঁচাইবার জন্ত বাড়ীঘর ফেলিয়া ক্রমাগত উত্তরবঙ্গের ভিতরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে।

ফলে উত্তরবঙ্গে সীমান্ত অঞ্চলে ভারতের প্রতি অনুগত অধিবাসীর সংখ্যা ক্রমাগত কমিয়া আসিতেছে।

ইহার ফলে ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে কি না, জনৈক পদস্থ সরকারী অফিসারকে এই প্রশ্ন করিলে, তিনি আমাকে জানান, "যদি সরকারী জবাব চান, তা হলে মুখ বন্ধ। তবে বেসরকারী ভাবে বলতে পারি, সীমান্তের উভয় দিকেই পাকিস্থানের বন্ধু যত আছে, আমাদের তত নেই। তত কেন, সত্যি বলতে কি, প্রায় নেই বললেই চলে।"

উত্তরবঙ্গের সীমান্তে ভারত যে কত অরক্ষিত তাহা উক্ত সরকারী অফিসারটির এই "বেসরকারী" মন্তব্য হইতেই বুঝা যাইবে।

ইহা অপেক্ষাও একটি মারাত্মক সংবাদ আছে। আমি কয়েকটি দায়িত্বশীল ও বিশ্বস্ত সূত্র হইতে (সরকারী এবং বে-সরকারী) জানিতে পারিয়াছি, আমাদের যে অফিসারই সীমান্ত সম্পর্কে তৎপরতা দেখান এবং ভারতের স্বার্থরক্ষার জন্ত সততার সহিত সক্রিয় হইয়া উঠেন, তাঁহাকেই—তা তিনি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটই হউন, পুলিস সুপারই হউন আর সীমান্ত থানার দারোগাই হউন—কোন অজ্ঞাত কারণে অন্ত স্থানে বদলি করিয়া দেওয়া হয়। এই রহস্যজনক বদলির খেলা প্রায়ই অনুষ্ঠিত হইতেছে। জলপাইগুড়িতে জনৈক কংগ্রেসী পরিষদ সদস্য এই সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে সখেদে বলেন, "বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না, তবুও সময় সময় মনে হয়, আমাদের শাসন-ব্যবস্থায় কোন এক অদৃশ্য হস্ত যেন পাকিস্থানের অনুকূলের বরাবর কাজ করে যাচ্ছে।"

মালদহের অবস্থা কি তাহা ত বুঝা গেল, এখন ত্রিপুরার চীফ কমিশনারের বিবৃতি দেখিলে বুঝা যাইবে পাকিস্থানী অনুপ্রবেশের রকম ও ধরন। সেই বিবৃতি এইরূপ :

আগরতলা, ১২ই জুলাই—গত কয়েক বৎসরে বে-আইনীভাবে প্রবেশকারী অন্ততঃ ৫০ হাজার পাক নাগরিক বর্ত্তমানে এই ভূভাগে বসবাস করিতেছে বলিয়া ত্রিপুরার চীফ কমিশনার শ্রী এন. এম. পট্টনায়ক জানান।

শ্রীপট্টনায়ক সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন।

তিনি সাংবাদিকদের বলেন যে, ১৯৫১ সনের লোকগণনার হিসাবের তুলনায় ১৯৬১ সনের হিসাবে ত্রিপুরায় মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধির হার হইতে তাঁহার উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়।

শ্রীপট্টনায়ক আরও বলেন যে, কোন কোন স্থানে যেমন, সমরপুর (২৪১.৯ শতাংশ), কমলপুর (২১৭.৬ শতাংশ) এবং বেলোনিয়ায় (১৭৩.১ শতাংশ) মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যধিক।

১৩ হাজার পাক নাগরিকের নিকট উপযুক্ত ভ্রমণ-সংক্রান্ত দলিলপত্র না থাকায় ত্রিপুরা হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছে বলিয়া তিনি জানান।

বলা বাহুল্য, ঐ বহিষ্কার ব্যবস্থা পণ্ডিত নেহরুর

ভাবোচ্ছ্বাসে রদ হইবার পর ঐ ১৩ হাজার পাকিস্থানী আরও ১৩ হাজার সঙ্গী লইয়া অনুপ্রবেশ করার অপেক্ষায় আছে। তাহারা অপেক্ষা করিতেছে পাকিস্থান সরকারের সাহায্য ও নির্দ্দেশের জন্য।

যে মালদহের সীমান্ত পার হইতে বনে-জঙ্গলে চলায় অভ্যস্ত কয়েক শত মাত্র সাঁওতাল ও রাজবংশী পাকিস্থানী পুলিস ও সীমান্তরক্ষীর গুলীতে হতাহত হয় সেখানে দশ-বিশ হাজার পাকিস্থানী মুসলমান সীমান্ত পার হইতেছে পাকিস্থান সরকারের অজানিতে এ কথা বিশ্বাস করে মূঢ় ও মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিই। বাস্তবপক্ষে ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই যে, এই অনুপ্রবেশ পাকিস্থানী সামরিক পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকারী সাহায্যে ও নির্দ্দেশে চালিত হইতেছে। পণ্ডিত নেহরু এই বিষয়ে কোনও কিছু বিচারবুদ্ধি বা কাণ্ডজ্ঞানের লেশমাত্র পরিচয় দেন নাই।

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া যাঁহারা নয়া দিল্লীতে গিয়াছেন তাঁহাদের এ বিষয়ে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সুস্পষ্টভাবে রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও এ বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন আমরা মনে করি।

কোনও দেশের স্বাধীনতা যখন যায় বা তাহার অংশ যখন শত্রুর কবলে চলিয়া যায় তখন সে দেশের রাষ্ট্র-চালকদিগের যেরূপ বিভ্রান্ত অবস্থার কথা আমরা ইতিহাসে পাই, আজ তাহাই দেখা যাইতেছে এদেশে।

"স্বাধীন" অর্থ ও রাষ্ট্রনীতি

ভারতের জনসাধারণ আহারের খাদ্য, বাসের গৃহ, পরিধানের বস্ত্র, চিকিৎসার ঔষধ ও শিক্ষার সরঞ্জাম আমলাতন্ত্রের অভিভাবকত্বে "র‍্যাশন" করিয়া কোন প্রকারে জীবিত থাকিবার মত পাইয়া স্বাধীনতার প্রায় চরমে পৌঁছাইয়া গিয়াছেন। মনে হইতে পারে যে আমলাততন্ত্রে সকল ব্যক্তির সকল কার্য্যই এই ভাবে ধাক্কা খাইয়া অর্দ্ধমৃত ভাবে চলিতে বাধ্য হয়। ধারণাটি মিথ্যা নহে। কিন্তু শুধু যে সকল কার্য্য নিয়ম ও আইন-সাপেক্ষ সেইগুলিই স্বাধীন ভারতে করা অতি দুরূহ। বেআইনী ও চোরাই কার্য্য এ দেশে অবাধে করা চলে। যথা, রাওরকেলা ইস্পাত কারখানার দুরবস্থা বিচার করিয়া জার্ম্মানীর ইস্পাত বিশেষজ্ঞজনের মত এই যে ভারত সরকারের নিযুক্ত হিন্দুস্থান ষ্টীলের পাণ্ডাদিগের অক্ষমতার জন্যই এই কারখানা নষ্ট হইতে চলিয়াছে (প্রায় ২৫০ কোটি টাকা লাগিয়াছে ইহা বসাইতে)। তাঁহারা না কি এত অধিক নিয়মের দাস যে কোন নূতন যন্ত্রাংশ প্রয়োজন হইলে তাহা আনাইবার হুকুম পাইতে ও তাহা আনাইতে ২৪।২৬ মাস অতিবাহিত হইয়া যায়! ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, যাঁহারা শুধু নিয়মকানুন রচনা কার্য্যেই দক্ষ, তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রেই নিয়মকানুনের উদ্দেশ্য ভুলিয়া শুধু তাহার প্রয়োগেই মত্ত হইয়া থাকেন। ফলে উদ্দেশ্য সিদ্ধি ত হয়ই না—সর্ব্বস্ব নষ্ট হয়। কিন্তু যেখানে নিয়ম কানুন নাই—যথা কলিকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম অথবা কোনারকের সূর্য্য-মন্দিরের মূর্ত্তি প্রভৃতি দিল্লী অথবা ইউরোপে চালান করিবার বিষয়ে—সেখানে দেখা যায় যে ভারত সরকার বিশেষ তৎপরতার সহিত মূর্ত্তিগুলি সরাইয়া লইয়া যাইতে সক্ষম হয়েন। ফেরৎ দিবার সময় সেকশন সাব-সেকশন ও ক্লজ দেখাইয়া ফেরত আর দেওয়া হয় না। শুনা যায় যে শ্রীহুমায়ুন কবির অনেক মূর্ত্তি বিদেশে পাঠাইয়া বিদেশী মূর্ত্তির সহিত অদলবদলের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে হিষ্টরিক্যাল মনুমেণ্টস প্রটেকশান আইনের কোন ধারা অনুসারে এই কার্য্য করা হইয়াছে আমরা জানিতে চাই। আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে এই সরকারী দীর্ঘসূত্রী পদ্ধতির পূর্ণতর পরিচয় দিবার জন্য, কিন্তু তাহা দিলে খুব আশা নাই যে আমলা মহলে একটা নবজাগরণ আরম্ভ হইবে। কেননা কোনও কাজ না করিয়া শুধু কাজ না করিবার কারণ ও নিয়ম আওড়াইয়া যাঁহারা বেতন ও উপরি "অর্জ্জন" করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের মস্তকে অপর কোনও আদর্শের স্থান কদাপি হয় না। জে. বি. এস. হলডেনের নিয়োগ কর্ম্মভোগ ও কর্ম্মে ইস্তফা দিবার কাহিনী শুনিলেও বুঝা যায় যে এমন কি শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক "রিসার্চ্চের" মত উচ্চাঙ্গের বিষয়েও জগতবিখ্যাত পণ্ডিত-দিগের ইজ্জত ভারত সরকারের আমলা মহলে রক্ষিত ও সম্মানিত হয় না। আমলাতন্ত্র ও আমলাবাদের অক্ষমতার পরিচয় যে আমরা শুধু সরকারী দপ্তরেই পাই তাহা নহে। সরকারী নহে অথচ সরকারী ঢংএ—পরিচালিত বহু প্রতিষ্ঠানেই এই বিষ ছড়াইয়া আছে। কলিকাতা করপোরেশন ইহার একটি অতি বড় উদাহরণ এবং যে সকল প্রতিষ্ঠান করপোরেশনের সহিত মিলিয়া কাজ করেন যথা গ্যাস ও ইলেকট্রিক কোম্পানী কিম্বা টেলিফোন সেগুলিও জনসাধারণকে উত্যক্ত করিতে বিশেষ ভাবে সুদক্ষ। কোথাও রাস্তা মেরামত এমনিতেই করপোরেশন করেন না এবং বহু ভাল ভাল মোটর গাড়ী গর্ত্তে পড়িয়া জখম হয় ও ভাঙিয়া যায় এই কারণে। কিন্তু যদি দৈবাৎ করপোরেশন কোন রাস্তা মেরামত করিয়া ফেলেন তাহা হইলে টেলিফোন ইলেকট্রিক অথবা গ্যাস

কোম্পানী তৎক্ষণাৎ সে রাস্তা খুঁড়িয়া ফেলেন নল অথবা তার চালাইবার বা মেরামত করিবার জন্য। এবং কাজ করিয়া বা না করিয়া খোদিত অংশ যেমন তেমন করিয়া রাখিয়া দিয়া ইঁহারা চলিয়া যান। অপর কোনও সভ্য-দেশে এইরূপ ঘটনা ঘটিলে কাহাকেও না কাহাকেও সে জন্য সাজা পাইতে হয়। এ দেশে সেরূপ কিছু ঘটে না। যে যত নিষ্কর্মা তাহাকে তত বড় বড় কাজের ভার দিয়া জনসাধারণের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তোলাই ভারতের 'রীতি'। শুনা যায় হাইড রোড খিদিরপুরে একটা বিরাট (৩০০০০ ফুট) সরকারী গুদাম ঘর ১৯৬০ সনে ভাঙিয়া পড়ে, গঠন কার্য্যের দোষে। কাহার দোষে ইহা ভাঙিয়াছে এই কথার বিচার ও আলোচনা এখনও চলিতেছে। ফলে এই গুদামটি দিনে দিনে আরও ভাঙিয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এই লোকসানের জন্য কাহারও কোনও সাজা কখনও হইবে না, একথা বলা বাহুল্য। এই গুদামের নিকটবর্ত্তী আরও দুইটি সমান পরিসরের গুদাম ঘরও ব্যবহার হয় না, কারণ সেগুলিও একই সময়ে একই লোকেরা গড়িয়া ছিল। অর্থাৎ ৯০,০০০ ব: ফু: গুদাম ঘর বেকার পড়িয়া নষ্ট হইতেছে যাহার বাৎসরিক ভাড়া লক্ষাধিক টাকা হইতে পারে। গরীব দেশের রাজকর্ম্মচারীদিগের পয়সা বাঁচাইবার দিকে নজর থাকা উচিত। এই দেশে তাহার বিপরীতই হইয়া থাকে। রাজকর্ম্মচারিগণ এদেশের রাজা এবং তাঁহাদিগের ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় যে তাঁহাদিগের রাজত্ব গভীর দায়িত্বহীনতার সহিতই চলিয়া থাকে।

এখন শুনা যাইতেছে যে কলিকাতা করপোরেশন সহর পরিষ্কার রাখেন না বলিয়া সরকার বাহাদুর দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া অনেকগুলি ময়লা সরাইবার গাড়ী ক্রয় করিতেছেন ও সেগুলি চালাইয়া সহর পরিষ্কার রাখিবার ভার দেওয়া হইতেছে একজন পুলিশ কর্ম্মচারীর উপর। এই পুলিশ কর্ম্মচারী শীঘ্র শীঘ্র কোন কার্য্য সুসিদ্ধ করিবার জন্য প্রসিদ্ধ নহেন। ইঁহার অব্যবস্থার ফলে কলিকাতায় ট্যাক্সি, রিক্সা, ঠেলাগাড়ী, লরী ও বাসের উৎপাতে সাধারণের রাস্তা চলা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ঐ সকল গাড়ীর চালকদিগের বসবাসের ফলে কলিকাতা সহরও বিশেষ করিয়া অপরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ সাধারণের আরও কিছু অর্থ নষ্ট হইবে সহর পরিষ্কারের নামে। অ.

সীমান্ত সম্বন্ধে শ্রীনেহরু

প্রধানমন্ত্রী লোকসভায় বলিয়াছেন, ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে সীমান্ত লইয়া যে সকল স্থানে বিরোধ রহিয়াছে, তাহা একবার সরল করিয়া ফেলিতে পারিলে, পাকিস্থানের ভারতীয় এলাকায় অনধিকার প্রবেশ, লোকজন ধরিয়া লইয়া যাওয়া, গো-মহিষাদি গৃহপালিত জীব-জন্তু অপহরণ ইত্যাদি অনেক কম হইত। কারণ, বিরোধের স্থানেই এই সকল ঘটনা ঘটিতেছে। নেহরু-নুন চুক্তির পরে প্রধানমন্ত্রী একাধিকবার লোকসভাতেই বলিয়াছিলেন, পূর্ব্বসীমান্ত-বিরোধের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা যে হয় নাই, জরীপকার্য্য অসমাপ্ত থাকাতেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। কয়েকটি এলাকা জরীপের পরেই উহা আর অগ্রসর না হইয়া কার্যতঃ রহস্য-জনক ভাবেই স্থগিত রহিয়াছে।

ভারতের পক্ষ হইতে এ বিষয়ে যত আগ্রহ প্রকাশ করা হইতেছে, পাকিস্থানের পক্ষ হইতে উহাতে ততই বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি চলিতেছে। ভারতের জরীপকারীরাই এ বিষয়ে অভিযোগ জানাইয়াছেন যে, তাহাদিগকে লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং ক্ষেত্র-বিশেষে বিতাড়িত হইতে হইয়াছে। জরীপের জন্য নির্দ্ধারিত দিবসে পাকিস্থান উপস্থিত হয় নাই ইহাও দেখা গিয়াছে। অতএব প্রধান-মন্ত্রী উহা সরল করিবেন কিরূপে? তাহাদের অনধিকার প্রবেশ যখন কোথাও বাধা পায় না তখন অবাধেই তাহারা ভারতের এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করিয়া জমির পর জমি অনায়াসে জবর দখল করিয়া পুলিস ও সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করিতেছে, এবং নিত্য-নূতন এলাকায় তাহাদের দাবি জানাইতেছে। ইহা এক অদ্ভুত এবং অসহনীয় অবস্থা। শ্রীনেহরুর উক্তি এই ব্যাপারে পাকিস্থানীদের আরও উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, প্রত্যেক গজ জমির জন্য তিনি পাহারা রাখিতে পারেন না, এবং এজন্য পাকিস্থানের সহিত লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হইতেও পারেন না। এই ধরনের উক্তির পরে কি আর পাকিস্থানের সীমান্ত সরল করার কোন আগ্রহ থাকিতে পারে?

ত্রিপুরাতে পাকিস্থানী অনুপ্রবেশ

আসামের ন্যায় ত্রিপুরাতেও এবং বিশেষ ভাবে সীমান্তবর্ত্তী এলাকাসমূহে পাকিস্থানী অনুপ্রবেশ বহুদিন ধরিয়া চলিতেছে। ত্রিপুরা-সীমান্তে অবস্থিত বিলোনীয়া পাক-অনুপ্রবেশের একটি প্রধান কেন্দ্র। ভারত সরকার এই ব্যাপারে বর্ত্তমানে একটু সতর্ক হইয়াছেন। আসামের ন্যায় ত্রিপুরাতেও তাহারা স্থানীয় মুসলমানদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া স্থায়ী হইবার চেষ্টা করে। পরীক্ষা দ্বারা

দেখা গিয়াছে যে, স্থানীয় অধিবাসীদের একটি প্রধান অংশ বিদেশী, যাহাদের সম্পর্কে ইহা বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে তাহাদের উপর ত্রিপুরা ত্যাগের আদেশ দেওয়া হইতেছে, এবং প্রায় ছয়শত বিদেশীকে সরকারী ব্যবস্থায় পাক-সীমান্তে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্ব পাকিস্থানে বেশ সোর-গোল আরম্ভ হইয়াছে। সীমান্তের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে পাকিস্থানী হামলা, গো-মহিষাদি চুরি ও স্থানীয় অধিবাসীদের উপর আকস্মিক উপদ্রব, মারপিট, জখম ইত্যাদির মাত্রা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ওদিকে আবার তাহারাই রটাইতেছে, ভারত হইতেই তাহারা আক্রান্ত এবং উপদ্রুত হইতেছে। পাকিস্থানীরা নিজেরাই অন্যায় কাজ করে, এবং রটায় যে তাহাদের উপরেই উপদ্রব চলিতেছে। এই কৌশলটি পাকিস্থানের অপেক্ষাকৃত নূতন আবিষ্কার। যে চুরি করে, সে অপরকে বড় গলায় বলে চোর। ভারত-সরকারের কার্য্যকলাপ উহার বিপরীত, তাহাদের সবই বিলম্বে, এবং অতিশয় সতর্কতা সহকারে ও সন্তর্পণে যেন পাকিস্থানের কাহারও গায়ে কাঁটার আঁচড়টি না লাগে। সুদৃঢ় ব্যবস্থা এবং সবল নীতি ছাড়া সীমান্তে পাকিস্থানী অনুপ্রবেশ বা হামলা প্রতিরোধের অন্য পথ নাই। ভারত-সরকার কি এতদিনেও ইহা বুঝিতে পারেন নাই?

শিক্ষা-বিস্তারে সরকারী প্রচেষ্টা

স্বাধীনতার পনের বৎসর পর ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা আজ কি ভাবে চলিবে তাহা স্থির হইল না! এ বিষয় লইয়া বহু আলোচনাও হইয়া গিয়াছে। একথা খুবই সত্য, আমাদের পরিকল্পনায় শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। মুখে অনেক কিছুই বলা হইতেছে, কিন্তু কার্য্যতঃ প্রাথমিক শিক্ষা যথেষ্ট প্রসার লাভ করিতেছে না। কথা ছিল, সংবিধান প্রবর্ত্তনের পনের বৎসরের মধ্যে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অর্থাৎ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণী পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি বালক-বালিকাকে আমরা বিনা বেতনে শিক্ষা দিব এবং প্রত্যেক অভিভাবককে বাধ্য করিব তাঁহারা যাহাতে তাঁহাদের সন্তানদিগকে ঐ বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে রাখেন। তাঁহারা রাখিতেছেনও, কিন্তু সরকার তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালন করিতেছেন না। কেবল নূতন নূতন বিদ্যালয় খুলিলেই সমস্যার সমাধান হইবে না। ইহা ত মিথ্যা নয়, আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি অনেকক্ষেত্রেই নামেমাত্র বিদ্যালয়। এই-সব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দুইবেলা ভরপেট খাইবার মত বেতন জোটে না, শিক্ষার উপকরণ ত দূরের কথা—অনেক বিদ্যালয়ের মাথার উপর ঠিকমত একখানা চালই নাই, যে সব ছাত্র-ছাত্রী এই সকল বিদ্যালয়ে পড়িতে আসে, তাহারা অনেকেই অপুষ্ট, রুগ্ন। এইসব বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা কতদূর হয় তা সকলেই জানেন।

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা নানা নূতন পরীক্ষার সূত্রপাত করিয়াছি। শিক্ষার পাঠ্যক্রমকে আমরা ভারাক্রান্ত করিয়াছি। যাহার ফলে মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে তাহাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। পাঠ্য-তালিকা যাঁহারা প্রস্তুত করেন, তাঁহারা বই না দেখিয়াই নির্ব্বাচন করেন। অধিকাংশই অপাঠ্য এবং অশুদ্ধ। তাও আবার অনেক বই বাজারে পাওয়া যায় না—মাঝে মাঝে দেখা দেয়, আবার অদৃশ্য হইয়া যায়। শিক্ষা-পর্ষদের এই কানা-মাছি খেলা আর কতদিন চলিবে? অথচ এদিকে পরীক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার, শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষনীয় ভাষা, কারিগরী শিক্ষা বা অর্থকরী শিক্ষা, নৈতিকশিক্ষা বা ধর্ম্মশিক্ষা, মেয়েদের ও অনগ্রসর সম্প্রদায়সমূহের শিক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে অজস্র প্রশ্ন ও নানা বিতর্ক একসঙ্গে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে চারিদিক দিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে। আমরা একসঙ্গে সবকিছু করিতে গিয়া কিছুই করিতে পারিতেছি না। পুরাতন যা ছিল তা ভাঙিয়া ফেলিবার জন্য আমরা হাতুড়ি তুলিয়াছি, কিন্তু সে জায়গায় নূতন কি আমরা গড়িব তা এখনও স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই।

পশ্চিমবঙ্গে চাউলের অবস্থা

চাউলের দর ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে। অথচ মন্ত্রীমহাশয় সমানে বলিয়া চলিয়াছেন, বাজারে ২৫ টাকা দরে চাল পাওয়া যাইতেছে। অবশ্য কোন্ দোকানে তাহা তিনি বলেন নাই। একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যের ব্যাপারে চিরকালই পরনির্ভরশীল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ব্যাপারে অবহিত নন একথা বলিলে অন্যায় হইবে। কারণ খাদ্যের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের পরনির্ভরতা দূর করিবার জন্য সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলেই একটি কার্য্যক্রম স্থির করেন এবং খাদ্যউৎপাদন দপ্তর নামে একটি নূতন দপ্তর সৃষ্টি করিয়া একজন মন্ত্রীর উপর তাহার ভার অর্পণ করেন। জনসাধারণ আশা করিয়াছিল, এই ব্যবস্থার ফলে পশ্চিমবঙ্গ সবরকম খাদ্যের ব্যাপারে না হোক, অন্ততঃ চাউলে স্বাবলম্বী হইবে। কারণ আলোচ্য কার্যক্রম অনুযায়ী তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ১৫ লক্ষ টন অতিরিক্ত চাউল উৎপাদনের একটা সংকল্প স্থির হইয়াছিল। কিন্তু

বর্ত্তমানে এই বিষয়ে যে সমস্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বুঝা যাইতেছে উহা আকাশকুসুমেই পরিণত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যোৎপাদন পরিকল্পনার এই পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া পশ্চিমবঙ্গবাসী মাত্রেই দুঃখিত হইবেন। কারণ এই পরিকল্পনার সাফল্যের উপর তাহাদের জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার অনুপাতে জমি বেশী নাই। কাজেই জমিতে সেচের জল সরবরাহ করিয়া এবং রাসায়নিক সার প্রয়োগ করিয়া জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করা ছাড়া খাদ্যের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের স্বাবলম্বী হইবার অন্য কোনো উপায় নাই। কিন্তু দেখা যাইতেছে, পরিকল্পনার এই দুইটির কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইতেছে না। ফলে খাদ্যশস্যের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ যে শুধু পরমুখাপেক্ষীই থাকিয়া যাইবে তাহা নহে, এরূপ অবস্থায় খাদ্যশস্যের জন্য বেশী পরিমাণ জমির প্রয়োজন থাকায় পশ্চিমবঙ্গে পাটের মত অর্থকরী ফসল উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ জমি পাওয়া যাইবে না।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একবৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। এই পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরও অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। সুতরাং খাদ্যোৎপাদনের ব্যাপারে আর সময়ক্ষেপ করা যাইতে পারে না। এজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্ত্তব্য, একটি উচ্চশক্তিসম্পন্ন সংস্থার সাহায্যে কি কারণে খাদ্যোৎপাদন পরিকল্পনা অভীষ্ট সিদ্ধির পথে আশানুরূপভাবে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না তাহা নির্ণয় করা এবং এই পরিকল্পনার রূপায়ণের দায়িত্ব এমন একটি সংস্থার হাতে অর্পণ করা যাহা সরকারী প্রভাব হইতে যতদূর সম্ভব মুক্ত থাকিবে এবং যাহা অনুগ্রহের আশায় অথবা নিগ্রহের ভয়ে নিজেদের কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হইবে না। কিন্তু সরকার কি এদিক দিয়া চিন্তা করিবেন?

কলেরা ও তাহার প্রতিকার

কলিকাতা নগরীতে ব্যাপক কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে। এই রোগে কোন্ বৎসরে কত লোক মরিয়াছে, এবারে তাহা অপেক্ষা কম কি বেশী, অঙ্ক কষিয়া সে হিসাব বাহির করিয়া লাভ নাই। বরং ভারতের বৃহত্তম নগরীতে প্রতি বৎসর শত শত লোককে এই রোগে প্রাণ হারাইতে হয়, ইহাই কি লজ্জা পাইবার মত যথেষ্ট কারণ নয়?

আমরা এমন কথা বলিব না, পৌরসভা ও রাজ্য সরকার ইহাতে বিব্রত বোধ করিতেছেন না বা রোগ-প্রতিরোধে কোন চেষ্টা করিতেছেন না। নিশ্চয় করিতেছেন, তবে বড় বিলম্বে। পূর্ব্ব হইতে তাঁহাদের এই চেষ্টা সক্রিয় হইলে, এতটা ব্যাপক হইতে পারিত না।

সংবাদপত্রে দেখিতেছি, তাঁহারা সব ছাড়িয়া এখন মাছি মারিবার দিকে ঝুঁকিয়াছেন। মাছিগুলি কি একটা ঘরে আবদ্ধ হইয়া আছে যে সেইগুলি শেষ করিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যাইবে? নগরীর সর্ব্বত্র কোটি কোটি মাছি সৃষ্টির কারখানা খুলিয়া, মাছি ধ্বংসের উদ্যোগী হইতে বলার বা চেষ্টা করার মত হাস্যকর আর কিছু নাই। প্রতিদিন এই শহরে যে আবর্জ্জনা সঞ্চিত হয়, তাহার প্রায় সমস্ত অংশই নগরীর বুকে দুষ্টক্ষতের মত জমিয়া থাকে। শুধু জঞ্জাল-স্তূপেই নয়, অনপসৃত ক্লেদপঙ্কিল, ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী যে মক্ষিকা উৎপাদনের বৃহৎ কেন্দ্র। এ সম্বন্ধে পৌরপিতাদের দৃষ্টি পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করা সত্ত্বেও অবস্থার উন্নতি হয় নাই।

ইহার উপরে আছে, নগরীর বিভিন্ন স্থানে অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর খাটাল, খাটা পায়খানা, অপরিষ্কৃত খোলা নর্দ্দমা, নানা স্থানে সঞ্চিত বদ্ধ জল। পৌরসভা বা রাজ্যসরকার মাছি মারিবার উদ্যোগ করুন, বা মাছি মারিতে বলুন, তাহাতে আপত্তি করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে মাছির জন্মরোধের কাজটাও তৎপরতার ও নিষ্ঠার সঙ্গে করা দরকার। তাহা না করিয়া—অর্থাৎ নগরীকে সর্ব্বপ্রকার পরিচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা না করিয়া, মক্ষিকা উৎপাদনের ধারা রুদ্ধ না করিয়া, কাটা ফল ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাদি বিক্রয় বন্ধ করিবার ব্যবস্থা না করিয়া, বস্তিগুলিতে বীজাণুমুক্ত বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা না করিয়া এবং প্রতিটি নাগরিককে কলেরার টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা না করিয়া শুধু মাছি মারিতে বলিলে বা মাছি মারিবার উদ্যোগ করিলে, কলেরা যে তাহার আস্তানা ছাড়িয়া পলাইবে না ইহা পৌরসভা ও রাজ্যসরকার উভয়েরই বিশেষ করিয়া মনে রাখা উচিত।

তাঁদের আরও একটি কথা স্মরণে রাখা উচিত, বিংশ শতাব্দীর শেষেও, আমাদের সেই রোগের ত্রাসে কাঁপিতে হইতেছে, যে-রোগ পৃথিবীর আর কোথাও নাই।

যক্ষ্মারোগের প্রতিষেধক 'টেবকেন'

সংবাদপত্রে দেখা যায়, আমাদের দেশে এখনও যক্ষ্মা-রোগে অনেক লোক মারা যাইতেছে। তবে পূর্ব্বাপেক্ষা ইহার ভয়াবহতা অনেক কমিয়া গিয়াছে। গত যুদ্ধের পর আমরা এই রোগের কয়েকটি মূল্যবান ঔষধ পাইয়াছি। যেমন, ষ্ট্রেপটোমাইসিন, পাস, আইসোনেক্স প্রভৃতি। এই ঔষধগুলি ব্যবহারের ফলে মৃত্যুর হার অনেক কমিয়া গিয়াছে। লোকের মনে বলও বাড়িয়াছে—তাহারা জানে, এ রোগে আর মরিবার ভয় নাই।

তবে এ ঔষধ ব্যবহারে কুফলও আছে। দীর্ঘদিন ব্যবহার করিয়া রোগ সারিবার পূর্ব্বেই ছাড়িয়া দিলে এবং পুনরায় অনিয়মিত ব্যবহার করিতে থাকিলে রোগ-বীজাণু-গুলি প্রতিরোধের শক্তি অর্জ্জন করে, যাহার ফলে সে ঔষধে আর কোনও কাজ হয় না। এই কারণেই এক নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে—যাহার নাম 'টেবাকেন।' মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় চিকিৎসার্থে ২০ লক্ষ টেবাকেন ট্যাবলেট পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য পাইয়াছেন। 'কথাবার্ত্তা'য় এইরূপ রিপোর্ট বাহির হইয়াছে:

"সুইজারল্যাণ্ডের জে. আর. গিগি এস. এ. বাসলের সহযোগিতায় পরিচালিত বোম্বাই-এর একটি প্রতিষ্ঠান সুহৃদ গিগি লিমিটেড় কর্তৃক প্রদত্ত প্রায় ২ লক্ষ টাকা মূল্যের যক্ষ্মারোগ প্রতিষেধী 'টেবাকেনে'র ২০ লক্ষ ট্যাবলেট পশ্চিমবঙ্গের অভাবগ্রস্ত যক্ষ্মারোগীদের চিকিৎসার্থ প্রদান করা হয়। টেবাকেনের মধ্যে আছে নিকোটিন অ্যালডিহাইড, থাওসেমিকার—বোজোন এবং আইসোনিকোটেনিক অ্যাসিড হাইড্রাজাইড। ইতি-পূর্ব্বে ভারতে কচিৎ ব্যবহৃত এই ঔষধ যক্ষ্মাব্যাসিলির প্রতিরোধ শক্তির বিরুদ্ধে কার্য্যকর হবে। এই নতুন ঔষধ পশ্চিমবঙ্গের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যনিবাসগুলিতে রোগীদের বিনামূল্যে প্রদান করা হবে।"

উঁহারা আশা করেন, এই ঔষধ আরও কার্য্যকর হইবে। এবং ইহা প্রতিষেধকরূপেও ব্যবহার করা চলিবে।

কর্ম্মযোগী বিধানচন্দ্র

গত ১লা জুলাই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, ভারতের অদ্বিতীয় চিকিৎসক, বাংলার জনপ্রিয় নেতা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অতি আকস্মিকভাবে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার মৃত্যু দিয়া প্রমাণ করিয়া গেলেন, তিনি কি ছিলেন।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই বিধানচন্দ্র পাটনায় জন্ম গ্রহণ করেন। বিধানচন্দ্রের জীবনের প্রথম কুড়ি বৎসর বিহারেই কাটে। এইখানেই তাঁহার স্কুল-কলেজের অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়। তখন বিহার বাংলা দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁহার পিতা প্রকাশচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। পুত্রকে ডাক্তারি পড়াইবেন, কি ইঞ্জিনীয়ারিং পড়াইবেন ইহা পিতা কিছুতেই স্থির করিতে পারিতে-ছিলেন না। কলিকাতায় আসিয়া অবশ্য তিনি ছেলেকে মেডিক্যাল কলেজেই ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। পরে বুঝিয়া-ছিলেন, তাঁহার নির্ব্বাচনে ভুল হয় নাই। এম-বি পরীক্ষার পূর্ব্বে কর্ণেল পেক-এর সহিত কোন বিষয় লইয়া কথান্তর হওয়ায় পরীক্ষায় তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরে অবশ্য এম্-ডি ডিগ্রী লাভ করিয়া বিলাত যান। সেখানে একই বৎসরে এম-আর-সি-পি ও এফ-আর-সি-এস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া নূতন রেকর্ড স্থাপন করেন। চিকিৎসক হইয়া তিনি জীবনে প্রভূত উপার্জ্জন করিয়াছেন। অর্থের লোভে তিনি মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন নাই। তিনি দেশ-গঠনের সুবৃহৎ পরিকল্পনা লইয়াই রাজ্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ডাঃ রায় এত বড় হইয়াছিলেন তার মূলে ছিল তাঁর নিঃস্বার্থপরায়ণতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, দৃঢ়চিত্ততা ও সত্যনিষ্ঠা। তিনি কোনদিন ক্ষমতার লোভে তার পিছনে ছোটেন নাই।

বরং ক্ষমতাই তাঁর কাছে ধরা দিয়াছিল। এক কথায় তিনি কর্ম্ম করিতে আসিয়াছিলেন, কর্ম্ম করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি ছিলেন, গীতার কর্ম্ম-যোগী। তিনি জীবনে কখনও কোন কারণে কাহারও নিকট নত হন নাই। ইহা তাঁহার স্বভাবেই ছিল না। তিনি নেতা হইয়া জন্মিয়াছিলেন, নেতৃত্ব করিয়াই চলিয়া গেলেন। এদিক দিয়া তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। জীবনে কখনও কাহারও নিকট পরাজয় স্বীকার করেন নাই। ছবির মত কয়েকটি ঘটনা আজও চোখের উপর ভাসিতেছে। স্যার সুরেন্দ্রনাথকে ব্যারাকপুর কেন্দ্রে হারাইয়া ডাঃ রায় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিলেন ১৯২৪ সনে। বাজেট বিতর্কে যোগ দিয়া অসাধারণ দক্ষতা তিনি দেখাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, পূর্ব্ব বাংলার এক ছোট গ্রামের সন্তান আমি। আমি গ্রাম-বাংলার রূপও চিনি। সমগ্র বাংলার অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের দাবি জানাইয়া নব্য বাংলার ভাবী কর্ণধার সেদিন ঘোষণা করিয়াছিলেন, যখনই জনসাধারণ জনস্বাস্থ্যের জন্য বাড়তি খরচের দাবি করে, সরকার উত্তরে বাংলার দৈন্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। কিন্তু দেশের

দারিদ্র্য যে অনেকাংশে শোচনীয় জাতীয় স্বাস্থ্যের জন্য, সেকথা বুঝা দরকার। জনগণকে দারিদ্র্য ও ভগ্নস্বাস্থ্য হইতে উদ্ধার করিতে না পারিলে আমাদের দুর্ভোগ ঘুচিবে না। ১৯২৫ সনের ১৬ই জুন দেশবন্ধু মারা গেলে নেতা নির্ব্বাচিত হন, জে. এম. সেনগুপ্ত। সেনগুপ্তের স্থান দখল করেন ডাঃ রায়। ১৯২৭ সনের আগষ্ট মাসে স্বরাজ্যদলের পক্ষ হইতে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করার ভারও পড়ে ডাঃ রায়ের উপর। ১৯৩০ সনে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রাক্‌কালে কংগ্রেসের নির্দ্দেশে অন্যান্য সদস্যদের সহিত তিনিও ইস্তফা দেন। তার পর আসিল ১৯৪৭ সন। স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম বিধানসভা। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি দিল্লী চলিয়া যাওয়ায় তাঁহার জায়গায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া আসিলেন ডাঃ রায়। এবং বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতেই ১৯৪৮ সনের ২৩শে জানুয়ারী বসিলেন মুখ্যমন্ত্রীর আসনে। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ছিল গগনস্পর্শী। এই ব্যক্তিত্বের জোরেই তিনি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি দলবিশেষের নেতা হইয়াও, সকল দলের উপর কর্তৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। এক কথায় ডাঃ রায় মানেই পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ মানেই ডাঃ রায়। সেদিক দিয়া বিধান নাম তাঁহার সার্থক হইয়াছে।

তিনি ছিলেন আশাবাদী—নবীন বাংলা গড়িয়া তুলিবার স্বপ্ন ছিল তাঁহার চোখে। এদিক দিয়া অনেক কাজই তিনি করিয়া গিয়াছেন, সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারিলেন না ইহাই দুঃখ। ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ঠিকই বলিয়াছেন, "ডাঃ বি. সি. রায় ছিলেন এক বিরাট পর্ব্বতের মত। সেই পাহাড়ের আড়াল আজ সরিয়া গেল। তাঁহার মৃত্যু তাই সারা দেশের বুকে আঘাত হানিয়াছে।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "বাংলা দেশ সম্পর্কে ডাঃ রায়ের পরিকল্পনা ছিল। নানা ধরণের পরিকল্পনা। তাঁহার সিদ্ধান্তই ছিল চরম সিদ্ধান্ত। তাঁহার কথা ছিল শেষ কথা।" "কলিকাতা ও বাংলার উন্নতিসাধনের জন্য তিনি যেসব পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সেগুলি রূপায়িত করা আমাদের কর্ত্তব্য।" রাষ্ট্রপতির এই কথায় আমাদের আশান্বিত করিয়াছে।

তিনি ছিলেন পুরাণের বিরাট পুরুষ। তাঁর পৌরুষ-দীপ্ত বৃহৎ জীবনের বিচিত্র কর্ম্মের ইতিহাস জাতি চিরদিন স্মরণে রাখিবে। মৃত্যু-তারিখ লইয়া অনেকে অনেক কথাই বলিতেছেন, সত্যই এরূপ ঘটনা জগতে বিরল। একই দিনে জন্ম ও মৃত্যু। জন্মদিনের ফুল আর মৃত্যু-দিনের মালা, আনন্দ ও অশ্রু সব একাকার হইয়া গেল।

রাজর্ষি পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন

ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস সভাপতি পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন গত ১লা জুলাই দীর্ঘকাল রোগভোগের পর পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স আশী বৎসর হইয়াছিল।

পুরুষোত্তমদাস ১৮৮২ সনে এলাহাবাদে সহয়াতপুর গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শালিগ্রাম ট্যাণ্ডন। তিনি স্কুল ও কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টে আইনব্যবসায় আরম্ভ করেন। অল্পসময়ের মধ্যে ইহাতে তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। ১৮৯৯ সনে তিনি স্বেচ্ছাসেবকরূপে প্রথম কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯০৬ সনে সুরাট কংগ্রেসে প্রথম প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন। ১৯১০ সন হইতে ট্যাণ্ডনজী হিন্দী প্রচার আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন। ঐ বৎসর হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ট্যাণ্ডন উহার প্রথম সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। ১৯৪৭ সনের জুন মাসে কংগ্রেস যখন মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশবিভাগে সম্মত হয়, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে ট্যাণ্ডনজী বিরোধী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তারপর ১৯৫০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে নাসিকে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ষট্‌পঞ্চাশ-তম অধিবেশনে সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

কর্ম্মজীবনে ইনি লাহোরে একটি ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী ও ম্যানেজাররূপে কাজ করেন। ১৯১৪-১৮ সন তিনি নাভা রাজ্যের আইন-দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬১ সনে তিনি ভারত সরকার কর্তৃক সর্ব্বোচ্চ উপাধি 'ভারতরত্ন' দ্বারা ভূষিত হন।

কর্ম্মজীবনের বহু কীর্ত্তি ও খ্যাতি পশ্চাতে ফেলিয়া উত্তরপ্রদেশের প্রবীণ জননায়ক একই দিনে অর্থাৎ ডাঃ রায়ের মৃত্যুদিনে পরলোকগমন করিলেন। দুই রাজ্যের দুই বিশিষ্ট নেতার জন্ম-সন ও মৃত্যু-তারিখের এই সাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার মত। কর্মক্ষেত্রে পৃথক হইলেও, উভয়েই নিজ নিজ রাজ্যে ছিলেন অদ্বিতীয়। উভয়েই 'ভারতরত্ন'। পুরুষোত্তমদাস ছিলেন সরল অমায়িক ও অনাড়ম্বর জীবনের মূর্ত্তপ্রতীক। উত্তরপ্রদেশে এজন্য তিনি রাজর্ষি ট্যাণ্ডন নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহার প্রতি উত্তর-প্রদেশের অধিবাসীদের সকলেরই শ্রদ্ধা ছিল গভীর ও আন্তরিক। এই শ্রদ্ধার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই তাঁহার জীবনের অবসান হইয়াছে।

বাংলা মঙ্গলকাব্য ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীদুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টির কাল সাধারণতঃ খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ইত্যাদি কাব্য এই সময় রচিত হয়; সুতরাং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি বড় অংশ হচ্ছে মঙ্গলকাব্য। এই কাব্য বাংলার নিজস্ব সম্পদ্।

বাংলা দেশের তদানীন্তন লোকজীবনের জন্ম ও বিবর্তন-ধারার একটা সুস্পষ্ট ছাপ পাওয়া যায় এই মঙ্গলকাব্যে। বাংলা দেশ ছিল চিরকালই শান্ত; উত্তর পশ্চিম থেকে যেসব বহিরাগত শত্রু ভারতে এসেছিল, তাদের অত্যাচার বা নৃশংসতার পরিচয় বাংলা দেশে ছিল অজ্ঞাত; কারণ তাদের অত্যাচারের ঢেউ বাংলায় আঘাত করে নি। সুতরাং বাঙালীদের জীবন কেটে যাচ্ছিল অতি সহজভাবে: কিন্তু হঠাৎ তুর্কীশক্তি উল্কার মত বাংলা দেশে এসে বাংলার শান্ত পরিবেশকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। বাংলার রাজশক্তি ছিল এই সময় অত্যন্ত দুর্বল; পুনঃ পুনঃ এই শক্তির উত্থান-পতনে রাজারা হয়ে পড়েন দুর্বল থেকে দুর্বলতর। লৌকিক জীবনকেই বেশী নাড়া দেয় এই রাজনৈতিক পরিবর্তন। সমাজের যা কিছু কল্যাণ, যা কিছু মূল্যবান্ সবই ধূলিসাৎ হয়ে যায় যুদ্ধবিগ্রহ ও সামাজিক সংঘাতে।

তুর্কীশক্তির কাছে বাঙালীর এই পরাজয়ের একটি গুরুতর কারণ আছে। দীর্ঘদিন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার ফলে বাঙালীর বাহুবল হয়ে যায় নষ্ট। প্রত্যন্ত দেশ বলে বাংলা চিরদিনই আর্যাবর্তের রাষ্ট্রীয় সংঘাতের বাইরে থেকে নিজের স্বতন্ত্র পথে চলে আসছিল। সেই কারণে উত্তরাপথে তুর্কী-অভিযান এবং তার পূর্বে গ্রীক, শক, হুন প্রভৃতির আক্রমণ বাংলায় কোনও আলোড়নের সৃষ্টি করে নি; কাজেই মহম্মদ বীন বক্তিয়ারের মুষ্টিমেয় তুর্কী ও পাঠান সৈন্য যখন বাংলা দেশে উপস্থিত হ'ল, তখন বাংলার রাজশক্তি বা জনসাধারণ এই আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারল না। লক্ষ্মণসেনের সুশাসনের ফলে দণ্ডশক্তি হয়ে যায় নিস্তেজ; যুদ্ধবিদ্যায় ও রণনীতিতে গতানুগতিকতাই চলে আসছিল; কালানুগ পরিবর্তনের আবশ্যকতার কথাও চিন্তা করা হয় নি। ধীরে ধীরে জনগণমানসে আধিভৌতিক বাহুবল অপেক্ষা আধিদৈবিক মন্ত্রবলই অধিকতর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। ফলে, গ্রহানুকূল্য ও মন্ত্রশক্তির ভরসায় সুখ-স্বপ্ননিমগ্ন ক্ষত্রিয়শক্তি তুরুক-তাকের উপর অধিকতর বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। সেকালের একটি রণনীতির বই থেকে এর নিদর্শন পাওয়া যায়। চারদিক্ থেকে শত্রু আক্রমণ করলে কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে বইটিতে যে বিধান দেওয়া আছে, তাতে জানা যায়—বিশেষ বিশেষ গাছের ছাল ও মূলের সঙ্গে শ্মশানের ছাই মিশিয়ে তূর্যের গায়ে মন্ত্র পড়ে বাজাতে হবে, সেই মন্ত্রটি হচ্ছে—

> ওং অং হং হলিয়া হে মহেলি বিহঙ্গছি সাহিনেতি
> মশাণেতি খাতি লুঞ্চতি ফিলি ফিলি কালি হুং ফট্ স্বাহা।
>
> (শ্রীসুকুমার সেন—মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী পৃঃ ২)

এর পর শ্বেত অপরাজিতার মূল ও ধুতরা পাতা এক সঙ্গে বেঁটে এবং তাই তিলকস্বরূপ কপালে দিয়ে মন্ত্র জপ করলেই সেই তূর্যের শব্দে শত্রু-সৈন্য পলায়ন করবে।

সমগ্র দেশে এই একই মনোভাব কাজ করে এসেছে বিগত শতাব্দী অবধি এবং এখনও করছে প্রত্যন্ত পল্লী-অঞ্চলে পুষ্পপরা, বশীকরণ, সাপের বিষ ও মাছের কাঁটা-নামানো, সুপ্রসব, ঘা-শুকানো ইত্যাদি নানাবিধ মন্ত্র-বিশ্বাসের আকারে। এই সব কারণে সংখ্যায় অল্প হলেও তুর্কী অভিযানকারীরা বিনা বাধায় সমস্ত দেশের উপর দিয়ে ধ্বংসের বন্যা বইয়ে দিল। তুর্কীর হাতে এই পরাজয়কে বাঙালী মনে করল দৈবপ্রেরিত; তাদের ধারণা, স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ ম্লেচ্ছরূপ ধারণ করে বাংলা দেশ আক্রমণ করেছেন। ধর্ম-ঠাকুর সম্পর্কে প্রাপ্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে কোন কোনটিতে মুসলমান-শক্তিকে ধর্মের অবতার রূপেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। নির্বীর্য পরাধীন জনগণের এই মনোভাবের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া গেল—

> ধর্ম হৈল যবনরূপী শিরে পরে কাল টুপি
> হাতে ধরে ত্রিকচ কামান,
> চাপিয়া উত্তম হয় দেবগণে লাগে ভয়
> খোদায় হইল এক নাম।

ব্রহ্মা হৈল মোহাম্মদ বিষ্ণু হৈল পেগম্বর
মহেশ হইল বাবা আদম,
গণেশ হইল কাজী কার্ত্তিক হইল গাজী
ফকীর হইল মুনিগণ।
তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইল শেখ
পুরন্দর হইল মৌলানা,
চন্দ্র সূর্য আদি যত পদাতিক হইয়া শত
উচ্চস্বরে বাজায় বাজনা।

(শ্রীসুকুমার সেন—মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী পৃঃ ৪।

মধ্যযুগের বাঙালীর এই অবস্থা পর্যালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সমাজে তখন যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, যে-শক্তির খেলা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ হইতেছিল, যে সকল আকস্মিক উত্থান-পতন লোককে প্রবলবেগে চকিত করিয়া দিতেছিল—মনে মনে তাহাকেই দেবত্ব দিয়া শাক্তধর্ম নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।' 'যখন আপন শক্তির মূলধন লইয়া জনসাধারণের কারবার চলে না তখন সকল ব্যাপারেই মানুষ দৈবের কাছে, গ্রহের কাছে, পরের কাছে হাত পাতিয়া ভয়ে ভয়ে কাটায়। এই ভাবটার বর্ণনা যদি কোথাও খুব সুস্পষ্ট করিয়া ফুটিয়া থাকে তাহা বাংলার প্রাচীন মঙ্গলকাব্যে।' 'আইন নাই বিচার নাই, জোর যার মুলুক তার; প্রবলের অত্যাচারে বাধা দিবার কোন বৈধ পথ নাই; দুর্বলের একমাত্র উপায় স্তবস্তুতি, ঘুসঘাষ এবং অবশেষে পলায়ন।' —সাহিত্য, পৃঃ ১৫১; কালান্তর, পৃঃ ৫৫-৫৬।

বাংলা মঙ্গলকাব্যে পৌরাণিক দেব-দেবতার সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটেছে নানা লৌকিক দেব-দেবীর। এই মিশ্রণের মধ্যে একটা আপোষ-রফার চেষ্টা দেখা যায় বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে অনুন্নত হিন্দুর, এমন কি হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানদেরও; কিন্তু এই প্রয়াসের মধ্যে প্রকৃত কোন মিলন আসে নি; অনুন্নত শ্রেণী বর্ণহিন্দু থেকে আলাদাই রয়ে গেছে। যখন সাহিত্যের মধ্য দিয়ে উভয়ের মিলন-সংঘটনের চেষ্টা করা হয়েছে তখন দেখা যায়, তা হয়েছে বিদ্বেষমূলক, মৈত্রীমূলক হতে পারে নি। বহিরাগত শাসকের অত্যাচার চলেছে বাইরে এবং সমাজের ভেতরে চলেছে বর্ণাশ্রমের দারুণ উপদ্রব। এই বিপর্যস্ত সমাজের মধ্যে নিজের সম্প্রদায়গত গৌরব প্রতিষ্ঠায় প্রত্যেক গোষ্ঠী নিজের দেবতাকে মহিমময় করার চেষ্টা করেছে এবং সেই দেবতাকে অন্য গোষ্ঠীর দেবতার উপর প্রাধান্য দিতে অগ্রসর হয়েছে। ফলে, পৌরাণিক ও লৌকিক দেব-দেবীর অত্যন্ত অধোগতি দেখা যায়, আর পরস্পরের মধ্যে অসুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতাও প্রবল আকার ধারণ করে। তদানীন্তন যে-সমাজের পরিচয় পাওয়া যায় তাতে এ কথা সুস্পষ্ট যে, সেই সমাজ সুশিক্ষিত, সুপরিচালিত বা সুশাসিত নয়। এই সমাজের নর-নারী নানা দুঃখ-দৈন্যে ও আধি-ব্যাধিতে বিপর্যস্ত এবং অশিক্ষা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। তাদের পৌরুষের কোন পরিচয় নেই, চরিত্রের বিকাশ রুদ্ধ। পারস্পরিক উদার সহনশীলতার অভাব দেখা যায় একান্তভাবে, আর সেই জন্যই তারা দেবতার হাতে হয়ে উঠেছিল অসহায় ক্রীড়নক। চাঁদ সদাগরের মনের আদর্শ মহৎ, তাই সে দেবতাকে অত্যাচারী ও জুলুম-জবরদস্তির প্রতীক ভেবে নিজের পৌরুষকে জাগ্রত করেছিল। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, 'যাহাকে সে কিছুতেই মানিতে চায় নাই, বহু দুঃখে তাহারই শক্তির কাছে তাহাকে হার মানিতে হইল। এই যে শক্তি, এর সঙ্গে জ্ঞান বা ন্যায়-ধর্মের যোগ নাই। মানিবার পাত্র যতই যথেচ্ছাচারী ততই সে ভয়ংকর, ততই তার কাছে নতি স্তুতি'। —কালান্তর, পৃঃ ৫৫ (কর্তার ইচ্ছায় কর্ম)।

চাঁদ সদাগরকে দিয়ে মনসার পুজো-আদায়ের চেষ্টার মধ্যে রয়েছে লৌকিক জীবনের জাগরণ-আভাস। চাঁদ সদাগর হলেন উচ্চ বর্ণহিন্দুর প্রতীক; সুতরাং তাঁকে দিয়ে অনুন্নতশ্রেণী-পূজিত মনসার পুজো আদায় করলেই উভয় শ্রেণীর মধ্যে আর ব্যবধান থাকতে পারে না। এই ব্যবধান দূর করার ব্যাপারে স্বতঃই সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছে দুইটি বিপরীত আদর্শের মধ্যে—একটি বর্ণহিন্দু ও অপরটি লৌকিক। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলে এই সামাজিক বিরোধই আত্মপ্রকাশ করেছে। উচ্চবর্ণের মধ্যে কিভাবে লৌকিক মনসার পুজো প্রতিষ্ঠিত হ'ল, তা জানতে পারলে এর তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে।

চাঁদ সদাগর গুরুর কাজের জন্য 'জালু মালু' নামে দুই জেলেকে পাঠায় মাছ ধরতে। এমন সময় মনসা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে তাদের কাছে এসে বললে, নদী পার করে দিতে। তারা নারাজ হলে মনসার মায়ায় জালে একটিও মাছ পড়ল না; তখন কি ভেবে তারা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীকে পার করে দিলেই তাদের জালে পড়ল, প্রচুর মাছ আর 'স্বর্ণঝারি'। পরে মনসা সব প্রকাশ করে ও তার পুজো প্রচারের সাহায্য করার আদেশ দিয়ে অন্তর্হিত হ'ল। জালু-মালুর মা সেই স্বর্ণঝারি মাথায় নিয়ে ঘরে এসে বিধিমত মনসার পুজো করল দুই বৌকে নিয়ে। চাঁদের পত্নী সনকা ছয় বৌ ও সখীদের নিয়ে স্নানে যাবার সময় এই পুজোর কথা জেনে স্নানান্তে বাড়ীতে এসে

মনসার পুজো করতে বলল। চাঁদের এক অনুচর এই ব্যাপার চাঁদকে জানালে চাঁদ রেগে-মেগে মনসার ঘট, পুজোপকরণ সব নষ্ট করে দিল। তখন প্রতিশোধ নেবার জন্য মনসা চাঁদের 'নাগরা' উদ্যান নষ্ট করে দেয়; কিন্তু মহাজ্ঞানের সাহায্যে চাঁদ পুনরায় উদ্যান রচনা করে মনসার শক্তি ব্যর্থ করে দিল। চাঁদের এই মহাজ্ঞান হরণ করার জন্য মনসা সুন্দরী যুবতী সেজে নদী-তীরে নিজেকে চাঁদের শ্যালিকা ও সনকার বোন-রূপে পরিচয় দিল। সনকা তাকে আদর করে ঘরে নিয়ে গেলে চাঁদ তার রূপে বিমুগ্ধ হয়ে পড়ল; এই সুযোগে মনসা চাঁদের কাছ থেকে মহাজ্ঞানের খবর জেনে ইন্দ্রদত্ত 'জয়-আচল' কেটে নিল চাঁদের বস্ত্রাঞ্চল থেকে। সিদ্ধমনোরথ হয়ে মনসা তখন নাগরা বন নির্মূল করে চলে গেল। মহাজ্ঞানের অভাবে চাঁদের আর কোন ক্ষমতা রইল না। স্বপ্নে মনসা চাঁদকে ভয় দেখিয়ে বলল, 'কি কর্ম করিলি রাজা লজ্বিয়া আমায়।' চাঁদ তখন পাত্র-মিত্রের পরামর্শে শঙ্খ ধন্বন্তরিকে ডেকে এনে নাগরা বন আবার জিয়িয়ে নিল। এর প্রতিশোধ নেবার জন্য মনসা ছুটল শঙ্খবণিককে ধ্বংস করতে মালিনীর বেশে। শঙ্খের ছিল ছ'-কুড়ি ছ'জন শিষ্য; তারাও সকলে মহাজ্ঞানে সুপণ্ডিত। সুতরাং শিষ্যদের বধ করলে অসহায় বণিককে আয়ত্ত করতে বেগ পেতে হবে না ভেবে মনসা কালকূট মিশ্রিত ফুলের মালা গেঁথে শঙ্খিনীনগরে শিষ্যদের কাছে গেল। শিষ্যরা 'এক এক পণেতে' এক একখানি মালা কিনে গলায় পড়লে কিছুক্ষণের মধ্যেই বিষক্রিয়া আরম্ভ হ'ল। সকলে মড়ার মত পড়ে আছে খবর পেয়ে—

> 'হুঙ্কার ছাড়িয়া ওঝা ইষ্টদেবতার পূজা
> অবিলম্বে কইল সেইখানে।
> হরিয়া পুষ্পের বিষ ছ'কুড়ি ছ'জন শিষ
> জীয়াইল ব্রহ্মার বচনে॥'

আর মনসাকে গাল দিতে দিতে ধন্বন্তরি চলল শিষ্যদের নিয়ে। এই পরাজয়ের গ্লানিতে মনসা আবার গোয়ালিনীর বেশে কালকূটমিশ্রিত দই নিয়ে হাজির হ'ল শিষ্যদের কাছে বঙ্কুকানদীর তীরে। সেখানে সবাই বিষ দই খেয়ে পড়ে রইল। ধন্বন্তরি বঙ্কুকায় স্নান করতে এসে এই কাণ্ড দেখে বুঝল যে এ কীর্তি সেই চেঙ্গমুড়ি কানীর। তখন এক এক চাপড় মেরে মহাজ্ঞান-বলবান্ গুরু শিষ্যদের বাঁচিয়ে দিল। এইবার মনসা শিষ্যদের কাছে না গিয়ে মূল গুরুকে নিয়েই পড়ল। মনসা ব্রাহ্মণী সেজে ধন্বন্তরিপত্নী কমলার সঙ্গে সই পাতাল। সই-এর ছলনায় স্বামীর কাছ থেকে মৃত্যুর কারণ জানতে পাবার সময় 'শ্বেতমাছিরূপে' মনসাও জেনে নিল যে শিবের জটাস্থিত উদয়-কালসাপ যদি ধন্বন্তরির নাসাপথ দিয়ে গিয়ে সাত ব্রহ্মাতিল একেবারে নিতে পারে তবে ওঝার মৃত্যু সুনিশ্চিত। তদনুসারে মনসা পিতা মহাদেবকে অনুনয় করে উদয়কালকে নিয়ে আসে ধন্বন্তরির ঘরে। ঐ সাপ নিদ্রিত ওঝার নাসাপথে গিয়ে সুতোর আকারে সাত ব্রহ্মাতিল নিল অপহরণ করে। ফলে জাগ্রত ওঝা সব বুঝতে পেরে দুই শিষ্য ধনা-মনাকে গন্ধমাদন পর্বত থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বেই বিশল্যকরণী আনতে পাঠায়; কিন্তু গাছ আনলেও মনসার ছলনায় শিষ্যরা গাছ ফেলে দেয়; তখন 'শঙ্খচিল' হয়ে মনসা বিশল্যকরণী নিয়ে অন্তর্হিত হ'ল। এইভাবে সূর্যোদয়েই হ'ল ধন্বন্তরির মৃত্যু। চাঁদ সদাগরের পরম সুহৃদ্ ধন্বন্তরিকে মনসা এইরূপ নানা ছলে-বলে মেরে ফেলল।

এরপর চলল চাঁদ সদাগরের সঙ্গে মনসার সংঘর্ষ। মনসা কিছুতেই যখন শৈব চাঁদকে দিয়ে তার পুজো করাতে পারল না, তখন মনসা ঈর্ষায় 'কালিনাগিনী'কে পাঠাল চাঁদের রন্ধনশালায় গিয়ে ভক্ষ্যদ্রব্যে বিষ মিশিয়ে দিতে। ফলে, চাঁদের ছয় ছেলে এক কালে মারা যায়। কিছুদিন পরে মনসা শিবের রূপে স্বপ্নে দেখা দিয়ে চাঁদকে বলল, 'অনুপাম-পাটনে' সমুদ্রযাত্রা করতে ও সেখানে আবার মহাজ্ঞান শিখে নিতে। রাজা হয়ে বাণিজ্য করতে যাওয়া গৌরবের নয়; কিন্তু চাঁদ কারও নিষেধ না শুনে বাণিজ্যতরী নিয়ে সমুদ্রযাত্রা করল। পথে কালিদহে মনসার সুসজ্জিত মন্দির দেখে সদাগর হেমতাল দণ্ড দিয়ে মন্দির ভেঙ্গে ও লুট করে চলে গেল। 'অনুপাম-পাটনে' পৌঁছে চাঁদ সেখানকার রাজার বিশেষ আতিথ্য লাভে পরিতৃপ্ত হয়ে নানা সওদা করল, তাতে তার প্রচুর লাভ হ'ল। সেখানে চাঁদ সুখেই থাকতে লাগল। এদিকে লখিন্দরের জন্ম হয়েছে। ক্রমে ক্রমে ছেলে বড় হয়ে উঠল। চাঁদের কোন সংবাদ না পেয়ে প্রজারা সনকার সম্মতি নিয়ে লখিন্দরকে শূন্য রাজপাটে অভিষিক্ত করল। চাঁদের এ সুখ মনসার সহ্য হ'ল না; সুতরাং সে চাঁদকে সনকার রূপ দেখিয়ে চঞ্চল করে তুলল। সাত ডিঙ্গা বোঝাই করে দেশের দিকে রওনা হ'ল সদাগর। এই সময়ে কালিদহে মনসা ঝটিকা সৃষ্টি করে হনুমানের সাহায্যে কালিদহে চাঁদের সপ্তডিঙ্গা ডুবিয়ে দিল; নিমজ্জমান চাঁদ জলমধ্যে মনসার নামাঙ্কিত বালিশ পেয়েও ঘৃণায় তা স্পর্শ করল না। অতি কষ্টে তীরে উঠে সে আত্মরক্ষা করল বটে, কিন্তু পথে ব্যাধ,

বন্ধ্যা, ও পাঁচ দরবেশের হাতে তাকে নির্যাতিত হতে হ'ল। কোন প্রকারে রক্ষা পেয়ে চাঁদ বন্ধু চন্দ্রকেতুর দেশে পৌছল এবং সেখানকার আদর-যত্নে অনেকটা সুস্থ হ'ল; কিন্তু চন্দ্রকেতুকে মনসার পূজারী জানতে পেরে চাঁদ আর এক মুহূর্তও সেখানে থাকতে চাইল না। বরাবর গৃহে ফিরে চাঁদ নিজ পুত্র লখিন্দরকে দেখল।

এরপর বেহুলার সঙ্গে লখিন্দরের বিয়ে ও বিয়ের রাতে সর্পদংশনে হয় লখিন্দরের মৃত্যু, 'কলার মাজুসে' মৃত স্বামীকে নিয়ে বেহুলা মনসার নিকট যাত্রা করল; পথে নানা প্রলোভন ও ভয় দেখিয়ে বেহুলাকে উদ্দিষ্ট পথ থেকে ভ্রষ্ট করার চেষ্টা হ'ল; কিন্তু বেহুলা সব অতিক্রম করে দুর্গন্ধময় স্বামীর শব নিয়ে পৌছল 'নেতো-ঘাটে।' ছদ্মবেশী ধোপানীর সহায়তায় বেহুলা সিজুয়া পর্বতে দেবপুরে উপস্থিত হল। সেখানে বেহুলার কাতর ক্রন্দনে ও অপূর্ব সতীত্ব দেখে শিবের মন মুগ্ধ হয়ে যায় এবং কন্যা মনসাকে ডেকে পাঠান হয় বেহুলার দুঃখের অবসান করিয়ে দিতে। মনসা এসে চাঁদের হাতে তার সমস্ত লাঞ্ছনার কথা শিবকে জানায়। এই সব শুনে বেহুলা প্রতিজ্ঞা করল, সে যে কোন উপায়েই চাঁদকে দিয়ে মনসার পুজো করাবেই। এতে সন্তুষ্ট হয়ে মনসা লখিন্দরকে বাঁচিয়ে দিল, আর সেই সঙ্গে বেঁচে উঠল চাঁদের মৃত ছয় ছেলে; কেবল তাই-ই নয়, কালিদহে নিমজ্জিত রত্নভরা সপ্তডিঙ্গাও ভেসে উঠল। শেষে বাজনা বাজিয়ে চাঁদের বাসবন্দর রামেশ্বর-ঘাটে এসে সকলে হ'ল উপস্থিত। সকলে চাঁদকে তখন মনসার পুজো করতে বললে চাঁদ নীরব হয়ে থাকল; শেষে বেহুলার সনির্বন্ধ প্রার্থনায় চাঁদ মনসাকে পুজো করতে রাজি হ'ল এই সর্তে যে, সাত ডিঙ্গা ঘাটের থেকে আপনিই বাড়ীর দরজায় এসে হাজির হবে। বেহুলা মনসাকে স্মরণ করলে মনসা শেষনাগের সহায়তায়—

সাত ডিঙ্গা পৃষ্ঠে করি চলিল সাত নাগ।
এড়িল চাঁদের দ্বারে সাতভাগে ভাগ॥

চাঁদ পুজো করতে বসল; কিন্তু দেবীর একেবারে ভয় যায় নি, চাঁদ আবার মনসাকে 'হেতালের বাড়ি' মারে। তখন বেহুলা শ্বশুরকে অনুরোধ করে হেতাল ফেলে দিতে। তখন—

শুনিয়া বধূর বোল চাঁদ সদাগর।
হেতালের বাড়ি টাঙ্গা ফেলে দূরান্তর॥

এই ভাবে মনসার কাজ সিদ্ধ হ'ল ও তার পুজো প্রতিষ্ঠিত হ'ল উচ্চবর্ণ-হিন্দুর সমাজে।

মনসাকে পুজো করা ত দূরের কথা, যার নাম পর্যন্ত কখনও চাঁদ করত না বা অন্যের মুখে শুনলে কানে আঙুল দিত, সেই চাঁদ সদাগর যখন মনসার পুজো করল, তখন বুঝতে হবে যে তার মনোবল ভেঙ্গে একেবারে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। মনসার অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত চাঁদ সদাগর নিতান্ত দুর্বল ও অসহায় হয়ে পড়ে। যে মনসা চাঁদের পুরুষকার দেখে বার বার প্রমাদ গণেছিল, সেই মনসাই আবার সদাগরকে নানা পাকচক্রের মধ্যে ফেলে ও তাকে হীনবীর্য করে তার স্বার্থসিদ্ধি করে নিল। মনসার এই কাজের মধ্যে নেই কোন ধর্ম, সত্য, ন্যায়, যুক্তি বা বিচার—আছে কেবল পুজো আদায়ের হীন প্রচেষ্টা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'এই যে শক্তি, এর সঙ্গে জ্ঞান বা ন্যায়ধর্মের যোগ নাই।...এ যেন এক রকম স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া, বাপু, যার যদি খাও তবে নিঃশব্দে মরাটাই অতীব স্বাস্থ্যকর...ওই ত কর্তা, ওই ত আমাদের কবিকঙ্কণের চণ্ডী, ওই ত বেহুলাকাব্যের মনসা, ন্যায়ধর্ম সকলের উপরে ওকেই ত পূজা দিতে হইবে, নহিলে হাড় গুঁড়া হইয়া যাইবে।'—
কালান্তর, পৃ ৭২

চাঁদ সদাগর ছিলেন পরম শৈব—পুরুষ দেবতার উপাসক। শেষে ঘটনাচক্রে তাকে স্ত্রীদেবতা মনসার কাছে মাথা নত করতে হ'ল দেখে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, "খামকা মেয়েদেবতা জোর করে এসে বায়না ধরলেন, 'আমার পুজো চাই', অর্থাৎ 'যে জায়গায় আমার দখল নেই, সে জায়গা আমি দখল করবই।' এই জায়গা দখল করতে যে সকল উপায় দেখা গেল, মানুষের সদ্‌বুদ্ধিতে তাকে সদুপায় বলে না। কিন্তু পরিণামে এই সকল উপায়েরই জয় হ'ল।...বাংলার মঙ্গলকাব্য-গুলির বিষয়টা হচ্ছে, এক দেবতাকে তার সিংহাসন থেকে খেদিয়ে আর এক দেবতার অভ্যুদয়। সহজেই এই কথা মনে হয় যে, দুই দেবতার মধ্যে যদি কিছু নিয়ে প্রতিযোগিতা থাকে তা হ'লে সেটা ধর্মনীতিগত আদর্শেরই তারতম্য নিয়ে। যদি মানুষের ধর্মবুদ্ধিকে নূতন দেবতা পুরাতন দেবতার চেয়ে বেশি তৃপ্তি দিতে পারেন তা হলেই তাঁকে বরণ করবার সঙ্গত কারণ পাওয়া যায়।" কালান্তর, পৃঃ ১৪৫-৪৬। "কিন্তু চাঁদ সদাগর-কৃত মনসা-পুজোর মধ্যে সে ভাব কুত্রাপি নেই, আছে ছল-কৌশল, অন্যায়-অবিচার ও নিষ্ঠুরতা। কেবল পুজো-প্রতিষ্ঠাতেই মনসা ক্ষান্ত হয় নি, কবিদের দিয়ে মন্দিরা বাজিয়ে চামর দুলিয়ে আপন জয়গান গাইয়ে নিলে। লজ্জিত কবিরা কৈফিয়ত দেবার ছলে

মাথা চুলকিয়ে বললেন, 'কী করব, আমার উপর স্বপ্নে আদেশ হয়েছে।' এই স্বপ্ন একদিন আমাদের দেশের উপর ভর করেছিল।" কালান্তর, পৃঃ ১৪৬ (বাতায়নিকের পত্র)।

এই যে এক দেবতার স্থান জোরপূর্বক দখল করে, অর্থাৎ শিবকে হটিয়ে শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করা হ'ল, এর মধ্যে রয়েছে উচ্চবর্ণ-সমাজে নিম্নবর্ণের প্রবেশাধিকারের স্বীকৃতি। মঙ্গলকাব্যে যে ব্রাহ্মণেতর জীবন-দর্শন ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তাতে এই কথাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তদানীন্তন কালে অব্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও জীবনাদর্শ ধীরে ধীরে সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে। অনাসক্ত শিবের বিরুদ্ধে মনসা বা চণ্ডীর সংগ্রাম এরই নিদর্শন। চণ্ডীর দয়ায় নিম্নবর্ণের ব্যাধ কালকেতুর উচ্চাসনলাভ, ব্যাধের সাহায্যে মর্তে দেবীর পুজোপ্রচার এবং ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরের ব্যাধরূপে ধরায় জন্মগ্রহণের মধ্যে তৎকালীন সমাজে অবনমিত সম্প্রদায়ের উচ্চস্থান লাভেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ধারণা, বণিকজাতি সামাজিক মর্যাদা হারায় সেন আমলে; কিন্তু ধীরে ধীরে এই সম্প্রদায় হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে সমর্থ হয়েছিল, তারই আভাস পাওয়া যায় ধনপতি ও চাঁদ সদাগরকে দিয়ে যথাক্রমে চণ্ডী ও মনসা পুজো করানর ব্যাপারে। সুতরাং বোঝা যায়, একটা গভীর সামাজিক উদ্দেশ্য ছিল মঙ্গলকাব্যরচনার মধ্যে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, চাঁদ-পূজিত শিব হচ্ছে শাস্ত্রিক, কিন্তু লৌকিক শিবায়নের শিব নয়। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, 'শাস্ত্রিক শিব যতী, বৈরাগী। লৌকিক শিব উন্মত্ত, উচ্ছৃঙ্খল। বাংলা মঙ্গলকাব্যে এই লৌকিক শিবেরই বর্ণনা দেখতে পাই। এমন কি, রাজসভার কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে যে চরিত্র বর্ণিত সে আর্যসমাজসম্মত নয়' শক্তিপূজা: কালান্তর, পৃঃ ১৫৮।

মঙ্গল দেবদেবীর সৃষ্টি হয়েছিল আর একটি কারণে। প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রবৃত্তির হাত থেকে বাঁচতে মানুষের সর্বদাই লড়াই করতে হয়, কিন্তু সেই শক্তির সঙ্গে কিছুতেই না পেরে মানুষ সেই শক্তির মানবিক দেহরূপ কল্পনা ক'রে নিজের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছে। কৃষিদেবতার আবির্ভাব হয়েছে সুসমৃদ্ধ কৃষির জন্য, ষষ্ঠীর কল্পনা নবজাত সন্তানের আধিদৈবিক ভীতি থেকে উদ্ধার ও নির্বিবাদে লালন-পালন করার জন্য; ধনসম্পদ্ লাভ করা ও নানা বিপদ্ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সৃষ্টি হয়েছে মঙ্গলচণ্ডী ও সত্যনারায়ণের; অনাবৃষ্টিতে বর্ষণ, নিঃসন্তান জননীর সন্তানলাভ ও রোগ-শোক থেকে মুক্তির জন্য হয়েছে ধর্মঠাকুরের আবির্ভাব; বাঘ, কুমীর ও সাপের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য যথাক্রমে দেবতা কল্পিত হয়েছে দক্ষিণ রায়, কালু রায় ও মনসা। এই ভাবেই লৌকিক দেবদেবীর সৃষ্টি। এই সব দেবতার শাস্ত্রিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা করতে যাওয়া বাতুলতামাত্র। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বাংলা মঙ্গলকাব্যে শক্তির যে স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে সে লৌকিক, এবং তার ভাব অনুরূপ। সংসারে যারা পীড়িত, যারা পরাজিত, অথচ এই পীড়া ও পরাজয়ের যারা কোন ধর্মসঙ্গত কারণ দেখতে পাচ্ছে না, তারা স্বেচ্ছাকারিণী নিষ্ঠুর শক্তির অন্যায় ক্রোধকেই সকল দুঃখের কারণ ব'লে ধরে নিয়েছে—এবং সেই ঈর্ষাপরায়ণা শক্তিকে স্তবের দ্বারা, পূজার দ্বারা, শান্ত করবার আশাই এই সকল মঙ্গলকাব্যের প্রেরণা— শক্তিপূজা: কালান্তর, পৃঃ ১৫৮।

মঙ্গলকাব্যের যুগে দেখা যায়, তখনকার মানুষ এক নূতন সংশ্লেষে উপস্থিত হচ্ছিল দুটি বিরুদ্ধ জীবনাদর্শ ও শক্তির সংঘাতের মধ্য দিয়ে। কেবলমাত্র মনোধর্মী আর্যের বিশিষ্টতা নিয়ে বা প্রাণধর্মী আর্যেতর বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাঙালী চরিত্র গ'ড়ে উঠতে পারে নি; আর্য ও আর্যেতর—এই উভয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে তা গ'ড়ে ওঠে। বাংলার সমাজ-জীবনের মধ্যে রয়েছে দুইয়ের মিশ্রণ। এই মিশ্রণের জন্য দেবদেবতার কল্পনা, দেবারাধনার নিয়ম ও ধর্মমতের বিবর্তন-পরিমার্জন হয়েছে নানা দিক্ থেকে। এই জন্যই দেখতে পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ্য বা অব্রাহ্মণ্য আচার-আচরণের মধ্যে নানা বিপরীত ভাব। বৌদ্ধভাবধারাও যে এর সঙ্গে যুক্ত হয় নি, তা বলা যায় না। বৌদ্ধ-সমাজে পূজিত জাঙ্গুলী দেবীর সঙ্গে বাংলা দেশের সর্পদেবী মনসার বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। চণ্ডী-মঙ্গলের উপর যোগতান্ত্রিক বৌদ্ধ-প্রভাব যে পড়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল নিহিত সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে; এই সঙ্গে আবার নাথধর্মের সৃষ্টিতত্ত্ব-কাহিনীও যুক্ত হয়েছে। ধর্মঠাকুরের মধ্যে বিষ্ণু ও শিবের অস্তিত্ব ত আছেই, উপরন্তু ইনি হচ্ছেন বৌদ্ধ স্তূপের প্রতীক; আর বাহন উলূক বা বানর থাকায় ইনি যে নাম-গোত্রহীন অনার্যদেবতা, তাও অস্বীকার করার উপায় নেই। এই দেবতার ধ্যানমন্ত্র থেকে বৌদ্ধ বজ্রযানপ্রভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যায়, এই সময়ে সমাজ যেমন নানা ধর্মের সমন্বয় সাধন করে নিয়েছিল, তেমনি সামাজিক ঐক্যও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সমাজের মধ্যে সকল গোষ্ঠীই পরস্পর একত্র হ'ল, কেউ কাউকে

দূরে ঠেলতে পারল না। এর নিদর্শন পাওয়া যায় কালকেতু-স্থাপিত আদর্শ রাজ্যের মধ্যে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কায়স্থ, ধীবর, গোপ, মুসলমান প্রভৃতি সকলেই এই রাজ্যে পরস্পরের সঙ্গে বাস করার অধিকার পেয়েছে। দেব-দেবতারাও পরস্পর থেকে বিশ্লিষ্ট নয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় বন্দনা-অংশে। এখানে সমস্ত দেবতাকে স্মরণ করা হয়েছে, এমন কি হরিনাম-উল্লেখেও মনসার মহিমা-প্রচারের ভেতরে কোন অসংগতি দেখা যায় না। দেবতাদের মধ্যে এই মিশ্রণকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'স্বপ্নে যেমন এক থেকে আর হয়, তেমনি করেই বুদ্ধ তখন শিব হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। শিব ত্যাগী, শিব ভিক্ষু, শিব বেদ-বিরুদ্ধ, শিব সর্বসাধারণের। বৈদিক দক্ষের সঙ্গে এই শিবের বিরোধের কথা কবিকঙ্কণ ও অন্নদামঙ্গলের গোড়াতেই প্রকাশিত আছে। শিবও দেখি বুদ্ধের মত নির্বাণ মুক্তির পক্ষে।'—বাতায়নিকের পত্র : কালান্তর, পৃঃ ১৪৬।

মঙ্গলকাব্যে যে সব দেব-দেবতা আছে, তার মধ্যে স্ত্রী-দেবতার আধিপত্যই বেশী, পুরুষ-দেবতার স্থান তেমন নেই ; সংখ্যার দিক্ দিয়েও স্ত্রী-দেবতা পুরুষ-দেবতাকে ছাড়িয়ে গেছে। এর কারণ অনুসন্ধান করলে জানা যায়, তান্ত্রিকতাই এর কারণ। কালী-উপাসনা রামপ্রসাদের পূর্বে সে রকম না দেখা গেলেও মনসা, চণ্ডী, অন্নদা প্রভৃতি দেবীর উপাসনার মধ্যে তান্ত্রিকতার ছাপ রয়ে গেছে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই পূজোর মধ্যে ভক্তি ও প্রেমের একান্তই অভাব। চাঁদসদাগর বা ধনপতির কাহিনীর মধ্যে মনসা ও চণ্ডীর যে আচরণ দেখা যায়, তাতে প্রেম ভক্তির কোন নিদর্শন নেই ; আছে পূজো প্রতিষ্ঠার জন্য নীচ জাতীয় প্রচার বুদ্ধি। কেবলমাত্র ভয় থেকে মুক্তি পাবার জন্যই এই সব দেবতার উদ্ভব ; সুতরাং আসল দেব-চরিত্র এদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই সব দেবতার কৃপায় অঘটন এবং অকৃপায় সর্বনাশ হতে দেখা গিয়েছে। পশ্চিমের সূর্যের পূর্বে উদয়, মৃত স্বামীর পুনরুজ্জীবন ইত্যাদি যেমন দেবতার কৃপায় সম্ভব হয়েছিল, তেমনি অকৃপায় পুত্রের মৃত্যু, ভরানৌকা-ডুবি ইত্যাদি দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। এই শক্তিকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা মানুষের ছিল না। একমাত্র পুরুষকার দেখিয়েছিল চাঁদ সদাগর ; কিন্তু তাকে দমন করে তার কাছ থেকে পূজো আদায়ের চেষ্টায় কতই না জঘন্য কাজ করতে হয়েছে দেবীকে। মনুষ্যত্বের এই অবমাননা অন্য সাহিত্যে কচিৎ দেখা যায়। মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর মধ্যে তদানীন্তন অত্যাচারী জমিদার বা চরিত্রহীন গ্রাম্য ডাইনীর স্বরূপও যে প্রতিফলিত হয় নি, তা জোর করে বলা যায় না।

মানুষ দেবতার হাতে যে ক্রীড়নকমাত্র, তা মঙ্গলকাব্যেই দেখা যায়। দেবতা মানুষকে যে ভাবে চালিত করছেন, তাকে সেই ভাবেই চলতে হচ্ছে। জীবনটা তার একান্ত ভাবে যন্ত্রবদ্ধ। দেবতার খেয়ালের বশেই তাকে হয় চলতে, তার নিজস্ব কোন ইচ্ছাশক্তি নেই। দুঃখ পেলে সে মনে করে, সেটা তার প্রাপ্য ; তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা তার নেই, কাজেই দুঃখনিবৃত্তির জন্য সে চেষ্টাও করে না। নিয়তির হাতেই তাকে বাঁধা থাকতে হয়। যদি কখনও দুঃখনিবৃত্তি হয়, তবে সে মনে করে যে, দেবতার অনুগ্রহেই তা হয়েছে। এর জন্য কোন আয়াস বা প্রয়াসের কথা সে ভাবতেই পারে না। সুতরাং মানুষের ব্যক্তিত্ব বা মনুষ্যত্ব বলে কোন বিষয় মঙ্গলকাব্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। কখন কার উপর দেবতার অকৃপা হবে এবং তার ফলে তাকে সংসারে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে হবে, এই ভেবে তখনকার লোক সর্বদা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত। মানুষের মেরুদণ্ড এমনই দুর্বল ছিল যে, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক, অজস্র ভয়-ভাবনাকে বুকে করে প্রতিপদক্ষেপে অবনত-শির ও হতবিশ্বাস হয়ে কোন রকমে জীবনটাকে টেনে নিয়ে যাওয়াই কর্তব্য ছিল। এ ক্ষেত্রে হঠাৎ যদি কারও ভাগ্যোদয় হ'ত, তবে তার জন্য কোন উল্লাসের হেতু থাকত না ; কারণ যে কোন সময় এর বিপর্যয় হওয়া অসম্ভব ছিল না। এই জন্য মঙ্গলকাব্যে নেই জাতীয় চিন্তা, উপরন্তু আছে চিত্তোৎকর্ষের একান্ত অভাব, আর সেই সঙ্গে শৌর্য ও মনুষ্যত্বের হীনতা এবং গ্লানি ও পরাজয়ের ইতিহাস। দেবতার অনুগ্রহ ছাড়া এক পা-ও চলা যায় না, আবার সেই দেবতা হচ্ছে অকরুণ, নিতান্ত অবিবেচক এবং অকারণেই রুষ্টি-তুষ্টির দাস।

শিব-দুর্গা কাহিনীর মধ্যে যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তা তদানীন্তন সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। কৌলীন্য প্রথার জাঁতাকলে প'ড়ে বিবাহিত তরুণী বধূর যে ক্লিষ্ট জীবন অতিবাহিত হ'ত তার প্রতিরূপ পাওয়া যায় সুন্দরী রাজপুত্রী পার্বতীর সঙ্গে বৃদ্ধ নেশাখোর শিবের বিবাহিত জীবনের মধ্য দিয়ে। মঙ্গলকাব্যের এই সব বর্ণনা থেকে তৎকালে দরিদ্র হিন্দু সংসারের একটা বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে ; ফলে তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই ; সুতরাং সাহিত্যে আজও তা অমর হয়ে আছে। এর ভেতর আধ্যাত্মিকতা অনুসন্ধান করতে গেলে বিপদ্ ঘটবে।

মঙ্গলকাব্যের মধ্যে আর একটি বিশেষ কথা ধরা

পড়েছে। সেটা হচ্ছে এই যে, কেবল জ্ঞানীদের জন্যই ঈশ্বর নন; তাঁকে লাভ করতে হলে মন্ত্রতন্ত্র বা বিধি-ব্যবস্থার দরকার হয় না; কেবল সরল ভক্তিতেই বড় থেকে ছোট, ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল পর্যন্ত সকলেই তাঁর আশীর্বাদ লাভের অধিকারী হয়। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে বলেছেন, 'হঠাৎ যেন একটা নূতন আবিষ্কারের মত আসিয়া ভারতের জনসাধারণের দুঃসহ হীনতাভার মোচন করিয়া দিয়াছিল। সেই বৃহৎ আনন্দ দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যখন ভাসিয়া উঠিয়াছিল, তখন যে সাহিত্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাহা জনসাধারণের এই নূতন গৌরবলাভের সাহিত্য। কালকেতু, ধনপতি, চাঁদসদাগর প্রভৃতি সাধারণ লোকই তাহার নায়ক;— ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় নহে, মহাজ্ঞানী সাধক নহে, সমাজে যাহা নীচে পড়িয়া আছে, দেবতা যে তাহাদেরও দেবতা, ইহাই সাহিত্য নানাভাবে প্রচার করিতেছিল'। সাহিত্যসৃষ্টি: সাহিত্য, পৃ ১০৪ (১৩৪১ সং)।

মঙ্গলকাব্যের যুগ হচ্ছে উত্থান-পতনের যুগ। সমাজে নীচুতে যারা বাস করত, তারা শক্তিবলে উপরে উঠে গেল। চণ্ডী, বিষহরি, শীতলার কাহিনীতেও শিবের পূজোর পরিবর্তে চণ্ডীপূজোর প্রবর্তনে এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করা যায়। 'দেবী চণ্ডী নিজের পূজাস্থাপনের জন্য অস্থির। যেমন করিয়া হউক ছলে-বলে-কৌশলে মর্তে পূজাপ্রচার করিতে হইবেই। ইহাতেই বুঝা যায়, পূজা লইয়া একটা বাদ-বিবাদ আছে। তাহার পর দেখি যাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া দেবী পূজা প্রচার করিতে উদ্যত, তাহারা উচ্চশ্রেণীর লোক নহে। যে নীচের তাহাকেই উপরে উঠাইবেন—ইহাতেই দেবীর শক্তির পরিচয়। নিম্নশ্রেণীর পক্ষে এমন সান্ত্বনা, এমন বলের কথা আর কি আছে? যে দরিদ্র দুইবেলা আহার জোটাইতে পারে না, সেই শক্তির লীলায় সোনার ঘড়া পাইল; যে ব্যাধ নীচজাতীয়, ভদ্রজনের অবজ্ঞাভাজন, সেই মহত্ত্বলাভ করিয়া কলিঙ্গরাজের কন্যাকে বিবাহ করিল—ইহাই শক্তির লীলা।...শিব তাঁহার স্বামী বটেন, কিন্তু তাতে কোন সঙ্কোচ নাই। শিবের সহিত শক্তির এই লড়াই। এই লড়াইয়ে পদে পদে দয়া-মায়া বা ন্যায়-অন্যায় পর্যন্ত উপেক্ষিত হইয়াছে।...কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ব্যাধের গল্পে দেখিতে পাই, শক্তির ইচ্ছায় নীচ উচ্চে উঠিয়াছে। কেন উঠিয়াছে, তাহার কোন কারণ নাই— ব্যাধ যে ভক্ত ছিল এমনও পরিচয় পাই না। বরঞ্চ সে দেবীর বাহন সিংহকে মারিয়া দেবীর ক্রোধভাজন হইতে পারিত। কিন্তু দেবী নিতান্তই যথেচ্ছাক্রমে তাহাকে দয়া করিলেন। ইহাই শক্তির খেলা।...ব্যাধকে যেমন বিনা কারণে দেবী দয়া করিলেন, কলিঙ্গরাজকে তেমনি তিনি বিনা দোষে নিগ্রহ করিলেন। তাহার দেশ জলে ডুবাইয়া দিলেন।'—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য: সাহিত্য, পৃ: ১৫১-২।

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তখনকার দিনে ধর্মনীতিসঙ্গত কার্য-কারণ অত্যন্ত বিরল ছিল। দেখা যায়, যে শক্তি নির্বিচারে পালন করছে, সেই শক্তিই আবার নির্বিচারে ধ্বংস করছে। এই পালন ও বিনাশের মধ্যে সাধু ও অসাধুর কোন ভেদ দেখা যায় না। তখনকার দিনে ধর্মাধর্ম-বর্জিত দয়া-মায়াশূন্য শক্তিই প্রাধান্য লাভ করেছিল।

এই বিষম শক্তির প্রতিফলনও দেখা যায় তদানীন্তন কালের নবাব-বাদশাদের ক্ষমতার মধ্যেও। এঁরা ছিলেন খেয়ালি; সুতরাং তাঁদের খেয়ালের সুযোগ নিয়ে ও সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে নীচ জন মহত্ত্ব লাভ করত বা ভিক্ষুকও রাজা হয়ে বসত। যদি এঁরা একবার নির্দয় হতেন, তবে ধর্মাধর্ম যেত তলিয়ে। একেই বলা হ'ত শক্তি। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'এই শক্তির প্রসন্ন মুখ মাতা, এই শক্তির অপ্রসন্ন মুখ চণ্ডী। ইহারই প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ—সেই জন্য সর্বদাই করজোড়ে বসিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু যতক্ষণ ইনি যাহাকে প্রশ্রয় দেন, ততক্ষণ তাহার সাতখুন মাপ—যতক্ষণ সে প্রিয়পাত্র, ততক্ষণ তাহার সঙ্গত-অসঙ্গত সকল আবদারই অনায়াসে পূর্ণ হয়। এইরূপ শক্তি ভয়ঙ্করী হইলেও মানুষের চিত্তকে আকর্ষণ করে। কারণ, ইহার কাছে প্রত্যাশার কোন সীমা নাই। আমি অন্যায় করিলেও জয়ী হইতে পারি, আমি অক্ষম হইলেও আমার দুরাশার চরমতম স্বপ্ন সফল হইতে পারে। এই কারণেই হর্ষ-শোক বিপৎ-সাগরের অতীত শান্ত সমাহিত বৈদান্তিক শিব সে সময়কার সাধারণের দেবতা হইতে পারেন না। রাগদ্বেষ প্রসাদ-অপ্রসাদের লীলাচঞ্চলা যদৃচ্ছাকারিণী শক্তিই তখনকার কালের দেবত্বের চরমাদর্শ। সেইজন্যই তখনকার লোকে ঈশ্বরকে অপমান করিয়া বলিত—দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।'—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য: সাহিত্য, পৃ ১৫৩-৫৪।

ইন্দ্রপুত্রের ব্যাধরূপে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ এবং তাকে দিয়ে চণ্ডীপূজোর প্রচারের মধ্যে একটি ইতিহাসও প্রচ্ছন্ন আছে। ব্যাধ শবরের মধ্যে প্রচলিত পশু বলির সাহায্যে ভয়াবহ পূজোপদ্ধতি এককালে উচ্চ সমাজে প্রবেশ লাভ করেছিল। চণ্ডীমঙ্গলে পাওয়া যায়, যে-কলিঙ্গে শক্তি-পূজো প্রতিষ্ঠিত হ'ল সে-কলিঙ্গ হচ্ছে উড়িষ্যা। এখানে

শৈবধর্মের অভ্যুদয় হয় বৌদ্ধধর্মের বিলোপে ; ভুবনেশ্বরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা তার নিদর্শন। কলিঙ্গের রাজারাও ছিলেন প্রবল। সুতরাং যারা শৈবধর্মবিদ্বেষী ছিল, তাদের আক্রোশ হওয়াই স্বাভাবিক। সাহিত্যে এই আক্রোশ বীজাকারে নিহিত আছে চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর মধ্যে। ধনপতি সদাগরেরও ঠিক তাই হয়েছে। তিনি ছিলেন উচ্চজাতীয় ভদ্র বৈশ্য কিন্তু শিব-উপাসক। কেবলমাত্র এই পাপেই তাঁর যত দুর্দশা ; চণ্ডী তাঁকে নানা দুর্গতির মধ্যে ফেলে ও ছলে-বলে-কৌশলে বশীভূত করে নিজ মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করলেন। এর মূলে যে ব্যাপারটি রয়েছে তা রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় সুস্পষ্ট ধরা পড়েছে। তিনি বলেছেন, 'অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার তরঙ্গ যখন চারদিকে জাগিয়া উঠিয়াছে, তখন যে-দেবতা ইচ্ছাসংযমের আদর্শ, তাঁহাকে সাংসারিক উন্নতির উপায় বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। দুর্গতি হইলেই মনে হয়, আমার নিশ্চেষ্ট দেবতা আমার জন্য কিছুই করিতেছেন না, ভোলানাথ সমস্ত ভুলিয়া আছেন। চণ্ডীর উপাসকেরাই কি সকল দুর্গতি এড়াইয়া উন্নতি লাভ করিতেছিলেন ? অবশ্যই নহে। কিন্তু শক্তিকে দেবতা করিলে সকল অবস্থাতেই আপনাকে ভুলাইবার উপায় থাকে। শক্তিপূজক দুর্গতির মধ্যেও শক্তি অনুভব করিয়া ভীত হয়, উন্নতিতেও শক্তি অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে। আমারই প্রতি বিশেষ অকৃপা, ইহার ভয় যেমন আত্যন্তিক, আমারই প্রতি বিশেষ দয়া, ইহার আনন্দও তেমনি অতিশয় ! কিন্তু যে দেবতা বলেন, সুখ-দুঃখ, দুর্গতি-সদ্‌গতি, ও কিছুই না, ও কেবল মায়া, ওদিকে দৃক্‌পাত করিও না, সংসারে তাহার উপাসক অল্পই থাকে :—সংসার, মুখে যাই বলুক, মুক্তি চায় না, ধন-জন-মান চায়। ধনপতির মত ব্যবসায়ী লোক সংযমী সদাশিবকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিল না, বহুতর নৌকা ডুবিল, ধনপতিকে শেষকালে শিবের উপাসনা ছাড়িয়া শক্তি-উপাসক হইতে হইল।'—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য : সাহিত্য, পৃ ১৪৭।

মঙ্গলকাব্যান্তর্গত শক্তিপূজোর মধ্যে অন্যতম একটি সত্য রবীন্দ্রনাথ দর্শন করেছিলেন, তা হচ্ছে—'সমাজ যখন নিজের চতুর্দিকবর্তী বেষ্টনের মধ্যে, নিজের বর্তমান অবস্থার মধ্যেই সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ থাকে, তখনও সে বসিয়া বসিয়া আপনার সেই অবস্থাকে কল্পনা দ্বারা দেবত্ব দিয়া মণ্ডিত করিতে চেষ্টা করে। সে যেন কারাগারের ভিত্তিতে ছবি আঁকিয়া কারাগারকে প্রাসাদের মত সাজাইতে চেষ্টা পায়। সেই চেষ্টার মধ্যে মানবচিত্তের যে বেদনা, যে ব্যাকুলতা আছে, তাহা বড় সকরুণ। সাহিত্যে সেই চেষ্টার বেদনা ও করুণা আমরা শাক্তযুগের মঙ্গলকাব্যে দেখিয়াছি। তখন সমাজের মধ্যে যে উপদ্রব, উৎপীড়ন, আকস্মিক উৎপাত, যে অন্যায়, যে অনিশ্চয়তা ছিল, মঙ্গলকাব্য তাহাকেই দেবমর্যাদা দিয়া সমস্ত দুঃখ অপমানকে ভীষণ দেবতার অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার সহিত সংযুক্ত করিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিতেছিল এবং দুঃখ-ক্লেশকে ভাঙ্গাইয়া ভক্তির স্বর্ণমুদ্রা গড়িতেছিল।'—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য : সাহিত্য, পৃ ১৫৩।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা মঙ্গলকাব্যের মধ্যে যে সত্য দর্শন করেছিলেন, তাতে বাংলা সাহিত্যের একটি অংশ প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে এবং সেই জন্যই এই কাব্য চিরদিন সমাদৃত হয়ে থাকবে।

বট গাছ

শ্রীশান্তিলতা চক্রবর্ত্তী
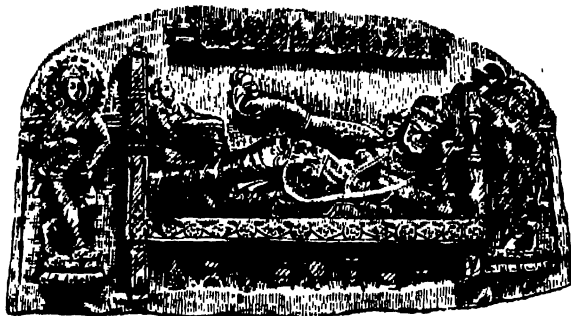
প্রথম দিন ওকে দেখেছিলাম মেল্টিং সেক্শানে। মধ্য প্রদেশের মেটাল এণ্ড ষ্টীল ফ্যাক্টরীর মিস্ত্রী ও।

চাকরির দায়ে বাংলা দেশ ছেড়ে ছুটে এসেছি মধ্য প্রদেশের পাথুরে মাটিতে রুক্ষ আবহাওয়ায়, মন কাঁদছে বাংলা দেশের সরস মাটির জন্যে। মা, ছোট ভাইবোন-গুলোর জলভরা চোখ বার বার মনের মধ্যে ভেসে উঠছে, ভার ভার মন নিয়ে ফ্যাক্টরীতে জয়েন করলাম।

আমাদের সেক্শানের ফোরম্যান বাঙালী। তিনি আমায় দেখে আনন্দ প্রকাশ করলেন। ওঁর সঙ্গে আলাপ শেষ করে সুপারভাইজার মিঃ ত্রিবেদীর সঙ্গে বেরোলাম সেক্শানটা ঘুরে দেখতে।

মিঃ ত্রিবেদী বেশ ভাল মানুষ, বয়সও বেশী নয়, আমার চেয়ে অল্প কিছু বড়। উনি আমায় সেক্শানের সব যন্ত্রপাতি ফার্নেস দেখাচ্ছিলেন, সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়েও দিচ্ছিলেন। প্রথম দিনের কাজ আমার এটিই। সকলের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, সেক্শানের সব কিছু দেখে বুঝে নেওয়া।

দেখতে দেখতে তিন নম্বর ফার্নেসের সামনে দাঁড়িয়ে মিঃ ত্রিবেদীর লোমশ ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল, আমিও মহা অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। তিন নম্বর ফার্নেসের মোল্ডের মুখে এ্যালয় উপচে পড়ছে।

ইলেক্‌ট্রিক ফার্নেস। কন্ট্রোলিং হুইলটাতে বোধ করি কোন গোলযোগ হয়েছে, যার ফলে এই বিপত্তি।

ফার্নেসম্যান অনেকক্ষণ থেকেই বোধ হয় ক্রুশিবলটাকে ডাউন করার চেষ্টা করছে আমরা আসার পর বিপন্ন মুখে আরও দু'একবার চেষ্টা করল, শেষে ঘর্মাক্ত কলেবরে মুখ তুলে অসহায় চোখে তাকাল ত্রিবেদীর মুখের দিকে।

কারখানার যন্ত্রপাতি ফার্নেসের সঙ্গে পরিচয় আমার আছে, কিছু অভিজ্ঞতাও আছে। সেই অভিজ্ঞতাতেই বুঝলাম, ফার্নেসম্যানের চেষ্টাটা কতখানি ছেলেমানুষী। বিকল ফার্নেসের ক্রুশিবল ডাউন করে পজিশনে আনা সহজ লোকের কাজ নয়। ত্রিবেদীও সেটা বুঝতে পেরে-ছিলেন। বুঝেও বিরক্তি-ভরা দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন ফার্নেস-ম্যানের ব্যতিব্যস্ত হাতের দিকে।

ঠিক সেই সময়, ফার্নেসের সামনে আমরা তিনটি মানুষ যখন তিন রকম অভিব্যক্তি নিয়ে জড়ের মত দাঁড়িয়ে আছি—কিছুই করতে পারছি না, সেই সময় ওয়েয়িং মেশিনের কাছ থেকে ছুটে এল একটি লোক।

লোকটিকে দেখে বিস্মিত হলাম। মুহূর্তের জন্যে ফার্নেসের বদমেজাজীপনা, ফার্নেসম্যানের কিংকর্তব্য-বিমূঢ় ভাব, ত্রিবেদীর বিরক্তি সব ভুলে গেলাম। অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলাম লোকটার পেশীবহুল বলিষ্ঠ দেহটার দিকে।

লোকটি একবারও আমাদের দিকে চেয়ে দেখল না, ছুটে গিয়ে দাঁড়াল কন্ট্রোলিং হুইলের পাশে। সবল দুটো হাতে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে চেপে ধরল হুইল।

আমি ওকে দেখে অবাক্ হয়েছিলাম, এখন হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। মনে হ'ল, লোকটা ঈশ্বরের মত ক্ষমতা-শালী। বহু দক্ষ, নিপুণ সমর্থ হাতকে এই অবস্থায় হিম-সিম খেতে দেখেছি, আজ ব্যাপারটা ঘটল ম্যাজিকের মত। ওর হাতের স্পর্শে ভয় পেয়ে যেন ফার্নেসটা আত্ম সংবরণ করল।

আলাপ করার লোভ সামলাতে পারলাম না। ত্রিবেদীর সঙ্গে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

লোকটা তখন ওয়েয়িং মেশিনে মাল ওজন করছে। আমরা কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই হাতের কাজ থামিয়ে মুখ তুলে দেখল।

ওর দু'চোখে বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টি। চোখের আর পলক পড়ে না। যেন পথ চলতে চলতে হঠাৎ একটা ফুলের মিষ্টি সুবাসে আত্মহারা হয়ে ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কেমন তন্ময় হয়ে গেছে।

—ইনি মিঃ রায়। নতুন চার্জম্যান হয়ে এসেছেন। তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান।

ত্রিবেদী আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ওকে দিলেন। পরিচয় পেয়ে বিনয়ে খুশিতে ওর মুখখানা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। বড় বড় হলদে দু'পাটি দাঁত বেরিয়ে পড়ল প্রকাণ্ড গোঁফের তলায়। কি ভয়ানক ওর হাসিটা! যেন ধারাল খড়্গের চকমকানির মত ভয়ঙ্কর, নিষ্ঠুর!

আমার সারাটা অন্তর কেঁপে উঠল। তাড়াতাড়ি

চোখ ফিরিয়ে নিলাম। কে জানে, এই কারখানার কর্মী ছাড়া লোকটার অন্ত পরিচয় আছে কি না। অমন বীভৎস ক্রুর হাসি যে হাসতে পারে—

মধ্য প্রদেশের কুখ্যাত ডাকাত ভূপৎ সিং-এর নাম শুনেছি। হ'লে হ'তে পারে লোকটা তার ডান হাত, কিংবা অনুচর। আলাপ না করতে এলেই হ'ত। এখন হয়ত ওর ঐ চোয়াল-জাগান প্রকাণ্ড মুখখানায় বিনয় প্রকাশ করে হাসির নামে হলদে দাঁতের ঝল্‌কানি দেখাচ্ছে, রাত্রে হয়ত দেখব অন্ধকার ঘরে ওরই হাতে চক্‌চকে ছুরিখানা ঝল্‌সে উঠছে। হায় ভগবান্! ভীরু বাঙালী ঘরের গোবেচারা ছেলে আমি!

—নমস্তে বাবুজী।

চমকে উঠলাম। ফিরে তাকালাম ওর দিকে। হলদে বড় বড় দাঁতগুলো ঢাকা পড়েছে গোঁফের তলায়।

—আপ বাবুজী কাল আয়া হেঁ?

স্মিতমুখে জিজ্ঞেস করল ও।

আমি যেন প্রাণ ফিরে পেলাম। যে ভয়ানক ভাবনাটা আমার মনকে হিম-শীতল করে দিচ্ছিল, সেটার থেকে মুক্তি পেলাম। ঘাড় নেড়ে বললাম, হ্যাঁ, কাল বিকেলে এসেছি।

—হাম দেখা।

আস্তে আস্তে সজীব ও সবল হয়ে উঠলাম। জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি?

—হামার নাম রামআজ্ঞা হুজুর। আপ বঙালী আছে বাবুজী?

—বাঙালী বৈ কি। খাঁটি বাঙালী। চাবুক মারলেও আমার মুখ দিয়ে আয়ে গা, যায়ে গা ছাড়া হিন্দি বেরুবে না।

রামআজ্ঞা হেসে ফেলল আমার কথা শুনে। আমায় আশ্বাস দিয়ে বললে, হামি বঙ্‌লা বাত ভী জানি।

ওর বাংলা জানার নমুনা শুনে আমিও হেসে ফেললাম। উৎসাহ প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলাম, তাই নাকি? কোত্থেকে শিখলে? বাংলা দেশে গেছিলে নাকি?

—নেহি বাবুজী। ইধার ত বহুৎ বঙালী বাবু আছে। কোথা-বারতা বোলতে বোলতে শিখে লিয়েছি।

—বাঃ! তা হ'লে তুমি আমার সাথে বাংলাতেই কথা বল।

—জরুর। হামি আপনার সাথ বঙলামেই কথা বোলবে।

মহাখুশী হয়ে বললে রামআজ্ঞা। তার পর ওর সঙ্গে আরও দু'চারটে কথা ব'লে ফিরে এলাম নিজের জায়গায়।

নতুন জায়গায় নতুন কাজের ভীড়ে রামআজ্ঞার ভাবনাটা আড়াল প'ড়ে গেল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মনে পড়ল মাকে। মাকে চিঠি লেখার সময় রামআজ্ঞার কথা একবারও উল্লেখ করলাম না। আমার ভয়টা পাছে মা'র মনে সংক্রামিত হয়—এই আশঙ্কায় নয়, আসলে ওর কথা আমি ভুলেই গেছিলাম। ছুটির পর ফ্যাক্টরী থেকে বেরিয়ে দেখা হ'ল ওর সঙ্গে।

গেট দিয়ে বেরিয়ে বেশ খানিকটা চ'লে গেছিলাম। হঠাৎ পিছনে ডাক শুনলাম—বা-বু-জী! এ নতুন বাবু!

প্রথমটা বুঝতে পারি নি কে ডাকছে, কাকে ডাকছে। নেহাৎ কৌতূহলবশে থম্‌কে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়েছিলাম। পরে দেখি রামআজ্ঞা আমাকেই ডাকছে।

কি ব্যাপার! বাংলা ভাষার নমুনা শোনানর জন্ত আমায় দাঁড় করাল নাকি। না—

আশেপাশে তাকিয়ে দেখলাম। ফ্যাক্টরীর চার পাশেই ফাঁকা মাঠ। দূরে দূরে গাছপালা। তার ও পাশে কোয়ার্টার। একদিকে কালো মেঘের স্তূপের মত পাহাড় আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

এখন পথটাতে অসংখ্য মানুষের ভীড় বটে, সবে ফ্যাক্টরী ছুটি হয়েছে। কিন্তু আর মিনিট দশেক পরে? চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে ফেললেও কারও কানে সে চীৎকার পৌঁছুবে না।

সত্যি লোকটাকে দেখলেই আমার বুকটা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে যায়। হয়ত আমার বয়স খুব অল্প ব'লে, নয়ত এই প্রথম ঘর ছেড়ে নতুন মাটিতে পা দিয়েছি তাই। এখানে পৌঁছেই নিজেকে কেমন অসহায় মনে হয়েছিল। এখানে আমার কেউ নেই। মা বাবা আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব কেউ না। এখানে আমি একা। সেই একাকীত্বের যন্ত্রণাটাই আমার মনকে দুর্ব্বল করে দিয়েছিল, ভীরু করে তুলেছিল।

রামআজ্ঞা আমার কাছে এসে হাতের সাইকেলটা আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বললে, বাবুজী, হামার সাইকেলঠো লিয়ে আপনে চলিয়ে যান।

বিহ্বল চোখে চেয়ে রইলাম রামআজ্ঞার মুখের দিকে। আমার ভাবনাটা ভয়ানক লজ্জা পেল।

—এ লিন।

সাইকেলটা হাতে ঠেকতেই আমার সম্বিৎ ফিরল। অপ্রস্তুত মুখে বললাম, না না রামআজ্ঞা, সাইকেল আমার লাগবে না।

—নেহি বাবুজী, সাইকেলঠো আপনে লিয়ে যান। বাহারমে এখনও বহুৎ ধুপ আছে। বহুৎ তকলিফ হোবে।

এ কি সুর ওর গলায় !

মাত্র তিন দিন আমি ঘরছাড়া। এই তিন দিনে আমার জীবনটাও যেন মরুভূমির মত শুকনো তৃষিত হয়ে পড়েছে। ওর এই স্নেহস্পর্শে আমার চোখদুটো জ্বালা করে উঠল। আর প্রতিবাদ করতে পারলাম না। এই সুন্দর মুহূর্ত্তটিকে বাদ-প্রতিবাদের কচ্‌কচিতে কণ্টকিত করতে মন চাইল না। নিঃশব্দে উঠে বসলাম ওর সাইকেলে।

নতুন কাজে ঢুকেছি। যথাসাধ্য মন দিয়ে কাজকর্ম করি। সেক্‌শানে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় গিয়ে দাঁড়াই রামআজ্ঞার কাছে। ও মুখ তুলে একটু হেসে ঘাড়টা নোয়ায়, নমস্তে বাবুজী। যতক্ষণ ফ্যাক্টরীতে থাকি, দেখা হলেও রামআজ্ঞা আমার সঙ্গে বেশী কথা বলে না। কিন্তু সন্ধ্যার সময়ই ও অন্য রকম। তখন ও চ'লে যায় আমার কোয়ার্টারে। বাইরে ইজিচেয়ার পেতে বসি—ও একখানা মোড়া টেনে নিয়ে বসে আমার মুখোমুখি।

আমি খুব মিশুকে ছেলে নই। এখানের ক্লাব আড্ডা তাসের আসর কিছুই আমার ভাল লাগে না। তার চেয়ে এই সময়টাতে চুপ করে বসে ভাবতে বেশ লাগে—মা যেন রয়েছেন রান্নাঘরে, অনু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছে, বিনু রুনু খেলতে গেছে, বাবা আসবেন এক্ষুণি। বাবার পিছন পিছন বিনু রুনু খেলা শেষ করে ফিরে আসবে, অনু পাখা হাতে এসে দাঁড়াবে বাবার পিছনে, মা চায়ের কাপ হাতে করে ঐ চৌকাঠের ওপর এসে দাঁড়াবেন---

মনে মনে এই সব অবাস্তব জিনিষ কল্পনা করতে বেশ লাগে। এক-এক সময় মনে হয়, আমার কল্পনাটা বুঝি কল্পনা নয় সত্যি। এরই মধ্যে এসে হাজির হয় রামআজ্ঞা।

সন্ধ্যের ঝাপ্‌সা অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে, মিষ্টি মিষ্টি বাতাস বয়, পাশের কোয়ার্টারে মিঃ খুব সিংএর বাচ্চাটা ঘুমের জন্যে বায়না ধরে কাঁদে, রামআজ্ঞা গল্প বলে, আমি শুনি।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা কেটে গিয়ে রাত্রি নামে, অন্ধকার গাঢ় হয়। এই ঘন অন্ধকারেও রামআজ্ঞার সাহচর্য্যে আমি ভয় পাই নে। বরং ঠিক এমনি ভাবে ইজিচেয়ারে আধ-শোয়া আধ-বসা অবস্থায় নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তে পারি। যেমন নিশ্চিন্তে ছোট বেলায় এখানে-সেখানে ঘুমিয়ে পড়তাম, সকালে উঠে দেখতাম ঠিক মা'র বুকের কাছে শুয়ে আছি।

এখানে এত লোক থাকতে রামআজ্ঞা কেন যে রোজই আমার কাছে আসে বুঝতে পারি নে। আমি কিন্তু ওকে ভালবেসে ফেলেছি। অথচ, ওর মধ্যে, ওই কাল ভৈরবের মত চেহারার মধ্যে আমি কি যে পেলাম, তা কে জানে। বয়সের ব্যবধানও আমাদের দুজনের কম নয়।

আশ্চর্য্য, রামআজ্ঞার আসল বয়সটা এত খুঁটিয়ে দেখেও আমি ধরতে পারি নে। বয়স ওর চল্লিশও হতে পারে—ষাটও হতে পারে। যেন ঐ দুর্দ্ধর্ষ শক্তিশালী মানুষটার কাছে বয়সটাও ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। বার্দ্ধক্য কাছ ঘেঁসতে সাহস পায় নি, শুধু মাত্র আগমনী সঙ্কেতটুকু জানিয়ে দিয়েছে ওর মাথার দু'চার গাছা চুলে।

এই এতখানি বয়সেও ওর শরীরটা লম্বায়-চওড়ায় দশাসই অসম্ভব মজবুত। পেশীগুলো সর্ব্বক্ষণ লোহার বলের মত ওঠা-নামা করছে, নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। রক্ত-মাংসে গড়া বলে মনেই হয় না। মনে হয়, এই মেটাল এ্যাণ্ড ষ্টীল ফ্যাক্টরীতেই বুঝি পিটিয়ে পিটিয়ে তৈরি হয়েছিল।

ওকে দেখলে আমার সোজাসুজি মনে পড়ে যা. বোটানিক্যাল গার্ডেনের দু'শো বছরের পুরাণো বট গাছটাকে। ঐ বট গাছটার মতই ও দু'শো বছর নয়, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছর আগে যেন জন্মেছে এই পৃথিবীতে। ও আদিম যুগের মানুষ। ঠিক সেই ভয়াবহতা ওর চোখে-মুখে। রক্তজবার মত লাল দু'টি চোখ, যেন কোন হিংস্র শপথের রেখায় ভয়াল মুখ। তবু লোকটাকে আমি ভালবাসলাম।

ভালবাসার কারণ নির্ণয় করতে পারলাম না, তবে ওকে দেখতে দেখতে, ওর মুখে আধা বাংলা, আধা হিন্দি শুনতে শুনতে আমি নির্জ্জন পাথুরে পাহাড়ের বুকে ঝর্ণার মিষ্টি গানের সুর শুনতে পেলাম, এ কথা সত্য।

রোজকার মত সেদিনও সন্ধ্যেবেলা রামআজ্ঞা এসে বসল আমার কোয়ার্টারে। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলে, বহুৎ রোজ ত হয়ে গেল বাবুজী, তিন মাহিনা খতম হোল, আভি ত আপকা দিল আচ্ছা হুয়েছে ?

ওর জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চোখ দু'টি মনে প'ড়ে গেল। চট্ করে উত্তর দিতে পারলাম না।

স্নেহ-মমতা-ভরা ঘরখানার মায়া, মা বাবা ছোট ভাইবোনের বিচ্ছেদ-যন্ত্রণার উপশম হওয়ার জন্যে তিন মাস সময়কেই কি যথেষ্ট মনে করে রামআজ্ঞা ?

অবিশ্যি তা ও মনে করতে পারে। যে বয়সে হৃদয়ের অনুভূতিগুলো তীক্ষ্ণ থাকে, সে বয়স ও পেরিয়ে এসেছে। তা ছাড়া ওর কঠিন দেহটার মত মনটাও কঠিন হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

আমাকে নীরব দেখে একটু হেসে রামআজ্ঞা বললে, আমি সমঝেতে পারি বাবুজী। ঘর ছোড়কে বাহার যানেসে দিল বহুৎ কাঁকা লাগে। লেকিন কামকা ওয়াস্তে বাহার মে ত যেতেই হবে। হামার লেড়কাঠো ভী ইস মাফিক।

—তোমার ছেলে ? তোমার কয় ছেলে-মেয়ে ?

—একঠো লেড়কা ঔর একঠো লেড়কী।

—তোমার ছেলেকে ত দেখি নি।

—নেহি বাবুজী। উ ত ইখানে থাকে না। অভ্রখনিমে কাম করে।

—তাই নাকি ?

—হাঁ বাবুজী। হামার লেড়কা উধার নোক্রী করে। উস্‌কো উমর ভী আপকা মাফিক হোবে।

মনে পড়ে গেল প্রথম দিনটির কথা।

সেদিন রামআজ্ঞাকে দেখে আমি যেমন অবাক্ হয়েছিলাম, সহজে চোখ ফেরাতে পারি নি, রাম-আজ্ঞাও তেমনি আশ্চর্য্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে ছিল আমার দিকে,—চট্ করে চোখ নামাতে পারে নি।

আমার ওপর রামআজ্ঞার প্রীতিটাকে এতদিন আমি অন্য ভাবেই নিতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, আমি ওর ওপরওলা, চাকরির খাতিরেই ও বুঝি আমায় তোয়াজ করে। আজ বুঝলাম, ও কবিগুরুর 'কাবুলী-ওয়ালা' গল্পের রহমৎ। তাই ও রোজ আসে আমার কাছে। রামআজ্ঞাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার ছেলে অভ্রখনিতে কত দিন কাজ করছে ?

—দো বরষ। আভিতক উস্‌কো দিল আচ্ছা নেই হুয়েছে। চিঠিমে লিখে—হামি নোকরী ছোড়ে দিব।

রামআজ্ঞার ছেলের অবস্থা দেখছি আমারি মত। মাঝে মাঝে যখন ঘরমুখী মনটা ঘরের জন্য ছটফট করে ওঠে, তখন ভাবি, দুত্তোর ছাই। দিই চাকরি ছেড়ে।

তবু, যেন ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে গেছি এমনি ভাবে জিজ্ঞেস করলাম, তাই নাকি ?

রামআজ্ঞা হাসতে হাসতে বললে, উ লেড়কা পাগলা আছে বাবু। হামি ভী লিখ দিইছি,—নোক্রী ছোড়বে ত হামি তুনার হাড্ডিসে মাস খুলিয়ে লিবো। হাঁ-আঁ।

চেয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। ওর হাসিটার মধ্যে একটু কোমলতা খুঁজতে চাইলাম, পেলাম না।

কে জানে কাবুলীওয়ালা রহমৎ তার মেয়ের গায়ের মাংস খুলে নিতে পারত কি না, রামআজ্ঞাও সত্যি পারে কি না জানি না, কিন্তু ওর হাসিটা !

কেমন একটা মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় আমার সমস্ত অন্তরটা ছটফট করে উঠল।

মাস দুয়েক পরে সেদিন ফ্যাক্টরীতে নিজের চেয়ারে বসে চিঠি পড়ছিলাম।

এই মাত্র ডাক বিলি হয়েছে। বাড়ী থেকে মা'র চিঠি এসেছে। হাতের কাজ ফেলে রেখে তাড়াতাড়ি চিঠিখানা খুললাম। বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে ঝুঁকে পড়লাম চিঠির ওপর।

তার পর কখন যে নিজেকে ভুলে গেছি, সাদা কাগজের ওপর কয়েক লাইন লেখা ছাড়া সমস্ত পৃথিবীটা লুপ্ত হয়ে গেছে আমার সামনে, টের পাই নি। হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদ উত্তপ্ত ছুরির ফলার মত ছুটে এসে বিঁধে ফেলল আমার নিবিষ্ট মনটাকে। আমার বুকের ভিতরটা হিম হয়ে গেল।

—কে কাঁদছে ? কেন কাঁদছে ? এমন আর্ত্তনাদ করছে কেন ? কোন দুর্ঘটনাই কি ঘটল ?

এই ত মাসখানেক আগে শিয়ারিং মেশিনে কপার প্লেট কাটতে গিয়ে—

মহা আতঙ্ক বুকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

সেক্‌শানের এক কোণ থেকে আর এক কোণ পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে ত্রাস। পাগলের মত ছুটোছুটি করে সবাই চলেছে কোল্ড স-এর দিকে। ওদের হৃদ্‌পিণ্ড কাঁপছে থর থর করে, মুখগুলি বিবর্ণ। সাহস করে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি চাপ চাপ রক্ত।

সেই রক্ত-সমুদ্রে পড়ে একটি অসহায় মানুষ অসহ্য

যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে প্রাণ-ফাটা চীৎকার করছে, হায় রামজী।

ত্রিবেদী আর মিঃ গাঙ্গুলীও বেরিয়ে এসেছেন তাঁদের আফিস ঘর থেকে। ব্যস্ত পায়ে ওঁরা ছুটে এলেন আমার কাছে।

পাংশু মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে? কোন দুর্ঘটনা কি?

ত্রিবেদী বললেন, দুর্ঘটনা বলেই ত মনে হচ্ছে। কিন্তু—

সামনে একজনকে দেখে ত্রিবেদী জিজ্ঞেস করলেন, এই যে রঘুনাথ, কে কাঁদছে? কি হয়েছে?

রঘুনাথ ভয়ে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল এক মুহূর্ত। তার পর ভাঙা ভাঙা গলায় বললে, কি জানি। বোধ হয় রামআজ্ঞা কাঁদছে।

—রামআজ্ঞা কাঁদছে? কেন? কি হয়েছে?

তিনজনে এক সঙ্গে সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলাম।

আতঙ্কে রঘুনাথের মুখ ফ্যাকাশে: সে কোন মতে বললে, জানি নে হুজুর। আমি ফার্ণেস-এর কাছে ছিলাম।

বেশী প্রশ্নোত্তর শোনার মত ধৈর্য্য ছিল না। তিনজনেই ছুটলাম কোল্ড স-এর দিকে।

কিন্তু রামআজ্ঞা কাঁদছে, এ যে বিশ্বাস করতে পারি না। ও অমানুষিক পরিশ্রম করতে পারে, ছেলের হাড় থেকে মাংস খুলে নিতে পারে, নিজের হাতের আঙুল কেটে দু' টুকরো হয়ে গেলে হাসতে পারে, কিন্তু কান্না! তাও এমন চীৎকার ক'রে? এমন মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদ করতে পারে রামআজ্ঞা!

না জানি কি বীভৎস দৃশ্য গিয়ে দেখব। হয়ত দেখব রোলিং মিলের চাপে প'ড়ে ওর অর্দ্ধেকটা শরীর থেঁৎলে গেছে, কিংবা ফার্ণেস-এর আগুনে ঝলসে গেছে ওর সর্ব্বাঙ্গ! ওর আধ-পোড়া বিকৃত দেহটা সেকশানের মেঝেয় আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে, পরিত্রাহি চীৎকার করে কাঁদছে রামআজ্ঞা—

—আ-হা-হা-হা! হায় রামজী, এ তুম কেয়া কিয়া? তুম মেরে জিন্দগী বরবাদ কর দিয়া।

দুঃস্বপ্নের মত ভয়ানক চিন্তাটা আমার শ্বাস রোধ করে দিল। অবশ পা দু'খানাকে টেনে নিয়ে পৌঁছলাম শিয়ারিং মেশিনের কাছে।

মেশিনের এ পাশে মস্ত ভীড়। সেকশানের যে যেখানে আছে সবাই উদ্বিগ্ন মুখে ছুটে এসে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। সবাই বাক্যহারা। ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে। বিস্ময় আর ভয়ের ছাপ ওদের মুখে। ভীড়ের মাঝখান থেকে উঠছে আর্ত্তনাদ। আমাদের দেখে ভীড়টা দু' পাশে স'রে পথ করে দিল। ত্রিবেদী আর মিঃ গাঙ্গুলী এগিয়ে গেলেন আগে, ওদের কাঁধের ওপর দিয়ে আমি মুখ বাড়ালাম।

সুস্থ অক্ষত দেহ রামআজ্ঞা মেঝের ওপর উপুড় হয়ে কপাল কুটছে, হাউ হাউ করে কাঁদছে। হরকিষণ, বনমালী ঝুঁকে প'ড়ে ভয়-ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করছে, ক্যা হুয়া? রোতা কাঁহে?

মিঃ গাঙ্গুলীর পিছনে দাঁড়িয়ে আঁতি পাঁতি করে খুঁজলাম, আঘাতটা ওর কোথায়?

না, আঘাত ওর সারা দেহের কোথাও খুঁজে পেলাম না। শুধু ডান হাতের তর্জ্জনীতে ময়লা ব্যাণ্ডেজ জড়ানো। সেই ব্যাণ্ডেজ জড়ানো হাতে রামআজ্ঞা মেঝেয় ঘুষি মারছে, মাথা কুটছে, হা-হা করে কাঁদছে, মেরে জিন্দগী বরবাদ কর্ দিয়া। হায় রামজী!

সপ্তাহখানেক আগে আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে রামআজ্ঞা একটু হেসে বলেছিল, রামজীকি কিরূপা বাবুজী।

সমস্ত ঘটনা-দুর্ঘটনা শুভ-অশুভের ওপর রামজীর অদৃশ্য হাতের স্পর্শ আছে বলে রামআজ্ঞার বিশ্বাস। সেদিন তাই বলেছিল, রামজীকি কিরূপা। আজও সেকশানের মেঝেয় মাথা কুটে কুটে কাঁদছে আর বলছে, হায় রামজী, তুম মেরে জিন্দগী বরবাদ কর্ দিয়া!

কিন্তু অমন শক্তিশালী প্রচণ্ড মানুষটার এমন অসহায় ভাব যেন সইতে পারি না। মনের মধ্যে বড় বেদনা অনুভব করি। সেই মুহূর্ত্তে মনে হয়, আমি ওর চেয়েও অসহায়। রামআজ্ঞা রামজীকে একান্ত ভাবেই বিশ্বাস করে। তাই তাঁর নিয়মকে মেনে নেওয়ার মত শক্তিও ওর আছে। কিন্তু আমার? থাক, নিজের কথা থাক। রামআজ্ঞার আঘাতটা কোথায়? তর্জ্জনীর ঘা'টা ত শুকিয়ে এসেছে। একরকম সেরেই গেছে। চোট খেয়েও তাই এক বিন্দু রক্ত ঝরছে না। অথচ মাত্র এক মাস আগে ঠিক এই জায়গাতেই রক্তস্রোতের মধ্যে সেদিন রামআজ্ঞা বসে ছিল অবিচলিত মুখে।

আমি অবাক্ হয়ে গেছিলাম ওর মুখের দিকে চেয়ে। বিবর্ণ মুখে মাত্র একটি কথাই জিজ্ঞেস করতে পেরেছিলাম, রামআজ্ঞা? মাথাটা একটু সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে হাঁটু ভেঙে বসেছিল রামআজ্ঞা। আমার গলার আওয়াজে মুখ তুলে তাকাল। আমায় দেখলেই ও যেমন খুশী হয়, তেমনি খুশিতে ওর চোখ-মুখ ঝলমল্ করে উঠল। শান্ত হেসে বললে, হাঁ বাবু, আঙুলঠো ক্যায়সে

চলিয়ে গেল শিয়ারিং মেশিন কা নীচুমে, উপরসে বিলেড্ ঠো গিরে গেল—

যেন খুব সাধারণ একটা ব্যাপার ও আমায় বোঝাচ্ছে। আমি কিন্তু শিউরে উঠলাম। আমার গলা দিয়ে ভীতি-পূর্ণ আর্ত্তনাদ বেরিয়ে এল, ইস্, এ কি করেছ রামআজ্ঞা!

সেদিনও ঠিক আজকের মত ছুটে এসেছিলাম শিয়ারিং মেশিনের কাছে। রামআজ্ঞাকে ঘিরে সেদিনও এমনি ভাবে নিঃশব্দ জনতা ভীড় করেছিল।

সেদিন ওর চীৎকারে বা কান্নার আওয়াজে আমি ছুটে আসি নি। মিস্ত্রী কানাইলাল ছুটে গিয়ে ভয়ার্ত্ত মুখে আমায় সংবাদ দিয়েছিল, বাবু, শিয়ারিং মেশিনে রামআজ্ঞার আঙুল কেটে গেছে।

—কি সর্ব্বনাশ!

লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। শিয়ারিং মেশিনে আঙুল কেটে গেছে! ওটা যে কপার প্লেট কাটা ব্লেড। ওর তলায় কপার প্লেট না প'ড়ে মানুষের আঙুল পড়ল! উঃ!

ভাবতে গিয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠেছিল। পাগলের মত ছুটে গেছিলাম। যেতে যেতে ভেবেছিলাম রামআজ্ঞা বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে গেছে।

শুধুই ত দেহের যন্ত্রণা নয়, একটা অঙ্গচ্ছেদ। বিশেষ যে আঙুলের সাহায্যে ও একটা পরিবারের রুটি-রোজগার করে, সেই আঙুল চলে গেলে দৈহিক যন্ত্রণার চেয়ে মানসিক যন্ত্রণাই বড় হয়ে ওঠে। সে যন্ত্রণা দুঃসহ। অজ্ঞান হয়ে যাওয়াটা এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু অবাক্ হয়ে গেলাম রামআজ্ঞার কাছে পৌছে। শিয়ারিং মেশিনের পাশে খানিকটা রক্ত-স্রোতের মধ্যে ও বসে আছে নির্ব্বিকার মুখে। বাঁ হাতে চেপে ধরেছে ডান হাতের তর্জ্জনী, আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝর্ ঝর্ করে রক্ত ঝরছে।

আমায় দেখে ও বললে, হামার কসুর ছিল বাবুজী। দিলঠো আচ্ছা নেই।

রক্ত দেখে আমার মাথা ঘুরে উঠেছিল। সেটা সামলে নিয়ে ক্ষোভের সঙ্গে বললাম, রামআজ্ঞা, ডান হাতের তর্জ্জনীটা চলে গেল!

হেসে উঠে রামআজ্ঞা বললে, মৎ ডরিয়ে বাবুজী। ইয়ে দেখিয়ে, আগাসে থোড়া গিয়েছে। হামি জরুর কাম করতে পারবে।

আঙুলের দিকে চেয়ে শিউরে উঠলাম। তর্জ্জনীর মাথাটা প্রায় পুরো একটা গাঁট সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে পাতলা চামড়ার সঙ্গে লেগে রক্তাক্ত অবস্থায় ঝুলছে। কাটা জায়গা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। দুটো গাঁট নিয়ে বাকী আঙুলটা কাঁপছে থর্ থর্ করে।

অঙ্গচ্ছেদে অঙ্গ কাঁপছে। যেন বিয়োগবেদনায় নিঃশব্দে ফুলে ফুলে কাঁদছে। রামআজ্ঞা নির্ব্বিকার। ওর মুখের ভাব দেখে বোঝার উপায় নেই যে, ওর আঙুলের মাথাটা কেটে আলাদা হয়ে গেছে, বা সেজন্যে কোন যন্ত্রণা আছে। একটা আঙুল যে ওর অকর্ম্মণ্য হয়ে গেল, সেজন্যে কোন আফশোষ নেই।

চামড়ার সঙ্গে ঝোলা আঙুলের মাথাটা বাঁ হাতে ধরে আমায় দেখিয়ে বললে, ইয়ে দেখিয়ে বাবুজী। থোড়াসে গিয়েছে।

কি সর্ব্বনাশ! ব্যথা-বেদনা আফশোষ ত নেই-ই—উপরন্তু গর্ব্বের ভাব!

আমি বিচলিত হয়ে পড়লাম। ব্যস্ত হয়ে বললাম, আঙুলটা চেপে ধর রামআজ্ঞা। রক্ত পড়ছে।

একটু হেসে রামআজ্ঞা বাঁ হাতে আঙুলটা চেপে ধরল।

ইতিমধ্যে ডাক্তারবাবু আর মিঃ গাঙ্গুলীকে নিয়ে ত্রিবেদী এসে হাজির হলেন। রামআজ্ঞার আঙুল দেখে ওঁরা রিপোর্ট লিখে নিলেন। ডাক্তারবাবু তাঁর মতামত লিখে দিলেন। তারপর রামআজ্ঞাকে নিয়ে ডাক্তারবাবু চলে গেলেন হাসপাতালে, আমি ফিরে এলাম নিজের জায়গায়।

ফিরে এলাম বটে, কিন্তু রামআজ্ঞার নিশ্চিন্ত ভাবটা কেমন রহস্যজনক মনে হ'ল।

মানলাম ওর সহ্যশক্তি বেশী। কিন্তু খেটে-খাওয়া মানুষ ও। ডান হাতের তর্জ্জনীটা ওর অকর্ম্মণ্য হয়ে গেল, ও কি ঐ হাতে আর কাজ করতে পারবে? ফ্যাক্টরীর চাকরিটাই কি ওর থাকবে? পাশের টেবিলের কেরাণী মিঃ বোস বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, রামআজ্ঞার মত এক্সপার্ট লোকের এ্যাক্সিডেণ্ট্! আশ্চর্য্য!

মিঃ বোসের কথায় মুখ ফিরিয়ে তাকালাম।

—অবাক হয়ে যাচ্ছেন? কি জানেন, রাম আজ্ঞা মহা ধড়িবাজ লোক। আঙুলটা একেবারে মাপ মতই কেটেছে।

ঘুরে বসলাম মিঃ বোসের দিকে মুখ করে।

রহস্যময় হাসিতে মিঃ বোসের ঠোঁটটা একটু বেঁকে গেল। বললেন, ওইটুকু আঙুলের বদলে টাকা পাবে দু'হাজার।

—তাই নাকি?

মনে মনে ভাবলাম, ক্ষতিপূরণ রামআজ্ঞা হয়ত পাবে, কিন্তু ওর চাকরি!

—হ্যাঁ মশায়। ওইটুকু কেটেছে বলেই বেশী টাকা পাবে। সবটা আঙুল গেলে ত কম পেত। তা ব্যাটা মহা চালাক।

সংশয়ভরা চোখে চেয়ে রইলাম মিঃ বোসের মুখের দিকে। সেটা লক্ষ্য করে উনি বললেন, আপনি ত মশায় সবে ঢুকেছেন। নিয়ম-কানুন কিছুই জানেন না। আমি চাকরি করছি আজ সাত বছর। আমাদের চেয়ে লেবারগুলো অনেক বেশী ভাগ্যবান্। ওরা ঝট্‌ঝট্‌ প্রমোশন পায়, একটু কেটে-ছড়ে গেলে ক্ষতিপূরণ পায়। কি কুক্ষণে যে মশায় এই কেরাণীর চেয়ারে বসেছিলাম!

জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, ওর চাকরি নিয়ে কোন-রকম গোলমাল, মানে ডান হাতের আঙুল—

—সে মশায় বুড়ো আঙুল। সেদিক্ দিয়ে বেঁচে গেছে। চাকরি ওর ঠিক থাকবে। চাই কি প্রমোশন-ই হয়ে যাবে। এদিকে আবার কড়কড়ে দু'হাজার টাকা। হতভাগা সকাল বেলা জানি কার মুখ দেখে কাজে এসেছিল। খুব জিতে গেল।

সত্যিই জিতে গেল রামআজ্ঞা। মিঃ বোসের কথা সত্যি হলে জিতে গেল বৈ কি? কিন্তু ও কি ইচ্ছা করে শিয়ারিং মেশিনের তলায় আঙুলের মাথাটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল? তাই কি কখনও সম্ভব? সে কি কেউ পারে?

রামআজ্ঞার মত দক্ষ কর্মী সেক্‌শানে আর একটিও নেই, সে কথা সত্যি। ওর এ ধরণের এক্‌সিডেন্ট্ সত্যিই আশ্চর্য্যের। কিন্তু ভুল ত মানুষ মাত্রেরই হয়। হয়ত ও অন্যমনস্ক ছিল, মন ভাল ছিল না।

রামআজ্ঞা যত বড় নিষ্ঠুরই হোক না কেন, ক্ষতি-পূরণ পাওয়ার জন্যে নিজের আঙুল ব্লেডের তলায় ঢুকিয়ে দেবে, এ কথা বিশ্বাস করতে মন রাজি হ'ল না।

দিন কুড়ি বাদে রামআজ্ঞা ফ্যাকটরীতে হাজিরা দিল। আমায় দেখে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতখানা কপালে ঠেকিয়ে হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললে, নমস্তে বাবুজী।

জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছ রামআজ্ঞা? আঙুলটা সেরেছে?

—হাঁ বাবু! বিলকুল আচ্ছা হোয়ে গিয়েছে।

—ব্যথা-বেদনা নেই ত?

রামআজ্ঞা হেসে বললে, নেহি বাবু। বেথা থাকবে কাহে?

কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, শুনলাম তুমি নাকি অনেক টাকা পাবে?

আমার প্রশ্নে রামআজ্ঞা অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। একটু হেসে নরম সুরে বললে, রামজীকি কিরপা বাবুজী। রূপায়াকে লিয়ে লেড়কী-ঠোর সাদী দিতে পারছিলাম নাই।

হতবুদ্ধি হয়ে চেয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে।

ও হয়ত বুঝতে পারল আমার মনোভাব। গম্ভীর ভাবে বললে, কোম্পানীকা কানুন এইসাই হ্যায় বাবুজী।

—ও। তা সে ত অনেক টাকা—

—হাঁ বাবুজী। দু' হাজার রূপায়া। লেড়কীঠো বহৎ বড় হুয়ে গিয়েছে। আভী উস্‌কো সাদী দিয়ে দিবো। সোব রূপায়া সাদীমে খোরোচ করবে।

বলতে বলতে রামআজ্ঞার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বাঁ হাতে কাটা আঙুলটাতে পরম স্নেহে হাত বুলোতে লাগল। যেন মেয়ের গায়েই ও হাত বুলোচ্ছে।

হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে।

একবার মনে হ'ল, ভাল ঘরে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্যই বোধ হয় রামআজ্ঞা ইচ্ছা করে ব্লেডের তলায় আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তাই সেদিন যন্ত্রণা অনুভব করতে পারে নি। একটু আর্ত্তনাদ করে নি।

কিন্তু আজ এমন আর্ত্তনাদ করছে কেন? সেক্‌শানের মেঝেয় মাথা কুটে কুটে চীৎকার করছে কেন, হায় রামজী? তুম মেরা জিন্দগী বরবাদ কর দিয়া!—যেন ওর বুকটা কেউ ছুরি দিয়ে চিরে ফেলে হৃদ্‌পিণ্ডটা উপড়ে নিয়েছে।

এগিয়ে গেলাম কাছে। নীচু হয়ে ডাকলাম, রাম-আজ্ঞা, ওঠ। উঠে বস। কি হয়েছে? কাঁদছ কেন?

আমার গলার আওয়াজে ও ধড়মড় করে উঠে বসল। কান্না থামিয়ে এক মুহূর্ত্ত চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। তার পরেই—বাবুজী মেরা লেড়কা—বলে হাউ হাউ করে কেঁদে টেলিগ্রামখানা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে।

দিন-দুয়েক বাদে ছুটির পর ফ্যাক্টরী থেকে বেরুচ্ছি, দেখি গেটের পাশে রামআজ্ঞা সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ছেলের মৃত্যু-সংবাদ আসার পর রামআজ্ঞা সাত দিনের ছুটি নিয়েছে। ফ্যাক্টরীর সামনে ওকে দেখে একটু অবাক্ হলাম।

ও এগিয়ে এল আমার কাছে। মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে বললে, বাবুজী, সাইকেলঠো লিয়ে এসেছি।

ও যে কি বলতে চায় বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, কেন? কি হবে সাইকেল দিয়ে?

রামআজ্ঞা একবার চোখ তুলে তাকাল আমার মুখের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে মৃদুস্বরে বললে, হামি ত সাত রোজের ছুটি লিয়েছি বাবু। সাইকেলঠো ঘরমে পড়িয়ে আছে। আপনে লিয়ে যান। ধূপমে আপনের ত বহুৎ কোষ্টো হোয়।

মাঝে মাঝে ফ্যাক্টরীতে যাতায়াতের পথে রামআজ্ঞার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে এক রকম জোর করেই ও আমায় সাইকেলের পিছনে তুলে নিয়েছে। কিন্তু এমন ভাবে সাইকেল নিয়ে কোনদিন আমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে নি। এমন কি আঙুল কাটা যাওয়ার পর ও যখন দিন-কুড়ি ছুটিতে ছিল, তখনও সাইকেলটা ঘরে পড়ে আছে বলে আমার জন্যে ফ্যাক্টরীর দরজায় অপেক্ষা করে নি। অথচ, আজ—

বললাম, মিছে ব্যস্ত হচ্ছ রামআজ্ঞা। কোয়ার্টার ত কাছেই। সাইকেল আমার লাগবে না।

—বাবুজী!

এমন করুণ স্বরে রামআজ্ঞা আমায় ডাকল, এমন কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে যে, একটি মাত্র ডাকে, একটুখানি চাউনিতে আমি ওর শূন্য-মনের দৈন্যটা বুঝতে পারলাম।

সাইকেলটাতে আমার প্রয়োজন না থাকতে পারে, কিন্তু সদ্য পুত্রহারা বাপের স্নেহ-করুণ আবেদনটাকেই বা অগ্রাহ্য করি কি করে? রামআজ্ঞার হাত থেকে সাইকেলটা টেনে নিলাম।

ও একটু খুশী হ'ল। বললে, বহুৎ ধুপ আছে বাবুজী। আপনার ত বোড্ডো কোষ্টো হোয়। ইস্‌লিয়ে হামি সাইকেলঠো লিয়ে এসেছি।

বলতে বলতে রামআজ্ঞার চোখ দু'টো ছল ছল করে উঠল। ওর মুখের দিকে চেয়ে মনে হ'ল, রামআজ্ঞা জীবনে চরম আঘাত পেয়েছে সত্য, কিন্তু তাতে ওর জিন্দগী বরবাদ হয়ে যায় নি। ওর মনের স্নেহ-ধারাটি শুকিয়ে যায় নি। বরং এই আঘাতে উত্তাল হয়ে ওর পাথুরে দেহটার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে পথ খুঁজে মরছে।

এতদিন যে স্রোত ছিল একমুখী, এখন সেটা সহস্র ধারায় বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। তারই একটি ধারায় আমি এই মুহূর্তে স্নান করে উঠলাম।

এর পর মাসদুয়েক কেটে গেছে। নির্দিষ্ট সময়ে রামআজ্ঞা ফ্যাক্টরীতে জয়েন করেছে। বিরাট্ শরীরের বিপুল শক্তিটাকে, অসীম কর্ম্মদক্ষতাকে আগের মতই কাজে লাগাচ্ছে।

ওর ছেলের মৃত্যুটা পুরণো খবর হয়ে গেছে। নূতন খবর—ও মেয়ের বিয়ের জন্যে চেষ্টা করছে।

আগের মতই সন্ধ্যাবেলা ও আমার কোয়ার্টারে এসে বসে। ওর আগ্রহে কোয়ার্টারের সামনে ক'টা ফুলের চারা লাগিয়েছি, সেগুলোর পরিচর্য্যা করে। সেই সময় একদিন একখানা চিঠি আমার হাতে দিয়ে বললে, দেখিয়ে ত বাবুজী, এ চিঠিমে কি লিখা আছে।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে দেখতে গিয়ে মনে পড়ে গেল রামআজ্ঞার ছেলের মৃত্যুটাকে। লরীর ড্রাইভার ছিল সে, ট্রাক উলটিয়ে খাদের মধ্যে পড়ে গেছিল, আর তাতেই—

রামআজ্ঞার ছেলেকে আমি দেখি নি। শুধু জানি সে ছিল—এখন নেই। তার থাকা-না-থাকা দুই-ই আমার কাছে সমান। তার জন্যে কোনদিন মনের মধ্যে বেদনা বা কাতরতা অনুভব করি নি। কিন্তু রামআজ্ঞাকে আমি কি বলব?

—অভ্‌ভর খনিসে লিখা হায় বাবুজী?

বেদনাহত দৃষ্টিতে তাকালাম ওর মুখের দিকে। আড়ষ্ট ঘাড়টাকে একটু নাড়লাম।

—কি লিখিয়েছে বাবুজী? অংরেজী হামি থোড়া থোড়া পড়তে পারি, লেকিন—

—ওরা তোমায় কতগুলো জিনিষ পাঠিয়েছিল—

—জিনিষ!

রামআজ্ঞার চোখের দৃষ্টিটা ম্লান হয়ে উঠল।

—হ্যাঁ। একটা শার্ট, একটা ফুল প্যান্ট, তিনটে সিগারেট সুদ্ধ একটা চারমিনারের প্যাকেট, ফেল্ট্ হ্যাট, একখানা চিরুণী, একখানা রুমাল—

আমার গলার স্বরটা বুজে গেল।

রামআজ্ঞা স্তব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার দিকে। নির্ব্বাক্ ওর কণ্ঠ, নিষ্পন্দ দেহ।

—অভ্রখনি থেকে জিনিষগুলো পাঠিয়েছিল। পেয়েছ কি না জানতে চেয়েছে।

ছোট্ট একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে রামআজ্ঞা ঘাড় নাড়লে, বললে, পেয়েছি বাবুজী। লেকিন ও সামান হামি ঘরমে লিতে পারি নি। উধার যো একঠো খদ আছে, উসিমে ফেক দিয়েছি।

একমাত্র ছেলের শেষ স্মৃতি ফেলে দিয়েছে রাম-আজ্ঞা! জিজ্ঞেস করলাম—ফেলে দিয়েছ?

—হাঁ বাবুজী। ও সামান হামার লেড়কার। লেড়কাঠো উধার মরিয়ে গেলো, তো উসকো সামান কোম্পানী ভেজলো হামার পাসমে। এহি কোম্পানীকা কাহ্ন। লেকিন হামারা ভী কাহ্ন আছে বাবুজী।

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালাম ওর মুখের দিকে।

—বাবুজী, হামারা ঘরমে বুড্ডী মা আছে—বহু আছে। উ লোগ বহুৎ রোয়। এ সামান দেখনেসে উ লোগ রোতে রোতে অন্ধা হুয়ে যাবে। মর্ যাবে বাবুজী।

দু'হাতে মুখ ঢেকে রামআজ্ঞা বসে পড়ল মোড়ার ওপর। আমি চেয়ে রইলাম ওর দিকে। দেখলাম ওকে। দেখলাম, একটি বিরাট্ বটগাছ,—মূল কাণ্ডটি বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও শত শত বৎসর ধ'রে বেঁচে রয়েছে। তার শাখা-প্রশাখা ঝুড়িপাতা বিস্তার করে অনেকখানি জায়গা ছায়া-সুশীতল করে রেখেছে। একশো দু'শো হাজার বছর ধ'রে ও বেঁচে থাকবে। বেঁচে থাকবে রামআজ্ঞা।

শত সহস্র যুগ আগে, সেই আদিম যুগে রামআজ্ঞা জন্মেছিল মানুষ নাম নিয়ে, আজও বেঁচে আছে। লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে, পৃথিবীর শেষ দিনটি পর্য্যন্ত ও বেঁচে থাকবে। বেঁচে থাকবে মানুষ নামে সমস্ত মানুষের মধ্যে।

বাৎস্যায়নের কালে নাগরক জীবন

শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু

ঐতিহাসিকদের মত এই যে, খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর রচনা হইল বাৎস্যায়ন-প্রণীত কামসূত্র। কামকলার নানা অলিগলিনির্দেশক গ্রন্থ হইলেও ইহাতে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-জীবনের অনেক অজ্ঞাত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। ইহাতে নাগরকের স্ফূর্তিচঞ্চল জীবন সম্বন্ধে বিবরণ আছে, যেমন তাঁদের বাসভবন, বাগান-বাগিচা, আমোদ-প্রমোদ, সুরুচি-সংস্কৃতি। 'নাগরক-বৃত্তম্' নামক অধ্যায়টিতে শহুরে মানুষের গুণাগুণ—তাঁদের চাতুর্য, তাঁদের শাঠ্য সম্বন্ধে কথা আছে। বাৎস্যায়নের সময়ে যারা সাধারণ লোকের চেয়ে কিছুটা বিশেষত্ব লাভ করিত—অর্থাৎ মেধায়, বিদ্যায়, শিল্পকলায় দক্ষতা অর্জন করিত—তারা নগরেই আকৃষ্ট হইত, এবং কোন রাজারাজড়ার পৃষ্ঠপোষকত্বে চাকরি পাইত, অথবা কোন ধনী নাগরকের আওতায় আসিয়া বিদূষক বা বৈহাসিকের পদে বাহাল হইত, অথবা, কোন শিল্পপতি বা বণিকের সঙ্ঘে নাম লিখাইত, অথবা, পৌরসভার সভ্য হইত।

শহুরে জীবনের আনন্দস্রোতের প্রতি এই যে প্রবল আকর্ষণ, তাহা হইতে মনে হয় যে, ভারতের প্রাচীনযুগে শহরের সংখ্যা অল্প ছিল না। ঋগ্বেদে গ্রাম, গ্রামীণ, মহাগ্রাম ও পুরের কথা আছে; পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে, যথা মানবগৃহ্যসূত্রে, গ্রাম, নগর ও নিগমের উল্লেখ আছে; পাণিনির সূত্রে নগর ও নাগরকের দৃষ্টান্ত আছে; মেগাস্থিনিসের বিবরণ ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বড় বড় শহর ও তাদের পৌরসংস্থা ও পৌর-শাসন-পদ্ধতির বিবৃতি পাওয়া যায়; বৌদ্ধজাতক ও অন্যান্য পালিপুস্তকে অসংখ্য নগর ও তাদের রাষ্ট্রীয় শাসন-সংক্রান্ত ইতিহাস আছে—যথা, মিলিন্দ-পন্‌হোতে 'শাকল'-পুরী সম্বন্ধে চমৎকার বর্ণনা আছে, অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ও ললিতবিস্তরে সে যুগের অনেক সমৃদ্ধ নগরের পরিচয় মিলে।

বাৎস্যায়নের কাল গুপ্ত-পূর্ব হওয়ায় সে-সময় ছোট-বড় শহরের সংখ্যা বড় কম ছিল না; কারণ, ভারতে তখন একচ্ছত্র সম্রাট্ না থাকায় উহা অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল এবং রাজধানীর সংখ্যাও অনুরূপ থাকা স্বাভাবিক। এ ছাড়া ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের পীঠস্থানগুলি ব্যবসা ও বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিয়াছিল। 'ফুনান্-তু-সু-চুয়াং' খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের একখানা চীনা বই; তাহাতে আছে খ্রীষ্টপূর্ব ৫৩ অব্দে কৌণ্ডিণ্য ইন্দোচীনে এক ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপন

করেন, যেটি বৈদেশিক বাণিজ্য-প্রসারের এক বিশাল কেন্দ্র ছিল। ভারতীয়েরা চীনের সঙ্গে সামুদ্রিক পথে ব্যবসা চালাইত, 'জিনান'-এর (বর্তমান ভিয়েটনাম) মধ্য দিয়া ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ইন্দোচীনে গমনাগমন করিত। অশোকের শিলালিপি হইতে জানা যায়, ভারতের সহিত এশিয়া-মাইনর ও অন্যান্য প্রতীচ্য ভূখণ্ডের বহুদিন যাবৎ যোগাযোগ বর্তমান ছিল এবং কুশানরাজ্য ভারতের উত্তর-পশ্চিমে অনেকটা প্রসারিত থাকায় পূর্ব-পশ্চিমে বাণিজ্যপথ খোলা ছিল, তজ্জন্য সভ্যজগতের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যসূত্র এক সুদৃঢ় বাঁধনে বাঁধা ছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে জনৈক কুশানরাজের উপাধি ছিল—"মহারাজ রাজাতিরাজ দেবপুত্র কৈসর-কণিষ্ক।" ইহা হইতে ধারণা হয় যে, সে সময়ে ভারতীয়-চৈনিক-রোমান এই ত্রয়ী সভ্যতার সমন্বয় ঘটিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে প্লিনি ও দ্বিতীয় শতকে টোলেমি বলিয়া গিয়াছেন যে, সে সময়ে রোমক-সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য-সংযোগ পুরাদমে চলিয়াছিল। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, পরবর্তী বাৎস্যায়নের সময়ে ঐ ব্যবসাবাণিজ্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' কথাতেই আছে। প্রাচীন ভারতের সর্বাতিশয়ী ঋদ্ধি নিশ্চয়ই অত্রস্থ নাগরকের জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাই নাগরকের জীবনের পত্রে-পত্রে যথা, গৃহের মার্জিত পরিকল্পনায়, উহার মনোরম আসবাবপত্রে, নাগরকের বেশভূষার পারিপাট্যে ও অলঙ্কার-মণ্ডনে, খেলাধূলায়, দান-দক্ষিণায়, অর্থ ব্যয়ের অবাধ প্রাচুর্যই দেখা যায়।

নাগরকের বাসভবনের নির্মাণ-কৌশল হইতে গৃহস্বামীর স্থাপত্য-জ্ঞান ও সৌন্দর্য-প্রীতি উপলব্ধি হয়, আসবাবপত্র ও প্রকোষ্ঠের কারুকার্য হইতে তাঁর শিল্পবোধ ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। নাগরকের গৃহটি কোন জলাশয়ের নিকটবর্তী হইতেই হইবে। ইহার দুইটি মহল, অন্তঃপুর ও বহির্বাটিকা। বহির্বাটিতে নাগরকের যাবতীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্য সম্পাদিত হয় ও তিনি অতিথি-অভ্যাগতের সঙ্গে আলাপ-আপ্যায়নে রত থাকেন। গৃহসংলগ্ন বৃক্ষবাটিকাটিতে পুষ্পবৃক্ষ, ফলের গাছ, ভেসজ-উদ্ভিদ্ এবং রন্ধনের জন্য শাকসব্জী উৎপন্ন হয়। বাগিচার মধ্যস্থলে কূপ অথবা পুষ্করিণী। বাগিচাটি অন্তঃপুর সংলগ্ন, যাহাতে বাটীর গৃহিণী বৃক্ষাদি দেখাশুনা করিতে পারেন। বাগিচায় যূঁথি, জাতী, নবমল্লিকা, জবা, কুরন্তকপুষ্প শোভা পাইতেছে ও তাদের সুগন্ধ চারিদিকে আমোদ বিকিরণ করিতেছে। বাগিচার মধ্যে মধ্যে কুঞ্জ এবং স্থানে স্থানে বিশ্রামের জন্য চত্বর নির্মিত আছে।

কোন কোন ধনাঢ্য নাগরকের বিশাল হর্ম্য ও প্রাসাদ থাকিত, যার উন্মুক্ত ছাদে বিহার করিতে করিতে কর্তা ও গৃহিণী নীলাকাশে ভ্রাম্যমান গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করিতে পারিতেন। প্রকোষ্ঠগুলির মেঝে মোজাইক বা মার্বেল পাথরের, এবং প্রবালখচিত। বৃক্ষবাটিকার অভ্যন্তরে ইঁহাদের আরামের জন্য "সমুদ্রগৃহ" থাকিত, অর্থাৎ জলাশয়বেষ্টিত শীতল গ্রীষ্মালয়। ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তা'য় এইরূপ সমুদ্রগৃহের উল্লেখ আছে। (পঞ্চম দৃশ্য দ্রষ্টব্য।) কালিদাসের রঘুবংশে ঐরূপ প্রমোদালয়ের কথা আছে—"দীর্ঘিকাঃ গূঢ়মোহনগৃহাঃ" (১৯।৯)। আসবাবের মধ্যে নাগরকের শয়নঘরে দুটি সুকোমল কৌচ ও তৎপার্শ্বে শুভ্রশয্যা পরিপাটি করিয়া আস্তীর্ণ। শয্যার শীর্ষে 'কূর্চস্থান' বা কুলুঙ্গি থাকিত, বোধ হয় তাঁর ইষ্টদেবতার মূর্তি রাখিবার জন্য। কৌচের সন্নিকটে কার্পেটের উপর মস্তক রাখিবার জন্য গির্দা বা তাকিয়া এবং দাবা ও পাশা খেলার সরঞ্জাম থাকিত। শয়ন-প্রকোষ্ঠের বহির্দেশে অলিন্দে থাকিত পক্ষিশালা, গৃহের নির্জন স্থানে লেদ, বাটালী, করাতজাতীয় যন্ত্র থাকিত, অবসরমত নাড়িয়া-চাড়িয়া আমোদ উপভোগ করিবার জন্য,—"একান্তে চ তুর্কতক্ষণস্থানমস্যাসাং চ ক্রীড়ানাম্" (কামসূত্র।)

নাগরক ছিলেন সে যুগের বেশ ছিমছাম্ কেতাদুরস্ত ব্যক্তি; তাঁর দৈনন্দিন কার্যক্রম সম্বন্ধে বাৎস্যায়ন এক সুন্দর চিত্র দিয়াছেন। প্রাতে শয্যাত্যাগ, প্রাতঃকৃত্য সমাধান, মুখপ্রক্ষালন ও দন্তমঞ্জন। অতঃপর প্রসাধন ব্যাপারে আত্মনিয়োগ। সেটি কিরূপ বলিতেছি। প্রসাধনের প্রথম বস্তুটি হইল 'অনুলেপন', উহা একপ্রকার মিহি করিয়া বাঁটা চন্দনের সুগন্ধি মলম—'অচ্ছীকৃতং চন্দনমন্যদ্বানলেপনং'। এই অনুলেপন খানিকটা দেহে মাখা তাঁর প্রথম কাজ। তার পর, ধূপের মিষ্টগন্ধী ধূমে পরিধেয়বস্ত্র সুগন্ধিযুক্ত করা তাঁর দ্বিতীয় কাজ। অতঃপর কণ্ঠে মাল্যধারণ ও নয়নে অঞ্জন-প্রলেপ এবং অধরোষ্ঠ অলক্তকরাগে রঞ্জিত ও মসলাযুক্ত তাম্বুলচর্বণ করিয়া মুকুরে স্বীয় অনুপম দেহযষ্টির কলাসৌষ্ঠব অবলোকান্তে গৃহকর্মে যোগদান। কেশের বিন্যাসে তাঁর মনোযোগ তীক্ষ্ণ। হস্তে মূল্যবান অঙ্গুরীধারণ। ললিতবিস্তরে আছে—'অনেকশতসহস্রমূল্যমঙ্গুলীয়কম্'। পরিধেয়বাস দুই প্রস্থ,—বস্ত্র ও উত্তরীয়। উত্তরীয় কুসুমগন্ধসিক্ত।

প্রাতঃকালীন কর্মশেষে নাগরক প্রত্যহ স্নানাভিষেক

করিতেন। একদিন অন্তর অঙ্গ-সংবাহন ও কেশ 'উৎসাদন' করিতেন; দুইদিন অন্তর সাবানযোগে ("ফেনক") শরীর প্রক্ষালন করিতেন; তিনদিন অন্তর মুখবিবরের নিম্নভাগ (অধর ও চিবুক) পরিষ্কার করা দীর্ঘায়ুর লক্ষণ ("আয়ুষ্যম্") বলিয়া বিবেচিত হইত; পাঁচদিন (কদাপি দশদিন) অন্তর ক্ষৌরকার্য-সম্পাদন এই ছিল নিয়ম।

"নিত্যং স্নানং, দ্বিতীয়কমুৎসাদনং, তৃতীয়কঃ ফেনকঃ, চতুর্থকমায়ুষ্যম্, পঞ্চমকং দশমকং বা প্রত্যায়ুষ্যমিত্যহানম্" (সূত্র—১৭)॥

দাড়ি কামান সম্বন্ধে বর্তমান স্কুলবাবুদের মত রুচি-বাগীশ না হইলেও, আঙুলের নখ ও দাঁত সম্বন্ধে নাগরক একটু বেশীমাত্রায় যত্নশীল ছিলেন। নখের বিশিষ্ট বাঁকা ছাঁট ও তাদের কোমলতা, মসৃণতা ও পরিচ্ছন্নতার দিকে তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। দাঁতের পরিচ্ছন্নতার দিকেও অনুরূপ দৃষ্টি দিতেন নাগরক। কেশ, নখ ও দাঁতের প্রতি তাঁর শিল্পীমানসসুলভ দৃষ্টি নাকি প্রেমচর্চার পক্ষে অনুকুল বলিয়া গণ্য হইত। এতদ্ভিন্ন স্বেদ অপনোদনের জন্য তিনি সর্বদা রুমাল ("কর্পট") ব্যবহার করিতেন।

নাগরক দিনে দুইবার আহার করিতেন, মধ্যাহ্নে এবং অপরাহ্ণে অথবা সন্ধ্যার পর। বাৎস্যায়ন তিন প্রকার আহার্যের কথা বলিয়াছেন,—ভক্ষ্য (শক্ত আহার্য), ভোজ্য (নরম আহার্য) ও পেয় (পানীয়)। তাঁর খাদ্য-সামগ্রীর অন্তর্গত ছিল এইগুলি—অন্ন, গম, যব, দাইল, প্রচুর সব্জী ও দুধ, এবং এগুলোর রন্ধনে ঘি, মাংস, মিষ্টান্ন, লবণ ও তৈল ব্যবহৃত হইত। মিষ্টান্নের মধ্যে গুড়, শর্করা ও খণ্ড-খাদ্য অন্তর্ভুক্ত। খাদ্য হিসাবে মৎস্যের কথা বাৎস্যায়ন বলেন নাই, তবে মাংসের কথা আছে। মাংস সুপ করিয়া অথবা ঝলসাইয়া খাওয়ার রীতি ছিল। নাগরকের পানীয়ের মধ্যে বৈচিত্র্য ছিল। জল ও দুধ ব্যতীত টাট্‌কা ফলরস, মাংসের নির্যাস, কাঞ্জি, আম ও পাতিলেবুর রসে শর্করা মিশ্রিত করিয়া সরবত। তীব্র পানীয়ের মধ্যে কয়েক জাতীয় মদ্য ব্যবহৃত হইত যথা, সুরা, মধু, মৈরেয়, আসব। কাষ্ঠ বা ধাতুনির্মিত "চষক" নামক পাত্র হইতে ঢালিয়া মদ্য পান করা হইত এবং মদ্যের স্বাদুতা বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ মিষ্টান্ন এবং মুখরোচক তিক্তজিনিষ খাওয়া হইত (আমরা বর্তমানে যাকে "চাট" বলি তাহাই মদের অনুপান ছিল)।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর নাগরক কিছুক্ষণ নিদ্রা উপভোগ করিতেন, অথবা, পীটমর্দ ও বিদূষক প্রভৃতির সহিত হাসিখুশিতে কাটাইতেন, অথবা, টিয়া-চন্দনা প্রভৃতি বিহঙ্গের কাকলী শুনিতেন, অথবা মোরগ, তিতির, মেড়ার লড়াই দেখিতেন, অথবা নানাপ্রকার চারুশিল্পের নিদর্শন উপভোগ করিতেন। আমোদ উপভোগের জন্য হরেকরকম কাকাতুয়া পুষিয়া তাদের মিষ্ট আলাপ শুনিতেন, অথবা ময়ূরের উজ্জ্বল পক্ষবিস্তার শোভা নিরীক্ষণ করিতেন, অথবা বাঁদরদের অদ্ভুত ক্রীড়ানৈপুণ্যে কৌতুক অনুভব করিতেন।

অপরাহ্নে মনোরম সাজে সাজিয়া নাগরক "গোষ্ঠীতে" উপস্থিত হইতেন; সেখানে বন্ধুবান্ধবদের সহিত নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চিত্তবিনোদন করিতেন অথবা হাস্যকৌতুকে কাটাইতেন। রাত্রে স্বগৃহে গীত-বাদ্যে ও মাঝে মাঝে নৃত্যাদি গান্ধর্ব অনুষ্ঠানে তিনি চক্ষু কর্ণের তৃপ্তিলাভ করিতেন।

নাগরক ও তস্যপত্নীর জীবনের বৈপরীত্য সুমেরু-কুমেরুবৎ। বাৎস্যায়ন নাগরকের যে জীবনচিত্র আঁকিয়া-ছেন, আমরা দেখিলাম, তাহা বিবিধ ইন্দ্রিয়সুখকে কেন্দ্র করিয়াই অঙ্কিত হইয়াছে; কিন্তু তাঁর পত্নীর জীবনকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে কর্তব্যকর্মের বিরাট্ বোঝা। বর্ণশাস্ত্রগুলিতে স্ত্রীর যে আদর্শ উপস্থাপিত হইয়াছে নাগরক-স্ত্রী সেই আদর্শকেই জীবনের ধ্রুবতারা করিয়া-ছেন। তাঁহার কর্তব্যের ফিরিস্তি একে একে দিতেছি:

ভক্ত যেমন শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ইষ্টদেবতার পূজা করেন ঠিক সেইরূপ ভক্তির সহিত নাগরকপত্নী স্বামীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন, নাগরকের ব্যক্তিগত প্রয়োজন সর্বদা নির্বাহ করেন, তাঁর খাদ্য ও পানীয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখেন ও তাঁর প্রসাধন ব্যাপারে ও আমোদ-প্রমোদে সাহায্য করেন; তাঁর পছন্দ-অপছন্দ বুঝিয়া চলেন; তাঁর মাতাপিতা ও আত্মীয়স্বজনদের ভালবাসেন ও ভৃত্যবর্গের প্রতি উদারতা দেখান। তাঁর শয়ন শেষে নিদ্রা যান এবং তাঁর শয্যা ত্যাগের পূর্বে গাত্রোত্থান করেন। কোন কারণে ক্ষুব্ধ হইলেও নাগরকের বিরাগ-সূচক বাক্য উচ্চারণ করেন না। নাগরকের অনুমতি লইয়া তাঁর বান্ধবীর সহিত কোন উৎসবে যোগদান করেন। তাঁর অজ্ঞাতে নাগরক-পত্নী কোন কিছু দান করেন না। তাঁর বিশ্বস্ততায় সন্দেহ জন্মিতে পারে নাগরক-পত্নী এরূপ কার্য কদাপি করেন না, সন্দেহজনক চরিত্রের স্ত্রীলোকের সঙ্গ পরিহার করিয়া চলেন, যথা: সন্ন্যাসিনী, নটী, জ্যোতিষিণী, 'মূলকারিকা' [যে স্ত্রীলোক যাদু জানে]। কামকলাশিক্ষার্থে

ইচ্ছা করিলে স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে পারেন। ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তা'য় উদয়ন তাঁর মহিষীকে 'হা প্রিয়-শিষ্যে' বলিয়া সম্বোধন করিতেন, কালিদাসের 'রঘুবংশে' মৃত ইন্দুমতীর জন্য অজের বিলাপে আছে, অয়ি, ললিতকলায় আমার প্রিয়শিষ্যা ("প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ")।

একটা শম ও সংযমের আবেষ্টনীর মধ্যে নাগরকপত্নী নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন। কথাবার্তায় তিনি স্বল্পবাক্, কখনও উচ্চ কথা বলা বা উচ্চ হাস্য করেন না, শ্বশুর বা শ্বশ্রূ দ্বারা ভর্ৎসিতা হইলে প্রত্যুত্তর দেন না, সৌভাগ্যগর্বে কখনও শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান করেন না। সাজসজ্জায় তিনি মধ্যপন্থিনী, কোন উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দিবার কালে সাদাসিধা অলঙ্কার ও সজ্জার পক্ষপাতিনী, সুগন্ধির ব্যবহার পরিমিত ও সাজসজ্জায় শ্বেতপুষ্প ছাড়া অন্য পুষ্পকে আদর করিতেন না। স্বামী সন্দর্শনের প্রাক্কালে প্রসাধন ব্যাপারে যত্ন লইতেন, নিজেকে উজ্জ্বলা ও সুহাসিনী রাখিবার প্রয়াসে অলঙ্কারের মণ্ডনে কিছু অতিরিক্ততা লক্ষিত হইত। নানা বর্ণের ও নানা গন্ধের পুষ্প ধারণ করিতেন, এবং মনোরম সুগন্ধি ব্যবহারে নিজেকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতেন। পুষ্প নানা প্রকারে ধারণ করিতে পারিতেন, কণ্ঠসংলগ্ন মাল্যাকারে (স্রজ্) অথবা শিরমাল্যরূপে, অথবা কেশে গুঁজিয়া দিয়া, অথবা, কর্ণভূষণের সঙ্গে জড়াইয়া 'কর্ণপূর' রূপে।

দৈনন্দিন গৃহদেবতার সেবায় সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় নাগরকপত্নী আত্মনিয়োগ করিতেন ও ব্রতনিয়মাদি পালনে যথাবিধি কর্ম সম্পাদন করিতেন। গৃহস্বামীর অনুমতিক্রমে পরিবারের 'তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার ভার তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। সারা বছরে একটি আয়ব্যয়ক (budget) তিনিই প্রস্তুত করিতেন। মনু বলিয়াছেন, 'অর্থস্য সংগ্রহে চৈনাং ব্যয়েচৈব নিয়োজয়েৎ' (সংহিতা, ৯।১১)। স্বামীর একটি কর্তব্য হইবে স্ত্রীকে অর্থ দিয়া তাঁহাকে হিসাবমত খরচপত্র করিতে দেওয়া, স্বামী আর্থিক সংস্থানের বেশী খরচের জন্য ঝুঁকিলে স্ত্রী গোপনে প্রতিবাদ জানাইতে পারিতেন। গৃহিণী সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মজুত রাখিতেন ও খরচ হইয়া গেলে পুনরায় আবশ্যকীয় দ্রব্য ভাণ্ডারজাত করিতেন। ভৃত্যবর্গের বেতন হিসাব করিয়া তিনিই দিতেন। কৃষি-কাজ ও গো-পালন তাঁর তত্ত্বাবধানেই হইত, গৃহপালিত পশুপক্ষী তিনিই দেখাশুনা করিতেন এবং রন্ধনশালার যাবতীয় কাজ ব্যতীত অবসরমত সুতাকাটা ও বয়নকাজও তিনি করিতেন।

ওদেরও বক্তব্য ছিল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

পূর্ব্ব-পরিকল্পনা মতই ওরা এসেছিল। হাত বাড়ালেই যদি আমটা মেলে—কে আর আঁকশির সন্ধানে এধার-ওধার ছোটাছুটি করতে চায়। থাকি কাছাকাছিই—পথে আসা-যাওয়ার কালে নিত্যদিন দৃষ্টিপথারূঢ় হই। দৃষ্টিতে যদি সহজলভ্য—দু'এক ঘণ্টার জন্য তা সুলভ্য হবে না কেন? সুতরাং একদিন সকালে সাহসে ভর করে ওদের দলটি আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

মুখপাত্র স্বরূপ এগিয়ে এসেছিল মাত্র দু'টি ছেলে। নিতান্তই কাঁচা কিশোর ছেলে। সকলের মিলিত লজ্জার অখণ্ড একটি রূপ নিয়ে বাকীগুলি গাদাগাদি করে উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিল।

মুখপাত্রদের দেখলেও মনে হবে না—কোন একটি উৎসবের সমাচার নিয়ে এসেছে। নেহাৎ গোবেচারা শোক-ম্রিয়মাণ মলিন মূর্ত্তি (বেশবাসও তদনুরূপ) সলজ্জিত সঙ্কুচিত ভীরু পদক্ষেপে ঘরের মধ্যে এল।

বাংলা ক্যালেণ্ডারটি দেওয়ালে টাঙানো ছিল। বৎসরের প্রথম মাসটি বিবিধ শুভকর্ম্ম অলঙ্কৃত মাস। নূতন খাতা মহরতের দিন থেকেই ব্রতব্রত, উপনয়ন, বিবাহ এবং জয়ন্তী পর্ব্বের মিছিল সুরু হয়েছে। এগুলি নানা স্তরের মানুষকে নানা ভাবে প্রমোদিত এবং শিকার করে ফিরছে। ক'দিন ধরেই চলছে এই শিকার-পর্ব্ব। মেজাজটা সে কারণে ভার ভার ছিল।

গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলাম, কি চাই?

আজ্ঞে, কালো রোগামত ছেলেটি—(অন্যতম মুখপাত্র) থতমত খেয়ে ঢোঁক গিলল। ঢোঁক গিলে বলল, আজ্ঞে আমাদের একটা ফাংশান—

বক্তব্যটা আমিই সরল করে দিলাম, রবীন্দ্র-জয়ন্তী?

সাহস পেয়ে মুখ তুলল ছেলেটি। আজ্ঞে হ্যাঁ। তার পর এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলল, আপনাকে—আপনি যদি দয়া করে—

ওদের বক্তব্যকে আরও খানিকটা সরল করে দিলাম, সভাপতি না প্রধান অতিথি?

আজ্ঞে প্রধান অতিথি।

কোন্ দিন?

আজ্ঞে পঁচিশে বৈশাখ—কবিগুরুর জন্মদিন।

কবিগুরু! বয়স কাঁচা হলে কি হবে—কথাটার গুরুত্ব আছে।

মাথা নেড়ে বললাম, এইমাত্র এক জায়গায় কথা দিলাম যে।

বলতে পারতাম বায়না হয়ে গেছে—কিম্বা স্বীকৃতি আদায় করে শিকারীরা চলে গেছে।

ওরা দু'জনেই বেশ মুষড়ে পড়ল। পিছনের দলটিও চঞ্চল হয়ে উঠল। ওরা যে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছে তা ওদের সবিনয়-করুণ কণ্ঠস্বরে বুঝতে পারলাম, তা হ'ল ভারি মুশকিল হবে যে স্যার!

কেন, মুশকিল কিসের? তোমরা ইস্কুলে পড় ত?

আজ্ঞে।

কোন্ ক্লাসে পড়ছ?

কালো ছেলেটি বলল, আমি ক্লাস টেন'এ পড়ছি—ও পড়ছে ইলেভেনএ।

তা হ'লে ওরা রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়েছে। কবিগুরু বলার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছে। ক্লাসের মধ্যে ভাল ছেলেও হয়ত বা। এত কম বয়সে, মাত্র তেরো বছর বয়সে ইস্কুলের বেড়া টপ্‌কে যাচ্ছে—ভাল ছেলে বলতে হবে।

বললাম, তবে আর কি—তোমাদের মাষ্টারমশাই-দের কাউকে প্রধান অতিথি করে নাও গে। চমৎকার হবে।

আজ্ঞে, ওদের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, আমরা যে আপনাকেই চাইছি স্যার। না হ'লে—

না হ'লে কি?

না হ'লে স্যার ফাংশানই হবে না।

কেন সাহিত্যিক ছাড়া আর কেউ কি প্রধান অতিথি হচ্ছেন না?

মাথা চুলকোতে আরম্ভ করল দু'জনেই। দু'জনেই একসঙ্গে বলতে লাগল, হচ্ছেন ত। মন্ত্রীরা হচ্ছেন, সেক্রেটারিরা হচ্ছেন, এম. পি. এম. এল.-এরা হচ্ছেন, বিরাট্ বিরাট্ বড় লোকরা হচ্ছেন, ফুটবল ক্লাবের

সেক্রেটারি, ফিল্ম স্টার এঁরাও হচ্ছেন, যিনি বেশী চাঁদা ডোনেশান দেন—তিনিও।

তবে?

আজ্ঞে আমরা সবাইকে বলেছি আপনাকে এবার প্রধান অতিথি করে নিয়ে আসব। তাই ত ওরা চাঁদা দেবেন বলেছেন, আপনি স্যার না গেলে—

ওদের আর্ত্ত অসহায় কাঁদ কাঁদ কচি মুখগুলি আমার সঙ্কল্পকে বেশ খানিকটা শিথিল করে দিলে। তবু সেই দণ্ডে ওদের কথা দিতে পারলাম না। ডায়েরিখানা উল্টাতে উল্টাতে বললাম, তোমরা জুন মাসের প্রথমে একটা দিন ঠিক কর।

তা হলে স্যার ফাংশানই হবে না। কবি-পক্ষ পার হয়ে গেলে কেউ এক পয়সা দেবে না স্যার।

কেন, আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত ত রবীন্দ্র-জয়ন্তী চলে।

ছেলে দু'টি একসঙ্গে কলরব করে উঠল, আমাদের চলবে না স্যার, তা হ'লে কেউ চাঁদা দেবেন না। এমনিতেই ত বলছেন—কবিপূজোর নাম করে আমরা নাকি আমোদ-আহ্লাদ করব। ওঁর জন্মদিনে ফাংশান হলে কেউ কিছু বলতে পারবেন না তবু।

ছেলেরা নেহাৎ কাঁচা নয়। পরিপক্ক বাক্যের নমুনা ইতিপূর্ব্বে পেয়েছি—এখন বুঝছি বুদ্ধিটাও এদের ডাঁশা।

বললাম, কিন্তু বললামই ত পঁচিশে বৈশাখ আর একটি জায়গায়—

ফরসা ছেলেটি তাড়াতাড়ি বলল, ক'টার সময় ওদের ফাংশান হবে?

সাড়ে ছ'টায়।

ওদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, বেশ ত—আমরা আরম্ভ করব পাঁচটায়। আমাদেরটা সেরে ওখানে যাবেন।

প্রস্তাবটি নিখুঁৎ। যুক্তিতর্কে বাতিল করা যাবে না। কিন্তু ওদের কেমন করে বোঝাব, আর একটি বড় বাধা রয়েছে। বয়সের বাধা, এই বয়সে দু'জায়গায় ছুটোছুটির ধকল সইতে পারব কেন?

শেষ পর্য্যন্ত শারীরিক অক্ষমতার কথাই বললাম।

ওরা বলল, না স্যার, আপনার কিছু অসুবিধা হবে না। মোটরে করে নিয়ে যাব, যেখানে বলবেন—পৌঁছে দেব। আপনি শুধু সভাটা আরম্ভ করে দিয়ে চলে আসবেন। সভার বাকি কাজ আমরা সভাপতিকে দিয়ে চালিয়ে নেব।

আটঘাট বেঁধেই ওরা কর্ম্মক্ষেত্রে নেমেছে—পরিত্রাণের কোন উপায় দেখছি না। শেষ চেষ্টা স্বরূপ বললাম, সভা কি তোমরা ঠিক পাঁচটায় আরম্ভ করতে পারবে? ওদের ওখানে ঠিক সাড়ে ছ'টায় আমাকে পৌঁছে দিতে হবে কিন্তু।

আপনি স্যার কিছু ভাববেন না—ঠিক সাড়ে ছ'টার মধ্যে আপনি ওখানে পৌঁছে যাবেন। তা হ'লে স্যার, কার্ড ছাপতে দিই?

কি আর বলব, সম্মতি দিলাম।

ওরা চলে গেলে মনে মনে হিসাব কষতে লাগলাম। ছেলেরা বলছে বটে—পাঁচটায় সভা আরম্ভ করব, পারবে না। বৈশাখের অগ্নিতপ্ত দিনগুলি দীর্ঘ—আকাশে আলোই থাকবে সাড়ে ছ'টা পর্য্যন্ত। নাচগান আবৃত্তি নাটক আলো না জ্বালিয়ে আরম্ভ করলে জমে কখনও? ভাষণের অংশটুকু ধরেও সাড়ে পাঁচটার আগে কিছুতেই সভা বসাতে পারবে না। পৌনে ছ'টাও হতে পারে। তাতেও অবশ্য ম্যানেজ করা যাবে যদি ফুল-ফেলা রীতিতে সভার কাজ পরিচালিত হয়।

ফুল-ফেলা রীতির কথাটা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল। যখন দেশে থাকতাম—অনেক দিন আগেকার কথা—রাজু ভট্টাচার্য্য ছিলেন আমাদের পুরোহিত। শুধু আমাদের বাড়ীর পুরোহিত ছিলেন না তিনি, আমাদের গ্রামের আশে-পাশে আরও চার-পাঁচখানা গ্রাম মিলিয়ে মোট ষাট-সত্তর ঘর যজমান ছিল তাঁর। লক্ষ্মী, ষষ্ঠী, অথবা মনসা পুজোর দিন তাঁর সে কি ব্যস্ততা! চলতেন যেন দু'চাকার গাড়ী দু'পায়ে বেঁধে নিয়ে। সকালে উঠেই নিজের বাড়ীর পুজো সেরে কাঁধে নামাবলী আর হাতে ফুল নিয়ে এ-বাড়ী সে-বাড়ী ছুটোছুটি সুরু করতেন। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে এ-গাঁ ও-গাঁয়ের সব বাড়ীর পুজো সেরে হাসিমুখে বাড়ী ফিরতেন। যদি কেউ জিজ্ঞেস করত—এত শীগ্‌গির কি করে হয় ভট্‌চাজ মশায়। হেসে উত্তর দিতেন উনি, কেন, এ আর শক্ত কাজ কি। এক বাড়ীর পুজো সেরে ফুলদুর্ব্বো হাতে মন্তর পড়তে পড়তে অন্য বাড়ীতে হাজির। সেখানে ঝপ্ করে ঠাকুরের মাথায় ফুল না চাপিয়ে আর এক বাড়ী। বলি—দেবতা ত একটিই, আলাদা আলাদা মন্তর ত নয়—কাজটা কঠিনই বা কি।

অতএব ওই রীতিতে কাজটা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ নয়। আরও এক দিক্ দিয়ে ভরসা রয়েছে। যারা নাচ-গান ভালবাসে তারা বক্তৃতা ভালবাসে না, যারা গানের সুরে মাথা দুলিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে, তারা বক্তব্যের বিষয়-

বক্তা বা বক্তার রীতি-প্রকরণ নিয়ে মাথা ঘামায় না। বিশেষণ-বহুল শ্রুতিমধুর বাছাই করা কয়েকটি শব্দের মালা গেঁথে দিতে পারলেই শ্রোতারা খুশী হয়ে ধন্য ধন্য করে। বিপদ্‌ ঘটে বক্তার নিজের দিক্‌ দিয়ে। তাঁর বক্তৃতা অন্যের মোহ না জন্মালেও নিজেকে সম্মোহিত করার আশঙ্কা প্রচুর। ভাষণ দান কালে মন যদি আবেগে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—সময়ের হিসাবকে তখন মিনিটের কাঁটায় ধরে রাখবে কে! সেদিক্‌ ভেবে প্রথম সভাটা আমাকে হুঁশিয়ার থাকতেই হবে। যদি ছ'টাতেও ওরা সভা বসায়—পনর মিনিটের মধ্যে কাজ সারতে হবে। ধরে নিলাম ওরা ছ'টাতেই সভা বসাবে। আমিও তখন মোহশূন্য মনে ভাষণ সংক্ষেপ করব—এবং…

ওরা যখন গাড়ী নিয়ে এল আমি তখন রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠেছি।

কব্জিতে ঘড়ি বেঁধে ফিটফাট ধোপ-দুরস্ত পোশাকে ছেলে দু'টি সামনে এসে দাঁড়াতেই গম্ভীর গলায় বললাম, ক'টা বাজে?

কব্জি উল্টে শুকনো গলায় ওরা জবাব দিল, সাড়ে ছ'টা।

বললাম, ক'টায় সভা আরম্ভ হবার কথা?

প্রশ্নের গুরুত্ব বুঝে ছেলে দু'টি কাঁদ কাঁদ গলায় বললে, স্যার, আমরা ছেলেমানুষ সব দিক্‌ সামলাতে পারি নি। মঞ্চ তৈরী করতে খানিকটা দেরি হয়ে গেল —যারা লাইট মাইক ফিট করবে তারাও দেরিতে এল। অন্যায় হয়ে গেছে স্যার। আমরা গাড়ী এনেছি স্যার—তাড়াতাড়ি দু'কথা বলে চলে আসবেন।

কিন্তু ওঁরা যে এখনই আসবেন।

আসুন! আমরা একজন এখানে থাকছি। ওঁরা এলে বুঝিয়ে বলব। আপনি তৈরী হয়ে নিন স্যার।

যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠে বসলাম, তিন-চার মিনিটের মধ্যে পৌঁছলাম মাঠে।

মাঠে পৌঁছে আমার ত চক্ষু স্থির! অন্ধকার মাঠ যেন অকূল সমুদ্র! ওরই মধ্যে দক্ষিণ কোণ ঘেঁষে একটি অস্থায়ী মঞ্চ উঠেছে। একশ'-দেড়শ' হাত দূর থেকে সেটা দ্বীপের মত দেখাচ্ছে।

মঞ্চস্থ হওয়ার পর দেখেছিলাম—একখানি মাঝারি-গোছের তক্তাপোশ ঘিরে কয়েকটা বাঁশের খুঁটি। খুঁটির তিন দিক্‌ কাপড় দিয়ে ঘেরা—মাথায় বিছানার চাদরের চাঁদোয়া। তক্তাপোশের উপর একখানা টেবিল, খান-দুই চেয়ার, মাইক দণ্ড—আর রবীন্দ্রনাথের ছবি। টেবিলের উপর ফুলদানে রজনীগন্ধার গুচ্ছ—তার সঙ্গে আরও সব টুকিটাকি জিনিষ; নানা সাইজের রবারের বল, প্লাষ্টিকের পুতুল খেলনা, সস্তার ঝরণা কলম, চটি-এক্সারসাইজ খাতা, হুইস্‌ল, চামচ, শিশুপাঠ্য বই।

প্রশ্ন করেছিলাম, কি ব্যাপার?

আজ্ঞে প্রাইজ দেওয়া হবে।

আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ছিল বুঝি?

আজ্ঞে না—মাস দুই আগে একটা স্পোর্টস হয়েছিল—তারই প্রাইজ। আমাদের ক্লাবের নাম—বয়েজ ওন স্পোর্টিং ক্লাব। বড়রা চাঁদা-পত্তর বিশেষ দেন না। যা চাঁদা উঠেছিল, প্রাইজের জিনিষ কিনতে সব ফুরিয়ে গিয়েছিল। নতুন করে কেউ চাঁদা দেয় নি—ফাংশান হয় নি। এবার কবিগুরুর জন্ম-জয়ন্তীর সঙ্গে এই প্রাইজ-গুলোও দেওয়া হবে।

ইতিহাস শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

যাই হোক, আপাততঃ দিক্‌হারা মাঠে আমাকে দাঁড় করিয়ে ছেলে দুটি চোঁ করে কোথায় বেপাত্তা হয়ে গেল। ভাবলাম, এখন আমি কি করব? যেদিক্‌ থেকে এসেছি—সেই দিকেই ফিরে যাব,—না—

একখানা চেয়ার কাঁধে ফেলে একটি ছেলে ছুটে এল। চেয়ারখানা সামনে পেতে দিয়ে বলল, বসুন স্যার। বলেই নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত।

বসলাম চেয়ারে। চেয়ারে বসে ভাল করে দেখতে লাগলাম এদিক-ওদিক্‌। একটু পরে মনে হ'ল, আমার পাশেতেই এক টুকরো দ্বীপ যেন রয়েছে। দ্বীপটি একবার নড়ে উঠল। আমারই মত কোন মন্দভাগ্য প্রাণী কি? অসহায় সভাপতি নন ত? নড়ে-চড়ে বসলাম। রাগ হ'ল, হতভাগা ছেলেগুলো কি! দু'জনকে পরিচিত করিয়ে দিয়ে যাবার তরটুকু সইল না, পালিয়ে গেল।

বেশ বুঝলাম—আমার মত ওঁকেও মোটরের জাল দিয়ে ছেঁকে তুলে পার্কের এই গভীর অন্ধকারের জলভর্ত্তি গামলায় জীইয়ে রেখে গেছে। সময় সুবিধা মত সুধী-বৃন্দের পাতে পরিবেশন করবে।

পাশের নিশ্চল মূর্ত্তিটিকে উদ্দেশ করে বললাম, মাপ করবেন—আপনি কতক্ষণ হ'ল এখানে এসেছেন?

মূর্ত্তি স্বচিন্তায় কিংবা স্বাভাবিক নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন হয়ত, কোন উত্তর দিলেন না।

প্রশ্নটি পুনরাবৃত্তি করলাম। এবার মূর্ত্তি নড়ে উঠলেন। ধ্বনি উঠল, আজ্ঞে আমাকে বলছেন? এসেছি তা—হাঁ, আধঘণ্টা ত বটেই—

বললাম, আপনি বিশ্বাস করেন এরা সাতটায় সভা আরম্ভ করবে?

উনি বললেন, না না, তা কি করে পারবে! আধ-ঘণ্টা থেকেই ত খটাখট শব্দ হচ্ছে। এতক্ষণে মাচা বাঁধা হ'ল। এইবার মাইক ফিট করবে।

বললাম, এদের মধ্যে বড় ছেলে-টেলে কেউ নেই বুঝি?

উনি বললেন, কই, দেখলাম না ত কাউকে। মোটর থামলে এক পাল চ্যাংড়া ছেলেমেয়ে ছুটে এসেছিল সব ক'টার পরনে আবার পোশাকও ছিল না! নেহাৎ দুগ্ধপোষ্য ত? ওরাই সব সামনে গিয়ে বসেছে। যারা আমাকে আনলে তারা ত সব উধাও। ফাঁকা মাঠ—দিব্যি ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। বসে বসে ঢুলুনি মত এসেছিল, তার পর আপনার গলার স্বর শুনে—

আপনার বুঝি আর কোথাও সভা-টভা নেই?

সভা! ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। না, না, আমরা কি সভায় বসতে পারি? সে সময় কোথায়? কাজের লোক মশায়—দিনরাত কারবার নিয়ে পড়ে আছি। দেখেন নি—কান্তিচৌধুরী রোডের মোড়ে মুদি-খানা দোকানটা? ওইখানি এই অধীনের। পাড়ারই ছেলে এরা—আপনার আমার আরও পাঁচজন পড়শীর ছেলে, সখ হয়েছে আমোদ-আহ্লাদ করবে, গানবাজনা করবে, ঠাকুরের ছবি পূজো করবে। এসে ধরল, জ্যেঠা মশায়—চাঁদা দিতে হবে। বেশী করেই দিতে হবে আর আপনাকে সভাপতি হতে হবে। বললাম—রক্ষে কর বাবা—ও সব পারব-টারব না। বললে, আপনাকে কিছু করতে হবে না, শুধু বসে থাকবেন। যা বলবার-করবার ওই তিনি—মানে প্রধান না কি—সেই ভদ্রলোক করবেন। তা আপনি কি—

হাঁ, আমিই সেই হতভাগ্য। তা বলতে পারেন—এরা কখন সভা আরম্ভ করবে?

বললে ত—দু' মিনিট অপেক্ষা করুন, মাইকটা ঠিক করেই—

আধ ঘণ্টা আগেকার সেই দু' মিনিট ত! ব'লে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম।

ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। উঠলেন যে?

যাচ্ছি। আর একটা জায়গায় সভা রয়েছে—

ভদ্রলোক সবটা না শুনেই চীৎকার করে উঠলেন, ওরে হরেন, মধু, ভোলা—ওরে—

মুহূর্তে অন্ধকার ফুঁড়ে কয়েকটি মূর্তির উদয় হ'ল। কি—কে, জ্যেঠামশায়, ডাকছেন কেন?

আমার দিকে হাত বাড়িয়ে ভদ্রলোক বললেন, তোদের এই ইনি—কি বলে—ইনি যে চলে যাচ্ছেন।

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা আমাকে ঘিরে বেড়া তৈরী করে কাকুতি-মিনতি জুড়ে দিলে, আর পাঁচ মিনিট স্যার—মাইকটা ফিট হয়ে এসেছে—পাঁচ মিনিট। দেখছেনই ত স্যার মাঠের মাঝখানে বাঁশ পোঁতা, তক্তাপোশ টেনে আনা, স্টেজ তৈরী করা—সব কিছু ছেলেমানুষ আমরাই করছি। বড়রা কেউ নেই স্যার।

নিরুপায়ে চেয়ার টেনে নিলাম। রাগ হচ্ছিল, করুণাও বোধ করছিলাম। ছেলেগুলি সত্যই অসহায়। হুজুগ কিংবা আর যাই বলি না কেন, রবীন্দ্রনাথের প্রতি একটু শ্রদ্ধাও রয়েছে ত। না হ'লে এতটা পরিশ্রম আর কষ্ট সহ্য করবে কেন! নিজে বড় বেশে কোন লাভ নেই। অপর পক্ষও যে সময় মত সুরু করবেন, মনে হয় না। তাঁদেরও ত মাচা বাঁধার ব্যাপার।

ওরা চলে গেলে আমরা দু'জনে আবার অন্ধকারে হারিয়ে গেলাম। কথা উনিও বললেন না, আমিও না। কি কথা বলব! চাল-ডালের দর, বি আনাজ-পাতির অগ্নিমূল্য নিয়ে আলোচনা করার অভিরুচি আপাতত ছিল না।

এমনি করে বেশ কিছুক্ষণ কাটলে অন্ধকার ফুঁড়ে দু'টি ছেলে সামনে এসে হাত জোড় করে বলল, এইবার স্যার আপনারা আসুন। সব রেডি হয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে মঞ্চের কাছে এলাম।

মঞ্চে উঠবার পথটি সুগম বলে বোধ হ'ল না। দুটো কেরোসিন কাঠের প্যাকিং বাক্স ফেলে সিঁড়ি তৈরী হয়েছিল। সিঁড়িতে পা দিতেই মচ্‌মচ্‌ করে উঠল। যদি আমার ভার বইতে না পারে তা হ'লে কি ঘটতে পারে ভাববার সঙ্গে সঙ্গেই পা আপনি নেমে এল।

দু' পাশ থেকে দু'টি কিশোর ছেলে আমার দু'টি হাত চেপে ধরে বলল, ভয় কি স্যার, উঠুন। আমরা আছি, ভয় কি।

সভাপতিকে ওরা যেভাবে ঠেলে-ঠুলে মাচায় তুললে, তা দেখে আমার ত চক্ষুস্থির। সিঁড়ি যদি আমার ভার বইতে না পারে—আমি যদি টলে পড়ি কোন একটির ঘাড়ে তা হ'লে ওই কচি ছেলের কি গতি হবে এবং তার দায়ে আমিই বা কি দুর্গতি ভোগ করব—মুহূর্তে সেটা আন্দাজ করে ওদের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, থাক, ধরতে হবে না—আমি উঠছি।

বিনা সাহায্যে টপ করে উপরে উঠে গেলাম।

আসন গ্রহণ করার মুহূর্তেই ফুলের মালাসমেত দু'টি

বাচ্চা মেয়েকে ওরা তোল্লা তোল্লা করে মাচায় তুলে দিলে।

আমাদের গম্ভীর মূর্ত্তি দেখে মেয়ে দু'টি ত এগোয় না। এই বুঝি কেঁদে-ফেলে-গোছ চেহারা নিয়ে পিছিয়ে যেতে লাগল।

উদ্যোক্তারা পিছন থেকে ঠেলে দিতে দিতে যতই বলে, ভয় কি, যাও খুকু যাও, মালাটা ওঁদের গলায় পরিয়ে দাও। ভয় কি—লক্ষ্মী মেয়ে, বাচ্চারা ততই পিছোতে থাকে।

পিছোতে পিছোতে ওরা তক্তাপোশের কিনারায় গিয়েছে তখন। আবার কি বিপর্য্যয় হয় মনে করে যে মুহূর্ত্তে শিউরে উঠেছি ঠিক সেই দণ্ডেই ঘটল চরম বিপর্য্যয়! না, আপনারা শিউরে উঠবেন না। তক্তাপোশ থেকে পড়ে যায় নি বাচ্চারা—মঞ্চের আলোটা সেই মুহূর্ত্তে নিবে গেল। চারদিক অন্ধকারে অন্ধকার। সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গ-বিক্ষোভে অন্ধকার সমুদ্র গর্জ্জন করে উঠল। চারিদিকে জন্তু-জানোয়ারের ডাক সুরু হ'ল—ঠোঁটের বাঁশী শৎকার ধ্বনি তুলল, ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়িতে মঞ্চ কাঁপতে লাগল। মঞ্চ থেকে নেমে যে চলে যাব সে উপায় নেই। গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়ার অবস্থায় বসে রইলাম। আমাদের করণীয় কিছুই ছিল না—যন্ত্রীদের যন্ত্র-দেবতাকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করতে লাগল। মঞ্চে বসে ঠুকঠাক শব্দ শুনতে লাগলাম।

সব প্রতীক্ষারই শেষ হয় এক সময়ে, এ ক্ষেত্রেও হ'ল। আবার আলো জ্বলল, মাইক চালু হ'ল। সামনে চেয়ে দেখি চেয়ারগুলো ভর্ত্তি হয়ে গেছে।

এতক্ষণ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে বাচ্চা মেয়ে দু'টি সাহস সঞ্চয় করেছিল। ওরা অপরের হস্তদ্বারা পরিচালিত হয়ে মালা নিয়ে এগিয়ে এল। মালা যথাস্থানে ন্যস্ত হ'ল, করতালি-ধ্বনিতে সভাপ্রাঙ্গণ মুখরিত হ'ল। উদ্বোধন সঙ্গীত হ'ল না।

মুখপাত্রদের একজন মাইকের সামনে এগিয়ে এসে ঘোষণা করল, উদ্বোধনী গানের আর্টিষ্ট এখনও এসে পৌঁছয় নি—অতএব এবার প্রধান অতিথি আপনাদের কিছু বলবেন।

তিন-চার মিনিটে ভাষণ শেষ করলাম। কবিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বললাম, ইস্কুলের ছেলে তোমরা, এই বয়স থেকে সময়ের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়া তোমাদের উচিত। পাঁচটার সভা সাড়ে সাতটায় বসালে সভা অবশ্যই বসবে—কেননা শ্রোতারা করতা বাদ দিয়ে সময়ের হিসাব করেই সভায় আসেন। তোমাদের পক্ষে সেটা কিন্তু গৌরবের কথা নয়। যে মহামানবের জন্মতিথি উৎসব পালন করছ তোমরা—তিনি প্রতিদিনই সূর্য্য উদয়ের আগে শয্যাত্যাগ করতেন। সমস্ত দিনটাকে নিয়ম-শৃঙ্খলায় বাঁধতে পেরেছিলেন বলেই কোনদিন সময়ের অভাব অনুভব করেন নি। সেইজন্য তিনি এত লিখতে পেরেছেন, এত কাজ করতে পেরেছেন—জগৎজোড়া খ্যাতিলাভ করেছেন।

চটপট করতালি ধ্বনির দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হয়ে মঞ্চ থেকে নেমে এলাম।

সেই মুখপাত্র ছেলে দু'টি সামনে এসে বলল, স্যার একটুখানি অপেক্ষা করুন—গাড়ীটা ফিরে এলেই—

গাড়ী কোথায় গেল আবার?

আজ্ঞে আর্টিস্টদের আনতে গেছে। একটু দাঁড়ান। ব'লে ছুটে অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়ে গেল।

গাড়ীর আশা ছেড়ে দিয়ে আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে চললাম পথের দিকে।

গেটের কাছাকাছি এসেছি এমন সময়ে মাইকে উদ্যোক্তাদের কণ্ঠ শুনে থমকে দাঁড়ালাম। ভাষণ চলছিল:

...দেরি হওয়াতে আপনাদের কাছে বার বার মাপ চাইছি। স্যার, দোষ এতে আমাদের নয়—যন্ত্রের দোষ। যন্ত্র যদি বিকল হয় কি উপায় বলুন! মাননীয় প্রধান অতিথি মহাশয় এইমাত্র যে কথাটি বললেন অত্যন্ত খাঁটি কথা—দামী কথা। আমাদের সকলেরই উচিত সময়ের মূল্য বুঝতে চেষ্টা করা। চেষ্টা আমরা করছি, করবও। কবিগুরুও তা করেছেন। কিন্তু কবিগুরু আর একটা উদাহরণ আমাদের দেখিয়েছেন—সব সময়ে নিয়ম ভাঙ্গা যে দোষের নয়, এ কথা উনি প্রমাণ করে দিয়েছেন। ধরুন স্যার—খুব ছেলেবেলা থেকে উনি যদি সব নিয়ম-কানুন মেনে চলতেন—শান্তশিষ্ট ছেলেটি হয়ে ইস্কুলে পড়াশোনা করতেন—কলেজে একটার পর একটা পাশ করে যেতেন, আপিসে খুব ভাল একটা চাকরি পেতেন—তা হ'লে কি স্যার আমরা এমন ঘটা করে ওঁর জয়ন্তী ফাংশান করতে পারতাম! আপনারাই ভেবে দেখুন—

আর শুনি নি। গেট পেরিয়ে তখন আমি পথে এসে দাঁড়িয়েছি।

বাংলা উপন্যাসে বাস্তবচেতনা

শ্রীশ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাংলা ভাষার উপন্যাস-সাহিত্য মাত্র উনবিংশ শতাব্দীর সৃষ্টি আর তার সমস্ত প্রেরণাই পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য থেকে এসেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে সংস্কৃত ভাষার সাহিত্যে অনেক কাহিনী ও গল্প, যা উপন্যাস ব'লে গণ্য হতে পারে, ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সে-সবের অনুপ্রেরণায় কোন আধুনিক ভারতীয় ভাষা-সাহিত্যে আজকের দিনে বিশ্বসাহিত্যে যাকে উপন্যাস বলা হয় তার জন্ম হয় নি। বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব একান্তভাবে আধুনিক যুগে আধুনিক আঙ্গিক ও আবহের মধ্যে। কাজেই প্রাচীন বা প্রাগ্‌আধুনিক যুগের সঙ্গে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের কোন যোগসূত্র খোঁজার চেষ্টা না করাই ভাল।

ষোড়শ শতাব্দীর কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য উপন্যাসধর্মী রচনা; এটিকে পয়ার ছন্দে লেখা উপন্যাস বলা যেতে পারে। কিন্তু ঐ রচনাটির সঙ্গে আধুনিক বাংলা উপন্যাসের কোন যোগ নেই। নানা দিক্‌ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, কবিকঙ্কণের রচনাকে উপন্যাসধর্মী বললে দোষ হয় না; কেবল আধুনিক বিচিত্রস্বভাব গদ্যে-রচিত বাংলা উপন্যাসের সঙ্গে তার কোন সংযোগ কল্পনা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

উপন্যাসের স্বভাব হ'ল জীবনের বিপুলতা ও বৈচিত্র্যের আভাস দেওয়া; কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জীবনের একটা দিক্‌ দেখিয়ে এই বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করে। এদিক্‌ থেকে মহাকাব্যের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে। কোন চরিত্রের ক্রমবিবর্তনের পরম্পরায় একটা সুনির্দিষ্ট পরিণতিতে উপস্থিতি, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা দিয়ে তার অগ্রগতি, অন্য সব চরিত্রের সান্নিধ্যে তাদের তুলনায় তার নিজের বিকাশ, আর সকলের সঙ্গে তার সম্বন্ধ, তাদের পরিপ্রেক্ষিতে তার অবস্থান—এই সবের বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ উপন্যাসের মুখ্য বিষয়বস্তু। উপন্যাস ব্যক্তি ও ব্যক্তির সম্পর্কীয় একটি নির্দিষ্ট সমষ্টির কাহিনী।

এখনকার দিনে এই সাহিত্যশৈলী এমন বিচিত্র আঙ্গিকের, এমন বিচিত্র প্রকৃতির হয়ে উঠেছে যে, উপন্যাসের অভ্যন্তরে তার স্বধর্ম অক্ষুণ্ণ রেখেই কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক ও রসরচনার সারনির্যাস অল্পাধিক পরিমাণে স্থান সংগ্রহ করতে পারে; উপন্যাসের নিজের মহিমা অক্ষুণ্ণ রেখেও অন্যান্য সাহিত্যভঙ্গি তার মধ্যে সুসমঞ্জসভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

উপন্যাসের এই অদ্ভুত সর্বগ্রাসী বিশেষত্বের জন্যে তার কোন ধরা-বাঁধা সংজ্ঞা অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত উপায়ে দেওয়া চলে না। উপন্যাস ঠিক এমন হবে, কিছুতেই অমন হবে না, একথা খুব আঁটসাঁটভাবে বলা উচিত হবে না; তা হ'লেও উপন্যাসের মূল স্বভাবটা একটু ব্যাখ্যা না করলে নয়, তার প্রধান কাজ একটি কাহিনীর সহায়তায় জীবনের বিপুল প্রসার ও বিচিত্র স্বভাবটা পাঠককে দেখিয়ে-শুনিয়ে দেওয়া, যাতে জীবনের সান্নিধ্য বা সাহিত্যটা উপলব্ধি ক'রে পাঠক জীবনের মহিমায় চমৎকৃত আর তার শিল্পরূপের স্রষ্টার নৈপুণ্যে সপ্রশংস হয়।

উপন্যাসের ঐ কাজ অল্প আয়তনের মধ্যেই হোক বা অধিক পরিমাণের দ্বারাই হোক, তাতে কিছু এসে যায় না। মোটের উপর ঐ কাজটি সুষ্ঠুভাবে হলেই হ'ল। ছোট গল্পের বেলায় নিয়মের কড়াকড়ি, কারণ তার কাজটা অন্যরকম। একটি কাহিনীর দ্বারা একটি মাত্র ঘটনা বা একটি মাত্র চরিত্রের বিশেষত্ব চকিতে উদ্ভাসিত ক'রে সেই কাহিনীর যবনিকাপাতই এর প্রধান লক্ষ্য; এই ব্যাপারটা এমনভাবে করা চাই যেন কোন অবান্তর ঘটনা বা চরিত্রের ছায়ামাত্র এসে মূল ঘটনা বা চরিত্রের স্বকীয়তাকে এতটুকুও আচ্ছন্ন না করে। এই নিয়ম মান্য করে ছোট গল্পটি যদি কিছু বেশি পৃষ্ঠায় লেখা হয়, তা হ'লে কোন দোষ হবে না। অবশ্য, অবান্তর প্রসঙ্গ বা ভাবের আতিশয্য বাদ দিতেই হবে। কিন্তু উপন্যাসে ঘটনা, চরিত্র ও ভাবের পরিমাণের নির্দিষ্ট মশলা দিয়ে সাজা পান থেকে একটু-আধটু চুন খসলে আতিশয্যের অপবাদ অত সহজে আসবে না।

সেইজন্যে উপন্যাস মূল কাহিনী অবিকৃত রেখে কাব্যভঙ্গিম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে পারে; গল্পের মত চিত্তাকর্ষক দু'একটি পার্শ্বকাহিনীর অবতারণায় তার কোন অসুবিধা নেই; সে পারে রসরচনার উপযুক্ত লঘু চটুলতার আয়োজন করতে, প্রবন্ধের মতই নানা

ধরণের তত্ত্ব ও তথ্য-প্রতিষ্ঠাকে সমর্থন করতে; সমালোচকের মত গম্ভীর অথচ নিপুণভাবে জীবনের দার্শনিক ব্যাখ্যা রচনায়, নাট্যকারের মত অপরিসীম চাতুর্যে পরস্পরবিরোধী ভাবধারা ও শক্তিপুঞ্জের সংঘাতে চমকপ্রদ দৃশ্যবিন্যাসে ঔপন্যাসিকের অবাধ অধিকার। কেবল, দেখা চাই যে, ঐ সব অভিনব সংযোজনা মূল কাহিনীর গতিকে কোথাও পীড়িত বা ব্যাহত করছে না। যে-প্রবর্তনা গতিকে ব্যাহত করে ও সেই ব্যাঘাতের দ্বারাই উপলপীড়িত নদীস্রোতের মত উপন্যাসের কাহিনীর গতিকে আরো তীব্র ও চকিত করে তুলবে, শেষ পর্যন্ত সংশ্লেষণের সাহায্যে এক মনোরম সামঞ্জস্যের রম্য পরিবেশ রচনা করবে, তাকে সাদরে বরণ করে নিতে কোন বাধা নেই। যে-সংযোজনা গতিকে কেবল ব্যাহত করে, তা বড় তত্ত্বদর্শিতা বা আদর্শবাদের পরিচায়ক হ'লেও বর্জনীয়; আর, যে-নূতনত্ব কাহিনীতে আনবে গতিলাস্য, তা স্বভাবত বাঞ্ছনীয় যদিও অনর্থক চমৎকারিত্ব উপন্যাসের মহিমামণ্ডিত স্বধর্মের সঙ্গে খাপ খায় না।

আধুনিক কালে এই সব বিশেষত্ব নিয়ে বিচিত্রসুষমা যে মহাকায় উপন্যাস গ'ড়ে উঠেছে, তাতে সাহিত্যের অন্যান্য উপাদানের মত কবিত্ব থাকতে কোন বাধা নেই। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র অনুসারে এই উপন্যাসকে স্বচ্ছন্দে "কাব্য" বলা চলে এবং একে এযুগের 'মহাকাব্য' নাম দিলেও ভুল হবে না। উপন্যাসের পক্ষে কাব্য হয়ে উঠতে, যদিও কবিতা হয়ে উঠতে নয়, আপত্তির কারণ নেই; তার রচনাও গদ্যে ও পদ্যে, দু'ভাবে হ'তে পারে, যেহেতু, পদ্যে লেখা হলেই কবিতা হয় না। কবিকঙ্কণের রচনায় পদ্যে-লেখা উপন্যাস এই জন্যেই পাওয়া গেছে, যদিও আধুনিক বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য তাতে একেবারে অনুপস্থিত।

সংস্কৃত সাহিত্যের "কাদম্বরী" প্রভৃতি রচনা থেকেও আধুনিক বাংলা উপন্যাসের উৎপত্তি কোনমতেই কল্পনা করা যায় না। কাদম্বরী বা দশকুমার-চরিতে মূল কাহিনী বারবার ব্যাহত হয়েছে বিভিন্ন উপাদানের, বিশেষত পার্শ্বকাহিনীর সংযোজনায়। হয়ত তাতে অন্য ধরণের লাভ হয়েছে, নানা দিক্ থেকে নতুন শিল্প ও সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে, কাহিনীর দ্রুতগতির প্রতিবন্ধকতার ক্ষতিপূরণ মিলেছে বর্ণনা ও ভাষার সূক্ষ্ম কারুকার্যে। কিন্তু উপন্যাসের বর্তমান ধারার সঙ্গে তার কোন যোগ নেই।

সংস্কৃত আর অন্য প্রাচীন ভাষার সাহিত্যগুলিতে নানা গাথা, কিংবদন্তী, উপকথা, রূপকথা, কাহিনী, কিস্সা বা কেচ্ছা ছড়িয়ে আছে; কিন্তু সে সবের এক বা একাধিক থেকে, সেগুলি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বা সেগুলির সম্মিলিত সাধনায় বিশ্বসাহিত্যে আধুনিক উপন্যাসের জন্ম হয় নি। উপন্যাসের অষ্টাদশ শতকীয় আধুনিক আবির্ভাব মানবের সাহিত্যচেতনায় এক বিপুল যুগান্তকারী আলোড়নের ফলে সম্ভবপর হয়েছে। মানবের ব্যক্তিত্ববোধ, স্বাধীনচিন্তা, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, রোমান্টিক জীবনবোধের বিকাশ, বস্তুনিষ্ঠা প্রভৃতি কতকগুলি আধুনিক মানস বিশেষত্বের বা প্রবণতার সঙ্গে চিরন্তন কাহিনীপ্রিয়তার সংমিশ্রণে তার বিরাট্ জীবনদর্শনের পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যবিকাশরূপে আধুনিক কালের উপন্যাসের উন্মেষ। পূর্ববর্তী গাথা, সাগা, জাতক, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতির কাহিনীগুলি উপন্যাসরচনায় কিছু-কিঞ্চিৎ আভাস-ইঙ্গিত দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজে লাগে নি, লাগতে পারে না, তারা মূলত এত পৃথক।

বিশ্বসাহিত্যে উপন্যাসের প্রথম সূচনা ও আবির্ভাব যে ভাবে যে উৎস থেকেই হোক না, বাংলা উপন্যাসের উৎস পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রেরণা। উপন্যাস লিখবার সময় বাঙালী ঔপন্যাসিকেরা যে বৌদ্ধ জাতক, হিতোপদেশ, কথাসরিৎসাগর, কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতির কথা স্মরণে রেখে লিখতেন না, সে-কথা একরকম শপথ করে বলা যায়। বাংলা উপন্যাসের ধারাটি প্রবল এবং এটি পুষ্ট হয়েছে বিভিন্ন ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রাণরস পান করে। ১৮৫২ সনে রচিত "ফুলমণি ও করুণা" অবাঙালীর লেখা প্রথম বাংলা উপন্যাস; নানা কারণে বাংলা সাহিত্যে এর প্রভাব গৌণ; ১৮৫৫ সনে লেখা প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরে দুলাল" প্রথম বাঙালীর লেখা বাংলা উপন্যাস; নানা দিক্ থেকে পরবর্তী বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে এর প্রভাব অপরিমেয়। ১৮৫৫ থেকে ১৯৬০ সন পর্যন্ত প্রায় এক শতাব্দী কালের বাংলা উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়, বিশ্বসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা যেদিকে প্রবাহিত হচ্ছে, বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসেরর ধারাও ঠিক সেই দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। সব সাহিত্যসমালোচক সে-বিষয়ে সচেতন নন। "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা" নামে বৃহদায়তন পুস্তকের লেখক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, উপন্যাস যতই সুপরিণত রূপ লাভ করবে, ততই তার প্রধান লক্ষণ হবে বাস্তবানুগামিতা। এই সিদ্ধান্ত অবলম্বনে তিনি ধরে নিয়েছেন যে, বাংলা উপন্যাসে ক্রমশ বাস্তবানুগামিতা প্রাবল্য লাভ করেছে এবং

করবে। কিন্তু বিশ্বসাহিত্যের গতি অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে, তাঁর সিদ্ধান্ত একদেশদর্শী; বাংলা দেশ যেহেতু বিশ্বছাড়া নয়, এবং উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অনুগামী, সেহেতু বাংলা উপন্যাসেও প্যারীচাঁদের পরবর্তী শতাব্দীর মধ্যে বাস্তবানুগামিতার ক্রমবর্ধমান প্রবলতা দেখা যায় নি।

বাংলার তথা ভারতের প্রাগ্‌আধুনিক সাহিত্যে উপন্যাসের অভাব এমন কি অনস্তিত্ব ছিল, একথা অপ্রতিবাদ্য। তার কারণ, ভারতের তৎকালীন মানস ও চিন্তাধারা একেলে উপন্যাসের জন্ম দিতে পারত না নেহাৎ স্বাভাবিক কারণেই: বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চল সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। আধুনিক যুগে ভারতীয় মানস পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার গুণে বিশ্বমনের সান্নিধ্যে এসে ব্যক্তিস্বাধীনতা কি বস্তু, তা বুঝতে শেখার পর বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা-সাহিত্যে উপন্যাসের উৎপত্তি হ'ল। উপন্যাসের অন্যতম কাজ ব্যক্তিত্ববোধের বিকাশ দেখান; বিংশ শতকে গোষ্ঠীর বিবর্তন তথা চেতনার অভিব্যক্তি দেখানও উপন্যাসের বিষয়ীভূত হয়েছে, যেমন ইলিয়া এরেনবুর্গের "পারির পতন।"

উপন্যাসের দুই প্রধান শাখা নভেল ও রোমান্সের মধ্যে নভেলের ক্ষেত্রে বাস্তবানুগামিতার সিদ্ধান্ত আংশিক ভাবে সত্য: সব ধরণের উপন্যাসের বেলায় তথাকথিত বাস্তবানুগামিতার কথা ওঠে না। আর সব ধরণের সাহিত্যের মত নভেল ও অন্যান্য উপন্যাসজাতীয় রচনায় সার্থকতার প্রমাণ পাওয়া যাবে রসপ্রাণতায় আর শ্রেণীরূপের প্রমাণ মিলবে নভেলের ক্ষেত্রে চরিত্রচিত্রণের প্রাধান্যে, বাস্তবানুগামিতায় কখনও নয়। রোমান্সের বেলায় যেমন, নভেলের ক্ষেত্রেও তেমনি, শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যের ব্যঞ্জনার জন্যে বাস্তবানুগামিতার আশু এবং অপরিহার্য প্রয়োজন নেই। কারো কারো ধারণা, নভেল হ'তে হ'লে বাস্তববাদী রচনা হওয়া দরকার। এই ধারণার মূলে কুঠারাঘাত জরুরি প্রয়োজন। নভেলের বৈশিষ্ট্য চরিত্র প্রাধান্যে, বাস্তববাদে কখনও নয়, একথা অবিস্মরণীয়।

যত দিন যাবে, ততই নভেলশ্রেণীর উপন্যাস অন্য সব উপন্যাসকে পরাস্ত করে শেষে একমাত্র উপন্যাস হয়ে উঠবে তা বরং সম্ভবপর; কিন্তু সর্বশ্রেণীর উপন্যাসকে বা বিশেষ করে নভেলকে ক্রমাগত বাস্তবানুগ হতে হবে, এই অদ্ভুত ধারণার কোন যুক্তিসম্মত ভিত্তি নেই; তা ছাড়া, কেবল নভেলই যে উপন্যাসজগতে একেশ্বর হয়ে বিরাজ করবে, তাও নয়; এই আধুনিক জড়বাদী যুগেও রোমান্স এবং অন্য নানা ধরণের উপন্যাসের চাহিদা থেকে বোঝা যায় যে, কেবল বাস্তবানুগ ভিন্ন অন্য জাতের উপন্যাসের প্রচলন অক্ষুণ্ণ ত আছেই, অনুমান করা যায় যে চিরদিনই থাকবে। পূর্ণ বস্তুপরতন্ত্র উপন্যাস বা নভেলের তুলনায় ওএল্‌স, মম্‌, ওয়াসারমান, হাক্‌স্‌লি, ইভলিন ওঅ প্রভৃতির কদর কম দেখা যায় নি। বাংলা দেশেও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা কারও চেয়ে কম নয়।

উপন্যাসে বাস্তবতা বলতে কি বোঝান উচিত, সে সম্বন্ধে আচার্য সুকুমার সেন মহাশয় একটি নিখুঁত বিশ্লেষণে বলেছেন: —

"সাহিত্যে 'বাস্তবতা' বলিলে বস্তুপরতন্ত্রতা বা realism নাও বুঝাইতে পারে। যে বস্তু, বিষয়, ব্যক্তি বা ভাব ইতিহাসে সত্য নয়, ভাবের দিক্‌ দিয়া সত্য হইতে তাহার পক্ষে কোনই বাধা নাই। বস্তুর জগৎ ও ভাবের জগতের মধ্যে যে সমন্বয় বা correspondence, তাহা সর্বদা খুঁটিনাটি অংশ লইয়া নয়—তাহা প্রতিচ্ছবি নয়, প্রতিফলন। বস্তুনিরপেক্ষ ভাব বা আদর্শগত বাস্তবতা অর্থাৎ idealism শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের উপজীব্য।"

এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, আমরা যে বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেক ক্ষেত্রে কল্পনাবিলাসী আদর্শবাদী বলে উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত দেখি, তিনি শ্রেষ্ঠ আদর্শগত বাস্তববাদী। বঙ্কিমচন্দ্র স্থূল অর্থে বস্তু-পরতন্ত্রবাদী ছিলেন না, কিন্তু তাঁর রোমান্টিক উপন্যাসাবলীতে নিখুঁত সাহিত্যিক বাস্তবতা আছে।

বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে নভেল ও রোমান্স—এই দুই শ্রেণীর উপন্যাস প্রবল; 'আলালের ঘরের দুলাল' নভেল জাতের উপন্যাস: রোমান্স জাতের উপন্যাস প্রথম রচনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র: ১৮৬৫ সনে তাঁর প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয় বাংলা উপন্যাস-জগতের প্রথম রোমান্সরূপে। দেখা যাচ্ছে যে, বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হ'ল নভেল এবং তা ১৮৫৫ সনের রচনা; এখানে 'ফুলমণি ও করুণা'-কে হিসেব থেকে বাদ দেওয়া হ'ল এবং মনে রাখা যাক্‌ যে, সেটিও নভেলপর্যায়ভুক্ত; বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্স নভেলের অন্তত দশ বছর পরে প্রকাশিত হয়; প্যারীচাঁদ মিত্রের বইএর সমসাময়িককালে প্রতাপচন্দ্র ঘোষ (?—১৯২১) বঙ্গাধিপ পরাজয় (প্রথম খণ্ড ১৮৬৯, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৪), তারকনাথ গাঙ্গুলি (১৮৪৩-৯১) স্বর্ণলতা (১৮৭৪), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) মেজ বৌ (১৮৭৯), রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)

সংসার (১৮৮৬), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৭-১৯৩২) স্নেহলতা (১৮৯২) প্রভৃতি কয়েকটি বাস্তবানুগ নভেল শ্রেণীর লেখা প্রকাশ করেন। কিন্তু শক্তিশালী লেখকের প্রতিভা যে সমস্ত অযৌক্তিক উপপত্তির উর্ধ্বে, সমসাময়িক সমাজের নভেল-প্রীতিকে পরাজিত করে রোমান্স যে ক্রমশ জয়লাভ করতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র তা প্রমাণ করলেন ১৮৬৫-৮৪, উনিশ বছরের মধ্যে চোদ্দটি রোমান্স পর্যায়ের উপন্যাস রচনা ক'রে। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক উপন্যাসের স্রষ্টা ও শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁর সমকালীন সমাজ যে রোমান্সের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল, ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকায় তিনি সহজেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, এমন কথা মনে করলে ভুল হবে। বাংলা সাহিত্যের ত বটেই, বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক ঔপন্যাসিক যাঁকে স্বচ্ছন্দে বলা চলে অন্ধ স্বজাতিপ্রীতির কিছুমাত্র পরিচয় না দিয়ে, সেই বঙ্কিমকে তাঁর নিজের সমাজ প্রসন্ন চিত্তে বরণ করে নেয় নি। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজ বৌ' প্রথম প্রকাশের পর তাঁর প্রথম প্রকাশিত যে কোন বইএর চেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছিল। কিন্তু ক্রমশ সমস্ত নভেল বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত হ'ল, নভেলপ্রিয় বাঙালী পাঠক সমাজ বঙ্কিমচন্দ্রকেই শিরোধার্য করে নিল তিনি বিশুদ্ধ রোমান্সের লেখক হওয়া সত্ত্বেও।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪) উপন্যাসজগতে আবির্ভূত হওয়ার আগে বাবু, নববাবুবিলাস, কলিকাতা কমলালয়, অঙ্গুরীয় বিনিময়, সফল স্বপ্ন, দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ, বিচিত্রবীর্য প্রভৃতি যে-সব ক্ষুদ্র রচনা লিখিত ও প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি বঙ্কিমচন্দ্রকে কোন প্রেরণা দিয়েছিল, এমন মনে করা ঠিক হবে না। ঐ সব রচনার ধারা তিনি গ্রহণ করেন নি। প্রথম থেকেই আদর্শগত বাস্তববাদের সঙ্গে রোমান্টিকতার সুসমন্বয় সাধন করে তিনি যে অভিনব উপন্যাস-শৈলীর প্রবর্তন করেন, তা একান্তভাবে মৌলিক। পাশ্চাত্য উপন্যাসের রস আকণ্ঠ পান করলেও তিনি বিশ্বসাহিত্যেও একজন মৌলিক স্রষ্টা। সার এডউইন আর্নল্ডের মতে, তাঁর কপালকুণ্ডলা-র অনুরূপ পাশ্চাত্য সাহিত্যে কিছু ছিল না। তাঁকে স্যার ওঅল্টার স্কটের অনুগামী মাত্র মনে করাও আর একটি গুরুতর প্রমাদ। স্কটের রচনা প্লট ও পরিবেশসর্বস্ব; কিন্তু বঙ্কিমের রচনায় সর্বত্র মহৎ জীবনদর্শন প্রতিভাত; Weltanschauüng-এর অনুরূপ কিছু স্কটের লেখায় পাওয়া যায় না; বঙ্কিম সমগ্র মানবজীবন পরিচালনার নীতি উপন্যাসের দ্বারাই নির্ধারণ করে গেছেন। এই আদর্শনিষ্ঠ জীবনবোধই প্রকৃত সাহিত্যিক বাস্তবতা; এই বাস্তবচেতনার জন্যেই বঙ্কিমের রোমান্স এক সঙ্গে লোককল্যাণকর এবং লোকপ্রিয় হতে পেরেছিল।

রঙ্গমল্লী

শ্রীসীতা দেবী

৭

রবিবার হইতেই পূর্ণিমা নিজের অফিস যাইবার কাপড়-চোপড়, হ্যাণ্ড্ব্যাগ, সব গুছাইতে আরম্ভ করিল। মাকে বলিল, "মা, স্কুলে যেরকম ক'রে যেতাম, এখানে সেরকম ক'রে গেলে চলবে না। অফিস পাড়ায় যারা কাজ করে তারা অনেক বেশী সাজগোজ ক'রে যায়। আমাকেও সেই চালে চলতে হবে ত? আমাকে তোমার শাড়ীর ভাণ্ডার থেকে আরও দু'খানা কাপড় দাও এখন। আমি আস্তে আস্তে নূতন শাড়ী দিয়ে ঋণ শোধ ক'রে দেব।"

মা বলিলেন, "তোদের দু'জনের জন্যেই রাখা, তার আর ঋণই বা কি, শোধই বা কি? দরকার থাকে নে।"

সরমা বলিল, "ভাগ্যে স্যাণ্ডালটা ক'দিন আগেই কিনেছিলে, বেশ নূতন রয়েছে। তোমার হ্যাণ্ড্ব্যাগটা কিন্তু বড় shabby হয়ে গেছে ভাই।"

দিদি ঠাট্টা করিয়া বলিল, "স্কুলের মেয়েরা আমাকে এক দিন বিদায়-অভিনন্দন দেবে শুনছি। একটা উপহার সে সময়ে দেওয়া নিয়ম, ব'লে আসব নাকি যে একটা হ্যাণ্ড্ব্যাগ দিও?"

সরমা বলিল, "বলতে পারলে ত ভালই হ'ত।"

যাহা হউক, এখন যাহা আছে তাহা লইয়াই পরদিন সকাল সকাল খাইয়া পূর্ণিমা বাহির হইয়া পড়িল। ভীড়ে কষ্ট খানিকটা পাইতেই হইল। বুঝিল, রোজই পাইতে হইবে। ভীড় এড়াইতে হইলে যত সকালে বাহির হইতে হয়, তাহার মধ্যে মায়ের রান্না হইয়া ওঠে না। সারাটা দিন ত অফিসে কাজ করা যায় না, না খাইয়া?

অফিসের দরজার ভিতর ঢুকিতে হেড টাইপিষ্ট্ বিকাশবাবুর সঙ্গে তাহার দেখা হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "বেশ, বেশ, ঠিক সময়েই এসেছেন। চলুন, আপনাকে বসবার জায়গা-টায়গা সব দেখিয়ে দিচ্ছি।"

তাঁহার সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পূর্ণিমা সবই দেখিয়া লইল। তাহার ঘরটি বড় সাহেবের ঘরের কাছেই, পাশাপাশি বলিলেই হয়। বাথরুম প্রভৃতিরও বেশ ভাল ব্যবস্থা আছে। ঘরটি ছোট, তবে আলো-বাতাস খুব। দরকারি আসবাব-পত্র সবই আছে, ভাল একটি টাইপরাইটারও আছে।

জিজ্ঞাসা করিল, "এ ঘরে আমি একলা বসব?"

বিকাশবাবু বলিলেন, "এখন ত একলাই। যদি আর কোন মেয়ে আসে পরে, তখন দেখা যাবে। আপনি বসুন, এখনি মিঃ মজুমদার ডেকে পাঠাবেন," বলিয়া বিকাশবাবু প্রস্থান করিলেন।

ভদ্রলোকের পদবী তাহা হইলে মজুমদার? যাহা হউক, এইটুকু ত জানা গেল।

বেয়ারা আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহাকে ডাকিবার জন্য। তাহার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণিমা গিয়া ঢুকিল, আগের দেখা সেই ঘরটিতে।

মিঃ মজুমদার তাকাইয়া দেখিয়া বলিলেন, "সুপ্রভাত। ঠিক সময়েই এসেছেন। অফিসের কাজে punctuality-টা বড় দরকার। আমি সদৃষ্টান্ত দেখাবার খাতিরে সর্ব্বদাই ঠিক সময়ে আসি। যদিও দু'-একদিন দেরি আমি ইচ্ছা করলে করতে পারি। আপনি যখন আমার সেক্রেটারি আর স্টেনোর কাজ করছেন তখন আপনাকেও রোজ ঠিক সময়ে আসতে হবে। কোন্ পাড়ায় থাকেন আপনি?"

"বালিগঞ্জে। একেবারে লেকের কাছে।"

"তা হ'লে ত বেশ দূর আছে। যাক, প্রথম বয়সে একটু কষ্ট করা ভাল, মানুষ শক্ত হয়ে যায় এতে।"

পূর্ণিমা মনে মনে ভাবিল, কত কষ্ট যে তাহাকে প্রথম জীবনে সহ্য করিতে হইয়াছে তাহা যদি ভদ্রলোক জানিতেন। শক্ত অবশ্য কতদূর সে হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। যাহা হউক, তাহাকে তখনই কাজ আরম্ভ করিতে হইল, সুতরাং আর বেশী কিছু ভাবিবার সময় রহিল না।

প্রথম দিন কাজে অল্প-স্বল্প ভুল হইল। মিঃ মজুমদার সেগুলিতে দাগ দিয়া বলিলেন, "আর একবার টাইপ ক'রে আনুন। লজ্জা পাবার কিছু নেই, আমি যখন

প্রথম টাইপ করতে শিখি, তখন এর চেয়ে ঢের বেশী ভুল করতাম।"

পূর্ণিমা ভাবিল, ভাগ্যে সে প্রথমেই এইরূপ সহৃদয় লোকের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল। বেশী কড়া মানুষ হইলে সে ভয় পাইয়া আরও বেশী ভুল করিত হয়ত। সারাদিনই কাজ চলিল, বসিয়া থাকিবার বিশেষ অবসর পাওয়া যায় না। তবে পরিবেশটা ভাল, একটি মানুষের সঙ্গেই যা সম্পর্ক, আর সবটাই ত নিরালায় বসিয়া আপন মনে কাজ করা। চারিটার পর তাহার বড়ই ক্লান্ত লাগিতে লাগিল। এই সময় সে স্কুল হইতে ফিরিয়া চা খাইত। কিন্তু অফিস ত পাঁচটার আগে ছুটিই হয় না।

পাঁচটাতেই সে ঠিক ছুটি পাইল। সকলেই তখন বাড়ী যাইবার জন্য উঠিয়াছে। আস্তে আস্তে সে হাঁটিয়াই নামিয়া চলিল। লিফ্‌ট্‌-এ বড় ভীড়, অত ঠাশাঠাশির মধ্যে উঠিতে তাহার ভাল লাগিল না। একতলায় পৌঁছিয়াই দেখিল, মজুমদার সাহেব লিফট্‌ হইতে বাহির হইয়া আসিতেছেন। পূর্ণিমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "হেঁটে নামছেন কেন? ব্যবস্থা একটা রয়েছে যখন?"

পূর্ণিমা বলিল, "হেঁটে নামতে আমার কোন কষ্ট হয় না। অফিস ভাঙার মুখে সবাই চড়তে চায় লিফট্‌-এ, বড় ভীড় হয়।"

মজুমদার বলিলেন, "কর্ম্মজগতে নেমে এসেছেন, এখন ভীড় আর avoid করবেন কি ক'রে? চিরজীবন এই ভীড়েই কাটাতে হবে।"

অতঃপর তিনি প্রস্থান করিলেন, এবং পূর্ণিমাও ট্রাম ধরিবার জন্য যথাস্থানে গিয়া দাঁড়াইল।

বাড়ী পৌঁছিল তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। সরমা আসিয়াই প্রশ্নের স্রোত বহাইয়া দিল, "কি রকম কাজ করলে দিদি আজকে?"

পূর্ণিমা কাপড় বদ্‌লাইতে বদ্‌লাইতে বলিল, "কাজ মন্দ করি নি। দু'চারটে ভুল অবশ্য করেছি। তা আমার বড় সাহেব লোক খুব ভাল, ধমক-ধামক কিছু করেন নি, খালি আর একবার টাইপ করিয়ে নিয়েছেন।"

সরমা সশব্দে হাসিয়া উঠিল, বলিল, "ঠিক স্কুলের task লেখার মত।"

পূর্ণিমা বলিল, "তাই প্রায়, তবে একলা ঘরে ব'সে করতে হয় ব'লে কোন লজ্জা করে না।"

তাহার মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "একেবারে সন্ধ্যার মুখে ফিরলি, ক্ষিদে পায় নি?"

"ক্ষিদে পায় নি ঠিক, তবে তেষ্টা পেয়েছিল। খালি মনে হচ্ছিল, এক পেয়ালা চা হ'লে মন্দ হ'ত না।"

চা, জলখাবার যাহা ছিল, খাইয়া লইল। তাহার পর ধীরে-সুস্থে, চুলটা আর একবার ভাল করিয়া বাঁধিয়া, মুখে সামান্য একটু পাউডার দিয়া সে বেড়াইতে চলিল।

দীপক বসিয়াই ছিল, বলিল, "খুব দেরি করলে যা হোক্‌, কতক্ষণ থেকে ব'সে আছি।"

পূর্ণিমা বলিল, "এর পর ত দেরিই হবে, শনি-, রবিবার ছাড়া। পাঁচটার আগে ত ছাড়া পাই না।"

দীপক বলিল, "তা ত পাবেই না, এ ত মেয়ে ঠ্যাঙানোর কাজ না।"

পূর্ণিমা বলিল, "এখানেও ছেলে ঠ্যাঙাতে হতে পারে। বিজ্‌ বিজ্‌ করছে পুরুষ মানুষ চারিদিকে, সবাই কিছু সভ্য বা ভদ্র নয়।"

দীপক বলিল, "এবার নিজে ঠেকে শিখবে। আমার কথা ত হেসে উড়িয়ে দাও। কেন, প্রথম দিনেই কিছু অভিজ্ঞতা হয়ে গেল নাকি?"

পূর্ণিমা বলিল, "না, না, অভিজ্ঞতা কিছু হয় নি। তবে এক-একটা লোক কেমন ক'রে যেন তাকায়, ভাল লাগে না। আর ট্রামেও যেমন ভীড়, লিফট্‌-এ ও তেমন ভীড়। গরমের দিনে বিশ্রী লাগে বড়। ট্রামের ঠেলা-ঠেলিটা অবশ্য কিছু নূতন নয় আমার কাছে। আগের কাজেও বেশীর ভাগ ট্রামে-বাসেই গিয়েছি ত? আর এই সময়ই গিয়েছি।"

দীপক বলিল, "এ রকম এক ঘণ্টা ধ'রে ত যাও নি?"

পূর্ণিমা স্বীকার করিল, "তা যাই নি অবশ্য।"

দীপক বলিল, "তোমার অফিসের কিছু কিছু খবর সংগ্রহ করলাম।"

পূর্ণিমা বলিল, "ব'লে ফেল।"

দীপক বলিল, "ভালগুলো আগে বলছি। মাইনে পাওয়া নিয়ে কোন হাঙ্গাম হবে না। মাসের গোড়াতেই পেয়ে যাবে। অফিসের কাজ ক্রমে বাড়ছে, কাজেই হঠাৎ ছাঁটাই হবারও কোন সম্ভাবনা নেই।"

পূর্ণিমা বলিল, "আর মন্দটা কি?"

দীপক বলিল, "মন্দ এই যে, বেশ বদ্‌ লোক আছে staff-এর মধ্যে। বিরক্ত খুবই করবে, খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হবে তোমাকে।"

পূর্ণিমা বলিল, "চলাফেরার পর্ব্ব খুবই কম। একবার হেঁটে বা লিফট্‌-এ ক'রে উঠি, এবং আর একবার সেই

ভাবেই নেমে আসি। বাকি সময় কাজ করি নিজের ঘরে ব'সে, নয় বড় সাহেবের ঘরে ব'সে ডিকৃটেশন লিখি। আমাকে জ্বালাবার সুবিধা খুব বেশী নেই।"

দীপক বলিল, "ইচ্ছা থাকলে কি উপায়ের অভাব? তোমাকে কোথায় বসতে দিয়েছে? হিরণ্ময় মজুমদারের ঘরের পাশেই নাকি?"

পূর্ণিমা বলিল, "ওঁর নাম যে হিরণ্ময় তা ত এই প্রথম শুনলাম। তুমি দেখি অনেক খবর জোগাড় করেছ। হ্যাঁ, আমাকে মিঃ মজুমদারের ঘরের পাশেই একটা ছোট ঘর দিয়েছে।"

দীপক বলিল, "মজুমদারের বিষয়ে এমনি ত ভাল রিপোর্টই পেলাম। কারু সঙ্গে বেশী খারাপ ব্যবহার করে না। তবে কাজে ফাঁকি, সময়ে ফাঁকি এ সব সহ্য করে না। আর একটা খবর শুনে একটু চিন্তিত হলাম।"

পূর্ণিমা উৎসুক হইয়া বলিল, "সেটা কি শুনি?"

দীপক বলিল, "ভদ্রলোক এত বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত আছেন।"

পূর্ণিমা হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "দেখ ত কাণ্ড! এর আবার খারাপ-ভাল কিছু আছে নাকি? তাঁর খুশি তিনি বিয়ে করেন নি, তাতে অন্য লোকের কি?"

দীপক বলিল, "অন্য লোকের পাছে কিছু হয়, সেই জন্যেই চিন্তা।"

পূর্ণিমা বলিল, "নিজের চরকায় তেল দিলেই ত পারে অন্য লোকরা। কাজকর্ম্ম নেই কি? কোথায় কোন্ ভদ্রলোক বিয়ে করছে না, তাতে তাদের ভালই বা কি, মন্দই বা কি?"

দীপক বলিল, "আচ্ছা, থাক ওকথা। ছেলেমানুষদের মাথায় বেশী idea ঢুকিয়ে দিতে নেই।"

পূর্ণিমা বলিল, "ঢের হয়েছে, আর বাজে বকতে হবে না। বড়কীর কোন খবর পেয়েছ?"

দীপক বলিল, "চিঠিপত্র কিছু আসে নি, লিখতে দেয় না বোধ হয়। তবে কবে জোড় ভাঙতে আসবে সেইটা ব'লে পাঠিয়েছে।"

পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করিল, "শ্বশুরবাড়ী ওর কোথায় হ'ল?"

দীপক বলিল, "কাছেই, রাণাঘাটে।"

পূর্ণিমা বলিল, "করে কি তোমার ভগ্নীপতি?"

দীপক বলিল, "থাকবার ঘর আছে, কিছু জমিজমা আছে এইটাই জানি। কাজ হয়ত একটা করে, কিন্তু কি কাজ তা ভুলে গেছি।"

পূর্ণিমা বলিল, "তোমার স্মরণশক্তির প্রশংসা করতে পারলাম না। বোনকেও দু'দিন পরে ভুলে যাবে।"

দীপক বলিল "যাব হয়ত। মনে রেখে যখন কোন লাভ নেই।"

পূর্ণিমা বলিল, "এ বেশ কথা, মানুষ মানুষকে মনে রাখে শুধু কি লাভের জন্যেই?"

দীপক উত্তর দিল না। মিনিট কয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কাজকর্ম্ম হ'ল কেমন আজ?"

পূর্ণিমা বলিল, "মন্দ নয়, তবে একেবারেই ভুল হয় নি তা নয়।"

"বকুনি খাও নি?"

পূর্ণিমা বলিল, "না, মজুমদার সাহেব ও'দিক্ দিয়ে খুব ভাল। আবার করিয়ে নিলেন, এই পর্য্যন্ত।"

দীপক বলিল, "এই পুরুষ সেক্রেটারী হ'লে, অন্যরকম মূর্ত্তি দেখতে তাঁর।"

পূর্ণিমা বলিল, "হবে, জানি না ওসব।"

আর কিছু কথাবার্ত্তার পর পূর্ণিমা বাড়ী যাইবার জন্য উঠিল।

দীপক বলিল, "এত তাড়াতাড়ি চলেছ কোথায়?"

পূর্ণিমা বলিল, "কিরকম ঝড় আসছে দেখছ না। কালবৈশাখীর পাল্লায় পড়লে ভীষণ মুশকিল হবে।"

সে তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। দীপকের উৎকণ্ঠা আর ঈর্ষা দেখিয়া তাহার হাসি পাইতে লাগিল। বেচারা হিরণ্ময় মজুমদার। অনর্থক তাঁহার সম্বন্ধে এসব আলোচনা ওঠে কেন? ধরণধারণে তিনি অতিশয় ভদ্রলোক।

পরদিন স্নান করিয়া কাপড় পরিতে পরিতে সে সরমাকে বলিল, "ওখানে যারা সব স্টেনো, সেক্রেটারী বা টেলিফোন অপারেটারের কাজ করে, তাদের দেখলে চমকে যাবি। আমাকে তাদের পাশে বোধ হয় ভিখিরীর মত দেখায়।"

সরমা চটিয়া বলিল, "ইস্, তা আর দেখায় না? তোমার মত মিষ্টি দেখতে ক'টা আছে? খালি অসভ্য কাপড়-চোপড় পরলে, আর ঠোঁটে-গালে একগাদা রং মাখলেই বুঝি চেহারা খোলে?"

পূর্ণিমা বলিল, "চেহারা যেমনই খুলুক, বড়মানষি দেখান হয়, ফ্যাশনেব্‌ল্ ব'লে নামও হয়।"

সরমা বলিল, "তোমাদের অফিসে আর মেয়ে আছে?"

পূর্ণিমা বলিল, "একজন ত দেখলাম লিফট্-এ উঠলেন, আমাদের অফিসেই ঢুকলেন। বোধ হয় টেলিফোন অপারেটার। পার্শী ব'লে মনে হ'ল।"

সরমা জিজ্ঞাসা করিল, "খুব সুন্দর ?"

পূর্ণিমা বলিল, "না, সুন্দর কিছু নয়। আরো মেয়ে আসে-যায়, নানা কাজে। ঐ বাড়ীতেই আরো সব অফিস আছে ত? সেখান থেকেও নানা ছাঁদের মেয়ে বেরোয় সব।"

সরমা বলিল, "তুমি ভাই আস্তে আস্তে ভাল কাপড়-চোপড় কতগুলো ক'রে নিও। কারু কাছে হার মানবে কেন তুমি?"

গল্প করিবার সময় বেশী ছিল না। খাইয়া-দাইয়া পূর্ণিমা বাহির হইয়া পড়িল। আজও উঠিবার সময় লিফট্-এই উঠিল। ভীড়ের জন্য বিরক্ত লাগে বটে, কিন্তু হাঁটিয়া উঠিবার মত সময় হাতে ছিল না। মজুমদার সাহেব হয়ত চটিয়াই যাইবেন, দেরি দেখিলে।

সে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিতে-না-ঢুকিতেই বেয়ারা তাহাকে ডাকিতে আসিল। পূর্ণিমার দিন সুরু হইল। একবার একটা চিঠি টাইপ করিয়া আনার পর হিরণ্ময় বলিলেন, "মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস নেবার অবকাশ পাচ্ছেন ত? না একটানাই কাজ চলছে?"

পূর্ণিমা বলিল, "না, না, মাঝে মাঝে ত বেশ ব'সে থাকি।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "এ ঘরে অনেক ম্যাগাজিন আছে, নিয়ে যেতে পারেন, এক-আধখানা। ব'সে ব'সে ছবি দেখবেন, যখন কাজ না থাকবে।"

পূর্ণিমা খুশী হইয়া একখানা ম্যাগাজিন লইয়া গেল। ছবিও দেখা চলিবে, গল্পও পড়া চলিবে।

আজ মজুমদার সাহেবের বাহিরে কোথায় কাজ ছিল। তিনি যাইবার আগে পূর্ণিমাকে বলিয়া গেলেন, "আপনিও ইচ্ছে করলে চ'লে যেতে পারেন।"

পূর্ণিমা ত বাঁচিয়া গেল। তাড়াতাড়ি তাহার ব্যাগ ও ছাতা প্রভৃতি গুছাইয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। সন্ধ্যায় আজকাল প্রায়ই ঝড়ঝাপটা আসে, সে সময় বাহিরে থাকিলেই বিপদ্। কপালগুণে ঝড়টা সে ট্রামে থাকিতে থাকিতে আর আসিল না। ঘরে ঢুকিতেই চারিদিক্ কাঁপাইয়া প্রচণ্ড ঝটিকা আসিয়া পড়িল। তখন ছুটাছুটি করিয়া উঠানের কাপড়-চোপড় সরান, দরজা-জানলা বন্ধ করার ধুম লাগিয়া গেল। ঝড় যদি থামিল ত আসিল বৃষ্টি। বৃষ্টি আর সে সন্ধ্যায় থামিলই না।

চা খাইয়া পূর্ণিমা খাটে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল। আজ ত আর বাহিরে যাইবার সম্ভাবনা মাত্র নাই। দীপকও বাহির হইতে পারিবে না। শুইয়া শুইয়া কত-রকম চিন্তা যে তাহার মাথায় আসিতে লাগিল। দীপক কাল বলিয়াছিল, staff-এর ভিতর অনেক বদ্ লোক আছে। কে তাহারা কে জানে? এখন পর্য্যন্ত ত হিরণ্ময় মজুমদার ও বিকাশবাবু ছাড়া আর কাহারও সঙ্গে তাহার আলাপ হয় নাই। দুজনেই অত্যন্ত ভদ্র, বিকাশবাবু ত পিতৃতুল্য প্রৌঢ় ব্যক্তি। তবে যাওয়া-আসার পথে তাহার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে, কয়েকজন যুবক কেরাণী, ইহা সে লক্ষ্য করিয়াছে। কদিনই বা সে যাইতেছে অফিসে, ক্রমে ক্রমে সবাইকার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

বৃষ্টির জন্য বেশীর ভাগ জানলা আজ বন্ধ করিয়া শুইতে হইল। গরমে ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিল না। আজে-বাজে স্বপ্ন দেখিল অনেক।

পরদিন অফিসে লিফট-এ বড় সাহেবের সঙ্গেই সে উপরে উঠিল। অন্যদিন তাহার গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইবার জন্য প্রতিযোগিতা লাগিয়া যায়। আজ সকলেই সতর্ক হইয়া রহিল।

কাজ অন্যদিনের মতই চলিতে লাগিল। একটা-দেড়টার সময় বেয়ারা একবার তাহাকে ডাকিতে আসিল। ঘরে ঢুকিয়া পূর্ণিমা দেখিল হিরণ্ময় বসিয়া চা খাইতেছেন। পূর্ণিমাকে দেখিয়া বলিলেন, "এই যে এক মিনিট। এখনই হয়ে যাবে।" চায়ের পেয়ালা প্রভৃতি একপাশে ঠেলিয়া সরাইয়া, তিনি কাগজপত্র হাতে লইয়া কাজ আরম্ভ করার উদ্যোগ করিলেন। হঠাৎ সেগুলি নামাইয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, এই যে সাড়ে ন'টা থেকে সাড়ে পাঁচটা অবধি আপনি বাইরে থাকেন, এর মধ্যে খান কিছু?"

পূর্ণিমা একটু যেন লজ্জিত হইয়া বলিল, "না।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "এটা ত ভাল নয়। আট-ন'ঘণ্টা এরকম না খেয়ে থাকা উচিত নয়। স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবে যে? এখানে canteen আছে ভাল, বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সেখান থেকে কিছু খাবার আনিয়ে রোজ খান। আমরা সকলেই তাই করি।"

পূর্ণিমা একটুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর মৃদু কণ্ঠে বলিল, "এখন ত afford করতে পারব না।"

হিরণ্ময় একটু যেন অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন। বলিলেন "Oh, I am sorry! না জেনে কথাটা বলা আমার ঠিক হয় নি। কিন্তু দেখুন, কতই বা খরচ হবে মাসে? টাকা কুড়িই ধরুন? শনি-রবিবারে ত আর খাচ্ছেন না?

তা টাকা কুড়ি extra আয়ের ব্যবস্থা আমি আপনার ক'রে দিতে পারি, যদি আপনার আপত্তি না থাকে।"

পূর্ণিমা একটু যেন উন্মনা হইয়া পড়িয়াছিল। কি ভাবিতেছিল কে জানে? এইবার জিজ্ঞাসা করিল, "কি করতে হবে?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "overtime কাজ করতে হবে কিছু। বেশী নয় সপ্তাহে দু'দিন। তা হ'লেই আপনার কুলিয়ে যাবে। পারবেন?"

পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারই কাজ করব ত?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "হ্যাঁ, আমারই। ঐ দু'দিন আমাকেও সন্ধ্যার পর থাকতে হয়।"

পূর্ণিমা বলিল, "আচ্ছা, থাকব।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "প্রায় সাতটা হয়ে যাবে বাড়ী যেতে। ভয় করবে না ত?"

পূর্ণিমা বলিল, "ভয় করবে না। মা হয়ত ভাববেন, তাঁকে বুঝিয়ে বলব।"

"তাই বলবেন। নিন এইবার কাজ আরম্ভ করুন।"

পূর্ণিমা আবার কাজে মন দিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু কেমন যেন অস্থির লাগিতে লাগিল। নানা অবান্তর চিন্তা আসিয়া তাহার মনের ভিতর ঘুরপাক খাইতে লাগিল। অন্য দিনের চেয়ে কাজে আজ দুই-চারিটা ভুল বেশীই হইয়া গেল।

হিরণ্ময় সেটা লক্ষ্য করিলেন। বলিলেন, "এই দেখুন, মানুষে বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়লে, কাজও ভাল ভাবে করতে পারে না। সুতরাং সকল দিকে উন্নতির জন্যে শরীর আগে ভাল রাখা চাই। আমরা ত কখনও কখনও বারো-চোদ্দ ঘণ্টা কাজ করেছি একটানা, কিন্তু তাও মাঝে মাঝে খেয়ে তবে। আচ্ছা, আজ এই পর্য্যন্ত। আপনাকে সামনের সোমবারে থাকতে হবে খানিকক্ষণ অফিস ছুটি হয়ে যাবার পরে, আর বৃহস্পতিবারে। খাওয়াটা কিন্তু কাল থেকে আরম্ভ করুন। সত্যিই শেষের দিকটায় আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখায়।"

কাজ শেষ হইয়া গেল সেদিনকার মত। পূর্ণিমা নিজের জিনিস-পত্র গুছাইয়া লইল। ঘরের চারিদিকটাও চাহিয়া দেখিল, কোথাও অগোছাল হইয়া আছে কি না। তাহার পর সিঁড়ি দিয়া আস্তে আস্তে নামিতে লাগিল। মনের ভিতরটায় এত এলোমেলো চিন্তা কেন আসিতেছে?

মানুষে যখন মহৎ হয়, তাহাদের সামান্যতম কাজেও সেই মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। দু'দিনের পরিচিতা পূর্ণিমা, হিরণ্ময়ের অফিসের একজন কর্মী মাত্র, অথচ তাহার সুখ-সুবিধা, স্বাস্থ্যের প্রতি ভদ্রলোক কতখানি দৃষ্টি রাখিয়াছেন। তাঁহার কি দায় ছিল? এক মা ছাড়া কে আর তার ভাবনা কখনও ভাবিয়াছে? দীপক? না, সেই বা কবে সত্যকার পূর্ণিমার ভাবনা ভাবে? তাহার নিজের জীবনে পূর্ণিমার স্থান যেখানে, সেইটুকুই সে দেখে, সেইটুকুর ভাবনাই ভাবে।

৮

পূর্ণিমার overtime কাজ করার কথা শুনিয়া দীপক সেদিন একেবারেই খুশী হইল না। বলিল, "এতদিন ঘরের মেয়ে ছিলে পূর্ণিমা, এখন সত্যিই career woman হতে চললে। এই যে জিনিসটি ঢুকল তোমার জীবনে, এ সুঁচ হয়ে ঢুকল বটে, কিন্তু ফাল হয়ে বেরোবে।"

পূর্ণিমা বলিল, "কি জিনিষ?"

"এই career-এর লোভ, টাকার লোভ। ঘরের টান এবার কমবে, বাইরের টানই বাড়বে।"

পূর্ণিমা বিরক্ত হইয়া গেল। বলিল, "career বা টাকা কোনটাই না হ'লে যদি চলত, তাহ'লে লোভ বলা যেত বটে। কিন্তু যখন ওরই উপর নির্ভর ক'রে নিজে বেঁচে থাকতে হবে, অন্য তিনটে মানুষকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে, তখন তাকে কোন বুদ্ধিমান্ মানুষে লোভ বলে না, necessity বলে।"

"কিন্তু এতদিন কি তুমি বেঁচে ছিলে না?"

পূর্ণিমা বলিল, "আমি ওকে বেঁচে থাকা বলি না। ম'রে যাই নি এই অর্থে শুধু বেঁচে থাকা। আমরা খেতে পাই না পেট ভ'রে, কাপড় পাই না প্রয়োজনমত, ছোটগুলোর পড়াশুনো হয় না ভাল ক'রে। রোগ হলে বুড়ো মা ওষুধ পান না, বিশ্রাম পান না। এর নাম বেঁচে থাকা নয়।"

দীপক বলিল, "বাইরের জীবনে তোমার অনেক অভাব আছে তা স্বীকার করি। সেগুলির কিছু কিছু তোমার মিটবে এই চাকরি নেওয়ার ফলে। কিন্তু অন্য কোথাও রিক্ততা কি আরো বেড়ে যাবে না? এই সামান্য একটা কি দেড়টা ঘণ্টা আমাদের নিজেদের জন্যে ছিল। তাও সপ্তাহে দুটো দিন এখন থেকে থাকবে না। এর জন্যে কোন দুঃখ নেই তোমার পূর্ণিমা? বাইরের জীবনটাই তোমার কাছে ঢের বেশী সত্য, ঢের বেশী মূল্যবান্।"

পূর্ণিমার মুখের উপর একটা বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া আসিল। বলিল, "ঠিকই বলেছ, ঢের বেশী সত্য ওটা, বড় নিষ্ঠুর রকমের সত্য। মূল্যবান্ কোন্‌টা বেশী কোন্‌টা

কম, তা জানি না। মূল্য কি-ভাবে যে এর নির্ণয় করব, তাও জানি না।"

দীপক বলিল, "নিজে যখন জান না, তখন অন্য কেউ জানিয়ে দিতেও পারবে না। 'যেচে মান, কেঁদে সোহাগ' যে হয় না, তা সবাই জানে।"

পূর্ণিমা ইহার কোন জবাব দিতে পারিল না। এ ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের অভিমান করা অনুচিত, তবে তৎসত্ত্বেও কেহ যদি করে, তাহাকে কি বলিয়া বোঝান যায়? কি করিয়া তাহার অভিমান ভাঙা যায়? আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে, দীপক যে পরিমাণ অভিমান করিতেছে, ততখানি আগ্রহ পূর্ণিমার মনে জাগিতেছে না, সেই অভিমান দূর করার জন্য। দীপকের অযৌক্তিকতা দেখিয়া দেখিয়া সে যেন শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

আচ্ছা, মা কি পূর্ণিমাকে দীপকের মতই বা তাহার চেয়ে ঢের বেশী ভালবাসেন না? সে বিষয়ে পূর্ণিমার সন্দেহ নাই। কই, তিনি ত এ খবর শুনিয়া অভিমান করিলেন না? দুঃখ করিলেন বটে, তাহার এত পরিশ্রম করিতে হইবে শুনিয়া, কিন্তু যখন বুঝিতে পারিলেন পূর্ণিমার স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই হিরণ্ময় এই ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন আর রাগ বা দুঃখ কিছুই করেন নাই, হিরণ্ময়ের প্রশংসাই করিয়াছেন কিন্তু কেন যে সে overtime খাটিবে, তাহার কারণ দীপককে বলিতে পূর্ণিমার সাহস হয় নাই। সে ইহার একটা কদর্থ করিবেই। প্রথম হইতেই হিরণ্ময় সম্বন্ধে দীপকের একটা ঈর্ষার ভাব আছে, তাঁহার কোনও কাজই সে ভাল চোখে দেখে না।

খানিক পরে দীপক বলিল, "ঐ দুটো দিন বিকেলে তা হ'লে আমিও কিছু কাজের চেষ্টা করি না?"

পূর্ণিমা বলিল, "ভাল কিছু পাও যদি ত কেন করবে না?"

দীপক বলিল, "ভাল কিছু পাওয়া আমাদের পক্ষে অত সহজ নয়। তবু একটা লাইব্রেরীর সঙ্গে কথা চলছিল, আমি তখন তত গা করি নি, আবার কথা ব'লে দেখব।"

অফিস ফেরত এখানে আসিতে দেরি হইয়া যায়, কাজেই খুব বেশীক্ষণ বসা চলে না। পার্কের আলো জ্বলিয়া উঠিতেই পূর্ণিমা উঠিয়া পড়িল। বলিল, "যাই তবে আজ। বড়কীরা কবে আসছে?"

দীপক বলিল, "রবিবার কি সোমবার হবে। তুমি যদিও আজকাল আর আমার সঙ্গে দেখা করতে বেশী ব্যস্ত নও, তবু জানিয়ে রাখি। ভগ্নীপতি যেদিন আসবেন, সেদিন আমি বিকেলে বেরোতে পারব না। বাড়ী ব'সে ব'সে তাঁকে খাতির করতে হবে। তার পরদিনও যদি না আসি ত জেনো যে, তিনি তখনও বিদায় হন নি। সরমা ত সারাক্ষণই লিলিদের বাড়ী আসছে-যাচ্ছে, ওর কাছেই খবর পাবে।"

"আচ্ছা", বলিয়া পূর্ণিমা চলিয়া গেল।

পরদিন হইতে অফিসের অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে সেও দেড়টা-দুইটার সময় চা-জলখাবার খাইতে লাগিল। দেখিল সত্যই আগের মত ক্লান্ত সে আর হয় না। বসিয়া বসিয়া পিঠও তাহার ধরিয়া উঠে না। মাসের শেষে বিল চুকাইয়া দিলেই চলিবে, কাজেই এখনই পয়সার ভাবনাও তাহাকে ভাবিতে হইবে না।

Overtime কাজ আরম্ভ হইল। প্রথমদিন পূর্ণিমার কেমন যেন একটা অস্বস্তি লাগিতে লাগিল। বিরাট্ অফিস বাড়ী প্রায় খালি হইয়া গিয়াছে। দুই-চারিটি মানুষমাত্র কাজ করিতেছে। টেলিফোন নীরব, calling bell-এর আওয়াজও প্রায় শোনা যায় না। খালি তাহার নিজের টাইপরাইটারটা খটাখট শব্দ করিয়া চলিয়াছে। হিরণ্ময়ের কণ্ঠস্বর ছাড়া মানুষের গলার আওয়াজও বিশেষ পাওয়া যায় না

ঘণ্টা দেড় কাজ করিবার পর হিরণ্ময় বলিলেন, "আজকের মত এই। দেখুন, বাড়ী যেতে ভয় করবে না ত? নইলে আমি খানিকটা এগিয়ে দিয়ে যেতে পারি।"

পূর্ণিমা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না, না। আমি বেশ যেতে পারব। একলা যাওয়া-আসার খুব অভ্যাস আছে। বেশী রাত ত কিছু হয় নি?"

হিরণ্ময় হাসিয়া বলিলেন, "বেশ, বেশ, স্বাবলম্বী হওয়ার মত জিনিষ নেই। এগোন তা হ'লে। তবে দরকার হ'লে আমি গাড়ী ক'রে পাঠিয়ে দিতে পারি। মহিলা কর্মীদের, এমন কি ভদ্রলোকদেরও emergency হলে আমাকে এ ভাবে সাহায্য করতে হয়। নূতন কিছু নয় এটা। কলকাতার শহর, বৃষ্টি হয়ে রাস্তাঘাট ডুবে যাওয়া বা ট্রাম ষ্ট্রাইক্ হওয়া কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়, সারাক্ষণই ঘটছে। সে ক্ষেত্রে ভয় পাবেন না, উপায় হয়েই যাবে।"

প্রথম দিন সাতটা বাজিয়া কয়েক মিনিট হইতেই সে বাড়ী পৌঁছিল। জলখাবার আর খাইতে চাহিল না, বলিল, "প্রায় ত ভাত খাওয়ার সময় হয়ে এল, শুধু চা-টাই দাও।"

বৃহস্পতিবারই বাধিল বিপদ্। সকাল হইতেই আকাশটা ঘোলাটে হইয়া ছিল, দুপুর হইতেই আকাশে মেঘ জমিতে আরম্ভ করিল। সকলেই উদ্বিগ্ন ভাবে একবার আকাশের দিকে তাকাইল। কিন্তু কাজ ফেলিয়া পালান ত যায় না? সকলে বসিয়া কাজই করিতে লাগিল।

পাঁচটা বাজিতে না বাজিতেই কালবৈশাখীর তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হইয়া গেল। ধুলায় পথঘাট এমন অন্ধকার হইয়া উঠিল যে, মানুষ চোখে দেখিতে পায় না। ঘরের ভিতরেও রাশ রাশ ধুলা আসিয়া, ঘরের মেঝে, চেয়ার টেবিল সব ঢাকিয়া ফেলিল। দরোয়ান, বেয়ারারা ছুটাছুটি করিয়া দরজা-জানলা সব বন্ধ করিতে লাগিল। মহাশব্দে দু'চার জায়গায় শার্সি ভাঙিয়া পড়িল।

ইলেক্‌ট্রিক বাতিও দপ্‌দপ্ করিয়া উঠিল দুই-চারবার। হিরণ্ময় বলিলেন, "এইবার বাতিগুলো নিভে গেলেই চার পোয়া পূর্ণ হয়।"

পূর্ণিমা ভীত হইয়া বলিল, "কি করেন তখন?"

মিঃ মজুমদার বলিলেন, "কি আর করব, মোমবাতি জ্বেলে ব'সে থাকতে হয়, যেমন বাড়ীতে সকলে থাকে। বেয়ারাগুলোর কাছে লণ্ঠনও আছে কতগুলো। Officer ও কেরাণীরা কেউ কেউ ঝড়-বৃষ্টির কালে টর্চ্চ্‌ও নিয়ে আসে।"

পূর্ণিমা বলিল, "যা ঝড়, বৃষ্টি ত নামবেই এর পরে। তার পর রাস্তা-ঘাট ডুববে, আর ট্রাম, বাস্ বন্ধ হবে।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "বাড়ী পৌঁছতে আর একটু রাত হবে, তা ছাড়া আর কিছু হবে না।"

বৃষ্টিও এবার সুরু হইল মুষলধারে। পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করিল, "আজ পাঁচটার পরে কি থাকবেন?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "ঝড়-বৃষ্টির জন্যে কাজ বন্ধ করি না ত? তা হ'লে ত এই সময় হপ্তায় দু'-তিন দিন বন্ধ করতে হয়। তবে যদি fuse হয়ে যায়, তা হ'লে আর কাজ করা চলবে না।"

বৃষ্টি সমানেই হইয়া চলিল, তবে বাতিগুলি দু'চারবার দপ্‌দপ করা ছাড়া আর কোন উৎপাত করিল না। সুতরাং পূর্ণিমা বসিয়া বসিয়া কাজই করিতে লাগিল। সাড়ে ছ'টা অবধি কাজ করিয়া হিরণ্ময় বলিলেন, "আজ আর থাক। এখন সকলের বাড়ী যাবার কি ব্যবস্থা তা দেখতে হয়।"

বাহিরে অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। রাস্তা-ঘাট জলে থই থই করিতেছে, গাড়ীর বদলে নৌকা চালাইলেই ভাল হয়। গাড়ী সব সার দিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে, কাহারও নড়িবার সাধ্য নাই। দরোয়ান, বেয়ারা, ড্রাইভার সকলে একবার করিয়া বাহির হইতেছে, আবার ছুটিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। তাহারা ভয়াবহ খবর আনিতেছে অনেকরকম। গাছ ভাঙিয়া পড়িয়াছে রাস্তার উপর, গাছের বড় বড় ডালও ভাঙিয়া পড়িয়াছে অনেক জায়গায়। ল্যাম্পপোষ্ট জখম হইয়াছে। টিনের চাল উড়িয়া মানুষের গায়ে পড়িয়া দুর্ঘটনা ঘটাইয়াছে। দেওয়াল ধ্বসিয়া পড়িয়াছে।

পূর্ণিমা অত্যন্ত ক্লিষ্টকণ্ঠে বলিল, "আমার বাড়ীর সকলে পাগলই হয়ে যাবে বোধ হয়।"

হিরণ্ময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাড়ার চেনা-শোনা কোন বাড়ীতে টেলিফোন আছে?"

লিলিদের বাড়ী টেলিফোন আছে, আভাদের বাড়ীও আছে। নম্বর ত মনে নাই পূর্ণিমার? পদবী শুনিয়া হিরণ্ময় ডিরেক্টারী ঘাঁটিয়া নম্বর বাহির করিলেন। ডায়াল ঘুরাইয়া তাহাদের বাড়ী পাওয়া গেল। পূর্ণিমার হাতে টেলিফোন দিয়া বলিলেন, "যাকে হোক ডেকে বলুন আপনার মাকে খবর দিতে। বলুন, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমি পৌঁছে দেব।"

সৌভাগ্যক্রমে আভাকেই পাওয়া গেল, সে বিশেষ বন্ধু সরমার। সে তৎক্ষণাৎ রাজী। পূর্ণিমা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

হিরণ্ময় বলিলেন, "ঘণ্টাখানিকের মধ্যে জল নেমেই যাবে। বরাবরই তাই যায়। আমার গাড়ীটাকে আজ খেয়া নৌকার কাজ করতে হবে। আপনাকে আর মিসেস্ দস্তুরকে প্রথম ক্ষেপে দিতে হবে। দুজন ভদ্রলোকের বাড়ীও পড়ে ঐ পথে। তাঁদেরও নিয়ে যাব।"

বসিয়া বসিয়া ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাইয়া কোন মতে সময়টা কাটিল। তখন হিরণ্ময়ের ড্রাইভার আসিয়া খবর দিল, এইবার সে গাড়ী চালাইতে পারিবে।

কোনমতে জুতা বাঁচাইয়া পূর্ণিমা ও পার্শী ভদ্রমহিলা গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। হিরণ্ময় উঠিলেন তাহাদের পরে। অফিসের দুজন কর্ম্মী ঠাসাঠাসি করিয়া ড্রাইভারের পাশে বসিয়া পড়িল। গাড়ী ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল। রাস্তাঘাট তখনও জলে ভর্ত্তি, আবর্জ্জনাও রাশ রাশ উড়িয়া পড়িয়াছে। খুব সাবধানে গাড়ী চালাইতে হইল। একটু করিয়া যায়, আর ড্রাইভার ব্রেক কষিয়া গাড়ী থামাইয়া দেয়।

হিরণ্ময় বলিলেন, "এ যে দেখি গরুর গাড়ীকেও হার মানাতে বসল।"

পূর্ণিমা একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া বড় বিরক্ত হইতেছিল। গাড়ী ঝাঁকুড়ানি দিতেছে ক্রমাগত, এবং তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী ভদ্রমহিলা ক্রমাগত মিঃ মজুমদারের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছেন। ভদ্রলোক পাথরের মূর্ত্তির মত বসিয়া আছেন। পূর্ণিমা ভাবিল, ভাগ্যে সে তাঁহার পাশে বসে নাই। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধাক্কা লাগিয়া যাইতে পারিত ত? পূর্ণিমার তাহা হইলে বড়ই অপ্রস্তুত বোধ হইত।

যাহা হোক, মিসেস্ দস্তরই সকলের আগে নামিয়া গেলেন। হিরণ্ময় পূর্ণিমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "অত কষ্ট ক'রে বসার দরকার নেই।"

পূর্ণিমা একটু নড়িয়া বসিল। একটা রাস্তার মোড়ে ভদ্রলোক দুইজন নামিয়া গেলেন। হিরণ্ময় বলিলেন, "এইবার পথ ব'লে দেবেন, ড্রাইভার চেনে না ত?"

তখনও সকল দিকে জল, তবু গলির মোড় খুঁজিয়া পাইতে অসুবিধা হইল না। রাস্তার আলো জায়গায় জায়গায় নিভিয়া গিয়াছে। পূর্ণিমার বাড়ীর সামনে গাড়ীটা আসিয়া দাঁড়াইল। পূর্ণিমা তাকাইয়া দেখিল, জানলার ধারে তাঁহার মা দাঁড়াইয়া আছেন।

হিরণ্ময় আগে নামিয়া পূর্ণিমাকে পথ করিয়া দিলেন। বলিলেন, "ভাগ্যে ঠিক দরজাটার সামনে জল দাঁড়ায় নি। তা হলে জুতো না ভিজিয়ে নামতে পারতেন না।"

সদর দরজাটা হড়াস্ করিয়া খুলিয়া গেল। সরমা দাঁড়াইয়া আছে দেখা গেল। পূর্ণিমা হিরণ্ময়কে নমস্কার করিয়া বলিল, "আসি তবে আজ।"

হিরণ্ময় হাসিয়া প্রতিনমস্কার করিলেন। বলিলেন, "দেখুন, ঠিক এক ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে দিয়েছি।"

গাড়ী চলিয়া গেল। পূর্ণিমা ভিতরে ঢুকিয়া বলিল, "দরজা জানলা ভাঙে নি ত কিছু?"

তাহার মা বলিলেন, "আমাদের বাড়ী নীচু, তাই বেঁচে গেছি। পাশের বাড়ীর একটা জানলার কপাট ভেঙে পড়েছে। কারো ঘাড়ে পড়ে নি ভাগ্যে।"

সরমা জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, উনিই তোমাদের বড় সাহেব নাকি?"

পূর্ণিমা বলিল, "হ্যাঁ।"

সরমা বলিল, "বাবা, কি লম্বা ভদ্রলোক।"

পূর্ণিমার মা বলিলেন, "তুই যে বলিস্ ভাল, তা সত্যিই খুব ভাল। মেয়েছেলে যেমন নিয়ে যায় কাজের জন্যে তেমনি যত্নও করে। দায়িত্বজ্ঞান খুব আছে।"

পূর্ণিমা বলিল, "তা খুবই আছে সত্যি মা। আমার কপাল ভাল যে, এরকম ভদ্রলোকের কাছে প্রথম কাজ পেলাম। নইলে অসৎ মানুষের ত অভাব নেই দুনিয়ায়।"

পূর্ণিমার কাজ চলিতে লাগিল। পূর্ণিমার মধ্যে মধ্যে অবাক্ লাগিত ভাবিয়া যে, দিনগুলি যেন বেশী দ্রুতলয়ে কাটিয়া যাইতেছে। অবশ্য সমস্তক্ষণই সে কাজে ব্যস্ত থাকে সেই একটা কারণ। দীপকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ঠিকই হয় সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছাড়া। মাঝে বড়কী বাপের বাড়ী আসাতে দিন-দুই সে বাহির হইতে পারে নাই।

তৃতীয় দিন দেখা হইতেই পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম অবস্থা দেখলে বোনের?"

দীপক বলিল, "যতটা খারাপ দেখব ব'লে আশঙ্কা করেছিলাম, ততটা নয়। আমাদের দেশের মেয়েদের একটা আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে, সব রকম স্বামীর সঙ্গে বনিয়ে নেবার।"

পূর্ণিমা বলিল, "সব মেয়েরই সেটা থাকে না।"

দীপক বলিল, "একেবারে পুরণো tradition-এ মানুষ যারা, তাদের বেশীর ভাগেরই থাকে। নবীনাদের কথা স্বতন্ত্র।"

পূর্ণিমা বলিল, "বড়কী খুব খুশী নাকি?"

দীপক বলিল, "খুব খুশী আর কোথা থেকে হবে? তবে খুব যে একটা অখুশী তাও মনে হ'ল না। বালা আর হার পেয়েছে, সেই একটা খুশীর কারণ। আর কোন কারণে তার ধারণা হয়েছে যে বিয়ে ক'রে তার গৌরব বৃদ্ধি হয়েছে খানিকটা। ছুটকীর কাছে শ্বশুর-বাড়ীর গল্প করছিল শুনলাম। তবে শাশুড়ী-ননদদের কিছু প্রশংসা করে নি। তারা নাকি বড় দজ্জাল।"

পূর্ণিমা বলিল, "সেটাও পুরণো tradition-এর নিয়ম একটা।"

কথায় বিদ্রূপের সুর ছিল হয়ত, দীপকের মুখটা লাল হইয়া উঠিল, বলিল, "পুরণো আদর্শগুলির সবই খারাপ তোমার মতে, না? ক্রমেই এ ধারণাটা বাড়ছে বুঝি?"

পূর্ণিমা বলিল, তোমার কি ধারণা যে আমি অফিসে ব'সে ব'সে sociology-র চর্চ্চা করি, আর ধারণা বদ্‌লাই? আমাকে খেটে খেতে হয়।"

দীপক বলিল, "তা জানি, ওটা আমায় না শোনালেও চলবে।"

দুজনেরই মেজাজ খানিকটা চড়িয়াছে দেখিয়া পূর্ণিমা চুপ করিয়া গেল। এখন কথা বলিতে গেলেই ঝগড়া বাধিয়া যাইবে। পার্কে বসিয়া ঝগড়া করিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না। দীপকের মতামত সম্পর্কে সে ক্রমেই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া, সে নিজে একটু লজ্জিতও হইয়া গেল।

খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার সেই লাইব্রেরীর কাজটার কিছু হ'ল নাকি?"

দীপক বলিল, "নাঃ, তারা সপ্তাহের সাতদিনের জন্যেই লোক চায়। সে ত আমি পারব না। আর মাইনেও যৎসামান্য।"

পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, বড়কী গিয়ে তোমার ভার লাঘব হয়েছে কিছু?"

দীপক বলিল, "সে এতই কম যে উল্লেখযোগ্য নয়। মা জানিয়েছেন যে, আসছে মাস থেকে তিনি আমার কাছ থেকে দশ টাকা কম নেবেন।"

পূর্ণিমা বলিল, "একটা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সব কিছু চ'লে যেত ঐ দশ টাকায়?"

দীপক বলিল, "নিশ্চয়ই যেত না। কিন্তু আমার মা আমার কাঁধের জোয়াল এর চেয়ে বেশী হাল্‌কা করতে রাজী নন। ছুটকীর বিয়ের জন্যেও কিছু রাখতে চান বোধ হয়।"

অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল, ইহার পর পূর্ণিমা বাড়ী যাইবার জন্য উঠিল। বলিল, "চলি তবে আজ। দু'জনেরই মন আজ ভাল ছিল না, মেজাজও সেইজন্যে ভাল ছিল না। একটু কথা-কাটাকাটি হয়ে গেল, কিছু মনে ক'রো না।"

দীপক বলিল, "মনে আর কি করব? দোষ ত দু'জনেরই। ক্রমাগত একটা দুর্ভাগ্যের বোঝা বয়ে বয়ে, মাথাটা যে ঠিক আছে সেই ঢের। তোমারও জীবন ত কিছু সুখের নয়।"

এক মাস প্রায় হইয়া আসিল। আর দুই-একদিনের মধ্যেই সে প্রথম বেতনের টাকা পাইবে। মাকে বলিল, "মা, তুমি মধুর মাকে ব'লে রাখ যে, পয়লা তারিখ থেকে তাকে রাত-দিন থাকতে হবে, আর রান্নার কাজও বেশীর ভাগ করতে হবে।"

তাহার মা বলিলেন, "অনেক বেশী চাইবে যে?"

পূর্ণিমা বলিল, "যাই চাক, দিতে হবে। তুমিই যদি এত কষ্ট করবে বারো মাস, তা হলে আমার লাভ কি বেশী উপার্জ্জন ক'রে?"

মায়ের মুখটা একটা প্রসন্ন হাসিতে ভরিয়া গেল। বলিলেন, "তুমি আমার লক্ষী মেয়ে। মা-বাপের কথা আজকালকার ছেলেমেয়েরা বেশী ভাবে না।"

পূর্ণিমা কথাটা তাড়াতাড়ি ঘুরাইয়া দিল। বলিল, "আর রণু কি present নিবি? সেদিন বলছিলি যে? খুব বেশী দামের কিছু চাসনে যেন, দিদি সত্যিই ত আর মহা বড়মানুষ হয়ে যায় নি।

রণেন ত ভাবিয়াই পায় না কি উপহার সে চায়। বলিল, "দরকারী জিনিষ নয় কিন্তু, সে ত তুমি এমনিই দেবে।"

অনেক ভাবিয়াও যখন কিছুই ঠিক করিতে পারিল না, তখন বলিল, "দুটো টাকা দিও, একদিন সিনেমা দেখব, আর একদিন আইস্‌ক্রীম খাব।"

পূর্ণিমা হাসিয়া বলিল, "সেই ভাল। এটা দিদির ক্ষমতার মধ্যে হবে। চারটে টাকাই দেব, সরমাও ঐ সঙ্গে সিনেমা দেখে এস, আর আইস্‌ক্রীম খেয়ে এস।"

সরমা বলিল, "হুঁঃ, ওর সঙ্গে আমি যাচ্ছি আর কি? আমার টাকা আমাকে দিও, আমি নিজের বন্ধুদের সঙ্গে যাব। আর আইস্‌ক্রীম আমি তত ভালবাসি না, 'কোয়ালিটি'তে গিয়ে আমি আইস্‌ড্‌ কফি খাব।"

বাড়ীর ব্যবস্থা ত হয়ে গেল এক রকম। আর যাহা যাহা করিবার ইচ্ছা আছে, তাহা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া করিতে হইবে।

টাকা হাতে পাইয়া সেদিন পূর্ণিমা বাহিরে চেহারাটা গম্ভীর রাখিতেই চেষ্টা করিল। তবে সম্পূর্ণ সফল হইল না। একটা আনন্দের আভা মুখখানাকে সুন্দরতর করিয়া তুলিল। প্রায় তখন তখনই তাহার ডাক পড়িল কাজের জন্য। ঘরে ঢুকিতেই হিরণ্ময় বলিলেন, "আপনার overtime-এর হিসেব-টিসেব ঠিক ক'রে দিয়েছে ত?"

পূর্ণিমা বলিল, "হ্যাঁ, ঠিকই দিয়েছে।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "এই মাসটার পরেই আপনার confirmation হয়ে যাবে। এ মাসেই দিতে পারতাম recommend ক'রে, তবে ভাবলাম, অন্যদের ক্ষেত্রে যা করি, আপনার বেলাতেও তাই করাই ভাল। দেখতে দেখতে কেটে যাবে এ ক'টা দিন।"

পূর্ণিমা বসিয়া কাজ করিতে লাগিল। মাঝে দু' একবার চোরা চাহনি ফেলিয়া হিরণ্ময়ের মুখের দিকে তাকাইল। দৃষ্টিটাতে কৃতজ্ঞতা ছিল প্রচুর পরিমাণে। মানুষ এত ভাল কি করিয়া হয়? আরও বেশী হয় না কেন এ রকম লোক? বাবা মারা যাইবার পর এই যেন সে প্রথম একটা মানুষের মত মানুষ দেখিল।

ক্রমশঃ

শিল্পী ও পৃষ্ঠপোষক

ডঃ আনন্দ কুমারস্বামী
অনুবাদ : সুধা বসু

৪। শিল্প সম্বন্ধে স্বাভাবিক মত।

শিল্প শব্দটির সংজ্ঞা নির্ণয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, কাজ যাই-ই হোক না কেন, তা করবার সুষ্ঠু পদ্ধতিই হ'ল শিল্প। চিত্রাঙ্কণ, সঙ্গীত-সাধনা ও ছুতোরের কাজের মতই রন্ধনকার্য্য এবং অশ্বচালনাকর্ম্মও শিল্প। শিল্পীও একজন মানুষ, তবে তিনি হলেন বিশেষ কোন একটি কলাকৌশলের অধিকারী এবং তাঁকে পৃষ্ঠপোষক বা ক্রেতার প্রয়োজন মেটানো ও হুকুম তামিলের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। শিল্পের সাধারণ লক্ষ্য বা পরিণতি নিছক 'শিল্পসৃষ্টিই' নয়; সে হ'ল মানুষ। শিল্পী যা নির্ম্মাণ করেন, তাকে বলা যেতে পারে 'কলাকৌশল-জাত' একটি কারুশিল্প। শিল্পীর অন্তরে যে কলাকৌশলটি থাকে তা তাঁর চেতনা ও অনুভবশক্তি সঞ্জাত। আবার ঠিক অনুরূপ ভাবেই মানুষ হিসেবে তিনি যা করে থাকেন, তা নিয়ন্ত্রিত হয় মিতাচার ও নীতিবোধের আদর্শ সম্বন্ধে একটি সচেতন ভাবের দ্বারা। চিরাচরিত প্রথানুগামী খেয়ালের বশবর্ত্তী হয়ে কোন শিল্পকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ ঠিক অধর্ম্মাচরণরূপে বিবেচিত না হলেও, চাপল্য বা লঘুত্বের প্রকাশনা বলে গণ্য করা হয়। কোন ভারতীয় শিল্প-শাস্ত্রানুসারে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত স্থপতি ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তির উপরে কোন নগর-পরিকল্পনার দায়িত্ব আরোপকে বাস্তবিকই নরহত্যার সমতুল্য অপরাধ বলে বিবেচনা করা হয়। খ্রীষ্টীয় দার্শনিকগণ শিল্পগত ও নৈতিক —এই দুই ভিন্ন-বিষয়ক অধর্ম্মাচরণকে খুব সতর্কতার সহিত স্বতন্ত্রভাবে বিচার করেছেন। পক্ষান্তরে, "কলা-নৈপুণ্য ব্যতীত কোন উৎকৃষ্ট ব্যবহারিক বস্তুসৃষ্টি সম্ভবপর নয়।" সর্ব্বোপরি শিল্পী হলেন একজন পেশাদার মানুষ। আর তাঁকে কতকগুলি বৃত্তিগত বিশেষ শিষ্টাচার মেনে চলতে হয়। কোন সৌখীন অথবা অনভিজ্ঞ ক্রেতা যদি বলেন যে, তিনি শিল্প সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তবে তাঁর নিজস্ব পছন্দ কিরূপ তা জানেন, তা হ'লে তিনি সেই জাতীয় লোকের চেয়ে এতটুকু শ্রেষ্ঠ পর্য্যায়ের নন, যিনি বলে থাকেন যে, ভালমন্দ কাকে বলে তা জানেন না বটে, তবে কি করতে তাঁর ভাল লাগে তা উপলব্ধি করতে পারেন; অথবা, এমন মানুষ যিনি বলেন যে, সত্য কি তা জানা নেই, তবে কি চিন্তা করতে আরাম লাগে তা বোঝেন। অনুরূপ ভাবেই ঐতিহ্যনিষ্ঠ শিল্পী এবং পৃষ্ঠ-পোষক ক্রেতা উভয়েই জানেন না যে, তাঁরা বাস্তবিক কি পছন্দ করেন। তাঁরা নিছক তাঁদের জ্ঞাত বস্তুতেই আকৃষ্ট হন।

স্বাভাবিক নিয়মানুগ সমাজে শিল্পী কোন স্বতন্ত্র ধরণের মানুষ নন। সেখানে প্রত্যেকটি মানুষই যেন বিশেষ বিশেষ ভাবের এক-একজন শিল্পী। অর্থাৎ যে-সকল যোগী সন্ন্যাসিগণ কোন সামাজিক দায়িত্বও পালন করেন না, আবার তাঁদের কোন দাবীও থাকে না (আধুনিক শিল্পীকুলের চিত্রের স্বত্বদাবীর মত নয়), তাঁদের কথা বাদ দিয়ে প্রত্যেকটি স্বাভাবিক মানুষ তাঁর জীবিকার্জ্জন করে থাকেন প্রতিবেশীর উৎপাদিত অতিরিক্ত বস্তুসমূহের সঙ্গে তাঁর নিজের বিশেষ কলা-কৌশলজাত সামগ্রীর বিনিময় দ্বারা। এই সকল প্রতিবেশীরা সকলেই কোন না কোন কাজে সুদক্ষ ও সুনিপুণ। এইরূপে প্রতিটি মানুষেরই একটি করে পেশা থাকে এবং উহাই আবার তাঁর উপজীবিকা।

আধুনিক মানুষের কানে "পেশা" কথাটি বড় অদ্ভুত ঠেকে। কারণ, এখনকার দিনে চাকরি-বাকরির কথা ভাবতেই মানুষ অভ্যস্ত। আর সব রকম চাকুরিকেই যে অবসর যাপনের একমাত্র উপায়স্বরূপ বিবেচনা করা হয়। এককালে সভ্যতার স্বাভাবিক অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল যে পেশা ও বৃত্তির আদর্শ, তাকে আমরা যতই বিচার বিশ্লেষণ করব, ততই অদ্ভুত মনে হবে। মানুষ তাঁর পেশা বা বৃত্তির মধ্যে যে আত্মপ্রকাশ করেন, তা বাস্তবিকই নিজেকে জাহির করবার জন্যে স্বেচ্ছাকৃত নয়। আসলে উহা হ'ল তাঁর সঠিক নিজস্ব প্রকৃতি এবং ঐ প্রকৃতির প্রভাবেই তিনি ঐ বৃত্তিতে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পেরেছেন। কোন স্বাভাবিক শিল্পীকে তাঁর পরিচয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি হয়ত কর্ম্মকার, চিত্রকর অথবা অন্য যা হোক একটা কিছু নিজের কথা বলবেন। এই ধরণের মানুষকে এক পলকের দৃষ্টিতে চিনে নেওয়া যায় তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে ও বাচনভঙ্গি এবং কথার মধ্যে ব্যবহৃত শব্দসম্ভার শুনে এবং আরও নানা উপায়ে।

তিনি কখনই তাঁর কর্ম্মপ্রণালীর পরিবর্ত্তন সাধন অথবা অন্য কোন স্বতন্ত্র বৃত্তির কামনা করবেন না; না তিনি এখন যা করছেন, তার বিপরীতও কিছু করতেও ইচ্ছুক নন। নিজে যা হয়েছেন, তার পরিবর্ত্তে রাজা-মহারাজা হওয়ার আকাঙ্ক্ষাও কোনদিন করবেন না। কর্ম্মকার অথবা চিত্রকর হিসেবে নিখুঁত ও সুনিপুণ হতে না পারলে তিনি বাস্তবিক উৎকৃষ্ট মানুষ হয়েও উঠতে পারবেন না।

এই দৃষ্টিভঙ্গিসহ বিচার করলে 'উচ্চাভিলাষ' কথাটির অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হয়ে যায় এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতি চিরাচরিত নিস্পৃহতা ও বীতশ্রদ্ধার গুরুত্ব কোথায় তাও আমরা উপলব্ধি করতে পারি। সাধারণ পার্থিব ও সামাজিক আদর্শ থেকে পেশা বা বৃত্তিকে পৃথক্ করে গ্রহণ করলে উহা হয়ে ওঠে একটি ধর্ম্মমূলক ও অতীন্দ্রিয় পন্থাস্বরূপ। এ ছাড়া বড়ই হোক, আর ছোটই হোক, কোন সামাজিক মর্য্যাদার প্রশ্ন-জড়িত কর্ম্মে নিযুক্ত হ'লে চলবে না; অথবা নিছক অবসর জীবনেও সম্ভবপর হবে না। বরং তাঁর স্বকীয় বৃত্তির মাধ্যমে ক্রমশঃ উৎকর্ষ ও পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হ'লে তিনি তাঁর সীমানা অতিক্রম করে উর্দ্ধে উন্নীত হতে পারবেন। তিনি মুচিই হোন্ আর স্থপতিই হোন্, তাঁর নিজস্ব বিশেষ কর্ম্ম-প্রণালীর জন্যে নয়, ঐ কর্ম্মেরই মধ্য দিয়ে তিনি বুদ্ধিবৃত্তি ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকে উন্নত হতে পারেন। উৎকর্ষের মধ্যে কোন স্তর ভেদ বা পর্য্যায় বিভাগের প্রশ্ন নেই। বরং রীতি-প্রকৃতির মধ্যেই কেবল উৎকর্ষ নিহিত থাকে। বিশেষ কোন ব্যক্তির রীতি-পদ্ধতির সম্পূর্ণ উৎকর্ষ সাধিত হওয়া মানে এমন একটি পর্য্যায়ে আরোহণ, যেখানে সর্ব্ববিধ উৎকৃষ্ট ভাবের হয়েছে সমন্বয় সাধন। এইরূপে গণতান্ত্রিক দৃষ্টির বিচারে সবই চলছে সম্পূর্ণ বিপরীত গতিতে। এই গণতান্ত্রিকতায় সামরিক বৃত্তির কোন ধারণা নেই বলে কোন জাতিকে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিতরূপে কল্পনা করা যায় না এবং শান্তির সময়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূল্য হ্রাস প্রাপ্তির ফলে একটি ক্ষুদ্র বিন্দু মাত্রে পরিণত করে এবং সে বিন্দু সমসাময়িক অন্যান্য বিন্দুর সঙ্গে পরিবর্ত্তনযোগ্য ও প্রভেদশূন্য। স্বাভাবিক রীতিতে গঠিত সমাজে যে কেহ, যখন খুশি সমান সুযোগ পেতে পারে না। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও বিশেষ কর্ম্মক্ষমতার প্রশ্ন এখানে জড়িত। আর সেই বিশেষ কাজের পারদর্শিতা, যা মানুষ পিতামাতার নিকট হতে উত্তরাধিকারসূত্রে অথবা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে লাভ করে,— সেই সকল বিষয়েই সুযোগের সমতা দৃষ্ট হয়। সামাজিক ভাবে বিশেষ কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের কোন ব্যবস্থা নেই।

সকলে অবশ্যই এই বাক্যাংশ বা বাগ্ধারাটির কথা শুনে থাকবেন—"একটি কারুশিল্পের গুহ্যতত্ত্বে দীক্ষিত হওয়া।" এই কথাটির অর্থ সম্বন্ধে যদি প্রশ্ন ওঠে, তবে ধরে নেওয়া যাক যে, এর অর্থ হচ্ছে কোন কাজ বা ব্যবসায়ের কৌশল শিক্ষা; ঠিক যেমন মানুষ কলেজে পড়তে যায় কখনও অধ্যাপক, কখনও দালাল হওয়ার মানসে। উপরন্তু, আমরা কোন "রহস্যাবৃত ধর্ম্মবিশ্বাস" সম্বন্ধে যেরূপ মন্তব্য করে থাকি, একটি 'কারুশিল্পের দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বে অনুপ্রাণিত' কথাটির আক্ষরিক অর্থও ঐরূপেই ব্যাখ্যাত হয়ে থাকে। সকল প্রকার দীক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যই হ'ল প্রত্যেক মানুষের অন্তরস্থিত সুপ্ত শক্তি বা সম্ভাবনাকে আধ্যাত্মিক প্রেরণাদ্বারা পরিপুষ্ট করে তোলা। প্রথম সূত্রপাতের শিক্ষা মানুষের পেশা বা বৃত্তির মধ্যে বাহ্যরূপে প্রকাশিত স্বতন্ত্র কর্ম্মপ্রণালীর বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ করে। এবং উহা বিশ্বজনীন রীতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত ও আভ্যন্তরিক দিকেও বোধগম্য। দীক্ষাপ্রাপ্ত কারুকৃৎ কোন বস্তুর বহিরাংশমাত্র নিয়েই নিরপেক্ষভাবে কাজ করে চলেন না। তিনি স্পষ্টতঃ সচেতনভাবেই বিশ্বজগতের সৃষ্টিরহস্য অনুযায়ী এবং উহার সার্থক রূপায়ণমূলক নক্সা রচনায় ব্যাপৃত থাকে না। এই জাতীয় দীক্ষামূলক শিক্ষা আবার বৃত্তিগত ভিত্তির উপরেই ভর ক'রে চলে এবং সেই পেশা বা বৃত্তির মধ্যেই উহার প্রতিফলন ঘটে। নিছক প্রতিভার বলে দুর্জ্ঞেয় বা গূঢ়তম ভাবের যে গভীরতা প্রকাশ সম্ভব হয় না, তা এই শিক্ষাদ্বারা সম্ভবপর হয়ে থাকে। বৃত্তিমূলক কর্ম্ম তখন এমন একটা পর্য্যায়ে উন্নীত হয় যে, উহা সর্ব্বপ্রকার বিষয়ের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে ঐক্য সাধন করতে পারে। এই বিস্তার শুধু জড় জগতেই ঘটে না; উহা জ্ঞানের রাজ্যে এমন কি ভগবানের সান্নিধ্য পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারে। যে ঐশ্বরিক সত্তা আমাদের চতুর্দ্দিকে নানাভাবে নানারূপে প্রকাশিত হচ্ছিল শিল্পরূপ নিয়ে, সেই পরম সত্তাই হচ্ছেন প্রত্যেক শিল্পীমানুষের আদর্শস্বরূপ। এইরূপে পরম্পরানুগ প্রথাপদ্ধতি এই কথাই দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করছে যে, শিল্পবস্তুর মাধ্যমে অন্য কোন জিনিষের প্রতিরূপ প্রকটিত হয় না; শিল্পীর মনোরাজ্যে যে-সকল রূপের ধারণা জন্মে, উহা তাহারই প্রতিফলন এবং এই রূপায়ণ পর্য্যায়ক্রমে শিল্পীর শক্তির সীমানায় যতদূর সম্ভব ততখানি চিরন্তন সত্যবস্তুর কাছাকাছি পৌঁছতে চায়।

এইরূপ ভাব-প্রকাশক কয়েকটি উক্তিমূলক বা সাহিত্যিক নিদর্শনও পাওয়া গিয়েছে। যেমন, অগাষ্টাইন বলেছেন,—"বস্তুর রূপের যাথার্থ্য বিচার করতে বসলে আমাদের যুক্তিশীল চিন্তাশক্তি অবশ্যই ভাবধারণার কার্য্যকারিতার নিয়মাধীন হয়ে পড়বে, এবং অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান বলতে ইহাকেই বুঝায়।" সেণ্ট টমাসের মতে—"মৌলিক সত্য দ্বারাই আত্মা বিচার করে থাকে এবং এই সত্য আর্শির মতই আত্মার মধ্যে হুবহু প্রতিফলিত হয়।" ওয়াংওয়ে বলেছেন যে, ধারণাটি সৃষ্টি হয় প্রথমে, তার পরে সেই ধারণানুসারে সৃষ্টি-কর্ম্ম চলতে থাকে। শুক্রাচার্য্যের মত হ'ল যে, প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণদ্বারা অবশ্যই নয়, একমাত্র অন্তর্দর্শনের মাধ্যমেই একখানি মূর্ত্তি সঠিকভাবে রূপায়িত হতে পারে।

যে মানুষ শিল্পী, তাঁর কার্য্যক্রম এইভাবে দু'টি ধারায় বিভক্ত। একটি হ'ল স্বাধীন ধ্যানমূলক; আর দ্বিতীয়টি হ'ল কায়িক শ্রমজাত অনুন্নত-স্তরের কাজ। কোন রূপ-কল্পনার ব্যাপারে যদিও শিল্পী "স্বাধীন" অথবা, বলা যেতে পারে যে, তিনি "সৃজনক্ষম", তথাপি সত্য ব্যাপারটি দাঁড়াচ্ছে এই যে, শিল্পী তাঁর রচনার মধ্যে যে রূপারোপের পরিকল্পনা করবেন, তা স্থিরীকৃত হবে পৃষ্ঠপোষকের প্রয়োজন ও রুচি অনুসারেই। যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিল্পীর কর্ম্মধারা হ'ল "নিম্নস্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন", অথবা বর্ত্তমানযুগে "অনুকরণবাদী" ব'লে আখ্যা দান করা যেতে পারে। কারণ, বিষয়বস্তুর রূপারোপে তিনি তাঁর অন্তরে যে রূপাবলী উপলব্ধি করেছিলেন, বাস্তবে তারই যেন অনুকরণ করে চলেছেন। জ্ঞানালোকে দীপ্ত রূপের প্রসঙ্গে অনুকরণ বলা যায় যে, শিল্পী বাস্তবিক সৃষ্টিকর্ম্ম সুরু করবার পূর্ব্বেই উহা শিল্পরূপেই শিল্পীর অন্তরে বিদ্যমান থাকে। আবার কাজটি সমাপ্ত হওয়ার পরেও উহার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না বা উহা বিলীন হয়ে যায় না। শিল্পীর মনোরাজ্যে বিরাজিত এই রূপ দিয়েই তাঁর রচনার বিচার বিশ্লেষণ হয়ে থাকে। শিল্পবস্তুর উৎকর্ষ ও গুণাগুণ বিচার একটি ভগ্নাংশের সাহায্যে বর্ণিত হয়েছে—অপরিহার্য্যরূপ বাস্তবিকরূপ। এই প্রকারে আমরা শিল্প এবং প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ—এই দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় করি না এবং আমাদের শিল্প-শিক্ষার আরম্ভ হয়ে থাকে কোন বিশেষ দেহভঙ্গিসম্পন্ন আদর্শ রূপ অনুশীলন করে রেখাঙ্কণ দ্বারা। এই প্রথা স্বাভাবিক যুগে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সেকালে শিল্পীর স্বীয় চেতনমনের বহির্ভূত অথবা উহাকে উপেক্ষা করে কোন আদর্শরূপের অস্তিত্ব স্বীকৃত হ'ত না। শিল্পের উৎকর্ষ নিহিত থাকে উহার মর্ম্মব্যাখ্যার প্রাঞ্জলভাব এবং পর্য্যাপ্ত নির্দ্দেশনা অথবা, প্রতীকবাদের মধ্যে কোনরকম সুস্পষ্টরূপের প্রতিকৃতি বা প্রতিরূপ রচনার মধ্যে নয়। এই প্রসঙ্গে প্লোটাইনাস্ যেমন বলেছেন—"জিউসের মূর্ত্তি কল্পনা ফিডিয়াসের কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আদর্শ অনুসরণে করা সঙ্গত হয় নি। বরং তিনি (জিউস) মানুষের চোখে ধরা দিলে, নিশ্চিত কি রূপটি নিয়ে আবির্ভূত হতেন, তাই-ই কল্পনা করে মূর্ত্তি-খানির রূপদান সমীচীন হ'ত।"

শিল্প "রূপায়ণে প্রকৃতিরই অনুকরণ হয়ে থাকে"—এই বিশেষ ব্যাখ্যাটি নিজস্বভাবেই আমাদের মনে ভ্রান্তিকর ধারণার সৃষ্টি করে। কারণ "অনুকরণ" ও "প্রকৃতি"—এই দু'টি কথার সৃষ্টি ও প্রচলনের মূলে যে আদর্শ ও বিশ্লেষণ রয়েছে, আমাদের জ্ঞান ও ধারণা তার কাছাকাছিও পৌঁছতে পারে না। আর এমন ব্যক্তি-গণের দ্বারা এই অর্থ বিধিবদ্ধ হয়েছিল যাঁরা ছিলেন শব্দ প্রয়োগের রীতি সম্বন্ধে আজীবন শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং সব-কিছুর চুলচেরা সূক্ষ্ম বিচারে সিদ্ধহস্ত ও সুদক্ষ। এই জাতীয় শক্তি ব্যতীত প্রকৃত জ্ঞান অর্জ্জনও সম্ভবপর নয়। প্রাচ্যদেশীয় অনুরূপ একটি সূত্র বা বিশ্লেষণমূলক সংজ্ঞা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে যে, সর্ব্ববিধ মনুষ্য-সৃষ্ট শিল্প, যেমন জামা-পোশাক অথবা যানবাহন সব কিছুই হ'ল "স্বর্গীয় শিল্পকলারই অনুকরণ"। এই ব্যাখ্যাতে মনে হয় শিল্পীকে এখানে যেন বর্ণনা করবার চেষ্টা হয়েছে যে, তিনি অর্থাৎ শিল্পী যেন মাঝে মাঝে স্বর্গে যেয়ে সেখানকার প্রচলিত রীতিপদ্ধতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে আসেন। আর প্রত্যাবর্ত্তনের পরে মানবসমাজের উপযোগী করে উহার চাক্ষুষ রূপদান করেন। প্লোটাই-নাসও অনুরূপ ভঙ্গিতেই বলেছেন যে, কারুশিল্প "সেই জগতের (স্বর্গ) আদর্শ ও চিন্তাধারা থেকেই ভাবধারা সংগ্রহ করে থাকে" এবং সমস্ত সঙ্গীতই হ'ল সেই "আদর্শ জগতের সঙ্গীতেরই প্রতিধ্বনি।"

"শিল্প রূপায়ণে প্রকৃতিরই অনুকরণ হয়ে থাকে।" এখানে অনুকরণ বলতে এমন একটি ভাবকে প্রকাশ করছে যার ব্যাখ্যায় প্লেটো বলেছেন যে, যেমন 'কিউ' (Q) অক্ষরটি অনুকরণ করছে দ্রুততা, গতি এবং কাঠিন্যের ভাবকে। প্রকৃতি হলেন সেই প্রকৃতি অর্থাৎ প্রকৃতিমাতা, যাঁর কথা আমরা 'ঈশ্বর' শব্দ কোন কারণে ব্যবহার করতে অনিচ্ছুক হলে, বলে থাকি। এ হলেন সেই "প্রকৃতি", যাঁর প্রসঙ্গে একহার্ট বলেছেন, "প্রকৃতির অন্তর্নিহিত রূপ অনুসন্ধান করতে গেলে, তাঁর সমগ্র রূপটি

অবশ্যই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে।” এই সে প্রকৃতি নয় যাঁর প্রসঙ্গে ব্লেক বলেছিলেন যে, তিনি নিজেকে “ভীত বোধ করেছিলেন যে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বড় বেশী প্রকৃতিপ্রিয় হয়ে পড়েছিলেন।”

এইরূপে শিল্পের প্রাথমিক অথবা সৃজনধর্ম্মী ভাব যতটা প্রকাশমান, তাতে দেখা যায় সে স্বর্গীয় এবং পার্থিব ভাব ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে প্রায় একই ধারায় সম পর্য্যায়ে চলে। “সমগ্র সৃষ্টিরহস্যের মূলে যে ঈশ্বর, তাঁর সম্বন্ধে সমস্ত জীবজগতের জ্ঞান হ'ল কারুশিল্পীর শিল্পজাত দ্রব্য সম্বন্ধীয় জ্ঞানেরই মত।” শিল্পী ঈশ্বরের মতই “তাঁর ধীশক্তির সাহায্যে কাজ করে যান” (সেন্ট-টমাস)। এই সকল কাজ নিছক তাঁর ইন্দ্রিয়-নিচয়ের সাহায্যে কোনক্রমেই সম্ভবপর হয় না (বাস্তবিক অন্যান্য জীবকুলের ন্যায় শিল্পীরও যা আছে)। বরং একটি মানুষ তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির বলেই শিল্পীরূপে পরিচিত হ'তে পারেন।

পৃষ্ঠপোষকের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী এবং তাঁর নির্দ্দেশনা অনুসরণ করেই শিল্পীকে শিল্পবস্তুর রূপদান করতে হয়। এই জাতীয় রূপারোপকালেই স্বর্গীয় ক্রিয়াকলাপ ও মনুষ্যসমাজের কার্য্যধারার অন্তর্নিহিত পার্থক্য সুপ্রকটিত হয়। কারণ, “ঐশ্বরিক চিন্তার উদয় হলেই, উহা রূপপরিগ্রহণও করে থাকে।” পক্ষান্তরে, এই জড়জগতের বুকে যে সকল আকৃতি ও রূপমালার অস্তিত্ব পূর্ব্ব থেকেই বিদ্যমান, শিল্পী মানুষের নিজস্ব গরজ হ'ল উহাদের মূর্ত্তিমান ও চাক্ষুষ করে তোলা। আর এ কাজটি কিছু অস্বাভাবিক ও অসম্ভব নয়। কারণ জড়-জগতের উপাদানসমূহের মধ্যে রূপবৈচিত্র্যের যে অপ্রতুলতা রয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যেখানে পৃষ্ঠপোষকের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাই হচ্ছে শেষ কথা এবং শিল্পসৃষ্টির মূলে শিল্পীর কল্পনাশক্তিই মূল বিষয়, সেখানে আরও দু'টি বিবেচনার বিষয় রয়েছে। একটি হ'ল উপাদান, যার দ্বারা শিল্পী তাঁর রচনাবলীর রূপদান করেন; আর দ্বিতীয়টি হ'ল শিল্পীর কুশলীহস্ত এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি, যাদের সাহায্যে তিনি রূপটিকে প্রত্যক্ষ করে তোলেন। আলোচ্য বিষয় ও বস্তুসমূহের প্রয়োজন হয় নির্দ্দিষ্ট শিল্পকর্ম্মটি সুরুকরণের পূর্ব্বেই। তা হ'লে উপসংহারে এই দাঁড়াচ্ছে যে, শিল্পনৈপুণ্য দ্বারা যাই-ই রচিত হোক্‌ না কেন তার মূলে চারটি বিষয়ের প্রভাব বিদ্যমান। সব কয়টি বিষয়ের গুরুত্ব সমান হলেও প্রথম দু'টির মধ্যে আবার এক নম্বরটি হ'ল মুখ্য, আর শেষ পর্য্যায়ের দু'টি হচ্ছে অপ্রধান। যখন কোন বিশেষ শিল্পদ্রব্যের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করতে অগ্রসর হয়, তখন সব কয়টি বিষয়কেই বিবেচনা করতে হবে। এবারে দেখা যাক্‌, কোন্‌ কোন্‌ বিষয় আমাদের জানা দরকার।

১। কি উদ্দেশ্যে শিল্পটি রচিত হয়েছিল।
২। কিসের মত করে গড়বার পরিকল্পনা ছিল।
৩। কি কি উপাদানে উহা নির্ম্মিত।
৪। উহার নির্ম্মাতা বা স্রষ্টা কে।

এখন ধরা যাক, শিল্প-সৃষ্টির কাজটি হয়ে গেছে সুসম্পন্ন এবং বস্তুটিও আমাদের সামনেই রয়েছে। আর উহার কলানৈপুণ্যের বিচার ও রসাস্বাদনের সময়ও সমুপস্থিত। এই কাজটি নির্ব্বাহকরণের জন্যে কি অন্য আর এক শ্রেণীর মানুষের প্রয়োজন, যিনি হয়ত পৃষ্ঠ-পোষকও নন, বা শিল্পীও নন; তাঁকে কি বলা যেতে পারে শিল্পসমঝদার—না, সমালোচক? কিন্তু ধরুন, যদি বহুযুগ পূর্ব্বে চীনদেশে নির্ম্মিত কোন শিল্পদ্রব্যের রসাস্বাদন আমাদের করতে হয়, যার ব্যবহারবিধি অথবা উহা নির্ম্মিতির পূর্ব্বে ঐ বিশেষ রূপটি রচনার মূলে শিল্পীর কি আদর্শ ছিল তা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, তখন আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াবে?

সমকালীন শিল্প প্রসঙ্গে দেখা যায় যে, এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে কোন বিশিষ্ট নতুন ধরনের সমঝদার মানুষের প্রয়োজন নেই। বরং প্লেটোর মতানুসারে তাঁদের মাকুর উপযুক্ততা ও ভালমন্দের বিচার করতে যেমন পারেন একমাত্র তাঁতিই, জাহাজের শক্তি ও উৎকর্ষের বিচারক হবেন স্বয়ং নাবিক, ঠিক অনুরূপভাবেই একখানি মূর্ত্তি বা প্রতিমার রূপাদর্শ সম্বন্ধে একজন ভক্ত পূজারীর মতামত এবং আদর্শই হবে অগ্রগণ্য। পক্ষান্তরে, কোন শিল্পনিদর্শনের আকৃতিগত বাস্তবিকতা ও বিশিষ্টতা সম্বন্ধে মতামত প্রদানের অধিকার রয়েছে একমাত্র শিল্পীরই। কারণ শিল্পে প্রকাশমান রূপরূপটি মুখ্যতঃ তাঁরই বুদ্ধিবৃত্তি ও ভাবাবেগ সঞ্জাত। অন্যান্য সাধারণ মানুষের নিকট ও জিনিসটি প্রকট হয় প্রায় আকস্মিক ভাবেই। তা ছাড়া আমাদের আরও একটি বিষয় স্মরণ রাখা দরকার যে, যে কোন সর্ব্ববাদীসম্মত সমাজে শিল্পী এবং সমঝদার-পৃষ্ঠপোষক উভয়েই অতিমাত্রায় সমভাবাপন্ন এবং এমন বিশেষ পরিচয়সূত্রে আবদ্ধ থাকেন যা আমাদের পক্ষে কল্পনা করা একটু কঠিন। বস্তুতঃ শিল্পটি যেন তাঁদের উভয়ের সমবেত চেষ্টা ও কর্ম্মেরই ফল। এই ঘটনাকে খেলা-ধূলার ব্যাপারের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এক-একটি দলের প্রতিটি খেলোয়াড়েরই বিশেষ বিশেষ অংশ গ্রহণ

করে দায়িত্ব বহন করতে হয় সত্য, কিন্তু সকলেরই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য এক, অর্থাৎ নিজস্ব দলীয় স্বার্থ রক্ষা করা এবং এই দলগত স্বার্থরক্ষার মানদণ্ডেই যে কোন খেলোয়াড়ের ক্রীড়া-নৈপুণ্যের মান ও উৎকর্ষ নির্ণীত হয়ে থাকে। একটি সমবেত সঙ্গীত প্রসঙ্গেও এই একই কথা। ভিন্ন ভিন্ন অংশ গ্রহণকারীর হাতে স্বতন্ত্র যন্ত্র থাকলেও প্রত্যেকেই নিজের এবং অপরের করণীয় বিষয়ে বিশেষ সচেতন থাকেন। একদিকে পৃষ্ঠপোষক বা ক্রেতার চাহিদা সম্পর্কে শিল্পীর ধারণা থাকে সুস্পষ্ট এবং তাঁর (ক্রেতার) দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শের মাপকাঠিতেই শিল্পদ্রব্যটির বিচারও করতে পারেন। কিন্তু অন্যদিকে দেখা যায় যে, পৃষ্ঠপোষকের সঙ্গে শিল্পীর সম্পর্ক ও আদর্শ যদি কোন প্রকারে বিপরীত ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে, তা হলে পৃষ্ঠপোষক বা ক্রেতা সমকালীন সাধারণে প্রচলিত রীতিপদ্ধতি ও আঙ্গিকের প্রতিই আকৃষ্ট হন। অর্থাৎ তিনিও শিল্পের রীতিসিদ্ধ সৌন্দর্য্যের একজন সুষ্ঠু ধরণের বিচারক হয়ে ওঠেন। এইরূপে প্রত্যেক মানুষই স্বাভাবিক ভাবে সমসাময়িক শিল্পের কার্য্যকারিতাশক্তি ও ভাবব্যঞ্জনাগুণ এই দু'টি বিষয়েরই যুগপৎ ভাল বিচারক। আধুনিক যুগে যদি এ রকমটি দেখা না যায়, তবে বুঝতে হবে যে, এখনকার কালের শিল্পী ও পৃষ্ঠপোষক উভয়ে বাস্তবিকই দু'টি স্বতন্ত্র প্রকৃতির মানুষ।

আমাদের সম্মুখে যদি প্রাচীন অথবা, বিদেশজাত কোন শিল্পের সমঝদারী বিষয়ে কোন স্বতন্ত্র সমস্যা উপস্থিত হয়, তা হ'লে স্পষ্টতঃই আমাদের আকাঙ্ক্ষিত আদর্শ দ্বারাই উহার বিচার করা যেতে পারে, ঠিক যেমন পৃষ্ঠপোষক ও শিল্পী উহা রচনাকালে করেছিলেন। যতক্ষণ শিল্প-নিদর্শনটি আমাদের কাছে রীতিবিরুদ্ধ অথবা রহস্যময় ও অস্পষ্ট প্রতিভাত হবে, ততক্ষণ আমরা উহার মর্ম্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি বলে ধারণা করতে পারি না। যখন উহাকে (শিল্প) আর অদ্ভুত কিছু বলে মনে হয় না, তখন উহার রস আস্বাদন করা যায় এবং উহা সঠিক উপভোগ্য হয় এবং মনে করি যে আমরা নিজের হাতে রচনা করলেও ঠিক অনুরূপ ধাঁচেই করতাম। উদাহরণ স্বরূপ খ্রীষ্টীয় অথবা, বৌদ্ধশিল্পের কথাই ধরা যাক্। এই সকল ধর্ম্মমূলক শিল্প সঠিক রূপ পরিগ্রহণে এবং ভাবের অভিব্যক্তিতে সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়েছে কি না তা আমাদের পক্ষে জ্ঞাত হওয়া কি প্রকারে সম্ভবপর, যদি উহারা কি প্রকাশ করতে চায় এবং উহাদের মূলগত আদর্শ ও তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের কিছু অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান না থাকে? যদি আমরা নিছক উহার বহিরাবরণ ও বাহ্য সৌন্দর্য্যের প্রতিক্রিয়াই বিচার ক'রি, তবে তা হবে নিতান্ত স্থূল ইন্দ্রিয়ানুগ ভাবেই পরিচয় গ্রহণ। ফলে ভাসাভাসা ভাবের পছন্দ-অপছন্দের স্তর ভেদ করে আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে না। কেবলমাত্র বস্তুর মাধ্যমেই শিল্পের অন্তর্নিহিত রসাস্বাদনের শিক্ষা লাভ করা যায় না, বরং যাঁরা উহার স্রষ্টা এবং ব্যবহারকারী, তাঁদের সহায়তায়ই উহা লাভ করা যেতে পারে। সুতরাং মামুলীধরণের পাণ্ডিত্য-মূলক বিচার-পদ্ধতি অত্যন্ত অনুপযুক্ত। আমাদের এখন বিশেষ প্রয়োজন হ'ল নিজেদের শিল্পস্রষ্টা ও ব্যবহারকারী উভয়ের সমপর্য্যায়ভুক্ত ও সমভাবাপন্ন করে তোলা। আর শিল্পরাজ্যের যবনিকা তুলে তার অন্দরমহলে প্রবেশ করে দেখা উচিত যে, সেই বর্ম্মকারখানায় প্রকৃতিকে কিরূপে, কি ভাবে অনুকরণ ক'রে নব নব রূপ সৃষ্টিকর্ম্মে প্রযুক্ত করা হচ্ছে। গীর্জ্জার স্থাপত্য সম্বন্ধে আমাদের তত্ত্বমূলক জ্ঞান গৌণধরণের এবং বিশ্লেষণাত্মক। ফলে, সমস্ত আধুনিক গথিক রীতির গীর্জ্জা আমাদের দৃষ্টিতে জটিল, অসরল ও আন্তরিকতাহীনরূপে প্রতিভাত হয় এবং বাস্তবিক পক্ষে উহারা তাই-ই। ঠিক এইরূপেই "বিদেশী প্রভাবসম্পন্ন" সকল সৃষ্টিই একটা ব্যঙ্গ-ব্যঞ্জনায় হয় পরিণত। "কোন বস্তুর রূপদান নিখুঁতভাবে করতে হ'লে প্রেরণাটি অন্তরের মূল উৎস হ'তে আসা চাই। উহার বাহ্যরূপ ও আকৃতি মর্ম্ম স্পর্শ করলেও সেই বহিরঙ্গের কোন মূল্য নেই, যা কিছু ভাবসম্পদ্ তা সবই আসবে অন্তরের অন্তস্থল থেকে।" (এবটি।) এই কারণেই জাপানী প্রভাবসম্পন্ন হুইস্‌লারের চিত্রমালাকে মনে হয় প্রাচ্য শিল্পের বিদ্রূপাত্মক প্রতিরূপ। কারণ এই চিত্রের রূপাবলী তাঁর নিজস্ব নয়। আঙ্গিকের দিকে গীর্জ্জা বা জাপানী চিত্রের মুদ্রিত প্রতিলিপিতে শিক্ষণীয় কিছুই নেই। সব স্বাভাবিক কালেই শিল্পের বহিরাকৃতিতে শিক্ষাপ্রদ বিশেষ কিছু থাকে না। যা কিছু শিক্ষণীয় তা নিহিত থাকে উহার তত্ত্বাংশ ও বিষয়বস্তুর মধ্যেই। আবার শিল্পের বহিরঙ্গ থেকে যদি শিক্ষা গ্রহণ করা যায়, তা হ'লেও একটি গ্রীসীয় মন্দিরের আদলে কোন আধুনিক ডাকঘর নির্ম্মাণের কাজ চিরদিনই অসম্ভব প্রতিপন্ন হবে। "পূর্ব্বপ্রচলিত রীতি ও আদর্শের সমাহারে একটি মিশ্ররূপ-রচনাকে প্রকৃত সৃষ্টিকর্ম্ম আখ্যা দান চলে না। তবে মিশ্ররূপ-সৃষ্টি অর্থপূর্ণ ও সার্থক হতে পারে যদি যুগপৎ সর্ব্বপ্রকার উদ্দেশ্য ও আদর্শরাজি উহাতে রূপ পরিগ্রহণ করতে পারে।"

আমার মতে "বিজ্ঞানসম্মত" কথাটির অর্থ হচ্ছে উপযুক্ত কারণের সাহায্যে যে কোন কাজের পরিণতি বা ফলাফলকে ব্যাখ্যাতকরণ। এই হেতুতেই আমি বলে থাকি যে, যতদিন আমরা কোন শিল্পের আধ্যাত্মিক ভিত্তি ও পরিবেশ এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পটভূমিকাকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করে উহার বিচারে অগ্রসর হব, ততদিন আমাদের খ্রীষ্টীয়, আসীরিয়, অথবা বৌদ্ধশিল্পের আসল প্রকৃতি, আদর্শ ও মর্ম্ম ব্যাখ্যানের চেষ্টা ঘোর ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হতে বাধ্য। যেমন, একটি প্রদত্ত সমীকরণের প্রতীক চিহ্নরাজির দ্বারা একমাত্র একজন গণিতজ্ঞের পক্ষেই ব্যাখ্যাতকরণ সম্ভবপর, ঠিক তেমনি একজন খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীই কেবল খ্রীষ্টীয় শিল্পের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিতে পারেন। সৌন্দর্য্যতত্ত্ববিদ্‌গণ নিছক এই সকল প্রতীকমালার সহায়তায়ই বলে থাকেন যে, উহাদ্বারা নক্সাটি সঠিকভাবে ও সুন্দররূপে রূপায়িত হয়েছে কি না।

অতিশব্দের ভূমিকা

শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায়

শাস্ত্রে বলেছে শব্দই ব্রহ্ম, এখন বিজ্ঞানিগণ বলছেন, শব্দই ব্রহ্মাস্ত্র ; এর নিধন-ক্ষমতা ভবিষ্যতে পারমাণবিক অস্ত্রের সমতুল্য হতে পারে। কথাটি শুনতে চমকপ্রদ হলেও উপেক্ষণীয় নয়। বচনের তীক্ষ্ণতায় মানুষকে গাঁ ছাড়া করার লোকশ্রুতি আমরা কম শুনি নি। গ্রীষ্মকালে ভীমলোচন শর্ম্মার সঙ্গীত সাধনায় দালান ফাটার কাহিনীর কৌতুকও উপভোগ করেছি। এ সব হয়ত একান্তই পরিহাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু রসকষের যাঁরা ধার ধারেন না, নির্ভেজাল সত্য নিয়ে যাঁদের কারবার, সেই বিজ্ঞানীমহলও শব্দের সংহার-শক্তি সম্বন্ধে কি অভিমত পোষণ করেন—সে ত প্রবন্ধের গোড়াতেই উদ্ধৃত করেছি। তবে কারুর সংহারমূর্ত্তি দর্শনে আমরা আদৌ উৎসুক কি না, তা বিচার্য্য এবং সেহেতু এই আলোচনা অবান্তর। কিন্তু শিল্প এবং বিজ্ঞানের সহায়তায় শব্দের যে কল্যাণীরূপ প্রকাশিত তার সঙ্গে পরিচিত হ'তে আমরা স্বভাবতই আগ্রহবোধ করি।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে শব্দের ভূমিকা আলোচিত হবে তা অকল্পনীয়রূপে তীক্ষ্ণ। এত তীক্ষ্ণ যে নিঃশব্দ। কথাটি আপাতদৃষ্টিতে অবোধ্য ঠেকবে, কারণ শব্দের মৃদুতাই তাকে অশ্রুত রাখে—সাধারণ অভিজ্ঞতা তাই বলে। কিন্তু এটা আংশিক সত্যমাত্র। বস্তুতঃ খুব মৃদুশব্দ যেমন আমরা শুনতে পাই নে, খুব তীক্ষ্ণ শব্দও তেমনি পাইনে। পর্য্যবেক্ষণে দেখা গেছে সেকেণ্ডে কুড়ি হাজারের বেশী যার কম্পাঙ্ক (frequency) সেই শব্দ আমাদের কাছে অশ্রুতই থেকে যায়। তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে শ্রুতিপারের শব্দ বা অতিশব্দ (supersonic sound)।

শ্রুতিপারের শব্দের স্বরূপ বিশ্লেষণ বিজ্ঞানের অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ঘটনা। অথচ আজ থেকে বহু-কাল আগেও এর অন্ততঃ একটি ব্যবহার মানুষের জানা ছিল। ইউরোপের কোন কোন রাষ্ট্রে সংরক্ষিত অরণ্যে বে-আইনী পশু শিকার ছিল যাদের জীবিকা, এই কৃতিত্ব তাদেরই প্রাপ্য। প্রহরারত রাজকর্ম্মচারীদের ফাঁকি দিয়ে শিকার-সঙ্গী কুকুরবাহিনীকে সঙ্কেত জ্ঞাপনের জন্য তারা এক আশ্চর্য্য উপায় উদ্ভাবন করেছিল। শিকারী-দের সঙ্গে থাকত বিশেষ একধরণের হ্রস্বকায় বাঁশি। এটি অত্যন্ত উচ্চগ্রামের শব্দসৃষ্টির উপযোগী করে নির্মিত হ'ত যা যথেষ্ট কাছাকাছি থাকা প্রহরীরাও শুনতে পেত না। কিন্তু কুকুরের শ্রবণযন্ত্র একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত অতি-শব্দ শুনতে অভ্যস্ত। সেহেতু তারা বহু দূরে থেকেও অনায়াসেই প্রভুর নির্দ্দেশ গ্রহণ করতে পারত।

বর্ত্তমান শতকের প্রারম্ভ থেকেই শ্রুতিপারের শব্দ বিষয়ে গভীরতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার তাগিদ অনুভূত হতে থাকে। ফরাসী-বিজ্ঞানী পল ল্যাঞ্জেভিন-এর (Paul Langevin) গবেষণা বিষয়টির উপর উল্লেখযোগ্য আলোকপাত করে। প্রথম মহাযুদ্ধকালে জার্ম্মান সাবমেরিনের অতর্কিত আক্রমণে ফরাসী নৌবহর নিদারুণ ভাবে বিপর্য্যস্ত হ'ত। ঐ ল্যাঞ্জেভিনের উদ্ভাবনী-প্রতিভা ফরাসী নৌবহরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধারের পথ সূচিত

করে। ফরাসী প্রতিরক্ষা দপ্তর শ্রুতিপারের শব্দতরঙ্গকে জলের মধ্যে লুক্কায়িত সাবমেরিনের অস্তিত্ব-সন্ধানে প্রয়োগ করল। কোন নির্দিষ্ট দিক্ লক্ষ্য ক'রে ঐ তরঙ্গ নিক্ষেপ করলে তা স্বাভাবিক ভাবে অগ্রসর হতে হতে হারিয়ে যাবার কথা; কিন্তু জল অপেক্ষা ঘনতর কোন বস্তুতে বাধাপ্রাপ্ত হলেই প্রতিধ্বনিরূপে ফিরে আসতে বাধ্য। শব্দরশ্মি প্রেরণ এবং তার প্রত্যাবর্তনের সময়ের ব্যবধান থেকে বস্তুটির দূরত্ব অনুধাবন করা যায়। সাধারণ শব্দ বহুমুখী বলেই এতদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত হবার অযোগ্য। অবশ্য অতিশব্দের এই ব্যবহার মানুষেরই প্রথম আবিষ্কার নয়, জীবজগতের কোন কোন অধিবাসী স্মরণাতীত কাল থেকেই এ বিষয়ে অবহিত ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাদুড়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। দৃষ্টিশক্তিহীন হয়েও এরা শ্রুতিপারের শব্দের সহায়তায় চলাফেরা করে।

অতিশব্দ সৃষ্টির সরঞ্জাম বাদুড়ের দেহযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মানুষ কৃত্রিম উপায়ে অনুরূপ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। সেকেণ্ডে মাত্র ২০ হাজার কম্পাঙ্কের বেশি হলেই তা শ্রুতিপারের শব্দের পর্যায়ভুক্ত, কিন্তু গত শতকের শেষভাগেই বিজ্ঞানীগণ গবেষণাগারে যে শব্দসৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন—তার কম্পমান ছিল নব্বুই হাজারের অধিক। বর্তমানে তা যে বহু লক্ষতে গিয়ে পৌঁছেছে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

শ্রুতিপারের শব্দের প্রয়োগ-সূচীর মধ্যে সম্ভবতঃ ঔষধ প্রস্তুতে তার ব্যবহারই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এমন কতগুলো ঔষধ আছে যারা জলে অদ্রাব্য, আবার অন্য কোন তরল পদার্থে তাদের দ্রবণ তৈরি ক'রে চিকিৎসায় ব্যবহারও যুক্তিযুক্ত নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কর্পূরের কথা। কর্পূর জলে দ্রবণীয় নয়, অথচ কোন কোন ব্যাধি থেকে রোগীর আরোগ্যলাভের জন্য ক্যাম্ফর-অয়েল ইঞ্জেকশন অপরিহার্য। কিন্তু ক্যাম্ফর-অয়েল স্বাভাবিকভাবে শরীরের রক্ত চলাচল বন্ধ ক'রে রোগীকে মৃত্যুমুখেও ঠেলে দিতে পারে।

শ্রুতিপারের শব্দ এই সমস্যাটির বাস্তব সমাধান করেছে। উচ্চগ্রামের শব্দতরঙ্গের সহায়তায় জলে ঐসব ঔষধকে মোটামুটি দ্রবণীয় করা চলে (যথার্থ বলতে গেলে বলতে হয় emulsion) এবং নির্ভয়ে মানুষের রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যায়। উপরন্তু ইঞ্জেকশন ছাড়াও কোন কোন ঔষধ মানুষের দেহে প্রবেশ করানর কাজে পাশ্চাত্ত্য দেশে আজকাল একটি অভিনব কৌশল গ্রহণ বিন্দুমাত্র ক্ষতিসাধন না করে অতিশব্দ-তরঙ্গ সাহায্যে লোমকূপের সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়ে রোগীর দেহে ঔষধ ঢুকিয়ে দেন।

শ্রুতিপারের শব্দ অদূর ভবিষ্যতে ক্যান্সার নিরাময়ের পথ প্রশস্ত করতে পারে। মিনিসোটাতে মেও ক্লিনিক এই পর্যায়ে বিশেষ ফল লাভ করেছেন। ক্যান্সার আক্রান্ত খরগোসের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে তাঁরা দেখেছেন, শতকরা নব্বুই ভাগ দূষিত কোষই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। অতিশব্দ-তরঙ্গ প্রয়োগের ফলে যে উত্তাপ সঞ্চারিত হয়, তাই কোষগুলি বিনষ্ট করার জন্য দায়ী। পরীক্ষায় এও দেখা গেছে, একমাত্র শব্দতরঙ্গই ক্যান্সার-আক্রান্ত কোষ ধ্বংস করার অনুকূল উত্তাপ সৃষ্টিতে সমর্থ।

যন্ত্রশিল্পে অশ্রুত শব্দের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কোন যন্ত্রাংশ ঢালাই বা তৈরী করার পর তাকে না ভেঙে ভেতরের যথার্থ গঠন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা লাভ অবশ্য প্রয়োজন। এই প্রক্রিয়ার নাম Non-Destructive Testing of Metals. বস্তুটির মধ্যে যদি কোন ফাটল, সূক্ষ্ম ছিদ্র বা এয়ার-হোল থেকে যায়, যার অস্তিত্ব এমনিতে ধরা পড়ছে না, তবে তা ব্যবহার করলে অনেক ক্ষেত্রেই বিপদের সম্ভাবনা। সম্প্রতি রুশ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক সোকোলভ-এর গবেষণায় 'সুপারসনিক ডিফেক্টোস্কপি অফ মেটাল্‌স্' যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করেছে। পরীক্ষণীয় বস্তুর মধ্য দিয়ে উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দতরঙ্গ পাঠান হয়। কোথাও ফাটল বা এয়ার-হোল থাকলেই তা প্রতিধ্বনিত হতে থাকে এবং সূক্ষ্ম গ্রাহকযন্ত্রে ঐ প্রতিক্রিয়া ধরে রাখা হয়। এ থেকে কি ধরনের খুঁত রয়েছে আর তার সঠিক অবস্থানই বা কোথায়—সেই ধারণা লাভ করা যায়। অবশ্য 'সুপারসনিক ডিফেক্টোস্কপি'র প্রয়োগ কেবল ধাতব পদার্থেই সীমাবদ্ধ নেই; কাঁচ, প্লাষ্টিক, সেরামিক প্রভৃতি পদার্থের অন্তর্গঠন নিরূপণেও এর সার্থক প্রয়োগ হয়েছে। অধুনা চিকিৎসকগণ মানুষের রোগ নির্ণয়ে অতিশব্দের ব্যবহার করছেন। রঞ্জনরশ্মিকেও ফাঁকি দেয়, দেহকোষে এমন সূক্ষ্ম কোন গোলযোগ যদি ঘটে থাকে, তা শ্রুতিপারের শব্দরশ্মির চোখ এড়াতে পারে না। কিছুকাল আগে সান ফ্রান্সিস্কো শহরে অ্যামেরিকান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে ডক্টর গিলবার্ট বন্ নামক জনৈক চিকিৎসক এই পর্যায়ে সাফল্যের নিদর্শন উপস্থাপিত করেন। ইতিপূর্বে চোখের পশ্চাদ্দেশে কোন রোগ হ'লে তা ঠিকমত জানা যেত না, কিন্তু ডক্টর

কয়েকটি আলোকচিত্র প্রদর্শন করেন যার একটি ছিল চোখের ছানির আড়ালে ঢাকা পড়ে-থাকা কোন টিউ-মারের ছবি—যার অস্তিত্ব রঞ্জনরশ্মির কাছেও ধরা পড়ত না।

ধাতব, অধাতব, ভঙ্গুর, অভঙ্গুর—সকল শ্রেণীর পদার্থে স্বল্পায়াসে গর্ত্ত করার জন্য বর্ত্তমানে অতিশব্দীয় ভেদন যন্ত্র (Supersonic drilling machine) উদ্ভাবিত হয়েছে।

পশমশিল্পে অতিশব্দের বহুল প্রচলন রয়েছে। শুধু পশমই নয়, মোটরের আর্মেচার, টারবাইনের ব্লেড্, ইলেকট্রিক মীটার ইত্যাদি যন্ত্রপাতির অংশগুলি না খুলেও ভেতরের ময়লা অতিশব্দ-তরঙ্গ দ্বারা পরিষ্কার করার কৌশল আমাদের করায়ত্ত। এ ছাড়া বয়লার প্লেট এবং পারমাণবিক চুল্লীতে ব্যবহৃত ইউরেনিয়াম-ইন্ধন দণ্ডের ওপর যে scale-এর প্রতিরোধী আবরণ সঞ্চিত হয়, তাও অনুরূপ প্রক্রিয়ায় দূরীভূত করা যায়।

অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি তাপ-সহ (Refractory) পদার্থে নির্ম্মিত বস্তুর ঝালাই করার কাজে অধুনা শব্দতরঙ্গের সহায়তা গ্রহণ করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় একটি বড় সুবিধে এই যে, কোন বিগলন-সহায়ক প্রয়োজন হয় না, সেহেতু প্রক্রিয়াটির নাম flux-less soldering.

যে সব বস্তুর বেধের পরিমাণ নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়, শ্রুতিপারের শব্দের সাহায্যে তা অত্যন্ত সহজ হয়ে গেছে। ভূগর্ভে প্রোথিত কোন শিলাস্তর ঠিক কতটা পুরু, স্তরটির মধ্য দিয়ে ড্রিলিং না করে আমরা বলতে পারি নে। কিন্তু অতিশব্দ-তরঙ্গ পাঠিয়ে তা স্বল্পায়াসেই নিরূপণ করা চলে।

অশুদ্ধি সংশোধন

১৩৬৯ জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে,

বিপ্লবী যোগী রসিক প্রবন্ধে,

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭৯	১	২১	নলিনীকান্ত গুপ্ত	নলিনীকান্ত সরকার
১৮০	১	২৭।২৮	রং ঢং	রংঢং
১৮৪	২	১৪	ঠেঙাই	ভেঙাই

অমরত্ব কবিতায়

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০৭	১	১	ওপরে	ওপারে

১৩৬৯ আষাঢ়ের প্রবাসীতে,

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ছবির নীচে ১২৭১ ১২৭২

বিবিধ প্রসঙ্গে

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৬৭	২	৯	৯৮তম	৯৭তম

দেবকার্য্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

আর তো ডেকে প্রাণ ভরে না
ডাকি তোমায় কম,
আকাঙ্ক্ষা হয় সেবা করি
তোমায় প্রিয়তম।
সেবা করার শক্তি কোথায়?
জীর্ণ দেহ—চেষ্টা বৃথায়,
তোমার ধরা দেখতে পাই
অধিক মনোরম।

২

বসে থাকি সারা দিবস
দেউল প্রাঙ্গণে
উঠছে গড়ে যে মন্দির—তাই
রত নিরীক্ষণে।
শক্তি যত—তার বেশীও
খাটছে দেহ—সাবাস্ দিও—
জরাকে তার সরায় এসে
কৈশোর যৌবনে।

৩

ভাবে বুড়া বৃথায় জীবন
কাটাইলাম আমি,
পরের সেবায় নিজের সেবায়
গেল দিবস যামী।
যে ক'টা দিন আর বাঁচে হায়
তোমার কাজই করতে সে চায়,
বুড়া হ'ল তোমার চাকর
বিলম্বেতে স্বামী।

৪

তোমার পূজার অঙ্গনেতে
রোপে ফুলের গাছ
কোথায় তাহার এত সাধের
বিদগ্ধ সমাজ?
হায়রে, বুড়া কি খেয়ালী!
মালিকের তুই হবি মালী?
চোখের জলে ফুল ফুটাবি—
বড় কঠিন কাজ!

৫

ব্যাকুল হ'ল তোর যে প্রতি
রক্ত, কণিকাটি—
দুর্ব্বল তুই ভুবন ভবন
করবি পরিপাটী।
ফুরালো তোর সাধ্য যখন—
কি শুচি সাধ ভরলো রে মন?
কাণ্ড যে তোর দেখে হাসেন—
পাষাণ-প্রতিমাটি।

কবির ভাষা

শ্রীকালিদাস রায়

ভক্ত চায় করিবারে ভক্তি নিবেদন
দেবে বা মানবে,
হৃদয়ে আকুতি তার করি সংবরণ
রহে সে নীরবে।
আমি কবি, কণ্ঠে তার ভাষণ যোগাই,
বাণী ফুটে মুখে
পুষ্প সম, গন্ধ পায় ছন্দে তায়, তাই
স্পন্দ জাগে বুকে।

লঘু যে করিতে চায় করিয়া বিলাপ
হৃদয়ের ভার
ঝরায় নয়নে অশ্রু শোকের সন্তাপ,
ভাষা নাই তার।
আমি কবি, কণ্ঠে তার বচন যোগাই,
শোক পায় রূপ,
তাহারে সুরভি করে ধূম-মাল্যে তাই
হৃদয়ের ধূপ।

প্রেমিক করিতে চায় প্রেয়সীর সাথে
প্রেম আলাপন,
শরতের প্রাতে কিংবা বসন্তের রাতে,
জানে না ভাষণ।
আমি কবি, ভাষা দিই ললিত মধুর
গদগদ রসে,
মুখে তায় হাসি ফুটে মানিনী-বধূর
তাহারি পরশে।

জননী করিতে চায় দুলালে সোহাগ
কিসে সে ভুলাবে?
থামে না রোদন তার গলে না ক রাগ,
ভাষা কোথা পাবে?
আমি কবি, ভাষা দিই, সুর দেয় তারে
মায়ের অন্তর,
শিশুমুখে হাসি ফুটে—প্রভাতী নীহারে
যেন রবিকর।

শার্দ্দূল

(ব্লেকের অনুবাদ)

শ্রীপৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শার্দ্দূল! শার্দ্দূল! প্রজ্বল ও রে,
রাত্রির বনভূমি আলোকিত ক'রে,
কোন্ সে অমর হাত? কোন্ সে নয়ন
গড়েছিল তোর ওই সুষমা ভীষণ?

সে কোন্ সুদূর নভে, কোন্ জলতলে
তোর নয়নের শিখা উঠেছিল জ্ব'লে?
কোন্ পাখা মেলে'—তার আকুতি উছল?
নির্ভয়ে কোন্ হাত ধরে সে-অনল?

কোন্ বাহু, শিল্পীর কোন্ সাধনায়
তোর হৃদয়ের পেশী আকৃতি পায়?
যখন হৃদয়ে তোর জাগে স্পন্দন,
কার সে ভীষণ ভুজ? কার সে চরণ?

কোন্ সে হাতুড়ি? আর সে কোন্ শেকলে
মগজ গড়েছে তোর দারুণ অনলে?
সে কোন্ নেহাই? আর কোন্ দৃঢ়-কর
বুকে টেনে নিল ওই রূপ ভয়ঙ্কর?

তারারা যেদিন দিল বর্শা ফেলে,
স্বর্গ ভিজিয়ে দিল অশ্রু ঢেলে,
আপন সৃষ্টি দেখে হাসলেন তিনি?
তোকেও কি বানালেন—যীশুকে যিনি?

শার্দ্দূল! শার্দ্দূল! প্রজ্বল ওরে
রাত্রির বনভূমি আলোকিত ক'রে,
কোন্ সে অমর হাত, সে কোন্ নয়ন
নির্ভয়ে গড়ে তোর সুষমা ভীষণ?

আম উৎসর্গ

শ্রীগিরিবালা দেবী

বৈশাখ মাস বিদায় নিয়েছে। জ্যৈষ্ঠ ধরণীর দ্বারে জাগ্রত। রৌদ্রের প্রখর উত্তাপে পল্লীগ্রামের পথ-ঘাট ও দিগন্ত-প্রসারিত মাঠে ফাটল ধরেছে। এবার এখন পর্য্যন্ত কালবৈশাখীর স্নিগ্ধ-সুশীতল বারিধারা দেবতার আশীর্ব্বাদের মত নেমে এসে চরাচর পরিসিক্ত করে নি।

প্রতিদিনই বেলা শেষে অনল বর্ষণকারী ধূসর আকাশের ঈশান কোণে খণ্ড খণ্ড ঘন নীল মেঘ-রেখা আসর সাজায় বটে, কিন্তু ঝ'রে পড়ে না। মেঘ ডাকে গুরু গুরু, প্রবল বাতাস বয়ে যায় সন্ সন্ রবে কিন্তু তা নেমে আসে না তপ্ত ধরণীর বুকে। কৃষকের সাধনার ধন, আশার স্বপ্ন দর্শন দিয়ে মিলিয়ে যায় নভোনীলে।

এবার বৈশাখ মাসে, আম উৎসর্গের দিন না থাকায় জ্যৈষ্ঠের প্রথমেই পূর্ণিমায় প্রশস্ত দিন পাওয়া গেছে। অসংখ্য আম্র বৃক্ষের মালিক এবং আম্র ফলের পরম ভক্ত ভাদুড়ী বাড়ীর কর্ত্তা এতদিন আম উৎসবের দিন না থাকায় এখনও পাকা আমের আস্বাদ গ্রহণ করতে পারেন নি। কাজেই গৃহিণীও পাকা আম খেতে পারেন নি। দেব কুল; গুরু কুল; পিতৃ এবং মাতৃ কুলের উদ্দেশে বছরের নূতন ফল উৎসর্গ না করলে, পূজনীয় শ্বশুর-শাশুড়ী গুরুজনেরা না খেলে, ছেলে নটবর ও বধূ রাইকিশোরী পাকা আম মুখে দিতে পারে না। এই দুঃখে কর্ত্তার দুই নাত্‌নী ঝুলন ও মিলন সারাটা দিন আম বাগানে বিচরণ ক'রে লক্ষ্য করে কোন গাছের আমে রং ধরেছে। কোন্ গাছের আম পাকতে সুরু করেছে। কি জানি পূর্ণিমা আসতে আসতে সব গাছের আমগুলি যদি এক সঙ্গে পেকে ফুরিয়ে যায়, তখন কি হবে? বাড়ীর গাছের পাকা আম বাড়ীর লোক ভাল ক'রে খেতে পাবে না, এ দুঃখের ভেতরে তাদের সুকুমার চিত্তে আরও আশঙ্কা জাগে, আম ফুরিয়ে গেলে তারাই বা খাবে কি? গৃহিনা যদিও ওদের নাম দিয়েছেন "আমের পোকা", আসলে এ পরিবারের সকলেই আমের বিষম ভক্ত। সেই মুকুল থেকে পেকে নিঃশেষ হ'য়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত ঝুলন, মিলনের শান্তি নেই। ভাতের সঙ্গে সম্বন্ধ কম। দিনভোর তারা আম গাছের তলায়। ওদের ছোট ভাইটা খোকন এখনো তেমন পরিপক্ক হয়ে ওঠে নি। কিন্তু দিদিদের সঙ্গে ছোট বাঁশের ডালা হাতে নিয়ে তালে তাল দিয়ে বেড়ায় বাগানে বাগানে।

এরা আমের ভক্ত হলেও অন্য ফলের প্রতিও কম অনুরাগী নয়। তার নমুনা স্বরূপ গোটা বাড়ীতে অনেক রকম ফলবৃক্ষ শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করেছে।

দিবসারম্ভের সূচনায় বনে-জঙ্গলে যে তিনটি বালক-বালিকার পরিক্রমা চলছিল তার অবসান হ'ল সন্ধ্যার গোধূলি আলোকে। তিন ভাইবোন বারান্দায় গোল হয়ে বসল ঠাকুমাকে ঘিরে। এখন চলবে বৃক্ষ দেবতার উপাখ্যান। যারা দিবাভাগে গাছ হয়ে ফুল ফল বিতরণ করে, রাতে মানুষ হয়ে যায়। যারা ডাল ভাঙে না, ফুল ছিঁড়ে নষ্ট করে না, তাদের শিয়রে ব'সে বাতাস দিয়ে ঘুম পাড়ায়। অপার স্নেহে চুমো খায়। পরের দিনের জন্যে পাকা পাকা ফল সাজিয়ে রাখে পাতার অন্তরালে।

বৃক্ষ-দেবতার সহৃদয়তার কাহিনীর শেষে খোকনের প্রিয় গল্প ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর কথা না বললে তার চপল চঞ্চল চক্ষে ঘুমের নীল পরী মায়ার কাঠির পরশ দেয় না। ধীরে রজনী নিবিড় হ'তে থাকে। বন বনান্তর অন্ধকারে আবৃত হয়। ঝোপে-ঝাড়ে জোনাকি জ্বলে। বনের পাখী ঘুমিয়ে পড়ে। তখন ঘরের পাখীরও চোখ ঘুমে জড়িয়ে যায়।

খোকন ঘুমিয়েছে, পাড়া জুড়িয়েছে। ঝুলন কল্ কল্ করে, "হাঁ, ঠাকুমা, তোমাদের আম উচ্ছুগ্‌গের দিন যে আসে না? আম পাকা ধরেছে, এবার ফুরিয়ে যাবে। তুমি, ঠাকুরদা, বাবা মা, পাকা আম না খাবার আগেই যদি সব আম পেকে ফুরিয়ে শেষ হয় তখন আমরা কি করব?"

মিলন দিদির কথায় সায় দেয়, "হাঁ, এবার সব গাছের আম পেকে উপ্‌টুপু ক'রে ঝ'রে পড়ছে। আজ কি কাণ্ড হয়েছে জান ঠাকুমা? সিঁদুরে গাছের একটা পাকা আম গাছতলায় থেকে কুড়িয়ে নিয়ে খোকনটা কামড়াতে কামড়াতে ছুটে গিয়ে ঠাকুরদার মুখে পুরে দিয়েছিল। ঠাকুরদা তাড়াতাড়ি থু থু ক'রে ফেলে দিয়ে মুখ ধুয়ে হেসেই অস্থির।"

ঝুলন বলে, "খোকন যে ঠাকুরদার আহ্লাদে গোপাল, ওর বেলায় কথা নেই। আমরা অমনধারা করলে বাড়ীতে কুরুক্ষেত্র হয়ে যেত।"

ঠাকুরমা সস্নেহে দুই নাত্‌নীর সর্ব্বাঙ্গে স্নেহ হস্ত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিলেন, "খোকন যে অবুঝ শিশু, ওর ত কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। তোমরা যে বড় হয়েছ দিদি, তোমাদের কত বুদ্ধি বিবেচনা। তোমরা কেন অমন কাজ করতে যাবে? নইলে ঠাকুরদার কাছে তোমরা সকলেই সমান আদরের। তোমাদের আম ফুরিয়ে যাবার আর ভয় নেই। রবিবারে পূর্ণিমার দিন আম উৎসর্গ হবে। মাঝে আর তিনটে দিন বাকী।"

দুই বোন আশায় আনন্দে সচকিত হয়ে সাগ্রহে প্রশ্ন করে, "মোটে তিন দিন বাকী? তা হ'লে আম পাড়াচ্ছ না কেন? গাছ ভরা ভরা কাঁচা আম গাছে ঝুলছে, আম উচ্ছুগ্‌গু হবে কি দিয়ে?"

"কাল সকাল বেলা আম পাড়া হবে। আমের পাতায় 'জাগ' দিয়ে রাখলেই তিন দিনেই কাঁচা আম পেকে যাবে।"

ঝুলন, মিলন আশ্বস্ত হ'ল, বড়রা কাঁচ আম পাকাবার কত কৌশল জানে, আমের পাতায় ঢেকে রেখে আম পাকায়। কিন্তু ওরাও যে মাটির ছোট ছোট হাঁড়িতে আমের পাতা দিয়ে ঢেকে রেখে আম পাকায় বটে কিন্তু সে আম পাকে না, রং ধরে না, নরম হয় মাত্র। সুকুমারমতি বালিকারা জানে না কাঁচা যা তা চিরদিন কাঁচাই থাকে। জোর ক'রে পাকানো যায় না।

ঝুলন ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি যে বলেছিলে ঠাকুমা, 'যারা তালের গাছ বোনে তারা তাল খেতে পায় না।' তা হ'লে এবার তুমি তাল খাবে কেমন করে? তোমারই বোনা তাল গাছে এবার কাঁদি কাঁদি তাল হয়েছে। হলুদ রঙের কাঁদিতে খয়েরি রং হচ্ছে। তাল পাকলে তালের ক্ষীর, বড়া তুমি কি খাবে না?"

গৃহিণী হাসলেন, "তোরা বদ্ধ পাগল রে। তালের আঁটি পুঁতলে বারো বছর পরে ফল ফলে ব'লে লোকে বলে, যে তালের আঁটি পোঁতে তার ভাগ্যে ফল খাওয়া হয় না। কিন্তু আমার ভাগ্যে নারায়ণের তালের প্রসাদ জুটবে বৈ কি? যেবার তোদের বাবা-মায়ের বিয়ে হয় সেইবার আমি তাল বুনেছিলাম, ঠিক বারো বছর পরে এবার ফল ধরেছে। বৃক্ষ দেবতা প্রসন্ন হয়েছেন।"

বৃক্ষ-দেবতার দয়ার কথা ভাবতে ভাবতে ঝুলন, মিলন ঘুমিয়ে পড়ল।

ঝুলন, মিলনের গভীর সুপ্তির ঘোর কেটে গেল রজনী প্রভাতের দমকা বাতাসে। প্রভাতী আম্রকুঞ্জ মর্ম্মরিত হয়ে পাকা ফল বোঁটায় আশ্রয়চ্যুত হয়ে খসে পড়ছে ধুম্‌-ধুম্‌ শব্দে।

দুই হাতে চোখ মুছতে মুছতে দুই বোন সাজি নিয়ে ছুটে গেল আম তলায় আম কুড়োতে।

বড়দের অনেক থাকলেও ছোটদের সযত্নে রক্ষিত গোপন ভাণ্ডার হতে আম উৎসর্গের দিন বাছা বাছা সুপক্ব অমৃত ফল ঠাকুরদা-ঠাকুমাকে উপহার দিতে হবে। তাই সংগ্রহের সীমা নেই।

বাংলা দেশের বারো মাসের তেরো পার্ব্বণের ভিতরে আম উৎসর্গ সামান্য একটা অনুষ্ঠান ভিন্ন বিরাট্‌ কিছু নয়। তবু আয়োজন আছে। পুরোহিত আসবেন, আমের সঙ্গে পিঠে-পায়েস ও নানাবিধ ফল দিয়ে নারায়ণকে ভোগ দিতে হবে। পূর্ব্বপুরুষদের উদ্দেশে নামে নামে দুধ, আম ও অন্যান্য উপকরণ নিবেদন করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ভোজ্য। প্রসাদ পাবে গ্রামের ব্রাহ্মণ, কামার, কুমোর, ছুতোর, ভুমিমালি ও অনুগত বাধ্য যারা।

ভোজ্যের একধামা আতপ চাল নিয়ে গৃহিণী বারান্দায় বসে ঝাড়া বাছা করছিলেন। এমন সময় জেলেপাড়ার হরিচরণের মা এক ঘটি দুধ ও কয়েকটা পাকা আম নিয়ে উপস্থিত।

গৃহিণী চোখ তুলে সাদরে আহ্বান করলেন, "হরির মা, এস, বস পৈঠার ওপরে। তোমাদের বুঝি গোরুর নতুন বাছুর হয়েছে? দিব্যি বড় বড় আম হয়েছে ত তোমার গাছে।"

হরির মা আম, দুধ চালের ধামার পাশে রেখে বলল, "হঁ, মাঠান নতুন বাছুর হইচে, একুশ দিন বাদ দিয়ে ঠাকুরের ভোগের নেগে দুধ আনিচি। এ আমগুলান চারা গাছের, দেব-বেম্মণকে না দিয়ে কি মুখে দেওন যায়? তাই আন্‌লাম।"

গৃহিণী হাতের কুলো নামিয়ে একটা আম নাকের কাছে ধরে বললেন, "বেলে আম, বেলের গন্ধে ভুর ভুর করছে। নারায়ণের ভোগে কেটে দেব। দুধ দিয়ে ক্ষীরের নাড়ু করব। তুমি বিকেল বেলা এসে প্রসাদ নিয়ে যেও। নাত্‌নী ভাল আছে? হরির মেয়ের কি নাম রাখলে?"

হরির মা আপ্যায়িত হয়ে ফিক্‌-ফিক্‌ ক'রে হাসছে

লাগল, "আমাগরে ঘরে আবার ম্যায়ার নাম! সুখেও থাকি নি, সুখলতা রাখি নি, বনে বনে ঘুরিচি, বনলতা থুইচি।"

"বনলতা, বেশ নাম, সুন্দর নাম। তোমাদের পাড়ায় এমন নাম পেলে কোথায়? হরির বৌয়ের মেয়ের নাম পছন্দ হয়েছে?"

হরির মা ঘাড় নাড়ে, "হুঁ, মাঠান, জেলের বেটির নাকি ভাল নাম ভাল নাগে? ও নাম রাখিচে তুফানী। হরি আর আমি বনলতা ব'লেই ডাকি ম্যায়াডারে। নাম আমাগরে পাড়ার নয়, তোমার ঠাঁই হক কথা কইচি। গোরুর নেগে একদিন দল-দাম কাটতে গেইছিল চলন বিলে। তখন বেলা ঝিকিমিকি। পাড়ার ভদ্দর নোকের ডবৃকা ছাওয়ালরা নাও নিয়ে বাচ দিইচিল বিলের জলে। আর গায়ান ধরিছেল, 'বনলতা, বনলতা, মনের কথা ক'য়ে যাই, তোর নেগে সাঁঝ-সকালে বিলের ধারে নৌকা বাই।' গায়ান শুনে আমি লজ্জায় খুন খুন হইয়ে ঝোপের মধ্যে পলায়ে গেইলাম। কিন্তক বনলতা নাম-টুকুন মিঠা লাগে কানে। তাই হরির পরথম ম্যায়ার নাম থুইচি।"

গৃহিণীর চোখে-মুখে কৌতুকের হাসি ঝিলিক দিল। তিনি হেসে বললেন, "খুব ভাল কাজ করেছ হরির মা। কিন্তু তোমার নাতির বয়েসী ছেলেদের গান শুনে লজ্জা পাবার কি হয়েছিল? লজ্জা-সরমের বয়েস ত তোমার পার হয়ে গেছে?"

হরির মা ক্ষুণ্ণ হয়, "কি যে কও মাঠান? ম্যায়া-মানুষের আবার নাজ-নজ্জার বয়েস যায় নাকি? নোকে কথায় কয়, 'মরবে ম্যায়া উড়বে ছাই, তবে ম্যায়ার গুণ গাই।' ননাটে দুঃখু মা, না হলে হরির বাপ মরবে কেনে? বুড়া নাই বলেই না নোকের কানাকানিতে ডরাই, আমার বেন্দাবন সুখের ঠাঁই তাতে রাধার মুখ নাই।"

হরির মায়ের দুঃখের কাহিনী আর বেশি দূর অগ্রসর হতে পারল না। রহিম সেখের মা, আজু বুড়ী ছেঁড়া স্তাকরায় বেঁধে কয়েকটা আম নিয়ে হাজির হ'ল।

গৃহিণী আজু বুড়ীকেও আদরের স্বরে ডাক দিলেন, "দাদি তুমিও আম এনেছ? তোমরা ভাল আছ ত? বস, রবিবারে আমাদের আমের পূজো, সেদিন তোমরা এসে আম খেয়ো। রহিমকে বল।"

আজু বুড়ী খুশী হয়ে স্তাকড়া খুলতে খুলতে জবাব দিল, "তা আনবুনি মা, তোমাগরে নগেই যে আমাদের আম রাখন গেল না। রহিম গাছের বেবাক আম পাইড়ে কইলো ঠাকুর বাড়ী আর পীরের দরগায় দিইতি।"

"হাঁ, নতুন ফল দেবতাকে না দিলে কি চলে, দিদি?" ব'লে গৃহিণী আমগুলি স্পর্শ করলেন।

এঁদের চাষী-প্রধান ছোট গ্রামে হিন্দু ও মুসলমানের চালে চালে বসতি। কোন সম্প্রদায়ের কারো সঙ্গে কলহ নাই, বিদ্বেষ নাই। হিন্দুরা গাছের ফল-তরকারি, গরুর দুধ, নূতন ধানের চাল, নূতন গুড়ের পাটালি যেমন পীরের দরগায় দিয়ে আসে, তেমনি আনে হিন্দুর দেব-দেউলে। মুসলমানেরাও তাই করে।

দেখতে দেখতে আম উৎসর্গের দিন এসে গেল। বৃহৎ ব্যাপার না হলেও আয়োজন কম নয়। বাগানে রাশি রাশি ফল ফললেও হাট থেকে আনা হ'ল ঝাঁকা ঝাঁকা ফল। 'মরা গরু ঘাস খায় না' প্রবাদ থাকলেও যারা চলে গেছে চিরতরে, ধূলিময় ধরণীর ধুলোয় বিলীন হয়ে গেছে, তাদের ভুলতে পারে নি বংশধরেরা। ফল জল ফুল দিয়ে স্মৃতির মন্দিরে জাগ্রত ক'রে রাখবার যত্ন ও প্রয়াস তাই দেখা যায়।

প্রকাণ্ড মণ্ডপঘরের আধখানা মেঝে জুড়ে পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। বড় বড় পাথরের থালায় ও বারকোসে স্তূপ স্তূপ কাটা ফল। বোঁটা-কাটা সারি সারি আম। পাথরের ছোট-বড় বাটিতে কাঁচা দুধ। ফলের পাশে তিলের নাড়ু, ক্ষীরের নাড়ু, নারকেলের তক্তি, বাতাসা। শুধু ফল-দুধ দিয়েই এঁরা পূর্ব্বপুরুষকে পরিতৃপ্ত করতে চান না। ফলের সঙ্গে গৃহজাত মিষ্টান্নও চাই।

কলার পাতায় অনেকগুলো ভোজ্য সাজানো হয়েছে। প্রত্যেক ভোজ্যের ওপরে একটি করে সাদা ফুলের মালা। ঝুলন ও মিলন স্নানান্তে এক ডালা ফুল নিয়ে মালা গাঁথতে বসেছে। সবগুলি মালা এখনও গাঁথা হয় নি; বাকি আছে ক'টা।

দিদিদের মাল্য রচনার কাছে খোকন বসে বসে দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে চারদিক্ পর্য্যবেক্ষণ করছে।

পূজোর যোগাড় ক'রে দিয়ে গৃহিণী ঢুকেছেন ভোগশালায়। আজ ভোগের কম সমারোহ নয়। কর্ত্তার স্বর্গীয়া জননীর প্রিয় খাদ্য ছিল পাকা কাঁঠালের বড়া। স্বর্গীয় জনক ভালবাসতেন ক্ষীর-পুলি। আর যে কে কি পছন্দ করতেন, তা এখন অস্পষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু কাঁঠালের বড়া ও ক্ষীর-পুলি এখনও ঝাপসা হয়ে

বামুন-পাড়ার বিরাজ পিসী এসে ভোগ চড়িয়েছেন। তিনি পতিপুত্রহীনা বালবিধবা, ভাই-এর সংসারে প্রতিষ্ঠিতা। পূজো-পার্ব্বণে বাড়ী বাড়ী ভোগ রান্না ক'রে পূজোর আয়োজন ক'রে দিয়েই তাঁর একটা পেট নির্ব্বিবাদে চলে যাচ্ছে।

বাড়ীতে বধূ ও শাশুড়ী দুইটি মাত্র কাজের লোক। ঝুলন, মিলন এখনও বড় হয় নি। বধূ ঢুকেছে মাছ রান্নার ঘরে। গৃহিণী একবার মণ্ডপে, একবার ভোগ-শালায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেন। বিরাজ পিসী যেমন কর্ম্মকুশলা তেমনি রন্ধনে সাক্ষাৎ দ্রৌপদী। তবুও গৃহিণীকে পিঠে পায়েসে হাত লাগাতে হচ্ছে।

যথাসময় পুরোহিত এলেন। কর্ত্তা স্নান সেরে পট্ট-বস্ত্র প'রে পূর্ব্বেই প্রস্তুত হয়েছিলেন। এবার আসন নিলেন। এর পরে সুরু হ'ল পূর্ব্বপুরুষদের নামগোত্র ও নিবেদনের পালা।

ভরা দ্বিপ্রহর, জ্যৈষ্ঠের কড়া রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছে। বাতাস স্তব্ধ, কাননকুন্তলা বনশ্রী খর রৌদ্রের উত্তাপে মলিন লাবণ্যহীনা। বন-বনান্তর থেকে একটানা ঘুঘুর উদাস স্বর বিষাদের প্লাবন বইয়ে দিচ্ছে।

পূজো শেষ হলে পুরোহিত জলযোগ করতে বসলেন। মণ্ডপের কোণে নাতি-নাত্‌নীদের নিয়ে কর্ত্তা বসলেন পাকা আমের আস্বাদ গ্রহণ করতে।

তাঁর পাশে ছোট ছোট কলার পাতায় প্রসাদ নিয়ে খাচ্ছে ঝুলন, মিলন ও খোকন।

কর্ত্তা কয়েক টুকরা পাকা আম মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে চোখ তুলে ভারী গলায় বললেন, "প্রত্যেক বছর বৈশাখ মাসে আম উৎসর্গ ক'রে গাছগুলো ন্যাড়া ক'রে রাখ। ভাল করে পাকতেও পায় না। তোমার দেবভোগ গাছের আম শেষ। এবার সত্যিই দেবভোগ্য হয়েছে। চেখে দেখ।" বলতে বলতে কর্ত্তা নিজের পাতায় থেকে কয়েক টুকরা আম গৃহিণীর দিকে তুলে ধরলেন। পলকের ভেতরে গৃহিণীর শুষ্ক পাণ্ডুর মুখে একটু লালের আভা খেলে গেল। তিনি চকিত হয়ে মাথার কাপড় আরো একটুখানি টেনে দিয়ে পুরোহিতের দিকে কটাক্ষপাত করলেন। না, বুড়োর এদিকে নজর নেই, তিনি ভোজনানন্দে মত্ত। বারকোষের ওপর থেকে কাটা দেবভোগ আম একথাবা ফের কর্ত্তার পাতায় নিক্ষেপ করে গৃহিণী চাপা স্বরে বিরক্তি প্রকাশ করলেন, "ছিঃ, তোমার আর বিবেচনা হ'ল না এখনো। ছেলে-বৌকে জল খেতে দেই নি, নারায়ণের ভোগ সারি নি, এখন আমি তোমার সঙ্গে আম খেতে বসব?"

কর্ত্তা আর কথা না বাড়িয়ে অপ্রতিভের হাসি হাসলেন।

সকলের জলপানের পরে ভোজনপর্ব্ব আরম্ভ হ'ল। ঘরে, বারান্দায়, আঙ্গিনায়, ছায়াময় কাঁঠালতলায় জায়গা হ'ল সারি সারি। এক এক পংক্তিতে এক এক দল বসে গেল। নিমন্ত্রিতের চেয়ে অনিমন্ত্রিতের সংখ্যাই বেশি। গ্রামের নিম্ন-শ্রেণীর বালক-বালিকাদের ডাকতে হয় না। তারা বাতাসে বার্ত্তা পেয়ে ছুটে আসে। কলার পাতা নিয়ে বসে যায় অঙ্গনে। ওদের খেতে দিতে গৃহস্বামী বিরক্ত হন না, দায়সারা ভাবে পরিবেশন করেন না। ওরাই যেন পল্লীর প্রাণ, উৎসবের কেন্দ্র।

সকলকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিয়ে যারা অনুপস্থিত তাদের কানাতোলা বড় বড় পিতলের থালায় ভাত বেড়ে দিয়ে দুই শাশুড়ী বধূ যখন খেতে বসলেন তখন সন্ধ্যার আর দেরি নেই। বাঁশ-বনের মাথার উপরে রূপোর থালার মতন পূর্ণিমার নিটোল চাঁদ দেখা দিয়েছে। চাঁদের চারদিক্ বেষ্টন করে ঘননীল কাল-বৈশাখীর মেঘপুঞ্জ সান্ধ্যসমীরণে ভেসে বেড়াচ্ছে। আম-কাঁঠাল পাকা শেষ হয়েছে। এখন প্রকৃতিদেবীর প্রখর রৌদ্রের আর প্রয়োজন নেই। এবার ধারা বর্ষণের পালা। ধারাস্নাত হয়ে নিদাঘে পীড়িত তরুলতা আবার প্রফুল্ল হবে, কিন্তু ফলশূন্য আম্রকুঞ্জের বিলাপতান মিশে রইবে বনমর্ম্মরে।

গ্রহযাত্রা

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

আগামীকালের মানুষ, তোমরা
চলেছ গ্রহান্তরে,
নূতন যুগের যোগ্য তীর্থযাত্রায় চলেছ ;
গেয়ে যাই তার পথের মাঙ্গলিকী,
রেখে যাই সেই সঙ্গে শুভেচ্ছা
আমার একালের।
যাত্রা অবাধ হোক।
জয়ী হয়ে ফিরো
পৃথিবীর কোলে প্রিয় বাহুবন্ধনে।

অন্য আকাশে উজ্জ্বলতর সূর্য্যের আলোকে
আত্মা-বুদ্ধি হবে কি উদ্ভাসিত ?
উদ্‌গীত হবে নূতন গায়ত্রী ?
তীর্থপথের শেষে দেবতার কোন্ মন্দিরচূড়া
মহাকাশ জুড়ে উঠবে ঝলমলিয়ে,
পরিচিত যত স্তবের মন্ত্র, মনে হবে অপপাঠ।
সেখানে সুন্দরের
ভিন্ন অভিধা। ভাষা হতে বাঙ্ময়
অভাব্য কোন্ বাণীর জগৎ।
প্রাণের অন্য লীলা।
আর কোনো নাম অঘটন-ঘটনার।
সেখানে অকস্মাৎ
শাশ্বত কোন শক্তি-উৎসে স্নান ক'রে হবে
অমিত শক্তিমান্।

গ্রহতীর্থের যাত্রী !
পার হলে কত অযুত যোজন পথ
চিহ্নিত কর আকাশের মানচিত্রে।
জানো কি তোমরা
দীঘলহাটি যে
আরো কত বেশী দূরে ?

দীঘলহাটির সেই গাছগুলি !
দূর থেকে দেখে মনে হ'ত, যেন গায়ে গায়ে ঘেঁষা।
ভালবাসতাম।
সবচেয়ে উঁচু কদম গাছটা,
বড় হাওড়ের ওপার থেকেও চেনা যেত। তাকে
ভালবাসতাম।
বড় বড় পালে বড় হাওড়ের
ঢেউ ভেঙে চলা বেপারীর নাও,
জেলের উখার।
ভালবাসতাম।
মরা গাঙটার বুকভরা জল
শাপলার ফুলে শাদা হয়ে থাকে।
বিলের জল ত চোখেই পড়ে না,
পানিফল আর পানিফল, কিছু কচুরিপানাও
বেগুনীফুলের সমারোহ নিয়ে।
ভালবাসতাম।
কুমীরে শুশুকে ভরা ধনু নদী,
মাছে ভরা বৌলাই।
টিলার উপরে গায়ে গায়ে ঘেঁষা
খড়-ছাওয়া ঘর নিয়ে পাড়াগুলো।
ভালবাসতাম।
গায়ে গায়ে ঘেঁষা মানুষের মন,
যেই মন নিয়ে
সুতোর মতন সরু ক'রে কাটা
সুপুরির সাথে পান ও খয়ের
পাঠাত আমাকে পূবের পাড়ার
পাটনীর মেয়ে।
এ জীবনে আর দেখব না তাকে,
দেখব না। তাকে
ভালবাসতাম।

দীঘলহাটি যে আজকে ভিন্ন দেশ !
জীবনান্তের ব্যবধানে সেই দেশ,
অগণিত জীবনান্ত।

গ্রহান্তরের ব্যবধানও বুঝি সামান্য তার কাছে!

আকাশ পারের যাত্রী!
গ্রহবাণিজ্যে লাভের পণ্য
শূন্যও যদি হয়,
বিস্তৃততর দিগন্তে শুধু
মরুভূমি আর মেরুহিম দেখে
ফেরো তোমরা,
তাতেও দুঃখ নেই,
যদি ফিরে এস সজল শ্যামল
এই পৃথিবীকে
আর-একটু ভালবেসে।

যদি ফিরে এসে বল,
এই পৃথিবীর হাওয়া,
নিঃশ্বাস নিই যাতে,
বুক ভ'রে নিঃশ্বাস,
আহা রে, বিশ্বে এর মত আর
আছে কি কোথাও কিছু?

হয়ত তখন আণব বোমার বিস্ফোরণের বিষে
এই হাওয়াকে বিষিয়ে তুলবে না।
হয়ত তখন সুরু হবে এক নূতন তীর্থযাত্রা
পৃথিবীরই যত দীঘলহাটির দিকে।

কাশ্মীরী কবি মুজাফর আজিম অবলম্বনে

শ্রীসুনীলকুমার নন্দী

'নিশাত'-এর এই গুলবাগিচায় কতই ঘুরে ঘুরে
তৃপ্ত হ'লে বিচিত্র সব দৃশ্য চোখে মেখে।
কিন্তু অবশ ক্লান্ত দেহে নগ্ন পায়ে তুমি
হেঁটেছ কি মখমলেরই মত নরম ঘাসে?
আনল কোন রহস্য কি পায়ের তলায় ঘাস
স্পর্শে? তুমি নিজেই বোঝ, কেউ পারে না আর
বুঝিয়ে দিতে, এমন কি ওই কথার যাদুকর
যার কিনা চোখ স্বচ্ছ এবং ধারণা নিশ্চিত,
সে-ও পারে না; থাম, থাম, ডুবল বুঝি দিন।
আকাঙ্ক্ষিত রাত্রি এল অভীপ্সিত বধূ—
অঙ্গে তারার চুমকি তোলা কালো আকাশ শাড়ি,
সঙ্গে এল স্নিগ্ধ নিবিড় স্বপ্ন অনুকূল।

রাত্রি নামের ধ্বনি তরঙ্গে আমার হৃদয়ে স্পন্দন রোল
দ্রুত হয়, দ্রুত সুতীব্রতর;
সুপ্তিমগ্ন স্বপ্ন চিন্তা জেগে ওঠে মনে—
কিন্তু দীর্ঘদিনের নিরালা হৃদয় কবে না হারিয়ে ফেলেছে
স্বপ্নের দেশ,
শান্ত প্রকৃতি যে-গান শুনিযে যে-সাড়া তুলত
আমার হৃদয়ে,
সে-সাড়া আজ আর খুঁজে পাই কই!

ঘৃণা লোভ আশা ভয় ও বৈরী ভালবাসা সব
অসংখ্য ছায়া সারা দিনমান আমার হৃদয় ঘিরে থাকে; ওই
কালোছায়া মুছে শান্ত রাত্রি আনে আনন্দ অজানা অপার—
জীবন আবার খুঁজে পায় বুঝি প্রকৃত অর্থ।

ওই ত রাত্রি বিস্তার করে চিন্তা, ঈগল পাখনার মত—
যে-দুঃখ থাকে মনের অতলে
তাকে তুলে আনে, ছিঁড়ে ফেলে যত অবগুণ্ঠন
অলীক চিন্তা, জাগর চক্ষু খুঁজে পায় পথ।

জ্যোৎস্না রাত্রি প্রেমিক হৃদয়ে আনে সুতীব্র জ্বালা
হৃদয় মথিত অতৃপ্ত কামনায়—
ঘুমে ঢুলু ঢুলু নগরী-শিয়রে গলিত চাঁদের আলো,
প্রেমিক হৃদয় অঞ্জলি দেয় প্রেমে।

হরতন

শ্রীবিমল মিত্র

৪

অন্ধকার পথ। আর কর্ত্তামশাই-এরও চোখের দৃষ্টি আগেকার মতন নেই। বাড়ি যাবার পথে কর্ত্তামশাই আর থাকতে পারলেন না। বললেন, এর মধ্যেই তুমি সব ভুলে গেলে ?

নিবারণও ত বুড়ো হয়েছে। তারও ত স্মরণশক্তি কমে আসতে পারে, চোখের দৃষ্টিও ক্ষীণ হতে পারে। কিন্তু কর্ত্তামশাই যেন তা আর মানতে চান না। সেই তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে যেমন কাজকর্ম্ম করবার ক্ষমতা ছিল, এখন কি ক'রে সে-ক্ষমতা থাকবে ? এই যে এতগুলো বছর মাথার ওপর দিয়ে গেল, চেহারায় তার ছাপ রেখে যাবে না ? নিবারণের চোখের ওপর দিয়েই ত ভট্টাচার্য্যি-বাড়ীর ঐশ্বর্য্যের ইঁট একটা একটা ক'রে খ'সে পড়ল। তারই চোখের ওপর দিয়েই ত কর্ত্তামশাই-এর অহঙ্কার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল ! অথচ ওই দুলাল সা, ওই নিতাই বসাক একদিন নিবারণকে দেখেই খাতির করত।

কর্ত্তামশাই অন্ধকারে হোঁচট খাবেন ব'লে নিবারণ হাতটা ধরতে গেল।

কর্ত্তামশাই হাতটা টেনে ছাড়িয়ে নিলেন। বললেন, ছাড়ো, হাত ধরতে হবে না—

—আজ্ঞে এইখানটায় একটা গর্ত্ত আছে।

—থাক্ গর্ত্ত, আমি তোমার মত কানা নই।

তারপর যেন নিজের মনেই গজ্-গজ্ করতে লাগলেন, আমারও হয়েছে জ্বালা, কপালের গেরো, নইলে এমন সর্ব্বনাশ হবে কেন ? এমন জানলে আমি ত নিজেই শ্মশানে যেতাম। তোমাদের ওপর ভার দিয়ে এই ত সর্ব্বনাশ হ'ল। এখন কি করি ? এখন যে মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে আমার !

নিবারণের নিজেকেই যেন অপরাধী করতে ইচ্ছে হ'ল !

বললে, আমার যেন মনে হচ্ছে আমি শ্মশানে গিয়েছিলাম। আমিই ত ছোটবাবুকে ডেকে আনলাম।

—তা সেই কথাটা তখন সাধু-বাবার সামনে বলতে পারলে না ? তখন ত তোমার মুখ বোবা হয়ে গেল !

—আজ্ঞে আমি ত ভাবছিলাম সেই কথাই বলব ! কিন্তু আমি বোধ হয় সৎকারের সময় ছিলাম না। ছোটবাবু আমাকে বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলে। বললে, তুমি ফিরে যাও সরকার-কাকা, তুমি বাবাকে দেখ গিয়ে একবার—

কর্ত্তামশাই উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছিলেন। বললেন, তা হ'লে তুমি শেষ পর্য্যন্ত থাক নি ?

—আজ্ঞে থাকব কি ক'রে ? ছোটবাবু অমন ক'রে বললে, আর আপনার শরীরটাও তেমন ভাল ছিল না।

—রাখ তোমার শরীরের কথা। শরীরের আমার কি হয়েছে শুনি ? আজ হরতন বেঁচে থাকলে আমার শরীরের এমন দশা হ'ত ! না দুলাল সা'ই এই রকম করে আমার চোখের সামনে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে উঠত ?

নিবারণ বললে, আমি কি এমন হবে জানতাম কর্ত্তামশাই ? জানলে কি আর মরতে চ'লে আসি ?

কর্ত্তামশাই থামিয়ে দিলেন। বললেন, থাম, তোমায় আর মড়াকান্না কাঁদতে হবে না ? তার'পর কি হ'ল বল ?

—আজ্ঞে, তার পর আর কি হবে ? আমি চ'লে এলাম।

—তার পর ?

—তার পর এসে দেখলাম আপনি অজ্ঞান-অচৈতন্ত হয়ে প'ড়ে আছেন, আমি ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনলাম শ্রীনাথপুর থেকে।

কর্ত্তামশাই এবার ক্ষেপে গেলেন। বললেন, আমার কথা তোমায় কে জিজ্ঞেস করেছে ? বলি, সিধু কখন ফিরে এল ? সিধু ফিরে এসে তোমায় কিছু বলেছিল ?

নিবারণ তখন আকাশ-পাতাল করছে। অত দিনের কথা কেমন ক'রে মনে থাকবে তার ? সেই পনেরো-ষোল বছর আগেকার ঘটনা। তখন এই কেষ্টগঞ্জই এ-রকম ছিল না। দুলাল সা আর নিতাই বসাক তখন সবে হরিসভার চাঁদার খাতা নিয়ে এর-ওর কাছে ঘোরাঘুরি করছে। আর তাদের সঙ্গে জুটে গিয়েছিল ছোটবাবু। কর্ত্তামশাই-এর নাতনী তখন হেসে-খেলে বেড়ায়।

হরতন-অন্ত প্রাণ কর্ত্তামশাই-এর। কর্ত্তামশাই বৈঠকখানা ঘরে ব'সে থাকেন। লোকজনের সঙ্গে দেখা করেন। কথাও বলেন তাদের সঙ্গে। দেশের হাল-চাল নিয়ে সবাই পরামর্শও নেয় তাঁর কাছে। তখন কর্ত্তা-মশাই-এর পরামর্শ না নিয়ে কেষ্টগঞ্জের কোনও কাজই হ'ত না বলতে গেলে। ইংরিজী খবরের কাগজই হোক্ আর বাংলা কাগজই হোক্, সবগুলোই এসে জড় হ'ত তাঁর বৈঠকখানায়।

খবরের কাগজ শুনতে শুনতে কর্ত্তামশাই বলতেন, ওইখানটা আর একবার পড় ত ভানু ?

ভানু কলকাতা থেকে লেখাপড়া শিখে গরমের ছুটিতে আসত দেশে। দেশে এলেই খবরের কাগজের লোভে কর্ত্তামশাই-এর বৈঠকখানায় এসে বসত। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবর প'ড়ে শোনাত সবাইকে। ইংরিজী সবাই বুঝত না। ভানুই ইংরিজীর মানে বুঝিয়ে দিত।

—ওইখানটা আর একবার পড় ত ভানু, কথাটা যেন ভাল মনে হচ্ছে হে !

ভানু পড়তে লাগল, জেনারেল অকিন্‌লেক্ বলেছে :

"All political matters will be in the hands of the new War Member under whom I shall serve, just as the Commanders in Britain serve under Civil Ministers."

কর্ত্তামশাই বললেন, ভাল কথা। তা হ'লে তোমার কি মনে হয় ভানু, ইংরেজ বেটারা তা হ'লে সত্যি-সত্যিই দেশ ছেড়ে চ'লে যাবে মনে কর ?

ভানু বললে, আজ্ঞে কর্ত্তামশাই, তাই ত মনে হচ্ছে ! ক্যাবিনেট্ মিশন ত ওই জন্যেই এসেছে। আর গান্ধীও ত তাই বলছেন।

গান্ধীর নাম শুনেই কর্ত্তামশাই ক্ষেপে গেলেন একেবারে। বললেন, আরে রাখ তুমি গান্ধীর কথা ! ওর কথা আর ব'লো না ! ওর কথা আমি বিশ্বাস করি না।

ভানু বলত—আজ্ঞে, গান্ধী ত কিছু অন্যায় বলেন নি।

—অন্যায় বলে নি মানে ?

রেগে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠতেন কর্ত্তামশাই। গান্ধীর প্রশংসা শুনলেই ক্ষেপে যেতেন। ঘরসুদ্ধ লোক জানত কর্ত্তামশাই গান্ধীর নাম সহ্য করতে পারতেন না।

কর্ত্তামশাই বলতেন, চরকা কাটতে কে বললে শুনি ?

সবাই বলত—আজ্ঞে গান্ধী !

—আর বোম্বাইতে কে কাপড়ের কল খুলল শুনি ?

এবার সবাই বিপদে পড়ত। এ ওর মুখের দিকে চাইত ফ্যালফ্যাল ক'রে।

কর্ত্তামশাই বলতেন, বাঙালীদের বললে চরকা কাটতে আর বোম্বাইতে গুজরাটীদের গিয়ে গান্ধী বললে কাপড়ের কল খুলতে ! এতেও তুমি সাঁচ্চা লোক বলবে গান্ধীকে ?

গান্ধী কবে কোথায় চরকা কাটতে বলেছেন বাঙালীদের, আর কবে কোথায় গুজরাটীদের কাপড়ের কল খুলতে বলেছেন, তা কেউ মনে করতে পারলে না।

কর্ত্তামশাই সকলের মুখের দিকে চাইতেন, বলতেন—কই হে, বছিরুদ্দি শেখ্, তুমি কিছু বলছ না যে ?

বছিরুদ্দি শেখ্ কর্ত্তামশাই-এরই পুরাণো প্রজা। বলত—আজ্ঞে, কর্ত্তামশাই আপনি যখন বলছেন তখন কি আর মিথ্যে বলছেন ?

কর্ত্তামশাই বলতেন—তা বাপু, তোমাদের জিন্না সাহেবও লোক ভাল নয়, এও ব'লে দিচ্ছি—

—আজ্ঞে তা ত নয়ই—

কর্ত্তামশাই বলতেন—ও আমাদের গান্ধীটাও লোক ভাল নয়, তোমাদের জিন্নাটাও লোক ভাল নয়, সব বেটা পাজির পা-ঝাড়া !

তার পর সকলের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করতেন—কি, তোমরা সব কথা বলছ না যে ? ঠিক বলি নি ?

সবাই বলত—আজ্ঞে কর্ত্তামশাই, আপনি ঠিকই বলেছেন—

কর্ত্তামশাই বলতেন—আসলে ভাল লোকই আজকাল কমে আসছে সংসারে। দেখছ না, যত ভাল-ভাল লোক-গুলো সব একে একে পট্ পট্ ক'রে ম'রে যাচ্ছে !

তার পর বলতেন—এই দেখ না, সুভাষ বোসটা ভাল লোক ছিল, পট্ করে মরে গেল !

ব'লেই ভানুর দিকে চেয়ে বলতেন—পড় হে, তুমি থামলে কেন ? তার পর আর কি খবর আছে পড় না—

ভানু পড়তে লাগল। বললে—পণ্ডিত জহরলাল নেহরু একটা ষ্টেট্‌মেণ্ট্ দিয়েছেন, পড়ব ?

—ওই আর একটা খারাপ লোক। বুঝলে হে ! বড্ড কথা বলে। আরে বাপু, যারা কাজের লোক তারা কি এত কথা বলে ? কাজের নামে অষ্টরম্ভা, কেবল কথার জাহাজ ! ওর বাবা লোকটা ভাল ছিল। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর নাম শুনেছ দ্বিজপদ ? দ্বিজপদ যে একেবারে কথাই বলে না, কি হ'ল হে তোমার দ্বিজপদ ?

বিভূপদ বললে—আজ্ঞে কর্তামশাই, আমি ত শুনছি—

—তা শুনছ কি না আমি বুঝব কি ক'রে? একটু মাঝে মাঝে 'হুঁ' দেবে ত?

এমনি ক'রেই বৈঠকখানা গুলজার হয়ে থাকত সারাদিন! কর্তামশাই সকলকে নিয়ে আসর জমাতেন। সেই ভানু। কলকাতায় পড়ত। শহরের খবরাখবর রাখত আর এখানে এসে কর্তামশাইকে খবরগুলো শোনাত। ভানুকে দেখলেই কর্তামশাই বলতেন—কি গো ভানু, কলকাতার খবর কি বল?

ভানু বলত—আজ্ঞে খবর আর কি বলব, শুনছি নাকি ক্যাবিনেট মিশন আসছে ইণ্ডিয়ায়—

—তার মানে?

কর্তামশাই ক্যাবিনেট মিশন কথাটার মানে বুঝতে পারতেন না।

ভানু বলত—আজ্ঞে তারা আসছে ইণ্ডিয়াকে স্বরাজ দেওয়ার জন্যে। এবার জহরলাল নেহরুকেই বোধ হয় ভাইসরয় করে দেবে।

—য়্যা? বল কি? কর্তামশাই চমকে উঠলেন।

—আজ্ঞে কলকাতায় সেই রকমই ত শুনে এলাম।

কর্তামশাই হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। একটা তাচ্ছিল্যের হাসি। বললেন—দেশে আর ভাইসরয় করবার লোক পেলে না? তা হঠাৎ ইণ্ডিয়ার ওপর এত দরদ কেন হ'ল ইংরেজ বেটাদের?

দুলাল সা, নিতাই বসাকও তখন এসে বসত আসরে। তখন তাদের অত প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা হয় নি।

কর্তামশাই বলতেন—কি গো, তোমরা কথা বলছ না যে? আমি অন্যায় কিছু বলেছি?

দুলাল সা বরাবরই বিনয়ের অবতার, দুটো হাত জোড় ক'রে বলত—আজ্ঞে, আপনি ত ন্যায্য কথাই বলেন বরাবর—

কর্তামশাই বলতেন—তা তোমরা সেটা আমার দোষই বল, আর গুণই বল, আমি অন্যায্য কথা বলতে পারি নে! আমি খাঁটি কথার মানুষ! তা তার পর? তার পর পড় ভানু—তুমি চুপ করলে কেন? প'ড়ে যাও—

হঠাৎ ভেতর থেকে নাতনীর কান্নার শব্দ আসতেই কর্তামশাই অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন—হরতন কাঁদে না?

তার পর নিবারণকে ডাকলেন—নিবারণ, দেখ ত হরতন কাঁদে কেন?

নিবারণ তাড়াতাড়ি ভেতরে গিয়ে হরতনকে নিয়ে এল কোলে ক'রে।

—দাও দাও, আমার কোলে দাও—ব'লে কর্তামশাই হাত বাড়ালেন।

কর্তামশাইয়ের কোলে উঠেই হরতন একেবারে চুপ। আহা, কি রূপই ছিল মেয়েটার! তখনও কর্তামশাইয়ের বেশ বয়েস। সেই বয়েসেই কর্তামশাই নাতনীকে একেবারে কোলে তুলে জড়িয়ে ধরলেন বললেন—কে মেরেছে মা? কে বকেছে তোমাকে?

ব'লে সেই আসরের মধ্যেই নাতনীকে আদর করতে লাগলেন।

হরতন তখন কর্তামশাই-এর গড়গড়ার নলটা ধ'রে টানাটানি সুরু ক'রে দিয়েছে।

কর্তামশাই দেখে অবাক্ হয়ে গেছেন, বললেন—দেখছ ভানু, সিধুর মেয়ে কি রকম চালাক হয়ে গিয়েছে—

ভানু বললে—আজ্ঞে বড় হলে খুব বুদ্ধি হবে হরতনের—

দুলাল সা বললে—আহা, ভারি চমৎকার নামটি রেখেছেন কর্তামশাই—

বছিরুদ্দি শেখ বললে—আল্লাতালার দোয়া কি সবাই পায় কর্তামশাই?

নিতাই বসাক বললে—এর কলকাতায় বিয়ে দেবেন কর্তামশাই—কলকাতায় আজকাল ভাল ভাল সব পাত্র বেরোচ্ছে—বি. এ., এম. এ. পাশ দেখে নাত-জামাই করবেন আপনি—

কর্তামশাই তখন হরতনের মুখের দিকে চেয়ে বলছেন—কি রে, শুনছিস? নিতাই বসাক কি বলছে?

তার পর নিতাই বসাকের দিকে ফিরে বললেন—বুঝলে নিতাই, নিজের বাপের কাছে এ বেটি থাকবে না, রাত্তিরে ঘুমোতে ঘুমোতে কেঁদে ওঠে, তখন বলে দাদুর কাছে যাব। শেষে আমার কোলের কাছে শুয়ে চুপ!

ভানু বললে—তাই ত বলছিলাম কর্তামশাই, খুব বুদ্ধি হবে ওর—

কর্তামশাই বললেন—আসলে হয়েছে কি জান, আমার মা এ জন্মে এই নাতনী হয়ে বউমার পেটে এসেছে। এই মুখখানা দেখ আর ওই আমার মায়ের ফোটোখানা দেখ, ঠিক একরকম মুখ নয়?

সবাই চেয়ে দেখলে। ভানু দেখলে, বছিরুদ্দি শেখ দেখলে, নিতাই বসাক, দুলাল সা', সবাই চেয়ে দেখলে।

দুলাল সা বললে—অবাক্ কাণ্ড ত!

কর্ত্তামশাই বললেন—বললে তোমরা বিশ্বাস করবে না দুলাল, যেদিন বৌমার ব্যথা উঠল, আমি কিচ্ছু জানি নে, আমি অঘোরে ঘুমোচ্ছি, হঠাৎ মনে হ'ল মা যেন আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন—কীর্ত্তি, আমি এলাম—আর 'এলাম' বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেছে—

এ গল্পও অনেকবার সবাই শুনেছে। কতবার কথা-প্রসঙ্গে কর্ত্তামশাই এ সব গল্প বলেছেন। তখন বক্তা হলেন একমাত্র কীর্ত্তীশ্বর আর শ্রোতা ছিল কেষ্টগঞ্জের সব গ্রামের লোক। তারা নিয়ম ক'রে সবাই আসত যেত, তার পর এক সময়ে কর্ত্তামশাই হরতনকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়াতেন।

বলতেন—এবার উঠি হে, হরতন আবার আমি সঙ্গে না খেলে ভাত খাবে না—

শুধু এক সঙ্গে খাওয়াই নয়, এক সঙ্গে শোওয়া, এক সঙ্গে বসা, গল্প করা, সবই কর্ত্তাশাইয়ের হরতনের সঙ্গে। শেষকালে এমন হ'ল, হরতন আর বাপ-মা'র কাছে যায়ই না, কর্ত্তামশাইয়ের কাছেই থাকত দিনরাত। বড় গিন্নী হরতনকে বিছানায় নিয়ে এসে শুইয়ে না-দেওয়া পর্য্যন্ত কর্ত্তামশাইও ছটফট্ করতেন।

তা এসব সেই পনর বছর আগেকার ঘটনা।

এতদিন পরে অন্ধকার রাস্তায় চলতে চলতে দু'জনেরই যেন সেই পনর বছর আগেকার ঘটনাগুলো মনে পড়তে লাগল। পনর বছর আগে হ'লে কি কর্ত্তামশাই এমনি ক'রে এত রাত্রে দুলাল সা'র বাড়ীতে অযাচিত হয়ে যেতেন! এই পনর বছরে কত কি বদ্‌লে গেল। দুলাল সা' উঠল, কর্ত্তামশাই নামলেন। নিবারণের মনে হ'ল কর্ত্তামশাইয়ের হাতটা যেন থর্ থর্ ক'রে কাঁপছে। নিবারণ আরও জোরে হাতটা চেপে ধরলে। বললে, এখানটা একটু আস্তে, নর্দ্দমা আছে—

কর্ত্তামশাই কিছু কথা বললেন না এবার। নিবারণের হাতে নিজের হাতটা ছেড়ে দিয়ে অবশ হয়ে চলতে লাগলেন।

অথচ আজ সিধু থাকলে কি তাঁকে এই অবস্থায় পড়তে হ'ত! সিদ্ধেশ্বরটাই বা কোথায় গেল।

কর্ত্তামশাই ডাকলেন, নিবারণ!

নিবারণ বললে, আজ্ঞে —

—তোমার কি রকম মনে হ'ল?

নিবারণ হঠাৎ কথাটার মানে বুঝতে পারলে না। বললে, কার কথা বলছেন?

—আবার কার কথা? ওই সাধুর। ও কি সত্যি মনে কর তুমি, না সব বুজরুকী!

নিবারণ আমৃতা আমৃতা ক'রে বললে, আজ্ঞে, আমি ত ঠিক বুঝতে পারলাম না—

কর্ত্তামশাই বললেন, ও-সব কাক-চরিত্র, আমার ত মনে হয় স্রেফ কাক-চরিত্র! আমার অবস্থা ত বুঝতে পেরেছে। দেখতে পাচ্ছে ত আমার বয়েস হয়েছে, তাই একটু ফষ্টি-নষ্টি করলে আর কি!

নিবারণ বললে, আজ্ঞে, ফষ্টি-নষ্টি কেন বলছেন? চেহারা দেখে ত মনে হ'ল মুখে বেশ পবিত্র ভাব—

কর্ত্তামশাই বললেন, তা তুমি তাকে সৎকার ক'রে এলে, তার পর এখন বেঁচে থাকে কি ক'রে শুনি?

নিবারণ কিছু উত্তর দিতে পারলে না এ-কথার।

—আর তা ছাড়া বেঁচে যদি থাকেই ত এতদিন পরে ত আর তাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়!

খানিকক্ষণ দু'জনের মুখেই আর কোনও কথা বেরোল না। ঘটনার সাক্ষী যদি কেউ থাকে ত সে সিদ্ধেশ্বর, আর সিদ্ধেশ্বরই যে বেঁচে আছে তারই বা ঠিক কি! অত বড় জোয়ান ছেলে, বি-এ পাশ ক'রে বামুনের ঘরে অমন আহাম্মক ছেলে কেন জন্মালো কে জানে! বউকে বাপের ঘাড়ে ফেলে রেখে চ'লে যেতে হয়!

ততক্ষণে বাড়ীর কাছাকাছি এসে গেছেন।

সামনের কাল-কাসুন্দির ঝোপ পেরিয়ে পোড়ো উঠোন। তরে পরেই চক্‌মিলান রাজবাড়ী। রাত অনেক হয়েছে। দুলাল সা'র বাড়ীর মত এ-বাড়ীতে ইলেকট্রিক লাইট নেই। দেখে-শুনে হাঁটতে হয়। এক-কালে হাতী থাকত এখানে। দু'টো বড় বড় হাতী। সে হাতী দেখেন নি কর্ত্তামশাই, শুধু শুনেছেন বাবার কাছে। আর শুধু হাতী নয়। গরু, মোষ, ঘোড়া, ময়ূর এইখানে ঘুরে বেড়াত। আজ অন্ধকার চারদিকে। ভট্টাচায্যি বাড়ীর ঐশ্বর্য্যের অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তামশাইয়ের নাতনীও কোথায় অন্তর্দ্ধান করল। শেষ ছিল বৌমা। সেই বৌমাও আর আজ নেই। বৌমা থাকলেও না হয় কথাটা তাকে গিয়ে বলা যেত!

সামনেই সিঁড়ি।

নিবারণ সাবধান ক'রে দিলে।

—এইখানটায় সিঁড়ি, সাবধানে উঠবেন!

দরদালান পেরিয়ে বৈঠকখানা। বৈঠকখানার ভেতরে তখনও নিবারণের তক্তপোশের উপর মশারিটা টাঙানো রয়েছে। তার পাশ দিয়ে সন্তর্পণে কর্ত্তামশাইয়ের হাতটা ধ'রে দোতলার সিঁড়ির কাছে এগিয়ে নিয়ে গেল নিবারণ।

তার পর কর্তামশাইয়ের পেছন পেছন ওপরে উঠতে লাগল।

কর্তামশাই বললেন, তুমি আবার উঠছ কেন? তুমি যাও শোও গে যাও, রাত অনেক হয়েছে, আমার চোখ আছে, আমি একলাই যেতে পারব—

ব'লে একলাই পায়ে পায়ে ওপরে উঠতে লাগলেন কর্তামশাই। কিন্তু সিঁড়ির বাঁকের কাছে গিয়ে হঠাৎ ডাকলেন।

—শোন নিবারণ!

নিবারণ দাঁড়িয়েই ছিল। বললে, বলুন—

—ও সাধু ভোরবেলাই চ'লে যাবে, না?

নিবারণ বললে, আজ্ঞে, সেই রকমই ত কথা!

হাতে কর্তমশাইয়ের সেই কোষ্ঠীর বাণ্ডিলটা তখন ধরা রয়েছে। সেটা হাতে নিয়ে কি যেন ভাবলেন খানিক। তার পর সেখানে সেইভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বললেন, কোষ্ঠী পড়তে জানে এমন কেউ কেষ্টগঞ্জে আছে তোমার জানা? মানে বেশ পণ্ডিত হওয়া চাই! ওপর ওপর জানলে চলবে না। তেমন আছে কেউ?

নিবারণ বললে, কেষ্টগঞ্জে তেমন ত কেউ নেই—

—তবে কোথায় আছে?

নিবারণ বললে, আজ্ঞে কাশীতে কেউ থাকতে পারে!

—কাশীতে আছে সে ত সবাই জানে! কিন্তু কাশীতে এখন যাচ্ছে কে? তোমার যেমন কথা! লঙ্কায় সোনা সস্তা ব'লে ত আর···

কথাটা আর তিনি শেষ করলেন না। যেমন উঠছিলেন তেমনি উঠতে লাগলেন আপন মনে।

বড়গিন্নী তখনও জেগে। কর্তামশাই ঘরে ঢুকলেন। তখন বড়গিন্নী কিছু বললে না। কর্তামশাই আস্তে আস্তে পাশের ঘরের দরজা খুলে ভেতরে গেলেন। সিন্দুকটা কোণের দিকে ছিল। অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে সেখানে গেলেন। তার পর অতি কষ্টে লোহার ভারি ডালাটা প্রাণপণে খুলে কোষ্ঠীর বাণ্ডিলটা ভেতরে ফেলে দিলেন। আর তার পর ডালাটা আবার আগের মত বন্ধ ক'রে নিজের ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লেন এতখানি পরিশ্রমের পর হাঁফিয়ে গিয়েছিলেন। বুকের ভেতরে যেন দমটা আট্‌কে আসছিল।

—তেলটা বুকে মালিশ ক'রে দেব?

কর্তামশাই বুঝতে পেরেছিলেন, বড়গিন্নী তখনও ঘুমোয় নি। কর্তামশাই না-ঘুমোলে বড়গিন্নী ঘুমোতে পারে না, এটা তাঁর জানা ছিল।

বললেন—থাক্, গোড়া কেটে আগায় জল দিতে হবে না—

এ-সব কথায় বড়গিন্নী কখনও রাগ করে না। আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে কুলুঙ্গী থেকে তেলের বাটিটা নিয়ে এল। তার পর কর্তামশাই-এর বুকে মালিশ করতে লাগল।

দুলাল সা'র বাড়িতে আগের দিন অনেক রাত পর্য্যন্ত উৎসব গেছে। কর্তামশাই আর নিবারণ যখন চ'লে গেছে তখন দুলাল সা'র জাপানী ঘড়িতে রাত বারোটা বেজে গেছে। অত রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে নাম-মাত্র একটু বিশ্রাম করেছে সবাই। তার পরই ভোর চারটে বাজতে-না-বাজতে আবার উঠেছে। ভোর বেলাই যাত্রা।

কেষ্টগঞ্জের লোক তখন সবাই ঘুমিয়ে। আগের দিন দশখানা গ্রামের লোক এসে পাত পেতে খেয়ে গেছে। তার পর আর অত ভোরে ওঠবার ক্ষমতাই ছিল না কারো, যারা চালানী-কারবারের ব্যাপারী তারাও যে-যার নৌকোয় গিয়ে সটান শুয়ে প'ড়ে নাক ডাকিয়েছে, কখন দুলাল সা'র নৌকো লেগেছে ঘাটে, কখন গুরু-দেবকে নৌকোয় তুলে দিয়েছে দুলাল সা, তা কেউ-ই টের পায় নি। কেষ্টগঞ্জ থেকে গুরুদেবকে নিয়ে নৌকো সোজা যাবে গঙ্গার মোহানায়। সেখান থেকে গুরুদেব নিজের খুশিমত যেখানে ইচ্ছে চ'লে যাবেন। তার পর নৌকো ফিরে আসবে আবার কেষ্টগঞ্জে। সঙ্গে গেছে দুলাল সা'র নিজের কাছারির লোক। তার হাতে হাজার টাকা দেওয়া আছে। যেখানে যেমন দরকার হবে, খরচা করতে পেছপা করবে না। দুলাল সা', নিতাই বসাক, এমন কি নতুন-বৌ পর্য্যন্ত ঘাটে এসে গুরুদেবের পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকিয়েছে। তার পর যথা-সময়ে নৌকো ছেড়ে দিয়েছে।

তার পর দুলাল সা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘাটের কাজ সুরু ক'রে দিয়েছে। গোবিন্দ বালতি-তেল-গামছা নিয়ে হাজির ছিল। দুলাল সা সারা ঘাট ঝাঁটা দিয়ে নিজের হাতে ঝাঁট দিয়েছে। তেল মেখেছে। স্নান করেছে। তখন পুব দিকের আকাশটা একটু একটু ফুন-ফরসা হতে সুরু করেছে।

—কে গো, মুকুন্দ নাকি?

মুকুন্দ পাল সবে ঘুম থেকে উঠে গাড়ু নিয়ে মাঠের দিকে যাচ্ছিল। দুলাল সা'কে দেখেই প্রাতঃপ্রণাম করলে। বললে—এ কি সা-মশাই, আজকেও বাদ দেন্ নি? আজকেও এত ভোরে উঠেছেন?

দুলাল সা হাসতে লাগল মিটি-মিটি।

—এটা তুমি কি কথা বললে মুকুন্দ? তুমি বিবেচক লোক ব'লে জানতাম!

—আজ্ঞে, কাল অত রাত অবধি উপোস কাটিয়েছেন, তাই বলছিলাম!

দুলাল সা হাসতে হাসতে বললে—তা ভাত খেতে ত ভুলে যাই নে মুকুন্দ, আর মা-গঙ্গাকে স্মরণ করতেই ভুলে যাব?

—আজ্ঞে, আপনি পুণ্যাত্মা লোক! আপনার মত ভক্তি যদি পেতাম!

দুলাল সা বললে—পাবে, মুকুন্দ পাবে। এ আর এমন কিছু হাতী-ঘোড়া নয়! চেষ্টা করলেই পাবে।

—চেষ্টা ত করি সা-মশাই। কিন্তু আমরা পাপী লোক, আমাদের আর কত হবে?

দুলাল সা বললে—কেন হবে না মুকুন্দ? হবে না ব'লে কোনও কথা আছে দুনিয়ায়? একটু লোভ কমাও দিকি নি! লোভ জিনিসটা বড় নচ্ছার—

মুকুন্দ বললে—আজ্ঞে লোভ ত করি না—

—তা লোভ যদি না কর ত আবার বাড়ী করতে যাচ্ছ কেন? বাড়ীর লোভ কেন তোমার? টিনের বাড়ীতে তোমার শানাচ্ছে না? এই আমার দিকে চেয়ে দেখ না, আমার লোভ ব'লে কোনও জিনিষ দেখেছ? আমার যা কিছু আছে সব ত ঝেড়ে-ফেলে সন্নিসী হয়ে যেতে ইচ্ছে করে! অত বড় বাড়ী করেছি, কিন্তু শান্তি পেয়েছি? অত টাকা করেছি, তাতে শান্তি পেয়েছি? নইলে নিজের হাতে ঝাঁটা নিয়ে এই ঘাট ধুই?

কি কথায় কি কথা এসে গেল। মুকুন্দ তখন আর পালাবার পথ পায় না। তাড়াতাড়ি যেতে যেতে বললে—আমি তা হ'লে আসি সা-মশাই এখন—

ব'লে হন্ হন্ করে ফাঁকা মাঠের দিকে চ'লে গেল।

বাড়ীতে ঢুকতেই দেখে কাছারি-ঘরে নিবারণ ব'সে আছে বেঞ্চির ওপর।

—কি নিবারণ, এত ভোরে? কি সংবাদ?

অত ভোরেই নিবারণকে দেখে দুলাল সা মিটি-মিটি হাসতে লাগল।

নিবারণ বললে—আজ্ঞে কর্ত্তামশাই ভোরবেলাই পাঠিয়ে দিলেন। গুরুদেব কি চ'লে গেছেন?

তখনও গত রাত্রের উৎসবের টুকরো-টাকরা চিহ্ন ছড়ান রয়েছে আশে-পাশে। দুলাল সা'র পোষা ছাগল ফুলের পাপড়িগুলো খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। বাড়ীর চাকর উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে। কাছারি-ঘরের ভেতরে তখনও রাত্রের বিছানা এলোমেলো প'ড়ে আছে। গুটিয়ে তোলা হয় নি।

নিবারণ আবার বললে—কাল সারারাত কর্ত্তামশাই ঘুমোন নি!

দুলাল সা বললে—আহা, বুড়ো বয়েসে কি দুর্ভোগ দেখ ত! তাই ত বলি, তোমার কর্ত্তামশাইকে একটু লোভ ত্যাগ করতে বল ত—দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে!

— আজ্ঞে লোভ ত তেমন কিছু নেই!

দুলাল সা বললে—লোভ নেই? তা হ'লে পেঁপুল-বেড়ের বাঁওড়টা আমাকে বেচে দিতে বুক এত ফেটে যাচ্ছে কেন তোমার কর্ত্তামশাই-এর?

নিবারণ এর উত্তরে কি বলবে বুঝতে পারলে না।

—এত লোভ ভাল নয়, বুঝলে নিবারণ। তোমার কর্ত্তামশাই-এর অনেক বয়েস হ'ল, এখন একটু ধর্ম্মকর্ম্ম করতে পরামর্শ দিও। এই আমাকেই দেখ না, আমায় তুমি কখনও লোভ করতে দেখেছ? লোভ যে কি বস্তু তা এ-জন্মে জানলাম না। তাই কত শান্তিতে আছি দেখ। তোমার কর্ত্তামশাই কি দিয়ে ভাত খাচ্ছে তা জানবার জন্যে আমার কখনও মাথা-ব্যথা হয় নি নিবারণ—আর এখন ত দীক্ষা নিয়ে সন্নিসী হয়ে গেলাম!

তার পর একটু থেমে বললে—তা যাকগে, গুরুদেবের সঙ্গে কর্ত্তামশাই-এর কিসের দরকার ছিল?

নিবারণ হয়ত জবাব দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ নতুন-বৌ ভেতর-বাড়ী থেকে বাইরে এসে পড়তেই দু'জনে সেই দিকে তাকিয়ে চুপ হয়ে গেল।

নতুন-বৌ নিবারণকে দেখে নিয়ে বললে—বাবা, আপনার আহ্নিকের জায়গা করে দিয়েছি উঠুন—গল্প পরে হবে। উঠুন—

ক্রমশঃ

—

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

বর্ষামঙ্গল

শ্রীঅমর দাসগুপ্ত

(প্রবাসী ১৩৪০ আষাঢ় হইতে পুনর্মুদ্রিত

রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি চিঠি

শ্রীমতী হেমবালা সেনকে লেখা

ওঁ পিনাঙ

কল্যাণীয়াসু

হেমবালা, আজ বিজয়া দশমী, তোমাদের সকলকে স্মরণ করচি। যদিও আজ আশ্রম শূন্য তবু আশ্রমের সকল মেয়েকে মনে মনে আমার আশীর্ব্বাদ পাঠালুম। ইতি ১৩৩৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

উৎসবে তুমি আমাদের কাছে আসবে শুনে মনে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছিলুম। তোমার সম্বন্ধে আমার মনে গভীর একটা বেদনা আছে, তুমি যদি আসতে পারতে তাহলে অনেকটা উপশম হোতো। তোমাকে আমি যথার্থই স্নেহ করি, তুমি আমাদের অত্যন্ত আপন একথা নিঃসংশয় জেনো। আমাদের আশ্রমিক জীবনে বহুদিনের সুখদুঃখের সঙ্গে তুমি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত সে কথা কখনই ভোলবার নয়॥

তুমি আমার সর্ব্বান্তঃকরণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো, খুকু তাতুকেও জানিয়ো। ইতি ৮ই পৌষ ১৩৩৪

স্নেহরত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

হেমবালা, আমাদের আশ্রমে মেয়েদের আসনটিকে আর একবার নূতন যত্নে নির্ম্মল সুন্দর ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করে নেবার ভার তোমাদের উপর দিয়ে গেলুম। নিশ্চয় জেনো, আশ্রমে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ভার মেয়েদের 'পরেই। পুরুষরা শুষ্ক নিয়মকে বড় বলে জানে—স্বভাবতই প্রাণের নিয়মকেই মেয়েরা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে থাকে। এই জন্যই আশ্রমে মেয়েদের স্থানটিকে আমি এত বিশেষ যত্নে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস পেয়েছি। তোমরা আমার প্রত্যাশা পূর্ণ করবার চেষ্টা করবে এই বিশ্বাস মনে নিয়ে আমি বিদায় নিলুম। তোমরা আমার একান্ত মনের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করবে। ইতি ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৩০

শুভাকাঙ্খী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

হেমবালা, এ যাত্রায় দেশে চিঠিপত্র লেখা এক রকম বন্ধ করেচি। গোড়ার দিকে যখন কাজে প্রবৃত্ত হই নি তখন ছবি আঁকতুম যখনি সময় পেয়েচি। ওটা একটা পাগলামি, প্রকৃতিস্থ লোকের সম্পূর্ণ অযোগ্য। ছবিতে যখন পেয়ে বসে তখন ভদ্রতা রক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়ে, কর্ত্তব্যবুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। তার পরে কাজের পালা সুরু হোলো, কথায় কথায় বক্তৃতা, পদে পদে সভা, যেখানে সেখানে লোক-জটলা, সহরে সহরে ঘুরপাক। এরা দৈত্য, পুরুষানুক্রমে গোমেধ যজ্ঞ করে এদের দেহ যা গড়ে উঠেচে তাতে করে আমা-দের মত পাঁচ-দশটা কৃষ্ণের জীবের দেহ-গঠনের মাল-মশলা পেরিয়ে যায়।

তাই এদের নিজেদের মাপে আমার জন্য যে কর্ম্মতালিকা তৈরী করে দেয় সেটা এখানকার আদর্শে অত্যন্ত নরম করে দিলেও আমার পক্ষে প্রবল দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে। আজ দুদিন ধরে এখানকার এক ডাক্তারের হাতে আত্মসমর্পণ

করেচি—সে দেখে শুনে বল্‌চে, দিনে সকালে এক ঘণ্টা বিকেলে এক ঘণ্টা নিদ্রা দাও—দিনের বাকি কয় ঘণ্টার মধ্যে সকালে তিন ঘণ্টা চুপচাপ করে থেকো, দুপুর বেলাটা ঘুমিয়ে কাটিয়ো, বিকেল বেলায় বিরাম, রাত্তির বেলায় নিদ্রা, তাহলে, চাই কি, দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে পারবে। জিজ্ঞাসা করতে সাহস হোলো না, বেঁচে কী করব।

খবর পেলুম, ষষ্ঠবর্গ পর্য্যন্ত সমস্ত পাঠভবন তোমরা কয়জনে দখল করে বসেচ—ভালোই করেচ—কিন্তু তার মানে দুটো বর্গ। তোমাদের জনসংখ্যা যে রকম দেখা যাচ্চে তাতে অন্তত পঞ্চম বর্গ পর্য্যন্ত তোমরা সীমানা বাড়িয়ে নিতে পারো। এদিকে তোমাদের পুরাণো শিক্ষকের তরফ থেকে অনেকটা ফাঁক পড়ে গেছে। এম্‌নি করে বারবার উলট্‌ পালট্‌ করতে করতে ছেলেগুলোর সর্ব্বনাশ হয়। এ সম্বন্ধে চিরকাল আমাদের নাম খারাপ আছে, সে নাম কিছুতে উদ্ধার হোলো না। আশা এসেচে, ভক্তিও যদি আসে তাহলে অনেকটা অভাব পূরণ হবে।

আর দুই-এক দিনের মধ্যে অগষ্ট মাস পড়বে। অর্থাৎ শ্রাবণের মাঝামাঝি। মনে করলে মন খারাপ হয়ে যায়। আমি নেই অথচ আশ্রমে বর্ষাঋতু যথানিয়মে দেখা দিচ্চে, এটা কি করে সম্ভব হয় আমি তো বুঝতে পারি নে। বোধহয় দিনুর উপরে ওর ভরসা। শ্রাবণধারার সঙ্গে সুরের ধারার পাল্লা আশ্রমে ঠিক মত চলেচে তো? এখানে মেঘ-বৃষ্টির অভাব নেই কিন্তু এই ম্লেচ্ছদের দেশে আষাঢ় শ্রাবণ কোথা থেকে পাওয়া যাবে? বৃষ্টি পড়ে কিন্তু হৃদয় আমার ময়ূরের মত নাচে না, ভিজে কাকের মতো পাখার মধ্যে মাথা গুঁজে থাকে। এবারে আমার আয়ু থেকে শরৎ ঋতুটাও কাটা যাবে। তোমাদের বড়ো বড়ো দুটো ছুটি গলাধঃকরণ করেও আমার প্রবাসের পেট ভরবে না। চিঠি তো কতগুলো লিখলুম কিন্তু আজকাল ভারতীয় ডাক-বিভাগের কর্ত্তব্যবুদ্ধি খাঁটি আছে কি না জানি নে।

ক্ষিতিবাবু, কিরণ আমার চিঠি পেয়েছিলেন কি? রথী বৌমা আছেন ইংলণ্ডে, ভালোই আছেন শুনচি।

ইতি
শুভাকাংখী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮ জুলাই ১৯৩০

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

হেমবালা, শরীর খারাপ হয়েচে খবর পেয়েচ। বিশেষ ক্ষতি হয় নি—আরামে আছি শয্যাতলে—ঘোরাঘুরি বকাবকি ডাক্তারের ইঙ্গিতে একেবারে থেমে গেছে। ভিক্ষার কাজ সমানেই চল্‌চে কিন্তু রাজার মত শুয়ে শুয়ে। যাদের কাছ থেকে ভিক্ষা পাবার প্রত্যাশা করি তারাই আসে আমার শয়নালয়ের খাস্‌ দরবারে।

তবু ভিক্ষের কাজ আমার পছন্দসই নয়—এর চেয়ে ডাকাতি ভালো, তাতে পৌরুষ আছে। অতলান্তিক পাড়ি দেবার আগে অনেক দ্বিধা করেছিলুম—শরীরও বিমুখ হয়েছিল—মন ততোধিক। ভিতরে ভিতরে কেবল একটি মাত্র তাগিদ ছিল যার তাড়নায় আমাকে মরিয়া করেছিলো। মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে এই সঙ্কল্প আমাকে রাস্তায় বের করেচে। যদি কিছুমাত্র সিদ্ধি লাভ করি তাহলে দেহের দুঃখ এবং মনের গ্লানি ভুল্‌তে পারব। অনেকদিন অনেকের দ্বারে ঘুরেচি, অনেক অযোগ্য লোকের কাছে মাথা হেঁট করতে হয়েচে, বারে বারেই অকৃতার্থ হয়েচি, আরো একবার যদি সেই দুর্গ্রহ ঘটে তবে এইবার ভিক্ষের ঝুলিতে আগুন লাগিয়ে গঙ্গাস্নান করে জীবনের শেষ খেয়ার জন্যে চুপচাপ বসে অপেক্ষা করব। দেশে আমার স্থান সঙ্কীর্ণ তার প্রমাণ ভারি হয়ে উঠেচে তবুও

নমো নমো নম সুন্দরী মম
জননী বঙ্গভূমি।

কিছুই যদি সংগ্রহ করতে না পারি তবে ক্লান্ত হাড় ক'খানা মিলিয়ে দিয়ে যাব সেই নিষ্ঠুর জননীর

পায়ের ধুলোর সঙ্গে। থাক্ নালিষ থাক্; এবার একটুখানি আশার কথা বলা যাক্ কিন্তু খুব ক্ষীণ গলায়। কেন না নলোপাখ্যানে পড়েচি, কলির চক্রান্তে পোড়া মাছ জলে ঝাঁপিয়ে পড়েচে। আমার দময়ন্তী হলেন বিশ্বভারতী—আমার লজ্জা রক্ষার জন্যে অর্দ্ধেক আঁচলও বাকি রাখবেন কি না সন্দেহ করি। এবারে মনে হচ্চে যেন একটা মাছ প্রায় ডাঙার কাছে তুলেচি—কিন্তু জলচর আবার জলের তলায় ফিরবে কি না—সে কথা কাকে জিজ্ঞাসা করব? কিন্তু কল্পনা করতে দোষ কি যে ঝুলি কিছু পরিমাণ ভর্ত্তি হবে—কেননা এ তো "আমার জন্মভূমি" নয়—এখানে এরা আমাকে কিছু খাতির করে, আমার বিদেশ-ভাগ্যটা ভালোই। কিন্তু ঝুলির কতখানি ভরবে জানি নে। যদি যথেষ্ট দক্ষিণা জোটে তবে আমার দেশের মেয়েদের হাতে আমার শেষ দান দিয়ে যাব, বিদ্যাদান। দেশের মেয়েদের আমি বরাবর ভালোবেসেচি। বোধহয় তাদের কল্যাণেই সরস্বতী আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েচেন—সরস্বতীর সেই প্রসাদের অংশই আমি যদি কোনো অভঙ্গুর পাত্রে মেয়েদের জন্যে রেখে যেতে পারি তবে আমার ভাগ্যদেবতার জয়ধ্বনি করে বিদায় নেব।

নভেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত এদেশে আমার শয়ান অবস্থায় কাটবে। তার পরে সমুদ্র পার হতে হতে পৌষ পার হবে না এই আশা করে আছি। কিন্তু দেশের দুঃখে আমার এই জীর্ণ হৃৎপিণ্ড কদিন টিকবে তাই ভাবি। তবু একথাও ভাবতে হয়, বড়ো দাম না দিয়ে বড়ো ফল পাওয়া যায় না—বড়ো দুঃখের ভিতর দিয়েই সকল দেশ সার্থকতায় পৌঁচেছে। আমাদেরও শেষ কড়া পর্য্যন্ত গুণে দিতে হবে। বুকের পাঁজর বিছিয়ে দেব, ভাগ্যের জয়-রথ তার উপর দিয়ে চলবে।

সেই অতি দুর্গম পথের চেহারা দেখে এসেচি রাশিয়ায়। তাই মনে হচ্চে, এখনো যথেষ্ট হয় নি—যে চিকিৎসক মুমূর্ষু দশা থেকে আমাদের দেশকে বাঁচিয়ে তুলবেন তিনি হচ্চেন সহস্রমারী চিকিৎসক—অনেক মার মেরে মেরে তবে তিনি বাঁচান। সেই জন্যে মার খেয়ে যখন দুঃখ প্রকাশ করি তখন তাতে লজ্জা বোধ হয়। বার বার বলতে হবে, নাঃ, কিছু লাগে নি। এমনি করেই মারকে লজ্জা দিতে হয়। রাশিয়ার বিপ্লবের ইতিহাস পড়ে দেখো।

ইতি ২৮শে অক্টোবর ১৯৩০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আপনিও হয়ত অসাধারণ প্রতিভা নিয়েই জন্মেছিলেন

কিন্তু আপনার যখন বয়স অল্প ছিল তখন সেটা ধরা যায় নি ব'লে আপনি যথোপযুক্ত সুযোগ ও উৎসাহ পান নি, তাই আপনার মধ্যে সেই প্রতিভার স্ফুরণ হয় নি। অল্পবয়সে অসাধারণ প্রতিভাবান্ ব্যক্তিদের অসাধারণত্ব প্রায়শঃই ধরা পড়ে না। রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলায় তাঁর গুরুজনদের একজন এই ধরণের উক্তি ক'রে দুঃখ করেছিলেন যে, 'ভেবেছিলাম বড় হয়ে রবিটা মানুষ হবে, কিন্তু এর আশাই সবচেয়ে বেশী নষ্ট হয়ে গেল।' জগদ্বিখ্যাত দুজন বৈজ্ঞানিক, এডিসন এবং আইনষ্টাইন, ছেলেবেলায় অল্পবুদ্ধি বলে বিবেচিত হতেন।

সময় থাকতে, অর্থাৎ অল্পবয়সেই প্রতিভাবানদের চিনতে পারার কোনো উপায় আছে কি না, যাতে সুযোগ-সুবিধার অভাবে তাদের প্রতিভার অপচয় না ঘটে, জানবার জন্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চলছে কিছুদিন ধ'রে। গত ছ' বৎসরে আমেরিকার একজন মনস্তত্ত্ববিদ, ডাঃ ম্যাকিনন কয়েক শ' অসাধারণ সৃজনীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিয়ে নানাভাবে এই পরীক্ষার কাজ করেছেন। তাঁর মতে সত্যিকারের সৃষ্টি-প্রতিভা যাঁদের আছে, যাঁরা স্বপ্নবিলাসী নন, অর্থাৎ যাঁরা সত্যিকারের কোনো সমস্যার সমাধান নিজেদের মত ক'রে ভাবতে পারেন, এবং তার পর সেই ভাবনাকে বাস্তবতার রূপ দিতে পারেন, তাঁরা অন্যদের থেকে যে একটু স্বতন্ত্র রকমের হন তা ঠিক, কিন্তু তাঁদের এই স্বাতন্ত্র্য নানা অচিন্তনীয় দিক দিয়ে প্রকাশ পায়।

তাঁদের তোখোড় হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। তাঁরা দুর্দান্ত-বুদ্ধির মানুষ হন না, কিন্তু তাঁদের বুদ্ধির মাত্রা বা I.Q -এর গুরুত্বও বেশী কিছু নেই।

স্কুলে তাঁদের ভাল ছাত্র বলে নাম হয় না। আমাদের দেশের সাম্প্রতিক কালের আওয়াজ তোলা ছাত্রদের পক্ষে খুবই একটা আশাপ্রদ কথা। কলেজে গিয়েও, এমনকি যাঁরা পরে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক হয়েছেন তাঁদেরও অনেকে সেকেণ্ড বা থার্ড ডিভিশন নিয়ে বের হয়ে এসেছেন! এঁদের মধ্যে বেশীরভাগ কলকাতার কোনো কলেজে বি-এ, বি-এসসি ক্লাসে ভর্তি হতেই পারতেন না।

এঁদের মধ্যে কৌতূহল বা জিজ্ঞাসুতা জিনিষটা খুব বেশী পরিমাণে থাকে, এবং কেউ একজন বলছে ব'লেই নির্বিচারে কোনো কথাকে মেনে নিতে এঁরা নারাজ। ঠিকমত প্রশ্ন না ক'রেও, ঠিক জবাবটি আদায় ক'রে নিতে এঁরা ওস্তাদ।

যে কাজ নিয়ে এঁরা থাকেন তা সত্যিকারের একটা কাজের মত কাজ এবং একটা বড় কাজ, এ বিষয়ে এঁদের মনে সংশয় কিছু থাকে না। অন্যেরা সে সম্বন্ধে কি ভাবছে, তা নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামান না।

সস্তায় বাজি মাৎ করবার প্রবৃত্তি থাকে না তাঁদের মধ্যে। সাধারণ মানুষ কি ক'রে কাজটি সহজে ক'রে ফেলা যায় তা ভাবে, এঁরা সেই কাজের জটিলতাগুলিকে নিয়েই ভাবতে ভালবাসেন।

এঁরা ঠোঁটচাপা গভীর জলের মাছ হন না। এঁরা চান অন্যরা তাঁদের মনের কথা জানুক, এবং অন্যদের মনের কথাও এঁরা বুঝতে চান, বেশীরভাগ মেয়েদের যেটা স্বভাব, কিন্তু যদি তাঁরা পুরুষ হন, ত অন্য কোনো দিকে মেয়েলী স্বভাবের তাঁরা হন না মোটেই।

এঁদের সকলেরই দৃষ্টি বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যতের দিকে নিবদ্ধ থাকে বেশী।

এখন অবধি পরীক্ষা যতটা এগিয়েছে তার ফলে যা জানা যাচ্ছে তা বলা হ'ল, কিন্তু এই সিদ্ধান্তগুলি যে একেবারে নির্ভুল তা বলবার মত সময় এখনো আসে নি।

টেকো মাথায় চুল

মাঝে মাঝে শোনা যায়, বৈদ্যুতিক সূচের সাহায্যে টাকের র চুল বুনে টাক ঢাকবার চেষ্টা চলছে। ঐ উপায়ে ঢাকা টাক দেশে বিদেশে কেউ দেখেছেন ব'লে আমাদের জানা নেই। সম্প্রতি আমেরিকার একজন ডার্মাটলজির ডাক্তার এক অভিনব উপায়ে টেকো মাথায় চুল গজাবার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি চুল না বুনে, চুল গজাচ্ছে এমনতর চামড়া বুনছেন টেকো মাথায়।

সাধারণতঃ মাথার পিছন দিকটায় টাক পড়ে না। সেইখান থেকে সরু সরু ফালি চামড়া তুলে নিয়ে টাকের উপর 'কলম' ক'রে বসিয়ে দিয়ে দেখা গেছে, ঠিকই সেখানে যথানিয়মে তারপর চুল গজাচ্ছে। আর পিছনদিকের চামড়া সরু ফালি ক'রে এমনভাবে তুলে নেওয়া হয়েছে যে, আশেপাশের চুল সহজেই সেই জায়গাগুলিকে ঢেকে দিতে পারে।

নব্বুই বৎসর আগে

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে, মে মাসে, বিসুবিয়াস ভীষণভাবে অগ্নি উদ্গীরণ করেছিল। মে মাসের ২ তারিখে লণ্ডনের একজন সংবাদদাতা এইভাবে সেই দৈবদুর্বিপাকের বর্ণনা পাঠিয়েছিলেন তাঁর কাগজে।

মিহি ছাইয়ের একটা বাত্যার মতন নেমে এল আমাদের উপরে, সেই ছাইয়ের আবরণে রাস্তাঘাট ঘরবাড়ী ছেয়ে গেল, আমাদের নিঃশ্বাস রোধ হয়ে গেল প্রায়, চোখও প্রায় অন্ধ হয়ে গেল। আমরা প্রয়োজন বোধেই ছাতা নিয়ে চলছিলাম, খুব যে তাতে লাভ হচ্ছিল তা নয়, তবে সেই ভস্ম-বাত্যাকে খানিকটা প্রতিরোধ করা যাচ্ছিল তার সাহায্যে। গত শুক্রবার আর শনিবারি, মনে হচ্ছিল যেন একসঙ্গে এবং অবিরত অনেকগুলি কামান দাগা হচ্ছে, এমনই তার শব্দ যে কুড়ি মাইল দূর থেকে তা শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু ছাই ও ধুলোর ঝড় বা বইতে আরম্ভ করল তার পরে, তা বহুগুণ বেশী ভয়াবহ। বিসুবিয়াসের গর্জন দিবারাত্রি চলেছে, তার মধ্যে ঘুমোয় কার সাধ্যি? শুধু সেই গর্জনেরই

শব্দতরঙ্গে, কেবল যে আমাদের দরজাজানালাই কাঁপছিল তা নয়, গোটা বাড়ীটাই কেঁপে উঠছিল।

হাওয়ার চেয়ে হালকা আকাশ-যান

গত সংখ্যা প্রবাসীতে হাওয়ার চেয়ে হালকা বিমান সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছিল। তাদের সম্বন্ধে আরো একটু কিছু বলা যাক।

এদের আকৃতি ছিল কতকটা তিমি মাছের মতন। সমুদ্রে যেমন তিমি মাছের চেয়ে বড় কিছু বিচরণ করে ব'লে আমাদের জানা নেই, তেমনি পৃথিবীর বায়ুর আস্তরণে হিণ্ডেনবার্গ ও তাঁর স্বগোত্র জেপেলিনদের চেয়ে বড় কিছু আজ অবধি সঞ্চারণ করে নি, অপর ভবিষ্যতে করবে বলেও মনে হয় না।

আজ থেকে পঁচিশ বৎসর আগে, ১৯৩৭ এ ৬ই মে, এদের যুগের অবসান হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে মানুষের কত যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কত গবেষণা, কত পরিশ্রম, কত অর্থব্যয় ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে তা মানুষ এরই মধ্যে ভুলে যেতে আরম্ভ করেছে।

আকারে যে এরা কত বৃহৎ ছিল তা এখন অনেকেই ধারণা করতে পারবেন না। লম্বায় হিণ্ডেনবার্গ ছিল এক মাইলের ছয় ভাগের এক ভাগ। যে সব মাল এই আকাশযানগুলি বহন করত তার মধ্যে থাকত সার্কাসের সব বড় বড় জীবজন্তু, মোটর-কার, এমন কি এরোপ্লেনও।

কোনো শহরের উপর দিয়ে যখন এরা উড়ে যেত, তিনটি পাড়া জুড়ে এদের ছায়া পড়ত।

হাওয়ার চেয়ে হালকা বিমান

হিণ্ডেনবার্গের যাত্রীকক্ষে জানলা

যাত্রীদের স্থান ছিল এইসব উড়োজাহাজের খোলের মধ্যে, কিন্তু বড় বড় বসবার ঘর ও পায়চারি করবার জায়গার পাশে পাশে কাত ক'রে তৈরি বড় বড় কাচের জানলা দিয়ে আরোহীরা অনেকখানি দৃষ্টিপথ-জোড়া বাইরের ও নীচের দৃশ্য দেখতে পেতেন।

দু'শ জনেরও বেশী লোকের দরকার হ'ত দড়ি ধ'রে হিণ্ডেনবার্গকে টেনে ঠিক জায়গায় নামাতে ও নোঙর না করা অবধি ধ'রে থাকতে। কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। একটু জোরে হাওয়া দিলেই দড়ির বাঁধন মান্য না ক'রে হিণ্ডেনবার্গ লাফিয়ে উপরে উঠে যেত। সে সময় দড়ি ছেড়ে দেওয়ার কথা মনে না থাকাতে কেউ কেউ উঠে যেত আকাশে এবং তারপর প'ড়ে মরত।

এমন বিরাট দেহ নিয়েও হিণ্ডেনবার্গের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৭৭ মাইল। ৮৪ মাইল পর্য্যন্ত বেগে চলবার ক্ষমতা তার ছিল।
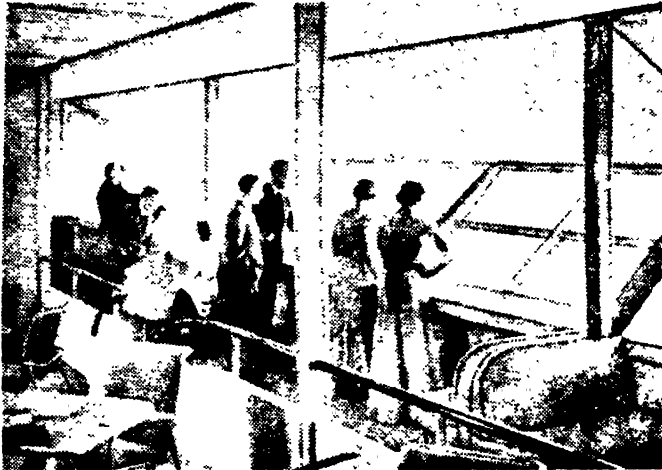
হাওয়া থেকে হালকা আকাশযানের যুগ শেষ হয়ে গেল, হিণ্ডেনবার্গ পুড়ে ছারখার হয়ে গেল ব'লে নয়। এরোপ্লেন ত রোজ দু'টো একটা প'ড়ে এবং পুড়ে ছারখার হচ্ছে। জেট এরোপ্লেন আটলাণ্টিক পার হচ্ছে ছ' ঘণ্টায়, জেপেলিনের দরকার হ'ত ষাট ঘণ্টা। হিণ্ডেনবার্গের আরোহী-সংখ্যার তিনগুণ আরোহীর স্থান হয় এই প্লেনগুলিতে, আর একটা জেপেলিন তৈরীর খরচার এক সামান্য একটা অংশ খরচ করলেই একটা জেট প্লেন তৈরী হয়ে যায়।

বাইসাইকেল প্লেন

দুপায়ে পেডাল ক'রে বাইসাইকেল চালানোর মত প্লেন চালিয়ে উড়বার চেষ্টা চলছিল অনেকদিন ধ'রে। সম্প্রতি ইংলণ্ডের দু'টি জায়গায়

বাইসাইকেল প্লেন

এই চেষ্টা খানিকটা সফল হয়েছে। হ্যাটফিল্ডের বৈমানিকদের একটি দল এইরকম একটি বাইসাইকেল প্লেন চালিয়ে পাঁচফুটের মত উঁচুতে উঠে সিকি মাইলের মত পথ উড়ে যেতে সমর্থ হয়েছেন দ্বিতীয় বাইসাইকেল প্লেনটি উড়েছে সাদাম্পটনে। এই প্লেনটির প্রথম প্রয়াসের ওড়ার পাল্লা ২১০ ফুট। এটি সাদাম্পটন ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের তৈরী। এরা এদের অভিজ্ঞতা থেকে বলছে, এই ধরণের প্লেন নিয়ে মাটি ছেড়ে উঠতে তিন অশ্বশক্তির মত বেগে পেডাল করা প্রয়োজন হয়, আর প্লেনটিকে বাতাসে ভাসিয়ে রাখতে দরকার হয় দেড় অশ্বশক্তির বেগ। বোঝা যাচ্ছে, এটা যে-সে মানুষের কর্ম্ম নয়।

স্বাধীনতা

দক্ষিণ আলাস্কা একসময় রুশের অধীন ছিল। তখন রুশীয় কর্তারা নিয়ম করে দিয়েছিলেন যে, সে অঞ্চলের সকলকে সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন করে স্নান করতে হবে। মহা শীতের দেশ, কাজেই বাষ্পস্নান। আর সেইজন্যে দক্ষিণ আলাস্কার প্রত্যেকটি গ্রামে রুশীয়রা বাষ্প-স্নানাগার নির্ম্মাণ করেছিলেন। এরপর যখন দক্ষিণ আলাস্কা ইউনাইটেড স্টেটসের শাসনাধীনে এল, তখন সেই সঙ্গে এল স্বাধীনতা। তখন আর তাদের পায় কে? স্নান যে কাকে বলে, সেটা তারা এতদিনে একেবারেই ভুলে গেছে।

আমরাও স্বাধীন হবার পর অনেক কিছু করছি না, যা আগে পেয়াদায় করাত, আর করাত বলেই আমাদের জীবন অনেক বেশী নোংরামি-মুক্ত ছিল এখনকার চেয়ে।

রাস্তার ধারে নোংরামির প্রতিবাদ করাতে এক ব্যক্তি মনে করিয়ে দিয়েছিল যে, আজাদি এসেছে।

দেশের আরও কত গভীরতর নোংরামিকে নিয়ে এই আজাদি সাফাই চলছে, তাও আমরা জানি।

নিউগিনির অধিবাসী

এদের সম্বন্ধে গত মাসের প্রবাসীতে কিছু বলা হয়েছে। পোর্ট মোরেসবীতে কিছুদিন আগে খবর পৌঁছায় যে অনেক দূরের একটি গ্রামে নরখাদকরা যখন হানা দেয়, তখন সেখানকার পুলিশটি কিছুই করে নি সে-বিষয়ে। তার কাছ থেকে কৈফিয়ৎ তলব করতে গিয়ে জানা গেল, নরখাদকরা পূর্ব্বাহ্ণেই তাকে উদরস্থ ক'রে ফেলেছিল।

পৃথিবীর উচ্চতম অট্টালিকা

নিউ ইয়র্কের এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং পৃথিবীর উচ্চতম অট্টালিকা। এতে ৭৪টি লিফট কাজ করে, তার ৬৩টি যাত্রীবাহী, ৬টি মালবাহী, আর ৫টি সাধারণের ব্যবহারের জন্য নয়। এক্সপ্রেস বা দ্রুতগামী লিফটগুলির নীচতলা থেকে ৮০ তলা উপরে উঠে যেতে লাগে এক মিনিট। অর্থাৎ এদের গতিবেগ মিনিটে ১২০০ ফুট বা ঘণ্টায় সাড়ে তের মাইল।

রুটি টোষ্ট করলে কি তার পুষ্টিকরতা কমে যায়?

না। টোষ্ট করলে রুটির জলীয় অংশ কমে যায়, আর যেহেতু জলের কেলরী-মূল্য বা পুষ্টির উপকরণ কিছু নেই, এতে রুটির কেলরী-মূল্য অপরিবর্ত্তিতই থাকে।

লণ্ডনের কয়েকটি প্রসিদ্ধ রাস্তা

ফ্লিট ষ্ট্রীট খবরের কাগজ প্রকাশনার জন্যে, হার্লে ষ্ট্রীটকে তার সেরা ডাক্তারদের জন্যে, বণ্ড্ ষ্ট্রীটকে কাপড়চোপড়ের জন্যে, আর থ্রেড নীডল্ ষ্ট্রীটকে লণ্ডনের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের কেন্দ্র হিসাবে প্রায় বিশ্ববিখ্যাতই বলা চলে।

চশমা আবিষ্কার কারা করেছিল?

কারা আর? যারা প্রথমে বারুদ আবিষ্কার করেছিল, আজকের দিনের গ্রহযাত্রী রকেটের পূর্ব্বসূরী হাউই আকাশে উড়িয়েছিল, রেশমের সন্ধান প্রথমে দিয়েছিল মানুষকে, প্রথম কাগজ তৈরি ক'রে তাইতো প্রথম বই ছেপেছিল, আজকের দিনের পরিবেশে শুনতে যদিও অনেকের ভাল লাগবে না, সেই চীনদেশের লোকেরা। ছোট অক্ষর একটু বড় দেখায় এইরকম কাচ দিয়ে তারা খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে চশমা তৈরি ক'রে ব্যবহার করতে আরম্ভ করে, পড়বার সুবিধার জন্যে।

ডাক্তারের ফী কত হওয়া উচিত?

বলা খুব শক্ত।

উচ্চতম ফী কোন্ ডাক্তার পেয়েছেন অদ্যাবধি, তা অবশ্য বলা যেতে পারে। আশা করি এদেশের ডাক্তাররা, যাঁরা জানেন না এটা, তাঁরা এরপর নিজেদের ফী আর বাড়াবেন না। যথেষ্টই ত বাড়িয়েছেন।

ইংলণ্ডের ডাক্তার টমাস ডিমস্‌ডেল ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রুশিয়ার সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথেরিণের শিশুপুত্রকে বসন্ত-প্রতিষেধক টীকা দেন। ডাক্তার ডিমস্‌ডেল ফী পান প্রায় দু'লক্ষ টাকা, তদুপরি পান আজীবন পেনশান বৎসরে দশ হাজার টাকার মত। সাম্রাজ্যের একজন ব্যারণ বলেও স্বীকৃত হন তিনি।

ডাক্তার এবং ওঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের যাওয়া-আসার রাহাখরচ ও রুশিয়াতে যতদিন তাঁরা অবস্থান করেছিলেন তার যাবতীয় খরচ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়া রুশিয়ার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তাঁকে বহুতর উপহার দেন। এই সব উপহারের মধ্যে একটি চুনী ছিল যার একলারই দাম ন্যূনাধিক ৬০,০০০ টাকা।

প্রোহিবিশন

আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলে যখন প্রোহিবিশন বা মদ্যপান-বিরোধী আইন চলছে, তখন পূর্বাঞ্চলের এক ব্যক্তি তৃষ্ণার্ত হয়ে পশ্চিমাঞ্চলের একটি লোককে জিজ্ঞেস করেছিল, কোথায় গেলে তার এই তৃষ্ণার নিবৃত্তি একটু হয়। পশ্চিমীটি বলেছিল, এখানকার কানুন হচ্ছে এই যে, যদি তোমাকে সাপে কামড়ায় ত তুমি কোনো ওষুধের দোকানে গেলেই তারা তোমাকে আর কোনো প্রশ্ন না করে এক বোতল হুইস্কি দিয়ে দেবে।

পূর্বাঞ্চলীয়টি বলল, বেশ কথা। তা হ'লে ত সাপের সন্ধান করতে হয়। সাপ কোথায় পাওয়া যাবে?

পশ্চিমীটি বলল, এ শহরে সাপ কেবল একটাই আছে। কিন্তু তার অবস্থা অতি শোচনীয়। এত লোককে এতবার কামড়াতে হয়েছে তার, যে ক্লান্তিতে সে এখন আর হাঁ করতেই পারছে না ত আর কামড়াবে কি!

আত্মরক্ষার দুটি নূতন উপায়

আমেরিকার বড় সহরগুলিতে গুণ্ডামি আর রাহাজানি ক্রমশঃ বেড়েই চলছে বলে আত্মরক্ষার নানারকম উপায়ও সেইসঙ্গে উদ্ভাবিত হচ্ছে। সবচেয়ে কাজের হয়েছে দুটি জিনিষ, ছোট একটি এ্যালার্ম, যার থেকে এমন আর্ত চীৎকার বের হয় যা তিনপাড়ার লোককে সচকিত ক'রে দেয়। আর সাধারণ একটি ফাউন্টেনপেন, যার একটি ছোট বোতাম টিপলে ঝাঁঝালো গ্যাস বের হয়ে আততায়ীকে অভিভূত ক'রে ফেলে।

কনে নিয়ে লোফালুফি

আলাস্কার এস্কিমোদের মধ্যে একটি প্রথা বহুপুরুষ ধ'রে চ'লে আসছে। গ্রামের জোয়ান ছেলেরা একটা কম্বলের ধারগুলো চেপে ধ'রে থাকে। গ্রামের বিবাহযোগ্যা মেয়েদের একটির পর একটিকে সেই কম্বলের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। তারপর তাদের নিয়ে লোফালুফি চলে। এক-একটি মেয়েকে ২৫ ফুট পর্যন্ত উঁচুতে ছুঁড়ে দিয়ে আবার লুফে নেওয়া হয় কম্বলে। সমবেত জনতা চীৎকার ক'রে বাহবা দিতে থাকে। এস্কিমোদের বিবেচনায় বিবাহযোগ্য ছেলেরা বিবাহযোগ্যা মেয়েদের এই উপায়ে খুব সহজে বাছাই ক'রে নিতে পারে।

আমাদের দেশে এই প্রথা চালু করবার পক্ষে কেবল দুটি অসুবিধা আছে। পঁচিশ ফুট উঁচুতে ছুঁড়ে দেওয়া হবে শুনেও লোফালুফিতে রাজী হবে, এমন মেয়ে পাওয়া দুষ্কর। আর একটা বিবাহযোগ্যা মেয়ের কম্বলের ধার ধরে এত উঁচুতে ছুঁড়ে দেবার মত যথেষ্ট পালোয়ান ছেলেরও এদেশে অভাব।

ক্যান্সার-ভীতি

এদেশের মানুষ কলেরা, বসন্ত ও টাইফয়েডের ভয়েই এত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে যে অন্য কোনো রোগের ভাবনা তারা বিশেষ ভাবে না। যেসব সভ্য দেশে এই রোগগুলির প্রাদুর্ভাব নেই, সেসব দেশে সবরকম ব্যাধিভীতির মধ্যে ক্যান্সার-ভীতিই সবচেয়ে প্রবল। আর দেখা গেছে, ক্যান্সার-জনিত মৃত্যুর বেশীরভাগের মূলে আছে এই ক্যান্সারভীতি।

দুশ্চিকিৎস্য পাকাপাকি ক্যান্সার নিয়ে যেসব রোগী হাসপাতালে আসে তাদের সঙ্গে কথা ব'লে জানা গেছে, যে তাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জনের এই অবস্থা হ'ত না, যদি তারা যথাসময়ে চিকিৎসা সুরু করত। তা যে তারা করেনি, তার কারণ তাদের ভয়, পাছে শুনতে হয় তাদের ক্যান্সার হয়েছে!

ক্যান্সার সম্বন্ধে যাই আপনি শুনে থাকুন, আজকালকার পরিণত চিকিৎসাব্যবস্থায় অধিকাংশ ক্যান্সার রোগী রোগমুক্ত হতে পারে। কোনো কোনো জাতীয় ক্যান্সার, যথাসময়ে চিকিৎসিত হলে, শতকরা ১০০ জনেরই আরোগ্য হয়ে যায়।

যে লক্ষণগুলি দেখলে, ভয় না পেয়ে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া বিধেয়, সেগুলি হচ্ছে দীর্ঘকালস্থায়ী স্বরভঙ্গ বা কাশি; গায়ের চামড়া পুরু হয়ে যেতে থাকা বা চামড়ার উপর গুটি পাকানো; শরীরের কোথাও থেকে অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ বা অন্যজাতীয় অস্বাভাবিক ক্ষরণ; এমন ক্ষত যা কিছুতে শুকোয় না; গিলতে অসুবিধা বা হজমের গোলমাল যদি দীর্ঘকালস্থায়ী হয়; দীর্ঘকালস্থায়ী অনিয়মিত মলমূত্র।

ক্যান্সার নিয়ে আরো এইজন্যে ভয় পেতে নেই, যে, উপরিউক্ত প্রত্যেকটি লক্ষণ অত্যন্ত সাধারণ কারণেও দেখা দিতে পারে।

স্বাস্থ্য নিয়ে অকারণে বা সকারণে ভয় পাওয়ার ফল স্বাস্থ্যের পক্ষে কিছুমাত্র ভাল হয় না। বরং খারাপই হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, যেসব লোক নিজেদের শরীর নিয়ে বেশী মাথা ঘামায় না, মাথা ঘামানোর কাজটা ডাক্তারের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে, তারা অসুখে পড়লেও ভোগে কম, অসুখের মধ্যে জটিলতা কম আসে তাদের, এবং তারা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই নিরাময় হয়ে যায়।

ভিক্টোরিয়া ফল্‌স্

আফ্রিকার জাম্বেসী নদীর বিরাট জলপ্রপাত, যার নাম ভিক্টোরিয়া ফল্‌স, তার গর্জনের শব্দ ২০ মাইল দূর থেকে শোনা যায়, আর তার ফেনায়িত জলকণার কুয়াসা চোখে পড়ে ৭ মাইল দূর থেকে। নায়াগারার জলপ্রপাতের চাইতে এই প্রপাতের বিস্তৃতি ও উচ্চতা দুই-ই অনেক বেশী।

পৃথিবীর কি কোনো ধূমকেতুর সঙ্গে ধাক্কা লেগে চুরমার হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে?

ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা যদি বা থাকে, তার ফলে চুরমার হয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই। বেশীরভাগ ধূমকেতুর উপাদান যে বিক্ষিপ্ত বস্তুপিণ্ড তারা আকৃতিতে ছেলেদের খেলবার মার্বেলের চেয়ে বড় নয়। কোনো না কোনো ধূমকেতুর পুচ্ছের ভিতর দিয়ে পৃথিবীকে বহুবার যেতে হয়েছে, তাতে তার ক্ষতি কিছু হয়নি। সর্বাধুনিক দৃষ্টান্ত, ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে 'হ্যালিজ কমেট' নামধেয় ধূমকেতুর পুচ্ছ পৃথিবীকে ঝেঁটিয়ে চ'লে গিয়েছিল, কিন্তু তার ফলে পৃথিবীর একটি ধূলিকণাও স্থানচ্যুত হয়নি।

স চ.

আরব দেশে ঘোড়া হয়ে জন্মালেই আরবী ঘোড়া হওয়া যায় না

আরব দেশে ঘোড়ার বাচ্চা জন্মাবামাত্র তাদের এমন-সব লোকের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় যারা তাদের নানারকমের শিক্ষা দিয়ে তৈরী করে। এই লোকেরা কোনো কথা না ব'লে শুধু তূর্যধ্বনি ক'রে এদের নিয়মিত ভাবে খাদ্য ও জলের দিকে নিয়ে যায়, তারপর তাদের খাওয়া ও জলপান করা হয়ে গেলে, যেই বেড়া-দেওয়া জায়গায় ঘোড়াদের রাখা হয়, তূর্যধ্বনির সঙ্কেতেই সেইখানে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

এইভাবে কয়েক সপ্তাহ শিক্ষা দেওয়ার পর এই বাচ্চাগুলিকে পুরো

চারদিন কোনো খাদ্য বা পানীয় না দিয়ে নির্জ্জলা উপবাস করিয়ে রেখে দেওয়া হয়। বাচ্চাগুলি সেইসময় স্বভাবতই ভীষণ ছটফট করতে থাকে। তারা দূর থেকে নদীর জলের গন্ধ পায় এবং মুক্তি পাবার প্রয়াসে বেড়ার গায়ে ক্রমাগত আঘাত করতে করতে নিজেদেরই আহত ক'রে ফেলে।

যখন এই দুঃখের দিনগুলি শেষ হয়, তখন এই বাচ্চা ঘোড়াগুলিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এরা তখন তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে পাগলের মত বাঞ্ছিত জলের দিকে ছুটে যায়। তাদের জল খাওয়া শেষ হবার আগেই হঠাৎ আবার তূর্য্য বেজে ওঠে তাদের বাড়ী ফিরে আসার সঙ্কেতধ্বনি ক'রে। যে বাচ্চা ঘোড়াগুলি তৃষ্ণার নিবৃত্তি না হওয়া সত্ত্বেও তখন নিজেদের বাসস্থানে ফিরে আসে, তাদেরই শুধু প্রজননের কাজ নেওয়া হয়। আরবী ঘোড়ার যে সমস্ত বিশেষত্ব আছে, রক্তের মধ্যে দিয়ে সেইগুলিকে বংশ-পরম্পরায় বহন ক'রে চলার যোগ্যতা কেবল এই বাচ্চাঘোড়াগুলিরই আছে ব'লে মনে করা হয়।

সমুদ্রের নীচে হীরার খনি

দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় উপকূল থেকে তিন মাইল দূরে সমুদ্রের মধ্যে হীরার খনির কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, এখানে খুব উচ্চশ্রেণীর হীরক পাওয়া যাচ্ছে।

সমুদ্রতল থেকে নমুনা হিসাবে টাগ-এর সাহায্যে এক টন কাদা মাটি তোলা হয়। এই কাদার ভেতর যে হীরার টুকরোগুলি পাওয়া যায় তাদের সমবেত ওজন নয় ক্যারাট। সবচেয়ে বড় হীরাটির ওজন ছিল আধ ক্যারাট।

মানুষের বহুকাল ধ'রেই ধারণা যে সমুদ্রের মধ্যে হীরা থাকতে পারে না। এ ধারণার যে কি মূল্য তা ত এখন বোঝাই যাচ্ছে।

ইঁটকাটা জাঁতি

রাজমিস্ত্রীদের কর্ণিক দিয়ে ইঁট কাটতে যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই লক্ষ্য করেছেন, ইঁট ছোট করে, বা কোণাকুনি ক'রে কাটতে গিয়ে কত ইঁট তারা ভেঙে নষ্ট করে, এবং প্রায়শঃই কাটা ইঁট কত অসমান হয়। এবড়ো-খেবড়ো ধারগুলিতে চুনবালি চাপা দিয়ে তারা কাজ সারে।

পাশে যে যন্ত্রটির ছবি দেওয়া হ'ল এটিকে একটি ইঁটকাটা জাঁতি বা গিলোটিন বলা যেতে পারে। গিলোটিনের মধ্যে ইঁটটাকে ঢুকিয়ে যেখানটা যেভাবে কাটা দরকার সেইভাবে ফলার নীচে রেখে ফলার উপর ছোট একটি হাতুড়ির ঘা দিলেই নিখুঁৎ হয়ে ইঁটটা কাটা হয়ে যায়। কর্ণিকের ঘা দিতে যত সময় লাগে, এতে সময়ও তার চেয়ে বেশী লাগে না।

গিলোটিনটি ওজনে খুব হালকা, যদিও বেশ মজবুত ক'রে এবং পাকা ইস্পাতের ফলা দিয়ে এটি তৈরি।

নাক যখন ডাকার মত ডাকে

আমেরিকার কোনো একটি নাইটক্লাব থেকে একটি 'এ্যাম্প্লিফায়ার' বা আওয়াজ বাড়ানোর যন্ত্র চুরি করার অপরাধে আটাশ বৎসর বয়সের ট্রাভিস জেলিসকে তিন মাসের জেল দেবার পর বিচারক সাইমন এল. লেইস দণ্ডাদেশ পরিবর্ত্তন ক'রে তাকে জেলে না পাঠিয়ে বাইরেই তিন মাসের 'প্রোবেশন' বা এক প্রকারের নজরবন্দী হয়ে থাকার ব্যবস্থা দিলেন।

এর কারণ হচ্ছে, যে, জেলিস্ এ্যাম্প্লিফায়ারের সাহায্য না নিয়েই এমন আকাশ ফাটানো শব্দ ক'রে নাক ডাকাতে লাগল, যে, জেলের অন্য কয়েদীরা রাত্রে ঘুমাতে না পেরে প্রায় ক্ষেপে যাবার জোগাড় হ'ল। অগত্যা শেরিফ এবং কারারক্ষক বিচারপতির কাছে ও প্রোবেশন ডিপার্টমেণ্টের কাছে দরবার ক'রে জেলিসের কারামুক্তির ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

একবার কলকাতা থেকে বোম্বাই যাবার পথে এয়ারকন্‌ডিশন্‌ড্ কোচে এইরকম একটি নাক-ডাকানো সহযাত্রী আমাদের জুটে গিয়েছিল। কোচগুলির প্রত্যেক কামরায় আস্তে কথা বলবার নির্দ্দেশ দেওয়া প্লেট আঁটা আছে, কিন্তু আস্তে নাক ডাকানোর নির্দ্দেশ দেওয়া নেই। যদি থাকত তাহলেও তা নিয়ে কারও কাছে দরবার ক'রে সেই সহযাত্রীটির বা, বিকল্পে কোচের অন্য আরোহীদের এয়ার-কনডিশন্‌ড্ কারামুক্তির কোনো ব্যবস্থা হ'ত বলে মনে হয় না। ট্রাভিস এলিস-এর সঙ্গে নাক-ডাকানোর প্রতিযোগিতায় এই নেপালী রাণা শ্রেণীর ভদ্রলোকটি হেরে যাবেন ব'লেও আমাদের মনে হয় না।

স্মি

ইঁট-কাটা গিলোটিন

আগুন নেভানো গ্যাস

জলের বদলে গ্যাস দিয়েও আগুন নেভানো যায়। একটা বার্ণারের ভেতরে যত হাওয়া থাকে তার প্রায় অর্দ্ধেক অক্সিজেনতাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তার ওপর মোটা মোটা পাইপের সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়া হয়। এই ভাবে স্প্রে করার ফলে ভেতরের ধোঁয়া কমে যায় এবং অগ্নিনিবারণকারীদের পক্ষে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস সহজ হয়।

২০ চাকার গাড়ী

২০ চাকার গাড়ী

ছবিতে যে ২০ চাকার গাড়ীটি দেখা যাচ্ছে, এটি জলে, স্থলে, সর্ব্বত্র অবাধ গতিতে যাতায়াত করে। এমন কি চাই বরফের উপর দিয়ে যেতেও এর কোন অসুবিধে হয় না। উঁচু দিকেও অনেকটা পর্য্যন্ত উঠতে পারে।

এইধরণের গাড়ীগুলোর দু' সারিতে ৮টা করে মোট ১৬টি চাকা আছে। এই ধরণের গাড়ী একটি ফোক্‌স-ওয়াগন এঞ্জিন দ্বারা চালিত হয়। সামনের দু'সারিতে দু'টি করে চারটি চাকা আছে, যেগুলির সাহায্যে এই যানটি সমস্ত বাধা কাটিয়ে অবাধ গতিতে এগিয়ে যেতে পারে। এই চাকা চারটিকে যেদিকে যেমন ভাবে ইচ্ছে চালান যায়। এই ধরণের গাড়ী ঘণ্টায় ৪০ মাইল পথ পর্য্যন্ত চলতে পারে এবং এর ৮০ মাইল পথ যেতে এক গ্যালনের বেশী তেল লাগে না।

মুরগীর পাক-খাওয়া বাসা

জাপানে ফুনাবাশী ব'লে এক জায়গায় মুরগীদের থাকার জন্যে ছ' তলা খোপ-অলা বাড়ী মত আছে। সেটা সর্ব্বদাই ঘোরে। তার ফলে প্রত্যেকটি খোপের মুরগীই সমান ভাবে সূর্য্যের আলো পায়। এক অশ্বশক্তি পরিচালিত ঘূর্ণায়মান বাড়ীর প্রত্যেকটি কক্ষের মুরগীই দিনেমানে প্রতি ৪৫ মিঃ অন্তর অন্তর সূর্য্যের আলো পায়। তার ফলে দেখা গেছে যে, অন্য যে কোন সাধারণ মুরগী অপেক্ষা এরা বেশী পরিমাণে ডিম পাড়ে।

মুরগীদের ঘুরপাক খাওয়া ঘর

ডাকব্যাগের ভাঁজ করা গাড়ী

ডাকব্যাগগুলো খুব ভারী হওয়ার জন্যে, হল্যাণ্ড, আমস্টারডাম, ইত্যাদি দেশের ডাকবিলিক রিরা একরকম ভাঁজ করা চাকালাগানো গাড়ী ডাক বিভাগ থেকে পায়। এরা ভারী ভারী ব্যাগগুলোকে বয়ে না নিয়ে গিয়ে, এই গাড়ীর উপর রেখে অনায়াসেই ঠেলে ঠেলে নিয়ে যেতে পারে। যখন সমস্ত ডাক বিলি করা হয়ে যায়, তখন আবার এই গাড়ীগুলোকে এরা অনায়াসেই ভাঁজ ক'রে মুড়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

ডাক ব্যাগের ভাঁজ করা গাড়ী

ডানাঝাপটানো উড়োজাহাজ

পাশের ছবিটি দেখে অনেকের মনে ধারণা হতে পারে যে কোন মিউজিয়ম থেকে তুলে আনা মানুষের আকাশে ওড়বার প্রথম চেষ্টার ছবি। আসলে তা নয়। NASA (এর পরিচয় প্রথানীর পঞ্চশস্যে আগেও দেওয়া হয়েছে) এবং সৈন্যদলের তরফে, একটি কোম্পানী যে সমস্ত উড়োজাহাজ তৈরী করেছেন, এটিও তাদের মধ্যে একটি।
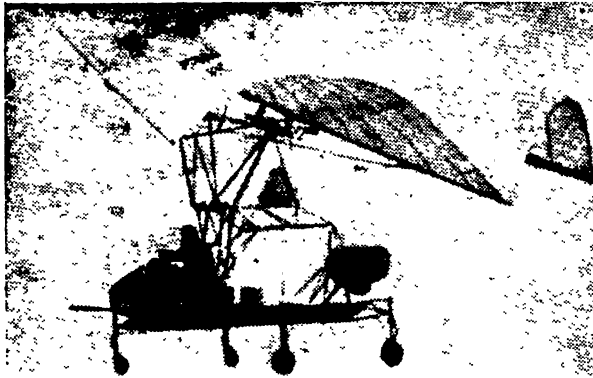
ডানা-ঝাপটানো এরোপ্লেন

হাল্কা নাইলনের তৈরী এর ডানাটি ইংরাজী V অক্ষরের আকৃতির। এটি প্রান্ত দেশের এবং মাঝখানের কয়েকটি খুঁটির সঙ্গে আটকানো থাকে। নিচের একটি প্ল্যাটফর্মে পাইলটের আসন ছাড়াও অনেকখানি জায়গা থাকে। এই ডানাটিকে আবার সময় সময় সম্পূর্ণভাবে ভাঁজও করা যায়। এই ডানাটির সাহায্যেই জাহাজটি চালিত হয়।

স. না.

মাছেরা কি ঘুমোয়?

Freshwater fish বলতে নদী খালবিল পুকুর ডোবার মাছ বোঝায়, অর্থাৎ যারা নোনাজলের মাছ নয়। এদের চোখের পাতা নেই ব'লে এরা চোখ বুজতে পারে না। কিন্তু এটা নিঃসন্দেহ, যে, তা সত্ত্বেও এরা ঘুমোয়।

প্রমাণ হয়েছে, মাছরাও ঘুমোয়। তাদের চোখও নেই, চোখের পাতাও নেই। সুতরাং মাছরাও ঘুমোয় শুনে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

মাছরা যে শুধু ঘুমোয় তা নয়, কোনো কোনো মাছ এক পাশে কাৎ হয়ে শুয়ে ঘুমোয়।

সব সময় যে জলতলের মাটী বা বালি বা পাথরের উপর শুয়েই তারা ঘুমোয়, তা নয়। জলের গভীরতার যে-কোনো স্তরেই এরা ভেসে ভেসেও ঘুমোতে পারে।

ওম্বাট

পাশে যাঁর ছবি দেওয়া হল, তাঁর সঙ্গে পরিচয়টা ক'রে রাখুন। এঁর সঙ্গে আপনার যে সাক্ষাৎ পরিচয় কখনো হবে তার সম্ভাবনা অত্যন্তই কম, কিন্তু যদিই হয়, বলতে পারবেন, আপনাকে আগে কোথায় দেখেছি বলুন ত?

এঁর নাম ওম্বাট, নিবাস অষ্ট্রেলিয়া। ছোট ভালুক আর বড় ইঁদুরের মাঝামাঝি চেহারার ধরণ। দুই থেকে তিন ফুট লম্বায়, মাথাটা শরীরের তুলনায় বড় আর চওড়া, ঘাড় বলতে কিছু প্রায় নেই বললেই হয়, মোটা সোটা গড়ন, খাটো থপথপে পা, ছোট একটুখানি একটা ল্যাজ। দেখে মোহিত হবার মত কিছু নয়।

ওম্বাট

ক্যাঙ্গারুদের দেশের জীব ব'লে কি না জানি না, এঁদের প্রত্যেকের পেটে একটা করে থলের মত আছে। দেখতে যেমনই হোক, এরা বেশ ভাল মেজাজের জন্তু।

মনে রাখবার মত কথা

জেমস্ এস কেম্পার বলছেন, জীবনে এগিয়ে যাবার দুটো পথ আছে, এক, কাজ ক'রে যাবার পথ, আর এক, কাজ করছি ব'লে কৃতিত্ব দাবী করার পথ। তাঁর মতে প্রথম পথটাই ভাল। কারণ, সে পথে এগিয়ে যাবার সুযোগ সুবিধা ঢের বেশী, আর প্রতিযোগিতা প্রায় নেই বললেই হয়।

আনাতোল ফ্রাঁস: মূর্খের মত কথা যদি পাঁচ কোটী লোকও বলে, তবু সেটা মূর্খের মত কথাই থাকে।

জে সি সালাক: মধ্যবয়সী মানুষের বয়সটার চেয়ে মধ্যটা নিয়েই ভাবনার কারণ বেশী।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন: ভালবাসা নেই অথচ বিবাহ যেখানে আছে, বিবাহ নেই কিন্তু ভালবাসা আছে, এও সেখানে ঘটবে।

আলেকজাণ্ডার পোপ: ভুল স্বীকার করতে মানুষের লজ্জিত হবার কোনো কারণ নেই। ভুল স্বীকার করা মানে এই কথা বলা, কাল আমার জ্ঞান বুদ্ধি যা ছিল আজ তার চেয়ে বেশী আছে।

মার্ক টোয়েন: যদি আপনি সর্ব্বদা সত্যি কথা বলেন, তাহলে কোনো কিছুই মনে ক'রে রাখবার ভাবনা আপনাকে ভাবতে হয় না।

কার্ল এলষ্টার: একটি ভিন্ন রমণীর দিকে কখনো তাকাননি এমন পুরুষ মানুষ পৃথিবীতে একটিই মাত্র জন্মেছেন। তিনি হচ্ছেন এ্যাডাম।

ও ডব্লিউ এইচ: হাসিখুশি ও আশাভরসা নিয়ে সত্তর বৎসরের যুবক হওয়া শ্রেয়, চল্লিশ বৎসরের বৃদ্ধ হওয়ার চেয়ে।

ডি বেনেট: খারাপ কিছু দেখবে না, খারাপ কিছু শুনবে না, খারাপ কিছু ভাববে না, এই নীতি মানতে হলে, বেশ ভাল বিক্রি হয় এমন উপন্যাস লেখার কথা ভুলে যেতে হয়।

এইচ গ্রিনার: বিয়ের আগে যে মেয়েরা বলে, তোমার রোজগারের টাকার ভাগ নিতে আমি চাই না, বিয়ের পরেও তারা সেই কথাই বলে, ভাগ নিতে তারা চায় না, সবটা চায়।

উইনষ্টন চার্চিল: শিখতে আমি সব সময়েই রাজী, তবে কিনা, আমাকে কেউ শিখাচ্ছে এটা ভাবতে আমার সব সময় ভাল লাগে না।

এইচ জি হাচিসন: আমাদের দশটি নীতিনির্দেশ (খ্রীষ্টানদের ten commandments) যে এত অল্প কথায় ও প্রয়োজনাতিরিক্ত একটি কথাও না ব'লে দেওয়া সম্ভব হয়েছে, তার কারণ, নীতিগুলি কি হবে তা কমিটি বসিয়ে স্থির করা হয়নি।

স.চ.

বাংলা ও বাঙলীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

উদ্দাম সংস্কৃতির স্রোত

প্রসিদ্ধ একটি দৈনিক সংবাদপত্র বলিতেছেন:

"এই শহর (কলিকাতা) সংস্কৃতিচর্চ্চার প্রাণকেন্দ্র। তাই প্রত্যহ অনেক আনন্দ। অলিতে-গলিতে, স্কুল-কলেজে, রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপে নিত্য নতুন আয়োজন। আনন্দের সংস্কৃতি-সাধনার।"

পড়িলে মনে হয়, দেশে আজ আর কোন দুঃখ নাই, দারিদ্র্য নাই, কষ্ট নাই—তাই চারিদিকে আনন্দ-সমারোহের এই প্রবল বন্যা! কিন্তু কালনার 'পল্লীবাসী' উল্টা কথা বলিতেছেন কেন?

—"বড্ড বাড়াবাড়ি চলিয়াছে, সাংস্কৃতিক সম্মেলনের নাম করিয়া ডামাডোলের চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়াছে! বন্ধ কর।

"...সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে। একটা সময় আছে। কুলী মজুর সাঁওতালেরাও নাচ গান করে, তাহাদেরও একটা সময় আছে। হাতের কাজ ফেলিয়া তাহারা নাচে না, মাদল বাজায় না। কিন্তু তোমরা এ কি করিতেছ?

"মাথার উপর চীন গুটি গুটি থাবা বাড়াইয়া আগাইতেছে। দুইধার থেকে পাকিস্থানের নষ্টামি জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে, এ সময় শুধু নাচ গান আর রং তামাসা—এ কি ভাল লাগে? না, কোন ভদ্রস্থ আছে?

—"একবার নিজেদের পানে চাহিয়া দেখ। পরণে কাপড় নাই, পকেটে পয়সা নাই—বাজারে আগুন লাগিয়াছে, ধুম্বো ধুম্বো অনূঢ়া মেয়েদের অসহায় অস্বস্তি, দলে দলে বেকার ছেলের হতাশার দীর্ঘশ্বাস। আর সমস্ত চাপা দিয়া মাইকে এখনও—লারেলাপ্পা লারেলাপ্পা!"

সংস্কৃতিচর্চ্চার সহজ অর্থ আজ দাঁড়াইয়াছে—লোকের উপর অত্যাচার, জোরজবরদস্তি করিয়া চাঁদার নামে চৌথ আদায় করিয়া নাচ, গান, হৈ-হল্লা করা। এর মধ্যে যুব-সম্প্রদায়ের আজ দেশের প্রকৃত অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার সময় কোথায়?

দেশের সংবাদপত্রগুলিও,একদিক্ দিয়া বিচার করিলে, এই তথাকথিত সংস্কৃতির প্রশ্রয় দিতেছেন। এখনকার সংবাদপত্র লোকে যাহা চায় তাহাই প্রকাশ করেন, বিকৃত সংবাদ এবং বিকৃত সংস্কৃতির সচিত্র বর্ণনা প্রকাশে এই-সবের প্ররোচনা দান করেন। কিন্তু লোকের কি চাওয়া উচিত এবং লোককে কি দেওয়া কর্ত্তব্য—সে বিষয় কয়টি সংবাদপত্র চিন্তা করেন? সংবাদপত্র যদি সুস্থ জনমত গঠন না করিয়া অসুস্থ জনমতেই নিজেদের ভাসাইয়া দেন—তাহা হইলে সংবাদপত্র ধর্ম্মচ্যুত হইবেন।

চাকুরী ক্ষেত্রে বাঙালী

সংবাদে প্রকাশ যে—"পশ্চিমবঙ্গে চাকুরীক্ষেত্রে বাংলার সন্তানদের অগ্রাধিকার দেওয়ার যে প্রয়াস কিছুকাল যাবৎ চলিতেছিল তাহা বর্ত্তমানে পরিত্যক্ত হইতে চলিয়াছে।

"নূতন শ্রমদপ্তর কর্ত্তৃক অনুসৃত পরিবর্ত্তিত শ্রমনীতি এই প্রয়াসের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া ওয়াকেবহাল মহল মনে করিতেছেন।

"পশ্চিমবঙ্গের বে-সরকারী ক্ষেত্রে শিল্প-কলকারখানা-ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত মোট কর্ম্মীর শতকরা মাত্র ৪১ জন বাঙালী; কিন্তু তালিকাভুক্ত বেকারদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭৭ জন বাঙালী।

"এই উদ্বেগজনক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব্বতন শ্রম-দপ্তর বাংলার জনমতের প্রতিধ্বনি করিয়া শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষদের নিকট এই রাজ্যের কর্ম্মহীন যুবকদের কাজ দেওয়ার জন্য বার বার অনুরোধ জানান। ফলে শ্রমের কাজে বাঙালীর কাজ পাওয়ার একটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছিল। কল-কারখানা, ব্যবসা-সংস্থার কাজে বহু বাঙালী ছেলে অধিকসংখ্যায় প্রার্থী হইতে-ছিল। ইতিমধ্যে তাহাদের একাংশ অদক্ষ শ্রমিকের কাজে নিযুক্তও হইয়াছে। কিন্তু নূতন শ্রমদপ্তর পূর্ব্বেকার অনুসৃত নীতি পছন্দ না করায় কর্ম্মসংস্থান বিভাগ বর্ত্তমানে বাংলার সন্তানদের চাকুরীক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য শিল্প-মালিকদের অনুরোধ করা হইতে বিরত হইয়াছেন।"

ফলে যাহা ঘটিবার তাহাই হইতেছে। পূর্ব্বতন শ্রমমন্ত্রী সাত্তার সাহেব ছিলেন বাঙালী, তাই বাঙালীর প্রতি তাঁহার অন্তরের টান ছিল কিন্তু বর্ত্তমান শ্রমমন্ত্রী খাঁটি কংগ্রেসী এবং বাংলাবাসী ও বাংলাভাষী হইলেও—বাঙালী নহেন—এবং বাঙালী নহেন বলিয়াই হয়ত তিনি সাত্তার সাহেবের—বাঙালীর পক্ষে কল্যাণকর—নীতির পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

সরকারী কর্ম্মসংস্থাগুলির বাংলায় অবস্থিত কল-কারখানা মিল এবং ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাঙালীকে কর্ম্মসংস্থান করিয়া দিবার বাধ্যতামূলক ক্ষমতা নাই। সরকারী কর্ম্মসংস্থাগুলির প্রধান কাজই হইল নিয়মিত ভাবে দপ্তরের খাতাপত্র, রেকর্ড এবং ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত রিটার্ণ-ফর্ম্‌গুলির যথাযথ সংরক্ষণ।

বাঙালীকে (অবশ্যই যোগ্য) বাংলায় অবস্থিত সকল প্রতিষ্ঠানে শতকরা অন্ততঃ ৬০ ভাগ কাজ দিবার বাধ্যতা-মূলক আইনের অভাবে বাংলার অবাঙালী ব্যবসায়-বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলি অবাঙালী নিয়োগের পূর্ণ সুযোগ লইতেছে। ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান এবং কলকার-খানার অবাঙালী মালিকগোষ্ঠী নিজ নিজ প্রদেশ হইতে লোক আমদানী করিয়া—বাংলায় তাহাদের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছে। বাঙালী মরিল কি বাঁচিল—এ বিষয়ে অবাঙালী মালিকদের কোন মাথা-ব্যথা নাই।

অথচ—ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ব্যবস্থা অন্যপ্রকার। স্থানীয় লোকদের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া—বাহিরের কোন লোককে ঐ সব প্রদেশে চাকরী দেওয়া অসম্ভব। এ বিষয়ে অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারগুলিও সদা সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াছে। বিশেষ করিয়া বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশ।

কিন্তু আমাদের বাংলা সরকার উদার এবং উচ্চমনা এবং সকল মানুষকে আত্মীয় জ্ঞান করেন বলিয়াই হয়ত—বাঙালীকে খাস বাংলাতে কোন প্রকার বিশেষ সুযোগ দিতে নারাজ।

আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে—একজন অবাঙালী মন্ত্রী একক ভাবে কি করিয়া চাকুরীক্ষেত্রে বাঙালীর প্রতি এমন অবিচার করিবার সাহস দেখাইতে পারেন? এ বিষয়ে আমাদের নূতন মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পাকিস্তানী-বহিষ্কার নীতির সমাধি

"কেন্দ্রীয় সরকারের বহির্বিষয়ক দপ্তরের জনৈক মুখপাত্রের নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের 'মন্থর গতিতে' বহিষ্কার করার জন্য ভারত সরকার ত্রিপুরার স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

"এই নূতন সিদ্ধান্ত আসাম ও পশ্চিমবঙ্গেও সমভাবে প্রযোজ্য হইবে।

"প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ও পাকিস্তানী হাই কমিশনার শ্রীআগা হিলালীর মধ্যে আলোচনার ফলেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

"বহির্বিষয়ক দপ্তরের ঐ মুখপাত্র বলেন, 'সীমান্ত অঞ্চলে উত্তেজনায় ভারত উদ্বিগ্ন এবং যাহাতে উত্তেজনা না হয়' তজ্জন্যই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।"

এ দিকের সংবাদ এই—এবং ওদিকের সংবাদে প্রকাশ:

"পূর্ব্ব পাকিস্তানে কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের উপর এই মর্ম্মে এক নোটিশ জারি করা হইতেছে যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে সকল ব্যক্তি সক্ষম বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে ভারত হইতে সম্প্রতি বহিস্কৃত পাকিস্তানীদের পুনর্ব্বাসনের জন্য নিজেদের গৃহ এবং ভূসম্পত্তির একাংশের উপর হইতে মালিকানা স্বত্ব ত্যাগ করিতে হইবে।

"পাকিস্তান বেতারে এই বহিষ্কৃত পাকিস্তানীদের ভারত হইতে আগত উদ্বাস্তু বলিয়া বর্ণনা করা হইতেছে।"

অর্থাৎ—পাকিস্তানী মুসলমান গাছেরও খাইবে, তলারও কুড়াইবে! প্রধান মন্ত্রী নেহরু কি তাহা হইলে ইচ্ছামত যাহা খুশি তাহাই করিবেন—এবং লোককে বুঝাইবার জন্য অবিরাম প্রলাপ বকিবেন?

নেহরুর ক্রিয়াকলাপের প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কি এত বড় ভারতে কাহারও নাই? পাকিস্তানের নিকট হইতে জুতা, লাথি এবং কিল চড় খাইয়াও নেহরুর পাকিস্তানী প্রেম অবিকৃত, অটুট রহিল!

কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পুলিস

"কয়েকদিন পূর্ব্বে ৪০৪ ডাউন ইস্টবেঙ্গল মেলে বিনা পাসপোর্টে আগত তিনজন হিন্দু যুবককে গেদে স্টেশনে গ্রেপ্তার করিয়া, কোমরে দড়ি ও হাতে হাতকড়া লাগাইয়া কৃষ্ণনগর কোর্টে বিচারার্থ চালান দেওয়া হইয়াছে। ঐ ট্রেনে অনুরূপভাবে আগত অপর সাতজন হিন্দু মহিলাকে পূর্ব্ব পাকিস্তানে ফেরৎ পাঠান হইয়াছে। রাত্রিতে পাকিস্তানগামী ৫০১ নং আপ ইস্টবেঙ্গল এক্সপ্রেস ট্রেনে ঐ সকল মহিলাদিগকে তুলিয়া পাকিস্তানে তাঁহাদের অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে বৃদ্ধা, মধ্যবয়স্কা ও যুবতী এই সকল স্তরের মহিলাই ছিলেন।"

পশ্চিমবঙ্গের পুলিসকে যাঁহারা বলেন—"কর্ত্তব্যনিষ্ঠ নহে"—তাঁহারা এবার কি বলিবেন? পুলিসের এমন অপূর্ব্ব তৎপরতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় বিরল।

কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু বাঙালীরা কি সত্যই 'না ঘরকা—না-ঘাটকা' হইয়া গেলেন? বেসরকারী ভাবে আমাদের, অর্থাৎ বাঙালীদের এ-বিষয় কিছুই করিবার নাই?

দেশের এমন অবস্থাতেও সংস্কৃতি ও 'কৃষ্টির' পালা অব্যাহত রহিবে?

"পূর্ব্ব পাকিস্তানের বর্ত্তমান অসহনীয় অবস্থায় তথায় থাকিবার আর কোনও উপায় না পাইয়াই তাঁহারা আজ ভারতে আগমনে মরিয়া হইয়া চেষ্টা করিতেছিলেন। সীমান্তের গোপন পথ তাঁহাদের নিকটে অজানা। তাই তাঁহাদের জানা পথেই আগমনের এই প্রচেষ্টা, কিন্তু বিফল-মনোরথ ঐ নরনারীবৃন্দের নিকটে আজ পাষাণ দেউলে মাথা খুঁড়িয়া মরাই সার হইল। বিগত দুই মাস ধরিয়া প্রায় প্রত্যহই গেদে স্টেশনে এই দৃশ্য দেখা যাইতেছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানে নারীর সম্মান আজ এতটুকুও নাই। রাজসাহী, পাবনা, কুমিল্লা, বরিশাল জিলা ও চাঁদপুর অঞ্চল হইতে যে সকল খবর প্রত্যহ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে জানা যায় যে, হিন্দু নারীর নিগ্রহ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। পূর্ব্ব পাকিস্তানে ইহার প্রতিকার নাই।"

পশ্চিমবঙ্গেও নাই।

বিরাট্‌-হৃদয় খান্না

"ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনার ভাব বৃদ্ধি পায় এরূপ কিছু না করাই ভারত সরকারের নীতি।

"পাকিস্তান হইতে ভারতে এবং ভারত হইতে পাকিস্তানে যত লোক চলিয়া গিয়াছে তাহাদের সংখ্যা বিচার করিয়া পাকিস্তানের নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণ জমি ও সম্পত্তি দাবি করা হইয়াছে কি না, রাজ্যসভায় এই প্রশ্নের উত্তরে পূর্ত্ত, গৃহনির্ম্মাণ ও সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

"তিনি বলেন, ভারত এরূপ কোন দাবি করে নাই। কারণ ইহার ফলে বহু জটিলতার সৃষ্টি হইবে এবং উভয় দেশের মধ্যে অসন্তোষের ভাব বৃদ্ধি পাইবে।"

রাজনৈতিক বুদ্ধি এবং মানবতার চরম দৃষ্টান্ত! ভারত এবং পাকিস্তানের সম্পর্ক অতি মধুর—প্রায় বৈবাহিকের মত, কাজেই এই মধুর এবং প্রীতির সম্পর্ক যাহাতে কোন প্রকারে নষ্ট না হয়, তাহা দেখা এবং সেইমত কাজ করাই আমাদের মহত্তম কর্ত্তব্য—এ কথা কে অস্বীকার করিবে?

পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙ্গালীকেই বিশেষ করিয়া এই কর্ত্তব্য কর্ম্মে সর্ব্বপ্রথম অগ্রসর হইতে হইবে।

ছাত্র-সমাজ আজ কোন্ পথে?

'বর্দ্ধমান-বাণী' বলিতেছেন :

"ছাত্রসমাজের ঐক্যবদ্ধ উচ্ছৃঙ্খলতা আর কতকাল চলিবে এই প্রশ্ন আজ প্রতিটি চিন্তাশীল মানুষের মধ্যে জাগিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের কক্ষের সামনে মেডিক্যাল ছাত্রদের তাণ্ডব-লীলা পূর্ব্বকার ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতাকে ছাপাইয়া গিয়াছে। ছাত্রসমাজের ঐক্যবদ্ধ উচ্ছৃঙ্খলতা নিশ্চয়ই উদ্বেগের কারণ হইয়া এক নূতন সমস্যা নেতাদের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছে।

"পরীক্ষা পিছাইয়া দিবার দাবীর যৌক্তিকতা থাকিতে

পারে কিন্তু সেই অজুহাতে দাবী জানাইবার পন্থা যে ভাবে ছাত্ররা দেখাইয়াছে তাহা একান্ত কলঙ্কজনক। টেলিফোনের সংযোগ কাটিয়া, জানালার সার্শি ভাঙ্গিয়া, উপাচার্য্যকে দীর্ঘ আট ঘণ্টা আটক রাখিয়া ছাত্ররা দাবী আদায়ের যে পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে তাহাতে কেবল সর্ব্বোচ্চ শিক্ষাপীঠের মান-সম্ভ্রম, পবিত্রতা বিনষ্ট হয় নাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছে। সমগ্র ছাত্রসমাজের মুখে দুরপনেয় কালিমা লেপন করিয়া দিয়াছে।

"কোন কোন রাজনৈতিক নেতা এবং অনেক খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্ পুলিশের উপস্থিতিকে অন্যায় বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ছাত্ররা উপাচার্য্য ও সিণ্ডিকেটের সদস্য, যাঁহারা কক্ষমধ্যে অবরুদ্ধ ছিলেন তাঁহাদের পিটাইয়া শায়েস্তা করিলেই বোধহয় শিষ্টাচার-সম্মত হইত? পুলিশ কিসের জন্য? অন্যায়ের পোষকতা করিবার জন্য কি পুলিশ-বাহিনী গঠনের প্রয়োজন হইয়াছে? কক্ষমধ্যে দীর্ঘক্ষণ অবরুদ্ধ উপাচার্য্যকে উন্মত্ত ছাত্রদের কবল হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব কি পুলিশের নহে?"

এখন কলিকাতার বাহিরের অবস্থা কি?—

"ইদানীং ছাত্রদের লক্ষ্য হইতেছে বাস্। তাহারা দলবদ্ধভাবে বাসে চড়িবে, ভাড়া দিবে না, ভাড়া দিলেও দূরত্বের তুলনায় তাহা এত অকিঞ্চিৎকর যে বাস-মালিক আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। বাসে ছাত্রদের যাতায়াতের কন্‌সেশন দেওয়া হইত। অর্থাৎ ভাড়ার অর্দ্ধেক লওয়া হইত। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল—কে ছাত্র আর কে ছাত্র নয়। সময় নাই, অসময় নাই, সকাল দুপুর বৈকাল সন্ধ্যা রাত্রি যে কোন সময়ে হাতে একটা খাতা বা বই থাকিলেই কন্‌ডাক্টারকে বলিল—সে ছাত্র, অতএব অর্দ্ধেক ভাড়া লইতে হইবে। কন্‌ডাক্টার অস্বীকার করিলেই পরদিন দলবদ্ধভাবে সেই বাস্ বা অন্য যে কোন বাসের উপর আক্রমণ চালান হইল। ড্রাইভার কন্‌ডাক্টার প্রহৃত হইল, বাস্‌টিও রেহাই পাইল না।"

রেলগাড়ীতেও একই অবস্থা। একদল ছাত্র আছেন (সবাই অবশ্যই নহেন)—যাঁরা তৃতীয় শ্রেণীর কিংবা বিনা টিকিটে প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করিবেনই। কেবল এমনই নহে—গাড়ীতে এমন সকল আলোচনা এবং হৈ-হল্লা করিবেন, যাহা ভদ্রনামধারী কাহারও পক্ষে শোভন নহে। অথচ প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই, করিলেই অনর্থ ঘটিবে।

"সৎকাজ, ন্যায়কাজ করিবার সময় ছাত্রসমাজ ঐক্যবদ্ধ হইতেছে না। যত কিছু অন্যায়, অসামাজিক, তাহার জন্য ছাত্রসমাজ সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে, অনর্থ ঘটাইতেছে। শিক্ষক, অভিভাবক এবং চিন্তাশীল জনসাধারণ এখন হইতে অবহিত না হইলে, প্রতিকারে অগ্রসর না হইলে পুত্রকন্যাদের শিক্ষার জন্য যে ব্যয় বহন করা হইতেছে, শিক্ষকগণ যে শ্রম করিতেছেন তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সচেতন হইবার সময় কি এখনও আসে নাই?"

এ প্রশ্নের জবাব কে দিবে?

ভারতীয় মুদ্রার রপ্তানী

ত্রিপুরার 'সমাচার'-এ প্রকাশ যে:—

"—প্রচুর ভারতীয় মুদ্রা পাকিস্তানী মুদ্রায় পরিবর্ত্তিত হইয়া শ্রীনগর পোষ্ট অফিস হইতে পাকিস্তানে পাচার হইতেছে বলিয়া নিশ্চিত সন্দেহ করা হইতেছে। সীমান্তস্থিত শ্রীনগর ও সমরেন্দ্রগঞ্জ পোষ্ট অফিসে ভারতস্থ মুসলমানেরা হিন্দুদের নামে টাকা মনিঅর্ডার করে এবং সেই টাকা পাক-মুদ্রায় রূপান্তরিত হইয়া পাকিস্তানে পাচার হয়।

"চট্টগ্রাম ও নোয়াখালির বহু মুসলমান আসাম এবং ত্রিপুরার অপরাপর অঞ্চলে বসবাস করিতেছে। তাহারাই সীমান্তস্থিত ভারতীয় পোষ্ট অফিসে পরিচিত হিন্দুদের নামে টাকা মনিঅর্ডার করে এবং পরে সীমান্ত হইতে ঐ অর্থ কৌশলে পাকমুদ্রায় পরিবর্ত্তিত হইয়া পাকিস্তানে চলিয়া যায়।"

জনবিরল স্থানে পোষ্ট অফিস কাহার কল্যাণে আছে জানি না। কিন্তু অসহায় নরনারী ঠেকাইতে এবং নির্দ্দয় ভাবে আবার পাক-নরকে তাড়াইয়া দিতে যে পুলিস বা সৈন্য এত বিষম তৎপর—তাঁহারা এই ব্যাপারে নীরব কেন?

ভাগাভাগির হার বোধহয় প্রচুর।

প্রাণ রাখিতে প্রাণান্ত

করিমগঞ্জের 'যুবশক্তি' বলিতেছেন:—

"নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য যে হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে শুধু দরিদ্র জনসাধারণ নহে, মধ্যবিত্ত সমাজের পক্ষেও জীবনধারণ করা দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। দুষ্প্রাপ্যতা, করবৃদ্ধি বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, কোন বস্তুর মূল্য একবার বৃদ্ধি পাইলে সাধারণতঃ আর তাহা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। মাছ, পান, সব্জী, ডাল, তৈল, মশলা, কাপড়, ঔষধপত্র, লকড়ি, ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য স্বাধীনতার পর হইতেই বৃদ্ধি পাইতে পাইতে বর্ত্তমানে এমন পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে,

অধিকাংশ পরিবারই সংসার-খরচের ধাক্কা সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এই সহরেই সমস্ত দ্রব্যাদির মূল্য এত বাড়িয়া গিয়াছে যে তাহা সম্পূর্ণরূপে জনসাধারণের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।"

বৃথা চিন্তার কারণ নাই। কর্ত্তারা বলিয়াছেন, দ্রব্যমূল্য আরও বৃদ্ধি পাইবে। তবে কোনরকমে যদি দেশবাসী আরও তিনটি পাঁচ-বছরী পরিকল্পনার ধাক্কা সামলাইতে পারেন, তাহা হইলে দেশে দানাপানির প্রবল বন্যা হইবে। কোন প্রকারে আর বছর পঞ্চাশ ধৈর্য্য ধারণ করুন।

জালের কারবার

'বর্দ্ধমান-বাণী' প্রকাশ করিয়াছেন যে :—

"সহরের কোন কোন ঔষধের দোকানে ব্যাপকভাবে জাল ঔষধ বিক্রয় হইতেছে। ইহা বন্ধ হওয়া উচিত। অবিলম্বে ইহা বন্ধ না হইলে বহু লোকের জীবনহানি হইবে। আমরা এমন সংবাদ পাইয়াছি যে টিটেনাসে আক্রান্ত রোগীর জন্য ক্রয় করা এ্যান্টিটক্সিন্ সিরাম জাল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সরকারের এন্ফোর্স্‌মেন্ট্ বিভাগ কিছু কিছু দোকানের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিলে এবং অতর্কিতে হানা দিলে প্রচুর জাল ঔষধ পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আশা করিতেছি, জাল ঔষধ বিক্রয় বন্ধ করিতে এন্ফোর্স্‌মেন্ট বিভাগ তৎপর হইবেন।"

আশা করিতে দোষ নাই—কিন্তু ফলের চিন্তা না করিয়া। কলিকাতার অবস্থা এ-দিক্ দিয়া আরও ভয়াবহ। সরকারী আইন জাল ঔষধ প্রস্তুত-বিক্রয় সম্পর্কে যতই কঠোর হইতেছে—এই কারবার ঠিক সেই পরিমাণে ব্যাপক হইতেছে।

বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি—মানুষের ক্ষতি করে বলিয়া রাস্তার কুকুর এবং বিড়াল প্রভৃতি ব্যাপকভাবে হত্যা করিবার পরামর্শ দেন—ইহা প্রায়ই সংবাদপত্রে দেখি। কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি জাল ঔষধের কারবার করিয়া সমগ্র দেশের মানুষের বিপদ্ ঘটাইতেছে, হাজার হাজার রোগীর অকালমৃত্যু ঘটাইতেছে, তাহাদের বিনষ্ট করিবার কথা কেহই উচ্চারণ করেন না কেন?

কুকুর-বিড়াল কামড়াইলে মানুষ সঙ্গে সঙ্গে টের পায় এবং প্রতিকার-ব্যবস্থা গ্রহণ করে, কিন্তু মানুষের কামড় সঙ্গে সঙ্গে টের পাওয়া যায় না, বহু বিলম্বে যখন টের পাওয়া যায়, তখন অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে।

দুর্ব্বিষহ সহজ-জীবন

"কলিকাতায় পুনরায় সমাজ-বিরোধী কার্য্যকলাপ মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। কয়েকটি হত্যাকাণ্ড ও ছুরি মারার ঘটনা ঘটিয়াছে। বে-আইনী চোলাই মদ অবাধে বিক্রি হইতেছে। পুলিশের নিকট লোকে ভয়ে খবর দেয় না। সংবাদ যাঁহারা দিবেন তাঁহাদের নিরাপত্তা কোথায়? ষাঁড় ও গরুর উৎপাতে রাস্তায় চলা বিপদ্‌সঙ্কুল। প্রকাশ্য রাজপথে বে-আইনী খাটাল এ এলাকার একটি বৈশিষ্ট্য। রাজপথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লরী দাঁড়াইয়া থাকে, ফুটপাথগুলি গুদামরূপে ব্যবহৃত হয়। খাদ্যে ভেজাল দেওয়া হইতেছে, ভেজালকারীরা শাস্তি পাইতেছে না। এ অঞ্চলের লোকের ট্যাক্সিতে চড়িবার উপায় নাই, ট্যাক্সি-চালকেরা অল্প দূরে যাইতে সম্মত নহে। সমাজ-বিরোধীদের দৌরাত্ম্যে অভিভাবকেরা মেয়েদের পড়াশুনা বন্ধ করিয়া দিতেছেন।"

প্রকৃত অবস্থা—ইহা অপেক্ষা বহুগুণে খারাপ। তবে "কলিকাতার পুলিস কমিশনার মহাশয় এ সম্পর্কে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, জনসাধারণের সহযোগিতা পাইলে এই সকল সমস্যার সমাধান পুলিসের পক্ষে 'কষ্টকর হইবে না।' তবে সমস্যা থাকিবেই, সমস্যা না থাকিলে মানুষ মুমুক্ষু অথবা জড়ত্বে পরিণত হয়। আজিকার অভাব-অভিযোগ মিটিয়া গেলে কাল আবার নূতন অভাব-অভিযোগ দেখা দিবে। ইহাই যুগের ধর্ম্ম।"

বর্ত্তমান অভাব-অভিযোগ মিটিলেই যখন নূতন অভাব অভিযোগ দেখা দিবে, তখন বর্ত্তমান অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করিয়া লাভ কি? 'অভ্যস্ত' অভাব-অভিযোগ লইয়াই বসবাস করা ভাল—এবং বুদ্ধিমানের কাজ। অচেনার চেয়ে চেনাই ভাল নয় কি?

আমাদের ভয়, এই 'অভ্যস্ত' অভাব-অভিযোগে অতিষ্ঠ হইয়া হঠাৎ আবার বেসরকারী ঠেঙাড়ে দল একটা গড়িয়া উঠিবে না ত?

কলিকাতা পুলিস

"একজন সৎ ও সদিচ্ছাপরায়ণ পুলিস কমিশনারের অধীনে দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইতে থাকায় ব্যাপারটি বিস্ময়কর পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছে। পুলিস শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মহল বলিতেছেন একদিকে দুর্নীতি-দমন দপ্তরের ব্যর্থতা এবং অন্যদিকে লালবাজারের উপরতলার একাংশে দুর্নীতি সম্পর্কে উদাসীনতা আজ

এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যে, কলিকাতা পুলিস সাধারণ নাগরিকের কাছে ভীতির সৃষ্টি করিতেছে। কলিকাতা পুলিস 'বিনা টাকায় কাজ হইবে না' পর্য্যায়ে পৌঁছিতে চলিয়াছে।...

"...কলিকাতার কয়েকটি থানায়, লালবাজারের পাস ডিপার্টমেণ্টে, ট্রাফিক শাখায় ও আর্মস্ এ্যাক্ট্ শাখায় তদন্ত করিলে অভিযোগের সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হইবে। কলিকাতা পুলিসে সম্প্রতি আর একটি বিপজ্জনক মনোবৃত্তি লক্ষ্য করা যাইতেছে।

"...সাধারণ ভাবে বলা যায়, কলিকাতা পুলিসে দুর্নীতির তদন্তভারপ্রাপ্ত এন্ফোর্স্মেণ্ট্ ব্রাঞ্চ্কে ধীরে ধীরে একটি অক্ষম ও অপদার্থ বিভাগে পরিণত করার চেষ্টাই লালবাজার কর্তৃপক্ষের নীতিতে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

"কলিকাতা পুলিসে গাড়ীর অপব্যবহার বর্ত্তমানে চূড়ান্ত পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছে। শহরের রাস্তায়, বড় বড় মিশনারী স্কুলের সামনে, নিউ মার্কেটে, সিনেমা হলের সামনে জীপগাড়ীগুলি পুলিস অফিসারদের পরিজনদের লইয়া অবাধে চলাচল করিতেছে। অফিসারদের নিছক ব্যক্তিগত প্রয়োজনে, এমন কি পুলিসী ভাষায় 'মাস-কাবারি' সংগ্রহের জন্যও গাড়ী ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা রোধ করিবার চেষ্টা লক্ষ্য করা যাইতেছে না।

"সাব-ইন্স্পেক্টার হইতে প্রমোশনপ্রাপ্ত অফিসারদের ঠিক অবসর গ্রহণের পূর্ব্বে কলিকাতা শহর এলাকায় এক-একটি প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্ম্মাণ সুরু এবং অবসর গ্রহণের পর নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করা বর্ত্তমানে স্বাভাবিক ঘটনা। এখন ইন্স্পেক্টার পর্য্যায়ের কয়েকজনও কলিকাতায় বাড়ী করিতেছেন। ইহারা স্বোপার্জ্জিত অর্থে বড় বড় বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে পারেন কি না সেই বিষয়েও তদন্তের অবকাশ রহিয়াছে। কিন্তু কে তদন্ত করিবে? দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে লালবাজার কর্তৃপক্ষ উদাসীনতার মনোভাব গ্রহণ করিয়াছেন।

"...শহরের হকাররা ত কলিকাতা পুলিসের এক শ্রেণীর অফিসারদের নিয়মিত শিকার। অভিযোগ করিলে রক্ষা নাই। হকারের ব্যবসা যাইবে, পুলিসের কিছুই হইবে না। প্রমোশন পাইবার ঘটনাও ঘটিয়াছে।

"অথচ সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক ঘটনা হইতেছে, কলিকাতা পুলিসের ডেপুটি কমিশনারদের মধ্যে একটা বড় অংশ তরুণ আই পি এস অফিসার। ব্যক্তিগতভাবে ইঁহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আজও ওঠে নাই। কিন্তু ইঁহাদেরই পরিচালনায় শহরের পুলিস-বাহিনীতে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাইতেছে—এ অভিযোগ আজ প্রায় সকলেই স্বীকার করিতেছেন।"

যুগান্তরে প্রকাশিত (২২শে জুন, ১৯৬২) রিপোর্ট হইতে সামান্য অংশমাত্র উদ্ধৃত করিলাম। পুরা রিপোর্টটি আরও চমকপ্রদ এবং বিস্ময়কর।

কিন্তু স্বয়ং পুলিস-কমিশনার বলিয়াছেন, অভিযোগের প্রতিকার হইবা মাত্র আবার নূতন অভিযোগ উঠিবে। সুতরাং অভিযোগের পণ্ডশ্রম করিয়া লাভ কি?

আনন্দের, সংস্কৃতি-সাধনার সংবাদ দিয়া এবারের নিবন্ধের শুরু হয়, তাহার পর পশ্চিমবঙ্গের কতকগুলি 'আনন্দ-সংবাদ' দিয়া এ নিবন্ধের সমাপ্তি হইল। গত এক মাসের 'আনন্দ-সংবাদের' পূর্ণ বিবরণী দিতে হইলে মহাভারত হইবে—তাহার স্থান নাই।

গ্রহযাত্রার ভবিষ্যৎ

শ্রীঅশোককুমার দত্ত

"এ সমস্ত অভিযানের পিছনে যে বৈজ্ঞানিক গণনা-পদ্ধতি কাজ করছে তা আমাকে অভিভূত করে।"

—অধ্যাপক সত্যেন বসু।

ভবিষ্যতের চিত্র আরও উজ্জ্বল হয়েছে। মহাকাশের পথে যিনি সম্প্রতি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করলেন তাঁর মুখে খবর এসেছে: পথ পরিষ্কার, মানুষের জয়যাত্রা এবার গ্রহান্তরের দিকে প্রসারিত হোক। এ সংবাদে কে না উল্লসিত হবে? তবে সম্ভাবনা জেগেছিল কয়েক বছর আগে। ১৯৪৭ সনের ৪ঠা অক্টোবর—মানুষের তৈরী সামান্য এক পার্থিব জিনিস সেদিন আকাশে চাঁদের অনুকরণে আর এক চাঁদ হয়ে দেখা দিল। এ ঘটনার পিছনে বিজ্ঞানের যে বিপুল তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উন্নতির কথা আছে তা আমাদের অভিযাত্রিক মনকে আর একবার দোলা না দিয়ে পারে নি। চাঁদে যেতে আর কত দূর, মঙ্গল গ্রহে মানুষ পাড়ি দিচ্ছে কবে। সেই একই দিকে এই সাম্প্রতিক ইতিহাস—রুশ বৈমানিকের মহাকাশ যাত্রা। ইয়ুরি গ্যাগারিনের সফল প্রত্যাবর্তনের ফলে গ্রহান্তর-যাত্রার বহু সমস্যা সমাধানের রূপ পেল।

জটিল অভিযান

সমস্ত অভিযানেরই মোটামুটি তিনটি ভাগ: যাত্রা, এগিয়ে চলা ও ফিরে আসা। এদিক্ দিয়ে দেখতে গেলে সাধারণ সমুদ্র-অভিযানের সঙ্গে দুষ্কর গ্রহান্তর-যাত্রার বিশেষ অমিল নেই। যাত্রাপথে গতি সময় পথ ও অবস্থিতির কথা দু' ধরণের অভিযাত্রীকেই বিবেচনা করতে হয়। কিন্তু মূলগত এই সামঞ্জস্য থাকলেও দু'টি প্রধান কারণে আকাশযাত্রার বাস্তব রূপটি অনেক বেশী জটিল হতে বাধ্য। প্রথম হ'ল পৃথিবীর অভিকর্ষ বা আকর্ষণী শক্তি। যাত্রা ও প্রত্যাবর্তনের সময় এই বিপুল শক্তিকে অবশ্যই কাটিয়ে তুলতে হবে। তবে মধ্যবর্তী সময়ের চলমান অবস্থায় এ শক্তি আমরা সহায়ক হিসাবেও কাজে লাগাতে পারি, কিন্তু শুধু মহাকর্ষের উপর নির্ভর করলে আর এক অসুবিধা, চাঁদে যেতেই লাগবে কয়েক মাস। জাহাজ বা এরোপ্লেনের ক্ষেত্রে সমস্ত নিয়ন্ত্রণের ভার চালকের হাতে। কিন্তু মহাকাশ-যানের অভিযাত্রী সাংখ্যের নির্বিকার পুরুষের মত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহিঃপৃথিবীর দর্শকমাত্র, কঠিন অঙ্কের সূত্রে গাঁথা নানা যন্ত্রপাতি প্রাক্‌নির্ধারিত ভাবে রকেটের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করবে। গ্রহান্তরের পথে অজস্রভাবে যে-সমস্ত সমস্যা পদার্থবিদ্যাসম্মত ভাবে এসে পড়ে, তাদের নিখুঁত সমাধান তৎপরভাবে কাজে লাগানোর জন্যই এ সমস্ত ইলেকট্রনিক বিধিব্যবস্থার প্রয়োজন।

পৃথিবীর অভিকর্ষ

আগে একবার উল্লেখ করলেও, যে সমস্যা গ্রহান্তর-পথিকের মনকে সবচেয়ে বেশী অভিভূত করে তা হ'ল পৃথিবীর অভিকর্ষ। এই শক্তির প্রভাবে পার্থিব যে কোন জিনিসের গতি ক্রমশঃ দ্রুত হয়ে ভূ-কেন্দ্রের দিকে যেতে চায়। প্রথম সেকেণ্ডের শেষে গতি ৩২.২ ফুট, দ্বিতীয় সেকেণ্ডে২ × ৩২.২ = ৬৪.৪ ফুট, এভাবে গতি ক্রম-বর্ধমান (accelerating)। মহাকর্ষের এই মানটি কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র সমান থাকছে না। পৃথিবী ছাড়িয়ে যত উপরে উঠা যায় তার আকর্ষণী প্রভাবও তত কম। অঙ্কের হিসাবে অবশ্য শক্তির এই মান অনন্তপ্রসারী, তবে কার্যত কয়েক লক্ষ মাইল দূরে তা আমরা শূন্য ধ'রে নেব।

চিত্রের রূপকে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। কল্পনা করুন, পৃথিবীর অভিকর্ষের ফলে একটি গহ্বর সৃষ্টি হয়েছে, গভীরতা চার হাজার মাইল, উপরের দিকে তার বক্রতা ক্রমে সমতল হয়ে উঠেছে—অর্থাৎ এমন জায়গায় পৃথিবীর আকর্ষণ প্রায়শূন্য। সহজ যুক্তিতে পৃথিবীর আকর্ষণ কাটিয়ে ওঠা যেন চার হাজার মাইল পাহাড়ে ওঠার সামিল (অভিকর্ষের মান সর্বত্র এক ধ'রে নিলাম)। আর-এক ভাবে দেখতে গেলে কোন জিনিসের ঊর্ধ্বগতি সেকেণ্ডে ১১.২ কিলোমিটারের বেশী হলে তা হবে পৃথিবী থেকে উধাও। একটা ঢিলে সুতো বেঁধে কেউ ঘোরাচ্ছে কল্পনা করুন। ঢিলটি যত জোরে ঘুরবে, সুতোর উপর টানও পড়বে তত বেশী, ফলে সুতো ছিঁড়ে এক সময় ঢিলটি ছিটকিয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই "সুতো ছেঁড়ার" ব্যাপারটা দাঁড়ায়, গতি সেকেণ্ডে সাত মাইল—অর্থাৎ ১১.২ কিলোমিটার হলে। এ হ'ল তাত্ত্বিক হিসাব, তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অভিকর্ষ যাতে কোনভাবে

রকেটের পেছন না "ধাওয়া" করে তার জন্ম এই গতি আরও বাড়িয়ে দিলে ভাল হয়। হিসাব ক'রে দেখা গেছে, চাঁদে পাড়ি দিতে গেলে এই গতি হওয়া উচিত সেকেণ্ডে ১৬ কিলোমিটার, মঙ্গলের জন্ম ২৬। এ হিসাব শুধু একদিক্কার—যাওয়ার দিকের। ফিরিয়ে আনার প্রশ্ন থাকলে গতি আরও বাড়িয়ে তুলতে হবে। গতিবেগের সঙ্গে সঙ্গে রকেটের শক্তি বাড়ানোরও প্রশ্ন আছে। গ্রহান্তর-যাত্রার এই একমাত্র নির্ভর যানটি যে এ বিষয়ে আমাদের প্রত্যাশাকে অপূর্ণ রাখে নি, তার প্রমাণ গত কয়েক বছর বিজ্ঞানের নানা কার্য্যকরী পদ্ধতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। মহাকাশ-পথিকের কাছে যানবাহনের অভাব তাই আর সমস্যা নয়।

গণিতের যুদ্ধ

কিন্তু রকেটকে শক্তিশালা ক'রে গ'ড়ে তোলাই একমাত্র মীমাংসা নয়। অতিকায় মহাকাশযানটির কার্য্যপদ্ধতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হিসাবেও নিখুঁত হওয়া চাই। মঙ্গলগ্রহে সরাসরি রকেট ছোঁড়া মোটামুটিভাবে দু'শ গজ দূরে মারবেল টিপ ক'রে মারার সামিল। হিসাবের কতখানি সূক্ষ্মতা চাই তা সহজেই অনুমেয়, অঙ্কের ক্ষেত্রে তা উপস্থিত করাও অসম্ভব নয়; কিন্তু সমস্যা দাঁড়ায় রকেটের কার্য্যকরী কৌশলের মধ্যে তাকে রূপায়িত করতে গিয়ে। উপমায় বলতে গেলে, এ যেন পিঁপড়ের চলার পথে হাতীকে চলতে বলা। বিষয়টি আরও দুরূহ হয়, যখন দেখি, পৃথিবীসহ সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহই সঞ্চরণশীল, প্রত্যেকেই নিজস্ব গতিতে বিশিষ্ট কক্ষ ধ'রে পরিক্রমায় রত আছে। এর ফলে, যে মহাকাশযানটির সম্ভাব্য গতির কক্ষ বা পথ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ গণনা হয়েছিল তা শুধু এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্যই কার্য্যকরী থাকবে, অন্য সময়ে এই বিপুল গণনার ফল ভুল অঙ্কের মতই কাজে লাগবে না। মূল গণনা থেকে বিচ্যুত হবার যখন এতগুলি সম্ভাবনা তখন অভিযাত্রী রকেটটির গতি ও দিক্ পূর্ব-নির্ধারিত অবস্থায় প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা চলমান অবস্থাতেই সম্পন্ন করতে হবে। কিন্তু এজন্য যে গণনার কাজ করতে হয় তার প্রকৃতি যেমন জটিল, সমাধানও তেমনি সময়সাপেক্ষ। এদিকে রকেটের গতি অত্যন্ত দ্রুত থাকায় প্রতি মুহূর্তে তা পরিকল্পিত পথ থেকে শত শত মাইল দূরে সরে যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক প্রতিভা আজ ইলেক্ট্রনিক্স্ পদ্ধতিতে চালিত গণনাযন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন—জটিল সমস্যার উত্তর এখন যে শুধু বিদ্যুৎবেগে সমাধান করাই যায় তা নয়, সে অনুসারে চলন্ত যানটিকেও আপনাআপনি নিয়ন্ত্রণ করা চলে। মহাকাশ যাত্রার পথে ছিল যে দুস্তর গাণিতিক সমস্যা, গণিতেরই সাহায্যে তা পরাভূত হয়েছে।

আমি কোথায়

কিন্তু গণনাযন্ত্রের উর্বর "মস্তিষ্ক" পুরোপুরি ব্যর্থ হবে, যদি-না মহাকাশযানটির প্রতিমুহূর্তের অবস্থান পৃথিবী বা অন্য কোন গ্রহের তুলনায় জানতে পারি। রকেটের খোলের মধ্যে মহাকাশের যে মহাপথিকটি সেজে "বসে" আছে তার প্রধান কাজটি হ'ল, এই জানা—আমি কোথায়। অবশ্য এক্ষেত্রেও কোন কাজ পুরোপুরি অভিযাত্রীর ভরসায় রাখা হয় না। পৃথিবীর নিকট-অঞ্চলে (লক্ষ মাইলের ভিতর) রাডার যন্ত্রে তা পৃথিবী থেকেই জানানো যাবে। কিন্তু দূরত্ব আরও বাড়লে রাডারের ব্যবস্থা নির্ভুল হয় না। তখন উচিত, আকাশে গ্রহতারার সাহায্যে নিজের পথ নিজে চিনে নেওয়া। একটি তারা আর একটি গ্রহ যখন একই সরল রেখায় থাকে তখন টানব একটি রেখা। এভাবে আর এক জোড়া গ্রহতারার জন্য আর একটি সরলরেখা। এই দুটি রেখা যেখানে এসে মিলছে সেখানে হলাম আমি। খানিক পরে রেখা দুটি আবার নূতন জায়গায় এসে মিলবে। তারকা অনেক দূরে থাকায় তাদের আমরা স্থির ধ'রে নেব। এভাবে বিভিন্ন সময়ে রকেটটির অবস্থান জানলে তা পৃথিবীস্থিত বিজ্ঞানীর কাছেও আর অজানা থাকবে না। সে যা হোক, এসব দেখার ব্যাপারেও মূল পরিকল্পনা মানুষের ক্ষীণদৃষ্টির উপর বিশেষ নির্ভর করছে না। রকেটের "ভাঁড়ারে" থাকে যে অজস্র যন্ত্র তার কোন না কোন একটি সে কাজ ক'রে দেবে। মূল সূত্রটি হ'ল এই। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তা অবশ্য নানা ভাবে জটিল হয়ে উঠছে—যন্ত্রের সাহায্য তাই চাই এ ক্ষেত্রেও। এ সমস্ত যন্ত্রের কৌশল আজ শুধু পরিকল্পনার স্তরেই আবদ্ধ থাকে নি, নানারকম দুঃসাহসী পরীক্ষায় বারবার নিয়োজিত হয়ে মানুষের গ্রহযাত্রার কালকেই আরও কাছে টেনে আনছে।

শেষ লক্ষ্য

এত নিখুঁত গণনার মধ্য দিয়ে রকেট ছোঁড়া এবং মহাকাশের পথে নির্দিষ্ট গতি-কক্ষ ও সময় মেপে তাকে চালনা করার পরেও আর একটি সমস্যা প্রধান হয়ে ওঠে, মূল লক্ষ্যের কাছাকাছি এসে তা কি ভাবে কাজ করবে। ধরা যাক তার লক্ষ্যটি ছিল চাঁদ, মঙ্গল, না হয় শুক্র। প্রথম অবস্থায় চাঁদকেই ধ'রে নিলাম। রকেট কি চাঁদের

চারদিকে শুধু ঘুরপাক খাবে, না কি চাঁদের মাটিতে এক-বার পা ফেলে আসবে। অবতরণের উদ্দেশ্য যদি থাকে, নির্দিষ্ট দূরত্বের পর তার প্রচণ্ড গতিকে স্তিমিত করা দরকার। বিপরীতমুখী রকেটের শক্তি তখন কাজে লাগাতে হবে, কিন্তু এজন্য সময় এবং গতির যে নিখুঁত কার্য্যক্রম অনুসরণ করতে হয় তা ভাবলেও মন অভিভূত হয়ে আসে।

ফিরে আসার পথে আবার চাঁদের মহাকর্ষ অতিক্রম করার সমস্যা আছে, পৃথিবীর তুলনায় এ শক্তি অনেক কম, সেকেণ্ডে মাত্র ২·৩৫ কিলোমিটার। এই গতিতে আগন্তুক রকেট সহজেই চাঁদের আওতার বাইরে চ'লে আসবে।

পৃথিবীতে নামার সময় আবার এই উপায়, গতি-বেগকে সংযত করে নেওয়া। তবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল থাকায় (চাঁদে যা নেই) বিশেষ ধরণের প্যারাস্যুটের সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে। মহাকাশের প্রথম পথিক কোন্ পদ্ধতি যে নিয়েছিলেন সঠিক জানা যায় নি, দ্বিতীয় অভিযাত্রিক শেপার্ডের প্রত্যাবর্তন-পথ প্রথমে উলটো রকেট চালিয়ে নিয়ন্ত্রিত করা হয়, পরে প্যারাস্যুটে অবতরণ। এ সমস্ত সফল অভিযানের ফলে বিজ্ঞানের অনেক তাত্ত্বিক বিচার যে সত্যের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'ল, সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

জৈবিক বাধা

এ পর্য্যন্ত যে-সমস্ত সমস্যার কথা আমরা আলোচনা করলাম, তা হ'ল কঠিন জড়বস্তুর বিষয়ে। কিন্তু গ্রহ-যাত্রার পথে মানুষের সপ্রাণ জৈবিক দেহটিও এক দুস্তর বাধা। রহস্যময় এই পৃথিবী অত্যন্ত অনুকূল অবস্থার মধ্যে আমাদের জীবনের ছন্দকে টিঁকিয়ে রাখে, কিন্তু অসীম অনন্ত যে মহাকাশ তার এ বিষয়ে কোন দৃকপাত নেই। সেখানকার এক অজ্ঞাত উৎস থেকে অজস্রধারায় ছড়িয়ে থাকে যে মহাজাগতিক রশ্মি, তার প্রভাব বাতাসের সমস্ত স্তর ভেদ ক'রে সমুদ্রের জলের মধ্যেও ছড়িয়ে থাকে কয়েক শ মিটার। এই বিষাক্ত রশ্মি বায়ুহীন মহাকাশে অনেক প্রখর, তার জীবন-বিনাশী স্পর্শ থেকে মানুষকে সর্বদাই নিজেকে রক্ষা করার যত্ন নিতে হবে। রকেটের মধ্যে মহাকাশযাত্রীর কক্ষটি হবে সবদিক্ থেকে আবদ্ধ, গ্রহান্তরে নামার সময় বিশেষভাবে প্রস্তুত পোশাক তাকে প্রকৃতির প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করবে।

জলহীন বায়ুহীন স্থানের মানুষের প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিষের ব্যবস্থা পুরোপুরি করতে হবে। অফুরন্ত সরবরাহ নিয়ে চলা যখন সম্ভব নয়—নিশ্বাসে ফেলে দেওয়া কারবন-ডাই-অক্সাইড থেকেই আমরা অক্সিজেন টেনে নেব। দেহের বিপাক-ক্রিয়ায় যে সব জিনিষ পরিত্যক্ত হয় তাদের মধ্য থেকেই জলের অভাব পূর্ণ করতে হবে, খাওয়ার জন্য চাই বিশেষ খাদ্য—পুষ্টিকর অথচ পরিমাণে কম। এ সমস্ত অভিনব সমস্যার প্রতিটিরই নানাভাবে সমাধান হয়েছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা একসঙ্গে কাজ ক'রে যাচ্ছে, গ্রহান্তর-যাত্রার পথে মানুষের সমস্ত জ্ঞান এক জায়গায় এসে মিলিত হয়েছে।

জ্ঞানের যা শক্তি ক'রে যাচ্ছে। কিন্তু মানুষের দেহগত সীমা যে বারবার যাত্রাকে ব্যাহত করে! ক্রমবর্দ্ধমান গতিতে রকেট ওঠে এবং মন্দীভূত বেগে তাকে আবার নামানো হয়। অধিক গতিতে রকেট উল্কার মতই বাতাসের সংঘর্ষে জ্বলে যায়, কিন্তু রকেটবাহিত মানুষ গতি-পরিবর্তনের সাধারণ মাত্রাকেও যে সহ্য করতে পারে না। সমস্যা তাই জটিল হয়ে ওঠে, তবে মানুষ অনেক দিনের অভ্যাসে তার সহ্যের সীমানাকে বাড়িয়ে তুলতেও পারে। সমস্যাটি যে আর খুব বেশী প্রতিবন্ধক হয়ে নেই, গ্যাগারিনের সফল অভিযানই তার প্রমাণ। পৃথিবীর বুকে মানুষ ভারশূন্যতার কথা চিন্তা করতে পারে না, কিন্তু মহাকাশের যাত্রীকে সর্বক্ষণই এ অবস্থার সঙ্গে পরিচিত থাকতে হয়। অভিযাত্রী এজন্য আগে থেকেই কৃত্রিম ভারশূন্য অবস্থার মধ্যে থেকে নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নেবেন। আকাশের ৩০০ বা ১৮০ কিলোমিটার উপরে পৃথিবীর আকর্ষণ লোপ পাওয়ার কথা নয়, কিন্তু প্রথম মহাকাশযাত্রীরা ভারশূন্যতাই অনুভব করেছেন। অভিকর্ষ নিচের দিকে টানে, অথচ মহাকাশযান গতির প্রভাবে সে টান কাটিয়ে বাইরে ছুটতে চায়—এদিক্ ওদিক্ দু দিকের টানে রকেট তাই নিজের ওজন হারিয়ে ফেলেছে। অপরিচিত ভারশূন্য অবস্থা যে মানুষকে বিশেষ কাবু করতে পারে না, সফল মহাকাশযাত্রী তার অধিকন্তু সাক্ষী।

লক্ষ লক্ষ মাইল অতিক্রম করতে হবে। তবে চন্দ্র, তবে মঙ্গল গ্রহ। পথ অনন্ত। এর পদে পদে নানা সমস্যা। মানুষ এগিয়ে চলেছে। একদিন কল্পকথার রোমাঞ্চকর বিবরণের মধ্যেই সে তৃপ্তি খুঁজত। আজ সে-সমস্ত সহজ উত্তেজনা তার কাছে মিথ্যা হয়ে গেছে। অসীম মহাকাশ, তার মধ্যে সূর্য্য এবং তারাগুলি জ্বলছে—পৃথিবী ধাবমান, মানুষ এগিয়ে চলবে।

বীরভূমে সাঁওতাল বিদ্রোহ

শ্রীকালীপদ ঘটক

ভারতীয় আদিবাসীর সমাজের পক্ষ হইতে ব্যাপকতর ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রাম হিসাবে শতাধিক বর্ষ পূর্বে সংঘটিত সাঁওতাল বিদ্রোহের বিস্তারিত বিবরণ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিশেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ গণ-অভ্যুত্থানের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। সাঁওতাল ও পাহাড়িয়া অধ্যুষিত গভীর অরণ্য ও পর্বতসঙ্কুল সাঁওতাল পরগণার দামিন-ই-কো অঞ্চলে বিক্ষুব্ধ আদিবাসী-জাগরণকে কেন্দ্র করিয়া দেশব্যাপী যে দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটে তাহার ভৌগোলিক পরিধি নিতান্ত অল্প ছিল না। সাঁওতাল বিদ্রোহ সংক্রান্ত আমার পূর্বপ্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। সম্প্রতি বীরভূমের তৎকালীন অবস্থা ও সাঁওতাল বিদ্রোহের উপসংহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

বিদ্রোহ-কবলিত অন্যান্য অঞ্চলের মতই ১৮৫৫ সালের সমগ্র জুলাই মাস ধরিয়া বিদ্রোহিগণ বীরভূম জেলায় ব্যাপকভাবে লুণ্ঠন নরহত্যা ও নানারূপ অত্যাচার চালাইয়া যাইতে থাকে। বহু ইংরেজ সৈন্য ও সশস্ত্র সাঁওতাল বীরভূমের নানাস্থানে সম্মুখ সংগ্রামে হতাহত হয়। বর্ধমানের কমিশনার বাহাদুরের নিকট লিখিত বীরভূমের তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখের পত্র হইতে জানা যায়:

গত একপক্ষকালের মধ্যে উপর বান্ধা (তৎকালীন বীরভূম ও বর্তমান জামতাড়া মহকুমার অন্তর্গত) ও নাঙ্গুলিয়া থানার প্রায় ত্রিশখানারও অধিক গ্রাম লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইয়াছে। নগর-সংলগ্ন লাউজোড় হইতে পশ্চিমে প্রায় দেওঘর পর্য্যন্ত সমগ্র অঞ্চল বিদ্রোহীদের করতলগত। ডাক যাতায়াত বন্ধ হইয়াছে—গ্রামবাসিগণ সাঁওতালদের ভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে, গ্রামগুলি প্রায় জনশূন্য। বিদ্রোহিগণ দুইটি বৃহৎ দলে বিভক্ত হইয়া অভিযান চালাইতেছে। তাহাদের মোট সংখ্যা প্রায় ১২ হইতে ১৪ হাজারের কম নহে। চারিদিক্ হইতে বিদ্রোহীদল আসিয়া ক্রমশঃই তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে।

সিরু মাঝি নামক জনৈক সাঁওতালের নেতৃত্বে একটি বৃহৎ দল সিউড়ি অভিমুখে অগ্রসর হয়। তাহাদের ভয়ে গ্রামবাসিগণ ইতস্ততঃ লুকাইতে থাকে। উন্মত্ত সাঁওতালেরা তাহাদের ধরিয়া আনিয়া একে একে হত্যা করিতে থাকে। চন্দ্রপুর গ্রামের অধিবাসী রামধন মণ্ডল নামক এক ব্যক্তি ও তাহার পুত্রকে উক্ত গ্রামের ধর্মরাজ মন্দিরের খুঁটায় ফেলিয়া বলিদান দেওয়া হয়।

২০শে জুলাই তারিখে নারায়ণপুর গ্রাম আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হয়। অফজলপুর থানার দারোগা সাহেব গুলাম আলি খাঁর তৎপরতায় উক্ত গ্রামের জমিদার-ভবনটি কোনরকমে রক্ষা পায় এবং তাহার প্রতিদান স্বরূপ জমিদারের পক্ষ হইতে দারোগা সাহেবকে একটি তরবারি ও মূল্যবান্ একখানি শাল উপহার দিয়া সম্মানিত করা হয়। ২১শে জুলাই তারিখে বিদ্রোহীদল কাটনায় গিয়া উপস্থিত হইলে খাজুরির সর্দার ঘাটোয়াল অপর কয়েকজন ঘাটোয়াল ও গ্রামবাসিগণের সাহায্যে বিদ্রোহী দলকে বাধা দিতে সমর্থ হয়। ২২শে জুলাই তারিখে বিদ্রোহীরা গাঙ্গপুর লুণ্ঠন করিয়া নগর অভিমুখে ধাবিত হয় এবং সেখান হইতে ময়ূরাক্ষীর অপর তীরবর্তী কুমড়াবাদে গিয়া উপস্থিত হয়। মহাজন ও ব্যবসায়ী প্রধান উক্ত কুমড়াবাদ গ্রামে তাহাদের হত্যালীলা নিষ্ঠুরতার চরমে গিয়া পৌঁছে। রথের দিন উক্ত গ্রামের বহু লোককে হত্যা করিয়া তাহাদের ছিন্নমুণ্ডগুলি রথের চারিপাশে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। রথস্থ দেবতা বিক্ষুব্ধ আদিবাসীর প্রলয়ঙ্কর মূর্তি দেখিয়া নিজেই হয়ত সেদিন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন।

ময়ূরাক্ষীর উত্তর তীরবর্তী কুমড়াবাদ, পাটজোড়, মহম্মদবাজার, পরিহারপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্রোহের তীব্রতা ও ভয়াবহতা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আমরা মহম্মদবাজার অঞ্চল নিবাসী প্রত্যক্ষদর্শী জনৈক গ্রাম্য কবির রচিত একটি ছড়া-কবিতা এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ তারিখে কবি স্বহস্তে কবিতাটি নকল করিয়া বীরভূমের স্বনামধন্য সাহিত্যিক ৺শিবরতন মিত্র মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দেন। উক্ত কবিতাটি 'রতন লাইব্রেরী'র ২০৯৬ সংখ্যক পুঁথির অন্তর্ভুক্ত। পাঠক-পাঠিকাগণ লক্ষ্য করিবেন,

নিতান্ত গ্রাম্য ভাষায় সরল ও অনাড়ম্বর শব্দবিন্যাসে অভিনব ছন্দ-বৈচিত্র্যে কবি সাঁওতাল বিদ্রোহের কি অপূর্ব এক জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কবিতাটির কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত হইল।

সাঁওতাল বিদ্রোহ

যুন ভাই, বলি তাই, সভাজনের কাছে
সুভবাবুর হুকুম পেয়ে, সাঁওতাল ঝুঁকেছে।
বেটারা কোক ছাড়িল—
বেটারা কোক ছাড়িল, জড় হইল, হাজারে হাজার
কখন এসে কখন লাটে থাকা হল্য ভার।
হলো সব দুভ্যাবনা—
হলো সব দুভ্যাবনা, রাড় কান্দনা, সবাই ভাবে বসে
ঘড়া ঘটি মাটিতে পোতে কখন লিবে এসে।
বলে ভাই রাখিব কোথা—
বলে ভাই রাখিব কোথা, যেথা সেথা, এই কথা যুনি
রাখতে মোলুক সলা যুলুক ভাবতেছে কোম্পানী।
বেটাদের সক্তি শোনে—
বেটাদের সক্তি শোনে প্রজাগণে, কইছে ধীরে ধীরে
জিনিস ছেড়ে পালাও না ভাই সভাই থেক ঘরে।
আমাদের আছে গোরা—
আমাদের আছে গোরা, সাঙ্গিন চড়া, জামাজোড়া গায়
বন্দুকেতে গোলি পোরা ভুড়ুক স্বয়ার তায়।
বেটারা থাকে কোথা—
বেটারা থাকে কোথা, সর্ত্ত কথা, যুধায় তোমাদেরে
কেহ বলে দেখে এলাম মোরাক্ষির ধারে।
আছে সব জড় হয়ে—
আছে সব জড় হয়ে, পুর্ব্ব মুয়ে, তীর মারিছে গাছে
কত শত কর্মকার সঙ্গেতে এনেছে।
তিরের ফলি বনাইতে—
তিরের ফলি বনাইতে, বরাত মতে, জখন যেমন কয়
হাতে হাতে যোগাইছে ফলা পাছে টানা হয়।
বেটাদের পোষাক চড়া—
বেটাদের পোষাক চড়া, কপ্নী পরা, লইতে বেড়া বুকে
ভাড়ের উপর পুজা করে কোক ছাড়িছে মুখে।

... ...

বলে ভাই রাজা হব—
বলে ভাই রাজা হব, টাকা পাব, করিয়া মন্ত্রণা
দুদিন বাদে পুড়াইল গিয়ে নাঙ্গুলের থানা।
ঐ কথা যুনে—
ঐ কথা যুনে, সিফাইগণে, বন্দুক নিল হাতে
দারগা মুন্সির···সঙ্গে দেখা হইল পথে।
তখন সিফাই ঘেরা—
তখন সিফাই ঘেরা, সাঙ্গিন চড়া, কাপ্তান সহিত
নদীর উপান্তে আসি হইল উপনীত।
জত সব সিফাইগণে—
জত সব সিফাইগণে, ভাবে মনে, হয়ে স্থার স্থার
দেখে যুনে মোরাক্ষি উভয়ে না হয় পার।
তির বর্ষা তুয়ার আছে—
তির বর্ষা তুয়ার আছে, আপন সাজে, রন নাইখ বাজে
নদীর ধারে সাঁওতালরা লাগড়া বাজায় নাচে।
সেখানে সার্দ্দি কার—
সেখানে সার্দ্দি কার, পারাপার, দুকুল বহে বাণ
হাতেতে কিরিচ ধরে' দেখিছে কাপ্তান।
দেখিয়া বহুত সেনা—
দেখিয়া বহুত সেনা, কি মন্ত্রনা, করে দুইজনে
বন্দুক তুয়ার রাখ কহে সিফাইগণে।
দণ্ড চ্যার ছয় পরে—
দণ্ড চ্যার ছয় পরে, কয় হল্যদারে, যুফেদারের প্রিতি
লির্ণয় করিতে দুরপীনে আন সিঘ্র গতি।
বলে উঠিল গজে—
বলে উঠিল গজে, হাউদা মাঝে, নয়নে দুরপীন
ঝাড়ে ঝোড়ে আছে সাঁওতাল কোষ দুই তিন।

... ...

বলে সব মার মার—
বলে সব মার মার, ধর ধর, এই মাত্র রব
আজি সিহুড়ি জেলা লোটব গিয়ে করে পরাভব।
ভাব সব জেহাল খানা—
ভাব সব জেহাল খানা, দিব থানা, মুক্ত করিব চোরে
সুভবাবু রাজা হবেন জ্যাজ সাহেবকে মেরে।
আমরা ঘুচিব মাঝি—
আমরা ঘুচিব মাঝি, কাজের কাজি, মহুর করব বখ্যে
কৃষ্ণ শৌণ্ডর দোকান ভেঙ্গে সরাব খাব কশে।
আলি হুকুম পেয়ে—
আলি হুকুম পেয়ে, সিফাই যেয়ে, বন্দুক হাতে তোলে
পঞ্চাষ পঞ্চাষ গোলি মারে এক কালে।
জেমন তারা খসে—
জেমন তারা খসে, আশে পাশে, তেমনি গেল ছুটে
পিষ্টেতে বাজিয়া কারু পার হইল পেটে।

... ...

শুনে সব দুস্থ মনে—
শুনে সব দুস্থ মনে, পরদিনে, কৈল একাকার
জন্দি হইতে আনায় সাঁওতাল দ্বাদশ হাজার।
নাহিক মৃত্যুভয়—
নাহিক মৃত্যুভয়, সদা রয়, ধেনুকেতে চড়া
লগর মোকামে জেয়ে বাজায় নাগেড়া।
শুনে সব লোক পালাইল—
শুনে সব লোক পালাইল, বিসম হল্য, তামলি পুদ্যার
সতগোপ গোওলা পালায় কান্দে লয়ে ভার।
পালায় সব বুড়াবুড়ি—
পালায় সব বুড়াবুড়ি, দৌড়াদৌড়ি, হাতে লয়ে লড়ি
মস্তলমান ফকির পালায় মুখে পাকা দাড়ি।
মুখেতে বলে আল্যা—
মুখেতে বলে আল্যা, বিষমল্যা, এ কি বেটাদের তির
এ বিপদে রক্ষা করহে সর্ব্বপ্রির।
বলে প্রাণ জায়—
বলে প্রাণ জায়, হায় হায়, কি বিপদ হইল
কালু সেখের মা কেন্দে বলে আমার মরিগ কোথা গেল।

... ...

পূর্ব্বে হনুমান—
পূর্ব্বে হনুমান, লঙ্কাখান, জেমতে পোড়ায়
ঘরাঘরি অগ্নি দিয়ে সাঁওতাল বেড়ায়।
ঐ গ্রাম নিবাস—
ঐ গ্রাম নিবাস, সাধু দাশ, তার সঙ্গে জনা চারি
সিহুড়ি আসি জজ্যের কাছে বলছে বিনয় করি।
আরত্য প্রাণ বাঁচে না—
আরত্য প্রাণ বাঁচে না, কি মন্তনা, কহ্যেন হুজুর বস্তে
ঘর কর্ন্যা পুড়ায়ে আমার ভাইকে কাটলে সেষে।
সিঘ্র উপায় কর—
সিঘ্র উপায় কর, সাঁওতাল মার, রাখ প্রজাগণ
টাঙ্গির চোটে মোলুক কেটে পতিত কল্যে বোন।
সাহেব ওস্তামনে—
সাহেব ওস্তামনে, সিফাইগণে, বলয়ে বচন
অতি সিঘ্র জাও তোমরা কর গিয়ে রণ।
কথা শুনে তখন—
কথা শুনে তখন,জত সিফাইগণ, বন্দুক হাতে লিল
রাতারাতি সিফাইগণ কুমড়াব্যাদকে গেল।
যুর্দ্ধ যেই মতে—
যুর্দ্ধ যেই মতে, বিস্তারিতে, হবে বহুত ক্ষণ
আকাশের চাঁদ কোথা ধরয়ে বামন।
বেটারা ধেনুক ধরে—
বেটারা ধেনুক ধরে, তির মারে, করে মার ২
সঙ্গেতে কুকুর আছে হাজারে হাজার।
সাহেব হুকুম দিলে—
সাহেব হুকুম দিলে, ফয়ের বলে, যুনে সিফাইগণ
হাজারে হাজারে সাঁওতাল মারে ততক্ষণ।
অমনি ভগড়্যা হয়ে—
অমনি ভগড়্যা হয়ে, পূর্ব্ব মুয়ে, পালাইয়া যায়
পাটজোড় মোকামে আসি নাগড়া বাজায়।
লাগড়ার সব্দ শুনে—
লাগড়ার সব্দ শুনে, সর্ব্বজনে, পালায় সর্ত্তরে
জনা দষ বাগিডে গোওাল সেই দিনেতে মারে।
লোকের কি জন্তনা—
লোকের কি জন্তনা, কি লর্ঞ্জনা, কল্যেরে সাঁওতালে
কত গর্ভবতি রাস্তায় পুসুবিল ছেলে।
এমনি সর্ব্বস্তরে—
এমনি সর্ব্বস্তরে, লোট করে, বেড়ায় সাঁওতাল
মনিস্ত কা কথা দেবতা পালান গোপাল।
ভাগ্নিবোন ছেড়ে—
ভাগ্নিবোন ছেড়ে, পালান দোড়ে, পুস্কুরির মাথায়
বিরসিংহপুরের কালিমাএর বলিহারি জাই।
১২৬২ বারষ বাসষ্ঠী সাল—
বারষ বাসষ্ঠী সাল, বরসা কাল, বানের বড় বির্দ্ধি
আন্ধারপুরে মানুষ কেটে কল্যে গাদাগাদি।
কাটিলে বিষ্ণুপুরে—
কাটিলে বিষ্ণুপুরে, হারা তাঁতিরে, প্রিয়েমুলার-মাঠে
বিপন গোপকে তিরিয়ে মারলে পখুরের ঘাটে।
লোটালে কুলকুড়ি—
লোটালে কুলকড়ি, দৌড়াদৌড়ি, লাগড়া দেয় সেশে
দেবু রায়কে তেড়ে ধল্যে আখবাড়িতে এশে।

... ...

রাই কৃষ্ণদাশে ভনে—
রাই কৃষ্ণদাশে ভনে, সংক্ষেপনে, কিছু লেখা হল্য
বিস্তার লিখিতে হল্যে অনেক বাহুল্য।
কাএস্ত কোলে জন্ম মোর রাই কৃষ্ণদাশ
কুলকুড়ি গ্রামে মোর হয় জে নিবাষ।
জেলা বিরভুম তাহে নোনি পরগনা
লাট রাম নাম তাহে নাঙ্গুলের থানা।

... ...

১২৬২ বারষ বাশষ্টী সাল—
বারষ বাশষ্টী সাল, এই গোলমাল, বড় ভাবনা মনে
কুলকুড়ি লোট হয় ২৩ শ্রাবনে।

বীরভূম অঞ্চলে সে সময় অনেক ইংরেজ ব্যবসায়ী নীলকুঠি ও রেশমের কুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ সাঁওতালদের হাতে নিহত হন এবং অনেকেই প্রাণভয়ে কুঠি ছাড়িয়া নৌকাযোগে অন্যত্র পলায়ন করেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত সিক্ত মাঝি প্রায় ৫।৭ হাজার সাঁওতালের একটি দল লইয়া সিউড়ি হইতে মাত্র ছয় মাইল পশ্চিমে পরিখা খনন করিয়া ইংরেজ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। উক্ত অঞ্চলে সিক্ত মাঝি ব্যাপক একটা সন্ত্রাসের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য।

বীরভূমের উত্তর ও পশ্চিম দিক্ হইতে সিউড়ি আক্রমণের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা দেয়। ইংরেজ সৈন্যগণ অতি তৎপরতার সহিত বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া বিদ্রোহীদের উৎখাত করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। বীরভূমের তদানীন্তন অস্থায়ী কালেকটার মিঃ রিচার্ডসনের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে ২০শে জুলাই হইতে ৩০শে জুলাই পর্য্যন্ত তিনি বীরভূমে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান চালাইবার জন্য ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মিঃ মরিসের অধীন ৫৬ এন.আই. দলভুক্ত একদল সৈন্যকে ২০শে জুলাই তারিখে সিউড়ি হইতে ৭ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত ময়ূরাক্ষী তীরবর্ত্তী নাঙ্গুলিয়া নামক গ্রামে প্রেরণ করা হয়। মিঃ মরিসকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়, তিনি যেন বিদ্রোহীদের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং তাহারা যেন কোনমতেই ময়ূরাক্ষী নদী পার হইয়া সিউড়ি অভিমুখে অগ্রসর হইতে না পারে।

সিউড়ি হইতে ১৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত তদানীন্তন বীরভূমের রাজধানী নগর আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় ২১শে জুলাই তারিখে মিঃ রিচার্ডসন লেঃ রাইক্‌স্ ও পূর্ব্বোক্ত দলের কতকগুলি সৈন্যসহ সেইদিনই বেলা দুইটার সময় নগরে গিয়া সদলবলে উপস্থিত হন। মিঃ মরিস নাঙ্গুলিয়া হইতে সংবাদ পাঠান যে অবিলম্বে আরও কতকগুলি সৈন্য পাঠাইয়া তাঁহাকে সাহায্য করা না হইলে তিনি সত্বর সিউড়ি ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইবেন। মিঃ রিচার্ডসনকে নাঙ্গুলিয়ার ব্যবস্থা করিবার জন্য নগর হইতে সিউড়ি ফিরিয়া যাইতে হয়। মিঃ মরিস সিউড়ি হইতে সৈন্য পাঠাইবার জন্য প্রতীক্ষা পর্য্যন্ত না করিয়া সিউড়ি অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে থাকেন। লেঃ ডিলুম্যেন আরও কতকগুলি সৈন্য লইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য পূর্ব্বেই রওনা হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে উভয়ের সাক্ষাৎ হওয়ায় মিঃ মরিস লেঃ ডিলুম্যেন সহ পুনরায় নাঙ্গুলিয়ায় ফিরিয়া যান। মিঃ রিচার্ডসন নগর ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় মিঃ রাইক্‌সকে নির্দ্দেশ দিয়া যান যে, বিদ্রোহীরা নগর আক্রমণ করিলেও যতক্ষণ অতিরিক্ত সৈন্য আসিয়া না পৌঁছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত মিঃ রাইক্‌স্ যেন বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ না করিয়া শুধু আত্মরক্ষামূলক প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। মিঃ রাইক্‌স্ সে উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া নগর হইতে তিন চারি মাইল দূরে সমবেত এক সাঁওতাল দলকে মাত্র ৩১ জন সিপাহী লইয়া আক্রমণ করেন। বিদ্রোহীরা পলায়ন করে, কিন্তু যাইবার সময় দুইখানি গ্রাম তাহার জ্বালাইয়া দিয়া যায়। মিঃ রাইক্‌স্ ফিরিবার সময় দেখিতে পান যে প্রায় দুই-তিন হাজার সাঁওতাল নগরের সন্নিকটবর্ত্তী গাঙমুড়ি গ্রাম আক্রমণ করিয়াছে। তিনি গুলীবর্ষণ আরম্ভ করিলে বিদ্রোহীদল ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়।

নগর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মিঃ রাইক্‌স্ দেখিতে পান যে, বিদ্রোহীদল সেখানেও হানা দিয়াছে। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে নগর আক্রান্ত হইয়াছে এবং বিদ্রোহীরা তাঁহার সুবাদারকে আক্রমণ করিয়া স্থানত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছে। মিঃ রাইক্‌স্ উপায়ান্তর না দেখিয়া আত্মরক্ষার জন্য নগর রাজবাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিদ্রোহীদল সমগ্র নগরব্যাপী অবাধ লুন্ঠন চালাইয়া যাইতে থাকে। দুইদিন যাবৎ নগর প্রায় অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল। অতঃপর নগর রক্ষার জন্য সৈন্য পাঠানো অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। মিঃ টুলমিনের অধীন ২৫ জন ও সার্জ্জেণ্ট মেজরের অধীন ৪০ জন সিপাহী গিয়া তাহাদের সমবেত প্রচেষ্টায় ২৩শে জুলাই তারিখে নগর রাজপ্রাসাদে অবরুদ্ধ মিঃ রাইক্‌সকে কোন রকমে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়।

নাঙ্গুলিয়ার ঘটনা। নাঙ্গুলিয়ায় প্রায় দুই হাজার সাঁওতালের সহিত ২০শে জুলাই তারিখে ইংরেজ সৈন্যের প্রবল সংঘর্ষ বাধে। বিদ্রোহিগণ ময়ূরাক্ষী নদী পার হইয়া লেঃ ডিলুম্যেনের শিবির আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। পঁয়ত্রিশ জন সুশিক্ষিত ইংরেজ সৈন্য লইয়া লেঃ ডিলুম্যেন বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হন এবং অবিলম্বে আরও কিছু সংখ্যক সৈন্য আসিয়া মিঃ ডিলুম্যেনের শক্তি বৃদ্ধি করে। মিঃ মরিসকেও তাঁহার সাহায্যার্থে আহ্বান করা হয়। প্রথম দিকে বিদ্রোহীদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। হঠাৎ তাহারা লেঃ ডিলুম্যেনের শিবিরের নিকট নাগরা (নাকাড়া) বাজাইতে আরম্ভ করিলে সঙ্গে সঙ্গে আরও প্রায় আটশত সাঁওতাল চারিদিক্ হইতে ছুটিয়া আসিয়া বিদ্রোহীদের সহিত মিলিত হয়। সাঁওতালদের সমষ্টিগত এই বৃহৎ দলটি ইংরেজ সৈন্যের

উদ্দেশে তরবারি আস্ফালন করিতে থাকে এবং অবিলম্বে চারিদিক্ হইতে ইংরেজ সৈন্যের উপর তীর নিক্ষেপ সুরু হইয়া যায়। লেঃ ডিলুম্যেন তাঁহার সৈন্যদলকে গুলী চালাইবার আদেশ দেন। প্রায় দশ মিনিটকাল গুলী-বর্ষণের পর বিদ্রোহীদল ছত্রভঙ্গ হইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ময়ূরাক্ষী অভিমুখে ধাবিত হইয়া নদী পার হইয়া পলায়নের চেষ্টা করে। লেঃ ডিলুম্যেনের সৈন্য-বাহিনী তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ক্রমাগত গুলীবর্ষণ করিতে থাকে। ফলত প্রায় দুইশত সাঁওতাল আহত ও নিহত অবস্থায় জলমগ্ন হইয়া ময়ূরাক্ষীর প্রবল বন্যায় ভাসিয়া যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের মাত্র ৬১টি মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায়।

অতঃপর নাঙ্গুলিয়া হইতে লেঃ ডিলুম্যেনকে সৈন্যদলসহ সিউড়ি ফিরিবার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। নগর রক্ষার জন্য ইতিপূর্বেই সৈন্য পাঠানো হইয়াছিল, সুতরাং সিউড়ি শহর রক্ষার জন্য সে সময় মাত্র ২৭ জনের অধিক সৈন্য মোতায়েন রাখা সম্ভবপর হয় নাই। লেঃ টুলমিন ২৬শে জুলাই তারিখে সংবাদ পান যে, নগর হইতে ৮ মাইল উত্তরে বাঁশকুলি ও বিন্দাবনী গ্রামে বিদ্রোহীরা অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করিতেছে। লেঃ টুলমিন লেঃ টুকুস্‌কে খয়রা-সোল হইতে অবিলম্বে রওনা হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবার আদেশ দেন। লেঃ রাইকৃস্ ১০৬ জন সৈন্যের একটি দল লইয়া সিউড়ি হইতে ছয় মাইল দূরে গিয়া উপস্থিত হন। বৃহৎ একটি নালা পার হইয়া হঠাৎ তাঁহারা আট হাজার সাঁওতালের এক বিরাট্ বাহিনীর সম্মুখে গিয়া পড়েন এবং কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে গুলী চালাইতে আরম্ভ করেন। মিঃ টুলমিনের এই হঠকারিতার ফল শুভ হয় নাই। গুলী চালনার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্ত হায়েনার মত আট হাজার সশস্ত্র সাঁওতাল ইংরেজ সৈন্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। বিপর্য্যস্ত ও বিধ্বস্ত সিপাহীদল উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রাণভয়ে যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করে। লেঃ টুলমিন ১৩ জন ইংরেজ সৈন্যসহ বিদ্রোহীদের হাতে শোচনীয় ভাবে নিহত হন। এই যুদ্ধে ইংরেজের আগ্নেয়াস্ত্রে তিনশত সাঁওতালের জীবনান্ত ঘটে।

সিউড়ির কয়েক মাইল পশ্চিমে সিরু মাঝির ঘাঁটি স্থাপনের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সাঁওতালদের এই ভীতিকর সমাবেশ সিউড়ি অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য।

ইতিমধ্যে বর্ষাকাল অতিক্রান্ত হইয়াছে। দিকে দিকে শরতের পদধ্বনি। পৃথিবী ঠিক আগের মতই মেঘমুক্ত আকাশের নীচে রূপে রঙে ঝলমল করিতেছে। বীরভূমের বর্ষাবিধৌত বনান্ত ভূমি ও নদী-গিরি-প্রান্তরে সুদূর-বিথারী শরফুল ও কাশপুষ্পের শ্বেত সমারোহ। শেফালীঝরা শ্যামল তৃণে কাহার যেন পায়ের চিহ্ন; বৎসরান্তে শরৎ আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। কাহারও মুখে কিন্তু এতটুকু হাসি নাই। শারদীয়া আবাহনের নাই কোন প্রস্তুতি। আকাশে বাতাসে কি যেন একটা করাল অমঙ্গলের ছায়া, মহামারীর নিষ্ঠুর সঙ্কেত। গ্রামের পূজামণ্ডপে এবার হয়ত আর সানাই বাজিবে না, ভীতি-গ্রস্ত ঋত্বিক ব্রাহ্মণের দল বোধনের মন্ত্র বুঝি ভুলিয়া গিয়াছে।

এই অবস্থায় হঠাৎ সংবাদ পাওয়া গেল, সিরু মাঝি পরিচালিত বিদ্রোহীদল মহাসমারোহে দুর্গোৎসবের আয়োজন করিতেছে। নিম্নশ্রেণীর বহু হিন্দু সে সময় বিদ্রোহীদলে যোগদান করিয়াছিল। তাহাদের সহিত একযোগে বিদ্রোহী সাঁওতালগণ দুর্গোৎসব অনুষ্ঠানে বিশেষ উৎসাহের সহিত অংশ গ্রহণ করে। আনুষ্ঠানিক দিক্ হইতেও কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতির অবকাশ রাখা হয় নাই। নাঙ্গুলিয়া থানার একটি গ্রাম হইতে বলপূর্ব্বক দুইজন পূজারী ব্রাহ্মণকে ধরিয়া আনিয়া তাহাদের পৌরোহিত্যে দুর্গোৎসব অনুষ্ঠান যথারীতি সম্পন্ন করা হয়।

ইতিমধ্যে আর একটি দুঃসংবাদে সিউড়ির অধিবাসিগণ অতিশয় ভীতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। বিদ্রোহী-দল কর্তৃক দেওঘর হইতে সিউড়িগামী ডাক পথিমধ্যে লুণ্ঠিত হয়। ডাকবাহক অর্দ্ধমৃত অবস্থায় তিনটি শালপত্রসহ একটি শালবৃক্ষের শাখা লইয়া সিউড়ি আসিয়া উপস্থিত হয়। বিবরণে প্রকাশ, বিদ্রোহিগণ পথিমধ্যে ডাকবাহককে আক্রমণ করিয়াছিল। শুধু এই সর্ত্তে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে যে সে যেন সিউড়ি পৌঁছিয়া শালপত্রের নিগূঢ় সঙ্কেত সকলের মধ্যে প্রচার করিয়া দেয়। সাঁওতালদের "ডাল ফেরানো" পদ্ধতি অনুসারে তিনটি শালপত্রের সঙ্কেত হইল তিনদিন, অর্থাৎ বিদ্রোহীরা তিনদিন পর সিউড়ি শহর আক্রমণ করিবে। এই সংবাদ ঝড়ের বেগে চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং জনসাধারণ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া দলে দলে শহর ত্যাগ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে সাঁওতালদের পক্ষে সিউড়ি আক্রমণ করা সম্ভবপর হয় নাই, তৎপূর্বেই তাহারা অপর

একটি দলের সহিত মিলিত হইবার জন্ত সংগ্রামপুর রণ-ক্ষেত্র অভিমুখে রওনা হইয়া যায়।

উপক্রত অঞ্চলে সামরিক আইন জারি হওয়ার পর ইংরেজ সৈন্যগণের উৎসাহ ও উদ্দীপনা দ্বিগুণতর বাড়িয়া যায় এবং পূর্ণোদ্যমে তাহারা বিদ্রোহ দমনে তৎপর হইয়া উঠে। জেনারেল লয়েড ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বার্ডের নেতৃত্বে প্রায় চতুর্দ্দশ সহস্র ইংরেজ সৈন্সের বিরাট্ এক বেষ্টনী রচনা করিয়া বিদ্রোহীগণকে পশ্চাৎগামী করিতে করিতে ক্রমশই তাহাদের স্বল্পায়ত একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলা হয় এবং চারিদিক্ হইতে তাহাদের উপর প্রবল বেগে আক্রমণ চালান হইতে থাকে। বহু সাঁওতাল ইংরেজসৈন্সের আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হইয়া গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ও দামোদর নদ অতিক্রম করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাদের পলায়ন-পথ রুদ্ধ করিয়া সুকৌশলে রচিত উক্ত সৈন্স-বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলা হয়। অবশেষে দামিন-ই-কোর বিদ্রোহী সাঁওতাল এইভাবে বেড়াজালে বন্দী হইয়া অতি শোচনীয় ভাবে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম প্রায় শেষ পর্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছে।

এইভাবে ভয়াবহ এই সাঁওতাল বিদ্রোহ বহুলাংশে প্রশমিত হওয়ার ফলে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী তারিখে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয়। সামরিক আইন প্রত্যাহৃত হইবার পরও স্থানে স্থানে বিদ্রোহীরা পুনরায় সক্রিয় হইয়া উঠে। তাহাদের সম্পূর্ণ দমন করিতে আরও কিছু সময় লাগিয়াছিল। ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে জামতাড়ার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত উপর বান্ধা নামক স্থানে বিদ্রোহী নেতা কানু সর্দ্দার ধরা পড়ে এবং কয়েকদিনের মধ্যেই তাহার ফাঁসী হইয়া যায়। সিধু সর্দ্দারকে বন্দী করিয়া তাহার গ্রাম সংলগ্ন বারহেট বাজারে ধরিয়া লইয়া যাওয়া হয় এবং বহু সাঁওতাল ও অন্তান্য গ্রামবাসীদের সম্মুখে সাঁওতালদের প্রিয় 'পণ্টিন সাহেব' মিঃ পণ্টেট সিধুকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিবার ব্যবস্থা করেন। নিরস্ত্র ও নিরুপায় সমবেত সাঁওতাল-গণের সেদিন আর কিছু করিবার ছিল না, তাহাদের প্রিয় নেতা সিধুসর্দ্দারের মর্ম্মান্তিক মৃত্যু-উৎসবে সেদিন তাহারা নির্ব্বাক্ দর্শক মাত্র। সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রধানতম অধিনায়ক সাঁওতাল বীর সিধু সর্দ্দার যে কারণে এবং যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য দিয়া সেদিন ইংরেজের হাতে এই ভাবে শোচনীয় মৃত্যু বরণ করিতে বাধ্য হইয়া-ছিল, তাহার সম্পূর্ণ ইতিকথা ও নিরপেক্ষ ইতিহাস আদৌ এ পর্য্যন্ত রচিত হইয়াছে কিনা সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

অতঃপর সিধু ও কানুর সহযোগী অপরাপর মুখ্য ও নেতৃস্থানীয় বিদ্রোহীদিগকে বন্দী করিয়া সিউড়ি শহরে লইয়া যাওয়া হয় এবং সিউড়ির দক্ষিণ উপকণ্ঠে উন্মুক্ত ময়দানে সর্ব্বজন সমক্ষে একে একে তাহাদের ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। তাহাদের অন্তান্ত আরও বহু অনুচরকেও অনুরূপ ভাবে ফাঁসীকাষ্ঠে মৃত্যুবরণ করিতে হইয়াছিল। বিচারে বহু সাঁওতালকে দীর্ঘমেয়াদী সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে বিদ্রোহীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া এই ভাবে ইংরেজ সরকার দীর্ঘ আট মাস কাল পরে বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হন। প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৬ সালের শীতঋতুর অবসানে সাঁওতাল বিদ্রোহের সম্পূর্ণ পরিসমাপ্তি ঘটে।

আমরা কৌতূহলী পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত বিদ্রোহ সংক্রান্ত একটি বিচার বিবরণী এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। সাঁওতাল পরগণার ডেপুটি কমিশনার মহোদয়ের রেকর্ড অফিসে রক্ষিত পুরাতন ফাইলের একটি নথি হইতে জানা যায় যে, সাঁওতাল পরগণার কমিশনার বাহাদুর উক্ত নথি-ভুক্ত মামলায় সংশ্লিষ্ট এক বিদ্রোহীদলের বিচার করিয়া-ছিলেন—আলোচ্য মামলায় অপরাধীর মোট সংখ্যা ছিল ২৫৩ জন। তন্মধ্যে দুইজন রাজসাক্ষী হিসাবে সরকারকে মামলা পরিচালনায় সাহায্য করিয়াছিল। বাকি ২৫১ জনের মধ্যে সাঁওতালের সংখ্যা ছিল ১৫১ জন, ডোম ৫ জন, নোয়া ৩৪ জন, ধাঙড় ৬ জন, কোল ৭ জন, গোয়ালা ১ জন, ভূঁইয়া ৬ জন ও রাজোয়ার ১ জন। ৫২টি বিভিন্ন গ্রাম হইতে তাহাদের গ্রেপ্তার করা হয়। তিন জনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল, এবং বিচারে অপরাপর আসামী-দের সকলকেই লুণ্ঠন ও নরহত্যার অপরাধে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত করা হয়। এই মামলায় কয়েকজন বিচক্ষণ এসেসর (তন্মধ্যে দুইজন সাঁওতাল) নিযুক্ত করা হইয়াছিল। উপরি উক্ত ২০৮ জন বিচারাধীন বন্দীর মধ্যে ৯।১০ বৎসর বয়স্ক বালকের সংখ্যা ছিল ৪৬ জন। তাহাদিগকে শিক্ষায়তনের পদ্ধতি অনুসারে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং তাহাদের প্রত্যেককে চার দিনের পরিমিত খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে দিয়া তাহাদের স্ব স্ব গ্রামে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। অবশিষ্ট বন্দীদের সকলকেই অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে ৭ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল। মির্জ্জা মাঝি নামক জনৈক সাঁওতালকে লুণ্ঠনকারীদের দলপতি

ও কুমড়াবাদ গ্রামের অধিবাসী তিন ব্যক্তির হত্যাকারী বলিয়া বিচারে সাব্যস্ত করা হইয়াছিল।

সাঁওতাল বিদ্রোহের ফলে শুধু এইটুকুই লাভ হইয়াছিল যে অতঃপর ইংরেজ সরকার সাঁওতালদের অভাব অভিযোগ ও তাহাদের বিরূপ মনোভাবের কারণ সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের অনুকূলে কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। বিদ্রোহ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি অনুসন্ধানের পর কর্তৃপক্ষের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে দামিন-ই-কোর দুর্বল শাসন-ব্যবস্থা ও নিপীড়িত সাঁওতাল সমাজের প্রতি ইংরেজ সরকারের চরম ঔদাসীন্যই সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রধান কারণ। অবিলম্বে শাসন-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন অত্যাবশ্যক বলিয়া কর্তৃপক্ষগণ মনে করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে দামিন-ই-কোর সহিত বীরভূম ও ভাগলপুর জেলার কিয়দংশ সংযুক্ত করিয়া ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৩৭ আইন অনুসারে সাঁওতাল পরগণা নামে একটি পৃথক্ জেলার সৃষ্টি হয়। ভাগলপুরের কমিশনারের অধীন একজন ডেপুটি কমিশনারের উপর সাঁওতাল পরগণার শাসনভার ন্যস্ত করা হয়। প্রাক্তন সহকারী স্পেশাল কমিশনার ও বাংলার ভবিষ্যৎ লেঃ গভর্ণর অনারেবল্ মিঃ এ্যাশ্লি ইডেন (পরে স্যার) নবসৃষ্ট সাঁওতাল পরগণা জেলার প্রথম ডেপুটি কমিশনার।

পরে তিনি পদত্যাগ করিলে (১৮৫৬) মিঃ রির্ভাস্ টম্সন্ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া সাঁওতাল পরগণার শাসনভার গ্রহণ করেন।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জমিজমার খাজনা বৃদ্ধি ও ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে লোকগণনা উপলক্ষ্য করিয়া সাঁওতালদের মধ্যে আর একবার প্রবল বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের ভাব দেখা দিয়াছিল কর্তৃপক্ষ অতি তৎপরতার সহিত সাঁওতালদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া তাহাদের অভিযোগ সম্বন্ধে যথাবিহিত ব্যবস্থা ও প্রতিকার করা হইবে, এই প্রতিশ্রুতি দিয়া কোন রকমে তাহাদের শান্ত করিতে সমর্থ হন।
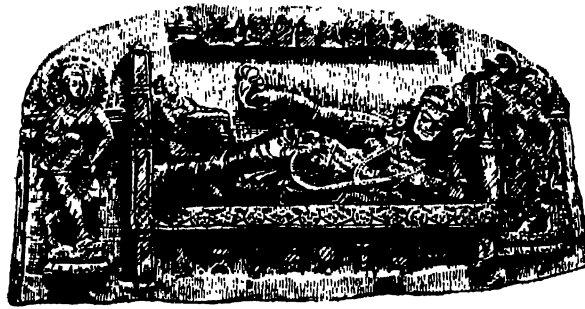
স্তব্ধ প্রহর

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

চোদ্দ

এখানে আছে জেনে এসেছেন?

দুজনের মধ্যে বয়স যার একটু বেশী সেই বধূটিই বিস্ময়টা প্রকাশ করলেও প্রথমে দুজনেরই কেমন একটু অস্বস্তি দেখা যায়। পরস্পরের দিকে তাদের মুখ চাওয়া-চাওয়িটুকুও শোভনার দৃষ্টি এড়ায় না।

বয়স্কা বধূটি তার পর গলায় বেশ একটু ঝঙ্কার দিয়ে বলে, কেমন ক'রে জানলেন এখানে আছে? এই ত আমরা তিন ঘর এখানে আছি দেখতে পাচ্ছেন! সেদিন যার নাম করছিলেন সে নামের কোন মানুষই এখানে নেই। থাকলে মিথ্যে বলব কেন? আমরা কি চোর-ছ্যাঁচড় না জাল-জোচ্চোর?

প্রতিবাদ করবার মত কথা। শোভনা কোন জবাব না দিয়ে তবু নীরব হয়েই থাকে। যা সে চায় তা বাদ-প্রতিবাদে হবার নয়—সে বুঝেছে।

তার নীরবতা কিছুটা সফলও হয়। দ্বিতীয় বধূটি একটু যেন সহানুভূতির সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করে, যাকে খুঁজছেন সে কে হয় আপনার?

এ প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেওয়া সেই মুহূর্তে শোভনার পক্ষে একটু বুঝি অস্বস্তিকর হ'ত, কিন্তু বয়স্কা বধূটির ঝাঁঝালো ধমকের দরুণ সে তখনকার মত রেহাই পায়।

তুই থাম্ ত চপলা! বয়স্কা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—কেউ হয় ব'লে খোঁজ করতে এসেছে না কি? শুনলি না এরা সব সরকারের চর। কে কোথায় সরকারী টাকা ফাঁকি দিয়ে নিচ্ছে মিথ্যে নাম ঠিকানা লিখিয়ে, তাই এসেছে খোঁজ করতে। আসল কাজের বেলা অষ্টরম্ভা শুধু ভাল মানুষদের হায়রাণ করতেই জানে।

চপলাই কিন্তু মৃদু প্রতিবাদ জানায় এবার—আমার কিন্তু তা বিশ্বাস হয় না রাণীদি! সে রকম খোঁজ করতে থানা-পুলিসের লোক আসবে না!

তুই যেমন বোকা গাঁইয়া! রাণীদি চপলার নির্বুদ্ধিতাকে ভৎ'সনা ক'রে বলে, ক'দিন আর এসেছিস যে এখানকার হাল চাল বুঝবি? চেহারা পোশাক দেখে এখানে মানুষ চেনা যায়? থানা-পুলিসের লোক কি জানিয়ে শুনিয়ে আসে না কি? কত তাদের ভোল!

চপলা ও রাণীদির আলোচনাটা কোন্ দিকে এর পর যেত বলা যায় না। শোভনাই এবার তাতে বাধা দিয়ে মৃদু হেসে জানায়—আমি সত্যিই থানা পুলিস বা সরকারের কেউ নয় কিন্তু। আমি নিজের গরজেই একজনের খোঁজ করতে এসেছি।

রাণীদি আবার বুঝি কি বলতে যাচ্ছিল, শোভনা তাকে সে সুযোগ না দিয়ে তার পর বলে, আমি যার খোঁজ করতে এসেছি, নিজের চোখে সেদিন তাকে এখানে দেখে গেছি!

নিজের চোখে দেখেছেন? চপলার গলায় ও মুখের ভাবে বিস্ময়ের চেয়ে কেমন একটা আশঙ্কাই এবার ফুটে ওঠে।

হ্যাঁ। শোভনা শান্ত স্বরে বলবার চেষ্টা করে—সেদিন সেই বাঁশের পোল পার হবার সময় একবার ফিরে তাকিয়ে তাকে আমি দেখতে পাই। বলতে আমার খারাপ লাগছে কিন্তু আমরা যখন এখানে এসে খোঁজ করছিলাম তখন সে এইখানেই কোথাও লুকিয়ে ছিল ব'লে সন্দেহ হচ্ছে।

রাণীদি বা চপলা কারুর মুখেই এখন কথা নেই। চপলার মুখ ত রীতিমত বিবর্ণ দেখায়।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কম্পিত কণ্ঠে সে-ই জিজ্ঞাসা করে, আপনি ঠিক দেখেছিলেন ত? সেদিন—সেদিন—

কথাটা শেষ করতে চপলা আর পারে না। আশঙ্কায় আবেগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।

শোভনার মনের ভেতরও কেমন ক'রে যেন সব ওলট-পালট হয়ে যায়। এই অচেনা সরল দরিদ্র গ্রাম্য মেয়েটির ভয় ভাবনার সঠিক কারণ সে জানে না তবু কি একটা অস্পষ্ট সন্দেহ তীব্র ক্ষণিক বিদ্যুৎময় যন্ত্রণায় সমস্ত হৃদয় যেন বিদীর্ণ ক'রে দিয়ে যায়। মৌন কাতর মুখে সে চপলার দিকে চেয়ে থাকে। তারও কথা বলার শক্তি যেন লোপ পেয়েছে।

এই অস্বস্তিকর স্তব্ধতা রাণীদিই ঝঙ্কার দিয়ে ভাঙে—

তোর হ'ল কি চপলা! কোথাকার কে কি বললে না বললে তাতেই চোখে একেবারে অন্ধকার দেখলি?

শোভনাকে উদ্দেশ ক'রে রাণীদি তার পর সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে—যাকে খুঁজছেন তাকে ত নিজের চোখেই দেখেছেন বলছেন। মানলাম ঠিকই দেখেছেন, কিন্তু থানা পুলিস থেকে যখন আসেন নি তখন এত খোঁজা-খুঁজি কিসের জন্যে? কি জন্যে তাকে খুঁজছেন শুনি?

সব চেয়ে কঠিন মুহূর্ত বুঝি এই।

কি জবাব দেবে শোভনা? যা বলা উচিত, যা বলবার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে আজ এখানে এসেছে, সব কি চপলার মুখের দিকে চেয়েই তার গলায় আটকে যায়?

চপলা তার সন্তানটিকে কোলের কাছে ধ'রে কাতর বিবর্ণ-মুখে তীক্ষ্ণ উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। সে দৃষ্টিতে মনের মধ্যে দুঃসহ একটা জ্বালার সঙ্গে অসীম একটা করুণাও অনুভব করে শোভনা।

নিজের মনটা স্থির করবার সময় নেবার জন্যেই শোভনা কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বলে, দেখুন, আপনাদের হয়ত মিছিমিছিই বিরক্ত করছি। দূর থেকে এক মুহূর্তের দেখায় হয়ত আমারই ভুল হয়েছে। তাই কি জন্যে খুঁজছি বলার আগে সত্যিই সেদিন এখানে কেউ ছিলেন কি না এবং থেকেও আমাদের সামনে বার হন নি কি না জানতে চাইছি।

রাণীদি ও চপলা দু'জনেই এবার কিছুক্ষণ চুপ।

তার পর চপলাই ধীরে ধীরে প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে জানায়—হ্যাঁ, ছিল। আমার স্বামী। সরকারী লোক ভেবে সে আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চায় নি।

একটা বর্ষার মেঘ কিছুক্ষণ থেকে পূর্ব-দিগন্তটা ঢেকে দিচ্ছিল। এখন দূরে তার বর্ষণও সুরু হয়ে গিয়েছে দেখা যায়। কিন্তু শোভনা বোধ হয় তা দেখতে পায় না। তার সমস্ত দৃষ্টির সামনে সব কিছু অকস্মাৎ যেন তার আগেই ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। চপলার শেষ কথাগুলো তার কানে যায় কি না সন্দেহ।

যত চেষ্টাই করুক, তার চোখের দৃষ্টি আর মুখের চেহারায় কিছুই বোধ হয় আর গোপন থাকত না, কিন্তু আকাশের বৃষ্টিই এ যাত্রা তার সহায় হয়। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টিটা সবেগে তখন তাদের কাছে এসে প'ড়ে বেশ প্রবল ধারায় পড়তে সুরু করেছে।

শিশুদের নিয়ে রাণীদি ও চপলা তাদের ঘরের দিকে ছুটে যায়। তাদের ডাকে শোভনাকেও একটি ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিতে হয়।

ঘর নেহাৎ নামেই। মাথার উপর যেমন তেমন একটা আচ্ছাদন দেওয়া মাটিলেপা বাঁশ বাঁখারির দেয়াল ঘেরা একটা খুপরি মাত্র। দারিদ্র্যের সঙ্গে শোভনার ভাল রকমেরই পরিচয় থাকলেও এ রকম বাসায় থাকবার অভিজ্ঞতা তার কখনও হয় নি।

ঘরের নিচু টিন ও খোলা মেশানো জোড়া-তালি দেওয়া চালের উপর বৃষ্টির একটানা শব্দ শুনতে শুনতে শোভনা কিন্তু এ সব কথা ভাবে না। নিজের মনের সঙ্গে যে কঠিন সংগ্রাম তার তখন চলেছে তাতে বাইরের কোন কিছু তার চোখেই পড়ে নি। এই সঙ্কীর্ণ প্রায় বাতায়নহীন ঘরের আধ অন্ধকারের জন্যে সে তখন কৃতজ্ঞ। মাটির মেঝেয় একটা জীর্ণ মাদুরের উপর ব'সে সে কিছুক্ষণ অন্ততঃ নিজের হৃদয়কে শান্ত করবার সময় পেয়েছে।

ঘরে ঢোকার পর শোভনাকে বসতে ব'লে চপলা কিছুক্ষণ আর তার দিকে মনোযোগ দেবার অবসর পায় নি।

ছাদের যা অবস্থা তাতে বৃষ্টির জল সম্পূর্ণ আটকায় না। যেখানে উপর থেকে জল পড়ে সেখানে কাগজ বা চট গুঁজে ও তাতে বিফল হলে সেখানকার জিনিষপত্র সরিয়ে ছেলেটিকে বিছানায় শুইয়ে ঘুম পাড়াতেই চপলাকে ব্যস্ত থাকতে হয়।

তার মধ্যে হঠাৎ এক সময়ে তার কণ্ঠ শুনে শোভনা চমকে ওঠে।

আমার স্বামীকেই কি আপনি খুঁজছেন?

শুধু এ প্রশ্নের আকস্মিকতায় নয়, চপলার এ প্রশ্ন করবার ধরণেও শোভনা চমকিত হয়। এ প্রশ্নে উত্তরের কোন প্রবল দাবীই যেন নেই। গলার স্বর যেমন ক্লান্ত করুণ, প্রশ্নের ভঙ্গিও তেমনি বিমূঢ় অসহায়। উত্তরটা জানবার আশঙ্কাতেই প্রশ্নটা যেন ক্ষীণ ও স্তিমিত।

শোভনা আগড় দেওয়া দরজার দিকে মুখ ক'রে ব'সে ছিল।

মুখ ফিরিয়ে এবার সে চপলার দিকে তাকায়।

বাইরে বৃষ্টির মেঘ আরও গাঢ় হয়ে নেমেছে। ঘরটা বেশ অন্ধকার। মাঝে মাঝে জানলার চটের পর্দা হাওয়ার ঝাপটায় দুলে স'রে গিয়ে ঘরের ভেতরকার সে আবছা অন্ধকার কিছুক্ষণের জন্য একটু ফিকে হয়ে আসে।

জীর্ণ বিছানার ওপর চপলার মূর্তিটা সে আলো-অন্ধকারের দোলায় ফুটে উঠতে গিয়ে যেন মুছে মুছে যাচ্ছে।

বাইরে অদূরে কোথায় প্রচণ্ড শব্দে হঠাৎ একটা বাজ পড়ে।

শিশুটি সভয়ে কেঁদে উঠে মাকে জড়িয়ে ধরে। চপলা তাকে বুকে নিয়ে শঙ্কিত ভাবে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে।

আর একটা বিদ্যুৎ চমকে চপলার সেই শঙ্কিত স্নেহব্যাকুল মুখ শোভনা এবার স্পষ্ট দেখতে পায়।

সেই মুহূর্ত্তেই বুঝি সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আলোড়ন শেষ হয়ে যায় তার মনে।

চপলার প্রশ্নের পর বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে। এখন আর তার কথার উত্তর না দিলেও বুঝি চলে।

কিন্তু শোভনা নিজে থেকেই প্রশ্নটা আবার জাগিয়ে তোলে উত্তরের সব দায় যেন একেবারে চুকিয়ে ফেলবার জন্যে।

আপনার স্বামীরই খোঁজ করছি কি না জিজ্ঞাসা করছেন ?

চপলার দিক্ থেকে অস্ফুট একটা শব্দ আসে—হ্যাঁ। তাকে ছাড়া আর কাউকে সেদিন ত দেখবার কথা নয়।

তাহলে তাঁকেই বোধ হয় দেখেছিলাম। তবে আমি যাঁকে খুঁজছি তিনিই আপনার স্বামী কি না এখনও জানি না। চেহারার মিল থাকার দরুণ দূর থেকে দেখার ভুলও হতে পারে। এখানকার খবর যার কাছে পেয়েছি সেও হয়ত সেই ভুলই করেছে।

চপলার দিক্ থেকে খানিকক্ষণ কোন সাড়া পাওয়া যায় না। ধীরে ধীরে মৃদুকণ্ঠে সে তার পর জিজ্ঞাসা করে—কিন্তু কেন তাঁকে খুঁজছেন ?

কেন ? শোভন' এবার হৃদয়ের চরম পরীক্ষাই দেয়। একটু হেসে উঠে ব্যাপারটাকে হাল্কা ক'রে দেবার চেষ্টা ক'রে বলে—তেমন গোলমেলে কিছুর জন্যে নয়। আপনার স্বামীই যদি হন তাহলেও ভয় ভাবনার কিছু নেই। খুঁজছি শুধু একটা ব্যাপারের সাক্ষী হিসেবে।

সাক্ষী !—চপলার কণ্ঠে সংশয় ও আশঙ্কার সুরটা শোভনার আশ্বাসেও দূর হয় নি .বোঝা যায়।

হ্যাঁ, সাক্ষী। তবে বললাম ত ভয়ের ব্যাপার কিছু নয়—কি বলবে শোভনা এতক্ষণে কিছুটা স্থির ক'রে ফেলেছে। এবার সে কল্পনার রাশ ছেড়ে দেয়।

চপলাকে সে বোঝায়, একটা উইলের সাক্ষী হিসেবেই সে তার পুরাণো একজন প্রতিবেশীর খোঁজ করছে। শোভনার এক নিঃসন্তান মামা যেন মৃত্যুর আগে শোভনাকে তাঁর যা কিছু দিয়ে যাবার উইল করেছিলেন। সে উইলের সাক্ষীদের মধ্যে ছিলেন চপলার স্বামী বা তাঁর মত দেখতে একজন প্রতিবেশী। সবাই ভাড়াটে বাড়ীর বাসিন্দা। কিছু দিন বাদে সেই প্রতিবেশী অন্য কোথায় যে উঠে যান, শোভনা তা জানে না। না জানলেও ক্ষতি কিছু ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি শোভনার মামার অন্য এক আত্মীয় সে উইল মিথ্যে ব'লে প্রমাণ করবার চেষ্টা করছে। উইলের তখনকার সাক্ষীদের দুজন বৃদ্ধ আগেই মারা গেছেন। একমাত্র সেই তখনকার প্রতিবেশীই তাই শোভনার ভরসা। তাঁকে খুঁজে বার করবার জন্যে তাই তার এত আগ্রহ। তার বিপক্ষদল পাছে সে সাক্ষীর আগে সন্ধান পেয়ে টাকা-পয়সা দিয়ে তাকে সরিয়ে রাখে সেই ভয়েই এমন ভাবে সে ছুটাছুটি করছে।

বানানো গল্পটা শোভনা যখন শেষ করে তখন কল্পনার উদ্বেগেই বুঝি তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। বাইরের বৃষ্টির বেগ কমে এলেও ঘরটা তখনও অন্ধকার। নইলে শোভনার মুখটা সে মুহূর্ত্তে দেখলে চপলা কি ভাবত কে জানে। হৃদয়কে মিথ্যার শবাধারে সম্পূর্ণ বন্দী ক'রে দিয়ে সে যেন একটা শূন্যতার ছায়ামূর্ত্তি হয়ে ব'সে আছে।

চপলা শোভনার সব কথা বুঝতে পারে কি না বলা যায় না, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়া শিশুকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতেই তার নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ততার একটু আভাস বুঝি পাওয়া যায়।

আভাস পাওয়া যায় চপলার পরের কথাতেও।

সত্যিকার কুণ্ঠার সঙ্গেই সে বলে, বৃষ্টিটা এখনও থামল না। যা আমাদের ঘরদোরের ছিরি, আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে, নিশ্চয়।

তা একটু হলই বা ! শোভনার গলায় হাসির শব্দই বুঝি শোনা যায়,—দিনরাত তোমরা যেখানে থাক সেখানে দুদণ্ড আমি কাটাতে পারি না !

আপনি থেকে তুমিতে নামানটা ইচ্ছাকৃত। এই মেয়েটিকে সম্বোধনের কৃত্রিম দূরত্বে রাখা এখন আর যেন তার পক্ষে অর্থহীন।

চপলা পরিবর্ত্তনটুকু লক্ষ্য করুক বা না করুক, তার ক্ষুণ্ণ হবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। শিশুর বিছানা থেকে উঠে এসে শোভনার পাশেই ব'সে প'ড়ে সে সরল ভাবে বলে, আপনি আজ আবার আসায় সত্যিই কিন্তু ভয় পেয়েছিলাম !

পেয়েছিলে ! কিন্তু এখন ত আর ভয় নেই। সুতরাং আমায় আর আপনি নাই বললে !

তা কি হয় ! চপলা লজ্জায় কুণ্ঠাতেই হেসে ওঠে, আপনারা লেখাপড়া জানা শহুরে মেয়ে, আমাদের মত মুখ্যু গাঁইয়ার মুখে তুমি শুনলে রাগ করবেন না ?

রাগ যদি না করি, তাহলে ত বলতে দোষ নেই। রাগ করার বদলে আমি খুশীই হব।

বেশ, তাহলে বলব। চপলার গলার স্বরে বোঝা

যায় সে কৃতার্থ হয়ে গেছে—কিন্তু আপনি, না না তুমি কি আর কখনো এ হাঘরেদের পাড়া মাড়াবে। নেহাৎ আজ গরজ আছে ব'লে তাই।

আজ গরজে এসেছি ঠিকই। শোভনার গলার স্বরটা গাঢ় হয়ে ওঠে, কিন্তু তুমি যদি আসতে বল তা হলে বিনা গরজেই আসব। তখন আবার বিরক্ত হবে না ত?

বিরক্ত হব! চপলা তীব্র প্রতিবাদ জানায়, কি যে বলেন? না না ভুল হয়েছে। কিন্তু কেনই বা এখানে আবার আসবে? আমরা ত ভাল ক'রে দুটো কথা বলতেই জানি না।

শোভনা এবার একটু হাসে, আমি ত কথকতা শুনতে তোমার কাছে আসব না। তোমায় ভাল লেগেছে তাই আসব।

বাইরের দিকে আগড়ের ফাঁক দিয়ে একবার দেখে শোভনা তারপর বলে, বৃষ্টিটা থেমেছে মনে হচ্ছে, আমি কিন্তু এখন তাহলে চলি।

এর মধ্যেই যাবে! চপলা সত্যিই ক্ষুণ্ণ হয়ে বলে, কিন্তু বসতেই বা বলি কি ক'রে? ওঁর সঙ্গে দেখা হলে একটা যা হোক মীমাংসা হয়ে যেত। কিন্তু উনি ত সেই রাত্রের আগে ফিরবেন না!

অনেক রাত ক'রে ফেরেন বুঝি? প্রশ্নটা নিজের অজ্ঞাতসারেই শোভনার মুখ দিয়ে বুঝি বেরিয়ে যায়। তাড়াতাড়ি তাই সেটা চাপা দেবার জন্যে সে আবার বলে, কিন্তু রাত পর্যন্ত ব'সে থাকা ত আমার চলবে না। আমি বরং আর একদিন আসব।

হ্যাঁ, তাই আসবে। খুব সকাল সকাল কিন্তু। এক পহর বেলা না হতেই বেরিয়ে যায় কিনা! আগড়টা ঠেলে শোভনার সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসে চপলা উৎসাহের সঙ্গে বলে, কাল যদি আস তাহলে খুব ভাল হয়। আমি অবশ্য আজই সব কিছু ব'লে কয়ে বুঝিয়ে রাখব।

কি বুঝিয়ে রাখবে? শোভনা হেসে না জিজ্ঞাসা ক'রে পারে না।

তোমার উইলের কথা জানিয়ে, মিথ্যে ভয়ের কিছু নেই তাই বুঝিয়ে রাখব। কে জানে উনিই হয়ত তোমার উইলের সাক্ষী ছিলেন। বিয়ের আগে উনি কোথায় ছিলেন না ছিলেন কিছু ত জানি না।

শোভনা প্রাণপণে কণ্ঠটাকে সহজ স্বাভাবিক রাখবার চেষ্টা ক'রে জিজ্ঞাসা করে, কতদিন তোমাদের বিয়ে হয়েছে?

কতদিন! চপলাকে বেশ একটু ভাবতে হয়, সেই দেশ থেকে পালিয়ে ক্যাম্পে এসে ওঠার পরই। তা এই দু' শীত আর ক'মাসে এই—এই প্রায় আড়াই বছর হ'ল।

আড়াই বছর? মুখে নয় বুকের ভেতরই একটা জলন্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে শোভনা কিছু আর না ব'লে নস্কর নির্দেশ দেওয়া সেই জোড়া খেজুর গাছের দিকে এবার চলতে সুরু করে।

বৃষ্টি থেমে গিয়ে চারিদিক্ ধোয়া-মোছা হয়ে ঝলমল করছে। প্রকৃতির এ উজ্জ্বলতা যেন তার হৃদয়েরই প্রতি বিদ্রূপ।

কিছুদূর যেতে যেতেই পেছন থেকে রাণীদির গলা শুনতে পায়। বৃষ্টি থামবার পর বেরিয়ে এসে চপলার কাছে শোভনার আসার উদ্দেশ্য সে বুঝি ইতিমধ্যেই একটু শুনেছে।

তার তীক্ষ্ণ অবিশ্বাসের স্বর এতদূর পর্যন্ত কিছুটা এসে পৌঁছোয়।

তুই যেমন হাবা গাঁইয়া! ওদের কথা কখনও বিশ্বাস করতে আছে? ওরা কলকাতার শহরে মেয়ে ভাজছে উচ্ছে ও ওরা বলবে পটল। ক্রমশঃ
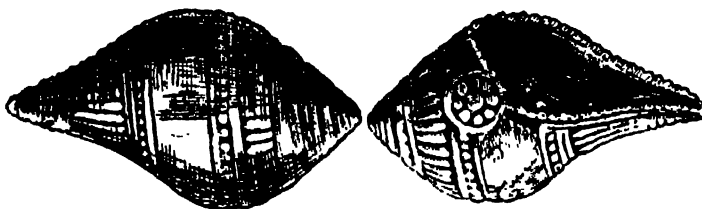
বোরখার আড়ালে

(অভিজ্ঞতা-মূলক)

শ্রীআভা পাকড়াশী

মানুষের বেশ-বাসের সামান্যতম পরিবর্তনেও যে তাকে চিনতে কত অসুবিধে হয়, অথচ বেশ পরিবর্তন যে করেছে সে আবার অতি-পরিচিত বন্ধুর কাছে কি রকম ব্যবহার পায়, তাদের আরও একটা রূপ তার কাছে স্বপ্রকাশ হয়ে পড়ে কি ভাবে, সেই নিয়েই আমার এই কাহিনীর অবতারণা।

তখন ফাল্গুন মাস। কলকাতায় গরম প'ড়ে গেলেও ইউ-পি-তে এ সময় সন্ধ্যের দিকে বেশ একটা ঠাণ্ডার আমেজ থাকে। সেদিনে আমার পাড়ার এক মুসলমান-বাড়ীতে বেড়াতে গেছি। প্রায়ই এদের বাড়ী আসি আমি। এরা পাঁচ বোনই আমাকে খুব ভালবাসে। আন্টি ব'লে ডাকলেও বন্ধু ভাবেই মেশে। আমার বাড়ীতে মন না লাগলেই এদের কাছে এসে খানিকক্ষণ হৈ চৈ ক'রে সময় কাটিয়ে যাই।

এরা যাকে বলে গোঁড়া মুসলমান, তাই। খানদানি ঘর ব'লে একটা গর্বও আছে। পাঁচ ওক্ত নমাজ পড়ে। বোরখা প'রে নিজের বাড়ীর গাড়ীতে কাক-পক্ষী ওঠার আগে হপ্তায় মাত্র একদিন বেড়িয়ে আসে: মানে রবিবারে। সেদিন এখানে সব দোকান বন্ধ থাকে। অন্য সাত দিন দোকান খোলা, সুতরাং ওরাও বাড়ীতে বন্ধ। সিনেমা যায় না, বা রাস্তায় হাঁটে না। সময় কাটায় সেলাই ক'রে, বুনে, রেডিও শুনে আর রিসালা প'ড়ে তাই আমি যখন খানিকটা বাইরের হাওয়া সঙ্গে নিয়ে ওদের বাড়ী যাই, তখন যেন আকাশের চাঁদ পায় হাতে। বলে, নতুন কি লিখেছ, প'ড়ে শোনাও আন্টি। ওরাও ওদের 'বানু' পত্রিকা থেকে উর্দু গল্প, কবিতা প'ড়ে শোনায়।

সেদিন আর এসব ভাল লাগল না। সেদিন ওদের সখ হ'ল আমার মত শাড়ী পরবে, সুতরাং নিজের শাড়ীর বদলে বাধ্য হয়ে আমাকে ওদের পোশাক পরতে হবে। তখন ওরা বলল, এস আন্টি, তোমাকে খাস মুসলমানী সাজিয়ে দিই। আমি বললাম,ঠিক আছে, আমার আপত্তি নেই। সত্যিই আমার ওসব কুসংস্কারের বালাই নেই, তাহলে আর এদের সঙ্গে এইভাবে মিশতে পারতাম না।

পাঁচ বোনের মধ্যে হুড়োহুড়ি প'ড়ে গেল, কার কোন্ জিনিষটা আমার গায় ঠিক হবে। কোন্ গয়নাটা এই স্যুটের সঙ্গে মানাবে। আবার যারটা না পরব সে-ই দুঃখিত হবে। সেই নিজেদের তোলা জামা-কাপড় যা ওরা কোথাও বিয়ে-সাদিতে পরে; না হলে বাক্স থেকে বারই করে না,তাই বার ক'রে নিয়ে এল।

সেই সব ভাল ভাল সলমা চুমকির কাজ করা সাটিনের সালোয়ার, ভেলভেটের কামিজ, নায়লনের দোপাট্টা, এই সব ঝলমলে জামা-কাপড়, আবার তার সঙ্গে ম্যাচ করা কানের ঝুমকো, গলার নেক্‌লেস্, মাথার ঝাপটা, এই-সব আমাকে পরতে হবে। যত বলি, যা তোমরা বাড়ীতে প'রে আছ, তাই আমাকে পরিয়ে দাও, কিছুতেই শুনবে না।

যাই হোক, অনেক তর্ক-বিতর্কের পর, গয়না কিছু বাদ দিয়ে, এক বোনের নীল সাটিনের সালোয়ার, অন্য বোনের নীল কামিজ আর একজনের আনারকলি দোপাট্টা, অন্য জনের নাগরা এই সব প'রে, লম্বা বেণী বেঁধে, কানে মুক্তার টানা দেওয়া ঝুমকো প'রে ত মুসলমানী সাজলাম। এর পর দিল ওরা বোরখা পরিয়ে। তখন আয়নায় নিজেকে দেখে হঠাৎ খেয়াল হ'ল একটু দুষ্টুমি করার। ওদের বললাম, যদি এই সব পরিয়েই দিলে, তবে ঘণ্টাখানেকের জন্য এগুলো ধার দাও; এই সন্ধ্যের অন্ধকারে আমি এই সব প'রে ক্যান্টনমেন্টে আমার বন্ধুর বাড়ী একটু ঘুরে আসি।

ওরা অনেক ঠাট্টা করল আমাকে, বলল, বা কেই চৌধবী-কা-চাঁদ লগ রহী হো আন্টি, কঁহী লুঠ যাওগী, ত আঙ্কেল-কো হমলোগ কেয়া জওয়াব দেঙ্গে? মানে তোমাকে ঠিক চতুর্দশীর চাঁদের মত দেখাচ্ছে আন্টি, যদি কেউ তোমাকে লুঠে নিয়ে যায় তবে আঙ্কল্, মানে আমার স্বামীকে কি জবাব দেবে ওরা? তখন আবার চৌধবী-কা-চাঁদ সিনেমাটাও পুরোদমে চলছে এখানে। বললাম, ভয় নেই দাঁড়াও, বাড়ীতে ফোন ক'রে ছেলেকে ডেকে নিচ্ছি, সে সঙ্গে যাবে। অবশ্য এই পোশাকে তোমাদের আঙ্কেলের সামনে আমি যাচ্ছি না তা ব'লে।

আমি যে ওদের সঙ্গে মিশি সেটা আমার কর্তা বা ছেলে কারুরই পছন্দ নয়। ওদের ইস্ট্ পাকিস্তানের

সম্পত্তি মুসলমানে নিয়েছে, তাই মুসলমান জাতের ওপর রাগ। মানছি, সেটা স্বাভাবিক কিন্তু আমিই বা কি করি? পাড়ায় ত একটা হিন্দুর বাড়ী নেই, বাঙ্গালী ত দূরস্থান, সুতরাং পাকিস্তানই ভরসা। সত্যি বলতে কি, এদের সঙ্গে মিশে আমিও আনন্দ পেতাম। যতটুকু থাকতাম, পরনিন্দে পরচর্চা কিছু নয়, শুধু সাহিত্য আলোচনা, খোস গল্প, যাকে বলে নির্ভেজাল আনন্দ তাই উপভোগ করতাম। আমিও আমাদের রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের গল্প, কবিতা যতটা পারতাম হিন্দিতে ওদের বোঝাতাম, ওরা আর কিছু না বুঝুক, ভাবটা নিতে পারত। আর আমিও ওদের হাফিজ, গালিবের বা সাকিল বাদাউনির কবিতা, সৈর বা উর্দু গল্পের মধ্যে সত্যিকারের সাহিত্যরস খুঁজে পেতাম।

যাক্, এবার সেদিনকার ঘটনাটা বলি। ছেলেকে ফোন ক'রে এদের বাড়ীতে ডেকে নিয়ে একটা সাইকেল রিক্শয় চড়ে বসলাম। ক্যান্টনমেন্টে থাকেন আমার দুটি বান্ধবী। এঁদের বাড়ী দুটি কাছাকাছি। একজনের বাড়ী গেলেই অন্যজনের বাড়ীতেও যাই, যেতেই হয়, না গেলে অনুযোগ অভিযোগ শুনতে হয়। দুজনকার স্বামীই এখানকার হার্নেস ফ্যাক্টরীর অফিসার। দুজনেরই বাংলো প্যাটার্ণের কোয়ার্টার।

প্রথম বাড়ীতে পৌঁছবার কিছু আগেই রিক্শ ছেড়ে দিলাম। তারপর ছেলেকে আগে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে একটু পরে এগুলাম। দেখি, ঐ বাড়ীর গৃহস্বামী মানে আমার বন্ধুর স্বামী, লনের সামনে বারান্দায় ব'সে খুব মনোযোগ দিয়ে একখানি বই পড়ছেন। বাগান পেরিয়ে আমার ছেলে বারান্দায় উঠতেই তিনি অবশ্য একবার জিজ্ঞেস করলেন, কি রে, তোর মা আসে নি? ছেলেকে সব শেখানই ছিল। সে অতি কষ্টে হাসি চেপে বলল, না, কাল আসবে। এর পরই আমি এগিয়ে গিয়ে বারান্দার ঠিক নীচেই একটু আলো-আঁধারি জায়গায় দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে ডাকলাম—আলিজা! ভদ্রলোক মুখ তুলে তাকিয়ে কর্কশস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ হ্যায়? কেয়া মাঙ্গতা? আমি তখন আবারও করুণকণ্ঠে বললাম, 'লক্ষ্ণৌমে বহুত বাড় আয়া হ্যায়, ইস লিয়ে কুছ সাহেদা মাঙ্গতি হুঁ। মেহেরবানি করকে গরীবপর রহম্ কিজীয়ে।' তারপর আমার হাতের আতরমাখা ফুলকাটা সিল্কের রুমালের ওপর রাখা একটি নোট আর পয়সাভরা ছোট টিনের বাক্স এগিয়ে দিলাম। এবার তিনি হাঁক ছাড়লেন, ওগো, কিছু পয়সা থাকে ত দিয়ে একে বিদেয় কর। (স্বগত) 'জ্বালালে বাবা সন্ধ্যেবেলা এসে।' গিন্নী মানে আমার বান্ধবী বেরিয়ে এলেন। এসেই আমাকে দেখে চমকে উঠে দু-পা পেছিয়ে গিয়ে ব'লে উঠলেন, ও বাবা! এ আবার কে? আমি কোন-রকমে হাসি চেপে আবার সেই করুণ বুলি ছাড়ি—'গরীব পর রহম কিজীয়ে।' কর্ত্তা আবার হাত তুলে বিরক্তি প্রকাশ করেন। গিন্নীকে বলেন, দাও না বাপু দু-চার আনা দিয়ে বিদেয় ক'রে।

গিন্নী গেলেন পয়সা খুঁজতে। আমারই দুর্ভাগ্যবশতঃ গিন্নীর কাছে আবার খুচরো পয়সা নেই, দাঁড়িয়ে আছি ত দাঁড়িয়েই আছি। সেই আলো-আঁধারিতে থামের আড়ালে। তবু মাঝে মাঝে নীল চুড়ি-পরা ডান হাতটা বের ক'রে কর্ত্তাকে সেলাম দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছি। উনিও বই পড়তে পড়তে আড়চোখে তাকাচ্ছেন আমার দিকে। বোরখার নকাবের মধ্যে দিয়ে দেখতে পাচ্ছি ত সবই। আবারও গলাটা আরও একটু মিষ্টি ক'রে ডাক দেই, আলিজা! খোদা আপপর হামেশা খুশ রহেঙ্গে।

এবার ব্যস্ত হয়ে কর্ত্তা ডাকেন, কই গো পয়সা পেলে? নাঃ, নিশ্চিন্তে একটু বইটাও পড়তে পাব না দেখছি। আবার আমার নীলচুড়ি-পরা ফর্সা হাতের দিকে এক নজর তাকিয়ে নেন। অতি কষ্টে পয়সা খুঁজে নিয়ে গিন্নী বেরুলেন। কর্ত্তা ইসারায় জিজ্ঞেস করলেন, কত? উনি বললেন, দু'আনা। কর্ত্তা আরও দু'আনা পকেট থেকে দিয়ে চার আনা ক'রে দিলেন। (জানি না ঐ চুড়ি-পরা হাতের কল্যাণে কিনা।) এবার আমি সন্তর্পণে সেই সিল্কের রুমালে হাতের নোয়া ঢেকে বাক্সটি তুলে ধরলাম। তারপর বললাম, ব্যাস্ প্রিফ্ চারই আনা? ইসমে সের ভর আটা ভি ত নেহি হোগি?

কর্ত্তা এবং গিন্নী দুজনেই এবার রুক্ষস্বরে ব'লে উঠলেন, ব্যাস্ ব্যাস্, আর না, আর দিতে পারব না।

ওদিকের জানলায় একবার আমার ছেলের হাসি-মাখা মুখখানা চকিতের জন্য দেখতে পেলাম। এবার গেটের দিকে ফিরে যেতে যেতে পরিষ্কার বাংলায় এবং নিজের স্বরেই বোরখার ভেতর থেকে বললাম, "যাঃ চ'লে, রিক্শ ভাড়াটাও উঠল না।"

তৎক্ষণাৎ বইটা ফেলে দিয়ে কর্ত্তা তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে ডাক ছাড়লেন, 'হ্যাঁগা শুনছ? আরে ঐ বোরখার মধ্যে মিসেস্ পাকড়াশী।' তখন বান্ধবী ছুটে

এসে বললেন, 'অ্যাঁ! তাই নাকি! বাবা কি উদ্র্দুর দাপট, মোটে বুঝতে পারি নি।'

হাসির হল্লা প'ড়ে গেল। ওদের ছোট মেয়ে টুটু বাবা মাকে বলল, তোমরা কি বল ত? এই রকম সাটিনের সালোয়ার কামিজ আর সিল্কের বোর্খা প'রে কেউ ভিক্ষে চাইতে আসে? তখন কর্ত্তা বললেন, আপনার ঐ গোলগাল হাতখানা দেখে আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল বটে। আমিও তখন হেসে বলি, আমার যা সন্দেহ হয়েছে তা আমি আমার বান্ধবী আর আমার মিয়া-সাহেবকে ব'লে দেব কিন্তু। মুখটা একটু নীচু হয়ে যায় ভদ্রলোকের।

এবার আর এক বাড়ীর পালা বলি। ছেলেকে এবার ওদের বাড়ী রেখে ওদের মেয়ে টুটুকে সঙ্গে ক'রে অন্য বান্ধবীর বাড়ী গেলাম। ওঁর কর্ত্তা আবার তাস্‌বুড়ে। প্রায়ই একরাশ ইয়ার বন্ধু নিয়ে ড্রয়িং-রুম সরগরম ক'রে তাসের আড্ডা জমান। আর বাড়ীর মধ্যে যেতে গেলে ঐ ড্রয়িং-রুম এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। আজও যদি ঐ রকম আড্ডা ব'সে থাকে তবে আর এই পোশাকে ওমুখো হচ্ছি না। তাই টুটুকে সঙ্গে নিলাম, আগে গিয়ে দেখে আসবে বাড়ীর কি রকম হালচাল।

গেটের কাছে চিনেজবার গাছের পাশে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছি। টুটু গেছে ভেতরে দেখতে। ভাবছি, এই সময় যদি হঠাৎ গেট দিয়ে কেউ ঢোকে তবে তারই বা আমাকে দেখে কি অবস্থা হবে আর আমিই বা কি করব? তখন কোথায় লুকোব?

টুটু এসে চুপি চুপি বলল, মাসীমা, বাড়ীতে পুরুষ মানুষ কেউ নেই, তবে এঁর দুই ননদ এসেছে। তাদের একজন খাটে শুয়ে বই পড়ছে, তার ছেলেমেয়েরা শুনছে, আর অন্য জনের পেট ব্যথা করছে তাই শুয়ে আছে। এই বাড়ীর মাসীমা জিজ্ঞাসা করছিলেন আপনি আমাদের বাড়ী এসেছেন কি না? আমি বলেছি, না ত! আমিই ত এসেছি উনি এখানে এসেছেন কি না দেখতে। তখন বললেন, কই আসে নি ত? সন্ধ্যা সাতটা বাজে, তবে আর আসবে না বোধ হয়। আমি তখন ওকে বললাম, তা হলে তুই এইখানটায় দাঁড়া, আমি যাই। ভয় করবে না ত? ও কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে একটু ভয় ভয়েই বলল, 'না'।

গেট পেরিয়ে প্রথমে বাগান। তার পর লম্বা টানা বারান্দা। বারান্দার ধারে সারি সারি তিনখানা ঘর। ড্রয়িংরুম, বেডরুম, ডাইনিংরুম। ড্রয়িংরুম বন্ধ। কর্ত্তা নেই। বেডরুমেই আড্ডা হচ্ছে। দরজা খোলা। ঐ বেডরুমের দরজা দিয়ে বারান্দায় আলো এসে পড়েছে। বারান্দার আলো কিন্তু নিবানো। বাড়ীর পেছনে আছে চাকরদের কোয়ার্টার।

পায় পায় এগিয়ে বারান্দার অন্ধকারে মিশে দরজার আলোর কাছে ডান হাতটা বাড়িয়ে সবে সেলাম দিয়েছি। একটা কথাও বলি নি, তাইতেই বিকট চেঁচিয়ে উঠলেন আমার বান্ধবীর ছোট ননদ, 'ওরে বাবা রে, কালো ভূতের মত এ আবার কে রে?' ব'লেই দড়াম ক'রে আমার মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়েই ছুটে পালিয়ে গেলেন তিনি। ছেলেমেয়েরা বিকট কান্না জুড়ে দিল। আর বান্ধবীর বড় ননদ বেচারী বোধ হয় পেটের কাপড় আলগা দিয়ে শুয়েছিলেন, তিনিও কোন রকমে কাপড়টা জড়িয়ে, ওরে বাবা রে, তোরা সব আমাকেই ফেলে পালালি রে, ব'লে ভেতরে ছুটলেন। আমি ত কাঁচের সার্শির মধ্যে দিয়ে সবই দেখতে পাচ্ছি আর বোরখার মধ্যেই হেসে কুটি-পাটি হচ্ছি। এবার রণাঙ্গনে আমার বান্ধবীর আবির্ভাব হ'ল। তিনি এবার অতিথি-দের সাহায্যকল্পে সাহস ক'রে এগিয়ে এসে ঐ সার্শির মধ্যে দিয়েই আমাকে তাঁর পাটনাই হিন্দীতে ধমক লাগাচ্ছেন—এই তুম কওন হায়, কেয়া চাতা হায়? আমি তখন অতি কষ্টে হাসি চেপে বলি, লক্ষ্ণৌমে বাড় আয়া হ্যায়, গরীব পর রহম কিজীয়ে। মুখে এই বুলি বলছি আর হাতে সমানে দরজা ধাক্কা দিচ্ছি, কারণ আমি জানতাম ও ঘরের ওপরের ছিটকিনিটা আলগা, বার দু'চার বাইরে থেকে ধাক্কা দিলেই দরজাটা খুলে যায়। নীচের ছিটকিনি দেবার চেষ্টা করছিলেন বান্ধবী। এবার তাঁর আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হবার জোগাড়। তিনি এখন নীচের ছিটকিনি বন্ধ করার চেষ্টা ছেড়ে আমার বাপান্ত করতে করতে ছুটে চ'লে গেলেন চাকর ডাকতে।

চাকর এল বাইরে, ইয়া লম্বা এক বাঁশের লাঠি ঠুকতে ঠুকতে। ওদিকে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে টুটুর ত ভয়ে প্রাণ উড়ে যাচ্ছে। সে প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে কপালে দু'হাত তুলে ইসারায় আমাকে ডাকছে, মাসীমা, পালিয়ে আসুন, ও মাসীমা! আমি তাকে হাত তুলে থামাই। আমার হাত তোলা দেখে ডাণ্ডাওয়ালা চাকর পিছিয়ে গেল। আমি তখন তাকে ভারী গলায় এক ধমক দিলাম, এই, তুম মরদ হোকর জনানাকে উপর হাত উঠাতা হ্যায়? সরম নেহি লগতা তুম্হে? ওদিকে বান্ধবী সমানে ড্রয়িংরুমের জালঘেরা জানলার মধ্যে দিয়ে চাকরকে আদেশ করছেন, আমাকে মেরে ভাগিয়ে দেবার জন্য। চাকরটা একবার এগোয় ত দুবার পেছোয়;

কিন্তু এবার সত্যিই শালীখাণ্ডরী ব'লে গালাগাল দিয়ে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসাতে আমি মুখের নকাবটা তুলে নিজের মুখটা তাকে দেখিয়ে দিয়ে চুপ ক'রে থাকতে বলি। সত্যিই সে চুপ ক'রে দাঁড়ায় তখন। ওদিকে ওরা চারদিক্ বন্ধ ক'রে ড্রয়িংরুমে ঢুকে আছে আর চাকরটাকে বলছে, তাড়া না, ভাগিয়ে দে না। চাকরটা এবার মিটি মিটি হেসে বলে, 'কা করি? মেইন রোড-কি মাজী হইল্ বা?' অ্যাঁ ব'লে এবার আমার বান্ধবী বেরিয়ে এসে আমাকে বেশ ক'রে কিলিয়ে দেন। টুটুটা এসে এবার আমাকে জড়িয়ে ধ'রে বলে, উঃ, মাসীমা, আমি ত ভয়ে কেঁদে ফেলেছিলাম। ভাবছিলাম, এই বুঝি শঙ্করসিংটা মারল লাঠি আপনার মাথায়। ওরাও বলে, ধন্যি মেয়ে বাবা তুমি, এই সন্ধ্যের অন্ধকারে এসেছ ভয় দেখাতে, বলিহারি সাহস। আমি বলি, খুব হয়েছে, নিজেদের যা সাহসের নমুনা একখানা দেখালে? তার পর বোরখা খুলিয়ে সাজ দেখে বলে, কে বলবে বাপু তুমি বাউনের মেয়ে, এ যে সত্যি মুসলমানী।

এদিকে আমার ছেলেও এসে পড়েছে দেরী দেখে। আবার রিক্শয় চ'ড়ে বাড়ীর দিকে রওনা দিলাম। ঐ বাড়ীর পথেই আমার এক দাদার বাড়ী। তাই যেতে যেতে ছেলেকে বললাম, দেখ্, এক জায়গায় গিয়ে মাত্র চার আনা পেলাম, আর এক জায়গায় ত লাঠ্যৌষধি, সুতরাং খরচ পোষাল না, চল্ ওদের বাড়ী যাই।

ওমা, গিয়ে দেখি বাড়ী ভোঁভাঁ, বৌদিরা কেউ নেই। শুধু আছেন বুড়ী মাসীমা। সে বেচারী ত আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে হাঁ হাঁ ক'রে উঠলেন। প্রাণের ভয়ে নয়, ধর্ম্মভয়ে। দাদাকে ডাকতে তিনি আমার মুখের করুণ আবেদনে গ'লে গিয়ে পাঁচটা টাকা দিলেন। ছেলেকে বলেছিলাম রিকশায় বসে থাক্, ওপরে আসিস না। কিন্তু মজাটা থেকে বঞ্চিত হতে আর কারই বা ইচ্ছে হয়? তার ওপর ছেলেমানুষ। ওকে সঙ্গে দেখেই ধ'রে ফেলল দাদা। তবে অবশ্য এ পাঁচ টাকা সত্যই লক্ষ্ণৌতে সাহায্যভাণ্ডারে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

এবারে পাড়ায় ফিরে এসে দেখি, বাড়ীর গেটের সামনে মুসলমান-বাড়ীর ছোকরা চাকর হামিদটা ব'সে রয়েছে—আমাকে দেখেই বলল, পহলে হামারে ঘর চলিয়ে, আপালোগ আসরা লেকে বৈঠে হ্যায়, কিস্সা শুননে-কে লিয়ে। মানে আগে আমাদের বাড়ী চলুন, দিদি-সাহেবারা আপনার কাছে কি কি হ'ল শোনবার জন্য উৎসুক হয়ে ব'সে রয়েছে। গেলাম। সাজ-পোশাক খুলতে খুলতে বললাম সব কাহিনী। শুনে ও'দের হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরার জোগাড়।

এইবার আমার কর্ত্তাটিও তাঁর গিন্নীর কীর্ত্তি জানতে পারবেন।

সত্যজিৎ রায়ের কাঞ্চনজঙ্ঘা

শ্রীমিহির সিংহ

চলচ্চিত্র শিল্পকে অগ্রাহ্য ক'রে আজকের জগতে চলবার উপায় নেই। লোকরঞ্জক শিল্প হিসাবে এটি সব-চাইতে জনপ্রিয়, জীবিকা-নির্ব্বাহের পথ হিসাবেও বোধ হয় অন্য যে-কোনও কলার চাইতে বেশী সংখ্যক ব্যক্তি চলচ্চিত্রের উপরে নির্ভর ক'রে থাকেন। কিন্তু শিল্পকলার বিচারে এর সব-চাইতে বড় বিশেষত্ব হ'ল যে, বহু শিল্পের—এমন কি বহু বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটে চলচ্চিত্র শিল্পের মাধ্যমে। বস্তুতঃ সমাজের উপরে অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর প্রভাব বিস্তার করে এই শিল্পটি। জনমত গঠনের ব্যাপারে বেতারও খুব শক্তিশালী সন্দেহ নেই, রুচি ও সামাজিক চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন আনতে রঙ্গমঞ্চও হয়ত অনেকটা পরিমাণে সক্ষম হয়—কিন্তু সমস্ত দিক্ থেকে বিচার করতে গেলে চলচ্চিত্র (এবং অন্যান্য দেশে টেলিভিশন) যে সবার উপরে স্থান পায় তাতে সন্দেহ নেই।

প্রথম থেকেই চলচ্চিত্রের জগতে দুটি তিনটি পৃথক্ ধারা বয়ে এসেছে। তথ্যমূলক বা documentary ছবি মূলতঃ ব্যস্ত থাকে তথ্য পরিবেশন করতে—তা সে সাংবাদিকসুলভই হোক বা সমাজতাত্ত্বিকই হোক। কাহিনীমূলক বা সাধারণ feature ছবির প্রধান অবলম্বন কোনও একটি গল্প। বলা বাহুল্য, গল্প নেহাৎ কল্পনা-প্রসূতও হতে পারে, পৌরাণিকও হতে পারে কিংবা জীবনীমূলকও হতে পারে। এ দুটি প্রধান জাত ছাড়া আরও একটি জাতের চলচ্চিত্রের সন্ধান আমরা অনেক সময় পাই যা তথ্যমূলকও নয় আবার কাহিনী-অবলম্বীও নয়। এ যেন খানিকটা lyric কবিতার মতন: বক্তব্য কিছু একটা নিশ্চয়ই থাকে তবে তা কোনও কাহিনীর আকারে উপস্থাপিত হয় না। কোনও একটা বিশেষ মেজাজ বা moodকে ঘিরে কিংবা শিল্পীর অন্তরঙ্গ কোনো উপলব্ধিকে ব্যক্ত করার জন্যে এর সৃষ্টি।

চলচ্চিত্রের ইতিহাসের গোড়ার দিক্‌কার পরিচ্ছেদগুলি ওল্টালে দেখা যাবে যে, তথ্যমূলক, কাহিনীমূলক ও এই শেষোক্ত ধরনের প্রয়াসগুলি বেশ স্পষ্ট ভাবে পরস্পর থেকে পৃথক্ অস্তিত্ব বজায় রাখত। বিশেষ ক'রে তথ্যমূলক ও কাহিনীমূলক ছবিগুলি সম্পূর্ণ বিপরীত পথে চলাটাই ঠিক ব'লে মেনে নিয়েছিল। শেষোক্ত ধরনের lyrical বা কাব্যমূলক সুষমা অবশ্য সব রকমের ছবিরই কাম্য—একদিক্ থেকে বলতে গেলে। অর্থাৎ তথ্যমূলক ছবিও যখন নিছক সাংবাদিকতা না থেকে পা বাড়ায় গভীরতর কোনও সৌন্দর্য্যের দিকে, তখনই মেলে এই শিল্পীসুলভ মেজাজ কিম্বা উপলব্ধির পরিচয়। আর কাহিনীমূলক ছবি ত শিল্পের মানে উৎরোতে গেলে কাব্যের মহিমা পাবেই, কাব্যই ত হ'ল সব সার্থক শিল্পের মাপকাঠি। কিন্তু যত দিন গেল ততই দেখা গেল যে তথ্যমূলক ছবি আর কাহিনীমূলক ছবির মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই কমে এল। বিশেষ ক'রে যুদ্ধোত্তর চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বোধ হয় এটাই সব-চাইতে বড় ঘটনা। এক দিক্ থেকে তথ্যমূলক ছবির নির্ম্মাতারা নিছক কতকগুলি তথ্যকে ক্যামেরার মধ্যে দিয়ে পরিবেশন না করে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধকে বিচার করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ representation-এর পরিবর্ত্তে interpretation করবার পথে তাঁরা এগিয়েছেন। আর অন্য দিকে, কাহিনীমূলক ছবির যাঁরা প্রস্তুতকারক তাঁরা ভেবেছেন যে, কল্পনাপ্রসূত কাহিনী অবলম্বনে রচিত হলেও ছবিকে কি ক'রে একটা বাস্তবানুগ বা authentic রূপ দেওয়া যায়। ফলে এই দুই জাতের ছবিই দ্রুত এগিয়ে আসছে পরস্পরের দিকে, এবং অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান যুগের এই সংঘটনার ফলে এমন সব ছবি তৈরি হচ্ছে যাদের কাব্যিক মূল্যও অসাধারণ রকমের বেশী।

ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ চলচ্চিত্র প্রস্তুতকারক দেশ হিসেবে প্রসিদ্ধ। এবং এটাও সর্ব্বজনবিদিত যে, সাধারণ ভাবে আমাদের দেশের চলচ্চিত্রের মান অত্যন্ত লজ্জাজনক ভাবে নীচু। বাংলাদেশের কয়েকজন পরিচালককে যদি বাদ দেওয়া যায় তবে বোধ হয় নাম করার মত শিল্প-প্রতিভা ভারতীয় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে বিশেষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। এককালে নিউ থিয়েটার্স প্রতিষ্ঠানটি যেমন সমস্ত দেশের চলচ্চিত্র শিল্পকে পথ দেখিয়েছিল—প্রধানতঃ কাহিনীমূলক চিত্রের ক্ষেত্রে—, আজও তেমনি রাজেন তরফদার, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক প্রমুখ পরিচালকেরা তাঁদের প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে বয়ে নিয়ে এসেছেন নূতনত্ব ও শিল্পীসুলভ নিষ্ঠার বাণী।

বাংলাদেশের চিত্র-পরিচালকের কথা তাই সমস্ত ভারতবর্ষের চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। বলা বাহুল্য, এঁদের মধ্যমণি স্বরূপ হলেন সত্যজিৎ রায়। চলচ্চিত্র জগতে তিনি এসেছেন অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সে এবং অনেক পরিণত মন নিয়ে। শিল্পী হিসাবে তাঁর মস্ত বড় আর একটি সাফল্যের কথা আজকে অনেকে ভুলে গিয়ে থাকলেও কালের বিচারে নিশ্চয়ই বাদ পড়বে না। সেটি হ'ল পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে সজ্জার ব্যাপারে। ছবি ও lay-out-এর দিক্ থেকে বর্ত্তমানে বাংলাদেশে প্রকাশিত বইগুলিতে যে উঁচু মান দেখা যায় তার জন্যে সত্যজিৎ রায়ের প্রয়াস যে অনেকটা আছে তাতে সন্দেহ নেই। সেই জন্যে তাঁর চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ গোড়ার দিকে অপ্রত্যাশিতই ছিল বলতে হবে।

তাঁর তৈরি বহুখ্যাত চিত্র "কাঞ্চনজঙ্ঘা" সম্প্রতি দেখে এসেছি। সত্যজিৎ রায়ের সমস্ত ছবিই দেখতে ইচ্ছে করে কিন্তু নানা কারণে হয়ে ওঠে না। এখনও মনে পড়ে প্রথম দিন "পথের পাচালী" দেখবার কথা। দেখেছিলাম যে সিনেমা হাউসটিতে সেটি আয়তনে বেশ বড় হলেও অত্যন্ত অগোছালো রকমের এবং নানারকমের ত্রুটিতে পূর্ণ। "পথের পাঁচালী" ছবিটির মধ্যে শব্দগ্রহণ ইত্যাদিও খুব নিখুঁত হয় নি, ফলে ছবিটি দেখতে গিয়ে রসগ্রহণে ব্যাঘাত ঘটেছিল বার বার। তবু সেই দিন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছিলাম যে, "পথের পাঁচালী" মানুষের শিল্পসৃষ্টির ইতিহাসে মহত্ত্বের সন্ধান দিয়েছে। সেদিন সত্যজিৎ রায় আমাদের দেশে সাধারণের কাছ থেকে আদর পান নি। আমরা যেদিন গিয়েছিলাম সেদিন প্রেক্ষাগৃহ ফাঁকাই ছিল বলতে হবে। তার কিছুকাল আগেই যুদ্ধোত্তর ইটালীর দুটি একটি ছবি দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষ্যে। স্বভাবতঃ মনে জাগছিল সেই সব ছবির কথা। যখন "পথের পাঁচালী" দেখে বেরোলাম তখন টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে, খুব দুঃখের সঙ্গে ভাবছিলাম ইটালিয়ান ছবিগুলি দেখতে গিয়ে যে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ চোখে পড়েছিল তা আজ কোথায়? "পথের পাঁচালী" সে যাত্রা কলকাতা শহরে খুব সাফল্যমণ্ডিত ভাবে চলে নি। তার পরে বিদেশ ঘুরে এসেছে, দেশে ও বিদেশে সমালোচকদের কাছ থেকে অনেক অভিনন্দন লাভ করেছে যুগসৃষ্টিকারী চিত্র হিসেবে। শুনেছি, পয়সাকড়ির দিক্ থেকেও পরবর্ত্তী কালে "পথের পাঁচালী" সফলতা অর্জ্জন করতে পেরেছে। তারপরে গত কিছুদিন ধ'রে সত্যজিৎ রায় বোধ হয় টিকিট বিক্রির দিক থেকে বাংলা পরিচালকদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য। তাঁর কোন একটি ছবি উঠবার আগে থেকেই শুরু হয়ে যায় নানা রকমের আলাপ ও আলোচনা। ছবি যখন শেষ হয়ে আসে তখন ত কথাই নেই, উর্দ্ধশ্বাসে সবাই প্রতীক্ষা করে কবে সেটি মুক্তি পাবে। চিত্র সমালোচকেরা সত্যজিৎ রায়ের ছবি দেখতে যান ও সমালোচনা করেন নেহাৎ কর্ত্তব্যের খাতিরে নয়। তাঁর ছবি সমালোচনা করা সমালোচকদের কাছে বিশেষ একটি আনন্দের কাজ। দর্শকেরা তাঁর কোন ছবি ভাল না লাগলেও সেটা স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ করেন। তিনি আজ সত্যিই বাংলা চিত্র-জগতে সবচেয়ে বড় শিল্পী।

সেই জন্যেই এবার যখন "কাঞ্চনজঙ্ঘা" ছবিটি মুক্তি পাবার পর অনেকের মুখে শুনতে লাগলাম যে ছবিটি ভাল হয় নি, এমন কি খারাপই হয়েছে, তখন কৌতূহল বোধ করেছিলাম। আমাদের দেশের দর্শকদের রুচির নিন্দা করছি না, একথা বলছি না যে, তাঁরা খারাপ বললেই বা প্রত্যাখ্যান করলেই কোন ছবির মূল্য সম্বন্ধে আশ্বস্ত হওয়া যায়। শুধু বলছি যে, আমাদের দেশের দর্শকেরা (বোধ হয় অন্যান্য সব দেশের দর্শকদের মতনই) সাধারণ ভাবে গতানুগতিক। নতুন কোন জিনিস তাঁদের সামনে এলে সেটাকে নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে যাচাই ক'রে নেবার সাহস তাঁদের অনেক সময়ই হয় না। যে জিনিষটা যে ভাবে চ'লে আসছে তাকে সেই ভাবে দেখতেই তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। যখন সমালোচকেরা এবং অপেক্ষাকৃত সাহসী দর্শকেরা তাঁদের ভাল-লাগা মন্দ-লাগাকে খানিকটা প্রতিষ্ঠা দিতে পারেন, তখন আস্তে আস্তে সাধারণ দর্শকের রুচি তৈরী হয়, তাঁরাও নতুন ধরনের সৃষ্টিকে গ্রহণ করতে শেখেন। দুঃখের বিষয়, সত্যিকারের ভাল লাগার চাইতেও শক্তিশালী হয়ে ওঠে ভাল লাগা যে উচিত এই ধরণের একটি মনোবৃত্তি। যে মনোবৃত্তি নিয়ে আমরা নির্বিচারে ভীড় করি বিভিন্ন জলসায় বা সঙ্গীতানুষ্ঠানে অথবা কাড়াকাড়ি করি রবীন্দ্র-রচনাবলীর জন্যে। একদিক্ থেকে এটা খুশী হওয়ারই কথা যে, যে-কোন ভাবেই হোক অন্ততঃ ভাল জিনিষকে ভাল বলছে লোকে। কিন্তু "কাঞ্চনজঙ্ঘা" ভাল হয় নি একথা শুনে আশান্বিত হয়েছিলাম এই ভেবে যে, সত্যজিৎ রায় বোধ হয় আবার নতুন কিছু দিলেন আমাদের। তিনি একজন এমন স্তরের শিল্পী যে, ফেল্‌না কিছু তাঁর হাত থেকে আসতেই পারে না, এ বিশ্বাস আমার আছে। কাজেই একথা একবারও মনে হয় নি যে, তাঁর ছবি খারাপ হয়েছে। মনে হয়েছিল যে, "পথের পাঁচালী", "অপুর সংসার" ও "তিনকন্যা"র

রায়বাহাদুরের পত্নীর ভূমিকায় শ্রীমতী করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়

("রবীন্দ্রনাথ" ছাড়া তাঁর এই তিনটি ছবিই দেখেছি এর আগে) মধ্যে যে ধারা বয়ে আসতে দেখেছিলাম, "কাঞ্চনজঙ্ঘা"তে গিয়ে বোধ হয় তার কোন মহত্তর বিকাশ দেখতে পাব। দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি যে, ছবিটি দেখে নিরাশ হয়েছি। "কাঞ্চনজঙ্ঘা" ছোট্ট ছবি, ভারতবর্ষের সমগোত্রীয় ছবির তুলনায়। যতক্ষণ দেখেছি তন্ময় হয়ে দেখেছি। কিন্তু দেখার পরে বঞ্চিত হবার ক্ষোভটুকু থেকে গেছে। অনেক সময়ে সত্যিই নতুন, সত্যিই বড় কোন শিল্পসৃষ্টির সামনে প্রথমবার উপস্থিত হলে তার প্রকৃত চেহারাটি অজ্ঞাত থেকে যায়। দুবার, তিনবার, বার বার জিনিসটিকে দেখতে হয়, তবে মনের গভীরে গিয়ে পৌঁছয় তার উপলব্ধি। "কাঞ্চনজঙ্ঘা"ও আবার দেখব, আশা করি ভালও লাগবে, কিন্তু প্রথমবার দেখে নিরাশই হয়েছি।

ছবিটিতে সত্যজিৎ রায় অসাধ্যসাধন করেছেন। একাধারে তিনি ছবিটির সামগ্রিক পরিচালনা, সঙ্গীত পরিচালনা ও কাহিনী রচনার দায়িত্ব নিয়েছেন। পরিচালকদের মধ্যে বোধ হয় দুটি দল আছে, একজনরা বিশ্বাস করেন যে গুণী অভিনেতার স্থান সবচাইতে উপরে, পরিচালক যেন অভিনেতার বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে দেবার জন্যই আছেন। আর একদলের পরিচালক বোধ হয় সচেতন ভাবে হোক বা অবচেতন ভাবে হোক এই ধারণা পোষণ করেন যে চলচ্চিত্র নিতান্তই পরিচালকের সৃষ্টি, চিত্রগ্রহণকারী থেকে শুরু ক'রে অভিনেতা পর্য্যন্ত সকলেই তাঁর মালমশলা স্বরূপ। যে কোনও সামান্যীকরণের বিপদ্ আছে; তবে সত্যজিৎ রায় যে এই দ্বিতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত সে বিষয়ে বোধ হয় মতদ্বৈধ হবে না। আলোচ্য ছবিটি তার সবচাইতে বড় প্রমাণ। ছবিটির সম্বন্ধে একটি মাত্র সমালোচনা আমি পড়েছি, তাতে সমালোচক ঈষৎ বাঁকা ভাবে বলেছেন, ছবিটির সর্ববিভাগে পরিচালকের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের কথা। বস্তুতপক্ষে ছবিটি যে কোনও সার্থক শিল্পের মতন একটি সম্পূর্ণ জিনিস এবং তার স্রষ্টি-কর্ত্তা সত্যজিৎ রায় নিজে। কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রী, তা তিনি অভিজ্ঞ এবং কুশলীই হোন বা নবাগত এবং আড়ষ্টই হোন, তাঁদের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই এ ছবিতে। ছবিটির প্রতিটি অংশ এত খুঁটিয়ে এবং এত সুন্দর ভাবে গ'ড়ে তোলা হয়েছে যে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ব্যক্তিগত দুর্বলতাগুলি পর্য্যন্ত সত্যজিৎ রায়ের তৈরী ছকের মধ্যে প'ড়ে গেছে। তার মানে কি শিল্পকুশলতার দিক্ থেকে কোন ত্রুটি নেই? নিশ্চয়ই আছে: শ্রীযুক্তা অমিয়া ঠাকুরের গানের সঙ্গে করুণা দেবীর ঠোঁট নাড়ার দৃশ্যটি কি আমাদের পীড়া দেয় না? কিন্তু মোটের পরে "কাঞ্চনজঙ্ঘা" নিছক শিল্প-চাতুর্য্যে ও গঠন-নৈপুণ্যে শিল্প-জগতে কাঞ্চনজঙ্ঘার মতন উচ্চতাসম্পন্ন এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও মন ভরেনি।

ছবিটির শুরু রায়বাহাদুরকে নিয়ে, সমাপ্তিও চিত্রপট থেকে তাঁর নিষ্ক্রমণের সঙ্গে। বস্তুতপক্ষে এই চরিত্রটিই

রায়বাহাদুরের পৌত্রীর ভূমিকায় ইন্দ্রাণী সিংহ

কাহিনীটির কেন্দ্রস্বরূপ। নাটক গ'ড়ে উঠেছে অনেকগুলি দ্বন্দ্বকে আশ্রয় ক'রে। রায় বাহাদুর ও তাঁর সহধর্ম্মিণীর মধ্যে নির্ব্বাক্ দ্বন্দ্ব, তাঁদের জ্যেষ্ঠা কন্যা ও তাঁর স্বামীর মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য ক'রে দ্বন্দ্ব, এবং সবচাইতে সুখদৃশ্য দ্বন্দ্ব—রায় বাহাদুরের কনিষ্ঠা কন্যার মনের মধ্যে জীবনসঙ্গী নিরূপনের ব্যাপারে। সব দ্বন্দ্বগুলি দুটি দুটি মানুষকে আশ্রয় ক'রে রূপ পেয়েছে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে, দ্বন্দ্বগুলি সবই মূলতঃ রায় বাহাদুরেরই সঙ্গে। বড় মেয়ের স্বামীই হোক কিংবা ছোট মেয়েই হোক, সকলেরই প্রতিবাদ আসলে রায় বাহাদুরেরই বিরুদ্ধে। এমন কি যেখানে আপাতদৃষ্টিতে কোন দ্বন্দ্বের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না সেখানেও তীব্র দ্বন্দ্ব লুকিয়ে আছে বুঝতে পারি: পত্নী-জীবন অনুসন্ধিৎসু আপনভোলা মানুষটি যখন প্রতিবাদে অনভ্যস্তা ভগিনীর পক্ষ গ্রহণ করেন কিংবা ভুটিয়া ছেলেটি রায় বাহাদুরের সঙ্গে ক্ষণিকের দৃষ্টি বিনিময় করে, তখন বুঝতে বাকী থাকে না দ্বন্দ্ব আছে কি না। নাটকটির গতি এই বিভিন্ন সংঘাতগুলির ক্রমবর্দ্ধমান তীব্রতার মধ্যে। অপূর্ব্ব সুন্দর সমস্ত প্রতীকের সাহায্যে চিত্রিত হয়েছে দ্বন্দ্বগুলির ক্রম-পরিণতির ইতিহাস। বড় মেয়ে ও জামাইয়ের জীবনে যে প্রচণ্ড কেন্দ্রাতিগ গতির সঞ্চার হয়েছে তাকে প্রতিহত ক'রে ঘিরে ঘিরে বাঁধছে একটি ছোট শিশুর কলকণ্ঠ "তিনবার ঘুরেছি আর একবার ঘুরব।" অন্য দিকে ছোট মেয়ের মনের দ্বন্দ্ব চরম তীব্র হয়ে ওঠে একেবারে অসহনীয় ভাবে—ধাবমান পশুর গলার ঘণ্টার চট্টগোলে। যিনি বহুকাল নীরব ছিলেন, তিনি কতকাল পরে ক্ষীণ কণ্ঠের গাওয়া গানের মধ্যে দিয়ে বোধ হয় মনের মধ্যে খুঁজে পেলেন বিদ্রোহ করবার শক্তি যা এতকাল সুপ্ত ছিল। তাঁর বিদ্রোহও তাঁর ব্যক্তিত্বেরই মতন শান্ত সংযত। এই সমস্ত দ্বন্দ্বগুলির মধ্যে দিয়ে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে চলেছেন রায় বাহাদুর। তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ যার হ'ল সে, বলতে গেলে, একজন "বাইরের লোক।" কলকাতা থেকে এসেছে ছেলেটি, ঠিক কেন তা অবশ্য বুঝতে পারলাম না, অসুস্থ আত্মীয়কে নজরে রাখবার জন্যে না চাকুরী খোঁজার উদ্দেশ্যে? যাই হোক, সত্যজিৎ রায়ের উদ্দেশ্য স্পষ্ট—এই রকম একটি বাইরের লোকের ধূমকেতুসুলভ আচরণের প্রয়োজন ছিল রায় বাহাদুরের ছোট্ট সৌরজগতটির equillibrium নষ্ট করার জন্যে। সে যে রায় বাহাদুরকে অমান্য করবে তা আমরা গোড়া থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম, নয় কি? তার কাছে এই অতর্কিত আঘাত পেয়ে তাঁর অভিব্যক্তিটুকু চিরকাল মনে থাকবার মত। ছেলেটির সঙ্গে রায় বাহাদুরের একটা

বিভিন্ন ভূমিকায় বিশ্বনাথন, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, অলকনন্দা

কোমলতার সম্পর্ক গড়ে ওঠার পরে যখন তিনি অতর্কিতে আঘাত পেলেন তার কাছ থেকে,সেই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছিল, যে রায় বাহাদুর যদি একটিও কথা বলেন তখন তাহলে ব্যাপারটা নেহাৎই গতানুগতিক বাংলা ছবির মত হয়ে যাবে। বেশীর ভাগ বাংলা পরিচালকের হাতে বোধ হয় হ'তও তাই। কিন্তু কি সংযমের সঙ্গেই না এই সংঘর্ষের তীব্রতাটি ফোটানো হয়েছে রায় বাহাদুরের কথা না বলার মধ্যে দিয়ে। দু-এক জায়গায় অবশ্য আমার মনে হয়েছে যে, ছন্দপতন ঘটেছে, যেমন ছেলেটি যখন ফিরে আসবার পথে আবার রায় বাহাদুরকে দেখতে পেল তখন তার মুখের উচ্চারিত Good day sir, বড্ড বেয়াড়া বিদ্রূপের মতন কানে বাজে। যাই হোক, মোটের উপর এই বিভিন্ন দ্বন্দ্বগুলি ফুটে উঠেছে খুব আশ্চর্য সুন্দর ভাবে। কিন্তু মহৎ শিল্প গ'ড়ে ওঠে মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্বকে আশ্রয় ক'রে, সেং দ্বন্দ্বের প্রকাশ কোথায় রায় বাহাদুরের চরিত্রে? চিত্রটির শেষ হওয়ার আগের মুহূর্তে বুঝতে পারি যে তাঁর মনে পরিবর্তন এসেছে কিন্তু কেন এল সেই পরিবর্তন, কখন শুরু হ'ল সেই পরিবর্তন? তাঁর এত বছরের 'অভিজ্ঞতা', সাহেবদের প্রতি তাঁর বদ্ধমূল ভক্তি, স্বাধীনতার ফলভোগের প্রতি তাঁর নিজেরই স্বীকৃত আকাঙ্ক্ষা,সে সবের বনিয়াদ ধ্বসিয়ে দিয়ে শেষ মুহূর্তে তিনি কেন ছুটলেন অমন ক'রে পরিবর্তনকে মেনে নিতে?

যেহেতু এই প্রশ্নগুলির উত্তর মেলে না, সেই হেতুই মনে হয় যেন রায় বাহাদুরের এই বিরাট পরিবর্তন ঘটল তাঁর চরিত্রের নিজের নিয়মে নয়, নিতান্তই পরিচালকের ইঙ্গিতে। চলচ্চিত্র শিল্প মানে বহু শিল্পের যুগপৎ স্ফুরণ: চিত্রশিল্পী, শিল্প-নির্দেশক, পোশাক-প্রস্তুতকারক, রূপ-শিল্পী, ধ্বনিরক্ষক, সম্পাদক, সঙ্গীত-পরিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্রী ইত্যাদি প্রত্যেককে নিখুঁত ভাবে কাজ করতে হয় পরিচালকের তৈরী করা ছকের মধ্যে। 'তবু পথের পাঁচালী'র মতন ছবি যখন আমরা দেখি তখন ভুলে যাই যে এর প্রতিটি দৃশ্যের পিছনে আছে অনেক মহড়া,অনেক-বারকার চেষ্টা ও বিফলতা। শিল্পের চরম প্রয়াস অনায়াস রূপে প্রতিভাত হওয়ার জন্য। দুঃখের বিষয়, প্রচণ্ড পটুতা সত্ত্বেও 'কাঞ্চনজঙ্ঘায়' মনে সে ভাব আসে নি। ভেঙে যাওয়া সংসারকে জোড়া লাগানোর জন্য মেয়ে এসে যখন বাবার কোলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তখন মনে হয়

না যে,সে তার নিজের খুশিতে ছুটে এসেছে বাবার কাছে; মনে হয়, পরিচালকের প্রয়োজন ছিল তাকে ঠিক সেই সময়ে সেইখানে সেইভাবে উপস্থিত করবার। মনীষার মাথার ফুল-পোশাক ও গাছটি মিলে formal আলোক-চিত্রের খুব চমৎকার বিষয়বস্তু হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু কাহিনীটির মধ্যে তার প্রয়োজন কোথায়? তেমনি তার দিদি এবং তার স্বামী যখন তাদের জীবনের জটিল সমস্যার গ্রন্থি উন্মোচনে ব্যস্ত তখন বার-বার বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ কতকগুলি ভঙ্গিমায় তাঁদের বিচিত্র ক'রে নাটকটির কোন সামগ্রিক উদ্দেশ্য কি সাধিত হয়েছে? তবে সেই একই কথা বলতে হয়, এ সব ত্রুটিও চোখে পড়ে সত্যজিৎ রায়ের ছবি ব'লেই। মোটের 'পরে এত সুন্দর ছবি আর কারুর হাতে হওয়াই কঠিন। তবু ছবিটা দেখবার পরে মনে হয়, খামখেয়ালী সাধারণ মধ্য-বিত্ত ছেলেটির কথা: এসবই হ'ল কাঞ্চনজঙ্ঘার অস্তিত্বের গুণে। কাঞ্চনজঙ্ঘাকে বিশেষ কোথাও দেখতে পাই না, তবে ছবির শুধু নামে'না, সর্ব্বত্রই তার প্রভাব পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। মনে হয় ছেলেটি কলকাতায় ফিরে গেলে বোধ হয় সেই চাকরীর উমেদারীই করবে, রায়বাহাদুর তাঁর সমস্ত শুভইচ্ছা সত্বেও অত্যন্ত মত ও পথ ছাড়তে পারবেন না, মনীষা ত নিশ্চয়ই সুপাত্রটির কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করবে। এই কাহিনীটুকু তাদের প্রত্যেকের জীবনে ক্ষণস্থায়ী, ক্ষণস্থায়ী শুধু নয় কেমন যেন অর্থহীন inconsequential বলে মনে হয়। আসলে এসব চরিত্রই বাংলা ছবিতে আমাদের বহুবার দেখা। রায় বাহাদুর বাবা, সহনশীল ব্যক্তিত্ববিহীন মা, আপনভোলা মামা, বড়লোক মেয়ে. গরীব ছেলে, এমন কি ফুর্ত্তিবাজ দাদা সবাই কি আমাদের অতি পরিচিত নয়? বুঝতাম, যদি এই সব stock character এর সাহায্যে নতুন কোন বক্তব্য পৌঁছে দিতে পারতেন সত্যজিৎ রায়। কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘায় মেঘমুক্তিও যেমন আমাদের দৃষ্টির দোষে hackneyed হয়ে উঠতে পারে, তেমনি মেঘমুক্ত কাঞ্চনজঙ্ঘার সামনে রায় বাহাদুরের চরিত্রে যে আলোকপাত করেছেন সত্যজিৎ রায় তা নেহাৎই পুরানো ও পরিচিত। নতুন কিছু আবিষ্কার নয়। কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত করবার পক্ষে ছবিটি সুন্দর কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু মহৎ শিল্প মহৎ কোনও বক্তব্য ছাড়া সম্ভব নয়। কাঞ্চনজঙ্ঘার মধ্যে prettyness-এর কোন অভাব নেই, কিন্তু 'পথের পাঁচালী'র মতন ছবির তুলনায় অত্যন্ত অন্তঃসারশূন্য ব'লে একে মনে হয়। এ ধরণের ছবি দেখা যায় খুব নিরাপদে —দর্শকের emotionগুলি কোনও সময়েই বিশেষ নাড়া পায় না। সেইজন্যেই দেখা হয়ে যাওয়ার পরে মাথায় থেকে যায় সুন্দর দেখতে কয়েকটি shot-এর কথা, তার বেশী কিছু নয়। সত্যজিৎ রায়ের মতন শিল্পীর কাছ থেকে আমরা কিন্তু এইটুকু পেলে সন্তুষ্ট হতে পারি না।

গল্পরচয়িতা সত্যজিৎ রায়ের তৈরি কথোপকথনের ভাষা ভাল লাগে নি মোটের উপর। যেখানে ভাষা ভাল সেখানে প্রায় একতরফা বক্তৃতা হয়ে উঠেছে। নাটক জমে ওঠার পক্ষে সেটা ব্যাঘাত ঘটায়। তা সত্বেও অভিনয় অনেকেরই বেশ ভাল হয়েছে। ক্যামেরার নজর সবচাইতে বেশী ক'রে পড়েছে ছবি বিশ্বাস মহাশয়ের উপর এবং তিনি তার সুবিচার নিঃসন্দেহ ভাবে করতে পেরেছেন। আজকে তাঁর ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিনয় আমাদের কাছে বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ তাঁর ও সত্যজিৎ রায় মহাশয়ের মনীষার যুগপৎ স্ফুরণের শেষ স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে। বিশ্বনাথনের অভিনয় আমার খুব ভাল লেগেছে—বিশেষতঃ তাঁর বলিষ্ঠতার ব্যঞ্জনাটি সেনশর্ম্মার dissipation-এর চিত্রের বিপরীতে খুব সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। অল্পবয়স্ক যুবক চরিত্র আরও ছুটি আছে—তারাও পরস্পরের থেকে বিপরীতধর্ম্মী—কিন্তু বঙ্গবাসী থেকে পাস করা ছেলেটিকে রায় বাহাদুরের ছেলের কাছে অত্যন্ত নিষ্প্রভ ব'লে মনে হয়েছে—জানি না পরিচালক মহাশয় তাই চেয়েছিলেন কি না। মামার চরিত্রে সান্যাল মহাশয় খাপ খেয়ে গেলেও—মার চরিত্রে করুণা দেবী যেন বড্ড বেশী শোকে মুহ্যমান বলে চিত্রিত হয়েছেন—কিসের জন্যে শোক তা বোঝা যায় না। রায় বাহাদুরের কন্যাদের ভূমিকায় কারুর অভিনয়ই ভাল লাগে নি। অন্যান্য ছোট ভূমিকায় নেপালী বালকটি ও অল্পবয়সী মেয়েটির অভিনয় অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সুন্দর হয়েছে। পর্দার অন্তরালে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের ভুল প্রায় ধরাই যায় না। ছবি ও শব্দ-গ্রহণের কাজ খুবই উঁচু দরের হয়েছে।

মোরান ভিলায় রবীন্দ্রনাথের সুরের সৃজন-লীলা

শ্রীমৃণাল ঘোষ

সেই বয়স—যে বয়সকে লক্ষ্য করে মিথিলার কবি বলেছিলেন 'শৈশব যৌবন দুঁহু মিলি গেলা'—সেই বয়সে রবীন্দ্রনাথ এলেন চন্দননগরে গঙ্গাতীরে। মন তখন অকারণ পুলকে খুশিতে ভরে যায়, সৃষ্টির সব কিছুর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী রোমান্টিক। ব্যারিষ্টার হবার জন্য দ্বিতীয়বার বিলেত পাঠাবার ব্যবস্থা করা হল, কিন্তু হঠাৎ মত পরিবর্তন ক'রে মাদ্রাজের সমুদ্রতীর থেকে রবীন্দ্রনাথ সোজা মুশৌরীর পর্বতশিখরে পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহচ্ছায়াতলে উপস্থিত হলেন। উত্তর প্রদেশের পাহাড় পবত থেকে নেমে এবার তিনি পাড়ি জমালেন বাংলার স্নিগ্ধ শ্যামল নদীতীরে, ফরাসী শাসিত চন্দননগরে, আর আশ্রয় নিলেন তাঁর জ্যোতি-দাদার কাছে বকুলবীথিকা শোভিত মোরান সাহেবের প্রাসাদোপম হর্ম্যে।

সাগরপারে 'লিংকন্‌স্ ইন'-এ যোগদান ক'রে বিলেতে বসে রোমান ল, ব্রিটিশ জুরিসপ্রুডেন্স ইত্যাদি আইন গ্রন্থ পাঠ করে, ভোজ দিয়ে ব্যারিষ্টার হবার চেষ্টায় তিনি জলাঞ্জলি দিলেন, কারণ তখন তাঁর পক্ষে "বাংলা দেশের এই আকাশভরা আলো, এই দক্ষিণের বাতাস, এই গঙ্গার প্রবাহ, এই রাজকীয় আলস্য, এই আকাশের নীল আর পৃথিবীর সবুজের মাঝখানকার দিগন্ত-প্রসারিত উদার অবকাশের মধ্যে সমস্ত শরীর মন ছাড়িয়া দিয়া আত্মসমর্পণ—তৃষ্ণার জল আর ক্ষুধার খাদ্যের মতই আবশ্যক ছিল।"[১]

চন্দননগরের দিনগুলি তখন রবীন্দ্রনাথের সুধায় সুধায় ভরে উঠেছিল। তখন থেকেই মোরান সাহেবের বাগানের স্মৃতি-বিজড়িত চন্দননগরের প্রতি তাঁর হৃদয়ানুরাগ হয়েছিল অতি সুগভীর এবং জীবনব্যাপী। মোরান ভিলার তেতলার হাওয়া-ঘরে ব'সে গঙ্গার শোভাদর্শন প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

> "আবার সেই গঙ্গা! সেই আলস্যে আনন্দে অনির্ব্বচনীয়, বিষাদে ও ব্যাকুলতায় জড়িত, স্নিগ্ধ শ্যামল নদীতীরের সেই কলধ্বনিকরুণ দিনরাত্রি! এইখানেই আমার স্থান, এইখানেই আমার মাতৃহস্তের অন্ন পরিবেশন হইয়া থাকে।"[১]

এখানে কবি-মানসের অনুকূল শ্যামলশ্রীমণ্ডিত ভাগীরথীতীরের এই রমণীয় পরিবেশে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি এবং আনন্দে রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটি বিচিত্র পর্ব অতিবাহিত হয়েছে। জীবনস্মৃতির পাতায় রয়েছে সেই অবিস্মরণীয় অনুভূতির সুমধুর স্মৃতিকথা :

> "আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ করা পূর্ণ বিকশিত পদ্মফুলের মতন একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখনও বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হারমোনিয়াম যন্ত্রযোগে বিদ্যাপতির 'ভরা বাদর মাহ ভাদর' পদটিতে মনের মত সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাতমুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন খ্যাপার মত কাটাইয়া দিতাম, কখনও বা সূর্য্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম—জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন, আমি গান গাহিতাম…।" ইত্যাদি

অনির্বচনীয় সঙ্গীতস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের জীবনে চন্দননগরের দিনগুলি ছিল সুরের কলস ভরার দিন। রবীন্দ্র-মানস গঠনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অসামান্য প্রভাবের কথা সর্বজনবিদিত। ঠাকুর পরিবারের বহু অসাধারণ গুণ-সম্পন্ন সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই ছিলেন ভার্সেটাইল বা বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। এ দেশের এবং ওদেশের কাব্য সাহিত্য এবং সঙ্গীতাদি ললিতকলার উপর জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের দখল ছিল অনন্যসাধারণ। মহাকবি কালিদাসের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত নাটকগুলির সাথে সমান পারদর্শিতার সঙ্গে দিনের পর দিন তিনি অনুবাদ করে গেছেন

১ জীবনস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ।

২ জীবনস্মৃতি- রবীন্দ্রনাথ।

* এখানে স্মরণীয় যে বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যস্রষ্টা Johan Bojer প্রতীচ্যে রবীন্দ্রপ্রতিভার অবদানকে সৌরভময় প্রস্ফুটিত শতদলপদ্মের সঙ্গে তুলনা করেছেন "Rabindranath Tagore.........He is India bringing to Europe a new divine symbol, not the Cross but the Lotus."—লেখক।

ফরাসী মোপাসাঁর গল্পগুলি। তাঁর ঘর কখন মুখরিত থাকত সেতার ঝঙ্কারে, ভারতীয় মার্গ-সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর আলাপে, আবার কখন পিয়ানোর টুংটাং শব্দের সঙ্গে সেখান থেকে ভেসে আসত ফরাসী সুরস্রষ্টা শোপ্যাঁর সোনাটা। অনেক সময় যখন পিয়ানোয় বিদেশী সুরের খেলা চলত, জ্যোতিদাদার পাশে বসে রবীন্দ্রনাথ সংযোগ করতেন তাতে বাংলা কথা। এমনি করেই কত বিদেশী মেলোডিকে আত্মসাৎ করে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতে সেদিন করেছিলেন নব নব রূপসৃষ্টি। কবির অসামান্য প্রতিভা এবং অন্তরের আবেগ এই অপরূপ সুর-সঙ্গতিকে সেদিন সার্থক এবং অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। "বিচিত্রের দূত" রবীন্দ্রনাথের জীবনে চিরদিন চলেছিল অনেক সুরের ভাঙ্গা-গড়ার খেলা। নদীতীরে মোরান ভিলার মনোরম পরিবেশে নব নব সুরসৃষ্টির দুর্বার গতি-বেগে ঘনঘোর বর্ষার দিনে এমনি করেই বিদ্যাপতির গানে মনের আনন্দে তিনি সঞ্চারিত করে দিলেন মনের মত বাংলা সুরের আমেজ। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই লিখেছেন :

"...মেঘের ছায়া ভেসে চলেছে স্রোতের উপর ঢেউ খেলিয়ে, মেঘের ছায়া কালো হয়ে ঘনিয়ে রয়েছে ওপারে বনের মাথায়। অনেকবার এইরকম দিনে নিজে গান তৈরী করেছি, সেদিন তা হ'ল না। বিদ্যাপতির পদটি জেগে উঠল আমার মনে, 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর।' নিজের সুরে ঢালাই করে রাগিনীর ছাপ মেরে তাকে নিজের করে নিলুম। গঙ্গার ধারে সেই সুর দিয়ে মিনে-করা এই বাদল দিন আজও রয়ে গেছে আমার বর্ষাগানের সিন্দুকটাতে।"৩

রবীন্দ্র-জীবনে এই সুরম্য মোরান ভিলা তখন হয়ে উঠেছিল সুরের অলকাপুরী। এখানে নব নব সুরসৃষ্টির সার্থকতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-স্নেহ-ধন্য মনীষী ডাঃ কালিদাস নাগ বলেন :

"...ষোলো বছরের রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির পদে প্রথম যে সুর দিয়েছিলেন চন্দননগরের গঙ্গাতীরে, তাতেও মেঘমল্লারের পাকা আলাপ।"৪

বিশেষ করে যে সময় বাংলার তথাকথিত অভিজাত এবং শিক্ষিত সমাজে পদাবলী গানের প্রবেশ নিষেধ ছিল, সে সময় বৈষ্ণব পদাবলীকে এমন সহজ আনন্দে আপনার করে নেবার এই দুঃসাহসের কথা সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্র সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে বলেন :

"বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ ছিল।...গিয়েছেন চন্দননগরে। সেখানে আকাশ অন্ধকার করে এল কালো মেঘ। সেদিন বৌ-ঠাকুরাণীকে শুনিয়ে দিলেন, 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর' গানটি। সে সময় পদাবলী গান সভ্যসমাজে ছিল অপাংক্তেয়। তখনকার ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের দৃষ্টি ছিল পাশ্চাত্ত্য দেশের দিকে কিন্তু বিদেশী সঙ্গীতের রসকে পুরোপুরি গ্রহণ করবার মত শিক্ষা ও সংস্কৃতি সে সমাজের ছিল না। অথচ দেশের রসসৃষ্টি, সাহিত্য, গান সবকে অবহেলা করে এরা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিল যে, এরা শিক্ষিত। সেই রকম দিনে রবীন্দ্রনাথ মোজা-বর্জ্জিত পায়ে ড্রয়িং রুমে ঢুকে সে সমাজকে যেমন চমকে দিয়েছিলেন একদিকে, অন্য-দিকে তাদেরই সামনে তিনি পদাবলী সঙ্গীতকে সার্থক করে তুলেছেন তাঁর নিজস্ব রং লাগিয়ে।"৫

মোরান ভিলায় অবস্থানের সময় রবীন্দ্রনাথ বিদ্যা-পতির পদাবলী গানকে 'নিজের সুরে ঢালাই করে রাগিনীর ছাপ মেরে তাকে নিজের করে' যে অবিস্মরণীয় সুরসৃষ্টি করেছিলেন সে কথা স্মরণ করে নিজ জীবনের শেষার্দ্ধে শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"জ্যোতিকাকা মহাশয় থাকেন তখন ফরাস-ডাঙ্গার বাগানে।...এক-একদিন বেড়াতে যেতুম ফরাসডাঙ্গার বাগানে যেমন ছেলেরা যায় বুড়োদের সঙ্গে।...বসে আছি বাগানে। খুব আম-টাম খাওয়া হোলো...তার পর গান। জ্যোতিকাকা মহাশয় বললেন, 'রবি গান গাও।' গান হোলেই রবির গান হবে।...সেই গানটা হোলো :

ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

গঙ্গার ধারে জ্যোতিকাকা মহাশয় হারমোনিয়াম বাজাচ্ছেন ; প্রথম সেই গান শুনলাম, সে সুর এখনও কানে লেগে রয়েছে। কি চমৎকার লাগল।"৬

তরুণ বয়সে মোরান-ভিলায় থাকার সময়টি ছিল রবীন্দ্র-জীবনে সুরের ফুল ফোটানোর যুগ। রবীন্দ্রনাথের শৈশবে যদুভট্ট, মৌলাবক্স, শ্রীকণ্ঠ এবং আদি

৩ ছেলেবেলা—রবীন্দ্রনাথ।
৪ সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথ—ডাঃ কালিদাস নাগ
৫ রবীন্দ্রনাথের গান—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৬ ঘরোয়া—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্ম-সমাজের বিষ্ণুরাম চক্রবর্ত্তী ইত্যাদি সেকালের স্বনামধন্য শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-শিল্পীগণ মুখরিত করে রেখেছিলেন জোড়াসাঁকের ঠাকুরবাড়ী। মার্গ সঙ্গীতের সঙ্গে, ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতির সঙ্গে বাল্যকাল হতেই রবীন্দ্রনাথ যথেষ্টভাবে পরিচিত ছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসঙ্গীতের অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি এবং তাতে বহু রাগ-রাগিণী ভারতীয় সঙ্গীত-শাস্ত্রসম্মত শুদ্ধ ঠাটে এবং শুদ্ধ তালে বাঁধা। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, তাঁর চিরবৈচিত্র্যময় প্রতিভা জীবনে কোনো বাধ্যতামূলক শিক্ষাকে কোনো দিনই স্বীকার করেনি। সারাজীবন সুরের খেলা খেলতে খেলতে তিনি রবীন্দ্র-সঙ্গীতে কত নূতন ছন্দ ও তালের সৃষ্টি করেছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সঙ্গীতের সমন্বয়েরও পরিচয় রয়েছে তাঁর সঙ্গীতে,যেমন আইরিশ-বিলাবল, স্কচ-ভূপালী ইত্যাদি। তাঁর চিরবিস্ময়কর কবি-মানস গানের অন্তর্নিহিত ভাবটিকে রূপ দেবার জন্য অবলীলাক্রমে কতকগুলি রাগ-রাগিণীর মিশ্রণ ঘটাতে তাঁকে চিরদিনই অনুপ্রাণিত করে রেখেছিল। (অবশ্য এই রাগ-রাগিণীর মিশ্রণ অশাস্ত্রীয় নয়। ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রে দুই রাগিণীর মিশ্রণজাত রাগিণীকে 'সালঙ্ক' এবং ততোধিক মিশ্রণে উৎপন্ন রাগিণীকে 'সঙ্কীর্ণ' বলা হয়েছে।) সুরের মিশ্রণ সাধনে, সুর ভাঙা-গড়ার খেলায় তিনি কিছুটা হাত পাকিয়েছিলেন এই মোরান ভিলায়।

রবীন্দ্রনাথের গান যেন এক-একটি বাণী-চিত্র। এ সঙ্গীত যেন বিশেষ ভঙ্গিতে ফুটে ওঠা পুষ্পস্তবক, যেন একটি রজনীগন্ধার ঝাড়, তার শুচি শুভ্র স্নিগ্ধতায়, সুগন্ধের আত্মনিবেদনের মধ্যে রয়েছে পূর্ণের পরশ। Emotionকে আশ্রয় করে ভাব ও কথার সাহায্যে অপরূপ ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর অজস্র গানে। গানের মধ্যে এই যে imagery—এ যেন প্রকৃতির বিশেষ একটি রূপকে নিজের একটি mood-এর মধ্যে আত্মগত করে সুরের মাধ্যমে পুনঃপ্রকাশ। বর্ষা-বিভোর প্রকৃতির রূপটি মোরান ভিলায় রবীন্দ্র-চিত্ততলে চিরমুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল।

এখানে রবীন্দ্রনাথ কতদিন বাস করেছিলেন সঠিক জানা যায় না। তিনি নিজে বলেছেন :

> "মোরান সাহেবের বিখ্যাত হর্ম্যে আমাকে কিছু দীর্ঘকাল যাপন করতে হয়েছিল।"৭

কোনো কোনো সমালোচকের মতে সে সময় এখানে চন্দননগরের গঙ্গাতীরে তিনি পূর্ণ এক বৎসরকাল ছিলেন—

> "মনে হয় পুরো একটি বছর কবি চন্দননগরে কাটালেন। এই পর্ব্বে গদ্য ও পদ্যে অজস্র রচনা তাঁর লেখনীমুখে সৃষ্টি হয়েছে।"৮

এখানে তিনি যতদিনই থাকুন না কেন, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে চন্দননগরে নদীতীরে বর্ষার দিনে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের রূপটি তাঁর অন্তরকে অতি নিবিড় ভাবে স্পর্শ করেছিল। দীর্ঘকাল পরে মোরান ভিলার স্মৃতি প্রসঙ্গে সে কথা তিনি বলেছিলেন চন্দননগরে তাঁর এক সম্বর্দ্ধনা সভায় :

> "ছেলেমানুষের বাঁশী ছেলেমানুষী সুরে যেখানে বাজত সে আমার মনে আছে। মোরান সাহেবের বাগান বাড়ি···ছাদের উপর থেকে মনে হ'ত মেঘের খেলা যেন আমাদের পাশের আঙ্গিনাতেই।" ইত্যাদি ৯

এর পর, ৯ই ফাল্গুন ১৩৪৩ সালে বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সেই ঐতিহাসিক বিদ্বজ্জনসমাগমে, চন্দননগরে তাঁর 'কবিজীবনের উদ্বোধন' প্রসঙ্গে শ্রদ্ধাস্পদ ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৺হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৺যদুনাথ সরকার, ৺অনুরূপা দেবী, ৺অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ৺ইন্দিরা দেবী, অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ ইত্যাদি মনীষি-বৃন্দের সামনে কিশোর বয়সের স্মৃতি প্রসঙ্গে চন্দননগরে মোরান ভিলায় বসে দিনের পর দিন যে মেঘের খেলা দেখতেন সেই অপূর্ব্ব স্মৃতিকথা রবীন্দ্রনাথ আর একবার বললেন :

> "···গঙ্গার তীরের উপর সেই হর্ম্যের অলিন্দে ও সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় আমি অনেক রাত্রি কাটিয়েছিলাম এবং আকাশের মেঘের সঙ্গে ছিল আমার মনের খেলা···তখনি আমার কবি-জীবনের প্রথম সূচনা হয়েছিল।"১০

সেদিন কিশোর বয়সে 'বৃষ্টিপাতমুখরিত জলধারাচ্ছন্ন'

৭ বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের রিপোর্ট।

৮ শনিবারের চিঠি, কবিমানসী, চতুর্দশ অধ্যায়—জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

৯ ২১শে বৈশাখ ১৩৩৪ নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে পৌরসভার অভ্যর্থনা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের উত্তর ভাষণ।

১০ অভিভাষণ—রবীন্দ্রনাথ, জাহ্নবী নিবাস, চন্দননগর, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭

মধ্যাহ্নে রবীন্দ্রনাথ মোরান-ভিলায় বসে মিথিলার কবির বর্ষাগানে মনের মত বাঙলা সুর বসিয়েছিলেন। সেদিনকার বর্ষার রূপ তাঁর মনে চিরন্তন রেখাপাত করেছিল। চিরবৈচিত্র্যময় রবীন্দ্র সঙ্গীতের মধ্যে তাই দেখি তাঁর বর্ষার গানগুলি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। বিদ্যাপতির বর্ষাগান আত্মগত করে তাতে বাঙলা সুরের ছোঁয়াচ লাগাবার অনেক পরে রচিত তাঁর বর্ষার গানগুলির মধ্যেও যেন সেদিনকার মোরান-ভিলার সুরসৃষ্টির রেশ আবেগে আনন্দে আবার আত্মপ্রকাশ করেছে, যেমন—

(১) "আজ বারি ঝরে ঝরঝর ভরা বাদরে"১১

(২) "ঝরঝর বরিষে বারিধারা"১২

(৩) "ঝরে ঝরঝর ভাদর-বাদর বিরহকাতর শর্বরী"১৩

(৪) "আজি ঝরঝর মুখর বাদরদিনে।"১৪

অনেক রাগ-রাগিণীর মধ্যে মল্লার রাগিণীটি ছিল কবিগুরুর অত্যন্ত প্রিয়। কারণ 'বর্ষার কবি রবীন্দ্রনাথ'-এর সঙ্গীতের মর্মবাণীটির সঙ্গে এই বিশেষ রাগিণীটির অন্তর্নিহিত ভাবের এক সুগভীর একাত্মবোধ রয়েছে। বর্ষামঙ্গল উৎসবের প্রবর্ত্তক রবীন্দ্রনাথ মোরান-ভিলায় মেঘাচ্ছন্ন দিনগুলিতে একসময় বর্ষার গান নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর নব নব সুর সৃষ্টি করেছিলেন তারই অপরূপ পরিণতি লক্ষ্য করা যায় পরবর্ত্তীকালে রচিত তাঁর বহু মল্লার রাগিণীর রবীন্দ্র সঙ্গীতে, যেমন 'আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে দুয়ার কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে' কিংবা 'কাঁপিছে দেহলতা থর থর' ইত্যাদি গানগুলির মধ্যে যেন একই সূত্রে গাঁথা রয়েছে বর্ষণোন্মুখ নিবিড় আকাশে পুঞ্জীভূত মেঘের সঞ্চরণের সঙ্গে মানুষের অন্তরের আকুল প্রতীক্ষা আর প্রচ্ছন্ন বেদনা।

গঙ্গার এপারে চন্দননগরে নদীতীরে মোরান ভিলা আর ওপারে শ্যামনগরের মূলাজোড়। ভবিতব্যের কোন্ নিঃশব্দ ইঙ্গিতে, দু'শ বছর আগে বাংলার আর এক অবিস্মরণীয় কবি, রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র ঠিক এই অঞ্চলটিতে এপারে এবং ওপারে কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। সেদিন তিনি এখানে নৌকাবিহার করতেন কি না জানা যায় না, কিন্তু দু'শ বছর পরে প্রতিদিন অপরাহ্নে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুই অসামান্য প্রতিভাবান্ পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ মোরান ভিলার বাঁধাঘাট থেকে নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন মাঝ-গঙ্গার দিকে। নৌকায় বসে বেহালা বাজাতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর গান গাইতেন রবীন্দ্রনাথ। অপার বিস্ময়ে আর আনন্দে মুগ্ধ হয়ে সেদিন গঙ্গার এপারের আর ওপারের অধিবাসীরা রোজ সন্ধ্যায় শুনত বিশ্বকবির কিশোর বয়সের অনিন্দ্যসুন্দর কণ্ঠে গাওয়া সুমধুর সঙ্গীত। গঙ্গাবক্ষে নৌকায় এই সুরের সাধনার কথা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন:

> "সূর্য্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম—জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন আমি গান গাহিতাম ·····পূর্ব্ববনান্ত হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিত। আমরা যখন বাগানে ফিরিয়া আসিয়া নদীতীরের ছাদটার উপরে বিছানা করিয়া বসিতাম, তখন জলে স্থলে শুভ্রশান্তি, নদীতে নৌকা প্রায় নাই, তীরের বনরেখা অন্ধকারে নিবিড়, নদীর তরঙ্গহীন প্রবাহের উপর আলো ঝিকমিক করিতেছে।" ১৫

চন্দননগরে গঙ্গাবক্ষে এই সঙ্গীতমুখর সন্ধ্যার কথা তিনি কোনো দিন ভোলেন নি। অনেকদিন পরে বিলেত যাবার পথে লোহিত সমুদ্রে এক অলৌকিক সূর্য্যাস্তের বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে ২রা আষাঢ় ১২৯৯ সালে শিলাইদহ থেকে লিখেছেন:

> "এমন এক-একটি দিন সম্পত্তির মত······চন্দন-নগরের গঙ্গার গুটিকতক সন্ধ্যা······এই রকম কতক-গুলি উজ্জ্বল সুন্দর ক্ষণখণ্ড আমার যেন ফাইল করা রয়েছে।"১৬

নিরবচ্ছিন্ন শান্তির মধ্যে, প্রশান্ত গভীর আনন্দে উদ্বেলিত হৃদয়-মন নিয়ে যখন তিনি মোরান-ভিলায় মেতে উঠেছিলেন নিত্যনূতন সুরের খেলায়, জীবনের সেই অবিস্মরণীয় পর্বটিকে সন্ধ্যা-সঙ্গীতের যুগ বলে তিনি নিজেই চিহ্নিত করে রেখেছেন এবং মোরান-ভিলাকে তাঁর কবি-জীবনের উদ্বোধন তীর্থের১৭ অমর মর্য্যাদা দান করে গেছেন।

শুধু কবিজীবনের উদ্বোধনতীর্থ বললেই মোরান সাহেবের বাগানবাড়ীর সব পরিচয় নিঃশেষ হয়ে যায় না। সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের দিক্ থেকে বিচার করলে ইহার অধিকতর মূল্যায়ন সম্ভব।

১১, ১২, ১৩, ১৪, গীতবিতান, প্রকৃতি— রবীন্দ্রনাথ।

১৫ জীবনস্মৃতি - রবীন্দ্রনাথ।

১৬ ছিন্নপত্র—রবীন্দ্রনাথ।

১৭ 'এই গঙ্গাতীরে এই নগরের একপ্রান্তেই আমার কবি-জীবনের উদ্বোধন'' — রবীন্দ্রনাথ।

এখানে রবীন্দ্রনাথের প্রাণের সুরে ঝঙ্কৃত সন্ধ্যাসঙ্গীতের অধিকাংশ কবিতা এবং তাঁর প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস বৌঠাকুরাণীর হাট লেখা সুরু হয়। এখানে স্মরণযোগ্য যে, মোরান-ভিলায় রচিত সন্ধ্যাসঙ্গীত এবং বৌঠাকুরাণীর হাটের জন্যই রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যার বিবাহের দিন সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র কিশোর রবীন্দ্রনাথের গলায় নিজের প্রাপ্য জয়মাল্যটি পরিয়ে দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্র-জীবনে সুর-সাধনার ইন্দ্রপুরী এই মোরান-ভিলা সম্বন্ধে বিদেশিনী লেখিকা Marjorie Sykes বলেন :

> "In this happy home among these beautiful scenes, he wrote the volume called Evening Songs. This book at once made him famous among the Bengali writers of the time."১৮

'বিস ও সুধা' ব্যতীত সন্ধ্যাসঙ্গীতের সব কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথ মোরান ভিলায় রচনা করেন। সন্ধ্যাসঙ্গীত সম্বন্ধে প্রখ্যাত 'রবীন্দ্র-জীবনী' রচয়িতা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন :

> "সন্ধ্যাসঙ্গীতে কবি অতীতের বন্ধন ছিন্ন করিয়া নূতন আত্মশক্তি অনুভব করেন বলিয়াই এই কাব্যের এত সমাদর। সন্ধ্যাসঙ্গীতকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্য গ্রন্থাবলীর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ-নিরপেক্ষ নিজস্ব কাব্য-সৃষ্টির সূত্রপাত হইয়াছিল এই কাব্যের মধ্য দিয়া।"১৯

১৮ The Story of Rabindranath Tagore—Marjorie Sykes

১৯ রবীন্দ্র-জীবনী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্র-রসিক প্রমথনাথ বিশী বলেন :

> "রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহের উৎস সন্ধ্যাসঙ্গীত… আমাদের নিকট সন্ধ্যাসঙ্গীতের যে মূল্য তৎপূর্ববর্তী কাব্যের তাহা নহে। …আমাদের অনুমান ছাড়াও গুরুতর প্রমাণ আছে, স্বয়ং কবির সাক্ষ্য।"২০

রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথম প্রকাশের সময় সন্ধ্যাসঙ্গীত সম্বন্ধে কবিগুরু লিখেছেন :

> "তাকে আমের বোলের সঙ্গে তুলনা করব না, করব কচি আমের গুটির সঙ্গে, অর্থাৎ তাতে তার আসল চেহারাটা সবে দেখা দিয়েছে শ্যামল রঙে।… কিন্তু সেই কবিতাই প্রথম স্বকীয় রূপ দেখিয়ে আমাকে আনন্দ দিয়েছিল। অতএব সন্ধ্যাসঙ্গীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়।"২১

মোরান-ভিলার তেতলার হাওয়া-ঘর, যেখানে তাঁর প্রাণের সুর, লিরিকধর্মী সুরের প্রথম মর্মোপলব্ধি হয়েছিল, সন্ধ্যাসঙ্গীত রচনার সুমধুর স্মৃতি-বিজড়িত সেই ঐতিহাসিক কক্ষটি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"এইখানে ছিল আমার বাসা আর এইখানেই আমার মানসীকে ডাক দিয়ে বলেছিলেম :

> এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
> তোর তরে কবিতা আমার।"২২

২০ রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহ—প্রমথনাথ বিশী।

২১ রবীন্দ্র-রচনাবলী, কবির মন্তব্য—রবীন্দ্রনাথ।

২২ ১৩৩৪ সনে রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা সভায় কবির ভাষণ প্রসঙ্গে (বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত)।

জনমত ও গণতন্ত্র

শ্রীঅশোককুমার মুখোপাধ্যায়

আজকাল প্রায় সব সময়েই 'গণতন্ত্র' কথাটা আমরা শুনি। কিন্তু এর যথার্থ অর্থের অনেক সময়ই বিকৃতি, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, ঘটে থাকে। গণতন্ত্রের ধারণা অনেক পুরোন হলেও এর সঠিক সংজ্ঞা, প্রয়োগ ও ব্যবহার কালে কালে, দেশে দেশে বিভিন্ন। আজকের দিনে যে দুই পরস্পর-বিরোধী আদর্শের সমাজব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে, তাদের উভয়েরই লক্ষ্য গণতন্ত্রের সার্থক রূপায়ণ। কিন্তু এ দুই রকমের গণতন্ত্রের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলের অংশটাই বেশি চোখে পড়ে। তেমনি প্রাচীন ভারতীয় বা গ্রীক গণতন্ত্র ও আজকের ব্রিটিশ গণতন্ত্রে যে প্রভেদ তা আকাশ পাতাল না হলেও বেশ অনেকখানি। তবুও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আর সমাজবিজ্ঞানীগণ মোটামুটি যেটুকুতে এক-মত তার থেকে গণতন্ত্রের একটা চলনসই ধারণা করা যেতে পারে। আব্রাহাম লিঙ্কনের মত 'জনগণের দ্বারা গঠিত, জনগণের দ্বারা চালিত, জনগণের জন্য শাসিত' সরকার বললে কিছুই প্রায় স্পষ্ট হ'ল না। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারা সরকার গঠন করলেই তা 'গণতান্ত্রিক' হয় না। কেন না, তাহলে হিটলারের শাসনও গণতান্ত্রিক, যেহেতু ভোটের মাধ্যমেই তিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন। আবার জনকল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেই যে-কোন শাসনকেই গণতান্ত্রিক বলা যেতে পারে না। কেন না, তাহলে মধ্যযুগীয় অনেক রাজা-রাজড়া বা উদার-নৈতিক সামন্ত প্রভুদেরও গণতন্ত্রের শিরোপা দিতে হয়। মনে রাখতে হবে যে, তাঁরা জনহিতার্থ যে কাজ করেন সেটা সম্পূর্ণ ভাবে স্বেচ্ছায় করেন, জনসাধারণের কোন সুপারিশকে তামিল করেন না। জনমতের প্রতি শ্রদ্ধার বোধ অগণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার চরিত্রগত গুণ নয়। গণতন্ত্রে সর্বপ্রকার কাজের জন্য শাসিতের কাছে শাসক-গোষ্ঠীর সব সময়ই একটা দায়-দায়িত্বের ভার accountablity থাকে। এই দায়িত্ববোধ যেখানে অনুপস্থিত সেখানে গণতন্ত্রের বিশিষ্ট গুণটির অভাব ঘটেছে বলে মনে করা যেতে পারে। এই সঙ্গে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই দায়িত্ববোধ যে শুধুমাত্র কয়েকজন নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছেই থাকবে এমন কোন কথা নেই। এই দায়িত্ববোধ যে কোন ভাবে অনুভূত হতে পারে। আজও সুইজারল্যাণ্ডের কোন কোন অঞ্চলে 'পল্লীসভা' Landsgemeinde আহূত হয় যেখানে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক ও সরকারের প্রতিনিধি প্রত্যক্ষ ভাবে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছয়। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের এই উদাহরণ প্রাচীন ভারতবর্ষ ও গ্রীসে প্রচলিত ছিল, কেন না, তখনকার রাষ্ট্রের কল্পনা 'নগর-রাষ্ট্রের' বেশি আর এগোয় নি। কিন্তু আধুনিক জীবন-যাত্রার জটিলতা, জনসংখ্যার বৃদ্ধি, রাষ্ট্রের পরিবর্তিত ধারণা—এই সমস্তের জন্য আজ প্রত্যক্ষের বদলে পরোক্ষ গণতন্ত্রের আবির্ভাব হয়েছে। অর্থাৎ জনসাধারণের মতাধিকার যদিও আজ পর্যন্ত তার গুরুত্ব হারায় নি তবুও পরোক্ষ গণতন্ত্রে শাসক-শাসিতের সম্পর্ক একটু দূর হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে নির্বাচনের সময় সাময়িক ভাবে যে যোগসূত্র স্থাপিত হয় সেটাও তত গুরুত্বপূর্ণ নয়, কেন না, তখন দল-প্রথার ভিত্তিতে প্রাণপণ প্রচারের মধ্যে দিয়ে আপন আপন দলীয় কর্মসূচীর জন্য জনগণের সম্মতিসূচক ভোট লাভের প্রশ্নই প্রধান হয়ে ওঠে। শাসনকার্যে জনগণের অংশ গ্রহণ এর দ্বারা বেশি দূর এগোয় না। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে নির্বাচিত সরকারকে প্রতি পদে আয়ত্তে রাখা জনসাধারণের দ্বারা সম্ভব হয় না। কিন্তু এর মধ্যেও যা বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় সেটা হ'ল যে, "জনমতে"র রায়কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করার উপায় গণতন্ত্রের আধুনিক ব্যবস্থায় নেই। সেটা সম্ভব হয় একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্রে, তা সে জনহিতব্রতী বা অত্যাচারী যাই হোক না কেন। গণতন্ত্রে 'জনমত' আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, শাসকের প্রতিটি কাজের যথাযথ মূল্যায়নে সদা তৎপর।

এই যে 'জনমতে'র কথা বলা হ'ল তা সংখ্যাধিক্যের অভিমতের সঙ্গে সহজেই তুলনীয় হলেও এই দুটো কখনই এক জিনিষ নয়। এমন কি এরকমও হতে পারে যে, কোন নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকৃত জনমতের ঠিক বিপরীত মতই প্রকাশ পেল। তাই একথা মনে রাখতে হবে যে সংখ্যাধিক্যের মতই "প্রকৃত জনমত" নয়।1 সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভের অভিমত মাত্রই জনমতের অভিব্যক্তি নয়।2 রাজনৈতিক দলের প্রচারের মধ্যে জন-

মতের প্রকাশ সব সময় নাও হতে পার। জনমতের প্রকৃত রূপের সৃষ্টি হয় এদের প্রত্যেকের মধ্যে থেকেই, কিন্তু সৃষ্টমতটি এদের কোন একটির সঙ্গে একাত্মক হবে—এ ধারণা ভুল। প্রকৃত জনমতের সৃষ্টি হয় তখনই যখন সংখ্যাগুরুর মতকে সংখ্যালঘু মেনে নেয় অত্যাচারের ভয়ে নয়, দীর্ঘ বিচার-বিবেচনা-প্রসূত যুক্তি-পূর্ণ প্রয়োজনবোধের তাগিদে, আপন বিবেকের নির্দেশে।3 একথা উল্টোভাবেও সত্য। প্রভাবশালী সংখ্যালঘুর বিশেষ কোন নীতি যখন কেবলমাত্র প্রচার বা অত্যাচারের চাপে নয়, সহজ ভালমন্দ চিন্তাধারার আঘাতে-সংঘাতে সংখ্যাগুরুর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সম্মতি লাভ করে, তখন তাকে জনমতের প্রকাশ বলা যায়। এই যে জনমত তার উদ্দেশ্য হবে জনকল্যাণের বৃহত্তর আদর্শ, ক্ষুদ্র স্বার্থপরায়ণতার চতুরালি নয়। গণতন্ত্রে জাগ্রত জনমত সব সময়ই সরকার বা সাধারণের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখে এবং যে কোন শৈথিল্যের প্রতি তৎক্ষণাৎ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে তাদের উপযোগিতা বা কার্যক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

সার্থক গণতন্ত্রে 'জনমত' কখনই হঠাৎ তৈরী হয় না। বিরাট্ কোন দেশনেতার সুপারিশ, শক্তিশালী দলের সমর্থন, সংবাদপত্রের নিরন্তর প্রচার-অভিযান বা বিশেষ বিশেষ স্বার্থসংশ্লিষ্ট সংগঠনের চাপে জনমতের বিকাশ না হয়ে বিকৃতিই ঘটে। জনমতের আধুনিক ধারণার ভিত্তি মূলতঃ সমাজতাত্ত্বিক।4 সমাজের প্রতিটি স্তরে, কারখানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে, সভা-সমিতিতে, বাড়ীতে, পথেঘাটে প্রতিটি মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ রকমের মতের প্রকাশ ও ব্যাখ্যান চলে গণতন্ত্রে; সেখানে শাসকের রক্তিম চোখ এর স্বতঃ-উৎসরণকে বন্ধ করে না; একনায়কের শ্যেনদৃষ্টিতে এর প্রাণ যায় না শুকিয়ে। গণতন্ত্রে কল প্রকার ব্যক্তি-স্বাধীনতার মধ্যে মতপ্রকাশের ও সমালোচনার অধিকার প্রধানতম।5 বিভিন্ন মতাদর্শের আতিথ্য করাই গণতন্ত্রের প্রধান ধর্ম.6 সদাবিতর্কিত বিভিন্ন মতের নিরন্তর প্রতি-যোগিতার মধ্যে দিয়েই জন্ম নেয় "প্রকৃত জনমত" এবং তাকে উপেক্ষা বা অশ্রদ্ধা করা গণতন্ত্রে কোন মতেই সম্ভব নয়।

জনমতের আধুনিক ধারণা একটা প্রবাহের ধারণা।7 নানাদিক্ হতে বিভিন্ন ধরণের মতের ছোট ছোট ধারা সব সময়ই প্রবহমান। প্রতি পদে তাদের গতিপথ পরিবর্তিত হচ্ছে, কোন এক মান্ধাতার আমলের নির্দিষ্ট করা বিশেষ কোন খাদে তাদের গতি নয়। সব সময়ই তারা একে অপরের সঙ্গে মিলছে এবং পরিশেষে একটি বেগবতী ধারার রূপ নিচ্ছে। বিভিন্ন মত যখন জনমতের রূপ গ্রহণ করে তখন তার শক্তি অপরিসীম। তাকে অনুসরণ করে দেশের আইনও তখন নিত্য নতুন রূপ নিতে থাকে।

জনমতকে এই যে বিশেষ অর্থে আমরা বুঝি, সে অর্থে জনমতের কোন ধারণাই প্লেটো বা অ্যারিষ্টটলের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না।8 তাঁরা রাষ্ট্রের ধারণার ওপর একট নৈতিকগুণ আরোপ করেছিলেন। প্লেটোর মতে রাষ্ট্রই শিক্ষা দেবে কি ভাবে চিন্তা করা উচিত, আর এই রাষ্ট্রের পরিচালন-ভার ন্যস্ত থাকবে "দার্শনিক-শাসক"দের ওপর যাঁরা কেবলমাত্র বিশুদ্ধ জ্ঞানের দাবীতেই এই শাসনের অধিকার লাভ করবেন। সুতরাং যাদের বুদ্ধি-বৃত্তি তাঁদের চেয়ে কম, সেই জনসাধারণের মতকে অনু-সরণ করে শাসনকার্য চালনার কোন প্রশ্নই তাঁদের মনে জাগে নি।

কিন্তু আধুনিক যুগের ধারণা এর থেকে ভিন্ন। আজকের সমাজ-বিজ্ঞানী বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন যে, জনমতের সহজ, সুন্দর ও স্বাভাবিক বিকাশ যখন সম্ভব হবে, তখন তা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে এবং গণতন্ত্রও সার্থকতর রূপ নেবে। একমাত্র তখনই মনে করা যেতে পারে "জনগণের বাণীই ভগবানের বাণী" (Vox Populi Vox Dei)।

সংখ্যাচিহ্নিত বিশেষ মতের ওপর বিস্তারিত আলোচনা নিম্নলিখিত বইয়ে পাওয়া যাবে:

1. Lowell—Public Opinion and Popular Government.
2. Lippmann—Public Opinion.
3. Lowell—Public Opinion and Popular Government.
4. Mannheim—Freedom, Power and Democratic Planning.
5. H. W. Stead—The Press.
6. E. Barker—Reflections on Government.
7. E. Barker—Greek Political Theory: Plato and His Predecessors.
8. Sabine—A History of Political Theory.

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ

(সমসাময়িক ইংরেজের অভিমত)

শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়

ইংরেজ আমলের স্কুল কলেজে পড়া ভারতবাসী শিখিয়াছে যে, ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ ফৌজের ভারতীয় সিপাইরাই বিদ্রোহ করে। তাহাতে যোগ দেয় রাজ্যচ্যুত ও পেনসনচ্যুত রাজন্যরা। ভারতের জনতা শান্ত ও নির্লিপ্ত ছিল। বিশেষতঃ আধুনিক উত্তরপ্রদেশে ও মধ্য-প্রদেশের কতক অংশে ইহা সীমাবদ্ধ ছিল। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-ভারত নির্লিপ্ত ও রাজভক্ত ছিল। রজনী গুপ্ত "সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস" অনুবাদ করিয়া এই ধারণা দৃঢ়ীভূত করেন।

ভারত স্বাধীন হইবার পর স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয়তা বোধ করায় ভারত-গবর্ণমেন্ট এ দেশের ঐতিহাসিকদের উপর মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস লেখার ভার দেন। ৮৫৭ সালের সংগ্রামকে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পর্য্যায় হিসাবে গণ্য করিতে বলা হয়।

কিন্তু ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটিল। একদল ১৮৫৭ সালের ক্রান্তিকে "জাতীয়" সংগ্রাম বলিতে অস্বীকার করিলেন নানা মুনির নানা মত হইয়াই থাকে। যাঁহারা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে "জাতীয়" বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহারা বোধ হয় শব্দার্থ সম্বন্ধে উগ্রপন্থী। ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর প্রত্যেকে কলকল-নিনাদ করালে দ্বিত্রিংশকোটি ভুজৈধৃ´ত ডাণ্ডা লইয়া তাড়া করিলেই তাহা "জাতীয়" হইবে, নহিলে হইবে না—ইহাই সম্ভবতঃ উক্ত ঐতিহাসিক পণ্ডিতদের মত। "জাতীয়" শব্দের কেতাবী অর্থ হয়ত তাহাই। কিন্তু ব্যবহারিক অর্থে সজ্ঘবদ্ধ ভাবে স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির সচেতন প্রচেষ্টাকে ইতিহাস সব দেশেই "জাতীয়" আখ্যা দিয়াছে। উগ্রপন্থী শব্দার্থবাদী ঐতিহাসিকদের ব্যাখ্যানু-সারে নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে জার্মানীর, অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ইতালীর অভ্যুত্থান "জাতীয়" নহে। মুষ্টিমেয় বল-শেভিকদের দ্বারা সজ্ঘটিত রুশ বিপ্লব "গণ-আন্দোলন" নহে। সুরেন্দ্র-দাদাভাইয়ের কংগ্রেস আন্দোলন "জাতীয়" নহে। অরবিন্দ-সৃষ্ট সশস্ত্র বিপ্লবীদের বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্টাও জাতীয় আন্দোলন নহে। গান্ধী-আন্দোলন ত নহেই। কেননা, ঐ ঐতিহাসিকরা এবং তাঁহাদের মত কোটি কোটি ভারতবাসী ইংরেজের ও ইংরেজপুষ্ট মুসলীম লীগের তাঁবেদারী করিয়া পুত্র-কন্যার গ্রাসাচ্ছাদন অর্জ্জনে ব্যাপৃত থাকিয়া "জাতীয়" ভাবে ইংরেজ উচ্ছেদের কোনও প্রচেষ্টায় যোগ দেন নাই। তাঁহারা মনে করেন উদার, বদান্য ও পরম নিঃস্বার্থ ইংরেজ জাতি ভারতের হিন্দু ও মুসলমান এই দুই "জাতি"কে স্বাধীনতাদানপূর্ব্বক বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছে। সুতরাং ব্রিটিশ ও কিছুটা মুসলীম লীগের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ থাকিব।

আবার অন্যদিকে যাঁহারা ১৯০৫ সাল হইতে ১৯৪৭ পর্য্যন্ত ফাঁসি, কারাবাস, দৈহিক নির্যাতন, আর্থিক ক্ষতি, অর্দ্ধাশন, সামাজিক অবহেলা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা মনে করেন যে, ১৮৫৭ সালের ব্যর্থ প্রচেষ্টার শেষ পরিণতি ১৯৪৭ সালে ইংরেজের বিদায় গ্রহণ। মধ্যবর্ত্তী আন্দোলনগুলি একে অন্যের অনুপূরক। সব কয়টাই স্বাধীনতার জন্য সচেতন জাতীয় সংগ্রাম। এই দুই মতের মধ্যে আমরা বলিব, বুঝ সাধু যে জান সন্ধান।

এই প্রবন্ধ সেই সন্ধান কার্য্যে সামান্য একটু প্রচেষ্টা :

১৮৮৪ সনে জন মারে কর্তৃক প্রকাশিত একটি পুস্তক হস্তগত হইয়াছে। ইহার লেখক মার্ক থর্ণহিল। ইনি বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে ছিলেন। (তখন ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস হয় নাই)। বইটির নাম : "The Personal Adventures and Experiences of A Magistrate During the Rise, Progress and Suppression of the Indian Mutiny." মলাটে ও পুস্তক মধ্যে সংক্ষেপ নাম "The Indian Mutiny." গ্রন্থকার "সিপয় মিউটিনী" নাম ত দেন-ই নাই, তিনি ইহাকে "সিপাহী বিদ্রোহ" বলিতে নারাজ তাহা স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছেন। লেখক ১৮৫৭ সালে মথুরার ম্যাজিষ্ট্রেট পদে ছিলেন। তিনি নিজে যাহা দেখিয়াছেন ও করিয়াছেন তাহাই কেবল বর্ণনা করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁর বিবরণ আগ্রা ও মথুরা জেলার ঘটনায় সীমাবদ্ধ। এই দুই জেলায় যে সব ইংরেজ ছিল তাহাদিগকে আগ্রা দুর্গে আশ্রয় লইয়া বহুদিন অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকিতে হয়। দুই জেলারই অধিবাসীরা বিদ্রোহ করে। যে সব সিপাহী ছিল, তাহাদের বেশীর ভাগই দিল্লী চলিয়া যায়

বাদশাহকে তক্তে বসাইয়া ভারতের "স্বাধীনতা" ঘোষণা করিতে।

থর্ণহিল সাহেবের পুস্তক পাঠে বুঝা যায় যে, তিনি অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক। তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মাত্র তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। মীরাট, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, দিল্লীর কোনও ঘটনার তিনি উল্লেখ করেন নাই কেননা—তাহার কিছুই তিনি নিজে দেখেন নাই। এমন কি যে ঘটনার সোরগোল তুলিয়া ইংলণ্ডবাসীর জিঘাংসা জাগ্রত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল—কানপুরের সেই তথাকথিত নৃশংসতা সম্বন্ধে ইনি নীরব। ভারতবাসীদের বর্বরতার প্রমাণ করিবার জন্য কলিকাতার অন্ধকূপ হত্যা ও কানপুরের হত্যাকাণ্ড লইয়া ইংরেজ যথেষ্ট বর্ণনা দিয়াছে। দুইটারই বিশদ বর্ণনা সত্যবাদী ইংরেজের লেখা আছে। কানপুরে যেরূপ নির্মমভাবে শিশু ও নারীহত্যা হইয়াছিল, তাহা পাঠে আমরাই লজ্জায় ও ঘৃণায় সঙ্কুচিত হই। অথচ একজন ইংরেজ,যে বিদ্রোহের কারণে স্বয়ং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে—সে ভারতীয়দের ঐরূপ নৃশংসতা সম্বন্ধে নির্ব্বাক্! বরং ৩২৭ পৃষ্ঠায় জোর দিয়া লিখিয়াছেন যে, অনুরূপ পরিস্থিতিতে অন্য দেশের লোক যতটা নৃশংস হয়, ভারতীয়রা আদৌ সে নৃশংসতার পরিচয় দেয় নাই।[১]

কৃষক শ্রেণীর মধ্যেও যে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, তাহা থর্ণহিল সাহেব বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার কারণ, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতের ভূমি-স্বত্বের বুনিয়াদ বিনষ্ট করিয়াছিল। তিনি লিখিতেছেন—"আমরা যাদের ভূস্বামী মনে করিতাম, অর্থাৎ জমিদার ও তালুকদাররা, ইংরেজীতে প্রোপাইটার বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা তাহারা ছিল না। তাহারাও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রজাই ছিল। কিন্তু আমরা তাহাদিগকেই জমির মালিক বানাইয়া দিলাম। পরে দেখা গেল, কৃষকদেরও ভূমিতে কতকগুলি বিশেষ অধিকার আছে যাহা হইতে তাহারা বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছে।" (৩১ পৃঃ)

"ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব্বে কৃষক মহাজনদের নিকট জমি বন্ধক দিয়া ঋণ লইত বটে, কিন্তু ঋণের দায়ে জমি হস্তান্তরিত করিতে হিন্দু আইন সাহায্য করিত না। ইংরেজী আইন তাহা করিল। ফলে এক পুরুষের মধ্যে "The ancient propritors had given place to new men, mostly strangers, often Bunniahs ...from the Zamindars downward the whole Village was in the Bunniah's debt, and of all creditors he was the most pitiless. (৩৪পৃঃ) দেশীয় শাসনকালে মহাজনরা জমি গ্রাস করিতে পারিত না এবং তজ্জন্য কেহ শাইলকের মত ব্যবহার করিত না। কিন্তু, "আমাদের আইন সমাজপ্রচলিত বাধানিষেধগুলি উড়াইয়া দিল। বানিয়া মহাজন তার পাওনার পরিবর্ত্তে জমি দখলের অধিকার লাভ করিল। বিচারপদ্ধতির জটিলতা, মহার্ঘতা ও দীর্ঘসূত্রতার সুযোগ লইয়া বানিয়ারা কত জাল দলিল প্রস্তুত করিল। আমাদের আইন তাহাদের এই কার্য্যে এমন সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিল যে false documents and false witnesses became almost part of the stock-in-trade of a successful Bunniah" (৩৪পৃঃ)। এবং "ইংরেজ আমলের পূর্ব্বের জমিদাররা গ্রামেরই অধিবাসী ছিল। গ্রামবাসীরাও অধিকাংশ সময়ে তাদের স্বজাতি ছিল, অনেক ক্ষেত্রে একই বংশের হইত। এই জমিদাররা দেশের মাটিকে ভালবাসিত। সে ভালবাসা খাজনার পরিমাণের উপর নির্ভর করিত না। ইংরেজ আমলে যে জমিদারদের উদ্ভব হইল তাহাদের জমির উপর কোনও দরদ ছিল না—কেবল মুনাফার প্রতি ছিল তাদের নজর। খাজনা আদায়ের অত্যাচারের যুগ আরম্ভ হইল।"

আমি শাব্দিক অনুবাদ দিয়া যাইতেছি।

"প্রাচীন জমিদাররা একেবারেই অত্যাচার করিত না, তাহা নহে। কিন্তু জমিদার আর প্রজায় এমন একটা সৌহার্দ্দ্যের সম্পর্ক ছিল যে অত্যাচারের পরিমাণ ইংরেজ আমলের জমিদারদের অত্যাচারের সঙ্গে তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। জমিদার-প্রজায় একটা আত্মীয়তার বন্ধন থাকায় যখন দেশের রাষ্ট্রশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িত, তখন গ্রাম-অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম হইত।" ইংরেজ আমলে উল্টা হইল। বিদ্রোহের সময় ইংরেজের রাজশক্তি শিথিল হওয়া মাত্র সর্ব্বত্র মাৎস্যন্যায়ের প্রকোপ দেখা দিল।

"যখন সংবাদ আসিল দিল্লীর বাদশাহ পুনরায়

---

1. "I learnt more of the natives during the mutiny than I had during all the many years of my previous residence in the country. Compared with what other nations would have been under similar circumstances, they were not more cruel, they were certainly less violent."

"বিদ্রোহের পূর্ব্বে এ দেশে বহু বৎসর কাটাইয়াও, এ দেশবাসীর চরিত্র সম্বন্ধে আমি বিদ্রোহের সময়েই সম্যক্ জ্ঞান লাভ করি। অনুরূপ অবস্থায় অন্য দেশের লোক যেরূপ নিষ্ঠুর ও হিংস্র হয়, ভারতীয়রা তত নিষ্ঠুর তো ছিলই না, হিংস্রতা তাদের অবশ্য কম ছিল।"

তক্তে বসিয়াছেন, লোকে ধরিয়া লইল ইংরেজ শাসনের অবসান হইয়াছে। ইংরেজ আইনের ইজ্জত যাওয়ায়, ইংরেজের ভূমিব্যবস্থার বিরুদ্ধে সর্ব্বত্র বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। বানিয়াদের উপর প্রথম আক্রোশ পড়িল। তাদের বাড়ীঘরে আগুন লাগান হইল, দলিলপত্র পুড়াইয়া দেওয়া হইল। নূতন জমিদারদের বিতাড়িত করার চেষ্টা চলিল। যে অরাজকতা দেখা দিল তাহা কেবল সিপাহীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল না। দেশের জনতা ইংরেজ শাসনের অন্ত করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। যে সব গ্রামে প্রাচীন জমিদারদের উচ্ছেদ হয় নাই, শুধু সেই সব গ্রামেই অবস্থা শান্ত ছিল।"

যে সব শহরে ইংরেজ ফৌজ ছিল, সেখানকার সিপাহীরা বিদ্রোহ করিয়া, খাজনা লুঠ করিয়া, বাধা পাইলে ইংরেজদের হত্যা করিয়া দিল্লী রওয়ানা হইত, বাদশাহের পতাকাতলে সমবেত হইত। তাহারা চলিয়া গেলে শহরের জনতা আসিয়া কোতোয়ালী আক্রমণ পূর্ব্বক পুলিসের অস্ত্র কাড়িয়া লইত। পলায়িত ও পলায়মান ইংরেজদের গৃহ লুণ্ঠিত হইত।

বিদ্রোহের সূত্রপাতে থর্ণহিল অন্যান্য ইংরেজসহ এক ধনী শেঠের বাড়ী আশ্রয় লন। কিন্তু ক্ষিপ্ত জনতা শেঠের বাড়ী আক্রমণ করার আয়োজন করায় সাহেবরা রাত্রির অন্ধকারে আগ্রা পলাইয়া গেলেন। থর্ণহিলের পুস্তকপাঠে ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, বিদ্রোহকে "জাতীয়" সংজ্ঞা দিই আর না দিই, নিঃসন্দেহ যে উহা শুধু সিপাহীদেরই বিদ্রোহ ছিল না।

বিদ্রোহের অন্তে প্রতিহিংসাপরায়ণ ইংরেজ শুধু অকারণ নরশোণিতেই ধরিত্রী রঞ্জিত করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। ভারতের শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এরূপ অনেক ইমারত অনর্থক ধ্বংস করিয়াছিল। থর্ণহিল বলিতেছেন, "ভবিষ্যতে এমন সময় আসিবে যখন দেশীয় ইমারতগুলি অকারণ বরবাদ করার জন্য আমাদের গবর্ণমেণ্টের অপবাদ হইবে। যখনই আমি এই ধ্বংসকার্য্যের কথা ভাবিয়াছি, আমার মনে যুগপৎ ক্রোধ ও দুঃখের উদ্রেক হইয়াছে।"[২]

দিল্লীর রাজপ্রাসাদ ও লক্ষ্ণৌয়ের ইমারতগুলি ক্ষুদ্রচেতা ইংরেজ অফিসারদের প্রতিশোধস্পৃহার কবলে বিধ্বংস হয়। থর্ণহিল বলিতেছেন যে, এ কার্য্য নিতান্ত হীন মনের পরিচয় দেয়, বিশেষ করিয়া ইহা করা হইয়াছে বিদ্রোহ শেষ হইবার অনেক পরে, যখন দুই পক্ষেরই চিত্তবিকার শেষ হইয়া শান্ত পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে।

"দিল্লীর রাজপ্রাসাদ ভারতীয় চিত্রকলার চরম অভিব্যক্তি। এমন ইমারত আগে ছিল না এবং সম্ভবতঃ ভবিষ্যতেও হইবে না, কেননা যে পারিপার্শ্বিকে ইহা নির্ম্মিত হয়, তাহা আর পুনরায় ঘটিবে না। অথচ ইহার অধিকাংশ ইচ্ছাপূর্ব্বক বিনষ্ট করিয়া ইহার মালমসলা নিলাম করা হয়।"[৩-৪]

পুস্তকটির শেষ অধ্যায়টির শিরোনামা—"What Caused the Mutiny?" "বিদ্রোহ কেন হইল?" থর্ণহিলের ভাষায়—(মূল আর উদ্ধৃত করিলাম না)

"প্রথম প্রশ্ন এই যে বিদ্রোহ কি কেবল ফৌজী বিদ্রোহ ছিল, না, আমাদের বিরুদ্ধে আপামরসাধারণের বিপ্লব ছিল?

"ব্যাপারটা এই—সিপাহীরা বিদ্রোহ করিয়াছিল এ কথা ঠিক। তজ্জন্য রাজশক্তি শিথিল হওয়ায় জনতা বাধ্যতা ভুলিয়া গেল। তাহারা খাজনা দেওয়া বন্ধ করিল, আইনের আনুগত্য ত্যাগ করিল। এরূপ পরিস্থিতিকে যে নামই দেওয়া হউক, ইহার উদ্ভবের যে কারণই নির্দ্দেশ করা হউক,—ইহা নিশ্চয়ই বিপ্লব।"

"ফৌজী বিদ্রোহের কারণ এ স্থানে আলোচনা করিব না। তাহার খানিকটা নিতান্তই ফৌজী ব্যাপার এবং খানিকটা সাধারণ জনতার অসন্তোষের কারণ যাহা, তাহাই। যে কারণে সিপাহীরা বিদ্রোহ করা মাত্রই জনতা আমাদের শাসন অস্বীকার করিয় বসিল, তাহার আলোচনাই করিব।

---

2. "In some future age our Government may be condemned for its wanton destruction of the native edifices. . . . . . This destruction I could never contemplate without regret, without indignation." *The Indian Mutiny*, p. 327.

3. The palace of Delhi was the culminating effort of Indian Art. It was an edifice the like of which had not before existed and in all probability would not again appear, for it was the result of conditions not likely to be repeated. Yet the greater portion of it was deliberately pulled to pieces and the materials sold by auction." পৃ.৩২১

৪ দিল্লীর দুর্গের গাইডরা দর্শকদের বলিয়া থাকে যে এই ধ্বংসকার্য্য এবং প্রাচীর গাত্রের বহুমূল্য প্রস্তরগুলির লুণ্ঠন জাঠদের দ্বারা অনুষ্ঠিত। ইংরেজ আমলে গাইডদের ইহা যেন শিখান হইতেছিল, কিন্তু আমাদের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্ত্তারা এখনও গাইডদের দ্বারা এই মিথ্যাই প্রচার করাইতেছেন।

"ইংরেজরা বিদ্রোহের নানা কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। সেগুলি অত্যন্ত পরস্পর-বিরোধী। ভারতীয়রা স্বয়ং যে কারণ নির্দেশ করে তাহার আলোচনাই সুসঙ্গত। মূলতঃ এই তিনটি কারণ দেখা যায়:

(১) ট্যাক্সের উচ্চহার

(২) দেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধি

(৩) দেশের অধিবাসীদের খ্রীষ্টান করা হইবে এই সন্দেহ।" (পৃঃ ৩৩১)

"ট্যাক্স বৃদ্ধির গুজবটা অতিরঞ্জিত হইলেও ভিত্তিহীন ছিল না। আমাদের দ্বারা ধার্য্য ভূমি-রাজস্বের হার নিঃসন্দেহে খুব উচ্চ ছিল। অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছিল, কেন না আমরা জমি নিলামের দ্বারা বনেদী খান্দান উন্মূল করিতে লাগিলাম। এতদুপরি বৃটিশ আইন কুসীদজীবী বানিয়াদের প্রজা-নিপীড়নে সহায়ক হওয়ায়, আক্রোশটা ব্রিটিশদের উপর আপতিত হয়।

"ইংরেজদের বিরুদ্ধে জনতার আক্রোশের আরও কারণ ছিল। প্রথম দিকে আমরা রাজস্ব আদায় করিয়া ও পুলিশী ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতাম। কিন্তু পরে যখন দেশীয় ব্যবস্থা ও আইনের স্থানে আমাদের ব্যবস্থা ও আইন প্রচলনে চেষ্টিত হইলাম, লোকের সন্দেহ বৃদ্ধি পাইল। এতদ্ব্যতীত যতই অধিক সংখ্যায় এদেশে ইংরাজরা আসিতে লাগিল, জাতিদ্রোহের (antagonism of race) মনোভাব বৃদ্ধি পাইল। যতই সাম্রাজ্যের বিস্তার হইতে লাগিল, রাজার পর রাজাকে উচ্ছেদ করিয়া তাদের রাজ্য আমরা দখল করিতে লাগিলাম, there became roused against us a feeling of patriotism—আমাদের বিরুদ্ধে জাতিপ্রেম উদ্বুদ্ধ হইতে লাগিল।"

দেখা যাইতেছে থর্ণহিল "ন্যাশনালিজম" না হউক "পেট্রিয়টিজম" দেখিয়াছিলেন।

অথচ কয়েকজন তথাকথিত ঐতিহাসিক ইহা দেখিতে পান না।

—•—
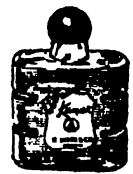
বিধানচন্দ্রের একটি জন্মদিন

শ্রীতপতী মুখোপাধ্যায়

শ্রীবিধানচন্দ্র রায় বাংলার গৌরব, এর পিছনে তাঁর পিতামাতার অভূতপূর্ব্ব দাম্পত্যপ্রেম ও ভগবৎপ্রেমে জড়িত পুণ্যময় জীবনের আশীর্ব্বাদ কতখানি তা আজকে অনেকেই জানেন না। আমার পিতামহী হেমলতা সরকারের আলেখ্যে সেই কথাই সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। মনকে স্নিগ্ধ করে তাঁর বর্ণনায় সেই যুগের কথা, যখন বিধানচন্দ্র নব্যযুবা, সবে কৃতিত্বের সঙ্গে ডাক্তারী পাশ ক'রে বিলেত থেকে দেশে ফিরছেন। আমাদের দার্জিলিং-এর বাড়ীতে তখন তাঁহার পিতা ভক্তবর প্রকাশচন্দ্র রায় ছিলেন। কৃতীপুত্রের জন্মদিন আগত, ছেলে তখনও বিদেশে। হেমলতা সরকারের আলেখ্য থেকে উদ্ধৃত করে দিলাম, তাঁর সুললিত ভাষায় ফুটে উঠুক সেই তরুণ বিধানচন্দ্রের জন্মদিনের কথা।

"আমাদের বাড়ীতে যখন ছিলেন, তখন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বিলাত হইতে আসিলেন। আমার বাড়ীতেই বিলাত-প্রত্যাগত পুত্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হইল। সে কথা আমার চিরদিন মনে থাকিবে। বিধানচন্দ্র যখন সমুদ্রপথে, তখন তাঁর জন্মদিন উপস্থিত। জন্মদিনের দুই দিন আগে প্রকাশচন্দ্র বলিলেন, 'পরশু বিধানের জন্মদিন। আমার ইচ্ছা হইতেছে সেদিন তোমাদের মিষ্টমুখ করাই, তুমি এখানকার দুই-চারজন বন্ধুকে ডাকিয়া জলযোগ করাইতে পারিবে?' আমি বলিলাম, 'কেন পারিব না?' তখন কি কি আহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে বলিলেন। দেখিলাম, উৎকৃষ্ট বস্তু না হইলে তাঁর মন উঠিল না। বিধানচন্দ্রের জন্মদিনে সকালে সকলকে লইয়া পুত্রের মঙ্গলকামনায় উপাসনা করিলেন। বিকালে ৪টার সময় বন্ধুদিগকে সুন্দর করিয়া জলযোগ করাইলেন। তার পর রাত্রে আবার আমাদের লইয়া ভগবানের চরণে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন এবং পুত্রের জন্য আবার প্রার্থনা করিলেন। যেদিন বিধান আসিবেন তার পূর্ব্বদিন বলিলেন, 'দেখ, কৃতী পুত্র ঘরে আসছে আজ দেবীজী থাকলে কত আয়োজন করতেন। আমি বাবা, আমার ত কৃতী পুত্রের প্রতি সমাদর দেখাতে হয়, তুমি যদি পার তার যথাযোগ্য অভ্যর্থনার জোগাড় কর।'

"আমি বলিলাম, 'কি করতে হবে?' বলিলেন, 'ফুল পাতা দিয়া বাড়ী সাজাও, রাত্রে বাড়ীতে রোসনাই কর, ঐক্যতান বাদ্যের যদি জোগাড় হয় কর, আর প্রীতিভোজন।' আমি তথাস্তু বলিয়া বাড়ী পত্রপুষ্পে সাজাইলাম, ফটকে 'শুভাগমন' লেখা হইল, রাত্রে আলোকমালায় গৃহপ্রাঙ্গণ সুসজ্জিত হইল এবং সখের কনসার্টের দল মধুর বাদ্য শুনাইল। সে এক মহোৎসবের ব্যাপার। বিধানচন্দ্র সমারোহ দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন! 'বাবা এক ব্যাপার করেছেন, লজ্জায় মরি।' প্রকাশচন্দ্র পুত্রের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া তৃপ্ত হইলেন।"

এই ত গেল সন্তানবাৎসল্যের কথা। আমার পিতার মুখে শুনেছি পুত্রের পিতৃভক্তির মধুর কথা। বিধানচন্দ্র বিলেত থেকে এসে, জাহাজ থেকে বোম্বাই শহরে নেমে ট্রেন ধ'রে চ'লে এলেন কলকাতায়। এমন তাঁর প্রগাঢ় পিতৃভক্তি যে, সেখানে না থেমে হাওড়া থেকে সোজা গেলেন শেয়ালদা ষ্টেশনে, ধরলেন দার্জ্জিলিং মেল। দার্জ্জিলিং এসে পিতৃপাদবন্দনা ক'রে তবে তাঁর তৃপ্তি হ'ল, সম্পূর্ণ হ'ল বিদেশের জয়লাভের ফল।

আজ দেশবাসী তাঁর বিদেহী আত্মার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছেন, আমিও সেইসঙ্গে আমার ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করলাম।

কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেট : রবীন্দ্র শতাব্দীর সংখ্যা (১৯৬১)। কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেট (১৯৬১)

সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্র ভট্টাচার্য ও তাঁর সহকর্মীদের সাধুবাদ করি যে নানা প্রতিকূলতা লঙ্ঘন করে তাঁরা একটি স্মরণীয় বই ছেপে রবীন্দ্র ভক্তদের উপহার দিলেন। প্রায় ১৪০ পাতা বাংলা (গদ্য পদ্য) ও প্রায় ১৮০ পাতা ইংরেজী রচনায় সমৃদ্ধ এই বইখানি ঘরে ঘরে বহুকাল থাকবে মেয়র শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র মজুমদার ও তাঁর পরামর্শদাতাগণকে ধন্যবাদ জানাই যে তাঁরা অর্থব্যয়ে এতটুকু কার্পণ্য করেন নাই। ছবি ফোটো ও আর্টপ্লেটগুলি দেখলেই বোঝা যায় কবিগুরুর উপযুক্ত স্মারক-পত্রিকা তাঁর জন্মস্থান কলিকাতায় প্রকাশ হল। রাষ্ট্রপতি শ্রীরাধাকৃষ্ণন্ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বে লিখেছিলেন 'The philosopy of Rabindranath' তিনিই এ সংখ্যায় অনেক মনীষীদের সঙ্গে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দিয়েছেন। মন্ত্রীবর ডঃ গোপাল রেড্ডী শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও বাংলা জানেন। তাঁর At the feet of the master" স্মরণীয় হয়ে থাকবে। U.S.S.R. Academy of sciences প্রতিনিধি Y Chelyshiv 'রাশিয়ায় রবীন্দ্র প্রবন্ধে অনেক খবর দিয়েছেন যেগুলি ১৯৩০ সালে "রাশিয়ার চিঠি" পুস্তিকার ভাষ্য। রবীন্দ্রনাথের 'আফ্রিকা' কবিতাটির তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ ও তাঁর নিজের সংগ্রহ থেকে দুষ্প্রাপ্য চিত্রাদি Municipal Gazette-এ দিয়েছেন ও প্রবন্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মারফতে ১০০০৲ পাঠান সে কথাও লিখেছেন। Rev. Father Fallon ও আমেরিকার Norman Cousins প্রভৃতি চিন্তাকর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন : রবীন্দ্রনাথের Illinois বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ সর্ব্ব প্রধান (১৯১২)। মার্টিন ফোটো ও ইংলণ্ডের ফোটোও ছাপা হয়েছে।

রঙ্গ-বিভাগে রবীন্দ্রনাথের দুই জন প্রিয় সহকর্মী মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পরলোকে তবু তাঁদের আমরা প্রথমেই স্মরণ করি। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর 'রবীন্দ্রকাব্যের বারমাস্যা' ও শান্তাদেবীর "শান্তিনিকেতন" প্রবন্ধের সঙ্গে অবনীমোহন বন্দ্যো লিখিত "পুরাণো কথা" পড়ে অনেকে আনন্দ পাবেন। কাজী আবদুল ওদুদ ও সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁদের নিজস্বভঙ্গীতে লেখা দিয়েছেন। রবীন্দ্র সঙ্গীতের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করেছেন শিল্পাচার্য্য অসিত হালদার ও সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। যামিনী রায়ের "গুরুদেব গান্ধীজী" ছবিখানি মনে করিয়ে দেয় যে, কী গভীর অধ্যাত্ম-যোগে দুই মহাপুরুষ সংযুক্ত হয়েছিলেন। প্রচ্ছদ পটে রবীন্দ্র-প্রতিকৃতিখানি সার্থক উদ্বোধন হয়েছে। শেষে স্মরণ করাই যে, বন্ধুবর অমল হোম ১৯৩১ সালে ৭০ বার্ষিকী সংখ্যায় যে ঘটনা-পঞ্জী (Chronology) ছাপেন সেটি অবলম্বনে রবীন্দ্র-নির্ব্বাণ (১৯৪১) ও শতাব্দী (১৯৬১) উৎসব পর্য্যন্ত সব জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশন করে গেজেট আমাদের গভীর আনন্দ দিয়েছে, তাই আশা করি যে, উক্ত সংখ্যা ঘরে ঘরে সযত্নে সংরক্ষিত হবে ও পাঠক পাঠিকাদের বহুকাল সাহায্য করবে। হস্তাক্ষরের নকল ছেপে কবিগুরুকে যেন ঊর্দ্ধলোক থেকে আমাদের "ঘরের মানুষ" মনে করা'ন হয়েছে তাই এ পত্রিকার বহুল প্রচার কামনা করি।

দীপঙ্কর

হাওড়া জেলার লোক-উৎসব : তারাপদ সাঁতরা। শরৎস্মৃতি-সংগ্রহশালা, পাণিত্রাস : হাওড়া। দাম দু'টাকা।

আধুনিক সভ্যতা ও আধুনিক জীবনযাত্রা প্রণালী প্রসারের ফলে প্রাক্তন গ্রাম্য জীবনের প্রাণস্বরূপ পাল-পার্ব্বণ ধর্মোৎসবগুলি ক্রমশঃ তাহাদের পূর্বগৌরব হারাইয়া অনাদৃত অপ্রচলিত বা বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। তাই ইহাদের নিখুঁত বিবরণ সংকলনের দিকে অবিলম্বে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া বাঞ্ছনীয়। এই সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত ভাবে কিছু কিছু কাজ হইয়াছে সত্য কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহা যথেষ্ট নহে। বিভিন্ন অঞ্চলের অনুসন্ধিৎসু কর্মীদের দ্বারা সেই অঞ্চলের বিবরণ সংকলিত হইলে ভাল হয়। তবে সংকলন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে করা দরকার। বিভিন্ন জেলার প্রকাশিত ইতিহাসগুলিতে সংকলিত বিবরণ সে দিক দিয়া খুব উপযোগী নহে। আলোচ্য পুস্তিকাখানির বিবরণও ঠিক নিয়মানুগভাবে সংকলিত না হইলেও ইহা অভিনন্দন যোগ্য। কোন অঞ্চলের উৎসব লইয়া এরূপ স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রকাশ বাংলায় বোধ হয় এই প্রথম। শরৎসংগ্রহশালার ন্যায় অন্যান্য আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলিও এরূপ কার্যে ব্রতী হইলে সুফল লাভের আশা করা যায়।

আলোচ্য পুস্তিকায় কতকগুলি গ্রাম্য দেবদেবী, উৎসব-পার্বণ, বারব্রত, আচার-অনুষ্ঠানের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে বিবরণগুলি অনেক স্থলে কিঞ্চিৎ অসম্পূর্ণ, বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খ করা অপেক্ষা অনুষ্ঠানের মূল নিরূপণের চেষ্টার দিকে গ্রন্থকারের আগ্রহ বেশী মনে হয়। অথচ বর্তমানক্ষেত্রে তাহার তেমন উপযোগিতা আছে বলিয়া বোধ হয় না। পক্ষান্তরে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিলাইয়া আলোচনা না করায় অনেক অনুষ্ঠানের তাৎপর্য স্পষ্ট হয় নাই। দীপালী উৎসব উপলক্ষে উল্লিখিত পিতৃপুরুষের উদ্দেশে অন্নব্যঞ্জন নিবেদন ও পঞ্চম চাদবদনী অনুষ্ঠান পর্ব্বণ শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানের স্মৃতিবহন করিতেছে। অম্বুবাচীর অনুষ্ঠান বঙ্গ প্রচলিত শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান বৃষকাষ্ঠ পোঁতা শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের বিকৃত রূপ। পুস্তিকার মধ্যে ভাষাগত ত্রুটী ও বর্ণাশুদ্ধির বাহুল্য পীড়াদায়ক।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

পল্লী-পুনর্গঠন—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত। পরিবেশক—সর্ব্বোদয় প্রকাশন সমিতি, সি-৫২ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য—৩.০০ টাকা।

পুস্তকখানি মহাত্মা গান্ধী রচিত 'Re-Building our Villages' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। মহাত্মাজীর এই মূল রচনাগুলি প্রধানতঃ 'হরিজন' এবং 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অনুবাদক

শৈলেশবাবু সর্ব্বোদয় আদর্শে পরম বিশ্বাসী এবং একনিষ্ঠ কর্ম্মী। গ্রাম সংগঠনের সঙ্গে ইঁহার সম্পর্ক ছিল বহুকাল ব্যাপী এবং এ-কাজে তাঁহার পরম অভিজ্ঞতাও আছে।

আলোচ্য পুস্তকখানি, যাঁহারা গ্রাম-পুনর্গঠনের কাজে লিপ্ত আছেন কিংবা এ-বিষয় চিন্তা করেন, তাঁহাদের পক্ষে মূল্যবান। সাধারণ পাঠকও এ-পুস্তকে গান্ধীজীর দূর-দর্শিতা এবং ভূয়োজ্ঞানের পরিচয় লাভ করবেন। গান্ধীজীর গঠনমূলক কার্য্যের চিন্তাধারা গ্রামকর্মীদের চিত্তকে নানা ভাবে ও নানাদিক দিয়া প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছে। বর্ত্তমানে সরকারী আওতায় এবং প্ররোচনায় গ্রামের উন্নতি প্রচেষ্টা বহুভাবে হইতেছে সত্য কিন্তু ইহা ঠিক পথে চলিতেছে কি না, সে-বিষয়ে তর্কের অবকাশ আছে। "পল্লী-পুনর্গঠন" পুস্তকখানি মন দিয়া পাঠ করিলে, গ্রাম-কর্মীদের পথের নিশানা মিলিবে বলিয়া মনে করি। আশা করি এ-পুস্তকখানি বাংলা দেশের পল্লী এবং গ্রামোন্নয়নের সহায়ক হইবে। পুস্তকখানির লিখনভঙ্গী ভাল এবং ইহাতে সংকলয়িতার সাহিত্যিকের পরিচয় সহজপ্রকাশ হইয়াছে। আর একটি কথা মহাত্মাজীর নাম এবং দোহাই দিয়া বহুজন গ্রামের উন্নতিকল্পে নানা প্রচেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু গান্ধীজীর আদর্শে মৌখিক আনুগত্য প্রকাশ করিলেও প্রচেষ্টা যেন ক্রমশ বিপরীতমুখীই হইতেছে বলিয়া মনে হয়। আলোচ্য পুস্তকখানি পাঠ করিলে মহাত্মাজীর প্রকৃত আদর্শ কি ছিল, গ্রামের উন্নতি বলিতে তিনি মনে কি করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই দিক দিয়া এই পুস্তকখানির মূল্য প্রভূত এবং ইহার সম্যক প্রচার হওয়া প্রয়োজন।

পুস্তকখানির ছাপা, বাঁধাই এবং প্রচ্ছদপট মনোরম।

ডিলিরিয়াম—শ্রীধীরেন চট্টোপাধ্যায়, প্রাপ্তিস্থান: ৭৮ সূর্য্য সেন রোড, কলিকাতা-৩২। মূল্য চার টাকা।

পুস্তকখানি ১৯৪৭ সনে মার্চমাসে লেখা—এবং সেই সময়কার হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-বিবাদের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ও আলোচিত হইয়াছে এই পুস্তকে। লেখক যে-ভাবে তাঁহার বিষয়বস্তু আলোচনা করিয়াছেন, তাহা প্রায় ডিলিরিয়ামের পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছে। বক্তব্য সংজ্ঞবোধ নহে এবং লিখনভঙ্গী খাপছাড়া ও গোলমেলে। ১৯৪৭ সালের রাজনৈতিক অবস্থার কথা বলিতে গিয়া বহুদূর পিছাইয়া ১৯২১, ১৯৩০ এবং অন্যান্য বৎসরের আন্দোলনের কথা বলিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু তাহা বোধহয় সব দিক দিয়া যথাযথ হয় নাই। এই পুস্তকে মহাত্মা গান্ধীকে লইয়া প্রচ্ছন্ন পরিহাস প্রচেষ্টার সমর্থন করা যায় না। এ-প্রকার পুস্তকের মূল্য কি তাহা বলা শক্ত। লেখকের সাহিত্য বিলাস বলা চলে।

হ·চ

শতদল: শ্রীনবগোপাল সিংহ। প্রকাশক--গ্রন্থকার স্বয়ং (ঝুমরী তিলাইয়া, হাজারিবাগ), পত্রাঙ্ক ১১০, মূল্য দুই টাকা পচিশ নয়া পয়সা।

আলোচ্য কবিতাপুস্তকখানি পাঠ করিয়া শক্তিমান লেখক সম্বন্ধে যেমন আশান্বিত হইয়াছি, তেমনি আবার তিনি কোন পথ অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যতে কবিতা লিখিবেন, তাহা ভাবিয়া কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছি। তিনি অতি-আধুনিকতার মোহও ছাড়িতে পারেন নাই, যথা,—"ক্লান্তির খুন দু'পায়েতে এসে জমে", "সুধার নেউল ডন্ টানে পেটে ছড়িয়ে পা", "ছেঁড়া মশারীর ইনক্লাব শুনে মশারা হাসে", "ছ্যাকড়া গাড়ীর চাকার কাশিতে ঘুম টুটে,"—ইত্যাদি। পরে অবশ্য কি ভাবিয়া লিখিয়াছেন "পশ্চিমপ্রভাব বলে উড়িয়ে দিয়েছি এতোকাল, অপপ্রচার করে এসেছি এই সব উদ্ভট কল্পনার।" তারপর হাল্কা সুর ছাড়িয়া একেবারে ধ্রুপদে ঝঙ্কার তুলিয়াছেন, যথা,—"ধূলিম্লান চাপল্যের শুভ্রশুচিশুদ্ধিত বলাকা," "আত্মার বর্ণালি মায়া ছন্দহারা কঠিন বাস্তবে," "অনাবিল স্নিগ্ধতায় হানে নিত্য বধূর ইশারা," "বেপথু মম দ্বিগুণ মন উৎসিত," ইত্যাদি। তবে তিনি আরও একটা কাজ করিয়াছেন, দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব সহজভাবে বাংলার পাঠকসম্প্রদায়কে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, যথা,—"তোমার ইচ্ছা না হলে গাছের একটি পাতাও নড়ে না, তোমার ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোন শুষ্ক পত্র পড়ে না," ইত্যাদি। আবার তাঁর আন্তরিক নেহরু-প্রেম প্রকাশ পাইয়াছে শ্রীনেহরুকে উদ্দেশ করিয়া, যথা,—"যিনি বিশ্বের বিস্ময়, সেই নেহরুর জয়," ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের কথা বলিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "কত না যুগের কথা ও কাহিনী মহুয়ার বনে নাচে," এই গ্রন্থের ভূমিকায় কবি নরেন্দ্র দেব লীলাকমল-রচয়িত্রীর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ হয়ত বা আক্ষেপ করিয়াই বলিয়াছেন "এই শতদল হয়ত লীলাকমল হয়ে উঠতে পারেনি।" গ্রন্থকারের কথায় জানা যায় যে তাঁর "ছাত্রজীবন থেকেই কবিতা রচনার ঝোঁক ছিল," এবং এ সংকলনের উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, আমার কাব্যজীবনের স্মৃতিটুকু ধরে রাখা।" গ্রন্থকার স্বয়ং এ কবিতা পুস্তকখানি ছাপাইয়া সে উদ্দেশ্য সফল করিয়াছেন। বাংলার কাব্য-সাহিত্যে তাঁহার স্থান যে উল্লেখযোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীকৃষ্ণধন দে

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র: মণি বাগচি, জিজ্ঞাসা, ১৩৩-এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯। মূল্য ৪·৫০ ন

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন-কথা খুব কমই লেখা হইয়াছে। যদিও উনিশ শতকের এই ক্ষণজন্মা পুরুষটির কথা আমাদের বিস্মৃত হইবার কথা নয়। কারণ তিনি আমাদের জন্য অনেক কিছু করিয়া গিয়াছেন, অনেক দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। সকলেই জানি, তিনি একজন বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন, রসায়ন-বিদ্যার নূতন দিগ্‌দর্শন করাইয়াছেন। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা, তিনি আমাদের দেশে 'কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ'-এর প্রবর্ত্তন এবং প্রসার করিয়া গিয়াছেন। তিনি সেই যুগে আসিয়াছিলেন, যে-যুগে আমাদের দেশে বিজ্ঞান-চর্চার কোনো সুবিধাই ছিল না। গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "ছাত্রদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল সেক্সপিয়রের সঙ্গে নিউটনের সঙ্গে নয়। তাহারা চমৎকার ইংরেজি শিখিয়াছেন, কিন্তু ঐ ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শেখে নাই।" এই ত্রুটির ফলে বাংলা-দেশের দুইজন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রকে কি অসুবিধার মধ্যে তাঁহাদের কাজ করিতে হইয়াছে তাহা গ্রন্থকার অতি সুন্দর ভাবে এইগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থকার ঠিকই বলিয়াছেন, "বিজ্ঞান প্রয়োগপ্রধান শাস্ত্র। বিশ্বের এই জ্ঞানকে মানুষ যদি কর্মে প্রয়োগ করিতে না পারিত তবে আজিকার দিনে মানব-সমাজে বিজ্ঞানের এই অসাধারণ প্রতিপত্তি কখনই ঘটিত না।" এই দিক দিয়া বাংলা দেশের দুই মনীষী জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র প্রভূত উপকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের এই অসাধারণ কৃতিত্বের কথা ভারতবাসী কোনদিনই বিস্মৃত হইবে না। "প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন শিল্প-পাগল মানুষ। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা দেশীয় শিল্পপ্রয়াসের ভিতর দিয়া কি ভাবে সার্থকতা লাভ করিয়াছিল, তাহার নিদর্শন শুধু বেঙ্গল কেমিক্যাল নয়, আরো কয়েকটি দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।" এককথায় গ্রন্থকার শিল্পীর যে পরিচয় দিয়াছেন

তাহাই আচার্যদেবের প্রকৃত পরিচয়। গুরুহিসাবে তিনি যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনাও বিরল। আজ তিনি নাই, কিন্তু রাখিয়া গিয়াছেন তিনি অসংখ্য ছাত্র, তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অতি চমৎকার কথা বলিয়াছেন- "উপনিষদে কথিত আছে, যিনি এক তিনি বললেন, আমি বহু হব। সৃষ্টির মূলে এই আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্টিও সেই ইচ্ছার নিয়মে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে। নিজেকে অকৃপণ ভাবে সম্পূর্ণ দান না করলে এ কখনো সম্ভবপর হোত না।"

আচার্যের বহু কথাই এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে তথ্যও আছে, তত্ত্বও আছে। বইখানি ভাল লাগিল। লেখক সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত। সুতরাং লেখার বিচার না করিলেও চলিবে। এরূপ গ্রন্থের প্রচলন আমাদের দেশে যত হয় ততই মঙ্গল।

গৌতম সেন

সৃষ্টিতত্ত্ব—(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) শ্রীআদিনাথ সেন। গ্রন্থকার কর্তৃক ৩২, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯ হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই খণ্ড একত্রে তিন টাকা।

আমরা পরমাণবিক যুগে বাস করিতেছি: মুগ্ধ বিস্ময়ে টিটভ-গাগারিনের গ্রহান্তর যাত্রার কথা সংবাদপত্রে পড়িয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি। কিন্তু এই আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিলে চলিবে না। আমাদের মধ্যে যাহারা বিজ্ঞজন তাঁহাদের দায়িত্ব হইতেছে আপামর জনসাধারণকে পারমাণবিক যুগের দৈত্য-শক্তির উৎস সম্বন্ধে সচেতন করা। এই চেতনা আনিতে হইলে বিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু গবেষণা-সিদ্ধ তথ্যাদি মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রচার করিতে হইবে। আকাশ 'অনু-পরমাণু, আলোকরশ্মি ও সৌরজগৎ সম্বন্ধে আমাদের জানিতে হইবে। স্যার জেমস্ জীন্সের Mysterious Universe-কে জানিবার চেষ্টাকে শিক্ষিতমহল হইতে অশিক্ষিতমহলে ধীরে ধীরে প্রসারিত করিয়া দিতে হইবে। এই প্রয়াস ফলবতী করিতে হইলে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের গ্রন্থ প্রণয়ন করা দরকার। শ্রীআদিনাথ সেন মহাশয় সেই দুরূহ কর্তব্য পালন করিয়াছেন। জাতীয় অধ্যাপক আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় শ্রীসেনের কর্মের স্বীকৃতি হিসাবে তাঁহার পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। তিনি যথার্থই বলিয়াছেন যে তাঁহার এই প্রচেষ্টা…বাঙ্গালী পাঠকের মনোরঞ্জন করিবে। আমরা পুস্তক দুইটি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আচার্য বসুর উক্তির যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি।

সৃষ্টিতত্ত্ব প্রথম খণ্ড চারটি অধ্যায়ে সমাপ্ত। প্রথম অধ্যায়ে গ্রন্থকার অনু-পরমাণু ও আলো সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরমাণুর গঠন সম্বন্ধীয় আলোচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই অধ্যায়েই পরমাণুর রূপান্তর সম্বন্ধে সুষ্ঠু আলোচনা করা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় পর...গোড়ারই তত্ত্বকথা। গ্রন্থকার কোয়াণ্টাম থিওরির মত দুরূহ তত্ত্ব অত্যন্ত সহজ ভাষায় আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার স্বচ্ছন্দ বাচনভঙ্গী ও সহজ-শব্দের ব্যবহার পাঠককে সহজেই বুঝাইয়া দেয় যে গ্রন্থকারের আলোচ্য বিষয়বস্তুতে অধিকার কত ব্যাপক ও গভীর। চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি পরমাণবিক বোমার গঠন, শক্তি ও ইহার মূলতত্ত্বের কথা আলোচনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে বিশাল সৌরজগৎ। সৃষ্টিতত্ত্ব ও নীহারিকা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন গ্রন্থকার। দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় মূলতঃ তারা, গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্ররাজি সম্বন্ধীয় আলোচনা। প্রত্যক্ষ ও বাস্তব শীর্ষক আলোচনায় গ্রন্থকার বিজ্ঞানের সীমারেখা প্রায়শঃই লঙ্ঘন করিয়া দর্শনের বিস্তীর্ণ রাজ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন। উভয়শাস্ত্রেই গ্রন্থকারের অধিকার। তাই তাঁহার আলোচনা সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে।

আমরা পুস্তক দুইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

রক্তকমল : অজিত সরকার, করুণা প্রকাশনী। ১১ শ্যামা-চরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম-৩৲।

উপন্যাস। বহু চরিত্র, বহু ঘটনা কিন্তু ঘটনার সঙ্গে চরিত্রগুলি পুরোপুরি সঙ্গতি রেখে এগিয়ে চলে নি। প্রধান নায়ক তারক, নায়িকা সুমিতা, কিন্তু এদের চেয়ে পার্শ্ব চরিত্র হিসাবে মায়া সুন্দর ফুটে উঠেছে।

যুক্তির চেয়ে ভাবাবেগ প্রাধান্য লাভ করেছে গ্রন্থখানিতে গুটিকয়েক প্রধান চরিত্রের মধ্যে। ভবিষ্যতে এদিকে লেখক অবহিত হলে আমরা ভাল কিছু এঁর কাছ থেকে আশা করতে পারি। কারণ লেখকের বলবার ধরণটি আকর্ষণ করে। স্বচ্ছ ভাষা, সহজ সংলাপ, সুন্দর প্রচ্ছদ, ঝর ঝরে ছাপা।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

"ছিন্নপত্রাবলী"

জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে 'ছিন্নপত্রাবলী'র সমালোচনা' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, আমি ঐ গ্রন্থ সম্পাদন করেছি। বস্তুতঃ ঐ গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীকানাই সামন্ত, এ ক্ষেত্রে 'আমি'র 'কর্মী'। আলোচনায় এই গ্রন্থের সম্পাদনা সম্বন্ধে যে সাধুবাদ প্রযুক্ত হয়েছে তা তাঁরই প্রাপ্য।

এই গ্রন্থের অন্তর্গত পূর্বে অপ্রকাশিত চিঠিগুলি যখন কয়েক বৎসর আগে বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তখন আমি সেগুলির অন্যতম সংকলয়িতা ছিলাম, তার ফলে সমালোচক মহাশয়ের এই ভ্রম হয়ে থাকবে।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

রাগিণী গৌড়া

(অতি প্রাচীন কাংড়া চিত্র হইতে)

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬২শ ভাগ
১ম খণ্ড } ভাদ্র, ১৩৬৯ { ৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

স্বাধীনতা দিবস

স্বাধীনতা লাভের পর পনের বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। লোকের মুখে এখনও শুনা যায় "এই স্বাধীনতার মূল্য কি? ইয়ে আজাদী ঝুটা হায়" ইত্যাদি আক্ষেপ ও চীৎকার, যাহার কারণ অভাব-অনটন, অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা বা সংসার যাত্রাপথে দুর্নীতি-অনাচারের বাধা-বিপত্তি। আরও সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, আমাদের এই স্বাধীনতা এখনও পূর্ণাঙ্গ হয় নাই এবং তাহার পূর্ণাঙ্গ গঠনের বাধা আমাদেরই অনভিজ্ঞ ও উদ্যমহীন হৃদয়-মনের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

ইংরাজী প্রবাদ বাক্যে বলে যে, প্রত্যেক জাতি বা দেশ তাহার যোগ্যতা আনুযায়ী শাসনতন্ত্র পাইয়া থাকে। অর্থাৎ দেশের লোকের সমষ্টিগত দেহমনোবৃত্তিই সে দেশের শাসনতন্ত্রে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। সাধারণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র যে দেশে প্রতিষ্ঠিত সে দেশের শাসনতন্ত্রের অধিকারীবর্গ, অর্থাৎ প্রথমে লোকসভা ও বিধানসভা ইত্যাদিতে নির্বাচিত সাধারণ জনের প্রতিনিধিগণ এবং পরে তাহাদের সমর্থিত মন্ত্রীপরিষদের সদস্যবর্গ, সাধারণ লোকেরই ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির প্রতীক-মাত্র। দেশের পরিচালনা ও শাসনতন্ত্রের ব্যবহার হয় মন্ত্রীপরিষদের নির্দেশে এবং লোকসভা ও বিধানসভায় অধিকসংখ্যক সদস্যের সমর্থন ভিন্ন সে মন্ত্রীপরিষদ প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না, এ কথা ত আমরা সকলেই জানি। দেশ যদি কায়েমী স্বার্থের ব্যভিচারে জর্জ্জরিত ও দুর্নীতির অত্যাচারে পীড়িত হয় তবে তাহার প্রতিকার লোকসভায় ও বিধানসভায় অধিষ্ঠিত জনপ্রতিনিধিদিগের হস্তে সর্ব্বক্ষণই রহিয়াছে। এই জনপ্রতিনিধিগণ যদি নিষ্ক্রিয় বা স্বার্থচিন্তায় মগ্ন থাকেন তবেই দেশের জন-সাধারণের সম্মিলিত স্বার্থ ক্ষুণ্ণ বা ব্যাহত হইতে পারে। এই প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের সময় যদি সাধারণ জন যোগ্যতার বিচার না করিয়া, উচ্ছ্বাসের বশে, চতুর ভাগ্যান্বেষীর মধুর বচনে ভুলিয়া বা "শুধু অকারণ পুলকে" এমন সকল লোককে সমর্থন দিয়া নির্ব্বাচিত করেন যাহাদের যোগ্যতা শুধুমাত্র দলগত স্বার্থেরই প্রতিফলন, অর্থাৎ দলগত স্বার্থ—ও সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বার্থ—সমর্থন ভিন্ন যাহার যোগ্যতার অন্য কোনই নিদর্শন নাই, তবে শাসনতন্ত্রের বিকার ত অবশ্যম্ভাবী।

পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা বলিতে স্বাধীনতার যে চারিটি অঙ্গ বুঝায় তাহার মধ্যে বাক্যের ও বিবৃতি প্রকাশনের স্বাধীনতা আমাদের আছে। স্বাধীনতার দ্বিতীয় অঙ্গ অর্থাৎ নিজের মত অনুযায়ী, ব্যক্তিগত ভাবে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার ও তাহার ব্যবহারে অধিকার আমাদের আছে। স্বাধীনতার তৃতীয় অঙ্গ অর্থাৎ অভাব-অনটন হইতে মুক্তি ইহা আমা-দের হয় নাই এবং ইহারই কারণে দেশে এত অসন্তোষ ও আক্ষেপের প্রাচুর্য্য এখনও রহিয়াছে। স্বাধীনতার চতুর্থ অঙ্গ, ভয় হইতে মুক্তি, আমাদের হয় নাই—এবং সে বিষয়ে আমাদের চিন্তাও নাই, ভাবনাও নাই। অবশ্য

এই স্বাধীনতা বর্ত্তমানে কোন দেশেই পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত নাই, তবে জগতের সকল জাগ্রত দেশই এই ভয় হইতে মুক্তির জন্য সক্রিয় ভাবে চেষ্টিত—শুধু স্তোক বাক্যের বা আপ্ত বাক্যের মাধ্যমে নয়, যেমন আমাদের দেশ।

এই যে জাগৃতির প্রশ্ন, ইহার সঙ্গেই আমাদের যত অভাব, যত অন্যায়-অনাচারের প্রাদুর্ভাব জড়িত। চিরন্তন ও জাগ্রত প্রহরা স্বাধীনতার মূল্য (Eternal vigilance is the Price of Liberty)—এ কথা আমরা এখনও শিখি নাই। ইহার প্রত্যক্ষ অর্থ এই যে, দায়িত্বজ্ঞান ভিন্ন স্বাধীনতা রাখা যায় না। আমরা নিজের দাবি-দাওয়া, নিজের স্বার্থ চিন্তা সম্পর্কে ষোল-আনা সচেতন, কিন্তু আমার দায়িত্ব ও আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি-বিবেচনা আচ্ছন্ন ও মোহনিদ্রাগত। আমাদের এই চিন্তাবিমুখ মোহাচ্ছন্ন অবস্থার সুযোগ লইয়াই চতুর ভাগ্যান্বেষী, দলের ছাপ দেখাইয়া ও আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির লোভ দেখাইয়া নিজের ও নিজের দলের জন্য জনসাধারণের সমর্থন লাভ করে। কার্য্যসিদ্ধি হইয়া গেলে ইহারা যে যাহার ইচ্ছামত দলের ইঙ্গিতে চলে, তখন জনসাধারণের স্বার্থ বা মঙ্গল চিন্তা পাঁচ বৎসরের মত গৌণ ও অবহেলিত ব্যাপারের স্তূপের মধ্যে চাপা থাকে। মেকী চালাইয়া এই ভাবে দেশের লোক ঠকানো এখন এতই সহজ দাঁড়াইয়াছে যে, মেকীর ঠেলায় খাঁটি সোনা-রূপা বাজার হইতে চলিয়াই গিয়াছে।

"এই স্বাধীনতার মূল্য কি" এই প্রশ্ন আজ আমাদের মনে যে খোঁচা দিতেছে, "ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়" শুনিয়া তৃপ্তিলাভ না করিলেও মনের ঝাল ঝাড়িবার পরোক্ষ সুযোগ যে আমাদের অনেকের মনে আসিতেছে তাহার মূল কারণ নিহিত রহিয়াছে আমার, আপনার, আমাদের ও আপনাদের নিষ্ক্রিয় ও দায়িত্বহীন মনেরই মধ্যে। মন মোহমুক্ত করুন, পিতৃগণ-প্রদত্ত চিন্তাশক্তির ব্যবহার সরল পথে চালাইতে চেষ্টিত হউন, নিজের ও অন্যের দায়িত্বজ্ঞান জাগ্রত করুন, দেখিবেন এই স্বাধীনতা কিরূপ মহামূল্য ও ইহার মান ও গৌরব কত উজ্জ্বল।

আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষার বস্তু এই স্বাধীনতা, যাহার চিন্তায়, যাহার ধ্যানে এই ভারত-মাতার অনেক সুসন্তান দীর্ঘ দিন রজনী যাপিত করিয়া গিয়াছেন সার্দ্ধ-শতাধিক বর্ষেরও পূর্ব্বকাল হইতে। এই স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য দেশমাতৃকার কত সহস্র পুত্র-কন্যা আত্মনিবেদন করিয়াছেন এই শতাব্দীরই মধ্যে। ইহার বিকার হইয়াছে বা ইহা অশুদ্ধ বা মেকী, এ কথা চিন্তা করা আমাদেরই মনের বিভ্রান্ত বা সাময়িক বিকারগ্রস্ত অবস্থার লক্ষণ।

মুনাফা-লোভী কালোবাজারী বা দুর্নীতি-পরায়ণ রাষ্ট্র-কর্ম্মচারী দেশময় যে বিষ ছড়াইতেছে তাহার প্রতিকার প্রয়োজন, একথা সত্য। কিন্তু সে প্রতিকার বিলাপ-প্রলাপ বা উদ্দাম আন্দোলনের পথে যে সম্ভব নয় সেকথা কি আমাদের বুঝিবার সময় আসে নাই? এই কলিকাতা মহানগর ত ঐরূপ আন্দোলনে বিপর্য্যস্ত এবং ঐরূপ চীৎকারে উদ্‌ব্যস্ত শতাধিকবার হইয়াছে। তাহার ফলে আমাদের লাভ-লোকসানের অঙ্ক কোথায় দাঁড়াইয়াছে তাহা ত অল্পক্ষণের চিন্তাতেই পাওয়া যায়।

নিজে কোনকিছুরই দায়িত্ব লইব না অথচ অন্যকে নিজের অভাব-অনটন বা দুরবস্থার জন্য দায়ী করিব, নিজের কর্ত্তব্যে ফাঁকি দিব অথচ অন্যের কাজের ষোল-আনা হিসাব চাহিব, অন্যের প্রয়োজন অবহেলা করিব, অন্যের প্রাপ্য অস্বীকার করিব অথচ "আমাদের দাবী মানতে হবে" বলিয়া হুঙ্কার ছাড়িব, এই অপরূপ মনোবৃত্তি কোনও দেশ বা জাতিকে এ জগতে কোনও দিন সাফল্যের বা প্রগতির পথে কখনও লইয়া যায় নাই। স্বাধীনতার মূল্য দানে যাহারা অনিচ্ছুক তাহারা পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার ফলভোগ করিতে কোনও দিন পারে নাই ও পারিবে না।

আমরা এই স্বাধীনতা পাইয়াছি অন্যের স্বার্থত্যাগে, অন্যের আত্মবলিদানে, নিজেরা মূল্যস্বরূপে কোনও কিছু দিই নাই বলিয়াই এই অমূল্য রতনকে অন্যের প্ররোচনায় মেকী বলিয়া নিজের অভাব-অনটনের জ্বালা মিটাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছি।

দেশ অভাব-অনটন ও অনাচারের স্রোতে প্লাবিত হইতেছে। অযোগ্য অধিকারী এবং তাহাদের অধীনস্থ অকর্ম্মণ্য বা ফাঁকিবাজ কর্ম্মচারী দেশ-পরিচালনার ও এ দেশের শাসনতন্ত্রের কাজ কলুষিত ও দুঃসহ করিতেছে। কিন্তু ইহারা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে আমাদেরই দোষে। যদি আমরা ধীরস্থির ও সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে প্রতিকারের পথ খুঁজিতে চেষ্টিত হই তবে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবেই, কেননা উহাই স্বাধীনতার নিয়ম। তবে দীর্ঘদিনের অবহেলার ফলভোগ আরও কিছুদিন আমাদের করিতে হইবে।

বাইশে শ্রাবণ

স্বাধীনতা দিবসের আগমনের সঙ্গে সেই দিনের কথা মনে করি—স্বাধীনতা লাভের ছয় বৎসর পূর্ব্বেকার—

যেদিন বাংলা দেশের তথা ভারতভূমির তথা সমস্ত সভ্য জগতের সুধীসমাজ রবিহারা হইল। দাসত্বের দিনে, নৈরাশ্যের মধ্যে যাঁহার উদাত্ত আহ্বান আমাদের উদ্বুদ্ধ করিত, যাঁহার অমর লেখনিপ্রসূত বাণীতে জনগণের হতাশা দূর করিত, যাঁহার রচিত স্বদেশ-প্রশস্তি-সঙ্গীতে সারা ভারতে দেশাত্মবোধের ও নবজীবনের জাগরণ আনিয়াছিল, তাঁহার তিরোধানের স্মৃতি বহন করিয়া ২২শে শ্রাবণ, এই স্বাধীনতার আগমনী গান বিষাদমণ্ডিত করিতেছে। এই দিনে স্মরণ করি সেদিনের কথা যেদিন ব্রিটিশ সিংহের নখদন্ত-কেশর-সজ্জিত রুদ্রমূর্ত্তিতে ও তাহার রোষকষায়িত রক্তচক্ষুর দৃষ্টিতে অসহায় সঙ্গীহীন ভীত সন্ত্রস্ত বাঙালীর মনে শক্তি সঞ্চারের জন্য তিনি গাহিয়াছিলেন শক্তির আগমনী গান :

আজি বাংলা দেশের হৃদয় হ'তে
কখন আপনি,
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির
হ'লে জননী!
ওগো মা—
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে!
ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে,
বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ;
দুই নয়নে স্নেহের হাসি
ললাট-নেত্র আগুন বরণ!
ওগো মা—
তোমার কি মুরতি আজি দেখি রে—
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে!
তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি;
তোমার আঁচল ঝলে আকাশ-তলে
রৌদ্র-বসনী!
ওগো মা—
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!

কি অভয়ের প্রেরণা এনেছিল সেদিন এই গানে, কি উদ্দীপনা জাগাইয়াছিল বাঙালীর মনে এই শক্তির আবাহনে! সে দিনের কথা আজ ভুলিয়াছে বাঙালী, তাই ত আজিকার দিনে বাংলার এই খণ্ডিত, অবহেলিত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত অবস্থায় বাংলা মায়ের সন্তানেরা এরূপ বিভ্রান্ত ও হতাশ ভাবে ফিরিতেছে চতুর্দ্দিকে।

আজ স্মরণ করি সেদিনের কথা যে-দিন সারা জগতে সাড়া পড়িল এই তেজস্বী মহামানবের রাজসম্মান প্রত্যাখ্যানে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায়। জগৎ দেখিল যে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ ভারতে একজন পুরুষসিংহ এখনও জীবিত, যাহার উচ্চ শির নত করিতে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ব্রিটিশরাজও অসমর্থ। মনে পড়ে এই প্রত্যাখ্যানের সংবাদ শুনিয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ব্যাকুল ইচ্ছা তাঁহার পরম সুহৃদ রবীন্দ্রনাথকে দেখিবার জন্য ও তাঁহার নিজ মুখে এই প্রত্যাখ্যান পত্রের পাঠ শুনিবার জন্য। মনে পড়ে প্রিয় বন্ধুকে দেখিয়া ও তাঁহার মুখের বাণী শুনিয়া রামেন্দ্র-সুন্দর বলিয়াছিলেন যে, তিনি মনে শান্তি লইয়া পরলোক যাত্রা করিতে পারিবেন।

আজ বাংলার আকাশ রবি, চন্দ্রহীন, রাত্রিও প্রায় নক্ষত্রহীন। কিন্তু যতদিন স্মৃতির পঞ্চপ্রদীপ এই দেশে উজ্জ্বল থাকিবে ততদিন এই পুণ্যভূমি নিষ্প্রদীপ হইতে পারিবে না। ভয় এই মাত্র যে, এই অভিশপ্ত দেশের বিভ্রান্ত সন্তানগণ সেই স্মৃতির আলোকও নানা কুহকে আচ্ছন্ন করিতে বসিয়াছে।

যতদিন সেই আলোক উজ্জ্বল থাকিবে ততদিন বাংলার সন্তান অসহায় ও ভয়ত্রস্ত হইতে পারিবে না। দেশপূজ্য ও দেশগুরু এই বাংলা মায়ের জগৎবরেণ্য সন্তানের আশীর্ব্বাদ এখনও সকল বাংলার তথা ভারতের সন্তানসন্ততির চেতনামন্ত্র রূপে রহিয়াছে।

কলিকাতা পৌরসভার ক্ষমতাহ্রাস সম্ভাবনা

২২শে শ্রাবণের সংবাদপত্রগুলিতে এক খবর আছে যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার কলিকাতা পৌরসভাকে এক অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, যাহাতে পৌরসংস্থার মোটর যানবাহনের ও রেলওয়ের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ও দায়িত্ব উক্ত সংস্থার কমিশনারের উপর অর্পিত হয়। এই ব্যবস্থা আপাততঃ এক বৎসরের মত স্থায়ী হইবে বলা হইয়াছে।

ঐ ব্যবস্থায় শহরের আবর্জ্জনা ও জঞ্জাল অপসারণ এবং মোটরযান বিভাগ পরিচালনের জন্য সরকার মেয়র ও ডেপুটি মেয়রের সহিত পরামর্শ করিয়া একদল বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারী নিয়োগ করিবেন যাঁহাদের সাহায্যে কমিশনার এই কাজ চালাইবেন, ইহাও ঐ সিদ্ধান্তে প্রস্তাবিত হইয়াছে।

এই প্রস্তাব কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ৩০ ধারা অনুযায়ী করা হইতেছে। ঐ ধারার অনুযায়ী

সূত্রে কলিকাতা পৌরসংস্থার মোটরযান ও রেলওয়ে পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সকল ক্ষমতা পৌরসভা ও উহার ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি হইতে কমিশনারের নিকট হস্তান্তরিত করা প্রস্তাবিত হইয়াছে। তবে বাজেট অনুমোদন বা এককালীন ১০ হাজার টাকার অধিক ব্যয়ের ক্ষমতা এই প্রস্তাবের অধিকারের মধ্যে থাকিবে না। ঐ সংস্থা দুইটিতে কর্মী নিয়োগ বা বরখাস্ত করার পূর্ণ ক্ষমতা ঐ প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

রাইটার্স বিল্ডিংয়ে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় গত ৬ই আগষ্ট এক উচ্চ পর্য্যায়ের বৈঠকে কলিকাতা মহানগরীতে মহামারী নিবারণের সকল ব্যবস্থার পর্য্যালোচনা করেন। উক্ত বৈঠকে এই সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের পূর্ণ আলোচনায় বহু বিশেষজ্ঞ এবং পৌরসভার মেয়র ও ডেপুটি মেয়র যোগদান করিয়াছিলেন। সেই বৈঠকে স্থির হয় যে, জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক এবং সরকারের ভাড়া-করা লরী ১৬ই আগষ্ট হইতে প্রত্যাহৃত হইবে। এবং সেই সঙ্গে কলিকাতা পৌরসভাকে অনুরোধ করা হয় যে, জঞ্জাল পরিষ্কার করার ব্যবস্থায় যাহাতে পুনর্ব্বার অবনতি না হয় সেদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি রাখিতে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে।

কিন্তু সেই ব্যবস্থা সক্রিয় রাখিতে হইলে একদিকে যেমন কর্ম্মীদের কাজে অবহেলা নিবারণ করা প্রয়োজন অন্যদিকে মোটর যানবাহন ও রেলওয়ের কাজ পুরামাত্রায় চালু রাখারও প্রশ্ন আছে। এই দ্বিতীয় ব্যাপারের পর্য্যালোচনায় সরকার মোটরযান বিভাগের এক ভয়াবহ চিত্র উদ্‌ঘাটন করেন। 'যুগান্তরে'র সংবাদে সে বিষয়ে বলা হইয়াছে :—

"সরকারের নিকট যে নির্ভরযোগ্য রিপোর্ট আছে, তাহাতে সরকার বলিতে পারেন যে, কলিকাতা কর্পোরেশনের মোটর ভেহিকলস্ ডিপার্টমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সেখানে এক চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা। অথচ সহরের ময়লা অপসারণ, জঞ্জাল পরিষ্কার এবং সহরে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইলে মোটরযান বিভাগ কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। জঞ্জাল পরিষ্কার করার লরী এবং অন্যান্য সাজসরঞ্জামের বর্ত্তমান অবস্থা ভয়াবহ। কর্পোরেশনের বিভিন্ন প্রকার গাড়ীর মোট সংখ্যা ৫০৩ টি। ইহার মধ্যে ২৮টি ট্রাকটরের সবগুলি অকেজো, দীর্ঘকাল অকেজো থাকিয়া ১৯৫১ সনের পূর্ব্বে ক্রীত ৭৫ খানি গাড়ী লোহালক্করে পরিণত হইয়াছে। বহুসংখ্যক গাড়ী ৬ মাস, কতকগুলি তিন মাস অকেজো হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। কর্পোরেশনের কারখানায় গাড়ী সারাইবার এবং চালুরাখার উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। ইহা নূতন করিয়া সংগঠিত করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। কলিকাতা সহরে জঞ্জাল অপসারণের কাজ যখন গাড়ীর অভাবে ব্যাহত হইতেছে, তখন কর্পোরেশনে ৫০৩ খানি গাড়ীর মধ্যে মোটে ২৪২ খানি অর্থাৎ শতকরা ৪৮ খানি গাড়ী দ্বারা কাজ চালানো হইতেছে। ১৯৫১ সনের পর ক্রীত ৩৬৭ খানি গাড়ীর মধ্যে ১০২ খানি গাড়ী ৬ মাস বা তাহার চেয়ে বেশী সময় এবং ৬২ খানি ৬ মাসের কম সময় অকেজো হইয়া রহিয়াছে। সরকার কর্ত্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, এই অবস্থায় সহরের ময়লা পরিষ্কার যে ঠিকমত হয় না, তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই।"

বলা বাহুল্য এই রিপোর্ট এবং উহার আনুষঙ্গিক তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যের আলোচনার ফলেই কলিকাতা পৌরসভার ক্ষমতা আংশিক ও সাময়িক ভাবে হস্তান্তর করার প্রস্তাব আসিতেছে।

এই প্রস্তাব ও সেইমত ক্ষমতা হ্রাসের সম্ভাবনায় কলিকাতা পৌরসভা ও বিভিন্ন মহলে নানারূপ প্রতিক্রিয়ার সংবাদ আসিতেছে। কিন্তু কলিকাতার নাগরিকগণের স্বাস্থ্য-স্বাচ্ছন্দ্য এবং পথঘাট, বস্তি এবং বাজার অঞ্চল আবর্জ্জনা-মুক্ত রাখাই হইল সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বোপরি বিবেচ্য কথা। ঐ বিষয়ের বিধিব্যবস্থা করার দায়িত্ব এতদিন ন্যস্ত ছিল কলিকাতা পৌরসভা ও তাহার নির্দ্দেশ অনুযায়ী পৌরসংস্থার বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মচারী ও কর্ম্মিগণের উপর। ইহারা যে ভাবে সে দায়িত্ব পালন করিয়াছেন, তাহা এই মহানগরের অধিবাসিগণ ভুক্তভোগী রূপে দীর্ঘদিন দেখিয়াছেন ও বুঝিয়াছেন। সুতরাং এই সরকারী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোনও আন্দোলন উঠিবার পূর্ব্বে নাগরিকদিগের পক্ষ হইতে দাবী আসা প্রয়োজন যে, যাহা জনসাধারণের নিরাপত্তা বা স্বাস্থ্য-স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় সেই ব্যবস্থা যেন সরকার কাহারও খোসখেয়ালের উপর ছাড়িয়া না দেন। পৌরসভা ভবিষ্যতের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ বা অপারগ সেই প্রশ্নের মীমাংসা সর্ব্বপ্রথমেই প্রয়োজন সেই কারণে।

কলিকাতার পথ ও অলিগলি

কলিকাতার পথে চলাফেরা ক্রমেই বাধা-বিপত্তিপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। দিনে চলায় ভিড়ের ঠেলায় ফুটপাথ ছাড়িয়া যানবাহনের পথে নামিতে হয়, সেখানে পায়ে-

চলা পথিকের প্রধান শত্রু মোটরযানের চালক। বাস্তব পক্ষে এই মহানগরে যত কাণ্ডজ্ঞানহীন দুর্ব্বৃত্ত মোটর-চালক হিসাবে যানবাহন হাঁকায়, পৃথিবীর অন্য কোথাও এত আছে মনে হয় না। ট্যাক্সি-চালক উন্মত্তভাবে ডাইনে বামে ত চালায়ই, তবে দিনের আলোয় লোক চাপা দেওয়ায় বিপদ আছে এই জ্ঞান এত দিনে তাহাদের অনেকের মাথায় প্রবেশ করায় পূর্ব্বেকার মত বেপরোয়া লোক চাপা দিতে তাহারা ইতস্তত: করে। এখন পদাতিকের মারক প্রধানত: লরী-চালক এবং ষ্টেটবাসের চালক।

আগেকার দিনে যানবাহনের পথে চলার কতকগুলি নির্দ্দেশ বাঁধাধরা ছিল। অন্য কোন গাড়ীকে ছাড়াইয়া চলিতে হইলে তাহার ডাইনের পাশ কাটাইয়া যাওয়াই নিয়ম ছিল। এখন সে আইন কার্য্যত: বাতিল হইয়া গিয়াছে। যদি কোনও গাড়ী অপেক্ষাকৃত মন্দগতিতে পথ চলে তবে তাহার ডাইনে ও বামে সমানে দ্রুতগামী মোটরের স্রোত চলিবে এবং আগাইলেই সেই গাড়ীর সম্মুখের পথ সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর করিবে। যদি কোনও কারণে যানবাহনের স্রোত আটকাইয়া যায় তবে সেই মন্দগতিতে চালিত গাড়ী কাঁচিকলে আবদ্ধ হয়। এই ভাবে ক্রমাগত গাড়ীতে গাড়ীতে ধাক্কা ও ঘষা লাগা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার সর্ব্বত্রই দাঁড়াইয়াছে।

বড় রাজপথে ত ঐ উন্মত্তগতিতে চালিত যানবাহনের স্রোত এড়াইবার তবু কিছু ফাঁক থাকে। পদাতিক ফুট-পাথে চলিতে পারেন, অবশ্য চলিতে হইলে ফুটপাথের গর্ত্ত এড়াইয়া এবং রাবিশের স্তূপ ডিঙাইয়া চলিতে হইবে—ভিড়ের ধাক্কা ও উঁচুনীচু পথে হোঁচট সহিয়া ও খাইয়া—ধীর ও মন্থর গতিতে। কিম্বা যানবাহন-পথের কিনারা ধরিয়া ঠেলাগাড়ীর সঙ্গ লইয়াও যাওয়া যায়। কিন্তু ছোট পথে ও ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্রের গলিতে সে সুযোগও নাই, সেখানে ঠেলা, রিক্সা ও লরী সমস্ত পথই দখল করিয়া চলিতে থাকে যাহার ফলে 'ট্রাফিক জাম' সে সকল স্থানে প্রায়ই হয়। সে সকল স্থানে পথ চলা দুর্ব্বহ ও দুরূহ ব্যাপার, সোজা পথ ত নাই-ই, যানবাহন এড়াইয়া চলিতে রীতিমত কষ্ট পাইতে হয়।

এই সকল বাধা-বিপত্তি না হয় বুঝিলাম যে মহা-নগরীতে বাস করার আনুষঙ্গিক ব্যাপার। কিন্তু পথ-ঘাটের অবস্থা মেরামতির অভাবে যাহা দাঁড়াইতেছে তাহা ত এই মহানগরীর সুনাম বাড়াইতেছে না। ট্রাম কোম্পানী কতকগুলি প্রধান রাজপথে লাইন ও লাইনের দুই ধার মেরামত করিতেছে, কিন্তু তাহা এতই শ্লথ ভাবে যে,পূর্ণপথের মেরামত শেষ হইবার পূর্ব্বেই প্রথমে যেখানে মেরামত হইয়াছিল তাহার অবস্থা কাহিল হয়। যে সকল পথে ট্রাম নাই সে সকল পথের মেরামতও নাই, এই ত আজ কয় বৎসরের অভিজ্ঞতা আমাদের সকলের। মাঝে মাঝে রাস্তার খানিকটা জোড়াতালি দেওয়া মেরামত হয় অবশ্য, কিন্তু যে ভাবে তাহা করা হয় তাহাতে মনে হয় যে, সেই মেরামতে উপকার হয় পৌর-সংস্থার কতিপয় কর্ম্মচারীর ও কণ্ট্রাক্টারের এবং হয়ত কোনও পৌরসভার সদস্যের, কিন্তু তাহা নাগরিকের কোনও কাজে লাগে না, কেননা তাহাতে পথ আরও উঁচুনীচু ও খানাখন্দে পূর্ণ করাই হয়।

ছোট-বড় পথের ত এই ব্যবস্থা, অলিগলির কথা বলাই বৃথা। এতদিন ফুটপাথ ও অলিগলি আবর্জ্জনায় ঢাকা ছিল, এখন জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর তরুণদের উদ্যমে ও উৎসাহে সেই আবর্জ্জনা ও জঞ্জালের স্তূপ সরিয়া যাওয়ায় সেই ফুটপাথ ও গলিগুলির যে নগ্ন, জীর্ণ ও জঘন্যরূপ প্রকাশ পাইতেছে তাহা এই মহানগরীর পক্ষে নিতান্তই লজ্জাকর ও বেদনাদায়ক—যদিও উহার পৌর-পিতাগণের অন্তরে ওই দুই বস্তুর স্থান আছে বলিয়া বুঝা যায় না।

এই ত দিনের আলোয় কলিকাতা। রাত্রের অন্ধকারে ঐ পথঘাট অলিগলির যা অবস্থা হয় তাহা বর্ণনার অতীত। যে সকল অঞ্চলে পথের দুই ধারে দোকানপাট আছে যেখানে রাত আটটা-নয়টা পর্য্যন্ত তবুও পথ চলার মত আলো থাকে। নয়টার পর মোটর-যানের সম্বল হেডলাইট ও পায়ে-চলা পথিক বা রিক্সা ইত্যাদির ভরসা কপালের জোর। এই নগরের অনেক অঞ্চল, যেখানে দোকানপাট নাই, সেখানে পথের পাশে কোনও আলোবাতির বিশেষ বালাই নাই—আজও নাই এবং গত দুই-তিন-চার বৎসরেও ছিল না। এই সকল অঞ্চলে চুরি-চামারি নিত্যই লাগিয়া আছে, যদিও সে সকল চুরির খবর সংবাদপত্রে উঠে না—কেননা দশ-বিশ হাজারের কম চুরি বা রাহাজানির রিপোর্ট চমকপ্রদ নয়—এবং পুলিসে জানানোও হয় না, কেননা জানাইলে কোনও ফল হয় না।

এ সকলের সঙ্গে আছে অন্য এক শ্রেণীর দুর্ব্বৃত্তের উপদ্রব। এই মহানগরের কয়েক অঞ্চলে রাত আট-নয়টার পর কোন ভদ্র স্ত্রীলোকের পক্ষে—তিন-চারজন পুরুষ সঙ্গী ছাড়া পথচলা দায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুর্ব্বৃত্তের মুখে অশ্রাব্য কথা শোনা ত আছেই, উপরন্তু আছে লাঞ্ছনার ভয় যদি দ্রুত কোনও বড় এবং আলোক-

যুক্ত পথ, যেখানে লোক চলাচল আছে বা কোনও আশ্রয়ে পৌঁছান না যায়। সঙ্গীর দল ভারী না থাকিলে রিক্সা বা ট্যাক্সি ছাড়া অল্প দূরও যাওয়া যায় না এবং একটু অধিক রাত্রে তাহাও নিরাপদ নয়। বহুদিন পূর্ব্বে কিপ্লিং কলিকাতাকে বলিয়াছিলেন, "The city of Dreadful Nights" (দুর্ব্বহ রাত্রির পুরী)। এখন কলিকাতার রাত্রি শুধু দুর্ব্বহ বা দুঃসহ নয়, বিপদসঙ্কুলও হইয়া দাঁড়াইতেছে। জানি না ইহার প্রতিকার কি!

কলিকাতা-নরককুণ্ড উদ্ধার

গ্রীক পুরাণে হারকিউলিসের দুঃসাধ্য সাধনের যে আটটি কাহিনী আছে, তাহার মধ্যে অজিয়ার আস্তাবল পরিষ্কার করা (Cleaning of the Augean Stables) অন্যতম। আমাদের এই কলিকাতা তাহার পৌর-সংস্থার কর্ম্মী, কর্ম্মচারী ও পৌরসভার সদস্যবর্গের কৃপায়, গত দুই-তিন বৎসরে বৃহত্তর ও জঘন্যতর আস্তাবলে পরিণত হইতেছিল। গলিঘুঁচির বা বস্তির ত কথাই নাই, বড়বাজারের পথঘাট, শিয়ালদহ বাজারের সম্মুখে প্রশস্ত রাজপথ, ফ্রি-স্কুল ষ্ট্রীটের মত জনবহুল কর্ম্ম ও ব্যবসা কেন্দ্রের পথও আবর্জ্জনা ও জঞ্জালের স্তূপে সঙ্কীর্ণ ও দুর্গন্ধময় নরকে পরিণত হইতেছিল। এই নরক উদ্ধার করিয়া জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর তরুণগণ যে অসাধ্য সাধন করিয়াছেন তাহাতে দেশের মুখোজ্জ্বল হইয়াছে। তাঁহাদের উদ্যম ও প্রয়াসের প্রশংসা চতুর্দ্দিকে যে ভাবে শোনা যাইতেছে তাহা তাঁহাদের কৃতিত্বেরই কারণে আসিতেছে। ইঁহাদের জীবনযাত্রাপথ জয়যুক্ত হউক।

ভারত সরকারের ব্যবসা পরিচালনা

বিগত মহাযুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে সরকারী নীতি অনুসারে কোন আমলা জাতীয় ব্যক্তির কারখানা অথবা ব্যবসা চালাইবার অধিকার ছিল না। আমলাদিগের ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইবার ক্ষমতা অল্পই থাকে, কেননা তাঁহারা ব্যাপকভাবে নিয়ম গঠন ও সেই সকল নিয়ম অপরের উপর প্রয়োগ করাই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্টতম কার্য্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া থাকেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ও কাজ-কারবার চালান অনেকাংশেই শাসন ও প্রভুত্বনীতির বাহিরে। অর্থাৎ দূরে সৈন্যবাহিনী ও নিকটে সশস্ত্র পেয়াদা খাড়া রাখিয়া রাজ্যশাসন কিম্বা খাজনা আদায় এক কথা এবং সস্তায় কাঁচামাল সংগ্রহ করিয়া অল্প খরচে তাহা দ্বারা বিক্রয়ের মালমসলা প্রস্তুত করিয়া বাজারে তাহা উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করা সম্পূর্ণ অন্য জাতীয় কার্য্য। জনসাধারণকে নিয়ম-কানুন ও শাসনপদ্ধতির উৎকট প্রয়োগে প্রমথিত করিয়া জাতীয় আয় ও ঐশ্বর্য্যের নবনীটুকু তুলিয়া লইয়া জন-নেতাদিগের ইচ্ছামত ব্যবহারের জন্য ধরাইয়া দেওয়া আমলাদিগের কার্য্য। চিরপরিবর্ত্তনশীল যে কেনা-বেচার আবহাওয়া ও অসংখ্য শাখা-প্রশাখা শোভিত যে মানব-সভ্যতা ও তাহার অর্থনীতির বিস্তৃতি তাহার মধ্যে আসিয়া নিজেদের কর্ম্মশক্তি ও গঠনক্ষমতা দেখান আমলা-দিগের পক্ষে সম্ভব নহে। এই কারণে কোন দেশেই আমলাদের প্রধান ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা কারখানা চালনা করিতে দেখা যায় না।

ভারতবর্ষে বিগত এক যুগাধিক কাল যে ভাবে জাতীয়-জীবনের সকল অঙ্গে সাধারণের অধিকার দমন করিয়া আমলাশক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে ও উত্তরোত্তর সেই পদ্ধতি প্রবলতর ও বর্দ্ধিত ভাবে নিয়োগ করা হইতেছে, তাহাতে ভারতের জনসাধারণের ব্যক্তিত্ব বিশেষ ভাবে খর্ব্ব করা ত হইয়াছেই, উপরন্তু জনসাধারণের অর্থদান ও অসুবিধা ভোগের তুলনায় কোন লাভই হয় নাই বলা চলে। অতিরিক্ত মূল্যে ক্রয় করিয়া অত্যন্ত অধিক ব্যয়ে স্থাপিত করিয়া যে সকল কারখানা বসান হইয়াছে সেগুলি সামান্য লাভেও চলিতেছে না, লোকসানই হইতেছে। যে জাতীয় অর্থ অপব্যয় করিয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সকল বাস্তবে ব্যক্ত হইতেছে সেই সকল অর্থই ধার হিসাবে জাতির স্কন্ধে চাপিয়া থাকিবে এবং সেই ধার শোধ করিতে ও তাহার সুদ দিতে জাতির যে খরচ হইবে তাহা জাতির অর্থনৈতিক "উন্নতির" তুলনায় অত্যধিক বলিয়াই মনে হয়। ইউনাইটেড নেশনস-এর যে সকল পুস্তকাদি বাহির হয় তাহার একটিতে দেখা যায় ১৯৫৩-৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতের আর্থিক উন্নতি বিশেষ কিছু হয় নাই। এই সময়ে জাপানের জাতীয় আয় শতকরা ৬২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বর্ম্মার হইয়া-ছিল শতকরা ৩১ ভাগ, থাইল্যাণ্ডের ২৮ ভাগ, কাম্বোজের ২৯ ভাগ, ইন্দোনেশিয়ার ২১ ভাগ ও ভারতের মাত্র ১৯ ভাগ। যে ক্ষেত্রে ভারতবাসীর রাজ-করের পরিমাণ আয়ের শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ, সে ক্ষেত্রে এই আয়বৃদ্ধির মূল্য কতটা তাহা সহজেই বিচার করা যায়। আসল কথা, অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমলা বর্জ্জন অতি প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ দেশনেতাদিগকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্র হইতে সাধারণতঃ সরাইয়া দেওয়া আবশ্যক, এবং অতি শীঘ্র। অ.

চীন, ভারত ও পাকিস্থান

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীনেহরু বলেন যে, পাকিস্থান ভারতকে চীনের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত করাইবার চেষ্টা করিতেছে। আমরা জানি না যে, শ্রীনেহরুর কি প্রমাণ আছে এই অভিযোগ প্রতিপন্ন করিবার জন্য। হইতে পারে পাকিস্থান চীনের সহিত ভারত যুদ্ধে জড়িত হইলে খুশী হইবে এই আশায় যে, ভারত যুদ্ধ করিয়া শক্তিহীন হইলে পর পাকিস্থান ভারত আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু শ্রীনেহরুর এইরূপ কথা বলিবার আর একটি কারণ থাকিতে পারে যে, তিনি চীনের সহিত কোন প্রকারেই যুদ্ধ করিতে চাহেন না। সুতরাং পাকিস্থানের ঐরূপ যুদ্ধে সুবিধা ও আগ্রহ আছে, এই অজুহাতে তিনি নিজের যুদ্ধে অনিচ্ছার সাফাই গাহিতেছেন পাকিস্থানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠাইয়া। তাঁহার যদি পাকিস্থানের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ থাকে, তাহা হইলে তাঁহার উচিত সকল কথা খুলিয়া বলা। নচেৎ সাধারণের মনে এই সন্দেহই হইবে যে, তিনি যুদ্ধে অপারগ এবং পাকিস্থানের নাম করিয়া যুদ্ধ না করা উচিত প্রমাণ করিতেছেন মাত্র।

চীন যখন হইতে ভারতের বিভিন্ন স্থানে হামলা করিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন হইতে পাকিস্থান চীনের সহিত সখ্য স্থাপন চেষ্টা করিতেছে বলা যাইতে পারে। চীন হামলা আরম্ভ করিবার অনেক পূর্ব্বেই পাকিস্থান সেই কল্পিত অবস্থার সুযোগ আহরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। চীনের সহিত ভারতের যুদ্ধ সম্ভাবনা তখন হইতেই হইয়াছে যখন চীন ভারতের জমি দখল করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই জমি-দখল কার্য্য চীন নিজ আগ্রহেই করিয়াছে। পাকিস্থানের প্ররোচনায় করে নাই। চীনের এই অন্যায় লোভের কারণ প্রধানতঃ ভারতের দুর্ব্বলতার মধ্যেই দেখা যায়। ভারত যদি চীনের অন্যায় ভাবে তিব্বত দখলের প্রশ্রয় না দিতেন ও তিব্বতীদিগের উপর চীনের পাশবিক অত্যাচার বিনা প্রতিবাদে হজম করিয়া না যাইতেন, তাহা হইলে চীনের কখনও ভারতের উপর হামলা করিবার স্পর্দ্ধা হইত না। বর্ত্তমানে শ্রীমেনন যদি গায়ে পড়িয়া চীনের প্রতিনিধির সহিত ভাব জমাইবার চেষ্টা না করিতেন, তাহা হইলেও সম্ভবতঃ মার্শাল চেন য়ীর সাহস হইত অযথা কতকগুলি মিথ্যা কথা প্রচার করিবার চেষ্টা। এবং তৎপরেও শ্রীনেহরুর চীনের সহিত আবার কথাবার্ত্তা চালাইবার ব্যবস্থা আরও অশোভন দুর্ব্বলতার পরিচায়ক হইয়াছে। সুতরাং যদি চীন অদূর ভবিষ্যতে ভারতের আরও অধিক জমি দখল করিয়া লয় তাহা হইলে তাহার জন্য দায়ী হইবেন শ্রীনেহরু ও শ্রীমেনন। চীনাদিগকে উত্তরোত্তর আসকারা দিয়া বাড়াইয়া তুলিতেছেন ঐ দুই ব্যক্তি। পাকিস্থান যদি এদিকে ওদিকে ফোড়ন দিয়া থাকে তাহা সর্ব্বশ্রীনেহরু-মেননের দুর্ব্বল হস্তে প্রস্তুত আত্মসম্মান-হীনতার ব্যঞ্জনেই পড়িয়াছে।

অ.

সুমন সরকারের বীরত্ব

কয়েকদিন পূর্ব্বে নীলরতন সরকার হাসপাতালের মধ্যে একজন চিকিৎসাধীন ব্যক্তি ছোরা লইয়া দৌড়াইয়া কয়েকজন ডাক্তারকে সাংঘাতিক ভাবে আহত করিয়াছে। সে কি কারণে এইরূপ করিল তাহা ঠিক জানা যায় নাই। গুজব যে, বর্ত্তমান পশ্চিম বাংলার স্বাস্থ্য বিভাগের একজন উচ্চতম কর্ম্মচারী কোন কোন প্রকার ঔষধ-ব্যবহার বন্ধ করার ফলে রুগীদিগের নানাপ্রকার কষ্ট ভোগ করিতে হয় এবং উপরোক্ত ব্যক্তিও সেই কারণে ভীষণ কষ্ট পাইয়া পাগলের মত হইয়া গিয়া ছোরা লইয়া ডাক্তার হত্যার চেষ্টা করে। সে যাহা হউক, এই ঘটনাকালে একজন যুবক বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া ও নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া ঐ খুনে লোকটাকে নিরস্ত্র করিয়া অপর অনেকের প্রাণ বাঁচাইবার কারণ হইয়াছেন। ইঁহার নাম শ্রীসুমন সরকার ও ইনি ৺নীলরতন সরকারের পৌত্র। ঘটনা কালে শ্রীসুমন সরকার হাসপাতালে কোন রুগীকে দেখিতে গিয়াছিলেন ও কয়েকজন ব্যক্তি চক্ষের সম্মুখে ছুরিকাঘাতে পতিত হইতেছে দেখিয়া তিনি আততায়ীকে প্রত্যাক্রমণ করিয়া শেষ অবধি তাহাকে নিরস্ত্র করিয়া ফেলেন। তাঁহার বুকেও ছোরার আঘাত লাগে কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ জখম গভীর হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচিত এই বীরপুরুষকে উপযুক্তরূপে পুরস্কৃত করা। এবং উচিত এই সম্বন্ধে পূর্ণ অনুসন্ধান করিয়া যাহাতে এইরূপ ঘটনা আর না ঘটে তাহার ব্যবস্থা করা।

অ.

মোরারজীর রাজস্ব আদায় নীতি

রাজস্ব আদায় নীতি অপরাপর নীতির মতই ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, সত্য-মিথ্যা প্রভৃতি গুণাগুণে রঞ্জিত হইতে পারে। তাহা ছাড়াও সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে রাজস্ব আহরণ এমন ভাবে করা উচিত যাহাতে কি আদায় করা হইতেছে ও শেষ অবধি কে সে অর্থ দিতে

বাধ্য হইতেছে এবং আদায়ের ফলে পরোক্ষভাবে সরকারী লাভের তুলনায় জাতীয় লোকসান অধিক হইতেছে কি না ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর পরিষ্কার ও সঠিক ভাবে সাধারণের বোধগম্য হওয়া আবশ্যক। রাজস্ব আদায় সহজ ও সরল উপায়ে করা উচিত। আদায় করিবার জন্য জনসাধারণকে উত্যক্ত করিয়া ও আদায় অপেক্ষা আদায়ের খরচ অধিক করিয়া ফেলিলে সেই প্রকার রীতি বর্জ্জনীয়। যথা আমাদিগের আয়কর অথবা ইনকাম ট্যাক্স। ইহার জন্য যে পরিমাণ হাঙ্গামা করা হইয়া থাকে ও এই কর দেওয়ার ক্ষেত্রে যতটা ফাঁকি ও মিথ্যার খেলা চলিয়া থাকে সে তুলনায় খরচ বাদে লাভ অল্পই হয়। উপরন্ত এই ট্যাক্স থাকায় যাঁহারা ট্যাক্স দিতে রাজী ও ট্যাক্স দিয়া থাকেন তাঁহাদিগের উপরে ইনকাম ট্যাক্স অফিসের কর্ম্মচারিগণ অকারণে উৎপাত করিয়া নিজেদের সময় অতিবাহিত করেন। যাহারা ফাঁকি দিয়া, ঘুষ দিয়া ও অপর অন্যায় উপায়ে ন্যায়ত-দেয় রাজকর না দিবার চেষ্টা করে, সেই সকল ব্যক্তির নিকটে ইনকাম ট্যাক্স অফিসের কর্ম্মচারী কদাপি উচ্চকণ্ঠে কথাও বলেন না।

মোরারজীর রাজস্ব আদায় নীতি পূর্ব্বকালের সকল দোষে দুষ্ট ত বটেই, উপরন্ত তাঁহার নীতির নূতন নূতন অনেক দোষ আছে। তিনি ভারতের সাধারণে কে কি রাজকর দিবে তাহা বলিয়াই নিরস্ত হন না। তিনি জনসাধারণকে জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কে কি করিতে পারিবে অথবা পারিবে না তাহার নির্দ্দেশ দিতে ব্যস্ত। আমদানি ও রপ্তানি কারবার, কারখানা নির্ম্মাণ, বিভিন্ন মাল ক্রয়-বিক্রয়, বিদেশ ভ্রমণ, চিকিৎসা, শিক্ষা বা বাণিজ্য হেতু দেশান্তর গমন—কোন কিছুই মোরারজীর আদেশ না পাইলে কেহ করিতে পারে না।

কারণ এই সকল ক্ষেত্রেই জনসাধারণের কার্য্যকলাপ মোরারজীর রাজস্ব আদায় অথবা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সহায়ক কিনা তাহা বিচার করিয়া তবে তিনি নির্দ্দেশ দিতে পারেন। ভারতীয় মানবের জীবনযাত্রা পদ্ধতির উপর এইভাবে আলমগীর বাদশাহ কখনও আক্রমণ করেন নাই। ভারতীয় মানবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আজ অর্থ-নীতির ক্ষেত্রে নাই বলিলেই চলে। অপর সকল ক্ষেত্রেই ভারতীয় মানবের মনুষ্যত্ব আজ আহত, গৌরবহীন ও অতি খর্ব্ব। কারণ মোরারজী, তথা নেহরু বিদেশী মাল-মশলা ক্রয় করিয়া দেশের আর্থিক অবস্থা উন্নত করিয়া দিবেন। বিগত ১৫ বৎসরে আমরা যাহা লাভ করিয়াছি আর্থিক ভাবে তৎপূর্ব্বকালের তুলনায়, আমরা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক অর্থ দিতে বাধ্য হইয়াছি রাজস্ব হিসাবে। এবং জাতীয় ভাবে হাজার হাজার কোটি টাকা আমাদিগের ঋণ লইতে হইয়াছে ও হইতেছে, যাহা শোধ করিতে আমরা কখনও পারিব না। সেই ঋণের সুদ গুণিতে আমাদিগের আরও অধিক "লাভের গুড় পিঁপড়ায়" খাইয়া যাইবে। আর্থিক উন্নতি সুদূর পরাহত। লোকসানগুলি সাক্ষাৎ ভাবে সম্মুখে উপস্থিত।

অ.

শ্রমশক্তি ও জাতীয় মূলধন

ভারতবর্ষের জাতীয় মূলধনের মধ্যে চাষের জমি সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করে। ভারতের জাতীয় আয় যদি বার্ষিক ১৫,০০০ কোটি ধরা হয় (প্রকাশ্য, অদৃশ্য ও গুপ্ত আয় একত্রে ধরিয়া) তাহা হইলে সেই আয়ের শতকরা ৭৫ ভাগের অধিক আসে চাষের জমি হইতে। এই জমি প্রকৃতির দান হইলেও, মানুষের শ্রমশক্তি নিয়োগেই জমি চাষের উপযুক্ত হয়। চাষও শ্রমশক্তির দ্বারাই করা হয়। গ্রামের ঘর-দুয়ার গঠন, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন, পশুপালন, শকট-চালনা, ময়দা-পেষা অথবা ঢেঁকি-চালান এবং অসংখ্য অপরাপর কার্য্য শ্রমশক্তির ব্যবহারেই করা হইয়া থাকে। শ্রমশক্তির ব্যবহারে সাক্ষাৎ ভাবে উপভোগ্য বস্তু তৈয়ার হয় এবং পরে অপর দ্রব্য প্রস্তুতের কলকব্জা বা উপায় হিসাবে যাহা ব্যবহার করা হয় ও যাহার নাম মূলধন, তাহাও শ্রমশক্তির দ্বারা প্রকৃতির দানগুলিকে সাজাইয়া-গুছাইয়া ও উপযুক্ত আকৃতি দান করিয়া তৈয়ার করিয়া লওয়া হয়। যথা, গৃহ নির্ম্মাণ হয় শ্রমশক্তির দ্বারা মালমশলা যথাস্থানে লইয়া আসিয়া তাহার সাহায্যে বিশেষ আকৃতির গৃহ গঠন করিয়া। গৃহের বার্ষিক ভাড়া যাহা অথবা এক বৎসর গৃহে বাস করিলে সেই বাস করিবার সুবিধার যাহা মূল্য ধার্য্য হইবে; তাহা হইল মূলধনের বার্ষিক আয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভারতের মূলধনের অধিকাংশই জমি, নদী, পুষ্করিণী, জঙ্গল, ফলের বাগান, পথঘাট, কুঁড়ে ঘর, ছোট বাড়ী, চাষবাসের সাধারণ যন্ত্রপাতি, মানুষের ভোগ্যবস্তু দান বা কর্ম্মে সাহায্য করে এইরূপ জীবজন্তু, শকটাদি ও কুটীর শিল্পের তাঁত, চরকা, ঢেঁকি হাতিয়ার প্রভৃতি। এই সবকিছুই মানুষের শ্রমশক্তির দ্বারা গঠিত, পরিবর্দ্ধিত, পরিস্কৃত, পরিবর্ত্তিত, আহৃত, পালিত ও উপযুক্ত আকার প্রাপ্ত হয়। এবং এই জাতীয় মূলধনের সাহায্যেই ভারতের যে মাথাপিছু বার্ষিক ২৯৬৲ (?) আয় তাহার

২৫০৲ প্রমাণ উৎপন্ন হয়। সুতরাং দেশের মানুষের শ্রমশক্তি ব্যবহারের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিয়া যাঁহারা বিদেশী শ্রমিক-রচিত যন্ত্রাদি ধার-কর্জ্জ করিয়া অথবা রপ্তানি মাল লব্ধ বিদেশী মুদ্রার শেষ কপর্দ্দক অবধি অপব্যয় করিয়া আহরণ করেন ও বলেন যে, এই উপায়ে দেশের অর্থনীতি প্রচণ্ড গতিতে উর্দ্ধগামী হইবে ও দেশের লোকের আয় শীঘ্র শীঘ্র দ্বিগুণ হইয়া যাইবে; তাঁহারা অবিমৃষ্যকারিতা দোষে জাতির নিকট অপরাধী। কেননা তাঁহাদিগের পরিকল্পনার ফলজাত যে মূলধন গঠন ভারতে হইয়াছে তাহা হইতে কোনও আয় বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস নহে। যেটুকু আয় বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা ভারতবাসীর ভোগে লাগে নাই এবং তাহার অধিকাংশ ভারত সরকারের হস্তগত হইয়া জলে ফেলা হইয়াছে। এবং সে আয় বৃদ্ধি হইয়াছে চাষবাস বৃদ্ধি ও পুরাতন অর্থনীতি-জাত বস্তুর পরিমাণ ও মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে। সরকারী আমলাদিগের স্পর্শ এড়াইয়া যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার জন্য ভারত সরকারের কোনও মন্ত্রণাদায়ক পণ্ডিত কোন প্রশংসা দাবী করিতে পারেন না। অর্থাৎ ভারত সরকারের যে জোর করিয়া জাতির অভিভাবকত্ব গ্রহণ নীতি তাহার ফলে জাতির আর্থিক উন্নতির বাধারই সৃষ্টি হইয়াছে; লাভ যাহা হইয়াছে তাহা সরকারী বাধা ও সর্ব্বগ্রাসী রাজস্ব আহরণ থাকা সত্ত্বেও।

বর্ত্তমানে তাহা হইলে, আমাদিগের জাতীয় কর্ত্তব্য হইতেছে জাতীয় মানবের শ্রমশক্তিকে সংহত, সংযত ও সংগঠিত করিয়া সেই শ্রমশক্তি ব্যবহারে ক্রমবর্দ্ধনশীল ভাবে সাক্ষাৎ ভোগ্যবস্তু ও মূলধন উৎপাদন করা। ইহাতে সরকারী সাহায্য যদি পাওয়া যায়, উত্তম; এবং না পাওয়া যাইলেও এই কার্য্য করিতে হইবে। কারণ বর্ত্তমানে আমাদিগের দেশের শ্রমশক্তি দৈনিক প্রায় ৮০ কোটি ঘণ্টা প্রমাণ নষ্ট হইতেছে। ইহার মূল্য ১০ কোটি মজুরের মজুরি ও যাহা তাহারও প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ মজুরি-প্রসূত সকল বস্তু ও বাস্তব ঐশ্বর্য্যসমূহ। এই শ্রমশক্তি ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা হইলে ভারতের যে প্রায় দশ লক্ষ মাইল পাকা রাস্তা নির্ম্মাণ অবশ্য-প্রয়োজন, তাহা নির্ম্মাণ করা সম্ভব হইবে। সকল গ্রাম তাহা হইলে শহর ও কারখানা জগতের সহিত অর্থনৈতিক ভাবে সংযুক্ত হইয়া যাইবে এবং সেই সকল গ্রামের উৎপন্ন বস্তু বিক্রয়ের বিশেষ সুবিধা হইবে। বস্তু উৎপাদন বিক্রয়ের উপর নির্ভর করে। বিক্রয়ের সুবিধা ঘটিলে উৎপাদন সহজেই হয়। অর্থাৎ চাহিদা জাগ্রতরূপ ধারণ না করিলে মাল প্রস্তুত ও সরবরাহ সম্ভব হয় না। শ্রমশক্তি ব্যবহারে ঘর, দুয়ার, পুষ্করিণী, বৃক্ষসম্পদ, পশুসম্পদ প্রভৃতি ক্রমাগত বাড়িয়া চলিবে এবং এই উপায়ে কোনও প্রকার বিদেশী যন্ত্র ব্যবহার না করিয়াই জাতীয় আয় দ্বিগুণ এমন কি চতুর্গুণ হইতে পারে এবং ব্যবস্থা করিলে অবশ্যই হইবে।

অ.

ভেজাল ঔষধ প্রণয়নে কাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অপরাধী

অবশেষে ঔষধেও ভেজাল ধরা পড়িল! ধরা পড়াটাই বড় কথা নয়, অপরাধীর শাস্তি কোথায় হইতেছে? শুনিতেছি, ভেজালকারীদের মৃত্যুদণ্ড দিবার আইন নাই। সুতরাং বুঝিতে হইবে, আমরা বিচিত্র দেশে বাস করিতেছি। আমরা জানি ভারতবর্ষে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী সমস্ত রকম মানবিকতাবোধশূন্য। ইহাদের বিবেক বলিয়া কোন বস্তু নাই, মানুষের শুভাশুভের পরোয়া ইহারা করে না। অর্থই ইহাদের একমাত্র লক্ষ্য। এই অর্থ উপার্জ্জনের জন্য ইহারা শিশুর খাদ্যে কিংবা রোগীর ঔষধে ভেজাল দিতেও দ্বিধাবোধ করে না। মহারাষ্ট্রে, কেরলে, অন্ধ্রে এবং মাদ্রাজে এতদিন পর লক্ষ লক্ষ এ্যাম্পুল ভেজাল ইনজেকসন এবং ডিষ্টিল্‌ড্‌ ওয়াটার ধরা পড়িয়াছে। অন্যান্য রাজ্যের বাজারে এখনও সেইগুলি বিনাবাধায় বিক্রয় হইতেছে। কারণ, এই প্রতিপত্তিশালী অপরাধীদের ধরিবে কে? আর ইহাদের চরম শাস্তি দিবার জন্য আইনই বা কোথায়? মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচ্যবন বিধানসভায় আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, আইনে এই ভেজাল-কারবারীদের ফাঁসি দিবার কোন ব্যবস্থা নাই।

এ আইন কেন নাই সে প্রশ্ন এখন করিব না। প্রয়োজনে নূতন আইন সংযোজন বা সংশোধন না হইতেছে এমন নয়, তবে এখানেই বা এ ঔদাসীন্যের কারণ কি? জগতে কোন সভ্য দেশেই খাদ্যে ভেজাল কিংবা ঔষধে জাল উপকরণ মিশ্রণ বরদাস্ত করা হয় না। ব্যবসায়ীরাও এইরূপ জঘন্যধরনের অপরাধ করিতে সাহসী হয় না আইনের ভয়ে। সোভিয়েট রাশিয়ায় সামান্য ঘুষ গ্রহণের জন্য অপরাধীকে গুলী করিয়া মারা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে সকল দুষ্কার্য্যই সম্ভব হইতেছে। কারণ এখানে সারাজীবন পাপাচারণ করিয়া কৌশলে এবং নিঃশব্দে গোটা জাতিকে মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দিলেও, আইন কিছু বলিবে না। ভেজাল খাদ্য

কিংবা জাল ঔষধ প্রস্তুত ও বিক্রয়ের জন্ম অতি সাধারণ দণ্ড দানের ব্যবস্থাই এই পাপ ব্যবসায়কে এতটা ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া বাড়বাড়ন্ত করিতে প্ররোচনা দিয়াছে। আর এই গণতন্ত্রের ঠাট বজায় রাখিতে অসহায়, নিরুপায় সাধারণ মানুষ—যাহারা অর্থ দিয়া শিশুদের ভেজাল খাদ্য খাওয়াইতেছে, মুমূর্ষু রোগীকে জাল স্যালাইন ইনজেক্‌শন দিয়া প্রাণে মারিতেছে।

এই জাল-কারবারীদের চক্রান্তে শুধু সাধারণ মানুষেরই জীবন যায় নাই। কয়েক বছর আগে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডাঃ এস. ভাটনগরের পত্নীকে জাল এমিটিন ইন্‌জেক্‌শন দিয়া হত্যা করা হয়। লোকসভার ভূতপূর্ব্ব সদস্য বিশ্বম্ভরদয়াল ত্রিপাঠীরও মৃত্যুর কারণ এই অনুপযুক্ত মানের ইনজেক্‌শন। এতগুলি মর্ম্মান্তিক ঘটনা পর পর ঘটিয়া গেল—সকলেই ভাবিল, এবার একটা কিছু হইবেই। কিন্তু সকলকে বিস্মিত করিয়া সরকার আজও নীরবই রহিয়াছেন।

জাল ঔষধ নির্ম্মাণের কারখানা ভারতবর্ষে ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া উঠিয়াছে। আরও দুর্ভাগ্য, মেধাবী বিজ্ঞানকর্ম্মীরাও পেটের দায়ে এই জাল ব্যবসায়ে সাহায্য করিতেছেন। ইহাও আর একটি সামাজিক সমস্যা।

এই জাল ঔষধ উৎপাদন বন্ধ করিবার জন্য যতই তদন্ত কমিশন বসান হউক না কেন, যতদিন না অপরাধী-দের চরমতম শাস্তি দিবার জন্য আইন তৈয়ারি হইতেছে ততদিন ইহার কোন প্রতিকারই হইবে না। ইহাদের মৃত্যুদণ্ড চাই—কারণ, ইহারা সমগ্র জাতিকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি করিয়াছে। যে দেশের আইন খাদ্যে ভেজাল কিংবা ঔষধে ভেজালের পাপ-চক্রান্তকে বন্ধ করিতে পারে না, সে আইন গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে না, বরং দুর্ব্বলই করে। রাষ্ট্রদ্রোহের জন্য মৃত্যুদণ্ড আছে, কিন্তু রাষ্ট্রের নাগরিকের জীবন নাশ করিয়াও তাহারা সুস্থদেহে বিচরণ করিবে—ইহা কোন্ দেশীয় গণতন্ত্র?

অনুরূপ কথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সুশীলা নায়ারও বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভেজাল ঔষধ তৈয়ারী ও বিক্রয় নরহত্যার সমতুল্য। সমতুল্যও যদি, তবে দণ্ডও তদনুরূপ হইতেছে না কেন? প্রতি বৎসরই পার্লামেণ্টে বহু নূতন আইন হইতেছে এবং পুরাতন আইনের প্রয়োজন মত সংশোধন চলিতেছে। কিন্তু ভেজাল, প্রস্তুতকারীদের বিরুদ্ধে আইনের কঠোরতম শাস্তির বিধান হইতেছে না কেন? দেশের আইন নরহত্যার সমতুল্য অপরাধে অপরাধী সমাজদ্রোহীদের সম্পর্কে এত উদাসীন ও নিষ্ক্রিয় কেন? আইনের কঠোরতা না থাকাই যদি ইহার সর্ব্বপ্রধান কারণ হয় তাহা হইলে সে আইন স্বাধীনতা লাভের পরে পনের বৎসরেও প্রণীত হইল না কেন? সমাজদ্রোহীদের ক্ষমা নাই, থাকাও উচিত নয়। কারণ, তাহারা তাহাদের কার্য্যদ্বারা সমগ্র সমাজকে বিপন্ন ও নষ্ট করিতেছে। অতএব সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধনে বিলম্বও গুরুতর অপরাধেরই সমতুল্য।

লালদীঘির উপর তৃতীয় আঘাত

ইংরাজ করিয়া গিয়াছে, আমরা রাখিতে পারি নাই। তৈরী জিনিস ভাঙ্গিবার দৃষ্টান্ত আমরা নিত্যই দেখিতেছি—ইতিপূর্ব্বে ইডেন উদ্যানকে ভাঙ্গিয়া তছনছ করা হইয়াছে, কার্জ্জন পার্ক নামে আছে, এখন লালদীঘিও বুঝি যায় যায়। যদিও লালদীঘির পূর্ব্ব শোভা আর নাই—দীঘির ধারে ট্রামের লাইন পাতা হইয়াছে, এক অঙ্গে টেলিফোনের সুরম্য অট্টালিকা উঠিয়াছে। বাকী আছে পুকুরটুকু—তাও বুঝি আর থাকে না। শুনা যাইতেছে, ঐ পুকুর নাকি ভরাট করা হইবে। প্রস্তাব উঠিয়াছে বণিক-সভা হইতে। অবশ্য তাঁহাদের ইহাতে ভালই হইবে—গাড়ী রাখা যাইবে। গাড়ী রাখা বা পার্ক করার ব্যাপারে এ-অঞ্চলে অনেক অসুবিধা আছে সত্য, কিন্তু তার জন্য লালদীঘিকে ভরাট করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। আসল গলদটা এই যে, যান-বাহন চলাচল এবং পার্কিং ব্যবস্থার যাঁহারা উন্নতি ঘটাইতে চান, শহরের ফাঁকা জায়গাগুলিতে হাত না দিয়াও যে তাহা করা যাইতে পারে, এই সহজ কথাটাই তাঁহারা বোঝেন না। এমনিতেই এই শহরে এখন খোলামেলা জায়গা বড় কম—শহরটা ক্রমেই যেন ইট, কাঠ আর কংক্রীটের স্তূপে পরিণত হইতেছে। তাহার উপর মুষ্টিমেয় যে-কয়টি খোলা জায়গা এখনও বাকী আছে, তাহাতেও যদি টান পড়ে তবে মস্ত বড় ক্ষোভের কারণ হইবে। তাহা ছাড়া ডালহৌসি অঞ্চল এমনিতেই বড় নীরস—তার মধ্যে ঐ দীঘিটাই যা কিছু সরসতার আভাস দেয়, তাহাও যদি নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হয় তবে অবিচারই করা হইবে।

নূতন সৃষ্টি করিতে যাঁহারা অক্ষম তাঁহাদের এই ভাঙিবার প্রবৃত্তিই বা কেন?

ভাষা লইয়া সরকারের পক্ষপাতিত্ব

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৬৮তম বার্ষিক অনুষ্ঠান

উপলক্ষ্যে পরিষদের সভাপতি ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যে ভাষণ দিয়াছেন, তাহা একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য। হিন্দী ভাষা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ভারত সরকারের কথায় ও কাজে অসামঞ্জস্য, সারা ভারতব্যাপী হিন্দী ভাষার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দী-ভাষীদের অশোভন উদ্যম, 'ইংরেজী হঠাও' আন্দোলনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য ও অভিপ্রায় বিশ্লেষণ করিলেন।

হিন্দী জাতীয় ভাষা বলিয়া স্বীকৃত ভাষাগুলির অন্যতম। কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় সব ভাষাকেই সমদৃষ্টিতে দেখেন, তাহাদের সবগুলির সম্যক উন্নতি ও পরিপুষ্টির জন্য সরকার আগ্রহী—একথা নানা প্রসঙ্গেই তাঁহারা ব্যক্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহারা হিন্দী ভাষার প্রচার ও প্রসারের জন্য যাহা করেন, অন্যান্য জাতীয় ভাষাগুলির জন্য যে তাহা করেন না, সেই তথ্য ও তত্ত্বটির প্রতিই ডঃ চট্টোপাধ্যায় দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, হিন্দী ভাষায় সাহিত্য রচনার জন্য বিশেষ পারিতোষিক দেওয়া হইতেছে। হিন্দী প্রচারের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইতেছে। কিন্তু বাংলা, তামিল বা অন্য ভাষাগুলির উন্নতির জন্য সরকার কিছুই করিতেছেন না।

কেন্দ্রীয় সরকারের হিন্দীর প্রতি এই বিশেষ প্রবণতা, বলা চলে পক্ষপাতিত্ব ঘোষিত নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এবং ইহা হিন্দীর প্রতি অহিন্দীভাষীদের প্রীতি উৎপাদনের সহায়কও নহে। অন্যতম জাতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দীর প্রতি অহিন্দীভাষী ভারতীয়দের বিরূপতা থাকিবার কোনই কারণ নাই। যেমন তামিল, মারাঠা, গুজরাটী বা উড়িয়া ইত্যাদি ভাষার উপর কোনও বিরূপতা তাহারা পোষণ করে না। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের হিন্দীর প্রতি এই মাত্রাধিক প্রবণতাই তাহাদের মনকে বিষাইয়া তুলিয়াছে। শুধু কেন্দ্রীয় সরকার নহেন, হিন্দীর প্রতি অহিন্দীভাষী দেশবাসীর মনকে বিশেষভাবে বিরূপ করিয়া তুলিতেছে, দেশে হিন্দীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য উগ্র হিন্দীপন্থীদের মাত্রাতিরিক্ত দাপাদাপি ও প্রস্তুতি। হিন্দীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহারা এক কৌশলময় প্রচার পদ্ধতিও অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা 'ইংরেজী হঠাও' আন্দোলন করিয়া ইংরেজীকে বর্ত্তমান স্থান হইতে বিচ্যুত করিবার যে উগ্র প্রচারণা চালাইতেছেন, আপাতদৃষ্টিতে তাহা একটি বিদেশী ভাষাকে দেশ হইতে বিদায় করিয়া দিবার সাধু সংকল্প মনে হইলেও, উহার আসল উদ্দেশ্য, ইংরেজীর স্থানে হিন্দীর আসন কায়েম করা। ইংরেজী এখন সরকারী কার্য্যে ও জাতীয় জীবনে যে-স্থান অধিকার করিয়া আছে, সে-স্থান হইতে উহাকে বিচ্যুত করিতে পারিলে হিন্দী সহজেই সে-স্থান অধিকার করিতে পারিবে, এই মনোগত ভাব লইয়াই তাহাদের এই নূতন আন্দোলন। ডঃ চট্টোপাধ্যায় আরও বলিয়াছেন, সারা ভারতে হিন্দীর রাজত্ব কায়েম করাই এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য।

হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হউক, কেহই আপত্তি করিতেছে না। কিন্তু আপন আপন মাতৃ-ভাষাকে সমান মর্য্যাদা দেওয়া হইবে, ইহাই সকলে চায়। সত্য বটে, ইহা লইয়া কোনও আন্দোলন বাংলা দেশ হইতে করা হয় নাই। এমন কি, বাংলা দেশের রাজনীতিজ্ঞ মনীষীরাও তেমন কোনও দাবী জোরালো ভাষায় পেশ করেন নাই। সুনীতিবাবু, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ কিংবা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মত নেতৃবৃন্দ কেহই এ বিষয়ে সময় থাকিতে সর্ব্বভারতীয় কর্ত্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নাই, দেশব্যাপী আন্দোলনও হয় নাই। যেমন পূর্ব্ব বাংলায় হইয়াছিল। তাহারা নিজের জীবন দিয়া তাহাদের মাতৃ-ভাষাকে রক্ষা করিয়াছে। আমরা যাহা করিতেছি তাহাতে রাষ্ট্রীয় দরবারে মাতৃ-ভাষার মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইবে না। চাই আন্দোলন—তীব্র আন্দোলন। যে ভুল আমরা করিয়াছি, আর যেন দ্বিতীয়বার সে-ভুল না করি।

আকাশচারী সাইকেল

কথাটা শুনিতে বিস্ময়কর, কিন্তু মানুষ সকল বিস্ময়কে আজ অতিক্রম করিতে চলিয়াছে। আমরা বিমানে করিয়া আকাশে উঠিতে পারি, কিন্তু মানুষের আবিষ্কার আজ নূতন পথ ধরিয়াছে—সে সাইকেলে করিয়া আকাশে উঠিবে। ১০ই আগষ্টের 'যুগান্তর' নিম্নের এই সংবাদটি পরিবেশন করিয়াছেন :

"ইংলণ্ডে এবং আমাদের দেশেও 'আকাশচারী সাইকেল' কিংবা 'হাওয়াই সাইকেল' আবিষ্কারের চেষ্টা চলিতেছে। জনসাধারণ জানিয়া আনন্দিত হইবেন যে, একজন বাঙালী এই চেষ্টা করিতেছেন, তাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ২৪ পরগণা জেলার নবজীবন সমবায় কলোনীর বাসিন্দা। যে যন্ত্রযোগে এই 'হাওয়াই সাইকেল' আকাশে উড়িতে পারিবে, তার নাম 'অরনিথপটর'। এই যন্ত্রটি সাফল্যের সঙ্গে প্রস্তুত করিবার জন্য শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় চেষ্টা করিতেছেন। যে-ভাবে প্যাড্‌ল করিয়া সাইকেল চালানো হয়, 'অরনিথপটর' যন্ত্রটিও সেভাবে চালানো যাইবে। যন্ত্রটির

দুই পাশে বিশেষ ধরণের কাপড়ে নির্ম্মিত পাখীর ডানার মত দুটি পাখা এবং পিছনের দিকে পুচ্ছ থাকিবে। কয়েকবার পাখা ঝাপ্‌টে উপরে উঠিবার পর যন্ত্রটি চিলের মত আকাশের বুকে ভাসিতে পারিবে এবং তার পর ঘণ্টায় ৩০।৪০ মাইল চলিতে পারিবে। এই যন্ত্রের ওজন ৩০ পাউণ্ডের বেশী হইবে না। ডানা সমেত উহা প্রস্থে ২০ ফুট এবং দৈর্ঘ্যে ১৬ ফুট হইবে। চালনার জন্য গ্যাস বা বিদ্যুৎশক্তি কিছু লাগিবে না। উঠিবার বা নামিবার জন্য কোন রানওয়েরও দরকার হইবে না।

অবশ্য উপরের এই সমস্ত বর্ণনাই শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত। তিনি খুব আশাবাদী এবং ইংলণ্ড, রাশিয়া ও অন্যান্য স্থান হইতে কিছু কাগজপত্রও সংগ্রহ করিয়াছেন।"

কিন্তু 'যুগান্তর' আরও একটি সংবাদ দিয়াছেন - তাঁহার অর্থ নাই। ইহাকে চালু করিতে হইলে যে অর্থের প্রয়োজন সে অর্থ কে দিবে? কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য এই গবেষণার জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিয়াছেন। সরকার এ বিষয়ে কৃপণতা কেন করিতেছেন বুঝা যায় না। বাঙালী বলিয়া কি? দেশে ধনীর অভাব নাই। তাঁহাদেরও এ বিষয়ে তাঁহাকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। হয়ত অর্থাভাবেই তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে। এ বিষয়ে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারে ও কি কোন কর্ত্তব্য নাই?

তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রের দশা

মাধ্যমিক শিক্ষাসম্পর্কীয় ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিতে মাধ্যমিক পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের সমস্যা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ শ্রীমালী যা বলিয়াছেন তা বাস্তবিকই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রেরা কলেজেও বৃত্তিমূলক উচ্চতর বৃত্তিশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিতে পারে। তৃতীয় বিভাগের ছাত্রেরা কোথাও ভর্ত্তির সুযোগ পায় না; চাকুরিতেও কেহ তাহাদের গ্রহণ করিতে চান না। ইহাদের সমস্যা কি ভাবে সমাধান করা যাইতে পারে তাহা ভাবিতে হইবে। ডাঃ শ্রীমালী নিশ্চয় জানেন, যত পরীক্ষার্থী প্রতি বৎসর মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহার বারো আনাই থাকে তৃতীয় বিভাগে। সুতরাং বৃহত্তম অংশই পাস করিয়া ফেলের সমতুল্যরূপে পরিগণিত হয়। সমগ্র জাতির দিক দিয়া ইহা একটি নিদারুণ অপচয় ছাড়া কিছু নয়। এই অপচয় নিবারণের জন্য কমিটি কি সুপারিশ করিবেন জানি না, তবে মনে হয়, তৃতীয় বিভাগ বাতিল করা এবং দ্বিতীয় বিভাগের গণ্ডি প্রসারিত করাই সমাধানের একমাত্র উপায়। তৃতীয় বিভাগ কথাটার সঙ্গে কোথায় যেন অলক্ষ্যে একটা নাক-সিঁট্‌কানর সম্পর্ক আছে—যা এই বিভাগটি বজায় থাকিতে কোন দিনই যাইবে না। আর একথাও নিশ্চয় বলিয়া দিতে হইবে না যে, পাঁচ নম্বরের জন্য যে তৃতীয় বিভাগে পড়ে, পাঁচ নম্বর বেশীর জন্য দ্বিতীয় বিভাগে গৃহীত ছাত্রের তুলনায় সে একেবারেই অজ্ঞ বা গণ্ডমূর্খ নয়। এই কথাটা একটু চিন্তা করিলেই তাঁহারাও পথ খুঁজিয়া পাইবেন।

কালীপদ মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কালীপদ মুখোপাধ্যায় গত ২৩শে জুলাই হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬২ বৎসর হইয়াছিল। ১৯০০ সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ক্ষেত্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁহার পিতামহ ছিলেন চন্দননগরের রায়বাহাদুর গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কালীপদবাবু সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং সেখানে বি. এ. পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া ১৯২০ সনে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সহিত যুক্ত হন। তিনি অল্প বয়সেই স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন ও রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের জন্য কয়েকবার কারাবরণ করেন। তিনি বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গেও একসময় নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একজন সক্রিয় সদস্য এবং কয়েক বৎসর পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। স্বাধীনতার পরে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের যে প্রথম মন্ত্রিসভা গঠিত হয় কালীপদ মুখোপাধ্যায় তাহাতে রাজস্বমন্ত্রী হিসাবে যোগ দেন। ইহার পরে তিনি কারাদপ্তরেরও ভার পাইয়াছিলেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা পুনর্গঠিত হইলে উহাতে তাঁহাকে শ্রমমন্ত্রীরূপে গ্রহণ করা হয়। ১৯৫৭ সন হইতে তিনি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রমমন্ত্রীরূপে তিনি ১৯৪৮ সনে একবার এবং ১৯৫৩ সনে আর একবার ইউরোপ ভ্রমণ করেন। প্রথমবার যান জেনেভায় কার্পাস-বস্ত্র সংক্রান্ত শিল্প-কমিটির দ্বিতীয় অধিবেশন উপলক্ষ্যে ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেতারূপে এবং দ্বিতীয়বার যান জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক শ্রমসম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতারূপে।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর মাত্র তিন সপ্তাহ পরেই পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার আর একজন সদস্যের লোকান্তর সত্যই বেদনাদায়ক।

১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ

ডক্টর শ্রীদুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কয়েকটি সাল বিশেষ স্মরণীয়; তার মধ্যে ১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ অন্যতম। মহাপুরুষের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয় আমাদের এই ভারতবর্ষে; অন্যত্র এ-শ্রদ্ধার নিদর্শন তেমন আছে কিনা জানি না। পরলোকগতদের জন্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ভারতের সংস্কৃতির পরিপোষক। বিশ্ব-ভারতীর তিনদিনব্যাপী সমাবর্তন উৎসবের তৃতীয় দিন নির্ধারিত আছে পরলোকগত আশ্রমবাসীদের স্মরণের জন্য। সেদিন আশ্রমের একটি বিশিষ্ট দিন; নানা ভাবে আশ্রমবাসী বিশেষ সংযমের সঙ্গে পরলোকগতদের স্মরণে সারাদিনটি অতিবাহিত করেন; ঐ দিন সকলের আহার হচ্ছে নিরামিষ। রবীন্দ্রনাথ এই নিয়ম প্রবর্তন ক'রে গিয়েছেন এবং আজও তা শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে। পূর্বগামীদের সঙ্গে যে আমরা এক অবিচ্ছিন্ন সূত্রে গ্রথিত তা ভারতবাসী কোনদিন ভুল করে নি। এই সহজধর্মের বলেই প্রতিবৎসর ২২শে শ্রাবণ উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে রবীন্দ্রনাথের পবিত্র মহাপ্রয়াণকে স্মরণ ক'রে।

২২শে শ্রাবণের মহিমা স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ। এই দিনটি নানা স্থানে নানাভাবে প্রতিপালিত হয়ে আসছে; কিন্তু অনেকেই হয়ত জানেন না যে কি ভাবে ধীরে ধীরে রবীন্দ্র-জীবনপ্রদীপ এই দিনে নির্বাণলাভ করে। এই প্রবন্ধে তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার প্রয়াস করা হয়েছে।

মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ কালিম্পঙে যান অসুস্থ শরীর নিয়ে পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর কাছে। সেখানে প্রতিমা দেবী পূর্বেই এসেছিলেন স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য। ডাক্তার বিধান রায় প্রমুখ চিকিৎসকবর্গ রবীন্দ্র-নাথকে অসুস্থ শরীর নিয়ে কলকাতা ছেড়ে অন্যত্র যেতে নিষেধ করেছিলেন; কিন্তু তিনি একটিবারের জন্য কালিম্পঙে আসবার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় সুধাকান্ত রায়চৌধুরী মশায় কবিগুরুকে প্রতিমা দেবীর কাছে নিয়ে আসেন। এখানে আসার পর কবিগুরু একটু সুস্থ বোধ করতে লাগলেন। প্রতিমা দেবীর হাত ধ'রে তিনি লম্বা বারান্দায় পায়চারি করতেন। তখনও কবিতা লেখা চলছিল; প্রায় সমস্ত দিন তিনি লেখায় ব্যস্ত থাকতেন। 'জন্মদিনে'র ১৪ ও ২০ সংখ্যক কবিতা এই সময়ের লেখা। কালিম্পংকে উদ্দেশ ক'রে কবি লিখলেন:

> পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে
> শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে ছন্দে আর মিলে।
> বনেরে করায় স্নান শরতের রৌদ্রের সোনালি।
> হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে বেগুনি মৌমাছি।
> মাঝখানে আমি আছি,
> চৌদিকে আকাশ তাই দিতেছে নিঃশব্দ করতালি।
> আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রং,
> জানে তা কি এ কালিম্পং।......

—জন্মদিনে ১৪

বিকেল হ'লে চা পানের পর তিনি সকলের সঙ্গে ব'সে গল্প করতেন। কয়েকটা দিন মাত্র তিনি সুস্থ ও প্রফুল্ল ছিলেন; কিন্তু তার পরেই এই প্রফুল্লতার আস্বাদন আর পান নি।

১৯৪০ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর; কবিগুরু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। প্রতিমা দেবী খুব শঙ্কিত। কবিতা লেখায় তবুও কবির বিরতি নেই; বেলা সাতটার দিকে তিনি কবিতার খাতা নিয়ে বসলেন। ডাক্তার এলেন তাঁকে দেখতে ন'টার সময়। হজমের গোলমালে শরীর অসুস্থ হয়েছে, বললেন ডাক্তার। এই সময় মৈত্রেয়ী দেবী কবির কাছে আসায় তাঁর মুখ আবার প্রফুল্ল হয়ে উঠল; কিন্তু দুপুরের দিকে তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন; মুখ লালবর্ণ, সংজ্ঞাও অস্পষ্ট। এই সময় প্রতিমা দেবী বা মৈত্রেয়ী দেবী কাউকে তিনি চিনতে পারছিলেন না। আবার ডাক্তার ডাকানো হ'ল; ডাক্তার এসে বিশেষ কিছু বুঝতে পারলেন না। সন্ধ্যার পর কবিগুরু একটু সুস্থ বোধ করলেন; তখন লোকজন চিনতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল না। এই সময় দু'জন ডাক্তার এলেন; এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন হাসপাতালের চিকিৎসক। তাঁরা রুগীকে পরীক্ষা করে বললেন যে, কিডনীর অসুখ চলছে। চিকিৎসার ব্যবস্থা হ'ল গ্লুকোজ ও ডাবের জল। সে রাত্রি বড় কষ্টে গেল, শুয়ে-ব'সে তাঁর রাত্রি কাটল, ঘুম

ভাল হ'ল না। সকাল হ'লে অনিল চন্দ মশায়কে কলকাতায় টেলিফোন ক'রে জানান হ'ল যে, কবিগুরুর অবস্থা ভাল নয়। এই সময় রথীন্দ্রনাথ ছিলেন পতিসরে; তাঁকেও খবর দেওয়া হ'ল। দুপুর থেকে জ্বর বাড়তে লাগল, সন্ধ্যার দিকে রুগী এলিয়ে পড়লেন—কোন জ্ঞান আছে কি না জানা যাচ্ছিল না। রাত্রি আটটার দিকে দার্জিলিং থেকে ডাক্তার এসে পরীক্ষা ক'রে বললেন যে, রোগ হচ্ছে য়ুরিমিয়া এবং তারই বিষক্রিয়ার ফলে রুগী অচেতন হয়ে আছেন। ডাক্তার অপারেশন করতে চাইলেন; কিন্তু প্রতিমা দেবী সাহস না পেয়ে তাঁকে অপেক্ষা করতে বললেন, যে পর্যন্ত কলকাতা থেকে সকলে না আসছেন। এদিকে ওষুধের ব্যবস্থা হোমিওপ্যাথিক ছাড়া উপায় নেই। ডাক্তারের পরামর্শে ক্যানথারিস ৩০ শক্তি দু'ঘণ্টা অন্তর অন্তর খাওয়ান চলল। সে রাত্রি বড় দুর্যোগপূর্ণ। নানা আশঙ্কায় সকলের মন আচ্ছন্ন। ভোরের দিকে রুগীর অবস্থা ভাল দেখা গেল: তিনি লোকজন চিনতে পারলেন। সকলের মনে কিছু আশার সঞ্চার হ'ল। সকাল হ'ল, কলকাতা থেকে ডাক্তার নিয়ে সবাই আসবেন, এই ভরসায় প্রতিমা দেবী ও মৈত্রেয়ী দেবী অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন: এমন সময় তিনজন ডাক্তার নিয়ে অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশ উপস্থিত। এর পর এলেন মীরা দেবী, অনিল চন্দ, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী প্রভৃতি অনেকে। ডাক্তাররা পরীক্ষা ক'রে বললেন যে, একটু সুস্থ হলেই কবিকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হবে। সেদিন ছিল ২৮শে সেপ্টেম্বর। কালিম্পং থেকে রওনা হয়ে সকলে কবিগুরুকে নিয়ে জোড়াসাঁকোর বাসায় পৌঁছলেন পরের দিন।

কবিগুরুর অসুস্থতার খবর জেনে মহাত্মাজী মহাদেব দেশাইকে ওয়ার্ধা থেকে পাঠিয়ে দেন মহাত্মাজীর প্রেম, প্রীতি ও সহানুভূতি জানাবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ কানে ভাল শুনতে পেতেন না। মহাত্মাজীর বার্তা জোরে জোরে তাঁকে শোনান হলে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। অতি শোকেও তাঁর চোখে জল বিশেষ দেখা যেত না; কিন্তু এবার মনে হ'ল কবিগুরু খুবই ভেঙ্গে পড়েছেন। অক্টোবর-নবেম্বর কলকাতায় কেটে গেল। এই দুই মাস রোগের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করতে হয়েছে তাঁকে। এই সময় অপারেশনের কথা উঠেছিল; কিন্তু স্যার নীলরতন সরকার মহাশয়ের নির্দেশে অপারেশন বন্ধ থাকে। নবেম্বর মাসের শেষের দিকে কবিকে শান্তিনিকেতনে আনার অনুমতি পাওয়া গেল ডাক্তারদের কাছ থেকে; কারণ আশ্রমের খোলা বাতাস ও শীতের তাজা ভাব কবির দেহমনকে সজাগ ক'রে তুলবে, এই ছিল সকলের ধারণা।

কলকাতায় অবস্থান কালে 'রোগশয্যায়'-এর দশটি কবিতার সৃষ্টির পর 'আরোগ্য'র কবিতাবলী, 'গল্পসল্প' ও 'জন্মদিন' এর কবিতা রচনা সুরু হয়। জোড়াসাঁকো থেকে শান্তিনিকেতনে আসার পরও 'রোগশয্যায়'-এর কবিতা লেখা চলছিল।

কবিগুরুর শান্তিনিকেতনে আসার পর আশ্রমের কর্মীরা তাঁর সেবার ভার নিলেন। দেখতে দেখতে ডিসেম্বরের দিন এগুতে লাগল। ১০ই ডিসেম্বর চীন থেকে রাষ্ট্রমন্ত্রী এলেন কবিগুরুর সঙ্গে রাষ্ট্রসংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা করতে। কবি অসুস্থতা নিয়েও নিজে অতিথির অভিনন্দনপত্র লিখে দিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে এল ৭ই পৌষ; কবিগুরু এবার অসুস্থ। উৎসবে যোগ দিতে না পেরে তিনি মনে বড়ই ব্যথা পেলেন। আশ্রমে উপস্থিত থেকেও যে তিনি মন্দিরে যোগদান করতে পারলেন না, এ কষ্টের আর শেষ ছিল না। 'আরোগ্য' নামে গদ্যভাষণ পঠিত হয় এই উৎসবে। এই ভাষণটি লিখে নেন অমিয় চক্রবর্তী মশায় এবং পড়েন ক্ষিতিবাবু। এই সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছিল। কবিগুরু প্রত্যহ যুদ্ধের খবর পাবার জন্য ব্যস্ত হতেন। এত রোগ-যন্ত্রণাতেও তাঁর মনের সজীব ভাব যে অক্ষুণ্ণ ছিল, তা ভাবলেও বিস্ময় বোধ হয়। বাংলা দেশে তখন মুসলীম লীগের শাসন। দৈনন্দিন খবরের মধ্যে নারীহরণ বা নারীনির্যাতন ছিল অন্যতম মুখ্য ঘটনা। এই আঘাত সইতে না পেরে 'অবিচার' নামে এক কবিতা লিখে কবিগুরু দেশবাসীকে তাঁর মনোবেদনা জানান। এই সব লেখার ব্যাপারে রাণী চন্দ অগ্রণী ছিলেন। কবি যেতেন ব'লে, আর লিখে নিতেন রাণী চন্দ; 'গল্পসল্প'ও লেখা হতে থাকে এই সময়ে; কিন্তু পড়লে মনে হয় না যে রচয়িতা তখন অসুস্থ ছিলেন।

শান্তিনিকেতনে আসার পর ভাল-মন্দয় তাঁর দিন কাটছিল। কখনও রোগ একটু বৃদ্ধি পেত আবার কখনও কমত। এই ভাবে শীতকাল চ'লে গেল, কিন্তু তাঁর জ্বর প্রায় প্রত্যেক দিনই আসত। ৯৯ ডিগ্রি জ্বর উঠলে বলা হত ৯৮ ডিগ্রি। একটু কমিয়ে না বললে পাছে তিনি দ'মে যান, এই কারণে এই রকম বলা হ'ত। কেউ এলে তাঁর সঙ্গে সহাস্যে কথাবার্তা বলতেন, অনুচরদের সঙ্গে হাস্য-কৌতুক করতেন, তাতে তাঁর ঘরটি

রুগীর ঘর ব'লে ভাবতে দ্বিধা হ'ত। এইরূপ প্রাণ খুলে হাসি তাঁর শেষের দিকেও অম্লান ছিল। সেবাশুশ্রূষাকারীদের মনে প্রফুল্লতা আনার জন্য কবিগুরু মুখে মুখে নানা কবিতা বলে যেতেন। তিনি 'আরোগ্য' কাব্যখানি তাঁদের নামেই উৎসর্গ ক'রে গেছেন। এতে একটি কবিতা আছে বিশ্বরূপ বসুর নামে। একটু পরিচয় দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না—

বিশুদাদা
দীর্ঘ বপু, দৃঢ় বাহু, দুঃসহ কর্তব্যে নাহি বাধা,...
অমোঘ আশ্বাসে
সুপ্ত রাত্রে বিশেষ আকাশে।
যখন শুধায় মোরে, দুঃখ কি রয়েছে কোনোখানে,
মনে হয়, নাই তার মানে—
দুঃখ মিছে ভ্রম,
আপন পৌরুষে তারে আপনি করিব অতিক্রম।
সেবার ভিতরে শক্তি দুর্বলের দেহে করে দান
বলের সম্মান।

—আরোগ্য ২০

রোগে ভুগে শীর্ণ হয়ে গেলেও তাঁর চোখের উজ্জ্বলতা অটুট ছিল। তাঁকে তপঃক্লিষ্ট ঋষি ব'লে ভ্রম হ'ত। চুল ছেঁটে ফেলা হয়েছিল এই সময়, তাতে তাঁর প্রশস্ত ললাট সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন কানে তিনি ভাল শুনতে পেতেন না, তেমনি দৃষ্টিশক্তিও ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসে। তাঁকে আনন্দ দেবার জন্য শান্তিদেব ঘোষ প্রমুখ সঙ্গীতবিদ্ প্রায়ই তাঁর কাছে গান করতেন, কিন্তু তিনি তা ভাল শুনতে পেতেন না ব'লে কষ্ট বোধ করতেন।

শেষ মাঘোৎসবে কবি দুইটি কবিতা উপহার দিলেন। এর পর এল বসন্তোৎসব। কবির নির্দেশে নটীর পূজার রিহার্সাল চলল, গানও তিনি বেছে দিলেন। উৎসবে নাটকটি মঞ্চস্থ হবার পূর্বে একদিন তাঁর সামনে অভিনীত হলে তিনি বেশ খুশী হয়েছিলেন। উৎসবের দিন সার্থকভাবে নাটকটি অভিনীত হলেও যেন কোথায় তার এক করুণ সুর বেজে উঠেছিল। এই ভাবে ১৩৪৭ সাল চ'লে গেল; এল ইতিহাসবিশ্রুত সেই ১৩৪৮ সাল। ১লা বৈশাখে নববর্ষ ও কবির জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হ'ল। শেষ জন্মদিনের জন্য তিনি লিখলেন—

হে নূতন,
দেখা দিক আর-বার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ॥
তোমার প্রকাশ হোক কুহেলিকা করি উদ্ঘাটন
সূর্যের মতন।
রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে করো উন্মোচন।
ব্যক্ত হোক জীবনের জয়,
ব্যক্ত হোক তোমামাঝে অসীমের চিরবিস্ময়।
উদয়দিগন্তে শঙ্খ বাজে, মোর চিত্ত মাঝে
চিরনূতনের দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ॥

এই দিনে বেরোল তাঁর 'সভ্যতার সঙ্কট' অভিভাষণটি ও 'জন্মদিনে' বইখানি। এবারকার উৎসবটি যেন বড় সুন্দর হয়েছিল, বোধ হয় তাঁকে সামনে বসিয়ে এ উৎসব আর হবে না এমন কিছু একটা কোথাও প্রচ্ছন্ন ছিল। উপহারে তাঁর ঘর গেল ভ'রে। তাঁকে সাজিয়ে সন্ধ্যাবেলায় উত্তরায়ণের বারান্দায় আনা হ'ল, তাঁকে দেখে সকলে হ'ল পরিতৃপ্ত। আশ্রমবাসীদের তিনি সেদিন যা বলেছিলেন, তাই তাঁর শেষ আশীর্বচন। নববর্ষে তাঁর জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হলেও ২৫শে বৈশাখে ছাত্রছাত্রীরা 'বশীকরণ' অভিনয় ক'রে কবিকে আনন্দ দান করেন। এই সময় তিনি 'ভারতভাস্কর' উপাধি পান ত্রিপুরার রাজদরবার থেকে।

সন্ধ্যায় দিনের তাপ কিছু কমলে তাঁকে বারান্দায় আনা হ'ত। তখন তাঁর মাথায় ঘুরত গল্পের প্লট, আর তা লিখে নিতে বলতেন প্রতিমা দেবীকে। এই ভাবে একদিন দুপুরে কবি এক গল্প ব'লে গেলেন, আর প্রতিমা দেবী তা লিখে নিলেন, তাতে 'বদনাম' গল্পের হ'ল উৎপত্তি। এই ভাবেই তৈরি হ'ল 'প্রগতি-সংহার'। এ ছাড়া টুকরো টুকরো রচনাও কিছু সৃষ্ট হয়েছিল।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, জীবনের শেষ মুহূর্তেও রবীন্দ্রনাথ ভারতের অপমানকে সহ্য করেন নি। এর নিদর্শন মেলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য মিস রাথবোন-এর খোলা চিঠির জবাবে।

আষাঢ় মাস এল; এ সময় দেখা গেল তাঁর আঙুলের অসাড়তা, তিনি কলম দিয়ে আর লিখতে পারতেন না, নাম সই করতেন বহু কষ্টে। বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রোগও বেড়ে চলল, বোঝা গেল যে আর তাঁকে টিকিয়ে রাখা যাবে না। এই সময় তিনি একদিন প্রতিমা দেবীকে ডেকে বললেন যে তাঁর যাবার সময় হয়েছে। শান্তিনিকেতনের ভার নেবার কথাও জানালেন তিনি।

মুক্ত আকাশে বর্ষার রূপ দেখবার জন্য কবির মন উতলা হয়ে উঠত, উত্তরায়ণের দোতলায় তাঁকে এজন্য আনা হ'ত। এ সময় তাঁর চিকিৎসা চলছিল কবিরাজী মতে। সুপ্রসিদ্ধ শ্যামাদাস বাচস্পতির পুত্র কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ মশায় চিকিৎসা করছিলেন। ইতিমধ্যে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ কয়েকজন চিকিৎসক

শান্তিনিকেতনে এসে কবিকে পরীক্ষা ক'রে স্থির করলেন যে, অপারেশন করতে হবে শ্রাবণ মাসে। সুতরাং শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় তাঁকে নেবার আয়োজন শুরু হ'ল। এই সাধনার স্থানটি ছেড়ে যেতে তাঁর মন বেদনায় ভ'রে উঠল। যাত্রার দিন সব প্রস্তুত। বোলপুর ষ্টেশন থেকে তাঁকে নেবার জন্য রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ একখানি সেলুন গাড়ীর ব্যবস্থা করেছিলেন। আশ্রমবাসীরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে নীরব উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কবিগুরুকে বিদায় দিলেন, তিনিও আশ্রমদেবতার উদ্দেশে যেন শেষ প্রণাম জানালেন। ৩০শে জুলাই অপারেশন হয়ে গেল। অস্ত্রোপচার করেছিলেন ডাক্তার ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। অপারেশনের কিছু পূর্বে জীবনদেবতার উদ্দেশে কবিগুরু শেষ অর্ঘ্য নিবেদন করেন—

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে,
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত ;
তার তরে রাখ নি গোপন রাত্রি।
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে-পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চির স্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চির সমুজ্জ্বল।
বাহিরে কুটিল হোক, অন্তরে সে ঋজু,
এই নিয়ে তাহার গৌরব।
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

অপারেশনের পর দেখা গেল, রুগী ভালর দিকে—ক্ষীয়মান প্রদীপের যেন প্রোজ্জ্বল দীপশিখা। তা হলেও সকলের মন আনন্দে ভ'রে উঠল এই ভেবে, বোধ হয় কবিগুরু সেরে উঠলেন, কিন্তু ৩রা আগষ্ট কবির অবস্থা খারাপের দিকে চলল, চেতনা আচ্ছন্ন। এই ভাবে গেল তিন দিন। ৬ই আগষ্ট বিকেল থেকে বড়ই বাড়াবাড়ি। এল রাত্রি, সেদিন রাখী-পূর্ণিমা, এক আসন্ন আশঙ্কায় যেন সেই পূর্ণিমার রাত্রি নিজেকে ঢেকে রাখল মেঘের মধ্যে। সারারাত্রি চলল যমদেবতার সঙ্গে লড়াই। ৬ই আগষ্ট হ'ল ভোর। এল সেই ৭ই আগষ্ট, ২২শে শ্রাবণ। রুগীর নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল ; রামানন্দবাবু কবিগুরুর পাশে ব'সে উপাসনা করলেন, মাঝে মাঝে বাড়ীর মেয়েরা ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতে লাগলেন। বেলা ১২টা ১০ মিনিটে কবিগুরুর পবিত্র আত্মা চিরশান্তিধামে প্রস্থান করল। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার।

কাল মেয়ে

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

লণ্ঠন হাতে লোকটা ঘোষালপাড়ার দিক্ থেকেই আসছিল। খুঁড়িয়ে চলার ভঙ্গি থেকেই বুঝলাম মানিক ভট্চাজ। জোরে পা চালিয়ে হাঁটছে। দীঘির দক্ষিণ প্রান্তে আমার ডিসপেন্সারী। এদিকে আসছে মানেই বাড়াবাড়ি একটা কিছু হয়েছে।

রাত হয়ে গিয়েছে, ডাক পড়লেই চমৎকার। ঘোষালপাড়া কি এ মুল্লুকে? রায়গড়ের জলা পার হ'লে, রাজা বাবুদের বাড়ী,তার পর মোড়লদের গোলা, মানিক থাকে ঐখানে। সঙ্গে যাবার জন্যে অনুরোধ করলে 'না' বলতে পারব না। যা খুশি তাই শুনিয়ে দেবে। ওর কাছে টাকা ধারি, সুদে আসলে বেশ জ'মে গিয়েছে, ইচ্ছে করলেও এক কথায় সব চুকিয়ে দেবার ক্ষমতা নেই। সুদের পাওনা শুনে আসলের কিছুটা দিতে গেলে বলে, থাক্, থাক্, অত ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন, তোমার কাছে থাকাও যা ব্যাঙ্কে রাখাও তাই।

এ অঞ্চলে বেশীর ভাগ বাসিন্দারই আর্থিক অবস্থা প্রায় আমারই মত, সুতরাং মানিককে খুশী রাখা আমাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। সুদের পাওনা মানিক সুবিধানুসারে আদায় করে। সুবিধার হিসাবে কাল ও পাত্রের সামঞ্জস্য থাকে যথেষ্ট। যথাসময় দেনাদার প্রতিশ্রুতি অনুসারে সুদ না দিতে পারলে পাওনার অনুপাতে তরিতরকারি থেকে আরম্ভ ক'রে তেল, ঘি, চাল, ডাল, যেটা পারে আদায় ক'রে ছাড়ে। দেনাদার ভট্চাজের প্রত্যাশাকে সামলাতে না পারলে, শ্রমদানের প্রস্তাব ক'রে বসে। উপযুক্ততা অনুসারে ক্ষেত-জমিতে লাঙল চালানো থেকে হাটের জিনিস কেনা, ঢেঁকি দিয়ে ধান ভানানো, কোনটাই বাদ যায় না। নিখরচায় খাটিয়ে নেবার নিয়ম আমার বেলাতেও বাদ পড়ে না। ডাক পড়লেই ব্যাগার খেটে আসি। দক্ষিণা চাইলে বলে, বেশ আছ ডাক্তার, এই বার নিয়ে ত মাত্র আড়াই কেস হ'ল, ওদিকে যে চার মাস কিছু দাও নি, হিসেবটা ভুলে গেলে? দু'টাকা ফি হ'লে, কত বাকি থাকে, তুমি নিজেই হিসাব ক'রে বল না,তোমার ধর্মের উপরই ছেড়ে দিচ্ছি। শিক্ষানবিসীর কালে অঙ্কেই আমার নাম ছিল। ভুল বলার সাহস না থাকায় কোন প্রতিবাদ করি না, রোগীর সেবায় পুণ্য সঞ্চয় হ'ল ভেবে শুধু হাতেই বাড়ী ফিরি।

হন্তদন্ত হয়ে ভট্চাজ যখন ডিসপেন্সারীতে পৌঁছাল তখন সে হাঁপাচ্ছে। বহুকষ্টে দম যোগাড় ক'রে বললে, "ডাক্তার, এখুনি যেতে হবে। মেয়েটার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। কাটা পাঁঠার মত ছটফট করছে।" এতটা ব'লে ফতুয়ার পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার ক'রে আমার হাতে গুঁজে দিল, তার পর বলতে লাগল, "দেরি ক'রো না ডাক্তার। কখন কি হয়ে যায় তার ঠিক নেই।"

ভট্চাজের এইরূপ আচরণ কখনও দেখি নি, ডাকের পিছনে কৃপাপ্রার্থনা ছিল। খটকা লেগে গেল। সঙ্গে যেতে হ'লে যথাসম্ভব রোগের উপযুক্ত ওষুধও কাছে রাখতে হয়। সুতরাং রোগের লক্ষণগুলি ভালভাবে জেনে নেওয়া দরকার।

জিজ্ঞাসা করলাম, ঐ রকম ব্যথা আগেও হ'ত নাকি? আরও অনেক খবর জানতে হ'ল যার বিশদ বিবরণ দেবার প্রয়োজন বোধ করি না। ভট্চাজ জেরার মুখে পড়ায় ঘাবড়ে গিয়েছিল, শেষ পর্য্যন্ত বললে, "ওসব খবর জানি না। প্রথমে পেট ফাঁপার মত হয়, তার পর এখন—" কথাটা শেষ না ক'রেই ভট্চাজ থেমে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে আর একটি নোট হাতে দিয়ে বললে, "বাড়ীতে চল ডাক্তার ওখানে সব শুনতে পাবে। মেয়েটাকে বাঁচাও, তোমার সব ধার শোধ ব'লে লিখে দেব।"

ব্যাপার কিছুই নয়, কিন্তু অকারণেই পরের দিন কেলেঙ্কারীর ভাণ্ডার ভ'রে উঠল। কেলেঙ্কারী একটি লাভজনক সম্পদ্। যাকে মূলধন ক'রে সুদে খাটানো চলে। যারা লাভবান্ হ'তে চায় তারা ব্যবসাকে ফাঁপিয়ে তোলার ব্যবস্থাও করে আটঘাট বেঁধে। সংক্রামক ছোঁয়াচে রোগের আবির্ভাবে স্বাস্থ্যরক্ষা সমিতি যে ভাবে রোগ আর তার প্রতিকার সম্বন্ধে স্থানীয় মানুষদের সজাগ ক'রে তোলে, ঠিক সেই ভাবে চারিত্রিক আদর্শ রক্ষকরা ভট্চাজ পরিবারের কথা এ-কান থেকে ও-কানে চালু

ক'রে দিতে লাগল। কানে কানে কথার গোড়াতেই বলে, এ সব নোংরা ব্যাপার মুখে আনাও পাপ। পাপ পুষে রাখতে নেই ব'লেই বলছি। দেখ, যা বললাম তা খুবই গোপনীয়, তুমি যেন কাউকে ব'লো না। একজনের পাপ আর একজনের ঘাড়ে চাপালে সেই বা বহন করে কেমন ক'রে। ফলে একান্ত গোপন কথা নিয়ে গ্রামে বেশ একটা সোরগোল প'ড়ে গেল। ক্রমে এমন একটা সময় এল যখন কুৎসিত দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হলেই গোপনীয়কে বেআবরু ক'রে পাপক্ষয় করাটা ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।

ভট্টচাজের মেয়ের নাম শ্যামলা। বয়স ১৯.২০ হবে। গঠনশ্রীর আকর্ষণে যারা ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের চেষ্টা করেছে তাদের প্রত্যেককেই রূপের তাতে ঝলসিয়ে পিছাতে হয়েছে। পোড়ার জ্বালা লুকিয়ে রাখা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। জ্বালা নিবৃত্তির সম্ভাবনা না থাকলে সমবেদনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, দুটো দরদের কথা শুনলে বেদনার কতকটা উপশম হয় বৈকি। মুখপোড়ার দল সমবেদনার সন্ধানে প্রকাশ্যেই নতুন আন্দোলনে যোগ দিয়ে বসে।

"মুখপোড়া" শ্যামলার-দেওয়া খেতাব। চরিত্র-শুদ্ধির প্রচারে মুখপোড়াদের উৎসাহ বেশী থাকায় অল্প সময়ের ভিতর সকলে জেনে গেল মেয়েটার চরিত্তির, একেবারে ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

অমনটি হবে না? বাড়ন্ত মেয়েকে আইবুড়ো অবস্থায় পরিপুষ্ট হতে দিলে, এরকম ত হবেই। মুখপোড়াদেরই বা দোষ দেওয়া যায় কেমন ক'রে। মেয়ের চেহারা অমন হলে একটু কাছে যাবার ইচ্ছা কার না আসে। কালো পাথরের তলায় যে আগুন লুকানো থাকে তা নিরীহ মানুষগুলো জানবে কেমন ক'রে।

শুধু কি মেয়েটাই রূপের তলায় আগুন নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, ওর বাপটাই বা কম যায় কিসে?

মানলাম, মহাজনী কারবারে বেশ কিছু জমিয়ে ফেলেছিস। জলের দরে নিলাম থেকে ক্ষেত-জমি কেনা হয়েছে, অনেক জোড়া হাল চলছে। তোর করকরে নতুন টাকা যতই জমা হোক, তার কি বাবুদের সম্পত্তির সঙ্গে তুলনা হয়? তুই না খেয়ে যা জমিয়েছিস তা বাবুদের খরচের গা ঘেঁসে দাঁড়াতে পারে না। চোদ্দপুরুষ ধরে ওরা খরচ করার হাত পাকিয়েছে,—ঐ রকমটি তুই করতে গেলে তোর কলজে পর্য্যন্ত ফেটে যাবে, এ সব জেনেও ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়ার প্রবৃত্তি কেন? আমরা গ্রামের পাঁচজন প্রাচীন মাতব্বর মানুষ রয়েছি, সদাই লোকের উপকার করার জন্যে প্রস্তুত, আর আমাদের না জানিয়েই বড় ঘরের সঙ্গে কুটুম্বিতার চেষ্টা! না-হয় আমাদের বাদ দিয়েই স্বার্থসিদ্ধির দিক্‌টা গোপনে সারলি? এসব বিষয় ভদ্রলোকে সোজাসুজি কাজ করে। মেয়েকে লেলিয়ে দিয়ে জামাই পাকড়ানোর কথা কখনো শুনি নি। ছোটবাবু এলেই হয়, দেখবে, মেয়েটা সব সময় বাবুদের বাড়ীতে প'ড়ে আছে। এমন ক'রে লেগে থাকলে একটা কিছু ঘটবে না? এখন ধিঙ্গী মেয়েটাকে নিয়ে যে মুখ দেখাবার যোটি রইল না। ওর ভবিষ্যতের কথা ভেবে দেখেছিস?

বাবুদের বাড়ীতে ঘন ঘন যাতায়াতের খবরটা মিছে নয়। ঘরের কাজ সেরে, একবার ওদিকে ঘুরে আসা, শ্যামলার দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। লক্ষ্মীর সঙ্গে দুটো কথা না বলতে পারলে ভাবত, একটা গোটা দিনই নষ্ট হ'ল।

লক্ষ্মী বাবুদের একমাত্র কন্যা, শ্যামলার ছেলেবেলার সাথী। বয়েসের দিক্ দিয়ে অনেক ছোট হলেও মেলা-মেশায় কোন অসুবিধা ছিল না। চেহারা তুলনা করলে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আকাশ-পাতাল। লক্ষ্মী গৌরাঙ্গী, প্রায় মেমসাহেবদের মত সাদা, পটল-চেরা চোখ, দৃষ্টি দীপ্তিহীন, টিকোলো বাঁশীর মত নাক, যেন দেখার জন্যই অঙ্গটির অস্তিত্ব, আজানুলম্বিত মসীকৃষ্ণ চুল, সর্ব্বদাই তাকে দড়ির মত পাক খাইয়ে মাথার উপর বহন করতে হয় অন্যথায় চলাফেরায় বিঘ্ন ঘটিয়ে বসে। স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়ে লক্ষ্মী চিররুগ্না। তুলনায় শ্যামলার রং কালো, মিশ না হলেও বেশ কালো। লক্ষ্মীর পাশে দাঁড়ালে মনে হয়, প্রথমটি ক্ষণভঙ্গুর মোমের পুতুল, সাবধানে সাজিয়ে না রাখলে ভেঙ্গে পড়ার আশঙ্কা সব সময় পিছু নিয়ে থাকে। পরেরটি কালো পাথরে খোদাই করা মূর্ত্তি। পাথরে গড়া উদ্ধত গঠন নিয়ে শ্যামলা যখন চলে তখন এক বস্ত্রের আড়াল উদ্ধত যৌবনশ্রী কিছুতেই সামলাতে পারে না। অপর দিকে লক্ষ্মী পরিচ্ছদের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। পরিচ্ছদের চলন্ত পোঁটলা, দেখলে মনে হয় কোন বস্ত্র-বিক্রেতার বিজ্ঞাপন। বেশের তলার মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায় না। যৌবনের তাড়ায় শ্যামলার মধ্যে প্রাণশক্তি যেন উছলিয়ে পড়তে চায়। সদাই হাস্যময়ী, স্থির হয়ে ব'সে থাকা তার কাছে পীড়ন। কিছু কাজ না থাকলে অযথা ঢেঁকি দিয়ে ধান ভানে, গাছে চড়ে, কাঁঠাল পাড়ে, এতেও সময় না কাটলে খ্যাপলা জাল দিয়ে মাছ ধরে। এক দিকে উভয়ের পার্থক্য যেমন উৎকট, মনের মিল উভয়ের

তেমনই অদ্ভুত। ওরা যেন একাত্মা, কারও কাছে কিছু লুকানো-ছাপানো নেই।

শোনা যায়, মাঝে মাঝে শ্যামলার বিবাহের সম্বন্ধ আসে। বিবাহের প্রস্তাব যে আসছিল, সে খবর ও মিছে নয়, কিন্তু ভট্টচাজের হিসাব এমনই কড়া যে শেষ পর্য্যন্ত বরপক্ষীয়রা ব'লে যায়, অমন ঘর থেকে মেয়ে আনলে হেঁসেলে হাঁড়ী উঠবে না এবং হাঁড়ী উনুনে চড়ালে তাও ফাটবে। ভট্টচাজ-গিন্নী দেখে-শুনে বলেন, অমন হাড়-হাবাতে মেয়ে মরলে বাঁচি। বাপ হলেন আবলুশ কাঠ, আর মেয়ে পাথুরে কয়লা, তার উপর পণের হিসাব নিয়ে বাড়ীতে মাছের বাজার বসালে অমন মেয়ের বিয়ে হয়?

ভট্টচাজ-গিন্নীর স্বভাব চেঁচিয়ে চিন্তা করা। মেয়ে মায়ের উক্তি শুনে বলে, আমি মড়া বিয়ে করব না। গতর আছে, খেটে খাব। যত সব কোমর-ভাঙ্গা পচা চিংড়ি মাছের মত চেহারা,—আশা কম নয়। পুলিশের হাঙ্গামা না থাকলে যত হেংলা ছেলেদের মাথাগুলো ধড়ের উপরেই দড়ির মত পাক খাইয়ে দিতাম।

হাল-ফ্যাশানের অনেক ছেলেকেই যে শ্যামলা পাক খাওয়াতে পারে তাতে সন্দেহ নেই।

শ্যামলা ভট্টচাজের মেয়ে। সুতরাং তাকে জড়িয়ে যে-কোন ঘটনাই সংবাদ হিসাবে দামী। এই কারণে ব্যাপক প্রচারের কোন অসুবিধা ছিল না। প্রচারকদের ভিতর যাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মহৎ কর্ত্তব্য সাধনের জন্য এগিয়ে আসতেন তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই হয় ভট্টচাজের কাছে ঋণগ্রস্ত অথবা শ্যামলা-প্রদত্ত খেতাবে অভিষিক্ত, মুখপোড়া। উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষোভ অথবা গাত্রজ্বালার বহিঃপ্রকাশের প্রয়োজন থাকায় ঘটনার সুযোগগুলি কাজে লাগানো হ'ত, বার্ত্তার বিবরণ ব্যক্তি-বিশেষের সুবিধা অনুসারে পরিবর্ত্তিত হয়ে যেত, কেচ্ছা-বিলাসীদের খোরাক জুটত ভালো।

শ্যামলার কালো রূপ ও তার ঝাঁঝের সংস্পর্শে আসার পর যখন বরপক্ষীয়রা একের পর এক মেয়ে দেখার আয়োজন পণ্ড করতে লাগল তখন উপযুক্ত কেন্দ্রে ভট্টচাজ-পরিবার সম্বন্ধে নানা আলোচনা সুরু হয়ে গেল। সকলেই স্বীকার করল, নিখরচায় অমন একটা তাগড়া দাসী পেলে, ভটচাজের মত কৃপণ যে মেয়েকে আইবুড়ো ক'রে রাখবে তাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? তা ছাড়া বাবুদের বাড়ীতে যে উপরি আয়টা হচ্ছে তা বিয়ে দিলে ত আর থাকবে না। ছোটবাবু এলে যখন যা পায় তা থোকেই পায়। দেখ না, ছোটবাবু চ'লে গেলেই জমি কেনার ধুম প'ড়ে যায়? একেই বলে গতর খাটিয়ে টাকা রোজগার। আমাদের মেয়ে অমন হলে ঘেন্নায় মারা যেতাম। ভাবো, টাকার কি বা মহিমা। প্রকাশ্যে সত্য কথাটি বলার পর্য্যন্ত আমাদের অধিকার নেই। অমনি রক্তশোষক সুদখোর আদালতের প্যায়দার মত বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য বাড়ী চড়াও হবে।

ছোটবাবু লক্ষ্মীর বড ভাই, নাম নবগোপাল। তখন সে কলকাতায় থেকে কলেজে পড়ে। তবে প্রায়ই দেশে আসতে হয় সম্পত্তি দেখার জন্য। তার অনুপস্থিতিতে মহামায়া, লক্ষ্মীর মা তত্ত্বাবধান করেন, এবং বিচক্ষণ ভাবেই করেন, তবে জমি দখল ইত্যাদির ব্যাপারে নব-গোপালকে উপস্থিত থাকতে হয়, যথাস্থলে দাঁড়িয়ে হুকুম দেবার জন্য পুরুষ না থাকলে চলে না। তার উপর বিভিন্ন মহালে নায়েবদের বিরুদ্ধে অভিযোগ লেগেই থাকে। উত্তরাধিকারী স্বত্বে যারা নায়েবের পদে অভিষিক্ত হয় তারা প্রভুর আদেশও মানে না। এই জাতীয় কয়েকজন নায়েবকে সায়েস্তা করার ভার নেওয়ার পর নবগোপাল বিব্রত হয়ে পড়েছে। বিব্রত বলব না, জমিদারীর উপরই বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছে, তথাপি মায়ের আদেশ পালন না করে উপায় নেই।

মহামায়ার পাশ-করা বিদ্যার উপর দখল না থাকলেও সম্পত্তির উপর দখল কি ভাবে রাখতে হয় তা তিনি জানতেন। পূজার্চ্চনার পর বেশির ভাগ সময়ই তাঁহাকে বিষয়-কর্ম্মে কাটাতে হ'ত। এই কারণে সংসার চালানর দায়িত্ব শ্যামলার উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

আপন ভাই-বোন বলতে শ্যামলার কেহ না থাকায় নবগোপাল দাদার স্থান অধিকার করে বসেছিল। তাস খেলা বা কেরাম খেলার হার জিতের তর্কে যখন নবগোপাল আর শ্যামলার কথা কাটাকাটি কলহের স্তরে উঠে পড়ত তখন লক্ষ্মী ছুটে গিয়ে মহামায়াকে ডেকে আনত মধ্যস্থতার জন্য।

নবগোপালের প্রকৃতি শ্যামলার ঠিক উল্টো। শ্যামলা রেগে গেলে কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে যায়। শ্যামলা যতই রাগে নবগোপাল ততই হাসে। শ্যামলাকে রাগিয়ে দিয়ে মজা দেখা নবগোপালের একটি বিশেষ কৌতুকের বিষয়। এই কারণে দাদা এলেই লক্ষ্মীকে আশঙ্কান্বিত হয়ে থাকতে হয়।

সংক্ষেপে বাবুদের বাড়ীতে শ্যামলার প্রতিপত্তি এমন ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে তাকে পরিবারভুক্ত না ভাবলেই অস্বাভাবিক লাগত।

দেখতে দেখতে বৎসরের পর বৎসর কেটে গেল, ইতি-মধ্যে নবগোপাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা তকমা সংগ্রহ করে ফেলেছে তবু তার লেখাপড়ার নেশা কাটতে চায় না। উপস্থিত কি একটা অকেজো বিষয় গবেষণা চালিয়েছে ডক্টরেট খেতাব লাভের জন্য। এদিকে লক্ষ্মী বিবাহ-যোগ্যা হয়ে উঠেছে, বড় ভাইয়ের সে-বিষয়ে খেয়াল নেই। সৎপাত্র সন্ধানের জন্য মা অনবরত চিঠি লিখছেন, উত্তর যা যাচ্ছে তাতে আশাপ্রদ কিছু থাকছে না। শেষ পর্য্যন্ত মহামায়া একটি কড়া চিঠি লিখে জানালেন, পাত্রের সন্ধান না দিতে পারলে তিনি নিজে কলকাতায় এসে খোঁজ করবেন। আসল কথা, কন্যাদায়গ্রস্ত হওয়াটা যে কি ব্যাপার তা নবগোপাল সঠিক উপলব্ধি করতে পারে নি। তবে মা নিজে এসে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার্থীর মত যার-তার শরণাপন্ন হন এমনটি নবগোপাল চায় নি। পাত্রের সন্ধান দিতে দেরি হলে মা যে কোন সময় এসে পড়তে পারেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। অগত্যা দীনেশের পিতা যা প্রস্তাব করেছিলেন তাই মাকে জানানো হয়।

দীনেশ নবগোপালের সহপাঠী ছিল। সম্প্রতি বিলাত থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করে ফিরেছে। এখানকার কলেজে পাঠ্যাবস্থায় লেখাপড়া অপেক্ষা সৌখিনতায় খ্যাতি অর্জ্জন করেছিল বেশি। পরিবারের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল বলা চলে। বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। শাসনের দিকটা শিথিল হওয়ায় সংযম ও শৃঙ্খলা সম্বন্ধে দীনেশ সম্পূর্ণ উদাসীন। তার ইচ্ছাটাই ছিল শেষ বিধান, ভাল-মন্দ বিচারের অবকাশ পাওয়া যেত না। দীনেশ উগ্র সাহেব-পন্থীদের প্রায়ই পার্টিতে ডাকত। দীনেশের পিতা ওদের পছন্দ না করলেও কিছু বলতে পারতেন না। কিন্তু যখন ক্রমান্বয়ে ট্যাস জাতীয় মেম সাহেবরা তাঁর বাড়ী চড়াও হতে লাগল তখন তিনি বাস্তবিকই পুত্রদায়গ্রস্ত হয়ে পড়লেন। দোতলার সমান উঁচু হাইহীল জুতো-পরা মেয়েকে তিনি পুত্রবধূ হিসাবে গ্রহণ করতে একেবারে নারাজ। অমন বৌ ঘরে ঢুকলে দেউলিয়া হতে হবে। বাড়ী থেকে কর্ত্তা-গৃহিণীকে তাড়িয়ে দেওয়াও বিচিত্র নয়। যথেচ্ছ খরচ ও সাহেব-প্রীতি নিয়ে পিতা পুত্রের মতভেদ যে-সময় প্রকট হয়ে উঠেছিল সেই সময় নবগোপালের কাছে তিনি একটি গৃহস্থঘরের পাত্রীর সন্ধান চেয়েছিলেন। বেশি লেখা-পড়া জানা মেয়ের দরকার নেই। তবে ভাল ঘর আর ফরসা রং হলেই চলবে।

প্রস্তাবের সঙ্গে লক্ষ্মীর এমন মিল ঘ'টে গেল যে, কালবিলম্ব না ক'রে মহামায়া কন্যাসহ কলকাতার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন।

মেয়ে দেখার পর দীনেশের পিতা বেজায় খুশী। পাকা দেখা হয়ে গেল।

পুত্র তখন কাশ্মীরে হাওয়া বদ্‌লাতে গিয়েছে। পাকা দেখার পরই পুত্রের কাছে লক্ষ্মীর ফোটো পাঠানো হ'ল। সমর্থন যে আসবে সে বিষয় বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না, কিন্তু ঘটল বিপরীত। পুত্রের বন্ধুরা ব'লে দিল, একেবারে সেকেলে, কোন পার্টিতেই ওকে বার করা চলবে না, তার উপর রোগা। ওদের মধ্যে একজন অধিকতর নব্যপন্থী ছিলেন, তিনি জানিয়ে দিলেন, অপূর্ব্ব স্লিম, আজকাল এই ত ফ্যাশান। ফ্যাশান কথাটায় জোর পড়ায় দীনেশ একটু সাহস পেয়েছিল, কিন্তু ভোটে প্রত্যাখ্যান সাব্যস্ত হওয়ায় পত্রোত্তরে বাবাকে জানাল, মেয়েটির সবই ভাল তবে সেকেলে। পাকা দেখা হলেও 'না' বলার কোন অসুবিধা দেখছি না, কারণ সাহেবদের মধ্যে এইরূপ ঘটনা আকছার ঘটে।

গৃহিণী চিঠি প'ড়ে বললেন, ঠিক হয়েছে। ছেলেকে মেয়ে দেখানো নেই, পণের সর্ত্ত নেই, কর্ত্তা মেয়ে দেখলেন আর অমনি বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। এমন অনাছিষ্টি কাণ্ড কখনো দেখি নি। এদিকে ত শুনছি, জমিদারের মেয়ে, বেজায় বড়লোক, আর টাকা-কড়ির কথা না ব'লেই বিয়ে ঠিক ক'রে ফেললে?

দীনেশের বাবা একটু প্রাচীনপন্থী, কথার খেলাপ করতে তাঁর বাধছিল। গিন্নী বললেন, অমন গুঁই-গাঁই ক'রে কি হবে, সোজা ব'লে দাও ছেলের পছন্দ নয়। বিলাত থেকে পাশ করা ছেলে। সাহেব-মেমদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, ওর বিয়ের জন্যে মেয়ের ভাবনা?

সাহেব-মেমদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোই যে গৃহকর্ত্তাকে ভাবনায় ফেলেছে, খরচের দিক্ সামলাতে পারছেন না, সে কথা তিনি গৃহিণীকে বোঝান কেমন ক'রে? সারাটা জীবন তিনি আদেশ মেনেই আসছেন, এবারও বাধ্য স্বামীর কর্ত্তব্য সারলেন। পুত্রের পত্র নবগোপালের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল।

পাকা দেখার পর এমন কথা উঠতে পারে, মহামায়া কল্পনাও করতে পারেন নি। নবগোপালকে বললেন, অমন ছেলেকে কি ব'লে আমাদের পরিবারে ঢোকাবার কথা ভেবেতে পারলি?

নবগোপাল উত্তর দেয়, বাইরে থেকে যতটা জানা

যায় ততটাই খবর দিয়েছি। তুমি যা চেয়েছিলে, সবই ওর মধ্যে ছিল। দীনেশ সাধারণ পাশ-করা ছেলে নয়, বিলেতের ছাপ আছে ওর শিক্ষায়। আর্থিক অবস্থা ভালই বলতে হয়, তা না হ'লে তিনবার ফেল মেরেও বিলাতে থাকার খরচ সামলাতে পারে? কলকাতার মত সহরে নিজেদের বাড়ী আছে, ওরকম ছেলেকে ত কন্যাপক্ষরা বলে সোনার চাঁদ। আমি ত লক্ষ্মীর বিয়ের জন্য ব্যস্ত হই নি, বরং চেয়েছিলাম, লেখাপড়া শেখাও, বুদ্ধি মার্জ্জিত হোক, কামারহাটির বাইরেও যে একটা জগৎ আছে তা সে জানুক। তুমিই ত জোর দিয়ে বললে, মেয়েদের বেশি লেখাপড়া শিখিয়ে হবে কি? সংসার চালাতে হলে নিজের ঘরের কথাই আগে ভাবতে হয়, নভেল প'ড়ে বিলাতের গৃহস্থালী জেনে আমাদের কি লাভ হবে? নতুন ঢংএ কাপড় পরতে শিখলেই ত শিক্ষার পরাকাষ্ঠা হয় না? ওগুলো ত বাইরের খোলস, ছদ্মবেশও বলতে পারিস।

মা যে এত কথা বলতে পারেন তা দীনেশের জানা ছিল না। শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে মায়ের দৃঢ় মত যখন জানতে পারল তখন বললে, ওসব আলোচনায় এখন কোন লাভ নেই। ছেলে যখন বিয়ে করতে চাইছে না তখন অন্যত্র চেষ্টা করা ভাল।

কথা শুনে মা অবাক্; বলেন, ও মা, কথা শোন! পাকা দেখা মানে অর্দ্ধেক বিয়ে ত হয়েই গেল, এখন কি পিছুবার উপায় আছে, লোকে বলবে কি! হাল-ফ্যাশানের নয় বলাতে প্রমাণ হয় না মেয়েকেই খারাপ লেগেছে। আসলে ছেলে কি চায় খোঁজ নিতে পারিস?

উত্তর আসে, হয়ত বাড়ী গাড়ী নগদ টাকা আর আনুষঙ্গিক কত কি, তা কে জানে। ছেলে যা চাইবে তাই তুমি দিতে পারবে? তার মানে ঘুষ দিয়ে মেয়ে পার করতে চাও।

মহামায়া উত্তর দেন, ঘুষ কেন হতে যাবে, পণ দেওয়া ত নতুন কথা নয়। পণের বিষয় বরপক্ষ যখন কিছু বলে নি তখন আমাদের দিক্ থেকে জানানোর দোষ কি আছে? তুই আজই জানিয়ে দে, আমরা কি দিতে পারি।

নবগোপালের ইঙ্গিত অনুসারে মহামায়া জানালেন কলকাতায় বাড়ী ও গাড়ী দুইই দেবেন, মায় গাড়ী চালনোর মাসিক খরচা ও লক্ষ্মীর উপযুক্ত মাসোহারা।

খবরটি বিশ্বস্ত সূত্র থেকে অবগত হওয়ায় লক্ষ্মীর যাবতীয় ত্রুটি সংশোধনের জন্য দীনেশের মাতা নিজে এগিয়ে এলেন। পুত্রকে চিঠি লিখলেন, পত্রপাঠ চ'লে এস, এমন মেয়ে পাওয়া ভাগ্যের কথা। হাল-ফ্যাশানের উপযুক্ত ক'রে নিতে সময় লাগবে না। দরকার হলে মেমসাহেব মাইনে দিয়ে রাখা যাবে। শাড়ী পরা শিখতে আর কত টাকা লাগে? পণের নগদ যা পাওয়া যাচ্ছে তার থেকে সামান্য খরচ করলেই তুমি যা চাও তা পেয়ে যাবে।

পণের বহর শুনে বন্ধুদের মধ্যে অনেকের ঈর্ষার উদ্রেক হয় নি এমন কথা বলা যায় না। সব দিক্ থেকে সমর্থন এগিয়ে আসায় দীনেশ হাওয়াই জাহাজে ফিরে এল।

পাকা দেখাকে কায়েমি করার জন্য মহামায়া বরই কিনে ফেললেন। জিদের মাথায় যে জিনিস ঘটল তার প্রতিক্রিয়া যে দূরগামী হতে পারে, এ কথা একবারও মহামায়া ভেবে দেখার অবকাশ পেলেন না। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই জমিদারী পরিচালনার ভার তাঁর উপর পড়ায় আজ্ঞাকারী ভূস্বামীর মনোবৃত্তি তাঁকে এমন ভাবেই অভিভূত ক'রে রেখেছিল যে, তিনি বুদ্ধিমতী হয়েও দূরদৃষ্টিকে অবহেলা করলেন। বিবাহের মত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে, অনিচ্ছুক মানুষকে প্রলোভন দ্বারা বাঁধার যে প্রতিকূল সম্ভাবনা থাকতে পারে একথা তাঁর আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান স্বীকার করতে পারল না। কৌলিক সম্মান, কন্যার কল্যাণচিন্তাকে পরাভূত ক'রে দিল।

বর কিনে ফেলা ঘোষাল পরিবারে নতুন ঘটনা নয়। ঘরজামাই না হলেই বরং লোকে বলত, রাজাবাবুদের আয়ে ঘুণ ধরেছে।

গোল বাধল বিবাহের আনুষ্ঠানিক রীতি নিয়ে। প্রথম, বরপক্ষীয়রা কামারহাটিতে যাওয়া সমর্থন করেন নি। কারণ খুবই সঙ্গত। মশার অভ্যর্থনায় জর্জ্জরিত হয়ে ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত হওয়াটা কেহ আরামপ্রদ ভাবে না। দ্বিতীয়, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-বাড়ীর পঙ্‌ক্তি ভোজনে, সর্ব্বভুক্ আধা-সাহেবদের আবির্ভাব। সাহেব বরযাত্রীদের মধ্যে যাঁরা যোগদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই এমন স্তরের মানুষ যে ভদ্র বলতে বাধে। তা হলেও সাদা চামড়ার গুণ অনেক। গ্রাম থেকে আনা কর্ম্ম-উদ্‌যোগীদের তাক্ লেগে গেল। সকলেই বললে, আমাদের জামাইবাবু একজন কেউকেটা মানুষ নয়। সাহেবদের পর্য্যন্ত পাতা পেড়ে খাইয়ে দিলে হে।

বরযাত্রীদের মধ্যে যে সাহেবরা আসবে, একথা মহামায়ার কাছে গোপন রাখা হয়েছিল। দীনেশ সাহেব-দের উল্লেখ ক'রে জানিয়ে দিয়েছিল, বিশিষ্ট বরযাত্রীদের

জন্য যেন পৃথক্ আয়োজন করা হয়। আমরা যে এখনও বর্ব্বর তা বিদেশীদের জানতে দেওয়া উচিত হবে না। এলো গায়ে পরিবেশন, হুস্-হাস্ শব্দ ক'রে দধি শোষণ এবং সর্ব্বোপরি ঢাক পিটিয়ে ঢেঁকুর তোলাকে দীনেশ বর্ব্বরতারই অঙ্গ মনে করে। অপর দিকে পরিতোষের সহিত ভূরিভোজনের পর যদি পাড়া মাতিয়ে ঢেঁকুরই না উঠল, তা হ'লে ভাবতে হয় লোকটা অভুক্ত থেকে গেল।

সনাতন প্রত্যাশা অনুসারে আমরা বরযাত্রীকে আরাধ্য দেবতার পঙ্‌ক্তিতে আসন দিয়ে থাকি। নবগোপাল এ দিক্‌টা লক্ষ্য রেখেছিল, সুব্যবস্থার চূড়ান্ত হওয়া সত্ত্বেও শেষ রক্ষা হ'ল না।

ভোজনের আগে মস্‌গুলী পানীয় না থাকায় একজন সাহেব পাশের মেমকে বললেন, প্রিয়তমে, এ যে নিট জল, এত কড়া হাতে সইবে?

মেম উত্তর দেন, অভিযোগ অবহেলার বস্তু নয়। বাড়ীতে ডেকে এই ভাবে তাচ্ছিল্য নেটিভদের পক্ষেই সম্ভব।

টেবিলের বিপরীত দিক থেকে সমর্থন আসে। ঠিক বলেছ, নেটিভদের কাছ থেকে এর বেশী প্রত্যাশা করা চলে না।

শ্লেষজড়িত রসিকতা নবগোপালের কানে গিয়েছিল। উক্তিগুলি সে সহজ ভাবে নিতে পারে নি। দু-একটি কটু কথা শুনিয়ে দিয়েছিল। ফলে ঘটনাটি বচসার স্তরে গিয়ে ওঠে এবং অল্পক্ষণেই মহামায়ার কানে গিয়ে পৌঁছায়। কালবিলম্ব না ক'রে তিনি পুত্রকে ডাকিয়ে পাঠান এবং আদেশ দেন, এখুনি ওদের বাড়ী থেকে বার ক'রে দেওয়া হোক। যতগুলি বরকন্দাজ আছে তাদের গেটের সামনে দাঁড় করিয়ে দাও। বর তুলে নেবার চেষ্টা হলে কি করতে হবে আশা করি তোমাকে শেখাতে হবে না।

মাতৃ-আজ্ঞা পালিত হলে শুভানুষ্ঠানে দাঙ্গার সম্ভাবনা সুনিশ্চিত। দুর্ঘটনাকে এড়াবার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিতে হ'ল। মা শুনলেন, বাইরে কে একটা মাতাল, যা তা বকছিল, তাকে তাড়াতে গিয়ে গোলমাল হয়েছিল, আর কিছু না।

মিথ্যার আবরণ অভেদ্য ছিল না। মহামায়া সবই বুঝলেন তথাপি আত্মতোষের জন্য মিথ্যাকেই সত্য ব'লে স্বীকার করতে হ'ল।

সাহেব-পূজার পালা এইখানেই শেষ হ'ল না। পিতার অমতে নিজেদের বাড়ীতেও দীনেশ বল্ নৃত্যের ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছিল। সাহেবী মতে বিবাহের পর জোড়ে নাচ যখন একটি অপরিহার্য্য সামাজিক অনুষ্ঠান তখন সভ্যদের অনুকরণ না করলে দীনেশের মত মার্জ্জিত ব্যক্তি নিজের পরিচয় দেয় কেমন ক'রে। নাচের মধ্যে কেরামতি দেখাবার জন্য যাঁরা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, তাঁদের মধ্যে দীনেশ যোগ দিতে পারায় বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করল। নাচের হুজুগ শেষ হতে বেশ রাত হয়ে গেল।

দীনেশ শোবার ঘরে এসে দেখে লক্ষ্মী উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, ফুঁপিয়ে কাঁদছে। লক্ষ্মী যেন দীনেশের জন্যই অপেক্ষা করছিল, ঘরে ঢুকতেই উঠে বসল এবং ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করল, তুমি যদি পরের স্ত্রীকে নিয়ে ঢলাঢলি করতে ভালবাস তা হ'লে আমাকে বিয়ে করলে কেন? অত লোকের সামনে ঐ ভাবে ·····তোমার কিছুমাত্র লজ্জা লাগল না? মা তোমার কীর্ত্তি শুনলে কখনও আমাদের বাড়ীতে ঢুকতে দেবেন না। এমন কি আমাদের জন্য উইলে যে ব্যবস্থা করেছেন তাও ছিঁড়ে ফেলতে পারেন।

অপ্রত্যাশিত মোটা যৌতুকের উপর উইলে আরও ব্যবস্থা হয়েছে জানায় দূরদর্শী দীনেশের পক্ষে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সাবধান হওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ল, বুঝল আসল জায়গায় ঘাঁটি আগলাতে হলে লক্ষ্মীকে বশ করা দরকার। অত্যন্ত কাছে এসে নিতান্তই নিরীহের মত বললে, তুমি একেবারে হেলেনাহুস। সাহেবী জোড়ের নাচে সচরাচর কেউ নিজের বৌ নিয়ে নাচে না। লক্ষ্মীটি রাগ ক'রো না। তুমি নিজের চোখেই ত দেখলে, সকলেই পরের বৌ নিয়ে নাচছিল। ওর মধ্যে এতটুকু খারাপ কিছু নেই। সাহেবরা ত আমাদের মত নয়? স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গাঢ় বিশ্বাস আছে ব'লেই এমন ভাবে উদার হতে পারে। সব সময় সন্দেহ করলে ওদের সমাজ লণ্ড-ভণ্ড হয়ে যেত। সভ্যতার দিক্ দিয়ে ওরা এত এগিয়ে গিয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হলে, আপোষে আলাদা হয়ে যায়। বড় জোর আদালতে হাজির হয় বিবাহভঙ্গের আবেদন নিয়ে। আর আমরা বাঁদর-ছাগলের মত দাবী নিয়ে লড়াই করি। তুমিও একদিন নাচ শিখবে। আমার বন্ধুদের সঙ্গে নাচবে। আমার বন্ধু না হলেও আপত্তি উঠবে না, কারণ, তোমার বন্ধুর সঙ্গে অবাধ মিলনের অধিকার তোমার আছে। স্ত্রী ব'লে তুমি ক্রীতদাসী নও।

নাচ শিখতে হবে, পুরুষের সঙ্গে নাচের অজুহাতে হুড়োমুড়ি করতে হবে, শুনে লক্ষ্মী আঁতকে উঠল, তার উপর যখন নিজের পুরুষ বন্ধুর কথা উঠল তখন

সে বিরক্তির স্বরে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি বলতে চাও আমার পুরুষ বন্ধু আছে?

প্রশ্নে তীব্র আপত্তিসূচক ইঙ্গিত থাকায় দীনেশ বলে, আমি কি বলছি আছে? তবে থাকলে দোষের কিছু নেই। সাহেবদের কাছে থাকাটাই স্বাভাবিক।

লক্ষ্মী বলে, থাক্ তোমার সাহেবী কায়দা, আমার নাচ শিখে দরকার নেই। আইন, ক্রীতদাসী, ওসব বুঝি না। তোমাকে কিন্তু কথা দিতে হবে, অমন ক'রে আর কখনও মেয়েদের জড়িয়ে ধরবে না।

দীনেশ চিন্তাশীল ব্যক্তি, হুঁসিয়ার মানুষ, সাক্ষাৎ বিপদ্‌কে এড়িয়ে চলা হ'ল বুদ্ধিমানের ধর্ম্ম, সুতরাং অঙ্গীকারবদ্ধ হলে যদি উপস্থিত উদ্ধার পাওয়া যায় তা হ'লে ভবিষ্যতে ধরা না-পড়া পর্য্যন্ত প্রতিশ্রুতি অটুটই থাকে। সঙ্গত যুক্তির আশ্রয় পেতে শপথ করল, আর কখনও সে স্ত্রীলোকের দেহস্পর্শ করবে না।

স্বামীর কথা লক্ষ্মী মন দিয়েই শুনল এবং বিশ্বাস করল। আপন মনে বিচার ক'রে দেখল, বাস্তবিকই কুচিন্তা থাকলে কেহ অমন ক'রে আদরের কথা বলতে পারে না; চোখের সামনে ঐ সব দেখে পুরুষের মত পুরুষ চুপ ক'রে সহ্য করে? স্বামীকে অবিশ্বাস করার জন্য লজ্জায় নত হয়ে যায়। মিটমাটের পর নব-দম্পতীকে আড়ালে ছেড়ে দিই।

বৎসর দেড়েক হবে লক্ষ্মীর বিবাহ হয়েছে, কিছুদিন আগে মাতৃত্বের দাবী নিয়ে শ্বশুরালয় থেকে ফিরেছে। শ্যামলা এখন সকাল-বিকেল দু'বেলাই লক্ষ্মীর সঙ্গে থাকে। এমনকি মধ্যাহ্নের আহারও অনেক দিন বাবুদের বাড়ীতেই সারতে হয়। কথাপ্রসঙ্গে বেলা হয়ে গেলে বাড়ী ফেরা আর হয় না। লক্ষ্মীর মাও শ্যামলাকে স্নেহের চক্ষে দেখেন। কৌলিক আভিজাত্যের বেড়া স্নেহের আকর্ষণে বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি। মনের টানের সঙ্গে অতীতের অনেক ঘটনা জড়িয়ে আছে, সেগুলিই স্নেহের বন্ধনকে কড়া ক'রে বেঁধেছে। অসুখ-বিসুখ হলে শ্যামলার সেবা ছাড়া গতি নেই। বিশেষ ক'রে লক্ষ্মীর বেলায়। ঠিক সময় ওষুধ খাওয়ানো, পথ্য দেওয়া, ঘুমপাড়ানোয় শ্যামলা সিদ্ধহস্ত।

সেদিন লক্ষ্মীর ঘরে দুই সখী গল্পের মধ্যে জমে গিয়েছিল। লক্ষ্মীকে তার শ্বশুরবাড়ীর কথা বলার জন্য শ্যামলা নানা ভাবে প্রশ্ন সুরু ক'রে দিল। স্বামীর আদর থেকে, কি ভাবে তার দিন কাটে, কাদের সঙ্গে মিশতে হয়, শ্বশুরবাড়ীর লোকগুলো কি রকম ধরনের মানুষ, আরও কত কি কথা তার ঠিকানা নেই। নতুন বৌ-এর জীবনধারা যেন পোশাকী ব্যাপার। সব সময়ই সেজে থাকতে হয়। কথা বলা থেকে চলাফেরায় কেমন যেন একটা আড়ষ্ট ভাব।

শ্যামলা জিজ্ঞাসা করে, সকলের সঙ্গে অমন ক'রে বনিয়ে চলতে তোর অসুবিধা হয় না?

লক্ষ্মী উত্তর দেয়, হলেই বা করছি কি।

লক্ষ্মীর বর যে সাহেব-ঘেঁসা মানুষ, বিলাতে অনেক দিন ছিল। সেই জন্য অনেক কিছু শিখে ফেলেছে। সাহেবী চালে অশোভনীয় আচরণ সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়ে জিভ কেটে অন্য দিকে কথার মোড় ফেরাবার চেষ্টা করে।

শ্যামলার কৌতূহলের উপর জুলুম এসে পড়ায়, জানার জন্য জিদ আরও বেড়ে যায়; চেপে ধরে, বলতেই হবে লুকোনা কথা।

লক্ষ্মী বাধ্য হয়ে শোনায় নাইট ক্লাবের ব্যাখ্যা। ওখানে যেতে হ'লে সধবা মেয়েদের সিঁদুর পরা নাকি চলে না। উল্টে চুল ছেঁটে ফেলতে হয়। কোন কোন মেয়ে ত ক্ষুর দিয়ে ঘাড়ের পিছনটা কামিয়েই ফেলে। তার উপর রুক্ষু-সুক্ষু চুল ফুরফুর ক'রে হাওয়ায় ওড়ে।

শ্যামলা জিজ্ঞাসা করে, সধবারা চুল ছেঁটে বিধবা সাজলে, বিধবারা কি খোঁপা বাঁধে?

লক্ষ্মী উত্তর দেয়, দূর পাগলী! ওখানে কি সধবা আর বিধবা চেনার উপায় আছে? রং চড়ার পর সব একাকার হয়ে যায়। নাচতে নাচতে রাত কাবার ক'রে ছাড়ে। এ সব শোনা কথা, সত্যি-মিথ্যে ভগবান্ জানেন। জায়গাটা সাহেব-পন্থীদের তীর্থস্থান। বারো মাস শিবরাত্রি ওখানে লেগেই থাকে।

শ্যামলা আঁতকে উঠে বলে, মাতালের কাছে মেয়েদের থাকতে ভয় লাগে না?

লক্ষ্মী উত্তর দেয়, তা কি জানি ভাই। তবে তোদের জামাইবাবু সকলের মত নয়, ও কেবল পাঁচ-মেশালী সরবৎ খায়, নাম ককটেল। ঐটা খেলে নাকি খোস-মেজাজে কথা বলা যায়। সাহেবী-ধরনের মানুষরা ত ক্লাবে গিয়ে আমাদের মত পটল আর বেগুন চচ্চড়ির কথা বলে না? ওখানে কৃষ্টির আলোচনা হয়।

কট্‌মটে কথা শুনে শ্যামলা বলে, ওরে বাবা! ওটা আবার কি? কামড়ায় নাকি?

না রে না, কৃষ্টির মধ্যে অনেক কিছু থাকে, মেয়েদের শাড়ী, শাড়ীর ভাঁজের নতুন কায়দা, কায়দা-দোরস্ত হলে কে কতটা পরপুরুষকে জাপটে ধ'রে নাচতে পারে, কার

বাড়ীতে ব্রঞ্জের নটরাজ আছে, কে হাল-ফ্যাশানের তার দিয়ে গড়া মূর্ত্তি কিনেছে, কার বৌকে নিয়ে কে পালাল, আরও কত কি।

এই ধরনের কথা, পরপুরুষকে জাপটে ধ'রে নাচা আর বৌ-কাড়াকাড়ির কথা শুনে শ্যামলা অবাক্। বলে, ওমা বলিস কি লো? পরপুরুষকে চোখের সামনে জাপটে ধরলে, মেয়ের বর সহ্য করে কেমন ক'রে?

উত্তর শোনে, বরও ত ঐ রকম। আর একজনের বৌকে নাচায়।

শ্যামলা আনুষ্ঠানিক রীতি বিশ্লেষণ ক'রে বলে, ঠিক ধরেছি, গণ্ডগোলের গোড়ায় গলদ হ'ল ঐ পাঁচমেশালী সরবৎ, ওটার নাম কি বললি, ককটেল না? আর যাই করিস ভাই, তুই ককটেলটা খাস না। নিজের বর ছেড়ে আর কাউকে জাপটে ধরলে, আমার ভয় হয়, তোদের মধ্যে গোল বেধে যাবে।

লক্ষ্মী শ্যামলাকে সোহাগ ক'রে ঠেলা মেরে বলে, দূর্ ছুঁড়ী, ককটেল খেতে গেলাম কি দুঃখে, আমি কি কুষ্টির কথা বলি?

শ্যামলা কুষ্টির কথায় কেমন যেন অমঙ্গলের ইঙ্গিত খুঁজে পায়। বলে, ভাই তোর বরকেও কুষ্টির কাছ থেকে সরিয়ে রাখিস, আর ঐ পাঁচমেশালীটা খেতে দিস না। ওটা সরবৎ না ছাই, নাম ককটেল বললে কি হয়। আমি যেন বুঝি না। যা-তা খেয়ে পুরুষরা যে কি করে তা আমি জানি। এই ত সেদিন ও পাড়ার যোগীন, ঐ সব খেয়ে আমার সঙ্গে চালাকি করতে এসেছিল। আমবাগানে ঘুপ্‌টি মেরে কোথায় বসে ছিল, আমি কি তা জানি? পুকুর-ঘাটে উঠতেই ড্যাকরা ছোঁড়া এগিয়ে এল। যতই কাছে আসতে বারণ করি, ততই তার ভালবাসা তেড়ে ওঠে। শেষ পর্য্যন্ত ছোঁড়া নাগালে যখন এসে গেল তখন এক চড় কষিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বাছাধন কুপোকাত। ভিজে কাপড় আর কলসী কাঁখে না থাকলে ছোঁড়ার হাড়গোড় ভেঙে দিতাম। আমি বলি, ঐ জিনিষটা তোর বরকেও খেতে দিস না। ওটা পেটে পড়লে মানুষ কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে যায়।

লক্ষ্মী শ্যামলার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে, অমন কথা মুখে আনতে নেই। আমার বরকে আমি জানি না? ও কেবল মুখেই রসিকতা করে, ঐ পর্য্যন্ত। সামনের রবিবারেই আসছে, তোর পিছনে লেলিয়ে দেব, দেখবি কথা বলতে গিয়ে মুখে তুবড়ী বাজী ফুটবে। আমার বিশ্বাসকে পরীক্ষা করতে চাস, তাও দেখিয়ে দিতে পারি। বাসর ঘরে তোকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসার কথা আজও বলে। তোর গড়নের প্রশংসা করতে গিয়ে মনের মত কথা খুঁজে পায় না। হাঁপিয়ে ওঠে, বলে, অমন গড়নের কথা, ব'লে কি শেষ করা যায়? ছুঁয়ে দেখতে হয়। আর কত কি যে বলে তার ঠিক নেই। অন্য মেয়ে হলে হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে মরত কিন্তু আমি তোদের জানি, তাই কিছু হয় না। তা ছাড়া তোর ভিতরটাও পাথরের মত কঠিন। তোর মত মেয়েকে যে পুরুষ প্রেমে ফেলতে পারে, তাকে আমি বলি বাহাদুর। ড্যাকরা ছোঁড়ার দল, তোর পিছনে লেগেই আছে, আজ পর্য্যন্ত কেউ তোকে নাড়াতে পেরেছে? তাই বলি, মনের মত একটা পেলে বিয়ে করে ফেল্। একবার প্রেম জমে গেলে, পুরুষের নাম শুনলেই খারাপ বলবি না।

মনের মত কাউকে পাওয়া যে শ্যামলার ইচ্ছানুসারে হবার উপায় নেই তা লক্ষ্মী জানত। কথাটা বেফাঁস বেরিয়ে যাওয়ায় নিজেই দুঃখ পেল। সমবেদনা দেখাতে গিয়ে ব'লে ফেলল, সাত পাকে বাঁধা বরটাকে যদি চাস, তাই দিয়ে দেব।

শ্যামলা দুঃখের আড়াল সরিয়ে হেসে উঠল, বললে, ধর্, তোর বরের মত সুন্দর চেহারা দেখে যদি সত্যিই আমার ভাল লেগে যায়?

লক্ষ্মী বলে, আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস? বললাম না, আমার বরকে আমি জানি। স্বর্গের মেনকা, রম্ভা এলেও কিছু করতে পারবে না।

শ্যামলার ভিতরটা যে পাথরের মত অসাড় নয়, সেও যে মনের মত বর পেলে লক্ষ্মীর মতই ভালবাসতে পারে, বিশ্বাসের বাঁধনে আটকে রাখতে চায়, এ গর্ব্ব করার সুযোগ পেল কই? পুরুষকে ভালবাসার অভিজ্ঞতা শ্যামলার নেই। তবু সে জানত, তার গঠনে কতটা আকর্ষণের বস্তু আছে—বিশ্বস্ত পুরুষকে জব্দ করার লোভ ছাড়তে পারছিল না, বলতে চাইল, তোর বরকে একবার দিয়েই দেখ্ না? দেখিয়ে দি, মেনকা, রম্ভাকেও হার মানাতে পারি কি না? কিন্তু বক্তব্যের মধ্যে যেটুকু প্রকাশ হয় তা বুক মোচড়ানো দীর্ঘনিঃশ্বাস। জীবনটাই মনে হয় ব্যর্থ, তার পর গল্প আর জমে না। শ্যামলা বলে, আজ উঠি ভাই, বেলা হয়ে গেল। কাল আসব।

রবিবার জামাই আসছেন। অভ্যর্থনার জন্য মহামায়া বিশেষ ব্যস্ত। ভিতর-বাড়ীতে সাধারণ পাকপ্রণালীর পরিবর্ত্তন হয়েছে। বিশেষ প্রকারের মিষ্টান্ন প্রস্তুত হচ্ছে। সংক্ষেপে একটি ছোটখাট উৎসবের সাড়া প'ড়ে গিয়েছে।

উৎসবকে পরিপূর্ণ করার জন্য শ্যামলাও প্রস্তুত হয়ে ছিল। প্রতিশ্রুতি রক্ষার সময় যখন এল তখন লক্ষ্মী বিশ্বাসের পরীক্ষাকে উৎসবের একটি অঙ্গ করে ফেলল, হাসতে হাসতে জোর ক'রে শ্যামলাকে ঘরের মধ্যে পুরে দরজার বাইরে থেকে শিকল লাগিয়ে দিল। বলাই বৃথা, বলপ্রয়োগে শ্যামলাকে শক্তিশালী পুরুষও যে নাড়াতে পারে না সে কথা শ্যামলাও জানত। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য দৈহিক শক্তির ব্যবহার প্রয়োজন না হতে পারে, কিংবা প্রয়োজন হয় ত হ'ল কিন্তু তার ব্যবহার হ'ল না এমনও ত হয়?

বিশ্বাসের পরীক্ষায় লক্ষ্মীর জিত হ'ল কি না পরে ভাবা যাবে।

কিছুদিন বাদে লক্ষ্মীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। কোল-জোড়া নবজাত শিশু পেয়ে মাতা আনন্দে আত্মহারা। শিশুর গণ্ডে বার বার চুম্বন দেবার সময় স্বামীকে মনে পড়ে। ভাবে, এমন স্বামী না পেলে কি এমন সাত রাজার ধন মানিক পেতাম? সময় এগিয়ে চলে, লক্ষ্মীর শরীরও দিনের পর দিন ভাঙতে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত কলকাতায় বড় ডাক্তার দেখানো প্রয়োজন হয়ে পড়ায় শ্বশুরালয় থেকেই চিকিৎসার ব্যবস্থা হ'ল। খরচ অবশ্য সবই মহামায়ার। অসুস্থ অবস্থায় নিকট আত্মীয় কাছে থাকা একান্ত দরকার। শাশুড়ী কাছে থাকবেন, এই ভরসায় মহামায়া নিশ্চিন্ত মনে মেয়েকে পাঠিয়ে দিলেন।

চিররুগ্নার শুশ্রূষা কতকটা যন্ত্রচালিতের মত। সবই নিয়মে বাঁধা এমন কি, 'কেমন আছ' প্রশ্নটাও বাঁধা গদে চলে। লক্ষ্মী ওষুধ, পথ্য ও কুশলপ্রশ্নে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা না করলেও অভ্যাসবশতঃ ব'লে ফেলে, কালকের চেয়ে ভাল আছি। বেশী কথা তার ভাল লাগে না। ভাল-মন্দ প্রশ্ন সম্বন্ধে সে আজকাল নির্ব্বিকার হয়ে গিয়েছে। একান্ত যখন একলা প'ড়ে থাকে তখন শ্যামলার কথা মনে আসে। সে থাকলে, আর কিছু না হোক, ছেলেটা সময় মত দুধ খেতে পেত।

শয্যাশায়ী অবস্থায় লক্ষ্মী দাদাকে একটি চিঠি লিখে জানায়, শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, সময় পেলে একবার এদিকে এসো। তাড়া কিছু নেই, ভাবনারও কিছু নেই। অনেক দিন তোমাকে দেখি নি, তাই লিখলাম। চিঠি প'ড়ে নবগোপালের বুঝতে বাকি থাকে না, যে সব কিছু ঠিক মত চলছে না। 'ভাবনার কিছু নেই' কথাটাই আরও ভাবিয়ে তোলে। লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার বাধা অনেক। প্রথম, কুটুম-বাড়ীতে শুধু হাতে যেতে নেই ব'লে মাস-খানেকের রসদ সংগ্রহ করতে হয়। রসদের মধ্যে তরিতরকারি, কাতলা মাছ থেকে বহুবিধ বাছাই করা মিষ্টান্ন না থাকলেই নয়। দোকান ঘুরে বাজার করা নবগোপালের একেবারেই পোষায় না। দ্বিতীয়, শাশুড়ীর মেজাজ সব সময়ই চড়া, ওটা পদমর্য্যাদার লক্ষণ, বরের মা,একটু ভারিক্কে ধরনের না হলে চলে কেমন করে। মেয়ের বাড়ার মানুষ তাঁর বৌ সম্বন্ধে ভাল-মন্দ কিছু বলতে গেলে,ভেবে নেন অনধিকার-চর্চ্চা এবং মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে যা বলেন তাকে অশ্রাব্যই বলতে হয়। এই সব নানা কথা ভেবে, আজ যাই কাল যাই ক'রে বেশ কিছুদিন হয়ে গেল, নবগোপাল ওমুখো হতে পারে নি। চিঠি পাবার পর হঠাৎ গিয়ে পড়লেও লক্ষ্মীর শাশুড়ী ভাববেন, নিশ্চয় বৌ কিছু অভিযোগ পাঠিয়েছে, তা না হ'লে মেয়ের এত উৎপাত কেন? সংক্ষেপে যে ভাবেই ওদিকে যাবার চেষ্টা করা হোক না কেন, রূঢ় অভ্যর্থনা থেকে পরিত্রাণ নেই। লক্ষ্মীর চিঠি পাওয়ার পর গড়িমসি ভাব কাটাতে হ'ল। কেনাকাটার ভার ছিল বাজার-সরকারের উপর। দণ্ড জাতীয় দক্ষিণার মধ্যে কি ছিল তা নবগোপাল জানত না, দেখে নেবার মত মনও ছিল না। বিকেলের দিকে নবগোপাল ভগিনীর শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হ'ল। যথাস্থানে নজরানা পৌঁছতে ভগিনীর ঘরে নবগোপালের ডাক পড়ল।

লক্ষ্মীর ঘরে ঢুকেই যে দৃশ্য দেখল তাতে নবগোপালের ভিতরটা সাংঘাতিক ভাবে নাড়া খেল। লক্ষ্মী ঠাণ্ডা মেজের উপর মাদুরে শুয়ে আছে; পাশেই সুপ্ত শিশু-সন্তান। খাটের উপর শয্যা মলিন হয়ে গিয়েছে। আট-পৌরে ব্যবহারের জন্য দীনেশের সাহেবী পোশাক যে খোলা আলমারীতে টাঙ্গানো থাকত সেটি ঘর থেকে অন্তর্দ্ধান করেছে।

নবগোপাল কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই লক্ষ্মী বললে, তোমাকে বসতে বলি কোথায়? চেয়ার টেবিল যা ছিল তা পরিষ্কার করার জন্য ঘর থেকে বাইরে নিয়ে গিয়েছে। স্প্রিং-এর গদি-দেওয়া চেয়ার, সোফা পরিষ্কার করতে হ'লে, কলকে ঢেলে সাজার মত আগাগোড়া বদ্লাতে হয়।

এত শীগগির গদি বদলের প্রয়োজন হওয়া উচিত নয়, কারণ, ওগুলি দানের সামগ্রী হওয়ায় নবগোপাল নিজে পছন্দ ক'রে সাহেবী দোকান থেকে কিনেছিল। বিছানার দিকে তাকাতে লক্ষ্মী আর কিছু বলে না।

অবহেলার মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে নবগোপালকে বলতে হ'ল, আমাদের বাড়ী চল্‌। মা আর শ্যামলাকে ওখানে আনতে পারব। কি বলিস?

লক্ষ্মী মাকে অনেক দিন দেখে নি। মাকে দেখতে পাওয়ার আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠল। ক্ষণিকের উচ্ছ্বাস স্থায়ী হতে পেল না। পরক্ষণেই তার চোখ ছল ছল ক'রে উঠল। লক্ষ্মী হাঁ না কিছুই বলল না, তার মাথা নিচু হয়ে গেল।

দরজার আড়াল থেকে লক্ষ্মীর শাশুড়ী নবগোপালের প্রস্তাব শুনেছিলেন, তাড়াতাড়ি নীচে গিয়ে স্বামীকে বললেন, ওপরে কি সব কথা হচ্ছে শুনলে বুঝবে, কি মেয়ে ঘরে এনেছ। তোমাদের জমিদারপুত্রকে নাচে ডাকিয়ে আনাও। এইখানেই চা দেওয়া যাবে। তোমার সামনেই যা জবাব দিতে হয় আমি দেব।

প্রমাদ কাণ্ড ঘটার সম্ভবনা ঘনিয়ে ওঠায় গৃহকর্তা বললেন, এতদিন বাদে ছেলেটি এল, কি সব জিনিষ এনেছে সেগুলো আগে দেখ না।

গৃহিণী হাত নেড়ে, চাবির থোকা পিঠে ফেলে উত্তর দিলেন, আহা, সোহাগ দেখে আর বাঁচি না। জিনিষপত্র তুমি বলার আগেই দেখা হয়ে গিয়েছে, তা না হ'লে উপরে যেতে পেত? জমিদারী চাল দেখে দেখে অবাক্‌। মানলাম, কাতলা মাছটা বড়ই দিয়েছে, তাই ব'লে একটা? মেয়ের বাড়ী থেকে পাঠালে তত্ত্ব পাড়াপড়শীকে বিলুতে হয়, তা পর্য্যন্ত জানে না। নতুন পটল উঠেছে, ফুলকপি, বাঁধাকপি, সবই বাজারে পাওয়া যায়, কিন্তু একটিও ঝুড়ির মধ্যে দেখা গেল না। কুটুম-বাড়ীতে মিষ্টি দেবার বহরও চমৎকার, রাজভোগ ফেলে একরাশ নতুন রকমের সন্দেশ নিয়ে এসেছে, হয়ত ওগুলো চিনির ডেলা। সস্তায় যেখানে যা পেয়েছে তাই তরকারি ব'লে ঝুড়ি ভরেছে। আমরা কি গরু, যে ঐগুলো মুখে পুরে জাবর কাটব? ডাকো, ডাকো, উপর থেকে জমিদার-পুত্রকে নীচে নামিয়ে আনো।

গতিক খারাপ দেখে কর্ত্তা নিজেই উপরে গেলেন। নবগোপালকে কর্ত্তা স্নেহের চক্ষেই দেখতেন। ওর নম্র স্বভাবের জন্য কথা বলতেও ভাল লাগত। ঘরে ঢুকেই বললেন, এ কি, তুমি মেজের উপর ব'সে আছ?

প্রশ্নটা একটু উঁচু গলাতেই হয়েছিল। ভীত-চকিত দৃষ্টিতে চার পাশ দেখে নিয়ে বললেন, চল বাবা, নীচে চল, একটু চা খাবে।

লক্ষ্মীকে দীনেশের বাবা মা ব'লে সম্বোধন করতেন। গৃহিণী কাছাকাছি আছেন জানলে বৌ ব'লে ডাকতে হ'ত, এটা এ বাড়ীর নিয়ম, নড়চড় হবার উপায় নেই।

চায়ের জল গরম হতে তখনও দেরি ছিল। গৃহিণী প্রতিশ্রুতি অনুসারে এবং একান্ত কর্ত্তব্যের খাতিরে দরজা ভেজিয়ে পাশে দাঁড়ালেন। গৃহিণীর ধৈর্য্যের উপর তখন পীড়ন সুরু হয়ে গিয়েছে। অতিথির অভ্যর্থনার জন্য যে শ্রুতিমধুর বাক্যগুলি জড় হয়েছিল, সেগুলি ব্যবহার না ক'রে থাকা গেল না। বিনা নোটিসে বাড়ী চড়াও হয়ে ভগিনীর স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে খানাতল্লাসী যে ভদ্রোচিত ব্যবহার নয় তাই প্রমাণ করার জন্য গৃহকর্ত্তাকে দিয়ে বলালেন, এ বাড়ীর বৌকে যেমন ভাবে রাখা আমরা দরকার বোধ করব বৌকে সেই ভাবে থাকতে হবে। কন্যাদানের পর এ বিষয় কোন কথা জিজ্ঞাসা করা চলে না। নবগোপালবাবুর জানা উচিত, তিনি ভগ্নীপ্রীতি দেখাতে গিয়ে এমন বাড়াবাড়ি করেছেন যে, ভবিষ্যতে ওঁকেও এ বাড়ীতে আসতে দেওয়া সম্বন্ধে আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

অন্য ক্ষেত্র হলে নবগোপাল বাড়ীটা ডবল দাম দিয়ে কিনে ফেলেই গৃহপ্রবেশের নিমন্ত্রণ গৃহিণীর কাছে পাঠাত। ভগিনীর কথা ভেবে বললে, দীনেশ সব সময় কাছে থাকতে পারে না, তার নাইট ক্লাব আছে, পার্টি আছে আজকাল আবার মাছ ধরা আর শিকারের সখ চেপেছে। বেশির ভাগ সময় কলকাতার বাইরেই থাকে, তাই ভাবছিলাম, আমাদের বাড়ীতে নিয়ে গেলে কেমন হয়। ওখানে মাকেও আনানো যেতে পারে।

পার্টি, নাইট ক্লাব আর শিকারের কথা উত্থাপন হ'তে দীনেশের বাবাকে দিয়ে বলানো হ'ল, শিকারের উপলক্ষ্যে ঘরের বাইরে প'ড়ে থাকার জন্য দায়ী কে? মড়ার মত রোগা মেয়েকে গছিয়ে দিলে কোন জোয়ান পুরুষ ঘরের মধ্যে আটক থাকতে পারে? পুরুষ মানুষ একটু-আধটু বাইরে যাবেই। গৃহকর্ত্তা, পোষ্ট আপিসের মত বার্ত্তাবাহকের কর্ত্তব্য সারছিলেন। মধ্যস্থতার অধিকার না থাকলেও ঘটনাটি নরম করার জন্য বললেন, কাজ কি এ সব ঝামেলায়, বৌকে যখন নিয়ে যেতে চাচ্ছে, তখন ওদের মেয়ে ওদের কাছেই যেতে দাও না?

খাঁচার ভিতর বাঘিনীকে খোঁচালে হিংস্রনখী যে ভাবে গর্জ্জন ক'রে ওঠে, ঠিক সেই ভাবে দরজার আড়াল থেকে গৃহিণী গর্জ্জে উঠলেন। কথা বলার জন্য গৃহকর্ত্তাকে আর প্রয়োজন হ'ল না, সোজা

নবগোপালকে শুনিয়ে দিলেন, কে চায় ঐ মড়াকে ঘরে রাখতে, আজই ওটাকে বার কর। ঘরে পচা গন্ধ হয়ে গেল। ছেলেকে জানাবার দরকার নেই। ওর যা খুশি তাই নিয়ে থাক্। বিলাত থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ-করা ছেলে, সাহেবী চালে চলে, নাইট ক্লাবে ওর প্রতিপত্তি কত। অমন ছেলের আবার বিয়ে দেওয়া আটকায় কে?

নবগোপাল ধীর ভাবে সব কিছু শুনল। পুত্র সম্বন্ধে এইরূপ আস্ফালন প্রকাশ করা কোনও ভদ্রমহিলার পক্ষে যে সম্ভব তা নবগোপাল কল্পনাও করতে পারে নি। সবদিক্ বিবেচনা ক'রে স্থিরচিত্ত নবগোপাল জানাল, লক্ষ্মীকে ঘরে এনে আপনাদের যে বিশেষ অসুবিধা হয়েছে তা বুঝতে পারছি। আমিও বলি, পচা গন্ধের কারণকে ঘর থেকে বিদায় করা ভাল। ঘরের মধ্যে মড়াকে পচতে দিয়ে সেই ঘরে নতুন বৌ আনলে সকলেরই স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা আছে।

কথার উত্তরে শোনা গেল, জমিদারবাবুর জাঁক এখুনি ভাঙ্গছি। আজই ঝাঁটা মেরে লক্ষ্মীছাড়ীকে বিদায় করছি।

কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্মীর ঘর থেকে আর্তনাদ শোনা গেল। গৃহকর্তা তাড়াতাড়ি উপরে চ'লে গেলেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বচসার সঙ্কেত আসছিল। নবগোপাল আর ব'সে থাকতে পারল না। মাথার ভিতর তখন ঝড় উঠেছে, মনে হচ্ছে, নির্দয় পশুর মত ঐ নারীকে এখুনি নিরবচ্ছিন্ন দৈহিক শক্তি দিয়ে পিসে ফেলে। কিন্তু একান্ত নিরুপায় হয়েই ঘরের ভিতর অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল। মাঝে মাঝে টেবিলের উপর আঙ্গুলের টোকা পড়ছিল, সঙ্কেতের পিছনে কি ছিল বলা কঠিন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আর একটি ঘটনা ঘটল। ভিতর-বাড়ী আর বাইরে বসার ঘরের মাঝে দরজা হঠাৎ জোরে খুলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে কেহ যেন ধাক্কা দিয়ে লক্ষ্মীকে নবগোপালের সামনে ঘরের ভিতর ফেলে দিল। মেজের উপর সজোরে আছাড় খেয়ে লক্ষ্মী বলে উঠল মা গো! তার পরেই আর্তকণ্ঠে মিনতি জানাল, আমার ছেলেটাকে দাও, আর কি বলতে চাইছিল কিন্তু পারল না, অজ্ঞানের মত নেতিয়ে পড়ল।

উপরে বচসার পর গৃহকর্তা ফিরে আসেন নি। দরজার আড়াল থেকে কর্ত্রী বললেন, তোমার পেটে যে ছেলে জন্মায় তাকে গলা টিপে মারাই উচিত। তবে আমার ছেলের রক্ত ওর মধ্যে আছে তাই ছাড়ান পেল।

লক্ষ্মীর মুখ দিয়ে খানিকটা রক্ত বেরিয়ে এসেছিল। কালবিলম্ব না ক'রে নবগোপাল বাহিরে এসে ড্রাইভারকে বললে, এখুনি নবীন ডাক্তারকে ডেকে আনো।

বেশ খানিকক্ষণ লক্ষ্মী অজ্ঞান অবস্থায় প'ড়ে ছিল। মুখে এক ফোঁটা জল দেবারও উপায় নেই। মজা দেখার জন্য একজন চাকর এদিকে ঘোরাঘুরি করছিল, জলের কথা বলতেই সেও উধাও হয়ে গেল, কোন উপায় না থাকায় নবগোপাল বাইরে বেরিয়ে গেল। রাস্তার কল থেকে রুমাল ভিজিয়ে জল আনার জন্য। লাল রক্ত ইতিমধ্যে খয়েরী রঙ নিয়ে জমাট বাঁধতে আরম্ভ করেছে। আর খানিকটা সময় কাটতে, একটু একটু ক'রে জ্ঞান ফিরে আসতে লাগল। কথা বলার শক্তি নেই, মুখ হাঁ ক'রে জানাল, জল। লক্ষ্মীর অর্দ্ধনিমীলিত চোখের দিকে তাকালে বেশ বোঝা যায়, ও চাহনিতে দৃষ্টি নেই। চোখের তারা পাপড়ির ভিতর দিকে ঢুকে গিয়েছে, নীচেটা মড়ার শুকনো হাড়ের মত সাদা। লালা ঝরার মত তখনও মুখে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে আসছে।

নবগোপালকে আবার উঠতে হ'ল পূর্ব্বপ্রথায় জল সংগ্রহের জন্য।

ডাক্তার এসে দেখেন, রুমাল নিংড়ে লক্ষ্মীকে জল খাওয়ান হচ্ছে। রক্তাক্ত মৃৎশয্যায় ভূলুণ্ঠিত কুলবধূকে এই ভাবে জল খাওয়ানোর ব্যবস্থা ডাক্তার বোধ হয় কখনও দেখেন নি।

ঘরে নবগোপাল ছাড়া আর কেহ নেই। ডাক্তার হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। কোন প্রশ্ন করার আগেই নবগোপাল বলল, বুকটা দেখুন, বাড়ী পর্য্যন্ত নিয়ে যাওয়া যাবে ত?

ডাক্তার পরীক্ষা ক'রে জানালেন, অতটা খারাপ না। তার পরে ঘরে আর কোন কথা হ'ল না। গাড়ীতে উঠেই নবগোপাল জানাল, পুলিশ কেসও হতে পারে। ডাক্তারের সঙ্গে ঘোষাল-পরিবারের অনেক দিনের পরিচয়, উত্তেজনার মধ্যে তিনি কোন কথা বললেন না।

দাদার এখানে আসার পর, উপযুক্ত আহার, সেবা ও চিকিৎসায় লক্ষ্মী একটা বড় ধাক্কা সামলে নিল। নিজেকে নিয়ে তার ভাবনা ছিল না, দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দেখতে না পেয়ে মায়ের মন হাহাকার ক'রে উঠছিল। কেবলই দাদাকে বলেছে, ওঁকে খবর দাও, আমার ছেলেকে কেড়ে নিয়েছে জানলে এখুনি তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। শ্যামলাকে ডাকাও, ওকে না হ'লে আমার অসুবিধা হচ্ছে। মা কোথায়, কবে আসবেন?

নবগোপাল প্রত্যেকটি কথা শোনে, কিন্তু মানুষের হৃদয় নিয়ে কেমন ক'রে বলে, বিশ্বাসের চরম পুরস্কারই আজ তাকে সন্তানহারা করেছে। দুঃখ ও অসহায় অবস্থা নবগোপালকে এমন ভাবেই অবসাদগ্রস্ত করেছিল যে, স্থির ভাবে কোন বিষয় চিন্তা করার শক্তিও তার ছিল না।

এখানে একমাত্র হিতৈষী ডাক্তারবাবু। তিনি লক্ষ্মীর কথা ভেবেই উপদেশ দেন, ঘটনাটি নিয়ে গোলমাল না করাই ভাল। কামারহাটিতে সব খবর গিয়ে পৌঁছালে একটা হুলুস্থূল কাণ্ড বেধে যাবে। জামাই-শিকারের অছিলায় মাঝে মাঝে কামারহাটিতেই যায়। এ কথা মনে রাখা উচিত। যা কিছু ঘটেছে, তার বিচারের ভার যদি মহামায়া নিজে নেন তা হ'লে শাস্তির প্রয়োজন হ'লে জামাইকেও বাদ দেবেন না।

প্রতিক্রিয়ায় লক্ষ্মীর কি অবস্থা হবে ভেবে দেখা দরকার। দুই-একদিন আগেই নবগোপালকে মা চিঠি লিখেছেন, তোমার এখানে আসা একান্ত দরকার। ফৌজদারী মোকদ্দমায় দারোগা জখম হওয়ায় সব কিছু জটিল হয়ে উঠেছে। জখমের জন্য যে আমরা দায়ী নই তা প্রমাণ করা শক্ত হবে না। দাঙ্গায় হারের অপমান সহ্য করতে হলে গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে থাকা ছাড়া তাঁর উপায় নেই।

মা যদি লক্ষ্মীর বর্তমান অবস্থা জানতেন তা হ'লে মান-অপমান বা সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের কথা তুলতেন না। এদিক্‌কার সব কথা খুলেও লেখা যায় না; হিতে বিপরীত হয়ে যাবে।

অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যখন নিস্তেজ হয়ে যায়, শক্তি থাকা সত্ত্বেও তা যখন ঘটনার ফেরে ব্যবহার করা চলে না, তখন হাত-পা বাঁধা মানীর অবস্থা কি হতে পারে তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কাকেও বোঝাতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

শ্বশুরবাড়ী থেকে ফিরে আসার পর, লক্ষ্মী দিনকতক ভালই ছিল. কিন্তু স্বামী, সন্তান ও মাকে কাছে না পাওয়ায় দিনের পর দিন শুকিয়ে যেতে লাগল। ডাক্তার বললেন যে, রোগ ভিতরে বাসা বেঁধেছে—তার কবল থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে মনকে প্রফুল্ল রাখা একান্ত দরকার। মায়ের কাছে থাকলে আশা করা যায় উপকার হবে মাতা ঠাকুরাণীকে লিখে দেওয়া ভাল. লক্ষ্মীকে যেন আলাদা ক'রে ফেলা হয়। তিনি বুদ্ধিমতী, বুঝে নেবেন কি করণীয়।

চিকিৎসার জন্যই লক্ষ্মীকে কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল। রোগের কিছুমাত্র উপশম হওয়ার আগেই পুনরায় ঘরে নিতে হ'লে, মাকে আদ্যোপান্ত সব খুলে লিখতে হয়। দীনেশকেও বলা উচিত কি না, চিন্তার বিষয় হয়ে উঠল। সে ত সবই জানে, তবু একদিনের জন্যেও এদিক্ মাড়াল না। সে ছেলের বাপ, শিশুর কল্যাণের জন্যই সন্তানকে মায়ের কাছে ফেরত দেওয়া উচিত। রাগ-অভিমানের কথা ভুলে একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখা ভাল। সিদ্ধান্ত স্থির হতে, দীনেশের কাছে নবগোপাল চিঠি পাঠাল, কিন্তু কোন উত্তর এল না। লক্ষ্মীর রোগকে আর লুকিয়ে রাখা সমীচীন হবে না ভেবে নবগোপাল মহামায়াকে চিঠি লিখে সবই জানাল। পত্রোত্তর নবগোপালের কাছে গেল না। সমস্ত ঘটনার উল্লেখ ক'রে দীনেশকে লিখলেন। কি লিখলেন তার বিষদ আলোচনার দরকার নেই, তবে ভাষার মধ্যে আদেশের ইঙ্গিত যে ভাবে কথার ফাঁকে ফাঁকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তাতে দীনেশের বুঝতে বাকি রইল না যে, মহামায়ার কাছে দৌহিত্রকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৌঁছিয়ে না দিলে, ভবিষ্যতের সংস্থান যে দলিলে আছে তাতে আবার কলম চলতে পারে।

ডাক্তারের চিঠি পেয়ে সাবধানতার জন্য যা দরকার মহামায়া সবই করেছিলেন। এমন কি, জামাই এলে তার থাকার ব্যবস্থাও পৃথক্ ঘরে হয়েছিল। স্থায়ী রোগ নিয়ে যখন লক্ষ্মী পিতৃগৃহে ফিরে এল তখন গ্রামে উৎসবের ধুম প'ড়ে গেল। লোকে ভাবল, রাজাবাবুদের বাড়ীতে এইবার যজ্ঞির ঘটা প'ড়ে যাবে। শহরে চিকিৎসায় যখন কিছু হ'ল না তখন, স্বস্ত্যয়নের উপলক্ষ্যে দরিদ্র নারায়ণ থেকে ব্রাহ্মণ ভোজন প্রত্যহই লেগে থাকবে। মঙ্গলা-কাঙ্ক্ষীদের মধ্যে কেউ বললে, সোনা দান, কেউ বললে ভূমি দান, কেউ বললে গাভী দান স্বস্ত্যয়নের অনুষ্ঠানে না থেকেই পারে না। চিকিৎসায় যে রোগ সারে না তাকে মন্ত্রপাঠে সায়েস্তা করা কি চাট্টিখানি কথা?

যথা সময় জামাইবাবু দাই সহ সন্তানকে নিয়ে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হলেন। দীনেশের একটি মহৎ গুণ ছিল, স্বার্থ বাঁচানোর প্রয়োজন থাকলে সে সহজেই নত হতে পারত। সমস্ত দোষ নিজের মায়ের উপর চাপিয়ে সে প্রমাণ করতে চাইল, মাতার আদেশ না মেনে উপায় ছিল না। এই কারণে লক্ষ্মীকে নানা অসুবিধা সহ্য করতে হয়েছে। মায়ের কাছ থেকে আলাদা থাকার মত আর্থিক ব্যবস্থা থাকলে যা ঘটেছে তা কখনই হ'তে পেত না। অত্যন্ত সৎপথে চলার দরুন আদালতেও

তেমন কিছু আর হয় না। প্রমাণ-জড়িত কারণ শুনে মহামায়া কতটা বিশ্বাস করেছিলেন তিনিই জানেন, তবে স্বীকারোক্তি শোনার সময়, বিদ্যুৎ চমকানোর মত তাঁর ঠোঁটের উপর মাঝে মাঝে বক্র হাসি দেখা যাচ্ছিল যার ইঙ্গিতপূর্ণ অর্থ পরম বোকাও বোঝে। দীনেশও এদিক্ দিয়ে পিছিয়ে ছিল না।

দীনেশ কিছুদিন থেকে কামারহাটিতেই আছে। এখানে আসার জন্য তাকে নাকি ত্যজ্যপুত্র হতে হয়েছে। কথাটা সত্য হলে মানতে হয়, লক্ষ্মীর জন্য সে সব কিছু পরিত্যাগ করতে পারে সুতরাং অবহেলার অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন। লক্ষ্মীর সেবা-শুশ্রূষা শৃঙ্খলার সহিত নিয়ম বদ্ধ হওয়ায় হাসপাতালের রীতির মতই ওর ঘরে দেখা করার জন্য সময় নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। দীনেশও মাত্র একবার ঘরে যেতে পেত এবং অল্পক্ষণ থেকেই বেরিয়ে আসতে হ'ত।

শ্যামলার উপর তখন সংসার চালানর যাবতীয় ভার পড়েছে। মহামায়া শিশুকে সুস্থ রাখার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করছেন। পূজাহ্নিকের কর্ত্তব্য ছাড়া রোগী ও শিশুর তত্ত্বাবধানে তাঁর সমস্ত সময় অতিবাহিত হয়ে যেত, তাই সংসার চালানর ভার শ্যামলার উপর ছেড়ে দিতে হয়েছিল। জমিদারী-সংক্রান্ত ব্যাপারে এ বাড়ীতে অতিথির ভিড় লেগেই থাকে নয় প্রজার দল অভিযোগ কাঁধে ক'রে হাজির হয়, অথবা নায়েববাবুরা একটু সদর কাছারি ঘুরে যান, খানাতল্লাসীর হাওয়া কোন্ দিকে বইছে জানার জন্য। এসব কাজ আগে ম্যানেজারবাবুই করতেন কিন্তু-দুই তিনটি বড় মহাল মোটা টাকার হস্তবুদ থাকা সত্ত্বেও সেগুলি নিলামে চড়ার পর থেকে মহামায়া প্রজাদের অভিযোগ পর্দার আড়াল থেকে নিজেই শুনতেন, সরকারী রেভিনিউ দেওয়ার দায়িত্বও নিজে নিয়েছিলেন। এদের ঝঞ্ঝাট ত আছেই, তার উপর জামাইবাবু আসায় একাই একশ' হয়ে বসেছেন। মহামায়া জামাই-এর সামনে বার হতেন না। এই কারণে আহারকালীন শ্যামলাকে জামাইবাবুর সামনে বসতে হ'ত, ভক্ষদ্রব্যগুলি চিনিয়ে দেবার জন্য। এই সময় দীনেশের দুই-একটি রসিকতা যে কথাপ্রসঙ্গে ছিটকে বেরিয়ে আসত না এমন কথা বলা যায় না। শ্যামলা শ্যালিকার স্থান অধিকার করায় রসিকতার মধ্যে এমন অনেক ইঙ্গিত থাকত যা ভদ্রোচিত বলা চলে না। শ্যামলা প্রকারান্তরে প্রতিবাদ জানাত, কিন্তু কপট প্রতিবাদে যে সঙ্কেত প্রকাশ পেত তাতে সমর্থনের আভাসই থাকত বেশি।

লক্ষ্মীকে সবচেয়ে বড় ঘর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ঘরের সামনেই চওড়া বারান্দা। বারান্দার বাইরে ফুলের বাগান। আবেষ্টনী মনোরম হলেও, যার জন্য ঘরের ভিতর আলো-বাতাস আর সুগন্ধের আয়োজন সেই স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে নির্লিপ্ত। এই কারণে মহামায়াকে সব সময়ই দুশ্চিন্তা ঘিরে থাকত। তিনি জানতেন, লক্ষ্মীর রোগটি কি এবং তার পরিণতি কোথায়।

সেদিন হঠাৎ মহামায়া অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নতুন শীতের আবির্ভাবে ঘরে ঘরে সর্দ্দি, কাশী ও জ্বরের উপদ্রব সুরু হয়ে গিয়েছে। রোগের চলন্ত বীজাণু মহামায়াকেও ছাড়ান দিল না। মাথা ধরাটাই রোগের অগ্রদূত। লক্ষণ দেখে শ্যামলা মহামায়ার কাছে থাকতে চায়, কিন্তু সেবার প্রয়োজন থাকলেও তিনি বলেন, তা কি হয় রে পাগলী? তুই জামাই আর মেয়েটাকে দেখ্। ক্ষুদে নাতির দুধ খাওয়ার সময় দাইকে বলিস্ বোতলটা ভাল ক'রে ধুতে। না, না, তুই নিজে ধুয়ে দিস। ওরা বড় নোংরা।

নিত্য সন্ধ্যায়, ঘরে ঘরে ধুনো দেওয়া ও বাতি জ্বালা শ্যামলার কাজ। ধুনোর পালা শেষ ক'রে, জামাইবাবুর ঘরে বাতি দিতে গিয়ে দেখে, তিনি বিছানায় শুয়ে পড়েছেন এবং নিজেই নিজের মাথা টিপছেন। ধুনো দেবার সময়ও ব'সে ছিলেন, এরই ভিতর কি হ'ল কে জানে? ঘরে আলো আসতে বিরক্ত হয়ে বললেন, ওটা আবার কেন, বড্ড চোখে লাগে, বাইরে রেখে দাও।

আলো অপসারিত হওয়ায় ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে শ্যামলা যন্ত্রণার কাতর ধ্বনি শুনতে লাগল। মানুষ যন্ত্রণায় অতটা অধীর হয়ে পড়লে সচরাচর লোকে কারণ জিজ্ঞাসা করে এবং উপশমের ব্যবস্থা সম্ভব হলে তাও করতে হয়। যখন শুনল, বড্ড মাথা ধরেছে, তখন কিছু না ভেবেই জিজ্ঞাসা ক'রে ফেলল, মাথা টিপে দেব? কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলার ভিতরটা ছ্যাঁক্ ক'রে উঠল। প্রথম ধাক্কা সামলে নিতেই মনে হ'ল, এখানে বেশিক্ষণ থাকলে সে নিজেকে ধ'রে রাখতে পারবে না। অজ্ঞাত আশঙ্কা যেন তাকে শিখিয়ে দিল, স্মেলিং সল্ট্ আনার অছিলায় এখান থেকে চ'লে যেতে পারে। কিন্তু মন চললেও পা চলে না। অন্ধকারের আড়ালে যে রহস্যময় আশঙ্কা লুকিয়ে ছিল, তারও কি সম্মোহন ছিল একটা বিষধর সাপের দৃষ্টিতে যে সম্মোহন অনুভব করে তার শিকার?

শ্যামলার দেহ ও মনে তখন কাঁপুনি সুরু হয়ে

গিয়েছে। শ্যামলা চৌকাঠের ওপাশে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করছিল। বোধ হয় উত্তরটা তার শুনে যাওয়া উচিত। খানিকক্ষণ পরে, বেদনাজড়িত কণ্ঠে জামাইবাবু বললেন, হ্যাঁ, তাই দাও। মাথাটি টিপেই দাও একটু, বড় বেদনা।

শ্যামলা ধীরে সন্ত্রস্তপদে জামাইবাবুর মাথার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। প্রাচীন চালের অতিকায় পালঙ্ক। শ্যামলা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে হাত বাড়ালে আঙুলের ডগা দিয়ে কপাল ছোঁয়া যায় বটে, কিন্তু হাতের তেলো থাকে অনেকটা পিছিয়ে। ঘুরে আসতে হ'ল শ্যামলাকে। আর একটু নাগালের মধ্যে।

ঘটনা যখন নানা রঙে রঞ্জিত হয়ে গ্রামে প্রচারিত হতে সুরু হ'ল তখন মহামায়ার সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হয়েছে। তিনি স্থির করলেন, দীনেশের সামনে বার হবেন এবং কামারহাটি থেকে তাকে বাইরে যেতে বলবেন।

সব কিছুর জন্য প্রস্তুত হয়েই সেদিন দীনেশের ঘরে ঢুকলেন। দীনেশ তখন সহজ অবস্থায় ছিল না। মহামায়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও দীপ্তিপূর্ণ গৌরাঙ্গীকে চেনার কোন অসুবিধা হ'ল না। অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় দীনেশ তখন ধূমপান করছিল। মহামায়াকে ঘরে দেখে তাড়াতাড়ি ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সিগারেটের ছাই ফেলার জন্য ভস্মাধার সামনেই ছিল কিন্তু মহামায়া অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘরে ঢোকায় দীনেশ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। জ্বলন্ত সিগারেট হাতেই ধরা রইল।

মহামায়া আদেশ করলেন, বৈঠকখানায় এস, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ফাঁসীর হুকুম শোনার পর খুনে-আসামী যে ভাবে বধ্যভূমির দিকে অগ্রসর হয়, সেই ভাবে দীনেশ মহামায়াকে অনুসরণ ক'রে বসবার ঘরে গেল।

বৈঠকখানায় যাবার সময় দীনেশের টলায়মান দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখেও মহামায়া বিচলিত হলেন না। বললেন, বোস।

আদেশ পালিত হবার পর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ছিলেন। ঐটুকু সময়ের মধ্যেই তাঁর মুখাবয়বের পরিবর্ত্তন দেখা গেল। অটল পাহাড়ের উপর ঝড়ের পূর্ব্বাভাস তখন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঝড়ের পূর্ব্বে গুমট যেভাবে আলোড়নের আশঙ্কা প্রচার করে, সেইরূপ ঘরের ভিতরকার নিস্তব্ধতা দীনেশকে ভারাক্রান্ত ক'রে তুলল। মহামায়ার মত শক্তিশালিনী নারীর সান্নিধ্য লাভ ইতিপূর্ব্বে দীনেশের হয় নি। বেশীক্ষণ সে সহজ ভাবে বসে থাকতে পারল না, আপনা থেকেই মাথা নত হয়ে গেল। মহামায়া জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে কি জানাতে চাই অনুমান করতে পার?

বলাই বৃথা, ঘরে ঢোকার আগে অনুমান অনেক কিছু গ'ড়ে তুলছিল, কিন্তু কোন্‌টা ঠিক, স্থির না করতে পেরে দীনেশ চুপ ক'রে রইল।

মহামায়া বললেন, তোমাকে জড়িয়ে লোকে নানা কথা বলছে, লক্ষ্মী জানতে পারলে কি দারুণ আঘাত পাবে তা ভেবে দেখেছ কি? ঐরূপ আঘাতে মেয়েটার যদি কিছু হয়ে যায় তা হ'লে শিশুর কি দুর্গতি হবে কল্পনা করতে পার? আমার শরীরে ঘুণ ধরেছে, ওপারে যেতে বেশী দিন নেই। নবগোপাল এখনও বিবাহ করে নি। করলে কি রকম বৌ আসবে বলা যায় না। নতুন বৌ যদি আমাদের অবর্ত্তমানে ছেলেটার দিকে না তাকায় তা হ'লে সে যে জলে ভেসে যাবে, সে বিষয় দ্বিমতের কিছু আছে কি?

পিতা যে পুত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, ঐটুকু জানাবার দরকার ছিল তাই নাতির কথা তুলতে হ'ল।

নাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনার পর মহামায়া আসল কথা বলার জন্য কঠোর হয়ে উঠলেন। মনোভাব প্রকাশ করতে একটু সময় লাগল। বললেন, কেলেঙ্কারীকে চাপা দিতে হলে তোমাকে কামারহাটি থেকে যেতে হয়।

আকস্মিক প্রস্তাব শুনে দীনেশ বিবেচনা ক'রে দেখল, মেয়েকে শাসনের অধীনে রাখলে মাকেও জব্দ করতে কোন অসুবিধা হবে না। প্রবাদবাক্যেই আছে—কান টানলে মাথা আসে। দীনেশ উত্তর দিল, কলকাতায় গিয়ে থাকব কোথায়? থাকার জায়গা যদি জোটে তা হলে লক্ষ্মীকেও সঙ্গে যেতে হয়। তার সঙ্গে শ্যামলাকে না নিলে সেবা করবে কে?

মানুষ এত নির্লজ্জ বেহায়া ও নির্দ্দয় হতে পারে মহামায়া কল্পনাও করতে পারেন নি। উত্তর দিলেন, শ্যামলার ব্যবস্থা আগেই হয়ে গিয়েছে। ওরা সকলেই কামারহাটি ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে। যেখানে যাবে সেখানে ভালভাবেই থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

দীনেশ অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করে, ওদের ত নিজেদের বাড়ী, জমি সব ছিল, সেগুলি ছেড়ে চলে যাবে? আপনি কি ওদের উচ্ছেদ করলেন? আইন ত এইরূপ আচরণ মানবে না। তা ছাড়া বংশানুক্রমে যারা আপনাদের

আশ্রয় পেয়ে এসেছে তাদের হঠাৎ ভিটা-ছাড়া করলে লক্ষ্মীর কোনও অকল্যাণ হবে না?

মুমূর্ষু রোগীর স্বামী হয়েও যে লোক সেবার দায়িত্ব নিজে নিতে চায় না, তারই মুখে লক্ষ্মীর অকল্যাণের কথা শুনে মহামায়া বাস্তবিকই হেসে উঠলেন। সে হাসিতে শত বৃশ্চিকের বিষোদ্গিরণ ছিল। বৃশ্চিক দংশনের জ্বালায় দীনেশ অস্থির হয়ে উঠল। শ্যামলাকে বিতাড়নের খবর দীনেশের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। লজ্জার মাথা ইতিপূর্ব্বেই চর্ব্বিত হয়েছিল, সুতরাং ওদিকে দৃক্‌পাত না ক'রে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, আমরা এখান থেকে যাবার পর শ্যামলা যদি সঙ্গে না যায়, দিনরাতের জন্যে দুইটি নার্স রাখতে হয়। তাদের টাকার ব্যবস্থা নিশ্চয় আপনি করবেন?

শান্ত এবং দৃঢ় ভাবে মহামায়া উত্তর দিলেন, লক্ষ্মী এইখানেই থাকবে এবং সামনের সপ্তাহে শ্যামলার বিয়ে। ওর স্থান স্বামীর ঘরে।

শ্যামলার বিয়ে! এও কি সম্ভব?

দীনেশের মুখ দেখলেই অনুমান করা চলে, সে ভাবছে, অমন একটা চরিত্রহীন মেয়েকে বিয়ে করবে কে?

শিল্পী ও পৃষ্ঠপোষক

ডঃ আনন্দ কুমারস্বামী

অনুবাদ: সুধা বসু

১। সৌন্দর্য্য

প্রসঙ্গক্রমে নয়, স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্যের গূঢ় অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেই যদি আমরা সৌন্দর্য্যের বিচারকর্ম্ম স্থগিত না করে থাকি, তা হলে এর কারণ হ'ল এই যে, শিল্পকলার স্বাভাবিক আদর্শে কিছু নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মূলে কখনও সৌন্দর্য্যের প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নি। কোন শিল্প-সৃষ্টির মূলে ও অন্তরালে সর্ব্বদাই একটি উপলক্ষ্য থাকে; যেমন তেমন করে, যা কিছু একটা রচনা করলেই হ'ল না। সর্ব্বপ্রকার শিল্প-রচনার জন্যেই কোন বিশেষ বস্তু বা কোন রূপ নির্দ্দিষ্ট থাকে। সদাশয়তার ন্যায় সৌন্দর্য্য ও একটা অনির্দ্দিষ্ট তত্ত্বমূলক বিষয়। কেহ হয়ত সাধারণভাবে কিছু সৎকাজ ও সুন্দর কিছু রচনা করবার সঙ্কল্প করতে পারেন। পরিণতিতে তিনি কোন ক্ষেত্রেই হাস্যাস্পদ না হয়ে বরং 'আড়ষ্ট বা অভিভূত' এবং কিছু পরিমাণে 'সৌখিন' হয়ে উঠবেন। মানুষ কোন সৎ উদ্দেশ্যে কাজ করতে পারেন; কিন্তু সদাশয়তা-চর্চ্চার মানসেই সৎকাজ করেন না। ঠিক এই আদর্শে বা এই রীতিতে একমাত্র উন্মাদ ব্যক্তিই কিছু করার জন্যই করে থাকেন অথবা, বলতে কিছু হবে বলেই বলে যান। অতি উৎসাহী পাচক নিছক রান্নার জন্য রন্ধন কার্য্যটি করেন না; তার মন জুড়ে ব'সে আছেন অতিথিবৃন্দ। সুতরাং একজন সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের কাজের অনুপ্রেরণা কোন সৌন্দর্য্যস্পৃহা বা মনস্তাত্ত্বিক অতৃপ্তিসম্ভূত নয়। এর মূলে থাকে পৃষ্ঠপোষকের প্রয়োজনমূলক বিশেষ কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সমস্যা। কেহ যদি নিজের বাড়ী স্বহস্তে নির্ম্মাণ করেন তা হ'লে সে সমস্যা স্বকীয়; আর যদি অন্য লোক কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়ে করেন, তবে সে সমস্যা হবে সেই অপর ব্যক্তিটিরই।

কোন শিল্পী বা কোন বস্তুর নির্ম্মাতাকে তাঁদের স্বকীয় রচনার সৌন্দর্য্য আলোচনা করতে বিশেষ শোনা যায় না। যিনি স্রষ্টা, তাঁর ভাবটি হ'ল যে, কোন রচনা হয়ত ভাল হয়ে সঠিক রূপটি পেতেও পারে; না হয়ত খারাপ হয়ে ব্যর্থ সৃষ্টিতেও পর্য্যবসিত হতে পারে। সহজাত কলাকৌশল বৃত্তির পরিচায়ক হচ্ছে সরল সাদাসিধেভাবে ও সম্পূর্ণরূপে একটি ভাল কাজকে সঠিকভাবে সম্পন্ন করা। কোন জিনিষ অনিপুণভাবে নির্ম্মিত হ'লে শিল্পী উহাকে 'আকৃতিবিহীন' আখ্যা দিতে পারেন। এর অর্থ হচ্ছে যে, মূল পরিকল্পনাটি অজ্ঞতাসূচক অথবা, কোন প্রকারে জোড়াতালি বা গোঁজামিল দিয়ে জিনিষটিকে দাঁড় করান হয়েছে! শিল্প বস্তুর যুগপৎ দু'টি গুণ থাকা চাই। একটি হ'ল চোখকে তৃপ্তিদানের ক্ষমতা; আর দ্বিতীয়টি হ'ল প্রকৃতি উদ্দেশ্য সাধনের উপযুক্ততা। কিন্তু যিনি দার্শনিক, তিনি এসে মন্তব্য করেন যে, শিল্পীর রচনাটি বেশ সুন্দরই হয়েছে। একথার উত্তরে শিল্পী

বলে উঠলেন—"আপনার যে পছন্দ হয়েছে এতেই আমি খুশী।"

এখন দার্শনিকের মতামতটি বিচার করা যাক। তিনি তাঁর পরিবেশের অন্যান্য জিনিষ যা হয়ত স্বকীয় ভাবেই সুন্দর ও অসুন্দর দুই-ই, উহাদের মত এই আলোচ্য বস্তুটিকেও একই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেছেন অথবা একই দৃষ্টিতে দেখেছেন। শিল্পকলার যেমন একটি বিশ্বজনীন ধারাবাহিক রীতি আছে, তেমনি সৌন্দর্য্যেরও একটা চিরাগত আদর্শ আছে এবং তা যে কোন জিনিষ প্রসঙ্গেই প্রযোজ্য। দার্শনিকের জিজ্ঞাসা হ'ল,—"সৌন্দর্য্য বলতে কি বোঝায়?" গুণ হিসেবে উহা এমন দু'টি বস্তুর মধ্যে একই মাত্রায় প্রকটিত হতে পারে যে, সেই বস্তু দু'টি হয়ত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির ও ভিন্নধর্মী। দার্শনিক বস্তুর সন্ধানী নন, তিনি হলেন মূলতত্ত্বের সাধক। দার্শনিকের সৌন্দর্য্যাদর্শ সাধারণ মানুষের পছন্দ-অপছন্দ ও ভালমন্দ বিচারের অনুবর্ত্তী নয়। অগাষ্টাইন বলেছেন যে, এমন কতক মানুষ আছেন যাঁরা অঙ্গ-বৈকল্যই পছন্দ করেন। আকৃতিগত বাহ্য সৌন্দর্য্যের মধ্যে কিছু চিত্তাকর্ষক, না হয় অপ্রীতিকর কিছু থাকবেই (প্রত্যেক মানুষেরই বিশেষ প্রিয় রং, আকৃতি এবং গঠন-পদ্ধতির প্রতি বিশেষ ঝোঁক বা প্রবণতা থাকে) অথবা, উহার সঙ্গে সাদৃশ্যের ফলে অন্য এমন জিনিষ মনের মধ্যে জেগে উঠবে, যা হয়ত স্বকীয় ভাবেই আকর্ষণীয়ও হতে পারে, আবার বিরক্তিকরও হতে পারে। অর্থাৎ উহা এমন এক ব্যক্তির প্রতিকৃতি চিত্র, যাঁকে হয়ত আমি শ্রদ্ধা করি ও ভালবাসি, আবার তিনি হয়ত আমার ঘৃণার পাত্রও হতে পারেন। এই জাতীয় ব্যাপারে আমাদের বিচার-পদ্ধতি চলে পক্ষপাতিত্ব অথবা অভ্যাসের বশবর্ত্তী হয়ে। যখন আবার বিভিন্ন দিকে আমাদের সহানুভূতির মাত্রা বৃদ্ধি এবং রুচিজ্ঞান উন্নত হওয়া বাঞ্ছনীয়, তখনও উহা সৌন্দর্য্যগত না হয়ে, কড়াকড়িভাবের নৈতিক ব্যাপারে হয় পরিণত। তখন আর উহার শিল্পকলার জ্ঞানগত বা বুদ্ধিদীপ্ত বৈশিষ্ট্য বা মূল্য সম্বন্ধে কিছু করণীয় থাকে না। আমরা যদি ঐ পর্য্যন্ত পৌঁছেই বিরত হই, তবে আমরাও তাঁদের পর্য্যায়ভুক্তই হ'ব যাঁদের প্রসঙ্গে প্লেটো বলেছেন, "মনোরম বর্ণালী দেখ, আর মধুর ধ্বনিসমূহ শোন, কিন্তু কোন প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ রূপের অস্তিত্বকে স্বীকার ক'রো না।"

এই সকল বিষয়-বহির্ভূত একটা বুদ্ধিবৃত্তিগত সৌন্দর্য্যের অস্তিত্বও রয়েছে যা কোন প্রকারেই পছন্দ অপছন্দের গণ্ডিতে সীমিত নয়। এই জাতীয় সৌন্দর্য্য বাহ্য আকার ও নৈতিক দিকে অরুচিকর বস্তুর মধ্যেও প্রকটিত হয়ে আনন্দদায়ক হতে পারে; যেমন একখানি সুষম গড়নের অস্ত্রের মধ্যে একজন শান্তিবাদী মানুষের এবং একটি নগ্নদেহের প্রতিরূপের অন্তরে কোন সন্ন্যাসীর সৌন্দর্য্যানুভূতি বা সৌন্দর্য্যের সন্ধান প্রাপ্তি।

কোন বস্তুর 'সৌন্দর্য্য'—এই কথাটির অর্থ হ'ল কোন সুষ্ঠু কাজ বা কোন রূপের উত্তম বিন্যাস। কোন বস্তুর বাস্তবিকতা ও তাৎপর্য্য অনুসারেই সৌন্দর্য্যের বিচার হয়ে থাকে। মূল্য বিচারের ক্ষেত্রে সব জিনিষেরই একটা স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য আছে। অর্থাৎ ধ'রে নিতে হবে যে, দু'টি জিনিষই স্বতন্ত্রভাবে নিখুঁত এবং একটি অপরটির ন্যায়ই সুন্দর। যেমন, একটি হিপোপটেমাস একজন মানুষের মত এবং একটি চক্র একটি গীর্জ্জার মতই স্ব স্ব ক্ষেত্রে ও স্বকীয় অভিব্যক্তিতে সুন্দর। সমগ্র বিশ্বপটের সৌন্দর্য্য এই সকল বস্তু ও প্রাণীর সমন্বয়ে ও সমাহারে রচিত। এবং প্রতিটি অংশ ও বস্তুসামগ্রী স্বতন্ত্র রূপে ও স্বকীয় ভাবেই কেবল সুন্দর হতে পারে; অর্থাৎ উহারা বিশেষ নির্দ্দিষ্টরূপে অথবা রীতিসিদ্ধ ভাবেই সুন্দর। নিছক রীতিবিরুদ্ধ যা—তাই-ই কুৎসিত ও অসুন্দর। একটি নিখুঁত সাদাসিধে সরল প্রকৃতির জিনিসও সুন্দর হতে পারে, কিন্তু একটি রূপবিহীন অসুন্দর বস্তুতে শত অলঙ্কার যোজনা করেও তাকে সুন্দরের কোঠায় উন্নীত করা যায় না। যৌক্তিকতা রক্ষা ক'রে, ভালভাবে ও সত্যরূপে যা কিছু নির্ম্মাণ করা যায়, তাই-ই সুন্দর বলে হয় পরিগণিত।

এই সৌন্দর্য্যের তত্ত্ব, যা রুচি-প্রবৃত্তির উপরে নির্ভরশীল নয়, তা ব্যাখ্যাত হয়েছে এইরূপে:

চরমোৎকর্ষ অথবা যাথার্থ্য; সামঞ্জস্য অথবা সুর-সঙ্গতি হ'ল সমগ্ররূপের এক-একটি অংশ বিশেষ এবং এক-অপরের পরিপূরক। আর ঔজ্জ্বল্য অথবা স্পষ্টতাগুণ আনে বোধগম্যতার ভাব। এর সবকয়টি বিষয়ই সৌন্দর্য্য বিচারের ভিত্তিস্বরূপ, বিশেষতঃ উহা যখন চাক্ষুষভাবে প্রত্যক্ষীভূত নয়।

উৎকর্ষ, নিখুঁতভাব অথবা সত্যের পরিমাপ হয় সেই নির্দ্দিষ্ট বস্তু এবং উহা রচনার পূর্ব্বে এবং পরেও শিল্পীর মনে ঐ সম্বন্ধে যে ধারণা উদ্ভূত হয়েছিল—এই দুয়ের সমন্বয়ের ভিত্তিতে। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত সৌন্দর্য্য হচ্ছে বিশেষ কোন যোগ্যতা বা প্রবণতারই সামিল। ইহা কেবলমাত্র বস্তুর কার্য্যকারিতাগুণের মধ্যেই নিহিত থাকে না; ইহাদ্বারাই শিল্পের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য হয় প্রকাশিত। ইহা সাধারণভাবে কোন

অভিযোজন নয়; প্রত্যক্ষভাবে উপযোগিতা বৃদ্ধির একটি প্রণালী।

সুরসঙ্গতি বা সামঞ্জস্য হ'ল বিভিন্ন অংশ বা অঙ্গ-অবয়বকে সুশৃঙ্খলরূপে স্থাপনা ও সংযোজনা। যেমন একখানি মুদ্রিত পৃষ্ঠায় বিষয়বস্তু ও সাদা কিনারাসমূহের বিন্যাস এবং উহার আনুপাতিক মাপজোখ; অথবা, একটি গীর্জ্জার অভ্যন্তরে জনসমাবেশের স্থান ও দেওয়ালের পার্শ্ববর্ত্তী উন্মুক্ত স্থানের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান। শিল্পবিষয়ক ধারাবাহিক শাস্ত্রগ্রন্থরাজির প্রধান অংশ-সমূহে লিপিবদ্ধ আছে শিল্পের উপাদান নির্ব্বাচন ও উহা নির্ম্মিতির নির্দ্দেশাবলী এবং বিভিন্ন প্রকৃতির সম্ভাব্য বস্তুসামগ্রীর উপযুক্ত মাপজোখ, রূপারোপ ও সামঞ্জস্য বিধানের সূত্রাবলী। এই নির্দ্দেশসমূহ স্থিরীকৃত হয়েছে দু'টি বিষয়ের সহায়তায়। একটি হ'ল সৃষ্ট বস্তুর স্থূল ও প্রত্যক্ষ কার্য্যকরী ক্ষমতা; আর দ্বিতীয়টি হ'ল আদর্শ-বাদিতার দিক্ অর্থাৎ বিশ্বরহস্যের সৃষ্টিমূলক সম্বন্ধকে সচেতনভাবে অনুকরণমূলক। এই সমানুপাতের ধারাবাহিক একই বস্তুতে সম্মিলিত হতে পারে এবং ইহা এমন একটি মতের উপর নির্ভরশীল যা দীক্ষাগ্রহণের বা অনুপ্রেরণালাভের ব্যাপারে পূর্ব্ব থেকেই পরোক্ষভাবে যোগযুক্ত। আর সমগ্র বিশ্বজগৎ একটি সাধারণ ভিত্তিগত সমানুপাতের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই সমানুপাত বা সামঞ্জস্য বিশ্বপ্রকৃতির সমুপযুক্তই এবং উহার আভাস প্রকৃতির প্রতিটি অঙ্গ-অবয়বে সম্পূর্ণ বিদ্যমান। সুপরিকল্পিতভাবে সৃষ্টিরহস্যমূলক ভাবযোজনা—গীর্জ্জা বা মন্দির স্থাপত্যের মত যে কোন ধর্ম্মমূলক শিল্পেরই বিশিষ্ট লক্ষণ।

ঔজ্জ্বল্য মূলগত জিনিষ হ'লেও প্রকৃত সৌন্দর্য্যের ক্ষেত্রে ইহা তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। চিরাচরিত বিশ্লেষণ ও বিচার পদ্ধতিতে আলো, বর্ণবিন্যাস, ঔজ্জ্বল্য, সমারোহ প্রভৃতি বাস্তবিকপক্ষেই সম্ভবতঃ সৌন্দর্য্যের প্রধান অঙ্গ; এবং এই অর্থেই ইহা প্রধান, যেমন বলা হয়—পুস্তকস্থ চিত্রমালার মনোহারিত্ব, ভাষার চমৎকারিত্ব, অথবা ভাবাদর্শের স্বচ্ছতা এবং কোন গ্রন্থকারের বক্তব্যের প্রাঞ্জলতার ইত্যাদি ঔজ্জ্বল্য সম্বন্ধে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এর কোন সম্পর্কই নেই। আজকাল ঔজ্জ্বল্য অর্থে বাস্তবিক বা সাধারণ মামুলী আলোর অস্থায়ী বা স্বল্পস্থায়ী প্রভাবের কথাই ধরা হয়; অর্থাৎ বিশেষ ধরণের আলোর প্রভাবে বস্তুর যে রূপটি প্রতিভাত হয়। পরম্পরাগত শিল্পে বাস্তবিকই এই অর্থে ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি কখনও হয় না। সেখানে বস্তুর ঘনমান ও কাঠিন্য সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়ে থাকে বিমূর্ত্ত আলোর সাহায্যে। সৌন্দর্য্য প্রকাশনার উজ্জ্বলভাব ও স্পষ্টতা হ'ল বুদ্ধিদীপ্ত আলোর মত যা শিল্পবস্তুর সমানুপাতিক অংশ সমূহকে তোলে আলোকময় ক'রে। এ হ'ল সেই বিশেষ ধরণের দীপ্তি যার অন্তরে রয়েছে রূপ হ'তে রূপান্তরের ব্যঞ্জনা বা ইঙ্গিত। এ হ'ল সেই দস্তুরমাফিক রীতিসিদ্ধ আলো, যার ধারা অনুসরণ করেই রূপ গ্রহণ করেছে শিল্প বস্তুটি; আর এই শিল্পে সমাবিষ্ট উপাদানের মাধ্যমেই এখন আলো হচ্ছে বিকীর্ণ। এই পদ্ধতিতেই আত্মাকে দেহের একটা অঙ্গ বা অংশরূপে বিবেচনা করা হয়। দীপ্তি বা প্রভাই হ'ল স্বাস্থ্যের বর্ণালি এবং কোন বিষয় অথবা বস্তুর উৎকর্ষ। যখন কোন কিছুর অন্তর্নিহিত সত্ত্বা স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে বিকশিত হয়, তখন উহা যে জাতীয় জিনিষই হোক না কেন, তা হয়ে ওঠে উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান।

আমাদের এই অভিজ্ঞতাই হয়েছে যে, জিনিষটি যে ধরণেরই হোক না কেন, যদি নিখুঁতভাবে নির্ম্মিত হয়, তবে উহার উপাদান ইত্যাদির প্রশ্ন ব্যতীতই উহা সুন্দরের কোঠায় স্থান অধিকার করবে। আমরা আরও উপলব্ধি করেছি যে, কোন জিনিষের সৌন্দর্য্য যেন একটা আকস্মিক ঘটনা এবং উহা ঐ বস্তুর অস্তিত্বের কারণ-সঞ্জাত নয়। তা হ'লে সৌন্দর্য্য কিসের জন্য? উত্তরটি বেশ মামুলী ও নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতির। সৌন্দর্য্য হ'ল আনন্দের উৎস। তবে ইহা কেবল নিজের মধ্যেই পর্য্যবসিত থাকে না; পরন্তু বিশেষ কর্ম্মাদর্শের অনুপ্রেরণাও বটে।

সৌন্দর্য্য আমাদের আকর্ষণ করে না; যা সুন্দর তার প্রতিই আমরা আকৃষ্ট হই। সৌন্দর্য্য হ'ল অনুভবের জিনিষ। তবে উহার মাধ্যমেই কোন বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। সৌন্দর্য্য হচ্ছে সত্যের এমন একটি বিশিষ্ট অঙ্গ যার প্রভাবে আমরা সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হই। অলঙ্কার শাস্ত্রের কাজ ও গুণই হ'ল ভাষাকে সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত করণ। কেবল নিজের মানসে স্বকীয় বক্তব্য ব্যক্ত করাই নয়। অধিকন্তু বক্তব্যের প্রতি আমাদের আকৃষ্ট করা। কোন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান্ শিল্পী নিছক আনন্দদানের উদ্দেশ্যেই কোন শিল্প সৃষ্টি করেন না; বরং মানুষের রুচি প্রবৃত্তিকে সুপরিচালনার মানসে করে থাকেন। দান্তে যেমন নিছক সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্যেই তাঁর 'ডিভাইন কমেডি' রচনা করেন নি; তিনি নিজেই আমাদের সন্দেহ নিরসন করে বলেছেন যে, এই গ্রন্থখানি রচনার মূলে আদর্শটি সম্পূর্ণ বাস্তবধর্ম্মী, অর্থাৎ তিনি জন-সমাজকে দুঃখ-দুর্দ্দশামুক্ত ক'রে আনন্দময় জীবনের দিকে পরিচালিত করণের মানসেই উহা রচনা করেছিলেন।

এই অর্থে প্রত্যেকটি বাস্তবিক রূপের খাঁটি শিল্পকর্ম্মই হচ্ছে নীতিগর্ভ ও শিক্ষাপ্রদ। কোন শিল্প নিদর্শনের অন্তরস্থিত ভাব-সম্পদকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র উহার রচনা-রীতি ও আংশিক পদ্ধতিকেই যদি প্রশংসা করা হয়, তবে ভাবগম্ভীর-চিন্তাশীল শিল্পী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষুণ্ণ হন। পূর্ব্বে যেমন বলা হয়েছে যে, পুডিং-এর উৎকর্ষ বিচার করা যেতে পারে উহাকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেই। কিন্তু যে মানুষ একমাত্র সাহিত্যিক মূল্য ও তাৎপর্য্যের জন্যেই বই পড়েন, অথবা কোন চিত্রপটের বর্ণালির মধ্যেই যে চিত্রসত্ত্বা নিহিত থাকে না, তাকে উপেক্ষা ক'রে, বাহ্য সৌন্দর্য্যই মাত্র বিচার করে থাকেন, তাঁকে তুলনা করা যায় এমন ব্যক্তির সঙ্গে যিনি একটি কেক সম্পূর্ণ হজম করবার শক্তির অভাবে উহার উপরিভাগের মিষ্টি আবরণটিই আস্বাদন করেন।

স্বাভাবিক-পন্থী শিল্পীর মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল শিল্প দ্রব্যটিকে সুষ্ঠুরূপে গ'ড়ে তোলা। তিনি কিছু সঞ্চিত না রেখে স্বীয় ভাবভাণ্ডারের সমগ্র উজাড় করে দিয়ে থাকেন সেই শিল্পটির ভাবসত্তার রূপায়নে। সে শিল্পী কখনও তাঁর রচনাকে স্বীয় নামাঙ্কনে চিহ্নিত করেন না, অথবা যে নির্দ্দিষ্ট স্থানের উপযোগী করে এবং যে উদ্দেশ্যে উহা রচিত, তার বাইরে কোথাও উহা প্রদর্শনেরও ইচ্ছা পোষণ করেন না।

মিউজিয়ম সংগ্রহশালাসমূহে স্থান অধিকার করে শিল্পরাজিকে প্রদর্শনের যে উচ্চাভিলাষ, এর অপেক্ষা আধুনিক শিল্পের অসারতা ও বাহ্যাড়ম্বরে অধিক প্রমাণ আর কি হতে পারে! সুন্দর জিনিসের অনুরাগীদের সঙ্গে স্বাভাবিক শিল্পী সহযোগিতা করবেন না অথবা তাঁদের উদ্দেশ্যে কিছু রচনা করতে নারাজ এমন কথা নয়। তবে তাঁর সম্মুখে মুখ্য আদর্শ রয়েছে জিনিষের ব্যবহারিক উপযোগিতা। স্বাভাবিক শিল্পী হলেন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন একজন মানুষ। একজন সৈনিকের প্রতি তাঁর মনোভাবটি কল্পনা করা যাক্। সৈনিকটির জন্যে হয়ত তিনি চমৎকার একখানি তরবারি প্রস্তুত করে দিলেন। আর সেই সামরিক মানুষটিও দিবারাত্র তরবারিখানির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু উহাকে কাজে লাগানর কোন চিন্তা ও চেষ্টা তাঁর একেবারেই নেই। তখন শিল্পীর মনের ভাবটি কি হয়? একখানি মূর্ত্তি বা প্রতিমা রচনার ব্যাপারেও শিল্পীর মনোভাব ঠিক অনুরূপ ধরনেরই। শিল্পীর কর্ত্তব্যই হ'ল প্রতিমাখানিকে সুষ্ঠুরূপে নিখুঁত ভাবে গড়া এবং তিনি স্বভাবতঃই আকাঙ্ক্ষা করবেন যে, ক্রেতা বা পৃষ্ঠপোষকের উহা ব্যবহারের বিধি-নির্দ্দেশও জানা থাকবে। এই প্রসঙ্গে সৌন্দর্য্যতত্ত্ববিদ্, যিনি শুধু সংগ্রহশালার দ্রব্য-সম্ভারের আলঙ্কারিক উপযোগিতা অর্থাৎ সংগ্রহাগারের মর্য্যাদাবৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্যসাধনে উহার সার্থকতা বিচার ও বিশ্লেষণেই ব্যস্ত, তাঁর তুলনায় মূর্ত্তি প্রতিমার তত্ত্ব ও পরিবেশ সম্বন্ধে একজন ভক্ত পূজারীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনেক বেশী সুগভীর। শিল্পসংগ্রহকারীকে বাবুইপাখীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কারণ ঐ পাখীরাও যে খড়কুটা দ্বারা বাসা বাঁধে, তার প্রকৃতি না বুঝে, না জেনেই উহা সংগ্রহ করে যায়। প্রাচীন এবং প্রাচ্য-শিল্পের তত্ত্বাংশমূলক আলোচনার অধিকাংশই এই অর্থে সুকুমার শিল্পের প্রতি ভাবালুতাময় অনুরাগমূলক।

৬। সত্য

শিল্পকলায়-নিহিত বুদ্ধিবৃত্তি-সংক্রান্ত মূল্য ও তাৎপর্য্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যও নয়, সাদৃশ্যমূলকও নয়; বরং ভাবব্যঞ্জনাময়। বর্ণনরীতির উৎকর্ষ, ঔজ্জ্বল্য বা স্বচ্ছতা অথবা সৌন্দর্য্যের প্রভাবেই মানুষ উহার বিষয়বস্তুর দ্বারা আকৃষ্ট ও আচ্ছন্ন হয়। আমাদের জন্য শিল্পের কিছু করণীয় নেই; বরং উহাকেই আমরা প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবহার করতে পারি। কোন শিল্পের মূলগত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে উহার মধ্যে সীমিত মনে করা, বিষয়বস্তু ও ব্যবহারিক কার্য্যকারিতার মধ্যেই উহার আদর্শকে পর্য্যবসিত হতে দেওয়া, অর্থ-প্রকাশনার ক্ষেত্রে উহাকে স্বকীয় অর্থে পরিপূর্ণ বিবেচনা করা এবং উহার স্বরূপ কি, উহা নির্ম্মিতির প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান না করা হ'ল কঠোর প্রকৃতির মনস্তত্ত্ব, পৌত্তলিকতাবাদ অথবা আদিমভাবাপন্ন জড়বস্তু বা মূর্ত্তি পূজাপদ্ধতির আদর্শসম্ভূত। শিল্পপ্রিয় মানুষমাত্রই প্রতিমাপূজক।

দেখা যাচ্ছে যে, সবরকম শিল্পই অনুকরণবাদী বা সাদৃশ্যবাদী। তবে সে সাদৃশ্য বস্তুর আকৃতি বা রূপ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। এরূপ কল্পনা স্বতন্ত্র সত্তায় প্রত্যক্ষীভূত হওয়ার জিনিস নয়। এ হ'ল শিল্পীর অন্তর্নিহিত চেতন-সত্তার মতই তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি নিচয়ের একটি বিশেষ প্রকাশ-ভঙ্গি। এই জন্যই মনীষী দান্তে বলেছেন যে, কোন শিল্পীই (চিত্রকর) কোন মূর্ত্তি রচনায় সফল হতে পারেন না যদি তিনি সর্ব্বাগ্রে মূর্ত্তিখানির যে রূপটি পরিগ্রহণ করা উচিত—তার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নিতে না পারেন। ভারতের চিত্রশিল্পীকেও অনুরূপ ভাবে প্রতিটি বিষয়ে তাঁর শিল্পরূপের ভাবকল্পনার সহিত একাত্ম হতে হয়। এর ফলে শিল্পী আর বলতে পারেন না যে, তিনি

শুধু দেখছেন; বরং তিনি বলবেন যে, তিনি স্বয়ং ঐ ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছেন। প্লোটাইনাসও ঠিক এই রকমই বলেছেন—"শিল্পী তাঁর দিব্যদৃষ্টির সহায়তায় আদর্শরূপ সংগ্রহ করছেন বটে, কিন্তু তাঁর নিজস্ব সত্তাই অব্যক্তভাবে ও প্রচ্ছন্নরূপে উহার মধ্যে বিরাজমান।" যখন এই কাজটি সমাপ্ত হয়, তখনই কেবল শিল্পের বিষয়বস্তু চাক্ষুষভাবে অনুকরণীয় রূপে তাঁর দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হয়। অনুরূপ একটি সম্ভাব্য ধ্যানকল্পনার সাহায্যে শিল্পমূর্ত্তি সেই বিষয়বস্তুতেও প্রতিগমন করা যায়; অর্থাৎ যে বিষয়বস্তু ঐ সাদৃশ্যে মূর্ত্তি গ্রহণ করেছে। এইরূপেই সমস্ত ঐতিহ্যবাদী শিল্পের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে একটি যথাযোগ্য প্রতীকবাদ দ্বারা। আর বাস্তবিপক্ষে ইহাই শিল্পের একমাত্র সাধারণ ভাষা। এই জাতীয় একই প্রকারের প্রতীকমালা যুগে যুগে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী হয়েছিল পরিব্যাপ্ত। এ হ'ল একটি বিধিবদ্ধ মূর্ত্তিতত্ত্বকে প্রকৃতপক্ষে অস্বীকার করল। আধুনিক শিল্পের শিথিলভাব ও পরিবর্তনশীলতার মূলেও রয়েছে এই মূর্ত্তিবাদের প্রভাব এবং উহার কোন সাধারণ আবেদন ও প্রয়োজন নেই। আর বাস্তবিক সেই সেই ধরণের মানুষেরাই একমাত্র এ জিনিষটির মূল্য দান করেন, যাঁরা ব্যক্তিত্বের বিকারপ্রাপ্তির পক্ষপাতী এবং উহাতে আরষ্টও হন।

শিল্পে মৌলিকত্ব সম্বন্ধে মধ্যযুগীয় শিল্পী সম্প্রদায়ের যে ধারণা, তা আমাদের আদর্শ থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এখন সেখানে অপরের লেখা রচনা ইত্যাদি নিজের নামে প্রকাশনার সর্ববিধ উপায় আইনের সাহায্যে নিষিদ্ধ ও বন্ধ হয়েছে, সেখানেও পরম্পরানুগ শিল্প সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত ঐ দোষে দোষী; অর্থাৎ যেন একই রূপ, একই আদর্শের ধারাবাহিক হুবহু অনুকরণ বা জাবরকাটা চলেছে। ঐতিহ্যবাদী পরম্পরানুগ শিল্পী বা চিন্তাশীল মানুষের চরম আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে একমাত্র মৌলিক শক্তির অধিকার লাভ করা এবং তাঁর আরও চেষ্টা হ'ল খাঁটি মানুষ ও সত্যের প্রকৃত সাধক হওয়া। স্বাভাবিক পরিবেশে উচ্চস্তরের মার্জ্জিত চারুশিল্পের সঙ্গে লোকশিল্পের যা প্রভেদ, তা হ'ল প্রথমোক্তটির কতক পরিমাণে এবং আপেক্ষিক অসরল, কৃত্রিমতাপূর্ণ জটিল-ভাবের জন্য; তা ছাড়া রীতিপদ্ধতি বা আঙ্গিকে কোন পার্থক্য নেই। "এমন একটি সামাজিক পরিবেশের কথাই এখানে আলোচিত হ'ল যেখানে খাঁটি জাতীয়-ভাবাপন্ন এবং জনপ্রিয় কবিতাবলী হয় রচিত, যেখানে জনসমাজ বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শদ্বারা গোষ্ঠী বা দলবদ্ধ নয় ও পুঁথিগত কৃষ্টি সংস্কৃতির প্রভাবে যেখানে মানুষ উল্লেখনীয় শ্রেণী সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয় নি এবং এর ফলে ভাবধারা ও মনোবৃত্তির মধ্যে এমন একটা সমন্বয় সাধিত হয়েছে যাতে সমগ্র জনসমাজ যেন রূপান্তরিত হয়েছে একটি সত্তায়। এই পরিবেশে শিল্পকলা সর্ব্বদাই হয়ে ওঠে একটি সমষ্টিগত হৃদয়মনের একক অভিব্যক্তিস্বরূপ। কখনই উহাতে কোন ব্যক্তি-সম্প্রদায়ের বিশেষ ব্যক্তিত্ব আরোপিত হতে পারে না। এক্ষেত্রে গ্রন্থকার বা শিল্পকার কাহারও কোন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্ন জড়িত নয় এবং ইহা কোন আকস্মিক ঘটনাও নয়; বরং যুক্তি সহকারেই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, তাঁরা (শিল্পী ও স্রষ্টা) অনামীরূপেই রয়ে গেছেন আমাদের কাছে; অর্থাৎ নিজেদের নাম-পরিচয় প্রচ্ছন্ন রেখে সৃষ্টিসমূহের মাধ্যমেই তাঁরা তাঁদের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছেন" (চাইল্ড)। জীবিতকালে অবশ্য স্বীয় নামে পরিচিতি লাভের বিশেষরকম সুবিধে রয়েছে। কিন্তু মৃত্যুর পরে প্রত্যেকে অবশ্যই তাঁর সৃষ্টি, তাঁর কর্ম্মপ্রণালী ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পরিচিত হয়ে থাকতে চান। তবে সেই সৃষ্টিরাজির মধ্যে যা কিছু তাঁর নিতান্ত ব্যক্তিগত থাকবে, তাই-ই হবে সর্ব্বাপেক্ষা নিরর্থক বা অধিক অর্বাচীন। লোকশিল্পী অথবা, অন্য যে কোন ঐতিহ্যবাদী কারুকৃৎ, যিনি বংশানুক্রমিক ভাবে একই নক্সা-প্যাটার্ণের পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছেন, তিনি জ্ঞাত নন যে, উহার মধ্যে সর্ব্বদাই কি ধীরগতিতে আঙ্গিক পদ্ধতির পরিবর্তন প্রবাহ চলছে এবং তাঁর অজ্ঞাতসারে স্বকীয় ব্যক্তিসত্তারও কি অভিব্যক্তি ঘটছে। আর তিনি, যে সকল শিল্পীর রূপকল্পনা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ ও নেহাৎ ব্যক্তিগত প্রেরণামূলক, তাঁদের তুলনায় অধিকতর উচ্চ পর্য্যায়ে উন্নীত হয়ে অবিরাম গতিতে করে চলেছেন সৃষ্টিকর্ম্ম। ঐতিহ্যনিষ্ঠ শিল্পী অন্তরে হলেন তাঁর ব্যক্তিগত রচনারীতি অপেক্ষা অনেক বেশী বিস্তৃত ও গভীরভাবাপন্ন এবং চরম বিশ্লেষণমূলক বিচারেও তাঁর চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার তুলনায় তাঁর স্বকীয় ভাবধারা অধিকতর গভীর। কারণ, ধারাবাহিক রীতির শিল্প মানুষের সৃষ্টিরহস্যের চেয়েও উচ্চস্তরের এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রতীকতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অধ্যাপক মোরে বলেছেন, "সত্য থেকে সৌন্দর্য্যের এরকম অদ্ভুতভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে যে পণ্ডিতিরীতি সতের শতক থেকে পরম্পরাক্রমে চলমান, তাকে খ্রীষ্টধর্ম্মমূলক শিল্পের পর্য্যায়ভুক্ত করা খুবই মুস্কিল। কারণ এই শিল্পরীতি সাধারণ মানবমনের

উর্দ্ধেকার কোন ভাবধারা হ'তে কিছুই প্রেরণা লাভ করে নি।"

এমন কি সাধারণভাবে যখন প্রতীকের অর্থ অবলুপ্ত-প্রায়, তখনও ঐ রীতিতে উহার প্রচলন ছিল এমনভাবে যেন স্বকীয় সত্তায়ই উহারা ছিল প্রাণবন্ত। যেমন, আয়োনীয় স্তম্ভ এবং ডিম্বাকার ও বর্শাফলকসদৃশ গড়ন যা আড়াই হাজার বছরব্যাপী নিছক আলঙ্কারিক 'নক্সা-শিল্প' রূপেই চালু ছিল, উহাও একদিন একটা উগ্রধর্ম্মমতমূলক গূঢ় অর্থে ছিল পরিপূর্ণ। এই ভাবটি রূপকথার কাহিনী ও সর্ব্ববিধ লোকশিল্পে প্রযোজ্য হলেও একথা কোনপ্রকারেই গ্রহণযোগ্য নয় যে, স্মরণাতীত কাল থেকে পৃথিবীময় এই একই গল্পকাহিনীর বর্ণনা এবং একই আলঙ্কারিক নক্সা-পদ্ধতির পুনরাবর্ত্তন নিরবচ্ছিন্নগতিতেই চলেছে। আজ যা আমাদের কাছে নিছক আমোদ-প্রমোদের বিষয় ও গৃহসজ্জার উপাদান মাত্র, মূলতঃ তার মূল্য ছিল গণিত শাস্ত্রের সমতুল্য। আজও উপযুক্ত লোকের হাতে পড়লে, উহারা ততখানিই উচ্চ মর্য্যাদার আসন লাভ করতে পারে এবং সেই উপযুক্ত ব্যক্তিটি আবার কেবল বাহ্য সৌন্দর্য্যে অভিভূত মূর্ত্তিপূজক হলে চলবে না।

ঐতিহ্যগত শিল্পের রূপ এই প্রকারে সৌন্দর্য্যবিজ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না; উহা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির সৌকর্য্য-সাধনমূলক প্রয়োজনের বশীভূত। এই শিল্পরূপ ভাবাবেগের প্রতিফলনে পরিণতি লাভের পূর্ব্বেই রূপান্তরিত হয় সত্যে, প্রতিরূপে। তবে উহা যে ভাবাবেগেরই চাক্ষুসরূপ, তা বাস্তবিকই সঠিক। কারণ বিশ্লেষণের শেষ পর্য্যায় পর্য্যন্ত পৌঁছেও সত্য আকর্ষণীয়ই থাকে, অর্থাৎ সত্যই সুন্দর। প্রাচীন এবং প্রাচ্য শিল্পের রূপায়ণ অদ্যকার ন্যায় স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের উদ্দেশ্যেই নির্দ্দিষ্ট ছিল না; উহার লক্ষ্য ছিল সত্যের প্রকাশনা। শিল্প কোন অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে জন্মলাভও করে না; আবার কোন অসুস্থতাও শিল্পকলা দূরীভূত করতে পারে না। বর্ত্তমানযুগের শিল্পকলার যা কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি তা চাক্ষুষ রূপবদ্ধ শিল্পেরই হোক, অথবা সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক ব্যবস্থামূলক কার্য্য-কৌশলেরই হোক, তার কারণ হ'ল কোন অখণ্ড সত্য অথবা, শাশ্বত নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের কোন আগ্রহ বা স্বীকৃতির অভাব। অথচ এই সত্য ও নিয়ম-কানুনের বিভিন্ন অংশ আমাদের প্রতিদিনের জীবনে প্রকাশমান ও স্মরণীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়; অর্থাৎ আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ধারা ও পদ্ধতি উহার অনুসরণেই গঠিত হওয়া উচিত। কিছু বলতে হবে অথবা, আমরা কিছু শুনতেও চাই—এই-ই হ'ল আমাদের পক্ষে যেন সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফলে আমাদের কোন কাজেই কলানৈপুণ্য ও দক্ষতার কোন স্থান নেই; শিল্পকলা যদি কেবল একটা ভাবালু আবেদনপূর্ণ বিলাস দ্রব্যেই পরিণত হয়ে থাকে এবং বাস্তবিকই যদি উহা জীবনে বাহুল্যরূপেই বিবেচিত হয়, যার জন্য সেজানের তুলনায় ম্যাক্সফিল্ড প্যারিস অধিক মাত্রায় উপযুক্তরূপে সমাদৃত হতে পারেন, তার কারণ হ'ল যে আমরা এখন আর যে সকল সত্যরূপে অর্থাৎ যে সত্য প্রকাশনার উদ্দেশ্যে শিল্পের রূপকল্পনাটি হয়েছিল, তার প্রতি আর আস্থাবান্ নই।

যে মানুষের জন্য শিল্পের অস্তিত্ব, সেই মানুষের সত্যতার সঙ্গেই শিল্পে নিহিত সত্যভাব জড়িত। প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে উপযোগিতা অনুসারে এক-একটি শিল্পের স্থান রয়েছে। তবে কথা হ'ল যে, মানুষের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিসত্তার উপযুক্ততা বিচার করেই উহার রূপায়ণ হয়ে থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত মানুষ তাঁর নিজ স্বতন্ত্রের নির্দ্দিষ্ট সীমা সম্বন্ধে সন্দেহাতীত অবস্থায় উপনীত না হতে পারবেন, ততদিন তাঁর বক্তব্য যতই সুন্দর ও যতই তৎপরতার সহিত প্রকাশিত হোক না কেন, উহা অবশ্যই কৃত্রিমরূপে পরিগণিত হবে। যখন তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে নিজস্ব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পথে যাত্রা সুরু করবেন সেই অখণ্ড অনিয়ন্ত্রিত সত্তার উপলব্ধিসহ, ঠিক তখনই সমস্ত উপাদানের সমাহারে তাঁর রচনা নিখুঁতরূপে সার্থক হয়ে উঠবে। কর্ণপটাহ তাড়নাকারী কোন শব্দের অনুকরণ সঙ্গীত নয়। সমস্ত সার্থক সঙ্গীত হ'ল গ্রহমণ্ডলের গতিজনিত 'গ্রহ-সঙ্গীতেরই' প্রতি-ধ্বনি। যখন সেই গ্রহ-পরিমণ্ডলের সঙ্গীত আর শ্রুত হয় না, পার্থিব সঙ্গীতও তখন হয়ে উঠবে বেসুরো ও শ্রুতিকটু। শিল্পের স্বাভাবিক আদর্শে একথাটি স্বতঃ-সিদ্ধরূপে হয়েছে গৃহীত এবং যদিও সকল রকম রীতি-পদ্ধতিতেই চারু ও কারু—দুই শিল্পই সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনে রচিত হয়ে থাকে, তথাপি উহার মূল উৎস ও আদর্শ হ'ল অলৌকিক ও অতি-মানবীয়। এ হল বিভিন্ন তথ্যাদির সামঞ্জস্য বিধানেরই বিষয়-বিশেষ। স্বর্গরাজ্য মানুষের অন্তরেই বিরাজমান। "দেখ, পাহাড়ের উপরে স্থাপিত যে সকল নক্সা-প্যাটার্ণ দৃষ্ট হচ্ছে, উহাদের অনুসরণেই সমস্তকিছুর রূপদান কর" (এক্সোডাস্, XXV, ৪০)। রূপায়ণের যোগ্য সমস্ত বস্তুই ওখানে আছে সাজান। শিল্পরচনার মুখ্য বিষয় হ'ল ধ্যান-কল্পনা। এই ধ্যান দ্বারাই কেবল অনুকরণীয় রূপমালাকে

উপলব্ধি করা যায়। ইহা কোন প্রকারেই নিষ্ক্রিয় গ্রহণ ক্ষমতা বা, 'অনুপ্রেরণা' নয়। বরং ইহা হ'ল বুদ্ধিবৃত্তি-সঞ্জাত কর্মপ্রণালী এবং উহা একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মেই চলে। উহা ভক্তি বা নিষ্ঠাগুণের সমপর্য্যায়ভুক্ত। সৌন্দর্য্য, সদাশয়তা এবং সত্যভাব—এই তিনটি হচ্ছে একটি মৌলিক সত্যেরই ভিন্ন ভিন্ন অংশ। কিন্তু স্বতন্ত্র অংশ হিসাবেও উহাদের প্রত্যেকটিকেই পৃথকভাবে আলোচনা ও বিচার করা চলে। তবে কেহ যদি উহাদের এক-একটিকে আলাদাভাবে জীবনে গ্রহণ করতে বা অনুশীলন করতে চেষ্টা করেন, তখন দেখা যাবে যে একটিরও অস্তিত্ব বিদ্যমান নেই; সব কয়টিই একযোগে অন্তর্হিত। আর তিনি নিজেকে চিরকালের জন্ম স্বীয় পছন্দ-অপছন্দ ও রুচি-অরুচির প্রাচীর দিয়ে আবদ্ধ করেই রাখবেন।

আকাশের রঙ

শ্রীরমেন কর

শেষ কথাটির শেষ নেই। শেষ কথার আশায় বসে থাকলে শেষ কথাট আর শোনা হবে না। প্রথমে তাই শেষ কথাট শেষ করে নিই। বিশ্বসৃষ্টি সৃষ্টিছাড়া, নক্ষত্রের আগুন জ্বলা ছাপ আকাশের গায়ে নয়, মানুষের মনে। তাই বলে তার যে কোন অস্তিত্ব নেই তা নয়। অস্তিত্ব আমাদের মনে। আমি চোখ মেললাম আকাশে, আলো উঠল জ্বলে—পূবে পশ্চিমে। আবার আমাদের মনের বাইরে এমন 'একটা কিছু' না-জানার কালো গর্ত আছে যা আমাদের মনকে ভাবায়। এই যে 'একটা কিছু' একেই আমরা বলব 'বাস্তব', একেই বলব 'সত্য'। এই সত্যের দিকে বিজ্ঞান অনিমেষে তাকিয়ে থাকে, গালে হাত দিয়ে চুপটি করে ভাবে, যেমন আকাশের দিকে পৃথিবী। এই বাস্তবের পিছনে বিজ্ঞান অক্লান্ত ভাবে ছুটে চলে, যেমন রাত্রির পিছনে দিন। "রাত্রির তপস্যা সে কী আনিবে না দিন?"

গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্যের বিতর্ক-সভায় গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করলেন, পদার্থের সৃষ্টি কোথা থেকে?

তিনি উত্তর করলেন, চেতনা থেকে।

গার্গী আবার প্রশ্ন করলেন, চেতনার সৃষ্টি কোথা থেকে?

প্রাণের থেকে।

প্রাণের সৃষ্টি?

ব্রহ্ম থেকে।

ব্রহ্মার সৃষ্টি?

যাজ্ঞবল্ক্য তখন বললেন, থাম গার্গী। তুমি তোমার জ্ঞানের শেষ সীমা পেরোবার চেষ্টা কর না। ব্রহ্মই জ্ঞানের সীমা। তাঁকে জানা যায় না।

আকাশ ব্রহ্মের বৃহত্তম অংশ। তাই ব্রহ্মাণ্ড। যে আকাশ সেই ব্রহ্মাণ্ড। এই আকাশকে জানলে প্রকৃতির অধিকাংশই জানা হয়ে যায়।

এই যে আকাশের কথা এতক্ষণ ধরে বারবার বললাম, এই আকাশ বাস্তব, এই আকাশ সত্য। এই বিরাট সত্যকে অল্প কথায় একেবারে সম্পূর্ণ করে জানা যায় না। তাকে জানতে হয় অল্প অল্প করে, গাছ যেমন রস নেয় মাটির থেকে অল্প অল্প করে, আর তাতেই তার সারা দেহে জাগে ফুল ফোটাবার শিহরণ। প্রত্যেক সত্য বস্তুর একটা রঙ আছে। এইখানে মনে রাখা প্রয়োজন শূন্যও একটা সংখ্যা।

আকাশ কী আলো দেয়? আকাশের সীমানায় আলোর সমুদ্র। শুধু আলোর ঢেউ আর আলোক-কণিকা-গুচ্ছের স্পন্দন। লক্ষ লক্ষ রকমের স্পন্দন। কিন্তু তাদের অতি অল্পই আমরা দেখতে পাই। কেননা মানুষের দৃষ্টিক্ষমতা সীমাবদ্ধ। স্পন্দন-সংখ্যা যখন প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় চারের পিঠে বারোটা শূন্য বার (৪×১০^{১২}) হয় তখন তাকে দেখি লাল আলো বলে। তার কম হলে দেখতে পাই না বটে কিন্তু উত্তাপ অনুভব করি। আবার যখন বেশী হয় তখন দেখি কমলা রঙ। আরও বেশী হলে দেখি যথাক্রমে, হলুদ, সবুজ, আকাশী, নীল ও বেগনী। স্পন্দন-সংখ্যা তারও বেশী হলে আমরা আর দেখতে পাই না, যদিও তারাও আলো। যেমন

বেগনীপারের আলো বা অতিবেগন রশ্মি, রঞ্জন রশ্মি, গামা রশ্মি, মহাজাগতিক রশ্মি বা জগৎ পারের আলো। এদের আমরা বলি অদৃশ্য আলো। অদৃশ্য আলোর কার্য্য-ক্ষমতা বেশী। অনায়াসেই তারা আপাত অস্বচ্ছ বস্তুর মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করতে পারে। যেমন বেগনীপারের আলো কাগজের মধ্য দিয়ে, যেমন জগৎ পারের আলো কয়েক ইঞ্চি পুরু সীসার পাতের মধ্য দিয়ে। দৃশ্য-আলো আলো দেয়, কিন্তু দহন করে না। কিন্তু অদৃশ্য আলো আলো দেয় না অথচ দহন করে। যে আলো আলো দেয় না অথচ দহন করে সেই দীপ্তিহীন শিখার নির্দ্দয় দহনে পলে পলে দগ্ধ হয় মানুষের শিরা-উপশিরা, মানুষের হৃদয়।

এখন প্রশ্ন হ'ল, আকাশের সীমানায় যদি নানা রকমের রঙ ও রঙের অতীত বৈচিত্র্য থাকে তবে আকাশকে আমরা নীল দেখি কেন? আসলে আকাশকে আমরা দেখি না, দেখতে পাই না, দেখতে পাওয়া সম্ভবও নয়। যে ব্রহ্মের অর্ধাংশ তাকে কি এই সাধারণ দুটো চোখ দিয়ে দেখতে পাওয়া যায়? যদিও বা দেখতে পাই ত দেখব কেবল নীরন্ধ্র অন্ধকার, চোখ মেলে যত বেশী দেখতে চেষ্টা করব, দেখব তত বেশী অন্ধকার। ব্রহ্মকে না জানার কালো গর্ত যেমন আমাদেরকে গোলাকার হয়ে ঘিরে আছে, আকাশকে তেমনি দেখব একটা বিরাট কালো অর্দ্ধগোলক। নীল যদি থাকে ত আকাশ নয়, আলোয় নয়, আলোকে বিচ্ছুরিত করে দিচ্ছে বাতাসের যে অণু-পরমাণু তাকে। যে কোন তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য হ'ল, সে যদি তার নিজস্ব তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের থেকে বেশ কিছু ছোট মাপের কোন বস্তুর ওপর পড়ে তখন সেই তরঙ্গ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই ছড়িয়ে পড়ার নাম বিচ্ছুরণ। ছড়িয়ে পড়ার জন্যে বিচ্ছুরিত তরঙ্গের তীব্রতা যায় পালটিয়ে, আর নির্ভর করে আগত তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ওপর। তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত ছোট হবে, তীব্রতা যাবে ততই বেড়ে। অঙ্ক কষে দেখান যায় যে এই তীব্রতা আগত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চতুর্থ শক্তির সঙ্গে ব্যস্তসমানুপাতিক, অর্থাৎ

$$\propto \frac{1}{\lambda^4}, \quad (\lambda = \text{আগত তরঙ্গদৈর্ঘ্য})$$

আমরা প্রত্যেকে জানি যে সূর্য্যের সাতটা রঙ ক্রমবর্দ্ধমান তরঙ্গদৈর্ঘ্যানুসারে সাজালে দাঁড়ায় বেণীআসহকলা (VIBGYOR) অর্থাৎ দৃশ্য আলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো হ'ল বেগনী ($\lambda = ৪০০০ \times ১০^{৮}$ সে. মি.) আর সব থেকে বড় লাল ($\lambda = ৭২০০ \times ১০^{৮}$ সে. মি.)। তাই যদি হবে তবে গ্যাসীয় অণু দ্বারা বিচ্ছুরিত সূর্য্যের আলো ত বেগনী দেখান উচিত ছিল, কিন্তু তা না হয়ে ঠিক তার পরের রঙ নীলকে ছাড়িয়ে আকাশী হ'ল কেন? তার কারণ আগেই বলেছি যে বিচ্ছুরিত আলোর তীব্রতা বিচ্ছুরণ-কারী বস্তুর মাপের ওপর নির্ভর করে। গ্যাসীয় অণুর মাপ সাধারণত বেগনী আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সঙ্গে প্রায় সমান এবং নীল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের থেকে সামান্য ছোট। তাই বিচ্ছুরিত আলোতে বেগনী রঙ থাকে না বললেই হয়। থাকে অল্প পরিমাণ নীল আর বাকী প্রায় সবটুকুই আকাশী। সব মিলিয়ে পৃথিবীর ওপর গ্যাসীয় স্তরকে আমরা তাই আকাশী দেখি, আর তাকেই সোজা ভাষায় বলি নীল আকাশ। গ্যাসীয় অণুপরমাণুগুলো যদি না থাকত তবে আকাশকে আমরা দেখতাম সম্পূর্ণ কালোরূপে।

কথাপ্রসঙ্গে আর একটা কথা এসে পড়ল। আমরা সাধারণত বলে থাকি, অমুক আলো দেখছি। কথাটা ভুল। আলো আমরা দেখতে পাই না, আলো আমাদেরকে দেখায়। "নয়ন তোমায় পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।" নয়নে আলো থাকে বটে কিন্তু সে আলোকে আমরা দেখি না, দেখি সেই বস্তুকে যে বস্তু সেই আলো আমাদের চোখে পাঠিয়ে দেয়। বিশেষ বিশেষ বস্তু বিশেষ বিশেষ আলো ত্যাগ করে। কোন্ বস্তু যে কোন্ রঙ ত্যাগ করবে তা নির্ভর করে তার অণু-পরমাণুর গঠনের ওপর। আমরা সৌন্দর্য্যের উপাসক, কিন্তু আসলে উপাসনা করি সেই সুন্দরকে যে সুন্দর বস্তু আলোর সুন্দর সমন্বয় ঘটিয়ে আমাদের চোখে পাঠিয়ে দেয়। সুন্দর বস্তুর খ্যাতি তাই তার ত্যাগের মাহাত্ম্যে, অকৃপণতার ঔদার্য্যে। আকাশকে আমরা সুনীল দেখি তার অকৃপণতায়, তার ঔদার্য্যে।

মহালক্ষ্মীমন্দিরের অর্দ্ধমণ্ডপ

কোল্‌হাপুরে মহালক্ষ্মীর মন্দির

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

ভারতের প্রদেশে প্রদেশে, নগরে নগরে, নদীকিনারে, পর্ব্বতশিখরে, অরণ্যের ধারে কত কত মন্দির কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোন কোনটির অপূর্ব্ব কারুকার্য্যে শিল্পকলা মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। তেমনি একটি সুন্দর মন্দির হ'ল কোল্‌হাপুরের মহালক্ষ্মীর মন্দির, ভাস্কর্য্যে ও স্থাপত্যে সমৃদ্ধ। প্রতি বৎসর লক্ষাধিক যাত্রী আসে এই মন্দিরে দেবী দর্শন করতে।

কোল্‌হাপুর মহারাষ্ট্র অঞ্চলের একটি দেশী রাজ্য ছিল, বর্ত্তমানে ইহা মহারাষ্ট্র ষ্টেটের একটি জেলা। ইহা সহ্যাদ্রি বা পশ্চিম ঘাট পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। পার্ব্বত্য নদী পঞ্চগঙ্গা সহরের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে আছে। অনেক বৎসর পূর্ব্বে কোল্‌হাপুর রাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী সমতল ভূমির উপর একটি অনুচ্চ ছোট মন্দির ছিল। গবর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ববিভাগ থেকে সে মন্দির গভীর ভাবে খনন করা হয়, তাতে দেখা যায় যে, আশেপাশে বহু নীচে মন্দিরের মূল ভিত্তি। তা থেকে কারুকার্য্যময় স্তম্ভ ও দেয়াল সোজা উপরে চলে গেছে। পূর্ব্বে এ সব স্তম্ভের উপরের অংশ মাত্র দেখা যেত; পরে মন্দির-অঙ্গনের সমস্ত ইট-পাটকেল সরিয়ে মূল প্রাচীন মন্দিরটিকে অক্ষত অবস্থায় আবিষ্কার করা হয়েছে। সেই মন্দিরেই এখন লোক সমাগম ও পূজা অর্চ্চনা হয়।

আশেপাশের রাস্তা থেকে মন্দিরের ভিত্তি এত নীচে কেন, কেহ তার বিশেষ সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নি, তবে এক প্রত্নতাত্ত্বিক বলেছেন, খুব সম্ভব একটা বড় ভূমিকম্পে এই ভারী পাথরের মন্দিরটি নীচে বসে গেছে। রাজ্যের বহু স্থানে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে নাকি কোল্‌হাপুরে ২৫০টি মন্দির ছিল।

মন্দিরে প্রবেশ করতে হ'লে রাস্তা থেকে প্রথমে ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে অনেক নীচে নামতে হয়। প্রবেশ দরজার উপরে খুব উঁচু নহবৎখানা, সেখানে ভোরে, দুপুরে ও সন্ধ্যায়, জোরে বাদ্য বাজতে থাকে। নীচে নামলে প্রস্তর-বাঁধান প্রশস্ত চত্বর, তা থেকে অনবরত উপরে জল উপচে পড়ছে, চৌবাচ্চাতে বহু রঙ্গীন মাছ; শিশু দর্শকের কৌতূহল ও আনন্দ বর্দ্ধন করে।

মন্দিরের সামনে নাটমন্দির, অতি সুন্দর মসৃণ কালো পাথরের কারুকার্য্যময় স্তম্ভগুলি তার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করছে। মহালক্ষ্মী মন্দিরের এ প্রশস্ত অংশটুকুকে জনসাধারণ তাদের আপনার স্থান মনে করে। দেখেছি কত পথিক, তীর্থযাত্রী, গ্রামের শ্রমিক, সব্জীওয়ালী নারী নিশ্চিন্তমনে সেখানে বিশ্রাম করছে। যে যার খাগু বের করে খাচ্ছে, কেউ বা কথাবার্ত্তা বলছে, কেউ বা দিবানিদ্রা দিচ্ছে, কিন্তু কোন হট্ট-কোলাহল নেই। এদেশে পাণ্ডা বা ভিখারীর উপদ্রব নেই বলে মন্দিরের মাহাত্ম্য আরও বেড়ে উঠেছে।

মন্দিরে প্রবেশ দরজার বাইরে দু'পাশে সারি সারি দোকানে সমস্ত পুজোপকরণ বিক্রী হয়, তবে এদেশে পুজোর পদ্ধতি অতি সাদাসিধে ও আড়ম্বরশূন্য। মন্দিরে দেবী প্রণাম করে চৌকাঠের উপর কর্পূর জ্বালিয়ে এক মুঠো চাল রাখে। কেউ বিশেষ পুজো দিতে হ'লে একটা নারকেল ও কিছু পেঁড়া বা মিশ্রী দেয়।

মন্দিরের চারদিকে পাথর-বাঁধান চত্বর, তার উপরে সুউচ্চ পাষাণ প্রাচীর। চারদিকে চারটি বিরাট্ দরজা। মন্দিরের দু'দিকে দু'টি ছোট পুষ্করিণী, নাম কাশী ও মণিকর্ণিকা। সব সময় জলে পূর্ণ থাকে, আগে হয়ত স্বচ্ছ জল ছিল, এখন ততটা নয়।

মহালক্ষ্মীর মন্দির সম্বন্ধে নানা ঐতিহাসিকের নানা মত। কেহ কেহ বলেন, ইহা প্রায় দু'হাজার বৎসরের প্রাচীন মন্দির। এর পশ্চিম দিকে গণপতি মন্দিরের একটি স্তম্ভে সংস্কৃত লিপি প'ড়ে দেখা যায় ১২১৮ খ্রীষ্টাব্দে দেবগিরি যাদবদের রাজত্বের সময় 'রাজা তাসিম' দেবী মহালক্ষ্মীকে বহু রত্নালঙ্কার দিয়ে ষোড়শোপচারে পূজা করেছিলেন।

এই মন্দিরটি আয়তনে সুবৃহৎ এবং চতুর্দ্দিকে বহু দেবদেবীর মন্দির ও ছোট ছোট কুঠরী আছে। একটি ছোট মন্দিরের ছাদে জৈনদের তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি খোদাই করা আছে। আরও নানাবিধ প্রমাণ দিয়ে কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, হয়ত মূল মন্দিরটি জৈনদেরই ছিল। আবার কেহ কেহ বলেন এ মন্দিরটি বৌদ্ধদের ছিল। কোল্হাপুর পঞ্চগঙ্গা নদী থেকে কিছু দূরে সহরের এক ভাগকে ব্রহ্মপুরী বলা হয়। সেখানে ভগ্নস্তূপের মধ্যে কিছুকাল পূর্ব্বে যে সব জিনিষ পাওয়া গেছে তাতে বুদ্ধদেব, ধর্ম্ম চক্র, পুষ্পদান ও বৌদ্ধ মুদ্রা ছিল। তা ছাড়া নদীগর্ভে একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত বাক্স পাওয়া গেছে তার ভিতরে একটি স্ফটিক পেটিকা ছিল। এ সব কারণে প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলেন, হয়ত এটি বৌদ্ধ মন্দির ছিল এবং তার আশেপাশের ভগ্নস্তূপগুলি বৌদ্ধ বিহার ও বৌদ্ধ স্তূপের চিহ্ন।

কিন্তু হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যে কখনও এমন গুরুতর পার্থক্য ছিল না, যার জন্য কল্পনা করতে হবে যে, এক ধর্ম্ম আর এক ধর্ম্মকে বলপূর্ব্বক সরিয়ে নিজের মন্দিরাদি স্থাপন করেছে। ভারতে কোথাও কোথাও দেখা যায়, তিন ধর্ম্মের মন্দির একত্র বিরাজ করছে যেমন এল্লোরায়। কোথাও হিন্দু জৈন দুই ধর্ম্মই পাশাপাশি সমৃদ্ধি লাভ করেছে যেমন খাজুরাহোতে। কাজেই মনে হয় যে, হয়ত এটি তিন ধর্ম্মেরই মন্দির ছিল এবং এক এক যুগে এক এক রাজার ধর্ম্ম অনুযায়ী সেই ধর্ম্মের প্রাধান্য হয়েছিল ও তার মন্দির নির্ম্মিত হয়েছিল।

ঘুরে ঘুরে মন্দিরটি যতই দেখি ততই বিস্ময় জাগে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বিরাট্ মন্দির, নানা ভাগে বিভক্ত, তার কারুকার্য্য আর কত বা তার গঠন-নৈপুণ্য। সমস্ত মন্দির ঘিরে বহু কালো মসৃণ পাথরের স্তম্ভ। মন্দির গাত্রে আর সেই সব স্তম্ভে কত বা বিচিত্র ভঙ্গিতে নানা অলঙ্কারে সুশোভিতা নারীমূর্ত্তি। লোকেরা বলে মহালক্ষ্মী মন্দিরের স্তম্ভের এই নৃত্যশীলা নারীমূর্ত্তিগুলি হ'ল চৌষট্টি যোগিনী, এ সব নৃত্যভঙ্গিতে ভারত নাট্যশাস্ত্রের অপূর্ব্ব বিকাশ। এই মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ২০০ ফুট ও প্রস্থে ১৫০ ফুট।

মুখ্য মন্দিরটি তিন ভাগে বিভক্ত, মুখমণ্ডপ বা মহামণ্ডপ, অন্তরাল মণ্ডপ বা অর্দ্ধ মণ্ডপ এবং গর্ভগৃহ। মহালক্ষ্মী মন্দিরের ডানদিকে মহাকালী ও বাঁদিকে মহাসরস্বতী আর সামনে এক পাশে গরুড়ের মন্দির। বেশ কয়েকটি সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠলে দেবী মন্দিরের ভিত্তির নাগাল পাওয়া যায়। মন্দিরের গর্ভগৃহটি চতুষ্কোণ, তার তিন দিকে তিনটি কক্ষ। উত্তর দিকের কক্ষটি হ'ল দেবীর শয়নকক্ষ, রাত্রি দশটার সেজ আরতি বা শয্যা আরতি হবার পর দেবীর নিদ্রা দেওয়া হয়।

প্রথম কক্ষের ছাদ থেকে একটি ঘণ্টা ঝুলছে, দর্শকরা কক্ষে প্রবেশ করেই প্রথমে জোরে ঘণ্টা বাজায় ও পরে দেবী প্রণাম করে, এর মেজে শ্বেত পাথরের তৈরী। তার মধ্যস্থলে মসৃণ কালো পাথরের তৈরী একটি কচ্ছপ উল্টে প'ড়ে আছে। কক্ষের দু'পাশে সারি সারি কারুকার্য্যময় কালো প্রস্তরের স্তম্ভ, এগুলির পাশে পাশে ব'সে ভক্তরা পুরাণ ভাগবত পাঠ করে। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি বিধবা ও সধবা নারী আছে। সধবাদের চুল পরিপাটি বাঁধা, কপালে বড় সিন্দূরের ফোঁটা। পরণে কাছা দেওয়া। বিধবাদের মস্তক মুণ্ডিত ও পরিধানে পাড়হীন লাল বস্ত্র।

পরে জানলাম খুব গোঁড়া পরিবারের মহিলারা বৈধব্যের পর এরকম যতিব্রতীর পোশাক ধারণ করেন ও খুব কৃচ্ছ্রতার সহিত জীবন কাটান। এদের ছাড়া মহারাষ্ট্রীয় অন্য বিধবা ও সধবাদের পোশাকে খুব কম প্রভেদ আছে, আমাদের দেশের মত নয়। বিধবারা শুধু এয়োতির চিহ্ন গলার মঙ্গলসূত্র ও কপালের কুঙ্কুম বা সিন্দুরের ফোঁটা পরে না।

মহালক্ষ্মী ঐশ্বর্য্যের দেবী, তাঁর নিদর্শন মন্দিরে রয়ে গেছে। দেবীর কক্ষের চৌকাঠ পিতলের ও তার উপর রূপার কারুকাজ। থামগুলিরও নীচের অংশ রূপা ও পিতল মিশ্রিত, কিন্তু গর্ভগৃহ এত অন্ধকার যে, সে সব কিছু দেখা যায় না। চৌকাঠের উপর রোজ অগণিত দর্শকরা ধূপ ও কর্পূর জ্বালিয়ে দিয়ে যায়, তাতে চৌকাঠের কারুকার্য্য ঢাকা পড়ে গেছে। ভিতরে সুন্দর দেবীমূর্ত্তি তিন ফুট উঁচু কালো পাথরের বেদীর উপরে স্থাপিত। মূর্ত্তিটি উচ্চতায় চার ফুট। বেদীর নীচে একপাশে ধাতুনির্ম্মিত দেবীর উৎসব-মূর্ত্তি। দেবী চতুর্ভুজা, সিংহ তাঁর বাহন, উপরের ডান হাতে গদা, বাম হাতে খেতক বা কর্ম্ম আর নীচের ডান হাতে মাতুলিঙ্গ বা শিবের প্রতীক, এবং বাম হাতে কলসী। মন্দিরের গম্ভীর সৌন্দর্য্য, ফুল চন্দন ধূপের গন্ধ, ঘিয়ের প্রদীপের আলো-আঁধার আলোর মধ্যে দেবীকে রহস্যময়ী ও মহিমাময়ী করে তুলেছে।

মহালক্ষ্মী

অন্ধকার গর্ভগৃহে দেবীর মুখ খুব স্পষ্ট ভাবে দেখা যায় না তাই বর্ত্তমানে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিয়ে কক্ষটি আলোকিত করা হয়। দেবীর কক্ষের দ্বার পশ্চিমাস্য। কিন্তু তা এমনই সুকৌশলে তৈরি যে, বৎসরে একবার মাঘ মাসের পঞ্চমীদিন সূর্য্যকিরণ এসে দেবীর উপর পতিত হয়। দেবী সূর্য্যকিরণে স্নাতা হয়ে উঠেন। সেদিন মন্দির লোকে লোকারণ্য হয়ে যায় এই পুণ্যদৃশ্য দেখতে। তাদের ধারণা, এই বিশেষ দিনে সূর্য্যদেব এসে মহালক্ষ্মীকে বন্দনা করেন।

কোল্হাপুর রাজ্যের ঐতিহাসিক পুস্তকে ঐশ্বর্য্য-শালিনী মহালক্ষ্মীর মন্দির সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, ১৭৭৪ সনে মুসলমান আক্রমণে মহারাষ্ট্র যখন সন্ত্রস্ত, তখন কোল্হাপুরের মহারাজা দেবীমূর্ত্তিকে বহুকাল তাঁর এক সর্দ্দারের গৃহে লুক্কায়িত রাখেন। পরে ছত্রপতি রাজারাম মহারাজের পুত্র সম্ভাজী মহারাজ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সর্দ্দার সিধোজী হিন্দুরাও ঘোরপাড়ের দ্বারা সেই মূর্ত্তিটি আনিয়ে বর্ত্তমান মন্দিরে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

সর্ব্বত্র দেবীদের নিয়ে নানারূপ অলৌকিক কাহিনী রচিত হয়ে আছে, তেমনি মহালক্ষ্মী সম্বন্ধেও নানাবিধ কাহিনী প্রচলিত আছে। দেবী-ভাগবত, মৎস্যপুরাণ, পদ্ম-পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে কোল্হাপুরের মহালক্ষ্মীর বর্ণনা আছে। রুদ্র কোল্হা দানবের পুত্র করবীরকে এ স্থানে বধ করায় রাজ্যের নাম করবীর। এবং দেবীকে করবীরবাসিনী বলা হয়। বিষ্ণু মহালক্ষ্মীর রূপধারণ ক'রে কোল্হাদানবকে বধ করেন ও সেই থেকে রাজ্যের নাম হয় কোল্হাপুর।

করবীর মাহাত্ম্যে একটি কাহিনী আছে যে, একবার

কাশীর বিশ্বেশ্বর ও কোল্‌হাপুরের মহালক্ষ্মীর মধ্যে বিবাদ চলল, কে বড়। তখন রঙ্গস্থলে বিষ্ণু আবির্ভূত হয়ে এ বিবাদের বিচার করতে এলেন। তাঁর ন্যায়দণ্ডে একদিকে কাশী ও অন্যদিকে কোলহাপুর রেখে দেখলেন ওজনে কোল্‌হাপুর ভারী। দেবীর জয় হ'ল। সেই থেকে কোল্‌হাপুরকে দক্ষিণ কাশী আখ্যা দেওয়া হ'ল, এবং কোল্‌হাপুরের প্রাধান্য বাড়ল। জনসাধারণ এই কাহিনীতে বিশ্বাস করে বলে, এজন্যই নাকি শঙ্করাচার্য্য কাশী ছেড়ে এসে দক্ষিণ কাশীতে বাস করেন। এবং শঙ্করাচার্য্য দ্বারা স্থাপিত শঙ্কর মঠ থেকে পরে এই মন্দিরের কয়েকটি ভগ্ন গোপুরকে নূতন করে তৈরি করা হয়েছে।

মন্দিরে মহালক্ষ্মীকে রোজই একখানা মূল্যবান্ রেশমী বস্ত্রে সুসজ্জিতা করা হয়। দেবীর নাকে হীরার নথ, মাথায় সোনার মুকুট। দুর্গাপূজার সময় নবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে খুব ধুমধাম হয়, মন্দিরের আলোকসজ্জা অতি চমৎকার দেখায়। প্রত্যেক শুক্রবারে দেবীর উৎসবমূর্ত্তিকে পাল্কীতে করে নিয়ে নগর পরিভ্রমণ করা হয়, তখন কামান গর্জ্জন করে ওঠে। বেশ সুন্দর ছোট-খাটো একটি শোভাযাত্রা বের হয়। হাতী ঘোড়া উট, উটের পিঠে বাদ্যকররা তবলাজাতীয় এক রকম বাদ্য কাঠি দিয়ে ডুমাডুম করে বাজাতে থাকে। শিঙ্গা ফুঁকে নগরে দেবীর আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করে।

দেওয়ালী উৎসবেও মন্দিরে খুব সমারোহ হয়, দীপমালায় মন্দির ঝলমল করতে থাকে। প্রতি দেওয়ালী ও পৌষ সংক্রান্তি তিল গুড় উৎসবে মহারাণী মন্দিরে যেতেন। কোন্ সময় মহারাণী মন্দিরে দেবীদর্শনে যাবেন, তা রাজ্যে আগেই ঘোষণা করা হ'ত। রাস্তার দু'পাশে লোকেরা ভিড় করে দাঁড়াত মিছিল দেখতে। মহারাণীর সুদৃশ্য চিকে ঢাকা চার ঘোড়ার গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলত হাতী ঘোড়া উট, সৈন্যসামন্ত দেহরক্ষী, মন্দিরের প্রবেশদ্বারে এসে গাড়ী থামত। সখি-পরিবৃতা হয়ে মহারাণী নামতেন, সোনার থালায় কারুকার্য্য করা রেশমীবস্ত্রে ঢাকা পূজার নৈবেদ্য নিয়ে সঙ্গে চলত দাসী। মহারাণী দেবী প্রণাম করে মূল্যবান্ শাড়ী,খণ বা কাঁচুলী, সিন্দুর, মিষ্টি ইত্যাদি নিবেদন করে ফিরে আসতেন। এই দুই উৎসবে নগরের ধনী-গৃহিণীরাও মন্দিরে গিয়ে দেবীকে উৎকৃষ্ট, শাড়ী খণ, নারিকেল নিবেদন করে আসেন।

শিশুর জন্মের পর দু'তিন মাস হলেই তাকে নিয়ে মা মন্দিরে দেবী দর্শন করিয়ে আনে, তার পর থেকেই শিশুকে নিয়ে ঘরের বাইরে যেতে পারে। বিয়ের উৎসবেও প্রথমে দেবী পূজা করতে হয়, এবং বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর বরকনেকে ধুমধামে শোভাযাত্রা করে নিয়ে দেবী প্রণাম করানো হয়। এরকম যত কিছু সংস্কার ক্রিয়াকাণ্ড আছে, প্রায় তার সবটাতেই প্রথমে দেবীকে পূজো দেবার নিয়ম, কাজেই মন্দিরে উৎসব সমারোহ লেগেই আছে। সরকারী সম্পত্তিভোগী বহু ব্রাহ্মণ সেবায়েৎ দেবীর কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। নগ্নগাত্র, লাল পট্টবস্ত্র পরিহিত পূজারীরা খুব নিয়ম-নিষ্ঠায় রান্না করে দু'বেলা দেবীর ভোগ দেন, খুব ভোরে বাদ্য বাজতে থাকে।

সারাদিন মন্দিরে অসংখ্য লোকের যাতায়াত, বিধবারা ও ভক্তরা দিনের অধিকাংশ সময়ই মন্দির চত্বরে ব'সে পূজোআর্চ্চা করে,কেউ বা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করে, কেউ বা জপ করে। যারা শোকগ্রস্ত, তারা মন্দিরে দেবীর পায়ের কাছে অশ্রুবিসর্জ্জন ক'রে শান্তি পায়,যারা সংসার-সংগ্রামে বিধ্বস্ত, তারা মন্দিরে খানিক সময় বসে পূজো করে মনকে শান্ত করে যায়। সৌভাগ্যবতী (সধবা) মহিলারা সেজেগুজে মন্দিরে আসে, দেবীকে প্রণাম করে আপন পতিপুত্রকন্যার কল্যাণ কামনা করে। তার পর বিশাল মন্দিরের এদিকে-ওদিকে বেড়ায়, নানা দেবদেবী দর্শন করে, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা হলে হাসিগল্প করে, নিজের ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের জন্য খেলনা, এটা-সেটা কিনে, খুশী মনে বাড়ী ফিরে যায়, দেখে মনে হয় যেন মন্দিরটি শান্তির আলয়।

কোল্‌হাপুরে ও মহারাষ্ট্রে মহালক্ষ্মীর মন্দির অম্বাবাঈর মন্দির নামেই প্রসিদ্ধ। এই মন্দিরে আশ্বিনের শুক্লাপঞ্চমীতে একটি উৎসব হয়, সেদিন রাজ্যের দুই দেবীর মিলন হয়। এক দেবী হলেন নগরের মধ্যস্থলে স্থাপিতা অম্বাবাঈ ও অন্য দেবী হলেন নগরের মাইল দুয়েক দূরে এক পাহাড়ের চূড়ায় অধিষ্ঠিতা টেম্বলাবাঈ। এই দুই দেবী সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী আছে :—দেবীরা হলেন দুই বোন, বড় বোন অম্বাবাঈর হস্তে কোল্‌হাদানব নিহত হলে পর আসন্ন প্রসবা দানবপত্নী অন্যত্র গিয়ে আত্মগোপন করে। যথাসময়ে তার এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়, তার নাম কামাখ্যা। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য কামাখ্যাকে একটি যাদুকাঠি দিলেন শত্রুসমেত দেব-দেবীকে নির্ম্মূল করতে। কামাখ্যাদানব এই যাদুকাঠির সাহায্যে একে একে সব দেবদেবীকে ছাগল-ভেড়ায় পরিণত করতে লাগল। তখন এই দেবী টেম্বলাবাঈ
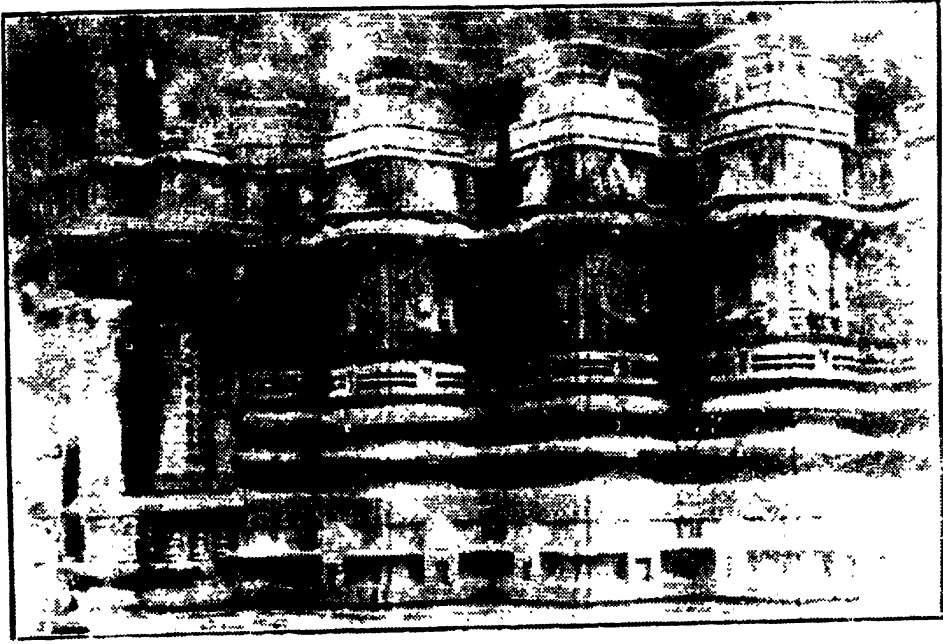
মন্দিরের উত্তর-পূর্ব্ব দিক

নানারূপ ষড়যন্ত্র করে কামাখ্যাকে বধ করে যাদুকাঠি হাতে নিয়ে সব দেবদেবীদের শাপমুক্ত করলেন, দেবতাদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বইল। তাঁরা আনন্দ উল্লাসে মগ্ন হয়ে উৎসব করতে লাগলেন। মহালক্ষ্মীকে অনুরোধ করলেন, তিনি কি ভাবে দুর্দ্দমনীয় দানব কোল্হার শিরশ্ছেদ করেছিলেন তা দেখাতে। দেবী সমস্ত দেবতাদের কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্য সম্মত হলেন ও একটি কুষ্মাণ্ড ও চালকুমড়া আনতে বললেন। তা আনা হ'লে দেবী নিজ হাতে সেটা তুলে নিয়ে প্রস্তরে পরিণত করলেন ও সেটাকে মন্দিরের মুখমণ্ডপে নিয়ে রাখলেন। কোল্হাদানবের প্রতীক হিসাবে। তার পর দেবতাদের বললেন, এটাকে দু'টুকরো করতে। কিন্তু দেবতারা কেহই তলোয়ার দিয়ে এই কুমড়ো দু' টুকরা করতে পারলেন না। দেবী তখন তাঁর তলোয়ার দিয়ে এক কোপে সেই প্রস্তর চালকুমড়োকে দ্বিখণ্ডিত করলেন, সেদিন ছিল আশ্বিনের পঞ্চমী তিথি। এই যে টেম্বলা দেবী দানবকামাখ্যা বধ করে দেবতাদের শাপমুক্ত করেছিলেন, এই আনন্দ উৎসবে সেই দেবীর কথা সবাই ভুলে গেলেন। দেবী মনের দুঃখে অপমানে নগরের বাইরে এক পাহাড়ের চূড়ায় বসে রইলেন। অম্বাবাঈ, তাঁর পাশে ছোট বোন টেম্বলাবাঈকে দেখতে না পেয়ে তাঁকে উৎসবে যোগ দিতে খবর পাঠালেন, কিন্তু অভিমানিনী দেবী এলেন না। তখন অম্বাবাঈ নিজের ছোট বোনকে সন্তুষ্ট করবার জন্য সেই পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে দেবীর সামনে আবার কুষ্মাণ্ড বলি দিলেন।

রাজ্যে সেইদিন থেকে এই প্রথা চলে আসছে যে, প্রত্যেক বৎসর আশ্বিনের পঞ্চমী তিথিতে দু'বোনের মিলন হবে। ঐদিন অম্বাবাঈর উৎসবমূর্ত্তিকে নানা বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করে পাল্কীতে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় টেম্বলাবাঈ মন্দিরে। বিরাট শোভাযাত্রা চলে, স্বয়ং মহারাজা পাত্রমিত্র সহ এতে যোগ দেন। নানারূপ বাদ্য বাজে, হাতী, ঘোড়া, উট চলে। মন্দিরের পুরোহিতরা লাল পট্টবস্ত্র প'রে দেবীর পাল্কী কাঁধে নিয়ে চলেন, পাল্কী লাল রেশমী বস্ত্রে ঢাকা থাকে, আর সেই পাল্কীর উপর প্রকাণ্ড রেশমীছত্র ধরা থাকে। দু'জন ব্রাহ্মণ দেবীর দু'পাশে চামর দোলাতে দোলাতে চলে। মন্দিরে পৌঁছে খুব ধুমধামে পুজো হয় ও একটি সুসজ্জিতা সালঙ্কারা কুমারী কন্যাকে সংগ্রাম-বিজয়িনী দেবীর প্রতীক হিসাবে আনা হয়। সে এসে তলোয়ারের এক কোপে একটি চালকুমড়োকে দু'টুকরা করে। বাদ্য বেজে উঠে, পুজো শেষ হয়। আবার দেবীকে স্বস্থানে ফিরিয়ে আনা হয়।

পুরাণবর্ণিত দানব কামাখ্যার অলৌকিক শক্তি দ্বারা

দেবতাদের পশুতে পরিণত করবার কথা শুনে এই ধরণের আর একটি কাহিনী মনে পড়ল। বাল্যে আমরা শুনতাম, আসামে, কামরূপে কামাখ্যার নারীরা পুরুষদের নাকি ভেড়ায় পরিণত করতে পারত। কামাখ্যা দানবের এই কাহিনীর সহিত কামরূপ কামাখ্যার এই জনপ্রবাদের কোন সংযোগ আছে কি না কে জানে।

কোল্হাপুর যখন মহারাজার শাসনে ছিল। তখন আমরা সে রাজ্যে ছিলাম, কাজেই রাজ্যের নানাবিধ আড়ম্বরপূর্ণ উৎসবে যোগ দেবার ও দেখবার সুযোগ পেয়েছি। এখন রাজা-মহারাজের প্রাধান্যের যুগ চলে গেছে, এখনও রাজ্যে সে সমস্ত উৎসব পূর্ব্বের মতই জাঁকালো ভাবে হয় কি না কে জানে।

ইন্দ্রজাল

পি. সি. সরকার

অনেকেই ইন্দ্রজাল কথাটিকে জাদুবিদ্যা, ভোজবাজী, ইংরেজী "ম্যাজিক" (Magic) এই অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। হস্তকৌশল, যান্ত্রিক কৌশল, ঔষধপত্র, বুদ্ধির প্রখরতা বা মনঃশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির একক বা সম্মিলিত প্রয়োগদ্বারা অদ্ভুত, অভূতপূর্ব, বা অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শনই ইন্দ্রজালবিদ্যার মূল তাৎপর্য্য।

আসলে এই বিদ্যার আদি জন্মস্থান এই প্রাচ্য মহাদেশে, ইহা ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রের একটি অংশ বিশেষ, এবং গুপ্ত বা গুহ্যবিদ্যা হিসাবে প্রচলিত।

জাদু বা যাদু এই উভয় বানানই শুদ্ধ এবং ইহা পারসী শব্দ।

কথিত আছে যে, স্বর্গে ইন্দ্রের সভায় মায়াকারগণ নানারূপ অদ্ভুত অদ্ভুত খেলা দেখাইয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতেন, সেই কারণেই এই বিদ্যা 'ইন্দ্রজাল' নামে খ্যাত। অনেকে বলেন ইন্দ্রিয়ের শ্রেষ্ঠ 'চক্ষুর' উপর 'জাল' বিস্তার করে বলিয়া, দৃষ্টিবিভ্রম ঘটায় বলিয়া ইহার নাম 'ইন্দ্রজাল' হইয়াছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ-যোগ্য যে, ব্রহ্মদেশে ইন্দ্রজালকে তাহাদের ভাষায় বলে 'মিয়া হ্লে' অর্থাৎ চক্ষুর উপর ভ্রম বিস্তার করা।

কথিত আছে যে, মালব দেশের রাজা ভোজ এই বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার কন্যা (বিক্রমাদিত্য মহিষী) রাণী ভানুমতীও এই ইন্দ্রজাল বিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। তাঁহাদের নাম হইতে এই বিদ্যার অপর নাম 'ভোজবাজী' বা 'ভোজবিদ্যা' এবং 'ভানুমতী কা খেল' হইয়াছে। অনেকে মনে করেন ভোজবাজী এবং ভোজবিদ্যার সহিত রাজা ভোজের কোনও সম্পর্ক নাই। বস্তুতঃ ইহা 'ভুজবাজী' এবং 'ভুজবিদ্যা' কথা দুইটির ব্যতিক্রম মাত্র। তাঁহাদের মতে ভুজ = হাত এবং 'ইন্দ্রজাল' হইতেছে 'হাত সাফাইয়ের খেলা' বা 'হস্ত লাঘব বিদ্যা'। ইংরেজীতে অনুরূপ কথার (sleight-of-hand) এই বিদ্যা বিষয়ে ব্যবহার আছে। তাঁহারা মনে করেন যে, দ্রুত হস্তসঞ্চালন কৌশলে মানবচক্ষু বিভ্রান্ত হয় এবং এক্ষেত্রে হস্তসঞ্চালন এবং চক্ষুর বিভ্রান্তি সৃষ্টি উভয়ই ইন্দ্রজাল কথায় প্রযুক্ত হইয়াছে। অনেকে মনে করেন 'ভানুমতী কা খেল' বলিতে রাণী ভানুমতীর কোন ব্যাপারই নাই; উহা ভানুমতী কা খেল'—যে খেলায় মতি (মনে) বিভ্রম ঘটায় উহাই 'ভানুমতী কা খেল'।

ইংরেজ রাজত্বের পর হইতে ভারতবর্ষে ইন্দ্রজাল বিদ্যার প্রভূত পরিবর্তন হইয়াছে—এবং এদেশে ইহার প্রতিশব্দ হিসাবে 'ম্যাজিক' কথাটির বহুল প্রচলন হইয়াছে। অহরহঃ ব্যবহারের ফলে 'ম্যাজিক' কথাটি চেয়ার-টেবিলের মত নিত্যব্যবহার্য বাংলা শব্দ বলিয়া ভ্রম হয়।

যীশুখ্রীষ্টের জন্ম সময়ে তিনজন প্রাচ্যের বুদ্ধিমান্ লোক (ইংরাজীতে ইহাদের নাম 'ম্যাজি' Magi) আকাশে তারকার আবির্ভাব হইতে গণনা করিয়া খ্রীষ্টের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বেথেলেহেম যান। প্রাচীন সেই 'ম্যাজি' বা বুদ্ধিমান্ লোকদের ক্রিয়াকলাপ হইতেই 'ম্যাজিক' কথাটি সৃষ্টি হইয়াছে। ইন্দ্রজাল বলিতে বুদ্ধির

খেলাই বুঝান উচিত। প্রচুর অভ্যাস (অভ্যাসের অন্য নাম সাধনা) দ্বারা, (হস্তলাঘব কৌশল) দ্বারা, ইচ্ছাশক্তি মনঃশক্তি দ্বারা, ঔষধপত্র ব্যবহারে অথবা যন্ত্রপাতির ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে অদ্ভুত কিছু সম্পাদন করলেই তাহা ইন্দ্রজাল আখ্যা দেওয়া চলে।

ভারতীয় ইন্দ্রজাল সম্বন্ধে গবেষণা করিলে দেখা যায় বাটী ও বলের খেলা এদেশের (ঐতিহাসিকদের মতে পৃথিবীর) সর্বাপেক্ষা প্রাচীন খেলা। ভারতের পথের বেদিয়াগণ শূন্য বাটী এবং কয়েকটি ছোট ছোট গুটি (বল) লইয়া "এই আছে, এই নাই এইরূপ ভেল্কি" দেখাইয়া থাকেন। উহা প্রকৃতই পুনঃ পুনঃ অভ্যাসলব্ধ হস্ত-কৌশলের ফল। প্রদর্শনভঙ্গিমা এবং বংশপরম্পরাগত অভিজ্ঞতার গুণে এই হস্তলাঘববিদ্যার খেলাটি দর্শক চক্ষুতে মায়া বা ভ্রমের সৃষ্টি করে। জ্যোতিষী বা সন্ন্যাসীগণ যে কোন অঙ্ক সংখ্যা বা রাশি অথবা ফুলের নাম পূর্বাহ্নে লিখিয়া রাখিয়া যে সমস্ত মনঃশক্তির খেলা দেখান অথবা যে কোন গন্ধের ঘ্রাণ পাইবার অথবা নখদর্পণে দেবদেবীর মূর্তির আবির্ভাব দেখান উহা প্রকৃতই মনঃসমীক্ষণ, ইচ্ছাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির খেলা। বশীকরণ, চিন্তাপাঠ, সম্মোহন প্রভৃতিকে এই পর্যায়ভুক্ত করা চলে। পথের বেদিয়াগণ জলের মধ্য হইতে শুষ্ক বালি তুলিয়া লইয়া যে খেলা বহুশতাব্দী যাবৎ দেখাইয়া আসিতেছেন উহা বস্তুতঃ ঔষধপত্রাদি বা রাসায়নিক ক্রিয়ামাত্র! কারণ সাধারণ বালুকাকে ঘৃতে ভাজিয়া লইয়া এই খেলা দেখান হয়। শূন্যে অবস্থান, আদেশমত হুঁকা হইতে ছোট কাঠের খেলনা, নৌকার মধ্যে জল ফেলা এবং বন্ধ করা, ঝুড়ির মধ্যে মেয়ে-ভর্তি করিয়া অদৃশ্য করা প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় খেলাগুলিও বস্তুতঃ যন্ত্রপাতি এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালী-সম্বলিত খেলামাত্র। যাদুকরগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ হইতে নানাবিধ উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহাদের গুপ্ত প্রয়োগ করিয়া লোক-সমাজের মনোরঞ্জন করিয়া খ্যাতি এবং জীবিকা অর্জন করিয়া থাকেন—প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা যাদুকরের অভিনয় করেন মাত্র।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ইন্দ্রজালবিদ্যার প্রচলন হইয়াছে। মিশর দেশের ধর্মযাজকগণ, রোমের পুরোহিতগণ, ভারতের প্রাচীন মুনিঋষি ও সন্ন্যাসীগণ এই বিদ্যা নানা ক্ষেত্রে নানা ভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। ধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া প্রাচীনকালের পুরোহিত, ধর্মযাজক এবং সন্ন্যাসীগণ নিজদিগকে ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী, সম্রাট্ অপেক্ষাও অধিক দৈবক্ষমতাশালী প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে এই বিদ্যার প্রচলন করেন। তাঁহারা ইহাকে গুপ্তবিদ্যা হিসাবে অনুসরণ করিতেন এবং গুরু হইতে শিষ্য এইভাবে যুগপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছিল। পরে দর্শকদের চক্ষু ধাঁধাঁইবার এবং অলৌকিক ক্রিয়া দেখাইবার উদ্দেশ্যে এই বিদ্যার প্রচলন হয়। মোগল রাজত্বকালে একদল বাঙালী যাদুকর বাদশাহ জাহাঙ্গীরের দরবারে অপূর্ব যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাঁহার আত্মজীবনীতে (জাহাঙ্গীর নামা) ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য তাঁহার বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যে স্থানে স্থানে সর্পরজ্জুভ্রম, মায়া প্রভৃতির উদাহরণ স্বরূপ ইন্দ্রজাল বিদ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। উত্তর রামচরিতে, অথর্ববেদে এবং তন্ত্রশাস্ত্রের অসংখ্য স্থানে ইন্দ্রজাল ও ঐন্দ্রজালিকের উল্লেখ আছে।

রঙ্গমঞ্চে কাল পর্দার সম্মুখ কাল রংএর কোট-প্যাণ্ট পরিধান করিয়া ইন্দ্রজাল (ম্যাজিক) প্রদর্শনরীতি সম্পূর্ণ ইংরেজদের অবদান। ইংরেজরা সান্ধ্যপোষাকে যেধরণের কাল কোট-প্যাণ্ট (ডিনার স্যুট) পরিধান করেন উহাই এদেশে যাদুকরদের পোশাক হিসাবে প্রচলিত হয়। ইদানীং কালে ভারতীয় যাদুকরগণ স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখিয়াছেন এবং নিজেদের বিশ্বস্ত ইন্দ্রজাল প্রতিষ্ঠান (All-India Magic Circle) মাধ্যমে নানা ভাবে তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া ইন্দ্রজালের সাজ-সরঞ্জাম, প্রয়োগপদ্ধতি, পোশাক এবং পরিবেশের বিরাট্ পরিবর্তন করিয়াছেন। ভারতীয় ইন্দ্রজালকে কলা (আর্ট) এবং বিজ্ঞান (সায়েন্স) পর্যায়ে ফেলিয়া ইহা সম্বন্ধে রীতিমত গবেষণা চলিতেছে এবং ভারতীয় ইন্দ্রজাল আবার বিশ্বের জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

এতাবৎকাল রঙ্গমঞ্চে (থিয়েটারে) নাটকে প্রয়োগ-কর্তাগণ ইন্দ্রজালবিদ্যার সাহায্য লইতেন। পৌরাণিক নাটকে দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণমূর্তি কালীমূর্তিতে রূপান্তরিত হইল, সীতা পাতাল প্রবেশ করিলেন অথবা আরব্য উপন্যাসে নায়কের পক্ষীরাজ ঘোড়া অথবা উড়ন্ত কার্পেটে আগমন, সবগুলিই এই ইন্দ্রজালের খেলা মাত্র। নানারূপ আলোক-কৌশল, পর্দার প্রয়োগচাতুর্য, দড়ি, সূতা স্প্রিং, মেঝেতে গর্ত (Trap) প্রভৃতির সাহায্যে এইসব সম্ভবপর হইত। এতকাল নাটক ইন্দ্রজালের সাহায্য লইত—কিন্তু বর্তমানে ইন্দ্রজাল নিজেই নাটকে রূপান্তরিত হইতে চলিয়াছে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রজালের প্রতিটি ক্রিয়ায় এক্ষণে নাটকীয় রূপ দেওয়া হয়। ইহার পাত্র-পাত্রীদের চরিত্রে অভিনয়-দক্ষতার

আলোক-বিন্যাস, বিবিধ পোশাক-পরিচ্ছদ, পশ্চাৎপট এবং গতিশীল আবহসঙ্গীত সমন্বয়ে একীভূত হইয়া ভারতীয় ইন্দ্রজাল নূতন তিলোত্তমার বেশ ধারণ করিয়া বিশ্বপরিক্রমা করিতেছে। বর্ত্তমান কালেও এই বিদ্যায় বাঙালীদের দান সর্বাধিক।

অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্যর টমাস রো সাহেব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দৌত্য করিতে আসিয়া রাজধানী সহরে ইন্দ্রজাল দেখিয়া যান। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গপট্টম্ হইতে একদল ভারতীয় যাদুকর ইংলণ্ডে ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করিতে যান। তৎপূর্বে অপর একটি ভারতীয় যাদুকরদল সেখানে ভেল্কির খেলা দেখাইয়াছিল। ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যাদুকর রামস্বামীর নেতৃত্বে লণ্ডনের বণ্ড ষ্ট্রীটের (bond street) রঙ্গালয়ে ইন্দ্রজাল প্রদর্শিত হয়। বর্তমান শতকের প্রথম ভাগে (১৯০৫-৬) প্রসিদ্ধ মার্কিন যাদুকর থার্স্টন (Thurston) সাহেব ভারতবর্ষে আসেন। তিনি বেলা হাসান নামক তৎকালীন একজন ওস্তাদ যাদুকরকে তাঁহার দলভুক্ত করেন এবং সঙ্গে করিয়া আমেরিকাতে লইয়া যান। বিদেশী বড় বড় ঐন্দ্রজালিক এদেশে আসিবার ফলে বোম্বাইতে প্রফেসর মিনু, সুরাটে প্রফেসর আলভারো এবং বাংলা দেশে যাদুকর সত্য ঘোষ, রাজা বসু, প্রফেসর গণপতি চক্রবর্তী প্রভৃতি কীর্তিমান্ যাদুকরদের আবির্ভাব হয়। ইঁহাদের মধ্যে প্রফেসর আলভারো এবং যাদুকর গণপতি স্টেজম্যাজিকে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। যাদুকর গণপতি প্রথমে যাত্রাদল তারপর নাটকের দল হইতে জাদু জগতে প্রবেশ করেন। ক্রমে ক্রমে বিখ্যাত বসুর সার্কাসের দলের সঙ্গে ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করিয়া বহু দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং শেষ জীবনে নিজেও যাদুবিদ্যার একটি দল গঠন করিয়া ভারতের নানা স্থানে ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করেন।

যাদুকর গণপতি-প্রদর্শিত ভৌতিক বাক্সের খেলা, কংস কারাগার, ভৌতিক বৃক্ষ হইতে মুক্তিলাভ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

—০—

ভারত-সীমান্ত

শ্রীতরুণবিকাশ লাহিড়ী

সীমান্তের মাধ্যমে দু'টি প্রায় পরস্পরবিরোধী কাজ করা হয় ব'লে সীমানা নিয়ে আজ এত সমস্যা। সীমানা নিষেধ করে আবার অভ্যর্থনাও জানায়। অনুপ্রবেশ যেখানে অভিসন্ধিমূলক, প্রতিবেশীর সার্ব্বভৌমতা ক্ষুণ্ণ করা যে অনুপ্রবেশের উদ্দেশ্য, সেখানে সীমানার কাজ প্রতিহারীর, কিন্তু দুই প্রতিবেশী বন্ধু-রাষ্ট্র যদি বৈধভাবে বাণিজ্য করতে চায় তবে সীমান্ত অঞ্চলে সেই প্রচেষ্টায় সানন্দ সহযোগিতা করার ব্যবস্থা অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। সীমান্তের এই দ্বৈত ভূমিকার জন্যই সমস্যার উদ্ভব হয়। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সীমানা নিয়ে জটিলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা নিজেদের রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌমতা সম্বন্ধে আজ অত্যন্ত সচেতন, সামান্যতম সীমানা-লঙ্ঘনও উপেক্ষা করতে পারি না। প্রতিটি সভ্য রাষ্ট্রের প্রধানতম দায়িত্ব নিজের সীমান্ত রক্ষা করা, কেননা শুধু নিরাপত্তার বিবেচনায় নয়, সীমানার সঙ্গে দেশের মর্য্যাদা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কিন্তু এই গুরুদায়িত্ব সুচারুভাবে সম্পাদন করা সহজ নয়, অনেকগুলি কারণের মধ্যে দু'টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

(ক). ভৌগোলিক অসুবিধার জন্য যথাযথভাবে সীমানা নির্দ্দেশ বা নিরূপণ করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে।

(খ) সীমানা সম্পর্কে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের এক বিশেষ মনোভাবের ফলে সঙ্কট দেখা দিতে পারে। নাৎসী রাজনীতিজ্ঞ হাওসোফার মনে করতেন, একমাত্র দুর্ব্বল রাষ্ট্রের পক্ষেই কোন একটি নির্দ্দিষ্ট সীমানাকে মান্য করা শোভা পায়, যে রাষ্ট্র প্রগতিশীল ও বলিষ্ঠ তার কাছে সীমানা এক সাময়িক যুদ্ধ-বিরতি রেখা-মাত্র !

উপরোক্ত দু'টি কারণের মধ্যে দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন কেননা, কোন রাষ্ট্র ঐ অদ্ভুত মতবাদে বিশ্বাসী হলেও তা প্রকাশ করবেন না। এ বিষয়ে

আলোচনা করলে কেবলমাত্র অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হবে। তবে ভারত-সীমান্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম কারণটি অনুধাবন করা যায় আর তার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিয়েছে। তার পূর্ব্বে সীমানা ও সীমান্তের শ্রেণী-বিভাগ সম্বন্ধে সাধারণভাবে দু'কথা ব'লে নেওয়া হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

সীমানার শ্রেণীবিভাগ

প্রধানতঃ চার প্রকার সীমানা দেখা যায়:

(ক) প্রাকৃতিক সীমারেখা, অর্থাৎ পর্ব্বতমালা, নদী, হ্রদ, ইত্যাদির সাহায্যে যে সীমানা নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে।

(খ) সাংস্কৃতিক সীমারেখা, জাতিগত, ভাষাগত পার্থক্যের উপর ভিত্তি ক'রে যে সীমানা চিহ্নিত করা হয়।

(গ) মিশ্র সীমারেখা, প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক কারণের সমন্বয়ে গঠিত সীমানা।

(ঘ) জ্যামিতিক সীমারেখা, সাধারণতঃ প্রশাসনিক সুবিধার জন্য সরলরেখার সাহায্যে সীমানা নির্দ্দেশ করা হয়। এই ধরণের সীমারেখা প্রধানতঃ আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় দেখা যায়।

ভারত-সীমান্ত

ভারতবর্ষ একটি উপদ্বীপ। ভারতের একদিকে সমুদ্র আর তিনদিকে স্থলভাগ। সমুদ্রের কল্যাণে দক্ষিণ সীমা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই, যত জটিলতা উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব্ব সীমান্ত ঘিরে, ভারত-চীন, পাক-ভারত সীমান্ত নিয়ে।

ভারত-চীন সীমান্ত

কাশ্মীর থেকে আসাম পর্য্যন্ত দীর্ঘ ২৪০০ মাইল ধ'রে বিস্তৃত ভারত-চীন সীমান্ত। অবশ্য পূর্ব্বদিকের কিছুটা অংশ জুড়ে রয়েছে নেপাল ও ভারতের প্রভাবাধীন দুই রাষ্ট্র, ভুটান ও সিকিম। তবে সমগ্রের তুলনায় এদের পরিসর এত অল্প যে, মোটামুটিভাবে উত্তর সীমান্তকে ভারত-চীন সীমারেখা হিসাবেই গণ্য করা যায়। এই সীমারেখা প্রাকৃতিক হিমালয় পর্ব্বতমালার জল-বিভাজিকাকে অনুসরণ করেছে।* সিমলায় ১৯১৩-১৪ সনে ভারত, চীন ও তিব্বতের প্রতিনিধিদের এক যুক্ত বৈঠকে এই সীমানা নির্দ্ধারিত হয়। অনুরূপ উদাহরণ পৃথিবীর অন্যত্রও দেখতে পাওয়া যায়, যেমন ফ্রান্স ও স্পেনের সীমানা পীরেনিজ পর্ব্বতমালার জলবিভাজিকাকে অনুসরণ করেছে, আণ্ডিজ পর্ব্বতমালার জলবিভাজিকা চিলি ও আর্জ্জেন্টিনার মধ্যবর্ত্তী সীমানা রচনা করেছে। এই ধরণের প্রাকৃতিক সীমান্ত বিজ্ঞান-সম্মত কেননা জল-বিভাজিকা হতেই নদীর উৎপত্তি হয়, নিজের দেশের নদ-নদীর উৎসস্থল স্ব-সীমার মধ্যে থাকাই বাঞ্ছনীয়।

গঠনের জন্য হিমালয় ভারতের উত্তর সীমান্ত রক্ষার ব্যাপারে কিছু বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। উত্তর ভারতের সমতলভূমি হতে হিমালয় অত্যন্ত খাড়াভাবে ওঠায় যোগাযোগ ব্যবস্থা গ'ড়ে তোলা, দক্ষিণ হতে উত্তরে যাওয়ার পথ নির্ম্মাণ করা কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য। তিব্বতের দিকে হিমালয়ের ঢাল অনেক ক্রমনিম্ন হওয়ায় ঐ প্রান্ত হতে ভারতীয় এলাকায় প্রবেশ করা সহজসাধ্য, রাস্তা-ঘাট তৈরী করার সুবিধা রয়েছে। আল্পসের ক্ষেত্রেও এই অবস্থা দেখা যায়। ইটালীর সমতলভূমি হতে আল্পস্ খাড়াভাবে উঠেছে অথচ জার্ম্মান ও সুইস মালভূমি থেকে তার উত্থান অনেক ক্রমউচ্চ। এই প্রাকৃতিক প্রতি-কূলতায় জার্ম্মান আক্রমণ থেকে ইটালীকে রক্ষা করায় অসুবিধা হ'ত ব'লে নেপোলিয়ন আল্পস্‌কে 'Splendid Traitor' আখ্যা দিয়েছিলেন।

উত্তর সীমান্তবর্ত্তী এলাকায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল, জম্মু ও কাশ্মীর। এই রাজ্যের অতি নিকটে সোভিয়েট রাশিয়া, আর এর সীমানা স্পর্শ ক'রে রয়েছে তিনটি রাষ্ট্র আফগানিস্থান, পাকিস্থান ও চীন। এই রাজ্যে ও এর কিনারে রয়েছে হিমালয়ের সবচেয়ে সুবিধাজনক তিনটি গিরিপথ: কারাকোরাম, গিলগিট, ব্রাজেল আর অদূরেই গুরুত্বপূর্ণ সিপকি গিরিপথ। ঝিলম উপত্যকার মত বিমান-ঘাঁটি নির্ম্মাণের এমন উপযুক্ত জায়গা বন্ধুর মধ্য এশিয়ায় আর একটিও নেই। আশ্চর্য্য কি, মধ্য এশিয়ার এই স্নায়ু-কেন্দ্রে চীন ঘাঁটি স্থাপন করতে চাইবে, লাডাকের যে অংশটুকু অবৈধভাবে দখল করেছে তা পুনর্ব্বার হস্তান্তর করতে নারাজ হবে।

অবশ্য শুধু লাডাকের বেলায় নয়, চীন সমগ্র ভারত-চীন সীমান্ত পুনঃ নির্দ্ধারণের জন্য দাবী তুলেছে। চীন সরকার সিমলা বৈঠকের সিদ্ধান্ত অস্বীকার করেছেন, ম্যাকমেহন লাইনের (নেফা ও তিব্বতের মধ্যবর্ত্তী সীমারেখা) বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চল মিলিয়ে ভারতের প্রায় পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল ভূমি দাবি করেছেন। চৈনিক মানচিত্রগুলিতে লাডাকের অংশবিশেষ ও নেফাকে চীনের অংশ হিসাবে দেখান হচ্ছে। কিন্তু প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক উভয়

---

* হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গগুলিকে একটি কাল্পনিক রেখার দ্বারা যুক্ত করলে জলবিভাজিকার অবস্থান সম্বন্ধে আন্দাজ পাওয়া যায়।

বিচারেই চীনের দাবি অযৌক্তিক ব'লে মনে হয়। চৈনিক দাবি অনুযায়ী ভারত-চীন সীমান্ত হিমালয়ের জল-বিভাজিকা হতে অনেকখানি দক্ষিণে স'রে আসে, তাদের মনোমত সীমারেখা অবৈজ্ঞানিক হয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কেবল ভারতের ক্ষেত্রেই অন্যায় দাবি উত্থাপন করা হয়েছে। চীন ও ব্রহ্মের মধ্যে সম্প্রতি যে সীমানা-চুক্তি হয়েছে তাতে উভয় দেশের মধ্যবর্তী জলবিভাজিকাকেই (ম্যাকমেহন লাইনেরই প্রসারিত অংশ) চীন-ব্রহ্ম সীমান্ত হিসাবে স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়েছে। নেফাকে চীনের অংশ ব'লে দাবি করার পিছনে অপর যে যুক্তি প্রদর্শন করা হয় তারও ভিত্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল। একথা প্রচার করা হয় যে, নেফার অধিবাসীদের সংস্কৃতি তিব্বতীয়দের মত। কিন্তু এই রটনা সত্য নয়। তিব্বতীয়রা নেফার অধিবাসী দাফলা, মিরি, আবর প্রভৃতি উপজাতিদের চিরকাল পৃথক্ ব'লে গণ্য করেছে, এই উপজাতিদের তারা 'লোপাস' অর্থাৎ নিম্ন-শ্রেণীর অসভ্য ব'লে মনে করেছে। সুতরাং দেখা যায়, চৈনিক দাবির পিছনে কোনও বলিষ্ঠ-যুক্তি নেই আর সেই কারণেই আশঙ্কা হয়। যেখানে তথ্যের অভাব, সত্য যেখানে সহায় নয়, সেই অন্যায় দাবি যখন উত্থাপন করা হয়েছে তখন তার সমাধান বোধ হয় সহজে হবে না।

উত্তর সীমান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিব্বতের অতীত ভূমিকার কথা বাদ দেওয়া যায় না। ভারত ও চীনের মধ্যে অবস্থিত অনুন্নত স্বাধীন তিব্বত ১৯৫১ সাল অবধি 'বাফার রাষ্ট্রের' কাজ করেছে। উত্তর সীমান্তে এই ধরণের একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অবস্থিতি ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক ছিল। তিব্বতের কল্যাণেই দীর্ঘকাল ধ'রে আমাদের উত্তর সীমান্তে কোনও উপদ্রব হয় নি। ১৯৫১ সালে চীন সরকার তিব্বতের স্বাধীনতা হরণ করেন, এর পর থেকেই উত্তর সীমান্তে অশান্তি সুরু হয়েছে। শক্তিশালী চীন ভারতের সীমানা পর্য্যন্ত নতুন নতুন সড়ক নির্ম্মাণ করেছেন, ভারতের প্রান্তবর্ত্তী লাসা-সিগাতসি-গারতংসি ও সিংকিয়াং-তিব্বত রাজপথ দুইটির আমূল সংস্কার ক'রে ভারত সীমান্ত পর্য্যন্ত দ্রুত সামরিক সরবরাহের সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে, কারমালিক-গারটক রাজপথ ত লাডাকের ওপর দিয়েই নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সবদিক্ বিচার করলে দেখা যায়, উত্তর সীমান্তে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তিব্বতের স্বাধিকার প্রশ্নটি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তিব্বতীয়রা যে স্বাতন্ত্র্য দাবী করেন তা মোটেই অযৌক্তিক নয়। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক্ দিয়ে তিব্বত চীন থেকে পৃথক্, তিব্বতের ভাষা আলাদা, তিব্বতীয়দের লোকাচার ও সংস্কৃতি চীনাদের থেকে স্বতন্ত্র। তিব্বতীয়রা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পাওয়ার জন্য যে দাবী করছেন তা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত।

পাক্-ভারত সীমান্ত

পাক্-ভারত সীমান্ত তথাকথিত সাংস্কৃতিক ভিত্তির (দুই জাতি তত্ত্ব) ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বিচার করলে দেখা যায়, দেশ বিভাগে সিরিল র‍্যাডক্লিফ কোন একটি সুসমঞ্জস নীতির অনুসরণ করেন নি, না সাংস্কৃতিক, না প্রাকৃতিক, না প্রশাসনিক। সীমারেখা বিজ্ঞানসম্মত না হওয়ায় আজও পর্য্যন্ত সীমান্ত-অঞ্চলে বিবাদের অন্ত নেই। বিচারপতি বাগে পরে ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বিশেষ সফল হন নি।

ভারত-পাক্ সীমানা একটি সংযুক্ত রেখা নয়, দুই অংশে বিভক্ত। পশ্চিমে এই আন্তর্জ্জাতিক সীমারেখা সৌরাষ্ট্র ও রাজস্থানের পশ্চিমসীমা অবলম্বন ক'রে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হয়ে পাঞ্জাবকে দুই অংশে বিভক্ত করেছে। পূর্ব্বাঞ্চলে আসাম ও পশ্চিম বাংলা পূর্ব্ব পাকিস্তানকে বেষ্টন ক'রে রয়েছে। দুই অংশের সীমান্ত সমস্যা একরূপ নয়, তাই ভিন্ন-ভাবে আলোচনা করলে পাক্-ভারত সীমান্ত সমস্যা বুঝতে সুবিধা হবে।

পশ্চিম-বাংলা-পূর্ব্ব পাকিস্তান আসাম সীমান্ত

কোন সময়েই একটি বদ্বীপকে স্বাভাবিকভাবে ভাগ করা যায় না। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-গঠিত বদ্বীপ বাংলা দেশ খণ্ডিত করার অসুবিধা অনেক। পূর্ব্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম বাংলার মধ্যেকার বঙ্কিম আন্তর্জ্জাতিক সীমারেখা কখনও নদীপথ ধ'রে কখনও বা অত্যন্ত জনবহুল সমতল ভূমির ওপর দিয়ে গিয়েছে। গাঙ্গেয় সমভূমিতে দীর্ঘ পাক্-ভারত সীমান্ত প্রায় সর্ব্বত্রই নদীখাতের দ্বারা চিহ্নিত। এই ধরণের সীমানা সমস্যা সৃষ্টি করে। বদ্বীপের নদীগুলির বৈশিষ্ট্যই হ'ল, অবিরত গতি পরিবর্ত্তন করা। এর ফলে ঘন ঘন নতুন ক'রে সীমানা নির্দ্ধারণের প্রয়োজন দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বেশ কিছুটা দৈর্ঘ্য জুড়ে যে মাথাভাঙা নদী পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব্ব পাকিস্তানের মধ্যে সীমারেখা রচনা করেছে, সেই মাথাভাঙার গতি পরিবর্ত্তনের ব্যাপারে বিশেষ দুর্নাম আছে। এইখানেই শেষ নয়, নদীতে নতুন চর ওঠে, নতুন বিবাদের সূত্রপাত হয়, তা ছাড়া, মৎস্য শিকারের অধিকার নিয়ে সঙ্কট ত লেগেই আছে।

আসাম পূর্ব্ব পাকিস্তান সীমান্ত জনবিরল অরণ্যাবৃত পার্ব্বত্যভূমির ওপর বিস্তৃত। এই প্রান্তের প্রধান অসুবিধা যথাযথ যাতায়াত ব্যবস্থার অভাব। সেই কারণে এই বন্ধুর সীমান্ত রক্ষা করা কষ্টকর। অনেকটা দৈর্ঘ্য জুড়ে লুসাই পর্ব্বতমালা সীমান্ত বরাবর সমান্তরাল ভাবে প্রসারিত। পরিবহনের উপযোগী গিরিপথ প্রায় নেই বললেই চলে। সীমান্তের সঙ্গে অন্তর্দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্ব্বল। বিশেষ আশঙ্কাজনক যে, এই সামরিক দিক্ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে রেলপথ ও রাজপথের দৈর্ঘ্য অতি নগণ্য। আট'শ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য সীমান্ত অঞ্চলে প্রতি ১০০ বর্গ মাইলে মোটর উপযোগী পথের দৈর্ঘ্য মাত্র ১ থেকে ৫ কিলোমিটার। রেলপথের অবস্থাও অনুরূপ, ৬৭৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত অঞ্চলে নিকটতম রেললাইন থেকে (রেল ষ্টেশন নয়) সীমানার দূরত্ব ৮০ কিলোমিটারেরও বেশী। এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, বিপদের সময় আসাম সীমান্তে দ্রুত সরবরাহ পৌঁছান কত কঠিন।

পূর্ব্বাঞ্চলে সীমান্ত রক্ষার সমস্যা ছাড়াও প্রশাসনিক অসুবিধা আছে। সীমানা যেখানে জনবহুল সমভূমির ওপর দিয়ে গিয়েছে সেখানে অবৈধ বাণিজ্যের প্রকোপ বেশী। Enclave গুলিতে যথাযথভাবে শাসন-কার্য্য পরিচালনা করা আর এক সমস্যা।

ভারত-পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্ত

পঞ্চনদীর দেশ পাঞ্জাবকে খণ্ডনের ফলে এর সেচ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছে। বৃহত্তম সেচখালগুলি ও জলসেচিত জমির শতকরা সত্তর ভাগ পড়েছে পশ্চিম পাঞ্জাবে, কিন্তু নদীগুলির উৎসস্থল রয়েছে ভারতে। দেশ বিভাগের পর স্বাভাবিকভাবেই ভারতের পক্ষে নতুন খাল খননের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় আর তার ফলে পাকিস্তানে জল-সরবরাহ কমে যাবে এই আশঙ্কায় পাক-সরকার আপত্তি প্রকাশ করেন। এই খাল-সম্পর্কিত বিবাদ বহুদিন ধ'রে চলেছে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় এই বিরোধের একটা নিষ্পত্তি হয়েছে, ভারত পাকিস্তানকে একটা মোটা অঙ্কের টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছে। কিন্তু মনে হয়, এই শান্তি সাময়িক। কেননা, ক্রমবর্দ্ধমান লোকসংখ্যার চাপে নতুন সেচখালের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে আর তার ফলে পুনরায় বিবাদ সুরু হওয়া অসম্ভব নয়। জলের সেখানে অনেক দাম।

দক্ষিণে অবশ্য বিরোধের সম্ভাবনা ও সুযোগ কম। সীমানা এখানে রাজস্থানের ঊষর ধূর মরুভূমি ও কচ্ছের লবণাক্ত জলাভূমি বেষ্টন ক'রে রয়েছে। এই দুই অনুর্ব্বর প্রান্তে সীমানা লঙ্ঘনের ঝোঁক না হওয়াই স্বাভাবিক।

ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত

সৌভাগ্যক্রমে, এই সীমান্ত-অঞ্চলে আজও কোন সঙ্কট দেখা দেয় নি। পর্ব্বতাকীর্ণ বিপদ্সঙ্কুল এই সীমান্ত আজও নিরুপদ্রব। প্রায় দশ হাজার ফিট উঁচু পর্ব্বত-শৃঙ্গগুলির ধারা এই সীমান্ত সুরক্ষিত। এই সীমানা অতিক্রম করবার জন্য দু'টি মাত্র উল্লেখযোগ্য পথ আছে :

(ক) তাউনগুপ গিরিপথ

(খ) কোহিমা-তমু-কাবাভ্যালী সড়ক। এই পথটির গুরুত্বই সবচেয়ে বেশী।

প্রাকৃতিক কারণে ভারত-ব্রহ্ম বাণিজ্য ও সংযোগ প্রধানতঃ জলপথেই হয়ে থাকে। শান্তিকামী দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে আজও কোন বিরোধ হয় নি।

* * *

সীমানা সুচারুভাবে নির্দ্দিষ্ট করা দরকার, সীমান্ত-অঞ্চল সুরক্ষিত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য্য, কিন্তু সবার উপরে সত্য, দুই দেশের সঙ্গমস্থলে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রেষ্ঠতম উপায়, মৈত্রী; দুই প্রতিবেশীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব: বিভেদ নয়, বিশ্বাস।

এ শুধু গানের রাত

শ্রীসৌরি ঘটক

সমাজ-গবেষকদের মতে পুরাকালে মানুষের সৃষ্টি-রহস্য সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা থেকেই লিঙ্গপূজার প্রথম উৎপত্তি। আমাদের মহাদেবের কল্পনাতেও সেই রকমের কোন ধারণা থাকতে পারে। সে যাই হোক না কেন, পল্লী-বাংলার শিবঠাকুরটি কিন্তু তাদের ঘরের জন। বর্ষার রাতে সেই শিবঠাকুরের তিন কন্যের বিয়ের সমস্যা, কুমারীদের শিবপূজা, মেয়েদের নীলপূজা আর চৈত্র-সংক্রান্তির গাজনের উৎসব তাদের সাংস্কৃতিক জীবনে ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছে। তাই গাজনের তিনদিন আগের এই রাতটি রূপান্তরিত হয় এক গানের রাতে—দেশের লোকের ভাষায় বোলান গানের রাত।

এ রাতটা যে কেমন করে এমনধারা গানের রাতে রূপান্তরিত হ'ল, সে আজ গবেষণার বিষয়। হয়ত প্রাথমিক স্তরে এমন একটা ধারণা ছিল, শিব শ্মশান-চারী—ভূতপ্রেত, যক্ষ, রক্ষ তার অনুচর। তাই শিব-পূজোর রাতে এমনিধারা উদাস হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয় গাঁয়ে গাঁয়ে গান গেয়ে—তার পর সেইটাই বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংস্কারের ভেতর দিয়ে রূপান্তরিত হয়েছে এই ভাবে। কিন্তু সে যেমন করেই হোক, দীর্ঘ যুগ যুগান্তরের সাধনায় রাঢ়-বাংলার মানুষ সৃষ্টি করে ফেলেছে একটি আশ্চর্য্য রাতের—যে রাতে শুধু গান আর গান—ঝিঁঝিঁ-ডাকা পল্লীর বুকভরা শুধু সুর আর সুরের হিল্লোল।

রাঢ়-বাংলার আর কোন উৎসবে গ্রামের সর্ব্বস্তরের মানুষের এমন সার্ব্বজনীন অংশগ্রহণ হয় না। গাঁয়ের দাদাঠাকুর থেকে সবচেয়ে নিচু জাতের মানুষটি নিয়ে দল হয় তিনটে চারটে। এদের ভেতর যারা বোলান গায়—তারা কোমরে কি পায়ে ঘুঁঘুরের ছড়া পরে, হাতে একগাছা করে কঞ্চি কি ছোট লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। শুধু দলের একজনের হাতে থাকে একটা হারিকেন—একজনের গলায় ঝোলান একটা হারমোনিয়াম আর এক-জনের কোমরে কাপড় দিয়ে বাঁধা একটা ঢোলক। এ ছাড়া দলে একজন থাকবে মুহুরী। তার হাতে খাতা। তাই দেখে সে গানের কলি বলে দেবে। এরা ছাড়া

দু' মাস আগে থেকে সেই আশ্চর্য রাতটির প্রস্তুতি সুরু হয়। প্রথম ফাল্গুনের হাওয়ায় তখনও পাকা ধানের গন্ধের রেশ লুকিয়ে থাকে, আমের মুকুলে মধু-খাওয়া মৌমাছিরা মৌজ হয়ে গুন্ গুন্ করে ভেসে বেড়ায়। গাঁয়ের ধুলো-ওড়া পথে চোখে পড়ে ভিনদেশী মানুষদের আনা-গোনা। শান্ত গ্রাম্য চেহারা, গায়ে রঙীন আলোয়ান। ছোট্ট কপালটায় বিন্দু বিন্দু ঘাম, হাঁটুর ওপর তোলা কাপড়ের নীচে এক পা ধুলো, দেখেই বোঝা যায় অনেক দূর থেকে অনেক মাঠ-ঘাট পেরিয়ে তারা আসছে। গাঁয়ের লোক কোন কিছু শুধোবার আগে তারাই প্রশ্ন করে, 'ছড়াদারের বাড়ীটা কমনে যাব বলতে পারেন—'

গাঁয়ের এক কোণে হয়ত মাটির একখানা চালা ঘর। তারই নিচু বারান্দায় ছোট ছোট তালপাতার চাটাইয়ের ওপর বসে গান নিচ্ছে সব—একজন গুন্ গুন্ করে সুর বলে দিচ্ছে, আর একজন কথাগুলো লিখে নিচ্ছে খাতায়। ছড়াদার মাথাটা একপাশে হেলিয়ে, একটা হাত গালে দিয়ে বেঁধে যাচ্ছে গান—'কৈকেয়ীর সেবাতে গেল দশরথের জ্বালা। আজ আমরা গাইব রামের বনগমনের পালা॥'

একটা গাঁয়ের দল লিখছে, আরও দু' তিনটে গাঁয়ের দল হয়ত ছড়াদারের বাড়ীর পাশের পচা ডোবাটায় হাত-পা ধুয়ে এসে অপেক্ষা করছে, গান লিখে নেবে বলে। এক দলের সারা হ'লে আর একদল বসবে। এরা যদি নেয় সীতাহরণ, ওরা নেবে সাবিত্রী সত্যবান্। তার পর এরা চলে গেলে আরও দল আসবে। ছড়াদার দক্ষিণে পাবে গানপিছু চার টাকা, পাঁচ টাকা। পালাবন্দী গান ছাড়া কেউ কেউ আবার নেবে পাঁচালি, ছড়া। তার পর গাঁয়ে ফিরে গিয়ে প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে এক-একটা আখড়ায় ব'সে সুরু হবে গান সাধা। গাঁয়ের পর গাঁ, পাড়ার পর পাড়ায় সন্ধ্যারাত নেচে উঠবে ঢোলক কি মাদলের বাজনায়। নিশুতি মাঠের বুক বেয়ে ভেসে বেড়াবে সুরের পর সুর, দিনের বেলায় মাঠে গরু চরাতে চরাতে, কি ক্ষেতে কাজ করতে করতে চাষীর কণ্ঠ হতে সেই সব গানের কলি চমকে দেবে দুপুরের প্রশান্তিকে—ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে একটি পরিবেশ—রাঢ় বাংলার বোলানের রাতের পরিবেশ।

দলে থাকে আরও বিশ-পঁচিশ জন। পনের-ষোল থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর বয়সের পর্য্যন্ত মানুষ।

এই বোলান গাওয়া ছাড়া আর একরকমের দল হয়, তার নাম শ্মশান। এরা মাসখানেক আগে একটা কি দুটো মরার মাথা শ্মশান হতে এনে রেখে দেয় কোন পতিত ঘরের কোনায়, কি কোন পুকুরের ধারে বটগাছের গোড়ায়। এক মাস ধ'রে প্রতিদিন সেখানে ধূপ-ধুনো দেয়, একে বলে শ্মশান জাগানো। এদের দলে লোক থাকে কম। পনের-কুড়ি জন। এদের সাজ-পোশাক অন্য রকম। কালি-ঝুলি মেখে যতরকমে পারে বীভৎস করে তোলে নিজেদের চেহারা। পরে শতছিন্ন কাপড়-চোপড়। কেউ কেউ মাথায় এক ফালি নেকড়া বেঁধে গোঁজে শকুনের পালক—কেউ হাতে নেয় মড়ার হাড়, কেউবা মাথা। কোন কোন দল নদীর গর্ভ থেকে কুড়িয়ে আনে আস্ত মড়া ছেলে—কি শেয়াল কুকুরে-খাওয়া তার বিকৃত দেহটা। তার পর রাত একটু ঘন হলে 'জয় শিব মহাদেব' বলে বেরিয়ে পড়ে গাইতে।

যারা শ্মশান গায় তারা সেই বোলানের রাত ছাড়া বেরোয় না। কিন্তু যারা বোলান গায় তারা আগের দিন সন্ধ্যাবেলা গাঁয়ের আসরে একবার গেয়ে নেয়। সন্ধ্যার পরই গুটি গুটি করে গাঁয়ের মেয়ে-পুরুষরা এসে ছেঁড়া চট কি চাটাই পেতে আসর জাঁকিয়ে বসে। মাঝখানে খানিকটা জায়গা ফাঁক থাকে গায়কদের জন্য। 'জয় শিব মহাদেব' বলে গায়করা লাফাতে লাফাতে এসে আসরে ঢোকে। ঢাকি ড্যাডাং ড্যাডাং করে নাচতে নাচতে ঢাক বাজাতে থাকে—আর সেই বাজনার তালে তালে গায়করা মাথার ওপর হাত তুলে মাজা দুলিয়ে উদ্দাম নৃত্য সুরু করে।

পাঁচ-সাত মিনিট ধ'রে চলে এই রকম উদ্দাম নৃত্য। তার পর ঢাকি তার বাজনার তালে তালে একসময় নাচ থামিয়ে দেয়। গোটা দল ভাগ হয়ে যায় দুটো ভাগে। এ পাশে কতক, কতক ও পাশে। মাঝখানে থাকবে হারমোনিয়ম, বাজনদার আর মহুরী। হারমোনিয়ামে সুর উঠবে, বাজনদার মাথা ঝাঁকিয়ে ঢোলকে চড়বড় চড়বড় করে তেয়াই মারবে—আর মহুরী খাতা খুলে একটা ভাগের কাছে গিয়ে ধরিয়ে দেবে প্রথম কলি—'প্রথমে বন্দনা করি মূষিক-বাহনে'—তার পর ও ভাগ সেই ধুয়োটা ধরতেই পরের কলিটা বলবে—'তার পর বন্দনা করি দেব পঞ্চাননে গো—'

প্রথম ভাগ প্রথম কলি গেয়ে নাচতে নাচতে পিছিয়ে যায়, অপর ভাগ গাইতে গাইতে এগিয়ে আসে সামনে। এমনি করে ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে গাওয়া হয় দীর্ঘ পালা।

এক একটা কলিতে এক এক রকম সুর। প্রথম কলি যদি হয় পাঁচালি, দ্বিতীয় কলি রামপ্রসাদী, তৃতীয় হবে ঝুমুর, পরেরটি হবে হয়ত ভাটিয়ালি। যতগুলো কলি তত রকম সুর এমন কি আজকালকার সিনেমার সুর পর্য্যন্ত। তার পর গানের শেষ কলিতে এসে শেষ হবে ছড়াদারের নাম আর মহুরীর গলায় এক গাছি মালা প্রার্থনা করে—

> ছড়াদার যে সুধা কর গো সর্ব্বলোকে বলে
> একটি গাছি ফুলের মালা
> দাও মুহুরীর গলে গো দাও মহুরীর গলে।

মালাটাই সম্মান। মালা চাই-ই। বোলানের রাতের জন্য মালা ভক্তদের গেঁথে রাখতে হবে পঞ্চাশ-ষাট গাছা। মালা ফুরিয়ে গেলে সুতোয় বেল পাতা গেঁথেও মালা পরিয়ে দিতে হবে। এই হ'ল নিয়ম।

গান গাইতে গাইতে রাত গভীর হয়। আকাশে যদি চাঁদ থাকে ত সে চাঁদ উঠে আসে মাথার ওপর। জনহীন বাড়ীগুলো নিঃশব্দে পড়ে থাকে অন্ধকারে—দু' একটা কুকুর হয়ত গাছের ছায়ায় কাঁপন দেখে ঝাঁ ঝাঁ করে ডেকে ওঠে—মানুষগুলো ঘন হয়ে বসে গান শোনে। বোলান শেষ হয়। সুরু হয় ছড়াদারের কাছে বেঁধে-আনা নতুন নতুন পাঁচালি। কোনটা ধর্ম্ম বিষয়ে, কোনটা দেবদেবীর উপাখ্যান নিয়ে, আবার কোন কোনটা ঘরোয়া পারিবারিক সমস্যা নিয়ে।

ঢোলকদার নেচে নেচে ঢোল বাজাতে থাকে। গায়ক একটি হাত মাজায় দিয়ে আর একটি হাত সামনে ছড়িয়ে আঃ আঃ করে সুর ভাঁজে, মানুষগুলো তন্ময় হয়ে শোনে। মেয়েরা গায়ে গা দিয়ে ঘেঁষাঘেষি ব'সে বড় বড় চোখ তুলে শোনে—ছড়াদার নাচতে নাচতে তাদের সামনে এসে হাত নেড়ে গান ধরে—

> "ডাক্তার বলেছে ভাত আর দেব না,
> কি উপায় করি বল না।
> যখন যুবো বয়স ছিল
> না বুঝে কাজ করেছিল,
> এখন পাঁচ ছেলের বাপ হয়ে বলে
> বিয়ে করা ভাল না—"

মেয়েগুলো গান শুনে খিল খিল করে হেসে ওঠে। কোন কোন বয়স্কা হয়ত কপট মুখ ঝাপটা মেরে ওঠে। আঃ মর্, কি ছিরি গানের—। গায়ক ততক্ষণে তাদের কাছ হতে স'রে গিয়ে আসরের মাঝখানে গাইছে—

দোয়াররা চড়া সুরে টান ধরে রেখেছে—অনন্ত রাতের নীচে পৃথিবী কোথায় তলিয়ে গিয়েছে—শুধু বাংলার এক নিভৃত পল্লী-কোণে গুটিকতক মানুষ তাদের জীবনের দুঃখ-বেদনায় কাঁদছে, হাসছে।

হয়ত গ্রামের কোন বিত্তবান্ অত্যাচার করেছে, তার প্রতিবিধান করার ক্ষমতা নাই। তাই এই বোলানের রাতে তাকে উপলক্ষ্য করে পাঁচালি বেঁধে এনেছে ছড়াদারের কাছ থেকে—

"ও এক ভদ্রলোকের ভাতের হাঁড়ি কুকুরে খেয়েছে,
সে কথা বলতে মানা নাই অজানা সবাই জেনেছে।
আমাদের ছোট লোকের ছোট ঘরে
ছোট কাজ ত হতেই পারে,
তোমাদের ভদ্রলোকের মেয়েরা কেন
বিয়ের আগে এঁটো হতেছে।"

যাকে উদ্দেশ করে গান বাঁধা হয়েছে লোকে বুঝছে। হাসছে হো হো করে—হাততালি দিয়ে—উৎসাহ দিচ্ছে ছড়াদারকে 'বলিহারি ভাই—ঘুরে ঘুরে।' ছড়াদারও মনের আনন্দে নেচে নেচে গাইছে—বাজনদার ঢোল বাজাচ্ছে লাফিয়ে লাফিয়ে—কখনও এগিয়ে যাচ্ছে, কখনও পেছিয়ে যাচ্ছে, কখনও গায়কের মুখের কাছে ঢোলটা উঁচু করে তুলে কুরু কুরু তাক দিচ্ছে—আসর জমে উঠেছে।

সেদিন গভীর রাত অবধি এমনি করে চলবে পাঁচালি ছড়া। কারণ পরের দিন আর অবসর পাওয়া যাবে না। সন্ধ্যার প্রদীপটি জ্বালা হতে না হতেই গাঁয়ের কোন শেষ প্রান্ত থেকে সাড়া উঠবে 'জয় শিব মহাদেব' —সঙ্গে সঙ্গে গাজনতলায় জড়ো-হওয়া শিশুরা লাফিয়ে চিৎকার করে উঠবে 'দল এসেছে, দল এসেছে।' শিশু-কণ্ঠের কোলাহলের সঙ্গে সঙ্গে সজাগ হয়ে উঠবে ভক্তরা। ঢাকি কারও কাছে একটা বিড়ি চেয়ে নিয়ে ধরাবে—চারি ধারের অলিগলি থেকে পিল পিল করে বেরিয়ে আসবে মেয়েরা—একপাশে চাপ হয়ে ভিড় করে দাঁড়াবে বেটা-ছেলেরা—তার পর নেপথ্যে নূপুর-নিক্বণের মত ঝুমুর ঝুমুর আওয়াজ তুলতে তুলতে এগিয়ে আসবে দল—ঢাকি ঢাক কাঁধে নিয়ে নাচের বোল তুলবে—আর তারই তালে তালে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে এসে 'বল শিব মহাদেব' বলে একটা হুঙ্কার দিয়ে—হেঁট হয়ে গাজনতলার মাটি মাথায় তুলে দল নাচ সুরু করে দেবে। তার পর পাঁচ-সাত মিনিট এমনি নাচের পর সুরু হবে গান।

এক দলের গান শেষ হওয়ার আগেই আর এক দল এসে অপেক্ষা করবে আসরে। তাদের শেষ হতে না হতে আর একদল। কখনও কখনও দুটো-তিনটে দল জমে যাবে এক সঙ্গে। তখন গোটা গানের বদলে এক-আধ কলি গেয়েই বিদায় নিতে হবে এক-একটা দলকে।

এমনি ভাবেই কেটে যাবে সন্ধ্যাবেলা। রাত একটু গভীর হবে। তখন এসে হাজির হবে শ্মশানের দল। হাতে মরার মাথা—হাড়-গোড়—সঙ্গে কোন মরা ছেলে কি মরা শেয়াল কুকুর - বীভৎস চেহারা সব। ওরা আসরে ঢুকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠবে সব। বোলানের দল যদি থাকে তারা তাড়াতাড়ি গান সেরে নেবে—মেয়েরা কোলের ছেলেদের বুকে টেনে নিয়ে গা ঘেঁসাঘেঁষি করে বসবে। ছোট শিশুরা বড় মানুষের গা ঘেঁষে দাঁড়াবে। ঢাকি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে সুরু করবে ঢাক বাজাতে।

প্রবাদ ঢাকি যদি ঠিক তালে বাজিয়ে নাচাতে পারে ত ঐ মরা সুদ্ধ জেগে উঠে নাচতে সুরু করবে। কিংবদন্তী আছে এমনি ধারা কত আসরে ঐ রকম মরা জেগে উঠে নাচতে সুরু করে দেয়—প্রাণের ভয়ে ঢাকি ঢাক ফেলে পালায়—আসরের মেয়েরা মূর্চ্ছা যায়—আর ভক্তরা পরিত্রাহি শিবের নাম ডাকে। তাই শ্মশানের দল এলেই ধুনো দিতে হয় আসরে। মাঝখানে এক জায়গায় মরাটা নামিয়ে তারা সব তার চার ধারে গোল হয়ে বসে—তার পর শকুনের ডানার মত দু'খানা হাত দু'ধারে চিতিয়ে দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে পাক মারবে গোল হয়ে—আর মুখে এক রকম হিস্ হিস্ শব্দ করবে ঠিক যেমন ক'রে শকুনরা মরা খায়।

এদের গানের সুরগুলো বিচিত্র। পাহাড়িয়াদের টানা সুরের মত করুণ বিষণ্ণ। পালাগুলো সবই বিয়োগান্ত—রুইদাসের মৃত্যু কি লক্ষ্মণের শক্তিশেল। বার কয়েক মরাটাকে পাক দিয়েই এরা সেই টানা সুরে গান ধরবে—

প্রাণের রুইদাস রে—এ ঘোর শ্মশানে—
মাকে ফেলি কোথা গেলি বাছা আমার রে—

এই সুরের টানে মুহূর্তের মধ্যে আসরে নেমে আসবে এক ভয়াবহ বিষণ্ণতা—থম থম করবে গভীর রাত—ঢিব্ ঢিব্ করবে মানুষগুলোর বুকের ভেতরটা। গান শেষ হ'লে এরা লাফিয়ে উঠে দাঁড়াবে—তার পর ঐ মরার মাথা কি হাড় নিয়ে সুরু করবে—উদ্দাম নৃত্য। মেয়েরা ভয়ে চোখ বুঁজবে—ছোট ছোট ছেলেরা জড়িয়ে ধরবে পুরুষদের—ঢাকি প্রাণের দায়ে পরিত্রাহি ঢাক বাজিয়ে চলবে।

একটা শ্মশানের দল শেষ হতে না হতে আর একটা

আসবে। এমনি ধারা শ্মশান আর বোলান চলবে সারাটা রাত। সেদিন গভীর রাতে নির্জ্জন মাঠে অবিশ্রান্ত বেজে চলবে ঘুঙুরের ঝুমুর ঝুমুর শব্দ—বোলানের দলগুলো ঘুরে ঘুরে এ গাঁ হ'তে ও গাঁয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে কোন জমিতে ব'সে মদ খেয়ে নিচ্ছে একটু-আধটু—তার পর আবার চলছে—দেখে মনে হয় সেদিন সেই নির্জ্জন মাঠে নিশীথিনীই বুঝি ঘুঙুর পায়ে নাচতে নেমেছে।

এমনি ভাবে রাত পেরিয়ে চলে। রাঢ়-বাংলার গাঁয়ের পর গাঁয়ে সমস্ত মানুষ জেগে জেগে গান শোনে। যারা গাইতে আসে তারা আশে-পাশের গাঁয়ের তাদেরই আত্মীয়, শালা-ভগ্নীপতি—জামাই-বেয়াই। নবপরিণীতা কোন বোলানের দলে দেখে তার স্বামীকে—কোন বোন্ দেখে তার ভাইকে। শ্মশানের কালি-ঝুলি-মাখা চেহারা চিনতে না পেরে কেউ হয়ত পাশের সঙ্গিনীকে গা টিপে প্রশ্ন করে—'হ্যাঁ লো ওটা আমাদের রাণীর দেওর না—

এমনি ভাবেই রাত বয়ে যায়। আস্তে আস্তে এক সময় স্বচ্ছ হয়ে ওঠে ভোরের আকাশ। গান শেষ হয়—রাতজাগা মানুষেরা ফিরে যায় নিজের নিজের ঘরে। পল্লী-বাংলার মানুষদের জীবনের ওপর দিয়ে পার হয় একটি আশ্চর্য্য সুন্দর সাংস্কৃতিক রাত। যে রাতে শুধু গান আর গান—সুর আর সুর।

মানবসেবায় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

কামারপুকুরে তাঁর আবির্ভাব জগদ্ধিতায়, সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণকামনায়। সাধনার বিচিত্রপথে পরম সত্যের শিখরদেশে আরোহণ করলেন তিনি। ঈশ্বরীয় আনন্দের অনির্ব্বচনীয় অনুভূতিতে ধন্য হ'ল তাঁর ভাগবত জীবন। কিন্তু ব্যক্তিগত মুক্তিতে তাঁর সত্তা তৃপ্তি পেল না। "বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে একা আমি বসে র'ব মুক্তি-সমাধিতে?" ঐ দেশ-বিদেশের কোটি কোটি নরনারী ভোগের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে রয়েছে, ছায়া থেকে ছায়ার পিছনে দৌড়াচ্ছে আনন্দের সন্ধানে। কিন্তু অন্তের মধ্যে ত মানুষের আত্মার তৃপ্তি নেই? সে যে অনন্তের পিয়াসী। তাই ভোগের মধ্যে সে কুড়াচ্ছে শুধু দুঃখের পর দুঃখের অভিজ্ঞতা, নৈরাশ্যের পর নৈরাশ্য। সংসারে দিগন্তপ্রসারী দুঃখ দেখে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের করুণ হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল। আধ্যাত্মিক সংগ্রামের পর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গিয়ে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের তিনি আস্বাদন পেলেন সে আনন্দ কি শুধু তাঁর একারই জন্যে? সংসার-তপ্ত জীবেরা বঞ্চিত হয়ে থাকবে ঈশ্বরীয় আনন্দের সেই অনুভূতি থেকে? এত তপস্যার অগ্নি-পরীক্ষা পেরিয়ে যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হ'লেন তিনি, সেই উপলব্ধির মহাসম্পদের অধিকারী হবে সমগ্র মানব পরিবার।

আর ধর্ম্ম নিয়ে এই যে মতান্তর থেকে মনান্তর, প্রতিবেশীর ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি এই যে কটাক্ষপাত এরও কি কোন প্রয়োজন আছে? ঠাকুর নতুন কথা শোনালেন। বললেন,"দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম্ম করেছেন। কিন্তু সব মতই পথ, মত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক ভক্তি ক'রে একটা মত আশ্রয় কল্লে তাঁর কাছে পৌঁছন যায়।" "সকলেই তাঁকে ডাকছে। দ্বেষাদ্বেষের দরকার নাই। কেউ বলছে সাকার, কেউ বলছে নিরাকার। আমি বলি যার সাকারে বিশ্বাস সে সাকারই চিন্তা করুক, যার নিরাকারে বিশ্বাস সে নিরাকারই চিন্তা করুক। আমার ধর্ম্ম ঠিক, আর সকলের ভুল,—এই মতুয়ার বুদ্ধি dogmatism ভাল নয়।"

কিন্তু দুঃখতপ্ত প্রাণীদের আর্ত্তিনাশ করতে হলে, 'যত মত তত পথ'—এই উদার ধর্ম্মমতকে দিক্ থেকে দিগন্তরে ছড়িয়ে দিতে গেলে চাই এমন একদল সর্ব্বত্যাগী যুবক যাদের দেহ-মন হবে অনাঘ্রাত পুষ্পের মত পবিত্র, যারা হবে ত্যাগের পতাকাবাহী সন্ন্যাসী, যারা দেশে দেশে জনসাধারণের মধ্যে বহন ক'রে নিয়ে যাবে গুরুদেবের

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের বাণী। সংঘপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করলেন। নবযুগের প্রয়োজন মেটাবার জন্যই তাঁর আবির্ভাব। আর কি এই প্রয়োজন? সব ধর্ম্মই যে মূলতঃ সত্য এই বাণীকে দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে দেওয়া। এই দিক্ থেকেই রোম্যাঁ রোলাঁ ঠাকুরকে বলেছেন: The pilot and the guide for the needs of the new age.

সংঘ ত তৈরী করতে হবে। কিন্তু কোথায় সেই সিংহের মত সাহসী এবং স্ফটিকের মত নির্ম্মল, বজ্রের চেয়ে কঠিন এবং কুসুমের চেয়েও কোমল তরুণেরা যারা এসে তাঁর চারিদিকে দানা বাঁধবে? যারা তাঁর সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের বাণীকে পৌঁছে দেবে সাত সমুদ্রের তীরে তীরে, মহাসিন্ধুর এপারে এবং ওপারে সর্ব্বত্র? ঠাকুরের খেয়ে সুখ নেই, ঘুমিয়ে আরাম নেই। তাঁর প্রাণের মধ্যে সর্ব্বদার জন্যে একটা ব্যাকুলতা তাদের সঙ্গ পাওয়ার জন্যে, যারা একান্ত আপনার জন, জন্মজন্মান্তরের লীলাসহচর। আরতির শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনিতে দক্ষিণেশ্বরের আকাশ-বাতাস যখন মুখরিত হয়ে ওঠে তখন ঠাকুর চুপে চুপে চলে যান কুঠির ছাদে। সেখানে ব্যাকুলকণ্ঠে ডাকেন, 'ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস চলে আয়।' আর্ত্তকণ্ঠের সেই রোদন-ভরা ধ্বনি নৈশ আকাশকে কাঁদিয়ে চলে যায় দূর থেকে দূরান্তরে। এই প্রসঙ্গে রোলাঁ ঠাকুরের জীবনীতে লিখেছেন:

> This mighty cry of the soul soared up into the night like the sacred serpent; and its attraction was exerted over the winged spirits. From all directions, without understanding what command or what power constrained them, they felt themselves drawn, as if caught by an invisible thread; they circled, they approached and soon one after another they arrived.

দক্ষিণেশ্বরের সেই আকুলকরা আহ্বান ডানায় ডানায় লাগাল কাঁপন। নরেন, লাটু, রাখাল, তারক, যোগেন, শশী, শরৎ, কালীপ্রসাদ, হরিপ্রসন্ন, গঙ্গাধর, গিরীশ, পূর্ণ—এরা প্রাণের মধ্যে শুনতে পেল আকাশের ডাক। কে তাদের এমন ক'রে টানছে? তাদের জীবন যেন কোন্ অদৃশ্য সূতায় বাঁধা। উড়ল তারা আকাশে। চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে নামতে লাগল দক্ষিণেশ্বরের দিকে। তার পর একে একে ঠাঁই নিল ঠাকুরের পদপ্রান্তে। যারা এল তারা আর সংসারে ফিরল না। ঠাকুর তাদের পথে এনে নিঃশেষে অকিঞ্চন করলেন।

এতদিনে ঠাকুরের প্রাণের পিপাসা মিটল। কত দিনে, কত রাতে যার স্বপ্নে তিনি বিভোর ছিলেন সেই সংঘ প্রতিষ্ঠার বীজ অবশেষে উপ্ত হ'ল। আর ত ভাবনা করার কিছু নেই। কুম্ভকার যেমন ক'রে মাটির প্রতিমা তৈরী করে তেমনি ক'রে তিনি তাঁর সন্তানদের জীবন হাতের মধ্যে নিয়ে সেগুলিকে মনের মত ক'রে রূপ দিলেন। লিখেছেন রোলাঁ:

> This great moulder of souls cast with his fingers of fire the bronze of Vivekananda as well as the delicate and tender wax of Yogananda or Brahmananda.

তিনি ছিলেন মানুষের আত্মার মহারূপকার। আগুনের আঙুল দিয়ে তিনি একদিকে তৈরী করলেন বজ্রকঠিন বিবেকানন্দকে, আর একদিকে তৈরী করলেন পুষ্প-কোমল যোগানন্দ আর ব্রহ্মানন্দকে।

আর কেন? সন্ন্যাসীদের সংঘ তৈরী হয়েছে। এরা তাঁর কাজকে সম্মুখ থেকে সম্মুখের পানে নিশ্চয়ই আগিয়ে নিয়ে যাবে। রইল তাঁর প্রিয়তম শিষ্য নরেন। সংঘকে শুভপথে পরিচালনা করার মত বিরাট্ হৃদয়, ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং সর্ব্বোপরি প্রচণ্ড কর্ম্মশক্তি তার আছে। সকলের উপরে রইলেন সহধর্ম্মিণী সারদামণি, যাঁর চরণপদ্মে তিনি সমর্পণ করেছিলেন নিজের জপমাল্য, যিনি ছিলেন তাঁর কাছে সাক্ষাৎ জগদম্বা।

নরলীলা সংবরণ ক'রে ঠাকুর ইহজগৎ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। গুরুদেবের মহাপ্রয়াণের পর শিষ্যেরা প্রায় সকলেই পরিব্রাজকের বেশে ছড়িয়ে পড়লেন দিকে দিকে। স্বামী বিবেকানন্দও পদব্রজে ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। আর্য্যাবর্ত্ত থেকে যখন দাক্ষিণাত্য দিয়ে চলেছেন কন্যাকুমারীর অভিমুখে, দেখতে পেলেন দিগন্তপ্রসারী দারিদ্র্যের মর্ম্মন্তুদ ছবি। মানুষ নয়—জীবন্ত নরকঙ্কাল বিচরণ করছে সর্ব্বত্র। তাদের নিষ্প্রভ চোখে নৈরাশ্য ঘনীভূত। অজ্ঞানের অন্ধকারে মন তাদের আচ্ছন্ন। নিজেদের উপরে তারা হারিয়ে ফেলেছে বিশ্বাস। পুঞ্জিত অবসাদভারে জীবন তাদের ভারাক্রান্ত। স্বামীজীর চোখে ঘুম নেই। দিন-রাত মনে লেগে রয়েছে এক চিন্তা—কি ক'রে স্বদেশের কঙ্কালসার জড়প্রায় মানুষগুলিকে জীবনের প্রাচুর্য্যের মধ্যে বাঁচান যায়। কন্যাকুমারীতে এসে স্বামীজী সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন, দেহে

যতকাল প্রাণ আছে, স্বদেশের দরিদ্র, মূর্খ, ভাগ্যহত জনসাধারণের সেবা ক'রে যাবেন। সম্মুখে গৃহহারা উচ্ছল জলধির অশান্ত ক্রন্দন; স্বামীজীর হৃদয়েও রোরুদ্যমান অশ্রুসিন্ধু! ভারতের শেষ সীমায় দেবী কন্যাকুমারীর মন্দিরের ছায়ায় স্বামীজীর মনে প'ড়ে গেল গুরুদেবের কথা: 'খালি পেটে ধর্ম্ম হয় না।' যারা বৎসরের মধ্যে একবেলাও পেট ভ'রে খেতে পায় না সেই অনশনক্লিষ্ট জনসাধারণের কাছে ধর্ম্মের তত্ত্ব শোনাতে যাওয়া কি পাগলামি নয়? যারা উপবাসী তাদের কাছে অন্ন পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। যদি কতকগুলি নিঃস্বার্থ সন্ন্যাসী নর-নারায়ণের সেবাকে জীবনের ব্রতহিসাবে গ্রহণ ক'রে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে, জনশিক্ষার প্রসারকল্পে জীবন উৎসর্গ করে, তবে কেমন হয়? জনসাধারণকে টেনে তুলতেই হবে দুর্গতির অন্ধকূপ থেকে। পরমেশ্বর ত রুদ্ধদ্বার দেবালয়ের কোণে গুপ্ত হয়ে নেই। মানুষেই যে তিনি মূর্ত্ত! গুরুদেব কি বলেন নি শিবজ্ঞানে জীবসেবার কথা? তবে আর ইতস্ততঃ কেন? সংশয় কেন? যুগের কর্ণে স্বামীজী শোনালেন একটি অমূল্য কথা। দরিদ্র-নারায়ণ। উদাত্ত-কণ্ঠে বীর সন্ন্যাসী উচ্চারণ করলেন, 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?' বললেন, 'ব্রহ্ম হ'তে কীটপরমাণু সর্ব্বভূতে এক প্রেমময়।'

ঘুমন্ত ভারতবর্ষ স্বামীজীর বাণী শুনে নিদ্রার মধ্যে পাশ ফিরল। সুপ্তির মধ্যে এল মহাজাগরণ। শিক্ষিত ভারতবর্ষ প্রথম উপলব্ধি করল, কোন্ দুরূহ কর্ত্তব্য তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। ঠাকুরের সর্ব্বত্যাগী সন্তানদের মনে কর্ত্তব্য সম্পর্কে আর কোন সংশয় রইল না। শুধু ধ্যান-ধারণা নয়, শুধু নিজের মোক্ষ নয়; জগদ্ধিতায় আমরণ কাজ ক'রে যেতে হবে। সমস্ত পৃথিবী রইল পড়ে, তুমি একা যাবে দায় এড়িয়ে। কর্ম্মের দায়কে অস্বীকার করা যায় কেমন ক'রে? রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "ব্যক্তিগত শক্তিতে নিজে কেউ যতটুকু মুক্ত হচ্ছে সেই মুক্তি তার নিরর্থক যতক্ষণ সে তা সকলকে না দিতে পারে। বুদ্ধদেব আপনার মুক্তিতেই সত্যই যদি মুক্ত হতেন তা হ'লে একজন মানুষের জন্যেও তিনি কিছু করতেন না। দীর্ঘজীবন ধ'রে তাঁর ত কর্ম্মের অন্ত ছিল না। দৈহিক প্রাণ নিয়ে তিনি যদি আজ পর্য্যন্ত বেঁচে থাকতেন তা হ'লে আজ পর্য্যন্তই তাঁকে কাজ করতে হ'ত আমাদের সকলের চেয়ে বেশী। কেননা যাঁরা মহাত্মা তাঁরা বিশ্বকর্ম্মা।"

কবির কথাগুলি যেন স্বামীজীরই! জীবের সেবা করতে হবে শিবজ্ঞানে—এই মানবসেবার আদর্শ নিলেই কর্ম্মের আহ্বানকেও স্বীকার ক'রে নিতে হয়। খালি পেটে যখন ধর্ম্ম হয় না তখন অন্ন উৎপাদনের দায় আপনা থেকেই এসে পড়ে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে তাই জোরের সঙ্গেই বলা হয়েছে: অন্নং বহু কুর্ব্বীত। তদ্ ব্রতম্। ঈশ্বরের আনন্দের উপলব্ধির পথে শুধু ঐশ্বর্য্যই কি অন্তরায়? দারিদ্র্য নয়? আর কর্ম্মযোগকে অস্বীকার ক'রে কখনও প্রচুর অন্ন ফলানো যায়? শুধু কর্ম্মের উপরে জোর দিলেই তাই যথেষ্ট হ'ল না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কর্ম্ম হওয়া চাই নিষ্কাম। তবেই সে কর্ম্ম হবে শুভ এবং ফলপ্রসূ। তাই স্বামীজী নব্য ভারতবর্ষের কানে ধ্বনিত করলেন কর্ম্মবাদের শঙ্খনাদ আর সেই সঙ্গে জোর দিলেন শিক্ষার প্রসারের উপরে। কর্ম্ম হবে না সমাজের অনুন্নত শ্রেণীর নিরবচ্ছিন্ন হাড়ভাঙা খাটুনি। সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের কাছে শারীরশ্রম হবে সম্মানের এবং আনন্দের বিষয়।

কিন্তু পুঞ্জিত অবসাদভারে যে-জাতি পক্ষাঘাতগ্রস্ত, ঘোর তামসিকতায় যে-জাতি পঙ্গু তাকে কর্ম্মচঞ্চল করা যায় কেমন ক'রে? স্বামীজী দেখলেন, একটা কর্ম্মকীর্ত্তি-হীন জাতির নিস্ফল নির্ব্বীর্য্য বাহুতে কর্ম্মপ্রবণতা আনতে হ'লে সর্ব্বাগ্রে দরকার সেই জাতিকে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করা। তাই তিনি বনের বেদান্তকে আনলেন লোকালয়ে। উপনিষদের মধ্যে বীর্য্যের অগ্নিমন্ত্র, আত্মার ভাস্বর বাণী। আত্মার মধ্যে রয়েছে অপরিমেয় শক্তি। হীনবীর্য্য জীবন্মৃত জাতিকে জাগ্রত ও উদ্যত করবার জন্যেই ত স্বামীজীর বেদান্ত প্রচার।

জীবন থেকে ধর্ম্মকে স্বামীজী বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখলেন না। ঈশ্বরের মধ্যে মানুষের আনন্দের অনির্ব্বচনীয় অনুভূতিই ধর্ম্ম। ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে চলতে গেলে ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ। কিন্তু চোখ বুজে শুধু ধ্যান-ধারণাতেই কি মুক্তি? স্বামীজী বললেন, 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' এল শিবজ্ঞানে জীবসেবার মহান্ আদর্শ। সেবার রাস্তায় ধর্ম্মের সঙ্গে কর্ম্মের সমন্বয় ঘটল। নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং—কর্ম্মযোগের এই আদর্শ ছিল গীতার পাতায় নির্জ্জীব হয়ে। নির্জ্জীব আদর্শকে নূতন জীবন দিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্তু মহাতামসিকতায় আচ্ছন্ন জাতির মধ্যে উৎসাহের একান্ত অভাব। সেই অভাব দূর ক'রে জাতিকে প্রাণচঞ্চল করবার জন্যে শক্তিমন্ত্রের প্রয়োজন ছিল। আত্মশক্তিসম্পর্কে সচেতন করবার জন্যে তাই বেদান্তের আশ্রয় গ্রহণ।

স্বামীজীর মনে সংশয়ের আর লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই। সত্য তিনি পেয়ে গেছেন, পথের নির্দ্দেশ তিনি লাভ

করেছেন। এখন দরকার সেবাব্রতী কর্মীর দল এবং টাকা। শুধু কি ধর্মপ্রচার করতে স্বামীজী আমেরিকায় গিয়েছিলেন? ভারতবর্ষের জনসাধারণের জীবনকে কল্যাণময় করবার জন্যে প্রয়োজন ছিল প্রচুর অর্থের, আর ডলারের দেশ আমেরিকায় অর্থলাভের বিপুল সম্ভাবনা ছিল। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের এক পত্রে স্বামীজী লিখছেন শিকাগো থেকে: "আমি অর্থের জন্যে অনেক ঘুরেছি। ভারতবর্ষে অর্থ দেবে কে? তাই আমেরিকায় এসেছি অর্থ সংগ্রহ করতে। এ কাজ সম্পন্ন হ'লে দেশে ফিরে যাব এবং বাকী জীবনটা আমার জীবনের এই এক উদ্দেশ্যকে সফল করবার জন্য নিয়োজিত করব।"

প্রতীচ্যখণ্ডে বেদান্তধর্ম্মের বীজ বপন ক'রে ১৮৯৭ সালের ১৫ই জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। ঐ বৎসরেই ১লা মে রামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী ও গৃহীশিষ্যগণকে একত্র ক'রে স্বামীজী 'রামকৃষ্ণ মিশন' নাম দিয়ে একটি প্রচার সমিতি গঠন করলেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য: (১) সকল ধর্ম্মকে একই সনাতন ধর্ম্মের বিকাশ মনে ক'রে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা, (২) উন্নতচরিত্র কর্ম্মী তৈরী করা যারা জনসাধারণের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধানকল্পে আত্মোৎসর্গ করবে, (৩) ভারতের শিল্প, সাহিত্য, ললিতকলাদির উন্নতি ও বিস্তার সাধন করা, (৪) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্ব্বজনীন শিক্ষার আলোকে জনসাধারণের মধ্যে বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্ম্মের প্রকৃত আদর্শ প্রচার করা, এবং (৫) জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে নরনারায়ণ-জ্ঞানে আর্ত্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করা।

স্বামীজীর বহুবাঞ্ছিত পরিকল্পনা এতদিনে ফলবতী হ'ল। সঙ্ঘের সন্ন্যাসীবৃন্দ স্বামীজীর ইচ্ছাকে ঠাকুরের আদেশ মনে ক'রে সোৎসাহে কর্ম্মসাগরে ঝাঁপ দিলেন। দেশে দেশে দিকে দিকে সন্ন্যাসীদের কর্ম্মধারা নানাপথে প্রবাহিত হতে লাগল। আজ সমুদ্রের এপারে ওপারে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম্মকেন্দ্র নেই কোথায়? বর্ত্তমানে ভারতে ও ভারতেতর দেশে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ১১৫টি কর্ম্মকেন্দ্র বিদ্যমান। তন্মধ্যে ভারতে ৮৪টি এবং বিদেশে ৩১টি।

স্বামীজীর মানসদুহিতা বিপুল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে কলিকাতার বাগবাজারে এক জনাকীর্ণ পল্লীতে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করলেন ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বৎসরের ৪ঠা জুলাই শুক্রবার স্বামী শিবানন্দ কাশীতে প্রতিষ্ঠিত করলেন রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম। স্বামী বিজ্ঞানানন্দের প্রেরণায় ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদে প্রতিষ্ঠিত হ'ল রামকৃষ্ণমঠ। স্বামী কল্যাণানন্দের প্রচেষ্টায় কনখলে গ'ড়ে উঠল একটা সেবাকেন্দ্র। এদিকে স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদ জেলার এক নিভৃত পল্লীতে পাতলেন তপস্যার আসন। কলেরায়, দুর্ভিক্ষে স্বামী অখণ্ডানন্দ মাতৃহৃদয়ের করুণা নিয়ে কৃষকদের দ্বারে দ্বারে সাহায্য পৌঁছে দিতে লাগলেন। সারগাছিতে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস স্বামী অখণ্ডানন্দের সেবাপরায়ণতার এবং চিত্তের অনমনীয় দৃঢ়তার গৌরবোজ্জ্বল অভিব্যক্তি।

পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে এই যে সব সেবাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে—এদের পিছনে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের অদ্ভুত কর্ম্মশক্তির কি আশ্চর্য্য প্রকাশ! ১৯৫৬ সনে মঠের এবং মিশনের যে স্বামী কর্ম্মতালিকার পরিচয় পাই তাতে আছে: (১) ১২টি ইন্‌ডোর হাসপাতাল এবং ৬০টি আউটডোর ডিসপেন্সারী। হাজার হাজার রোগী এইসব কেন্দ্রে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছে।

২। (ক) ৫৩টি ছাত্রাবাস বা ষ্টুডেণ্টস্ হোম-এর ছাত্রসংখ্যা ২৬৩৮ এবং ছাত্রীসংখ্যা ৩১১ (খ) একটি প্রথম-শ্রেণীর কলেজ, আর একটি আবাসিক ইনটারমিডিয়েট কলেজ, (গ) দুইটি শিক্ষকশিক্ষণ কলেজ, (ঘ) তিনটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, (ঙ) একটি উদীয়মান কৃষিবিদ্যালয়, (চ) ৩৫টি হাইস্কুল এবং ১২৭টি লোয়ার গ্রেড স্কুল, একটি শুশ্রূষাকারিণী এবং ধাত্রীবিদ্যা শেখাবার প্রতিষ্ঠান, ছ) প্রায় প্রতিকেন্দ্রেই নিয়মিত ক্লাসের এবং সাময়িক লেকচারের ব্যবস্থা আছে, (জ) অধিকাংশ কেন্দ্রেই গ্রন্থাগার এবং রিডিংরুম আছে, (ঝ) পুস্তকপ্রকাশের কেন্দ্রগুলিও উল্লেখযোগ্য, ইংরেজীতে পাঁচটি সাময়িক পত্রিকা এবং ভারতীয় ভাষাগুলিতে পাঁচটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে।

পশ্চিম বাংলায়, আসামে, বিহারে, উড়িষ্যায়, যুক্তপ্রদেশ, দিল্লীতে, বোম্বাইতে, মাদ্রাজে, অন্ধ্রে, কেরলে, মহীশূরে সর্ব্বত্র রয়েছে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকেন্দ্র। পাকিস্তানে রয়েছে মিশনের ১২টি সেবাকেন্দ্র। বর্ম্মায়, সিঙ্গাপুরে, ফিজিতে, সিংহলে, ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে, আমেরিকায়, আর্জ্জেন্টিনায়—কোথায় নেই রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকেন্দ্র?

ধন্য যুগাবতার ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁকে কেন্দ্র ক'রে সন্ন্যাসী সঙ্ঘ একদিন অতিক্ষুদ্রাকারে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ধন্য সঙ্ঘজননী সারদাদেবী যাঁর অফুরন্ত স্নেহপীযূষধারায় সিঞ্চিত হয়ে সঙ্ঘ পুষ্টিলাভ করে। আর ধন্য স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর গুরুভ্রাতৃবৃন্দ যাঁদের অক্লান্ত উদ্যমে ও সাধনায় দক্ষিণেশ্বরে উপ্ত বীজটি আজ মহামহীরুহে পরিণত।

ক্ষণ-বসন্ত

শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী

পড়ার টেবিলে ব'সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কি একটা বই পড়ছিল সরোজ, কখন যে মা ঘরে ঢুকে ওর পাশে এসে চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছেন টেরই পায় নি। কাঁধের কাছে ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া পেয়ে চমকে উঠে মুখ তুলে তাকাল, বলল, "কি বলছ মা?"

পড়ায় বাধা দেবার জন্য মনে যে সঙ্কোচটুকু জমেছিল তা কাটিয়ে মৃদু কণ্ঠে হেমাঙ্গিনী বললেন, "বেলা ত পড়ে এল, এখন না গেলে যে অনেক রাত হয়ে যাবে সরোজ—"

মা-র কথা শুনে কিছুক্ষণের জন্য বিমনা হয়ে রইল সরোজ, খোলা কলমটা দিয়ে সামনের সাদা কাগজের ওপর নানান আঁকিবুকি করতে করতে বলল, "আর কাউকে পাঠাও না মা—"

"শোন ছেলের কথা—" সস্নেহে হেসে হেমাঙ্গিনী বললেন, "আর এ বাড়ীতে কে আছে যে যাবে? উনি ত একটু পরে কোর্ট থেকে ফিরেই এলিয়ে পড়বেন, শঙ্কর আজ সিনেমায় যাবে বলে রেখেছে, ওর টিকিটও নাকি কেনা হয়ে গেছে, বাকী আছিস শুধু তুই—"

"আর সে জন্যই বুঝি তোমার যত কিছু কাজের বোঝা আমার ঘাড়ে চাপাতে চাও, না? সে হবে না মা, —আমার পড়া আছে—" অসহিষ্ণু স্বরে সরোজ বলে।

ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় হেমাঙ্গিনী বলে ওঠেন, "সে কি রে। এখন না করলে চলবে কেন? খবর পাঠান হয়েছে, ব্যবস্থা-ট্যবস্থা সব ঠিকঠাক, —এখন না গেলে ওরা কি ভাববে বল্ দেখি? নে বাবা, আর অমত করিস নে,— যাই আমি তোর জামা-কাপড় সব বার ক'রে দিই গে—"

সরোজকে আর আপত্তি করবার অবকাশ না দিয়ে দ্রুতপদে হেমাঙ্গিনী চলে যান পাশের ঘরে, আলমারিতে চাবি ঘোরার শব্দ ওঠে, পাল্লা দুটো মৃদু শব্দ ক'রে খুলে যায়, ধপ্ ক'রে একরাশ কাপড়-জামা মেঝেতে পড়ে যায়, সে শব্দও সরোজের কানে আসে।

গোঁজ হয়ে বসে থাকে সরোজ। অনিচ্ছা তার যাওয়া-আসার পরিশ্রমের জন্য নয়। চেষ্টা ক'রে যাকে ভুলতে হয়েছে, আজ আবার তারই সান্নিধ্যে যাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই তার। এমন কি কমলা আসবে শুনে অবধি সে মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছিল যে, যে ক'দিন কমলা এ বাড়ীতে থাকবে সেক'টা দিন সে তার এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে কাটিয়ে দিয়ে আসবে পড়াশোনা ক্ষতি হবার অজুহাতে। কিন্তু তার সব পরিকল্পনাই ভেস্তে গেল সকালে চায়ের টেবিলে।

সকালবেলার রোদ তখনও তাদের ছাদের চিল-কুঠুরীর জানালার শিক ছুঁতে পারে নি। নিচের তলায় বাবা আর শঙ্কর চা খেয়ে উঠে যাবার পর সরোজের দৈনন্দিন বরাদ্দ দ্বিতীয় চায়ের কাপটি এগিয়ে দিয়ে মা বলেছিলেন, "হ্যাঁ রে সরোজ, আজ সন্ধ্যায় কি তোর কোন কাজ আছে?"

একটু অন্যমনস্ক ছিল সরোজ, তাই মায়ের কথার জবাবে বলেছিল, "না মা—"

"তা হ'লে তুই-ই যা, কমলাকে নিয়ে আয় গেণ্ডারিয়া থেকে। বাপের বাড়ি এসে অবধি তিন-তিনটি চিঠি লিখেছে বেচারী, আহা, আমাকে মাসীমা বলতে অজ্ঞান মেয়েটা, আমাকে ঠিক মায়ের মতই দেখে—"

মায়ের এই কথাগুলো কানে যেতেই চমকে উঠেছিল সরোজ, পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল যে, নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মেরেছে সে। তবু প্রবল আপত্তি তুলে হাত নেড়ে বলেছিল, "না মা, ও-সব আমার দ্বারা হবে না, তুমি যোগেশকে পাঠাও—"

বিরক্ত হয়ে হেমাঙ্গিনী বলেছিলেন, "আচ্ছা তুই কি হ'লি বল্ ত? এ কি চাকর-বাকরের কাজ? কমলার মা কি মনে করবেন বল দেখি?"

গোঁজ হয়ে সরোজ বলেছিল, "তা হ'লে শঙ্কর বা আর কাউকে পাঠাও মা—"

একটু কঠিন দেখিয়েছিল হেমাঙ্গিনীর মুখ। বলেছিলেন, "অত খোসামোদ করতে পারব না আমি। বড় হয়েছ, ভাল-মন্দ বুঝতে শিখেছ। আমার বলার ভাগ আমি বললাম, এখন তোমার কর্তব্য বলে ত যেও, না হয় যেও না—"

রুষ্ট মুখে সেখান থেকে উঠে রান্নাঘরের দিকে চলে গিয়েছিলেন হেমাঙ্গিনী। তাঁর শেষ কথাগুলো বসে-থাকা সরোজের কানে বাজছিল—"নেহাৎ বাসাটা পাল্টে

অনেক দূরে চলে এসেছি, তা না হ'লে কারুর আনতে যাবার দরকারই হ'ত না, নিজে থেকে ঠিক চলে আসত কমলা।"

এক চুমুকে জল হয়ে-যাওয়া চা-টুকু শেষ করে পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে জালে ধরা-পড়া পাখীর মত ছটফটে মন নিয়ে সেখান থেকে চলে এসেছিল সরোজ। তার পর ওপরে এসে পড়ার টেবিলে বসে এ বই ও বই ওল্টাতে ওল্টাতে পড়ার বই-এর পাতায় পাতায় কমলার নাম আর ছবি দেখে চমকে উঠেছিল। অনেক দিন আগে ভুলে-যাওয়া ভোঁতা বিষণ্ণ বেদনা মেরু-রজ্জু থেকে উঠে আস্তে আস্তে সারা মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে ফেলল। ফেলে-আসা রূপ-বর্ণ-গন্ধময় দিনগুলির ভেতর তার নিস্তেজ মন ক্রমেই ডুবে যেতে থাকল।

সেদিনও নিজের পড়ার টেবিলে বসে এমনি ভাবেই একমনে এমনি ভাবেই পড়ছিল সরোজ। তার এই ছোট্ট পড়ার ঘরে কেউ আসে না বড়। তাই হঠাৎ খিল্ খিল্ হাসির শব্দ শুনে চমকে মুখ তুলে তাকিয়েছিল সে। টানা টানা ভুরু দুটির নীচে নদীজলে-পড়া চঞ্চল আলোর মত উজ্জ্বল দুটি চোখ কয়েক মুহূর্তের জন্য তাকে সম্মোহিত করে রাখে। পশ্চিমের জানালা দিয়ে কমলার সুগৌর মুখে অস্তগামী সূর্যের রাঙা আলো এসে পড়েছিল, সেই আলো যেন সরোজের মনকেও এক নিমেষে রাঙিয়ে দিয়েছিল। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সরোজ।

পলকের জন্য চোখ নামিয়ে আবার সরোজের মুখে তাকিয়ে হাসিমুখে কমলা বলেছিল, "বাব্বাঃ, ধন্যি পড়া আপনার। এই যে এতক্ষণ ধ'রে ছাদে এসেছি, চারদিক্ ঘুরে-ফিরে দেখেছি তাতেও আপনার হুঁশ নেই। তা না থাক, কিন্তু এই অল্প আলোয় পড়াশুনা করলে যে দুনিয়ার কোন লেন্সই আপনার চোখে আলো আনতে পারবে না—"

বাইরে ঘনিয়ে-আসা অন্ধকারের দিকে একবার তাকিয়ে সুমুখের মোটা বইটা বন্ধ করে দিয়েছিল সরোজ, বলেছিল, "তাই ত, আলোরা যে কখন চুপি চুপি পালিয়ে গেছে তা জানতেই পারি নি, ভাগ্যিস তুমি এলে, মনে করিয়ে দিলে—"

এতদিনের আপনি থেকে সরোজ আজ হঠাৎ তুমিতে নেমে এসেছে লক্ষ্য করে কমলার বড় বড় দু' চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিল, সারা শরীরে খুশির তরঙ্গ তুলে বলেছিল, "আপনি যে আত্মভোলা মানুষ, অনেক কিছুই পালিয়ে যাবে, আপনি জানতেও পারবেন না। নিন্ এখন উঠুন, চলুন ঐ ঘেরা ছাতে। দেখুন, দেখুন, পশ্চিমের ঐ আকাশে মেঘের দল কেমন আবির খেলছে—"

ছাদের উঁচু আলসের ধারে খুব পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল সরোজ আর কমলা. মৃদুস্বরে সরোজ বলেছিল, "বাঃ কি সুন্দর, সূর্য যেন শ্রীকৃষ্ণ, মেঘের দল যেন ষোড়শ গোপিনী, মনের আনন্দে হোরী খেলায় মেতে উঠেছে সবাই—"

কৌতুকোচ্ছল স্বরে কমলা বলেছিল, "আচ্ছা, ঐ মেঘ-রাঙা একটা শাড়ি পেলে কি মজাটাই না হ'ত। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনটাও কেমন রাঙা হয়ে উঠত—"

হতাশ কণ্ঠে সরোজ বলেছিল, "ওঃ, ঘোর গদ্য মেয়ে তুমি, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না—"

তেমনি সুরে কমলা বলেছিল, "মেয়েদের একটু গদ্য হওয়াই ভাল সরোজদা, ছেলেদের আকাশ-কুসুমগুলো আঁচল ভ'রে তুলবে কে তা না হ'লে—

মাঝে মাঝে ওদের কাঁধে কাঁধ ঠেকে যাচ্ছিল, সরোজের নাকে ভেসে আসছিল কমলার চুলের মৃদু গন্ধ, সান্ধ্য প্রসাধনের স্নিগ্ধ সৌরভ আর উন্মোচিত নিটোল যৌবনের বিহ্বল করা উষ্ণ স্পর্শ সরোজের মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলছিল। চোখের সামনে প্রসারিত সান্ধ্য আকাশের অপার সৌন্দর্য দেখবে কি, বুকের ভেতর একটা অব্যক্ত ব্যথা বার বার মোচড় দিয়ে উঠছিল। কমলার ছোট ছোট কথা আর ছোট ছোট হাসি কিছুই কানে যাচ্ছিল না তার।

তখন সরোজ জানত না যে এ ব্যথা যৌবনের, এ বেদনা প্রেমের। উদ্‌ভ্রান্ত অশান্ত মন যুগে যুগে এ বেদনার সৃষ্টি করেছে, একে লালিত করেছে।

এর পর কখন যেন পশ্চিম আকাশের ঐ আশ্চর্য সব রঙ শুষে মুছে নিয়ে আদিম অন্ধকার তার বিশাল থাবা বিস্তার করে হাঁ হাঁ করে এসে পড়ল ছাদে, কখন যেন নিঃশব্দে ঝরে-পড়া শেফালীর মত হারিয়ে গেল কমলা, সে সব কথা ভাবতে পারে না সরোজ। শুধু সেই সন্ধ্যার আনন্দ-বেদনাটুকু মধুর স্মৃতি হয়ে তার সারা মন জুড়ে আছে এখন।

আলমারি থেকে সিল্কের পাঞ্জাবি আর পাট-ভাঙা শান্তিপুরী ধুতি হাতে নিয়ে এ ঘরে ঢুকে অবাক্ হয়ে যান হেমাঙ্গিনী। সরোজ তখন হাত দু'টি পেছনে মুঠো করে ধ'রে ছোট্ট ঘরের এ কোণ থেকে ও কোণ পর্যন্ত লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সারা মুখে যন্ত্রণার সুস্পষ্ট চিহ্ন আঁকা।

ভয় পেয়ে হেমাঙ্গিনী বললেন, "কি রে, অমন করছিস কেন? শরীর খারাপ লাগছে নাকি? থাক্ তবে, না গেলি কমলাকে আনতে—"

মায়ের কথা কানে যেতে থমকে দাঁড়ায় সরোজ, যেন স্পষ্ট ভাবে কমলার কণ্ঠস্বর শুনতে পায়, "সরোজ দা—আমাকে কি একেবারেই ভুলে গেলে? একটা ভুল ভোলা কি এতই কঠিন?"

বিনা বাক্যব্যয়ে এগিয়ে এসে মা-র হাত থেকে জামা-কাপড় নিয়ে বারান্দায় এসে বাড়ির কাপড় ছাড়ে সরোজ।

একটু পরে িডউকাট পাম স্যু'র মস্ মস্ শব্দ তুলে রাস্তায় পা দেয় সরোজ।

ঘোড়ায়-টানা পাল্কী গাড়ী নবাবপুর রোড দিয়ে এগিয়ে যায়, রায় সাহেবের বাজার পার হয়ে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের মোটা মোটা থামওয়ালা বিশাল অট্টালিকা ডান দিকে রেখে বাংলা বাজারের রাস্তায় পড়ল। গাড়ীর ঘড়ঘড়ানির ও দুলুনির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলল সরোজের অশান্ত মন। দু'ধারের শ্রেণীবদ্ধ অট্টালিকাশ্রেণীর ফাঁক দিয়ে হঠাৎ দেখা গাছের শ্যামল পত্রগুচ্ছের মত তার মন অতীতের ঝিলিক দেখতে পেল।

সায়েন্স কলেজের ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল সেদিন। হন হন করে বাড়ীর দিকে যাচ্ছিল সরোজ। ডাক-বাংলোর কাছাকাছি আসতেই সুমিষ্ট কণ্ঠের আহ্বানে তার পা দুটো আপনা থেকেই মন্থর হয়ে এল—থেমে গেল এক সময়ে। পেছন থেকে ছুটতে ছুটতে কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে কমলা বলেছিল—"বাব্বাঃ ছুটতেও পার তুমি সরোজদা। সেই কখন থেকে তোমায় ধরবার জন্য ছুটছি, কিছুতেই পারলাম না, শেষটায় লজ্জার মাথা খেয়ে ডাকতে হ'ল—তাও কি কানে যায়? আচ্ছা, সব সময়ে এমন অন্যমনস্ক থাক কেন বল ত?"

পরিহাসের সুরে সরোজ জবাব দিয়েছিল, "যদি বলি তোমারই ধ্যানে থাকি বলে—"

একটু লাল হয়ে কমলা জবাব দিয়েছিল, "আহা, আমি যেন আর জানি না কিছু, ধ্যান॰ কর ত তোমার সহপাঠিনী মালবিকা সেনের—"

"হ্যাঁ, রাক্ষসীমন্ত্র জপ করবার সময়ে তাঁর ধ্যানের প্রয়োজন হয় বটে। কিন্তু বর্ত্তমানে আমি ইন্দ্রানীর ধ্যানে মগ্ন আছি, বুঝলে—" বলে জনবিরল রমণার মাঠ দিয়ে চলতে চলতে কমলার ডান হাতখানা নিজের হাতে টেনে নিয়েছিল সরোজ।

কোন বাধাই দেয় নি কমলা, একটা নিশ্বাস ফেলে বলেছিল, "মিছে কথাও তোমার মুখ থেকে শুনলে সত্যি বলে মনে হয়। যাক, এখুনি বাড়ী ফিরবে? চল না নিরিবিলি কোথাও গিয়ে বসি একটু আড়ালে—"

"বেশ ত, চল, সত্যি-মিথ্যের প্রশ্নটারও একটা মীমাংসা হয়ে যাবে এখন—"

দু' আনার চিনে বাদাম কিনে গবর্ণার প্যালেসের কাছাকাছি ঘন সবুজ ঘাসের গালিচায় পাশাপাশি অন্ধকারে বসেছিল ওরা দু'জনে। অনেক দূরে ব্রিটানিয়া টকিজের আলো জ্বলে উঠেছে, আলো জ্বলেছে ভিক্টোরিয়া ও উয়ারী ক্লাবের টেন্টে। আলোর ঐ ভাসমান দ্বীপ কটি ছাড়া রমণার বিশাল মাঠ জুড়ে অন্ধকারের সমুদ্র। দূর থেকে ভেসে আসছে বাড়ী-ফেরা শিশুদের হিল্লোলিত কলধ্বনি, আর জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে-বেড়ানো নারী-পুরুষের বিশ্রম্ভালাপের মৃদু অস্পষ্ট গুঞ্জনধ্বনি। মেঘাবরণমুক্ত আকাশে একে একে দেখা দিয়েছিল গলানো রূপোর ভিতর ডুব দিয়ে-আসা তারার দল।

জায়গার কোন অভাব ছিল না, তবু গায়ে খুব গা ঠেকিয়ে বসেছিল সরোজ আর কমলা।

মৃদুকণ্ঠে সরোজ বলেছিল, "আমাদের বাড়ীতে ভাড়াটে হিসেবে প্রথম যেদিন এলে সেদিন মা-র কাছে তোমার নাম শুনে কি ভেবেছিলাম জান?"

মুখ তুলে সরোজের চোখে চোখ রেখে কমলা বলেছিল, "কি?"

"ভেবেছিলাম, এ ত বেশ যোগাযোগ। আমার নাম সরোজ আর তোমার নাম কমলা, আমার বুকের ওপরেই তোমার আসন—"

হাসির ভঙ্গিমায় কমলার পাৎলা ঠোঁট দুটো বেঁকে গিয়েছিল, নীচু গলায় বলেছিল, "সত্যি সত্যি ত আর তা নয়, তোমার বুক জুড়ে বিরাজ করছেন মালবিকা সেন—"

কমলার গায়ে একটা ধাক্কা দিয়ে সরোজ বলেছিল, "আবার ঐ কথা। বললেও বিশ্বাস করছ না কেন?"

"তোমার নামে গোলাপী খামে চিঠি আসে—"

অসহিষ্ণু স্বরে সরোজ বলেছিল, "প্রশ্রয় না দিলেও যদি কেউ বোকার মত কাজ করতে থাকে তবে আমি তার কি করতে পারি বল?"

"কিন্তু আমরা তোমাদের বাড়ীতে আসবার আগে কি তাকে খুব প্রশ্রয় দাও নি—"

"সে সব ছিল ছেলেখেলা—"

"আর এটাও ছেলেখেলা নয় তার কি প্রমাণ দিতে পার তুমি সরোজদা? তোমরা পুরুষ, হৃদয় থেকে হৃদয়ান্তরে উড়ে যেতে তোমাদের বাধে না—"

হঠাৎ কমলাকে চেপে ধ'রে গাঢ় অবরুদ্ধ স্বরে সরোজ বলেছিল, "এই তোমাকে ছুঁয়ে বলছি কমলা, আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে না পেলে আমার সমস্ত জীবন অন্ধকার হয়ে যাবে—"

সরোজের আবেগ কমলার মনেও সঞ্চারিত হয়েছিল, ওর মাথাটা সরোজের কাঁধে নামিয়ে দিয়ে চুপ করে বসেছিল, নিবিড় মধুর অন্তরঙ্গতাটুকু সমস্ত শরীর মন দিয়ে উপভোগ করছিল।

অনেক পরে উত্তর আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল আস্তে আস্তে একটু একটু ক'রে স'রে গিয়েছিল। পৃথিবীর শব্দের জগৎ ধীরে ধীরে নীরবতার আশ্রয় খুঁজছিল। এবার গলা পরিষ্কার ক'রে সরোজ বলেছিল, "কমলা—"

যেন অনেক দূর থেকে কমলা বলেছিল, "কি?"

"তোমার আমার এই নিবিড় সান্নিধ্যকে কি চিরায়ত করা যায় না?"

অস্ফুট স্বরে কমলা বলেছিল, "কেন যাবে না সরোজ-দা,—খুব যাবে,—কিন্তু—"

"কিন্তু কি? তোমার বাবার কথা ভেবে বলছ?"

"হ্যাঁ—"

অধীর হয়ে সরোজ বলেছিল, "কিন্তু সমাজপতিদের দণ্ড কি চিরকালের জন্যই আমাদের প্রেমের ওপর উদ্যত হয়ে থাকবে?—কি, কথা বলছ না যে?"

উত্তর দিতে গিয়ে কমলার গলা কেঁপে গিয়েছিল, যে কথাটা সরোজকে বলবে ব'লে সেই বিকেল থেকে মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে তার জন্য প্রতীক্ষা করছিল সেই কথাটা বলি বলি ক'রেও বলতে পারছিল না।

গভীর সুরে সরোজ ব'লে চলেছিল, "তোমার বাবা আমাদের ঘনিষ্ঠতা পছন্দ করেন না, তোমরা ব্রাহ্মণ আর আমরা কায়স্থ, শুধু এই একটা সামাজিক কৃত্রিম বাধা আমাদের প্রেমকে ব্যর্থ ক'রে দেবে এ কখনও হ'তে পারে কমলা? চল আমরা দু'জনে অন্য কোথাও চলে যাই"—

কেঁপে উঠে সরোজের হাত দুটো শক্ত ক'রে ধ'রে রুদ্ধশ্বাসে কমলা বলেছিল, "তা হয় না সুরোজদা, আর এই বোধ হয় আমাদের শেষ নির্জনে দেখা—"

"তার মানে?"

"বাবা অন্য বাড়ী দেখে এসেছেন গেণ্ডারিয়াতে, কাল সকালেই চলে যাচ্ছি আমরা, আর এ কথাটা বলব বলেই তোমার খোঁজে বিকেল থেকে দাঁড়িয়ে ছিলাম এখানে—"

কমলার খুব আস্তে আস্তে বলা কথাগুলো সরোজের মনে প্রচণ্ড আঘাত করেছিল, এক মুহূর্তে নিথর হয়ে গিয়েছিল সে, একটু পরে ম্লান হেসে বলেছিল, "হঠাৎ?"

"হঠাৎ নয়,—যেদিন তোমাকে আমাকে একসঙ্গে রাত্রে অন্ধকার ছাদ থেকে নাবতে দেখেছিলেন বাবা, রাত্রে মা-র কাছে খুব একচোট বকুনি খেতে হ'ল, আর বাবাও উঠে-পড়ে লাগলেন অন্য বাড়ী দেখতে—"

"ও, তাই তোমাকে ছাদে কি আমার পড়ার ঘরে দেখি নি এ ক'দিন,—আমি ভাবছিলাম কি না কি—এবার বুঝলাম সব। তা, ছোট্ট একটু বকুনির ভয়ই এত বেশী হ'ল তোমার কাছে যে, একবার দেখাটাও করতে পারলে না—"

"মেয়েদের যে কতদিকে কত বাধা সে তুমি বুঝবে না সরোজদা—"

"এবার গেণ্ডারিয়ার নতুন বাসায় গিয়ে তুমিই ভাল ক'রে বুঝে নিও—"

"রাগ করছ কেন সরোজদা—দেহের সান্নিধ্যই কি সব? মনে মনে কি কাছাকাছি থাকা যায় না, না তার কোন দাম নেই জীবনে?"

"দাম তার নিশ্চয়ই আছে"—ব্যঙ্গের স্বরে সরোজ বলেছিল, "খুব চড়া দামই আছে, কিন্তু সে শুধু কাব্যে আর সাহিত্যে। বাস্তব জীবনে তার দাম কানাকড়িও নয় কমলা—"

নিজের মনের কথাটাই সরোজের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে দেখে একটা নিশ্বাস ফেলে চুপ করে সুমুখের দিকে তাকিয়েছিল কমলা, তার জলভরা দু'চোখ কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না, এমন কি পাশে-বসা সরোজকেও না। শুধু বার বার মাথা নেড়ে সরোজের কথাটাকে অসত্য বলে ভাবতে চেষ্টা করছিল সে।

সহ্য করা যায় না এমন একটা ব্যথা সরোজের বুকের ভেতরটা যেন কুরে কুরে খেয়ে চলছিল, নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল। কমলার চুলের মৃদু গন্ধ, মাঝে মাঝে বেজে ওঠা চুড়ির নিক্কণ, আর শারীরিক উত্তাপ, তাকে বুকের ওপর চেপে রাখা সে যন্ত্রণাটাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল।

একটু থেমে সরোজ বলেছিল, "ভৌগোলিক দূরত্বকে অতিক্রম করবার মত ক্ষমতা প্রেমের নেই কমলা, প্রেম ত শুধু মনকে নিয়ে নয়, তার একটা দেহের দিক্‌ও আছে

এই দেহের দাবিকে অগ্রাহ্য করবার ক্ষমতা খুব কম মানুষেরই আছে। তুমি আমাকে দু' দিনেই ভুলে যাবে কমলা, আমার জন্য পাতা পুরাণো আসন তুলে নতুন আসন পাততে বেশী দেরি হবে না তোমার—"

দু' হাতে মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে সরোজের কোলে মাথা গুঁজে অবরুদ্ধ স্বরে কমলা বলে চলেছিল, "না না সরোজ দা, আমি কক্ষণও তা করব না, ভুলব না তোমাকে—তুমি ভুলে যেও না আমায়। হয়ত একদিন আজকের এই রক্ষণশীলতা কাটিয়ে এক হয়ে যেতে পারব আমরা—আমি তোমার জন্য প্রতীক্ষা ক'রে থাকব সরোজ দা—"

ভাবতে ভাবতে সরোজের চোখে জল এসে যায়। সেদিনের আবেগদীপ্ত বিদ্যুৎ-শিহরিত অনুভূতির ছোঁয়া নতুন ক'রে লাগে তার বুকে। তার ঠোঁটের কোণের করুণ হাসিটুকু যেন বলতে থাকে—না কমলা, যা হয় না তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তুমি ভুল করেছিলে। তা না হলে ক্রমে ক্রমে তোমার চিঠি বিরল হয়ে এল কেন? কেন তুমি এক বছর কাটতে না কাটতেই আর একজনের গলায় মালা দিলে? আর একজনের হয়ে গেলে?

পাঁচ বছর কেটে গেছে তার পর। সরোজের হৃদয়ের বেদনার ক্ষত শুকিয়ে এসেছে সময়ের মলমে। এম. এস-সি পাশ করে ঢাকা ইয়ুনিভার্সিটিতেই কেমিষ্ট্রির লেকচারার হয়ে আছে সরোজ। মালবিকাও সরোজের সঙ্গেই পাশ করে তার সঙ্গেই চাকরি করছে। সহপাঠিনী হয়েছে সহকর্মিণী। বাইরে ভালো অফার পেয়েও মালবিকা ঢাকা ছাড়ে নি, তার এই নীরব প্রতীক্ষার দুষ্কর তপস্যা সরোজকে দগ্ধ করে, কিন্তু পুড়ে-যাওয়া প্রেমের ভস্মে আগুন জ্বালে না।

রাস্তায় রাস্তায় ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির এক-চোখো আলোগুলো এক ঠ্যাংএ দাঁড়িয়ে অন্ধকারকে নীচে নাবতে দিচ্ছে না। সরোজের গাড়ী কমলাদের বাসার সামনে এসে থামল।

খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল সরোজ। একটা মাঝারি মাপের বসবার ঘর, ভেতরে যাবার দরজায় পুরু পর্দা ঝুলছে। একটু ইতস্তত: করে সরোজ ডাকল, "মামীমা—"

পরদা সরিয়ে এক ঝলক বাসন্তী বাতাসের মত ছুটে এল কমলা—কলকণ্ঠে বলে উঠল, "বাব্বা:, সেই কখন থেকে সেজেগুজে বসে আছি, এতক্ষণে আসার সময় হ'ল তোমার সরোজদা—"

একটা আধ-ফুটন্ত কলি যেন পরিপূর্ণ ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে। সুমুখে দাঁড়ান কানায় কানায় ভ'রে-ওঠা নারীকে দেখে চোখ নত করল সরোজ।

ফুটফুটে বছর তিনেকের একটি মেয়ে কমলার আঁচল ধরে টান দিল, আধ ফোটা স্বরে বলল, "কে মা?"

চোখে-মুখে স্নিগ্ধ হাসি ছড়িয়ে কমলা বলল, "তোর মামা হয় রে শতদল—যা, প্রণাম কর্—"

মার পেছনে লুকোবার আগেই সরোজ হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলে, আদরে কাছে টানতে টানতে বলে, "কমলাই কি আর একবার শতদল হয়ে জন্মাল? কি সুন্দরই না হয়েছে তোমার মেয়ে—"

পুলক আর গর্ব-ভরা চোখে একবার শতদলের মুখে একবার সরোজকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে কমলা বলে, "তুমি যে একেবারে বুড়িয়ে গেছ সরোজ দা, অমন সুন্দর ঘন চুল ছিল তোমার, এত পাতলা হ'ল কি করে?"

সরোজ জবাব দেবার আগেই কমলার মা পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন। এগিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করল সরোজ, বলল, "কেমন আছেন মামীমা?"

মলিনা বললেন, "আমার আর থাকা। এদের রেখে এবার যেতে পারলেই বাঁচি বাবা—"

সরোজ তাকিয়ে দেখল, এ ক'বছরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে তাঁর। মেঘের মত কালো চুল ছোট করে ছাঁটা। রিক্ত শুভ্র বেশ একটা সকরুণ বিষণ্ণতার ছায়া ফেলেছে তাঁর মুখে। মৃদু স্বরে মলিনা বললেন, "তোমাদের বাড়ির সবাই ভালো আছে ত বাবা? কমলা—চা করে নিয়ে আয়—"

চঞ্চল হয়ে সরোজ বলল, "না মামীমা চা থাক। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে, রাস্তাও খুব কাছের না—"

মলিনা বললেন, "হ্যাঁ, সে কথা ঠিকই, তা হ'লে সুট-কেসটা এখানে নিয়ে আয় কমলা, যাবিই যখন তখন আর দেরি করে লাভ কি?"

কমলা ছুটে চলে যেতে একটু হেসে মলিনা বললেন, "ক'বছর পরে বোম্বাই থেকে এল। এসে অবধি খালি মামীমার বাড়ি যাব বলে বলে আমাকে একেবারে অস্থির করে তুলেছে। দিদিকে ভীষণ ভালবাসত ত ও—তা যাক, দিন কয়েক ঘুরে আসুক। শতদল থাকবে আমার কাছে—"

পাশাপাশি নয়, সামনা-সামনি বসেছে ওরা দু'জনে। পাল্কি গাড়ির ভেতরটা খুব অন্ধকার, খোলা জানালা

দিয়ে মাঝে মাঝে রাস্তার আলো সেই অন্ধকারের বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

বাঁধান রাস্তার ওপর দিয়ে ঘড় ঘড় ঘড় ঘড় শব্দে এগিয়ে চলেছে ঘোড়ার গাড়ি। কালের চাকাও এমনি ভাবেই প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে চলেছে—তবে তার সেই অলক্ষ্য নিঃশব্দ গতি শোনা যায় না। হাজার চেষ্টা করলেও সে চাকা পেছন দিকে ঠেলে নিতে পারা যায় না। সে যেন সব সময়ে বলছে—অতীতের কবর খুঁড়তে যেও না, বর্তমানের ঝরে-পড়া ক্ষণগুলি কুড়িয়ে নিয়ে তৈরী করে নাও ভবিষ্যতের মণিহার।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে কমলা বলল, "সরোজদা"—

—"কি?"

"তোমার সব কথা শুনেছি আমি মার কাছে। কেন এমন করে কষ্ট পাচ্ছ, আর—আরেকজনকেও কষ্ট দিচ্ছ বল ত সরোজদা—"

একটু কঠিন সুরে সরোজ বলল, "সবাইকে তোমার মত হৃদয়হীনা বলে মনে কর কেন বল ত কমলা?"

আঘাতটা সয়ে নিতে একটু সময় লাগল, তার পর কমলা বলল, "এতদিন পরে ঝগড়া করতে আসি নি সরোজদা, আর আমি হৃদয়হীনাও নই, তোমাকে আমি ভালবাসতাম, আজও খুব ভালবাসি, তবে আজ হয় ত তার রূপ বদ্‌লেছে—"

"মিথ্যা কথা মিথ্যা কথা"—প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সরোজ—"যার প্রতিশ্রুতির কোন দাম নেই, তার কোনও কথা আমি আজ বিশ্বাস করি না—"

ধীর স্বরে কমলা বলল, "বিশ্বাস তোমাকে করতেই হবে সরোজদা। সব শুনলে বুঝবে যে, আমি যা করেছি তা ঠিকই করেছি। আমরা গেণ্ডারিয়ার বাসায় যাবার কয়েকদিন পরেই একদিন মালবিকাদি এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে—উদ্‌ভ্রান্ত চোখে, যোগিনীবেশে, আমার হাত ধ'রে আমার কাছ থেকে তোমাকে ভিক্ষা চেয়েছিলেন। তাঁর প্রেমের তীব্রতা দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম, তার কাছে আমার ভালবাসা নেহাৎ ছেলে-খেলা বলে মনে হ'ল। তোমার জীবন থেকে আমি স'রে যাব—এই কথা আমি তাঁকে দিয়েছিলাম সেদিন। আমারও কষ্ট হচ্ছিল খুব, কিন্তু এই প্রায়-উন্মাদিনীর হতাশ দীর্ঘশ্বাসকে উপেক্ষা করে সংসার পাতবার সাহস আমার হ'ল না। আমাকে তুমি মাপ কর সরোজদা—"

উল্টো দিক্ থেকে আসা একটা মোটর গাড়ীর তীব্র আলো এসে পড়ল গাড়ীর ভেতরে। সেই আলোতে সরোজ দেখল কমলার দু' চোখে অশ্রুর ফোঁটা মুক্তার মত টল্‌টল্ করছে, থর থর করে কাঁপছে পাৎলা ঠোঁট দুটি।

সরোজের বুকের যে ক্ষতটা সময়ের মলমে সম্পূর্ণভাবে সারে নি, তাই যেন আজ কমলার কথায় আর তার চোখের জলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সরোজের বহু অনাদর ও অবহেলা সহ্য করেও যে মেয়েটি সব সময়ে তার কাছা-কাছি থাকতে চেয়েছে, দুটো কথা বলতে চেয়েছে, এক টুকরা হাসি পেলে কৃতার্থ হয়ে গেছে, তার নিঃসঙ্গ মনের বিপুল বেদনা সরোজের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। মালবিকার বাইরের রূপ ম্লান হয়ে গিয়ে তার মনের অনিন্দ্য রূপই বড় হয়ে দেখা দিল।

সরোজের বাড়ীর সামনে গাড়ী এসে থামল।

কোথায় বসব!

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

ও ছায়াটা তুমি ছেড়ে চ'লে এস,
ওখানে ব'সো না।
কাছাকাছি সব যারা ঘুরছে,
ভালক'রে তারা খেতে পায় না।
ওদের শুকনো মুখগুলো দেখ।
দেখতে তোমার ভাল লাগবে না।
আর একটা ছায়া খুঁজে নিই, চল।

একটু বসব।
হাতটিতে হাত একটু রাখব।
আমার তাকানো দুঃসহ হলে
ঘন-পক্ষ্মের ছায়াতে দুচোখ
একটুকু তুমি আড়াল করবে।
তারপর নত করবে দৃষ্টি।
চোখের ভাষায় বলা যা হবে না,
দু-ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস
সেই কথাটিকে ঘুরিয়ে বলবে।

আজকে তাদের কথা ভাবব না
ভাল ক'রে যারা খেতে পায় না।
আজকে কেবল তোমাকে দেখব।

ও ছায়াটা তুমি ছেড়ে চ'লে এস।
ওখানে এখনই ভিড় করবে
আশেপাশে ঐ যারা ঘুরছে,
ভাল ক'রে যারা খেতে পায় না।
জায়গাটা সব তারাই জুড়বে।
আওয়াজ তুলবে।
শুনতে তোমার ভাল লাগবে না।

এদের জিভে যে লালা ছিল, তার
বেশীর ভাগ যে শুকিয়ে শুকিয়ে
বিষ হয়ে গেছে, সে ত তুমি জানো।

এও জানো তুমি,
ক্ষিদে কাকে বলে যারা জানত,
এ শহর আর শহরতলির
রাস্তায় প'ড়ে তারা যে মরেছে।
নিজেরা শুকিয়ে ম'রে গেছে তারা।
জিহ্বার লালা শুকিয়ে শুকিয়ে
বিষিয়ে উঠতে সময় পায় নি।

ভাল ক'রে যারা খেতে পায় না,
তাদের আওয়াজ ওঠে, থেমে যায়।
মৃত্যু-পাণ্ডু চোখের যে ভাষা
আকাশে-বাতাসে রেখে গেল তারা
পথে প'ড়ে যারা নীরবে মরল,
ধ্বনিস্পন্দন হতে খরতর
স্পন্দন তার ভূলোক, দ্যুলোক,
স্বর্লোক জুড়ে কেবলি কাঁপছে।
সেই থেকে শুধু কেঁপেই চলেছে।
কেঁপে কেঁপে এসে স্পর্শ করছে
তোমার আমার মনকে।
হয়ত
তোমার আমার মনের যে ভাব
ভাবলেশহীন নির্মমতার,
এদের মৃত্যু-পাণ্ডু চোখের
অভিশাপ তার মধ্যে রয়েছে।

আজকে এসব কিছু ভাবব না।
এস, জায়গাটা ছেড়ে চ'লে যাই।

কিন্তু বলো ত,
হাজার হাজার লোককে না খেয়ে
পথে প'ড়ে যারা মরতে দেখেছে,—
তাদের মনকে সহজে স্পর্শ

কি ক'রে করবে এদের দুঃখ,
ভাল ক'রে যারা খেতে পায় না?
এদের দুঃখ সহজে স্পর্শ
কি ক'রে করবে তাদের, নিজেরা
ভাল ক'রে যারা খেতে পায় না?

তুমি ভাল ক'রে খেতে পাও না।
ভাল ক'রে আমি খেতে পাই না।

তবুও নীরব অবকাশ খুঁজি।
উত্তরণের কি উপায়, সেটা
কালকে না হয় দুজনে ভাবব।

আজকে এখন হাতে হাত দাও,
ওই জায়গাটা ছেড়ে চ'লে এস।
ওখানে ব'সো না।

বলছ, কোথায় বসব আমরা?

সবখানে বুঝি তারাই ঘুরছে
ভাল ক'রে যারা খেতে পায় না!

শিক্ষার সঙ্কট

শ্রীবিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিবার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই আমরা কার্য্যতঃ শিক্ষানৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। সুতরাং শতাব্দীর চতুর্থাংশেরও অধিক সময় ব্যাপিয়া আমরা স্বহস্তে শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিতেছি। স্বাধীনতা লাভ করিবার পর শিক্ষার জন্য নিয়োজিত সরকারী অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ছাত্র-সংখ্যাও আশাতীতরূপে বাড়িয়াছে। শিক্ষা বাবদ ছাত্রদিগের নিজ ব্যয় ও সরকারী ব্যয় একত্র করিলে একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্ক হইবে সন্দেহ নাই। জাতির এই বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া এবং এতদিন ধরিয়া স্বাধীনভাবে শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করিয়া আমরা কতটা সাফল্যলাভ করিলাম তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। শিক্ষাই যদি জাতির উন্নতির প্রথম সোপান বলিয়া স্বীকৃত হয়, তবে শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আত্ম-সমালোচনা সর্ব্বদাই প্রয়োজন। শিক্ষানীতি বা শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে যাহা ত্রুটি বলিয়া মনে হয়, তাহার প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করা প্রত্যেক শিক্ষাব্রতীর পক্ষেই কর্ত্তব্য; এবং সমালোচনা যেদিক্ হইতেই আসুক না কেন, শিক্ষাক্ষেত্রের বর্ত্তমান অবস্থায়, তাহা উপেক্ষা না করিয়া তাহার তাৎপর্য্য বিচার করা সংশ্লিষ্ট সকলেরই কর্ত্তব্য।

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা অনেকাংশে নিষ্ফল হইতেছে এই সন্দেহের ছায়া আজ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে আমাদের শিক্ষা-পরিচালনা কিরূপ ছিল এবং তাহা দ্বারা কতটা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলাম, বর্ত্তমানের সহিত তুলনার জন্য, তাহার আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক নহে। ইংরেজ আমলে শিক্ষার ব্যাপকতা বা গভীরতা যে ছিল না তাহা অনস্বীকার্য্য। তখনকার দিনে আমরা যে শিক্ষালাভ করিতাম তাহা দ্বারা দেশের বৃহত্তর কল্যাণ সাধনে আমরা সক্ষম হইতাম না; তাহা দ্বারা বিশ্বসভায় আমরা কোনও সম্মানিত আসন লাভ করিতে পারিতাম না। উন্নতিশীল ইউরোপীয় দেশগুলির জ্ঞান-বিজ্ঞানের উজ্জ্বল সম্ভারের তুলনায় আমাদের শিক্ষাক্ষেত্র নিতান্তই নিষ্প্রভ ছিল। বস্তুতঃপক্ষে ইংরেজ আমলে কেবল নিম্নস্তরের শিক্ষারই ব্যবস্থা ছিল; উচ্চতর শিক্ষার কোনও উল্লেখযোগ্য আয়োজন ছিল না। তথাপি সে আমলের শিক্ষা সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সার্থক হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার কারণ এই যে, তখনকার দিনের শিক্ষার একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিল ও শিক্ষা-পরিচালনা ত্রুটিবিহীন ও কার্য্যকরী ছিল।
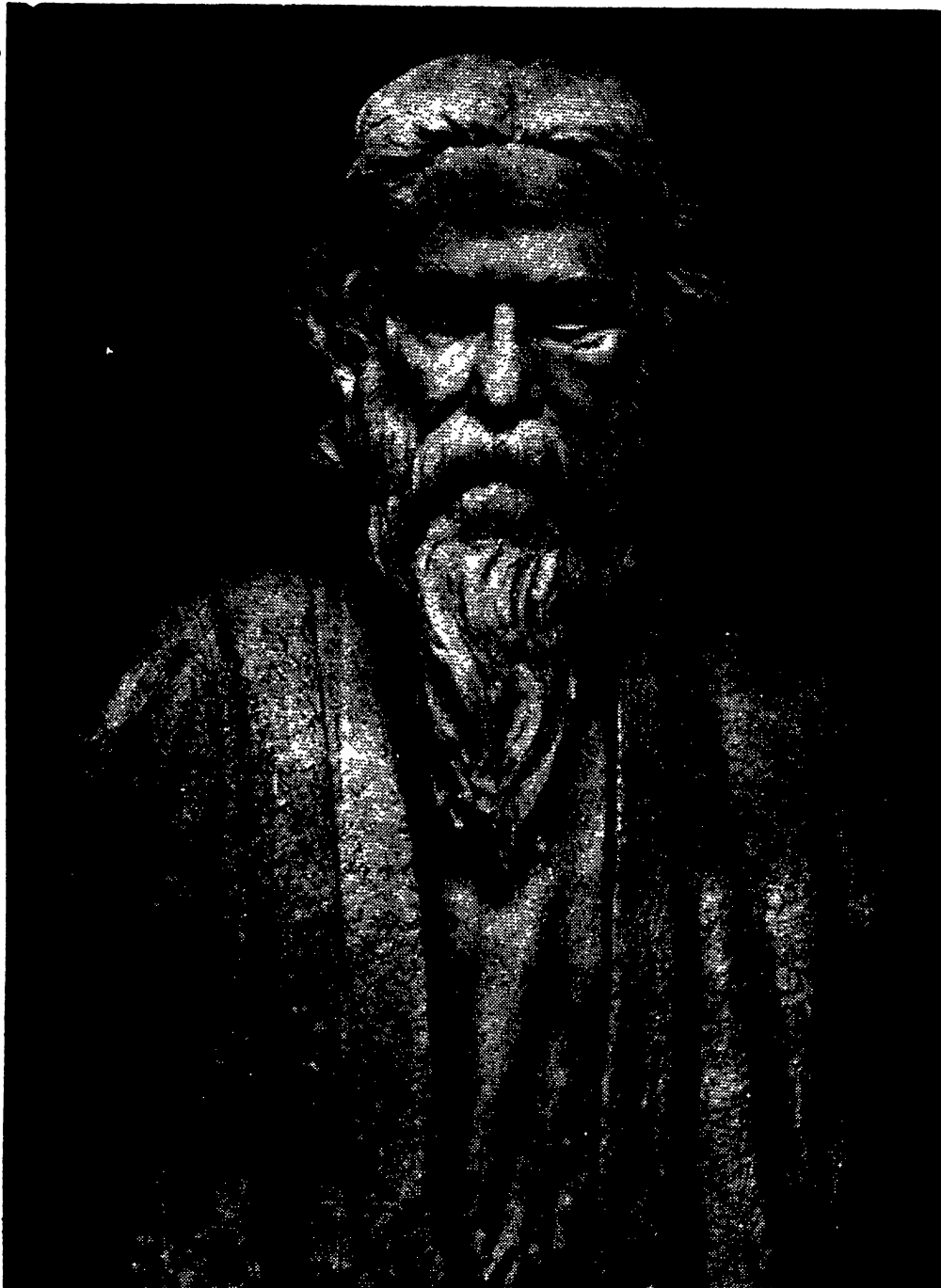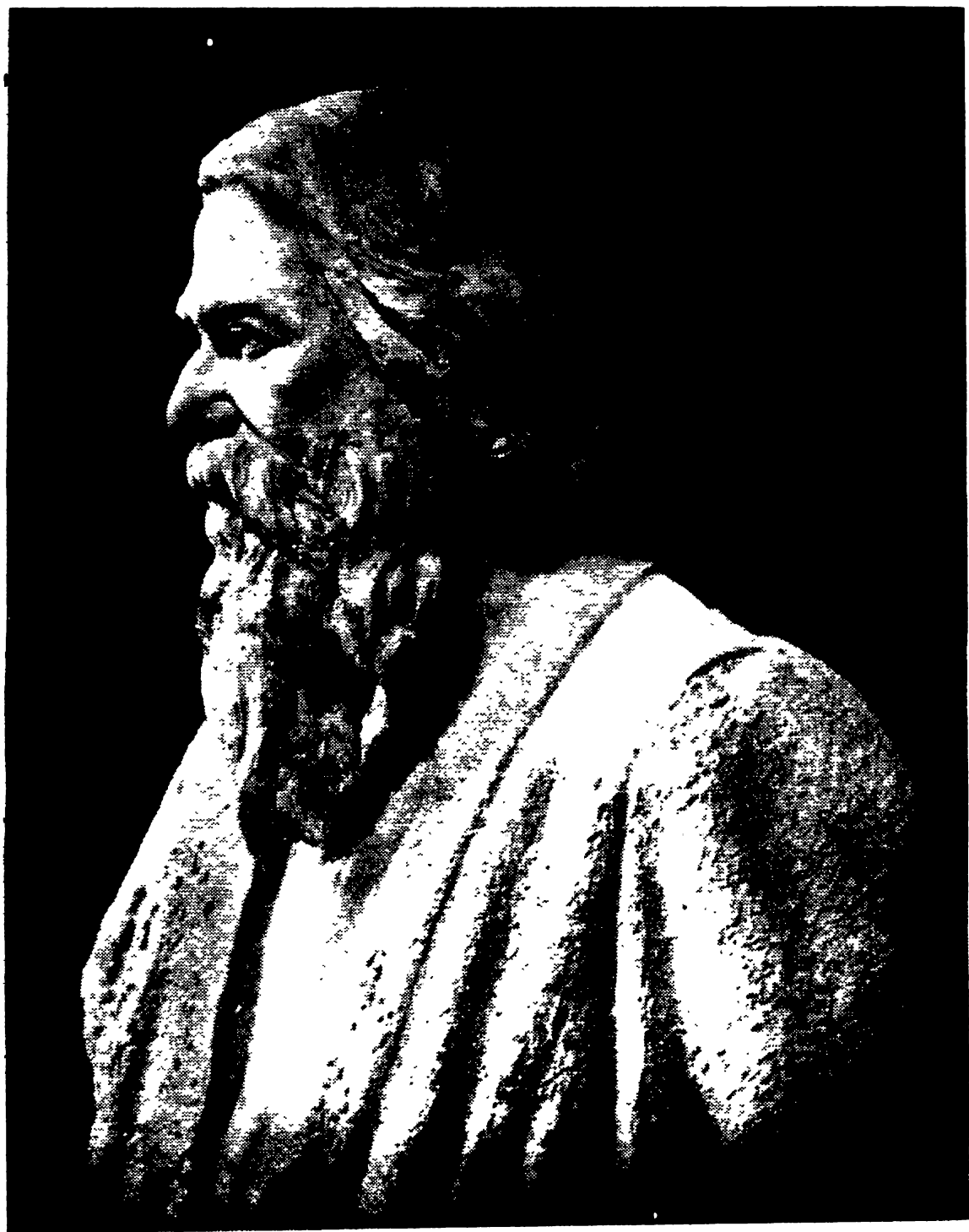
রবীন্দ্রনাথ (পার্শ্ব হইতে)
শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

ইংরেজের রাজ্য পরিচালনার জন্ত ইংরেজী ভাষায় শুদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন লোকের প্রয়োজন ছিল। ইংরেজী ভাষায় লিখিত আদেশগুলি যথাযথভাবে বুঝিয়া কাজ করিবার, দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক 'রিপোর্ট' পাঠাইবার, ইংরেজী ভাষায় লিখিত আইন-কানুন সঠিক বুঝিয়া বিচার করিবার লোকের প্রয়োজন ছিল। রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে, ইংরেজী শিক্ষিত চিকিৎসক, ইংরেজী শিক্ষিত ভূতত্ত্ববিদ্, ইংরেজী শিক্ষিত রসায়নবিদ্ প্রভৃতির প্রয়োজন ছিল। সকল ক্ষেত্রেই ইংরেজই কর্ত্তৃত্ব-স্থলাভিষিক্ত ছিলেন; রাজনৈতিক কারণ ব্যতীতও দেশীয়গণ শিক্ষা দ্বারা কর্ত্তৃত্বপদের উপযুক্ততা অর্জ্জন করিতে পারিতেন না—কারণ সেরূপ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না। ইংরেজকে অতিক্রম করিয়া স্বাধীনভাবে কাজ করিবার জন্য দেশীয়দিগের কোন প্রয়োজন ছিল না।

তাই ইংরেজ আমলে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল ইংরেজী নির্ভুলভাবে লিখিতে, বলিতে ও বুঝিতে পারার ক্ষমতা অর্জ্জন করা এবং বিজ্ঞানের সদা-প্রয়োজনীয় পদ্ধতিগুলিতে নির্ভুল কুশলতা অর্জ্জন করা। এই সকল কর্ত্তব্য অতিক্রম করিয়া কোনও বিষয়ে গবেষণায় লিপ্ত হইবার ব্যবস্থা দেশীয়দিগের জন্য প্রয়োজন ছিল না; বাঙালী চাকুরিয়ার প্রাণে যদি কখনও অনুসন্ধিৎসার স্রোত বহিতে আরম্ভ করিত, তাহা হইলে তাহা বাহিরের তপ্ত মাটিতে প্রকাশ পাইবামাত্র শুকাইয়া যাইত।

উল্লিখিত সাধারণ কর্ত্তব্যগুলি সুষ্ঠুভাবে করিবার জন্য কর্ম্মীর প্রয়োজন পূর্ব্বেও ছিল; এখনও আছে। রাষ্ট্রের বা জাতির শিক্ষা-ব্যবস্থায় এই স্তরের শিক্ষা একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে, ইহা স্বাভাবিক; ইংরেজ আমলেও তাহা ছিল। ইংরেজের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আমাদের প্রকৃত অভিযোগ এই যে, তখন উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয় নাই।

আজিকার দিনে জিজ্ঞাস্য এই: (১) নিম্নস্তরের অর্থাৎ স্নাতকপূর্ব্ব (under-graduate) স্তরের শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের ত্রুটি কোথায়; (২) উচ্চস্তরের অর্থাৎ স্নাতকোত্তর (post-graduate) স্তরের শিক্ষা প্রসারে আমরা নির্ভুল পন্থা অবলম্বন করিতেছি কিনা। উচ্চস্তরের শিক্ষা সম্বন্ধে ইংরেজ আমলের দৃষ্টান্ত নগণ্য; কিন্তু নিম্নস্তরের শিক্ষাক্ষেত্রে ঐ সময়ের দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা লাভবান্ হইতে পারি।

নিম্নস্তরে ইংরেজ আমলে শিক্ষার যাহা লক্ষ্য ছিল, আজিও মূলতঃ তাহাই থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বোধ হয় কার্য্যতঃ সে লক্ষ্যে আর দৃষ্টি নিবদ্ধ নহে। এই স্তরে জ্ঞান-বিজ্ঞানে বহু তথ্যের অবতারণা না করিয়া যে মূল সূত্রগুলির স্পষ্টত্ব অধিকতর বাঞ্ছনীয়, আজ সম্ভবতঃ এই নীতি আর স্বীকৃত হইতেছে না। শিক্ষণীয় বিষয় সম্পূর্ণ আয়ত্ত হওয়ার প্রয়োজন অপেক্ষা শিক্ষণীয় বিষয়ের ব্যাপকতার প্রতি মনোযোগ অধিকতর দেখা যাইতেছে।

শিক্ষা-পরিচালনা ক্ষেত্রেও যে ত্রুটি প্রবেশ করিয়াছে এরূপ সন্দেহ করিবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। পূর্ব্বে প্রথা ছিল যে, নবাগতকে ক্রমে ক্রমে সকল পর্য্যায় পার হইয়া পরিণত বয়সে পরিচালকমণ্ডলীতে স্থান পাইতে হইত। এমনকি ইংরেজের পক্ষেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না। দেশীয় ভাষায় অনভিজ্ঞতার জন্ত, নবাগত ইংরেজ অবশ্য স্কুলে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইতেন না। কিন্তু কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করিয়া, স্কুলে পরিদর্শকের কাজ কিছুকাল করিয়া স্কুল ও কলেজের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবার পর শিক্ষা-পরিচালকমণ্ডলীতে স্থান পাইতেন। তাহার পূর্ব্বে নহে। দেশীয়দিগের পক্ষে প্রথমে স্কুলে, পরে কলেজে শিক্ষকতা করিয়া অবশেষে পরিচালকমণ্ডলীতে স্থান হইত। যাঁহাদের স্থান হইত তাঁহাদের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকিত না। আজ শিক্ষাক্ষেত্রে এই শিক্ষানবিশী প্রথা (apprenticeship) প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য হইতেছে না। নানা ছলে, নানা কৌশলে নবাগতদের দ্বারা শিক্ষণ ও শিক্ষা পরিচালনের দায়িত্ব অধিকৃত হইতেছে। অভিজ্ঞতার দাবী বা শিক্ষানবিশীর প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষিত হইতেছে। কেহ বা বিদ্যালয়ের জন্ত অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন, অথবা বিদ্যালয় নির্ম্মাণে সহায়তা করিয়াছেন, অথবা কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তি বা দলের প্রীতিভাজন হইয়াছেন বলিয়া যোগ্যতম প্রশ্নকে উপেক্ষা করিয়া শিক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত হইতেছেন।

কোনও কোনও দেশীয় 'মিশন' অধুনা শিক্ষা-প্রচেষ্টায় শক্তি নিয়োগ করিতেছেন। তাঁহাদের শিক্ষা-প্রচেষ্টা ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। জনসাধারণের মনে সংস্কার আছে যে, সন্ন্যাসী বলিয়াই তাঁহারা শিক্ষা-পরিচালনায় অপর অপেক্ষা অধিকতর যোগ্য। সত্য বটে, বিদেশীয় 'মিশন' ব্যতীত, বে-সরকারী সকল শিক্ষা-প্রচেষ্টাই আমাদের দেশে নৈরাশ্যজনক হইয়াছে। কিন্তু যে সকল কারণে নৈরাশ্যজনক হইয়াছে সেগুলি বর্ত্তমান থাকিলে কার্য্যকারণের অমোঘ নিয়ম অনুসারে, দেশীয় 'মিশন' হইতেও অনুরূপ ফল লাভ করিব। সন্ন্যাসী হইলেই শিক্ষকতায় বা শিক্ষা-পরিচালনায় যোগ্য হইবেন ইহা স্বতঃসিদ্ধ নহে। অধ্যাত্মক্ষেত্র

শিক্ষাক্ষেত্র হইতে পৃথক্; উত্তম শিক্ষক ও গবেষক হইতে হইলে ভিন্নরূপ অভ্যাস ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। উত্তম শিক্ষক ও গবেষক না হইয়া এবং শিক্ষাক্ষেত্রের ব্যাপক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করিয়া শিক্ষা-পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলে শিক্ষার উৎকর্ষ কখনই হইবে না; আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে যে সকল আবর্জ্জনার স্তূপ সঞ্চিত রহিয়াছে তাহারই কলেবর বৃদ্ধি পাইবে মাত্র।

আমাদের দেশে বিদেশী 'মিশন' কর্ত্তৃক শিক্ষা-পরিচালনার মধ্যে শিক্ষোত্তর কারণ ছিল। নিজ নিজ দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে কোনও বিদেশী 'মিশন'ই তত প্রভাবশালী নহে। তথাপি আমাদের দেশে বিদেশী 'মিশনগুলির' অবদান বিপুল ভাবে কল্যাণকর হইয়াছে। আজও বিদেশী 'মিশনগুলির' স্থাপিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি আদর্শ-স্থানীয় বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিতেছে। এই জন্যই শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা দেশীয় 'মিশনগুলির' প্রতিও আস্থাবান্ হইয়া উঠিয়াছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিদেশী 'মিশনারী'-গণ 'মিশনারী' বলিয়াই সাফল্য অর্জ্জন করেন নাই। তাঁহাদের পাণ্ডিত্য ও শিক্ষাপ্রীতি দ্বারাই তাঁহাদের স্থাপিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারিয়াছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানে দেখিতে পাই, কত বিদগ্ধজন শিক্ষার জন্য, শিক্ষার কর্ত্তৃত্বের জন্য নহে—জীবন উৎসর্গ করিয়া আসিতেছেন; অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিমগ্ন থাকিতে পারিলেই জীবন সার্থক বলিয়া মনে করিতেছেন। দেশীয় কোনও 'মিশনে'র শিক্ষাব্রতিগণ, সংখ্যায় ও পাণ্ডিত্যে, কি ইঁহাদের তুলনীয় হইতে পারেন? তাহা না হইলে তাঁহাদের হাতে শিক্ষা-পরিচালনার ভার তুলিয়া দেওয়া মঙ্গলজনক হইবে কেন? এই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে, আমাদের নব-নির্ম্মিত শিক্ষার আশ্রমগুলি পরিচালনার জন্য, শিক্ষা-প্রচেষ্টায় নিযুক্ত কোনও বিদেশী 'মিশন'কে আহ্বান করিলে অপেক্ষাকৃত সুফল পাওয়া যাইত, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

যোগ্যতাই শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন। যোগ্যতার অভাবই আজ শিক্ষাক্ষেত্রে সঙ্কট আনয়ন করিয়াছে।

ইদানীং বাংলা দেশে কয়েকটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে। আশা করা যায়, ইহা দ্বারা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত হইবে। প্রদেশের দূরবর্ত্তী অঞ্চলে কেবলমাত্র সাধারণ শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিবেশন করিবার জন্যই পৃথক্ বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজন। সাধারণ শিক্ষা পরিবেশন করা ব্যতীত, স্থানীয় সমস্যাগুলির গবেষণা-ক্ষেত্র প্রস্তুত করাও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রদেশের দূরবর্ত্তী অঞ্চলে স্থানীয় সমস্যাগুলি লইয়া গবেষণা পরিচালনা করা, কলিকাতার মত কেন্দ্র হইতে সুবিধাজনক হইবার কথা নহে। সুতরাং এই সকল অঞ্চলে পৃথক্ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সম্পূর্ণরূপে সঙ্গত। প্রশাসনিক দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ফীতি বিভ্রান্তিকর। সুতরাং কলিকাতার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলেও পৃথক পৃথক্ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সমর্থনযোগ্য। কিন্তু এইগুলিতে বিভিন্নমুখী গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত না করিলে ইহাদের সার্থকতা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইবে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্গঠন করিবার চিন্তা আজও অঙ্কুরিত হয় নাই। কিন্তু এরূপ অনুকরণ করিলে হয়ত শিক্ষার উৎকর্ষ খর্ব্ব না করিয়াও নিছক প্রশাসনিক ব্যয় সীমিত হইতে পারে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের অধীন হইয়াও ইহার অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণা পরিচালনা করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে এখনও সুচারুরূপে গবেষণা পরিচালনা হইতেছে না। যে সকল গবেষণা হইতেছে তাহা ব্যক্তিগতভাবে, বিক্ষিপ্ত দিকে এবং কতকটা উদ্দেশ্যহীন ভাবে হইতেছে। জাতীয় প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কোনও নির্দ্দিষ্ট দিকে দলবদ্ধ ভাবে নূতন জ্ঞানের সন্ধান আজও আরম্ভ হয় নাই। এরূপ গবেষণায় নেতৃত্ব করিবার মত জনবলও আমাদের নাই।

আমাদের শিক্ষার সঙ্কট দুইটি: (১) লক্ষ্যের অস্পষ্টতা, (২) যোগ্যতার বিরলতা। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াই যে আমরা আশু ফল লাভ করিব তাহা মনে করিবার কারণ নাই।

রঙ্গমল্লী

শ্রীসীতা দেবী

১

স্কুল-কলেজ সব খুলিতে আরম্ভ করিয়াছে গ্রীষ্মের ছুটির পর। ইহারই মধ্যে একদিন পূর্ণিমার পুরাতন কর্ম্মক্ষেত্রে তাহাকে বিদায়-অভিনন্দনও দেওয়া হইয়া গেল। আশ্চর্য্যের বিষয়, পূর্ণিমাকে তাহারা একটা ভাল হ্যাণ্ড-ব্যাগই উপহার দিল। ব্যাপার দেখিয়া সরমা ত হাসিয়াই খুন। বলিল, "দেখলে দিদি, যা চেয়েছিলে তাই পেয়ে গেলে। সত্যি মনে হয়, কেউ যেন তাদের গিয়ে ব'লে দিয়ে এসেছে।"

বিদায়-অভিনন্দনের দিনে পূর্ণিমাকে অফিস্ হইতে ছুটি লইয়া আসিতে হইয়াছিল। কারণ স্কুল খোলা যে-দিন থাকিবে সেদিন ত সভা করা যাইবে? তা বেশী ছুটি নয়, দুই ঘণ্টার ছুটি।

হিরণ্ময় তাহার আবেদন শুনিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়, তা যাবেন বৈকি? এতদিন ছিলেন তাদের মধ্যে, তারা একটু কান্নাকাটি করবে ত, আপনাকে উপলক্ষ্য ক'রে?"

পূর্ণিমা বলিল, "আজকালকার ছেলেমেয়েরা ঢের বেশী কড়া হয়ে গিয়েছে মনের দিক্ দিয়ে। অল্পে কাঁদে না।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন কিন্তু কান্নাকাটি করাটাই রেওয়াজ ছিল। আমাদের এক প্রিয় হেডমাষ্টার যখন বিদায় নিলেন, আমরা ছাত্রেরা ত কেঁদে ভাসিয়ে দিলাম। সে মফঃস্বলের শহর, অত মোটর-টোটর তখন ছিল না। ঘোড়ার গাড়ীর ঘোড়া খুলে দিয়ে আমরাই টেনে নিয়ে গেলাম। আপনি যখন ইচ্ছে যেতে পারেন।"

অভিনন্দনের পর আর অফিসে যাইবার কথা ওঠে না, ততক্ষণ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ট্যাক্সি ডাকিয়া মেয়েরা তাহাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিল। অত ফুলের মালা পরিয়া আর ফুলের তোড়া হাতে করিয়া ত ট্রামে আসা যায় না?

দীপক সেদিন জিজ্ঞাসা করিল, "কি, কত কাঁদল তোমার ছাত্রীরা?"

পূর্ণিমা বলিল, "হাউ হাউ ক'রে কেউ কাঁদে নি, তবে নাক চোখ মুছেছে কয়েকজন।"

দীপক জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি নিজে কি করলে?"

পূর্ণিমা বলিল, "আমিও কাঁদি নি, তবে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে কেশেছি কয়েকবার।"

"তুমি কাঁদবে না জানতামই। স্ত্রীলোকের পক্ষে তোমার মনে মায়া-দয়া একটু কম আছে।"

পূর্ণিমা চটিয়া বলিল, "গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদা দরকার ছিল বুঝি আমার? আমার দয়ামায়া কম, এটা মনে করবার কি কারণ ঘটল?"

দীপক বলিল, "নাঃ, থাকগে ওসব কথা। আজকাল রোজই খালি ঝগড়া বাধবার উপক্রম হচ্ছে, এটা ভাল নয়।"

পূর্ণিমা বলিল, "তুমি খোঁচাও ব'লেই ত ঝগড়া বাধে, নইলে বাধত না।"

সেদিন দুজনেই খুব সাবধান হইয়া রহিল, আর যেন তর্ক না বাধে। পূর্ণিমার মনটা অত্যন্তই ভার হইয়া উঠিল। এ কিসের দিকে চলিয়াছে তাহারা দু'জন?

অফিসে যখন গেল, তখনও তাহার মনের ভার সম্পূর্ণ কাটে নাই। হিরণ্ময়ের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, তিনিও যেন আজ অন্যদিনের অপেক্ষা বেশী গম্ভীর। কাজ আরম্ভ করিতে যাইবে এমন সময় বেয়ারা এক-গোছা চিঠি দিয়া গেল। একখানা চিঠি তাহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া মিঃ মজুমদার বলিলেন, "এটা আপনার।"

পূর্ণিমা বিস্মিত হইয়া চিঠিখানা হাতে লইল। খাম ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিয়া সেদিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই যেন তাহার মাথায় বাজ পড়িল। এ কি?

সাধারণ শাদা কাগজে, সবুজ কালিতে লেখা চিঠি। নাম নাই লেখকের। অক্ষরগুলা পূর্ণিমার চোখের সামনে যেন সাপের ফণার মত দুলিতে লাগিল।

সুচরিতাসু,
আপনি আমায় চেনেন না। কিন্তু আমি আপনার মঙ্গল চাই, তাই এ চিঠি লিখছি। আপনি সংসারজ্ঞান-হীনা বালিকা মাত্র। না জেনে অতিশয় বিপজ্জনক

পরিস্থিতির মধ্যে গিয়ে পড়েছেন। আপনি মনে করতে পারেন যে, আপনার কাজের যোগ্যতা দেখে আপনাকে মজুমদার সাহেব সেক্রেটারীরূপে গ্রহণ করেছেন।, কিন্তু আসল ব্যাপার অন্য। আপনি সুন্দরী যুবতী, সেই হিসাবে আপনাকে মনোনীত করা হয়েছে। হিরণ্ময় মজুমদার অতি বিখ্যাত লোক। অনেক যুবতীর সর্ব্বনাশ তিনি করেছেন, তারপর আর ফিরেও তাকান নি। আপনি তাঁর নবতম victim। সময় থাকতে স'রে যদি না যান, আপনার অদৃষ্টও আপনার অগ্রগামিনীদের মত হবে।

ইতি
শুভাকাঙ্ক্ষী।

নিজের অজ্ঞাতসারেই বোধ হয় পূর্ণিমার মুখ দিয়া একটা অস্ফুট কাতরোক্তি বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। চিঠি পড়িতে পড়িতে হিরণ্ময় মুখ তুলিয়া তাকাইলেন। পূর্ণিমার মাথাটা একেবারে হেঁট হইয়া গিয়াছে। যে হাতে সে চিঠি ধরিয়া আছে তাহা কাঁপিতেছে। কোলে যে হ্যাণ্ডব্যাগটা ছিল তাহা পায়ের কাছে সশব্দে পড়িয়া গেল।

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া হিরণ্ময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'ল মিস্ সান্যাল? চিঠিতে খারাপ খবর আছে কিছু?"

পূর্ণিমা ভাঙা গলায় বলিল, "না।"

"কে লিখেছে চিঠি?"

পূর্ণিমা কোনমতে গলাটা পরিষ্কার করিয়া বলিল, "জানি না। নাম নেই চিঠিতে।"

হিরণ্ময় তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার হাত হইতে চিঠিটা টানিয়া লইয়া বলিলেন, "চিঠিটা দেখছি আমি।"

চিঠি পড়া তাঁহার দু' মিনিটেই হইয়া গেল। তাহার পর ডাকিলেন, "মিস্ সান্যাল।"

পূর্ণিমা কোনমতে মাথা তুলিল। মুখ তখন তাহার মোমের মত শাদা, রক্তহীন হইয়া গিয়াছে।

হিরণ্ময় বলিলেন, "দেখুন, মেয়েরা যখন কর্ম্মক্ষেত্রে নামে বাড়ীর আবেষ্টন ছেড়ে, তখন তাদের অজস্র ইতরামি আর নোংরামির সামনে পড়তে হয়। আপনার এই বোধ হয় প্রথম পরিচয়, এই রকম বাঁদরামির সঙ্গে। খুব ভয় পেয়েছেন আপনি, আর অত্যন্ত upset হয়েছেন। কিন্তু কেন? অপরাধ কি আপনি কিছু করেছেন? জগতে অসংখ্য scoundrel আছে, তার জন্যে কি innocent-রা মাথা হেঁট ক'রে থাকবে? চিঠি আমি ছিঁড়ে waste paper basket-এ ফেলে দিচ্ছি, সেটাই তার উপযুক্ত জায়গা। এসব লোকের খোঁজ পাওয়া যায় না, সে বিষয়ে তারা খুব সাবধান থাকে। আর খোঁজ নিয়ে হবেই বা কি? আপনিও মন থেকে দূর ক'রে দিন এ সব কথা।"

পূর্ণিমার কাঁপুনি এতক্ষণে থামিল, হ্যাণ্ডব্যাগটাও সে কুড়াইয়া রাখিল। বলিল, "আমি ত কারও অনিষ্ট কখনও করি নি, আমার অনিষ্ট করতে চায় কেন লোকে?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "শত্রু নেই এমন লোক পৃথিবীতে ক'টা আছে? নাই বা করলেন আপনি কারও অনিষ্ট, তাতে নিষ্কৃতি পাবেন না। শত্রুতা করার খাতিরেই অনেকে শত্রুতা করে, এও তাদের এক আনন্দ। আবার ভগবান্ এমন মানুষও গড়েছেন, যাঁরা কোন প্রতিদানের আশা না রেখেই মানুষের উপকার করেন। নানা জাতীয় জীব নিয়ে এ সংসার।"

পূর্ণিমা বলিল, "একবার যখন লিখেছে, তখন আবারও পারে ত লিখতে?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "তা পারবে না কেন? তবে যদি দেখে যে আপনি কোন notice-ই নিচ্ছেন না ওদের চিঠির, তা হ'লে থেমে যাবে।"

একটু থামিয়া বলিলেন, "আপনি এখনও স্বাভাবিক হতে পারছেন না, বড্ড বেশী shock পেয়েছেন। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আমার সম্বন্ধে কি কোন ভয় বা সন্দেহ এসেছে আপনার মনে?"

পূর্ণিমা প্রায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "না, না, একেবারে না। আপনি আমাকে ছোট বোনের মত ক'রে আগ্‌লে রেখেছেন, তাই না আমি এখানে কাজ করতে পারছি? নইলে আমার সাধ্য ছিল না এখানে থাকার। বাইরের জগতের সঙ্গে আমার পরিচয় বড় কম ছিল। আমি ভয়ই পেতাম, কাজ করতে পারতাম না।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "তা হ'লে নির্ভয়ে এখানে থাকুন। হিতার্থীদের কথায় কান দেবেন না। আমি যতদিন এখানে আছি, ততদিন কোন অনিষ্ট আপনার হবে না। আমার কাছ থেকেও না, অন্য কারও কাছ থেকেও না। ব্যক্তিগত কথা হ'লেও বলছি, আমি ও লাইনে বিখ্যাত ব্যক্তি মোটেই নয়। কোনও যুবতীর কোন সর্ব্বনাশ করিও নি কোনদিন, করবার ইচ্ছাও রাখি না। যান দেখি, আপনি চোখে-মুখে একটু জল দিয়ে আসুন, তার পর কাজ আরম্ভ করুন। না কি বাড়ী চ'লে যেতে চান আজকের মত?"

পূর্ণিমা বলিল, "না, আমি বাড়ী যেতে চাই না, বাড়ী গেলে আমার বেশী ভয় করবে।"

হিরণ্ময় এতক্ষণে হাসিলেন। বলিলেন, "লক্ষ্মীছাড়া অফিসের ঠিকানায় চিঠি দিয়ে ভালই করেছে তা হ'লে। হয় ত বাড়ীর ঠিকানা জানে না। সম্ভব আপনার চেনা লোক নয়। আমারই কোন বন্ধু। আপনি বড় অল্প বয়সে বাধ্য হয়েছেন এই বীভৎস ভীড়ের মধ্যে এসে দাঁড়াতে। কি আর করা যাবে? তবে ভয় বেশী পাবেন না। আমি সর্ব্বদাই সব রকমে আপনার সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি, এটা জানবেন।"

পূর্ণিমা একবার বিস্ফারিত চোখে হিরণ্ময়ের দিকে তাকাইল। তাহার পর বলিল, "আমি মুখটা ধুয়ে আসি। এসে কাজই করব।"

মুখে-চোখে জল দিয়া আসিয়া সে কাজ করিতেই বসিল। আজ তাহা কাজই অল্প কিছু করিল। হিরণ্ময়ের দৃষ্টি বার বার তাহার অবনত মস্তকের উপর দিয়া ঘুরিয়া যাইতে লাগিল। তাহাতে অনুকম্পা ছিল অনেকখানি, আর কি ছিল কে জানে?

পাঁচটার একটু আগেই হিরণ্ময় বলিলেন, "থাক, আজ আর দরকার নেই কাজ ক'রে। আপনাকে বড় অসুস্থ দেখাচ্ছে। আপনি বাড়ী চ'লে যান। ড্রাইভারকে ব'লে দিচ্ছি, সে আপনাকে রেখে আসবে বাড়ীতে।"

পূর্ণিমা বলিল, "আমি ট্রামেই যেতে পারব। তেমন কিছু খারাপ ত লাগছে না।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "দরকার নেই ঐ ধাক্কাধাক্কির মধ্যে গিয়ে আজ। গাড়ীতেই যান। লম্বা rest নিন বাড়ী গিয়ে, একেবারে কাল সকালে উঠবেন।" তিনি বেয়ারাকে ডাকিয়া ড্রাইভারের কাছে আদেশ পাঠাইয়া দিলেন।

অগত্যা জিনিষপত্র গুছাইয়া লইয়া পূর্ণিমা ফিরিয়াই চলিল। দরজার কাছে গিয়া একবার হিরণ্ময়ের দিকে তাকাইল। দৃষ্টিটা তাহার প্রায় পূজারিণীর দৃষ্টির মত হইয়া উঠিয়াছে তখন। বাড়ী ফিরিয়া মায়ের কাছে সত্য-মিথ্যা মিশাইয়া জবাবদিহি করিতে হইল। তাহার পর চা খাইয়া, কাপড়চোপড় বদ্‌লাইয়া শুইয়া পড়িল। শরীর মন তাহার বড়ই অবসন্ন লাগিতেছে। আজ আর তাহার উঠিবার চেষ্টা করা উচিত নয়। কাল না-হয় দীপকের কাছে জবাবদিহি করা যাইবে।

মনের ভিতর অনেকখানি কান্না তাহার যেন সঞ্চিত হইয়া আছে। কাহার কাছে কাঁদিয়া মনের এ বোঝা নামাইবে সে? মাকে বলা যায় না। অত্যন্ত স্নেহময়ী তিনি, কিন্তু কন্যার এ বেদনা তিনি বুঝিবেন না। দীপক? সেও বুঝিবে না, বুঝিলেও কোন সাহায্য সে করিতে পারিবে না।

হঠাৎ চোখ দিয়া তাহার জল ঝরিতে আরম্ভ করিল। কেহ ছিল না ঘরে, কেহ দেখিল না। এ কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছে সে? তাহার জীবন লইয়া ভগবান্ এ কি খেলা খেলিতেছেন? সুখ বা আনন্দ তাহার বিগত জীবনে খুব বেশী ছিল না, কিন্তু সংঘাতও ছিল না, এক ধরণের শান্তি ছিল বলা চলে। প্রাণপণ কাজ করিয়া মা ও ছোট ভাইবোন-দু'টির ভরণপোষণ করিতেছিল, ইহাতে একটা চরিতার্থতা সে খুঁজিয়া পাইত। ভবিষ্যতে হয়ত আকাঙ্ক্ষিত সঙ্গীর সঙ্গে মিলাইতে পারিবে নিজের জীবনকে, এ আশাও রাখিত, খুব সুস্পষ্ট ভাবে না হইলেও। দীপকের উৎসাহহীন ভাব তাহার ভাল লাগিত না, কিন্তু তাহার নিজের মনই দীপকের হইয়া ওকালতি করিত। অল্প বয়স হইতে বিষম বোঝা বহিয়া সে এই রকম হইয়া গিয়াছে। পৌরুষ তাহার মধ্যে পরিপূর্ণ রূপে জাগ্রত হইতে পারে নাই। দীপক পূর্ণিমার অপেক্ষা প্রায় এক বৎসরের বড় ছিল, কিন্তু তাহার প্রতি পূর্ণিমার যে মনোভাব, তাহার মধ্যে কিছুটা বাৎসল্য মিশ্রিত ছিল।

কিন্তু হঠাৎ একটা ঝড় যেন পূর্ণিমার সত্তার উপর দিয়া বহিয়া গেল। পরিচিত পথ-ঘাট সব সে ভুলিয়া গেল। চেনা মুখও যেন অচেনা হইয়া আসিতেছে। এ কি আসিল তাহার জীবনে?

কাঁদিতে কাঁদিতে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িল তাহা জানিতেই পারিল না। অনেক রাত্রে মা তাহাকে ডাকিয়া খাওয়াইতে বসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "হঠাৎ অসুখ করল কেন রে খুকী? খাটুনি বড় বেশী হয়ে যাচ্ছে, না?"

পূর্ণিমা বলিল, "তেমন আর বেশী কি। আগে ট্যুশানি আর স্কুলের কাজ নিয়ে যতটা সময় যেত, এখন তার চেয়ে বড়জোর ঘণ্টাখানিক বেশী করি। এমনিই শরীরটা খারাপ লাগছে, মানুষের শরীর ত? মাঝে মাঝে একটু এদিক্-ওদিক্ হবেই।"

মা বলিলেন, "ডাক্তার দেখিয়ে একটা ওষুদ-বিষুদ খা না কিছু?"

পূর্ণিমা বলিল, "দরকার নেই মা। এমন কিছুই হয় নি। ডাক্তার বরং তুমি দেখাও, বড় রোগা হয়ে যাচ্ছ তুমি।"

শরীর মন তখনও বড় ক্লান্ত, তবু জোর করিয়া উঠিতে হইল, স্নানাহার করিতে হইল। ট্রামে চড়িতে দারুণ অনিচ্ছা বোধ হইল, কিন্তু অতদূর ট্যাক্সি করিয়া

যাওয়ার সম্মতি তাহার নাই। ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইল।

হিরণ্ময়ের সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হইল, তখন তিনি বলিলেন, "এখনও ঠিক normal দেখাচ্ছে না। রাত্রে ঘুমোতে পেরেছিলেন ত?"

পূর্ণিমা বলিল, "ঘুমিয়েছি, তবে খুব ভাল ক'রে নয়।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "এ ধরণের shock এই প্রথম আপনার জীবনে, তাই বেশী লেগেছে। আমরা নামী-বেনামী নানারকম চিঠি পেয়ে ঝানু হয়ে গেছি। কিন্তু মনে হচ্ছে,আজ আপনার overtime-টা না করাই ভাল। কাল হবে না-হয়। আজও পাঁচটার পরে বাড়ীই চ'লে যাবেন।"

পূর্ণিমা বলিল, "না, আজকের কাজ আজই করা ভাল। বাড়ী গিয়ে আমার আরো অস্বস্তি বাড়ে। সেখানে আমাকে পরামর্শ দেবার কেউ নেই, সাহস দেবার কেউ নেই।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "ভগবানের কাজের সমালোচনা করা মানুষের সাজে না। তবু মনে হয়, আপনার বাবাকে তিনি বড় অসময়ে নিয়ে গেছেন। ছেলেমানুষ আপনি, এতবড় ভার বহন করার সাধ্য আপনার থাকার কথা নয়।"

পূর্ণিমা নীরবে, নতমুখে কাজ করিতে লাগিল। ভয়ে কথা বলিল না, যদি কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক না রাখিতে পারে?

হিরণ্ময় বলিলেন, "শুক্রবার overtime-এর কাজ চলবে না। ভুলে গিয়েছিলাম যে, সেদিন বিকেলে আমি একবার আসানসোল যাচ্ছি, সোমবার ফিরব। শনিবারে আপনার কাজ থাকবে না কিছু। তবু অফিসে আসবেন, এসে খাতায় নাম লিখে চ'লে যাবেন।"

পূর্ণিমা মুখ তুলিয়া বলিল, "আচ্ছা।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "Nervous লাগবে বোধ হয়, না? কিন্তু এটাও অভ্যাস ক'রে নিতে হবে।"

পূর্ণিমা বলিল, "তা ত করতেই হবে। আমাকে আড়াল ক'রে রাখার লোক চিরজীবনই জুটবে না ত?" বলিয়াই মনে হইল, এ ভাবে কথা বলা বোধ হয় ঠিক নয়। সে সেক্রেটারী মাত্র, বন্ধুস্থানীয় কেহ নয় হিরণ্ময়ের। তিনি অন্তরঙ্গ সুরে কথা বলা পছন্দ না করিতে পারেন। কিন্তু তিনি পছন্দ করিতেছেন না, এমন কোন লক্ষণ দেখাইলেন না। হাসিয়া বলিলেন, "তা জুটেও যেতে পারে, বলা যায় না।"

পূর্ণিমা কিছুক্ষণ নীরবে কাজ করিতে লাগিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি প্রায়ই যান বুঝি বাইরে?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "হ্যাঁ, প্রতিমাসেই এক-আধবার যেতে হয়। আপনি মেয়ে না হয়ে ছেলে হলে আপনাকেও ঘুরতে হ'ত আমার সঙ্গে সঙ্গে। তবে মেয়েদের বেলা এটা কেউ expect করে না।"

খানিক পরে বলিলেন, "আজ overtime-টা একটু বেশী লম্বা হবে। কাল আমায় অনেক কাগজপত্র ঠিক ক'রে নিয়ে যেতে হবে। আটটা, সাড়ে আটটা হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। আপনি এক কাজ করুন, মাকে একটা চিঠি লিখে দিন। আমাদের পিওন গিয়ে দিয়ে আসবে। লিখে দিন যে, আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসব, তিনি যেন ভাবনা না করেন। আর পাঁচটার পর আপনাকে আর একবার এখানে খেয়ে নিতে হবে। সেটার খরচ অফিস দেবে।"

পূর্ণিমা চিঠি লিখিতে বসিল। ভাবিল, দীপকের আর একটা ছুতো মিলবে কাল ঝগড়া করবার। কিন্তু ঝগড়া ত প্রায় নিত্যই হচ্ছে, এর নূতনত্ব আর কোথায়? এ যেন তাহার গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে।

পাঁচটার পর হাতমুখ ধুইয়া, আর একবার কিছু খাইয়া লইয়া সে কাজ করিতে বসিল। এত বড় বিরাট বাড়ীটা যখন খালি হইয়া যায়, তখন ইহার যেন একটা বিষণ্ণ সুর স্পষ্ট হয়। কাজের ফাঁকে ফাঁকে এটা পূর্ণিমা শুনিতে পায়। আজ কেমন যেন অভিভূতের মত কাজ করিতে লাগিল, চোখ ও কান শুধু কাজের মধ্যেই নিবদ্ধ করিয়া রাখিল। আরো যাহারা দুই-চারিজন কাজ করিতেছিল, তাহারা এক এক করিয়া চলিয়া গেল।

আটটার পর হিরণ্ময় বলিলেন, "আজ আর থাক। আর বসিয়ে রাখা উচিত নয় আপনাকে। মেয়ে সেক্রেটারী রাখার সুবিধা যেমন আছে, অসুবিধাও আছে। পুরুষ হ'লে রাত দশটা অবধি আপনাকে বসিয়ে রাখলেও ক্ষতি ছিল না। চলুন।"

পূর্ণিমা উঠিয়া দাঁড়াইল। হ্যাণ্ডব্যাগ, কাগজপত্র তুলিয়া নিল। হিরণ্ময় নিজের দেরাজগুলি বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া চলিলেন। পূর্ণিমা চলিল তাহার পিছন পিছন।

গাড়ীতে আজ শুধু তাহারা দু'জন। পূর্ণিমার বুকের ভিতরটা দুই-চারিবার দুরুদুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, অথচ ভয় ত সে মোটেই পায় নাই? একমাত্র যখন হিরণ্ময়ের কাছাকাছি থাকিত, তখনই অভয় তাহার মনকে অধিকার করিয়া রাখিত।

বাড়ী পৌঁছিতে খুব বেশী দেরি হইল না। সত্যই সাড়ে আটটাতেই সে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সে নমস্কার করিয়া নামিয়া গেল, গাড়ীটা সগর্জ্জনে আবার পথ ধরিল।

মা বলিলেন, "তোর ক্রমেই যে খাটুনি বেড়ে যাচ্ছে খুকী?"

পূর্ণিমা বলিল, "মজুমদার সাহেব বাইরে যাচ্ছেন দু'দিনের জন্যে, তাই আজ অনেক কাজ ক'রে দিতে হ'ল। পরশু তিনি থাকবেন না, সেদিনটা প্রায় সবটাই ছুটি পাব।"

রণেন তখনও পড়ার নাম করিয়া ঘোরাঘুরি করিতেছিল, একখানা বই হাতে করিয়া সে বলিল, "বেশ ত, মজাই ত তোমার দিদি। কেমন গাড়ী চ'ড়ে এলে।"

দিদি বলিল, "মজা ত বটে, এদিকে যে ঘাড়ে পিঠে ব্যথা ধ'রে গেছে আমার টাইপ করতে করতে।"

পরদিন সমস্তটা দিন কাজ হইল না। হিরণ্ময় তিনটার পর চলিয়া গেলেন। বলিলেন, "মাঝের দুটো দিন খুব ভাল ক'রে বিশ্রাম ক'রে নিন।"

পূর্ণিমা বলিল, "চেষ্টা ত করব।"

পার্কে সেদিন দীপকের সঙ্গে ঝগড়া হইল না অবশ্য, তবে সে বেশ খানিকটা গম্ভীর হইয়া গেল। বলিল, "এই অফিস তোমাকে ক্রমে ক্রমে গ্রাস ক'রে ফেলবে একেবারে।"

পূর্ণিমা বলিল, "আমাকে চাকরি ক'রেই যখন খেতে হবে, তখন ওসব ভাবনা ভেবে কি হবে?"

দীপক বলিল, "এ পাড়াটা খুব আধুনিক নয়। সেকেলে লোকই বেশীর ভাগ। তারা যদি দেখে যে রাত ক'রে boss-এর সঙ্গে গাড়ী চ'ড়ে বাড়ী ফিরছ ত একটা অপবাদ তুলে দিতে পারে।"

পূর্ণিমা বলিল, "দিলে দেবে, তার আর কি করব? তবে এইটুকু জেনে রেখো যে, অফিস-পাড়ার মেয়ে-কর্মীরা এটা ক'রেই থাকে দরকার হ'লে। আমি একলা নয়।"

অন্যদিন যতক্ষণ বসে, পূর্ণিমা আজ আর ততক্ষণ বসিল না।

পরদিন সে অফিসে গেল নিয়মমত। চতুর্দ্দিক্ গম্‌গম্ করিতেছে, যেমন রোজ করে। কিন্তু হিরণ্ময়ের ঘর স্তব্ধ হইয়া আছে। বেয়ারা ঘর খুলিয়া, ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। পূর্ণিমা নিজের ঘরে একবার গিয়া বসিল, বেয়ারা খাতা আনিলে খাতায় নাম লিখিল। আবার হিরণ্ময়ের ঘরে গিয়া দাঁড়াইল। প্রাণহীন ইটকাঠের ঘর, আসবাবপত্র হঠাৎ যেন সজীব হইয়া উঠিল পূর্ণিমার চোখে। তাহারা যেন পূর্ণিমার মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে প্রশ্ন করিতে লাগিল, এ ঘরের অধীশ্বর কোথায়?

একটা হিমশীতল হাত পূর্ণিমার হৃৎপিণ্ডকে মুঠা করিয়া ধরিল। নীরবে নতমস্তকে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। অল্পক্ষণ পরেই অফিস ত্যাগ করিয়া সে বাড়ীর পথ ধরিল। পূর্ণিমার কাজের দুই মাস পূর্ণ হইল। হিরণ্ময় বলিলেন, "আজ আপনাকে confirm করার অর্ডার দিয়ে দিলাম। সামনের মাস থেকে দু'শ পঁচিশ টাকা ক'রে পাবেন। Maximum যেটা দেওয়া যায়, তাই দিতে বলেছি। এর কমে সত্যিই আপনার চলে না। এখন ইচ্ছে করলে overtime-টা আপনি নাও করতে পারেন। এত খাটুনি আপনার সহ্য হয় না সম্ভবতঃ। ক্রমেই যেন রোগা হয়ে যাচ্ছেন মনে হয়।"

পূর্ণিমা বলিল, "overtime ছাড়া আমার চলবে না। রোজগার ক্রমাগত বাড়ানই আমার দরকার, কমান নয়। ভাইটাকে ভাল একটা স্কুলে না দিলে, বা প্রাইভেট টিউটার একজন না রাখলে সে চিরকাল মূর্খ হবে থাকবে। বালীগঞ্জের একটা বাজে স্কুলে পড়ে সে, কোন পরীক্ষাতেই ভাল করতে পারছে না।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "বছরের মাঝখানে ছাড়িয়ে লাভ নেই। এখন মাষ্টারই রাখুন, না-হয় কোচিং ক্লাসে দিন। সব পাড়াতেই এখন এ সবের ব্যবস্থা হয়েছে। পরের বছর অন্য কোন ভাল স্কুলে দেবার চেষ্টা করা যাবে। আপনার ছোট বোন কি পড়ছে?"

"সে ত সামনের বছর আই. এ দেবে। দুজনেই পড়াশুনোয় একটু পিছিয়ে আছে।"

"পিছিয়ে থাকলেও ব'সে ত নেই? এটা আপনার কম কৃতিত্ব নয়। অল্প বয়সে পিতৃহীন হ'লে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছেলেমেয়ে সব বয়েই যায় যদি না অন্য কোন অভিভাবক জোটে। আপনি যে রকম fight ক'রে ওদের মানুষ করছেন, সে রকম বেশী মেয়েতে পারে না। আশা করি পরবর্ত্তী জীবনে তারা সেটা মনে রাখবে।"

পূর্ণিমা বলিল, "কেউই রাখে না বোধ হয়, ওরাও রাখবে না। অনাত্মীয়ের কাছ থেকে পাওয়া উপকার মানুষ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে, আত্মীয়ের কাছ থেকে পাওয়া উপকার পাওনা ব'লেই ধ'রে নেয়।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "অনাত্মীয়ের কাছে পাওয়া উপকারও সব মানুষ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে না মিস্ সান্যাল। এমন অনেক মানুষ আছে যারা কৃতজ্ঞতার বোঝাটা ঝেড়ে ফেলার জন্যে উপকারীর শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, তাকে টেনে নীচে নামাতে চেষ্টা করে।"

পূর্ণিমা বলিল, "তাদের আর মানুষ ব'লে লাভ কি ?"

"তবু মানুষই বলতে হয়, আর কি বলা যাবে তাদের ? তারা সংখ্যায় ত কম নয় ? ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রে এঁদের খুবই দেখা যায়। এখানের নৈতিক মানদণ্ড একটু অন্য রকমের। পুরুষগুলি বেশীর ভাগই পরস্পরের অকারণ শত্রু। নারীরও শত্রু এঁরা, তবে সে শত্রুতা আবার মিত্রতার ছদ্মবেশ প'রে আসে।"

কাজ অনেক পড়িয়া ছিল, কাজেই বেশীক্ষণ আর গল্প করা গেল না।

সেদিন বাড়ী গিয়া কাজ পাকা হওয়া ও মাহিনা বৃদ্ধির কথা বলিয়া পূর্ণিমা সকলকেই অত্যন্ত আনন্দিত করিয়া দিল। মা শুষ্ক মুখে হাসিয়া বলিলেন, "এবার তোদের একটু মাছটাছ দিতে পারব ভাতের সঙ্গে।"

পূর্ণিমা বলিল, "নিজে একবেলা ক'রে দুধ খাচ্ছ ত, না ফাঁকি দিচ্ছ ?"

"না গো না, খাচ্ছি ঠিকই।"

সরমা একখানা ছাপা রেশমী শাড়ীর জন্য আবদার করিয়া রাখিল। রণেনকে একটা ফুটবল দিতে হইবে, তাহাদের ক্লাবের ফুটবলটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। দীপকের কাছে প্রথম দিন সে এ কথা তুলিলই না। কাজের দিক্ দিয়া পূর্ণিমার যত উন্নতি হইতেছে, দীপক যেন আরও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেছে। এখানেও কি ঈর্ষ্যার আবির্ভাব হইতেছে ?

পূর্ণিমার মনের অশান্তি যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। সে আর নিজেকে চিনিতে পারে না। কোথায় যে ভাসিয়া চলিয়াছে তাহা ভাবিতে ভয় পায়। হৃদয়ের উপর অবগুণ্ঠন টানিয়া রাখিতে চায়।

ইহার মধ্যে ছোটখাট একটা অশান্তির কারণ আবার জুটিয়া গেল। বোম্বাই হইতে এক কর্ত্তাব্যক্তি আসিয়া পৌঁছিলেন। টকটকে রং, বিশাল চেহারা, মেদের ভারে ভদ্রলোক যেন চলিতেই পারেন না। প্রায় প্রৌঢ়ত্বে উপনীত, অথচ ধরণ-ধারণ যুবকের মত। কাজের জন্য আসিয়াছেন, সুতরাং ইনি মজুমদার সাহেবের ঘরেই আড্ডা গাড়িলেন। নানা কর্ম্মচারীর ডাক পড়িতে লাগিল, এবং সব চেয়ে বেশী ডাক আসিতে লাগিল পূর্ণিমার, কারণে ও অকারণে। কারণে ডাক দিতে হইল হিরণ্ময়কে, অনেক কাজ আজ। আর অকারণে ডাক পাড়িতে লাগিলেন, আগন্তুক ভদ্রলোক, শুধু পূর্ণিমাকে দেখিবার জন্যই বোধ হয়। পূর্ণিমার মনটা ক্রমেই বিরক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। দুই-একবার হিরণ্ময়ের দিকে তাকাইয়া দেখিল, তাঁহারও মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল হইয়া উঠিয়াছে।

যাহা হোক, আড়াইটা বাজিতে না বাজিতে ভদ্রলোক প্রস্থান করিলেন, কোথায় যেন সিনেমা দেখিতে যাইবেন। পূর্ণিমা এইবার হিরণ্ময়ের ঘরে আসিয়া বলিল, "উনি এখানে ক'দিন থাকবেন আর ?"

হিরণ্ময় হাসিয়া বলিলেন, "কেন, একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন ? কালকের দিনের খানিকটা থাকবেন, দুটোর পরে আর নয়।"

পূর্ণিমা বলিল, "এঁদের মত মানুষের জন্যেই ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মেয়েদের পাঠাতে লোকে ভয় পায়। যেন উপকথার রাক্ষস-খোক্কসের দল।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "রাক্ষসের হাত থেকে বাঁচাবার লোকও থাকে। আপনি ভয় পাবেন না। কাজ ছেড়ে দেবার সঙ্কল্প করছেন নাকি মনে মনে ?"

পূর্ণিমা বলিল, "না, তা করছি না। তবে এইরকম মানুষের কাছে আমি কাজ করতে পারতাম না।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "যতটা খারাপ ভাবছেন এদের, ঠিক ততটা খারাপ নয়। Boss-দের সঙ্গে রসিকতা করা, এবং সেক্রেটারীর সঙ্গে অল্প একটু flirt করা এই পর্য্যন্ত এঁদের দৌড়। অবশ্য সত্যিকারের রাক্ষসও যে নেই তা নয়। তবে সম্প্রতি এখানে নেই। আমি সেদিনও বলেছিলাম, আজও বলছি, আমি থাকতে ভয় পাবেন না। যদি এমন অবস্থা হয় যে, আমিও আগলাতে না পারি, তখন আমিই অন্য জায়গায় কাজ নিয়ে দেব আপনার।"

পূর্ণিমা ভাবিল, সেই অন্য জায়গায় আমাকে আগলাইবে কে ? সব স্থানে ত তোমার মত মানুষ বসিয়া নাই ? ভগবান্ কত দয়া আর আমাকে করিবেন ?

দ্বিতীয় দিনে দেখা গেল যে, বম্বেওয়ালা ভদ্রলোক আরো উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছেন। পূর্ণিমার পাশে আসিয়া বসিবার জন্য, তাহার হাতখানা একবার স্পর্শ করিবার আকাঙ্ক্ষায় কতরকম কসরৎই যে করিতেছেন, তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। পূর্ণিমা একবার নিরুপায়

দৃষ্টিতে হিরণ্ময়ের দিকে তাকাইল। তিনি গম্ভীর হইয়া আছেন, তবে চোখের চাহনিতে কিছু আশ্বাস যেন পূর্ণিমা পাইল।

হঠাৎ হিরণ্ময় বলিলেন, "মিস্ সান্যাল, আজ আমাদের অনেক কাজ অল্প সময়ের মধ্যে করতে হবে। আপনার speed বেশী নয়, আপনি গিয়ে বিকাশবাবুকে পাঠিয়ে দিন খানিকক্ষণের জন্যে। আপনি ততক্ষণ তাঁর কাজগুলো দেখুন।"

মুক্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তাড়াতাড়ি পূর্ণিমা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সে চৌকাঠ পার হইতে না হইতে আগন্তুক ভদ্রলোক হিরণ্ময়কে বলিলেন, "আপনি সুন্দরী ষ্টেনোটিকে খুব আগলে রাখেন দেখছি। মেয়েটি সত্যি বড় সুন্দরী।"

রাগে পূর্ণিমার গা জ্বলিয়া গেল, কারণ কথাটা সে শুনিতেই পাইল। ভাবিল, 'তোমার মত খোক্কস ত নয়, কাজেই আগলে রাখেন।'

বিকাশবাবু বড় সাহেবের আদেশ শুনিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "আমি যাচ্ছি, আপনি বসুন এখানে। কাজ খুব বেশী নেই। এই ক'টা। ততক্ষণ করুন আস্তে আস্তে।"

পূর্ণিমা তাঁহার পরিত্যক্ত আসনে বসিয়া কাজ আরম্ভ করিল। সহকর্মীদের বিস্মিত দৃষ্টি সে যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অনুভব করিতেছিল। তবু কোন দিকে সে তাকাইল না। মনের ভিতর চিন্তার স্রোত তাহার বহিয়া চলিল। পৃথিবীটা মেয়েদের পক্ষে কিছু স্বস্তিকর জায়গা নয়, বিশেষ অল্পবয়সে। ধর, এই ভদ্রলোকের মত কেউ যদি পূর্ণিমার উপর-ওয়ালা হইতেন, তাহা হইলে সে কি করিত? না খাইয়া মরিলেও সে এখানে কাজ করিতে পারিত না। কিন্তু বিধাতার আশীর্ব্বাদে সে এমন লোকের কাছে আসিয়া পড়িল, যিনি নিষ্কলুষ-চরিত্র নিজে এবং পরের উৎপাত হইতেও পূর্ণিমার রক্ষাকর্ত্তা।

ঘণ্টাখানিক এইভাবে কাটিয়া গেল। তাহার পর একসঙ্গে হিরণ্ময় ও বিদেশাগত ভদ্রলোক বাহির হইয়া গেলেন। বিকাশবাবু যথাস্থানে আসিয়া বলিলেন, "যান আপনি এবার নিজের ঘরে।"

পূর্ণিমা যথাস্থানে ফিরিয়া আসিল। বিকাশবাবু ঘরখানা একটু অগোছাল করিয়া গিয়াছেন, কাগজপত্র ছড়াইয়া। সেগুলি গুছাইয়া সে ঘরটা ঠিক করিতে লাগিল। হিরণ্ময়ও যে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাহার সাড়া পাইল।

একটু পরেই তাহার ডাক পড়িল। পূর্ণিমা ঘরে ঢুকিতেই হিরণ্ময় হাসিয়া বলিলেন, "এমন ব্যাপার হবে জানলে হয় আমি পুরুষ ষ্টেনোগ্রাফার রাখতাম, নয় প্রৌঢ়া মহিলা রাখতাম। প্রায় কন্যাদায়গ্রস্তের অবস্থা হয়েছে আমার।"

পূর্ণিমা মনে একটু আঘাত পাইল, বলিল, "খুব বিরক্ত হতে হচ্ছে আমার জন্যে, না?"

হিরণ্ময় তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "না, না, বিরক্ত হতে যাব কিসের জন্যে? ও সব ঠাট্টা আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। আপনি ভয়ানক ভয় পান, তাতেই একটু বিব্রত লাগে। মনে হয়, আমার কর্ত্তব্য যেন ঠিকমত করতে পারছি না।"

পূর্ণিমা বলিল, "সে কি? কর্ত্তব্যের চেয়ে অনেক বেশী করছেন যে?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "employer হিসাবে কর্ত্তব্য বলছি না, মানুষ হিসাবে কর্ত্তব্য। অনেক আশ্বাস দিয়েছি আপনাকে, তার মর্য্যাদা ত আমায় রাখতে হবে?"

পূর্ণিমার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, বলিল, "এর চেয়ে বেশী আর কি করা যেত বলুন? আমার বাবা মারা যাবার পর এই আমি প্রথম অনুভব করতে পারছি যে ভগবান্ তাঁকে নিয়ে গিয়েছেন বটে পৃথিবী থেকে, কিন্তু তাঁর মঙ্গলেচ্ছা এখনও আমাকে ঘিরে রেখেছে।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "এ বিশ্বাস যদি থাকে, তাহলে অত ভয় পান কেন? ভগবান্ ত এই মঙ্গলেচ্ছাকে বিভিন্ন স্থান কাল আর পাত্রের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে পারেন? তবে আর ভাবনা কি?"

পূর্ণিমা বলিল, "একবার পাবার পরম সৌভাগ্য হয়েছে ব'লে চিরকালই কি পাব? এমন কোন্ পুণ্যফল বা আমার আছে?"

হিরণ্ময় কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "কাজ এখনও কিছু রয়েছে, আসুন সেরে ফেলি। গল্প করতে খুব ভাল লাগে বটে, তবে সময় পাওয়া যায় না।"

কাগজ পেন্‌সিল গুছাইতে গুছাইতে পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করিল "head office থেকে প্রায়ই এঁরা আসেন বুঝি?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "প্রতি মাসেই নয়, তাহলেও বছরে বেশ কয়েকবার আসেন। এখানে কাজ নেবার আগে অফিস্ পাড়ার একটু খোঁজখবর নেন নি কেন? তাহলে আর এত চমকে যেতে হ'ত না। কাজও হয়ত নিতেন না।"

পূর্ণিমা বলিল, "কাজ নিতেই হ'ত। মানুষ না খেয়ে

থাকতে ত পারে না? টিচারের মাইনেতে সংসার প্রায় অচল হয়ে এসেছিল। তাই এ লাইনে এলাম।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "একেই আপনার খাটুনি বেশী শক্তির তুলনায়, না হলে বলতাম, প্রাইভেট্ প'ড়ে বি. এ বি, টি, পাস ক'রে নিন্। ঐ লাইনেই আপনি ভাল থাকতেন। এখানে দেখুন, আমি যতক্ষণ আছি, আপনি ভালই থাকবেন। কিন্তু আমি অন্য জায়গায় চ'লে যেতে পারি, ম'রেও যেতে পারি।"

পূর্ণিমাকে যেন কে তপ্ত লৌহশলাকা দিয়া বুকের মধ্যে খোঁচা দিল। কাহার সঙ্গে কথা বলিতেছে তাহা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়া কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না, না, ও কি বলছেন আপনি।" বলিয়াই মাথাটা তাহার হেঁট হইয়া গেল।

হিরণ্ময় একবার একটু গভীর দৃষ্টিতে পূর্ণিমার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। অত্যন্ত ব্যথিত মুখ, লজ্জাও আসিয়া জুটিয়াছে তাহার সঙ্গে। হাসিয়া জিনিসটাকে হাল্কা করিয়া দিবার চেষ্টায় বলিলেন, "ওটা কথার কথা আর কি? এ সব জায়গার আবহাওয়ায় একটুখানি কলুষের স্পর্শ থাকেই। আপনি যে তার আঁচও সহ্য করতে পারেন না। অনেক মেয়ে আছে যারা এ ব্যাপারগুলোকে বেশ enjoy করে। তাই মনে হয়, মেয়েদের অন্য যে সব লাইন আছে, তার কোনটায় গেলে ভাল হ'ত আপনার।"

ইহার পর কাজ খানিকক্ষণ হইল, জোর করিয়াই দুই জনে অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হইতে নিবৃত্ত রহিল। হিরণ্ময় যেন একটু বেশী গম্ভীর হইয়া গেলেন। পূর্ণিমার মুখ ক্রমে বিবর্ণ হইতে বিবর্ণতর হইতে লাগিল। ছুটি হইবার পর গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস যেন তার বক্ষ ভেদ করিয়া উত্থিত হইল। অন্যদিন হিরণ্ময়কে দুই-একটা কথা বলিয়া সে বিদায় গ্রহণ করে, আজ নীরবে চলিয়া গেল। তন্দ্রাচ্ছন্নের মত পথ অতিক্রম করিল, ট্রামে গিয়া বসিল, বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। সরমা বা রণেন কাহাকেও সে বাড়ীতে দেখিল না, তাহাতে আরামই বোধ করিল। কথা বলিতেই যেন সে পারিতে ছিল না।

চা খাইয়া বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল, অস্ফুট-স্বরে নিজেকে নিজে বলিল, "আর নয়, আজ এর একটা শেষ ক'রে ফেলব। মরি ক্ষতি নেই।"

দীপক আসিতেছে দূর হইতে দেখিতে পাইল। সে কাছে আসিয়াই বলিল, "এ কি পূর্ণিমা, তোমার চেহারা এ রকম দেখাচ্ছে কেন? অসুখ করেছে?"

পূর্ণিমা বলিল, "শরীরটা একটু খারাপ আছে বটে। তুমি বস, তোমার সঙ্গে আজ জরুরী কথা আছে।"

একটুখানি উদ্বিগ্নমুখে দীপক বলিল, "কি বল ত?"

"বলছি। আমার কাজ পাকা হয়ে গেছে, এতদিন বলব বলব ক'রেও তোমায় বলা হয় নি। মাইনে সওয়া দুশো টাকা পাব এখন থেকে। তার উপর overtime আছে, তাও পঁচিশ ত্রিশ টাকা হয়। আমার যে দুটো মেয়ে পড়ানর কাজ ছিল আগে, তাদের একজনরা আবার আমায় ডাকছে, শনি-রবিবারে তাদের কাজ আমি করতে পারি। তাতেও গোটা পঁচিশ পাব আশা করছি। এই পৌনে তিন শ' টাকা থেকে, মাকে আমি আগে যা দিতাম তাই যদি দিই, তাহলে তিনি চালিয়ে নেবেন, কারণ আমার খরচটা বাঁচবে। বাকি যা থাকবে, তাই নিয়ে আমরা সংসার আরম্ভ করতে পারি না? কতকাল আর পথে পথে ঘুরব দীপক?"

দীপকের মুখ একবার লাল হইয়া উঠিল, তাহার পরেই বিবর্ণ হইয়া গেল। বলিল, "এ হয় না পূর্ণিমা।"

পূর্ণিমার মুখটা যেন দীপকের চেয়েও বিবর্ণ হইয়া গেল। চোখের দৃষ্টি অদ্ভুত হইয়া উঠিল। একটু যেন তীব্র স্বরেই বলিল, "কেন হয় না দীপক?"

"তুমি উদয়াস্ত পরিশ্রম ক'রে টাকা আনবে, আর তাই দিয়ে সংসার চলবে? আমি নিজের কাছে মুখ দেখাব কি ক'রে? আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের কাছে মুখ দেখাব কি ক'রে?"

পূর্ণিমার গলাটা ধরিয়া আসিল, যেন কান্না ঠেলিয়া উঠিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিতেছে। বলিল, "তুমি কি এখনও মধ্যযুগে আছ? স্বামী-স্ত্রী মিলে কাজ করে সংসার চালাচ্ছে এ তুমি দেখনি?"

"দেখেছি, কিন্তু তোমার প্রস্তাবের গোড়াতেই মস্ত ভুল রয়েছে পূর্ণিমা। আমার সংসারে এলে এরকম সমস্ত দিন অফিসে কাটাতে তুমি পারবে না, এ রকম রাত ক'রে মনিবের সঙ্গে বাড়ী আসতে পাবে না। আমি যদি মধ্যযুগে বাস করি ত আমার পরিবারের লোকেরা অন্ধকার যুগে বাস করে। তারা এ-সব অতি নিন্দনীয় ভাববে। তাদের কথা তুমি সইতে পারবে না। এদের ফেলতে আমি পারব না। রক্তের ঋণ আমার এদের কাছে। যে ভালবাসার খাতিরে তুমি সব ত্রুটি মেনে নিয়ে আসবে আমার কাছে, সেই ভালবাসাই তোমার নষ্ট হয়ে যাবে, পরিবেশের কদর্য্যতায়। তুমি কি কাজ ছেড়ে দেবে, যদি তাই আমি অনুরোধ করি?"

পূর্ণিমার মুখটা যেন মৃত মানুষের মুখের মত

দেখাইতেছিল, সে বলিল, "কাজ ছেড়ে দিতে বলবে? আমার ভাই বোন মা না খেয়ে মরবে? আর তোমার কাছে যাব আমি কিসের জোরে তবে? এতদিন তাহলে যেতে পারিনি কেন? দিনের পর দিন এই মরুভূমির পথে হেঁটে বেড়াব, শেষে একদিন মুখ থুবড়ে প'ড়ে ম'রে যাব, এই আমার ভবিষ্যৎ?"

দীপক খানিকক্ষণ মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "পূর্ণিমা, আমার সত্যি কোন অধিকার নেই, এ রকম ক'রে তোমার পথ আটকে ব'সে থাকবার। তবু শেষ আবেদন আমার, ছ'মাস সময় আমাকে দাও। তার মধ্যে যদি কোন এমন ব্যবস্থা আমি না করতে পারি, যাতে সব দিক্ রক্ষা হয়, তাহলে তোমার পথ থেকে আমি স'রে যাব।"

পূর্ণিমা জলের দিকে তাকাইয়া কি ভাবিতেছিল কে জানে? বলিল, "কোন কথা তোমায় আমি দিচ্ছি না। ছ'মাস কেন, ছ'বৎসর হয়ত এই ভাবেই থাকব, আবার ছ'দিন পরে এমন কিছু ঘটতে পারে, যাতে আমার সম্বন্ধে মনই তোমার বদ্‌লে যাবে। শুধু মনে রেখ এইটুকু যে, আমি যেতে চেয়েছিলাম, তুমি নিতে চাও নি।"

দুইজনে নীরবে খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল। তাহার পরে দীপক উঠিয়া বলিল, "আমি আজ যাই পূর্ণিমা। আর কথা ব'লে ব'লে নিজের অপদার্থতার অপরাধ বাড়াব না।"

পূর্ণিমা যেমন বসিয়া ছিল, তেমনিই বসিয়া রহিল। দীপকের মূর্ত্তি ঘনায়মান সন্ধ্যার ছায়ায় মিলাইয়া গেল। তখন বাড়ী যাইবার জন্য পূর্ণিমা উঠিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে বলিল, 'ভগবান্ আত্মহত্যার চেষ্টার সমর্থন করেন না বোধ হয়, চেষ্টা ক'রেও ত পারলাম না আমি।'

বাড়ী আসিয়া তাহার মনে হইল জ্বর আসিয়াছে। চোখ-মুখ জ্বালা করিতেছে, সমস্ত দেহ হইতে একটা উত্তাপ বাহির হইতেছে। থার্ম্মোমিটার লইয়া দেখিল, না, জ্বর আসে নাই। তবু শরীর যেন একেবারেই ভাঙিয়া পড়িতে চায়। হয়ত জ্বরই আসিবে শেষ পর্য্যন্ত। ভাত আর খাইল না, মা কাঠখোলায় অল্প ক'টি চিঁড়া ভাজিয়া দিলেন, তাহাই খাইয়া সে শুইয়া রহিল। সকালে উঠিয়াও কিছু ভাল বোধ করিল না। হিরণ্ময়কে খবর দিলে তখনি তিনি ছুটি দিয়া দিবেন। কিন্তু ছুটি যে পূর্ণিমা চায় না? অন্য দিনের মত তাড়াতাড়ি করিতে পারিল না, আস্তে আস্তে প্রস্তুত হইতে লাগিল। অফিসে পৌঁছিতে আধ ঘণ্টারও বেশী দেরি হইয়া গেল।

হিরণ্ময় তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "এ কি, এরকম চেহারা কেন? অসুখ করেছে নিশ্চয়। আসবার কি দরকার ছিল? কাজ ঠিকই চলত, আরো ত দুজন লোক রয়েছে।"

পূর্ণিমা বলিল, "কাজ পাকা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যদি কামাই করতে আরম্ভ করি, তা হলে লোকে আমায় কি বলবে? জ্বর হয় নি, temperature দেখে এসেছি। সারারাত ঘুমোই নি ব'লে চেহারা অমন দেখাচ্ছে।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "এসব জায়গায় কাজ করতে হলে একটু গণ্ডারের চামড়া থাকা দরকার, দেহ ও মনের উপর। পর পর দুটো shock খেয়েছেন আপনি, এই অসুস্থতা সেই জন্যেই। শারীরিক অসুখ এটা নয়, ডাক্তারের ওষুধে সারবে না। এ শুধু আপনার নিজের চিকিৎসায় সারতে পারে।"

পূর্ণিমা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "চেষ্টা ত করি সারাতে। কিন্তু ব্যাপারগুলো যেই সামনাসামনি এসে পড়ে তখন কিরকম হতবুদ্ধি হয়ে যাই।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "সময়ে সবে যাবে। আর কি বলা যায়? কিন্তু দেখুন, অন্য দিকে যাই অসুবিধা হোক, শরীর নষ্ট ক'রে কাজ করবেন না। তাতে লাভ হবে এই যে, কাজ বেশীদিন আর করতেই পারবেন না। আপনার চেহারা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। কোন একজন ডাক্তারকে consult করুন। ভাল ডাক্তার চেনা যদি কেউ না থাকেন ত আমি সন্ধান দিতে পারি দু' একজনের।"

পূর্ণিমা বলিল, "ডাক্তারের অভাব ও পাড়ায় নেই, চেনাও ঢের আছেন। কিন্তু ডাক্তার ডাকতে ইচ্ছা করে না, মনে হয়, এ সবই আমার nervousness-এর জন্যে হচ্ছে, ডাক্তার কি করবে?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "কি নিয়ে এত nervous আপনি বলুন ত? তার কি প্রতিকার নেই?"

পূর্ণিমা বলিল, "আমার হাতে ত নেই। এক ভগবান্ যদি আমার মনটা বদ্‌লে দেন, আর একটু যুদ্ধ করার ক্ষমতা দেন।"

হিরণ্ময় একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পূর্ণিমার দিকে তাকাইলেন। বলিলেন, "দেবেন হয়ত, যদি একাগ্র মনে চান।"

ক্রমশঃ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সাপ্তাহিক শনিবারের চিঠি

শ্রীযোগানন্দ দাস

'কল্লোল যুগ' নিয়ে বই বেরিয়েছে। 'শনিবারের চিঠি', বিশেষ ক'রে তার আদি সাপ্তাহিক সংস্করণের ইতিহাস লিখবার প্রয়োজন ঘটেছে অনেক কারণে।

একটি কারণ হ'ল, বাংলা হাস্যরসের ও ব্যঙ্গরসের সাহিত্যে 'শনিবারের চিঠি' ও তার লেখকদের স্থান নির্ণয় করা, গদ্যে ও কাব্যে। বঙ্কিম সাহিত্যে 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর যেমন একটি বিশেষ মূল্য আছে, রবীন্দ্র সাহিত্যে যেমন 'হাস্য কৌতুক' ও 'ব্যঙ্গ কৌতুক' একটি বিশিষ্ট আসন অধিকার ক'রে রয়েছে, তেমনি 'শনিবারের চিঠি'র সাপ্তাহিক সংস্করণ ও আদি পর্ব থেকে যদি একটি সংকলন করা যায়, তবে দেখা যাবে, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে, অন্য সমস্ত কিছু ছেড়ে দিলেও শুধু হাস্য রসে ও ব্যঙ্গ রসেই 'শনিবারের চিঠি'র দান সামান্য নয়। সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র অবদান শুধু সাহিত্যে নয়, সামাজিক আদর্শে ও রাষ্ট্রনীতিতেও।

এ কথা সত্য, ব্যঙ্গ সাহিত্যে 'শনিবারের চিঠি'র চেয়ে কিছু কম শক্তিশালী ছিল না তার পূর্ববর্তী—১৩২৯ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত—ক্ষণজন্মা মাসিক পত্রিকা 'বেপরোয়া'। আকারে ছোট,—বীরবলের বিখ্যাত 'সবুজপত্র' পত্রিকার মত। এর সম্পাদক ছিলেন "শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য"। লেখক ছিলেন পঞ্চজন: "শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল্; শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম-এ; শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়, এম্-বি; শ্রীতুলসীচরণ ভট্টাচার্য, এম্-বি; শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য, এম-এ।" 'শনিবারের চিঠি'র দু'বছর আগে, বর্তমান যুগের সামাজিক কুরুক্ষেত্রে ঐ নব পাঞ্চজন্যের যুদ্ধের আহ্বানে, ঐ পাঁচ ফোড়ন দেওয়া ধানি লঙ্কার জ্বালা-ধরানো ব্যঞ্জনে সেদিনকার বাংলা সাহিত্যে একটি নূতন তীক্ষ্ণ রসের সঞ্চার হয়েছিল। কি ব্যঙ্গ সাহিত্যে, কি ব্যঙ্গ চিত্রে, এরূপ উচ্চাঙ্গ ক্ষুরধার পত্রিকা বাংলা সাহিত্যে এর আগে কখনও বেরোয় নি।

এর মলাটে থাকত ভাঙা কলসী, ঝাঁটা, ফণীমনসা, সাপ, ব্যাঙ্ প্রভৃতি অযাত্রার কার্টুন্। দুঃখের বিষয়, সকল রকম অযাত্রাকে কলা দেখিয়ে যে-পত্রিকার যাত্রা শুরু, কুল্যে তিনটি সংখ্যা বেরুবার পরেই তাকে মহাযাত্রা করতে হ'ল। বর্তমানে ঐ তিনটি সংখ্যা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। সম্প্রতি শ্রীপরিমল গোস্বামীর সৌজন্যে মাত্র তৃতীয় সংখ্যাটি (চৈত্র, ১৩২৯) আবার দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। ওটি হ'ল "পূজা সংখ্যা"। সকলেই পূজা সংখ্যা বার করে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে, আশ্বিন-কার্তিকে। 'বেপরোয়া'র "পূজাসংখ্যা" বেরুলেন চৈত্র মাসে, সশব্দে ভাঙা কলসী বাজিয়ে, ঘেঁটু পুজো করবেন ব'লে।

গোড়াতেই "আবাহন"। খুজুলি-চুলকনা-খোস-দাদ-বসন্ত ইত্যাদি যাবতীয় রোগের চিকিৎসা-বিশারদ ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায় "soap" দিয়ে হাত না ধুয়ে সেই হাতেই অঞ্জলি দিয়ে স্বরচিত সংস্কৃত স্তোত্রের দ্বারা "দেবাদিদেব" ঘেঁটুর পদবন্দনা করলেন। একটি সংস্কৃত স্তোত্রে ঘেঁটুর স্তুতি করা হ'ল, তার পরেই আবাহন। প্রথম অংশটুকু এখানে তুলে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না ('বেপরোয়া', চৈত্র, ১৩২৯, পৃঃ ৫৯-৬০):

"দৃষ্টাঃ স্পৃষ্টা বিমৃষ্টাঃ কচিদপি ন ময়া মাধবাবীকৃতাপঃ
হস্তে বাস্তিক্যলোপাচ্চকিতমতিমতা জাতু নারোপিতঃ soap
অদ্য প্রোদ্দামদীব্যৎ খুজুলিচুলকনা-খোসদার্দীকৃতোঽহং
বন্দে মন্দারশোভং তব পদমমলং হে মহাদেব ঘেঁটো।"

"হে দেবাদিদেব, হে ঘেঁটো, একবার আমাদের সম্মুখে দাঁড়াও, আমরা তোমার আবাহন করি। তুমি মহান্, তুমি শক্তিমান্, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। তোমার চরণস্পর্শে বঙ্গদেশ আজ নবশোভা ধারণ করিয়াছে। আজ বসন্ত তাহার শাখা-পল্লবে, বসন্ত তাহার ঘরে ঘরে। আজ শীতলার আর বিরাম নাই। তোমারই বা বিরাম কোথায়? শীতলার তবু একটি গাধা আছে, তোমার তাহাও নাই,—quack বলিয়া আজও গাধা কিনিতে পার নাই। ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইও না। এদেশে হাতুড়ের দর কম কিন্তু কদর বেশী।"...

পত্রিকার গোড়ার পাতাতেই, উপরে সম্পাদকের নাম, নীচে লেখকদের নাম, মাঝখানে একটি হাস্যমুখ, বেপরোয়া বিলাতী 'Devil'-এর কার্টুন। লেখক ত নয়, একেবারে একটা আস্ত **daredevil**-এর দল।

পত্রিকার শেষে গুটিকয়েক ডায়মণ্ড-কাটা চকচকে বচন, নাম 'ফাউ'। আজকের দিনের আসমুদ্র-হিমাচল ভারতজোড়া 'আধ্যাত্মিকতা'র বিশাল বোঝার উপর শাকের আঁটিটির মত এখানে বনবিহারী-বিরচিত একটি

লক্ষ টাকার ছোট্ট 'কাউ' উপহার দিলাম (ঐ পৃঃ ১১১): "পাশের ট্রেন যখন চলতে থাকে তখন মনে হয় আমাদের নিশ্চল ট্রেন তার উল্টো দিকে চলছে। পৃথিবীর চৌদ্দ আনা যখন materialism-এর দিকে ছুটছে তখন আমরা ভাবি আমাদের সমাজ আধ্যাত্মিকতার দিকে এগুচ্ছে।"

আসলে আমাদের "সমাজ"-ট্রেন্‌টা 'নট্ নড়ন চড়ন নট্ কিচ্ছু'। মেটিরিয়্যালিজ্‌মেও দড়ো নই, আধ্যাত্মিকতাতেও বড়ো নই। যা কিছু সম্বল তা ৵বিগত যুগের পোলাও কালিয়ার বাসি দুর্গন্ধ।

যাই হোক, ঘেঁটু-পুজোর পরে সেই যে পত্রিকার বিসর্জন হ'ল, অনেক বছর ঘুরে এল, আর তার পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয় নি; বোঝা গেল, "quack" বলাতে কুপিত হয়ে ডাঃ ঘেঁটু 'বেপরোয়া'র বেলায় ইচ্ছাপূর্বক সাল্‌সার বদলে লেডী ডাক্তার মনসা দেবীর কাছ থেকে ধার করেও বিসবড়ি চালিয়েছেন।

ব্যঙ্গ সাহিত্যে, রবীন্দ্রোত্তর যুগে 'বেপরোয়া'র পরেই 'শনিবারের চিঠি'র স্থান, তার সাপ্তাহিক সংস্করণ থেকেই। 'বেপরোয়া'র চেয়ে অবশ্য 'শনিবারের চিঠি'র বৈচিত্র্য বেশী। এ বিষয়ে তার সাপ্তাহিক সংস্করণ ও আদি পর্ব একটি মূল্যবান্ সৃষ্টি।

'বেপরোয়া'র তিন সংখ্যার মত 'শনিবারের চিঠি'র সাপ্তাহিক সংস্করণের (বাংলা ১৩৩১ সাল) ২৭টি সংখ্যা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ায় তার সকল লেখকের লেখার সঙ্গে জনসাধারণের কোন পরিচয় নেই। এই পরিচয় ঘটলে দেখা যাবে, 'শনিবারের চিঠি' কোন একজন 'আমি'র কীর্তি ছিল না, ছিল বহু প্রতিভার মিলিত সৃষ্টি। এই দলের আদি নাম ছিল 'শনিমণ্ডল'। আদি বা মূল 'শনিবারের চিঠি' গোটা শনিমণ্ডল কর্তৃক নূতন ব্যঙ্গ রসের ও হাস্য রসের সাহিত্য সাধনা।

এই সাহিত্য-প্রতিভা তার বিশিষ্ট ছাপ রেখে গিয়েছে তার সাপ্তাহিক সংস্করণে। এই সংস্করণ দুষ্প্রাপ্য হওয়ার সুযোগ গ্রহণ ক'রে কোন কোন লেখক এই পর্বকে "অতি তুচ্ছ" ব'লে উড়িয়ে দেবার সুবিধা পেয়েছেন। সুতরাং এই আদি পর্বের পরিচয় নেবার ও দেবার প্রয়োজন এসেছে।

এই আলোচনার আর একটি কারণ আছে। যে-জন্যই হোক, বর্তমানে 'শনিবারের চিঠি'র প্রতি সংখ্যায় যে বর্ষ-গণনা করা হয়, তা থেকে দাঁড়ায়, ঐ কাগজের প্রতিষ্ঠা কার্তিক, ১৩৩৫। কিন্তু আসলে 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যার (সাপ্তাহিক) তারিখ হ'ল শ্রাবণ ১০, ১৩৩১। এমন কি তার মাসিক সংস্করণেরও সুরু ভাদ্র, ১৩৩৪। সুতরাং ঐ কাগজের আদি অস্তিত্ব, তার মূল উদ্দেশ্য ও তার গোড়াকার প্রকৃতি সম্বন্ধে জনসাধারণের অজ্ঞতা অত্যন্ত স্বাভাবিক। বর্তমান বর্ষ গণনা থেকে সাধারণ পাঠকদের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হবে যে, ১৩৩৫-এর আগে 'শনিবারের চিঠি'র কোন অস্তিত্বই ছিল না।

বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখকের সুবিধার জন্যও এই তারিখের গণ্ডগোল দূর করবার সবচেয়ে ভাল উপায় হ'ল, তার প্রতিষ্ঠার ও আদি পর্বের প্রকৃত ইতিহাস লেখা এবং সেই সঙ্গে তাতে প্রকাশিত বিভিন্ন লেখকের বিস্মৃত লেখার পরিচয় দেওয়া।

এরূপ দু'টি লেখার পরিচয় এবারে দেব। তার আগে কিছু ভূমিকার প্রয়োজন ঘটেছে, নইলে 'চিঠি'র আদি লেখকদের বিরুদ্ধে কতকগুলো অন্যায় অবিচার ও মিথ্যা অপবাদের কলঙ্ক থেকে যাবে।

'শনিবারের চিঠি'র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও তার সাপ্তাহিক সংস্করণ সম্পর্কে কোন কোন লেখক কিছু কিছু লিখেছেন এবং সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণ না দেখিয়ে নিজ অভিরুচি অনুসারে মন্তব্য প্রকাশও করেছেন। কিন্তু প্রধানত যে তিনজনের হাতে ঐ পত্রিকার জন্ম, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায়, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ও বর্তমান প্রবন্ধের লেখক,—এঁদের কেউই এখনও পর্যন্ত 'শনিবারের চিঠি'র জন্মকথা লেখেন নি।

তার ফলে, বিশেষ ক'রে তার সাপ্তাহিক সংস্করণ ও তার জন্ম বিষয়ে অনেক আজগুবি কথা লেখা হয়েছে, কিছুটা অন্যের কাছে শোনা কথা বলে এবং বাকীটা কোন কোন লেখকের আত্মম্ভরিতার জন্য।

যেমন, কেউ কেউ বলেছেন, 'শনিবারের চিঠি'র প্রতিষ্ঠাতা মোহিতলাল মজুমদার। অবশ্য, এর জন্য দায়ী মোহিতলাল স্বয়ং। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর একটি অতি নিম্নশ্রেণীর অপ্রকাশিত রচনা কিছুদিন পূর্ব্বে (খ্রীঃ ১৯৫৯, শক ১৮৮১) 'বিংশ শতাব্দী' মাসিক পত্রিকার পূজা সংখ্যায় ছাপা হয়। সেই রচনা থেকে মনে হয় যে, ঐ মিথ্যা দাবী তিনি জীবিতকালেই প্রচার করতেন, যা' থেকে অন্য কাহারও কাহারও সেই ধারণাই হয়েছে। প্রবন্ধটিতে 'শনিবারের চিঠি' সম্বন্ধে তিনি লিখছেন, " 'চিঠি' আমারই মানস কন্যা।" (ঐ, পৃঃ ২৭০-৭১)। প্রবন্ধটির নাম "আমি ও শনিবারের চিঠি।" মুড়োয় 'আমি' ল্যাজে 'শনিবারের চিঠি'। এই অলীক অহমিকা

লেখাটির ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। এক জায়গায় মোহিতলাল লিখছেন, "শনিবারের চিঠির যাহা কিছু মর্যাদা ও প্রতিমূর্তি, তাহা একমাত্র আমিই রক্ষা করিতেছিলাম।" (ঐ, পৃঃ ২৭০)। অন্যত্র "আমি উহার রথারূপে সেকালের সেই কুরুক্ষেত্রে ভীমার্জুন (sic) ভীষ্মকর্ণের সহিত সম্মুখরণে উহাকে অটল রাখিয়াছিলাম।" (ঐ, পৃঃ ২৭০)। এখানে অহমিকার চাপে মোহিতলাল নিজেকে কলিযুগের শ্রীকৃষ্ণ খাড়া করতে গিয়ে একটু ঠিকে ভুল ক'রে ফেলেছেন। "সেকালের কুরুক্ষেত্রে" একই ব্যক্তি "রথীরূপে" একাধারে "ভীমার্জুন" ও "ভীষ্মকর্ণের" সঙ্গে সম্মুখরণ করেছিলেন ব'লে মহাভারতে পাওয়া যায় না। আর এক জায়গায় লিখছেন, "কিন্তু আমি দূরে বসিয়া ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিতে লাগিলাম।" (ঐ, ঐ)। এখানে দেখা যাচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ শুধু "রথী" ন'ন। তিনি স্বয়ং "ব্রহ্মাস্ত্র" ত্যাগ করছেন। এটাও কবি মোহিতলালের একটি নূতন "সৃষ্টি"। পুনশ্চ, "যে সাহিত্যিক বন্ধুমণ্ডলী তাঁহাকে [সজনীকান্ত দাসকে —॥যো॥] কেন্দ্র করিয়া অতঃপর বাংলার সাহিত্যাকাশে গ্রহ-উপগ্রহের মত ঘূর্ণ্যমান্ ও দীপ্তিমান্ হইয়া উঠিল, তাহারা তাঁহাকেই 'শনিবারের চিঠি'রও প্রধান ও প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া বিশ্বাস করিল ; তাহাদের চক্ষে আমি একজন অন্যতম বিশিষ্ট লেখক মাত্র।" (ঐ, পৃঃ ২৭১) কিন্তু আসলে—মোহিতলাল সঙ্গে সঙ্গে সাবধান ক'রে দিচ্ছেন—"শনিবারের চিঠি আমার ধর্ম ও আদর্শের অনুপ্রেরণায় এবং আমার লেখনীর দৃপ্ত ও সদাজাগ্রত সারস্বত উদ্দীপনায় সকল কুৎসা ও সকল গ্লানির ঊর্দ্ধে একটি নিজস্ব মহিমায় সকল চিন্তাশীল রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।" ঐ, ২৭২। এই ভাবে প্রবন্ধটির গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত "আমি" ও "আমার"। যাঁরা 'সত্যসুন্দরে'র এই অসত্য ও অসুন্দর প্রবন্ধটি ছাপবার অনুমতি দিয়েছেন, তাঁরা লোকচক্ষে মোহিতলালকে কতদূর হেয় করেছেন ও তাঁর ক্ষতি করেছেন, তা এখনও ধারণা করতে পারেন নি।

প্রবন্ধটিতে তিনি আরও বলেছেন যে, ঐ কাগজে তিনি যোগ দেবার আগে সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি' একটা "অতি তুচ্ছ" "নর্দমার কাগজ" ছিল। মোহিতলাল যোগ দেওয়াতেই তার যা কিছু মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা! শুধু তাই নয়। নিজেকে বাড়াতে গিয়ে বাধ্য হয়ে মূল প্রতিষ্ঠাতাদের নামে মিথ্যা অপবাদের কলঙ্ক আরোপ করতে হয়েছে। "সে পত্রিকার জন্ম হইয়াছিল কয়েকটি যুবকের আমোদ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য, তাহার পশ্চাতে কোন গুরুতর উদ্দেশ্য ছিল না…'শনিবারের চিঠি' নাম দিয়া তাহারা প্রতি সপ্তাহে গদ্যে পদ্যে এমন সব রচনা প্রকাশ করিত যাহাতে 'ভদ্রলোকের তকমা-তাবিজ ছিঁড়ে মদোন্মত্ত হাওয়ায়' নিজদিগকে উড়াইবার একটা দুরন্ত শক্তির পরিচয় ছিল। ইহার অধিক কিছু ছিল না।…" (ঐ, পৃঃ ২৬৮)।

অবশ্য, 'শনিবারের চিঠি'র প্রতিষ্ঠায় মূল প্রতিষ্ঠাতাদের "উদ্দেশ্য" বুঝবার ক্ষমতা মোহিতলালের ছিল না, কারণ ঐ প্রতিষ্ঠাতাদের শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক আদর্শ ও চিন্তাধারার সঙ্গে মোহিতলালের শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক আদর্শ ও চিন্তাধারার আশমান্-জমীন্ ফারাক্ ছিল। সে জন্য তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু "প্রতি সপ্তাহে" "ভদ্রলোকের তকমা তাবিজ ছিঁড়ে মদোন্মত্ত হাওয়ার" যে জঘন্য অপবাদের কলঙ্ক আরোপ তিনি করেছেন, সেটি যে কতদূর মিথ্যা ও ঘৃণ্য তা' বোঝা যাবে 'শনিবারের চিঠি' প্রতিষ্ঠার প্রকৃত ইতিহাস লেখা হ'লে এবং তার সাপ্তাহিক সংস্করণের সঙ্গে পাঠকের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটলে। এবং মিথ্যা জেনেই মোহিতলাল তাঁর উক্তির সমর্থনে "প্রতি সপ্তাহের" কোন সপ্তাহের কোন লেখাই উদ্ধৃত করেন নি, করতে পারেন নি।

'শনিবারের চিঠি'র সাপ্তাহিক সংস্করণের (যার থেকে পত্রিকার নামকরণ হয়) ৬৭টি সংখ্যা বেরুবার পরে সজনীকান্ত দাস ও তিন মাস পরে, দ্বাদশ বা "বিদ্রোহ" সংখ্যা (কার্তিক ৮) থেকে মোহিতলাল মজুমদার ঐ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। 'শনিবারের চিঠি' আরম্ভ হবার সময়ে সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতাদের কারোরই পরিচয় ছিল না, এবং মোহিতলাল তাঁদের কারও কারও কাছে কবি ও প্রবন্ধকার হিসাবে পরিচিত থাকলেও 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্কই ছিল না। তিনি এই দলে ভিড়বার আগেই 'শনিবারের চিঠি'র সাপ্তাহিক সংস্করণ বাংলা দেশের পত্রিকা-জগতে একটা সাড়া জাগিয়েছিল ব'লেই দ্বাদশ সংখ্যা বেরুবার আগে নিজের লেখা কবিতা বগলে নিয়ে হন্তদন্ত ভাবে মোহিতলাল পত্রিকার আপিসে এসে উপস্থিত হন ঐ "অতি তুচ্ছ" কাগজে নিজের লেখা ছাপাবার জন্য এবং ঐ "নর্দমার কাগজের" সঙ্গে যুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষায়।

সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র আগাগোড়া সাতমাস (শ্রাবণ ১০—ফাল্গুন ৯, ১৩৩১) ঐ কাগজের অবৈতনিক সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর ছিল বর্তমান প্রবন্ধের লেখক। এই সাত মাসের মধ্যে এবং তার পরে মাসিক সংস্করণের প্রথম তিন সংখ্যায় (বর্তমান লেখকের

সম্পাদনা কালে) কাগজের নীতি বা উদ্দেশ্য বিষয়ে মোহিতলালের বিন্দুমাত্র প্রভাব ছিল না,—তাঁকে "উপদেষ্টা"র আসন বা "আদর্শ রক্ষার ভার" দেওয়া ত দূরের কথা, যে দাবী তিনি ঐ আত্মসর্বস্ব প্রবন্ধে করেছেন (পৃঃ ২৬৯) অথচ, এই কালের মধ্যেই এক আনা দামের কাগজ হকাররা এক টাকায়ও বিক্রী করেছেন,—মোহিত-লালের লেখার জন্য নয়।

যে সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'কে মোহিতলাল "অতি তুচ্ছ" ও "নর্দমার কাগজ" বলেছেন, সেই অতি তুচ্ছ নর্দমার কাগজে অর্থাৎ সাপ্তাহিক সংস্করণেই স্বনামে, বেনামে অথবা দুইভাবেই লিখেছেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডঃ কালিদাস নাগ, শান্তা দেবী, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, কবি সুধীরকুমার চৌধুরী, কবি জীবনময় রায়, শিবরাম চক্রবর্তী, প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই ঐ কাগজ বেরুবার আগেই খ্যাতিমান্ ও সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক-লেখিকা। সুতরাং মোহিতলালের মতে এঁরাও "অতি তুচ্ছ" "নর্দমার কাগজে"র লেখক ছিলেন।

"অতি তুচ্ছ" বলবার কারণ আছে। যে-উদ্দেশ্যে 'শনিবারের চিঠি'র জন্ম এবং যে-উদ্দেশ্যের প্রতি উল্লিখিত লেখকদের মত বাংলা দেশের বহু খ্যাতিমান্ লেখকের সহানুভূতি ছিল, সেই উদ্দেশ্য বা নীতির প্রতি মোহিত-লালের কোন অনুরাগই ছিল না, এবং যে দূরদৃষ্টিসূচক* রাষ্ট্রনৈতিক মতামত এবং ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাত্মক নিবন্ধ ('সংবাদ সাহিত্য')†—(প্রধানতঃ অশোক চট্টোপাধ্যায়ের ও হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের লেখা)—সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'তে খুব জোরের সঙ্গে প্রকাশ করা হ'ত, সেই মতামত মোহিতলালের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে একটি কথা বলবার সাহস মোহিতলালের কোনদিন হয় নি। আসলে, রাষ্ট্রনীতির প্রতি মোহিতলালের কোন ঝোঁকই ছিল না। ও-বিষয়টি ছিল তাঁর অধিকারের বাইরে। তিনি ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক। ঐ গণ্ডির বাইরে যেখানেই পা বাড়া-বার চেষ্টা করেছেন, সেখানেই ঘটেছে গণ্ডগোল। অথচ সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে গোড়া থেকেই রাষ্ট্র নীতির একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এমন কি তখনকার রাষ্ট্রনীতি 'শনিবারের চিঠি'র জন্মের একটি মুখ্য কারণ। মোহিত-লাল যখন থেকে 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে যুক্ত হ'ন (দ্বাদশ সংখ্যা), তখন থেকেই তাঁর ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল 'শনিবারের চিঠি'কে রাষ্ট্রনীতি থেকে বিযুক্ত ক'রে শুধু সাহিত্যের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখতে ও বাংলা সাহিত্য বলতে মোহিতলাল যা বুঝতেন সেই সঙ্কীর্ণ ধারা 'শনিবারের চিঠি'র মাধ্যমে প্রচার করতে। বর্তমান লেখকের সম্পাদনা কালে সেটি তিনি ক'রে উঠতে পারেন নি। সাপ্তাহিক সংস্করণকে ঐ জিনিষ ক'রে তুলতে পারেন নি ব'লেই, সাহিত্য বিষয়েও মোহিতলালের রবীন্দ্র-বিরোধী, সহজ ও সমগ্র মানবতা-বিরোধী, একান্ত-বাঙালীত্ব-প্রধান, 'আধুনিক' সমালোচনার নামে একপেশে রস-বিচারের সাহিত্য-সমালোচনার সঙ্কীর্ণ চিন্তাধারা ঐ সংস্করণে চালাতে পারেন নি বলেই এবং যেটুকু বা যে-ধরণের রাষ্ট্রনীতি তিনি বুঝতেন সেটা সাপ্তাহিক 'শনি-বারের চিঠি'র রাষ্ট্রনৈতিক মতামতের সম্পূর্ণ উল্টো ছিল বলেই তাঁর কাছে ও তাঁর মতে ঐ সাপ্তাহিক সংস্করণটি ছিল "অতি তুচ্ছ" "নর্দমার কাগজ।"

অবস্থা বিশেষে কারও কারও কাছে নাগালের বাইরের আঙুর যেমন "টক" হয়, সাপ্তাহিক অবস্থায়, তেমনি, মোহিতলালের কাছে, 'শনিবারের চিঠি'ও ছিল "অতি তুচ্ছ" "নর্দমার কাগজ।"

মোহিতলালের মতে ঐ সাপ্তাহিক সংস্করণ শুধু "অতি তুচ্ছ"ই ছিল না, "তা ছাড়া ঐ সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র প্রচার একটা বন্ধুদলের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল" (ঐ, পৃঃ ২৬৯।) মোহিতলাল অবশ্য তাঁর উক্তির সমর্থনে কোন প্রমাণ দেন নি।

---

* সপ্তম সংখ্যায় (ভাদ্র ২১,১৩৩১) "শ্রীযুক্তচিত্তরঞ্জন দাশের বিপ্লবের ভয়" শীর্ষক স্বাক্ষরহীন রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধে সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি' ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে যে, চিত্তরঞ্জনের একটি চিন্তাহীন ও দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তির ফলে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক খানাতল্লাস ও ধরপাকড় শুরু করবে। 'চিঠি'র কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়, কিছু কালের মধ্যেই ধরপাকড় শুরু হয়। ত্রয়োদশ সংখ্যায় (কার্তিক ১৫,১৩৩১) "যাহা বলিয়াছিলাম" শীর্ষে সেই ভবিষ্যদ্বাণী মনে করিয়ে প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করা হয়, যাতে ক'রে দেশবাসী চিত্তরঞ্জন বিষয়ে সাবধান হ'তে পারে। এই প্রবন্ধটি অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী' 'পঞ্চশস্য' বিভাগে পুরোটা ছেপে দেন। প্রবন্ধটির লেখক অশোক চট্টোপাধ্যায়।

† গোড়াতে বেনামীতে লেখা বেশীর ভাগ ও পরে, সাপ্তাহিক সংস্করণের শেষের দিকে, স্বনামে লেখা ব্যঙ্গাত্মক 'সংবাদ সাহিত্য' হেমন্তকুমারের লেখা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ইংরেজের নাম ক'রে তাদের বিরুদ্ধে কোনো কিছু লিখবার ভরসা "জাতীয়তার জনক" রূপে পরিচিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েরও কোনোদিন হয় নি,—ব্যঙ্গ করা তো দূরের কথা। ইংরেজ অধীনতার বিরুদ্ধে প্রথম স্বদেশী গান চৈত্র মেলায় (১৮৬৭)। ইংরেজ শাসক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গ রচনায় পথ প্রদর্শক 'সুলভ সমাচার' (১৮৭০ সাল থেকেই)। ইংরেজী শাসন সম্বন্ধে সত্য কথা বলতে বা তার বিরুদ্ধে বিপ্লবাত্মক গান রচনা করতে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন পিছপা হ'ন নি।

সাপ্তাহিক সংস্করণের ত্রয়োবিংশ সংখ্যার (মাঘ ১১, ১৩৩১) গোড়াতেই "কার্যাধ্যক্ষ, শনিবারের চিঠি" স্বাক্ষরে একটি বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়। তাতে দেখা যায়: "প্রথম চারি মাসের 'শনিবারের চিঠি' (১-১৬ সংখ্যা) মাত্র ২৮ সেট আছে, প্রত্যেকটি সেটের মূল্য ১৲ টাকা।"

কোন নূতন সাপ্তাহিক পত্রিকা সুরু হবার মাত্র ছ'-মাসের মধ্যেই প্রথম ১৬ সংখ্যা "মাত্র ২৮ সেট" অবশিষ্ট থাকাটাই একটা বড় প্রমাণ, ঐ পত্রিকা (বর্তমান ক্ষেত্রে সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি') কতটা "তুচ্ছ" ছিল এবং তার প্রচার শুধু "একটা বন্ধুদলের মধ্যেই আবদ্ধ" ছিল কি না। গোড়া থেকেই কলকাতার মোড়ে মোড়ে যে হকাররা 'শনিবারের চিঠি' বিক্রী করতেন সেটা কি কেবল "একটা বন্ধুদলের" কাছে? সুদূর মফঃস্বল থেকে যাঁরা সাময়িক পত্রিকাগুলির সমালোচনা প'ড়ে গ্রাহক হয়েছিলেন তাঁরা কি "একটা বন্ধুদলের" লোক? সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র পরিচয় ও প্রচার যে "একটা" বন্ধুদলের চেয়ে তার বাইরে ঢের বেশী ছিল, তার অনেক প্রমাণ আছে। সে আলোচনায় আপাতত দরকার নেই।

প্রথম ১৬ সংখ্যার চাহিদা যে মোহিতলালের লেখার জন্ম হয় নি তার বড় প্রমাণ হ'ল, ঐ সময়ের মধ্যে তাঁর খুব কম লেখাই সাপ্তাহিক সংস্করণে ছাপা হয়েছে। ঐ ১৬ সংখ্যার মধ্যে দ্বাদশ সংখ্যায় 'দ্রোণ-গুরু' নামে মোহিতলালের একটি ও পরে ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও ষোড়শ সংখ্যায় গোড়ায় 'নব রুবাইয়াত্' ও পরে 'রুবাইয়াৎ-ই-চামার-খায়-আম' নামে তিন কিস্তিতে আর একটি কবিতা সাপ্তাহিক সংস্করণে ছাপা হয়।

যে ১৬ সংখ্যার "মাত্র ২৮ সেট" অবশিষ্ট ছিল সেই ১৬ সংখ্যায় ৪৫৫ পৃষ্ঠার মধ্যে বিভিন্ন লেখকের ৯০টির উপর কবিতা ছাপা হয় (গোটা 'বিদ্রোহ' সংখ্যাটাই, মায় 'সংবাদ সাহিত্য' পর্যন্ত কবিতায় ছাপা), তার মধ্যে মোহিতলালের মোট উল্লিখিত চারটি। এবং ঐ সময়ের মধ্যে প্রবন্ধে নাটকে গল্পে নিবন্ধে নক্সায় ('সংবাদ সাহিত্য' বাদ দিয়েও) ৮০টির উপর গদ্য রচনা ছাপা হয়। তার একটিও মোহিতলালের নয়। গদ্যে ও পদ্যে ঐ কালের মধ্যে ('সংবাদ সাহিত্য' নিয়ে) ২০০টির উপর রচনার একটিরও প্রেরণা বা "আদর্শ" মোহিতলালের নয়। এই দুই শতাধিক গদ্য রচনার ও কবিতার অধিকাংশই ছিল হাস্য-কৌতুকে ও ব্যঙ্গ-কৌতুকে উজ্জ্বল রস-সাহিত্য।

'শনিবারের চিঠি'তে মোহিতলালের প্রথম কবিতা 'দ্রোণ-গুরু' কবি কাজি নজ্‌রুল ইসলামের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ। কবিতার মুখবন্ধে তিনি নিজেকে একাধারে কর্ণের গুরু ও অর্জুনাদি পাণ্ডবকুলের গুরু 'দ্রোণাচার্য' বলে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ মোহিতলাল বলতে চান যে, এক পক্ষে তিনি নজ্‌রুলের "গুরু", অন্য পক্ষে, অশোক, সজনীকান্ত, হেমন্তকুমার, সুধীর চৌধুরী, জীবনময় রায়, অবনী ঠাকুর, প্রভৃতি বেনামীতে যাঁরা যাঁরা 'শনিবারের চিঠি'তে কবিতা লিখতেন তিনি সকলেরই "গুরু"। অথচ, নজ্‌রুল ও মোহিতলাল, উভয়ের কবিতার সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে, কি ভাষার দিক্ থেকে, কি ছন্দের দিক্ থেকে, নজ্‌রুল্ সহজ এবং অত্যন্ত সাবলীল স্বভাব-কবি, আর মোহিতলালের কবিতা অত্যন্ত মাজা-ঘষা, চাঁছা-ছোলা, ইংরেজীতে যাকে বলে chiselled। উভয়ের কাব্য-শৈলী সম্পূর্ণ পৃথক্।

অপর পক্ষে, 'শনিবারের চিঠি'র কবিরা কবিতা লিখবার আগে মোহিতলালের কবিতা পড়েছিলেন কি না সন্দেহ। তা ছাড়া, সাপ্তাহিক শনিবারের চিঠির অন্যতম বেনামী কবি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "গুরু" মোহিতলাল মজুমদার, এর চেয়ে হাসির কথা নেই।

বরং 'নব-রুবাইয়াত' ও 'রুবাইয়াৎ-ই-চামার-খায়-আম' পড়লে দেখা যায়, ব্যঙ্গ কবিতায় মোহিতলাল 'শনিবারের চিঠি'র নতুন কবিদের সাকরেদি করবার চেষ্টা করেছেন। এর আগে, অর্থাৎ 'শনিবারের চিঠি'র কবিকুলের আওতায় আসবার আগে, মোহিতলাল ব্যঙ্গ কবিতা লেখেন নি। তবে ও ধরণের লেখা তাঁর ঐখানেই সুরু ও ঐখানেই শেষ। আর বেশী দূর অগ্রসর হ'ন নি। কারণ রসসাহিত্য সৃষ্টি স্বভাবত serious—কবি মোহিতলালের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

* *

যাই হোক 'শনিবারের চিঠি'র আদি পর্বের বিস্তৃত আলোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। মোহিতলালের আত্মশ্লাঘায় টইটুম্বুর ও বহু ভ্রান্তিতে ভরা উল্লিখিত ব্যক্তিগত খেদোক্তিপূর্ণ গ্লানিময় প্রবন্ধটি ছাপার অক্ষরে প্রকাশ না পেলে ভূমিকা স্বরূপ এত কথা বলবার দরকার হ'ত না। সুবুদ্ধি বশতঃ জীবিতকালে তিনি লেখাটি কোথাও ছাপান নি, ছাপালে তখনি জবাব পেতেন।

বর্তমান প্রবন্ধে কেবল সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দু'টি লেখার পরিচয় দেব। একটি স্বনামে লেখা গদ্য, অন্যটি "রমুন আলী" এই বেনামীতে কবিতা।

'শনিবারের চিঠি'র জন্মকালে -১৯২৪ সালে, ভারতে

চলছে গান্ধীযুগ এবং বাংলা দেশে সুরু হয়েছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সোনার পাথর বাটি 'রেস্পন্সিভ কো-অপারেশনের' ও কংগ্রেস-খিলাফৎ-স্বরাজ্য পার্টির বা সংক্ষেপে 'স্বরাজ্য পার্টি'র যুগ। এই রাষ্ট্রনৈতিক পটভূমিকায় 'শনিবারের চিঠি'র জন্ম, এবং এই পটভূমির সঙ্গে 'শনিবারের চিঠি'র একটা যোগ ছিল। কিন্তু সে-কথা এখন নয়।

ঘরে ঘরে চরখার ঘর্ঘর। হাটে মাঠে ঘাটে তকলি। সকলেই জানেন, সে-সময় দেশ-জোড়া এই বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে চরকা-ঘোরানর যান্ত্রিক 'রেজিমেণ্টেশন্' পছন্দ করতেন না বৈচিত্র্য-ধর্মী সুরের কবি রবীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথ শুধু রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন না, এ-বিষয়ে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের মানসপুত্র।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অনবদ্য ভঙ্গিতে সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র দ্বিতীয় সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৭) স্বনামে একটি প্রবন্ধ দিলেন, নাম "চরখা না বেহালা।" প্রবন্ধটি ছোট, পুরোটাই এখানে উদ্ধৃত ক'রে দিলাম।

চরখা না বেহালা

(তুলোনার তুলোধোনা)

চরখা—সুতো কাটে ঘ্যেনর ঘ্যেনর সুরসার কিছুই নেই
কাজেই লোকে চরখার শব্দ শুনে প্যালা দেয় নাই

বেহালা—ছড়া কাটে "টাকা দিবি কি না দিবি বল্"
একেবারে নিছক্ কাজের কথা, কিন্তু সুরে বলে বেহালা অতএব লোকে শুনে খুসি হয় এবং প্যালাও দেয়।

চরখা যে কাটে সে সুতোর সঙ্কারে লক্ষ্মীকে পায়, কাপড় যে বোনে সে হাতে বহরে লক্ষ্মীলাভ করে, মহাজন সে তাঁতীকে দাদন দিয়ে লক্ষ্মীকে কষে বাঁধন পরায় এবং দুই পায়ে সোনার বেড়ী লাগিয়ে লক্ষ্মী ঠাকুরুণকে নিজের ঘরে অচলা করে রাখে, কিন্তু মহাজন টেরও পায় না যে, 'লক্ষ্মীবিলাস' যাত্রায় বেহালাদার কান মলে তার ঘরের কড়ি নিয়ে গেল। তুলার সঙ্গে সম্পর্ক চরখার, তাঁতের সঙ্গে সম্পর্ক বেহালার, সুতরাং দেশকে কাপড় পরাতে গেলে বেহালারও বিশেষ প্রয়োজন। তা ছাড়া চরখার কান মলাও নেই, ছড়ি চালানও নেই, বেহালাতে এ দুটোই আছে অতএব দেশের বর্তমান অবস্থায় বেহালা যন্ত্র চরখা যন্ত্রের অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় পদার্থ বলেই বোধ হচ্ছে—তুলোনায় ও তুলোধোনায় বেহালাই জবরদস্ত এবং ভারি বোধ হচ্ছে—ডবল চরখার চেয়ে।

চরখা একটা যন্ত্র, সমাজ বিদ্যালয় কনগ্রেস এমন কি স্বরাজ তন্ত্র এরাও যন্ত্র (জাঁতা) ছাড়া আর কিছুই নয়। ঘর্ঘর শব্দ ছাড়া সুর বার হতে পারে না এসব থেকে,—কিন্তু বেহালা যন্ত্র হলেও তা থেকে সুর ওঠে, সুতরাং এটি হ'ল সমতুল্য বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি মানুষের শরীর যন্ত্রটির যেটা খুব কাজের অথচ যা' সুরে বলছে, এই কারণে শরীরের সঙ্গে কবিরা বীণা, বাঁশী, বেহালা, তানপুরা, একতারা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের উপমা দিয়ে থাকেন, জাঁতার সঙ্গে উপমা দেন সংসার চক্র ইত্যাদি যা পীড়া দেয় সুর দেয় না।

সুতরাং সুর সৃষ্টি একটা প্রকাণ্ড সাধনা যার কাছে খদ্দর সৃষ্টি খেলাফৎ সৃষ্টি অসহ দুঃসহ সব রকম সৃষ্টি ও অনাসৃষ্টি হার মেনেছে, এটা ক'দিন বেহালা বাজিয়েই আমি বুঝছি। এবং এও দেখছি যদি দেশ উদ্ধারে যাত্রাই করতে হয় আমাদের তবে একখানা বেহালা ও এক ওস্তাদ না হ'লে জাতা কলে প'ড়ে ছাতু হতে হবে, আমাদের রস জমবে না, যাত্রাও একপা চলবে না।

ইতি—

মন্ত্রী নয় যন্ত্রী

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঠিক পরের সংখ্যাতেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এর জবাবে একটি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ প্রবন্ধ দিলেন স্বনামে। প্রবন্ধের নাম "চরখার কথা।" (শনিবারের চিঠি, প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, শ্রাবণ ২৪, ১৩৩১, পৃপৃ: ৪৯-৫৪)।

প্রবন্ধটি তিনি আরম্ভ করছেন এই ভাবে :

"একটি সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকে আছে যে, সঙ্গীত ও সাহিত্য রসে যাহারা অনভিজ্ঞ, তাহাদিগকে প্রায় 'পুচ্ছ-বিষাণহীন' পশু বলিলেও চলে। সুতরাং শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বেহালার গুণকীর্তন করিয়াছেন, তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। বাস্তবিক বেসুরা কিছুই ভাল নয়। রূপক ভাষায় বলিতে গেলে, সমস্ত বিশ্ব-ব্যাপারই সুরের আলাপ।"

"চরখারও একটা সুর আছে; আমাদের জাতীয় জীবনের সুরের সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য আছে।"

"সঙ্গীতের এবং বেহালা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু 'উদরে অন্ন না থাকিলে সঙ্গীতের মত স্বর্গীয় জিনিষও ভাল লাগে না,' তাহা সৃষ্টি বা উপভোগ করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকে না।"

"চরখা গরিবের অন্নের একটি উপায়। আমি এই দিক্ দিয়েই ইহার সমর্থন করি। সাক্ষাৎভাবে

স্বরাজ লাভের উপায় ইহা না হইতে পারে; কিন্তু নিজেদের অভাব নিজেরা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা স্বরাজের একটা অঙ্গ, এবং চরখা তাহার অন্যতম সাধন। তা ছাড়া দারিদ্র্যের 'একান্ত' পীড়ন দূর হইলে, এবং নিজের চেষ্টায় তাহা দূর করিয়াছি এই বিশ্বাস জন্মিলে, মনের যে জোর হয়, তাহা রাষ্ট্রীয় স্বরাজ লাভে সাহায্য করিতে পারে, ইহা বোধ করি স্বীকার্য্য।"···

পরে এক জায়গায় লিখছেন :

"আমেরিকার প্রসিদ্ধ মোটর গাড়ী নির্মাতা ফোর্ড সাহেব একটা এরূপ কার্যপদ্ধতি উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, যাহাতে তথাকার লোকে গ্রামে থাকিয়া চাষবাস করিবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কাজও অবসর সময়ে করিতে পারে। তাহার জন্য সম্ভবত: জলের শক্তি ও বিদ্যুতের শক্তি ব্যবহৃত হইবে। এমন দিন আসিবে যখন আমাদের দেশেও পাড়াগাঁয়ে লোক ঘরে বসিয়া বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে সূতা কাটিতে ও তাঁত চালাইতে পারিবে। তখন তারা মিলের সূতা ও কাপড়ের সঙ্গে টক্কর দিতে পারিবে। কিন্তু সেই দিনের অপেক্ষায় এখন আলস্যে বৃথা গল্পগুজবে বিবাদ-কলহে ব্যসনে অমূল্য জীবন নষ্ট করা উচিত নয়।"···

এই ব'লে প্রবন্ধ শেষ করছেন :

"বিলাতী কলের সূতা ও কাপড় ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বে অতি সূক্ষ্ম ঢাকাই মস্‌লিন চরখার সূতাতেই প্রস্তুত হইত। কিছুদিনের অভ্যাসের পর অনেকে মিহি সূতা কাটিতে পারিবেন। তখন মিহি সূতার খদ্দর পাওয়া যাইবে, এবং সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়ন শিল্প লোপ পাইবে না।"

প্রবন্ধটি মূল্যবান্। আজকে স্বাধীন ভারতেও এর মধ্যে ভাবার কথা আছে।

কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ দমবার পাত্র নন। তিনি শিল্পী ও কবি, কঠিন যুক্তি দিয়ে তাঁকে ঠোকানো সম্ভব নয়। এবার তিনি কবিতার আশ্রয় নিলেন—বেনামীতে। মেঘনাদ এবারে সম্মুখ সমর ছাড়ি চলি গেলা মেঘের আড়ালে।

* * *

চিত্তরঞ্জন-মতিলালের স্বরাজ্য পার্টি জমজমাট। কলিকাতা কর্পোরেশনে স্বরাজ্য-পার্টির স্বর্ণ-সিংহাসন, মসনদে স্বয়ং দেশবন্ধু। বড় শরিক গান্ধীজীর বাদী পুত্র 'নন্-কো-অপারেশন্'-এর মামলায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বিবাদী পুত্র 'রেস্পন্‌সিভ্ কো-অপারেশন্'-এর সওয়াল জবাবের বিপুল আওয়াজে বাজার সরগরম। বাদী আদালতে গরহাজির ডিক্রী একতরফা, বিবাদীর জিত।

খিলাফতের ছোট ভাই 'শতকরা ৪৫:৫৫—চুক্তি'র গাঁটছড়ায় হিন্দু-মুসলমানকে অচ্ছেদ্য প্রেমের বাঁধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলবার আয়োজন করেছেন দেশবন্ধু।

গরজ বড় বালাই। গরজে খিলাফৎ, গরজে '৪৫:৫৫' হিন্দু-মুসলিম্ চুক্তি। কিন্তু গরজ ফুরোলে?

দারুণ দুর্যোগ। আকাশে মেঘের জটাজাল, চারি দিক্ অন্ধকার। ঘন ঘন বিদ্যুৎ, মুহুর্মুহু বনস্থলী কম্পিত ক'রে বজ্র পতন। মুষলধারে বর্ষণ। মধ্যিখানে একটুখানি আশ্রয়, পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে বাঘে ও হরিণে। কিন্তু বৃষ্টি যখন থামবে, মেঘ যখন কেটে যাবে, আকাশ পরিষ্কার হবে?

আগত সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে একই গাছে আশ্রয় নিল কাকে-কবুতরে, একই ডালে বাজে-বুলবুলিতে, শুধু যতক্ষণ রাত।

রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনে হিন্দু-মুসলমানে 'শতকরা' চুক্তি, চরখার সঙ্গে বেহালার সহাবস্থান, বাজপাখীর সঙ্গে বুলবুলির মিতালি, যত মত তত পথের পেল্লাই মজলিশ। কিন্তু সাময়িক প্রয়োজন যখন ফুরিয়ে যাবে, মৎলব হাসিল হবে, অন্ধকার রাত প্রভাত হবে, তখন চুক্তির শেষ রক্তে, সহাবস্থানের অবস্থান গোরস্থানে। তখন মিতালির গুলতানি যাবে টুটে, যত মত তত পথ যার যার পথ দেখবে। তখন জোর যার মুলুক তার—গায়ের, গলার বা গিণি সোনার।

* * *

মাস খানেকের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের কবিতা এসে পৌছল 'শনিবারের চিঠি'র জন্য। অশোকের মারফৎ পাণ্ডুলিপিটি এল আমার হস্তে, গোপনে। ঠিক রইল, কবির নাম প্রকাশ করা হবে না। লড়াইটা অবনীন্দ্র-রামানন্দ-রবীন্দ্রনাথ ভার্সাস্ গান্ধীজী। দীর্ঘকাল নাম প্রকাশ করা হয় নি। আজ অবনীন্দ্রনাথও নেই, রামানন্দও নেই, রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজী কেহই নেই, আদি পর্বের 'শনিবারের চিঠি'ও নেই, সুতরাং কবি "রসুন্ আলী"র নাম প্রকাশেও আর বাধা নেই।

কবিতাটি ছোট, পুরো তুলে দিলাম 'শনিবারের চিঠি', প্রথম বর্ষ, নবম সংখ্যা, আশ্বিন ৪,১৩৩১, পৃ: ২০২-৩)। এই বিচিত্র লিখনভঙ্গি, বিশিষ্ট শৈলী একমাত্র অবনীন্দ্রনাথেই সম্ভব। এবারে জবাব দেওয়া কঠিন, কারণ হেঁয়ালিতে লেখা, লিখেছেন শিল্পীর রাজা।

নানা পংহি

একহী দরখ্‌ত্‌ পর
সামকো দাখিল হো গিয়া
চুল্‌বুলাতে রহ গিয়া
বহ্‌তী মজ্জে পর।

কাউয়া কবুতর এক জগা পর
এক ডারমে বাঞ্চৌ বুলবুল্‌
বোল্‌তে চুঁহবুল্‌ চুঁহবুল্‌ চুঁহবুল্‌
গুল্‌তন্‌ মচায়া।

রাত গুজ্‌রা ফজর্‌ হুয়া তো
ঝট্‌কা মারা এক দুস্‌রেকো
বড়ি জোরদার
পড়ি সোরসার,
কাউয়া বোলা
হটো কবুতর
হট্‌ বুল্‌বুলা
হট্‌তেই চল্‌।

তিসরে পহর বাদ
চৌথে পহর মে
কোই ন উহা
বৈঠ্‌তী মজেমেঁ
একসে ঔর জুদা ঝট্‌পট্‌
রৌশন্‌ চৌকা চট্‌পট্‌
বোল্‌তী
রসুন্‌ আলী।

এটা কি "অতি তুচ্ছ" "নর্দমার" কবিতা ব'লে মনে হয়?

কবিতার নীচে সুরে সুর মিলিয়ে শনিমণ্ডলী-ধাঁচে একটু সম্পাদকীয় ফুটনোট জুড়ে দেওয়া গেল:

নানা জাতির, নানা ধর্মের, নানা ভাষার নানান্তর আদর্শ, উৎকর্ষ, সঙ্গীত, বক্তৃতা, উৎসুক, দোষ, গুণ, ত্রুটি, হাটেরহাঁড়ি, কাটা কান, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এ সব ইতিহাসের কথা, কালকের কথা, যা হয়ে গেছে ও হয়ে এসেছে তার কথা। ও সব নিয়ে ঘাঁটানো ভাল না। আমরা চাই মিলন, চাই একতা। সমস্তের মিলনাশায় ভবিষ্যৎ রঙীন, বর্তমান মশগুল। বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে একতা মিলনের প্রেমসূত্রে সেলাই ক'রে যে প্রচণ্ড সংহত শক্তি, যে উন্নত সভ্যতার উদ্ভব হবে, এই কবিতাটি সেই উন্নতিরই প্রথম ধাপ। সঃ শঃ চিঃ

সেদিন শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র পাতায় যে ছবি এঁকেছিলেন, আজকের ভারতে, আজকের দুনিয়ায় সেটা কি হাজার রঙে ফুটে উঠছে না?

'শনিবারের চিঠি'র সাপ্তাহিক সংস্করণের পাতা-চাপা অনেক রত্নই আজ প'ড়ে আছে অবহেলায়, লোকচক্ষুর বাইরে। আজকের 'চিঠি' দেখে যেন কেউ আদি পর্বের 'চিঠি'র বিচার না করেন। আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে উভয়ের তফাৎ অনেক। সে 'চিঠি' আজ তার বহু রচনা সম্ভার সমেত বিস্মৃতির অতল-তলে।
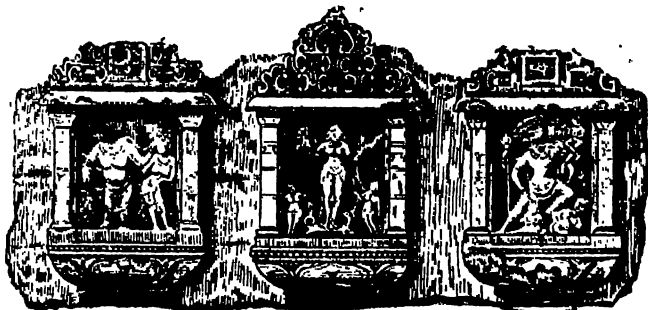
১৯৩০ সনের বিপ্লব-সাধনার পশ্চাৎপট

শ্রীকমলা দাশগুপ্ত

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে ভারতের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্ট ভাবে জেগে উঠতে লাগল। বিভিন্ন সভা-সম্মেলনে রাজনৈতিক অধিকারের দাবী সরব হয়ে উঠল। সে দাবী পূরণ না হওয়াতে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টি ক্রমেই বেড়ে গেল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মর্লি-মিণ্টো শাসন সংস্কার দিয়ে অসন্তুষ্টি দূর করতে চাইল। কিছু সংখ্যক লোক এই শাসন সংস্কার মেনে নিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে দেশের মধ্যে অসন্তুষ্টি তীব্রতর হয়ে উঠল। দাবী-দাওয়ার ভাষাও হ'ল তীক্ষ্ণ।

অপর দিকে বিপ্লবীরা শতাব্দীর প্রথম থেকেই ভিন্ন আদর্শে গ'ড়ে ওঠেন। তাঁরা বললেন, আবেদন-নিবেদনে স্বাধীনতা মেলে না, স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে হয় নিজেদের শক্তিতে। দুনিয়ার ইতিহাস এই শিক্ষাই দেয়। তাই তাঁরা সশস্ত্র বিপ্লবের পথেই অগ্রসর হন। যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় না করা পর্য্যন্ত তাঁদের সংগঠন ও কর্ম্মধারা কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা ক'রেই চলল। অসাড় নিদ্রায় আচ্ছন্ন জাতকে সচকিত জাগ্রত ক'রে তুলবার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাঁরা প্রাণের বদলে অকাতরে প্রাণ ঢেলে দিতে লাগলেন। তার পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে ইংরেজের শত্রু জার্ম্মানীর কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র এনে সারা ভারতব্যাপী একটা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের চেষ্টায় তাঁদের প্রতিনিধিরা জার্ম্মানীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। উদ্দেশ্য—খণ্ডযুদ্ধ দিয়ে বিপ্লব-যুদ্ধের পথের পরিচয় দেওয়া। কিন্তু দেশের এবং বিদেশের কিছু লোকের বিশ্বাসঘাতকতায় এই প্রচেষ্টার খবর ইংরেজ জেনে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার, কারাদণ্ড ও নিপীড়ন ক'রে বিপ্লবী সংগঠনকে তারা নির্ম্মূল করতে চায়। বিপ্লবী দলের ব্যাপকতা, গভীরতা ও দুঃসাহসিকতার পরিচয় পেয়ে ইংরেজ ভবিষ্যতের জন্য শঙ্কিত হয়ে ওঠে। তাই তারা বিপ্লবকে পিষে মারার জন্য রাউলাট এ্যাক্ট পাস ক'রে নির্ব্বিচারে সন্দেহবশে গ্রেপ্তার ও অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কারারুদ্ধ ক'রে রাখার মোক্ষম অস্ত্রটি হাতে তুলে নেয়।

১৯১৯ সনে গান্ধীজীর নেতৃত্বে বে-আইনী আইন রাউলাট এ্যাক্টের বিরুদ্ধে সারা ভারতব্যাপী প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ জেগে ওঠে। প্রতিবাদ দিবসে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র ভারতীয় জনতার উপর ইংরেজের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের পর গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ইংরেজের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন সুরু করে ১৯২১ সনে। ভারতের জনসাধারণ অপ্রত্যাশিত সাড়া দিয়ে আন্দোলনে দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কারামুক্ত বিপ্লবীরাও গণজাগরণের সুষ্ঠু পন্থা হিসাবে এই আন্দোলনে আন্তরিকতার সঙ্গে যোগদান করেন। তার পূর্ব্বে অবশ্য গান্ধীজীর সঙ্গে এ নিয়ে এঁদের খোলাখুলি আলোচনা হয়। তাঁরা স্পষ্ট দেখতে পেলেন এই আন্দোলন সফল না হলেও এর ভিতর দিয়ে দেশের জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, ইংরেজ শাসনের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা ও প্রতিরোধ-শক্তি জেগে ওঠার সম্ভাবনা আছে।

বিপ্লবীরা গান্ধীজীকে কথা দিলেন, বিপ্লবী আন্দোলনকে এক বছরের জন্য স্থগিত রাখবেন এবং সর্ব্বান্তঃকরণে কংগ্রেস আন্দোলনের জন্য কাজ ক'রে যাবেন। ১৯২২ সনে চৌরিচৌরার ঘটনার পর গান্ধীজী কংগ্রেস আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেল, গান্ধীজীর কাছে কথা দেওয়া সেই এক বছরও কেটে গেছে। তখন আবার বিপ্লবীদের নিজেদের চিন্তাধারা অনুযায়ী কর্ম্মসূচী গ্রহণ করবার সময় এল। বিপ্লবীদের পুনর্গঠনের এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের কাজ আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত তাঁরা গ্রহণ করলেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তখন স্বরাজ্য পার্টির কাজে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছেন এই বিপ্লবীদের উপর সমস্ত জেলায়। তা ছাড়া, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিও তখন এঁদের হাতে। এই ভাবে বাংলা দেশের সমস্ত রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ এবং গুপ্ত সংগঠন এই দলের হাতে চ'লে আসছিল। সেটা ইংরেজ শাসকগণ পছন্দ করতে পারে নি। পুলিস এই দলকে ভেঙে দেবার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা ও কারসাজি করতে থাকে।

১৯২৩-২৪ সনে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট যুগান্তর দলের নেতা ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ চট্টো-

পাধ্যায়, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, হরিকুমার চক্রবর্ত্তী, সুভাষ-চন্দ্র বসু প্রমুখ বহু বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার ক'রে বিনা বিচারে রাজবন্দী হিসাবে আটক রাখে ১৯২৮ সন পর্য্যন্ত।

প্রথম দল গ্রেপ্তার হবার পরেই তরুণ বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা অত্যাচারী পুলিস কমিশনার টেগার্ট সাহেবকে হত্যা করার জন্য অধৈর্য্য হয়ে ওঠেন। একজন এজেন্ট প্রভোকেটিওর ইচ্ছে করে টেগার্ট সাহেবের পরিবর্ত্তে আর্নেষ্ট ডে সাহেবকে দেখিয়ে দেয় গোপীনাথকে। গোপীনাথ এই এজেন্ট প্রভোকেটিওরকে দলের লোক ব'লেই বিশ্বাস করতেন। পুলিস এই ভাবে দলের ভিতরে ভিতরে নিজেদের এজেন্ট প্রভোকেটিওর রাখত। অন্য দেশেও এরকম করার ইতিহাস আছে। অকপট বিশ্বাসে গোপীনাথ ভুল ক'রে টেগার্ট সাহেবের বদলে আর্নেষ্ট ডে সাহেবকে হত্যা করেন ১৯২৪ সনের জানুয়ারী মাসে। ফাঁসী হয়ে যায় গোপীনাথ সাহার।

১৯২৮ সনে সকল রাজবন্দী মুক্তি পান। মুক্তি পাবার আগে জেলের মধ্যেই যুগান্তর ও অনুশীলন দুইটি বিপ্লবী দলের নেতৃবৃন্দ বাইরে এসে একসঙ্গে মিলিত ভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দুই দলের শীর্ষস্থানীয় নয়জন নেতাকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় হলেন এই কমিটির প্রধান। এই সময় ড্যান ব্রিন-এর লিখিত 'মাই ফাইট ফর আইরিশ ফ্রিডম' বইখানি খুব জনপ্রিয় ছিল। বাংলার বিপ্লবীদের মধ্যেও একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করবার পরিকল্পনা এখান থেকেই আসে। ১৯২৮ সনে বিপ্লবীদের ঐ নয়জনের শীর্ষ কমিটিতে ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত প্রস্তাব করেন যে, কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনের সুযোগে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনকে একটি আন্দোলন হিসাবে গ'ড়ে তোলা হোক্। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কংগ্রেস অধিবেশনের সময়ে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয় এবং তার সর্ব্বাধিনায়কত্বের ভার পড়ল সুভাষচন্দ্র বসুর উপর। বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে আগত তরুণ স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে বিপ্লবী ভাবধারা সঞ্চারিত ক'রে চললেন বিপ্লবী নেতাগণ। জেলায় জেলায় ভলাণ্টিয়ার দলও গ'ড়ে ওঠে।

ওদিকে কংগ্রেসের ১৯২১ সনের অসহযোগ আন্দোলন সফল না হলেও আন্দোলনের ফলে ভারতের জনসাধারণের মধ্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টি চরম আকার ধারণ করে। বিপ্লবী দল এবং কংগ্রেস ছাড়াও অন্যান্য দলগুলির মধ্যে রাজনৈতিক অধিকারের দাবী উগ্রতর হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ তখন বলেন, রাজনৈতিক দলগুলি একমত হয়ে কোন দাবী উপস্থিত করলে তা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। এই উদ্দেশ্যে ১৯২৭-২৮ সনে কংগ্রেস, মুসলীম লীগ, লিবারেল পার্টি, হিন্দুমহাসভা প্রভৃতির প্রতিনিধিদের নিয়ে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই নেহরু কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হ'লে দেখা গেল, ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনই ভারতের রাজনৈতিক লক্ষ্য ব'লে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

এই সময়ে জহরলাল নেহরু মস্কো থেকে ফিরে এসে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ গঠন করার কাজে এগিয়েছিলেন। বিপ্লবীরা দেখলেন, এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে এরই মারফৎ দেশের মধ্যে বিপ্লবী ভাবধারা প্রচারের সুযোগ মিলবে। ১৯২৮ সনে দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির (এ. আই. সি. সি.) অধিবেশনে বাংলার বিপ্লবীদের কয়েকজন যোগদান করেন। সেখানে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ পুনর্গঠিত হয় শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারকে সভাপতি এবং জহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসুকে যুগ্ম সম্পাদক করে।

১৯২৮ সনের কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে সর্ব্বদলীয় সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গান্ধীজীর প্রস্তাব ছিল যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন বা ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস হবে কংগ্রেসের লক্ষ্য। কিন্তু বাংলার বিপ্লবীরা এতে বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ ও বিচলিত হন। ব্রিটিশ-কবল-মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতাই বিপ্লবীদের আদর্শ। বাংলার বিপ্লবীদের চিন্তাধারার সেই ঐতিহ্যের পরিপন্থী ইংরেজের অধীনে স্বায়ত্ত শাসন প্রস্তাব বাংলা দেশের বুকে ব'সে বিনা বাধায় গৃহীত হবে এটা তাঁরা কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না।

এ. আই. সি. সি. মিটিং-এর আগের দিন রাতে একটা ঘরোয়া বৈঠকে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, জহরলাল নেহরু এবং সুভাষচন্দ্র বসু এঁরা তিনজন গান্ধীজী এবং অন্যান্য প্রবীণ কংগ্রেস নেতাদের কাছে কথা দিয়ে এলেন যে, ডোমিনিয়ান ষ্টেটাসের প্রস্তাব তাঁরা মেনে নেবেন, অন্ততঃ তার বিরোধিতা করবেন না।

গভীর রাতে বাংলার বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনার পর স্থির হয় যে, পরদিন সকালে এ. আই. সি. সি.র মিটিংয়ে ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হবে। সেই রাত্রেই শরৎ বসুকে রাজী করান হয় এবং সেই অনুসারে তিনি এ. আই. সি. সি. মিটিংয়ে প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন পরদিন ভোরে।

বিপ্লবীদের তরফ থেকে বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিদের ক্যাম্প ঘুরে ঘুরে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত গঠন করতে থাকেন, তাতে যথেষ্ট সাড়াও পান। এবং বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভ্যদের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে সুভাষচন্দ্রও প্রকাশ্য অধিবেশনে ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে বাংলার তরফ থেকে প্রবল বিরোধিতা করা হয় এবং প্রকাশ্য অধিবেশনেও বিরোধিতা করার সিদ্ধান্তে অন্যান্য প্রদেশের প্রতিনিধিদের প্রচুর সমর্থন লাভের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ফলে গান্ধীজী মধ্যপন্থা অবলম্বন করাই স্থির করলেন। তিনি ঘোষণা করেন, আপাততঃ ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস রইল আদর্শ। কিন্তু যদি এক বছরে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস না দেয় তবে এক বছর পরে পূর্ণ স্বরাজ হবে কংগ্রেসের আদর্শ এবং পূর্ণ স্বাধীনতা আনবার জন্য আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা হবে। প্রকাশ্য অধিবেশনে ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস প্রস্তাবের পক্ষে ১.০০ ভোট পড়ে এবং পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে ৪০০ ভোট। গান্ধীজীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এদিনে এই ভোট সংখ্যাকে বিপ্লবীরা কম মনে করেন নাই। কিন্তু তার চেয়ে বড় লাভ হ'ল গান্ধীজীর ঐ প্রতিশ্রুতি—এক বৎসর পরে পূর্ণ স্বাধীনতা আদর্শ ঘোষণা ক'রে সেই লক্ষ্যে পৌঁছাবার উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

এখান থেকে আবার নতুন ক'রে বিপ্লবী কর্ম্মসূচীর সূত্রপাত। তাঁরা বুঝলেন, ইংরেজ স্বেচ্ছায় ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস দেবে না এবং এক বছর পরে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব পাস হলেও সেটা বাস্তবে পরিণত করতে গেলে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজন হবে। অতএব আগে থেকেই সেই অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানকে গ'ড়ে তোলা প্রয়োজন। এই পরিকল্পনা অনুসারে বিপ্লবীদের একটা অংশ কংগ্রেসকে শক্তিশালী করবার জন্য গণ-আন্দোলনে যোগ দিলেন। তাঁরা জাতীয় জাগরণ আনবার জন্য আত্মনিয়োগ করলেন। আরেকটা অংশ সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রস্তুতির জন্য বিপ্লবী সংগঠন গ'ড়ে তুলবার কাজে সচেষ্ট হলেন।

যুগান্তর দল এই কর্ম্মসূচী কাজে পরিণত করার দিকে মন দিল। যুবমনে বৈপ্লবিক প্রেরণা জুগিয়ে তুলবার প্রয়াসে 'স্বাধীনতা' নামে যুগান্তর দলের একখানা সাপ্তাহিক মুখপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। তাতে কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি ও পরিণতির সম্ভাবনা নিয়ে নিপুণ বিশ্লেষণ এবং আসন্ন বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইঙ্গিত পূর্ণ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ সপ্তাহের পর সপ্তাহ বাংলার যুবকদের একটা নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে লাগল। ১৯৩০ সনে কি ঘটবে সে কথা 'স্বাধীনতা'য় বেশ স্পষ্ট ভাষায় বলা হ'ল। গভর্ণমেণ্ট ১৯২১ সনের অপেক্ষা অনেক বেশী অত্যাচার চালাবে আন্দোলনকে পিষে মারার জন্য। সমস্ত হিংস্র শক্তি দিয়ে তারা অহিংস জনতার টুঁটি চেপে ধরবে। সেই অত্যাচারের মুখে একতরফা মার খেতে খেতে অহিংস নিরস্ত্র জনতার নৈতিক বল হয়ত ভেঙে পড়বে। হয়ত হিংসার পীড়নকে রোধ করবার শক্তি তারা হারিয়ে ফেলবে। সেই সময় যদি বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে একটা প্রত্যাঘাত করার চেষ্টা হয় তবে হয়ত আইন অমান্য আন্দোলন ব্যর্থ হলেও জাতির নৈতিক বল বাড়বে।

এতে একদিকে ইংরেজ জানবে, তাদের শক্তিমদোন্মত্ত শাসনযন্ত্রের ভিত্তিমূলে আঘাত হানবার স্পর্দ্ধা রাখে দেশের একটা অংশ। তারা বিপ্লবী, তারা মৃত্যুপণে অনমনীয়। তারা দাঁড়িয়ে মরবে না, আঘাত হেনে ইংরেজ শক্তিকে ভূমিকম্পে ফাটিয়ে দিয়ে তবে মরবে। বিপ্লবীরা নিজেদের নিঃশেষে বলি দিয়ে দেশকে শেখাবে অন্যায়কে আঘাত ক'রে আত্মবিসর্জ্জন দিতে। জাতির মনে জেগে উঠবে আত্মবিশ্বাস। এই উদ্দেশ্য নিয়েই ১৯২৮ সনে থেকে বিপ্লবী আন্দোলনের যে প্রস্তুতি চলছিল সেটাকে আরও ত্বরান্বিত করা হয়। আরম্ভ হয়ে যায় অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ এবং বোমা-বারুদ তৈরীর কাজ।

এক বছর পার হয়ে গেল, ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস মিলল না। সুতরাং ১৯২৯ সনে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং লক্ষ্যে পৌঁছবার উদ্দেশ্যে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করবার সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তৃত্ব গান্ধীজীর উপর অর্পণ করা হয়। যুগান্তর দল গণআন্দোলনের নেতারূপে গান্ধীজীকে মেনে নেন।

১৯৩০ সন। শুরু হয়ে গেল কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন। গান্ধীজী স্বয়ং দণ্ডি অভিযান করলেন। ধারাসানাতে লবণ আইন ভঙ্গ ক'রে কাঁটা তারের বেড়া (Barbed wire) কেটে সরকারী গোলার লবণ বের ক'রে আনা হয়। বিপ্লবীরা এই সব লক্ষ্য ক'রে চলেছিলেন। তাঁরা দেখলেন যে, গান্ধীজীর আহ্বানে জনগণ '৯২১ সনের অপেক্ষাও বিপুল শক্তি নিয়ে অধিকতর সংখ্যায় সাড়া দিচ্ছে এবং আরও দেবে।

জেলের মধ্যে যুগান্তর ও অনুশীলন দুইটি বিপ্লবীদলের এক সঙ্গে মিলিত ভাবে কাজ করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করা হয়েছিল তা বাইরে এসে বেশীদিন টিঁকিয়ে রাখা সম্ভব হয় নি। ১৯২৮ সনের মধ্যেই সে মিলনের গ্রন্থি ছিন্ন হয়ে যায়।

পূর্ব্বে যুগান্তরের অংশ ছিলেন কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের কালে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান এমন দু'একটি দল যুগান্তর অনুশীলনের মিলনের কালে ফিরে আসেন। ১৯২৯ সনের ভিতর অনুশীলনের সঙ্গে মিলন সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেলেও এঁরা কিন্তু যুগান্তরের সঙ্গেই থেকে যান এবং এই সময়ের কর্ম্মসূচীতে বিশেষ কৃতিত্ব দেখান।

১৯২৯ সনেই যুগান্তরের নেতারা স্থির করেন যে, বাংলা দেশের সমস্ত জেলাতেই এক সঙ্গে বিপ্লবী সংগ্রাম শুরু হওয়া প্রয়োজন এবং তাই করার যথাসম্ভব ব্যবস্থা হয়।

বোমা তৈরি চলতে থাকে গোপনে কলকাতায়। যোগেন দে সরকার ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালের দলের একজন পুরাণো বিশ্বস্ত কর্ম্মী, প্রাক্তন স্টেট প্রিজনার। তিনি অরুণচন্দ্র গুহ ও ভূপেন্দ্রকুমার দত্তকে বলেন যে, মিলিটারীতে ব্যবহার করা হয় যে টি. এন. টি বোমা তা তৈরি করা যেতে পারে। কয়েকজন যোগ্য কর্ম্মী বোমা তৈরির কাজে নিযুক্ত হ'লে তিনি সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করবেন। তখন পুলিসের কোপদৃষ্টিতে না পড়া একদল কর্ম্মীর উপর এই বোমা তৈরির এবং বিলি ব্যবস্থার সকল রকম আযোজনের ভার দেওয়া হয়। এঁদেরই একজন ডাঃ নারায়ণ রায় কয়েকটি যুবককে নিয়ে হাতে-কলমে বোমা তৈরির কাজ উৎসাহের সঙ্গে শুরু করলেন। টি. এন. টি তৈরির বাস্তব অসুবিধার ক্ষেত্রে বোমা-বিশেষজ্ঞ যোগেন দে সরকার প্রতি পদে পদে ডাঃ নারায়ণ রায়কে সাহায্য ক'রে বোমা তৈরি সফল ক'রে তুললেন। অস্ত্র যোগাড়ও কিছু কিছু চলতে লাগল।

পরিকল্পনা ছিল, প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হ'লে বাংলা দেশের সর্ব্বত্র এবং তার বাইরেও বিপ্লবী সংগ্রাম ছড়িয়ে দেওয়া হবে। ১৯৩০ সনের প্রথম দিকে দেখা গেল, সমস্ত জেলার প্রস্তুতি সম্পূর্ণতার পথে সমানভাবে অগ্রসর হয় নি। অস্ত্র খুবই কম, বোমা তখনও অসম্পূর্ণ। চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা কিছু অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করতে পেরেছিলেন। তখনকার উপযোগী একটা কর্ম্মসূচীও স্থির ক'রে ফেলেছিলেন। চট্টগ্রামের কোন কোন কর্ম্মী অধৈর্য্য হয়ে উঠেছিলেন এই ভেবে যে, এখনি কিছু করা দরকার, নইলে প্রস্তুত করতে করতেই গ্রেপ্তার হয়ে যেতে হবে, শেষে আর কিছু করা যাবে না। কানাকানি শুনা গেল, চট্টগ্রামে চল্লিশ জনকে গ্রেপ্তারের আদেশ হয়ে গেছে। আই. বি. পুলিসও তখন খুব কর্ম্মতৎপর হয়ে উঠেছে। এই গ্রেপ্তারের আদেশের খবর চট্টগ্রামের সূর্য্য সেন পেয়ে গেলেন। তিনি তখন আর দেরি করা, অথবা অন্যান্য জেলার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করার জন্য অপেক্ষা করা সঙ্গত মনে করলেন না। তিনি চট্টগ্রামে ১৮ই এপ্রিল 'ইস্টার রাইজিং' দিবসে বিপ্লবী সংগ্রাম সুরু করার দিন স্থির করলেন।

ভারতের বিপ্লব সংগ্রামের সমগ্র ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা সফল এবং চমকপ্রদ ঘটনা সংঘটিত হয় ১৯৩০ সনের ১৮ই এপ্রিল সূর্য্য সেনের (মাস্টারদা) নেতৃত্বে। ঐদিন চট্টগ্রামের পুলিস ও রেলওয়ে অস্ত্রাগার আক্রমণ ও লুণ্ঠন করা হয়। চট্টগ্রামের বাইরের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন করার জন্য তাঁরা রেল লাইন, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন সমস্ত ধ্বংস ক'রে দেন। ইংরেজ সৈন্যের আগমনের খবর পেয়ে বিপ্লবীরা জালালাবাদ পাহাড়ে সাময়িক ভাবে আশ্রয় নিলেন। ২২শে এপ্রিল ইংরেজ সৈন্য জালালাবাদ পাহাড় ঘিরে ফেলল। শুরু হ'ল সম্মুখ সংগ্রাম। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলেছিল দুই ঘণ্টা ব্যাপী। পরাক্রান্ত ইংরেজ সৈন্য বিপ্লবীদের গুলীর মুখে টিকতে না পেরে পশ্চাৎ অপসরণ করতে বাধ্য হ'ল। ১২ জন বিপ্লবী বীর সেখানে মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করলেন। বাকিরা পাহাড়ের অপর দিকে নেমে গিয়ে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়লেন। নেতারা নানা স্থানে আত্মগোপন ক'রে সংগ্রামের ভবিষ্যৎ কর্ম্মধারার প্রস্তুতির জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। এদিকে বাংলা দেশের সর্ব্বত্র পরিচিত নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করা সুরু হ'ল।

তখন কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন চলছে। ধাড়াসানার অভিযানের পরে গান্ধীজী তখন জেলে। কংগ্রেসকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান ব'লে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নিরবচ্ছিন্ন গোপন অধিবেশন চলেছে আনন্দভবনে। ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষ থেকে মতিলাল নেহরু এবং মৌলানা আজাদ কংগ্রেস কর্ম্মীদের নির্দ্দেশ পাঠাচ্ছেন কংগ্রেসের গুপ্ত ডাকবিভাগের মারফত। ওয়ার্কিং কমিটির একটি গুপ্ত বৃহত্তর অধিবেশনে মতিলাল নেহরু প্রস্তাব করলেন যে, যেদিন সাইমন কমিশন রিপোর্ট (Simon Commission Report) প্রকাশিত হবে সেদিন একই সময়ে সারা ভারতে টেলিগ্রাফ লাইন কেটে দিয়ে প্রতিবাদ জানান হোক। ডাঃ বিধান রায় পণ্ডিতজীকে

বলেন, এ আলোচনা এখন মুলতুবী রাখুন। আমি বরং কলকাতা গিয়ে একজন লোককে পাঠিয়ে দেব, তার সঙ্গে কথা বলুন। ডাঃ রায় কলকাতা ফিরে এসে ভূপেন্দ্রকুমার দত্তকে ডেকে বলেন, "তুমি এলাহাবাদ যাও এবং পণ্ডিতজীর সঙ্গে আলোচনা ক'রে যদি উচিত মনে কর এর ভার নিও।" ১৯৩০ সনের জুন মাসের গোড়ায় ভূপেন্দ্রকুমার এলাহাবাদ যান।

পণ্ডিত মতিলাল তাঁর বক্তব্য বললেন—গান্ধীজী ধাড়াসানায় কাঁটা তারের বেড়া কেটে লবণ বার করলে যদি হিংসা না হয় তবে টেলিগ্রাফ লাইন কাটলে কেন তাতে অহিংসা মারা যাবে? আমি কথাটা ওয়ার্কিং কমিটিতে তুলেছিলাম, বিধান বললেন, ও কথা এখন থাক। পরে দেখলাম, বিধান ঠিকই বলেছেন। পরদিনই কথাটা এলাহাবাদের বাজারময় রাষ্ট্র। এখন দেখ কি করা যায়। তোমাদের ত আবার মনে হয়, সারা ভারতে একটিই মাত্র দল নয়।

ভূপেন্দ্রকুমার স্বীকার করেন এবং বলেন, আপনি যদি একটু দায়িত্ব নেন আমরা এক হয়ে কাজ করতে পারি।

পণ্ডিতজী বলেন, এই বয়সে ফাঁসী যেতে পারব না।

ভূপেন্দ্রকুমার বলেন, ফাঁসী আপনাকে যেতে হবে না। ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে আপনি বিপ্লবীদলের যোগসূত্র হবেন। আপনারা ওয়ার্কিং কমিটি থেকে এই ধরণের কর্মসূচী যা করবেন আমরা তা কাজে পরিণত করব। আমি চার পাঁচটি লোককে আপনার কাছে নিয়ে আসব। তাঁরা হচ্ছেন বাংলার ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জি ও সূর্য্য সেন, উত্তরপ্রদেশের চন্দ্রশেখর আজাদ এবং পাঞ্জাবের ধন্বন্তরী। এই রকম যোগাযোগ হ'লে আমরা ঐক্য বজায় রেখে সারা ভারতবর্ষে কাজ করতে পারব। টেলিগ্রাফের তার কাটার কাজের জন্য বিধান-বাবুর কথামত ভূপেন্দ্রকুমার মতিলালের কাছে টাকা চেয়ে আনেন। তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন ১০ই জুন। এবং সেই দিনই টাকাটা ডাঃ বিধান রায়কে দিয়ে আসেন। ডাঃ রায় টাকাটা শরৎ বোসের কাছে রেখে ঐ দিনই শিলং চ'লে যান। ভূপেন্দ্রকুমারকে ব'লে যান দরকার মত টাকা শরৎ বোসের কাছ থেকে নিতে।

ভূপেন্দ্রকুমারের আশঙ্কা হয়েছিল তাঁর গ্রেপ্তার আসন্ন। তিনি বাংলার কয়েকটি জেলায় নতুন কাজের জন্য তৈরি হ'তে ঐদিনই লোক পাঠান। লাহোর থেকে ধন্বন্তরী ইতিপূর্ব্বেই ব'লে পাঠিয়েছেন, পাঞ্জাবে বিপ্লবী কাজ সুরু করতে আর দেরি করা চলে না, তাঁদের তৈরি বোমা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

সেই দিনই ১০ই জুন বিকেল বেলায় বাসায় ফিরে ভূপেন্দ্রকুমার হাতের কাছে যাঁকে পেলেন তাঁকেই দলের সমস্ত যোগসূত্রের কথা এবং আসন্ন বিপ্লবী কর্ম্মধারা সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিয়ে যান। সেই রাত্রেই ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত গ্রেপ্তার হন।

সপ্তাহ তিনেকের ভিতর সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। কিছু কিছু জায়গায় তার কাটা হয়েছিল। কিন্তু পরিকল্পনা অনুযায়ী কোন কাজই সম্ভব হয় নি। কারণ, সুষ্ঠুভাবেই এই কাজ করার জন্য যে ভাবে সংগঠন করার দরকার তার সময় পাওয়া যায় নি। অন্যান্য কাজের ভিতর কথা ছিল ইউরোপীয়ান ক্লাবে বোমা ফেলবার। এ কাজ করতে পারলে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে সৈন্য কলকাতার রাস্তায় বের হবার সম্ভাবনা ছিল। তাদের উপর বোমা ফেলবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি মোড়ে মোড়ে দোতলার ঘরে কয়েকজনকে বসানো হয়। কলকাতার ইলেকট্রিক ও গ্যাস কারখানাও ভেঙে দেবার ব্যবস্থা হয়।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর বাংলা দেশের কয়েকটি জেলায় আয়োজন চলে ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলে উপর্য্যুপরি একটার পর একটা আঘাত হানবার। পরে আয়োজন যখন অনেকটা সীমাবদ্ধ করা হ'ল তখন কথা হ'ল, টেগার্টের উপর বোমা ফেলাটাই হবে সিগন্যাল আর সঙ্গে সঙ্গে যে-জেলা যা পারে তা করবে। ইতিমধ্যে একদিন সংবাদ প্রচারিত হ'ল, আলিপুর জেলে সুপারিন্-টেণ্ডেণ্ট সোম দত্ত মেরেছে বাংলার দুই প্রিয় নেতা সুভাষচন্দ্র ও সেনগুপ্তকে। কলকাতার সেদিনের উত্তেজনাকে মূর্ত্ত ক'রে নিয়ে এলেন ভূপেন্দ্রকুমারের কাছে ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়। সোম দত্ত ও টেগার্ট দুই-জনেরই গতিবিধির উপর এঁরা ও এঁদের সহকর্ম্মীরা নজর রাখতে শুরু করলেন। কিন্তু যাদুগোপালের নির্দ্দেশ হ'ল, ভারতীয় কর্ম্মচারী নয়, অন্ততঃ সিগন্যাল হবে ইংরেজ।

১৯৩০ সনের ২৫শে আগষ্ট তারিখে হয় ডালহাউসি স্কোয়ারে কলকাতার পুলিস কমিশনার টেগার্টের উপর আক্রমণ। নিজেদের বোমা ফেটেই অনুজা সেন ঘটনা-স্থলে প্রাণত্যাগ করেন। দীনেশ মজুমদার গ্রেপ্তার হন। বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। পরে মেদিনীপুর জেল থেকে পলায়ন ক'রে তিনি নানাস্থানে আত্মগোপন ক'রে থাকেন এবং বিপ্লবী পরিকল্পনাগুলি কাজে পরিণত করার প্রচেষ্টায় তৎপর হন। চন্দননগরে পলাতক অবস্থায় ফরাসী পুলিস দীনেশদের আশ্রয়স্থল ঘিরে ফেলে।

সঙ্গীদের নিয়ে সেই বাড়ী থেকে পলায়নকালে তাঁদের গুলীতে পশ্চাতে ধাবমান চন্দননগরের পুলিস কমিশনার কুঁইন্‌স্ (কুঁই) নিহত হয়। পরে কলকাতায় অবস্থান-কালে ১৯৩৩ সনের ২২শে মে প্রত্যুষে পুলিস সদলবলে তাঁদের আশ্রয়স্থল ঘিরে ফেলে। টের পেয়ে দীনেশ ও তাঁর দুই সঙ্গী গুলী ছুঁড়তে থাকেন। পুলিস ও বিপ্লবী উভয়পক্ষে গুলী চলে এবং খণ্ডযুদ্ধ হয়। গুলী ফুরিয়ে যাবার পর আহত অবস্থায় তাঁরা গ্রেপ্তার হন। বিচারে দীনেশের ফাঁসীর হুকুম হয়। ১৯৩৪ সনের ৯ই জুন রাত্রে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে তাঁর ফাঁসী হয়।

১৯৩০ সনের ২৯শে আগষ্ট ঢাকা মেডিকেল স্কুলের কাছে পুলিস ইন্সপেক্টার জেনারেল লোম্যান ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হডসনকে গুলী করেন বিনয় বসু (এক নম্বর)। লোম্যান তৎক্ষণাৎ নিহত হন এবং হডসন গুরুতর আহত হন। বিনয় বসু পালিয়ে যান। ৮ই ডিসেম্বর তিনি দুইজন বিপ্লবী বন্ধুকে নিয়ে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-স্-এ কারাগারের ইন্সপেক্টার জেনারেল কর্ণেল সিম্পসনকে গুলীর আঘাতে শেষ ক'রে দেন এবং শ্বেতাঙ্গদের উপর গুলী চলে যতক্ষণ তাঁদের কাছে গুলী ছিল। গুলী নিঃশেষ হয়ে গেলে পটাশিয়াম সায়নাইড খেয়ে সুধীর গুপ্ত (বাদল) নিজেকে সেখানেই লোপ ক'রে দেন। পাঁচ দিন পরে আহত বিনয় বসু হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিচারে দীনেশ গুপ্তের ফাঁসী হয়।

১৯৩০ সনের ১লা ডিসেম্বর। চট্টগ্রামের দুই বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্ত্তী চলেছেন চাঁদপুরের পুলিস ইন্সপেক্টার জেনারেল মিঃ ক্রেককে অনুসরণ ক'রে। ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরার আধো-আলোতে ভুল ক'রে তাঁরা ক্রেক সাহেবের বদলে পুলিস ইন্সপেক্টার তারিণী মুখার্জ্জীকে নিহত করেন। ফাঁসী হয়ে যায় রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের। কালীপদ চক্রবর্ত্তীর ফাঁসীর যোগ্য বয়স ছিল না। তাই তাঁর হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

ইতিমধ্যে গান্ধী-আরউইন চুক্তি হয়। এই চুক্তির মর্ম্ম বিপ্লবীরাও গ্রহণ করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজীকে ও তেজবাহাদুর সপ্রুকে বক্সা ক্যাম্প থেকে সুরেন্দ্র-মোহন ঘোষ, অরুণচন্দ্র গুহ, ভূপতি মজুমদার ও ভূপেন্দ্র-কুমার দত্ত এই চারজন বিপ্লবী নেতার দস্তখতে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, বিপ্লবী দল চুক্তি মেনে নিয়েছেন। ৮ই ডিসেম্বর রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ সিম্পসন হত্যার পর আর কোন ঘটনা সংঘটিত হয় নাই। কিন্তু যদি চুক্তির মর্ম্ম ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট না মানে আর ভগৎ সিংদের এবং চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলায় অভিযুক্তদের ফাঁসী হয় তা হ'লে বিপ্লবীরা চুক্তি মানবে না। দেশেও শান্তি আসবে না। তেজ বাহাদুর এই চিঠিখানি নিয়ে আরউইনের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু ফল কিছু হয় নাই।

বক্সা ক্যাম্প থেকে ইতিমধ্যে বাইরেও খবর যায়, ভগৎ সিংদের ফাঁসী হ'লে ১৫ দিনের ভিতর কিছু করতেই হবে। এবং তার পর যতদিন যতখানে সম্ভব চালিয়ে যেতে হবে। ১৯৩১ সনের ২৩শে মার্চ্চ ভগৎ সিং, শুকদেব এবং রাজগুরু তিনজনের ফাঁসী হয়। আর ১৯৩১ সনের ৭ই এপ্রিল মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পেডি সাহেবকে নিহত করেন বিমল দাশগুপ্ত। মেদিনীপুরে পেডি, ডগলাস, বার্জ্জ, পর পর তিনজন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে নিহত করা হয়। ডগলাসকে হত্যার জন্য ফাঁসীর আদেশ হয় প্রদ্যোত ভট্টাচার্য্যের। বার্জ্জ হত্যার ষড়যন্ত্রের মামলায় ফাঁসী হয় নির্ম্মলজীবন ঘোষ, রামকৃষ্ণ রায় এবং ব্রজকিশোর চক্রবর্ত্তীর। খেলার মাঠে বার্জ্জকে গুলী করার সময় মৃগাঙ্ক দত্ত ও অনাথবন্ধু পাঁজা দেহরক্ষীর গুলীতে নিহত হন। এ ছাড়া বহু লোকের দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড হয়।

ইতিমধ্যে গুলী চলে হিজলী ক্যাম্পে। দুইজন বিনা বিচারে বন্দী এই নৃশংস গুলীতে নিহত এবং প্রায় কুড়ি জন আহত হন। বক্সা থেকে আবার খবর যায়, এর জবাব দিতে হবে।

১৯৩১ সনের ২৭শে জুলাই তারিখে বিচারক গার্লিক সাহেব আদালত কক্ষে বসে বিচার করছেন। বহু বিপ্লবীর দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড ও ফাঁসীর হুকুম উচ্চারিত হয়েছে এই বিচারকের মুখ থেকেই। সেদিন এক যুবক হঠাৎ এসে বিচারে আসীন গার্লিক সাহেবকে সর্ব্বসমক্ষে গুলী ক'রে তাঁর বিচার করা চিরদিনের মত ঘুচিয়ে দেন। যুবক তৎক্ষণাৎ পটাসিয়াম সায়নাইড খেয়ে ইহজগৎ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যান। পুলিস শত চেষ্টা ক'রেও তিন বছরের মধ্যে জানতে পারে নি এই দুর্দ্ধর্ষ অদ্ভুত ছেলেটি কে। নাম ছিল তাঁর কানাই ভট্টাচার্য্য।

১৯৩১ সনের ১৪ই ডিসেম্বর কুমিল্লার অত্যাচারী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্টিভেন্স সাহেবের বাংলোতে স্কুলের দু'টি ছাত্রী একখানা দরখাস্ত নিয়ে এসে উপস্থিত। ম্যাজিষ্ট্রেট যখন দরখাস্ত পাঠ করছেন তখন ছাত্রী দু'টি শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী সেই ম্যাজিষ্ট্রেটের অত্যাচারের প্রতিবাদের মূর্ত্তি ধ'রে তাঁকে লক্ষ্য ক'রে গুলী চালান।

ষ্টিভেন্স নিহত হন। শান্তি, সুনীতির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

১৯৩২ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন সভা চলেছে। গবর্ণর জ্যাকসম অভিভাষণ পাঠ করছেন। ডিগ্রী গ্রহণকারীদের অন্যতম বীণা দাসের হাতের পিস্তল অকস্মাৎ গর্জ্জে উঠল। গবর্ণর নাকি তৎক্ষণাৎ মাথাটা সরিয়ে নিয়েছিলেন। ঠিক তাঁর কানের পাশ দিয়ে গুলীটা চলে যায়। সামান্য একটুর জন্য লাগে নি। সাজা হয়ে যায় বীণার নয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

একের পর এক আঘাত পড়তে লাগল। ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ডুর্নোকে আহত করেন ব'লে ধরা পড়েন সরোজ গুহ ও রমেন ভৌমিক। পুলিস সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট গ্রাস্‌বিকে আঘাত করেন বিনয় বসু (দুই নম্বর) ও বঙ্গেশ্বর রায়। কুমিল্লার সহকারী পুলিস সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট এলিসন সাহেবকে হত্যা যিনি করেন তিনি ধরা পড়েন নাই, ধরা পড়েন শৈলেশ রায়। কলকাতায় ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনে সভাপতি ভিলিয়ার্সকে আক্রমণ করেন লোম্যান হত্যাকারী বিনয় বসু (এক নম্বর)। আঘাত পড়েছিল ময়মনসিংহে ডিভিশনাল কমিশনার ক্যাসেল সাহেবের উপরও।

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ সম্পাদক ওয়াটসনের উপর দুইবার আক্রমণ চলে। প্রথম বার অকৃতকার্য্য হয়ে অতুল সেন পটাসিয়াম সায়নাইড খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন। দ্বিতীয়বার ঐ একই কারণে অনিল ভাদুড়ী এবং মণি লাহিড়ীও পটাসিয়াম খেয়ে শেষ হয়ে যান।

১৯৩৪ সনে বিপ্লবী কর্ম্মধারা শেষ প্রান্তে আসে। শেষ আঘাত হানা হ'ল গবর্ণর এণ্ডারসনের উপর দার্জ্জিলিং-এ লেবং পাহাড়ে ঘোড়দৌড়ের মাঠে। এই সম্পর্কে ধরা পড়েন ভবানী ভট্টাচার্য্য, উজ্জ্বলা মজুমদার, রবীন ব্যানার্জ্জি প্রভৃতি ছয়জন। ভবানী ভট্টাচার্য্যের ফাঁসী হয়। অন্যদের দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড হয়।

বাংলার অন্যান্য কেন্দ্রে যখন বিপ্লবী তরঙ্গ একটার পর একটা ফেনিয়ে উঠে এগিয়ে আসছিল তখন চট্টগ্রামের পলাতক বিপ্লবীরা সূর্য্য সেনের নেতৃত্বে আরও দুর্দ্দম হয়ে ওঠেন।

আসাহুল্লা ছিলেন চট্টগ্রামের গোয়েন্দা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত। অমানুষিক নির্য্যাতন করার দুর্নাম ছিল তাঁর। ১৯৩১ সনের ৩০শে অক্টোবর চৌদ্দ-পনেরো বছরের কিশোর বালক হরিপদ ভট্টাচার্য্য খেলার মাঠে তাঁকে রিভলবারের গুলীতে চিরকালের মত তার স্বদেশীদের নিপীড়ন করা বন্ধ ক'রে দেন। বিচারে হরিপদর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।

ধলঘাটে চারজন পলাতক বিপ্লবী আছেন এক বাড়ীতে। সূর্য্য সেন, নির্ম্মল সেন, অপূর্ব্ব সেন ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার। ১৯৩২ সনের ১২ই জুন রাতে মিলিটারী ঘেরাও করে সেই বাড়ীটি। ক্যাপ্টেন ক্যামেরন মই বেয়ে উপরে উঠছিল। নির্ম্মল সেনের গুলীতে তার ইহলীলা সাঙ্গ হয়। তার পর দুই পক্ষেই গুলী বিনিময় চলে। বীর সৈনিক নির্ম্মল সেন ও অপূর্ব্ব সেন সংগ্রামে আত্মাহুতি দিয়ে গেলেন। সূর্য্য সেন প্রীতিলতাকে নিয়ে মিলিটারীর ব্যূহ ভেদ ক'রে পালিয়ে যান।

১৯৩২ সনের ২৪শে সেপ্টেম্বর রাত্রি প্রায় দশটায় প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদারের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রান্ত হয়। ক্লাব ঘরখানা তখন প্রায় চল্লিশ জন শ্বেতাঙ্গ নরনারীর নৃত্যগীতে মুখর। প্রীতিলতা সঙ্গীদের নিয়ে অলক্ষ্যে ঢুকে পড়েছেন সেই ঘরে। তাঁর আদেশে বোমা ও রিভলবার ছুটতে থাকল। ক্লাব ঘরের দুই দিক্ থেকে প্রায় আধ ঘণ্টা যাবৎ আক্রমণ চলে। সফলকাম প্রীতিলতা বন্ধুদের স্থান ত্যাগ করতে নির্দ্দেশ দিয়ে নিজে পটাসিয়াম সায়নাইড খেয়ে প্রাণ দিলেন।

নেতা সূর্য্য সেন তখন গৈরালাতে পলাতক। সঙ্গে আছেন কল্পনা দত্ত, ব্রজেন সেন প্রভৃতি। ১৯৩৩ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে মিলিটারী এসে ঘিরে ফেলে সেই বাড়ী। টের পেয়ে অন্ধকারে বাড়ী ছেড়ে সবাই বেরিয়ে এলেন। কল্পনা ও অন্য কয়েকজন অন্ধকারে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন। ওদিকে শিকারের সন্ধানে পুলিস একটা আলো-বোমা (illuminating bomb) ছুঁড়ে চারিদিক্ হঠাৎ আলো ক'রে দিয়ে বেয়নেট চার্জ্জ ক'রে বেতের জঙ্গলের মধ্যে বিপ্লবী বীর সূর্য্য সেনকে ও ব্রজেন সেনকে ধ'রে ফেলে।

কল্পনা দত্ত, তারকেশ্বর দস্তিদার এবং আরও কয়েক জন বিপ্লবী গহিরায় একটি বাড়ীতে আত্মগোপন ক'রে থাকেন। ১৯৩৩ সনের ১৯শে মে ভোরবেলায় মিলিটারী এসে বাড়ীটি ঘেরাও ক'রে অবিশ্রান্ত গুলী বর্ষণ করতে থাকে। বিপ্লবী পক্ষেরও গুলী চলে। এই অবস্থায় বিপ্লবী মনোরঞ্জন দত্ত এবং আশ্রয়দাতা পূর্ণ তালুকদার নিহত হন। বিপ্লবীদের গুলী সম্পূর্ণ ফুরিয়ে যাবার পরে সকলেই তাঁরা গ্রেপ্তার হন।

মাষ্টারদা সূর্য্য সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা

দত্তের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সেকেণ্ড সাপ্লিমেণ্টারী কেস হয়। মামলার বিচারে সূর্য্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসীর আদেশ এবং কল্পনা দত্তের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

১৯৩৪ সনের ১২ই জানুয়ারী ইংরেজের ফাঁসীর রজ্জুতে সর্ব্বাধিনায়ক মাষ্টারদার মহাজীবন অমর হয়ে রইল। সেদিন তাঁর ফাঁসীর সঙ্গী ছিলেন তাঁরই অনুগত কর্মী তারকেশ্বর দস্তিদার।

তখনও মাষ্টারদার ফাঁসী হ'তে কয়েকদিন বাকী আছে। এই ফাঁসীর প্রতিবাদ জানাতে ১৯৩৪ সনের ৭ই জানুয়ারী চারজন কিশোর বিপ্লবী এগিয়ে গেলেন শ্বেতাঙ্গদের ক্রিকেট খেলার পল্টন মাঠে। কিশোরদের হাতে অগ্নিগর্ভ অস্ত্র গর্জ্জন ক'রে উঠল, শুরু হ'ল সংঘর্ষ। সেখানেই প্রাণ দিলেন নিত্যগোপাল ভট্টাচার্য্য এবং হিমাংশু ভট্টাচার্য্য। ফাঁসীর হুকুম হয়ে গেল কৃষ্ণ চৌধুরী ও হরেন চক্রবর্ত্তীর।

মনুষ্যত্ব হারিয়েছিল ব'লে জাত স্বাধীনতা হারিয়েছিল। ভাবজগতে সেই মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলেন এক শতাব্দী ধ'রে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাংলার মনীষীরা। ভাবজগতের এই আলোড়নের সৃষ্টি ভারতীয় বিপ্লবের ত্রিশ বছরের ইতিহাস—১৯০৫ থেকে ১৯৩৫। বাংলার একশ' বছরের ইতিহাসে ভাবজগতের এই নবসৃষ্টিরও যেমন তুলনা কম, তেমনি জগতের কোন দেশের বিপ্লব-প্রচেষ্টার ইতিহাসেও এই ত্রিশ বছরের মতন অকাতরে জীবন বিলিয়ে দেওয়ার সমতুল্য কিছু দেখতে পাওয়া যায় না। এরই ভিতর ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সন পর্য্যন্ত ঝাঁকে ঝাঁকে বাংলার ছেলেমেয়েরা শিখিয়ে গেল কি ক'রে মরতে হয়, কি ক'রে বাঁচতে হয়; মরণের ভিতর দিয়ে কি ক'রে প্রাণ পেতে হয়। সেদিনের সংগৃহীত সেই পথের কড়িই জাতকে পৌঁছে দিল ১৯৪২-এ।

—•—

স্বর্গত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

শ্রীমনীষা রায়

জীবনের শেষ সীমানায় দাঁড়িয়ে অতীতের দিকে তাকিয়ে দেখি, কত উজ্জ্বল স্মৃতি তারার মত জীবনাকাশে জ্বল্ জ্বল্ করে ফুটে রয়েছে। এগুলি আমাদের ধন-ভাণ্ডার, শক্তির আধার। এর প্রভাবে নিজের দীনতা, রিক্ততা যেন দূর হয়, নূতন জীবন পাই। অতীত ঘটনার নীরব আলোচনায় মনে শান্তি আসে। অপূর্ব এক অনুভূতির স্পর্শ পাওয়া যায়।

এই রকমই একটি স্মৃতিরত্ন অন্তরের মণিকোঠায় সযত্নে যা রক্ষিত আছে তার পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। কিন্তু নিজের অক্ষমতার জন্যে, যা বলতে চাই তার কিছুই হয়ত পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করা হবে না। তবুও চেষ্টা, সে যুগের শিক্ষিত, প্রগতিশীল শুদ্ধাচারী একটি পরিবারের কার্যকলাপ, ঘটনাবলী যা প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল তাই বলব। ঘটনাবহুল বর্ণনা নয়, ঘটনাগুলি কিছু ধারাবাহিকও নয়। কিন্তু এর তাৎপর্য এই যে, এ থেকে বুঝতে পারি, সমাজ কিরূপ সামগ্রী লাভ করলে সমৃদ্ধিশালী হতে পারে।

পরমভক্তিভাজন স্বর্গত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের কথা কে না জানে। আন্দাজ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। এই সময়ে উপেন্দ্রবাবু সপরিবারে প্রায় প্রত্যেক বৎসরেই গিরিডিতে যেতেন স্থান-পরিবর্তনের জন্যে। বারগণ্ডার বহু পরিবারের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা হবার সুযোগ হ'ত। তাঁদের অমায়িক ব্যবহারে সকলেই আকৃষ্ট হতেন। যতদিন তাঁরা গিরিডিতে থাকতেন, আমাদের দিনগুলি যেন উৎসবের মধ্য দিয়ে কেটে যেত। উপেন্দ্রবাবুর শান্ত, সৌম্য, উন্নত চেহারা তার উপর তাঁর হাস্যকৌতুকপূর্ণ সরস গল্প আমাদের মুগ্ধ করত। তাঁর বাড়ীর সকলের সহজ সরল সাদাসিধে ব্যবহার গিরিডি পল্লীবাসীদের কাছে অতি নিবিড় আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। তাঁর মেয়েরা শহরবাসী, আর আমরা পাহাড়-জঙ্গলের মেয়ে। কিন্তু কি আশ্চর্য তাঁদের সরল স্বাভাবিক মেলামেশার ধরণ ছিল! আমরা মুগ্ধচিত্তে কি আগ্রহ সহকারে তাঁদের কাছে কাছে কাটাতাম!

উপেন্দ্রবাবু চিত্রকর। তিনি প্রায়ই উশ্রীনদীর ঝোলা-তারের পোলের কাছে নদীর ধারে তাঁর আঁকবার সরঞ্জামপত্র নিয়ে গিয়ে বসতেন প্রাকৃতিক চিত্র আঁকতে। আমরা সন্ধান পেয়ে দূর থেকে তাঁকে দেখতাম। মনে হ'ত যেন তপোবনে ঋষিমূর্তি—কি সুন্দর সে চেহারা! গৌরবর্ণ উন্নত ললাট প্রশস্ত বক্ষে সারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে যেন আলিঙ্গন করছেন। সে মূর্তি ভোলা যায় না।

ছোট-বড় সকলেরই আকর্ষণের স্থান ছিল উপেন্দ্রবাবুর বাড়ী। খুব বৃদ্ধদের বড় একটা দেখতাম না আমাদের সঙ্গে। হয়ত তাঁরা অন্ত কোনও সময়ে আসতেন। সপ্তাহে কয়েকটা দিন ঠিক করা ছিল, বিকাল তিনটা আন্দাজ, অল্পবয়স্ক মেয়েরা উপেন্দ্রবাবুর কাছে ব্রহ্মসঙ্গীত শিখতে আসত। মনে আছে একজন মধ্যবয়স্কা মহিলাও আসতেন—ইনি স্বর্গীয় পার্বতী দত্ত মহাশয়ের স্ত্রী। আমরা তাঁকে বেবী বেবুচুণের মা বলেই জানতাম। পুরাণ ব্রহ্মসঙ্গীত যা বিকৃত সুরে গীত হত, সেগুলোকে শুদ্ধ সুরে স্বরলিপির মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে অতি সহজ উপায়ে শিক্ষা দিতেন। একটি একটি করে সুর ধরে নিজে গেয়ে যেতেন এবং বেহালাও বাজাতেন, আর শিক্ষার্থীরা হারমনিয়মে বা এস্রাজে সেই সুর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বাজিয়ে স্বরলিপির সুরে প্রকাশ করত। এইরূপে একেকটি পদ বার বার করে গেয়ে বাজিয়ে শেখান হ'ত। শব্দের উচ্চারণ সম্বন্ধে খুব সজাগ ছিলেন। পরিষ্কার উচ্চারণ সঙ্গীতের অঙ্গ, এই কথা বলতেন তিনি। যুক্তাক্ষর গাইবার সময় যুক্ত অক্ষর দুটিকে দুই ভাগে ভাগ করে পরিষ্কার উচ্চারণ করতে শেখাতেন। পুরাণ গান যেমন "বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা" বা "দাঁড়াও আমার আঁখির আগে" ইত্যাদি তাঁর গলায় শুদ্ধ স্বরলিপির সুরে সুন্দর পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ পেত। শিখতে একটুও কষ্ট হ'ত না। কখনও কখনও একটি আরামকেদারায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় তিনি তন্ময় হয়ে সুরগুলি ভাঁজতেন ও আঙুলের ইঙ্গিতে তালের নির্দেশ দিতেন। মনে হ'ত সারা রাত তিনি কেন গান শেখান না। মধ্যে মধ্যে বেহালা বাজাতেন শুধু—সে মন-মাতান বেহালার টান আজও কানে যেন বাজে! এসব কি অমূল্য স্মৃতি!

একবার কিছুদিনের জন্যে উপেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে কলকাতায় আমার থাকবার সুযোগ হয়েছিল। গিরিডিতে তাঁদের সান্নিধ্যে এসে তাঁর মেয়ে টুনির সঙ্গে বেশ ভাব হওয়াতে একবার তাঁরা আগ্রহভরে আমাকে কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন। পরিবারের ভিতরে থেকে দেখেছিলাম এ পরিবারের মাধুর্য! পরিবারটি কিছু ছোট ছিল না। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের কি চমৎকার ব্যবহার! অবহেলা, স্বার্থপরতার স্থান নাই। সবাই পরস্পরের প্রতি ভালবাসায় ও সেবায় আনন্দে ভরপুর। শিশু থেকে আরম্ভ ক'রে বয়স্কদের সঙ্গে গৃহকর্তা ও কর্ত্রীর একটা সহজ স্বাভাবিক যোগ দেখেছি। কোথাও জোড়াতালি দেওয়া সম্পর্ক নয়। যেন একসূত্রে গাঁথা জমাট ভাব। যার যা প্রাপ্য সে তাই পেয়ে যাচ্ছে, কোথাও ফাঁক নেই। কি মিষ্টি ব্যবহার তাঁদের দু'জনের সকলেরই সঙ্গে! স্নেহ, শ্রদ্ধা, প্রীতির যেন আকর ছিল পরিবারটি। উপেন্দ্রবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রী দুইটি তুতু, বুলু তখন ক্ষুদ্র বালিকা। তারা দুইজন অতি আদরে-যত্নে-লালিত পালিত হ'ত। জ্যেঠামশাই-জ্যেঠিমার স্নেহের মধ্যে থেকে মাতার অভাববোধ ছিল না বেচারীদের। দেখেছি তাদের স্ফূর্তি ও আনন্দ। সন্ধ্যায় সঙ্গীত ও প্রার্থনার পর প্রায়ই তুতু-বুলুর নাচ-গান হ'ত। টুনি পিয়ানো বাজাত আর বালিকারা সুন্দর ভঙ্গিতে নৃত্য করত। কখনও কখনও উপেন্দ্রবাবু নিজে গান ধ'রে তাদের সঙ্গে যোগ দিতেন। শেষে জ্যেঠামশাইর প্রচুর আদর।

উপেন্দ্রবাবুর আরও অন্যান্য আত্মীয়—ভাই, ভগ্নী, ভাইপো, ভাইঝি, ভাগ্নী, ভাগিনেয় ইত্যাদি সকলের মিলনানন্দ দেখতাম। দেখতাম, আর প্রাণটা যেন শীতল হয়ে যেত। মনে হ'ত এঁরা কত লোককে ভালবাসেন। আমিও তাঁদের স্নেহ-যত্ন পেয়েছি মনে করলে মন উন্নত হয়ে ওঠে, মনে হয় এ রকম একজন উচ্চস্তরের ব্যক্তির সংস্পর্শে আমার আসবার সৌভাগ্য হয়েছিল। কলকাতার সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ীতে তখন এঁরা ছিলেন। এঁদের কাছে থেকে কত আনন্দ পেয়েছি। আমার বাবা, মা, দাদাদের এঁরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন। এঁদের কাছে থেকে কত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যাবার সুযোগ আমার হয়েছিল। মন্দিরের উপাসনাতে মেয়েদের সঙ্গে যেতাম। ১১ই মাঘের গান অভ্যাস করার বৈঠক বসত —ছেলেমেয়েদের সংগে উপেন্দ্রবাবু নিজে মেতে যেতেন উৎসবের আয়োজনে। ..ই মাঘের প্রত্যুষের সেই চিরপরিচিত তাঁর নিজের রচিত গানটি—"জাগো পুরবাসী ভগবত-প্রেম পিয়াসী" কি জমকাল গম্ভীর অথচ মধুর ধ্বনিতে তাঁর পরিচালনায় গীত হ'ত, সঙ্গে থাকত তাঁর নিজ বেহালার মধুর স্বর। কি অপূর্ব সেই সঙ্গীত! মন্দিরের সকলকে মাতিয়ে দিত এবং তার পর ঊর্দ্ধে কোন্ দেশে গিয়ে যেন উপনীত হ'ত সে সঙ্গীত। মাঘোৎসবের এই স্মৃতি আজও অতি স্পষ্ট স্বচ্ছ হয়ে মনে জাগে।

ভক্তিভাজন উপেন্দ্রবাবু একাধারে চিত্রকর, সঙ্গীতজ্ঞ, লেখক ও সাহিত্যিক ছিলেন। বিশেষ করে শিশুসাহিত্য তাঁর অপূর্ব সৃষ্টি। এই বিশিষ্ট প্রতিভা পুত্রকন্যাদেরও দান করে গেলেন। যে সব গুণ মনুষ্যজীবনকে সার্থক করে, সে সব গুণের তিনি অধিকারী ছিলেন। যে সমাজে, যে দেশে এমন মানব জন্মলাভ করেন সে সমাজ, সে দেশ ধন্য। তাঁর অমূল্য অবদানের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। এই উপলক্ষে আমি অবনত মস্তকে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাই।

পাঠশালা

চেঙ্গিজ খানের দেশ

মঙ্গোলিয়ার দশ লক্ষের মত অধিবাসীর কাছে শারীরিক স্বাস্থ্য ও শারীর-শক্তির চেয়ে বেশী কাম্য আর কিছু নেই। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে
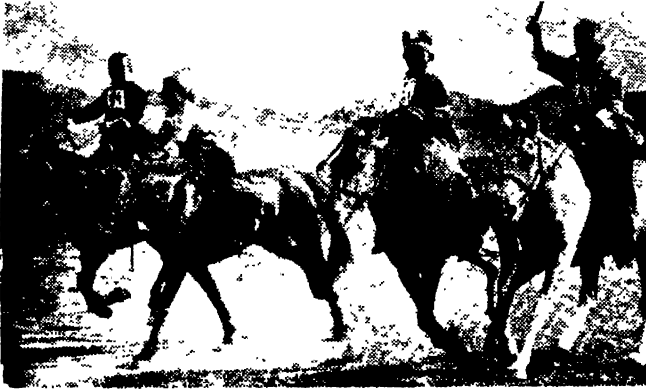
মঙ্গোলিয়ায় ছেলেবুড়ো স্ত্রীপুরুষের ঘোড়দৌড়

মঙ্গোলিয়ার কুস্তি প্রতিযোগিতা

পৃথিবীর ইতিহাসে স্থান লাভের পর থেকে এই ভাবেই তাদের চ'লে আসছে।

মঙ্গোলীয় সোভিয়েট রিপাব্লিকে প্রতিবৎসর 'জাতীয় দিবসে' যে উৎসবাদির আয়োজন হয়, তার মধ্যে খেলাধুলা ও নানাপ্রকার ব্যায়ামের কসরৎ দেখানোর ব্যবস্থা থাকে আর সব-কিছুর চেয়ে বেশী। সমস্ত দেশ জুড়ে সেদিন এইসব নিয়ে প্রতিযোগিতার ধুম প'ড়ে যায়। রুগ্ন এবং অশীতিপর বৃদ্ধ ব্যক্তিরা ভিন্ন স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকে এই সব প্রতিযোগিতার কোনো-না-কোনো একটিতে যোগ দেয়।

ছেলেমেয়েদের বাল্যকাল থেকেই কুস্তি লড়া আর ঘোড়ায় চড়া শেখানো হয়। সমস্ত রকম শরীর-চর্চ্চার মধ্যে এই দু'টির জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশী। ক্ষুদে ক্ষুদে বাচ্চাদের সঙ্গে দাড়িওয়ালা বৃদ্ধদের প্রতিযোগিতায় ভিড়-করা দর্শকদের শিস্ এবং হাততালির শব্দে চারদিক্ মুখরিত হতে থাকে।

মঙ্গোলীয় স্কুলগুলির শিক্ষাব্যবস্থাতে শরীর-চর্চ্চার অত্যন্ত কড়াকড়ি আর এতে সে-দেশের লোকেরা লাভবানও হয়েছে প্রচুর। জনগণের স্বাস্থ্য এতই ভাল যে, ব্যাধি জিনিষটা যে কি—তারা প্রায় জানেই না বলা যেতে পারে, আর সেদেশের বৃদ্ধবৃদ্ধারাও কারও গলগ্রহ হয়ে থাকে না, পরমায়ু শেষ হওয়ার দিন পর্য্যন্ত তারা যথানিয়মে তাদের সমস্ত প্রাত্যহিক কর্ত্তব্যগুলি ক'রে যায়।

মঙ্গোলিয়া কৃষিপ্রধান দেশ, কোনোরকমের যন্ত্রশিল্প সেদেশে নেই বললেই হয়। যে অনুর্ব্বর মাটির থেকে ফসল উৎপাদন করতে হয় সেদেশের লোকদের, তাতে তাদের শক্ত-সমর্থ না হয়ে উপায় নেই। স্বাস্থ্যে, শারীরিক শক্তিতে এবং সামর্থ্যে চেঙ্গিজ খানের দেশের এই লোকদের জুড়ি পৃথিবীতে নেই।

শ্রুতি-অগোচর ধ্বনি

যে ধ্বনির তরঙ্গ সেকেণ্ডে ১৬ থেকে ১৬০০ বার স্পন্দিত হয়, সেই ধ্বনিই সাধারণতঃ মানুষের শ্রুতিগোচর হয়ে থাকে। এর চেয়ে দ্রুততর স্পন্দনের ধ্বনিকে তাই বলা যেতে পারে শ্রুতি-অগোচর ধ্বনি, ইংরেজীতে যাকে বলা হয় supersonic sound। এই যে শব্দ আমাদের কাছে শব্দিত হয় না, ইউরোপ আমেরিকার বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে তাদের উৎপন্ন ক'রে তাদের শক্তিকে মানুষের কাজে লাগানো যায় কি না তার পরীক্ষা করছেন।

সেকেণ্ডে ২৫০০ কোটি বার স্পন্দিত হয় এমন শ্রুতি-অগোচর ধ্বনি উপরি-উক্ত উপায়ে তাঁর গবেষণাগারে উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন ডক্টর এডোয়ার্ড জ্যাকবসেন নামীয় একজন মার্কিন বিজ্ঞানী। এই রকমের দ্রুতস্পন্দিত ধ্বনির মধ্যে যে কি পরিমাণ শক্তি নিহিত থাকতে পারে তা কতকটা অনুমান করা সম্ভব হবে, যদি মনে রাখা যায় যে, কারুসোর কণ্ঠসঙ্গীতের ধ্বনি যখন সেকেণ্ডে ১২০০ বার স্পন্দিত হ'ত তখন কাচের পানপাত্রে চিড় ধ'রে যেত।

বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এই রকম ধ্বনির সাহায্যে শক্ত জিনিষে ফুটো করা যায়, ঘন কুয়াসাকে হালকা করা যায়, যে মাংসকে সিদ্ধ ক'রে নরম করা যাচ্ছে না তাকে নরম করা যায়।

কিন্তু মানুষের আরও বেশী প্রয়োজনে একে প্রয়োগ করা হচ্ছে চিকিৎসার ক্ষেত্রে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাঁপে এমনতর পক্ষাঘাত রোগে এই ধ্বনি তরঙ্গের চিকিৎসা অত্যন্ত ফলপ্রদ হয়েছে। মস্তিষ্কের যে-সমস্ত রোগাক্রান্ত কোষকে নির্ম্মূল করবার জন্যে এতকাল অস্ত্রোপচার করা হ'ত, এবং যা করতে গিয়ে কতগুলি সুস্থ কোষ বিনষ্ট হ'ত, শ্রুতি-অগোচর ধ্বনি-তরঙ্গ সুস্থ কোষগুলির কোনো ক্ষতি না ক'রে সেই রকমের রোগাক্রান্ত কোষগুলিকে ধ্বংস ক'রে দিতে পারে তা দেখা গেছে।

ক্যানসার রোগের চিকিৎসাতেও 'এক্স-রে'র সঙ্গে শ্রুতি-অগোচর ধ্বনি-তরঙ্গ প্রয়োগ ক'রে প্রচুর সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা হীরেতে আলোর প্রতিফলন নিয়ে গবেষণা করতে থাকুন। সেটাও একটা বড় কাজ সন্দেহ নেই। অন্তত মন্দ কাজ কিছু নয়।

কথাটা বলছি এইজন্যে যে, শ্রুতি-অগোচর ধ্বনিকে মন্দ কাজেও যে লাগানো যেতে পারে, পরীক্ষার ফলে তাও নিরূপিত হয়েছে। খুব কাছে থেকে এই তরঙ্গ প্রয়োগ ক'রে একটা লোককে প্রাণে মেরে ফেলা যায়, আর দু'শ গজ থেকে তার হাত-পা অসাড় ক'রে দেওয়া যায়।

নূতন ধরণের বিমান-বন্দর

ছবিটি দেখলে কি মনে হয়? বিমান-বন্দরের ছবি ব'লে মনে হয় কি? আসলে এটি তাই। একটু লক্ষ্য করলেই এরোপ্লেন পাঁচটিকে এরোপ্লেন ব'লে চিনতে পারবেন।

ক্যানসার কি বংশগত ব্যাধি ?

না। পেন্সিলভ্যানিয়ার 'স্কুল অব মেডিসিন'-এর বিজ্ঞানীরা তাই বলছেন। আটবৎসর ধ'রে যত রকমের পরীক্ষা করা সম্ভব তা ক'রে এঁরা বলেছেন, 'বুকের ক্যানসার নিয়ে যে রোগীরা চিকিৎসার জন্যে আসেন তাঁদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীদের মধ্যে বুক বা দেহের অন্যত্র ক্যানসারের বাহুল্য কোথাও আমরা লক্ষ্য করি নি।'

চীনা এবং জাপানী ভাষা কি সমগোত্রীয় ?

একেবারেই না। দু'টি ভাষার মধ্যে একমাত্র সাদৃশ্য-সূচক জিনিষ হচ্ছে তাদের লিপিপদ্ধতি। মনে হয়, এক সময় জাপানীদের লিপি ব'লে কিছু ছিল না, আর সেই জন্যেই, বহু শতাব্দী আগের কথা এটা, প্রতিবেশী চীনাদের লিপিপদ্ধতিকে নিজেদের কাজে তারা প্রয়োগ করতে শুরু করে। পাশাপাশি দুটো দেশের পৃথক ভাষা পরস্পরের কাছ থেকে জ্ঞানে-অজ্ঞানে কিছু কিছু গ্রহণ ক'রে থাকে। সেটুকু বাদ দিলে, চীনা এবং জাপানী এই দু'টি ভাষার মধ্যে শব্দগত, ধাতুগত বা গঠনগত কোনোই সাদৃশ্য নেই।

মাথা কেন ধরে ?

শতকরা নব্বইটি মাথা ধরার কারণ হচ্ছে, মাথা ও ঘাড়ের মাংসপেশীর উপর কোনরকম অস্বাভাবিক চাপ যাতে পেশী টাটিয়ে ওঠে, ও মাথার মধ্যেকার রক্তবাহী শিরাউপশিরার স্ফীতি। আর এই কারণগুলোর মূলে থাকে ঘরে যথেষ্ট হাওয়া চলাচলের অভাব, জ্বর, ক্ষুধা কিংবা, সবচেয়ে বেশী যে জন্যে মাথা ধরে, একটা কোনো কাজের মধ্যে অনেকক্ষণ মগ্ন হয়ে থাকা।

নূতন ধরণের বিমান বন্দর

ষড়্‌ধা

সান ফ্রান্সিস্কোর ইণ্টারন্যাশনাল এয়ার পোর্টে ইউনাইটেড এয়ার লাইনসের ষ্টেশন এটা। ষ্টেশন থেকে পাঁচজোড়া চারদিক্ ঢাকা পুলের মত করিডর পাঁচটি এয়ার প্লেনের সঙ্গে গিয়ে লগ্ন হয়। এক সঙ্গে পাঁচটি প্লেনের যাত্রীরা এদের সাহায্যে ওঠানামা করতে পারেন। করিডরগুলি কয়েকটি অংশে বিভক্ত খোলে তৈরি, একটি খোল আর একটির ভিতর ঢুকে যেতে পারে ব'লে এগুলিকে প্রয়োজন মত লম্বায় বাড়ানো কমানো যায়।

ষড়্‌ধা

এঁরা ছ'জন রয়াল এয়ার ফোর্সের প্যারাশুট ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষক, হাত ধরাধরি ও পা জড়াজড়ি ক'রে এক সঙ্গে প্যারাশুট নিয়ে লাফিয়েছিলেন। ৯০০০ ফুট উঁচু থেকে যখন তাঁরা ঐভাবে লাফিয়েছিলেন তখনকার এই ছবি। ৭০০০ ফুট উঁচুতে থাকতে তাঁরা পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। ২০০০ ফুট উঁচুতে, তাঁরা যখন পরস্পর থেকে বেশ অনেকটাই বিচ্ছিন্ন, তখন তাঁরা তাঁদের প্যারাশুটগুলো খুলে নির্ব্বিঘ্নে মাটিতে নামলেন।
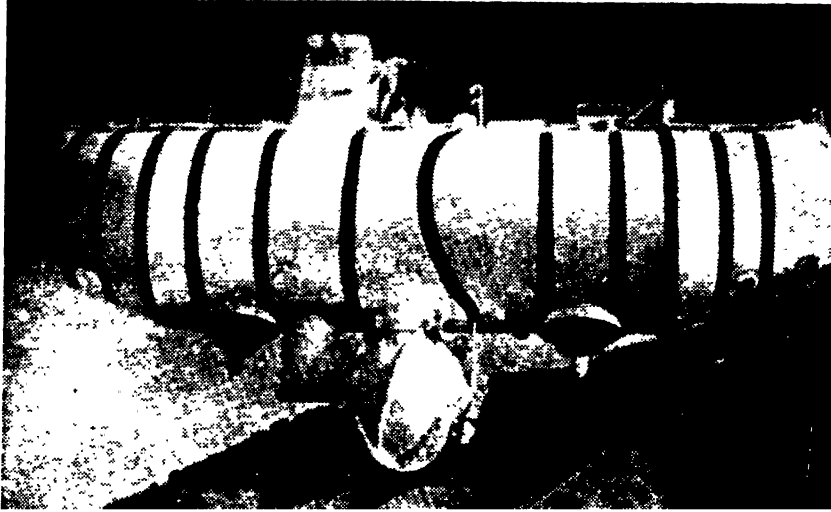
ব্যাথিস্কেপ

জলের সাত মাইল নীচে

সমুদ্রতলের তথ্যানুসন্ধানের জন্যে বিজ্ঞানী জাক্‌স্ পিকার্ড যে ডুবো নৌকাটি ব্যবহার করেন তার ছবি সঙ্গে দেওয়া হ'ল। এই ডুবো নৌকা, যার নাম ব্যাথিস্কেপ, এতে চ'ড়ে পিকার্ড ৩৫০০০ ফুট গভীর সমুদ্রতল পর্য্যবেক্ষণ ক'রে এসেছেন। মনে রাখবেন, এভারেষ্টের উচ্চতা ৩০,০০০ ফুটেরও কম।

সমুদ্রের এত গভীরতার জায়গায় কি প্রাণের অস্তিত্ব আছে? পিকার্ড ফিরে এসে বলছেন, বেশ বেশী রকমই আছে। বিবর্ত্তনের ধারার পরিণতির পথে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে এমনতর মেরুদণ্ডী অর্থাৎ শিরদাঁড়া-ওয়ালা মাছ সেখানে তিনি দেখে এসেছেন।

সাত মাইল জলের নীচে যে কি নীরন্ধ্র অন্ধকার তা সহজেই অনুমেয়। ব্যাথিস্কেপের ফ্লাড লাইট থেকে সেখানে প্রথম আলোকপাত হ'ল বলা চলে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, যে মাছগুলোকে পিকার্ড সেখানে দেখেছেন তাদের মাথার উপরে দু'টি দু'টি ক'রে গোলাকার চোখ আছে। কোন্ প্রয়োজনে এদের চোখ আছে? আলো যেখানে নেই, দৃষ্টিও সেখানে চলতে পারে না। হয়ত সমুদ্রজলে যে ফস্‌ফরেসেন্স জলতে দেখা যায়, তারই আলোতে এরা দেখে।

ক্লান্ত মানুষ চোখ রগড়ায় কেন?

মানুষ ক্লান্ত বোধ করে তখনই, যখন কোনো শ্রমসাধ্য কাজের পরে বা কর্ম্মব্যস্ত দিনের শেষে তার শরীর-যন্ত্রের নানা প্রকার ক্রিয়াকলাপের মধ্যে মন্থরতা আসে। নিঃশ্বাস ধীরে বয়, হৃৎস্পন্দনের গতি কমে যায়, শরীরের বিভিন্ন গ্ল্যাণ্ড ইত্যাদিও যেন ঝিমিয়ে পড়ে। এদের মধ্যে একটি হচ্ছে, চোখের ছোট ছোট দু'টি গ্ল্যাণ্ড, যাদের কাজ, আর্দ্রতার নিঃসরণে অক্ষিগোলক দুটিকে ভিজিয়ে রাখা। এই আর্দ্রতা একটু কমলেই চোখের মধ্যে জ্বালার মত অনুভূতি একটু হয়, চোখ করকর করে, আর মানুষ তখন চোখ রগড়ায়।

আফ্রিকার বৈশিষ্ট্য

পৃথিবীর অন্য মহাদেশগুলির তুলনায় আফ্রিকা খনিজ সম্পদে অনেক বেশী সমৃদ্ধ। স্বর্ণ, হীরক, তাম্র, ক্রোম, কোবাল্ট, ইউরেনিয়ম, লৌহ, অপরিমেয় আছে আফ্রিকায়। আরও যে কতরকমের খনিজ দ্রব্য আছে আফ্রিকায় তার কোনো হিসাব নেই।

হৃৎস্পন্দন দ্রুত হওয়া মানেই কি হৃদ্‌রোগ?

বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই না। যাঁরা অল্পতেই বিচলিত হন, আর যাঁদের বিচলিত হবার কারণ ঘটেছে তাঁদের হৃৎস্পন্দন দ্রুত হওয়াটা একটা সাধারণ ঘটনা। অত্যন্ত বেশী ক্লান্তি, বেশী কফি, চা বা মদ্যপান, বেশী তাম্রকূট সেবনের ফলেও হৃৎস্পন্দন দ্রুত হতে পারে।

দাম্পত্য-কলহে চৈব

বহুদর্শীদের মতে:

১। বহুকাল ধ'রে রাগ বা ঐ জাতীয় মনোভাব মনে পুষে রাখার চেয়ে ঝগড়া ক'রে ফেলা ঢের ভাল। কেবল দেখবেন, সেই ঝগড়াতে দাম্পত্য সম্পর্কের অবমাননা না হয়, আর কোনো অবস্থাতেই, আপনার সঙ্গে আপনার স্বামী বা স্ত্রীর সম্পর্কটা যে ভালবাসার সম্পর্ক, সেটা ভুলবেন না।

২। ঝগড়াটা অন্যদের সামনে, বিশেষতঃ সন্তানসন্ততিদের সামনে করবেন না। অবশ্য নিতান্ত নিরুপায় হ'লে তাও করবেন।

৩। ঝগড়াটা যখন বেশ দমে চলেছে তখন হঠাৎ চুপ ক'রে যাবেন না। তাতে শান্তির চেয়ে অশান্তির সৃষ্টি হয়ত বেশী হবে।

৪। যত খুশি গুছিয়ে ঝগড়া করুন, কিন্তু এমন একটিও বাক্য ব্যবহার করবেন না যাতে আপনার নির্ম্মমতা প্রকাশ পায়। হয়ত দু'ঘা লাগিয়ে দিলে তার চেয়ে কম আঘাত করা হবে।

৫। অন্যপক্ষ যখন হার মানছে, তখন তাকে আরও বেশী হার মানাবার জন্যে কথা বাড়াবেন না।

৬। ঝগড়ার মধ্যে যখন অন্যপক্ষ কিছু একটা বলছে, বা কোনো একটা যুক্তি খাড়া করবার চেষ্টা করছে, তখন সেটা তাকে করতে দেবেন, মাঝখানে বাধা দেবেন না।

৭। ঝগড়া না মিটে যাওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই ঘুমোতে যাবেন না। দরকার হ'লে সমস্ত রাত জেগে থাকবেন, হয়ত তার দরকার নাও হতে পারে।

৮। কোনো অবস্থাতেই স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে ঝগড়া মিটিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন না।

সবই ত বুঝলাম। আমরা বহুদর্শী নয়, কিন্তু ভাবছি, এত রকমের আটঘাট বেঁধে ঝগড়া করা সম্ভব যদিও বা হয়, ত সেটা কিরকমের ঝগড়া হবে।

হলের মধ্যে ফুটবল

গতবৎসর শীতকালে আমেরিকার আটলান্টিক সিটির হাইস্কুলগুলির ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতা হয় সেখানকার টাউনহলের মধ্যে। ৩৬০ ফুট লম্বা ও ৩০০ ফুট চওড়া এই হলটির মেঝে ঢেকে দেওয়া হয় চার ইঞ্চি পুরু মাটি দিয়ে। হলটির ১৩৭ ফুট উঁচু ছাত যার ভিতরে আমাদের নিউ সেক্রেটেরিয়েট বিল্ডিংটির স্থান হয়, খেলোয়াড়দের উঁচুর দিকে কিক্ করা বলের কোনো অসুবিধা ঘটায় নি।
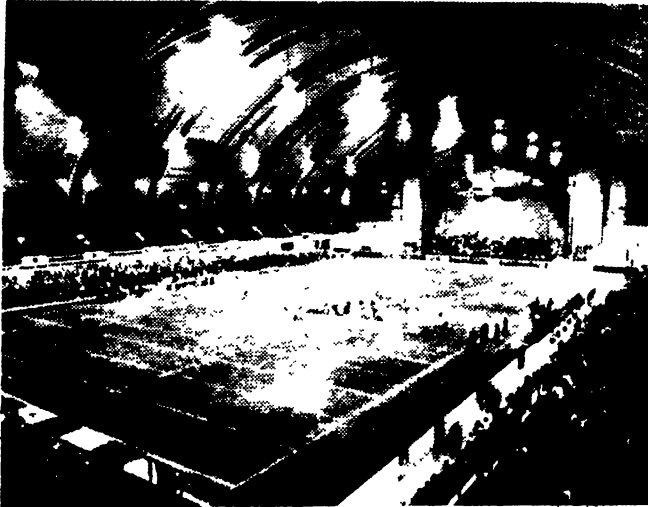
হলের মধ্যে ফুটবল

গেলার হিসাব

খাদ্য, পানীয়, বা মুখের লালানিঃসরণ মানুষ কতবার গেলে? এর উত্তর, গড়পড়তা হিসাবে:

মুখের মধ্যে পাঁচঘণ্টায় ৩৮ বার।
জাগ্রত অবস্থায় বিশ্রামের সময় ঘণ্টায় ৩১ বার।
পড়াশোনা করার সময় ঘণ্টায় ৩৪ বার।
খাওয়ার সময় পাঁচ মিনিটে ২৫ বার।

আত্মরক্ষার প্রস্তুতি

এর কতটা প্রচার (প্রোপাগাণ্ডা) আর কতটা সত্যি তা অবশ্য বোঝা শক্ত, তবে সম্প্রতি রুশীয় সৈন্যবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার দলের একজন অধিনায়ক রেডষ্টার নামক তাঁদের একটি কাগজে লিখেছেন: পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহতাকে অনেক বেশী বাড়িয়ে প্রচার করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য, অন্য দেশগুলিকে ভয় দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে, blackmail ক'রে নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে আনা। কিন্তু তাঁদের এই অপ-প্রচার সোভিয়েটের জনগণ সম্বন্ধে কার্য্যকর হবে না, কেননা তারা সুনিয়মিত ভাবে আত্মরক্ষার শিক্ষা পেয়ে এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে, পারমাণবিক আক্রমণ সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো ভয়-ডর আর নেই।

আত্মরক্ষার প্রস্তুতি খুবই ভাল জিনিষ, কিন্তু সেইসঙ্গে ভয়-ডরও একটু থাকলে ভাল হ'ত না কি?

বৈদ্যুতিক তালা

আপনার বাড়ীর সদর দরজার তালার চাবি পকেটে নিয়ে আপনাকে ঘুরতে হয় না, যদি সুইডেনে তৈরি এই বৈদ্যুতিক তালা একটি সংগ্রহ ক'রে আপনি দরজায় লাগিয়ে নিতে পারেন। এই তালার কাজ হয় বৈদ্যুতিক শক্তিতে। আপনার নিজের নির্বাচিত পাঁচটি সংখ্যা পর পর টিপে ডায়াল করলে তালা খুলবে, আর কিছুতেই খুলবে না। যদি আপনার কখনো সন্দেহ হয় যে, আপনি কোন্ সংখ্যার পর কোন্ সংখ্যা টিপছেন সেটা হয়ত কেউ জেনে গিয়েছে, ত আপনি সংখ্যাগুলির পারম্পর্য্য বদলে নিতে পারেন, ডায়াল থেকে যে তারগুলি আপনার বাড়ীর ভিতরে গিয়েছে তাদের প্লাগগুলিকে একটু এদিক্-সেদিক্ ক'রে সাজিয়ে।
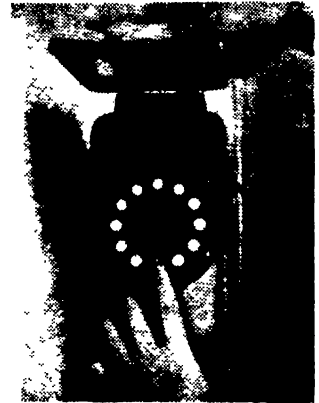
বৈদ্যুতিক তালা

হাওয়ার কুশন

ইংলণ্ডের যে রাস্তা দিয়ে ছবির ঐ ট্রাকটি চলছে সেটি উঁচুনীচু অসমান। তাতে ট্রাকের লোকদের খানিকটা ঝাঁকানি খেতে হয়

হাওয়ার কুশন

পারে, কিন্তু স্লেজ জাতীয় যে চাকাহীন যানটিকে ট্রাকটা টেনে নিয়ে চলেছে তার আরোহীর গায়ে একটুও ঝাঁকানি বা দোলা লাগবে না। এর কারণ স্লেজটি ঠিক রাস্তার উপর দিয়ে চলছে না, তার আর অসমান রাস্তাটার মধ্যে আছে একটি হাওয়ার কুশন। এই কুশন তৈরি করছে দু'টি পাখা আর হাওয়া ধ'রে রাখবার একটি পর্দা। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ব্যক্তিদের স্ট্রেচার তাদের ঝাঁকানি না খাইয়ে অসমান জমি বা রাস্তার উপর দিয়ে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে এই ব্যবস্থা।

শহুরে ব্যাধি

পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, নিউ ইয়র্ক শহরে (শহরতলি বাদ দিয়ে) প্রতি পাঁচজন মানুষের মধ্যে চারজনের মনের স্বাস্থ্য স্বাভাবিক নয়, এবং পাঁচজনের মধ্যে একজনকে নিঃসন্দেহে মানসিক পীড়াগ্রস্ত বলা যেতে পারে। আরও যা জানা গেছে তার মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য: বিত্তবানদের চেয়ে বিত্তহীনদের মধ্যে মানসিক রোগের প্রকোপ বেশী। এই রোগগ্রস্ত বিবাহিত স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সংখ্যার অনুপাতের পার্থক্য বিশেষ নেই, কিন্তু অবিবাহিত পুরুষরা অবিবাহিতা স্ত্রীলোকদের চেয়ে এই রোগে ভোগে বেশী। সবচেয়ে বেশী ভোগে যাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে তারা, স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে।

মনস্তত্ত্ববিদ্ বিশেষজ্ঞদের মতে পৃথিবীর সমস্ত বড় শহরগুলির এই একই অবস্থা। এইসব শহরে প্রায় সমস্ত অধিবাসীরাই একটু যেন কেমনধারা। একটু অস্বাভাবিক হওয়াই যেন শহুরে মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক।

শহর জিনিষটাই কি তা হ'লে অস্বাভাবিক? বোধ হয় তাই। শহরগুলিকে তুলে দেওয়া যায় না? মানুষ ফিরে যেতে পারে না শান্ত-স্নিগ্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে পল্লীতে পল্লীতে?

এদেশে এক শতাব্দীর মধ্যে হবে কি?

আমেরিকার নিউ জার্সির লিণ্ডেন শহরে খেলার মাঠে গ্রীষ্মকালে দশ সপ্তাহের জন্যে ছেলেমেয়েদের সাঁতার শেখা ও সাঁতার কাটার ব্যবস্থা করা হয় চলমান সুইমিং পুলের সাহায্যে। ইস্পাতে ও জলে-নষ্ট-হয় না এমন কাঠের তৈরি, দৈর্ঘ্যে ২০ ফুট ও প্রস্থে ৮ ফুট এই সুইমিং পুল মোটরট্রাকে বসিয়ে নিয়ে আসা হয় খেলার মাঠে। সেইসঙ্গে একটি মোটরভ্যান চ'লে আসে ব্যায়ামের নানা উপকরণ নিয়ে। ভ্যানটিতে ছেলেমেয়েরা কাপড় ছাড়ে, বদলায়। একদল ছেলেমেয়ে যখন সাঁতার শেখে, সাঁতার কাটে, আর একদল নানা রকমের ব্যায়াম নিয়ে মেতে থাকে।

মালপত্রের ঘোরাঘুরি

অধিকাংশ বিমানবন্দরে মালপত্র বুঝে নেবার জন্যে যাত্রীদের ঘোরাঘুরি করতে হয়। সান্ ফ্রান্‌সিস্কো'র ইণ্টারন্যাশনাল এয়ার পোর্টে, ইউ-নাইটেড এয়ার লাইন্‌সের যাত্রীদের সহজে ওঠানামা করবার একটি নূতন ধরণের ব্যবস্থার কথা পূর্ব্বে আমরা বলেছি। যাত্রীদের সুবিধার জন্যে এটিও তাঁদেরই আর একটি অভিনব ব্যবস্থা। আপনার মালপত্রের খোঁজে আপনি ঘুরবেন না, আপনার খোঁজে আপনার মালপত্র ঘুরবে।

মালপত্রের ঘোরাঘুরি

সবার উপরে

সবচেয়ে দ্রুতগামী পশু: চিতাবাঘ। প্রয়োজন হ'লে কতকটা পথ ঘণ্টায় ৮৪ মাইল বেগে এরা ছুটতে পারে।

সবচেয়ে দ্রুতগামী মাছ: সোর্ডফিশ। ঘণ্টায় ৫৭ মাইল পর্য্যন্ত উঠতে পারে এদের গতিবেগ।

সবচেয়ে দ্রুত বেড়েওঠা গাছ, আফ্রিকার উগাণ্ডায় একজাতীয় ইউকালিপ্টাস দু'বৎসরে ৪৫ ফুট বাড়ে, দেখা গেছে।

সবচেয়ে গতিশীল ট্রেন: ফরাসীদেশের দু'টি বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন ১৯৫৫ সালে এক শ টন মাল-বোঝাই তিনটি ওয়াগন টেনে নিয়ে ঘণ্টায় ২০৫ মাইলেরও বেশী বেগে চলেছিল অন্ততঃ সওয়া মাইল রাস্তা।

সবচেয়ে দ্রুতগামী বাষ্পীয় ইঞ্জিন: ব্রিটেনের মালার্ড ইঞ্জিন, যা ২৪০

ইজিচেয়ারে ব'সে মাছধরা

টন ভারবাহী কোচ টেনে ১৯৩৮-এর জুলাই মাসে নিজের গতিবেগ ঘণ্টায় ১২৬ মাইল পর্য্যন্ত তুলেছিল।

সবচেয়ে গতিশীল লিফ্‌ট্‌: দেখতে পাবেন নিউইয়র্কের আর-সি-এ বিল্ডিংএ, এরা ঘণ্টায় ১৬ মাইল বেগে ওঠানামা করে।

সবচেয়ে দ্রুতগামী জলযান: ব্রিটেনের ডোনাল্ড ক্যাম্পবেল ১৯৫৬ সনের ১৯ই সেপ্টেম্বর তাঁর টার্কোইঞ্জিনওয়ালা নৌকাটিকে ঘণ্টায় ২৮৬ মাইল বেগে চালিয়েছিলেন।

সবচেয়ে দ্রুতগামী স্থলযান: লেঃ কর্ণেল জন্ এল ষ্ট্যাপ ১৯ মার্চ্চ ১৯৫৪ সনে তাঁর রকেট-শ্লেজের গতিবেগ ঘণ্টায় ৬৩২ মাইল পর্য্যন্ত তুলেছিলেন। চাকাওয়ালা যানের সর্ব্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৪০৪'৬০ মাইল পর্য্যন্ত তুলেছিলেন আমেরিকার মিকি টম্‌সন, ১৯৬০ সনের ৯ সেপ্টেম্বর তারিখে।

কচ্ছপের গতিবেগ: নানারকম প্রলোভনের মুখেও মিনিটে ৫ গজের বেশী ওঠে না।

শামুকের গতিবেগ: ঘণ্টায় ২৩ ইঞ্চি থেকে ৫৫ গজ পর্য্যন্ত এদের দৌড়।

সবচেয়ে উঁচু সমুদ্রতরঙ্গ: ১৯৩৩ সনের ৬,৭ ফেব্রুয়ারীতে রামাপো নামক একটি আমেরিকান জাহাজ ম্যানিলা থেকে সান্ ডিয়েগো যাবার পথে ভীষণ ঝড়ের মধ্যে পড়ে। বায়ুর গতি ছিল ঘণ্টায় ৭৮ মাইলেরও কিছু বেশী। সেই ঝড়ে সমুদ্রে যে তরঙ্গ ওঠে, জাহাজ থেকে তার উচ্চতার মাপ নেওয়া হয়। এক-একটি তরঙ্গ ১১২ ফুট পর্য্যন্ত উঁচু হয়েছিল।

পাখীদের সবচেয়ে লম্বা ওড়ার পাল্লা: একটি এ্যালবেট্রস জাতীয় পাখী ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের মিডওয়ে এ্যাটলে একটানা উড়ে গিয়েছিল। জায়গা দু'টির ব্যবধান ৪,১২০ মাইল।

রেলপথের সবচেয়ে লম্বা সুড়ঙ্গ: আল্পস্ পর্ব্বতের নীচে দিয়ে কেটে নিয়ে যাওয়া এই সুড়ঙ্গটির দৈর্ঘ্য ১২ মাইল ১,৬৭৭ ফুট। ১৯২২ সনে এর নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়। ইটালীর সঙ্গে সুইজ'রল্যাণ্ডকে রেলপথের সাহায্যে জুড়েছে এই সুড়ঙ্গ।

সাধারণ চলাচলের পথের সবচেয়ে লম্বা সুড়ঙ্গ: এটির নাম কানমন সুড়ঙ্গ। জাপানের হোন্‌শু থেকে এই ৬.০১ মাইল লম্বা সুড়ঙ্গটি চ'লে গিয়েছে কিউশু দ্বীপে। ১৯৫৮ সনে এর নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়েছে।

কংক্রিটের তৈরী সবচেয়ে বড় বাঁধ, যা আবার কংক্রিটের বৃহত্তম স্থাপত্য: এটি হচ্ছে আমেরিকার কলম্বিয়া নদীর গ্রাণ্ড্ কুলী (Grand Coulee) ড্যাম। ৪,১৭৩ ফুট লম্বা ও ৫৫০ ফুট উঁচু এই ড্যামটির নির্ম্মাণ কার্য্য ১৯৪২ সালে শেষ হয়। এতে আছে এক কোটি পাঁচ লক্ষ পঁচাশি হাজার বর্গ গজ পরিমাণ কংক্রিট, যার ওজন দু'কোটি ষোল লক্ষ টন। এর বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্রে সাড়ে বারো লক্ষ কিলোয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই ধরণের বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্রের মধ্যেও পৃথিবীতে এইটি বৃহত্তম।

সবচেয়ে গভীর গর্ত্ত: আমেরিকার টেক্সাসে তেলের সন্ধানে ১৯৫৮ সালে কলের সাহায্যে যে গর্ত্তটি খোঁড়া হয় তার গভীরতা ছিল ২৫,৩৪০ ফুট (৪'৮ মাইল)। এটি খুঁড়তে সময় লেগেছিল ৭৩২ দিন এবং খরচ হয়েছিল ত্রিশ লক্ষ ডলার।

সবচেয়ে গভীর খনি: এটির নাম ইষ্টর‍্যাণ্ড প্রোপ্রাইটারী মাইন। এটি আছে দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্‌স্‌ভালে বোক্‌স্‌বার্গ নামক স্থানে। ১৯৫৮ সালে এর গভীরতা ১১০০ ফুট ছাড়িয়ে যায়।

সবচেয়ে গভীর নলকূপ: অষ্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ডে একটি নলকূপের গভীরতা ৭,০০৯ ফুট।

সবচেয়ে নিঃসঙ্গ গাছ: সাহারা মরুভূমির টেণেয়ার নামক

ওয়েসিসে গাছ আছে মাত্র একটি। এর শিকড় চ'লে গিয়েছে ১০০ ফুট নীচে অবধি। এর চারদিকে ১০০০ মাইলের মধ্যে আর কোনো গাছ নেই। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, যে, ১৯৭০ সালে একটি ফরাসী লরী এর গায়ে এসে ধাক্কা মারে, ফলে গাছটি এখন মরবার মুখে।

সবচেয়ে বড় বিস্ফোরণ: ১৮৮৩ সালের ২৭শে আগষ্ট ক্রাকাটোয়ার অগ্নুদ্গিরণ পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিস্ফোরণ। ইণ্ডোনেশিয়ার সুণ্ডা প্রণালীতে ক্রাকাটোয়া দ্বীপটি অবস্থিত। এই বিস্ফোরণের ফলে বড় বড় পাথরের চাঁই ৩৪ মাইল উঁচু অবধি উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল। বিস্ফোরণের দশ দিন পরে ৩,৩১৩ মাইল দূরে এর ধুলো ও ছাই পড়তে দেখা গিয়েছিল। ৩০০০ মাইল দূরবর্তী রড্রিকেজ দ্বীপে চার ঘণ্টা পরে এই বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছিল, "বড় কামানের গর্জনের মত।" সবচেয়ে শক্তিশালী হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণের এক শ' গুণেরও বেশী শক্তি ছিল এই বিস্ফোরণে।

সবচেয়ে উঁচু থেকে পড়া: ১৯৪৪ সনের ২৩শে মার্চ জার্মেনীর উপরে ব্রিটিশ রয়্যাল এয়ার ফোর্সের একটি বোমারু বিমানে আগুন ধ'রে যায়। তখন সেই জ্বলন্ত বিমান থেকে ২১ বৎসর বয়স্ক ফ্লাইট লেফটেনান্ট নিকোলাস ষ্টিফেন আল্‌কেমেড বিনা প্যারাশুটে লাফিয়ে পড়েন। বিমানটি তখন ১৮০০০ ফুট উঁচুতে উড়ছিল। আল্‌কেমেড সরাসরি মাটিতে না প'ড়ে প্রথমে পড়েছিলেন একটা ঝাউ গাছের উপরে, সেখান থেকে পড়েন ১৮ ইঞ্চি পুরু বরফের আস্তরণে ঢাকা একটা জায়গায়। আল্‌কেমেড মারা ত যানই নি, তাঁর শরীরের একটা হাড়ও ভাঙে নি।

সবচেয়ে নমনীয় ধাতু: এটি হচ্ছে সোনা। বিশুদ্ধ সোনা, কিংবা শতকরা তিনভাগ রূপা ও তামার খাদ মেশানো সোনাকে পিটিয়ে এক ইঞ্চির হাজার ভাগের একভাগ থেকে আড়াইলক্ষ ভাগের একভাগের মত পাৎলা পাত তৈরি করা যায়। এক আউন্স সোনাকে টেনে লম্বা ক'রে ৫১ মাইল লম্বা তারে পরিণত করা যায় ছিঁড়তে না দিয়ে।

শরীরের যন্ত্রাংশ পরিবর্তন

মোটরগাড়ীর কোনো যন্ত্রাংশ ভেঙে বা বিগড়ে গেলে সেটাকে যেমন বদ্‌লে নেওয়া সম্ভব হয়, শরীরের কোনো যন্ত্রাংশ অকেজো হয়ে পড়লে ঠিক সেইভাবে সেটাকে বদ্‌লে নেওয়া যেতে পারে কি না, তার পরীক্ষা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এবং অনেক সময় নিয়ে বহুদিন ধ'রে বিজ্ঞানীরা ক'রে চলেছেন।

অন্য লোকের কাছ থেকে ধার করা কিডনী বা মূত্রাশয় নিয়ে বেশ সুস্থ শরীরে অন্ততঃ তিনজন লোক এখনো বেঁচে আছেন।

মুশকিল হচ্ছে, আমাদের শরীরের একটা ধর্ম এই যে, যেসমস্ত শারীর-কলা বা tissue আমাদের শরীরে নিজে থেকে উপজাত হয় না, আমাদের শরীর সেগুলিকে একেবারে বরদাস্ত করতে পারে না, বর্জন করে। আর আমাদের শরীর সেটা করে ব'লেই জীবাণুঘটিত অনেক ব্যাধি থেকে আমরা রক্ষা পাই। কিন্তু আবার এই একই কারণে যে কোনো মানুষের শরীরের যন্ত্রাংশ যে কোনো অপর মানুষের কাজে লাগে না। ঠিক যেমন ফোর্ড গাড়ীর যন্ত্রাংশ ওপেল গাড়ীর কাজে লাগে না। শারীরবৃত্তি অভিন্ন এমন সুসদৃশ যমজরাই একমাত্র পরস্পরের শরীরের যন্ত্রাংশ স্বচ্ছন্দে পরস্পরের কাজে লাগাতে পারে।

কিন্তু যে তিনজন মানুষের কথা উপরে বলা হয়েছে তাঁদের যমজ কেউ ছিল না ব'লে তাঁরা কিড্‌নী ধার নিয়েছেন তাঁদের অতি নিকট আত্মীয়দের কাছ থেকে। যেমন, এক ব্যক্তি কিড্‌নী ধার করেছেন তাঁর মায়ের কাছ থেকে। মা এবং ছেলে দুজনেরই এখন একটি একটি কিডনীতে কাজ চলছে। অবশ্য বেশ ভালভাবেই চলছে। কিন্তু এখন যন্ত্রাংশগুলিকে লেবরেটরীতে তৈরী করবার চেষ্টা চলছে। এ বিষয়ে একটি চমকপ্রদ তথ্য আগামী মাসের প্রবাসীতে আমরা প্রকাশ করব।

সবচেয়ে কঠিন পদার্থ কি?

উত্তর হচ্ছে, হীরা। অনেক মণিমাণিক্য, কিছু কিছু তার নবাবিষ্কৃত, যেমন টাইটেনিয়া, হীরার চেয়েও সুদৃশ্য এবং উজ্জ্বল। কিন্তু সব অবস্থায় ঠিক থাকবে, অর্থাৎ নিজে যা তাই থাকবে, মানুষের শ্রমশিল্পে যার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, সে ক্ষমতায় হীরার কাছে কেউ এগোতে পারে না। অদ্যাবধি মানুষের জানা সব পদার্থের মধ্যে হীরাই কঠিনতম।

শিশুরা কাঁদে কেন?

শিশুরা কাঁদে, আমরা তাদের কাঁদতে শেখাই ব'লে। শিশুর যখন খিদে পায়, সে হয় জিভ বের করবে, নয় ঠোঁট চাটবে। তার শীত করলে সে গা মোড়ামুড়ি দেবে বা কাঁপবে। ভিজিয়ে শুয়ে থাকলে সে হাঁচবে। আমরা যদি তখন তাকে স্বর্গের ফুল ভেবে মশগুল হয়ে থাকি, ত সে বেচারাকে কিছু একটা করতে হয় সে যা চায় তা পাবার জন্যে?

কি সে আর করতে পারে কাঁদা ছাড়া? তাই সে কাঁদে।

অসুস্থতার জন্য যে কান্না, সেটা আশা কেউ তাকে শেখায় না। সুস্থ শিশুদের কান্নার কথাই বলা হচ্ছে।

অলৌকিক

দুপুর বারোটার সময় ১৮৫৮ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী চৌদ্দবৎসর বয়স্কা বারনাডেট্ সেবিরাস তার ছোট বোন ও অপর একজন সঙ্গিনী সহ ফ্রান্সের একটি গ্রাম লুর্ড্‌সে তাদের বাড়ীতে ফিরছিল। তারা গেভ্‌স নদীর তীরে কাঠ ও পুরোন হাড় কুড়িয়ে সকাল কাটিয়েছিল। সঙ্গিনীদের পিছন পিছন যেতে যেতে হঠাৎ একটা ঝোড়ো হাওয়া অনুভব করে বারনাডেট্ মুখ তুলে উল্টোদিকের তীরের দিকে তাকাল। সেইখানে গোলাপফুল ছড়ান গুহার মুখে একটি "ছোট মেয়ে" তার দিকে চেয়ে হাসল—মেয়েটি শুভ্র বেশধারিণী, ও নীল কোমরবন্ধ ও ওড়নায় সজ্জিত।

এইভাবে একটি অতিশয় দরিদ্র যাঁতাকলের মালিকের অশিক্ষিতা কন্যা বারনাডেট সর্বপ্রথম ভারজিন মেরিকে দেখল—এটি দৈবদৃশ্যের সর্বপ্রথম দৃশ্য। প্রথম প্রথম বকুনি দেওয়া এবং তাকে পাগল প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করা হলেও যুগপৎ চার্চ এবং রাজা অসংখ্য লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের ন্যায়ই বারনাডেটের সততা সম্বন্ধে পরে নিঃসন্দেহ হ'ল।

কিছুদিনের মধ্যে ওই গুহার কাছে একটি গীর্জা বানান হ'ল এবং লুর্ড্‌সও, জেরুসালেম ও রোমের মত একটি ক্যাথলিক্ তীর্থস্থানে পরিণত হ'তে চল।

ওই দৈবদৃশ্যগুলি ছাড়া যে কারণে এই লুর্ড্‌স গ্রামটি লোকের কাছে এত আকর্ষণীয় সেটি হচ্ছে এর রোগ সারাবার শক্তিসম্পন্ন জল। এটি বারনাডেট্ ভারজিন মেরির সঙ্গে কথাবার্তার সময় আবিষ্কার করে। এটি অনেক মানসিক ও দৈহিক রোগকে সারিয়েছে। একশটির চেয়ে কিছু বেশী ঘটনা চার্চ অলৌকিক ব'লে গণ্য করেছে। বলেছে, "আকস্মিক, চূড়ান্ত, এবং সাধারণ নিয়মাবলীর বহির্ভূত।"

বারনাডেট ১৮৭৯ সালে নেভার্সের একটি মঠে দেহত্যাগ করে। সে মৃত্যুকালে এই কথাটি স্মরণে রেখেছিল যে ভারজিন মেরি তাকে বলেছিলেন "আমি ইহলোকে তোমাকে সুখী না করলেও পরলোকে করব।"

ইজিচেয়ারে ব'সে মাছ ধরা

এই ইজিচেয়ারটি সবদিক্ দিয়ে অন্য-সব ইজিচেয়ারেরই মতন, তফাৎ কেবল এই যে, এটি জলে ভাসে। গোড়াতে হুইসিং পুলে আয়েস

হাওয়াই নৌকা

ক'রে ভেসে বেড়াবার জন্যে একে ব্যবহার করা হ'ত, কিন্তু আজকাল মাছ ধরার কাজেও একে লাগানো হচ্ছে। এলুমিনিয়ম টিউবের তৈরি ফাঁপা ফ্রেম, বোনা প্লাষ্টিকের সিট, পলিষ্টিরিন ফোমের তৈরি হাত ও পা রাখবার জায়গা। পাদানটাকে খুলে নিয়ে পিছনে লাগালে তার উপরে মাথা রেখে আরাম করা যায়।

সর্দ্দিগর্ম্মি

Sunstroke বা heat stroke, বাংলাতে যাকে আমরা সর্দ্দিগর্ম্মি বলি, মানুষ তাতে ভোগে, যখন তার শরীরের কতগুলি প্রয়োজনীয় লবণ জাতীয় জিনিষ ঘামের সঙ্গে খুব বেশী পরিমাণে বেরিয়ে যায়। সেটা যখন ঘটে তখন শরীর যন্ত্রের কতগুলি ক্রিয়া ব্যাহত হয়ে মানুষ অচেতন হয়ে পড়ে। সুতরাং রোদে না বেরোলেও sunstroke বা সর্দ্দিগর্ম্মি মানুষের হ'তে পারে।

একটু সাবধান হয়ে চললেই সর্দ্দিগর্ম্মির হাত এড়ানো যায়। খুব গরমের মধ্যে কাজ করতে হবে যখন বুঝবেন, তখন পেট বোঝাই ক'রে খাবেন না, সহজে হজম হয় এমন জিনিষ খাবেন, মদ্যপান একেবারেই করবেন না, বিশেষতঃ দিনের বেলায়, এবং নুন একটু বেশী ক'রে খাবেন। ঢিলেঢালা এমন কাপড়জামা পরবেন যার ভিতর দিয়ে হাওয়া চলাচল করতে পারে।

সর্দ্দিগর্ম্মি হঠাৎ হয় না, আগে থেকে জানান দিয়ে হয়। যদি দেখেন ছেলেমেয়েদের কারুর গরমে মাথা ধরেছে, সেই সঙ্গে মাথা ঘুরছে, গা বমি বমি করছে, গা গরম হয়েছে, আর নাড়ীর গতিও দ্রুত, তা হ'লে তাকে অবিলম্বে ঠাণ্ডা জায়গায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেবেন।

সর্দ্দিগর্ম্মির আক্রমণ সুরু হয়ে গেলে অবিলম্বে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়। রুগীকে ঠাণ্ডা হাওয়ার চলাচল হচ্ছে এমন জায়গায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিন, কেবল দেখতে হবে তার মাথাটা যেন দেহের তুলনায় বেশ একটু উঁচু হয়ে থাকে। পরণের কাপড়-চোপড় সব ছাড়িয়ে নিয়ে একটি চাদর দিয়ে তার শরীরটা ঢেকে দিন আর সেই চাদরের উপর ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দিতে থাকুন। আইসব্যাগ, বা ঠাণ্ডা জলে ভেজানো তোয়ালে মাথায় চাপা দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। কোনোরকমের উত্তেজক পানীয় কিছুই খেতে দেবেন না, নুন মেশানো ঠাণ্ডাজল কেবল খেতে দেবেন মাঝে মাঝে। তারপর ডাক্তার ডাকবেন।

হাওয়াই নৌকা

হাওয়ার কুশনের কথা আগে বলা হয়েছে; এই নৌকোগুলো হাওয়ার কুশনের উপর দিয়ে চলে না, চলে জলের উপর দিয়ে, কিন্তু হাওয়ার ঠেলায় চলে ব'লে অগভীর জল এবং জলজ উদ্ভিদ ইত্যাদির উপর দিয়ে এদের গতি স্বচ্ছন্দ।

ভগবান্ আমাদের রাণীকে রক্ষা করুন

God save the Queen ইংরেজদের এই দলবদ্ধ প্রার্থনা আজকে যেমন ইংলণ্ডে প্রত্যহ শোনা যায়, রাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের সময়েও ঠিক সেই রকমই শোনা যেত। অনেকের বিশ্বাস যে সেসময় একবার অন্ততঃ এই প্রার্থনা ফলপ্রদ হয়েছিল।

একটি এক্সপ্রেস ট্রেনে রাণী ভিক্টোরিয়া লণ্ডনে আসছিলেন। সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে, ঘন কুয়াসায় চারিদিক আবৃত। হঠাৎ ইঞ্জিনের ড্রাইভার দেখতে পেলে, তার সামনে একটা কালো মূর্ত্তি ক্ষিপ্তের মত ক্ষিপ্রবেগে হাত নেড়ে ইসারায় কি যেন বলতে চাইছে। ড্রাইভার ব্রেক ক'ষে গাড়ী থামাল। একজন কণ্ডাক্টার নেমে গেল দেখতে, কি ব্যাপার। সে দেখল, গাড়ী যেখানে থেমেছে তার ছ'শ গজের মধ্যে বৃষ্টির জলধারা-স্ফীত একটা নদীতে রেল লাইনের পুল একটা ভেঙে পড়েছে। ট্রেনযাত্রীদের নিশ্চিত মৃত্যু থেকে যে রক্ষা করেছে তখন তার সন্ধান সুরু হ'ল, কিন্তু কয়েক মাইলের মধ্যে বৃষ্টি-ভেজা নরম মাটিতে কোনো মানুষের পায়ের চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল না।

কয়েক ঘণ্টা পরে পুলটা মেরামত হ'ল এবং ট্রেনটা আবার চলতে লাগল লণ্ডনের দিকে। ড্রাইভার যথারীতি ইঞ্জিনের সব ঠিক আছে কি না মাঝে মাঝে দেখছে। হেডলাইটটা পরীক্ষা করতে নেমে গিয়ে সে একটা অদ্ভুত জিনিষ দেখল। দেখল, একটা মস্তবড় পতঙ্গ দুই ডানা প্রসারিত করে হেড লাইটের কাঁচের গায়ে লগ্ন হয়ে ম'রে রয়েছে। এরই ডানা ঝাপটানোর ছায়াকে একটা কালো মূর্ত্তির ইসারা মনে ক'রে ড্রাইভার ব্রেক কষেছিল!

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে যদি কখনো যান ত ভিক্টোরিয়ার জীবন রক্ষা করেছিল এই যে পতঙ্গটি, তাকে আপনি দেখতে পাবেন।

স্মি৹

কাশ্মীরী কবি মুজাফর আজিম অবলম্বনে

সুনীলকুমার নন্দী

তুমি কি কখনো দেখেছো প্রভাত জাগা—
সুরু হয় যেই সূর্য পরিক্রমা,
বহু দূরে দূরে পাহাড়ের যত চূড়া
স্নান করে যেন দীপ্ত অরুণরাগে।
প্রেমিক বুঝি বা প্রেমের খেলার ছলে
মুকুরে কিরণ করে প্রতিবিম্বিত—
চোখের স্পর্শ রক্তে লাগায় দোলা,
হৃদয় বিদ্ধ হয় সে-আলোর তীরে।

সাহসে ভর করে রাতের এ-আঁধারে
যদি গো যেতে চাও গহন বনে,
শুনতে পাবে তুমি বাতাসে বনভূমি
ফার ও পাইন শাখে কী সুর বোনে!
হয়তো মনে হবে কোন বা বনপরী
বিলায় পথে পথে গানে খবর—
সে-কথা মনে হতে হৃদয় নেচে ওঠে,
খুশিতে কম্পিত হয়, মধুর।

যখন প্রাঙ্গণে পায়রা ঝাঁকে ঝাঁকে
খাওয়াতে বস তুমি, হয়তো উন্মনা
হয়েছ ভেবে এই জীবনে লাভ-ক্ষতি।
অথবা মনে পড়ে পুরণো মধুস্মৃতি,
যে এসে তুলে ধরে জীবন-নাট্যের
দৃশ্যাবলীময় পর্দা, ছায়াছবি।

সৃষ্টি সুরু থেকে ফুলের রূপমায়া
কবিরা গানে গানে দিয়েছে উপহার।
তাদের চিন্তাকে করলে অনুসার
বিশাল রূপময় জগৎ উঁকি দেয়।
আমার কথা শোন, ওই যে-রূপময়
জগতে প্রবেশিলে তার কী বিস্তার
রক্তে ধ্বনি তোলে বেদনামিশ্রিত
মধুর তীব্রতা, যা স্মৃতি তুলে রাখে।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টির সুরে যদি
মনোযোগ আসে, সুন্দর শিবসত্য
করবেই জেনো গানের তন্ত্রী-স্পর্শ—
সৌন্দর্যেই ভরে ওঠে মনমুঠি,
মুক্ত করো না এ-রূপের সঞ্চয়।

সৌন্দর্যের কয়েকটি দিক তুলে
ধরা কি হয়েছে তোমার সামনে, সখি?
কী যে লোভ হয়, বলি আজ গানে গানে
আমারি প্রাণের অমর প্রেমের গাথা।
এ-যে পরীক্ষা কঠিন কঠোর, যাকে
অতিক্রমণে বেদনার যন্ত্রণা।
রুদ্রাক্ষের মাল্যে কী হবে বল
পরিয়ে মুক্তো, উজ্জ্বল দ্যুতিময়
মূল্য হারাবে নির্বোধ কোলাহলে
ডুবালে নিখাদ প্রাণের মুক্তোটিকে।

এ-জীবন আহা সুন্দর মধুময়,
সুন্দর এই পৃথিবীর সব সৃষ্টি—
রূপ-রঙে হয় সব কিছু প্রাণময়।
তার সে বিকাশ অনুভবে কার্পণ্য
আসলে জীবন বৃথাই, বিপর্যস্ত।

টানে যে-সখার যৌবন, জ্ঞান আলো,
তন্ময় প্রেম, বুদ্ধির যত কেলি,—
পৃথিবীর এই যত রূপ সৌন্দর্য
মূলত সব এক, নেই কোন পার্থক্য।
আয়োজন শুধু অনুপাতে মিশ্রণ ত
মহৎ জীবন বুনতে নিপুণ হস্তে।
সাবধানে, এর একটির দুর্ভিক্ষে
জীবন-প্রবাহ দুঃসহ হয় দুঃখে।

বাংলা ও বাঙালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের উপর নূতন আঘাত

"উদ্বাস্তু-প্রেমী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না বাঙালী উদ্বাস্তুদের নাকের জলে চোখের জলে এক করিয়া পুনর্ব্বাসন দপ্তর গুটাইয়াছেন। এখন তিনি কেন্দ্রীয় পূর্ত্তমন্ত্রী হিসাবে আরেকবার বাংলা দেশের প্রতি নেক নজর দিয়াছেন। সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতের কোয়াম্বাটুরে খান্নাজী সাংবাদিকদের নিকট বলিয়াছেন যে, কলিকাতায় কেন্দ্রীয় সরকারের যে ষ্টেশনারি অফিস আছে সেটাকে বিকেন্দ্রীকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। কারণ, কলিকাতার অফিসে ষ্টেশনারি মাল সংগ্রহ ও সরবরাহ করিতে বিলম্ব হয়। এই বিলম্ব দূর করিবার জন্য কলিকাতার অফিসটিকে তিন টুকরা করিয়া ভারতের তিনটি জায়গায় স্থাপন করা হইবে। এই সংক্ষিপ্ত সমাচারেই কলিকাতার কেন্দ্রীয় ষ্টেশনারি অফিসের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার ১৪ শত কর্ম্মচারী বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন। বিচলিত হইবার কারণও যথেষ্ট আছে বলিয়া আমরা মনে করি। খান্নাজী কলিকাতা অফিসের বিলম্ব সম্পর্কে যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহাই একটি শত বৎসরের পুরাতন অফিসকে ভাঙিয়া তিন টুকরা করার পক্ষে যথেষ্ট কিনা ভাবিয়া দেখা দরকার। কলিকাতা হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের অফিস স্থানান্তর নূতন ঘটনা নহে। ইতিপূর্ব্বে আরও কয়েকটি কেন্দ্রীয় সরকারের অফিস কোন না কোন অছিলায় এখান হইতে সরাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এবারে ষ্টেশনারি অফিসের পালা। কলিকাতার উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কি কুদৃষ্টি পড়িয়াছে জানি না। কলিকাতার কেন্দ্রীয় ষ্টেশনারি অফিসের কাজকর্ম্মের ক্ষমতা ইতিমধ্যেই অনেকখানি খর্ব্ব ও সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। কলিকাতার এই অফিস গত প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারী অফিস এবং বিদেশে ভারতীয় মিশন বা দূতাবাসসমূহে কাগজ কলম ইত্যাদি ষ্টেশনারি মালপত্র সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। এ ছাড়া টাইপরাইটার, ডুপ্লিকেটর এবং মুদ্রণ যন্ত্রাদি সরবরাহের দায়িত্বও এই অফিস এতদিন সুষ্ঠুভাবেই পালন করিয়াছে। এই অফিসের ক্রয় ক্ষমতা কাড়িয়া লইবার ফলে এখন কার্য্যতঃ ইহা ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত। দিল্লীর কর্ত্তাদের হুকুম না পাইলে এখানকার অফিস প্রায় কোন কিছুই ক্রয় করিতে পারে না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ষ্টেশনারি অফিসের মোট ক্রয়ের শতকরা ৮৫ ভাগই হইল কাগজ আর রেলওয়ে টিকিট ছাপাইবার বোর্ড। এইগুলি ক্রয় করিবার ক্ষমতা কলিকাতা অফিসের নাই। নয়া দিল্লীর ডাইরেক্টর জেনারেল অব সাপ্লাইজ এইগুলি সরাসরি কিনিয়া থাকেন। বাঁধাইয়ের জিনিষপত্র ক্রয়ের পরিমাণ শতকরা পাঁচ ভাগ। এইগুলির ব্যবস্থাও হয় দিল্লী ও বোম্বাইয়ের ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের হাত দিয়া। বাকী ১০ শতাংশের মধ্যে পড়ে কার্ব্বণ, ষ্টেনসিল পেপার, নিব, পিন ইত্যাদি। এইগুলি কলিকাতা অফিস হইতেই ক্রয় করা হয়। কিন্তু তার জন্য যথারীতি সর্ব্বভারতীয় টেণ্ডার আহ্বান করা হয় এবং এর বিলিব্যবস্থাও হয় দিল্লীর চীফ কণ্ট্রোলারের নির্দ্দেশে। অতএব সরবরাহ কিংবা সংগ্রহের বিলম্ব যদি কিছু হয় তাহা এই দশ শতাংশ জিনিসের এবং তার জন্যও কলিকাতা অফিসের দায়িত্ব অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। দিল্লীর দিকে চাহিয়া কাজ করিতে হইলে বিলম্ব হইবেই। কলিকাতা হইতে অফিস সরাইয়া মাদ্রাজে কিম্বা হায়দরাবাদে লইয়া গেলেও এই সমস্যার সমাধান হইবে না। ইহা কেবল কলিকাতা অফিসের দোষ নয়। দোষ সরকারী লালফিতার। তবে কি কলিকাতা হইতে টেণ্ডার আহ্বান হয় বলিয়াই খান্নাজী খাপ্পা হইয়াছেন? এই তুঘলকী সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে কেন্দ্রীয় দপ্তরকে কতকগুলি বিষয় আবার ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। পশ্চিম বাংলার মত বেকার সমস্যাজর্জ্জরিত একটা রাজ্য হইতে সরকারী অফিস স্থানান্তর শিক্ষিত বেকারদের কর্ম্মসংস্থানের একটা পথ বন্ধ করিবে। যাঁহারা এখন কাজ করিতেছেন তাঁহারাও আর্থিক বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইবেন। তা ছাড়া এই ষ্টেশনারি অফিসে মাল যোগান দিয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র কুটীর-শিল্পও বাংলা দেশে গড়িয়া উঠিয়াছে। অফিস স্থানান্তরিত হইলে এই ক্ষুদ্র শিল্পগুলির পাট উঠিবে, তার কর্ম্মচারীদেরও অন্ন ঘুচিবে।

মন্ত্রী মহাশয় দুর্ভাগা বাঙালীদের এইভাবে ভাতে মারার ব্যবস্থা করিলেন কেন? ইহা কি কল্যাণ-রাষ্ট্রের সমাজ-নীতি এবং অর্থনীতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ?"—

আরও বেশী মন্তব্য করিবার অবকাশ 'আনন্দবাজার' রাখেন—যদিও আমরা অংশমাত্র পাঠকদের নিকট উপস্থিত করিলাম।

উদ্বাস্তু মন্ত্রী বাংলা এবং বাঙালীদের উপর খুশী নহেন নানা কারণে—তাই তিনি নূতন করিয়া আর এক দল বাঙালী উদ্বাস্তু সৃষ্টি করিবার প্রয়াস করিতেছেন।

অবাক্ হইয়া ভাবিতেছি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা কি প্রত্যেকে এক-একজন স্বাধীন নরপতি? যাহা খুশি তাহাই করিবেন—বাধা দিবার কেহই নাই?

১লা আগষ্ট-এর ট্রামকর্ম্মীদের ধর্ম্মঘট

দৈনিক সংবাদপত্রের রিপোর্ট:

"ট্রামওয়ে কর্তৃপক্ষ দাবীদাওয়া মানিয়া লইতেছেন না এই অভিযোগে বুধবার ট্রামকর্ম্মিগণ হঠাৎ কাজে যোগ দেন না। ফলে এইদিন কলিকাতা ও হাওড়ার অধিকাংশ রুটে ট্রাম চলাচল বন্ধ থাকে এবং প্রায় দশ লক্ষ যাত্রীর হয়রানির একশেষ হয়। ট্রামকর্ম্মীরা কাজে যোগ দিবেন না এরূপ কোন সংবাদ পূর্ব্বে জানা না থাকায় এইদিন জনসাধারণের দুর্ভোগের একশেষ হয়। বহু অফিসে ১লা তারিখ বেতনের দিন। অথচ ট্রাম বন্ধ, বাসে তিলধারণের স্থান নাই। বস্তুতঃ এইদিন অফিসযাত্রী এবং আরও অনেকে একরূপ হাতে প্রাণ লইয়াই বাসে যাতায়াত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। নগরীর উনিশটি রুটের কয়েক হাজার ট্রামচালক ও কণ্ডাক্টর বিভিন্ন 'শিফ্‌টে' কাজে অনুপস্থিত থাকিয়াছেন। প্রত্যুষ হইতেই হাওড়ার তিনটি রুটে ট্রাম বাহির হয় নাই। কলিকাতার পথে মাত্র কয়েকটি ট্রাম চলাচল করে। কর্ম্মবিরতি সম্পর্কে পূর্ব্বাহ্নে কোন ঘোষণা করা হয় নাই। এই অঘোষিত কর্ম্মবিরতির দরুণ আজ কলিকাতায় নাগরিকগণ এক চরম দুর্ভোগের মধ্যে পতিত হন। যে সকল ডিপোতে ট্রাম কণ্ডাক্টর ও ড্রাইভার থাকা সত্ত্বেও ট্রাম চালান হয় নাই, সে সকল ডিপোতে যাত্রীদের সঙ্গে ট্রামকর্ম্মীদের বাদানুবাদ এবং দুইটি ডিপোতে উভয় দলের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কর্ম্মীরা যাত্রীদের প্রহারের ভয় দেখায়। হাওড়ায় বাসে ঝুলিয়া যাইবার সময়ে দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া একটি যুবক মারা গিয়াছেন ও অপর একজন গুরুতর আহত হইয়াছেন।"

ট্রামকর্ম্মী এবং ট্রাম-কর্তৃপক্ষের বিরোধের বিষময় ফল ভোগ করিতে হইবে যাত্রীসাধারণকে অথচ ট্রাম চলে এবং ট্রাম চলিবার ফলে ট্রামকর্ম্মীরা বেতন পায় এই হতভাগ্য যাত্রীদের দয়াতেই। যাত্রীরা যদি ট্রাম-চড়া বন্ধ করেন, তাহা হইলে কর্ম্মীদের কি হাল হইবে—তাহা যেন কর্ম্মীরা একবার চিন্তা করিয়া দেখেন।

নিরপরাধ যাত্রীসাধারণ কর্ম্মীদের এ অত্যাচার কতদিন সহ্য করিবে বলা যায় না, কিন্তু অত্যাচার এই ভাবে চলিতে থাকিলে কমপক্ষে দশ লক্ষ যাত্রীদের হাতে কর্ম্মীদের কি অবস্থা হইতে পারে তাহাও বিবেচ্য।

নোটিশ না দিয়া ধর্ম্মঘট কিম্বা লক্-আউট বে-আইনী কাজ। ইহা দণ্ডনীয়। হঠাৎ কর্ম্মবিরতির ফলে আইনত কর্ম্মীদের কর্ম্মচ্যুতিও ঘটিতে পারে এবং আদালত তাহাতে হস্তক্ষেপ বোধ হয় করিতে পারে না।

পেশাদার যে-সব তথাকথিত নেতা ট্রামকর্ম্মীদের এই ধর্ম্মঘট সমর্থন করিয়াছেন (শ্রীজ্যোতি বসু ইঁহাদের মূল গায়েন) তাঁহারা কর্ম্মীদের জন্য কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়াছেন, কিন্তু নিরীহ, দল-নিরপেক্ষ এবং অসহায় যাত্রীদের প্রতি তাঁহাদের দরদ অপ্রকাশ। এই সব সৌখিন নেতা মোটরকারে বিহার করেন, কাজেই তাঁহারা ট্রাম-বাস যাত্রীদের দুঃখ-বিপদ্ কি, তাহা কি করিয়া উপলব্ধি করিবেন?

ট্রাম ধর্ম্মঘটের ফলে যে যুবকটির (বোধ হয় দুইটি) মৃত্যু হইল, এবং যাহারা আহত হইল, তাহার জন্য দায়ী ট্রামকর্ম্মীরা, একথা বলা কি অপরাধ হইবে? না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রমমন্ত্রী এবং শ্রমদপ্তরকে অনুরোধ করিব, তাঁহারা যেন হঠাৎ ধর্ম্মঘটে যে অপরাধ হইয়াছে তাহার যথাবিহিত ব্যবস্থা করেন। আমরা শ্রমিকদের কল্যাণ চাহি, চাহি তাহাদের ন্যায্য দাবী স্বীকৃত হউক। কিন্তু তাহার অর্থ ইহা হইবে না যে, শ্রমিকরা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে ও তাহাদের সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতে হইবে।

প্রয়োজন হইলে যাত্রীসাধারণকে সমবেত ভাবে পাল্টা জবাব দিবার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। গত কিছুকাল হইতে এক শ্রেণীর ট্রামকর্ম্মীর ঔদ্ধত্য এবং অভদ্র ব্যবহার অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহারাই আবার মালিক কোম্পানীর নিকট হইতে ভদ্র ব্যবহার, আশা নহে, দাবী করে!

ডিগ্রী কোর্সে বয়সের মার

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্সের প্রথম বার্ষিক

শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার ন্যূনতম বয়স সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত লওয়া হয়। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, উচ্চ-মাধ্যমিক প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সমতুল্য কোন পরীক্ষা পাশের পর যেসব ছাত্রছাত্রী তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্সে ভর্ত্তি হইবে, তাহাদের বয়স ভর্ত্তি হওয়ার বৎসরের পয়লা অক্টোবর ষোল বৎসরের উর্দ্ধে হইতে হইবে। এ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট পরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবেন। বিশ্ববিদ্যালয় অর্থমঞ্জুরী কমিশনের (ইউ জি সি) সুপারিশ অনুসারে একাডেমিক কাউন্সিলে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয়। বর্ত্তমানে বিদ্যালয়ে নবম ও দশম কিংবা একাদশ শ্রেণীতে পড়িতেছে এমন অনেক ছাত্রছাত্রী আছে যাহাদের বয়স উচ্চ-মাধ্যমিক কিংবা প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা পাশের পরও ষোল বৎসর হইবে না। সুতরাং এই সব ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতে সমস্যায় পড়িতে হইতে পারে বলিয়া শিক্ষাব্রতীমহল আশঙ্কা করিতেছে।"

ইহার অর্থ বোধগম্য হইল না। বয়স লইয়া বাধ্য-বাধকতা প্রবর্ত্তন করিলে বহু মেধাবী এবং যোগ্য ছাত্রের প্রতি ঘোর অবিচার করা হইবে। ষোল বৎসর বয়সের কম বয়সী ছাত্রছাত্রীদের ডিগ্রী কোর্সে ভর্ত্তি করিলে কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হইবে জানি না। এই নিয়মের ফল এই হইবে যে—যোগ্য এবং মেধাবী ছাত্রছাত্রী কম বয়সে স্কুলের পড়া শেষ করিয়া—দু-এক বৎসর অলস জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইবে। অনেকের পড়াশুনা হয়ত চিরতরে বন্ধ হইয়াও যাইবে।

ভাল করিবার ইচ্ছা বা শক্তি নাই, অথচ মন্দ করিবার শক্তি অসীম। পড়াশুনার ব্যাপারে বয়সের সীমা রেখা পৃথিবীর অন্য কোথাও বোধ হয় নাই—অবশ্য অন্য কোন দেশে ইউ জি সি ও নাই।

এ বিষয়ে প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন। দেশের বাম-পন্থীরা কি বলেন? না তাঁহাদের পড়াশুনা বা ছাত্র-ছাত্রীদের সত্য-কল্যাণের দিকে দৃষ্টি দিবার সময় নাই! তাঁহাদের পক্ষে বোধ হয় অলস ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেই ভাল। তাহাতে গণ বা জন আন্দোলনে লোক বেশী পাওয়া যাইবে।

নারী-হত্যার ভয়াবহ চিত্র

"প্রায় সাত সপ্তাহে কলিকাতায় ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী চব্বিশ পরগণা, হাওড়া ও হুগলী জেলায় অন্ততঃ ১৩ জন মহিলা খুন হইয়াছেন অথবা রহস্যজনক মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। অর্থাৎ গড়ে সপ্তাহে প্রায় দুইজন করিয়া নারী কলিকাতা বা উহার আশেপাশে অসহায়ভাবে জীবন হারাইয়াছেন এই তথ্য পশ্চিমবঙ্গের অপরাধমূলক কার্য্যকলাপের এক ভয়াবহ চিত্র মেলিয়া ধরিয়াছে। গত ১লা জুন হইতে ২২শে জুলাই পর্য্যন্ত ১৩ বৎসরের বালিকা হইতে ৫৫ বৎসরের বৃদ্ধা পর্য্যন্ত লম্পটের লোভের, দুর্বৃত্তের লাভের অথবা সাংসারিক অশান্তির শিকার হইতেছেন। মৃতাদের মধ্যে অবশ্য অধিকাংশের বয়স ২০ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে। তাঁহাদের মধ্যে ছাত্রী আছেন, চাকুরিজীবী আছেন, গৃহস্থ বধূও আছেন। পশ্চিমবঙ্গে এই নারীঘাতী বীভৎসতার রোজনামচাটি নিম্নরূপ:

২রা জুন—১৭ বৎসর বয়সের দুর্গা বসাকের মৃতদেহ গড়িয়ার একটি পুকুরে পাওয়া যায়।

৫ই জুন—অনুমান ৪০-৪৫ বৎসর বয়সের একজন অজ্ঞাত-পরিচয় মহিলার মৃতদেহ হাওড়া ষ্টেশন প্ল্যাটফর্ম্মে পাওয়া যায়।

১২ই জুন—কন্যার উপর পাশবিক অত্যাচারে বাধা দিতে গিয়া হুগলী জেলার জঙ্গিপাড়া থানার কাপড়পাড়া গ্রামে একজন মহিলা খুন হন।

১৯শে জুন—২২ বৎসর বয়সের বানুজান বিবিকে গলাকাটা অবস্থায় ক্যানিং থানার সোনাখালী গ্রামে নিজ শয্যায় মৃত পাওয়া যায়।

২৫শে জুন—৫৫ বৎসর বয়সের এক মহিলার লাশ শিয়ালদহ মেন ষ্টেশনে পাওয়া যায়।

২৮শে জুন—৩০ বৎসর বয়সের সুহারান বিবি ও ৩৫ বৎসর বয়সের একজন পুরুষের রক্তাপ্লুত মৃতদেহ মধ্য কলিকাতার নবাব সিরাজুল ইসলাম লেনের এক গৃহে পাওয়া যায়।

১লা জুলাই—২৩ বৎসর বয়সের এক নার্সের মৃতদেহ নীলরতন সরকার হাসপাতালের নার্স কোয়ার্টারে পাওয়া যায়।

১১ই জুলাই—২৮ বৎসর বয়সের শনিবালা হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর থানার দেভাগাচক গ্রামে স্বামীর হাতে খুন হন। স্বামী পরে আত্মহত্যা করেন।

১৪ই জুলাই—অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার মুণ্ডহীন ধড় হুগলী জেলার সিঙ্গুর থানার হরিশপুর গ্রামে একটি ডোবার মধ্যে পাওয়া যায়।

১৬ই জুলাই—২৭ বৎসর বয়সের সন্ধ্যারাণী মুখোপাধ্যায় হাওড়া জেলার ডোমজুর থানা এলাকায় স্বামীর হাতে নিহত হন। স্বামী আত্মঘাতী হন।

১৯শে জুলাই—২৫ বৎসর বয়সের নমিতা নন্দীর

গলিত মৃতদেহ শিয়ালদহ ষ্টেশনে একটি নূতন ষ্টীল ট্রাঙ্কের মধ্যে পাওয়া যায়।

২০শে জুলাই—১৩ বৎসর বয়সের মহামায়া মণ্ডলের মৃতদেহ নৈহাটি থানার মামুদপুর গ্রামের এক মাঠে পাওয়া যায়।

২১শে জুলাই—৩৫ বৎসর বয়সের লক্ষ্মার মৃতদেহ আলিপুর পার্ক রোডের গৃহে পাওয়া যায়।"

চব্বিশ পরগণায় পাঁচ মাসে ৫৫টি খুন

"কেবল নারীহত্যা নয়, নরহত্যার খতিয়ানটিও বেশ দীর্ঘ। একমাত্র চব্বিশ পরগণা জেলা হইতেই যদি ইতস্ততঃ কয়েকটি দৃষ্টান্ত লওয়া যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে, এই মাসের মধ্যে ক্যানিং থানার বাঁশড়া ইউনিয়নে দুধ আলি নস্করকে ধারাল অস্ত্রের দ্বারা কোপাইয়া হত্যা করা হইয়াছে, মগরাহাট থানার ঈশ্বরপুর গ্রামে মাণিক ধাড়া ডাকাতদের হাতে নিহত হইয়াছে, বজবজ থানার বনরাজপুর গ্রামে কালীপদ সাধু ডাকাতদের হাতে নিহত হইয়াছেন ও বজবজ থানারই বাগুনেহাড়িয়া গ্রামের সুপতি নস্কর গুম খুন হইয়াছেন। তাহা ছাড়া এই সময়ের মধ্যেই বালী থানার জগদীশপুর গ্রামে মণিলাল কয়াল খুন হইয়াছেন এবং তাহার চারদিন পূর্ব্বে একই থানা এলাকায় দুধের দাম আদায় করিতে গিয়া খুন হইয়াছেন অমূল্যচরণ দাস। বাঁকুড়া জেলার হাটকৃষ্ণনগর গ্রামে ১২-১৩ বৎসরের বালক, নদীয়া জেলার নবদ্বীপ থানার স্বরূপগঞ্জ গ্রামে নারায়ণ দত্ত নামে এক সাধু এবং হুগলী জেলার আরামবাগ থানার ভাবপুর গ্রামে তিন ব্যক্তি খুন হইয়াছেন। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে বর্দ্ধমান জেলার আসানসোল এলাকায় তিনটি ডাকাতি হইয়াছে এবং এই তিনটি ডাকাতিতে মোট ৪ জন ডাকাতদের হাতে নিহত হইয়াছেন। সরকারী হিসাবে প্রকাশ যে, চব্বিশ পরগণা জেলায় ১৯৬১ সনের জানুয়ারী হইতে মে মাসের মধ্যে যেখানে ৩৫টি নরহত্যা হইয়াছিল সেখানে এই বৎসর জানুয়ারী হইতে মে মাসের মধ্যে ৫৫টি নরহত্যা হইয়াছে অর্থাৎ হত্যার সংখ্যা গত বৎসরের তুলনায় দেড় গুণের বেশী হইয়া গিয়াছে। হত্যা যদিও নিবারণযোগ্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না তথাপি হত্যাকাণ্ডগুলির কিনারা করিতে ও অপরাধীর শাস্তিবিধান করিতে পুলিসের ব্যর্থতা হত্যার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দায়ী বলিয়া মনে করা হইতেছে। চব্বিশ পরগণা জেলায় অন্যান্য অপরাধের বিস্তার স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি করিতেছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার দুর্বৃত্তদের উৎপাত বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া স্থানীয় জনসাধারণ অভিযোগ করিতেছেন। জুন মাসে দক্ষিণ বিষ্ণুপুর থানায় ১টি, মগরাহাট থানায় ৪টি, ডায়মণ্ডহারবারে ২টি ও জয়নগরে ১টি ডাকাতি হইয়াছে।"

মন্তব্য করিবার কিছুই নাই। অসহায় জনগণের সহায় একমাত্র তাহারা নিজেরাই এ কথা মনে রাখিতে হইবে।

স্বাগত প্রফুল্লচন্দ্র

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নির্ব্বাচিত হওয়াতে "সাধারণী"—সাধারণের মনের কথাই বলিতেছেন :

"যোগ্যপাত্রে যোগ্য ভার ন্যস্ত হয়েছে। আধার ও অধিকারী ভেদ বিবেচনা করলে প্রকৃত অধিকারীই আজ এ অধিকার পেয়েছেন। স্বাধীনতা-যুদ্ধের নেতা প্রফুল্লচন্দ্র, স্বাধীনোত্তর যুগের খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র আর আজকের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্রের মধ্যে সেই একই অনন্যকর্ম্মা, উৎসর্গীকৃত-জীবন, সেবাব্রতী কর্ম্মীকেই দেখতে পাই; কেবল পরিবেশের পরিবর্ত্তন হয়েছে মাত্র। সুতরাং এ কর্ম্মভার বহন করবার আধারও যে উপযুক্ত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ কোনদিনই ছিল না, আজও নেই; তাঁর নিজস্ব বলতে কোনদিনই কিছু ছিল না, আজও নেই। খাদ্যসমস্যাপীড়িত পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁর উপর দিয়ে যে ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে অন্য কোন প্রদেশে তার তুলনা নেই। তিনি যে ধৈর্য্য, যে সাহস, যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তাও সত্যই বিস্ময়কর। বিরোধী দল বিষোদ্গারণ ক'রে সারা দেশময় বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে। সে বিষ তিনি নীলকণ্ঠের মত আকণ্ঠ পান করে পরিবর্ত্তে অমৃতই বিতরণ করবার চেষ্টা করেছেন। গণের মানুষ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। কর্ম্মী ও জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর সর্ব্বপ্রকার যোগ বরাবরই অক্ষুণ্ণ আছে। তাঁকে রাষ্ট্রনায়কের চেয়ে রাষ্ট্রসেবকরূপেই আমরা দেখতে পাই। ডাঃ রায়ের নেতৃত্বে সারা বাংলার কৃষি, রাস্তাঘাট, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প প্রভৃতির বহুক্ষেত্রেই প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে কিন্তু বাধাও অনেক। ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে তাল রেখে সকল সমস্যার সমাধান করতে হবে। সুতরাং মুখ্যমন্ত্রী তাঁর এই গুরুদায়িত্ব বহন করবার জন্য, ডাঃ রায়ের আরব্ধ কর্ম্মকে সম্পূর্ণ করবার জন্য দেশবাসীর আশীর্ব্বাদ, সহানুভূতি ও সহযোগিতা কামনা করেছেন। জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া কোন পরিকল্পনাকেই বাস্তবের

যাদুস্পর্শে আলাদীনের প্রদীপের মত রাতারাতি রূপায়িত করা যায় না। তাই যদি আমরা মুখ্যমন্ত্রীর আন্তরিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করতে পারি তবেই তাঁর পক্ষে এই দুরূহ কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করা সম্ভব হবে।"

এ বিষয় সকলেই একমত। আমরাও বলি, স্বাগত প্রফুল্লচন্দ্র।

সামাজিক অত্যাচার ?

"আত্মীয়স্বজনের সামাজিক উৎসবে লৌকিকতার দাবী এমন বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছে যে, অনেক সময় মধ্যবিত্ত গৃহস্থকে লৌকিকতার জন্য টাকা ধার করিতে হয়। পূর্ব্বে লৌকিকতার বিলাসিতা ছিল না; ধনবানেরাও অল্প ব্যয়ে লৌকিকতার কাজ সারিতেন। তাহার ফলে উৎসবের আনন্দে দরিদ্রদের ব্যাঘাত জন্মিত না। এক-জন বন্ধু সেদিন বলিতেছিলেন, সপ্তাহে তাঁহার নিকট অন্ততঃ একখানি করিয়া বিবাহ, উপনয়ন বা জন্মদিনের নিমন্ত্রণ চিঠি আসে। সব জায়গায় যাইতে হইলে তিনি নীলামে উঠিবেন। কাজেই কোথাও যান না। একজন দরিদ্র বন্ধু বলিলেন, তিনি এই সকল নিমন্ত্রণ বর্জ্জন করিয়াছেন, কারণ তাঁহার অর্থ নাই। এই প্রকার বহু অনুযোগ প্রত্যহ শুনিতে পাওয়া যায়। ফলে একদিকে বাছিয়া বাছিয়া অর্থবানদের নিমন্ত্রণ হয়, অন্যদিকে দরিদ্র আত্মীয় ও বান্ধব সামাজিক উৎসবে আসেন না। তাই সত্যিকার সামাজিক উৎসব এখন আর নাই। সমাজে অর্থবান্ ও অর্থহীনের মধ্যে দুইটি ভাগ হইয়া যাইতেছে। নিমন্ত্রিতগণ বেশ কিছু না দিলে নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা বিশেষতঃ মহিলা-মহলে হতাশার ভাব দেখা যায়। বাল্যকালে দেখিয়াছি, বিবাহ, উপনয়ন প্রভৃতি নিমন্ত্রণে অতি নিকট আত্মীয় এক টাকা অথবা দুই টাকা আশীর্ব্বাদী দিতেন, অনাত্মীয় বান্ধবগণ আনন্দ করিয়া আহারাদি করিয়া যাইতেন। তাহাতে সামাজিক আনন্দ ও সংহতি থাকিত। অর্থবান্ ও দরিদ্র একত্রে প্রতি সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিতেন। অধিকাংশই ধান ও দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। এই পুরাতন ব্যবস্থা সমাজে পুনরায় চালু করিবার সময় আসিয়াছে। সমাজের অর্থবান্ দল, বিশেষতঃ মহিলাবৃন্দ এ বিষয়ে অগ্রসর হইলে মনে হয় সামাজিক উৎসবগুলি সত্যিকার উৎসবে পরিণত হইবে। সমাজের প্রত্যেকটি লোক পুনরায় সামাজিক হইবার সুযোগ পাইবে।"

'জনমত'—সত্যকার জনমতই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ফল কিছুই হইবে কি না সন্দেহ আছে। বর্ত্তমান সমাজে জন্মদিন, বিবাহ, উপনয়ন, বিবাহ-বার্ষিকী, বিবাহ-জয়ন্তী প্রভৃতি উৎসবে প্রকৃত এবং আন্তরিক আদর-আপ্যায়ন নির্ভর করে নিমন্ত্রিতের উপহার-দ্রব্যের মূল্যের বিচারে। এ কথা নিমন্ত্রণকারী এবং নিমন্ত্রিত—উভয় পক্ষই জানেন। লোভ দমন করা সহজ নহে, কাজেই জনমত যাহাই হউক না কেন, জনের মত পরিবর্ত্তন হওয়া কঠিন। উৎসবকে যাঁহারা প্রাপ্তিযোগ বলিয়া ধরিয়াছেন, তাঁহারা ইহা পরিত্যাগ করিবেন কি?

"করুণাময়ী" মন্দিরে পশুবলি ও মৎস্যভোগ

"বারাসাত"-এ ঘটা করিয়া (সচিত্র) প্রকাশ করা হইয়াছে এই আনন্দ-সংবাদ :

"আমডাঙ্গার প্রাচীন মঠ ৺শ্রীশ্রীকরুণাময়ী মাতার মন্দিরে পশুবলি প্রথা ও মৎস্যভোগ প্রথা সনাতন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই প্রথা যথার্থ শাস্ত্রানু-মোদিত কিনা তাহা নির্দ্ধারণের জন্য গত ৩০শে জুন আমডাঙ্গা মঠে শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিতবর্গের মহাসম্মেলনে চূড়ান্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তারকেশ্বর মঠের মোহান্ত মহারাজ দণ্ডিস্বামী ঋষিকেশ (?) আশ্রম মহাসম্মেলনের পৌরোহিত্য করেন। পশুবলিদান ও মৎস্যভোগ প্রথা শাস্ত্রানুমোদিত কি না তাহার বিষয়ে মদ্র দেশের (?)পণ্ডিতপ্রবর পট্টভিয়া শাস্ত্রী, ভট্টপল্লীর পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র স্মৃতি-তীর্থ, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ প্রমুখ পণ্ডিত-বর্গসহ হাওড়া, বারাকপুর, কলিকাতা, আন্দুল প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতবর্গ শাস্ত্রালোচনায় যোগদান করেন। বারাসাত কেন্দ্রের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত অশোক-কৃষ্ণ দত্ত শাস্ত্রালোচনায় অংশ গ্রহণ করেন এবং তাঁহার যুক্তি পণ্ডিতবর্গের পূর্ণ সমর্থন লাভ করে। পণ্ডিতবর্গের দীর্ঘ সময় ব্যাপী শাস্ত্রালোচনায় ইহা স্থিরীকৃত হয় যে, আমডাঙ্গা মঠে ৺শ্রীশ্রীকরুণাময়ী মাতার ভোগে মৎস্য-ভোগ্য প্রদান ও পশুবলি প্রথা যাহা স্মরণাতীতকাল হইতে প্রচলিত আছে তাহা শাস্ত্রানুমোদিত বিধায় অব্যাহত থাকিবে। পশুবলি প্রথা ও মৎস্যভোগ প্রথার বিরুদ্ধে স্থানীয় অঞ্চলে যাহাদের সংশয় ছিল এই শাস্ত্রালোচনা মহাসম্মেলনে উহা দূরীভূত হইয়াছে।"

বুদ্ধিমান্ শ্রীঅশোককৃষ্ণ দত্ত মহাশয় শাস্ত্রালোচনায় যে এত দক্ষ জানা ছিল না। আগামী নির্ব্বাচনের প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা এখন হইতেই করা বুদ্ধিমানের কার্য্য।

আর এক দিক্

'বারাসাত-বার্ত্তা' বলিতেছেন :

"কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জ্জন' নাটকের প্রধান

বিষয় হইতেছে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় রাজার দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্বের প্রধান বিষয় হইতেছে দেবতার পূজায় পশুবলি প্রথা। রাজা বলিপ্রথা উচ্ছেদ করিতে চাহেন, ব্রাহ্মণ রঘুপতি সনাতন প্রথা অপরিবর্ত্তিত রাখিতে বদ্ধপরিকর। আমডাঙ্গা মঠে ৺শ্রীশ্রীকরুণাময়ী মাতার মন্দিরে অদ্যাবধি পশুবলি প্রথা অব্যাহত আছে। এই প্রাচীন মঠের প্রথম অবস্থায় রাজ-রাজাদের স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে, কিন্তু পশুবলি প্রথা লইয়া 'বিসর্জ্জন' নাটকের মত কোন নাটকের সৃষ্টি হয় নাই। ৺করুণাময়ী মাতার ভোগে মৎস্যদান ও পশুবলি প্রথা প্রকৃত শাস্ত্রানুযায়ী কি না তাহা নির্দ্ধারণের জন্য পণ্ডিতবর্গের এক মহতী আলোচনা তর্কের তারিখ আগামী ১৫ই আষাঢ় স্থির হইয়াছে। (স্থির হইয়া গিয়াছে—বলি চলিবে!) আজিকার সমাজে পাপ কার্য্যেই লক্ষ্মীদেবীর আশীর্ব্বাদ আসিতেছে—খাদ্য, ঔষধে ভেজাল, কালোবাজার ও পাচারবাজার ইত্যাদি কার্য্যে যাঁহারা ফাঁপিয়া উঠিতেছেন তাঁহারা দিব্যি দেবতার মন্দিরে ছাগশিশু বলি দিয়া নিজ পাপ খণ্ডন করিতেছেন অন্যথায় পশু মানত করিয়া ধর্ম্মের নামে ছাড়িয়া দিতেছেন।"

বিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশ! আমরা কেবল এইটুকু বলিব যে, মন্দিরের নাম "শ্রীশ্রীকরুণাময়ী" পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য কিছু দেওয়া হউক। আমরাই মুসলমানদের গো-কোরবানি লইয়া দাঙ্গা করি।

১৫ই আগষ্ট

—লাল কেল্লায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্ত্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়া স্বাধীনতা দিবসের উদ্বোধন হইবে। ইহার পর তিনি একটি ভাষণ দিবেন। ঐদিন যাহাতে ভারতের সমস্ত রাজ্য, কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল এবং গোয়া,দমন ও দিউর স্কুল ও কলেজে বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, তাহার জন্য অনুরোধ জানান হইয়াছে। প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, এই অনুষ্ঠানে অন্যান্য কর্ম্ম-সূচীসহ সমবেত কণ্ঠে 'জনগণ মন' গাইতে হইবে। এই অনুষ্ঠানে দিল্লীতে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হইবে না। তবে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল স্থানীয় সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শক্রমে এই কুচকাওয়াজের ব্যবস্থা করিতে পারেন। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও ১৫ই আগষ্ট ছুটির দিন বলিয়া ঘোষিত হইবে।—

সবই হইবে, কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের জনগণের কি হাল হইয়াছে, তাহার প্রকৃত চিত্র কিছু দেখান হইবে কি? প্রতি বছর এই দিনটিতে একঘেয়ে একই চিত্র দেখাইয়া লাভ কিছুই হয় না। প্রধান মন্ত্রী আড়াই ঘণ্টা ধরিয়া সেই একই কথা বলিবেন, শ্রোতারা সেই একই পরম অমৃত বচন শ্রবণ করিবেন। আকাশবাণী (নেহরুর প্রচার বাহন) সেই একই ধারায় আকাশ মুখরিত করিবেন।

অতঃপর স্বাধীনতা উৎসবে—সুখ-চিত্রের উল্টা দিকটিতে একটু আলোকপাত করিলে সুখী হইব।

পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভাগ্য

—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুতে বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। ডাঃ রায়ের প্রখর ব্যক্তিত্ব ছিল এ যুগের এক বিস্ময়। তাঁর সঙ্গে তীব্র মতভেদ ঘটিলেও তাঁহাকে শ্রদ্ধা দানে কাহারও কোন কুণ্ঠা হয় নাই। বাঙালী তাঁহাকে ভালবাসিয়া-ছিল, বিশ্বাস করিয়াছিল। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত দেশের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস খুব কম গবর্ণমেণ্টের কর্ণধার পাইয়াছেন। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের নিকটেও তিনি ছিলেন অতীত যুগের ব্যক্তিত্বের শেষ স্তম্ভ। যতই মতানৈক্য হউক, তাঁর দাবী শেষ পর্য্যন্ত রক্ষিত হইত। রাজনৈতিক নেতার একটি প্রধান গুণ—সমালোচনায় সহিষ্ণুতা। বিধান সভার ভিতরে ও বাহিরে ডাঃ রায় তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছেন। তাঁর উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারার সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের প্রবল বিরোধ বাধিয়াছে, তার সঙ্গে তিনি সমান তালে চলিতে পারেন নাই। দুই শতাব্দীর মাঝখানে সেতুরূপে দীর্ঘজীবন নিয়া যাঁহারা রাজ্য শাসন করেন তাঁহাদের জীবনে এই সংঘর্ষ স্বাভাবিক। কিন্তু এই সংঘর্ষে প্রতি-পক্ষের প্রতি কোন বিদ্বেষ তিনি পোষণ করেন নাই। ইহা ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের আর একটি মহৎ দিক্। তাঁর আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক ইহাই প্রার্থনা করি।—

'যুগবাণী' সত্য কথা বলিয়াছেন। বাংলা তথা ভারতে রামমোহন যে-যুগের সূচনা করেন, বিধানচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে তাহার শেষ প্রতীক অবলুপ্ত হইল।

বর্ত্তমান সঙ্কট মুহূর্ত্তে পশ্চিম বাংলার পরম দুর্ভাগ্য।

সরকারী মহলে বিস্ময়

"পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ জীবনরতন ধরের সহিত পরামর্শ করিয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন স্থির করিয়াছেন যে, স্বাস্থ্য বিভাগের সেক্রেটারিয়েট ও ডিরেক্টরের কর্ত্তৃত্ব ভার পৃথক্ পৃথক্ দুই ব্যক্তির উপর অর্পণ করা হইবে।

এতদিন স্বাস্থ্য বিভাগের সেক্রেটারী ও ডিরেক্টর একই ব্যক্তি হওয়ায় তিনি একই সঙ্গে সেক্রেটারিয়েট ও ডিরেক্টরেটের উপর কর্তৃত্ব করিতেছিলেন। নূতন সরকারী সিদ্ধান্ত শীঘ্রই কার্য্যকর করা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন সরকারী মহলে প্রশ্ন উঠিয়াছে, পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় যে আদেশ দিয়া গিয়াছিলেন তাহার পর এখনও লেঃ জেনারেল ডি এন চক্রবর্ত্তী কি করিয়া স্বাস্থ্য বিভাগের সেক্রেটারী ও ডিরেক্টরের পদে কাজ করিয়া যাইতেছেন। ডাঃ রায় আদেশ দিয়াছিলেন যে, লেঃ জেনারেল চক্রবর্ত্তীকে স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এবং তিনি পুরা সময়ের জন্ম কলিকাতা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অর্গানাইজেশনের সেক্রেটারীর দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। সেই আদেশ সংশোধন করা হয় নাই। অতএব উহা বলবৎ আছে। কিন্তু লেঃ জেনারেল চক্রবর্ত্তী স্বাস্থ্য বিভাগে তাঁহার দায়িত্বভার এখনও ছাড়িয়া যাইতেছেন না। ফলে পশ্চিমবঙ্গের সরকারী মহলে বিস্ময়ের সৃষ্টি হইয়াছে।"

ক্ষমতাপ্রিয় ব্যক্তিদের স্বভাবই এই যে, তাঁহারা সহজে এবং সৌজন্যের সহিত কর্তৃত্বের গদি ত্যাগ করিতে চাহেন না। শেষ পর্য্যন্ত এই প্রকার ব্যক্তিদের এক প্রকার জোর করিয়াই আসনচ্যুত করিবার আবশ্যক হয়। পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর মহাশয়ও এই শ্রেণীর কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতালোভী মহাশয় ব্যক্তি।

স্বর্গত বিধানচন্দ্রের এই ব্যক্তিটিকে বহুদিন পূর্ব্বের দেওয়া আদেশ আজ পর্য্যন্ত কেন প্রতিপালিত হয় নাই বলিতে পারি না—কিন্তু হওয়া উচিত ছিল। স্বাস্থ্য-দপ্তর ত্যাগে ইঁহার আপত্তির কারণ এই হইতে পারে যে, মেট্রোপলিটান বোর্ডে সর্ব্বময় কর্তৃত্ব ইঁহার চলিবে না।

সরকারী এবং বেসরকারী হাসপাতালের উপর হুকুম চালান যত সহজ—মেট্রোপলিটান বোর্ডে তাহা সম্ভব হইবে না। বিশেষতঃ যাঁহার জোরে এই ব্যক্তির এত দাপট ছিল, সেই ব্যক্তির অবর্ত্তমানে। বর্ত্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে যতটা জানি, তাহাতে চালাকি এবং স্তোকবাক্যে তাঁহাকে খুশী করা বা ভুলানো চলিবে না। সরকারী স্বাস্থ্য-দপ্তরের কল্যাণ হউক।

পাকিস্তানী সৌজন্য-সহবত

পূর্ব্ব-পাকিস্তান হইতে যেসব পরিবার মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট লইয়া ভারতে আগমন করেন, পাক-সীমান্ত ঘাঁটিগুলিতে তাঁহাদের উপর লাঞ্ছনা ও হয়রানি যেন দিনের পর দিন বাড়িয়া গিয়াছে। বরিশাল হইতে আগত একটি পরিবারকে বেনাপোল পাক্-সীমান্ত শুল্ক ঘাঁটিতে পাক্-কর্ম্মীদের হাতে অহেতুক লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে।

মহিলাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট তল্লাসীস্থান থাকিলেও ঐ পরিবারভুক্ত মহিলাদের ট্রেনের কামরায় পায়খানার ভিতর লইয়া গিয়া দেহ তল্লাসী করা হয়। উচ্চপদস্থ পাক্-কর্ম্মচারীরা উঁকি মারিয়া নাকি এই দৃশ্য উপভোগ করেন। অভিযোগে আরও প্রকাশ, ঐ স্থানে ইণ্ডিয়ান লিয়াসোঁ অফিসার স্বয়ং উপস্থিত থাকিলেও তিনি এই ধরণের তল্লাসীতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করেন নাই। যে ট্রেনের কামরায় ঐ পরিবারের লোকজনদের তল্লাসী করা হইয়াছে, সেখানে উপস্থিত ছয় ব্যক্তি এই বিষয়ের প্রতি উক্ত ভারতীয় লিয়াসোঁ অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও তিনি নাকি এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব থাকেন। তাঁহাদের অভিযোগ, ঐ ব্যক্তি ঐ সময় পাক্-অফিসারদের সহিত গল্পগুজবে ব্যস্ত ছিলেন। অভিযোগ এই যে, তল্লাসীকালে পাক্ কর্ম্মচারীরা ঐ পরিবারের লোকজনের নিকট প্রাপ্ত টাকাকড়ি লইয়া গিয়াছে। অপমানকর উক্তি এবং অভদ্রোচিত ভাষা প্রয়োগ করিয়া পাক্-কর্ম্মীরা নিজেদের গায়ের ঝালও মিটাইয়াছেন। যে ছয় ব্যক্তি এই অভিযোগ করিয়াছেন, তাঁহারা এই ঘটনাটি এক স্মারকলিপির আকারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাক্-হাইকমিশনার প্রভৃতির নিকট প্রেরণ করিয়া এইরূপ গর্হিত কার্য্যের প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াছেন।"

প্রতিকার কি হইবে তাহা আন্দাজ করা সহজ। পাকিস্তানী কর্ম্মচারীরা নারীদের সহিত অভদ্রব্যবহার করিবে ইহা স্বাভাবিক এবং তাহাদের সহজাত ঐতিহ্য। কিন্তু ভারতীয় বেতনভোগী অফিসারেরা এই সব অভদ্র ব্যবহারের কোন প্রতিবাদ কেন করেন নাই বা করেন না, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। সঙ্গদোষে এই সব ভারতীয় হিন্দু-কর্ম্মচারীও কি পাকিস্তানী সৌজন্য সহবতে পোক্ত হইয়া গিয়াছেন?

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি নিশ্চয়ই কয়েক দিন পূর্ব্বের এই সংবাদটির উপর পড়িয়াছে। এ-বিষয় তাঁহাদের কি কোন কর্ত্তব্যই নাই? এই প্রশ্নের কোন জবাবই হয়ত পাইব না।

পাক্ বীরত্বের একটি নমুনা

সংবাদে প্রকাশ:

জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ থানার চাউলহাটি গ্রামের শ্রীরাধানন্দ গোপ নামক এক ব্যক্তিকে কয়েকদিন পূর্ব্বে

পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীর লোকেরা অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। তাহার আত্মীয়স্বজন সংবাদ পাইয়াছেন যে, পূর্ব্ব-পাকিস্তানের পঞ্চগড় থানায় তাহাকে পৈশাচিকভাবে পিটাইয়া হত্যা করা হয়। অভিযোগ পাইবার পর স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ দিনাজপুর জেলার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। শুকানি গ্রামের একটি বালিকাকেও অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়া তাহার শালীনতা নষ্ট করার অভিযোগ জেলা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আসিয়াছে। পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীর লোকেরা এই বালিকাটিকে পরে ফেরৎ পাঠাইয়া দিয়াছে।

প্রকাশ, ভারত-পাক্ সীমান্তে পাকিস্তানীদের অত্যাচার দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। সীমান্তের ভারতীয় মুসলমানরা একত্র হইয়া ভবিষ্যৎ কর্ম্মসূচী সম্পর্কে আলোচনা চালাইতেছে। রাজগঞ্জ থানার পুলিস রাষ্ট্রবিরোধী এবং অন্তর্ঘাতমূলক কার্য্যে লিপ্ত থাকার অভিযোগে পাঁচজন ভারতীয় মুসলমানকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

রাধানন্দ গোপকে অপহরণ করার সময় সীমান্তের ভারতীয় মুসলমানরা পাকিস্তানীদের সাহায্য করে।

এই প্রকার অপ্রকাশিত সংবাদ বহু আছে। কিন্তু ভারতীয় এলাকা হইতে এই ভাবে মানুষ অপহরণ আর কতদিন চলিবে? ভারতীয় পুলিস-মিলেটারী কি এতই অহিংস হইয়াছেন যে পাকিস্তানী নারকীয় অত্যাচারের কোন প্রতিবাদ প্রতিকার তাঁহারা করিতে ভয় পান? নেহরুর অহিংস নীতির এমন বিকট প্রকাশ কল্পনাতীত! ভারতীয় নাগরিকদের খাস ভারতীয় এলাকায় যদি পাকিস্তানী অত্যাচার এবং খুন-খারাপী বিনা বাধায় চলিতে থাকে, তাহা হইলে গরীব এবং অসহায় করদাতাদের রক্তের টাকা পুলিস-মিলিটারী বাবদ অনাবশ্যক অপব্যয় করিবার সার্থকতা কি জানি না।

প্রসঙ্গক্রমে সীমান্ত এলাকার এক শ্রেণীর ভারতীয় মুসলমানদের ভাবগতিক এবং কার্য্যকলাপ কি প্রকার তাহা জানা গিয়াছে। ইহারা নামে ভারতীয় হইলেও কাজে এবং মনে-প্রাণে পাকিস্তানী। এই প্রকার ব্যক্তিদের নিকট হইতে ভারতের, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ বিপদ কতখানি হইতে পারে, তাহা পাক্-প্রেমিক ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী হয়ত ভাবিয়া দেখিবার সময় এখনও পান নাই।

নেহরুজীর পাক্-নীতির বিষময় ফল

দেশ-বিভাগের পনরো বৎসর পরও উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের সীমান্ত-রাজ্যগুলির উপর পাকিস্তান যে একাদিক্রমে চাপ দিতে পারিতেছে, একটির পর একটি ভারতীয় অঞ্চল গ্রাস করিতে আগাইয়া আসিতে পারিতেছে, ইহাও শ্রীনেহরুর তোষণ ও পশ্চাদপসরণ নীতির বিষময় ফল। শ্রীনেহরুর প্রশ্রয় পাইয়াই নিত্যনূতন পাকিস্তানী দাবি গজাইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্ব-পাকিস্তানে নোয়াখালির বাসিন্দা মুসলমানরা পাকিস্তান সরকারের নিকট নালিশ জানাইয়াছে যে, ভারতীয় এলাকা ত্রিপুরা হইতে তাহারা জমির ফসল আনিতে পারিতেছে না। পাকিস্তানী মতে ইহা ঘোর অবিচার, ইহার দ্বারা চুক্তির খেলাপ করা হইতেছে! এ দিকে পূর্ব্ব-পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ হিন্দুর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সব-কিছু কাড়িয়া লইয়া তাহাদের নিঃস্ব অবস্থায় ভারতবর্ষে ঠেলিয়া দিবার বেলায় চুক্তি-খেলাপের কথা পাকিস্তানী বিচারে ঠাঁই পায় না। চুক্তি অনুযায়ী ভারতবর্ষের ন্যায্য পাওনা কোটি কোটি টাকা পরিশোধ করা বিষয়ে পাকিস্তানী কর্ত্তারা বেবাক ফাঁকি দিতে লজ্জা বোধ করেন না। চুক্তির কথা না হয় ছাড়িয়া দিই, পূর্ব্ব-পাকিস্তানে নোয়াখালি, কুমিল্লা ও ঢাকার গ্রামাঞ্চলে হিন্দুদের উপর এখনও যে-সমস্ত জঘন্য অত্যাচার চলিতেছে, তাহার জবাবদিহি করিবে কে?

জবাব পাকিস্তান দিবে না। নেহরুকে পত্র দিলে হয়ত একটা মনের মত জবাব অর্থাৎ 'বাণী' পাওয়া যাইবে! ব্যাপার সত্যই চমৎকার। যে পক্ষ ক্রমাগত চুক্তি খেলাপ করিয়া চলিবে, সেই পক্ষই চুক্তি-পালনকারী পক্ষকে চুক্তি-ভঙ্গকারী বলিয়া অভিযুক্ত করিবে! এবং পরম পণ্ডিত, ভারতের প্রধান মন্ত্রী তাহা অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইবেন! মিথ্যাকে বারবার সত্য বলিয়া গলা ফাটাইয়া চিৎকার করিয়া ঘোষণা করিলে তাহা অবশেষে, অন্তত কিছুলোকের নিকট, সত্যই সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইবে পাকিস্তান এই নীতিতে বিশ্বাসী। নেহরুও কি তাহাই?

পরিহাসপ্রিয় নেহরু

—আসাম ও ত্রিপুরা হইতে অনধিকার-প্রবেশকারী পাকিস্তানী মুসলমানদের ভদ্রভাবে বিদায় করিতে গেলেও পাকিস্তানী কর্ত্তারা সোরগোল সুরু করিয়া দেন এবং শ্রীনেহরু তৎক্ষণাৎ 'তোবা, তোবা' করিয়া পিছু হটিতে থাকেন। এক যাত্রায় পৃথক্ ফলের এই মর্ম্মান্তিক পরিহাস আর কতদিন চলিতে দেওয়া হইবে? ভারতের সহিত পাকিস্তানের বন্ধুত্ব চলিতে পারে না—প্রেসিডেন্ট

আয়ুবের এই স্পষ্ট উক্তির সহিত শ্রীনেহরুর সীমান্তরক্ষা-নীতি ও কর্ম্মপদ্ধতির কিছুমাত্র মিল নাই। পাকিস্তানী হুমকি ও হামলার সমুচিত উত্তর দিতে ভারত সরকার অবিলম্বে উদ্যোগী না হইলে মাত্র দুই-চারিখানি গ্রাম নয়, পশ্চিমবঙ্গ,আসাম ও ত্রিপুরার বিস্তীর্ণ অঞ্চল গ্রাস করিয়াও পাকিস্তানের দাবী কখনও মিটিবে না।

রাজ্য দু'টি যদি বিহার এবং উত্তর প্রদেশ হইত, তাহা হইলে নেহরুর পরিহাসপ্রিয়তা বোধহয় এতখানি দেখা যাইত না।

পরিহাস যদি এই ভাবে চলিতে থাকে, তাহা হইলে অবশেষে হয়ত পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামকে যুক্তভাবে প্রাণরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারত সরকারের দয়ার প্রতি বিশ্বাস আমাদের প্রায় নাই বলিলেই চলে।

পাকিস্তানী অনুপ্রবেশ

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী এখান হইতে ৩১ মাইল দূরে লাটিটিল্লা অঞ্চলে অনধিকার প্রবেশ করে। তাহারা ভারতীয় মুসলমানদের পাকিস্তান সরকারের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করিতে বলে এবং পাকিস্তানের বাজারে জিনিষপত্র ক্রয়-বিক্রয় করিতে বলে। কারকাহাপিটনী, বড়াপুটনী, ছোটপুটনী, ডুমাবার্ড়ী এবং লাটিটিল্লা—এই পাঁচটি ভারতীয় গ্রাম পাকিস্তান তাহাদের বলিয়া দাবি করিতেছে। এ সম্পর্কে একটি মামলা ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের বিবেচনাধীন। সুপ্রীম কোর্টের নির্দ্দেশ-সাপেক্ষ এই অঞ্চলের চিহ্নিতকরণ স্থগিত আছে।

পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনী ভারতীয় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীকে সাবধান করিয়া দিয়াছে যে, তাহারা যেন ঐ অঞ্চলে প্রবেশ না করে। কারণ, তাহাদের মতে ঐ অঞ্চল পাকিস্তানের।

এই ঘটনার পর ভারত ও পাকিস্তানের সীমান্ত-রক্ষি-বাহিনীর অধিনায়কগণ গত সপ্তাহে সীমান্তে এক বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকে স্থির হইয়াছে যে, এ বিষয়ে চূড়ান্তভাবে নির্দ্ধারণের জন্য উভয় দেশের কর্তৃপক্ষের মধ্যে এক উচ্চ পর্য্যায়ের বৈঠক হইবে। এই সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এই অঞ্চলের অসামরিক প্রশাসন ভারত কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং ভারত বা পাকিস্তানের কাহারও সশস্ত্র টহলদার দল এই অঞ্চলে প্রবেশ করিবে না।

পাকিস্তানের সহিত ইতিপূর্ব্বে চুক্তিগুলির যে পরিণাম হইয়াছে—বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহার কোন ব্যতিক্রম নাই। এই চুক্তিপত্রের কালি শুকাইবার পূর্ব্বেই পাকিস্তান যথারীতি অন্য বহুস্থলে বে-আইনী প্রবেশ করিয়াছে, বহু স্থান জবরদখল করিয়া পরম আরামে বসবাস করিতেছে। ভারত সরকার নির্ব্বিকার।

কিন্তু গ্রাসে গ্রাসে ক্ষুধা বাড়ে; চীনের দেখাদেখি পাকিস্তানেরও ক্ষুধা বাড়িতেছে। ভারতবর্ষের উপর হুমকি ও হামলা চালানোয় চীন এবং পাকিস্তান এখন সমানে পাল্লা দিতে সুরু করিয়াছে। কাশ্মীরের এক অংশ গ্রাস করিয়া পাকিস্তানের ক্ষুধা মেটে নাই; কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা-পরিষদ পাকিস্তানের আবদার অনুযায়ী গোটা কাশ্মীর প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের হাতে তুলিয়া দিতে নারাজ। কাজেই পাকিস্তানীরা আবার হুমকি ও হামলার জোর বাড়াইয়া যেখানে যতখানি পারা যায় ভারতভূমি জবরদখল করিতে অগ্রসর হইয়াছে। করাচিতে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব ঘোষণা করিয়াছেন, ভারতের সহিত পাকিস্তানের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত না হইলে উভয় দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা সব সময়েই থাকিবে। আয়ুব খাঁ তাঁহার এই হুমকির মর্ম্মার্থ আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেও ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার দাবি —কাশ্মীর চাই, নহিলে ভারতের সহিত পাকিস্তানের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে না।"

"কাশ্মীরের পর দাবী উঠিবে আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গের কি অংশ পাকিস্তানের চাই-ই।"

দেশ ভাগ করিয়া, লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে ভিটামাটি ছাড়া করিয়াও পাকিস্তানীদের ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় নাই। অতএব আরও চাই, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের দেহ খণ্ডবিখণ্ড করিয়া উপঢৌকন দিলে তবেই পাকিস্তানী কর্ত্তারা খুশী হইয়া বন্ধুত্ব করিতে অগ্রসর হইবেন। আয়ুব খাঁ নিজেও জানেন, ইহা প্রকৃতপক্ষে বন্ধুত্বের প্রস্তাব নয়, ক্রুর, কুটিল পররাজ্যগ্রাসী লালসার নির্লজ্জ প্রকাশ।

আমরা অবাক্ হইতেছি ভারত সরকারের ক্লৈব্য দেখিয়া। পাকিস্তানের নিকট হইতে গত ১৫ বছরে এত লাথি চড় গাল এবং জুতা খাইয়াও—ইহাদের পাকিস্তানী প্রেমে কোন ধস্ নামে নাই। প্রধান মন্ত্রী নেহরু জবরদস্ত ব্যক্তি, পাকিস্তান না চাহিলেও তিনি তাহাকে প্রেম করিবেনই! ভগবান্ শ্রীচৈতন্যও বোধ হয় হার মানিলেন! সেই ভগবৎ প্রেমী সন্ন্যাসীও অন্যায়ের প্রতিরোধ স্পৃহায় রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা

'সেবক' বলিতেছেন:

কোন বিদেশী নাগরিকই কোন দেশে বে-আইনীভাবে

বাস করিতে পারে না। ইংলণ্ডে বিপুল সংখ্যক পাকিস্থানী গিয়া আস্তানা গাড়ায় সেখানের রাজনৈতিক দলের চাপে গভর্ণমেণ্টকে আইন করিতে হইয়াছে। ইহা বেশী দিনের কথা নয়। আর আমাদের দেশে বৈদেশিক নাগরিক আইন প্রয়োগ করিতে গেলে রাজনৈতিক দল প্রবল বাধা সৃষ্টি করে। ত্রিপুরায় বসবাসকারী মোট পাকিস্তানীর শতকরা মাত্র ১ জনকে বহিস্কার করিতে না করিতেই লীগপন্থী ভারতীয় নাগরিক এবং তাহাদের অভিভাবক রাজনৈতিক পাণ্ডারা এমন সব কাণ্ড করিতেছে যাহাতে প্রকারান্তরে পাকিস্থানের হস্তকেই শক্তিশালী করা হইতেছে। এই সমস্ত বিদেশী নাগরিক যে একদিন ভারত রাষ্ট্রের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিতে পারে এই জরুরী কথাটিই তাহারা ভাবিতে পারিতেছে না।

যাঁহারা পাকিস্তানীদের ভারতে অনুপ্রবেশে বিবিধ প্রকারে প্রকাশ্য এবং গোপন সহায়তা দান করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর মুসলমান ছাড়া বিশেষ এক রাজনৈতিক দলও আছেন। এই দল কেবল পাকিস্তান নহে, চীনাদেরও ভারতে দখল দিবার গোপন আয়োজনে লিপ্ত আছেন। ভারত সরকার ইহা জানেন, কিন্তু তাঁহারা ব্যক্তি এবং দল-স্বাধীনতায় পরম বিশ্বাসী বলিয়া চোরকে চুরি, খুনেকে খুন, ডাকাতকে ডাকাতি, দেশের এবং জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বাসঘাতকতা করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিয়াছেন।

ভারতই প্রকৃত ডিমোক্র্যাটিক রাষ্ট্র—সন্দেহ নাই।

পাকা চাল

হিন্দুবাণীর মতে :

কম্যুনিষ্ট প্রভৃতি দলগুলি বাংলা দেশের ছাত্রদের মধ্যে কি ভাবে কাজ করিয়া যাইতেছে, তাহা একটু সতর্ক দৃষ্টি দিলেই বোঝা যায়। কলিকাতা এবং আরও বিভিন্ন কলেজে প্রতি বৎসর 'ফেল' করিয়া ইহাদের কর্ম্মীরা থাকিয়া যায় এবং ছাত্রদের নিজেদের মতবাদে টানার চেষ্টা করে। এই সব চাঁই ছাত্রদের মাহিনাও পার্টির তহবিল হইতে দেওয়া হয়। ইহারাই দল পাকাইয়া ছাত্র ইউনিয়ন প্রভৃতি হাত করিয়া রাখে এবং কাজ দেখিবার নামে একটা কিছু অজুহাত বাহির করিয়া হৈ চৈ করিয়া থাকে। আবার মাঝে মাঝে উপরওয়ালা রাজনৈতিক মোড়লদের নির্দ্দেশে তুচ্ছ কারণে ধর্ম্মঘট করিয়া ছাত্রদের লইয়া শোভাযাত্রা বাহির করে।

মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের বয়স কিছু বেশী হয়, কাজেই তাহাদের নিকট হইতে অধিকতর মর্য্যাদাবোধের পরিচয় সকলেই আশা করেন। পড়াশুনার মাঝে নানান অসুবিধা প্রত্যেক কলেজেই থাকে। কিন্তু কিছুকাল আগে পরীক্ষা পিছাইবার দাবী তুলিয়া কলিকাতায় মেডিকেল ছাত্ররা যাহা করিয়াছে, তাহা তাহাদের কলঙ্কিতই করিয়াছে। মেডিকেল ছাত্রদের প্রথম উস্কানি আসে কম্যুনিষ্টপন্থী একদল ডাক্তারের তরফ হইতে। তাহারা ছাত্রদরদী সাজিয়া মেডিকেল ছাত্রদের অসুবিধা-গুলির কথা তুলিয়া ছাত্রদের মনে বিক্ষোভ দানা বাঁধিতে সাহায্য করেন।—

সবই জানা কথা, কিন্তু প্রতিকার যাঁহারা করিতে পারেন, তাঁহারা যদি ভয়ে চুপ করিয়া থাকেন তাহা হইলে অবস্থার চরম অবনতি হইবে অনতিবিলম্বে।

এ বিষয়ে জনমত সৃষ্টি করিতে পারেন সংবাদপত্র। কিন্তু আমাদের দেশে জনমতই প্রকারান্তরে অধিকাংশ সংবাদপত্রকে প্রভাবান্বিত করিতেছে!

ডি-ভি-সি'র চরম ব্যর্থতা

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার এক অধিবেশনে সেচ ও দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা খাতে ব্যয়-বরাদ্দের দাবি সম্পর্কে আলোচনাকালে বিরোধী ও কংগ্রেস—উভয় পক্ষের সদস্যগণই চাষেরজন্য সময়মত জল সরবরাহে ডি-ভি-সি'র শোচনীয় ব্যর্থতা সম্পর্কে ঐক্যমত প্রকাশ করেন।

অথচ এই 'ডি-ভি-সি'র জন্য পশ্চিমবঙ্গকে কোটি কোটি টাকা দিতে হয়। মোট যত টাকা কর্পোরেশনের জন্য খরচ হয়, তাহার শতকরা কম পক্ষে ৬৫ টাকা পশ্চিম-বঙ্গের দেয়। বাকী টাকার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার দেন ২০ এবং বিহার বোধ হয় ১৫! অথচ লাভের গুড় যদি থাকে তাহা ভোগ করে বিহার এবং বেশ কিছু সংখ্যক মান্দ্রাজী এবং পাঞ্জাবী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। অবশ্য—বাঙ্গালী একেবারে বঞ্চিত হয় না, পায় কিঞ্চিৎ মাত্র।

সংবাদপত্র যাঁহারা পড়েন, তাঁহারা জানেন, ডি-ভি-সি সর্ব্বদিক্ হইতেই ব্যর্থ হইয়াছে। অথচ এই পরিকল্পনার প্রারম্ভে পশ্চিমবঙ্গকে স্বর্গের স্বপ্ন দেখানো হইয়াছিল। দরিদ্র করদাতাদের টাকা দামোদরের জলে এমন করিয়া না ভাসাইলে, সেই টাকায় বহুবিধ ছোট-খাট পরিকল্পনা সার্থক করা যাইত।

কেন্দ্রীয় প্রায় সকল সরকারী পরিকল্পনার পরি-কল্পনাতেই রহিল—ধরা দিল না। ইস্পাত কারখানা-গুলির কথা না বলাই ভাল। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃতিত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। ডাঃ রায় পরিকল্পনাতে তাঁহার অসাধারণ বাস্তবতার সাক্ষ্য-প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনও এ বিষয়ে তাঁহার গুরুর মান রক্ষা করিবেন, বিশ্বাস করি।

আমি ঃ তুমি ঃ মিতা

শ্রীতেজেন্দ্রলাল মজুমদার

আমি গল্প শোনাতাম তোমাকে। তুমি আমাকে।

আমি বলতাম, জান, তোমাকে বিয়ে করার আগে আরেকটি মেয়েকে আমি ভালবেসেছিলাম। তার নাম বলব না। শুধু জেনে রাখ, তাকে আমি মিতা বলে ডাকতাম।

তুমি বলতে, জান, তোমাকে বিয়ে করার আগে অনেক ছেলে এসেছিল আমার জীবনে। তাদের কোনও একজনকে আমি হয়ত ভালবাসতাম। কিন্তু আমার মাসতুতো বোন মিনতিদিকে দেখার পর থেকে সে সাহস আমার হয় নি। বেচারী কাকে যেন ভালবেসেছিল। কিন্তু প্রতিদানে কেবল ব্যর্থতা আর অপবাদই পেল।

অবশেষে আমি সম্মতি দিলাম। তুমি লিখলে। আর তোমার মিনতিদি একদিন আমাদের বিলাসপুরের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন।

আমি জানলাম, তোমার মিনতিদি আসলে আমার মিতা!

তুমি জানলে, তোমার মিনতিদি যাকে ভালবেসেছিল সে আমিই!

সেই দিন থেকে আমি ঘৃণা করলাম তোমাকে। তুমি আমাকে। আর আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কও দ্রুত এগিয়ে গেল একটি বিয়োগান্ত পরিসমাপ্তির দিকে।

ড্রয়িংরুমে বসে দৈনিক সংবাদপত্রে একটি রোমহর্ষক নারীহরণের সংবাদ পড়ছিলাম আমি। আমার গজ দুয়েক দূরের সোফাতে বসে অর্দ্ধনিমীলিত চোখে, ফেলে আসা জীবনের স্মরণে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিল মিতা। এমনি সময় তুমি এসে বলেছিলে আমাকে, হ্যাঁগা, তুমি কি আজ হাসপাতালে যাবার নাম করবে না? ওদিকে সেই সকাল থেকে ত শুধু টেলিফোনের উপর টেলিফোন আসছে।

বলেছিলাম, আসুক গে। একটা দিন না-হয় নাই বা গেলাম।

কেন, আজ আবার শরীর খারাপ করেছে নাকি? কই শ্বাস ত আজ তুমি বেশ ভাল ভাবেই নিচ্ছ।

তোমার প্রশ্ন শুনতেই মিতা চোখ মেলে একবারটি দেখেছিল আমার দিকে। জবাবে তোমাকে বলেছিলাম, না, শরীর খারাপ টারাপ নয়, এমনিতেই আজ যেতে ইচ্ছে করছে না।

শোনো কথা! বিস্ময় প্রকাশ করেছিলে তুমি। ডাক্তার গুকু বার বার করে বলেছেন কি একটা সিরিয়াস কেস্ এসেছে হাসপাতালে। তুমি ছাড়া কারুরই সাধ্য নেই কেস্‌টিকে হাতে নেয়।

অগত্যা উঠে এসেছিলাম আমি। আর আসতে আসতে ভাবছিলাম, তোমার এই হঠাৎ পরিবর্ত্তনকে। এই তুমিই কি কাল পর্য্যন্তও অসুস্থ শরীরে সারাদিন কাজ নিয়ে থাকি বলে আমার উপর রাগ করতে না?

হাসপাতালে এসে দেখেছিলাম, তুমি মিথ্যা বল নি।

পাঁজরার হাড় ভেঙ্গে ফুসফুসে ঢুকে গিয়েছিল একটি মেয়ের। তার বর্ত্তমানে তার স্বামী অন্য একটি মেয়েকে ভালবাসত বলে, ছাদের উপর থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল সে।

হাসপাতাল থেকে ফিরে, লাঞ্চের টেবিলে তোমাদের এই ঘটনাটা শোনাতে শোনাতে আমি আমার মন্তব্য যুক্ত করেছিলাম, উঃ, কি ক্রুর ওই স্বামীটা! ওর কিন্তু ফাঁসী হওয়া উচিত। স্পর্দ্ধা দেখ না? হতচ্ছাড়া স্ত্রীর বর্ত্তমানে অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে গেছে!

চকিতে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিল মিতার মুখ।

তুমি কিন্তু আমার বিচারবোধের রীতিমত প্রশংসা করে এক সময় বলেছিলে, হ্যাঁগা, বৌটি বুঝি দেখতে ভাল ছিল না?

তা অবশ্য ছিল না। কিন্তু তাতে কি? বিয়ে করা স্ত্রীকে ছেড়ে অন্য মেয়ের পিছনে দৌড়ান কি সুস্থ মনুষ্যত্বের লক্ষণ?

পরদিন সকালে মিতাকে হাত ধরে টানতে টানতে তুমিই জোর করে নিয়ে এসেছিলে আমার সামনে। বলেছিলে, ওগো শুনছ কথা! মিনতিদি আজকেই চলে যাবে বলছে।

সে কি? ওঁর ত এক মাস থাকবার কথা। তা

ছাড়া বিলাসপুরের কিছুই ত এখনও উনি দেখেন নি।

মিতা বলেছিল, আবার যখন আসব, তখন দিন কয়েক বেশ ঘোরাঘুরি করে সব কিছু দেখে নেব রবীনবাবু।

তখন ত আমরা এখানে নাও থাকতে পারি মিনতিদি। জানেন ত, আমার সরকারী চাকরী, তার উপর মেডিক্যাল লাইন। কে জানে কখন কোথায় বদলী হই।

এর পরে মিত'র গলাটিকে তোমার দুটি হাতে ঘিরে নিয়ে, তুমি আব্দারের সুরে বলেছিলে, আমি কিন্তু এক মাসের আগে তোমাকে যেতে দেব না মিনতিদি। না, কিছুতেই না।

দিন দুয়েক পরে একদিন হাসপাতাল ফেরতা আমি বাড়ী আসতেই, তুমি একা পেয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছিলে, হ্যাঁগা, মিনতিদি খুব সুন্দরী। তাই না?

বলেছিলাম, এই প্রশ্ন কেন?

এমনিই। নিছক কৌতূহল।

না, এই ধরণের কৌতূহল ভাল নয়। উনি আমাদের গুরুজন।

হোক্ গুরুজন। ও ত আর এখানে শুনতে আসছে না? বল না লক্ষীটি।

আমাকে নিরুত্তর দেখে তুমি আমার হাতখানাকে তোমার মুঠিতে তুলে নিয়ে পীড়াপীড়ি করতে যাচ্ছিলে। কিন্তু তার বদলে একটি অস্ফুট যন্ত্রণার অভিব্যক্তি দিয়ে তুমি বলেছিলে, ওমা, তোমার শরীর যে দেখছি আগুনের মত গরম! শরীর খারাপ, তা এতক্ষণ বল নি কেন? চল শুয়ে পড়বে।

বলেছিলাম, এবারের অসুখ আমার কিন্তু আর ভাল হবে না অনিতা।

রাখ দিকি যত অলুক্ষণে কথা।

সেদিন সন্ধ্যায় ডাক্তার ওকের বাড়ীতে তাঁর ছেলের জন্মদিনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে তুমি একাই গিয়েছিলে। অসুস্থ হয়ে পড়ার দরুণ আমি যেতে পারি নি। আর তোমার অনুপস্থিতিতে আমার উপর লক্ষ্য রাখার জন্য মিতাকে তুমি নিজেই সঙ্গে নিয়ে যাও নি।

তুমি চলে যাবার পর মিতাকে এক সময়ে একা কাছে পেয়ে আমি বলেছিলাম, মিতা, একটা কথা যদি বলি রাগ করবে না ত?

মিতা! মিতা কে রবীনবাবু? আমি ত আপনার মিনতিদি।

বেশ, তুমি তাই। বল না, একটা কথা বলব তোমাকে?

কি কথা?

তুমি আমাকে ভুল বুঝেছিলে মিতা।

ভুল বুঝেছি?

হ্যাঁ, ভুল বুঝেছ। জানো, কন্‌জেনটেল্ হার্ট ডিজিজে দীর্ঘদিন থেকে আমি ভুগছি।

অবাক্ বিস্ময়ে মিতা প্রশ্ন করেছিল, অসুখের সঙ্গে ভুল বুঝাবুঝির কি সম্পর্ক রবীনবাবু?

সে কথাই ত বলতে চাই মিতা। মনে আছে, তোমার সঙ্গে আমার যখন শেষ দেখা হয়, অর্থাৎ সেই দুবছর আগে, আমি একবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম?

হ্যাঁ, মনে আছে।

বিখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসু তখন দেখেছিলেন আমাকে। তিনি সব দেখে শুনে বললেন, 'ইণ্টার ভেনট্রিকুলার সেপটেল ডিফেক্ট উইথ আরলি ফেইলুওর' হয়েছে আমার। আর এই এত বড় অসুখটা আসলে কি জান? হৃদয়ের প্রকোষ্ঠে শুদ্ধ রক্তের সঙ্গে অশুদ্ধ রক্তের সংমিশ্রণ হয়ে যাওয়া। নিজেও ডাক্তারী পড়েছি বলে সেদিন বুঝেছিলাম আমি, মৃত্যু আমার অবধারিত। অবশ্য এই অসুখটায় মানুষ যে বাঁচে না, তা নয়—বাঁচে। তবে তা শতকরা তিন কি চারজন। তাও আমেরিকায় গিয়ে বহু সহস্র টাকা খরচ করে যদি চিকিৎসা করায় তবেই। সমান্য কেরানী বাবার ছেলে আমি। প্রাইভেট্ ট্যুশানি করে তখন সবেমাত্র ডাক্তারীটা যা হোক করে পাশ করেছিলাম। বাঁচবার ক্ষীণতম আশা করাও সেদিন আমার জন্য দিবাস্বপ্ন ছিল। আর এই নিশ্চিত মৃত্যু জানার পরেও তোমাকে বিয়ে করা কি জেনে শুনে তোমার সর্বনাশ করা হ'ত না মিতা?

শ্লেষ-বঙ্কিম স্বরে মিতা বলেছিল, আমাকে ভালোবাসতেন বলে আপনি আমার সর্বনাশ করেন নি রবীন বাবু—সেজন্য ধন্যবাদ আপনাকে। কিন্তু অনিতার এত বড় সর্বনাশ করার কি অধিকার আপনার ছিল? কেন সব জেনে শুনেও আপনি ওকে বিয়ে করেছেন?

ভ্রান্ত আশাতেই ত মানুষের মন ধাঁধিয়ে যায়। মানুষ কর্ত্তব্যবিস্মৃত হয়। জান মিতা, এই দুরারোগ্য অসুখ হয়েছে জানার পরেও আমি স্বপ্ন দেখলাম ভাল হবার। দীর্ঘজীবন লাভ করার। মনে হ'ল, বিদেশে কোথাও গিয়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় করলে হয়ত চিকিৎসা করান যেতে

পারে। কিন্তু প্রশ্ন এল, অত টাকা আমি কোথায় পাব? অবশেষে বিত্তবান্ পিতার একমাত্র সন্তান অনিতাকে আমি বিয়ে করে আনলাম। তুমি বলবে, আমি অনিতার সর্বনাশ করেছি। আর আমি বলি, আমি নিজের সর্বনাশ করেছি।

মিতা বলেছিল, এ সব কথা তুমি আমাকে আগে কেন বল নি রবীন?

বলে কি লাভ হ'ত মিতা? শুধু দুঃখই বাড়ত তোমার। ইষ্টার্ন ট্রেডার্স ফেল পড়ায় তোমার বাবা তখন কপর্দ্দকহীন। তা ছাড়া আমি যদি টাকা চাইতাম, তাহলে তুমি হয়ত ভেবে বসতে, তোমার দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে তোমার মা-বাবার উপর জুলুম করছি আমি! তার চেয়ে এই ভাল হয় নি কি, নিজেকে তোমার ভালবাসার অযোগ্য প্রতিপন্ন করে চোরের মত এমনি পালিয়ে আসা?

মিতা প্রশ্ন করেছিল, তুমি বিয়ে করেছ আজ ছয় মাস। শুধু সেরে উঠবে বলেই যদি তোমার এই বিয়ে করা, তাহলে আজও কেন তুমি বিদেশে গেলে না রবীন?

আমি বলেছিলাম, যেতাম মিতা। কিন্তু ইতিমধ্যে কলকাতায় গিয়ে আরেকটি এক্সরে নিয়ে জেনে এলাম, আমার অসুখটি এখন এ্যাডভান্স্‌ড্ ষ্টেজে। এই সময় বিদেশ কেন, স্বয়ং ভগবানের কাছে গেলেও আমি বোধ হয় আর ভাল হব না। যাক্, এ সব কথা, এবার তুমি বল মিতা, আমাকে তুমি ভুল বোঝ নি?

উত্তরে মিতা আমার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অবোধ শিশুর মত কাঁদতে আরম্ভ করে দিয়েছিল!

ঠিক সেই সময় বাড়ী ফিরে এসে আমাদের দু'জনকে ঐ ভাবে ধরে ফেলেছিলে তুমি। প্রশ্নবাণে মিতাকে জর্জ্জরিতা করে দিয়ে তুমি বলেছিলে, মিনতি-দি, এত নির্লজ্জা তুমি? এত বেহায়া?

সেই রাত্রিতেই মিতা মরে গেল গলায় দড়ি দিয়ে। টেবিলের উপর থেকে মিতার হাতের এক লাইন লেখা একটি কাগজ তুমি তুলে এনে দিয়েছিলে আমাকে, তাতে লেখা ছিল, তুমি যখন আসছই, তখন ক্ষতি কি আমি যদি একটু আগে পৌঁছে যাই।

রোগশয্যায় শায়িত আমার মুখের দিকে জিজ্ঞাসার দৃষ্টি বিছিয়ে দিয়ে, তুমি জানতে চেয়েছিলে এই লাইনটির অর্থ।

দিন কয়েক বাদে মুমূর্ষু আমাকে নিয়ে কলকাতায় আসতেই হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বন্ধু তোমাকে আমার হয়ে জবাব দিয়েছিলেন, 'ইন্টার ভেনট্রিকুলার সেপটেল ডিফেক্ট উইথ আরলি ফেইলুওর। যদি বাঁচাতে চান ত শীগগির নিউইয়র্ক নিয়ে যান। ওখানকার হার্ট স্পেশালিষ্ট ডাঃ ডেভিস ছাড়া পৃথিবীতে কারও সাধ্য নেই একে ভাল করে।

আজ তোমার বাবার সঙ্গে নিউইয়র্ক যাবার পথে লণ্ডনে এসে পৌঁছেছি আমি। প্যান আমেরিকানের মস্তবড় যাত্রীবাহী প্লেনটা ঘণ্টাচারেক বিশ্রাম করবে এখানে। এরই মধ্যে এত সব কথা তোমাকে লিখে ফেললাম।

আমি বাঁচব কি?

তুমি হয়ত লিখে পাঠাবে, ভেঙে পড়ো না, এটা বিজ্ঞানের যুগ, এর চেয়ে বড় বড় অসুখকেও ভাল করেছেন আজকের চিকিৎসকেরা।

কিন্তু কে জানে কেন, এই মুহূর্তে মিতার লেখা এক লাইনের সেই কাগজটিই বার বার ভেসে আসছে আমার চোখের সামনে।—তুমি যখন আসছই, তখন ক্ষতি কি আমি যদি একটু আগে পৌঁছে যাই।

জীবনে যাকে আমি প্রতারণা করেছি, মৃত্যুতেও তাকে আমি প্রতারণা করব কি?

হরতন

শ্রীবিমল মিত্র

৫

তার পর নিবারণের দিকে চেয়ে নতুন-বৌ বললে—আপনি কি রকম মানুষ সরকার মশাই, সবাইকেই কি আপনার কর্ত্তামশাই-এর মত মনে করেন? দেখছেন সকাল বেলা বাবা স্নান ক'রে ক্লান্ত হয়ে এসেছেন, এখন একটু আহ্নিক করতে বসেছেন, এখনি আপনার কথা বলবার সময় হ'ল?

সরকার মশাই আড়ষ্ট হয়েই গিয়েছিল। নতুন-বৌ-এর কথাতে উঠে দাঁড়াল।

বললে—আমি ত মা সা'মশাইকে আটকে রাখি নি—

—তা কাক-কোকিল ডাকতে না ডাকতে বাড়ীতে এসে ব'সে থাকলে কেউ চ'লে যেতে বলতে পারে?

—আর বেশি কথা বলতে হবে না মা, আমি নিজেই যাচ্ছি।

ব'লে নিবারণ উঠল। উঠে চ'লেই যাচ্ছিল। কিন্তু সা'মশাই ডাকলে।

বললে—রাগ করলে না কি নিবারণ?

—আজ্ঞে না।

—না রাগ ক'রো না, আমার নতুন-বৌ তোমার মেয়ের মতন, ওর কথায় আমি রাগ করি নে—

নিবারণ বললে—আর রাগ করলে ত আমার চলবে না সা'মশাই, আমি কে? আমি ত হুকুমের চাকর বই কেউ নই? আমার ওপর হুকুম হয়েছিল আপনার কাছে আসতে তাই এসেছিলাম, আপনি তাড়িয়ে দিলে আমি চ'লে যাব—

সা'মশাই বললে—কে কাকে তাড়ায় নিবারণ! এই দেখ না, এই বিজয়ের মা'র কথাই বলছি, আমিই কি তাকে তাড়িয়েছি? তবু সে চ'লে গেল কেন? কার হুকুমে চ'লে গেল? কে তিনি? কোথায় থাকেন তিনি? বল, কোথায় গেলে তাঁকে পাই?

ব'লে প্রশ্নটা নিবারণের দিকে ছুঁড়ে দিলে।

কিন্তু নিবারণের মুখে উত্তরটা জোগাল না। দুলাল সা'র মুখেও জোগাল না। দুলাল সা' একটা অর্থপূর্ণ হাসি হাসল। বললে—বলতে পারলে না ত? কেউ বলতে পারে না। কেউ না! সেই জন্যেই ত দীক্ষা নিলাম নিবারণ! নইলে কি আমার খেয়ে-দেয়ে দীক্ষা নেবার জন্যে এত পাগল হই?

নতুন-বৌ আর ধৈর্য্য রাখতে পারলে না। কথার মাঝখানেই বাধা দিলে।

বললে—বাবা, দেরী হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আপনার—

ব'লে জোর ক'রে ভেতরের দিকে নিয়ে গেল।

চণ্ডীতলার দিকেই আগে ছিল শ্মশান। এখনও শ্মশানটা আছে। একটু দূরে স'রে গেছে। তেঁতুল গাছ দিয়ে জায়গাটা ঘেরা। চণ্ডীতলায় আগে লোকের আনাগোনা বিশেষ ছিল না। যারা মড়া পোড়াতে যেত, তারা দিনমানেই কাজটা সেরে ফেলত। সন্ধ্যের পর বড় একটা কেউ যেতে চাইত না ওদিকে।

কিন্তু এখন হাওয়া বদলে গিয়েছে। আগে কেষ্টগঞ্জ থেকে চণ্ডীতলা পর্য্যন্ত যেতে রাস্তা বলতে কিছু ছিল না। এখন পিচ-ঢালা রাস্তা হয়েছে। আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে ওই রাস্তার ওপর চাষারা ধান শুকাতে দেয়। সাইকেল-টাইকেল সব সেই ধানের ওপর দিয়েই চলাচল করে। তাতে কেউ কিছু আপত্তি করে না। তবে রাস্তার পাশে রাখালরা লাঠি নিয়ে পাহারা দেয়। গরু-ছাগলে না খায়। গরু-ছাগল এলেই লাঠি নিয়ে তাড়া করে—য্যাই, হুস্, হুস্—

গরু-ছাগলের উৎপাতটাই বেশি।

চণ্ডীতলায় যেখানে রাস্তাটা শেষ হয়েছে, সেখানেই ব্লক্-ডেভেলপ্মেণ্ট অফিস। সার সার অনেক বাড়ী হয়েছে নতুন-নতুন। এ-অঞ্চলে এ-রকম বাড়ী এই প্রথম। বেশ সিমেণ্ট-কন্ক্রিটের মজবুত দালান। কন্ক্রিটের ছাদ বেশ সামনের দিকে বাড়ানো। সামনে একটু ক'রে বাগান। রাণাঘাট কলকাতা থেকে ছেলে-মেয়েরা এসে এখানে চাকরি করছে। জেলে-মালো চাষাভুষোদের স্কুল হয়েছে। সেখানে বইখাতা-শ্লেট নিয়ে পড়তে আসে। আগে যারা রাস্তার ঘাটে-জঙ্গলে খেলা ক'রে, মাছ ধ'রে, পাখী-শিকার ক'রে বেড়াত, তারা এখন স্কুলে এসে মন দিয়ে পড়ে। এখন জামা-কাপড় পরে, বাপ-মা'র কথা শোনে।

এ যেন একটা নতুন শহর গ'ড়ে উঠেছে এখানে।

ব্লক-ডেভেলপ্‌মেণ্ট অফিসার নিজের বাড়ির সামনে বাগান তৈরি ক'রে নিয়েছে' ভাল ক'রে। প্ল্যানে ছিল তিন-কামরা ঘর। কণ্ট্রাক্টারকে ব'লে চার-কামরা ক'রে নিয়েছে। বেশি বয়েস নয় সুকান্ত রায়ের।

নিতাই বসাক জিজ্ঞেস করেছিল—চাকরিটা যে পেলেন, কারুর সঙ্গে জানাশোনা ছিল?

সুকান্ত রায় বলেছিল, না মশাই, বলতে গেলে স্রেফ্‌ লাক্‌—

—আশ্চর্য্য ত! নিতাই বসাক সত্যিই অবাক্‌ হয়ে গিয়েছিল উত্তরটা শুনে।

—কারুর সঙ্গে আলাপ ছিল না? প্রফুল্ল ঘোষ, বিধান রায়, অতুল্য ঘোষ, কারুর সঙ্গে নয়?

—আজ্ঞে না—

—তা হ'লে কি ক'রে চাকরিটা পেলেন শুনি? শুধু দরখাস্ত ক'রে?

—না।

সুকান্ত রায় বললে, তাও না—

নিতাই বসাক আরও অবাক্‌। সুকান্ত রায় বললে, আমি মশাই এম্‌-এ পাশ ক'রে ফ্যা ফ্যা ক'রে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, সেই সময়ে এক কাণ্ড হ'ল।

—কি কাণ্ড?

সুকান্ত রায় বললে, কিরণশঙ্কর রায়ের নাম শুনেছেন?

নিতাই বসাক বললে, আ রে কিরণশঙ্কর রায়ের নাম শুনব না? অত বড় কংগ্রেস লীডার, য়্যাণ্টি সুভাষ বোস—

সুকান্ত রায় বললে, তাঁর মরবার খবর পেয়েই আমি তাঁর বাড়ীতে গিয়ে হাজির, তখন তাঁর ডেড্‌-বডি বার করা হচ্ছে, আমি তাঁর সেই খাটের একটা মাথা ধ'রে শ্মশান পর্য্যন্ত সারা রাস্তা বয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম—

—তার পর?

—খবরের কাগজে সেই প্রসেশনের ছবি বেরিয়েছিল। আমার ছবিটা স্পষ্ট উঠেছে। আমি বুদ্ধি ক'রে আনন্দ-বাজার পত্রিকা অফিস থেকে সেটা কিনে রেখেছিলাম, যখন চাকরির খবরটা কাগজে বেরুল, আমি সেই ছবিটা নিয়ে সোজা রাইটার্স বিল্ডিং-এ গিয়ে খোদ-কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করলাম—

তার পর?

সুকান্ত রায় বললে, তার পর একটা নমিন্যাল য়্যাপ্লি-কেশন করতে হ'ল, আর সঙ্গে সঙ্গে এই চাকরি।

এই হ'ল সুকান্ত রায়ের গবর্ণমেণ্ট-চাকরির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কিন্তু ওই পর্য্যন্তই। চাকরিটাই শুধু হ'ল বিয়েও হ'ল চাকরির দৌলতে। সুন্দরী বউ পেয়েছে। কিন্তু অজ পাড়াগাঁ। কিন্তু অজ পাড়াগাঁয়ে এসে প'ড়ে থাকতে ভাল লাগে না। নিতাই বসাক কলকাতায় যায়। সেক্রেটারিয়েটে দহরম-মহরম আছে। তার সঙ্গে মনের কথাগুলো বলে সুকান্ত রায়। সুকান্ত রায়ের সাজান বৈঠকখানায় ব'সে চা খায় নিতাই বসাক। সুকান্ত রায়ের বউও সঙ্গে থাকে। কিছু দরকার হলে নিতাই বসাক বলে—আমাকে বলেন নি কেন, আমি যোগাড় ক'রে দিতাম—

নিতাই বসাক সুকান্ত রায়ের ডান হাত হয়ে গিয়ে-ছিল। নিতাই বসাক গাড়ি পাঠিয়ে দিত। বলত—যেখানে খুশি আপনারা বেড়াতে যান্‌, গাড়ি ত আমার পড়েই থাকে, আর তা ছাড়া মাসের মধ্যে অর্দ্ধেক দিন ত আমি কলকাতাতেই থাকি—

গাড়ি ছিল, নিতাই বসাক ছিল, দুলাল সা ছিল, তাই ব্লক্‌-ডেভলপমেণ্ট অফিসারের কোনও ভাবনা ছিল না। নতুন কাঁচা বয়েস, নতুন বউ, সস্তা-গণ্ডার দেশ, কিছুই পাওয়া যেত না, তাই খরচও কিছু ছিল না। কিন্তু বউ বিশেষ সন্তুষ্ট ছিল না।

বউ বলত—পাড়াগাঁয়ে আর ভাল লাগছে না—

আসলে এইটেই হয়েছিল মুশকিল। এই মুশকিলের জন্যেই সুকান্ত রায়েরও ভাল লাগত না। নিতাই বসাক কলকাতা থেকে এলেই জিজ্ঞেস করত কি হ'ল নিতাই বাবু, সেক্রেটারিয়েটের খবর কি?

নিতাই বসাক এসে চেয়ারে ব'সে বলত—এবারে গিয়ে কোনও কাজ হ'ল না স্যার, স্রেফ পয়সা নষ্ট—গিয়ে-ছিলাম আপনার জন্যে একটু তদ্বির করতে, কিন্তু সব ভেস্তে গেল—

—কেন?

—আবার কেন কি? আমি যেদিন গিয়ে পৌঁছলাম, সেই দিনই মিনিষ্টার হেম নস্কর মারা গেলেন। তখন কি আর কাজ-কর্ম্ম কিছু হয়?

—তা সাত দিন ত ছিলেন। সাত দিন ধ'রে থেকেও কিছু কাজ হ'ল না?

নিতাই বসাক বললে—না, একজন মিনিষ্টার মারা গেলে কি ক'রে কাজ-কর্ম্ম হবে বলুন স্যার? অন্ততঃ পনর দিন লাগবে ত শোকের ঘোর কাটতে—তাই চ'লে এলাম—

এমনি করেই দিন কাটছিল। নিতাই বসাকও আশা দিয়ে যাচ্ছিল, সুকান্ত রায়ও চাকরি ক'রে যাচ্ছিল।

এমনি ক'রেই বছর কেটে যাচ্ছিল। টেম্পোরারী ডিপার্টমেণ্ট, কবে আছে কবে নেই। নিতাই বসাককে ধ'রে যদি অন্য কোনও ডিপার্টমেণ্টে যাওয়া যায়, সেই চেষ্টা করত সুকান্ত রায়। কিম্বা যদি কলকাতায় হেড অফিসে চাকরিটা ট্র্যানস্‌ফার করিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু রাইটার্স বিল্ডিংসে কারও সঙ্গে জানা-শোনা নেই। একমাত্র সেই ফটোটা ভরসা। সেই কিরণশঙ্কর রায়ের মরদেহ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে কাঁধে ক'রে—সেইখানা। সেই ফটোখানা বাঁধান ছিল ঘরে। দেয়ালে টাঙান ছিল। সেই পুরাণো খবরের কাগজখানাও ফ্রেমে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রেখে দিয়ে ছিল। জীবনে ঐ একটি মাত্র মূলধন। ঐ মূলধনটি খাটিয়েই যদি ভবিষ্যতে আরও কিছু কাজে লাগান যায়।

লোককে সুযোগ পেলেই সুকান্ত রায় দেখাত। বলত —ঐ দেখুন—আনন্দবাজারে আমার ছবি বেরিয়েছিল।—গ্রামের লোকরা অবাক্ হয়ে যেত। ব্লক-ডেভলপমেণ্ট অফিসারকে দেখছে না, যেন দেবদর্শন করছে।

স্ত্রী ও মেয়েদের বলত—কিরণশঙ্কর রায় তাঁকে খুব স্নেহ করতেন কিনা—

ঠিক এমনি সময়ে দুলাল সা'র বাড়িতে সাধুবাবা এসে হাজির। নিতাই বসাক এসে নেমন্তন্ন ক'রে গেল। আর তার পর দিনই মেজাজ বদলে গেল। নিতাই বসাক সকাল বেলাই এসেছে।

বললে—কি রকম স্যার, কি রকম সাধু দেখলেন বলুন?

সুকান্ত ছিল, সুকান্তর স্ত্রী ছিল। সুকান্ত বললে—মিরাকুলাস—

—কি রকম?

সুকান্ত বললে—আমার বাবা কবে মারা গেছেন তার ডেট্‌টা পর্য্যন্ত ব'লে দিলেন সাধুবাবা—

—আর চাকরি? চাকরির কথা কিছু বলেন নি?

সুকান্ত বললে—আর তিন বছর বাকি আছে—

—কিসের বাকি?

সুকান্ত বললে—উন্নতির। তখন আমার এমন উন্নতি নাকি হবে যে, আমি এখন কল্পনাই করতে পারব না—

নিতাই বসাক বললে—তখন যেন আমাদের ভুলে যাবেন না স্যার, যদি মিনিষ্টার হয়ে যান ত যেন কিছু পারমিট্-টারমিট্ পাই—

—আমার ত মশাই বিশ্বাসই হচ্ছিল না।

সুকান্তর স্ত্রী বললে—অনেক সময় কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী ফলে যায়—

নিতাই বসাক বললে—এমন অলৌকিক সব ব্যাপার আমার শোনা আছে যা শুনলে আপনারা চমকে উঠবেন—

সুকান্ত বললে—আমি ও তাই আসবার সময় পাঁচ টাকা প্রণামী দিয়ে এলাম নিতাইবাবু—তা সাধুবাবা চ'লে গেছেন?

—হ্যাঁ, ভোর চারটের সময় নৌকোয় তুলে দিয়ে এলাম। প্রণামী যত পেয়েছিলেন সব দিতে গেলাম, একটা পাই-পয়সা পর্য্যন্ত ছুঁলেন না, তা দুলালকে বললাম—সব হরিসভার ফাণ্ডে জমা ক'রে দিতে—

সুকান্ত বললে—হরিসভা কি এখনও আছে আপনাদের?

নিতাই বসাক বললে—কি বলছেন আপনি? হরিসভা নেই? হরিসভার আটচালার ভেতরে একদিন গিয়ে দেখবেন, এখনও রোজ ঝাঁট-পাট দেওয়া হয়, রোজ কেউ আর আসে না ব'লে একপাশে দুলালের গরুগুলো রাখা আছে—

তার পর হঠাৎ রাস্তার দিকে নজর পড়তেই দেখলে —নিবারণ যাচ্ছে।

—ওই দেখুন, ওকে চেনেন?

সুকান্ত বললে—ওই ত কীর্ত্তীশ্বর ভট্‌চার্য্যির সরকার—

নিতাই বসাক সেখানে ব'সে ব'সেই ডাকলে—নিবারণ, অ নিবারণ, ও সরকার মশাই—

সরকার মশাই ডাক শুনে দাঁড়াল। তার পর এদিকে ফিরে চাইলে।

—এস এস, ভেতরে এস—

নিবারণ আস্তে আস্তে কাছে এসে জুতো খুলে ভেতরে ঢুকল।

—এত সকালে কোথায় যাচ্ছ?

নিবারণ বললে—আজ্ঞে, বসাক মশাই, একটু চণ্ডীতলার দিকে যাব—কর্ত্তামশাইয়ের হুকুম—

—কেন, চণ্ডীতলায় কি করতে? কোন্ পাড়ায়?

—আজ্ঞে মালো-পাড়ায়।

—মালো-পাড়ায় এখন কি করতে? মাছের চেষ্টায়?

নিবারণ বললে—আজ্ঞে না, সকাল বেলা সা' মশাই-এর বাড়ী গিয়েছিলাম, তিনি আহ্নিক করতে গেলেন, তাই কথা হ'ল না, এখন যাচ্ছি কেষ্ট মালোর কাছে, কতকগুলো কথা জিজ্ঞেস করতে! শুনেছি এখনও বেঁচে আছে কেষ্ট মালো—

নিতাই বসাক বললে—বেঁচে আছে বৈ কি। বেশ

হৃষ্ট-পুষ্ট হয়ে বেঁচে আছে, তোমার কর্ত্তামশাই-এর মত অথর্ব্ব হয়ে পড়ে নি—

নিবারণ বললে—আজ্ঞে, কর্ত্তামশাই-এর মত শোক-তাপ ক'জন পেয়েছে বলুন, ছেলে গেছে, ছেলের বউ গেছে, নাতনী গেছে—নিজের স্বাস্থ্যও···

—তা সাধুবাবা যে বললেন নাতনী যায় নি, বেঁচে আছে ?

নিবারণ বললে—সেই শোনার পর থেকেই ত কর্ত্তা-মশাই কেমন হয়ে গেছেন ·

—কি রকম ?

—আজ্ঞে কাল চৌপর-রাত বুকের ব্যথায় ভুগেছেন, কর্ত্তামশাইও জেগে, গিন্নীমাও জেগে, আর আমিও জেগে। তিনজনেই জেগে কাটিয়েছি। এই ভোরবেলাই আমাকে ডেকে, পাঠিয়েছিলেন সা'মশাই-এর বাড়ীতে। তা সাধুবাবা ত চ'লে গেছেন শুনলাম, এখন কেষ্ট মালোর কাছে যাচ্ছি, সে যদি কিছু বলতে পারে—

ক্রমশঃ

'কালের যাত্রা' প্রসঙ্গে

শ্রীমিহির সিংহ

সিনেমা কিংবা রেডিও কিংবা টেলিভিশনের থেকে মঞ্চে অনুষ্ঠিত অভিনয় একটি বিশেষ অর্থে স্বতন্ত্র। রেডিওতে যে অনুষ্ঠান করা হয় তা শুধুমাত্র শ্রবণীয়—দর্শনের কোনও ব্যাপার তাতে নেই। টেলিভিশন আজকাল আমাদের দেশে কিছু কিছু আরম্ভ হয়েছে—তা শ্রবণীয়ও বটে আবার দর্শনীয়ও বটে। কিন্তু তবু তার অস্তিত্ব দর্শকের থেকে অনেক তফাতে।—কাঁচের তৈরী একটি ক্ষুদ্রাকার পর্দ্দার উপরে তাকে আমরা দেখতে পাই, এবং রেডিওরই মতন লাউড স্পীকারের মধ্যে শুনতে পাই। এদের চাইতে সিনেমা অনেকটা এগিয়ে আসে দর্শকের কাছে ;—সফল অনুষ্ঠান হলে ত আমরা অনেক সময়ে ভুলেই যাই যে, সিনেমাটা আবদ্ধ রয়েছে পর্দ্দায় আর লাউড স্পীকারে। তবু আমাদের মাথার মধ্যে এ ভাবনাটা রয়ে যায় যে, সিনেমা তৈরী হয় অনেক আলোতে উজ্জ্বল ফ্লোরে, বড় বড় যন্ত্রপাতির সাহায্যে।

আমরা যারা সিনেমার তৈরী হওয়ার বৃত্তান্ত একটু-আধটু জানি তারা অনেক সময়ে চমক ভেঙে স্মরণ করি যে, এডিটরের কাঁচির সাহায্যে আর সেন্সরের কাঁচি এড়িয়ে সিনেমার জন্ম। সেটা দেখতে স্বাভাবিক হলেও অনেক কৃত্রিমতার সাহায্যে লাভ করে এই রকম স্বাভাবিকতার চেহারা। আর তা ছাড়া দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা, বস্তুর এই তিন রকমের প্রসার বা three dimensions নিয়ে নানা experiment সত্ত্বেও এখনও সিনেমা মূলতঃ two dimensional, অর্থাৎ তা আবদ্ধ থাকে শুধু মাত্র দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সম্বলিত একটি পর্দ্দার উপরে। তার তুলনায় মঞ্চে অনুষ্ঠিত কোনও অনুষ্ঠান সাধারণ দর্শকের কাছে অনেক বেশী কাছের জিনিষ। প্রথমতঃ তা three dimensional—মঞ্চে শুধু দৈর্ঘ্য ও প্রস্থই নয়, একটি বেধ বা গভীরতাও স্পষ্ট ভাবে উপস্থিত দ্বিতীয়তঃ এটা একটা জীবন্ত (live) অনুষ্ঠান—অভিনেতা, অভিনেত্রী বা অন্য অংশ-গ্রহণকারীরা সশরীরে বর্ত্তমান মঞ্চের উপরে। তৃতীয়তঃ পুরাতন ও আধুনিক সব কিছু উপকরণ বা যান্ত্রিক সাহায্য সত্ত্বেও মঞ্চে যে অনুষ্ঠান দেখা যায় তাতে অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে, যেটা সিনেমা কিম্বা রেডিও কিম্বা টেলিভিশনের বেলায় হওয়া সম্ভব নয়।

আরও একটা দিক্ থেকে বিচার করলে থিয়েটার বা মঞ্চাভিনয়ের সঙ্গে সিনেমা ও রেডিওর প্রভেদটুকু খুব স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হবে। সিনেমাতে অভিনেতা অভিনয় করেন দর্শকের সামনে নয়, ক্যামেরার সামনে। দর্শকের চোখের অন্তরালে সেই যে দীর্ঘ অধ্যায়টুকু থাকে তার মধ্যে যথেষ্ট অবকাশ থাকে কোনও ত্রুটি বিচ্যুতিকে শুধরে নেওয়ার। তেমনি তাঁর অভিনয়টি নিছক তাঁর নিজস্ব রূপে দর্শকের সামনে উপস্থাপিত না হয়ে ফোটোগ্রাফী, সাউণ্ড এঞ্জিনিয়ারীং ও এডিটিং-এর অনেক কারিকুরির মধ্যে দিয়ে অনেক পরিবর্ত্তিত রূপে দর্শকের সামনে আসে

রূপালী পর্দায়। কিন্তু মঞ্চে যে অভিনয় হচ্ছে তা একবার খারাপ হলে তাকে আবার ফিরিয়ে ফিরিয়ে করা সম্ভব না। শুধু তাই নয়, মঞ্চাভিনেতা অভিনয় করেন দর্শকের চোখের সামনে এবং প্রকৃতপক্ষে দর্শকের প্রশংসা বা নিন্দা অনেক সময় তখন তখনই ছাপ ফেলে অভিনেতার মনের উপরে। একথা ত সর্ব্বজনবিদিত যে সমঝদার দর্শকের সামনে অভিনয় করতে পারলে অভিনেতার মধ্যে নূতন প্রেরণা আসে,—অভিনয়টাই অন্য অন্য দিনের চাইতে অনেক বেশী উৎরে যায়।

আমরা "অভিনয়" বলে উল্লেখ করলেও মঞ্চে যে সব অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তার মধ্যে বহু রকমফের আছে। আবৃত্তি, গান, বাজনা, নৃত্য, নৃত্যাভিনয়, গীতাভিনয় ইত্যাদি থেকে সুরু করে মূকাভিনয় ও আসল নাটকাভিনয় পর্য্যন্ত বহু রকম অনুষ্ঠানই আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি মঞ্চের উপরে।—জানি না বিতর্ক কিম্বা public speakingও এই গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে কিনা! তবে সাধারণ ভাবে বলতে গেলে নাটকের মধ্যে মূল অভিনয় ছাড়াও মিশে থাকে এই সব রকমের জিনিষই। আবৃত্তি, গান, বাজনা, নাচ—কিছুই প্রায় মঞ্চে অনুষ্ঠিত নাটকের মাল-মসলার অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকে না—এমন কি অভিনয় দেখতে গিয়ে কোনও কোনও চরিত্রের মুখে পুরোপুরি public addressও ত শুনতে হয় কখনও কখনও! আসলে মহাকবির ভাষা উলটে বলতে হয় যে মঞ্চটি জীবনেরই প্রতিকৃতি—জীবনে যা কিছুর স্থান আছে তাই প্রায় স্থান পায় রঙ্গমঞ্চের উপরে, আর নাটকের ভিত্তিই ত জীবনের আদি উপকরণ নিয়ে: বিভিন্ন শক্তির সংঘর্ষ ও তার সমাধান।

তবে নাটকের বেলায় তার এই নাটকীয় প্রকৃতিটাও যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তার আঙ্গিকটাও তেমনি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। জীবনের কোন্ ক্ষেত্র থেকে আমরা নাটকের রসের সন্ধান করছি তার উপরে যেমন নির্ভর ক'রে নাটকটিকে সামাজিক বলব, না, ঐতিহাসিক বলব না আর কিছু বলব, তেমনি সেই নাটকীয় সংঘর্ষের সমাধান কেমন ভাবে ঘটল তার উপরে নির্ভর করে বলা হয় নাটকটি মিলনান্ত বা বিয়োগান্ত। কিন্তু এসব বিচার ছাপিয়ে ওঠে নাটকটির উপস্থাপন রীতি। কারণ, অভিনেতা (ও পরিচালকের) গুরুদায়িত্ব হল মূল কথাটিকে সরাসরিভাবে দর্শকের দেখা ও শোনার মধ্যে দিয়ে তার মনের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া। "সরাসরি ভাবে" কথাটি বিশেষ করে বলছি এই জন্যে যে, মঞ্চে অবতীর্ণ হওয়ার পরে অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে "ব্যবধান" বলতে আর কিছু থাকে না—না স্থানের, না কালের।

এখানে অভিনয় হয় দর্শকের চোখের সামনে। তবু দর্শককে ভুলিয়ে দিতে হয় যে, এটা সত্যি নয়—এটা আসলে একটা অভিনয়। অভিনীত নাটকের আবেদনটুকু এই ভাবে দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে অনেক পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে—যার বিভিন্নতা অনুযায়ী গড়ে ওঠে ভিন্ন ভিন্ন অভিনয়-রীতি ও নাটক-রচনা-রীতি। এই বৈচিত্র্যের কোনও শেষ নেই—নাট্যকার ও পরিচালকের উদ্ভাবনী শক্তি যতদিন সজীব আছে। তবে এই-সব পদ্ধতিগত ভিন্নতাগুলিকে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে: প্রথমত: নাটকের বিন্যাসের, দ্বিতীয়ত: অভিনয়ের ধরণ ধারণ রূপ ও তৃতীয়ত: মঞ্চের উপকরণ।

বলা বাহুল্য সার্থক অনুষ্ঠানের বেলায় এই তিনটির একটি নিগূঢ় সামঞ্জস্য গড়ে উঠতে দেখা যাবে। নাটক যিনি রচনা করেন, মূল বক্তব্যটি তাঁরই। তিনি কথোপকথনের ভাষা ও অভিনেতার আচরণের একটা কাঠামো তৈরি করে দেন এই বক্তব্যটির বাহন হিসাবে। নাটকের পরিচালকের দায়িত্ব থাকে আলোক, মঞ্চসজ্জা ইত্যাদি উপকরণের সাহায্যে ও অভিনেতাদের কুশলতার সাহায্যে বক্তব্যটিকে সম্পূর্ণ ভাবে দর্শকের মনের কাছে পৌঁছে দেওয়ার। ক্ষেত্র বিশেষে অভিজ্ঞ পরিচালক নাটক রচয়িতার ভাষাতেও পরিবর্ত্তন করে থাকেন তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। তবে সব সময়েই মনে রাখা উচিত যে, নাটকের মূল বক্তব্য ও কাঠামো নিতান্ত ভাবেই রচয়িতার—পরিচালকের নয়। পরিচালকের দক্ষতা সেইখানেই, যেখানে তিনি সুন্দর ভাবে উপস্থাপিত করতে পারেন রচয়িতার বক্তব্যটুকুকে।

সম্প্রতিকালে কলকাতা শহরে সাড়া জাগিয়েছে এই দিক্ থেকে সার্থক একটি নাটকের অভিনয়, রবীন্দ্রনাথের 'কালের যাত্রা' বা 'রথের রশি'। নাটকটি symbolic বা প্রতীক-ধর্ম্মী। একদিক্ থেকে দেখতে গেলে সব নাটকের মধ্যেই প্রায় একটা প্রতীকের চেহারা থাকে: কোনও একটি ঘটনা বা চরিত্র যখন মঞ্চের উপরে উপস্থাপিত হয় তখন তা আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় নিঃসঙ্গ ভাবে নয়—জীবনের কোনও দিক্ বা কোনও বিশেষ শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে। তবে সাধারণ ভাবে বলতে গেলে প্রতীক ধর্ম্মী নাটকের মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষণ থাকে—সেটি হ'ল এই যে, এর

কালের যাত্রা : মঞ্চসজ্জা
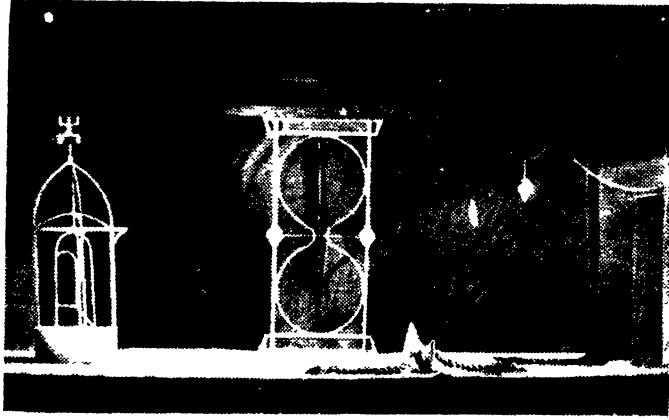
যা আপাত-বক্তব্য তার মধ্যে দিয়ে কোনও গভীরতর বক্তব্যের ইঙ্গিত করা হয়।

আপাত দৃষ্টিতে কালের যাত্রার বিরোধ কয়েকটি শ্রেণীর অন্তর্গত মানুষের মধ্যে : উপলক্ষ্য, রথের দড়ি টানবে কে? চিরকাল রথ টানার অধিকারটি সীমাবদ্ধ থেকে এসেছে সমাজের উপরতলার মানুষদের মধ্যে—রাজা অথবা তাঁর কাছাকাছি অবস্থিতদের মধ্যে। কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে, রাজা পারেন নি রথটি টলাতে। না পেরেছেন আমন্ত্রিত সাধু কিম্বা ধর্মের ধারা-রক্ষক পুরোহিতদের মন্ত্রশক্তি। সাধারণ মানুষরা এখানে এসেছে দুই দলে—নগরবাসীরা ও শহরের বধূরা। তারাও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত—কেন এমন হ'ল। সৈন্যরা আসে—তারাও দ্বিধাগ্রস্ত। ধনপতির দল—যাদের ডাক পড়ে সব অনর্থপাতের বেলায়—তারাও হ'ল বিফল। এরা যে সকলে সকলের বিফলতার মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রয়েছে তা নয়—প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের শ্রেণীগত বিরোধ প্রতি মুহূর্তেই প্রকাশ পাচ্ছে বিশেষতঃ দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের আবহাওয়ায়।

রথের রশি নাটকটি অতি স্বল্পায়তন। তারই মধ্যে এই অন্তর্বিরোধের ভাবটি বেশ সুন্দর ভাবে ফোটানো আছে। বিশেষ করে সৈন্যদের ক্ষাত্রশক্তি আর ধনিকদের বৈশ্যশক্তির মধ্যে সংঘর্ষটি স্পষ্ট। আবার মন্ত্রোচ্চারণকারী পুরোহিতের উপস্থিতি সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের কাছে যে ধর্মের টান ক'মে এসেছে তার প্রমাণ মেলে, যখন নাগরিকেরা ও সৈন্যেরা পরস্পরকে সায় দিয়ে বিদ্রূপ করেন নর্মদাতীরের বাবাজিকে, যিনি রাজাজ্ঞায় আনীত হয়েছিলেন রথ চালানোর একটা ব্যবস্থা করতে। ধর্মের অনুষ্ঠানগুলির একটা মূল্যবোধ মেয়েদের কাছে থাকলেও সেটা নেহাৎ ঐ অনুষ্ঠানগুলির সম্বন্ধেই, ধর্মের প্রতি তাদের কোনও আকর্ষণ আছে বলে মনে হয় না। অনুষ্ঠানগুলিকেও ইচ্ছে করে এত ফেনানো হয়েছে মেয়েদের দিয়ে যে, তাদের অন্তঃসারশূন্যতা খুবই স্পষ্ট। তার পরে যখন ধনিকের দলও পরাভূত হয় অনড় দড়ির কাছে, তখন বোঝা যায়, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ই শুধু নয় বৈশ্যশক্তিও আজকে অশক্ত। বৈশ্যপ্রধান ধনপতি অন্যান্যদের তুলনায় স্পষ্টতঃই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। তাঁর মুখেই প্রথম আভাস পাই আগামী দিনের সম্ভাবনার। তিনিই প্রথম ধনিকদের সতর্ক করে দেন : আজ যারা চোখে পড়ে না, কাল তারা দেখা দেবে সবচেয়ে বেশী। বস্তুতঃপক্ষে ধনিকদের প্রস্থানের সঙ্গে শেষ হয় নাটকটির প্রথম অংশ, যে অংশের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল, ক্ষমতার যারা বর্তমান অধিকারী, যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ব্যর্থতা ও অসম্পূর্ণতা এটা বুঝতে বাকী থাকে না যে, সময়ের বিচারে তারা ফুরিয়ে গেছে।

চরের প্রবেশের সঙ্গে প্রবেশ করে নতুন সময়ের নতুন হাওয়ার ঝাপটা। দলে দলে শূদ্ররা আসছে ছুটে, বলছে, রথ চালাব আমরা। এর বিরুদ্ধে সকলেই একজোট : বলে কি? রশি ছুঁতেই পাবে না। কিন্তু মন্ত্রীর বক্তব্য সম্পূর্ণ অন্য : দল বেঁধে আসছে বলে ভয় করিনে—ভয় হচ্ছে, পারবে ওরা। মন্ত্রীর চরিত্রটা সত্যিই খুব একটা বলিষ্ঠ চরিত্র। রাজার উপস্থিতি মঞ্চের বাইরে, তবে সৈন্যদের কথোপকথনে মনে হয় তাঁর আত্মীয়তা ক্ষত্রিয়-শক্তির সঙ্গে। তবে এটা বেশ স্পষ্ট যে, রাজ্য চালানোর ব্যাপারে মন্ত্রীই প্রধান, রাজা নন

যখন শূদ্রবস্থা এসে ঢোকে মঞ্চের উপরে আর সৈন্যরা উদ্যত হয় তলোয়ারের বেড়া তুলে তা ঠেকাতে তখন মনে হয়, সংঘর্ষ এড়ানো যাবে না। কিন্তু সেখানে মন্ত্রীর আচরণ গভীর বিচক্ষণতার সাক্ষ্য দেয়: বাধা দিও না ওদের। বাধা পেলে শক্তি নিজেকে নিজে চিনতে পারে—চিনতে পারলেই আর ঠেকানো যায় না। তিনি যে কেন তাদের দাবী মেনে নিলেন তা স্পষ্ট হয়ে যায়, যখন বলেন: কিন্তু বাবা, সাবধানে রাস্তা বাঁচিয়ে চল। বরাবর যে রাস্তায় রথ চলেছে, যেয়ো সেই রাস্তা ধরে। প'ড়ো না যেন একেবারে আমাদের ঘাড়ের উপর। অর্থাৎ মন্ত্রীর উদ্দেশ্য, পরিবর্ত্তিত যুগধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেদের স্বার্থ বাঁচিয়ে চলা। শেষ পর্য্যন্ত তিনি চলেই যান তাদের সঙ্গে রশি ধরতে—বাঁচবার দিকে ফিরিয়ে আনতে রথটাকে।

নাটকের তৃতীয় অংশটি আমার কাছে সবচাইতে গভীর দ্যোতনাময় বলে মনে হয়। মন্ত্রী চলে গেছেন, রাজশক্তি আজ সন্ধি করেছে (করতে বাধ্য হয়েছে) নবোত্থিত শূদ্রশক্তির সঙ্গে। রথের হাঁক শোনা যাচ্ছে, বাপদাদার পথ না মেনে একটা কাঁচা পথে ছুটেছে বুনো মহিষের মতন। সাবধানী ধনিকেরা এ প্রলয়ের আগেই বিদায় নিয়েছে মঞ্চ থেকে, তাদের খাতাপত্র সামলাতে আর সিন্দুকগুলো বন্ধ করতে শক্ত তালাতে। সৈনিকরা এখনও আছে কিন্তু তারা চরম বিধাগ্রস্ত। পুরোহিতও ভাবছেন: রশি ধরব, না শাস্ত্র আওড়াব? অর্থাৎ যুগান্তকারী প্রলয় ঘটে যাওয়ার পরেও লোকের বোঝার বাকী থাকে অনেক কেননা ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতেই শুধু তার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব।

সেই বিশেষ দৃষ্টিকোণের পরিচয় দেন কবি,—ইনি সেই কবি যিনি পশ্চাতে দেখতে পান, সম্মুখেও যাঁর দৃষ্টি অব্যাহত। এতদিন পুরোহিত বুঝিয়ে এসেছেন কি হওয়া উচিত; আজকে কবি বুঝিয়ে দিলেন কি হয়েছে ইতিহাসের পাতায়।

একটি চরিত্রের কথা আমরা এখনও বলি নি। সেটি হচ্ছে সন্ন্যাসীর চরিত্র। এটি একটি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, যাঁর প্রথম উক্তি হ'ল: সর্ব্বনাশ এলো। বাধবে যুদ্ধ, জ্বলবে আগুন, লাগবে মারী, ধরণী হবে বন্ধ্যা, জল যাবে শুকিয়ে। নাটকটির ঘনায়মান সংঘাতগুলির মধ্যে বারবারই আনাগোনা করছেন এই সর্ব্বনাশের দূতটি। তাঁর উক্তিও বড় ভয়ঙ্কর: তোমরা কেবলি করেছ ঋণ, কিছুই কর নি শোধ, দেউলে করে দিয়েছ যুগের বিত্ত। ছোট ছোট কথা। কিন্তু তার অর্থব্যাপ্তি বিরাট। সমাজের বিধিব্যবস্থার উৎপত্তি মানুষের জীবনযাত্রা ও প্রগতির পথ সুগম করতে। গাছ যখন ছোটো থাকে তখন বেড়া বাঁধতেই হয় তাকে ঘিরে, তাকে নিরাপত্তা দেবার জন্যে। কিন্তু সেই গাছই যখন বড় হয়ে ওঠে, তখন বেড়াটা হয়ে ওঠে শ্বাসরুদ্ধকারী একটা বাধা স্বরূপ। সেই বেড়া না ভেঙে গাছটা আর বাড়তে পারে না। সন্ন্যাসী সেই ভাঙনেরই মন্ত্রবহনকারী। কবিও বলছেন: যুগাবসানে লাগেই তো আগুন। কিন্তু তিনি তাতেই সন্তুষ্ট হন নি। তাঁর সান্ত্বনা: যা ছাই হবার তাই ছাই হয়, যা টিকে যায় তাই নিয়ে সৃষ্টি হয় নবযুগের।

ঐখানেই প্রভেদ সন্ন্যাসী ও কবির মধ্যে। সন্ন্যাসী এই গজভুক্ত কপিত্থবৎ বর্ত্তমান যুগটার সমাপ্তিতেই খুশী, কিন্তু কবি স্বপ্ন দেখেছেন নতুন যুগের—এমন কি ততদূর পর্য্যন্ত দেখছেন যখন আসবে উল্টোরথের পালা, যখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নীচুতে হবে বোঝাপড়া।

রুচির বিভিন্নতা অনুযায়ী প্রতীকধর্মী নাটক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপভোগ করতে পারা উচিত। 'রূপকারের' তৈরী কালের যাত্রা একাধিকবার দেখেছি এবং মুগ্ধ হয়েছি এই দেখে যে, বিভিন্ন স্তরের মানুষ বিভিন্নভাবে রসগ্রহণ করতে পারেন নাটকটির। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যটি খুব সহজ নয়। তা ছাড়া অভিযোগ ত আছেই যে, রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির ভাষা ও সংগঠন সাধারণের গ্রহণ-উপযোগী নয়। কিন্তু পরিচালকের অসামান্য কৃতিত্ব যে, তিনি কালের যাত্রাকে সাধারণ দর্শকের আওতার মধ্যে এনে দিতে পেরেছেন মৌলিক আবেদনটিকে একটুও ক্ষুণ্ণ না ক'রে। প্রকৃতপক্ষে অনেকের অনেক দিক্ থেকে ভাল লাগবে নাটকটি: কারুর ভাল লাগবে আপাত-দৃষ্টিতে যে নাটকীয়তা দেখা যায় তারই জন্যে, কারুর ভাল লাগবে কয়েকটি বিশেষ অভিনয় কিম্বা গান, আবার কারুর ভাল লাগবে নাটকের মূল বক্তব্যটি।

এই অসাধ্যসাধন করতে গিয়ে পরিচালক কিছু কিছু হস্তক্ষেপ করেছেন রবীন্দ্রনাথের রচনার উপরে। তার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হ'ল দুটি: কবির কণ্ঠে অনেকগুলি গান দেওয়া হয়েছে এবং কবির আনাগোনা ঘটানো হয়েছে বেশ কয়েকবার। দু'টিই মনে হয়েছে পরিচালকের অসাধারণ দক্ষতার প্রমাণ। গান দেওয়ার ফলে কবির তথা রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যটি অনেক সুন্দর ও স্পষ্ট ভাবে উপস্থিত করা গিয়েছে। এবং কবিকে রবীন্দ্রনাথের

রথের রশি

অনুসরণে প্রলয়ের শেষে শুধু ভাষ্যকার হিসেবে না এনে গোড়া থেকেই নিয়ে এসে এটা বোঝান গিয়েছে যে, কবি ঐতিহাসিক প্রবাহের দ্রষ্টা নন—অংশগ্রহণকারীও বটে। একদিক্ থেকে তাঁর গানগুলি ঘটমান পটভূমিকার একটা সুন্দর সম্পূর্ণ ধারাবিবরণীর মত শুনিয়েছে। তেমনি আর একদিক্ থেকে,নাটকের শেষে যখন তিনি বলেন: আজকের মত বল সবাই মিলে—যারা এতদিন মরেছিল তারা উঠুক বেঁচে, যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে তারা দাঁড়াক এক বার মাথা তুলে,—তখন একজন participantএর বক্তব্য হিসেবে এই উক্তির মর্য্যাদা কি অনেক বেড়ে যায় না?

কবির চরিত্রে অসামান্য গভীরতা এনেছেন পরিচালক সবিতাব্রত দত্ত স্বয়ং। তাঁর অভিনয় সুন্দর, গলাও সুন্দর—এবং এ দুয়ের সংমিশ্রণ আধুনিক বাংলা রঙ্গমঞ্চে খুবই বিরল। তবে নাটক প্রস্তুত করতে গিয়ে তিনি নিজেকে অকারণ প্রাধান্য দেবার সেই মারাত্মক ভুলটি করেন নি। সন্ন্যাসীর ভূমিকায় বঙ্কিম ঘোষ এবং মন্ত্রীর ভূমিকায় ভবরূপ ভট্টাচার্য্য কবির বৈপরীত্যে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ছোট ছোট চরিত্রগুলিও, যথা গ্রামবাসীরা, মেয়ের দল, ধনিক ত্রয়ী, এঁরাও উচ্চারণের স্পষ্টতায় ও অভিনয়ের সাবলীলতায় মনের মধ্যে অবিস্মরণীয় ছাপ রেখে যান। পুরোহিতের অভিনয় ভাল তবে উচ্চারণের দোষ আছে। সৈন্যরা মোটের 'পরে অন্য দলগুলির চাইতে দুর্ব্বল; ধনপতির চরিত্রটিও বোধ হয় আরও ফুটতে পারত। আর শূদ্রদল, বিশেষ করে তাদের দলপতি, অপূর্ব্ব অভিনয় করেছেন নতুন ঘুম-ভাঙা awkward গরুড়ের ভূমিকায়। নাটকটির বক্তব্য নির্ভর করছে তীক্ষ্ণ সংঘাতের উপরে। বলতে গেলে কবি ছাড়া প্রত্যেকেই নেমে পড়েছেন এই সংঘাতের মধ্যে। তার সঙ্গে তাল রেখে অভিনয়ও করেছেন সবাই খুব দ্রুত লয়ে এবং staccato ভাবে কবিই শুধু তার মধ্যে এনেছেন কোমলতার স্পর্শ।

এটা মনে রাখতে হবে যে, নাটকের বিচার সম্ভব তিন দিক থেকে: রচনারীতি, অভিনয় ও উপকরণ। প্রথম দু'টি দিক্ থেকে—কালের যাত্রার রূপায়ণ সার্থক হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তৃতীয় দিক্টি দেখা এখনও বাকী রয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে মঞ্চসজ্জার কথা। প্রতীকধর্মী নাটকের ক্ষেত্রে মঞ্চসজ্জাটি বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ এই জন্যে যে, তার মধ্যে দিয়েই ফুটে উঠতে পারে নাটকটির অনেকখানি বক্তব্য। ডাকঘরের সেই ঐতিহাসিক মঞ্চসজ্জায় অবনীন্দ্রনাথের পাখীর খালি দাঁড় ঝুলিয়ে দেওয়ার গল্প নিশ্চয়ই কারুর অজানা নেই। তবে দুঃখের বিষয়, বাংলা দেশে কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল সেই ফোয়ারার ছবিওয়ালা আর থামের vista দেখানো বীভৎস কাণ্ড। আর এখন চলতি হয়েছে আলোর কারসাজীতে অভিনয়ের দৈন্য লুকোনোর প্রথা। এইসব দেখে দেখে অভ্যস্ত (?) হয়ে যাওয়ার পরে কালের যাত্রার সহজ স্পষ্ট মঞ্চসজ্জাটি বড় সুন্দর লেগেছে। সত্যি, এত সম্পূর্ণ অথচ সংযত মঞ্চসজ্জা বিশেষ দেখা যায় না। বাজনার পরিকল্পনা ভাল হলেও শিল্পীদের কুশলতা বোঝা যায় না। তবে রথের চলার শব্দটা বেশ ভালই এসেছে। আলোর ব্যবহার কিন্তু মোটের উপর অগোছাল রকমের।

পল্লীকবির মৃত্যু

শ্রীকৃষ্ণধন দে

চাঁদ উঠেছে হিজলবনে, দীঘিটি টলমল্,
গহিন্ রাতে ঢেউয়ের দোলায় ঘুমায় শতদল,
মেঘের সাদা পান্সীগুলো
বোঝাই নিয়ে যাচ্ছে তুলো,
শিউলি ঝোপের মাথার উপর তারাটি জলজল্ ;
—আজকে আমার মরণ-দিনে ওদের কথাই বল্ ।

মাঠের বাতাস বেড়ায় হুতাশ কদম কেয়ার বনে,
চকাচকীর ঘুম আসে না মুখর গুঞ্জরণে,
হুলিয়ে বেণী সজ্‌নে ফুলে
কে ডাকে ঐ হাতটি তুলে,
বনকাপাসীর ফুটল হাসি, চাঁপার চোখে জল !
—আজকে আমার মরণ-দিনে ওদের কথাই বল্ ।

শিরীষ ফুলের কোমল রেণু ছড়িয়ে দিয়ে গায়ে
বাউল বাতাস চলছে নেচে বনের আলোছায়ে,
বাঁশের ঝাড়ে নিঝুম রাতে
কি সুর বাজায় একতারাতে,
সে সুর শুনে প্রহর গুণে আকাশ যে বিহ্বল !
—আজকে আমার মরণ-দিনে ওদের কথাই বল্ ।

ঘুমন্ত পথ স্বপন দেখে বনতুলসীর কোলে,
খেয়াঘাটে নোঙর-বাঁধা নৌকাখানি দোলে,
ঘুমভাঙা কোন্ পাখীর ডানায়
রাত্রি যে তার বেদন জানায়,
ঝাউয়ের বনে নূপুর শোনায় স্বপনপরীর দল ;
—আজকে আমার মরণ-দিনে ওদের কথাই বল্ ।

রিক্ত সাজে দাঁড়িয়ে ছিল বিরহী শিমুল,
কোন্ রসিকা অঙ্গ ভরি সাজিয়ে দিল ফুল !
রূপ-উপোসী কোন্ রূপসী
বরণ মালা গাঁথছে বসি,
ফোটায় নিশিগন্ধা-কলি অঙ্গুলি চপল ;
—আজকে আমার মরণ-দিনে ওদের কথাই বল্ ।

ককিয়ে কাঁদে শালিক ছানা বন-সেঁজুতির ঝাড়ে,
শুকনো পাতায় শোলোক শোনায় বাতাস বারে বারে
ঝরা ফুলের আসন পেতে
জোনাক্-সারির মালা গেঁথে,
পথ চেয়ে হায় কার ধুয়ে যায় চোখেরি কাজল !
—আজকে আমার মরণ-দিনে ওদের কথাই বল্ ।

পদ্মপাতার পাশে জমে মাছের ছানার ভিড়,
দুপুর রাতে নেইক যে ভয় মাছরাঙা পাখীর ;
শেওলা-নাচে চম্‌কে ওঠে
কি ভয় পেয়ে হঠাৎ ছোটে,
চাঁদের আলোয় জড়ায় ঢেউয়ে রূপালি শিকল ;
—আজকে আমার মরণ-দিনে ওদের কথাই বল্ ।

ঝুম্‌কো ফুলের হ্যাংলাপনা সইবে না আর বন,
আহ্লাদীকে যতই কেন নাচাক্ না পবন ;
ঘুমন্ত ঐ মৌমাছিদের
ঘূর্ণি-হাওয়া জাগালো ফের্,
পাতায় পাতায় হাল্‌কা হাসি চলল যে কেবল !
—আজকে আমার মরণ-দিনে ওদের কথাই বল্ ।

মেঘের মায়া, বনের ছায়া, মায়াবী আকাশ,—
তৃণের গন্ধে ছড়ায় সে কোন্ কুহকিনীর শ্বাস !
শিশির-কণার মুক্তাগুলি
আল্‌গোছে ঐ কে নেয় তুলি',
অপ্‌রাজিতার পাপ্‌ড়িতে কার ভরেছে আঁচল !
—আজকে আমার মরণ-দিনে ওদের কথাই বল্ ।

পাকা ধানের গন্ধ আনে তন্দ্রা সুমধুর,
হাওয়ার দোলে মাঠ ভরে' কার বাজিছে নূপুর ;
লক্ষ্মী পেঁচার ডানায় ঢেকে
ঝাঁপিটি তার কে যায় রেখে,
আল্‌তাপাটি ফুলে কে তার মুছে চরণতল !
—আজকে আমার মরণ-দিনে ওদের কথাই বল্ ।

হঠাৎ-জাগার পড়ল সাড়া শঙ্খচিলের দলে,
কৃষ্ণচূড়া-গাছের মাথায় শুকতারাটি জলে ;
চাঁদ-হারা ঐ কাঁদছে চকোর,
ঝিমায় ধরা তন্দ্রা-বিভোর,
কনক-লেখায় মেঘের রেখায় কার লিপি উজল !
—আজকে আমার মরণ-দিনে ওদের কথাই বল্।

কি হবে আজ ধর্ম্মগ্রন্থ আমার কাছে আনি',
কি হবে আর তত্ত্বকথা মোক্ষসুধার বাণী,
মাটির ধরা মুগ্ধকরা
সকল ব্যথা-বেদন-হরা,
এরি ধূলায় বুক ভরে পাই শান্তি সুশীতল ;
—আজকে আমার মরণ-দিনে এর কথাটিই বল্।

পূজা সংখ্যা

আগামী আশ্বিনের 'প্রবাসী'ই হইবে পূজার বিশেষ সংখ্যা। শুধু আকারেই বড় হইবে না, খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের রচনা হইবে ইহার বড় আকর্ষণ। এক কথায় সংখ্যাটিকে মনোরম করিয়া তুলিবার জন্য সকল প্রকার চেষ্টা করা হইতেছে।

কর্ম্মাধ্যক্ষ, প্রবাসী
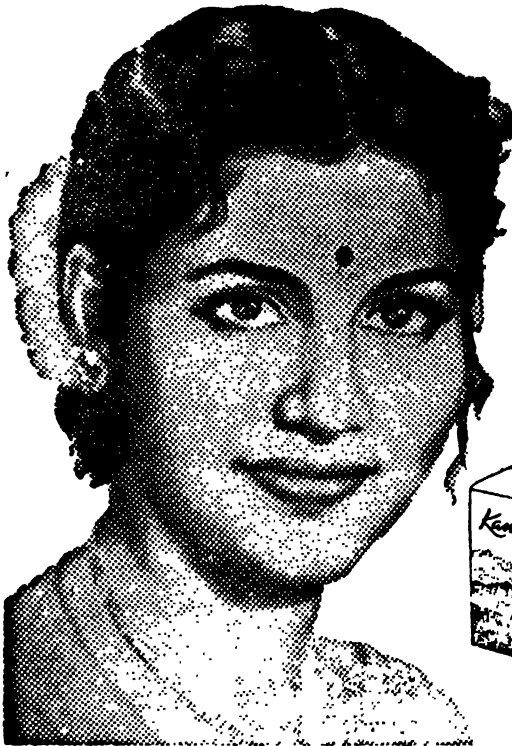
বেদমীমাংসা : অনির্বাণ, কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা। সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দশ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি বেদ-অধ্যয়নের ভূমিকা। বাংলা ভাষায় বেদশাস্ত্রের প্রচার এবং প্রসার অবশ্যই কাম্য। ভাসা ভাসা অবৈজ্ঞানিক বিকৃত তথ্য এবং রূপকথার বুয়াশায় আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের শাস্ত্র ও পুরাণ জ্ঞান যে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বিশেষ পাঁজি-পুঁথির সাহায্য লইতে হইবে না। পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিতেরা যাহাকে এম্পিরিকাল এভিডেন্স বলিয়াছেন তদ্দ্বারাই ইহা অনায়াসে সপ্রমাণ করা যাইবে। সুতরাং আমাদের বেদ-বেদাঙ্গ, মন্ত্রসংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ এবং অন্যান্য শাস্ত্রপুরাণ সম্পর্কিত গবেষণার এবং পঠনপাঠনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বেদ অপৌরুষেয়। আধুনিক বিজ্ঞান যেমন তাহার তত্ত্বসংগ্রহের ব্যাপারে পৌরুষেয়তাকে পরিহার করিয়া চলে ঠিক তেমনই বেদ-পন্থীরা বেদের তত্ত্বাবলীকে 'অপৌরুষেয়' আখ্যায় আখ্যাত করিয়া তাহাদিগকে সর্ববিধ স্বাভাবিক ভ্রমপ্রমাদের ঊর্দ্ধে রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এতদসম্পর্কে মীমাংসক যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। সাধারণ মানুষের মধ্যে আমরা ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব বা বিপ্রলিপ্সা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি. অতএব অধ্যাত্মজ্ঞান ও সাধনার ভিত্তিভূমি হইল অপৌরুষেয়, ইহা ও স্বাভাবিক। পুরুষ প্রবক্তা হইলেও তাহার বাণীতে আমরা পুরুষের কোনও অধিকার স্বীকার করি নাই। সত্যের খ্যাপনের ক্ষেত্রে কোন পুরুষের কর্তৃত্বই বেদ-বাদীদের দ্বারা স্বীকৃত হয় নাই ; সে পুরুষ ঈশ্বরই হউন আর কোন দেবী-অবতারই হউন। মন্ত্র বাণী মাত্র ইহা ঈশ্বরের বাণীও নহে। মন্ত্রের অন্তর্গূঢ় শক্তি, তাহার স্বাভাবিক স্ফুরত্তা মানুষকে সিদ্ধি ও ঋদ্ধির পথে প্রাগ্রসর করিয়া দেয়। মানুষ সশ্রদ্ধ চিত্তে তাহাকে অনুসরণ করিবে। উপনিষদে এই শ্রদ্ধার স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আধুনিক-দর্শনশাস্ত্রীরা ইহাকে ফেথ' (faith) কনভিকশন (conviction) রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈদিক দেববাদের ভিত্তি হইল এই শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধাই হইল মানব-চিত্তের মৌলিক বৃত্তি ; অতীন্দ্রিয় সত্তাকে পরাক্ দৃষ্টিতে অনুভব করাই হইল ইহার লক্ষণ। এতদ্মূলোদেশে রহিয়াছে 'আবেশ' ; 'ঊহ' বা 'ঊহ' শীর্ষক মানবচিত্তের অপর একটা বৃত্তি ইহার প্রতিবেশী। 'ঊহ'-কে পরবর্ত্তী যুগে 'তর্ক' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তর্কের দৃষ্টি প্রত্যক্বৃত্ত ; তাহার মূলে রহিয়াছে জিজ্ঞাসা। সাধনার দিক দিয়া ইহার পরিণাম আত্মবাদে দেবতাও অতীন্দ্রিয়, আত্মাও অতীন্দ্রিয়। সুতরাং দেবদর্শন এবং আত্মদর্শন ইহারা উভয়েই অতিপ্রাকৃত ; যে পন্থায় এই দর্শনটুকু সম্ভব হয় তাহাও অতিপ্রাকৃত। আপনার আত্যন্তিক প্রকৃতি বা স্বভাব অনুসারে মানুষ দেববাদী বা আত্মবাদী হয়। ইঁহারা উভয়েই 'বৃহৎ'-কে লাভ করেন; তাঁহাদের প্রান্তর, পন্থাটুকু ভিন্ন। দেববাদী ইঁহাকে লাভ করেন হৃদয়ের আবেগকে আশ্রয় করিয়া ; বোধিগ্রাহ্য বস্তুরূপে। 'বৃহৎ' তাঁহার কাছে প্রত্যক্ষ। আত্মবাদী ইঁহাকে লাভ করেন আপনার বীর্যকে আশ্রয় করিয়া। 'বৃহৎ' যেন তাঁহার আত্মরূপায়ণমাত্র। বেদ দেববাদীকে বলিয়াছেন আবেগ কম্পিত বিপ্র। আত্মবাদিকে বলিয়াছেন পৌরুষদৃপ্ত নর। একজনের প্রাপ্তির সাধনা শ্রদ্ধা এবং বোধি। অপর জনের তপঃ এবং বুদ্ধি। এই দুইটি মৌলিক চিত্তবৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া আমাদের দেশের সাধনার ধারা দুইটি ভিন্ন খাতে বহমান। ইহাদের বলা হইয়াছে ঋষিধারা এবং মুনিধারা। বৈদিক ঋষিরা বহুস্থানেই 'অদেব' এবং 'দেবাবিদের' প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। পরবর্তীকালে ইঁহাদের 'হৈতুক' আখ্যায় ভূষিত করা হইয়াছে। এই হৈতুকেরা সম্প্রদায়গত। ইঁহারা বেদনিন্দুক বা নাস্তিক ছিলেন না. হেতুবাদী এই মননশীল মানুষের দলটি ভারতবর্ষের দার্শনিক চিন্তাধারার পথিকৃৎ। এতদ্দেশের পরম্পরাগত সকল দর্শন-শৃঙ্খলার স্রষ্টা হইলেন এই হৈতুকেরা। বৌদ্ধ (Rationalist) এবং ব্রাহ্মণ্য ধারা (Intuitionist) এই দর্শনচিন্তার অঙ্গীভূত হইয়াছে।

বৈদিক সাহিত্য দুর্বোধ্য বলিয়া খ্যাত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রসংহিতাই দুর্বোধ্য। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদকে দুর্বোধ্য বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। বেদের মন্ত্রভাগের ভাষা প্রাচীনতম ; সুতরাং তাহার ব্যাখ্যা উদ্ধার করা সহজসাধ্য নহে। ইহার উপর আর একটি অসুবিধা হইল এই যে, যে ব্রাহ্মণগুলিতে আমরা বেদমন্ত্রের প্রাচীনতম ব্যাখ্যা পাই তাহারা ধারাবাহিকভাবে মন্ত্রব্যাখ্যা করে নাই। ব্রাহ্মণভাগ মুখ্যত বেদার্থ মীমাংসা নহে ; ইহা কর্ম-মীমাংসা মাত্র। ব্রাহ্মণ-মন্ত্রের উপাখ্যান রূপ-ধর্ম্য হইলেও ইহার দ্বারা আমরা মন্ত্রসংহিতার সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাই না। আরণ্যক এবং উপনিষদ এই ব্রাহ্মণেরই অন্তর্ভুক্ত। প্রকাশভঙ্গির বিভিন্নতার দিক দিয়া বিচার করিলে মনে হয় যে সাহিত্যের আরম্ভ হইয়াছে উপনিষদে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে, ইহা বলা যায়। উপনিষদ ভাব-প্রধান। উপনিষদ বেদের ভাবধারার পরিপুষ্ট রূপায়ণ। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে এই বৈদিক ভাব, সাধনা এবং সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। বৈদিক জ্ঞানের বিস্তার ঘটাইবার পথে এই গ্রন্থখানি অপরিহার্য। ইহার দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরম জ্ঞানী গ্রন্থকার বৈদিক সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। ইহা আমাদের অবশ্য-পঠনীয় অধ্যায়। এতদ্ব্যতীত, এই অধ্যায়ের অন্যান্য বিভাগে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ এবং বেদাঙ্গের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সশ্রদ্ধচিত্তে গ্রন্থখানি প্রণিধান করিলে পাঠক যে পরম উপকৃত হইবেন, ইহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি।

এই পুস্তকের প্রকাশ ব্যাপারে যাঁহারা আনুকূল্য করিয়াছেন তাঁহারা ভারতীয় সংস্কৃতির সংবর্দ্ধনে যথার্থ সহায়ক। তাঁহারা দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ।

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী।

ব্যাঙ মাষ্টারের মা : শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, ৯, রায় বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬। মূল্য ৩॥০ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে বারোটি গল্প আছে। সাহিত্যক্ষেত্রে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর নাম চিহ্নিত হইয়া আছে। লেখিকা গল্প বলিতে জানেন। কুশলী হাতে পড়িয়া গল্পগুলি এই কারণে সুখপাঠ্য হইয়াছে। স্বাতন্ত্র্যের দিক দিয়া গল্পগুলির বৈশিষ্ট্যও আছে। সকলশ্রেণীর পড়ুয়াদেরই ইহা ভাল লাগিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

কাকলি : সুপ্রিয়া মজুমদার, আগাপুর, আহারামপুর ২৪ পরগণা হইতে সুরেশচন্দ্র মজুমদার ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। মূল্য—১.৫০ ন. প.।

কয়েকটি কবিতার সমষ্টি। নূতন প্রয়াস হিসাবে কবিতাগুলি সুখপাঠ্য হইয়াছে। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁহার কবিতাগুলি কোথাও কষ্ট-কল্পিত হয় নাই। আরও একটি আশার কথা, কবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে তাঁহার কবি-মনের পরিচয় মেলে। ভবিষ্যতে ছন্দ বিষয়ে সজাগ থাকিলে উন্নতির সম্ভাবনা আছে।

শ্রীগৌতম সেন

সাংবাদিকের আত্মকথা : মঁসিয়ে ব্লাউইৎস (অনুবাদক মনোজ দাস), প্রকাশক ক্লাসিকস্ পাবলিশার্স, ১০৬৭, সত্যেন রায় রোড কলিকাতা-৩৪। মূল্য—৫ টাকা।

"জনসাধারণের জানা উচিৎ একটি সংবাদের জন্যে কত চেষ্টা, কত পরিকল্পনা এবং কত অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয়, বিশেষ ক'রে তাঁরা যখন প্রকাশিত কোন দলিল সংবাদপত্রের স্তম্ভে পাঠ করেন তখন হয়ত ভাবেন শুধুমাত্র চেয়ে বা কিছু টাকার বিনিময়েই তা পাওয়া গেছে, শুধু টাকা দিয়েই যদি সব সংবাদ পাওয়া যায় তবে এর চেয়ে আর কি সহজ কাজ থাকতে পারে!" কিন্তু তা পাওয়া যায় না বলেছেন মঁসিয়ে ব্লাউইৎস তাঁর 'মাই মেমরিজ (My Memoirs) নামক গ্রন্থে। অনুবাদ করেছেন মনোজ দাস সংবাদ। সংগ্রহের জন্য সাংবাদিককে কত বিপদের ঝুঁকি নিতে হয় তারই চমকপ্রদ কাহিনীর বিবরণ আছে বইটির পাতায় পাতায়। বহু ঘটনার সহিত ঐতিহাসিক কাহিনী জড়িত। বার্লিন কংগ্রেস, বিসমার্কের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, বিসমার্কের পদত্যাগ, ফরাসী প্রিন্সদের নির্বাসন, শ্যাম্পেনের ষড়যন্ত্র প্রভৃতি বহু ঘটনার নাটকীয় বিবরণ দিয়েছেন লেখক। আর তার স্বচ্ছন্দ সাবলীল ভাষায় অনুবাদ করেছেন অনুবাদক। বইটি বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে একটি সার্থক সংযোজনা হবে বলেই মনে হয়। প্রচ্ছদপটটিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু

রবীন্দ্র বৈজয়ন্তী : কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। প্রকাশক শ্রীকিঙ্করমাধব সেনগুপ্ত, ৮৫।১ বি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পত্রাঙ্ক—৫২, মূল্য দুই টাকা।

কবি কালীকিঙ্কর সেনগুপ্তের 'রবীন্দ্র বৈজয়ন্তী' প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল ৩রা আশ্বিন, ১৩৪৮ সালে, কবিগুরুর শতবার্ষিক জন্মদিনে ইহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে; অবশ্য কিছু সংযোজন ও পরিবর্ত্তন লইয়াই এ সংস্করণের আত্মপ্রকাশ।

বাংলাসাহিত্যে কবি কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। গদ্য-পদ্য-রচনায় ও সাহিত্যবিশ্লেষণী আলোচনায় তাঁহার সমান নৈপুণ্য। আলোচ্যগ্রন্থের প্রথমে তিনি অতি সুন্দরভাবে রবীন্দ্র-কাব্য, রবীন্দ্র-দর্শন ও রবীন্দ্র-মানসের সারগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের বৈবাহিক শ্রদ্ধেয় বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের দুইখানি অপ্রকাশিতপূর্ব্ব মূল্যবান পত্র ও রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরের ব্লক-করা আরও একখানি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পত্র এই গ্রন্থের প্রধান আকর্ষণ। একখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ যে সকল সরল সত্যকথা বলিয়া ফেলিয়াছেন সেগুলি আধুনিক যুগের অনেক ধুরন্ধর রবীন্দ্র-গবেষকের প্রতিও প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: "আমি কোনদিন কি বলিয়াছি তাহা বাহির হইলে এতই লজ্জাবোধ করি যে, তাহা আমি ভাল করিয়া পড়িতেই পারি না এবং বারবার মনে হইতে থাকে ঠিক আমি একথাটা বলি নাই।" অথচ আধুনিক অনেক লেখকই রবীন্দ্রনাথের নামে কত-কি চালাইতেছেন! নোবেল-প্রাইজ পাওয়ার পরে রবীন্দ্রনাথ লণ্ডন হইতে বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন সেখানি সমগ্রভাবে ব্লক করাইয়া এই পুস্তকে ছাপানো হইয়াছে। নানা কারণে ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ এই পত্রের মধ্যে দেশবাসীর বিরুদ্ধে তাঁহার অভিমান ও প্রচ্ছন্ন হৃদয়-বেদনার পরিচয় দিয়াছেন। পত্রখানি এস্থলে সমগ্রভাবে উদ্ধৃত করা বাঞ্ছনীয় মনে করি:

ওঁ

C/o Messrs Thomas Cook and Son
Ludgate Circus
London
19 June 1913

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

আমার যশকে যে আপনারা লাভ বলে গণ্য করচেন এইটেই আমার পরমলাভ। নইলে আর কোনো কারণে যশ জিনিষটাকে নিছক সৌভাগ্য বলে জ্ঞান করতে পারি নে। মাথার উপর থেকে যেন ঝড়ে ঘরের চালটা উড়িয়ে নিয়ে গেল এখন সমস্ত লোকের চক্ষু তারকার নীচে বাস করতে হবে এতে শান্তি কোথায়? যাই হোক, অত্যন্ত দুরপথ দিয়ে দেশের লোকের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশের অবারিত অধিকার লাভ করা গেল যখন কাছে ছিলুম তখন হয়ত এত কাছে ছিলুম না কিন্তু এই সমস্ত গোলে-হরিবোলের মধ্যে অনেকটাই ফাঁকা আওয়াজ—এতে তৃপ্তি নেই। বয়স যখন অল্প ছিল তখন হয়ত এতে নেশা ধরে যেত—এখন কেবল ভয় হচ্চে জীবনের সন্ধ্যাপ্রদীপটাকে জ্বালিয়ে তোলবার মত একটু আড়াল পাব না বুঝি—চারদিক থেকে হাওয়া দিচ্চে। দেশের লোকের ভয় হয়েছিল আমার একটা নূতন পরিবর্ত্তন হয়েছে কিন্তু দেশের লোক হয়ত জানে না এ পরিবর্ত্তন আমার জন্মকালেই হয়েছে। বস্তুত আমি যদি য়ুরোপের স্পর্শে অচেতন থাকতুম, যদি দেখতুম এখানকার হাওয়ায় আমার কুঞ্জবনে কোনো মুকুলই ধরচে না, কোথাও কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্চে না, তা হলেই বুঝতুম আমার পরিবর্ত্তন হয়েছে। আমার গান হচ্চে—

আমি সব দিতে চাই, সব নিতে চাইরে,
আপনাকে তাই মেলব যে বাইরে।

মানবজীবন নিয়ে এই যে পৃথিবীতে এসেছি এ পৃথিবীকে আমি খাটো করে নিজেকে ফাঁকি দিতে পারব না—পশ্চিম দিকের উপর আড়ি করলেই যে পূর্ব্ব দিকটাকে বেশি করে পাওয়া যায় এ কথা আমি বিশ্বাস করি নে—বরঞ্চ ঠিক এর উল্টো।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের এ পত্রটি প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার কালীকিঙ্করবাবু বঙ্গসাহিত্যের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের আরও দুইখানি দুষ্প্রাপ্য ব্যক্তিগত পত্রও এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। উহাদের একখানিতে রবীন্দ্রনাথ নিজের কাঁচা লেখা সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই উপভোগ্য। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: "এমন-সকল জিনিষকে (নিজের কাঁচা লেখা-গুলিকে) নিত্যকালের সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড় করানো বেয়াদপি।

কাঁচা লেখার প্রতি লেখকের মমতা থাকে, কিন্তু জ্যাঠা লেখার প্রতি থাকে না।" সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের মতে যে-সকল কাঁচা লেখাতে "বাল্যের সরলতা নাই, পরিণত বয়সের নৈপুণ্য নাই, মাঝবয়সের কৃত্রিমতার আতিশয্য আছে" সাহিত্যের ভদ্র আসরে তাহাদের সত্যিকারের স্থান নাই।

এই পুস্তকখানি রবীন্দ্রনাথের শতজন্মবার্ষিকী স্মরণ রচনা হইলেও গ্রন্থকার-রচিত স্বতঃস্ফূর্ত কবিতাগুলির ভিতর দিয়াও শ্রদ্ধার্ঘ্য সাজানো হইয়াছে। লেখক যে শক্তিমান কবি, তাহার পরিচয় প্রত্যেক কবিতার মধ্যেই পাওয়া যায়। এই পুস্তকের মূল্যবান ভূমিকা 'আভাষিকা' রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গ্রন্থকারের এক ভাবসমৃদ্ধ রচনা, ইহাতে নানা দিক্ দিয়া রবীন্দ্রনাথকে বিচার করা হইয়াছে এবং সে বিচার বিশেষণ যে সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন বিদগ্ধজনোচিত, তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এরূপ একখানি পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

রবি-বাসরে রবীন্দ্রনাথ : সন্তোষকুমার দে। প্রকাশক বিচিত্রা প্রকাশনী, কলিকাতা ৬, পত্রাঙ্ক ৯০, মূল্য এক টাকা।

'রবিবাসর' বাংলা দেশে তথা ভারতে এক উন্নত পর্য্যায়ের সাহিত্য প্রতিষ্ঠান। লেখক সন্তোষকুমার দে মহাশয় ইহার সহকারী সম্পাদক, তিনি সুসাহিত্যিক ও কবি। কবিগুরুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রবিবাসরের সঙ্গে কবিগুরুর গভীর ও নিবিড় সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়া তিনি এই গ্রন্থখানি সংকলন করিয়াছেন। রবিবাসরের বিভিন্ন অধিবেশনে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের ভাষণগুলি তিনি বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন ও এতদ্দ্বারা প্রকারান্তরে বাংলা সাহিত্যের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সুধিগণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতেও রবীন্দ্রচরিত্রের নানাদিকের আলোচনা এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকের সর্ব্বাপেক্ষা বড় আকর্ষণ,—অনেক ভুল বোঝাবুঝির পর শরৎচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাণী দানের উল্লেখ। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন : "শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙ্গালীর হৃদয়-রহস্যে। সুখে দুঃখে, মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্রসৃষ্টির তিনি এমন ক'রে পরিচয় দিয়েছেন, বাঙ্গালী যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। ... তিনি কারও স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞান পত্রের জন্য অপেক্ষা করেন নি। আজ তাঁর অভিনন্দন বাংলা দেশের ঘরে ঘরে স্বতঃউচ্ছ্বসিত। ...তিনি বাঙালীর বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন।" রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বাংলার পল্লীকে যে কত ভালবাসিতেন তাহার পরিচয় তিনি দিয়াছেন শান্তিনিকেতনে আহুত রবিবাসরের এক অধিবেশনে : "আমার জীবনের অনেকদিন নগরের বাইরে পল্লীগ্রামের সুখদুঃখের ভিতর দিয়ে কেটেছে, তখনই আমি আমাদের দেশের সত্যিকার রূপ কোথায় তা' অনুভব করতে পেরেছি। যখন আমি পদ্মানদীর তীরে গিয়ে বাস করেছিলাম, তখন গ্রামের লোকের অভাব অভিযোগ এবং কত বড় অভাগা যে তারা তা' নিত্য চোখের সম্মুখে দেখে আমার হৃদয়ে একটা বেদনা জেগেছিল···এই সব গ্রামবাসীরা যে কত অসহায় তা' আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলাম···তখন আমি আমার গল্পে, কবিতায়, প্রবন্ধে সেই অসহায়দের সুখদুঃখ ও বেদনার কথা এঁকে এঁকে প্রকাশ করেছিলাম। আমি একথা নিশ্চয় করে বলতে পারি, তার আগে সাহিত্যে কেউ ঐ পল্লীর নিঃসহায় অধিবাসীদের বেদনার কথা, গ্রাম্য জীবনের কথা প্রকাশ করেন নি।" বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি যে কত মূল্যবান্ তাহা বোধ করি কাহাকেও আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। গ্রন্থকার এই পুস্তক প্রকাশদ্বারা অনেক নূতন কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন, এজন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদার্হ। রবিবাসরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ যে কত আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল এই গ্রন্থে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, রবীন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানের অধিনায়ক রূপে ইহার মর্য্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। নানা তথ্যপূর্ণ এই পুস্তক সুধীসমাজে যথেষ্ট আদৃত হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি।

শ্রীকৃষ্ণধন দে

রাষ্ট্র সাহিত্য জীবন যৌবন—বসুধা চক্রবর্তী প্রণীত। প্রকাশক জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স, কলিকাতা-১৩। মূল্য—৬, পৃষ্ঠা ১২৯।

প্রবন্ধের বই। কিঞ্চিদধিক পঁচিশ বৎসর ধরিয়া লেখক যত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, এই পুস্তক তাঁহার একটা ক্ষুদ্র সঙ্কলন। ইহাতে আছে : রাষ্ট্রীয় শক্তির কেন্দ্র কোথায় (১৩৪১), মার্ক্সবাদীর দৃষ্টিতে মহাত্মা গান্ধী (১৩৫৪), প্রশ্ন (১৩৯১), ব্যক্তি ও রাষ্ট্র (১৩৪১), ভারতপথে কার্ল মার্ক্স (১৩৩০) এবং বামপন্থা (১৩৫৮)। প্রবন্ধগুলি সমসাময়িক অর্থাৎ প্রাক্-স্বাধীন ভারতের অবস্থাকে অবলম্বন করিয়া লেখা। সময়ের সঙ্গে লেখকের চিন্তাধারা এবং লেখার ভাষা উভয়ই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ইহা লক্ষ্য করা যায়। লেখক চিন্তাশীল। পুস্তকের ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

আমার দেখা নেপাল : শ্রীমৃণাল ঘোষ প্রণীত : সাহিত্য সংসদ, চন্দননগর হইতে প্রকাশিত মূল্য ২, পৃষ্ঠা ৩৭।

নেপাল ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী এবং মিত্ররাজ্য। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে সমস্ত ভারত যখন বৃটিশ কবলিত তখনও ইহা স্বাধীনতা হারায় নাই। তবে দেশটি গণতন্ত্রী শাসনের অধীন ছিল না। নামে মাত্র একটা রাজবংশ ছিল, প্রকৃত শাসন ক্ষমতা এক মন্ত্রী পরিবার বা রাণাগোষ্ঠীর হাতে ছিল। পৃথিবীর, এমন কি ভারতের সহিত তাল রাখিয়া এই ভারতীয় হিন্দুরাজ্যটি আধুনিক অর্থে মোটেই প্রগতিশীল ছিল না। কিন্তু ভারত স্বাধীনতা লাভের পরই নেপালে কয়েকটা বিদ্রোহ হয় এবং বর্তমানেও বিদ্রোহ চলিতেছে। এই প্রজা জাগরণ নেপালকে কোনপথে লইয়া যাইবে ইতিহাস তাহা বলিবে।

বর্তমান পুস্তিকায় লেখক নেপালের প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বেকার অবস্থার বর্ণনা দিয়াছেন। শৈশবে পিতার সহিত নেপালে অবস্থানকালে তিনি জংবাহাদুর রাণার দেশ দেখিয়াছিলেন। চলচ্চিত্রের ছবির মত পাঠককে মুগ্ধ করিবে এমনি সুন্দর বাস্তব বর্ণনা। পুরাতন ইতিহাসের কথাও বাদ যায় নাই। অল্পকথায় নেপালকে জানিবার সুন্দর পুস্তিকা।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

রাগ কমল

(প্রাচীন চিত্র)

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬২শ ভাগ
১ম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৬৯

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র

আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র তিনটি, পাকিস্থান, চীন ও ব্রহ্মদেশ। ইহাদের মধ্যে ব্রহ্মদেশ নির্লিপ্ত ও প্রতিবেশী হসাবে ভদ্র। ব্রহ্মদেশের সহিত আদান-প্রদানে কখনও তিক্ততার আভাস পাওয়া যায় নাই। এমন কি যখন াসাম হইতে পার্ব্বত্য উপজাতি মারফৎ আফিংয়ের চোরা চালান ধরা পড়ে তখন ব্রহ্মদেশের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ামাদের প্রধানমন্ত্রীকে সাক্ষাৎভাবে জানাইয়া প্রতিকার চাহিয়াছিলেন। শোনা যায় ঐ আফিং চোরা চালান ্যাপারে আসামের এক কংগ্রেসী ধুরন্ধর যুক্ত থাকার প্রমাণও তিনি সাক্ষাতের সময় দিয়া যান এবং ঐ ব্যক্তির সঙ্গে পজাতিদিগের যোগ ছিন্ন করার অনুরোধও জানাইয়াছিলেন। অন্য ব্যাপারে, যথা কেনা-বেচায় খুঁটিনাটি ত্যাদিতে, আমাদের সঙ্গে ব্রহ্মদেশের সহজভাবেই সকল কাজ চলে, কখনও মন-কষাকষি হয় নাই।

অন্য দুইটি প্রতিবেশী এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। দুইটিই পরস্বলোলুপ এবং দুইটিই সত্য মিথ্যা ন্যায় ীতির সম্পর্ক রাখে না। দুইটিই শক্তিজোটে যুক্ত, তবে দুই বিপরীত শক্তিজোটের। চীন আছে সোভিয়েটের জাটে এবং পাকিস্থান মার্কিনি জোটে। আশ্চর্য্য এই যে, বিপরীত শক্তিজোটে থাকা সত্ত্বেও দুইজনের মধ্যে প্রতি যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে এবং কথাবার্ত্তাও চলিতেছে সহজভাবে। অবশ্য কথাবার্ত্তার ভিত্তি হইল টের ভাগ ব্যবস্থা লইয়া, যদিও এই "মাসতুত ভাইয়ের ভাগ বাটোয়ারা" শেষ পর্য্যন্ত কোথায় দাঁড়াইবে তাহার কানও স্থিরতা নাই।

দুই রাষ্ট্রই ভারতের নানা এলাকায় পঞ্চমবাহিনী ও গুপ্তচরের ঘাঁটি স্থাপনে খুব তৎপর। এই কাজে দুই াষ্ট্রই বিপুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিতেছে এবং দুইটি ভিন্ন জাতীয় রাজনৈতিক দলের যোগসাজসে এই কাজ াগ্রসর করিতে চেষ্টিত।

পাকিস্থানী লোকজন ত বিপুল সংখ্যায় পূর্ব্ব-ভারতে অনুপ্রবেশ করিয়াছে ও করিতেছে। এই অনুপ্রবেশের পছনে যে পাকিস্থান সরকারের সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা ও সমর্থন আছে সে কথা আমরা পূর্ব্বের এক সংখ্যায় লিখিয়াছি। নহিলে সাঁওতাল এদেশে আসিতে গেলে পাকিস্থানি গুলী চালায়, অথচ লক্ষ লক্ষ পাকিস্থানি মুসলমান এদেশে অনুপ্রবেশ ও চোরাপথে যাতায়াত করে কেমনে?

এই অনুপ্রবেশ ব্যাপারে, পশ্চিমবঙ্গে, আসামে ও ত্রিপুরায়, আমাদের সীমান্তের এপারেও বহু দেশদ্রোহী এই ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত আছে নিশ্চয়, নহিলে এ ভাবে অনুপ্রবেশকারী পারাপার করে কি করিয়া?

সম্প্রতি আদমসুমারির ব্যাপারে কতকগুলি অতি আশ্চর্য্যজনক তথ্য পাওয়া যায়, জনসংখ্যার বিচারে। সারা

ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ২১.৫ হারে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বৃদ্ধি-হার দেখা যায় শতকরা ৩২.৭৯, আসামে ৩৪.৪৫, মণিপুরে ৩৫.০৪ এবং ত্রিপুরায় ৭৮.৭১। পশ্চিম ভারতে দিল্লীর বৃদ্ধি-হারও ৫২.৪৪ হইয়াছে, কিন্তু তাহার অনেকটাই দিল্লীর প্রসার ও সেখানে নগরমুখী জনস্রোতের বসতি হওয়ার দরুন হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে, আসামে, মণিপুরে ও ত্রিপুরায় এইরূপ অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলির মধ্যে যে পাকিস্থানিদিগের অনুপ্রবেশ একটি, সে বিষয়ে সেন্সাস কর্তৃপক্ষের কোনও সন্দেহ নাই।

পাকিস্থানিরা এইভাবে আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, খাদ্যের অনটন ইত্যাদি নানা সমস্যা আরও জটিল করিতেছে। অন্যদিকে চীনেরা আমাদের দেশের ভূমির অনেকখানি (প্রায় ১২৫০০ বর্গমাইল) দখল করিয়া বসিয়াছে এবং সেই দখল আরও প্রসারিত করিতে চেষ্টিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গ লিখিবার সময় সংবাদ আসিয়াছে যে, ভারত, ভুটান ও তিব্বতের সীমানায়, নেফা অঞ্চলের কামেং সীমান্তের উত্তরে স্থিত একটি ভারতীয় ঘাঁটিকে চীনা সেনা অবরুদ্ধ করিয়াছে। ঐ অঞ্চল পরিদর্শন করার সময় একটি ভারতীয় বিমান চীনা-সৈন্যের গুলীর লক্ষ্যও হয় তবে তাহার কোনও ক্ষতি হয় নাই। অবশ্য একথাও জানা যায় যে, সেই ঘাঁটিতে এখনও ভারতীয় সেনা দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত আছে এবং ঐ অঞ্চলে ভারতীয় সামরিক বিভাগের কর্তৃপক্ষ তৎপরতার সহিত যাবতীয় ব্যবস্থা করিতেছেন।

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই যে, আর কতদিন আমরা গান্ধীবাদের মিথ্যা অজুহাতে এইভাবে দস্যু ও তস্করের হাতে সর্বস্ব খোয়াইতে থাকিব? আমাদের বহিঃরাষ্ট্র-বিষয়ক দপ্তর এখন ত সম্পূর্ণরূপে নেহরুর মুখাপেক্ষী। পণ্ডিত নেহরুর আদেশ নির্দেশ ভিন্ন ওই দপ্তরে কেহই কোন কাজ করিতে সাহস পায় না। আর পণ্ডিত নেহরু? তিনি জীবনে কখনও কোনও কাজে ধীর ভাবে বিচার করিয়া কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তাহা দৃঢ়তার সহিত অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই অপবাদ তাঁহার সম্পর্কে আমরা কখনও শুনি নাই।

কলিকাতায় "ছাত্রবিক্ষোভ"

বিগত ৪ঠা সেপ্টেম্বর, (১৮ই ভাদ্র) কলিকাতা মহানগরীর কেন্দ্রমূলে ছাত্রবিক্ষোভের নামে যে উদ্দাম গুণ্ডামি ও অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে তাহাতে সুস্থ-মস্তিষ্ক নাগরিক মাত্রেরই মনে চিন্তা ও ধিক্কারের উদয় হইয়াছে। ঘটনার বিবরণ যাহা পাওয়া যায় তাহাতে এই গোলযোগের সৃষ্টি হয় শিয়ালদহ ষ্টেশনে একটি ছেলে তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট লইয়া প্রথম শ্রেণীতে যাওয়ায় চেকার তাহার নিকট ভাড়ার তফাৎ অনুযায়ী অতিরিক্ত টাকা চাহিয়া না পাওয়ায় তাহাকে পুলিসে দেয়। পুলিসের হাত হইতে তাহাকে ছিনাইয়া লইবার চেষ্টায় শিয়ালদহ ষ্টেশনে হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়। হাঙ্গামাকারীদিগের মধ্যে ছাত্র অনেক ছিল এবং হাঙ্গামাকারীদিগকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য যে মারপিট হয় তাহাতে কিছু ছাত্রও মার খায়। তার পর যখন পুলিস সেই লোকটিকে লইয়া হ্যারিসন রোডে যাইতে থাকে তখন গোলযোগ গুরুতর অবস্থায় পৌঁছায়। ছাত্রের দল ইট-পাটকেল চালাইয়া সমস্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ করে। তাহার পর ব্যাপকভাবে গোলমালের আরম্ভ হয়।

ঐ দিন রাত্রে এক সরকারী প্রেস নোটে এই হাঙ্গামার যে বিবরণ দেওয়া হয় তাহাতে ধৃত যাত্রীকে ভুলক্রমে ছাত্র বলা হয়। ভুল পরের দিন সংশোধন করিয়া জানান হয় যে, ধৃত ছেলেটি জহরলাল মান্না আদৌ ছাত্র নয়, বেতার-শিল্পের শিক্ষানবীশ মেক্যানিক। সরকারী বিবরণ এইরূপ ছিল:

সরকারের পক্ষ হইতে এই প্রেসনোট দেওয়া হয়: তৃতীয় শ্রেণীর মান্থলী লইয়া উচ্চতর শ্রেণীর কামরায় ভ্রমণের অভিযোগে মঙ্গলবার সকালে লোক্যাল ট্রেনের একজন ছাত্র-যাত্রীকে রেল কর্মচারীরা শিয়ালদহ ষ্টেশনে আটক করেন। তাহাকে টিকিট কালেক্টরের অফিসে লইয়া যাওয়ার সময় ছাত্র এবং সাধারণে মিলিয়া প্রায় পাঁচশত জনের এক জনতা ঐ অফিস ঘেরাও করে, ধৃত ছাত্রের মুক্তি দাবি করে এবং তাহাকে ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করে। জনতা ইটপাটকেল ছোঁড়ায় শিয়ালদহ রেল ষ্টেশনে কর্তব্যরত চারজন পুলিস কনষ্টেবল আহত হয়। ঐ সম্পর্কে মোট কুড়িজনকে গ্রেপ্তার করার পর জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়।

ইহার পর হাঙ্গামা ষ্টেশন এলাকার বাহিরেও ছড়াইয়া পড়ে। তখন যে বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহার সুযোগ লইয়া সমাজবিরোধীরা জমায়েত হয় এবং জনতাকে উত্তেজিত করিতে সুরু করে। রাষ্ট্রীয় পরিবহনের বাস এবং ট্রাম আক্রান্ত হয়। দুইটি সরকারী বাসের চালক আহত হন এবং তাঁহাদের হাসপাতালে পাঠাইতে হয়। মুচিপাড়া পুলিস ফাঁড়ির উপর প্রবলভাবে ইটপাটকেল বর্ষিত হয়। পুলিসকে বহু রাউণ্ড কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়িতে হয় এবং তার পর ভীড় হটাইবার জন্য লাঠিও ব্যবহৃত হয়।

হ্যারিসন রোডে অপেক্ষমান কয়েকটি ট্রামে দুষ্কৃতকারীরা আগুন ধরাইয়া দেয়। প্রথম দুইটি ট্রাম-গাড়ীর আগুন নিভাইবার কাজে দমকলবাহিনী সাহায্য করে। কিন্তু অলিগলি ও বাড়ীর ছাদ হইতে প্রবল ইটপাটকেল ও সোডার বোতল বর্ষণের ফলে দমকলবাহিনীর পক্ষে কাজ করা সম্ভব হয় না। জনতা মারমুখী হওয়ায় পুলিসকে বারে বারে কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়িতে হয় এবং লাঠি চালাইতে হয়।

কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর খবর অনুসারে তেরটি ট্রামে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

রাজাবাজার ও মৌলালীর মোড়ের মধ্যে আপার ও লোয়ার সার্কুলার রোডের উপর কয়েকবার হাঙ্গামা হয়। কয়েকটি স্থানে দুষ্কৃতকারীরা আলকাতরার পিপে দিয়া পথ অবরোধ করায় পুলিস-বাহিনীর চলাচলে বাধা সৃষ্ট হয়। পরে পুলিস অবরোধগুলি অপসারণ করে।

লোয়ার সার্কুলার রোডের উপর একটি ট্রাম-গুমটিতে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হয়। যথাসময়ে পুলিসের হস্তক্ষেপে ট্রাম কোম্পানীর অর্থ ও সম্পত্তি রক্ষা পায়। অপেক্ষমান বন্দী-গাড়ীতেও আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। এই ঘটনা ঘটে বেলেঘাটা মেন রোডের মোড়ে।

এই দিনের ঘটনায় প্রায় ৬০ জন পুলিস কর্ম্মচারী ও অফিসার আহত হয়। এই সকল ঘটনা সম্পর্কে পুলিস আনুমানিক দুই শত জনকে গ্রেপ্তার করে। উপদ্রুত এলাকাগুলিতে হাঙ্গামা সুরু হইবার পরই সরকারী বাস ও ট্রাম চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। সন্ধ্যার পর অন্যান্য অঞ্চলেও ট্রাম ও বাস চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। রাত্রি নয়টার পর আর কোন ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় না।

পরের দিন কলিকাতার অবস্থা মোটের উপর শান্তই ছিল যদিও দক্ষিণ কলিকাতার কয়েক স্থলে কিছু উত্তেজনা দেখা যায়। বালিগঞ্জ অঞ্চলে ও ভবানীপুর জগুবাবুর বাজারের নিকটে ট্রাম লক্ষ্য করিয়া ইটপাটকেল নিক্ষিপ্ত হয়। সহরতলীতে কয়েকজন লোক গড়িয়া, যাদবপুর, ঢাকুরিয়া, দমদম, আগড়পাড়া ও বেলঘরিয়ায় হাঙ্গামা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। তবে অবস্থা মোটের উপর আয়ত্তে আনা সম্ভব হয়।

এই "বিক্ষোভ" এবং তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত অগ্নিকাণ্ড, হাঙ্গামা ও লুটতরাজের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়াছিলেন তৎসংলগ্ন তথ্য 'আনন্দবাজারে' এই ভাবে প্রদত্ত হয়:—

"বুধবার দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সেন তাঁহার বিবৃতিতে আরও বলেন যে, মঙ্গলবারের হাঙ্গামা সম্পর্কে মোট ২৫৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা প্রায় ৪০ জন। ছাত্রদের ১৯ জনকে শিয়ালদহ ষ্টেশনেই গ্রেপ্তার করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী জানান যে, যাহাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে আহতদের সংখ্যা ছিল ৭০ জন। ৬৪ জনকে, ঐদিনই প্রাথমিক শুশ্রূষার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বাকি ৬ জন বুধবার সকালে হাসপাতাল হইতে ছাড়া পায়।

ইহা ছাড়া একজন সহকারী পুলিস কমিশনারকে লইয়া ৬২ জন পুলিস কর্ম্মচারী ইটপাটকেলে আহত হন।

অর্থাৎ সরকারী হিসাব অনুযায়ী মঙ্গলবারের হাঙ্গামায় আহতের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩২ (৭০ + ৬২) জন।

বুধবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী পুলিস হাসপাতালে গিয়া আহত কর্ম্মচারীদের দেখিয়া আসেন। ঐদিন হাসপাতালে ১০ জন আহত পুলিস কর্ম্মচারী ছিলেন।

ইহা ছাড়া জনৈক সহকারী পুলিস কমিশনার গুরুতর আহত অবস্থায় বাড়ীতেই আছেন বলিয়াও তিনি জানান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মঙ্গলবারের হাঙ্গামায় ১৩টি ট্রাম, ২টি মিল্ক বুথ, ১টি ট্রাম গুমটি এবং একটি বাস গুমটিতে অগ্নি-সংযোগ করা হয়।

শ্রী সেন বলেন, আরও বিস্ময়ের কথা ওই দিন ৪০০।৫০০ ছাত্রের এক মিছিল যখন হ্যারিসন রোড ধরিয়া শিয়ালদহের দিকে অগ্রসর হইতেছিল তখনই প্রথম ট্রামটিতে অগ্নিসংযোগ হয়। ওই সময় বরাবর সমাজবিরোধী-দের ভীড় জমিয়া যায়। 'যদি ছাত্ররা ট্রামে আগুন না লাগাইয়া থাকে, তাহা হইলে সমাজবিরোধীরাই...অগ্নি-সংযোগ করিয়াছে' তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, তিন হাজার হইতে আট হাজার জনতার এক ভীড় পুলিসের উপর ইটপাটকেল ছোঁড়ে। প্রথম ট্রামটিতে যখন আগুন লাগানো হয় তখন সেখানে কোন পুলিস ছিল না।"

অগ্নিকাণ্ড ও লুটপাটে ছাত্রদের সক্রিয় অংশ কিছু ছিল একথা বিশ্বাস করিতে আমাদের মন চাহে না, কেননা ছাত্রদের অবনতি যদি ওই নিম্নস্তরে পৌঁছাইয়া থাকে তবে দেশের ভবিষ্যৎ সত্য সত্যই অন্ধকার। আমাদের মনে হয় একদল সমাজদ্রোহী ও রাষ্ট্রধ্বংসকারী দুর্বৃত্ত ওই উচ্ছৃঙ্খল ও দায়িত্বজ্ঞানশূন্য ছাত্রদের শিখণ্ডীরূপে ব্যবহার করিয়া নিজেদের কার্য্য সিদ্ধি করে। এই বিষয়টি বিচারাধীন সুতরাং এই হাঙ্গামায় ছাত্রদের অংশ প্রকৃতভাবে নির্দ্ধারিত না হওয়া পর্য্যন্ত সে বিষয়ে মন্তব্য অবান্তর।

এই ব্যাপারে রাষ্ট্রধ্বংসকারী দুর্বৃত্তদের যোগ ছিল বলিয়া আমরা মনে করি। ট্রাম ঠিক খড়ের গাদা বা আতসবাজীর জতুগৃহের মত দাহ্য পদার্থে নির্ম্মিত নহে যে, তাহাতে অগ্নিসংযোগ এতই সহজসাধ্য। যাহারা '৪২ সনের বিক্ষোভে এই কার্য্যের আরম্ভ করে এবং পরে ট্রামের ভাড়া নিরোধের বিক্ষোভে যাহারা এই কাজ ব্যাপকভাবে আরম্ভ করে, তাহাদের নিকট যে বিবরণ আমরা পাইয়াছিলাম, এবং নিরুপায় প্রত্যক্ষদর্শীরূপে ঐ দ্বিতীয় বারের হাঙ্গামায় যাহা আমরা দেখিয়াছিলাম তাহাতে আমাদের জানা আছে যে, দুই-একটা ট্রাম পোড়াইতে কতটা পেট্রোল, কেরোসিন, মবিল, আলকাতরা বা কয়লা লাগে এবং ঐ অগ্নিসংযোগে কিরূপ ক্ষিপ্রকারিতার সঙ্গে "ওস্তাদ"দের সঙ্গে সঙ্গে সরিয়া আসিতে হয়—অন্যথায় অগ্নিসংযোগের পর প্রবল আগুনের হলকায় ভিজান কাপড় জামাতেও আগুন লাগিবার সম্ভাবনা থাকে।

পূর্ব্বেকার হাঙ্গামা ব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও কোনও একদিনে দুই-তিনটির বেশী ট্রামের অগ্নিদগ্ধ হওয়ার খবর আমাদের মনে পড়ে না। এইবারের হাঙ্গামায় একদিনে, অল্পক্ষণের মধ্যে তেরটি ট্রামে এইভাবে অগ্নিসংযোগ করার পিছনে যে কোনও সুপরিকল্পিত ও উত্তমভাবে গ্রথিত ব্যবস্থা ছিল না, একথা আমরা বিশ্বাস করিতে অসমর্থ। ছাত্রদের সঙ্গে সমাজদ্রোহীদের যোগাযোগ আছে কিনা জানি না—যদিও থাকা আশ্চর্য্য নয়, তবে উহাদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল ও দায়িত্বজ্ঞানশূন্যদের সংখ্যা বেশ কিছু আছে এবং কয়েকটি কলেজ ও স্কুলে তাহাদের পরামর্শদাতাদের মধ্যে রাষ্ট্রবিধ্বংসকারী "পঞ্চমবাহিনী" জাতীয় লোকও আছে, যাহাদের উস্কানীতে ঐ অপরিণত মস্তিষ্ক তরুণদের মাথা সহজেই টলে।

ব্যাপক অগ্নিসংযোগ ও দমকলবাহিনীকে প্রতিরোধ, এই দুই কাজেই ঐ ছাত্রদল অন্ততঃপক্ষে শিখণ্ডীর কাজ করিয়াছে। উহারা ছড়াইয়া না থাকিলে পুলিস গুলী চালাইত সন্দেহ নাই এবং একথা স্থানীয় গুণ্ডারা বিলক্ষণ জানে। সুতরাং "ছাত্রবিক্ষোভ" এবং অগ্নিকাণ্ড ও লুটপাট ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সহিত জড়িত, প্রত্যক্ষভাবেই হউক বা পরোক্ষভাবেই হউক। সেইজন্য এখন আমাদের সকলেরই চিন্তা করা প্রয়োজন যে, কি উপায়ে ছাত্রদের সহিত দুর্বৃত্তদের এই কথামালার "বিড়াল ও বানর" সম্পর্ক ছেদ করা যায়। তবে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে উপাখ্যানের সম্পর্ক ছাড়াও আর একটি সম্পর্ক আছে। কিছু অল্প সংখ্যক ছাত্রের অধঃপতন বেশ অনেক দূর যাওয়ায় তাহারা ঐ সমাজদ্রোহীদের সমপর্য্যায়ে নামিয়াছে। ইহারাই ঐ পেশাদার দুর্বৃত্ত ও গুণ্ডাদের সঙ্গে ছাত্রদের যোগসূত্র এবং ইহাদের উস্কানীতেই অধিকাংশ ছাত্র উপাখ্যানের নির্ব্বোধ বিড়ালের মত নিজেদের হাত পোড়াইয়া দুর্বৃত্তদিগের কার্য্যসিদ্ধিতে সহায়তা করে। দুর্বৃত্তদিগের মধ্যে সমাজদ্রোহী গুণ্ডা ও রাষ্ট্রধ্বংসকারী-বিদেশীর দালাল বা পঞ্চমবাহিনীর চর থাকার সম্ভাবনাও আছে।

ছাত্রদের মধ্যে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার মূলে যে সকল শক্তি কাজ করিতেছে, সেগুলিকে প্রতিহত করার কাজ ছাত্রদের সাধ্যাতীত, যদি না সমাজের ও জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ও বলিষ্ঠ সহযোগ তাহাদের পিছনে থাকে। এবং এইখানেই যত নষ্টের মূল।

একদিকে ত আজকার দিনে সাধারণ নাগরিকের জীবনযাত্রা এতই কষ্টকর যে, এ সকল বিষয়ে চিন্তা করার বা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে প্রতিকারের ব্যবস্থা করার মত উদ্যম বা প্রবৃত্তি কোনটাই তাহার নাই। উপরন্তু আছে আমাদের অপত্য স্নেহের উচ্ছ্বাস, যাহার বশে সুশিক্ষিত পিতামাতাকেও তাঁহাদের গুণধর সন্তানদিগকে দোষমুক্ত করার চেষ্টায় তাহাদের সকল অপকীর্ত্তির আজগুবি ও অপরূপ ব্যাখ্যা দিতে দেখা যায়। এ বিষয়ে তাঁহাদের প্রধান সহায়ক এক শ্রেণীর সাংবাদিক, যাঁহাদের কৃপায় এই অভাগা প্রদেশের নাগরিকগণের এইরূপ বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত অবস্থা হইয়াছে। বাংলার ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন করার কাজে তাহাদের পিতামাতার একদিকে দায়িত্বপূরণে অবহেলা ও অন্যদিকে অন্ধ ও বিকারগ্রস্ত অপত্যস্নেহই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল শক্তি। ইঁহাদেরই যদি দায়িত্বজ্ঞান না থাকে তবে ইঁহাদের সন্তানেরা মানুষ হইবে কেমনে?

ছাত্রদের দৃঢ়ভাবে বুঝাইতে হইবে যে, যতদিন তাহারা দেশ বা সমাজের কোনও কাজে না আসে, যতদিন না তাহারা কর্ম্মজীবনের ও সমাজকল্যাণের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণে সমর্থ হয়, ততদিন দেশের বা সমাজের উপর তাহাদের সকল দাবিই শুধু স্নেহের ভিত্তিতে স্থাপিত। সে স্নেহের বদলে যদি তাহারা এইরূপে কুকর্ম্মের ও যথেচ্ছাচারের পথে চলিবার দাবী করে তবে শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের ঐ সাধারণ দুর্ব্বৃত্তেরই মত দুষ্কৃতির শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিভাষণ

বিগত ২৩শে ভাদ্র রবিবার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনকে কলিকাতা ময়দানে নাগরিক সংবর্দ্ধনা দেওয়া হয়। যাঁহারা ঐ সংবর্দ্ধনার অংশ গ্রহণ করেন তাঁহাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ব্যাপক ভাবে জ্ঞাপন করিবার পর মুখ্যমন্ত্রী যাহা বলেন তাহার মধ্যে অতি স্পষ্ট ভাষায় দেশাত্মবোধের প্রেরণা ও দেশের ও দশের কল্যাণার্থে আত্মনিবেদনের আহ্বান ছিল।

এই পশ্চিম বাংলাকে সবল ও সক্ষম প্রদেশে পরিণত করার জন্য এদেশবাসীকে অগ্রসর হইয়া সরকারকে নূতন গঠন কাজে সহায়তা করিতে আহ্বান করেন। নিজের ও মন্ত্রিসভার সহকর্ম্মীদিগের পক্ষ হইতে তিনি জানাইয়াছিলেন যে, "আমি তোমাদের সেবক। আমি নিজের এবং আমার সহকর্ম্মীদিগের হইয়া এই প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, আমরা এই কাজে অগ্রসর হইবার পথে যে সকল সমস্যা আছে তাহার কোনটাই এড়াইবার চেষ্টা করিব না। আমরা জানি যে, সে সকল সমস্যা পূরণের ক্ষমতা আমাদের আছে। সকল বাধা-বিপত্তি আমরা অতিক্রম করিতে বদ্ধপরিকর। আমাদের ভবিষ্য-সাফল্যের পথে যাহা কিছু প্রতিবন্ধক, সে সবলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা প্রগতির পথে চলিবই। কিন্তু এ কাজে জনসাধারণের পূর্ণ সহযোগ ও সমর্থন নিতান্তই প্রয়োজন কেননা গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় এ দায়িত্ব শুধু তাঁহার একার নহে, 'আমার, আপনার, সকলেরই।' গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার দায়িত্বও সকলকে লইতে হইবে।"

পশ্চিমবঙ্গের সমস্যার 'জটিলতা, গভীরতা ও ব্যাপকতার' উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, ইচ্ছাশক্তি ও আদর্শনিষ্ঠা থাকিলে বাঙালী তাহার শত সহস্র সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম হইবে। শ্রীচৈতন্য, রাজা রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের বাংলায় হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান সকল ধর্ম্মাবলম্বীই আছেন, উহার রাজধানীতে "সমগ্র ভারত মিলিত হইয়াছে।"

৩৫ হাজার বর্গমাইল পরিমিত পশ্চিমবঙ্গে মোট সাড়ে তিন কোটি এবং প্রতি বর্গমাইলে ১০৩১ জন বসবাস করেন। রাজ্যের শতকরা যে ৬৫ ভাগ জমি চাষের উপযোগী, তাহার শতকরা ৮২ ভাগে চাষ হয়—পৃথিবীর আর কোনও স্থানে এত অধিক হারে জমিতে চাষ হয় না। রাজ্যের ৭ লক্ষ পরিবার ভূমিহীন এবং আরও ৭ লক্ষ কৃষিমজুর। বৃহৎ শিল্পে সোয়া সাত লক্ষ আর ছোট ও মাঝারি শিল্পে সতর লক্ষ মানুষ কাজ করিলেও রাজ্যের বেকার সমস্যা এখনও ভয়াবহ, ৩৫ লক্ষ উদ্বাস্তু আসিয়া উহাকে আরও ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছেন।

তিরিশ লক্ষ মানুষের শহর কলিকাতার সমস্যার উল্লেখ করিয়া মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, টোকিও, লণ্ডন প্রভৃতি বড় বড় শহরেও প্রতি বর্গমাইলে ৬৫ হাজারের অধিক মানুষ থাকে না, কিন্তু কলিকাতায় প্রতি বর্গমাইলে বসবাস করে ৮০ হাজারের মত মানুষ। শহরের অসংখ্য অলিগলি, মোটরগাড়ী আর মানুষে-টানা লজ্জাকর রিক্সার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, হুগলী নদীর জল কমিয়া যাওয়ায় শহরের গর্ব্ব উহার বন্দরও দুর্দ্দশায় পড়িয়াছে—আট বৎসরের আগে গঙ্গা-বাঁধ নির্ম্মিত হইবে না, তাহার আগে উহার সমস্যার সমাধানও সম্ভব নহে। কলিকাতাকে বাঁচাইতে হইলে হাওড়া পুলের ন্যায় আর একটি সেতু দরকার। উহাতে নয় কোটি টাকা লাগিবে। জল-প্লাবন হইতে রক্ষার জন্য শহরের ড্রেন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার দরকার। শহরের ৪২ হাজার খাটা পায়খানা আর বস্তিগুলির শোচনীয় অবস্থা ভাবিলে লজ্জায় তাঁহার মাথা হেঁট হইয়া আসে।

দেশবাসীকে "নূতন, বড় আর ভাল" কলিকাতা গড়িয়া তুলিতে এবং উহাকে গুণ্ডা ও অসামাজিক মানুষের দৌরাত্ম্য হইতে মুক্ত করিতে আহ্বান জানাইয়া তিনি বলেন যে, জনসাধারণের বিশেষ করিয়া দেশের যাহারা ভবিষ্যৎ, সেই ছাত্র-সমাজের সক্রিয় সহযোগিতা পাইলে কলিকাতা আবার সুন্দর আর শান্তিময় হইয়া উঠিবে। কলিকাতাকে প্রাণ দিয়া রক্ষা করিব, উহার শান্তি, সম্মান ও বাঙালীর মানরক্ষা করিব—এই শপথ লইতে হইবে।

"বটবৃক্ষের তলে" ছিলেন বলিয়া আগে—মন্ত্রিসভার সদস্যরা অবসর বিনোদনের সময় পাইয়াছেন; কিন্তু এখন

সকলেই প্রত্যহ বার-চৌদ্দ ঘণ্টা করিয়া কাজ করেন, বাংলার মুখ উজ্জল করিবার জন্ত তাঁহারা আরও অধিক সময় কাজ করিবেন। প্রয়োজন হইলে প্রাণ দিবেন—তিনি এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেন। গর্ব্ব করিয়া তিনি বলেন যে, মহান নেতার মহাপ্রয়ানের পর প্রদেশ কংগ্রেস নেতারা দেখাইয়াছেন যে, দেশের কল্যাণে মান, অভিমান ত তুচ্ছ, তাঁহারা সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিতে পারেন।

মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁহার ঈপ্সিত প্রগতির যাত্রার শুভেচ্ছা জানাইয়া আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করি। জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগ পাওয়া ক্রমেই দুরূহ হইয়া দাঁড়াইতেছে, কিন্তু এখনও তাহার উপায় আছে। যদি ইচ্ছা থাকে তবে সেই সহায়তা ও সহযোগকে সুসংবদ্ধ ও সুগঠিত করিবার কার্য্যক্রমে ছাত্রদেরও যুক্ত করা চলে। কিন্তু সহযোগ লাভের জন্ত অন্য পথ এবং অন্য রূপ সংস্থা যোজনার আবশ্যক আছে।

জাকার্ত্তা

জাকার্ত্তায় এশিয়ার ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফলাফলে দেখা যায় যে, ভারত সরকার বিদেশী অর্থ ক্রয় করিতে অনুমতি না দিয়া যে বহু সংখ্যক ভারতীয় খেলোয়াড়দিগের জাকার্ত্তা গমন নিবারণ করেন; তাহার ফলে ভারতের ক্রীড়াক্ষেত্রে যশের দিক দিয়া অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে। কারণ আরও ৩০।৪০ জন খেলোয়াড় জাকার্ত্তা গমন করিলে ভারত অনায়াসে আরও ১০।১৫টি স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রঞ্জ পদক অর্জ্জন করিতে পারিতেন এবং ভারতের স্থান ইন্দোনেশিয়ার উপরেই হইত সহজেই। এই সকল খেলোয়াড়দিগের মধ্যে মুষ্টিযুদ্ধে অলিম্পিক কমিটি কর্ত্তৃক বাছাই করা আরও পাঁচজনের নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। এই পাঁচজন যাইলে নিশ্চয়ই আরও দুইটি স্বর্ণ পদক ও দুইটি রৌপ্য কিংবা ব্রঞ্জ পদক ভারতের হস্তে আসিত। যে তিনজনকে ভারত সরকার পাঠাইয়াছিলেন তাহাদিগের মধ্যে তিনজনই পদক আহরণ করেন। পদম বাহাদুর মল এশিয়ার শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা বলিয়া নির্ব্বাচিত হ'ন ও নিজ ওজনের যোদ্ধাদিগের মধ্যেও প্রথম স্থান অধিকার করেন। কিন্তু পদম বাহাদুরকেও ভারত সরকার প্রথমে যাইতে দিতে চাহেন নাই! পরে যাইবার দুই একদিন মাত্র পূর্ব্বে পদম বাহাদুরকে যাইবার অনুমতি দেওয়া হয়। পাকিস্থানের একজন মুষ্টিযোদ্ধা কাহারও সহিত না লড়িয়া স্বর্ণ পদক লাভ করেন। ঐ ব্যক্তির ওজনের যে ভারতীয় মুষ্টিযোদ্ধাকে অলিম্পিক কমিটি নির্ব্বাচিত করেন তিনি পাকিস্থানি মুষ্টিযোদ্ধার তুলনায় বহু খ্যাতনামা ও কৌশলী ছিলেন। কিন্তু ভারত সরকার তাঁহাকে যাইতে না দিয়া যে পরিমাণ বিদেশী অর্থ বাঁচাইলেন, স্বর্ণ পদকটির মূল্যই তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। ভারত সরকারের দেশের ভিতরে অর্থ অপব্যয় নীতি ও বাহিরে অতিকার্পণ্য ক্রমশঃ ভারতীয়দিগকে বিদেশে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিতেছে। যে রাষ্ট্রের নেতা-দিগের হিসাবের গরমিলে অনায়াসে দশ বিশ লক্ষ পাউণ্ড এদিক-ওদিক হয় সেই রাষ্ট্রের কোন লোকই প্রায় বিদেশ ভ্রমণে যাইতে পারেন না; ইহার মূলে নেতাদিগের অক্ষমতা ব্যতীত আর কিছু আছে বলিয়া কে স্বীকার করিবে? এক লক্ষ পাউণ্ড যদি ব্যয় করা যায় তাহা হইলে ৪০০।৫০০ ভারতীয় দুই-তিন মাস বিদেশে ঘুরিয়া আসিতে পারেন। দশ লক্ষ পাউণ্ডে ৪।৫ হাজার লোকের ব্যবস্থা হয়। এবং ভারত সরকার শুধু রাওরকেলার ইস্পাত কারখানায় কত লক্ষ পাউণ্ড অযথা বিদেশী মালমশলা ক্রয় করিয়া নষ্ট করিয়াছেন তাহার হিসাব অনায়াসেই পাওয়া যায়। অধিক সংখ্যক খেলোয়াড় সঙ্গে থাকিলে ভারত হয়ত হকিতে পাকিস্থানের নিকট পরাস্ত হইতেন না। ক্রীড়াক্ষেত্রে জাকার্ত্তায় ভারতের উপযুক্ত সম্মান লাভ না হওয়ার মূলে রহিলেন ভারত সরকার। ক্রীড়াক্ষেত্রের বাহিরেও তাহাই হইল।

ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রী সোন্ধি ইন্দোনেশিয়ার সমালোচনা করায় কি হইয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। ইন্দোনেশিয়া যখন এশিয়ান ক্রীড়া প্রতিযোগিতার নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা হইলেন তখন কেহই জানিত না যে ইন্দোনেশিয়া ক্রীড়াক্ষেত্রকে রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করিবেন। কিন্তু এশিয়ার সকল জাতিকে আমন্ত্রণ না করিয়া ইন্দোনেশিয়া কাহাকেও আসিতে দিলেন এবং অপর কাহারও আগমন নিবারণ করিবার জন্য তাহার আগমন "ভিসা" দিবার ব্যবস্থা করিলেন না। এই উপায়ে ইন্দোনেশিয়া ফরমোজা ও ইসরাইল হইতে কোনও খেলোয়াড়কেই আসিতে দিলেন না। এই দুই দেশের সহিত ইন্দোনেশিয়ার কোন সাক্ষাৎ ঝগড়া বিবাদ নাই। অপরের ঝগড়া নিজেদের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া ইন্দোনেশিয়া অকারণে উপরোক্ত দুই দেশের খেলোয়াড়দিগকে এশিয়ান প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে দিলেন না। শ্রী সোন্ধি এই কথার আলোচনাসূত্রে বলেন যে, ইচ্ছামত

যাহাকে তাহাকে বাদ দিয়া নিমন্ত্রণ করিলে এই প্রতিযোগিতা আর পূর্ব এশিয়ার খেলা বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না। ইহার নাম অপর কিছু দেওয়া প্রয়োজন। ইন্দোনেশিয়ার কর্ণধারগণ এই কথায় চটিয়া ভারতবর্ষের খেলোয়াড়, জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় পতাকার প্রতি নিজেদের অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে সকল সভ্যতার রীতিনীতি ভুলিয়া নামিয়া পড়িলেন। ভারতের খেলোয়াড়গণ ইন্দোনেশিয়ার বর্ব্বরতা উপেক্ষা করিয়া মাথা উঁচু রাখিয়াই সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলেন। সঙ্গে লইয়া আসিলেন ১০।১১টি স্বর্ণ পদক। আরও অনেকগুলি স্বর্ণ পদক আসিত যদি না ভারত সরকার নিজেদের স্বভাবসুলভ বিদেশী মুদ্রা কার্পণ্য দেখাইয়া প্রায় অর্দ্ধেক খেলোয়াড়ের গমন নিবারণ করিতেন। ইন্দোনেশিয়ার বর্ব্বরতা সম্বন্ধেও ভারত সরকার নিজেদের চিরঅনুসৃত রীতি অনুসারে এক গণ্ডে চপেটাঘাত লাভ করিয়া আততায়ীকে অপর গণ্ড আগাইয়া দিতেছেন। কেননা অসভ্য জাতিগুলির সহিত মিতালি না করিলে হিন্দুস্থানী সভ্যতা কেমন করিয়া সংরক্ষিত হয়? দেশে এই সভ্যতার ধাক্কায় বহু কোটি নরনারী ভিটামাটি ছাড়িয়া যত্রতত্র ভ্রাম্যমাণ। কিছু করা যায় না কারণ নিজ হস্তে গঠিত নবজাত এক বর্ব্বর প্রতিবেশী যদি তাহাতে ক্ষুব্ধ হন এই ভয়। তথাকথিত প্রদেশগুলিতেও সংখ্যালঘু গণ্ডির সৃষ্টি করিয়া সেগুলিকে সংখ্যাগুরুদিগের বর্ব্বরতার লক্ষ্য হিসাবে স্থাপন করা হইয়াছে। অর্থাৎ ভারতীয় মানব আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া দেশের ভিতরে-বাহিরে, কোথাওই বাস করিতে অথবা চলিতে ফিরিতে পাইবে না, ইহাই বস্তুত ধার্য্য হইয়াছে। ইহা অতি উচ্চাঙ্গের "পলিসি" হইতে পারে কিন্তু চলিত ভাষায় সাধারণ লোকে ইহাকে ইতর ও কাপুরুষবৃত্তিই বলিবে মনে হয়। অ.

পূর্ব্ব-সীমান্তে পুনরায় চীন

ইন্দোনেশিয়ার ভারতের প্রতি অপমানজনক ব্যবহার শুনা যায় চীন কর্ত্তৃক প্ররোচিত হইয়াছিল। অবশ্য চীন দেশের লোকে বলে শ্রী সোন্ধি আমেরিকার প্ররোচনায় ইন্দোনেশিয়ার সমালোচনা করিয়াছিলেন। প্ররোচনা ধরা যাইতে পারে কেহ কোথাও করে নাই ; কারণ প্রমাণ যে স্থলে নাই সেখানে দোষারোপ করা ন্যায়ানুমোদিত হয় না। কিন্তু শ্রী সোন্ধি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সত্য কথা এবং ইন্দোনেশিয়া যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা যে বর্ব্বরতা একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। নিখিল এশিয়া ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নাম দিয়া তাহা হইতে এশিয়ার দুইটি জাতিকে বাদ দিয়া ইন্দোনেশিয়া প্রতিযোগিতার স্বরূপ নষ্ট করিয়াছিলেন বলা বাহুল্য। এশিয়ার অর্থ ইহা নহে যে, ইন্দোনেশিয়া যে-সকল দেশের প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ করেন শুধু সেইসকল দেশই এশিয়া। এবং নিমন্ত্রিত জাতির প্রতি প্রকাশ্যে অপমানজনক ব্যবহার করা যে বর্ব্বরতা তাহাও অবশ্যগ্রাহ্য। চীন যে ইহার মধ্যে কিছুটা ফোড়ন দিয়াছিলেন তাহা ঘটনার পরে সাক্ষাৎ ভাবেই দেখা যায় চীনের সংবাদপত্রের মতামতের ভিতর। এখন আরও দেখা যাইতেছে চীনের ভারত-বিরুদ্ধতা হঠাৎ প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে। কয়েক দিন পূর্ব্বেই চীন ভারতের পূর্ব্ব-সীমান্তে আবার হানা দিয়াছে। ভারত-তিব্বত-ভুটান এই তিন দেশের সীমানাতে চীনা সৈন্যদল পুনর্ব্বার জোর করিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। চীনের এই দস্যুবৃত্তি তখন হইতেই পূর্ণবেগে চলিতেছে যখন ভারত চীনের প্রতি সখ্য নিবেদন করিয়া চীনের তিব্বত ধর্ষণের সমর্থন করেন। ভারতের নেতাদিগের যেটুকু ইতিহাসের জ্ঞান আছে তাহাতে একথা তাঁহারা জানিতেন যে, তিব্বত চীন দেশ নহে। তিব্বতের ভাষা, ধর্ম্ম, সামাজিক রীতিনীতি, নৃতত্ত্বের হিসাবে জাতি প্রভৃতি কোন কিছু চীনদেশীয় নহে। ইতিহাসে চীনা সাম্রাজ্যবাদের যুগে এক সময় চীন তিব্বত দখল করিয়াছিলেন মাত্র। তেমনি তাহার পূর্ব্বে আর এক যুগে তিব্বতও চীন দেশ দখল করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের যুগের অধিকার দেখাইয়া যদি চীন তিব্বত দখল করিতে পারেন তাহা হইলে ইংলণ্ডও আবার ভারত দখল করিতে পারেন ও জাপানও চীনের অনেকাংশ অধিকার করিলে কাহারও আপত্তি করা চলে না। কিন্তু আমরা সাম্রাজ্যবাদের অধিকার সকলকে বর্ত্তমান কালে স্বীকার করি না। উপনিবেশ স্থাপনের অধিকার কাহারও নাই বলিয়াই আমরা মনে করি। এই হিসাবে তিব্বতে চীনের উপনিবেশ স্থাপনও সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারত সেই অন্যায়ের প্রশ্রয় দিয়া অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ভারত সেই অন্যায়েরই শাস্তিভোগ করিতেছেন। যেমন পাকিস্তান সৃষ্টির পাপের ফলে ভারত আজ বহু অপমান সহ্য করিতে বাধ্য হইতেছেন। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার সহিত ভারতের যে সম্বন্ধ তাহাতে কিছু কিছু বিশ্ব-প্রেমের ভেজাল মাত্রই আছে ; সত্যকার বন্ধুত্বের কোন সাক্ষাৎ ও বাস্তব প্রকাশ তাহার মধ্যে নাই। অর্থাৎ পঞ্চশীল কিম্বা বান্দুং

বলিয়া আনন্দাশ্রুপাত করিলেই যে কিছু হয় না, তাহা অনেক বার প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত নেহরু অতি সহজেই ও অকারণে অপর জাতীয় লোকদের প্রতি প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়েন ও পরে সে বন্ধনগুলি তাঁহার "ভূষণ বলে গলার ফাঁসি" হইয়া শ্বাসরোধের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ইন্দোনেশিয়া বর্ত্তমানে যে অসভ্যতা করিয়া পার পাইয়া যাইতেছেন তাহার মূলে রহিয়াছে ভারত সরকারের নির্বীর্য্য ভাব। ভারতের সহিত উক্ত দেশের ব্যবসা বিশেষ হয় না। বৎসরে ১০ কোটিও তাহার পরিমাণ নহে। চীনের সহিত হয় প্রায় ১৫০ কোটি, পঃ জার্ম্মানীর সহিত ১০০ কোটির অধিক, জাপানের সহিতও ৫০.৬০ কোটি। কিন্তু জাপান ইন্দোনেশিয়ার বর্ব্বরতার জবাব কঠিন ভাষাতেই দিয়াছেন। ভারত এখনও ক্ষীণকণ্ঠে শান্তি ও প্রেমের স্তোত্র আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছেন—আশা বিদেশী মুদ্রা আমদানীতে ভাঁটা না পড়ে। শেষ অবধি কি দাঁড়াইবে কেহ বলিতে পারে না। তবে অপমান হজম করিয়া যাওয়ায় এখন আমরা অভ্যস্ত। ইন্দোনেশিয়ার সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিলে আমাদিগের বিশেষ ক্ষতি নাই। কিন্তু কে করিবে সে অসম্ভব কার্য্য? অ.

কলিকাতা উন্নয়নের প্রথম কথা

এবার দিল্লীতে গিয়া পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এক সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাগুলি যে ভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। ঐ প্রসঙ্গে বৃহত্তর কলিকাতার উন্নতির জন্য যে মাষ্টার প্ল্যান রচনার কথা বলিয়াছেন তাহা সকলেই মন দিয়া শুনিয়াছেন বুঝা যাইতেছে। শ্রীপ্রফুল্ল সেন নয়াদিল্লীতে স্পষ্টই জানাইয়াছেন যে, তাঁহাদের দৃষ্টি শুধু সুদূর ভবিষ্যতের দিকে নিবদ্ধ নয়, বর্ত্তমান এবং অদূর ভবিষ্যতের দাবিও তাঁহারা ভুলিয়া যান নাই অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে স্বল্পমেয়াদী প্রকল্পের কথাও তাঁহারা ভাবিয়াছেন।

কলিকাতা নগরী সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের হৃৎপিণ্ড। কিন্তু ইহার চারিপাশের প্রায় চার হাজার বর্গমাইল এলাকার আর্থিক ভাগ্য ঘনিষ্ঠভাবে কলিকাতার সহিত জড়িত। এখানকার অধিবাসীদের নানা খাদ্য—বিশেষ করিয়া তরি-তরকারি এবং মাছ, ডিম ইহারাই যোগাইয়া থাকে। দুধ এবং ছানা সরবরাহের কেন্দ্রও এখানেই। চালও কিছু এ অঞ্চল হইতে পাওয়া যায়। এই বিস্তীর্ণ এলাকার উন্নয়নের দিকে যদি নজর দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেখানকার অধিবাসীদের বৈষয়িক সমস্যার সমাধানের একটা উপায় যেমন পাওয়া যায়, তেমনি কলিকাতার বাসিন্দাদেরও তরিতরকারি, এবং মাছের দুর্ভিক্ষও কিছুটা ঘোচে। যথেষ্ট তরিতরকারি ফল, মাছ এবং ডিম যদি ন্যায্যমূল্যে কলিকাতায় পাওয়া যায়, তাহা হইলে নাগরিকদের খাদ্যের রুচিও অনেকটা বদলাইবে এবং লোকে শুধু ভাতের উপর ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য নির্ভর করিবে না। শুধু অনুরোধ বা অনুনয় করিয়া লোকের খাদ্যের অভ্যাস পরিবর্তন করানো যায় না—তাহার জন্য প্রয়োজন পরিপূরক খাদ্যের সরবরাহ। এই ব্যবস্থা অনায়াসে সম্ভব হইতে পারে বৃহত্তর কলিকাতার উন্নয়ন করিলে।

অনেকে উৎপাদন বৃদ্ধির কথা হয়ত বলিবেন। কিন্তু উৎপাদন বাড়াইলেই যোগান বাড়ানো যায় না। ইহাতে সরবরাহের ব্যবস্থারও উন্নয়ন প্রয়োজন। তাহার জন্য কলিকাতার সহিত চারপাশের অঞ্চলের যোগাযোগ যাহাতে আরও ঘনিষ্ঠ হয় তাহা দেখিতে হইবে। যাঁহারা রেলপথের বৈদ্যুতিকরণের কথা ভাবিতেছেন, তাঁহারা একথা ভুলিবেন না শহরের পরিবহন ব্যবস্থাও উন্নত হওয়া দরকার।

মুখ্যমন্ত্রীমহাশয় সেদিক দিয়া ঠিক পথেই অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক্।

কলিকাতা পৌরসভা তথা মজদুর মণ্ডলী

বহুদিন পরে কলিকাতা ভদ্র, পরিচ্ছন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। কিন্তু এ কৃতিত্ব কাহাদের? বলিতেই হইবে এ কৃতিত্ব প্রধানত জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী-বাহিনীর বাঙালী তরুণদের। প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী হইতে কলিকাতার সাধারণ নাগরিক সকলের নিকটই তাহারা এ কৃতিত্বের স্বীকৃতি পাইয়াছে। তাহারা প্রমাণ করিয়াছে যে, প্রয়োজন হইলে বাঙালী তরুণেরা যে কোন কাজ করিতে পারে। শুধু করিতে পারে না নয়, নিপুণতা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে করিতে পারে। এই কাজে অভ্যস্ত পৌরসভার মজদুরদের অপেক্ষাও তাহারা দ্রুততা ও সুষ্ঠুতার সঙ্গে কাজ সম্পন্ন করিতে পারে। তাহাদের নিষ্ঠা ও নীরলস শ্রমের দ্বারা তাহারা প্রমাণিত করিয়াছে যে, বাঙালী জোয়ান শ্রমের মর্য্যাদা বুঝে, কোন কাজকেই তাহারা ছোট বা হেয় বলিয়া মনে করে না। কিন্তু ইহাদের ত চিরদিন এ কাজে

নিযুক্ত রাখা সম্ভবও নয়, সঙ্গতও নয়। কলিকাতা মহানগরীর পরিচ্ছন্ন রূপ এখন বজায় রাখার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে কলিকাতা পৌরসভার।"

এইবারে পৌরসভার সচেতন হইবার সময় আসিয়াছে। সজাগ হইতে হইবে পৌরসভার মজদুরদেরও। কারণ, তরুণেরা যে কাজ এত কৃতিত্বের ও তৎপরতার সঙ্গে করিয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যদি সে তৎপরতার অভাব দেখা যায়, তাহা হইলে বলিতেই হইবে যে অকৃতিত্ব স্বেচ্ছাকৃত। সুস্থ স্বাভাবিক যে কোন মানুষ এরূপ অকৃতিত্বের জন্য লজ্জিত হয়, তাহা সংশোধনের চেষ্টা করে। কিন্তু ইহাদের সে লজ্জাও নাই, সংশোধনের চেষ্টাও নাই।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। এই যে মজদুরেরা কাজ কম করে কেন? কাজে গড়িমসি করিবার যে প্রবৃত্তি ইহাদের মধ্যে দেখা যায়, তাহার জন্য দায়ী কে? ব্যক্তিগতভাবে কাহাকেও দায়ী করা বোধ হয় উচিতও হইবে না। স্বতন্ত্রভাবে ইহারা অন্যান্য সাধারণ মানুষ অপেক্ষা অসামাজিক আচরণে অধিকতর প্রবণ হইবে তাহা মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। সুতরাং ইহা নিঃসংশয়ে ধরিয়া লইতে পারি যে, ইহার পিছনে কোনো শক্তি কাজ করিতেছে। এই শক্তি হইল, ট্রেড ইউনিয়ন। এইখান হইতেই তাহারা প্রেরণা পায়। কিন্তু এই ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের উদ্দেশ্য কি শুধু সুবিধা আদায় করাই? সুষ্ঠুরূপে কর্তব্য সম্পাদনের কথা তাঁহারা বলেন কই? দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে যাঁহারা ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতা বা পরিচালক তাঁহাদের অধিকাংশই সুবিধা আদায়ের জন্য অসামাজিক আচরণে প্রবৃত্ত হইবার প্রেরণা যতটা যোগান, কর্তব্য সম্পাদনে তাহার একাংশও উৎসাহিত করেন না বা করিতে পারেন না।

কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যাঁহারা একস্থানে কাজ না করার বা কম কাজ করার প্রেরণা যোগান, তাঁহারাই আবার অন্যত্র গিয়া কাজ কেন সম্পাদিত হইল না বলিয়া দাপাদাপি ও গলাবাজি করেন এবং অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া নিজেরা সাধু সাজেন।

পৌরসভা এ বিষয়ে সজাগ থাকিলে, সকল দিকেই মঙ্গল। নহিলে এই গোলমাল চলিতেই থাকিবে।

প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ইরাণ অঞ্চল বিধ্বস্ত

গত ১লা সেপ্টেম্বর মধ্যরাত্রিতে ইরাণের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যে ভয়াবহ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে, তাহাতে মৃত্যু সংখ্যার হিসাব যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা দশ হাজারেরও অধিক। তেহারাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছেন যে, ইরাণে ইতিপূর্ব্বে ইহা অপেক্ষা প্রবল ভূমিকম্প বড় জোর পাঁচ-ছয়টি হইয়াছিল। ইহা হইতেই ক্ষয়ক্ষতির কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। তাঁহারা বলিতেছেন, স্থানীয় সময় রাত্রি দুইটার সময় তেহারাণ হইতে প্রায় একশত মাইল দূরে ত্রিভুজাকৃতি একটি অঞ্চলে প্রায় ৮ হাজার বর্গমাইল ব্যাপিয়া ভূগর্ভে গভীর আলোড়ন সুরু হইয়াছিল। ফলে মাটির উপরে অবস্থিত অন্ততঃ ৭৫টি শহর ও গ্রামের ঘরবাড়ী ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। এমন কি, কম্পনের কেন্দ্রস্থল হইতে শতাধিক মাইল দূরে অবস্থিত তেহারাণ শহরেও অনেক পাকাবাড়ীতে ফাটল ধরিয়াছে। গভীর রাত্রিতে প্রায় সকলেই নিদ্রিত ছিল। প্রবল কম্পনে অনেকে জাগিয়া ওঠে, কিন্তু ঘর ছাড়িয়া খোলা জায়গায় বাহির হওয়ার পূর্ব্বেই ঘরবাড়ীগুলি তাহাদের উপর ধ্বসিয়া পড়ে। অনেকে আবার ঘুমন্ত অবস্থায়ই ভূপ্রোথিত হয়।

প্রকৃতির এই নির্ম্মম ধ্বংসলীলায় কত লোক যে হতাহত হইয়াছে, কত পিতামাতা যে সন্তান হারাইয়াছেন, কত বালক-বালিকা যে পিতামাতার স্নেহচ্ছায়ায় বঞ্চিত হইতে চলিয়াছে—তাহার মোটামুটি আভাসও এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তেহারাণ হইতে প্রায় একশত মাইল দূরবর্ত্তী একটি গ্রামেই তিন হাজার ঘুমন্ত নরনারী ও শিশু জীবন্ত কবরস্থ হইয়াছে। আর একটি গ্রামে প্রায় এক হাজার অধিবাসীর মধ্যে মাত্র সত্তর জনকে ধ্বংসস্তূপ সরাইয়া জীবন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে। অল্পবিস্তর আহতের সংখ্যাই এখন পর্য্যন্ত চার হাজারের বেশী। প্রকৃতির ধ্বংসলীলায় এই ধরনের ক্ষয়ক্ষতি নিতান্ত মর্ম্মান্তিক। কারণ, বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের আশ্চর্য্য উন্নতি সত্ত্বেও ভূগর্ভে আলোড়ন রোধের কোন উপায় উদ্ভাবন করা অদ্যাবধি সম্ভব হয় নাই—ভবিষ্যতেও কোনদিন ইহা সম্ভব হইবে কি না সন্দেহ।

ইরাণের রেডক্রশ ইতিমধ্যেই বিধ্বস্ত এলেকায় সাহায্য ও চিকিৎসার সরঞ্জাম প্রভৃতি প্রেরণ করিয়াছে।

শাহের ভগিনী স্বয়ং ইহার তত্ত্বাবধান করিতেছেন। তবু, কেবলমাত্র নিজস্ব সঙ্গতিদ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদিগকে পুনর্ব্বাসিত করা ক্ষুদ্র ইরাণ রাজ্যের পক্ষে সম্ভব নয়। ইরাণের প্রধানমন্ত্রী দুর্গতদের জন্য আন্তর্জাতিক ও বিভিন্ন দেশের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। পৃথিবীর সবদেশেরই ইরাণের ভাগ্যবিপর্য্যয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত।

লীলা পুরস্কার

প্রবাসী সম্পাদক স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র স্বর্গত রায়বাহাদুর সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীযুক্তা পুষ্প দেবী তাঁহার 'উপনিষদ নির্ম্মাল্য' গ্রন্থের জন্য ইউনিভার্সিটি সিণ্ডিকেট হইতে ১৯৬২ সনের লীলা পুরস্কার পাইয়াছেন।

গ্রন্থখানি প্রশ্ন মুণ্ডক মাণ্ডুক্য তৈত্তিরীয়ো ও ঐতেরীয়োপনিষদের কাব্যানুবাদ। স্বল্প শিক্ষিতদের মধ্যে এই দুরূহ উপনিষদের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার এই লেখা সুধীসমাজে বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়াছে। তিনি ইতিপূর্ব্বে শতশ্লোকী গীতাও কবিতায় অনুবাদ করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা পুষ্প প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীশান্তনুকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী।

সত্তর বৎসর পূর্ত্তিতে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্বর্দ্ধনা

গত ২৮শে আগষ্ট হইতে ৩০শে আগষ্ট পর্য্যন্ত মহাজাতি সদনে শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সত্তর বৎসর পূর্ত্তি উপলক্ষে সাহিত্যিকদের চেষ্টায় যে সম্বর্দ্ধনার আয়োজন-অনুষ্ঠান হইয়া গেল, তাহাতে সুখের বিষয় জনগণও বিপুলভাবে সাড়া দিয়াছে। গুণীজনকে এই ভাবে সম্মানিত করিয়া সেই ব্যক্তিকেই শুধু তাঁরা ধন্য করিলেন না, সেই সঙ্গে ভারত-সংস্কৃতির প্রতিও শ্রদ্ধা জানাইলেন।

পবিত্রবাবু সারাজীবন একনিষ্ঠভাবে সাহিত্য-সেবা করিয়া আসিয়াছেন। প্রথম জীবনে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের 'সবুজপত্র'-এর সহিত তিনি একান্তভাবে যুক্ত ছিলেন। কল্লোল যুগে—এক সময় যাঁহারা সাহিত্যে এক নূতন ধারা প্রবর্ত্তন করিয়া বহু সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, আজ তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই খ্যাতনামা—পবিত্রবাবু তাঁহাদের অন্যতম। সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি সর্ব্বজন পরিচিত। তাঁহার নিষ্ঠা প্রশংসনীয়। তাঁহার মত এরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণ, সদালাপী, পরোপকারী বন্ধুবৎসল এ যুগে বিরল। অনুবাদ-সাহিত্যে তাঁহার সুনাম আছে। হ্যুট্‌হামসুনের 'হাঙ্গার' গ্রন্থটির অনুবাদ—'বুভুক্ষা'র সঙ্গে আজ সকলেই পরিচিত। তাঁহার 'চলমান জীবন' আত্মকথা হইলেও, সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের দুই শতকের একটি বিরাট অধ্যায় উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সেদিক দিয়া উহার মূল্যও বড় কম নয়। তিনি শতায়ু হইয়া সাহিত্যের সেবা করুন ইহাই কামনা করি।

পৃথিবী জুড়িয়া এ হাহাকার কেন?

খাদ্য ও কৃষিসংস্থার ডিরেক্টর শ্রীবিনয়রঞ্জন সেনের হিসাব হইতে দেখা যায়, পৃথিবীর ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ কোটি মানুষ আজও অর্দ্ধভুক্ত ও অভুক্ত। সুতরাং ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে তাঁহারা ক্ষীণ স্বাস্থ্য ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন। চারিদিকেই দেখি শিল্প-বাণিজ্যের অনগ্রসর অবস্থা, শিক্ষার নগণ্য আয়োজন, চিকিৎসার দৈন্য, এবং নানা দিক দিয়া মানুষের ইতিহাসের এক মর্ম্মান্তিক অধ্যায় উন্মুক্ত হইয়াছে। অথচ আজিকার পৃথিবীতে মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-বাণিজ্যে যেরূপ উন্নতি করিয়াছে, যত খাদ্য, পরিচ্ছদ, ঔষধ ও যানবাহন আজ মানুষের বৈজ্ঞানিক প্রতিভায় উৎপন্ন হইতেছে, তাহাতে মানুষের এরূপ দুর্দ্দশা হইবার কোনও কারণ নাই। সমাজ উন্নয়নে, স্বাস্থ্যোন্নয়নে, দারিদ্র্য দূরীকরণে ও শিক্ষাবিস্তারকল্পে যদি এই সম্পদ বুদ্ধি খাটাইয়া সমভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে এই দুরবস্থা থাকিবার কথা নয়। দুঃখের বিষয়, তাহা সুষ্ঠুভাবে ও সমানভাবে বণ্টিত হইতেছে না।

মধ্যযুগের শেষ ধাপে ইউরোপে বাষ্প ও বিদ্যুৎ আবিষ্কার করিয়া মানুষ এই বিরাট শক্তি এবং গতি উৎপাদনে নিযুক্ত করিতে অভ্যস্ত হন। তাহার ফলে শিল্প-বাণিজ্যের রাজ্যে তাঁহাদের বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন আসে এবং তাঁহারা যে ঐশ্বর্য্যের সন্ধান পান, তা কোন দিন মানুষ কল্পনাও করেন নাই। এই নূতন কারখানা-যুগকে সার্থক করিয়া তোলার জন্য তাঁহারা তখন পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়েন এবং প্রায় সর্ব্বত্রই বড় বড় সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ গড়িয়া তোলেন। এই ভাবেই এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা জুড়িয়া পাশ্চাত্য-জাতিদের অধিকার-গুলি গজাইয়া উঠে। এই সব দেশ হইতে সুলভে কাঁচামাল সংগ্রহ করা এবং নিজ দেশের কারখানায় তৈয়ারী পণ্য

আনিয়া আবার ইহাদের বাজারে বেচা, ইহাই ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের একমাত্র লক্ষ্য। এই জন্য তাঁহারা যতটুকু প্রয়োজন, ঠিক ততটুকুই নগর, বন্দর বানাইয়াছিলেন এবং যানবাহন ও শিক্ষা-দীক্ষার পত্তন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ দুই শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক প্রগতিতে পশ্চিমী দুনিয়া যখন দিনের পর দিন অকল্পনীয় ধনের অধিকারী হইয়াছে, এই সমস্ত দেশ তখন অনগ্রসর মধ্যযুগীয় সমাজ, শিক্ষা ও উৎপাদন ব্যবস্থা আঁকড়াইয়া থাকিয়াছে। ফলে অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, অনাহার—অধিকাংশ মানুষের ভাগ্যলিপিস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পর পর দু'টি বিশ্বযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের মেরুদণ্ড চূর্ণ হইয়া যাওয়ায়, এ সব দেশ আজ একে একে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, অথবা করিতেছে। কিন্তু অর্থনৈতিক দৈন্য তাহাদের জীর্ণ ও পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে।

এই দৈন্য দূর করিতে হইলে, অনগ্রসর দেশগুলির শিক্ষা বিষয়ে, শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ে সর্ব্বাত্মক উন্নয়ন প্রয়োজন। এবং ইহা করিতে হইলে, উন্নত ও অগ্রসর দেশগুলিকে মুনাফালোভের মনোভাব ত্যাগ করিতে হইবে। নিছক মানব-প্রীতি বশেই পশ্চাদ্‌বর্ত্তী দেশগুলিকে খাদ্য, ঔষধ, কলকব্জা, কারিগরি সহায়তা ও অর্থানুকূল্য দিয়া আগাইয়া লইতে চেষ্টা করিতে হইবে। দুঃখের বিষয়, সে মানব-প্রেম বা সে আদর্শ আজ জগৎ হইতে লোপ পাইয়াছে। ইহার ফলে সাধারণত আমরা দেখিতে পাই, এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের, এক গোষ্ঠীর সঙ্গে আর এক গোষ্ঠীর নিরন্তর শক্তি-সংঘাত চলিতেছে। আর ইহারই আড়ালে কোটি কোটি মানুষ খাদ্যের জন্য, চিকিৎসার জন্য, জীবিকা ও বাসস্থানের জন্য মাথা কুটিয়া মরিতেছে। অন্য দেশ হইতে দৃষ্টি সংকুচিত করিয়া নিজ দেশের দিকে তাকাইলে আমরা কি দেখি? মুষ্টিমেয় মানুষ স্বাধীনতার আশীর্ব্বাদে সমৃদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু কোটি কোটি মানুষের যে দুর্দ্দশা আজ হইয়াছে, কোন ঐতিহাসিককালে তেমন অবস্থা কাহারও হয় নাই। যাহার ফল আজ প্রত্যক্ষ করিতেছি, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, আত্মহত্যা। সমাজ-জীবনে এত বড় বিপর্য্যয় আর হয় নাই। কিন্তু ইহার প্রতিকারই বা কি?

নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিতে সরকার

নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধিতে আমরা শঙ্কিত হইয়া পড়িতেছি। ইহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, তরিতরকারি এবং মাছের মূল্য বৃদ্ধিই ইহার অন্যতম কারণ। মাছ বা আলুর দাম বাড়িলে সেইসঙ্গে শাকসব্জীর দামও বাড়িতে থাকে। অবশ্য প্রতি বৎসরই বর্ষার সময় মাছ আলু ইত্যাদির মূল্য বাড়ে, তথাপি বর্দ্ধিত মূল্যের উপর আরও মূল্য বৃদ্ধি বোঝার উপর শাকের আঁটির মতই দুর্ব্বিষহ মনে হয়। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় এ সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে, গত মার্চ্চ মাসের মধ্যভাগের তুলনায় প্রধান প্রধান নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলির মধ্যে শুধু চাউল, মুগডাল, চিনি, লবণ, লঙ্কা, হলুদ, মাছ, তরকারি ও মিহি ধুতির দাম বাড়িয়াছে। গম, আটা, ময়দা, কয়লা ও মিহি শাড়ীর দাম স্থির আছে এবং মসুর ডাল, ছোলার ডাল, সরিষার তেল, পাঁঠার মাংস, মাঝারি ও মোটা ধুতি ও শাড়ীর দাম কমিয়াছে।

সরকারী তথ্য যাহাই হউক, সাধারণের বাজারলব্ধ বাস্তব অভিজ্ঞতা এই যে, দৈনন্দিন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর প্রায় সব জিনিসের মূল্য বাড়িয়াছে। কিছু-কমার যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা এত কম যে, উহা চোখে পড়িবার মত নহে। ধাপে ধাপে জিনিসের দাম ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে—জানি না, উহার শেষ কোথায়?

এই মাছের দুর্ম্মূল্যতা লইয়া বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ যথেষ্ট হইয়াছে। সরকারী দপ্তরও সচেতন হইবার এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা বিহিত করিবার মত সময় যথেষ্ট পাইয়াছেন। তথাপি মাছের দরের উর্দ্ধগামিতা নিরোধ করিতে সরকারী দপ্তরের কোন কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গেল না। ইহা লজ্জার কথা। তবে শুনিতেছি, আগামী নবেম্বরে তাঁহারা মাছের একটা নির্দ্দিষ্ট দর বাঁধিয়া দিবেন। দেখা যাক্।

ইহার মধ্যে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপাতিল হঠাৎ একটা কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, দুধ মাছ বেশী করিয়া খাও, ভাতের খরচ কমিবে। তিনি কোন্ জগৎ হইতে আসিয়াছেন? মাটির জগতের কি কোন খবরই রাখেন না?

রেল-দুর্ঘটনার জন্য দায়ী কে ?

রেল-দুর্ঘটনার খতিয়ান দেখিলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, লোকসভায় রেলমন্ত্রী শ্রীস্বর্ণ সিং স্পষ্টই ঘোষণা করিলেন, ভারতীয় রেলপথে দুর্ঘটনা বৃদ্ধির কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। রেলমন্ত্রীর হিসাব যাহাই বলুক, সম্প্রতি যেসব বড় বড় রেল-দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতে হতাহতের সংখ্যা কম নয়। এখন রেলযাত্রীমাত্রেই অনুভব করিতেছে যে, রেলে চড়া মানেই প্রাণ হাতে করিয়া নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দেওয়া। তবুও রেলমন্ত্রী পরম নিশ্চিন্ত ভাবে ভরসা দিতেছেন যাহা হইতেছে তাহা কিছুই নয়।

রেল-দপ্তরের উপমন্ত্রীর হিসাব কিন্তু অন্যরূপ। তিনি হিসাব দেখাইয়াছেন, গত জানুয়ারী হইতে জুলাই মাসের মধ্যে ভারতীয় রেলপথে এগার শত দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। সাত মাসে এগার শত রেল-দুর্ঘটনা নিশ্চয়ই আজে-বাজে যুক্তি দেখাইয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। দিন দিন রেল-দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে, রেলমন্ত্রী এই অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছেন। রেলমন্ত্রী বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, গত বৎসর দুর্ঘটনার সংখ্যা প্রায় নয় হাজার দেখানো হইলেও, উহার মধ্যে শতকরা পঁচাত্তরটি সামান্য রকমের দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনা সামান্য কিংবা অসামান্য, তাহার চুলচেরা বিচার না করিয়া রেলমন্ত্রীর মনে রাখা দরকার যে, ছোট-বড় প্রত্যেকটি দুর্ঘটনাই রেল-চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, জনসাধারণের নিরাপত্তাবোধ নষ্ট করে, হতভাগ্য রেল-যাত্রীদের ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণহানি ইত্যাদি যাহা ঘটে, তাহা আরও মর্ম্মান্তিক এবং রেল-পরিচালনা ব্যবস্থার কলঙ্কসূচক।

রেলমন্ত্রী বলিয়াছেন, দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য নানা রকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। রেলপথ, রেল এঞ্জিন এবং সাজসরঞ্জাম ঠিকমত যাহাতে চালু থাকে, তাহার উপর নজর দেওয়া হইতেছে। দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য উন্নত ধরনের যান্ত্রিক কলাকৌশল প্রয়োগের ব্যবস্থাও করা হইতেছে।

এ সব তামুলী কথা। কিন্তু রেল-দুর্ঘটনার সহিত অনেক ক্ষেত্রে রেলকর্ম্মীদের দায়িত্বহীনতা, কর্ত্তব্যচ্যুতি এবং নাশকতামূলক কার্য্যকলাপের যে নিগূঢ় যোগাযোগ রহিয়াছে, তাহার উপর রেলমন্ত্রী অথবা লোকসভার সদস্যগণ কেহই বিশেষ গুরুত্ব দিতেছেন না। পুরনো এঞ্জিন, ভাঙ্গাচোরা রেলপথ, অযত্নরক্ষিত ত্রুটিপূর্ণ সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি লোকসভার কোন কোন সদস্যের মতে দুর্ঘটনার প্রধান কারণ এবং ইহার জন্য তাঁহারা দায়ী করিয়াছেন রেল-পরিচালনা ব্যবস্থার উদ্ধতন কর্ম্মচারিবৃন্দকে। রেল-লাইনের জোড় খুলিয়া ফেলিয়া, যাত্রী-ট্রেন ও মালগাড়ী লাইনচ্যুত করিয়া সুকৌশলে লুটতরাজ এবং অন্য নানাপ্রকার নাশকতামূলক উদ্দেশ্য সিদ্ধির সুযোগ যাহারা লইয়া থাকে, তাহারা নিশ্চয়ই রেলের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী নয়। অথচ এই সকল অন্ধকারের জীব যে রেল-চলাচল ব্যবস্থার গোপন অন্ধিসন্ধি আবিষ্কারে পাকাহাত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কাজেই রেল-দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষ কার্য্যকারণ সম্পর্কে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিদের উপর দোষ চাপাইয়া দিবার কোনই অর্থ হয় না। দুর্ঘটনার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই দায়ী অধস্তন রেলকর্ম্মীদের উচ্ছৃঙ্খল অথবা নীতিবিগর্হিত আচরণ।

স্পষ্ট ভাষায় বলিতে হইলে ইহাই বলিতে হয়, শ্রমিক সংগঠনই রেল-দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। দলীয় রাজনৈতিক কারণে অথবা ট্রেড ইউনিয়ন স্বার্থের খাতিরে যাঁহারা এই সব শ্রমিক-সংগঠনভুক্ত এক শ্রেণীর কর্ম্মীদের অবাঞ্ছিত কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে একটিও কথা বলিতেছেন না, উপরন্তু নানারূপ প্রশ্রয় দিতেছেন, রেল-পরিচালনায় এই দুষ্ট চক্রপোষণের জন্য তাঁহারাও অবশ্যই পরোক্ষভাবে দায়ী।

রবীন্দ্রনাথের সাধনায় ভক্তিতত্ত্ব

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

ভক্তি শব্দের উৎপত্তি ভজ্ ধাতু হইতে ; ভজ্ অর্থ পূজা, ভজন, (=উপাসনা)। (বৈষ্ণব দার্শনিক) রামানুজ-মতে, ভক্তি শব্দের অর্থ ধ্যান—"এবংরূপা ধ্রুবানুস্মৃতিরেব ভক্তি শব্দেনাভিধীয়তে, উপাসনাপর্য্যায়ত্বাদ্ ভক্তিশব্দস্য" —ভক্তি শব্দে ধ্রুবানুস্মৃতিই অভিহিত হয়, কারণ ভক্তি শব্দ উপাসনারই একার্থবোধক : 'ধ্রুবানুস্মৃতি' কী ?—তৈল-ধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে একাগ্রচিত্তে স্থিররূপে উৎপন্না বৃত্তিধারা : ধ্রুবা—একটিমাত্র লক্ষীকৃত বিষয় হইতে অবিচ্যুত। ইহারই নাম 'ধ্যান'। এই মতে, ভক্তি, ধ্যান, উপাসনা একার্থবোধক।

ভক্ত দার্শনিক নিম্বার্ক মতে, ভক্তি উপাসনা নহে প্রগাঢ় ভগবৎ-প্রীতি. ইহা 'প্রেমবিশেষ লক্ষণা' হৃদয়বৃত্তিমাত্র, 'ধ্যানের ন্যায় কর্ম্মবিশেষ নহে'।—অন্যান্য ভক্তিশাস্ত্রমতেও 'ভক্তি'র সংজ্ঞা ইহাই,—'সা [ভক্তি] পরানুরক্তিরীশ্বরে' ঈশ্বরের প্রতি শ্রেষ্ঠ অনুরাগ. (শাণ্ডিল্য সূত্র)। কিন্তু ইহা ক্ষণিকের ভাবাবেগ মাত্র নহে : ভাগবতের ভাষায় ইহা 'অব্যবহিতা' অর্থাৎ বিরামহীন একাগ্রচিত্তবৃত্তিধারা ('অব্যবহিতা যা ভক্তি পুরুষোত্তমে')। এই জন্যই রামানুজাচার্য্য ভক্তিকে ধ্যানোপাসনাদি পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়াছেন, আর 'ধ্যান' বলিতে তাঁহার মতে অবিচ্ছিন্ন চিন্তা-প্রবাহ বুঝায়। আমরা এখানে যে ভক্তির আলোচনা করিতে যাইতেছি তাহা অন্ধ ভাবপ্রবণতা নয় ; ইহা জ্ঞান-মূলক প্রেমসাধন। সংক্ষেপে. ইহার নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।—শ্রবণ অর্থাৎ বেদান্তাদি শাস্ত্রপাঠ বা গুরুর উপদেশ শ্রবণ হইতে ব্রহ্মস্বরূপ এবং জীব ও ব্রহ্মের সম্পর্ক (ব্রহ্মবিজ্ঞান) সম্যক্ বা যথাসম্ভব অবগত হইয়া বাক্যার্থ জ্ঞানকে চিত্তে স্থিরতর করার জন্য মনন এবং ধ্যানাদি উপাসনা দ্বারা যখন ভগবানের আনন্দময় প্রেমস্বরূপত্ব উপলব্ধ হয় তখন তাঁহার প্রতি যে আত্মসমর্পণমূলক গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সঞ্চার হয়, তাহাকেই ভক্তি বা ভগবৎ-প্রেম বলা যাইতে পারে। এই ভক্তি এক প্রকার জ্ঞান (জ্ঞানের অবস্থা), ব্রহ্মজ্ঞান, 'বেদনম্' (রামানুজ)। (জ্ঞানমূলক) ধ্যান ও ভক্তি পরস্পরাপেক্ষী : ধ্যান ভক্তির জনক, অপর দিকে ভক্তি বা অনুরাগ ভিন্ন অবিচ্ছিন্ন চিন্তন মনন সম্ভব হয় না। রবীন্দ্রনাথও "ব্রহ্মকে সহজ করে জানবার উপায়" অনবরত মনন ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।—"নিয়ত বলতে বলতে আমরা যে সত্যলোকে বাস করছি এই বোধটি ক্রমশঃই আমাদের কাছে সহজ হয়ে আসবে ··বার বার তাঁকে বলতে হবে 'এই তুমি, এই তুমি ··বলতে বলতে তাঁর নামে আমার সমস্ত শরীর বাজতে থাকবে"···(সত্য হওয়া শাঃ নিঃ)

ভক্তি তত্ত্বের আলোচনায় দুইটি বিচারের দিক্ আছে।—(১) **ভক্তের ভগবদনুরক্তি।** (২) **ভক্তের প্রতি ভগবানের আকর্ষণ।**

(১) ভক্তের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ কত নিবিড় তাহা নানা ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। ভক্ত তাঁহার ব্রহ্ম লক্ষ্যে 'শরবৎ তন্ময়' হইয়া তদ্গত চিত্তে একমাত্র সেই লক্ষ্য অক্ষরপুরুষকেই দেখিতে পান ; নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার জ্ঞান থাকে না। একটি সুপরিচিত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। দ্রোণাচার্য্য যখন লক্ষ্য-ভেদোদ্যত শিষ্য অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস তুমি কী দেখিতে পাইতেছ ?' তখন অর্জ্জুন উত্তর করিয়া-ছিলেন, 'আমি আমার লক্ষ্য পক্ষিচক্ষু ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।' ভক্তেরও ব্রহ্মলক্ষ্যে ঠিক সেই-রূপ তন্ময়তা-প্রাপ্ত স্থির একাগ্রদৃষ্টির অবস্থা হয়। তখন ভক্তের তদ্গত চিত্তে কী প্রতিভাত হয় ?—"পলক নাহি নয়নে, হেরি না কিছু ভুবনে, নিরখি শুধু অন্তরে সুন্দর বিরাজে।"*

নিম্নোদ্ধৃত বিবৃতি হইতে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, সকল দেশের প্রকৃত ভক্তগণেরই সাধনলব্ধ অভিজ্ঞতা

* রামানুজ মতে ভক্তি, ধ্যান, উপাসনা একার্থবাচক হইলেও তাঁহার মতে সমস্ত উপাসনাই ধ্যান নয়, কেবল 'ধ্রুবানুস্মৃতিই' ধ্যান। ধ্যানের লক্ষণ "প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্" (পাতঞ্জল যোগসূত্র) : সুতরাং ধ্যানের অবস্থাবাচক এই সঙ্গীত "নিরখি শুধু অন্তরে সুন্দর বিরাজে" সাধারণ উপাসনাকালে বা নাম-অনুষ্ঠানে গীত হওয়া যুক্ত নয় বলিয়াই মনে হয়।

এইরূপ। ফ্রান্সের অন্তর্গত Tuscany র সেণ্ট বোনাভেণ্ট্ুরা (ত্রয়োদশ শতাব্দী), যিনি ভক্তিকে জ্ঞানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে স্থান দিতেন, বলিয়াছিলেন :

"আমি স্বীকার করি অন্তর্দৃষ্টি পরমাত্মাতে এরূপভাবে লক্ষীভূত করা যায় যে, সাধকের চিত্তে অন্য কিছুই প্রতিভাত হইবে না : অথচ দৃষ্টি সেই অন্তর্জ্যোতি-সমুদ্রে মগ্ন হইয়া তাহাকে বাহিরের দ্বিতীয় বা স্বতন্ত্র বস্তুরূপে দেখিতে পাইবে না। যেন এক নিবিড় অন্ধকারের অনুভূতির উন্নততর স্তরে নীত হইয়া কিছুই দেখিতে পাইতেছে না, কারণ সে অবস্থায় সকল দর্শনযোগ্য বস্তুই দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে।" (ইংরাজীর অনুবাদ)

বৃহদারণ্যকের চতুর্থ অধ্যায়ে জনক যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে স্বয়ংজ্যোতি পরমাত্মার সহিত একাত্মতালাভের বর্ণনায় ইহাই বলা হইয়াছে—"এই অবস্থায় তিনি দর্শন করেন না কারণ তাঁহা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা বিভক্ত বস্তু নাই যাহা তিনি দর্শন করিবেন।" যোগী কেশবচন্দ্রের বর্ণনায—"যোগেতে এই অভিন্নতা বিশেষ রূপে উপলব্ধ হয় সেই এক অনন্ত ব্রহ্ম পুত্রকে গ্রাস করিয়া ফেলেন। তখন জলেতে জল, জ্যোতিতে জ্যোতি।" ইহাই ভক্তি সাধনার চরম লক্ষ্য বা গন্তব্য স্থল : যেহেতু ইহাই ব্রহ্মদর্শন বা প্রত্যক্ষানুভূতি বা (ব্রহ্মের) প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সঙ্গীতের উল্লিখিত দুই চরণে (পলক নাহি নয়নে···) ব্রহ্ম দর্শনের এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে দার্শনিক পরিভাষা বর্জিত সহজবোধ্য এক মনোহর রূপে রূপায়িত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ রচিত ব্রহ্মসান্নিধ্য লাভের অবস্থা জ্ঞাপক আরও একাধিক সঙ্গীত আছে : দুঃখের বিষয় এই সকল সঙ্গীত অজ্ঞতাবশতঃ নানা অযোগ্য পরিবেশে যথেচ্ছভাবে গীত হইতে শোনা গিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী হইতে তাঁহার সাধনা সম্বন্ধে যতটুকু জানিবার সুযোগ পাওয়া যায় তাহা হইতে দেখিতে পাই ঈশ্বরানুভূতি লাভের জন্য তাঁহার সাধনপথে অনুভূতির উচ্চাবচ অবস্থার বর্ণনা আছে। সঙ্গীতগুলির অধিকাংশ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ঠিক নিম্নস্তরের দর্শনলাভের জন্য প্রয়াসের বর্ণনা। সর্বেন্দ্রিয়লব্ধ বিষয়জ্ঞানরূপ উপাধিযুক্ত আত্মার পৃথগস্তিত্বের যে বোধ তাহাই 'অহম্' বা 'আমিত্ব বোধ' নামে বিদিত। বদ্ধ জীবের "সাধনার বাধা অহম্ : যেখানে আমি সেখানে ভগবান নাই ; আমার সম্মুখে 'আমি' আছে খাড়া হইয়া, তাতেই তিনি আছেন লুকাইয়া" (দাদূ)। এই 'আমিত্ব' বোধের জন্য যে অবস্থায় দর্শনলাভ হইতেছে না, সে অবস্থায় ভক্ত সাধক গাহিতেছেন :

(ক) আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও হৃদয় পদ্মদলে :
(খ) আরও প্রেমে আরও প্রেমে মোর আমি ডুবে যাক নেমে।

অন্যত্র ইহার ব্যাখ্যায় বলিতেছেন, 'আমি' তার সমস্ত বোঝাশুদ্ধ একেবারে তলিয়ে যাক সেই অতলস্পর্শ সত্যে যেখানে তুমি তোমার সন্তানকে আপনার পরিপূর্ণ আনন্দে আবৃত করে জানছ। (শা. নি. পিতার বোধ)

তবেই ত মিলন সম্পূর্ণ হইবে, তখন 'হৃদয়পাত্র সুধায় পূর্ণ হবে' আর অন্তরের অবশিষ্ট অন্ধকারটুকু তাঁহারই কৃপায় উষাগমে অন্ধকারের মত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া দূরে যাইবে—"তিমির কাঁপিবে গভীর আলোর রবে।" ইহা অপেক্ষাও নিম্নগ্রামে বাঁধা সংশয় ও নিরাশার ভাব-প্রকাশক সঙ্গীত আছে।

(ক) স্বামী তুমি এস আজ অন্ধকার হৃদয় মাঝ
(খ) কোথা আছ প্রভু এসেছি দীন হীন।

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে সিদ্ধান্ত করা ঠিক হইবে না যে, তিনি বেশ কিছুকাল এই প্রকার বিভিন্ন মানসিক অবস্থার মধ্য দিয়া পরবর্তী উন্নত স্তরে উপনীত হন ; তাঁহার ধীশক্তি এরূপ প্রখর ছিল যে, যে সময়কালে উক্ত সঙ্গীত দুইটি রচিত হয় তাহার অতি নিকটবর্তী সময়ে, পূর্বে অথবা পরে, গভীর আধ্যাত্মিকতত্ত্বপূর্ণ এই সঙ্গীতটি রচিত হইয়াছিল "সত্য মঙ্গল·········

ইহার শেষ চরণ 'যেই ভকত সেই জানে তুমি··জানে"—ভাষ্যকারগণ প্রদত্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ইহার অর্থ পরে প্রদত্ত হইবে।

দর্শনলাভের জন্য সাধন-পথের শেষ সম্বল ঈশ্বরের করুণা, কেবল নিজ সাধন বলে দর্শন লাভ হয় না—এই চরম তত্ত্বটি শঙ্কর ও রামানুজ প্রভৃতি জ্ঞানী ও ভক্ত দার্শনিকের ন্যায় ভক্তি-সাধক রবীন্দ্রনাথও তাঁহার রচিত সঙ্গীতে ব্যক্ত করিয়াছেন। শঙ্কর বলিয়াছেন, যে জীব নিষ্পাপ, ঈশ্বর ধ্যানে রত ও সদা সচেষ্ট, ঈশ্বর প্রসাদে সেই জীবের অজ্ঞানতার

আবরণ বিধ্বস্ত হইলেই জ্ঞানাবির্ভাব হয়ঃ যেরূপ উষধশক্তিবলে অন্ধব্যক্তি দৃষ্টিলাভ করেন। আর রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন—

"সহসা একদা আপনা হইতে ভরি দিবে তুমি তোমার অমৃতে সেই ভরসায় করি পদতলে শূন্য হৃদয় দান।"

রবীন্দ্রনাথ সতর্কতার সহিত একটি condition যোগ করিতেছেন 'শূন্য হৃদয়',—"The heart must be emptied of all things else."

দেহাশ্রিত জীবনে সাধনার উচ্চতম স্তরে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হইলেও স্থায়ী মিলন হওয়া সম্ভব নয়; "তাঁহার ততদিনই চিরমিলন লাভে বিলম্ব যতদিন না তিনি দেহ মুক্ত হন" (ছান্দোগ্য, ৬।১৪।২)। দর্শন লাভের পর, ভক্ত আবার দর্শন লাভের জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করিতে থাকেন। ভক্তি শাস্ত্রের একটি গ্রন্থে ভক্ত চিত্তের এই অবস্থা বর্ণনা করিয়া লিখিত হইয়াছে—"অদৃষ্টে দর্শনোৎকণ্ঠা দৃষ্টে বিশ্লেষভীরুতা—" বিচ্ছেদজনিত অদর্শনের অবস্থায় দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠা, আর মিলনের অবস্থায় বিচ্ছেদের ভয়। রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন—

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চিরদিন কেন পাই না···
ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে তোমারে যবে পাই হে দেখিতে,
হারাই হারাই সদা ভয় হয়।"···

এই ভাবে 'পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর' পথে চিরদিন সাধক-যাত্রী যুগে যুগে মুক্তির পথে চলিয়াছেন।

অনেকে বলিয়া থাকেন রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনা অনেকাংশে বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত। বৈষ্ণব-ধর্মে ভক্তির নানা প্রকার-ভেদ ও স্তর-ভেদ আছে। এ সকলের পৃথক ভাবে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া লাভ নাই, কারণ আমরা দেখিব রবীন্দ্রনাথ সাধন জীবনে এ সকল প্রকার-ভেদ ও স্তর-ভেদ অনুসরণ করিয়া চলেন নাই। বৈষ্ণব-শাস্ত্রে ভাগবদোক্ত ভক্তি নয় প্রকারের—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনম্, বন্দনম্, দাস্যম্, সখ্যম্ আত্মনিবেদনম্।

এই নয়টির মধ্যে শেষ তিনটিই রবীন্দ্রনাথের ভক্তি সাধনা সম্বন্ধে আলোচ্য হইতে পারে—দাস্যং সখ্যম্ আত্ম-নিবেদনম্। জীব ও ঈশ্বরের যোগ সম্বন্ধে নানা ভাবে মানবীয় সম্পর্ক প্রকাশক মনন ও অনুভূতি বিষয়ে কিছু বলিবার পূর্ব্বে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথ সাধক-জীবনে mystic ছিলেন, একথা সকলেই বলিয়া থাকেন। mystic বলিতে কি বুঝায় তাহা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া সংক্ষেপে বুঝানো কঠিন; কারণ ইহা ঈশ্বরের সহিত যোগযুক্ত অবস্থায় এক প্রকার অতীন্দ্রিয় অনুভূতি যাহা সাধারণ্যে সমান ভাবে অনুভূত হয় না, সুতরাং অস্পষ্ট। বাংলা ভাষায় 'মরমিয়া' বাক্যটি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়; কিন্তু সাধক কবীরের একশত ভজনের তৎকৃত ইংরাজী অনুবাদ "Hundred songs of Kabir" গ্রন্থের ভূমিকায় ঋষি কবি এই ইংরাজী বাক্যের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাই তাঁহার mysticism সম্বন্ধে প্রযোজ্য এবং প্রামাণিক বোধে উদ্ধৃত করা যাইতেছে 'a temperamental reaction to the vision of Reality'; সুতরাং ইহাকে 'ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বিশিষ্ট অতীন্দ্রিয় অনুভূতির প্রকাশ' বলা ভুল হইবে না; ইহার বিষয়বস্তু তাঁহারই ভাষায় 'the warmly human and direct apprehension of God as the supreme object of Love, the soul's comrade, teacher, and bridegroom.' রবীন্দ্রনাথের প্রেরণার উৎস যে ধর্মশাস্ত্রই হউক না কেন, মানব হৃদয়ের প্রেম ও ভক্তির পাত্ররূপে ঈশ্বরের অনুভূতি প্রকাশ মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ছাপ সর্ব্বত্র বিদ্যমান। তাঁহার প্রত্যেকটি সঙ্গীতের আলোচনা দ্বারা ইহা প্রদর্শিত হইতে পারে। এখন ভক্তির প্রকারভেদের আলোচনায় আসা যাউক।

'দাস্যং সখ্যং আত্মনিবেদনম'—তিনি প্রভু আমি দাস, বৈষ্ণব ধর্ম শাস্ত্রে এই সম্বন্ধ 'নিত্য' অর্থাৎ চিরকালস্থায়ী। জীব বদ্ধ ও মুক্ত সকল অবস্থায়ই তাঁহার দাস। রবীন্দ্র রচনাবলীর মধ্যে তাঁহার ভক্তির এই ভাব কোথাও ব্যক্ত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের 'প্রভু' যিনি তিনি উপনিষদের "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষ", তিনি অন্তর্যামী 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ"; গীতাঞ্জলিতে তিনি দর্শনকাতর বিরহী হিয়া কর্ত্তৃক এই ভাবে সম্বোধিত—"প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে," যে সঙ্গীতে তিনি "কোথা আছ প্রভু, এসেছি দীন হীন" বলিয়া পুনঃ পুনঃ সম্বোধিত, সেই সঙ্গীতের মধ্যে তাঁহাকেই বলিতেছেন 'জগত জননী লহ লহ কোলে।' কোথাও 'প্রভু' শব্দের সহিত 'দাস' শব্দের ব্যবহার নাই; বরং আছে 'প্রভু এসেছি হে নাথ পরাতে রাখী'; 'প্রভু···এবে তোমার ক্রোড় চাহি।' 'প্রভু'র সহিত 'দাসত্বে'র

সম্বন্ধ প্রকাশক বর্ণনা এরূপ ভাবে লক্ষ্য করা যায় নাই যাহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, তিনি এই প্রকারের ভক্তি-সাধনা বা ভক্তি ভাবের ধারণা কোনও সীমাবদ্ধ কালে করিয়াছেন।

তাহা হইলে ভগবানকে 'প্রভু' সম্বোধনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অন্তরের কোন নিগূঢ় ভাব ব্যক্ত হয়?—তাঁহার 'প্রভু', যিনি হিন্দী সাধকের 'Lord of the universe', তিনি রবীন্দ্রনাথেরও 'বিশ্বরাজ', 'মহারাজ', 'দেবাধিদেব মহাদেব' যাঁর 'অসীম সম্পদ, অসীম মহিমা': কিন্তু অন্তর্জ্জগতে সেই মহিমাময়কে প্রেমাস্পদরূপে নিকটতর মনোহর রূপে দর্শনই মিলনের পূর্ণদর্শন; ইহাই প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

'জগতে তুমি রাজা অসীম প্রতাপ,
হৃদয়ে তুমি হৃদয়নাথ, হৃদয়হরণরূপ!

এ জন্য তাঁহার 'প্রভু'—যাহার 'হৃদয়স্বামী' 'হৃদয়নাথ': এই সঙ্গীতে তার পরিচয়—

"হৃদয়-বেদনা বহিয়া প্রভু এসেছি তব দ্বারে
তুমি অন্তর্যামী', হৃদয়স্বামী, সকলি জানিছ হে,
...সব বিরহ বিচ্ছেদ ভুলিব তব মিলন-অমৃত-ধারে।"

আরও বিশিষ্ট পরিচয় পরবর্ত্তী সঙ্গীতে—

'প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরমধন হে!
চির পথের সঙ্গী আমার, চির জীবন হে!...

—যিনি প্রভু, তিনিই প্রিয়, শুধু প্রিয় নন—প্রিয়তম, এইজন্য প্রিয়তম স্থানেই 'পরমধন' রূপে সম্বোধিত; সুতরাং প্রিয়তম যিনি তিনি হৃদয়স্বামী: পরে আছে 'পরমা গতি,' 'নিত্য প্রেমের ধামে পরমপতি,' 'মুক্তি আমার...বন্ধন ডোর' তিনি তাঁহার (সাধকের) সকল কিছুই: কোন ভাবই পরস্পর-বিযুক্ত (exclusive) নয়; একটি ভাব অপরটিকে পরম্পরাক্রমে স্থান করিয়া দেয় সেই পূর্ণতাকে প্রকাশ করিবার জন্য, কারণ 'সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে': কিন্তু নিখিলকল্যাণগুণাকর পূর্ণকে কোন্ একটি বাক্যে সংজ্ঞাপন করিবেন? "পূর্ণস্য আবাহনম্ কুত্র?" এই মিলিত রূপে উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের ভক্তিভাবের অতীন্দ্রিয় অনুভূতির (mystical "religion of love"-এর) একটি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, যাহা তাঁহার ভাষায় 'temperamental reaction to the vision of Reality'.।

তাঁহার ভক্তিভাবের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিবার আছে। শেষোক্ত সঙ্গীতের আলোচনায়—"প্রভু আমার প্রিয় আমার"—আমরা অজ্ঞাতসারে (বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহাকে সখ্যভাব বলা হয় তাহার) প্রেমতত্ত্বে আসিয়া পড়িয়াছি। ভগবানের প্রতি ভক্তের যে শ্রেষ্ঠ ও বিশুদ্ধ অনুরাগ (highest devotion, পরানুরক্তি) তাহার মধ্যে যে উভয়ের মিলন তাহাতেই ব্রহ্মের পূর্ণ ও মাধুর্য্যময় প্রকাশ; এবং ইহা ভক্তের আত্মনিবেদনের (self-effacement) পরিণতি; এই তত্ত্বটি পরবর্ত্তী একটি সঙ্গীতে উদাহৃত হইতেছে—

"উতল ধারা বাদল ঝরে...
ওগো বঁধু, দিনের শেষে, এলে তুমি কেমন বেশে।
আঁচল দিয়ে শুকাব জল, মুছাব পা আকুল কেশে।
নিবিড় হবে তিমির রাতি জ্বেলে দেবো প্রেমের বাতি
পরাণখানি দেবো পাতি চরণ রেখো তাহার পরে।"

'মুছাব পা আকুল কেশে' ইত্যাদি বাক্যে যে ইন্দ্রিয়গত কল্পনার ভাবমূর্ত্তি (sensuous imagery) প্রকাশিত, তাহার মধ্যে শ্রদ্ধাপূর্ণ অনুরাগের ভাবই প্রকটিত। 'নিবিড় হবে তিমির রাতি' যে তিমিরে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইবে না, শুধু প্রেমালোকে প্রেমাস্পদকে দেখা ভিন্ন; ইহার সহিত সেন্ট বোনাভেন্‌চুরার উক্তি তুলনীয়।

"পরাণখানি...চরণ রেখো তাহার পরে" ইহা সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদনের ভাবপ্রকাশক। রবীন্দ্রনাথের ভক্তি-সাধনা শ্রদ্ধা ও আত্মসমর্পণের ভাববর্জ্জিত প্রেম-সাধনা নয়। ইহা তাঁহার ভক্তি-সাধনার আর একটি বৈশিষ্ট্য; এজন্য তিনি অনেক স্থলে তাঁহার মনের এই ভাবটি বুঝাইবার জন্য "প্রেম-ভক্তি" এই যুগ্ম বাক্যের ব্যবহার করিয়াছেন—'প্রেম-ভক্তি ভরে শরণ লাগি'; 'প্রেমভক্তি মম সকল শক্তি মম তোমারি দয়ারূপে যেন পাই'। 'প্রেম ভক্তিতে আনন্দে পরিপূর্ণতায় নত'। এই শ্রদ্ধামূলক প্রেমের আর একটি প্রসিদ্ধ উদাহরণ পাই, যে সঙ্গীতে আছে—"মূর্ত্তি তোমার যুগল-সম্মিলনে সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে", তাহার পূর্ব্বেই আছে—'তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে

তবু আমার হৃদয় লাগি"···এই (শ্রদ্ধামূলক) বৈশিষ্ট্য হইতেই তাঁহার প্রেম-সাধনার আর একটি বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব। তাঁহা (রূপকের মধ্যদিয়া) ইন্দ্রিয়গত অনুভূতির বর্ণনাতিশয্য হইতে মুক্ত। কবীরের ভগবৎ-প্রেম প্রকাশক ভজনগুলি এই ভাবমুক্ত ছিল। এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তিনি বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, তিনি তাঁহার অনুভূতি প্রকাশ সম্বন্ধে এই ত্রুটি সংস্পর্শ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন।

তাঁহার ভাষায় 'These are excessive dramatisations of the symbolism under which the mystic tends instinctively to represent his spiritual intuition to the surface consciousness."

কবীর সম্পর্কে তাঁহার মন্তব্য তাঁহার ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ প্রযুক্ত হইতে পারে। "He escapes the excessive emotionalism, the tendency to an exclusively anthropomorphic devotion seen in India in the exaggerations of Krishna worship, in Europe in the sentimental extravagances of certain Christian saints",

যে সকল ত্রুটি বা অতিশয়োক্তির কথা তাঁহার প্রেম বা ভক্তিতত্ত্ব মধ্যে স্থান পায় নাই তাহার দৃষ্টান্ত প্রদান সম্ভব নয়; অন্যত্র যাহা লক্ষ্যগোচর হয় তাহারও দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা এস্থলে শোভন হইবে না। তবে একথা ঠিক, তিনি যেমন এক দিকে বৈষ্ণব কবিতার সহিত সুপরিচিত ছিলেন তেমনি খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম জগতের বহু ভক্ত কবি ও mystic সাধকবৃন্দের রচনাবলীও আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছেন। ইঁহার লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় ও তদীয় ঘনিষ্ঠ শিষ্য এবং সহকর্ম্মীদিগের নিকট প্রাপ্ত সাক্ষ্যে জানা যায়; 'শান্তিনিকেতনের' 'আত্মবোধ' নামক উপদেশ মধ্যে একজন ভক্ত ইংরেজ কবির উল্লেখ আছে। আবার সুফী সাধকবৃন্দের রচনা এবং মধ্য যুগের কবীর প্রমুখ সাধকবৃন্দের ভজনের মধ্য হইতেও সঙ্গীত রচনার প্রেরণা পাইয়াছেন। কবীরের "গ্রহ চন্দ্র তপন জ্যোত বরত হয়" অনেক স্থলেই "আনন্দ-লোকে মঙ্গলালোকে" ও "তাঁরে আরতি করে চন্দ্র তপন" এই দুটি ভজনের ভাবোদ্দীপক। এই সকল ভাব আধ্যাত্মিক জগতের সার্ব্বজনীন সম্পদ। কিন্তু কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মতবাদের গণ্ডির মধ্যে তাঁহার ধর্ম্মসাধনা পরিপুষ্টি লাভ করে নাই; সাম্প্রদায়িক মতবাদ (dogma) তাঁহার ধর্ম্মের আদর্শ ও চিন্তা-বিরুদ্ধ। তিনি বলিতেছেন—"ধর্ম্মসাধনার যেখানে উৎকর্ষ সেখানে গতির বাধাহীনতা, ভাবের বৈচিত্র্য এবং অক্ষুণ্ণ মাধুর্য্যের নিত্য বিকাশ" (রসের ধর্ম্ম)। তাঁহার সাধনায়, ভগবানকে কোন নির্দ্দিষ্ট প্রকার ভক্তিভাবে আরাধনার স্তর বিভাগ ছিলনা।

রবীন্দ্রনাথের ভক্তি-সাধনার অন্তর্গত আর একটি ভাব আছে যাহার উল্লেখ না করিলে বিশেষ অঙ্গহানি হইবে—ঈশ্বরের সঙ্গে পিতৃত্বের সম্বন্ধবোধ, 'পিতা-মাতা এক হয়ে আছেন' এই বোধ; শান্তিনিকেতন গ্রন্থে 'পিতার বোধ'; 'মন্ত্রের বাঁধন' 'প্রাণ ও প্রেম', 'ভয় ও আনন্দ' ইত্যাদি উপদেশ মধ্যে তাঁহার 'পিতার' বোধ বিশিষ্ট রূপ ধরিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার এই অনুভূতির উৎস ছিল যজুর্বেদের 'ওঁ পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি' এই মন্ত্রটি; যাহার শিক্ষা তিনি তদীয় পিতৃদেবের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন; এবং 'মহানারায়ণ' উপনিষদের 'স নো বন্ধুর্জ্জনিতা স বিধাতা'—ইহাও তিনি উপদেশ মধ্যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বহু সঙ্গীতে তিনি ঈশ্বরকে 'পিতা' এবং 'জননী' সম্বোধনে তাঁহার ভক্তিভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

২। **ভক্তের প্রতি ভগবানের আকর্ষণ,** বা ভক্তের প্রতীক্ষায় ভগবান। দেখা যায়, ইহসংসারে দুই হৃদয়ের মিলন তখনই সম্ভব হয় যখন দু'জনেই দু'জনের প্রেমলাভের জন্য আকাঙ্ক্ষিত। ভগবান এবং ভক্তের মিলনের ক্ষেত্রেও ইহা সত্য। ভগবান ভক্তের ধ্যানারাধনায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে দর্শন দেন, শুধু তাহাই নহে, তিনিও ভক্তের সহিত মিলিত হইতে অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞানে নিজ স্বরূপে প্রকাশিত হইতে চাহেন। ভক্তও এই প্রকাশের অপেক্ষায় চিরপ্রতীক্ষাকারী। ভক্ত এই পৃথিবীর ভিক্ষুকের মত রাজদ্বারে তণ্ডুলকণার প্রত্যাশী নহেন; তিনি রাজার পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইবার আকাঙ্ক্ষা করেন। তিনি যখন সংসারের সকল কিছু পশ্চাতে ফেলিয়া তাঁহার আরাধ্য দেবতার দর্শনলাভের জন্য অগ্রসর হন তখন ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী ভগবান তাঁহার সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া ভক্তের দিকে অগ্রসর হন ও তাহার হৃদয়দ্বারে সাড়া দিয়া তাহাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে দেন যে তিনি ভক্তের সঙ্গে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান, ও তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া আছেন এবং তাহাকে তাঁহার সান্নিধ্যলাভের জন্য আরও অগ্রসর হইবার সুযোগ করিয়া দেন। গীতায় এই তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করিয়া গীতাকার ঋষি বলিতেছেন:

• যাহারা আমার প্রতি সর্ব্বদা একাগ্রচিত্ত হইয়া ('Constanty devoted') আমাকে ভক্তিহৃদয়ে পূজা করে

আমি তাহাদিগকে মহত্ত্ববিষয়ক সেই প্রকার সমভাবযুক্ত জ্ঞান ('Concentration of understanding') প্রদান করি যাহার সাহায্যে তাহারা আমাকে পাইতে পারে। 'একভক্তি' সাধক যখন এই ভাবে stage by stage দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে থাকেন, ভগবানও, নিশিদিন তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া তাঁহাকে প্রতি অবস্থায় জ্ঞানালোক প্রদর্শনে লইয়া চলেন, যে পর্য্যন্ত না তিনি সেই অভয়পদ প্রাপ্ত হন 'সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমম্পদং'। ঐশ্বরিক বিধান এইরূপ না হইলে, সাধকের পক্ষে ক্ষুরধারশাণিত পথ অতিক্রম করিয়া ভগবদ্দর্শনলাভ কখনই সম্ভব হইত না। এই ভাবে প্রেমাস্পদের আকর্ষণ মধুর ধ্বনির মত ভক্তের নিকট নিয়ত আসিয়া পৌঁছিতেছে এবং ভক্ত প্রেরণালাভ করিয়া অগ্রসর হইতেছেন।

ঈশ্বরবিশ্বাসী জ্ঞানী ব্যক্তি এই বলিয়া আপত্তি করিতে পারেন—ইহা ত মানসপটাঙ্কিত একটি মনোহর কল্পনার দৃশ্য; কিন্তু ভগবান যে ভক্তের সহিত মিলিত হইবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া তাহাকে নিয়ত আকর্ষণ করেন তাহার প্রমাণ কি প্রকারে পাওয়া যায়? ঠিক কথা, কিন্তু সেই আকর্ষণ অনুভব করেন, মধুর ধ্বনি শ্রবণ করেন ভক্ত, যিনি একাগ্রচিত্ত। ঋষিরা যাঁহাকে 'রসো বৈ সঃ' প্রেমময়রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই রসানভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট যুক্তি-তর্কাদি সাহায্যে কিরূপে তাহার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে? মাতার হৃদয়ে সন্তানের প্রতি যে নিঃস্বার্থ স্নেহ-ভাণ্ডার সঞ্চিত, নিঃসন্তান ব্যক্তিও তাহার কথঞ্চিৎ বাহ্যিক প্রমাণ পাইতে পারেন, কিন্তু যে প্রেমরসসম্ভোগের কোন বাহ্যিক প্রমাণ পাওয়া যায় না, যাহা কেবল ভক্তের সম্ভোগের বস্তু, তাহা তর্কাদি প্রমাণলভ্য নয়। শাস্ত্রে এজন্য বলা হইয়াছে 'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাং স্তর্কেণযোজয়েৎ', যে সকল ভাব চিন্তা দ্বারা লাভ করা যায় না তাহাদিগকে তর্কারূঢ় করিবে না। আর যাঁহার এই আত্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে তাঁহার এই অভিজ্ঞতা তর্কের দ্বারা প্রাপ্য নয়—বলিয়াছেন কঠোপনিষদ্। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ঈশ্বরবিশ্বাসী হইলেই ঈশ্বরের ভক্ত হওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলিতেছেন,"ব্রহ্ম ত কেবল জ্ঞানের ব্রহ্ম নহেন—রসো বৈ সঃ। ব্রহ্মই যে রসস্বরূপ—ইনিই আত্মার পরম আনন্দ ব্রহ্মজ্ঞানী ত ব্রহ্মের ভক্ত নহেন।" 'ব্রহ্মজ্ঞানী' বলিতে রবীন্দ্রনাথ এখানে ইহাই বলিতে চাহেন 'ব্রহ্মবিজ্ঞানী' অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ক সকল তত্ত্ব যিনি শাস্ত্রাদি হইতে সম্যক্ অবগত হইয়াছেন। আবার বলিতেছেন "এই জন্যই শাস্ত্রে বলে ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং। এ তত্ত্ব বাহিরে নাই; এ তত্ত্ব অন্তরের মধ্যে সকলের মনে নিহিত, সেইজন্য আমাদের তর্ক বিতর্কের উপর, স্বীকার-অস্বীকারের উপর ইহার নির্ভর নহে। ইহা আছেই।"

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত ভক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় এই তত্ত্বটি, অর্থাৎ ভগবান যে ভক্তের সহিত মিলন চাহেন এবং কেন চাহেন, যে ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন ও তাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহারই ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব। যদি কেহ প্রশ্ন তোলেন, যাহা নিগূঢ়, ভক্তের অন্তরেই যাহা অনুভূত হয় তাহা অপরের নিকট প্রকাশের ফল কি? তাহারও কারণ তিনি এক স্থানে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, "অহমিকার প্রভাবেই যে নিজের কথা বলতে চাই তা নয়। যেটা যথার্থ চিন্তা করব, যথার্থ অনুভব করব, যথার্থ প্রাপ্ত হব যথার্থরূপে তাকে প্রকাশ করে তোলাই তার স্বাভাবিক পরিণাম।"

প্রথমে দেখা যাউক রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে আমাদের দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে এই তত্ত্বটি কি ভাবে বিবৃত হইয়াছে। কঠ এবং মুণ্ডক উভয় উপনিষদে দেখি একই শ্রুতি—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন; যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্" এই পরমাত্মাকে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা বা মেধা দ্বারা কিম্বা বহু উপদেশ বাক্য শ্রবণের দ্বারা লাভ করা যায় না; [এজন্যই ত রবীন্দ্রনাথ বলিলেন "ব্রহ্মজ্ঞানী ত ব্রহ্মের ভক্ত নহেন;] এই আত্মাই যাহাকে বরণ করেন, তিনি স্বয়ংই তাঁহার ভক্তের নিকট নিজরূপ প্রকাশ করেন। পরমাত্মা কাহাকে বরণ করেন বা করিবেন? ভক্ত দার্শনিক রামানুজ ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন, সংসারে দেখা যায়, যিনি নিরতিশয় প্রিয়তম ব্যক্তি তাঁহাকেই তাঁহার প্রেমাস্পদ যিনি তিনি বরণ করেন। সেইরূপ এই পরমাত্মা যে ভক্তের নিকট জগতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় সেই ভক্তই পরমাত্মার প্রিয়তম বরণীয় হন এবং পরমাত্মা তাঁহারই নিকট নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন। এই অর্থেই রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন 'যেই ভকত সেই জানে, তুমি জানাও যারে সেই জানে; 'তুমি জানাও যারে' বলিতে 'যে কোন ব্যক্তি নয়', 'যেই ভকত' তাকেই ত তিনি জানান, দুইটি পৃথক বাক্য নয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র ব্যাখ্যাতা বলদেব এজন্য বলিয়াছেন, ভগবানের দর্শন দান নির্ভর করে জীবের অনুরাগের উপর, ঈশ্বর তাঁহাদেরই বরণ করেন যাঁহারা অনন্য ভক্তিপরায়ণ। গীতায় ভগবান বলিতেছেন, আ.ম

জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় ; (জ্ঞানী অর্থ যিনি ভগবানকে জানিয়াছেন এবং জানিয়াছেন বলিয়াই ভালবাসেন ; to know him is to love him,) আর সেই জ্ঞানী ব্যক্তিও আমার প্রিয়। ভাগবতে আছে—সাধবো হৃদয়ম্ মহ্যম্ সাধূনাং হৃদয়ম্ত্বহম্, ভক্তগণ আমার হৃদয় অর্থাৎ আমার হৃদয়ে, এবং আমিও তাহাদের হৃদয়। সেইরূপ রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি যে আমারে চাও আমি সে জানি", এখানে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি তাঁহার মত ভক্তকেই কেবল লক্ষ্য করিতেছে না; সকল জীবকেই ভগবান নিকটে পাইতে চান, তিনি ইহাই বলিতেছেন। আবার বলিয়াছেন—"তুমি আছ মোরে চাহি" ('মহাবিশ্বে মহাকাশে')। কেন? যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি ও স্রষ্টা তাঁর এই দীনহীন জীবের জন্য কেন এ আকাঙ্ক্ষা? এর উত্তরে যাইতে হয় গোড়ার প্রশ্নে—কেন এ জীবকে তিনি সৃষ্টি করিলেন? রবীন্দ্রনাথের উত্তর—

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে
তাই তো আমি এসেছি এই ভবে।

আবার,

তোমার লীলা হবে এ প্রাণ ভরে
এ সংসারে রেখেছ তাই ধরে।

এ লীলা কি রকম?—

তোমায় আমায় মিলন হবে বলে আলোয় আকাশ ভরা
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে ফুল্ল শ্যামল ধরা।···
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে যুগে যুগে বিশ্বভুবন তলে
পরাণ আমার বধূর বেশে চলে চির স্বয়ম্বরা

ব্রহ্ম, জ্ঞাতা বিহীন 'নির্বিষয়,' নিরপেক্ষ জ্ঞানময় সত্তা রূপে আপনার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিলেন না, কেননা তিনি ত শুধু জ্ঞানমাত্র ('জ্ঞানম্') নহেন, তিনি জ্ঞানদাতা ও আনন্দময় ; এই আনন্দময় রূপেই তিনি প্রেমময়—'রসো বৈসঃ' শঙ্করের উক্তি—'আনন্দস্বরূপত্বং নাম পরম প্রেমাস্পদত্বং'—পরম প্রেমের আধার যিনি তাঁহাকেই আনন্দস্বরূপ বলা হয়। রবীন্দ্রনাথও এইজন্য বলিয়াছেন—আমাদের দেশের ভক্তিতত্ত্বের গোড়ার কথা এই যে, সীমার সঙ্গে অসীমের যে যোগ তাহা আনন্দের যোগ, অর্থাৎ প্রেমের যোগ। সংসারে দেখা যায় প্রেমের উৎস যার অন্তরে সেই অপরকে আনন্দ দিতে চায়, অযাচিত ভাবে কেহ আনন্দ বিতরণ করে না। আনন্দময় এই জন্যই আপনাকে অর্থাৎ নিজ আনন্দকে দিতে চান, প্রকাশ করিতে চান ; রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, 'আনন্দের ধর্মই হচ্ছে স্বতই দান করা, স্বতই বিসর্জ্জন করা,' অর্থাৎ নিজ আনন্দময়ত্ব, আনন্দ প্রাচুর্য্য হইতে তিনি অপরকে আনন্দ দান করিতে চাহেন, নিজ আনন্দকে প্রকাশ করিতে চাহেন "গোপনে প্রেম রয় না ঘরে, আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে।" কিন্তু কাহার নিকট প্রকাশ করিবেন? সৃষ্টিতে—জীব ও জড় জগৎ সৃষ্টিতে, এজন্য 'সৃষ্টি' শব্দের অর্থ 'বিসর্জ্জন,' 'emanation, letting loose' (রাধাকৃষ্ণণ) ঋগ্বেদ পুরুষ সূক্তে উক্ত হইয়াছে, ঈশ্বর সৃষ্টির আদিতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিলেন, 'The act of creation is an act of sacrifice'; কিন্তু যাহার নিকট নিজেকে প্রকাশ করিবেন তাহার তো অনুভব করিবার মত জ্ঞান-শক্তি থাকা চাই। জড় জগতে তাঁহার মহিমামণ্ডিত প্রকাশ এই প্রকাশ অনুভবের জন্য সৃষ্টি করিলেন জীবকে। কি দিয়া? ঈশ্বর জীব সৃষ্টিতে আপনাকে দান করিলেন, নিজ স্বভাবের জ্ঞান, আনন্দ ও প্রেম জীবে বীজ রূপে বা অণুপরিমাণে সঞ্চারিত করিয়া সৃষ্টি করিলেন -'God made man in his own image'; এই আত্মদানের মধ্যেই তাঁর প্রেমের প্রকাশ। (God created the world in love) ঋষি-কবি বলিতেছেন 'এই যে তিনি বিসর্জ্জন করেন এর মধ্যে কোনো দায় নেই, প্রয়োজন নেই, কোনো বাধ্যতা নেই।' 'তিনি চিরদিনই নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করবেন, দান করবেন এই তাঁর আনন্দের লীলা' জীবলীলা বা সৃষ্টি-লীলা। শঙ্কর হইতে বাংলা দেশের বলদেব পর্য্যন্ত সকল ভাষ্যকারই এই সৃষ্টি ঈশ্বরের আনন্দ-(প্রেম) স্বভাববশেই নিষ্পন্ন হয়, শ্বাস-প্রশ্বাসের মত এই বলিয়াছেন। "তিনি ত্যাগ করছেন" এই জন্য 'তিনি প্রেমস্বরূপ'; 'আমাদের জন্য', 'জগতের উপকারার্থে' বিষ্ণুপুরাণ)। কী রূপে? অবারিতদ্বার এই বিশ্বভাণ্ডারের রূপরসাত্মক সৌন্দর্য্যের মধ্যে, হৃদয়ের স্নেহ প্রেমজনিত সুখানুভবের মধ্যে তাঁর প্রেমের প্রকাশকে অবাধে উপলব্ধি করেই আমি মুক্ত হব—(তাঁরই প্রদত্ত জ্ঞান, আনন্দ ও প্রেমের সাহায্যে)। "তোমায় আমায় মিলন হবে বলে আলোয় আকাশ ভরা"; তাঁহার সহিত মিলনের যে পূজা তাহারই বাহ্যিক

উপকরণ অর্ঘ্য হইল আকাশ ভরা আলোক, নহিলে এ সকলই অর্থহীন। 'বিশ্ব তাঁর আনন্দরূপ, কিন্তু আমরা রূপকে দেখছি, আনন্দকে দেখছি নে'; তিনি নানা দিক থেকে কেবলই বলছেন, "তোমাকে আমার আনন্দ দিচ্ছি, তোমার আনন্দ আমাকে দাও"। এই ইচ্ছার দানের মধ্যে প্রেমস্বরূপের সহিত জীবের অন্তরের প্রেমের মিলন, ইহাই মুক্তি। ভক্ত, তাঁর অন্তরের প্রেম, ভক্তি কৃতজ্ঞতা দ্বারা যখন প্রেমস্বরূপের নিকট আত্মনিবেদন করেন, তখন 'ভক্তের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়'। এইরূপেই 'যুগল সম্মিলনের' মধ্যে ভগবানের মূর্ত্তি পূর্ণ প্রকাশিত। সেই প্রকাশ সকল জীবের অন্তরে তিনি চাহিতেছেন; কেননা সকল জীবের সহিত তাঁহার এই আনন্দ-লীলা। ভক্তের নিকট 'অহংকার বিসর্জ্জনের আহ্বান নিয়ত আসিয়া পৌঁছিতেছে, যতদিন না তাঁহার প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়'—

'তাঁহার আহ্বান গীত যে শুনেছে কানে, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে'; তিনি তার জন্য প্রতীক্ষা করে আছেন, লোক লোকান্তরে যুগযুগান্ত ধরিয়া এই প্রেমের প্রতীক্ষা চলিবে—

Look also, Love, a brooding star,
A rosy warmth from marge to marge—

তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভ'রে।
নিশিদিন অনিমেষে দেখছ মোরে।

'যতক্ষণ কুঁড়ি না ফুটছে ততক্ষণ তাঁর পূজার অর্ঘ্য ভরছে না'। এই হইল ভক্তের জন্য ভগবানের প্রতীক্ষা। আর যে তাঁর আহ্বান শুনিল না, 'যে মানুষ তাঁকে দেখতে না পেয়ে গোল করছে' তার জন্যও তিনি ধৈর্য্য ধ'রে ব'সে আছেন। "তিনি বলছেন, "আমি তো জোর করে চাইনে, যে ভুলে আছে তার ভুল একদিন ভাঙবে।" এই হইল প্রাকৃতজনের জন্য, সকলের জন্য তাঁহার প্রতীক্ষা, যুগযুগান্তর ধ'রে অপেক্ষা—ইহাই তাঁহার সৃষ্টি-লীলা, জীবলীলা। প্রতি সৃষ্ট মানবকে এই ভক্তের পদবীতে আরূঢ় ও তাঁহার সহিত মিলিত হইতে হইবে, যে সুদূর ভবিষ্যতেই হউক—ইহাই Tennyson কথিত—

One far off divine event,
To which the whole creation moves.

'The final reconciliation or union of all
Souls with their divine source' (Bradley).

প্রেতাত্মার সহিত বাক্যালাপ

প্রাচ্যেও আত্মার আবির্ভাব নূতন কথা নয়। কিন্তু আত্মার সহিত বাক্যালাপ করার সুযোগ কি ঘটে? কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার সেই সুযোগই ঘটেছিল।

রংপুর জেলার শৌলমারী গ্রামে বিহারী নামে এক যুবকের বাস। সে আত্মা আনতে পারে শুনে আমার ভাইপো প্রফুল্লকে বললাম তাকে একবার তলব দিতে। প্রফুল্ল সেই অঞ্চলের ডাক্তার। আমাকে তার কাছে তখন যেতে হয়েছিল।

ডাক্তারবাবুর তলব পেয়েই বিহারী এসে উপস্থিত হ'ল। লোকটি জাতে নমঃশূদ্র, ব্যবসা করে জেলের। দোহারা চেহারার যুবক, খালি পা, গায়ে শুধু একটা গেঞ্জি। আচার-ব্যবহারে বেশ ভদ্র।

তাকে ডাকাবার উদ্দেশ্য শুনে সে ব'লে গেল আমরা যেন একখানা কুলো ও কিছু নূতন সরষে জোগাড় ক'রে রাখি। আর তার সঙ্গে দু'তিনখানা পিঁড়িও, তাতে ভূতের আসন হবে। সে রাত্রে আসবে। রাত্রে ছাড়া তার প্রক্রিয়া চলেও না।

আসরের আয়োজন করা হ'ল স্থানীয় সরকারী ডাক্তারখানার একপাশে একটা হলঘরে। সেই ঘরটির দু'দিকে দুটো দরজা ও তিনটে বড় জানালা। একটা দরজা বন্ধই থাকে, অন্য দরজাটাও বন্ধ ক'রে দিলে মূল ডাক্তারখানা হ'তে এ ঘরখানি সম্পূর্ণই আলাদা হয়ে যায়। ঘরের একদিকের দুটো জানালার নীচেই ছোট একটা মাঠ, তার মধ্য দিয়ে পায়ে-চলা পথ। অন্য দিকের জানালার ও সম্মুখে মাঠ, তা ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডেরই সামিল। দু' দিকের জানালা দিয়ে বাঁশ-ঝাড়ের ফাঁকে একটা নদীর জল চিক্ চিক্ করছে দেখা যায়।

সন্ধ্যার পরেই হলঘরের আসর ঠিক করা হ'ল একটা সতরঞ্চি ও দু'খানা পিঁড়ি পেতে রেখে। কুলো ও সরষে এনেও সেখানে রাখা হ'ল। ব্যাপারটা গোপন রাখার উদ্দেশ্যেই এ বিষয়ে বাইরের কাউকে কিছু বলা হয় নি। আসরের প্রধান অতিথি স্বয়ং আমি, দর্শকদের দলে ভাইপো প্রফুল্ল, প্রফুল্লর ছোট ভাই প্রবোধ (ডাক নাম বেণু), ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডার নগেনবাবু এবং তরুণ বয়সের স্থানীয় একজন সরকারী কর্ম্মচারী।

বিহারী বিড় বিড় ক'রে মন্ত্র পড়তে লাগল

বিহারীর আসতে দশু-চার রাত্রি হ'ল। তার সঙ্গে এল তারই স্বজাতি ও সমবয়সী সুবল। বিহারী একটা পিতলের প্রদীপ হাতে ক'রে নিয়ে এসেছিল। কুলো ও সরষে তার কাছে রেখে দিয়ে ছয়-সাত হাত দূরে এক দিকের জানালার কাছে দু'খানা পিঁড়ি পেতে রাখা হ'ল। ঘরের দরজা-জানালা সমস্তই বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছিল। বিহারী পিতলের প্রদীপটা জ্বেলে অন্য আলো নিভিয়ে দিল। তার পর কুলোর উপরের সরষেগুলো ডান হাত দিয়ে নাড়তে নাড়তে বিড়্ বিড়্ ক'রে কি মন্ত্র পড়তে লাগল। তার এই প্রক্রিয়া দু-চার মিনিট চলার পরই সুবল ফুঁ দিয়ে পিতলের প্রদীপটাও নিভিয়ে দিল। ফলে ঘরখানি একেবারেই অন্ধকার হয়ে গেল।

আমাদের আসরে যে সতরঞ্চিখানা পাতা হয়েছিল তার পেছনে ছিল একখানা তক্তপোশ। আমি সেই তক্তপোশের উপর ব'সে ছিলাম। আমার বাঁদিকে আধা-দাঁড়ান আধা-বসা অবস্থায় ছিল প্রফুল্ল। বিহারী ও সুবল ব'সে ছিল পাশাপাশি সতরঞ্চির এক কোণ ঘেঁষে। তাদের পাশে কেষ্ট, নগেনবাবু ও সরকারী কর্ম্মচারীটি।

সরষে নেড়ে মন্ত্র প'ড়ে প'ড়ে বিহারী আধ ঘণ্টার উপর কাটিয়ে দিল। কিন্তু ভূতের সাড়াশব্দ কই? মন্ত্র পড়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ভূত আসার কথা, আর ভূত এসেই বসার আসন পিঁড়িতে ঠক্‌ঠক্ শব্দ ক'রে নাকি আগমনবার্ত্তা জানায়। কিন্তু এতক্ষণের মধ্যেও পিঁড়ির শব্দ হচ্ছে না দেখে বিহারী নিজেই একটু নিরাশ হয়ে পড়ল। একবার বলল, কি রে সুবল, মাদুলি আনব নাকি? তার পর নিজেই আবার বলল, না, থাক। আজ আর কাজ হবে না। ভূত সেদিন আসবে না, নিশ্চিত বুঝেই হয় ত বিহারী হাল ছেড়ে দিল।

তখন তার মুখে এই মাদুলির রহস্যটা শোনা গেল। মাদুলি পিতলের প্রদীপের শিখায় তাতালে নাকি ভূতের না এসে উপায় নেই। কিন্তু ওরকম করায় বিপদ্‌ও আছে। আগুনের তাত মাদুলিতে লাগলে ভূতের গায়েও যাতনা হয়। যাতনায় ছুটিতে ছুটিতে তার আসতে হয় বটে, কিন্তু সেজন্য সে চ'টেও যায় বেজায়। তখন আসনের পিঁড়ি ধ'রে আছড়াতে থাকে। তাতে পিঁড়ি ত ভাঙ্গারই কথা, একটু অসাবধান হ'লে রোজাও রেহাই পায় না। সেদিনের আসর নিরাশায় ভেঙ্গে গেল। পরের দিন আবার আসবে ব'লে বিহারী ও সুবল বিদায় নিল।

পরের দিন রাত্রে সেই জায়গায় সেই ভাবেই সমস্ত ব্যবস্থা করা হ'ল। সেদিনের দর্শকও হ'লাম আগেকার মত আমরা ক'জন।

প্রক্রিয়া চলল—পূর্ব্ব রাত্রির মতই। পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই শুনলাম, ছয়-সাত হাত দূরে পাতা পিঁড়ির ঠক্‌ঠকানি শব্দ। বিহারী বলল, এসে গ্যাছে। এখন আপনারা কেউ ওদিকে তাকাবেন না, হয় চোখ বুজে, নয় মাথা নীচু ক'রে ব'সে থাকুন। বিহারীর কথামত আমরা দৃষ্টিরোধ করলাম। বিহারী নিজে বিড়্‌বিড়্ ক'রে মন্ত্র পড়তে পড়তে কুলোর উপরের সরষে নাড়তে লাগল।

পিঁড়িতে চার পাঁচবার ঠক্‌ঠকানির শব্দ হওয়ার পর সেদিক্ হ'তে ছেলেছোকরার স্বরের মত সরু গলার স্বর শোনা গেল—কেন ডেকেছেন? কি চাই?

আমরা কোন উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বেই আর একখানা পিঁড়িতে দু-তিনটা ঠকঠক শব্দ হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে মোটা ও কর্কশ গলার স্বর শোনা গেল। আমার ভাইপোর উদ্দেশেই কথা বলতে শোনা গেল—গুড ইভ্‌নিং, ডাক্তারবাবু, কেমন আছেন? বড় চুপচাপ ব'সে আছেন যে! বড় ভাবনা হচ্ছে বুঝি? কিসের ভাবনা? ট্যাকা—ট্যাকা—ট্যাকা, ট্যাকার ভাবনা, না? একটা হাসির শব্দও হ'ল, হাঃ—হাঃ—হাঃ। তার পরে আবার কথা—তা বেশ, ভাবুন ব'সে ট্যাকার কথা! কিন্তু—কিন্তুর পর শব্দটা একটুখানি থেমে গিয়েছিল; পরেই আবার শোনা গেল—আপনার কাছে ব'সে কে উনি?

প্রশ্নের উত্তর দিল প্রফুল্ল। বলল—আমার কাকা। কলকাতা থেকে এসেছেন। আপনাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে চান

সঙ্গে সঙ্গে আমিও বললাম—আমি আপনাদের কাছে দু-চারটে বিষয় জানতে চাই।

উত্তর পেলাম—বলুন, কি বলতে চান।

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কে? থাকেনই বা কোথায়?

জবাব এল—আমি প্রেত। থাকি প্রেতস্তরে।

প্রেতস্তরে! প্রশ্ন করলাম সে স্থান কোথায়, আর সেখানে আছেনই বা কি ভাবে?

উত্তর শুনলাম—প্রেতস্তর প্রেতলোকে, পৃথিবীর বাইরে, বড়ই কষ্টকর জায়গা। সেখানে কেমন আছি শুনতে চান? বড় যন্ত্রণা, বড় যন্ত্রণা। কি যে সে যন্ত্রণা তা বুঝাবার নয়।

জিজ্ঞাসা করলাম—এ যন্ত্রণা হ'তে আপনাদের কি মুক্তির উপায় নাই?

জবাব শুনলাম—জানি না। কর্ম্মভোগ শেষ না হ'লে হয়ত নাই।

আবার প্রশ্ন করলাম—ওখানে থাকেন কি ভাবে, আর খান-দানই বা কি?

উত্তর হ'ল—থাকি কি ভাবে তা বুঝাতে পারব না। আর খাওয়া-দাওয়া।—সে ত দেখাই সার।

আমি ব্যাখ্যা ক'রে বললাম, দৃষ্টিভোগ?

জবাব এল—হ্যাঁ।

এই পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা হতেই প্রথম আগন্তুকের সরু গলার ত্রস্ত স্বর শোনা গেল—দেখুন, দেখুন, ঐ যে উনি চোখ খুলে আমাদের দিকে তাকাচ্ছেন। ওঁকে মানা করুন, মানা করুন।

সত্যিই, এই সময়ে আমার ছোট ভাইপো কেষ্ট নাকি চোখ খুলে আসনের দিকে তাকাচ্ছিল। অভিযোগ শুনেই সে চোখ বুজল।

চোখ মেলে তাকাতে নাই কেন? এই সময়ে এ প্রশ্নটা আমার মনে জাগল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, বলুন ত, আপনাদের দিকে তাকানো মানা কেন? তাকালে কি হয়?

উত্তর পেলাম মোটা ও কর্কশ গলায়—আমাদের লজ্জা করে। আমরা ন্যাংটা কি না?

কথাটা শুনে একটু হাসলাম। তার প্রতিক্রিয়া ওদিকে কিছু হ'ল নাকি বুঝলাম না, তবে মিনিটখানেক পরে সেই গলারই নির্দ্দেশ পেলাম—এবার তাকান দেখি এদিকে।··· কিছু দেখছেন?

কই, কিছুই ত চোখে পড়ল না। কিন্তু কানে শুনলাম একটুখানি হাসির মত শব্দ।

ফের সরু গলাওয়ালার কথা শোনা গেল, যেন চটা মেজাজের স্বর—দেখুন ত কম্পাউণ্ডারবাবু, বাইরে কত লোকের ভিড়! আবার আলো জ্বেলে দেখা হচ্ছে! ওদের স'রে যেতে বলুন, নইলে দেব দেখিয়ে মজা!

কম্পাউণ্ডার নগেনবাবু দরজা ফাঁক ক'রে উঁকি মেরে দেখলেন—বাস্তবিকই বাইরে কতগুলি লোক এসে দাঁড়িয়েছে। আর তাদের একজন টর্চ জ্বেলে জানালার ফাঁকে আলো ফেলার চেষ্টা করছে। তিনি তাদের ধমক দিয়ে স'রে যেতে বললেন।

নগেনবাবু ফিরে আসতেই মোটাগলার আওয়াজ শোনা গেল—একটু আসছি। আসছি বলার মানে হয় ত বাইরে যাওয়া। কাজে হ'লও হয়ত তাই। কেননা, চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যে আর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তার পরে আবার পিঁড়িতে শব্দ হ'ল—ঠক্ ঠক্।

বিহারী বলল, ফিরে এসেছে। ওদের কিন্তু আর বেশী সময় রাখা যাবে না। আপনাদের আর কিছু বলার থাকলে চট্‌পট্ সেরে নিন্।

পৃথিবীর বাইরের প্রাণীর সঙ্গে কথা বলছি, তার ত ভুল নেই। এদের দৃষ্টি হয়ত অনেক দূরেই চলে,—এই ভেবে আমার কলকাতার বাসার খবর জানতে উৎসুক হ'লাম। আমার একটি মেয়ে সামান্য অসুস্থ ছিল। তার খবরটা প্রথমে জানতে চাইলাম।

উত্তর পেলাম মোটা ও কর্কশ গলায়—আমরা প্রেত, আমরা কি তা বলতে পারি! তবু চেষ্টা ক'রে দেখি। বলুন ত আপনার মেয়ের নাম।

নাম শুনে আমার ডান হাতখানা উপরে তুলে ধরতে বলা হ'ল। আমি হাত তুলতে একটু পরে শুনতে পেলাম - ভাল আছে। তবে এখনও চিকিৎসা করাতে হবে।

আমার পিতা ছিলেন পূর্ব্ববঙ্গের প্রথম নাট্যকার। নাম মহেশচন্দ্র দাশগুপ্ত। ১৩৩১ সালে কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়। আমি নয় মাস বয়সের সময়ে মাতৃহারা, সুতরাং আমার পিতাই ছিলেন একাধারে আমার মা-বাপ। তাঁর অভাবের বেদনা ভুলতে পারি নি। তাই তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানা যায় কি না, সেই আশায় প্রশ্ন করলাম—বলুন দেখি, আমার বাবা কোথায়?

বাবার নাম ও বিস্তৃত পরিচয়াদি একে একে জেনে নিয়ে মোটা গলাওয়ালার জবাব পেলাম—কই, তাঁকে ত প্রেতস্তরে দেখছি না। এর উপরের স্তরে আমাদের দৃষ্টি চলে না।

এর পরে এদিনকার আলোচনায় পূর্ণচ্ছেদ পড়ল। বিহারী আরও কিছুক্ষণ মন্ত্র প'ড়ে সরষে নাড়তে লাগল। কিন্তু তাতেও যখন আর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না তখন ক্ষান্ত দিয়ে বলল, আজ আর কাজ হবে না, চ'লে গ্যাছে।

এবারের আসর যতটুকুই জমুক না কেন, ওতেই আমাদের কৌতূহল বেড়ে উঠেছিল। আমরা বিহারীকে আর একদিন আসর করতে বললাম। বিহারীর বাইরে যাওয়ার বরাত ছিল, কাজেই তার ফেরার পর পাঁচ-ছয় দিন বাদে এবারকার আসর বসল।

শুনেছিলাম, বিহারীর তাঁবে আরও দু'টি ভূত আছে। তাদের একজন এক গোসাঞী-বাবাজী, আর

একজন মেথর। পূর্ব্বে তাদের জন্য আসন পেতে রাখা হয় নি, তাই হয়ত তাদের আসাও হয় নি, এই মনে ক'রে এবারকার আসরে চারখানা পিঁড়ি পেতে রাখা হ'ল। আর সব ব্যবস্থাও হ'ল পূর্ব্বের ন্যায়। বিহারীর প্রক্রিয়াও চলল সেইরূপ।

একে একে সরু গলাওয়ালার ও মোটা গলাওয়ালার আবির্ভাব টের পেলাম পিঁড়ির ঠক্‌ঠক্ শব্দ শুনে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা ত প্রেতলোকের বাসিন্দা, সম্ভবতঃ বায়ুভূতো নিরাশ্রয়, অথচ চলছেন-ফিরছেনও ত দেখছি। কি ক'রে তা সম্ভব হয়? ধরুন, এই ঘরের মধ্যেই যাওয়া-আসা চলে কি ক'রে, ঘরের দরজা-জানালা ত বন্ধ?

সরুগলার কথা শুনলাম—আচ্ছা, আপনাকে একটা প্রশ্ন করি। দরজা-জানালা বন্ধ থাকলেও এ ঘরে বাতাস আছে, আসে-যায়ও, ঠিক কি না?

বললাম, হ্যাঁ।

তবেই দেখুন—জবাব পেলাম—দরজা-জানালা বন্ধ থাকলেও বাতাসের মত আমাদেরও চলাফেরায় বাধা নেই।

প্রশ্ন করলাম—তা নয় হ'ল, কিন্তু কথাবার্ত্তাও বলা হয় কি ক'রে?

সরু স্বরের প্রশ্ন হ'ল—আপনারা যাকে গ্রামোফোন বলেন তাতে গান হয় কি ক'রে?

বললাম—তাতে ত রেকর্ড আছে।

শুনলাম—এখানেও ত রেকর্ড আছে কুলোখানাই, আর সরষেগুলো রেকর্ড চালাবার পিন্।

ব্যস্, মীমাংসা হয়ে গেল। এর পর ইচ্ছা হ'ল পরলোকের গোটাকতক তত্ত্ব জানতে। তাই মৃত্যু কি, মৃত্যুর পরের অবস্থা কি, স্বর্গ-নরক কি, একে একে এরূপ প্রশ্নের অবতারণা করলাম।

জবাব দিল মোটাগলাওয়ালা। কোন কিছুরই সমাধান করতে না পেরে শেষে বলল, একটু অপেক্ষা করুন, গোসাঞী-বাবাজীকে ডেকে আনছি।

দু-তিন মিনিট বাদে তৃতীয় পিঁড়িখানার শব্দ শুনে বুঝলাম বাবাজী হাজির। ধীর ও গম্ভীর স্বরে সত্যিই যেন এক বৈষ্ণববাবাজীর গলায় কথা ফুটল—কি, বাবারা, কি জানতে চাইছেন?

আমি আমার প্রশ্ন উত্থাপন করলে প্রথমে ভূমিকা শুনলাম—বাবারা, আপনারা জ্ঞানীলোক, আমি চাষাভুষা মুখ্যু মানুষ, আমার নিকট এ প্রশ্ন কেন?

বাবাজীর বিনয়ে থামলাম না। বার বার জেদ করায় উত্তর শুনলাম—সবই ত শাস্ত্রে আছে। মৃত্যুর পরের অবস্থা কর্ম্মফল-অনুসারে হয়, স্বর্গ-নরকও কর্ম্মফলের ভোগ। গীতায়ই ত পড়েছেন—এই ব'লে গীতার একটা শ্লোক আবৃত্তি করা হ'ল। তার পর চৈতন্যচরিতামৃতেরও দু-একটা পংক্তি ব'লে কথা শেষ হ'ল—বাবারা, আপনারা জ্ঞানী, শাস্ত্র পড়ুন, সবই জানবেন, আমার মত চাষাভুষা ও মুখ্যু মানুষের কাছে এসব আর কি শুনবেন!

বাবাজীর বৈষ্ণবোচিত বিনয়ে দমলাম না। আমি তৎক্ষণাৎ বললাম—তবে যে শুনি গয়ায় পিণ্ডদান করলে পাপীতাপীরও মুক্তি হয়, তা কি সত্যি না?

ধীর ও গম্ভীর স্বরে জবাব এল—না। কর্ম্মফলের ভোগ শেষ না হলে, না।

হঠাৎ সে স্বর থেমে গেল। প্রশ্ন ক'রেও আর কারও জবাব পেলাম না। বুঝলাম—সবাই চ'লে গিয়েছে।

বিহারীর প্রক্রিয়া তখনও থামে নাই। কাজেই আগেকার দল চ'লে গেলেও চতুর্থ পিঁড়িখানিতে ঠক্‌ঠক্ শব্দ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দীভাঙ্গা বাংলায় কথা শুনলাম—সেলাম ডাক্তারবাবু, কুছ খিলাইবেন না?

এ সেই মেথরের গলা। প্রফুল্ল আগেও শুনেছে, তাই চিনতে পেরে বলল—খাওয়াব বইকি? কি খেতে চাস্?

জবাব এল—কলা।

প্রফুল্ল বলল—বেশ, দেব কলা। কিন্তু আগে একটা গান গা দেখি।

ফরমাসের ফল পাওয়া গেল। গানের সুরে শোনা গেল ফিরিয়ে ফিরিয়ে একটা কলি, আর তার তালে তালে পিঁড়ির বাজনা—ঠক্ ঠক্। পিঁড়িখানি ঠক্‌ঠক্ করতে করতে গানের তালে তালে এগিয়ে আসতে লাগল। বিহারী টের পেল বাজনা তার পায়ের কাছে এসে পড়েছে, অমনি সে একমুঠো সরষে নিয়ে পিঁড়ির দিকে ছুঁড়ে মারল। সঙ্গে সঙ্গে পিঁড়িও থেমে গেল, গানওয়ালারও সুর বন্ধ হ'ল। শুনলাম—পিঁড়ির তাল সময়মত না ঠেকালে

বিহারীর হয়ত বিপদ্ হ'ত, কেননা পিঁড়ি তখন রোজার শরীরের বাধা গ্রাহ্য করত না। এ পর্য্যন্ত পায়েই তাল ঠোকা চলছিল, তার পর হয় ত হাতে তুলে নিয়ে মাথার উপরই পিঁড়ির ঠকাঠক্ চলত। বস্তুতঃ, দু'-এক ক্ষেত্রে নাকি রাগের কসরতে ওরূপ ঘটনা ঘটতে দেখাও গিয়েছে।

মেথরকে কলা খাওয়াবার আর উপায় রইল না। আশা রইল আর একদিন সে-কথা রক্ষার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু সে ব্যবস্থা হওয়ার পূর্ব্বেই আমাকে কলকাতায় ফিরতে হয়েছিল।

শুনেছি, এই ভূতদের সকলেই নাকি কুচবিহারের ওদিক্ হ'তে আমদানী। মৃত্যুর পূর্ব্বে সরুগলার ছোকরাটি ছিল ইস্কুলের ছাত্র, মোটা ও কর্কশ-গলাওয়ালা ডাক্তার, বৈষ্ণববাবাজীর আখড়াও ছিল একটা। আর মেথর?—সে ত সর্ব্বঘটে বর্ত্তমান। বিহারীর গুরু নাকি এদের জীবদ্দশায় শরীরের রক্ত নিয়ে রেখেছিল কাপড় চুপিয়ে আর সেই রক্তমাখা কাপড় গোটাকতক মাদুলিতে পুরে রেখেছিল। সেই মাদুলিই অনুপায়ের উপায় স্বরূপে শেষবারে তাতাবার ব্যবস্থা। এই গুরুটি ছিল ব্যবসাদার ভূতের রোজা। বিহারীও তারই দীক্ষিত শিষ্য। তবে ক্ষেত্র বুঝে খয়রাতী কাজও চালায়।

আমাদের সংশয়ী মন। পূর্ব্ব হতেই সন্দেহ ছিল এর মূলে হরবোলার কারসাজি (ventriloquism) আছে নাকি। দর্শকদের মধ্যে সকলেই, বিশেষতঃ কাঁচা চোখের দৃষ্টি নিয়ে কেষ্ট, বিহারী ও সুবলের প্রতি কড়া নজর রেখেছিল। কিন্তু নিষ্ফল চেষ্টা। মেথরের গানের তালে তালে পিঁড়িখানা এগিয়ে আসা, বাইরের ভিড় ও কেষ্টর চোখ খুলে ধরা পড়া—এই সকল সমস্যার সমাধানই বা কি? তার উপর বিহারী ও সুবল দুজনেই সামান্য লোক, লেখাপড়া অক্ষরপরিচয়েই সীমাবদ্ধ। গুড ইভনিং বলা শিখে রাখলেও, গীতার শ্লোক কিম্বা চৈতন্যচরিতামৃত আওড়ানোর বিদ্যা তাদের নেই।

ছায়ামূর্ত্তির মুখোমুখী

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জাপানী বিভীষিকা দূর হয়েছে বটে, কিন্তু আত্মরক্ষার বৃহ্যচক্র ব্যাফ্‌ল্‌ওয়াল (Baffle Wall) তখনও শহরময় বর্ত্তমান।

এই সময়ে একদিন আমাকে কলকাতার এণ্টালী অঞ্চলে যেতে হয়েছিল। বাসে এণ্টালী বাজারের সামনে পৌঁছে হাঁটা পথে মিড্‌ল্ রোডের এক প্রান্তে আমার গন্তব্যস্থল। যাওয়ার সময় বেলাবেলিই গিয়েছিলাম, ফিরতে রাত হয়ে গেল।

ছোট দুটো গলির পেট কেটে অপেক্ষাকৃত একটা বড় গলি আড়াআড়ি পূবপশ্চিমদিকে গিয়েছে। সেই বড় গলির সংযোগস্থলে একদিকের ছোট গলিটার মুখে একটা ব্যাফ্‌ল্‌ওয়াল, তার এক প্রান্ত একটা বাড়ীর কোণে মিশানো; সেদিক্ থেকে সাত-আট হাতের মধ্যে বাড়ীর দরজা-জানালা কিছুই দেখা যায় না। ব্যাফ্‌লওয়ালের অপর প্রান্তের সংলগ্ন একটা ফাঁকা জায়গার পাশ ঘেঁষে সরু গলি দিয়ে আমার যাওয়ার পথ। ভাঙাচোরা জায়গাটার মাঝে কয়েকটা ইটের স্তূপ ছিল। যাওয়ার সময়ে সবই নজরে পড়েছিল, কিন্তু দিনের আলোতে কোনো কিছুই অস্বাভাবিক মনে হয় নি।

ফেরার বেলা রাত্রে এই দেয়ালটার কাছে এসে পাশ ঘেঁষে ফাঁকা জায়গার দিকে পা দিতে যাব, হঠাৎ দেখি দেয়ালের গায়ে এক ছায়ামূর্ত্তি। মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি, মুখময় দাড়ি, গায়ে আলখাল্লার মত জামা, হাতে লাঠি। আমি চমকে উঠে বিপরীত দিকে স'রে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্ত্তিটাও আমার সামনে দেয়ালের গায়ে স'রে এল। আমি ডান দিকে ফিরলাম। সে মূর্ত্তিও যেন আমার গতিরোধ করতে সেই দিকের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। একবার সন্দেহ হ'ল আমারই ছায়া নাকি! কিন্তু তক্ষুনি মনে হ'ল, নাঃ, আমার ত খালি মাথা, গায়ে পাঞ্জাবি ও উড়ানি; তার উপর মুখে দাড়ি-গোঁফই বা কই? হাতে ছাতা ছিল, তা দিয়ে আঘাত করলাম, দেয়ালে লেগে ঠকাস্ ক'রে একটা শব্দ হ'ল। কিন্তু মূর্ত্তিটা তখনও আমার সামনে দাঁড়িয়েই রইল। এইবার আমার গা একটু ছমছম্ ক'রে উঠল। যে বাড়ীর কোণ ঘেঁষে দেয়ালটি রয়েছে সেদিকে চেয়ে দেখলাম, ভেতরে যাওয়ার পথ নেই, দরজা-জানালাও দেখা যায় না যে কাউকে ডাকি। এদিক্-ওদিক্ স'রেও ছায়ামূর্ত্তিটিকে এড়াতে পারছি না, যেখানেই দাঁড়াই সেটিও আমার মুখোমুখিই এসে দাঁড়ায়। দু-চার মিনিটের এ ব্যাপার, কিন্তু আমার মনে হ'ল যেন আধ ঘণ্টা

ধ'রে সে মূর্ত্তির অনুসরণ চলছে। একবার পেছন ফিরে যাওয়ার কথাও ভাবলাম, কিন্তু কি জানি কেন,—তা না ক'রে মরিয়া হয়ে ফাঁকা জায়গার পথেই মারলাম ছুট, আর এক ছুটেই গিয়ে পড়লাম বড় গলিটা পেরিয়ে অন্য দিকের সরু গলির পথে। সেখানে দু চারটে বস্তির পরে একটা খোলার ঘরের বাইরে তক্তপোশ পেতে বসে তিন-চারটি মুসলমান বিড়ি পাকাচ্ছিল। আমি তাদের কাছে এসে দু-চারটে কথায় আমার অবস্থা বলতেই তারা উত্তর দিল—বাবু, আপনি চ'লে যান। ওদিকে তাকাবেন না। কোন্ ভয় নেই।

তাদের এ কথার তাৎপর্য্য তখন ঠিক বুঝি নি। পরে শুনেছি, ফাঁকা জায়গায় কতকগুলো ইটের যে ভাঙা স্তূপ দেখেছি, সেখানে নাকি কবর ছিল। সেই কবরের সঙ্গে এই ছায়ামূর্ত্তির সংস্রব ছিল কি না, কে জানে? বিড়িওলারা হয় ত তা জানত, তাই আমাকে ওদিকে না তাকিয়ে চ'লে যেতে বলেছিল।

কায়াহীনের ছায়া

আমাদের গ্রামের বাড়ীর দু'দিকে ছিল দু'খানা ব্রাহ্মণ-বাড়ী। বাসিন্দাদের পদবী অনুসারে একখানার নাম পুষলীবাড়ী, অন্যখানার নাম বারড়ীবাড়ী। পুষলীবাড়ী ও আমাদের বাড়ী একেবারে পাশাপাশি। বারড়ীবাড়ীও আমাদের বাড়ীর সংলগ্ন একটা দীঘির পাশের একটি খানার ওপারে। সেখানে যাতায়াতের জন্য ছিল একটা বাঁশের সাঁকো। খান দুই বাঁশ লম্বালম্বি ফেলে সে-সাঁকো তৈরী। উপরের দিকে বাঁশের হাতলও থাকে তার। আমাদের দেশে সেরকম সাঁকোকে বলা হয় 'চার'। এক সময়ে একজনের বেশি লোকের সে-চার পার হওয়া চলে না।

আমাদের বাড়ী ও পুষলীবাড়ীর ছেলে-ছোকরাদের মজলিশের আসর ছিল বারড়ীবাড়ীতে। আড্ডার সঙ্গে তাদের পড়াশুনা, এমন কি সময়ে সময়ে রাত্রের শোওয়াও চলত সেখানে। আমার এক খুড়তুত ভাই নরেন্দ্র তখন দেশের ইস্কুলে পড়ে। পুষলীবাড়ীর বিনোদ তার বন্ধু। তারা দুজনেই ছিল সেখানকার দলে।

একদিন রাত্রে নরেনের বারড়ীবাড়ীতে গিয়ে শোবার কথা। সেখানে যাওয়ার আগে রাত হয়ে গেল অনেক। নরেন খানাটার কাছে গিয়ে বাঁশের সাঁকো পার হ'তে যাবে, এমন সময়ে দেখে, কে একজন ওপার থেকে এপারের দিকে আসছে। তাকে বাঁশের সাঁকোটা পার হওয়ার সুযোগ দিতে গিয়ে নরেনকে এপারেই দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ল। কিন্তু যাকে সে দেখছিল এদিকে আসতে, সে খানিকটা এসেই আবার ফিরে চলল। নরেনও ওপারে যাওয়ার পথ খোলা পেয়ে সাঁকোটার গোড়ায় পা দিল। অমনি ওদিক্কার দৃশ্যও গেল বদ্‌লে। যে ওপারে যাচ্ছিল সে ফিরে এল তড়বড় ক'রে ছুটে, আর এসেই দাঁড়িয়ে পড়ল সাঁকোটার মাঝখানে। তাই দেখে নরেনের আর এগোবার জো রইল না। এই রকম চলতে লাগল অনেকক্ষণ ধ'রেই। নরেন সাঁকোটার উপর পা দিতেই সে-মূর্ত্তি এপারের দিকে ছুটে আসে, আবার সে সাঁকো ছেড়ে দাঁড়াতেই মূর্ত্তিটা চ'লে যায় ওপারের দিকে। কে, কে, ব'লে ডেকেও নরেন কোন সাড়া পাচ্ছিল না।

অন্ধকার রাত্রে মূর্ত্তিটা ছায়ার মতই দেখা যাচ্ছিল। তার চাল-চলন আর কাপড়-চোপড় দেখে নরেনের সন্দেহ হ'ল। বিনোদ পুষলীই এর নায়ক। তাই সে বিরক্তির সুরে চেঁচিয়ে উঠল—বিনোদ, তামাসা করার আর সময় পাস্ নি! ঘুমে আমার চোখ ভেঙে পড়ছে আর তুই মজা করছিস আমাকে যেতে বার বার বাধা দিয়ে। হয় এপারে আয়, নয় পথ ছেড়ে চ'লে যা।

বিনোদের মা তাঁর ঘরে তখন জেগে ছিলেন। নরেনের কথা তাঁর কানে গেল। তিনি নরেনকে ডেকে বললেন—বিনোদকে তুই কি বলছিস রে, নরেন?

নরেন বলল—দেখুন ত খুড়ীমা, বিনোদের কাণ্ড! আমাকে চার পার হ'তে দিচ্ছে না।

বিনোদের মা বললেন—তুই আগে আয় দেখি একবার আমার কাছে।

নরেন বিনোদের মায়ের কাছে যেতেই তিনি বললেন—এত রাত্রে তোর আর বারড়ীবাড়ীতে যেয়ে কাজ নেই। শুয়ে থাক্ এখানেই ঐ বিছানায়।

বিনোদের মা নরেনকে শোবার জন্য যে বিছানা দেখিয়ে দিলেন তা পাতা ছিল ঘরের একপাশে। নরেন শুতে গিয়ে দেখে, সেখানে শুয়ে আছে বিনোদ। কিন্তু সে ঘুমে অচেতন।

সেই বাঁশের সাঁকোর রহস্যের এইখানেই শেষ নয়। তার দুই দিকেই ছিল কতগুলো চিতা। পাড়াগাঁয়ে

আলাদা শ্মশান নেই। বসত-বাড়ীর বাইরেই মৃতের সৎকার করা হয়। আমাদের জলের দেশে মৃতের বিছানাপত্র ফেলে দেওয়াও হয় চিতার পাশের খানাডোবায়। সেখানে বারো মাসই জল চলাচল করে। ঐ রকম চিতার পাশের একটা খানায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল একটি শবের বিছানাপত্র। শবটির সৎকার করা হয়েছিল যে-রাত্রে, তার পরের দিন ভোরে দেখা গেল, সেই বিছানা পাতা রয়েছে পরিপাটিরূপে তার চিতার উপরে—নীচে হোগলা পেতে তার উপর তোশক, চাদর ও শিয়রের বালিশটি। আর সেই বালিশের উপর দাগ মাথার চাপের—কেউ যেন ঘুম থেকে উঠে সদ্য সে বিছানা ছেড়ে গিয়েছে।

সাঁকোর উপরে নরেনের সঙ্গে যে-মূর্ত্তির কৌতুক চলছিল, সেই শ্মশানচারীর কেউই হয়ত এই দুই রহস্তেরই মূলে।

গেছো ভূত

ঢাকায় আমার পঠদ্দশায় সাহিত্যরথী রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষের সহিত অনেকদিনই আমাকে বৈকালিক ভ্রমণে যেতে হ'ত। ঐ সময়ে তাঁর বান্ধব-পত্রিকায় প্রেততত্ত্ববিষয়ক কাহিনী বোধ হয় ছায়াদর্শন—এই নামে প্রকাশিত হ'ত। সেই সকল কাহিনীর লেখক ছিলেন তিনি নিজেই।

একদিন বেড়াতে বেড়াতে রায়বাহাদুরকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি ত বান্ধবে ভূতের কাহিনী অত লিখছেন, নিজে কি ভূতে বিশ্বাস করেন ?

বিশ্বাস করিনে ! রায়বাহাদুর আমার কাঁধে হাত দিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন—বিশ্বাস ত করিই, আমি স্বচক্ষে ভূত দেখেছিও।

আমি একটু হেসে বললাম—কোথায় ?

তিনি বললেন—তোমাদেরই বরিশালে।

রায়বাহাদুর ঘটনাটা আমাকে যা বলেছিলেন তার মর্ম্ম এই : তিনি তখন বরিশাল শহরে থাকেন। একদিন দুপুরবেলা তাঁকে শহরের ভাটিখানা মহলায় যেতে হয়েছিল। সেখানে যেতে পথে পড়ে বেণু সিংহের বাড়ী। বাড়ীর সামনে পুকুর এবং পুকুরপাড়ে বড় একটা গাছ। তিনি সেই পথে যেতেই হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল গাছটার দিকে। তখন তিনি দেখেন গাছের একটা ডালে পা ঝুলিয়ে ব'সে রয়েছে অদ্ভুত একটি প্রাণী, দেখতে মানুষেরই মত বটে, কিন্তু নেহাৎ বেঁটে, আর গায়ের রং পাঁঠার উজুলির (নাড়িভুঁড়ি-ঢাকা থলের) মত সবুজে। তাঁকে দেখেই প্রাণীটি সর্ সর্ ক'রে উপরে উঠে গেল। তিনি ভয় পেয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গেলেন নিকটে এক আত্মীয়ের বাড়ী। সেখানে গিয়ে শোনেন—লোকের বিশ্বাস ও গাছে ভূত আছে, আর তিনি যে-প্রাণীটিকে দেখেছেন সেটাই সেই ভূত। রায়বাহাদুরের নিজেরও বিশ্বাস, তিনি ভূতই দেখেছিলেন।

বেণু সিংহের বাড়ী বরিশালে হয়ত এখনও আছে। তাঁর বাড়ীর সংলগ্ন পুকুর ও পুকুরপাড়ের গাছ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি নিজেও দেখেছি। বরিশাল-হিতৈষী-আফিস তখন তারই নিকটে ছিল।

আত্মার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা

মৃত্যুর পূর্ব্বে কারও কোন বিষয়ে প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকলে তা মেটাতে মৃতের আত্মা পূর্ব্বদেহে ফিরে আসে। কবি ৺করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় সে-সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ পারিবারিক একটি কাহিনী আমাকে বলেছিলেন। ঘটনাটি এই :

করুণানিধানবাবুরা তখন কলকাতায় হেদোর কাছে ডাফ্ ষ্ট্রীটে থাকতেন। তাঁর এক ভাই চাকরি করতেন চুঁচুড়ায়। আফিসের ক'দিনই তিনি সেখানে থাকতেন ; শনিবার আফিস ক'রে আসতেন কলিকাতার বাসায় এবং রবিবার পর্য্যন্ত থেকে সোমবার চুঁচুড়ায় ফিরে যেতেন।

করুণানিধানবাবুর এই ভাইটি ছিলেন যেমন মাংসপ্রিয় তেমনি থিয়েটার-ভক্ত। কলকাতার বাড়ীতে এসেই মাংসরান্নার ফরমাস করতেন এবং শনিবার, রবিবার দু'দিনই থিয়েটার দেখতেন।

একবার তিনি হঠাৎ বৃহস্পতিবারে এসে কলকাতায় উপস্থিত হন এবং মাংসরান্নার ফরমাস করেন। রাত্রে পেট পুরে মাংস খেয়ে থিয়েটার দেখতে যান। পরের দিন অনেক বেলা পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে রাত্রিজাগরণের ক্লান্তি দূর

করেন। তার পর দুপুরে খাওয়া-দাওয়া ক'রে—আমার জরুরী কাজ আছে, এক্ষুণি চুঁচুড়ায় যেতে হবে—এই ব'লে চ'লে যান।

এই হ'ল শুক্রবারের ঘটনা। তিনি চ'লে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে করুণানিধান বাবুর বাড়ীতে সংবাদ এল—বৃহস্পতিবার আফিসের পর তাঁর ভাই সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে প'ড়ে গুরুতর আঘাত পান; তৎক্ষণাৎই তাঁকে হাসপাতালে পাঠান হয়, কিন্তু দুঃখের ব্যাপার, সেই দিনই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

মৃত্যুর সময়টা মিলিয়ে পরে দেখা গিয়েছিল, মৃতের আত্মা দেহত্যাগের পরক্ষণেই কলকাতায় এসেছিলেন; এবং সম্ভবতঃ অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে অন্তর্হিত হয়েছিলেন।

করুণানিধান বাবুর স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনিও স্বামীকে দেখা দিয়েছিলেন সেদিন ছিল বিজয়া দশমী। সেই শুভদিনে স্ত্রীর কথা বারবারই করুণানিধান বাবুর মনে পড়ছিল। সন্ধ্যার পর তিনি চুপ ক'রে শোবার-ঘরে ব'সে ছিলেন। ভাসান দেখে ছেলেপিলেরা ঘরে ফিরে এলে তাদের হাতে যে মিষ্টি দিতে হবে সেকথাও ভুলে গিয়েছিলেন। হঠাৎ তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠল স্ত্রীর মূর্ত্তি—যে বেশে তিনি বিদায় নিয়েছিলেন সেই রকমই কাপড়চোপড়-পরা। সেই মূর্ত্তি আঙুল দিয়ে তাঁর শোবার ঘরের আলমমারিটা দেখিয়ে দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। করুণানিধান বাবুর তখন মনে পড়ল, ছেলেদের হাতে দেওয়ার জন্য যে সন্দেশ আনা হয়েছিল তা সেই আলমারিতেই আছে। ছেলেরা বাড়ীতে ফিরলেই সেই মিষ্টি তাদের দিতে হবে। বিজয়াদশমীর দিনে ছেলেদের প্রতি বাপের কর্ত্তব্যের ত্রুটি না হয়, এই জন্যই হয়ত স্ত্রীর আত্মা স্বামীকে কর্ত্তব্যপালনের নির্দেশ দিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

সেই পথে যেতেই হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়লো গাছটার দিকে

মৃত্যুর পরেও জীবন্ত মূর্ত্তি

মৈমনসিংহ শহরে ৺গিরীশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রসিদ্ধ কবিরাজ ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শরৎচন্দ্র সেনগুপ্ত ছিলেন সেখানকার আদালতের সেরেস্তাদার।

একদিন গভীর রাত্রে শহরের এক নির্জ্জন পথে আসতে আসতে শরৎবাবু দেখেন, একখানা খোলার ঘরের দাওয়ায় একটা ছায়ামূর্ত্তি দাঁড়িয়ে আছে। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমস্তই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল এবং তার একদিকের গাল ঢেকে মাথায় জড়ানো ছিল সাদা-ধব্‌ধবে কাপড়।

ব্যাপার কি বুঝতে না পেরেও শরৎবাবু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে গিয়ে পরিচিত এক দোকানে উঠলেন। সেখানে গিয়ে যা জানলেন তাতে বুঝলেন—ছায়ামূর্ত্তি ওখানকারই এক হারমোনিয়মওয়ালার প্রেতাত্মা। অনেক

দিন হ'ল লোকটির মৃত্যু হয়েছে। জীবদ্দশায় তার গাল পুড়ে গিয়ে বড়ই কদর্য্য হয়েছিল, তাই সে মাথায় ও গালে সাদা রুমাল বেঁধে রাখত। গভীর রাত্রে ও-পথে যে গিয়েছে সেই ঐ দৃশ্য দেখেছে।

শরৎবাবুর পরামর্শে স্থানীয় বাসিন্দারা সেই খোলার ঘরের মধ্যে একটা গাই গরু বেঁধে রেখে তিন দিন ধ'রে অষ্টপ্রহর মহানামকীর্ত্তন করে। তার পর হ'তে সে ছায়ামূর্ত্তি আর দেখা যায় নি।

প্লাঞ্চেটে আত্মার আবির্ভাব

এর পরের ব্যাপার প্লাঞ্চেটের সম্পর্কে। প্লাঞ্চেটে মৃতের আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় দু-রকমে—এক রকমে সন্ধান মেলে, যে-টেবিলের পাশে ব'সে আত্মাকে আহ্বান করা হয় সেই টেবিলের পায়ার সাঙ্কেতিক শব্দ শুনে; অন্তরকমে—কাগজের উপর পেন্সিলের লেখায়। আমরা যে কাহিনী বলতে যাচ্ছি তা আত্মার লেখনীতেই প্রকাশ পেয়েছিল।

আমার সহাধ্যায়ী সাহিত্যিক বন্ধু শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বরিশাল জেলার পিরোজপুরে ওকালতি করতেন। নন্-কোঅপারেশনের সময় ওকালতি ছেড়ে কলকাতায় এসে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে বাসা ক'রে থাকেন।

এই সময়ে তাঁর (তখনকার দিনে একমাত্র) পুত্রের এবং জামাতার মৃত্যু হয়। তাঁর বিধবা কন্যা ননীবালা, পিতার অগোচরে, প্লাঞ্চেটের সহায়তায় স্বামীর আত্মার সন্ধান পান। পরে তা জানতে পেরে সতীশবাবুও মেয়ের সাহায্যে প্লাঞ্চেটে পারলৌকিক অনেক তথ্য জানতে পারেন। সেই উপলক্ষ্যে তাঁর মৃত পুত্রের, জামাতার ও পিতার, বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত ও কালীশ পণ্ডিত মহাশয়দ্বয়ের, দাদা-মা ব'লে খ্যাত স্বামী-স্ত্রী-সম্পর্কান্বিত দুজন বিশিষ্ট ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীর, এমন কি ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে এজিনকোর্ট যুদ্ধে নিহত একজন ইংরেজ সেনাপতির আত্মার আবির্ভাব হয়েছিল। এঁদের লেখনীর মুখে প্রত্যেকের প্রকৃতির, ভাষার, মায় বানানের, বিশেষত্ব পর্য্যন্ত ধরা পড়েছিল।

পূর্ব্ববঙ্গে শরীরের 'হাড়কে' উচ্চারণ করা হয় 'হার'। সতীশবাবুর পিতার মৃত্যুর পর তাঁর অস্থি (হাড়) গঙ্গায় নিক্ষেপের জন্য একটা বেলগাছের তলায় মাটির নীচে কৌটায় পুরে রেখে দেওয়া হয়েছিল। সতীশবাবু তা জানতেন না। সেই হাড় তখনও গঙ্গায় দেওয়া হয় নি। তাই মৃতের আত্মা সে-বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় হাড়কে লিখেছিলেন হার। ফলে তা নিয়ে একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। সতীশবাবু পরে মায়ের নিকটে তার সন্ধান পান। তাতেই সমস্যার সমাধান হয়।

বরিশালের কালীশ পণ্ডিত মশায় ছিলেন সেবাব্রতী উদারস্বভাবের লোক। তিনি হাস্য করতেন উচ্চৈঃস্বরে। তাঁর আত্মার লেখনীতেও সে রকমই প্রাণখোলা হাসির শব্দ যেন ধরা পড়েছিল। দাদা-মায়ের আদি নিবাস ছিল কুমিল্লায়। সেদেশের ভাষায় তাঁরা 'তোমার' শব্দকে বলতেন 'তুমার'। তাঁদের আত্মাও সে অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেন নি।

লোকের মনে প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির প্রাধান্য থাকলে মৃত্যুর পরেও আত্মা তার প্রভাব এড়াতে পারে না। যে ইংরেজ সেনাপতির আত্মার সন্ধান প্লাঞ্চেটে পাওয়া গিয়েছিল, পঁচিশ বছর পরেও তাঁর সে মনোবৃত্তির লোপ হয় নি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী অন্য পতি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর আত্মা স্ত্রীর সেই স্বামীর উদ্দেশে আক্রোশ জানিয়েছিলেন, তাকে পেলে গুলী ক'রে মারবেন। এমন কি, সেজন্য তাঁদের তখনকার শত্রু ফরাসী পক্ষেও যোগ দিতে তিনি প্রস্তুত। এসব কথা ব্যক্ত হয়েছিল তাঁর মাতৃভাষা ইংরেজীতেই। স্বদেশী যুগের একটি যুবকের দেশের জন্য প্রাণ দিতে হয়েছিল। মৃত্যুর পরেও তাঁর আত্মা দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনের পন্থা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর সে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন প্লাঞ্চেটে।

জনলোক, মহর্লোক ইত্যাদি উচ্চস্তরের যে-সমস্ত লোকের কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, মৃতের জীবিতাবস্থায় গুণ ও দোষ অনুসারে আত্মার গতিও সেরূপ উচ্চ বা নিম্নস্তরে হয়। প্লাঞ্চেটে লেখনীমুখে তাঁদের নিকট হ'তেই নিজেদের অবস্থান-সম্বন্ধে সে সংবাদ জানা গিয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে আর একটি বিষয়ও প্লাঞ্চেটে প্রকাশিত হয়েছে। তা হচ্ছে গয়ায় পিণ্ডদানের পর সতীশবাবুর বাবার আত্মার উর্দ্ধগতি ও বালক-পুত্রের স্বাচ্ছন্দ্যবোধ। 'প্রেতাত্মার সহিত বাক্যালাপে' আমি নিজে কিন্তু বিপরীত কথাই জেনেছিলাম। অবশ্য, তা হয়ত ছিল বৈষ্ণব-বাবাজীর নিজস্ব মত'।

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটেছিল দুটি। তার একটি হ'ল, বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ দশটি উচ্চস্তরের আত্মাকে ভোজন করানো; অন্যটি, তারানাথ নামক এক ব্যক্তির অপমৃত্যুর পর তার প্রেতাত্মার ইচ্ছানুসারে ইলিশ মাছ খেতে দেওয়া। সতীশবাবু তাঁর পিতার আত্মা এনে তাঁর কাছে প্রকাশ করলেন, তিনি তাঁর সঙ্গে অশ্বিনীবাবু, কালীশ পণ্ডিত প্রমুখ আর কয়েকটি আত্মাকেও কিছু খাওয়াতে চান। তাঁদের যেন তিনি নিমন্ত্রণ ক'রে রাখেন এবং কবে ও কি খাবার তাঁদের দেওয়া যায় যেন জানান। সে খবর পরে প্লাঞ্চেটের লেখনীতে জানা গেল। তখন তাঁদের জন্য আসন পেতে পাত্রে ক'রে খাবার দেওয়া হ'ল ডাবের জল আর আম। সেই খাবার দশটি আত্মা গ্রহণও করেছিলেন। অবশ্য, দৃষ্টি-ভোগেই নাকি তাঁদের খাওয়া হয়েছিল। তাঁরা তা জানিয়েও দিয়েছিলেন। তারানাথের প্রেতাত্মার জন্য একটা ইলিশমাছ ছাদের উপর রেখে দেওয়া হয়েছিল। আত্মাটা তা খেয়ে ছাদের উপর রেখে গিয়েছিল একরাশ আঁশ। যে-বাড়ীতে সতীশবাবু ছিলেন, সেই বাড়ীতেই একসময়ে তারানাথ আত্মহত্যা করেছিল। সতীশবাবু তা জানতেন না। প্লাঞ্চেটে অশ্বিনী দত্ত-মহাশয়ের আত্মা তা প্রকাশ ক'রে দিয়েছিলেন, আর সতীশবাবুকে সতর্ক ক'রেও দিয়েছিলেন যে, ভূত হয়ে তারানাথ কিন্তু তাঁর বাড়ীতেই আছে। একদিন রাত্রে সেই ভূতেরই ছায়ামূর্ত্তি কলতলায় দেখে ভয় পেয়ে অল্পদিনের অসুখে সতীশচন্দ্রের পুত্রটি মারা যায়। সেই পুত্রের আত্মার লেখনীতেই এ তথ্য পরে প্রকাশিত হয়েছিল। অকালে কেন সে তার বাপ-মাকে ছেড়ে গেল এ-প্রশ্নের উত্তরে সে জানাল তার নিজের মঙ্গলের জন্যই তা হয়েছে। সে মঙ্গল যে কি তা অবশ্য সে বলতে চায় নি। তারানাথের প্রেতাত্মা এতই নিম্নস্তরের ছিল যে, ঠাকুর-দেবতার নাম উচ্চারণ করা তার পক্ষে সম্ভবপর হ'ত না; উচ্চারণ করতে বললে 'না-না-না-না' অক্ষরগুলো প্লাঞ্চেটে লিখিত হ'ত। অথচ সেই ঠাকুরদেবতার নাম মানুষের হলে তার নাম নিতে বাধত না। যেমন দশরথের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র বলতে হলেই সে 'না-না' লিখে অক্ষমতা জানাত। কিন্তু রামচন্দ্র নামক কোন লোকের নাম দিব্যি লিখে দিতে পারত। সেই রকম গঙ্গানাম নিতে তার বাধত না বটে, কিন্তু গঙ্গাদেবী বলতে হলেই 'না-না' ক'রে উঠত।

বিপদ

শ্রী সুধাকান্ত দে
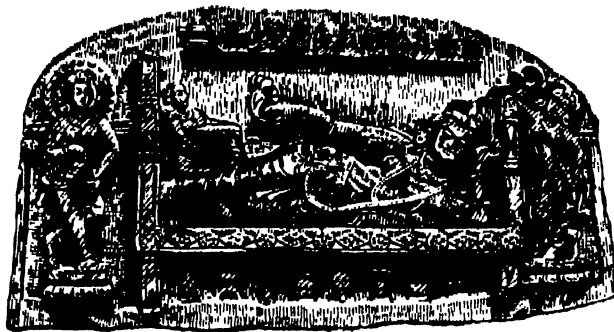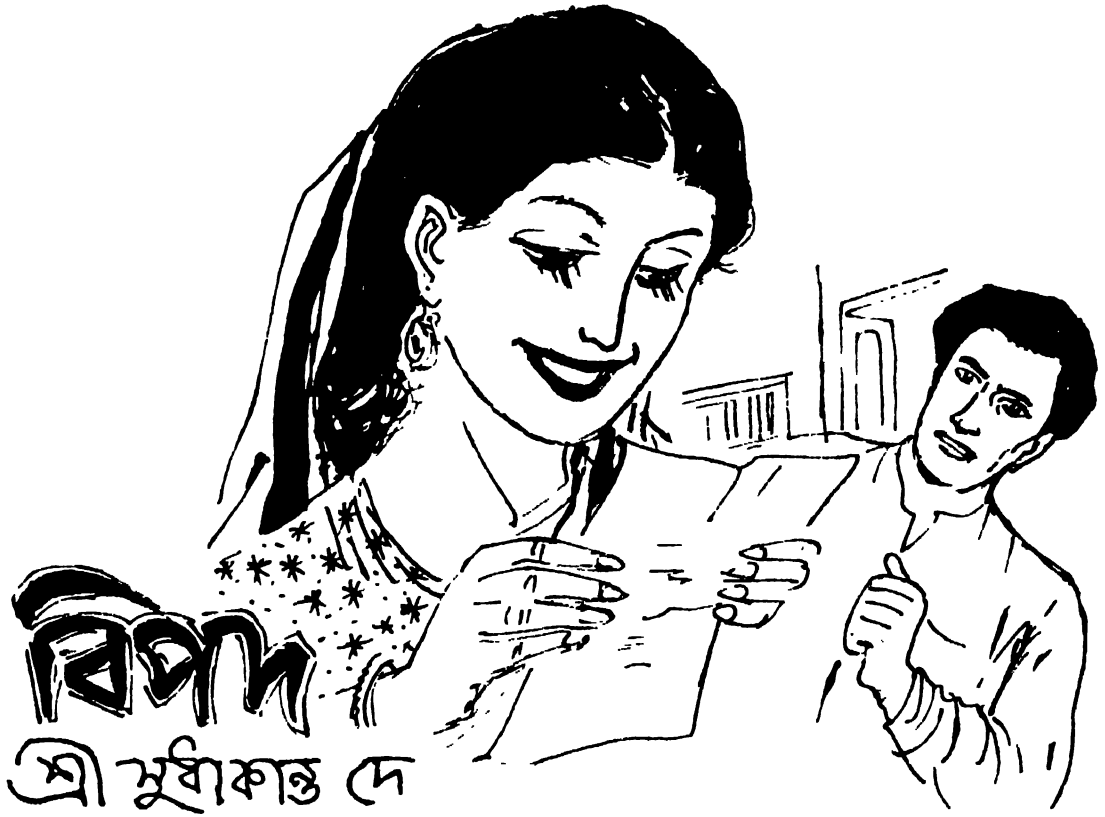
আজ অনেক—অনেক দিন পরে অমিতাভ এক অতিপরিচিত, আজ প্রায় ভুলিয়া-যাওয়া হাতের লেখা চিঠি পাইয়াছে। চিঠিটা নিম্নরূপ:

দার্জিলিঙ্
তুষার-কণা
১৯শে অক্টোবর

বন্ধু, শেষ তোমায় যে চিঠি লিখিয়াছিলাম তাহাতে এই সম্বোধনই করিয়াছিলাম। সে কত বৎসরের কথা? পাঁচ বৎসরের। মানুষের জীবনে পাঁচ বৎসর খুব বেশি সময় নয়, আবার খুব কম সময়ও নয়। যে সময় বহিয়া গিয়াছে, তার স্রোতকে উজান বহাইবার আর ত কোন উপায় নাই। কিন্তু পাঁচ বৎসর পূর্বে তোমার সহিত যে আচরণ করিয়াছিলাম, তার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তোমাকে অপমানিত করিব না। তোমার বুকের কালো ক্ষত মুছিয়া দিবার মত কোন সম্বল আমার নাই। বিশ্বাস কর, আমার সে আচরণের কারণ আমি নিজেও বুঝিতে পারি না।

কিন্তু সেই পুরাতন কাহিনী শুনাইবার জন্য তোমায় এই চিঠি লিখিতেছি না। আজ আমার তোমাকে বড়ই দরকার। আমার বিপদ্। মানুষ যেমন বিপদে পড়িয়া ভগবানের শরণ লয়, আমি তেমনই তোমার শরণ লইতেছি। আশা করি বিমুখ করিবে না। আমি পথের দিকে চাহিয়া থাকিব। তুমি কবে আসিবে লিখিও। আমি স্টেশনে নিজে উপস্থিত থাকিয়া তোমাকে বাড়ীতে লইয়া আসিব। আমার পুত্র দু'টিও তাদের মায়ের সহিত তোমায় সাদর আহ্বান জানাইতেছে। ইতি

নিজেকে আর তোমার বলিতে পারে না এজন্য দুঃখিত

অণিমা

হাঁ, পাঁচ বৎসর আগেকার কথা। সে সব কথা স্মরণ করিলে অমিতাভর চিত্ত আজও উদ্বেল হইয়া উঠে। সংসারে হাজার হাজার নারীর মধ্যে অণিমা আজ একজন মাত্র। সে নারী-মেলার মধ্যে চিরতরে হারাইয়া

গিয়াছে। কিন্তু পাঁচ বৎসর আগে ষোড়শী অণিমা তার চোখের মণি ছিল, একজন অন্যজনকে চোখের আড়াল করিতে চাহিত না। আর অণিমার ভালবাসা? সে গভীর ভালবাসা স্মরণ করিতেও আজ পরম দুঃখ। সেই অণিমা, অনিন্দ্যসুন্দরী অণিমা, একদিন কেমন করিয়া স্বচ্ছন্দে অন্য এক ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়া তাঁর ঘর করিতে চলিয়া গেল, আজও সে তা ভুলিতে পারে না।

সেই হৃদয়-নিংড়ান বেদনার এমন দিনগুলি! সেগুলির কথা মনে পড়িতেও তার সমগ্র দেহ ও মন শিহরিয়া উঠে। সে যে কেন পাগল হইয়া যায় নাই, অথবা আত্মহত্যা করে নাই, তা আজও বুঝিয়া উঠিতে পারে না। পাঁচ বৎসর পূর্বে সে কল্পনা করিতে পারে নাই, অণিমার অদর্শন একদিনও সহ্য করিতে পারিবে। অথচ তার পর পাঁচটি বৎসর চলিয়া গিয়াছে। সেই দুঃসহ-দুঃখও সময়ের প্রলেপে মুছিয়া গিয়াছে। শুধু তাই নয়। তার পর সে বিবাহ করিয়া সংসার-যাত্রাও নির্বাহ করিতেছে। এখন অণিমাকে তার দিনান্তেও মনে পড়ে কি না সন্দেহ, এবং তজ্জন্য সে দুঃখিত নয়। এমন কি, অণিমার ছবিখানা যে কোথায় রহিয়াছে, তা স্ত্রীর সাহায্য ছাড়া বলিতে পারিবে না।

তথাপি অণিমার আহ্বান তার বুকে খচ্‌ করিয়া বিঁধিল। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল।

কেন এ আহ্বান? অমিতাভকে অণিমার কি প্রয়োজন হইল? পাঁচ বর্ষ নহে, বহু বর্ষ, বহু যুগ পরে যেন এই আহ্বান আসিয়াছে। আজ অণিমা তার কেহ নয়। তবে কোন্ অধিকারে সে অমিতাভকে ডাকিতেছে? আর সেই বা কেন ছুটিয়া যাইবে? একদিন যাকে সব কিছু দেওয়াও সহজ ছিল, আজ তাকে দিবার কিছু নাই। বিপদ্! সংসারে কার না বিপদ্ ঘটে? অমিতাভ পরের বিপদে মাথা ঘামায় কি? অণিমা ত পরের চেয়েও পর। সুতরাং তার বিপদে তার কিছুই আসে যায় না। বরং তার বিপদে অমিতাভের খুশী হইবার কারণ আছে।

কিন্তু অমিতাভ খুশী হইতে পারিল না। সে অম্লানবদনে চিঠিখানা তার স্ত্রী মমতার হাতে তুলিয়া দিল।

মমতা ত চিঠি পড়িয়া হাসিয়াই খুন।

অমিতাভ এতটা আশা করে নাই। অন্য এক নারীকে বিপদে পড়িতে দেখিয়া মমতা এমন ভাবে হাসিবে, এটা তার ভাল লাগিল না। সে আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল:

'হাসছ যে?'

'চিঠি প'ড়ে।'

অমিতাভ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল:

'চিঠিতে হাসির কি পেলে?'

মমতা অমিতাভের ভ্রূকুঞ্চন লক্ষ্য করিল, কিন্তু গ্রাহ্য করিল না। তেমনি হাসি মুখে বলিল: 'মাগীর ঢং দেখে হাসছি।'

ঢং! নারীকে নারী যত সহজে বুঝিতে পারে, অন্যে তত সহজে পারে না। সুতরাং মমতার মন্তব্যে অমিতাভ অপ্রতিভ হইয়া সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাহিল।

মমতা জোরে জোরে চিঠিটা ইচ্ছামত বিভিন্ন স্থানে জোর দিয়া পড়িল, তার পর বলিল—'বন্ধু! বন্ধুতা ত তুমিই চুকিয়েছিলে, আবার ও-ডাক কেন? বিপদের কথা বলেছে, অথচ কি বিপদ্ তার আভাসমাত্র নেই—'

অমিতাভ বিনীত ভাবে বলিবার চেষ্টা করিল—'তবে কি সব মিথ্যা লিখেছে? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—'

স্বামার করুণ প্রশ্নকে আমলমাত্র না দিয়া মমতা বলিয়া চলিল—'বেশ ত, বিপদে পড়েছিস্, সোজাসুজি বল্ না, বিপদ্‌টা কি। তারপর যা পারি সাহায্য করি। তা না, ছুটে এস। মর্ জ্বালা, সংসার নেই? চাকরি নেই? তুই পাঁচ বছরের মধ্যে একবারও ত বন্ধুকে মনে করলি না? তোর সুখের দিনে একবারও ত তাদের স্মরণ হ'ল না। আর আজ বিপদে প'ড়ে সেই পুরাণো প্রেমিককে মনে প'ড়ে গেল! বলিহারি যাই! ধন্য প্রেম! কালো ক্ষত! কালো ক্ষত দেবার বেলা ত বেশ হাসিমুখ ছিল। আজ আবার বলা হচ্ছে, কেন এমন করেছি জানি না। আহা, কচি খুকী আর কি! সাধে বলি, ঢং দেখে আর বাঁচি না।'

এইরূপে অনেকক্ষণ ধরিয়া মমতা বক্ বক্ করিল আর অণিমাকে বহুবার চণ্ডী, মাগী ইত্যাদি বলিয়া গালি দিল। অমিতাভ মাঝে মাঝে দু'এক কথা বলিতে চেষ্টা করিয়া বিফল হইল।

শেষ কালে মমতা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল—'কি বিপদ্ কিছু বুঝতে পারছ?'

'না।'

'মাগী বিধবা হয়নি ত।'

'কি ক'রে বলি? তাও হয়ত না।'

মমতা গালে হাত দিয়া অপরূপ এক ভঙ্গি করিয়া বলিল, 'নিজেকে আর তোমার বলিতে পারি না এজন্ম দুঃখিত।' আহা হা! এমন নির্লজ্জ বেহায়া মেয়েমানুষ আর দু'টি আছে নাকি? কে তোমায় মানা করেছিল আমার বলতে? স্বামী বেঁচে আছে, তবু পর-পুরুষকে এমন চিঠি লিখতে বাধে না। ঝ্যাঁটা মার এই সব মেয়েমানুষের মুখে।

আবার এক প্রস্থ গালাগালি চলিল। তার পর মমতা ধীরে ধীরে শান্ত হইল। তখন তার মুখ এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। মমতা যখনই এইরূপে দেখা দেয় তখনই অমিতাভ ভাবে, ইহাকে ঘরে আনিয়া আমার ঘর আলো হইয়া গিয়াছে।

মমতা মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিয়া বলিল—'কি করবে, ঠিক করেছ?'

'তুমি যা বল।'

মমতা মৃদু—অতি মৃদু হাসিল:

'স্ত্রীর কথামত স্বামীরা কখনও চলে? তুমি যা ভাল মনে কর, তাই করবে।'

'তোমার ইচ্ছাটা কি শুনি।'

'শুনবে?'

'হাঁ।'

দাঁত দিয়া জিভ কাটিয়া মমতা কিছুক্ষণ যেন কি ভাবিল, তার পর ধীরে ধীরে বলিল—'যা—ও। তার কাছে যাও।'

'ঈস্! তার পর যদি আর ছেড়ে না দেয়। সে এখন অনেক টাকার মালিক, জান ত? সে আমায় কিনে রাখতে পারে। আমায় আসতে না দিলে—'

'ঈস্ নয়, যা-ও। আসতে না দেয়, আসবে না। তুমি সুখে থাকলে কি আমি অসুখী হব?'

'কি পাগল!' অমিতাভ সস্নেহে মমতার চোখের জল মুছাইয়া দিল। 'ঠাট্টাও কি বোঝ না?'

'আমি ত ঠাট্টা করি নি। তুমি তাকে আজও ভালবাস আমি জানি—'

'না, না, না—'

'অস্বীকার ক'রো না। আমার মন জানে, তুমি তাকে ভালবাস। আজ তিন বৎসর তোমার সঙ্গে ঘর ক'রেও যদি তা না বুঝতে পেরে থাকি, তা হ'লে মিথ্যাই তোমাকে ভালবাসলাম। আর তাকে ভালবাসা তোমার ত অন্যায় নয়, অস্বাভাবিকও নয়।' মমতা আঁচলে চক্ষু মুছিল।

অমিতাভ কিছুক্ষণ মাটির দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। তার পর দৃঢ়স্বরে বলিল—'আমি যাব না।'

'ছিঃ, রাগ ক'রো না।'

'আমি রাগ করিনি।'

'তা হ'লে যাও। আমার মাথা খাও, যাও। না গেলে ধর্মে পতিত হবে।'

'কি ক'রে?'

'একজন বিপদে প'ড়ে এমন ভাবে ডাকছে, আর তুমি চুপ ক'রে ব'সে থাকবে, তা হয় না। অন্ততঃ আমি তোমাকে তা করতে দেব না।'

'তার ত স্বামী আছে।'

'তা থাক্। সে যখন স্বামী থাকা সত্ত্বেও তোমায় ডেকেছে, তখন নিশ্চয় তোমাকেই দরকার।'

'বেশ, কি তার দরকার, তাই না হয় আগে জানাতে লিখি। তার পর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।'

'না। এমন হতে পারে তার নিতান্ত দরকার, দেরি হ'লে ক্ষতি হবে। ওগো, মেয়ে হলেও অবিশ্বাসী না হতে পারে। আর দেরি না ক'রে চ'লে যাও।'

অমিতাভ অণিমার চিঠিতে বিচলিত হইয়াছিল, কিন্তু যাইতে সে চাহে নাই। দার্জিলিংগামী ট্রেনে উঠিয়া সে প্রথম বুঝিতে পারিল, অণিমার মুখ তাকে কি দুর্নিবার বেগে টানিতেছে। কে ভাবিতে পারিয়াছিল, এ জীবনে আবার তার সহিত দেখা হইবে? সে ত তাকে মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছিল। অণিমাই তাকে ডাক দিবে, এ কল্পনা সে স্বপ্নেও করিতে পারিত না। স্বপ্নাতীত জিনিষ সত্য হইতে যাইতেছে। একবার নয় বহুবার তার মধ্যে পুরুষের অহঙ্কার মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়াছে। যে চূড়ান্ত অপমান অণিমা তাকে করিয়াছিল, তার প্রতিশোধ নেবার এই ত উপযুক্ত অবসর। কিন্তু অণিমার বিপদের আশঙ্কায় সে অহঙ্কার জয়লাভ করিতে পারে নাই। তার মন ছুটিয়া চলিয়াছে প্রকৃতির লীলা-নিকেতন দার্জিলিং শৈলশিখরে।

পাঁচ বৎসর আগেকার দেখা অণিমা কি আর সেই অণিমা আছে? ইতিমধ্যে সে দুইটি সন্তানের জননী হইয়াছে। হাজার কেন সুখ-লালিতা ও সৌভাগ্যশালিনী হউক না, সময় তার কাজ নীরবে করিয়াছে। একুশ বছরের অণিমা, ছেলেদের মা অণিমা যতটা দেখিবার মত, বড়লোকের ঘরণী অণিমা ততটা নহে।

স্বামীকে বিদায় দিতে মমতা স্টেশনে আসিয়াছিল। সে নম্র-হৃদয়ে চোখের জলের মধ্য দিয়া অমিতাভর পায়ের ধূলা লইল। সে দৃশ্য অনন্ত আকাশপটে বিলীন হইয়া যাইবে না। কল্যাণী মমতার সশঙ্ক স্নেহ ও প্রেম দিনরাত তাকে অনুসরণ করিয়া ফিরিবে। তথাপি পুরাতনকে নূতন করিয়া জয়লাভের আশায় এ যাত্রার উন্মাদনা অসীম।

মেঘ ও রৌদ্রের কান্না-হাসি অতিক্রম করিতে করিতে অপরাহ্নে অমিতাভ যখন দার্জিলিং আসিয়া পৌঁছিল, তখন স্টেশন, পথঘাট সব কুয়াশায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়াও অমিতাভ প্রথমে কিছু দেখিতে পারে নাই। অণিমাই তাকে প্রথম দেখিয়া কোলাহল করিয়া উঠিল। তার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া প্রায় চারি বৎসর বয়স্ক তার পুত্রকে বলিতে লাগিল, 'কাকা! কাকা! কাকা!'

পুরা সাহেবী পোশাকে সজ্জিত পুত্রও কথাগুলি আবৃত্তি করিল, 'কাকা! কাকা! কাকা!'

অমিতাভ স্টেশনে পা দিবামাত্র অণিমা, সেই অণিমা যাকে ভালবাসিয়া তার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এবং অনেক কাঁদিতে হইয়াছিল, মাটিতে হাঁটু গাড়িয়া প্রণাম করিল। অমিতাভর তৎক্ষণাৎ মনে হইল, মমতা সঙ্গে থাকিলে বলিত, মাগীর ঢং দেখ। তার পর ছেলের কাছে তার পরিচয় মামা বলিয়া না দিয়া কাকা বলিয়া দেওয়াও কি ঢং নয়?

নতজানু অণিমার মুখের উপর চোখ পড়িবামাত্র অমিতাভর মনে হইল, এ সেই মুখ যার জন্য সে এখনও লক্ষ মাইল দূর হইতে ছুটিয়া আসিতে পারে। অণিমা চিরকালই কৃশ ছিল। এখন কৃশতর হইয়াছে। সৌন্দর্য বাড়িয়াছে না কমিয়াছে? বলা কঠিন। কিন্তু তার মোহিনী-শক্তি যে কমে নাই, বাড়িয়াছে, তা বলা কঠিন নয়। আর সৌন্দর্য ও মোহিনী শক্তি যে এক জিনিষ নয়, তা কে না জানে?

অণিমার সহিত বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইতে হইতে অমিতাভ জিজ্ঞাসা করিল, 'গৃহকর্তা? গৃহকর্তা কৈ?'

অণিমা মৃদু-মধুর হাসিল। অপাঙ্গে এক প্রকার দৃষ্টি হানিয়া বলিল, 'ও আমার কপাল! তেমন ভাগ্য ক'রে আসি নি।'

অণিমার কথা প্রহেলিকার মত মনে হইল। তথাপি তার অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিতে তার সাহস হইল না।

পরক্ষণেই কিন্তু অণিমা গম্ভীর হইয়া গেল। বেশ সহজ ভাবে বলিল, 'উনি মফঃস্বলে গেছেন। ত্রিশ দিনের মধ্যে উনত্রিশ দিন বাইরে থাকতে হয়। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।'

চমৎকার! যেন তাঁর সঙ্গে যাহাতে দেখা না হয় সেজন্য অমিতাভ ব্যাকুল হইয়াছে। বরং এইরূপে চোরের মত পর-গৃহে বাস করাকেই সে ঘৃণা করে। তার মন অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু অণিমা যেজন্য তাকে ডাকিয়াছে তা বলিতে দেরি করিতেছে কেন? সে কি আহ্বান? কেন সেই আহ্বান? আজ বিপদের কোন লক্ষণ চোখেমুখেও ত প্রকাশ পাইতেছে না। হাসিতে ঐশ্বর্যে ঝল্‌মল্ করে অণিমা। এ কি অভিনয় বা ষড়যন্ত্র? অণিমার কুসুম-কোমল মুখের দিকে চাহিয়া তা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

পরম স্নেহ ও আদরের মধ্যে অমিতাভর চা-পান শেষ হইল। বাড়ীর সর্বত্র ঐশ্বর্য ও সুরুচির পরিচয়। কলিকাতার বাসায় বসিয়া বহুমূল্য গালিচার উপর পা রাখিয়া অণিমা ও তার পুত্রের সহিত মুখোমুখি বসিয়া এইরূপ সান্ধ্য চা-পানের কথা সে ভাবিতেও পারে না। তথাপি অমিতাভর জড়তা ও আড়ষ্টতা দূর হয় না।

অমিতাভ জিজ্ঞাসা করিল, 'কি জন্য ডেকেছ?'

'শুনবে বন্ধু, শুনবে। কিন্তু আজ নয়, এখন নয়। শোনাবার জন্যই ত ডেকেছি। এখন বিশ্রাম কর, নিজেকে উপভোগ কর।'

নিজেকে না তোমাকে? এই প্রশ্ন অমিতাভর জিভের আগায় আসিয়াছিল। কিন্তু সে নিজেকে সামলাইয়া লইল। ছেলেটি বড় চতুর। যা শোনে তা মনে করিয়া রাখে এবং আবৃত্তি করিতে পারে।

এইরূপে অণিমার বাড়ীতে অমিতাভর দুই দিন কাটিয়া গেল। তার জীবনে বিচিত্র এই দু'দিন। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায় পুরাতন দার্জিলিঙের অপরূপ শোভা সে নূতন করিয়া আবিষ্কার করিল। এই দু'দিনই সে মমতাকে কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী চিঠি লিখিয়াছে, তার কথা অনেকবার ভাবিয়াছে, মনের মধ্যে অস্বস্তি অনুভব করিয়াছে, তথাপি এই দুটি দিন তার মনের মধ্যে অপরূপ মিষ্টতায় সঞ্চিত হইয়া রহিল।

তার মনের অস্বস্তি অণিমা লক্ষ্য করিয়াছিল কি না সেই জানে। সে বার বার করিয়া বলে, 'তোমায় যত্ন করতে পারছি না। তোমার কষ্ট হচ্ছে।'

অমিতাভকে বার বার করিয়া বলিতে হয়, 'না, না, না।'

দার্জিলিঙ প্রকৃতির লীলা-নিকেতন। প্রকৃতির এই রাজ্যে, নিজের অজ্ঞাতে নর-নারীর মনে নব নব দৃশ্য এক বিচিত্র মায়াজালের সৃষ্টি করে। অমিতাভ যতই অধীর হইয়া উঠুক, মমতা তাকে যতই আকর্ষণ করুক, মাঝে মাঝে সে আত্মহারা হইয়া যায়। বিশেষতঃ পূর্বতন প্রিয়ার কাছাকাছি হইবার এই অপূর্ব সুযোগ এক অজানা সুরের কাঁপন ধরায়, তার মন রঙীন হইয়া উঠে।

মাঝখানের পাঁচটা বৎসর যদি সত্য না হইয়া স্বপ্ন হইত! আজ এই সুন্দর দার্জিলিঙ শহরে অণিমা যদি পরের স্ত্রী না হইয়া তার স্ত্রী হইত এবং খোকা দুইটি তার হইত।

সকালে ও রাত্রে খাওয়া-দাওয়া চুকিবার পর ছেলেদের লইয়া আয়া চলিয়া যায় অথবা শোয়াইয়া দেয়। তারা দু'জনে চুপচাপ মুখোমুখি হইয়া বসিয়া থাকে। ভারী ভাল লাগে এইরূপে অণিমার সঙ্গ উপভোগ করিতে। বিশেষ, স্নিগ্ধ শীত-গভীর রাত্রে। অণিমার পল্লব-ঘন দু'টি চোখে কোন্ ভাষা ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠে। সে কি এই ভাষা?

'বন্ধু, সব স্বপ্ন, সব মায়া, দার্জিলিঙের মেঘ ও রৌদ্রের মত মিথ্যা। সত্য তুমি আর আমি। আমায় একবার ডাক দাও। আমি তোমার হাতে ধরা দিব। তোমার হাতে মরিতে চাই। তুমি মরিবার জন্য ডাক, ডাক।'

কিন্তু সে ডাক দিবার ক্ষমতা অমিতাভর নাই। অণিমা অমিতাভকে আহ্বান করিয়াছে। তার পর স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। একদিন দুইটি জীবনের যাত্রাপথ ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাদের মিলিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

এইরূপে সপ্তাহ কাটিয়া গেল। যে বিপদের কথা বলিয়া অণিমা ব্যাকুলভাবে চিঠি লিখিয়াছিল, তা কি মিথ্যা কথা? হোক্ মিথ্যা, অমিতাভ তা লইয়া আর প্রশ্ন করিবে না। সে শুধু সংক্ষেপে জানাইল, 'যেতে হবে।'

'এত শীগ্‌গির?'

'শীগ্‌গির! এক সপ্তাহ কেটে গেছে।'

অণিমা যেন ঘুম হইতে জাগিল। এক সপ্তাহ! তার সুশৃঙ্খল সাজান জীবনে এক সপ্তাহ কতটুকু সময়? কত সপ্তাহ আসে, কত সপ্তাহ যায়, তার পদধ্বনিও শোনা যায় না। কিন্তু এই সপ্তাহ বুঝি অন্য সপ্তাহগুলির মত নয়। আপন মনে কি ভাবিয়া লইয়া তার সুন্দর মাথাটি দোলাইতে দোলাইতে বলিল: 'তা যাবেই ত, তা যাবেই ত। আর দু'দিন অপেক্ষা কর।'

সেদিন তারা দু'জনে কার্ট রোড ধরিয়া অনেক দূর বেড়াইতে চলিয়া গিয়াছে, যেমন প্রতিদিন যায়। কিন্তু অণিমা যেন নূতন মূর্তিতে দেখা দিয়াছে। এ কোন্ অণিমা? কোন্ কথা স্মরণ করিয়া তার মুখ বার বার
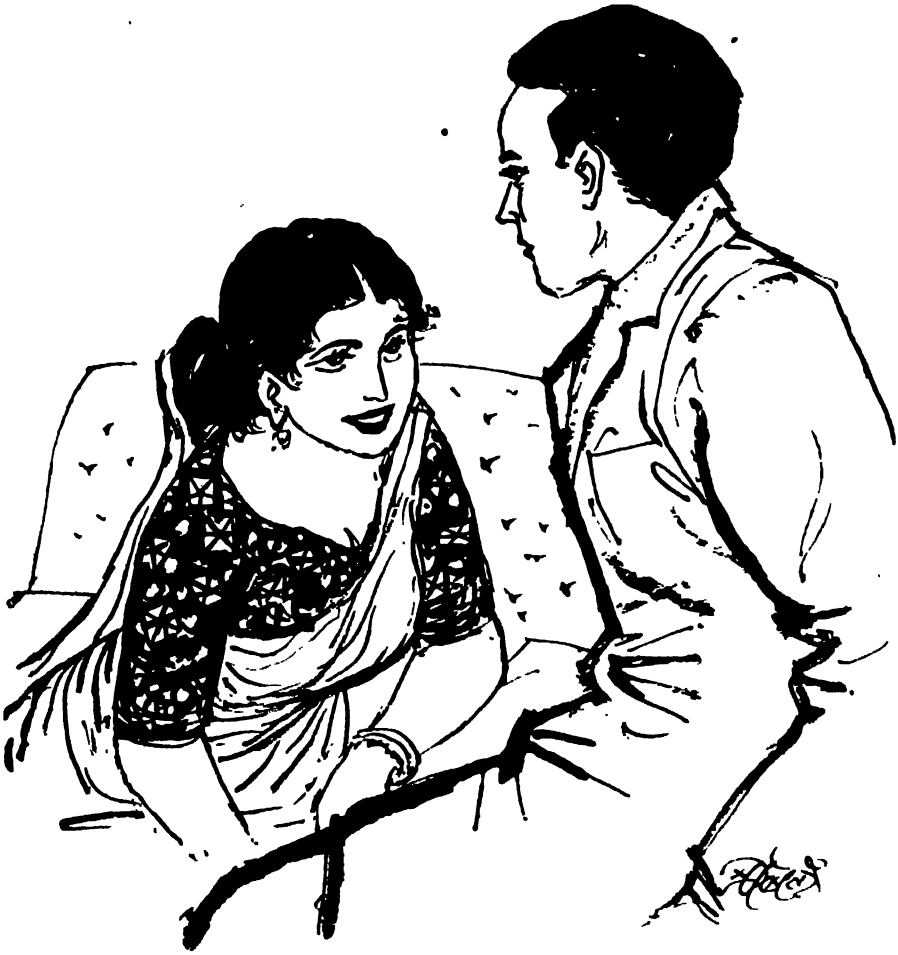
শোন বন্ধু, তোমায় কি জন্য ডেকেছি বুঝেছ কি?

সিন্দূরের মত লাল হইয়া উঠিতেছে? কেন সে এত অমিতাভর চোখের সন্ধান করিতেছে? ক্ষণে ক্ষণে বুকের নিঃশ্বাস কেন জোরে জোরে পড়িতেছে?

তারা বসিবার ঠিক সেই জায়গাটিতে আসিয়াছে, যেখান হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। দু'জনে কাছাকাছি বসিল।

অমিতাভ উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিল:

'কি সুন্দর।'

অণিমার গাল লাল হইয়া গেল।

অমিতাভ নিজের মনে বলিয়া চলিল: 'কাঞ্চনজঙ্ঘা কখনও পুরণো হয় না। দার্জিলিং কখনও পুরণো হয় না। পরিষ্কার আকাশে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে যত দেখি, দেখার আশা আর মেটে না। আরও দেখতে ইচ্ছা করে।'

হায়! এই উচ্ছ্বাসের মধ্যে অণিমার স্থান কোথায়? আপনার অজ্ঞাতসারে তার বক্ষ হইতে এক দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইল। সে আলগোছে অমিতাভর একটি হাত নিজ হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল: 'শোন বন্ধু, তোমায় কি জন্য ডেকেছি, বুঝেছ কি?'

অমিতাভ নড়িয়া-চড়িয়া স্থির হইয়া বসিল, তার পর গম্ভীর ভাবে বলিল: 'না।'

অণিমার মুখে এক অদ্ভুত হাসি দেখা দিল: 'আমার জীবনে তোমার কোন প্রয়োজন নাই, আজ কোন প্রয়োজন নাই। একদিন ছিল, খুব ছিল, কিন্তু সেদিন কত দূরে চ'লে গেছে, মনে পড়ে না। তবু যে পাঁচ বৎসর পরে তোমায় ডেকেছি, তার কারণ আছে।

'বন্ধু, বিপদে প'ড়েই তোমায় ডেকেছি। অণিমা স্বার্থপর সে ত জানই। একদিন তার চূড়ান্ত পরিচয় পেয়েছিলে। কাজেই বিপদে প'ড়ে তোমায় ডাকব, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আশ্চর্য হয়ো না, বন্ধু।'

অণিমা কথার মাঝখানে দম্ লইল। কিন্তু অমিতাভর মনে হইল, আজ সপ্তাহ ধরিয়া সে যে সুন্দর স্বপ্ন দেখিতেছিল, তা এক মুহূর্তে চুরমার হইয়া গেল। অনন্ত প্রত্যাশা ছিল, কিছুমাত্র বাকী রহিল না। তখন তার মনে হইল, সে অণিমার প্রতি অবিচার করিয়াছে। আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্যে এই গোপন আহ্বান, ক্রমে ক্রমে এই ধারণা তাকে পাইয়া বসিয়াছিল। এখন তার মনে হইল, অণিমা খাঁটি সোনা। সঙ্গে সঙ্গে তার মন আনন্দে ভরিয়া গেল। সে কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

অণিমা থামিয়া থামিয়া বলিয়া চলিল: 'শোন। এমন বিপদে কোনদিন কোন মানুষ পড়েছে কি না সন্দেহ। আমার কোনদিকে কোন অভাব নাই। স্বামী ভালবাসেন, বিশ্বাস করেন। নইলে কি আজ তোমায় ডেকে আনবার সাহস করতাম? কিন্তু—কিন্তু পাঁচ বৎসর আগে তোমাকে বুকে দাগা দিয়ে যে আমি এসেছি সে কথা কিছুতেই ভুলতে পারি না। প্রত্যেক কাজে, শয়নে, স্বপ্নে আমার বুকে কাঁটা বিঁধে আছে। আহা! না জানি সে সময়ে তুমি কি আঘাতই পেয়েছিলে। সেই আঘাত শতগুণ হয়ে আমার বুকে বাজে। তোমার মলিন-কাতর মুখ আমার সকল সুখকে ম্লান ক'রে দেয়। সুখী আমি হয়েছি, কিন্তু এই পাঁচ বৎসর আমি যে কি অশান্তির আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরেছি, তা তোমায় বলতে পারি না। যখনই ভাবি, তোমাকে যন্ত্রণা দিয়েছি, তখনই আমার সব কিছু, আমার জীবন বিস্বাদ হয়ে যায়। আজ পাঁচ বছর, হাঁ পাঁচ বছর, এই শত্রু আমাকে পিছনে তাড়া ক'রে ফিরেছে।

'তারপর ঠিক করলাম, একে নির্মূল করতে হবে। এই বিপদ্ থেকে উদ্ধার করবার মালিক তুমি। তোমাকে দেখে যদি বুঝতে পারি, তোমার মুখ থেকে নিঃশেষে বেদনার ছাপ মুছে গেছে, তা হ'লে আমি কতকটা সান্ত্বনা পাব। জানি, কি বিষম জ্বালা তুমি একদিন ভোগ করেছ, বন্ধু, আমার এই অন্তরে তা টের পেয়েছি। তাকে মুছে ফেলবার কোন উপায় নাই। যা হয়ে গেছে তা আর ফিরাবার উপায় নাই। কিন্তু ভাবী জীবনকে ত আমরা আরও একটু শান্তিময় করতে পারি। নিজের ভার আরও একটু লাঘব করতে পারি।

'আমি জানি তুমি বিয়ে করেছ। তোমার বিয়ের খবর আমায় প্রথম কি যে সান্ত্বনা দেয়, বলতে পারি না। তখন বুঝলাম, তুমি আমায় ক্ষমা করেছ। কিন্তু তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার অবসর আমার মিলল কৈ? এতদিন জ্বলে-পুড়ে মরেছি, তবু তোমায় ডাকবার সাহস পাইনি। এবার মরীয়া হয়ে ঠিক করলাম, তোমায় ডাকব। তুমি শোন বা না শোন তোমায় ডাকব। আমার ভাগ্যক্রমে আমার ডাক শুনেই তুমি ছুটে এসেছ। এখন তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তুমি বল, কিসে আমার মনের জ্বালা জুড়াই। তুমি আমায় উপায় ব'লে দাও, বন্ধু।'

অমিতাভ চমৎকৃত হইল। অণিমার চোখের জল তাকে বিস্মিত করিল না। সে জানে, নারী কল্যাণময়ী। কিন্তু স্বামীসোহাগিনী কোন নারী যে অন্যের হৃদয়-জ্বালায় এরূপ বেদনা অনুভব করিতে পারে, তা সে ধারণা করিতে পারে না। হউক না সে নারী তার একদিনের প্রিয়তমা। সে ধীরে ধীরে বলিল—'অণি, কিসে তোমার এ জ্বালা যাবে, বল।'

অণি অদ্ভুত কথা বলে—'যদি তোমায় সর্বদা চোখের সামনে দেখতে পেতাম, দেখতাম তুমি সত্যি সুখী হয়েছ, তা হ'লে আমার জ্বালা নিবত, শান্তি পেতাম।'

কিন্তু তা ত হইবার নয়। সুতরাং অমিতাভকে এই অদ্ভুত আবদারে সম্মত হইতে হইল যে, সে সপ্তাহে এক-খানা করিয়া চিঠি অণিমাকে লিখিবে। আর কিছু নয়? না, আর কিছু নয়। শুধু এইটুকু জানাইবে যে সে ভাল আছে। এই চিঠিতে অণিমার মনের জ্বালা জুড়াইবার কি সাহায্য হইবে, অমিতাভ বুঝিতে পারিল না। তবে নারী-চরিত্র নাকি রহস্যময়, তা হোক না সে নারী খাঁটি সোনা, তাই সে সম্মত হইল।

দার্জিলিঙ হইতে কলিকাতাগামী ট্রেনে চাপিয়া অমিতাভর অবস্থা দুর্যোধনের মত হইল। হরিষে বিষাদ। সে বার বার করিয়া নিজের কাছে আবৃত্তি করিল—'কিছুই বোঝা গেল না।'

অণিমা অবশ্য চোখের জলের মধ্য দিয়া অমিতাভকে বিদায় দিল। হয়ত অণিমা তাকে কিছুই দেয় নাই। তথাপি নতজানু অণিমাকে দেখিয়া তার বলিতে ইচ্ছা করিল—'তুমি মোরে করেছ সম্রাট্।'

অণিমাকে সে ভাল করিয়া স্পর্শ পর্যন্ত করে নাই, যদিও তাতে বাধা ছিল না। এমন কি, এখন যখন সে চোখের আড়াল হইয়া গিয়াছে, তার মনে হইতেছে তার দিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া পর্যন্ত দেখে নাই। আজ তাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইলেও নিষেধ করিবার কেহ ছিল না।

'তুমি মোরে করেছ সম্রাট্।'

অণিমার কাছে সে কি পাইয়াছে? কিছু কি পাইয়াছে? সে কি পাইবার আশা করিয়াছিল, নিজেই ভাল করিয়া জানে না। কি পাইয়াছে, তাও জানে না। তবু তার বলিতে ইচ্ছা যাইতেছে

'তুমি মোরে করেছ সম্রাট্।'

এদিকে যে সময়ে মন্থরগতি দার্জিলিঙের ট্রেন মেঘ ও রৌদ্রের নানা দৃশ্যের মধ্য দিয়া ছুটিতেছে, তখন অমিতাভর পকেটে অণিমার লেখা এক চিঠিও ছুটিতেছে। এই লিপির কথা অমিতাভ কিছুই জানে না। কারণ তার অজ্ঞাতসারে অণিমা ইহা তার পকেটে রাখিয়া দিয়াছে। পকেটে হাত দিলেই উহা তার হাতে ঠেকিবে এবং সে খুলিয়া পড়িবে, ট্রেনে করিয়া দূরে যাইতে যাইতে পড়িবে, এই আশায় অণিমা ইহা রাখিয়া দিয়াছে। লিপির মর্ম এই—

দার্জিলিঙ
তুষার-কণা
২৭শে অক্টোবর

বন্ধু, তোমার মত ভীরু এবং নির্বোধ লোক আমি পৃথিবীতে দু'টি দেখি নাই। আমি ভাবিতে পারি না, তোমার মত আর কেহ আছে। যে তৃষ্ণার্ত পথিক তৃষ্ণার জল সম্মুখে পাইয়াও পান করে না, তাকে কি বলিব? তোমাকে কেন ডাকিয়া লইয়াছিলাম, তুমি কি কিছুই বুঝিতে পার নাই? একবারও জিজ্ঞাসা করিতে পারিতে, কেন ডাকিলাম। না-হয় বিপদের কথা লিখিয়াছিলাম ও গল্প করিয়াছিলাম। তাতে একবার আমার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতে তোমায় কে নিষেধ করিয়াছিল?

এত কাছে সপ্তাহাধিক কাল থাকিলে, তবু তোমার মনে কোন ছায়াপাত হইল না? কোন প্রশ্ন জাগিল না? তুমি যেন কি! জান কি, বন্ধু, তোমার ও আমার মধ্যেকার দরজা কোনদিন বন্ধ থাকিত না, ভেজান থাকিত মাত্র। এই কথা শুনিয়া তুমি সুখী হইবে, না দুঃখিত হইবে যে, আমি তোমার অপেক্ষায় বিনিদ্র রজনী কাটাইয়াছি? দিনের পর দিন।

তুমি যে কত বড় হৃদয়হীন, তাও বুঝিলাম। তোমার হৃদয়ে আজ আর অণিমার কোন স্থান নাই। অথচ একদিন ছিল যখন অণিমাকে না হইলে তোমার এক দণ্ডও চলিত না। এই কথা শুনিয়া কি তোমার অন্তর হায় হায় করিয়া উঠিবে না যে, তোমার অণিমাকে তুমি অতি সহজে পাইতে, প্রতিদিন পাইতে, একটু যদি যত্ন করিতে, এবং এখন আর কোনদিন তাকে পাইবে না। দরজা চিরকালের জন্য বন্ধ হইয়াছে। আমি নিজে অগ্রসর হইতে পারিতাম। কিন্তু লজ্জায় নয়, ভয়ে অগ্রসর হইতে পারি নাই। পাছে তুমি ঘৃণা কর, এই ভয়। বিদায়, নিষ্ঠুর অথচ মধুর বন্ধু, বিদায়। ইতি

তুমি চাও না তবু তোমারই
অণিমা।

সারা পথে পকেটে হাত দিবার প্রয়োজন অমিতাভর একবারও হইল না। সুতরাং অণিমার চিঠি তার কাছে অনাবিষ্কৃত রহিয়া গেল।

অমিতাভ মমতাকে সকল কথাই খুলিয়া বলিল। অণিমাকে সপ্তাহে একখানা চিঠি লিখিবে বলিয়া আসিয়াছে, তাও বাদ দিল না।

সমস্ত শুনিয়া মমতা জ্বলিয়া উঠিল। 'মাগীর ঢং-এর আর সীমা নেই।'

অমিতাভ পরামর্শ চাহিল, 'কি করব ? তুমি যা বলবে তাই করব।'

অণিমার বিরুদ্ধে বিস্তর সুমধুর বিশেষণ প্রয়োগ করিবার পর মমতা স্থির হইল।

'আমার আপত্তি নেই।'

চার-পাঁচ দিন পর। অমিতাভ খাওয়া-দাওয়ার পর আফিসে গিয়াছে। দার্জিলিং-এ যে শীতবস্ত্রগুলি স্বামীর সঙ্গে গিয়াছিল, মমতা সেগুলি রোদে দিতেছে। এমন সময় একটা কোটের পকেট হইতে একখানা চিঠি পড়িয়া গেল। মমতা কুড়াইয়া দেখে, উপরে লেখা অমিতাভ দাশগুপ্ত। আঁটা খাম। টিকিট নাই, নিশ্চয় ডাকে আসে নাই। মেয়েলি হাতের লেখা। কে চিঠি লিখিল ? আর স্বামীর এমন আলস্য, এটা খুলিয়া পড়িবার অবসর পর্যন্ত তাঁর হয় নাই।

সে খাম ছিঁড়িয়া চিঠি পড়িল। পড়িতে পড়িতে তার মনে হইল, কেহ যেন তপ্ত শলাকা তার চোখে বিদ্ধ করিয়া দিয়াছে। উঃ, এই অণিমা! কি ভয়ঙ্কর মেয়ে! আজ স্বামী আসুন। এই চিঠি দেখাইয়া একটা হেস্তনেস্ত করিতে হইবে। তার সহিত তিনি আর কোন সম্পর্ক রাখিতে পারিবেন না।

বেলা বাড়িয়া চলিয়াছে, সেদিকে মমতার ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। অস্নাত, অভুক্ত সে বসিয়া আছে। অন্তরের সমস্ত জ্বালার মধ্যে এইটুকু সুখের হিল্লোল বহিতেছিল যে, স্বামীকে সেই নাগিনী বশ করিতে পারে নাই। স্বামীর বিমল চরিত্রের কথা মনে করিয়া তার গর্ব হইল। উদ্দেশে তাকে বার বার প্রণাম জানাইল।

না, এমন স্ত্রীলোকের সহিত তার স্বামী কোন সম্পর্ক রাখিবেন না। শুনিবামাত্র তাঁর সমস্ত অন্তর ঘৃণায় ভরিয়া যাইবে। তিনি ত তাকে কোন কথা গোপন করেন না। আজও করিবেন না। করিবার কিই-বা আছে ? তাঁর অন্তর ত স্বচ্ছ। তারপর আর কি তিনি অণিমার নাম মুখে আনিবেন ? কখনোই না। অণিমার প্রতি তাঁর বর্ধমান অপরিসীম ঘৃণার কথা মমতা যত ভাবে তত তার মনে এক বিজাতীয় আনন্দের উদয় হয়। এখন শুধু স্বামীর ফিরিয়া আসার অপেক্ষা।

ঝি দুই-তিনবার স্নানের তাড়া দিয়া নিজে তাড়া খাইল।

'মা, আজ কি তুমি চান করবে না, মা ?'

'না, করব না। তোর তাতে কি ?'

'ওমা! বেলা যে গড়িয়ে গেল। বাবু আসবার সময় হ'ল। এসে দেখে রাগ করবেন না ? তোমার হাতে ও কিসের চিঠি মা ?'

'ঝি, নিজের চরকায় তেল দাও গে যাও। সব কথায় তুমি কথা কইতে আস কেন, বল ত ?'

ঝি'র চোখে জল দেখা দিল। সে তাড়াতাড়ি সরিয়া গেল। চোখের জল দেখিয়া মমতার মনটা একটু খারাপ হইল। চোখে জল আসিবার মত কথা ত সে বলে নাই। আচ্ছা, স্নানটা সারিয়া লওয়া যাক্।

অণিমার চিঠির কথা অমিতাভ নিশ্চয় জানে না। মাগী নিশ্চয় তাঁর অলক্ষিতে তাঁর পকেটে রাখিয়া দিয়াছিল। যে ভোলা মন। পকেটে আর হাত দেন নাই। কিন্তু যদি ট্রেনে ঐ চিঠি খুলিয়া পড়িতেন, তা হইলে কি করিতেন ? ভাবিতেও তার শরীর শিহরিয়া উঠে।

কিন্তু—কিন্তু চিঠিটা তাঁর হাতে দেওয়া কি ঠিক হইবে ? হাজার হোক, অণিমা নারী মমতার হাত দিয়া যদি এ চিঠি অমিতাভর হাতে পৌঁছায়, তবে তা হইবে চূড়ান্ত অপমান। নারীর এই পরম লজ্জা নারী হইয়া সে কেমন করিয়া সহ্য করিবে ? অমিতাভ যদি নিজে চিঠি খুলিয়া পড়িত এবং তার পর তা ছিঁড়িয়া ফেলিত বা তার হাতে দিত, তা হইলে অন্য কথা হইত। কিন্তু অণিমার চিঠি মমতা দেখিল যে!

তাই বলিয়া চণ্ডী মাগীর কাণ্ডটা স্বামীর অজ্ঞানা থাকিবে, ইহা কি উচিত ? অণিমাকে তিনি স্বর্গের দেবী মনে করেন। এইবার বুঝুন—

নাঃ, মাথাটা গরম হইয়া উঠিল। মাথায় সে বালৃতি বালৃতি জল ঢালিতে লাগিল। মাথা আর ঠাণ্ডা হইতে চায় না। তার পর হঠাৎ ভিজা গায়ে, ভিজা কাপড়ে দৌড়িয়া বাহির হইয়া চিঠিটার উপর পড়িল, চিল যেমন করিয়া শিকারের উপর পড়ে। তার পর সেই চিঠি সে কুচিকুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। তার পর শান্ত মনে গিয়া স্নান সারিল ও দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া রহিল। বাহিরে গনগনে আগুনে চিঠির টুকরাগুলি ভস্ম হইয়া গেল। ঘরের ভিতরে অকারণে মমতার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

অমিতাভর ফিরিবার সময় হইতেই সে উঠিয়া ভাল করিয়া মুখ ধুইল। ঝি ময়দা তৈরী করিয়াছিল। সে লুচি ভাজিতে বসিল ও চায়ের জল ঠিক করিয়া রাখিল। এইরূপে মমতা দৈনন্দিন কাজে নিজেকে আবার ব্যাপৃত করিল। ঝিকে তার ভাতগুলি এক ভিখারীকে দিতে বলিল। তার মুখের দিকে চাহিয়া ঝি নিরুত্তরে আদেশ পালন করিল।

অমিতাভ ফিরিয়া আসিয়া রান্নাঘরের রোয়াকে দাঁড়াইবামাত্র মমতা একবার তার হাসিমাখা মুখের দিকে তাকাইল। তারপর গলায় আঁচল দিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল, বাধা মানিল না।

অপ্রস্তুত অমিতাভ দুই পা পিছনে সরিয়া গিয়া বলিল, 'কি কর? কি পাগলামি কর?'

ততক্ষণে শান্ত প্রণাম করিয়া মমতা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাকাব্যের নবতম দিগ্দর্শন

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

নজরুল-কাব্যের দু'টি মূল দিক্ হ'চ্ছে প্রেম এবং সমাজ। তাঁর সাধনভূমি স্বদেশও এই সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত। তাঁর নারী-প্রেম এবং দেশ-প্রেমের মধ্যে পার্থক্যটা মূলতঃ বাইরের, ভিতরের নয়। আবার একদিকে নারী-প্রেম ও অপরদিকে দেশ-প্রেম তাঁর মধ্যে যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে, তাতে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছেন বিদ্রোহীবেশে, প্রেম তাঁকে মাত্র স্বপ্নবিলাসী ক'রে রাখে নি। এখানে নারী-প্রেমের নারী কাল্পনিক দয়িতাও হ'তে পারে, আবার স্বদেশ-লক্ষ্মীও হ'তে পারে। যেমন—

মনে মনে বলি, তুমি যে আমার ছন্দ-সরস্বতী,
ওগো চঞ্চলা, আমার জীবনে তুমি দুরন্ত গতি।
... ...
তোমার অধরে আঁখি পড়ে যবে, অধীর তৃষ্ণা জাগে,
মোর কবিতায় রস হয়ে সেই তৃষ্ণার রং লাগে।
... ...
সুর হয়ে ওঠে সুরা যেন, আমি মদিরামত্ত হয়ে
যৌবনবেগে তরুণেরে ডাকি খর তরবারি লয়ে।...

কোন কোন সমালোচক নজরুলের এই নারীকে বাস্তব জগতের দয়িতা হিসেবে অঙ্কন করেছেন। যেমন, সৈয়দ আলী আশরাফ বলেছেন: নজরুলের প্রিয়া কোন আদর্শ কাল্পনিক প্রিয়া নয়, কোন মায়ালোকবাসিনী স্বপ্নলোকবিহারিণী রহস্যময়ী জীবনদেবী বা জীবনদেবতা নয়, এ প্রিয়া একান্তভাবে রক্তমাংস মজ্জায় সজ্জিত মর্ত্যলোকের মানবী। তবে এ মানবীকে কবি দেখেছেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে। কখনও মনে হয়েছে—এ যেন প্রিয়া নয়, এ যেন চিরশুদ্ধা তাপসকুমারী, আবার কখনও তাঁর প্রিয়া গৃহিণীরূপে অবতীর্ণা হয়েছেন। প্রিয়ার বিচিত্র রূপ ও তার সাথে মান-অভিমানের পালাই হচ্ছে নজরুলের কাব্যের উপজীব্য। এই প্রিয়াই তাঁর কাছে বিশেষতম নারী হয়ে দেখা দিয়েছে। কখনও সে—

বিজয়িনী নহ তুমি—নহ ভিখারিণী;
তুমি দেবী চির শুদ্ধা তাপস-কুমারী,
তুমি মম চিরপূজারিণী।

আবার কখনও—

প্রিয়া রূপ ধরে এত দিনে এলে আমার কবিতা তুমি,
আঁখির পলকে মরুভূমি যেন হয়ে গেল বনভূমি।

নারী যেখানে কবির কাছে কোন বিশেষের মধ্যে পর্যবসিত, সেখানেও যৌবনের আত্মসমর্পণে অতৃপ্তির বিস্বাদই বেড়ে উঠেছে। তাই বিশেষের মধ্যে কবিসন্ধান করেছেন চিরকালের অনামিকাকে। কখনও কখনও সেই সন্ধান থেকে উদ্ভূত হয়েছে 'সহজিয়া সাধনার প্রেমিকের মত' যৌন-দর্শন, যেমন—

প্রেম সত্য চিরন্তন, প্রেমের পাত্র সে বুঝি চিরন্তন নয়,
জন্ম যার কামনার বীজে,
কামনারই মাঝে সে যে বেড়ে যায় কল্পতরু নিজে।
... ...
প্রেম সত্য, প্রেমপাত্র বহু অগণন,
তাই চাই, বুকে পাই, তবু কেন কেঁদে ওঠে মন?

এই ক্রন্দন সেই চিরকালের অনামিকার উদ্দেশেই। কবির কাছে তখন এ পৃথিবীর রক্তমাংসের প্রিয়া মিথ্যা হয়ে যায়, তখন কবি উর্ধ্বলোকে দু'চোখ বিস্ফারিত ক'রে বলেন—

অনন্তলোকে অনন্তরূপে কেঁদেছি তোমার লাগি,
সেই আঁখিগুলি তারা হয়ে আজো আকাশে রয়েছে জাগি

তাঁর দোলন চাঁপা, সিন্ধুহিন্দোল, ছায়ানট, চক্রবাক, নতুন চাঁদ প্রভৃতি গ্রন্থে এই জাতীয় কবিতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তবু একথা নিঃসন্দেহ যে, নজরুল-কাব্যে প্রণয়ের যে প্রকাশ, তা যৌবনের আবেগধর্মী যতটা, পরিণত বয়সের গাম্ভীর্যের স্পর্শ তাতে তত বেশী নেই। কিন্তু নজরুলের ভাবধারায় হিন্দু-দর্শন-শাস্ত্র ও সুফীমতবাদের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়।

নজরুলের পিতা কাজী ফকির আহমদ বিশেষ ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, এবং কাকা কাজী ফজল করীম ভাল ফার্সি জানতেন। শিশুকাল থেকেই নজরুলের উপর তাঁর বাবা ও কাকার প্রভাব পড়েছিল। ফকির আহমদের প্রথম চার পুত্রের মৃত্যুর পর জন্ম হয় নজরুলের। বাবা-মা তাঁর নাম রাখলেন 'দুখু মিয়া'। বাবা-মার অনেক দুঃখের ধন ছিলেন নজরুল। সংসারটাও ছিল অতি গরীব। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই ক'রে বহু দুঃখ তবে বড় হ'তে হয়েছে নজরুলকে। পরবর্তী জীবনে তিনি নিজেই বলেছেন: 'সকল ব্যথিতের ব্যথায়, সকল অসহায়ের অশ্রুজলে আমি আমাকে অনুভব করি।...এই ব্যথিতের অশ্রুজলের মুকুরে যেন আমি আমার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই।'

দুঃখের সংসারে দুখু মিয়া ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছিলেন। ১৯১৬ সালে দশ বছর বয়সে গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা পাস করেন নজরুল। ইতিমধ্যে ফকির আহমদ পরলোকগত হন। দুঃখের সংসার তখন আরও দুঃখের অভিঘাতে ভেঙে পড়ে। বাধ্য হয়ে মক্তবেই মাষ্টারী নিতে হয় নজরুলকে। মাঝে মাঝে হাজী পহ্লোয়ানের মাজারে খাদেমগিরি ও ইমামতি করতে থাকেন। ছেলেরা তাঁকে বলত ছোট ওস্তাদজী, আর মোক্তাদিরা বলত বাচ্চা ইমাম। পরবর্তী জীবনে তাঁর অধ্যাত্মবোধের প্রথম উন্মেষ এসময় থেকেই অলক্ষ্যে ঘটে। মসৃজিদে ইমামতি করা থেকেই নজরুলের প্রথম কাব্যসৃষ্টি সুরু হয়। প্রচলিত জীবনযাত্রায় তাঁর ঔদাসীন্য লক্ষ্য ক'রে প্রতিবেশীরা তাঁকে বলত—ক্ষ্যাপা। তাদের চোখে দুখু মিয়া সত্যিই হয়ত তখন ক্ষেপে উঠেছেন। স্কুলের মাষ্টার থেকে সুরু ক'রে সবাই বলতেন: 'ও হতভাগা, ওর কিছু হবে না।' কিন্তু অলক্ষ্যে প্রকৃতিরাণী কখন তাঁকে নিজের স্কুলে সব পরীক্ষায় পাস করিয়ে দিয়েছেন, এ কথা কে জানত?

নজরুল লেখাপড়া ত্যাগ ক'রে লেটোর নাচের দলে গিয়ে নাম লেখালেন। তাঁর শিল্পকৃতি লক্ষ্য ক'রে দলের মাষ্টার তাঁর নাম দিলেন 'ব্যাঙাচি', বলতেন: 'আমার ব্যাঙাচি বড় হয়ে সাপ হবে।' তাঁর ভবিষ্যৎ-বাণী ব্যর্থ হয় নি। জীবনে বিষধর সর্পের মতই তিনি জাতির বজ্জাতি ও ব্রিটিশ রাজশক্তিকে দংশন করেছেন। কিন্তু তাঁর বিড়ম্বিত ভাগ্য এমনই ছিল যে, লেটোর দলেও বেশীদিন তিনি কাটাতে পারলেন না; চ'লে গেলেন

আসানসোলে। সেখানে এক রুটির কারখানায় চাকুরি নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলেন। কিন্তু তার মধ্যেও তাঁর পাঠতৃষ্ণা ছিল প্রবল ; মাঝে মাঝে অবসর মত আপন মনে ব'সে গান করতেন গলা ছেড়ে। এর পরের ইতিহাস—বেঙ্গল রেজিমেণ্ট বা বঙ্গবাহিনীতে তাঁর সৈনিক-জীবন যাপন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ ক'রে কামানের উপর দাঁড়িয়ে নজরুল হয়ত তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের আভাস পেয়েছিলেন সেদিন। সেই উন্মাদনাময় রণদুন্দুভির মধ্যে প্রথম রচনা করেন তিনি 'শাতীল আরব'। আরবদের স্বাধীনচেতা চরিত্র কাহিনীতে মুগ্ধ হয়ে তিনি লিখেছিলেন : 'সাহারায় এরা ধুঁকে মরে তবু শিকল পরে না পদ্ধতির—।'

যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে যে নজরুল আমাদের সামনে দাঁড়ালেন—তিনি সৈনিক নন, সৈনিক কবি। তিনি চারণ, তিনি গীতিকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও প্রেমিক। দেশপ্রেমে ও নারীপ্রেমে তিনি প্রভেদ রাখেন নি।

বাংলা কাব্যক্ষেত্রে যে সময়ে নজরুলের আবির্ভাব, সে সময়ের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে একদিকে সন্দেহবাদ, সংশয় ও নেতিবাদ এসে যেমন জাতীয় জীবনে ভর করেছে, তেমনি যুবকশ্রেণীর মধ্য থেকে জাতীয় চেতনামূলক উদ্দীপনার অনুসন্ধানও চলেছে। অপরদিকে দেখতে পাই—বাংলা কাব্যে রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত হয়ে তরুণ শিল্পীরা এমন নতুন কোন সুরের সন্ধান করছিলেন —যা তৎকালে তাঁদের সামনে পুরোপুরি অনুপস্থিতই ছিল। এ সময়ে অনেকাংশে রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত হয়ে যিনি কাব্যক্ষেত্রে এগিয়ে এলেন, তিনি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর ছন্দমাধুর্য ও শব্দঝঙ্কার বাঙালীচিত্তকে এমন ভাবে আকৃষ্ট করল যে, অল্পকালের মধ্যেই তিনি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করলেন। কিন্তু ভাবসম্পদের গভীরতার অভাবে সেই জনপ্রিয়তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি। বাংলার তরুণ মন তাই এমন কাব্য অনুসন্ধান করছিল—যার মধ্যে শব্দবিন্যাস, ছন্দমাধুর্য, কাব্যাদর্শ ও ভাবসম্পদের একত্র সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায়। কাব্যে এই মণিভাণ্ডার নিয়ে এলেন নজরুল। রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্তির পথ অনুসন্ধান ক'রে নজরুল-কাব্যে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারল তৎকালীন বিপ্লবী তরুণসম্প্রদায়। কিন্তু রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্ত হলেও সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যরীতির ছাপ থেকে গেল নজরুলের সৃষ্টিতে। কাব্যে তিনি অনেকাংশেই সত্যেন্দ্রপন্থী। তবু জাতীয়তাবাদী বা প্রেমবাদী কাব্যের বহুস্থলে আমরা নজরুলের ছন্দপতন লক্ষ্য করেছি, যদিও উচ্ছ্বাস ও অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে তাঁর দ্রুতসঞ্চরণশীলতার ভিত্তিতে সেই ছন্দপতনকে আমরা গুরুত্ব দিই নি। বাঙালীমন তখন এমন উদ্দীপনা খুঁজছিল—যা তারা বহু প্রতীক্ষায় খুঁজে পেল 'বিদ্রোহী' কাব্যে। নজরুল পরিচিত হলেন বিদ্রোহী কবি ব'লে। কাব্যের মাধ্যমে তিনি শুধু এদেশের গণচিত্তে অগ্নিসংযোগই করলেন না, সেই সঙ্গে এদেশের হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের শতাব্দীসঞ্চিত কুসংস্কারের মূলেও কুঠারাঘাত করলেন। পুরোহিততন্ত্র ও মোল্লাতন্ত্রকে বরবাদ ক'রে খাঁটি মানব-চিত্তের বিশুদ্ধতার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এলেন তিনি। 'মানুষ' কবিতায় কবি বললেন—

গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান্।

বললেন—

জীর্ণ বস্ত্র শীর্ণ গাত্র, ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ
ডাকিল পান্থ, 'দ্বার খোলো বাবা, খাইনিকো সাতদিন।'
সহসা বন্ধ হলো মন্দির, ভুখারী ফিরিয়া চলে,
তিমির রাত্রি, পথ জুড়ে তার ক্ষুধার মানিক জ্বলে!
ভুখারী ফুকারি কয়,
'ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয়!'
মস্‌জিদে কাল শিরণী আছিল—অঢেল গোস্ত রুটি
বাঁচিয়া গিয়াছে, মোল্লাসাহেব হেসে তাই কুটি কুটি,
এমন সময় এলো মুসাফির গায়ে আজারির চিন্
বলে, 'বাবা আমি ভুখা ফাকা আছি আজ নিয়ে সাতদিন।'
তেরিয়া হইয়া হাঁকিল মোল্লা—'ভ্যালা হ'ল দেখি ল্যাঠা,
ভুখা আছ মরো গো-ভাগাড়ে গিয়ে ; নামাজ পড়িস বেটা?'

ভুখারী কহিল, 'না বাবা!' মোল্লা হাঁকিল—'তা হলে শালা
সোজা পথ দেখ।' গোস্ত রুটি নিয়া মস্জিদে দিল তালা!
ভুখারী ফিরিয়া চলে,
চলিতে চলিতে বলে—
'আশীটা বছর কেটে গেল, আমি ডাকিনি তোমায় কভু;
আমার ক্ষুধার অন্ন তা ব'লে বন্ধ করোনি প্রভু।
তব মস্জিদ মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবী!
মোল্লা-পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি।'

বললেন: 'জাতের নামে বজ্জাতি সব, জাত-জালিয়াৎ খেলছে জুয়া।' জাতির জীবনে এমনি ক'রে বর্ণবৈষম্য ভেঙে দিয়ে হিন্দু ও মুসলমানকে মিলিয়ে এক অখণ্ড মানবগোষ্ঠীতে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন তিনি। মধ্যযুগীয় ভারতীয় সাধকবৃন্দের জীবন থেকে এই শিক্ষার উদাহরণ গ্রহণ করা নজরুলের পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়েছিল, কারণ তাঁর মধ্যে হিন্দু তন্ত্র, বৌদ্ধ ও সুফীবাদ, বৈষ্ণব ও শাক্ত রীতি এবং ইসলামের নীতিবোধ এসে একত্রিত হয়েছিল। কাব্যে যেমন তিনি এই উন্নত দর্শনকে রূপায়িত করলেন, তেমনি হেঁয়ালী বর্জন ক'রে সহজতা দান করলেন তিনি কাব্যকে। হিন্দু-মুসলিমের দ্বন্দ্ব মেটাতেও তিনি বর্ণহীন গোটা মানুষকেই প্রতিষ্ঠা ক'রে বলেছেন:

'হিন্দু না ওরা মুস্লিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।'

বিপ্লবী যৌবনের উদ্গাতা ছিলেন নজরুল। যৌবনের জয়োল্লাস করেছেন তিনি কাব্যে। এ জয়োল্লাস রবীন্দ্রনাথে শ্রেষ্ঠ রূপ পেয়েছে সন্দেহ নেই; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পর মনে হয়েছিল—হয়ত বাংলা কাব্য থেকে তা দীর্ঘকালের জন্যই অন্তর্হিত হ'ল, কিন্তু নজরুলের লেখনীতে সেই যৌবন আবার নতুন প্রাণশক্তিতে জেগে উঠল। তিনি বললেন, 'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ।' বললেন:

আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা।
করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা,
আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা।

তেমনি অন্যত্র তিনি বললেন:

আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে
বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার ভাঙা কল্লোলে!

রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের' মতই বন্ধনহীন গতি এই যৌবনের। 'সব্যসাচী' কাব্যেও এই যৌবনের অমিত আহ্বান গিয়ে ভেঙে পড়েছে সারা দেশে। দুর্বৃত্তের দুর্বিনয় ও পরশাসনের ঔদ্ধত্যকে ভাঙতে সেই যৌবনের প্রতীক পার্থের আবির্ভাবকে কল্পনা ক'রে কবি বললেন:

ওরে ভয় নাই আর, দুলিয়া উঠেছে হিমালয়-চাপা প্রাচী।
গৌরীশেখরে তুহিন ভেদিয়া জাগিছে সব্যসাচী!
দ্বাপর যুগের মৃত্যু ঠেলিয়া
জাগে মহাযোগী নয়ন মেলিয়া,
মহাভারতের মহাবীর জাগে, বলে, 'আমি আসিয়াছি।'
নবযৌবন-জলতরঙ্গে নাচে রে প্রাচীন প্রাচী!

এক অখণ্ড মানবগোষ্ঠী রূপায়ণের স্বপ্নে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের উপর তিনি একেবারেই গুরুত্ব দেন নি। বাঁধ ভেঙে না দিলে যেমন সব ঘাটের সব জলের জোয়ার একীভূত হয়ে মহাসমুদ্রে মিলতে পারে না, তেমনি সব দেশের সব জাতের স্বাতন্ত্র্য না ভেঙে দিলে এক অখণ্ড মানবসমাজ গ'ড়ে উঠতে পারে না। সকলকে এই সমভাবে দর্শন থেকেই সাম্যবাদের সৃষ্টি। সাম্যবাদী নজরুল তাই গাইলেন:

গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান।
যেখানে মিশেছে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলিম ক্রীশ্চান।
গাহি সাম্যের গান।

নারীকেও তিনি এই সাম্যবাদী চোখ নিয়েই দেখেছেন। নারীকে তাই যারা লাঞ্ছিত করে, কবির ধিক্কার তাদেরই উপর। আসলে পুরুষে ও নারীতে কোন পার্থক্যই নেই। দু'জনকে নিয়েই তবে সৃষ্টি সার্থক, জগৎ সার্থক। কবি বললেন :

সাম্যের গান গাই—
আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোন ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বে যা কিছু মহান্ সৃষ্টি—চির কল্যাণকর,
অর্দ্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্দ্ধেক তার নর।
... ...
তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখিয়াছ তার প্রাণ?
অন্তরে তার মোমতাজ নারী, বাহিরেতে শাজাহান।
জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্যলক্ষ্মী নারী,
সুষমালক্ষ্মী নারীই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারি।
... ...
নর বাহে হল, নারী বহে জল, সেই জল-মাটি মিশে
ফসল হইয়া ফলিয়া উঠিল সোনালী ধানের শীষে।

পুরুষ-শাসিত সমাজে নারী যেমন নির্ভরশীলা এবং বহুক্ষেত্রে অবহেলিতা ও নির্যাতিতা, তেমনি সমাজে যারা নিচুতলার মানুষ, যারা মেহনতী লোক, ধনীর দুয়ারে তারা অনাদৃত। এই ভাবেই আমাদের সামাজিক ইতিহাস এতকাল চ'লে আসছিল। কিন্তু নতুন যুগে যে নতুন প্রাণের কল্লোলপ্রবাহ অনুভব করা গেল, তাতে নিচুতলার মানবগোষ্ঠীর একটা সর্বাত্মক জাগরণ আমরা লক্ষ্য করলাম। এই জাগরণের পিছনে আছে এদেশীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব ও পাশ্চাত্যদেশীয় মানবিক মূল্যবোধের নবরূপায়ণের প্রেরণা। তাকে রূপ দিতে গিয়ে নজরুল লিখলেন :

চির অবনত তুলিয়াছে আজ গগনে উচ্চশির,
বান্দা আজিকে বন্ধন ছেদি ভেঙেছে কারা-প্রাচীর।

এই সর্বাত্মক মানব-জাগরণের অনুভূতি থেকেই জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের প্রেরণায় তিনি উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন। প্রথম মহাযুদ্ধে যে ইংরেজের পক্ষে বেঙ্গল রেজিমেণ্টে সৈনিক হয়ে নজরুল যুদ্ধে নেমেছিলেন, অবশেষে সেই ইংরেজই হ'ল তাঁর প্রধান শত্রু। তাদের শৃঙ্খল যতবারই তাঁকে বন্দী ক'রে কারারুদ্ধ করেছে, ততবারই তিনি চীৎকার ক'রে বলেছেন :

এই শিকল-পরা ছল, মোদের এ শিকল-পরা ছল,
এই শিকল প'রেই শিকল তোদের করব রে বিকল।

খিলাফৎ আন্দোলনে, কি গান্ধীজী-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে বাঙালী সেদিন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সঙ্গে নজরুলের এ-জাতীয় বহু গান গাইতে গাইতে কারারুদ্ধ হয়েছে, হাসিমুখে গলায় পরেছে ফাঁসির দড়ি, গেয়েছে :

মোরা ফাঁসি পরে আনব হাসি মৃত্যুজয়ের ফল।···
মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল।

একদিকে তিনি যেমন যৌবনশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, তেমনি ভ্রাতৃকলহের উর্ধ্বে শত্রুর স্বর্ণলঙ্কা ছারখার ক'রে দিতেও তাঁর সমান প্রয়াস দেখেছি। তিনি বলেছেন :

যে লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ পড়ে মন্দির চূড়া,
সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে শত্রু-দুর্গ গুঁড়া।

প্রভাতে হবে না ভায়ে ভায়ে রণ,
চিনিবে শত্রু, চিনিবে স্বজন,
করুক কলহ, জেগেছে ত তবু, বিজয়কেতন উড়া!
ল্যাজে তোর যদি লেগেছে আগুন, স্বর্ণলঙ্কা পুড়া।

এই জাতীয় আরও কয়েকটি কবিতা যেমন: 'অগ্রপথিক', 'যৌবন-জল-তরঙ্গ', 'অন্ধ স্বদেশ-দেবতা', 'অন্তর ন্যাশনাল সঙ্গীত' প্রভৃতির মধ্যে আমরা নজরুলের শুধু জাতীয়তাবোধকেই খুঁজে পাই না, সেই সঙ্গে বড় করে পাই আন্তর্জাতিক মানবগোষ্ঠীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধকে।

কিন্তু এ ছাড়াও নজরুলকে পাই আমরা সামান্য কিছু নাটক, উপন্যাস ও ছোটগল্পকার হিসেবে। এগুলোর মধ্যে তাঁর 'রিক্তের বেদন' ও 'ব্যথার দান' গল্পগ্রন্থ দু'টি এককালে কিছু জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল সন্দেহ নেই। নজরুলের জীবনকাহিনী যাঁরা জানেন, তাঁরা এই কাহিনীগুলির মধ্যে নজরুলকেই বিশেষ ভাবে খুঁজে পাবেন; তবে গল্পগুলো গল্প হয়েও মহাকালের স্বাক্ষর রাখতে পারে নি পাঠকের মনে। সেখানে তাঁর কাব্যের পরেই সঙ্গীতের স্থান।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নজরুলের প্রাণের সুষমা অত্যন্ত সহজভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে যে ক্রটিবিচ্যুতি বা ভাবব্যঞ্জনায় স্থানে স্থানে অসঙ্গতি না ঘটেছে, এমন নয়; কিন্তু তাঁর স্বকীয় প্রকাশভঙ্গি ও রচনারীতি বাংলা গানের ক্ষেত্রকে যে বহুদূর সম্প্রসারিত করেছে, তাতে সন্দেহ নেই। তিনি আত্মলীলায় বা প্রাণের তাগিদে যত না গান রচনা করেছেন, ততোধিক গান তাঁকে রচনা করতে হয়েছে রেকর্ড ও ফিল্ম কোম্পানীগুলির তাগিদে। শুধু গান রচনাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই গানে সুরারোপও করতে হয়েছে। তার মধ্যে তাঁর অবকাশ একরকম ছিল না বললেই চলে। নতুবা তাঁর যে গীতিপ্রতিভা ছিল, তাতে বাংলা দেশে গীতিকার ও সুরকার হিসেবে নজরুলের স্থান তাঁর প্রচলিত খ্যাতির আরও ঊর্ধ্বে গিয়ে পৌঁছাতে পারত। তাঁর মত একই সময়ে বহুতর ভাবের সঙ্গীত খুব কম গীতিকারই রচনা করতে পেরেছেন। কি শ্যামাবিষয়ক বা মাতৃসঙ্গীত, কি জাতীয় সঙ্গীত, কি ইসলামি গান, কি আধুনিক, ঝুমুর, ভাটিয়ালী ও গজল—সর্বত্র তাঁর লেখনী একই গতিতে চলেছে। তাঁর গান রেকর্ড করেন নি, কিছুকাল আগে পর্যন্তও এমন শিল্পীর সংখ্যা বাংলায় খুব কমই ছিল। তাঁর রচিত—'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিস নে আজি দোল', 'যবে তুলসীতলায় প্রিয় সন্ধ্যাবেলায় তুমি করিবে প্রণাম', 'তুমি আর একটি দিন থাকো', 'কে বিদেশী মন-উদাসী', 'বল রে জবা বল', 'খেলিছ এ বিশ্ব নিয়ে', 'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন', 'ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে আমার মনের বুলবুলি', 'পরমাত্মা নহ তুমি, তুমি যে পরমাত্মীয় মোর', 'জাতের নামে বজ্জাতি সব', 'নীলাম্বরী শাড়ী পরি নীল যমুনায় কে যায়', 'আমি যদি আরব হতাম, মদিনারি পথ', 'দুর্গমগিরি কান্তারমরু', 'আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ঐ', 'আমরা ছাত্রদল', 'চল চল চল, ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল' প্রভৃতি গানগুলি বাংলার শিশু-বৃদ্ধ প্রত্যেকেরই জানা। এসব গানের রেকর্ড হাজার হাজার শ্রোতাকে দিনের পর দিন মুগ্ধ করেছে। এ ছাড়া হাসির গানেও নজরুলের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়; অন্যদিকে চারণের ভূমিকায় 'ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস', 'লীগ অব নেশন্‌স', 'সাইমন কমিশনের রিপোর্ট', 'রাউণ্ড টেবল কন্‌ফারেন্স' প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তিনি যে সমস্ত কমিক গান রচনা করেন, দেশ ও রাষ্ট্রের উপর তার প্রভাব ছিল অসামান্য। যে যুগে রবীন্দ্রনাথ বৃহত্তরভাবে, এবং দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদ আংশিকভাবে বাংলা সঙ্গীত জগৎকে আচ্ছন্ন ক'রে রয়েছেন, সে যুগে নজরুলের মত আত্মবৈশিষ্ট্যবাদী গীতিকারের অসাধারণ জনপ্রিয়তা লক্ষ্য ক'রে বিস্মিত হ'তে হয়। তিনি একাধারে ট্রেনার ও টেক্‌নিশিয়ান দুইই ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি নিজের কণ্ঠে কিছু গান রেকর্ড করেছিলেন সত্য, কিন্তু পরবর্তী জীবনে মস্তিষ্কবিকৃতির পূর্বকাল পর্যন্ত ট্রেনার হিসেবেই তিনি কাজ করেছেন। এ ক্ষেত্রেও তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের ছাপ র'য়ে গেছে।

এই সঙ্গীত থেকেই মূলতঃ তাঁর সাধনজীবন বা ঈশ্বরানুভূতির পথে যাত্রা। শেষ বয়সে তাঁর মনের মধ্যে এমন এক উন্নত দর্শন এসে স্থান নেয়—যার মধ্যে কর্মের অবকাশে মাঝে মাঝেই তিনি এসে সম্পূর্ণভাবে আশ্রয় নিয়েছেন। বাইরে থেকে অপরের পক্ষে তা উপলব্ধি করবার বিষয় ছিল না। ১৯৪১ সালের ১৬ই মার্চ বনগ্রাম সাহিত্য সম্মেলনে তিনি যে সভাপতির অভিভাষণ দেন, তার মধ্যে এই সাধনলব্ধ পারলৌকিক দর্শনের কিছু মূর্ত আভাস আমরা পাই। তিনি বলেন, "আমি কখন যে গভীর সমাধির অতল গহ্বরে গিয়ে

প্রবেশ করলাম, তা আজও আমার স্মরণাতীত।...ঐ সমাধির মাঝে শুনতাম, অনন্ত-প্রকাশ জগৎ যেন আমায় ঘিরে কাঁদছে: 'ফিরে আয়, ফিরে আয়।' কেন যেন মনে হ'ত, এ নিথর নির্বিকার শান্তির পথ আমার নয়। সমাধির তৃষ্ণা যখন মিটল, পরম একাকীর পরম শূন্য সেদিন যেন আমার সাথীহীন একাকিত্বের বেদনায় কেঁদে উঠল। সেই রোদনের অসীম প্রবাহকূলে দেখা পেলাম আমার চির-চাওয়া পরম সুন্দরের।...যদি তাঁর অনন্ত শ্রীর একটি রূপ-রেণুকেও আমার কাজে, গানে, সুরে আজ রূপ দিয়ে যেতে পারি, তা হ'লে আমি ধন্য হব—পৃথিবীতে আসা আমার সার্থক হবে।...আজ আমার সকল সাধনা, তপস্যা, কামনা, বাসনা, চাওয়া-পাওয়া, জীবনমরণ তাঁর পায়ে অঞ্জলি দিয়ে আমি আমিত্বের বোঝা বওয়ার দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়েছি।...আমার এই পরম মধুময় অস্তিত্বের প্রেম-শক্তিতে আত্মসমর্পণ ক'রে আমি বেঁচে গেছি, আমার অনন্ত জীবনকে ফিরে পেয়েছি।"

এই অনুভূতি থেকেই তিনি 'আমার সুন্দর' নিবন্ধটি রচনা করেন—যার মধ্যে তাঁর অধ্যাত্মচেতনা পূর্ণ রূপ লাভ ক'রেছে।

তাই, নজরুল শুধু বিদ্রোহী কবি, চারণ ও মরমী গীতিকারই মাত্র ন'ন, সর্বশেষ তিনি সাধক। তিনি একদিকে যেমন বাংলার বিপ্লবী গণমানসের উদ্গাতা, অপরদিকে তেমনি সাধনপথের পথিক।

রঙ্গমল্লী

শ্রীসীতা দেবী

সেদিন ভোররাত্রে সুরবালার ডাকে পূর্ণিমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল. "কি হয়েছে মা?"

"জর এসেছে বোধ হয়। মধুর মা এসে পড়বে এখনি, তাকে একটু দরজাটা খুলে দিস্।"

পূর্ণিমা উঠিয়া পড়িয়া মায়ের কপাল পরীক্ষা করিয়া দেখিল, বলিল, "জরই ত এসেছে। কাল রাত্তিরেই যে তোমার চেহারাটা কেমন দেখাচ্ছিল। মধুর মাকে রাত্রে থাকতেই ত বলতে পার, তার ত রাতদিনের কাজ।"

"শোবার জায়গার অভাব তাই বলতে পারি না। বললে অবিশ্যি থাকে সে। একটা ছেলে আছে বাড়ীতে তাই যেতে চায় আর কি?"

"আচ্ছা, শুয়ে থাক এখন, উঠ না। যা করবার আমি করছি।"

সুরবালা বলিলেন, "করতে কিছুই হবে না। ঐ সব করতে পারবে। তবে তোর অফিস্ যাওয়ার দেরি না হয়ে যায়।"

"হ'লে হবে, কি আর উপায়? ঐ বোধ হয় ঝি এল," বলিয়া পূর্ণিমা গিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

পুরাণো ঝি, সব কাজে খুব অভ্যস্ত, তাড়াতাড়ি হাত চালাইয়া কাজ করিতে লাগিল। পূর্ণিমা বলিল, "সবাই মিলে যে বেরিয়ে যাব, তা মাকে দেখবে কে? জরটা বেশ বেশী মনে হচ্ছে।"

সরমা বলিল, "আমি থাকি না-হয়। আজ মোটে দুটো ক্লাস আছে আমার, না গেলেও হয়। Percentage ঢের আছে আমার।"

পূর্ণিমা বলিল, "তবে তুই-ই থাক্।"

সকলে মিলিয়া কাজ করিয়াও কিন্তু পূর্ণিমা ঠিক সময় বাহির হইতে পারিল না। অফিসে পৌঁছিতে তাহার দেরিই হইয়া গেল।

হিরণ্ময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?"

পূর্ণিমা লজ্জিত হইয়া বলিল, "না, আমার কিছু হয় নি, মা বড় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাই একটু দেরি হয়ে গেল। খুব কি অসুবিধা হয়েছে?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "না, অসুবিধা কিছু হয় নি। তাই ত, আপনার মা আবার পড়লেন? এ আবার একটা additional ভার পড়ল আপনার উপরে।"

পূর্ণিমা বলিল, "বোঝা বয়ে বয়ে অভ্যাস হয়ে গেছে। বাবা যখন চ'লে গেলেন, তখন আমি তেরো বছরের মাত্র, কিন্তু তখনই যেন বুড়ো হয়ে গেলাম।"

হিরণ্ময় হাসিয়া বলিলেন, "বাইরের চেহারায় সে বুড়োত্বের ছাপ কিছু নেই, থাকলে তবু একটু রক্ষা-কবচের কাজ করত। প্রথম দেখলাম যেদিন, সেদিন মনে হয়েছিল, আঠারো-উনিশ বৎসরের বেশী বয়স হবে না, জোর ক'রে বাড়িয়ে বলছে।"

পূর্ণিমা হাসিবার চেষ্টা করিল, বলিল, "তা নিশ্চয়ই ভাবেন নি, তা হ'লে রাখতেন না।"

"রাখলাম নানা consideration-এ। একটা ছেলে candidateও ছিল, নিতান্ত মন্দ হ'ত না কাজের দিক্ দিয়ে। কিন্তু এমন uncouth দেখতে, আর কাপড়-চোপড় এত নোংরা যে, তাকে সারাক্ষণ চোখের সামনে বসিয়ে রাখাও এক যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার হ'ত। আর অন্যান্য সব অফিসে এ কাজগুলো সচরাচর মেয়েদেরই দেয়। আমিও সেই নিয়ম মেনেই চললাম।"

পূর্ণিমা কাজের ফাঁকে ফাঁকে মায়ের ভাবনা ভাবিতে লাগিল। বাড়ী গিয়া যদি দেখে জরটা একটু কমের

দিকে, তাহা হইলে ভাল। না হইলে ডাক্তার ডাকিতেই হইবে, যেমন করিয়া হোক। মাসের শেষ হইয়া আসিল এদিকে, পয়সাকড়ি কিছুই নাই হাতে।

বিকালের দিকে কাজ বেশী ছিল না, হিরণ্ময় তাহাকে ছুটি দিয়া দিলেন। বলিলেন, "বাড়ী যান, মায়ের জন্তে কিছু যদি করতে হয়, সকাল সকাল করাই ভাল।"

বাড়ী ফিরিয়া পূর্ণিমা দেখিল, মায়ের জ্বর আরো বেশী মনে হয়। চেহারাটাও বড় খারাপ দেখাইতেছে। কাশি আছে। নিজের দেরাজ খুলিল, মায়ের বাক্সও খুলিয়া দেখিল। মায়ের বাক্সে চার টাকা, তাহার নিজের কাছে দুই টাকা মাত্র আছে। এখনও মাহিনা পাইতে তিন দিন বাকি। মাসের শেষের দিকে সর্ব্বদাই তাহাকে কষ্ট করিয়া চালাইতে হয়।

কিন্তু সম্প্রতি উপায় কি? ডাক্তার ডাকিলে তাহাকে চার টাকা ফি দিতে হইবে। ওষুধ-বিষুদ যাহা দিবেন, তাহাতে অন্ততঃ তিন-চার টাকা লাগিবে। তা ছাড়া বাড়ীর খরচ। কিন্তু সে যাহা হয় হইবে, এখন ডাক্তার ডাকা নিতান্ত প্রয়োজন। মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া সত্যই তাহার ভয় করিতে লাগিল।

রণেনকে ডাকিয়া বলিল, "রণু, মোড়ের ডিস্‌পেন্‌সারী থেকে পশুপতি ডাক্তারবাবুকে একবার ডেকে আনতে পারিস্? উনি এখন ঐ দোকানেই থাকেন।"

রণেন দৌড়িয়া চলিয়া গেল। এক পেয়ালা চা শুধু খাইয়া পূর্ণিমা মায়ের পাশে বসিয়া তাঁহাকে হাওয়া করিতে লাগিল।

রণেন ডাক্তার লইয়াই ফিরিল একেবারে। তিনি ঘরে ঢুকিয়া রোগিণীকে পরীক্ষা করিতে বসিলেন। ইনি পূর্ণিমার একেবারে অপরিচিত নন, কালেভদ্রে চিকিৎসার্থে এ বাড়ীতে আসিয়াছেন।

বুক-পিঠ সব পরীক্ষা করিয়া ডাক্তারের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। রণেনের ছোট ঘরে ঢুকিয়া তিনি পূর্ণিমাকে বলিলেন, "অসুখটা একটু serious বোধ হচ্ছে। এর আগে ওঁকে সম্প্রতির মধ্যে ডাক্তার দেখানো হয় নি?"

পূর্ণিমা বলিল, "না।"

"দেখালে রোগ আগে ধরা পড়ত। বাড়ীতে যখন অভিভাবক স্থানীয় আর কেউ নেই, তখন আপনাকেই বলতে হচ্ছে। কালই ওঁর X-Ray করাবার ব্যবস্থা করতে হবে। আর দেখুন, উনি যে ঘরে রয়েছেন, সে ঘরে আর কেউ শোবেন না।"

ডাক্তার কি যে বলিতে চাহিতেছেন, তাহা বুঝিতে ভুল হইল না পূর্ণিমার। তাহার মাথায় তখন আকাশ ভাঙিয়া পড়িয়াছে। তবু জিজ্ঞাসা করিল, "X-Ray করাতে কোথায় নিয়ে যেতে হবে?"

ডাক্তার বলিলেন, "আমি ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। আমারই এক বন্ধু radiologist আছেন। তাঁর chamber কাছেই। আমি গিয়েই telephone ক'রে appointment করব। সকাল সাড়ে সাতটায় আমি এখানকার ডিস্‌পেনসারীতে এসে বসি, তখন আপনি রণেনকে পাঠিয়ে খবর নেবেন। আর এই ওষুধ দুটো আনিয়ে নিন। ওঁর খুব পুষ্টিকর খাবার দরকার। যাক সে সব আলোচনা পরে হবে, আগে X-Rayটা হয়ে যাক আচ্ছা আসি।" বলিয়া টাকা লইয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

পূর্ণিমা এই আকস্মিক আঘাতে কেমন যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কি করিবে সে? কাহার সাহায্য চাহিবে? মায়ের হঠাৎ এ কি হইল? ইঁহারই স্নেহের ছায়ায় তাহারা এতদিন বাঁচিয়া আছে, কোন দুঃখকে দুঃখ ব'লিয়া মনে করে নাই, কোন অভাবকে অভাব বলিয়া বোঝে নাই। যাহা কিছু করা দরকার মায়ের জন্য, তাহা পূর্ণিমাকে করিতেই হইবে, যেমন করিয়া হউক। তাহার জীবন ত এখন তমসাচ্ছন্ন। আলো কোথাও নাই, সে যেন হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া পথ চলিতেছে। যা একটি মাত্র আনন্দের ক্ষীণ সুর তাহার জীবনে বাজিত, তাহাকেও সে চিরদিনের মত স্তব্ধ করিয়া দিয়াছে। উহা হয়ত কল্পনাই ছিল কে জানে?

কিন্তু জীবনাকাশে থাকিয়া থাকিয়া উষার আগমনের আভাস কেন সে দেখিতে পায়? ইহাও কি মরীচিকা? না, সত্যই একটু আলো দেখা যায়? ইহারই সহায়তায় সে পথ চলিতেছে, না হইলে এ ভাবে চলিতেও পারিত না, আঁধারের স্রোতে মিলাইয়া যাইত।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। আবার বাহিরে যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইল। সরমাকে ডাকিয়া বলিল, "মায়ের দিকে চোখ রাখিস ভাই, আমাকে একটু বেরোতে হচ্ছে, কয়েকটা ব্যবস্থা করতে।"

রাস্তার মোড়ে একটা বড় কাপড়ের দোকানে টেলিফোন আছে, পয়সা দিয়া সেখান হইতে টেলিফোন করা যায়। পূর্ণিমা গিয়া সেখানে দাঁড়াইল।

পয়সা দিয়া ডায়াল ঘুরাইতেই, পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে আসিল, "হ্যালো!"

"মিঃ মজুমদার আছেন?"

"কথা বলছি। আপনি কি মিস্ সান্যাল নাকি?"

পূর্ণিমা বলিল, "হ্যাঁ। খুব জরুরী দরকার, আপনার সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বলতে চাই। যাব?"

"আপনি কেন আসতে যাবেন? আমি যাচ্ছি। দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব, আপনি বাড়ী ফিরে যান।"

পূর্ণিমা যথাসাধ্য দ্রুতপদে ফিরিয়া আসিল। রণেনের ঘরে জিনিষপত্র স্তূপাকার হইয়া আছে। তবু ইহারই মধ্যে বসিতে দিতে হইবে হিরণ্ময়কে। কোনমতে একটা চেয়ার আনিয়া রাখিল।

হিরণ্ময়ের বাড়ী বেশী দূর নয়। সত্যই দশ মিনিটের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিলেন তিনি।

পূর্ণিমা তাঁহাকে লইয়া আসিয়া ছোট ঘরখানায় বসাইল। বসিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে বলুন ত? মায়ের অসুখের বাড়াবাড়ি যাচ্ছে নাকি?"

পূর্ণিমা রুদ্ধকণ্ঠকে কোনমতে পরিষ্কার করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, জ্বর আরও বেড়েছে।"

"ডাক্তার দেখিয়েছেন?"

"দেখালাম অফিস থেকে ফিরে। তিনি সন্দেহ করছেন যে খুব serious কিছু হয়েছে। কালই X-Ray করতে বলছেন।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "ও, এ ত দেখি আর এক ফ্যাসাদ বাধল। কত দিক্ সামলাবেন আপনি? তা X-Rayর ব্যবস্থা কি ডাক্তার ক'রে দেবেন, না নিজেদের করতে হবে?"

পূর্ণিমা বলিল, "ডাক্তারবাবুই ক'রে দেবেন। কাছেই ওঁর এক বন্ধুর chamber আছে। কিন্তু আমার কাছে কিছু নেই যে এখন?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "মাসের শেষে কার কাছেই বা থাকে? এতে লজ্জা পাবার কি আছে? কত দরকার আপনার বলুন ত? ঠিক হিসেব এখন করতে পারবেন না বোধ হয়। আচ্ছা, এই পঞ্চাশটা টাকা রাখুন এখন। কাল আরও দেব দরকার হলেই। কোন সঙ্কোচ না ক'রে আমাকেই যে approach করেছেন, এতে আমি খুব খুশী হয়েছি।"

পূর্ণিমা বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে হিরণ্ময়ের দিকে তাকাইয়া রহিল। টাকা ধার চাহিতেছে বলিয়া খুশী হইয়াছেন? কেন? পূর্ণিমা বলিয়াই কি? সজোরে মনটাকে সে ফিরাইয়া লইল।

হিরণ্ময় বলিলেন, "কটার appointment জানাবেন ত? গাড়ীটা পাঠিয়ে দেব। রুগ্ন মানুষ, সাবধানে নিয়ে যাওয়া দরকার।"

পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করিল, "অফিসে যাবেন কি ক'রে তা হ'লে? গাড়ী ফেরত পাঠাতে যদি দেরি হয়ে যায়?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "কিছু অসুবিধা হবে না, অফিস থেকে একটা গাড়ী আনিয়ে নেব। এটা আমার নিজের গাড়ী।"

পূর্ণিমা কি যেন বলিতে যাইতেছিল, হিরণ্ময় বাধা দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, শুনুন আর একটা কথা। আপনারা সকলে এক ঘরে শোন নাকি?"

পূর্ণিমা বলিল, "রণেন এই ঘরে শোয়। আমরা দুই বোন মায়ের সঙ্গে এক ঘরে শুই। এই দুটোই মোটে ঘর।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "আজ থেকে রণেনের ঘরেই আপনারা দুজনে শোনে। না হয় মাটিতেই বিছানা ক'রে শোবেন। গরমের দিনে তাতে কষ্ট হবে না। আপনাদের দু' বোনের মায়ের কাছে খুব বেশীক্ষণ থাকা উচিত নয়। কিন্তু এখনই অন্য কি ব্যবস্থা করা যায়? যাইই করতে যান, একটু সময় লাগবে। আচ্ছা আমি ভেবে দেখছি। Prescriptionটা দিন দেখি, ওষুধগুলো আনিয়ে দিই। একটা Dettol জাতীয় antiseptice আনিয়ে রাখা ভাল।"

পূর্ণিমা নীরবে তাঁহার হাতে প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনটা তুলিয়া দিল। তাহার কথা বলিবার ক্ষমতাই যেন চলিয়া গিয়াছিল।

হিরণ্ময় এইবার যাইবার জন্ম উঠিলেন। বলিলেন, "কাল সকালে খবর দেবেন ক'টায় গাড়ী দরকার। আর অফিসে যেতে যদি একটু দেরি হয়ে যায় ত ভয় পাবেন না। বিকাশবাবু আছেন, অভিলাষ আছে, আমি চালিয়ে নেব। আর দেখুন, বাসন-কোসনও ওঁর আলাদা ক'রে রাখবেন। আচ্ছা, আসি এখন।" তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

পূর্ণিমা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল অল্প কিছুক্ষণ। কাহার আশীর্ব্বাদে সে ইঁহার কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল? তাহার মাথার উপর যে দুর্ভাগ্যের ঢেউ উত্তাল হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে ডুবিয়া যাইবারই ত কথা? কিন্তু কাহার হাত তাহাকে বারে বারে টানিয়া তুলিতেছে? ইনি কি পূর্ব্বের কোন জন্মে পূর্ণিমার নিকটতম কেহ ছিলেন? না হইলে কেন এত দয়া তাহার উপর? সেও কেন দেখিয়াই তাঁহাকে চিনিয়াছিল?

কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার সময় নাই। আবার কাজের স্রোতে পড়িয়া গেল। ওষুধ খাওয়াইল, মায়ের জ্বর দেখিল, তাঁহার পথ্য তৈয়ারি করিল। শুইবার ব্যবস্থার অদল-বদলে রণেন বিধিমতে আপত্তি করিল, কিন্তু তাহার আপত্তি শুনিবার কোন উপায় ছিল না। মধুর মাকে বলিয়া-কহিয়া মায়ের ঘরে রাত্রে শুইতে রাজী করা হইল। সে বৃদ্ধা মানুষ, বেশী ভয় তাহার নাই হয়ত।

শুইতে অনেক রাত হইয়া গেল। শুইয়াও ঘুম আসিল না। দুশ্চিন্তায় মন যেন ভাঙিয়া পড়িতে চায়। কি উপায় হইবে তাহাদের? বারে বারে গিয়া মাকে দেখিয়া আসে, তিনিও ঘুমাইতে পারিতেছেন না। নিজের বেশী কিছু একটা অসুখ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছেন, তবে কি অসুখ সেটা হয়ত বোঝেন নাই। পূর্ণিমাকে বার রবা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুই ঘুমোতে যা বাবা, নইলে কাল অত কাজ করবি কি ক'রে?"

রাত্রি ক্রমে শেষ হইল। সারারাত ছটফট্ করিয়া পূর্ণিমা উঠিয়া বসিল। শুইয়া থাকিয়া লাভ নাই, ঘুরিয়া বেড়ানই ভাল।

ক্রমে ক্রমে সকলে উঠিল, বাড়ীর কাজকর্ম্ম আরম্ভ হইল। মায়ের অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই, প্রায় এক-রকমই আছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তোমাকে একটুক্ষণের জন্যে অন্য একজন ডাক্তারের বাড়ী যেতে হবে। পারবে ত?"

মা বলিলেন, "ট্যাক্সি ক'রে ত? তা পারব।"

পূর্ণিমা বলিল, "ট্যাক্সি করতে হবে না। মিঃ মজুমদার তাঁর গাড়ী পাঠিয়ে দেবেন, তাতে ঢের আরামে যেতে পারবে।"

মা বলিলেন, "ভদ্রলোককে ভগবান্ রাজা করুন। পরের জন্যে কেউ এত করে না।"

রণেন গিয়া ডিস্‌পেন্‌সারী হইতে খবর লইয়া আসিল। সাড়ে আটটায় তাহাদের পৌঁছিতে হইবে, ডাক্তারের chamber-এ। মাকে কাপড়-চোপড় বদ্‌লাইয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া পূর্ণিমা হিরণ্ময়কে খবর দিতে গেল।

হিরণ্ময় বলিলেন, "সওয়া আটটায় বেরোবেন তা হ'লে। আমি গাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছি। অফিসের গাড়ী ক'রে আমি চ'লে যাব। আপনি যদি ডাক্তারের বাড়ী থেকে ফিরে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে পারেন, তা হ'লে ঐ গাড়ীতেই অফিসে চ'লে আসবেন।"

পূর্ণিমার এখন যেন নিজের ইচ্ছাশক্তি বলিয়া কিছু ছিল না। হিরণ্ময় যখন যাহা বলিতেছিলেন, সে তাহাই পালন করিতেছিল। অতিরিক্ত পরিশ্রমের পর দেহ যেমন অবশ হইয়া আসে, তাহার মনেরও হইয়াছিল সেই অবস্থা। "আচ্ছা, তাই যাব" বলিয়া রিসিভার রাখিয়া দিয়া সে আবার বাড়ী ফিরিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া অফিসে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। খাওয়ার ভাবনা এখন থাক, অফিসেই যাহা হোক খাইয়া লইবে। মায়ের কাছে কাহাকে রাখিয়া যাইবে আজ? সরমাকে রোজরোজ কামাই করানো যায় না ত?

রণেন নিজ হইতেই বলিল, "আজ আমি থাকছি দিদি। পালা ক'রে এক-একজনকে থাকতে হবে ত?"

পূর্ণিমা বলিল, "আচ্ছা, ঘড়ি দেখে ঠিক সময় ওষুধ খাওয়াবে। আর সব কাজ মধুর মা করবে এখন। দরকার হলেই অফিসে গিয়ে আমাকে খবর দেবে। আমার অফিস চেন ত?"

রণেন বলিল, "আহা, তা যেন আর চিনি না? কতবার গিয়ে দেখে এসেছি। তুমি আমায় ভাব কি?"

পূর্ণিমা হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, তুমি মস্ত বয়স্ক লোক, তা আমি জানি।" বলিতে বলিতেই গাড়ী আসিয়া পড়িল।

মাকে সঙ্গে করিয়া পূর্ণিমা ও সরমা দুজনেই বাহির হইল। খুব বেশী দূর নয়। গিয়াই অবশ্য তাহারা ডাক্তার মহাশয়কে পাইল না। তিনি আর একজন রোগীকে লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। মিনিট পনেরো-কুড়ি কাটিয়া গেল। তাহার পর তাহাদের ডাক পড়িল।

আসল ব্যাপারে সময় লাগিল না, খুব বেশীক্ষণ। মা কাতরও হইলেন না, বেশী কিছু। আবার তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিয়া বিছানায় শোওয়াইয়া দিল। বলিল, "আমি এখন যাই মা, মিঃ মজুমদারের গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, আমাকে নিয়ে যাবে ব'লে।"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "খেয়েছিস ?"

পূর্ণিমা বলিল, "এখন কিছু খাবার সময় হবে না মা। অফিসের canteen থেকে খাবার আনিয়ে খেয়ে নেব। রণু রইল আজ তোমার কাছে।"

গাড়ী করিয়া যাওয়ার জন্য খুব বেশী দেরি হইবে না বোধ হয়। কাজে ফাঁকি দিবার কল্পনাও এখন তার করা উচিত নয়। যথেষ্ট উৎপাত সে এমনিই করিতেছে হিরণ্ময়ের উপর। কেন, কেন এত করুণা তাঁহার পূর্ণিমার প্রতি ? মানুষটা স্বভাবতঃই অত্যন্ত পরদুঃখকাতর ব'লিয়াই কি ? না, আর কিছু আছে তাঁহার মনে ? কিন্তু পূর্ণিমার মত দুর্ভাগিনীর এ সব চিন্তা করিয়া লাভ কি ?

মোড়ের কাছে গাড়ীটা আসিতেই দেখা গেল দীপক বাহির হইয়া কোথায় চলিয়াছে। পূর্ণিমার দিকে একবার ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে তাকাইয়া সে চলিয়া গেল। আশ্চর্য্য, এই দু'দিনের মধ্যে একবারও পূর্ণিমার মনে পড়ে নাই দীপকের কথা। এমনি সম্পূর্ণরূপে কি সে পূর্ণিমার জীবন হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া গিয়াছে ? সাহায্যকারীর জন্য যখন তাহার প্রাণ আকুল হইয়া খুঁজিতেছিল, তখনও ইহার কথা সে মনে আনে নাই। মানুষের অতি দুঃখের দিনের সাথী হইবার মত মানুষ দীপক নয়। জীবনে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য থাকিলে হয়ত সে পাশে পাশে চলিতে পারে।

অফিসে পৌঁছিয়া আজ আর তাহার হাঁটিয়া উঠিতে ইচ্ছা করিল না। বড় ক্লান্ত সে, নড়িতে আর ইচ্ছা করে না। Lift-এই উঠিল, যদিও সেখানে বড় ভীড়। কিন্তু পূর্ণিমা যেন তাহা লক্ষ্যই করিল না।

হিরণ্ময়ের ঘরে কাহারা যেন কথা বলিতেছে। পূর্ণিমা নিজের কাগজপত্র গুছাইতে লাগিল। একটু পরেই তাহার ডাক আসিল। ঘরে ঢুকিতেই হিরণ্ময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "X-Rayটা ভালয় ভালয় হয়ে গেল ত ? উনি আজ সকালে আছেন কেমন ?"

পূর্ণিমা বলিল, "X-Ray হয়ে গেছে। মা একই রকম আছেন।"

"কবে plate পাওয়া যাবে ?"

"কাল সকালে দেবে বলেছে।"

হিরণ্ময় নিজের চিঠিপত্র দেখিতেছিলেন। বলিলেন, "কাজ আছে আজ অনেক। পাঁচটা অবধি থাকতে পারবেন ত ? টাইপ অন্য দুজন করতে পারে বটে, তবে বড় গল্প ক'রে বেড়ায়। Confidential ব্যাপার থাকে সব, এ রকম না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।"

পূর্ণিমা বলিল, "হ্যাঁ, পাঁচটা অবধি থাকতে পারব। রণুকে রেখে এসেছি মায়ের কাছে। সরমাও এসে পড়ে চারটার মধ্যে।"

হিরণ্ময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "খেয়ে এসেছেন ত ? সকালেই কি রকম যেন শুকনো দেখাচ্ছে।"

পূর্ণিমা বলিল, "না, খাওয়া হয় নি, এখানেই দুপুরে খেয়ে নেব। ঘুম হয় না মোটে, তাই এরকম দেখায়।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "খাওয়াও হচ্ছে না, ঘুমও হচ্ছে না। এবার নিজে না অসুখে পড়েন। দুপুরে ভাল ক'রে খাবেন কিন্তু শুধু এক পেয়ালা চা খেয়ে ব'সে থাকবেন না। আমি গিয়ে দেখে আসব কি খাচ্ছেন। আর একটা কথা। X-Rayর ফল যা হবে বলে অনুমান করছি, তাতে আপনার মাকে হাসপাতালে কি নার্সিংহোমে রাখা দরকার হবে। বাড়ীতে থাকবেন আপনারা তিনটি ছেলেমানুষ ভাইবোন। এটা ঠিক হবে না। আজ থেকেই কোনো মাসী-পিসীর সন্ধান করুন, যিনি আপনাদের কাছে থাকতে পারেন। তেমন নেই কেউ ?"

পূর্ণিমা বলিল, "আছেন দু'চার জন। আজ ফিরে গিয়েই তাঁদের খবর দেব।"

তাহার পর কাজ আরম্ভ হইল। প্রায় দেড়টার সময় শেষ চিঠিখানা শেষ করিয়া পূর্ণিমা উঠিয়া দাঁড়াইল।

হিরণ্ময় বলিলেন, "যান, খেয়ে নিন গিয়ে ভাল ক'রে। দুটো টোষ্ট অন্ততঃ, তা ছাড়া অমলেট্ নিশ্চয় খাবেন। চা না খেয়ে কোকো খেলে ভাল। ফাঁকি দেবেন না, গুরুজনের কথা মান্য ক'রে নেবেন।"

পূর্ণিমা বাহির হইয়া গেল। গুরুজন? তাই ত বটে! তোমার চেয়ে বড় গুরুজন জগতে কে আমার আছে?

১২

বিকালেও মায়ের অবস্থার বিশেষ কোনো উন্নতি দেখা গেল না। তবে জ্বর আর বাড়িল না। পূর্ণিমা বেশীর ভাগ বারান্দায় বসিয়া কাটাইল, মাঝে মাঝে ঘরে ঢুকিয়া মাকে দেখিয়া আসিতে লাগিল।

এই কয়দিনই সে বাড়ীর বাহির হয় নাই। ইহাতে তাহার শরীর আরো ক্লান্ত ও অবসন্ন বোধ হয়। কিন্তু যাইবে বা কি করিয়া? দীপকের সঙ্গে দেখা হওয়াটা তাহার বহু দিনের অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছিল। না দেখা হইলেই মনের মধ্যে খচখচ করিত। ইহা কি শুধু অভ্যাসেরই বন্ধন ছিল, না আর কিছু ছিল ইহার মধ্যে? শুধুই বন্ধু? চিরদিন ইহারই সঙ্গে থাকিবার কল্পনা কি ছিল না পূর্ণিমার? মনে হয়, সে যেন বিগত কোন জন্মের কথা। এখনকার পূর্ণিমার যে জীবন, তাহার মধ্যে দীপকের স্থান কোথায়? পূর্ণিমার মনে তাহার অজ্ঞাতসারেই দীপকের মূর্ত্তি ক্রমে ছায়াময় হইয়া উঠিতেছিল, সে বুঝিতে পারে নাই। হঠাৎ একদিন সন্ধান লইতে গিয়া দেখিল, ছায়াও যেন আর অবশিষ্ট নাই!

পার্কে এখন গেলে হয়ত তাহার সঙ্গে দেখা হইতে পারে কিন্তু পূর্ণিমার মন ওদিকে কেমন যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে। দীপককে দেখিতে তাহার এখনই ইচ্ছা করে না। যাক্ কয়েকটা দিন! পূর্ণিমার মায়ের অসুখের কথা পাড়ার অনেকেই জানে, দেখিতে অনেকেই আসে। কিন্তু দীপকের কাছ হইতে কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় নাই। অতিরিক্ত অভিমানী স্বভাবের মানুষ সে। কিন্তু অভিমান করার অধিকার কি পূর্ণিমারও নাই? আশ্চর্য্য হইয়া পূর্ণিমা দেখিল, সে অভিমানও করে নাই।

পরদিন সকালে গাড়ী পাঠানোর কথা হিরণ্ময় কিছু বলেন নাই, পূর্ণিমাও বলে নাই। অথচ সকালে গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। হিরণ্ময় লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, পূর্ণিমা যেন গাড়ী করিয়া গিয়া X-Ray-র plate লইয়া আসে। ডাক্তারকে তাহা দেখাইয়া এবং তাঁহার ব্যবস্থা লইয়া সে ইচ্ছা করিলে ঐ গাড়ীতেই অফিসে আসিতে পারে। তিনি নিজে আজও অফিসের গাড়ীতেই যাইবেন, কাজেই পূর্ণিমার জন্য যদি গাড়ীটাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয়, তাহাতেও আসিয়া যাইবে না কিছু।

পূর্ণিমা কেমন যেন হাল ছাড়িয়া দিয়াছিল, কোন কথারই আর প্রতিবাদ করিত না। সে প্রস্তুত হইতে গেল। মনের ভিতর কি যেন একটা পাষাণভারের মত চাপিয়া আছে, উহা কিছুতেই টলে না। শুধু কি মায়ের অসুখের জন্য? তাহাও সে বুঝিতে পারে না।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে সে গিয়া উপস্থিত হইল, radiologist-এর chamber-এ। তিনি গম্ভীর মুখে খামে পুরিয়া প্লেট বাহির করিয়া দিলেন, টাকা লইলেন। তাহার পর বলিলেন, "আমার report ওটার সঙ্গে পিন্ দিয়ে আটকান আছে, পশুপতিবাবুকে দেখাবেন।"

Report-এর দিকে চোখ পড়িতেই পূর্ণিমার মাথাটা ঘুরিয়া গেল। দুই ফুসফুসেই রোগের আক্রমণের প্রবল চিহ্ন। ডাক্তার অবিলম্বে হাসপাতালে লইয়া যাইবার উপদেশ দিতেছেন।

ইহার পর তাহার যাওয়া উচিত ছিল পশুপতিবাবুর কাছে। যাইবে এখন। তাহার প্রাণটা ছটফট্ করিতে লাগিল একবার হিরণ্ময়ের কাছে যাইবার জন্য। তাঁহার মুখের একটা আশ্বাসবাণী না শুনিলে সে আর দাঁড়াইতে পারিবে না।

ডাক্তারটিকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি আপনার ফোনটা একটু ব্যবহার করতে পারি কি?"

ডাক্তার বলিলেন, "নিশ্চয়।"

হিরণ্ময় টেলিফোন ধরিলেন আসিয়া। পূর্ণিমা এক নিঃশ্বাসে বলিয়া গেল, "মায়ের X-Ray plate আর ডাক্তারের report পেলাম। খুব খারাপ। আমি যাচ্ছি আপনার কাছে। আপনি কি এখনই বেরোবেন?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "আসুন আপনি, আমার এখনও দেরি আছে খানিকটা।"

পূর্ণিমা চলিল। তাহার আর কোন অবলম্বন ত নাই? হিরণ্ময়ের করুণাকে আশ্রয় করিয়াই তাহাকে বাঁচিতে হইবে। একলার তাঁহার সাধ্য নাই। কিন্তু মাকে বিনা চিকিৎসায় মরিয়া যাইতে দিতে সে পারিবে না।

গাড়ী গিয়া দাঁড়াইল হিরণ্ময়ের বাড়ীর সামনে। তিনি দোতলায় থাকেন। Calling bell টিপিতেই হিরণ্ময়ের চাকর আসিয়া বলিল, "আজ্ঞে উপরে আসুন আপনি, সাহেব অপেক্ষা করছেন।"

উপরে উঠিল পূর্ণিমা। সিঁড়ির মুখেই হিরণ্ময়ের সঙ্গে দেখা হইল। সবে স্নান সারিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন। পূর্ণিমাকে লইয়া বসিবার ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "বসুন, ভয়ানক হাঁপাচ্ছেন যে? কই, দেখি ছবি আর রিপোর্ট?"

পূর্ণিমা খাকি রঙের লম্বা খামটা তাঁহার হাতে তুলিয়া দিল। তাহার অদূরে একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া হিরণ্ময় সেগুলি দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন, "ভগবান্ আপনাকে একটার পর একটা পরীক্ষার মধ্যে ফেলছেন। যাই হোক, ঘাড় শক্ত ক'রে মানুষকে এ সবের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। যাদবপুরে প্রথম চেষ্টা ক'রে দেখি। ওখানে আমার চেনাশোনা অনেক ডাক্তার আছেন, cousinও একজন কাজ করেন। বলেন ত এখনই ফোন্ করতে পারি। দেরি করা একেবারে উচিত নয়। রোগিণীর নিজের জন্যে নয়, আপনাদের তিনজনের খাতিরে আরও নয়। এমনিতেই আপনাদের যথেষ্ট exposure হয়ে গিয়েছে।"

পূর্ণিমার মুখে তখন কালো একটা ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে। বলিল, "ওখানে free seat আছে না কিছু?"

"আছে, তবে পাওয়া শক্ত। অনেক সময় ছ'মাস আট মাস ব'সে থাকতে হয়।"

পূর্ণিমা হতাশ কণ্ঠে বলিল, "ততদিনে আর আমার seat-এর দরকার থাকবে না। যা সর্ব্বনাশ হবার তা হয়ে যাবে।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "অত ভয় পাবেন না। আপনি ত সাহসী মেয়ে, শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে আপনাকে। বাড়ীতেও চিকিৎসা যে না হয় তা নয়, কিন্তু এক্ষেত্রে সেটা চলবে না। বাড়ীতে জায়গা নেই, এবং আপনাদের infected হবার ভয় বড় বেশী। কিন্তু free seatই হতে হবে কেন? Free না পাওয়া যায়, পয়সা দিয়েই নিতে হবে।"

পূর্ণিমা বলিল, "আমি পারব কি ক'রে? আমার অবস্থা ত আপনি সবই জানেন?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "মিস্ সান্যাল, বিপদে প'ড়ে আপনি আর কারও কাছে যান নি, আমার কাছেই এসেছেন। এই বিশ্বাসেই এসেছেন যে, আমি আপনাকে সাহায্য করব। তা হ'লে আর এ কথা বলছেন কেন? টাকা যা লাগবে তা আমি দেব আপনাকে।"

পূর্ণিমার চোখ প্রায় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। কোনমতে জোর করিয়া নিজেকে সম্বরণ করিল। বলিল, "কতদিন তাঁকে সেখানে থাকতে হবে কিছুই জানি না। কিরকম খরচ হবে তাও জানি না। আপনার ঋণ কোনদিন কি আমি শোধ করতে পারব? ভগবান্ সে ক্ষমতা কি আমাকে দেবেন?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "ঠিক দেবেন। ক'টাই বা টাকা, তার জন্যে এত ভাবনা কেন আপনার? ঢের উন্নতি হবে আপনার, জীবনে ক'টা দিনই বা আপনার কেটেছে? এ সামান্য জিনিষ নিয়ে অত ব্যস্ত হবেন না। নাও যদি দিতে পারেন, কি এসে যাবে আমার? দেখছেন ত, আমি একলা মানুষ, কোন পোষ্য নেই আমার। ওসব ভাবনা থাক এখন, ঢের সময় পাওয়া যাবে ওসবের আলোচনার জন্যে। আমি আজই seat-এর জন্যে চেষ্টা করব। অফিসে যাবার পর ফলাফল আপনি জানতে পারবেন। ব্যবস্থা আজকালের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা হয়ে যাবে। কিন্তু নিজের বড় অযত্ন করছেন আপনি। চেহারা ক্রমেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে।"

পূর্ণিমা বলিল, "এতখানি দুশ্চিন্তার ভারে আমার প্রায় দম আটকে আসে। ভাববার ক্ষমতাসুদ্ধ যেন নেই মনে হয়।"

"আপনার মাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেই অনেকটা relief পাবেন। আচ্ছা, এরপর আপনি বাড়ী যান, একটু বিশ্রাম ক'রে, নেয়ে-খেয়ে তবে অফিসে আসবেন। আমাকেও ready হতে হবে। অফিস থেকেই আমি ফোন্গুলো করব।"

পূর্ণিমা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর হঠাৎ নতজানু হইয়া হিরণ্ময়ের দুই পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। চোখের দু'ফোঁটা জলও ঝরিয়া পড়িল।

হিরণ্ময় চমকিয়া তাহার দুই বাহু ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন। বলিলেন, "এ কি করছেন বলুন ত? এটা নিয়ম নয় কিন্তু।"

পূর্ণিমা বলিল, "কি জানি, কোন্‌টা নিয়ম, আর কোন্‌টা নয়। এই যে একটা হতভাগা অনাত্মীয়া মেয়ের জন্যে এত করছেন, এটাই কি নিয়ম?"

"রক্ত সম্পর্কে অনাত্মীয় হলেই কি তাকে অনাত্মীয় বলা যায়? মানুষের স্নেহের সম্পর্ক ত নানারকম থাকে? আপনি বড় বিচলিত হয়েছেন। হতেই পারেন। আজ অফিসে না যদি যান, তা হ'লে কেমন হয়?"

পূর্ণিমা বলিল, "না, না, আমি অফিসেই যাব। নইলে খবর পাব কি ক'রে? আচ্ছা আসি, আর আপনাকে দেরি করাব না।" বলিয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। দুই চোখ দিয়া তখন জল পড়িতেছে, তাহা হিরণ্ময়কে আর দেখাইতে পারিল না।

বাড়ীতেও এমন চোখের জলে ভেজা, থমথমে মুখ দেখান যায় না। এ রকম মুখ যে দেখিবে, সেই ভয় পাইবে। নিজের কাপড়-জামা, তোয়ালে লইয়া সে এক রকম ছুটিয়াই স্নানের ঘরে চলিয়া গেল। ভিজা শানের মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিল। আজ সে নিজের কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। হিরণ্ময়ের হাত যেখানে তাহাকে স্পর্শ করিয়াছিল, তাহা যেন এখনও শিহরিয়া উঠিতেছে।

ভালবাসা কি এই রকম বস্তু? পূর্ণিমা আজ যদি হিরণ্ময়ের পায়ের উপর আরও খানিকক্ষণ পড়িয়া থাকিতে পাইত, তাহা হইলে এই দারুণ পাষাণভার আর কি তাহার বুকে এমনি করিয়া চাপিয়া থাকিত? ওখানে মরিতে পাইলেও তাহার শেষ মুহূর্তে জীবনটাকে সার্থক মনে হইত। কিন্তু সে দিন তাহার জীবনে আসিবে না।

অনাত্মীয়া তাহাকে মনে করেন না, তাহা না হইলে এত কেন করিবেন তাহার জন্য? স্নেহও একটু হয়ত আছে তাহার জন্য। ইহাকেই জীবনসম্বল করিয়া পূর্ণিমাকে চলিতে হইবে। ইহার বেশী সে পাইবে না। ভিখারিণীকে ইহার বেশী কেন তিনি দিতে চাহিবেন?

কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চোখের জলও যখন ফুরাইয়া গেল, তখন সে উঠিয়া স্নান করিল। হোক খানিকটা দেরি। একটু প্রকৃতিস্থ না হইলে সে হিরণ্ময়ের কাছে মুখ দেখাইবে কি করিয়া? খাওয়া-দাওয়া করিয়া সে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। গাড়ীটা তখনও দাঁড়াইয়া আছে। সরমা জিজ্ঞাসা করিল, "আজ মায়ের কাছে কে থাকবে দিদি?"

পূর্ণিমা বলিল, "আজ ভবানীপুরের পিসীমা সাড়ে দশটার মধ্যে আসবেন ব'লে চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন। আমি আসা পর্য্যন্ত তিনি থাকবেন মায়ের কাছে।"

অফিসে গিয়া যখন পৌঁছিল তখন সত্যই খানিকটা দেরি হইয়া গিয়াছে। হিরণ্ময়ের ঘরে অভিলাষ বসিয়া কাজ করিতেছে। হিরণ্ময়ের মুখে সুস্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন। তাহাকে দেখিবামাত্র অভিলাষ পলাইবার জন্য যেন ব্যস্ত হইয়া উঠিল। হিরণ্ময় বলিলেন, "মিস্ সান্যাল, আপনি যদি ready থাকেন ত এখানে এসে বসুন, আমার আজ অনেক কাজ।"

অভিলাষ বাহির হইয়া যাইতেই, পূর্ণিমা আসিয়া বসিল। প্রথম আসিয়াই একবার হিরণ্ময়ের দিকে তাকাইয়াছিল, তাহার পর সেই যে মাথা নীচু করিয়া বসিয়া কাজ আরম্ভ করিল, মাথা আর তুলিল না। সকালের কথা স্মরণ হইয়া বুকের ভিতর কি রকম একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল। আবার মায়ের জন্য দুর্ভাবনায়ও তাহার মনটা হাহাকার করিতে লাগিল। কিন্তু হিরণ্ময়ের কাজ শেষ না হইলে, অন্য কথা পাড়া যায় না। তিনি পূর্ণিমাকে কি ভাবিয়াছেন কে জানে? হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত বালিকাই ভাবিয়া থাকিবেন হয়ত।

কাজ খানিকটা হইয়া যাইবার পর হিরণ্ময় নিজেই বলিলেন, "মিস্ সান্যাল, এবার একটু দম নিতে পারেন। আপনি সকাল থেকে এরকম মাথা নীচু ক'রে ব'সে আছেন কেন? লজ্জা পাবার মত কি ঘটেছে?"

পূর্ণিমা একবার চোখ তুলিয়া তাঁহার দিকে তাকাইল, আবার মাথা নীচু করিল, বলিল, "সকালে ওরকম করা আমার উচিত হয় নি।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "করেছেন কি আপনি যে উচিত-অনুচিতের কথা উঠছে? দেখুন, ভগবান্ যে মানুষের মনে emotion জিনিষটা দিয়েছেন, সেটার প্রয়োজন আছে জীবনে ব'লেই দিয়েছেন। Emotion-এরও ভালমন্দ

আছে অবশ্য। রাগ, দ্বেষ, হিংসা, এগুলি সংক্রান্ত ভাবোচ্ছ্বাস ত সারাক্ষণই দেখছেন চারদিকে, এ নিয়ে কিন্তু কেউ লজ্জিত হয় না বিশেষ, অত্যন্ত বাড়াবাড়ি না হয়ে গেলে! তা হ'লে মানুষের মনের যেটি সুন্দর দিক্, অন্য মানুষের প্রতি তার ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসার দিক্, সেখানে কিছু যদি emotion প্রকাশ পায়, তাতে লজ্জার কি আছে? অল্প বয়সে মানুষের মন কোমল থাকে, সহজে বিচলিত হয়, তাতে কেউ কি তাদের সমালোচনা করে? আমি নিজে কিন্তু কিছু মনে করি নি। খুশী হয়েছিলাম এই ভেবে যে, আমাকে নিতান্ত একটা পর ভাবলে আপনি আমার কাছে আসতেনও না, চোখের জলও ফেলতেন না। শুধু অফিসের কর্তা যদি ভাবতেন, তা হ'লে formality রক্ষা ক'রেই চলতেন।"

পূর্ণিমা বলিল, "সেটা যে আমি প্রথম থেকে কোনদিনই ভাবতে পারি নি। নিজের পরমাত্মীয় গুরুজনের মতই দেখেছি।"

"খুব ভাল করেছেন। এই আত্মীয়তা আশা করি চিরদিনই থাকবে আমাদের মধ্যে। হ্যাঁ, এখন আর একটা কাজের কথা। খোঁজ খবর অনেক নিলাম। Free seat এখন পাওয়া যাবে না, ঢের দেরি হবে। এমনি seatই ঠিক করলাম। ইচ্ছা করলে কালই মাকে পাঠাতে পারেন। তার পর ঘরদোর জিনিষপত্র খুব ভাল ক'রে disinfect করবেন। আপনাদের সঙ্গে থাকবার কাউকে কি পেলেন?"

পূর্ণিমা বলিল, "একজন পিসীমা আসবেন আজ। তাঁর বিশেষ ঝামেলা নেই সংসারে, বললে তিনি হয়ত থাকতে রাজী হবেন। আজ বাড়ী গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।"

"ওঁকেই ধ'রে রাখুন। তা হ'লে ঐ seatটা নেওয়ার ব্যবস্থা পাকা ক'রে ফেলি?"

পূর্ণিমা বলিল, "তা করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই যখন। মাকে কি কাল নিয়ে যাবার জন্যে রেডী করব?"

"তাই করুন। কিছু কাপড়-চোপড় আর personal use-এর জিনিষ ছাড়া, আর কিছু দরকার হবে না।"

পূর্ণিমা বলিল, "কবে যে ভগবান্ আমাকে নিজের ভার বইবার যোগ্যতা দেবেন। আমি বেঁচে গেলাম আপনার দয়ায়, কিন্তু আপনার জীবনে এ এক নূতন উৎপাতের সৃষ্টি হ'ল। এর শেষ কোথায় দেখতে পাই না।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "সত্যি পরমাত্মীয় যদি ভাবতেন, তা হ'লে এমন কথা বলতেন কি? আমি যদি বলি, এই সাহায্যটুকু করতে পেয়ে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি, তাহলে আপনার মনের দুঃখ একটু কমবে কি?"

পূর্ণিমা এতক্ষণ হিরণ্ময়ের দিকে তাকাইতেই পারে নাই। এখন অতৃপ্ত চোখে কিছুক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

হিরণ্ময় আবার বলিলেন, "বাবা-মায়ের আমি একমাত্র সন্তান। ভাইবোন কেউ নেই, এবং নিকট আত্মীয় বলতে যা বোঝায় তাও কেউ নেই। মানুষের মন একটু তৃষিত থাকে এই সব সম্বন্ধের জন্যে। আপনার মত ছোট বোন যদি আমার একটি থাকত, তা হ'লে খুশী হয়েই কি আমি তার জন্যে এর চেয়ে অনেক বেশী করতাম না? মনে করুন না, আমার সেই না-পাওয়া ছোট বোনের জায়গাতেই আমি আপনাকে গ্রহণ করছি।"

হিরণ্ময় চোখের জল দেখিলে বিব্রত বোধ করেন, পূর্ণিমা জানিত। তাই প্রাণপণ চেষ্টায় চোখের জল সে চোখেই রাখিয়া দিল। শুধু বলিল, "টাকার কথা আর আমি আপনার সামনে বলব না। শুধু কোনদিন যদি সত্যি ছোট বোনের সেবার আপনার দরকার হয়, তা হ'লে আমাকে মনে করবেন।" হিরণ্ময়ের দিকে আর তাকাইতে পারিল না।

হিরণ্ময় বলিলেন, "নিশ্চয়। জন্মসূত্রে যে বোনকে পাওয়া যায়, তাকে মানুষ অনেক সময় ভুলেও যায়। কিন্তু মানুষ যাকে নিজের চেষ্টায় সংগ্রহ ক'রে আনে, তাকে ত ভোলা যায় না।"

ইহার পর আবার আরম্ভ হইল কাজ। পাঁচটায় কাজ শেষ করিয়া উঠিয়া হিরণ্ময় বলিলেন, "তা হ'লে seatটা আমি reserve ক'রে ফেলব বাড়ী গিয়ে। জিনিষপত্র যেমন বললাম গুছিয়ে রাখবেন। আর কিছু যদি দরকার থাকে ওখানে গিয়ে জানা যাবে এবং সংগ্রহ করা যাবে। কালকে ত রবিবার, সেই একটা সুবিধা। আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারব, নইলে আপনি একটু nervous হয়ে পড়বেন। ন'টার সময় সব তৈরি রাখবেন।"

বাড়ী যাইতে যাইতে চারিদিকের বাড়ীঘর দোকানপাট কিছুই যেন পূর্ণিমা দেখিতে পাইল না। চোখ তাহার আগাগোড়াই ঝাপসা হইয়া রহিল। সহযাত্রীরা সকলেই একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে এই অশ্রুমুখী সুন্দরী তরুণীর দিকে তাকাইতে লাগিল। পূর্ণিমা সেটাও যেন খেয়াল করিল না।

ছোট বোন বলিয়াই শেষে তিনি পূর্ণিমাকে জীবনে স্থান দিলেন? না ওটা কথার কথা, পূর্ণিমাকে একটু সান্ত্বনা দিবার জন্য বলা? হইতেও পারে। তাহার জীবনে হিরণ্ময়ের স্থান কোন্‌খানে, তাহা আর পূর্ণিমার বুঝিতে বাকি নাই। কিন্তু ভিখারিণীর ত ক্ষমতা নাই মুষ্টিভিক্ষা ফিরাইয়া দিবার? তাহাকে বাঁচিয়া যখন থাকিতে হইবে, তখন খুদ্‌কুঁড়া যাহা জোটে তাহারই উপর নির্ভর করিয়া সে জীবন কাটাইবে। এক-একবার মনে হইতে লাগিল, দীপকের অভিশাপ কি আসিয়া লাগিতেছে তাহার জীবনে? পূর্ণিমা তাহাকে বিদায় দিয়াছে, তাই কি নিজেও সে নির্ব্বাসিতা হইল নিজের বাঞ্ছিত স্বর্গলোক হইতে?

কিন্তু দীপক সত্যই কি তাহাকে কোনদিন ভালবাসিয়াছিল? তাহা হইলে মিলিত হইবার সব সম্ভাবনাকে সে এমন করিয়া এড়াইয়া চলিত কেন? ইহা যেন ছিল তার একটা মানসিক বিলাস। বিকাল বেলার মৌতাত। না হইলে গা ম্যাজ ম্যাজ করে, মন বিষণ্ণ হইয়া যায়। যেটুকু প্রয়োজন, সেইটুকু জুটিয়া গেলেই আর দরকার থাকে না। তাহার কোন উদ্যম ছিল না জীবনকে ভাঙিয়া গড়িবার, পায়ের বেড়ি ভাঙার বদলে সে যেন আরও প্রাণপণে উহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিত। চেষ্টা যাহা করিবার, তাহা পূর্ণিমাই করিয়াছে।

যাক্, সে পর্ব্ব ত চুকিয়াই গিয়াছে। পূর্ণিমাও কি সত্যই কোনদিন তাহাকে সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিল? এখন আর ত তাহা মনে হয় না। খুব একটা সখ্য ছিল দীপকের সঙ্গে প্রথম প্রথম। তাহার অদর্শন পূর্ণিমাকে পীড়া দিত, সাহচর্য্য আনন্দ দিত। কিন্তু এই রকম হোমবহ্নির মত বুকের ভিতর কি জ্বলিত? জীবন কি এমন দুর্ব্বিষহ ভার মনে হইত, তাহার বিরহে? দিনের আলো কি উজ্জ্বলতর হইত তাহার মুখ দেখিলে? রাত্রির আকাশের দিকে সেও হয়ত চাহিয়া আছে মনে করিয়া কি সেই নক্ষত্রদীপ্ত আকাশকে সুন্দরতর লাগিত চোখে? কোনদিনই তাহা হয় নাই।

বাড়ীতে পৌঁছিয়া দেখিল, পিসীমা আসিয়াছেন, এবং তখনও তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। এখন সব কথা খুলিয়াই বলিতে হইল সকলকে। মা সবচেয়ে বেশী আপত্তি করিবেন, পূর্ণিমা ভাবিয়াছিল, কিন্তু তিনি কোন আপত্তিই করিলেন না। বলিলেন, "তাই কর্ বাবা, আমাকে পাঠিয়েই দে হাসপাতালে। এখানে তোরা আমাকে নিয়ে বড় বিব্রত হয়ে পড়েছিস। ওখানে দেখা-শোনা ভালই করে শুনেছি।"

সরমা আর রণেনের ত চোখে জলই আসিয়া গেল। মাকে ছাড়িয়া তাহারা কোনদিন থাকে নাই। বাবার মৃত্যুর কথা তাহাদের মনে পড়ে না, মা-ই ছিলেন তাহাদের বিশ্বজগৎ।

যাহা হোক, সারিয়া-সুরিয়া মা শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন শুনিয়া তাহারা তখনকার মত চুপ করিয়া গেল। পূর্ণিমা তখন পিসীমার সঙ্গে কথা বলিতে বসিল। সব কিছু সবিস্তারে শুনিয়া তিনি বলিলেন, "মাস দুই-তিন থাকতে পারি যদি দরকার হয়। এখন বৌমা বাপের বাড়ী থেকে ফিরে এসেছে, তাড়া কিছু নেই যাবার।"

তার পর আস্তে আস্তে পূর্ণিমা মায়ের জন্য জিনিসপত্র গুছাইতে লাগিল। যাহা যাহা দরকার হইবে মনে করিল, সবই দিল। মাও দুই-চারিটি জিনিসের নাম করিলেন। একবার মেয়েকে একলা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত খরচ কি ক'রে চলবে মা?"

মেয়ে বলিল, "সব এখন মজুমদার সাহেব দিচ্ছেন মা। বেঁচে যদি থাকি, তাঁর ঋণ আমি শোধ করব, নইলে টাকা পাবেন না, তবে ভগবানের আশীর্ব্বাদ পাবেন।"

ক্রমশঃ

ব্যাধি

শ্রী হরিনারায়ন চট্টোপাধ্যায়

দুপুর থেকেই আকাশে মেঘের পর মেঘ জমছিল, ক্লাসে ব'সে শীলা অতটা লক্ষ্য করে নি। বিকেলে যখন রাস্তায় পা দিল, তখনও চারদিক্ অন্ধকার বটে, কিন্তু মেঘ-থমথম আকাশে শুধু গর্জ্জন, বর্ষণের ছিটে-ফোঁটা নেই।

বেশ খানিকটা হেঁটে গেলে তবে বাস-স্টপ। বইগুলো বুকের মধ্যে জাপ্‌টে ধ'রে শীলা জোরে জোরে পা ফেলল। আর একটু পরেই ভিড় সুরু হবে। বাসে তিল ধারণের স্থান থাকবে না। মাঝপথ থেকে বাসে ওঠাই দুষ্কর, বিশেষ ক'রে মেয়েদের পক্ষে।

কিন্তু বাস-স্টপে পৌঁছবার আগেই বৃষ্টি সুরু হ'ল। জুঁইফুলি ধারাপাত নয়, একেবারে মুষলধারায়। একটু ছুটে শীলা এক গাছের তলায় আশ্রয় নিল। ঝাঁকড়া গাছ। বর্ষার তোয়াজে পত্রের বাহার কম নয়, কিন্তু তাতে শরীর বাঁচল না। বড় বড় ফোঁটা শীলার সারা দেহে প'ড়ে তা'কে বিপর্যস্ত ক'রে তুলল।

বইগুলো শীলা একেবারে ব্লাউজের মধ্যে নিল। রুমাল দিয়ে ঘড়িটা চাপা দিল। মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগল।

বাসের দেখা নেই। মোড়ের একটু ওধারে একটু বৃষ্টি হলেই জল দাঁড়ায়। রীতিমত ডোবার সামিল। বাস্ তখন বুদ্ধিমান গৃহস্থের মতন বিপদ্ এড়াবার জন্যে ঘুরপথ ধরে। তার মানে, বৃষ্টি থেমে, জল না স'রে গেলে বাস্ আসার কোন সম্ভাবনা নেই।

নিরুপায় শীলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির নূপুর শুনতে লাগল। ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ নিশ্বাসের সঙ্গে টেনে টেনে নিল কলিজা ভ'রে। হালকা একটা গানের কলি গুন গুন ক'রে গাইল।

আচমকা একটা শব্দে চমকে মুখ ফিরিয়েই শীলা অবাক্।

একেবারে গা ঘেঁষে কালো রঙের একটা মোটর। চালকের সীটে একটি ভদ্রলোক কাঁচটা তুলে কি বুঝি বলছে।

আমাকে কিছু বলছেন? শীলা ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করল।

আপনি কোন্ দিকে যাবেন ? ভদ্রলোক বারিপাতের শব্দের ওপরে গলার স্বর তোলার চেষ্টা করল।

ভবানীপুর।

উঠে আসুন। আমি যাদবপুর যাব। ভবানীপুর আমার পথেই পড়বে।

শীলা কিছু ভাবল না। অপরিচিত এই ভদ্রলোকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার মোটরে ওঠা সমীচীন কি না, এত কথা একটিবারের জন্যও মনে এল না। এই দুর্যোগে অত কথা ভাবতে গেলে চলে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এভাবে ভিজতে ভিজতে অনির্দিষ্ট বাসের অপেক্ষা করার চেয়ে ভদ্রলোকের সৌজন্যের মর্যাদা রাখা বুদ্ধির কাজ।

আর দ্বিরুক্তি না ক'রে শীলা খোলা দরজা দিয়ে ভদ্রলোকের পাশে গিয়ে বসল। ব'সেই বুঝতে পারল, ভুল করেছে।

শাড়ীটা যে এতটা ভিজেছে সে খেয়াল শীলার ছিল না। বসার সঙ্গে সঙ্গে সীটটা ত ভিজে গেলই, বেশ কয়েক ফোঁটা ছিটকে ভদ্রলোকের ধোপদুরস্ত সার্ট আর প্যান্টের ওপর গিয়েও পড়ল।

ছি, ছি, সীটটা একেবারে ভিজে গেল। শীলা সঙ্কোচভরা কণ্ঠে বলল।

মোটর চালু করতে করতে ভদ্রলোক হাসল, ব্যস্ত হবেন না। সীটের কভারগুলো শুকানো যায়, তা ছাড়া জলে ভিজলে মানুষের মতন সীটের অসুখ-বিসুখ হবার সম্ভাবনা কম।

ঠোঁট চেপে মুখ ফিরিয়ে শীলা হাসল। তার পর বলল, কিন্তু কিছু জলের ফোঁটা ত আপনার গায়েও পড়ল ?

ভদ্রলোক এবার হাসিতে ভেঙে পড়ল, শুধু গান গাইব, এস কর স্নান নবধারা জলে, অথচ জল ছোঁব না, তা কি হ'তে পারে। তা ছাড়া একজন সম্পূর্ণ ভিজবে আর একজন একেবারে শুকনো থাকবে, এটাও ত অন্যায় কথা।

শীলা কিছু বলল না। সীটে হেলান না দিয়ে, একটু সামনে ঝুঁকে বসল। সামনের কাঁচে বৃষ্টির ফোঁটার অবিচল নৃত্য। সরীসৃপ রেখায় জলের ধারা হুড থেকে গড়িয়ে পড়ছে। একজোড়া ওয়াইপার প্রাণপণ চেষ্টাতেও তাদের মুছে ফেলতে পারছে না। চারপাশে নীরন্ধ্র বৃষ্টির প্রাচীর। দূরের কিছু দেখবার উপায় নেই।

আপনি এদিকে কোথাও চাকরি করেন বুঝি ? ভদ্রলোক গিয়ার পাল্টাতে পাল্টাতে প্রশ্ন করল।

চাকরি মানে, আমি হেমাঙ্গিনী বিদ্যানিকেতনে মাস্টারি করি।

ও, ভদ্রলোক ঢোঁক গিলল, আপনি বোধ হয় খুব কড়া টিচার, তাই না ?

অবাক্ চোখে শীলা ভদ্রলোকের দিকে চাইল, কড়া টিচার ? কেন বলুন ত ?

কড়া টিচার না হ'লে এই দুর্যোগে একটি ছাত্রীও ছত্র ধরতে এগিয়ে এল না ? দিদিমণিকে জলপ্রপাতের মুখে ঠেলে দিয়ে স'রে পড়ল ?

উত্তর দিতে গিয়েও শীলা কিছু বলল না। এত কথা বলার কোন মানে হয় না। একটা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষিকা, সেই অনুপাতে তার বেশ একটু গম্ভীর হওয়া উচিত। এমন কিছু আলাপ নেই। জীবনে আর কোনদিন হয়ত দেখাই হবে না। এমন ভাবে যে কোন লোকই বিপদ্‌গ্রস্তা একটি মেয়েকে সাহায্য করত। ভদ্রলোক নূতন কিছু করে নি।

শীলার মনে হ'ল, ভদ্রলোক একটু বেশীই কথা বলে। কথা বলে আর কারণ-অকারণে হাসে।

গাড়ীর গতি মন্থর করতে করতে ভদ্রলোক বলল, আপনাদের স্কুল ছাড়িয়ে একটু দূরেই আমার কারখানা। কারখানা বলা অবশ্য উচিত নয়। জন ছয়েক লোক কাজ করে, মেশিন মাত্র দু'টি। নাট বল্টু এই সব তৈরী হয়। কাজ দেখতে দেখতে নিজের মাথার নাট বল্টু ঢিলে হয়ে গেল। নামটা বেশ জবরদস্ত। দি টুল এম্পোরিয়ম। নামটা শুনেছেন কখনও ?

শীলা ঘাড় নাড়ল। না, শোনে নি।

অথচ প্রত্যেক রবিবারে দু'তিনটি বড় বড় কাগজে আমি বিজ্ঞাপন দিচ্ছি। অবশ্য এ ত শাড়ী-গয়নার ব্যাপার নয়, যে আপনাদের চোখ পড়বে। এ একেবারে নীরস ব্যাপার কি না।

ভদ্রলোক সশব্দে হেসে উঠল। তার হাসি থামবার আগেই শীলা বলল, দয়া ক'রে বাঁ দিকে একটু রেখে দিন, আমি এখানে নেমে যাব।

ভদ্রলোক মোটর থামাল বটে, কিন্তু অনুযোগও করল, এখানে নামবেন কোথায়, এ ত মহাসাগর !

এই মহাসাগরেই নামা ছাড়া আর উপায় নেই, কারণ বাঁ দিকের গলিতে আমার বাড়ী, সেখানকার যা অবস্থা তাতে আপনার গাড়ী ঢুকলে অচল হয়ে যাবে।

কোন উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই শীলা নেমে পড়ল। নামবার আগে ধন্যবাদ জানিয়ে হাত তুলে নমস্কার করতে গিয়ে থেমে গেল। এই প্রথম সে সোজাসুজি চাইল ভদ্রলোকের দিকে। এতক্ষণ ভিজে শাড়ী নিয়ে একটু বিব্রতই ছিল। তা ছাড়া ভদ্রলোকের পরিহাসের ধরণটাও তার ভাল লাগে নি। তাই সারাক্ষণ বাইরের দিকেই চেয়ে ছিল।

চোখ ফিরিয়েই অবাক্ হয়ে গেল।

সুগৌর বর্ণ, বুদ্ধিদীপ্ত দু'টি চোখ, প্রশস্ত ললাট। মুখের হাসি অম্লান। অকারণেই শীলার দু'টি গাল আরক্ত হয়ে উঠল। এমন একজন কান্তিমান পুরুষের পাশাপাশি ব'সে এতটা পথ এসেছে দেখে মনে একটা শিহরণ অনুভব করল।

আবার দেখা দিন-সাতেকের মধ্যে।

এবারে দুর্যোগ নয়। বেশ আলো ঝলমল্ দিন। ক্লাশ শেষ ক'রে স্কুলের বাইরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সেই কালো মোটর। এবারেও একেবারে পাশে।

আড়চোখে দেখেই শীলা মন শক্ত ক'রে নিল। না, আর নয়। এবারে মোটরে উঠতে বললে সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করবে। আস্কারার নরম মাটি বেয়ে সোহাগের লতাকে আর উঠতে দেবে না।

ভদ্রলোক মোটর থামাল বটে, কিন্তু শীলাকে উঠতে বলল না। হাত জোড় ক'রে হেসে শুধু বলল, নমস্কার, দেখুন ত এটা আপনার জিনিষ কি না?

তার প্রসারিত হাতের দিকে চেয়েই শীলা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আজ সাতদিন ধ'রে এ জিনিষটা সমস্ত জায়গায় তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেছে। বোনদের সঙ্গে ঝগড়া করেছে, মায়ের সঙ্গে মন কষাকষি।

একটা কানপাশা। ভদ্রলোকের রক্তাভ তালুতে কানপাশাটার ঔজ্জ্বল্য যেন শতগুণ বেড়ে গেছে।

সেদিন বৃষ্টিতে ভিজে তাড়াতাড়ি মোটরে ওঠার সময় কি ভাবে খুলে পড়েছে। প্রথমে হয়ত শাড়ীর ভাঁজে আটকে ছিল, তার পর নেমে যেতে গাড়ীর মধ্যে পড়েছে।

হাত বাড়িয়ে জিনিষটা নিতেও শীলার লজ্জা করল, কি জানি যদি হাতে হাতে ঠেকে যায়। ভদ্রলোক আবার কি রসিকতা ক'রে বসবে ঠিক নেই। আর মাথা তুলতে পারবে না শীলা, বিশেষ ক'রে স্কুলের এত কাছে।

ভদ্রলোকই সমস্যার সমাধান ক'রে দিল।

নিন, আঁচল পাতুন।

শীলা অঞ্চল প্রসারিত করল। ভদ্রলোক কানপাশাটা টুপ ক'রে ফেলে দিল।

যাক্, দায়মুক্ত হলাম। ক'দিন যে কি ভাবে কেটেছে। ভদ্রলোক হাসবার চেষ্টা করল।

কানপাশাটা শীলা নিজের ভ্যানিটি ব্যাগে রাখতে রাখতে বলল, আমায় খুঁজে না পেলে কি করতেন?

কি আর করতাম। কিছুদিন অপেক্ষা ক'রে সোনা বেচে লোহা কিনে নিতাম। আমার কারখানার বাড়-বাড়ন্ত হ'ত।

কথা শেষ ক'রেই ভদ্রলোক মোটরের দরজা খুলে দিলেন।

বাড়ীর দিকে যদি যান, নামিয়ে দিতে পারি।

মোটরটা নজরে পড়া থেকে শীলা ঠিক করেছিল কিছুতেই মোটরে উঠবে না। অনুরোধ করলেও পাশ কাটিয়ে যাবে, কিন্তু ভদ্রলোক একবার বলতেই শীলা ইতস্ততঃ করল। দৃঢ় সংকল্প, দুর্বার প্রতিজ্ঞা সব শিথিল। বাসের বাদুড়-ঝোলা অবস্থার সঙ্গে, হাত-পা ছড়িয়ে মোটরের গদীতে নিজেকে ছেড়ে দেওয়ার কথা তুলনা করতেই শীলা মন ঠিক ক'রে ফেলল। ক্ষতিটা আর কি! একটা ভদ্রলোকের পাশাপাশি দিনের আলোয় শহরের মধ্যে দি কিছুটা পথ গেলে আর কি অন্যায় হবে। যে কোন সভ্যজগতেই এ ভাবে ভদ্রমহিলাকে তুলে নেওয়ার রেওয় আছে। তাতে শীলার জাত যাবে না, ধর্মও নয়।

তবু উঠতে উঠতে শীলা বলল, রোজ রোজ এভাবে আপনাকে বিব্রত করতে আমার ভারি লজ্জা করে।

ভদ্রলোক এ্যাকসিলেরাটরে চাপ দিয়ে মোটরে গতি সঞ্চার ক'রে বলল, রোজ রোজ আর আপনি আসছেন কোথায়। আমার কারখানা থেকে ফেরবার পথেই আপনার স্কুল, যদি অভয় দেন ত রোজই তুলে নিতে পারি।

শীলা আরক্ত হ'ল। বলল, না, আপনার অত উপকার ক'রে আর দরকার নেই।

কেন বলুন ত? ভদ্রলোক রীতিমত বিস্মিত হ'ল।

কেন আবার, আমার এত কষ্টের সংগ্রহ করা চাকরিটা দু'দিনে যাবে।

চাকরি যাবে?

যাবে না? একশ' কুড়ি টাকা মাইনের শিক্ষিকাকে যদি কেউ বারোহাজারী মোটরে ক'রে রোজ তুলে নিয়ে যান, সেক্রেটারীর কাছে কথাটা উঠলে, তখনই পত্রপাঠ বিদায় ক'রে দেবেন। বলবেন, যাও, সত্যিকারের দুঃস্থ মেয়েকে স্থান ক'রে দাও।

এবার ভদ্রলোক সশব্দে হেসে উঠল। হাসি থামলে বলল, অবশ্য আমার মোটর বারোহাজারী নয়। সাড়ে আট হাজারে কিনেছি, কিন্তু এর জন্যে যদি আপনার চাকরি যায় তবে থাক, আপনাকে মোটরে তোলার আর চেষ্টা করব না। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, উত্তর দেবেন? যদি কিছু মনে না করেন।

শীলা ভ্রূকুঞ্চিত করল। মুখে কিছু বলল না।

এই সব ছেলেমেয়ে পড়ানোর কাজ আপনার ভাল লাগে? দোহাই আপনার, শিক্ষার আদর্শ, নারী-জাগরণ এ সব বড় বড় কথা বলবেন না। ঠিক যা মনে হয়, সেইটুকুই বলুন।

শীলা হাসল, আপনার কি ধারণা মনের মত জীবিকা বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা আমাদের আছে? ভিক্ষার চাল, তা আবার কাড়া না আকাড়া।

কিন্তু যে জীবিকার সঙ্গে মনের কোন সংযোগ নেই, তেমন কাজ করা অপরাধ ব'লে মনে করেন না? এতে ত ছাত্রছাত্রীদেরও ক্ষতি হয়।

এবার কিন্তু বড় বড় কথা আপনি বলছেন। অপরাধতত্ত্ব বিশ্লেষণ না ক'রেও এটুকু বলতে পারি, এমন অনেক কাজ আমাদের করতে হয়, যাতে মনের সম্মতি পাই না।

যেমন ধরুন, আমার পাল্লায় প'ড়ে মোটরে ওঠা।

ছি, ছি, ওকথা বলছেন কেন? আমার ইচ্ছা না থাকলে আপনি আমাকে কি পারতেন গাড়ীতে ওঠাতে?

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। দুরন্ত হাওয়ায় নিজের এলোমেলো চুলগুলো শীলা হাত দিয়ে ঠিক ক'রে নিল, তার পর প্রতিপ্রশ্ন করল, আপনার মতে মেয়েদের কি করা উচিত?

মেয়েদের? ভদ্রলোক একটু বুঝি ভাবল, তার পর বলল, দিব্যি বিয়ে-থা ক'রে সংসারী হওয়া উচিত। স্বামী বেরিয়ে গেলে পড়শীদের কাছে পান চিবোতে চিবোতে স্বামীর নিন্দা, আবার বিকেলে স্বামী ফিরে এলে তাকে চা দিতে দিতে পড়শীদের কুৎসা।

শীলা হাসল বটে, কিন্তু বলতে ছাড়ল না, ও, মেয়েরা বুঝি পরনিন্দাই করে?

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক উত্তর দিল, না, শুধু পরনিন্দা কেন, আত্ম-প্রশংসাও করে।

মোটর গলির মধ্যে ঢুকতেই শীলা সচেতন হয়ে উঠল, এ কি গলির মধ্যে মোটর ঢোকালেন কেন?

আজ ত আর জল জমে নেই যে, মোড় থেকেই বিদায় দেবেন? আজ আপনাকে বাড়ীর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দেব।

একটু গিয়েই মোটর থামল, শীলারই নির্দেশে। শীলা দরজা খুলে নেমেই দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘুরে বলল, আপনাকেও নামতে হবে।

আমাকে?

হ্যাঁ, গরীবের বাড়ী এক কাপ চা খেয়ে যাবেন। আসুন।

শীলার পিছন পিছন ভদ্রলোকও বাড়ীর মধ্যে ঢুকল।

মধ্যবিত্ত বাইরের ঘর। দরজায় মোটর থামতে ছোট দুই বোন উঁকি দিচ্ছিল। পিছনে শীলার বাপের বলিরেখাঙ্কিত মুখের কিছুটা দেখা গেল। তিনিও উৎসাহ দমন করতে পারেন নি।

এক নজরে শীলা একবার ঘরের দিকে দেখে নিল। টেবিলের ওপর একটা ময়লা আস্তরণ। কিছুক্ষণ

আগে বাবা চা খেয়েছিলেন, চায়ের কাপটা তখনও বসান রয়েছে। দেয়ালে বিবর্ণ ক্যালেণ্ডার। ওদিকে একটা পর্দা ঝুলছে বটে, কিন্তু যে কোন ভদ্রলোকই একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে, পর্দাটা আসলে ছেঁড়া একটা শাড়ী। তাও দু'-এক জায়গায় তালি দেওয়া।

কিন্তু উপায় নেই। ভদ্রলোককে আমন্ত্রণ জানাবার সময় এ-সব শীলার মনে পড়ে নি।

শীলার বাবা এগিয়ে এলেন। কৌতূহলী দৃষ্টি বোলালেন ভদ্রলোকের ওপর, তার পর মেয়ের দিকে চোখ ফেরালেন।

পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়েই শীলা বিব্রত হ'ল। ভদ্রলোকের নামটা জানা নেই। জানবার কথাও নয়, তাই শুধু বলল, বাবা, সেই বৃষ্টির দিনে ইনিই গাড়ী ক'রে আমায় মোড় পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন। আজকেও পথে দেখা হয়ে গেল, কিছুতেই ছাড়লেন না।

শীলার বাবা হরদয়ালবাবু রেসকোর্সের কেরাণী ছিলেন। অশ্বপুচ্ছের তাড়নায় বহু আমীরকে ফকির হতে দেখেছেন। দুনিয়াটা চেনেন রন্ধ্রে রন্ধ্রে। এখানে বিনা স্বার্থে কেউ কুটোটি নড়ায় না, সেটা তাঁর জানা।

কাজেই বুঝলেন, মেয়ে ব্যাপারটা যত সহজ ব'লে তাঁকে বোঝাতে চাইছে, সব কিছু এত সরল নয়। তা হোক, মেয়ের পছন্দ আছে! ছেলেটি সুপুরুষ। গাড়ী যখন আছে, ছোট খাটো বাড়ী একটা কি আর নেই? সবই ঠিক, কিন্তু, ওই কিন্তুর কথাটাই হরদয়ালবাবু ভাবলেন।

মিনিট কয়েক, তার পরই জড়তা কাটিয়ে উঠে হরদয়ালবাবু আবাহনের ভঙ্গিতে দু'হাত বাড়ালেন, আসুন, আসুন। আপনার মতন লোকের পায়ের ধুলো এ বাড়ীতে পড়েছে, অসীম সৌভাগ্য আমার। বসুন দয়া ক'রে।

হরদয়ালবাবু সামনের একটা চেয়ার টেনে দিলেন।

অভ্যর্থনার আতিশয্যে ভদ্রলোক বিব্রত হ'ল। চেয়ারে বসতে বসতে বলল, আপনি আমায় ওভাবে আপনি, আজ্ঞে করছেন কেন? আমি আপনার ছেলের মতন।

হরদয়ালবাবু ঢোঁক গিললেন। আর দেখতে হবে না। বঁড়শি কানকোয় মোক্ষমভাবে বিঁধেছে, এ মাছ ডাঙ্গায় উঠল বলে।

বেশ ত বাবা, তুমিই বলব। আজকালকার ছেলেদের আবার মেজাজ বোঝা মুশকিল কি না।

আমার নাম প্রিয়ব্রত।

বা, বেশ নাম, চমৎকার নাম। আমি তা হ'লে প্রিয় ব'লেই ডাকব। কথাটা ব'লেই হরদয়ালবাবু থেমে গেলেন। ঈশ্বর জানেন, মেয়েও ইতিমধ্যে ওই নামে ডাকতে সুরু করেছে কি না।

সেদিন প্রিয়ব্রত চা জলখাবার খেয়ে যখন উঠল, তখন রাত প্রায় আটটা, হরদয়ালবাবুর অনুরোধের উত্তরে মাঝে মাঝে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

মাঝরাতে শীলার ঘুম ভেঙে গেল। একটা ঘরে ছোট দুই বোন নিয়ে সে শোয়। পাশের ঘরে মা আর বাবা।

বাপের গলা শোনা গেল, ছেলেটি ত খুবই ভাল। নিজের বাড়ী, গাড়ী, কারখানা। আমাদের পাল্টা ঘর। কোন দিকে কোন অসুবিধা নেই। যে ভাবে তোমার মেয়ের দিকে কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে দেখছিল, তাতে মনে হ'ল দুজনের মধ্যে বেশ আলাপ-সালাপও হয়েছে। আর কিছুদিন পরে কথাটা পাড়লে হয়।

এবার মায়ের কণ্ঠ, সবই ত বুঝলাম, কিন্তু এদিকের কি হবে?

কি আবার হবে। ওতে আটকাবে না।

না বাপু, আমার মনে হয় সব কিছু জানিয়ে দেওয়াই ভাল।

মাথা খারাপ তোমার। জানিয়ে দিলেই পিছু হটবে। এমন পাত্র আমি হাজার বছর মাথা খুঁড়লেও আনতে পারব না।

তা ব'লে, এ ভাবে লুকোচুরি করবে? ভবিষ্যতে জানতে ত পারবেই, তখন মেয়ের জীবনটা যে বিষময় হয়ে উঠবে!

শীলা আর কিছু শুনতে পেল না। কথাবার্তা খুব চাপা গলায় সুরু হ'ল। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে

উঠে জানালার কাছে গিয়ে বসল। বাইরে অবারিত জ্যোৎস্না। টেবিলের ওপর থেকে হাত বাড়িয়ে ছোট আয়নাটা তুলে নিয়ে মুখের সামনে ধরল।

না, কিছু বোঝা যায় না। বোঝবার উপায় শীলা রাখে নি। গাঢ় লাল লিপষ্টিকে দুটো ঠোঁটই রক্তিম। নীচের ঠোঁটের সাদা ছাপগুলো অনেক খুঁটিয়ে দেখলেও ধরা যায় না।

কিন্তু কতদিন এ ভাবে শীলা লুকিয়ে রাখতে পারবে। একেবারে কাছের মানুষটাকে কি ক'রে ভোলাবে দিনের পর দিন প্রসাধনের প্রলেপ দিয়ে। তা ছাড়া একটু একটু ক'রে শ্বেত চিহ্নগুলো ঠোঁটের উপর ছড়িয়ে পড়ছে, বিস্তার লাভ করছে, খুব শম্বুক গতিতে। কিন্তু তবু একদিন আসবে, যেদিন শীলা লিপষ্টিকেও বুঝি আড়াল করতে পারবে না। দুরারোগ্য ব্যাধির করাল ছায়ায় তার জীবন বিষাক্ত হয়ে উঠবে।

নিজের মনকে শীলা বোঝাল। এই মুহূর্তে এই সব কথা ভাবার কি খুব প্রয়োজন আছে? মাত্র দু'দিনের আলাপ। এই প্রথম দিন প্রিয়ব্রত শীলার বাড়ীতে এসেছে। শুধু এইটুকু সম্বল ক'রে আকাশে বাসর সাজানো অর্থহীন। আর হয়ত কোনদিনই দেখা হবে না, এতদিন যেমন হয় নি। হাজার জনতার চাপে দু'জন দু'দিকে ছিটকে পড়বে।

সব ঠিক আছে। শীলা বার বার মনে মনে আওড়াল। অর্থহীন চিন্তা ক'রে কোন লাভ নেই। কিন্তু সব সংযম, সব দৃঢ়তার বাঁধ ধ্বসে পড়ে। শীলার কানের কাছে সুমধুর কণ্ঠে এক পাখী তার বাপের কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করে। দুজনের মধ্যে বেশ আলাপ-সালাপও হয়েছে।

চায়ের কাপটা দেবার সময়ে একবার বুঝি প্রিয়ব্রতর হাতের সঙ্গে শীলার হাতটা ঠেকে গিয়েছিল। শীলা অসূর্যম্পশ্যা নয়। হাজার মানুষের ভিড়ে তাকে যাওয়া-আসা করতে হয়। অবাঞ্ছিত ভাবে বহু ছোঁয়াছুঁয়ি হয়েই থাকে। তার মধ্যে সুকান্ত পুরুষ দু'একজন যে না থাকে, এমন নয়। কিন্তু কোনদিন হাতে হাতে স্পর্শের রেশ বুকের সমুদ্রে এ ভাবে উত্তাল ঢেউ তোলে না। মাতাল করে না মনকে।

এইখানেই শীলার ভয়। এ ভয় কাটিয়ে উঠতে না পারলে সে অতলে তলিয়ে যাবে।

আয়না সরিয়ে রেখে শীলা আবার বিছানায় এসে শুল। দু'চোখে হাতচাপা দিয়ে ঘুমাবার চেষ্টা করল, আর তখনই ধরা প'ড়ে গেল।

দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়ছে, ঠিক যেমন ভাবে পড়ত এই চিহ্ন প্রথম ধরা পড়ার সময়। ছোট তিলের মত সাদা একটা দাগ। চোখ কুঁচকে আয়নার খুব কাছে না গেলে বোঝাই যেত না। হাত দিয়ে ঘ'সে ঘ'সে দাগটা তোলবার অনেক চেষ্টা শীলা করেছিল। শাড়ী দিয়ে মুছেছিল, কিন্তু সে দাগ নিশ্চিহ্ন করতে পারে নি।

আস্তে আস্তে দাগটা ছড়িয়ে পড়ল। শীলার মা একদিন দেখতে পেলেন। মেয়েকে কাছে ডেকে বেশ কিছুক্ষণ ধ'রে নিরীক্ষণ ক'রে বাপকে জানালেন।

হরদয়ালবাবু প্রথমে বিশেষ আমল দেন নি। বলেছিলেন, আরে দূর, ও রোগ বংশে কারো নেই, শীলার হবে কি ক'রে?

কি ক'রে হবে শীলার মা বোঝাতে পারেন নি, কিন্তু এটুকু মনে হয়েছিল, একবার ডাক্তার দেখানো দরকার।

হরদয়ালবাবু অনেক দিন এড়িয়ে গিয়েছিলেন। শীলারও ডাক্তারের কাছে যাবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। তার ভয়, কি জানি এখন যেটা কেবল সন্দেহের ধোঁয়া, সেটা স্থির বিশ্বাসে পরিণত হবে। তার চেয়ে জানা-না-জানার দ্বন্দ্বে দোল খাওয়াই ত ভাল।

কিন্তু শীলার মা ছাড়েন নি। জোর ক'রে বাপের সঙ্গে মেয়েকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

দুজনে যখন ফিরে এল, তখন হরদয়ালবাবুর মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। মেয়ের মুখ দেখে মনে হ'ল সারাটা রাস্তা সে কেঁদেছে।

এসেই শীলা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। মা-বাপের হাজার ডাকেও বেরোল না। সারা রাত কিছু মুখে দিল না।

তার পর অনেক মলম এল, বড়ি, নানা রঙের ওষুধ। শেষকালে টোটকা আর তাবিজ। কোন ফল হ'ল না। নীচের ঠোঁটটা সাদা দাগে ছেয়ে গেল। এতদিন দূর থেকে এতটা বোঝা যেত না, এবার বেশ বিসদৃশ দেখাতে

লাগল

শীলা প্রসাধনের শরণ নিল। গাঢ় লাল লিপষ্টিকে দুটো ঠোঁট রঞ্জিত করল। কোন সময়ে বিনা লিপষ্টিকে থাকত না।

তা যেন হ'ল। এ ভাবে পথচারী অথবা সহকর্মিণীদের চোখে ধুলো দেওয়া হয়ত সহজ, কিন্তু জীবনের অন্তরঙ্গ মানুষটিকে কি ভাবে প্রবঞ্চিত করবে! ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন বাদ দিয়েও শীলা সম্ভব-অসম্ভবের কথা ভাবল। প্রতি মুহূর্তে যে মানুষটা সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে, ঘনিষ্ঠ বাঁধনে বাঁধা, তার চোখ এড়াবে কি করে!

এতদিন এ সমস্যার বালাই ছিল না। হরদয়ালবাবু মেয়ের বিয়ের কোন কথা বলেন নি। চেষ্টাও করেন নি। শীলাও নিজের পড়াশোনা নিয়ে আর পড়ানো নিয়ে ব্যস্ত ছিল। নিশ্ছিদ্র বইয়ের প্রাচীর ভেদ ক'রে বসন্তের বাতাস আসার অবকাশই ছিল না।

কিন্তু এতদিন পরে সবকিছু যেন ওলোট-পালোট হয়ে গেল।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে শীলা নিজের মনকে শক্ত ক'রে নিল। না, প্রিয়ব্রতর সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখবে না। হরদয়ালবাবু অবশ্য যা ভেবেছেন, সে ধরনের কোন সম্বন্ধই দু'জনের মধ্যে গ'ড়ে ওঠে নি। তবু এখন থেকে শীলাকে সাবধান্ হতে হবে। যা কোনদিন হবার নয়, এমন একটা আশাকে বুকের রক্ত দিয়ে লালন করার কোন মানে হয় না।

সেদিন মাথাধরার অজুহাতে শীলা স্কুল থেকে আধঘণ্টা আগে বেরিয়ে পড়ল। কিছু বলা যায় না, ছুটির সঙ্গে সঙ্গে হয়ত প্রিয়ব্রতর কালো মোটরটা গা ঘেঁসে এসে দাঁড়াবে, মূর্ত্তিমান্ বিভীষিকার মতন। তার চেয়ে একটু আগে বেরিয়ে পড়াই ভাল।

ঠিক বাস-স্টপের কাছাকাছি এসেই শীলা চমকে উঠল। পিছনে মোটরের হর্ণ। সর্বনাশ! কি বলবে শীলা? কি ক'রে প্রিয়ব্রতর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

পিছন ফিরেই শীলা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। কালো মোটর বটে, কিন্তু প্রিয়ব্রতর নয়। মোটরে ভর্তি স্ত্রীলোকের পাল। মাড়োয়ারী মহিলা।

একটু স'রে শীলা পথ ক'রে দিল।

দিন দশেক কালো মোটরের সাক্ষাৎ মিলল না। ক্রমে ক্রমে শীলা নির্ভয় হ'ল। প্রিয়ব্রত সম্ভবত পথ বদলেছে, কিংবা ফেরবার সময়। শীলা নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতে পারবে।

শীলা যতটা স্বচ্ছন্দ হতে পারবে মনে করেছিল, ততটা যেন হতে পারল না। মনের নিভৃত স্তরে একটা কাঁটার আভাস। চলতে-ফিরতেই খচ্ ক'রে উঠল। সামান্য বেদনা, রক্তক্ষরণ হয়ত নয়, কিন্তু দারুণ একটা অস্বস্তিতে মন ছেয়ে গেল।

কি হ'ল প্রিয়ব্রতর? আর কোন সঙ্গিনী জুটল কি না কে জানে। পথ থেকে তুলে নেওয়া কোন বান্ধবী।

হরদয়ালবাবু কিন্তু ছাড়লেন না। প্রথম প্রথম মেয়ের মুখের দিকে নিবিষ্টচিত্তে কি পড়ার চেষ্টা করলেন। বোধ হয় শীলার প্রণয়-কাহিনী। মেয়ে কতটা এগিয়েছে। ছলাকলার বাঁধনে নিবিড় ক'রে প্রিয়ব্রতকে জড়াতে পেরেছে কি না। মাঝে মাঝে তাকে বাড়ীতে আনছে না কেন? বড়লোকের ছেলেকে এই আবর্জনাস্তূপে টেনে আনতে বুঝি লজ্জা করছে। তা হ'লে বোধ হয় বাইরে দেখা করছে দু'জনে। আজকাল ত হাজার সুবিধা। সিনেমা, রেস্তরাঁ, পার্ক। মেয়ের মুখ দেখে কিন্তু কিছু বোঝার উপায় নেই।

হরদয়ালবাবু দ্বিধায় পড়লেন। ঠিক সময়ে বেরিয়ে মেয়ে ঠিক সময়েই ত বাড়ী ফিরছে। তা হ'লে দেখা করছে কখন। অবশ্য আধুনিক মেয়েদের অসাধ্য কিছু নেই।

কোন গোলমাল হয় নি ত? এমন ছেলেকে হাতছাড়া করা চরম নির্বুদ্ধিতা। চেহারা ভাল, বাড়ী আছে, গাড়ী আছে। একেবারে ট্রিবল টোট।

হরদয়ালবাবু মেয়েকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসাই করলেন, হ্যাঁরে, সেই ছোকরার সঙ্গে তোর আর দেখা হয় না?

শীলা স্কুল থেকে ফিরে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিল, বাপের কথায় কাপ নামিয়ে রেখে ভ্রূ কোঁচকাল, কার কথা বলছ?

শিলালিপি ফটো : আনন্দ মুখার্জি
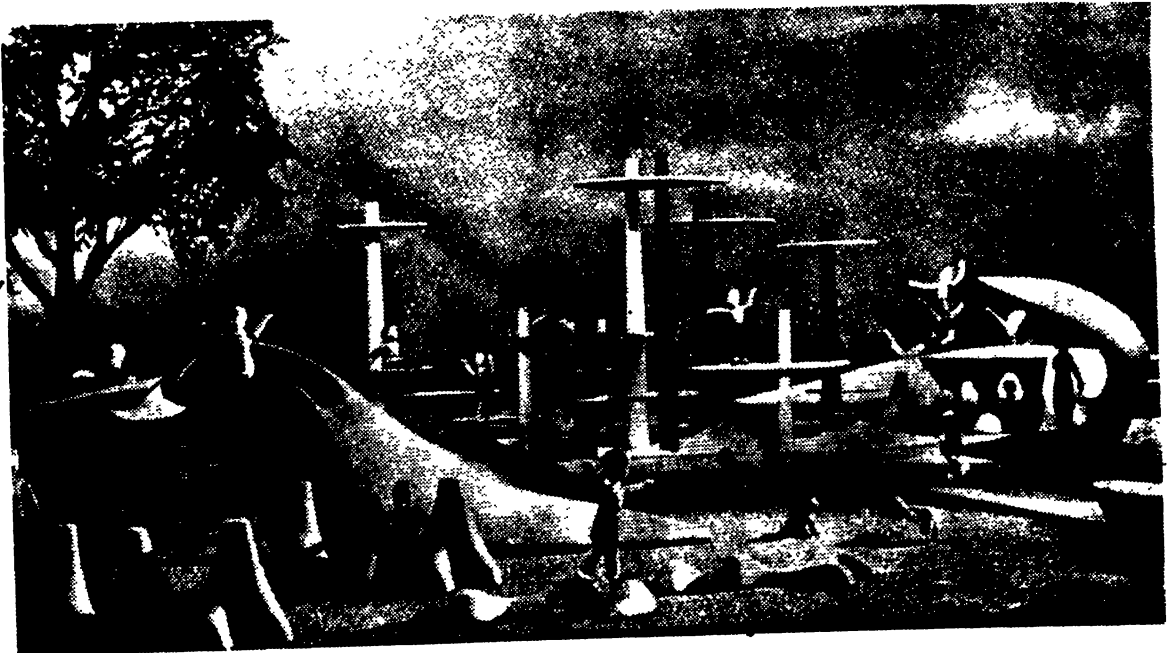
শিশুদের জন্য পরিকল্পিত নূতন ধরণের খেলার মাঠ
(হামবুর্গে আন্তর্জাতিক উদ্যান-প্রদর্শনীতে ইহা দেখান হইবে)

হংস-মিথুন
ফটো : রামকিঙ্কর সিংহ

গোধূলির হাসি
ফটো : আনন্দ মুখার্জি

কি জানি, আর আমার সঙ্গে দেখা হয় নি। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে শীলা উঠে দাঁড়াল। দু'এক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল, বোধ হয় দ্বিতীয় প্রশ্নের প্রতীক্ষায়, তার পর ভিতরে চ'লে গেল।

হরদয়ালবাবুর কপালে অনেকগুলো বাড়তি খাঁজ পড়ল। একটু বুঝি জলে উঠল দুটো চোখ। ঠিক বোঝা গেল না। কোথাও বুঝি একটা গোলমাল হয়েছে। বোকা মেয়ে, তীরে এনে তরণী বানচাল করেছে হয় ত।

ঠিক তার দু'দিন পরেই প্রিয়ব্রতর সঙ্গে শীলার দেখা হ'ল।

স্কুলের ছুটির পর নিঃশঙ্কচিত্তে পথে পা বাড়িয়েছিল, একেবারে সামনে প্রিয়ব্রত। কালো মোটর নয়, ট্যাক্সি।

নমস্কার। প্রিয়ব্রত ট্যাক্সি থেকে নেমে দাঁড়াল।

চোখ চেয়ে দেখেই শীলা চমকে উঠল। উস্কোখুস্কো চুল, পাণ্ডুর মুখ, রীতিমত শীর্ণ চেহারা।

হাত তুলে শীলা প্রতিনমস্কার ক'রে বলল, আপনার শরীর খারাপ নাকি?

বেশ কয়েকদিন ফ্লুতে ভুগে উঠলাম। এখনো খুব দুর্বল, তাই আর গাড়ী বের করি নি। ট্যাক্সিতে যাওয়া-আসা করছি। আসুন।

একটু দূরে কয়েকজন ছাত্রী জটলা করছিল। স্কুলের গেটে জন দুয়েক শিক্ষিকা। তবু শীলা প্রিয়ব্রতর আহ্বান উপেক্ষা করতে পারল না। তার পাশে গিয়ে বসল।

ট্যাক্সি বেশ কিছুটা যাবার পর প্রিয়ব্রত কথা বলল, জানেন, জ্বরের সময় কেবল আপনাকে মনে পড়েছে।

শীলা একটু শিউরে উঠল। এ শিহরণ আনন্দের না আকস্মিকতার তা সে বলতে পারবে না। চুপচাপ মাথা নীচু ক'রে ব'সে রইল।

প্রিয়ব্রত থামল না।

মাঝে মাঝে ভেবেছি, আপনি যদি পাশে ব'সে সেবা করতেন তা হ'লে বোধ হয় এত কষ্ট হ'ত না।

নিজের হৃৎস্পন্দন শীলা নিজের কানে শুনতে পেল। উত্তাল হয়ে উঠেছে রক্তের সমুদ্র। প্রবল আবেগে শিরা, উপশিরা, স্নায়ু থরথরিয়ে কাঁপছে।

খুব মৃদু গলায়, প্রায় স্বগতোক্তি করার ধরণে শীলা বলল, আপনার বাড়ীতে আর কেউ নেই?

না, প্রিয়ব্রত ঘাড় নাড়ল, একেবারে ঝি-চাকরের সংসার।

আত্মীয়স্বজন?

মা আর বাবা গিয়েছেন খুব ছেলেবেলায়। মানুষ হয়েছি নিঃসন্তান কাকার কাছে। যেটুকু লেখাপড়া শিখেছি তাঁরই কল্যাণে। কারখানার পত্তনও তিনিই ক'রে গিয়েছিলেন। গত বছর তিনি মারা গিয়েছেন। কাকীমা গেছেন তাঁর অনেক আগে।

হয়ত অসাবধানে আচমকা প্রিয়ব্রতর একটা হাত শীলার হাতে ঠেকে গেল। তাড়াতাড়ি নিজের অবশ হাতটা শীলা নিজের কোলের ওপর রাখল। সারা দেহ জুড়ে মৃদু ভূমিকম্পের আভাস। অদৃশ্য দুর্নিবার এক আকর্ষণে ক্রমেই শীলা স'রে স'রে যাচ্ছে আর একটি সত্তার প্রাণ টানে। মন যেন সূর্যমুখী হতে চায়। নিজেকে নিবেদন করার ব্যথায় আকুল হয়ে ওঠে।

চোখ তুলেই শীলা স্থির হয়ে গেল। সব উন্মাদনা ছাপিয়ে অব্যক্ত একটা ব্যথায় দেহমন অভিভূত। সামনের দর্পণে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শীলার রক্তিম ওষ্ঠাধর। গাঢ় রঙের অন্তরালে বিষাক্ত এক ব্যাধি আত্মগোপন ক'রে রয়েছে। পাশের মানুষটা যার সামান্য হদিশও পায় নি এখনও।

সেদিন প্রিয়ব্রত শীলাকে বাড়ীর দরজায় নামাল না। গলির মোড়ে ট্যাক্সি থামিয়ে বলল, আমি একটু ডাক্তারের বাড়ী ঘুরে যাব। যদি কিছু মনে না করেন—

না, না, মনে করার কি আছে, শীলা বাধা দিল। নামতে নামতে বলল, আরও কিছুদিন বিশ্রাম নিলেই পারতেন। এ রোগে বড় দুর্বল করে দেয়।

প্রিয়ব্রত হাসল, নিজের ব্যবসার ঐ ত অসুবিধা। ছুটি নিলেই সব অচল।

ট্যাক্সি চ'লে যাবার পর অনেকক্ষণ শীলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কেউ নেই প্রিয়ব্রতর। রোগে সেবা করার, দুঃখে সান্ত্বনা দেবার, নিজেকে উজাড় ক'রে দেবার মত কেউ নেই। সামান্য কয়েকটা শ্বেতচিহ্নকে যদি ক্ষমা করতে

পারত প্রিয়ব্রত, তা হ'লে শীলার কোন আপত্তি ছিল না। আজকে প্রিয়ব্রতর রোগোত্তীর্ণ, ক্লান্ত চেহারা দেখে মনের মধ্যে কোথায় একটা পরিবর্তন শুরু হয়েছে। জলোচ্ছ্বাসে মাটি ভেঙে ভেঙে যাওয়ার মত, মনের দৃঢ়তা, নিস্পৃহতা, কাঠিন্য সব ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে।

বাড়ীতে ঢুকেই হরদয়ালবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল।

পুরোণা একটা খবরের কাগজ খুলে বসেছিলেন, শীলা আসতেই মুখ তুলে দেখলেন।

আজ ইচ্ছা ক'রেই শীলা বাপের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। নিজে থেকেই বলল, আজ প্রিয়ব্রতবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল বাবা।

তাই নাকি? দুটো চোখে জোনাকির দ্যুতি শীলার চোখ এড়াল না, তা বাড়ী নিয়ে এলি না কেন?

শরীর অসুস্থ। ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন।

শরীর অসুস্থ? হাতের কাগজ আছড়ে ফেলে হরদয়ালবাবু লাফিয়ে উঠলেন। যেন খুব নিকটজনের মরণাপন্ন অবস্থার খবর পেয়েছেন।

কি অসুখ? কবে থেকে?

কবে থেকে জানি না। বললেন, ফ্লু।

শীলা আর দাঁড়াল না। ভিতরে ঢুকে গেল। হরদয়ালবাবু পিছন পিছন এলেন।

প্রিয়ব্রতর বাড়ী কোথায় জানিস?

না।

কারখানার ঠিকানা?

তাও জানি না।

এ সব খবর রাখতে হয়। মানুষের দায়বিপদে খোঁজ-খবর নেওয়া উচিত।

বিড় বিড় করতে করতে হরদয়ালবাবু বাইরে চ'লে গেলেন।

বাপের আগ্রহ দেখে শীলা আশ্চর্য হ'ল। এর আগে বিয়ে-থা'র ব্যাপারে খুব ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন নি। বোধ হয় ভেবেছিলেন, শীলা চ'লে গেলে, এক মুঠো টাকা চ'লে যাবে সংসার থেকে। শুধু পেন্‌শনের সামান্য টাকায় সংসার চালানো মুশকিল হবে।

এখন ব্যাপার আলাদা। সেদিন প্রিয়ব্রতর সঙ্গে কথাবার্তায় এ খবরটুকু হরদয়ালবাবু নিশ্চয় সংগ্রহ করেছেন যে, প্রিয়ব্রত সংসারে একলা। শীলাকে তার সঙ্গে গাঁথতে পারলে এ সংসারে সাহায্য করার পক্ষে কোন অসুবিধা হবে না। বরং সচ্ছল হবে অবস্থা।

পরের দিনও প্রিয়ব্রতর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বাস্‌ স্টপে। শীলাই অপেক্ষা করছিল। পর পর তিনটে বাস্‌ এল আর গেল। শীলা দাঁড়িয়ে রইল পথের দিকে চোখ রেখে।

একটু পরেই প্রিয়ব্রতর মোটর দেখা গেল। শীলার কাছাকাছি এসে মোটর থামল।

প্রিয়ব্রত কিছু বলার আগে শীলাই কথা বলল।

আপনার জন্য কাল যা বকুনি খেয়েছি বাড়ীতে।

দরজা খুলতে খুলতে প্রিয়ব্রত বলল, আমার জন্য? সে কি?

হ্যাঁ, আপনি বাড়ী আসেন নি ব'লে। আমি অবশ্য বললাম, আপনি অসুস্থ। ডাক্তারের কাছে গেছেন।

কথা বলতে বলতে শীলা মোটরে উঠে বসল।

আমার নাকি আপনার বাড়ীর ঠিকানা নেওয়াটা উচিত ছিল। সেই দুর্যোগে আপনি আমার এত উপকার করেছেন, আর আপনার অসুখের সময় আমরা কিছুই করতে পারলাম না, বাবা এ কথা বলছিলেন।

প্রিয়ব্রত হেসে বলল, বেশ, এবার অসুস্থ হয়ে পড়লে, আপনাকে খবর দেব, আপনি সেবা করতে যাবেন।

অনেকক্ষণ আর কোন কথা হ'ল না। ময়দানের পাশ দিয়ে মোটরটা ডান দিকে ঘুরতেই শীলা ব'লে উঠল, এ দিকে কোথায়?

ভয় নেই, আপনাকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছি না। ডাক্তার বলেছে গঙ্গার ধারে রোজ একটু বেড়াতে। একটু পায়চারি ক'রেই বাড়ী ফিরব। সামান্য দেরি হ'লে আপনার কি খুব অসুবিধা হবে?

অনেক চেষ্টা করেও শীলা বলতে পারল না। থর থর করে কেঁপে ওঠা ঠোঁটের মাঝখানকার শ্বেত চিহ্নগুলো এই পরম মুহূর্তে আর যেন বিষাক্ত বলে মনে হ'ল না।

শীলা কথা বলল না। শুধু মাথা নাড়ল।

গঙ্গার ধারে মোটর রেখে প্রিয়ব্রত জলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। শীলা সামান্য ব্যবধান রেখে, পিছনে।

আবছা অন্ধকার। আকাশে মেঘ থাকার জন্য অন্ধকার নেমেছে অসময়ে।

প্রিয়ব্রত শীলাকে পাশে ডাকল। তার পর ইনিয়ে বিনিয়ে কাব্যিক ভাষায় নয়, একেবারে সোজাসুজি বলল, আত্মীয়স্বজনহীন সংসারে পাশে একজন প্রয়োজন। জীবনের সঙ্গিনী। শীলাকে প্রথম দেখেই তার ভাল লেগেছিল। শীলাকে কামনা করা কি তার পক্ষে দুরাশা?

শীলা কিছু উত্তর দেবার আগেই দেখল, তার কটিদেশ বেষ্টন করেছে প্রিয়ব্রতর হাত। নদীর কুলুকুলু ধ্বনির সঙ্গে মিল রয়েছে আবেগভরা কণ্ঠের। দূর আকাশের একটি নিঃসঙ্গ নক্ষত্রের জ্যোতির প্রতিচ্ছায়া প্রিয়ব্রতর চোখের দৃষ্টিতে।

অনেক চেষ্টা ক'রেও শীলা বলতে পারল না। থর থর ক'রে কেঁপে-ওঠা ঠোঁটের মাঝখানের শ্বেতচিহ্নগুলো এই পরম মুহূর্তে আর যেন বিষাক্ত ব'লে মনে হ'ল না। একটা মধুর জীবনকে বঞ্চিত করার শক্তি শীলার নেই।

তার পর এক মাস ধ'রে প্রাণান্তকর এক চেষ্টা। সারা রাত শীলা কাঁদল। সারাটা দিন ক্ষতবিক্ষত হ'ল বিবেকের কশাঘাতে। একবার ভাবল, সব কিছু বলবে প্রিয়ব্রতকে। প্রতারণার বিনিময়ে নতুন জীবন কেনা যায় না। কেনা উচিত নয়; ডাক্তার এটুকু বলেছে, এ রোগ সংক্রামক নয়। এক দেহ থেকে আর এক দেহে ছড়াবার কোন ভয় নেই। কিন্তু তবু, নিজের মনকে অবারিত ক'রে তুলে ধরার সঙ্গে দেহের সব কিছু খোঁজও দেওয়া প্রয়োজন। কোন লুকোচুরি দিয়ে জীবন সুরু করা ঠিক নয়।

কিন্তু শীলা পারল না। এ ভাবে নিজেকে অমৃত থেকে বঞ্চিত করতে, অস্বীকার করতে নতুন জীবনকে।

সানাই, ফুল, আলোর সমারোহের মধ্যে প্রিয়ব্রত প্রিয়তম হ'ল। যাদবপুরের দু'তলা মাঝারি আয়তনের এক বাড়ীতে শীলা প্রতিষ্ঠিত হ'ল। প্রিয়ব্রতের কথায় স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিল। প্রথম কয়েকটা মাস আদরে, সোহাগে, প্রেমে নিজেকে হারাল।

খুব ধীরে বাইরের সোনালী আবরণটা খ'সে পড়তে লাগল। প্রথম দিন সামান্য একটু সন্দেহ। শীলার মনে হ'ল, বুঝি ভুলই হয়েছে। অনেকবার বাতাস শুঁকে শুঁকে দেখল। এ গন্ধ শীলার পরিচিত। হরদয়ালবাবু চাকরি-জীবনে মাঝে মাঝে এই রকম নেশা ক'রে আসতেন। খুব সামান্য। একটুও বেসামাল হতেন না। বন্ধুবান্ধবরা রেসে জিতে ফুর্তি করতেন। হরদয়ালবাবুকেও সঙ্গে নিতেন।

ব্যস্, ওই পর্যন্ত। চাকরি যাবার সঙ্গে সঙ্গে নেশাও গেল। বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন। এখন হরদয়াল-বাবু আফিং-সম্বল।

শীলা জিজ্ঞাসা করল, এ কি, কিসের একটা গন্ধ পাচ্ছি?

পাশ কাটাতে কাটাতে প্রিয়ব্রত বলল, ওই এক পার্টিতে গিয়েছিলাম। সকলে চেপে ধরল। তাই একটুখানি।

কথা শেষ না করেই প্রিয়ব্রত বাথরুমে ঢুকে পড়ল।

আবার দিন তিনেক পরে একই অবস্থা। এবার মাত্রা যেন একটু বেশী। সিঁড়িতে এলোমেলো পা ফেলার ভঙ্গি দেখেই শীলা বুঝতে পারল। কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই প্রিয়ব্রতর উচ্চকণ্ঠে হাসি সুরু হ'ল। কোন রকমে চাকরের সাহায্যে প্রিয়ব্রতকে বিছানায় শুইয়ে দিল।

পুরানো চাকর ভোলা। খুব বিশ্বাসী, সেটা ক' মাসেই শীলা বুঝতে পেরেছে। সেই বলল, বাবুর মাথাটা ধুইয়ে দিন মা। আর ড্রয়ারের মধ্যে ঘুমের ওষুধ আছে, একটা বড়ি খাইয়ে দিন।

মাথা ধুয়ে, বড়ি খাইয়ে শীলা জিজ্ঞাসা করল, তোমার বাবুর এ অসুখটা কতদিনের, ভোলা?

ভোলা কোন উত্তর দিল না। মাথা চুলকাতে চুলকাতে স'রে গেল।

রোগ একটা নয়। আর একটা রোগের খবর প্রিয়ব্রত নিজেই দিল। একদিন অসংলগ্ন কথার ফাঁকে ফাঁকে একটা নাম বার বার উচ্চারণ করল। মাথায় বাতাস করতে করতে শীলা চুপ ক'রে শুনল। দাঁত দিয়ে নির্মম ভাবে ঠোঁটটা চেপে ধ'রে।

সুমিত্রা! সুমিত্রা! সুমিত্রা!

প্রিয়ব্রত যে গলির নামটা বলল, সেটা ভদ্রলোকের আস্তানা নয়। তা হ'লে এ সব জায়গাতেও প্রিয়ব্রতর যাতায়াত আছে? যে সুমিত্রা এমন একটা গলির বাসিন্দা, তার কৌলীন্য সম্বন্ধে শীলার কোন সন্দেহ রইল না।

সে রাতে আলাদা ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে মেঝের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে শীলা অনেকক্ষণ ধ'রে কাঁদল। সহজ অবস্থায় প্রিয়ব্রতর তুলনা হয় না। কথায়বার্তায়, আদরযত্নে ত্রুটিহীন। মদের নেশাটুকু শীলা সহ্য করত। প্রিয়ব্রতকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একটা মাত্রার মধ্যে নামিয়ে আনত আসক্তি। কিন্তু আর একটা রোগকে কি ক'রে ক্ষমা করবে? কোন মেয়েই ক্ষমা করতে পারে না। আর একটা স্ত্রীলোককে অলঙ্কার, পরিধেয় সব কিছুর ভাগ হয়ত দেওয়া যায়, কিন্তু স্বামীর শয্যার অংশীদার করা যায় না।

এ কথা নিয়ে সোজাসুজি একদিন প্রিয়ব্রতর সঙ্গে শীলা আলাপ করবে। তার আগে ভোলার কাছে কথাটা পাড়ল।

অনেক চেপে ধরার পর ভোলা শুধু বলল, বুঝতেই ত পারছেন মা, অভিভাবক বলতে ছেলেবেলা থেকে কেউ ছিল না। 'কাকাও এই ধরণের। তবে এবার আপনি এসেছেন, একটু একটু ক'রে এ রোগ সেরে যাবে।

সহজ অবস্থায় শীলা প্রিয়ব্রতর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা ব'লে দেখেছে, প্রিয়ব্রত প্রথমে অস্বীকার করে তার পর চ'টে ওঠে, শেষকালে বলে, তোমার আর অসুবিধাটা কি হচ্ছে? রাণীর হালে ত রেখেছি। আমি কোথায় কি ক'রে বেড়াচ্ছি, তার ফিরিস্তিতে তোমার প্রয়োজন?

সেই প্রিয়ব্রত, দুর্যোগের লগ্নে যে আহ্বান জানিয়েছিল, গঙ্গার কূলে ব'সে যে প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল! সোনালী পালিশ এত দ্রুত, এত সহজে উঠে যাবে তা শীলা কল্পনাও করতে পারে নি।

শুধু সুস্মিত্রা নয়, এ ব্যাপারে প্রিয়ব্রত একনিষ্ঠ এমন অপবাদ কেউ দিতে পারবে না। এক-একদিন মদের ঘোরে এক-এক নাম। মধুপ-বৃত্তিতে প্রিয়ব্রতর বুঝি তুলনা নেই। অবসর সময়ে শীলা ভাবে, তার সঙ্গে আলাপ করার মূলে এই বৃত্তিই কাজ করেছে কি না কে জানে! শুধু একটু বৈচিত্র্য, নতুনতর কিছু করার মোহ।

হরদয়ালবাবু মাঝে মাঝে আসেন। কন্যার ঐশ্বর্যে, তার সুখে বিগলিতচিত্ত। জামাইয়ের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয় না। মেয়েকে একান্তে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, প্রিয় কিছু বুঝতে পারে নি ত? খুব সাবধান, সর্বদা লিপষ্টিক দিয়ে রাখবি। নিজে থেকে জানাবার কোন দরকার নেই।

শীলা কোন কথা বলল না। চোখের জল ঢাকতে মুখ ফিরিয়ে স'রে গেল সেখান থেকে।

অন্যদিন নয়, শুধু শনিবার। শনিবার হলেই প্রিয়ব্রত যেন বদলে যায়। কারখানা থেকে বাড়ী ফেরে না। সোজা চ'লে যায় ফূর্তি করতে। আগে জানলার ধারে ব'সে শীলা অপেক্ষা করত। সারারাত পর্যন্ত। আজকাল করে না। খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজের ঘরে গিয়ে খিল বন্ধ করে। সে রাতে কিছুতেই প্রিয়ব্রতকে শয্যার ভাগ দিতে পারে না।

বিছানায় শোয় বটে, কিন্তু শীলার ঘুম আসে না। বিনিদ্রচোখে রাতের প্রহর গোণে। জেগে জেগেই শোনে, একটা মানুষের বেসামাল পদধ্বনি।

সে রাত্রে ব্যাপার চরমে উঠল।

প্রিয়ব্রত অনেক রাতে ফিরল। টলতে টলতে। জামা-কাপড় কর্দমাক্ত। গলায় বেলকুঁড়ির ছিন্ন মালা। এসব জায়গায় প্রিয়ব্রত মোটর নিয়ে বেরোয় না। ট্যাক্সিতে যাতায়াত করে। চেনা ট্যাক্সিচালক বাড়ীতে পৌঁছে দেয়। চাকরের জিম্মায় দিয়ে তবে যায়।

অন্যবার চুপচাপ ফেরে, এবার প্রিয়ব্রত চীৎকার করে গান ধরল। এত জোরে যে আশপাশের বাড়ীতে আলো জ্ব'লে উঠল। দু'একজন দরজা খুলে বাইরেও এসে দাঁড়াল।

লজ্জায় আরক্ত হয়ে শীলা বাইরে বেরোল। একেবারে প্রিয়ব্রতের সামনাসামনি গিয়ে দাঁড়াল।

ছি, ছি, গলায় দড়ি তোমার! লজ্জা ঘেন্নার মাথা খেয়েছ? তোমার সম্মান-জ্ঞান না থাকে, আমার আছে।

সামান্য কয়েক মুহূর্তের জন্য প্রিয়ব্রত থেমে গেল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে শীলার আপাদমস্তক জরিপ করল, তারপর কঠিন করল কণ্ঠস্বর।

এমন ভাষা শীলা জীবনে শোনে নি। দু কানে আঙুল দিয়ে ছুটে চ'লে গেল ঘরের মধ্যে।

সারারাত দুজনের কেউ ঘুমাল না। না প্রিয়ব্রত, না শীলা।

প্রিয়ব্রত চীৎকার করল। দু' একটা কাঁচের প্লেট ভাঙল। এক অভিনেত্রীর নাম করতে লাগল জপ করার ভঙ্গিতে।

শীলা বিছানায় মুখ লুকিয়ে অঝোর ধারায় কাঁদল।

পরের দিন ভোর বেলা উঠে শীলা স্নান সেরে নিল। শীলা জানে, রবিবার প্রিয়ব্রত অনেক বেলায় ওঠে। বেলা দশটার আগে নয়। তাও শীলা ডেকে ডেকে তোলে।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে ঝুঁকে প'ড়ে প্রসাধন করতে গিয়েই শীলা চমকে উঠল। এতদিন শুধু নীচের ঠোঁটে ছড়ানো ছিল সাদা দাগগুলো, এবার গোটা দুয়েক ওপরের ঠোঁটেও দেখা গেল। হয়ত কিছুদিন পরে ওপরের ঠোঁটটাও ছেয়ে যাবে এই রকম দাগে।

লিপষ্টিকটা তুলে ঠোঁটের ওপর ঘসতে গিয়েই শীলা থেমে গেল। দর্পণে কার কঠিন একটা দেহের প্রতিবিম্ব। সন্ধানী দু'টি দৃষ্টি। আস্তে আস্তে মানুষটা এগিয়ে আসছে।

শীলার কাঁধের ওপর বিরাট এক থাবা। তার হাত থেকে লিপষ্টিকটা ছিটকে পড়ল মেঝের ওপর।

বা, চমৎকার! তাই ত বলি, দিন নেই, রাত নেই, এত লিপষ্টিকের বাহার কেন? রোগটা দিব্যি লুকিয়ে আমার ঘাড়ে এসে বসেছ। তোমার মা-বাপকেও বলিহারি। ঘুণাক্ষরেও এমন একটা কুৎসিত রোগের কথাটা বলেন নি। লজ্জা হয় না, এ ভাবে লুকিয়ে একজনের সর্বনাশ করতে?

প্রিয়ব্রতর কথা শেষ হবার আগেই শীলা টান হয়ে দাঁড়াল। আঁচল খসে মেঝের ওপর। ঠোঁটের শ্বেত চিহ্ন-গুলো বিশ্রী ভাবে প্রকট। দুটো চোখ জ্ব'লে জ্ব'লে উঠল।

আমি শুধু ঠোঁটের কয়েকটা নিরীহ শ্বেতচিহ্ন লুকিয়েছিলাম তোমার কাছ থেকে। যে কোন ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে আমাকে পরীক্ষা করাও, সকলেই বলবে এ রোগ সংক্রামক নয়, মারাত্মক নয়। আমি শুধু এইটুকুই লুকিয়েছি। কিন্তু তুমি যে সারাজীবন, জীবনের ধারা লুকিয়েছ আমার কাছ থেকে। আমি লিপষ্টিকের সাহায্য নিয়েছি, তুমি ভদ্রতার মুখোসে নিজের অন্তরের দীনতা ঢেকেছ। নিজের কুৎসিত জীবনযাত্রার ওপর ছলনার আবরণ টেনেছ। আমার এ ব্যাধির ছায়া তোমার দেহে পড়ার কোন ভয় নেই, কিন্তু তোমার ঘৃণিত ব্যাধি আমার জীবনে চরম সর্বনাশ ডেকে আনবে।

থর থর ক'রে শীলার সারা দেহ কেঁপে উঠল। এবারেও পাশের কয়েকটা বাড়ীর জানালা খুলে গেল। দু'-একজন উঁকিঝুঁকি দিল।

দিক। আর শীলার ভয় নেই। লুকোচুরি করার আর কোনদিন তার প্রয়োজন হবে না।

—•—

বিপ্লবের অভিব্যক্তি

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ও শ্রীকমলা দাশগুপ্ত

পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য ভারতীয় বিপ্লবীরা প্রথম থেকেই পথ হাতড়েছেন নানা ভাবে। দেশের তখনকার শিক্ষাদীক্ষা, মানসিকতা ও সামাজিক পরিবেশে কি ভাবে কোন্ পথে বিপ্লবকে সফলতার দিকে এগিয়ে নেওয়া যায় সেটাই তাঁরা খুঁজে ফিরেছেন। আধুনিক অর্থে যা জাতীয়তাবোধ (national consciousness), যুগ যুগের ইতিহাসে এদেশে তা ছিল না। সমস্ত দেশটাই যে একটা জাতি (nation), এ কথা দেশের মানুষ বুঝতেন না, উপলব্ধি করতেন না। জাতি বলতে তাঁরা বুঝতেন বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়—যেমন, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, নমঃশূদ্র ইত্যাদি অথবা হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান। ব্যক্তিগতভাবে নিজে অথবা বড় জোর নিজের জাতিটা সুখে স্বচ্ছন্দে যাতে থাকতে পারে এই ছিল তাঁদের চিন্তার ধারা, তার বেশী আর কিছু তাঁরা চাইতেন না, ভাবতেও পারতেন না। তাঁদের বৈষয়িক ও সামাজিক অবস্থার মর্যাদাটুকু যাতে বজায় থাকে, নিরাপদে থাকে তার জন্য তাঁরা চাইতেন দেশে সুশাসন—সে শাসন জাতীয় হউক অথবা বৈদেশিক হউক তা নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করতেন না।

ইউরোপীয় সমাজের সংস্পর্শ এখানে ক্রমে জাগিয়ে তুলতে লাগল জাতীয়তাবোধ। বহুযুগের ইতিহাসে ওরা গোটা দেশের সমস্ত লোকের সমবেত স্বার্থ মোটামুটি এক ক'রে দেখতে শিখেছে। সে আদর্শ আমরা পেতে সুরু করলাম ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রথমটা রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টায়। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা অংশ এই জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পরশাসনের অমর্যাদা থেকে গোটা জাতিকে মুক্ত করতে চাইলেন, জাতিকে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হ'লেন। এই লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যেই রামমোহন এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন চেয়েছিলেন।

বিদেশী শাসনের ভিত্তিমূলে প্রথম আঘাত হানল ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ। নানা ব্যাখ্যা এর হয়েছে কিন্তু এও মূলতঃ আমাদের জাতীয় অসম্মান থেকে বাঁচবার প্রচেষ্টা। নীলকরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকারান্তরে তাই। জাতির ক্রমজাগরণশীল আত্মমর্যাদাবোধের প্রকাশ।

মর্যাদাবোধ যখন জাগতে থাকে পথ খোঁজার তখন আর অন্ত থাকে না। ঐ দুটো বিদ্রোহকে জোর ক'রে বাইরে থেকে দাবিয়ে দেওয়া হ'ল বটে, কিন্তু শিক্ষিত লোকের মনের আগুন ধিকি ধিকি জলতে রইল। গুপ্ত সমিতি গ'ড়ে তুলবার ছোট ছোট পরিকল্পনা এর পর থেকে বাংলা দেশের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকে সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্র কলকাতার ছাত্রসমাজের কাছে ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডির আদর্শ প্রচার করতে থাকেন।

উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রশ্ন ও সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা ক্রমে প্রসার লাভ করে। জগতের কাছে জাতির অসম্মানে বেদনাবোধ তাঁদের সর্বদা চঞ্চল ক'রে রাখত। এই অনুভূতি প্রথম দানা বেঁধে ওঠে ১৮৮৫ সালের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। কিন্তু ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে কোন সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন গ'ড়ে তোলার কল্পনা করতেও যে সাহসের প্রয়োজন তা তখনও দেখা দেয় নি। এই সাহসের ল. সা. গু. হিসাবে দেখা দেয় ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট দাবীদাওয়া পেশ ক'রে দেশের জন্য কিছু রাজনৈতিক সুবিধা-সুযোগ আদায় করার পন্থা। বহু নাগরিকের দস্তখত-সম্বলিত দরখাস্ত রাজার কাছে পেশ করার পন্থা ব্রিটেনের ইতিহাসেও সুপরিচিত। এর উদ্দেশ্য কেবল যে রাজার কাছ থেকে সুবিধা আদায় করা তা' পুরোপুরি সত্য নয়। রাজার বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টিরও এ এক উপায়। তারই অনুকরণে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের তরফ থেকে তথাকথিত "আবেদন নিবেদন" করার নীতি গৃহীত হয়।

কংগ্রেসের এই চরিত্র চলতে থাকে নানা আঘাত সংঘাতের ভিতর দিয়ে প্রায় ১৯১৯ সাল পর্যন্ত। এর ভিতরও আবার একান্ত নরমপন্থী ব'লে যাঁরা পরিচিত ছিলেন, এমন কি রাজনীতির সম্পর্কেও আসতেন না, এমনও অনেকে ভারতবর্ষে একটা বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতেন, বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগও রাখতেন। কয়েকটি নাম উল্লেখযোগ্য—গোখলে, রমেশচন্দ্র দত্ত, আনন্দমোহন বসু, জগদীশচন্দ্র বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শিবনাথ শাস্ত্রী। পরাধীনতার গ্লানি এঁদেরও এতখানি চঞ্চল ক'রে রেখেছিল যে, এঁরা কেউ কেউ যে ইংরেজের কাছে নিগৃহীত হন নাই সে অনেকক্ষেত্রে নিতান্তই আকস্মিক ঘটনাক্রমে।

পথ খোঁজা চলতে থাকে কিন্তু নানা দিকে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার মাত্র কয়েক বছর পরে ১৮৯৩ সাল থেকে অরবিন্দ বরোদায় ব'সে 'ইন্দুপ্রকাশ' নামক মহারাষ্ট্রীয় কাগজে লিখতে আরম্ভ করেন। তাতে তিনি এই মত প্রচার করেন যে, জাতিকে স্বাধীন করতে হ'লে বিপ্লবীকাজে প্রথম আসবে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, কিন্তু তাদের প্রচেষ্টায় যতক্ষণ না 'প্রলেটেরিয়েট' বা কৃষকশ্রমিকসহ জনসাধারণ যোগদান করবে ততদিন পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল হবে না। এখানে দৃষ্টি রয়েছে পন্থার অভিব্যক্তির দিকে, মুষ্টিমেয় থেকে জনগণের দিকে। তখনও পর্যন্ত অরবিন্দ ছিলেন চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রে বিপ্লবী ভাবধারার প্রচারক। পরে তাঁকে বাস্তব বৈপ্লবিক রাজনীতির ক্ষেত্রে নিয়ে আসেন যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে নিরালম্ব স্বামী), যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্লবের বীজ ছড়ান বাংলায়, বোম্বাইয়ে, পাঞ্জাবে, যুক্তপ্রদেশে।

আর অরবিন্দকেই এর প্রায় পনের বছর পর আবার দেখি—রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, সতীশ মুখোপাধ্যায়, ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে ইংরেজের অস্তিত্বকে অস্বীকার ক'রে নিজেদের জাতীয় স্বাধীন সত্তা ফুটিয়ে তুলবার নীতির প্রচারক। জাতীয় আত্মসম্মানবোধের এই যে বিকাশ, এ যেন আঘাত খাচ্ছিল কংগ্রেসের সেই প্রায় বিশ বছরের অনুসৃত নীতির কাছে। এই আঘাতের প্রত্যাঘাতেই সুরাটে কংগ্রেসের ভাঙাভাঙি হ'ল।

লাল-বাল-পাল (লালা লাজপত রায়, বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল) আর যেন কংগ্রেসের পুরাণো কাঠামোর ভিতর নিজেদের মানিয়ে চলতে পারছিলেন না।

জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধ থেকে এই যে জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য বেদনাবোধ, বাংলায় তথা ভারতবর্ষে এ থেকেই উৎপত্তি বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের। এই আন্দোলনের সর্বজনগ্রাহ্য আর একটি রূপ ছিল। সে রূপ বিদেশী শাসনকে আঘাত হানা। রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতৃস্থানীয়রা বলছিলেন, আঘাত হানা গৌণ, জাতির গঠন মুখ্য। সে যুগে এ ত সর্বসাধারণের কথা হ'তে পারে না। তাই নেতারা যখন বললেন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (passive resistance), দেশের যুবকরা চাইলেন সক্রিয় সংগ্রাম (active struggle)। এ যুবশক্তি থেকেও অরবিন্দ দূরে রইলেন না। বঙ্গভঙ্গের পর জাতীয় চেতনার উন্মেষ যখন উদ্বেল হয়ে উঠল, সে চেতনার ভাষা ফুটল

'বন্দেমাতরম্', 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', 'নবশক্তি'তে। এতে শুধু আত্মপ্রতিষ্ঠার কথাই থাকত না, সশস্ত্র আঘাত হানার কথাও থাকত। আর, অরবিন্দ ছিলেন এই কাগজগুলির সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি।

এই কথাই বলছিলাম—গোড়া থেকেই ভারতীয় বিপ্লবীরা পথ খুঁজছিলেন, দাসত্বের গ্লানি থেকে মুক্তি পাবার পথ। অন্য বাছ-বিচার কিছু নয়—কোন্ পথে সমগ্র জাতির জাগরণ সম্ভব, কোন্ পথে শৃঙ্খলমুক্ত হওয়া সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের কথাও বলেছি, অরবিন্দ বিপিনচন্দ্রের মতই তিনি জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠা মন্ত্রের পুরোহিত। আবার এও জানি, এই রবীন্দ্রনাথই নিজের ভাইবোনদের সঙ্গে নিজের বাড়ীতে গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করেছেন। সেখানে তাঁরা বুকের রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন। এ দুয়ের ভিতর অসামঞ্জস্য নেই—আছে ঐ পথ খোঁজার প্রবৃত্তি।

ওদিকে, বিগত শতাব্দীর শেষের দিকেই বোম্বাই প্রদেশে বালগঙ্গাধর তিলকের প্রচেষ্টায় বিপ্লবী দল গ'ড়ে ওঠে। ১৮৯৬ সাল মহারাষ্ট্রে মহামারীরূপে প্লেগ দেখা দেয়। একে উপলক্ষ্য ক'রে বেসামরিক ও সামরিক শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরা দেশে অনাচার অত্যাচার আরম্ভ করে। জনসাধারণ ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সরকারী প্লেগ কমিটির সভাপতি ছিলেন র‍্যাণ্ড এবং সদস্য ছিলেন আয়ার্স্ট। তিলকের উদ্দীপনায় জাতীয় অসম্মানের প্রতিবাদ-স্বরূপ চাপেকার-ভ্রাতৃদ্বয় র‍্যাণ্ড এবং আয়ার্স্ট সাহেবকে হত্যা করেন ১৮৯৭ সাল। লক্ষ্য, জাতীয় আত্মসম্মানবোধ ফুটিয়ে তুলে স্বাধীনতার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলা।

প্রায় ঐ একই সময়ে বাংলা দেশে প্লেগ লেগেছিল। বাংলায় কিন্তু জাতিকে জাগাবার জন্য ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করলেন ভগিনী নিবেদিতা। স্বামী বিবেকানন্দের উৎসাহে উদ্দীপনায় নিবেদিতা নিলেন সেবার পন্থা। সেবার ভিতর দিয়ে জাতীয় একতা ও জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা। মূল লক্ষ্য ঐ একই।

প্লেগের সময় নিবেদিতা যখন স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে কলকাতায় সেবা এবং রিলিফের কাজ করছিলেন সেই সময় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কলকাতায় এসে ঐ কাজে যোগদান করেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ লিখেছেন, যতীন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতেন এবং তাঁরা দুজনে ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে দীর্ঘ সময় ধ'রে আলাপ করতেন। কি আলাপ হ'ত তা কেউ জানে না। স্বামী অভেদানন্দ শুধু এইটুকু জানতেন যে, বিবেকানন্দ যতীন্দ্রনাথকে বলতেন, "ভারতের মর্মবাণী জগতে শোনাতে হ'লে আগে চাই ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা।" বিবেকানন্দের এই প্রগাঢ় দেশপ্রেমের বিকৃতি ফুটে ওঠে তাঁর সুযোগ্য শিষ্যা নিবেদিতার মধ্যে। বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার দরুণ বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর নিবেদিতাকে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হয়।

যতীন্দ্রনাথের ভিতর জাতীয় অসম্মানের প্রতিবাদ প্রথম যুগে অনেক সময় ফুটে ওঠে ব্যক্তিগত শৌর্যের ভিতর দিয়ে। খেলার মাঠে দেশীয় আর গোরা খেলোয়াড়দের খেলা দেখতে গিয়ে ভারতীয় দর্শক গোরার হাতে অনেক সময় মার খেয়েছে। মার খেয়ে দৌড়ে পালিয়েছে। যতীন্দ্রনাথ রুখে দাঁড়িয়ে প্রতিশোধ নিয়েছেন একলাই একদল গোরাকে পালাতে বাধ্য ক'রে। শিলিগুড়ি ষ্টেশনের ঘটনা আজ সকলেরই জানা। যতীন্দ্রনাথ বলতেন, অতগুলো সৈন্যের সঙ্গে একলা লড়া—এ গায়ের জোরের প্রশ্ন নয়, এখানে জাতির আত্মসম্মান দায়ের মত ঘাড়ে চাপে—যেন কাঁধে ভূত চেপেছে।

পরবর্তী যুগে যতীন্দ্রনাথ বলেছেন, ঠ্যালায় ঠ্যালায় দেশ উঠবে। শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের সংগ্রাম ছাড়া স্বাধীনতার সম্ভাবনা নেই। প্রথম দিকে প্রয়োজন ছিল, ব্যক্তির বিলোপ দিয়ে দেশে চমক লাগানো, দেশবাসীকে জাগানো। সে কাজ ক'রে গেছে প্রফুল্ল, ক্ষুদিরাম, সত্যেন, কানাই। এখন জাতিকে দেখাতে হবে, জাগ্রত জাতি কি ক'রে শত্রুর সঙ্গে লড়াই ক'রে মরতে পারে। তখনকার অবস্থায় সে চেষ্টার সাফল্য যা হয়েছিল তা দেখিয়ে গেছেন তিনি ১৯১৫ সাল বালেশ্বরের আত্মদানে। এই চেষ্টারই সফলতর রূপ ১৯৩০ সালের চট্টগ্রামে। আর, তার পূর্ণতর রূপ ১৯৪২। এখানেও ঐ একই কথা—আদর্শের অভিব্যক্তি।

আবার পুরাণো কথায় ফিরে যাওয়া যাক্। ১৯০৭ সালে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় রাজদ্রোহমূলক দু'টি প্রবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে অরবিন্দ অভিযুক্ত হন। সাক্ষী বিপিন পাল আদালতে শপথ গ্রহণ করতে অথবা কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করাতে অরবিন্দ মুক্তি পান কিন্তু বিপিন পালের ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। আদালতের বিপুল জনতাকে নিয়ন্ত্রিত করতে না পেরে পুলিস বেপরোয়া লাঠি চালায়। এক শ্বেতাঙ্গ পুলিস কিশোর বাংক

সুশীল সেনকে ঘুঁষি মারে। অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য বিপ্লবী বালক সুশীলও ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকে পাল্টা ঘুঁষি মারে। সুশীল আদালতে অভিযুক্ত হয়। ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড সুশীলকে ১৫ ঘা বেত মারার আদেশ দেন এবং সেইদিনই তাকে বেত মারা হয়।

এই ঘটনায় জাতীয় আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। প্রতিবাদে প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসু মজঃফরপুরে প্রেরিত হন ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করবার জন্য। কিন্তু ভুলক্রমে তাঁরা শ্রীমতী কেনেডি ও তাঁর কন্যাকে হত্যা ক'রে বসেন। প্রফুল্ল শত্রুর হাতে ধরা দেবেন না ব'লে নিজের হাতের পিস্তল দিয়েই নিজেকে শেষ করেন। ক্ষুদিরামের ফাঁসী হয়ে যায় ১৯০৮ সালে।

মজঃফরপুরের এই হত্যাকাণ্ডের সুখ্যাতি ক'রে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য তিলকের ছয় বৎসর কারাদণ্ড হয়।

আদর্শের প্রসার ও অভিব্যক্তি এগিয়ে চলল। ইতিমধ্যে ১৯০৭ সালের শেষভাগে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় এক রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য অভিযুক্ত হন। ব্রহ্মবান্ধব আদালতে বলেন যে, তিনি তাঁর কাজের জন্য কোন বিদেশী সরকারের কাছে কৈফিয়ৎ দিবেন না। বিচারাধীন অবস্থায় এক অস্ত্রোপচারের পর তাঁর মৃত্যু হয়।

জাতীয় আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠার এবং জাতিকে জাগাবার এই আর-এক পন্থা। 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আদালতে অভিযুক্ত হয়ে বললেন, "I have done what I thought to be my duty to my country. You may mete out any punishment you like. I will bear it cheerfully." আমার দেশের প্রতি যা কর্তব্যবোধ করেছি তা আমি করেছি। আপনি যা ইচ্ছা সাজা দিতে পারেন, আমি তা সানন্দচিত্তে সইব।

একখানি রাজদ্রোহমূলক পুস্তক প্রকাশের জন্য বোম্বাইয়ের গণেশ দামোদর সাভারকার ১৯০৯ সালে দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। তিন সপ্তাহ পরে লণ্ডনে ভারতসচিব লর্ড মর্লির অ্যাডিকং স্যার কার্জন ওয়াইলীকে হত্যা করেন মারাঠী যুবক মদনলাল ধিংড়া। বিচারে ধিংড়ার প্রাণদণ্ড হয়। রায় শুনে ধিংড়া সামরিক কায়দায় বিচারপতিকে সেলাম জানিয়ে বলেন, "Thank you my lord, I am glad to have the honour of dying for my country." ধন্যবাদ মহাশয়, আমার দেশের জন্য মৃত্যুবরণের গৌরব লাভে আমি আনন্দিত।

ইতিহাসের অনুরূপ অভিব্যক্তি দেখা দেয় মাদ্রাজে বিপিন পালের বক্তৃতার ফলে চিদম্বরম্ পিলে, সুব্রহ্মণ্য শিব, নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারীর প্রচেষ্টায়।

জাতির অসম্মানের প্রতিবাদে একে একে বিপ্লবী যুবকরা এগিয়ে আসতে লাগলেন মৃত্যুযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য। এতে যেমন ইংরেজকে উল্টে প্রত্যাঘাত করে প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে, তেমনি জাতিকে জাগানো হয়েছে। এঁদের পথ ছিল maximum sacrifice of the minimum number—মুষ্টিমেয় বীরের চরম ত্যাগ। বিপ্লবীদের এই আদর্শকে ভুল বোঝাবার জন্য ইংরেজ অপপ্রচার করেছে, এঁদের এনার্কিষ্ট ও টেররিষ্ট আখ্যা দিয়ে। আমাদের দেশের শিক্ষিতরাও অপপ্রচার না বুঝেই নির্বোধের মতো বিপ্লবীদের সম্পর্কে এই শব্দগুলি ব্যবহার ক'রে গেছেন। এখনও করেন।

১৯১৪ সালের যুদ্ধের সময় বিদেশের অস্ত্র-সাহায্য নিয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য সারা ভারত জুড়ে সশস্ত্র সংগ্রাম করবার আয়োজন হয়। তখন জাতি চলছে জাগরণের পথে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে। বিপ্লবীরা ভেবেছিলেন, আমরা ম'রে দেখিয়ে যাব কি ক'রে দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে হয়, কি ক'রে লড়তে গিয়ে মরতে হয়। ঘটনাক্রমে ইংরেজ আগেই জেনে ফেলে এই প্রচেষ্টার কথা। পাঞ্জাব থেকে সুরু ক'রে বঙ্গোপসাগরের তীর পর্যন্ত এই আয়োজনের শেষ হয় বহু দেশপ্রেমিকের ফাঁসিতে,দ্বীপান্তরে, জেলে এবং শেষ পর্যন্ত বালেশ্বরের হলদি ঘাটে।

এই সময়ে ইংরেজ সরকার বিপ্লবীদের গুপ্ত সমিতির সংগঠনের ও কার্যকলাপের অনেক গোপন তথ্যের সন্ধান পেয়ে যায়। তারা বহু বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার ক'রে বিনা বিচারে দীর্ঘকাল জেলে বন্দী ক'রে রাখে। অনুসন্ধানের ফলে তারা বিপ্লবী সংগঠনের ব্যাপকতা ও গভীরতা দেখে ভবিষ্যতের জন্য শঙ্কিত হয়ে ওঠে। নামমাত্র বিচার ক'রে বা বিচারের প্রহসন ক'রে এবং সন্দেহবশে বিনা বিচারে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দী ক'রে রাখার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার রাউলাট এ্যাক্ট পাস করে। বিপ্লবকে পিষে মারার জন্য স্বৈরাচারী নিষ্ঠুর অস্ত্রটিকে প্রধান অবলম্বনরূপে তারা গ্রহণ করে। এই বে-আইনী আইনের বিরুদ্ধে সারা দেশময় একটা বিক্ষোভ জেগে ওঠে।

গান্ধীজী তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এসেছেন ভারতবর্ষে। তিনি ভাবছিলেন, Servants of India Societyর মতো কোন সেবা-প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে জীবন অতিবাহিত করবেন। কিন্তু অত্যাচার ও জাতির অসম্মানমূলক রাউলাট আইন তাঁকে বিচলিত ক'রে তুলল। এই আইনের বিরুদ্ধে তিনি সারা দেশ জুড়ে একটা প্রতিবাদ দিবসের আয়োজন করেন। প্রতিবাদ দিবসে পাঞ্জাবের জালিয়ান-ওয়ালাবাগে নিরস্ত্র জনতার উপর ইংরেজের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে লাহোরে, কাসুরে দলে দলে ভারতবাসীর লাঞ্ছনার পর গান্ধীজী আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেস ইংরেজের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে ১৯২১ সালে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা গান্ধীজীকে টেনে নিয়ে এল বৈপ্লবিক রাজনীতির ক্ষেত্রে, স্বাধীনতা আন্দোলনের পথে। রাজনৈতিক চিন্তায় তাঁর ভিতর স্পষ্ট রূপ নিল, যে আদর্শ একদিন ফুটে উঠেছিল বিপিন পাল, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথের ভিতর। কিন্তু গান্ধীজী তাঁর আন্দোলনকে এক নতুন পন্থায় নিয়ে গেলেন—সে পন্থা অহিংস সত্যাগ্রহের পন্থা।

নির্মম স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একটা নিরস্ত্র জাতি কি ক'রে সংগ্রাম করতে পারে তার পরীক্ষা তিনি সুরু করলেন। লক্ষ্য সম্বন্ধে বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য তখনও অনেকখানি। তাঁর স্বরাজ ও বিপ্লবীদের স্বাধীনতা—এ দুইয়ের বোঝাপড়া হয় অনেক পরে। তবু পথের মিল হ'ল খানিকটা পর্যন্ত। বিপ্লবীদের চিন্তায় কেবলমাত্র সশস্ত্র সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই পরিপূর্ণ স্বাধীনতা আসা সম্ভব। গান্ধীজী জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠা চাইলেন নিরস্ত্র সংগ্রাম দিয়ে। বিপ্লবীরা এ পর্যন্ত চলেছেন গুপ্ত সমিতির ভিতর দিয়ে। কিন্তু অরবিন্দের ১৮৯৩ সালের আদর্শ তাঁরা ভোলেন নাই। গণ আন্দোলন ছাড়া দেশের স্বাধীনতা সম্ভব নয়। গান্ধীজীর আন্দোলনে যখন গণজাগরণের সম্ভাবনা দেখা দিল, বিপ্লবীরা তাঁর সঙ্গে যোগ দেবার সংকল্প করলেন।

বিপ্লবীদের তরফ থেকে নাগপুরে ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত গান্ধীজীকে প্রশ্ন করেন—আপনি বলেছেন, আপনার প্রোগ্রাম যদি দেশ মেনে নেয় তবে এক বছরের মধ্যে আপনি স্বরাজ দেবেন। এ কথার অর্থ কি? আপনি কি কংগ্রেসকে স্বাধীন রিপাব্লিকান ভারতের পার্লামেণ্ট বলে ঘোষণা করতে প্রস্তুত আছেন?

উত্তরে গান্ধীজী বলেন—Exactly that is my idea—ঠিক এই আমার মত।

ভূপেন্দ্রকুমার বলেন—তা যদি আপনি করেন তাতেই দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে, আমরা বিশ্বাস করি না, কিন্তু আন্দোলন এতে একটা বিপ্লবী পর্যায়ে উঠবে। বিপ্লবের সেখানে আরম্ভ, শেষ নয়। তিনি গান্ধীজীকে কথা দিলেন যে, বিপ্লবীরা এই এক বছর তাঁদের প্রোগ্রাম স্থগিত রাখবেন এবং সর্বান্তঃকরণে কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান করবেন। গান্ধীজী সমর্থন জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বিপ্লবীরা যদি নীতি হিসাবেও না গ্রহণ করতে পারেন, অন্ততঃ যেন পলিসি হিসাবে অহিংসাকে গ্রহণ করেন। বিপ্লবীদের মনের কথা ছিল—এতে জাতীয় আত্ম-মর্যাদাবোধ পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। সমস্ত জাতি সংগ্রামমুখী হয়ে উঠবে।

ইতিমধ্যে এসে গিয়েছিল রাশিয়ায় বলশেভিক বিদ্রোহ। তাতে সাধারণ লোক যারা যুগ যুগ ধ'রে ক্রমাগত দরিদ্র ও নিরন্ন রয়েছে, যারা আশা করতে ভুলে গেছে, তাদের মনেও আশার স্পন্দন জাগে।

কংগ্রেসের ভিতর এই সব বিভিন্ন আদর্শের বিরোধসমন্বয়ে নানারকম আন্দোলন দেখা দেয়। তারই মোটফল দাঁড়ায়, কংগ্রেসকে সংগ্রামমুখী কৃষকশ্রমিক আন্দোলনের রূপ দিয়ে গ'ড়ে তুলবার চেষ্টা হয়। ইতিমধ্যে এসে পড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তার ভিতর গান্ধী-আন্দোলনের ও বিপ্লবান্দোলনের সমন্বয় ঘটে ১৯৪২ সালে। সহযোগিতা আসে পূর্ব এশিয়া থেকে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির' আক্রমণে। ইংরেজ জাতির কাছে তার সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ধরা পড়ে। সর্বনাশের শেষ দেখবার আগে ভারতের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর ক'রে সে স'রে যায়।

প্রায় আকস্মিক ভাবে বিদেশী শাসনের গ্লানি-মুক্ত হয়ে জাতি খুশী হ'ল। কিন্তু গণ-জাগরণের পরিপূর্ণ প্লাবনে বিপ্লব সাধিত হ'লে দেশের পুনর্গঠনের কাজ পাঁচের সঙ্গে পাঁচ জুড়ে হ'ত না, হ'ত পাঁচের সঙ্গে পাঁচের পূরণে। নানা বাধা বছরের পর বছর চোখের জল বওয়াতে পারত না, এক বছরের বানের জলে ভেসে যেত। দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োজন যদি হ'ত ত দেশবিভাগ হয়ে যেত ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে, অথবা তার আগে—রক্তপাতের পর কিছুতেই নয়। এনভার পাশার কৃতিত্বে অনেক পাকিস্থান সৃষ্টি ক'রে জারের রাজত্ব শেষ হ'তে পারত। সে অমানুষি থেকে ইতিহাস বেঁচেছে গণ-বিপ্লবের কল্যাণে।

কিন্তু আশার কথা—বিপ্লব ব্যর্থতা জানে না। ছলকে পড়া দুখের শোকে ইতিহাসও কখনও মুষড়ে পড়ে না বা থমকে দাঁড়ায় না। ঘোরালো পথে হলেও বিপ্লব এগিয়ে চলে। কোথাও বা মানুষের চোখের জলের কাহিনী দীর্ঘ হয়ে ওঠে, কখনও বা মনে হয় অকারণে। এর কোন প্রতিকার নেই, কারণ-অকারণ ইতিহাসের পাতাতেই খুঁজতে হয়।

কি হ'তে পারত, সে বিচারের স্থান কিন্তু এ নয়। এখানে কি হয়েছে, তারই সমীক্ষা।

গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস আন্দোলনের ভিতরও স্পষ্ট ফুটে উঠেছে বিপ্লবের অভিব্যক্তির ধারা। প্রাক্-গান্ধী যুগের বিপ্লবীরা জাতিকে জাগাবার রাস্তা ধরেছিলেন—maximum sacrifice of the minimum number—জনগণের কাছে পৌঁছবার পথ ছিল সেদিন যেমন অজানা, তেমনি রুদ্ধ, তাই সেদিন পথ ধরতে হয়েছিল স্বল্পসংখ্যকের চূড়ান্ত আত্মত্যাগের।

এর পর গণ-আন্দোলনের নীতিতে যেখানে গান্ধীজীর সঙ্গে বিপ্লবীদের প্রথম মিলন ঘটল, সেখানে পথ হ'ল সর্বাধিক লোকের স্বল্প ত্যাগ—minimum sacrifice of the maximum number-এর। প্রথম স্তরে ১৯২১ সালে শুধু ইংরেজ সরকারের সঙ্গে অসহযোগ। পরের স্তরে আঘাত হানা। শুধু ইংরেজ সরকারের আইন ভেঙে। তাও লবণ আইন।

শেষ স্তরে ১৯৪২ সালের মূলমন্ত্র সর্বাধিক লোকের চরম ত্যাগ—maximum sacrifice of the maximum number, ১৯৩০ সালের চট্টগ্রামের সংগ্রাম এখানে ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতে গণসংগ্রামে।

১৯২৮-৩০ সালে বিপ্লবীদের মুখপাত্র ছিল সাপ্তাহিক 'স্বাধীনতা'। এ কাগজ স্পষ্ট ভাষায় বলে, জাতির নেতৃত্ব গান্ধীজীর, কিন্তু ১৯৩০ সালে গান্ধীনেতৃত্ব যেদিন পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শে গণসংগ্রাম ঘোষণা করবে সেদিন যদি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী নিরস্ত্র ভারতবাসীকে ১৯২১ সালে যেমন করেছিল তেমনি গরু-ভেড়ার মত লাঠিপেটা করে তা হ'লে বিপ্লবীরা এই জাতীয় অপমানকে স'য়ে যাবে না, চুপ ক'রে ব'সে মার খাবে না, মারের বদলে মার দেবে, ইংরেজ সাম্রাজ্যের তুলনায় তার মারের অস্ত্র যত ক্ষীণই হউক। মার হয়ত তাতে আরও বেশীই পড়বে। কিন্তু জাতি লাভবান্ হবে—সে ক্ষিপ্ত হবে, মরিয়া হবে।

তাই হয়েছিল। জাতির তরফ থেকে বিপ্লবীপন্থার সকল প্রচেষ্টা ১৯৩০ সালে ফুটে ওঠে চট্টগ্রামে। সেই দিন থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত চলে দুনিয়ার ইতিহাসে বিপ্লবী যুবক-যুবতীর আত্মদানের শ্রেষ্ঠতম, সবচেয়ে চমকপ্রদ, সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায়।

গান্ধীজীর স্বরাজের পথ প্রতিটি মানুষের আত্মমর্যাদাবোধ জাগাবার পথ। বিপ্লবীদের জাতীয় স্বাধীনতার পথও জাতীয় আত্মমর্যাদা জাগাবার পথ। দুয়ের মিলনে ১৯৪২ সাল। গান্ধীজী এ মিলন পছন্দ করেন নাই। মৌলানা আজাদ, পণ্ডিত নেহরু, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ আন্দোলনে যা কিছু ঘটেছে তার দায়িত্ব নিয়েছেন। এমনিই হয়। অমিশ্র আদর্শের পথ ইতিহাসের গতিপথ নয়। অতীত বর্তমানের সঙ্গে মিশে থাকে, বর্তমান ভবিষ্যতের সঙ্গে।

কিন্তু ১৯৪২ সালেও সামনে ছিল অনাগত ভবিষ্যতের হিরোশিমা। আণবিক অস্ত্রের যুগে অস্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে এশিয়া আফ্রিকার অগণিত মানুষের, সারা দুনিয়ারই সমাজের নীচের স্তরের লোকেদের সশস্ত্র সংগ্রামে আশা কতটুকু? সেখানে সমগ্র বিশ্বেরই একমাত্র আশার বাণী—অস্ত্র আমরা তৈরি করব না, ধরব না, অসম্মানও সইব না। প্রতিটি মানুষের স্বরাজের এই দ্বন্দ্ব আজও সামনে।

এই হিসাবে ভারতীয় বিপ্লব সমগ্র বিশ্বমানবের শুধু আত্মসম্মানই জাগায় নাই, আত্মসম্মানবোধকে প্রতিষ্ঠিত করবার পথও দেখিয়েছে।

এই কাহিনী আমার নিজস্ব নয়। এটা আমার বন্ধু মিহিরের ডায়রী থেকে পাওয়া। সে ছিল একজন ডাক্তার। মস্ত বড় ঘরের ছেলে। কলকাতার মিত্তির বাড়ীর নাম জানে না এমন কেউ নেই। সুতরাং ডাক্তারী পাস ক'রে আরও ডিগ্রী নেবার জন্য সে যখন ইংলণ্ডে গেল, তখন সবাই খুব উৎসাহ দিলেও আমরা কিন্তু জানতাম, এ কারণে যাওয়াটা তার গৌণ, তার আসল উদ্দেশ্য নানা দেশ বেড়ান। নিয়মিত চিঠি পেতাম তার কাছ থেকে। ছোটবেলা থেকে হেয়ার স্কুলে, তার পর প্রেসিডেন্সি কলেজে একসঙ্গে পড়েছি, বন্ধুত্বটা গাঢ়ই ছিল। যখন জানলাম সে প্রায় মিশরের কাছাকাছি এসেছে, তখন তাকে লিখলাম একবার আমার এক্সকাভেশন ক্যাম্পে ঘুরে যেতে। অনেক দিন বাদে তার মত আনন্দময় বন্ধুকে কাছে পেলে কতটা যে আনন্দিত হব সেটা অকপটেই জানিয়ে দিলাম। উত্তর এল। যাচ্ছি। কয়েকদিনের মধ্যেই পৌঁছব। তখন কি জানতাম যে আমিই তার নিয়তি? এর পর তার ডায়রীটা পেলাম ক্যাম্পের বাইরে বালুর ওপর। কিন্তু তাকে আর খুঁজে পেলাম না। সে এসেছিল আমার কাছে, এই মিশরে। কিন্তু ফিরে যায় নি আর। তার অনুসন্ধিৎসাই করল তার সর্ব্বনাশ।

মিহিরের ডায়রী

আজ সন্ধ্যেয় মিশর পৌঁছব। দিলীপটা নিতে আসবে। অনেককাল পরে দেখা হবে দিলীপটার সঙ্গে। আর এবার দেখব সেই পিরামিডের রাজত্ব। সেই ফারাওদের দেশ। সেই ছোটবেলার ইতিহাসে পড়া স্বপ্নপুরী মিশর। এসে গেল আলেকজান্দ্রিয়া।

কাল আলেকজান্দ্রিয়া থেকে ট্রেনে কায়রো পৌঁছে বিশেষ কিছুই নূতনত্ব অনুভব করি নি। ঠিক যেন ছোটখাট বিলেতের মত আর একটা শহর। আসার পথেও ত কত শহর দেখে এলাম। ফ্রান্সের বন্দর ক্যালেতে এলাম। সেখান থেকে ট্রেনে করে ফ্রান্স পার হয়ে, প্যারিসের ওপর দিয়ে মার্সেলসে পৌঁছলাম। সেখান থেকে জাহাজে চ'ড়ে আলেকজান্দ্রিয়া। এত কাণ্ড না ক'রে অনায়াসে প্লেনে আসতে পারতাম কায়রো। দেশে ফেরার পথে দেরি না করাই উচিত, কিন্তু আমার দেশ দেখার নেশায় তা ঘটে উঠল না। শুধু যে দেশই দেখেছি তা নয়, এই

যাত্রাপথে কত বিচিত্র দৃশ্য আর কত চরিত্রের মানুষই যে দেখলাম তার আর ইয়ত্তা নেই। এই সব মানুষের সংস্পর্শে এসে কত বিচিত্র অভিজ্ঞতাই লাভ করেছি, আরও কত করব। এই বিদেশে এসে এদেরই মধ্যে খুঁজে পেয়েছি সাহায্যকারী বন্ধু, স্নেহময়ী মা, কল্যাণকামী বোন। শুভানুধ্যায়ী গুরুজনের আশীষও পেয়েছি, আবার পেয়েছি শিশুদের সরল ভালবাসা। ভরিয়ে দিয়েছে এরা আমার মন। অনাত্মীয়ের দেশে এসে খুঁজে পেয়েছি আত্মীয়।

কালকের ধারণা কিন্তু আজ বদলে গেল সমুদ্রের আর্দ্র বাতাস আর খেজুর গাছের ছড়াছড়ি দেখে। ফেলে আসা প্রাচ্যকে মনে প'ড়ে গেল।

পিরামিড দেখে দিলীপের সঙ্গে ওদের ক্যাম্পে এলাম। ধারে-কাছে কোন বসতি নেই। খালি স্তূপ স্তূপ মাটির ঢিপি। আর বড় বড় গহ্বর। আর সেই গহ্বরের মধ্যে থেকে কোন অতীতের গহ্বরের স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন বা দৈনন্দিন জীবনের রীতিনীতি বহু শতাব্দীর অন্তে মৃত্তিকা গর্ভের বন্দিদশা মুক্ত হয়ে আলোকপ্রাপ্ত হচ্ছে। বড় ভাল লাগছে এই উষালোকে এমন একটা জায়গায় একা ঘুরে বেড়াতে। সবাই এখন কম্বল মুড়ি দিয়ে নিজের নিজের ক্যাম্পে ঘুমোচ্ছে। যত বেলা বাড়বে, তার সঙ্গে বাড়বে সূর্য্যের তাত। আর রাত্রে দারুণ ঠাণ্ডা। এই ভোরবেলাটিতে মনে হচ্ছে, যেন রাত্রির মত ধীরে ধীরে অতীতের অবসান হচ্ছে, আর বর্ত্তমানের হচ্ছে অভ্যুদয়!

বন্ধু বলেছে, আজ থেকে উত্তর পশ্চিম কোণের ঐ টিলাটা কাটা হবে। কথিত আছে ঐখানে নাকি অতীতে ভিষকাগার ছিল। মানে আজকালকার যুগে যাকে বলে লেবরেটারি।

আজ তিন দিন হ'ল খোঁড়া হচ্ছে। দিনে দিনে সুন্দর একটি সুপরিকল্পিত ভিষকাগার রূপ নিচ্ছে। যতটা খুঁড়ে বার করা হয়েছে এদিকটা, তাও বিস্ময়কর। মাঝখানে একটি বড় হলঘর মত, তার পর তার সঙ্গে লাগান আরও কতকগুলি ছোট ছোট ঘর। কত রকমের কত আকারের মাটির বাসন। কত উনুন। ঘরে কত তাক। কত ভাবেই না তখনকার চিকিৎসকরা ঔষধ তৈরী করত। কি ভাবে সেগুলি রাখত। কত রকমের চামচে, হাতা। দেখতে দেখতে মনে বিস্ময় জাগে। মনে হয়, কত দূর অতীতে চলে গেছি। হয়ত এইখানেই তৈরী হ'ত সেই আশ্চর্য্য আরক যা মাখিয়ে এরা মরা মানুষের দেহকে পচনশীলতা থেকে বাঁচাতে পারত, হাজার হাজার বছরেও যার অবয়ব নষ্ট হয় না এমন ভাবে মমি করত এরা। কি কি জিনিষ দিয়ে তৈরী করত এরা সেই আরক? কোন্ গাছের ছালের সঙ্গে কি ভেষজ মেশাত? কেমন ক'রে তৈরী করত? এই কয়দিন যেন স্বপ্ন-সাগরে ডুবে ছিলাম। নতুন দেশ দেখার আনন্দে আর বন্ধুর সঙ্গে গল্পে মশগুল ছিলাম। কিন্তু এখন ধীরে ধীরে আমার মনের মধ্যে সেই ডাক্তারটা জেগে উঠছে। জেগে উঠে জানতে চাইছে, কি ক'রে, কি ভাবে তৈরী করত এরা সেই মমি বানাবার অদ্ভুত আরক।

আজ বেশ চাঁদ উঠেছে। আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছি ক্যাম্পের চার ধারে। বন্ধু বলেছে, অচেনা জায়গা, বেশী দূরে একা একা যেও না। আজ বিকেলে আমার 'অনারে' বন্ধু অনেক কিছু তৈরী করিয়েছিল। মাটন চপ, মুর্গির কাটলেট, স্যাণ্ডউইচ, তার সঙ্গে আবার অদ্ভুত স্বাদের টক আর ঝাল মেশান কিছু খাঁটি মিশরীয় ডিশও ছিল। সেগুলিকে হজম করার জন্য তাই একাই বেরিয়ে পড়েছি। হাঁটতে হাঁটতে নতুন কাটা সেই স্তূপটার ওপর উঠেছি। বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। ওভার কোটটা আনলে হ'ত। ভাবলাম ফিরে যাই। এই ভেবে ঘুরে দাঁড়াতেই পাটা কি রকম ফসকে গেল আর আমি একটা গর্ত্তের মধ্যে দিয়ে নীচেয় প'ড়ে গেলাম। খুব বেশী নীচে পড়ি নি তাই বেশি লাগে নি। বিশ্রী একটা ভ্যাপসা গন্ধে ভ'রে আছে জায়গাটা। কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। সঙ্গে যে ছোট টর্চটা ছিল সেটা জ্বালিয়ে চারধারটা একবার দেখলাম আ রে, এ যে চেয়ার-টেবিল দিয়ে সাজান বেশ সুন্দর একটা ঘর। একপাশে একটা পাথরের উনুন, তার পাশে মাটির বয়েম। ঐ উনুনে বোধহয় ওষুধ জ্বাল দেওয়া হ'ত। বয়েমটার গায়ে আবার বেশ সুন্দর নক্সা কাটা। মেয়েরা লম্বা মত হামানদিস্তায়, দু'জন দু'দিকে দাঁড়িয়ে কি কি সব কুটছে—আবার কেউ সোরাই কাঁধে জল নিয়ে যাচ্ছে। পোড়া-মাটির বয়েমটা একেবারে আস্ত, মোটেই ভাঙা নয়। আশ্চর্য্য ঐ ঘরের কিছুই ভাঙা নয়। যেন ঘরের মালিক কিছুদিন হ'ল বাইরে গেছে, তাই ঘরটা বন্ধ ছিল ব'লে ধুলো পড়েছে। কেমন যেন একটা কৌতূহল পেয়ে বসল আমাকে। চার ধার ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। ঘরটা খুব বড় নয়। তবে যে ক'টা জিনিষ রয়েছে, সবই যেন কেমন একটু অদ্ভুত ধরণের। টেবিলের

ডেস্কটা যতটা সম্ভব মনে হ'ল যেন একটা মানুষের পিঠ। আর সেই টেবিলের ধারে রাখা বাতিদানটা যেন কোন মানুষের দুটো হাত। তার হাতের চেটোর ওপর রাখা আছে বাতিদান। তাতে মোম ভরা। দুটো উঁচু টুল মত রয়েছে। কোন মানুষ চেয়ারে বসলে তার দুটো পা যেমন অবস্থায় থাকে, ঠিক সেই রকম একটা পা একটা টুল, আর একটা পা আর একটা। ভারী অদ্ভুত লাগছিল আমার কাছে। অবাক্ বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলাম সেই দিকে, এ আবার কি রকম চেয়ার-টেবিল? কিন্তু দূরে কোন নিশাচর জন্তুর ডাকে চমক ভাঙল, মনে হ'ল ফিরতে হবে। বন্ধু ভাবছে। হয়ত বা দেরি দেখে খুঁজতে বেরিয়েছে। হয়ত বা খাবার নিয়ে ব'সে আছে। ডিনার তৈরি।

কিন্তু বেরুতে গিয়েই পড়লাম মুশকিলে। কোথা দিয়ে যে এখানে ঢুকেছিলাম কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না। টর্চটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছি, শুধু পাথরের পর পাথর সাজান, কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। তবে আমি এলাম কোথা দিয়ে? আশ্চর্য্য ত? এবার আমার মনে একটু ভয়ই জাগল। কি হবে এখন? কি ক'রে বেরুব? হঠাৎ একটা জোর বাতাসের সঙ্গে এক ঢেলা মাটি পড়ল পায়ের কাছে। ঢেলাটার আসার জায়গা নিরীক্ষণ ক'রে দেখে বুঝলাম, ছাতটা এমন অ্যাঙ্গেলে ফুটো হয়েছে যে ভেতর থেকে দেখা যাচ্ছে না। যাক্, অতি কষ্টে বেরিয়ে এলাম। অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতা হ'ল।

বেরিয়ে এসে সেই রাত্রেই খেতে বসে বন্ধুকে সব বললাম। সে ত তখন মুর্গির ঠ্যাং চিবোতেই ব্যস্ত, প্রথমটা ত বিশ্বাসই করল না আমার কথা। বলল, দূর, অন্ধকারে কি দেখতে কি দেখেছিস। তার পর সব শুনে বলল, আচ্ছা কালকেই ঘরটা আবিষ্কার করা যাবে এখন, নে, এখন খেয়ে নে ত তুই।

কিন্তু পরদিন সারাদিন ধ'রে খোঁড়ার পরও সেই ঘরটা পাওয়া গেল না। তার বদলে বেরুল কোন সম্ভ্রান্ত সৌখিন মানুষের থাকার ঘর। সেই ঘর থেকে বেরুল কত অদ্ভুত ধরণের সব ভাঙ্গা বাজনা। একটা বেশ বড় আকারের হার্প। তার তারগুলো কিন্তু বিশেষ নষ্ট হয় নি। ঐ ঘরের পাশে বেরুল মস্ত বড় একটা স্নানাগার। তাতে অনেকগুলো বড় বড় চৌবাচ্চা কাটা। একসঙ্গে অনেক লোক এতে স্নান করতে পারত। সুগন্ধি জলে হয়ত টলমল করত চৌবাচ্চাগুলো। এই বাড়ীর অধিবাসী বোধহয় তাঁর আত্মীয়-পরিজন বা বন্ধু-বান্ধব নিয়ে এই স্নানাগারের চৌবাচ্চাগুলিতে অবগাহন করতেন। তার পর স্নানশেষে ক্রীতদাসরা তাদের গাত্র মার্জ্জনা ক'রে মিশরীয় পোশাক পরিয়ে দিত। মনটা যেন সেই যুগে চ'লে গিয়েছিল। কত অশরীরী মিশরবাসীর ফিস-ফাস কথা-বার্ত্তা আর জলের ছপ্ ছপ্ শব্দ যেন শুনতে পাচ্ছিলাম। এমন সময় বন্ধু এসে বলল, কাল কি যে একখানা গুল মারলি তুই, কোথায় রে বাপু তোর সেই আজগুবি ঘর? কন্ধ-কাটা টেবিল? আর ঠ্যাঙের চেয়ার?

সত্যি কাল রাত্রে যে কোথা দিয়ে সেই অদ্ভুত ঘরটায় ঢুকে ছিলাম তা আর আজ এই দিনের আলোয় কিছুতেই খুঁজে পেলাম না। অথচ বেশী নীচে নয়, অল্প একটু খুঁড়লেই সেই ঘরটা পাওয়া যাবে, এমনি একটা ধারণা কাল রাত্রে ঐ ঘরটায় প'ড়ে গিয়ে হয়েছিল।

আবার রাত হ'ল। আবার গেলাম সেই জায়গায়। কেমন যেন একটা নেশা আমাকে পেয়ে বসেছে। খুঁজে বের করতেই হবে ঘরটা। গত রাত্রের চিহ্ন মিলিয়ে মিলিয়ে গিয়ে হাজির হলাম ঠিক সেই জায়গায়। না:, এ ত খোঁড়া হয়ে গেছে। এটা ত সেই বাজনার ঘর। ঐ ত টর্চের আলোয় বিরাট্ আকার হার্পটা দেখা যাচ্ছে। তবে? কি ভেবে নেমে পড়লাম ঐ বাজনার ঘরটার মধ্যে। অন্যমনস্কে ঘুরে বেড়াচ্ছি সেই বিরাট্ হলটার মধ্যে। দেখলাম, একদিকের দেওয়ালে অন্ধকারে কি যেন একটা চক্চক্ করছে। সেদিকে এগিয়ে চললাম। কাছে গিয়ে সেই চক্চকে উঁচুমত জিনিসটা হাত দিয়ে দেখতে লাগলাম। অনেকটা যেন আমাদের দেশের বাঁদর নাচানর ডুগডুগির মত দেখতে সেটা। তবে সেই ডুগডুগিটার একটা দিক্ দেয়ালের সঙ্গে আটকান। আমি সেটা ধ'রে কত টানাটানি করলাম, কিন্তু খসাতে পারলাম না। এবার বিরক্ত হয়ে সেটাকে ঠেলে দিতেই বিকট একটা ঘড়ঘড় শব্দ হতে লাগল, আর ধুলো-বালি-মাটিতে প্রায় চাপা পড়ার মত হলাম। তার পর দিক্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে কোন রকমে ছুট লাগালাম ক্যাম্পের দিকে।

হাঁপাতে হাঁপাতে দিলীপকে বললাম সব ঘটনা। সে শুনেই সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন কুলি আর একটা হ্যাজাক নিয়ে তক্ষুণি এল আমার সঙ্গে সঙ্গে। ভেতরটা তখনও ধুলোবালিতে ধোঁয়াটে হয়ে রয়েছে। তবে শব্দটা বন্ধ হয়ে গেছে। অতি কষ্টে চোখ না বন্ধ ক'রে ভেতরে ঢুকতেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম। সেই বাজনার

ঘরের খানিকটা দেয়াল স'রে গিয়ে সেই অদ্ভুত ঘরটা বেরিয়ে পড়েছে। দিলীপটাও অবাক্ বিস্ময়ে সেই ঘরের জিনিষগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে দেখলাম।

ভোর না হতেই আবার গিয়ে হাজির হলাম সেখানে। দেখি, দিলীপও এসেছে পেছু পেছু। দুজনেই একসঙ্গে ঢুকলাম ভেতরে। আজ দিনের আলোয় দেখলাম সেই মানুষের পিঠের আকারের টেবিল, আর পায়ের টুল আর হাতের বাতিদান। আর তা ছাড়াও আছে একটা ডাবের মত দেখতে ফুলদানি। দিলীপ বলল, আ রে, এটাই ত সেই এরিকের মাথা। এটা বোধ হয় সেই রাজবৈদ্য পেরিথিউসের ঘর। যে সেই নিত্য-নতুন এক্সপেরিমেণ্ট করত। আমি বলি, কি বলছিস? আমি ত এ নাম কক্ষণো শুনি নি? দিলীপের কাছে এবার একটা অদ্ভুত ঘটনা শুনলাম। তার এসব বিষয়ে যথেষ্ট পড়াশুনা আছে। তাছাড়া থাকেও ত এই সব নিয়ে।

বহু হাজার বছর আগে এই রাজবৈদ্য পেরিথিউসই প্রথম চেষ্টা করেছিলেন, কি ক'রে মানুষের মৃতদেহ অবিকৃত রাখা যায়। তাঁর ধারণা ছিল প্রত্যেক প্রাণীই তার নিজের দেহটা যে পরিমাণ ভালবাসে তাতে যদি কোন অনিবার্য্য কারণে তার আত্মাটা তার সেই প্রিয় দেহ ছেড়ে বেরিয়েও যায়, তবু আবার তা ফিরে আসবার চেষ্টা করবে, করতে বাধ্য। কিন্তু তার জন্য তার সেই দেহটাকে সাজিয়ে রাখতে হবে। নষ্ট করা চলবে না। আর তা হ'লেই সে একদিন না একদিন বেঁচে উঠবে। এই জন্যেই মমি তৈরি করার আরকের সৃষ্টি। এই আরক তৈরি করার জন্যই তিনি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত জেগে গবেষণা করতেন। নানান গাছ-গাছড়া থেকে নির্য্যাস বার ক'রে আরক তৈরি করতেন। যাতে পচন নিবারণ হয়—সেই আরক, এই ছিল তাঁর প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। অদ্ভুত সাধনা ছিল তাঁর। তিনি মরা মানুষকে মমি করার পর নানা রকম ওষধি মেশান জলে স্নান করতেন। আর তার পর বসতেন বাজনা নিয়ে। বীণা বা হার্পের তারে তারে তাঁর আঙুল চলত দ্রুত তালে। সুরু হ'ত সুরের ইন্দ্রজাল। ধূপদানে কি সব সুগন্ধি পুড়'ত, ঘরটা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যেত। তার পর ধীরে ধীরে জেগে উঠত সেই মৃত মমি। তাদের কাছেও তিনি আরক তৈরির উপায় জেনে নিতেন। কখনো তার ফল হ'ত ভাল, কখনো মন্দ। অবশ্য তিনি এগুলিকে নিজের ইচ্ছেমত চালাতে পারতেন। তাঁকে সব সময় সাহায্য করত তাঁর একটি ক্রীতদাস। সে ছিল ইউরেশীয়। লম্বাচওড়া গড়নের সুন্দর সুপুরুষ চেহারা ছিল তার। নাম এরিক। পেরিথিউস নিজে ছিলেন অতি কুৎসিত দেখতে। কিন্তু তাঁর মেয়েটি ছিল বড় সুন্দরী আর বুদ্ধিমতী। তারও ছিল এই মমি করার অদ্ভুত ঝোঁক। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাপ তাকে কাছে ঘেঁষতে দিতেন না। কারণ পেরিথিউস ছিলেন বড় অহঙ্কারী। তিনি চাইতেন, জগতে একমাত্র তিনি ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি এই বিদ্যা জানবে না। তা সে যেই হউক। কিন্তু পেরিথিউসের মেয়ে ইথার প্রচণ্ড কৌতুহলই তাকে টেনে নিয়ে যেত বাপের কাছাকাছি। সেখানে তার লাঞ্ছনা আর গঞ্জনাই সার হ'ত। সে তখন গিয়ে ধরত ঐ বাপের সাহায্যকারী এরিককে। বলত, তুমি আমাকে শিখিয়ে দাও কি ক'রে মমি করে? কি ক'রে তাকে জাগায়?

এরিক তাকে প্রভুকন্যা ব'লে যথেষ্ট সম্মান করত। তবু সে বলত, মমি করা শেখ ক্ষতি নেই কিন্তু মমি জাগাবার চেষ্টা ক'রো না। যার দেহ তারই আত্মা যে সেই দেহে ফিরে আসবে তার কোন মানে নেই। কোন দুষ্টু আত্মা যদি শয়তানের রূপ নিয়ে জেগে ওঠে, সে সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড করবে। কিন্তু ইথার ভারী সখ, সে দুটোই শিখবে। মমি করবেও, আবার তাকে জাগাবেও।

কি করে এরিক? সে সব সময় তাই প্রভুর কাছে থেকে থেকে সব শেখবার চেষ্টা করত। প্রথমে শিখল, কি ক'রে আরক তৈরি করতে হয়, তারপর কি ভাবে সেটা প্যাপিরাসের ছালে প্রলেপের মত মাখিয়ে ধীরে ধীরে ডার গায়ে জড়াতে হয় সব সে পারত। শুধু তার প্রভু কোন্ মন্ত্রে যে মমি জাগাতে হয় সেটা তাকে কিছুতেই শুনতে দিতেন না। ওদিকে ইথাও এরিকের কাছ থেকে সে যতটা জানে সবটাই শিখে নিল। নতুন জিনিষ শেখার আনন্দেই বিভোর ওরা। নিজেদের অজ্ঞান্তেই কখন যে ওরা দুজনে দুজনের কত কাছে চ'লে এসেছে জানে না। এখন মনিব-কন্যা আর ভৃত্যের সম্বন্ধ ছাড়িয়ে তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্কটাই বড় হয়ে উঠেছে। ইথা খালি জেদ ধরে, বলে বাবার কাছে এবার ঐ মমি জাগানর মন্ত্রটা তুমি শিখে নাও এরিক। এরিকও চেষ্টা করে শেখার, তবে খুব সাবধানে, যাতে কোনক্রমেই পেরিথিউস কিছু জানতে না পারেন, বা তাকে অবিশ্বাস না করেন।

ইথা সারাদিন ধ'রে উৎসুক হয়ে থাকে কখন এরিক আসবে। কখন সন্ধ্যে হবে। এরিক তার নিত্য প্রাপ্য দুঘণ্টার ছুটি পাবে। আর সেই অবসরে কাল সে যা শিখেছে বাবার কাছে, তাই তাকে শেখাবে। এরিক তাকে

শেখায়, যতটা সে জানে তা শেখাতে কার্পণ্য করে না। কিন্তু নিজে সে জড়িয়ে পড়ছে। ইথার রূপ তাকে সব ভুলিয়ে দিচ্ছে। ইথাও ভুলে যায় যে এরিক ক্রীতদাস। তার পাশে তাকে বসতে নেই। নিজের খাবার পাত্রে তার সঙ্গে একসঙ্গে খেতে নেই। ইথার মা নেই। তাই সে তার গুটিকয়েক সখা ও ক্রীতদাসী সমেত অন্তঃপুরে থাকে। গান, বাজনা, ছবি আঁকা এই ছিল তার এত দিনের নেশা। বড় জোর মিশরীয় ভাষায় সুন্দর সুন্দর গাথা রচনা করত প্যাপিরাসের পাতায়; আবার সেই পাতাটির চার ধারে পাখী, ফুল, লতা, পাতা এঁকে সেটিকে আরও সুন্দর ক'রে তুলত। কিন্তু এই সূর্য্যদেবতা রীর মত চেহারা নিয়ে এরিক তার সামনে এসেই বড় বিপদ্ বাধিয়েছে। যে দু'ঘণ্টা তারা একসঙ্গে থাকে সে সময়টুকু যেন তাদের স্বপ্নের মত কেটে যায়। শুধু মমি করাই এখন শেখে না ইথা, গানও শেখে এরিকের কাছে। বড় সুন্দর গান করে এরিক। ওদের পূর্ব্ব-পুরুষরা ছিলেন চারণকবি। যাদের কাজই ছিল হার্প বাজিয়ে রাজাদের গুণগান করা। বাগান পেরিয়ে সেদিন ওরা যাচ্ছিল জীবন-দেবী আইসিসের মন্দিরে। এরিকের হাত ধ'রে চলছিল ইথা। সে জানত না যে ঐ বাগানেরই এক ধারে ব'সে আছেন তার পিতা পেরিথিউস।

এর পরই দারুণ অভিশাপ নেমে এল এরিক আর ইথার জীবনে। তখন কিন্তু মমি জাগানর মন্ত্র দু'জনেই শিখে নিয়েছিল। তবে ইথা জানত না যে, তার বাবা এতটা নিষ্ঠুর বা নৃশংস হতে পারেন। সেই রাত্রের পরদিন সন্ধ্যেবেলা যখন ইথা এরিকের জন্য উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছে, ঠিক তখনই তার ঘরে এল দুটো টুল। সেই টুল দুটো ছিল এরিকের পায়ের তৈরি। ওর কাটা পা মমি ক'রে ফ্রেমে আটকে টুল তৈরি করা হয়েছে। যন্ত্রণায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল ইথা। ঐ পা যে তার বড় চেনা। যেদিন সে নাইলে স্নান করতে গিয়ে প্রায় তলিয়ে যাচ্ছিল, তখন এরিকই প্রাণ তুচ্ছ ক'রে সাঁতার দিয়ে তুলে এনেছিল তাকে। তার পর ঐ পা দু'টির ওপর শুইয়েই তার মুখে ঢেলে দিয়েছিল গরম ওষুধ।

পরদিন এল একটা বাতিদান। সে দুটোতে যতই মাটির প্রলেপ থাক, সে দুটো যে এরিকের হাত তা সে বেশ চিনতে পারল। ঐ ত কনুইতে সেই ক্রীতদাসের চিহ্ন, পেতলের তাগা। তার পর যেদিন ঐ টেবিলটা এল, সেদিন আর সে সহ্য করতে পারল না। ছুটে গেল বাপের কাছে। যদিও সে বুঝেছিল, কেন তার পিতা এভাবে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করেছেন এরিকের দেহটা, তবু সে গেল। গিয়ে করুণ ভাবে আবেদন ক'রেই এরিকের মাথাটা চাইল। চেষ্টা করবে সে, প্রাণপণে চেষ্টা করবে এরিককে জাগাতে। কিন্তু এমনি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহ কি ভাবে জুড়বে সে, এ ত সে কখনো করে নি। তবু শেষ চেষ্টা করবে যদি মাথাটা পায়। তাই সে আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে চাইল মাথাটা।

বাপ কিন্তু ক্রূর হাসি হেসে বলেন, কেন, মমি জাগান ত তুমি শিখেছ এরিকের কাছে। জাগাও দেখি কেমন জাগাতে পার? এ যেন পিতা কন্যা নয়, যেন তাদের মধ্যে কোন স্নেহসম্বন্ধ নেই, কোন ভালবাসা নেই। এ যেন একই বিদ্যার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। যেন দু'জনেই দু'জনকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করছে। একে অপরকে যেন তেন প্রকারেণ হারিয়ে দিতে পারলেই খুশী হয়। তবে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী এসেছে প্রার্থী হয়ে, আর একজন, কেন তাকে ছলনা ক'রে তার বিদ্যে শিখে নিয়েছে ব'লে নিতে চাইছে তার ওপর প্রতিশোধ। পেরিথিউস এরিককে জীবন্ত অবস্থায় যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে তার হাত-পা কাটতে কাটতে জেনে নিয়েছিলেন, সে আর ইথা কি জানে, আর কতটা জানে।

ইথার একটি সখী মারা গিয়েছিল। তাকে মমি করেছিল ইথা। ইদানীং সে এরিকের সঙ্গে গান-বাজনায় মেতে থাকত ব'লে একে আর কোনদিন জাগাবার চেষ্টা করে নি। আজ সে বসল তার হার্পখানি নিয়ে। গাইতে লাগল সেই মমি জাগানর মন্ত্র। প্রথমে আস্তে আস্তে তারপর ক্রমে ক্রমে তার স্বর পর্দ্দায় পর্দ্দায় চড়তে লাগল, ধীরে ধীরে সে তার মনের ব্যাকুলতা, আবেদন পৌঁছে দিল আকাশে-বাতাসে অশরীরীর কানে। আস্তে আস্তে চোখ খুলে গেল সেই মৃতা সখীর। এবার নিজের সমস্ত ঘৃণা, প্রতিহিংসা, রাগ, ক্ষোভ নিজের চোখে একত্র ক'রে একদৃষ্টিতে সেই মৃতের চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে গম্ভীর স্বরে অথচ জোরে জোরে উচ্চারণ ক'রে গাইতে লাগল সেই মন্ত্র। অনেকটা আমাদের বেদগানের মত। এবার উঠে দাঁড়াল মমি, আর টলতে টলতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সে যাবার আগে ইথা তাকে চিৎকার করে নির্দ্দেশ দিল, তার বাবার কাছ থেকে যেমন ক'রে হোক এরিকের মাথাটা আনা চাই।

মাথা নিতে গিয়েই লাগল সংঘাত। পেরিথিউস মন্ত্রের জোরে ঘুম পাড়িয়ে দিতে চাইল ইথার সখীকে। উল্টো ফল হ'ল। কেননা ইথা তার প্রাণ পণ ক'রে জাগিয়েছিল ওকে। আর পেরিথিউস সেদিন ছিলেন খুব ক্লান্ত। সবেমাত্র তিনি একটি মমি ক'রে উঠেছেন। তিনি কিন্তু বুঝেছিলেন ও কি চায়। তাই এবার এরিকের মাথাটা তিনি লুকোতে চাইলেন আর সেটাই হ'ল ভুল। ইথার সখী গলা টিপে শেষ ক'রে দিল তাঁকে। আর মাথাটা কেড়ে নিয়ে এল ইথার কাছে। কিন্তু ইথা আর তখন ইহজগতে নেই। সে তার শোকতপ্ত দুর্ব্বল শরীরের সবটুকু ক্ষমতা দিয়ে সখীকে জাগিয়েছিল। এতটা উত্তেজনা আর তার সহ্য হ'ল না। শেষ হয়ে গেছে তখন সে। ইথা তখন ইথারে মিশে গেছে।

এইটেই তা হ'লে ইথার গুপ্তঘর। এই ঘরেই সে বাবাকে লুকিয়ে এরিকের কাছে মমি করা শিখত। মমি জাগাত। আর এই বড় ঘরটা বোধ হয় ইথারই শয়ন-মন্দির। ঐ স্নান-ঘরও তার। সখাপরিবৃতা হয়ে সে-ই ওখানে স্নান করত। এইটেই তা হ'লে ইথার মহল। পেরিথিউসের নয়।

দিলীপের গল্প যখন থামল তখন অকস্মাৎ যেন আমি সে যুগ থেকে এ যুগে চ'লে এলাম। এতক্ষণ এই সব ধুলোবালি-মাখা জায়গা আমার চোখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। সব যেন অন্যরূপে, অন্য রংএ আমার চোখের সামনে ছিল। আমি দেখছিলাম, একটি সুন্দরী মেয়ে ঐ নীচুমত চৌকিটায় ব'সে হার্প বাজাচ্ছে। তার গায় ইজিপসিয়ান মেয়েদের মত ভায়লেট রংএর পোশাক আর তার সোনালী চুলের রাশ চুড়ো ক'রে বাঁধা। কালো কালো ক্রীতদাসীরা এদিক্-সেদিক্ ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘরে সুন্দর গালচে পাতা। প্রত্যেকটি বাতিদানে বাতি জ্বলছে। এখন হঠাৎ বাস্তবে নেমে এলাম। দিলীপ বলল, কি রে, চমকে গেলি যে? আমি বললাম, অ্যাঁ? তার পর বললাম, হ্যাঁ। তার পর কি হ'ল? ও তখন গোটা কতক বড় বড় খেজুর আমার হাতে দিয়ে বলল, নে, চল্ এখন ক্যাম্পে চল্।

পরদিন আবার খোঁড়া সুরু হ'ল। এবার নিশ্চয়ই পেরিথিউসের বাসস্থান আর সূর্য্যদেব রীর মন্দির বেরুবে। ও দু'টি কাছাকাছিই ছিল। দিলীপের সব জানা। অদ্ভুত জ্ঞান আছে ওর এই মাটির তলার ইতিহাসে। আমার মনে কিন্তু সেই এক কৌতূহল, কি দিয়ে ওরা মমি বানাবার আরক তৈরি করত?

এখন প্রধান সমস্যা হ'ল, ঐ সব জিনিষগুলি মিউজিয়মে না পাঠান পর্য্যন্ত কোথায় রাখা হবে? ফালতু কোন ক্যাম্প আর নেই। আমি বললাম, কেন, আমার ক্যাম্পটা ত বেশ বড়, আমার ক্যাম্পে রাখ। রাজী হ'ল দিলীপ। অন্ততঃ যতদিন পর্য্যন্ত না ব্রিটিশ মিউজিয়ম বা লুভ্‌র্ মিউজিয়ম থেকে কোন প্রতিনিধি আসে, ততদিন আমার ক্যাম্পেই থাকবে ঐ কঙ্কাটা টেবিল আর ঠ্যাঙের চেয়ার।

রাত্রে শুয়ে আছি। পাশে প্যাকিং বাক্সর ওপর মোমবাতি রেখে শুয়ে শুয়ে ডায়রী লিখছি, এটা আমার নিত্যকার অভ্যাস। না লিখলে কি রকম শান্তি পাই না, মনে হয়, সারাদিন কি যেন একটা কাজ হ'ল না। কি যেন একটা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা সারাদিনে না ঘটলে, শুধু আমার মনের তখনকার চিন্তা-গুলো লিখেও শান্তি পাই। আজ সত্যিই লেখার মত কিছু ঘটে নি, তাই মনের চিন্তাগুলোই লিখছিলাম. আর এক-একবার পাশে রাখা সেই পায়ের টুল মমিটায় হাত বুলোচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম, কি ভাবে, কি ক'রে মমি করেছে? কোন্ আরক মাখিয়ে মুড়েছিল এই পাটিকে, যা দেখলে এখনও সেই পুরুষটির সুঠাম পেশীপুষ্ট দু'টি পা-কে মনে পড়িয়ে দেয়। উরু থেকে পায়ের চেটো পর্য্যন্ত চিনতে কোনই অসুবিধে হয় না। পালিশ করা কাঠের ফ্রেমে আটকে তাকে টুল বা বসবার আসন করা হয়েছে। ঐ পায়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ঐগুলি ভাবছি আর মনের কথাগুলি লিখছি, আবার তাকাচ্ছি। হঠাৎ মনে হ'ল, দুটো টুলই নড়ছে। মানে, দুটো পা-ই নড়ছে, মানুষ যে ভাবে ব'সে থেকে দাঁড়িয়ে ওঠবার চেষ্টা করে, ঠিক তেমনি করছে পা দুটো। প্রথমে ত নিজের চোখের ভুল মনে ক'রে আমলই দিলাম না। দেখছি আর লিখছি। আসলে আমি মড়া কাটা ডাক্তার ত, মমি কাছে রয়েছে ব'লে মনে কোন বিকারই ছিল না। কিন্তু এবার শব্দ হ'ল, বেশ জোর শব্দ ক'রে প'ড়ে গেল একটা টুল। আমি সেটাকে হাত দিয়ে সোজা ক'রে রাখলাম। রাত বেশ গভীর হয়েছে। খেজুর গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে শন্ শন্ ক'রে হাওয়া বইছে, ঝাপ্‌সা চাঁদ উঠেছে। আবার লিখতে সুরু করলাম। এবার কেমন যেন মনে হ'ল, আমি লিখছি

বেশ শব্দ ক'রে প'ড়ে গেল একটা টুল, আমি সেটাকে হাত দিয়ে
সোজা করে রাখলাম।

না, কেউ আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিচ্ছে। পাতার পর পাতায় লিখে যাচ্ছি আমি। প্রায় আধ ঘণ্টা আমার হাতটাকে খাটিয়ে আমাকে যখন নিষ্কৃতি দিল অশরীরী, তখন এদেশের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা রাত্রেও আমার গা ঘামে ভিজে গেছে। আর সব যেমনকার তেমনি নিথর, নিশ্চুপ, শুধু আমার নিজের হাতের লেখা ঐ ডায়রীর পাতাক'টি ছাড়া কোনই স্বাক্ষর নেই আর। মোমবাতিটা নিবে গিয়েছিল না নিবিয়ে দিয়েছিল, জানি না। অন্ধকারেই পাতার পর পাতা লিখে গেছি। এবার মোমবাতিটা জেলে সেই লেখা পড়তে সুরু করলাম।

লেখা হয়েছে—

ডাক্তার, তুমি এ যুগের ডাক্তার, তুমি সব জানতে চাও। একদিন আমারও এমনি জানার ইচ্ছে ছিল, অবশ্য তার সবটাই নিজের জন্ম নয়। আমার সব চেয়ে প্রিয়জন ইথার ঔৎসুক্যই আমাকে সব কিছু জানার প্রেরণা দিত,

জেনেও ছিলাম। আর সেই জানার জন্য কঠিন শাস্তি ভোগ করেছি। আজও আমার অবস্থা ত তুমি নিজেই দেখছ। তবে তোমার যা-কৌতূহল, কি দিয়ে মমি করার আরক তৈরি করা হ'ত, আর কেমন ক'রে মমি করা হ'ত, তা আমি তোমায় বলব ; তবে একটি সর্ত্তে। তুমি আমাকে বন্ধনদশা থেকে মুক্ত করবে। তারপর তোমার ডাক্তারী মতে, বা নিজের বুদ্ধিতে, যে ভাবে সম্ভব হয়, আমার সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি জুড়ে দেবে। তার পর আমার শেখান মমি জাগানর মন্ত্রে আমাকে জাগাবে। আমি ঐ শয়তান পেরিথিউসের ওপর প্রতিশোধ নিতে চাই। সেই জন্য আমার এখন তোমার সাহায্যের দরকার। যদি তুমি আমাকে জাগাতে পার তা হ'লে আমি আমার কাজ শেষ ক'রে আমার ইথার কাছে চ'লে যাব। বল, রাজী ?

এই হ'ল এরিকের চিঠির সারাংশ। আমি ভাবলাম, পেরিথিউসই বা এখন কোথায় যে এরিক তার ওপর প্রতিশোধ নেবে ? আর ইথাই বা এখন কোথায় ? যে ও তার কাছে চ'লে যাবে ? ঐ ঘরটা খুঁজলে বোধহয় বড়জোর ইথার কঙ্কালের কিছু টুকরো পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমি যখন এমন সুযোগটা পেয়েছি, ছাড়ি কেন ? সত্যিই যদি জানতে পারি কি নির্য্যাস দিয়ে মমি করার আরক তৈরি হ'ত তবে ত সারা জগতে সাড়া প'ড়ে যাবে। বিরাট্ চাঞ্চল্যকর ব্যাপার হবে একটা। এইটা মনে মনে ভাবছি, এমন সময় আবার টুল নড়ে উঠল। আবার বসলাম কলম নিয়ে। লেখা হ'ল, তবে আর দেরি নয়। কিন্তু দেখো, যেন কেউ টের না পায়। আর একটা কথা, লক্ষ্য রেখো, কোনরকমে যেন আমার এই মমি করা দেহটায় আগুনের ছোঁয়া না লাগে। তা হ'লে কিন্তু তুমিও রেহাই পাবে না।

পরদিন সকালে ব্রিটিশ মিউজিয়ম থেকে একজন প্রতিনিধি এলেন। নাম মিঃ ফিলিপ্‌স্। তিনি ঐ বিস্ময়কর মমিগুলি পরিদর্শন ক'রে ভারী খুশী হলেন। বললেন, যতশীঘ্র সম্ভব আমি এগুলিকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব। আর কারুর সঙ্গে আপনারা এই মমিগুলি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলবেন না। আমাদের কর্ত্তৃপক্ষ এই জিনিষগুলি পেলে আন্তরিক আনন্দিত হবেন।

আমি পড়লাম মহা মুশকিলে। যদি ঐ লোকটি এগুলি নিয়ে চ'লে যায়, তবে আমার আর এক্সপেরিমেণ্ট করা হ'ল না। মনটা আজ সেইজন্য কেমন যেন ভার হয়ে রয়েছে। অন্যমনস্কে ডায়রীর পাতায় আঁচড় কাটছি। হঠাৎ সেই হাতের মমি বাতিদানটা উল্টে গেল। আমি সেটাকে সোজা ক'রে রেখে সেটার গায় হাত বুলোচ্ছিলাম। কেমন যেন মনে হ'ল, হাতটা জীবন্ত হাতের মত গরম। চমকে উঠলাম আমি। আমার ডাক্তারী অভ্যাসে ততক্ষণে আমার দুটো আঙুল সেই মমির মণিবন্ধের ওপর চ'লে গেছে। কি আশ্চর্য্য! দপ্‌দপ্ করছে যে ? অ্যাঁ, এ যে জীবন্ত মানুষের নাড়ী। কি ক'রে এটা সম্ভব হ'ল ? এখন যদি ভরা দুপুর না হ'ত, তা হ'লে নির্ঘাৎ আমি ভয় পেয়ে একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসতাম। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই সেই ব্রিটিশ মিউজিয়মের প্রতিনিধি ঢুকলেন আমার ক্যাম্পে। তাঁরও দেখলাম এই অদ্ভুত মমিগুলি সম্বন্ধে প্রচুর কৌতূহল রয়েছে। খুব নিবিষ্ট মনে সেগুলো পর্য্যবেক্ষণ ক'রে দেখতে লাগলেন। দেখতে দেখতে তাঁর মুখটা কেমন যেন একটা ক্রূর হাসিতে ভ'রে উঠল। আমার দিকে চেয়ে একটু শ্লেষের স্বরেই বললেন, কি হে ভারতবাসী ডাক্তার, দেখ তোমাদের যাদুবিদ্যা অ্যাপ্লাই ক'রে আবার যেন এই বিদ্ভুত মমিটিকে জাগিয়ে বসো না। অবশ্য তোমরা যেরকম ভীতু হও জানি, তাতে তুমি যে কি ক'রে এই মমি সমেত এক ক্যাম্পে রাত্রিবাস করতে সাহস কর বুঝতে পারছি না। যাক, আর দিন তিনেক তোমাকে কষ্ট দেব। তার পর আমাদের কার্গো প্লেনটা এসে যাবে, আমিও এগুলি নিয়ে চ'লে যাব। কথাটা শেষ হওয়া মাত্রই সেই কঙ্কাকাটা টেবিলটা হঠাৎ দড়াম্ ক'রে পড়ল সেই ভদ্রলোকের পায়ের ওপর। অথচ কোথাও এতটুকু ঝড়বাতাসের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। আর ঐ জগদ্দল টেবিল ঝড়ে পড়ার নয়। ভদ্রলোক ত দারুণ জখম হলেন। ব্যাথায় কাৎরাতে লাগলেন। আমি ওঁর ঐ শ্লেষপূর্ণ কথায় ওঁর ওপর বিরক্ত হয়ে থাকলেও এখন নিজের কর্ত্তব্যে অবহেলা করলাম না। কিন্তু আচমকা ঐ টেবিলটি কি ক'রে প'ড়ে গেল ? আর কেনই বা প'ড়ে গেল ? মনটা সেই চিন্তায় ভ'রে রইল।

ভদ্রলোক ত পা ভেঙে পঙ্গু হয়ে প'ড়ে রইলেন ক্যাম্পে। তাঁরই তাগিদে এই মমিগুলো রোজ ঝাড়া-পোঁছা হ'ত। দেখাশুনো হ'ত। এখন সব বন্ধ। দিলীপটাও এখন নতুন আবিষ্কৃত পেরিথিউসের বাসস্থান নিয়ে মেতেছে। এই আমার পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ। আর দেরি নয়। আজ রাত থেকেই কাজ সুরু ক'রে দেব।

রাতের খাবার খেয়ে এসে ক্যাম্পে ঢুকলাম। বেশ ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। দিনের প্রচণ্ড তাত আর নেই।

কাজ সুরু ক'রে দিলাম। সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিই প্রায় কাঠের আবরণ মুক্ত ক'রে এনেছি। অদ্ভুত কৌশলে সেই কাঠের ডেস্কে মমিটার গলা থেকে উরু পর্য্যন্ত আটকান ছিল। মমিটাকে পেছন ফিরিয়ে বসান ছিল। পিঠটা ঠিক স্কুল ডেস্কের মত উঁচু করা ছিল। বুকের তলায় একটা বেল্ট মত ছিল, সেটা দিয়ে শক্ত ক'রে বাঁধা ছিল ওটা, এ ডেস্কের সঙ্গে। বেল্টটা মনে হ'ল কোন গাছের লতা। এখনও সেটাতে ইলাসটিসিটি রয়েছে। আশ্চর্য্য শতাব্দীর অন্তেও তা জমে কাঠ হয়ে যায় নি। অদ্ভুত লতা। এবার সমস্যা হ'ল মাথাটার কি ব্যবস্থা করি? বাতিদান থেকে হাত খুলেছি, টুল থেকে পা খুলেছি, ডেস্ক থেকে শরীরটা খুলেছি। সবগুলিই প্রায় ঐ একই প্রক্রিয়ায় ঐ লতা দিয়ে কাঠের ফ্রেমের সঙ্গে বাঁধা ছিল। কিন্তু মাথায় ত তা নয়। সেটা কোন রকম একটা শক্ত জিনিষ। মনে ত হয় সিমেণ্ট জাতীয় রঙিন মাটির মত জিনিষ দিয়ে একেবারে মোড়া। হঠাৎ দেখলে মনেই হয় না ওটা মমির মাথা, মনে হয় বেশ বড়সড় ডাবের আকারের একটা ফুলের টব বা ফুলদানি। যাক, উপস্থিত ত ঐ লতাগুলি দিয়েই মাথাটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে একটা মানুষের আকার দিলাম। তার পর সেটাকে আমার বিছানায় শুইয়ে একটি চাদর ঢাকা দিলাম। ঠিক মনে হচ্ছিল, যেন একটা মানুষ হাঁটু মুড়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। আমি ওর দুমড়ানো পা দুটো কিছুতেই সোজা করতে পারছিলাম না।

একটা বেশ বড় ক্যাম্প চেয়ার ছিল আমার তাঁবুতে। আমি তাতে শুয়ে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছি আর ভাবছি, মাথাটার কি ব্যবস্থা করা যায়? এখন বেশ গভীর রাত। ঘুরে ঘুরে এক-একবার দেখছি চাদর-ঢাকা মমিটার দিকে। কেমন মনে হ'ল, যেন চাদরের তলায় অল্প অল্প নড়ছে মমিটা। আমার সেই রাত্রের কথা মনে পড়ল, ও বলেছিল, ওকে জুড়ে জাগাতে হবে, সেই সর্ত্তে ও আমাকে আরক তৈরির ফরমুলা বলবে। আমার কাজ ত আমি করতে চলেছি, কিন্তু ও ত বলুক কিছু, তা ছাড়া মাথাটার সমস্যা পারে ত ঐ সমাধান করুক। বসলাম খাতা-কলম নিয়ে।

সুরু হ'ল লেখা। কতকগুলো বিদ্‌কুটে গাছের নাম লিখেছে, কোনটার শেকড়, কোনটার ছাল, কোনটার পাতা এই সব আগে সংগ্রহ করতে বলল। তার পর কোনটাকে পচিয়ে, কিছু পাতা বেটে, কিছু শেকড় সেদ্ধ ক'রে তার সঙ্গে পরিমাণ মত সুরা মিশিয়ে রোদ্দুরে দিয়ে তবে প্রাথমিক ভাবে সেই মমি করার আরক তৈরি হ'ল। এখন এর সঙ্গে একটা গাছের পাতা এবং ফুল মেশালে তবে সম্পূর্ণ ভাবে আরক তৈরি হবে। কিন্তু সেটা সে এখন বলবে না। তাকে জাগাবার পরে বলবে। নিজের মুখে বলবে। এবার মাথা। ওর মাথার কথা ভেবে ভেবে আমারই মাথা ব্যথা ধ'রে গেল। কিন্তু যা ও বলল, সেটা ত আর আমি জানতাম না। অবশ্য সেটা আমার মাথাতেও আসে নি। ও লিখল, ঐ যে লাল মাটির বাসনটা দেখছ, আসলে ওটা একটা খাপ। ওটার মাথার ওপর চাপ দিলেই দু'আধখানা হয়ে খ'সে যাবে। আর ভেতর থেকে আমার মমিকরা মাথাটা পাবে। আমি অবাক্ হয়ে তাড়াতাড়ি সেই পাত্রটা নিয়ে এসে মাথার দিকে চাপ দিলাম, কিন্তু কই, কিছুই ত হ'ল না। এবার আলোর সামনে ধ'রে ভাল ক'রে পরখ ক'রেও, কোথাও জোড় দেখতে পেলাম না। মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে রেখে দিয়ে মমিকে এবার চেয়ারে শুইয়ে নিজে গিয়ে খাটে শুয়ে পড়লাম।

বেশ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ আমার মাথার ঠিক মাঝখানটা যেন কেমন টন টন ক'রে উঠল আর ঘুমটা ভেঙে গেল। মনে হ'ল যেন একটা ভারী কিছু আমার মাথার ওপর থেকে স'রে গেল। দেখি সেই মমির পায়ের একটা টুল আমার মাথার ওপর কাত হয়ে প'ড়ে রয়েছে। বেশ একটু অবাক্ হলাম। ওটা মাথার কাছে ছিলই তবে মাথার ওপর পড়াটা বেশ অসম্ভব। কি খেয়াল হতে তাড়াতাড়ি সেই মমির মাথাটা নিয়ে এলাম আর ঠিক যেখানটায় আমার মাথাটা টন টন করছিল, সেখানটায় একটা শক্ত পাথর ঠক ক'রে মারলাম। অবাক্ কাণ্ড, সঙ্গে সঙ্গে সেটা দু'আধখানা হয়ে গেল আর ভেতর থেকে পোঁটলার মত মমির মাথাটা বেরিয়ে এল।

এই আবিষ্কারের আনন্দে তখন আমার মন ভ'রে উঠেছে। ঘুম মাথায় উঠল, মমি জুড়তে ব'সে গেলাম। সারারাত্রের চেষ্টায় প্রায় সবটাই জুড়ে ফেললাম—এবার বাকি আছে মাথাটা, সেই পোঁটলাটা নিয়ে এসে তার আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা প্যাপিরাসের মোড়ক খুলতে লাগলাম আর মনে ভাবতে লাগলাম, আজ থেকে কত যুগ আগে শুধু মাত্র এই মাথাটি পাবার জন্য একটি তরুণীর মনে কতটা আকুলতা ছিল; সেও চেয়েছিল এমনি ক'রে প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জুড়ে দিয়ে তার প্রিয়তমকে জাগাতে। আজ যদি সেই মেয়েটির,—কি যেন নাম, হ্যাঁ ইথা,—ইথার যদি মমি থাকত তবে আমি এর সঙ্গে রেখে দিয়ে এদের মিল করিয়ে দিতাম।

জুড়ে দিলাম মাথাটা। ছোটবেলায় রামকৃষ্ণমিশন স্কুলে আমাদের সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ ক'রে তুলতে চেয়েছিল। তাই ব্রতচারী নাচের সঙ্গে ট্যাক্সিডার্মিরও কিছুটা জ্ঞান হয়েছিল। সেই জ্ঞান আজ এত বছর পর কাজে লাগল। দেখতে দেখতে উষার আলো ফুটে উঠল। ভোর হয়ে গেল, আর আমিও সারারাত্রের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুমিয়ে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। ঠিক আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে, পরনে মিশরীয় পোষাক। অপূর্ব্ব সুষমাময়ী মেয়েটি। বলছে, তোমাকে ধন্যবাদ ডাক্তার, অনেক ধন্যবাদ। তবে আমার একটি অনুরোধ, এরিককে জাগিও না, ওকে আমি এমনি ভাবেই আমার কাছে পেতে চাই। আমার ঘরে একটা লম্বা মত বাক্স পেয়েছ না তোমরা? তার মধ্যেই আমি আছি। আমার সেই মৃতাসখী, যাকে আমি আমার মৃত্যুর দিন জাগিয়েছিলাম, সেটা তারই কফিন। সেই আমাকে ওর মধ্যে রেখে না জানি কোথায় চ'লে গিয়েছিল, ওকে নিয়ে গিয়ে আমার পাশে রেখে দাও, ঠিক এমনি ক'রে জুড়ে। আবারও বলছি, সাবধান, ওকে জাগিও না, তা হ'লে তোমার দারুণ ক্ষতি হবে। ছ্যাঁত করে ঘুমটা ভেঙে গেল। দেখি বেশ বেলা হয়ে গেছে—চায়ের সময়ও হয়ে গেছে, এখুনি হয় ত কেউ ডাকতে আসবে। আমি চাই না আমার তাঁবুর মধ্যে কেউ ঢোকে।

পেরিথিউসের বাসভবন আজ সম্পূর্ণ ভাবে মৃত্তিকাগর্ভের অভিশাপ মুক্ত হয়ে রা দেবতা মানে সূর্য্যদেবের মুখ দেখল। ঐ বাসভবন দেখতে দেখতে আজ সারাদিন দারুণ উত্তেজনায় কেটে গেল। কত যে অলিন্দ, কত যে প্রকোষ্ঠ, আর কত রকম আকারের যে মাটির পাত্র আর কাঠের আসবাবপত্র, দেখলে বিস্ময় জাগে। আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগেও মানুষ কত সভ্য ছিল। কি অদ্ভুত জ্ঞান ছিল তাদের বাড়ী তৈরি, ছবি আঁকা, বাসন তৈরি, মুদ্রার ব্যবহার আর ওষুধ তৈরিতে, ভাবলে আশ্চর্য্য হ'তে হয়। কত গভীর জ্ঞান ছিল তাদের বিজ্ঞানে। আর এদেরই কিনা আমরা বলি সেকেলে।

আবার রাত্রি নেমেছে, আবার বসেছি ডায়রীর খাতা খুলে। নিজের লেখা ও লিখছি আর অন্য মনে ভাবছি কখন অশরীরী এরিক এসে ভর করবে আমার হাতে। কাল যতটা ফরমুলা বলেছে আরক তৈরির, আজ বাকিটা শেষ করবে। অবশ্য কালই ও লিখেছে, আর বলবে না এখন, ওকে জাগালে তার পর বলবে। একবার একবার সেই সুন্দরী মিশরবাসিনী ইথার কথাও মনে জাগছে। অমঙ্গল হবে, তোমার অমঙ্গল হবে। আজ দেখছি সেই কারুকার্য্য করা সুন্দর কাঠের বাক্সটা। তার মধ্যে একটি সরু আর হাল্কা কঙ্কাল। আমি তার ওপরে আমার স্বপ্ন-সুন্দরী ইথাকে কল্পনা করলাম। ঠিক যেন খাপে খাপে মিলে গেল। এবার লিখছে এরিক, বুঝতে পারছি যে আমি আর লিখছি না। ক'দিনের অভ্যাসে এটা আমি বেশ ধরতে পারি।

লিখেছে, যদি তুমি গাতেই জ্ঞান ডাক্তার, তবে যে সুর ভালবাস সেই সুরে বসিয়ে প্রাণ ঢেলে এই মন্ত্র গাও ডাক্তার। তবেই আমি জেগে উঠব, এটা আর কিছু নয় আমাদের দেব-দেবীর স্তুতি গান।

আমি নাইল নদীতে বিসর্জ্জিত পুত্র। আমার মা-বাবা তাঁদের মানত পূরণ করতে আমার দশ বছর বয়েসে আমাকে নদীতে বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন, তাঁরা অপুত্রক ছিলেন। নাইল দেবীর পুজো ক'রে তাঁরা আমাকে পান। তখন দেবী স্বপ্ন দেন, তোমার দ্বিতীয় সন্তান হলেই তুমি এই প্রথম সন্তানকে আমায় দেবে, সেইজন্য আমার ভাই জন্মালে আমাকে ওঁরা নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে পুজো দেন নাইল দেবীর। তবে আমার মা'র সেই আকুল ক্রন্দন আমি কখনো ভুলব না। আমাকে সকলে মিলে পুজোর মন্ত্রের উচ্চারণের মধ্যে, বাজনা-বাদ্য বাজিয়ে জলে ফেলে দেবার পর আমার মা প্রতিটি দেব-দেবীর কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করছিলেন আমাকে ফিরে পাবার জন্য। হয়ত সেই কারণেই আমি মরি নি। নদী দেবী আমাকে গ্রহণ করেন নি, অবজ্ঞা বা অনিচ্ছার দান তিনি কেনই বা নেবেন। আমি খানিকটা ভেসে যাবার পর রাজার লোকেরা আমাকে জল থেকে তোলে আর তারপর ক্রীতদাস বানায়। আর ফিরে যেতে পারি নি মা-বাবার কাছে।

পালাতে হয়ত পারতাম কিন্তু ইচ্ছে ক'রেই পালাই নি, মনের মধ্যে একটা প্রচণ্ড অভিমান ছিল। সেটা যে কার প্রতি সেটা বুঝতাম না, পরিচয় দিলে হয়ত মুক্তি পেতে পারতাম। ঐ শয়তান পেরিথিউসের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন আমার বাবা, তিনি ত আর তার এই রূপটা জানতেন না। তবে পরিচয় আমি দিয়েছিলাম যখন ওই পেরিথিউস আমাকে অকথ্য যন্ত্রণা দিচ্ছিল তখন, কিন্তু সে তা বিশ্বাস করে নি, করলেও মানতে চায় নি। তার কারণ, তার সব-চেয়ে রাগ ছিল আমার ওপর, আমি তার বিদ্যে শিখে নিয়েছি ব'লে, তার মেয়ের সঙ্গে মিশেছি ব'লে নয়। তার

আমাকে মারা দরকার ছিল, তাই সে আমার পরিচয় স্বীকার করে নি, না হ'লে আমার সঙ্গে ইথার বিবাহে কোন বাধা ছিল না।

যাক্, দেবীর প্রত্যাখ্যাত জীবন আমার অতি লাঞ্ছনা আর অশেষ কষ্ট পেয়ে শেষ হ'ল। আমি আর ইথা কি জানি, আর কতটা জানি, জানার জন্য ওই পেরিথিউস আমাকে তিন দিন ধ'রে অকথ্য যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে কেটেছে। ওর সাহায্যকারী ছিল দুটো কালো নিগ্রো ক্রীতদাস, তারাও তেমনি নিষ্ঠুর, আমাকে এক ফোঁটা জল দেয় নি খেতে, আর পাথরের করাত দিয়ে পুঁচিয়ে পুঁচিয়ে কেটেছে আমার হাত-পা, যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে গেলে ওষুধ খাইয়ে জ্ঞান করিয়েছে পেরিথিউস, তার পর আবার কেটেছে, সেই অস্ত্র তোলা আছে ওদের জন্য। মনে রেখ, এ জগতে কিছুই ফেলা যায় না, সবই আবার ঘুরে আসে, যত পরেই হোক দিন আবার ফিরে আসে। উঃ, দেবীর অভিশাপ কি ভাবে না আমার ওপর ফলেছিল, মা'র করুণ কান্নায় যদি জীবন-দেবী আইসিস্ আমাকে না বাঁচিয়ে রাখতেন, যদি নাইল দেবী আমাকে উপেক্ষা না ক'রে কোলে তুলে নিতেন, তা হ'লে আর আমাকে এত দুঃখ-কষ্ট সইতে হ'ত না, তবে আমার কাঁটায়-ভরা দুঃখের জীবনে একমাত্র ফুল ছিল ইথা। আর সারাদিন পর যখন শুতে যেতাম, রাত্রে ঘুমের ঘোরের মধ্যে কানের কাছে মা'র সেই করুণ কান্না শুনতে পেতাম। ও হেক্ট দেবী, তুমি ত জলে থাক, দাও, আমার ছেলেকে এনে দাও। ও জীবন-দেবী আইসিস, তুমি তোমার সন্তানকে কত মমতায় দুধ পান করাও, আমার সন্তানও তোমার দুধপান করেছে। তুমি তাকে প্রাণ দাও। ও রা দেবতা, তোমার জন্যই সকাল হয়, আমরা আলো পাই। তুমি তোমার আলোর তেজে আমার ছেলেকে জ্যোতির্ম্ময় কর, যাতে তাকে আমি দেখতে পাই। অমনি ক'রে কেঁদে কেঁদে আমাদের ব্যাং দেবী হেক্ট, গরুদেবী আইসিস, আর সূর্য্যদেব রা'র কাছে প্রার্থনা করছিলেন। ওঃ আমি আমার জীবনের কথা বলতে ব'সে তোমাকে মন্ত্রটাই ত বলি নি। এবার সেটা বলি।

প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় একটি গাথার মত মন্ত্র লেখা হ'ল। তারপর এরিক লিখল, গাও ডাক্তার, এই মন্ত্র গাও। যেন ঝড় উঠছে, গাছ কাঁপছে, নদীর জল উথাল-পাথাল করছে, বালু উড়ছে, চাঁদ নদীর বুকে মিলিয়ে যাচ্ছে, মেঘে আকাশ ঢেকে গেল, প্রলয় সুরু হ'ল; গাও ডাক্তার, গাও, ঐ মন্ত্র ঝড়ের বেগ সুরে প্রকাশ ক'রে আকাশ-বাতাস মাতিয়ে দাও।

আমি কি করি? কোথায় সুর পাই? গাইতে ত জানতাম। এককালে রবীন্দ্রসঙ্গীত ভালই গাইতাম। মনের মধ্যে হাতড়ে বেড়াই, কোন্ সুরে গাই, কি গানের সঙ্গে মেলাই এই ঝড়ের বেগ। হঠাৎই মনে এল :

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার—

গেয়েই চলেছিলাম এক মনে। ওর ঐ কথাগুলোতে কবিগুরুর এই গানের সুর বসিয়ে। তার পর কখন যে ওর কথা থেকে স'রে গেছি, আপন মনে মূল গানটাই গেয়ে চলেছি, বাইরে সত্যিই ঝড় উঠেছে, কিছুই জানি না আমি। কোনই খেয়াল ছিল না আমার। গায়ের খুব কাছে একটা কঠিন বস্তুর ঘর্ষণ আর ভ্যাপ্সা গন্ধে চমক ভাঙল আমার। দেখি, আমার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে মমিটা। শুনলাম, দুর্ব্বোধ্য ভাষায় হিস্ হিস্ একটা শব্দ। ঐ কঠিন মমিটা জীবন্ত হয়ে উঠেছে? আতঙ্কে আমার গায়ের সমস্ত লোম খাড়া হয়ে উঠল। মমিটা তার ধনুকের মত বাঁকা পায়ে হাঁটতে হাঁটতে আমার সামনে দিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে গেল। যেন সেই বাকি ফরমুলাটা ব'লে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চ'লে গেল। এই ভাবে যে একটা মমি সত্যিই জীবন্ত মানুষের মত চলবার, বলবার ক্ষমতা ফিরে পেতে পারে ত' আমার ধারণার বাইরে ছিল। এতক্ষণ বা এই ক'দিন ধ'রে যা করেছি, তা যেন কেমন একটা ঘোরের মধ্যে করেছি। আমার বন্ধু আমাকে কতবার অনুযোগ করেছে, দেখ্, তুই যেন কেমন হয়ে গেছিস মিহির, তুই সারাক্ষণ কি ভাবিস বল্ ত? এত অন্যমনস্ক থাকিস কেন? কিন্তু এখন এইমাত্র যেন আমি নিজের সত্তা খুঁজে পেলাম। তখুনি আতঙ্কে শিউরে উঠে ভাবলাম, এ আমি কি করলাম? ও ত প্রতিশোধ নিতে চলল। না জানি কার জীবনে নেমে আসবে মৃত্যুর অন্ধকার। এই হাজার হাজার বছর পরেও সেই প্রতিহিংসার উত্তাপ কি ভাবে জেগে রয়েছে মমিটার বুকে? কে হবে ওর শিকার? কোথায় গেল ও? আর কিছু ভাবতে পারি না। ছুটে বেরিয়ে যাই মমিটাকে ফেরাতে।

এরি--ক, এরি—ক। ফিরে আসছে প্রতিধ্বনি, ঝড়ের বেগে হারিয়ে যাচ্ছে শব্দ। চোখে-মুখে লাগছে বালির ঝাপটা, খুঁজে পাচ্ছি না তাকে। কোথায় গেল সে? আর জানি না।
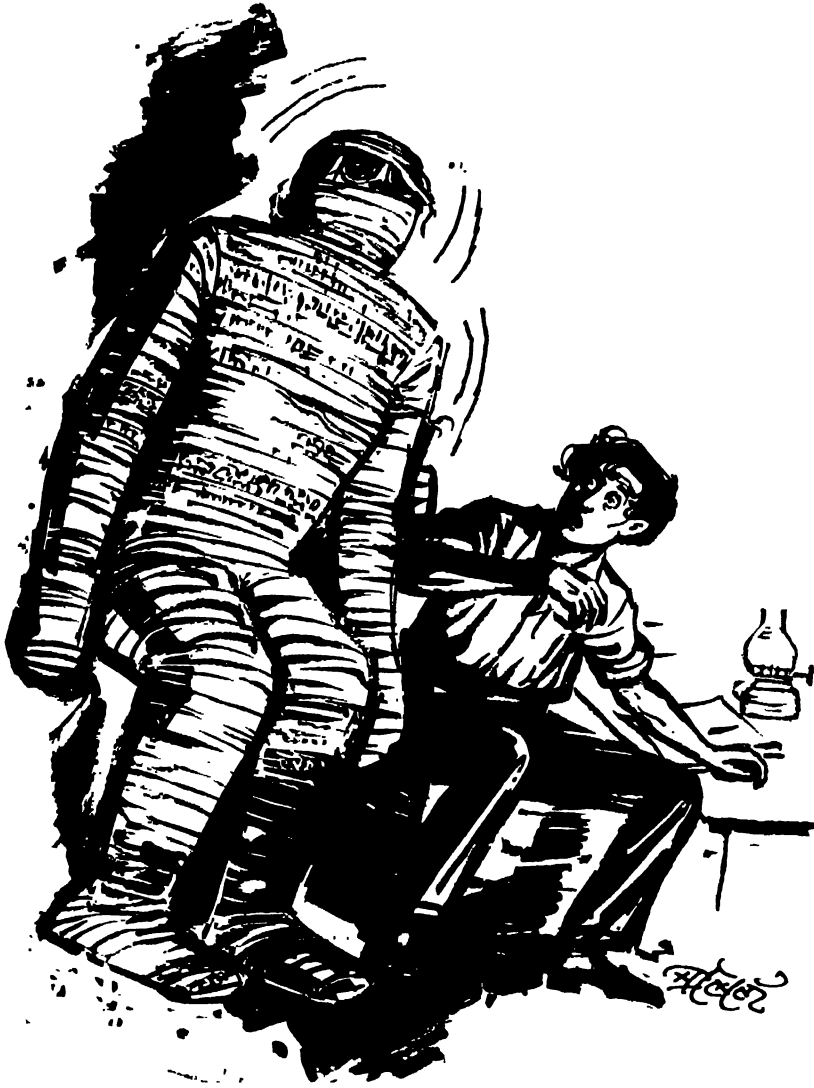
দেখি, আমার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে মমিটা।

জ্বরের ঘোরে আমি আজ তিন দিন ছিলাম অজ্ঞান অচৈতন্য। জ্ঞান হতে দেখি, দিলীপ মাথার কাছে ব'সে। তার মুখ শুকনো, চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। আমি আমার দুর্বল হাতটা কোন রকমে বাড়িয়ে দিয়ে তার হাত ধরলাম। সে তক্ষুণি আমার মুখের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে বলল, মিহির, তুই নিজে ডাক্তার, এমনি ক'রে শুয়ে থাকবি? তোকে যে এখন ভীষণ দরকার, শীগ্‌গির ভাল হয়ে ওঠ্‌ ভাই। আমি যে বড় অসহায় বোধ করছি। আমি বলি, কেন দিলীপ, কি হয়েছে? বল্‌, সব আমাকে খুলে বল্‌। ও বলে, না, থাক্‌, আগে তুই ভাল হয়ে ওঠ্‌। আমি অধৈর্য্যের মত ব'লে উঠি, না না দিলীপ, তুই বল্‌, আমি এক্ষুণি শুনব, না হ'লে আমি শান্তি পাব না। দিলীপ বলে, কি যে করি এই অজানা জায়গায়, পর পর তিনটে লোক ম'রে গেল। কি ক'রে যে এমন বীভৎস ভাবে মরল তাও বুঝতে পারছি না। তবে এটুকু বুঝছি, কেউ তাদের মেরেছে। শুধু মেরেছে নয়, কেটেছে। মিঃ ফিলিপসকে ত টুকরো টুকরো ক'রে কেটেছে। আর অন্য দু'জনকে ত চুপিয়েছে। ওঃ সে একটা কাহিনী,একটা দুঃস্বপ্ন।

প্রথমে ত মিঃ ফিলিপ্‌সের ওপর দিয়ে গেল। একই রাত্রে প্রথমে তাঁর দুটো হাত যেন কেউ কেটে নেয়।

তার পর শেষরাত্রে দুটো পা, তার পর মাথা। কে যে তাঁর তাঁবুর মধ্যে ঢুকে এমনি করে তাঁকে কাটল? আশ্চর্য্য, প্রথম রাত্রে হাত কাটার পর আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম, ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলাম রক্ত বন্ধ হবার জন্ত। তার পর একটু বিশ্রামের জন্ত যখন যে যার তাঁবুতে ফিরেছি সেই ফাঁকে এসে আবার পা কেটে দিয়ে গেল। ওঃ, সে কি বীভৎস দৃশ্য, তোকে কি বলি। তার পর দুটো নিগ্রো পোর্টার। তাদের ত কুলি ব্যারাক থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছে ঐ পেরিথিউসের মহলে। সেখানে নিয়ে গিয়ে একটার ডান হাত, ডান পা কেটেছে। অন্তটার বাঁ হাত বাঁ পা। আমরা তাদের চীৎকার শুনেই দৌড়ে গেছি। কিন্তু কোথায় কোন্ ঘর থেকে চীৎকারের শব্দ আসছে খুঁজে বের করতে করতেই শয়তান তার কাজ সেরে ফেলেছে। ওদের যতক্ষণ জ্ঞান ছিল, সমানে জিজ্ঞেস করেছি, কে তোমাদের এই দশা করেছে, এমনি ক'রে খুন করেছে বল? কি রকম দেখতে তাকে? কাটা হাত-পায়ের মধ্যে রক্তে ভাসছে তখন লোক দুটো। তারই মধ্যে কোনরকমে হাঁপাতে হাঁপাতে যা বলল, তাতে এইটুকু বুঝলাম যে, একটা কুঁজো মত লোক, তার পা দুটো ধনুকের মত বাঁকা আর সমস্ত শরীরে ন্যাকড়া জড়ান।

চমকে উঠি আমি। এ তবে এরিকের কাজ। এরিক ছাড়া কেউ নয়। আমি তাকে জোড়ার সময় শত চেষ্টাতেও তার পা সোজা করতে পারি নি। পা দুটো যে ঐ বসার মত ভাঁজ করেই মমি ক'রে টুল করা হয়েছিল। ধিকারে ভ'রে ওঠে আমার মন। ছিঃ ছিঃ এ আমি কি করলাম? কেন অমন শয়তান পাষণ্ডকে প্রাণ দিলাম? ও ত ম'রেই গিয়েছিল। হয়ত অকথ্য যন্ত্রণা পেয়েই মরেছিল। কিন্তু এই তিনজন জীবন্ত লোক যে আজ শুধুমাত্র আমারই অদূরদর্শিতার জন্ত প্রাণ হারাল, এটাই আমার কাছে ভীষণ মর্ম্মান্তিক হয়ে বাজল।

এই যে হাজার হাজার বছর পর ও প্রতিশোধ নিল, এরা কি তবে তাদেরই আত্মা? ঐ ব্রিটিশ মিউজিয়মের প্রতিনিধি মিঃ ফিলিপ্‌স্ কি রাজবৈদ্য পেরিথিউস? কেননা, তাকেই ত জীবন্তে টুকরো টুকরো ক'রে কেটেছে, সবশেষে মাথাটা কেটেছে। ঐ যে কুলি দুটোর হাত পা কেটেছে, তা হ'লে কি যারা পেরিথিউসের হুকুমে ওর হাত-পা কেটেছিল এরা দুজন কি সেই কালো নিগ্রো ক্রীতদাস? আশ্চর্য্য, কোথায় গেল মমিটা? এখনো যদি ওর প্রতিহিংসার আগুন না নিবে থাকে, আরও যদি হত্যা করে? নাঃ, যেমন ক'রে পারি, দরকার হ'লে নিজের প্রাণ দিয়েও এই হত্যালীলা বন্ধ করতে হবে।

শরীরটা ক'দিনের জ্বরে খুবই দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল, তার পর এই বিকট উত্তেজনা। সারাটা দুপুরের অসহ্য উত্তাপে কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছিলাম। সন্ধ্যের দিকে একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ নাকে আসতে হঠাত করে ঘুমের ঘোরটা কেটে গেল। দেখি আমার পাশের ডেক-চেয়ারটায় মমিটা ব'সে। সেই এরিকের মমি। তার গায় জড়ান প্যাপিরাসের ছালগুলো কোথাও কোথাও খুলে গিয়ে ঝুলছে। আর মরা মাছের চোখের মত ঘোলাটে চোখে চেয়ে রয়েছে আমার দিকে। যেন কৃতজ্ঞতা জানাতে চায়। আমার তখন রাগে ধিকারে জ্বলে যাচ্ছে বুকের ভেতরটা। শেষ ক'রে দেব আজ ওকে, শেষ ক'রে দেব। এই ভেবে জোর ক'রে উঠে বসলাম। আর সঙ্গে-সঙ্গে মনে প'ড়ে গেল, আগুন ছুঁইও না আমার শরীরে। তক্ষুণি দেশলাই-এর একটা কাঠি জ্বালিয়ে ছুঁড়ে দিলাম ওর গায়। দপ্ করে জ্বলে উঠল মমিটা। বোধ হয় কোন দাহ্য পদার্থ আছে ঐ মমি করার আরকে। এই বার সেই জ্বলন্ত মমিটা এগিয়ে আসছে—পায় পায় এগিয়ে আসছে আমার দিকে। বুঝতে পেরেছি ওর উদ্দেশ্য, বুঝতে পেরেছি আমি, ও আমাকেও মারতে চায়, নিজের জ্বলন্ত শরীরের সঙ্গে আমাকে চেপে ধ'রে পুড়িয়ে মারতে চায়—কিন্তু আমি যে নিরুপায়, উত্থানশক্তি-রহিত। পালিয়ে যে যাব তার উপায় নেই। আসছে, ঐ আসছে—আগুন—আগুন। উঃ, কি হল্কা—উঠতে পারছি না—পার—ছি না।

এই হ'ল মিহিরের ডায়রী। এতটাই সে লিখেছে। তারপর সব হিজিবিজি। উঃ, আগুনের বেড়াজালে প'ড়েও জ্বলন্ত মমিটা যমদূতের মত এগিয়ে আসছে দেখেও যে কি ক'রে কলম চালিয়েছে জানি না। বোধ হয় তার শেষ অভিজ্ঞতাটুকুও সকলকে জানাতে চেয়েছিল, বোঝাতে চেয়েছিল তার অত্যাশ্চর্য্য মমি করার আরক তৈরির ফরমুলা। ঐ অনুসন্ধিৎসাই তার জীবনান্ত ঘটাল। সে তার জীবন দিয়ে জানিয়ে গেল, কি দিয়ে কোন্ ফরমুলায় ঐ নির্য্যাস তৈরি হয়। আর নিজে না বেরুতে পারলেও আগুন থেকে বাঁচবার জন্ত ডায়রীটাকে প্রাণপণ শক্তিতে বাইরে ছুঁড়ে দিয়েছিল। আজ হয়ত তার সেই প্রাণের বিনিময়ে লেখা ডায়রীর জন্তই অনেকের অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে।

কলকাতারই একটা পাড়া, তবে একটুখানি পাড়াগাঁ ঘেঁষা। সামনে বড় রাস্তা, এক সার পাকা দোতলা তিনতলা বাড়ী। তার পিছনে অপরিসর গলি, সেখান দিয়ে একটি মাঝারি গোছের বস্তির প্রবেশ-পথ। বস্তিতে খোলার ঘর, টিনের ঘর নানারকম ছোট-বড় আকারের। কোনরকম নাগরিক সুখ-সুবিধার বালাই নেই। বড় রাস্তার কল থেকে এরা জল ধরে, পাড়ার ভদ্রলোকদের বাড়ীর চাকরদের কলতলা, বাথরুম নির্ব্বিচারে ব্যবহার করে। তাড়া খেলে পালিয়ে যায়, এবং দূরে দাঁড়িয়ে গালাগালি করে। ভোররাতে বা মাঝরাতে আবার এসে ঢোকে এই সব জায়গায়। এর ভিতর গোয়ালা, ধোপা, মুচি, মিস্ত্রি অনেক রকমই আছে। বেকার, ভিখিরীও যে নেই তা নয়। অনেকগুলি মানুষ আছে যাদের পেশা কেউ জানে না, তবে আন্দাজ করে। তবে পাড়ার উপর এখন পর্য্যন্ত কোন উৎপাত হয় নি ব'লে কেউ তাদের কিছু বলে না। বউ-ছেলেও আছে কারও কারও ঘরে। পাড়াগাঁ থেকে অতিথি-অভ্যাগতও এসে জোটে এখানে মাঝে মাঝে।

পাকা-বাড়ীর বাসিন্দারা যে এদের সঙ্গে খুব মেলামেশা করে তা নয়, তবে ছেলেপিলেরা অতটা আভিজাত্য বজায় রাখতে ব্যস্ত নয়, তারা মাঝে মাঝে ডেকে কথা বলে, বেশ দুষ্টু ছেলে হ'লে পিছনের গলিতে নেমে বস্তির ছেলেদের সঙ্গে দু'একবার ফুটবল খেলেও আসে।

বাঁড়ুজ্যেরা যে বাড়ীটাতে থাকে তার পিছনে একটা টিন-মিস্ত্রির ঘর। লোকটার রোজগার বোধ হয় ভাল, ঘরখানা তার বড়, এবং মজবুত, সামনে এক ফালি উঠোনও আছে। বউ আছে, একটা খোঁড়া ছেলে আছে। সে সকাল হলেই একটা বড় কাঠের পিঁড়ি টেনে নিয়ে ঘরের সামনের ছোট দাওয়াটায় এসে বসে, এবং গলা ফাটিয়ে যে যেখানে আছে সকলের সঙ্গে গল্প জোড়ে। গল্প করবার জন্যে কেউ না দাঁড়ালে, অনর্গল গালাগালি দিতে থাকে।

সেদিন সকালে বাঁড়ুজ্যেদের টিনি স্নান ক'রে শাড়ী-জামা মেলে দেবার জন্যে পিছনের বারান্দায় গিয়েছে, এমন সময় দেখে টিন-মিস্ত্রির বাড়ীর উঠোনে অদ্ভুত দৃশ্য। সাপুড়ে সাপ খেলাচ্ছে, আর তার বাঁশীর তালে তালে বড় ঝুড়ির মধ্যে থেকে কুণ্ডলী পাকানো মস্ত কালো সাপ ফণা মেলে উঠে পড়েছে। বাবাঃ কি ভীষণ চেহারা! আর তাকে দেখে ভয় পাওয়া দূরে থাক্, মিস্ত্রির খোঁড়া ছেলেটা হি হি ক'রে হেসে লুটোচ্ছে।

টিনি ত এক দৌড়ে ঘরের ভিতর, "ও ছোট মাসী, দেখবে এস, কি ভীষণ সাপ!"

শুধু ছোট মাসী কেন, প্রায় বাড়ীসুদ্ধই এসে হাজির এক মিনিটের মধ্যে। সাপুড়ে খুব বেশীক্ষণ খেলা দেখাল না, এখানে ত পয়সা পাওয়ার আশা নেই। খেলা যতক্ষণ চলবে, ততক্ষণ সবাই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে, যাহাতক খেলা শেষ, পয়সা চাওয়ার সময়, তখন দর্শকবৃন্দ দে ছুট।

সাপ এর অনেকগুলো, কেউ কেউ ফণা নাচাল, কেউ কেউ নির্জীব দড়ির মত প'ড়ে রইল রোদে। একটা ময়াল সাপের বাচ্চা কিল্‌বিল্‌ ক'রে রোদে ছুটোছুটি করতে লাগল। ছেলেপিলের দল ভয়ে হৈ হৈ ক'রে ওঠাতে

সাপুড়ে সাপ খেলাচ্ছে

সাপুড়ে সেটাকে ধ'রে ঝুলিতে পুরে ফেলল। তার পর গিরগিটি, বহুরূপী, গোসাপ অনেক কিছু দেখাল, কৌটা-ভর্ত্তি নানা মাপের কাঁকড়া বিছে, তেঁতুলে বিছেও বাদ গেল না।

অতঃপর গুছিয়ে সবগুলোকে তুলে ফেলার পালা। টিনির ভাই বোঁচা বলল, "হয়ে গেল এর মধ্যে? আর একটু বাঁশী বাজাও না?"

সাপুড়ে দোতলার বারান্দার দিকে তাকিয়ে বলল, "মায়ের কাছ থেকে একটা টাকা চেয়ে আন না, একঘণ্টা ধ'রে খেল দেখাব।"

টিনি বলল, "মা ত ঢুকেছে কলঘরে, দু' ঘণ্টার কমে সেখান থেকে বেরোবেই না।"

বোঁচা বলল, "আচ্ছা, তুমি কি কাল আসবে এদিকে? তা হ'লে না হয় আমি পয়সা জোগাড় ক'রে রাখব।"

সাপুড়ে বলল, "আমি ত এখানেই আছি, আসতে হবে কেন? আচ্ছা বেশ কাল দেখো, যদি সকালে থাকি নানা পাড়া ঘুরতে হয় ত পেটের ধান্দায়?"

বোঁচা বলল, "এখানে থাক? কই, তোমাকে আগে ত দেখি নি? মিস্ত্রি কে হয় তোমার?"

"হবে আর কে? গেরামের লোক।"

টিনি জিজ্ঞাসা করল, "কতদিন থাকবে তুমি এখানে?"

"তা মাস দুই ত বটে, খুব বর্ষা নামলে দেশে যাই।"

টিনি ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল, "ছোট মাসী, তোমার কাছে পয়সা আছে?"

ছোট মাসী হেনা ঠোঁট উল্টে বলল, "এসেছি ত এক ঘণ্টার জন্মে বেড়াতে, পয়সা-কড়ি কি আর আঁচলে বেঁধে এনেছি ?"

একটি স্ত্রীলোক ঘর থেকে বেরিয়ে সাপুড়ের ঝোলাঝুলি ঝুড়ি সব বয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করছিল। শাড়ীটা ময়লা, তবে গায়ে রূপোর গহনা আছে অনেকগুলি। দেখতেও মোটাসোটা, হাসিখুশী। দর্শকদের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, "তবে একখানা শাড়ী দিওগো দিদিমণি, এখানে সবাই কত ভাল ভাল শাড়ী পরে, আর আমার দেখ কি ময়লা ছেঁড়া কাপড়।"

ছোট মাসী হেনা বলল, "তাই বরং আনব, যদি কাল আসি। শাড়ী ত বাক্স ভর্ত্তি পচছে, নিজে ত ভৈরবী বেশ ধরেছি, সেই থেকে।"

হেনা বিধবা, বেশভূষা ঠিক বিধবার মত নয়, কালপেড়ে শাড়ী-পরা, হাতে দু'গাছি বালা, গলায় সরু হার। বেশ ফরশা রং, বড় বড় চোখ, তবে দৃষ্টিটা বেশ তীব্র। মুখে দারুণ বিরক্তি আর অসন্তোষের ছাপ। বয়স বেশী নয়, পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে।

টিনি বলল, "বাবাঃ, ওকে দেবার বেলা ত বেশ রাজি হচ্ছ, আর আমি সেই লাল ঢাকাইটা চেয়েছিলাম ব'লে মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলে।"

হেনা বলল, "তোকে দিতে যাব কেন অলক্ষুণে মানুষের কাপড় ?"

টিনি বলল, "হ্যাঁ, তা না ত আরো কিছু। ঐ ত দিদিমার সব শাড়ী-জামা তোমরা তিন বোনে ভাগ ক'রে নিলে, তাতে বুঝি কিছু হয় না ?"

হেনা কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় বোঁচা বলল, "ঐ নাও ছোট মাসী, তোমার পেয়াদা এসে গেছে, একেবারে রিক্‌শ ডেকেই এনেছে।"

হেনা বলল, "শাশুড়ীর এদিক্ নেইত ওদিক্ আছে। বাড়ীতে যখন থাকি, তখন ত চোখে দেখতেই পায় না, কিন্তু বাইরে গিয়ে এক ঘণ্টার বেশী দু ঘণ্টা থাকি দেখি, অমনি পাইক বরকন্দাজ দৌড়বে।"

যা হোক, পাইক বরকন্দাজের বদলে তার শ্বশুরবাড়ীর বুড়ী ঝি রাজলক্ষ্মী এসে দাঁড়াল। অগত্যা সকলের কাছে বিদায় নিয়ে চ'লেই যেতে হ'ল হেনাকে।

শ্বশুরবাড়ী খুব দূরে নয়, দশ-পনের মিনিটেই পৌঁছে গেল। বাড়ীটি শ্বশুরের নিজেরই, হাত-পা মেলে থাকবার জায়গা আছে। ভাড়াটের সঙ্গে থাকা পছন্দ নয় ব'লে সবটা নিজেরাই ভোগদখল করে আছে। মানুষ বেশী নয়, কর্ত্তা গিন্নী, বিধবা বড় বউ, দ্বিতীয় ছেলে মণীশ আর তার বউ লীলা, এবং অবিবাহিতা ছোট মেয়ে ময়না।

বাড়ীতে হৈ চৈ গোলমাল বেশী নেই, কারণ বালক-বালিকার অভাব। ময়না চৌদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে। বড় বউয়ের ছেলেমেয়ে হয় নি। লীলার বিয়ে হয়েছে মাত্র বছর খানিক আগে, তারও খোকা-খুকী কিছু হয় নি এখনও।

গোলমাল নেই, কিন্তু মনে হয় সুখ-শান্তিও বেশী নেই। একমাত্র ময়নাই যা হাসিখুশী। কর্ত্তা গিন্নি কারও মুখেই হাসি নেই, অত বড় ছেলে হঠাৎ ক'রে চ'লে গেল, তখন থেকে তাঁদের মনে অন্ধকার যেন বাসা বেঁধে আছে। হেনা সদাই বিরক্ত। লীলার মুখখানি শান্ত অথচ বিষণ্ণ। মণীশ যতক্ষণ বাড়ী থাকে, তার বেশীর ভাগ সময়ই একে-ওকে কথার হুল ফুটিয়ে বেড়ায়। এক হেনা ছাড়া কারও সঙ্গে ভাল ক'রে কথাই বলে না।

দোতলায় সব শোবার ঘর, নীচে বসবার ঘর, খাবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর প্রভৃতি। হেনা আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল। স্নান সে বেরোবার আগে সেরেই গিয়েছিল, ইলেক্‌ট্রিক্ ষ্টোভে যখন হয় একটা ভাতে ভাত ফুটিয়ে নিলেই হবে। খাওয়াটা তার বাধ্য হয়ে বিধবার মত করতেই হয়, শ্বশুরবাড়ীতে আর কিছু চলে না।

দোতলার বারান্দায় উঠে দেখল, ছোট জা লীলা একরাশ রেশমী, পশমী, সুতি কাপড়-জামা বার ক'রে রোদে দিচ্ছে, অবশ্য বারান্দা দিয়ে হাঁটবার একটু পথ রেখেছে।

হেনার চোখ দুটো একটু চক্ চক্ ক'রে উঠল। সে নিজে বিয়ের সময় খুব যে অঢেল গহনা কাপড় পেয়েছিল

তা নয়, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের মেয়ে সে। লীলা অপেক্ষাকৃত বড়লোকের মেয়ে, তাও চার ভাইয়ের একমাত্র বোন, কাজেই তার ভাগ্যে জুটেছে অনেক বেশী।

হেনা পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বলল, "কি গো ছোট বউরাণী, শাড়ী-জামার দোকান সাজাচ্ছ কেন?"

লীলা বলল, "এই একটু রোদে দিচ্ছি, নইলে ছাতা ধ'রে যায়। এর পর বর্ষাকালে ত আর কিছু বাইরে বার করা যাবে না?"

হেনা বলল, "এত বাক্স-ভর্ত্তি শাড়ী-জামা, একখানা কি একদিন অঙ্গে তুলতে নেই?"

লীলা শান্তভাবেই বলল, "কোথায় বা বেরোচ্ছি আমি যে অত আনারসী বেনারসী পরে সাজতে যাব?"

হেনা বলল, "কেন, বাড়ীতে কি মানুষ নেই, না মানুষদের চোখ নেই? এখানে শুধু ভূত সেজে থাকা যায়?"

লীলা বলল, "ভূতের মতই ত দেখতে ভাই, ভূত সাজলে আর ক্ষতিটা হচ্ছে কি?"

লীলার স্বামী মণীশ এই সময় কাছে এসে পড়ল। আজ রবিবার, অফিস যাবার তাড়া নেই। হেনার দিকে তাকিয়ে বলল, "ভূত পেত্নীর কথা কি হচ্ছে?"

হেনা বলল, "এই তোমার গিন্নীকে বলছিলাম, এত রাশ রাশ কাপড়-জামা যে পেলে বিয়ের সময়, তা একখানা কি অঙ্গে ওঠে না? সারাদিন ভূত সেজে বেড়াও কেন? তা বলছেন, 'ভূতের মতই ত দেখতে, ভূত সাজলে আর ক্ষতি কি'?"

মণীশ বলল, "তা লেখাপড়া জানা মেয়ে ভদ্রমহিলা, তাঁর সঙ্গে তুমি কথায় পারবে কেন, পেটে ত বিদ্যেবুদ্ধি কিছু নেই? রংটাই না হয় ফরশা। তবে ছোট বউয়ের একটু বিনয়ের আধিক্য হয়ে যাচ্ছে না?"

ছোট বউ কথার কোন জবাব দিল না। হেনা দেওরকে জিজ্ঞাসা করল, "বেরনো হচ্ছে কোথায়?"

"কোথায় আর, যে দিকে দু' চক্ষু যায়। কেন, তোমার কিছু আনতে টানতে হবে নাকি?"

"এই মাথার তেলটা ফুরিয়ে গেছে। এ দিক্‌কার দোকানে ওটা পাওয়া যায় না। যদি ও পাড়ায় যাও ত এক শিশি নিয়ে এস।"

মণীশ বলল, "বেশ, ছোট বউয়ের কিছু চাই নাকি?"

লীলা মাথা নেড়ে জানাল তার কিছুই চাই না। পারতপক্ষে সে স্বামীর সঙ্গে কথা বলে না। আবার কাপড় রোদে দেওয়ার কাজ আরম্ভ করল। হেনা তার দিকে একবার কুটিল দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

এ বাড়ীতে বড় বউ হেনা রূপের জোরেই এসেছিল। শ্বশুরবাড়ীর যোগ্য সে আর কোনদিকে নয়, লেখাপড়া বিশেষ শেখে নি, কাজকর্ম্ম করতে নারাজ, বাপ পয়সা-কড়িও বেশী কিছু খরচ করতে পারেন নি। বেশ রাগী এবং জেদী। শাশুড়ীর তাকে একেবারেই পছন্দ হয় নি, অবিশ্যি স্বামী সুন্দর মুখে বেশ খানিকটা ভুলেছিলেন। কিন্তু সে মুখ ত কপালে বেশীদিন টিঁকল না।

লীলা এঁদের সমান ঘরের মেয়ে, টাকা-পয়সা খরচ করতে তার বাবা ত্রুটি করেন নি। মেয়ে থার্ড ইয়ারে পড়ছিল, তখন তার বিয়ে হয়ে গেল। দেখতে সুন্দরী নয়, বরং শ্যামবর্ণ। তবে কুৎসিত একেবারেই বলা যায় না। মুখে শান্তশ্রী আছে, চোখে বুদ্ধির দীপ্তি আছে। কাজকর্ম্ম জানে, শাশুড়ীকে সকল বিষয়ে সাহায্য করে। তবে স্বামীর তাকে পছন্দ হয় নি। বড় বউয়ের পাশে একে বড় ম্লান দেখায়। তার বন্ধুবান্ধবের কাছে বউ বার করতে লজ্জা করে। দাদার গর্ব্বিত মুখের ভাব তার মনে পড়ে। প্রথম প্রথম বউ নিয়ে সে ত একেবারে পাগল হয়ে উঠেছিল। যেন এমনটি আর জগতে কেউ পায় নি। মণীশেরও একটু গর্ব্ব হয়েছিল বই কি এই বৌদিটিকে নিয়ে?

কিন্তু শ্বশুরের সংসারে হেনার নিন্দেটাই বেশী হ'ল। স্বামী আর দেওর তার ভক্ত থাকলেন অবশ্য, কিন্তু তাঁদেরও উৎসাহটা বাধ্য হয়ে খানিকটা মনে মনেই রাখতে হ'ল। তার পর ত এল সেই বিনামেঘে বজ্রাঘাতের দিন।

সাধারণতঃ বিধবা সন্তানহীনা মেয়ে বাপের বাড়ীতেই চ'লে যায়, কিন্তু হেনার বাবা ইতিমধ্যে মারা গিয়েছিলেন। কোনদিনই অবস্থা ভাল ছিল না, এখন ত প্রায় অচল হয়ে দাঁড়াল। সুতরাং হেনা বাধ্য হয়ে শ্বশুরবাড়ীতেই

থেকে গেল। খাওয়া, পরা, থাকা, এ সবের কোন অসুবিধা ছিল না। তবে সে হাড়ে হাড়ে বুঝতে লাগল যে, সে একটা নিদারুণ অবহেলার পাত্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজেদের মান রক্ষার্থে এঁরা তাকে বাড়ীতে স্থান দিয়েছেন, কিন্তু তার মুখ দেখতেও তাঁদের ইচ্ছে করে না। একমাত্র মণীশ তার দিকে। সে হেসে কথা বলে, জিনিষপত্র যখন যা দরকার এনে দেয়, শরীর খারাপ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। হাত খরচের জন্যে টাকা দেয়। মণীশ না থাকলে হেনা বোধহয় পাগল হয়ে যেত।

এগুলি কিন্তু কেউ ভাল চোখে দেখে না। শাশুড়ী নিজে কিছু বলেন না, কিন্তু আত্মীয়স্বজন সকলেই বড় বউয়ের নিন্দে করে। এত ভাবন কেন বিধবা মেয়ের? সোমত্ত বয়সের মানুষ, দেওরের সঙ্গে কি রাত্তির্দিন ফুসুর ফুসুর?

হেনা শোনে আর হাড়ে হাড়ে জ্ব'লে যায়। নেহাৎ কলিযুগে কাউকে তাকিয়ে ভস্ম ক'রে দেওয়া যায় না, নইলে সে তাই দিত বোধ হয়। প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছায় তার রক্তস্রোত যেন বিষিয়ে ওঠে, কিন্তু আর কেউ তাতে যন্ত্রণা পায় না, সে নিজেই পায়। মণীশের কানেও যে কথাগুলো না আসে তা নয়, কিন্তু তার ব্যবহারের কোন নড়চড় হয় না।

এ হেন সময় মণীশের বিয়ে হয়ে গেল। হেনার মাথায় যেন আগুন ধ'রে গেল। একজন মাত্র লোক দুনিয়ায় তার কদর বুঝত, সেও এবার পর হয়ে যাবে? কি করবে হেনা? কোথায় যাবে সে? কত লোকে কত পরামর্শ দেয়, লেখাপড়া শেখ, নার্সিং শেখ, নয় ত কোন তীর্থস্থানে গিয়ে কোন আশ্রমে থাক। কিন্তু যার মন ভোগসুখের লালসায় পরিপূর্ণ, তার এসব দিকে মন যাবে কেন?

মণীশের বউ এল। তাকে দেখে হেনার তবু বুকের ভিতরটা জুড়োল। যাক, রূপে অন্ততঃ তার পাশে দাঁড়াবার যোগ্য নয়। মণীশ কি এই বউ দেখে খুশী হবে? শ্বশুর-শাশুড়ী ত পারলে নতুন বউকে মাথায় তুলে নাচেন। তা নাচবেনই ত? অঢেল টাকা খরচ করেছে ছোট বউয়ের বাবা।

মণীশ যে খুশী হয় নি তা তার ব্যবহারেই বোঝা গেল। ছোট বউ বাড়ীর পূর্ণ মর্য্যাদা পেল বটে, কিন্তু স্বামীর ভালবাসা পেল না। বাইরের চালচলনে সেটা বিশেষ কিছু যে ধরা পড়ত তা নয়। স্বামী-স্ত্রী এক ঘরেই থাকে, কথাবার্ত্তা দরকার মত বলে। ছোট বউ সব রকম কর্ত্তব্যই পালন ক'রে চলে, কাজে তার কোথাও খুঁৎ নেই। ঘর-দোর পরিপাটি সাজান, মণীশের কোন অযত্ন হয় না। তবে দরকার ছাড়া লীলা কথা বলে না, রাত্রে সবাই শোবার পর নিজের ছোট ড্রেসিংরুমে মাদুর পেতে শোয়। খুব গরম লাগলে শোবার ঘরে এসে দক্ষিণমুখী বড় জানলাটার ধারে শুয়ে থাকে। বিয়ের দু'তিন দিন পরেই সে মণীশের মন বুঝতে পেরেছিল। অত্যন্ত আহতচিত্তে সে একেবারেই স'রে দাঁড়াল স্বামীর কাছ থেকে। মণীশ এতে একটু আরাম বোধ করল তবে একটু অপ্রতিভও হ'ল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা নেই, অথচ স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কটা আছে, এ ত বাংলা দেশে নূতন ব্যাপার নয় কিছু? তা অত দেমাক দেখিয়ে একেবারে স'রে যাবার দরকার কি ছিল? আচ্ছা, এতেই যদি লীলার সুবিধা হয়, ত সে এমনি ক'রেই থাকুক। তার উপর কোন অত্যাচার হচ্ছে এ অন্ততঃ কেউ বলতে পারবে না।

হেনা খানিকক্ষণ চুপচাপ নিজের ঘরে ব'সে কি যেন ভাবতে লাগল। তার পর একটু ক্ষিদে বোধ হওয়াতে উঠে গেল ষ্টোভটার কাছে। রোজ ভাতে ভাত খেতে ইচ্ছে করে না, অন্য সবাই কেমন পাঁচ ব্যঞ্জন দিয়ে ভাত খায়। নিরামিষ তরকারি-টারি একটু দিতে পারে হেনাকে, বামুনীতেই রাঁধে, কিন্তু সেদিকে কি কারো দৃষ্টি আছে? শাশুড়ী ত হেনা ম'রে গেলেও ফিরে তাকান না, আদরের বউ-ছেলেমেয়েকে গেলাতেই ব্যস্ত। শ্বশুরের সঙ্গে তার বাক্যালাপও নেই। এক মণীশ, তা সে পুরুষ মানুষ, সে কি আর কোথায় কে কি খাচ্ছে, না খাচ্ছে তা দেখতে আসে?

ভাতে ভাতই চড়াল। দিদির বাড়ী থেকে খানিক আচার নিয়ে এসেছিল, তারই সাহায্যে খাবে এখন। ভাত ফুটে গেছে, এখন নামালেই হয়, এমন সময় মণীশ ফিরে এল। তেলের শিশিটা হেনার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "এই নাও, ধর।"

হেনা জিজ্ঞাসা করল, "হাতে ওটা আবার কি?"

মণীশ বলল, "একখানা নূতন বই বেরিয়েছে উমাশঙ্করের, ছোট বউয়ের জন্যে নিয়ে এলাম, ও খুব ভালবাসে ওঁর বই।"

হেনার বুকের ভিতর খচ্ খচ্ ক'রে উঠল। তা হ'লে উপহারটা আস্তা দেওয়া হয়ে থাকে? বলল, "চেয়েছিল নাকি ছোট বউ?"

"না চায় নি। সে আমার অধমের কাছে কিছু চায় নাকি? ওসব চাওয়া-টাওয়ার উর্দ্ধে সে। এমনি আনলাম। ওদের বাড়ী থেকে ত লরী বোঝাই উপহার নিচ্ছি প্রতি বছর। কিছু না দিলে নিজের কাছে নিজের মান থাকে না।"

হেনা মুখ টিপে হেসে বলল, "তা বটে।" মণীশ চ'লে গেল। ভাত নামিয়ে হেনা খেতে বসল, কিন্তু খাওয়াটায় তার যেন সব রুচি চ'লে গেল।

পরদিনও সকাল বেলা দিদির বাড়ী যেতে চাওয়াতে শাশুড়ী বললেন, "রোজই যেতে হবে? কে আবার আজ তোমায় নিয়ে আসবে? রাজলক্ষ্মী রোজ যেতে চায় না।"

হেনা বলল, "আমি বোঁচাকে সঙ্গে ক'রে নিজেই আসব, কাউকে যেতে হবে না। দুটো জামা করতে দিয়েছিলাম দিদির দরজীকে, তাই ছোট ব্যাগটা নিয়ে যাচ্ছি। যাব?"

গৃহিণী মুখ ভার ক'রে বললেন, "যাও।" হেনা বেরিয়ে গেল। ঝি রিক্‌শ ডেকে দিল, তাদের বহু দিনের চেনা পুরাণো রিক্‌শওয়ালা, তার রিক্‌শয় গেলে আর সঙ্গে লোক দিতে হয় না।

টিনি ছোট মাসীকে দেখে ছুটে এল।

"হ্যাঁ ছোট মাসী, কি এনেছ ব্যাগে ক'রে?"

হেনা বলল, "একখানা শাড়ী আনলাম ঐ সাপুড়ে বউটার জন্যে। তোরা সাপখেলা দেখবি বলেছিলি না?"

টিনি হাততালি দিয়ে উঠল, "বেশ মজা হবে। দাঁড়াও, বোঁচাকে ডাকি, সে চেঁচিয়ে ওদের ডাকবে।"

বোঁচা চলল পিছনের বারান্দায়, সঙ্গে সঙ্গে অন্যরাও। বাইরের উঠোনে তখন টিন-মিস্ত্রীর ছেলে এসে জাঁকিয়ে বসেছে, অন্যদের তখনও দেখা নেই। বোঁচা ডাকতেই বলল, "দাঁড়াও ডেকে দিচ্ছি। এখনও হরিশখুড়ো বেরোয় নি, এই যাব যাব করছে।"

খুড়ো বেরোবার আগে খুড়ী বেরিয়ে এল। হেনাকে দেখে হেসে বলল, "কি দিদিমণি, শাড়ী এনেছ?"

হেনা বলল, "এনেছি ত। কিন্তু এখান থেকে ছুঁড়ে দিলে ত কাদায় প'ড়ে যাবে। তুমি নীচের খিড়কির দরজার কাছে এসে দাঁড়াও, আমি যাচ্ছি।"

বেশ রঙীন চটকদার একখানা শাড়ী বার ক'রে হেনা নীচে নেমে গেল। সাপুড়ে বউ ততক্ষণে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। শাড়ী দেখে সে ত আহ্লাদে আটখানা।

হেনা বলল, "শুধু হাসলে হবে না বাপু, আজ অনেকক্ষণ ধ'রে খেলা দেখাতে হবে।"

বউ বলল, "তা ত বটে দিদিমণি, মুড়ি ক'টা খেয়ে নিক, এখুনি আসছে।"

এরপর হেনার উপরে চ'লে আসা উচিত ছিল, কিন্তু সে সেই গলির দরজা ধ'রে দাঁড়িয়ে গল্প ক'রেই চলল। শাড়ী পেয়ে সাপুড়ে বউয়ের মেজাজটা খুবই ভাল ছিল, সেও নিশ্চিন্ত মনে দাঁড়িয়ে কথার উত্তর দিতে লাগল।

ইতিমধ্যে হরিশ ঝোলাঝুলি চুবড়ী নিয়ে বেরিয়ে এল। হেনা তখন উপরে উঠে বোনপো, বোনঝিদের মধ্যে দাঁড়াল সাপ খেলানো দেখবার জন্যে।

অনেকক্ষণ ধ'রে চলল খেলা, বালক-বালিকারা পেট ভ'রে দেখল। তাদের মাও দর্শকদের মধ্যে ছিলেন, কাজেই কয়েক আনা পয়সাও জুটল হরিশের ভাগ্যে।

বোঁচাকে জোগাড় ক'রে খানিক পরে হেনা বাড়ী ফিরে গেল।

বোনের বাড়ী যাওয়া তার লেগেই আছে। কখনও দিদির অসুখ, কখনও দেশের থেকে মাসী এসেছেন, কখনও তাদের বাড়ী কীর্ত্তন হবে। ছলছুতোর অভাব হ'ত না, শাশুড়ীও বিশেষ আপত্তি করতেন না। হেনাকে কোন কাজে পাওয়া যায় না, তিনি ডাকেনও না। তাঁর চোখের আড়ালে থাকলেই ভাল।

বৈশাখ মাসের শেষ দিকটা, দারুণ গরম পড়েছে। হেনা সেদিনও দিদির বাড়ী গিয়েছিল সকালে। সাপুড়ে বউয়ের ভাগ্যে দুটো রঙীন জামাও জুটল। তবে বড় অসহ্য গরম, বেশীক্ষণ থাকা গেল না। নিজের মার্কেল পাথরের মেজেওয়ালা ঘর, আর নূতন পাখাটার জোর হাওয়া তার মনকে টানতে লাগল। এ পাখাটা মণীশই

শাড়ী দেখে সাপুড়ে-বউ আহ্লাদে আটখানা

ব'লে ক'য়ে করিয়ে দিয়েছিল, পুরাণো ফ্যান্‌টা নষ্ট হয়ে যাবার পরে। তা না হ'লে শ্বশুর কখনও বড় বউয়ের জন্যে অতটা করতেন না।

বাড়ী ফিরে এসে রান্নাবান্না ক'রে খেল। যা গরম, কিছু খেতে ইচ্ছাও করে না। কিন্তু পোড়া পেট যে মানে না, পিণ্ডি গিলতেই হয়। দিদিও তেমনি, একদিন খেতে বলে না, জানেই ত তার অত বাছবিচার নেই, একসঙ্গেই খেতে পারে। ভয় পায় আর কি? পাছে লোক-জানাজানি হয়ে যায়।

রাত্তিরে শোবার সময় আর ঘরে থাকা যায় না। বারান্দা আছে, ছাদ আছে, বেরিয়ে যে না শোওয়া যায় এমন নয়, কিন্তু জো কি? শাশুড়ী গালমন্দ দিয়ে পাড়া মাথায় করবেন। একেই ত শ্বশুরবাড়ীর লোকের কাছে তার নাম "বেহায়া বৌ"। একটা বেড্‌কভার টেনে নিয়ে সে শুয়ে পড়ল মেঝের উপর, ঘুম এসে গেলে উঠে খাটে শোবে।

মণীশ সেদিন নিয়ম মত বিছানায়ই শুয়েছিল, লীলা শুয়েছে জানলার ধারে মাদুর পেতে।

মণীশের ঘুম আসছে না, খালি উঃ আঃ করছে, আর পাশ বদ্‌লাচ্ছে। খানিক পরে বলল, "আমি ঘুমোতে পারব না এখানে, গদি-তোশক ফুঁড়ে যেন আগুন বেরোচ্ছে, আর পাখার হাওয়াটা যেন কোন furnace-এর ভিতর থেকে আসছে। আমি নেমে শুই, তোমার কি খুব অসুবিধা হবে?"

লীলা উঠে বসল, বলল, "না, কোন অসুবিধে নেই। তুমি এই জানলাটার ধারে শোও, বেশ হাওয়া আসছে। আমি ঐ পুবের জানলাটার ধারে শুচ্ছি, ওখানেও বেশ হাওয়া।"

সে উঠে মণীশের জন্যে শীতলপাটি পেতে দিল, তার বালিশ নামিয়ে দিল, তার পর নিজের মাদুরটা আর একটা জানলার পাশে টেনে নিয়ে, বাতি নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

ঘণ্টাখানিক বড়জোর ঘুমিয়েছিল। হঠাৎ দারুণ আর্তনাদে তার ঘুম দেশ ছেড়ে পালাল। ধড়মড় ক'রে

উঠে বসতেই মণীশ বলল, "শীগ্‌গির আলো-জেলে দেখ, কি আমায় কামড়াল! উঃ গেলাম যে! সাপ নাকি কে জানে!"

লীলা ছুটে গিয়ে ঘরের দুটো আলোই একসঙ্গে জেলে দিল। মণীশ ভয়ানক কাতরাচ্ছে, আর ছটফট্ করছে। লীলা কাছে আসতেই বেশ মাঝারি গোছের একটা কাঁকড়া বিছে ল্যাজ উঁচু করে সড়সড় ক'রে ঘরের জল নিকাশের নৰ্দ্দমার মধ্যে ঢুকে গেল।

লীলা বলল, "এত বড় কাঁকড়া বিছে দোতলার ঘরে কি ক'রে এল! সর্ব্বনাশ!"

মণীশ বলল, "শীগ্‌গির ডাক বাবা-মাকে। ওঃ, আমার প্রাণটা যে বেরিয়ে গেল।"

দু'তিন মিনিটের মধ্যেই বাড়ীর সব ক'জন লোক ঘরের ভিতর এসে জুটল। যার যতরকম টোট্‌কাটুট্‌কি জানা ছিল সব একসঙ্গে সবাই বলতে লাগল। যা কিছু হাতের কাছে পাওয়া গেল তা ক্ষতস্থানে দেওয়াও হতে লাগল। কিন্তু যন্ত্রণা ত কিছুই কমে না। অতবড় বলিষ্ঠ ছেলে, সে যেন ক্রমেই এলিয়ে পড়ছে, তার আর্ত্তনাদ ক্রমে গোঙানিতে পরিণত হচ্ছে।

মণীশের মা তার মাথা কোলে নিয়ে ব'সে পাগলের মত কাঁদছেন, আর দরজার বাইরে আধ-ঘোমটায় মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে মেনা। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে যেন পাথর হয়ে গিয়েছে, চোখেও যেন দৃষ্টি নেই।

লীলা বলল, "মা, ডাক্তার ডাকতেই হবে, আর দেরি ক'রে কাজ নেই, ও-সব টোট্‌কায় সারবে না।"

শাশুড়ী কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, "কে যাবে বৌমা? পোড়া-বাড়ীতে টেলিফোন নেই, আজ আসছে, কাল আসছে ক'রে বছর ঘুরে গেল। চাকরসুদ্ধ একটা নেই। রাজলক্ষ্মী বুড়ী রাতে চোখে দেখে না। আর তোমার শ্বশুরের হাঁপানির টান এমন বেড়েছে যে, সিঁড়ির ধার অবধিই যেতে পারবেন না।"

লীলা দৃঢ়স্বরে বলল, "আমি যাচ্ছি। গলি যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে বড় রাস্তার উপর একজন খুব ভাল হোমিওপ্যাথ ডাক্তার থাকেন, তাঁকে ডেকে আনি। ওঁদের ওষুধে খুব চট্ ক'রে কাজ হয়।"

শাশুড়ী বললেন, "সে কি বৌমা? দুপুর রাতে একলা বৌ-মানুষ কোথায় যাবে?"

লীলা বলল, "যেতেই হবে মা। বেশী দূর নয়, এখনি ফিরে আসব। এস ত ময়না, সদর দরজাটা বন্ধ ক'রে একটুক্ষণ ওখানে দাঁড়াবে।"

দু'জনে নেমে গেল। লীলা দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল, ময়না দরজায় হুড়কো তুলে দিয়ে পাশের জানলাটা খুলে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

লীলা দ্রুতপদে হেঁটে চলল। গলিতে আলো আছে, পথ দেখা যায়। গাড়ী করে আসা-যাওয়া করে গলিটা যে এত নোংরা আর এত খানাখন্দে ভরা তা তার জানা ছিল না। সৌভাগ্যের বিষয় কয়েকটা নেড়ী কুকুর ছাড়া আর কারো সঙ্গে তার দেখা হ'ল না।

ডাক্তারের বাড়ী পৌঁছতে তার বেশী দেরি হ'ল না। বাঁচা গেল, বাড়ীতে লোক জেগে আছে এখনও, নীচের ঘরটায় আলো জলছে। এই ঘরটাতেই ডাক্তারবাবু সকালবেলা রুগী দেখেন।

লীলা খোলা জানলা দিয়ে দেখতেই পেল, তিনি ব'সে একখানা বই পড়ছেন। সে সামনের বারান্দার সিঁড়ি পার হয়ে সদর দরজায় ঠুক্‌ঠুক্ ক'রে ঘা দিল। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, "কে?"

লীলা বলল, "আমি এই পাড়ারই একজন বউ। আমার স্বামীকে কাঁকড়া বিছেতে কামড়েছে, ভয়ানক যন্ত্রণা। তাই আপনাকে ডাকতে এসেছি, দয়া ক'রে একটু আসুন।"

অল্পবয়সী মেয়ের গলার স্বর শুনে ডাক্তার তাড়াতাড়ি এসে দরজাটা খুলে দিলেন। বললেন, "ভিতরে এসে বসুন মা, আমি কয়েকটা ওষুধ গুছিয়ে নিচ্ছি।"

লীলা ভিতরে ঢুকে দাঁড়াল। ডাক্তার ব্যাগে কয়েকটা ওষুধ ঢুকিয়ে নিয়ে জুতোজোড়া পায়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। একটা ছোকরা চাকরকে ডেকে দরজা বন্ধ করতে ব'লে তিনি লীলার সঙ্গে রাস্তায় নেমে পড়লেন।

ময়না তখনও দরজার পাশে দাঁড়িয়ে, সে ওদের আসতে দেখেই দরজা খুলে দিল। নীচ থেকেই মণীশের কাতর কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে।

ডাক্তার নিয়ে উপরে উঠতেই সবাই পথ ক'রে তাঁকে মণীশের কাছে নিয়ে এল। ডাক্তার তার পায়ের

অবস্থা দেখে বললেন, "এ জায়গায় এত যা-তা লাগিয়েছেন কেন? ভালোর বদলে মন্দ হবে যে? ওখানটা ধুয়ে দিন দেখি ফোটান জল দিয়ে।"

ডাক্তার ওষুধ বার ক'রে এক ডোস্ তখনই মণীশকে খাইয়ে দিলেন। বাড়ীতে ভাগ্যে ফোটান জল ছিল লীলার ঘরে, সে বাপের বাড়ীর নিয়মই বজায় রেখেছে। এ বাড়ীর লোকেরা ফোটান জল খেতে চায় না, বলে কোন স্বাদ পাওয়া যায় না। লীলা তুলো ভিজিয়ে আস্তে-আস্তে মণীশের পা পরিষ্কার ক'রে দিতে লাগল।

সেখানেও ডাক্তারবাবু ওষুধ জলের পটি দিলেন। ওষুধ খাওয়ান চলতেই লাগল। মণীশের দারুণ ছটফটানি কমে আসতে লাগল, সেই অসহ্য যন্ত্রণাকাতর আর্ত্তনাদও থেমে গেল। ডাক্তার তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভাল বোধ করছেন কিছু?"

মণীশ বলল, "খানিকটা।"

ডাক্তার বললেন, "আধ ঘণ্টা পরে একেবারে জুড়িয়ে যাবে। ওষুধটা আর একবার খাবেন, তার পর ঘুমোতে চেষ্টা করুন। বিছানায় উঠে শুলে ভাল। বিছেটা মারা হয় নি বোধ হয়, ঘরের মধ্যেই কোথায় লুকিয়ে আছে।"

লীলা বলল, "মারতে পারি নি, ঐ নর্দ্দমায় ঢুকেছে, আমি বড় একটা তোয়ালে দিয়ে নর্দ্দমার মুখ ঠেসে বন্ধ ক'রে দিয়েছি।"

মণীশকে অনেকটা সুস্থ দেখে সবাই আবার কথা বলতে আরম্ভ করল। কর্ত্তা বললেন, "কলকাতার শহরে, বাড়ীতে দোতলার উপর কাঁকড়া বিছে! এমন ব্যাপার কখনও কেউ শুনেছে?"

ডাক্তার বললেন, "কলকাতার শহর আজব জায়গা মশাই। সেদিন শুনলাম, আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে দোতলার উপর ভাঁড়ার ঘরে সাপ পাওয়া গেছে।"

মণীশের মা শিউরে উঠে বললেন, "কাল সারা বাড়ী আমি ঝাড়াব। সব কটা নর্দ্দমায় লাইসল দিয়ে মুখ বন্ধ ক'রে দেব।"

ডাক্তার বললেন, "আমি তবে উঠি এখন। আর ভয় নেই, যন্ত্রণা গেছে, এর পর ঘুমিয়ে পড়বেন। জেগে যদি থাকেন, ওষুধটা আর একবার খাইয়ে দেবেন। ঘুমিয়ে পড়লে আর তুলবেন না। সকালে একটা খবর দিয়ে পাঠাবেন।"

কর্ত্তা বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, নিশ্চয়।" তাঁর নির্দ্দেশ মত ময়না তার মনিব্যাগ নিয়ে এল। কর্ত্তা ডাক্তারকে তাঁর পাওনা দিতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "রাত দুপুরে টেনে এনেছে, কত আপনাকে দেব বলুন ত?"

ডাক্তার বললেন, "প্রতিবেশী মানুষের কাছে বেশী নিই না, আমাকে আট টাকা দিলেই হবে।"

ব্যাগ গুছিয়ে এবার তিনি নেমে চললেন। ময়না নীচ অবধি নেমে তাঁকে বিদায় দিয়ে এল।

মণীশের মা স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "যাও, তুমি গিয়ে শুয়ে পড়, নইলে হাঁপানি আরও বেড়ে যাবে। ময়না যা ত, বাবার পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিবি, ঘুমিয়ে পড়বেন এখন।"

কর্ত্তা খুবই শ্রান্ত বোধ করছিলেন, ছেলের বিপদ্ কেটে যাওয়াতে নিশ্চিন্ত হয়ে শুতে চ'লে গেলেন। হেনাও স'রে গেছে কখন দরজার সামনে থেকে সেটা শুধু মণীশ লক্ষ্য করেছে।

লীলা এবার শাশুড়ীর দিকে চেয়ে বলল, "মা, আপনিও শুতে যান, সেই ত ভোররাতে ওঠেন, দু'এক ঘণ্টা না ঘুমিয়ে নিলে আর মাথা তুলতে পারবেন না। ওষুধ আমি ঠিক সময় খাইয়ে দেব।"

মণীশ এবার উঠে বসল। বলল, "হ্যাঁ মা, যাও। যা হোক একখানা কাণ্ড হ'ল বটে।"

তার মা বললেন, "কাণ্ড ব'লে কাণ্ড। ভাগ্যে বৌমা বেটা-ছেলের সাহস ধরে, তাই ত এত শীগ্‌গির নিষ্কৃতি পেলে, নইলে সারারাত এই তাণ্ডব চলত।"

শাশুড়ীও উঠে গেলেন। লীলা বলল, "তুমি এবার বিছানায় উঠে শোও দেখি, আমি বাতিটা নিভিয়ে দিই।"

মণীশ বলল, "তোমাকেও উঠে শুতে হবে। এই ঘরের মেঝেয় আজ অন্ততঃ তোমাকে শুতে দিচ্ছি না, আগে বিছে সাপ কোথায় কি আছে সব মারা হোক।"

লীলা বলল, "এখন ত খানিকক্ষণ জেগেই থাকব। তোমাকে ওষুধ খাওয়াতে হবে আর একবার, যদি না

ঘুমিয়ে পড়। পাশের ঘরের আলোটা জেলেই রাখি বরং, আমারও গাটা কেমন ছম্ ছম্ করছে। আর রাতই বা ক'ঘণ্টা আছে ?"

মণীশ বলল, "সে যাই হোক; তুমি মেঝেয় শুতে পাবে না, তা হলে আমিও নীচে শোব।"

এ ঘরের দুটো বাতি নিভিয়ে পাশের ঘরের আলোটা জেলে রাখল লীলা। মণীশ তখন খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে বিছানায় শুয়েছে। স্ত্রীর হাত ধ'রে বলল, "উঠে এস, আমার কথা আজ শুনতে হবে।"

লীলা খাটে উঠে ব'সে রইল মণীশের মাথার কাছে। মণীশের ঘুম হচ্ছে না। লীলা বলল, "খুব গরম লাগছে নাকি ?"

মণীশ বলল, "গরম ত লাগছেই, মনটাও বড় ভার হয়ে আছে।"

লীলা বলল, "মন ভার কেন হ'ল ? কারও দোষে ত এ ব্যাপার হয় নি ? Accident হয়েই থাকে।"

মণীশ বলল, "পরকে যন্ত্রণা দিলে, নিজেকেও যন্ত্রণা পেতে হয়, এই শিক্ষা হ'ল।"

লীলা ব্যথিত হয়ে বলল, "ওসব কার্য্য-কারণ খুঁজে লাভ কি ? তুমি ঘুমোতে একটু চেষ্টা কর না ?"

মণীশ তার খানিকটা কাছে এসে বলল, "আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেবে, না ঘেন্না করবে ?"

লীলা একেবারে চমকে গেল, বলল, "না না, ছি, ছি, এ কি বলছ তুমি ? তোমাকে ঘেন্না করব ? আমি কি পাগল নাকি ?"

সে ব'সে ব'সে মণীশের মাথায় হাত বুলোতে লাগল। কিন্তু মণীশের ঘুম আর কিছুতেই আসে না।

ময়না সবার আগে ঘুমিয়ে পড়ল, তার পর ঘুমোলেন তার বাবা আর মা। হেনার ঘরে সে মেঝেতে লুটোপুটি খেতে লাগল।

এ কি ক'রে বসল সে ? সে ত লীলাকে খানিকটা যন্ত্রণা দিয়ে নিজের মনের জ্বালা জুড়োতে চেয়েছিল। মণীশ যে উঠে লীলার জায়গায় শুয়েছে তা সে জানবে কি ক'রে ? শেষে তার হাত দিয়ে মণীশের এত দারুণ একটা ব্যথা পেতে হ'ল ? মণীশ জানবে না, কিন্তু হেনা ত জানে, ভগবান্ও যে জানেন। এ সংসারে স্বার্থপ্রণোদিত হয়েও যা একটু প্রীতির সম্বন্ধ তার একজনের সঙ্গে ছিল, তাতেও বিষ মিশল ? ছোট বউয়ের কোন অপকার সে করতে পারে নি, অন্য সকলের কাছে তার দর আরও অনেক বেড়ে গেছে।

যন্ত্রণাকাতর মণীশের কাছে সে যেতে পারে নি। শাশুড়ী শ্বশুর বাঘের মত তাকে আগলে ছিলেন। ছোট বউ বিবাহিতা স্ত্রীর অধিকারে তার সেবা করেছে। মণীশ কি ভাবল তাকে ? সে শুধু নিতে জানে, দিতে জানে না ?

কতক্ষণ কাটল কে জানে ? বাড়ী ত নীরব, ডাক্তার চ'লে যাওয়া অবধি সে ঘরের বাইরেই ছিল। শ্বশুর শাশুড়ী নিজের ঘরে, ময়না এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে।

একবার গিয়ে দেখে আসবে মণীশকে ? দরজা খোলা পাবে না, তবে জানালা ত ওরা খোলাই রাখে। মণীশ যদি জেগে থাকে, তা হ'লে দরজা খোলান যেতে পারে। তার ঘরে চিরদিনই হেনার প্রবেশাধিকার ছিল সব সময়েই।

উঠে পড়ল হেনা। চুলটা এলো খোঁপা ক'রে জড়িয়ে নিল। ঘরের আলো নিভিয়ে পা টিপে টিপে বারান্দায় বেরিয়ে এল। মণীশের ঘরে আবছা আলো, ঘরের বাতিগুলো জলছে না। পাশের ঘরের আলো জ্বালা আছে।

খাটের উপর মণীশ শুয়ে। তার মাথা লীলার কোলে। উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, জেগে আছে কি ঘুমিয়ে আছে বোঝা যায় না। তবে দুই হাত দিয়ে লীলাকে জড়িয়ে ধ'রে রয়েছে।

হেনা আবার পা টিপে টিপে ফিরে গেল নিজের ঘরে। মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে লাগল, পাথরের মেঝেয় টিপ্ টিপ্ ক'রে মাথাটা ঠুকে কালশিরা পড়িয়ে ফেলল।

বেকার জীবনকে ভয় করে আজ জ্যোতির্ময়। চাকরি পেয়ে ভয় বেড়েছে তার। বুঝেছে ও, জীবন সুখের নয় কারও।

তাই ত বিয়েতে আপত্তি তার মনে মনে। সে টলে না মা-বৌদির পীড়াপীড়িতে। মন ভরে না তার, বিয়ের কথায় বৌদি মধুর পরিবেশ সৃষ্টি করলেও। মনে হয়, যে আসবে সে ত বেকার। সে বেকার জীবনে যেমন ভার ছিল সকলের, তেমনি ভার হবে সে এসেও। টাকা দিয়ে যখন সংসারের সব কিছুকে কিনতে হয়, তখন সে টাকা যে আনবে না তার অবস্থা হবে তার বেকার জীবনের মত।

—দেখ খোকা, যে আসে সে তার খাবার নিয়ে আসে। মায়ের এ কথা কানে নেয় না সে।

—তোমার দাদার একার আয়ে চলে নি আমাদের? কষ্ট হয়েছে বলবে ত! কোন্ সংসারে কষ্ট নেই?

বৌদির কথা মানলেও কেন মিছামিছি কষ্ট বাড়াবে সে?

কিন্তু টলতে হয় তাকে দিনরাত সকলের পীড়াপীড়িতে, অবশ্যই তার যুক্তিকে বজায় রেখে। জ্যোতির্ময় চায় চাকরি-করা মেয়ে। বেকার নয়। উপায় ক'রে আনবে সংসারে। তা হ'লে বেকারত্বের জ্বালায় জ্বলতে হবে না তাকে। জ্যোতির্ময়ের মতই সে হবে বাড়ীর সম্পদ্। ব্যস্ত থাকবে সকলে তার জন্য, যেমন আজ থাকে জ্যোতির্ময়কে ঘিরে।

মনে মনে বেদনা অনুভব করেছে এই ভাবে মেয়ে বাছতে গিয়ে। কিন্তু উপায় নেই জ্যোতির্ময়ের। সংসারকে গ'ড়ে তোলার দায়িত্ব তারও। মা-বৌদির মৃদু আপত্তি ছিল চাকরি-করা মেয়েতে। মুখে না বললেও বুঝেছে জ্যোতির্ময়। যেন উৎসাহ কম চাকরি-করা মেয়ের কথায়।

তা হোক, জানে জ্যোতির্ময় যে, এ আপত্তিটা নিতান্তই সংস্কার, মন-গড়া। এ সংসারে রূপের চেয়ে রূপার দাম বেশী, চাকরি পাবার পর বুঝেছে সে হাড়ে হাড়ে। অন্তর দিয়ে করেছে উপলব্ধি। চাকরিটা পাওয়ার পর থেকেই জ্যোতির্ময়ের দর বেড়েছে হঠাৎ। খতিয়ে দেখে আগের অবস্থার সঙ্গে এখনকার।

জ্যোতির্ময়কে দেখলে এখন সবাই মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করে কুশল প্রশ্ন। পাশ দিয়ে চলে গেলে বোঝে যে, সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে। অথচ কয়েক মাস আগে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা হ'লে খামকা বর্ষণ করেছে প্রচুর উপদেশ বাণী। বলেছে, এখনও জোগাড় করতে পারলে না কিছু! দেখ তে দেখ, বেকার জীবন কোন কাজের নয়—চেষ্টা কর!

—সে কি! জানতাম না যে তুমি বেকার ব'সে! দুদিন আগে জানলে আমার হাতেই একটা চান্স এসেছিল! কথাটা ব'লেই চুক্‌ চুক শব্দ ক'রে আপশোষ জানাল আত্মীয়টি।

বাড়ীর লোকের কথা না বলাই ভাল। সব সময় মুখ ভার। যেন কত অপরাধ করেছে জ্যোতির্ময়। অত যে হাসিখুশী মানুষ বৌদি, তারও তাগাদা তাড়াতাড়ি খেয়ে নেবার জন্য।

—সময়মত খেয়ে নিয়ে আমাদের রেহাই দাও ঠাকুরপো!

সেদিনে একটা চাকরির খোঁজে বেরুবে জ্যোতির্ময়, তাই সকালেই স্নানের ঘরে ঢুকেছিল। ওঃ কি তাগাদা দাদার!

—তোর আবার তাড়া কিসের রে জ্যোতে? সকালবেলাতেই কলঘরে কেন?

মাসীমার বাড়ী গিয়েছিল জ্যোতির্ময় কয়েক দিনের জন্য বেড়াতে। মেয়েটাও বুঝি দূর সম্পর্কের কেউ। ভারী চমৎকার মেয়ে। মিষ্টি স্বভাব আর কাজ দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছিল বাড়ীর লোকদের। সকালে চা ক'রে বুঝি নিয়ে আসছিল তার ঘরে। মা তার বলেছে—আমাকে দে তুমি, আমি দিয়ে আসি।

অমন ভাল চা-টা বিস্বাদ লেগেছিল মুখে। বেকারের সুমুখে আইবুড়ো মেয়ে পাঠাতে মায়ের আপত্তি। অথচ চাকরি পাবার পর? মাসীমাই চিঠি লিখেছেন বোনকে। যেন ছেলের বিয়ের কথা কোথাও পাকা না করা হয়, তাঁর আত্মীয়া মেয়েটিকে তিনি চান পার করতে। সে মেয়েকে দেখেছে জ্যোতির্ময়। চমৎকার মেয়ে। কাজেকর্মে অতুলনীয়।

জ্যোতির্ময় দেখেছে মেয়েটিকে। অর্থাৎ সেই মেয়েটি, যাকে দিয়ে বেকারের সুমুখে এক কাপ চা পাঠিয়ে দেওয়াও ছিল না নিরাপদ্‌।

অবাক্‌ হয়েছেন আর এক আত্মীয়া। সে কি কথা দিদি! ছেলের বিয়ে দাও নি এখনও! এমন সোনার চাঁদ ছেলে? ঠিক আছে! আমার জানাশোনা মেয়ে আছে একটা। তারাও এই রকম পাত্তর খুঁজছে! দেবে-থোবেও অনেক। আমি আজই খবর পাঠাচ্ছি।

এই আত্মীয়াটি আগেও এসেছেন তাদের বাড়ী। এতদিন চোখ পড়ে নি এই রত্নের দিকে।

আর মেয়েরা! এতদিন বুঝি করুণার দৃষ্টিতে দেখেছে তাকে। এখন দেখলেই অকারণেই লজ্জায় লাল হয়ে ঘেমে ওঠে। এমন কি পাশের বাড়ীর যে মেয়েটি চোখ তুলে চাইত না ভাল ক'রে, এখন সেও বুঝি সামনে পড়লে চায় অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে।

রবিবার। ঘরে ব'সে ব'সে কাগজ পড়ে। সপ্তাহের এই ছুটির দিনটাকে শুয়ে-বসে রসিয়ে কাটাতে চায়। মনে হয়, চা দু কাপের জায়গায় তিন কাপ হ'লে বেশ জমে সকালটা।

ভাবতে ভাবতেই চায়ের পেয়ালা হাতে হাজির বৌদি!

—চায়ের কথাই ভাবছিলাম বৌদি! কি ক'রে বুঝলে বল ত? বৌদির হাসিমুখ এবার কৌতুকে ঝলমলিয়ে ওঠে। কি ভাবছিলে তা কি আর বুঝি না ঠাকুরপো!

—কি?

—ভাবছিলে এক নতুন মুখের কথা, যে মিষ্টি হাতে চা নিয়ে ঢুকবে ঘরে···

—সত্যি বৌদি। আমি ভাবছিলাম তোমার কথাই!

—মিথ্যে কথা বলতে নেই ঠাকুরপো! বৌদির চায়ে কি মন ভরে?

—তুমি বিশ্বাস কর বৌদি! তোমার চেয়ে ভাল চা কেউ করবে?

—পারবে গো পারবে! তখন আর মুখে রুচবে না বৌদির চা! একটু থেমে বলেন, একা সত্যিই আর পারি নে! এবারে নতুন লোক নিয়ে এস। তোমারও মন ভরবে! ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে আর কড়িকাঠ গুণতে হবে না আর আমিও বাঁচব একজন সঙ্গী পেয়ে! আমারও আর ভাল লাগে না একা একা!

অথচ এই বৌদিই আগে তার বিয়ের কথা কখনও উঠলে আপত্তি করেছেন বেজায়। বলেছেন কি হবে একটা পরের মেয়েকে দুঃখের সংসারে টেনে এনে। আমরা যে জ্বালায় জ্বলছি তার মধ্যে আর একজনকে জ্বালান কেন?

শুধু বৌদি নয়, এখন দাদাও চান বিভিন্ন কাজে জ্যোতির্ময়ের পরামর্শ। যেন রাতারাতি জ্যোতির্ময় বিজ্ঞ

হয়ে উঠেছে। এখন ভাইয়ের খোঁজখবর প্রতিটি ব্যাপারে, একসঙ্গে খেতে ব'সে জ্যোতির্ময়ের খাওয়ার দিকে তীক্ষ্ণ নজর।

খাওয়ার ব্যাপারে দাদা চিরকালই পেটুক। মাছের মাথা এলে তার দিকে লোভ দাদার চিরকাল। এখন খেতে ব'সেই বলেন—জ্যোতিকে মাথাটা দিও!

—জ্যোতির্ময় দাদার দিকে আড় চোখে চায়।

ভাবান্তর নেই মুখে। কষ্ট নেই এতটুকু।

—সে আর তোমায় বলতে হবে না! তুমি চাইলেও পাবে না। বৌদির জবাব আসে কথার পিঠেই।

হঠাৎ জ্যোতির্ময় যেন সাপের পাঁচ পা দেখেছে। যেন নতুন মানুষ সে এ সংসারে। অনেক সাধনা আরাধনার পর এসেছে গুরুঠাকুর। বাড়ীসুদ্ধ লোক ব্যস্ত তাকে নিয়ে, তার সুখ সুবিধার জন্য ঘুম নেই এতগুলো লোকের। পান থেকে চুণ খসার উপায় নেই, পান না খেলেও খাওয়ার শেষে বৌদি মুখশুদ্ধি নিয়ে দাঁড়িয়ে। চাকরি পাওয়ার আগের দিনেও একশ'বার শুনতে হয়েছে সংসারের টানাটানির কথা। চাকরি পাওয়ার পরদিন থেকে যেন এ সংসার একটা টাকার গাছের সন্ধান পেয়েছে। কোন জিনিসের অভাব নেই। যখন যা প্রয়োজন তাই আসে হাতের কাছে।

মাও অফিসে যাবার আগে বার বার বলতে থাকেন—খোকা! টিফিনে ফলটল কিনে খাস বাবা! মাথা খাটিয়ে কাজ করতে হয়! না খেলে শরীর টিকবে কেন? দাদাও প্রতিদিন টিফিনের আলাদা পয়সা দেন। এক-এক দিন আট আনা দিয়েও জিজ্ঞাসা করেন এতে হবে কি না?

অথচ এই আট আনা পয়সা এর আগে হঠাৎ কোনদিন চাইলে বৌদি বলেছেন, আমি বাপু চাইতে পারব না! তুমি গিয়ে ব'লে দেখ।

আর আজ দাদার ভুল হ'লে বৌদি হাতে গুঁজে দিয়ে যাচ্ছেন আগে আগে। দরকার নাই বললেও পকেটে ফেলে দেন জোর ক'রে।

এক-একদিন মনে হয় জ্যোতির্ময়ের, এই যে তার আদর, হঠাৎ এই যে তার দাম বেড়ে যাওয়া, কাল যদি চাকরিটা না থাকে তবে? তখন কি এই আদর থাকবে? এমন করে বাড়ীসুদ্ধ সকলের তাকে নিয়ে যে ভাবনা, এ থাকবে কি?

সেদিনও ছুটির দিন। ঘুমিয়েছে জ্যোতির্ময়। কখন দুপুর গড়িয়ে বেলা সন্ধ্যার দিকে চলেছে ছুটে সে জানতেও পারে নি। বৌদি ডেকে তুলছেন চা হাতে নিয়ে। ওঠ ঠাকুরপো! চা খাবে ত ওঠ।

জ্যোতির্ময় উঠে বসেছে ধড়মড় ক'রে।

—আর পারি না বাপু!

তখনও ঘুম জড়ানো চোখ। হাঁ ক'রে চেয়ে আছে বৌদির দিকে।

—এই ঘুম ভাঙিয়ে চা দেওয়ার দায়িত্ব কি চিরকাল বয়ে বেড়াতে হবে আমাকেই!

এতক্ষণে সুর গিয়েছে কানে।

জেনেশুনেও জ্যোতির্ময় বলে—কে করবে তবে।

—আহা হা—কিছু যেন জানেন না! এমনি ক'রেই কাটবে দিন?

—বেশ ত কাটছে বৌদি!

—আমি আর পারব না।

—তবে ঝি দেখতে হয় একটা!

—তাই দেখ, তবে সেটা তোমার নিজের জন্য, বুঝলে!

ঐ এক সুর মায়েরও। অফিস থেকে ফিরে যখন বিশ্রাম নেয় জ্যোতির্ময়, মা এক সময় ঘরে এসে বসেন। এ কথা সে কথার পর আসেন আসল কথায়।

—খোকা! সবই ত হ'ল বাবা, এবারে আমার কথাটা রাখ!

—কি কথা মা!

—কবে আছি, কবে নেই। বৌমার মুখ দেখে যেতে চাই রে।

—এক বৌমার মুখ ত দেখছ মা! আর একজনের নাই বা দেখলে?

—তাই কি হয় রে? যখনকার যা! তোকে সংসারী না দেখে আমার যে ম'রেও সুখ নেই।

মায়ের কথায় সায় দিতে গিয়েও থমকে যায় জ্যোতির্ময়। বেশ ত আছে। কিন্তু বেশ থাকতে দেবে না তাকে। অন্যদের সঙ্গে বন্ধুরাও যেন তাকে পাত্রীস্থ করতে না পারলে দায়মুক্ত হচ্ছে না। তাই মা বৌদি তাদের শরণাপন্ন।

হাসি পায় জ্যোতির্ময়ের। বাড়ীর সমস্ত লোকের চিন্তা এখন তাকে ঘিরে। ভাল লাগে! টাকার এত মূল্য, আগে এমন ক'রে বোঝে নি সে। মাসের শেষে সংসারের জন্যে কয়েকখানা নোট গুঁজে দিলে তার মত বেকার ছেলেও মানুষ হয়ে যায়। মাইনে পেয়েছে ত এক মাস কাজ করার পর। কিন্তু চাকরির প্রথম দিন থেকেই সে বেকারত্ব থেকে মনুষ্যত্বে উন্নীত। দায় থেকে দায়িত্বে উত্তরণ।

কিন্তু জ্যোতির্ময় জানে, সে আজ সংসারের দায় না হলেও বৌদি মা আর বন্ধুর দল যে দায়িত্বের বোঝা চাপাতে চাইছে, সে দায়িত্ব বহন করার পর কি অবশিষ্ট থাকবে তার? আজকে যে তাকে নিয়ে এত মাথাব্যথা, তখন সেই ব্যথাটা হবে অন্য রকম। সংসারের মধ্যে সূক্ষ্ম ফাটল দেখা দেবে। বেকার থেকে সাকারে আসার আনন্দ থাকবে না আর। দুই ভাইয়ের টাকায় যে আনন্দ, তার ভাগীদার জুটলে ঘাটতি পড়বে ভাগে। তখন হবে তার অন্য রূপ। এক জীবনেই তিন জন্ম। বেকার, চাকুরে এবং স্ত্রীর স্বামী। একটা বছরের মধ্যে তিনটা জীবনের স্বাদ। তিক্ত, মধুর অম্ল!

প্রথম মাইনে পেয়েই কাপড়চোপড় নিয়ে এসেছে দাদা বৌদির আর মার। বৌদির ফ্যাকাশে মুখে যেন রক্তের ছোপ লাগে।

—এত ভাল কাপড় কেন আনলে ঠাকুরপো!

—পছন্দ হয়েছে তোমার?

—খু-উ-ব! কিন্তু আরও আনন্দ পেতাম যদি আর একজনকে আনতে এই রকম ভাল কাপড়ে সাজিয়ে।

জ্যোতির্ময় ভাবে, কি বোকা এই সংসার। শুধু নিজেরা পেয়ে ক্ষান্ত নয়, দিতে হবে অন্যকেও। সে এ সংসারে না থাকলে আনতে হবে তাকে। যেন তাকে বাদ দিয়ে চলবে না এদের। সে একই কলসীর জল খাবে, ভাগে কম পড়বে তবু তাকে ছাড়া চলবে না। এরা যেন প্রমাণ করতে চায়, শুধু তার টাকাটাই বড় নয়, টাকাটাকে কত অসংখ্যভাগে ভাগ করা যায় সেটাই কাম্য।

কিন্তু সত্যিই কি তাই! না তাই নয়, সে দেখাতে চায় তা নয়। তাই সে রাজী হয় বিয়েতে শুধু একটা সর্ত্তে। যে আসবে সেও নিয়ে আসবে। সেও হবে চাকুরে। সেও আদর পাবে তার মত। এমন কি তা, চেয়েও বেশী। বেশীটা তার টাকার দিকে চেয়ে, তার সুন্দর মুখের জোরে নয়। জ্যোতির্ময় প্রমাণ করিয়ে দেবে, তার চেয়ে তার টাকাকেই ভালবাসবে তোমরা। সে রাণী হয়ে থাকলে তোমরা করতে চাইবে তাকে পাটরাণী! সে ঘুমাতে চাইলে তোমরাই ঘুম পাড়াবে তাকে।

বৌদিই খুশী সব চেয়ে বেশী। সে একাই একশ'। নতুন লোক আসছে সংসারে! নতুন বৌ। বৌ নয়, যেন এক ঝলক আলো। শাড়ীর আঁচল উড়িয়ে এল না, যেন নিয়ে এল দক্ষিণের ঝিরঝিরে বসন্ত বাতাস।

তবু কি হ'ল? কয়েকদিন পরেই যেন ঘুরে গেল দখিনা বাতাস। বয়ে নিয়ে এল উত্তরের উত্তুঙ্গ হিমেল হাওয়া। বৌ ত বৌ হয়ে রইল না ঘরে। এ যেন একটা চাকুরে জীব। সকাল থেকে জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে পাল্লা অফিস যাওয়া নিয়ে। জ্যোতির্ময় কলঘরে যায় নটায় ত সে সাড়ে আটটায়। জ্যোতির্ময়ের দশটায়, ত তার অফিস সাড়ে নটায়। ঘুম থেকে উঠেই সে অফিসমুখো। সে এ বাড়ীর বৌ নয়, সে শুধু অফিসের কেরাণী। সে বৌদির সঙ্গিনী নয়, মুখের অন্ন। সে নিশ্চিন্ত আরামের অংশীদার নয়, বিলাসের ফাঁস।

মায়ের মুশকিল সবচেয়ে বেশী। তিনি চেয়েছিলেন পুত্রবধূ, পেয়েছেন আর একটি পুত্র। যে তাকে সেবা করবে তার কমনীয়তা দিয়ে সে নয়, তাকেই সেবা কর নিজের পরমায়ুর গোনা দিনের বিনিময়ে।

আর সুমন্ত্র। তার চোখের সুমুখ দিয়ে বাসের হাতল ধ'রে ঝুলতে থাকে মীনা। তাকে সরিয়ে দিয়ে ওঠে ট্রামের পাদানিতে। ভীড়ের মধ্যে ভাসুর ভাদ্রবধূর প্রাণান্তকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কাকে ফেলে কে যাবে এগিয়ে।

সবচেয়ে নির্লিপ্ত জ্যোতির্ময়। সে যেন একজন দর্শক এই সংসার রঙ্গভূমে। অফিস থেকে ফিরে ক্লান্ত দেহ-

যখন একখানি শীতল হস্তের কামনা করে সে

মন নিয়ে যখন একখানি শীতল হাতের মধুর স্পর্শ কামনা করে সে, তখন মীনা নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছে বিছানায়। একই কামনা বুঝি তারও। সেও বুঝি চায় এক বলিষ্ঠ হাতের বেষ্টনীর মধ্যে ধরা পড়তে। আশ্রয় নিতে এক লোমশ বুকের নিরাপদ আশ্রয়ে।

চা নিয়ে এলেন বৌদি দুজনের জন্যেই। মিলিয়ে গিয়েছে মুখের হাসি। বিয়ের আগে যে চোখ দুটো কৌতুকে ঝলমল করত, সে চোখ বুঝি বেদনায় ম্লান।

কিন্তু কেন? বৌদির মুখের হাসি গেল কোথায়? আগের চেয়ে দামী কাপড় ব্লাউজ উঠেছে গায়ে। যে মুখ ছিল তেল আর ঘামের সংমিশ্রণে ভরা, এখন তা স্নো পাউডারের স্পর্শে উজ্জ্বল। শ্বেত শঙ্খের শাঁখার বদলে দু' হাতেই সোনালী চুড়ির ঠুন ঠুন শব্দ। দারিদ্র্যের কাশবন থেকে সম্পদের কমলবনের পদ্মগন্ধ কেন বৌদিকে উজ্জীবিত করতে পারল না! কেন খুশী হ'ল না সবাই, মীনার উপায় ক'রে আনা একগোছা নোটের বাড়তি আনুকূল্য সত্ত্বেও।

সংসারটা সচ্ছলতায় ভরে উঠলেও ফাঁক রয়ে গেল বুঝি মানস রাজ্যে। তাই সবার আগে বিদ্রোহ করলেন বৌদিই। ফেটে পড়লেন যেন চাপা আক্রোশের কারাগার থেকে।

—পারব না আমি রাজ্যের লোকের ঘানি টানতে! চাকরী করিনে ব'লে কি আমি মানুষ নই? দাম নেই আমার জীবনের? আমি কি এতই ফেলনা এ সংসারে?

মাও এগিয়ে এসে ধরলেন না রান্নাঘরের হাল। হাতা খুন্তি রইল প'ড়ে। যেন ধর্মঘট করছে বাড়ীসুদ্ধ সবাই।

যে কদিন বৌ হয়ে ছিল মীনা, বৌদি শত কাজের মধ্যেও ছিলেন আনন্দে উচ্ছল। আদর যত্ন আর সোহাগে অস্থির ক'রে তুলেছিলেন মীনাকে। কৌতুক আর রঙ্গরসের ঝরণা ঝরত বৌদির চলাফেরার মধ্যেও। কিন্তু এখন এমন হ'ল কেন?

জ্যোতির্ময়ই সুমুখে পেয়ে শুধাল—কি হ'ল বৌদি? শরীর খারাপ নাকি? ঠাকুর রাখব একটা?

গম্ভীর মুখ। বললেন—জানি না।

—এতগুলো লোকের অফিস তো চালাতে হবে?

—তা আমি কি জানি? সকলেই অফিসের বাবু! আমি হয়েছি তোমাদের রাঁধুনী। রাঁধুনীরও তো শরীর খারাপ হয়?

—ছিঃ বৌদি! তুমি হলে এ বাড়ীর গৃহিণী। তুমিই তো সব! তুমি যে ভাবে চালাবে, সংসার চলবে সেই ভাবে। তাই তো বলছি রাঁধুনী···

—না—না—না, বৌদি রাগে ক্ষোভে দুঃখে ছুটে বেরিয়ে যান ঘর থেকে।

মীনা চাকরি ছেড়ে ঘরের বৌ হয়ে সঙ্গিনী হয়েছে বৌদির। বিয়ের আগে যেমনটি চেয়েছিলেন তেমনটি পেয়েছেন মীনাকে। মীনা চাকরি করার সময় যে খাটুনি খাটতেন বৌদি, ঠিক ততখানিই খাটেন এখনও। কিন্তু যেন অন্য মানুষ বৌদি। সেই হাসিখুশী—রঙ্গরসে ভরা। ঠাট্টা আর যে রসিকতা ভুলে গিয়েছিলেন বৌদি মীনা চাকরি করার সময়, তা যেন মনে পড়েছে আবার।

মীনার চাকরির এতগুলো টাকা কমে গেল সংসারের আয় থেকে, তার জন্য বৌদির দুঃখ নেই বিন্দুমাত্র। সে সে কথা কেউ তুললে এড়িয়ে যান বৌদি। এখন বৌদি বেজায় সুখী। সুখী শুধু মীনাকে তার পাশে তারই মত একজন হিসাবে পেয়ে।
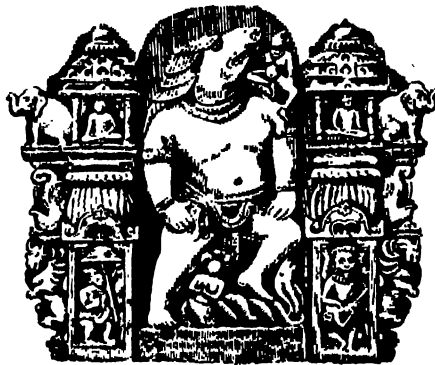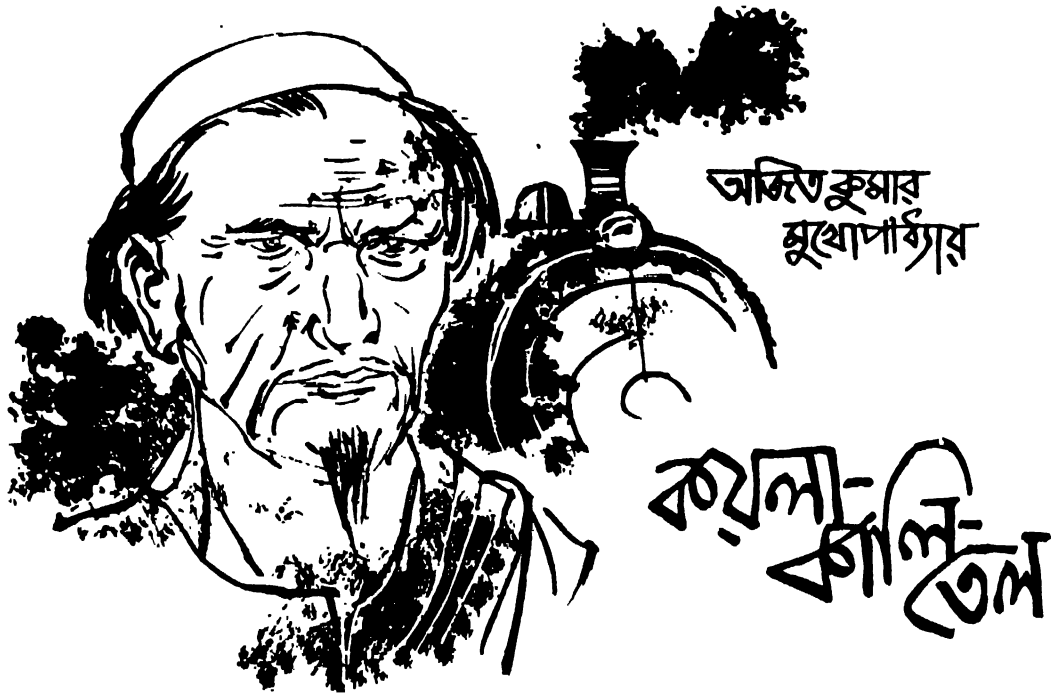
আমাকে ফায়ারিং শেখাবে চাচা ?

একটা পিনের মাথায় হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে দেখছিল ড্রাইভার খালেক চৌধুরী। ঠোকা বন্ধ ক'রে আমার দিকে তাকাল। তার পর হঠাৎ বাঁ হাত আমার কাঁধে রেখে বললে, জরুর বেটা, যো আমাকে চাচা বলে ডাকিয়েসে—সে ত আমার বেটার মাফিক হইয়ে গেলো। হেড মিস্ত্রীকে ডেকে বললে, আরে ওস্তাদজী, লিখাপড়াওয়ালা আদমির দস্তুর আলাগ হ্যায়। আমাকে খোঁকাবাবু চাচা বলে ডাকিয়েসে আর বোলে কাম শিখাতে হোবে।

তার পর বললে, ঠিক হ্যায় বেটা, কালসে হামারা সাথ লাইন পর চলেগা।

অথচ এই খালেক চৌধুরীকে আগে কি ভয়ই না করতাম। তখন সবে মাত্র লোকোশেডে চাকরি পেয়েছি। আম গাছের ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশে রং-করা একটি মাল গাড়ীতে লোকো অফিস। অফিসের গেট থেকে দু'দিকে ইটের কেয়ারি করা ইঞ্জিনের ছাই আর ঝামার টুকরো দিয়ে তৈরী এক ফালি রাস্তা ওয়াটার-কলামের কাছ বরাবর গিয়ে শেষ হয়েছে। উটের মত গলা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওয়াটার-কলাম। রবারের মোটা নলটা সোজা নেমে এসেছে ইঞ্জিনের ট্যাঙ্কের মুখ পর্যন্ত। নলটার মুখ ভ'রে হড় হড় করে জল পড়ে। কণাগুলো ছিটকে বয়লারের তেল চুকচুকে গায়ে লেগে গড়িয়ে যায়। তার চেয়েও গরম ষ্টীম পাইপের ওপর প'ড়ে বিজবিজ করতে করতে বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। মাথা বাঁকা হুক দিয়ে ছাই ঝাড়া হয়। ছাইয়ের গুঁড়ো বাতাসে ওড়ে। জলন্ত কয়লার ওপর জল প'ড়ে ছ্যাক্ ক'রে শব্দ হয়। ভ্যাপ্‌সা সোঁদা গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। মুঠো-ভরা জুটের দড়ি দিয়ে খালাসীরা বয়লারের গা চর্বি দিয়ে পালিশ করে। ঘামে ছাইয়ে আর কয়লার ধুলোতে তাদের মাথার টুপি অথবা রুমাল, গায়ের জামা চবচবে হয়ে ওঠে। আঠার মত গায়ের সঙ্গে লেপটে থাকে। আর একটু উত্তরে ওয়াশ আউট্ শেড। দিনের পর দিন জল ফুটে ফুটে বয়লারে যে চুণের মত তলানি জমে তাই ধুয়ে বার ক'রে দিতে হয়। ক্যানভাস অথবা রবারের পাইপের মুখে লাগানো থাকে তামার নজেল। তার সরু মুখ দিয়ে তোড়ে জল ঢোকে বয়লারের ভেতরে। আবর্তের সৃষ্টি হয়। আর খুলে-নেওয়া ওয়াশ আউট্ প্লাগের গর্ত দিয়ে চুণ-গোলা জল

বেরিয়ে আসে। রানিংরুমের বেড়ার পাশে চুল্লী জলে। রাং গালাইয়ের কাজ হয়। কাজ হয় ঝালাইয়ের। নাট্ বল্টুর প্যাঁচ কাটা হয়। পশ্চিম দিকের কয়লা গাদায় মোটা মোটা হাতুড়ী দিয়ে কয়লা ভাঙা হয়। টেণ্ডারে কুলিরা ঝুড়ি উল্টে কয়লা ঢালে। তাদের চেহারা হয় কালি-মাখা ভূতের মত। চারিদিকে ব্যস্ততা, হৈ চৈ—যতক্ষণ অবশ্য ইঞ্জিনখানা আছে। এক সময় হঠাৎ সকলকে সচকিত ক'রে বাঁশী বাজায়। তার পর ভস্ ভস্ ক'রে ধোঁয়া আর জল আকাশে ছুঁড়তে ছুঁড়তে লোকো অফিসের পাশ দিয়ে চ'লে যায়।

সর্বপ্রথম টিণ্ডেল আমাকে সঙ্গে ক'রে শেডের মধ্যে নিয়ে এল। সঁপে দিল পুরোণ খালাসী পচার হাতে। সে আমাকে কাজ শেখাতে লাগল। ইঞ্জিনের ফুট প্লেটের দুধারে (ড্রাইভার ফায়ারম্যান যা ধ'রে দাঁড়ায়) যে হাত-রোলার আছে সেইগুলো কেমন ক'রে মেজে মেজে রূপোর মত সাদা করতে হয় দেখিয়ে দিল। জুটের দড়ি জলে ভিজিয়ে ছাই বালি আর ঝামার গুঁড়ো মাখিয়ে তাই দিয়ে রোলারের গা ঘষতে হয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হাত লাল হয়ে আঙুলের গোড়ায় ফোস্কা পড়ল। কষ্টে কান্না এল। গলার মধ্যে ঢেলার মতন আটকে গিয়ে গলা বুজে এল। যতবার মুঠোতে ছাই-মাখা জুট তুলতে যাই, চিন চিন ক'রে জ্বালা করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে কাজ থামিয়ে ব'সে রইলাম চুপ ক'রে।

এই শালা শুয়ারকা বাচ্চা—কে যেন কাকে গাল দিচ্ছে।

শালা, খালেক সাহেবের ইঞ্জিন—যদি জানতে পারে, তোর শালা বাপ চোদ্দ পুরুষের নাম ভুলিয়ে দেবে।

জীব বিশেষকে যার পিতৃস্থানীয় করা হ'ল সেই রোগা তামাটে রংএর খালাসীটি আমার বিপরীত দিকের হাত-রোলার মাজছিল। অসাবধানে পেতলের পাইপের ওপর ছাইমাখা জুট রাখার অপরাধে টিণ্ডেল তাকে গাল দিচ্ছে।

ইঞ্জিনের ফুট প্লেটে যেখানে ড্রাইভার আর তার ফায়ারম্যান দাঁড়ায় সেখানে তাকিয়ে দেখলাম। আশ্চর্য লাগল। কি পরিষ্কার ক'রে রেখেছে। পেতলের পাইপগুলো দিনের পর দিন মেজে ঘষে সোনার মত করা হয়েছে, আর কি সাজান! পেতলের খুব পাতলা চাদর কেটে ছোট-বড় নানা আকারের পদ্ম আর তারা তৈরা করা হয়েছে। সেগুলোকে জয়েন্টের মুখে নাটের সঙ্গে এঁটে দেওয়া হয়েছে। ফায়ার বক্সের ঠিক মুখের ওপর একটা পতাকা। এত হাল্কা যে একটু হাওয়াতেই দোলে। সমস্ত জায়গাটা ধুয়ে-মুছে সাফসুফ ক'রে রাখা হয়েছে। দেখছি, আর কেন জানি না মনে পড়ছে মা'র হাতে নিকোন তুলসীতলার কথা।

কৌতূহল চাপতে না পেরে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম,—আচ্ছা, ইঞ্জিনের গায়ে এত পদ্ম আর তারা কেন?

সহকর্মী বললে—পদ্মও নয় তারাও নয়—গয়না, বুঝলে?

আমার হতভম্ব ভাব দেখে সে আবার বললে,—আরে ইঞ্জিন ত আর ইঞ্জিনই নয়। সে খালেক সাহেবের বিবি। বিবিকে ড্রাইভার আদর ক'রে গয়না গড়িয়ে দিয়েছে। বিবি তার কথা মেনে চলে।

খালেক সাহেব কখন আসবেন ভাই?

এবার সহকর্মীর বিস্মিত হওয়ার পালা। লোকোশেডে প্রায় সকল কথার আগেই স্ত্রীর ভাইকে যোগ করা হয়। তাই আমার মুখে ভাই সম্বোধনে সে কিছুটা অবাক্ হ'ল। বললে, ড্রাইভার সাহেব তিনটের লোক্যাল নিয়ে যাবে। সওয়া একটায় শেডে আসবে। ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু ড্রাইভার সাহেব কখনো লেট করে না। আর তখন শেডের চেহারাই পাল্টে যাবে। ভীষণ মেজাজদার লোক কিনা? কাজ ঠিক না হ'লে কাউকে ছেড়ে কথা বলে না। হুরুলকে ত একদিন এক লাথি মেরে দিলে। ইঞ্জিনের সামনে স্মোক বক্সের ছাই ছিল। হুরুলের ডিউটি ছিল ধুয়ে দেবার। সে ভুলে যায়, আর সেই ছাই উড়ে এসে ফায়ারম্যান হামিদের চোখে পড়ে।

নোতুন ছোঁড়াটা গেল কোথায় রে পচা?

কিছু বুঝবার আগেই দেখি পলকের মধ্যে যে খালাসীটি আমার সঙ্গে কথা বলছিল, বয়লারের নীচে যেখানে চাকা আর যন্ত্রে জট পাকিয়ে আছে সেখানে ঢুকে গেল। যেতে যেতে ব'লে গেল—শীগগির রোলার ঘষতে আরম্ভ কর। শালা, বাপের বেজন্মা ছেলে আসছে। এখুনি শালা গাল দেবে আর রিপোর্ট ঠুকে দেবে।

একটার পর একটা দিন চ'লে যায়। কাজ করতে গিয়ে হাত পুড়েছে। ছ্যাঁকা লেগেছে যখন-তখন। প্রথম প্রথম কষ্ট হ'ত। সহকর্মীরা বলত—দুদিনেই ঠিক হয়ে যাবে। ছ্যাঁকা লেগে এমন হবে যে, শেষে চামড়ায় আর

ঠাহর পাবে না। আ রে এই ত আমাদের কাজ। শালা জান কয়লা হয়ে যাবে—তবু নসীব খুলবে না। বছর ঘুরলে মাইনে বাড়বে আট আনা। আর যে শালারা পাখার নীচে ব'সে আরাম করে—মোটা মোটা তলব নেবে আর ফুর্তি মারবে। দুনিয়াটাই এই রকম। একটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাতের তেলোটা উল্টে দিত—যেন সব কিছুর শেষ দেখেছে।

সকাল সাতটায় কাজে আসতাম। এগারোটার ভোঁ বাজলে খাবার ছুটি। আবার একটা থেকে কাজ। গরম কালে কষ্ট হ'ত খুব। দুপুরের খাঁ খাঁ রোদ্দুরে আকাশ ঝল্‌সে যেত। ধুলো উড়ত, ঝড় বইত। বট অশ্বত্থের পিঙ্গল পাতার দিকে তাকান যেত না। শিমুলের ফুল দেখলে ফায়ার বক্সের ভেতরটার কথা মনে পড়ত। ছুটি হ'ত পাঁচটায়। ছুটির আগে সেগুন তলার কলে হাত-মুখ ধুতাম। পাতায় পাতায় তখন অস্ত-সূর্যের রক্তিমা ছড়াত। সারাদিনের ক্লান্তি নতুন ক'রে চেপে ধরত।

রাত্রে বেঘোরে ঘুমোতাম। সকালে ঘুম ভাঙলেও চোখ মেলে তাকাতে পারতাম না। মনে হ'ত, কে যেন আমাকে নির্দয় হয়ে প্রহার করেছে, সমস্ত শরীরে পাকা ফোঁড়ার টাটানি, কোন মতে টলতে টলতে পথে বেরোলে সকালের ঠাণ্ডা আমেজে শরীর জুড়িয়ে যেত। লতা ঝোপের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো পথের ধূলোয় লুটোপুটি খেত। আলোর রেখাগুলোকে আমার বোন অভিজ্ঞার আঙুলের মত মনে হ'ত।

সেদিন সকালে আটটা-পঁয়ত্রিশের গাড়ী ছেড়ে গেলে ক্যান্টিনে চা খেতে গেলাম। দু'পয়সার চা আর কুচো নিমকি বিস্কুট খাচ্ছিলাম। ঠাট্টা ইয়ার্কি হৈ-হট্টগোল সব সময় লেগে আছে। বিলাস এসে দোকানদারকে বললে, এই বৌয়ের ভাই, বোনাইয়ের জন্য ভাল ক'রে চা বানা।

দোকানদার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিল, আরে শালা, বোনকে বিয়ে দিয়েচিস নিজের কাছে রাখবি ব'লে নাকি? পাঠিয়ে দিস।

প্রথম প্রথম অস্বস্তি হ'ত খুব। পরে সয়ে গিয়েছিল। আসলে এ গাল-গালাজ নয়। এই এখানকার নির্দোষ ইয়ার্কি। এতে কেউ রাগ করে না। যে আগে সুযোগ পায় অন্যকে স্ত্রীর ভাই করতে চায়। লোহার কাজ। আগুনের কাজ। এ সব কথা বলতে হয় বৈ কি। যে পুজোর যেমন মন্তর।

চা খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। খালেক চৌধুরী এসে দাঁড়াল। বললে—খোকাবাবু একটা দরখাস লিখে দেবে?

লিখে প'ড়ে বুঝিয়ে দিতে বললে—ঠিক হইয়েসে, খুব বালো হইয়েসে। শালা ইস্টোর বাবুকে বললাম ত শালার রোয়াবি কত।

সে গাল দিচ্ছিল। আর আমি তাকে দেখছিলাম। মিশকালো গায়ের রং, লম্বা চওড়া দশাসই মানুষ। আঙুল সমেত হাতের তেলোখানাকে থাবার মত মনে হয়। চৌধুরী সৌখিন। কাঁচা দাড়ি আর চুল মেহেদী পাতার রংএ রাঙায়। সযত্নে ছাঁটা। চোখের কোলে সুর্মা। কিন্তু সবচেয়ে অবাক্ লাগল চোখের দিকে তাকিয়ে। সে দৃষ্টির সামনে দাঁড়ালে অস্বস্তি হয়। মনে হয় যেন লোকটা আমার বুকের ভেতর পর্যন্ত চালিয়ে দিচ্ছে তার দৃষ্টি। সব কিছু দেখছে তন্ন তন্ন ক'রে। চোখের দিকে তাকান যায় না বেশীক্ষণ। আপনা থেকে মাথা নুয়ে আসে।

১৯৪৭-এর সেই দুর্দিন এল। দেশ হ'ল দ্বিধাবিভক্ত। একটা ছোট ঢেউ, যা মহা সমুদ্রে একবার উঠেই মিলিয়ে যায়, আমাদের শেডে এসে লাগল। শতকরা নিরানব্বই ভাগ ড্রাইভার ফায়ারম্যান মুসলমান—সকলে স্বীকৃতি দিল পাকিস্তানে যাওয়ার। শেড প্রায় অচল হ'ল। খালেক চৌধুরী কিন্তু সাফ জবাব দিল। জোর গলায় বললে, এক রাজা যাবে ত আর এক রাজা হোবে। দেশ ভাগ রাজার কাজ আছে। হামার কাজে ভাগ না লাগাবে তো হামভি কুছ বলবে না। আমি এখানেই কাজ কোরবে।

আর আমি এসে বললাম, আমাকে ফায়ারিং শেখাবে চাচা.

স্পষ্ট মনে আছে, যেদিন প্রথম লাইনে গেলাম চৌধুরী বলেছিল—বেটা ইঞ্জিন হামারা বিবি আছে।

একটু থেমে আমার মুখের দিকে চেয়ে হেসে বলেছিল, তুমার চাচী, সমঝা বেটা—তুমার চাচী।—পরম আদরে ইঞ্জিনের গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে গাঢ় স্বরে বলেছিল, হামার বিবি হামার সাথে কভি বেইমানি কোরে না।

গার্ডের কাছ থেকে সঙ্কেত পেলেই হামিদ বাঁশী বাজাত। চৌধুরী ষ্টীম দিত খুলে। প্রথমে একটু ঝাঁকুনি, কাপলিং হুকে একটা আওয়াজ। তারপর ঘাড় থেকে শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে নেমে যাওয়ার মত একটার পর একটা কাপলিং হুকের ভেতর দিয়ে ঝাঁকুনিটা গাড়ীটার স্থবির দেহে ছড়িয়ে পড়ত। চাকাগুলো এক পাক ঘোরার পর ঝক্ ক'রে একটা শব্দ চিমনির মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসত। তার পর একটানা ঝক ঝক শব্দ তুলে সাপের মত বেরিয়ে যেত গাড়ীখানা।

পাখী পড়ানোর মত চৌধুরী আমাকে কাজ শেখাত। বলত, বেটা, এখোন একশো পঁচিশ পাউণ্ড ইষ্টিম আছে। দেখতে হোবে যেন একশোর নীচে না নামে। মগর কৈ ডর নেহি।

সময় হ'লে চোখ দিয়ে ইসারা করত। ঝড়াম ক'রে ফায়ার বক্সের দরজা খুলতাম। ঝলসে যেত চোখ-মুখ। কোন মতে অপটু হাতে দু'চার বেলচে কয়লা দিয়ে বন্ধ ক'রে দিতাম ফায়ার বক্সের দরজা। আমার দিকে চেয়ে হামিদ আর চৌধুরী হাসত। চৌধুরী বলত, কিরে বেটা, ইষ্টিম যে পড়িয়ে গেলো।

দেখতাম ষ্টীম ঘড়ির কাঁটা একশোর নীচে নেমে এসেছে। হামিদ এগিয়ে এসে ফায়ারিং করত। চৌধুরী বলত, আভ দেখো, ক্যায়সা ধুঁয়া নিকালতা হ্যায়। দেখতাম কালো থামের মত ধোঁয়া গল গল ক'রে বার হচ্ছে আর ষ্টীম ঘড়ির কাঁটা ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠছে।

চৌধুরী বলত, যোখন কোয়লা মারতে হোবে, আগে দেখো চিমনিসে ধুঁয়া নিকালতা কি নেহি। তার পর কোয়লা মারো।

আঙ্গুলে আঙ্গুল দিয়ে টোকা মেরে বলত, বাঁয়া কোনমে এক, ডাইনা কোনমে এক, মু'পর এক শাবল; ব্যস হইয়ে গেল।

বলত, সফেদ আগমে কোয়লা ডালো, লাল যাঁহা মৎ মারো।

বুঝিয়ে দিত 'একুঝষ্ট্' হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন ক'রে বাইরের হাওয়া আগুনের ফাঁক দিয়ে ঢুকে কয়লা জ্বালায়। কেমন ক'রে জল ফুটে ষ্টীম হয়। আর বলত, লোহেকে ভি জান হ্যায় বেটা; লোহেকে ভি জান হ্যায়।

আমাকে যখন তার ফায়ারম্যান ক'রে নিল, গর্ব ক'রে বললে—ইঞ্জিন হামারা বিবি, আউর ফায়ারম্যান আংরেজী বলনেওয়ালা। কোন শালাকে পরোয়া করি? যো সাহাব আসবে, হামি ফায়ারম্যানকে ভিড়িয়ে দেবে। আংরেজীমে বাৎ চিত হোবে—পাঁচ আদমি বলবে—খালেক সাহেব আংরেজী বলনেওয়ালার সাথে কাম কোরে।

অভিজ্ঞার জ্বর হয়েছিল। রেমিটেন্ট ফিভারের গতি খারাপের দিকে যেতে যেতে অভিজ্ঞার জীবনের পথে বিরাট্ জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়ে দাঁড়াল। আমার ভাই বিশু শেডে আমার ছুটির আবেদনপত্র নিয়ে গিয়েছিল সকালে আর বিকালে এল খালেক চৌধুরী।

সূর্যটা ডুবছে। গাছ-গাছালির মাথায় ঝিকিমিকি রোদে। খুটখুট ক'রে দরজার কড়া নড়ে উঠতে মা এগিয়ে গেলেন। অভিজ্ঞার পাশে ব'সে শুনলাম—বহিন্, হামি খালেক চৌধুরী, তুমার বেটার সাথে কাম করি।

আমাকে দেখে বললে, অভিজ্ঞা মায়ী কেমোন আছে রে বেটা?

কথা বলতে বলতে সে ঘরে ঢুকল। অভিজ্ঞাকে দেখে মাকে বললে—কোন ডর নাই বহিন্। বেটি তুমার আরাম হয়ে যাবে।

মা কিছু বলেন নি শুধু কেঁদেছিলেন। মাকে কোনদিন এত কাঁদতে দেখি নি।

চৌধুরী গিয়ে পীরের দরগায় সিন্নি মেনেছিল। আর অভিজ্ঞাও বেঁচে গিয়েছিল। তার পর থেকে খালেক চৌধুরী অভিজ্ঞার খেলাঘরের কাদার পায়েসের লোভে বহুদিন আমাদের বাড়ীতে এসেছে।

শেডে কত দেশের লোকই না কাজ করে। তারা ছুটি নেয়। বৌ-ছেলেমেয়ে আনতে যায় অথবা রেখে আসে। এ ছাড়াও পুজো পার্বণ আছে; সকলেই যায়। যায় না কেবল খালেক চৌধুরী।

একদিন বলেছিলাম, আচ্ছা চাচা, তুমি কখনো দেশে যাও না?

আমার প্রশ্ন শেষ হবার আগেই প্রবলভাবে সে বলেছিল, না-না-না।

সব ছিল তার। বৌ-ছেলেমেয়ে। বসন্ত রোগে বৌ-মেয়ে দুইই গেল। বুকে ক'রে ছেলেকে মানুষ করল চৌধুরী। একাধারে বাবা এবং মা হয়ে। ছেলে পুলিশ-সুপার হয়ে বাবার ড্রাইভারের কাজে অসম্মতি জানালে। বাপ বললে, এহি কামকা পয়সা দেকে তুমকো লিখাপড়া শিখলায়া। মৎ ভুলো।

নিজের সম্মান বাঁচাতে যেদিন ছেলে তাকে চাকর ব'লে পরিয়ে দিয়েছিল, সেদিন থেকে চৌধুরী আর ছেলের মুখ দেখে নি।

ও মেরা নৌকর হ্যায়। এইটুকুই শুনেছিল চৌধুরী। তার ছেলে বন্ধুকে বলছিল।

বিমূঢ় হয়ে ব'সে ছিলাম। চৌধুরী বলছিল, আদমি লিখাপড়া শিখে ভি জানবর হয়। নিজের খুনকো ভি পসন্তা নেহি। কেয়া মালুম—তু ভি এক রোজ বড়া অফসর বনকে হামকো বোলেগা—এই উল্লু তুম কোই কামকা নেহি।

আর্তনাদের মত চীৎকার ক'রে উঠেছিলাম। না, না, চাচা, আমি বড় হব না। আমি বেইমানি করব না।

হা হা ক'রে হেসে উঠে চৌধুরী জবাব দিয়েছিল—না রে বেটা, বড়া জরুর হোতে হোবে। না হোলে ত হামারাভি বদনামি। লেকিন বেইমানি কভ্ভি না। বেইমান কো মু' দেখা ভি গোনাহ্।

সব রোগের গোড়া মারতে না পারলে শেষে ভয়ঙ্কর হয়। খালেক চৌধুরীর তীক্ষ্ণ অভিজ্ঞ চোখও আমাদের ইঞ্জিনের রোগ ধরতে পারে নি তার ভয়ঙ্কর পরিণতি হ'ল যখন আমরা·· নং ডাউন কাজ ক'রে আসছিলাম।

আগের দিন থেকে বোয়ার ঠিক মত কাজ করছিল না। কয়লাও ছিল একদম পাথুরে। আপ ট্রেন নিয়ে যাবার সময় আমার অবস্থা চরমে উঠেছিল। ঘেমে নেয়ে হাত পুড়িয়ে চোট লাগিয়েও কোন মতে ষ্টীম করতে পারি নি। পৌঁছতে দেরি হয়েছিল প্রায় আধ ঘণ্টা মত। নিকাশীপাড়া ওয়াটার কলামে জল নেবার সময় প্যাসেঞ্জার ক্ষেপে উঠল। ভদ্রলোকেরা অসভ্যের মত ব্যবহার জুড়ে দিল! একজন সরাসরি আমার সহকারী ফায়ারম্যানকে প্রশ্ন করলে - কি ভাই, ইঞ্জিন খানায় প'ড়ে গেল না কি?

মেজাজ তার ভাল ছিল না। জবাব দিল—না এখনও পড়ে নি, তবে পড়লে আপনাকে তুলতে ডাকব।

তেড়ে উঠলেন ভদ্রলোক—ইঞ্জিন দেখে নিয়ে বেরোতে পার না? শেডে ব'সে কয়লা, তেল চুরি করবে আর রাস্তায় এসে বলবে ইঞ্জিন ফেল। ভদ্রলোক দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন।

কেউ কম যায় না। সহকারী জবাব দিল—ভদ্রভাবে কথা বলুন। বাড়ী থেকে সুস্থ শরীরে বেরিয়েছেন ত। ফিরে যাবার আগে যদি প'ড়ে গিয়ে পা ভাঙেন তখন কি পা'খানা 'এগ্জামিন' না ক'রে বেরোনোর জন্যে নিজেকে দায়ী করবেন?

মৌচাকে ঢিল পড়ল যেন। হাঁ হাঁ ক'রে উঠল সবাই। মার শালাকে, জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দে। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।

অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজে কানপাতা দায় হয়ে উঠল। চৌধুরী ইঞ্জিনে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। সোজা এগিয়ে এল, যে ভদ্রলোক সবচেয়ে বেশী চেঁচাচ্ছিলেন তার কাছে গিয়ে বললে—মেরা সাথ এক ষ্টিশন চলিয়ে ইঞ্জিন পর। আপনা আঁখসে দেখ লিজিয়ে তিনো আদমিকো কেয়া হাল হুয়া। কামমে ফাঁকি—হামারা দস্তুর নেহি।

সবাই হকচকিয়ে গেল। আমরা যখন রানিংরুমে পৌঁছলাম, কেউ কারও সঙ্গে কোন কথা না ব'লে তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ ক'রে শুয়ে পড়লাম।

···নং ডাউন যখন মহেশপুর ষ্টেশনে এল, ইঞ্জিনের বোয়ার জয়েন্ট বার্স্ট করল। যেটুকু বাকী ছিল, কপালজোড়ে সেটুকুও ঘটে গেল। ওয়াটার কলামে আগুনের ছাই ঝাড়া শেষ হ'লে চৌধুরী স্মোক-বক্স খুলে ফেলল। আমি তেল দিতে লাগলাম। সহকারী টেণ্ডারে জল ভরছিল। কাজ শেষ ক'রে চৌধুরীর কাছে গেলাম। ঘেমে নেয়ে উঠেছে। রঙ-করা দাড়ির ডগা থেকে ঘাম ঝরছে টস টস ক'রে। ল্যাপিং দিয়ে যতবার নাট আঁটতে যাচ্ছে, হয় স্প্যানার যাচ্ছে ঘুরে নয় ত পাইপের মুখ যাচ্ছে বেঁকে। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। গরম সহ্য করতে না পেরে বাইরে এসে দাঁড়াচ্ছে। কালি-মাখা জুট দিয়ে কপালের ঘাম মুছে নিয়ে গামছার মত ক'রে নিংড়ে ফেলে দিচ্ছে, আর বলছে—শালা খুন পশিনা হয়ে গেল তভ্ভি শালা ঠিক হ'ল না।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আবার যায়। আমাকে এটা-ওটা করতে বলে।

পয়েণ্টসম্যান এসে বললে, মাষ্টার মশাই জিজ্ঞেস করছেন গাড়ী কখন যাবে।

যখন হবে যাবে—সাফ জবাব দিল।

ঝনাৎ করে একটা আওয়াজ উঠল। দেখি স্প্যানার ছিটকে তার কষে লেগেছে। গল গল ক'রে রক্ত বেরোচ্ছে। আমি কিছু বলবার আগেই সে হাতুড়ী দিয়ে পাগলের মত জয়েন্টের গোড়ায় আঘাত করছে আর বলছে—হারামী কি বাচ্চী—এ লে তেরী বেইমানী কি নতিজা। খালেক চৌধুরীকো বিবি বননেকো দিল হ্যায় তো বেইমানী কভি না করনা। বেইমানী, হামারা সাথ বেইমানী!

একটার পর একটা হাতুড়ীর আঘাত পড়ছিল আর আমার মনে হচ্ছিল যেন ইঞ্জিনের সমস্ত অন্তরাত্মা কাঁপছে।

চাচা কি করছ তুমি?—

চীৎকার ক'রে উঠলাম। নেমে এল সে। কালি-মাখা ঘামে ভেজা জুট দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধ'রে সে ষ্টেশনের দিকে গেল।

কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে থেকে খেয়াল হ'ল স্মোক-বক্সের দরজা খোলা। বন্ধ করতে গিয়ে চোখে পড়ল, ভাঙা জয়েন্টের মুখে উত্তাপ কমে যাওয়ায় পাইপের ভেতরকার ষ্টীম জমে জল হয়েছে। একটু একটু ক'রে জ'মে ফোঁটার আকার নিচ্ছে। স্বচ্ছ স্ফটিকের মত। সবুজের আভা। তারপর টুপ ক'রে ঝ'রে পড়ছে ছাইয়ের ওপর। ছাইগুলো দলা পাকাচ্ছে। ফোঁটা ঝরার সঙ্গে সঙ্গে কিছু ছাই উড়ছেও। আমার মনে হ'ল, অপমানে আঘাতে বিবি কাঁদছে। খালেক চৌধুরীর বিবি। স্মোক-বক্স বন্ধ করে শিশুগাছের তলায় বসলাম। আকাশটা রোদে জ্বলছিল। মনে হচ্ছিল যেন খালেক চৌধুরী বলছে—লোহেকে ভি জান হ্যায় বেটা, লোহেকে ভি জান হ্যায়।

খালেক চৌধুরীর এক দূরসম্পর্কীয় চাচা থাকতেন মুঙ্গেরে। তার মৃত্যুর খবর পেয়ে সে ছুটি নিল। আমি এই তাকে প্রথম ছুটি নিতে দেখলাম। এক মাস পরে ফিরে এসে আবার সে তার বিবিকে নিয়ে মেতে উঠল। আবার আমি আমার পুরণো ড্রাইভারের সঙ্গে কাজে বেরিয়ে স্বস্তি পেলাম। বিকেল বেলার পড়ন্ত রৌদ্রের ভেতর দিয়ে আমাদের ট্রেন যাচ্ছিল। সামনে দেখা যাচ্ছিল কালুপাড়া ষ্টেশনের লাল রঙের বিল্ডিং। রোদ চিক্‌চিক্‌ করছিল গাছের পাতায়। দেয়ালে লেগে তা বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। মরা নারকেল গাছে শকুন ব'সে ছিল একটা।

ষ্টেশনে ঢোকার আগে মোশন পার্টে কি একটা আওয়াজ হতে চৌধুরী বাঁ-হাত দিয়ে রেলার ধ'রে ঝুঁকে পড়ে দেখতে গেল নীচের দিকে। ঠিক সেই মুহূর্তে ইঞ্জিনখানা ভীষণ ভাবে দুলে উঠল। একটা একটানা ঘট্ ঘটাং ঘড়র ঘড়র ঘটাং ঘট আওয়াজ তুলে ইঞ্জিনটি থেমে গেল। কিছু ঠিক ক'রে বুঝবার আগে খালাসীর চীৎকার শুনতে পেলাম—'ড্রাইভার সাহেব গির গিয়া—গির গিয়া'। কি ক'রে সেদিন ইঞ্জিন থেকে নেমেছিলাম আজ আর মনে নেই। যখন চৌধুরীর কাছে গেলাম, দেখি, সে সম্পূর্ণ অচেতন। কানের ইঞ্চিখানেক ওপরে রগ ঘেঁষে গভীর ক্ষত, রক্ত বেরোচ্ছে। ডান হাত দুমড়ে গেছে। বাঁ পায়ের জুতো ছিটকে প'ড়ে আছে। বুড়ো আঙ্গুলটা থেঁতলে গেছে।

তিন মাস যমে মানুষে টানাটানির পর চৌধুরী ফিরল যা ছিল তার অর্দ্ধেক হয়ে। ডাক্তার সুপারিশ করেছে হাল্কা কাজ দেওয়ার জন্যে। কেমন যেন আধমরা হয়ে গেল মানুষটা।

কথায় বলে, হাকিম নড়ে ত হুকুম নড়ে না। খালেক চৌধুরীর শারীরিক বা মানসিক ভাঁটার খবরের কোন তোয়াক্কা কেউ করল না। বিভাগীয় অনুসন্ধানের তারিখ পড়ল। হোমরাচোমরা সবাই এলেন। অনেক তর্কাতর্কির পর শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হ'ল, যে জায়গায় ইঞ্জিন পড়েছে সেখানে দু' লাইনের মাঝখানে প্রয়োজনীয় ব্যবধান ছিল না। দোষটা যে সম্পূর্ণ পি. ডব্লিউ. আই.-এর এটা স্পষ্ট হ'ল। কিন্তু বিভাগীয় অধীক্ষক চৌধুরীকে বললেন—তুম ড্রাইভার নেহি হো। যো ইঞ্জিনসে গির যাতা উসকো পাক্কা ড্রাইভার বননা ঠিক হ্যায়।

দপ ক'রে জ্ব'লে উঠল চৌধুরীর চোখ—এ দৃষ্টি আমি চিনি। কিন্তু সে সামলে নিয়ে বললে, তুম নেহি বোলনা সাব। আপ বোলনা চাহিয়ে। মেরা ইজ্জত আপ দেঙ্গে ত আপকো ভি ম্যায় দুঙ্গা। মেরা কুছ কসুর নেহি। গাড়ী চালানেকো ওয়াখৎ ম্যায় লাইনকো অন্দর কুছ নেহি দেখ সকতা। হামারা কুছ হোগা ত পহেলে পি. ডব্লিউ. আই. সাবকো হোনা চাহিয়ে। দু'চোখে তার ঘৃণা উথলে উঠল।

শেডে ফিরে এসে সে লাইন ডিউটি চেয়ে নিলে। শেডের সুস্থির কাজে আর তার মন বসছে না। কিন্তু

তুম্‌ নেহি বোলনা সাব। আব বোলানা চাহিযে
মেরা ইজ্জত আপ দেঙ্গে ত আপকো ভি ম্যয় দুঙ্গা

লাইনে যাওয়া মানে ইঞ্জিনের পেছনে ট্রেন বেঁধে নিয়েই যাওয়া নয়। সে যে তার বিবিকে লোকচক্ষুর সম্মুখে বার করবে। না সাজিয়ে কি ক'রে তা সম্ভব?

আর সত্যি কি হাল হয়েছে ইঞ্জিনের। রঙের জৌলুষ নিবে গিয়েছে। এখন আর কোন আভরণ নেই। আবরণও দীর্ণ। নানা দোষ হয়েছে। পেতল সোনা হয়েছিল—আবার পেতল হয়েছে। লোহার গায়ে রূপোর রঙে মরচে ধরেছে। স্বামীর বুক থেকে ছিনিয়ে নেওয়া ধর্ষিতা রমণীর অবস্থা তার।

ট্রেন ছাড়বে এগারটায়। চৌধুরী ঘুরে ফিরে সব দেখছে। পেতলের গয়নাগুলো আবার নিজের হাতে এক এক ক'রে পরিয়ে দিচ্ছে। স্মোক-বক্সের সামনে থাকত একটা চক্র। সেটাকে লাগিয়ে দিয়ে হঠাৎ বললে—আরে. ভাইলোগ, দেখ, দেখ, নাকছাবি পহিনকে মেরা বিবিকো খুবসুরৎ দেখলাতা হায়।

আমাকে থেকে থেকে হুঁসিয়ার করছে। যেন বাপেরবাড়ী পাঠাবার আগে বিবিকে নিজের হাতে সাজিয়ে দিচ্ছে।

এমন সময় এল সেই খবর। চিঠি এসেছে। ঐ দিন থেকেই চৌধুরী এক বছরের জন্তে ডিগ্রেডেড হয়েছে! চিঠির তলায় বিভাগীয় অধীক্ষকের সই অত্যন্ত স্পষ্ট।

সব শুনে একবার তার হাতের পেশী ফুলে উঠল। শূন্যে বাড়িয়ে দিল দুই থাবার মত হাত। তার পর কিছুটা শূন্যই যেন মুঠো ভ'রে ছিঁড়ে নিল। যে ইঞ্জিনে চড়তে যাচ্ছিল সেই ইঞ্জিনের দিকে একবার শুধু তাকাল। ঠোঁট দুটো তার কাঁপতে লাগল। কারও সঙ্গে কোন কথা না ব'লে সোজা চ'লে গেল নিজের কোয়ার্টারের দিকে। আমার মনে হ'ল, সমস্ত ইঞ্জিনটার অঙ্গে কে কালি ঢেলে দিয়েছে।

চৌধুরী শান্টারের ডিউটি করে। মুখে কথা নেই। যন্ত্রবৎ। তার দুঃখ বুঝি নি, বোঝাতেও পারব না। শুধু দেখেছি মানুষটা বদ্‌লে গেছে। কতদিন দেখতাম চৌধুরী ওয়াশআউট শেডের মাথার ওপর তার ইঞ্জিনের ঠাণ্ডা ফুট-প্লেটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে। তখন হয়ত ডিউটি নেই। ঘরের আরাম তাকে ধ'রে রাখতে পারে নি। নির্জীব লৌহপিণ্ড তার বেদনায় সাড়া দিত কি না জানি না—কিন্তু সে বিবির সঙ্গে কথা বলত বিড়বিড় ক'রে।

অন্ধকার রাত। ঘুরঘুট্টি পরিবেশ। ভোর সাড়ে চারটেয় আমার ছিল ডিউটি। বিশেষ প্রয়োজনে রাণিং-রুমে গিয়েছিলাম। ফিরে আসার সময় একটা চাপা কান্নার মত আওয়াজ শুনতে পেলাম। মনে হ'ল, মরা ইঞ্জিনটার বয়লারের গায়ে কে যেন উপুড় হয়ে আছে। হাতের টর্চ্ জ্বালতেই দেখি খালেক চৌধুরী। 'চাচা' ব'লে ডাকলাম। সাড়া দিল না। তার কাছে গিয়ে পিঠে হাত রাখলাম। এবারও সে মুখ তুলল না। ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর বলছে—নেহি, নেহি, এ বিচার ঠিক নেহি। মেরা কুছ কসুর নেহি। কিন্তু এ অভিযোগের উত্তর কে দেবে। সকলে যখন অপমান আর আঘাত দিয়েছে তখন সে ছুটে এসেছে তার বিবির কাছে। বিচারের জন্তে নয়—একটু ভাগ দিতে ব্যথার। একটু বুঝি স্নেহ পেতে।

শীতের রাত ভোর হয়ে আসছে। পাতার শিশির টুপ ক'রে বয়লারের গায়ে প'ড়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। হয়ত বা গড়িয়ে গিয়ে ঠেকছে চৌধুরীর রোমশ বুকে। বিবির হাতের ঠাণ্ডা ছোঁয়া, চোখের জলে জ্বালা বুঝি জুড়িয়ে যাচ্ছে। শেডের কিছু দূরে ক্ষেতে পাকা ধানে বাতাস বইল। সমস্ত শরীর হি হি ক'রে কাঁপতে লাগল। আবার টর্চ্ জ্বেলে চৌধুরীকে দেখলাম। সে এতটুকু বিচলিত হয় নি। তেমনি ক'রে উপুড় হয়ে দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরার ভঙ্গিতে বয়লারের গায়ে শুয়ে আছে। মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে উঠছে আর বলছে - নেহি, নেহি।

কিছু না ব'লে চ'লে এলাম। থাক্, ও ওখানেই থাক্। কেঁদে যদি বুক হাল্কা হয় হোক। সারাদিন কাজ করে মুখ বুঁজে। আমাকে পর্যন্ত দেখলে হাসে না আর। পাগল এখনও হয় নি। তাই দিনের আলোয় বিবিকে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে পারে না। লজ্জা আছে—আছে অপবাদের ভয়। সর্বোপরি আইন। শেডে যা খুশি তা ত আর করা যায় না? তাই রাতের অন্ধকারে সোজা এসেছে ইঞ্জিনের কাছে, যাকে সে শুধু লৌহপিণ্ড মনে করে নি। রক্ত-মাংসের তৈরী কোন মানবীর মত দেখেছে, ভালবেসেছে সেই নিষ্ঠায়।

ভাবছিলাম। মনে পড়ল মিশর দেশের সুখী রাজপুত্রের সীসের তৈরি মূর্তির হৃদয় সোয়ালো পাখীর মুখে অন্তের দুঃখের কথায় ফেটে গিয়েছিল। কাল সকালে যদি দেখি…নং ইঞ্জিনের বয়লার ফেটে দু'ভাগ হয়েছে, আমি আশ্চর্য্য হব না।

বুঝি সম্বিৎ হারিয়েছিলাম। রাত ডিউটির শান্টার বললে—কি হে, হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে কেন? সময় হয়ে গেল যে। চেতনা ফিরে এল। পূবের আকাশ নিভু আগুনের রঙে লাল হচ্ছে। একটু পরেই আমার ট্রেন ছাড়বে।

তিন দিনের জ্বরে শিবুর বৌটি মারা গেল।

দিনরাত্রি বৌটা ঝগড়া করত। মারা যেতে শিবু ঝগড়া, অশান্তির হাত থেকে বাঁচল বটে, কিন্তু আর একদিক্ দিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ল।

গুটি-চারেক ছেলেমেয়ে। সবাই ছোট। কেই বা তাদের দেখে-শোনে, কেই বা দুটো রেঁধে দেয়।

শিবু রেলের খালাসী।

কাজ যে খুব বেশী তা নয়। কিন্তু দায়িত্ব অনেক। হামেহাল হাজির থাকিতে হয়। অধিকন্তু বেগার আছে। সকাল-বিকাল ইন্দারা থেকে রেল-বাবুদের স্নানাহারের জল তুলে দিতে হয়। এই অবস্থায় কখনই বা রাঁধে, কখনই বা বাচ্চা-কাচ্চাদের দেখে!

শিবু মহা বিব্রত হয়ে পড়ল। দিন দিন সে শুকিয়ে যেতে লাগল। মেজাজ খিটখিটে। কাজে ঢিল পড়তে লাগল। যখনই সময় পায়, মালের বস্তার আড়ালে ব'সে দুই হাঁটুতে মুখ গুঁজে ভাবে। কি যে ভাবে তা সেও জানে না।

বন্ধুরা বললে, হাত দেখিয়ে আসবি চল্।

—কোথায়?

— বুড়ো বটতলায় একজন বসে, খাসা হাত দেখে।

সেইখানেই গেল শিবু। বুড়ো বটতলায় চট পেতে, সামনে দু'খানা বনমানুষের হাড়, শিকড়-জড়ি, একটা ছক এবং আরও কি কি সাজিয়ে ব'সে থাকে। যেতে-আসতে শিবু অনেকদিন তাকে দেখেছে। কিন্তু হাত দেখানর কথা কোনদিন মনে হয় নি। দাম্পত্যকলহ সত্ত্বেও তখন তার জীবনের রথ গড়গড়িয়ে চলছিল। সে অবস্থায় মনে হবার কথাও নয়। মানুষ বিব্রত হয়ে যখন চর্মচক্ষে আর কূল-কিনারা দেখতে পায় না, তখনই জ্যোতিষীর শরণ নেয়।

জ্যোতিষীও সে কথা জানে।

শিবুকে দেখেই বললে, সময় খুব খারাপ যাচ্ছে। বিশেষ সাবধানে থাকবে। আরও বিপদ্ আসতে পারে।

শিবুর মুখ শুকিয়ে গেল।

শনি এবং মঙ্গল দুইই কঠিন দেবতা। দুই কোণ থেকে উভয়ের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ওর উপর পড়েছে। একথা শুনলে মুখ শুকোবে না, এমন সাহসী মানুষ বাংলা দেশে ক'জন আছে?

মুখ শুকিয়ে শিবু স্টেশনে ফিরল।

কাজে মন বসে না। তবু কাজ না ক'রেও ত উপায় নেই?

বাড়ীতে দিনরাত ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কুরুক্ষেত্র চলছে:

বড় ছেলেটি মেজ'র মাথায় এমন ইট ছুঁড়েছে যে রক্তগঙ্গা। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হয়েছিল। তিনি ঔষধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছেন। তাই নিয়েই সে দিগ্বিজয় ক'রে বেড়াচ্ছে। ছোট মেয়েটা রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে। এই অবস্থায় কোন বাপেরই কাজে মন বসে না। তবু বসাতে হয়। কাজ না করলে খাবে কি? তাতে ছেলেমেয়েগুলো গাড়ি চাপাই পড়ুক, আর নিজেরা লাঠালাঠি ক'রে মারা পড়ুক।

এই কথা ভাবতে ভাবতে শিবু চলছিল ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যালে বাতি লাগাতে। নিজের ভাগ্যের কথা।

বৌটা বেঁচে থাকতে ছিল জ্যান্ত অশান্তি। ম'রে গিয়ে সেই অশান্তি আরও বাড়িয়েছে!

লোহার সিঁড়ি দিয়ে যখন ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যালের মাঝ বরাবর উঠেছে তখন মনে হ'ল, কারা যেন এসে সিগন্যালের নিচে দাঁড়াল। মনে হ'ল ওরই জন্যে।

পাশের ইয়ার্ডে মালগাড়ি শান্টিং করছে।

এই জংশন স্টেশনটার কাছাকাছি কয়েকটা ছোট বড় কারখানা আছে। সেজন্যে মাল আসা-যাওয়া খুবই বেশি হয়। সেজন্যে লাইনও অনেকগুলো।

শিবুকে আরও কতকগুলো সিগন্যালে আলো বাতি লাগাতে হ'ত। আগে সে ছুটতে ছুটতে চলত, লাফিয়ে লাফিয়ে মই দিয়ে উঠত। এখন পারে না। দেহের সেই চট্পটে ভাবটা নষ্ট হয়ে গেছে। আধ ঘণ্টার কাজ এখন এক ঘণ্টাতেও পারে না।

শিবু মালগাড়ির শান্টিং একবার অপাঙ্গে চেয়ে দেখলে। তার পর বাতি লাগিয়ে নামতে লাগল।

লোকগুলো তার জন্যেই অপেক্ষা করছে সত্যি। একজন বাদে আর সবাই তার অপরিচিত। যাকে পরিচিত মনে হ'ল, সেও মুখ-চেনা মাত্র। নাম জানে না, প্লাটফর্মে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে।

সেই লোকটা তার সঙ্গীদের বললে, এই হ'ল শিবু। ইয়ার্ডের মালিক বললেই চলে।

এরকম একটা সম্মানজনক পরিচয়ে শিবু হকচকিয়ে গেল। সে সামান্য একজন খালাসী। সন্ধ্যার মুখে ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যালের নিচে কোনদিন মালিক ব'নে যেতে পারে, এ সে জীবনে কখনও কল্পনাও করে নি।

উত্তরে কি বলবে ভেবে পেলে না।

লোকগুলি বললে, বসুন শিববাবু, আপনার সঙ্গে কিছু জরুরী কথা আছে।

শিবু কি স্বপ্ন দেখছে? তাকে কেউ কোনদিন শিববাবু ব'লে ডাকে নি।

বললে, আমার বসবার সময় নেই মশাই। অনেক কাজ আছে।

লোকগুলো হা হা ক'রে হেসে উঠল: কত টাকার কাজ আছে শিববাবু? আমরা এক বছরের মাইনে গুণে দিচ্ছি, লেন না?

কথার ভঙ্গিতে লোকটিকে বাঙ্গালী ব'লে মনে হ'ল না।

এবং কথাটাকে একটা উচ্চাঙ্গের রসিকতা ব'লে গ্রহণ ক'রে শিবু বললে, সে আরেক দিন গুণে নোব মশাই। আজ যাই, সত্যি অনেক কাজ আছে।

লোকটির প্রকাণ্ড গোঁফের ফাঁকে দু'পাটি ধারাল দাঁত ঝক্ঝক্ ক'রে উঠল।

পকেট থেকে এক তাড়া নোট বের ক'রে বললে, বেশ ত মশাই, কাজ আছে কাজে যান। লেকিন নোটগুলো পকেটে রেখে দিন। পাঁচ-শো আছে। বাড়ি গিয়ে গুণে নেবেন।

পাঁচ-শো টাকার নোট শিবুর চোখের সামনে নাচতে লাগল।

না, এটা রসিকতা নয়।

বেশ ত মশাই কাজ আছে কাজে যান। লেকিন নোটগুলো পকেটে রেখে দিন।

শিবুর মাথা ঝিমঝিম ক'রে উঠল।

সেইখানে লাইনের উপর ব'সে প'ড়ে শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার বলুন তো?

—ব্যাপার আর কি! মা লক্ষ্মী আসছেন, তাঁকে হাত বাড়িয়ে নিয়ে লেন। আর কি ব্যাপার?

শিবু বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা কি। এর আগে যে ছিল রেল-গুদামের খালাসী, সে লাল হয়ে গেছে। আর চাকরি করে না। মুলুক চ'লে গেছে। গোপন খবরে প্রকাশ, সেখানে জিমদারী কিনে রাজার হালে আছে।

তার জায়গায় কাজ করছে শিবু আজ কয়েক মাস থেকে। সেই সুবাদে তার কাছে এদের আগমন। সেই সুবাদে শিবু আজ শিববাবু।

প্রকাণ্ড বড় প্রলোভন। কিন্তু ভয়ে তার হাত-পা কাঁপছে। গলা শুকিয়ে গেছে।

তার ডান চোখের সামনে পাঁচশো টাকার নোট। কিন্তু বাঁ চোখের সামনে শনি ও মঙ্গলের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি যে বুকের ভিতর পর্যন্ত পুড়িয়ে দিচ্ছে। কানে বাজছে জ্যোতিষীর কথা: সামনে আরও বিপদ্ আসছে। সাবধান!

বিপদ্ ত আসতেই পারে। যে রাস্তা দিয়ে মা লক্ষ্মী আসেন, সেই রাস্তা দিয়েই আসে বিপদ্।

শিবু হাতজোড় ক'রে বললে, মাফ করতে হবে। আমি পারব না।

লোকগুলো সাহস দিলে: ভয় কিসের? কুছু ভয় নেই। এ শেকল অনেক দূর পর্যন্ত গেছে।

কিন্তু শিবুর তাতেও সাহস এল না।

সে হাত জোড় ক'রে নমস্কার জানিয়ে ছুটল কাজে। পিছনের লোকগুলোর অট্টহাসি অনেক দূর থেকেও শুনতে পেলে।

আর একটি খালাসীর পদ খালি হ'ল।

অনেকদিন থেকে শিবুর এক ভাগনে ধরেছে তার একটা চাকরির জন্যে। এতদিন সুযোগ পায় নি। এখন মনে হ'ল, স্টোরবাবুকে ধরলে হয়।

শিবুর উৎসাহ আরও বাড়ল এইজন্যে যে, ভাগনের বৌ আছে। তাকে আনতে পারলে শিবুর ছেলেগুলোর একটা হিল্লে হয়। সে নিজেও দুটো রাঁধা-ভাত পায়।

স্টোরবাবু তাকে স্নেহ করেন। সুতরাং চেপে ধরলে ভাগনের চাকরিটা হয়ে গেলেও যেতে পারে।

এক সময়, যখন স্টোরবাবুর মেজাজটা বেশ ভাল মনে হ'ল, তাঁকে গিয়ে ধরলে। বেশ চেপেই ধরলে। নিজের দুঃখের কথা সবিস্তারে বললে। ভাগনে এলে তার কি সুবিধা হয় তাও বুঝিয়ে বললে।

কিন্তু হ'ল না।

স্টোরবাবু জানালেন, লোক ঠিক হয়ে গেছে। সে কাল এসে কাজে যোগ দেবে। আরও আগে বললে হ'ত। এখন আর কোন উপায় নেই।

কি আর করা যায়? তার সময় যে খারাপ যাচ্ছে এবং আরও যাবে, তা ত জ্যোতিষী ব'লেই দিয়েছে।

শিবু ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে আসছিল। স্টোরবাবু আবার ডাকলেন। বললেন, দেখ তোমার শরীর ভাল নয়, মনও ভাল নয়। রেঁধে-বেড়ে খেতে হয়। বাচ্চা-কাচ্চাদেরও দেখাশোনা করা দরকার। তোমার কাজ কিছু হাল্কা ক'রে দিলে কেমন হয়?

বিগলিত-হৃদয়ে শিবু হাত জোড় ক'রে বললে, খুব ভাল হয় বাবু। আমি আর পারছি নি।

শিবুর কাজ অনেক কমে গেল। স্টোরের কাজ রইল না। সে জায়গার ভার নিলে নতুন খালাসী রামরতন। স্টোরের বাইরে টুকিটাকি কাজগুলো শুধু শিবুর উপর রইল।

শিবু খুশী।

বয়স তার বেশি নয়। কিন্তু স্ত্রীবিয়োগের পর যেন বুড়িয়ে গেছে। খাটতে আর ভালও লাগে না। পারেও না।

শিবু মহাখুশী।

এখন সে বিশ্রাম পাচ্ছে। অবসর পাচ্ছে ছেলেমেয়েগুলোকে দেখবার, রান্না-বাড়া করবার। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এদিক্-ওদিক্ একটু ঘুরেও বেড়ায়।

শনি এবং মঙ্গল। দুটোই প্রবল গ্রহ। শিবু খুশী যে সে অতগুলো টাকার প্রলোভন সম্বরণ করতে পেরেছে। নির্ঘাৎ বিপদ্ আসত। গ্রহ বিরূপ থাকলে থানা-পুলিস-জেল-হাজত সবই হ'তে পারত।

শিবুর মনে কোন ক্ষোভ নেই। সে মনের আনন্দে আছে।

হঠাৎ একদিন চোখে পড়ল, তার মুখচেনা সেই লোকটি, যে সিগন্যালের নিচে অন্য লোকগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, সেই লোকটি ঘুরে বেড়াচ্ছে রামরতনের সঙ্গে। চক্ষের পলকে সেই সন্ধ্যার ঘটনা তার মনে পড়ল। রামরতন এখন তার জায়গায়, স্টোরে। বিচিত্র নয়, ওরা এখন একে পাকড়াও করার তালে রয়েছে।

কে জানে হয়ত পাকড়াও ক'রে ফেলেছে। বোধ হচ্ছে গলায় গলায় ভাব জমে গেছে। রামরতনের মত আনকোরা নতুন লোকের পক্ষে পাঁচশো টাকার প্রলোভন সম্বরণ করা সহজ নয়। সামনে শনি-মঙ্গল না থাকলে তার পক্ষেও সম্বরণ করা সহজ হ'ত না।

যাই হোক, সে পেরেছে, কিন্তু রামরতন পারবে না, এ বিষয়ে সে নিশ্চিত।

একদিন রামরতনকে নিরিবিলি পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কি রামরতন, কাজ কি রকম লাগছে?

রামরতনের মুখে সকল সময় খুশির ভাব। বললে, ভালই লাগছে!

—কিন্তু যে লোকটির সঙ্গে ঘুরছ, ও বড় সুবিধের লোক নয়। সাবধান হয়ে চ'লো।

রামরতন চমকে উঠল: তুমি ওকে জান?

—বিলক্ষণ জানি।

—হুঁ।

রামরতন আর বসল না। উঠে চ'লে গেল।

শিবু মনে মনে হাসল : বেটা মরবে একদিন। টোপ গিলেছে স্পষ্ট বোঝা গেল। কিন্তু টোপের ভিতর যে বঁড়শী থাকে, সে এখনও টের পায় নি। পাঁচশো টাকা হাত বাড়িয়ে নেওয়া যত সহজ, হজম করা তত সহজ নয়।

দূরে রামরতন শিস্ দিতে দিতে চলেছে শোনা গেল। দাও বাবা, যতদিন না ধরা পড়ছ ততদিন শিস্ দাও। যেদিন ধরা পড়বে সেদিন টের পাবে।

শিবুও শিস্ দিতে দিতে অন্য দিকে চ'লে গেল।

এক লাইনেই দু'জনের বাসা। শিবুর আর রামরতনের।

একদিন শিবুর মেয়ে বললে, জান বাবা, রামরতন কাকার বৌ একটা সোনার হার পেয়েছে।

—কোথেকে পেল রে?

—ওর কে এক মাসী দিয়ে গেছে।

শিবু ফিক্ ক'রে হেসে ফেললে, জানি সে মাসীকে। ইয়া বড় বড় গোঁফ?

—যাঃ! মাসীর আবার গোঁফ থাকে নাকি?

—থাকে। ভাল-ভাল মাসীদের থাকে। তার ফাঁক দিয়ে ঝকঝকে দাঁত বের ক'রে হাসে।

—যাঃ!

—হ্যাঁ রে। আমার নিজের চোখে দেখা। ইয়া বড় বড় গোঁফ।

শিবু হাসতে লাগল : মালক্ষ্মী আসছেন। লিয়ে লেন শিববাবু। হুঁ হুঁ বাবা! ঘুঘু দেখেছ ত ফাঁদ ত দেখ নি। পিছমোড়া দিয়ে বেঁধে কোমরে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যায়!

—কে টেনে নিয়ে যায়? মাসী?

—মাসী নয় মা, মাসীর ভগ্নীপতিরা। তখন বাপ বাপ ক'রে ডাক ছাড়তে হয়।

বলে আর শিবু হাসে। মনে তার কোন দুঃখ নেই।

কিন্তু হারের পর চুড়ি, চুড়ির পর বালা, রামরতনের স্ত্রীর গহনা ক্রমে বেড়েই চলেছে, মাসীর ভগ্নীপতিদের দেখা নেই। কোথায় নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে তারা?

যত দিন যায়, শিবু ততই উদ্বিগ্ন হয়। কোথায় শনি, কোথায় মঙ্গল, কোথায় বা মাসীর ভগ্নীপতিরা! কাকস্য পরিবেদনা!

মনে মনেই বললে, দিনকাল বদলে গেছে। ধর্মের কল এখন আর বাতাসে নড়ে না, ঝড় দরকার।

স্টোর তার জানা। ক'টা দিন তক্কে তক্কে থেকে সে টের পেলে, কত হাজার গ্যালন লুব্রিকেটর অয়েল আর কত হাজার গ্যালন কেরোসিন পাচার হয়ে গেল।

সবাই বলাবলি করতে লাগল, পুরাণো রেল বদলাবার জন্যে নতুন রেল এসেছিল অনেক। ইয়ার্ডে গাদা করা ছিল। আর অর্ধেক স'রে গেছে।

শিবুর বুঝতে বিলম্ব হ'ল না, এ কাদের কীর্তি।

সেই সঙ্গে আরও মনে পড়ল সেই মাসীর কথা : ভয় পাবেন না। এ শিকল অনেক দূর পর্যন্ত গেছে।

অনেক দূর পর্যন্ত যে গেছে তাতে ভুল নেই। বুঝলে, তার লোককে খালাসী পদে না নেওয়া এবং তাকেও স্টোর থেকে সরিয়ে দেওয়া, এই দূরবিস্তৃত শিকলেরই কাজ।

রোসো বাবা!

চোরের সাতদিন, সাধুর একদিন।

সেই একদিন, সেই ভয়ংকর শেষের দিন আগতপ্রায়।

শিবু লেখাপড়া জানা একটি বিশ্বস্ত লোককে দিয়ে সমস্ত কথা সবিস্তারে জানিয়ে উর্ধ্বতন মহলে এক দরখাস্ত

করলে, নিজের নাম দিয়েই করলে। সত্যি কথা লিখেছে সে। এর প্রত্যেকটি বর্ণ সে প্রমাণ করতে পারে। সুতরাং তার আর ভয় কি?

দরখাস্ত পাঠিয়ে শিবু দিন গোণে!

এক সপ্তাহ গেল, দু'সপ্তাহ গেল, মাস শেষ হতে চলল, কিন্তু দরখাস্তের ফলাফলের চিহ্ন নেই। সে ভেবেছিল, হঠাৎ একদিন ভারী বুটপরা অজস্র পুলিশ মস্‌মস্‌ ক'রে এসে স্টোরবাবু আর রামরতনের বাড়ী ঘেরাও ক'রে ফেলবে। স্টোর আর ইয়ার্ড চ'ষে ফেলবে।

কিন্তু পুলিশ দূরের কথা, একটা নীল জামা-পরা, পেটি-বাঁধা চৌকিদারেরও আবির্ভাব ঘটল না!

কি ব্যাপার! দরখাস্ত কি ডাকবিভাগের কল্যাণে যথাস্থানে পৌঁছুল না?

বিচিত্র কিছুই নয়। কত চিঠি নর্দমায় সাঁতার কাটে। কত চিঠি প্রেরক এবং প্রাপকের মৃত্যুর পনের বৎসর পরে গিয়ে পৌঁছয়! তেমনি কিছু হয় ত। নর্দমায় সাঁতার কাটছে, কিংবা সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছে।

আর একখানা দরখাস্ত করবে না কি?

আগের দরখাস্তের নকল, কিংবা আরও জোর এবং আরও প্রমাণসহ নতুন একখানা দরখাস্ত?

অথবা কি ভিতরে ভিতরে কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে, বাইরে থেকে টের পাওয়া যাচ্ছে না?

কিন্তু রোজ দেখা হচ্ছে স্টোরবাবু আর রামরতনের সঙ্গে। তাদের ত বেশ স্ফূর্তির ভাব। উদ্বেগ অথবা দুশ্চিন্তার চিহ্নমাত্র নেই।

হতে পারে খুব গোপনে কাজ চলছে। ওরাও এখনও টের পায় নি। তার পরে হুড়মুড় ক'রে আচম্বিতে একদিন আকাশ ভেঙে পড়বে ওদের মাথার উপর তখন আর হাত-পা নাড়বারও সময় পাবে না!

হুঁ হুঁ বাবা! ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ ত দেখ নি?

তার পরে সত্যি সত্যি একদিন আকাশ ভেঙে পড়ল।

কিন্তু ওদের মাথার উপর নয়; শিবুরই মাথার উপর। তার বদলীর আদেশ এল গঙ্গাপুরে।

ছেলে জিজ্ঞাসা করলে, সে কোথায় বাবা?

—ধাবধাড়া গোবিন্দপুরে। চল্‌ ত, দেখবি সন্ধ্যে হতে না হতে কোয়ার্টারের পাশে কচুবনে শেয়াল ডাকছে।

—শেয়াল!—মেয়েটা ভয়ে কুঁকড়ে গেল।

—হ্যাঁরে বাবা, কেঁদো কেঁদো শেয়াল। সারারাত শুয়ে শুয়ে ব্যাঙের ডাক শুনবি। ঘাসে ঘাসে জোঁক। রাত্রে নুনজল দিয়ে গা ধুইয়ে তবে তোদের বিছানায় শোয়াব।

—নুনজল কেন?

—জোঁকের জন্যে। নইলে সকালে উঠে দেখব বিছানা রক্তে লাল। আর তোরা হলদে হয়ে গেছিস।

—কি সর্বনাশ!

শিবু হো হো ক'রে হেসে উঠল: সর্বনাশের এখনই হয়েছে কি রে? তোদের মা-মাগী ত ম'রে বেঁচেছে, আমাকে রেখে গেল শনি আর মঙ্গলের সঙ্গে ঘর করতে।

—তারা কে বাবা?

—তা কি আমিই জানি ছাই। বড় কর্তা কেউ হবে। দেখা পেলে বলি, ভালোমানুষ পেয়ে যত বজ্জিয়াতি আমার ওপর চালালে বাবা! মরদের বাচ্চা হও ত মাসীর কাছে যাও দিকি। গাঁইতির এক ঘায়ে ভবলীলে সাঙ্গ ক'রে দেবে।

শিবু মনের আনন্দে হাসতে লাগল।

জরুরী তলব। দম ফেলবার সময় নেই। সামান্যই জিনিস অবশ্য। খানকয়েক দড়ির খাটিয়া ব্রেকে যাবে। আর গোটাকয়েক শতচ্ছিন্ন কাঁথা, আর কয়েকখানা পিতলের থালা-ঘটি-বাটি। আর একখানা ট্রাঙ্ক, খালি বললেই চলে। কাপড়-জামা কারও কিছু কি আছে?

ওর মধ্যে একখানা কাঁথা ঐতিহাসিক। বহুকাল আগে তার দিদিমা তাকে উপহার দিয়েছিল, তার নিজের হাতে তৈরি। দিদিমার প্রতি শ্রদ্ধাবশতই হোক, আর সুদীর্ঘ সহবাসজনিত মমতাতেই হোক, সেখানিকে ছাড়ে নি। যখনই ছিঁড়েছে, তখনই তার উপর একখানি ছেঁড়া কাপড় বসিয়েছে। ক্রমাগত এই প্রকার পুলটিসের ফলে সেটি গদির মতো পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে।

বৌ বলত মরণ কাঁথা। অর্থাৎ শিবুর মৃত্যুর আগে ওর ছুটি নেই।

ছেলেমেয়েরাও তা জানত। বললে, ওটাও নিয়ে যাবে বাবা?

—যাব না? কতদিনের কাঁথা?

—কিন্তু বড্ড ভারী যে?

হাত উলটে শিবু বললে, হ'লই বা, আমাদের ত আর বইতে হবে না, বইবে রেলগাড়ি। শালা রেলগাড়ি, অনেক কষ্ট দিয়েছে। ভারীতে আর দুর্গন্ধে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়বে।

সমস্ত বোঝাই ক'রে শিবু ছেলেমেয়ে নিয়ে রেলগাড়িতে উঠল। পরিচিত সহকর্মীদের অনেকে এল তাকে বিদায় দিতে, আর তাদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে।

সবশেষে এল একজন ইয়া গোঁফ!

—কি শিববাবু? চললেন শেষ পর্যন্ত!

শিবুর মনে কোন দুঃখ, কোন ক্ষোভ নেই। একগাল হেসে বললে, হ্যাঁ মশাই। আপনাদের রাজত্ব হোক, আমি শেষ পর্যন্ত চললাম।

— থাকলেই পারতেন।

বাঁশি বাজিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিলে। শিবু উত্তর দেবার অবকাশ পেলে না, ছেলেমেয়েগুলো বড় দুরন্ত। তাদের সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

—ও কে বাবা?

—ওই ত মাসা!
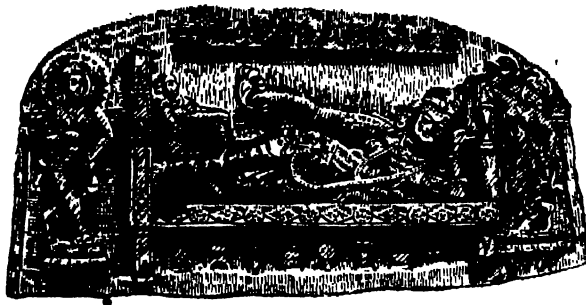
ভালবাসা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

একই জীবনে এত জীবনের—
ভালবাসা যায় পাওয়া।
এক 'খেপে' সেই বিপুল পণ্য
যায় না ক লয়ে যাওয়া।
অনেক কিছু যে পড়ে থাকে তার,
তাই তার ফিরে আসা দরকার।
চলে নিরবধি কত আহ্বান,
ডাকাডাকি পথ চাওয়া।

মধুময় করে পার্থিব রজ
ক্ষুদ্র কুটীরে রয়,
শ্রীভগবান্‌কে সে পারে আনিতে
নাহি ভয় সংশয়।
বটে ভঙ্গুর, বটে নশ্বর,
অপরাজেয় সে অবিনশ্বর,
মানুষের প্রেম অমরত্বে যে
সব তার দাবী-দাওয়া।

ধরার এ প্রেম, মাটির এ প্রেম
সত্য অপরিমেয়।
গভীর নিবিড় অফুরন্ত যে
জানিতে পাবে না কেহ।
আকাশস্পর্শী আকাঙ্ক্ষা তার—
সে যে বিস্ময় সব দেবতার,
তৃণফুলে আনে পারিজাত-বাস,
কল্পতরুর হাওয়া।

স্বর্গে মর্ত্ত্যে এক করে তার
চিরদিন আনাগোনা।
সোনা নয়, সে যে পরশ পাথর—
সব ক'রে দেয় সোনা।
'বেহুলার' মত প্রণয়ের টানে
'লখিন্দর'কে ফিরাইয়া আনে,
সে প্রেমের কাছে মরণ তো শুধু
অমৃতের হ্রদে নাওয়া।

ঘণ্টার ভাষা

শ্রীকালিদাস রায়

ঘণ্টা বাজে, মনটা কাজে লাগছে না।
ঘুমটা কারো ভাঙছে না, কেউ জাগছে না।
ঘণ্টা বাজে, একাই কণন শুনছি তাই,
একটি দু'টি করি রণন গুনছি ভাই।
ঝাঁক বেঁধে সব নিরুদ্দেশে যায় চ'লে,
ডাক দিয়ে যায় তারা আমায় আয় ব'লে।
ভাষা তাদের ভাসা ভাসা বুঝছি আর,
আসল মানে নিজের প্রাণেই বুঝছি তার।
ঘণ্টা বলে—হাতের বাকি নে সেরে।
মরীচিকার পিছন ধাওয়া দে ছেড়ে।
ঘণ্টা বলে—সকল বাঁধন কর্ ঢিলে,
গানের চরণ থাকুক পড়ে গরমিলে।

এখনো যে সরাইখানার টান ভারি,
ডাকছে শোন্ ঐ শিঙায় ফুঁয়ে কাণ্ডারী।
ঘণ্টা বলে—পাড়ের কড়ির কৈ পুঁজি,
পাবি না তা আলমারিটার বই খুঁজি।
রেখে দে তোর যুক্তি বিচার চুল চিরে।
ভুলাবি কি তাতে ঘাটের গুদ্দীরে!
ঘণ্টা বলে—কণ্ঠাগত প্রাণটা যে
লাগবে কি আর খ্যাতি খাতির মান কাজে?
যাবে না বাগ্‌বিলাস ছটা সঙ্গে তোর।
ছন্দ অলংকারের ঘটা অঙ্গে তোর।
ক্ষোভ অভিমান ফেল্ মুছে, রয় যা জমা।
সবার কাছে বিদায় নিয়ে চা' ক্ষমা।

—•—
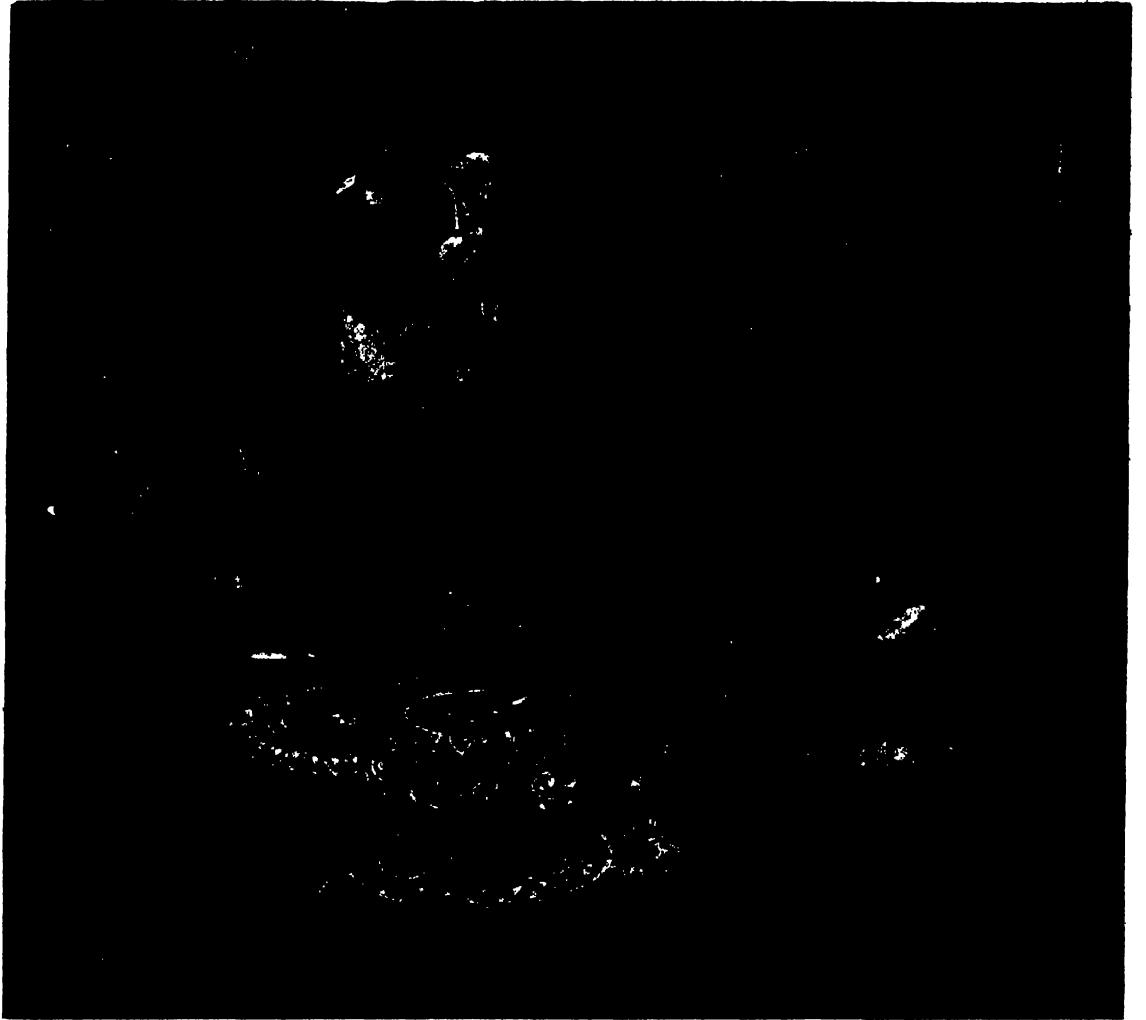
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

আলপনা

প্রভাত নিয়োগী

প্রবাসী: ১৩৩৭ অগ্রহায়ণ হইতে পুনর্মুদ্রিত

আত্মহত্যার আগে

শ্রীকৃষ্ণধন দে

শেষ কথা লিখলাম, বাজল যে সাতটা,
লিখলাম স্বেচ্ছায়, তবু কাঁপে হাতটা ;
ভাদ্রের সন্ধ্যায় টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি,
চোখে জল নেমে আসে ঝাপ্সা যে দৃষ্টি ;
এখনো হয় নি জোর রাস্তার আলোতে,
বিদ্যুৎ ঝিক্‌মিক্ আকাশের কালোতে ;
সামনের বাড়ীগুলো চেনা কত দিনকার,
আজ যেন মুছে গেছে, সাধ নেই চেন্‌বার ;
লটারির টাকা পেয়ে চৌধুরী অযুত
কিনেছে ও বাড়ীখানা, উঁচু যার গম্বুজ :
ও-সব পুরণো কথা আজ আর থাক্‌গে,
শেষ দাঁড়ি টানলাম এই কালো ভাগ্যে !

এখন নেই ক আর বাঁচবার যুক্তি
বিষটা ঢেলেছি গ্লাসে, ও-ই দেবে মুক্তি !
দেওয়ালে ঘড়িটা শুধু করে যায় টিক্‌টিক্,
মরণের লগ্নটা ঘড়িও যে জানে ঠিক !
কুসুমিকা আজ রাতে পারবে কি জানতে ?
কিবা ফল এ জীবনে তার জের টানতে !

হাসি পায়, ভালবাসা কি করে সে ভুল্‌ল,
ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গুর,—এই তার মূল্য ?
মনে পড়ে জীবনের কত উষা সন্ধ্যা,
ক্ষণিকের পথ-চাওয়া কত নিশিগন্ধা !
মনে পড়ে কেয়া, রুমা,—বান্ধবীবর্গে,
মন-গড়া স্বপ্নের ঠুন্‌কো সে স্বর্গে !

যেখানে দিয়েছি ব্যথা,—মনে আজ পড়ছে,
চোখ থেকে ধীরে ধীরে যবনিকা সরছে,
বঞ্চনা করেছি যে,—তারা সব আসছে,
কত অসহায় মুখ চারপাশে ভাসছে,
যারা এসে ফিরে গেছে দেখে দ্বার বন্ধ,
যারা ঝরে পড়ে গেছে, রেখে গেছে গন্ধ,
লাভ-ক্ষতি নিয়ে যারা সাথে ছিল নিত্য,
যাদের রেখেছি দূরে অকরুণ চিত্ত,—
তারা আজ একে একে দাঁড়ায় যে সামনে,
মন বলে : 'এইবার খেসারৎ-দাম নে' !
বিষটা ধরেছি মুখে,—এ কি কথা রাখবে ?
— মাটির পৃথিবী, তুমি এর পরও থাকবে ?

—*—

কবিকে

শ্রীবাণী রায়

তোমার ডাক আমার মনে আসে, যখন আসে ঝড়ের ডাকে,
চায়ের কাপে তুফান তোলে ; শান্ত-নীরব মন, কাঁপায় তাকে।
হাতের পাশে সাজানো যে মোটাপাতার বই—পাতার ফাঁকে
আঙুল রাখে

আমার যেই দেহ,—বিস্মৃতির ভস্ম মাখে।
উঠেপড়ে ছোটে, তোমার ডাকে ;
আমার কবি,
ভুলি আমি সবি,
দিনের আলো, গাছের পাতা, ট্রাম বা বাসের চাকা ;
আমি বসে কেবল শুনি
রাত্রিজপের মালা ;
একটি করে অক্ষমালা,
রাতের সাগা বুনি।
গভীর রাতের পথিক তুমি, তুমি আমার কবি,
যখন তখন তোমার ডাকা।

২

সন্তপ্ত সমুদ্র আমি উত্তপ্ত সাগর,
সারাদিন লেলিহান তপনের জ্বালা
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে গেলে—গোধূলির পালা
এবার নেমেছে বুকে বিরহে জর্জ্জর।
উদ্দীপ্ত যৌবন গানে জেগেছি যখন
তোমার প্রাখর্য্য যেন আরো অসহন !
নিজের সৃষ্টির দৈন্য পেয়ে তুলনায়,
জ্বলন্ত ব্যর্থতা শুধু মনের সীমায়।
তুমি যদি অস্ত গেলে নিভন্ত গৌরবে
নামলো সন্ধ্যার শান্তি দীর্ঘ পিপাসায় ;
পেলাম দু'হাতে খুঁজে অমৃত অপার
আমারি উদ্দেশে আছে গানের ছায়ায়।
তুমি কি নিদাঘ-অন্তে মারুত-প্রবাহ,
তুমি কি অনন্ত সুখ দেহমন ব্যেপে ?
তুমি কি আকাশে কবি, স্নিগ্ধ শুকতারা,
আজ তুমি নদী, কবি, এ সমুদ্রে হারা।

এ কোন্ আকাশ

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

তাপজর্জ্জর আগাছার ঝাড়
অম্লগন্ধী নিঃশ্বাস ছাড়ে।
জড়াজড়ি ক'রে জ্বলে পাতাগুলো
চোখজ্বালা-করা প্রখর রৌদ্রে।
বেড়ার গা বেয়ে এসে যে লতাটা
জড়িয়ে ধরেছে গাব গাছটাকে,
এক থোকা তার পাতার আড়ালে
টকটকে লাল পাকা তেলাকুচো,
তেলতেলে তার নিটোল দেহটি।
টক গন্ধের আভাস বাতাসে।

পাতার আড়ালে লুকোনো একটা
টকটকে লাল পাকা তেলাকুচো
পাগল করেছে বুনো পাখীটাকে।
কি হবে এখন এই পাখীটার ?

যেসব আকাশে উড়ে সে এসেছে
সেসব আকাশে বারুদ ছিল না,
ছিল না আণব বোমার ভস্ম,
ভয়াবহ যা সে বোমার চেয়েও।
সেসব আকাশ স্পন্দিত হ'ত
চিক্‌চিক্ ক'রে পাতারা জ্বললে,
রোদে-জ্বলা সেই পাতার আড়ালে
টকটকে লাল পাকা তেলাকুচো
নিভৃতে ফললে।
এ আকাশ সেই আকাশ ত নয়!

অনেক ঘুরেছে।
আকাশে আকাশে অনেক উড়েছে।
কখনো বা গান জুড়েছে, কখনো
রুদ্ধকণ্ঠে কেবল উড়েছে।
জলেতে ভিজেছে, রোদে সে পুড়েছে,
উড়ে উড়ে উড়ে ক্লান্তি মানেনি।
সে যে পাখী, সে যে আকাশের পাখী,
আকাশের কি যে মায়া সে ত জানে?

সে মায়ায় ভুলে আরো কি উড়বে ?

সব আকাশই ত স্বচ্ছ ছিল না।
নীলও ছিল না।
চাঁদ তারা আর সূর্য্য ছিল না
এমনও আকাশে উড়ে সে এসেছে।
ঝাপটেছে ডানা এমনও আকাশে
আকাশ যা নয়।
একান্ত তার নিজের ব'লেই
মনে হত যেন আকাশ সেটাও।
এ আকাশ সেই আকাশও ত নয়

এ কোন্ আকাশ, যেখানে এল সে ?

জানে না, হয়ত তবুও উড়বে।
টক গন্ধের আভাস বাতাসে।
টকটকে লাল পাকা তেলাকুচো,
তেলতেলে তার নিটোল দেহটি।
একে ঘিরে ঘিরে হয়ত ঘুরবে।

কোথা যাবে আর, এ বুনো পাখীটা ?
যেসব আকাশে উড়ে সে এসেছে,
সেসব আকাশ কোথায় মিলালো?
মিলালো যদি ত তাকে সাথে নিয়ে
কেন মিলালো না ?

সে যে আছে, তার
ডানা আছে, তার
যে ডানা কিছুতে ক্লান্তি মানে না।
নিজের আকাশে শেখা গানে তার
বুক ভ'রে আছে,
গানও সে গাইবে।
গান গেয়ে গেয়ে উড়বে, ঘুরবে।
বসবে না কারো চালের বাতায়,
ভাবনা ক'রো না।

অম্লগন্ধী আগাছার ঝাড়ে
পাতা-ঢাকা লাল পাকা তেলাকুচো
ফলে ত এখনো?
মাস্কারা-আঁকা চকিত চোখের
চাওয়ার গভীরে ভীরু মন তার
কথাটি আভাসে বলে ত এখনো?

—•—

একটি আকাশ

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

একটি আকাশ আমাকে কখনো দিয়ো,
মেঘগুলি তার হবে বুঝি পাল, ভাবনা উত্তরীয়।
সেখানে অনেক মুখের মিছিলে একটুখানিক আশা,
চন্দন আর কুমকুম সাজে গ্রহ থেকে গ্রহে ভাসা।
কারা যেন বলে যায়
তারা-চমকানো নিবিড় আকাশ অবশ মূর্চ্ছনায়।
শরতের হিম, ফাল্গুনে হাওয়া, আষাঢ়ের মেঘ কালো,
মাঝেমাঝে তার দেখি মুখ ভার। বিদ্যুৎ চমকালো।
বুক দুরু দুরু করে,
আকাশের ডাক বুঝি নেমে আসে অশান্ত অন্তরে।
খুঁজে খুঁজে শুধু যাই,
অন্ধের মতো এ-কোন্ অন্ধকারে
শুধু পথ হাতড়াই ?
বেশি কিছু আমি চাই না,
একটি আকাশ পেয়েও কেন যে পাই না।

শব

শ্রীকমলেন্দু ভট্টাচার্য্য

শুনেছি :
এখানে প্রেম আছে, আছে মন।
লক্ষ লক্ষ পদচিহ্নে জীবনের স্পন্দন

ভেবেছি :
জীবন বেঁচে উঠবে সমুজ্জ্বল হয়ে
আকাশভরা সবুজ প্রান্তরে।

কিন্তু দেখেছি :
এখানে জীবন এসেছে
শুধু আরেকটি শব হবার জন্যে।

চায়ের কাব্য

শ্রীসমরাদিত্য ঘোষ

[illegible]ম পেয়ালাখানি স্পর্শ দেয় উত্তাপ তোমার,
[illegible] রচি মধুময় চুম্বনের রেখায় রেখায়,
[illegible]রূপ মর্ত্যলোক হ'ল ম্লান বর্ণসুষমায়,
[illegible]ন হয় সিন্ধুতলে তুমি মোর নব আবিষ্কার।

রমণীর অধিকার অমৃতের বণ্টন গৌরব,
পুরুষে কৃতার্থ কর মিতবাক্ অয়ি শুচিস্মিতে,
মৃত্যুকে বরিতে পারি এ মুহূর্তে হাসিতে হাসিতে,
আমার প্রশ্বাসে আজ একাকার তোমার সৌরভ।

হয়ত এখন মাঠে অন্ধকার আরো জমকালো,
হয়ত গাছেরা শীতে অসহায় কাঁপে থর থর,
পথে কোন লোক নেই, জোনাকিরা হয়েছে তৎপর,
আমার চলার পথ মসীময়—নেই কোন আলো।

সঙ্গীহীন একা যাই, দৃষ্টি মোর স্বপ্ন-সমাকুল,
যেখানে চরণ ফেলি ফুটে ওঠে পারিজাত ফুল।

হিমেল বনভূমি

শ্রীসুনীলকুমার নন্দী

দিও না হাওয়া বৃথা হিমেল বনভূমি
জাগাও ফুলে ফুলে রক্তে অনুরাগে
লাজুক শিহরণ ; না, তুমি ফিরে যাও—
শীর্ণ প্রশাখায় ফুলের আনাগোনা
তুলবে চাপা হাসি এপাড়া ওপাড়ায়।

শূন্য কাক-ডাকা দুপুর···সন্ধ্যায়
বাদুড় পাখা নাড়ে···সময় ঝরে যায়···
নিভৃতে বসে বসে এখন দিন গোনা।
জয়ন্তী ইন্দ্রাণী সাজাতে আয়োজন
করো না···ফুলসাজ সুদূর ইতিহাস।

তবুও নিবু নিবু বাসনা শিখা মেলে
দূরের ছায়াপথে, রক্তে শরাঘাত :
অলুক দীপাবলী···না, তুমি ফিরে যাও
আলোর উৎসব, বিসর্জিত সীতা
বক্ষে তুলে কেন বাড়াও কোলাহল—
রঙের সমারোহ পার তো ঢেলে দাও
যত্নে বর্ধিত ফুল্ল শাখে শাখে
অশোক পারিজাত রঙন ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

রিক্ত হিমশাখে এখন দিন গোনা।

অভ্যুদয়-অপবর্গ

শ্রীতারকনাথ ঘোষ

অভ্যুদয় অভিহিত বাসনার স্বার্থান্ধ আঘাতে।
মহর্ষির সম্ভাবনা প্রতি পলে পরিনষ্ট হয়।
অনায়ত্ত প্রেয়-গ্রস্ত বীতভেজ মন ও হৃদয়।
সিদ্ধার্থ নিয়তবৃদ্ধ কাম—চিত্ত ধ্বস্ত এ সংঘাতে॥

অপবর্গে অপহ্নব, কৃতরোধ সংসারের ক্ষয়।
শিবের মানস মূর্তি চূর্ণীকৃত বিকীর্ণ ধলাতে।
সংবিৎ বিমূঢ়—সুপ্ত, চেতনায় ছায়াপাতী ভয়।
অভীপ্সার নিত্য লয় স্বকেন্দ্রিকী তামসী মায়াতে॥

শ্রমক্লিষ্ট ঘর্মপাতে পরিক্ষীণ আশার বীজন।
পেচক-ঘুৎকারে দীর্ণ আর্তরবা রাত্রির হতাশ।
অবচিত্ত-রসাতলে অগোচর প্রাণের অয়ন।
এ শ্মশানে শবাকীর্ণ শিবারোলে ভয়ার্ত আকাশ।
ধ্বংসরূপা যোগিনীর নৃত্যাহত মৃত্যুর নায়ক।
তমিস্রার গর্ভকোষে দুর্নিরীক্ষ্য উত্তরসাধক॥

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
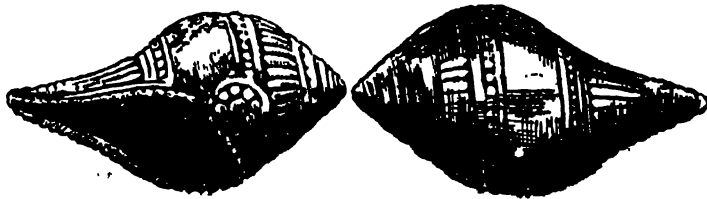
পশ্চিম বাঙ্গলার ভেষজ-শিল্পের বিষম সঙ্কট

জাল এবং ভেজাল ঔষধের যে দেশব্যাপী কারবার চলিতেছে, তাহার জন্য একমাত্র পশ্চিমবঙ্গকেই দায়ী করিয়া বোম্বাই-এ পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড ষড়যন্ত্র দানা বাঁধিয়াছে। বোম্বাই-এর নূতন শ্লোগান—"একমাত্র মহারাষ্ট্রের ঔষধ ক্রয় কর—" অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের প্রস্তুত ঔষধাদি বয়কট করিয়া ঐ রাজ্যের ভেষজ-শিল্পকে হত্যা কর, এবং এই পুণ্যকর্ম্ম সাধন করিতে পারিলে সমগ্র ভারতে একমাত্র মহারাষ্ট্রের প্রস্তুত জাল-ভেজাল ঔষধাদি চালানো সহজসাধ্য হইবে! মহারাষ্ট্রের সরকারী, বেসরকারী এবং অন্যান্য বহু দায়িত্বশীল এবং সমাজ-জীবনের উচ্চস্তরের ব্যক্তিরা আজ পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে উগ্র একটা সর্ব্বব্যাপী জেহাদ ঘোষণা করিয়া একজোটে এবং তারস্বরে বলিতেছেন যে—"যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের প্রস্তুত 'সকল' ঔষধাদিই ভেজাল, অতএব ঐ সব দ্রব্য বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র মহারাষ্ট্রের প্রস্তুত ঔষধ সকলে ক্রয় করুন!" এ-বিষয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশ (১০-৮-৬২):

"মহারাষ্ট্রের ড্রাগ ইনস্পেক্টররা অনেক জায়গায় বাঙ্গলা দেশের কোন ঔষধ না কেনার জন্য মৌখিক নির্দ্দেশ দিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। এমন কি মহারাষ্ট্র সরকারের ড্রাগ কন্ট্রোলার গত ২রা আগস্ট ভারতীয় চিকিৎসক সমিতির বোম্বাই শাখার সভায় বলিয়াছেন, সকলে যেন মহারাষ্ট্রে তৈরি ঔষধ কেনেন ও রোগীদের দেন। কারণ, এ রাজ্যেই 'ড্রাগ আইন' অত্যন্ত কঠোরভাবে মানা হয়। ঐ ড্রাগ কন্ট্রোলারের গত কয়েক বৎসরের রিপোর্ট কিন্তু অন্য কথা বলে। রিপোর্ট পড়িলে বুঝা যায়, মহারাষ্ট্র ভেজাল ঔষধ তৈরির ব্যাপারে কম নয়। গত পাঁচ বৎসরে সেখানে প্রস্তুত অন্তত ৩ হাজার ঔষধের নমুনা নিম্নমানের বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে। ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগে উপযুক্ত সংখ্যক কর্ম্মী ও ব্যবস্থাদি না থাকার দরুণ ভেজাল ঔষধের ফলাও কারবার সেখানে চলিতেছে।"

কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? মহারাষ্ট্রের অধিবাসীরা মহারাষ্ট্রে প্রস্তুত ভেজাল ঔষধ সেবন করিলে কোন দোষ বা ক্ষতি নাই, কারণ মহারাষ্ট্র-মার্কা ঔষধ—'খাঁটি' ভেজাল, ইহাতে কোন ফাঁকি নাই। আর ঔষধ সেবনে যদি মৃত্যুই হয়, তাহা হইলে সে মৃত্যু বাঙ্গলার প্রস্তুত ঔষধে কেন হইবে? বর্গী-বীরেরা ভেতো বাঙ্গালীর ঔষধ সেবনে কেন প্রাণত্যাগ করিবে?

হঠাৎ পশ্চিম বাঙ্গলার প্রতি এ মনোভাব কেন—তাহাও পাঠকের জানা দরকার। মহারাষ্ট্রের ব্যথা-বেদনার উৎস কি এবং কোথায়? সন্ধান এইখানেই মিলিবে:

"ড্রাগ কন্ট্রোলার শ্রীরঙ্গনেকার তাঁহার বক্তৃতায় বাঙ্গলা দেশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ না করিলেও পরোক্ষভাবে কলিকাতার বিরুদ্ধেই কটাক্ষ করিয়াছেন। কারণ মহারাষ্ট্রের পর ভেষজশিল্পে পশ্চিমবঙ্গেরই স্থান। কঠিন প্রতিযোগিতার মধ্যেও মান ও উৎকর্ষের জন্য খোদ বোম্বাই শহরে বাঙ্গলা দেশের ঔষধ বহুল-প্রচলিত। কয়েকটি অখ্যাত প্রতিষ্ঠানের তৈরি নিম্নমানের ঔষধকে কেন্দ্র করিয়া সামগ্রিকভাবে বাঙ্গলা দেশের ভেষজ-শিল্পের উপর দুর্নাম চাপাইবার পিছনে তাই প্রাদেশিকতার উস্কানি আছে বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন।"

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি ভেষজ-প্রতিষ্ঠান বলিয়াছেন, অখ্যাত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের দুষ্কর্ম্মের জন্য কলিকাতার সব প্রতিষ্ঠানকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। অথচ বোম্বাই তাহাই করিতেছে।

তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে এই অভিযোগও করিয়াছেন যে, কলিকাতায় অনেক নামকরা কোম্পানীর লেবেল জাল করিয়া সুনাম ভাঙাইয়া বিস্তর ভেজাল ঔষধ বোম্বাইয়ে তৈরি হইতেছে।

এই অভিযোগের কোন জবাব এখনও বোম্বাই হইতে পাওয়া যায় নাই—কেন, তাহা বুঝা শক্ত নহে।

বোম্বাই-এ প্রায় ১৯০টি সরকারী অনুমোদন-প্রাপ্ত ঔষধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান আছে। এই সব তথাকথিত ঔষধ প্রস্তুতকারকদের অধিকাংশেরই কোন কারখানা নাই—তোড়জোড় বা সাজ-সরঞ্জামও নাই। বোম্বাই সরকার হইতে এ বিষয় যাচাই করিবার কোন প্রয়োজনই অনুভূত হয় নাই। সোজা কথা, ইহারা অন্যের মাল কিনিয়া নিজেদের মার্কা দিয়া বিক্রয় করে। আরও আছে:

"কল্যাণ শহরের নিকট 'উল্লাস-নগরে' বহু ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান আছে। অভিযোগ পাওয়া যায়, বোম্বাইয়ের কিছু ঔষধ-বিক্রেতার সহযোগিতায় ইহারা ভেজাল কারবারে জড়িত। ঐ সকল ঔষধ বিক্রেতারা খাঁটি ঔষধের পরিবর্ত্তে নামকরা প্রতিষ্ঠানগুলির (বিশেষত বাঙ্গলা দেশের) লেবেল লাগানো শিশিতে এই ভেজাল ঔষধ বিক্রয় করে। স্থানীয় ড্রাগ কণ্ট্রোলার এখনও ইহার বিরুদ্ধে যথোচিত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন নাই।"

বোম্বাই-এর হাসপাতালগুলির জন্য ঔষধাদি ক্রয় করার ব্যাপারে বোম্বাই-এর ড্রাগ কন্ট্রোলারের বিধিনিয়মও উল্লেখ করা প্রয়োজন :

"সরকারী টেণ্ডার দেওয়ার সময় টেণ্ডারের সঙ্গে ঔষধ সরবরাহকারী ড্রাগ কনট্রোলারের একটি সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হয়। একবার এই সার্টিফিকেট পাইলে, সরকারী অর্ডার লাভের পর সারা বৎসর বিভিন্ন সময়ে কি ঔষধ সরবরাহ হইতেছে, তাহা আর পরীক্ষা, বা যাচাই করিয়া দেখা হয় না। সরবরাহকারী কোন সময় নিম্নমানের বা ভেজাল ঔষধ দিলে তাহা ধরার ব্যবস্থাও ড্রাগ কন্ট্রোলারের নাই।"

কারণ তাহা থাকিলে মহারাষ্ট্রের বহু বহু "শিশু" ঔষধ-প্রস্তুত-কারক বিনা পথ্যে অকাল মৃত্যুর পথে যাত্রা করিবে!

এইবার দেখুন :

"পশ্চিমবঙ্গের ভেষজ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ কলিকাতার এক দোকানে হানা দিয়া মহারাষ্ট্রে প্রস্তুত পেটেণ্ট ঔষধের কিছু নমুনা হস্তগত করিয়াছে। মহারাষ্ট্র ও অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে তৈরি নিম্নমানের ঔষধ কলিকাতার বাজারে চলিতেছে বলিয়া ঐ দপ্তরে অভিযোগ আসিয়াছে।

"পশ্চিমবঙ্গের ভেষজ-শিল্পের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রের অভিযানের প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যেই দেখা দিয়াছে। কেরালায় পরিশোধিত জলের প্রয়োজন হইলে তাহা পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য হইতে সংগ্রহের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে পশ্চিমবঙ্গের পরিশোধিত জল বর্জ্জন করিতে না বলিয়া ঘুরাইয়া মহারাষ্ট্রের ডিষ্টিল্ড ওয়াটার লইতে বলা হয়।"

"ইতিমধ্যে এরূপ অভিযোগ পাওয়া যায় যে, নিম্নমানের পরিশোধিত জল এবং ঔষধ বিক্রীর জন্য এক শ্রেণীর অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে কারবার ফাঁদিয়াছেন। প্রকাশ, ইঁহারা পশ্চিমবঙ্গের লাইসেন্সহীন কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে অর্থ অগ্রিম দেন। সেখানে নিম্নমানের ও জাল লেবেলের ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া বোম্বাই সহ ভারতের সর্ব্বত্র বিক্রী করেন।

"এই মুষ্টিমেয় অসাধু ব্যবসায়ীর সমাজবিরোধী কাজের জন্য যাহাতে পশ্চিমবঙ্গের ভেষজ-শিল্পের সুনাম নষ্ট না হয়, সেজন্য এই রাজ্যের কয়েকটি ভেষজ-সংস্থা এই দুষ্টচক্রের প্রতি রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রে এই রাজ্যের কিছু নিম্নমানের পরিশোধিত জাল ঔষধ ধরা পড়িবার আগেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে ইহারা এই সব অসাধু অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানগুলির পুরা নাম-ঠিকানা দিয়া ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তখন সরকারের টনক নড়ে নাই।" (যুগান্তর, ১৪-৮-৬১)

লালফিতার মাহাত্ম্য সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বকালে এই প্রকার! সময়ের কাজ সময়ে করিলে, হাতে কাজ থাকিবে না বলিয়াই বোধ হয় এই রীতি!

কিন্তু যত দোষ বাঙ্গালী নন্দ ঘোষের! সরকারী সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, ইতিপূর্ব্বে বহুবার মহারাষ্ট্রে প্রস্তুত বহুবিধ ভেজাল এবং নিম্নমানের ঔষধ কলিকাতায় ধরা পড়ে। যুগান্তরে (১১-৮-৬২) প্রকাশ :—

"সম্প্রতি মহারাষ্ট্রে প্রস্তুত এমন একটি দাঁতের ঔষধ কলিকাতায় পাওয়া যায়, যাহার গায়ে কোন লাইসেন্স নম্বর ছিল না। অভিযোগে প্রকাশ, ঐ ঔষধটি কলিকাতার কোন দূতাবাসে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু উহার ফল খারাপ দাঁড়ায়। এজন্য দূতাবাস হইতে ঐ ঔষধ জাল সন্দেহে, রাজ্য ভেষজ নিয়ন্ত্রণ বিভাগে পাঠান হয়। তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে ঐ ঔষধ সম্পর্কে মহারাষ্ট্র সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু তাঁহারা এ সম্পর্কে এখন পর্য্যন্ত কোনো কিছুই জানান নাই!

"আরও কিছুকাল আগে কলিকাতার কোন একটি দোকান হইতে মহারাষ্ট্রে প্রস্তুত কিছু জাল ঔষধ ধরা পড়ে। কলিকাতা কর্ত্তৃপক্ষ যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া ঐ দোকান বন্ধ করিয়া দেন। ঐ সংবাদ যথারীতি

মহারাষ্ট্র সরকারকে জানান হয়। কিন্তু তাঁহারা ঐ প্রস্তুতকারক সংস্থার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট এখনও কোন সংবাদ আসে নাই। (আসিবেও না।)

"আরও জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ভেষজ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ মহারাষ্ট্র সরকারের নিকট ঔষধ প্রস্তুতকারক এবং বিক্রেতাদের নাম পাঠাইতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা শুধু প্রস্তুতকারকদের নাম পাঠান, বিক্রেতাদের নাম দেন নাই। ফলে কলিকাতায় মহারাষ্ট্রের ঔষধের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে।..

"পশ্চিমবঙ্গে প্রস্তুত কিছু নিম্নমানের ডিসটিল্ড ওয়াটার এবং ইনজেকশন মহারাষ্ট্রে আটক করার পর ঐ রাজ্যের কয়েকজন এনফোর্সমেণ্ট পুলিস এবং ভেষজ-পরিদর্শক সোমবার কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাঁহাদের তালিকা অনুযায়ী তাঁহারা নিজেরাই কলিকাতায় বিভিন্ন কারখানায় অনুসন্ধান কার্য্য চালাইতেছেন। বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত এ ব্যাপারে তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ভেষজ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের সহিত একত্রে কাজ করেন নাই। মহারাষ্ট্রে আটক পশ্চিমবঙ্গের ঔষধাদি সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভেষজ-পরিদর্শককে কিন্তু মহারাষ্ট্রে পাঠান হয় নাই।"

পশ্চিমবঙ্গের অতি-উদারতার ফল হাতে হাতে সর্বত্র এবং সর্ব্বব্যাপারেই দেখা যাইতেছে। মহারাষ্ট্র সরকারের পুলিশ কোন্ অধিকারে এবং কাহার নির্দ্দেশে পশ্চিমবঙ্গে 'স্বাধীনভাবে' কাজ করিবার সাহস এবং অধিকার পায় বুঝিলাম না।

পশ্চিমবঙ্গের ভেষজ-শিল্পকে আণবিক বোমা মারিবার যে পরিকল্পনা বোম্বাই করিয়াছে—তাহার প্রতিকার সরকারী ভাবে না হইলে এই রাজ্যকে প্রতিরোধ ব্যবস্থা অন্য ভাবে করিতে হইবে। ভেজাল এবং জাল ঔষধের প্রচলন বন্ধ হউক আমরাও চাই, কিন্তু তাই বলিয়া কেবল পশ্চিমবঙ্গের উপর সব দোষ চাপাইয়া—ভারতের তথা এই রাজ্যের একটি প্রধানতম শিল্পকে ধ্বংস করা হইবে, ইহা বরদাস্ত করা যাইবে না।

এইবার দেখুন—মহারাষ্ট্রে কি প্রকার উত্তম এবং অতিগুণসম্পন্ন ঔষধ প্রস্তুত হয়। বহু দৃষ্টান্ত হইতে মাত্র কিছু দেওয়া হইল:

"কলিকাতা, ১৯শে আগষ্ট—বোম্বাই-এর এক বিখ্যাত ভেজষশিল্প প্রতিষ্ঠানের একটি দামী ইনজেকশনের ফাইলের মধ্যে এক খণ্ড সূতা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইনজেকশনটি 'ইন-অপারেবেল ক্যান্সার' রোগে ব্যবহৃত হয়।

"উত্তর কলিকাতার রাজা গোপেন্দ্র ষ্ট্রীটের জনৈক রোগিণীর জন্য ডাক্তার ইনজেকসন প্রেসক্রিপশন করেন। ইনজেকসনটি যথারীতি কেনা হয়। কিন্তু ইনজেকসন দিতে গিয়া ডাক্তার ইনজেকসনের মধ্যে সাদা সূতা দেখিতে পান। ইহা দেখিতে পাইয়া তিনি সংশ্লিষ্ট দোকানে উহা লইয়া যান এবং উহা ফিরাইয়া দেন। ভারতে ঐ ইনজেকসনটি বোম্বাই-এর একটি প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত করিয়া থাকে।

"ইহা উল্লেখযোগ্য সম্প্রতি বোম্বাই অঞ্চলের আর একটি ভেষজশিল্প প্রতিষ্ঠানের ইনজেকসনের মধ্য হইতে মাছি আবিষ্কৃত হইয়াছিল।"—(যুগান্তর)

মহারাষ্ট্র এ-বিষয়ে হয়ত বলিবেন—ইনজেকসনের মধ্যে প্রাপ্ত সূতা এবং মাছি ভেজাল নহে, দুইটি বস্তুই বোম্বাই-এ প্রস্তুত খাঁটি বস্তু।

পশ্চিমবঙ্গের দৈনিক সংবাদপত্র এমন কি মফঃস্বল পত্রিকাগুলিও ভেজাল ঔষধ প্রস্তুতকারকদের প্রতি কোন দরদ না দেখাইয়া নির্ম্মম ভাবে এ-পাপব্যবসায় এবং পাপীব্যবসায়ীদের কেবল সমালোচনা নহে, কঠোর দণ্ডেরও দাবী করিয়াছেন। এ-বিষয়ে পত্রিকাগুলি বাঙ্গালী অবাঙ্গালী বিচার করেন নাই, সকলকেই একই গোত্রে ফেলিয়াছেন। কিন্তু বোম্বাই-এর পত্র-পত্রিকায় বিষ উদ্গার করা হইয়াছে কেবল পশ্চিমবঙ্গের উপর। দেখুন "বারাসাত বার্ত্তা" কি বলিতেছেন:

'ফাঁসী কাঠে উঠাও"

"ভারতবর্ষের ইংরাজ কর্ত্তৃত্ব ও শাসনের বিরুদ্ধে হাজার হাজার শহীদের রক্তদান, মৃত্যুবরণ এবং লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর স্বাধীনতার সংগ্রামের উদ্দেশ্য এই ছিল না যে, মুষ্টিমেয় মুটিকতক অসাধু ব্যবসায়ী ঔষধের মধ্যে ভেজাল মিশ্রিত করিবে।

"এই ধূর্ত অসাধু ব্যবসায়ীদের আর কিছু না থাকুক টাকা আছে এবং টাকার দৌলতে আইনকে ফাঁকি দিতে পারে। যদি তাহা না পারে তবে বিচারালয়ের শাস্তি তাহাদের ভোগ করিতে হইবে।' কি সে দণ্ড? কারাবাস ও অর্থদণ্ড? যদি খাদ্যে ঔষধে ভেজাল মিশাইয়া সামান্ত কারাবাস ও অর্থদণ্ড দিয়া নিষ্কৃতি পাওয়া যায় এবং জেলখানা হইতে বাহির হইয়া পুনরায় সমাজ-জীবনে টাকা ছড়াইয়া 'পজিশন' তৈরী করা যায় তবে এই কার্য্যে মানুষ প্রলুব্ধই বা হইবে না কেন? আমরা রাষ্ট্রের নিকট সোজা কথায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইংরাজ শাসন সময়ের পরে খাদ্যে ঔষধে ভেজালের সংখ্যা বাড়িতেছে কেন? ইংরাজ শাসনের পরে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। ভারতবর্ষে কি একজনও এইরূপ মেরুদণ্ড-সোজা নির্ভীক পুরুষ নাই যিনি পার্লামেণ্টে দাঁড়াইয়া খাদ্যে ঔষধে ভেজাল মিশ্রণের দণ্ড হিসাবে ফাঁসি অথবা প্রকাশ্য পথে কোর্ট মার্শালের দাবী করিতে পারেন? খাদ্যে ঔষধে ভেজালের দণ্ড হিসাবে সশ্রম কারাবাস অর্থদণ্ড তুলিয়া ফাঁসি প্রদানের আইন চালু করিতে না পারিলে এই পাপ ভারতবর্ষের মাটি হইতে উৎখাত করা যাইবে না। অন্ততঃ কয়েকটি ক্ষেত্রে খাদ্যে ঔষধে ভেজালদাতাদের প্রকাশ্য পথে গুলী করিয়া দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে শত্রুতা বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম দেখাইতে পারিলে অপর রাজ্যে কলিকাতার এই বদনাম মুছিয়া দেওয়া যাইত। কিন্তু আমাদের এই দেশ সত্যই বিচিত্র দেশ।"

এই বিষয়ে 'জনমত' সাপ্তাহিক মন্তব্য করিয়াছেন :—

"বিধান সভায় পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী অবশেষে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভেজাল ঔষধকারক ফার্ম্মসমূহের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। এখন নাকি এমন কতকগুলি ঔষধ পাওয়া গিয়াছে যাহা পুরাপুরি ভেজাল এবং মারাত্মক। এইরূপ ব্যবস্থা কিন্তু বহুদিন হইতেই চলিতেছে। এখন ইহা বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। সরকারের অবস্থা কিরূপ হইলে এইরূপ অসাধু ব্যবসায়ীরা মাথাচাড়া দিয়া উঠিতে পারে? সরকার যদি এইরূপ অসাধু ব্যবসায়ীদের একটি নামের তালিকা প্রস্তুত করিয়া জনসাধারণের নিকটে প্রকাশ করিতেন তবে সরকারের উপর আস্থাশীল জনসাধারণ নিজেরাই এই সকল অসাধু ব্যবসায়ীদের শাস্তি বিধানের জন্ত নিজেরাই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিত এবং তাহা যে মোটেই সুখের হইত না তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ যাহারা ঔষধে ভেজাল মিশাইয়া মানুষ মারিতেছে, খাদ্যে ভেজাল মিশাইয়া মানুষকে পঙ্গু করিতেছে তাহারা যে মানুষের মিত্র নহে তাহা দেশবাসীর বুঝিতে দেরি হইবে না এবং সরকারও জনসাধারণের সরকার বলিয়া দাবী করিতে পারিতেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে কার্য্যত তাহা হইতেছে না। বরং দিনের পর দিন ভেজাল কারবার বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং তাহারা বহাল তবিয়তে মোটা পয়সা কামাইয়া শহরে সম্মানের সহিত বিচরণ করিতেছে। কিন্তু ইহাদের দুই-একজনকে যদি গুলী করিয়া মারিয়া ফেলা হইত তবে দেশবাসী বুঝিতে পারিত, এই সরকার সত্যসত্যই জনপ্রতিনিধি এবং জনসাধারণের মঙ্গল চায়। কিন্তু কার্য্যতঃ পনেরো বৎসর স্বাধীনতার পরও একটি চোরাকারবারীকে, একটি ভেজালদারকেও শাস্তি দেওয়া হয় নাই। ফলে দেশবাসী সরকারের উপর আস্থা হারাইয়াছে, তাহারা ধরিয়া লইয়াছে এই সরকার ভেজালদারের, চোরাকারবারীর সরকার।"

ভেজাল ঔষধ প্রস্তুত এবং বিক্রয় করার অপরাধের জন্ত দণ্ডবিধানের কথা কেন্দ্রীয় সরকার নাকি চিন্তা করিতেছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কথায় ইহা প্রকাশ। ডাঃ সুশীলা নায়ার বলিতেছেন যে :—

আইনে অপরাধীদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান থাকা সত্ত্বেও গত বৎসর ২০০টি মামলার মধ্যে মাত্র ১০টি ক্ষেত্রে কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। তিনি আরো বলেন : খাদ্যে ভেজালকারীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় খাদ্যে ভেজাল আইন যথাযথ ভাবে সংশোধন করা হইবে। খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার ঘটনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং জনসাধারণ এ বিষয়ে সতর্ক না হইলে ইহা বাড়িয়াই চলিবে। ভেজাল খাদ্য বিক্রয় না করার জন্ত তিনি ব্যবসায়ীদের নিকটে আবেদন জানান।

তবু ভাল যে সরকারী দৃষ্টি 'আবার' এ-দিকে পড়িয়াছে। কিন্তু এতদিন সরকার কি নিদ্রা যাইতেছিলেন? কিন্তু কবে তাঁহাদের চিন্তা কার্য্যকরী হইবে—তাহা বলা শক্ত। হঠাৎ হয়ত শুনিব—আগামী পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিকী প্ল্যানে ভেজাল ঔষধাদি নিবারণ ব্যবস্থা হইবে। বহু চিন্তায় ইহাই স্থির হইল

মহারাষ্ট্রে প্রস্তুত বিশুদ্ধ নির্ভেজাল ঔষধের আর একটি নমুনা !!

কলিকাতা, ২৫শে আগষ্ট—শনিবার পশ্চিমবঙ্গ ড্রাগ লাইসেন্সিং বিভাগ উত্তর ও মধ্য কলিকাতার দুইটি

দোকান হইতে মহারাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক প্রস্তুত ছয় শত শিশি ইনজেক্শন বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। স্ত্রীরোগের জন্য ব্যবহৃত এই ইনজেকসনগুলিকে নিম্নমানের বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে। কয়েকটি শিশির মধ্যে সূক্ষ্ম আঁশ জাতীয় বস্তু পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ঔষধগুলিকে ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। —(যুগান্তর)

মহারাষ্ট্রে প্রস্তুত ভেজাল ঔষধের সংখ্যা এবং পরিমাণ কি, তাহা বলা অসাধ্য। সাধারণত ১,০০০টি চোরের মধ্যে ২০।২৫ জন চোর ধরা পড়ে।

এমন চোরও একশ্রেণীর আছে—নিজেরা চুরি করিয়াই যাহারা "চোর চোর" বলিয়া চীৎকারে লোকচিত্তে বিভ্রমের সৃষ্টি করিয়া নিজেদের রক্ষা করে। মহারাষ্ট্রও কি এই নীতি গ্রহণ করিয়াছেন? এখন অপরকে চোর না বলিয়া আত্মরক্ষার আর কোন পথই কি নাই? পশ্চিমবঙ্গকে সর্ব্বপ্রকার ভেজাল ও জাল ঔষধের জন্য দায়ী করিয়া প্রজাবৎসল বোম্বাই সরকার প্রজাপালনের সত্যই এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন!

কয়েকদিন পূর্ব্বে বোম্বাই শহরে ঔষধ নহে—বিলাতী মদের এক অপূর্ব্ব 'দেশী' কারখানা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বোম্বাই রাজ্যে মদ্যাদি বিক্রয় আইন করিয়া বন্ধ করা হইয়াছে, অর্থাৎ বোম্বাই-এ "নেশা-বন্দী" (আকাশবাণীর ভাষায়) সার্থক। কাজেই মধ্যবিত্ত এবং গরীব জনসাধারণ মদ্যাদি ক্রয় করিয়া পান করিতে পারে না। কিন্তু বড়লোকেরা ৭৫৲।৮০৲ টাকায় বোম্বাই-এ প্রস্তুত স্কচ্ হুইস্কী এবং অন্যান্য মদ্যাদি নিয়মিত পাইয়া থাকেন। বলা বাহুল্য পানও করিয়া থাকেন। বিলাতী মদের দেশী কারখানায় দেশী মদে অন্য কিছু মিশাইয়া (টিন্চার আইডীন?) বিলাতী বোতলে এবং লেবেলে নিখুঁত ভাবে প্যাক্ করিয়া বাজারে ছাড়া হইত! কারখানাটি নাকি এখন পুলিস দখল করিয়াছে। পরের খবর কিছু প্রকাশ পায় নাই।

হিন্দীর বিজয় অভিযান

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক সম্মেলনে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সভাপতির ভাষণে বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার একমাত্র হিন্দী ছাড়া বাংলা ও অন্যান্য ভাষার সমৃদ্ধি চাহেন না। তিনি আরও বলেন: কেবলমাত্র হিন্দীর প্রচারকার্য্যেই প্রায় ৩৪ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। কিন্তু সে অনুপাতে বাংলা, তামিল বা অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষা কতটুকু সাহায্য পাইয়াছে?

এই প্রসঙ্গে যুগান্তরের (১৪-৮-৬২) "আংরেজী হটাও" সম্পাদকীয় (অংশ মাত্র) উল্লেখ করিলাম—

"এলাহাবাদে হিন্দীপ্রেমীদের উদ্যোগে ইংরেজীকে ঝাঁটাইয়া বিদায় করিবার জন্য একটি জবরদস্ত সম্মেলন আহূত হইয়াছে। এই সম্মেলনের উদ্যোক্তারা নিজেদের পরিচয় দিয়াছেন 'আংরেজী হটাও কমিটি' রূপে। এই আধা-হিন্দী, আধা-ইংরেজীর তকমা আঁটিয়া কমিটি সম্মেলনে প্রস্তাব পাশ করিয়াছে যে, ১৯৬৫ সালের পর আর ইংরেজী রাখা চলিবে না। ইংরেজী রাখিলে হিন্দীর ইজ্জত থাকিবে না এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষারও সম্মান নষ্ট হইবে। উদ্যোক্তাদের আসল উদ্দেশ্য হিন্দীর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। ইংরেজীর সঙ্গে উগ্র হিন্দীওয়ালারা একটা সপত্নীর সম্পর্ক আবিষ্কার করিয়াই ভাষার দরবারে মহা হট্টগোল সুরু করিয়াছেন। বিষয়টি অত্যন্ত অশোভন ব্যস্ততার মধ্যে উত্থাপিত হইয়াছে এবং যাঁহারা ইহা লইয়া হৈ-চৈ করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে ভাষাবিশেষজ্ঞ অপেক্ষা রাজনৈতিক টাউটদের সংখ্যাই বেশী। অতএব ভারতের ভাষা সমস্যা সমাধানের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি এই হিন্দীওয়ালা টাউটদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। এ বিষয়ে সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শই বিবেচ্য। কেন্দ্রীয় সরকার ভাষা কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই ১৯৬৫ সালের পরও ইংরেজীকে একটি সহযোগী ভাষারূপে সরকারী কার্য্যপরিচালনায় আর কিছুকাল চালু রাখিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আংরেজী হটানেওয়ালারা সে কারণেই এতটা খাপ্পা হইয়া উঠিয়াছেন। এলাহাবাদের সম্মেলনে এই ভাষা-পণ্ডিতরা একটি প্রস্তাবে এইরূপ দাবীও করিয়াছেন যে, পরীক্ষায় ছাত্ররা কেবলমাত্র ইংরেজীতে ফেল করিলে তাহাদিগকে পাশ করাইয়া দিতে হইবে! কারণ, তাঁহাদের মতে দেশের প্রশাসন কার্য্য-পরিচালনায় কিংবা বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিষয় শিক্ষা লাভের জন্য ইংরেজী ভাষার জ্ঞান অপরিহার্য্য নয়। আর একটি প্রস্তাবে সম্মেলন দাবী করিয়াছে যে, সমস্ত ভারতীয় ভাষার জন্য দেবনাগরী লিপি প্রবর্ত্তন করা হউক। ইহা দ্বারা সর্ব্বভারতীয় ঐক্য (?) স্থাপনে সহায়তা হইবে বলিয়া সম্মেলনে আশা প্রকাশ করা হইয়াছে।"

এ বিষয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা' (১৭-৮-৬২) বলিতেছেন :

"রাজধানী দিল্লীতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জমজমাট মজলিসে যাঁহারা 'এক রা' হইয়া 'আংরেজী হঠানো'র রায় দিলেন, তাঁহারা কাহারা? মজলিসের নাম সর্ব্বভারতীয় ভাষা সম্মেলন—তাহাতে কিছু আসে যায় না, এ দেশে লাল শালু থাকিলেই হয়, যাহা খুশি তাহা লিখিয়া লটকাইয়া দিলে আটকায় কে? বিবরণে দেখিতেছি, সম্মেলনে হাজির ছিলেন দুই শত ডেলিগেট। ইঁহাদের নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইলেন কাহারা জানিতে সাধ হয়। অধুনা ইংরেজীবিদ্বেষী ডাঃ লোহিয়া বলিয়া থাকেন যে, আধ কোটি ইংরেজীনবিসদের ইচ্ছা ৪৫ কোটি লোকের উপর চাপাইয়া দেওয়া অন্যায়। তাঁহার যুক্তি দিয়াই তাঁহার নিকট জানিতে চাই, দুই শত জন 'আপনি মোড়লের' ফতোয়া ৪৫ কোটির উপর চাপানোর মধ্যেই বা ন্যায় কোন্‌খানে?

"জাতীয় সংহতির দোহাই পাড়িয়া লাভ নাই। সংহতির অছিগিরি ১৯৪৭ সনে যাঁহাদের উপর বর্ত্তাইয়াছিল, তাঁহারা ন্যায়ের মর্য্যাদা রাখিতে পারেন নাই, অঞ্চল, ভূগোল, ভাষা ইত্যাদি নানা কারণে সংহতি ভাঙ্গিয়া খান্‌খান্‌ হইয়াছে। কি রাজ্য-পুনর্গঠন-কমিশন, কি ভাষা-কমিশন, গোড়ার গলদে কেহ যান নাই, কোনমতে জোড়াতালি আর ঠেকনো দিয়া জাতীয়তাবোধকে খাড়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। বেসামাল নেতারা কখনও ভাবিয়াছেন, সংহতি মানে হয়ত ডাক-টিকিট, নয়া পয়সা, আর রেলগাড়ির একতা মাত্র, কখনও বা সর্ব্বভারতীয় পুলিসবাহিনী গড়িয়া সংহতি ফিরাইয়া আনিতে চাহিয়াছেন। অর্থাৎ ফৌজ সর্ব্বভারতীয় হইয়াও যাহা পারে নাই, সর্ব্বভারতীয় পুলিস যেন তাহা পারিবে!

"পুরাপুরি চৈতন্য যে হয় নাই, লোকসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি—স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী সেদিন সংবাদিক সম্মেলনে যাহার ভাষ্য করিয়াছেন—তাহার প্রমাণ। মূল আর টীকা মিলাইয়া পড়িয়া এইটুকু বুঝিতেছি যে, অনেক ঠেকিয়াও কর্ত্তারা ইংরেজীকে বড়জোর সহযোগী রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা দিতে চান। পূর্ব্ব চাহে না, দক্ষিণ চাহে না, তবু গোটা দেশ জুড়িয়া হিন্দীর ঝাণ্ডা উঁচা রাখা চাই-ই চাই। মজা এই যে, কর্ত্তারা যখন বলেন, হিন্দী চলিবে, তখন তাঁহারাও জানেন না কোন্‌ হিন্দী? এই ভাষাটার একটা প্রাথমিক সংজ্ঞাই আজ অবধি স্থির হইল না, অথচ এদিকে সরাসরি এবং বকলমে কোটি কোটি টাকা হিন্দীর উন্নয়ন এবং প্রচার-প্রসারের জন্য নাকি জলের মত খরচ হইয়া গেল! বিহারের হিন্দী উত্তরপ্রদেশে অচল, উত্তরপ্রদেশের হিন্দী পাঞ্জাবে। তবে কি 'আকাশ বাণী' কথিত সমাচারকেই হিন্দীর নমুনা হিসাবে মানিয়া লইব? সেখানেও ত বিস্তর বখেড়া। সংস্কৃতঘেঁষা হিন্দী শুনিলে আমরা পূর্ব্বাঞ্চলের বাসিন্দারা কতকটা স্বস্তি পাই বটে, কিন্তু সেই শব্দভাণ্ডারও কৃত্রিম এবং আড়ষ্ট। তাহা ছাড়া প্রধানমন্ত্রী হইতে সুরু করিয়া লখনউ দিল্লীওয়ালারা সমস্বরে হাঁক ছাড়েন, চলবে না, চলবে না। আরও উর্দ্দু-ঘেঁষা জবান চাই।...

"'হিন্দী চাই, হিন্দী চাই' বলিয়া আজ যাঁহারা চেঁচান, আর সেই গোলে বশংবদ যাঁহারা হরিবোল দেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, প্রয়োজন কেবল কাজচলা গোছের একটি সরকারী ভাষা হইলে গোল ছিল না—জ্ঞান-বিজ্ঞান, গবেষণা এবং বৈষয়িক উন্নয়নের সঙ্কল্পবদ্ধ স্বাধীন ভারতের একটা দরকারী ভাষাও যে নিতান্তই চাই। এ কথা খোলাখুলি বলার সময় আসিয়াছে যে, 'সহযোগী'কে ভিখ্‌ দেওয়া অথবা বিকল্প ভাষার ভাঁওতা দিয়া অ-হিন্দী অঞ্চলকে ভুলাইলে চলিবে না, ইংরেজীকে তাহার যোগ্য মর্য্যাদায় বহাল রাখিতে হইবে।"

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কাজের কাজ কিছু হইবে কি না সন্দেহ আছে। এই সম্পর্কে ১৭-৮-৬২ তারিখে 'যুগান্তর' মন্তব্য করিয়াছেন :

"শ্রীনেহরু বলিয়াছেন, ১৯৬৫ সনের পরও অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য ইংরেজী সহযোগী সরকারী ভাষারূপে চলিত থাকিবে এবং অহিন্দী ভাষাভাষীরা স্বেচ্ছায় তাহার পরিবর্ত্তন না চাওয়া পর্য্যন্ত তাহার আসন অব্যাহত থাকিবে। সম্প্রতি দিল্লীতে যে নিখিল ভারত ভাষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে হিন্দীর সঙ্গে সহযোগী সরকারী ভাষারূপে ইংরেজীর স্বীকৃতির জন্য সংবিধান সংশোধনের যে প্রয়াস চলিতেছে, তাহার তীব্র বিরোধিতা করা হয় এবং হিন্দীকেই একমাত্র সরকারী ভাষা হিসাবে বলবৎ করা হউক বলিয়া দাবী করা হয়। এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতেই প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে উপরোক্ত আশ্বাসবাক্য উচ্চারণ করেন। শুধু তাই নয়, সহযোগী সরকারী ভাষা সম্পর্কীয় ধারাটি সংবিধানে সংযোজিত করার জন্য শীঘ্রই আইন প্রণয়ন করা হইতেছে বলিয়াও জানান। বলা বাহুল্য, শ্রীনেহরু একথা এই প্রথম বলিলেন না। ইতিপূর্ব্বেই তিনি এবং অধুনা লোকান্তরিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপন্থ এই আশ্বাস দিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে উদ্বিগ্ন অহিন্দী ভাষাভাষীরা তাঁহাদের আন্দোলন,

প্রত্যাহার করিয়া নিয়াছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁহারা ষোল আনা আশঙ্কা মুক্ত হইতে পারেন নাই। কেন না, হিন্দী প্রেমিকদের সংহত উদ্যম পূর্ণ বেগেই চলিয়াছে এবং অফিস-আদালতে, রেলপথে, ডাকঘরে, বেতারে শনৈঃ শনৈঃ হিন্দী কায়েমের চেষ্টা যেমন চলিতেছে, তেমনি দরাজ হাতে সরকারী টাকাও কেবলমাত্র হিন্দীর উন্নতি ও ব্যাপ্তির জন্য ব্যয়িত হইতেছে। স্বভাবতই আশঙ্কা করার কারণ আছে যে, জাতীয়তার জিগির তুলিয়া যোগেযাগে একবার ইংরেজীটা হটাইয়া হিন্দীকে সরকারী ভাষার আসনে বহাল করিতে পারিলে, তখন ধীরে ধীরে তাহাকেই উচ্চশিক্ষার মাধ্যম ও আন্তঃরাজ্য আদান-প্রদানের একমাত্র বাহন বানাইয়া অন্যান্য ভাষাকে কোণঠাসা করা যাইবে। আর এইভাবে হিন্দীভাষীরাই হইবেন ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি ও উঁচু সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে একমাত্র অধিকারী।"

কেন্দ্রীয় কর্ত্তারা মুখে যাহাই বলুন—কার্য্যক্ষেত্রে যে ভাবে হিন্দীর প্রাধান্য দিতেছেন, তাহাতে আমাদের চিন্তার যথেষ্ট অবকাশ ও আশঙ্কা আছে।

কলিকাতা আকাশবাণী প্রচারকেন্দ্রে বাঙ্গলাকে কোণঠাসা করা হইয়াছে। হিন্দী শিক্ষার বে-ফায়দা আসরও নিয়মিত চলিতেছে। সংবাদ প্রচার, তাহার উপর দিল্লী হইতে হিন্দীতে অপূর্ব্ব 'নিউজ রীল' রিলে করিয়া বাঙ্গলা শ্রোতাদের কর্ণে অহরহ গলানো সীসা ঢালিয়া দেওয়া হইতেছে।

বিহারের বাঙ্গালী-প্রধান অঞ্চলগুলিতে বাঙ্গলা ভাষাকে খেদাইয়া দিয়া, জমিজমার রসিদ, পরচা, নোটিস, টেক্সের চালন-চাহিদা সবই হিন্দীতে হইতেছে। ফলে বাঙ্গালী, যাঁহাদের সামান্য জমিজমা বা ঘরবাড়ী আছে ঐসব অঞ্চলে, তাঁহারা ত্রাহি ত্রাহি রব তুলিতেছেন।

রেলের ইঞ্জিনগুলিতে পূর্ব্বে E. R., S. R. প্রভৃতি ইংরেজীতে লেখা থাকিত এখন তাহার বদলে হিন্দী অক্ষরে হইয়াছে 'পূঃ রে', 'দঃ পূঃ রে' ইত্যাদি।

খাম-পোষ্টকার্ড, মণিঅর্ডার ফরম্, টেলিগ্রাম ফরম্—প্রভৃতিতেও হিন্দী যে ভাবে আসর জমাইযাছে, আর কিছুকাল পরেই হয়ত ইংরেজীকে একেবারে লোপ করা হইবে।

ইংরেজী—সহকারী সরকারী ভাষা

যদিও সুখবর—

"ইংরাজীকে সহযোগী সরকারী ভাষায় পরিণত করিবার জন্য ভারত সরকার যে সিদ্ধান্ত লইয়াছেন ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে এক জনসভায় তৎপ্রতি অভিনন্দন জানান হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টার ডঃ ত্রিগুণা সেন সভাপতিত্ব করেন।

"ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তকে 'দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় জাতীয় সংহতি সাধনের এক অপরিহার্য্য অঙ্গ' বলিয়া সভায় অভিমত প্রকাশ করা হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তা হিন্দী গোঁড়ামির নিন্দা করেন এবং এই সিদ্ধান্তের জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরুকে ধন্যবাদ দেন।

"প্রস্তাবে হিন্দীর গোঁড়া সমর্থকদের কার্য্যকলাপের তীব্র নিন্দা করিয়া বলা হয় যে, ইংরাজী সংবাদপত্রের বহ্ন্যুৎসব করিয়া ইঁহারা বর্ব্বরতার আশ্রয় লইয়াছেন। ইহার ফলে জাতীয় সংহতির আদর্শের গুরুতর ক্ষতি হইবে।

"শ্রীরাজাগোপালাচারী মাদ্রাজ হইতে এই সভায় প্রেরিত এক বাণীতে এই মর্ম্মে আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, সংসদে এই বিল লইয়া আলোচনার পরও এই প্রসঙ্গের সমাপ্তি হইবে না। হিন্দীকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য এবং যাহারা হিন্দী গ্রহণ করিবেন না, তাঁহাদের সরকারী চাকুরির পরীক্ষার ক্ষেত্রে অসুবিধায় ফেলার জন্য চেষ্টা চালাইয়া যাওয়া হইবে।"—(আনন্দবাজার, ২০-৮-৬২)

শ্রীরাজাগোপালাচারীর আশঙ্কা অমূলক নহে—এবং এই কারণে সকলকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। 'হিন্দী-বীজাণু' যে সব মহাত্মারা ছড়াইতেছেন, তাঁহারা সহজ নহেন এবং ইঁহাদের দমন করিতে হইলে (অন্তত পশ্চিমবঙ্গে)—বাঙ্গলাকে এবং অন্যান্য রাজ্য ভাষাকে অমোঘ "বীজাণুনাশক" করিয়া তুলিতে হইবে, সক্রিয় এবং ব্যাপক ভাবে।

বদ্ধ উন্মাদদের দমন করিতে সাধারণত যে সকল পন্থা গৃহীত হয়, এই হিন্দী-উন্মাদদের সম্পর্কে ঠিক তাহাই করিতে হইবে, নিজেদের এবং নিজেদের ভাষাকে আমরা যদি বাঁচাইতে চাই।

দুঃখের বিষয় শ্রদ্ধেয় রাজেন্দ্রপ্রসাদও আবার এই উগ্র হিন্দী উন্মাদদের সঙ্গে নূতন করিয়া হাত মিলাইয়াছেন!

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দী—কেন?

কংগ্রেসের বহু নেতা হিন্দীর উগ্রতা পছন্দ করেন না, বিশেষ করিয়া দেশের অন্য-ভাষী অঞ্চলগুলিতে—কিন্তু হিন্দী-প্রধান স্থানগুলির ভোট সম্পর্কে তাঁহারা অত্যধিক অবহিত বলিয়া হিন্দীর বিরুদ্ধে কোন কথাই প্রকাশ করিতে ভরসা করেন না। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী নেতাদের অবস্থাও প্রায় একই প্রকার। সর্ব্বভারতীয় কংগ্রেসী নেতৃত্ব এখন প্রধানতঃ "হিন্দী"-ভাষী গুরুজনদের উপর। কাজেই 'গুরুজনদের' বিরাগভাজন হইয়া "রাজনৈতিক বিপাকে" পড়িবার ভয়ে বাঙ্গালী কংগ্রেসী নেতারাও রুদ্ধবাক্ হইয়া আছেন।

হিন্দী-'ফেরিওয়ালাদের' একটা কথা মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন—(বিশেষতঃ বর্ত্তমানের সঙ্কটকালে চীন এবং পাকিস্তান যখন থাবা তুলিয়া সুযোগের অপেক্ষায় রহিয়াছে)। তামিল অঞ্চলে হিন্দীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হইয়াছে—হিন্দীর উগ্রতা এবং হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিবার উন্মাদনার ফলে—দাক্ষিণাত্যে স্বতন্ত্র তামিল রাজ্যের জন্য প্রকাশ্য সঙ্কল্পও ঘোষিত হইয়াছে। হিন্দী-প্রচারের উগ্রতা এবং উন্মাদনা ভারতকে আবার একটা পরম-সঙ্কটের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে। এ উগ্রতার প্রতিরোধ না হইলে দেশ নূতন করিয়া বহু-বিভক্ত হইতে বিলম্ব হইবে না।

খাস্ হিন্দী অঞ্চলের হিন্দী-ভাষীরা ইংরেজী বর্জ্জন করুন, ইংরেজীকে আন্দামানে পাঠাইয়া দিন, স্কুল-কলেজে সকল বিষয় একমাত্র হিন্দীতে পড়াইবার ব্যবস্থা করুন, মূর্খতাকে—পাণ্ডিত্যের নিদর্শন করিয়া তুলুন—বলিবার কিছু নাই। কিন্তু ভারতের মাত্র ৮।৯ কোটি লোকের অর্দ্ধ-পক্ক ভাষা হিন্দীকে বাকি ৩৪ কোটি লোকের ওপর চাপাইবার জবরদস্তি ত্যাগ করুন। সময় থাকিতে সাবধান হউন।

পাকিস্তানী দৌরাত্ম্য

সংসদের আলোচনা হইতে জানা যায় যে:

গত ১লা জানুয়ারী হইতে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এই ৬ মাস সময়ের মধ্যে ১০জন ভারতীয় নাগরিককে বলপ্রয়োগে বিপর্য্যস্ত করিয়া ভারতীয় এলাকা হইতে অপহরণ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত কাহাকেও ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই এবং পাকিস্তানে ইহাদের ভাগ্যে যে কি ঘটিয়াছে তাহাও এ পর্য্যন্ত জানিতে পারা যায় নাই। ইহা ছাড়া গত ২০শে জুলাই তারিখে পুলিসের একজন এসিস্ট্যাণ্ট সাব ইনস্পেক্টার এবং পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর একজন সদস্যকে জোর করিয়া পাকিস্তানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাগুলীও কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে।

ইহা ছাড়া পাকিস্তানী সৈন্যগণ কর্ত্তৃক সীমান্তে ভারতীয় এলাকার কয়েকটি অংশ, যেমন জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত দৈখাতা প্রভৃতি অঞ্চল, বলপূর্ব্বক অধিকৃত হইয়াছে। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী সৈন্যগণ কোনওরূপ বাধা না দিয়াই ঐ সমস্ত অঞ্চল হইতে সরিয়া আসিয়াছে। উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলা-বারুদের অভাবেই তাহারা এইরূপ করিয়াছে বলিয়া বোঝা যাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি এই কথা বলিয়াছেন যে, দৈখাতার একাংশ এখনও পাকিস্তানী সৈন্যদের দখলেই রহিয়া গিয়াছে। পাকিস্তানীদের দ্বারা নিরস্ত্র ভারতীয় নাগরিকগণের উপর গুলী বর্ষণ এবং তাহাদের প্রাণ হরণ দৈনন্দিন ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে।

এই সমস্ত ঘটনার বিরুদ্ধে বারংবার প্রতিবাদ জানাইয়াও কোনও ফল হয় নাই।

আমাদের সৈন্যবাহিনীর জোয়ানদের পরম অহিংস মন্ত্রে দীক্ষার চরম সুফল ও সার্থকতা দেখা যাইতেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সংসদে বর্ণিত পরিসংখ্যান হইতে দেখা যায় যে, ১৯৫১ সাল হইতে গত দশ বৎসরে অন্তত চার লক্ষ পাকিস্তানী পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং ত্রিপুরায় বেআইনী অনুপ্রবেশ করিয়াছে।

আসামে সবচেয়ে বেশী পাকিস্তানী অনুপ্রবেশ করিয়াছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতে বিগত ১০ বৎসরের মধ্যে আড়াই লক্ষ হইতে তিন লক্ষ পাকিস্তানী আসামে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, এই সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৪৫ হাজার হইতে ৫০ হাজার এবং ত্রিপুরায় ৫০ হাজার পাকিস্তানী অনুপ্রবেশ করিয়াছে।

প্রসঙ্গত প্রকাশ পাইয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত রক্ষার ভার রাজ্য সরকারের হাতে ন্যস্ত হইয়া থাকিলেও

পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এইজন্য উপযুক্ত অর্থ দেওয়া হয় নাই এবং সৈন্যদলও সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে কোনওরূপ সাহায্য করে না। সীমান্তে যে সমস্ত ঘাঁটি আছে তাহা রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত লোকবল এবং সাজ-সরঞ্জামও নাই।

এ বিষয় বার বার একই মন্তব্য করার কোন সার্থকতা নাই। সাধারণ পাঠক নিজ নিজ মতামত নির্দ্ধারণ করিতে পারেন।

শহরের জঞ্জাল

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হস্তক্ষেপে কলিকাতার পথঘাট বহু পরিমাণে জঞ্জালমুক্ত হইয়াছে—কলিকাতার পৌরসভার অকর্ম্মা এবং স্বার্থান্বেষী কাউন্সিলর ছাড়া আর সব ময়লাই ক্রমশঃ সাফ করা হইতেছে। রাস্তা হইতে ধর্ম্মসণ্ডগুলি বিতাড়িত হইতেছে—কিন্তু কর্পোরেশনের অকেজো পা-সণ্ডগুলিকে কবে তাড়ানো হইবে জানি না। কলিকাতার ভীষণ মারাত্মক আর একটি আবর্জ্জনার প্রতি 'আনন্দবাজার পত্রিকা' দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

"আরও একটি ভয়ানক আবর্জ্জনা আছে যাহা মানুষের গৃহবাসের শান্তি বিনষ্ট করিয়া থাকে। তাহা হইল লাউডস্পীকারের উপদ্রব। কিছুকাল আগে আমরা জানিয়া সুখী হইয়াছিলাম যে, কলিকাতার পুলিস কর্ত্তৃপক্ষ লাউডস্পীকারের ব্যবহার সম্পর্কে যথোচিত কড়াকড়ি করিবেন। পল্লীর শান্তি বিঘ্নিত হইতে পারে, এমনভাবে লাউডস্পীকার ব্যবহার করিবার সুযোগ কাহাকেও প্রদান করা হইবে না। কিছুদিনের অভিজ্ঞতায় ইহাও দেখা গিয়াছে, কলিকাতা শহরে লাউডস্পীকারের যথেচ্ছাচার অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে; এবং জনসমাজেও দেখা যায় যে, লাউডস্পীকারকে প্রশ্রয় না দিবারই একটি জনমত দৃঢ়তর হইয়াছে।

"কিন্তু রাজ্য সরকার কি মফস্বলের এবং কলিকাতার শহরতলীর জীবনযাত্রার শান্তি নিরাপদ করিবার জন্য লাউডস্পীকারের যথেচ্ছ ব্যবহার নিষিদ্ধ করিতে যথোচিত তৎপরতা অবলম্বন করিয়াছেন? মাইকের উপদ্রবে শহরতলীর প্রাত্যহিক জীবনে যে কি দুঃসহতা দেখা দিয়াছে, তাহা পুলিসের পক্ষে না জানিবার কোন কারণ নাই। বৌভাত, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ হইতে সুরু করিয়া মনসাপূজার অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত সব ব্যাপারেই মাইকসংযুক্ত রেকর্ডের সঙ্গীত প্রচণ্ড শব্দের আবর্জ্জনা অহরহ বাতাসে ছিটাইতেছে। মুমূর্ষু রোগীর শেষ মুহূর্ত্তের শান্তিও দানব কোলাহলের চিৎকারে বিনষ্ট হইতেছে। ছাত্রের অধ্যয়ন, শিল্পীর মনোযোগ, ধর্ম্মনিষ্ঠের পূজা ও ধ্যান—সবই লাউডস্পীকারের করাল শব্দে উৎপীড়িত হইতেছে। চব্বিশ পরগণার পুলিস কর্ত্তা যদি অনুগ্রহ করিয়া অনুসন্ধান করেন, তবে জানিতে পারিবেন যে, দমদম ও পাতিপুকুর অঞ্চলে শুধু এক মনসাপূজার ব্যাপারে পাঁচ দিন ধরিয়া দিন-রাত সমানভাবে লাউডস্পীকারের চিৎকারিত সঙ্গীত পল্লীর মানুষের উপর কি অত্যাচার করিয়াছে।"

যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালের চারিদিকে লাউডস্পীকার হইতে যে প্রকার বিষম সঙ্গীত ও বাদ্যের সাইক্লোন দিবারাত্র চলে, তাহাতে রোগীদের প্রায় প্রাণান্ত ঘটিবার মত হইয়াছে! অথচ কাছেই ২৪ পরগণার পুলিস থানা!

'আনন্দবাজার পত্রিকা' আরও বলিতেছেন:

"কেহ যদি তাহার প্রতিবেশী ব্যক্তির কানের কাছে মুখ লইয়া এবং চিৎকার করিয়া গান করে, তবে তাহা নিশ্চয়ই একটি অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিন্তু এই ব্যাপারটি একটি যন্ত্রের সাহায্যে সম্পন্ন করিলেই কি সে নিরপরাধ হইয়া যাইবে? এমন অনেক সঙ্গীত আছে যাহা ব্যক্তিবিশেষের রুচিবোধ এবং ধর্ম্মবোধের পক্ষে আঘাতজনক; এমন সঙ্গীত লাউডস্পীকারের সাহায্যে তাহাদের কানে পৌঁছাইয়া দিয়া তাহাদিগকে অপমানিত করিবার অধিকার কাহারও থাকিতে পারে না। কিন্তু লাউডস্পীকারের যথেচ্ছ ব্যবহারে অনেক ক্ষেত্রে এই কাণ্ডই হইতেছে। শালীনতাবিহীন সঙ্গীতকে উচ্চকিত করিয়া পল্লীর অল্পবয়স্ক বালক-বালিকার কৌতূহল বিকৃতও করা হইয়া থাকে।"

"ট্রামে-বাসে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। ইহাতে সভ্য-আচরণের বিধি নিরাপদ করা হইয়াছে। দশজনের সুবিধার জন্য এক-দুইজন ধূমপায়ীর যথেচ্ছা ও সুবিধাকে নাগরিক অধিকার বলিয়া এক্ষেত্রে স্বীকার করা হয় নাই। লাউডস্পীকারের ব্যবহার-সম্পর্কেও এই নীতি সরকার প্রয়োগ করিবেন না কেন?

"প্রত্যেক পল্লীতেই এমন কিছুসংখ্যক লোক থাকে যাহারা বহু প্রতিবেশীর সুবিধা-অসুবিধার প্রতি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া লাউডস্পীকারে রেকর্ডের গান উচ্চকিত করিয়া উৎকট শব্দতাণ্ডব উপভোগ করিতে চাহিবে। ইহাদিগকে সংযত করিতে সরকার যদি না পারেন তবে যে আবর্জ্জনারই কাছে পল্লীর শান্তি ও সমাজের সভ্যতাকে অসহায়ভাবে নতি স্বীকার করিতে হইবে।"

এ বিষম অত্যাচারের বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার অধিকার নাই! প্রতিবাদ করিতে গেলেই কেবল গালাগালি নহে, শারীরিক নির্য্যাতনের আশঙ্কাও প্রচুর।

একমাত্র সরকারই শান্তিপ্রিয় মানুষকে এই অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে পারেন। তথাকথিত নেতার দল ভোট হারাইবার ভয়ে কোন প্রতিবাদ চেষ্টা করিবেন না। প্রকারান্তরে ইহারাই সর্ব্বপ্রকার হৈ-হল্লাকারীদের কেবল প্রশ্রয় নয়, বাহবা দেন।

পৌরপিতাদের বিষম ক্রোধ এবং প্রতিবাদ

রাজ্য সরকার শহরের আবর্জ্জনা পরিষ্কারের জন্য যে পৃথক সংস্থা গঠন করিতেছেন তাহার বিরুদ্ধে দলমত-নির্ব্বিশেষে কাউন্সিলারবৃন্দ প্রতিবাদের ঝড় তোলেন। মেয়র শ্রীরাজেন্দ্র মজুমদার সভায় ঘোষণা করেন যে, রাজ্য সরকার তাঁহার সহিত কোনও পরামর্শ করেন নাই। পৌরসভায় রাজ্য সরকারের কোন হস্তক্ষেপ তিনি অনুমোদন করেন না।

জনৈক কংগ্রেস কাউন্সিলার উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন যে, রাজ্য সরকারের প্রস্তাব পৌরসভার স্বাধীনতার অর্থাৎ যথেচ্ছাচারের উপর আঘাত হানা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই তিনি মেয়র, ডেপুটি মেয়র এবং সকল কাউন্সিলারদের পদত্যাগের প্রস্তাব করেন এবং বর্ত্তমান কমিটিগুলি ভাঙ্গিয়া দিবার দাবী করেন। (আহা! সত্যই যদি করেন—আমরা বাঁচিব!)

কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীকে, এল, সাহা এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন যে, বর্ত্তমান পৌরসভার অর্থ-নৈতিক সমস্যা এবং বাস্তুহারাদের সমস্যার সময় আমাদের সরকারের সকল সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। তিনি প্রস্তাবে সরকারকে নিজ অর্থ দিয়া ব্যয়ভার বহন করিতে বলেন। অর্থাৎ 'তোমরা টাকা দাও, আমরা খুসীমত তাহার অপব্যয় করি!'—চলতি কথায় যাহাকে বলে—'তোদের কড়ি, বুদ্ধি মোদের—স্ফূর্ত্তি করা যাক্!'

একদল অকর্ম্মার নিকট হইতে ইহার বেশী আর কিছুই আশা করা যায় না। বর্ত্তমান পৌর (উপ) পিতারা কর্পোরেশনকে তাঁহাদের পৈতৃক জমিদারীতে পরিণত করিয়াছেন এবং সেইমত নিজেদের খেয়ালখুসীমত কাজ করিতেছেন। এই অকর্ম্মাদের লজ্জা বলিয়া কোন কিছু নাই, যদি থাকিত, তবে তাঁহারা অবিলম্বে পদত্যাগ করিয়া কলিকাতাবাসীদের বাঁচাইতেন। কিন্তু আমাদের কপালে সে সৌভাগ্য নাই। পৌরপিতারা আর যাহাই হউন—বোকা নহেন। পরের পয়সায় এমন নবাবী এবং মেজাজ দেখাইবার সুযোগ অন্যত্র কোথাও যে নাই, ইহা তাঁহারা ভাল করিয়াই জানেন।

কলিকাতাকে জঞ্জাল মুক্ত করিতে হইলে, রাজ্য সরকারের প্রথম কর্ত্তব্য এই শহরকে অপদার্থ "পৌর (উপ) পিতা" নামক বিষম জঞ্জাল হইতে সর্ব্বপ্রথম মুক্ত করা। ইহারা কলেরা-ছড়ানো মাছি অপেক্ষাও ভীষণতর এবং হীনতর কীট, কিন্তু এই বিষম জঞ্জাল দূর করিবার মত সাহস এবং সুবুদ্ধি রাজ্য সরকারের হইবে কি?

একজন দরিদ্রের পথে মৃত্যু

৪৫ বৎসর বয়সের এক দরিদ্র গ্রামবাসী শুক্রবার হাওড়া হইতে কলিকাতার ম্যাডান ষ্ট্রীটে একটি চেষ্ট ক্লিনিকে আসিতেছিলেন তাঁহার যক্ষ্মারোগাক্রান্ত ফুসফুসের এক্সরে ফটো তুলিবার জন্য। হতভাগ্য ক্লিনিকে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, অসংখ্য পথিকের দৃষ্টির সম্মুখে তাঁহার মৃতদেহ ক্লিনিকেরই দুয়ারে পড়িয়া ছিল। দরিদ্রের শেষ সম্বল জুতা জোড়াটি, হাতের লাঠি ও টিনের কৌটা মৃতদেহের পাশে পথের উপর পড়িয়া বিনা পথ্যে, বিনা চিকিৎসায় একজন যক্ষ্মারোগীর অসহায় মৃত্যুর সাক্ষ্য দিতেছিল।

এ দৃশ্য কলিকাতার রাজপথে নূতন নহে। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এই প্রকার একটি মৃত্যু ঘটিলে—"সরকার" বদল হইত এক দিনেই। প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলিব। কলিকাতার কয়েকটি যক্ষ্মা-সংস্থা আছে—ছোট, বড়, মাঝারি। এই সব সংস্থার কর্ত্তব্যই নাকি দরিদ্র অসহায় যক্ষ্মা রোগীর সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসা ব্যবস্থা করা, কিন্তু কাজে কর্ত্তব্য পালিত হয় কতটুকু?

যক্ষ্মা-সংস্থাগুলির প্রধান কাজই বোধহয়—যক্ষ্মার এবং সেই সঙ্গে কিছু কিছু ব্যক্তিগত প্রচার। দরিদ্র অসহায় যক্ষ্মারোগীদের শতকরা ৮০ জনই—এই সব সংস্থার বোধ হয় কোন প্রকার কার্য্যকরী সহায়তা পায় না। নীতি সর্ব্বত্রই প্রায় 'ফেল টাকা মাখ তেল'।

অনিমেষের কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণ অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেল। কর্মক্ষেত্রে তার সাফল্যটা এত রূঢ়ভাবে প্রকট অথচ তার নিজের কাছেও এত অভাবিত যে, বেশীক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে অন্যের মুখে অসামান্যা মহিলাদের গল্প শোনা তার কাছে বড়ই পীড়াদায়ক। সে-ই কি অসামান্যা মহিলা কিছু কম দেখেছে না কি? অবশ্য তার নিজের গণ্ডিতে তারা মহিলাদের girls ব'লেই ভাবতে অভ্যস্ত। সে ব'লে উঠল, রাখ্ রাখ্ তোদের ঐ সব মামুলী মেয়েদের গল্প। মেয়েরা মামুলী হ'লে নেহাৎই মিইয়ে-যাওয়া বেগুনীর মতন হয়ে দাঁড়ায়। বরং যদি কিছু মেজাজী গল্প থাকে স্টকে ত ছাড়্।

অনিমেষের টেরিলিনের টাইটার উপর দিয়ে চোখটা একবার বুলিয়ে নিয়ে সুরজিত চট্ ক'রে ভেবে নেওযার চেষ্টা করল, এর উত্তরে কি বলা যায়। তার মুখের কথা কেড়ে নিযে নির্মল ব'লে উঠল, দেখ্ অনিমেষ, জীবনটা সব সময়ে তোদের মার্চেন্ট অফিসের মত ভালগার নয়। সিগারেটের জ্বলন্ত ডগাটাকে দক্ষ হাতে অর্ধশূন্য পেয়ালার কফিতে ঠেকিয়ে নিভিয়ে ফেলে বাঁ হাতটা দিয়ে নিজের ঘাড়টা শক্ত ক'রে ধ'রে নির্মল বেশ বিচক্ষণ ভঙ্গিতে বলল, জীবনটা সুরজিতের মতন নেহাৎই লিরিক্ কবিতা হয়ে উঠবে তা অবশ্য আমি বলছি না। আর তাই বা কেন? সুরজিতের জীবনটাই কি আসলে ওর ব্যক্তিগত পাগলামীর মতন কাব্য-মার্কা? ও কি সকালে উঠে জীবনানন্দ দাশের বই নিয়ে বসে, না ছেলেদের পরীক্ষার খাতা নিয়ে বসে? কবিতা না হাতী—ওর জীবনটা বরং তোর চাইতেও কড়া শাসনে বাঁধা। দশটায় খাওয়া, এগারটায় ক্লাস, পাঁচটায় ছুটি,—হ্যাঁ, বলতে পারিস, সন্ধ্যেবেলা সাতটার পরে ও বাড়ীতে ব'সে প্রবাসীর জন্যে সাহিত্য-চর্চা করে। কিন্তু ভেবে দেখ, ওর সাহিত্য-চর্চাটাই ওর ভাবালুতার ওষুধ। নেশা নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে হলে অতি বড় নেশাখোরেরও নেশা ছুটে যায়। নয় কি? তোর আপত্তি আসলে ওর আদর্শপ্রবণতা নিয়ে নয়। তোর মনে নেতিভাব বেশী হ'লে কি আর এই বয়সে ঐ রকম জাঁকিয়ে চাকরি করতে পারতিস? আসলে তুই সব সময়েই খুঁজিস পষ্টাপষ্টি positive কিছু। প্রেমের ব্যাপারেও।

চাকরির উল্লেখে অনিমেষ একটু লজ্জা পেলেও উৎসাহিত বোধ করল। শার্টের কলারের মধ্যে দিয়ে তর্জনীটা একবার চালিয়ে নিয়ে সে একটু জমিয়ে বসল।

নির্মল একবার দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকাল, একবার বাইরের বর্ষার শব্দটা শুনবার চেষ্টা করল কফি-হাউসের মেছোহাটা পেরিয়ে। সে অভিজ্ঞ গল্পিয়ে। Positive কিছু প্রত্যাশার কথা ব'লে সে যে অনিমেষের মনোযোগটুকু ধ'রে ফেলেছে তা সে বুঝতে পেরে গিয়েছিল। সুরজিতের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা সে করে নি;

নির্মল-অনিমেষের কথোপকথন আরম্ভ হ'লে সুরজিত চুপচাপ অন্যদিকে তাকিয়ে ব'সে থাকবে কিংবা চুরুট টানবে অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে—কারণ তাইই সে করে চিরকাল।

Dramatic pause-টা একটু যেন অতিরিক্ত হয়ে গেল, অনিমেষ একটু উস্‌খুস্‌ ক'রে উঠল। নির্মল হেসে ফেলল। বলল, তোর আর কি, কইয়ে বলিয়ে মোটামুটি রুচিসম্পন্না একজন কেউ হলেই হ'ল। যদি দেখতে সুশ্রী হয় আর মেজাজটা ভাল হয় তা হ'লে ত কথাই নেই। তোর বছরখানেকের গল্পের খোরাক জুটে গেল।

অনিমেষ যেন এই রকমই একটা সুযোগের প্রত্যাশা করছিল। সে একটু নাকতোলা হাসি হেসে বলল, কমিউনিষ্টদের এইটাই দোষ, জানিস? তোরা বড় সব জিনিষকে সাদা আর কালো এই দুই ভাগে ভাগ ক'রে ফেলিস। হয় তোর মতন ট্রেড ইউনিয়নের নেতা, সর্বহারাদের জন্যে কেঁদে কেঁদে প্রাণটার সর্দি ধ'রে গেছে, সঙ্গিনী বলতে সব তথাকথিত ইস্পাত মানবীর দল। আর নয়ত বুর্জুয়া সমাজের পেটোয়া আমার মতন সমস্ত ব্যুরোক্র্যাট্‌, খালি স্টেনোগ্রাফার আর গার্ল ফ্রেণ্ড নিয়ে হৈ হৈ ক'রে বেড়াচ্ছে। ভেবে দেখিস না যে সাদা আর কালোর মধ্যে হাজারটা শেড আছে, আসলে যাদের নিয়ে চলছে দুনিয়াটা। স্টেনোগ্রাফার নিয়ে রোমান্স করার কথাই ধর্‌ না কেন। সব স্টেনোগ্রাফারই কি এমন যে, সাহেব বললেই তার সঙ্গে সিনেমা দেখতে ছুটবে না রেস্তোরাঁতে খেতে যাবে? তুই হয়ত বলবি যে, স্টেনোগ্রাফারটি যেমনই হোক না কেন, তাকে নিয়ে প্রেম সম্ভব নয়, কারণ গোড়া থেকেই ত মন প'ড়ে থাকে নেহাৎ স্থূল আনন্দের সন্ধানে। কিন্তু তোরা যদি এই extreme-টাকে এত অপছন্দ করিস ত সুরজিতের ঐ এনিমিক গল্পতেই বা চটিস না কেন? ওটাও ত একটা extreme—শুধু extremeই নয়, একটা বিকৃতি। ভগবান্‌—সর্বনাশ! তোরা ত আবার ভগবান্‌ বললেই চটে যাস্‌—প্রকৃতি যে পুরুষ মানুষ ব'লে আলাদা একটা জাত তৈরি করেছেন তা ত তাদের ব্যবহারে প্রকাশ পাবে? তা নয়, তোরা ক্রমাগতই—

নির্মল আর একটা সিগারেট ধরাচ্ছিল। এক মুখ ধোঁয়া মার্কেন্‌টাইল সাহেবের মুখের উপরে ছেড়ে দিয়ে বলল, তুই একটা ভুলই চিরকাল ক'রে গেলি। পুরুষ মানুষের পৌরুষ থাকুক, কিন্তু তাই ব'লে মনুষ্যত্বটুকু ত লোপ পাবে না। তার ব্যবহারে ত অন্য জীবজন্তুর চাইতে সে যে একটু পৃথক্‌ তা প্রকাশ পাবে?

অনিমেষ উত্তেজিত হয়ে বলল, ঠিক ঠিক, সেটা যে আমি ভুলে যাচ্ছি তা ভাবছিস্‌ কেন? আমি শুধু বলছি যে, সুরজিতের কাহিনী যেমন একটা extreme মনোভাবের ব্যাপার, সব সময়ে মেয়েদের নিয়ে হৈ চৈ করাও তেমনি আর একটা extreme ব্যাপার। সুরজিতের গল্পটা ওর ঐ সব ভণিতা বাদ দিয়ে ভেবে দেখ ত কেমন শোনায়? ধর্‌ যদি আমি বলতাম গল্পটা:

মফঃস্বলের উকিলের ছেলে, ছেলেবেলা থেকেই ভাল ছেলে, আদর্শবাদী। কবিতা শুধু পড়িই না, লিখিও। আর চারিদিকে ছোঁক ছোঁক ক'রে ঘুরে বেড়াই কোন মূর্তিমতী প্রেরণাদাত্রীর সন্ধানে। সুরজিতটা চেপে গেল, নইলে নিশ্চয়ই বলত, চালকলের বাড়ীর ছোট মেয়ে সুরমার বেড়া-বিনুনী নিয়ে কবিত্ব করতে গিয়ে তার দাদার হাতে কেমন থাপ্পড় খেয়েছিল। যাই হোক, এমনি সব ব্যর্থতার ইতিহাসের মধ্যে হঠাৎ একদিন দেখা মিলল এক অপরূপার। সুরজিতের ভাষায় সজল প্রভাতের শেষ স্বপ্নটির মতন স্নিগ্ধ কোমল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সদ্য বদলি হয়ে-আসা এস. ডি. ও-র কন্যা—নাম মিলি!

এস. ডি. ও. সাহেব ছোটবেলায় বিলেত গিয়েছিলেন আই. সি. এস. হ'তে। ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে দেশে ফিরে হয়েছেন বি. সি. এস। মনে তাতে খুশী হয়েছেন কি না জানা যায় না। তবে প্রচুর পরিমাণে রোমান্স মিশিয়ে আচার জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে থাকেন, বাংলা দেশের হাকিমী জীবনযাত্রা পদ্ধতি নিয়ে। কন্যাও বিলিতি রুচি লাভ করেছে উত্তরাধিকার সূত্রে, তার সঙ্গে সাহিত্যিক প্রবণতা। কাজেই গবর্ণমেণ্ট প্লীডারের সুদর্শন ছেলের সঙ্গে তার মনের মিল হতে বিলম্ব হ'ল না।

চাঁদের আলোয় ষ্টীমার ঘাট, পড়ন্ত সূর্যের আলোয় রেলওয়ে ষ্টেশন, ভোরের আলোয় বকুল বাগান তথা কিশোর প্রেমের সব কিছু ইত্যাদিই যথা সময়ে এল। শুধু এল না সব-চাইতে স্বাভাবিক বস্তুটি—যেটা খুব সহজেই আসত এবং সকাল সকালই আসত আমার নিজের ব্যাপার হ'লে। কিন্তু সে কথা ব'লে লাভ নেই, সুরজিতের কাণ্ডকারখানা ঐ রকমই কিছু একটা হবে।

যাই হোক, এই ভাবেই দুটো বছর কাটল। প্রথম পরিচয় ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরে ছুটির অবসরে। আর বিচ্ছেদ ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পর ছুটির অবসানে। ভেবে দেখ্ নির্মল - দুজনেরই হ'ল সেই বয়স যে বয়সে পশ্চিম দেশে কিশোর-কিশোরীরা নেকিং পার্টি রপ্ত করেছে। বুঝলাম, সেটা একটা উচ্ছৃঙ্খল আধুনিক বর্বরতা, কিন্তু সেটারও একটা গুণ আছে—তার মধ্যে দু'টি মানুষ, একটি ছেলে ও একটি মেয়ের পরস্পরের প্রতি প্রকৃতিগত আকর্ষণটাকে সহজ ভাবে মেনে নেয়। বুঝলাম, সেটা হ'ল একরকমের পেটুকেপনা। কিন্তু পেটুক হওয়া বরং ভাল, খিদে অস্বীকার করার ভণ্ডামীর চাইতে। নয় কি?

নির্মল একটু অস্বস্তি বোধ করল। ঈষৎ ইতস্ততঃ করে সামান্য ঘাড় নেড়ে সায় দিল। ওয়েটার এসে আর এক পট কফি নামিয়ে দিয়ে ব্যালকনির ধারে এসে নীচের দিকে ঝুঁকে কার একজনের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করতে লাগল। সুরজিত নীরবে তাকিয়ে রইল ডান-পায়ের জুতোটার দিকে।

একটু দম নিয়ে অনিমেষ ব'লে চলল। এই দু'টি বছরের বন্ধুত্বের মধ্যে দিয়ে সুরজিত জেনেছে, মিলি কোন্ কবিতাটা কি ভাবে পড়তে ভালবাসে, কোন্ মেয়ের বেশভূষার কোন্ দিক্টা নিয়ে সমালোচনা পছন্দ করে, রাস্তায় বা বাড়ীতে কখন নৈকট্য চায় আবার কখন চায় না। দুজনের মধ্যে মফঃস্বল শহরের সাংস্কৃতিক দৈন্যের বিরুদ্ধে মতবাদের এক প্রগাঢ় ঐক্য স্থাপিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, তারা দু'জনে একসঙ্গে চলতে-ফিরতে এত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে, সমস্ত শহরের গুঞ্জন সত্ত্বেও তাদের অভিভাবকেরা তাদের ব্যবহারের মধ্যে কোনও ত্রুটি খুঁজে পান না কখনও।

এমনই অবস্থায় মার্চের এক রঙীন সন্ধ্যায় নদীর ধারে অতি-পরিচিত এক নিভৃত তরুতলে সুরজিত আধফোটা চাঁদ, ঝিকিমিকি জল আর অদূরবর্তিনী মিলির সুঘ্রাণে বিহ্বল হয়ে ব'লে বসল, আমি তোমাকে বড্ড ভালবাসি। অঙ্ক-কষা আর ইংরেজী-বলা সপ্রতিভ মিলি কেমন যেন ঘেমে উঠল। তার নিজের ভিতরে, অনেক ভিতরে কোথায় যেন একটা কাঁপন ধরল। সে দুই হাত দিয়ে নিজেকে শক্ত ক'রে ধ'রে অত্যন্ত কঠিন গলায় বলল, অতএব? সুরজিত বেচারী ওর ভিতরটা দেখতে পাচ্ছিল না। সে শুধু ওর গলার কাঠিন্যটা বুঝতে পারল। সে ঢোঁক গিলে বলল, অতএব আর কি? মিলির মুখটা যেন কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বলল, তাই বল, আমি ভাবলাম সুদীপ্তার ব্যাপার না হয়।

সুদীপ্তা তাদেরই ক্লাসের মেয়ে। মাসখানেক আগে একজন নবাগত শিক্ষকের অবাঞ্ছিত মনোযোগ লাভ ক'রে খ্যাতি অর্জন করেছিল।

একটি অতি দীর্ঘ মিনিট অতিবাহিত হবার পর মিলি জলের মধ্যে ঢিল ফেলতে সুরু করেছিল। সুরজিত ত আমাদের বলল যে, প্রত্যেকটি ঢিল তার একেবারে গভীরে গিয়ে পৌঁছেছিল। একটি, দু'টি, তিনটি, চারটি—ঠিক পাঁচটি ঢিল এইভাবে ফেলবার পরে মিলি উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, আচ্ছা, আজ আমি একলাই চলি জিতু। কাল মণিমালাদের ওখানে সকালে দেখা হবে।

মণিমালাদের বাড়ী অবশ্য সুরজিত তার পরদিন যায় নি। বিকেলেও না—আর কোনও দিনই না। তার কারণ সুরজিতের একটি ছোট্ট অভিজ্ঞতা।

সেদিন মিলি চ'লে যাওয়ার সময়ে সুরজিত নেহাৎ অভ্যাসের বশেই উঠে দাঁড়িয়ে মিলির সঙ্গে দু'চার পা এগিয়ে গিয়েছিল। তার পরেই মিলি চ'লে গেল তার চটির খস্ খস্ শব্দে সমস্ত সন্ধ্যাটির বুকে বিদ্রূপের রেশ রেখে। ঠিক এ ধরণের পরিস্থিতিকে কি ভাবে নিজের আয়ত্তে আনতে হয় তা সুরজিতবাবুর জানা ছিল না। তিনি কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন। তার পরে আবার ব'সে প'ড়ে ভাববার চেষ্টা করলেন যে, কি কি কথোপকথন তাদের মধ্যে হয়েছে। অর্থাৎ এমন কিছু হয়েছে কি না যার জন্যে মিলি সত্যিই চটে যেতে পারে। ভেবে-চিন্তে কিছুই কূলকিনারা হ'ল না। কারণ মিলির চিন্তাধারার প্রকৃতিটাই তার অজানা ছিল। কাজেই শেষ পর্যন্ত সুরজিত ঠিক করল যে, অবিলম্বে একদফা মাপ চেয়ে রাখাই নিরাপদ্। তাতে অন্ততঃ ভবিষ্যতের পথটা বন্ধ হবার সম্ভাবনা নেই।

এস. ডি. ও-র বাড়ীটা বেশ খানিকটা পথ। লক গেটের উপরে এসে থমকে গেল এইজন্যে যে, বাড়ীটা অন্ধকার। বুকের মধ্যেটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেল। হঠাৎ মনে পড়ল আজ ত সার্কিট হাউসে বড় পার্টি আছে এবং মিলি ত সেখানে যাবে না। প্রায় এক ছুটে লন পেরিয়ে ঝিমন্ত কুকুরটাকে চকিত আদর ক'রে বারান্দার প্রান্তে মিলির ঘরে ঢুকতে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। অন্ধকার ঘর। শুধু কিশোরী চৌকিটার উপরে চাঁদের

আবছায়া আলো এসে পড়েছে। মিলির শাড়ী আর চাঁদের আলোয় রচিত মায়াময় পরিবেশেও কিন্তু সে মুগ্ধ হতে পারল না। চৌকির শিয়রের কাছে কি ও আর্দালী চিন্ত?

আহত পশুর মতন ফোঁপাতে ফোঁপাতে দৌড়ে বেরিয়ে এল সুরজিত। শুধু মিলির কাছ থেকেই নয়, তার ভাষায় বলতে গেলে বাল্যজীবনটার থেকে, মেয়েদের প্রতি সকল আকর্ষণের গণ্ডি থেকে, আর এখনও নাকি সে দৌড় শেষ হয় নি।

ঠাণ্ডা কফিটা এক চুমুকে শেষ ক'রে একটা ঢোঁক গিলে অনিমেষ দুই কনুই ছোট টেবিলটার উপর রেখে সুরজিতের চোখে চোখ রেখে বলল, এই ত তোমার গল্প? সুরজিত একটু ম্লান হেসে একবার আড়চোখে নির্মলের দিকে তাকিয়ে বলল, আমারই গল্প, তবে বললি আমার চাইতে ভাল। আজকে তোর মুখে আমার গল্পটা শুনে আবার নতুন ক'রে মনে হচ্ছে মিলি কি চেয়েছিল? ওর কোন্ রূপটা সত্যি? রুচিবাগীশ তার্কিক মিলি, না সেদিন সন্ধ্যেবেলায় তার যে চেহারা আমার কাছে ধরা পড়েছিল সেইটা? নাকি সবটাই তার অভিনয়?

অনিমেষ অপ্রস্তুত ভাবে হেসে বলল, বাজে কথা রাখ্। আসল কথা হচ্ছে তুই একটা ইডিয়ট। আমি যদি হতাম—

নির্মল এতক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে ব'সে ছিল। একটু ন'ড়ে ব'সে অনিমেষকে বাধা দিয়ে বলল, তুই হলে কি করতিস তা জল্পনা না ক'রে তোর নিজের একটা গল্প বল্। মনটা বড্ড ভারী ক'রে দিয়েছিস পরের গল্প ব'লে।

একটুও না দমে অনিমেষ বলল, আমি হ'লে দুই থাবড়া দিয়ে আর্দালী ব্যাটাকে বার ক'রে দিয়ে শ্রীমতী কাব্যদেবীকে একটু যুক্তির পথ দেখাতাম। আরে, হাজার হলেও বয়সে ছোট ত? দরকার হ'লে তাঁকেও আচ্ছা ক'রে একটা দুটো চপেটাঘাত করতে কুণ্ঠিত হতাম না। কিন্তু সে যাই হোক, তুই যা বললি তাই ঠিক। নিজের গল্পই বলি।

নির্মলই ত বলল যে, আমার রোমান্সের কাহিনী কলকাতার যে কোনও আড্ডায় গেলেই শোনা যায়। আমার ভারী ইচ্ছে করে, ওরা সব কি বলে তা শুনতে। আমি ঠিক জানি না, তবে মনে হয়, আমার সম্বন্ধে বিরূপ কথাই সব বলে। বোধ হয় ভাবে, স্থূল ব্যাপার ছাড়া আর কিছুতে আমার আগ্রহ নেই। সত্যি কথা কি জানিস? ওটাও আমার খুব দরকার। এত হাই প্রেশারে কাজ করি যে, ওটা খুব একটা হাল্কা আনন্দ হিসেবেই নেবার চেষ্টা করি। তা না হ'লে ত চল্লিশ পেরোতে না পেরোতেই থ্রম্বোসিসের কথা ভাবতে হবে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে, ওর মধ্যেও কেমন যেন এক-একটা সিরিয়াস ব্যাপার ঘ'টে যায়। এত সিরিয়াস হয়ে পড়ে যে, দু-তিন-চার সপ্তাহ না কাটলে কেমন যেন ধাতস্থ হতে পারি না।

গত বছর জানুয়ারীতে থ্রি হানড্রেড ক্লাব-এ একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। নামটা তার বলব না, কেননা সেটা নিরাপদ্ হবে না। তবে তোরা হয়ত আঁচ করতেই পারবি। যাই হোক, মেয়েটির খ্যাতি শুনেছিলাম যে, ছেলেদের নাচিয়ে দিতে অসাধারণ পটু। আমার একটু পাল্লা দেওয়ার ইচ্ছে জেগেছিল, নাচাতে আমিও একটু-আধটু পারি। প্রথম দিন থেকেই, মানে প্রথম সন্ধ্যা থেকেই কিন্তু সে আমাকে ঘোল খাইয়ে দিল ভাই। কেমন যেন নেশার ঘোরে কাটল মাস কয়েক। প্রচুর পয়সা, সময় এবং শান্তির বিনিময়ে বাঁদরীটার মন পাবার চেষ্টা করলাম। আর কিছু পেলাম, কিন্তু মনটা পেলাম না।

নির্মল ব'লে উঠল, মন ব'লে কোন পদার্থ তার ছিল ত ঠিক?

অনিমেষ হো হো ক'রে হেসে উঠে বলল, দেখ্, না হয় আঙুর নাই পেলাম, তাই বলে আঙুর টক ব'লে নিজেকে বোকা বোঝাব কেন? যাক্‌গে, ভদ্রমহিলাটি ত আমাকে নিয়ে যথেষ্টই খেললেন। তার পরে এক দিন বিধাতার সদয়মুহূর্তে তিনি দিল্লীতে একটা 'এম্‌ব্যাসীতে' কাজ নিয়ে কলকাতা ত্যাগ করলেন। আমিও প্রচণ্ড প্রেম-জ্বরের পরে আরোগ্যের পথে যাত্রা সুরু করলাম। মনে মনে দারুণ প্রতিজ্ঞা করলাম যে, এসব এবার ছাড়ব।

আগস্ট মাসে আমাদের অফিসে চাকরি নিয়ে এল মিসেস কাপুর। ইন্টারভিউ নেবার সময়ে খুব কিছু বিশেষ ব'লে মনে হয় নি। কোনও গহনা নেই। হাতে ষ্টিলের ঘড়ি। একটা ফলশাই রঙের শাড়ী আর বেগুনে রঙের জামা পরা। পায়ে একজোড়া নাগ্‌রা। হাঁটা, চলা, কথাবলার মধ্যে স্টেনোগ্রাফারদের মতন চট্‌পটে খট্‌খটে ভাবের বেশ অভাবই আছে ব'লে মনে হ'ল। মাথার চুলটা বব্ না করা থাকলে স্নিগ্ধ কোমল স্বভাবের একটি

বাঙালী তরুণী ব'লে ভুল হ'ত। আগেকার কোনও অভিজ্ঞতাও নেই; আমরা হয়ত বাদই দিয়ে দিতাম। কিন্তু স্মিথ সাহেব তার ধীর ইংরেজী শুনে আর বিলিতি রেফারেন্স দেখে খুব ঝুঁকে পড়লেন। ফলে তার পরদিন থেকেই মিসেস কাপুর এসে আমাদের হাজিরা খাতায় নাম সই করলেন।

আমার স্টেনোগ্রাফার টাইফয়েডে পড়েছিল। আমি একে-ওকে দিয়ে কাজ করাচ্ছিলাম। স্মিথ সাহেব ট্রেড ডেলিগেশনের মেম্বার হয়ে বিদেশ পাড়ি দিতে আমি কাপুরকে ধ'রে নিলাম। অক্টোবর মাসে পনেরো দিনের ছুটি মঞ্জুর করিয়েছিলাম। কাজেই তার খেসারৎ স্বরূপ গোটা সেপ্টেম্বর মাসটা ডবল খাটুনি চলছিল। তার উপর আমার লোকজনের মধ্যে জনকয়েক ছুটি নিয়েছিল অসুখ-বিসুখের দরুণ। কিন্তু দু'চার দিনের মধ্যেই মিসেস কাপুর কেমন যেন সহজ সরল ভাবে আমার কাজকর্মের মধ্যে একটা ছন্দ এনে দিল। স্টেনোগ্রাফার হিসেবে যে আমার ডিস্‌স্থজার চাইতে সে ভাল তা মোটেই নয়। কিন্তু আমার সেই সব জটিল কাজকর্মের মধ্যে যেন পুরুষালী পটুতা নিয়ে ঢুকে গেল। নিজের অজ্ঞাতসারেই তার উপর অনেকটা নির্ভর করতে সুরু করলাম। অথচ তার ব্যবহারের মধ্যে পুরুষালী যে বিন্দুমাত্র কিছু ছিল তা নয়।

একদিন অফিসের ছুটির পরে ব'সে কাজ করছি। মিসেস কাপুর আমার জন্যে চা ক'রে নিয়ে এলেন। আমি অন্যমনস্ক ভাবেই বললাম, তোমার জন্যেও একটা পেয়ালা নিয়ে এস। মৃদুস্বরে 'ধন্যবাদ' ব'লে সে বেরিয়ে গেল। প্রায় তার পিছন পিছনই আমি বেরিয়েছি টয়লেটে যাব ব'লে। দেখি লম্বা হলে সারি সারি চেয়ার-টেবিল খালি প'ড়ে রয়েছে, টাইপরাইটারগুলো ঢাকা পরানো পরানো। একেবারে শেষ প্রান্তে জন কয়েক পিয়ন ব'সে নিজেদের মধ্যে কি প্রাইভেট মিটিং করছে। মোটের 'পরে কেমন যেন একটা বিষণ্ণ অথচ গা-ছমছমে আবহাওয়া। সত্যি বলছি ভাই, তোরা সব কবিতা-টবিতা লিখিস্, আমার ত ওসব আসেই না। তবু অনেক সময়ে ভাবি, যদি কেউ একটা কবিতা লিখত কিম্বা ছবি আঁকত সন্ধ্যেবেলা বড় কোনও অফিসের হলটাকে নিয়ে ত একটা দারুণ ব্যাপার হ'ত।

যাই হোক, এমনি একটা ব্যাকগ্রাউণ্ডে মিসেস কাপুর দেখি আমার কামরা পেরিয়ে যে জানলাটা, তার ধারে একটা চেয়ারের পিঠটা দু'হাতে ধ'রে চুপ ক'রে বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সে এমন একটা চুপ ক'রে থাকা যে তোরা ভাবতে পারবি না। মনে হ'ল, যেন শুধু তার শরীরটাই নয়, যেন সমস্ত মনটা একেবারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কার প্রতীক্ষায়। আমার দিকে পাশ ফিরে—তার profile-টা আমার মনের মধ্যে আগুনের মতন ছাপ এঁকে রেখে গেল চিরদিনের জন্যে। আমার বুকের মধ্যেটা কেমন ক'রে উঠল। আমার মনে হ'ল এভাবে দাঁড়িয়ে এরকম কিছু একটা দেখবার অধিকার আমার নেই। তাড়াতাড়ি টয়লেটে ঢুকে একটা সিগারেট ধরালাম একটু ঠাণ্ডা হবার জন্যে।

মিনিট তিন-চার বাদে ঘরে ফিরে এসে দেখি মিসেস কাপুর এর মধ্যে ফিরে এসেছে। আজও জানি না সে বুঝতে পেরেছিল কি না যে, আমি তাকে ঐ রকম একটা অসতর্ক মুহূর্তে দেখে ফেলেছিলাম। তবে তার ব্যবহারে হঠাৎ যেন কেমন একটা পরিবর্তন এল সেদিন থেকে। আমি ঘরে ঢুকেই অনুভব করেছিলাম যে, সে যেন একটু অন্য রকম, একটু যেন কাছে এগিয়ে এসেছে। এতদিন তাকে বিশেষ লক্ষ্য ক'রে দেখি নি। সাধারণ সুশ্রী মেয়েদের সম্বন্ধে যেমন একটা সচেতনতা থাকে তেমনি ছাড়া আর কিছু বিশেষ মনোভাব আমার ছিল না। হঠাৎ যেন আবিষ্কার করলাম, তার কপালটা কি মসৃণ, যেন পুরাণো হাতীর দাঁত, ভুরু দু'টি তাদের নাতিসূক্ষ্ম রেখা দিয়ে অতি দীর্ঘ পল্লবগুলিকে যেন সযত্নে আগলে রেখেছে, চোখ দু'টি সন্ধ্যার আকাশের মতন আগুনের আভাস বুকে রেখেও যেন কোন অনির্দিষ্ট বেদনায় করুণ। নাকটি মোটেই টিকোলো নয় কিন্তু তাতেই যেন ব্যক্তিত্বের এক উজ্জ্বল প্রকাশ। ঠোঁট দু'টি পুরু, sensuous, ঈষৎ প্রসাধনের আমেজে আরও চিত্তাকর্ষক।

নির্মল স্তম্ভিত হয়ে শুনছিল। ব'লে উঠল, সাবাস্ কম্‌রেড! তুমি যে সুরজিতকেও মেরে দিলে ভাই!

অনিমেষ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে কটূক্তির সঙ্গে একটা সিগারেট ধরিয়ে জোরে জোরে টানতে লাগল। সুরজিত দু'মিনিট অপেক্ষা ক'রে একটু শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় বলল, কেন ওর পিছনে লাগছিস্? তুই বল্ অনিমেষ।

নির্মল হেসে ফেলে বলল, তুই চটছিস্ কেন? তোর মধ্যে যে এত সুপ্ত প্রতিভা ছিল তা জানতাম না, তাই আমার স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ময় প্রকাশ করছিলাম। বিদ্রূপ ত আর করি নি? অনিমেষ একটু নরম হয়ে বলল,

দাঁড়া আর একটু কফি আনানো যাক্‌, আজ বেশ জমিয়ে বসা গেছে। এখানে ব'সে এতক্ষণ ধ'রে আড্ডা আমাদের বোধ হয় তিন-চার বছরের মধ্যে হয় নি।

সুরজিত বাধা দিয়ে বলল, তোর গল্প বল্‌।

অনিমেষ একটু অপ্রস্তুত ভাবে হেসে বলল, ওসব সেন্‌টিমেণ্ট বাদ দিয়েই বলি ভাই—শুধু প্লটটুকু আর কি।

সেপ্টেম্বর মাসটা কাটল আমার খুব ব্যস্ততার মধ্যে। সকাল থেকে ডুবে থাকতাম কাজে। দুপুরে খেতামও হয়ত ঘরে ব'সে। সন্ধ্যেবেলায় বেরিয়ে পড়তাম মিসেস কাপুরের সঙ্গে। ও থাকত একা একটা ঘর নিয়ে লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের একটা ছোট হোটেল মতন বাড়ীতে। কোনও কোনও দিন অফিস থেকে বেরিয়ে আগে যেতাম ওর ঘরে। হয়ত ও কাপড় বদ্‌লে নিত। কোনও দিন বা অনেক ঘুরে রাত ক'রে ফিরতাম ওর আস্তানায়। অনেক—প্রায় ছ-সাত-আটজন মেয়ের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছি কিন্তু এরকম শান্তি কখনও পাই নি। ওর পারিবারিক কথা কখনও বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা করি নি। শুধু একদিন জানতে চেয়েছিলাম, তোমার স্বামী কি বেঁচে আছেন? তাতে হঠাৎ কেমন তীক্ষ্ণভাবে আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করেছিল, তাতে কিছু কি যায় আসে?

আমি ভয়ানক অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম। আর কোনও দিন ঐসব ব্যাপার নিয়ে অনধিকার চর্চা করতে যাই নি। আর তা ছাড়া এরকম ধরণের ভেসে-বেড়ানো মেয়ে ত কলকাতা শহরে কিছু অপরিচিত নয়। মিসেস কাপুর অবশ্য যেসব ধরণের রেফারেন্স দিয়েছিল আমাদের চাকুরিতে ঢোকার সময়ে, তাতে তাকে একেবারে হেঁজিপেঁজি ব'লে মনে হয় নি। তবে যাই হোক, ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনও ইচ্ছে ছিল না আমার।

দিনগুলো কাটছিল খুব দ্রুত গতিতে। পয়লা অক্টোবর থেকে আমার ছুটি। তিন দিনের জন্যে যাব দেশের বাড়ীতে। চৌঠা কলকাতা ফিরে সেদিনই মাদ্রাজ মেলে রওনা হব গোপালপুরের দিকে। সাতাশ আটাশ তারিখ থেকেই আমার মনটা ভয়ানক খারাপ লাগছিল, ক'দিন মিসেস কাপুরের সঙ্গে দেখা হবে না। তা ছাড়া অফিসের আবহাওয়াটাও যেন কেমন সুবিধার ব'লে মনে হচ্ছিল না। আমি খুব আশা করেছিলাম, ও আমায় কিছু বলবে। কিন্তু সে একেবারেই যেন তার normal self—কোনও আসন্ন বিরহ ব্যথার ছাপ তার মধ্যে দেখা গেল না।

তিরিশ তারিখটা আমার কাছে একেবারে অসহ্য ব'লে মনে হতে লাগল। ম্যাক্সিম থেকে শেরাজাডে; শেরাজাডে থেকে স্পেন্সেস, স্পেন্সেস থেকে আবার ফিরে প্রিন্সেস সেরে যখন বেরোলাম তখন আমি যে আমি সেও আর দাঁড়াতে পারছি না। লাষ্ট রাইড টুগেদারের লাইনগুলো যা দুটো-একটা মনে ছিল তাই বলবার চেষ্টা করছিলাম আর ও আমাকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করতে করতে খালি হাসছিল আর ফাজলামি করছিল। হ্যাঁ, তোদের ত একটা কথা বলা হয় নি। ড্রিঙ্ক ও করত না। নেহাৎ পেড়াপীড়ি করলে একটু শেরী হয়ত চাখত। কাজেই ও সম্পূর্ণ সুস্থ আর আমি সম্পূর্ণই অসুস্থ। এমনি অবস্থায় ওর বাড়ী যখন পৌঁছলাম তখন আমার অবস্থা অত্যন্ত করুণ। এতক্ষণ আমি আশা করছিলাম, ও আমায় বিদায় সম্ভাষণ কিছু করবে। এখন আমার সব আশাই প্রায় রাতটার মতনই ফুরিয়ে এল। কিন্তু মিসেস কাপুর ত কিছু একটা অভাবিত ব্যাপার করবেই। সে হঠাৎ ড্রাইভারকে ব'লে বসল, রহমান, তুমি গাড়ি গ্যারাজ ক'রে দাও, সাহেবকে আমি ট্যাক্সি ক'রে পৌঁছে দেব।

আমাকে ত সযত্নে ওপরে ওঠান হ'ল। আমার তখন আশায় আশঙ্কায় এক নিদারুণ অবস্থা। আবহাওয়াটাকে তরল করবার জন্যে বললাম, আজি রজনীতে হয়েছে সময় এসেছি বাসবদত্তা।

ব'লেই ভাবলাম, অবস্থাটা ঠিক উল্টো, বাসবদত্তা ফ্ল্যাট না হয়ে উপগুপ্ত বেচারীই আজকে ফ্ল্যাট! ভেবেই এমন হাসি পেল যে, পাড়ার লোক জেগে যাওয়ার অবস্থা। কোনও রকমে হাসি থামিয়ে দেখি, ও এক অপরূপ হাসি ঠোঁটে টেনে ব'সে আছে। আমি আর পারলাম না। তার চেয়ারের পাশে মাটিতেই ব'সে প'ড়ে তার হাতটা ধ'রে বললাম, আজ আমাকে মাপ কর, আজ আর আমার কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই।

ও বলল, সত্যিই আজ তোমাকে অন্যরকম লাগছে। কেন, তোমার কি হয়েছে?

আমি বললাম, কাল থেকে আমি ছুটিতে যাচ্ছি—দীর্ঘ পনেরো দিন। তার পরে ত দিল্লীতে প্রোভাকুটিভিটি

আমি বললাম, কি দেবে ?
সে জানতে চাইল, কি চাও ?

কাউন্সিলের সেমিনার, তার পরে যদি স্মিথ সাহেব না ফেরে ত জাপান যেতে হবে। এতদিন তোমায় না দেখে থাকব কি ক'রে ?

ও একটু ম্লান হেসে বলল, তোমার ত শুনলে খারাপ লাগবে, কিন্তু আমারও স্বার্থের ক্ষতি হয়েছে তোমার এই বেরিয়ে যাওয়ার প্ল্যানে।

খারাপ লাগা ত দূরের কথা। আমার ভয়ানক রাগ লেগে গেল। আমি ব'লে উঠলাম, তোমার জন্যে কিছু কি করতে পারি আমি ?

ও একটুক্ষণ চুপ ক'রে রইল।

—সেই রকম চুপ ক'রে থাকা, যেন ওর সমস্ত অতীত অভিজ্ঞতা, বর্তমান অস্তিত্ব এবং ভবিষ্যৎ আশাটুকুকে নিজের মধ্যে শামুকের মতন গুটিয়ে নিয়ে সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে পাঁচিল তুলে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার পরে

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বোধহয় এইই ভালো। তাতে খারাপ হ'তে পারে এই যে, তুমি আমার উপরে শ্রদ্ধাটুকু হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু at all যে তোমার শ্রদ্ধা আছে আমার উপরে তাই বা কি ক'রে জানব?

আমি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম। সে মৃদু হেসে আমাকে নিরস্ত ক'রে বলল, আগে আমার কথাটা শোনো। আমি তোমার কাছ থেকে কিছু টাকা চাই। আমার কাছে তা অনেক টাকা—দু হাজার চার শো টাকা। আরও আট শো টাকা আমার দরকার, সেটা আমি জমিয়ে ফেলেছি, কাজেই তোমার কাছ থেকে নিতে হবে না। কিন্তু টাকাটা চাই আমার খুব তাড়াতাড়ি। তা সে যে ক'রেই হোক। যদি না পাই তোমার কাছ থেকে ত আর কিছু উপায় ভাবতে হবে।

আমি প্রকাণ্ড হাঁফ ছেড়ে বললাম, এই কথা?

আমার তখন এমন অবস্থা যে ও আমাকে বিয়ে করতে চাইলেও বোধ হয় রাজি হয়ে যেতাম! ওরই সাহায্যে একটা চেক্ লিখে ওর কাছ থেকে একটা পুরাণো খাম চেয়ে নিয়ে তার মধ্যে ক'রে ওর হাতে দিয়ে বললাম, এবার খুশী?

ও খামটা হাতে নিয়ে প্রথমে টেবিলের উপর রাখল। তার পরে নিজের হাতব্যাগটা খুলে তার মধ্যে রেখে দিয়ে একটুক্ষণের জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ফিরে এল যখন, তখন আমার মাথাটায় আরও ঝিম্ ধ'রে এসেছে। সমস্ত ঘটনাটাই যেন আমার কাছে কেমন মাদকতাময় লাগছিল। মেয়েদের প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে টাকা দেওয়ার অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বেও হয়েছে, কিন্তু এরকম তৃপ্তি যেন পাই নি। ও ঘরে ঢুকে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, অনিমেষ, তোমায় কিন্তু ঐ টাকাটা হয়ত কোনও দিনই ফিরিয়ে দিতে পারব না।

আমি বললাম, তাতে কি কিছু যায় আসে?

সে আমার কথাটা না শুনেই বলল, কিন্তু প্রতিদানে তোমায় কিছু দিতে চাই।

আমি বললাম, কি দেবে?

সে জানতে চাইল, কি চাও?

আমি এরকম অবস্থায় সচরাচর একটি চুমুর আশা প্রকাশ ক'রে থাকি। কিন্তু সে আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, ছোট কিছু চেও না। আমার কাছে টাকাটা অনেক। বেশী ক'রে কিছু চাও।

নেশার জোরে জোর বেড়ে গিয়েছিল আমি বললাম, আমার সঙ্গে গোপালপুর চল, চল একটু হৈ হৈ ক'রে আসা যাক।

হঠাৎ পৃথিবীটার ভারসাম্য টলে গেল। ও আমার মাথাটাকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে দুটো, তিনটে, চারটে চুমু খেয়ে বলল, দেব তোমাকে যা চাও, আমার মাণিক।

পরেকার ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত। একেবারে হাক্সলীর নভেলের মতন। দশটা দিন পেয়েছিলাম তাকে। আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে, ওরকম দশটা দিন পৃথিবীতে আর কোনও মানুষের জীবনে কখনও এসেছে। কিন্তু সব চাইতে অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, দশদিন বাদে ও এল কলকাতার পথে, আর আমি গেলাম দিল্লী। আসার সময়ে ছোট্ট ক'রে শুধু জিজ্ঞাসা করল, আমি খুশী হয়েছি কি না।

দিল্লীতে আমার কাছে একটা চিঠি এল, সেদিন তোমার মহত্ত্ব দেখে আমি সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আমার আশঙ্কা ছিল যে, তুমি বোধ হয় আমাকে বিয়ে করতে চাইবে। তা হ'লে সেটা ভণ্ডামি হ'ত। কিন্তু তুমি যে অমন সহজ ভাবে আমার কাছে quid pro quo চাইলে তাতেই মুগ্ধ হলাম। আশা করি তুমি খুশীই হয়েছ। আজ আমার রেজিগ্‌নেশন পাঠিয়েছি অফিসে। তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে কি না জানি না, তবে তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রইল।

—কি কাণ্ড বল ত? এমন কখনও দেখেছ? আমাকে যদি ভালই বাসবে ত অমন ক'রে চ'লে যাবে কেন, আর যদি চ'লেই যাবে ত অত ভালবাসবে কেন? না কি সবটাই তার অভিনয়—আসলে সে-ই দিয়ে গেল quid pro quo আমার টাকার বিনিময়ে, আসলে তার টাকারই দরকার ছিল?

নিচের হলের কোলাহল থেমে এসেছিল। একটা একটা ক'রে আলো নিভছিল। সবাই যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। কেমন একটা এ্যান্টি ক্লাইম্যাক্সের আবহাওয়া এসে পড়েছিল। সুরজিত বলল, এবার ওঠা,

যাক। সকলেই যেন উঠে প'ড়ে বাঁচল। কিন্তু কাহিনীটা এখানেই শেষ হওয়ার কথা ছিল না। হঠাৎ নিচে যেন কেমন একটা গুঞ্জন উঠল। গুঞ্জন এগিয়ে এসে প্রায় একটা কোলাহলে পরিণত হ'ল। অনেক মূল্যবান্ সুগন্ধ ছড়িয়ে চোখ ঝলসান একটি তরুণী এসে ঢুকলেন ব্যাল্কনিতে। পিছনে ব্যতিব্যস্ত চেহারার এক সুবেশ ভদ্রলোক, কয়েকটি ওয়েটার এবং দশবারোটি কৌতূহল-রোগাক্রান্ত যুবক।

নির্মলই প্রথম ব্যাপারটা বুঝতে পারল। বলল, নিশ্চয়ই ফিল্ম-ষ্টার।

পাশে এসে দাঁড়ানো ওয়েটারটি ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল, হ্যাঁ স্যার, নামটা ভুলে গেছি, ওঁরই ত একটা ছবি—

অনিমেষ হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে ইংরিজিতে বলল, মিসেস কাপুর তুমি কোথা থেকে উদয় হ'লে?

ভদ্রমহিলা প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। একটু সময় লাগল মনোযোগটিকে কেন্দ্রীভূত করতে অনিমেষের উপরে। তার পরেই হঠাৎ উচ্ছ্বসিত ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাত দিয়ে অনিমেষের বাড়িয়ে-ধরা হাতটি ধ'রে ব'লে উঠলেন, আরে সরকার সাহেব! মানে অনিমেষ। তুমি এখানে কোথা থেকে? তোমার সঙ্গে ত কতদিন দেখা হয় নি। এখানে কি তুমি আস? আমার এই বড়লোক বন্ধুটি দেখ না ক্রমাগত আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করছে যে এসব জায়গায় ভদ্রলোকে আসে না। এস, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই—শ্রীযুক্ত অনিমেষ সরকার, বেঙ্গল ষ্টীলের জেনারেল ম্যানেজার। আর শ্রীযুক্ত দ্বারকাপ্রসাদ ওঝা, ওয়েষ্টার্ণ মুভিটোনের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

দ্বারকাপ্রসাদ প্রথমে স্পষ্টতঃই বিরক্ত হয়েছিলেন। তার পরে পরিষ্কার বাঙলায় বললেন, অনিমেষ সরকারকে আমি চিনি। আমরা পোষ্ট গ্র্যাজুয়েটে একসঙ্গে পড়েছি। ও অবশ্য পরীক্ষা দেয় নি।

অনিমেষ একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলল, আমার বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই—শ্রীযুক্ত নির্মল রায় এম. এল. এ., আর ইনি অধ্যাপক সুরজিত মুখার্জি।

ভদ্রমহিলা বিস্মিত হয়ে বললেন, তোমরা সকলেই কি ক'রে সকলকে চিনলে? তাঁর গলায় বাংলা শুনে অনিমেষ একেবারেই হতভম্ব হয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে পড়ল। সুরজিতই জবাব দিল। বলল, অনিমেষ আর আমি বোধ হয় থার্ড ইয়ার থেকেই একসঙ্গে পড়ছি, আর নির্মল এল আমাদের সঙ্গে 'ল' ক্লাসে, কিন্তু তোমার মিলিত্ব ঘুচে কাপুর জুটল কবে?

বিচলিত নির্মলও যেন বিদ্রূপের মধ্যে ভরসা খুঁজে পেল। বলল, তুমি এতদিনে তোমার নিজের লাইন খুঁজে পেয়েছ শ্যামলী। আজকে বুঝতে পারছি, সেই অপদার্থ চিরঞ্জীবের চুরি করা টাকা পার্টি ফাণ্ডে কি ক'রে কোথা থেকে ফেরত দিয়েছিলে। তবে অত কষ্ট ত না করলেও পারতে। অনিমেষের চাইতে অনেক সহজে টাকা পেতে পারতে ফিল্ম প্রোডিউসারদের কাছ থেকে। কত অভিনয়ই ত করলে জীবনে, তোমাকে মারে কে?

সুরজিতের মুখটা অনভ্যস্ত রাগে লাল হয়ে উঠল। সে তীব্রভাবে ব'লে উঠল, নির্মল!

মিলি ওরফে শ্যামলী ওরফে মিসেস কাপুর হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, কিন্তু তোমরা জান না, বম্বেতে ইতিমধ্যেই আমার নাম ছড়িয়ে পড়েছে খারাপ অভিনেত্রী ব'লে। প্রথমে ওরা সবাই ঝুঁকেছিল আমার দিকে আর এখন ওঝা নিজে এসেছে, পারলে বাংলা দেশের কন্ট্রাক্ট জোগাড় ক'রে দিতে।

ওঝা আর অনিমেষ স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল।

নিঃসঙ্গ

আশাপূর্ণা দেবী

স্কুলের মধ্যে একদিন রাস্তায় দেখা হয়ে যাওয়ায় আগ্রহ ক'রে বাড়ীতে ডেকে এনেছিলাম। সামান্য সেই ভুলের ক্ষ চারাটুকু যে এমন একখানি 'অক্টোপাস লতা' হয়ে উঠবে তা কে ভেবেছিল?

ওটুকু আগ্রহ কে না দেখায় অনেক দিন পরে হঠাৎ কোথাও পুরনো টিচারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে?

সত্যি বলতে—সেদিন আগ্রহের মধ্যে কোনও খাদ ছিল না। বাস্তবিকই ভারী আনন্দ হয়েছিল অপ্রত্যাশিত ভাবে রেখাদির সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায়। অনেক দিন সংসার ক'রে-আসা এই 'বর্ত্তমান-সন্তুষ্ট' মন কেমন যেন উতলা হয়ে উঠেছিল সেই অনির্ব্বচনীয় পুলক স্বাদে-ভরা অতীত দিনগুলিকে স্মরণ ক'রে। ছাত্রজীবনের চাইতে সুখের আর কি আছে?

রেখাদিকে তক্ষুণি পথের ভীড়ে হারিয়ে যেতে দিতে ইচ্ছে হয় নি। ডেকে এনে আদর অভ্যর্থনা ক'রে ঘুরে ফিরে দেখিয়েছিলাম নিজের ঘর-বাড়ী। এমন কি রেখাদি আমার রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘর পর্য্যন্ত দেখলেন।

অবশ্য এতে আমার আনন্দ বৈ লজ্জা পাবার কিছু হয় নি। কারণ কোথাও কিছু অগোছালো থাকে না আমার। পরিচিত মহলে আমার ঘর-সংসারের 'পরিপাটিত্ব' সম্পর্কে বেশ একটু সুনাম আছে।

মিথ্যে বলব না, নিজের মনেও একটু গোপন গর্ব্ব ছিল আমার এই ছবির মত ছোট্ট বাড়ীটি ও গৃহসজ্জার রুচি নিয়ে।

দেখলাম রেখাদির বয়সের রেখাঙ্কিত মাংসল আর প্রায় ভাবশূন্য মুখটাও খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

বার বার বলতে লাগলেন, 'ভারী ভাল লাগল মিনতি, তোমার বাড়ী দেখে। খুব খুশী হলাম।'

বললেন, 'শীলাকে মনে আছে তোমার? সেই যে মুখে পক্সের দাগ? তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল একদিন।' হঠাৎ একটু থামলেন রেখাদি। একটু যেন ক্ষুব্ধ হাসি হাসলেন। হেসে বললেন, 'তোমার মত আগ্রহ করে নি, আমি এক রকম নিজেই জোর ক'রে—তা' বাড়ী দেখে ভাল লাগল না। বুঝলে? একেবারে সাজানো নয়। অথচ অবস্থা খারাপ নয়। চোখ চাই, রুচি চাই, বুঝলে মিনতি।'

তা এ সেই প্রথম দিনের কথা।

যেদিন আগ্রহ ক'রে বাড়ীতে ডেকে এনেছিলাম রেখাদিকে। বলেছিলাম, 'কি আশ্চর্য্য, আপনি এত কাছে—'

তার পর আর ডাকতে হয় নি।

দিন দুই পরেই একবার এসেছিলেন। একটু অপ্রতিভ অপ্রতিভ হেসে বলেছিলেন, 'এলাম আবার। যাচ্ছিলাম এই দিক্ দিয়ে—'

আমি প্রথম দিনের মতই আগ্রহ দেখালাম। বললাম, 'সে কি, সে কি! আসবেনই ত। এত কাছে রয়েছেন যখন। না এলে নিজেই গিয়ে ধ'রে আনতাম।'

ভদ্র সমাজে অতিথিকে যেমন বলতে হয় তা বলেছিলাম। বাড়ীর অন্য সদস্যরা অবশ্য এখন বলছে, 'একটু বেশী বলা হয়ে গিয়েছিল।'…বলছে, 'এতটা বাড়াবাড়ি না দেখালেই হ'ত।' বলছে, 'এখন নিত্য আবির্ভাবের ঠেলা সামলাও।'

কিন্তু অনেকদিন সংসার ক'রে-আসা পুরনো হয়ে-যাওয়া মন, হঠাৎ পুরনো টিচারের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায়, সেই হারানো দিনগুলি স্মরণ ক'রে এটুকু উল্লাস দেখাবে না?

তখন কে জানত, রেখাদির প্রৌঢ়-কুমারী-মন অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় যে কোনও একটা সংসার আশ্রয় হাতড়ে বেড়াচ্ছিল।

সেই আসার পর থেকেই—

আমার বাড়ীর নিত্য অতিথির খাতায় নাম লেখালেন রেখাদি। যে রেখাদির সঙ্গে এ সংসারের পারিবারিক কোন সম্পর্ক নেই, হৃদয়ের কোনও যোগ নেই, পুরনো কোন পরিচয় নেই। যে রেখাদি নিতান্তই আমার একলার।

আর কেবলমাত্র 'একলার' একটা মানুষকে অন্য পাঁচজনের সংসারে আদরের আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখা কি দুরূহ!

অতএব প্রতিটি দিন সমস্তটি সন্ধ্যা আমাকে যাপন করতে হয় রেখাদির সঙ্গে। অবিশ্যি কথা আমাকে বেশী বলতে হয় না, কারণ রেখাদি বেশী কথার মানুষ নয়। আমাকে শুধু ব'সে থাকতে হয় বিনীত হাস্যমুখে, আর রেখাদি মাঝে মাঝে যে সব উপদেশবাণী বিতরণ করেন তাতে সোৎসাহে সায় দিতে হয়।

যেমন রেখাদি বললেন, 'তোমার ওই অ্যাকোয়েরিয়ামটা ঘরের এ কোণে না রেখে ও কোণে রেখো মিনতি, সেটাই বেশী মানাবে।'

আমি সবিনয়ে বললাম, 'আচ্ছা রেখাদি, কালই সরিয়ে নেব। সত্যি, বলেছেন ঠিকই। এদিক্‌টায় রাখলে আলো একটু বেশী পড়বে।'

বলা বাহুল্য সরাবার কোন লক্ষণ প্রকাশ করি না। রেখাদি পরদিন বলেন, 'কই, ওটা সরাও নি মিনতি?'

আমি চরম কুণ্ঠার অভিনয়ে বলি, 'না, হয়ে ওঠে নি। চাকরটা হয়েছে তেমনি। একটু যে সাহায্যে আসবে—'

সুখের বিষয় একটা কথা বেশীদিন মনে থাকে না রেখাদির। ততক্ষণে তিনি অন্য আর একটা কিছুতে মন দিয়েছেন। কাজেই 'লাল মাছেরা' বাহাল তবিয়তে পূর্বস্থানে বিরাজিত থাকলেও রেখাদি অক্ষুব্ধচিত্তে দু'দিন পরে বলেন, 'তোমার এই বুককেসটা কিন্তু এ দেয়ালে একেবারে অচল। এটাকে এখানে রেখেছ কেন?'

নেপথ্যে বলতে বাধা নেই, রেখাদির এই মন্তব্যে আমি মনে মনে হেসেছি। কারণ আমার ধারণায় আমার গৃহসজ্জার উপকরণগুলি আমি 'যেখানে যা সাজে', তাই সাজিয়েছি। দামী না হোক, রুচিতে সুন্দর সব উপকরণ।

তবু মুখে আমি সবিনয়ে বলি, 'আপনিও যেমন রেখাদি, কোথায় কি মানায় অত কে দেখছে? ওই বসিয়ে রসিয়ে রেখেছি এক-একটাকে এক-একটা জায়গায়।'

রেখাদি মাথা নেড়ে বলেন, 'না না, আর ত সব বেশ ভালই আছে। শুধু ওইটা! জায়গা বদ্‌লে দিও, বুঝলে মিনতি!'

আমি স্বীকারসূচক ঘাড় নেড়ে বলি, 'দেব।'

পরদিন রেখাদি বলেন, 'কই, এটা সরাও নি?'

উত্তর মুখস্থ করা থাকে, সবিনয়ে নিবেদন করি, 'ওই ভাবছি কি রেখাদি, ওটাকে একবার একটু পালিশ করতে দেব। তখন ত নাড়াচাড়া করতেই হবে—'

একটা আসবাব পালিশ করতে দেওয়ার ব্যাপারে 'ভাবনাটা' কাজে পরিণত করতে যেটুকু সময় লাগা চলে, সেটুকুর মধ্যে বুক্‌কেসের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যাবেন রেখাদি, এই ভরসা।

ছোটখাটো জিনিষ রেখাদি নিজের স্বাধীনতাতেই এদিক্‌-ওদিক্‌ করেন। আর তারিফও করেন নিজেকে। যেমন একগাল হেসে বলেন, 'দেখেছ মিনতি, তোমার এই পাথরের বুদ্ধকে কোণের টেবিল থেকে সরিয়ে এনে মাঝখানে বসিয়ে কেমন ভাল দেখাচ্ছে! এখানেই রেখ। এমন জিনিষটা, কোণে প'ড়ে থাকে, কেউ দেখতেই পায় না।'

আমাকে বলতে হয়, 'তা সত্যি !'

রেখাদি চ'লে গেলেই মেয়ে এসে ফেটে পড়ে, 'আহা হা, কি না একখানা মানিয়েছে ! এ্যাশট্রের পাশে বুদ্ধ ! বুকের ওপর বসিয়ে না রাখলে কেউ দেখতেই পাবে না। সব কথায় অমন "তা' সত্যি" ব'লে ঘাড় নাড় কেন বল ত মা ? যেন তুমি একেবারে বোকা অবোধ ! কেন, বলতে পার না, যেখানে যা মানায়, সেইভাবেই রাখা আছে, কিছু নড়াবার দরকার নেই ?'

'তাই কখনো বলা যায় ?'

ওকে আমি ব'কে উঠি।

সভ্যতা ভব্যতার যে অ, আ, ক, খ-ও শেখা হচ্ছে না ওদের তা বলি, বলি—তুচ্ছ কারণে মানুষকে আহত ক'রে কি লাভ ? আর বলি, 'ক্লাসের মধ্যে আমাকেই সবচেয়ে ভালবাসতেন রেখাদি, তা জানিস ?'

কিন্তু আমার এই গৌরবের পরিচয়ে মেয়ে যে অভিভূত হয়ে যায়, মোটেই তা নয়। বরং হেসে উঠে বলে, 'কেন বাসতেন তা জান ? সমগোত্র ব'লে। দু'জনেই ত যাকে বলে কিনা—'ব'য়ে ওকার, 'ক'য়ে আকার।'

কিন্তু মেয়ের অভিভাবক আর এখন হাসি-খুশির মধ্যে নেই, উত্তরোত্তর উত্তপ্ত তিনি। বলেন, 'ভাল এক জ্বালা হয়েছে ! সন্ধ্যেবেলা বাড়ী এসে বসবার ঘরে একটু বসার জো নেই। ঠিক দেখব তোমার আদরের রেখাদি এসে ব'সে আছেন। আশ্চর্য্য ! আর কি কোনখানে জায়গা নেই ওঁর ? তাই প্রতিদিন একই বাড়ীতে আসতে ইচ্ছে করে !'

মন্তব্যটা রূঢ়, কিন্তু মানুষটাকে খুব অভদ্র ভাবলেও আবার একটু অবিচার করা হয়। কারণ উত্তাপের কারণ সবটাই 'ঘর' নয়। প্রতিটি সন্ধ্যা যে ঘরণীও হাত ছাড়া !

গৃহাগত কর্ম্মক্লান্ত গৃহকর্ত্তার সেবাযত্নের সম্পূর্ণ ভার এখন দুহিতার ঘাড়ে। গৃহিণীর টিকিও দুর্লভ।

দুর্লভ ছাড়া সুলভ আর কি ক'রে হবে ?

রেখাদি যে প্রতি মুহূর্ত্তে বলেন, 'যাই মিনতি, অসময়ে এসে তোমার অসুবিধে ঘটিয়েছি বোধ হয়।'

অগত্যাই ত বলতে হবে আমায় 'না না, সেকি ! কিচ্ছু অসময় নয়। মেয়ে ত আজকাল সবই শিখেছে রেখাদি, আমাকে কিছু করতেই হয় না।'

সংসারের সহানুভূতির বাইরে একা কাউকে বহন করতে হওয়া কম কষ্ট নয়, তাই প্রায় রোজই রেখাদি চ'লে গেলেই মনে মনে বলি, আহা, কাল যেন রেখাদির সঙ্গে ওঁর অন্য কোন ছাত্রীর দেখা হয়ে যায়।

কিন্তু এই গোপন প্রার্থনায় অদৃশ্য লোকের কেউ কর্ণপাত করে না।

পরদিনই আবার ঠিক বিকেল পাঁচটা বাজলেই রেখাদির জুতোর খুট্‌খুট্ শব্দটি ক্রমে কানে বাজে।

আর বসবার ঘরে ঢুকে ঘরের ফ্যানটা জোরে খুলে দিয়ে ধুপ্ ক'রে ব'সে প'ড়ে ব'লে ওঠেন রেখাদি, 'আঃ ! তোমার বাড়ীটা এত ভাল লাগে মিনতি।'

বুঝতে পারি ভাল লাগাই স্বাভাবিক।

বয়স হয়েছে, অবসরপ্রাপ্ত জীবন, অথচ সংসার বলতে কিছু নেই। একটা ঝি আছে, সে-ই যা পারে করে। সারাটা দিন যা হোক ক'রে কাটলেও সন্ধ্যাটা ওই শূন্য জীবনের মাঝখানে টিকতে পারেন না। পালিয়ে আসেন ওর থেকে।

'তা' এ শূন্যতার দরকারই বা কি ছিল ?'

রেখাদির নিত্য আবির্ভাবে নিজে যিনি 'শূন্য-সন্ধ্যা'র তিক্তস্বাদে উত্তরোত্তর উত্তপ্ত, তিনি এই তীব্র প্রশ্নটি করেন, 'বিয়ে-টিয়ে, ঘর-সংসার করেন নি কেন ?'

এই তীব্র প্রশ্নের ঝাঁজ দেখে হেসে ফেলি, 'করেন নি ভাগ্যে 'বর' জোটে নি ব'লে বোধ হয়।'

'তা' সত্যি, এমন কে বর্ব্বর আছে যে, ওঁর মত নির্ব্বোধ মহিলাকে—'

'আহা, ও-কথা ব'লো না বাপু ! এখন বুড়ী হয়ে অমন বোকা বোকা হয়ে গেছেন, নইলে পড়ানোয় উনি খুব ভাল ছিলেন।'

ঝট্ ক'রে টেম্পারেচার কয়েক ডিগ্রী নেমে যায়। তীব্রতার উপর কৌতুকের স্নিগ্ধতা এসে নামে, 'হ্যাঁ, পড়ানোয় কত ভাল ছিলেন, সে ত ছাত্রীর বুদ্ধির বহর দেখেই বোঝা যাচ্ছে।'

'ইস্! ভারী যে! না, শোন একটা কিন্তু ভারী হাসির ব্যাপার ঘটেছিল ওঁকে নিয়ে। মানে আমরা যখন পড়তাম। হঠাৎ মেয়েদের মধ্যে চাপা আলোচনার উত্তেজিত ঢেউ, কি'না রেখাদির সঙ্গে স্কুলের কেরাণী রমাপদ-বাবুর বিয়ে!

'হাসি আর ধিক্কারের সেই ঢেউ হেড মিষ্ট্রেসের কানে গিয়েও পৌঁছল শেষ অবধি। তিনি একদিন মেয়েদের কয়েকটি হেড্‌কে ডেকে কিছু নৈর্ব্যক্তিক উপদেশ দিলেন, যার নিহিত অর্থ হচ্ছে এই, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী সম্পর্কে চপল আলোচনা ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে 'মানুষ খুন' অপেক্ষাও গর্হিত। সেকালে গুরুগৃহে শিষ্যরা—ইত্যাদি ইত্যাদি।

'পরদিন দেখলাম রেখাদির মুখ, হ্যাঁ চিরদিনই অমনি ভারী ভারী মুখ ওঁর, আরো ভারী, আরো থম্‌থমে। বুঝলাম, উপদেশ কেবলমাত্র এক দিকেই বর্ষিত হয় নি।

'ওদিকে কিন্তু এ সংবাদের প্রথম পরিবেশক রমাপদবাবুর পাড়ার সেই মেয়েটা নতুন নতুন সংবাদ পরিবেশন করতে থাকে। রমাপদবাবু আর রেখাদি নাকি একসঙ্গে বিয়ের বাজার ক'রে বেড়াচ্ছেন, রমাপদবাবু আর রেখাদি একসঙ্গে লেকে ব'সে চিনেবাদাম খাচ্ছেন, ইত্যাদি।

'তার পর কিসের যেন ছুটি গেছে ক'দিন। ওমা, ছুটির পর মাইনে দিতে এসে দেখি, রমাপদবাবুর চেয়ারে ব'সে অন্য লোক কাজ করছে।

'কি রে বাবা। কি হ'ল!

'যাক, শেষ ভরসা রমাপদবাবুর পাড়ার সেই মেয়েটা। সে বলল, রমাপদবাবুর বিয়ে, দেশের বাড়ীতে চ'লে গেছেন ওঁরা সপরিবারে।

'কনে? নাঃ, রেখাদি নয় মোটেই। ওই দেশ গাঁয়েরই কেউ হবে। তখন আমরা সকলেই বলাবলি করতে লাগলাম, তা হ'লে হয়ত রেখাদি পরোপকারের বশেই রমাপদবাবুর বিয়ের বাজারের সঙ্গিনী হয়েছিলেন।...কিন্তু একটা খট্‌কা চিরদিন রয়ে গেল। রমাপদবাবু যদি ছুটি নিয়েই গেলেন, আর ফিরলেন না কেন?...আর রেখাদিই বা তার পর থেকে অমন মরা মাছের মত চোখ নিয়ে পড়াতে আসেন কেন?'

'তা' জিগ্যেস করলে না কেউ কাউকে?'

'বাঃ, হেড মিষ্ট্রেসের সেই শাসন নেই? আর ক্রমশঃ ত আবার সব ঠিক হয়ে গেল, আমরাও ও কথা ভুলেই গেলাম। তার পর বা তা ছাড়া রেখাদির জীবনে আর কোন ট্রাজেডি ঘটেছিল কি না কে জানে!'

ভদ্রলোক হেসে উঠে বলেন, 'তা জানবার দরকার নেই। আপাততঃ জানছি, আমার জীবনে তোমার রেখাদি একটি ট্র্যাজেডি।'

কিন্তু ঠাট্টার কথা ক্রমশঃ সত্যি হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমার জীবনেও। রেখাদি আর কেবলমাত্র বসবার ঘরের অতিথি হয়ে থাকতে চাইছেন না। বাড়ীর একজন হয়ে উঠতে চাইছেন।

প্রথম সুরু লিচু দিয়ে।

একঝাড় লিচু হাতে ক'রে এলেন রেখাদি।

'এ কি, এ কেন, ছি ছি! আপনি কি জন্যে এত বাজে খরচা করতে গেলেন!' বললাম আমি।

রেখাদি মাংসল মুখে পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, 'বাজে মানে? বাঃ! তুমি এত কর, আমার বুঝি ইচ্ছে করে না—কেন তোমরা খাও না লিচু? ভালবাস না?'

আহা, কে পারে ওই আলো আলো মুখটা নিভিয়ে দিতে?

মহোৎসাহে বলতেই হয়, 'ওমা, ভাল আবার বাসি না? সবাই ভালবাসি। আমার ছেলেটি ত লিচুর যম।'

'কাল' হ'ল সেইটিই।

বাড়ীর সকলে এখন বলছে, 'পয়লা রাত্তিরেই বেড়াল কাটতে হয়। প্রথম দিন অত উৎসাহ না দেখিয়ে রাগ রাগ ভাব দেখান উচিত ছিল। তা হ'লে সাহস বাড়ত না।'

কিন্তু তাই কখনও পারা যায়?

এখনও কি পারছি?

এই যে রেখাদি রোজ একটা না একটা কিছু এনে হাজির করছেন, বলতে পারছি, 'খবরদার, আনবেন না!'

বাজে মানে? বাঃ তুমি এত কর, আমার বুঝি ইচ্ছে করে না?
কেন, তোমরা খাও না লিচু?

বড় জোর সেই, 'এ কি রেখাদি, ছি ছি, ! রোজ রোজ এ ভাবে—নাঃ আপনি ভারী লজ্জায় ফেলছেন!... কি সর্ব্বনাশ রেখাদি, ওই অতবড় ইলিশমাছ!...না বাপু আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না।...রেখাদি, এ কি কাণ্ড। আপনি মাংস এনে হাজির করেছেন? এ রকম করলে কিন্তু রেগে যাব।'

'রেগে যাব!'

এর বেশী কে বলতে পারে?

কিন্তু রেখাদির মুখে শত বিদ্যুতের আভা! 'বেশ বাপু, তুমি রাঁধতে না পার আমি রেঁধে দিয়ে যাচ্ছি—।'

আমি লজ্জায় মরি।

'বাঃ, সে কি? আমি কি আর রান্নার জন্যে বলছি?'

কিন্তু রেখাদি উৎসাহে অন্ধ। 'তা' না হোক, আমিই আজ তোমাদের রেঁধে খাওয়াই। তোমার রান্নাঘরটি দেখে গেছি, চমৎকার! দেখে ইচ্ছে করে রাঁধি! আমার বাড়ীতে ঝি যা বিশ্রী ক'রে রাখে! ঢুকতে প্রবৃত্তি হয় না। আর'—রেখাদির একটা নিশ্বাস পড়ে, 'কার জন্যেই বা রাঁধব!'

সত্যি, এর পরেও কি রান্না থেকে ঠেকিয়ে রাখা যায় তাঁকে? মানুষ ত আর পাথর নয়?

রান্না করতে করতে রেখাদি হঠাৎ এক সময় ব'লে ওঠেন, 'বুঝলে মিনতি! সত্যি! প্রথম যেদিন তোমার রান্নাঘরটা দেখলাম, ইচ্ছে হ'ল একদিন রাঁধব এখানে।'

অদ্ভুত সাধ!

হাসিও পায়, করুণাও হয়। কিন্তু 'একদিন' মানে কি? প্রত্যেক দিন!

রেখাদি রান্না করছেন, অতএব রেখাদিকেও খেয়ে যেতে বলতে হয়।

খাবার টেবিলে পুত্র কন্যা স্বামী তিনজনের বিরস মুখের খেসারৎ পোহাতে আমাকেই সারাক্ষণ গল্প করতে হয়, রান্নার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে হয়, বার তিনেক চেয়ে খেতে হয়।

আর ফলস্বরূপ পরদিনই রেখাদি 'ভগ্নাপতি আর বোন পো বোনঝি'কে 'ফ্রেঞ্চ টোষ্ট' খাওয়াবার বাসনায় একরাশ ডিম আর পাঁউরুটি নিয়ে হাস্যবদনে এসে দাঁড়ান!

আজকাল আর এসেই হাঁফিয়ে ব'সে পড়েন না রেখাদি, সোজা চ'লে যান রান্নাঘরের দিকে। হাতের জিনিষ নামান, তবে এদিকে এসে একটু বসেন।

কিন্তু কতক্ষণ আর?

তখুনি ছটফট ক'রে ওঠেন, 'দেরি ক'রে কাজ নেই মিনতি, ওদিকে ঠিক সময়ে হয়ে উঠবে না।'

আজকাল অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে—

রেখাদি চ'লে গেলেই বাড়ীতে রীতিমত একটি বচসা সুরু হয়ে যায়। ছেলে মেয়ে স্বামী তিনজনে একদিকে, আমি একা একদিকে। সুরুটা হয় অবশ্য ব্যঙ্গ দিয়েই—

'রেখাদিকে এত তোয়াজ করার মানে এবার পাওয়া যাচ্ছে, বুঝলি খুকু। একবেলার বাজার খরচ বেঁচে যাচ্ছে। রান্নার পরিশ্রম বেঁচে যাচ্ছে! কম কথা!'

খুকু ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'হেস না বাবা, আমি ত ঠিক করেছি এবার স্রেফ্ একদিন ব'লে দেব, আপনার ওই তেল-মশলায় জর্জ্জরিত রান্না খেয়ে খেয়ে লিভারে দোষ ধ'রে যাচ্ছে আমার, আমায় ক্ষমা দিন।'

খোকা গম্ভীর ভাবে বলে, 'রোজ রোজ খাবার সময় একজন বাইরের লোক! বিশ্রী লাগে!'

'তা'তে কি!' প্রথম বক্তা বলেন, 'তোমাদের মহীয়সী জননী বিগলিত আনন্দে যে সেই বাইরের লোকটিকে বোঝাচ্ছেন 'আহা কি আনন্দই পেলাম!' অতএব তিনিও—'

এই সব ঝঞ্ঝাটে কষ্ট আমারও কিছু কম হয় না, কাজেই দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠি। রেগে রেগে বলি, 'তা' তোমরা সবাই এমন পেঁচা মুখ ক'রে থাক যে, আবহাওয়া একেবারে বিশ্রী হয়ে দাঁড়ায়। বাধ্য হয়েই আমাকে—সৌজন্য ব'লে একটা কথা আছে ত?

'কিন্তু সৌজন্যেরও একটা সীমা আছে—'

'তা' কি করতে বল? বলব, আর এস না?'

'তা' কেন? একটু বুদ্ধি প্রকাশ ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া, এগুলো আমাদের বিরক্তিকর।'

কিন্তু বুদ্ধিটা প্রকাশ করব কখন?

যখন রেখাদি তাঁর সেই মোটা-সোটা দেহখানির প্রত্যেকটি রেখায় আনন্দের হিল্লোল বয়ে এনে বলেন, 'আজ তোমাদের এমন একটা মজার জিনিস খাওয়াব মিনতি—'

তখন?

না, যখন রান্নাঘরে কোমরে আঁচল জড়িয়ে হাতা-খুন্তি-ডেকচির শব্দ তুলে আর তেল-মশলা মাংস মিষ্টির একটা লোভনীয় সুবাস সৃষ্টি ক'রে তিনি একটা স্বপ্নময় রাজ্যে বিচরণ করেন, তখন ?

অথবা যখন খেতে বসিয়ে বারবার প্রশ্ন করেন, কেমন হয়েছে ? খুব টেষ্টফুল না ? এ রান্নাটা আমি শিখেছিলাম আমার ছোট মাসীর কাছে ! রান্নার ভারী শখ ছিল তাঁর ! তখন ?

না কি চ'লে যাবার মুখে অপরিসীম একটা পরিতৃপ্তির ছাপ মুখে এঁকে যখন বলেন, 'কী ভালই লাগে মিনতি, তোমার বাড়ীটি। তুমি নিজে যেমন ভাল, তেমনি তোমার ছেলেমেয়ে স্বামী ! মনেই হয় না যে তোমরা আমার সত্যি নিজের কেউ নও।'

সেই তখন ?

না, বুদ্ধি প্রকাশ করতে আমি পারি নি।

শেষ পর্য্যন্ত প্রকাশ ক'রে বসেছিলাম একটু বুদ্ধিহীনতা ! আর তাতেই ত কাজ হয়ে গেল।

অথচ এমন কিছু ভেবেও নয়, শুধু সামান্য একটু কৌতুক, সামান্য একটু অসতর্কতা !

তার আগের দিনটা অবিশ্যি একটু চরমেই উঠেছিল। মানে রেখাদি চ'লে যাওয়ার পরবর্ত্তী বিতর্কটা।

আমি বলেছিলাম, 'না, পারব না, মানুষের মনে আঘাত দিতে আমি পারব না ! সে আমার যতই অসুবিধে হোক।'

অপরাপর সদস্যরা বলেছিল, 'অসুবিধেটা তোমার একার নয়, আমাদেরও।'

'একটা নিঃসঙ্গ মানুষ যদি এখানে এসে একটু তৃপ্তি পায়—।'

'ওটা একটু বেশী মহত্ত্ব হয়ে যাচ্ছে। তোমার রেখাদি যে তোমার সাজানো-গোজানো সংসারটি দেখে পরম পুলকিতচিত্তে তার ওপর দিয়ে সংসার-সুখ মিটিয়ে নিচ্ছেন ওটার শেষ কোথায় ঠিক করছ ?'

বিপন্ন আমিও ত কম হচ্ছিলাম না ! তাই তর্কের বহরটা একটু বেশীই হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু ওই পর্য্যন্ত।

তার বেশী না।

সত্যিই কিছু আর রেখাদিকে 'কিছু' বলব, তা ভাবি নি।

শুধু একটু অসতর্কতা। কিন্তু কবে আবার দুপুরবেলা আসেন রেখাদি ?

দুপুরে হঠাৎ ফোন করেছিল অরুণা।

'এই শোন্, কলেজের 'রি-ইউনিয়নে' আসছিস ত ? চামেলি বলছিল—'

আমি হেসে উঠে বলেছিলাম, 'আর কলেজ ! এখন ত আবার নতুন ক'রে স্কুলের ছাত্রী হয়ে পড়েছি।'

'সে কি, কেন রে ?' বলল অরুণা।

তার পর হৈ হৈ হাসির উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে দুইজনের যা কথার আদান-প্রদান হ'ল তার আমার দিকের অংশটা এই—

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের সেই 'গোলআলু' রেখাদি !...আর বলিসনে ভাই, অপরাধের মধ্যে একদিন রাস্তার দেখা হয়ে যাওয়ায় বাড়ীতে ডেকে এনেছিলাম !...কি বলছিস ?...ও হ্যাঁ তাই ত তোকে বলব কি ভাই, তদবধি জীবন মহানিশা ?...যা বলেছিস্, এই সব বোকা মানুষদের নিয়েই যত জ্বালা !...কী বলছিস্ ?...ও হো হো ! এভ্রি ডে ! ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাত কামাই নেই !...আর জীবনে উনি যত রান্না শিখেছেন, সব আমাদের জিভের ওপর দিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করেছেন।...এতদূর কি ক'রে ? ওঃ, সে অনেক কথা। দেখা হ'লে বলব।

'...শনৈঃ পন্থা আর কি।...মজা ? আহারে...মরে যাই ! মজাই বটে ! রীতিমত সাজা ! গৃহযুদ্ধ, বন্ধুবিচ্ছেদ দাম্পত্যকলহ...লিভার ট্রাবল্...'

ওইদিকে হাসিতে ভেঙে পড়েছিল অরুণা।

এদিকে আমিও।

তার পর রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ঘর থেকে বেরিয়েই পাথর হয়ে গেলাম।

রেখাদি নীচু হয়ে জুতোর ষ্ট্র্যাপ বাঁধছেন !

হাঁ, বাঁধছেনই। খুলছেন না।

তার মানে রেখাদি এসেছিলেন।

রেখাদি চ'লে যাচ্ছেন!

রেখাদি কখন এসেছিলেন?

রেখাদি দুপুরে এসেছিলেন কেন? না, কথা বলতে আমি পারি নি। মরা মাছের চোখের মত একজোড়া নিভে-যাওয়া চোখের সামনে পাথরের পুতুলের মত আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি।

রেখাদি কোনও কথা বলেন নি। মুখ নীচু ক'রে আস্তে আস্তে চ'লে গিয়েছিলেন।

হঠাৎ দেখতে পেলাম, রেখাদির জুতোর ষ্ট্র্যাপের একটা বকলস প'ড়ে রয়েছে।

রেখাদির চোখটা কি হঠাৎ ঝাপ্‌সা হয়ে গিয়েছিল? বকলসের ঘরটা খুঁজে পাচ্ছিলেন না? তাই আজেবাজে ক'রে টানাটানি করতে গিয়ে ছিঁড়ে গেছে?

রেখাদি আগের দিন বলেছিলেন, 'দিশী রান্না জানি না ভেবেছিস? দেখিস্ এমন গোকুলপিঠে খাওয়াব, ভুলতে পারবি না!'

রসের খাবার করবেন ব'লে দুপুরবেলাই চ'লে এসেছিলেন রেখাদি। রান্নাঘরের দরজার কাছে নামিয়ে রেখে গেছেন হাতের জিনিষগুলো, রান্নাঘরে ঢোকেন নি।

ক্ষীর আর নারকেল এনেছিলেন রেখাদি।

রেখাদির বোকামীর জ্বালায় আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম, রেখাদি আমার কাছে হাস্যকর, রেখাদির সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল শুধু সৌজন্যের, তবু রেখাদির নামিয়ে রেখে-যাওয়া সেই তুচ্ছ জিনিস দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম, রেখাদি আর আসবেন না।

আমাদের আড্ডার সংখ্যাতাত্ত্বিক শশিশেখরের তুচ্ছ ও অদ্ভুত জিনিষের দিকে আশ্চর্য্য রকমের ঝোঁক। সেদিন অন্য কোন প্রসঙ্গ ওঠবার আগেই সে কথাটা ওঠালে, তোমরা লক্ষ্য করেছ কি না জানি না, আজকাল শহরে ফুটপাত-জ্যোতিষীদের সংখ্যা ক্রমশই কমে আসছে।

ঐতিহাসিক সুন্দরলাল বললে, উত্তম লক্ষণ, মধ্যযুগের বিশ্বাস আর কুসংস্কার এখনও আমাদের সমাজে অনেক রয়ে গেছে। সেগুলো যত যায়, তত ভাল। রোমক যুগে যে সুথসেয়ারস্‌রা ছিল, এরা তার শেষ ছন্নছাড়া ধারাবাহক।

বৈজ্ঞানিক বিদ্যুৎবরণ বললে, শশী, তুমি কি এ বিষয়ে ষ্ট্যাটিসটিক্স্ নিয়েছ? যদি না নিয়ে থাক তা হ'লে রাজভবনের ফুটপাত আর আশপাশের আদালতগুলো একবার ঘুরে এস।

বিদ্যুতের প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ শশিশেখরের কান এড়াবার কথা নয়।

শশিশেখর গম্ভীর হয়ে বললে, দেখেছি আর দেখেই বলছি।

আমরা জানি ষ্ট্যাটিসটিক্স্ না নিয়ে শশী কোন মত প্রকাশ করে না।

আমি বললাম, কারণটা কি বল ত?

আধুনিক গল্পলেখক দিব্যেন্দু এতক্ষণ চুপ করে ছিল। বললে, দুই মহাযুদ্ধের পর আর বিশেষ করে মহাকাশ বিজয়ের পর দৈবের ওপর মানুষের বিশ্বাস আলগা হয়ে আসছে। আমরা যে যুগের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি সেখানে ঈশ্বর নামক কোন বস্তুর স্থান সঙ্কুলান হওয়া মুশকিল। মানুষ তার নিজের শক্তিতে এত বেশি সজাগ হয়ে উঠবে যে, কোন অদৃশ্য সর্বশক্তিমানকে আর পাত্তা দেবে কি না সন্দেহ।

বিদ্যুৎ বললে, তোমাদের যুগ-যন্ত্রণার সঙ্গে এর কোন যোগ-সাজস আছে নাকি? বিদ্যুৎ শুধু বিজ্ঞান নয়, ব্যঙ্গ-বিশারদও। বিদ্যুৎ আধুনিক-পন্থী গল্পলেখকদের ওপর চটা। ও বলে, ওদের ঐ যুগ-যন্ত্রণার হিং টিং ছট্ পড়লে, ওর ব্লাড-প্রেশার নাকি বেড়ে যায়।

দিব্যেন্দু ধারালো হেসে বললে, আছে বৈকি। সে যন্ত্রণা অর্থনীতিক। পশারের অভাবে মধ্যযুগের শেষ ধারাবাহক যারা ছিল, তারা না খেতে পেয়ে মরছে, নতুন লোক লাইনে আসছে না। গালভরা ভাল কথা ব'লে

ব'লে ওরাও ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল, আর ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া খদ্দেরগুলোও নিষ্ফল ভাল কথা শুনে শুনে সমান ক্লান্ত।

বললাম, সুন্দর বিশ্লেষণ, কি বলো শশিশেখর?

শশিশেখর সায় দিলে।

দিব্যেন্দু বলে ভাল। প্রশংসা পেয়ে সে আরও প্রখর হয়ে উঠল। বললে, কথাটা যখন উঠল, তখন একটা সত্যি গল্প তোমাদের শোনাচ্ছি। এই দৈব বা অদৃশ্য শক্তিতে বিশ্বাস একটি মানুষের জীবন নিয়ে যে কি ছিনিমিনি খেলেছিল, এ গল্প না শুনলে তোমরা বিশ্বাস করতে পারবে না।

দিব্যেন্দু গল্প লেখে ভাল, বলে আরও ভাল।

বিদ্যুৎ বললে, এটা কি তোমার আগামী গল্পের কোন প্লট নাকি, আমাদের ওপর দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিচ্ছ?

দিব্যেন্দু বললে, আরে না, না। এটা একেবারে সত্যি ঘটনা। এর নায়ক আমার চেনা। বিদ্যুৎ, তুমিও একে জানো।

বিদ্যুৎ বিস্মিত হয়ে বললে, কে বল ত।

দিব্যেন্দু বললে, যথাসময়ে বলব।

আমাদের আগ্রহও বেশ প্রখর হয়ে উঠছিল। বললাম, দিব্যেন্দু, তোমার গল্প আরম্ভ কর।

দিব্যেন্দু আরম্ভ করলে, তোমরা জান, আজকাল আমার গল্পে কোন কাহিনী থাকে না। আজকাল গল্পে কাহিনী থাকাটাই সেকেলে। এটা তোমরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে, পুরণো আঙ্গিকে লেখা গল্পগুলো কি মারাত্মক রকমের একঘেয়ে হয়ে আসছে। কাহিনীর বদলে জীবনের গভীর অভিজ্ঞতা শুধু ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া, আর তার থেকে গভীরতম আইডিয়ার ইমেজ তৈরি করাই নতুন রীতি। আধুনিক মনের কাছে তার আবেদন অনেক বেশি প্রবল। ধর, কিং লীয়ারকে যদি ফ্রাস্ট্রেটেড হিউম্যানিটি, আর তার কাঁধে মৃত কর্ডেলিয়াকে যদি মানুষের অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসা আর বিশ্বাসের শব হিসেবে ভাব, তা হ'লে কাহিনী ছাড়িয়েও এই প্রতীকের আবেদন আরও গভীর, আরও বিশ্বজনীন হয় না কি? হয়ত বক্তৃতার মত শোনাচ্ছে, কিন্তু যে গল্প তোমাদের শোনাতে যাচ্ছি, তার ভূমিকা হিসেবে এটা বলা দরকার। কারণ, যখন আমি প্রথম লেখা সুরু করি, তখন ভাবতাম কাহিনীই সব। আর এখানে-সেখানে নতুন নতুন কাহিনীর সন্ধানে ঘুরতাম। ডায়েরি থাকত সঙ্গে, যা দেখতাম, শুনতাম, নোট করে নিতাম। সেবার গিয়েছিলাম মুঙ্গেরে দিদির বাড়ীতে। মীরকাসিমের কেল্লার ভেতর গঙ্গার ধারটা আমার বড় ভাল লাগত। বিশেষ করে কষ্টহারিণীর ঘাট, আর তার কিছু দূরে মীরকাসিমের প্রাসাদ, এখন অবিশ্যি জেলখানা। সকাল-সন্ধ্যেয় ফাঁক পেলেই ঘাটে এসে বসতাম। অনেক লোকের আনাগোনা, বেশ লাগত। সকাল বেলা একজন পশ্চিমা জ্যোতিষী ঐ ঘাটের কাছে তার ছকপত্তর নিয়ে বসত। খদ্দেরও মন্দ মিলত না। সন্ধ্যায় নাটমন্দিরের একধারে তার বিছানাটা পেতে বসে থাকত। ঐ তার আস্তানা। লোকটির মুখ কেমন যেন আমার চেনা চেনা লাগত, কিন্তু কোথায় দেখেছি, স্মরণ করতে পারতাম না। আমার কেন জানি না মনে হয়েছিল, ওর জীবনে গল্প আছে। একদিন আলাপ করলাম। হিন্দীটা ভাল আসত না। বেশ অসুবিধা হ'ত। আমি যখনই ওর জীবনের কথা জানতে চাইতাম, ও এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করত। তার পর এমনি কৌতূহল মেটাতে একদিন আমার হাতটা দেখতে বললাম। তোমরা বিশ্বাস করবে না, ও আমার ছেলেবেলা থেকে আমার জীবনের অনেক ঘটনা এমনি ঠিক ঠিক ব'লে দিল যে, আমি অবাক্ হয়ে গেলাম। এমন কি, ক' ভাই, তাদের নাম কি, আমার বাবার নাম, মায় আমার নাম পর্যন্ত। জ্যোতিষে কোনকালেই আমার বিশ্বাস বা দুর্বলতা নেই। সেই অবিশ্বাসও যেন টলিয়ে দিল। ভারি অস্থির হয়ে উঠলাম। শেষে মনে হ'ল, ও নিশ্চয়ই আমাকে চেনে, জানে। কে হতে পারে? দু'তিন রাত্রি ঘুম হ'ল না। চিন্তা করতে লাগলাম। শেষে একদিন মরিয়া হয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, কে বল তুমি? নিশ্চয়ই তুমি আমাকে জান। তোমায় আমি কোথায় দেখেছি, কিন্তু স্মরণ করতে পারছি না।

ও হেসে বললে, হ্যাঁ, তোমাকে আমি চিনি। আমি বাঙালী।

ওর চেহারাটা এমনিই নিখুঁত পশ্চিমাদের মত হয়ে গিয়েছিল যে, ওর কথা বিশ্বাস হ'ল না। কিন্তু ওর খাঁটি বাঙলা কথা শুনে আমার বিষম ধন্দ লাগল।

আমার সংশয় দেখে ও বলল, আমি সুরেশ। তুমি আমায় চিনতে পার নি, তাই আমার বড় কষ্ট লাগছে।

কোন্ সুরেশ! ওর মুখের দিকে বার বার তাকাতে লাগলাম। একটা ক্ষীণ আদল ছাড়া গোঁফ-দাড়িতে ঢাকা ঐ রুক্ষ নিষ্প্রভ মুখে, ওই লম্বা লালচে জটপড়া কটা চুলে আমার জানা সুরেশের বোধ হয় কোন চিহ্নই ছিল না। আস্তে আস্তে সব মনে পড়তে লাগল। এই সুরেশ ত আমাদের জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশনে ফার্স্ট হয়েছিল, আই-এস-সিতে সেকেণ্ড। বিদ্যুৎ, তুমি নিশ্চয়ই চিনতে পারছ, তুমি থার্ড হয়েছিলে সেবার। কিন্তু ভাব একবার, কোথায় তুমি আর সে কোথায়।

বিদ্যুৎ কেমিষ্ট্রিতে ডক্টরেট পাওয়া নাম-করা অধ্যাপক। বিদ্যুৎ নির্বাক্ বিস্ময়ে দিব্যেন্দুর মুখের দিকে চেয়ে রইল। গল্পটি খুব জমাট হয়ে ওঠবার প্রত্যাশায় আমরা কোন কথা বললাম না। বললাম—তার পর?

দিব্যেন্দু আরম্ভ করলে, ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষার পর সুরেশের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল। ও নিল সায়েন্স, আমি আর্টস। আমি এলাম দক্ষিণের আশুতোষ কলেজে আর ও ভর্তি হ'ল প্রেসিডেন্সিতে। তবে ওর খবর আমি রাখতাম। মাঝে মাঝে দেখাও হ'ত। ওদের অবস্থা ভাল ছিল না। বিধবা মা ছাড়া আর কোন বিশেষ আত্মীয়স্বজনও ছিল না। দেশে শুধু একটা ভাঙা পুরণো একতলা বাড়ী ছিল। ও আই-এস-সিতেও ভাল রেজাল্ট করবার পর শুনেছিলাম কোন্ এক মস্ত ধনী ব্যবসায়ী নাকি যেচে ওর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ওকে ঘর-জামাই করে নিয়ে গিয়েছিল। তার পর বি-এস-সিতে ও মিজারেবল রেজাল্ট করে। অনার্স দূরে থাক, কোন ক্রমে পাশ করেছিল। সে ত বিদ্যুৎ তুমি জান। তার পর সুরেশের আর কোন খবর পাই নি।

এই অদ্ভুত বেশে বিদেশে ওকে অমন অবস্থায় দেখে আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। ও ম্লান হেসে বলেছিল, কি বিশ্বাস হচ্ছে না?

আমি বললাম, তোমার এমন পরিণতি আমি গল্প-লেখক হলেও ভাবতে পারি না। ব্যাপার কি? আমাকে সব খুলে বল ত

ও তেমনি ম্লান হেসে বললে, শুনবে চল একটু নিরিবিলিতে বসি গিয়ে।

একটু দূরে গঙ্গার উঁচু পাড়ের ধারে একটা পাথরের চাঙড়ের ওপর দু'জনে মুখোমুখি বসলাম। নিচে শুধু অবিরাম জলের ছলছল শব্দ।

মন্দিরে তখন আরতি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বোলান বড় ঘণ্টাটা ঘন ঘন বাজছিল। অনেক স্ত্রী-পুরুষের মিলিত গুঞ্জন হাওয়ায় ভেসে আসছিল। কার্তিক মাসের মাঝামাঝি। মৃদু জ্যোৎস্নার ওপর পাতলা কুয়াসা-ঢাকা চারদিক্ কেমন রহস্যময় মনে হচ্ছিল।

ও বললে, আমার বিয়ের কথা শুনেছিলে নিশ্চয়?

বললাম, হ্যাঁ।

ও বললে, আমার শ্বশুর খুব ধনী, কিন্তু বংশে বিদ্যে ছিল না। উনি আমায় পছন্দ করেছিলেন আমার পরীক্ষায় ভাল ফল আর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আশায়। বিয়ের পর ওঁরা আমায় নিয়ে গেলেন তাঁদের সেই প্রকাণ্ড প্রাসাদের মত বাড়ীতে। সুন্দরী বউ, না চাইতেই প্রমোদের হাজার উপকরণ চারপাশে স্তূপাকার হয়ে থাকে। হৈ-হল্লা, খাওয়া-দাওয়া, অসংখ্য ধনী আত্মীয়স্বজন, আজ এখানে, কাল ওখানে নেমন্তন্ন: সিনেমা, থিয়েটার—এমনি করে দিনগুলো কোথা দিয়ে কেমন করে কেটে যেত, জানতেও পারতাম না। ফল ত তোমরা নিশ্চয়ই জেনেছিলে।

বললাম, হ্যাঁ, আমরা অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, বি-এস-সিতে তুমি আরও ভাল করবে।

সুরেশ শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল। তার পর সুরেশ তার সেই সময়কার মনের অবস্থা, তার পরের ঘটনা একে একে আমায় সব বলেছিল। শ্বশুরের মুখ কালো হয়ে গেল। আশা-ভঙ্গের দুঃখ। সুরেশ বললে, তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। এই এক ধাক্কায় সুরেশের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব যেন ধুলোয় গুঁড়িয়ে গেল। তার মনে হ'ল, সবাই যেন আঙুল দেখিয়ে বলছে, ওটা একটা ঠগ, ও মিথ্যে ভড়ং দেখিয়ে যা ওর প্রাপ্য নয় তাই ঠকিয়ে নিয়েছে। এখন তার আসল চেহারা ধরা পড়ে গিয়েছে। তার সেই স্ত্রী, যে দু'বছরের প্রতিটি দিন রাত সুধায় ভরে দিয়েছিল, সেও পর্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেছে। তার সঙ্গে ভাল করে কথা বলে না। তার আর দোষ কি? সুরেশ ছিল তার অহঙ্কারের জিনিষ। মেয়েদের সেই অহংকার গেলে আর থাকে কি। যদিও মুখে তাকে কেউ কিছু বলে নি, তবুও সেই আদর, যত্ন, রাজভোগ সুরেশের সব বিষের মত লাগত। একদিন ভোরবেলা উঠে সে পালিয়ে গেল। তার মনে হ'ল, কেউ যেন তাকে ধাক্কা দিয়ে গেটের বাইরে এনে রাস্তা দেখিয়ে দিলে।

তার শ্বশুর অবিশ্যি পরের দিনই তাদের দেশের বাড়ীতে এলেন। তাকে অনেক বোঝালেন, আবার পড়তে বললেন। সুরেশ তার আঘাতের কারণটা বিচার করে দেখল না। বিষয় বুদ্ধিহীন, অনভিজ্ঞ, তার ওপর বয়স অল্প, লেখাপড়ার ওপর হ'ল প্রবল আক্রোশ। তার শ্বশুর বললেন, বেশ, তাঁর যে কোন কার্যে এসে সে বসুক। সুরেশ তাতেও রাজি নয়। নিজের শক্তিকে সে যাচাই করে দেখাতে চায়, ওঁরা যা ভাবছেন, সে তাই নয়। মা'র কথাও শুনলে না। শ্বশুর নিরাশ হয়ে ফিরে গেলেন।

তার পর অনেক হাঁটাহাঁটি ক'রে একটা মার্চেণ্ট আপিসে সুরেশ একটা কেরানির চাকরি যোগাড় করলে। মাইনে তখন সব মিলিয়ে দু'শো টাকা, পরে আরও বাড়বার আশা আছে। সে কলকাতায় ছোটোখাটো একটা বাসা ভাড়া করলে, তার পর তার স্ত্রীকে আনতে গেল।

ওখানে সকলে একেবারে হৈ হৈ করে উঠল। ওর শাশুড়ী বললেন, কার মেয়েকে কোথায় নিয়ে যেতে চাইছ? তোমার সাহস ত কম নয় বাপু।

ওর তখন রোখ চেপে গেছে। বেশ জোরের সঙ্গেই বললে, ও যে-ই হোক, ও আমার স্ত্রী।

শ্বশুর গম্ভীর হয়ে বললেন, সে রকম কথা ত ছিল না বাবাজী, বেয়ান ঠাকরুণের সঙ্গে। তিনি আসুন, বলুন এসে। আর তা ছাড়া আমায় আগে গিয়ে দেখে আসতে হবে, আমার মেয়ের থাকবার উপযুক্ত জায়গা কিনা ওটা।

সুরেশ বললে, বেশ, তবে আমি চললাম। আর কখনও আসব না।

হঠাৎ এক অসম্ভব ব্যাপার ঘটল। ওর স্ত্রী বোধ হয় এতক্ষণ আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিল। এবার সামনে এসে বললে, বাবা, বরং আমি যাই। আমার কোন কষ্ট হবে না।

তার মা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন। বাবা বোঝাতে চাইলেন। কিন্তু মেয়ে একটুও বেঁকলো না। সেই এক কথা —আমার কোন কষ্ট হবে না।

তার পর সুরেশ তার স্ত্রীকে নিয়ে উঠল এঁদো গলির ভেতর সেই পঞ্চাশ টাকার ভাড়াটে বাড়ীতে। তার স্ত্রীর ত দেখে কান্না পেল, তবুও সে মুখ বুজে রইল। তাদের ঝি-চাকরেরাও এর চেয়ে ভাল ঘরে থাকে। তার পর আস্তে আস্তে সে সব করতে লাগল—রান্না, বাসন-মাজা, কাপড়-কাচা সব। একটা ঠিকে-ঝি ছিল অবশ্য, কিন্তু যেদিন কামাই করত, সেদিন তাকেই সব করতে হ'ত। সুরেশ অবিশ্যি প্রথম প্রথম বেশি পরিশ্রমের কাজটা নিজেই করে দিত, কিন্তু সে ক'দিন! তার মা, বাবা দু'জনেই এসেছিলেন কয়েকদিন পর. দুপুরে সুরেশ আপিসে বেরিয়ে যেতে। তার মা বাড়ী দেখে, তার দিন-রাতের খাবার দশা দেখে ত হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

পরের দিন ওর শ্বশুর সকালে এসে সুরেশকে অর্থসাহায্য করতে চাইলেন। ও-ও নেবে না, ওর স্ত্রীও ওকে নিতে দেবে না। মেয়ের দিকে চেয়ে ওর বাবা গুম্ হয়ে গেলেন। মেয়ের চোখে যেন তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনা জ্বলছিল, আমার অন্য সব বোনের বেলা তুমি লক্ষপতি, কোটিপতিকে বেছে দিয়েছ। আর আমার বেলা—এখন আর মায়া দেখিয়ে কাজ নেই, আমার যা হয় হবে। তোমরা যাও, আমার কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিতে এস না। স্বামীর ওপর ভালবাসা না বাপের ওপর অভিমান, কোন্‌টা যে তার প্রবল, তা কেউ বলতে পারে না। তার সেই আধ-ময়লা শাড়ি, নিষ্প্রভ মুখ দেখে তার বাবা চোখের জল মুছতে মুছতে চলে গেলেন।

বাপের বাড়ীতে বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই আছে। তার পর বড় বড় আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী কত পার্টি, কত বিয়ে, কত অন্নপ্রাশন—নেমন্তন্ন আসে, তারা গাড়ী পাঠিয়ে দেয়। ও নিজেও যায় না, সুরেশকেও যেতে দেয় না। তার অন্য অন্য বোনেরা এসেছিল ওকে দেখতে, ও প্রায় অপমান ক'রে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। সুরেশকেও তার ভাল লাগে না, বাপের বাড়ীরও কাউকে নয়। সে যেন নিজের আগুনে নিজেই নিঃশব্দে জ্বলতে থাকে।

এমনি ক'রে চার বছর কেটে গেল। একটি মেয়েও হয়েছে সুরেশের। মানে, আর একটা পেট বেড়েছে। অথচ সুরেশের চাকরি-স্থানেও কোন উন্নতি হয় নি সামান্য কিছু মাইনে বাড়া ছাড়া। ইংরেজের হাত থেকে ফার্ম চলে গেছে মাড়োয়ারির কবলে। ছাঁটাই চলেছে। তিন জনের কাজ এখন একজনকে করতে হয়। আরও মাইনে বাড়া দূরের কথা, এখন চাকরি টিকলে হয়।

অহরহ এই দারিদ্র্য, অভাব, অনটনের মধ্যে ওর স্ত্রী আস্তে আস্তে একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেল। সেই সোনার মত টকটকে রঙ, সেই উজ্জ্বল চোখ, সেই ঢেউ-খেলান রেশমের মত রাশীকৃত কোঁকড়ান চুল—সে যেন

আর এক জন্মে ছিল। এ আর একটা মানুষ। এখন প্রতিদিন ঝাঁঝালো গলায় ঝগড়া করে, সুরেশকে দুঃশ্রাব্য কটু কথা বলে। কচি মেয়েটাকে নিষ্ঠুরের মত মারে। অর্ধেক দিন সুরেশ না খেয়েই আপিসে চ'লে যায়। যত কিছুই হোক, সুরেশ তার স্ত্রীকে ভালবাসত, গভীর ভালবাসত। একটি পয়সাও সে বাজে খরচ করত না। সে নিজে তালি-মারা কাপড়-জামা পরত। পূজোর সময় বোনাসের টাকায় ধার-দেনা শোধ ক'রে সবটাই স্ত্রীর আর মেয়ের জন্য খরচ করত। তবু দু'একটা ছাড়া তার দামী গহনাগুলো বাঁচান যায় নি। তিন বার স্ত্রী আর একবার নিজের মারাত্মক অসুখের সময় সেগুলো বিক্রী হয়ে গেছে। ওর স্ত্রী এখন উঠতে-বসতে সেই গঞ্জনা, সেই খোঁটা দিত।

আশ্চর্য, তার স্ত্রী অদ্ভুত লোভী হয়ে গিয়েছিল। যে বোনেদেরও অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তাদের স্বামীর কথা তুলে সুরেশকে অহরহ খোঁটা দিত। বলত, রোজগার যদি ক'রতে না পার, চুরি করতে পার না?

স্ত্রীর দিকে চেয়ে সুরেশের মন খারাপ হয়ে যেত। মাঝে মাঝে ভাবত, এখানে ওকে হয়ত না আনলেই ভাল ছিল। ও না-হয় মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসত, দু'দণ্ড জুড়িয়ে আসত। একটা সুন্দর ফুল তা হ'লে ঝ'রে শুকিয়ে এমন আঁস্তাকুড়ে লুটোত না।

ও কেবলই চিন্তা করত কি ক'রে আয় বাড়ান যায়। টিউশানি করার চেষ্টাও করেছিল। যা পাওয়া যায়, তাতে পেট ভরে না। দেশে শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা ত কম নয়। এতদিন ওর নিজের ওপর আস্থা ছিল, ঘা খেতে খেতে একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ল। তার পর আর-একজন বাড়ল সংসারে। এবারে এল একটা ফুটফুটে ছেলে।

তার পর একদিন অতি কুক্ষণে সওয়া পাঁচ আনা পয়সা খরচ ক'রে ও রাজভবনের সামনের ফুটপাতে এক জ্যোতিষীর সামনে হাত মেলে দিয়েছিল। জ্যোতিষী হেন তেন ব'লে একটা মারাত্মক বিষ ওর কানে ঢুকিয়ে দিল। বললে, আপনার কপালে গুপ্তধন পাওয়ার যোগ আছে। তার পর হেসে বলেছিল, চোখ মেলে পথ চলবেন স্যার।

ব্যস্, এই হ'ল কাল।

আপিসে যাওয়ার সময় সুযোগ হ'ত না। ছুটির পর এখানে-ওখানে সুরেশ ঘুরে বেড়াত। সমস্ত মন-প্রাণ-চোখ দিয়ে সে যেন পৃথিবীময় কি খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই অবস্থায় তাকে দেখলে লোকে বোধ হয় তাকে পাগল ভাবত। রাত্তিরের শেষ ট্রামে যখন ভিড় একদম নেই সে আসত। তার চোখ ঘুরত কেউ কিছু সিটের ওপর বা সিটের তলায় ফেলে যায় নি ত? দিনরাত এক চিন্তা তার, টাকা তাকে পেতেই হবে। ভাঙা সংসার তাকে জোড়া লাগাতেই হবে। স্ত্রীকে আবার ফিরে পেতেই হবে তাকে। বাড়ীতে যখন ফেরে, বিভ্রান্তের মত।

এমনি আর কিছুদিন গেলে ও নিশ্চয়ই পুরো পাগল হয়ে যেত। কিন্তু একদিন সেই অখ্যাত সস্তা দামের রাস্তার জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যিই ফলে গেল। গুপ্তধন সে পেয়ে গেল, আর তা পথেই।

দিব্যেন্দু বললে, আমি অবাক্ বিস্ময়ে যেন কোন কুহকগ্রস্তের মত সুরেশের নিজের মুখ থেকে এই অদ্ভুত অবিশ্বাস্য কাহিনী শুনে যেতে লাগলাম। মন্দিরের কোলাহল কখন এক সময় থেমে গেছে। গঙ্গার জলোচ্ছ্বাস বেড়েছে, দুর্গ-প্রাচীরের পাথরে পাথরে তীব্র ঘা মেরে ঢেউগুলো যেন হিংস্র গর্জন করছে।

দিব্যেন্দুর মুখ থেকে আমরাও কুহকগ্রস্তের মত এই অদ্ভুত অবিশ্বাস্য গল্প শুনে যেতে লাগলাম। বললাম, তার পর?—

দিব্যেন্দু আরম্ভ করলে, সেদিন শনিবার। দুপুরে আপিসের ছুটির পর তার নিত্যকর্ম ক'রে ঘুরতে ঘুরতে সে চলে এসেছে ইডেন গার্ডেনের নির্জন এক কোণে। তখন সূর্য অস্ত যাবার আর বেশী বাকি নেই। হঠাৎ তার নজর পড়ল পাশের ঘন ঝোপের ভেতর মাঝারি গোছের একটা কাপড়ের পুঁটলির ওপর। টেনে বের ক'রে একটু খুলতেই ভেতরে দেখে গোছা গোছা করকরে নতুন নোট। তখন তার হাত কাঁপছে। সারা শরীর থর থর ক'রে দুলছে। তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। পুঁটলিটাকে কোঁচার আড়ালে ক'রে সে সেখান থেকে এক রকম ছুটে বেরিয়ে গেল। কার টাকা কে রেখেছিল ওখানে লুকিয়ে, কেন রেখেছিল—এ সব ভাববার মত মনের অবস্থা তার ছিল না। ট্রামে উঠতে গিয়েও উঠল না। দু'দিন বাজার হয় নি, তিনটে টাকা দিয়েছিল স্ত্রী বাজার

একটু খুলতেই দেখা গেল, গোছা গোছা করকরে নতুন নোট।

ক'রে নিয়ে যেতে। সে একটা ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে ফেললে। স্ত্রী পাছে কিছু সন্দেহ করে তাই বড় রাস্তার মোড়েই ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে হন্‌হন্‌ ক'রে বাড়ীতে ঢুকল। স্ত্রী তখন বোধ হয় রান্নাঘরে। ছেলেটা আপন মনে বারান্দায় খেলা করছিল। মেয়েটা বোধ হয় পাশের বাড়ীতে মাসীমার কাছে গেছে। সে আস্তে আস্তে দরজায় খিল লাগিয়ে দিল। তার পর গুণতে লাগল—এক—দুই—তিন—চার—তিরিশ হাজার টাকা—সব একশ' টাকার, দশ টাকার, পাঁচ টাকার নোট, কেতায় কেতায় সাজান। তার সর্ব শরীর তখনও থরথর ক'রে কাঁপছে। তার পর তার নিজস্ব বাক্সের ভেতর টাকাটা রেখে চাবি বন্ধ ক'রে দিলে। একবার ভাবলে স্ত্রীকে বলবে। তার পর ভাবলে, না, এখন না। একেবারে অবাক্ ক'রে দেবে। এমন সুযোগ সে ছাড়বে না। এতদিনের সব অপমান, গঞ্জনা, দুর্ব্যবহারের এক মধুর প্রতিশোধ নেবে চরম বিস্ময়ের মধ্যে।

শরীরের মধ্যে অসহ্য উত্তেজনার ঢেউ দুলছে। কিন্তু বাইরে সে অদ্ভুত শান্ত হয়ে গেল। তার স্ত্রী কিছুই বুঝতে পারলে না। বাজার আনে নি ব'লে তাকে এক ঝাঁক কটুক্তি হজম করতে হ'ল। সুরেশ আজ মনে মনে

হাসতে লাগল। কয়েকদিন যাক। সব ঠিক হয়ে যাবে। কোথাও কোন রুক্ষতা, জ্বালা থাকবে না। নতুন জীবন, নতুন আবহাওয়া। এ বাড়ীটা ছেড়ে দেবে। ব্যবসা করবে, বড়লোক হবে।

সুরেশ সে রাত ঘুমোতে পারল না। মাথার মধ্যে কত কি ভাবনা যে ঘুরপাক খেতে লাগল, কতবার উঠে মাথায় জল দিলে, তার আর ঠিক নেই।

পরদিন রবিবার। সে বাজার করল। ছেলেদের আদর করল। অনেকদিন পর কাপড়-চোপড় কাচাতে স্ত্রীকে সাহায্য করতে গেল। স্ত্রীর সঙ্গে দু'একটা রসিকতা করারও চেষ্টা করল। কিন্তু তার গম্ভীর মুখ দেখে সে বেশি এগোতে সাহস করল না। শুধু মনে মনে বললে, আর কয়টা দিন শুধু যাক।

এমনি ক'রে সাত দিন কেটে গেল। কোথাও কোন গোলমাল নেই। কেউ তার কাছে এল না, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে না। খবরের কাগজ তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখত কেউ হারানো টাকার খোঁজ করছে কি না, বা সেই রকম কিছু। মাঝে মাঝে বুকের কাছে বিবেক নাড়া দিয়ে ওঠে, কাজটা হয়ত ভাল হচ্ছে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে মনের সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে নেয়; এ ত আমায় দৈব দিয়েছে। এ ত আমার। আমারই পাওয়ার কথা ছিল। তবে—

শুধু আপিসে না গেলেই নয়, অতি কষ্টে সে সময়টুকু বাইরে থাকা। তার পরই বাড়ী ফেরা, সন্তর্পণে বাক্স খুলে দেখা— সব ঠিক আছে।

আর এক রবিবার। খাওয়া-দাওয়া তখন চুকে গিয়েছে। খাটে পা ঝুলিয়ে স্ত্রীকে বললে, ভাবছি এ বাড়ীটা ছেড়ে দেব। আর চাকরিটাও বেশি দিন করব না। নিজে একটা ব্যবসা-ট্যাবসা যা হোক করব।

ওর স্ত্রী ওর দিকে কট্‌মট্‌ ক'রে চেয়ে রইল। ও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে বললে, এ সময়ে তোমার বাবার সাহায্য পেলে খুব ভাল হয়। তার পর যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমনি ভাবে বললে, ভাল কথা, চল দেখি আজ বিকেলে একটু বেরোই। কিছু কেনা-কাটা করতে হবে।

ওর স্ত্রী ঝাঁঝিয়ে উঠল, আজ মাসের কত তারিখ, খেয়াল আছে? অত বড়-মানুষি ফলাচ্ছ যে! না, আজকাল নেশা-ভাং কর?

সুরেশ অনেকদিন পরে প্রাণ খুলে দরাজ হাসি হাসতে লাগল। বললে, আগে গিয়েই দেখ না। টাকার ভাবনাটা না-হয় আজ আমার ওপরই ছেড়ে দাও।

তার পর বিকেল বেলা সেজেগুজে স্ত্রী ছেলেমেয়ে সঙ্গে নিয়ে বেরুল। রাস্তা থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা উঠল বৌবাজারে প্রকাণ্ড এক গহনার দোকানে। ট্যাক্সিওয়ালাকে ভাড়া দিতে গিয়ে প্রথম ঐ টাকায় হাত দিলে, একটা পাঁচ টাকার নোট নিয়ে। ট্যাক্সিওয়ালা নোটটা নিয়ে তাকে ফিরতি চেঞ্জ দিয়ে আর এক সওয়ারি নিয়ে চ'লে গেল। কলকাতার ট্যাক্সিগুলোর ফুরসৎ নেবার সময় নেই। সুরেশ ভাবে, একটা ট্যাক্সি করতে পারলে বেশ হয়।

সুরেশের স্ত্রী ত অবাক্ হয়ে গেছে। তার পর সুরেশের অর্ডার মত দোকানের কর্মচারীরা যখন দামী দামী জড়োয়া হার বের করতে লাগল, আর সুরেশ বার বার তাকে পছন্দ করতে বলল, তখন তার মূর্চ্ছা যাবার মত অবস্থা হয়েছে।

সুরেশ যখন নাছোড়বান্দা, তার স্ত্রী একটা ভাল ডিজাইনের হার পছন্দ করলে। ইতিমধ্যে বড় খদ্দের দেখে মালিক নিজে আপ্যায়িত করতে এসেছেন। দাম বললেন, সাড়ে তিন হাজার। তার পর একজোড়া ব্রেস্‌লেট, ইয়ারিং—তার দাম হ'ল দেড় হাজার। ছেলের জন্যে একটা আংটি, মেয়ের জন্যে একটা হার, দু'গাছা বালা, সেও হ'ল সাতশো ষাট টাকা। সুরেশ যখন তার কোটের ভেতর-পকেট থেকে একগোছা একশো টাকার আর দশ টাকার, পাঁচ টাকার নোট বার ক'রে গুণে গুণে দোকানদারকে দিচ্ছিল, তার স্ত্রীর যেন আর কথা বলবার শক্তি নেই। সে অবাক্ হয়ে চেয়ে আছে, যেন স্বপ্ন দেখছে।

সুরেশ আড়চোখে তার দিকে চেয়ে শুধু মিটি মিটি হাসছে। দোকানদার নোট গুণে গুণে পরীক্ষা ক'রে হাতেই ধ'রে রইলেন, তার পর সুরেশের দিকে চেয়ে একটু মৃদু হেসে বললেন, আপনারা ভেতরে আমাদের রিসেপ্‌শন্ রুমে একটু বসুন। প্যাকিং করতে একটু সময় লাগবে।

তারা দোকানের ভেতর দিকে নিভৃত একটা ঘরের মধ্যে বসল। কর্মচারীরা দামী কাপে চা দিয়ে গেল। সুরেশের জন্যে দামী সিগারেট।

ওর স্ত্রী আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না। বললে, হ্যাঁগো, এত টাকা তুমি কোথায় পেলে? অ্যাঁ? আমার যে ভয় করছে।

সুরেশ হেসে বললে, ভয় কি! আমি কি চিরকাল গরীব থাকব, টাকা রোজগার করতে পারি না ভেবেছ?

ওর স্ত্রী তেমনি উৎকণ্ঠার সঙ্গে বললে, না, না, তুমি আমার কাছে লুকোচ্ছ! আমার সব যেন কেমন কেমন ঠেকছে। সত্যি ক'রে বল না, এত টাকা তুমি কোথায় পেলে।

সুরেশ চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললে, তোমার চা যে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, খাও, এঁরা আদর করে দিয়েছেন। বড় খদ্দেরদের কেমন খাতির করে দেখেছ?

সুরেশ অভ্যাসের বশে ভুলে গিয়েছিল যে, তার স্ত্রী এ সব অনেক দেখেছে, সেই কখনও দেখে নি।

বললে, ব্যস্ত হচ্ছ কেন? সব বলব। চল না, এর পর নিউ মার্কেটে তোমার জন্যে একটা বেনারসী শাড়ী, ব্রোকেডের ব্লাউজ কিনে একটা ভাল রেষ্টুরেন্টে যাব। আজ আর রান্নাবান্নার ঝঞ্চাটে কাজ নেই, ওখান থেকেই রাতের খাবার খেয়ে নেব। তার পর বাড়ীতে গিয়ে তোমায় সব বলব। তোমাকে একটুখানি অবাক্ ক'রে দেবার জন্যে আগে কিছু বলি নি।

ওর স্ত্রীর মুখে অনেকদিন পরে আজ প্রথম হাসি ফুটে বেরুল। মধুর চাপা তর্জন ক'রে বললে, ধন্যি চাপা লোক ত তুমি। বাব্বা, তোমার পেটে পেটে এত? আমি একবারে বিন্দুবিসর্গও জানতে পারি নি।

সুরেশ খুকীর মাথাটা আদর ক'রে নেড়ে দিয়ে বললে, কি খুকু মা, হার পছন্দ হয়েছে? মেয়েটা ভারী শান্ত। তার কালো কোঁকড়ানো চুলভর্তি মাথাটা নেড়ে জানাল, সে খুব খুশী হয়েছে।

সেই দামী সিগারেটের প্যাকেট থেকে দুটো সিগারেট পর পর শেষ ক'রে তিন নম্বর সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে সুরেশ যখন দরজার দিকে তাকাল, তখন তার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল, বুকের মধ্যে যেন ধপ্ ধপ্ ক'রে আওয়াজ হতে লাগল। তার হাত থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটা দামী কার্পেটের ওপর প'ড়ে গেল। দু'তিন জন পুলিস অফিসার, তাদের পিছনে দোকানের মালিক। এগিয়ে-আসা পুলিস অফিসারের হাতে একতাড়া নোট। ততক্ষণে ওর স্ত্রীও দেখতে পেয়েছে।

পুলিস অফিসার যেন ধমকিয়ে বললেন, এ টাকা আপনি দিয়েছেন?

সুরেশ স্তম্ভিতের মত বললে, হ্যাঁ। তার পর হঠাৎ মরিয়া হয়ে পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠল, ও আমার টাকা—ও আমার টাকা—

পুলিস অফিসার ব্যঙ্গ ক'রে বললেন, সে ত নিশ্চয়ই। আপনার নিজে হাতে তৈরি করা টাকা। তার পর বজ্রাঘাতের মত প্রচণ্ড শব্দ ক'রে বলে উঠলেন, এ সব জাল নোট।

আমরা সবাই একসঙ্গে আর্তনাদের মত ব'লে উঠলাম—জাল নোট!

দিব্যেন্দু বললে, হ্যাঁ, সব জাল নোট। সুরেশের স্ত্রীর মুখ দিয়ে একটাও কাতর চীৎকার বেরুল না। বার বার একটা মর্মান্তিক কথা তার মনে হতে লাগল। মাসের পর মাস সুরেশের অনেক রাত্রি ক'রে বাড়ী ফেরা, তার সেই বিভ্রান্তের মত চেহারা। তার কাছে দিনের আলোর মত সব পরিষ্কার হয়ে গেল। সে শুধু স্বামীর দিকে আগুন-ভরা চোখ তুলে কট্মট্ ক'রে চেয়ে রইল। খোকন আর খুকীকে দু'হাত দিয়ে সবলে বুকের মধ্যে চেপে ধ'রে যেন এই দুর্যোগের ঝড় থেকে আড়াল ক'রে রাখতে চাইল।

তার পর সুরেশের পকেটে আরও চারহাজার, বাড়ী তল্লাসী ক'রে বাকি সব জাল নোট পুলিস আটক করলে। তার স্ত্রী ছেলেমেয়েকে নিয়ে বহুদিন পরে চিরকালের মত বাপের বাড়ী চ'লে গেল। একবার সুরেশের দিকে ফিরেও চাইল না।

তার পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। দিনরাত চলল অত্যাচার। পুলিস টাকা-তৈরির কারখানার সন্ধান চায়। সুরেশ কোথা থেকে তা দেবে? তার স্বীকারোক্তিতে পুলিস কানই দিল না। ধরা পড়লে সবাই এই

সব গল্প বলে। তার পর ছোট আদালত থেকে সেসন্‌স্ আদালত। তার জন্যে জামিন চাইবার কেউ নেই, তার উকিল নেই, মামলা তদ্বির করবার কেউ নেই। শেষের দিকে তার মা যখন খবর পেলেন, বাড়ী বিক্রি ক'রে তিনি উকিল ব্যারিষ্টার লাগালেন। কিন্তু অত প্রবল প্রমাণের বিরুদ্ধে ব্যারিষ্টার আর কি করবে। তার ছ'বছর জেল হ'ল। জজের রায় শুনে তা'র মা আদালত ঘরেই অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। আর সেই রাত্রিতেই হাসপাতালে মারা গেলেন।

দিব্যেন্দু থামলে। কোন প্রশ্ন করবার মত মন আমাদের ছিল না। আমরা বেশ খানিকটা অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। দিব্যেন্দুর বলার গুণে আমাদের মনে হচ্ছিল, যেন একটা দুর্ভাগা জীবনের মর্মান্তিক ট্র্যাজিডি আমাদের সামনেই অভিনীত হচ্ছে।

দিব্যেন্দু আবার বলতে সুরু করলে, তার পর ছ'বছর পরে সুরেশ এক দিন জেল থেকে ছাড়া পেল। অনেক দ্বিধা, দুশ্চিন্তা নিয়ে সে শ্বশুরবাড়ীর গেটের সামনে দাঁড়াল। নতুন দারোয়ান তার বেশ-বাস দেখে ভেতরে ঢুকতে দিল না। ভেতরে চিঠি পাঠাল, কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে চাইল না। হয়ত মিথ্যে করে ভেতর থেকে খবর এল, তারা সব হাওয়া বদল করতে বাইরে গেছে।

তার পর সুরেশ পথকে সম্বল করে বেরিয়ে পড়ল।

দিব্যেন্দু একটু থেমে আমাদের মুখের দিকে চাইলে, তার পর আবার বলতে লাগল, সুরেশ তার জীবনের দুঃখের কাহিনী এমন নিস্পৃহের মত বলেছিল যে, আমি তার দৃঢ়তা দেখে সত্যিই অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম, ভাগ্যের হাতের এই প্রচণ্ড আঘাত সে প্রতিহত করার মত শক্তি কোথাও পেয়েছে। কিন্তু সে আমার ভুল ধারণা। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় আমি তার মুখ ভাল দেখতে পাচ্ছিলাম না। এই কাহিনীর অভিঘাত সেখানে কি চিহ্ন রেখে যাচ্ছিল, তা জানতে পারি নি। হঠাৎ অসহ্য আবেগে বিকৃত তার গলার স্বর শুনে আমি চমকে উঠলাম।

আমার সব চেয়ে দুঃখ কি জানো, দিব্যেন্দু, আমার স্ত্রীর অনাদর আমার অনেকটা সয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার খোকন, খুকী? তারা ত সত্যি কথা জানবে না. তাদের সামনে সারাজীবন ত আর মুখ দেখাতে পারব না। তারা যখন বড় হবে, যখন জানবে তাদের বাবা জালিয়াৎ, জাল নোট তৈরি করে জেলে গিয়েছিল, তখন ঘেন্নায় তাদের মুখ কুঁচকে উঠবে না? তারা আর বাবা বলে কাছে আসবে, আমার দিকে তাকাবে, কখনও কোনোদিন? তার পর ছেলেমানুষের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সুরেশের সে কি কান্না।

কিন্তু আশ্চর্য, হঠাৎ সেই কান্না থামতে না থামতেই সুরেশ উঠে দাঁড়াল। বললে, আমি যাই দিব্যেন্দু, আর না—তার পর অন্ধকারের মধ্যে সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আমি চীৎকার করে ডাকলাম, সুরেশ শোন, আমার একটা কথার জবাব দিয়ে যাও। সেই নির্জন অন্ধকারে, সেই বিস্তৃত কেল্লার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত আমার ঐ কথাগুলিই শুধু অসংখ্য প্রতিধ্বনিতে গেজে উঠল। আমি ঘাটে ফিরে এলাম। সেখানেও সুরেশকে দেখতে পেলাম না। ভাবলাম, কাল সকালে সুরেশকে যা জিজ্ঞেস করবার করব। পরের দিন, তার পরের দিন—প্রায় এক মাস ধ'রে অপেক্ষা করলাম। সুরেশ আর ফেরে নি। তার সেই ছক্, পুঁটলি, বিছানা—কিছুই সে নিয়ে যায় নি। কি তার লজ্জা, কি তার অভিমান, আমি কিছুই বুঝতে পারি নি। আজও না। আমার তাকে প্রয়োজন ছিল। বানিয়ে গল্প অনেক লিখেছি, যেমন ইচ্ছে শেষ করেছি। কিন্তু এই সত্যি গল্পের একটা ভাল উপসংহার তৈরি করার আমার বড় ইচ্ছে ছিল। তার জন্যে ওর বউয়ের ঠিকানাটা আমার প্রয়োজন ছিল। আমার কেন জানি না বিশ্বাস হয়েছিল যে, আমি আবার সব ঠিক করে দিতে পারতাম। আমি এখনও হাল ছাড়ি নি, যদি কোনদিন সুরেশের সঙ্গে আবার দেখা হয়।

বিদ্যুৎ হঠাৎ একটা ভারি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, আশ্চর্য, তুমি ত কোনদিন আমায় জিজ্ঞেস করো নি দিব্যেন্দু। আমি জানি, ওর বিয়েতে বরযাত্রী গিয়েছিলাম। আমাদের কলেজের আরও দু'একজন বন্ধু গিয়েছিল। তালতলার ওদিকে প্রকাণ্ড বাড়ী। কিন্তু জেনে ত আর কোন লাভ নেই।

দিব্যেন্দু চমকে উঠে বললে, কেন?

বিদ্যুৎ বললে, সুরেশের বউ, ছেলেমেয়ে কেউ বেঁচে নেই। ওদের দেশের বাড়ীতে যাবার সময় কালবোশেখীর ঝড়ে নৌকো-ডুবি হয়ে সবাই মারা যায়। সুরেশের শাশুড়ীও সেই নৌকোয় ছিল।

দিব্যেন্দু যেন চীৎকার করে উঠল, তুমি কেমন করে জানলে?

বিদ্যুৎ বললে, গত বছর একটা উইলের ব্যাপারে ওর শ্বশুর আমার বাবার কাছে এসেছিলেন। ওঁকে চিনতে পেরে আলাপ করি, সেই সময় বলেছিলেন। কিন্তু সুরেশের এ সব কথা ত তিনি কিছুই বলেন নি। শুধু বলেছিলেন, ভাল আছে।

আমরা সকলেই এই পরিণতির জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না।

দিব্যেন্দু শুধু বললে, ভাবো একবার, পাছে তার স্ত্রী, ছেলেমেয়ের সঙ্গে আবার দেখা হয়, এই ভয়ে সুরেশ বাংলা দেশ ছেড়ে কোথায় কোথায় না পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সমস্তইটা যে মিথ্যে, সুরেশ তার বিন্দুবিসর্গও জানে না। সে শুধু ভাবছে, তার ছেলে বড় হচ্ছে, মেয়ে বড় হচ্ছে। তাদের কাছ থেকে যত দূরে পালিয়ে থাকা যায়, সেই তার জীবনের এখন একমাত্র কাম্য। দেখ, ভগবান্ বা ওই ধরণের কোন অন্ধ শক্তি ছাড়া এ ট্র্যাজেডি মানুষের পক্ষে কল্পনা করা শক্ত। ভালই হয়েছে, সুরেশ পালিয়ে বেড়াক্ তার কল্পনা নিয়ে, সত্যের সামনে যেন আর কোন দিন তাকে মুখোমুখি দাঁড়াতে না হয়।

আমি বললাম, আচ্ছা, সুরেশের জ্যোতিষী হওয়াটা কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে না?

দিব্যেন্দু বললে, আমিও এ রহস্য ভেদ করতে পারি নি। নিজের ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে সে হয়ত মানুষের দুর্বলতা নিয়ে খেলিয়ে কোন অদ্ভুত মানসিক সান্ত্বনা পায়। কি যে তার ঠিক মনের কথা, বলা কঠিন।

আমাদের আড্ডার আধুনিক শিল্পী ভাস্কর কুলকারণি মারাঠি, কিন্তু বাংলা বলে ভালো, লেখেও ভালো। সে এতক্ষণ চুপ করে ছিল, গভীর মনোযোগ দিয়ে এই কাহিনী শুনছিল বললে, আমার হালের ছবি 'মহানগর ও পতঙ্গ' তোমরা ত সকলেই দেখেছ। সেই অনেক পতঙ্গের একটি সুরেশ। অদৃশ্য আগুনের ছটা সত্যি, দৈব শুধু নিমিত্ত।

আমাদের দ্বিতীয় দফার ধোঁয়া-ওড়া কফির কাপগুলো দু'জন আর্দালি আমাদের সামনে সাজিয়ে সাজিয়ে দিতে লাগল।
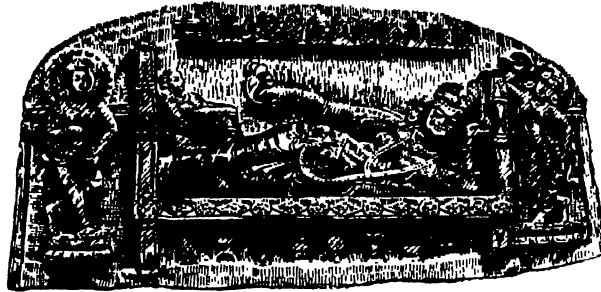
হরতন

শ্রীবিমল মিত্র

যে পেঁপুলবেড়ের বাঁওড় নিয়ে অত দর-কষাকষি মন-কষাকষি চলেছে, সেই পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়ের ওপারেই দেখা গেল কুলি-কাবারি লোকজন সেদিন কোদাল-শাবল নিয়ে কাজ আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। মাঠের দিকে ভোরবেলা কারো নজরে পড়ে নি। বাঁওড়ের দিকে ভোরবেলা কে-ই বা যাবে।

কেষ্টগঞ্জ থেকে মাইল আড়াইটাক দূরের পথ। কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য্যের আমলে ওখান থেকে মোটা আয় হ'ত। জলকর থেকেও বার্ষিক মোটা আয়ের বন্দোবস্ত ছিল। কর্ত্তামশাইও সে জলকর ভোগ করেছেন। চণ্ডিতলার মালোরা ওখানে মাছের কারবার করত। বার্ষিক ডাক হ'ত। এক-একজন মালো-সর্দ্দার সব সম্প্রদায়ের হয়ে জায়গাটা জমা নিত। সে কুড়ি বছর পঁচিশ বছর আগের কথা। তখন ইছামতীতে জল ছিল। বর্ষার সময় যখন নদীতে ঢল নামত তখন দুপাশের পাড় ভেঙে যেত। জায়গায় জায়গায় পাড়ের মাটিতে ধস্ নামত। সেই জল পাড় ছাপিয়ে সময়-সময় ডাঙায় এসেও উঠত। ধান-ক্ষেত পেরিয়ে জলের তোড় নাবাল্ জমির ওপর দিয়ে ওই পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়ের গর্ভে গিয়ে পড়ত। একটানা তিন দিন বৃষ্টি হ'লে আর দেখতে হ'ত না। ইছামতী আর বাঁওড় একাকার হয়ে যেত। তখন পোলো নিয়ে বেরিয়ে পড়ত মালোরা। কেষ্টগঞ্জের মানুষ-জনও ঝুড়ি-গামছা নিয়ে মালকোঁচা মেরে নেমে পড়ত ধান-ক্ষেতের ওপর। কার ধান-ক্ষেত কার বাঁওড়, তখন আর তার হিসেব থাকে না। মালোপাড়ার লোকেরা তখন সমস্ত রাত ধ'রে বাঁওড়ের চারধারে বাঁধ দেবার চেষ্টা করে। বড় বড় গাছের গুঁড়ি আর মাটি ফেলে ফেলে মাছ আটকে রাখবার চেষ্টা করে। সে ক'দিন কেষ্টগঞ্জে মাছের গন্ধে বাতাসও আঁশটে হয়ে ওঠে।

কিন্তু তার পর কি যে হ'ল, ইছামতীর সে তেজও ক্রমে কমে এল। কেষ্টগঞ্জের দক্ষিণে চাংড়িপোতার দিকে রেলের নতুন পুল তৈরি হ'ল আর জলের তোড় কমে এল। তখন এক নাগাড়ে দশ দিন বৃষ্টি হলেও পাড় ছাপিয়ে জল আর ডাঙায় ওঠে না। বাঁওড়টা শুকোতে শুকোতে একেবারে ফুটিফাটা হয়ে উঠল। চোত-বোশেখ মাসে রাখালরা গরু, মোষ, ছাগল চরাতে নিয়ে যেত ঐ পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়ে। বেশ বড় বড় মানুষ-সমান গজাল ঘাস জন্মায় ওখানে। পেট পুরে খেয়ে বাঁচে গরু ছাগল।

কিন্তু সেই সময় থেকেই কর্ত্তামশাইয়ের খারাপ সময় পড়ল।

আর জলকর দেয় না কেউ। কেউ আর জমা নেয় না বাঁওড়। এককালের সেই জম-জমাট্ গা ছম-ছম-করা বাঁওড় ফাঁকা আকাশের নীচে ধূ ধূ করে। আর সেই দিকে চেয়ে চেয়ে কর্ত্তামশাইয়ের বুকটা হু হু ক'রে ওঠে। ঐ বাঁওড়টাই ছিল যেন কর্ত্তামশাইয়ের হৃদ্‌পিণ্ড। সেই হৃদ্‌পিণ্ডটাই শুকিয়ে গিয়েছিল। আর সেই সঙ্গে হরতনও চ'লে গিয়েছিল, ফটিকও নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল, বউমা একলা ছিল—সেও একদিন সব মায়া ত্যাগ ক'রে চ'লে গেল, থাকবার মধ্যে তিনি একলাই রইলেন।

নিবারণ যথারীতি সকালবেলা বাজারে গিয়েছিল। বাজারেই খবরটা প্রথম শোনা গেল।

হলধর পশ্চিমপাড়ার চাষী, সেও বাজারে এসেছে।

বললে—সরকার মশাই, কর্ত্তামশাই কি বাঁওড়টা বেচে দিলেন?

নিবারণ অবাক্ হয়ে গেল। বললে—কেন? বেচতে যাবেন কেন?

—তা হ'লে পথ ঘেরাও ক'রে দিচ্ছে যে সা' মশাইয়ের লোক। আমি বাজারে আসবার পথে দেখে এলাম—

পথ ঘেরাও ক'রে দিচ্ছে! কথাটা যেন ব্যাঁকা ব্যাঁকা মনে হ'ল। আর দাঁড়াতে পারলে না এক মুহূর্ত্ত। হাঁফাতে হাঁফাতে আড়াই মাইল পথ পেরিয়ে যখন পেঁপুলবেড়েতে পৌঁছাল নিবারণ, তার আগেই সব কাজ শেষ

হয়ে গেছে। বাঁওড়ের একটা দিক পুরো বেড়া দেওয়া হয়ে গিয়েছে। নিতাই বসাকবাবুর ম্যানেজার সদানন্দ তদারক করছে আর অমন শ'তিনেক মজুর পুরোদমে হেঁইও-হেঁইও ক'রে কাজ করছে।

নিবারণ খানিকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়েই দম নিলে।

সদানন্দ ছাতার আড়ালে দূর থেকেই দেখেছিল নিবারণকে। কাছে আসতেই বললে—আসুন সরকার মশাই, ছাতার তলায় আসুন—ঘেমে নেয়ে উঠেছেন একেবারে—

ছাতার তলায় নিবারণ গেল না। তার মুখ দিয়ে কথাও যেন আর বেরোতে পারছে না।

সদানন্দ আবার বললে—আহা, কি মাটি দেখছেন, যেন সোনা—

ব'লে নিচু হয়ে হাতের আঁজলায় ধুলো তুলে নিলে।

নিবারণ সেদিকে দেখলে না। বললে—তুমি কার হুকুমে বাঁওড়ে মজুর লাগিয়েছ শুনি? কে এখানে আসতে হুকুম দিয়েছে তোমাদের?

সদানন্দ বললে—তার মানে?

– তার মানে তুমি ভালো ক'রেই জানো সদানন্দ। এ বাঁওড়ের মালিক তোমার কর্তা নয়, মালিক এখনও বেঁচে আছেন, তিনি এখনও মারা যান নি—তা ত জানোই?

সদানন্দ বললে—আজ্ঞে সরকারমশাই, আমি ত তা জানতাম না—

—তুমি জানো না যে কর্তামশাই বেঁচে আছেন?

সদানন্দ বললে—আজ্ঞে সে কথা বলছি না, আমি বলছি বাঁওড় ত হাত-বদল হয়ে গেছে।

—হাত-বদল হয়ে গেছে কি রকম?

—আজ্ঞে এ বাঁওড় ত সা' মশাই কিনে নিয়েছেন।

কথাটা সদানন্দ নিরাসক্ত হয়েই বললে। কিন্তু নিবারণ যেন আকাশ থেকে পড়ল।

বললে—দেখ সদানন্দ, দেশে অরাজক হয়েছে বটে কিন্তু তা হ'লেও এখনও আকাশে চন্দ্র-সূর্য্য উঠছে, তা জানো? আদালতে গেলে সা' মশাইয়ের দশাটা কি হবে, তাও বোধ হয় ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলতে হবে না তোমাকে। এখনও বলছি, তোমার লোকজনদের থামতে বলো, নইলে শেষে কেঁদে কূল পাবে না তোমার বাবু—এই ব'লে রাখছি।

সদানন্দ একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল।

বললে—আদালতই যদি দেখাবেন ত কষ্ট ক'রে আর এই রোদ্দুরে কেন মিছিমিছি দাঁড়িয়ে আছেন, যান না, আদালতেই যান না—

নিবারণও সচরাচর এমন উত্তেজিত হয় না কখনও।

বললে—ভাল কথা বললাম আর তুমি আমাকে আদালত দেখালে সদানন্দ? আদালতে যেতে পারিনে ভেবেছ? কর্তামশাইয়ের অবস্থা খারাপ হয়েছে ব'লে কি আদালত করবার ক্ষমতাটুকুও নেই মনে করেছ?

সদানন্দ আর পারলে না। বললে—যান্ যান, যা পারেন করুন গে যান, মেলা বকবেন না—

—কি বললে?

ওদিকের লোকজনদেরও বোধহয় শেখান ছিল। হঠাৎ নিবারণ চারদিকে চেয়ে কেমন হকচকিয়ে গেল। হঠাৎ নজরে পড়ল, তার আশে-পাশে চারদিকে অসংখ্য লোক যেন তাকে ঘিরে ধরেছে। চারদিকে ভাল ক'রে দেখে নিয়ে যেন তার মাথাটা ঘুরে গেল বন্ বন্ ক'রে। ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ্দুর। মাথার তালু ফেটে যাচ্ছিল এতক্ষণ। এবার যেন তা ফুটিফাটা হয়ে গেল। যতক্ষণ জ্ঞান ছিল ততক্ষণ মনে আছে যেন সবাই তার সামনে একেবারে মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না, আর কিছু শুনতে পাচ্ছে না, আর কিছু বুঝতেও পারছে না। সব একাকার হয়ে গিয়েছে…

৯

এমনিতে কর্তামশাই-এর কাছে যা-কিছু খবরাখবর আসে তা নিবারণের মারফতই আসে। আগে যখন চোখ ভাল ছিল তখন তিনি খবরের কাগজ কিনতেন, লোককে দিয়ে তা পড়িয়ে নিতেন। আর কেষ্টগঞ্জের নানারকম

লোক এসে এটা-ওটা নানা খবর মুখেও ব'লে যেত। ইদানীং তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। লোকজন এখন সবাই যায় ছুলাল সা'র বাড়ীতে।

নিবারণ সেই সকালবেলা বাজারে গিয়েছিল, তার পর বেলা হতে চলল, তখনও দেখা নেই।

বড়গিন্নী যথারীতি উহুনে আগুন দিয়েছিল। তিনটে মাহুষের ত ভারি রান্না। ফুস্ ক'রে দেখতে-না-দেখতে রান্না হয়ে যায়। তার পর আর কোনও কাজ থাকে না। একটা কথা বলবার লোকও নেই বাড়ীতে। বড়গিন্নীরও ত বয়েস হয়েছে। ছেলে বউ নাত্নী সব গেছে। একটা মেয়ে এসে কাজ-কর্ম একটু ক'রে দেয়। বাটনাটা বেঁটে দিলে। ঘরটা ঝাঁট দিয়ে দিলে। কিম্বা কাপড় ক'টা সেদ্ধ ক'রে দিয়ে গেল। তার পর একথালা ভাত নিয়ে আবার নিজের বাড়ী চ'লে গেল।

রাত্রে সরষের তেল গরম ক'রে নিয়ে কর্ত্তামশাই-এর কাছে এসেও বড় একটা কথা হয় না। বড় কম কথার মাহুষ। সেদিন কেষ্ট মালোর খোঁজ করতে যাওয়ার পর থেকেই কর্ত্তামশাই একটু যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। নিবারণের কাছে কথাটা শুনে পর্য্যন্ত মনটা ছট্‌ফট্ করছিল।

নিবারণ বলেছিল, সে বলেছে সে নিজে আপনার কাছে আসবে একবার—আপনাকে যেতে হবে না—

কর্ত্তামশাই বলেছিলেন, তা তুমি তাকে একেবারে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলে না কেন ?

—আজ্ঞে সে তখন নাতির বাড়ীতে যাচ্ছিল, তাই আসতে পারলে না। নাতির বাড়ি সেই মোহনপুরে। মোহনপুর থেকে এসেই দেখা করবে বলেছে—

—তা এতদিন হয়ে গেল, এখনও আসছে না কেন ?

—আজ্ঞে মোহনপুর ত এখানে নয়, সেখানে যাবে, নতুন জায়গায় গেলে কি একদিনের মধ্যে ফিরে আসতে পারে ? সে বলেছে, হরতনের সৎকারের সময় সে হাজির ছিল, ছোটবাবু চণ্ডীতলার শ্মশানে গিয়ে কেষ্ট মালোকে খবর দিয়েছিল—কেষ্ট মালোই লোকজন ডেকে কাঠ জোগাড় করেছিল—

—তার পর ? সৎকার হয়েছিল ?

নিবারণ বলেছিল, কেষ্ট মালো কাঠের ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে চ'লে গিয়েছিল নিজের বাড়ীতে, তার পর বুড়ো মানুষ ঝড়-জল আসছে দেখে আর থাকে নি, নিজের বাড়ী চলে গিয়েছিল—

—তা হ'লে সৎকার হয় নি ?

নিবারণ বলেছিল—তার বেশি কিছু বলতে পারলে না সে। কেষ্ট মালো বললে, আর কে কে ছিল তা ত মনে পড়ছে না, আর বুড়ো মানুষ সব মনেই নেই তার—

—তা তুমি বললে না কেন আর কাউকে জিজ্ঞেস ক'রে খবরটা নিতে ? মালো-পাড়ার আরও ত অনেকে ছিল সেদিন—

—তাও বলেছিলাম ! তা তখন যাবার জন্যে তৈরি, আমি আর কিছু বললাম না।

—তা তুমি নিজেই কাউকে জিজ্ঞেস করলে না কেন ? মালো-পাড়ায় ত গিয়েই ছিলে—

নিবারণ বলেছিল—কেষ্ট মালো নিজেই বললে, সে মোহনপুর থেকে ফিরে এসে খোঁজ-খবর নেবে, তাই আর আমি কিছু করলাম না, ফিরে এলাম।

কর্ত্তামশাই-এর মনঃপুত হ'ল না কথাটা। এতটুকু আক্কেল যদি থাকে। কোনও মাহুষকে দিয়ে একটা কাজ হবার নয় ! তবু ছ'দিন অপেক্ষা করলেন। ভাবলেন, কেষ্ট মালো বুঝি এল ব'লে। রোজ ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠেই বাইরের দিকে চেয়ে দেখেন। চোখে তেমন নজর নেই। রাস্তার লোকজনদেরও চিনতে পারেন না। তবু চেষ্টা করেন। নিচেয় নেমে এসে জিজ্ঞেস করেন—কই, কেষ্ট মালো এল ?

—আজ্ঞে না, এখনও ত এল না।

—এলে আমাকে ডাকবে !

—আজ্ঞে তা ত ডাকবই। আপনার সঙ্গেই ত সে দেখা করতে আসবে।

—সে ত আসবে, কিন্তু আসছে কই ?

নিবারণ বলত—আজ্ঞে সে মোহনপুরে গেছে, ফিরে এলেই আসবে—কথা যখন দিয়েছে তখন নিশ্চয়ই আসছে, কেষ্ট মালো সে রকম লোক নয়—

কর্তামশাই রেগে যেতেন।

বলতেন—কেষ্ট মালো কি রকম লোক সে আমাকে তোমায় আর শেখাতে হবে না। কিন্তু আসছে না কেন শুনি?

বেশিক্ষণ কথা বললে পাছে মাথা গরম হয়ে যায় তাই আর কথা বলতেন না কর্তামশাই। সোজা আবার ওপরে গিয়ে উঠতেন। দিনের মধ্যে বার তিন-চার ওঠা-নামা করতে করতেই বুকটা টন্ টন্ ক'রে উঠত। তার পর সমস্ত চোটটা গিয়ে পড়ত বড়গিন্নীর ওপর। যেন বড়গিন্নীরই সব অপরাধ। বলতেন—না না, আর তেল মালিশ দরকার নেই।

তবু হাতটা বাড়িয়ে দিত বড়গিন্নী। সারা জীবন কর্তামশাই-এর চোটপাট সহ্য ক'রে এসেছে। মানুষটাকে চেনা হয়ে গিয়েছে তার। বলত—একটু মালিশ করি, দেখবে ঘুম আসবে—

—ঘুম এসে কি হবে আর? একেবারে মরণ ঘুম এলেই বাঁচি আমি!

তার পর একটু নরম হতেন যেন। বলতেন—এই দেখ না, কেউ কোনও কম্মের নয়। নিবারণকে পাঠালাম কেষ্ট মালোর কাছে, তা একটা কাজ যদি হয় নিবারণকে দিয়ে। লোকটা ব'লে গেল সে বেঁচে আছে, আর একটু চেষ্টা-চরিত্র ক'রে দেখলে ক্ষতিটা কি? সবাইকে যা-যা বলেছে সমস্ত মিলে গেছে, আর এটা মিলবে না? বেঁচে যদি থাকে ত এখন আঠার বছর বয়েস হয়েছে তার, তা জান? তোমারও ত একটু ভাবনা-টাবনা কিছু নেই! যত ভাবনা সব একলা আমি ভাবব? তোমার কি একটু মায়া-দয়াও হয় না হরতনের জন্যে?

অন্ধকারে বড়গিন্নীর মুখটা দেখা গেল না।

শুধু বললে—আমার কথা ছেড়ে দাও—

—তা ত ছেড়েই দিয়েছি, আমার আর কে আছে: আমার কথাটা কেউ ভাবে না। এই যে চোখের ওপর দুলাল সা' জমি-জমা টাকা-কড়ি হরিসভার নাম ক'রে আমার কাছ থেকে ঠকিয়ে নিলে, কে তার জন্যে ভাবছে? সে-কথা আমি তোমায় বলতে গেছি? না তুমিই কোনও দিন শুনতে চেয়েছ?

বড়গিন্নী এ কথারও উত্তর দিলে না।

—বেশ হয়েছে, ভালই হয়েছে। জাহান্নমে যাক্ সব। আমার কি? আমি ত ড্যাং-ড্যাং ক'রে চ'লে যাব! তখন তোমরাই বুঝবে! আমি ত আর জমি-জমা কিছু সঙ্গে নিয়ে যাব না। আমি যাবার পর তোমার খাওয়া-পরার কষ্ট যাতে না হয়, তাই এত ভাবি! নইলে দুনিয়াতে কে কার?

এই রকম আবোল-তাবোল কত কি বকতেন রোজ।

কিন্তু সেদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই আবার ধপ্ ধপ্ ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নেমে এলেন। নিবারণ সবে তখন মুখ হাত পা ধুয়ে জামা গায়ে দিচ্ছে। কর্তামশাই এসেই জিজ্ঞেস করলেন—কি? আবার সেজেগুজে কোথায় যাচ্ছ? কোন্ রাজকার্য্য করতে যাচ্ছ শুনি?

নিবারণ বললে—কোথাও যেতে বলছেন আমাকে?

কর্তামশাই বললেন—কোথায় আবার যেতে বলব তোমাকে? কোন্ কাজটা তোমার দ্বারা হয় শুনি? কোন্ উপ্‌কারটা হয় তোমাকে দিয়ে?

—আজ্ঞে, আপনি বলুন কোথায় যেতে হবে?

—আমি বলব তবে তুমি যাবে? তোমার নিজের একটা আক্কেল বিবেচনা নেই? সেই যে কেষ্ট মালোর কাছে গিয়েছিলে, তার পর এতগুলো দিন কেটে গেল, তবু সে আসছে না। তা তুমি একবার যেতে পারলে না তার কাছে? একবার গিয়ে দেখে আসতেও পারলে না যে সে মোহনপুর থেকে ফিরে এসেছে কি না!

নিবারণ একটু বিব্রত বোধ করলে।

বললে—এই এখ্খুনি যাচ্ছি কর্তামশাই—

—আমি মনে করিয়ে দেব, তবে তুমি যাবে! কেন? তোমার মনে একবার কথাটা উদয় হয় না যে, কর্তামশাই ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে যাচ্ছেন, দিনে বিশ্রাম নেই, রাত্রে ঘুম নেই, যাই, একবার মালো-পাড়ায় গিয়ে দেখে আসি কেষ্ট মালো ফিরে এল কি না!

এর পর আর দাঁড়ায় নি নিবারণ। বাজারের থলিটা নিয়ে বেরিয়েছিল। তাড়াতাড়ি কেষ্টগঞ্জের বাজারটা

সেরে তার পর ফেরবার পথে মালো-পাড়াটা ঘুরে বাড়ি ফিরে আসবে। বড়গিন্নীও উনুনে আগুন দিয়ে ব'সে ছিল। মেয়েটা বাটনা বেঁটে দিয়েছে। দু' বালতি জল তুলে দিয়েছে রান্নাঘরে। তখনও সরকারমশাই ফিরছে না।

পাড়ার মেয়ে। বহুদিন থেকে কাজ-টাজ ক'রে আসছে। আগে মা কাজ করত, এখন মেয়েটা। হাত-নুড়বুড় একটা লোক না হলে চলেই বা কি ক'রে!

বড়গিন্নী বললে, তুই এবার বাড়ী যা গৌরী, তোর মা আবার ভাববে—

গৌরী বললে, তুমি রান্না চড়াবে না মা?

—বাজারই এখনো আনে নি সরকারমশাই, রাঁধব কি?

তা গৌরী আর কতক্ষণ থাকবে! সেও একসময়ে চ'লে গেল। ভাতের হাঁড়ি চড়িয়ে বড়গিন্নী ব'সে ছিল। ভাত নামল। বড়গিন্নী ভাতের ফ্যান গাললে। তারপর ডাল চড়াল। ডালও হয়ে গেল। তার পর রান্নার আর কিছু নেই। তার পর রান্নাঘরে অনেকক্ষণ ব'সে রইল চুপচাপ। সামনের উঠোনটায় রোদ বেঁকতে বেঁকতে পুবের দালানে গিয়ে সঙ্কীর্ণ হয়ে এল। ছায়া-ছায়া হয়ে এল জায়গাটা। তখনও সরকারমশাই-এর দেখা নেই। সমস্ত বাড়ী তখন রাত-দুপুরের মতন নিঃঝুম হয়ে টা-টা করছে।

হঠাৎ বাড়ীর সদরে কাদের যেন গলা শোনা গেল। হৈ-চৈ করতে করতে কারা এসেছে সদরে।

কর্ত্তামশাইও চম্‌কে উঠেছিলেন। ঝাপ্‌সা চোখে স্পষ্ট দেখতে পান নি প্রথমে। সামনের কালকাসুন্দির বন ঠেঙিয়ে সরু পায়ে-চলা পথটা ধ'রে যেন অনেক লোক আসছে সদরে। কাছে এলেও চিনতে পারলেন না।

—কে? কে তোমরা?

আজকাল ত তেমন কেউ আগেকার মতন আসে না। তাই একটু অবাক্‌ই হয়ে গিয়েছিলেন।

—আমি হলধর, কর্ত্তামশাই।

হলধরকে চিনতেন কর্ত্তামশাই। কর্ত্তামশাই-এর খাস প্রজা। হঠাৎ সামনে যেন ভূত দেখলেন কর্ত্তামশাই। নিবারণের সারা গায়ে রক্তের ছিটে লেগে আছে। কর্ত্তামশাই চোখ দুটো আরো নামালেন।

—নিবারণ না? কি হ'ল এর?

আরো অনেক লোক জমে গিয়েছিল ঘরের ভেতর। তারা সবাই সরকারমশাইকে শুইয়ে দিলে তক্তপোশটার ওপর। নিবারণের মুখ দিয়ে তখন কথা বেরুচ্ছে না। মাথাতেই বোধহয় চোট্‌টা লেগেছিল বেশি। চিঁ চিঁ ক'রে একটু কথা বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই হলধর বললে, কেষ্টগঞ্জের বাজারে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সরকার মশাই-এর, তা আমি জিজ্ঞেস করলাম—কর্ত্তামশাই কি পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়টা বেচে দিলেন?

কর্ত্তামশাই আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, কি বললে হলধর? পেঁপুলবেড়ের বাঁওড় আমি বেচেছি? বেচব কেন? কাকে বেচব?

—আজ্ঞে সা' মশাইকে! তাই ত শুনলাম!

—দুলাল সা'কে বেচেছি? সেই পাষণ্ডটাকে আমি পেঁপুলবেড়ের বাঁওড় বেচেছি? আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

সমস্ত ব্যাপারটা শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন কর্ত্তামশাই। এত পাষণ্ড দুলাল সা'! বহুদিন থেকেই মতলব আঁটছিল বাঁওড়টা নেবার জন্যে। সুগার মিল করবে! থর থর ক'রে কাঁপতে লাগলেন কর্ত্তামশাই সেইখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ যেন মনে হ'ল তাঁর বাস্তুভিটের মাটিটুকু পর্য্যন্ত তাঁর পায়ের তলা থেকে স'রে যাচ্ছে। কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য্যের বংশের সমস্ত ঐশ্বর্য্যটুকু যেন এক মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হয়ে গেল তাঁর চোখের সামনে। ওইটুকুই বলতে গেলে বাকি ছিল। আর ত বড় বড় জমি-জমা সবই গেছে একে একে। এই বাঁওড়টার ওপরই নির্ভর ক'রে ছিলেন তিনি। এইটি গেলে তাঁর আর কি থাকবে? তাঁর বাস্তুভিটেটুকু? সেটা যেতেই বা কতক্ষণ?

যারা নিবারণকে ধ'রে নিয়ে এসেছিল তারা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। তারা দু'পক্ষের কেউই নয়। কোনও পক্ষেরই লোক নয় তারা। অথচ যেন দু'পক্ষেরই। দু'পক্ষের উত্থান-পতনের ছন্দে তারাও ওঠে-নামে।

—ডাক্তারবাবুকে একবার খবর দিয়ে আসি কর্ত্তামশাই।

ব'লে একজন চ'লে গেল। কর্তামশাই নিবারণের মুখের ওপর চোখ নীচু ক'রে দেখছিলেন। কে বুঝি নিবারণের কাপড়টাই ছিঁড়ে মাথায় ফেটি দিয়ে বেঁধে দিয়েছে। তার ওপর রক্তের দাগ লেগে চাপড়া হয়ে গেছে।

কর্তামশাই জিজ্ঞেস করলেন, ওরা তোমাকে মারতে গেল কেন নিবারণ? কী করছিলে তুমি?

নিবারণের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল গড়িয়ে গড়িয়ে।

—কে বললে তোমাকে বাঁওড় বেচার কথা?

নিবারণ আস্তে আস্তে বললে—কর্তামশাই, এর শোধ একদিন ভগবান্ ঠিক নেবেন।

—ভগবানের কথা থাক্ নিবারণ; এত বয়েস হ'ল তোমার, এত দেখলে, তবু ভগবানের নামে নালিশ করছ?

—আজ্ঞে কর্তামশাই, তা ব'লে চন্দ্র-সূর্য্য ত এখনও উঠছে!

—তা উঠুক! কেন মারলে তোমাকে ওরা তাই বল? তুমি ওদের গায়ে হাত তুলেছিলে?

নিবারণ বললে, আজ্ঞে সদানন্দ তদারক করছিল, সে বললে সা' মশাই নাকি বাঁওড় কিনে নিয়েছে! তাতে আমি বললাম, কর্তামশাই জমি বেচলে আমি টের পাব না? তার পর আর জানি না কি হ'ল।

কর্তামশাই রাগে গর গর ক'রে উঠলেন।

বললেন, হারামজাদা শুয়োরের বাচ্ছা মনে করেছে কি? গরীব হয়ে গেছি বলে ভেবেছে কি আমি ম'রে গেছি? থানা-পুলিশ-আদালত-গভর্ণমেণ্ট কিছু নেই?

হলধর বললে, কর্তামশাই, থানায় খবর দিন, আমরা সাক্ষী দেব।

নিবারণ হাত নাড়তে লাগল। চি চিঁ ক'রে বললে, না, না—

কর্তামশাই ব'লে উঠলেন, তোমার কিসের ভয় নিবারণ, দু'টো টাকা হয়েছে ব'লে বে-আইনী কাজ ক'রে যাবে আর আমরা মুখ বুজে সহ্য করব?

হঠাৎ বাইরে একটা গাড়ীর শব্দ হ'ল। সবাই চেয়ে দেখলে অবাক্ কাণ্ড! কালকাসুন্দির ঝোপ যেখানে শেষ হয়েছে, সেই সরু হাঁটা-পথটার মুখের সামনে দুলাল সা'র মটর গাড়িটা এসে দাঁড়াল। কীর্ত্তীশ্বর ভট্টাচার্য্য চোখে দেখতে না পান, দুলাল সা'র গাড়ির শব্দটা চিনতেন। সেই দিকে চেয়ে তিনি দৃষ্টিটাকে আরও তীক্ষ্ণ ক'রে দিলেন। কিন্তু তবু কিছু ঠাহর করতে পারলেন না।

হলধর বললে, সা' মশাই-এর গাড়ি—

কর্তামশাই মনে মনে নিজেকে তৈরি ক'রে নিলেন।

আজ আর কোনও মায়া-দয়া নেই। সারা জীবন জ্বালিয়েছে দুলাল সা'। বিনয়ের ছদ্মবেশ ধ'রে বরাবর তাঁর মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে। একে একে তাঁরই চোখের সামনে কেষ্টগঞ্জে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তাতেও খুশী হয় নি। এখন জোর জবরদস্তির পথ ধ'রে কীর্ত্তীশ্বরকে সমূলে ধ্বংস করতে চায়। এত বাড় বেড়েছে তার।

হলধর হঠাৎ আবার ব'লে উঠল—না কর্তামশাই সা'মশাই নয়, নতুন-বৌ—

নতুন-বৌ! দুলাল সা'র পুত্রবধূ।

নতুন-বৌ গাড়ি থেকে নেমে সোজা আসতে লাগল। কর্তামশাই কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। যেন ছায়ার মত একটা মূর্ত্তি তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। সামনে এসেই একেবারে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে হাতটা মাথায় ছোঁয়াল।

—আমি নতুন-বৌ জ্যাঠামশাই!

কর্তামশাই নতুন-বৌ-এর মুখখানার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। কী বলবেন বুঝতে পারলেন না।

(ক্রমশঃ)

হিংস্র উদ্ভিদ্

আমাদের এই পৃথিবীতে, অবিশ্বাস্য হ'লেও, ঠিক পাঁচশ' রকমের এই ধরণের হিংস্র গাছ আছে।

এরা মাংসাশী। এরা খালি যে বাতাস অথবা মাটির উপর খাদ্যের জন্য নির্ভর করে তা না. জন্তু-জগতেও এরা খাদ্যের সন্ধান করে।

যে কোন ধূর্ত্ত শিকারীর মতই এই খুনী-গাছগুলি শিকারের সন্ধানে অপেক্ষা ক'রে থাকে, তার পরে তাদের ধ'রে খেয়ে ফেলে।

গাছের পক্ষে এইরূপ অস্বাভাবিক ধরণের খাদ্য সংগ্রহ ওদের কেন? তার কারণ হচ্ছে, ওরা সাধারণতঃ লবণাক্ত জলাভূমিতে, যেখানে নাইট্রোজেন নেই সেই রকম জায়গায় জন্মায়—এই নাইট্রোজেন সমস্ত গাছপালার পক্ষে জীবনধারণ করবার জন্য দরকার। সুতরাং যে ভাবে তারা এই নাইট্রোজেন আহরণ করে তাতে তাদের প্রকৃতির সবসেরা আশ্চর্য্য বস্তু ব'লে পরিগণিত করা যেতে পারে।

ব্ল্যাডার ওয়ার্ট নামক একটি গাছ—এটি একটি জলজ গাছ, জলের উপরে জন্মায়। এর পাতাগুলি ছোট ছোট ব্যাগে ভর্ত্তি। একটি পোকা জলে সাঁতার দিতে দিতে এই গাছটির সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ অনুভব করে না। কিন্তু যেই ব্যাগের মুখের কাছে ছুঁচোল লম্বা চুলের একটি ছোঁয়া, অমনি ব্যাগটি বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। যেই এটা ঘটে, অমনি একটা দরজা খুলে যায়, আর জলের স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে পোকাটিও ব্যাগের মধ্যে ঢুকে যায়।

উদ্ভিদ্ জগতের আরেকটি আশ্চর্য্য বস্তু হচ্ছে পিচার প্ল্যান্ট বা কলসী গাছ। এটি একটি উজ্জ্বল রঙের পাতাওয়ালা গাছ, জলাভূমিতে এর বাস—এটি পোকামাকড়দের ভুলের উপর খাদ্যের জন্য নির্ভর করে না। নিজের উজ্জ্বল রঙ, হলদে, লাল, বেগুনী যেমনই হোক্ না কেন, এই দিয়ে শিকার আকর্ষণ করে। অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে এমন একটা গন্ধ ছাড়ে যার নাকি পোকাদের কাছে দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণ।

প্রকৃতি বোধহয় সান্‌ডিউ গাছের মত নিরীহ দেখতে অথচ এত মারাত্মক আর কোন গাছ সৃষ্টি করে নি। এর গোলাকৃতি পাতাগুলি জলের ন্যায় পদার্থে ভর্ত্তি—যেটি সূর্য্যালোকে চক্‌চক্ করে—কোন কোন পোকা, এই যে তরল পদার্থ যেটি সূর্য্যালোকে ঝকঝক্ করে সেইটের দ্বারা আকৃষ্ট হয়—কোনগুলি আবার ওই তরল পদার্থটির গন্ধেও হয়। একটি পোকা যেই এই চুলগুলির একটিতে বসে অমনি কাছাকাছি যে সব চুল আছে ওর উপর ঝুঁকে পড়ে। শিকার মুক্তি পাবার আগেই এই চুলগুলি তাকে জড়িয়ে ধরে। এই চুলগুলি তারপরে এই শিকার থেকে খাদ্যরস বের ক'রে নেয়, তার পর আবার অন্য শিকারের আশায় তাদের আগেকার অবস্থায় ফিরে যায়।—এই পোকাখেকো গাছগুলির মধ্যে সবচেয়ে হিংস্র হচ্ছে ভিনাস ফ্লাইট্রাপ। এরা শিকারের প্রতি হিংস্র ব্যবহার করে ও এরা দক্ষিণ ও উত্তর ক্যারোলিনায় জন্মায়। এর পাতাগুলির ধারে ধারে কাঁটার মত জিনিষ জন্মায়। যেই একটি পোকা এর উপর উড়ে এসে পড়ে, অমনি পাতাটি জুড়ে যায়—এই কাঁটাগুলি পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে। যে পর্য্যন্ত পাতাটি না খুলছে, এই পোকাটি ওই খুনে আলিঙ্গনের মধ্যে ধরা প'ড়ে থাকে যার থেকে আর কোন নিষ্কৃতি নেই।

আশ্চর্য্য যে, এই জন্তু-গাছগুলি ঠিক এরা কি খেতে চায় তা জানে। এরা নাইট্রোজেনওয়ালা খাবার চায়, আর কিছু হ'লে চলবে না। বোটানিষ্টরা অন্যান্য ধরণের খাবার দিয়ে দেখেছেন, কিন্তু এরা সেগুলি প্রত্যাখ্যান করে। বৈজ্ঞানিকগণ প্রায়ই বলেন যে, এই প্রাণীগুলির যে বুদ্ধি নেই, তা বিশ্বাস করা শক্ত।

পৃথিবীতে কোন্‌টি সবচেয়ে বড় হীরব?

এটির নাম হচ্ছে কিউলিনান্—এটির নাম সার টমাস কিউলিনানের নাম অনুসারে রাখা হয়েছিল। সার টমাস কিউলিনান্ দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রিমিয়ার খনি খুলেছিলেন—যেখানে এই হীরকখণ্ড আবিষ্কৃত হয়। এই কিউলিনান্ হীরকখণ্ডটি ১৯০৫ সালে একটি মাইন সুপারিনটেনডেন্ট মাটিতে পড়ে থাকতে লক্ষ্য করেন। এর ওজন ছিল ৩১০৬ ক্যারট অথবা ১ এবং এক-তৃতীয়াংশ পাউণ্ড। এটি এত বড় ছিল

যে, এটাকে নিয়ে যে কি করা যায় তাই কেউ ভেবে পেত না। অবশেষে ট্রানসভাল গবর্ণমেণ্ট এটি অতি অল্পমূল্যে, প্রায় ১৫০,০০০ পাউণ্ড, অর্থাৎ আজকালকার ৪২০,০০০ ডলার দিয়ে কিনে নিলেন এবং রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডকে উপহার দিলেন। এটি ব্যবহার করার পক্ষে অত্যন্ত বড় ছিল তাই ১৯০৮ সালে আমষ্টারডামের হীরক-বিশেষজ্ঞগণ এটিকে ৯টি বড় মণি ও ৯৬টি ছোট হীরকখণ্ডে বিভক্ত করলেন। সবচেয়ে বড় চারটি খণ্ডকে বলা হয় "আফ্রিকার তারা", এদের ব্রিটেনের রাজকীয় সম্পত্তি ব'লে ধরা হয়। প্রথম তারাটির ওজন ৫৩০ ক্যারেট; এটির 'হোপ' হীরার বারগুণ ওজন, এটি রাজার রাজদণ্ডে রাখা হয়েছে। দ্বিতীয়টি (৩১৭ ক্যারেট ওজন) সাম্রাজ্যের মুকুটে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় এবং চতুর্থটি ১৯১১ সালে অভিষেক উৎসবে মহারাণী মেরীর মুকুটে বসানো হয়েছিল। এগুলির স্থলে পরে মেকী-প্রস্তর লাগানো হয়। আসল হীরকখণ্ডগুলি রাণী মেরীর সম্পত্তি ছিল, এখন তা রাণী এলিজাবেথের সম্পত্তি হয়েছে। রাণী এলিজাবেথ এই দু'টিকে রাজ বংশের অন্যান্য বহুমূল্য মণি-মাণিক্যের সঙ্গে বন্ধ করে রেখে দিয়েছেন। মুকুটটি এখন এই মেকীপ্রস্তর সমেতই দেখান হয়।

স্মি

অদ্ভুত বুদ্বুদ

পেনসিলভেনিয়ার জেনারেল ইলেক্ট্রিক কোম্পানীর এঞ্জিনিয়ার মিঃ উইলসন, পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ যান আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করেছেন।

দূর থেকে জলের উপর ঠিক একটি বুদ্বুদের মত দেখাতে এই যানটির তিনি নাম দিয়েছেন "ওয়াটার ট্রটার"।

যখন জলে ভাসান হয় তখন এর ওজন এত কম হয়ে যায় যে, জলে ডোবার কোন ভয়ই থাকে না। তার ফলে আরোহীর ডুবে যাওয়ার ভয় থাকে না।

এতে একটা ফুটো হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আপনি নিশ্চিন্ত মনে এতে চড়তে পারেন। তবে দুটো কি তিনটি ফুটো হ'লে না চড়াই ভাল।

এই যানটি একরকম শক্ত, স্বচ্ছ প্লাষ্টিক দিয়ে তৈরী এবং এর খোল ০.৩ ইঞ্চি পুরু। স্বচ্ছ আবরণ থাকায় আরোহীটি জলের ওপর ব'সে জলের নীচের অনেক কিছুই দেখবার সুযোগ পায় এবং সাবমেরিণের রহস্যও কিছুটা উপলব্ধি করতে পারে।

দশ বছর থেকে একশ বছরের যেকোন অভিজ্ঞ অনভিজ্ঞ ব্যক্তি এই যাত্রার আনন্দ উপভোগ করতে পারে। এতে ব'সে আবার মাছ ধরাও যায়। সাধারণতঃ একজনের জন্যে নির্ম্মিত হলেও দু'জনেও অনায়াসে এই যাত্রা উপভোগ করতে পারে।

অদ্ভুত বুদ্বুদ
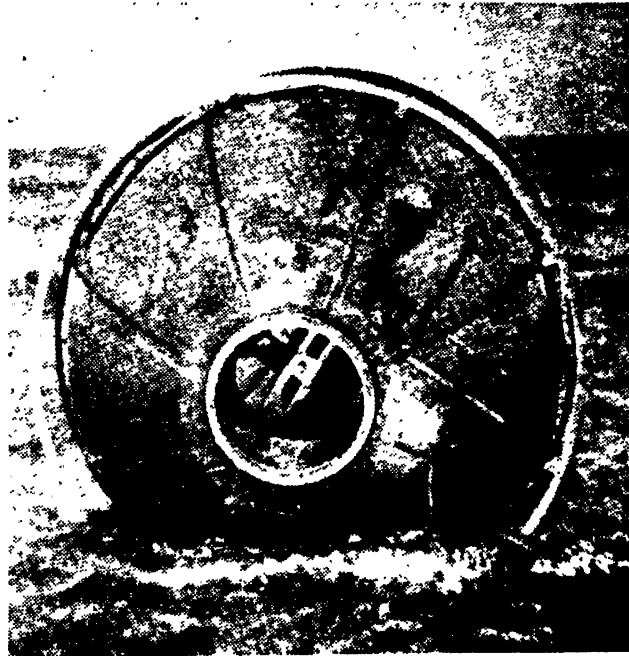
স. না.

সবচেয়ে ভাল পাম্প্

বিগত ৭০ বৎসর ধ'রে গবেষণা ক'রেও বিজ্ঞানীরা এখন পর্য্যন্ত নিশ্চয় ক'রে বলতে পারেন না, কিসের টানে মাটির নীচেকার রস উপরে উঠে গাছেদের পত্র-পল্লবে, শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে যায়। এমন জাতের গাছ আছে যারা ৩০০ ফুট উঁচু হয় এবং যাদের শিকড় মাটির নীচে ৩০০ ফুট পর্য্যন্ত চ'লে যায়। যে রস মাটির থেকে এই গাছরা আহরণ করে তা কোন্ শক্তির সহায়তায় ৬০০ ফুট ঠেলে উপরে ওঠে? মানুষের

হে হৃদযন্ত্র একটি পাম্প্, যার সাহায্যে মনুষ্যদেহের রক্তচলাচলের কাজ সম্পন্ন হয়। এর সমতুল্য কোনো যন্ত্র উদ্ভিদদের দেহে নেই। [illegible]দের দেহে রসের চলাচল হয় কেমন ক'রে? কোনো সাড়াশব্দ নেই, কোনো যন্ত্রপাতি নেই, অথচ একটি পাম্পের কাজ সুনিয়মিত ভাবে [illegible]ছে, কল বিগড়ে গিয়ে কাজ বন্ধ হচ্ছে না, এসব চিন্তা করলে গাছগুলিকে পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল পাম্প্ ব'লে মানতে হয় বই কি?

কোনো কোনো বিজ্ঞানীর মতে জ্বলন্ত বাতির সলতের যে কারণে নিজে থেকে তেলের যোগান উঠে আসে, সেইরকম কোনো কারণেই [illegible]ছেদের সর্ব্বদেহে মাটির নীচে থেকে রসের যোগান উঠে এসে ছড়িয়ে যায়। অর্থাৎ পত্রপল্লব থেকে রসের জলীয় অংশ ক্রমাগত বাষ্প হয়ে [illegible]ড় যায়, এবং তার ফাঁকা ভরাতে নীচেকার রস ক্রমাগত উপরে উঠে আসে। খুবই ভাল ব্যাখ্যা সন্দেহ নেই, কিন্তু এখন পর্যন্ত এটা [illegible]কটা অনুমান মাত্র।
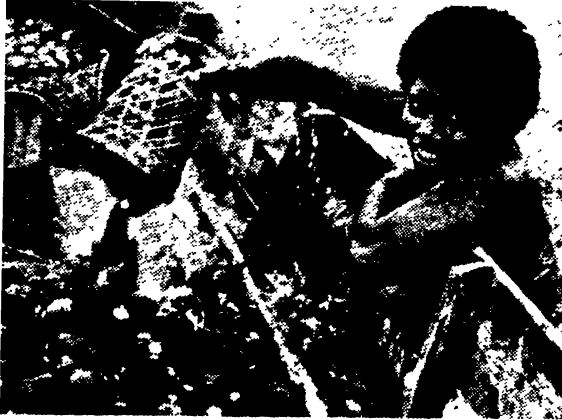
সমুদ্র ও নারী

জাপানী মেয়েরা কি আশ্চর্য্য সাহস ও দক্ষতা নিয়ে সমুদ্রের সম্মুখীন হয়ে তার সঙ্গে লড়াই করে, এ বিষয়ে প্রবাসীর পঞ্চশস্য বিভাগে কিছুদিন আগে আমরা লিখেছি। সম্প্রতি জানা গেল, ফিজি দ্বীপের মেয়েরাও এদিক্ দিয়ে তাদের জাপানী ভগ্নীদের চেয়ে কিছুমাত্র কম যায় না।

এরাও সমুদ্রের জলে ডুব দিয়ে দিয়ে ঝিনুক সংগ্রহ করে। ঝড়-ঝাপ্টাকে এরা একেবারে গ্রাহ্য করে না। বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ক্ষীণাঙ্গী তরুণীরা বিনা দ্বিধায় নেমে যায়। দম নিয়ে এরা যে কত দীর্ঘ সময় জলের নীচে থাকতে পারে, না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না।

ফিজি দ্বীপের ঝিনুক-সংগ্রহকারিণী

পেডি-বাস বা পা-বাস

সাইকেল রিক্শার ধরণের এই পায়ে-চালানো সাইকেল বাসটিতে চ'ড়ে ফরমোসার (টাইওয়ান) কিন্তু শহরের বাচ্চারা কিণ্ডারগার্টেন ইস্কুলে যায়। গরাদে দেওয়া জানলা দিয়ে মাথা গলাতে পারে না ব'লে তাদের প'ড়ে যাওয়ার ভয় নেই। বাংলা দেশের মফঃস্বলের শহরগুলিতে কাচ্চাবাচ্চাদের ইস্কুল যাওয়া-আসার কাজে এই ধরণের পা-বাস চালু করা চলতে পারে।

৮৫ মাইল চওড়া ও ২২৫ মাইল লম্বা ফরমোসা (টাইওয়ান) দ্বীপে বেশীর ভাগ লোকই সাইকেলে চলাফেরা করে। এই দ্বীপের ছয়টি ফ্যাক্টরীতে বৎসরে ৬০,০০০ সাইকেল তৈরি হয়।

পেডি-বাস্ বা পা-বাস্

তুক্‌তাকের ব্যবসা

একজন পর্য্যটক লিখেছেন, তিনি কয়েক বৎসর আগে একবার পশ্চিম আফ্রিকায় ঘানার রাজধানী আক্রার একটি ছোট দোকানে গিয়ে দেখতে পেলেন, সেখানে সাজান রয়েছে মুরগীর শুঁটকি-করা মুণ্ড, জুতোর সুখতলা, নানারকমের দুষ্প্রাপ্য গাছ-গাছড়া, বাচ্চাদের ঝুমঝুমি, হরিণের খুর, উটপাখীর পালক, সাপের চামড়া, এবং এমনি ধারা আরও অনেক-কিছু যাদের একটার সঙ্গে আর-একটার কোন সম্পর্ক নেই, সাধারণ দৃষ্টিতে কারও কোন প্রয়োজনে লাগবার জিনিষ যেগুলি নয়, এবং যেগুলির বেশীর ভাগকে বলা যায় উদ্ভট ও অদ্ভুত।

তিনি সন্ধান নিয়ে জানলেন, এটি একটি তুক্‌তাকের দোকান। মানুষের সমস্ত রকম দুঃখ দুর্দশা, আধিব্যাধির প্রতিকার যে সমস্ত তুক্‌তাকের সাহায্যে হতে পারে তা এই দোকানে কিনতে পাওয়া যায়।

যাঁর চোখ খারাপ হয়ে ব'চ্ছে, যিনি ভাবছেন তাঁর স্ত্রীর মন আর ঠিক আগের মতন ক'রে এখন পাচ্ছেন না, যাঁর কুকুরের মেজাজ ক্রমশঃ খারাপ হচ্ছে, কিংবা তাঁকে নিজের কাজকর্ম্ম বিষয়-আশয় নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে হচ্ছে, তিনি এই দোকানের মালিক মিষ্টার নুকোএর কাছে গেলে অব্যর্থ ফলপ্রদ তুকতাকের সন্ধান একটা না একটা পেয়ে যাবেন।

পর্য্যটক ভদ্রলোকটি একটু মজা করবার জন্তেই বলতে চেয়েছিলেন, তাঁর আঙুলের নখ কামড়াবার অভ্যাসটি তিনি পরিত্যাগ করতে পারেন, এমন কোন তুকতাক্ মিষ্টার নুকোএর জানা আছে কি না। জবাবে মিষ্টার নুকোএ তাঁকে ছোট একটি কাঠের পুতুল দিয়ে সেটিকে তাঁর শোবার ঘরের দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখবার ব্যবস্থা দিয়েছিলেন।

পর্য্যটক ইউরোপীয় ভদ্রলোকটি লিখছেন, যেদিন থেকে ঐ কাঠের পুতুলটিকে তিনি নিজের শোবার ঘরের দেয়ালে টাঙিয়েছেন, সেইদিন থেকেই তাঁর আশৈশবের আঙুল কামড়ানোর বদভ্যাস একেবারে সম্পূর্ণভাবে সেরে গিয়েছে।

পর্য্যটকটি বলছেন, তিনি বুঝতে পারছেন না, এটা faith cure, অর্থাৎ অবিচলিত বিশ্বাস-জনিত রোগমুক্তি, না অন্য কিছু!

সাইকেল-প্লেন

কেবল দৈহিক শক্তির সহায়তায় প্লেন চালিয়ে অন্ততঃ আধ মাইল উড়তে পারলে ১০০০ টাকার মত একটি পুরস্কার দেওয়া হবে ব'লে ঘোষণা করা হয়েছিল। ব্রিটিশ বিমান প্রতিষ্ঠান ডি হাবিল্যাণ্ডের ইঞ্জিনিয়ার ৩১ বৎসর বয়সের জন্ উইমপেনী পায়ে পেডাল-করা গ্লাইডারের ধরণের ছোট একটি প্লেন চালিয়ে ঘণ্টায় উনিশ মাইল বেগে একটানা ২,৯৭১ ফুট (আধ মাইলের চেয়ে বেশী) উড়তে সমর্থ হয়ে এই পুরস্কারটি অর্জ্জন করেছেন। এজন্তে তাঁকে কোনো সরকারী সাহায্য নিতে হয়েছে ব'লে আমরা শুনি নি। অস্মদ্দেশে কেউ একজন উড়বেন ব'লে সরকারী সাহায্যের প্রত্যাশায় আছেন। সাহায্য তিনি পান, এই কামনা করি। হয়ত তিনি কেবল আধ মাইল উড়বেন না, বঙ্গেচ্ছ উড়ে বেড়াবেন। বলা কি যায়?

সাইকেল প্লেন

ফেলে দিন না সিগারেটটা?

লাইটার বের ক'রে সিগারেট ধরাবার সময় এই কথাগুলি একটু মনে রাখবেন।

ধূম্রপানের সঙ্গে ফুসফুসের ক্যান্সার রোগের অত্যন্ত নিকট সম্পর্ক। এ বিষয়ে ইউরোপ-আমেরিকার বিজ্ঞানীদের মনে কোন সন্দেহই আর প্রায় নেই। আমেরিকার ক্যান্সার সোসাইটী চার বৎসর ধ'রে প্রায় দুই লক্ষ লোককে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে যে সিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হয়েছেন সেগুলি এই:

যাঁরা খুব বেশী ধূমপান করেন, তাঁদের মধ্যে ফুসফুসের ক্যান্সারজনিত মৃত্যুর হার যাঁরা ধূমপান করেন না তাঁদের চেয়ে ২৭ গুণ বেশী। যাঁরা সিগারেট খান না তাঁদের সঙ্গে তুলনায়, সিগারেট যাঁরা খান তাঁরা হৃদরোগেও অনেক বেশী সংখ্যায় মারা যান। অত্যধিক ধূমপানের সঙ্গে আরও অনেক কঠিন ব্যাধির, যেমন পাকস্থলীর ক্ষত ইত্যাদিরও নিকট সম্পর্ক।

সিগারেট খাওয়ার অপকারিতা বিষয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ দিনে দিনে স্তূপীকৃত হয়ে উঠছে। ইংলণ্ডে মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের প্রোফেসার ব্রাডফোর্ড হিল ধূম্রপায়ীদের এই ব'লে সতর্ক ক'রে দিয়েছেন যে, ২৫ বৎসর বয়সের কোন মানুষ যদি দৈনিক ২৫ থেকে ৫০টি সিগারেট ক্রমাগত খেয়ে চলে, তা হ'লে তার ফুসফুসের ক্যানসার রোগে ভুগে মরবার সম্ভাবনা শতকরা দশের পর্য্যায়ে আসবে।

কিন্তু সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দাও বললেই সবাই ছেড়ে দিতে পারেন না তাও সত্যি। এজন্তে যে-পরিমাণ ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োজন হয় তা অনেকেরই স্বভাবে থাকে না। যাঁরা ছাড়বার চেষ্টা করছেন তাঁরা অনেকেই জানেন, ক্রমশঃ কমিয়ে ছেড়ে দেবার প্রয়াসও বিফল হয়ে যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে।

তবে বিফলতা আসে প্রথম কয়েকদিনের মধ্যেই। সপ্তাহখানেক কোনরকমে সিগারেট না খেয়ে কাটিয়ে দিতে পারলে প্রতি পাঁচজনের মধ্যে চারজন এই বদভ্যাসের কবল থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারেন দেখা গেছে। ভাবনা এই প্রথম সপ্তাহটাকে নিয়েই।

নীল রঙের একটি বুনো ফল থেকে পাওয়া ভেষজ লোবেলিন থেকে তৈরি ব্যান্ট্রন নামক বড়ি এক সপ্তাহ কাল খেতে দিয়ে অনেকের ধূমপানের অভ্যাস ছাড়ান সম্ভব হচ্ছে ওসব দেশে। এদেশে বড়িটির আমদানী করতে চাইলে আমাদের আইন নিশ্চয় বাধা দেবে।

পৃথিবীর বয়স : মানুষের বয়স

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আইরিশ আর্কবিশপ জেমস্ আশার, একটি বাইবেল নিয়ে ব'সে চারবৎসর ধ'রে বাইবেল-বর্ণিত পুরুষানুক্রমগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব ক'রে এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, যে পৃথিবী-সৃষ্টির তারিখ হচ্ছে, ২৬শে অক্টোবর, ৪০০৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ, সকাল ন'টা।

ডেভিল্‌স্ টাওয়ার

সে-সময় কথাটা অনেকেই বিশ্বাস করেছিল। বাইবেল যে! কিন্তু বিজ্ঞানীদের উৎপাতে বাইবেলের প্রতিপত্তি কমতে লাগল ক্রমশঃ। পরীক্ষার ফলে তাঁরা জানতে পারলেন, ওয়াইয়োমিঙের ডেভিল্‌স্ টাওয়ার নামক লাভা-পাহাড়টির বয়স ৪ কোটি বৎসরেরও বেশী।

এমন গ্র্যানাইট পাথর পাওয়া গেছে যার বয়স ৫০ কোটি বৎসর। ভূতত্ত্ববিদ্‌রা আমেরিকার ম্যানিটোবাতে এমন খনিজ দ্রব্য পেয়েছেন যার বয়স ২৭০ কোটি বৎসর। রাশিয়াতে পৃথিবীর ভিত্তিভূত এমন পাথর পাওয়া গেছে যার বয়স ৩৪০ কোটি বৎসর। রাশিয়া আমেরিকার কাছে এখানেও হার মানতে রাজী নয়!

পৃথিবীর বয়স এসবের তুলনায় স্বভাবতঃই আরোই বেশী। কত বেশী তা নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না, তবে ৪৫০ কোটি বৎসরের কম যে নয়, তা হলফ ক'রে বলা যেতে পারে। হায় বাইবেল! হায় আর্কবিশপ জেম্‌স্ আশার আর তাঁর পুরুষানুক্রমের হিসাব!

কিন্তু মনুষ্যজাতির বয়সের বেলাতেও বাইবেলের পুরুষানুক্রমের হিসাব কোনো কাজে লাগছে না। বিজ্ঞানীরা দেখছিলেন, মানুষের বয়স যা ভাবা যাচ্ছে তা ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ লুইস্ এস্. বি. লিকি, টাঙ্গানিকাতে মনুষ্যজাতীয় একটি জীবের মুণ্ডাস্থি এবং পায়ের অস্থি আবিষ্কার করেন; আর সেইসঙ্গে আবিষ্কার করেন তার ব্যবহৃত কয়েকটি পাথরের তৈরি হাতিয়ার। অত্যন্ত জোরে জোরে তিনি বলেন, এই অস্থি এবং পাথরের হাতিয়ারগুলির বয়স ছয় লক্ষ বৎসরেরও বেশী। তাঁর এই সিদ্ধান্ত প্রমাণিত করতে, আগ্নেয়গিরির যে অগ্ন্যুৎপাত-চূর্ণিত ছাইয়ের মধ্যে এই অস্থি এবং পাথর তিনি পেয়েছিলেন, তা ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষার জন্যে পাঠিয়ে দেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ গার্নিশ এচ্‌ কার্টিসের কাছে। ডঃ কার্টিস পরীক্ষা ক'রে বলেছেন, এই অস্থি ও পাথুরে হাতিয়ারগুলির বয়স ন্যূনপক্ষে ১৭,৫০,০০০ বৎসর।

মানুষ ত মানুষ হয়ে বিবর্তিত হবা মাত্রই হাতিয়ারের ব্যবহার শেখে নি? তাতে তার আরও কত লক্ষ বৎসর লেগেছিল কে জানে?

যুগান্তকারী দশটি ঘটনা

নিউ ইয়র্ক সিটি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার পরামর্শদাতা ডঃ হান্‌স্ কোহ্‌ন্ নিম্নোক্ত দশটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে যুগান্তকারী ঘটনা ব'লে গণ্য করেন।

প্রথম : আনুমানিক ১৭৫০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে হামুরাবির code বা সংহিতা। বাবিলোনিয়ার এই মহৎকীর্ত্তি রাজার প্রাচীন বিধি-বিধানগুলির প্রভাব প্রাচ্য, মধ্যপ্রাচ্য এবং পরবর্ত্তীকালে পাশ্চাত্য জগতের আইন-কানুনগুলোর উপর অত্যন্ত গভীর ভাবে পড়েছে। এই বিধি-বিধানগুলির মূলগত কথা হ'ল, শক্তিমানরা দুর্ব্বলদের ক্ষতি করবে না। জনগণের কল্যাণ, জিনিষপত্রের উর্দ্ধতম মূল্য, শ্রমিকদের নিম্নতম পারিশ্রমিক, এই-সমস্ত অতি আধুনিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা রয়েছে এই সংহিতায়।

দ্বিতীয় : আনুমানিক ৫১৪ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে গৌতম বুদ্ধের জন্ম। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দী মানুষের আত্ম-জিজ্ঞাসার দিক্ দিয়ে একটি স্মরণীয় যুগ। ইস্রায়েলে ইসায়া ও জেরেমিয়া, চীনে লাও-ৎসে ও কনফুসিয়াস, গ্রীসে এস্‌কাইলাস, এইরকম নানা দেশে বিভিন্ন চিন্তানায়কদের দ্বারা মানুষের চিন্তাধারা নূতন নূতন দিকে প্রবাহিত হয়েছে।

তৃতীয় : ৩৯৯ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে সক্রেটিসের মৃত্যু। সত্তর বৎসর বয়সে এই গ্রীক মহামানবকে রাষ্ট্রশক্তির বিরোধিতা করার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সক্রেটিসের মৃত্যু তাঁর শিষ্য প্লেটোকে তাঁর অনুগামিতায় বিশেষ ক'রে অনুপ্রাণিত করে। প্লেটো এবং তাঁর শিষ্য এরিষ্টটলের প্রভাবে পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তা ও শিক্ষানীতি বিশেষভাবে প্রভাবিত।

চতুর্থ : ৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জুলিয়াস সিজারের হত্যা। এই দিগ্বিজয়ী বীর রাজা হয়ে সিংহাসনে বসতে চান সন্দেহ ক'রে রোমক সাধারণতন্ত্রের অভিজাত বংশীয় নেতারা একজোট হয়ে তাঁকে নিহত করেন। তাঁর মৃত্যুর ফলে রোমে যে অন্তর্যুদ্ধ সুরু হয়, তাতে জয়ী হন সিজারের প্রপৌত্র-স্থানীয় অক্টেভিয়াস। অক্টেভিয়াসের সময় থেকে রোম সাম্রাজ্যের সূত্রপাত। সম্রাট্ অক্টেভিয়াসের রাজত্বকালে যীশুখ্রীষ্টের জন্ম হয়। আর এই সময়েই লাতিন সাহিত্য ভার্জিল, হোরেস, ওভিদ ইত্যাদিকে নিয়ে তার স্বর্ণযুগে উত্তীর্ণ হয়।

পঞ্চম : ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে রোমীয় সম্রাট প্রথম কনষ্টান্টাইনের খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ এবং ধর্ম্মীয় সঙ্ঘ ও রাজকীয় শক্তির মিলনে সেই ধর্ম্মের বহুল প্রসার।

ষষ্ঠ : ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই হিজিরা, বা মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহম্মদের মক্কা ছেড়ে মদিনায় গমন। এই দিনটির থেকে মুসলমানদের অব্দ গণনার সুরু, কারণ এই দিন থেকেই অব্যাহতভাবে মহম্মদের শক্তি বৃদ্ধি হতে থাকে। নূতন একটি ধর্ম্মের অনুপ্রাণনা নিয়ে আরব-দেশীয়েরা মহম্মদের তিরোধানের দুই বৎসর পরে পূর্ব্ব রোমক সাম্রাজ্য থেকে সিরিয়া দেশটি ছিনিয়ে নেয়। হিজিরার ১০০ বছরের মধ্যে সমস্ত পশ্চিম এশিয়ায় এবং উত্তর আফ্রিকায় তারা আধিপত্য বিস্তার করে। ইউরোপের মধ্যেও অনেক দূর অবধি তারা তাদের জয়ধ্বজা নিয়ে ঢুকে যায়। তাদের দর্শন, প্রাচীন গ্রীক চিন্তাধারার সঙ্গে তাদের নিবিড় পরিচয়ের যোগ, গণিতে তাদের অসামান্য অধিকার, এই সমস্ত নিয়ে আরব-দেশীয় মুসলমানরা মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় সভ্যতাকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল।

সপ্তম : ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা জন্-এর কাছ থেকে বিদ্রোহী ব্যারণদের ম্যাগ্না কার্টা নামক একটি ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি-পত্র আদায়। এই প্রতিশ্রুতি-পত্র প্রজার উপর রাজকীয় অধিকারকে সীমিত করে, এবং অপক্ষপাত ন্যায় বিচার ও প্রজার সম্মতিসাপেক্ষ করনির্দ্ধারণ প্রথার ভিত্তি স্থাপন করে।

অষ্টম : ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে জার্ম্মেনীতে মার্টিন লুথার কর্ত্তৃক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের নামে নানা অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন।

নবম : ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার। এই বৎসর জেম্‌স্ ওয়াট নামীয় একজন স্কটিশ ইঞ্জিনীয়ার ষ্টীম ইঞ্জিনের পেটেণ্ট নেন। একই বৎসরে রিচার্ড আর্করাইট নামীয় একজন ইংরেজ সুতো বুনবার একটি ফ্রেমের পেটেণ্ট নেন, যার থেকে আধুনিক কাপড়ের কলগুলির উদ্ভব। এই সময় থেকে প্রথম শিল্প-বিপ্লব বা industrial revolution-এর সূত্রপাত। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এক্স-রে, এবং ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ইলেকট্রনের আবিষ্কার থেকে দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লব সুরু হয়েছে ব'লে ধরা হয়।

দশম : ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্যাসোলিন শক্তি পরিচালিত এয়ারপ্লেন আবিষ্কার। এই বৎসরের ১৭ই ডিসেম্বর অর্ভিল এবং উইল্‌বার রাইট নামক মার্কিন ভ্রাতৃদ্বয় গ্যাসোলিন-পরিচালিত একটি এয়ারপ্লেনকে ১২০ ফুট দূর অবধি শূন্যপথে চালিয়ে নিতে সমর্থ হন। দু-এক শতাব্দী পূর্ব্বে যে সব দেশ পরস্পরের অস্তিত্ব বিষয়েও অজ্ঞ ছিল, এয়ারপ্লেনের কল্যাণে আজ তারা নিকট প্রতিবেশী। হয়ত অনতিকাল পরে গ্রহ-চন্দ্ররাও আমাদের নিকট প্রতিবেশীর দলে যোগ দেবে।

চোর-ধরা ব্যাগ

ব্যাঙ্ক দারোয়ানের হাত থেকে এই ব্যাগটি ছিনিয়ে নেবার অনেক বিপদ্। প্রথমতঃ দারোয়ান এটা ছেড়ে দেবার সময় হাতলের একটা সুইচ্ টিপে দেবে, যার ফলে হাতলটার একটা লুকানো অংশ বেরিয়ে এসে চোরের হাতটা চেপে ধ'রে রাখবে। প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই ব্যাগটার তিনদিক্ থেকে তিনটে লোহার বেশ লম্বা হাতা বেরিয়ে আসবে, যাতে চোর ব্যাগটা নিয়ে কোনো গাড়ী বা বাড়ীর দরজা দিয়ে

চোর ধরা ব্যাগ

ঢুকতে না পারে। এতেই শেষ নয়। সেইসঙ্গে একাদিক্রমে একটা হুইশ্‌ল্‌ বাজতে থাকবে, যতক্ষণ না ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে হাজির হয় 'কলকাতার পুলিশের কথা হচ্ছে না, ব্যাগটি ব্রিটেনে তৈরি।

যে বয়সের যা

স্বাস্থ্য-রক্ষার নীতিগুলি সব বয়সের মানুষের পক্ষে একই রকম হতে পারে না। খাদ্য, ব্যায়াম, নিদ্রা ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তার তারতম্য হয় বিভিন্ন বয়সের মানুষের বেলায়।

খাদ্য : কৈশোর অতিক্রান্ত হবার পর খাদ্যবস্তু যে প্রক্রিয়ায় শরীরের পুষ্টি-সাধন করে তার মধ্যে ক্রমশ মন্থরতা আসে। শরীরের পুষ্টির জন্যে এক বেলার আহার্যে ১৮ বৎসরের বালকের যে-পরিমাণ ক্যালরীর প্রয়োজন হয়, ৪০ বৎসর বয়সের মানুষের প্রয়োজন হয় তার চেয়ে ১০০০ ক্যালরী কম। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাই খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে যেতে হয়, সুস্থদেহে বাঁচতে হ'লে। একই কারণে অল্প বয়সে ক্ষুন্নিবৃত্তি না করলে সবল স্বাস্থ্যসম্পন্ন দেহ লাভ করা যায় না। যেসব ছেলেমেয়েদের আহারে রুচি নেই, তাদের সেই অরুচির কারণ অনুসন্ধান করা অবশ্য কর্তব্য।

ব্যায়াম : ক্লান্তিকর নয় এমন ব্যায়াম সব বয়সের মানুষের পক্ষেই আবশ্যক। ডাকপিয়ন প্রভৃতি, যাঁদের হাঁটাচলা ক'রে কাজ করতে হয় এবং অন্তরঃ যাঁরা অবসর সময়ে নিয়মিত ব্যায়াম ক'রে থাকেন, স্বাস্থ্য পরীক্ষায় তাঁরাই নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হন, তাঁদের মধ্যে হৃদ্‌রোগের প্রকোপ লক্ষিত হয় সবচেয়ে কম। তবে এটাও ঠিক যে, হাসপাতালগুলিতে অনেক প্রৌঢ়বয়স্ক এবং বৃদ্ধ রোগীরা আসেন, ভাঙা হাড় ইত্যাদি নিয়ে, যাঁদের সেই অবস্থার জন্যে দায়ী তাঁদের নিজেদের বয়স সম্বন্ধে অচেতনতা। বেশী বয়সে শরীরের হাড় ভঙ্গুর হয়ে আসে। তখন এমনতর খেলাধুলা, ছুটোছুটি ও ব্যায়াম ইত্যাদিতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয় যাতে প'ড়ে গিয়ে বা অন্য কোন রকমে হাড়ে চোট লাগার সম্ভাবনা থাকে। ষাট বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হয়েছে এমন মানুষের পক্ষে হাড় ভেঙে যাওয়া একটি মারাত্মক দুর্ঘটনা। ঐ বয়সে ভাঙা হাড় জোড়া লাগাও যেমন কঠিন, তেমনি হৃদ্‌যন্ত্র, ফুসফুস এবং রক্তবাহী শিরা-উপশিরাগুলি প্রায়শঃই সেই দুর্ঘটনার ধাক্কা সামলাতে অপারগ হয়। কিন্তু বয়স যখন অল্প, তখন শরীরকে সুস্থ, সবল এবং সচল রাখবার জন্যে নিয়মিত এবং আয়াস-সাধ্য ব্যায়ামই হচ্ছে বিধেয়। এমন অনেকে আছেন, যাঁরা কুকুরকে সুস্থ রাখবার জন্যে প্রত্যহ তাকে মাঠে ছুটোছুটি করিয়ে আনেন, কিন্তু নিজের ছেলেমেয়েদের প্রাত্যহিক ব্যায়াম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত।

নিদ্রা : ষাট বৎসর বয়স বহুদিন হ'ল উত্তীর্ণ হয়েছে এমন একজন ভদ্রলোক অল্প কিছুদিন আগে অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা, তাঁর ইন্‌সম্নিয়া (ঘুমোতে না পারার রোগ) হয়েছে। কেননা তিনি রাত ন'টায় ঘুমোতে যান, আর ঠিক ভোর রাত্রি সাড়ে তিনটেয় তাঁর ঘুম ভেঙে যায়, তার পর শত চেষ্টাতেও ঘুম আর আসে না। তাঁর ডাক্তার তাঁকে এই ব'লে ফিরিয়ে দিলেন যে, তাঁর বয়সে যতটা ঘুম তাঁর হচ্ছে তাই যথেষ্ট, আট ঘণ্টাই যে তাঁকে ঘুমোতে হবে এমন কোন কথা নেই। এমন কি, বেশী বয়সে বেশী ঘুম হওয়াটাই শরীরের পক্ষে ক্লান্তিকর হ'তে পারে। অপর দিকে আট ঘণ্টা ঘুমও সব সময়ে যথেষ্ট নয় কিশোর বয়স, অর্থাৎ তের-চোদ্দ থেকে আঠারো-উনিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত। ঐ বয়সের ছেলেমেয়েরা দিনমানে খেলাধুলো ইত্যাদিতে যে পরিমাণ শারীরিক শক্তি ক্ষয় করে তার পরিপূরণের জন্যে দশ ঘণ্টা, এমন কি তার চেয়ে বেশী ঘুমের প্রয়োজন তাদের হয়।

মন : ভাবাবেগ জিনিষটাকে যে-মানুষ জীবনে কখনো অনুভব করে নি, সে হয় অতি-মানুষ, নয়ত মানুষ নামের অযোগ্য। ছোটদের মনে ভাবপ্রবণতা থাকবে এইটেই স্বাভাবিক। তাদের ভাবপ্রবণ মনে নানারকমের প্রেরণা আসবে, অনুপ্রাণনা আসবে, গগনস্পর্শী উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাদের দুর্গম এবং দুরধিগম্য লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এতে বাধা দিতে গেলে তাদের মন ভেঙে যায়, তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। বেশী বয়সের নিয়ম একেবারে উল্টো। অত্যধিক উৎসাহ বা উদ্দীপনা তখন স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। রক্তসংবহন তন্ত্র, হৃদ্‌যন্ত্র এবং শরীরের অন্যান্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাদি হঠাৎ বিকল হয়ে যেতে পারে, যদি ওদের উপর অত্যধিক উত্তেজনার ভার চাপানো হয়।

র্দ্ধক্য বৃদ্ধদের পক্ষে আনন্দদায়ক হবে যদি তাঁরা মনে রাখেন যে তাঁরা জ্ঞানবৃদ্ধ, তাঁদের চিন্তা এবং মননশীলতায় বহু অভিজ্ঞতা এবং বিচক্ষণতা-জনিত শান্ত সমাহিত ভাব তাঁরা আনতে পারেন। এ ভাব আনা মানে এই নয় যে, তাঁরা ভাববেন, বুড়ো হয়ে গেছি, কি আর হবে, হাল ছেড়ে দিলুম। ভাবপ্রবণতার অভ্যাসকে গুটিয়ে নিতে হবে ধীরে ধীরে, খুশী মনে ও বিনা প্রয়াসে।

লাফারু

পিঠে একটি জেট এঞ্জিন বেঁধে এই লোকটি শূন্যে লাফিয়ে উঠে প্রথমবারের চেষ্টাতেই একশ' ফুট দূরে গিয়ে নেমেছিল। লাফাবার কায়দাটা যাদের এখন ভাল রকম আয়ত্ত হয়েছে, তারা ঘণ্টায় ৩৫ মাইল বেগে বেশ কয়েকশ' ফুট চ'লে যেতে পারে। পাহাড় থেকে লাফিয়ে নির্বিঘ্নে নীচে নামা, লাফিয়ে চারতলা বাড়ীর ছাদে উঠে যাওয়া, ছোট নদীনালা পার হওয়া, কাঁটাতারের বেড়া ডিঙ্গানো এ সমস্তই এখন এই লাফারুদের পক্ষে সম্ভব। আমাদের বীর হনুমান্ ত্রেতাযুগে লাফিয়ে লঙ্কায় চ'লে গিয়েছিলেন, সুতরাং এইসব খবরে আমাদের চমৎকৃত হবার আর কি আছে?

লাফারু

স. চ.

বাঙ্গলা দেশে আধুনিক চিত্রাঙ্কন শিল্পের ইতিহাস

শ্রীমিহির সিংহ

আমাদের দেশে আধুনিক চিত্রাঙ্কন শিল্পের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে ই. বি. হ্যাভেল সাহেবের নাম না উঠে পারে না। তবে তাঁর রুচি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের কথা বাদ দিলে তাঁর মতন, ভারতীয় চিত্রকলার প্রতি আগ্রহশীল মানুষের দেখা, ইংরেজদের মধ্যে অনেক মিলবে তাঁর আগে থাকতেই। তাঁরা কেউ ছিলেন শাসনযন্ত্রের পরিচালক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, কেউ বা ছিলেন শিক্ষা বা অন্য বৃত্তি ধারণকারী। এদেশের জলহাওয়ায় বাস করতে গিয়ে নিজেদের অল্প-বিস্তর খাপ খাইয়ে নিতেন এদেশের সমাজের সঙ্গে। চিত্রাঙ্কন শিল্পের নিদর্শন যা লভ্য ছিল এদেশে, তার সম্বন্ধে একটা অনুরাগও স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের মধ্যে গ'ড়ে উঠত। এ অনুরাগ প্রকাশ পেত দু'টি ভাবে: প্রথমতঃ, যাঁরা সত্যিই রুচিশীল ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন, তাঁরা প্রধানতঃ মুঘল বা অন্যান্য শৈলীর ক্ষুদ্রায়তন ছবিগুলির সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রতি যত্নশীল হতেন। দ্বিতীয়তঃ, অবসর বিনোদনের জন্য অনেকে দেশী পটুয়াদের উৎসাহিত করতেন, পাশ্চাত্ত্যে প্রচলিত জলরঙ ব্যবহার পদ্ধতি শিখে এদেশীয়-বিদেশীয় সম্মিলিত এক ধরণে বিভিন্ন ভারতীয় বিষয় নিয়ে পট বা বর্ণনামূলক ছবি আঁকতে।

এই যে শেষোক্ত রকমের ছবিগুলি, এদের অঙ্কনপদ্ধতিও যেমন ছিল মিশ্র-প্রকৃতির, রুচি বা দৃষ্টিভঙ্গিও তেমনি পুরো ভারতীয় হতে পারত না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ-ত্রিশ বছরে এই মিশ্র ধারাটির সবচাইতে উল্লেখযোগ্য স্ফুরণ ঘটল দাক্ষিণাত্যে রাজা রবিবর্ম্মার মধ্যে। রবিবর্ম্মার বিষয়বস্তুগুলি ভারতীয় হলেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সম্পুর্ণভাবে ভিক্টোরিয়ান এবং অঙ্কনপদ্ধতিও ছিল যে-কোনও পেশাদারী ইউরোপীয় প্রতিকৃতি শিল্পীর সমগোত্রীয়। ভিক্টোরিয়ান অঙ্কনপদ্ধতি শিখবার বা শেখাবার লোকের তখন অভাব ছিল না। চারিদিকে সরকারী আর্ট কলেজগুলি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং ইউরোপীয় শিল্পশিক্ষকেরা প্রাণপণে চেষ্টা করছেন চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের "মানুষ" ক'রে তুলতে। অপরপক্ষে এই কলেজগুলির বৃহৎ ছাত্রসম্প্রদায়ের তখন একমাত্র উচ্চাশা, রবিবর্ম্মার মতন খ্যাতি ও স্বীকৃতি লাভ করা।

মানুষ ও পাখী
শ্রীঅরুণ বসু

তবে এই সব শিক্ষকদের মধ্যে ব্যতিক্রমস্বরূপ দেখা দিলেন ই. বি. হ্যাভেল; এবং ছাত্রের দলে ব্যতিক্রম ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই দুইজনের মিলন ঘটল আঠারশ' ছিয়ানব্বই সালে, যখন হ্যাভেল সাহেব মাদ্রাজ আর্ট কলেজ থেকে কলকাতা আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে এলেন—ভারতীয় চিত্রকলার নবজাগরণ এই থেকে সুরু হ'ল বলা যেতে পারে।

মা
শ্রীশ্যামল দত্তরায়

আজকের দিনে, নূতন মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে অবনীন্দ্রনাথ বা হ্যাভেল সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করা হয়ত স্বাভাবিক। এটাও হয়ত ঠিক যে, কালের বিচারে হ্যাভেলের শিল্পবিশ্লেষণ বা অবনীন্দ্র-নাথের শিল্পসৃষ্টির অনেক নিদর্শনই মহত্ত্বের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে পারবে না। তবুও আমাদের মনে রাখতে হবে, এই দু'টি মানুষের দ্বারা ভারতীয় চিত্রকলা তথা চারুশিল্পের জগতে সেদিন কি সংঘটিত হয়েছিল। যে কোনওদিকেই হোক, মানুষের সৃজনীশক্তির স্ফুরণের জন্তে অবশ্য-প্রয়োজনীয় হ'ল আত্মবিশ্বাস তথা আত্মমর্য্যাদা। উনবিংশ শতাব্দীর সেই মূল্যহীনতার যুগে যখন চিত্র-করেরা বিস্মৃত হয়েছেন নিজেদের দেশের প্রবহমান সংস্কৃতির ধারা, অথচ খুঁজে পান নি পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির চাবিকাঠি, সেই সময়ে এই দু'টি ভিন্নধর্ম্মী, ভিন্ন জাতীয় মানুষ একাত্ম হয়ে গেলেন ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দে। এদেশের চিত্রকরেরা তাঁদের দু'জনের মধ্যে দিয়ে ফিরে পেলেন লুপ্ত আত্মবিশ্বাস। আবার, তাঁদের সুসংবদ্ধ প্রচারের মধ্যে দিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজ দীক্ষিত হলেন নতুন রুচির পথে। শুধু তাই নয়, হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে যে আত্মিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার থেকে সূচিত হ'ল শিষ্যপরম্পরার এক অপূর্ব্ব ধারা।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে গেলে অবনীন্দ্রনাথ যে এদেশে শিল্প-সচেতনতার জনক তাতে বোধ হয় খুব সন্দেহের কারণ নেই। তবে তাঁর সবচাইতে বড় দুর্ব্বলতা ছিল যে, তিনি ভারতীয় চিত্রশিল্পকে আত্মমর্য্যাদা দিতে গিয়ে ইতিহাসের পথে ফিরে গিয়েছিলেন অতীতে। ঘড়ির কাঁটা পেছিয়ে দিলে তার ফলভোগ করতেই হয়, কখনও না

কখনও। তাঁকেও করতে হ'ল, বিশেষ ক'রে তাঁর শিষ্যদের ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে। হ্যাভেলের অনুপ্রেরণায় যখন অবনীন্দ্রনাথ হাতড়াচ্ছিলেন ভারতবর্ষের পক্ষে উপযোগী শিল্পসৃষ্টির মালমশলার সন্ধানে, তখন স্বভাবতঃই তাঁর নজর গিয়েছিল ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক বিষয়বস্তুর দিকে এবং অজন্তা, মুঘল ও রাজপুত অঙ্কনপদ্ধতির দিকে। সেটা যদি প্রথম পরিচ্ছেদেই শেষ হয়ে যেত ত আপত্তি ছিল না। কিন্তু যখন দেখা যায় যে, তাঁর শিষ্যদের মধ্যে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর মতন দুই-একজন ছাড়া সবাই ব'সে রইলেন গুরুর বেঁধে-দেওয়া চৌহদ্দির মধ্যে তখন সত্যিই সেটা হতাশার কারণ হয় বই কি। প্রবাসীর পাতায় তাঁদের বেরনো ছবি একসময়ে আমাদের রুচির ক্ষেত্রে যুগান্তর ঘটিয়েছে। কিন্তু আজকে যদি সেগুলি ঘাঁটলে দেখা যায় তবে হয়ত মনে হবে যে, অবনীন্দ্রনাথ জলরঙের যে ব্যবহার আরম্ভ করেছিলেন তা এতদূর পর্য্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁর শিষ্যদের আর সে পথে বিশেষ কিছু করবার ছিল না।

শিল্প-বিচারের ক্ষেত্রে অবশ্য অনেক আলোচনা হয়ে থাকে মূল্যায়নের মাপকাঠিগুলি নিয়ে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সে সম্বন্ধে দু'টি-একটি কথা হয়ত ব'লে নেওয়া উচিত। চিত্র-শিল্প যখন সৃষ্টি হয় তখন তার বিচারের দু'টি দিক্ থাকে। প্রথমতঃ, যিনি শিল্পী তিনি যদি সৎ ও আত্ম-মর্য্যাদাসম্পন্ন হন ত তিনি নিজের উপরেই নিজে কয়েকটি দাবী রাখেন। শিল্পকর্ম্মটি সমাপ্ত হবার পরে তিনি নিজেই প্রথম দর্শক হিসাবে তার একটি বিচার করেন। তিনি দেখেন তাঁর নিজের যা যা করবার অভিপ্রায় ছিল তা তিনি ক'রে উঠতে পেরেছেন কি না। যদি তাঁর নিজের মনে হয় যে, তিনি এ বিষয়ে সফল হয়েছেন ত চিত্রটি শিল্পনিদর্শন হিসাবে যে মূল্যবান্ তাতে সন্দেহ নেই। প্রশ্ন উঠবে যে, অন্য দর্শকদের স্থান কোথায়? আমাদের মতে তাদের স্থান শিল্পীর পরে। শিল্পীর শিল্পসৃষ্টি একান্তভাবেই তাঁর নিজের তৃপ্তির জন্য, দর্শকের বা সমজদারের তৃপ্তির কথা আসে তার পরে। এটা অবশ্য ঠিক যে, বহু দর্শকের ভাল লাগা বা মন্দ লাগার মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে গ'ড়ে ওঠে শিল্পের আর একটি মূল্য—যে মূল্যের সঙ্গে স্বয়ং শিল্পীর আরোপিত মূল্যের কোনও সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই। সার্থক যে শিল্প তাকে এই দ্বিবিধ মূল্যায়নেই উৎরোতে হয়। শুধু তাই নয়, সাম্প্রতিক মূল্য ছাড়া তাকে কালের বিচারেও টি কে যেতে হয়, তবে তা স্থান পায় সার্থকতার আসনে।
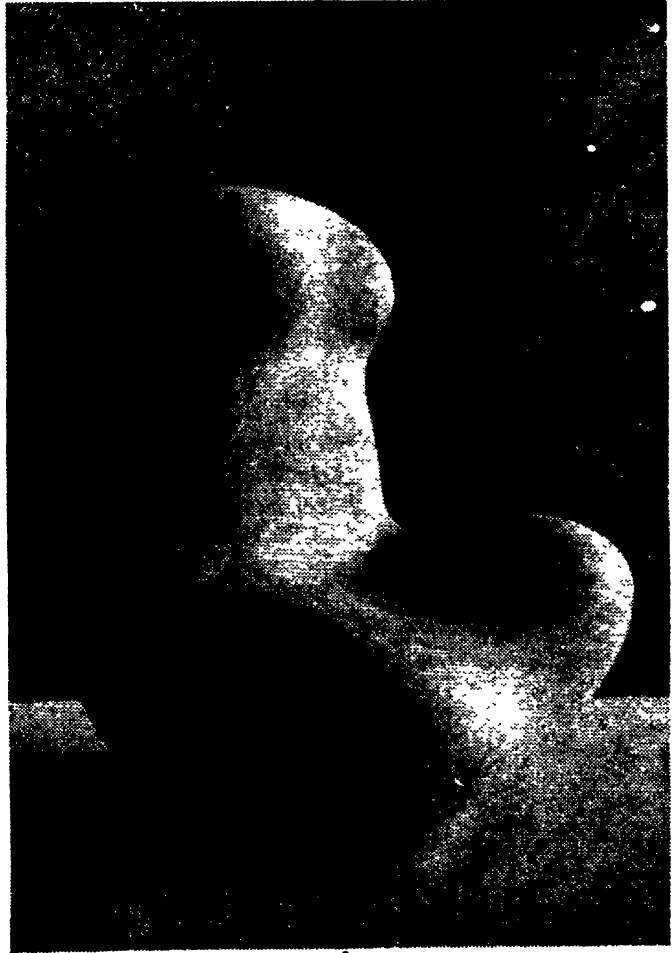
দেহাবয়ব
(ভাস্কর্য্য)
শ্রীঅজিত চক্রবর্ত্তী

শিল্পসৃষ্টির মূলকথা মানুষের সহানুভূতির জগতে নানা দিক্ থেকে নানা "রূপ" বা "form"-এর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আবিষ্কার করা। সবচাইতে উঁচুদরের শিল্পকীর্তিগুলির ক্ষেত্রে এই "সম্পর্কের" প্রতি শিল্পীর যেন প্রায় একটা নিরাসক্তির ভাব প্রকাশ পায়। একটি রক্তমাংসে গড়া মানুষ যখন একান্তে ব'সে কোণারক অথবা তাজমহলের পরিকল্পনা করে তখন সৌন্দর্য্যের প্রতি আবেগও যেন তুচ্ছ হয়ে যায়। চরম সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিল্পী কোনও রকমের আসক্তি বা আবেগের কথা মনে স্থান দিতে পারেন ব'লে মনে হয় না। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীদের মধ্যে সাধারণ ভাবে এই নিরাসক্তির পরিবর্ত্তে একটা রোম্যাণ্টিক আসক্তির ভাবই লক্ষ্য করা যায়। তার থেকে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমস্বরূপ বলা যায় নন্দলাল বসুর উডকাট, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর ভাস্কর্য্য (যা ছাপ ফেলেছে তাঁর চিত্রাঙ্কনের উপরেও) এবং অবনীন্দ্রনাথের নিজের শেষ জীবনের খেলা কাটুম-কুটুমের কথা। এই ধরণের শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে দেখা যাবে, সচেতন ভাবে চেষ্টা চলছে আমাদের অনুভূতির জগতে বিভিন্ন "form"-এর সম্পর্ক তথা ছক্ বা "patttorn"-কে বোঝার মধ্যে দিয়ে অনুভূতিকেই আরও গভীরতা ও যাথার্থ্য (precision) দেওয়ার।

শ্রীমতী
শ্রীসোমনাথ হোড়

আমাদের বক্তব্যটি হয়ত একটি উদাহরণ দিলে সহজবোধ্য হবে: গল্প যখন পড়ি, তখন প'ড়ে আনন্দ পাই ব'লেই পড়ি। সব চাইতে উঁচুদরের সাহিত্যের অন্তর্গত যা গল্প তা কিন্তু নিছক আপাত আনন্দ দেওয়ার পরিবর্ত্তে এমন কিছু উপলব্ধি পৌঁছিয়ে দেয় পাঠকের মনে যা তার মধ্যে গভীরতা আনে, জগৎটাকে হঠাৎ একটা নতুনভাবে বা উজ্জ্বলভাবে বা আরও ভাল ক'রে সে বুঝতে পারে। চিত্র-শিল্পও সেইরকম একটি ব্যাপার। তার সাহায্যেও মানুষের উপলব্ধির গভীরতা বাড়ে—প্রথমতঃ শিল্পীর নিজের ও দ্বিতীয়তঃ রসজ্ঞ দর্শকের। কিন্তু যে জিনিসটা পুরনো বা যাকে ইতিপূর্ব্বে আরও ভালোভাবে দেখা হয়ে গেছে বা বোঝা হয়ে গেছে, তাকে আবার দেখে ত তত আনন্দ নেই? অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যদের মধ্যে সেই নিরানন্দের আস্বাদ অনেক মেলে। তার একটা কারণ হয়ত তৎকালীন সেই শক্তিশালী জাতীয়তাবাদ (যার একটা সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ফল হ'ল জাপানী শিল্পকলার প্রভাব বিস্তার)। স্বাজাত্যাভিমানের যেমন একটা গ'ড়ে তুলবার ক্ষমতা আছে তেমনি কূপমণ্ডুকতার ফাঁদে বেঁধে রাখবারও ক্ষমতা আছে। অবনীন্দ্রনাথ প্রকৃত শিল্পী ছিলেন ব'লে শেষ বয়সেও প্রকৃতির কারখানার বাতিল ক'রে-দেওয়া মালমশলার সঙ্গে রূপের ছক্ খুঁজতে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর অনুগামীরা চিরদিনই ক'রে চললেন সেই ঝাপ্‌সা রঙ আর দ্বিধা-কম্পিত রেখার চর্ব্বিতচর্ব্বণ। তাঁদের সৃষ্টির সঙ্গে আমাদের জীবনের কোনও যোগ তাই দৃষ্টিগোচর হয় না। আমাদের কাছে তা তাই অর্থহীন।

এই জাতীয়তাবাদী কূপমণ্ডুকতার মধ্যে যিনি একেবারেই আবদ্ধ থাকেন নি, তিনি হলেন অবনীন্দ্রনাথের ভ্রাতা গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্পীদের স্বাবলম্বী ক'রে তুলবার প্রয়াসে অবলম্বন করেছিলেন প্রাচীন ভারতীয় (ও জাপানী তথা অন্যান্য প্রাচ্য) পদ্ধতিকে। কিন্তু গগনেন্দ্রনাথ সেরকম কোনও সামাজিক মঙ্গলের জন্যে প্রয়াসী ছিলেন না—তিনি বোধহয় নিতান্তই নিজের খেয়াল-খুশিতে আঁকতেন তাঁর ছবি। তখন পাশ্চাত্ত্যে চলছে ইম্‌প্রেশনিজম ও তার পরেকার যুগ, বহু শক্তিশালী শিল্পী তখন নূতন যুগের সূচনায় রেখে যাচ্ছেন তাঁদের নিজেদের স্বাক্ষর। কি আশ্চর্য্য যে, আমাদের দেশে এক গগনেন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কোনও শিল্পীর সৃষ্টি দেখে মনে হয় না, তাঁরা

একটুও অবহিত ছিলেন সেই সব সংঘটনার সম্বন্ধে। গগনেন্দ্রনাথের শিল্পসাধনায় অবশ্য বেশ সচেতন ছাপ পাওয়া যায় পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার। বিশেষ ক'রে বিভিন্ন রূপের ও আকৃতির জ্যামিতিক বিশ্লেষণ এবং আলো-ছায়ার পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে যে তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল তা বেশ স্পষ্ট। অনেক স্বাবলম্বী মানুষের মতন তাঁর ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি ছিল এই যে, সারা জীবনই তিনি থেকে গেলেন শিক্ষানবীশ। তবে "শিক্ষানবীশ" তিনি একটি দিকে একেবারেই ছিলেন না—সেটি হ'ল ব্যঙ্গচিত্র বা কার্টুনের ক্ষেত্রে। ঠিক জানি না, তবে বোধ হয় গগনেন্দ্রনাথই ভারতীয় কার্টুনের জনক। কালিঘাটের পটুয়ারাও হয়ত ব্যঙ্গচিত্র আঁকতেন কিন্তু সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনার উপরে মন্তব্যমূলক চিত্র গগনেন্দ্রনাথই বোধহয় এভাবে প্রথম সুরু করলেন। যাই হোক, ব্যঙ্গচিত্র নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়। গগনেন্দ্রনাথের যা অন্য সৃষ্টি তার ধারাও তাঁর সঙ্গেই সুরু হয়ে গেল, তাঁর কোন অনুগামী সম্প্রদায় কখনই গ'ড়ে ওঠে নি। গগনেন্দ্রনাথ আমাদের শিল্পজগতে নিতান্তই একটি ধূমকেতুরূপী ব্যক্তিত্ব।

যারা গাড়ী টানে
শ্রীসুহাস রায়

ভারতীয় শিল্প-সৃষ্টির ইতিহাসে অবশ্য সবচাইতে স্বাবলম্বী মানুষটির আবির্ভাব ঘটেছিল সবচাইতে অপ্রত্যাশিত ভাবে—তিনি হলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তীব্র অনুভূতি, প্রবল আত্মবিশ্বাস, রূপ সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ক্ষমতা—সবই তাঁর ছিল, শুধু ছিল না চিত্রাঙ্কনে কোনও শিক্ষানবীশী। কিন্তু তাই বোধহয় তাঁর পক্ষে শাপে বর হয়ে দাঁড়াল। রবীন্দ্রনাথের শিল্প সাধনায় সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্যটি হ'ল এই যে, তিনি গোড়া থেকেই আত্মসমর্পণ করেছিলেন অবচেতন মনের নির্দ্দেশের কাছে। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় অবচেতন-আশ্রয়ী শিল্পশৈলী—যাকে অনেক সময়ে sur-realism নামে অভিহিত করা হয়—কিছু নতুন নয়, কিন্তু সেখানে শিল্পীর মাথা-ব্যথা থাকে টেক্‌নিক্ নিয়ে। মেক্সিকোর শিল্পী স্যালভাডোর ডালির কোনও চিত্র যদি দেখা যায় তবে বোঝা যায় যে, বাস্তবধর্ম্মী শিল্পের আয়াস-সাধ্য টেক্‌নিকের সঙ্গে অবচেতন চিন্তার উপর নির্ভরশীলতার সংমিশ্রণের ফল কি হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলায় কোনও রকমের টেক্‌নিক নিয়ে—ব্যস্ততার কারণই ছিল না—তিনি শুধু মেনে চলেছিলেন তাঁর নিজের মনের নির্দ্দেশগুলি। তাঁর বহু সৃষ্টির মধ্যেই তাই তাঁর বিরাট্ তীক্ষ্ণ ধীশক্তির নীচে বয়ে-চলা সেই বিচিত্র অবচেতনার দীপ্তি আমাদের চোখ ঝল্‌সে দেয়। তবু তাঁর জীবনের সব দিক্ যেমন এক-একটা সম্পূর্ণ সাংস্কৃতিক পরিণতির ইতিহাস—চিত্রশিল্পীরূপেও তাঁর মধ্যে দেখি সূচনা, পরিণতি ও অবনতির এক পূর্ণ চিত্র। প্রথম দিকে দেখি, তাঁর আস্তে আস্তে হাত্‌ড়ে নিজের মতন একটা মাধ্যম খোঁজার চেষ্টা; তার পর, তাঁর সেই বিচিত্র-সম্পদে সাজান চিত্রগুলি—যার বর্ণগৌরব ও বিষয়বস্তু এ জগতেরই বাইরের জিনিষ; আর তারও পরে, অবচেতনকে বিসর্জ্জন দিয়ে দুর্ব্বল আত্মসচেতন ভাবে গতানুগতিকতার শিথিল অনুকরণ—সত্যিই সম্পূর্ণ একটা ইতিহাস! এ ইতিহাস অনুসারে তাঁর কোনও অনুগামী থাকবার কথাও নয়, কেউ ছিলও না। সুতরাং আজকের শিল্পী-সমাজের সঙ্গে তাঁর কোনও সাক্ষাৎ যোগাযোগের সূত্র বার করার চেষ্টা না করাই ভাল।

এর পরেই এসে পড়ে তাঁদের কথা যাঁরা সাধারণভাবে পরিচিত "আধুনিক" শিল্পী হিসেবে। "আধুনিক" কথাটির অপপ্রয়োগ অনেক হয়—কাব্য, সাহিত্য, চিত্র সর্ব্বক্ষেত্রেই অপপ্রয়োগ, যাঁরা আধুনিক ব'লে পরিচিত হতে চান তাঁরা নিজেরাও করেন, আবার যাঁরা নিজেদের অনাধুনিক ব'লে পরিচিত করতে চান তাঁরাও ক'রে থাকেন। মুশকিল এই যে "আধুনিক" যেটা আজকে, সেটা কালকে আধুনিক নাও থাকতে পারে—এবং না থাকাই স্বাভাবিক। শুধু তাই

নয়, আমাদের দেশের একটি মস্ত বিড়ম্বনা এই যে, আমাদের অনেক ফ্যাশান চালু হয় পশ্চিমের ফ্যাশানের অনুকরণে —অথচ পশ্চিমের থেকে আসতে গিয়ে "ডাকে" দেরী হয়ে যায় অনেক। তবুও, এসব বিবেচনা সত্ত্বেও এ কথাটা স্বীকার করতেই হয় যে, কোনও একটা অর্থে নিশ্চয়ই আধুনিক শিল্প ব'লে একটা ধারা চালু আছে যেটা আজকের দিনেই আধুনিক—কোনও বিচারে নিশ্চয়ই আজকের যুগের উপযোগী। যেখানে টেক্‌নোলজি নিয়ে কথা হয় সেখানে সহজেই বোঝা যায় কোন্‌টা আধুনিক, কোন্‌টা নয় ; কিন্তু এখানে বিচারের ভিত্তি হ'ল—রুচি, তা সে হোক ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত।

আমাদের দেশে অবশ্য খুব কৌতূহলোদ্দীপক হ'ল এই সামাজিক রুচির প্রকৃতিটি। চিত্রের জগতে, পাশ্চাত্ত্য দেশে, অর্থবান্ ব্যক্তি এবং বড় বড় ট্রাষ্ট গোষ্ঠের প্রতিষ্ঠানের হাতেই থাকে পৃষ্ঠপোষকতার মধ্যে দিয়ে রুচি তৈরি করার দায়িত্ব। আমাদের দেশেও, চিরকালই—সামন্ততান্ত্রিক নেতারা প্রধান ভূমিকা নিয়ে এসেছেন এ ব্যাপারে। কিন্তু সম্প্রতিকালে, বিশেষতঃ বাংলা দেশে, মধ্যবিত্ত সমাজের হাতেই থেকে এসেছে রুচি গঠনের দায়িত্ব। দু'একজন ছাড়া বেশীর ভাগ শিল্পীই এসেছেন মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের থেকে এবং পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠানগত সাহায্য বা ধনকুবেরদের সাহায্য মোটের পরে খুব বেশী আসে নি—প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে। ফলে পপুলার বা লোকরঞ্জক শিল্পের তুলনায় প্রকৃত শিল্প নিদর্শনগুলি অনাদৃতই থেকে এসেছে। মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে রুচি, ইংরেজী (ও অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য ভাষার) সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে গ'ড়ে উঠেছে খুব তাড়াতাড়ি—কিন্তু চিত্রশিল্প সম্বন্ধে রুচি গড়েছে তার চাইতে শ্লথ গতিতে। এর কারণ অন্যত্র নির্দেশ করা যাবে, তবে ১৯৪৭ সালের পর থেকে বিদেশীয় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলির আনুকূল্যে এবং এ দেশ ও বিদেশে ভ্রমণসুযোগ-বাহুল্যে যত দ্রুত এগিয়ে এসেছে শিল্পরুচি, ১৯৪৭ সালের আগে তার তুলনায় রুচি ছিল অনেক পেছিয়ে এবং তৎকালীন শিল্পীরাও, সচেতন ভাবে হোক বা অবচেতন ভাবে হোক, লোকরঞ্জনের দায়িত্বকে অনেকটাই মেনে নিতেন শিল্প-সাধনার ক্ষেত্রে।

পল্লীগীতির আসর
শ্রীশৈলেন মিত্র
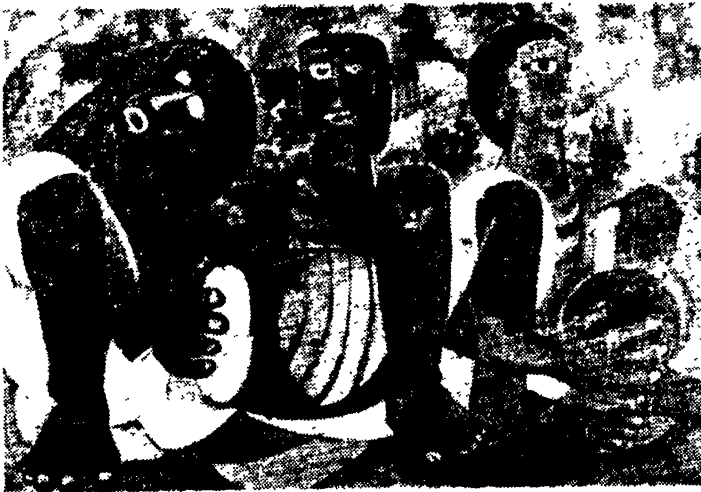
বলা বাহুল্য যে, লোকরঞ্জক শিল্পের ইতিহাসে আমাদের দেশে সব চাইতে বড় নাম হ'ল যামিনী রায়ের। অথচ বিদেশী শিল্প-সমালোচকদের চোখে তাঁর স্থান শিল্প-সাধনার ক্ষেত্রে খুবই উঁচুতে, এবং আমাদের দেশেও তাঁর স্থান নতুন ক'রে কিছু ক'রে দেবার নয়। অসাধারণ দক্ষ এই শিল্পীটি সাধনার প্রথম থেকেই যেন জীবনের ব্রত হিসাবে নিয়েছিলেন বিভিন্ন ধারার অঙ্কন-পদ্ধতি আয়ত্ত করার কাজটি। দেশী, বিদেশী বহু শিল্প-ধারার সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে এবং তাঁর অনুসৃত পটুয়া শৈলীর মধ্যে তাদের অনেকেরই ছাপ পাওয়া যাবে একটু খুঁটিয়ে দেখলে। রঙের ব্যবহার এবং বক্র কিংবা ঋজু রেখাপাতে তাঁর সাহস ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে অনন্যসাধারণ। কিন্তু কালের বিচারে হয়ত দেখা যাবে, কালিঘাটের সেই অনতিপটু পটুয়ারাও উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে তাদের সততার দাবীতে অথচ যামিনী রায় হতে পারেন নি। তার কারণ তাঁর ছবি, সাধারণ ভাবে বলতে গেলে, লোকরঞ্জক শিল্পের পর্য্যায়েই থেকে গেছে এবং তার বিচার হবে কারুশিল্প হিসাবে, চারুশিল্প হিসাবে নয়, তা সে দেখতে যত সুন্দরই হোক না কেন। টেক্‌নিকের উপরে তাঁর অবিশ্বাস্য দক্ষতা যেখানেই মিলিত হতে পেরেছে শিল্পীসুলভ অনুপ্রেরণার

সঙ্গে, সেখানেই তিনি সাফল্যলাভ করেছেন শিল্পের বিচারে। কিন্তু সে যোগাযোগ ঘটেছে বড় কম, তিনি প্রায় সব সময়েই এঁকে গেছেন দর্শকের চাহিদা মাথায় রেখে। তাতে ক্রেতার গৃহাভ্যন্তর সুসজ্জিত হয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু তার চাইতে মহত্তর কিছু ঘটে নি।

যুদ্ধের সমাপ্তি ও স্বাধীনতার সূত্রপাত—এই পর্য্যন্ত এসে গেলেই আমরা পৌঁছিয়ে যাই আমাদের সমসাময়িক যুগে। এ যুগে প্রতিভার অভাব নেই—গোপাল ঘোষ, রামকিঙ্কর বৈজ, কালিকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার ইত্যাদি অনেকের নাম করতে পারি এক নিঃশ্বাসে যাঁদের কেউই খুব ফ্যালনা ব'লে মনে হয় না। তবে এঁরা এখনও আমাদের এত কাছাকাছি যে এঁদের মূল্যায়ন করার সময় হয়ত এখনও আসে নি। এক দিক্‌ থেকে দেখতে গেলে ক্যালকাটা গ্রুপের অন্তর্গত বা তাঁদের সমসাময়িক এই সব শিল্পীদের একটা বিশেষ স্থান দিতে হয় আমাদের দেশের
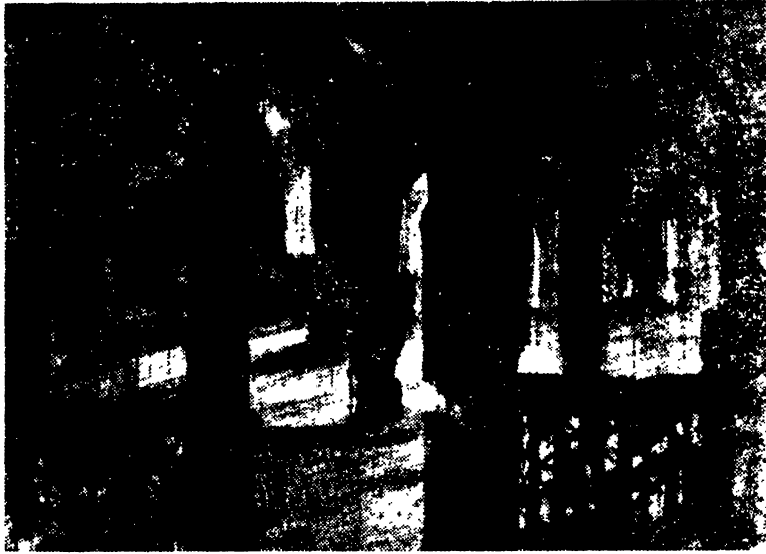
খিলান
শ্রীঅনিলবরণ সাহা

শিল্প-ইতিহাসে। এঁদের সকলেরই প্রায় গোড়াপত্তন অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত হাওয়ায়, তার পরে এসেছে অমৃত শেরগিল প্রমুখ ভারতীয়দের ও ভান গ, শেজান্‌ থেকে সুরু ক'রে পল ক্লে পর্য্যন্ত পাশ্চাত্ত্য শিল্পীদের প্রভাব। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিদেশে শিক্ষানবিশীও করেছেন, তবে তাছাড়াও ভারতের অন্যান্য কেন্দ্রের, বিশেষতঃ বোম্বাই অঞ্চলের শিল্পীদের সঙ্গে সাধারণ অর্থে একটা যোগাযোগের সম্পর্ক এঁদের আছে। অর্থাৎ মোটের উপর এঁরা সবাই—বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে সচেতন এবং টেক্‌নিকের উপরে দখল এঁদের মোটের উপরেই বেশ ভালো। তবে বয়সের বিচারে যদি আরও একধাপ আমরা নেমে আসি ত দেখতে পাব সেই সব শিল্পীদের, যাঁরা গ'ড়ে উঠেছেন অবনীন্দ্রনাথে সুরু নবজাগরণের প্রতি বিশেষ কোনও শ্রদ্ধা ছাড়াই এবং যাঁদের বিশেষ কোনও দ্বিধা নেই দেশীয় (?) বা বিদেশীয় যে কোনও শৈলীর সাহায্যে নিজের নিজের শিল্পী বিবেকের দাবী মেটাতে। ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীদের কাছ থেকে নতুন কোনও খুব বড় জিনিষ আর বিশেষ আশা করা উচিত নয়। তাঁরা দিয়েছেন অনেক, এখন বাকী আছে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়নের। কিন্তু আধুনিকতর শিল্পীরা সবে পা বাড়িয়েছেন সাধনার পথে, কাজেই তাঁদের গুরুত্বই বোধহয় সম্প্রতিকালে সব চাইতে বেশী—এটা তাঁদেরও মনে রাখতে হবে, আমাদেরও মনে রাখতে হবে।

শিল্পের সাধক হিসাবে তাঁদের কর্ত্তব্য বিশেষ সহজ একটা ব্যাপার নয়। শিল্পীর মূল কর্ত্তব্য, যা ইতিপূর্ব্বেই সংক্ষেপে আলোচনা করেছি, তা ত তাঁদের সামনে আছেই। তা ছাড়া আরও দু'টি মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তাঁদের: একটি হ'ল, শিল্পীর নিজের প্রতি সৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের কাছে জীবিকা-নির্ব্বাহের

স্বীকৃতি লাভ করা এবং দ্বিতীয়তঃ আধুনিকতার ফ্যাশানে না মুগ্ধ হয়ে আধুনিক এই যুগটার সঙ্গে প্রকৃত একটি প্রাণের বন্ধন স্থাপন করা। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক শিল্পীর জীবনে এই সমস্যাগুলি তাঁর ব্যক্তিগত সমস্যা হিসেবে উপস্থিত হলেও সমধর্মীদের সঙ্গে একত্রিত হতে পারলে এই দুরূহ সমস্যাগুলির সমাধান ত্বরান্বিত হতে পারে, অন্ততঃ তাঁদের নিজের নিজের ব্যক্তিগত সাহস ও ধৈর্য্য আরও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। সম্প্রতিকালে Society for Contemporary Artists-এর সঙ্গে পরিচিত হয়ে এই সব কারণে সুখী হয়েছি। এই প্রতিষ্ঠানটিতে যে জন-কুড়িক শিল্পী একত্রিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে বয়ঃজ্যেষ্ঠ যিনি তাঁর বর্তমান বয়স ৩৪ এবং বয়ঃকনিষ্ঠ দু'জনের বয়স ২৪—অর্থাৎ বয়সের বিচারে এঁরা সত্যিই contemporary বা সমসাময়িক। শুধু তাই নয়, এঁরা প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে আধুনিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধে গভীর ভাবে অবহিত থাকতে চান, এঁদের উদ্দেশ্যই হ'ল এই বিঘ্নসঙ্কুল সময়ের স্রোতের বাইরে না দাঁড়িয়ে থেকে এর মধ্যে অংশ গ্রহণকারী হিসেবে নেমে পড়া। কাজেই, সার্থক হোক বা না হোক, এঁদের কর্মপন্থার মধ্যে যে একটা প্রকৃত আধুনিকতা আছে তাতে সন্দেহ নেই।

প্রণয়ী-যুগল
শ্রীসনৎ কর

একত্রে এই প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হলেও নিজের নিজের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য-গুলিকে এঁরা কোনও অর্থেই মিশিয়ে দিতে চান না সমষ্টিগত সত্তার মধ্যে। অর্থাৎ এঁরা এই প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে দিয়ে চান মানসিক আদান-প্রদানের সুযোগ, চিত্রকলা প্রদর্শনের সুযোগ এবং সম্ভবমত অন্যান্য সুবিধা, যার সাহায্যে প্রত্যেক সদস্য তাঁর ব্যক্তিগত শিল্পসমস্যাগুলির সমাধান খুঁজে পেতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, Young Contemporary Artists of Bengal নাম দিয়ে এরা প্রথম একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন বোম্বাইতে ১৯৫৯ সালে। এঁদের নামটি তার পরে পাল্টানো হয়েছে এবং ভিন্ন দেশীয় শিল্পধারার সঙ্গে আদান-প্রদানের প্রয়াসে আলিঁয়াস ফ্রাঁসেতে নিজেদের একটি প্রদর্শনী ও পরে চেকোস্লো-ভাকিয়ার শিল্পীদের প্রস্তুত গ্র্যাফিক শিল্পের একটি প্রদর্শনীও নিবেদন করেছেন। ১৯৬০ সালে ও ১৯৬১ সালে বার্ষিক একটি প্রদর্শনী ছাড়াও পর পর কয়েকজন সদস্যের ব্যক্তিগত প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও এঁরা ক'রে উঠতে পেরেছেন। ১৯৬২ সালে এই ধরনের ব্যক্তিগত প্রদর্শনীর সুযোগ পেয়েছেন মে মাসে সুকুমার দত্ত, জুন মাসে শ্যামল দত্ত ও সোমনাথ হোড়, জুলাই মাসে অনিলবরণ সাহা ও অজিত চক্রবর্ত্তী (ভাস্কর্য্য) এবং সেপ্টেম্বর মাসে দীপক ব্যানার্জি ও শৈলেন মিত্র। এই ছোট প্রদর্শনীগুলি সবই করা হয়েছে এঁদের নিজেদের ষ্টুডিওতে। তা ছাড়াও, এঁদের মধ্যে একজন, অরুণ বসুর চিত্রকলার একটি প্রদর্শনী হয়েছে গত জুলাই মাসে অশোকা গ্যালারীতে। যখন ভেবে দেখা যায় যে, পূর্ব্বে প্রদর্শিত কোনও ছবি এঁরা কোনও প্রদর্শনীতে স্থান দেন না তখন এটা অন্ততঃ বুঝতে পারা যায় যে, এঁরা কাজের ব্যাপারে কোনও কুঁড়েমীকে প্রশ্রয় দেন না।

বয়স এঁদের কম, উৎসাহও প্রচুর। সেই সঙ্গে শিল্পসাধনাকে এঁরা জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে মেনে নিয়েছেন। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠবে যে, এঁদের জীবিকার সংগ্রামের চেহারাটি কি? জেনে আশ্বস্ত হওয়া যায়, এঁরা কেউই সৌখীন শিল্পী নন। শিল্পের উপরেই নির্ভর করে এঁদের জীবনধারণের প্রশ্ন। কিন্তু জীবনধারণ করতে গিয়ে নিজেদের শিল্পকে বিকিয়ে দেন নি লোকরঞ্জনের পেশার কাছে। শিল্প-শিক্ষক হিসেবেই অনেকে একটা সামঞ্জস্য বিধান করতে পেরেছেন এই দুরূহ সমস্যার—আবার অনেকে অযাচিত পৃষ্ঠপোষকতা লাভ ক'রে থাকেন সরকারী গ্যালারী ও ধনী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে। সাধারণ ঘরোয়া মানুষরাও যে তাঁদের শিল্পপ্রতিভাকে আদর ক'রে থাকেন তার প্রমাণ ত প্রদর্শনীগুলিতে বিক্রয়ের মধ্যে মিলবেই—তবে আরও সুন্দর একটি প্রমাণ পাওয়া গেল বারুইপুর বেসিক ট্রেনিং কলেজের বার্ষিক মেলায় পর পর গত দুই বছর এঁদের ডাক পড়ায়। এ মেলায় স্থানীয় গ্রাম্য বা আধা শহরে মানুষেরাই আসেন আনন্দলাভ ও অবসর বিনোদনের উদ্দেশ্যে—তাঁরা যদি আদর ক'রে থাকেন এঁদের চিত্রকলাকে তবে যে এঁরা সমসাময়িক জীবনযাত্রার প্রকৃত অংশীদার হতে পেরেছেন তাতে সন্দেহ নেই। তবে কালের অগ্রগতির পথে আরও সব বিচিত্রতর জীবিকার সন্ধান পেয়েছেন এঁরা—কেউ নিয়েছেন গৃহ-সজ্জার বৃত্তি, কেউ বা প্রাচীন চিত্রসম্পদকে পুনরুদ্ধার ও রক্ষা করার বৃত্তি। মোটের উপর এঁরা খুবই প্রাণবন্ত, সেটাই এঁদের সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্য।

শিল্পী যদি প্রাণহীন হন, তিনি যদি থাকেন জীবনযাত্রার কোলাহল থেকে অনেক দূরে, তবে তিনি শিল্পী হতে পারেন কি না জানি না, তবে সমসাময়িক হতে পারবেন না কখনই। আমাদের এই অল্পবয়স্ক শিল্পীরা পরিপূর্ণভাবে সমসাময়িক তাতে সন্দেহ নেই—তবে শিল্পসৃষ্টির মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে পারবেন কি না সে বিচারের দিন আজও আসে নি। অবনীন্দ্রনাথ গত শতাব্দীতে যখন শিল্পের নবজাগরণের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার থেকে বহু দিন আমরা পিছনে ফেলে এসেছি। আজকের দিনে শিল্পের সমজদারের সংখ্যা অনেক বেশী, সফলতার মাপকাঠিও অনেক উঁচু। স্বাধীনতার যুগে কূপমণ্ডূকতার বৃত্তি অচল—দেশে-বিদেশে প্রবহমান বহু শক্তিশালী ধারার ঢেউ লাগছে তাঁদের গায়ে। এই অভাবিতপূর্ব্ব সুযোগের সদ্ব্যবহার তাঁরা করতে পারবেন কি না তা নির্ভর করবে নেহাৎই তাঁদের নিজেদের উপর। টেক্‌নিক নিয়ে বিব্রত থাকা স্বাভাবিক–বিশেষ ক'রে বয়স বা অভিজ্ঞতা যখন অল্প। কিন্তু শিল্পের বিচার টেক্‌নিক দিয়ে নয়—তার বিষয়বস্তু নিয়ে। মহৎ শিল্প মানুষকে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যায় গভীরতর উপলব্ধির মধ্যে। শিল্পী যখন কাজে ডুবে যান তখন তাঁর সামনে যে দিগ্‌দর্শন যন্ত্র থাকে তা হ'ল সততার চৌম্বক শক্তির স্পর্শ-ধন্য। তার সাহায্যে তিনি নিজেই তাঁর চেতন-অবচেতনের সুড়ঙ্গ পথ পেরিয়ে উত্তীর্ণ হন নিজের কাছে সফলতার মাপকাঠিতে। দর্শকের স্তুতি, পৃষ্ঠপোষকের সাহায্য ত তার অনেক পরের কথা। প্রাণবন্ত এই তরুণ শিল্পীরা নিশ্চয়ই পাবেন সফলতার স্বাদ—নিষ্ঠা হোক তাঁদের সহায়।

রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্রাবলী

রাজনারায়ণ বসুর নাম বাংলার বিদ্বৎসমাজ ভুলিতে পারেন না। তবে সাধারণ শিক্ষিত লোকে হয়ত তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছে। ইনি জন্মগ্রহণ করেন ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং সেকালের হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেন। বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত ছাড়া পারস্যভাষায় তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে "সেকাল ও একাল" এবং "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" আজও মানুষ স্মরণ করে। "ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা" প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য। রাজনারায়ণ বাংলার জাতীয়তার যজ্ঞে অন্যতম পুরোহিত ছিলেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজনারায়ণ, নবগোপাল মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি হিন্দুমেলার উদ্বোধন করেন। কংগ্রেস প্রথম হয় ১৮৮৫-তে। হিন্দুমেলায় সত্যেন্দ্রের "জয় ভারতের জয়" গান হয়। রাজনারায়ণকে একজন Grandfather of Nationality নাম দেন। এই সরল ও ধর্ম্মনিষ্ঠ গৃহস্থ জীবনের শেষ ভাগে দেওঘরে বাস করিতেন। সেখানে লোকে তাঁহাকে ঋষি বলিত ও দেওঘরে গিয়া তাঁহাকে না দেখিলে সেখানে যাওয়া বৃথা মনে করিত। রাজনারায়ণের দৌহিত্র অরবিন্দ ঘোষ এবং অন্যতম জামাতা কৃষ্ণকুমার মিত্র। কর্ম্মজীবনে রাজনারায়ণ মেদিনীপুরে বাস করিতেন।

সে-যুগে বাংলার বহু মনস্বীর সঙ্গে তাঁহার গভীর যোগ ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ইঁহা অপেক্ষা নয় বৎসরের বড় ছিলেন এবং তৎপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ বোধ হয় রাজনারায়ণ অপেক্ষা বার-তের বৎসরের ছোট ছিলেন। পিতা ও পুত্র উভয়ের সঙ্গেই রাজনারায়ণের গভীর যোগ ছিল। ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে তিনি মহর্ষির বন্ধু ছিলেন কিন্তু জাতীয়তা-বোধ, রসবোধ ইত্যাদিতে দ্বিজেন্দ্রনাথই তাঁহার অধিকতর নিকটের ছিলেন। রাজনারায়ণ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ উভয়ের প্রাণখোলা অট্টহাস্যই সেকালের লোকের নিকট তাঁহাদের একটা বিশেষত্ব বলিয়া কথিত ছিল। মহর্ষির অন্যান্য পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির সঙ্গেও রাজনারায়ণের যোগ ছিল। মহর্ষির জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবীকে রাজনারায়ণ স্নেহভরে "মা" বলিয়া ডাকিতেন। সৌদামিনীর সহিত ইঁহার পত্রবিনিময় হইত। রাজনারায়ণ উনিশ বৎসর বয়সে দেবেন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত হইয়া আদি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন।

প্রবাসীর প্রতিষ্ঠাতা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে রাজনারায়ণ 'স্যর' রামানন্দ বলিয়া ডাকিতেন, চিঠির উপরে এবং চাঁদার খাতায়ও স্যর রামানন্দ লিখিতেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট স্যর উপাধি দিলে রামানন্দ হয়ত প্রত্যাখ্যান করিতেন। কিন্তু রাজনারায়ণ-প্রদত্ত উপাধি ইনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমরা রাজনারায়ণকে লিখিত কয়েকজনের পত্র তাঁহার দৌহিত্রী শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্ত্তীর নিকট পাইয়াছি। সেগুলি প্রবাসীতে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশান্তা দেবী

ও

৩ পৌষ বৃহস্পতিবার
পার্ক ষ্ট্রীট

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

অনেক দিবস হইল আপনাকে পত্র লিখি নাই, আমাকে ছেলেরা ধরিয়াছে আপনাকে লিখিবার জন্য তাদের সাধনা কাগজের কতকগুলি গ্রাহক আপনার করিয়া দিতে হইবে ওখানে আপনার সহিত অনেক লোকের আলাপ হইয়াছে তাদের বলে কহে যদি কাগজ লওয়াতে পারেন; আপনি সাধনা পাইয়াছেন পড়িয়া কিরূপ বোধ হইল ভাল হইয়াছে কি? এখন অপরিপক্ক হাতের লেখা তত ভাল না হবারই কথা।

শান্তিনিকেতনের উপাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য খুব ধুমধাম হইতেছে, বড়দাদা কাল সেখানে যাইবেন আপনি তার সঙ্গি হইলে খুব আমোদ ভোগ করিতে পাইতেন; সকল দলই সেখানে একত্রিভূত হইবেন আপনি আসিলে ভাল হইত পৌষ মাসের উৎসব এবং মাঘ মাসের উৎসব দুইটা দেখে যেতেন।

আমি কুষ্ঠরোগীদের জন্য কতকগুলি টাকা চাঁদা তুলিয়া রাখিয়াছি আরো কতকগুলি পাবার আশায় আছি সেইগুলি যদি পাই তবে একত্র করে পাঠাব, আপনার নিকট পাঠাব কিম্বা এখানে কাহার নিকট পাঠালে

আপনারা পাইতে পারেন তাহা আমাকে লিখিবেন, ৫০৲ টাকা আমি গগনের নিকট হইতে লইয়া আপনার নিকট পাঠাইয়াছিলাম; মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় সত্যপ্রসাদের শ্বশুর ২৫ টাকা দিয়াছেন সেটা কি আপনার নিকট পাঠাব কিম্বা এখানে কাহার নিকট পাঠাব সেটা আমাকে বলে দেবেন; যাঁহারা ২ টাকা দিয়াছেন তাহাদের নাম যদি কাগজে বাহির করেন তবে মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় বাড়ি চোরবাগান নামটা দেবেন, আর আমরা মেয়েদের মধ্যে দু এক টাকা জড়ো করে যে টাকাটা তুলেছি সেটার নাম আপনার দিতে হবে না; দেখুন আপনার মা হয়ে আমি চুপ করে বসে নাই ছেলের জন্যে কাজ করে দিচ্ছি, বাস্তবিক গরীব হতভাগ্যদের দুর্দ্দশা শুনে বড় কষ্ট হয়, আপনি যত টাকা পাইয়াছেন তাহাতে ওদের বেশ ভরণপোষণের সবরকম সুবিধা হতে পারিবে ত? গরীবদের যদি সকল রূপ ভাল করে দিতে পারেন তবে আপনি দেশের একটা মহৎ কাজ করিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই; আপনাদের দেখাদেখি অন্যান্য তীর্থস্থানেও হতে পারবে।

আপনার শরীর কেমন আছে? বধূমাতা ও অন্যান্য সকলে কেমন আছেন?

সৌদামিনী দেবী।

ও

৩০ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

এবার আপনাকে পত্র লিখিতে বিলম্ব হইয়া গেল, আরবার এখানকার সংবাদ পান নাই বলিয়া ভাবিত ছিলেন সেই কারণে আমি শীঘ্র উত্তর দিয়াছিলাম এবার ততটা শীঘ্র উত্তর দেবার ততটা আবশ্যক নাই দেখিয়া ধীরে সুস্থে লিখিতেছি।

রাজা রামমোহন রায়ের প্রণীত গ্রন্থাবলি বলিয়া যে একখানি পুস্তক আপনি প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে আপনার ও বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, এখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক হইয়াছে, বেদের ও উপনিষদের সারমর্ম্ম যাহা তাহা লইয়া তিনি পণ্ডিতদের সহিত অনেক তর্ক-বিতর্ক করিয়াছেন, এবং অনেক দেশের কুপ্রথা নিবারণ করিয়া গিয়াছেন। সহমরণ উঠিয়া দিবার নিমিত্তে কতই তাঁর পরিশ্রম করিতে ও ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহা বলা যায় না, এই পুস্তকটী পাঠ করিয়া তাঁর কাজের অনেক পরিচয় পাওয়া গেল এবং অনেক জ্ঞান লাভ হইল; তিনি যে আমাদের দেশে একটি মহৎ লোক জন্মেছিলেন তাহার আর সন্দেহ নাই

বড়দাদা আজকাল ভারি ব্যস্ত তিনি একটি বিষয় লিখছেন সেইটি এই শনিবারে সাধারণদের নিকট বক্তৃতা দেবেন, তাঁর আহার নিদ্রার অবসর নাই দিনরাত সেই লেখা লইয়া মাথা ঘোরাইতেছেন, সে লেখার বিষয়টি এই আর্য্যামি ও সাহেবিআনা, আপনি এ সময়ে এখানে থাকিলে তাঁর পক্ষে বড় ভাল হতো, একএকবার আপনার জন্য বড় আক্ষেপ করেন।

আপনি ও বধূমাতা সকলেই বোধ হয় কুশলে আছেন, এখানকার মঙ্গল জানিবেন।

সৌদামিনী দেবী।

৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট।
১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৪।

শ্রীচরণেষু:—

আপনার প্রেরিত একখানি কার্ড এবং প্রুফের সহিত লিখিত কয়েকবর্ষের পত্র পাইয়াছি।

আমি পুস্তক-বিক্রয়ের কোন লাভের অংশ চাই না; কারণ সেরূপ উদ্দেশ্যে আমি পুস্তকখানি ছাপাই নাই। লাভ হইলে আপনারই থাকিবে। লোকসান হইলে আমারই হইবে।

ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যদি পুস্তকের কাটতি হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য পুস্তক বাঁধান যাইবে। ইংলণ্ডস্থ ব্যক্তিগণ এবং সম্পাদকগণকে উপহার দিবার জন্য কয়েক খণ্ড বাঁধান পুস্তক প্রস্তুত করাইব। আপনি যত ইচ্ছা পুস্তক উপহার দিতে পারেন। কিন্তু এগুলি বাঁধান হইবে না। কারণ, এক একখানি পুস্তক বাঁধাইতে অন্তত

ই আনা খরচ পড়িবে। সুতরাং ৭৫খানি পুস্তকের বাঁধাই খরচ ১।৴০ পড়িবে। আমার হাতে বেশী টাকা থাকে না। সম্প্রতি ত কিছুই নাই। এ স্থলে, পুস্তক কিরূপ কাটিবে, তাহা না জানিয়া, অধিক খরচ করিতে সাহস হয় না।

পুস্তকের মূল্য, কাগজের মলাট ।০ আনা, এবং বাঁধান ।৵০ আনা করিব মনে করিয়াছি। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় বিক্রয় হইলে তথায় cloth bound edition-এর মূল্য six pence করিব। আগামী সপ্তাহ হইতে আমায় এণ্টেন্স পরীক্ষার কাগজ দেখিতে আরম্ভ করিতে হইবে। সুতরাং পুস্তক উপহার দিবার ভার আর কাহারও হাতে দিতে পারিলে ভাল হয়।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনার নিকট একটি প্রার্থনা জানাইতেছি। ইন্দুবাবু দাসাশ্রমের কার্য্যে ময়মনসিংহ গিয়াছেন। আপনি যদি রাজা সূর্য্যকান্তের নামে দাসাশ্রম সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া একখানি চিঠি দেন, তাহা হইলে বিশেষ বাধিত হই। যদি কোন সঙ্কোচ বোধ করেন, বা আপত্তি থাকে, তাহা হইলে অন্ততঃ একখানি সার্টিফিকেট দিলেও কিছু কাজ হইতে পারে। যদি শারীরিক দৌর্ব্বল্য বশতঃ কিছুই লিখিতে না পারেন, তাহা হইলে কোন কথাই নাই। দাসাশ্রমের কার্য্য বলিয়া আপনাকে এত কথা লিখিতেছি।

আশা করি আপনারা সকলে কুশলে আছেন।

স্নেহ এবং আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
"স্যার" রামানন্দ।

পুঃ শেষ ফর্ম্মাটি ছাপা হইলেই বই পাঠাইব।

ওঁ

২৩ আশ্বিন বুধবার

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনাদের দুজনের মিটমাট হয়ে গেছে ভালই হইয়াছে, আপনি লিখেছিলেন বড়দাদাকে বারণ করিতে চিঠি লিখিতে, কিন্তু বড়দাদা যে আপনার চিঠি পড়িতেন, তাঁর ওইটে শুনে আরো রোক হইতো' চিঠি লিখিতে তাড়াতাড়ি করে লিখিতে বসিতেন, আপনি ক্ষান্ত হওয়াতে তবে সুস্থির হইয়াছেন।

আপনি যতটা আশঙ্কা করিয়াছেন, ততটা কিছুই হয় নাই এখানে একটিও হিন্দু ওঁর বিপক্ষে কিছু লেখে নাই, বলে নাই বরং সকলেই প্রশংসা করিয়াছেন; সকলে বলিলেন এখনকার সমাজের উপযোগী লেখা হইয়াছে হিন্দুদের প্রাণে আঘাত লাগিলে এতদিন কি চুপ করিয়া থাকিতে পারিত কত আন্দোলন চলিত, আপনার ভিতরে যতটা এখনো হিন্দু ভাব আছে, হিন্দু সমাজের মধ্যে ততটা আছে কি না সন্দেহ।

বড়দাদা আপনার শেষ চিঠি পেয়ে বড় খুসী, বলেন তিনি আমার সঙ্গে আড়ি করিয়াছিলেন আমাকে আর চিঠি লিখিবেন না বলিয়াছেন, ভারি মুস্কিলে পড়িয়াছিলেন।

যোগীনের শরীর এখন কেমন আছে? আপনি কেমন আছেন? বধূমাতা কেমন আছেন? এখানকার সকল মঙ্গল জানিবেন।

সৌদামিনী দেবী।

নীচের Vocabulary সমেত তারিখহীন ও স্বাক্ষরহীন এই চিঠিটি দ্বিজেন্দ্রনাথের:

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

"Paglasco Narisne"[১] is my motto as regards বাইবোড়ো[২] চিটি। আইবোড়োর ভাই বাইবোড়ো, আপনাকে ইহা বলা বাহুল্য। আমার শর্ব্ব্লচ[৩] কর্ত্তম্স্[৪] তদ্বৎ। আমি এখন ব্র্[৫] ব্যস্ত্। আমি এখন বঙ্গীয় আত্মগরিমার মানচিত্র লিখিতে ঘোরতর ব্যস্ত আর কিছুদিন বাদে আপনাকে খোলাসা করিয়া তাহার বিবরণ লিখিব —আপাততঃ এই পর্য্যন্ত।

Vocabulary

১। পাগলা সাঁকো নাড়িসনে। ২। বায়ুবৃদ্ধিজনক। ৩। শরীর ভাল আছে। ৪। কর্ত্তামশায়। ৫। বড় ব্যস্ত।

তারিখহীন ও DNT স্বাক্ষরিত এই চিঠিটিও দ্বিজেন্দ্রনাথের:

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমি যোগীনকে শান্তিনিকেতনে পাঠাইবার অনুরোধ যাহা করিয়াছিলাম তাহার একটি নিগূঢ় অভিসন্ধি ছিল। আমার···রচনার মন্ত্রতন্ত্র সমস্তই লিপিবদ্ধ হইয়াছে—যোগীনকে পাইলে তাহাকে তাহা রীতিমত গিলাইয়া দিই—এইটিই আমার মর্ম্মগত অভিসন্ধি। পুরাণে আছে বিশ্বামিত্র ঋষি দশরথের নিকট রামচন্দ্রের loan চাহিয়াছিলেন—তাহাতে দশরথ শিরে হাত দিয়া বসিয়াছিলেন—কৌশল্যা জননীর তো কথাই নাই!! কিন্তু জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী—আমি যোগীনকে মাতৃসেবা হইতে···বিরত করিতে ইচ্ছা করি না—শ্রদ্ধেয়া ঋষিপত্নী যদি ভাল থাকেন তাহা হইলে—এবং তাহা হইলেই (Englishism মাপ করিবেন)—আমি যোগিনের উপর আমার claim-এর ডিক্রীজারি করিব—এখন ডিক্রীপ্রাপ্ত হইয়াই আমি সন্তুষ্ট আছি; তবে কিনা—পাছে তামাদি হয়। সেই একটা ভয় আছে—caution (?) be helped!

শ্রদ্ধেয়া ঋষিপত্নীঠাকুরাণীর পীড়ার সংবাদ শুনিয়া আমার মনটা দমিয়া গেল। তাঁহার কিরূপ চিকিৎসা হইতেছে? ও অঞ্চলে নিপুণ চিকিৎসক আছে কি? বাত রোগটা আমাদের দেশে আজকাল সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে—আমি দেড় বৎসর কাল তাহাকে পুষিয়া এখন গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিয়াছি। ঝাড়ানোতে আমার কিঞ্চিৎ ফল দর্শিয়াছিল—আপনারা ওখানে ঝাড়াইতে জানে এমন কোনো ওঝা গোছের লোক থাকিলে, তাহাকে দিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ভাল হয়—যদিচ trial মাত্র। DNT

ওঁ

২৫২ সৌথ সার্কুলার রোড্
১ মে

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার এই বিপদের সময় আমি কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারিলে বড়ই সুখী হইতাম—কিন্তু আমার সাংসারিক অবস্থা এক্ষণে অত্যন্ত শোচনীয়। আপনি বোধ হয় জানেন আমি জাহাজ চালানি করবারে প্রবৃত্ত ছিলাম—ইংরাজ কোম্পানীদিগের সহিত ভয়ানক প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল—সেই কারবারে আমি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি—ঋণজালে একেবারে জড়িত হইয়া পড়িয়াছি—যে টাকা মাসহারা পাই তৎসমস্তই সুদ দিতে ব্যয় হইয়া যায়; আমার নিজের নিতান্ত আবশ্যকীয় খরচ অতি কষ্টে নির্ব্বাহ হয়।

এই অবস্থায় আপনাকে কোনোপ্রকার সাহায্য করা একেবারে আমার পক্ষে অসাধ্য। ঋণের দায় বড় দায়, এ দায় হইতে আপনি কোনোপ্রকার উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছেন জানিলে সুখী হইব। এখানে সমস্ত মঙ্গল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

৪ঠা আশ্বিন, শুক্রবার

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

বড়দাদাকে শাস্তি দেওয়া উচিত মত কার্য্য নহে বলিয়া আমাদের পারলিমেণ্ট হতে তাহা রহিত করা গেল। আমাদের ক্ষমাগুণও সদ্গুণের পরিচয় বড়দাদা ইহা হইতে পাইলেন।

আমার ভারি ইচ্ছা হয় যে, বড়দাদার ওই বক্তৃতা ইংরাজিতে অনুবাদ করে ম্যাক্সমুলারকে উপহার পাঠান হয়। কিন্তু ওরূপ বাঙ্গালা অবিকল অনুবাদ করা সহজ ব্যাপার নহে আর যে সে লোকেরও কর্ম্ম নহে। আপনি যদি একটু কষ্ট লইয়া চেষ্টা করেন, নিজে বোধ হয় এখন পারিবেন না। অন্য কোন লোকের দ্বারা যদি করাইয়া দেন বড়দাদার ইহাতে খুব মত আছে; আমি ত আপনার উপর ভার দিলাম আপনি কি করেন দেখি।

আপনার জন্য চার-পাঁচখানি আমশত্ত পাঠাইলাম। দুধের সহিত খাইবেন। ভাল আমশত্ত। পিতার জন্য দিয়াছিল, তিনি খাইলেন না, তাহা আপনার জন্য পাঠাইলাম।

আপনি কেমন আছেন এবং বধূমাতা ও অন্য সকলে কেমন আছেন?

জ্যোদ্দা (?) কর্ম্মের জন্য গেছেন তাহা ত বুঝিয়াছি ওঁরা সক করিয়া টাকা ব্যয় করে তিন মাসের জন্য বেড়াতে গিয়াছেন, টাকা থাকিলে আর কিসের ভাবনা তখন সকলি পাওয়া যায়।

আমশত্তটা আজ ডাকে পাঠালেম। আপনারা সন্ধান করিয়া ডাকঘর হইতে লইবেন। বেশীদিন থাকিলে বর্ষাতে খারাপ হইয়া যাইবে।

সৌদামিনী দেবী।

(সৌদামিনী দেবীর এই চিঠিটির দ্বিতীয় প্যারায় সম্ভবতঃ দ্বিজেন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে আড়াআড়ি ভাবে লেখা আছে—যোগিনের দ্বারা।)

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি।

ভক্তিভাজনেষু,

আমি সম্প্রতি কিছুকাল হইতে মফস্বলে আছি সেইজন্য আপনার পত্র পাইতে ও উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। আমারি কাছে কাল-মৃগয়া একখানিও নাই—কলিকাতায় থাকিলে সন্ধান করিতে পারিতাম—যদি কোথাও থাকে ত ক্ষিতির নিকট থাকা সম্ভব।

ভরসা করি আপনারা ভাল আছেন। ইতি ২৫ আশ্বিন। ১৩০২।

বিনত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমার কবিতা তুমি : শ্রীরণজিৎ কুমার সেন প্রণীত কাব্যগ্রন্থ। বাণীবিতান : ২৪ এন্, গড়চা ফার্স্ট লেন, কলিকাতা-১৯। মূল্য—দু'টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

খ্যাতিমান্ সাহিত্যিক শ্রীরণজিৎকুমার সেনের নূতন ক'রে কোনো পরিচয়ের আবশ্যক করে না। কারণ, দীর্ঘকাল তিনি বাংলা সাহিত্যের সেবা ক'রে আসছেন, তাঁর বহু রচনাই পাঠক-সমাজে সমাদৃত হয়েছে। "আমার কবিতা তুমি" তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ—দুই দশকের পরে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম নজরে 'তুমি' কথাটি প'ড়ে পাঠক হয়ত মনে করবেন—বইখানিতে শুধু প্রেমের কবিতা আছে, সেগুলি তাঁর প্রেমিকার উদ্দেশে নিবেদিত। এ 'তুমি' কিন্তু তাঁর স্বদেশ এবং প্রেয়সী দুই-ই। এতে প্রেমের কবিতাও আছে, কিন্তু 'স্বদেশ', 'জন্মভূমি', 'ইতিহাস', 'চিনেছি মাটির মায়ে', 'জনতা', 'নমস্কার,' 'উজ্জীবন' ও 'অটোগ্রাফ' এই কবিতাগুলির মধ্যে তাঁর স্বদেশপ্রেমের স্বচ্ছ সাবলীল সরস ও অকৃত্রিম প্রাণময়তা ফুটে উঠেছে। প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'চ্ছে 'আকাশ-বাসর', 'আমাদের প্রেম অক্ষয় হোক,' 'পুষ্পবতী', 'প্রিয়তমাসু', 'তুমি যে উজ্জ্বল তারও চেয়ে' প্রভৃতি।

তাঁর স্বদেশ কোনো ভৌগোলিক সীমায় তার পরিধি শেষ ক'রে দেয় নি, সারা পৃথিবী তাঁর স্বদেশ এবং 'সর্বকালের সর্বদেশের' মানুষ তাঁর আত্মীয়। কবির 'মৃণ্ময় মর্মে চিন্ময়ী মা' হচ্ছেন 'অনন্ত যৌবনা শস্যশ্যামলা ভারতবর্ষ।' তাঁর কাছে তিনি তাঁর অন্তরের 'বহু ব্যথা' 'বহু অশ্রু' নিবেদন করেছেন, তবু—

> 'এসেছে আলোক,
> অকস্মাৎ উদ্ভাসিয়া ওঠে মনোলোক ;
> অজস্র দুর্গম শিলা পেরিয়ে আবার,

স্পর্শ পেয়েছেন 'স্নিগ্ধ এক নব পূর্ণিমার।'

কবি আশাবাদী, তাই তিনি দেশের 'খণ্ডিত দেহের অখণ্ড সত্তা'র ধ্যান ক'রেছেন—মাথা নত ক'রেছেন তাঁর 'সাধনলব্ধ জন্মভূমির পায়ে।' কবি স্বপ্ন দেখেন 'আগামী দিনের'—স্বপ্ন দেখেন 'নতুন তৃণের'—শোনেন 'হারানো বাঁশের সুর' : 'ফসলের দিন আসে, ধানের সকাল।' এ ত আনন্দের কথা, আমাদের কাছে আনন্দের কথা তিনি কাব্যচিন্তায় স্বধর্মভ্রষ্ট নন, কিন্তু সেই 'রূপালী কাস্তে' নিয়ে টানাটানি কেন? তিনি সেজন্য কি কুণ্ঠিত হ'য়ে বলেছেন—তিনি 'ব্যক্তিমানসিকতা'য় 'আধুনিকতা'র বাইরে নন। আসলে তিনি সেই কবি—যাঁর কপালে আধুনিকতার ট্রেডমার্কা নেই—যিনি কোনো বিশেষ কালের বিশেষ দলের নন, যাঁর ব্যক্তিমানসিকতার যাচাই হয় কালের কষ্টিপাথরে—সে কাল কোনো বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত নয়। যার কাব্যকৃতি একটি বিশেষ কালের কড়া পাহারায় আঙ্গিকের বেড়াজালে বন্দী হয়ে থাকে, উদার আকাশের দিকে বাহুবিস্তারের ক্ষমতা থাকে না—সূর্যের অকৃপণ আলো, বাতাসের অবারিত স্পর্শ থেকে বঞ্চিত, তার আয়ুষ্কাল সীমিত, তার পরিস্ফুটন প্রতিবন্ধকতার মধ্যে অসম্পূর্ণ।

বাইরের পৃথিবীতে চলছে প্রচণ্ড পরিবর্তন আর মানুষের ভিতরে তার সাড়া জাগবে না—এ ত অসম্ভব। তাই দেখা যায় যে, রাষ্ট্রে, সমাজে, জনজীবনে এবং সেজন্যই সাহিত্যে তার প্রভাব স্বাভাবিক কারণেই সঞ্চারিত হচ্ছে। সে প্রভাব শুধু যে আধুনিক কবিদেরই একচেটিয়া এমন প্রচারণা অবশ্য মাঝে মাঝে শুনি। আমাদের বক্তব্য এই যে, কালাকাল নির্বিশেষে যিনি রসোত্তীর্ণ কবিতা রচনা করেন, তিনিই সত্যকার কবি—তা তিনি প্রাচীনই হোন আর আধুনিকই হোন।

বিষয়বস্তু হিসেবে এই গ্রন্থের কবিতাগুলিকে ভাগ ক'রে দিলে ভালো হ'ত, তাতে পাঠকচিত্তে কবির অন্তরের দু'টি দিকের প্রতিফলন অবশ্যই আনন্দদায়ক হ'ত। বহু প্রবন্ধপুস্তকের রচয়িতা এই কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থখানি পাঠক-সমাজে সমাদৃত হবে, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ : আশা দেবী। ডি এম. লাইব্রেরী। ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম—আট টাকা।

বিচিত্র মণিপুর—নলিনীকুমার ভদ্র। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। দাম তিন টাকা।

বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য প্রবাহের মত শিশুসাহিত্যও আর অনুন্নত নয়। ঠাকুরমার মুখে শোনা যে-রূপকথার রাজ্য একদা বাঙ্গালী শিশুদের কল্পনার দিগ্বলয়রেখা সুদূরবর্তী করত, তা প্রায় আজ হারিয়ে যেতে বসলেও, সৌভাগ্যের কথা, সেই সঙ্গে এসেছে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ লেখকদের রচনাসম্ভার—যা অন্য যে-কোন দেশের শিশুদের ঈর্ষার বস্তু হ'তে পারে। এই স্বর্ণফসল ফলাবার পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের ইতিহাস, বহুসাহিত্যকর্মীর ত্যনিষ্ঠ পরিশ্রম। অথচ বাংলাসাহিত্যের এই বিবেকবান্ প্রবাহটি অবহেলায় বড় বেশি মলিন। এর সামান্যতম ইতিহাস প্রণয়নাও ইতিপূর্বে সুশৃঙ্খলভাবে হয়েছে ব'লে আমার জানা নেই। হ'লেও এমনই অকিঞ্চিৎকর যা আজো আমার কাছে অদৃশ্য। স্বভাবতই, বক্ষমান গ্রন্থের লেখিকা শ্রীযুক্তা আশা দেবীর এ-সৎসাহসী উদ্যম ও পরিশ্রমসাধ্য অনুশীলনের ফলশ্রুতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার্য।

এ-গবেষণাগ্রন্থের দীর্ঘপথ পরিক্রমায় মনে হ'তে পারে, বিশ্লেষণ অপেক্ষা তথ্যের চাপ কিঞ্চিৎ অধিক যা হয়ত বর্জন করাও সম্ভব ছিল না। ফলস্বরূপ অজ্ঞাতপ্রায় বহু তথ্য উদ্ধার, বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রপূর্ববর্তী হরিনাথ মজুমদার রচিত 'বিজয় বসন্ত' ইত্যাদি নতুন ক'রে আবিষ্কৃত হয়েছে। এবং এই আবিষ্কৃত তথ্যে পরবর্তী গবেষক অশেষ উপকৃত হবেন।

প্রধানত তিনটি সময়-নির্ভর পর্বে লেখিকা মূল আলোচনা দাঁড় করিয়েছেন। প্রথম পর্ব: শিশুসাহিত্যের উৎসমুখ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সূত্রপাত থেকে বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমার ও তাঁদের সময়। দ্বিতীয় পর্ব: রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থসংগ্রহ'এর প্রকাশকাল। তৃতীয় পর্ব: 'বালক' পত্রিকার প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁ'র পরবর্তী সময় যার প্রান্তরেখা ১৯৩০। পরিশেষে একটি পৃথক্ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে য়ুরোপ ও আমেরিকার শিশুসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

সহজ ক'রে নীতিকথা শেখানো ও ধর্মবোধ জাগানো নয়, যা নিছক আনন্দে শিশুর সুকুমার কল্পনাকে সুদূরচারী করে, তার সার্থক বিকাশে তৃতীয় পর্বের সাহিত্য সর্বাধিক মূল্যবান্। বস্তুত, বিংশশতক বাংলাশিশুসাহিত্যের অপার ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল। ভবিষ্যতে লেখিকা যদি এ-সময়ের আলোচনা বিস্তৃততর করেন, তা হ'লে সাহিত্যজিজ্ঞাসু পাঠকের অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থটির আকর্ষণ, সংশয়াতীত বৃদ্ধি পাবে ব'লে আমার বিশ্বাস।

পরবর্তী আলোচিত গ্রন্থ 'বিচিত্র মণিপুর'। 'বিচিত্র মণিপুরে'র লেখক শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার ভদ্রের আদিবাসীদের নিয়ে লেখা কিছু রচনা এক সময় ভাল লেগেছিল। তাঁর সেই লেখায় ভার বিবর্জিত অনায়াসভঙ্গি গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ে বর্তমান। আর সেই সঙ্গে মিলিত হয়েছে লেখকের সরস কৌতুক—যা 'পালামৌ'-এর সঞ্জীবচন্দ্রের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

এ-ভ্রমণ বিবরণ রূপসী মণিপুরের কেবলমাত্র প্রাকৃতিক লাবণ্যের বর্ণনা নয় গল্পের আমেজে জড়িয়েছে মণিপুরের ধর্ম ও উপাখ্যান, সংস্কৃতি ও উৎসব, ইতিহাস ও রাষ্ট্রীক বিবর্তনের ইতিবৃত্ত। তা ছাড়া একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে, ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর রোমাঞ্চকর মণিপুর অভিযান কাহিনী।

মণিপুরের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ও অধিবাসীর অকৃত্রিম আরণ্য জীবন-কথার ফাঁকে ফাঁকে প্রসঙ্গত যে-সব তত্ত্ব বা তথ্যের অবতারণা লেখক করেছেন তাতে ভ্রমণবৃত্তান্তটি কিছুমাত্র ভারি হয় নি—বরং মণিপুর সম্পর্কে পাঠকের কৌতূহল ও আগ্রহ বাড়িয়ে তুলেছে। বাংলা দেশের সঙ্গে মণিপুরের মধুর সম্পর্ক কয়েক শতাব্দীর—মধ্যযুগে রচিত বৈষ্ণব গীতিকবিতার ছন্দ, সুর ও তান মণিপুরী নৃত্যসঙ্গীতে আজও ধ্বনিত হয়। লেখক বহু যত্নে প্রয়োজনীয় তথ্যসংগ্রহ ক'রে অতীতের সেই বিস্মৃতপ্রায় পটভূমি তুলে এনেছেন। সন্নিবিষ্ট মণিপুরী পুরাণ ও ইতিহাসাশ্রয়ী কাহিনীগুলির অন্যতম 'খাম্বা ও থইবি'র প্রেমময় উপাখ্যান, প্রসন্নবিষাদে এত স্নিগ্ধ যে, মনে মনে একে লালন করতে ইচ্ছে হয়।

শ্রীসুনীলকুমার নন্দী

শিক্ষাদর্শন প্রসঙ্গে: ডক্টর সুধীরকুমার নন্দী ও শ্রীলীনা নন্দী। প্রকাশ মন্দির, ৩, কলেজ রো, কলকাতা। মূল্য তিন টাকা [অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেনের ভূমিকা সম্বলিত।]

সাম্প্রতকালে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্নবিভাগে নানান্ সদ্গ্রন্থ লিখিত হইতেছে, ইহা খুবই আশার কথা। শিক্ষাচিন্তাবিষয়ক গ্রন্থের এতদ্দেশে বহুল প্রকাশ ও প্রচার আমাদের শুভ ঘোষণা করিতেছে। তবুও সবিনয়ে এ কথা না বলিয়া পারি না যে, শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কিত আমাদের অধিকাংশ গ্রন্থই পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিতদের বহুশ্রুত ও অতিপরিচিত মতামতগুলির চর্বিতচর্বণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। মৌলিক চিন্তা বা গবেষণার সুবিস্তৃত অবকাশ থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ গ্রন্থরচয়িতাই তাহার সদ্ব্যবহার করেন না বা করিতে পারেন না, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। বারংবার আমরা এই ধরণের পুস্তক সমালোচনা প্রসঙ্গে সেই আক্ষেপ এবং ক্ষোভকে প্রকাশ করিতেছি। ফল কিছুই হয় নাই। তাই আলোচ্য গ্রন্থখানি হাতে লইয়া পাঠারম্ভকালে আমাদের যে সংশয় ও দ্বিধা ছিল, তাহা অস্বীকার করিব না। গ্রন্থখানি পাঠ করিতে করিতে প্রবন্ধ হইতে প্রবন্ধান্তরে যাইবার সময় ভুলিয়াই গিয়াছিলাম যে, সংশয়াকুল চিত্তে গ্রন্থটি পাঠ করিতে সুরু করিয়াছিলাম। প্রথম প্রবন্ধ 'শিক্ষাদর্শন প্রসঙ্গে'—সাবলীল ভঙ্গিতে লিখিত স্বচ্ছন্দ সহজ পরিভাষায় পরিবেশিত উৎকৃষ্ট মননশীল প্রবন্ধ। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদ, আদর্শবাদ, প্রয়োজনবাদ ও বাস্তববাদের সুষ্ঠু প্রয়োগ ও তৎপ্রয়োগ শিক্ষাসমস্যার সম্যক সমাধান সম্ভব কিনা তাহার মনোজ্ঞ আলোচনা এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষ তৈয়ারী করা। মুখস্থবিদ্যার বেসাতি করিবার জন্য যে বিদ্যাগৃহগুলি স্থাপিত হয় নাই, তাহা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। আত্মজ্ঞানই যে আমাদের পরম কাম্য, তাহাই যে আমাদের চরম লক্ষ্য তাহা ভাবিবার মত, বিশ্বাস করিবার মত শক্তি আজ আর আমাদের নাই। তাই নতুন করিয়া আমাদের দেশবাসীকে, নব্যতান্ত্রিক সমাজের পুত্রকন্যাদিগকে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে। গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থটিতে 'শিক্ষার উদ্দেশ্য' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে শিক্ষার বহুমুখী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের কথা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রে সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহা সকল মানুষেরই কাম্য। তাই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় 'চারুকলা' ও 'কারুকলার' প্রতিষ্ঠা করা দরকার। শিক্ষাক্ষেত্রে 'সৌন্দর্যসাধনার' স্থান কতটুকু, কি ভাবে কোন্ পথে এই সাধনাকে চালিত করিতে হইবে গ্রন্থকার ইহার আলোচনা করিয়াছেন একাধিক প্রবন্ধে। কর্মশ্রয়ী শিক্ষা, বৈজ্ঞানিকী শিক্ষা, এযুগের মানুষের কল্পনাকে বিশেষভাবে উদ্রিক্ত করিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে এতদ্‌সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শিক্ষায় যেমন সৌন্দর্যসাধনার স্থান আছে ঠিক সেইরূপ ধর্ম ও নীতি শিক্ষাও শিক্ষাপরিকল্পনার অঙ্গ। বিদ্যাগৃহে তাই ধর্ম ও নীতি শিক্ষাকেও প্রবেশাধিকার দিতে হইবে। ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা বড়ই তিক্ত। সাম্প্রদায়িকতাবাদ, দুইজাতি তত্ত্ব ও দেশবিভাগ, এ সবই আমাদের প্রবল ধর্মান্ধতার ফল। তাই আমাদের রাষ্ট্রনায়কেরা, আমাদের দেশশাসকেরা এ দেশকে 'সেকুলার' আখ্যা দিয়া শিক্ষাক্ষেত্র হইতে ধর্মকে নির্বাসন দিয়াছেন। ব্যবহারবাদের দিক হইতে ইহাকে সমর্থন করা গেলেও তত্ত্বের দিক হইতে ইহা সমর্থনের যোগ্য নহে। ধর্ম অর্থাৎ যাহা মানুষের সমগ্র জীবনসত্তাকে ধারণ করিয়া থাকে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষাক্ষেত্র হইতে নির্বাসন দেওয়া যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কি না তাহা বারবার ভাবিয়া দেখিতে হইবে। গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। জিজ্ঞাসু পাঠক-পাঠিকা ইহা পাঠ করিলে চিন্তার যে খোরাক পাইবেন, ইহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি।

এতদ্ব্যতীত আলোচ্য গ্রন্থখানিতে প্রাচীন শিক্ষাদর্শনের উপর কয়েকটি মূল্যবান আলোচনা সংযোজিত হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দু শিক্ষাদর্শন, প্রাচীন বৌদ্ধ শিক্ষাদর্শন ও প্রাচীন গ্রীসের শিক্ষাদর্শন, তিনটি অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধত্রয় অতীতযুগের শিক্ষাদর্শনের সার্থক বিশ্লেষণ। বোদ্ধা পাঠক সহজেই হিন্দু, বৌদ্ধ ও গ্রীক শিক্ষাদর্শনের একটি আনুপাতিক মূল্যায়ন করিতে পারিবেন। সহজ সাবভাষায় গাম্ভীর্যপূর্ণ লিখনভঙ্গিতে এই তিনটি অধ্যায় আমাদের কাছে অতীব সুলিখিত বলিয়া বোধ হইয়াছে। বোধ হয় জিজ্ঞাসু পাঠকের সহিত আমাদের মতের মিল হইবে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্ব, স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শন, রাধাকৃষ্ণণের শিক্ষাসংস্কার সম্বন্ধীয় প্রবন্ধত্রয় আমাদের শিক্ষকদের চোখে মূল্যবান বলিয়া প্রতিভাত হইবে। যাহা আছে, যাহা বাস্তব তাহাকে আদর্শের আলোকে নূতন করিয়া রূপায়িত করিতে হইবে। ইহা করিতে হইলে আদর্শের সহিত আমাদের পরিচয় থাকা একান্ত প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ ও স্বামীজীর শিক্ষাদর্শ আমাদের এই আদর্শের সন্ধান দিবে

গ্রন্থকার 'শিক্ষা ও শান্তি' শীর্ষক প্রবন্ধে গ্রন্থের উপসংহার করিয়াছেন। বিনোবাজীর শিক্ষাদর্শ এই অধ্যায়টিকে প্রভূতভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। কেমন করিয়া সর্ব সংঘাত ও দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হইয়া আমরা ভয়হীন শান্তিময় এক নূতন সমাজ ব্যবস্থার পত্তন করিতে পারি তাহার ইঙ্গিত আলোচ্য প্রবন্ধটিতে মিলিবে। সব মিলিয়া গ্রন্থখানি শিক্ষাপ্রদ, চিন্তামূলক ও গবেষণাময়।

আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীগৌতম সেন

চন্দননগরে বিশ্বকবি : শ্রীমৃণাল ঘোষ প্রণীত, লেখক কর্তৃক চন্দননগর হইতে প্রকাশিত। ১৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲।

১২৮৮ সালে তরুণ রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম চন্দননগরে পদার্পণ করেন। ঐ সময় তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহিত গঙ্গাতীরে মোরান সাহেবের সুন্দর বাগানবাড়ীতে 'কিছু দীর্ঘকাল যাপন' করেন। ভাগীরথী-তীরের এই স্নিগ্ধশান্ত পরিবেশ রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা উন্মেষে সাহায্য করিয়াছিল। কবির 'জীবনস্মৃতিতে' এই অবিস্মরণীয় অনুভূতির উল্লেখ রহিয়াছে। ইহার পঞ্চাশ বৎসর পরে ১৩৪৩ সালে বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে বিশ্বকবি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাগানে তাঁহার কবিজীবনের উদ্বোধন। কবি জীবনে নদীর আকর্ষণ খুবই প্রবল ছিল এজন্য পদ্মা এবং গঙ্গাতীরে তাঁহার বহু অমূল্য সময় কাটাইয়াছেন। চন্দননগরের সম্মেলনের উদ্বোধন ভাষণেও ভারতীয় সভ্যতা এবং নিজেকেও গাঙ্গেয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন।

লেখক রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তি, নির্ভরযোগ্য তথ্য এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন.

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯